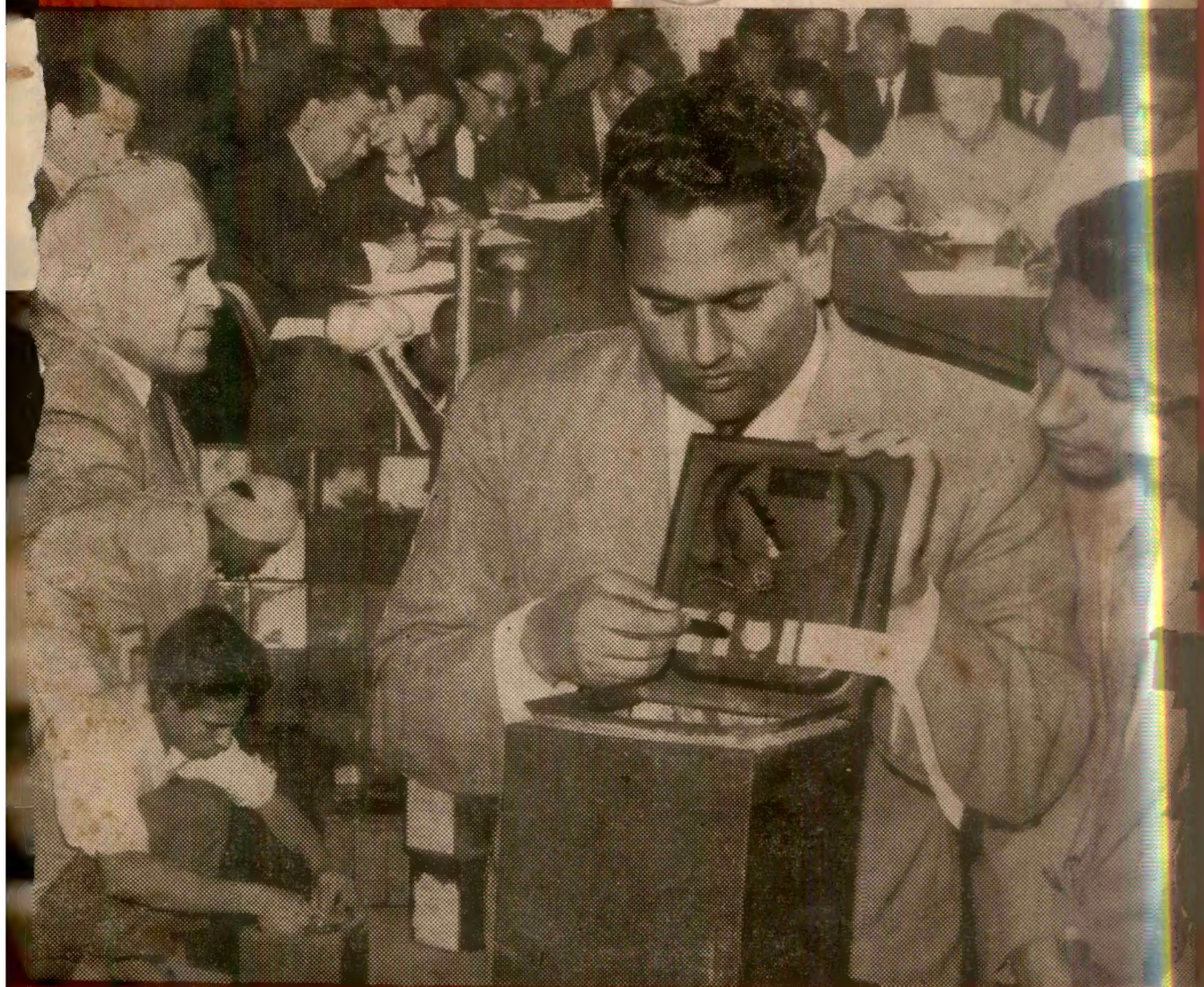


প্ৰতিদিন বাসু মতী

আসন্ন নিৰ্বাচন উপলক্ষে

সৰুকাৰী প্ৰস্তুতি

15



৮ : ৩৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবাৰ, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

• • • • •

16th Feb., 1967 * vol. 71, No.

সুগতা ও কোমলতাৰ জন্তু শীতে যিনি একবাৰ **বোৰেলিন** ব্যৱহাৰ করেন
ইকে ব্যৱহাৰ করতে বলেন।





বিষয়	লোক						মূল্য
সম্পাদকীয়	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	২২৪০
আজকের মানুষ	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	২২৪৪
ভারতদর্শন	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	২২৪৫
আন্তর্জাতিক	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	২২৪৯
চেতনার করোনাবীতে (কবিতা)	৪৫	—	অমিয়কুমার হাটি	৪৫	৪৫	৪৫	২২৫২
আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে	৪৫	—	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	৪৫	৪৫	৪৫	২২৫৩
অবস্বে	৪৫	—	চন্দ্রগুপ্ত	৪৫	৪৫	৪৫	২২৫৭
গ্রন্থমেলা	৪৫	...	...	৪৫	৪৫	৪৫	২২৬০
আবাদ-অঞ্চলের নির্বাচনী হাওয়া	৪৫	...	...	৪৫	৪৫	৪৫	২২৬৫
দিল্লী থেকে	...	—	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৪৫	৪৫	৪৫	২২৬৬
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	...	—	সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৫	৪৫	৪৫	২২৬৭
পাল্টাবে দিন অবশ্য ঝড়ে (কবিতা)	...	—	সুদীপা ভাদুড়ী	৪৫	৪৫	৪৫	২২৬৮
বঙ্গদর্শন	৪৫	...	...	৪৫	৪৫	৪৫	২২৬৯

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান
ভক্তিজগতের কৌতুভর, ভগবন্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
সদাশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সম্ভব।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রলাপ ও শিক্ষাস্তক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে
ংকণ্টা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমদ্ব্যনিস্ত 'শিক্ষাস্তক'
'শ্লোকই' তাহার একমাত্র রচনা। শ্রীল
কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুসংলিখিত পদ্যানু-
বাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।
নরোত্তম বিলাস
বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য
ভক্তিচরিতামৃত।
দুর্লভসার
শ্রীচৈতন্যমাংগল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস
বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।
আত্মতত্ত্ব
বৈষ্ণব দর্শনের সুস্বাদুতম অনুসরণ।
মনঃশিক্ষা
শ্রীপ্রমোদ দাস ঠাকুর বিরচিত।
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ়
মহাসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা
পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার
সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণ-
দাসের সুসংলিখিত পদ্যানুবাদ।
পাশ্চ-দর্শন
মর্ত্তমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-লীলা।
ভক্তিতত্ত্বসার
হাটপস্তু, শ্রীশ্রীগুরুদেবদান, নাম-
সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের
অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের
প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুসংলিখিত
নামমাত্র মূল্যে বিতরণিত।
মূল্য : ৩. টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেলা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-
শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে
ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির দিনে, বৃন্দদেবের
বৃন্দ, কাঠের কপাল, হাওর মানুসের
চোখের জল, ভুলের ভুল, মূর্গা চাচা,
বৃন্দদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো,
নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইন্দুরের
কীর্তিকাহিনী, বাদরের মেটলিচকাড়ি।
ছড়া—হট্টমালার যজ্ঞবাড়ী, হোহোহো
বৃন্দ করে, পালোমান প্যালোমান, উলটো
বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা প্যামের
বাস্তবায়ন, হাবুদাবুর মনের কথা, আদি
কালের বৃন্দ বৃন্দ।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সুখ রায় কর্তৃক
সুচিত্রিত

উপহার দিবার প্রস্তাব নাই।

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মজু

২০



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুবর্ণমতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	২২৭৩
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২২৭৮
সাধারণ নির্বাচনে আন্দোলন	— প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী	২২৮৪
কামরাঙ্গার স্বাধ (গল্প)	— সুধীরঞ্জন বেরা	২২৮৬
নিষ্ঠুর ইচ্ছার ছায়া (কবিতা)	— অনিলকুমার মোদক	২২৮৮
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	— বৃন্দাবন ভট্টাচার্য	২২৮৯
রংমঞ্চ—ওয়েশে এবং এয়েশে	— শিলালি	২২৯১
রংমঞ্চগৎ	— ...	২২৯৪
পট্টকরন	— ...	২২৯৯
বেলায়লা	— শ্রীঅমিতাভ	২৩০১

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ অন্তের স্বাধ

বন্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিশ্ববৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরী, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দির, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩ টাকা

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মদ্রিচরম গদ্য, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়); বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীররাগনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিস্তা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, রত্নরাগনা কাব্য, চতুর্দশপদী কাব্যাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়ার কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাধাই) সাড়ে তিন টাকা

ডঃ মতিলাল দাস প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

- ১। চলার পথে (উপন্যাস)
- ২। মনীষা (উপন্যাস)
- ৩। বিদ্রোহীশা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
- ৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
- ৫। চার্বাক (নাটক)

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড; ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



১৩ বর্ষ : ৩৬শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
সম্পাদিত, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 16th February, 1954

আসন্ন নির্বাচন

এবারের ভোটপর্বে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে গর্ব করার কিছুই নেই। আসন্ন নির্বাচনকে উপলক্ষ করে বিপক্ষদল পরস্পর হুঁড়িও ছুঁড়ে মেরেছে। ভাগ্যিস সাধারণ ও নজরুলের দল—একটি পঙ্কতি এসে ছিটকে পড়েছে—তা নইলে এই নির্বাচনিক ছড়াগুলিকে কাব্যের মতো দেখে না। পদ্যে পরস্পরের মূখে গুলি ছিটিয়ে দিলেই তা ষথার্থ কাব্য হয়। তবে এগুলিকে অস্বীকার করাও না। কারণ এগুলি জনমানসেরই প্রতিফল। অনেক সময় দেখা গেছে জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে অবিচ্যবজ্ঞানিত যে পুঞ্জীভূত ভ্রোশ—তারই প্রকাশ ঘটেছে নানা হাঁদের ছন্দে। এর স্মারা কে কতটা প্রভাবিত হবেন তা আমরা জানি না। তবে আপামব জনসাধারণ যে সুখে নেই—একথা পুনর্ব্যবস্থা বলা বাহুল্যমাত্র। জনসাধারণ কি চান তাব উত্তর আজ জনসাধারণই দেবেন। পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতিতে জনসাধারণের শাসনকে যেন আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছল্য জ্ঞান না করি। বর্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি রয়েছেন—যাদের নানাদল ও উপদলের কাণ্ডকারখানা প্রতিগ্রন্থ। আবার সরকার জনসাধারণের কল্যাণে যা করেছেন—তা দেখে-শুনে সাধারণ মানুষ ও বিক্ষুব্ধ। এই সরকারের অধিকাংশ প্রায় শিক্ষিত অধিকারের দাবী রয়েছে—তাও সরকারের আপাত-আনন্দের

কথা এই যে, তাঁরা নির্বাচনিক স্বন্দ্বদ্বন্দ্ব অংশগ্রহণের পক্ষপাতী নন এবং গণতন্ত্রকেও গোলায় দেবার মতন অমানুষ নন। সেই কারণে নির্বাচনের দায় ও দায়িত্বকেও তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। একথা তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র গণতন্ত্রপদ্ধতিতেই নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁরা যোগ্য ব্যক্তিকে আইনসভায় পাঠাতে পারেন। আর তাঁরা যদি ভোট-বাক্সকে অগ্রাহ্য করেন, তাহলে সেই পুরাতন ভেঙ্কী থেকে তাঁদের মূর্তি নেই। কারণ তাঁরা ভোট না দিলেও—কায়মী স্বার্থের মরুদ্বীপে বসে থাকবে না। তাঁরা তাঁদের অনগ্রহভাজনদের ভোট অবশ্যই পাবেন—একথা কেউ যেন ভুলে না যান।

ভোটদানের ব্যাপারে আমরা উপরে শিক্ষিত ব্যক্তিদের একাংশের মনোভাবের কথাই বললাম। কিন্তু মনে রাখতে হবে—সারা ভারতের একমাত্র কেরালা ছাড়া, অধিকাংশ রাজ্যেই শিক্ষিতের সংখ্যা হয় শতকরা ১০ ভাগ, নয় শতকরা ২০ ভাগ, অথবা শতকরা ৩০ ভাগ। পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচনের পর এই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে আশা করা গিয়েছিল যে, বয়সানুপাতে ভোট দেবার যোগ্যতা যাঁরা অর্জন করবেন তাঁরা সবাই সাক্ষর হবেন। আমাদের সে সাধ পূর্ণ হয় নি। সংবিধানের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিও পুরোপুরি রক্ষিত হয় নি। অতএব ধরে

নেওয়া যেতে পারে যে, ভোটবায়ে চার তিন-চতুর্থাংশ ভাগ ভোট নিরক্ষর ব্যক্তিরাই দেবেন। সত্যি কথা বলতে কি, এইসব সরল, স্বল্প-চতুর্থাংশ ব্যক্তিদের নিয়েই সমস্যা চেষ্টা বড় সমস্যা। গ্রামময় ভাবতেন দল-ময় চিত্রের এঁরাই প্রধান শরিক। ঐ নির্বাচনের প্রাক্কালে এঁদের মূখদর্শন করা হয়। এই মূখদর্শনকালে হয়তো হঠাৎ তাঁদের পুঞ্জীভূত অভাব-অভিযোগের কথা প্রথমে শুনতে হয়, তবু এই সবল লোক-গুলিকে জয় করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। চমকদারী প্রচার-অভিযান যাহোক আছে, এঁদের তাবাই আনে হাতেব মূর্ত্যে। ভোটযুদ্ধ শেষ হলে এইসব মানুষ পুনঃবিলাসমান হয় এক অন্ধকারের রাজ্যে। জানি না, এর স্মারা গণতন্ত্রের মর্যাদ কতখানি রক্ষিত হচ্ছে।

আমাদের কাম্য, মুখে নয়—ষথার্থ কাজের মাধ্যমে ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। সাধারণ নির্বাচন তার এক পবিত্র মাধ্যম। যদিও হয়তো দেখা যাবে যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাবাব ফলে কেউ মোট ভোটসংখ্যার লঘু-সংখ্যক ভোট পেয়েও বিজয়ী হবেন; তবুও বিচিত্র এই নির্বাচনের দিকে না তাকিয়ে আমাদের উপায় নেই।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন গ্রন্থকার জন গান্ধার একটি কথায় বর্ণনা শেষ করেছেন : “দ্যুট শ্লাই ফক্স অফ মাদ্রাজ” বলে। দেশের একজন বিদগ্ধ জন বলেছেন : “দক্ষিণ ভারতের চাণক্য”। আজকের ভারতের বর্ষায়ান নেতাকে নানালােকে নানারকমে চিহ্নিত করেছেন। মোটের ওপর, এ-বিষয়ে সকলেই একমত যে শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী একজন বান্দু রাজনীতিজ্ঞ।

তা যদি না হবেন তো এই বয়সেও (৮৮ বছর) তিনি শক্তিশালী কংগ্রেসকে নাস্তানাবুদ করার বুদ্ধি ও কৌশল যোগান কী কবে? কেমন কবে দেশের শ্রমকুবেরদের এবং কিছু বুদ্ধিজীবীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন? কী কবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বতন্ত্র দল গঠন করে ৮২ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় কংগ্রেসকে সারা ভারতে চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করতে সক্ষম হছেন? চমক সৃষ্টি করার দিক থেকে সারা ভারতে রাজাগোপালাচারী জড়ি নেই; শেষ বিচাবে হয়তো বুদ্ধি তাই ফাঁপা প্রতিপন্ন হবে, কিন্তু সে কেবল শেষ বিচাবেই, প্রথম চো-ঘাষেল হয় না এমন লোকের সংখ্যা স্বল্পই। আবার এ-ও অস্বীকার করা যাবে না, তাঁর মতেব সঙ্গে মিল না হতে পারে, কিন্তু প্রতিবারই তিনি নতুন কিছু করেন, বুদ্ধি থাকে তাঁর বক্তব্যে, তাই ঘটিতও করে চিন্তাশীল মানুষকে।

রাজাজীব শেষতম চমক : দেবেব সব শ্রমীর সাহায্য যদি পেতো, তবে এক মাসের মধ্যে তাঁর দল কংগ্রেসকে গদাচ্যুত করতে পাবতো। কিন্তু যে-কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করার জন্যে তিনি রাতকে দিন করে পারিশ্রম করছেন, সেই কংগ্রেসের তিনি একদিন অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন।

প্রথমে বাঙ্গালোরেব সেন্ট্রাল কলেজ এবং পরে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশোনা করেন রাজাগোপালাচারী, ল’ পাশ কবে ১৯০০ সালে ওকালতি শুরু করেছিলেন মাদ্রাজেই। ব্রিটিশরাজ বাল্ল-স্বাধীনতারোধী কুখ্যাত রাওলাট আইন পাশ করলে (১৯১৯) গান্ধীজী তাব বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের আহবান জানানেন। তবুণ ব্যবহারজীবী রাজাগোপালাচারীর মনও সেদিন অচঞ্চল থাকে নি। সেই থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক,

এবং যতই দিন যেতে লাগলো ততই তিনি নিজের সংগঠনী প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে নিজেকে কংগ্রেসে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। অসহ-যোগ আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্যে সমস্ত নেতাকে যখন গ্রেপ্তার করা হলো, গান্ধীজী নিষ্কপ্ত হলেন কারাগারে, তখন কংগ্রেসের মুখপত্র ‘ইং ইন্ডিয়া’ সম্পাদনার ভার পড়েছিলো রাজাগোপালাচারীর ওপরেই।

এবং যখন রাজাগোপালাচারীর দায়িত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্রুত বিস্তৃতি।



শ্রীরাজাগোপালাচারী

১৯২১-২২ সনে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী, এ-আই-সি-সি’র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে ছিলেন বীর্ঘ-কাল ১৯২২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত এবং আবার ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত। মল্লিহ বা অন্য দায়িত্বপূর্ণ পদেব ক্ষেত্রেও রাজাজীব কাছে অন্য সবায়ের রেকর্ড স্থান। সেই ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন-বিধিকে ভিত্তি করে ১৯৩৭ সনে যখন কংগ্রেস সরকার গঠনেব দায়িত্ব নিলেন সেই থেকে রাজাজীর মন্ত্রিপদ বাঁধা। প্রথমে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ১৯৩৭ থেকে

১৯৩৯ পর্যন্ত যতদিন না কংগ্রেস সরকার-ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বাধীনতা-প্রাক-মুহুর্তে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে (১৯৩৬-৪৭) রাজাজী তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দেখা গেলো তাঁকে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিদায় নেবার পর, ১৯৪৮ সনের নভেম্বরে রাজাজী হলেন ভারতের প্রথম ও শেষ ভারতীয় গভর্নর জেনারেল।

কিন্তু রাজনীতির আসর ছাড়া রাজাজী স্বস্তিবোধ করতে পারেন কৈ? দু’ বছর বাদে প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁর মন্ত্রিসভায় প্রথমে দপ্তরবিহীন ও পরে স্বরাষ্ট্রদপ্তর দিলেন রাজাজীকে। কিন্তু মাদ্রাজের রাজনৈতিক আকাশ তখন ধুমধুম করছে, কমিউনিস্ট কার্যকলাপে ও প্রভাব-বিস্তৃতিতে কংগ্রেস শঙ্কিত, চিন্তিত প্রবীণ নেতা রাজাগোপালাচারীকে আ-মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী করে ফেরৎ পাঠা হলো। অপরূপ কর্মদক্ষতা দেখা দিলেন রাজাজী, সসম্মানে দায়িত্ব করেছিলেন তিনি। ভারত সরকার বিশেষভাবে সম্মানিত কবেছেন ‘ভাবভার’ খেতাব দিয়ে।

কিন্তু এই কূটনৈতিক বিশ্রাম জানেন না, ক্রান্তি যানেন না। যাবা ভেবেছিলো মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রিত্বের পব তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন থেকে অ-নেবেন—তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝে পারলেন অল্প দিনের মধ্যেই—তাঁব চমক-লাগানে তবু আউড়ে তিনি সাধারণ ও ধনিকপ্রেমীর মন জয় করলেন, নতুন কংগ্রেসারোধী দল গঠন কবলেন স্বতঃ-পাটি। দলের তিনিই রাজনৈতিক গুরু, তিনিই আদর্শ তিনিই প্রধান তাত্ত্বিক। দলের মুখপত্র “স্বরাজ্য”-য় এখনো নির্যমিত লেখেন, তা ছাড়া ভারতের অপ্রতিস্বন্দী সাপ্তাহিক ‘কমিক’র তিনি নির্যমিত লেখক। ইংবেজী এবং তামিল ভাষায় বামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদেরও তিনি রচয়িতা।

রাজাজীর কূটনৈতিক জ্ঞানের দুটো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯৪২ সনে যখন ব্রিটিশ মিশন ব্যর্থ হলো তখন কংগ্রেসের মধ্যে তিনিই দেশ-বিভাগেব এবং পাকিস্তানের প্রস্তাবকে মেনে নিতে বলেছিলেন হাই কম্যান্ডকে। হাই কম্যান্ড তখন রাজাজীব প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলো প্রতিবাদে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন। ১৯৫২ সনে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেছিলেন কমিউনিস্ট নম্বরের শত্রু। এখন নিব’চনে হারাতে হারিয়ে যোগিতায়ও দোষী ‘লাইসেন্সবাজ’, বিভীষিত হতে ক্রান্তি চক্রব

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে নির্বাচনী সভায় যাঁরা ইন্টকবর্ষণের ম্বারা আহত করে ভুবনেশ্বর থেকে বিদায় দিয়েছেন তাঁদের রাজনীতিজ্ঞানের জাঁক, বাঁক কাকি ইন্টকবর্ষণের ম্বারা প্রমাণিত হয় নি। সামান্য চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিই এমন বে-আজেল জঘন্য এবং ঘৃণ্য উত্তেজনায় যে বিস্মিত এবং মর্মাহত তা' বলাই বাহুল্য। কেন না শ্রীমতী গান্ধীর তীক্ষ্ণ নাসিকাগ্র থেকে যে কয় ফোঁটা রক্ত করেছে, ভুবনেশ্বরের নির্বাচনী সমরাঙ্গনে সে কয় ফোঁটাই রক্তবীজের জন্মদান করবে। যাঁরা ইট ছুড়ে গায়ের কাল মেটালেন, তাঁরা অন্যায়ভাবে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিকে সেই ইটের আঘাতেই আহত করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী, কামনা করি, সামান্য শত্রুঘ্নার পরই সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু ভুবনেশ্বরে যাঁরা পড়ে রইলেন, তাঁদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত কাহিল হয়ে রইল।

শ্রীমতী গান্ধী এ সামান্য রক্তপাতের ম্বারা বেশ কিছু বিরোধী ভোটেরকে কায়দা করে গেলেন। আপনারা কি হামলাবাজদের ভোট দেবেন? আহত শ্রীমতী গান্ধী, নেহরুজীর প্রাণের ধন, রবীন্দ্রনাথের প্রিয়-দর্শিনী, রক্তাপ্রত অবস্থায় এ প্রশ্ন তুললে তার ধাক্কা কতদূর খোঁছায় অব্যাহত ইন্টকবর্ষণী বোঁবন তা ধরতে পারেন না। শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য বিনা যাকোই সিদ্ধ করে নিয়ে গেছেন। প্রতিদিন মিটিং করে তারম্বরে কতকগুলি সাজানো এবং মৃদুস্থ বৃদ্ধি উদ্ভিগরণের চেয়ে ভুবনেশ্বরের অবস্থা কম অভিপ্রেত নয়, যদি তা আঘাতকে গুরুতর না করে। বিরোধীকূলকে গালিগালাজে ডাবিয়ে দিয়েও যে ফলপ্রসূতি লভ্য হত না, কতিপয় ছবিম্বাকারী, ইন্টকবর্ষণের ম্বারা সেই ইন্সতি ফলপ্রসূতিই কংগ্রেসের কোলে প্রাপ্তব্য করে তুললেন।

আমাদের দেশের ভোটদারবৃন্দ এমনিই এক স্টেমিগেটাল। রাগে ফুঁসতে স্বতক্ষণ, ভিজ্জে গলতে তার থেকে চের কম সময় লাগে তাঁদের। এদেশী চরিত্রে জগাই-মাধাই পর্যন্ত সমেসী হয়ে যায় কলশির কানা ছুঁড়ে, আধা-কংগ্রেসী সংশয়ী বিরোধীদের তো কথাই নেই। বিরোধী স্টেমি-সম্বানের জন্য বিশবছরী ভারতবর্ষ সর্বদা মূখিয়ে বসেই আছে। একবার একটা প্রচারের গম্ব পেলেই টুপ করে টোপ গিলতে সংশয়ীর সময় লাগে না। এমনি এক বিচিত্র দেশে কতিপয় অতি উৎসাহী ইট মেয়ে বীরত্ব করে বিরোধী শক্তিকেই স্বতম করছেন।

শ্রীমতী গান্ধী ডায়াসের ওপর দু' টুকরো বরফ চেয়েছিলেন, পান নি। কিন্তু সেই বরফ এখন বহু বিরোধী মন গলাবে।



ভারতদর্শন

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স প্রেরণের জন্য সরকারের নির্বাচনী দপ্তরের কর্মীদের খুব তৎপর দেখা যাচ্ছে।

ইন্টকবর্ষণের ফলপ্রসূতিতে বিরোধী সম-ধিক সাধারণ নাগরিকের অনেকের মনই বেঁকে বসবে। কংগ্রেসের পক্ষে ভোটের ব্যাল ভারী হবে।

ইন্টকবর্ষণকারী অকালকুস্মাণ্ডদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব সূতরাং পদলি-শের চেয়ে বিরোধী দলেরই ওপর অধিক-তরভাবে বর্তায়। তাঁরা ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর দেশের মানুুষের মনোভাব ভালভাবেই জানেন। তাই ইটের টুকরো সাদরে গ্রহণ করবার জন্যই তিনি অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ডায়াসের পেছন সারিতে সরে বসেন নি। পদলিও বাধা দেয় নি। শ্রীমতী গান্ধী জানেন জখম হয়েই তিনি জখম করে যেতে পারবেন কংগ্রেস বিরোধিতাকে। তাই যাবার সময় অন্ধকারে পাটকেলটিও ছুড়ে গেছেন, : আপনারা কি হামলাবাজদের ভোট দেবেন!

বল্গা বাহুল্য, আমরাও যেমন, শ্রীমতী গান্ধীও তেমন সঠিক জানেন না, কে বা কারা এই মুখের স্বর্গধাম রচনা কর-ছিলেন মহানন্দে ইন্টকবর্ষণ করে। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি কাজে লাগিয়ে ডাক দিলেন : হামলাবাজদের ভোট দেবেন না।

এটা সাধারণ জ্ঞানেই বোধ্য যে কোন চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল ইট ছুড়ে নির্বাচন জিতবেন এমন অলীক কল্পনা করেন না। তাঁদের হাতে কালো পতাকা আছে, কণ্ঠে জনতা জাগানো ধ্বনি আছে, ইট অবধি যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁরা তেমনভাবে ইন্টক-রাজনীতিতে নির্ভরশীল হয়েছেন এমন দূর্ভাগ্যের বশুত কোন কারণ ঘটেছে বলেও সন্দেহ করার কারণ নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে 'নন্দ ঘোষের' অস্তিত্ব চিহ্নিত হয় বিরোধীদের ক্ষেত্রেই। শ্রীমতী গান্ধী সেই সনাত্তকরণও করে গেছেন। কেবল কাউকে বিশিষ্ট করা সম্ভব হয় নি বলেই তিনি সর্মগ্ধভাবে বিরোধীদেরই হামলাবাজ বলে তাঁর নির্বা-চনী সভার উদ্দেশ্য সফল করে গেছেন।

আর মুখের স্বর্গধামে যে উত্তেজনার বসবাস—সেই উত্তেজনা শ্রীমতী গান্ধীকে আহত করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি করে আঘাত এনেছে বিরোধী ক্যাম্পের ওপর।

এই কতিপয় মুখের হয়ে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে অনুরোধ, তিনি এদের মুখ বলেই ক্ষমা করুন, কিন্তু মুখ উত্তেজনাকে হামলাবাজী বিরোধী রাজ-নীতি বলে রক্ত চাড়িয়ে গণতন্ত্রী ভারতে

বিরোধী মনোভাবাপন্ন নাগরিকদের মধ্যে চূর্ণকালি লেপন করবেন না। এতে নির্বাচনের সুবিধা হতে পারে, কিন্তু হেহরদুন্নার উপযুক্ত মর্যাদা এই উদ্ভিতে প্রকাশ পায় না। এই উক্তি সহজ সাফল্যের প্রতি নজর রেখে শিক্ষিত বিরোধী মনোভাবকে অকারণে কলঙ্কিত করে।

দেশের নাগরিকবৃন্দের তরফে এ কথা সহস্রবার উচ্চারণ করি। মুখ্য ইন্সপেক্টরীরা জ্ঞানলাভ করুন, এবং শ্রীমতী গান্ধী সত্বর এই আঘাত থেকে আরোগ্যলাভ করুন।

ইউ পি সরকারী কর্মীদের অভূতপূর্ব বিজয়োৎসব

বার্ষিক দিনের আপোষহীন সংগ্রাম শেষ করলেন উত্তরপ্রদেশের সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। এদের বিক্ষমকর সংগ্রামী একা ভূ-ভারতকে তটস্থ করে তুলেছিল। ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে সরকারকে কেমন করে দম্ত পরিত্যাগ করতে হয় শ্রী পি এন সুকুলের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশের সরকারী কর্মচারীরা তার অবিচলিত প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্থাপন করলেন সমগ্র দেশের সম্মুখে। ভারতের কর্মচারী সংগ্রামের ইতিহাসে উত্তরপ্রদেশ একটি উজ্জ্বল উদাহরণরূপে জ্বল জ্বল করবে।

লক্ষ্মী-এর আমিনুদ্দৌলা পার্কে অগণিত জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে সংগ্রামী কর্মীদের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়। বিরাট উল্লসিত পার্কে এই অসংখ্য উৎসাহী জনতাকে স্থানসংকুলান করে উঠতে পারে নি। জনতা স্থান গ্রহণ করেছিলেন রাস্তার এবং উদ্যানের চতুর্পার্শ্বের সম্ভাব্য সকল স্থানে। এক অভিনব দৃশ্য অভূত করেছিল সকলকে। কর্মীরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে এবং অভিনন্দিত করে সরকারী দমন-নীতিটিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের আনন্দ-শিহরণ অনুভব করছিলেন।

সমস্ত রাজপথ সেজেছিল পুষ্প এবং মাল্যের আভরণে। যে সমস্ত বাস সরকারী বাস একদা রাস্তার ওপর ঢাকা বন্ধ করে দিয়ে সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে মিছিলে যোগদান করেছিল, উৎসবের সাজ-সজ্জা সেগুলির সর্বাঙ্গও মালাভূষিত করে।

আর কৈলাসপতি মিশ্র, একজন সামান্য জুনিয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট বা কর্নিষ্ঠ কেমনাকি অভিনন্দনের বর্ণনায় আরম্ভ হতে দেখা গেছে। এই নিরীহ কর্মীটি অকণ্ঠ পুর্লিশী অত্যাচারকে সহ্য করেছিলেন আয়োগ্যোপকারী কর্মী নেতাদের গৃপ্ত রাসস্থান পুর্লিশকে জানাতে অস্বীকার করার জন্য। শ্রীমিশ্র তাঁর সহকর্মী ভাই-

বোনদের অজপ্ত প্রীতি ও অভিনন্দনে, উপহারে ও আশীর্বাদে সেই অত্যাচার সহ্য করার মহান পুরস্কার লাভ করলেন। এ দৃশ্য নিরপেক্ষ মানুষের চোখে অশ্রু-সজল করে তুলেছে।

উত্তরপ্রদেশের সরকারী কাঠিন্য অবশেষে বর্মী সংহতির কাছে অবনত হতে বাধ্য হল।

শ্রীসুকুল জানালেন, সংগ্রামী একজন কর্মীর ওপরও অবিচার হলে তামাম উত্তরপ্রদেশ পুনরায় অসহযোগ সূত্র করতে বাধ্য হবে। সরকার যে এক সদস্য-বিশিষ্ট কমিশন নিয়োগ করেছেন, শ্রীসুকুল বলেন, সেই কমিশন দু-এক দিনের মধ্যেই অস্তবর্তীকালীন ভাতা বৃদ্ধি ঘোষণা করবে। সরকার যতদূর স্বীকার করেছেন, সেই স্বীকৃতির হেরফের হলে কর্মী সশ্রম এবার ছয় মাসাধিককাল সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।

এবং শ্রীসুকুলের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশের কর্মীগণ যে কেবলমাত্র মিথ্যা আশ্বালন করেন না, সরকার তা ঠেকে শিখেছেন। অতঃপর সরকারী তরফে যদি পুনশ্চ টালবাহানা দেখা দেয় তবে যে পুনরায় উত্তরপ্রদেশী প্রশাসন টলবে এতে সন্দেহের অবকাশ অন্তত বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই নেই।

উত্তরপ্রদেশ কেবলমাত্র নিজে নয়, তামাম ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিধিনিষেধে আবদ্ধ সরকারী কর্মচারীদের মনেই অটুট বল ও ভরসার সঞ্চার করেছে। উত্তরপ্রদেশকে কর্মচারী শক্তি একবাক্যে অভিনন্দন জানাবে।

সি বি গুপ্তের নির্বাচনী মহোৎসব

আমরা সেই বিখ্যাত চন্দ্রভান গুপ্তের কথা বলছি, যার হেপাজতে গুপ্ত ফান্ডের যথের ধন প্রোথিত আছে বলে ইতিপূর্বে বহু বিভক্তের সৃষ্টি হয়েছে; উত্তরপ্রদেশের সেই দাম্ভিক শক্ত মানুষটির কথা বলছি, যার বক্তৃতা আটুনির দাপটে উত্তরপ্রদেশ সরকারী কর্মচারীদের বহু ক্রেশ ভোগ করতে হল, এবং অবশেষে ফস্কা গেরো খুলে রাজ্যের কংগ্রেসী নির্বাচনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে আজ কর্মচারীদের কাছে সরকারকে নীতি স্বীকার করে। সেই প্রখ্যাত স্বনামধন্য রাজ্য কংগ্রেস 'বস' এবং রাজ্যের প্রাক্তন মধ্য-মন্ডী শ্রীগুপ্ত এবার রাণীকেত থেকে বিধানসভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কিন্তু বেশ বেগ পাবেন। কেন না তাঁর বিপক্ষে আছেন একজন জনপ্রিয় স্থানীয় নেতা শ্রীগোবিন্দ সিং মেহরা (নির্দলীয়)। অপরজন হলেন ত্রিগাবালিকান পার্টির



শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত

শ্রীসুধদেও। স্থানীয় সাধারণের বিশ্বাস মূল যুদ্ধটা হবে গুপ্ত ভাসাঁস মেহরার। শ্রীসুধদেও ভোট ভাঙাতে দাঁড়িয়েছেন। মেহরার কোল থেকে তিনি কিছু হরিজন ভোট সিরিয়ে নেবেন মাত্র। মেহরাকে বিরোধী দলগুলি জোটবদ্ধভাবে সমর্থন করছেন।

শ্রীগুপ্তের নিজের কাছেই কুবেরের ধন। তাছাড়াও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাঁকে খাড়া করার জন্য পরসাতরালা সুযোগসম্মানী ব্যবসায়ীর অভাব নেই। এজন্য শ্রীগুপ্তের নির্বাচনে হেলিকপ্টার না খাটলেও অসংখ্য জীপ গাড়ি এবং মোটরকার দিবারাত্র লাউড স্পীকারে গুপ্তসমর্থক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য রাজ্যসভার সভাপতি স্বয়ং শ্রীগুপ্তের নির্বাচনী সম্পাদক, উপমন্ত্রীরা তাঁরই মন্ত্রণাধীনা। চিনিকলের মালিক দিচ্ছেন প্রাসাদোপম অট্টালিকা, মোটর কোম্পানীর মালিক দিচ্ছেন 'যত চাও নিয়ে যাও চতুচ্চক্রয়ান', অন্যান্য ব্যবসায়িকুল দিয়েছেন জীপ গাড়ির সারি।

এ বেন দশপ্রহরগণারিণীকে যেমন করে অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছিল, মেহরা-বিরোধী নির্বাচনী অভিযানে তাকেও তেমন করে সজ্জিত করে তোলার মহোৎসব সূত্র হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। কিন্তু হলে কি হবে শ্রীগুপ্ত সুবিধে করে উঠতে পারছেন না আদপেই। শতক পুর্লিশ বেটনীর ব্যতীত তাঁর নির্বাচনী সভায় প্রবেশ করার সাহস নেই। ওঁদিকে শ্রীমেহরা অবাধে নাগরিকদের সঙ্গে সভায় মিলিত হচ্ছেন এবং নাগরিকসাধারণও তাঁর বক্তব্য শ্রবণের সঙ্গে শুনছেন।

উত্তরপ্রদেশে শ্রীমন্তের একমাত্র দলবাহী ১৯৬২ সালে ছিল অকম্পনীয়। এখন হাওয়া ঘুরেছে। স্থানীয় জনগণের একান্ত আশা এবারের নির্বাচনে শ্রীমন্তের দাপটের অবসান ঘটবে।

কেরালার কংগ্রেসী কর্মজ্ঞ অস্তগামী

সারা ভারতে কেরালাই একমাত্র দলবাহী রাজ্য—যেখানে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য একটি অবিরত প্রচেষ্টা সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে। যে খায় লক্ষ্য সেই হয় রূপ, কথাটা কেরালাই অপ্রমাণিত করেছে এবং আবারও করবে। কেরালার ইতিপূর্বে নাস্বাদিপান সরকার অর্থাৎ বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনসাধারণ ভয়ানক যে বিতর্কিত রূপের করাল মর্তি মর্শন করেন নি, বরং বিরোধী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেও কংগ্রেস এ রাজ্যের মন পায় নি, আসন্ন নির্বাচনে পুনরায় কেরালার বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠার যে সূচনা দেখা দিয়েছে, সে সত্যি এতদ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ অনেক বেশি সংস্কারমুক্ত রাজ্য হলেও সেখানে একটি বিরোধী সরকার গঠনের পূর্ণ সম্ভাবনাও মাঠে মারা গেল। (যদিচ কংগ্রেসকে কাং করার আশা বিরোধী মহল অদ্যাপি ত্যাগ করেন নি) কিন্তু কেরালার ধর্ম এবং বিভিন্ন সংস্কার নির্বাচনে সিদ্ধান্তমূলক (decisive) উপাদান হওয়া সত্ত্বেও এখানে বারম্বার বিরোধীগণ কর্তৃক সরকার গঠনের সম্ভাবনা হ্রাসিত হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের উগ্র শ্বেষ হিংসা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে দূই কম্যুনিষ্ট পক্ষকে তাঁর বিরোধিতায় কংগ্রেস-বিরোধিতার প্রশ্ন জুলিয়ে দেয় নি। অন্যত্র সম্মানজনক শর্তে দূই পক্ষে নির্বাচনী আঁতাত হয়েছে এবং ফলত জনসাধারণ বিভ্রান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েন নি।

অবশ্য কেরালার সম্ভবাম সূচির মূলে বাম কম্যুনিষ্টদের প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তিই কাজ করেছে বেশি। ১৯৬৫ সালের সুবিধাবাদী জোট-ভাঙানী উল্লাশা চোট খাওয়ার জন্যই বর্তমানে একটা পাকাপাকি সমঝোতার উপনীত হয়েছে। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই এস এস পি এবং মুসলিম লীগ বাম কম্যুনিষ্ট মোর্চা ভেঙে অন্যান্য দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা দখল করতে উৎসুক হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার সেই খাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেন। বিধান-সভা ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করেছেন। বাম কম্যুনিষ্টের কাঁধে ভর দিয়ে পুনর্ব্যবস্থা নির্বাচনী ভরণী কূলে

জোড়াতে গিরে এমনই এবার পরাম্পরকে আরও বিক্ষত কখনে আবস্থা হতে হয়েছে।

এস এস পি জানে বাম কম্যুনিষ্ট কুপা ভিন্ন আসন লাভের তাঁদের পক্ষে একক ক্ষমতা নেই। লীগ হৃদয়ঙ্গম করেছেন, মালাবার অঞ্চলে বাম কম্যুনিষ্টদের যে প্রভাব, আঁতাতে গররাজি থাকলে তা লীগ স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে।

১৯৬৫ সালে বাম কম্যুনিষ্ট, লীগ এবং এস এস পি সম্মিলিতভাবে পরিষিষ্টি আসন দখল করেছিল। কংগ্রেস পেরেছিল ছত্রিশ এবং দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্টরা পান তিনটি আসন। কেরালা কংগ্রেস, এস এস পি এবং লীগ সহ দখল করেন তেইশটা আসন।

দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীগোবিন্দন নাম্বার লীগের সঙ্গে বাম-পন্থীর আঁতাতে চটে উঠলেও সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনী লড়াই-এ নামতে লীগ রাজী থাকায় সি পি আই-ও শেষ পর্যন্ত যুক্ত ফ্রন্টে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত নগণ্য দল-দ্বয় আর এস পি, কে এস পি এবং কে টি পিও বাম পক্ষদ্বয়ের না এসে গতানুগত খুঁজে পায় নি।

এঁরা কেরালার একটি সম্মিলিত ও সর্বসম্মত কর্মসূচীর ভিত্তিতে শক্তিশালী কোয়ালিশন সরকার গঠনে চ্যুতিবদ্ধ হয়েছেন। এটা শুভ লক্ষণ। এবং এই লক্ষণ বর্তমান থাকায় বাম কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের শ্রীনাশ্বাদিপাদ এবং শ্রী বি টি রুগমিডে উভয়েই কেরালার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পক্ষে অনেক আশা পোষণ করছেন। কেরালাকে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্যের মানচিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে একটি প্রগতিশীল কংগ্রেস-বিরোধী আবহাওয়া গড়বারে তৈরি হয়ে উঠবে বলেও এঁদের আশা।

শক্তিশালী বিরোধী জোটের পক্ষে একটি অকংগ্রেসী সরকার গঠনের সম্ভব সম্ভাবনা কেরালার মানুষকে অত্যাশাহী করে তুলেছে।

এই প্রত্যাশিত সরকারে সবচেয়ে ক্ষমতাসালী দল হবে বাম কম্যুনিষ্টরা। এঁরা একষটি আসনে যুক্ত ফ্রন্ট থেকে বাম কম্যুনিষ্ট প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। নির্বাচনের কাজও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবেই এগোচ্ছে।

মুসলিম লীগ কংগ্রেসের দ্বারাও অতীতে যে ভাবে প্রভাবিত হয়েছে তাতে বাম কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে গঠিত ফ্রন্টকে পুনরায় কোন সুবিধাবাদী মতলবে ভাঙবার প্রয়াস পাবে না। প্রশ্নটি আজ এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, হাসান গনির নেতৃত্বে একাংশ লীগ সদস্য বাম ফ্রন্টে যোগদানের

জনা প্রকল্পে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁর যে বাম কম্যুনিষ্ট প্রভাবে নিজেকে প্রত্যক্ষ নিশ্চিন্তকরণের গণ্য পা বাড়িয়েছে এমন একটি আতঙ্ক লীগ সমর্থকদের মধ্যে ছড়াবার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু ফল হয় নি। কেরালার সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের জনবিরোধী কার্যকলাপে পুরোপুরি হতাশ। রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব চ্যুতভাবে দুনীতি এবং সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব পোষণের জন্য জনতার শূভ ইচ্ছায় বঞ্চিত হয়েছে। এ রাজ্যে কংগ্রেস ধর্মগোড়া প্রতিজ্ঞাশীল এবং স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

১৯৫৭ সালে কংগ্রেসী প্রতিজ্ঞার বিকট দল্লুর হাসি প্রত্যক্ষ করেছেন কেরালাবাসী জনগণ। মন্দির হারিয়ে কংগ্রেস হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বিরোধী দলের যে ভূমিকা গণতন্ত্রে কামা যে গঠন-মূলক ভূমিকার জয়গান করে থাকে কংগ্রেস শ্বেষ কেরালার নাস্বাদিপান মন্দিরসভার সঙ্গে সেই আদর্শ নিয়ে কাজ করতে কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। বিরোধী দলের সৃষ্টিশীল ভূমিকা গ্রহণ না করে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সন্ধান নিয়ে কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট মন্দিরসভাকে উৎখাত করল অগণতান্ত্রিক পন্থাভিত্তে। আর এই কাজে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, ক্যাথলিক চার্চ ও নম্মারগোষ্ঠীর সহায়তা গ্রহণ করে কংগ্রেস নিজেকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থগোষ্ঠীর মিতার পরিণত করে জনসাধারণের কাছে নিজেকে আরও ছের এবং অগ্রিয় করে তুলল। কম্যুনিষ্ট সরকার রাজ্যে যে প্রগতিশীল শিক্ষা বিলকে আইনে রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন এবং ভূমিসংস্কারের জন্য প্রয়াস পেয়েছিলেন—সেই প্রগতিশীল সৃষ্টিমূলক কাজের বিরুদ্ধতা করে মধ্যমগণীয় জনবিরোধী স্বার্থ কেরালাকে মধ্যমগণে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আন্দোলন শুরুর জরুরী আন্দোলনের পুরোহিত হলেন ক্যাথলিক চার্চ এবং নম্মারগোষ্ঠী। কংগ্রেসও এই প্রতিজ্ঞায় যোগ দিয়ে নিজেকে গণস্বার্থ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করে ফেলল। এরপর নিতান্ত স্বার্থান্বেষ ব্যক্তিবিশেষ ছাড়া কংগ্রেসের সমর্থক এ রাজ্যে খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে পড়ল। কংগ্রেসের আজও যে মূখ দেখাবার মতো অবস্থা আছে তার কারণ কেরালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থচক্র এবং ধর্মীয় গোড়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান।

কিন্তু ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর যে সংযুক্ত সরকার গঠিত হবে বলে বিশেষভাবে আশা করা হচ্ছে, সেই সরকারের প্রগতিশীল নেতৃত্ব যদি অন্যান্য সুবিধাবাদী স্বার্থকে যথোচিতভাবে নিরাসিত রাখতে

পারেন এবং কেন্দ্রীয় প্রভাবে কেরালায় বাদ পড়ার শাসন সম্পর্কে ভেঁর করা না হয়, তবে বাম নেতাদের আশা কেরালায় বর্তমান অন্ধকার বহুল পরিমাণে অপসারিত হবে এবং কংগ্রেসী মানচিত্র থেকে কেরালা নিজেকে সরিয়ে এনে জনজীবনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সার্থক হবে।

কেরালায় কংগ্রেসের ইতিহাস পার্টির মধ্যে স্ববিবোধী স্বার্থের সংঘাত এবং ক্ষমতা দখলের জন্য নীতিহীন লোলুপতা। কংগ্রেস পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও আপন দলে বিসম্বাদের ফলে সেই সুযোগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে নি। একশত আট আসন বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস একশ সাতটি আসন সংগ্রহ করেও দশ মাসের বেশি ক্ষমতায় টিকতে পারে নি। থানু পিল্লাই মন্ত্রিসভাকেও কংগ্রেস টেনে নামিয়েছিল।

নিজের কোলে থোল টানার জন্য এরপর কংগ্রেস চেষ্টা করছিল ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করে দক্ষিণী তামিল তালুকগুলিকে (কংগ্রেসবিরোধী) মাদ্রাজের সঙ্গে যুক্ত করে কংগ্রেস ভেঙেছিল বিরোধী ক্যাম্পের একটা শক্ত হাতই ভেঙে দেওয়া গেল; কিন্তু যে মালাবার অঞ্চলকে গ্রহণ করা হয়, দেখা গেল সেখানেও কমুনিষ্ট প্রভাব কংগ্রেসী আশাকে সমানভাবেই আহত করল।

সুতরাং কংগ্রেস তার সব প্রকার কৌশল প্রয়োগ করেই কেরালাকে কায়দা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেরালা প্রতিবারই তার জবাব দিয়েছে শূন্যভাবেই। ফলত এ রাজ্যে শাসন সঙ্কটকে টাঙিয়ে রেখে রাজ্যবাসীকে হতাশ করার ক্রমান্বয়ে চেষ্টা চললেও, রাজ্যবাসীর কঠোর কংগ্রেসবিরোধিতা প্রমাণ করেছে যে রাজনৈতিক কৌশল খাটিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করা যায় না। এজন্যই বিরোধী নেতারা সাগ্রহে কেরালায় দিকে ডাকিয়ে আছেন। সমগ্র দেশেও কেরালায় নির্বাচনের মায় জানবার জন্য উগ্রবী অশুপকার কালগণনা করছেন।

মধ্যপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশ

ভারতের মানচিত্রই মধ্যপ্রদেশের অবস্থান। বস্তুতপক্ষে এ রাজ্যে যে এমনতর রাজ্য-রাণীর হাট-বাজার ছিল ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে সে অবস্থাখবর নেওয়ার কারও প্রয়োজনই হয় নি।

কিন্তু স্বতন্ত্র এবং জনসংঘের মতো দুটি গণবিরোধী প্রতিরক্ষাশীল দল এবং দুর্বল কংগ্রেসের কুপায় আজ সমগ্র দেশের দুটি মধ্যপ্রদেশের মধ্যযুগীয় মতিগতি দেখে বিস্মিত আহত এবং বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ রাজ্যে রাজা এবং

রাণীরা এসিয়ে এসেছেন জনগণের কণ্ঠস্বর প্রজাতন্ত্রের মেওয়ার ভাগ বসাতে। ক্ষমতা লাভের পর কংগ্রেস পরামর্শদাতা রাজপারবারগুলিকে দুর্ভে-ভাতে রক্ষা করে এসেছিল। রাজারা তারই প্রতিদান দিতে মধ্যপ্রদেশে মাথা তুলছেন। বারো কংগ্রেস টিকিট নিয়ে নির্বাচনে গণমেধের গলায় ঘণ্টি বাঁধতে নেমেছেন, তাঁরাও কংগ্রেসকে তো তোলাকাই করেন না এমন কি কংগ্রেসী পতাকা নির্বাচনী প্রচারে প্রদর্শনেও আপত্তি। এদের কংগ্রেস ছুঁয়াগর্ষে কত প্রবল ভারই একটি উদাহরণ তিকনগড় বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা। এখানে কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ নির্বাচনী সফরে আসছেন শূন্যে কংগ্রেস টিকেটধারী জ্ঞানেন্দ্র সিং যুদেবের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছিল। তিনি স্ত্রিয়মাণ হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান শ্রীমসুরানকে জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেসী পতাকা বা কংগ্রেস সভাপতি ছাড়াও নির্বাচন জিততে তাঁর অসুবিধা নেই। এ সব বালাই, সুতরাং, না আনাই উচিত।

উপায়ান্তর বিহীন কংগ্রেস এ জাতীয় অপমান ঢকাঢ় ঢোক গিলেই হজম করে যাচ্ছে। ভয়ে পড়েও কংগ্রেসকে অনেক ক্ষেত্রে টিকিট বিলি করতে হয়েছে, যা আত্মমর্ষদাবোধের পরিপন্থী। প্রকাশ, খরগাড়া এলাকার রাজা বীরেন্দ্রবাহাদুর সিং ন্যাক কংগ্রেসকে এই বলে শাসিয়ে-ছিলেন যে, কংগ্রেসী টিকিট তাঁকে না দেওয়া হলে মহারাজ একাই অর্থাৎ নির্দলীয় মদভেই কংগ্রেসকে ধায়েল করবেন। আর এ আশ্চর্যজনক মধ্যযুগীয় মধ্যপ্রদেশেই সম্ভব। কেন না এখানে প্রভাবশালী দল হল গণবিরোধী শোষক-সমাজের পার্টি স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ।

স্বতন্ত্র এবং জনসংঘের প্রতিরক্ষাকে রক্ষার ক্ষমতা কংগ্রেসের হয় নি। যদিও কংগ্রেস বিশ বছর জনমনে প্রগতিশীল ধ্যানধারণা সৃষ্টির একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে আসছে। এর স্বারা কংগ্রেস স্বাধীন সলিল রচনা করেছেন, কিন্তু সেই সলিলধারা যে কংগ্রেসকে রাজপ্রাসাদী প্রমোদ পুষ্করিণীতেই নির্মজ্জিত করবে এতটা হয়ত কংগ্রেসী প্রতিরক্ষাশীলরাও কল্পনা করেন নি। মধ্যপ্রদেশের অবস্থা বর্তমানে এমনই বেগতিক যে, কংগ্রেস টিকিট নিয়েই রাজন্যবর্গ কংগ্রেসী সংগঠনকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য অহরহ ব্যস্ত আছেন। নির্বাচনের পরও তাই ভয় হয়। কংগ্রেসের সাজানো বাগানকে-ও রাজন্যবর্গের প্রমোদ পুষ্করিণীতেই অবগাহন করতে হবে। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত প্রতিরক্ষাশীল শক্তি এখন উল্লেখ্য হয়ে নতুন শত্রু করবেন,

আর কংগ্রেস সংগঠন মধ্যপ্রদেশে স্বাধীন সলিল রচনার ফলশ্রুতি অবলোকন করে দীর্ঘশ্বাস মোচন করবেন। অবশ্য শ্রীমতী গান্ধী আশা করেন স্বতন্ত্র দলের আন্তঃ-অধিককাল টিকবে না। হয়ত কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশে স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েই আত্ম-অবলোপ করে টিকে থাকার প্রয়াস পাবে।

মধ্যপ্রদেশে, সুতরাং, স্বতন্ত্র জনসংঘীরা-ই যে প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার পতাকা রোপণের প্রয়াস পাচ্ছে তাই নয়, কংগ্রেসও এই পশ্চাদগামী শক্তির মদভদারে পর্ববসিত হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসী রাজারা কংগ্রেস ম্যানিফেস্টোর নামোচ্চারণও করছেন না। রাজতন্ত্রপ্রেমী জনসাধারণের আনুগত্যই দাবি করছেন।

রাজমাতা বিজয়রাজে সিংধিয়া একাধারে জনসংঘী অনাপকে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র জনসংঘ যে আঁতাত করেছে তাতে রাজমাতা পেয়েছেন করোয়ার বিধানসভার জন্য জনসংঘী এবং পুন্য লোকসভার জন্য স্বতন্ত্রী মনোনয়ন।

রাজমাতা তাঁর প্রাক্তন প্রজা সাধারণের জন্য যত না হোক, সিংধিয়া বংশের স্বার্থে একান্ত কুপিতা হয়েছেন। তিনি মধ্যযুগী ডি, পি, মিশ্র এবং খাদ্যমন্ত্রী গৌতম শর্মাকে সিংধিয়া বংশের বিরোধিতা করার জন্য সমুচিত শিক্ষা দিতে চান। মধ্যপ্রদেশের নির্বাচন বিশেষ বংশমর্ষদাকে ইস্যু করতে কসুর করেছে না। রাজমাতা বলেছেন, 'অকৃতজ্ঞ' গৌতমকে তিনি এমন সাজা দেবেন যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি গৌতম শর্মার জামানত বাজেয়াপ্ত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। মধ্যপ্রদেশ এইভাবে সমগ্র ভারতের মধ্যে চূর্ণকালি লেপনের জন্য সাগ্রহী। আরও প্রকাশ রাজন্যবর্গের এই বিজয়টিয়ানে মাকিনী সাংবাদিকরাও উৎসাহিত। তাঁরা রাজা-রাণীদের প্রমোদধানে নির্বাচনী-বিহার করে বেড়াচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের মধ্যযুগীয় মাটিতে।

কংগ্রেস পক্ষে যে রাজাধিরাজ প্রচার-অধিকর্তা সেই মাতালদ সিং যুদেব কংগ্রেসী পতাকা বা বজ্রব্যাকে সুদূরে নিক্ষেপ করে মাধ্যাতার আমলের রাজপারিবারিক কীতিগাথা শুনিয়ে রাজ্য টহল দিচ্ছেন।

মধ্যপ্রদেশে এখন রাজা-রাণীর নরক গুলজার। এক রাজার বিরুদ্ধে আর এক রাজা। এই রাজবংশী গণতান্ত্রিক(?) ভোট-খেলার উল্লেখ্য নতুন-কুর্দন শত্রু করেছে গণ-আশাভঙ্গকারী স্বতন্ত্র জনসংঘ এবং প্রতিরক্ষাশীল কংগ্রেস।

সমগ্র দেশবাসী অসহায় দর্শক।



লন্ডনে কোসিগিন-উইলসন শৃঙ্খলা বিনিময়

বুটেন :

ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ কারো কম নয়, এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারও এমন ভাব করেন যে, শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে যেন তাঁরা কে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমেরিকার তরফে আগ্রহটা লোক-দেখানো না হয়ে যদি আন্তর্জাতিক হতো, তবে এ-সমস্যা কবে মিটে যেতো।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এসেছিলেন লন্ডনে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনাও হলো। ভিয়েতনাম প্রশ্নটি নিয়ে পূর্বে নির্ধারিত কর্মসূচী বাতিল করে তিন নেতা নিষ্ঠুর-আলাপও করলেন। মিঃ কোসিগিন আবার জোর দিয়েছেন উত্তর ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুয়েন দ্য ট্রিকের ঘোষণার ওপর। মিঃ ট্রিক বলেছিলেন যে, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ্যানয়ে বিনা শর্তে

বোমাবর্ষণ বন্ধ করে, তবে শান্তি বৈঠকে বসবার পক্ষে হ্যানয়ের আর কোনো বাধা থাকবে না। মিঃ কোসিগিনও বলেছেন যে, আগে হ্যানয়ে বোমাবাজী বন্ধ হোক, তবে আলোচনার পথ প্রশস্ত হবে। মিঃ উইলসন এ কথা প্রেসিডেন্ট জনসনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব সেই উৎসাহের আগুনে জল ঢেলে দিয়ে তাকে নিস্তেজ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ মিঃ রাস্কের বক্তব্য, অপরপক্ষ থেকে অনুদ্রুপ আশ্বাস না পেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে পারে না।

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মার্কিন আগ্রহ যে কত ফাঁপা ও বাকসর্বস্ব তা আরেকবার প্রমাণিত হলো। অথচ শান্তি বৈঠকের জন্যে যে অনুদ্রুপ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তার সুযোগ আমেরিকা সহজেই নিতে পারতো। ভিয়েতনামের চান্দ্র নববর্ষ 'টেট' উপলক্ষে চার দিনের জন্য যুদ্ধবিরতিতে

দু' পক্ষই রাজী হয়েছিল। এ যুদ্ধ-বিরতির সময়সীমা বাড়ানোর জন্য মহামান্য গোপ ৬ষ্ঠ পল সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছেই আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জনসনও ঘোষণা করতে দেয় করেন নি যে, তিনি এ-ব্যাপারে তৎপর হবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে, ভিয়েত যুদ্ধে ওই সময়সীমাকে সাত দিন পর্যন্ত বাড়তে রাজী হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে নীরব থাকাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। অর্থাৎ যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে উভয় পক্ষ যখন অস্ত্র সম্বরণ করেছে, যখন হ্যানয়ের ওপর বোমা পড়া বন্ধ হয়েছে তখন তাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আলোচনা টেবিলে বসার মতো বাস্তব ও প্রয়োজনানুগ পন্থা আমেরিকা নিল না।

অথচ তার সর্বনাশা ভিয়েতনাম নীতির দরুণ আমেরিকা ঘরে-বাইরে প্রবল বিরোধিতা ও সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। পাঁচবার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী,

আত্মজীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সরোজচন্দ্র চক্রবর্তী

মৃত্যু—দুই টাকা

“এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন”—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী

“একাক্ষরে বাহ্যজীবনী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কর্মী সচরাচর দেখা যায় না। কাক্রাই তাহার আত্মজীবনী অত্যন্ত সুবন্দিত গ্রন্থ হইয়াছে।”

—রায় বাহাদুর বটেশ্বরনাথ মিত্র

শ্রীশ্রী গোপালী দেবী

বিনয়-মাল্য

[বিখ্যাত চরিত্রিক উপন্যাস]

শ্রীচৈতন্যের শ্রীশ্রীরাধাক্ষের অপ্রাকৃত প্রেম-লীলায় লব্ধ প্রকাশ করিয়াছেন জনাটী শ্রীশ্রী গোপালী দেবী। শ্রীবিদ্য-ধারম নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু মণিরাহেন—

“আমর প্রথম ইহার ভাষা সালকার।

এই দ্বিতীয় দিন আর প্রথম প্রচার।”

মৃত্যু : তিন টাকা।

সঙ্গীত-নায়ক

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ

প্রতি ভাগ—৫।

হারমোনিয়াম শিক্ষা

মৃত্যু—৫।

শ্রীযামিনীমোহন রায় প্রণীত

কলা দেখিছে

মৃত্যু : এক টাকা

ছোবোদের জন্য আর একখানি রহস্যোপন্যাস। পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

উপহার দিবার যোগ্য বই

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

শ্রীকলা চক্রবর্তী দ্বারা সুচিত্রিত।

ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

বঙ্গবতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বঙ্গ-জীবী ও সাধারণ লোক আমেরিকার কাছে

দাবি জানাচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামে এক্ষণি

বোমাবাজী বন্ধ করতে। ভারতের পক্ষ

থেকেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ চাণলা অনুরোধ

জানিয়েছিলেন যেন দিনা শর্তে হ্যানয়ের

বোমাবর্ষণ বন্ধ করা হয়। অন্যদিকে চীনের

অভ্যন্তরে আজ যে-তুলকালান্ন কাণ্ড

চলছে তার ঠেলাভেই সে অশ্বির, উত্তর

ভিয়েতনামকে সাহায্য করবে সে কোথা

থেকে। দ্বিতীয়ত সোভিয়েট ইউনিয়ন

অভিযোগ করেছে যে চীন তাকে সান্নাৎকমে

বাধা দিচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামে সামরিক

সাহায্য পাঠাবার ক্ষেত্রে। এ অবস্থায়

আমেরিকার তো উচিত ছিল হ্যানয়ের

সুর যখন আগের চেয়ে অনেক নরম হয়েছে

তখন তার পূর্বা সুরোচ্চ নেওয়া। হ্যানয়

চার শত্রু আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামে

আর যেমনা না কেলে, আগের মতো সে

আর এ শত্রু বাধছে না যে শান্তি আলো-

চনায় ভিয়েত কংগের কপতে দিতে হবে

কিছু দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন

বিন্যাসের সরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু তা'

সত্ত্বেও আমেরিকা কিসের আগার

মগডল থেকে নামতে চাইছে না বোঝা

মুশকল। আমেরিকার সামরিক শক্তির

অরোহণ তো দুর্নিয়ামস্ব লোক দেখেছে,

তবে আর গুমোর কিসের। এখনো কি

এই রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমা-

ধানের প্রত্যাশা করে সে? সামরিক

প্রাধান্যের জোরে সে যদি উত্তর ভিয়েত-

নামকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে

পারবে বলে ভেবে থাকে, তবে সে

মারাত্মক ভুল করবে। কারণ, বাইরের কোন

সাহায্য ছাড়াই উত্তর ভিয়েতনাম আরো

২০ বছর একনাগাড়ে যুদ্ধ করে বেতে

পারবে বলে ডঃ হো চি মিন ঘোষণা

করেছেন। এত বিশ্বাস সত্ত্বেও উত্তর

ভিয়েতনামীদের মনোবল এতটুকু ক্ষুণ্ণ

হয় নি। দিলেন বিরেন ফু-তে যে মিয়াট

সাকলা তারা অর্জন করেছিলো তার

পুনরাবৃত্তি হবে বলে তারা আন্তরিকভাবে

বিশ্বাস করে।

মিঃ কোসিগিন কিরে গিয়েছেন

বটে তবে আবার তিনি মিঃ

উইলসনের সঙ্গে চেকোস্কে আলোচনা

করবেন বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে

তিনি রাশী এলিজাবেথকে মস্কো সফরের

আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

চীন :

চীন-সোভিয়েট সম্পর্কের কোনো

উন্নতি তো দেখা গেলই না, যার পত

কমিলে দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে

সম্পর্ক আরো ভিত্তি হয়েছে। তবে ভারই

অথো আশার কারণ ঘটেছে এখানে যে

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলেক্সি

কোসিগিন বলেছেন যে, দুই দেশে যুদ্ধ

সাধারণ কোন সম্ভাবনা আছে বলে তিনি

তো মনে করেনই না, এমন কি তার

দেশের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক সম্পর্কও

ছিদ্র করা হবে না।

তবে কী হবে তাও স্পষ্ট বোঝা

যাচ্ছে না কিছুই। কারণ, চীনের বাড় থেকে

ভূত এখনো নামে নি, সাধারণ তার আগের-

গতির বিস্ফোরণ চলছে সমানে। দক্ষিণের

সোভিয়েট দূতাবাস আজ ১৯ মিন

ধরে অবরুদ্ধ, চীনা সালরক্ষীরা দুতাবাস

ঘিরে রে-বেক্টনী রকনা করেছে তা'

এখনো প্রত্যাহার করে নেয় নি, আজো

দুতাবাসের একশো কূটনৈতিক কর্মচারী

এবং তাদের ২০ জন মহিলা অধিবাসী

বন্দী জীবনযাপন করছেন। বাইরের সঙ্গে

কোনো সম্পর্ক তাদের রাখতে দেওয়া

হচ্ছে না, চীনা নেতারা এই মর্মে হুঁশিয়ারী

দিচ্ছেন যে যদি কেউ সোভিয়েট

দুতাবাসে যান তবে তার দায়িত্ব চীন

সরকার নিতে পারবে না। সোভাগ্যের

কথা, চীন সোভিয়েট বন্ধুত্বের প্রতি

অকৃতজ্ঞের আচরণ করলেও পূর্ব ইরো-

য়েলের অন্য দেশগুলি করতে পারছেন না,

তারা খাদ্যলাভ্য ও সহানুভূতি জানাবার

জন্য নিবেদ্যজ্ঞার তোলাকা না করে নির্বিশ্ব

দুতাবাসে ঠিকই যাচ্ছেন।

অবরুদ্ধ নগরী থেকে সোভিয়েট

কর্মী, স্ত্রী ও শিশুদের মস্কো পাঠিয়ে

দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন সোভিয়েট

সরকার। কিন্তু তাতেও কি বাধা কম?

সাংস্কৃতিক বিশ্ববীরা বৈশ্বিক কারাদায়

তাদের বিদায় সম্পর্কনা জানিয়েছেন—

বিমানবন্দরে সোভিয়েট মহিলাদের থাকা

দিয়ে, অর্থে পুতু হিট্টেরে, গালিগালাজ

করে। সালরক্ষীরা ওই দুশো চীন

ত্যাগকারী বন্ধকে বাধা করে মাও সেন-ভুঙ,

লেনিন, স্ট্যালিনের প্রতিষ্ঠিত কক্ষে

বুকে হেঁটে বেতে।

স্বভাবতই সোভিয়েট জনসাধারণের

ওপর চীনের এই দুশু কীর্তীর প্রতি-

পাদ্যাত্মিক বন্ধন

কিন্তু দেখা নিচ্ছে। শত্রু শ্রমিক ও ছাত্রেরাও সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর চীনা দূতাবাসে গিয়ে কুটনীতিকের হাতে প্রতিবাদপত্র দিতে চান। কিন্তু কোথায় কুটনীতিবিদ। তিনি দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরে আছেন বসে। বাইরের দারোয়ানকে পাঠিয়েছিলেন নির্দেশ দিয়ে। সেই দারোয়ান ওই ছাত্রদের প্রতিবাদপত্র তাদের মূখের ওপর ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে মূহুর্তের মধ্যে। সোভিয়েট নিরাপত্তা বাহিনী সব সময় সজাগ ছিলো যাতে কুটনৈতিক শিষ্টাচার ছাত্র-শ্রমিকেরা কোনমতেই না লঙ্ঘন করতে পারে। আর চীনে? সরকার উৎসাহ দিচ্ছেন ওই চ্যাংডাদের অশালীন ও আপহিজনক কাজে? কুটনৈতিক শিষ্টাচার হাওয়ার ঠাঁড়িয়ে দিয়ে।

পিকিঙের সোভিয়েট দূতাবাসের সামনে এখন যে-ধরণের বিক্ষোভ চলছে, কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হবার পর থেকে কোনো বিদেশী দূতাবাসের সামনে এমনটি আর কখনো দেখা যায় নি। আজ চীনের

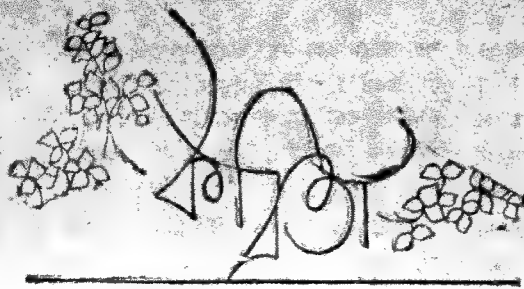
শত্রু আমেরিকা নয়, আমেরিকার বিরুদ্ধে সে একটুও গালি পাড়ে না, তার পরলা নম্বরের শত্রু “শোখনবাদী” সোভিয়েট রাশিয়ার “ফ্যাসিস্ট” শাসকচক্র! অর্থাৎ চীন পরিকল্পিতভাবে ক্রমাগত প্ররোচনা দিয়ে চলেছে সোভিয়েট রাশিয়াকে যাতে সে চীনের বিরুদ্ধতার জবাব দেয়—কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বা যুদ্ধ ঘোষণা করে। তার মতলব হলো : সোভিয়েট রাশিয়াকে কোনোরকমে ফাদে ফেলে চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করবে। আর সে-রকম কিছু করে বসলে বিশ্ববাসীকে তার বোকানো সুবিধে যে সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধবাজ, ফ্যাসিস্ট ইত্যাদি। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া সে-ফাদে পা দেবে কেন? কিন্তু তাই বলে সোভিয়েট রাশিয়াকে দুর্বল মনে করারও কোন কারণ নেই। সে ইতিমধ্যেই এক নোটে জানিয়ে দিয়েছে যে, সোভিয়েট ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে।

এ-অবস্থায় অনেকেই ভাবছেন, অতঃ কিম? সোভিয়েট-চীন সম্পর্ক এখন প্রায়

শত্রুর পর্বায়ে গিয়ে পড়েছে, আর কতদিন সে অপমান হজম করবে? কিন্তু সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন জর্জিত দিয়েছেন যতই প্ররোচনা দেওয়া হোক না কেন সোভিয়েট রাশিয়া কখনই অপর কুটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করবে না, ‘যুদ্ধ’ সূর্যের তো প্রশ্নই ওঠে না। মিঃ কোসিগিন এ-অবস্থায়ও যে সংযম, উদারতা এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। অন্য যে কোনো দেশ হলে বোধ হয় এতদিনে একটা এস্পার-ওস্পার হয়ে যেতো!

তবে একথা ঠিক যে, সারা বিশ্বের কাছে চীনা ঔষধতের আর একটা চিহ্ন উদ্ঘাটিত হলো—কারণ চীন শত্রু সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেই বিরুদ্ধ দেখাচ্ছে না, অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও করছে, অর্থাৎ শত্রু সৃষ্টি করছে নিজের। ঘরে চরম অশান্তি, বাইরেও শত্রু পাড়তে—তবে কি চীনে আবার দিন বদলের পালা এলো?





পাল্টাবে দিন অবশ্য বাডে

সত্যীন্দ্র ভাদুড়ী

পথে যেতে যেতে মনে হয় যেন
কোথায় রাজছে নকল খণ্ডী।
অনেক চিহ্ন পোষ্টারে জাকা
দেয়ালে দেয়ালে বাখার কবায়,
বিদ্রোহী পুর ডাঙা গলাতেও
হয়তো নকলই নকল জাবা,
নকল খণ্ডী শব্দ বা করে—
বিগড়ে বাজে কেবলি মনটা।

পথে যেতে যেতে কাব্য করি না।
করিছি কেবল রিপোর্ট তৈরী।
মান্য মল নানা মর্মানের মধ্যে
আঁট প্রহর মতের কারাক;
কোন রপগুরু জাহ্নবী সাধনার?
বাঁদে রাজছে লারুণ সে-চাক,
লিখছি কেবল শেখানো কথায়
আরা বিদ্রোহী তারা বৈরী।

অসম শোষণ করে যায় যারা
তারাও নেয় যে ভিকার বুলি,
ভারপর বরে এক নিম্নেবেই
হঠাৎ তারা বোম্ব দ্বর্তি,
একদিন যারা ভিকার বিদ্রোহ
পাঁচটি বছর উল্লসপূর্ণ
করতে করতে তারা বোম্ব
জাগের হিঙ্গা জ্বিলে বুলি।

অবশ্য কিহু অভাব নেইক
সব কিহু আছে ব্রাক মার্কেটে।
সাম্যও আছে, শ্রাবণীতা আছে,
নেই গাছতলা পাঁচতলা ভেদ,
এপে জমছে পণ্ড বর্ষে
টাকার অঙ্কে এক একটি বেধ,
মহাভারতের বর্ণনা দিতে

রক্ত দিয়েছে, প্রাণও দিতে পারে
এই ভারতের কোটি কোটি লোক—
দিয়েছে দিয়েছে দিয়েছে রক্তেছে
এখনো লিখিত প্রমাণ তার।
শিশুরে সংহতি, সঙ্ক সেজে করে
একদল লোক কী চীৎকার;
রিপোর্ট পড়লে তাদের চোখেই
জাহ্নবী মারের ভয়ানক চ্যাপক।

কাকে লোব দেব ভরা ডুবিতও
কবে বা করেছি নিজের বিচার,
সব জেনে শুনে রিপোর্ট কে'লোছি
লভ্য বিষয় বা মল গল্প,
কেন না কাগজে বাঁধা গতে লেখা
প্রতিটি শব্দ ওজন করা,
আগামী কল্য নিজে বা পড়লে
সবই তো বিষয় একে বিচার।

অজ্ঞ শৃঙ্খলিত দিতেই
কতো না খিসেরী নিশ্চয় জানে,
মনে মনে জানে তারাও সবাই
তোলা মালাতেই চলে পড়ে তেল।
তোটের বার বদল হয় না
দুটি পাকা তেল, সরিষার তেল
আওতে কখন সব জালগোল
পাকিরে হারান শ্রবণ সাধনা।

নকল খণ্ডী কে বাজায় করে?
পাততলা ঐ অট্টালিকা
খেঁকেই পড়ছে পুণ্ডপুণ্ড
মাথার উপরে; হিম কাপড়ে
তোমরা কে যাও? কোথায় চলেছ?
পাল্টাবে দিন অবশ্য কড়ে।
জানি, বিজয়লার ভাষা হেঁটে না

আমর নির্বাচনের পরিভাষা

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচন নিঃসন্দেহে ভারতের গণতান্ত্রিক বিবর্তনের পক্ষে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ মূহূর্ত, কেন না ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই এই নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। গত উনিশ বছরের তুলনায় আজকের অবস্থা অনেক বেশি অনিশ্চিত। বর্তমান সাধারণ নির্বাচনের স্নানহাওয়ার সঙ্গে পূর্ববর্তী নির্বাচন-সমূহের পরিবেশের পার্থক্য দৃষ্টান্ত। কেন না ইতিমধ্যে দুটি দশক পার হয়ে গেছে। সেইসবের নামকরা নেতারা, যারা একদা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, ধরা-পৃষ্ঠ থেকে চিবকালের জন্য বিদায় নিয়েছেন। তাদের জায়গায় নতুন লোকেরা এসেছে, যারা তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে হয়ত বেশি “প্রাগমেটিক”, কিন্তু যে উপাধানে জাতীয় নেতারা গড়ে ওঠেন, সে উপাধানে তারা নির্মিত নয়। সেকালের শাসকদের মতই তারা তাদের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থীদের কিছুটা ভয়-ভিত্তির পাশ্বে বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের আন্তরিক প্রস্ফার পাঠ হিসাবে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। নির্বাচনের মূলধর্মীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি হতাশাজনক, বিভিন্ন উপদলীয় চক্রান্তে বিভীর্ণ, সেখানে ঐক্য কোন ব্যক্তি বা বিষয় বা আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি, জোড়াতালি সত্ত্বেও তা যে টিকে আছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ক্ষমতালোভ বা ক্ষমতায় টিকে থাকার আকুল প্রবণতা। ফলে, জাতীয় স্তরে, ক্ষমতার মূলকেন্দ্রটি এক উপদল থেকে আর এক উপদলের কাছে হাত বদল হচ্ছে, এবং সর্বাপেক্ষা যা দুর্ভাগ্যজনক, এই উপদলগুলিরও কোন আদর্শভিত্তিক স্থায়ী চরিত্র নেই, রাজনৈতিক অস্তিত্ব-রক্ষার অন্ধ প্রেরণাই বিভিন্ন নেতাকে আজ এ গ্রুপ কাল ও গ্রুপের সঙ্গে গটিছড়া ধামিতে বাধ্য করেছে। রাজ্যসমূহের অবস্থাও সমান হতাশাজনক, সেখানেও সর্বস্তরে নেতৃত্বের ব্যর্থতার লক্ষণ পরিপূর্ণ। এই ব্যর্থতার মূল কারণ একটিই: জাতীয় জীবনের সার্বিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় আদর্শ ও নীতিসমূহের প্রতি নিষ্ঠার চেয়ে ক্ষমতালোভাতাই নেতা ও

দলগুলির নিকট মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের নিকট নেতাদের প্রতি-প্রতিসমূহ হাস্যকর ভাবপর্ষের দ্যোতক হয়েছে। ভাগ্য ও তিতিভার বাণী জন-সাধারণের কাছে একান্তই আবেদনহীন হয়েছে। অসম ধনবন্টন, বিগত উনিশ বছরের মধ্যে ধনীর ধনক্ষীণিত এবং দরিদ্রের অধিকতর দারিদ্র্য, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করে দিয়েছে। এই কারণে অনেকেই আশংকা করছেন যে এটাই হয়ত ভারতের শেষ সাধারণ নির্বাচন।

চতুর্থ নির্বাচনের গুরুত্ব

আগেই বলেছি চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্রচ্ছদপট পূর্ববর্তী তিনটি সাধারণ নির্বাচনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে পৃথক কেন না ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এই নির্বাচনের সঙ্গে যতদূর সংশ্লিষ্ট, পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলির ক্ষেত্রে সেই সমস্যা ততদূর প্রকট হয় নি। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে শাসকদলের সঙ্গে তুল্য-মূল্য একটি বিরোধী দল থাকার বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষে শাসকদলের বাইরে সেই রকম কোন বিরোধী দল গড়ে ওঠে নি, সুদূর ভবিষ্যতেও তা গড়ে ওঠা অসম্ভব। বামপন্থী দলগুলি, বিশেষ করে যে সব দলগুলি মার্ক্সবাদী আদর্শে দীক্ষিত, সেই সব দল ও তাদের নেতাদের মানসিকতা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সুরে বাঁধা নয়। তার জন্য তাদের দোষ দেওয়া হচ্ছে না, কেন না পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে আস্থা রেখে মার্ক্সবাদী থাকা যায় না। ফলে, যা পবিস্কার দেখা যাচ্ছে, বামদল-গুলির পক্ষে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের উপযোগী বিরোধী দল হয়ে ওঠা সম্ভব-পর নয়। একমাত্র শাসকদল থেকেই একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যদি বেরিয়ে এসে যথার্থ বিরোধী দলের ভূমিকায় অভিনয় করতে বাজী থাকে তাহলেই এদেশে গণ-তন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খানিকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। শাসক দল থেকে অবশ্য অনেকে বেরিয়ে এসেছে, এখনো আসছে, কিন্তু তাবা পাস্তা না পেয়ে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের স্বার্থে কোন মহৎ আদর্শে

অনুপ্রাণিত হয়ে কেউ কিছু বেরিয়ে আসছে না।

ফলে অবস্থাটা কি কত দুঃস্বপ্ন! বামপন্থী দলগুলি পবস্পন বিহীন, কেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শাসক বা বিরোধীদলবৃন্দে অংশগ্রহণ করতে মানসিকতার দিক থেকে নাবালক। তাপা-দিকে চলছে শাসকদলের হুমকি “ডিসইন্টিগ্রেসন” যার ফলে ভাগ্যী কয়েক বছরের মধ্যে কংগ্রেসন উপদল স্বার্থের সংঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে যাবে যার পরিণামে কোন একটি গ্রুপের পক্ষে অপর গ্রুপের সঙ্গে কোয়ালিশন ব্যতিরেকে ক্ষমতায় টিকে থাকার দৃষ্টান্ত হবে উঠবে, সেই সুবিধাবাদী আদর্শে যে কোন মূহূর্তেই ভেঙে পড়ে চক-চকিগ একনায়কতন্ত্রের পথ সুগম করে দেবে। এই কারণেই যারা ধারণা করছেন যে চতুর্থ নির্বাচনই হয়ত শেষ সাধারণ নির্বাচন তারা একান্তভাবেই চন্দ্র বস করছেন না।

দক্ষিণপন্থী বোঁক

ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান-মন্ত্রীর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি প্রবল মমত্ব ছিল এবং তাইই ব্যক্তিগত প্রেরণায় কংগ্রেস সংগঠনে একটা আনু-ষ্ঠানিক ঐক্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর জীবনকালেই বিচ্ছিন্নতাকামী উপা-দানসমূহ প্রাবল্য লাভ করতে শুরু করেছিল, এবং গ্রীনেহবুর সমাজতন্ত্রে ফো-নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস থেকে এংদল বেরিয়ে গিয়ে বাজাগোপালচাবী-রঙ-মাসানী-মুন্সী প্রভৃতির নেতৃত্বে স্বতন্ত্র দল গঠন করে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই দল দক্ষিণ-ভারতে ও পশ্চিমব-গ বিশেষ সুবিধা কবতে না পারলেও, পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর ভারতে তাবা বেশ ভাল ফল করেছে। ভারতের তিনটি রাজ্য বিধানসভা, যথা বিহার, গুজরাট ও রাজ-স্থানে স্বতন্ত্র পার্টি প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে, মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশূ-রাজ্যে মিত্রীয় বিরোধী দলেব। লোক-সভায় ১৮টি আসন নিয়ে স্বতন্ত্র পার্টি মিত্রীয় প্রধান বিরোধী দল হয়েছে। উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদ স্বতন্ত্র পার্টির

সঙ্গে মিশে যাওয়ায় লোকসভায় এদের আরও চারটি আসন বেড়ে গেছিল এবং উড়িষ্যার প্রধান বিরোধী দলের নেতৃত্ব এদের হাতে এসেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমী দ্বিতীয় যে উপাদানটি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে তা হল ভারতীয় জনসংঘ দল। বিগত নির্বাচনে এই দল বিস্ময়কর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। লোকসভায় এই দলের সদস্যশক্তি প্রায় চারগুণ বেড়েছে এবং বিধানসভাগুলিতে প্রায় তিনগুণ। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও পঞ্জাবে জনসংঘ শক্তি ঘাঁটি কবেছে।

পশ্চিমবঙ্গে এই দুটি দলের কোন ভবিষ্যৎ আপাতত না থাকলেও ভারতের অন্তত কয়েকটি রাজ্য এই দক্ষিণপশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে সংযোগে কংগ্রেসের যে পরাজিত হবার সুযোগ নেই তা নয়। এই দুই দলের নির্বাচনী ইস্তাহারও একটু যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। স্বতন্ত্র পার্টি এক কথায় সমাজতন্ত্র, জাতীয়করণ ও পরিকল্পনাকে বাতিল করেছে। এই দল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বাধার প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র পার্টি দেশের অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের বিকেন্দ্রীকরণও চায়। সেটা কিভাবে সম্ভবপন হবে তা তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারের কোন জায়গাতেই উল্লিখিত হয় নি। আবও এই যে এবারের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই পার্টি প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে কোন কথাই বলে নি। প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো কি কমানো হবে, এ বিষয়েও কিছু বলা হয় নি। এই পার্টি দৃশ্যতই ভারতের জোটনিরপেক্ষনীতির বিরোধী এবং মার্কিন ব্লকে যোগদান কবতে ইচ্ছুক। পক্ষান্তরে জনসংঘের নির্বাচনী ইস্তাহার আরও বেশি স্পষ্ট ও জোবাল ধরনের। জনসংঘ জাতীয়করণ নীতির একান্তই বিরোধী। কিন্তু প্রতিরক্ষা ও মৌলি শিল্পগুলির ক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কবে না। এই পার্টি খাঁটি “স্বদেশী ধারা” প্রবর্তনের পক্ষপাতী। জনসংঘ পরিকল্পনাব্যবস্থার বিরোধী নয়, তবে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী, বিদেশী ঋণ গ্রহণে অনিচ্ছুক। দেশরক্ষার প্রসঙ্গে এই পার্টির মনোভাব অত্যন্ত কঠোর, ভাবতক প্রথম প্রণয়ী সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত কবাই এদের লক্ষ্য, তাব জন্য যদি জনসাধারণের কৈামের বেট আনও শক্তি কবে বাধতে হয় তাতে আপত্তি নেই। এদের বৈদেশিক নীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীন ও পাকিস্তানের প্রতি কঠোরতম মনোভাব অবলম্বন করা, এমন কি তিস্ত বৈদেশিক চীনকে উৎখাত করাও এদের পবিকল্পনাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। জোট-

নিরপেক্ষ নীতি পরিহার করে সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী নিরস্ত্রাশ্রয় স্থান করাই জনসংঘের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা।

কংগ্রেস ও দক্ষিণপশ্চিমী প্রবণতা

এই দক্ষিণপশ্চিমী প্রবণতা যদি শূন্য স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে তা এতটা দৃষ্টিচ্যুতের কাবণ হত না। বস্তুত স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘ একই মদ্রাব দুই পিঠ, উভয়ের যা কিছু পার্থক্য তা শূন্য পশ্চিমী গণত। স্বতন্ত্র পার্টি গণতন্ত্রের একটা আপাতমিল প্রলেপের অস্তরালে যে স্বপ্ন দেখছে তারই রূঢ় বাস্তব দিকটা জনসংঘের বাস্তবনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে ব্যক্ত, যাকে এক কথায় বলা যায় মিলিটারি ন্যাশানালিজম, যা একবার ত্রিাশীল হতে শূন্য করলে শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদে গিয়ে পৌঁছবে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বা ভাব মূখে লাগাম লাগানোর ক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসেরই ছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে এ কথা স্বীকার কবতে হচ্ছে যে আজ কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও চরমতম দক্ষিণপশ্চিমী প্রবণতা শূন্য যে অনুপ্রবর্তিত হয়েছে তাই নয়, তা সঘর্ষে লালিত হচ্ছে।

আসন্ন নির্বাচনের কংগ্রেসী ইস্তাহার এইভাবে শূন্য হচ্ছে : “আমরা পূর্ববর্তী যুগে গান্ধীজীর পবিচালনা ও শ্রীজগদীশ-লাল নেহরুর যোগ্য নেতৃত্ব পেয়েছি। তাঁরা ভারতীয় জনগণের নিকট থেকে অভুলনীয় ভাসবাসা পেয়েছিলেন এবং জনগণের সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট বোঝাপড়া ছিল। শ্রীনেহরুর মৃত্যুর পর শাসনকার্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছিল শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্কন্ধে। উনিশ মাস সাহসেব-সঙ্গে সেই দায়িত্বপালন করে এক বিজয়ের মূহুর্তে, তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদনের পর, তিনি আমাদের পবিত্যাগ করেন। সেই অসমাপ্ত কর্মসমূহেব দায়িত্ব এখন ক্রমবর্ধমান অসুবিধাসমূহের মধ্যে নতুন প্রঞ্জনের উপব ন্যস্ত হয়েছে।” কিন্তু সত্যই কি কোন নতুন প্রঞ্জনের হাতে কংগ্রেস সংগঠন ন্যস্ত ববেছে? কামরাজ অথবা ঘোষ অথবা বৈষ্ণব অথবা পাতিল কি নতুন প্রঞ্জনের ধাবক?

কংগ্রেসী নির্বাচনের ইস্তাহারের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যা দাঁড়ায় তাতে দেখা যায় যে এই দল সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রেব একটা সমন্বয় সাধন করতে চায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পূর্ণ সন্যাবহার কবে “আধুনিক সমাজ” গঠন করতে চায়; আভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ, ডিফেন্সি ফিন্যান্সিং ও বৈদেশিক সাহায্য মারফত

গণবাণীকী পরিকল্পনা সাধক করার প্রয়াসী। কিন্তু কার্যত সমাজতন্ত্রের ভাবধারাসমূহ থেকে কংগ্রেস ইতিমধ্যেই অনেকটা সরে এসেছে। বৈদেশিক আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তথাকথিত “নেহরু লাইন” বহু পূর্বেই পবিত্যক্ত হয়েছে। “নেহরু লাইন” ভাল কি মন্দ সে বিতর্কের অবকাশ-এখানে নেই, তবে দৃশ্যত যা প্রতীক্ষমান হচ্ছে, এই নীতি থেকে সরে আসার ফলে কংগ্রেসের চবিত্ত পূর্ববর্তিত দুটি দক্ষিণপশ্চিমী দলগুলির কাছাকাছি চলে এসেছে। এ প্রশ্ন আজ অনেকেরই মনে জেগেছে যে একশো ভাগ দক্ষিণপশ্চিমী উপাদানকে হঠাতে গিয়ে কংগ্রেস কি পঁচাত্তর ভাগ দক্ষিণপশ্চিমী নিজেই হয়ে পড়বে?

চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসেব সামনে যে অসুবিধাগুলি দেখা যাচ্ছে, গত তিনটি নির্বাচনেব ক্ষেত্রে তা ছিল না। পশ্চিমবং ও কেরল ছাড়া কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে কোথাও বামপশ্চিমী শক্তিসমূহের মুখোমুখি হচ্ছে না, সমগ্র হিন্দী এলাকাতেই তাকে মোকাবিলা কবতে হচ্ছে স্বীকৃতভাবে দক্ষিণপশ্চিমী দলগুলির সঙ্গে। এই স্বিধাবিভক্ত ফ্রন্টে তাকে লড়তে হচ্ছে স্বিধাবিভক্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে। তাকে মহাপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে লড়তে হচ্ছে জনসংঘের সঙ্গে, বিহার, উড়িষ্যা, কয়দংশে রাজস্থান ও গুজরাটে লড়তে হচ্ছে স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে, পশ্চিমবং ও কেরলে মার্ক্সবাদী দলগুলির সঙ্গে, মাদ্রাজে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাক্সাগামের সঙ্গে। এতগুলি পরস্পরবিরোধী এলিমেন্টের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আদেশের দিক থেকে তাকে দেউলিয়া হতে হচ্ছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কংগ্রেসকে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আঁতাত করতে হচ্ছে না, কিন্তু আদেশের ক্ষেত্রে অজ্ঞ প্রমিত “মিউচুয়াল ইনকমপ্যাটিবল এলিমেন্টের” সঙ্গে সন্ধি করতে গিয়ে ভারতের এই বহুতম রাজনৈতিক দলটির ভিতবটা ক্ষয়রোগাক্রান্ত রোগীর মত হয়ে গেছে। তদুপরি নতুন কবে রাজ্য পুনর্গঠনের গ্রহচক্রে কংগ্রেসের কপাল, আবও পড়েছে। নবগঠিত পঞ্জাবী সূদার আকর্ষণটা কংগ্রেসেব চেয়ে আকালী দলের প্রতি বেশি থাকার সম্ভাবনা, পক্ষান্তরে হরিয়ানায জনসংঘের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে রুখে ওঠা দুষ্কর। এদিকে প্রস্তাবিত আসাম ফেডারেশন নির্বাচনে আব একটি বিক্ষোবণ ঘটতে পাবে।

আমরা পূর্বেই বলেছি আসন্ন নির্বাচনেব গুরুত্ব পূর্ববর্তী তিনটি নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি। ফলশ্রুতি

সামাজিক বলমতী



ফল যাই হোক না কেন তা আগামী দিনের এক মারাত্মক চিত্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদি সবকিছু রাজ্যে কংগ্রেস জয়লাভ করে তাহলেও অবস্থার কোন উন্নতি হবে না। উত্তরভারতে প্রবল দক্ষিণপন্থী বিরোধিতা এবং কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বাম-পন্থী বিরোধিতার দৃষ্টিক সামাল দিতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক একা পদে পদে বিঘ্নিত হবে। পক্ষান্তরে যদি উত্তরের ক্ষেত্রটি রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গে ও কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়, সেক্ষেত্রেও তার পক্ষে একই সমস্যা। গ্রীক ট্রাজেডির মতই সমগ্র দেশটা একটা বিশেষ পরিণতির দিকে ছুটে যাচ্ছে, যেখানে কোন বিশেষ বাজেনৈতিক দলের জয়-পরাজয় ভবিষ্যতে খণ্ডাতে পারবে না। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও এতখানি হতাশাজনক ভিত্তিভূমির উপর কংগ্রেস কখনোই আগে দাঁড়াইনি।

সমাজতান্ত্রিক শক্তি

আগেই বলেছি নেহরুর মৃত্যুর পর থেকেই কংগ্রেস থেকে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি পিছদ হটে আসছে। থাকে ইংরাজীতে বলে 'ক্যাবিনেটের লীডার-শিপ' নেহরুর তাই ছিল, বর্তমানকালে কংগ্রেসে তার শোচনীয় অভাব ঘটেছে, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীকে তো ক্যাবিনেট সাইজে কাটছাঁট কবে নেওয়া হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পিছনে কংগ্রেসের মধ্যে যে বৃহৎ ব্যক্তিগত ও রঙীন নেতৃত্ব ছিল তার অবলুপ্তি একদিকে ঘটেছে কিন্তু অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহ পৃথকভাবে দানা বাঁধতে পারে নি। প্রজা সোসালিস্ট পার্টি তৃতীয় নির্বাচনে এক মহাশূন্য ছাড়া আর সর্বত্রই ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে লোকসভায় ১১টি আসন দখল করে এই দল একদা ভারতীয় শ্রমিক বৃহত্তম দলের মর্যাদা পেয়েছিল, কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে হারানোর পরেই তার মর্যাদা হারিয়েছে।

প্রধান কারণ হচ্ছে পি, এস, পি প্রচারিত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ নেহরু আমলের কংগ্রেস কাগজে-কলমে গ্রহণ করায় পি, এস, পি-র পৃথক আকর্ষণ নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রমিক শ্রমিক পি, এস, পি-র অর্থ কমিউনিস্ট বিরোধিতা অন্যান্য সমাজতান্ত্রী শিবিরগুলিকে তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে লোহিয়ার নেতৃত্বে এই দলের একটা বড় অংশ সবে গিয়ে সোসালিস্ট পার্টি গঠন করায় পি, এস, পি-র সামগ্রিক সংগঠনে যে ফাঁকি ধবল তা আর শেষ পর্যন্ত জোড়া লাগান গেল না। এই দুটি দলের মধ্যে একটা সমঝোতা মাঝখানে হয়েছিল, যার ফলে সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টি জন্মলাভ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোহিয়া-পন্থীদের সঙ্গে পি, এস, পি-র মূল নেতাদের বিনবনা না হওয়ায় আবার হ্যাঁড় আলাদা করে ফেলা হয়। ১৯৬৪ সালে অশোক মেহতা বহু অনুচর নিয়ে কংগ্রেসে যোগদানের ফলে এই পার্টির অবস্থা ধুবুই শোচনীয় হয়েছিল। বর্তমানে কংগ্রেসের মতই পি, এস, পি-ও আদর্শের দেউলিয়া হয়ে ছুটছে। এই পার্টির বর্তমান আদর্শ এস, এন, শ্রমবীর ভাষায় "গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজবাদের সংমিশ্রণ। কমিউনিজম অথবা সাম্প্রদায়িকতাবাদ কোন কিছুই সঙ্গেই কোন বোঝাপড়া করা চলবে না.....আমরা কংগ্রেসের সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারি, কিন্তু শব্দ বিকল্প হবার জন্যই বিকল্প হব না।" তথাপি এই আদর্শের প্রতি পি, এস, পি কোনদিনই বিশেষ আনুগত্য পোষণ করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও, এই পার্টির উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধী ভূমিকা বিশেষ লক্ষণীয়। এই পার্টি দেশে কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তির সমন্বয় সাধনে অগ্রসর হব নি, কিন্তু কমিউনিস্টদের শক্তিশীনতা চেয়েছে যার ফলে কংগ্রেসেরই সর্বাধিক লাভ হয়েছে।

পক্ষান্তরে সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টির ভূমিকা কিছুটা এডভেঞ্চারিস্টিক, কিছুটা সর্বাধিকারবাদী। এই পার্টির নির্বাচনী ইচ্ছাহাযে একটি "জয়পালা সর্বোচ্চ" কথা বলা হয়েছে, বাজ্যে এবং কেন্দ্রে, যা হবে কোয়ালিফাইং। ভারতের ইচ্ছাহাযে আরও বলা হয়েছে যে প্রতিটি দলকে স্বচ্ছ, স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট ভিত্তিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হবে। এই দল মোটামুটি নির্বাক স্বাক্ষর সরকার প্রত্যাশা করে, এবং দলটি ইচ্ছাহাযে জন্য যে কোন সর্বাধিক আঁতাতে যেতে এদের কোন আপত্তি নেই। সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টির বক্তব্য হচ্ছে যে-তেন-প্রকাণ্ড যদি একদল তখনই সরকার গঠন করা যায় তাহলেই এটি প্রগতিশীল পরিবর্তনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পি, এস, পি-র সংযুক্ত সমাজতান্ত্রী দল এখানেই কমিউনিস্ট বিবেচনা নয়, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একা গঠিত বোধ হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে এই দলের সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই মন্তব্য কিছু বলা সম্ভবপর নয়, তবে সর্বত্রই ফেলে এই দলের ভূমিকা তখনই দেখা দেবে।

কমিউনিস্ট পার্টি ও আগামী নির্বাচন

ভারতের বিরোধী দলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে কমিউনিস্ট পার্টি দখল করে আছে। তাদের প্রথম নির্বাচনী ইচ্ছাহাযে তারা কংগ্রেস ও গ্রীনেহরুর উপর চ্যালেঞ্জ চালায়েছিলেন এই বলে যে, কখনো দুটি সাম্রাজ্যবাদের সহচর। পার্টিগুলি নরম নীতি অনুসরণের কথা তাদের ইচ্ছাহাযে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরে অবশ্য কংগ্রেস সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লটিং সামগ্রী—

নিকেল ভাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং টেনিট

কবিবাবু জন্ম দিবসীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শৌ ক্রম :- ৯৭, প্রমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন : ৩৩-৩১২০

৩, রামমোহন পাল লেন, কলি-১২ :

অফিস-ফোন-৩৪-৪৮৫৩

সাম্প্রতিক সমুদায়

হয়, বিশেষ করে রুশ নেতাদের। ভারতে আগমনের পর থেকে কংগ্রেসের ঐশ্বর্য বামপন্থী নীতি অবলম্বন করার ফলে। দ্বিতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের প্রো-কমিউনিস্ট পররাষ্ট্রনীতিতে কমিউনিস্টরা কিছুটা ভুলেছিল এবং তাদের দ্বিতীয় নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতির এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে তারা বলেছিল “প্রিসাইজলি দি ওয়রেন্টিংস হাইচ দি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া অলওয়েজ অ্যাডভোকেটেড।” আরও একটি বিস্ময়কর জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে সে সময়কার ইস্তাহারে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের সমরসভার বৃদ্ধি করার কথা বিশেষ করে বলেছিল : “দি পার্টি উইল ডিমান্ড দি ডেভালাপমেন্ট অফ আম্যামেন্ট এয়ারক্রাফট এন্ড শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ উইথ এ ডিউ টু স্ট্রেনর্সিং অ্যাওয়ার সিকিউরিটি এন্ড ন্যাশানাল ইন্ডিপেন্ডেন্স।” চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হলে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের আঞ্চলিক অর্থডা বজায় রাখার কথা ঘোষণা করেছিল এবং ম্যাকমহেন লাইনকেই চীন ও ভারতের স্থায়ী সীমানা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে চীন সংক্রান্ত নীতিকেই কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট হলে ভাঙন ধরে যার পরিণামে কমিউনিস্ট পার্টি শেষ পর্যন্ত স্বাধা বিভক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় নির্বাচনের তুলনায় তৃতীয় নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির হাস-বৃদ্ধি হয় নি। প্রথম নির্বাচনে কমিউনিস্টরা মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ বিধানসভায় যথাক্রমে ৬২ ও ৪২টি আসন সংগ্রহ করে, এবং দ্বিতীয় নির্বাচনে কেবলে ৬০টি এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৬টি আসন দখল করে রীতিমত চাপলোর সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয় নির্বাচনে অল্পে ৫১টি ও পশ্চিমবঙ্গে ৫০টি আসন এই পার্টি দখল করেছিল।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি (দক্ষিণ) প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমবায়ে কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করতে ইচ্ছুক। গত তিনটি নির্বাচনী ইস্তাহারের সঙ্গে এইখানে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এখন কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য হচ্ছে যে আজকের ভারতের সার্বিক সংকটের মূলে রয়েছে একটিমাত্রই কারণ, তা হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ। সরকারের ব্যর্থতার-সে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা একটি বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন মারফত পূর্ণ হতে পারে। কংগ্রেসের মধ্যে যে দক্ষিণপন্থী প্রণয়নের সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করা প্রয়োজন। এই পার্টি কংগ্রেসের ভিতরকার প্রগতিশীল শক্তিসমূহের গুরুত্ব

গ্রহণের ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমী ব্লকের দেশগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাবসম্পন্ন। চতুর্থ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের অপরাপর বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনী সমঝোতার এসেছে। পশ্চিম-বঙ্গে এদের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও বলশেভিক পার্টির নির্বাচনী আভাত হয়েছে।

মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি

ভারতীয় রাজনীতির রণাঙ্গনে বামপন্থী কমিউনিস্টরা মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট নামে পরিচিত হয়েছে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে বামপন্থী কমিউনিস্টদের মতপার্থক্য আজ নানা কারণে অনেক গভীরে চলে গেছে, যে ইতিহাস বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা এখানে নেই। আসন্ন চতুর্থ নির্বাচন সম্বন্ধে বামপন্থী কমিউনিস্টদের একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। তারা বলতে চায় যে, আজকের ভারতের চরমতম অর্থনৈতিক সংকট অতি দ্রুত গভীরতর “রাজনৈতিক সংকটে” রূপান্তরিত হতে চলেছে বা কালক্রমে গুণগতভাবে উন্নততর শ্রেণীসংগ্রামে রূপ নেবে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতায় আসীন হবার ঐতিহাসিক প্রয়োজন রয়েছে। বাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান খিওরিটিসিয়ান হাসব পুন্মিয়া মনে করেন যে বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর সংঘর্ষ থেকে স্বতচ্ছারিত কোন পরিণতি এই মর্মেতে উৎপন্ন হবে না কিন্তু তা নতুন বঙ্গের-স্বপ্নপাতের সহায়ক হবে। বাম কমিউনিস্টদের মতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোনই তাৎপর্য নেই বতর্কণ না পর্যন্ত সমগ্র কাঠামোটায় মথোই চিড় ধরছে। বর্তমান সরকার জমিদার, পুঁজিপতি ও বিদেশী মূলধনের অনুগত এবং এই কারণেই তার উচ্ছেদ প্রয়োজন, কিন্তু এই সঙ্গে বাম কমিউনিস্ট পার্টি এ কথাও স্বীকার করে যে, তার একার পক্ষে বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, এই কারণে বিভিন্ন প্রগতিশীল উপাদানের সঙ্গে বাম কমিউনিস্ট দল নির্বাচনী সমঝোতার কথা বলে। ছুঁমিসংস্কার রাষ্ট্রীয়স্বণ, সামরিক খাতে বরাদ্দ হাস, ব্যাপ্ত জাতীয়করণ, মার্কিন সম্পর্ক বর্জন, কমনওয়েলথ ত্যাগ, আফ্রো-এশীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি বাম কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বিষয়বস্তু। এই দলের সঙ্গে বিভিন্ন বামপন্থী দলের নির্বাচনী যোগাযোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি বামপন্থী

একটি সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে।

উপসংহার

তাইলে দেখা যাচ্ছে এবারকার সাধারণ নির্বাচন এমন কতকগুলি মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যা আগামী দিনের ভারতের ইতিহাসে একটি অসীম তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি বহন করে নিয়ে আসছে। নির্বাচনের ফলাফল ঘাই হোক না কেন, আগামী দিনের ছবিটি বড় উজ্জ্বল নয়। প্রত্যেকটি প্রতিদ্বন্দী রাজনৈতিক দলই আজ একটা চরম আদর্শগত সংকটে পড়েছে, বিশেষ করে বর্তমান শাসক দল। একদিকে দেখা যাচ্ছে ধীর অথচ পর্যাপ্ত গতিবেগের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী উপাদানসমূহ দ্রুত প্রভাব বিস্তার করছে। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহ বহুধা বিভক্ত। দেশবাসীর সামনে আগামী দিনের আশার আলো দেখাতে আজ কোন দলই সক্ষম হচ্ছে না। ইস্তাহারসমূহে চমকপ্রদ কথা অনেক আছে, কিন্তু কি করে সেগুলি কাজে পরিণত হবে সে বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। আর কয়েকদিনের মধ্যে ভোটগ্রহণ কার্য সমাপ্ত হচ্ছে কাজেই অনাবশ্যক স্পেকুলেশন এই মর্মেতে অর্থহীন। মূর্খের বিষয় আমাদের দেশের ভোটাররা সুসংবেদনশীল নয়, ফলে আদর্শের মাগকাঠিতে বিভিন্ন ধরনের কার্যকর বিশ্লেষণ করে ভোট দেবার ঐতিহ্য এ দেশে পড়ে ওঠে নি। সে ঘাই হোক আসন্ন সংকটময় দিনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভোটদাতাদের হৃদয় সম্ভব ততদূর ত্রিটিকাল হওয়া প্রয়োজন, কেন না এমনও হতে পারে যে এই নির্বাচনই জনসাধারণের মত প্রকাশের শেষ সুযোগ।



অবজ্ঞা

চন্দ্রশুশ্রু

শোনা যায়, এক সময় হিটলার ভিয়েনার একটি বড় দোকানে সেলসম্যানের দায়িত্ব প্রার্থী হয়েছিলেন। কোহন নামে জনৈক ইহুদি ছিলেন দোকানের বড় কর্তা। তিনি বিনা বাক্যবাহ্যে হিটলারকে বিদায় করতে চাইলে হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে দু'-চারটে কথা না বলে থাকতে পারলেন না। ফলে হিটলারকে খেতে হলো কোহনের লাথি। ইহুদি কোহনের লাথি পৃথিবীর ইতিহাসকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল ইতিহাসের ছাত্রের তা অজানা নয়।

আরও অসংখ্য ঘটনা মনে পড়ছে। কিন্তু সময় অল্প, পরিসর সংক্ষিপ্ত। আর মুখ্যত যে রাজনীতিজীবীদের জন্য এ রচনা, আমার চোখে তাঁরা বেনাবনের বাসিন্দা। অতএব.....

সোজা কথার তাঁদের কাছে আমার অবজ্ঞা: আমি ইতিহাস প্রণয়নে ব্যক্তির ভূমিকার বিশ্বাসী। আমার মতে যুগে যুগে ব্যক্তিই ইতিহাসের গতিধারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন, সমসাময়িক সমাজের শক্তির প্রতীক হয়েও এইসব ব্যক্তি সমাজ-শাসিত নন, সমাজ-অতিশয়ী।

অর্থাৎ আরো সোজা ভাষায়, আমি 'ব্যক্তি'তে বিশ্বাসী, 'দলে' নই। দলের জন্ম দলীয়দের জন্য, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার শক্তিদল কোটানোর জন্য ব্যক্তির আবির্ভাব। 'দল' কখনও 'ব্যক্তি' সৃষ্টি করে না, 'ব্যক্তি'ই দল সৃষ্টি করে।

দূরে যেতে হবে না। ঘরেই দৃষ্টান্ত: কংগ্রেস বলতে আজ অতুল্য ঘোষ, বাম কম্যুনিষ্ট পার্টি বলতে জ্যোতি বসু।

কংগ্রেসের কোন প্রার্থীকে ভোট দেবার কথা ভাবতে গেলে তাহলে কেন মনে আসে অতুল্য ঘোষের ছবি, কিংবা বাম কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন প্রার্থীর বেলার কেন জ্যোতি বসুকে মনে পড়ে?

আর এই ১৯৬৭ সালেও স্বাধীনতার বিশ বছর পরে যখন একদা ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজ-নন্দিত গণভক্ত গড়ে উঠল না, তখন গণভক্তের দোহাই না পাড়া হলো। কারণ স্বাধীনতার পরে দীর্ঘকাল

আমরা কার্যত কংগ্রেস নামক কোন দলের শাসনে ছিলাম না, ছিলাম জহরলাল নেহরু নামক একজন স্বপ্নচারী ব্যক্তির মায়াবী ছায়ায়। নেহরুর রাজত্বের শেষদিকে আমাদের মোহমুক্তি ঘটে ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চীনের আক্রমণে। এই মোহমুক্তি ঘটানোর জন্য বৈরী চীনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

চীন আক্রমণের পর থেকেই দেশে চীনপন্থী নামে একদল 'প্ৰগতিবাদী'র আবির্ভাব হলো, অধুনা যারা 'বামপন্থী' কম্যুনিষ্ট পার্টির শিবিরে সংহত হয়েছেন।

১৯৬২-র পরে ১৯৬৫ সালে এলো আর এক বিপদযুগ: পাক-ভারত যুদ্ধ। বাস্তব-সচেতন লালবাহাদুরের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত ইজ্জত বাঁচালো। কিন্তু লালবাহাদুর বেশিদিন বাঁচলেন না। সমরোচিত মৃত্যু তাঁকে বাঁচিয়ে রাখল।

তারপর ১৯৬৬-র ৬ই জুন চীন হামলার মতোই এলো এক শতীনের হামলা! কেন্দ্রীয় অর্থ কিংবা অনর্থ-মন্ত্রী শচীন চৌধুরী অকস্মাৎ মৃত্যুমুখ্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।



শ্রীঅমিয়নাথ বসু

অর্থমন্ত্রীর দক্ষপদ পথে এগিয়ে গেলে গোটা দেশ।

অতএব চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট এবং শচীনপন্থী কংগ্রেস দুই-ই আমার কাছে ভরের কারণ।

ভাবতেও ভর হয়, আরামবাগ কেন্দ্র থেকে শচীন চৌধুরী লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে গেলে এবং তারপর পুনরায় অর্থমন্ত্রী হলে এবং তারপর পুনরায় মৃত্যুমুখ্য হ্রাস করলে.....

'তার আর পর নেই!'

সুতরাং আরামবাগ কেন্দ্রের ভোটের হিসাবে আমি নেতাজীর ভাতুপুত্রের শরণ-চন্দ্র বসুর পুত্র শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বসুকেই আমার মূল্যবান ভোটাটি দিই।

প্রাদেশিক শোনাতেও আমি বলব, আমি প্রথমে বাঙালী, পরে ভারতীয়। 'দিল্লীতে বাংলার কথা পৌঁছে দেবার যোগ্যতম ব্যক্তিদের অন্যতম অমিয়নাথ বসু।

শচীন চৌধুরীর অনির্মূল সিদ্ধান্তে কংগ্রেসেরই বহু সঙ্জন ব্যক্তিগত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং তাঁদের কারো কারো ক্ষোভ প্রকাশ্যেও শোনা গেছে। আমার কাছে সেইসব সঙ্জন স্বভাবতই শ্রদ্ধার পাঠ। দেশের কথা মিনি ভাবেন, আমিও তাঁর কথা নিশ্চয়ই ভাবব। প্রখ্যাত আইনবিদ শ্রীযুক্ত অশোক সেনকে তাই আমি যোগ্য প্রার্থী মনে করি। গ্রীসেন অকংগ্রেসী কোন দল থেকে দাঁড়ালে আমি যে অধিকতর খুশি হতাম বলাই বাহুল্য। দিল্লীতে বাঙালীকে প্রতিনিধিত্ব দানের যোগ্যতা তাঁর কবায়ন, সুতরাং তাঁর পুনর্নির্বাচন বাঙালীর স্বার্থেই হওয়া উচিত বলে আমার বিশ্বাস।

ঠিক তেমনি বাঙালীর স্বার্থেই অশোক সেনের মতো হুমায়ুন কবিরেরও লোকসভায় পুনর্নির্বাচিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলা এবং বাঙালীর জন্য হুমায়ুন কবির যে সত্যই কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর মস্তিষ্ককালীন ইতিহাসেই তার প্রমাণ। কৃতী ছাত্র সফল অধ্যাপক এবং মনস্বী লেখক হুমায়ুন কবির তাঁর দেশহিতৈষী ও কম্যুনিষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন একাধিক ক্ষেত্রে: দমদম বিমান-বন্দরকে জেট বিমান চলাচলের উপযোগী করণে, দুর্গাপুরে রাসায়নিক কারখানা নির্মাণে এবং প্রকৃত অর্থ সাহায্যে এশিয়াটিক সোসাইটি রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রসার-বিবর্তনে।

১৯৫৬ সালে রাজসভায় তাঁর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হলদিয়া বন্দরের পরিকল্পনা হয় এবং পরে তাঁর উদ্যোগ ও চেষ্টাতেই হলদিয়াতে তেল শোধনাগার এবং পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হুমায়ুন কবিরের মন্দি-সভা থেকে অপসারণের সঙ্গে হলদিয়ার শব্দকগতিতে কাজ চলার সম্পর্ক আছে এমন সন্দেহও দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ প্রাদেশিক শোনাতেও বলব, বাঙালীর ভাগ্যে শিকে ছেঁড়বার সম্ভাবনা দেখা দিতেই কেন্দ্রের বাঙালী-বিশ্বেষী কর্ম-কর্তারা সচেতন হয়ে ওঠেন। আয়তনফা মানুষের সহজ প্রবৃত্তি, বাঙালী হিসেবে আমি আমার স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন, আমার প্রাণ্য অপরে কেড়ে নেবে এটা আমি বরদাস্ত করব না। আর সেই কারণেই আমি লোকসভায় অমিয়নাথ বসু, অশোক সেন, রেণু চক্রবর্তী, ত্রিদিব চৌধুরী, হুমায়ুন কবির, হীরেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়ের মতো যোগ্য প্রতিনিধিদের বিষয়ে নিয়ত সজাগ। অন্যভাবে, আমার কাছে রাজনীতির উর্ধ্ব নীতি, দলের উর্ধ্ব বাঁধ। দলের স্বার্থে আমি দেশের স্বার্থকে কয় হতে দিতে প্রস্তুত নই। দলমতনির্বিশেষে সঙ্কীর্ণ সং ও উদ্ভ্রান্ত পুরুষ লোকসভায় নির্বাচিত হোন, আমার নিঃস্বার্থ নাগরিক চিন্তার এই কামনা।



শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী

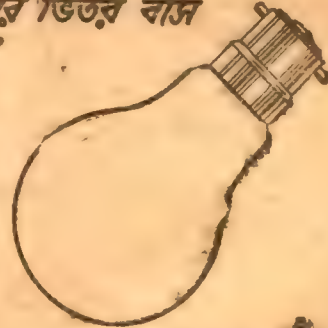
অথচ দলীয় রাজনীতির পথ এতই পঙ্ক-জটিল, সেখানে একদা-কংগ্রেসসেবী হুমায়ুন কবিরকে নির্বাচনে পরাস্ত করার চেষ্টার চ্যুতি নেই। তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা হচ্ছে এমন একজনের মুখ দিয়ে, যার

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ। আসামের মন্ত্রী, মৈনুল হক চৌধুরীর নাম আসামের 'বঙ্গাল-বেদা আন্দোলন'ের সূত্রে আমাদের অতি পরিচিত। অথচ সেই হক চৌধুরীকেই আজ বাংলাদেশে থেকে আমরা হলো মুসলমান-প্রধান বসিরহাটের মন্ত্রী-মহাদানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর জন্য। আর এই হুমতেই 'জাতীয়তাবাদী' নামধারী এক শ্রেণীর সাংবাদিকদের চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগে যখন দেখি কোন কোন সংবাদপত্র অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মৈনুল-বিষ বাজারে ছড়ানোর কাজে কোমর বাঁধেন। সত্যই কি বিচিত্র এই দেশ!

নির্বাচনে ব্যক্তিদের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রসঙ্গেই মনে আসে, শুধু লোক-সভায় নয়, প্রাদেশিক বিধানসভাদুলিতেও উপযুক্ত প্রার্থীর যাওয়া উচিত। পশ্চিম-বঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে তাই আমি দলমতনির্বিশেষে যোগ্য প্রার্থী প্রেরণের পক্ষপাতী। এবং সেই কারণেই আমি বাম-কম্যুনিষ্ট জ্যোতি বসুর বিরোধী হলেও পার্লামেন্টারিয়ান জ্যোতি বসুর এবং একই সঙ্গে জ্যোতি বসুদের নিন্দা-ভাজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ হেমন্ত বসুরও অনুরাগী। আর আদর্শনিষ্ঠা ও সাধুতার প্রতীক ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যদি নির্বাচিত

এক যে ছিল বুড়ী তার জুতোর ভিতর বাজ

'ভালো আলোয় দৃষ্টি খোলে'
—এই ছিল বিদ্যাজ
বেঙ্গল হান্সা ল্যাম্প ছিল
তার মনোমত আলো
সবাই বলত তাই—
বুড়ীর পছন্দ খুব ভালো



বেঙ্গল
হান্সা
ল্যাম্প

সোলিং এজেন্টস: বেঙ্কেনেক্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • আমেদাবাদ
হেড অফিস: ১০, প্রিন্সিপ স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩

সাম্প্রতিক বঙ্গবন্ধু

মা হন তা হলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অপমৃত্যু ঘটেছে। যদি কেউ দলের মোহাই দিয়ে আমাকে বলেন, ভোটের হিসাবে আমার একটি দলকেই সমর্থন করা উচিত তাহলে আমি সবিনয়ে আমার অবতরণ পুনরুজ্জীবিত করবো : আমি ব্যক্তি মানি, দল মানি না। কোন রাজনৈতিক দল একটি প্রস্তুতরথকে ভোট দিতে অনুরোধ করলে প্রাণবান আমার পক্ষে সে অনুরোধ রাখা কি সম্ভব?

জানি, দু'কুটি-কুটিল মন্তব্য অতঃপর আমার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হবে : আমি রাজনীতি ক্ষেত্রে 'খিচুড়ি' চালানোর পক্ষপাতী। উত্তরে আমার অবস্থাব্য : আমাদের গোটা জীবনটাই—কি ভিতরে কি বাইরে—'খিচুড়ি' নয় কি? প্রাত্যহিক অস্তিত্বের জন্য আমাকে কি কাঙ্ক্ষিতের সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিতের প্রিয়র সঙ্গে



শ্রীদিব চৌধুরী

রাজনৈতিক নির্বাচনের লগ্নে সাংস্কৃতিক আকাশ মলিন হওয়াই স্বাভাবিক, বিশেষত যে দেশে গণতন্ত্র এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু মৃত দেশ-পূজ্য ব্যক্তিকে যখন অকারণে ছোট করার চেষ্টা হয়, তখন ব্যক্তি 'জাতি' হিসাবে বড় হতে আমাদের এখনও অনেক দেরি। নতুবা কেন তথাকথিত শিক্ষিত নট-ও নাট্যকার শ্রীমান উৎপল দত্ত সম্পাদিত 'প্রসেনিয়াম' পত্রিকার (৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) প্রকাশিত জনৈক রচিত একটি নাটকের সংলাপে অত্যন্ত নোংরা ইঙ্গিতে জাতির জনক গান্ধীজিকে পক্ষে নামানো হবে! যৌনজীবন-সংক্রান্ত যে কঠোর পরীক্ষার কথা আমরা গান্ধী-শিষ্য নির্মল-



ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ

অপ্রিয়র সম্মুখ করতে হচ্ছে না? স্বয়ং প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরালে সেখানেও দেখা যাবে 'খিচুড়ি'। সূর্যের আলোককে সাটটি রঙের খিচুড়ি ছাড়া আর কি বলা যায়? প্রকৃতিতে এবং জীবনেই যখন খিচুড়ি তখন রাজনীতিক্ষেত্রেই খিচুড়ি চলবে না কেন? কেন আমি একই সঙ্গে বিধানসভায় প্রবীণ হেমন্ত বসু বা জ্যোতি বসু এবং তরুণ জ্যোতি ভট্টাচার্যের এবং লোকসভায় দ্বিদিব চৌধুরী বা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচন-সাফল্য কামনা করবো না? এবং এক সঙ্গে দেশহিতৈষী ও উপযুক্ত প্রতি-নিধি বিধানসভায় ও লোকসভায় উপস্থিত থাকলে তাতে দেশের সামগিক মঙ্গল ছাড়া ক্ষতি হবে না।



শ্রীজ্যোতি বসু

কুমার বসুকে কেন্দ্র করে, তাকে কেন্দ্র করে নিয়মের উত্ত নাট্যকার মশায় অত্যন্ত ঘণ্যভাবে বিকৃত করেছেন। গান্ধীজির রাজনৈতিক মত বা কর্মপন্থার অননুমোদন কি তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণেই বাধ করতে হবে? উৎপল দত্তের মতো ক্ষমতাবান শিল্পী—এবং শিল্পী যখন তখন নিশ্চয়ই রুচিবান—কি করে এই নাটক ছাপলেন ভাবতে অবাক লাগে। আর অবাক হবার অবশ্য কিছুই নেই কারণ সম্প্রতিই শ্রীমান উৎপলের মূখে সবই শোনা যায়।

* * *

আমাদের বর্তমান জাতীয় চরিত্রে উপর আলোকসম্পাতী এনে দেব মাসের দিয়ে এবারের রচনা থেকে যেটা পড়ে



শ্রীহেমন্ত বসু

৪ঠা ফেব্রুয়ারি শ্রদ্ধেয় জনৈককে বিদায়-সংবর্ধনা জানাবার জন্য দম্ভস্বর শ্রীমান-বন্দরে গিয়েছিলাম। একটি বিশেষত্ব হল নোকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা। এমন সময় একজন বিদেশী সেখানে এসে। দেড় টাকার মতো কিছু পত্রিকা কিনলেন, দোকানীকে একটি দ. টাকার নোট দিলেন। বিদেশী ও দোকানী দু'জনেই নোকানীর কাছে চেঞ্জ ফেরত চাইতে দোকানী বলল :

This is Airport.

এবং বিদেশী ভুললোকের স্বরিত তীক্ষ্ণ জবাব :

And this is India !

ঐচ্ছিক

ভূখ মিছিল—দিনেশ দাস। এডারেল্ট বুক হাউস; এ।১২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকতা-১২। দাম : দু' টাকা।

‘ভূখ মিছিল’ প্রথম সংস্করণ বের হয়েছিল ১৯৪৪-এ। দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে ১৯৬৬-তে। প্রায় বাইশ বছরের ব্যবধান। ১৯৪৪-এ প্রকাশিত পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি নিশ্চয়ই তার আগেই কয়েক বছরের মধ্যেই লেখা। সেই কণ্ঠি বছর ইতিহাসের পাতায় বিরাট জায়গা দখল করেছে এবং করবেই। তার মধ্যে আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪৩-এর হত্যাকাণ্ড, সুভাষচন্দ্র বসুর ভারত ত্যাগ ও মারলন থেকে আর্চিমিডেস বোতার ভাষণ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রভৃতি। সেই অনেক কিছুর মধ্যেই আছে সোটা ভারত-বর্ষ ও বশিষ্ঠ মানবের সম্পূর্ণ জীবনাবলীর মধ্যে প্রমুখ বিশ্লেষণ ইংগিত। সত্যি কথা বলতে কি ইতিহাস কবিতা নয়। কবিতার দ্বারা ইতিহাসের পটভূমিকায় মানবের জীবন। আর ঐতিহাসিক কবি দেখান সেই মানবকে পথ। তিনি হুকিরে দেন জীবনের মানে। দিনেশ দাস সেই এক ঐতিহাসিক কবি, ‘কালো কবি’ বলে যিনি আখ্যাত এবং যার কবিতার আমরা শুনতে পাই বিপ্লবের পদধ্বনি। শ্রীযুক্ত দাসের ‘ভূখ মিছিল’, ‘ডাস্টবিন’, ‘নববর্ষের স্বপ্নবাজসের ভোজ’, ‘কেরানী’, ‘ভারত ছাড়ো’, ‘সাম্রাজ্য’ কবিতা এককালে একালের নামী নেতাদেরও অনুপ্রেরণা দান করেছিল। তবে শব্দ সেকালের অনেকই তিনি কবিতা লেখেন নি। তাঁর কবিতার আছে সেই সত্যিকার মস্তোচ্চারণ যা সেকালে ছিল সত্য এবং একালে তা আরো সত্য। সেই বহু পঠিত, বহু উচ্চারিত ও বহু প্রচারিত কবিতাটির উদ্ধৃতি আবার আমরা দিচ্ছি—

“দক্ষিণ দিক” যত ইংগিত দিক
দক্ষিণ হাওয়া দিক যত হাওয়া
ওপরে বন্ধ হবে জানি রাজধানী
উলটো সড়কে চলো ঠিক নিভীক।
দক্ষিণ পথে জেলে যদি দক্ষিণা—
জেবে দেখো তুমি সেই পথ ঠিক
কি না :
আমাদের পথ নয় জেনো দক্ষিণে—
বামপন্থ নিও চিনে,” (বামপন্থী)।

বলা বাহুল্য, এ কবিতা দিনেশ দাস ইদানীংকালে লেখেন নি। তবে যুগোত্তীর্ণ তাঁর চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে নির্ভুল পথ-রেখায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কবে শেষ হয়ে গেছে, ইংরেজ সরকার পাতত্যাগী গুটিয়েছে এদেশ থেকে—তবে ‘ডাস্টবিন’ কবিতার আরোদন একজলেও মিথ্যা নয়। তিনি লিখেছেন,

“এই যে খুনে সভাতা
অনেক জনের অঙ্গ মেরে করেক জনের
ভাষাতা,
এগোয় নাকো গোহোয় নাকো অচলগতি
হিসাবকর—
হোটেলখানার পাশেই এরা বাসিন্দে
চলে আস্তাকুড়।”

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, দিনেশ দাসের কবিতায় বহু বাস্তবতার প্রকাশ থাকলেও কাব্যসভা থেকে তা বিন্দুমাত্র বিচ্যুত নয়। ছন্দ-যোজনা ও শব্দ প্রয়োগের কলা-কৌশলের গুণেও মনের মধ্যে এক গভীর অনুরাগের সূচি হয়।

এতদসঙ্গেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এমন সুরের একটি কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের এতো বিলম্ব দেখে আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। তবে আনন্দের ব্যাপার এই যে, সবচেয়ে বেশি যখন—দিনেশ দাসের ‘ভূখ মিছিল’ কবিতাগুলি পঠ করে—প্রেরণা লাভ করা দরকার ঠিক সেই চরম মুহূর্তেই বাক্যগুটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

মি পার্নেল ট্যাক্সেডো—জুলস আবেলস্
লিখিত ও বড়লে হেড কর্তৃক প্রকাশিত।
মূল্য : ৪২ শিলিং।

যদি এই হত কথাটা ঐতিহাসিক ব্যাপারে খুব ফলপ্রসূ হয় না, তবে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে বাক্যটি একরকম অপরিহার্য। যদি ঐশ্বরশালী মিসেস বেন উড ১৭ই বছর অবধি না বেঁচে ১০ বছর বরসে মারা যেতেন—এবং এই ১০ বছর বরসটাও নেহাৎ কম বরস নয়—তাহলে তিনি খুবই সুবিবেচনার কাজ করতেন। কারণ সেক্ষেত্রে উনিবংশ শতাব্দীর শেষ হবার আগেই

আয়ারল্যান্ড “হোমরুল”-এর আধিকার লাভ করতো। মিসেস উড ছিলেন মিসেস ক্যাথারিন ও’সির অস্ট্রা মিসেস উডের বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবার জন্য মিসেস ও’সি ও চার্লস “টুফাট” পার্নেলকে বহু বছর ধরে ব্যাভিচারকলুষিত জীবনব্যাপন করতে হয়। উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধক না থাকলে মিসেস ও’সি অনেক আগেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পার্নেলের জন্য নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত এই স্ক্যান্ডেলের জন্যই পার্নেলের কর্মজীবন নষ্ট হয়ে যায়, এবং ‘হোমরুল’ আশাপ্রদ সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়।

পার্নেলের জীবনের যে বিশেষ দিকটি এই বইতে আলোচিত হয়েছে তা পাঠক-মনকে চম্পকের মত আকর্ষণ করবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ডিভোর্সের ব্যাপারটা বাদ দিলেও, পার্নেলের কর্ম-জীবন চিরদিনই ছিল অসাধারণ। ১৮১৮ সালে গ্র্যাডস্টোন বলেছিলেন :

Parnell was the most remarkable man I have ever met. I do not say the ablest. I say the most remarkable and the most interesting. He was an intellectual phenomenon.

আইরিশ জাতির ভেতর এতাবৎ বড় নেতার আবির্ভাব হয়েছে—অবিসংখ্যাদিত-ভাবে পার্নেল তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাঁর নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয় তার ফলে বৃটিশ-শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাজনীতিক-স্বত্রে পার্নেলের মত শক্তিশালী এবং কঠিন মানসের নেতা বহু কক্ষই দেখা গেছে। বৈশ্বাভিক জীবনে তাঁর সাফল্যের পরিমাণও কম নয়—অন্যতঃ অনেক দিক থেকেই এতোটা সাফল্য লাভ করবার উপযুক্ত গুণাবলী তাঁর ভেতর ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর বহুকালের ধর্মিক সঙ্গী এবং একান্ত মনোভর আইকেল ডোভি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন :

He had neither wit nor humour, eloquence or the passion of conviction, and academic distinction of any kind, scholarship or profession, Irish accent, appearance or mannerism.

তবে আইরিশ পার্টি ছিল সম্পূর্ণভাবে তাঁরই নিরন্তরাধীনে—যদিও এক এক সময় মানের পর মাস তিনি পার্টি-মেটে অনুপস্থিত থাকতেন। নিজে প্রটেক্টেড জমিদার হলেও তিনি রোমান ক্যাথলিক কৃষক সম্প্রদায়ের আইরিশ জাতিকে স্ব-নেতৃত্বে পরিচালিত করতেন।

ঐতিহাসিক বসুমতী

তার ব্যক্তিগত চরিত্রও ছিল অত্যন্ত অশুভ। একদিকে যেমন রাজনীতিক কটকৌশলের তিনি ছিলেন সেবা বিচাৰক, আবার অন্যদিকে অপরিণত মস্তিষ্ক শিশুদের মত অনেক সময়েই যে সব কাজ করে ফেলতেন তাব ভেতর বুদ্ধি কখনও পবিচল পাওয়া যেতো না। বহু বৈপ্লবী গুণের সমাবেশ—তার ভেতর ছিল—কখনও তিনি ধীবিশ্বের আবার কখনও তিনি উদ্দাম এবং আবেগ-পূর্ণ, কখনও অত্যন্ত সুবিবেচক, আবার সময় সময় তার আচরণ ছিল উদ্দামের মত। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন কঠোর অসংযমী, কিন্তু এদিকে আবার বিলাসপূর্ণ হোটেলগুলিতে তাঁর স্বাভাবিক বিরূপ অঙ্গের বিল সঞ্চিত হয়ে উঠতো। একসময় হয়তো ছদ্মবেশে চাৰ-দিকে ঘুরে খবরদারি করে বেড়াতে লাগলেন, এই উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য দাড়ি-গোঁফ পরন্ত কার্মিয়ে নিতেন, তাব পরেই এমন সব কান্ড করে বসতেন যার ফলে জ্বলন্ত পার্লামেন্টের মধ্যে পড়ে ভারসাম্য সামলানো পরন্ত প্রাণ অসম্ভব হয়ে উঠতো। মিসেস ও'সির সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠল, যে কোন স্তরের রাজনীতিক নেতাব পক্ষে তা বিপজ্জনক। অথচ এদিকে অস্তর থেকে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে ষণ এবং সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা করতেন। তা সত্ত্বেও এমন বিপদের বড়ি ঘাড়ে নিলেন যে শেষ পরন্ত এক বুদ্ধিবৈবেচনাসহী মধ্যবয়সী মারীর জন্য তাঁকে ষণ, খ্যাতি, গৌরব সব কিছু বিসর্জন দিতে হোল। যখন সত্যিকার বিস্ফোরণ ঘটল তখন প্যানেল এমন সব কান্ডকাখানা করতে লাগলেন যার ফলে পরিপাতি আরও কদর হয়ে উঠল—দেখেশনে মনে হত প্যানেল যেন স্বেচ্ছায় ব্যাপারটাকে জটিলতর করে তুলছেন এবং পরীক্ষা করে দেখতে চান আইরিশ জাতি এবং তাঁর অনুগামীরা তাঁর বিষয় কতদূর অবধি সহ্য করতে পারে।

বিগত তিরিশ বছরে প্যানেলের কোন জীবনী রচিত হয় নি। সেই কারণেই মিস্টার আবেল্‌সের এই নতুন জীবনীটি সব দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। তিনি হয়তো প্যানেল সম্পর্কে বিশেষ কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করতে পারেন নি কিন্তু অনেক ব্যাপারেই নতুন ভাষা দিয়েছেন। এই বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যাতে

হয়েছিল, স্থির মস্তিষ্কে একজন বিবাহিত মহিলাকে তিনি সিঁড়িধুস করেছেন এবং তার স্বামীকে প্রত্যাখ্যাত করেছেন একথা সবাই বুদ্ধিতে পেরেছিল। ১৯৩১ সালে প্যানেলের সারা জীবনের সহকর্মী হেনরী হ্যারিসন এ ব্যাপারে প্যানেলের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে গিয়ে যা বলেছিলেন অনেকেই তা বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যাখ্যার গম্ভীর ছিল এই—প্যানেল এবং মিসেস ও'সি মিসেস উডের ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার পাবার জন্যই তাঁদের সম্পর্কের কথাটা গোপন রেখেছিলেন। ক্যাপ্টেন ও'সি সব-কিছুই জানতেন এবং তিনিও একই কারণে কোনো গোলমাল করেন নি। হেনরী হ্যারিসন এমন কথাও বলেছিলেন যে মিসেস ও'সিকে গ্রহণ করে প্যানেল তার স্বামীর সত্যিকার উপকারই করেছিলেন। প্যানেল নিজেও ঘোষণা করেছিলেন যে মিসেস ও'সির ব্যাপারে তিনি কোন অন্যায় বা অসম্মানজনক কাজ করেন নি। তিনি বোধহয় এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মিসেস ও'সিকে বিয়ে করার ব্যাপারে চার্চের আশীর্বাদ না পেলেও তার পূর্বস্বামীর আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন।

মিস্টার আবেল্‌স দেখিয়েছেন যে উপরের ভাষাটি ঠিক নয়। ও'সি বহুবার পব বহুর প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। দু'বার প্যানেলের স্বারা মিসেস ও'সির সন্তান-সম্ভাবনা হয় এবং তিনি স্বামীকে এ বিষয়ে অশ্বকারে রাখবার জন্য ঐ দু'বারই স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেন। মিসেস উডের মৃত্যুর পরও প্যানেল এবং মিসেস ও'সি বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে উৎসাহ দেখান নি। বরং মিসেস ও'সি চেষ্টা করেছিলেন টাকার বিনিময়ে মিস্টার ও'সির মূখ বন্ধ রাখতে। একথা আমাদের বোধগম্য হয় না কি ভেবে প্যানেল রাজনীতির দিক থেকে এই বিবাহ-বিচ্ছেদের উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এ কথা তো তাঁর অজানা ছিল না যে তাঁর অনেক প্রচণ্ড শত্রু রয়েছেন। লর্ড স্যালিসবারীর মতন লোকও মন্তব্য করেছিলেন :

'Kitty O'shea deserves to have a monument raised to her in every town in England, and another Unionist said that she was the first woman to save her country since Joan'

প্যানেলের হয়তো মনে মনে কোন দ্রাব্য ধারণা ছিল—মিসেস ও'সি তাঁর অধৈর্য সুপার্বীয়া তাঁর বিপক্ষীরা কোন প্রহণ করেন নি। কিন্তু বৃটিশ রাজের এটা তো একটা প্রচলিত প্রথা : হত্যাধবা না পড় যা ইচ্ছা করে হত্যা করা পার।

যে অসম্ভব পরিস্থিতি তৈরি করলেন প্যানেল, তাকে অশুভ-ভাগ্যে ষোগলেন আইরিশ, প্যাটিস্ট এবং তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে প্যানেলকে পুনঃনির্বাচিত করলেন তাঁদের দ্বারা মিসেস ও'সি এবং গ্ল্যাডস্টনের নির্দেশ নিয়ে কৃষি ভাগই তাঁর বিপক্ষে গেলেন। যে ফল প্যানেলের পক্ষে কাম্‌ হারে হস্তা খুলে গেল। তিনি এখন আইরিশ স্বাধীনতাকামীদের প্রধান কণ্ঠস্বর নিজেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। ল্যাংগ পেলেন—লোকে তাঁকে বহুদিনের অধৈর্য প্রেমিক হিসাবে না দেখে ইংলজ রাজত্বের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ্য প্রতিদানক হিসাবে শ্রদ্ধা দেখাতে শুরু করল। এপার প্যানেলের ভুলের ফলে প্যাটিস্ট ভাওন দেখা দিল। একসময়ে প্যাটিস্ট ভেতর সে বলিষ্ঠ আক্রমণাত্মক উগ্র স্পৃহা প্যানেল জাগ্রতে তুলেছিলেন, ভাওনস বহু চাক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল।

বইটিতে আবও অনেক ন্যাকাতীয় ঘটনা আছে, প্যানেলের নেতৃত্ব লাভ থেকে শুরু করে তাঁর নায়ক থাকারদলি বহু কাহিনী। কিন্তু এ সবই চান পড়ে গেছে শেষ পরিণতির ব্যাপারে। ইতিহাসে এক বিরাট জাতির ভবিষ্যৎ ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে প্রধান হয়ে উঠে এক মধ্যবয়সী নরনারীর দীর্ঘ অধৈর্য প্রেমকাহিনী এ একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার—কিন্তু সত্য-সত্যিই যা ঘটেছিল তখন তারই স্পন্দ দিয়েছেন বইটিতে।

মিস্টার আবেল্‌স তাঁর বচনায় নিখুঁত সত্যের বর্ণনার জন্য উচ্চ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। একটি মাত্র ভুল তিনি করেছেন। গ্ল্যাডস্টোন একথা বসনও বলেন নি যে তাঁর পরিচিত এগজন প্রধানমন্ত্রীর সবাই ছিলেন অধৈর্য প্রেম ব্যক্তিগতভাবে জড়িত—তিনি বলেছিলেন ঐ এগারজনের ভেতর সাতজন ছিলেন ঐ জাতের। স্বভাবত মনে প্রশ্ন ওঠে কাব্য এই সাতজন? ক্যানিং, ওয়েলিংটন, গ্রে, মেলবোর্ন, পামারস্টোন এবং তিজ-বল্লীকে মিস হল চান। অন্য

তিন পাহাড়ের স্বপ্ন—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থবিভাগ: ৭৩ বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকতা-২৬। মূল্য : দুই টাকা।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রথম গুণ এই যে, তা' মনকে সহজেই টানে। আধুনিক যুগের তিনি খ্যাতিমান কবি। 'কর্ম' ও 'কনটেস্টে' তিনি আধুনিক নন, তবু এমন স্বাভাবিকতা তাঁর কাব্যে অনুরণিত যে—তা হৃদয়কে অনায়াসে স্পর্শ করে। মোট কথা, তথাকথিত আধুনিক কবিদের মধ্যে আজকাল আবেগ কল যেন কিছুই থাকে না। না থাকার কারণ এই যে, যা তাঁরা লেখেন তার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তাঁদের একেবারেই নেই। অনুভূতি বা আন্তরিকতা তাঁদের নিতান্তই সামান্য। কিন্তু এই অনুভূতি ও আন্তরিকতার অসামান্য সম্পদই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাকে রসোত্তীর্ণ করে তোলে। 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন' কাব্যগ্রন্থে কবির ইতিপূর্বে প্রকাশিত ও অধুনা নিঃশেষিত দুটি কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতা শুনান্বিত হয়েছে। সে সব কবিতার আলোচনা নিঃপ্রয়োজন। কারণ 'মাতলামো', 'পূর্বরাগ', প্রভৃতি কবিতার চরণ যে কোনো কব্যানুরাগীর অন্তরে নিঃশেষে ঘোরাফেরা করে। যেমন, 'আসমানী-ওড়নার

মেঘজরি কলোমলো পরার পাখার মতো নীলমাথা সে', অথবা 'এইতো সে এতটুকু মেয়ে, হাসে খেলে...../পৃথিবী বদলে যায় তবু তাকে একটু জড়ালে।/ বাহোক, আনন্দের ব্যাপার যে, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে কবির অধিকাংশ কবিতা আদিবাসীদের অরণ্য ও পাহাড়কে নিয়ে—যা তাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মন্ডের মতো উচ্চারিত তাদের শব্দের গানেরও বাংলা কবিতায় এমন তর্জমা এর আগে আমরা পাই নি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে দিক দিয়ে অসাধারণ করেছেন। আদিবাসীদের প্রেমকে তিনি নাগরিক পাঠকের জীবনেও সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন। এই যে সাফল্য, এর মূলে নিহিত আছে কবির নিজের মন। তিনি নিজেই ত' আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে লিখেছেন সার্থক "পূর্বরাগ" কবিতা। আর এখন লিখেছেন, "পতঙ্গারি মতন, ওহো কাঁপ দিয়ে পড়ি/মেয়ে। পালক ওড়ালো।" "ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম/শঙ্খচূড়ের কামা : /এ আনন্দ অসহ্য, বোন,/দিসনে লো আর, আর না।/ জেগে উঠলাম, দেখতে পেলাম/আর-না-দেবার সূখে/কেয়া কুলটি ঘুমিয়ে আছে বিষধরের বুকো।" 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন' শীর্ষক কবিতা পাঠ করতে করতে মনে হয় আমরা যেন অন্য জগতে বিচরণ করছি। এ জগৎ এ্যাক্সট্রা হলোও অসাধারণ। পাহাড়, হালিপথ, খালি বিছানা, মাদলের শব্দ—তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ মানুষের আশ্চর্য কামনা—"তোকেও আমি বানিয়ে দেব ঘর;/এখন কিন্তু আশীর্বাদ কর।"

ছন্দ প্রয়োগেও গ্রীচট্টোপাধ্যায় যে স্বেচ্ছা-এর ব্যবহার করেছেন তা সূরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এ সব কারণে বলা যায়, উপরোক্ত গ্রন্থে তার স্বকীয়তা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণই আছে।

কামমোহিতম—চিত্ত ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন; ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : পাঁচ টাকা।

'কামমোহিতম' সেই ব্যর্থ মানুষের জীবন-কাহিনী যে স্বদেশী করতে গিয়েও স্বদেশের বাসনা থেকে বঞ্চিত, দারা-কন্যা ভাগের স্বারা যে সাধনধর্মকে রত করেও কঙ্কালী মন্দিরে মৃত ভাষা শিবানীর স্মৃতিতে ডগ্গত হয়ে তলিয়ে যায়। হয়তো

এই জন্যে উপন্যাসটির মামকরণের সার্থকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তারিণী চক্রবর্তী বলে : "হুর্না নদীর অগভীর শীতল জলে অবগাহন করে সিন্ধু বসনে এসে দাঁড়াই মায়ের সামনে।" "রিপ্পুর তাড়নে এই বন্যা জরাজুর দেখে এখনো, বিশ্বাস করুন বাবা, আমি এখনো উত্তেজিত হই যৌবনের চাঞ্চল্যে।" মনে হতে পারে, যাবতীয় আদর্শ থেকে যে বার বার বিচ্যুত তার জীবনকে উপন্যাসের নামভূমিকায় উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা কি? সেখানে উত্তর এই তারিণী চক্রবর্তীর মতো মনোবেদনায় দৃশ্য-বিশদ্য আজো কারো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মন্দিরে এরা সমাদৃত, তবু এদের অন্তর প্রকাশ করা সম্ভব হলেই বের হয়ে আসে সেখান থেকে হু-হু ঝড়। যে ঝড়ে শোনা যায় কন্যা জারার আকুল ক্রন্দন, ডিটেকটিভ শব্দরের ক্রোধ, স্বদেশী হাবুদলদার হৃদয়োচ্ছ্বাস, মাতার অসীম স্নেহ, স্ত্রীর কামনার আত্ননাদ।

শ্রীচিৎ ভট্টাচার্য উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যেমন দুটি সমান্তরাল গল্প ফেঁদেছেন তেমনি এনেছেন বাংলা দেশের মানুষ তারিণী চক্রবর্তীকে মধ্যপ্রদেশের শিলোন্ডীতে। সেখানে আছে কালী মন্দির। তারিণী তার সেবাইত। সর্বোপরি সেই মন্দিরের কঙ্কালী মূর্তিকে নিয়ে আর এক গল্প রচনা। সেই গল্পে আছে রাজপুত্র আনন্দ—যে ভালবেসেছিল কামিনী চন্দাকে শিল্পীর চোখে। সেই চন্দাকে অতীতের এক যুগে হত্যা করা হয়েছিল রাজ্যদেশে। কিন্তু সেই চন্দার ভালবাসায় যে মূর্তি রচনা করেছিল শোকাৎ আনন্দ—সেই মূর্তির মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে পায় তারিণী তার আপন স্ত্রীকে—যে আত্মহত্যা করে নিঃশেষ করেছে মানসিক দংশন। ঐতিহাসিক পরিবেশ, কিস্কদন্তী, স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য, তাম্রিকতা এবং স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার নরহবিবাবু মতন দেশপ্রাণ মানুষ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে ঘনীভূত করে তুলেছে। মূল কাহিনী হচ্ছে যদিও তাবর্ণীবি জীবন-কাহিনী, তবু আনন্দ ও চন্দার কাহিনীকে একটু বেশিই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। তবে গল্পপ্রিয় পাঠকরা এতে আনন্দিত হবেন।

সাপ্তাহিক বসুমতীর গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

	ট, প.
বার্ষিক চাঁদা (সভাক)	১৪.০০
ত্রৈমাসিক " "	৭.০০
মাসিক " "	৩.৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিলে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। কর্মসম্পাদক

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম-ঠিকানা সহ ডাকটিকিটযুক্ত খাম থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

আবাদ-অঞ্চলের নির্বাচনী হাওয়া

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সেই ববে, জঙ্গল-কাটার সময় রুস্তম মিঞার ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা এসেছিল এখানে, তাবপর থেকে লোনাজলের সঙ্গে লংগ্রাম করেই পুরুষানুক্রমে দিন কেটেছে ওদের। সে কতকাল আগে, সঠিক বলতে পাববে না রুস্তম মিঞা, তা সাত আট কুড়ি বছর আগে হবে। তখন, রুস্তম মিঞার দৃষ্টি অনুসরণ কবে আমিও তাকালাম ডাইনে-বায়ে সম্মুখে। আদিগন্ত শূন্যে প্রান্তর। দূরে নীল জলের রেখা। তখন, এখানে ঘন জঙ্গল, যাঘের বাসা নিশ্চয় ছিল এইখানেই—এই যেখানে ভেড়ার পড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমার।

আবাদের সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র এখন শূন্য। ধান উঠে গেছে কৃষকের ঘরে। এখানে, এই বিপ্লব বিস্তৃত মাঠের মধ্যে এক একটা ছোট ছোট গ্রামের মধ্যেও নেমে এসেছে নির্বাচনী উত্তাপ। সেই কথাই তুললাম রুস্তম মিঞার কাছে। রুস্তম মিঞার দেহটা ছোটখাট। কোমরে গামছা জড়ানো ছিল। নীল ছিটের ডোরাকাটা একটা পিরান। এলোমেলো চুল। শির-ওঠা কপাল আর শাণিত চোখের দৃষ্টি। নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলতেই সেই চোখে যেন অনেক ইতিহাস আভাসিত হল।

এখানে পোস্টার খুবই কম। কখনো-কখনো কোন গ্রামের কোন গাছে বা কোন ঘরের দেওয়ালে এক আধটা পোস্টার চোখে পড়েছে। কিন্তু মানুষগুলো, যারা নেহাতই মাটির কাছাকাছি রয়েছে—তাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে রয়েছে পোস্টার, রয়েছে প্রতীক। এ অঞ্চলের মানুষ, কর্মে কৃষক হলেও, রাজনৈতিক চেতনায় শহরাঞ্চলের মানুষের থেকে কিছুমাত্র কমতি নয়। পাঁচ বছর অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচনে তাদের এক একটি ভোটের যে অসীম মূল্য আছে, সে সম্পর্কে তারা সচেতন।

কিন্তু এবাবের আসন্ন নির্বাচনে আবাদ অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে কতকগুলো নতুন কথা শোনা গেল। অন্ততঃ তিন তিনটে সাধারণ নির্বাচনে এ ধরনের কথা উচ্চারিত হবার বলেই আমার বিশ্বাস। মুসলমান আদিবাসী ও তপশীল সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড় এখানে। আবাদের পূর্বে প্রান্তে অন্য দেশ। এপার থেকে

ওপারের মানুষদের দেখতেও পাওয়া যায়। যাতায়াত চোরা পথে হয়ত চলে। হয়ত কেন, জিনিসপত্র স্টেনদেনও হয় লোক-চক্ষুর অস্তরালে। কিন্তু ভাবত-পাকিস্তানের 'সশস্ত্র-সত্বর্ষের' সময়ে পুর্লিণী তৎপবতার নিদাব্ধ প্রতিক্রিয়া এখানকার মুসলমান চাষীদের কথাবার্তায় অস্পষ্ট রইল না। কেউ শোনাল রেডিও পাকিস্তান শোনবার অপরাধের কথা, কেউ শোনাল গুপ্তচরবৃত্তির মিথ্যা অভিযোগের কাহিনী। সত্যি মিথ্যের প্রশ্ন যাচাই করবার অবকাশ মেলে নি। কিন্তু যারা এতকাল চোখ বুজে একজোটে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে এসেছে—আজ তারা শ্বিধাগ্রস্ত।

শ্বিধীয়ত, প্রায় সকল কৃষকই এক-সূরে একবাক্যে লেভীর তীর প্রতিবাদ করে সরকারের প্রতি তাদের বিপ্লব মনোভাবের ও অসন্তোষের কথা ব্যক্ত করেছে। বাস্তু-জমি, বাঁশকাড় ও পুরুরের ওপরও লেভী পড়েছে এমন কথাও শুনেছি অনেক জায়গায়।

তৃতীয়তঃ জল নিকাশের বে-বন্দোবস্ত এখানকার চাষীদের অসন্তোষের অন্যতম কারণ। এ অসন্তোষ সরকারী অর্থের অপব্যয়ের দৃঢ়-চারটে দৃষ্টান্ত সহযোগে তারা ব্যাখ্যা করেছেন।

চতুর্থতঃ এবাব আবাদে তেমন ফলন হয় নি। শীতের মরসুমের বৃষ্টিতে তোলা ধান পচেছে কোথাও, কোথাও মাঠের ধান। শূন্য উদাস চোখে সত্তর বছরের জীবন মন্ডল বলেছে, একবার দেখুন, কী হাস মাঠের! সর্ব্বংসর খাব কি?

পঞ্চমতঃ টেস্ট বিলিফের হাস্যকর প্রয়োগ পদ্ধতি, কর্মকর্তাদের খামখেয়ালী আর অপচয় তারা উল্লেখ করেছেন নিরীতি-শয় তিষ্ঠতার সঙ্গে।

সর্বশেষে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দামের কথা প্রতি কথায় বলেছেন তাঁরা।

নীপেদ মন্ডল বললেন, বছরে আমার ৬০ মণ আলু লাগে। খাইয়ে ২৫ জন। শূন্য নীপেদ মন্ডলের বাড়িতে নয়—চাষীদের সব বাড়িতেই লোকসংখ্যা বেশি। আলুর খরচও বেশি। দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষে কম ফলনের জন্য তারা উদ্বেগিত।

আবাদের চাবীরা তাই আজ ভোট

দেবার আগে চিন্তিত। বাড়িগত জীবনের হুমবধমান সমস্যার সঙ্গে তারা আর কোন মতেই খাপ খাওয়াতে পারছেন না। ভাবছেন, ঢাল বাড়ন্ত, এই সৈনিক হাসনা-বাদ-বাদুরিয়া-স্বপ্নপনগবে চলা-তেলবে, চাল গুলী চলেছে—লেভীর হাত থেকেও পাবি-গ্রাণ নেই—পথ কোথায়? কোন পথে তারা যাবে? ৮০ বছরের ইলেক বটলান, আমার দিন তো শেষ হবে গেলে। ছেলেরা কি আব আমার কথা শুনবে?

কথাটির ইতিগত ভেবে দেখবার গতি।

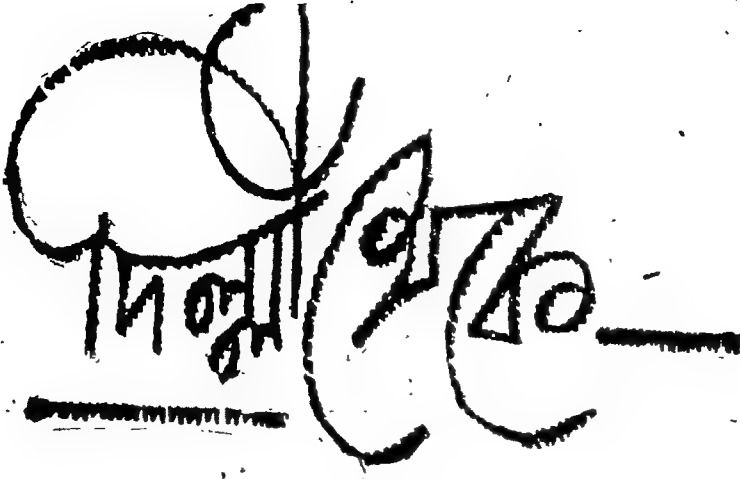
আবাব রুস্তম মিঞার দৃষ্টি ফিরে আসে। রুস্তম বদাছিল, প্রাণে ভরসা নিয়েছে, বাস্তব হচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু আমাদের ভাত সর্ব্বাঙ্গ হল নি?

আজাহাব সেই কথার চুপ করেই বলেছিল, আমরা যহবে যাবি পাবি কোন দিনে, আব দরকার পড়লি কখনো আশ্রিত পাবে চস ফলান—এই সন্দেহ।

শুনলাম মথুরাপুরে, ঘাবাব সা চোঁমাগেব, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সভা চলে গেছে। আট দশ মাইল দূর থেকে পুর্বে ছোট কংগ্রেস-বিবোধী সভার লোক বসে হয়েছে। শীতের রাত ৯।১০টা পড়লে মিটিং শুরুরে।

সমগ্রের হাওয়া এখানে। সুন্দরবনের সৌন্দর্য গন্ধ লোনাবাতাসে মিশে এখানকার মানুষদের হৃদয় কুণ্ঠিত করে তুলেছিল। এদের হঠাৎ-বগে-ওঠা বদমেজাজ বদ-ভাবের মধ্যে কি লুকনো আছে জ্বলি না। তবে দলগতভাবে সর্ব্বারের নির্দোষ ভেট দেবার দিন প্রায় ফুরিয়ে এনেছে বাকিই নেই হল। গ্রামের মোড়লরা এবাব সহজে বাটলি নির্দেশ দিচ্ছেন না অমূল্য প্রতীক ভোট দাও বলে। তারা এবাব হাওয়া বুঝতে চেষ্টা করছেন। নির্দোষ মধ্যে সভা ডাকছেন। সেখানেও ভোট উঠছে। বাদ-প্রতিবাদ চলছে। কংগ্রেস-নির্বোধী প্রভাবিত অঞ্চলেও তেমন।

মোটমোট এবাবের নির্বাচনে আবাব অঞ্চলে ব্যাপক ওয়াটপালট হবার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনন্তোষ আর প্রতিবাদ এখানকার জন-দেহ মধ্যে মূর্খ।



যমুনার তীরে মল্লিক-ই-নিগমবোধ।
পাশেই হিন্দুদের শ্মশানভূমি। যেন
পৃথিবীকে ডেকে বলতে চায় জীবনের সব
চাওয়া-পাওয়ার শান্তি পাবে এইখানে।
এই শেষ শব্দায়।

বেদনাঘন মনে প্রায়ই জাহান্ আরা
এখানে ছুটে আসেন শান্তির আশায়।
যুবরাজ দারাসিকোর ভজনাগায়। পাঠ্য-
গার। যুবরাজ দারার এ নিভৃত জায়গা-
টুকুতে যে ক্ষুদ্র শান্তি তা এ দিল্লীর
জনারণ্য মাঝে কীট লোকের জানা?

যুবরাজ দারা যে অমৃতের স্বাদ
পেয়েছেন, সে স্বাদের সাথে রাজদরবারের
কটা লোকের পরিচয়?

রাজদণ্ড হাতে নিয়ে বসলে শক্তি
আসে সন্দেহ নেই। সে শক্তির সীমা
শব্দ এই বিশ্বরঙ্গাণ্ড। এই পার্থিব-
জগৎটুকু ছাড়াও আছে আরও একটা জগৎ
যে জগতের নাগাল শব্দ সেই মনই
পেরে থাকে যে মনে নেই কোনো
আবিলতা।

রাজত্ব থাকলে রাজাও থাকে। রাজা
থাকলেই থাকবে একজন অধীশ্বর—সে
শক্তির অধিকারীর মন যেমনই হোক না
কেন রাজহস্ততলে তার প্রতাপ চির
স্বীকার্য।

দুল্লেরার শক্তি প্রতাপ-প্রতিপত্তি যত-
টুকুই হোক না কেন তাকে দেখলেই
জাহান্ আরার মনে হয় তিনি যেন সাক্ষাৎ
বিশ্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান। এ ধারণা তাঁর
একাধিকবার হয়েছে।

দুল্লেরা একজন সেনাধ্যক্ষ। সেটাই
বোধ হয় সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়।
রাজদরবারে শব্দ তাঁরই প্রতাপ রণক্ষেত্রে
যিনি তাঁর শত্রুপক্ষের শিরশ্ছেদ করতে
পারেন। সেটা তো রাজনীতির ক্ষেত্র।
এ ছাড়াও তো মানুষের একটা পরিচয়
আছে। যেখানে মানুষ মানুষকে ভাল-
বাসতে পারে। যে মন পরম সত্যের
সম্মুখে চিরদিন ছুটে চলে, যার নাগাল
মধ্যারণ নারীমণ জীবন, যৌবন, ধন-মান

দিয়েও পায় না—এ বিরাট বিশ্বে সে মনের
প্রতিকৃতি দেখেছেন কখন?

জাহান্ আরার মনে হলো তিনি যেন
সে মনের প্রতিকৃতি দেখেছেন। ধরা-ছোঁয়ার
বাইরে থেকে যে পুরুষটি সম্রাট-দুহিতার
সর্বস্ব হরণ করে বসেছেন তাঁর মনের
প্রতিকৃতি এ রাজদরবারে কেউ দেখেছেন
কি? দিল্লীর দেওয়ান-ই-আমে বসে
প্রাণমন ঢেলে যে পুজারীকে তিনি মীরার
ভজন গাইতে দেখেছেন তাঁর রূপ দেখে-
ছেন কেউ? অরোকার ফাঁক দিয়ে অপলক-
নেত্রে প্রাণভরে সম্রাটনন্দিনী তাঁর যে

প্রীতিবেকরঙ্গন ভট্টাচার্য

প্রতিকৃতি দেখেছেন অরুণের সাথে রূপের
সে মহামিলনের ছবিখানি আজও তাঁর
বুকে গাথা। আজও সে মহান্ পবিত্র
সঙ্গীতের সুর-মুছনার রেশ যেন তাঁর
কানে লেগে রয়েছে।

একাকিনী শয়নকক্ষের নিরালা ভাব
তাই মাঝে মাঝে সম্রাটনন্দিনী জাহান্
আরাকে নিয়ে যায় যেন কোন এক অজানা,
অদেখা জগতে—যেখানে রাজদণ্ড নিয়ে
আপন প্রমত্ত শক্তির পরিচয় দিতে কেউ
নেই বাস্তব, যেখানে প্রতিপত্তির মোহের
স্পর্শ কোন চিন্তকে করে নি কলুষিত।
যেখানে আনন্দ চির-বিরাজমান। মানুষের
ছোট মনের বিস্মৃতি, যখন গিয়ে
মহাসিদ্ধির সাথে মিলে একাকার হয়ে
গেছে।

এ বিষয়ে জাহান্ আরার তমসাক্ষর
জীবনে যিনি জ্ঞানের আলো দিয়েছেন
তিনি দারাসিকো ছাড়া আর কে?

দিনের পর দিন যুবরাজ ও জাহান্
আরা এ নন্দর দেহের অর্থহীনতার
ব্যাখ্যার আতিবাহিত করেছেন। সত্যি
যুবরাজ ভাগ্যবান—শাহ্ বুলন্দ একবাল্।
বসলে ছোট হলে কি হবে জাহান্ আরার

বেগমের জীবনাদর্শ দার্শনিক দারাসিকো
ছাড়া আর কে?

মনে পড়ে যুবরাজের স্বপ্নেব কাহিনী।
তখনও সকাল হয় নি। রাজপ্রাসাদের
সাইপ্রাস ইউক্যালিপটাসের শাখায় তখনও
প্রভাত-সূর্যের কিরণছটায় চারিদিক
রঞ্জিত হয় নি। পাখীর কলরবমুখরিত
কুঞ্জবন তখনও স্তব্ধ। যুবরাজ স্বপ্না-
বিশেষের মত সাইপ্রাসবীথিকায় পাখচারী
করছিলেন। মনে হলো চিত্র খুবই চণ্ডল।
অরোকার ফাঁক দিয়ে জাহান্ আরা লক্ষ্য
করলেন রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে দ্রুতভাবে
পায়চারী কবছেন। পৃথিবী যেন গভীর
চিন্তায় মগ্ন। জন্মাবাব। শেষরাতে
নামাজ পাঠেব পূর্বেই সম্রাট-দুহিতা
একাকিনী অগ্নয়ের দিকে ছুটে গেলেন।

এ কি?

বিস্ময়জড়িত চোখে জাহান্ আরা
যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এ অসময়ে
তুমি শয্যাভাগ কবে ঘবে বেড়াচ্ছে?”
তোমার শবীর সুস্থ আছে ভাইজান্?”

জবাবে তিনি যা শুনলেন তাতে
বিস্ময়ে হতবাক হলেন।

দারাসিকো ভগিনীর সান্নিধ্যে এসে
তাঁর হাত দুখানা চেপে বললেন, “এ কি
হলো বাদশা বেগম? এ আমি কি
শুনলাম? বিশ্বাস করা ভগিনী কিছু-
ক্ষণ পূর্বে একটি অপরূপ সুন্দরী এসে
আমার সামনে দাঁড়ালো। ঠিক যেন স্বর্গীয়
অঙ্গুরা, হাতিক। অলোয় ঘরখানা
ভবে গেল। স্বর্গীয় সুন্দরী আমার দিকে
তাকিয়ে হেসে হেসে বললেন, “যুবরাজ
তুমি মহাভাগ্যবান। সমগ্র পৃথিবীতে
কোনো নৃপতিব অদৃষ্টে বা জ্যোটে নি
তোমার ভাগ্যে তাই জুটেছে। তুমি দিব্য
দর্শন লাভ করবে। হিন্দুস্থান তোমার
ভিতর লাভ করবে বাজা ও ধর্মির
সমন্বয়।”

দার্শনিকবৃন্দের সমাগম হলো।

রাজ্যের আরিফবৃন্দকে এ স্বপ্নের
কথা জানানো হলো। সবাই একবাক্যে
জানালেন যুবরাজ দারাসিকো হিন্দুস্থানের
ভাবী রাজর্ষি।

এ ঘটনা যে নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়
ইতিহাস তার সাক্ষী। স্বয়ং যুবরাজ
আপন ‘রিসালা-ই-হকনুমাতে’ এ কাহিনী
লিপিবদ্ধ করেছেন। শব্দ তাই নয়। এই
হকনুমাতেই ধীরে ধীরে তাঁর স্বপ্নের
বাস্তব রূপায়ণের বর্ণনা দিয়েছেন।

জাহান্ আরা ভাবলেন, আমার
দুঃখনেই তো মিয়া মীরের আশীর্বাদ লাভ
করেছি। কই আমার জীবনে তো এ দিব্য-
জ্যোতি দর্শন ঘটলো না।

সাধু ফকীর সঙ্গ যুবরাজের জীবনে

অমৃতের সম্মানে চির ব্যাপ্ত রেখেছিল। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে বৃন্দ অশোক ব্যতীত কোনো যুবরাজের সত্যসন্ধানী সন্দেহের পিলাসী মন ছিল কি?

একবার ভারি মজা হয়েছিল। রাজ-সেভায় বহু সন্ত ফকীরের সমাবেশ। ঘলাই বাহুল্য এ সমাবেশের পিছনে ছিল যুবরাজের উৎসাহ। সুযোগ পেলেই তিনি গায়ক, সন্ত ফকীরের সভার আয়োজন করতেন। দারাগিকো জ্ঞানভেদ দূর থেকে আর একটি চমক মন এ সন্ত ফকীরদের আলোচনার যোগদান করার জন্য রয়েছে চির উদ্‌গ্রীব। ভাগিনী জাহান্ আরার মনের ভিতরটুকু পর্যন্ত যুবরাজ স্বচ্ছ স্ফটিকের মতন দেখতে পেতেন।

শেখ নাজির সাহেবকেও একবার এরূপ এক সভার ডাকা হয়েছিল। হঠাৎ সভায় তিনি ভাবাবেশে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এনে শেখের সম্মুখে তুলে ধরেন। অধোমুখীলিত নেড়ে প্ৰদ্যাকার শেখ গেলাস থেকে এক চমক জল পান করলেন।

সভায় সমবেত ফকীরদের ভিতর গেলাসের অবশিষ্ট জল নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবার সাথে সাথে যুবরাজ দারাগিকো জল পান করে সোঁদীন দেখে-ছিলেন পাদের সম্পূর্ণ জল মধুতে পরিণত হয়েছিল। নিছক কল্পনাপ্রসূত কাহিনী নয়। এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। যুবরাজের সাথে সাথে কাজী মুহম্মদ ইসলাম সাহেবও সেই জল পান করেছিলেন। উভয়েই মিলিতভাবে সন্ধ্যার নিকটে গিয়ে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পেশ করেছিলেন। এই শেখ সাহেবই একবার সভায় বসে একটা সাধারণ রুমালকে মুদ্রিতবন্ধ করে সেটাকে একটা পারাবতে রূপান্তরিত করেছিলেন। নামাজ পড়ার সময়ে শেখ সাহেবকে দূর থেকে দেখবার বাদে সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা বলেছেন এ মহাত্মার শরীর থেকে একটা অপরূপ আলোকচ্ছটা চারদিকে উদ্ভাসিত করে তুলতো। রাজা বিক্রমজিৎ এর বর্ণনা দিয়েছেন। আব্দুল হামিদ সাহেব তাঁর পাদশানামায় এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

মিয়া মীর, শেখ নাজির, মোলানা শাহ বাদাকশির পবিত্র স্পর্শে যুবরাজ দারা নবজীবন লাভ করেছিলেন।

যুবরাজ প্রাণায়ামের অনুরাগী ছিলেন। তিনি জীবনে একাধিকবার দিব্যজ্যোতির দর্শন লাভ করেছিলেন। শব্দ তাই নয় হিমালয়ের সিন্ধি যোগীদের মতন প্রকৃতির অনাহত ধ্বনির ভিতর পরমেশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম মিলিতভাবে প্রাণায়ামে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাণায়ামের মুসলিম সংস্করণ ছিল দিল-ই-সনোয়ারী। এর বিশদ বিবরণ-আজও পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দরবেস্তান-উল-মজাহিব-এ।

মিয়া মীর, শেখ নাজির, মোলানা শাহ বাদাকশির ছাড়া - দারাগিকোর জীবন থেকে প্রতিফলিত যে আলো জাহান্ আরার মন উদ্ভাসিত করেছিল তার কিরণচ্ছটা যে মহাবোণী বিকিরণ করেছিলেন মনে পড়ে তাঁর নাম? বাবা লালদাস তখন বাধকের দিকে পা বাড়িয়েছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের যোগীপুরুষ। বাবা লাল ছিলেন চেতন স্বামীর শিষ্য। চেতন স্বামীর ছিল অলৌকিক শক্তি। একদিন বাবা লাল দেখলেন নিজের পায়ের মাঝখানে ভিকালস্থ কঠ রেখে তার ওপরেই ঘটিতে করে সাধুবাবা। চালজল চাড়িয়ে দিলেন। লালদাস দেখে অবাক সেই আগুনে মৃদুত মথো সন্ধ্যাসী রান্না সমাপন

করলেন। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন নি সোঁদীন।

লালদাস চেতন স্বামীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন। চেতন স্বামী এককণা অঙ্গ দিলেন শিষ্যের হাতে।

বললেন, “থেকে দেখো।”

অন্ন-কণা খাওয়ার সাথে সাথে লালদাস দেখলেন এক বিরাট আলোকচ্ছটা। তিনি দেখলেন, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে শত সহস্র ঈশ্বরের প্রতীক—সবারই মানুষ্যের রূপ। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা দিয়ে বাদের অর্থাৎ রচনার মহাবোণী নিয়ে লালদাস উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করে বেড়ান—তাঁর ধর্মে হিন্দু-মুসলিমের প্রশ্নই নেই। জীব বেষ্টানে নারায়ণ সেখানে মানুষ্যমায়েই পূজা, আদরণীয়, বরণীয়।

লালদাসের সম্প্রদায় মধ্যযুগ কবীরের পথ অনুসরণকারী।

সে যুগে কবীরের মহান প্রেমের পথ কোন্‌ যোগী ফকীরকে না অনুপ্রাণিত করেছে? চেতন স্বামী ছিলেন কবীর-পন্থী। লালদাসজীও তাই। কবীরের মহান প্রেমের বাণী তখনও সমগ্র উত্তর ভারতের আকাশে বাতাসে। কবীরপন্থী লালদাসজী দারাগিকোর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দারার উদার চিন্তাধারায় যে হিন্দু মুসলিম মিলনের মহাবোণী রূপায়িত হয়েছিল তার পিছনে ছিল এ মহান বৈষ্ণব সাধকের মহান প্রেরণা।

শ্রীরামচরিত-মানস

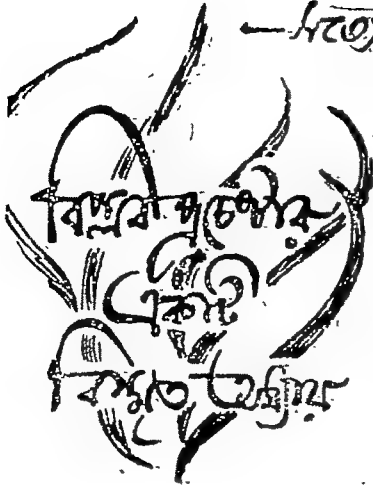
ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষে কীরিয়াছেন সমগ্র মঙ্গলভের মাধ্যমে। বহু গুণী ও জনস্বজন লেখনী ব্যরণ করিয়া আত্মাবসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্বরে ভারতবর্ষে মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। ভক্তকবি গোপীনাথ তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহস্র গুল্ল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা

মূল্য—১ম বন্ড দুই টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৫৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



জাহাজ থেকে পিস্তল উদ্ধাও

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের অন্তরীণ
১৯১৭-১৮

"You are cowards, unfaithful to your own future, if in spite of sorrows and delusions you do not pursue it to the end"—

—“তোমরা ভীরা, নিজেদের ভবিষ্যতে অবিশ্বাসী যদি দুঃখ ও প্রত্যাশা নষ্টেও আপন উদ্দেশ্য সিঁধের পথে শেষ পর্যন্ত লেগে না থাকতে পার।” (ডিউটিজ অফ ম্যান—গ্যার্টারসিন—পৃঃ ১৪ ভূমিকা)।

জ্যেট থেকে মাল খালাসেব সময়ে ম্যাগ্টন কোম্পানীর নামে চালান্য অস্ত্র উদ্ধাও হয়ে যাবার কথা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। এই ব্যাপারে কতৃপক্ষ সৈনিক যে কিরূপ বিভীষিকার ছবি দেখেছিলেন; তা প্রকাশ পেরেছিল তাঁদের সৈনিকার লক্ষ্য-হীন ধরপাকড়ের মধ্য দিয়ে। হয়তো কিছু কিছু আন্দাজে তাঁদের ভুল ছিল না। কিন্তু সভ্যজগতে প্রমাণহীন আন্দাজেব ভেতব দিয়ে অত্যাচারের তান্ডব চালালে মানুষ তো আব মানুষ থাকে না—তাকেই তো তখন অভিহিত করা হয় রাক্ষস নামে। মানুষেব পরিচিতি হচ্ছে তার শাস্ত কোমলতায়, ধীর-স্থির প্রকৃতির ভেতর দিয়ে। আর রাক্ষসের আত্মপরিচয় তার নিষ্ঠুর নোহুপতাব মাধ্যমে। বৃহত্তর মানবসমাজেব শিরা-উপশিরাতে রক্তহীন করে রাখা এইটেই বোধ হয় রাক্ষস-যার ভেতরে প্রজ্বল থাকে লোভ, আব তন্মজ্জিত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, এই অবস্থা থেকে মস্তিলাভ যাবা কবে, বা মস্তিলাভেব উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা যাবা করে, তারাই তো মানুষ। স্মান যথাসময়ে তারাই তো হয় দেবতা নামে লোকসমাজে পূজার পাত্র।

—নভেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

আমাদের শ্রীশ্রীচন্ডীতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে শ্রীকৃষ্ণর ভেতর দিয়ে গীতামাহাত্ম্যের প্রকাশের মধ্যেও বোধ হয় ঐ একই তত্ত্ব নিহিত আছে। যাই হোক, ১৯১৬ সালের ২০শে নভেম্বর বৃটিশ গভর্নমেন্ট সৈনিক একটা হািন কৌশলের মাধ্যমে প্রভাসচন্দ্র দে-কে গ্রেপ্তার করেও ফলন্ত হতে পারেন নি। তাঁদের ভারতরক্ষা আইনের বলে গ্রেপ্তার আর অন্তরীণের উদ্ভব তান্ডব চলে বহুদিন পর্যন্ত। এমনই সময় ঐ উল্লগ স্বাধীনতাকে সাযেশতা করা উপযোগী অতর্কিত অস্ত্র অনধিক দূ-বছরের মধ্যে আবাব বেমান্দ্রম উদ্ধাও হয়ে যাবার ফলে সৈনিকার অমলাতন্ত্র আবো উত্তপ্ত হয়ে প্রভাসচন্দ্রের বন্ধু ও অন্তরঙ্গ, আর একটি বিপ্লবী শিক্ষারতী জ্যোতিষচন্দ্রের গৃহে হানা দেয় ওরা জানুয়ারী, ১৯১৭ সালে।

জ্যোতিষচন্দ্র আসলে ছিলেন চুচড়ার অধিবাসী। এম-এ পাশ করে প্রথমে তিনি হুগলী কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে চুচড়াই অন্তর্গত “বেঙ্গল পলিটিক্যাল কনফারেন্স”-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য হুগলী কলেজ থেকে পদচ্যুত হয়ে কিছুকাল বিগন কলেজে (বর্তমান সুবেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা করেন। কিন্তু পদলিখিত কতৃপক্ষ সেটাও সহ্য কবতে পাবেন নি এবং সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ কবতে বাধ্য হন।

এইভাবে দেশকে ভালোবাসার অপরাধে একজন সুযোগ্য অধ্যাপক একাধিক কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে শেষে যখন চন্দ্রনগরের গরবাটি হাই-স্কুলেব প্রধান শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হয়ে নিজের নিষ্ঠুর তত্ত্বাবধানে গরবাটি স্কুলটির অঙ্গদিনের মধ্যেই বিবিধ উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন এমনই সময়ে কতৃপক্ষ ঐ মানুষটির স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা আব বরদাস্ত কবতে পারেন নি। পদলিখিত কনফিডেন্সিয়াল বিপোর্টে তিনি তখন সাধাবণেব জন্যে বিপক্ষনক বলে বিবোচিত হয়েছিলেন, আর সেই কাবণেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৯১৭ সালের ওরা জানুয়ারীর সকালবেলায়। (এই খবরগুলি ৫।১।১৯১৭ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত)। তাবপর তাঁর দীর্ঘ এক বৎসব হাজতবাস ও অকথ্য অত্যাচার সহ্য করার ফলস্বরূপ সংবাদে প্রকাশ—

“বাবু জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের মামলা”

“আমরা জানতে পেরেছি যে অতঃপর বাবু জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের মাতুল বি. বি. ঘোষ তাঁকে পাগল-গারদে দেখতে যাবার অনুমতি পেরেছেন.....ঐ আদেশের ভেতর দিয়ে একটা হৃদয়-বিদারক এবং সর্বতোভাবে উল্লগ তথ্য প্রকট হয়েছে এই যে জ্যোতিষ এখন সত্যি উন্মাদ অবস্থায় পৌঁছেছে; অন্যথা সে পাগলা গারদে থাকবে কেন?”

(অমৃতবাজার পত্রিকা—৭।২।১৯১৮)

একমাস পরের ঘটনা, ১০ই মার্চ, ১৯১৮ সাল। জ্যোতিষচন্দ্রের জননীর ভাষায়—“বহরমপুরের উন্মাদ-আশ্রমে, ম্যাজিস্ট্রেট ডারউ, এস, এডির সংগে আমার এক আত্মীয় জ্যোতিষকে দেখবার অনুমতি পান। তিনি দেখে এসেছেন জ্যোতিষ সেনের সামনের বারান্দার একটি খাটের ওপরে পড়েছিল, কোটরগত চক্কা মাথার প্রায় সমস্ত চুল তার ধূসরবর্ণ হয়ে এসেছে, চোয়াল দৃঢ় সংলগ্ন, কথা বলতে পারছে না.....লোক চিনতে অপাবগ..... সরকারী ডাক্তারের মতে এটা নাকি তান্দ্র পাগলের ডান....।” (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩।৩।১৯১৮)।

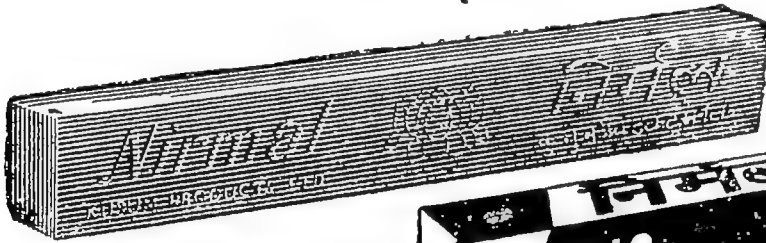
পরের ঘটনা, ১৯১৮ সাল, ৫ই অক্টোবর অমৃতবাজার পত্রিকায় সরকারের উদ্দেশ্যে জ্যোতিষচন্দ্রের জননীর এক আবেদনের প্রকাশ। জননী দাক্ষায়ণীর ভাষায়—“মেজর মোজেন, মেজর পিবল, ক্যান্টেন হিউস, আর ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রকে নিয়ে গঠিত এক চিকিৎসা পর্ষদ, ১৯১৮ সালের ১লা এপ্রিল, বহরমপুরের সেন্ট্রাল লুনেটিক এসেলামে জ্যোতিষচন্দ্রকে পরীক্ষা কবেছিলেন। তাঁদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে জ্যোতিষ এখন উন্মাদ ও বিবাদ-বায়ুগ্রস্ত হয়ে হতচেতন অবস্থায় আছে (melancholic stupor)।.....তাকে কৃত্রিম উপায়ে নাক দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে।.....ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র এক পৃথক বিবৃতিতে লিখেছেন—“অধিক পূর্বে না হলেও ৬ই মার্চ ১৯১৭ সালের সময় থেকে তাঁর মধ্যে উন্মাদ অবস্থার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছিল।.....” তাবপর অমৃতবাজারেব পর্বতর্কী সংখ্যাব সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই নিয়ে বিশেষ সমালোচনা দেখা যাব। কিন্তু সৈনিকার সরকার জ্যোতিষচন্দ্রের জননীকে যে নিরলঙ্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন তাব বিষয়ংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

“বাবু জ্যোতিষচন্দ্রের মাতা শ্রীমতী দাক্ষায়ণী দাসী সমীপেবঃ বাংলাব অতিরিক্ত কর্মসিচিবের নিকট থেকে। তাং ১লা ফেব্রুয়ারী—এতদ্বারা শ্রীমতী দাক্ষায়ণী দাসীকে জানান হচ্ছে যে তাঁর ছেলের থাকার জন্য গভর্নমেন্ট এখন বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারেন, রাজবন্দী জ্যোতিষ



নির্মল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে

ধুবধুবেরে  ফরসা
হালকা সুগন্ধে  উরশুর



নির্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-
জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর
সুগন্ধে ভরে উঠে।

নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই
ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা জড়হস্ত বেরিয়ে যায়।
আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সচ
যোপ দেওয়ার হগজে ভরে থাকে।

নির্মল দিয়ে কাচলে গরমারও সাশ্রয় হয়। ঢেব বেশী দিন
চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, ভাড়াভাঙি কয়ে যায় না।

নির্মল

পূর্ব ভারতে এই বার সাবান
কাটতিতে সবার ওপরে

কুমুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

চেতনার করোনারীতে

জামিনুন্নাহার হাট

বিশ্বাশ্রয়ী বিশ্বাস করি—কারণ
বাঁচবার বিপ্লব থাকে অব্যাহতই।
জীবনের জন্যে সমস্ত মনোচ্চারণ
জন্মাবধি অমৃতের আলপনা আঁকে।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনটাকে সারাতেই
হবে—নৈলে একবার যদি বেডসোর
হয়, কোন এ্যান্টিবায়োটিকে তাড়াতেই

পারবে না দৃষ্ট ক্ষত। বিশ্বাসের জোর
সবারে অমিতবীৰ্য করে দিতে পারে;
বিস্তৃত বিদ্যাত হতে দেব না বিজ্ঞাপে।
অশান্ত অনন্ত এক সমুদ্রের ধারে
প্রতিজ্ঞার পবিত্রের অন্তরাখ্যা কাঁপে।

চেতনার করোনারীতে প্রমবোসিস
হতে না দেবার জন্যে জাগি নির্নিমেষে

চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তিনি বহরমপুরে
পাগলা গারদে থাকার জন্য।”

কত বড় ধৃষ্টতার অভিব্যক্তি। কিন্তু
এইখানেই শেষ নয়। উক্ত চিঠিতে আরো
লেখা ছিল—

“এই কোয়ার্টারে দুটি ঘর থাকবে,
তিনটি বাহিরের ঘর থাকবে, একটি উঠান
থাকবে... সমস্তই প্রাচীর স্বারা ঘেরা।
পত্রিকাঃ ১৫।২।১৯১৯। দীর্ঘ এক বছর
যথেষ্ট আবরণ-সংযুক্ত।” (ক) (অমৃতবাজার
আমলাভ্রমের দ্বারা নিয়োজিত সর্দারদের
উৎপাদন-নিপীড়নের ফলে জননীর প্রাণের
দুলাল যখন উন্মাদ অবস্থায় কঠিন পীড়া-
গ্রস্ত আর সেই পুত্রের চিকিৎসা ও সেবা-
শুশ্রূষা জন্য মায়েব প্রাণ যখন ব্যাকুল

(ক) আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রীষ্মকালব্যয়ণ
চন্দ্র লিখিত ‘অবিস্মরণীয়’ নামক গ্রন্থে
কৈয়দগণ উদ্ধৃত করা গেল। “১৯১৭ সনের
৫রা জানুয়ারী Defence of India
Act-এ মাস্টারমশাই ধরা পড়লেন দ্বিতীয়-
বার। প্রথমবার ধরা পড়েছিলেন ১৯১১
সালের ৫ই মার্চ। টেগার্ট সাহেবের
নির্দেশ মতো আরম্ভ হলো তাঁর উপরে
জঘন্য অত্যাচার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য।
শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে তাঁকে
তার Injection দিয়ে কয়েকদিনের জন্য
গুজোহীন করে রাখলে। আবার আরম্ভ
হ’ল নির্যাতন। শেষে ব্যর্থ আক্রোশে
পুলিশ বাট্টে দিল যে মাস্টারমশাই
মস্তিষ্ক-বিকৃতির ভান করছেন।.....প্রতি-
ষাৎ মাস্টারমশাই অনশন আবৃত্ত করলেন।
তাঁকে আনা হ’ল বহরমপুর পাগলা
গারদে। তিনি সেখানে রইলেন দীর্ঘদিন
সমাধিস্থ হয়ে।” (পৃঃ ৫৮)।

হয়ে সরকারের দরজায় তাঁর করুণ আবে-
দন নিয়ে ছোটোছোটো করছেন ছেলের
চিকিৎসার ব্যাপারে অত্যন্ত সাময়িক মৃত্তির
জনা, সেই সময়ে আমলাভ্রমের ঐ জাতীয়
বিদ্‌পাশ্বক উক্তি শুনে মনে পড়ে কবির
উক্তি—“মানুষের অপমানে ওদের মাথা
হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ
ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।” (রক্তকরবী
—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৭৬)। তবে এই জাতীয়
শক্তিমদমত্ততার প্রকাশ কোনো দেশ-কাল-
পাঠ বা প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করে সীমাবদ্ধ
নয়। বঙ্গদেশ-সহায়ত্বের যুগ থেকে
শুরু করে আজ পূর্ব বঙ্গ-চালিত
আমলাভ্রমের ঐ এঞ্জিনের চাকা সনভারেই
ঘুরে চলেছে। জেলখানার নির্মম কাহিনীর
সংবাদ আজও রূপে-রূপান্তরে দেখা যায়,
আব কারারুদ্ধের জননী বা আপনজনের
প্রতি ব্যবহার সে-ও একই কথা। কিন্তু
একটা জাতি যখন তার আত্মসম্মতি ফিবে
পায় তখন কোনো অত্যাচারই বোধ হয়
তাঁর চলাব পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে
বলে জানা যায় না। এটা চিরন্তন সত্য।

যাই হোক জননী দাম্পত্যগীকে সেদিন
ঐ জাতীয় হীন প্রস্তাব স্বভাবতই প্রত্যা-
খ্যান করতে হয়েছিল। তাবপব প্রথম
বিশ্বযুদ্ধের অবসানে রাজবন্দীদের সাধা-
বগভাবে মৃত্তির সঙ্গে জ্যোতিষচন্দ্রও শেষে
মৃত্তি পেয়েছিলেন আর যথাসময়ে
আবোগাল্লাভ কবে পরবর্তী বৈপ্লবিক
আন্দোলনে বীরোচিত অংশগ্রহণ করে-
ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর
অমর কীর্তি অন্যত্র আলোচনা করা
হয়েছে। কর্ম ও ভাব, ত্যাগ ও আনন্দ,
শক্তি ও প্রেরণাকে সম্বল করে অত্যাচারের
বিষয়ীভূত এই মানুস্‌গুণীর অক্লান্ত
চেষ্টাতেই ক্রমে যে দেশের স্বার মুক্ত হয়ে-

ছিল, তার প্রমাণ বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার
সুদৃষ্ট পাতা। এঁদেরই চেষ্টায় ও সাহায্যে
কবি-বর্ণিত রক্তকরবীর বোধ-বস্ত্রিত রক্ত-
বেদনা যে ক্রমে ভীষণ তীরের মতো যক্ষ-
রাজের মস্তক ভেদ করে রক্তস্রাবে তাঁর
অন্তরে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল
তাতে আর সন্দেহ কোথায়। প্রসঙ্গত মনে
পড়ে এই বিপ্লবী শিক্ষাগুরুদের যারা সে-
দিন ছাত্রদের নিয়মিত পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে
নির্ব্যাহিত কিশোরদের হাতে তুলে দিতেন
একখানি শূদ্রা শিক্ষা, একখানি ব্রহ্ম-
চর্যের বই, একখানি আনন্দমঠ, আর
বাঁকমচন্দ্রের অনুশীলন। আর সেই সঙ্গে
বুঝিয়ে দিতেন ম্যাটার্সিনি, গ্যারিবল্ডি,
কারাকাহিনী, আত্মকাহিনী ইত্যাদির তত্ত্ব-
কথা। আব তাবই সঙ্গে উপদেশ থাকতো
ডাম্বেল-মুগ্ধের প্রভৃতি হাতে-কলমে
অভ্যাসের ব্যাপার। তারপরে পুলিশের
শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে তারাই আবার পৌঁছাত
গিয়ে শ্মশানে, ডাগাড়ে, ভূতের বাড়িতে
বেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য
আরো কত গল্পকথা শুনতে ও জানতে,
মৃত্তির মস্তে, মানুষকে তার অভিশপ্ত জীবন
থেকে পরিচরণের কাজে দীক্ষা দিতে। কিন্তু
আজকের স্বাধীন দেশে সেদিনকার পরাধীন
জাতির উপর ন্যস্ত বাধ্যবাধকতা যখন
অনেকটা শিথিল হয়েছে, তখন দেখা যায়
সেই জাতীয় শিক্ষকের বেশ একটা অভাব
পরিলক্ষিত—যারা নিজের আত্মত্যাগের
ভেতর দিয়ে ছাত্রদের শেখাবেন নিপীড়িতের
জন্য সেই আত্মত্যাগের ব্রত। আজ
ছাত্রদের সামনে বাস্তব আদর্শ কিছু
রাখা হয় বলে মনে হয় না। অবশ্যম্ভাবী
ফলস্বরূপ সামান্য কারণে নানা প্রকার
বিশৃঙ্খলার খবর সংবাদে পাতায় প্রায়ই
প্রকাশ পায়। এইগুণি দেশের ভবিষ্যৎ
পক্ষে সুলক্ষণ বলে মনে হয় না।

অবশেষে প্রত্যাশিত সাধারণ নির্বাচন এসে পড়ল। যার জন্য এত হাঁকডাক, এত ভোড়োড়, এত আলোচনা, ভবিষ্যৎবাণীর ছড়াছড়ি, নগরে গ্রামে পথে-ঘাটে ঘোঁরে বাসে ঘোঁরে ঘাটে গঞ্জে, সেই নির্বাচন-পূর্ব আর কদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আগামী পাঁচ বছরের দেশের সম্ভাব্য চিত্রটির আঁচ পাবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আর মাত্র কটা দিন।

পূর্ববর্তী তিনটি নির্বাচনী আবহাওয়া দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, এবারের নির্বাচনী আবহাওয়ার প্রত্যাশিত উত্তানের সত্তার হয় নি। কিন্তু সেই সশ্রেণে এই কথাও বলব যে, এবারকার ভোটাররা তাঁদের পছন্দের বিষয় আগেকার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করেছেন। নির্বাচনের গুরুত্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতনতার চিহ্ন পূর্বে দেখা যায় নি। এই কারণেই বোধ হয় বাইরের উচ্ছ্বাসের ভাবটা যথেষ্ট কম। বহু নির্বাচন কর্মীক জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, এবং তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, এবারকার ভোটারদের মন বোঝা শক্ত। নির্বাচন কর্মীদের দিকে তাঁরা শীতল চোখে চাইছেন, এবং মামুলি কয়েকটি কথাবার্তা ভিন্ন আর কিছু বলছেন না।

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এটা অবশ্যই শূভলক্ষণ। এ কথা বলতে বাধা নেই যে, রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে আজও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অনেক রাজ্যের চেয়েই বেশি উন্নত। এবারকার নির্বাচনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রীট কর্মীর ঘিটিং, ঘাটে বহু জনসভা আহ্বান করে সকল রাজনৈতিক দলই ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বাচনের প্রাকালে আমরা দেখেছি যে, ভোটার পূর্বে কোন জনসভা আহ্বান করা হলে 'গরম গরম' হুজুত শোনার ঘোড়ে অনেকেই সেখানে ভিড় করতেন। আজকে জনসভাগুলি সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে না। তার কারণ লোকে একটা কংক্রিট কিছু, চাম, ফাকা বুলি নয়। বহু ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইস্তাহার থেকেও ভোটাররা সংশ্লিষ্ট দলগুলির বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলছেন।

অবশ্য সকল ভোটারই যে এতখানি খাঁড়িয়ে বিচার করছেন তা নয়। কেন না আজও পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দেশে "ভোট দে-কেনো"র যে নীতিটি অনুসৃত হয়ে আসছে, চতুর্থ নির্বাচনের মাঝেও সে নীতিটি বিলুপ্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। সেন্সিটাইভেটো এক অব্যাহতী উদ্ভ্রমকের সঙ্গে এই নিয়ে আশঙ্কণ হচ্ছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল "আট পুরী এক লাড়ু" দিয়ে ভোট এখনো কেনা যায়।



বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অভিযান

সাপ্তাহিক বসুমতীতে নির্বাচন নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক প্রবন্ধই লেখা হয়েছে বা হচ্ছে, কাজেই গুরুগম্ভীর হিসাবপত্রের মধ্যে আর আসতে চাই না। শুধু কয়েকটি বিষয়ের উপর হালকাভাবে দৃষ্টি-নিষ্কেপ করব।

বিভিন্ন দল ও প্রার্থী

পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভার জন্য মোট চারশটি আসনের বরাদ্দ আছে। কংগ্রেস এই ৪০টি আসনেই প্রাধান্য দিচ্ছে। জনসংঘ মোট ৭টি আসন ও

সাম্প্রতিক কল্যাণ

স্বতন্ত্র পার্টি একটি আসনে লোকসভার জন্য প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। পি-এস-পি ২টি আসনে এবং এস-এস-পি ৩টি আসনে প্রাতিশ্রুতি করছে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ১২টি আসনে এবং বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ১৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এ ছাড়া লোকসভার জন্য বাংলা কংগ্রেস থেকে প্রার্থী হয়েছেন ৮ জন, ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে ৫ জন, আর-এস-পি থেকে ৩ জন, এস-ইউ-সি থেকে ১ জন এবং লোকসেবক সন্থ থেকে ২ জন। এ ছাড়া নির্দলীয় প্রার্থী আছেন ৩৮ জন। সব মিলিয়ে লোকসভার আসন-গুলির জন্য প্রাতিশ্রুতি করছেন ১৪০ জন প্রার্থী।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এগার আসনের সংখ্যা বেড়ে ২৪০টি হয়েছে। কংগ্রেস বলা বাহুল্য ২৪০টি আসনেই প্রাতিশ্রুতি করছে। জনসন্থ ও স্বতন্ত্র মঞ্চকে ৬৩টি ও ৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। পি-এস-পি ও এস-এস-পি মঞ্চকে ৪৫টি ও ৩০টি আসনে প্রাতিশ্রুতি করছে। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির মঞ্চকে ৫৭টি ও ১০০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এ ছাড়া বাংলা কংগ্রেস ৮০টি আসনে, ফরোয়ার্ড ব্লক ৪৭টি আসনে, আর-এস-পি ১৬টি আসনে, এস-ইউ-সি ৮টি আসনে, লোকসেবক সন্থ ৬টি আসনে ও অন্যান্য ছোট ছোট দল ১১টি আসনে প্রাতিশ্রুতি করছে। এ ছাড়া নির্দলীয় প্রার্থী আছেন ২৭৫ জন। সব মিলিয়ে ২৪০টি আসনে ১০৫৮ জন প্রার্থী প্রাতিশ্রুতি করছেন।

এ কথা পশ্চিমবঙ্গবাসীমাত্রেই জানেন যে, এবারে কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য যাতে সমস্ত বামপন্থী শক্তিগুলি একাবদ্ধ হয় জনসাধারণ একান্তভাবেই তা আশা করছিলেন। কিন্তু নানান কারণে তা সম্ভবপর হয় নি। এ জন্য কে বা কারা দায়ী তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই, সে তিন প্রসঙ্গে প্রবেশ করার কোন সাধকতাও এ মহোত্বে নেই। একান্ত নৈরাশ্যবোধী না হয়ে বরং বলা যায় বামপন্থী দলগুলির পক্ষে এ এককম ডালই হয়েছে, কার শক্তির দৌড় কতটা সেটা নির্বাচনেই বোকা হবে, কাগজে কলমে প্রমাণিত হবে। যদি বামপন্থীরা নির্বাচনে জয়লাভ করে নির্বাচনরূপ পরীক্ষার কঠিনপথে বিভিন্ন দলগুলির শক্তি বাড়াই হয়ে গেলে ভবিষ্যতে মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে নতুন করে কোন জটিলতার সৃষ্টি হবে না।

বামপন্থী শক্তিসমূহ বর্তমানে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে। একটি গঠিত হয়েছে বাম কমিউনিস্ট, আর-এস-পি,

এস-এন-পি, মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, এস-ইউ-সি প্রভৃতিকে নিয়ে, অপরাটি গঠিত হয়েছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও বলশেভিক পার্টি নিয়ে। এই উভয় জোটের মধ্যে বিরোধমুক্ত আসনের সংখ্যা যাতে কমে না আসে তার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কার্যত তা সম্ভবপর হয় নি। তা সত্ত্বেও এই দুটি জোটের মধ্যে বিরোধমুক্ত আসনের সংখ্যা লোকসভায় নয়টি এবং বিধানসভায় সের্গুশোর কিছু বেশি। পি-এস-পি এই উভয় জোটেরই বাইরে আছে। স্বতন্ত্র ও জনসন্থকে এখানে আমরা বিশেষ আমল দিতে রাজী নই।

বিগত তিনটি সংখ্যার বঙ্গদর্শনে আমরা ১৯৫৭ ও ১৯৬২-র নির্বাচনের নিরিখে সেই সব আসনগুলির কথা আলোচনা করেছিলাম যে সব আসন-গুলির হাতবদল হয়েছিল, যেগুলি একদলের হাত থেকে অন্য দলের হাতে এসেছিল। সেই প্রসঙ্গে আমরা এ কথাও আলোচনা করেছিলাম যে, কোন কোন কেন্দ্রে কোন কোন দলের শক্তিবৃদ্ধি অথবা শক্তিহ্রাস ঘটেছিল। আমাদের সমীক্ষা-সমূহ থেকে যে তথ্যগুলি আহৃত হয়েছে তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে, অবিস্তৃত কমিউনিস্ট পার্টি অন্ততপক্ষে ১৫টি জেলায় নিজের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল এবং কংগ্রেস ১টি জেলায়। আসনের হিসাবে কুচবিহারের ৫টি ও হুগলীর একটি নতুন আসন দখল করে ফরোয়ার্ড ব্লক পূর্বাশ্রয়ী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, লোকসভাভেদে ফরোয়ার্ড ব্লকের দুজন প্রতিনিধি গত নির্বাচনে গেছেন। আর-এস-পি-ও তুলনামূলকভাবে অবস্থার উন্নতি করেছিল। মার খেয়েছিল পি-এস-পি, এস-ইউ-সি, মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি। চতুর্থ নির্বাচনে এই দলগুলি কে কেমন ফল দেখাতে পারে তার জন্য আকুল প্রতীক্ষা সকলেরই। আর মাত্র কটা দিন পরেই তা জানা যাবে।

মর্বাদার আসন

প্রত্যেকবারই নির্বাচনে করেকটি বিশেষ আসন মর্বাদার আসন বলে গণ্য হয়। এবারকার মর্বাদার আসনগুলির কিছুটা পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। চিরকালই মর্বাদার আসনে লড়াই হয়েছে কংগ্রেসের জাঁদরেল প্রার্থীর সঙ্গে কংগ্রেসবিরোধী জাঁদরেল প্রার্থীর। এবারে ত্রিপাক্ষিক সংগ্রামেও মর্বাদার আসন স্থান পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মর্বাদার আসনে প্রাতিশ্রুতি হলে ডান কমিউনিস্টদের সঙ্গে বাম

কমিউনিস্টদের। যেমন ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর সঙ্গে মহম্মদ ইসমাইলের। আমি নিজে ব্যারাকপুর ঘুরে দেখেছি যে, সেখানে একজন কংগ্রেসের প্রার্থী আছেন একথাও অনেকে যেন ভুলে গেছেন। দক্ষ পালিমেন্টারীয়ান হিসাবে শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর খ্যাতি যেমন বহুদূর বিস্তৃত, শ্রমিকনেতা হিসাবে মহম্মদ ইসমাইলও কম পরিচিত নন। ফলে এখানকার নির্বাচনী আসর দারুণ জমে উঠেছে, পৃথক পৃথক কেন্দ্রে থেকে দাঁড়ালে দুজনেই হয়ত লোকসভার বেতে পারতেন, কিন্তু যেখানে রাজনীতি শক্তির বদলে জেদের দ্বারা পরিচালিত, সেখানে একজনকে আসর থেকে বিদায় নিজেই হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির দুই শরিকের বিরোধের আর একটি বিষয় হল অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কেন্দ্রে সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হীরেনমহাশয়ের মত পণ্ডিত ও সুদক্ষ পালিমেন্টারীয়ান যে কোন জাতির পক্ষেই গর্বের বস্তু। তাঁর রাজনীতির সঙ্গে হয়ত অনেকেরই মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, মনীষা, বাসিতা ও দূরদর্শিতার জন্য তিনি চিরদিন দলমত নির্বিশেষে সকলেরই প্রস্ফার পাত্র। এইরকম সুদক্ষ ব্যক্তিকে, তিনি যে দলের বা যে মতেরই হোন না কেন, প্রতিনিধি করে পাঠানো, যে কোন দেশ বা জাতির পক্ষে একান্তই কাম্য। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে যেভাবে কুন্দো রটনা করা হচ্ছে, তাতে যে কোন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই লজ্জার মাথা নিচু হয়ে আছে। পূর্বাশ্রয়ী দলের বিষয় এই যে জওহরলাল নেহরুর উপর তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য জেন্টল কলোসাসকে'ও নির্বাচনী আসরে টেনে আনা হয়েছে। স্নাত্তার চ্যাংডার মধ্যেও বইটি সম্বন্ধে শ্রীমতীরাবীন্দ্রী মন্তব্য শুনে লজ্জায় মুখচোখ আপনাই লাল হয়ে ওঠে।

গত নির্বাচনে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম নির্বাচন কেন্দ্রটি বিশেষ মর্বাদার আসন বলে বোধিত হয়েছিল এবং ওই কেন্দ্রের কমিউনিস্ট সমর্থিত প্রার্থীকে জেতাবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি যে পরিমাণ অর্থ ও সংগঠনশক্তি ব্যয় করেছিল, তার ফলে জয়লাভের কেন্দ্রে ওই পার্টির স্বীকৃত কতি হয়েছিল, যা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই পরে বিতর্ক বেধেছিল। এবারে অবশ্য গতবারের গুরুত্ব এই কেন্দ্রে অনুপস্থিত, এবার এখানে লোকসভার জন্য মোট তিনজন, তদুপরি একজন নির্দলীয় প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন। একজন স্বতন্ত্র ও একজন জনসন্থের প্রার্থী এই কেন্দ্রে থেকে দাঁড়ালেও মূল প্রাতিশ্রুতি

হলে কংগ্রেস প্রার্থী অশোক সেনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাম দল কতক নির্বাচিত নির্বাচনী প্রার্থী লড়াইর মধ্যে। নির্বাচন বঙ্গ শিকার সমিতির নেতা লড়াইর তার প্রথম বাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীক নিয়ে লড়াইর নিষ্পত্তি নিয়েছিলেন, কিন্তু এর ফলে শিকার সংগ্রামে অভ্যস্ত হিন্দু হলে ওঠেন এবং শ্রীমতের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানে কেউ পড়েন; তার কারণ তাঁর মনে করে ছিলেন নির্বাচন শিকার সমিতির নেতা হিসাবে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে সমগ্র শিকারসমাজকে টেনে জানা সম্ভবপর নয়।

বাক্য কংগ্রেসি এবারে স্বাধীন জাতি নামে গণ্য হতে পারে, তার কারণ এখানে থেকে অতুল্য যৌব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বলা বাহুল্য শ্রীমতের তাঁর পূর্ব কংগ্রেস ছেড়ে অসংকলিত নিরাপত্তা কেন্দ্রে কেউ এবারে প্রার্থী হয়েছেন। কংগ্রেসের সমগ্র লগটেনশিট পূর্ণভাবে এই কেন্দ্রে কাজ করছে। তা পড়েও শ্রীমতের বিরুদ্ধে যিনি লড়াইরছেন তিনি খুব দামী ও দামী না হলেও প্রকৃত জনপ্রিয়তার অধিকারী। এক নাম জে এম বিন্দ্রাব। পরিত্যক্ত লগটেন, সেই বিরুদ্ধে অকলৌপিত। তাঁর সেই, কিন্তু তাঁর সোচ্চারিত কংগ্রেস পক্ষ তিনি ওখানে বিশেষ সূচকিত। কাজেই এই কংগ্রেসিকে শ্রীমতের পক্ষে বতমান নির্বাচন মনে করা গিয়েছিল, ততখানি নিরাপত্তা নয়।

এবারে স্বাধীন লড়াইর শুরু জেল হলে বলিয়ার্ট কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মুহাম্মদ ইলেকের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হুসাইন কবীর। পত ফেরারীতে এই বলিয়ার্টেই বাংলা জাতিগণের প্রথম জাদু জাদেছিল। সেই জাদুকে উত্তর এখনো সেজে নি। হুসাইন কবীর বিগত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে এই কেন্দ্রে হতেই নির্বাচিত হয়েছিলেন, এখন তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বিরোধী হয়েছেন। বিরোধীদের মধ্যে হুইপক হলেও কবীর সাহেব দু'পক্ষেরই সমর্থন পান। এখানে সরাসরি লড়াই এবং প্রকৃত স্বাধীন লড়াই কেন না তাঁর কংগ্রেস জাদুর কারণে প্রমাণ করতে হয়ে কবীর সাহেবকে জাদু করতেই হবে, তার অপরাধকে কংগ্রেস প্রার্থী না জিতলে বলভাগ্যবের অভিযোগ লড়াই বলে প্রমাণিত হবে।

কিন্তু সবচেয়ে জটিলটি আসির হয়েছিল আরামবাগ। এখানে বতমান কেন্দ্রটি অর্থসম্পত্তি শ্রীমতের চৌধুরীর সঙ্গে লোক-সভা কেন্দ্রের জন্য সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবতীর্ণ হচ্ছেন শ্রীজয়িনাথ বসু। এটি একটি নীতির লড়াই—শ্রীবসু, সর্বদিক থেকেই শ্রীচৌধুরীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বর্তমান জীবনে শ্রীবসু ও ব্যারিস্টার এবং মজার বিষয় হচ্ছে তিনি অর্থজীবনে শ্রীচৌধুরীর জনিয়ার ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। তদুপরি শ্রীবসুর সমগ্র পরিবারেরই সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে। নেতাজী সত্যচ-চন্দ্রের তিনি সত্যপুত্র এবং প্রখ্যাত রাজনীতিক নেতাজীর অগ্রজ শ্রীশংকর বসু পুত্র। শ্রীচৌধুরীর বিরুদ্ধে কতকগুলি নির্বাচিত বিষয়কে অবলম্বন করেই নির্বাচনী অভিযান চালানো হচ্ছে। বতমানে দেশের শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য তাঁকে দায়ী করা হচ্ছে; বিশেষ করে ডিডালগুয়েন প্রদেশে। তদুপরি তাঁর পূর্বতন ঐতিহ্যকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। ইংরেজ আমলে তিনি ইংরেজ রাজত্বের অর্থ সমর্থক ছিলেন, দেশের দুর্ভিক্ষগ্রাসে তিনি কখনোই কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি কংগ্রেসে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে জনসামগ্রিকের কোন-দিনই যোগাযোগ নেই। উচ্চতার লোক হিসাবে দেশের ভিতরকার অবস্থা জানা তাঁর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না। ১৯৫৭-র নির্বাচনে হুগলী কেন্দ্রে থেকে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন, ইত্যাদি। আরামবাগ থেকে লোকসভা কেন্দ্রে এই স্বাধীন লড়াই সেনাবাহিনীর কাছে বিশেষ আগ্রহের সূচী করেছে।

আরামবাগের বিধানসভার আসনটিও স্বাভাবিক স্বাধীন লড়াই-এর কেন্দ্র হয়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানীর বহুকের কেন্দ্র। এবারে এই কেন্দ্রে থেকে তাঁর বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেনেছেন বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীজয় মুখোপাধ্যায়। এটি একটি সুস্পষ্ট নীতির লড়াই। এটি কোন প্রমাণের অসংকা সাথে না যে, সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ডতম আঘাত দিয়েছেন অজয় মুখোপাধ্যায়। তাঁর সামগ্রিক চ্যালেঞ্জ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের দুটি প্রধান লক্ষ্যের উপর। ...ইতিপূর্বেও কংগ্রেস থেকে অনেকে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু মূল কংগ্রেস লগটেনের উপর এভাবে কেউ আঘাত হানতে সক্ষম হন নি, যা হেনেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। আজ শ্রীমুখোপাধ্যায় জরী হলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁর সুদীর্ঘকাল অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হবে।

এই কারণেই আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রকৃত স্বাধীন জাদুর পরিণত হয়েছে।

কলকাতার দুটি বিধানসভার কেন্দ্রে স্বাধীন লড়াই চলেছে যেখানে বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বী বাম। চকুরিয়া কেন্দ্রে দক্ষিণ-পশ্চিম কমিউনিস্ট প্রার্থী সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে বাম কমিউনিস্ট প্রার্থী হরিবাস গাঙ্গাকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দুই দলের পক্ষে স্বাধীন লড়াই-এ পরিণত হয়েছে। মনে পড়ে কলকাতার ময়দানে শ্রীজয়ান্ত বসু, দমোদর—সোমনাথ লাহিড়ীর জাদুয় জাদুরা বাজেরা করত। দলীয় মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই-রকম শিষ্টভাববোধী উত্তর নজর খুব কমই দেখা যায়। গান্ধী জবাবে ফরোয়ার্ড রকর প্রদীপ নেতা শ্রীহেমন্ত বসু বা বলেছিলেন, সেটাও পাঠকের স্মরণ করতে বলি—“ওরা সোমনাথ-বাসু জাদুয় বাজেরা শুনে চোখী করুন, জাদুর বর চোখী করি যাতে জ্যোতিবাসু বরানগর কেন্দ্রে থেকে আরও বেশি ভোটে জরী হন।” কিন্তু হিপাথিক লড়াই-এর দ্বারা শ্রীহেমন্ত বসুর মত প্রবীণ ও সংগ্রামী নেতাকেও অহত করতে হাফ-নি। তাঁর কেন্দ্রেও অগ্রসর প্রার্থী শ্রীশংকর পাল-হাঙ্গা বাম কমিউনিস্ট প্রার্থী শ্রীপীতাম দাশপুত্র আছেন। শ্রীহেমন্ত বসুর কেন্দ্রে একজন বাম প্রার্থী দেওয়া অনেকেই হুজম করতে পারেন নি। এ নিয়ে সত্যবাক স্টেটের জাদুও মতভেদ হচ্ছে। এইরকম গেরিলাজির আরও একটি কদুশ দৃষ্টান্ত খড়বহ বিধানসভা কেন্দ্রে। সেখানকার জনপ্রিয় নেতা সোপাল-ক্যানাজীর (গোপালমহা) বিরুদ্ধেও বাম কমিউনিস্ট প্রার্থী সাহন চকুরীকে দাঁড় করানো হয়েছে। অজয় জাদুরা জীবনই জানি সোপালমহা, এই জাদুর কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্য বলেই একবার গণ্য হয়ে এসেছিলেন।

পরিসর আরও অসংকলিত থেকে না এইভাবে কেন্দ্র হতে হতে প্রার্থীদের সম্মুখে জালোচনা করছে। অজয় এ প্রদেশে এখানেই শেষ করা যায়।

কুলা, হাঙ্গামা ও অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন উপলক্ষে লগটেন হাঙ্গামা যে কোন রাজ্যের চেয়ে বহুবার কম, বতীর মধ্যে ইট ছুঁড়ে মারবে এরকম অসভ্যতা পশ্চিমবঙ্গে বড় একটা ঘটে না, সৌদিক থেকে অপরাধের জাদুর, তুলনার পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের গণতান্ত্রিক চেতনা অধিকতর উজ্জ্বল। মুখোপাধ্যায় সভা কয়েকবার অবলা ভাঙল হয়েছে। সেটা ঠিক নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নয়। কতৃত ১৯৫৬-র ফেরারীর খাদ্য জালোচনার পর থেকেই মুখোপাধ্যায়

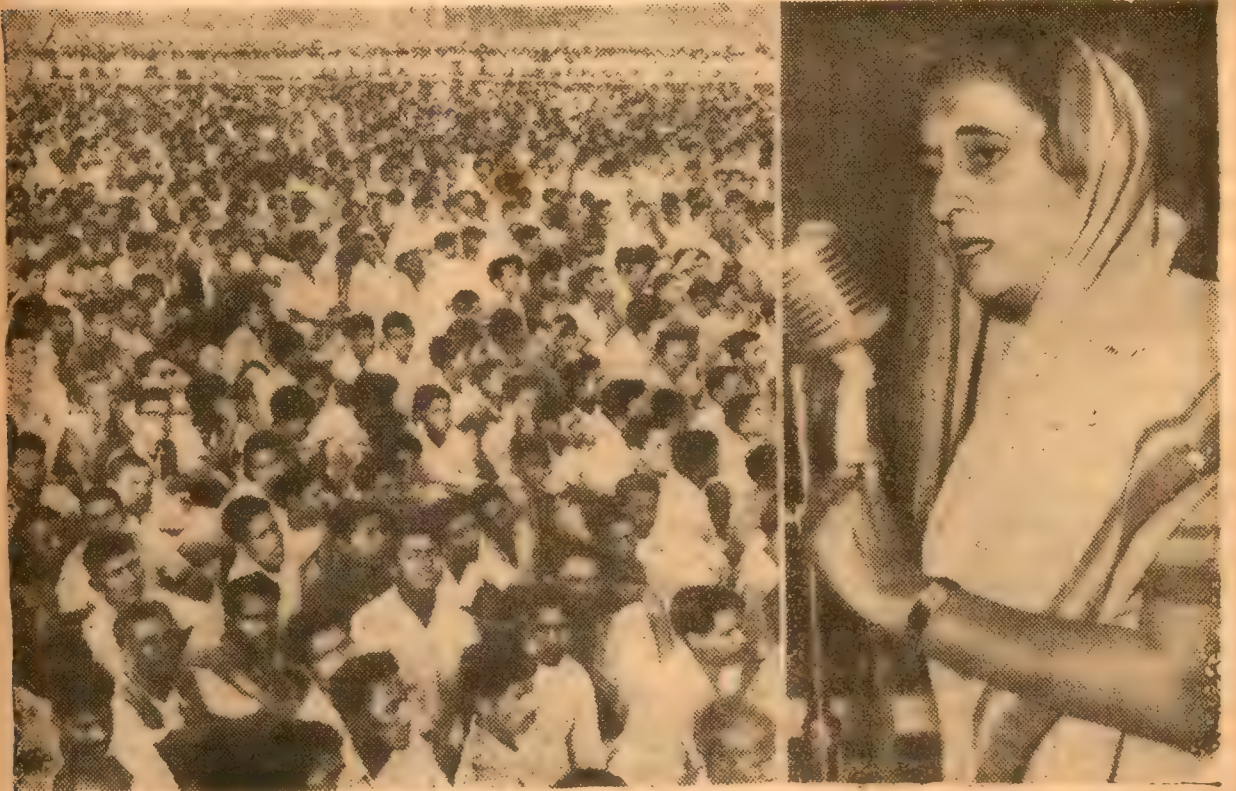
সভার বিকোভ প্রদর্শিত হচ্ছে। সেটা দৈনন্দিন জীবনযাপনের যন্ত্রণার বিরুদ্ধে বিকোভ। মধ্যমশ্রেণী ছাড়া অন্য কোন কংগ্রেস নেতার বক্তৃতায় বিষয় ঘটানো হয় নি। উত্তর ভারতের সর্বত্র যা ঘটছে। অর্থাৎ কোন কংগ্রেস নেতাকেই মুখ খুলতে দেওয়া হচ্ছে না, গাড়ি অবরোধ হচ্ছে, ইট পাটকেল ছোড়া হচ্ছে, বজাকে মগে উঠতেই দেওয়া হচ্ছে না, সেরকম কোন ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গে নেই।

কিন্তু এবারে যা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে, বিশেষ করে দুটি বাম ফ্রণ্টের ক্ষেত্রে, যেন খেউড়ের হাট বসেছে। এক ফ্রণ্টের নেতারা অপর ফ্রণ্টের নেতাদের বিরুদ্ধে যে আন্দাজে কুংসা ও খিস্তি খেউড় করতে শুরু করেছেন তা এক লজ্জাজনক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। পরস্পরের বিরুদ্ধে কুংসা গেয়ে তাঁরা নিজেদের দুর্বল করা ভিন্ন আর কোন মহৎ কাজ করেন নি। ফলে তাঁরা বতখানি না জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধিতা জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন নিজেদের। নির্বাচনের মাত্র দশদিন আগেও হীরেন-বাবু বলেছেন : এখনো সমস্ত

পারস্পরিক কুংসা রটনা বন্ধ করা জরুরি। জানি না শেষ মূহুর্তে এঁরা কি করবেন। তখন কি বেশি দৌর হয়ে যাবে না?

শাসকদলের বিরুদ্ধে নির্বাচনের স্বার্থে সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ সোচ্চার হচ্ছে। আমরা পূর্বে লিখেছি যে বারুইপুরে পদলিখিত কতক বিরোধী-পক্ষের কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, এবং একজন মন্ত্রী সপ্তাহে গড়ে চারদিন ধানায় বসে থেকে শাসনযন্ত্রকে নিজের স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। এইরকম অভিযোগ আরও বহু জায়গা থেকে আমাদের কাছে আসছে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডটি প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী বক্তৃতার জন্য ব্যবহৃত হতে দেওয়ার অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এমন কি গণতান্ত্রিক চেতনা-সম্পন্ন কংগ্রেসীও। কমিউনিস্টরা ওই উদ্দেশ্যে মাঠটি চেয়েছিল এবং তাদের তা দেওয়া হয় নি। এ অভিযোগ ন্যায্য বলেই মনে করি। প্রশাসনযন্ত্রকে শাসক-দলের স্বার্থে ব্যবহার করা নজীর হিসাবে শ্রবণীয় দৃষ্টিকটু, যা কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হওয়া উচিত নয়।

আগেই বলাইছে এবারে নির্বাচনী বক্তৃতা কোথাও মোটে জমে নি। ক্রোটিং জনতার নিকট স্ট্রীট কর্নার মিটিং যে কত দূর সার্থক হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্মীরাই বলতে পারবেন। তবে দেওয়ালে এবার যে আন্দাজ পোস্টার পড়েছে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভংগ করে দেয়। কোন জায়গায় একটুও স্থান খালি নেই। আমার বলতে একটু ভুল হল। পোস্টারের চেয়ে চুন অথবা আলকাতরা দিয়ে লেখার সংখ্যাটাই বোধ হয় বেশি। কি শহর, কি মফস্বল সর্বত্রই কোথাও কোন দেওয়ালে একটুকুও ফাঁক নেই। এবারে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে কবিতার লড়াই। একপক্ষ আর একপক্ষের উদ্দেশ্যে ছড়া কেটেছে। কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও শাণিত বিদ্রূপ, কোথাও বা একপক্ষের কবিতার জবাবে পাল্টা কবিতা। এগুলি সকলেই দেখে-ছেন, আর যাঁরা বড় একটা বাড়ি থেকে বার হন না তাঁরা সংবাদপত্র মারফত পড়েছেন। কাজেই এখানে আর সেগুলির উল্লেখ করে আপনাদের ধৈর্যচাঁতি ঘটানো না।



ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী বক্তৃতা



সুবর্ণলতা

ব্যবহারিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আশাশুনা দেবী

‘তু সুবর্ণলতার স্মৃতির পৃষ্ঠার
কবিতা লেখার দিনের’ স্মৃতি আর কই?
তার পাতার পাতার খাতার পাখীর ডানা
ঝটপটানির শব্দটাই তো প্রথর!

তবে তাকে তার সেই স্মৃতির জানলা
থেকে—কাঁবতা পড়তে দেখতে পাওয়া
যায়। কে জানে কোথা থেকে সংগ্রহ করে,
আর কেমন করেই বা পার ছাড়পত্র, তবু
দেখা যায়, যে বাড়িতে ছেলেদের পাঠ্য
পুস্তক আর ‘নতুন পঞ্জিকা’ ছাড়া আর
কোনো বই আসত না, সে বাড়িতে কোণের
দিকের একটা ঘরে খাটের তলার, দেয়াল-
আলমারিতে জানালা-দরজার মাথার তাকে
তাকে থাকে থাকে জমে ওঠে বই, কাগজ,
পত্রপত্রিকা।

হয়তো ঘরের প্রকৃত মালিক শাসন করে
করে এলে গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।
সইলে—কিশোরী সুবর্ণলতার স্মৃতির
ইতিহাসে তার বই কেড়ে নেওয়া,
ফেলে দেওয়া, ছিঁড়ে ফেলা, পুড়িয়ে
দেওয়া, সব কিছুর নজীরই তো আছে।
শেষ পর্বন্ত হাল ছেড়েছে। অথবা হয়তো
দেখেছে এতেই পাখীটা ঝটপটায় কম।

আরও পাখী তো আছে এ বাড়িতে,
খাঁটায় কই তারা তো এমন করে না?
বরং তারা আড়ালে বলাবলি করে ‘খানি
বেহারা মেয়েমানুষ বাবা, এত অপমানের
পরও আবার সেই কাজ? আমবা হলে
বোধহয় জীবনে আর ও বস্তু আঙুলের
আগা দিয়েও ছুঁতাম না। আর মেজবাবরও
হচ্ছে মনেই মর্দানী। বজ্র আঁটুনি ফস্কা
গেরো-!’

সুবর্ণলতা তার ‘আড়ালে’র কথা টের
পায় না। সুবর্ণলতা তার আপন আবেগ
আর অনুভূতির পরিমণ্ডলে বিরাজ করে।
তাতে বেহারা বল বেহারা, অবোধ বল
অবোধ।

তা’ হয়তো এক হিসেবে অবোধই।
নইলে উমাশশীদেবীর কাছেও এক এক-
সময় ছুটে যার সে এক একটা নতুন
অনুভূতির আবেগ নিয়ে। হয়তো শীতের
দুপুরে উমাশশী রোদে বসে বড়ি দিচ্ছে,
গিরিবালা পশমের রং মিলিয়ে ‘ব্লুস্টেপোষ’
বুনছে, আর বিন্দু রোদেই একটু গাড়ি
নেবে বলে মাদুর বিছোচ্ছে, সুবর্ণ সেখানে
বেন আছড়ে এসে পড়ে। উত্তেজিত
আরক্ত মন, চোখ লালচে, বলে, ‘দিদি
জীবনভোর শব্দ বড়িই দিলে, জানলে না
এ জগতের কোথায় কি আছে? শোনো,
শোনো একবার, পুরুষ কবি কেমন করে
ফুটিয়ে তুলেছেন মেয়েমনের কন্ট-দুশ্শব্দ।’
বলে কিন্তু চেয়ে দেখে না ওরা ‘জগতের
কোথায় কি আছে’ জানবার জন্যে উদ্যোগ
হয়ে তাকাচ্ছে, না পরস্পর কৌতুক দৃষ্টির
বিনিময় করছে। কৌতুক তো করেই তারা
সুবর্ণকে নিয়ে। ওটি যে একদিকে যেমন
ভৈরবী অহংকারী আসপন্দাবাজ আর এক-
দিকে তেমনি রম্য পাগল।

ওরা ওই পড়া মনুষ্যের মতন চোঁচিয়ে
পদ্য পড়ায় হাসে। বম্ব পাগলটা অবশ্য
ততক্ষণে সুবর্ণ করে দিয়েছে—

‘বেলা যে পড়ে এল জলকে চল!
পূরনো সেই সুরে কে যেন ডাবে
ধরে—’

আবেগে থরথর করে গলা, চোখ দিয়ে
অসতর্ক কখন জল গাড়িয়ে পড়ে, আর
তাবে, পদ্য না বন্ধুক প্রাণ নিংড়ানো ওই
মমকষাটুকু তো ওদের মর্মে গিয়ে
পৌঁছচ্ছে!...বেচারীরা চোখ বুজে দিন
কাটাচ্ছে, হঠাৎ তো এতেই চোখ ফুটে
যাবে। বন্ধুতে পারবে এই প্রাণপাত করে
সংসার করা, ওই ভয়ে সর্শাঙ্কত হয়ে
ধাকা, সব বৃথা, এখানে আমাদের কেউ
আপন ডাবে না। সবাই আমরা—

‘ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিরাছি
পরখ করে সবে করে না স্নেহ।’

আর এও বন্ধুক জগতে এমন হৃদয়-
বান মহৎ পুরুষও আছেন, যিনি নিরুপায়
মেয়েমানুষের এই মন্ত্রণা অনুভব করেন,
তাকে ব্যস্ত করবার ভাষা জোগান। আশ্চর্য,
আশ্চর্য, কি করে জানলেন রবীন্দ্রকুর—

এখানে মিছে কাঁদা

দেওয়ালে পেয়ে বাধা,

কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।’

কি করে টের পেলেন—

‘সবার মাঝে আমি

ফিরি একেলা,

কেমন করে কাটে

সারাটি বেলা,

ইটের পরে ইট,

মাঝে মানুষ কীট,

নাহিক ভালবাসা

নাহিক খেলা।’

এমন স্পষ্ট করে বলাও বন্ধুতে
পারবে না চিরবন্দিনী উমাশশী? বন্ধুতে

গাথাবিক কলহভাণ্ডী

সেই ভাবে না—আমাদের যে এই অবস্থা, তা' তো কই আগে জানতাম না। কি জন্মই ছিলাম।'

ওদের চোখ খুলতে বলে সুবর্ণ, আর হঠাৎ এক সময় নিজেরই চোখ খুলে যায় ওর। গিরিবালা সহসা শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'গলাটাকে একটু খাটো করো। স্নেহাদি, নিচে ফেন কার চটির শব্দ পেলাম, ছোট ঠাকুরপো এলেন বোধহয়।'

আর সেই বলে ওঠার ঢিল খেয়ে চমকে জাকিয়ে উঠে দেখে সুবর্ণ 'উমাশায়ী'র ইত্যবসরে দু'কুলো বাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে, আর কিন্তু ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে।

‘মর, চটির শব্দে কান খাড়া করেই মর তোমরা। জেলখানাই সুবর্ণের সাগর তোমাদের—’ বলে রাগ করে উঠে যায় সুবর্ণ, আর নিজের ঘরে বসে বইটা মুড়ে রেখে মদ্য আবেগে বলে, 'কোথায় আছিছ তুই কোয়ার মা গো, কোমলো ভুলিয়া আছিছ হ্যাঁ গো—'

ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়িয়ে পড়ে ঝড় বড় চোখ দুটো দিয়ে।

এমন ঘটনা কতদিনই ঘটে।

প্রবোধ প্রাপ্তই এই ভারী পম্পসে জন্মগত হারিয়ে যাওয়া মন স্নায়ুকেই কহে পায়।

কাজেই দোষ দেওয়া যায় না তাকে যদি সে বলে, 'এই এক রবিকাকুর হয়েছেন দেশের মাথাটা ধাবার জন্যে! মেরেমানুষ-গুলো যাবে এবার উচ্ছেদে। সেই যে বলে মা—'

‘পক্ষ গেল পটল গেল গুগলি হল আঁখি,

আর শালিষ গেল ফিঙে গেল আরশালা হল পাখী!'

হেসে বাড়িয়ে, ঈশ্বর গুপ্ত তো ছার—তোমার মতে বোধহয় তোমার ওই রবিকাকুর মাইকেলের চেয়েও বড় কবি।'

সুবর্ণ মাথা তুলে ওই বিদ্রূপমাথা মুখের দিকে তাকায় আর তারপর হিন্দু নারীর ঐতিহ্য সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'তোমাদের মত মদ্য-দেব-কাছে আমি কিছই বলতে চাই না।'

কিন্তু এসব কবেকার কথা?

খাঁচার পাখীর—এই জানা ঝটপটানির কাহিনী।

এসব তো সুবর্ণলতার স্মৃতিকথা।

যে সব কথা খাতায় লিখতে গেলে লোহান বিবর্ণ একঘেয়ে। 'তাই খাতায় তোলা হয় না, শব্দ স্মৃতির ঘরের চাবিটা খুললেই একসঙ্গে বোঁরিয়ে আসতে চায় অনেকে, হৃদয়ভিমে একাকার হয়ে।

কিন্তু খাঁচার পাখীর জানা ঝট-

পটানোর বাইরের বহু পৃথিবী তো স্থির হয়ে থাকে না।

খাঁচার পাখী আকাশের দিকে চোখ মেলে আত্ননাদ করে, পাখীর মালিক খাঁচার শিক শব্দ করতে চেষ্টা করে, বহু পৃথিবী তাকে উপহাস করে এগিয়ে যায়, আকাশকে হাতের মতোয় ভরে ফেলবার দুঃসাহসে হাত বাড়ায়।...কবিরা শিল্পীরা নিঃশব্দে আপন মনে অচলায়তন ভাঙার কাজ করে চলে, বিচারকের মন সশব্দ প্রতিবাদ ভেলে, শিকলদেবীর পুঙ্খবদীতে শাবল গাঁড়ির আ পড়ে।

তার মধ্য দিয়ে সমাজ মন অবিরাম ভাঙা-গড়ার পথে দ্রুত ধাবিত হতে থাকে।

তাই সহসা একদিন সচকিত হয়ে দেখা যায় কখন কোন ফাঁকে অবরোধের বজ্রমুদ্রি বেন শিখল হয়ে এসেছে, অব-গুপ্তন হ্রস্ব হয়ে গেছে, রাজরাস্তাটা যে একা পুঙ্খবদী কেনা জায়গা নয়, সেটা ওই স্বল্পাবগুপ্তিতারা যে বুঝে ফেলেছে, ওদের চোখে-মুখে আচারে-আচরণে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আর কতকগুলো দুঃসাহসী মেয়ে ইতিমধ্যেই বাঁপিয়ে পড়েছে সেই রাস্তায়। তারা পিকেটিং করছে। মার খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে। আসমুদ্র হিমালয় একটি নামে স্পন্দিত হচ্ছে, একটি কণ্ঠের ডাকে ছুটে আসছে।

সে নাম 'গান্ধীজী'।

সে ডাক 'একলা চল রে।'

কবির ভাষা প্রেমিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে।

দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক।

দর্জিপাড়ার গলিও বুঝি আর চোখে ঝুলি এটে থাকছে না। সেখানেও নাকি ছেলেরা বলছে 'বিলাতি সাবান মাখা হবে না আর,' এবং বিন্দু আর গিরিবালা না কি বিলাতি নুন আর বিলাতি চিনি বাতিল করে 'কক' আর 'দোলো' খাচ্ছে, এবং বাজার থেকে বিলাতি কুমড়া বিলাতি আমড়া আর বিলাতি বেগুন আনা নিষেধ করে দিয়েছে।

আবাল-বৃষ-বনিতা ইত্যর ভদ্র শিক্ষিত নারীর সবাই এক কথা কইছে কেউ আর এখন বলছে না 'রাজহুটা বটিশেরা।' সবাই বুঝে ফেলেছে ওরা অনায়াস করে দখল করে আছে, অতএব ন্যায়ের দখল নিতে হবে। সবাই জেনে গেছে মহাত্মা গান্ধী 'স্বরাজ' এনে দেবেন।

ফাঁসির মধ্যে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান' এ হয়ত তাদেরই রক্ত-ভেজা মাটির ফসল। তারা রাজ পুতে রেখে গেছে। এখন এসেছে আর এক নালী 'ভাতে জল দিতে।

ফসল?

যাবে দেশের লোক। খেলো বলে।

সদা ফল যে, যারা পুঙ্খবদী গর্তে আছে, বুড়ের চোঁকর খাচ্ছে জেলের ভাত খাচ্ছে, তারা কণ্ঠের শেষের পুঙ্খবদী খাবে সেই ফল।

কিন্তু সুবর্ণলতার মনের মধ্যে কেন তেমন সাজ নেই? যে সুবর্ণলতা 'স্বদেশী'র নামে টগবগিয়ে ফুটেতো, সে কেন স্বরাজের ব্যাপারে এমন মিইয়ে আছে?

দেশে যখন নিত্য-নতুন ঢেউ আসছে, যখন কুলভাঙা প্লাবন আসছে, প্রবোধের তো তখন সর্বদা সশব্দিত অবস্থা। আর বুঝি রাখা যাবে না ওকে গৃহ-কোঠেরে। হঠাৎ কোনদিন শুনবে মেয়ে দুটোকে নিয়ে পিকেটিং করতে বেরিয়ে গেছে সুবর্ণলতা লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে।

কিন্তু কই? তেমন উদ্ভাদনা কই?

কান্দু বোদিন একটা চরকা কিনে এসে বললো, 'মা বুজ্জু গাল-গল্পে দিন না কাট্টিরে এবার প্রতিটি মিনিট সুতো কাটতে হবে। এই চরকা-কাটা সুতোর কাপড় বুনিয়ে পরতে হবে সুবাইকে, সোঁদিন তো কই সুবর্ণ ওই নতুন জিনিস-টার ওপর কাঁপিয়ে এসে পড়ল না? বলল না, 'তোকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করি কান্দু, আমার মনের মত কাজ করলি তুই।'

না, সে কথা বলল না সুবর্ণ, শব্দ একটু হেসে বললো, 'গাল-গল্প আবার কে করছে রে এটা?'

'আহা গাল-গল্প না হোক নাটক-নভেল পাঠ। একই কথা। মোটকথা সম-য়ের অপচয়। আর অপচয় করা চলবে না।'

'চলবে না বুঝি?' আরও একটু হেসেছিল সুবর্ণ, 'তা চরকাটাই চালা। তোদেরই এখন সামনে সময়। আমার তো এখন সময়ের সম্বল সব পেছনে ফেলে চলে আসা জীবন।'

'চমৎকার! কত কত আশী-নন্দই বছরের বড়ো-বুড়ি চরকা কাটছে তা জানো? রাস্তায়-চলা-মানুষ পশ্চত তকলি কাটতে কাটতে চলেছে।'

'তা চলতেই পারে। যখন যা ফ্যাসান ওঠে।'

'ফ্যাসান! একে ফ্যাসান বলছো তুমি?'

কান্দু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

এমন কি কান্দুর বাবাও।

সুবর্ণর মুখে একথা অভাবনীয় বৈকি।

সাথে কি প্রবোধ এই অস্ফুট উল্টো-

পাল্টা'কে নিয়ে গোলকধাঁসায় ঘুরে মরলো
(চিরদিন)?

কান্দু মাকে অনেক থিকার দিয়েছিল।

বলোছিল, 'স্বরাজ্য' অর্মান আসবে না।

তার জন্যে ক্রেশ চাই, দূরুশ চাই।'

মুজ্জকেশীর নাতি, প্রবোধের বংশধর,
বলোছিল একথা উত্তেজিত গলায়।

অতএব বলতেই হবে দেশের মজা
নদীতে বান ডেকেছিল। তথাপি সুবর্ণ
উত্তেজিত হয় নি। সুবর্ণ আবার হেসে
উঠে বলোছিল, 'তা তোর এই সুতো
কাটার মধ্যে ক্রেশই বা কই? দূরুশই বা
কই? আর গেরস্তবরের মেয়েমানুষের
অবসরই বা কই?'

কান্দু আরও জ্বলোছিল।

আর একবার নাটক-নভেলের খোঁটা
দিয়োছিল, সুবর্ণলতার দু-দুটো বড়
হয়ে ওঠা মেয়ে কি রাজকার্য করে তার
হিসেব চেয়েছিল। হ্যাঁ দুটো মেয়ের কথাই
তুলেছিল কান্দু—তখনো পারুর ঘর বসন্ত
হয় নি।

আর কান্দুর বিয়ে হয় নি।

কান্দুর বিয়ে লাগলো ওই চরকার
টেউটা একটু কমলে। অনেকের বাড়িতেই
তখন আধভাতা চরকাটা ছাতের সিঁড়িতে
কি চিলেকোঠার আগ্রয় পেয়েছে। শব্দ
ফারদার কারুর দেয়ালে চরকা কাটা রত
ছোটোটি কুলছে উজ্জ্বল মহিমায়।

তা' সে যাই হোক—পারুল বকুলের
কথা তুলেও মাকে নোয়াতে পারে নি
কান্দু। সুবর্ণ বলোছিল, 'সে ওদের নিজের
থেকে ইচ্ছে হয় প্রেরণা আসে, করবে
ওরা। আমি হুকুম দিতে যাব কেন?
বিশেষ করে—আমার ষাতে বিশ্বাস
আসছে না!'

তা' হলেই বল উল্টোপাল্টা কি না।

দু-পাট্টা ছেলে ঘরে বসে দুটো
হাতবোমা বানিয়ে আর পুঁলিশ মেয়ে
দূরুশ বাঁটশের গোলা-বারুদের শক্তিকে
নিরশেষ করে ফেলবে এ বিশ্বাস তোমার
ছিল, আর এতে তোমার বিশ্বাস নেই?

তা' কান্দুর রাগের মানে অবশ্যই
আছে।

সুবর্ণরই ছিল।

কোনোটাই নিরর্থক নয়। কোনো
প্রাপ্তিই হঠাৎ আসে না। কাজ চলে নানা
চিন্তায়, নানা হাতে। বহু পরীক্ষা-
নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তো পরমকে পাওয়া
যায়।

কিন্তু একবগ্না সুবর্ণ বলে, 'পরমকে
পেতে হলে চরম মূল্য দিতে হয়।' অথচ
ওই চরমটা যে কি সেকথা বলে না। হয়তো
সে ধারণাও ওর নেই। শব্দ একটি 'বড়

বড়' কথা বললেও স্নানো ভাবের ফান্দে
বৈ তো নয়।

তবে মোটের মাথায় দেখা গিয়েছে
সুবর্ণ এতখানি সুবর্ণ-সুযোগেও রাজ-
পথে নামে নি। রাজপথের কলকোলাহলের
দিকে দর্শকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছে
শব্দ।

তবে বিদেশী জিনিস বজ্র'ন?

সে তো বহুকাল আগে থেকেই হয়ে
আসছে। ইচ্ছেন-অনিচ্ছেন মেনেই
নিয়মে সবাই সুবর্ণলতার এই জ্বর-
দম্ভিত। হয়তো বা রাগারাগি কেলেকারীর
ভয়েই। ঘরে পরে কাউকেই তো রোয়া
করে না সুবর্ণ।

এ পাড়ায় বাড়ি করার সময় থেকেই
পাশের বাড়ির পরিমলবাবুদের সঙ্গে
ভাব, পরিমলবাবুর স্ত্রী সবদা আল
বাড়িয়ে এসে নতুন-আসা পড়শীদের
সুবিধে-অসুবিধে দেখেছেন। বলতে গেলে
আত্মীয়ের মত হয়ে গেছেন। তবু একদিন
পরিমলবাবুর স্ত্রী যখন বেড়াতে এসে
মলোছিলেন, 'দিশী দেশলাই দেখেছ
বকুলের মা? দেখে—আর হেসে বাঁচ
না। জ্বলবার আগেই নিভেছে। একটা
উনুন জ্বালতে একটা দেশলাই লাগবে।
বিলাতির সঙ্গে আর পান্না দিতে হয় না
বাবা কিছুর।'

তখন সুবর্ণ ফস করে বিলাতি
দেশলাই কাঠির মত জ্বলে উঠে বলোছিল,
'এসব গল্প আমার কাছে করবেন না
দিদি, আমার শুনতে খারাপ লাগে।'
পরিমলবাবুর স্ত্রী মানুষ ভাল,
তবে মাটির মানুষ তো নয়? অতএব
হয়ে গিয়েছিল বিচ্ছেদ।

অনেকদিন লৈগোছিল মনের সেই
মালিন্য ঘুচতে। বোধকরি ছেলেমেয়েদের
কারো বিয়ে উপলক্ষেই আবার আসা-
যাওয়ার পথে পুনর্নির্মাণ। তা'ছাড়া পরি-
মলবাবুর ছেলে সুনির্মল তো কোনো-
দিনই ওসব মনোমালিন্যের ধার ধারে নি।
ঘরের ছেলের মত এসেছে, বসেছে, খেয়েছে।

সেই আসা-যাওয়ার অন্তরালে—

কিন্তু সেকথা থাক।

সুবর্ণর অগাধ সমুদ্রের এক অঞ্জলি
জল, অগাধ স্মৃতিকথার একমুঠো কথা
এবার আলোর মুখ দেখবে। তাই সুবর্ণ-
লতা মর্মীত হচ্ছে। তাই সুবর্ণ তাকিয়ে
দেখছে না তার অস্ত্রপুর্বে লোকাচার
বিধির সমস্ত অনুশাসনগুণি নিভুল
পালিত হচ্ছে কি না।

এখন সুবর্ণ অনেক বিশ্বাস-ব্রহ্ম কাটিয়ে
তার সেই 'প্রথম কবিতার দিনটির
কাহিনীখানি অক্ষরের বন্ধনে বন্দী করে

নিয়ে একবার মামীশাশুড়ীর বাড়ি
স্বাবার জন্যে স্পন্দিত হচ্ছিল।...

তাই ছেলেকে ডেকে বলছিল, 'সুবর্ণ
একখানা গাড়ি ডেকে এনে দিতে পারবে?'

তা এই রকমই কথা সুবর্ণর।

'সুবর্ণ একটা গাড়ি ডেকে এনে দে'
না বলে 'এনে দিতে পারবে?'

মা ছেলের সহজ সম্বন্ধের ধারার মধ্যে
যেন দূরত্বের পাথর পড়ে আছে চাই চাই,
তাই জলটা বয়ে যায় ঘোরা পথে।

কে জানে এই পাথরটা কার রাখা।

মায়ের না ছেলের?

সুবর্ণও তো বলল না, 'কী আশ্চর্য,
পারব না কেন? যাবে কোথায়? চল
পেঁচি দিচ্ছি গিয়ে।'

সুবর্ণ শব্দ বাস্তবিক গলায় উচ্চারণ
করলো, 'কখন দরকার?'

সুবর্ণলতা আহত দৃষ্টিতে তাকায়।

সুবর্ণলতা যেন বড় অপমান বোধ
করে।

সুবর্ণলতা তো জানে ওর এই ছোট
ছেলেটার ভিতরে হৃদয় আছে। তবে সুবর্ণ-
লতার বেলার কেন সে হৃদয়ের এতটা
কাপণ্য? যেন চেষ্টা করে হৃদয়টাকে শক্ত
মুঠোর আটকে রাখে সুবর্ণলতার ছোট
ছেলে। কিছতেই ষাতে না অসজর্ক
একটু স্থলিত হয়ে পড়ে।

আশ্চর্য!

মা' বলে কতদিন ডাকে নি সুবর্ণ?

ইচ্ছে করে না এই কাঠিন্যের সামনে

এসে কোনো আবেদন করতে। তবু এক-
আধ সময় উপায়ও তো থাকে না। এক



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২০০, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৫৮০

সাপ্তাহিক বসুমতী

একটা ভাড়াটে গাড়ি করে এবাড়ি-ওবাড়ি করার সাহসটাই তো অসম সাহসিকতা। তবু সে সাহস দেখায় সুবর্ণ, দুটো শব্দ-শাড়ি একাই যাওয়া-আসা করে। তাই বলে পথে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ি ধরে নিয়ে যাওয়া তো চলে না? সেটা যেন সাহস নয়, অসম্ভাব্য। অস্তিত্ব সুবর্ণর মাপকাঠিতে।

সুবল না হোক অন্য ছেলেরা এই নিয়ে শোনাতে ছাড়ে না। বলে, 'আর ছাড়ি ডেকে দেওয়ার 'ফাস' কেন বাবা? বেশ তো, স্বাধীন হয়েছ, যাও না বেরিয়ে পড়ে ডেকে নাও না গে এক-খানা।'

বলে আরো বোদের কাছে তর্কি-হুল খেয়ে।

বোদের একা এক পা বেরোবার হুকুম নেই, অঞ্চ-শাশুড়ী দিবা—

তা সুবল কিছু শোনাতে না। শুধু বললো 'কখন দরকার?'

সুবর্ণও অভাব সেই বান্ধব গলা-তেই উত্তর দেয়! এখনই দরকার! তা-নইলে বলতে আসবো কেন? বি আসে নি এখনো—

কথা শেষ হয় না, হঠাৎ বুকটা খড়স-করে ওঠে সুবর্ণর।

নিচে ও কার গম্বা?

জগু বটাকুরের না?

কেন?

এমন অসময়ে কেন উনি?

তবে কি বলতে এসেছেন ও বই উনি ছাপতে পারবেন না?

পড়ে কি বিরক্ত হয়েছেন?

অবাক হয়েছেন সুবর্ণব নির্লজ্জতার—কিন্তু সেই নির্লজ্জতার বিষয়ে এমন

কি ছেড়ে বাদ-বিতণ্ডা করবেন?

আর সঙ্গে করছেন?

একটা হিন্দুস্থানীর-গলা না?

গাড়োয়ান? পরসূ নিয়ে কচকাচ করছে?

আর বেশিক্ষণ ভাবতে হয় না।

ছাপাখানার মালিক জগন্নাথচন্দ্রের হেঁড়ে গলা আকাশে ওঠে—'সুবল কই রে সুবল? এই যে বোমা তুমি এসে গেছ। তোমার বই এনে দিলাম। পাঁচশ' কর্প ছাপিয়েছি বুদ্ধে। প্রথম বই, বিয়ের শস্যর মত বিলেতে তো চাটি? বেশি থাকাই ভাল। মট্টে-ব্যাটা কি কম শয়তান? ওই ক'খানা বই এপাড়া-ওপাড়া করতে কি না ছ' পয়সা চায়। চায় পয়সার বেশি হওয়া উচিত? বল তো বোমা! রাগ করে দ'আনিটাই ছুঁড়ে দিলাম। বল নে গে ব্যাটা পান খেগে যা।'

এই বাক্যস্রোতের মাঝখানে বকুল এসে ধীরবে জ্যাঠাকে প্রণাম করে, তাদের জগু

জ্যাঠামশায়ের এমন অসময়ে 'আবি-ভাবের কারণ ঠিক অনুধাবন করতে পারেন না। সঙ্গে ওগুলোই বা কি?

তা' জগু কাউকে বেশিক্ষণ অশ্বকারে ফেলে রাখে না। সহর্ষে বলে, 'এই যে তোমাদের মার বই হয়েছে গেছে। নাও এখন বন্ধুবান্ধবকে বিলোও। সাথ'ক মা'তোমা-দের, লোকের কাছে বলতে কইতে মুখ উজ্জ্বল। ছাপাখানার লোকেরা তো শুনেন ভাঙ্জব।'

বলা বাহুল্য বকুল এব বিন্দু-বিসর্গও বৃকত পারে না।

মার বই! সেটা আবার কি জিনিস।

তাই অবাক হয়ে মার মুখের দিকে তাকায়।

বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে সুবর্ণও। বই ছাপা হয়ে গেছে।

ছাপা এত শীগগির হয়।

নতুন পরিচ্ছেদটা আর দেওয়া গেল না তাহলে। না থাক, কিন্তু কোথায় বই? ওই বুদ্ধিটা! যে বুদ্ধিটা সিঁড়ির তলায় বসানো রয়েছে।

পুরনো শবরের কাগজে মোড়া দড়ি-বাঁধা স্তূপীকৃত কতকগুলো প্যাকেটভর্তি মস্ত বুদ্ধিটা জগন্নাথচন্দ্র এবার টেনে সামনে নিয়ে আসেন।

একটা অপ্রত্যাশিত স্তম্ভতার অব-হাওয়াটা যেন নিখব হয়ে গেছে।

মোটো বুদ্ধি জগন্নাথও যেন টের পান কোথায় একটা সুদ কেটে গেছে। ভাগ্যবোঁ উজ্জ্বলিত হয়ে উঠে পলক প্রকাশ করবে না সত্যি, তবু ভাবে-ভগ্নীতে তো বোকা যাবে।

যেদিন সুবর্ণ খাতিখানা নিয়ে ছাপার কথা বলতে গিরোছিল, সেদিনও কিন্তু আর ভাদ্রবোরের রীতি পুরোপুরি রক্ষিত হয় নি। অহম্মাদের একটি প্রতীকিত দেখিয়েছিল মানুষটাকে।

আর এখন?

যেন হঠাৎ সাপে কেটেছে।

বোমটা তো দীর্ঘ নয় বা বাড়ির বোদের মত, মুখ দেখতেই পাওয়া যায়।

অপ্রতিভের মত এদিক-ওদিক তাকায় জগন্নাথ, তারপব শুকনো শুকনো গলার বলে, 'বাবা বাড়ি নেই?'

বকুল আস্তে বলে, 'না। পাশের বাড়ি দাবা খেলতে গেছেন।'

অন্যদিন হলে নির্বাণ জগন্নাথ সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে বলে উঠতো, 'গেছে তো! জানি! চিরকলে নেশা। কথায় আছে তাস, দাবা, পাশা তিন সর্বনাশা। আর ভাষা আমার ওই তিনটিতেই ডুবে আছেন।'

কিন্তু আজ আর জগন্নাথের বাক-স্বর্গিত হয় না, 'আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি।'

আমি এখন যাচ্ছি।' বলে চিটিটা পায়ের গলার।

আর এককণ্ঠে সুবর্ণ প্রাণের ঘোমটা টানে। আঁচলটা গলার দিয়ে আস্তে পায়ের কাছে একটি প্রণাম করে।

'থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে—' বলে চলে যায় জগু।

আর পথে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে একটা সিঁধ্যান্তে-পৌঁছয়, আর কিছু নয়, অতি আহ্বাদে—কথাতেই আছে অল্প সুখে হাস্যমুখে নানা কথা কয়, বেশি সুখে চোখে জল চুপ কবে রয়।

আব বকুলটা?

ও বেচারা হকচকিয়ে গেছে আর কি! বোকাই যাচ্ছে বাড়িতে কিছু জানান নি বোমা।

আহ্বাদে নিশ্চিন্ততায় এবার জোরে জোরে পা ফেলে জগু, 'ওঃ প্রবোধচন্দ্র এসে চোখ কপালে তুলবেন! সাতপুরুষে কেউ কখনো বই লেখে নি, লিখল কিনা ঘরের বো!'

মাকে গিয়ে বলতে হবে, 'বুদ্ধে মা, আহ্বাদে তোমার মেজবোমার আব মুখ দিয়ে কথা সরে না।'

তা' প্রবোধচন্দ্রের প্রথমটা চোখ কপালে উঠেছিল ইক কি।

তাবপরই বাড়িতে উঠলো হাসির হুজুড়া।

ছেলেবা বোধ করি এমন হেঁচক করে হাসাহাসি করে নি বহুকাল। 'বাবা' বলে ডেকে কথাই বা কয় কবে?'

'বাবা, মার বই! জগু জ্যাঠামশাইয়ের ছাপাখানার মাল! দেখো দেখো! উঃ! প্রবোধ আকাশ থেকে পড়ে, মার বই! তার মানে?'

'তার মানে? মানে হচ্ছে আমরা তো কেউ কখনো মার কিছু করলাম না, তাই মা নিজেই হাল ধরেছিলেন, চুপি চুপি গিয়ে জগু জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি গিয়ে ছাপতে দিয়ে এসেছিলেন। সেই 'বই' ছেপে এসেছে।'

প্রবোধ মেয়েদের মত গালে হাত দিষ্ট বলে ওঠে, 'বলিস কি রে ভানু, এ যে সত্যিই সেই কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাঁধ। তাদের গভ'ধারিত্বের একে-বাবে গ্রন্থকার হবার বাসনা।'

'হু! ভানু হেসে হেসে ফর ফর করে বইয়ের পাতাগুলো উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আহা! গ্রন্থই বটে। গ্রন্থের নমুনটি লোককে দেখাবার মত।'

তা হাসাটা-নেহাৎ অপরাধ নয় ভানু, সুবর্ণজতার স্মৃতিকথা'র নমুনা দেখলে কে-ই বা না হেসে থাকতে পাবতো?

মোটোবুদ্ধি জগন্নাথচন্দ্র, 'পরসূর দ'খানা বর্ণবিচয়ের কাগজে বই ছেপে দিয়েছেন সুবর্ণজতাব ভাঙা

টাইপ আর পদ্ম কাল দিয়ে। অবশ্য সেটা ঠিক জগদ্র দোষ নয়, জগদ্র ছাপা-খানার দোষ। অথবা সুবর্ণলতার ভাগ্যেরই দোষ।

বই দেখে পর্যন্ত বন্ধি সুবর্ণ তার ভাগ্যের স্বরূপটা স্পষ্ট কবে দেখতে পেয়েছে। নাঃ আর কোনো সংশয় নেই, আর কারো দোষ নেই, সবটাই সুবর্ণলতার ভাগ্যের দোষ।

শুধুই কাগজ? শুধুই যন্ত্রাঘাতের প্রমাদ?

মুদ্রাকরের প্রমাদ নেই?

যা না কি—ছুরির মত বন্ধে এসে বিধেছে।

রসিয়ে রসিয়ে আব চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে আগেই পড়া হচ্ছে গিয়েছিল। আর একবার পড়া হতে থাকে বাপার সামনে, শুনুন বাবা, শুনুন যান। এই অপূর্ব প্রসঙ্গ; আর এই অপূর্ব প্রফরীড়ার নিয়ে ব্যবসা চালান জগদ্র জ্যাঠামশাই। নাম-ধাম কিছ নেই বইয়ের, বই ছাপা হয়েছে নাম হয় নি। প্রথমেই শব্দ, শব্দন, ভূমিকা, আমি একটি নিপুন্নায় বঙ্গনাড়ি, আমার একমাত্র

পরিচয় আমি একটি অম্বপদ্রির মেজবো! আমার—

প্রবোধ হঠাৎ প্রায় ধমকে ওঠে, 'ও আরার কি রকম পড়া হচ্ছে? কী ভাষা ওসব?'

'বাংলা ভাষাই। যা লেখা আছে তাই পড়ছি। আরো নমুনা আছে দেখুন না।' ক্রোড়কের হাসিতে চঞ্চল দ্রুতকণ্ঠে পড়তে থাকে ভান, 'আমার মন আছে, বন্ধি আছে, মস্তিষ্ক আছে, আত্মা আছে, কিন্তু কিছু কিছু কেহ আমার সম্বন্ধে স্বীকার করে না। আমি যে—'

থুক থুক করে একটা হাসির শব্দ শোনা যায়। বোয়েরা হাসছে মূর্খে কাপড় চাপা দিয়ে। ভানুর ভঙ্গীতেই যে বেশি হাসির খোরাক।

কিন্তু হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে যায়।

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

কেন্দ্রীয় ছিল সুবর্ণলতা, অকস্মাৎ জুধু ব্যায়ীর মত এসে প্রায় কাঁপিয়ে পড়ে বিরে হয়ে যাওয়া মস্ত বড় ছেলের ওপর।

ব্যায়ীর মতই একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায় সুবর্ণলতার গলা থেকে। বইখানা কেড়ে নিয়ে কুচিকুচি করছে।

বহুকাল আগের মত আবার একদিন ছাদে আগুন জ্বললো। সুবর্ণলতার গোলাপী রঙের বাড়ির ছাদে।... না যত উদ্ভ্রান্তই হোক সে, তন্দ্রাভেই বাড়ির যেখানে-সেখানে আগুন ছেঁলে একটা অগ্নিকাণ্ড করে বাসে নি।

ধীবে-সুস্থে সময় নিয়ে জ্বালিয়েছে আগুন, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে।

'পরসায় দু'খানা বর্ণপরিচয়ের কাগজে ছাপা, তেমনি কাগজের মলাটেই বাঁধাই পাঁচশোখানা বই পড়ে ছাই হতে এতক্ষণ লাগলো? না সেগুলো নিমেষেই গেছে। সময় নিয়ে আর চোখ জ্বলানো খোঁয়া উদ্গিরণ করে যেগুলো পড়লো সেগুলো হুচ্ছে অনেক কালের হলদে হয়ে যাওয়া পাতা, আর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কান্ডিতে লেখা অনেকগুলো স্বাত।

[জমশং]

॥ আত্মপ্রকাশ করেছে একলের বরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে স্মরণীয় গ্রন্থ ॥

কত কত কত অশ্রুর বিনমরে আমরা লাভ করেছি পবিত্র স্বাধীনতা; অগ্নিদার মত কত বিপ্লবী আত্মহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে, নীরা বৌদির মত বিপ্লবীর কত অসাধারণ, সহধর্মিণী নীরবে সহহৃদে সহ্য করেছেন অপবিস্ময় যন্ত্রণা। আজ আমরা তাঁদের সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। সেই অপাপবিঘ্ন সাহস নিশ্চয়, সেই স্বর্গচন্দ্রী আদর্শ আজ প্রসিদ্ধ। দর্শনটি, পাণাচার, কালোবাজারী আর স্বাধীনমতায় সমাজ আজ ক্রিস্ট ও তমসাজ্বর

কত কথা মনে পড়ে শৈলেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

দায়
চার
টাকা

তরুণ কবি ও প্রতিশ্রুতিবান কথাশিল্পী শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে একটি পরিচিত নাম। অনতি-অতীত স্বাধীনতার সংগ্রাম, মর্সলীম লীগের আত্মঘাতি ষড়যন্ত্র, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তি থেকে বর্তমান কালের যন্ত্রণা-বিধ্বস্ত জীবনযাগনা পর্যন্ত ভারতবর্ষের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক যুগকে অস্বিষ্ট মননশীলতায় অসাধারণ মর্সলীয়ানায় একেছেন লেখক। মণিদা একটি উজ্জ্বল চরিত্র; নীরা বৌদি সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে অনন্য। আরো অনেক চরিত্র এসেছে ভিড় করে, সব চরিত্রই বাস্তব-জীবনে আমাদের পরিচিত; কিন্তু এমনভাবে কি আমরা এঁদের চিনেছি? সম্ভবত এ ধরনের গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে নতুন।

বাক-সাহিত্য : ৩৩ কালজ্য রো কলিকাতা ৯

আমরা একটি মিথ্যা



আমরা

এই মাত্র যে একজন সাধারণ ভারতীয় মৃত সেপাইয়ের প্রতি আমরা সামরিক কারদায় স্যালুট বিলাম—তখনও জানতাম না কি তার জাত। মামলার সময় জেনোছি—তার নাম রমণী চক্রবর্তী। “Behind the guardroom the sentry Ramani Chakravarty was found lying in a dying condition from bullet wounds and unable to speak. He was removed to hospital where he died shortly afterwards.” (Judgement, of Chittagong Armoury Raid Case no 1)

সেই রাতে আক্রমণের সময় আমাদের গুলীতে আরো দু'জন কনস্টেবল আহত হয়। গার্ডরুম দখল করার জন্য আমরা ফায়ার করতে করতে ছুটে গেছি। গার্ডরুমে সেপাইরা তাদের খাটিরার সঙ্গে রাখা মাস্কেট্রীটি হাতে তুলে নেবার কোন সুযোগই পায় নি। “The constable Jay Karan tells a similar story. Aroused by the report of guns, he got up and was stretching out his hand for his rifle when he was shot in the left buttock, whereupon he leapt from the verandah and ran for cover to the jungle west of the doctor's quarters”. (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case No. 1).

গার্ডরুমে কনস্টেবল জয়করণ গুলীর শব্দ শুনে তাঁর বন্দুক তুলে নেবার জন্য ছাত বাজালেন। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশত তিনি বন্দুক আর খুঁজে পেলেন না। বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে ফালসি করে-

ছিলেন। পালাবার সময় তাঁর পিছনে বা নিকে গুলী লাগে—তিনি সামান্য আহত হন।

আর একজন কনস্টেবল পদলিখ লাইনে জখম হন। সেই রাতে গার্ডরুমে তাঁর ডিউটি ছিল না। শ্রীশীতলপ্রসাদ দত্তে “নং ১” পদলিখ ব্যারাকে ঘুমাইছিলেন। বন্দুকের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে তিনি গার্ডরুমের বা ম্যাগাজিনের দিকে ছুটে আসছিলেন। “Constable Sital Prasad Duby who was sleeping in No. 1 barrack was likewise awakened by the firing.... as he approached the magazine they turned their torchlights upon him and fired at him. The bullet hit him on the left hand where upon he ran back to the Police Hospital where he lurked all night until 8 a.m” (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case No. 1).

এক নম্বর ব্যারাক থেকে ঘুমচোখে শ্রীশীতলপ্রসাদ ম্যাগাজিনের দিকে ছুটে আসতেই আমাদের পিস্তলের গুলী তাকে অভ্যর্থনা জানালো। সামান্য আহত হয়ে পদলিখ হাসপাতালের কাছে নর্দমা বা ঝোপেঝাড়ে লুপ্তিয়ে প্রাণটি হাতে নিয়ে তিনি সারাটি রাত কাটালেন। বৃষ্টিমানের কাজই করেছেন—না হলে পৈশিক প্রাণটি তাঁর হারাতে হতো।

নয় ব্যাটারিখব্দ বড় বড় টর্চলাইট হাতে নিয়ে আমবা পাহারা দিচ্ছিলাম। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে কোনদিক থেকেই কারো আসা সম্ভব ছিল না। বেচারী শীতলপ্রসাদকে কি বিপদেই না পড়তে হয়েছিল! অচেনা কাউকে দেখলেই এবং আমাদের “ডাকের” জবাব না দিলেই ফায়ার করা হত। আমরা দেওয়া ছিল। পিছনের দিক

থেকে প্যারেড গ্রাউন্ড পার হয়ে কেউ কোন আসতে না পারে তার জন্য আমরা সব সময়ে টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছিলাম। হঠাৎ করেকজনকে দেখতে পেয়ে আমাদের যুবক সৈনিকরা ফায়ার করে। “We may here relate the previous adventures of Mr. Lewis. On being apprised by a constable of the attack on the police lines he went outside and heard firing and shouting in that direction. Arming himself with a pistol and his orderly with a shot gun he set off across country on foot and emerged on the parade ground at the lives where they were fired upon. They shouted “Don't shoot, we are police.” whereupon the firing became more intense. They took cover in a ditch there for about three quarters of an hour during which, Mr. Lewis says, firing went continuously from the direction of the reserve office. He could see the flash of electric torchlights and figures moving....” (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case no. 1).

অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট লুইস সাহেব একজন কনস্টেবলের নিকট খবর পেয়ে ঘরের বাইরে এলেন। পদলিখ লাইনের দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ ও চিৎকার শুনে পেয়ে তিনি আর কাল-বিলম্ব না করে নিজের পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর আদালতী ও বন্দুক চাঙা জীবন সঙ্গী হলো—। দ'জান

মধ্য দিয়ে পদাশ লাইনের দিকে এগোতে লাগলেন। সাহেবেব তাঁকে—পদাশ লাইনের প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত হওয়া সংগে সংগে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলী ফাঁকা হয়। মিঃ লুইসেব তখনও আশা ছিল পদাশেরা হস্ত আত্মরক্ষা পুনরুদ্ধার করছে। তাই তাঁরা চোঁচিয়ে বললেন—“আমরা পদাশ—আমাদের গুলী ফাঁকা না।” তাবপর সাহেবেব ভাষ্য হচ্ছে—গুলী ফাঁকা তবু ভাষ্য চললো। উপায় না দেখে তাঁরা একটি নদীমায় পৌঁছে এত ঘণ্টা লুইসেব বইলেন। যতক্ষণ তারা দেখানে ছিলেন মিঃ অফিসেব দিক থেকে গুলী আসছিল ও অনবরত টকেন আলো ও মোবাইলকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল।

আমরা ও গ্যাংগারন দখল করার পর শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের অনেক তৎপরতা অবলম্বন করতে হয়েছে। অবস্থা খুব সংগীন। সাদা পোশাকে বা ইউনিফর্মসে সেই এলাকায় কোন আজানা লোকের প্রবেশ একেবারে দৃশ্যে ছিল বললেই হয়। আব এরা সে এলাকায় যাওয়ার সাহস কারো হতেই পারে না। অবশ্য আমাদের ছোট ছোট দল প্রথম ফাফারের দু-এক মিনিটেব মধ্যেই এসে জড় হয়েছে। এখন আমাদের প্ল্যান মাফিক ১০-১০ মিনিটের সময় নতুন শেড্রোলে করে আসবে অস্ত্রকাণ্ডার দল। প্রায় সেই সংগে নরেশের দল ইমোনিয়াম ক্লাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ প্রতিনিধিদের নবমোদ যন্ত্র সমাপ্ত করে বর্তমানে আমাদের হেড কোয়ার্টার—পদাশ লাইনে এসে হাজির হওয়ার কথা। যে বাস্তব দিয়ে তারা আসবে সেই পথে তাদের অভিযান করা জন্য আমরা আকুল উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছি। প্রতি মুহূর্তে আশা করছি এই বৃদ্ধি তারা বিজয় সংবাদ নিয়ে এলো। এমন সময় ওয়াটার ওয়ার্কসেব বাকি সাদা পোশাকে একজনকে একা আসতে দেখতে পাই। এত রাতে এখানে একা একা কে আসতে পারে! স্বভাবত মনে করছি কোন ব্যাপকের পদাশ রাতে বোঁড়িয়ে ফিবেছে। আমাদের দশজন সেন্সিটী একসঙ্গে বন্দুক লক্ষ্য করল। দলপতি উচ্চকণ্ঠে আদেশ দিল—Hands up! Halt! who comes there? (হাত তোল। দাঁড়াও! কে ওখানে?) আগন্তুক মাথার ওপর হাত তুলল। শিথল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তাবপর উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল—“আমি স্বদেশ—আমি স্বদেশ!” কি! ঐক! স্বদেশ! আমাদের স্বদেশ! উপেক্ষিত, লঙ্ঘিত অবহেলিত, অপমানিত স্বদেশ! তাও কি সম্ভব? স্বদেশ এসেছে এখন অননুয়। করার অভিপ্রায়ে

নব। সে এনেছে তার স্বদেশপ্রেমের দাবি নিয়ে। ভয় দেখানোর জন্য লক্ষ্য করে বা না করবেই আমরা তখন চারিদিকে গুলী চালাচ্ছি। যে কোন আকস্মিক কারণে স্বদেশ যে গুলীর মুখে পড়বে না সে নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু স্বদেশেব সে দিকে দৃষ্টিপথ ছিল না। এখন সে নিশ্চয়। দাঁত ফণী ন্যায় ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। কাউকে দংশন করতে নয়—অপমানের বিবের জ্বালাব নিজেই সে এত দিন তিলে তিলে পুড়েছে—এখন বিপ্লবী সাথীদের গুলীভরা বন্দুকের সামনে দলিত সপরি মত ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে সীমাহীন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে। এমনই তাব দাঁড়াবার ভঙ্গী যেন সাথীদের উপহাস করে বলছে বনি এখনও আমাকে সন্দেহ হয়, তবে কে আছে—সাহস করে আমাকে গুলী কর!

মুহূর্তে আমাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সবার মুখে মুখে বব উঠলো স্বদেশ এসেছে! স্বদেশ এসেছে! আনন্দে সবাই উৎফুল্ল। উচ্চকণ্ঠে সকলে জয়-ধ্বনি দিল ‘স্বদেশ বায় কি জয়! বন্দে-মাতবম্’! স্বদেশ রায়ের কাছে তিনজন বন্দক বন্দু এগিয়ে গেল। তাকে বিশেষ আত্মনা করে নিয়ে এল। টিলার উপর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেউ তাকে রাইফেল এনে দিল—কেউ এনে দিল কাউন্সেলর থলি আবার কেউ দিল বিজলবার।

আমি স্বদেশের কাছে গেলাম। দু-হাতে তাকে বুক জড়িয়ে ধরলাম—সেও আমাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করল। কর্তব্যের খাতিরে তাকে আমি কি ভাবেই না প্রত্যাখ্যান করছি। মুখে আমার ভাষা ছিল না! স্বদেশ আমার নির্বাক ভাষার অভিযান্ত্রিক অন্তর দিয়ে হৃদয়ভব করেছে। তাবপর আমি আমার কটিদেশ থেকে একটি বিজলবার টেনে নিয়ে স্বদেশেব হাতে দিলাম—সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল—আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

স্বদেশেব প্রতি আমবা, বিশেষ করে আমি, অবিচ্যাব করছিলাম। স্বদেশ প্রমাণ করল আমবা তাকে ভুল বার্তা। পাঠক-বর্ণন হয় তো মনে হচ্ছে স্বদেশেব প্রতি আমি ক্ষমাহীন অন্যায় করছি? আমি তখনও মনে করি নি এখনও মনে করছি না যে স্বদেশেব প্রতি আমবা অন্যায় ইচ্ছাকৃত। বৈশ্ববিক কর্তব্যের খাতিরে শত বিশ্বাসী লোকও যদি বাদ পড়ে যায় তাব তা একজন অবিশ্বাসীকে নির্বাচন করার চাইতে শতগুণে প্রের। বৈশ্ববিক ষড়-যন্ত্রমূলক কাজের এই অজান্ত নীতিব ক্রান্তি ভাবা গুরুতর অন্যায়। তা ছাড়া যে বিপ্লবী—যে সত্যিকার স্বদেশপ্রেমিক—সে মিথ্যা মান-অপমানের অনেক উদ্দেশ্য সে বৈশ্ববিক কর্তব্যের অপরিহার্য নীতির

প্রতি কুণ্ঠা প্রকাশ করতেই পারে না। তাই খাঁটি বিপ্লবীর কাছে এইটি কোন সমস্যাই নয়। খাঁটি বিপ্লবী নিরাপত্তার কঠোর নীতিকে শ্রদ্ধা না করে পাবেন না। ষড়যন্ত্রমূলক কাজের গুরুত্বের প্রয়োজনে গোপন বিপ্লবীদের সভাপদ দেওয়া যে কতখানি সুকঠিন তা স্বদেশ বাবেব মত খাঁটি বিপ্লবী হৃদয়ঙ্গম করেছে—তাই নিজগুণে সে সব সমস্যারই সমাধান করেছে এবং কাউকে ভুল বোঝে নি।

স্বদেশ আগে সাধারণ স্ট্রীটের তার বন্দুক ব্যবহার করতে শিখেছে। তাই তাকে মাস্কট্টী ব্যবহার করার প্রাথমিক শিক্ষা দিতে খুব বেশ সময় লাগাব কথা নয়। দু-জন যুবক স্ট্রীট উৎসাহের সঙ্গে তাকে মাস্কট্টী চালাতে পদ্ধতি শেখাতে লেগে গেল। তাব রাই বাহুল্য স্বদেশ বিভলবারেব পিচ কোর্শলও শিখবে। স্বদেশকে নিয়ে আমাদের ড্রামা প্রায় শেষ হয়ে এলো। এত সময় নতুন শেড্রোলে গাড়ির তীর আলো জ্বালিয়ে অস্ত্রকাণ্ডার সফলভাবে এসে পড়লেন। মোটরের হেড লাইট তখন যদিও আমবা ডেবে নিয়েছিলাম যে এটা নিশ্চয়ই অস্ত্রকাণ্ডার গাড়ি—তবু আনন্দেব সেন্সিটী হকিলে—“Halt! Put-off light! (থামো! আলো নেভাও!) হুকুমমত, গাড়ির আলো নিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিচয় জানাবার জন্য পূর্বনির্ধারিত কবদার মোটরদেব হর্ন বাজাতে লাগলেন এবং পরিচয়পত্রা অনু-বাস্তী শোলাগান দিলেন—“বন্দে মাতবম্” “ইনক্লাব জিন্দাবাদ”, “সাম্রাজ্যবাদ” প্রভৃতির হোক।” প্রত্যুত্তরে পাহাড়ে-চোরা পদাশ-লাইনে প্রতিধ্বনি তলে আমারও উত্তর দিলাম—“ইনক্লাব জিন্দাবাদ”

পরিচয় জানার পর হুকুম হোল—Proceed! “এগিয়ে আসুন” স্বদেশ গাড়িটি আমাদের টিলার পাদদেশে এসে উপস্থিত হোল। তমলে জয়ধ্বনির সঙ্গ্য আমবা তাঁদের অভিযান বরদান।

মাস্টারবা এগিয়ে এসে স্ট্রীটের দিকে লেন—“টেলিফোন ভবন নির্মিত হয়েছে তো?”

অস্ত্রকাণ্ডা—“টেলিফোন ভবন এতক্ষণে পড়ে ছাই হয়ে গড়ে।”

মাস্টারবা—“ফোন পক্ষে বেট হত না আহত হয় নি তো?”

অস্ত্রকাণ্ডা—“কেউই না—আমরা বা তারা কেউ না।”

মাস্টারবা—“খুব আনন্দ হচ্ছে। বিনা রক্তপাতে সবকাবী টেলিফোন ভবন ধ্বংস করার নজীব ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

প্ল্যান অনুযায়ী খুব সফলভাবে সঙ্গে

টেলিফোন অফিস ধ্বংস করা হয়েছে—এই খবর অশ্বিকাদার কাছ থেকে জানতে পেরে আমরা সকলেই খুব খুশি হয়েছিলাম। তাঁরা ছরফর মর্মেতে একটি করে রাই-ফেল, খালিভাতি টোটা ও রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তাঁদের সবাইকেও রিভলভার ও মাস্কের চালাবার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হোল। অন্যান্যদের মত তাঁরাও lying position নিলেন—অর্থাৎ শুয়ে পড়ে পজিশন নিলেন।

পুলিশ লাইন অধিকার করার পর এখানেই আমাদের বিপ্লবী হেড কোয়ার্টার অবস্থান করবে তা পূর্বেই ঠিক করা ছিল। অন্যান্য সমস্ত দল—তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পূর্ণ করে এই হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসবে এই স্থির ছিল। টেলিফোন ভবন ধ্বংস করার পর তারা অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে। লোকনাথ ও নির্মলদার দলটির এখানে ফিরে আসার কথা নয় বরঞ্চ না আমরা গিয়ে তাঁদের সেইরূপ কোন নির্দেশ জানাচ্ছি। যদি পুলিশ লাইন ও A.F.I. হেড কোয়ার্টার দুইটিই আমরা সফলতার সঙ্গে অধিকার করতে পারি তবে আশ্চর্য্যকর প্রাকৃতিক সুবিধা-জনক অবস্থার জন্য আমরা ঠিক করেছিলাম পুলিশ লাইন-ই আমাদের সামরিক বিপ্লবী সরকারের প্রধান ঘাঁটি হবে; এবং সেই ক্ষেত্রে আমরাই নির্মলদাদের সঙ্গে সর্বোচ্চ স্থাপন করব—তাঁরা সেইখানেই অপেক্ষা করবেন। আর যদি কোন কারণে—ব্যারাকে উপস্থিত প্রায় দু'শ' লেপাইয়ের প্রতি-আক্রমণের মধ্যে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি তবে সেইরূপ অবস্থায় A.F.I. হেড কোয়ার্টারে এসে আমরা একত্র হব এবং এইখানেই আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করা হবে। সেইরূপ নির্দেশ লোকনাথ এবং নির্মলদার উপরও ছিল—তাঁরা যদি কোন কারণে ছত্রভঙ্গ হবে পড়েন তবে পুলিশ লাইনে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। পুলিশ লাইন ও A.F.I. আক্রমণকারী দলের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল বলে তাদের খবর না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে তারা অপেক্ষা করবেই সেইরূপ ধরে নিয়েছিলাম। তাই পুলিশ লাইনে তাদের আগমন আশা করি নি। আমরা বরং খুব উৎকণ্ঠায় ছিলাম নরেশ, ত্রিপুরা, দেব, অমরেন্দ্র, বীরেন ও মনোরজনের জন্য। তারা হাতবোমা ও মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শত্রুকে বন্ধু ক্লাব ঘরে নির্মমভাবে হত্যা করতে গেছে। ক্লাব-হাউসে আক্রান্ত হয়ে সাহেবের দল মরিয়া হয়ে প্রতি-আক্রমণ করবে বা করতে চেষ্টা করবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আমরা বাছাই করা যুবক-সাথীরা সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থার জন্য প্রস্তুত

ছিল। প্রতি-আক্রমণ রুখে কি করে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করতে পারে—কিভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সম্ভবিত প্রতিশোধ নিতে পারে তার জন্য এতদিন ধরে অনেক রিহার্সাল দিয়ে তারা শেষ রজনীর ড্রামার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। প্ল্যানের সফলতা সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তবু কি জানি এক অজানা আনশচয়তার জন্য মন ব্যাকুল অস্থির হয়ে আছে। কি জানি হয়ত কেউ অক্ষত থাকবে না—হয়ত কেউ-ই বেঁচে ফিরবে না! তাদের ফিরে আসার সময় হয়েছে। ক্লাব পুঁহটি খুব নিকটে। বড় বড় সাহেব আড়ালে মাঠের উপর দিয়ে শতিনেক গজ হেঁটে এলেই তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। বেবী অস্টিনটিও মাঠের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসতে পারে। ওয়াটার গুলার্কসের রাস্তার শেষ মাথায়, সেখান থেকে রাস্তাটি বাঁ দিকে ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, সেই বাকের উপর আমাদের সবার চোখ নিবদ্ধ। প্রতি মর্মেতে আমরা ইম্মোরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলের প্রত্যাগমন আশা করছি। শিরায়, শিবায়, ধমনীতে, ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের হেড কোয়ার্টারের সভায় যে জটিল প্রশ্ন তিনদিন ধরে আলোচনার পর মাস্টারদা ব্রিটিশ শত্রুর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন সার্বিক প্ল্যানের সেই বিশেষ অংশের শেষ পরিণতির সংবাদ পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল! নরমেন যজ্ঞের ভয়াবহ বিভী-ষিকাময় চিত্র থেকে থেকে শরীরে শিহরণ জাগাচ্ছে!

মনে হোল যেন বেবী অস্টিনের হর্ন সঙ্কেত দিচ্ছে। তখনও তাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। একটু পরে তারা পচি-জন পদরজে হেঁটে আসছে দেখতে পেলাম। অস্টিন গাড়িটিও তাদের সঙ্গে আছে। তাদের গতি খুব ধীর ও মন্থর। মনে হোল তাদের যেন কোন উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই—তারা যেন শ্রান্ত, ক্লান্ত নিজীব হয়ে পড়েছে। গাড়িটি বাকি ঘুরে যখন ওয়াটার গুলার্কসের কম্পাউন্ডের কোণে এসে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—তখন আমাদের প্রহরী নিঃশব্দ মত হাঁক দিল—“গাম! সঙ্কেত দাও!” সঙ্কেত মত হর্ন বেজে উঠল। কিন্তু কৈ বন্দ-মাতরম্ ধ্বনি তো শোনা গেল না? কেন “ইনক্লাব জিন্দাবাদ”—রশ্বহুস্কার তাদের কাছ থেকে আসছে না! সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক—প্রতিহিংসার বাণী বজ্রনির্ঘোষে প্রতিধ্বনি তুললো না কেন? আমাদের বিজয় উল্লাসের সঙ্গে কেন তারা যোগ দিচ্ছে না! কোথায় যেন কি একটা

ঘটেছে! যুবক-সাথীরা মহা উৎসাহে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলো।

তাদের সঙ্গে একত্র হওয়ার পর ঘন ঘন রণধ্বনি চট্টগ্রামের আকাশ বিদীর্ণ করেছে। ধ্বংস ভেঙে চট্টগ্রামবাসী বৈপ্লবিক রণরোল শ্রুনে হরত ভেবেছে কোন রাজ-নৈতিক মিছিল বেরিয়েছে বুঝি। তখনও হয়ত তাঁরা জানেন না—ব্রিটিশ সরকার আজ চট্টগ্রামে পরাভূত। আজ আমাদের জয়। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ভবন বিনা-রক্তপাতে ধ্বংস করেছে, অক্ষত দেহে প্ল্যান অনুযায়ী প্রধান শত্রুঘাটি পুলিশ লাইন আমরা অধিকার করছি; যখন বিচ্ছিন্নভাবে কেউ A.F.I. আর্মারী থেকে এখনও পুলিশ লাইনে এসে পৌঁছায় নি তখন স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে সেখানেও আমাদের জয় হয়েছে। তবু আমাদের সার্বিক জয়ের উৎসবে ইম্মোরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দল কেন প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারছে না!

মাস্টারদা—“নরেশ তোমরা একেবারে চুপচাপ কেন? কি হয়েছে তোমাদের?”

নরেশ—“কিছু হয় নি। আমরা দৈহিক সবাই সুস্থ। কিন্তু আমরা অক্ষম হয়ে ফিরে এসেছি।”

মর্মেতে আমাদের সবার মনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো। কি সেই অক্ষমতার কারণ? শেষ মর্মেতে কি তাদের morale (মনোবল) নষ্ট হয়েছে? তাও কি সম্ভব? আমাদের মধ্যে যাদের উপর সবচেয়ে বেশি আস্থা ছিল—যাদের ভেবেছিলাম—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর নিষ্করণ প্রতিহিংসা নিতে একটুও হাত কাঁপবে না—তারা কি তবে মৃত্যু-বিভীষিকার পিছিয়ে এলো? মাস্টারদা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন—“নরেশ তোমরা অক্ষম হয়ে ফিরে এলে? যুদ্ধে পারাছ না! খুলে বল কি হয়েছে!”

তারপর নরেশ বলতে লাগলো,—“আমরা প্ল্যান মত সবার দৃষ্টির অগোচরে ক্লাবগৃহের কাছে গেলাম। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল, বোমা, বন্দুক ও সঙ্গে তববারি কুড়ুল-প্রভৃতি নিয়ে অতর্কিতে ঝটিকা-বেগে বিভিন্ন দরজা ও জানালা দিয়ে আক্রমণ করতে হলের মধ্যে প্রবেশ করি—কিন্তু আশ্চর্য হলরর একেবারে শূন্য—হটে পাশের ঘরে গেলাম—সেখানেও কেউ নেই। তারপর একটাব পর একটা কামরা খুঁজে দেখলাম কোন ঘরে একটি সাহেবকেও পাওয়া গেল না। সামান্য কয়েকজন বয়, বয়সেরা যারা উপস্থিত ছিল তারা ভয়ে আতঁনাদ করে ওঠে। তাদের সাম্ফনা দিয়ে বিজ্ঞাসা করে জানলাম—সাহেবরা আটটা নটার মধ্যে সবাই বাড়ি চলে গেছে।” তারপর নরেশ খুব নিরাশার সুরে বললো—

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
মধ্য-বেদা জড়তা উন্নয়ন
করবার আধুনিক উপায়

মাইক্রোমাইট্র অ্যাসথ্রো

এখন আসাদেয় দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যাধি-রোগীই জমিদারের গমজায়া-‘আসুন্দো’-বিশাও-ইনকিউভরে
 ইংল্যান্ডের অ্যান্ডারসন পুস্তকখানা পুস্তক-বেদনা পুস্তকখানা অথবা অথবা অথবা অথবা
 স্ট্রান মাইজফাইও-‘আসুন্দো’-আরো তাকাতাকি ব্যাধি-বেদনা পুস্তকখানা
 স্ট্রান উগার।

মাইক্রোকাইও বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোকাইও বলতে বোঝায় যে, ব্যাধা-বেদনা পূর্ব অঙ্গার একেশানকালি 'আমোদ্যো'-তে মেশানো হয়, জা ৩০ ওপ বেলী হইতে স্বাধী হইতেছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই কক্কন টাবলেটে এখন প্রায় ১৫ হাজার মণ্ডা, হইতেছে। এবং কক্কন বোনা মানুষ কর্তৃক শক্তি বিশেষগুণও বৈদী দ্বারা শরীরে প্রয়োগ পড়ে। এটি পুষ্কর্তের মধ্যে ব্যাধা-বেদনা দূর করে।

দ্বিত্বের মধ্যে কত গুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে ?
 মজার মাইক্রোবাইও 'আম্বেলো' ৭ বাবা। দুই কবাবার সন্নিহিত উপাদানটি জড়ি সহজেই
 দেখা বুই নিগিলি-সরীরের মধ্যে বিশি গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের
 মধ্যে থাকে। সেইভাবে মাইক্রোবাইও 'আম্বেলো' আরও ভাড়াতি বাবা-বেলা
 বের করে দেয় এবং তার সঙ্গে অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি যেতে পারেন : নতুন মাইক্রোকাইও 'আলফ্রো' আপনি
 যেভাবে খুসী বেতে পারেন—তকনো, কলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা
 যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে ।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রায় মঙ্গল আইজোকাইট ‘আজুথো’ থাকে :
 বাবা-বরেন, মাগুরা। গা-বাধা। বাউবাধা। গাটে বেবকা। জর-অব-জাব-মু
 হের অর. মদাবনা।

জাতি : প্রাপ্তবয়স্ক : ছইটি ট্যাবলেট : প্রয়োজন হলে আবার খায়ে। শিশুদের
 জন্য : একটি ট্যাবলেট বা আশনার ডাকারের নির্দেশমত।

ମୟୂର ମାରିଦେଲାକାହିଁ "ମାୟାମୁକ୍ତା" କିତାବେ କାହା ଦ୍ଵାରା ଲେଖିଲା



টাকালোটের কণাগুলির কাছাকাছি ঘনত্ব
হয়, ওড়ই পরীক্ষার সঙ্গে যিশে বৈধক দেবে
দ্রষ্টব্য-আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষেও মঙ্গল
সাধে :

‘ଆମ୍ଭାନ୍ତା’ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି
‘ଆମ୍ଭାନ୍ତା’ର ଉଚ୍ଚିତ ଟୀକାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପୃଷ୍ଠା ବୁଦ୍ଧି
ବାଞ୍ଛୁ । ତାହା ଶ୍ରୀରାମେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହୁଏ ଓଡ଼ିଆଭାଷି ବାକ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୦୦
ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ।

ਸਰਸੁਮ ਸਾਹਿਬਕੋਸਾਹਿਬ 'ਕਾਸ਼ਮੁਖੀ' ਵਾਖਾ-ਕੇਰਨਾ ਪੁਰ ਕਰਾਸ ਮਰੀਯੂਨਿਯ ਏਨਾਤ ।



वाशेत्कारेण
अथवा

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

নিয়োগাঙ্গ-এর (২৩) চিত্র।

—“মাস্টারদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্য-
চারের প্রতিশোধ নিতে পারলাম না!”

মাস্টারদা—“ঐ নিয়ে তোমরা ঘন
খারাপ করো না। শহর আমাদের দখলে
প্রতিশোধ আমরা নেবোই।”

তাবা সবাই বন্দুক রিভলভার ও প্রচুর
পরিমাণে টোটা সঙ্গে নিল। রিভলভার
চালতে তবু সবাই দক্ষ। ৪৫০ বোরের
ব্রিস্টল ও এদের বিভলভার যা আমি ও
পলিশ অফিসাররা ব্যবহার করে তা আজ
আমরা প্রচুর পেয়েছি। এই রকম বড়
সাইজের রিভলভার অন্যদের দলে অবশ্য
গোপনে সংগৃহীত হয় নি। আজ বড়
সাইজের আমি রিভলভার পেয়ে সকলেই
খুব খুশি। তবু নবোশবা খুব অবসাদ-
গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অন্যান্য বন্দুকা তাদের
নানা প্রকার উৎসাহ দিতে চেষ্টা করছে—
তম তবুও আস্তে আস্তে অবসাদ কাটিয়ে
উঠল।

এই নিশীথে পলিশ লাইনের নিজস্ব
পদবীতে আবার একজনকে একা আসতে
দেখলাম। তার পরনে মিলিটারি ইউনি-
ফর্ম। তাকে পলিশ বলে ভুল করলে
কোন অপবাদ হতো না। এই সময়ে
আমাদের মধ্যে মিলিটারি ইউনিফর্ম আর
কাবো আসাব কথা নয়। এখন প্রায় বিশ
মিনিট অতিবাহিত হয়েছে। এত সময়
গত হওয়ায় পরে আমাদের মধ্যে কেউ তো
আসতে পারে না! তবে এ কে? আমাদের
প্রহরী হাঁক ছিল—“দাঁড়াও! হাত তোল!
কে তুমি?” দশটি বন্দুক তাকে লক্ষ্য
করে আছে। উত্তর এলো—“আমি কালী!!

কালীকঙ্কর দে পলিশ লাইনের
কাছাকাছি একটি দলের সঙ্গে থাকবে তাই
প্রথমে ঠিক ছিল। পলিশ লাইনে যাওয়ায়
জন্য গাড়ি না পেয়ে যখন আমরা দুই
ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দিই তখন মাস্টারদা
ও অম্বিকাদা দুজনে কালীকে একটি
গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিলেন।

কালীকে সাইকেলে যেতে হবে অনেক দূরে
তিনজননের কাছে। ইতিমধ্যে রাত আটটার
সময় থেকে আমাদের প্রচারপত্র বিলি করার
কথা। সবোচ্চ ভূমিচার্যের মাফক প্রচারপত্র-
গুলি আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন
বালী দে-কে ছুটে যেতে হবে প্রায় চাব-
পাঁচ মাইল দূরে ক্ষীরোদ মহাজনের কাছে।
ক্ষীরোদকে বলা প্রযোজন প্রচারপত্র রাত
দশটা অবধি বিলি করা হবে না। নোথান
থেকে সেই একই বার্তা বহন করে আবার
কালীকে ছুটেতে হবে, প্রফুল্ল গানিক ও
অর্ধেন্দু গুহের সঙ্গে দেখা কবে বলতে
যেন রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষার পর
তাবা প্রচারপত্র বিলির ব্যবস্থা করে। এই
গুরুদায়িত্ব মাস্টারদা কেবল তাকেই দিতে
পেয়েছিলেন যাব উপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা
ছিল।

কংগ্রেস অফিসের কম্পাউন্ডে একটি
গ্রুপের সঙ্গে পলিশ লাইন এলাকায়
যাওয়ার জন্য কালী দে অপেক্ষা করছিলেন।
আমাদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে মাস্টারদা
কালীকে ডেকে এই কাজের ভাব দিলেন—
আর বললেন—“দেখ তোমার ওপর কত-
খানি গুরুত্ব দায়িত্ব দিলাম। তুমি ইচ্ছা
করলে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারো,
আবার গ্যাকশনে যাওয়ার মুখে যদি মনে
ভয় এসে থাকে তবে এই যে তুমি যাচ্ছ
আর ফিবে না-ও আসতে পারো।-যাই কর
না কেন—বিশ্বাসঘাতকতা নিশ্চয়ই তুমি
করবে না—সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে
যদি শেষ মর্মে ভয়ে অ্যাকশনে যেতে
না-ও চাও তবে এই কাজটুকু নিশ্চয়ই
কোবো—সবাইকে খবর দেবে যেন দশটা
পর প্রচারপত্র বিলি করে। ভবসা করি তুমি
আমার এই বিশ্বাসের অবমাননা করবে না।
আবও বিশ্বাস করি তুমি সময় মত ফিবে
আসবে।”

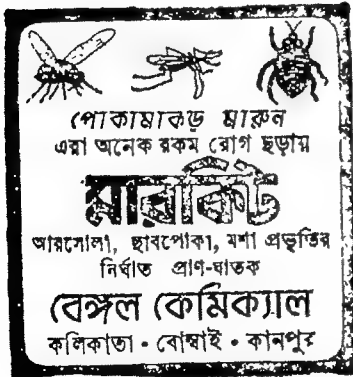
কালী দে তাব উপর আস্থা রাখতে
মাস্টারদাকে অনুরোধ জানালো। সে বলে
গেল সময় মত সে ফিবে আসবেই। বহু
চেষ্টা করেও তিনজনকে খবর দিয়ে কালী
ঠিক সময়ে কংগ্রেস অফিসে ফিবে আসতে
পারে নি। সামান্য কয়েক মিনিট আগে
সবাই পলিশ লাইনের দিকে বেঁচিবে
পড়েছে। কালী মগন হিবে এলো তখন
দেখলো কংগ্রেস অফিসে একদম খালি—
এদিকে ওদিক দ-একটি সাই-
কেল পড়ে আছে। কালী
এখন একেবারে একা! কি করবে?
পালাবে? রাতি ফিবে যাবে? লক্ষ্যী
ছেলেব মত লেগ-পড়া করবে? কালী সেই
ধবনের দরলচাবিত্রব ছেলে নব—তা
আমরা জানতাম। মাস্টারদা কালীকে সবার
চাইতে বেশি চিন্তিত। তবু তিনি সেই
ধবনের মনস্তাত্ত্বিক কথা কালীকে বলে-

ছিলেন। মাস্টারদার কথা বলার ঐ ধরনের
বিশেষ ভঙ্গী ছিল। কালী কংগ্রেস
অফিসে কাউকে না পেয়ে উদ্বেগে
পলিশ লাইনের দিকে ছুটলো। সে এসেই
বুঝেছিল—আমরা ইতিমধ্যে পলিশ লাইন
অধিকার করেছি। আমাদের শ্লেগান,
মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ আমাদের
অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল। তাই কালীর
সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। সে
বুঝেছিল আমবাই তাকে হুকুম দিয়েছি
হাত তুলে দাঁড়াতে। কালী ফিবে আসতে
মাস্টারদা খুব খুশি হয়েছেন। আমরা
সবাই তাকে আমাদের বিজয় গৌরবের
ভাগ দিলাম। সবার মত সে-ও এখন
রাইফেল ও রিভলভার নিয়ে সেজেছে।
সবার মত সে-ও মাটিতে শুয়ে পজিশন
নিল।

পলিশ লাইন অধিকার করার পর
থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা এইভাবে কেটেছে।
এখন পর্যন্ত প্রায় অনুযায়ী সব কাজই
হয়েছে। প্রচারপত্র বিলি করাও দু' ঘণ্টার
জন্য স্থগিত রাখা সম্ভব হয়েছিল।

ক্লাব আক্রমণ কবেও আমাদের অভিপ্রায়
সিদ্ধ হলো না—কারণ সাহেবেরা ইতিমধ্যে
প্রস্থান করেছেন। এখন পর্যন্ত আমাদের
কেউ আহত হয় নি। আব শত্রুপক্ষেও
নাও একজন মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু আমরা
এখন পর্যন্ত জানি না A.F.I. হেড
কোয়ার্টারে কি অবস্থা। আর বিলম্ব করা
যায় না। তৎক্ষণি আমাদের মধ্যে কারো
না কাবো অগ্রসর হওয়া উচিত। A.F.I.
হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন
করতেই হবে। কে যাবে? গণেশ ও আমি
দুজনেই যাবো, না কি সে পলিশ লাইনে
থাকবে? অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে
গণেশের যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বিকেল
থেকেই তার জ্বর। আক্রমণের পূর্বমুহুর্তে
পর্যন্ত জ্বরের খবর নেওয়ার কারো সময়
ছিল না—গণেশ নিজেও তা উপেক্ষা
করেছে। এখন দেখি তার গা জ্বরে পুড়ে
যাচ্ছে। মাস্টারদা ও আমি তাকে বিশ্রাম
করতে বললাম। গার্ডবুমের একস্থানে
শুয়ে সে বিশ্রাম করতে লাগল।

আমি তখন খুব ক্লান্ত। একটুও
হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। আবার যেতে
হবে কোন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে। কে
বলতে পারে firing line-এর সম্মুখীন
হবে না! প্রথম জয়ের পর একটা বিশ্রাম,
একটু নিবাপদ স্থান; আবও একটু দেরি
করলে ভালো হয়—এখনই আবার অনিশ্চয়-
তাব মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো—আবার হয়ত
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে গিষে পড়তে হবে!
সুস্থ মনের চিন্তা যে আমার মনের অগো-
চরে ঐরূপ প্রভাব বিস্তার একেবারে
করাছিল না তা এখন ঠিক করে বলতে



পোকামাকড় ঝাড়ন
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায়
বাবকিট
আরসোলা, ছাবপোকা, মশা প্রভৃতির
নির্ধাত প্রাণ-ধাতক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

পারছি না। তবে বিশ্লেষণ করে দেখলে ধরা পড়ে—কেন আমি এতক্ষণ দেরি করলাম—কেন আমি প্রথম জন্মে পরই-পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে রওনা হয়ে গেলাম না? কেন এই বিলম্ব তাব সঠিক কারণ এখন বলতে পারছি না। তবে সাময়িক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে আজ মনে হচ্ছে—কাল-বিলম্ব না করে আমাদের আরও অনেক বেশি তৎপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল।

দেরি যা হওয়ার তা হবে গেছে। নির্মলদাদের সঙ্গে লোকবল খুব কম। অবশ্য শত্রুপক্ষেরও তেমন লোকবল সেখানে উপস্থিত নেই। তবু চারিদিকে ছোট ছোট টিলার ওপর সুন্দর সাজানো বাংলো-

গুলিতে উচ্চপদস্থ সরকারী ও রেলের বড় বড় সাহেব কর্তাদের বাস। তাদের সবার কাছে বন্দুক ও রিভলভার আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেও ভাবনাব কিছু ছিল না—কারণ সম্ভব হতে তাদের সময় লাগবে—আর সম্ভব না হয়ে তারা এককভাবে প্রতি-আক্রমণ করতে আসবে না। তবু এককভাবে যদি কেউ আসেও বা—পৃষ্ঠপ্রদর্শন ছাড়া তার আব কোন উপায় থাকবে না। এই যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয় রণকৌশলের দিক থেকে এত বিলম্ব করা অমার্জনীয় ঘৃণি। সকল দিক ভেবে মন-স্থির হবে নিলাম। আমি গার্ডরুমের টিলার উপর থেকে নিচে নেমে এলাম। আমার সঙ্গে কে যাবে জানতে চাইলাম।

সবাই প্রস্তুত। তা তো আর হয় না! তিন-জনকে আসতে বললাম। হরিগোপাল বল (টেগুরা), হিমাংশু ও মনোব্রজ লায়ফে শেড্রোলে গাড়িতে উঠে বসল। আমি স্টিয়ারিং-হুইল হাতে নিলাম। পুলিশ লাইন প্রকম্পিত করে—“ইনক্রাব জিন্দাবাদ” বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, বঙ্গভ্রাতারম্ শ্লোগান দিবে সাধীবা আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল। আমাদের গাড়ি থেকেও অনুরূপ বগরোল আমাদের জরযাত্রা ঘোষণা করল। হেড লাইট জ্বালিয়ে শেড্রোলে গাড়িটি ক্লাব হাউসের পিছনের নির্জন রাস্তা দিয়ে এগোতে লাগল।

[কথায়:]

“পশ্চিমবঙ্গী” প্রতিযোগিতা—



সাধারণ নির্বাচনে আন্দামান

প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী

পূর্ববাংলা থেকে বাহ্যিকত লক্ষ লক্ষ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ভারতে আগ্রস্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ১৯৪৮ থেকে দলে দলে ও'রা এসেছেন পৈতৃক বাসভূমি পরিভ্রাণ করে—নিঃস্ব ও সর্বহারা। ওঁদের মধ্যে নমঃশূদ্রেব সংখ্যা খুব বেশি। বাছাই করে কয়েকশত পরিবার ১৯৪৯ সন থেকে আন্দামান শ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৬১ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার পরিবার ওখানে পাঠানো হয়েছে। ভারত সরকারের অনুসৃত কর্মব্যবস্থায় হয়তো আরও পরিবার ওখানে পাঠানো হবে। ওঁদের পুনর্বাসনের অনুকূল ব্যবস্থা আছে কিনা এবং তার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার পরিধি মোটামুটিভাবে জ্ঞানার জন্য সরকারের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য হিসেবে প্রবন্ধ লেখককে কিছুদিনের জন্য আন্দামান শ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করতে হয়েছে।

জানুয়ারী মাসের শেষভাগে। প্রকৃতির অপূর্ব সূক্ষ্মতা ও সম্ভার আন্দামানের বিরাট সম্পদ। পৃথিবীর যে কোনও মনোহর স্থানের সঙ্গে তুলনায় ইহা সমকক্ষ। সুন্দরের, নির্বিড় স্পর্শ মানস-চতনার নবীন উদ্দীপনায় ও অনুভূতিতে এক অলৌকিক জগতের নব পরিচয়সম্পন্ন অভিজ্ঞানে সমাধি এনে দেয়। বিস্ময়ের স্তম্ভতায় অন্তর পলকিত। কি সন্দের, কি মহান এই সৃষ্টি!

নিরবসব দিনগুলো কেটে গেলো সুন্দর বিস্তৃত শ্বীপগুলো উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ প্রান্তের বিভিন্ন কলোনী পরিদর্শন করে বাস্তুহারাগুলোর পুনর্বাসন ব্যবস্থার পরিচয় নিতে নিতে। ছোট জাহাজ বা পুলিশ বোট থেকে যায়। গাড়ি খুব বেশি দূর যায় না। রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে। আরও সময় লাগবে। বিশেষ করে পুলের ব্যবস্থা না হলে চলা অসম্ভব। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এ ব্যাপারে। ও'রা ন্যাক পরিকল্পনা করে নিবে কাজে হাত দিয়েছেন।

এই ঘোরাঘুরির মাঝে যতটুকু অভিজ্ঞতা মিলেছে, তার বিশদ বিবরণ ভারত গভর্নমেন্টের নিকট যথাবীতি পেশ করা হয়েছে এবং সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রিসভার বিবেচনা করে নতুন কর্মপন্থা স্বীকার করে আরও ব্যাপক কার্যের প্রোগ্রাম গ্রহণ করবেন আশা করা যায়।

কিন্তু আন্দামানের বর্তমান বাসিন্দা-

দের সমাজব্যবস্থার অভিনব পরিচয় লুকুন করে প্রবন্ধ লেখকের জিজ্ঞাসা অনেক উত্তেজিত করে তুলেছে। সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এ কথা খুব সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে যে, ভারতবর্ষের কোটি কোটি নর-নারী সমাজচেতনা ও জীবন-জিজ্ঞাসা আজ আন্দামান শ্বীপের অধিবাসীকে ঠিক একই সূত্রে সংযুক্ত করে ফেলেছে। এখানে আর বংশোদ্ভূতগণের দূরত্ব বা ভারত মহাসাগরের বিপুলতা ব্যবধানের সৃষ্টি করতে পারবে না। নতুন জীবনের স্পর্শ ও আবেদন আন্দামানকে উদ্ভূত করে তুলেছে। আন্দামানবাসী নিরপেক্ষ দৃষ্টি নর।

গোটা শ্বীপ সমষ্টিতে সব মিলিয়ে সত্তর হাজারের কিছু বেশি লোক। ও'রা

সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে অর্ঘটন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটেছে— সে খবরে আমরা ভিত্ত-বিস্ত। আবার এমন জায়গাও আছে যেখানকার নির্বাচনী খবর সংবাদপত্রে নামমাত্র বের হয়েছে। তেমনি একটি জায়গার নামঃ আন্দামান শ্বীপপুঞ্জ। সে আর কালাপানির দেশ নয়। জাপ্রক্ত আন্দামানের মানব নব-জীবনের ভূমিকায় আশা অনুষ্ঠের সাধারণ নির্বাচনকে ক্রিভাবে গ্রহণ করেছে—তারই আলেখ্য রচনা করেছেন প্রীতফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী, এম পি।

করা? আদিবাসী প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেলেও কিছু আছে। এক প্রাণী বংশ-ভাবাপন্ন। অপব প্রাণী এখনও অন্য কারুর সংস্রবে আসতে রাজী নয়। ওঁদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে “Hostile”। শত্রুভাবাপন্ন। তাঁর ধনুক নিয়ে তাড়া করে আসে। অতএব ‘সহস্রহস্ত দুরেণ’ নীতি গ্রহণ করে কোঁতলী মানব ওঁদেরকে পাহাড় ও জঙ্গল ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ জানে না ও'রা সংখ্যায় কত? নিকোবর শ্বীপপুঞ্জ দশ হাজারের উপর আদিবাসী। বেশির ভাগ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। স্কুলে পড়ার অভ্যাস হয়েছে। ওঁদের অভ্যাস সব বদলে গেছে। এখন ও'রা ভারতের অন্যান্য আদিবাসী মত।

অন্যান্য ষাট হাজারের মত অধিবাসী-দের মধ্যে রয়েছেন—(১) স্থানীয় বাসিন্দা। বিভিন্ন প্রদেশের লোক কঠিন দশে দাঁড়ত হয়ে বৃটিশ সরকারের আদেশে নির্বাসিত হয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের বংশধর। ওঁদের মধ্যে হাজার তিনেক বর্মার লোক। ‘কারেন’ জাতীয় পরিবার ছাড়া অন্যান্য বর্মীরা সব চলে যাচ্ছেন। হয়তো ‘কারেন’ প্রাণীরা লোকদের ডাক আসবে বর্মী থেকে কিছু কাল বাদে। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা দশ হাজারের উপর।

(২) অম্ব, তামিল ও কেরল প্রদেশ থেকে কয়েক সহস্র শ্রমিক এসেছেন এই শ্বীপে জাহাজের কাজ, কাঠের কারখানা ও রাস্তাঘাট তৈরি করা উপলক্ষে। তা ছাড়া ‘ফরেস্ট’ বিভাগ অনেক রয়েছে। গোটা শ্বীপের শতকরা ৭২ ভাগ জঙ্গল ও ছোট পাহাড়। এখানকার আগ্নেয় প্রধান অংশ এই বিভাগের মারফত আহঁরিত হয়।

(৩) পূর্ববাংলার বাস্তুহারা কৃষকের সংখ্যা তিন হাজার পরিবারের মত। লোক-সংখ্যা তের হাজারের উপর।

(৪) ব্যবসায় উপলক্ষে কিছু লোক এসেছেন।

(৫) সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও মন্দ নয়।

এতদিন পর্যন্ত আন্দামান থেকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভারত সরকার মনোনীত করে নিলে আসতেন। লোকসভার সদস্য হিসেবে। এবার সর্বপ্রথম আন্দামানবাসী ভোটারদের সুযোগ মিলেছে ওঁদের নির্বাচিত প্রাধীকে প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লীতে লোকসভায় পাঠাবার। এক বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এই সত্তর হাজার লোকেব প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তর আলোড়িত। আজ গোটা ভারতের অগণিত জনতার সঙ্গে তাল রেখে ও'রাও এগিয়ে যাবেন নতুন অভিবানে। আজ আর কেউ অপান্ত্রের নেই। গণতন্ত্রের ন্যায় অধিকার থেকে আন্দামান বঞ্চিত থাকবে না।

এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সবাই বুঝে নিচ্ছেন স্বাধিকারের মর্যাদা। নিত্যকার দাবি জীবনসমস্যার অসংখ্য কূট প্রশ্ন সমাজজীবনে নিয়ে আসে চঞ্চল অভিনিবেশ। আত্মপ্রকাশের উদগ্ন ও উদ্দাম আকৃতি সমাধানের পথ খোঁজে। তাতে আসে প্রত্যাবার ও প্রতি-

বোধ। অগ্রগতির গাথা নিরুদ্ধ্য। নিষ্ফল আকোশে অভিযাত্রী ক্ষুদ্র।

আন্দামান আজ পেয়েছে নতুন পথের সম্মান। নব আশা ও অভীপ্সার প্রথম প্রত্যাবাস্ত। স্বীপে স্বীপে পৌঁছেছে প্রত্যাশার বাণী। “এসো আজ এই নতুন দিনটিতে সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি— আন্দামানেব প্রাকৃতিক সম্পদ, জ্ঞান ও প্রতিভাব অধিকারে নতুন সৃষ্টিনিপুণতাব ও সার্থক কর্মকৌশলতায় সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করব। চাই সবল নেতৃত্ব ও অকুণ্ঠ একাগ্রতা।”

নির্বাচনেব এই পরম অবসরে এসেছে নবীন সমাজ গঠনের সুস্থ প্রয়োগব্যবস্থা। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছিল ব্যবধান। সাংস্কৃতিক, ধর্মগত ও ভাষাগত। আজ এখানে দেখা দিচ্ছে নতুন অভিসংখ্যসা, নব জীবন গঠনের অভিযোজন। সমসূত্রে সংগঠিত হবে আন্দামানেব সমাজ। ভেদ বিবাদেব অবকাশ থাকবে না জাতি, শ্রেণী বা ধর্মবিশ্বাসেব। জয়যাত্রাব প্রথম পদক্ষেপ।

এই দিনটিতে আন্দামানবাসী বিভিন্ন ভাষাভাষীদেব মধ্যে এক নির্বিড় পলিচর ও আত্মীয়তার শৃঙ্খল অতিসূচিত। কিন্তু ওঁরা কতদূর পর্যন্ত এই সুযোগকে উপলব্ধি কবে আপনাদেব সমাজ গঠন ব্যবস্থাব রীতিমত প্রণালী স্বীকার করতে পেবেছেন বিচার্য বিষয়। ওঁরা কি জানেন নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে ওঁদেব জীবন-বেদ। নতুন প্রয়াসে ও নবীন অভিচেষ্টানায় তা হবে অভিসংগত। সমাজের বৃদ্ধিবিদ্য হবে সুসংগঠিত।

কিন্তু কৈ কোথায় সেই নব জীবনেব শূন্য সঙ্কেত? নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে যাঁরা আন্দামানবাসীর সমর্থন লাভে আজ স্বীপে স্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন রঙের পতাকা উন্নীত কবে ওঁদেব জবেব প্রত্যাশার বিষয়বস্তু কি? ওঁরা কি সম্পূর্ণ ভাষায় আন্দামানবাসীকে ডেকে বলেছেন নতুন সমাজের জীবনজিজ্ঞাসা কি এবং কোথায় রয়েছে তাব পূর্ণ অভিবাতি?

এ পর্যন্ত প্রকাশ্য প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্রে রয়েছেন ছয়জন প্রার্থী। বিভিন্ন পার্টির মনোনীত তিনজন, কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, ডি-এম-কে। অপব তিনজনের মধ্যে একজন নন-গেজেটেড অফিসারদেব প্রতি-নিধি। তিনি নাকি বামপক্ষ কর্তৃক সমর্থিত। অন্য দুইজন কোনো পার্টির সমর্থনে দাঁড়ান নি। ওঁরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। উভয়েই বাঙালী।

ডি-এম-কেব বিশিষ্ট সমর্থক তামিল-ভাষী শ্রমিক ও ছোট ব্যবসাদার। ওঁব প্রচাবেব গভীবতা স্বজাতীয়দেব মধ্যে পরিসীমিত।

স্বতন্ত্র প্রার্থী গত এপ্রিল মাসে পোর্ট ব্লেয়ার মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে বর্তমান কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ওঁর জমা টাকা নাকি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আন্দামানে কংগ্রেস কমিটি স্থাপনের ইনি প্রথম উদ্যোক্তা। এখন তিনি ভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থী। কংগ্রেস প্রার্থী ও স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী উভয়েই স্থানীয় বাসিন্দা। দুইজনেব মাতৃভাষায় পার্থক্য রয়েছে। প্রথম তিন নির্বাচনে আন্দামানেব স্থানীয় নেতৃবর্গের তিনজন ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে লোকসভায় সদস্য হবার মর্বাদা পেয়ে-ছেন। অতএব স্থানীয় অধিবাসীদেব আনুগত্য এখনও কংগ্রেসের প্রতি রয়েছে বলে ওঁদেব সমর্থন পাবেন কংগ্রেস মনো-নীত প্রার্থী আশা করা যায়। তিনি তেলুগুভাষী এবং মাদ্রাজে পড়াশুনো করেছেন বলে তামিল শিখেছেন। তা ছাড়া স্থানীয় শ্রমিক সংস্থায় বিশেষভাবে যুক্ত।

ওঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসী হলেও হিন্দীভাষী স্বতন্ত্র পার্টির মনোনীত প্রার্থী খুব কম সমর্থন পাবেন বলে অনু-মান করা যায়। অন্তত স্থানীয় অধি-বাসীদেব নেতাদেব অভিमत এই।

এন-জি-ওর নেতা মালয়লমভাষী। অতএব ওঁব ভবসা কেরল প্রদেশেব শ্রমিক, কর্মচারী ও ছোট ব্যবসায়ীদেব সমর্থনের আশা। তা ছাড়া এই সংস্থাব চেম্বারদেব মধ্যে যাঁরা তামিলভাষী নন এবং যাঁরা স্থানীয় অধিবাসী নন এই দুই শ্রেণীর লোক বাদ দিবে যাঁরা রয়েছেন ওঁরাও হয়তো সমর্থন করবেন। কিছু সংখ্যক বাঙালী তো বটেই।

পার্টির মনোনয়ন না নিয়ে বে দুইজন দাঁড়িয়েছেন উভয়েই বাঙালী। একজন ব্যবসায়ী পোর্ট ব্লেয়ারে। অপব পূর্ব-বাংলাব বাস্তুহাবা কলোনীর উত্তর আন্দা-মানে অধিবাসী। তিনি অন্যান্যেব মত জমির চাষ করেন ও ছোট দোকান রয়েছে।

বাঙালীদেব মধ্যে যাঁরা ভারত সরকারেব পবামর্শদাতা কমিটির সদস্য, ওঁদেব সমর্থন রয়েছে কংগ্রেসেব প্রতি। কারণ মনোনয়নের দায়িত্ব সরকারেব। পোর্ট ব্লেয়ার মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বা-চিত সদস্য পূর্ববাংলাব ব্যবসায়ী। তিনি কংগ্রেস দলভুক্ত।

শ্রমিক সংস্থায় গাথোও ঠিক এইভাবে প্রদেশ ও ভাগাব উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রার্থী সমর্থন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ওঁদেব নিকোবরেব দ্বীপপুঞ্জে দণ সহস্রাধিক ম্যাসিবাসীব নেতা খন্টান সমাজের বিশিষ্ট অধিনায়ক। তিনিই প্রথম লোকসভাব মনোনীত সদস্য। ১৯৫৭ সনে তিনি শ্রীর বর্মস্থলে ফিরে যান। নিকোবরী-

দেব নতুন জীবনে উন্নীত করণ সংকল্প নিয়ে অক্লান্ত পবিশ্রম করে চলেছেন ব-ত বৎসর ধরে। অতএব ওঁব নির্দেশ হবে ওঁখানকার নির্বাচনে অমোঘ বাণী! ওঁখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ বাবাসাীও নাকি কংগ্রেস সমর্থক।

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ও ভাষাগত ব্যবধান এবং বিভিন্ন প্রদেশে জাতি ও উপজাতিব ভাগাভাগি ফলে সমাজজীবনে এসেছে সংকীর্ণচিত্রতা ও ভেদভেদ। নির্বাচনেব সমস্ব বহু প্রার্থী জবেব প্রত্যা-শায় নীতি ও জীবনধর্ম প্রত্যাখান কবে অন্যান্যেব পথে তেতাঁকে প্রতাবান্বিত করতে চিধা করেন না। পার্টির মেনি-ফেস্টা ও কার্যক্রম যা কিছু প্রকাশিত হব জনসাধারণেব অঙ্গগতির উপলক্ষে কার্য-ক্ষেত্রে ও প্রচারব্যবস্থায় কিন্তু সবই বাতিল। ওঁখানে সুবিধাবাদী প্রচেষ্টা জাতি, শ্রেণী-উপশ্রেণী, ভাষা এই বিভিন্ন অস্ত্রেব সুনিপুণ প্রয়োগব্যবস্থায় জবকে চাষ করাযত্ন করতে। এখানে ন্যায় ও নীতিবোধ বিসর্জিত। আজ সুদূর আন্দামানবাসীব সম্মুখে ঠিক সেই নিরপ-জ্ঞ অভিবাতি। এখন থেকে হিসেব নিরীক্ষা চলেছে কে কোন ভাষায় কথ বলে এবং কাব সমর্থন কে পাবে।

জাতিব সংহতি কি এই দৃষিত আবহাওয়ায় সংবন্ধিত হতে পারে? নতুন সমাজেব যে প্রতিশ্রুতি ছিল আন্দামানেব দ্বীপপুঞ্জে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত সমাজ-চেষ্টানাব সম্পর্কিত্তে এবাবকার নির্বাচনেব প্রকাশভঙ্গী কিন্তু প্রতিকূল। বৃহত্তর ভাবেব গলান এখানেও পৌঁছবে।

রোমাণু-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন বোবাস

রক্তনদীর ধারা মাসিক বঙ্গবন্ধুর পৃষ্ঠা-প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। বোম্বাই ও রোমাণোর সত্য ঘটনাব বইটির আদ্যোপান্ত পড়িপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনেব অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবণতা, ছলনা ও প্রেমের লীলায় চাণ্ডাল্যব বইটি চাণ্ডাল্য তুলেছে সকল সমাজেই।

লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

মূল্য : চার টাকা

বঙ্গবন্ধু প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গা-গুদারী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২



তিনদিন ছেলেটা দূবেলোই শব্দ মাইলোর খই খেয়েছে। ছেলেটা বলে—মাইলো আবার কি? তুমি তো বড় ধানের মূড়ি ভাজে। ওদের রুট, নিশার মা ধানের মূড়ি ভাজে। তুমি ধানব মূড়ি ভাজতে জান না।

রুট, আর নিশাব বাবাব ধানের ভূমি আছে তিন বিঘা। সম্বৎসর ধান কিনতে হয় না। তাই ওরা বেশনের মাইলো নেয় না। দূবেলো ভাত খায়। সকাল সম্বৎ মূড়ি ছলখাবার খায়। হীরার বাবা সাবা, বৎসব মজুর খাটে, ধান বোনা থেকে ধান বোমা বোশেখ জোষ্ঠ থেকে ভাদ্র মাস, আবার ধান তোলা, ধান কাডাই অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ মাস বড় চাষীদের বাড়িতে কাজ পায়। বাকী মাসগুলো বেকাব বসে থাকলে পেট চলে না। কাজের জন্য উত্তরে চলে যায়। পান ববজের কাজ করে। দূবেলো খাওয়া আর মজুরী। জিনিসপত্রের দামের তুলনায় সে মজুরী স্বল্প। মাসকাব্যরী কিছু টাকা পেলে বাড়িতে আসে হীরার বাবা। কিছু চাল, তেল, নুন কিনে দিয়ে যায়। হীরা, তার মা, আব একটা বাচ্চা মেয়ে মোট তিনজনের কোনরকমে চলে যায়। এক মাসের ওপর আরও সাতদিন হল। হীরার বাবা বাড়ি আসে নি। ঘরে এক কণাও চাল নেই। রুট, নিশাদের আর

নিজের রেশন কার্ডে যা মাইলো জুটেছিল তাতেই তিনদিন চলছে। আজ আর তাও নেই। অথচ আজ সকাল থেকে হীরাতা বায়না ধবেছে—মা, আজ ভাত রাঁধ, এবেলা গরম ভাত, ওবেলা পিঁরাঙ্গ, কাঁচা লস্কা দিয়ে ভিজ়ে ভাত।

হীরার মা চুপ করে থাকে, ফ্যাকাশে হাড় বোরিয়ে-পড়া মুখখানা ছেলের দিকে ফিরিয়ে দেখে—হীরাতা কি রোগা হয়ে গেছে। গায়ের রঙটা কালসিতে পড়ে গেছে। এইটুকু ছেলে গলার হাঁসুলী বোরিয়ে গেছে। বড়কের পাঁজরাগুলো যেন সব পরিষ্কার গোণা যায়, দুধ-মাছ দূরে থাক। ছেলেকে দূবেলো দূমুঠো ভাত দিতে পাবে না। এমন আকাশ কোনদিন পড়ে নি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হীরার মা। আপন মনেই বলে—ভগবান, অদেখোঁ কি আছে তুমিই জান।

—চল্ হীরা, তুই টুকরীকে নিয়ে দাঁড়াবি। আমি রাণীপুকুর থেকে শাক তুলে আনব।

হীরা আশাব্যত হয়ে ওঠে, মা তাহলে আজ সত্যিই ভাত রাঁধবে। আনন্দে টুকরীকে কাঁধে তুলে নেয়। টুকরীর দিকে ঘাড় উচু করে নাচতে নাচতে বলে—মা আজ ভাত রাঁধবে। মা আজ ভাত রাঁধবে।

—চল্ চল্ হীরা, পা চালিয়ে চল্। এখন রাণীপুকুরে কেউ নেই। আজ হাট-বার। বাবুরা সব হাট করতে গেছে। আমরা চুপি চুপি শাক তুলে আনব।

হীরার মা পেছনে। সামনে হীরা। টুকরী তার কাঁধে। ওরা তিনজন চলছে। হীরার মনে আনন্দের স্রোতটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে এল। একটা সন্দেহ তার মনে উঁকি দিল। হীরা ভাবতে শব্দ করল—মা তাহলে আমাকে তিনদিন ধবে শব্দ শব্দ বড় ধানের মূড়িগুলো খাওয়াল। ঘরে চাল ছিল। মা একটুও বলে নি। মা ভীষণ মিথ্যাবাদী। হঠাৎ হীরা পিছন ফিরে মার দিকে তাকিয়ে বলে—মা, তুমি আমাকে মিছা কথা বললে কেন? আমাকে তিনদিন ধরে বলছ ঘরে চাল নেই। আজ তবে ভাত রাঁধবে কিসে?

চমকে ওঠে হীরার মা। তাব ফাঁক ধরা পড়ে গেল। ভেবেছিল কিছু শাক তুলে এনে সিদ্ধ কবে দেবে। আর রাণীপুকুরের দূটো শালুক এনে সিদ্ধ করে তার সঙ্গে কিছুটা কড়া মিশিয়ে পোড়া করে দেবে! আজ লক্ষ্যবীর, ভাত খেতে নেই এমন একটা কিছু হীরাকে বলে ছুলিয়ে রাখবে। হীরার মার মনটা বিষম-তায় ভরে যায়। ছেলের কাছে ফাঁকটুকু ধরা পড়ার লজ্জায় নয়, একমুঠো ভাত

ছেলের মধ্যে ঘরে দেওয়ার অক্ষমতার মাফে-
হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। উপস্থিত কামাকে
চাপা দেওয়ার জন্যে স্বাক্ষরে ওঠে—চল
না হীরা। আমি আর তোর সঙ্গে বকতে
পারি না। আমি মরলে বাঁচি।

হীরা গম্ভীর হয়ে সামনে তাকিয়ে
চলতে থাকে। পেছনে তার মা আছে এ
কথা যেন ভুলেই গেছে। ছেলের মনের
ভাব বুঝতে গেরে মা বলে—লক্ষ্মীঠাকুরের
ভাড়ে পাঁচপো খান আছে। সেটা শীলে
ভেঙে তোর তরে আজ ভাত রেখে দোব।
শুনলি হীরা।

—তুমি যে বল লক্ষ্মীবারে খান ডানতে
নেই।

—না, সে এ মাসে ডানলে কিছু হয়
না।

ওরা তিনজনে রাণীপুকুরের ধারে এসে
গেছে। হীরার মা জলের সীমায় নেমে
কলমালতীর ডগদুলো ভেঙে ভেঙে তুলতে
লাগল। অনেক শূন্য শাক জলের ধারে
ছেরে আছে। খুব সুন্দর সবুজ হয়ে
আছে। তাও কিছু তুলবে কি না ভাবছে।
হীরা তার বোন টুকরীকে কাঁধ থেকে
নামিয়ে কোলের মধ্যে নিয়ে পাড়ের ওপর
চুপ করে বসে আছে। কি রকম মনমরা
হয়ে গেছে। হীরার মা ঘাড় তুলে দেখে।
আহা, ছেলেটা কি ভাবছে। নিশ্চয়ই খুব
ক্ষুধা পেয়ে গেছে। টুকরীটা ওর কোলের
মধ্যে ঝুমে নৌতরে পড়েছে। ওর কোন
বালাই নেই। কারণ ও এখন ভাত খায়
না। হীরাব মনটাকে হালকা করে দেওয়ার
জন্য হীরাব মার একটু গল্প করার ইচ্ছা
হল। যদি কখনো ভুলে থাকে।

—টুকরী ঘুমিয়ে গেছে, ওকে গামছাটা
পেঁতে গাছেব ছাই দেখে শুইয়ে দে।

হীরা কোমবেব গামছাটা খুলে গাছেব
ছায়ায় মাটি ওপর পেতে বাচ্চা বোনটাকে
শুইয়ে দিল। তারপর মা যেখানে শাক
তুলছিল সেখানে সোজাসজি পাড়ের ওপর
এসে বসল। এই পুকুরে শাক তুলতে
তুলতে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যায়
হীরার মার। তাই ছেলের সঙ্গে পুরনো
দিনের কথাই বলতে শুরু করে।

—উই যে হোথা পুকুরের কোণে বড়
একটা বাড়ি উইখানে আমাদের ঘর ছিল।
সে দশ-এগারো বছর আগে। উই যে বেড়া
দেখা যাক উইখানে আমাদের সেই কাম-
রাঙ্গা গাছটা আছে। মনে পড়ছে হীরা
সেই যে একবার দুটা কামরাঙ্গা দিয়ে
চাটনি করে দিছলাম। তখন তোর বাপ
ঘরে ছিল। কামরাঙ্গাগলার বস কি
কি সোন্দর! উপরটায় যেন সিঁদুর মাখান
আছে। চোখের কাছে এনে সুঁঝিয়ে দিকে
চাও দেখবে যেন তেল-হলুদের রস। আর
মিষ্টি—যেন গুড়। মনে পড়ছে হীরা।
তুই তো আমেকটাই খেয়েছিস।

—হু-উ-উ, আমার মনে আছে।

হীরার জিভে জল এসে গেল। তার
ঐ গাছটা দেখার খুব ইচ্ছা হল।

—মা, আমি একবার গাছটা দেখে
আসব?

—যা না, ওই বেড়ার ধারে দাঁড়ালেই
দেখতে পারি। বেড়া ডিঙিয়ে যাবি না।
বাবুয়া বকবে।

হীরা উল্লাসে উঠে পড়ে। ধীরে ধীরে
এগোয়।

হীরার মার সেদিনগুলোর কথা মনে
পড়ে, কি সুখেই না ছিল বাবুদের ওখানে,
দু'বিধা জমি ভাগে চাষ ছিল, সবই বাবু-
দের, হাল, গরু, বীজধান সবই। হীরার
বাবা বাবুদের বাড়িতেই বারমাস কাছ
করত। এদিকে ঘরে খানও থাকত, কোন
অভাব ছিল না। ঐ কামরাঙ্গা গাছটা
হীরার বাবা পশ্চিমে বাঁশ কিনতে গিয়ে
এনেছিল। গাছটা এখন কি সুন্দর আত-
কত বড় হয়েছে। কামরাঙ্গার ভারে ডাল
ভেঙে পড়ছে, কিন্তু অদর্শে নেই। দেশে
হাল সেটেলমেন্ট এল। বাবুয়া হীরার
বাবাকে বলল—তোর আর এখানে থাকা
হবে না, তুই তো আমাদের খাজনা দেওয়া
প্রজা নয়, হাল সেটেলমেন্টে যদি তোর
নামে দখল লেখা হয়ে যায় তাহলে তুই তো-
উঠবি না, আর তুই যে ভাগে দু'বিধা
চাষ করিস সেগুলোও ভাগদখল লেখাবি
না, বদ্বালি।

হীরার বাবা কথাগুলো ঠিক ধরতে
পারল না, সে তো আর বাবুদের জমি
নিরে নিচ্ছে না, তাহলে বাবুয়া এমন বলছে

কেন? বাবুদের গোমস্তাও বলল—এই
শোন ঐ খালের কাছে একটা ঘর করে
নিগে যা। বাঁশ, খড় সব এখান থেকে
নিবি। সেটেলমেন্টের জরিপ হয়ে গেলে
আবার তোর ঘরে চলে আসবি।

সরল, অশিক্ষিত হীরার বাবা বাবুল
বাবুয়া হয়ত ঠিকই বলেছে, হাল জরিপ
চলে গেল। কিন্তু হীরার বাবার আর
তার ঘরে ফিরে আসা হ'ল না, কারণ তার
যে জায়গাতে ছোট ঘরটা ছিল সেটা
পড়ল ছোটকর্তার ভাগে, তিনি বললেন—
তোকে তো আর ওখানে থাকতে দিতে
পারি না, আমার যে আলাদা বাস্তু করতে
হবে।

দু' বিধা জমি পড়ল মেজকর্তার
ভাগে। তিনি বললেন—ভাবছি সব জমিই
আমি জনমজুর দিয়ে নিজের হাতেই চাষ
করব। জমিটা আর তোকে দিতে পারব না।

হীরার বাবা বড়কর্তার পায়ে লুটিয়ে
পড়ল। কিন্তু কিছুই হ'ল না, বড়কর্তা
বললেন—আমি কি করি বল। জলজমি,
কালা, ডোবা, বাস্তু আমরা এমন ভাগ
করে না নিলে আমাদের সব জমিই যে
থাকবে না। সরকারকে ছেড়ে দিতে হবে।
আমরা আর কি করব, নতুন ভূমি সংস্কার
আইন হয়েছে, জমি রাখতে হলে আমাদেরও
ঐভাবে চলতে হবে। তবে তাদের ভাবনার
কিছু নাই। বড় বড় চাষীদের কাছ থেকে
সরকার যে সব বাড়তি জমি পাবে সেগুলো
ষাদের জমি-ভূমি নাই তাদেরই দেওয়া হবে,
এই আইনটা তাদের জন্যই হয়েছে,
বদ্বালি। তুইও কিছু পারি।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গল - আলাহাবাদ - শ্রীমঙ্গল - গোহাটী

নিভৃত ইচ্ছার ছায়া

জািলকুমার মোদক

নদীতে বন্যার জলে উদ্‌গামতা জাগে।—

নিভৃত ইচ্ছার ছায়া, কবেকার, যেন মূর্তি পায়;

সহজ, সচেতন হাড়ে নৃপতি-রচিত বাঁধগুলি

এবার বিচল করে বিপুল জীলাম

চরশের ভিতরে যেন সদর্পে সে বিশ্বকারিত হয়ে

জন্মের সন্মত গোরবে।

গ্রামের গাঁলতে, এই সহরেও রাক্ষপথ জুড়ে

দেখি তারই আয়োজন। অতীতের প্লানি

যতাই স্বরূপে আসে, সে-নদী আক্রোশে ওঠে ফুলে।—

হৃদয়ে ব্যথার ভাবে ক্ষিপ্ত কানাকানি

অবিরাম চলে যেনঃ নগবে প্রাসাদ, গ্রামে কবন্ধ কুটির

ভাসাবে নিশ্চিত।—তারই মন্ত-নেশা তরঙ্গে অধীর।

কারণ এখন সেই প্রশস্ত সময়। বাণ্য-নামে

সুযোগ একবার ডাকে কণ্ঠ ভরে, অসীম আদরে।

মদীরও শপথ তাইঃ সুখালোকে নেবেই সে, নেবে

ডোন্টের ব্যালটে স্বর্ণ-সুযোগের মোকাবিলা করে।

হীরার বাবা এবারেও কিছু বুঝল না। কোথায় কেমন করে কোন জমি কোন বাড়ি তার জন্য থাকবে সে ঠিক ঠাহর করতে পারল না। 'ভূমি সংস্কার' নামক কথাটা শুধু নতুন শুনল। কিন্তু কোথায় কি সংস্কার হ'ল তা বোধ হয় হীরার বাবার জানার কথা নয়। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—সবই অদৃষ্ট।

পুকুরের কোণে বেড়ার ওধার থেকে হঠাৎ উচ্চৈশ্বরে কলরোল ওঠে। হীরার মা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

—ওলাউঠি, শাকচুরি পুকুরে শাক চুরি করছে, আর ব্যাটাকে এদিকে পাঠিয়েছে চুরি করতে।

আবও বহু অপ্রাণ্য গালাগালি শোনা যায়। হীরার মা পুকুরের জল থেকে উঠে পড়ে। কোণে বেড়ার দিকে এগোয়, আশংকায় তাড়াতাড়ি চলতে থাকে,—হীরার আবার ওদেব কি করল। ও তো বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছিল।

হীরা বেড়ার ধারে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, দেখাচ্ছিল সেই কামরাঙ্গা গাছটা। গাছের ডালে ডালে প্রচুর কামরাঙ্গা, ভারে ডাল-গুলো নুয়ে পড়েছে। মা ঠিকই বলেছিল। খুব 'সৌন্দর্য বন' কামরাঙ্গাগুলোব, তেল-হলুদে রঙ। বোদ পড়ে চিক্ চিক্ করছে। মা সেবার চাটনি বেষ্টেছিল, রান্নার আগে একটু কাঁচাও খেতে দিয়েছিল। খুব মিষ্টি। জ্বলে জ্বল আসে হীরার। ঢোক গিলে, কখন আনমনে বেড়ার ওধারে চলে যায়। মা বসেছিল—বেড়ার ওধারে যাবি না। সে কথা হীরার মনে থাকে না। মা আরও বলেছিল—

গাছটা আমার বাবা লাগিয়েছিল। মিষ্টি কামরাঙ্গার টানে হীরা অনেকদূর এগিয়ে যায়, গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। গাছটা অনেক বড়। ডালগুলোর নাগাল পাওয়া যায় না। হীরা গাছের গোড়ায় চলে যায়। গোড়াটা বেশি মোটা নয়। ওটা যাবে। গাছ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করে। অনেক দূর উঠে পড়ে। আনন্দে দিশেহারা হয়ে যায়। বাঃ কত কামরাঙ্গা, কি সুন্দর! হাতের কাছে এখন অনেক পাওয়া যাবে। একটা মোটা ডাল দেখে গাছে পিঠ ঠেসে বসে। একটা কামরাঙ্গা ডাল থেকে তুলে নেয়। কি সৌন্দর্য বন! মিষ্টি—যেন গুড়। হীরা এক কামড় দিল। হ্যাঁ, মা ঠিকই বলছে—খুব মিষ্টি, জ্বলে দিয়ে এক ব্রকম টকাস্ টকাস্ শব্দ করে শব্দ নেয়।

—গাছে কেটা উঠেছে বে?

বাবুদেব কাজকরনী মেরেটা হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে।

—এই সুখা দেখত কামরাঙ্গা গাছে কেটা?

ছোট বাবুদেব ছেলে সুরেশ, বয়স চোদ্দ-পনের। এক দৌড়ে গাছেব তলায় এসে দাঁড়ায়। হীরাকে সে চেনে।

—এই হীরা, আয় নেমে আয় তোকে দেখাচ্ছি একবার। এটা কি তোরা বাবার গাছ পেয়েছিস, কামরাঙ্গা প্যাড়িছিস।

—আমার বাবাব গাছ নয় তো কি তোরা বাবার গাছ, আমার বাবাই তো এ গাছটা লাগিয়েছিল।

—ওরে শালা, এটা তোরা বাবার গাছ, দাঁড়া তোকে বাবা দেখাচ্ছি।

গাছের তলা থেকে একটা ইঁটের টুকরো

তুলে নেয়। সজোরে হীরাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেয়,—শালা, এবারে নাম।

সত্যিই হীরা এবারে নেমে আসে। গাছের প্রায় আগভাল থেকে টুপ করে তলায় পড়ে যায়।

হীরার মা বেড়ার ধারে এসে উঁকি দিয়ে দেখে। ছোটবাবু এবং আরও চার-পাঁচজন লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কামরাঙ্গা গাছটার তলায়। সুরেশ অনবরত বকে চলেছে, বেড়া পেরিয়ে গিয়ে দেখে হীরার অচেতন দেহখানা মাটিতে পড়ে আছে। কপালটা কেটে গেছে। রক্তের ধারা গড়িয়ে তাঁতের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। হীরার মা কাঁপিয়ে পড়ে হীরাকে কোলে তুলে নেয়, ডুকরে কেঁদে উঠে।

—হায় ভগবান, এই আমার কপালে ছিল।

পরক্ষণেই হীরার মার চোখে যেন আগুন খেলে যায়। হীরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সোজা দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে।

—তোমাদের কি মানুষের শরীর। তোমাদের দেহে কি অস্ত্র-মাংস নেই। এক ফোটা ছেলেকে অমন কবে মারে। বাছা তিনদিন ভাত পাষ নি। তোমরা আমার ঘর নিবেছ, জমি নিবেছ, তোমরা মানুষকে দুঃমতো খেতে দিতে পার না। তোমরা মানুষকে খুন করতে পার। তোমরা হলি মনিষা। আমরা হলি গরীব। ভগবান ওপর থেকে দেখছে। ভগবান তোমাদের বিচার করবে।

হীরাকে আঁচলের মধ্যে চেপে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হীরার মা চলে যায়।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

দৃশ্যবোধ ভট্টাচার্য

বিজ্ঞান-বোধ ও ভেজাল-বুদ্ধি

গিয়েছিল, শ্যামবাজার। ইচ্ছে ছিল, খাঁটি খেজুর গড় কিনবো। কিন্তু অনেক খুঁজেও তা' আব পেলাম না। যে গড়েই হাত দি, গন্ধ শূন্য, দেখি যে তাতে ভেলগড় মেশান। অগত্যা ঠিক করলুম, ভেলগড়ই কিনবো। কিন্তু দেখা গেল, তা'ও নিরুদ্দেশ। গড়ের নামে যা' বিক্রি হচ্ছে, বালি ও কাঁকরের অপবৃপ একটি কেমিক্যাল কম্পাউন্ড ছাড়া তাকে অন্য কিছু বলা যায় না। বাধ্য হয়ে তাই গড় না কিনেই বাড়ি ফিরবো বলে স্থির করলুম। পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধুটি দৃষ্টি করে বললেন, বড় অশাস্তিতে আছি ভাই।

শুধালুম,—কেন! কি হল আবার?

—আর বলা কেন! বালিতেও ভেজাল। বাড়ি করার কাজে চড়া দরে দু'লারী বালি কিনলুম সোদিন। কিন্তু পোড়া কপাল! দেখি যে, বালির সঙ্গে রাশি রাশি মাটি মেশান।

মুখ ব্যাজার করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলুম। ফিরে দেখি, লক্ষ্যাকাণ্ড। গৃহিণী হৈ-ঠে সুরু করেছেন। গোলযোগের মূলে এককুড়ি মাটি। গৃহিণী ন্যায্য পরসাদ দিয়ে সে মাটি কিনেছিলেন। কিন্তু কিনে দেখেন, ওতে মাটি যা' আছে, অন্য সব পদার্থ আছে তা'র চেয়েও অনেক বেশি। হাড়ের টুকরো, পাথর-কুচ, খড়কুটো ইত্যাদিতে তা' ভরপুর।

ভাবলুম, সব মাটি হয়েছে তা' হলে; এবং এ কারণেই চারিদিকে রব উঠেছে, গেল গেল। দেশ গেল, জাতি গেল। সমাজ গেল, সভ্যতা গেল। ভেজাল নামক বিদ্যাটি ক্রমেই অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরল আমাদের।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশেষ বিদ্যা-টিও এক ধরনের বিজ্ঞান কি না। এর উত্তরে বলা চলে, ভেজাল-প্রক্রিয়া বিশেষ রকমের একটি জ্ঞান বটে: কিন্তু এর সাহায্যে কোনো কিছুই বিশিষ্ট রূপকে জানা যায় না। বরং কোনো বস্তুই যে সত্যরূপকে আমরা জানি, মিথ্যার প্রলেপে তাকে আচ্ছন্ন করাই ভেজালের কাজ। অপরদিকে বিজ্ঞানের কাজ ঠিক উল্টো। যে সত্যকে আমরা জানতুম না, অথবা যে সত্য মিথ্যার আড়ালে চাপা পড়ে ছিল, বিজ্ঞান তাকে প্রকাশ করে। অতএব, দেখা

যাচ্ছে, গোড়াতেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের সঙ্গে ভেজালবিদ্যার বিরোধ।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির গোড়ার দিকে কিন্তু অবস্থা অন্যরকম ছিল। বিরোধের চিত্রটি তখন-আজকের মতো এতটা প্রকট হবে দেখা দেয় নি। কারণ, বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে বড় করে না দেখে তখন বিজ্ঞান-বোধকে প্রাধান্য দেওয়া হ'ত। আর তখন বিজ্ঞানবোধ বলতে বোঝাত কল্যাণবোধকে কোনো কিছুই সত্যস্বরূপ বোধবার ক্ষমতাকে।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির গোড়ার দিকে এই ক্ষমতার সম্ভাবহার হ'ত। ধাপে ধাপে যেমন এগোচ্ছিল বিজ্ঞান, মানুষের অজ্ঞানও তেমনি দূরে সরছিল। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যার নীহারিকালোকে থেকে যুগেকের মতো যেদিন ভেজাল নামক বস্তুটির আবির্ভাব হল, সেদিন থেকে বিজ্ঞানের জগতে অমঙ্গলের সূচনা। বিজ্ঞানের আনন্দ-নিকেতনে সেদিন থেকে নিরানন্দের অনধিকার-প্রবেশ।

এদিকে প্রথমটায় নজর পড়ে নি কারণ। কারণ খেয়াল হয় নি যে, অসত্য সত্য-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে। খেয়াল যখন হল, সত্য-মিথ্যায় তখন জট পাকিয়ে গেছে। ভেজালের জগতে বৈজ্ঞানিক সত্যের অপপ্রয়োগ তখন পুরোদমে সুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভেজাল-বুদ্ধির এই সর্বনাশা অভিধান আজও থেমে নেই। বরং বিজ্ঞানের কাছ থেকে সত্যকে চুরি কবে, আজ এ বুদ্ধি ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে; এবং কোনো কোনো দেশে এই ক্ষীণতার পরিমাণ এত বেশি হচ্ছে যে প্রকৃত সত্য-বুদ্ধিকেই তা' গ্রাস করতে উদ্যত। ফলে, বিপদ ঘটছে নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় সাধারণ-মানুষের। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ তাদের কাছে অভি-শাপের আকারে বর্ণিত হচ্ছে।

এই অভিশাপের রাক্ষুসে চেহারাটা ভালো কবে খুঁজে পেতে হলে ভারতবর্ষের মতো দেশের দিকে তাকাতে হয়। কেন না, বৈজ্ঞানিক ভেজাল-বুদ্ধির পরিপূর্ণ একটা চিত্র এদেশে বিনা অনুদৃশ্যানেই চোখে পড়ে। সব রকম জিনিসে এখানে এত বেশি ভেজাল চলছে যে, আব কিছুদিন পবে আমবা হয়তো সত্যিকারের খাঁটি জিনিসকেই ভেজাল বলে ভুল করবো। এখন প্রশ্ন, এই ভেজাল-বুদ্ধির মূলে বিজ্ঞানের অবদান কতখানি? অসংকোচে বলা চলে, অনেকখানি। কতখানি ভেজাল দিলে একটি সেতু ভেঙে পড়বে না, পড়ি

পড়ি করেও ফেটে চৌচির হয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে থাকবে, অবৈজ্ঞানিক সাধারণ মানুষ এ হিসেব কোথায় পাবে? কি ধরনের ভেজাল দিলে ওষুধের বর্ণ এবং গন্ধ অপরিবর্তিত থাকবে, অথচ থাকবে না শৃঙ্খল আসল জিনিসটুকু, বিজ্ঞানে অন-ভিজ্ঞদের পক্ষে এ কথাও জানা সম্ভব নয়। আর শৃঙ্খল কি এই! চারোতে চামড়া এবং চিনিতে কাঁচ মেশাতে হলেও কিছুটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দরকার। পাথরের চাল তৈরি করার জন্যে জার্মানিতে যে একটি যন্ত্রের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, তারও পেছনে কি বিকৃত বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি নেই?

এখানে প্রশ্ন উঠবে, দু'ধে জল মেশানোর মূলেও কি তবে বিজ্ঞান-বুদ্ধি? উত্তরে বলবো, হয়তো ঠিক তা' নয়। তবে এরও মূলে বিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন কিছুটা অবদান আছে বৈ কি। আজ বিজ্ঞানের বিকৃত ব্যাখ্যা আশীর্বাদদের ধর্মবোধকে শিথিল করে দিচ্ছে। কেমন করে দিচ্ছে, সে কথা বলা থাক।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই ধর্মবোধের বিরূপ এক অংশ জুড়ে থাকে কুসংস্কার; যা' থেকে আসে ধর্ম-ভয়। এই ধর্মভয় থেকেই আমবা নরকেস্ত আশ্রিত কল্পনা করতুম; কোথাও কার-কারণ সম্পর্ক খুঁজে না পেলে দৈব ঘটনার কোনো সংযোগ আছে বলে ভাবতুম। পাপ করলে নরকে যেতে হবে, এ ভয়টা কিছুকাল আগেও যতখানি প্রবল ছিল, এখন আর তা' নেই। বিজ্ঞানবিদ্যা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে নিত্য-নতুন কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করেছে। ফলে কুসংস্কার ক্রমশই বিদায় নিচ্ছে এবং ধর্মভয়ও ধীরে ধীরে কমে আসছে। তাই দেখি, কিছুকাল আগেও আমাদের দেশের অনেক গোয়ালাই দু'ধে জল মেশাতে ভয় পেত। ভাবত, দু'ধে জল মেশালে বাছুর মরে যায় এবং এতে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। কিন্তু এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে অন্যরকম। দু'ধে জল মেশানোর সঙ্গে বাছুরের মৃত্যুর যে কোনো সম্পর্ক নেই, এ কথা সকলেই এখন জানে। অর্থাৎ, কুসংস্কার যা' পরোক্ষভাবে অনেক সময় আমাদের মঙ্গলকে কারণ হ'ত, তা' এখন বিদায় নিতে চলেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্যাণ-দৃষ্টি তার শূন্যস্থানে আসন পাচ্ছে না। আসন যদি পেত তো দেখতাম, সে দু'ধের অনেকটাই শিশু-খাদ্য, রোগীর পথ্য,

তাতে জল মেশাতে আমাদের দেশের লোকদের বিচারবুদ্ধিতে বাধছে। কিন্তু তা' তো হয় নি। এব কারণ, কল্যাণধর্মী বিজ্ঞানবোধের সঙ্গে এদের ভ্রমেরই কোনো পরিচয় নেই। যতটুকু বিজ্ঞান-শিক্ষা থাকলে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করে কল্যাণ-অকল্যাণের অনেকটা দূর অবধি দেখা যায় তা' এরা লাভ করে নি। বিজ্ঞানবিদ্যার প্রসার এদের কুসংস্কারটুকুকে দূর করেছে মাত্র; কিন্তু কল্যাণধর্মকে জাগ্রত করে নি। যদি করত, তবে শ্রদ্ধামাত্র নিজেদের লাভ-লোকসানটুকুকেই ওরা বড় করে দেখত না। আলাদা করত না আপন চাহিদাকে। আর দশ জনের সঙ্গে সেটিকে মিলিয়ে দেখত। কিন্তু কার্যত দেখতে পাচ্ছি, এমন করে মিলিয়ে দেখার প্রবৃত্তি অধিকাংশের মতোই আজ অনুপস্থিত। বরং দূর্ভাগ্যবশত জল মেশান হচ্ছে এবং চালে কঁকর মেশাবার জন্যে যন্ত্রের প্রয়োজন হচ্ছে। এই যন্ত্রের প্রসঙ্গ বিজ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং বলতে হয়, এ-রূপের ভেজালের মূলে বিজ্ঞানবিদ্যার অবদান রয়েছে। কিন্তু একটা কথা; আমাদের দেশে দূর্ভাগ্য ভেজাল দেওয়া হয়, অথচ গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া বা জাপানে দেওয়া হয় না কেন? পাথরের নকল চাল তৈরি করার জন্যে ভারত থেকে জার্মানিতে যন্ত্রের অর্ডার যায়, অথচ জার্মানিতে এ ধরণের শরতানীর কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না কেন? ওই সব দেশ বিজ্ঞানবিদ্যার তো আমাদের চেয়ে-চেন বেশি এগিয়ে আছে। দূর্ভাগ্য জল মেশালে যে নবকে যেতে হয় না, এ কথা তো ওরা আমাদের অনেক আগে থেকেই জানে।

এ বহুসংখ্যক ফয়সালা করতে গেলে শিক্ষার দ্বারস্থ হতে হয়। বলতে হয়, ওই সব দেশের লোক যে ভেজালবিদ্যায় আমাদের মতো এতটা পারদর্শী হয়ে ওঠে নি, তার মূলে আছে শিক্ষা। ওদের শতকরা ৯৫ জনেবও বেশি শিক্ষিত। সত্যিবারের বিজ্ঞান-শিক্ষা লাভ করেছে ওরা। যে শিক্ষা ডিগ্রীর সেলামী দিয়ে শ্রদ্ধামাত্র চাকরিব দববাবে পৌঁছে দেয় না, এমন শিক্ষা লাভ করেছে। অর্থাৎ, বিজ্ঞান-বুদ্ধিবোধ জারিজন্মের নয়, কল্যাণধর্মী বিজ্ঞান-বোধ পরিবাপ্ত হয়েছে ওদের মধ্যে। তাই ওরা শ্রদ্ধামাত্র ব্যক্তিগতভাবেই প্রশংসা দেয় না; দেশের এবং দেশের কথাও চিন্তা করে। অপবাদকে আমাদের দেশের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি লোক এখনও অশিক্ষিত। নিরক্ষরের সংখ্যা যে এর চেয়েও আরও অনেক বেশি, এ কথা নিশ্চয় আজ আর কাউকে বলে দিতে হবে না।

অথচ সকলেই জানেন, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে সবচেয়ে বড় তফাৎ ন্যায়-অন্যায়ের বিচার-বোধে। শিক্ষিত লোক ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য যেভাবে বিচার করেন, ভাল-মন্দের হের-ফের যেভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন, অশিক্ষিতের পক্ষে তা' করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। যে মানুষ শিক্ষাই কোনোকালে লাভ করল না, বিজ্ঞানের কল্যাণ-অকল্যাণ বিচার করার শক্তি সে' পাবে কোথায়? তাই আজকাল অনেককেই বলতে শুনছি, ভারতের লোককে শিক্ষিত করে তুললেই ভেজাল-সমস্যার সমাধান হবে। এর উত্তরে বলবো, সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়তো হবে; কিন্তু পুরো-পুরি সমাধান এ থেকে সম্ভব নয়। কেন না, একটু আগেই বলছি, ভেজালের পিছনে শিক্ষিত লোকেরও হাত রয়েছে। সেতু ও ওষুধ তৈরির ফর্মুলা অশিক্ষিতরা জানে না। তা' ছাড়া শ্রদ্ধামাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই যদি ভেজাল দূর করা যেত, তবে যে সব দেশের শতকরা প্রায় ১০০ জনই শিক্ষিত, সেখানে ভেজাল নামক বস্তুটি নিশ্চয় একেবারেই থাকত না। কিন্তু তা' তো নয়। অতি উন্নত দেশেও ভেজালের অপরাধে মাঝে মাঝে দু-চাবজনকে হত্যা করার প্রয়োজন হয়। এবং এর চেয়েও বড় কথা, অনেক উন্নত দেশই বিদেশের সঙ্গে কাল-কায়বাসে ভেজালের আশ্রয় নেন। ভাল গমের পরিবর্তে অনেক সময় পচা গম আসে এবং চাল যা' আসে বহু-ক্ষেত্রেই তা'কে খাদ্য বলে অভিহিত করলে সত্যের অপলাপ হবে। তবে তো বলতে হয়, শ্রদ্ধামাত্র উন্নত বিজ্ঞান-বুদ্ধি থাকলেই ভেজাল-প্রবৃত্তি নির্মূল হয় না।

আসলে মানুষের মনের মধ্যে যে একটি স্বার্থপর ও হিংস্র দানব আছে, তা' থেকেই এই প্রবৃত্তির উদ্ভব। এই দানব বিজ্ঞান-বিদ্যার অগ্রগতির যুগে আছে, অনগ্রসর যুগেও ছিল। আজ থেকে হাজার বছর আগে আর্কিমিডিসের আমলেও বাজার জন্যে গড়া মুকুটে সোনার নামে অন্য ধাতু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল; এবং এর চেয়েও বড় কথা, ওই মুকুটে যে ভেজাল আছে তা' আর্কিমিডিসই নির্ধারণ করেছিলেন। আর্কিমিডিস যদি সত্যসন্ধানী না হতেন, তবে এ কাজ তাঁকে দিয়ে হত না। সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসামান্য একটা সূত্রের আবিষ্কারও অসম্ভব হত। তবেই দেখছি, ভেজাল-বুদ্ধি নয়, নির্ভেজাল সত্যদৃষ্টিই আর্কিমিডিসকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

যতদূর জানি, এ পৃথিবীর কোনো বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলেই শ্রদ্ধামাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তার প্রাধান্য ছিল না। নিজের অসুখ সারাবার জন্যে আলেকজান্ডার ফ্রেমিং পেনিসিলিন আবি-

ষ্কার করেন নি। রোডিয়ম বিকি' করে নিজে বড়লোক হবেন বলে মাদাম কুরী পিচ ব্লেন্ড নিয়ে দিনের পর দিন ধরে গবেষণা করেন নি। তরিমা সাধনা করেছেন, অজানাতে জানবেন বলে। যেখানে আছে অস্বাভাবিক সেখানে জ্ঞানের আলোক প্রক্ষেপ করে অদেখাকে দেখবেন বলে। এই দেখা এবং এই জ্ঞানার মধ্যে তারা আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন এবং এর চেয়েও বড় কথা, এই আনন্দকে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন নি; মহত্তর কল্যাণের আশায় দলজনের মধ্যে ভিলিয়ে দিয়েছেন। যেখানে এই ধরণের নিষ্কাম আদর্শ, সেখানে স্বার্থপ্রণোদিত ভেজাল-প্রবৃত্তির কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অতএব, স্বার্থ বিজ্ঞানবিদ্যা বলতে বড়, মঙ্গলের উপা-চার; সার্বজনীন কল্যাণ-বিধানের অমোঘ হাতিয়ার।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিজ্ঞানবিদ্যাকে তবে অসং কাজে লাগান হচ্ছে কেন? উত্তরে বলবো, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। বৌদ্ধ থেকে বিজ্ঞান-শক্তিকে মানুষ নিজেব প্রয়োজনে লাগাল, সৌন্দর্য থেকে অপ্রয়ো-জনেও বিজ্ঞান-বুদ্ধির ব্যবহার সুরু হল। সৌন্দর্য থেকে স্বার্থকে চরিতার্থ করার আশায় বিজ্ঞানীর কাছ থেকে ধার করা বিদ্যার অপপ্রয়োগ সুরু হল। শিক্ষা যেখানে অসং এবং অতাব যেখানে বেশি সেখানে এই অপপ্রয়োগ দেখা দিল প্রকট-ভাবে। আর যেখানে অতাব কম এবং শিক্ষা বেশি, সেখানে তা' বইল সূপ্ত আকারে।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, এখন এ সমস্যা থেকে পরিণামের উপায় তবে কি? এক কথায় এর কোনো জবাব দেওয়া চলে না। তবে একথা বিনা সন্দেহে বলা চলে, বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে ছাটাই করার মধ্যে এ সমস্যার সমাধান নেই। আমাদের অন্তরে বিজ্ঞান-বোধ জাগ্রত হয় যদি আমরা বৈজ্ঞানিকের মহৎ ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারি, একে স্বার্থসাধন নয়, বহুর কল্যাণবিধানই বিজ্ঞানবিদ্যার স্বার্থ ধর্ম, যদি এ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তবেই বিজ্ঞান-বোধবৃদ্ধির ছায়ায় ভেজাল-বুদ্ধির পবগাছা বেড়ে উঠতে পারবে না। এ ছাড়া আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। সুরবের মধ্যে ভুল না থাকে যেন। ভেজালের শাস্তিটাও যেন নির্ভেজাল হয়। কঠোর শাস্তিব্যবস্থায় মানুষের মনের সূপ্ত পশুটো যেন দাঁত বের করতে না পারে।

কিন্তু এমন দিন হতভাগ্য ভারতবর্ষে কবে আসবে? কবে খাঁটি খেজুর গুড় কিনতে গিয়ে হন্যে হয়ে যাবে বেড়াতে হবে না? খাদ্যে ভেজাল এবং অখাদ্যেও ভেজাল কবে বন্ধ হবে?

সুন্দর ওয়েব সাইট

সেজ্ঞানীর মনঃ নারী

মন্তব্যঃ সপ্তম দৃশ্য দেখা যাবে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে শেন্‌টের পক্ষে আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে সুফু সব সমস্যার সমাধান করে দিল। সুফুর আসাটা যেন জীবনে গোড়োর আবির্ভাবের মত। আমাদের এই ইস-পারফেক্ট সোসাইটিতে এমনটাও মাঝে মাঝে ঘটে—কোথা থেকে বিপদের সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য এসে যায়। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—দু'একজন ভাগ্যবশে এই ধরণের সাহায্য পায়। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিতের উপর নির্ভর করে তো সমাজজীবন চলে না। সমাজকে বদলাতেই হবে—এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন রেখট এই নার্টকটিতে।

অন্তর্বর্তী দৃশ্যে ওয়াং বেশ স্পষ্টভাবেই দেবতাদের জানাচ্ছে যে শেন্‌টের মন নিয়ে—অর্থাৎ মহৎ মানবের মনোভাব নিয়ে—তাজকের জগতে চলা যায় না।

সপ্তম দৃশ্য

[শেন্‌টের দোকানের সামনে শেন্‌টে বসে আছে এবং মিসেস সিন সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।]

মিসেস সিন—ব্যবসা রাখতে গেলে আরও শক্তভাবে তোমাকে বুঝতে হবে।

শেন্‌টে—কি করে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। দোকানের ভাড়া দেবার টাকা পর্যন্ত আমার কাছে নেই। বৃন্দ দম্পতিকে তাদের পাওনা দুশো ডলার আজকেই শোধ দিতে হবে। এই টাকাটা অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছি বলে এখন আমাকে দোকানের সব মজুত মাল মিসেস মিৎসুর কাছে বিক্রী করে ওই টাকা তুলতে হবে।

মিসেস সিন—ওই টাকাটা তাহলে গেছে? লোকজন নেই, মালপত্র নেই, বাড়ি ছাড়তে হবে। এমন অবস্থা হোল কেন জান? রয়ে সয়ে না চললেই এই হয়। এখন কি করে নিজেরটা চালাবে ভেবেছ?

শেন্‌টে—কিছুই জানি না। তোমাক বাছাইয়ের কাজ নিলে হয়তো কিছু রোজগার হবে।

[দ্রুতবেগে মিস্টার সুফু এসে ঢুকবেন। সুফু—আমাকে কিছু বলতে হবে না।

আমি সব জানি। বৃন্দ দম্পতির যাতে সর্বনাশ না হয়ে যায়, সেজন্য তুমি তোমার অন্তরের প্রেমকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হও নি। এমন কি আমাদের শহরের হতভাগা এবং হতজাড়া লোকগুলো পর্যন্ত তোমার মহত্ত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে তোমার নাম-করণ করেছে, 'দি এঞ্জেল অব দি স্ট্রাম্‌স্'।' যে লোকটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সে তোমার মতো নীতিশীল নয় বলেই তাকে তুমি পরিত্যাগ করেছ। এখন তুমি বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করে দিচ্ছ—যে দোকানের আর থেকে তুমি কতজনকে পালন করছিলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার এ সর্বনাশ দেখতে পারি না।—দিনের পর দিন আমার দোকান থেকে আমি লক্ষ্য করেছি তুমি আশ্রিতদের চাল ভাগ করে দিচ্ছ। এই মহৎ দৃশ্য আর কখনও দেখতে পাব না সে কি হয়। এই মহত্ত্ব, এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে আমি বোঁচে থাকতে। তুমি আমাকে সুযোগ দাও তোমার সব ভাল ভাল কাজে সাহায্য করতে। এই নাও একটা ব্যাঙ্ক চেক—তোমার ইচ্ছা মতো একটা যে কোনো অঙ্ক বসিয়ে নাও। আর মনে রেখ প্রতিদানে আমি কিছুই চাই না। এ আমার শ্রম্যার অর্থ—নিজেব স্বার্থের সঙ্গে জড়িত করে একে আমি কলঙ্কিত করতে চাই না।

[দ্রুতবেগে চলে যাবে]

মিসেস সিন—যাক বোঁচে গেলে। তোমাদের মতো বোকাশ্রয়ী লোকদের জীবনেই এই ধরণের সৌভাগ্য মাঝে মাঝে দেখা দেয়। চেকটার খালি অঙ্কের জায়গায় হাজার রুপোর ডলার লিখে দাও, ব্যাঙ্ক গিয়ে এখনই ভাগিয়ে আনি। দেরি করলে বোকা নাপতেটার মনে সুবুদ্ধির উদয় হতে পারে—তখন এসে নিশ্চয় চেকটা ফেরৎ চাইবে।

শেন্‌টে—চেকটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে সাজা এখন লজ্জিতে

চলে যাও—যে সব কাপড় দিয়েছিলাম, ফেরৎ নিয়ে এস।

মিসেস সিন মুগ্ধভঙ্গী করে বোঁচিয়ে যাবে। শেন্‌টে পকেট থেকে সুইটার ছদ্মবেশ পরে নেবে, সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকবে। মিসেস মিৎসু ঢুকবে।] মিৎসু—মিস্টার সুইটা, দোকানের মালপত্র বিক্রী করবার জন্যে তৈরি তো? আমি সঙ্গে করে তিনশো রুপোর ডলার নিয়ে এসেছি।

সুইটা—মিসেস মিৎসু, ঠিক কবলাম মালপত্র বিক্রী করব না। আপনার সঙ্গে চুক্তিপত্রই সই করব।

মিৎসু—কি বললেন? টাকার দরকার নেই? পাইলটকে টাকা দেবেন কি করে?

সুইটা—দেব না।

মিৎসু—বাড়ি ভাড়ার টাকা আছে তো?

সুইটা—(ব্যাঙ্ক চেকটা নিয়ে অশ্রুধারা ঘরটার লিখে নেবে) এই আমার কাছে আছে দশ হাজার ডলারের একটা চেক আছে। মিস্টার সুফু'র সই করা—তিনি আমার কাজিনের ব্যবসার ব্যাপারে খুবই ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন। আপনার দুশো ডলার অর্থাৎ সামনেব ছদ্মবেশের ভাড়া সম্বন্ধে ছটার আগেই আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা মিসেস মিৎসু, আমি এখন নানা কাজে খুব ব্যস্ত আছি। কিছু মনে করবেন না, আপনি এবার আসুন।

মিৎসু—তাহলে পাইলটের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন মিস্টার সুফু। দশ হাজার রুপোর ডলার। যাই হোক, টাকার গন্ধ পেলে আজকালকার যুবতীরা কত সহজে প্রেমকে বিসর্জন দিতে পারে—আপনার কাজিনকে দেখে শিখলাম।

[বোরিয়ে যাবে—ব্যাঙ্ক আউট]

মধ্যবর্তী দৃশ্য—রাস্তার ধারে।

[স্বল্প দৃশ্য—ওয়াং শূন্যে ঘূর্ণাবেশে বলতে থাকবে—তার ওপর আলোব স্পট পড়বে। দূরে দেবতাবা দাঁড়িয়ে আছেন দেখা যাবে—তাদের ওপরেও লাল রঙের স্পট।]

ওয়াং—শেন্‌টে আপনাদের কৃপায় একটা সুন্দর তামাকের দোকান কিনে ব্যবসা কবে বসল। তার জানাশোনা যত বেকার নরনারী এসে তার কাছে আশ্রয় নিল—তাছাড়া যে পারে তাকে ঠকাতে চেষ্টা করে। মনে হল দেনার দারে দোকানটাই বৃষ্টি উঠে যাবে। এমন সময় এসে হাজির হল তার কাজিন সুইটা—সেই এসে শেন্‌টেকে উদ্ধার করলে এই সব পরগাছাদের অত্যাচার থেকে।

১ম দেবতা—তাহলে শেন্‌টে এখন ভালই আছে।

ওয়াং—তা এক সম ভালই বলতে হবে। তবে বিপদ এড়াবার জন্যে অনেক সময়েই সে কাজিনের ঘাড়ে দাঁড়িয়ে চাঁপবে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়—আজকাল প্রায় প্রায়ই এ ব্যাপারটা ঘটেছে।

২য়—কাজিন যখন তার ব্যবসার তদারক করতে আসে তখন সে কি কাজকর্ম ছেড়ে শুধু আমোদ-প্রমোদেই মজে থাকে?

ওয়াং—সেজুয়ান শহরেই তখন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না প্রকৃত।

৩য়—সে যে কাকে বিয়ে করবে, ঠিক করেছিল।

ওয়াং—ইয়াং সুন বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শেন্‌টের সব টাকা হাতিয়ে নিতে চেয়েছিল। দোকানটা বেচে। কাজিন এ কথা জানতে পেবে ঠিক সময় হাজার হয়ে সুনকে হাটিয়ে দেয়। সে, ঠিক সময় না এলে শেন্‌টেকে পথে বসতে হোত।

১ম—তাহলে কাজিনটি তো ভাল লোক বলতে হবে।

ওয়াং—শেন্‌টের পক্ষে ভাল, কিন্তু তার দৃষ্টি বন্ধ-বান্ধবদের কাছে সাক্ষাৎ শনি।

১ম—তাহলে তো লোকটা ভাল নয়।

২য়—এ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে শেন্‌টে দুদিন বাদে আব ভাল থাকতে পারবে না।

ওয়াং—প্রভু আজকের পৃথিবীতে বাঁচতে হলে, শেন্‌টের মন নিয়ে চলা যায় না।

৩য়—আমরা কিন্তু মহৎ মানুষ্যের থাকবার জন্যেই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলাম।

১ম—আমরা এখন বাস্তব আছি, চললাম। তুমি শেন্‌টের খবরাখবর জেনে রাখবে—আবাব দেখা হবে।

[দেবতাবা চলে যেতে থাকবেন, আলো নিভে যাবে]

অন্তিম দৃশ্য—শেন্‌টের তামাকের দোকান।

[সুইটা দোকানের সামনে বসে কাগজ পড়ছে—এমন সময় মিসেস ইয়াং সুন ঢুকবেন এবং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন—সুইটা কাগজ থেকে মুখ তুলে বলবে—]

সুইটা—বলুন মিসেস ইয়াং সুন, আপনার জন্য কি করতে পারি? আপনি কি সিগারেট কিনতে এসেছেন?

মিসেস সুন—মিস্টার সুইটা আপনি তো জানেন আমি কেন এসেছি। আপনার তদারকিতে আপনাব কাজিনের ব্যবসা এই ক্রমাসে একেবারে ফেঁপে উঠেছে। সারা সেজুয়ান শহরে আপনারা অস্তুত দশটা তামাকের দোকান খুলেছেন। পরসার অভাব আপনাদের নেই। আমি আমার

ছেলেকে জেল থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি। আজ সকালে পদাশ আমার বাড়িতে এসেছিল। তারা জানালে শেন্‌টের সেই দুশো রুপোর ডলার ফেরৎ না দিলে, আপনারা তার নামে কেস করবেন।

সুইটা—পদাশ সত্যি কথাই বলেছে। আপনার ছেলেকে টাকা দিয়ে বেঁচে বলুন।

মিসেস সুন—আমি স্বীকার করছি আমার ছেলে একটা ইতভাগা। বোঁদন সে জানলো যে শেন্‌টে তাকে বাকি ভিনশো ডলার দিতে পারবে না, তখনই সে বৃকতে পারল যে পাইলটের চাকরি তার আর হবে না। তারপর দুদিনের ভেতরেই সে ওই দুশো ডলার ফুঁকে দিল। এখন টাকা ফেরৎ দেবে সে কোথা থেকে?

সুইটা—খণ শোধ না দেওয়ার অপরাধে তাহলে তাকে জেলে গিয়ে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মিসেস সুন—আপনি দয়া কবে শেন্‌টেকে একবার ডেকে দিন। সে তো এক সময় সুনকে ভালবাসতো। সে কখনই আপনার মতো নিষ্ঠুর হতে পারবে না।

সুইটা—শেন্‌টে এখানে নেই!

মিসেস সুন—কবে আসবে?

সুইটা—বলতে পারি না।

মিসেস সুন—শহরে গুরুত্ব যে আপনি তাকে কোথাও আটকে রেখে দিয়েছেন।

সুইটা—গুরুত্ব বিশ্বাস করবেন না।

মিসেস সুন—বেশ, আমি থানায় গিয়ে পদাশের সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করব।

সুইটা—চেষ্টা করতে পারেন।

মিসেস সুন—বোঁদ, আমি থানায় গিয়ে পদাশের সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করব।

কাপেটওয়ালী—আজ সকালের পোস্টে একটা রোজিস্টার্ড থাম পেলাম।

ভেতরে দুশো ডলারের নোট। কিন্তু বৃকতে পেরেছি শেন্‌টেই টাকাটা পাঠিয়েছে। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিতে চাই।

অনুগ্রহ করে তার ঠিকানাটা আমা-দেব বলুন।

সুইটা—অত্যন্ত দুঃখিত—আমাকেও সে ঠিকানা জানায় নি।

বৃক—চল, তাহলে যাই।

বৃক—আচ্ছা পবে এসে আবার খবর নেব—একদিন তো তাকে আসতেই হবে।

আচ্ছা চলি—

[সুইটা বাও করবে—এঁরাও বাও করে চলে যাবেন। বাইরে থেকে ওয়াং-এর গলা শোনা যাবে]

অন্যথাক্ষ—ওয়াং—সেজুয়ানের মহৎ নাবী

কি এতদিনেও ফেরেন নি? (ভেতরে ঢুকে) মিস্টার সুইটা, আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কবে শেন্‌টে ফিরছে? ছমাস আগে আপনি বলেছিলেন সে দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে। তারপর অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা সে থাকলে হতে পারত না। মিস্টার সুইটা, শহরের লোক বলছে নিশ্চয় তার কোনো বিপদ ঘটেছে। তার বন্ধুরা তার সম্বন্ধে এখন খুবই চিন্তিত। আপনি দয়া করে তার ঠিকানাটা আমাদের জানাবেন কি?

সুইটা—এখন আমার সময় নেই মিস্টার ওয়াং—আমাকে উঠতে হবে। আসছে সপ্তাহে আসবেন।

ওয়াং—লোকে বলছে আবার দীন-দুঃখী-দের বাড়িতে বাড়িতে চাল পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুইটা—এ থেকে তারা কি বৃকতে পারছে?

ওয়াং—শেন্‌টে শহর ছেড়ে কোথাও যায় নি।

সুইটা—কিন্তু—আমার অনুরোধ এ বিষয় নিয়ে আপনি মিথ্যা চিন্তা করবেন না। তার খবর পাওয়া মাত্র আমি নিজে গিয়ে আপনাকে জানিয়ে আসব—ক্ষমা কববেন, আমাকে এখন উঠতে হবে।

[উঠে দাঁড়াবে—রায়ক আউট]

মন্তব্য : ক্রমশ এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে শেন্‌টে স্বরূপে আর উপস্থিত থাকতে পারছে না—বর্তমানের বৃক-ধরা সমাজে এইভাবেই মানুষকে তার অস্তরের সমস্ত মহত্বকে বিসর্জন দিয়ে হীন হুমবোধ ধারণ করে চলতে হয়—নইলে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হতে বসে।

এরপরে আসে শেষ দৃশ্য—নাটকের মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আজকের জগতে মানুষ কিভাবে মহৎ থাকবে? দেবতারাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, এড়িয়ে গেলেন। সমস্যার সমাধান হোল না। নাটকের শেষে একটি এপিলাগ আছে। সেটি ইংরাজীতে বললেই ভাল শোনাযে—যে কোন একজন অভিনেতা এসে বলতে পারেন।

শেষ দৃশ্য—রাস্তার ধার।

[সঙ্গীত। ওয়াং রাস্তার ধারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে—দেবতাদের আবির্ভাব হবে।]

ওয়া—প্রভুদের সঙ্গে দেখা হবার প্রতীকার আমি ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছিলাম। শেন্‌টের ওখানে ভরা-বহু সব ঘটনা ঘটেছে—আবার সে সেজরান ছেড়ে চলে গেছে। এবার সে কয়েক মাসের জন্যে অদৃশ্য হয়েছে। এদিকে তার কাজিন সব কিছু লুটে পুটে নিচ্ছে। কেউ কেউ সন্দেহ করছে কাজিন শেন্‌টের ব্যবসা এবং টাকাকড়ি আত্মসাৎ কর-বার জন্যে তাকে হত্যা করেছে। আমার নিজের কিন্তু তা মনে হয় না। আমার ধারণা হল যে শেন্‌টেকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। যাক, প্রভুরা সবাই এসে গিয়েছেন—আপনারাই দয়া করে তাকে খুঁজে বার করুন।

১ম দেবতা—সত্যিই উদ্ভাবন ব্যাপার। আমরা তাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে গেছি—তবু তার দেখা পাই নি। পৃথিবীতে মহৎ মানবের অনুসন্ধান করতে গিয়েও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। শেন্‌টেরই আমাদের একমাত্র ভরসা।

৩য়—আশা যদি সে এখনও পর্যন্ত ভাল থেকে থাকে।

ওয়া—ভাল সে চিরকালই থাকবে—তবু সে যে অদৃশ্য হয়েছে।

১ম—ভাল তো আমাদের সমস্ত পরি-প্রমই বাধা হয়ে আছে।

২য়—তুমি কি আত্মবিশ্বাসই হারিয়েছ?

১ম—তা হলেই বা কী? শেন্‌টেকে খুঁজে না পেলে আমাদের এই পৃথিবী পরিভ্রমণ ব্যর্থ হয়ে পড়বে। এখানে এসে কি দেখলাম বল ফেরা। অসহনীয় দারিদ্র্য নীচতা এখানে মোরোম। যদি বা দু-তরফের জল লোক দেখা যায়, তারাও এ ধরনের সমাজে নিজেদের ঘেরাশের ভাল রাখতে পারে না।

৩য়—দেখ জলবিভ্রতা, এতকাল পৃথিবীর লোকদের জন্যে যে সব বিধি-বিধান আমরা ঠিক করে এসেছি, আমার ভয় হচ্ছে সবই ব্যর্থ করে দিতে পারে। কি করে কোনমতে বেঁচে থাকতে সেই চিন্তাভেই মানুষ অহরহ পাকল হয়ে উঠছে—ভাল হবার কথা তারা ভাববে কখন? (অন্য দেবতাদের প্রতি) পৃথিবীটা আর বাস করবার উপ-যোগী জায়গা নেই—তোমাদেরও এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

১ম—মানুষগুলো সব অপদার্থ!

৩য়—তার কারণ পৃথিবীর আবহাওয়াটা এমন বিষাক্ত যে এখানে শুদ্ধ আত্মাও বেশিদিন পবিত্র থাকতে পারে না।

২য়—মানুষ যদি দুর্বল স্বভাবের না

হোত তাহলে পৃথিবীকে এভাবে লোকের ভেতরে টেনে আনতো না। এখানেই ভ্রমশূন্য গড়ে তুলতো।

১ম—বন্ধুগণ, আমরা কে—সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। নৈরাশ্যের স্ফারাই বা অভিজ্ঞ হব কেন? অস্তিত্ব একজন সত্যিকার মহৎ মানবের দেখা আমরা পেয়েছি—পাপের সঙ্গে তার এখনও পরিচয় হয় নি। সে বর্তমানে অদৃশ্য হয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। একজন মহৎ মানবই আমাদের এই জগৎ পরিভ্রমণকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। সফরের আগে কি সিদ্ধান্তে আমরা এসে-ছিলাম স্মরণ কর—পৃথিবীতে অস্তিত্ব যদি একজন ভাল লোকের স্থান পাই, তাহলেই বুঝবো আমাদের জগৎসৃষ্টি ব্যর্থতার পর্য-বসিত হয় নি।

[অন্যদিক থেকে সুইটা ঢুকবে—দেবতা-দের যাও করে বলবে—]

সুইটা—হে দেবতার দল, আমার বহু ভাগ্য আবার আপনাদের দর্শন পেলাম।

১ম—(ওয়ারকে) এ কে? একে তো আমরা আগে দেখি নি?

ওয়া—জানি না ও আপনাদের চিনতে পারল কি করে? প্রভু, এই হচ্ছে শেন্‌টের সেই স্বাধীনতার কাজিন সুইটা। বিখ্যাত তামাকের ব্যাপারী।

২য়—তুমি কি বিখ্যাত টোব্যাকো মার্চেন্ট সুইটা?

সুইটা—(মৃদুভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

২য়—তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তুমি তোমার কাজিন শেন্‌টেকে হার খুন করছ, না হয় তাকে গুম করে রেখেছ। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার ব্যবসাতাকে হস্ত-গত করা। তুমি কি এ অভিযোগ অস্বীকার করো?

সুইটা—নিশ্চয়ই অস্বীকার করি।

১ম—আমাদের সেজরানের মহৎ নারীকে নিয়ে তুমি কি করছ? তাকে কি কোথাও লুকিয়ে রেখেছ, না হত্যা করছ?

সুইটা—প্রভু, আমিই সেই নারী! (হৃদয়বশ খুঁজে ফেলবে)

৩য়—শেন্‌টের!

শেন্‌টের—প্রভু, আমিই সে। আমিই সুইটা। আর আমিই শেন্‌টের।

শেন্‌টেরে বাঁচাতে গিয়ে সুইটার হাঁটু ছন্দবেশ আমাকে ধরল করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। "নিজের ভাল থাকা এবং পরের ভাল করা"—এই বিধান মানতে গিয়ে আমার সর্বনাশ হতে বসেছিল—আমি বুঝলাম

শেন্‌টেরে বাঁচাতে হবে। শেন্‌টেরে হিসাবেই—অর্থাৎ সেজরানের এক-মাত্র মহৎ নারীরূপে। কিন্তু পৃথিবীর আজ যে অবস্থা তাতে সেটা সম্ভব হবে যদি সুইটার আকর্ষণ ধর্মমো যায়। সুইটার একে শেন্‌টেরকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেবে, অথচ তার মহৎ চরিত্রে একটুকু পাপের সন্ধান পর্যন্ত লাগবে না। প্রভু, আপনারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখলেন, আমার ঐশ্বর-রূপ—সুইটাও বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীতে কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। পাশাপাশি এখানে মুখে দিন কাটায়, আর বার সত্যিকার ভাল তাদেরই ওপর দিয়ে দুঃখের কাড় বয়ে চলে।

১ম—এ সব কি বলছ শেন্‌টের? তোমাকে খুঁজে পেয়ে আমরা কত খুশি হয়েছি—এখন অব্যবহার্য করার অবতারণা করে—আমাদের স্বর্গীয় আনন্দে বাধা দিও না।

৩য়—তুমি হচ্ছে আমাদের আকর্ষণের সারা পৃথিবীর একমাত্র মহৎ ব্যক্তি।

শেন্‌টের—কিন্তু প্রভু, সুইটার নিন্দার তো লোকে পড়বে।

১ম—তুমি নিজেই বলছ যে তোমার হাঁটু ছন্দবেশ। আমরা তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি দিনে দিনে মহৎ থেকে মহত্তর থেকে মহত্তর হয়ে ওঠ।

দেবতারা তিনজন একসঙ্গে—বিদায় শেন্‌টের! বিদায় ওয়া!

[পেছনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দাঁড়াবে]

শেন্‌টের—কিন্তু আমাকে বাঁচাতে হলে মাঝে মাঝে আমার কাজিন সুইটাকে যে ডাকতে হবে।

১ম—তার সাহায্য বেশি নিও না।

শেন্‌টের—সপ্তাহে একবার।

১ম—মাসে একবার হলেই যথেষ্ট। বিদায় শেন্‌টের!

শেন্‌টের—কিন্তু প্রভু, এখনও আমরা অনেক কথা বলবার আছে—

দেবতারা একসঙ্গে—স্বর্গ থেকে অদৃশ্য মহাশক্তি আমাদের আকর্ষণ করছে শেন্‌টের। আর এখানে থাকার আমাদের উপায় নেই। বিদায় শেন্‌টেরে বিদায়—

[বলতে বলতে তারা মিলিয়ে যাবেন। ওয়া এবং শেন্‌টের বাও করবে। দুজনে মাথা তুলবে, আলো মিলিয়ে আসতে থাকবে। ওয়া শেন্‌টের হাত ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকবে।]

মন্তব্য : এরপর একজন অভিনেতা এসে ইয়োজীতে এপিগণটি বলবে।

স্বনিকা।

আর এক কেলেঙ্কারী

সুপরিচিত নাট্যকার ও অভিনেতা জোহন দস্তিদার লিখিত 'অমর ডিয়েতনাম' নাটকটি পুর্লিশের অনুমতি না পাওয়ায় অভিনীত হতে পারে নি। গত ২৯শে জানুয়ারী সকালে নাটকটি নিউ এম্পায়ার মধ্যে অভিনীত হবার কথা ছিল। এই নির্দিষ্ট দিনের জন্য টিকেট বিক্রয় হয়েছিল। সকাল ৯টা থেকে ১০টায় প্রচুর সংখ্যক দর্শক নিউ এম্পায়ার-এর সামনে এসে বিস্ময়ে হতবাক। হলের সামনে বিক্ষিপ্ত টাঙানো রয়েছে পুর্লিশের অনুমতি না পাওয়ায় নাটক অভিনয় হতে পারল না। যারা নাটক দেখতে এসেছেন তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যারা ব্যারাকপুর, চন্দননগর প্রভৃতি দূরবর্তী জগল থেকে এসেছেন। প্রায় সহস্রাধিক নারী-পুরুষ হলের সামনে সমবেত হয়ে নাটক বন্ধ হবার কারণ জানতে চাইছেন। নাট্যকার জোহন দস্তিদার ও তাঁর সংগঠনের সদস্যরা সকলকে কারণ জানাচ্ছেন। তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল, পুর্লিশ কর্তৃক নাটকের পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর করার সেই কুখ্যাত বিধির বলে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল অনেক সংস্থা পুর্লিশের মঞ্জুরী ব্যতীত নাটক অভিনয় করেন। কিন্তু নিউ এম্পায়ার কর্তৃপক্ষ পুর্লিশের মঞ্জুরীকৃত না হলে নাটক অভিনয় করতে দেবেন না। এমিকে পুর্লিশের কাছে পাণ্ডুলিপি মথাসময়ে পেশ করেও আগের দিন সম্মান্য পর্যন্ত খোঁজ করেও অনুমতি পাওয়া যায় নি। ফলে নাটক দেখার জন্য যারা টিকেট কিনেছেন তাঁদের এই পরিস্থিতি জানাবার সময় সুযোগও তাঁরা পান নি। তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে 'অমর ডিয়েতনাম'-এর মত নাটক এদেশের পুর্লিশ অভিনয় করতে দেবে না।

'অমর ডিয়েতনাম' দক্ষিণ ডিয়েতনামের বীর নগুয়েন ডান গ্রন্থ-এর জীবন অবলম্বনে রচিত নাটক। ডিয়েতনামী বীর

নগুয়েন ডান গ্রন্থের জীবনী সারা ভারতে প্রচুর বিক্রয় হচ্ছে। এই জীবনী কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় অনূদিত হয়েছে। এ বীরের জীবনী অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গে ইতিপূর্বে

একটি নাটক লিখিত হয়েছে এবং সেই নাটক কলকাতায় ও জেলায় জেলায় গণনাট্যসম্মেলন একটি শাখা কর্তৃক অভিনীত হয়েছে। তা' হলে জোহন দস্তিদারের নাটকে আপত্তি কেন? যদি নগুয়েন ডান গ্রন্থের জীবনী পুস্তক বিক্রয় ও পাঠে ভারত সরকারের আপত্তি না থাকে, যদি নাটক অভিনয়ও হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন? এর কারণ বড় রহস্যজনক। সম্ভবত জোহন দস্তিদার সরকারী বিধির প্রতি স্বীকৃতি জানাতে গিয়েই এই বিপদ ঘটিয়েছেন।

এই ঘটনায় সরকারী নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। ডিয়েতনাম থেকে নানা জটিল প্রশ্নে ভারত সরকার নিরপেক্ষতার দোহাই দেন। কিন্তু এই নিরপেক্ষতার আবরণ ভেদ করে একে একে দক্ষিণ ডিয়েতনামে জিলাই-এর লোহা-টুক গাড়ির চাকা দেওয়া থেকে



‘নারীকো সংবাদ’ ছবিতে অমর ডিয়েতনাম

প্রীতি কারিগর গিয়ে মার্কিন সৈন্যদের চিত্ত বিনোদন পর্যন্ত কিছই বাদ যেন না। নিরপেক্ষতার বাধা সৃষ্টি করল নগ্নরেন ডান চরিত্রের মত বীরের জীবনী অবলম্বনে নাটক অভিনয়ে। যে বীর অসীম সাহসে মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়ে বার বার তাদের পর্যুদস্ত করেছে। যে নগ্নরেন ডান চরিত্র সারা এশিয়ায় আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এক প্রেরণাময় নাম। যে বীরের সম্মানে গত বছর ১৫ই অক্টোবর দেশে দেশে অনুষ্ঠান হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, কিউবা, হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, সুইডেন এবং খোদ নিউ ইয়র্কে ছাত্র, শ্রমিক, সৈন্যরা এই বীরের প্রতি প্রস্থা জানিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে নগ্নরেন ডান চরিত্রের প্রতিকৃতি অসংখ্য ডাক টিকেট বার করেছে। আর এই হৃদভাগ্য দেশে নগ্নরেন ডান চরিত্রের জীবনী নাটক অভিনয়ে পুন্নিশের মঞ্জুরী মেলে না। হয়ত মার্কিন-দের অসন্তুষ্টির আশংকা। হায় আমাদের নিরপেক্ষতা!

—সুজন



চেক চলচ্চিত্র 'ভার্টিগো'র একটি দৃশ্য

নাটকের কথা

টোটাল থিয়েটার

ব্রেখট বিশেষজ্ঞার অভিমত

টোটাল থিয়েটারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ব্রেখট থিয়েটারকে আমরা কী চোখে দেখব? এই প্রশ্ন নিয়ে যখন ভাবতে চেষ্টা করি, আমি মূর্খকিমে পড়ে যাই। কেন না ব্রেখট নিজেকে কখনো তাঁর থিয়েটার সম্পর্কে এই সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেন নি।

ব্রেখটের নাট্য রচনায় যেসব ঐতিহ্য ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তা বহু প্রকারের। শুধু একটি তালিকা রচনা করলেই এ বিষয়ে ধারণা হতে পারে। শেক্সপিয়ারী থিয়েটার ব্রেখটকে প্রভাবিত করেছিল প্রাচীন থিয়েটার, মধ্য যুগের ইউরোপীয় থিয়েটার ও প্রাচ্য দেশের থিয়েটার। লেনগস, শিলার, গোটে, বয়েখনার-এর প্রভাব তো অসংখ্য। নবীন সোভিয়েট বিপ্লবী থিয়েটার, পিসকাটরের নাট্য প্রচেষ্টা, আগেকার কালের নির্বাক চলচ্চিত্র, জার্মান প্রোলেতারিয়েতের নাট্যদল এবং তাঁর কল্প-স্থান দক্ষিণ জার্মানীর বিভিন্ন বাৎসরিক মেলায় নাট্যনুষ্ঠান—এ সবের প্রভাবও কম ছিল না।

উল্লিখিত সমস্ত প্রভাবই এবং তা

হাড়াও আরো অনেককিছু ব্রেখটের নাটক ও প্রযোজনায় শিল্পপ্রতিমাটি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তার মানে কিন্তু এ নয় যে এই লক্ষণগুলোই ব্রেখটের থিয়েটারের সবটুকু।

ব্রেখটীয় থিয়েটারের মূল কথাটি তা হলে কী? এ সম্পর্কে ব্রেখট নিজে দীর্ঘ-কাল ধরে যে মত পোষণ করতেন এবং থিয়েটার ডারলেটিকস' রচনায় সর্বশেষ তিনি যে মত প্রকাশ করে গিয়েছেন তা এই: থিয়েটারে আমি প্রয়োগ করলে চেয়েছি এই কথাটি: 'জগতের ব্যাখ্যা নয়: পরিবর্তন করাটাই প্রধান বিষয়।' কার্ল মার্কসের বিখ্যাত উক্তিটি থিয়েটারে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ব্রেখট, তাঁর নিজের ভাষায়—'দর্শক যেন উপস্থাপিত বাস্তবতাকে সক্রিয়ভাবে আয়ত্ত করতে পারে' এই উদ্দেশ্যে।

এখানকার আলোচনায় একটি প্রশ্ন বারে বারেই উঠেছে: থিয়েটারে কিসের প্রাধান্য থাকবে? ব্রেখটের নাটকের ক্ষেত্রে প্রশ্নটির জবাব নিম্নে এই: ভাষা, অভিনয় রীতি, অঙ্গভঙ্গি, গান, মুখোশ, সঙ্গ-সঙ্গীত, সঙ্গীতগোষ্ঠী ইত্যাদি সকল শিল্প মাধ্যমের সমগ্রতার চেয়েও বড়ো করে উপস্থাপিত করতে হবে সমাজের সমগ্রতাকে, দেখাতে হবে যে সব কিছই পরিবর্তন সম্ভব এবং দর্শককে এই পরিবর্তন সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ব্রেখটের নাট্যরীতির প্রধান কথাটি এই যে, থিয়েটারকে তিনি কোন ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে ফেলেন নি। থিয়েটারে তিনি প্রয়োগ করেছেন এমন

একটি পন্থা, আব্রাহাম উল্টিম সাধনাই যার সাধকতা।

ব্রেখটীয় থিয়েটারের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় থিয়েটারের যে মিল দর্শকরা বারে বারে আবিষ্কার করেছেন তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। গোড়াতেই খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে অঙ্গভঙ্গি, যার সাহায্যে কোন একটি ঘটনাকে উপস্থাপিত করা হয়। সকলেই জানেন ব্রেখটের 'ডেয়ার ইরা-জাগের উল্ড ডেয়ার নাইম-জাগের' নাটকটি জাপানী নাটক 'ভানিকো'র অনুসরণে লেখা। তরুণ বয়সে ব্রেখট রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন, বিশেষ করে 'বিসর্জন' নাটকটি। বিশ্বের কোঠায় যখন তাঁর বয়স তখনই তিনি প্রবর্তন করেন নাটকে মুখোশ ব্যবহার, যেমনটি লক্ষ্য করা যায় এশিয়ার নাটকে। মুখোশের প্রচলন অবশ্য মধ্য যুগের ইউরোপের নাটকে ও প্রাচীন নাটকেও ছিল এবং এমন কি আজকের দিনের কার্নিভ্যাল ধরনের উৎসবগুলিতেও আছে। কিন্তু পার্থক্যটা এসে যাচ্ছে মুখোশের ব্যবহারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রেখটের 'কেসিয়ান চক সার্কল' নাট্য প্রযোজনা উল্লেখযোগ্য। এই নাটকে কহু চরিত্রই মুখোশধারী। শাসকরা আর রাজারা পরে পুরো গোপের মুখোশ। ফলে তাদের মুখগুলি দেখায় উল্টটরকমের বিকৃত, যে বিকৃতি শুধু শাসনের নর ক্রান্তিরও। নাটকের জনকদের ভূতের মুখেও মুখোশ। এ ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটেছে শাসিত হবার ফলে। পরিচরিকা গ্রুপে (যে শিল্পীটিকে গ্রহণ করে), সৈনিক



‘দি লাইম এন্ড দি গার্লস স্কুল’ চেক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ছবি

মাইন্স ও জনগণের বিচারক আৎসডাক—
এরা কিন্তু মন্থাস পাবে না। এদের মন্থ
পুত্রোপুত্রি মানুষেরই মন্থ।
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পশ্চিম
থিয়েটার সেমিনারে জার্মান গণতান্ত্রিক

সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি ডাঃ শ্রীমতী কেথে
রুলিকে ভাইলার উপরোক্ত বক্তব্য উপস্থিত
করেছিলেন। ডাঃ রুলিকে ভাইলার
বের্টোল ব্রেখটের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।
‘ব্রেখটের নাট্যকৃতি’ নামে একটি গ্রন্থ তিনি

রচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি পূর্ব
জার্মানীর টেলিভিশনের মধ্য নাট্য
প্রযোজিকা।

দিল্লীর সেমিনারে টোটাল থিয়েটার
বিষয়ে আলোচনার শেষে তিনি বলেছিলেন,
টোটাল থিয়েটারের সংজ্ঞা নিয়ে আমরা
আলোচনা করছি, এটা খুবই আনন্দের
বিষয়। কিন্তু এখানে আলোচনার গতি
থেকে আমার আশঙ্কা হচ্ছে থিয়েটারকে
ইতিহাস থেকে পৃথক করে নিয়ে উপস্থিত
করতে চাওয়া হচ্ছে, সামাজিক ও জাতীয়
বৈশিষ্ট্যগুলো অস্পষ্ট করে ফেলা হচ্ছে,
থিয়েটারের বৈচিত্র্যের দিকে নজর না রেখে
থিয়েটারকে সংকীর্ণ করে তোলা হচ্ছে।
যখন নাকি থিয়েটারের বৈচিত্র্য সাধন কাম্য
হওয়া উচিত।

মসীজীবী

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নেতাজী সুভাষ
ইনস্টিটিউটে রেলওয়ে বোর্ড স্টাফ সোস্যাল
এন্ড কালচারাল এসোসিয়েশনের তৃতীয়
বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে
সভাপতিত্ব করেন শ্রী সি এন কাপদর।
প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন
সাবোর্ডার প্রীদক্ষিপারজন বসু। বিশিষ্ট
চিত্র ও মণ্ড পরিচালক শ্রীমধু বসু, অনু-



ইক এ থাউন্সেন্ট ক্যারিনেন্ট চেক ছবির একটি দৃশ্য

ষ্ঠান উন্মোচন করার জন্য অনুরোধ হয়ে-
ছিলেন, কিন্তু আকস্মিক অসুস্থতার জন্য
উপস্থিত হতে না পারায় তিনি উৎসর্গে
সাক্ষ্য কামনা করে বাণী প্রেরণ করেন।
প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও
কলকাতার মেয়র শ্রদ্ধেচ্ছা বাণী প্রেরণ
করেন। শ্রীনির্মলেন্দু সেনগুপ্ত সম্পাদকের
বিবরণী পাঠ করেন, এবং শ্রীলক্ষ্মীকান্ত
হাতী ও শ্রী জে এন লুথরা বক্তৃতা করেন।
অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল শ্রীভানু
চট্টোপাধ্যায় রচিত নাটক “মসীজীবী”।
এই নাটকটি অভিনয় করেন সমিতির
সদস্যগণ। এই নাটকে সওদাগরী
অফিসের কেরানীদের অবস্থা, তাদের
কাজের অনিশ্চয়তা ইত্যাদির সঙ্গে দেখান
হয়েছে সত্যতার মূল্য দিতে অফিসের
কর্তারা ন্যায়াজ। অফিসের বড় বাবু
মহেশ এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে
বিস্ত্রিত আশ্রয় নিয়ে জীবনসংগ্রাম করেন।
অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের বিবেক
ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত তিনি
জয়ী হন। মানুষ আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়
ও সত্যের বিশ্বাস হারালেও শেষ পর্যন্ত
সত্যতার জয় নিশ্চিত। এই নাটকে
সাক্ষ্যের সঙ্গে অভিনয় করেন রবেন
চ্যাটার্জী, শিশির চক্রবর্তী, অখীর কাশি-
লাল, অরূপ গুহ, অশোক বসু, প্রকাশ
ধর, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, শিশির দাশগুপ্ত,

প্রভাস সিন্‌হা, সুনীল সরকার, কালী
ভট্টাচার্য, নেপাল সাহা, সুধাংশু ভট্টাচার্য,
এবং শিক্কা দীপালী ঘোষ, প্রতিমা
চক্রবর্তী এবং ইরা মিত্র। নাটকটি
কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন অবনী
বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংগৃহীত
অর্থ হতে ১০১ টাকা প্রধানমন্ত্রীর খরা
তহবিলে দান করা হয়েছে।

“দাগ” নাটকের পঞ্চাশ রজনী অভিনয়

.....নবরূপার প্রযোজনার প্রতাপ মেমো-
রিয়াল হলে “দাগ” নাটকের পঞ্চাশ রজনী
অভিনয় উৎসব সম্পন্ন হয়েছে গত ৫ই
ফেব্রুয়ারী। এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিক
ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।
বিজয়কুমার মুখার্জীর পরিচালনায় “দাগ”
নাটকটি রাজবাজারের নিকটে প্রতাপ
মেমোরিয়াল হলে নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে।

উত্তরপাড়ায় ‘মৃত-অঙ্গন’

উত্তরপাড়ায় বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক
প্রতিষ্ঠান “দেবদারু” উত্তরপাড়ার বিজয়-
কুমার স্ট্রীটে একটি “মৃত অঙ্গন মঞ্চ”
প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এই
উপলক্ষে এ মাসের প্রতি রবিবারে সুখ্যাত
সৌখীন গোস্বামী তাদের মণ্ডসফল নাটকের

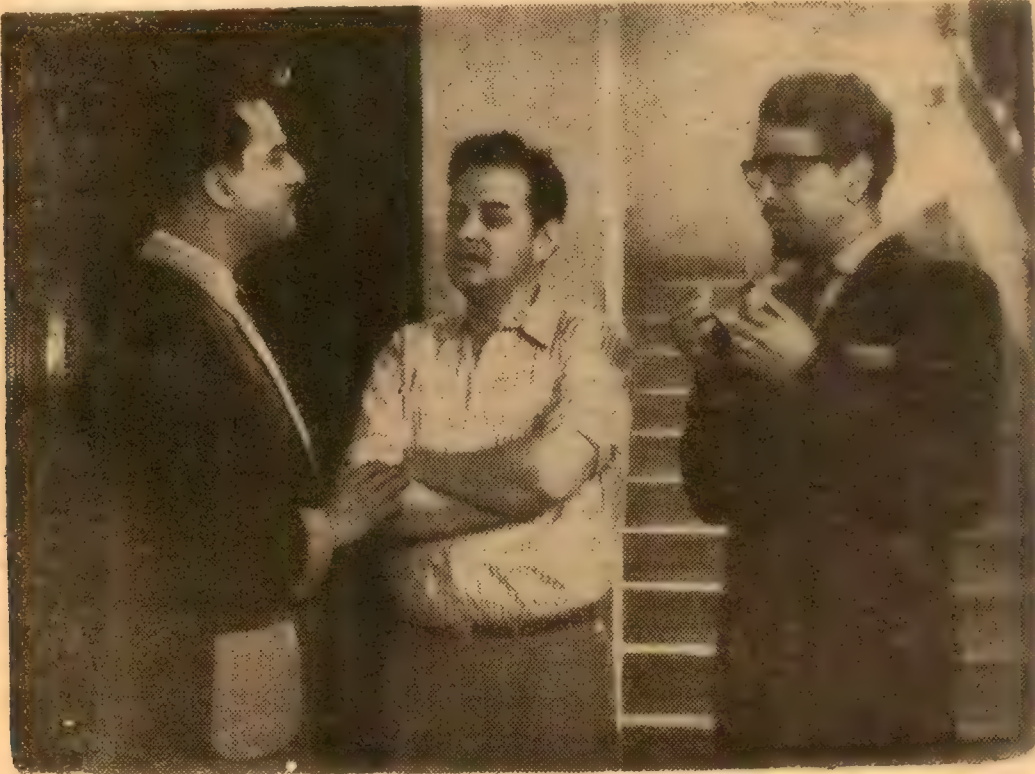
অভিনয় পরিবেশন করবেন। ১২ই রবিবার
‘কোটস্’ রিক্রিয়েশন ক্লাব’ বিধায়ক
ভট্টাচার্যর “তাহার নামটি রজনী” ও
‘সুদর্শনম্’ গোস্বামী জ্যেষ্ঠতম বসুরায়ের
“একাকী”-র অভিনয় পরিবেশন করবেন।

‘জীবনকাহিনী’ নিয়ে ‘অপরূপ’

শক্তিপদ রাজগুরু বিরচিত ব্যঙ্গাত্মক
হাস্যর নাটক ‘জীবনকাহিনী’ নিয়ে
সুপরিচিত ‘অপরূপ’ নাট্যসংস্থা নিয়মিত
মঞ্চাভিনয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথম
পর্বারে এই নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত
হবে আগামী ফেব্রুয়ারী মৃত অঙ্গন
মঞ্চে। নির্দেশনার আছেন সুনীল
আচার্য।

অভিনয়

গত ২৪শে জানুয়ারী আই আই টি
স্টাফ ক্লাবের নবনির্মিত ভবনের
ম্বারোস্টাটন উৎসব উপলক্ষে ক্লাবের
সভারা বিমল রায় রচিত “অভিনয়”
একাত্মকটি সাক্ষ্যের সঙ্গে মণ্ডসফল করেন।
নাটকটি সর্বাঙ্গসুন্দর হলেও বিদ্যুৎ
প্রোত্মমুখ্যের মতে সার্থক অভিনয়ই এর
প্রাণসম্পদ ছিল। কয়েকটি মৃদু চরিত্রে
সু-অভিনয় করেন অজিত চট্টোপাধ্যায়,
বিশ্বনাথ মিত্র ও শ্রীঅমিতাভ রায়। পার্শ্ব-
চরিত্রগুলিতে অভিনয় নাটকের সার্থক



অরবিন্দ মুখার্জী পরিচালিত ‘এই তীর্থ’ হাবির একটি দৃশ্যে অসীম চক্রবর্তী, অনিল চ্যাটার্জী, শেখর চ্যাটার্জী,



পোলিশ অভিনেতা জে, সাইবুলস্কি

অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে। এঁদের মধ্যে নাম করতে হয়—চিন্ময় ঘোষ, তরুণ ঘোষ ও ভবেন্দ্ৰ চ্যাটার্জী। অমল সাহা ছিলেন মণ্ডলসঙ্গায়।

স্মৃতি ও শ্রবণ

রাজকোথি-গার্সেন 'তকদীর'

তারচাঁদ বরজাতারা বিনা আড়ম্বরে 'তকদীর' ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন গত সেপ্টেম্বর মাসে। মোম্বাইয়ের কামদার স্টুডিওতে ছবিটির কাজ জানুয়ারী মাসে প্রায় অর্ধেক হতে পারে। নামকরা শিল্পী বা তারকাদের না নিয়ে 'দোস্তার' মত এই ছবিতেও তিনি অনেক নতুন শিল্পী নিয়ে কাজ করছেন। প্রযোজক বরজাতারা মনে করেন এই নতুন মঞ্চগুলি হবে ছবির অন্যতম আকর্ষণ। 'তকদীর'-এর পরিচালক এ সালাম। এই পরিচালকের কংকানি ছবি পুরুষের পেরেছিল। চলচ্চিত্র শিল্পে সালামের অভিজ্ঞতা বিশ বছরের।

এক সঙ্গীতজ্ঞের জীবনকে কেন্দ্র করে 'তকদীর'-এর চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। ভাগ্য বিপর্যয়ে যার পরিবারে ওঠা-নামা হয়েছিল। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। চিত্রগ্রহণ করছেন নরিম্যান ইরানী। বিনি চৌধুরী কা চাঁদ'-এর চিত্রগ্রহণ করেছিলেন। সম্পাদনা করবেন মুম্বতায় আহমেদ।

সঙ্গীতজ্ঞের চরিত্রে অভিনয় করছেন ভারতভূষণ। নাট্যমঞ্চের খ্যাতা অভিনেত্রী শালিনী 'তকদীর'-এর নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছে কমল কাপুর, গুজরাটি মণ্ডলসঙ্গায় চম্পক লাল, ক্যোডিয়ান দিলীপ দত্ত, 'দোস্তার' সঙ্গীতকার এবং তিনজন শিশু অভিনেতা মাস্টার শহীদ, বেবি রেগু, বেবি ইয়াসমিন। এই সঙ্গে চারটি নতুন মঞ্চ

দেখা যাবে। তাঁরা হলেন ফরিদা আলি ও জালাল আগা; পূর্ণিমা ও সুভাষ।

মা ছিন্নমস্তা

মাতৃমন্দির ছায়াচিত্রম্ নিবেদিত দ্বয়া ফিল্মস পরিবেশিত "মা ছিন্নমস্তা" ছবিটি দ্রুত সমাপ্তির পথে। সুকুমার বসু প্রযোজিত এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট, পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সন্তান পরিষদের পক্ষে ভূপেন রায় এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন কীর্তন কল্যাণি রথীন্দ্র ঘোষ, "মা ছিন্নমস্তা" ছবিটির শিল্প নির্দেশনা, চিত্রগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার আছেন যথাক্রমে বটু সেন, ধীরেন দে ও অশোক দাশগুপ্ত।

রূপায়ণে আছেন: মিহির ভট্টাচার্য, অসীমকুমার, সুবীরা রায়, জ্ঞানেশ মুখার্জী, সীতা বসু, প্রিয়া চ্যাটার্জী, গীতা দে, জীলাবতী দেবী (করালী), গণ্ধাপদ বসু, জীবন ঘোষ, স্বপনকুমার, গোপা ভৌমিক, রবীন মজুমদার, শঙ্কর নারায়ণ, বীরেন চ্যাটার্জী, সীমা রায়-চৌধুরী ও মাঃ তপন।

সম্প্রতি এই সোম্বী সদলবলে রাজকোথি-গার্সেন 'তকদীর' মন্দির এবং ভবেন্দ্র অঞ্চলে ছবিটির বাহাদ্য গ্রহণে ব্যস্ত।

অগ্রদূত

চেক চলচ্চিত্র উৎসব

১০ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৬ই পর্যন্ত প্রাচী সিনেমার চেকোস্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব হবে। এই উৎসবের উদ্যোক্তা সিনেমার অব কালকাটা এবং চেকোস্লোভাক রাষ্ট্রদূত। এই উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় চেক দূতস্থানে এক সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে কমসাল জেনারেল মিঃ যোগেশ সিমা বলেন, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্পের 'ফরম' ও 'কনস্টেট'-এ মৃত্যু হাওয়া লেগেছে। তরুণ শিল্পীরা নিজের স্বাধীনতা বিষয় নির্বাচন করছেন এবং ফরম তৈরি করছে। মৃত্যুর এই হাওয়া চেক সিনেমারও লেগেছে। আজ নতুন ধারার চেক ছবি তৈরি হচ্ছে। এই নতুন ধারাকে 'নিউ সিস্টেম' বা 'নিউ ওয়েভ' বলা চলে। এই-রূপ নিউ ওয়েভের ছবি এই উৎসবে দেখান হবে, ছবিগুলির মধ্যে আছে (১) এ ব্লুড ইন লাভ, (২) দি ক্রাইম এট দি গার্লস স্কুল, (৩) লেমনোড জো, (৪) ভার্টিগো

(৫) জেস্টস টো, (৬) সেন্ট এলিজাবেথ স্কোয়ার, (৭) ইফ এ থাউন্ড ক্যারিনেটস।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাচী সিনেমার এই উৎসব উদ্বোধন করেছেন রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য শ্রীহরমণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্ঘটনার জে সাইবুলস্কির মৃত্যু

এক বছরে প্রকাশ পোলিশ অভিনেতা জেবিগনিউ সাইবুলস্কি চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়ে মারা গেছেন। প্রকাশ সাইবুলস্কি ওয়ারশ বাওয়ার জন্ম রোক্ত স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করে বাধা হন, এবং ছিটকে ট্রেনের চাকর সামনে পড়ে মরেন। ওয়ারশতে টেলিভিশন থিয়েটারে এক রিহার্সালে যোগ দিতে যাবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। পোল্যান্ডের এই সু-পরিচিত চিত্রতারকা সাইবুলস্কি স্ত্রী এবং এক পুত্র রেখে গেছেন।

জে, সাইবুলস্কি ক্রেকোর ড্রামাটিক আর্ট একাডেমি হতে স্নাতক হয়ে নোবেল-এ উপকূল থিয়েটারে নিযুক্ত হন। ছাত্রদের প্রহসনমূলক নাট্যালয় 'ব্লি ব্ল' এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যে ছবিগুলিতে অভিনয় করেছেন তার মধ্যে 'থ্রি স্টারস', 'জেনারেশন', 'দি এন্ড অব দি নাইট', 'ব্রেকস', 'দি এশেস এন্ড দি ডায়মন্ড', 'নাইট ট্রেন', 'দি ক্রশ অব ডালর', 'সি ইউ টু-মোরো', 'ইয়ং সরসেরার্দ' ইত্যাদি। কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি সম্মেলন সদস্যরা সাইবুলস্কি অভিনীত অনেক ছবি দেখেছেন, এবং তিনি এদেশেও দলের প্রিয় অভিনেতা। বিশেষ করে 'এশেস এন্ড দি ডায়মন্ড', 'নাইট ট্রেন' ইত্যাদিতে তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়।



সর্বভারতীয় সঙ্গীতসম্মেলন আয়োজিত সঙ্গীত সম্মেলনে খেলা পরিবেশন করছেন প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সামগ্রাহিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠক। ইতিহাসের উপাদান, অগ্নিবায়ুর একটি অধ্যায়, বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়, একটি আদর্শ দাও, লেখাগুলি শব্দ সুসংলগ্ন নয়, অনু-সন্ধিৎসু পাঠক এর মধ্যে চিন্তার খোরাক এবং প্রায় বিস্মৃত, স্বপ্নালোচিত ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক উপাদানও পাবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখাটিকে কেন্দ্র করে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমি মনে করি এটাও সুলক্ষণ কারণ এইভাবেই হয়ত বিপ্লবের ইতিহাসের রূপরেখার সম্মান পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে আজও বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী যুগের নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস নেই। প্রখ্যাত রমেশ মজুমদার ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ছাড়া যে সব গ্রন্থ, পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণী বা পুস্তকাদি আমরা পাই তার সবকয়টিই যে ইতি-হাস পর্ব্বায় পড়ে না একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু স্মৃতিচারণ বা কর্মপ্রচেষ্টার বিচ্ছিন্ন বিবরণীগুলি ছাড়া বিপ্লব ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ইতিহাসের উপাদান পাবেনই বা কেমন করে?

বিতর্কের শেষ চিঠিখানি শ্রীমণি সেনের। হয়ত মণিবাবু বরসহকারে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার চড়াই-উৎরাইয়ের ইতিহাস অনুধাবন করেন নি—নতুবা শ্রীসুধীর ঘোষ লিখিত গান্ধীর দৃষ্টি ভূপেনবাবুর বিবৃতির একটি উদ্ঘাটিত সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশকালে আরও বস্তু-নিষ্ঠ হতেন। ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার ১৯১৪-১৫ থেকে ১৮/১৯ এবং ১৯২০-৪২/৪৬ পর্যন্ত ছোট-বড় উত্থানগুলির সংগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার সৌভাগ্য বীরা লাভ করে-ছেন জীবিত সেই দৃষ্টিমের ভাগ্যবানদের মধ্যে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত অন্যতম সার্থকনামা। বিচ্ছিন্ন বা যত্নভাবে যতগুলি দল বা গোষ্ঠী এই সব কর্মপ্রচেষ্টায় জড়িত ছিল—তার মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন মনন-শীল বিপ্লবী লক্ষ্য করেছেন যে ব্যক্তি দৃষ্টি গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হতে সমাপ্তিতে ক্রম-অভিব্যক্ত বৈপ্লবিক ভাবধারা ধীরে ধীরে একটি বিশেষ বিপ্লব-চরিত্রে পরিণতি লাভ করতে চলেছে। আরও লক্ষণীয় ছিল যে জন-আধারিত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিশেষ বিশেষ স্তরে অস্ত্রের প্রাধান্য ক্রমক্ৰীয়মাণ। গ্রীসেন একটু সংবেদনশীল বস্তুনিষ্ঠ চোখে ভারতীয় বিপ্লব-চরিত্রের বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে উদ্ঘাটিত নিয়ে অত লঘু উক্তি সম্ভবত করতেন না।

আমার মনে হয় 'ইতিহাসের উপাদান' এই শিরোনামটিই বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, বিরাট ঘটনা মাগ্রেই কোন ইতিহাস হয়ে ওঠে না তেমনি



যার accuracy (সঠিকতা)—তেই ঐতি-হাসিক দৃষ্টির সন্মত পরিচয় পাওয়া যায় না। গ্রীসেন এবং শ্রীয়ার ভূপেন-বাবুর বক্তব্যের মধ্যে কয়েক জায়গায় বাধাখোর অভাব দেখেছেন তার মধ্যে একটি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে। ভারতের তথা বিশ্বের সার্থকনামা বিপ্লবী অনেক নেতার জীবনেই দেখা যাবে প্রারম্ভে কদাচিৎ কেউ অবিসম্বাদী নেতৃত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন। নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে *Persona inter perse*-ও ছিলেন না অনেকেই। তার জন্য কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের অবিসম্বাদী নেতৃত্বের স্বীকৃতি পেতে বাধা হয় নি। বতদূর জানি লেনিনও প্রথম থেকেই অবিসম্বাদী নেতৃত্ব পান নি নিজের গোষ্ঠীতেই। এও দেখা যায় একই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আন্দোলনকে সার্থকতার এনেছেন এমন নেতা-দেরও একই ঘটনার বিবরণে, কার্যকারণ বিশ্লেষণে ভিন্ন মূর বেজে ওঠে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে ট্রটস্কী লিখিত Russian Revolution এবং প্রায় সম-কালে প্রকাশিত CPSU (B)-র ইতি-হাসে। সুতরাং কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন এদেশে এলেন প্রায় সেই আমলে (১৯২০-২৮) তিনি কোন কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে *Per-sona inter perse* ছিলেন না বলায় ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয় কি না বিচার সাপেক্ষ। ভূপেনবাবু সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন করতে যান নি, সে বিচারের ভার ঐতিহাসিকের, কিন্তু একটি বিশেষ সময়ের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে রচনাটির মূল্য অনস্বী-কার্য। গ্রীসেন ভূপেনবাবুর "বিপ্লবের পদচিহ্ন"-ও দেখতে পাবেন কিভাবে গোষ্ঠীর গন্ডী ছাড়িয়ে বিপ্লব সমাপ্তিতে ব্যাপ্তি লাভ করার সংগে সংগে বিপ্লব-চরিত্রেরও বিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। চরকাকে কোন এক সময়ে জন-আধারিত বিপ্লবের প্রতীক হিসাবেই গ্রহণ করা হয়ে-ছিল। জন-আধারিত বিপ্লবে অস্ত্রের প্রাধান্য বাস্তবে কতখানি সার্থক এটাও বিচার্য। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অভিজ্ঞ, সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র উভয় বিপ্লব-ধারায় নিপনাত ভূপেনবাবুর পরিণত বিপ্লবীমন যে বিশিষ্ট বিপ্লব-চরিত্রের কলমাষী

অভ্যুদয়ে বিশ্বাসী—তার লেখা Indian Revolution and Constructive Programme এবং অধুনা লুপ্ত For-ward, ইংরাজী সামগ্রাহিকে প্রকাশিত "Lonely Trek"-এ সুন্দর বস্তুনিষ্ঠ-ভাবে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গ্রীসেনের বক্তব্যও সাং বসুমতীর পাঠকদের কাছে উপস্থিত করা অবশ্য কর্তব্য মনে করি। এটি আমার চিঠির জবাবে লেখা চিঠি তারিখ ৬/১৫/৭১। পরটিতে প্রবীণ বিপ্লবীর সংবেদনশীলতা তথা বিপ্লব-চরিত্রের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। বিপ্লবী চিন্তার একটি মূল্যবান দলিল হিসাবেই ভূপেনবাবুর পরটি স্বীকৃতি লাভ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

কলিকাতা-৯

৬-১-৬৭

"স্নেহের সুধীর"

আমার লেখা সম্বন্ধে সামগ্রাহিক বসুমতীতে যে বাদানুবাদ বের হচ্ছে তা নিয়ে আমার কি বলবার আছে আমি বলছিলাম কেন তা নিয়ে তুমি অভিযোগ করেছ। বলছিলাম প্রবর্তি নেই বলে। দৃষ্টির জবাব হয় দৃষ্টিতে, বিশ্লেষণের জবাব হতে পারে বিশ্লেষণে। কিন্তু বিপ্লবের জন্যে প্রায় দেবার উদ্দেশ্যনায় একদিন বীরা বেরিয়েছিলেন তাদের আমি প্রণী-করি। কোন বিশেষ কোন কোনদিন সে প্রণীকে স্পর্শ না করে। অপর দিকে এক বিশ্লেষণের বশে ছাড়া কেউ কোনদিন কারও প্রতিটি কথাই কদম্ব টেনে বের করতে চেষ্টা করে না। সৈদিক থেকে অনেক কথা আমার হয়ত বলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইচ্ছা নেই। আমার আশা আছে, সহজবোধ্য পাঠকের মনে এইসব বাদানু-বাদ কোন বিজ্ঞানিত সৃষ্টি করবে না। ঘটনা যা ঘটেছে, যার মূখে যা আশি-শুনোছি, পৃথানিকে লিখেছি, সে তা বের করেছে "ইতিহাসের উপাদান" নাম দিয়ে। যার মূখে যা শুনোছি ইতিহাসে তা স্থান পাবে না। কিন্তু শ্রীমতী শান্তি যেমন বলেছেন ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তার মূল্য নিশ্চয়ই আছে।

তুমি যে দৃষ্টি বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে গালিগালাজের জবাব দেবার কথা ভাবতে বলেছ, তার কি সাধারণ পাঠকের জন্যে কোন প্রয়োজন আছে? চেক Post-dated (পরবর্তী তারিখ দেওয়া) হয়, কিন্তু ইতিহাস Post-dated হয়—এ-কথা, কে কবে শুনেন? মেজর সভ্য গুপ্তের আর আমার সুভাষ সম্পর্কে যে ভাষা প্রয়োগ তার ভিতর তাঁর সম্বন্ধে সত্যবাবু বা আমাদের পরবর্তী মনো-ভাবের কি যোগ থাকতে পারে? ইতি-হাসের দিক দিয়ে সুভাষের কাজকর্মের আলোচনা চিরকাল চলেবে। কিন্তু কারো

জন্ম বা অপভাব প্রয়োগের তিনি এখন অনেক উৎসাহ। সুভাষ নেতাজী হন ১৯৪৪/৪৫ সাল থেকে। তাই বলে ১৯২০-২৮ সালে তাঁর কার সঙ্গো কি সম্পর্ক ছিল বা কোন দলে তাঁর কি স্থান ছিল তা বলা চলবে না, এটা নেহাৎ গায়ের জোরের কথা। এ মনোভাব যেখানে, সেখানে কি ইতিহাস সম্বন্ধে কোন সুস্থ আলোচনা সম্ভব?

তোমার মিত্রীয় প্রসঙ্গ “দেশ” পত্রিকায় শ্রীসুধীর ঘোষ প্রকাশিত গান্ধীজীকে লেখা আমাদের চিঠি থেকে এক উদ্ধৃতি দিয়ে যেমন মন্তব্য করা হয়েছে তাই। আগে একটু গল্প শোনো। একবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমার একটি ভাগ্য-নেকে আমি প্রথম দেখি। দেখা হতে সে হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বলে, তুমি নাকি বিপ্লবী? লড় রো পাঞ্জা আমার সঙ্গো, দেখি তুমি কেমন বিপ্লবী।

১৯০৫ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত দেশকে জগাবার সমস্যা আর কয়টি বিপ্লবী দেশকে তার স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠা দেবার সমস্যা আমার চোখে এক নয়। দু'য়ের পথও ছিল। অবশ্য, আমাদের দেশকে তার স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠা দেবার কাজ ব্যস্ততবে আমাদের হাতে পড়লো, তাঁরা কোন পথ বেছে নিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা উঠতে পারে। কিন্তু সে আলোচনার স্থান জিল।

উপস্থিত কলি, ইতিহাস আমার কাছে কোনো পয়সা কলু নয়, ইতিহাস চির-জন্মান, চিরবিবর্তনশীল। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের চরিত্রও চিরবিবর্তনশীল না হয়ে পারে না। বিপ্লবের বিবর্তন যুগে যুগে নির্ভর করেছে সমকালে প্রচলিত অস্ত্রের প্রকৃতি এবং সমাজশাসন ও রাষ্ট্রশাস্ত্রের প্রকৃতির ওপর। রাজার হাতে অস্ত্র যেদিন ছিল তরবারি সেদিন বিপ্লবের প্রকৃতি যা ছিল, আর আজ যখন অস্ত্র অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা, আর সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি যখন আন্তর্জাতিক ফ্যাসিজম—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষিগত ফ্যাসিজম—তখনও বিপ্লবের চরিত্র সেই একই থাকবে, এ বিশ্বাস আমার নেই।

চরিত্রে বিবর্তনশীল গণ-সংগ্রাম আধুনিক বিশ্বে দাঁড়িয়েছে প্রধান পন্থা। অস্ত্রের ব্যবহারও তার সঙ্গো জ্বলছে। কিন্তু অসামর্থ্য ১৮৩০, ১৮৪৮ বা প্যারিস কম্যুনের লড়াইতেও যা হয়েছে তার সঙ্গো তুলনা করে দেখ, ১৯১৭ সালের বিরাট বিপ্লবে অস্ত্রের ব্যবহার যা হয়েছে তা সামান্য। নির্ভর করে বিবর্তনের ধারায় এক-একটি বিশেষ বিশেষ অবস্থা যেমন দেখা দেয় তার ওপর। ইদানীং গণ-আন্দোলনের সঙ্গো অস্ত্রের বা বিশেষায়কের

ব্যবহার যে না হচ্ছে তা নয়। কিন্তু যত হচ্ছে ফ্যাসিজমের শক্তি তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা দেখতে চায় তারা দেখতে পাচ্ছে। আমার আশা, বাকীদেরও চোখ খুলবে এবং শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের রূপ দাঁড়াবে, এমন কি, অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার কারখানার কর্মীদের পর্যন্ত নিরস্ত্র প্রতি-রোধ বা সত্যগ্রহ। অবশ্য, একথা বলা বাহুল্য যে, কোনো আদর্শই দুনিয়ার কখনও তার পরিপূর্ণ স্বরূপে ফুটে উঠতে পারে না, যে-কোন আদর্শই দিগন্তরেখার মত ক্রমাগত দূরে সরে সরে যায়। মোটের ওপর, আমার চোখে, অন্যতম ভবিষ্যতে দুনিয়াজোড়া ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিপ্লবের এই রূপ। কিন্তু আমার এ বিশ্বাস নিয়ে কারও সাথে পাঞ্জা লড়ারের অভিপ্রায় আমার নেই।

আর একটু খুলে বলি। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কালে যখন বেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব হয় তার ছোঁয়াতে ইউরোপের অনেক দেশে বৈপ্লবিক জাগরণ দেখা দিয়েছিল। ঠিক তেমনি মিত্রীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় বৈপ্লবিক উত্থানের ছোঁয়াতে এশিয়া আফ্রিকার অনেক দেশে এমন আত্মসম্মান বোধ আর মানবিক অধিকার বোধ জেগে ওঠে যে, চিরচরিত পন্থায় সাম্রাজ্য বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন এইসব দেশে সাম্রাজ্যের আসল উদ্দেশ্য যা—সেই ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

ফরাসী বিপ্লবের সম্পর্কে মের্টোনিক যা, রুশ বিপ্লবের সম্পর্কে মসোলিনী যা, আমার হিসাবে ভারতীয় বিপ্লবের সম্পর্কে জন ফস্টার ডালাস তাই। ডালাস এখানে মিত্রশক্তি বারা ছিল তাদের মূল্যপায় মাত্র। এই মিত্রশক্তি ফ্যাসিস্ট শক্তিরে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করেও সমাজবন্দ গঠনের ক্ষেত্রে ওদের হাতে পরাভূত হয়। অর্থাৎ যুদ্ধের পরে নিজেরাই বিশ্বসমাজকে পরিচালিত করতে চাইছে এক ফ্যাসিস্ট শাসনতন্ত্র দিয়ে। এই শাসনতন্ত্রকে চালু রাখছে প্রাথমিক যে যে যন্ত্রের সাহায্যে তা হচ্ছে অর্থ, খাদ্য, শিক্ষণ, শিক্ষা প্রভৃতি সদ্য-জাগ্রত সদ্য-স্বাধীন জাতিগুলোর বা বা প্রয়োজন হতে পারে। আর এইসব যন্ত্র পরিচালনা করছে সাম্প্রতিক জাতিসম্ম ও বিশ্বব্যাপক প্রভৃতি তার আনুসঙ্গিক নানাবিধ প্রতিষ্ঠান। জাতিসম্মকে যত অকোজো আমরা মনে করি তা সে আদর্শ নয়।

আসলে নতুন রূপের সাম্রাজ্যের এটি পরিচালক। আগেকার দিনে ছিল সাম্রাজ্য, এ এক মহাসাম্রাজ্য—দেশের ওপরে যেমন মহাদেশ। আরোেকটিটির হিসাবে এই

হয়ত এক বিশ্বসমাজের সূচনা। এ সূচনা যদিও দেখা দিচ্ছে এক বিপরীত আদর্শের দিক থেকে। বিচিত্র ধরণ ইতিহাসের অগ্রগতির। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কূটনীতিকেরা কত বিনীত রাতের পর্ষালোচনায় সৃষ্টি করলেন বিশ্বসাম্রাজ্য শাসনে যে নতুন বিধান, নতুন যন্ত্র, তার জঠরেই হয়ত গড়ে উঠছে সমস্ত প্রত্নতত্ত্বহীন নতুন মানবসমাজ। সেই সমাজ গড়ে ওঠার ভিতর যুদ্ধোত্তর যুগে পূর্ব-পশ্চিমের ভিতর যে যুদ্ধ চলছে সেই যুদ্ধেরও দান থাকতে বাধ্য। এই নতুন সমাজের অবশ্য পত্তনই হবে মাত্র। আদর্শ তখনও দিগন্তরেখার মতই সরে সরে যেতে থাকবে। কিন্তু একটি জিনিষ সম্পর্কে আজকের মানুষের হয়ত সন্দেহ থাকতে পারে—পূর্ব এবং পশ্চিমী উভয় ধরণেরই প্রত্নতত্ত্বের (Authoritarianism-এর) শেষ দিন ঘনিরে আসছে। তার আগে জগৎজুড়ে আজকের আধার আরও গাঢ় হবে।

সে যাই হোক, আমাদের হতাশার কিছু নেই। ইতিহাসের বিবর্তনে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ধরণের প্রতিষ্ঠার আগেও দেখা দিয়েছে—যেমন মের্টোনিক বা মসোলিনীর নেতৃত্বে। আরও একটা দিক ভেবে দেখ। এই প্রতিষ্ঠার জঠরে জগৎজোড়া যে বিপ্লব ফেনিয়ে উঠছে তার প্রসার কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। অধিকার মোহ হয়ত বা নানা বাধায় সময়ে সহজ প্রকাশের পথ না পেয়ে বিকৃত হয়ে ছড়িয়ে গেছে জীবনের, সমাজের সর্বক্ষেত্রে—এমন কি, পরিবারে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, শুল্কস্বার ক্ষেত্রে। বিপ্লব চলবে এইসব ক্ষেত্রে পাঞ্জা জোরে আর অস্ত্রের জোরে? আমার আশা নয় শব্দ, বিশ্বাস, চিরবিবর্তনশীল ইতিহাসে ফরাসী বা বলশেভিক বিপ্লবও যেমন বিফল হয়ে যায় নি, নিরস্ত্র বিপ্লবও তেমনি শেষ হয়ে যায় নি। নানা স্বাতন্ত্র্যপ্রতিঘাতে অগণিত বীচিমাল্য সৃষ্টি করে তরণের পর তরণে এইসব বিপ্লবের এক একটি অপরাপর বিপ্লবের সাথে মিশে গিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত হচ্ছে মাত্র। হতে হতে প্রতিটি মানুষের স্বচ্ছল, সর্বাঙ্গীণ স্বাধীন সত্তা নিয়ে মানুষের এক নতুন সমাজ গড়ে উঠতে চলেছে। ইতি—

তোমাদের ভূপেনদা।

সাম্প্রতিক বঙ্গবন্ধুতেই ইতিহাসের উপাদান প্রকাশিত হয়েছে তাই পাঠটি আপনার কাছেই পাঠাচ্ছি। আশা করি শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের বক্তব্য সাম্প্রতিক কম্যুতীর পাঠকেরা জানতে পারবেন।

সুধীর সূতাপাধ্যায়
বাঁশবোড়িয়া, হুগলী

অপরাজিত বিজয়ী

অন্যভাবে সরকারীভাবে প্রেরিতের মুকুট মাথায় পরলেন মহম্মদ আলি ক্রে। মুন্টিবুদ্ধকে নিয়ে প্রায় ছেলেখেলা সুরু করেছেন ক্রে, এক এক করে লড়ে চলেছেন তিনি অপরাজিত আখ্যা অক্ষুণ্ণ রেখে। আজ পর্যন্ত পেশাদার হিসাবে তিনি মোট আটশটি মুন্টিবুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং প্রতিটি লড়াইয়েই লাভ করেছেন জয়মালা।

ক্রে'র আনন্দদিনের লক্ষ্য ছিল আর্নি টেরেল, কারণ সরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের খেতাব বেশ আরামে ভোগ করছিলেন টেরেল। গত বছরের প্রথমদিকে ক্রে এবং টেরেলের মধ্যে বিশ্ব খেতাবের লড়াই হবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েকটি ব্যাপারে মতানৈক্য ঘটায় লড়াই বাতিল হয়ে যায়। ক্রে অনেকটা অনুশীলনের মেজাজে ১৯৬৬ সালে। পাঁচটি মুন্টিবুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বসলেন।

বকবাক্যে বজ্রার ক্রে অনেক ঠান্ডা হয়ে গিয়েছেন এখন। আগে কোন লড়াইয়ের আগে এবং পরে ক্রে কথার মূলধারি ছড়াতেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছড়ায় মাধ্যমে। ব্রাক মুসলিম সম্প্রদায়ের পাণ্ডা মহম্মদ আলি ক্রে মনে হচ্ছে তাঁর সম্প্রদায়ের কাজ নিয়ে বড় ব্যস্ত বলে, হাল্কা মেজাজী আবহাওয়ার আর সৃষ্টি করছেন না মুখে মুখে ছড়া কেটে।

আর্নি টেরেল ক্রে'র কাছে পরাজিত হয়েছেন বটে কিন্তু লড়াই টেনে নিয়ে গিয়েছেন একেবারে পঞ্চদশ রাউন্ড পর্যন্ত। একমাত্র কানাডার জর্জ শিভালো ছাড়া অন্য কেউ ক্রে'র সঙ্গে ইতিপূর্বে পনেরো রাউন্ড পর্যন্ত লড়তে পারে নি। হাউসটনের ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রায় আটশ হাজার দর্শক এই আকর্ষণীয় লড়াই প্রত্যক্ষ করে।

টেরেল সপ্তম রাউন্ড পর্যন্ত ক্রে'র সঙ্গে বেশ ভালভাবেই লড়েছেন। কিন্তু অষ্টম রাউন্ড থেকে টেরেলকে ক্রান্ত বলে মনে হয় এবং ধীরে ধীরে তিনি ক্রে'র আয়ত্তের মধ্যে চলে আসতে থাকেন। মার্জারের মত কিন্তু ক্রে রিংয়ে নৃত্যরত অবস্থায় টেরেলকে সুরু থেকেই বিরত করতে থাকেন এমনভাবে যে টেরেল জোরালোভাবে বেকায়দায় কোন আঘাত ক্রে'কে হানতে পারেন নি। শেষ তিন রাউন্ড রিংয়ে দাঁড়িয়ে টেরেল টলাতে থাকেন, নাক দিয়ে তাঁর প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং চোখে আঘাত লাগার ফলে তাঁর দৃষ্টিও বাপসা হয়ে যায়।

লড়াইয়ের শেষে টেরেলকে ড্রোিং রুমে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়, অনেকক্ষণ কোন কথা বলেন নি আর্নি টেরেল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আর্নি টেরেলের মুখে থেকে প্রথম কথা শোনা যায়—“আবার আমি ক্রে'র সঙ্গে লড়াই।” টেরেলের মতে



কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় হাই জাম্পে বিজয়ী নিম্মাঙ্গণ লাম্বা কলেজের এ. হক বাঘা অতিক্রম করছেন।

ক্রে লড়াইয়ের সময় জঘন্য কলা-কৌশলের সাহায্য নিরোছিলেন এবং এই নোংরামী না করলে নাকি টেরেল জয়ী হতে পারতেন। টেরেল অভিযোগ করেন যে, ক্রে রিংয়ের দাঁড়িতে তাঁর চোখ ঘষে দিয়েছেন আর চোখে আঙুলের খোঁচা মেরেছেন। ক্রে

প্রীতিমিত্রতা

তৃতীয় রাউন্ডের পর থেকে তিনি নাকি একসঙ্গে দু'জন-তিনজন দেখেছেন একজনকে। বর্টিশ প্রেস কাগজে কাগজে মহম্মদ আলি ক্রে'র এই অখেলোয়াড়ী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছেন।

ক্রে তেমন কোন বেকায়দায় পড়েন নি বটে কিন্তু মাঝে মাঝে লড়তে লড়তে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ক্রে টেরেলের পনেরো রাউন্ড লড়ার ক্ষমতা এবং সাহসের

প্রশংসা করেন। ক্রে'র মতে টেরেল রক্ষণাত্মক পন্থাভিতে প্রতিপক্ষকে ধরার এবং আঁচড়াবার চেষ্টা না করলে ভাল করতেন।

ক্রে-আর্নি টেরেল মুন্টিবুদ্ধে প্রত্যক্ষ করেন চারজন মুন্টিবুদ্ধা—জোয়া ফেলী, খাদ স্পেন্সার, এমস লিনকলেন এবং জর্জ শিভালো। ক্রে বলেন জোয়া ফেলী, প্যাটার্সন, শিভালো এবং স্পেন্সারের মধ্যে থেকে একজনকে তাঁর আগামী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তিনি স্থির কবনের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা ক্রে'র আগামী প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন জোয়া ফেলী।

রেল সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী

শেষ পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফি সফল করে তুলল ভারতীয় রেল দলই। ইতিপূর্বে ১৯৬১ সালে এবং ১৯৬৪ সালে রেল দল সন্তোষ ট্রফি জয়ের গৌরব অর্জন করেছিল। এবার ভাগ্যের জোরে

সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু

টসে জিতে সেমি-ফাইনালের ধাপ থেকে দু'টি দল ভারতীয় রেল এবং সার্ভিসেস দল ফাইনালে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সার্ভিসেস দলই সম্ভাব্য বিজয়ী হিসাবে গুরুত্বলাভ করেছিল। এ বছর সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়েরা অসামান্য ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে খর্বকায় গুর্খা খেলোয়াড়েরা। অপরদিকে রেল দলের শক্তি এবার কিছুটা কম বলে মনে হয়েছে কয়েকজন খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে। রেল দলে অলিম্পিক খ্যাত অরুণ ঘোষ, প্রদীপ ব্যানার্জী এবং কাজল মুখার্জী, সম্ভাব্য বঙ্গ প্রমুখ খেলোয়াড়েরা উপস্থিত থাকলে আরও শক্তি তাদের বৃদ্ধি পেত। সদ্য ডুরান্ড বিজয়ী গুর্খা ব্রিগেডের বেশ কয়েকজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় সার্ভিসেস দলে আছেন।

রেল এবং সার্ভিসেস দলের প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। কোন পক্ষই গোল করতে পারে নি এদিন, যদিও উভয় দলের ফরোয়ার্ডেরা গোল করার সুযোগ পেয়েছে। সার্ভিসেসের গোলরক্ষক রোভি নিশ্চিত গোলের সুযোগ ব্যর্থ করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। বিশেষত রেল দলের মীরকাশিম একা গোলের সম্মুখে বল পেয়ে গোল করার উপক্রম করলে রোভি মার্জারের মত ক্রিপ্স গতিতে তাঁর পা

থেকে বল কেড়ে নেন। রেল দলের রক্ষণ-ভাগের খেলোয়াড়েরা সার্ভিসেসের ক্রিপ্স এবং সুযোগসম্পন্ন ফরোয়ার্ডেরা রণজিৎ ধাপা, ভূপিন্দার সিং রাওয়াং এবং অমর বাহাদুর ধাপাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। সার্ভিসেসের টিকারাম হেড করে একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ সৃষ্টি করলে কালন গুহ সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন বটে, কিন্তু টিকারামের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করেন।

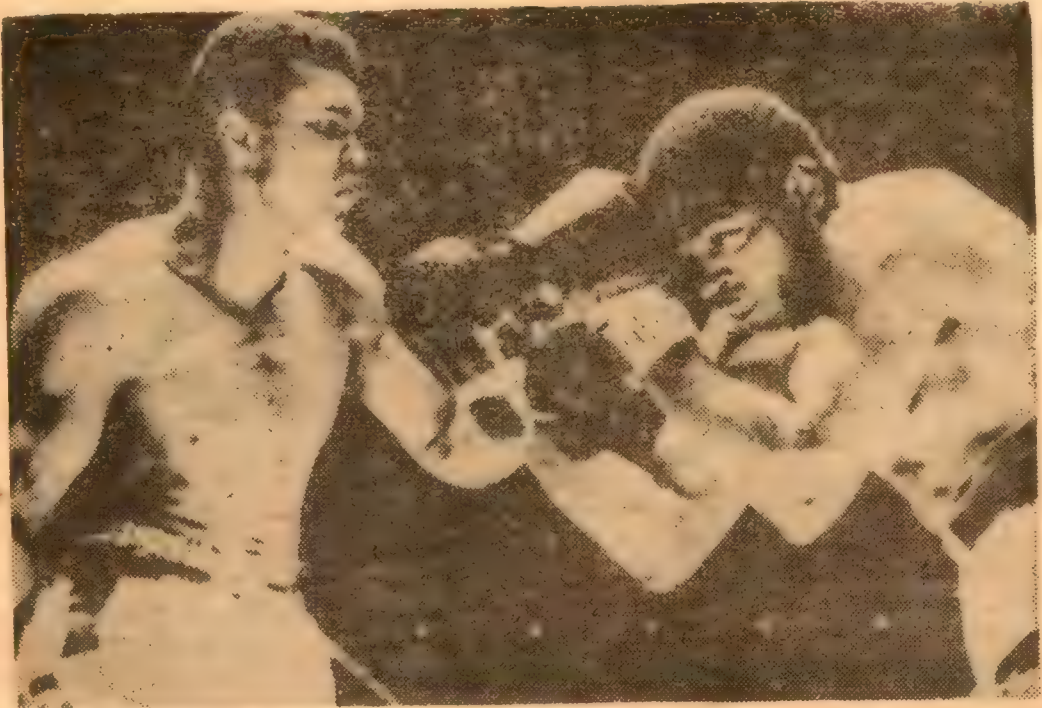
দ্বিতীয় দিন মাঠে নেমে আশ্চর্যভাবে খেলার সূর্যুতেই প্রায় দু'টি গোল করে বসে রেল দল এবং এই গোল দু'টিই খেলার ভাগ্য নির্ধারিত করে। প্রথমার্ধে ষষ্ঠ মিনিটে রেল দল লাভ করে একটি ছি কিক, তিরিশ গজ দূর থেকে জানকী-রাম সর্টিট করলে বলটি বুলেটের ন্যায় তাঁর গতিতে বারের কোণে লেগে চকিতে গোলে প্রবেশ করে, গোলরক্ষক রোভি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকেন। পনেরো মিনিটের সময় রেল দলের রাইট আউট বালকান গোল লক্ষ্য করে একটি মাটি ঘেঁসা সট করেন, রোভি কাঁপিয়ে পড়ে বলটি ধরেন বটে কিন্তু হাত ফস্ক বলটি গোলে প্রবেশ করে।

এইদিন উভয় দলেই কিছুটা পরিবর্তন হয়। সার্ভিসেসের পক্ষে এখিরাজ, বীর-বাহাদুর এবং এ্যান্টনীর পরিবর্তে খেলেন মাখবন, রাজেন এবং বীরখা সিং কিন্তু

এই পরিবর্তনে লাভের চেয়ে সার্ভিসেসের ক্ষতিই হয়। রেল দলে কালন গুহের পরিবর্তে মাঠে নামেন বঙ্গ সেনগুপ্ত এবং সেনগুপ্ত রেল দলের রক্ষণভাগের শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেন। দু'গোলে পেছিয়ে যাবার পরও সার্ভিসেসের ফরোয়ার্ডেরা গোল পরিশোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু অলিম্পিক গোলরক্ষক থংগরাজ যোগ্যতার সঙ্গে রেল দলের গোল পাহারা দিয়েছেন। রেল দল ২-০ গোলে জয়ী হয়ে সম্ভোষ ট্রফি লাভ করে তৃতীয় বার। শক্তির দিক থেকে কিন্তু বলতে গেলে উভয় দলই প্রায় সমান ছিল।

সম্মানস্বরূপ

কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হল ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ মাঠে। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এই ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ছাত্র বিভাগে বিদ্যাসাগর সাম্মান্য কলেজ নবাগতভাবে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করে মোট ৬৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে এবং এই কলেজের সমরেশ বসুরায় মোট ষোল পয়েন্ট অর্জন করে ব্যক্তিগত বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করেন। ছাত্রীদের বিভাগেও বিদ্যাসাগর কলেজ বিজয়ীর সম্মান লাভ করে এবং বিদ্যাসাগর কলেজের চিত্রা ব্যানার্জী ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেন কুড়ি পয়েন্ট সহ।



বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ক্যানিসাস ক্রে টেরেলকে আঘাত করছেন জোরালো ফোল্ট পাণ্ডের সাহায্যে

কালো সূর্যের আলো

ইংল্যান্ডের মাটিতে পদাৰ্পণ করে নতুন সূর্যের আলো দেখলেন বেসিল ডি ওলিভিয়েরা। প্রাণভরে মুক্ত বাতাসের স্পর্শ নিলেন; কোথায় নাদা-কালোর দুঃখিত ভেদাভেদের পুষ্টিগন্ধের মলিন রেশ, কোথাও নেই তো! এ যেন এক নতুন অচেনা পৃথিবীর ছবি, যেন তার স্বপ্নে দেখা স্বর্গরাজ্য। সত্যিই 'ওলভেরা' এক এক করে পা ফেলছেন আর মৃত্যু মৃত্যু বিস্ময় এসে ছাড়িয়ে পড়ছে তার কিস্কম্য-ভরা চোখের সামনে। মন তার উড়ে যাচ্ছে পেছনে ফেলে আসা দেশের দিন-গুলির মাঝে আর চমকে উঠছেন তিনি, কি লাঞ্ছনা, কি অপমানের জ্বালা। লন্ডনের পথে, একই পথে, একসঙ্গে শ্বেতকারদের সঙ্গে প্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছেন ভয়ে তিনি; এই বৃষ্টি কালো বলে কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় পথের প্রান্তে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকারদের নিম্নম্ন আত্যাচারের স্মৃতি এখনও তার মনের বিত্তীবিলা! না রাণীর দেশে মাথা উঁচু করেই এগিয়ে চলেছেন বেসিল ডি ওলিভিয়েরা। তার অজানা রাজ্যের সুন্দর পথে এগিয়ে চলেছেন; "ওলভেরার" মনে হচ্ছে সুন্দর এর আলো, সুন্দর এর ব্যতাস, মনে মনে তিনি ভাবছেন—না সত্যিই সুন্দর এ পৃথিবী, এ জীবন সত্যিই মধুর!

বেসিল ডি ওলিভিয়েরার পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়; নামটি আজ বিশ্বের প্রতিটি ক্রীড়ামোদীর কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু মাত্র দু'দিন বছর পূর্বে কেউ-ই জানত না ওলিভিয়েরাকে। প্রতিভার আদরের দুলাল বলে তাকে অভিহিত করলে কোন অত্যাধি হবে না। কিন্তু এই অমূল্য রত্নটি অন্যদরে, অবহেলায় সকলের অজ্ঞানতে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় এক কোণে। ক্রিকেটের অঙ্গনে বেসিল ডি ওলিভিয়েরার মত এমন একজন পরি-ণত এবং সর্বগুণসম্পন্ন জাত ক্রিকেটার সমূল্যে হীরকখণ্ড সম।

আজ থেকে বইশ বছর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় এক মিশ্রিত পরিবারে ওলিভিয়েরার জন্ম। আমাদের দেশে যেমন এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবার তেমনই একটি পরিবার। সভ্য জগতের দু'ট ফত দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য নীতি ভীষণ কঠোর এবং অত্যাচারিত নোংরা ধরণের। একমাত্র খাঁটি শ্বেতকার রক্তের ধারক ছাড়া অন্য কেউ মানদ্য নয় নাকি সেখানে! সাদা আর কালোর মধ্যে প্রায় স্বর্গ-নরকের ব্যবধান সেই আশ্চর্য দেখে। এই প্রসঙ্গে



দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী ইংল্যান্ডের টেস্ট খেলোয়াড় বেসিল ডি ওলিভিয়েরাকে বছরের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার প্রদান করছেন জোহানেসবার্গের মেয়র।

দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না, অল্প কিছুদিন আগে ঘটনাটি ঘটেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন শ্বেতকার মৃচ্ছিবোধা চিরজীবনের মত দক্ষিণ আফ্রিকায় মৃচ্ছিবোধে অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়েছেন। মৃচ্ছিবোধটি খাঁটি শ্বেতকার কিন্তু তিনি মিশ্রিত লোকেদের এলাকায় বসবাস করেন; শুধুমাত্র এই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় মৃচ্ছিবোধ সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে এই চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করেছেন।

বেসিল ডি ওলিভিয়েরা জন্মগ্রহণ করেছেন ক্রিকেটার হয়ে। ছোট থেকেই ব্যাট আর বল হাতে তুলে নিয়েছেন, কিন্তু কেউ তাকে হাত ধরে শেখায় নি ক্রিকেট খেলার কায়দা-কানুন। কারণ শ্বেতকার ছেলেদের ক্রিকেট খেলা শেখায় কোন সুযোগই নেই দক্ষিণ আফ্রিকায়। বেসিল ডি ওলিভিয়েরাও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন; আপন প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন নিজেকে।

মাত্র ষোল বছর বয়সেই বেসিল ডি ওলিভিয়েরা হয়ে উঠলেন একজন পাকা ক্রিকেটার। শ্বেতকারদের ক্রিকেট খেলার বড় বড় আসরেই তরুণ ওলিভিয়েরার ডাক পড়তে লাগল। এই সময় একটি ফেলো বোল বছরের এই তরুণ প্রায় এক অবি-

শ্বাস্য কাণ্ড করে বসলেন। মাত্র নব্বই মিনিটে ডবল সেঞ্চুরী করলেন; দলের ২৩৩ রানের মধ্যে একাই করলেন ২২৫ রান। চোখ কপালে উঠবে তাঁর ওভার-বাউন্ডারী মারার কথা শুনলে, এই দু'শো পঁচিশ রানের মধ্যে ছিল তাঁর আটশটি ওভার বাউন্ডারী। আর এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই দেখা গেল ওলিভিয়েরার অবিশ্বাস্য বোলিং; স্লোগ স্পিনার হিসাবে মাত্র দু'রানে নয়টি উইকেট। ওলিভিয়েরার হাতে যে অক্ষরমত মার আছে তা' প্রমাণিত হয় তাঁর রান তোলায় বহর দেখে। ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়ালে ওলিভিয়েরার ব্যাট খেঁক ঝরে মারের ফুলঝুরি, অনবরত বল বাউন্ডারী লাইন পেরিয়ে বেড়ায় লাগে।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে বাউন্ডারী মারার এক নতুন ইতিহাস রচনা করলেন ওলিভিয়েরা। শ্বেতকারদের একটি খেলায় আট বলের একটি ওভারে তিনি করলেন ছেচলিশ রান। প্রথম ছ'টি বল ওলিভিয়েরা সেন্সা মাঠের বাইরে পাঠিয়েছিলেন, সপ্তম বলে বাউন্ডারী আস শেষ বলে আবার ওভার বাউন্ডারী। এক ওভারে সাতটি ছয় কল্পনা করতেও আশ্চর্য লাগে।

দিন দিন ফুটে উঠতে লাগল ক্রিকে-

টের এই নিপুণ শিল্পীরা জীভাশৈলী। এই ধরনের অসম্ভব শালী ক্রিকেটারের পূর্ণ বিকাশের জন্য চাই স্থান, কাল, পাত্র কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সে ধরনের সুযোগ কোথায়। আরও উঁচুতে উঠতে হবে। ওলিভিয়েরা ক্রিকেটের ভরা যৌবন নিয়ে ছটফট করছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছেন তিনি, কাছাকাছি ছেলেদের এর পর আর এগোবার সুযোগ নেই। ওলিভিয়েরা দেখলেন দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে যাওয়ার অর্থ হল খেলোয়াড়ী জীবনের অকালমৃত্যু। তাই তিনি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করার। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনের পঁচিশটি বছর কেটে গিয়েছে। খেলোয়াড়ী জীবনের মূল্যবান দশটি বছর নষ্ট হয়েছে এই দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে।

ছোটবেলা থেকেই ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ার লীগের নাম শুনছেন তিনি; বহু নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড় এই লীগে খেলেন। কিন্তু ওলিভিয়েরার সঙ্গে কারুরই পরিচয় নেই, কেই-বা জানে যে অলকো দিনে দিনে করে যাচ্ছে “ওলভেরার” মত একটি প্রতিভা। ইংল্যান্ডে কয়েকটি জায়গায় চিঠি লিখলেন “ওলভেরা”। শেষ পর্যন্ত পঁচিশ বছর বয়সে দক্ষিণ আফ্রিকার মৃত্যু গহবর থেকে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে উপস্থিত হলেন ছোট ক্লাব মিডলটনের আহ্বানে। কয়েকজন সহধর্মী খ্যাতিনামা ক্রিকেটারের প্রচেষ্টায় মিডলটন এই অনামী অখ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকানকে দলে নিতে রাজী হয়।

ওলিভিয়েরা মনে মনে সতাই কৃতজ্ঞ ইংল্যান্ডের খ্যাতিনামা টেস্ট খেলোয়াড় টম গ্রেন্ডনীর কাছে। টম গ্রেন্ডনী একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি খেলার ওলিভিয়েরার বিরুদ্ধে খেলে বড়োই ছিলেন, তিনি অনেক দূর উঠবেন। গ্রেন্ডনী তাঁকে অনেক উৎসাহ এবং আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন। মিডলটন ক্লাব কর্তৃপক্ষকে গ্রেন্ডনী ওলিভিয়েরাকে নেবার জন্য বেশ চাপ দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে আসার পরও ওলিভিয়েরা যখনই তাঁর অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে মূষড়ে পড়েছেন, কিন্তু টম গ্রেন্ডনী এসে তাঁকে ভরসা দিয়েছেন উদ্দীপিত করেছেন, জাগিয়ে তুলেছেন তাঁকে।

দীর্ঘ ছ’টি ক্রিকেট মরশুম “ওলভেরা” কাটিয়েছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেট মাঠে। একবার একটি কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে পাকিস্তান সফরে গিয়ে এক বিচিتر ঘটনার সম্মুখীন হবার পর ইংল্যান্ডে ফিরে ওলিভিয়েরা ইংল্যান্ডের

নাগরিক গ্রহণ করেন। কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে করাচী বিমান বন্দরে অবতরণ করলে হঠাৎ তিনি জানতে পারেন যে কিছু অর্থ জামানত হিসাবে না রাখলে তাঁকে পাকিস্তানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না কারণ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার লোক।

১৯৬৫ সাল ওলিভিয়েরার জীবনের স্মরণীয় মরশুম; ইংল্যান্ড সফরকারী ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে তিনি প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ লাভ করেন লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে। আজ পর্যন্ত কোন অশ্বেতকার দক্ষিণ আফ্রিকান ইতিপূর্বে টেস্টে খেলার সুযোগ লাভ করে নি। ১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরে এসে শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যখন অগ্রসর হচ্ছিল তখন অনেকে ওই টেস্ট দলে বেসিল ডি ওলিভিয়েরাকে স্থান দেবার জন্য প্রস্তাব করে কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের টেস্ট খেলার সাফল্য অর্জনের পর বর্তমানে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের অমূল্য সম্পদ হলেন ওলিভিয়েরা। ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের মতে তিনি বর্তমানে ইংল্যান্ডের সেরা অলরাউন্ডার। গত বছর সম্মিলিত বিশ্ব একাদশের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রদর্শনী খেলার তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে জাত ক্রিকেটার কাকে বলে। ফাস্ট বোলার পিটার পোলক এবং ম্যাকক্লিককে অবলীলাক্রমে পিটিয়েছেন আর মেডেন বিশারদ ভারতের বাপু নাদকানীর এ্যাভারেজ খারাপ করেছেন মনের আনন্দে তাঁকে পিটিয়ে। মিডিয়াম পেস বোলিংয়ে এই খেলার তিনি গ্রিম পোলক এবং কলিন ব্র্যাণ্ডের মত দক্ষিণ আফ্রিকার দুই অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানকে প্যাডেলিয়ানে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ওয়েস্ট-ইন্ডিজের দুই দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার হল আর গ্রীফিথের বলে খেলতে বহু বড় ব্যাটসম্যানেরই বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু এই বোলারদের বিপক্ষে ওলিভিয়েরার খেলা দেখে অনেকেই মনে করতে পারেন যে হল-গ্রীফিথের দুরন্ত বলও খেলা যায় নিভয়ে। বাম্পার-বিসার-বিশারদ হলকে একটা টেস্টে ওলিভিয়েরা এমনভাবে বেড়ার বাইরে ছয় মেরেছিলেন যা দেখা যায় না সচরাচর। হেভিসের টেস্টে ওলিভিয়েরার ৮৮ রানের নাকি তুলনা নেই। ওলিভিয়েরার ব্যাট চালনার মধ্যে নিপুণ শিল্পীর ছোঁয়া তেমন নেই বটে, কিন্তু তিনি খেলেন একেবারে নিজের স্টাইলে যা মেনে না কপিবক ক্রিকেটের

ধাঁচের সঙ্গে। তাঁর এই ৮৮ রানের মধ্যে ছিল চারটি ওভার বাউন্ডারী।

খেলোয়াড়ী জীবনের প্রায় প্রান্ত সীমায় ইংল্যান্ড সুযোগ দিল ব্রিটিশ বৎসর বরষক এই খেলোয়াড়কে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণের এবং সে সুযোগ তিনি সর্বাত্মক পূর্ণ করেছেন। যে মিডলটন দল তাঁকে প্রথম ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলার সুযোগ করে দিয়েছে সেই ক্লাবের পক্ষে ব্যাট আর বল হাতে অনেক করেছেন তিনি। ১৯৬৫ সালে সারা মরশুমে মোট ১৬৫৩ রান সংগ্রহ করেন এবং ওই মরশুমে টম গ্রেন্ডনী এবং একমাত্র তিনি পনেরোশত রান অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

প্রথম ইংল্যান্ডে এসে ওলিভিয়েরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মিডলটনের হয়ে ক্রিকেট খেলতে যেতেন, শ্বেতকারীদের সঙ্গে লাগু খেতেন শ্বেতকারীদের সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করতেন কিন্তু কেউ কোন আপত্তি করত না। হোটেল বা রেস্টোরাঁয় অথবা সেলুনে বা সিনেমা হলে শ্বেতকারীদের সঙ্গে অশ্বেতকারীদেরও ছিল অব্যাহত স্মার। কোথাও এতটুকু বিভেদের চিহ্ন নেই। মিডলটনে প্রথম যখন তিনি খেলতে গেলেন পথে শ্বেতকারীরা নবাগত ওলিভিয়েরাকে পথে দাঁড় করিয়ে শব্দ সম্ভাষণ এবং করমর্দন করতেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন এবং তাঁর সাফল্য কামনা করতেন।

ওলিভিয়েরাকে নিয়ে এখন দায়ুশ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এম, সি, সি। ১৯৬৯ সালে ইংল্যান্ড দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের কথা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সম্পর্ক জানিয়ে দিয়েছেন যে, ওলিভিয়েরাকে টেস্ট দলে স্থান দিলে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এমন কি ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও এই প্রসঙ্গে গরম আলোচনা হয়ে গিয়েছে। অবস্থা বর্তমানে এমন যে ইংল্যান্ড দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিলও হতে পারে।

বেসিল ডি ওলিভিয়েরা একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকার খেলোয়াড় যিনি টেস্ট খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে না আসতে পারতেন তবে বিশ্ব ক্রিকেট কোনদিন জানতেও পারত না এমন একজন খেলোয়াড়ের নাম। ধীরে ধীরে করে পড়ত এই সুন্দর ফুলটি, সৌরভ বন্দ্য সমীরণে হারাত তার শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। কে জানে দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে-ময়দানে “ওলভেরার” মত কত অজানা প্রতিভা অজান্তে করে যাচ্ছে।

—সৌরভ চ্যাটার্জী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বস্তুমতী (প্রাঃ) লঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপনিবাহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বস্তুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহেমজদাদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Today, 16th February, 1967

SAPTAHIK BASUMATI

Regd. No. C 71

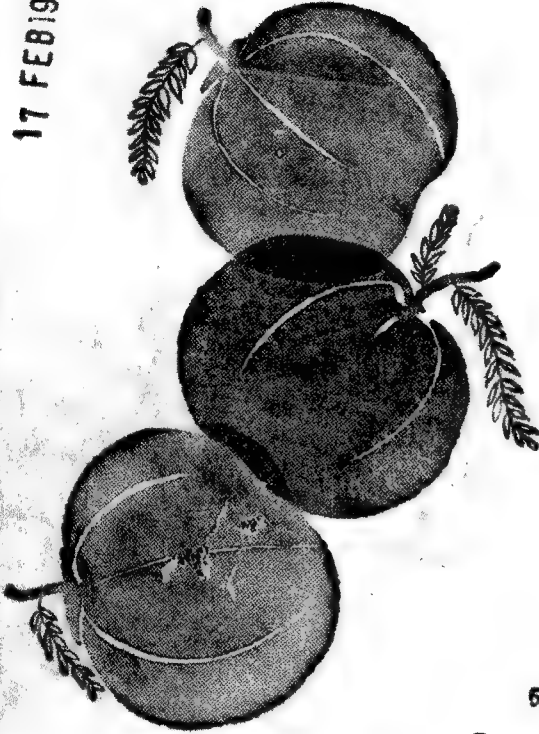
Price : 25 Paise

Gram : "BASUMATI"

PHONE : 34-7771, 72, 73

চ্যবনপ্রাশ

17 FEB 1967



চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী
দেহের পুষ্টিসাধনে ও দ্রুতস্থায়ীভাবে
আমলকীর অত্যন্ত গুণাবলী সর্বজন
বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যদুগ্ধ—
কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অগ্ন্যাত্ত ছত্রাশা
ও বহু মূল্যবান তেজস্ব সংমিশ্রণে ইহা
প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্বেদের সর্বপ্রথম
দ্রব্যময়।

সর্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গের মাহোষধ



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

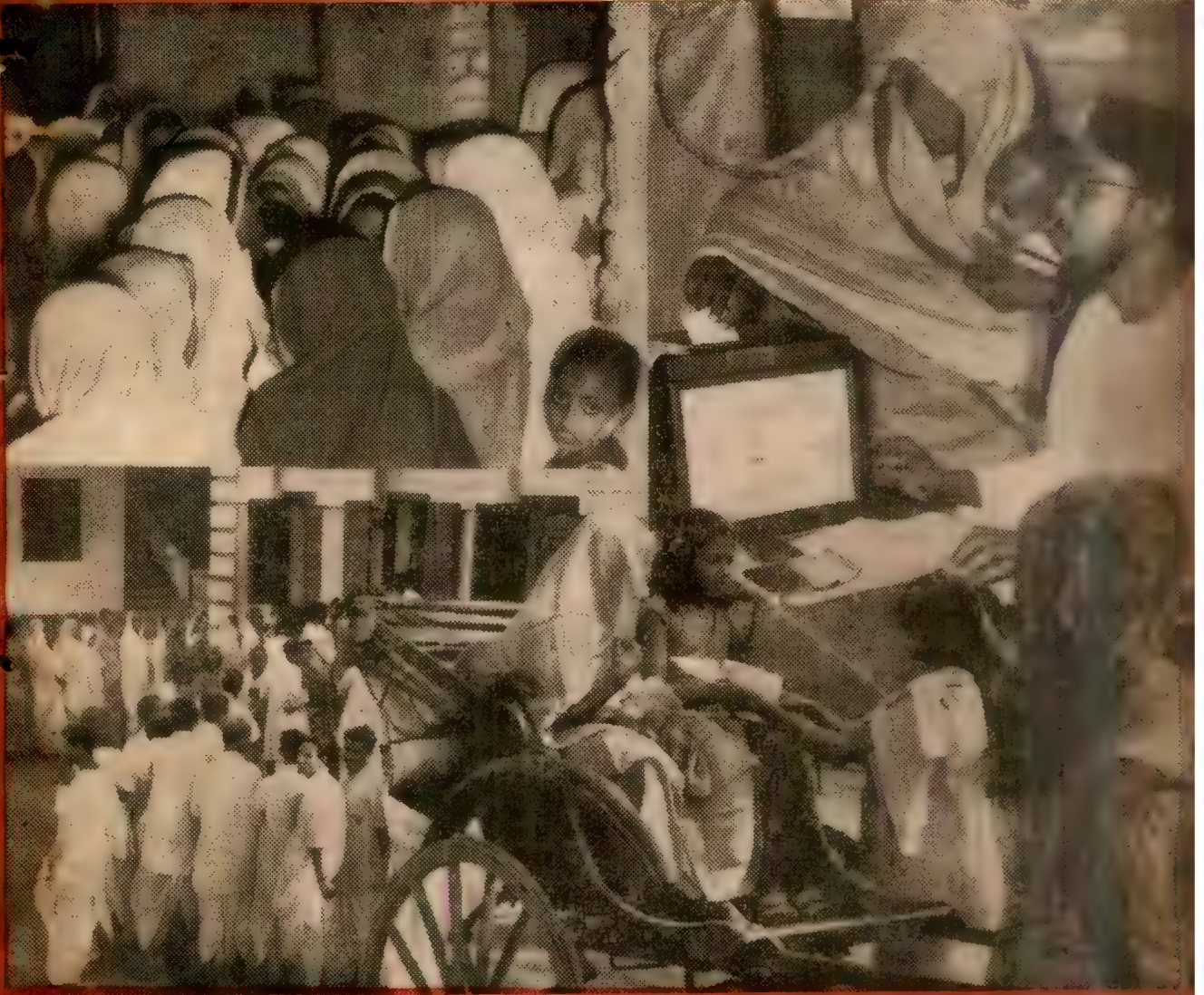
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৩৮

অধ্যাপক - শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বোস, এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী,
এম. সি. এস. (লন্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা)
আইকনগর কলকাতার ফার্মাসি শাস্ত্রের দ্রুতপূর্ণ অধ্যাপক।

অসিষ্টকাল কেন্দ্র - ডাঃ করেশনাথ বোস,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদশাস্ত্রী।

বঙ্গমতী

উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শৃঙ্খলার মধ্যে সারা
পশ্চিমবঙ্গ ভোটগ্রহণ পর্ব সম্বল



বর্ষ : ৩৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ



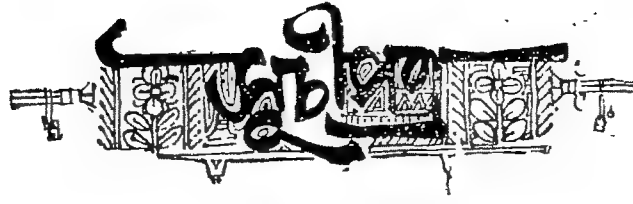
23rd Feb., 1967 * vol. 71 No.

নবম সৃষ্টি ও কোমলতার জন্ম দিতে যিনি একবার
নবমবাইকে ব্যবহার করতে বলেন।

বোরোলিন

বাইকোমল নবম





বিষয়	লেখক						পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	২৩০৭
আজকের মানুষ	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	২৩০৮
ভারতদর্শন	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	২৩০৯
আন্তর্জাতিক	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	২৩১৩
অজন্মা (গল্প)	৩০০	— শ্রীবিমল রায়				৩০০	২৩১৬
একুশের গান (কবিতা)	৩০০	— আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী				৩০০	২৩১৮
গ্রন্থমেলা	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	২৩১৯
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	৩০০	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়				৩০০	২৩২১
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	৩০০	— আশাপূর্ণা দেবী				৩০০	২৩২৬
পাক-ভারতের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	৩০০	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী				৩০০	২৩৩০

ডক্টর পণ্ডান ঘোষাল এম. এ. সি. প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য স্রোমাণ্ডের স্বর্ণখনি)

‘রক্তনদীর ধারা’, ‘অপরূপ বিজ্ঞান’ ও ‘বিখ্যাত বিচার রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবতা ন জানন্তি। কাহিনী’ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উন্মোচন ও মধ্যস্থ অন্বেষণ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধস্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

সার ওয়াণ্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শরৎচন্দ্র মিত্র অনুদিত

আইড্যানহো, হাইল্যান্ড উইডো, ফেমার

মুন্ড অফ পার্থ, সাজ্জেন্স ডটার

মূল্য—৩.০০

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনুদিত

দি রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোজ,

দি এ্যান্টিকোয়ারি

মূল্য ১১০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ানো

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ‘ভাগবতামৃত’ গ্রন্থের কবিচন্দ্র বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগোরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতচার্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহৎভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

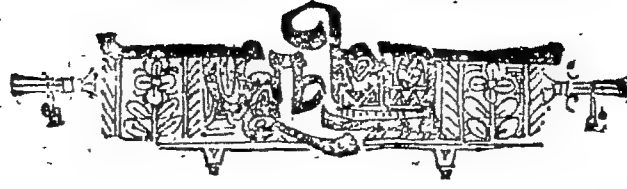
সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

“...শুনিয়া তাহার ভক্তিবোধের পঠন।

আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥”

ইহা কৃষ্ণবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বংশদর্শন	...	২০০০
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২০০৭
জীবনায়ন (অনুবাদ-গল্প)	— ভ্রমর বাগচী	২০০৮
ভাষা-আন্দোলনে পূর্ববঙ্গ (প্রবন্ধ)	— গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়	২০০৬
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	— জ্ঞানেশ্বর দেব ভট্টাচার্য	২০০৮
টোমে (কবিতা)	— গোবিন্দ চক্রবর্তী	২০০০
স্বপ্নমণ্ড—ওমেসে এবং এবেসে	— শিলালি	২০০১
স্বপ্নজগৎ	—	২০০৮
গাঠকমন	—	২০০১
খেলাধুলা	— প্রীতমিতা	২০০০
দিন বদলের পালা	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০৭

সাহিত্য-সম্রাট—বঙ্গদেবতার মন্ত্রের স্বাক্ষর

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষ্ণু, অগলাগদারী, অশালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), রাধারাম গড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীররাগনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাধাই)—সাতের চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিস্টা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, রত্নাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মল্লিকা কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাধাই) সাতের তিন টাকা

ডঃ মতিলাল দাস প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

- ১। চলার পাথে (উপন্যাস)
- ২। মনীষা (উপন্যাস)
- ৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খণ্ড গল্প সমাধি)
- ৪। দীপাশিখা (কবিতা সংকলন)
- ৫। চার্বাক (নাটক)

বঙ্গদেবী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



৭১ বর্ষ : ৩২৩ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 23rd February, 1967

নির্বাচনের দিনে ও তারপরে

সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের প্রাক-মুহুর্তে বা ভোটদানের সময় পশ্চিমবঙ্গে বড় রকম গোলমালের যে আশঙ্কা অনেকেই করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গণতন্ত্রের যে মর্যাদা রক্ষা করেছে, তার জন্যে তারা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। মাত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া, তেমন কিছুই ঘটে নি এবং যে আশঙ্কায় বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছিল—তা অমূলক প্রমাণিত হওয়ায় পুলিশের পক্ষেও শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের জুলনার ভারতের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনী অনুষ্ঠানের বিচার করলে দেখা যাবে যে, সে সব জায়গায় হাঙ্গামার দরুণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হওয়ায় ভারতের নির্বাচন কমিশনার পুনরুদ্ভাটনের নির্দেশ দিয়েছেন। আনন্দের কথা, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিগত কয়েকটি অধিবেশনের প্রসঙ্গ উঠলে এ কথা অস্বীকার করার উপায় থাকবে না যে, কিছুদিন আগে এ রাজ্যেই গণতন্ত্র বিপদাপন্ন হয়ে উঠেছিল। আর এখন সত্যক জনসাধারণ দেখিয়েছে যে, আইনসভার তাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদের চেয়ে তারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য কম কাতর নয়। এই কারণে আশা করা যায়, এবার যাঁরা নির্বাচিত হলেন তাঁরা গণতান্ত্রিক জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মনে রাখবেন।

কথায় যেমন বলে লক্ষ্যায় যে যায় সেই হয় রাবণ, তেমনি একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে না কি পাঁচ বছর ধরে এক একজন

হন মহীরাবণ। অবশ্য পাতালপুত্রীর মহী-রাবণেরও সন্ধানও মেলে, কিন্তু মর্ত্যের মাননীয় সদস্যদের দর্শন লাভ অসাধ্য ব্যাপার। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য কীতন করতে কে ইচ্ছুক হবে? তাছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে সব ঘটি রয়েছে, সেগুলি দূর করার ভার যদি প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার সদস্যরা গ্রহণ না করেন, তাহলে তা করবে কে?

নানা ধরনের ঘটি-বিচ্ছাদিত সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাকে আপাত নিরাপদ ব্যবস্থা বলে আমরা মেনে নিয়েছি এবং নেহরুজীর এই কথা আমরা স্মরণে রেখেছি যে, 'গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি না হতে পারে, কিন্তু এটা সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞাত পদ্ধতি।'

যা হোক, চতুর্থ নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে। এই বিরাট নির্বাচন ব্যবস্থাকে সুদৃষ্টভাবে কার্যকর করার জন্যে প্রধান কৃতিত্ব প্রাপ্য ভারতের ইলেকশন কমিশনারের। ভারতের নির্বাচন পরিচালনা ও এর দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপুল দায়িত্ব-ভার বহনে ইলেকশন কমিশন পূর্ববৎ গৌরব অক্ষুণ্ণই রেখেছেন। ভারতের প্রথম ইলেকশন কমিশনার এদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে এমন এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন যে, তা তত্ত্বমুহুর্তেই বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করেছিল। সেই ব্যবস্থা ও পদ্ধতি

পর পর নির্বাচনগুলিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর এখন আরো বিজ্ঞানসম্মত। তবু এবারের নির্বাচনে একটি ঘটি কেন যে ঘটল তা প্রশ্নের বিষয়। ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, ২১শে ফেব্রুয়ারীর আগে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের নির্দেশ না থাকলেও ৩।৪ দিন আগেই মণিপুরের কয়েকটি আসনের ফলাফল বের হয়েছিল। এই অবস্থিত ঘটনা ছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠান-পরিচালনা নিতুর্ল।

এখন পর্বস্ত নির্বাচনের ফলাফল অনেক বের হয়ে গেছে, বাকি কয়েকটির ফলাফল জানারও আর বিলম্ব নেই। আমরা আশা করবো, বিপক্ষ দলগুলি নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনের পূর্বে পরস্পর বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করলেও এখন তার অবসান হবে। গণতন্ত্রে বিপক্ষ দল থাকবেই, সুতরাং জয়-পরাজয়ও অবশ্যম্ভাবী। তবে সকলেরই উদ্দেশ্য যে দেশের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থ—একথা আমরা যেন ভুলে না যাই। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সংখ্যাগত ভেদাভেদ থাকলেও মনে রাখতে হবে তাঁরা প্রত্যেকেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। দেশ গঠনের সবাই সমান অংশীদার। আমরা তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি।

সম্পাদকীয়

ভোটারের মাত্র

২৫ কোটি লোককে 'পোষ মানানো', ক্ষুণ্ণ করা তাদের যন্ত্রের মতো পরিচালনা করা, একটি মাত্র ইস্যবায়ন কোটি কোটি লোককে কমচঞ্চল করে তোলা একজন ডিষ্ট্রিক্ট বা স্ট্রিকচারী শাসকেরই কাজ। কিন্তু হিটলার, স্ট্যালিন বা মস্কো-লিনীভ পক্ষেও বোধ হয় একাজ সম্ভব হতো না, কিংবা জুলিয়াস সীজারের পক্ষেও না। অথচ কুধর বৈদ্যনাথ কালানন্দ সুন্দরম ডিষ্ট্রিক্ট মোটেই নন, এমন কি রাজা-সন্ন্যাস বা প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ-গোববও তাঁর নেই; সুন্দরম ভারতের মধ্য নির্বাচনী কমিশনার মাত্র।

অব্যাহত নির্বাচন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-জীবনের প্রথম ও প্রধান স্মারকচিহ্ন। কিন্তু ভারতের মতো একটা বিরাট উপ-মহাদেশে যেখানে পঞ্চাশ কোটি লোকের বাস, তারও চেয়ে বড় সমস্যার কথা, যেখান-কবা শতকরা ৭০ জন লোকেরই অক্ষরজ্ঞান নেই, যারা হাজার রকমের ভাষায় কথা বলে, বাদের ঈশ্বর ও ধর্ম আলাদা, সংস্কার, রুচি বাঁতি স্বতন্ত্র, তাদের সকলকে একটি-মাত্র ছাঁচে ঢেলে পরিচালনা করা আর স্থির-অচঞ্চল হিমালয়কে টলানো প্রায় একই কথা। কিন্তু সুন্দরম নেই দুঃসাধ্য সাধন করছেন। সত্যি বটে, সুন্দরমই ভারতের প্রথম নির্বাচনী কমিশনারের পদ পালন না, এর আগে একজন বাঙালী, আই-সি-এস প্রশাসকের স্বার্থে চেপেছিল এই থ্যাঙ্কলেস বা আনন্দ-রসহীন দায়িত্ব, আব সুকুমার সেন অপূর্ণ যোগ্যতাব সত্ত্বেই এই বহুস্তম গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনী রথকে চালু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, ইতিমধ্যে ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার জটিলতাও বহুগুণিত হয়েছে।

কারণ নির্বাচন মানেই কেবল ভোটের দিন স্থির করে ভোটদাতাদের ভোট কেন্দ্রে হাজির হবার আমন্ত্রণ জানানো নয়, বরং যে-কোনো নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানের মতো এপ্র পছন্দে দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতিপর্ব রয়েছে। নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমারেখা টানা, ভোটদাতার তালিকা রচনা করা, সে তালিকা বার বার পরীক্ষা ও প্রয়োজনবোধে সংশোধন করা, বিভিন্ন রাজ্যের জন্যে নির্বাচনের

দিন স্থির করা—সবই করতে হয় নির্বাচনী কমিশনারকে। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন ঠিক করা থেকে সেগুলা পরীক্ষা ও প্রত্যাহারের দিন ধার্য করা সবই তাঁর কাজ। আর ভুলে গেলে চলবে না যে, এবার লোকসভার আসনসংখ্যা পাঁচশো কুড়িটি এবং সমস্ত রাজ্যের বিধান-সভার আসনসংখ্যা তিন হাজার পাঁচশো তেরটি। কাজেই এতগুলি আসনের একটি পাবার জন্যে কুড়ি হাজার লোক তো ভাগ্যপরীক্ষা করবেনই। এবং তাঁদের প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখার গুরুদায়িত্ব সুন্দরমের।

এ ছাড়াও রয়েছে নির্বাচন বতে সুস্ফু-ভাবে হতে পারে সেদিকে তাক্য নজরও



সুন্দরম

রাখা কর্তব্য। কোন যোগ্য নাগরিক যাতে তাঁর পবিত্র ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তিনি যাতে নির্বিঘ্নে তাঁর পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন, সে ব্যবস্থাও করতে হয় নির্বাচনী কমিশনারকে। সেজন্যেই এবার নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটা ছোট দ্বীপের মাত্র সাত জন ভোটারের জন্যেও বিশেষ ভোট কেন্দ্র স্থাপন করেছেন সুন্দরম, সারা দেশের জন্যে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি করেছেন সরকারের কাছে।

আবো আছে। প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার থেকে শুরু করে ভোট গণনার সময় পর্যন্ত কি কি বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে তা স্থির করার কর্তা নির্বাচনী কমিশনার। আবার ভোটদাতাদের কী করে

ভোট দিতে হবে, কোন ভোটই বা বাতিল বা নির্বাচনে অবৈধ বলে গণ্য হবে—সে সম্পর্কে শেষ কথা বলার হক সুন্দরমের। এত বড় দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা করা এবং তার পরিচালনা যেন পৌরাণিক যুগের অশ্বমেধ যজ্ঞকেও হার মানায়। স্বভাবতই সাধারণ নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছরের মাথায় একবার করে হলেও সারা বছর ধরেই নির্বাচনী কমিশনকে কাজ করে যেতে হয়, প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বছর-ভর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে-সেখানে ঘুটি যে থেকে যায় না এমন নয়, অভিযোগও শোনা যায় হামেশাই। কিন্তু কাজের বা দায়িত্বের বিরুদ্ধে তুলনায় সেগুলা সামান্যই।

নিঃসন্দেহে বলা চলে, সুন্দরম তাঁর যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, '৬২ সালের সাধারণ নির্বাচন, গোয়ার নির্বাচন এবং আরো বহু উপনির্বাচন তো তাঁরই হাত দিয়ে হয়েছে। '৫৭ সনের বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পরে ১৯৫৮ সনে সুন্দরম এই দায়িত্ব লাভ করেন। নির্বাচন পরিচালনা বা এ সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর না থাকলেও ইতিপূর্বে তিনি যে সমস্ত ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সেগুলো তাঁকে সাহায্য করেছে অনেকখানি। দেশের প্রবীণতম আই-সি-এসদের অন্যতম সুন্দরম—সেই ১৯২৭ থেকে দায়িত্বপূর্ণ পদ তিনি কম পূরণ করেন নি তো।

সুন্দরমের জন্ম মাদ্রাজে, এখানেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি কেমব্রিজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে সুন্দরম প্রথমে তদানীন্তন সেশাল প্রদেশে কাজ নেন, পরে ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের অধীনে রিফর্মস অফিসার হিসেবে কাজে যোগ দেন। নির্বাচনী বিধি-পদ্ধতির ব্যাপারে সুন্দরম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ভারত সরকারের আইন দপ্তরে এসে।। উনি এ বিভাগের আন্ডার-সেক্রেটারী থেকে আইন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী হিসেবে দশ বছর কাজ করেন। অভিজ্ঞতার ঝুলা আরো সমৃদ্ধ করার জন্য সুন্দরম ১৯৬৪ সালে পশ্চিম ইন্ডোরেপের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেও গিয়েছিলেন। নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সত্যিকারের গণতান্ত্রিক করার জন্যে সুন্দরমের প্রচেষ্টা অনলস। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতার সত্ত্বে তিনি এ ব্যাপারে প্রায়ই আলোচনায় বসে যান। বেতার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ দেবার জন্যেও তিনি চেষ্টা করেছিলেন। বলা যায়, ভারতের মতো বিরাট গণভন্ডের দেশের নির্বাচনী কমিশনারের যেমনটি হওয়া উচিত, শ্রীসুন্দরম তেমনি উদার মনোভাবাপন্ন, গোড়ামী, সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত তিনি।



১৯৬৭ সালের নির্বাচনে ভোট গ্রহণের প্রথম দিনে

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচন

সমগ্র ভারতের অবিরত এবং প্রশ্নাতীত ডালবাসার অধিকার নিয়ে যে ব্যক্তিত্ব ইতিপূর্বে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সাধারণ নির্বাচনে একাই শত-সহস্রের মহড়া নিয়ে কংগ্রেসকে ঢালের মতো আড়াল করে (শিখণ্ডী বলা যায় না বোধহয়) বিরোধী আক্রমণ তুচ্ছ করে নির্বাচনী বৈতরণী অতি সহজেই পার করিয়ে দিয়ে গেছেন, কংগ্রেস-কান্ডারী সেই জওহরলাল নেহরু, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে অনুপস্থিত। নেহরুহীন ভারতের এই প্রথম নির্বাচনটি তাই কংগ্রেসী শিবিরকে দল হিসেবে এবার কোনরকম অন্যান্য সুবিধায় নিশ্চিত রাখতে পারে নি। ক্ষমতাসীন দলের যতটুকু সুবিধা, সেটুকু ছাড়া কংগ্রেস বর্তমান নির্বাচনে সমধিক সুবিধালাভের সুযোগে বঞ্চিত হয়েছে।

অন্যপক্ষে বিরোধীদল নেহরুহীন ক্ষমতাসীন দলকে এবারেই যথার্থ সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর ভরসা নিয়ে নির্বাচনী লড়াই-এ আহ্বান জানাতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচন তাই অপেক্ষাকৃতভাবে ব্যক্তি-প্রভাবমুক্ত এবং সেকারণ কথঞ্চিৎ মোহমুক্তও বটে। মনে হয়, '৬৭-র এই অভূতপূর্ব চারিগ্রা-বৈশিষ্ট্যই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনকে পূর্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সচেতন নির্বাচকের যোগান দিয়েছে। বর্তমান নির্বাচনে তাই যেভাবে জনসাধারণকে বোঝানোর, আকর্ষণ করার এবং বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে, ইতিপূর্বে তার সঙ্গো আমাদের পরিচিত তেমন ছিল না। সাধারণ নাগরিকগণও সেই পরিমাণে নির্বাচনী প্রচারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। ক্ষমতাসীন দল সহজ পারাপারের নৌকাটির জীর্ণ দশা অবলোকন করে বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। কংগ্রেস দলে বিপর্যয়কর ভাঙন এবং ক্ষমতাম্বন্দ্য

বর্তমান নির্বাচনকে নতুন চ্যালেঞ্জ দান করেছে। অনুপস্থিত নেহরুহীন দলের ভাঙনও ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলকে খর্বিত শক্তিরূপে খাড়া করায় জনমনে বিকল্প সরকার গঠনের আশা জাগ্রত হয়ে গেছে। দেশব্যাপী কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব দ্বিতীয় অবলম্বন না পেলে দলটির বোধ করেছে। ফলত কংগ্রেসের ঘরোয়াইরে প্রগতিশীল অর্থনীতির বিরুদ্ধবাদীরা চাপা হয়ে উঠতে পেরেছেন, এবং চরম প্রতিক্রিয়ার প্রবৃত্তি দল এবং জনসংঘ অন্যান্যবাহের চেয়ে এগিয়ে মাটি-মেয়দ-একটি রাজ্য সমগ্র দেশে কুল দাঁড়াবার মতো পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে। ভারতের মাটিতে পুনশ্চ প্রতিদ্বন্দ্বীর রথ সশব্দে গাড়িয়ে চলার সম্ভাব্য ক্ষতি করেছে ১৯৬৭-র বিভ্রান্ত পরিবেশ।

প্রচারের চর্চা

এবারের নির্বাচনে প্রচারের কলা-

কৌশল ও অন্যান্যরূপে অপেক্ষা স্বতন্ত্র। আপন দলের স্বপক্ষে বক্তব্য হাজির করা অপেক্ষা প্রতিবন্দী দলের বিপক্ষে কতি-কারক মন্তব্যই বিভিন্ন দলের নির্বাচনী লড়াই-এ প্রধান প্রচার-কৌশল হিসাবে গৃহীত হয়। এর জন্য বক্তারা বক্তব্য বিবের বন্যা বইয়ে দেন; সংখ্যাগরিষ্ঠ আনেন বিপক্ষ দলকে ঘায়েল করার জন্য পরি-সংখ্যানের প্রমাণ; পদ্ম লেখক অবতীর্ণ হ'ন, ছন্দোবদ্ধ পদ সৃষ্টি করে বিপক্ষ দলের স্বরূপ এবং তৈরি করা বিকৃতরূপ প্রচারে। অন্ধনশিল্পী অবতীর্ণ হয়েছেন কাটুন রচনায়। নাট্যকার সৃষ্টি করেছেন নির্বাচনী একাঙ্কিকা। নটশিল্পীরা তাকেই রূপা-য়িত করেছেন রাজপথের রঙ্গমঞ্চে। সংবাদপত্রগুলি নাগরিক বোধ-বিদ্রোহকারী দৈনিক প্রচারসম্ভার নিয়ে নির্বাচনী কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, যদিচ সাধারণের সংবাদপত্রের এসময় সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করাই উচিত। কেন না সাধারণ ক্রেতার সহযোগিতার ব্যাধি সংবাদে ব্যবসা করেন, দলীয় প্রচারের ছদ্মবেশী ভূমিকার স্বারা তারা আপন বীরদ্বারের সঙ্গে ভয়ঙ্কর রক্ত প্রভাবনা করেছেন। ঐক নির্বাচনের সময় এই সব সংবাদপত্র অন্তর্ভুক্তভাবে তাদের রাষ্ট্রাচালা স্বরূপকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেন। সচেতন পাঠক এই মুহূর্তে তাঁর সংবাদপত্রের স্বরূপটি চিনে নিতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে, পত্রিকা পাল্টানোর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারেন। কেন না এমন সহজে সংবাদপত্রের স্বরূপ চেনা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অন্য সময় সম্ভব হয় না।

এবারের প্রচার অভিযানে বানর-খেলা প্রদর্শন থেকে আরম্ভ করে হেলিকপ্টার থেকে বক্তৃতা দান হ্যান্ডবিল-বিলি পর্যন্ত বিভিন্ন চমকপ্রদ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পরসার জোরে বহু দল বহু মূল্য পোষ্টারের প্রদর্শনী করেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা প্রচারের চেয়ে অপপ্রচার এবারে চূড়ান্ত।

শ্রীমতী গান্ধীর মতো এস এস পি নেতা শ্রীমধু লিমারেও দলীয় প্রচার অভিযানকালে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আহত হ'ন। শ্রীলিমারের ক্ষেত্রে প্রায় প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। সশস্ত্র আক্রমণকারীরা হত্যার অভিপ্রায় নিয়ে তাঁর জীপ আটক করে। এই সমস্ত আক্রমণ কোন সচেতন বিরোধী দলের স্বারা হয়েছে এমন কথা স্বীকার করতে মন চায় না। প্রধানমন্ত্রীর ওপর আক্রমণকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই সব বিতর্কের চেয়ে বড় কথা এ জাতীয় প্রবৃত্তি সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রবিরোধী ফ্যাসিস্ট হিন্দুত্বকেই চাপা করে তোলে। সুতরাং সব বিতর্কের আগেই এটা অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে, একমাত্র

ফ্যাসিস্ট মনোভাবের মোজাত বসের হুঁচকি অর্থ করে—ভারাই এইসব চক্রান্তের নেপথ্য নায়ক। এমনতর উত্ত-জনাকে নির্বাচনে বশত করাই হবে শুভ-ইচ্ছা-সম্পন্ন স্ববশতির কাজ। ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কাল থেকেই এই জাতীয় নাগসী বর্ষরতার পরিচয় ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল। বিগত ৭৫ নভেম্বরের ঘটনা সেই জঘন্য মনোবৃত্তির প্রথম ইতিহাস রচনা করে প্যারামেন্ট ভবনের সম্মুখে।

বাই হোক, প্রচার এবং অপপ্রচারের সঙ্গে ব্যক্তির ওপর আক্রমণ এবং দলগত সম্বন্ধও বর্তমান নির্বাচনকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

কতিপয় ক্ষেত্রে সম্বর্ষের জন্য নির্বা-চনও কোন কোন এলাকায় স্থগিত রাখতে হয়েছে।

এতক্ষণে বাকিলাল এদেশ সেদেশ নেই

১৯৬৭ সালে বিভিন্ন প্রাণী আপনাপন প্রচারের জন্য যে সময়ের কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং তন্দ্বারা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে তাতে দেশের লোকের চক্ষু চড়কগাছে উঠেছে। এই দারিদ্র বৃদ্ধপত্রক ছিন্ন কপ্পা সর্বস্ব রোগ-জ্বর কাটা ঘরের বাসিন্দা ভারতবাসী এবারের প্রচার বহর দেখে অকম্পা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। ১৯৬৭-র নির্বাচন তাদের চমকিত করে এই সংবাদ বহন করে এনেছে যে, এদেশ আর সেদেশ নেই, মার্কিন দুনিয়াকে প্রচারের মাঠে প্রায় মেরে এনেছেন এবারের ভোট প্রার্থীরা।

কেউ হেলিকপ্টার কেউ এয়ারোস্টেন তো ব্যবহার করেইছেন, কেউ কেউ আবার টি পার্টি দিয়ে ভোটার আপায়ন করে ভোট তিকাও করেছেন।

দক্ষিণ দিল্লীর জনৈক প্রাণী (নির্দলীয়) নিজের কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করে লম্বা চলচ্চিত্র তৈরি করিয়েছেন এবং প্রতি রাতে সে চিত্র নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে প্রদর্শিত হয়েছে।

জনৈক প্রাণী রাজপথে একদল মূখোসাবৃত প্রচারকের প্রদর্শনীর আয়ো-জন করেন। মূখোস পরে শোভাযাত্রার বোরিয়ে এ'রা দুর্নীতি ও কাণ্ডোজারীর চেহারা তুলে ধরেছেন বড় বাম্বা নির্বাচনী এলাকায়।

কোন প্রাণী খালি পায়ে হেঁটে বিরোধী নির্বাচকের কাছ থেকে আপন শরীরের ওপর আঘাতকারী ইস্টকবর্কণও প্রার্থনা করেছেন।

'স্টার্ট' ও 'স্টেপ' নামের এই খেলায় কাগজের নোট উড়েছে যে পরিমাণ—তাতে এদেশকে অকম্পা বিদেশ বলে ভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

বহুতর বিদ্রোহিত মধ্যও কিন্তু নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য নাগরিক আগ্রহ এবার সর্বশেষ পরিলক্ষিত হয়। ৬০/৭০ এমন কি প'চানবই পাতাৎ পর্যন্ত ভোটদান নাগরিক উৎসাহের পরি-চায়ক। এই নাগরিক উৎসাহের মূলে অবশ্য নাগরিক সচেতনতা ক্রিয়াশীল এমন কথা বলা যেতে পারে না। রাজনীতির শিক্ষা দূরের কথা, সাধারণ জ্ঞানও এসেছে এক মূর্খিমের মানুষেরই মোরসি পাড়া। অধিকাংশ নির্বাচক জানেন না, কাকে, কেন, কি জন্য এবং কোন উদ্দেশ্যে ভোট দিচ্ছেন। প্রাণী পরিচয়ের তো কথাই নেই, বিশিষ্ট কতকগুলি দল বা দলজোটকেও নাগরিকগণ কি ভালভাবে চেনেন? অশি-ক্ষিত সাধারণের কথা সিরিয়ে রাখলেও শিক্ষিত কতিপয়ের ক্ষেত্রেও এই বোধের অভাব শোচনীয়। বরং বহু অল্প শিক্ষিতকে দেখেছি অপেক্ষাকৃত সচেতন ও পরিষ্কার ধারণা পোষণ করতে।

সুতরাং ভোটের ব্যাপ্ত ভারী হতে দেখেও দেশে রাজনৈতিক সচেতনতা বর্ধিত হয়েছে এমন কথা কোনক্রমেই বলা যাচ্ছে না। ১৯৬৭-র নির্বাচন বরং নেহরু-সদৃশ ব্যক্তির অভাবে কিছুটা স্বাধীন উত্তেজনা লাভের সুযোগ ভোগ করেছে মাত্র। শাসক দলের ব্যর্থতা ঢাকার মতো বিরাট ব্যক্তির জনগণের সামনে কোন প্রশ্নাতীত প্রভাব না রাখায়, 'কংগ্রেস বিহনে দেশ দিশাহারা' এমন মনোভাব এবার বহুলাংশে নিশ্চিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলত বিরোধী দলের ওপর কংগ্রেস যে একটা সহজ সুবিধা এতাবৎকাল ভোগ করে আসছিল, এবার তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসী নেতৃস্থ সরকারী নীতির মাধ্যমতা বর্ণনা অপেক্ষা প্রতিবন্দীর প্রতি বিরোধপূর্ণের পথকেই সুতরাং অধিকতরভাবে অবলম্বন করার, কংগ্রেসের দুর্বলতা জনসমক্ষে অপেক্ষা-কৃতভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে এবং সেই তুলনায় কংগ্রেসও অনেকাংশে সাধারণ মানুষের মন থেকে মর্যাদাচ্যুত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলকে অসহায় এবং নিঃস্ব বলে ধারণা জন্মেছে দেশবাসীর মনে।

দেশের সমস্যা অপেক্ষা নির্বাচনে চীন-রাশিয়া সম্মিধক মূল্য লাভ করার, শাসকদলের পক্ষে দেশের বহুতর সমস্যা-গুলিকে ধামাচাপা দেওয়ার সুযোগ হয়েছে বটে, কিন্তু সমস্যাপীড়িত মানুষকে তন্দ্বারা খুব অল্পই বিচলিত করা সম্ভব হয়েছে। চীন-রাশিয়া প্রসঙ্গে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দল জনমনে বিরোধ সৃষ্টিতে কিছুটা সমর্থ হলেও, সেই গণ-

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তড়াতাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়

নতুন

মাইক্রোসফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার অজ আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোসফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোসফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী দ্রুত ভাঙা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি ছন্দ বর্ণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা দূর করার শক্তি বিগতপূর্বত বেগী সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মস্তিষ্কের মধ্যে কাজ শুরু করে ব্যথা-অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলাতে থাকে ও নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র ব্যথা দূর করার সক্রিয় উপাদানটি অতি সংকেই এবং খুবই লীপসির শরীরের মধ্যে বিশেষ গিরে থেকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইসঙ্গেই মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি নমনীয় আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুসী খেতে পারেন—চকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো দ্রব্য পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত রোগের ক্ষণস্থায়ী নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' থাকবে: ব্যথা-বেদনা, মাথাব্যথা, গা-ব্যথা, হাতব্যথা, পাঁজি বেদনা, জ্বর-জ্বর-জ্বর, হু-জ্বর, গলাব্যথা।

আম্রো: প্রাথমিক: ১টি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার ব্যাবহার। বিপণনের ক্ষেত্রে একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশন।

নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিতাবে কাজ করে দেখুন



আরাম

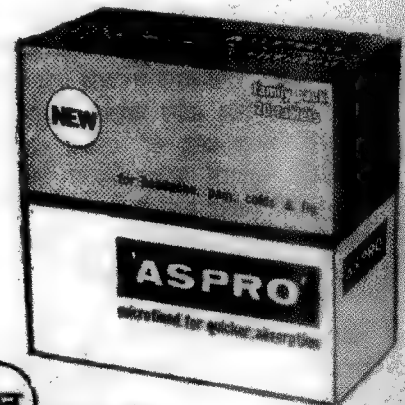


আরাম

ট্যাবলেটের ক্যাঙলির ডাকার হস্ত নড় হয়, ততই শরীরের মধ্যে বিশেষ খেতে গেলী হয়—আপনার আবার পেয়েও যাব খাবে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোসফাইণ্ড দ্রুতকার করে নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র একটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি ছন্দ বর্ণা রয়েছে। ততই শরীরের মধ্যে গলে-গলে বিশেষ খেতে গেলী খাবে।

নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।



নতুন

মাইক্রোসফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

সংখ্যান-৭৭ (৭৭) বোনা

AGL/08

বিভ্রান্তির দ্বারা সমর্থনলাভে সমর্থ হয় নি।

ভারতের মতো একটি অশিক্ষিত মহা জনসমূহের দেশে নির্বাচনে হার-জিতের দ্বারা সঠিকভাবে জনমনোভাবের বিচার হয় না। কেন না, বিরাট গণতন্ত্রই বিরাট গণসম্মেলনের প্রামাণ্য পরিচয় অনার্লোকিত দেশে তুলে ধরতে পারে না।

এজন্যই হয়ত ডঃ লোহিয়া প্রমুখ বিরোধী নেতারা মনে করেন, কংগ্রেস সরকার পুনশ্চ ক্ষমতায় আসীন হলেও তন্দ্বারা সত্যকার জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না এবং অসন্তোষেরও অবসান সম্ভব হবে না।

গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে বাধিত

একমাত্র করেদী এবং উম্মাদরাই নাগরিক অধিকার, প্রাথী মনোনয়নের সুযোগ থেকে বাধিত। বিচারামীন অবস্থায় আটক বন্দীদেরও ভোটদানের সুযোগ নেই। কিন্তু সরকারী কর্মচারী হওয়ার জন্যও বেশ কিছু লোক ভোট প্রদান ক্ষমতায় বাধিত থেকে যান বলে অভিযোগ। নির্বাচনের কাজে পোলিং অফিসারদের উপে নিষেধ হওয়ার আপন একাকার গিরে এরা ভোট দিতে পারেন না। এজন্য এদের ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই পোস্টাল ব্যালট বহুক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ নেই।

দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, দশ হাজার আশিটি পোস্টাল ব্যালট পেপার পোস্টাল ভোটদাতাদের কাছে পঠানো হয়েছে যদিচ সুবেদনকারীর সংখ্যা তের হাজার দশ' ষাটের মতো। আবেদনের পর্বশেষ দিন পার করে পরের দিন নাকি এগারশ' চৌদ্দটি আবেদন পড়ে এবং দু' হাজার একশ' ছাপারটি অসমাপ্ত থাকায় কিম্বা নিয়ম-মাত্রিক না হওয়ার মঞ্জুরী লাভ করে নি। বহু পোলিং অফিসার ব্যালট পেপার পান নি বলে অভিযোগও করেছেন।

বিভিন্ন কারণে যারা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের ভোটটিই বাঞ্চে ফেলতে পারবেন না, তাঁদের জন্য কোন গণতান্ত্রিক বিধান তৈরি করে তাঁদের অধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে এজন্য সময়ও প্রার্থনা করেছেন।

অত্যাধিকারী নাগরিক

নিজের সমর্থিত প্রাথীকে নির্বাচনী অভিযানে শুভেচ্ছা জানাতে এদেশেরই মহিলা আঙুল কেটে রক্তের তিলক পরিচয় দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর ললাটে এমন তিলক জড়ুটেছে। কিন্তু সমর্থিত প্রাথীর জন্য অগ্নিতে আত্মহত্যা দিলেন মাদ্রাজের অষ্টাদশী জয়লক্ষ্মী। সংবাদে প্রকাশ ভোট-

দানের অপরাধে যারা পড়লে জামিনে খালাস পাওয়ার পর জয়লক্ষ্মী কাপড়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

ওদিকে লক্ষ্মী-এ জনৈক মহিলা ভোট দিতে গিরে সন্তানের জন্মদান করেন। তাঁর অবস্থা ভোট দেওয়া আর হয়ে ওঠে নি, কেননা বৃথের অদূর থেকে হাসপাতালের দ্বারায় গিরে হাফির হতে হয়েছিল।

এই দুই মহিলার চাঞ্চল্যকর সংবাদের সঙ্গে আর এক মহিলার সংবাদও শোনা গেছে। ইনি ছেলের পিঠে চড়ে ভোট প্রদান কেন্দ্রে এসে তাঁর পবিত্র নাগরিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

সংবাদে প্রকাশ, ভূপালের করকটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আভ্যন্তিক ভিড়ের দরুন রাত্রি নয়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলতে থাকে।

গোহাটির জনৈক পোলিং অফিসার নাকি তাঁর মনোমত প্রাথীর চিহ্নে ছাপ দেওয়ার পরামর্শ দান করেছেন এই অভিযোগে তাঁকে অপসারিত করা হয়েছে।

নির্বাচনে রথী-মহারথী

এবারের নির্বাচনে সবার দৃষ্টি বাঁদের ওপর তরী দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং প্রচুর কৌতূহলের কারণ হয়েছেন। নিচে এদের সাজিয়ে ধরা হল:

উত্তর বোম্বাই কেন্দ্র থেকে বিভাজিত প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন কংগ্রেস ত্যাগ করে উত্তর বোম্বাই কেন্দ্রেই তাঁর কংগ্রেসী প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রী জি এস বাভের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এস কে পাতিলের মহড়া নিচ্ছেন এস এস পি প্রাথী জর্জ ফার্নান্ডেজ দক্ষিণ বোম্বাই লোকসভা কেন্দ্রে।

কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ নাদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ডি এম কে প্রাথী শ্রীনিবাসন।

দক্ষিণ মাদ্রাজ লোকসভা কেন্দ্রে ডি এম কে নেতা সি এন আমাদোরাই-এর বিরুদ্ধে লড়াই-এ নেমেছেন কংগ্রেসী শ্রমনেতা কে গুরুচরণ।

বাম কম্যুনিষ্ট নেতা অনিরুদ্ধনের সঙ্গে মর্যাদার বৃদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন আর শঙ্কর (কং)।

অতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে বাম সমর্থিত সাধারণ মানুষ জে এম বিশ্বাস একটি বহু-প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফলের জন্মদান করতে দাঁড়িয়েছেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে।

আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে নেতাজীর ভ্রাতৃপুত্র অমিরনাথ বসু (এফ-বি সম-

ধিত) চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী শচীন চৌধুরীকে।

প্রাক্তন আইনমন্ত্রী অশোক সেনের বিরুদ্ধে জনসম্মী হারিপদ ভারতী এবং বাম কম্যুনিষ্ট সমর্থিত সত্যপ্রিয় রায় বৃদ্ধে নেমেছেন কলকাতার উত্তর পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে।

এস এস পি নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে কনৌজ লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এস এন মিশ্রের (কং)।

মধ্য-দক্ষিণ বোম্বাইতে সি পি আই নেতা এস এ ডাঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন এইচ সি মহীন্দ্র (কং)।

এস এস পি চেয়ারম্যান এস এম ঘোষীর বিপক্ষে আছেন কংগ্রেসের ডি এন গ্যাডগিল (কং)।

জনসম্ম নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে লোকসভা আসনের জন্য কংগ্রেস দাঁড়ি করিয়েছেন সুভদ্রা ঘোষীকে।

রাজস্থানে মালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মহারাণী গায়ত্রী দেবী (স্বতন্ত্র) নেমেছেন রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্যাসের (কং) সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায়। এই কেন্দ্রে বিশেষ নজর পড়ার আর একটি কারণ, শ্রীবাস প্রথমে অন্য কেন্দ্রে মনোনয়ন পান, কিন্তু মহারাণী মালপুরা থেকে দাঁড়াচ্ছেন জানার পর ব্যাস তাঁর কেন্দ্র পরিবর্তন করে মহারাণীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এই কেন্দ্রে।

নির্বাচনবিধি লঙ্ঘন

১৯৬৭-র নির্বাচনে বেসামাল অবস্থা বোধ করে কোন কোন দল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। এই অপপ্রচার দলের বিরুদ্ধে তো বটেই ব্যক্তিগত বিরুদ্ধেও কুংসা নিক্ষেপের সব রকম শালীনতা উপেক্ষা করেছে। কোন কোন দল আপনাকে এতই নিঃস্ব বোধ করে যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিমূলক পোস্টার ছেপে প্রাচীরগারে তাই লটকে বেড়াতেও বিধা করে নি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারে মদৎ দিয়েছেন দেশের সংবাদপত্রগুলিও। সাধারণ বোধ-বুদ্ধিতেও যা অপপ্রচার বলে মনে হয়, সংবাদপত্রের বান্দু সাংবাদিক তা ধরতে পারেন না এমন নয়, কিন্তু তাঁদের অনেকেই জেগে ঘুমান বলে, অপপ্রচারের কাংসাধারন সংবাদপত্রের চক্কানিনাদের সঙ্গে বিকটভাবেই শ্রুত হয়। এমনতর অপকৌশল অগণতান্ত্রিক অসভ্য কুকীর্তি। কিন্তু কি আর করা যাবে, কীর্তির ঘরে শূন্যতা দেখা দিলে কুকীর্তিই অবলম্বনীয় হয়ে ওঠে।

ইন্দোনেশিয়া:

ডঃ সুকর্ণ যে আর বেশিদিন প্রেসিডেন্টের গদী আঁকড়ে থাকতে পারবেন না—এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ আইন পরিষদ পিপলস কনসালটেন্ট কংগ্রেস আগামী মাসের ৮ই মার্চ এক অধিবেশনে হচ্ছে; যেখানে প্রেসিডেন্টের গদী থেকে সুকর্ণের অপসারণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত কী হবে সে-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ সামান্যই আছে, আর একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে তা কার্যকর করতেও জেনারেল সুহর্তো যে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন এ-ব্যাপারেও সন্দেহ করা শাণ্ডল্য।

তবুও মজাটা হলো এখানে যে, যে-প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আগন্তি উঠেছে ১৯৬৫ সনের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর থেকেই তিনি এতদিন পর্যন্ত স্বপদে বহাল থেকেছেন। সুকর্ণের পদত্যাগ দাবি করে ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র ও জনতার একাংশ জোর আন্দোলন চালিয়ে চলেছিল। সেনাবাহিনী বা জেনারেল সুহর্তো প্রথমে সে-আন্দোলনের রাশ টেনে ধরলেও পরে সেনাবাহিনীর নেতারা এই দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের ডান হাত কাটা হয়ে গিয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবিন্দ্রন্যোকে সেই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে সামরিক আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এরপরে বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ ওমর দানীরও একই ভাগ্যবিধি ঘটেছে। ডঃ সুকর্ণও সেই সন্ত্রাসের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, ক্ষমতা দখলের জন্য কমিউনিস্ট চক্রান্তের কথা তিনি সম্পূর্ণ জানতেন এবং তাঁর অনুমোদন নিয়েই অভ্যুত্থান ঘটেছে—সুকর্ণ-বিরোধীরা এই অভিযোগ তোলেন এবং তাঁর বিচার-দাবি করেন। পিপলস কনসালটেন্ট কংগ্রেসও প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর ভূমিকার জবাবদিহি করার জন্যে ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব কেন হলো যার জন্যে অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে পেরেছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ কি জনতার কি কংগ্রেসের দাবির কাছে হার মানতে স্বীকার করেন নি। যদিও অন্যতম অপরাধী বলে সাব্যস্ত সুদর্দিয়ো সামরিক আদালতে তাঁর বিবর্তিতে স্বীকার করে-ছিলেন যে, অভ্যুত্থানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু সুকর্ণ নিজেকে তা কখনোই স্বীকার করেন নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের গদীতে সুকর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যদিও সেনা-রায়করা তাঁকে এ-হুমকি দিয়েছিলেন যে,



ভবিষ্যতের ডাবনার বিষয় সুকর্ণ

তিনি যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগে অসম্মত হন, তবে বলপ্রয়োগ করে তাঁকে অপসারণ করা হবে—আসলে এসবের কোনটাই করা হয় নি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক থেকে জেনারেল নাসুশন, জেনারেল সুহর্তো পর্যন্ত সকলেই প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে নানা ভাষায় ও ভাবে শাসিয়েছেন, কিন্তু তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে, কিম্বা তাঁকে প্রেসিডেন্টের আসন থেকে নামিয়ে দিতে সাহস করেন নি কেউ। এ-দুর্বলতার কারণ হলো, ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে, —বিশেষত মধ্য ও পূর্ব জাভার এখনো প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের জনপ্রিয়তা অপরি-সীম, সাধারণ লোকের কাছে এখনো তিনি রাজা, রূপকথার নায়ক। জোর করে সুকর্ণকে সরিয়ে দেবার অর্থ যে দেশে হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা এমন কি গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত বেধে যাওয়া—এটুকু সেনাবাহিনী বেশ ভালো করেই বোঝে। সে জন্যেই প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের কাছে তাঁরা দফায় দফায় আবেদন জানাচ্ছেন তিনি বেন দেশের নিরাপত্তা, সংহতি ও শান্তিশৃঙ্খলার স্বার্থে নিজে থেকেই পদত্যাগ করেন।

একথা ঠিক যে, সামরিক আদালতে যদি প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়, তবে আদালতের রায় তা বিপক্ষেই যাবে। এবং অপরাধীর শাসি যে মৃত্যু সে-বিষয়েও সন্দেহ করার কারণ নেই। সেনানায়করা হয়তো এতটা মুহূর্তে চান না তাঁদের প্রেসিডেন্টের প্রতি তাছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে দেশে অশান্তি দেখা দেবে প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্যেই তারা চেয়েছিলেন, সুকর্ণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চিরতরে বিদেশে চলে যান যাতে জনরোষের কোপে তাঁর আর পড়তে না হয়। এক সময় একধর শোনা গিয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ নাকি তাঁর সন্তান-সম্ভবা তৃতীয়পক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে জাপা যাবেন এবং জাপ সরকারও তাঁকে আশ্রয় দিতে সন্মত করবেন না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সেগদলি গল্পবলে উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন।

কিন্তু ৮ই মার্চ কী ভাগ্য নিয়ে আসছে, তা কি প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ জানে

না? তবে কিসের ভরসায় তিনি আছেন? কেবল আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক সাহস কি? পুরোনো দিনের ঐতিহ্য সন্মিলন করেই কি? উঃ সুকর্ণকে বাদ দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়—একথা সত্য। ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে, ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা, তাঁর অসামান্য নেতৃত্ব ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে, একথা সত্য; কিন্তু এও তো অস্বীকার করার উপায় নেই জনতার রায়ে তাঁর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ হস্ততো তাঁর দল ন্যাশনালিস্ট পার্টির দিকে চেয়ে আছেন তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে, তাঁকে সমর্থন করবে, প্রেসিডেন্ট পদ তাঁর অঙ্গ হয়ে থাকবে—এই আশা করে। কিন্তু দলের সে শক্তি আর আছে কোথায়? তা ছাড়া সেনাবাহিনী যে হুমকি দিয়েছে, সুকর্ণকে অপসারণের ব্যাপারে স্বীয় তাঁর পক্ষ সমর্থন করবেন তাদের নিশ্চয় করে দেওয়া হবে—একে অগ্রাহ্য করে মুখোমুখি হয়ে লড়ার কামতা ক'জনের আছে? চীন:

এখানে দেওয়ান পরিবর্তন সাংবাদিকদের স্থান গ্রহণ করার পর থেকে

প্রতিদিনই স্ববিরোধী খবর প্রচার করা হচ্ছে। সবশেষ সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে, লিউ শাও-চি এবং মার্শাল চু তেঁকে তাঁদের সমস্ত পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। লিউ চীনা রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টের পদেই শঙ্কু অধিষ্ঠিত ছিলেন না, কমিউনিস্ট পার্টিতেও তিনি নেতৃত্বের পর্যায়ে নম্বরের নায়ক ছিলেন যদিও পদ তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্টের। পলিটবুরোর তিনি অন্যতম সদস্য, এই সর্বোচ্চ সংস্থার স্ট্যান্ডিং কমিটিরও সদস্য ছিলেন তিনি। দলের থিয়োরিটি-শিয়ান বা তত্ত্ববিদ হিসেবে তাঁর আসন কারোরই নীচে নয়, এমন কি তাঁর ভ্রাতৃ এবং সমর্থকের সংখ্যাও চীনে কম নয়। এই লিউ শাও-চিকে অপসারণ এবং হের করার জন্যে চীনে চেষ্টা চলেছে গত কয়েক মাস ধরে।

বস্তুত প্রলোভনীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কার্যক্রমের একটা কাজই ছিল লিউ-বিরোধী আন্দোলন। গত কিছুকাল ধরে চীনে যে মাও সমর্থক দলের লোকেরা লিউ-বিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছে তার প্রধান কারণ হলো, মাও সে-তুং লিউর শক্তিকে ভয় করেন, তাঁর জনপ্রিয়তাকে ঈর্ষা করেন। মাওপন্থীদের সঙ্গে লিউ পন্থীদের সংগ্রাম এখন চরম পর্যায়ে

উন্নত হলো লিউর অপসারণে। চীনের বিভিন্ন প্রদেশে দৃশ্যে তাঁর সংঘর্ষ চলেছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও এবং তাঁর সেনাবাহিনী যদি মাও-এর পেছনে না থাকতেন, তবে মাও বা তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লবী বা লালরক্ষীদের কী অবস্থা হতো বলা কঠিন। অথচ এই লিউ শাও-চি-ই একদিন ছিলেন মাও-এর প্রথম ও প্রধান সহায়, উপদেষ্টা। অশীতিপর বৃদ্ধ সেনানায়ক চু-তের নেতৃত্ব ছাড়া চীনা বিপ্লব, কুয়োমিনটাং দলের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট সংগ্রাম সফল হতো কি না সন্দেহ। কিন্তু সেই চু-তেকে আজ অবলীলাক্রমে বাতিল করে দিয়েছেন মাও সে-তুং। ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের সভা না ডাকার জন্যেই নাকি মাও তাঁকে পদচ্যুত করেছেন। সেউ কমিটিতে লিউ শাও-চিকে অপসারণ করাই ছিল নাকি মাও-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু কমিটিতে লিউ-সমর্থকেরা এখনো সংখ্যাধিক্য বজায় রেখেছে—এই বিশ্বাসেই নাকি চু-তে সভা ডাকেন নি।

এদিকে তিব্বতেও মাও-বিরোধী হাঙ্গামা বিস্ফুট হয়েছিল, তবে চীন থেকে তিন ডিভিশন সৈন্য আমদানী করে মাও-পন্থীর আবার হুতগোরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছে।





লেখক নিশীথ চক্রবর্তীর নাম সকলেই প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। সাহিত্য-রসিক রিটার্ড 'সাবলক্ষ্য' অমূল্য সেনের বৈঠকখানায় সেদিন তাঁর আগমনে সকলেই অবাক হলেন। দশ-বারো বছর নিশীথ লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর লেখা কোন বই এখন বাজারে মেলে না। শব্দ লেখা ছাড়েন নি, কলকাতা শহরও। আঙ্গকাল-কার সাহিত্যিকরা অনেকেই তাঁকে চেনেন না। এক কালে যারা চিনতেন এখনকার নিশীথ চক্রবর্তীকে, তাঁরাও চিনতে পারবেন না।

উপস্থিত ভদ্রলোকদের সাথে নিশীথ চক্রবর্তীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে অমূল্য সেন বললেন, 'আমাদের অতি সৌভাগ্য আজ আমাদের আসরে পড়ুনো লেখক নিশীথবাবু এসেছেন।'

সকলে আবেকবার চেয়ে দেখলেন নিশীথ চক্রবর্তীকে। সবার থেকে অনেকটা দূরে বসেছেন কোণের দিকটাত্তে। ধূতি-পাঞ্জাবী পরা প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক। চেয়ারের হাতলে জাতিগাছ। চোখের দৃষ্টি বিষন্ন, কপালে সুগভীর কুণ্ডন। পাতলা অধরোষ্ঠের ওপর লম্বাটে নাক বড়লে পড়েছে। দেহ কুশ। সকলের মনোযোগে তিনি এতটুকু চম্পল হ'লেন না, তাঁর বিষন্ন উদাস দৃষ্টি বরং ঈষৎ করুণ হয়ে উঠল।

অমূল্য সেনের বৈঠকখানায় প্রতি

অলঙ্কার

শ্রী বিমল বায়

সম্মুখ সাহিত্যালোচনার আসর বসে। কখনো উপস্থিত কেউ লিখিত গল্প-কবিতা পড়েন, কখনো অপবের লেখার ওপব আলোচনা হয়। নিশীথ চক্রবর্তীর মূখ থেকে কিছ্ শুনতে সকলেই উৎসুক

হয়ে উঠলেন। সাহিত্যিক উকিল যাদব খোমাল প্রস্তাব পেশ করলেন।

'আজ আমরা নিশীথবাবুর মূখ থেকে কিছ্ শুনতে চাই।'

প্রস্তাব সমর্থন করে ডি, এস, পি,

‘মিথি গল্প বললেন, ‘একদিন গল্প-লেখক’ হিসেবে গুৰু নাম ছিলো।’

নিশীথ চক্ৰবৰ্তী মাথা তুললেন। দ্বাই ওৎসুক্যে তাঁৰ দিকে তাকালেন। কয়েক মূহূৰ্ত চুপচাপ কাটল। নিশীথ চক্ৰবৰ্তীৰ ঠোঁট কাঁপল, গলা-খাঁকিৰ দিগে মৃদুৰূপে বললেন, ‘লেখা অনেকদিন ছেড়েছি। আপনাতো কেউ বন্দন।’

অমল্য সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, ‘নিজের মূখে উনি কিছু না বললেও, আমি আপনাদের গুৰু লেখা একটি গল্প পাঠ করে শোনাবো। গুৰু শেষ ছোট গল্প। বয়সে বছর আগে ‘বিচিত্র ভাবত’ মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল।’

নিশীথ চক্ৰবৰ্তী মৃদুৰূপে আপত্তি জানালেন। সে আপত্তি কেউ গ্রহণ কৰলেন না। আলমারী খুলে বাঁধানো বিচিত্র ভাৱত বের কৰে গল্পটি পড়তে শুরু কৰলেন।

গল্পের নাম ‘অলখা।’

আমায় স্ত্রী মঞ্জুলাৰ অতীত ইতিহাস আমি যে বিয়ের আগেই জানতুম, মঞ্জুলা জানত, কিন্তু এত বেশি চাপা কখনো কিছু বলত না। বিয়ের পর যখন সন্দেহ হল মঞ্জুলাকে সত্যি আমি পোয়েছি কি না—তখন মনে হল, যে ওঁদাৰে আমি ওকে গ্রহণ কৰেছি সেটা অকৃত্রিম ও স্বাভাৱিক ছিল না হয়ত।

যত দিন কাটতে লাগল, স্থির প্রত্যয় হল মঞ্জুলাকে আমি পাই নি এবং কখনো সম্ভবও নয় পাওয়া।

একদিন সকালে মঞ্জুলাকে বারান্দাৰ ৱেলিং হাত রেখে চুপ কৰে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। চোখে শূন্য দৃষ্টি। সকালের সোনালী বোধ পোষা কুকুৰ-ছানার মতো শূন্যে আছে ওৰ পায়েৰ ডগায়। ৱেলিং বেয়ে ওঠা আইপোমিয়ার লতাৰ ফুলেৰ সমাবাহ। বোগেনভিলিয়াৰ ডালে ডালে হাওয়াৰ কানাকানি। আমাৰ ভেতৰটা দুলে উঠল। কেন এমনি দাঁড়িয়ে আছে? সন্তপণে কাছে গিয়ে আলগোছে ওৰ পিঠে হাত রেখে দাঁড়ালুম। মঞ্জুলা ফিৰে তাকাল। ভেবেছিলুম বুদ্ধি চমকে উঠবে। কিন্তু না, শূন্য ফিৰে তাকাল। জাহাজ গন্তব্যে পৌঁছে যেমন ধীৰে ধীৰে জেটিতে এসে লাগে, তেমনি শান্তভাবে মঞ্জুলা ফিৰে তাকাল। আমাৰ ডান হাতে ধৰা থবনা কলমেৰ দিকে তাকিৰে অক্ষুণ্ট কণ্ঠে বলল, ‘লেখা ফেলে উঠে এলে কেন?’

‘লেখা আসে না। নিৰ্ধাৰ শূন্যকিৰে গেছে।’

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। চাউনিৰ ভেতৰ স্পষ্ট অনুৰোধ দেখলুম।

‘শূন্য-সংখ্যাগুলোর লেখা তাঁৰ কৰবে না?’

‘সব লেখা হয়ত করে উঠতে পারবো না।’

মঞ্জুলা চুপ কৰে ৱইল। ওৰ নীৰবতায় আমি অস্থির হয়ে উঠলুম। এই বাহ্যিক প্রশান্ত নিৰ্লিপ্ততা, আমাৰ বিশ্বাস, মঞ্জুলাৰ আত্মৱক্ষাৰ বৰ্ম। যদি সত্যি আমাকে ভালবাসত, মৌনতায় নিমগ্ন কৰে ৱাখত না নিজেকে। গুল্মোট ভেঙে মূখৰ হয়ে উঠত।

ওৰ দুহাত টেনে ধৰে বললুম, ‘আমাকে ক্ষমা কৰো, মঞ্জু, জেনে-শুনো আমি তোমাৰ সূত্ৰেৰ অন্তৰায় হয়েছি।’

এতটুকু চমকালো না মঞ্জুলা, শূন্য একবাৰ আমাৰ দিকে তাকাল। স্থির স্বচ্ছ দৃষ্টি। শিশিৰ-ৱাৰা গোলাপেৰ পাৰ্শ্ব মতন ওব বিবৰ্ণ ঠোঁট দুটি আক্ৰমণে কঁপে উঠল। মনে হল অতি কণ্ঠে অতি বস্ত্ৰে নিজেকে সংযত কৰল। আমিও চুপ কৰে থেকে সময় দিলুম ওকে।

মঞ্জুলা মৃদু প্রতিবাদ কৰল, ‘শূন্য হই নি কি কৰে জানো?’

‘আগাৰ সত্যকাৰ-ধাৰণা। নিজের মধ্যে চিত্তবিক্ষণ অনুভব কৰি।’

‘তোমাৰ পাগলামো।’ মঞ্জুলাৰ গলায় অপ্ৰসন্নতা।

‘পাগলামো নয়,’ আত্মপ্ৰত্যয়েৰ সূত্ৰে বললুম, ‘আমি লেখক, আমি চিত্ৰ-সৃষ্টি কৰি, যদি মানুষেৰ ভেতৰটা না জানতে পাৰি তো লিখি কি কৰে?’

মঞ্জুলাৰ চোখ জলে ভৰে উঠল, ভাৱী চোখেৰ পাতা তুলে বলল, ‘জানাতো অনেক বাকী থাকে। এখন যাও, লক্ষ্মীটি, লেখাগুলো শেষ কৰো গে।’

যবে ফিৰে আবাৰ ৱননাৰ খসড়াগুলো নিৰে বসলুম। অনেক চেষ্টা কৰেও চাৰ-লাইন লিখতে পাৰলুম না। লেখাৰ টেবল ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ পায়চাৰি কৰলুম, কিছু লেখাৰ মত মানসিক স্বেৰ্ষ পেৰলুম না। চাদৰখানা কাঁধে ফেলে ধীৰেনেৰ উদ্দেশে বেরোলুম।

ধীৰেন আজকাল সৰ্বক্ষণ বাসায় থাকে। গেলেই পাওয়া যায়। শূন্য ওৰ ঠিকদাৱী ব্যবসাৰ অবস্থা ভালো না, গত বছৰ বেশ কিছু লোকসান দিয়েছে, সে ধাৰা এখনোও সামলে উঠতে পাৰে নি, বাইৰে কিছু বিল, কিছু সিকিউৰিটি আটকা পড়েছে, আদায়েৰ জন্য লেখালেখি কৰছে।

অনেকদিন পরে আমাকে দেখে অবাক হল। হাতের কাগজপত্র একপাশে সৰিৰে বেখে শূন্যকৰ্মে অভ্যর্থনা কৰল, ‘এসো—তাৱপৰ কি খবৰ তোমাৰ?’

মুখোমুখি চেয়ারে বসলুম। সিগাৱেট

ধাৱিয়ে সহজ হয়ে বললুম, ‘তোমাৰ কাছে এসলুম।’

‘আমাৰ কাছে? আশ্চৰ্য এখনো আমাকে তুমি ভোল নি?’

‘ভুলতে চেয়ে অন্যায় কৰেছি ধীৰেন। তুমি জানো স্নায়বিক ৱোগী যে জিনিস ভুলতে উঠে-পড়ে লাগে, সেই জিনিসই বড়ো বেশি ভেবে দুৰ্বল হয়ে পড়ে। আমাৰও ভাই সেই দশা।’

বস্ত্ৰেৰ উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এত স্পষ্ট কথা আমাৰ মূখে শুনবে আশা কৰে নি ধীৰেন।

বলল, ‘সাহিত্যিকৰা অমন ৱোগে ভুগে থাকে। আমি কি তাহলে তোমাৰ কাছে দুঃস্বপ্ন?’

‘আগে তাই ভেবেছি। এখন নিজের ভুল ধৰতে পেরেছি। যে ভয়ের সম্মুখীন হবাৰ সাহস আমাৰ ছিলো না, সেই ভয় ভাঙতে মাঝে মাঝে তুমি আমাৰ বাসাৰ যাৰে ধীৰেন?’

ধীৰেন ভুৱ কুঁচকে বলল, ‘আমাৰ ক্ষমা কৰো ভাই। তোমাৰ এ অনুৰোধ আমি ৱাখতে পাৰবো না।’

ধীৰেনেৰ হাত ধৰে মিনতি কৰে বললুম, ‘অনুরোধ না ৱাখলে মনে কৰবো তুমি আমাকে ভুল বুঝেছো, এবং তাতে মঞ্জু আব আমি দুজনেই দুঃখ পাবো।’

আপত্তি জানাতে তৎপৰ হিছিল ধীৰেন, তাকে কিছু বলবাৰ সূচ্যোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। বাড়ি ফিৰে দেখি, মঞ্জুলা আমাৰ গল্পেৰ পাণ্ডু-লিপি পড়েছে।

অমল্য সেন ‘বিচিত্র ভাৱতৰ’ পৃষ্ঠা ওল্টালেন। গল্প পড়াত এই অল্প বিৱৰ্তিত মধ্যে অনেকেই লেখক নিশীথ চক্ৰবৰ্তীৰ দিকে তাকালেন। নিশীথ চক্ৰবৰ্তীৰ মূখ্য প্ৰস্তুবেৰ মতো কঠিন। যযা কাঁচের মতো ঘোলা চোখ নিম্পলক। যেন এতক্ষণ অন্য কোন লেখকেৰ গল্প শুনাইলেন।

যাদব ঘোষাল কমিশনাৰ মস্তাখ মিগ্ৰকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, অমল্য সেন পুনৰাব গল্প-পড়া শুরু কৰলেন।

একদিন আফিস থেকে ফিৰতেই মঞ্জুলা প্ৰশ্ন কৰল, ‘ধীৰেনবাৰুকে তুমি আসতে বলেছো একানে?’

জবাব না দিয়ে পাশ কাটাতে চাইলে জামাৰ আসিতন আকৰ্ষণ কৰে মঞ্জুলা বলল, ‘কেন তুমি আমাকে এমনি জ্বালাতন কৰো?’

জামা ছাড়িয়ে নিৰে বললুম, ‘ধীৰেনেৰ আসা-যাওয়াৰ কোন দোষ নেই, মঞ্জু। ওৰ ওপৰ একদিন অবিচাৰ কৰেছি, এবাৰ তাৰ সংশোধন হোক।’

‘তাহলে তুমি ওকে আসতে বলেছো?’
মঞ্জুলার চোখের বিস্ময় অধিকতর
উজ্জ্বল করে বললুম, ‘সুখী বলি নি,
হাতে ধরে অনুরোধও করেছি।’

বিস্ময় মুছে গিয়ে চোখ ছলছল করে
উঠল মঞ্জুলার, ভারী গলাব বলল, ‘আর
তোমার অনুরোধ ধীরেনবাবু রেখেছেন
জেনে খুব সুখীও হয়েছে নিশ্চয়ই।’

কথাটা বলে মুখ ফেরল। মঞ্জুলার
চোখের পাতা জলে ভারী হয়, চোখ ছল-
ছল করে, গলা ধরে যায়, ঠোঁট কাঁপে,
কিন্তু কখনো কেঁদে ভেঙে পড়ে না।
যদি কাঁদতে কিংবা কাঁদার ভান করেও
একবার ভেঙে পড়ত, কি বে সুখী হতুম।
কাঁদলে নিশ্চয় ধরা পড়ত সে, ভয় না
পেলে কেউ কাঁদে? চীৎকার কবে?
কাঁদলে নিশ্চয় ধরা পড়ত মঞ্জুলা—সে
ভীষণ দুঃস্বপ্ন বোবা রহস্যব মধ্যে
লুকিয়ে থাকে, সে আতঙ্ক প্রকাশ হত
আমার কাছে তার কাছে। সে আতঙ্ক
ধেকে দুঃজেনেই মুক্তি পেতুম।

আমি শিব নিশ্চয় মঞ্জুলাকে পাই
নি। কিন্তু পাই নি বলে সুখী হয়ে
ওর ওপর দখল রাখব এমন পাশ্চাত্য আমি
নই। স্বামীজীর জোরে স্বীর কমলোকের
সমস্ত রঙ ঘষে মুছে সাদা করে দিতে
পারি নি। সব জেনেই একে আমি গ্রহণ
করেছি, মালিন্য ছেঁকে ঞ্জিক যদি না
থুঞ্জে নিতে পারি তবে দুঃসাহস কেন
করতে গেলুম?

আরেকদিন মঞ্জুলা বলল, ‘ইচ্ছে
করলেই নিজেকে সুখী করতে এমনি করে
তুমি আমার অপমান করতে পারো না।’

‘তুমি কি ধীরেনকে আসতে নিষেধ
করতে পারো না?’

‘আমি পারি নে।’

‘আমিও পারি নে,’ বলে মঞ্জুলাব
কাছ থেকে সবে যাবাব উপক্ৰম করতেই
দেখলুম, ধীবেন বাড়ির ভেতর ঢুকছে।

আমাকে বেবুতে দেখে ধীবেন জিজ্ঞাসা
করল, ‘কোথায় যাচ্ছে?’

আমি অতিশয় ব্যস্ততার ভান করে
বললুম, ‘তুমি বসো, বাইরে আমার বিশেষ
কাজ আছে।’

ধীবেন তাড়াতাড়ি বলল, ‘চলো
একটাই বাই, একসঙ্গে ফেরা যাবে।’

‘তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে?’
ধীবেনকে বাধা দিয়ে বললুম, ‘আমাকে
পারিশারের দোরে দোবে ধরতে হবে,
তুমি বিরক্ত হবে। তার চেষ্টে তুমি মঞ্জুর
সঙ্গে গল্পটুপ করো, চা খাও, আমি আধ
ঘণ্টাও মধ্যে ফিরছি।’

একটুও অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি
বেবোলুম, ব্যস্ত নেমে ফিরে দেখলুম
সিঁড়িতে ধীবেন ও বাবলদার রেলিং ধরে
মঞ্জুলা দুঃজেনেই মুখ চাওমা-চাওরি করছে।

আমার মন পরম প্রসন্নতায় ভরে গেল।

আরো কিছুদিন কাটল।

একদিন সকালে জানলার গরাদ ধরে
দাঁড়িয়েছিলাম। শরতের দরাজ আকাশে
আনন্দময়ীর গায়ের রঙ ফুটে উঠেছে।
বাতাসে প্রকল্পতার স্পর্শ।

মঞ্জুলা চা নিয়ে এসে ডাকল।

চা খেতে খেতে অকস্মাৎ বলল,
‘তোমার পারে পড়ি, ধীরেনবাবুকে আসতে
মানা করো।’

‘ধীরেনের ওপর তোমার অন্যায় অভি-
মান মঞ্জু। ও আসে জেনেই আমি নিজেকে
সহজ করতে পেরেছি।’

‘কিন্তু আমি পারি নি,’ মঞ্জুলা দীর্ঘ-
নিশ্বাস ফেলল।

সাম্বন্ধ দিয়ে বললুম, ‘তোমাকে আমি
অবিশ্বাস করি নে মঞ্জু, আমাকেও সন্দেহ
করো না তুমি।’

মঞ্জুলা চুপ করে রইল, আশায়
আশায় ছিলাম, আজ শবতের সোনালী
সকালে নিজেকে সামলাতে পারবে না.....
হঠাৎ সমস্ত ভেঙে পড়বে। বর বর করে
কেঁদে ফেলবে, পোকায় কুরে কুরে খাওয়া
আপেলটির মত একসময় ঝুপ করে
মাটিতে পড়বে। কিন্তু না। আমার প্রত্যাশা
ব্যর্থ করে উঠে দাঁড়াল, পরিবেশ সংযত
করে স্বভাবসিদ্ধ মদু গলাব বলল, ‘তুমি
আমাকে চিনতে পাবলে না। তুমি গম্পের
মানুষ সৃষ্টি কবো, যারা তোমার খেয়াল-
খুশিতে হাসে, কাঁদে, যারা কক্ষাল বাদেব
সঙ্গে রক্ত-মাংসেব কোন সম্বন্ধ নেই। সত্য-
কালের জানার অনেক বাকি, বলে
রাখলুম।’

ঠিক তখনই ধীবেন বাড়ির ভেতর
ঢুকল।

কয়েকমাস কাটল।

ধীবেনের আবির্ভাব যত বেশি হতে
লাগল, মঞ্জুলার অনযোগ্য ততই কমে

যেতে লাগল। ডাবলুম বুঝি আগসা
সহজ হতে পেরেছি। মঞ্জুলার ঠোঁটের চেহে
আবস্ত আর আমার মনের চেহে প্রশান্ত
যে স্বপ্নসুন্দর মানুষটি আমাদের দুঃজনের
মধ্যে লুকিয়ে ছিল, এতদিন যার অস্তিত্ব
অনুভব করতে পারি নি, এযাব জনতে
পারলুম।

বসন্ত এল, মঞ্জুলার নিজ হাতে
লাগানো টেবের ফুলগাছগুলোর ওপর
মধুর বাতাস বইতে লাগল, পথের ধূলো-
মাখা বিবর্ণ শিরীষ গাছের রিত দাখার
বসে পাখিবা শিস্ দিতে লাগল। পহ-
ঝরা শূন্যতাব মধ্যেও আমি এক
অনিবর্তনীয় পবিত্রতার আশ্বাস
পেলুম।

দুপরে আফিসে কাজ বহিঃস্থ।
বেশ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেশ মনে হাইল
দেখাছিলাম। আগে এমন শান্ত সংযত
হয়ে কাজ কবতে পারতুম না। মর্মান্ব
কি এক আশঙ্কায় জর্জবিত হতুম। আজ-
কাল অফিসের অন্যান্য কর্মচারীদের মতোই
মন দিয়ে কাজ করতে পারি। কাজ
করিছিলাম। অকস্মাৎ বড়ের বেগে ধীবেন
এসে উপস্থিত হল। শুকনো মুখ,
এলোমেলো চুল, অফিসে ধীবেন বড়ো
আসে না। আবার এমন গর্বের দুপরে
আগমন, উৎসুক হয়ে তাকালুম।

ধীবেন ইতস্তত করতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলুম, ‘ব্যাপার কি?’

প্রত্যুত্তরে একখন্ড কাগজ আমার
হাতে দিল। আট-দশ ছত্র মাত্র। হাতে
লেখা মঞ্জুলার। ধীবেনকে সম্বোধন করে
চিঠি। না পড়েই ফেরত দিয়ে বললুম,
‘পড়তে চাই নে। বলো কি হয়েছে?’

পুনর্বীর কাগজের টুকরোটা আঘা
হাতে দিয়ে ধীবেন বলল, ‘পড়ো সব
বুঝবে।’

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক: রমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বসূচী: রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাবলী। প্রতিমা দেবী (ববীন্দ্র ভারতী), হিরণ্ময়
বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব), সাধনকুমার ভট্টাচার্য (সংগীতে সুন্দর), বজ্রি-
কুমার ঘোষ (অ্যারিস্টটল ও ভবভের নাট্যবিচার), আশুতোষ ভট্টাচার্য (লোকসাহিত্য
ও লোকসমাজ), সম্মীর্ণ চক্রবর্তী (বৈদিক যজ্ঞেব সর্ববর্তী), শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (পদা-
বলীর সাধাভাব ও রবীন্দ্রকব্যের মিস্টারিসজ্জা), শীতানন্দ ঞ্জৈ (প্রতীকী নাটক),
ধীরেন্দ্র দেবনাথ (সাহিত্যসাধক দীনেশচন্দ্র সেন), সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (স্মৃতি-
চারণ) সুধাংশুআহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রকুমার সেন (গ্রন্থ সমালোচনা)।
চিত্রসূচী: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপ্ন-তরী)।

বার্ষিক চাঁদা চার টাকা (হাতে ও সাধারণ ডাকে), সাত টাকা (রেজিস্ট্রী ডাকে)।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: ৬/৪ প্রারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

একুশের গান

জাম্বুন গাফ্ফার চৌধুরী*

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-পঙ্কা এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশুহত্যার বিকোড়ে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি জগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না, খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রান্ন বেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

সেদিনো এমনি নীল গগনেব বসনে শীতের শেষে
রাভজাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা ঘেনো,
এমন সময় বড় এলো এক, বড় এল ক্যাপা বুনো ॥

* পূর্ববঙ্গের সুপরিচিত কবি।

সেই অধীরের পশুদের মূখচেনা,
তাদের তরে মায়ের, বোনের, ভাইয়ের চরম ঘৃণ্য
ওরা গুলী ছোঁড়ে এ-দেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণার পদাঘাত এই বাংলার বুক
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের জন্ম, বশ্ত, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলো বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সন্ত শক্তি হাতে মাঠে মাঠে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবে ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

‘না,’ আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, ‘কি ঘটন ঘটছে? বিষ খেয়েছে না আগুন পড়েছে—তোমার মুখেই শুনবো।’

‘মরে নি।’

বাগে উত্তেজনার কাগজটা দলে মচড়ে বললাম, ‘মরেছে, নিজে থেকে বাঁচতে ধরেছে।’

দল কাগজটা বাজে কাগজের ঝড়িতে ফেলতে গিয়ে লক্ষ্য কবললাম ধীরেনের দৃঢ়চোখ জলে ভরে উঠেছে। স্বাভাবিক, আমার স্ত্রীকে যথার্থই ভালোবাসত সে। আমার হাত চেপে ধরে ধীরেন বললো, চলো খুঁজি গে, এখনো বেশি দূর যেতে পারে নি। পাওয়া যাবে।’

চিরকুঁতানা ঝড়িতে ফেলে দিয়ে বললাম, ‘পাগল নাকি, কাছে থেকেও যাকে খুঁজে পাই নি, লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে পাবো তাকে? খুঁজতে হয় তুমি খোঁজো গে, আমাকে বিরক্ত করো না।’

ধীরেন কিছ্র বলতে যাঁড়ল, ওকে

অবজ্ঞা করে ফাইলে মনোযোগ দিলুম। ধীরেন চলে গেল।

বেচার। মঞ্জুলাকে ভালোবাসত। মঞ্জুলা যে কখনো ওকে ভালোবাসে নি সেই সত্যটা আজ আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল ধীরেন। মঞ্জুলাকে আমি নতুন করে ফিরে পেলুম।

অমূল্য সেন ‘বিচিত্র ভারত’ বন্ধ করলেন। গল্প শেষ হয়েছে।

যাদব ঘোষাল প্রশ্ন করলেন, ‘ধীরেন নিশ্চয় খুঁজে পেলো না মঞ্জুলাকে?’

মণি গুপ্ত বললেন, ‘গল্প বলেই হয়ত পেলো না, নয়ত খুঁজে বের করা এমন কি কঠিন? গল্পবস্তুর খোঁজ করা উচিত ছিলো।’

লাঠিগাছ হাতে নিশীথ চক্রবর্তী উঠে বললেন, ‘গল্পবস্তুর বোকা নয়, যে হারায় নি মিছে খুঁজে বেড়াতে তাকে।’

‘হারায় নি, তবে কি মরেছে?’ যাদব ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন।

‘না, মরেও নি।’ নিশীথ চক্রবর্তী শান্ত কণ্ঠে বললেন।

কমিশনার মন্মথ মিত্র বললেন, ‘ব্যাপারটা জালিআতিব। মঞ্জুলা ঘরেই ছিলো, কোথাও যায় নি। ধীরেনের চরিত্র সম্পূর্ণ মনগড়া, বাস্তবের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।’

নিশীথ চক্রবর্তীর বিষয় চোখ জ্বলে উঠল, কুণ্ঠিত অধরোষ্ঠ ঈষৎ প্রসারিত হল, প্রায় চিৎকার করে বললেন, ‘ধীরেন রক্তমাংসের মানুষ, কাল্পনিক নয়। আমবা যেমন এক-একজন। মঞ্জুলা সত্যিই বলেছে তার স্বামী কংকাল সৃষ্টি করে, মানুষ পারে না.....।’

নিশীথ চক্রবর্তী উত্তেজনার হাঁপাতে লাগলেন।

ইন্দু মেলা

অরিজিন এন্ড এডোজিউশন অফ ইন্ডিয়ান ক্রেস্কাপচারঃ অধ্যাপক চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি (ক্যাল এ ক্যান্টাব) প্রকাশক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য : ২৫ টাকা (৪০ শিলিং)।

৩
দি ডেভেলপমেন্ট অফ খরোষ্ঠী স্ক্রিপ্টঃ অধ্যাপক চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি (ক্যাল এ ক্যান্টাব) প্রকাশক, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। মূল্যঃ ৪০ টাকা (৭৫ শিলিং)।

আমাদের দেশে যে কোন বিষয়ে তথাকথিত গবেষণার বই অনেক পাওয়া যায়—কিন্তু সত্যিকার গভীর জ্ঞান এবং তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনাপূর্ণ রচনা কীচিৎ কদাচিৎ চোখে পড়ে। সৈদিক দিয়ে উত্তর দাশগুপ্তের কঠিন দুটি বাংলার ইতিহাস বিভাগের অমূল্য সম্পদ।

মানবসভ্যতাব ইতিহাসে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি যুগে যুগে নানা বস্তু সাহায্যে মূর্তি গঠনের মাধ্যমে তাঁদের শিল্পসৃষ্টির জ্ঞানীসা চরিতার্থ করেছেন। মূর্তি গঠনে পাথর, মাটি, বিবিধ ধাত এবং কাঠের ব্যবহারই বেশি হয়েছে বলে গণ্য হইবে। আদিম যুগ থেকেই ভারতে টেরাকোট্টা শিল্পের প্রসার দৃশ্য থেকে বেশি। প্রথম বইটিতে চারুদ্রাব্য ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হিন্দুশাসিত ভারতের শেষ সময় অবধি ক্রেস্কাপচারের বিভিন্ন দিক দিক্ গবেষণা করেছেন। আবিষ্কৃত মূর্তি-গুলির কালপরম্পরা নির্বাচনে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি এবং গভীর জ্ঞানের স্বাক্ষর রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়। ইন্ডিয়ান টেরাকোট্টা সম্বন্ধে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

বইটিতে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তিকা মূর্তির ইতিহাসের অবতারণা করা হয়েছে দক্ষিণ ভাষাতত্ত্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক মূর্তির নমুনা নিয়ে। আমাদের দেশের মূর্তিশিল্পের বিবর্তনের ইতিহাসে এই কয়েকটি নমুনার একটা বিশেষ মূল্য আছে

—অথচ এ বিষয়ে যারা গবেষণা করেন, অনেক সময়েই ঐ সব নমুনা মূর্তিগুলিকে তাঁরা অগ্রাহ্য এবং অবহেলা করে এসেছেন। প্রথম এ নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষণা করেছিলেন বিদগ্ধ গবেষক মিস্টার জে ডারউইকস্। যে সব মূর্তির বর্ণনা এবং উদাহরণ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় সেগুলির বেশির ভাগই জলপাঠ জাতীয় ভাসের মূর্তি—পিঠীকার উপর খোদিত। মিস্টার আর জি ফটে এরপর এই সব ফিগারিন নিয়ে পড়াশোনা এবং আলাপ-আলোচনা করেন। এ সম্বন্ধে তৃতীয় গবেষক ছিলেন শ্রী পি মিত্র—তাঁর অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান তিনি একটি ছোট কিন্তু সুচিন্তিত প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। এরপরেই অতীত ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তিমূর্তির সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে গভীর গবেষণা করে ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভারতীয় ক্রেস্কাপচারের বইটি রচনা করেন।

মূর্তিগুলো নরনারী, পশুপক্ষী প্রভৃতি বিষয় নিয়েই গড়া। উত্তর দাশগুপ্ত এগুলোকে তিন শ্রেণীতে ফেলেছেন—প্রাগৈতিহাসিক, আদিম-ইতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক। পশুপক্ষীর মূর্তির ভেতর দিয়ে সে যুগের শিল্পীরা প্রতীক-শিল্প-সৃষ্টির যে অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়েছেন তাঁর অতি সুন্দর এবং বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এ বইতে। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক মূর্তির সঙ্গেও এ সব মূর্তির তুলনা করে কোষায কার বৈশিষ্ট্য তা অতি সুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন গ্রন্থকার। দেশের কৃষ্টি এবং শিল্পকলার কতোটা উন্নতি হলে পরে এ ধরনের মূর্তি-মূর্তিশিল্পের সৃষ্টি এবং বিবর্তন সম্ভব সে কথা ভারতে গেলেও আজ আমাদের মন শ্রম্মা ও বিস্ময়ে ভরে ওঠে।

দুরূহ বিষয়বস্তুকে কত সহজ এবং কৌতূহলোদ্দীপক করে পাঠকের কাছে তুলে ধরা যায় তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় চারুদ্রাব্যের এই বইটিতে। শ্রদ্ধা ইতিহাসের ছাত্ররাই নয়, সাধারণ পাঠকও বইটি পড়ে প্রকৃত আনন্দ পাবেন এবং ভারতীয় সভ্যতা এবং কৃষ্টির ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন।

দ্বিতীয় বইটির বিষয়বস্তু ছিল অধ্যাপক দাশগুপ্তের কেমব্রিজের ডক্টরেটের থিসিস। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশী বিশেষজ্ঞরা সবাই জানেন যে, অতীতের ভারতে প্রধানত ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী হস্ত-লিপিই ব্যবহৃত হত। তাছাড়া ছিল ইন্ডাস-ভাষী-স্ক্রিপ্ট। আজও পর্যন্ত পণ্ডিতেরা এ লিপির পাঠোন্মাদ করিতে সক্ষম হন নি।

ব্রাহ্মী স্ক্রিপ্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে এ লিপি বাম দিক থেকে ডান দিক ধরে লেখা হয়। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এ লিপির সমাধিক প্রচলন ছিল সারা ভারতে—ভারতের বাইরেও ফার ইস্ট, নর্থ ইস্ট এবং নর্থের বহুদেশের অধুনা প্রচলিত বেশির ভাগ লিপির মূল আধার বা উৎস হচ্ছে এই ব্রাহ্মী স্ক্রিপ্ট।

খরোষ্ঠী লিপির বিশেষত্ব হল এই যে এ লিপি লেখা হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। এর বিশেষ প্রচলন ছিল নর্থ ওয়েস্ট ফ্রাঙ্টিয়ার প্রভিন্স, পঞ্জাব, গুজরা এবং যমুনা নদীর মধ্যবর্তী দেশসমূহে—খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খৃস্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী অবধি। ভারতে কুশান রাজবংশের অবসানের পর এই লিপি ভারতের বাইরে চাইনিজ টার্কিস্থানে প্রায় শতাধিক বছর প্রচলিত ছিল। তৃতীয় খৃস্টাব্দের পর আরও কয়েক শতাব্দী অবধি খরোষ্ঠী লিপি সেন্ট্রাল এশিয়াতে ব্যবহৃত হোত এবং তারপর এর অবলোপ ঘটে। খরোষ্ঠী লিপি থেকে কোন নতুন লিপির জন্ম হয় নি, যেমনটা হয়েছে ব্রাহ্মী লিপির ক্ষেত্রে।

খরোষ্ঠী নামটির আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন পূর্বতন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, পার্সিয়ার রাজা কাইবাস খৃস্টসম্ব্দ ৫৪০ বছরেরও আগে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবধি তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। সুতরাং পার্সিয়ার থেকে সাংস্কৃতিক ভাষা, বর্ণমালা এবং লিখনভঙ্গীর ভারতে অনুপ্রবেশ করাটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা দরকার—পার্সিয়ান লিপির মতই খরোষ্ঠী ভাষাও লেখা হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। খরোষ্ঠীর অর্থ গাথা (ইন্ডো-এশিয়ান) এবং ওষ্ঠের অর্থ তো সবারই জ্ঞান।

প্রাক্কলস্কির মতে খরোষ্ঠী লিপি ভারতে এসেছে মধ্য এশিয়া থেকে—উত্তর ভারতে গাথার সংখ্যা ছিল প্রচুর—সুতরাং ওষ্ঠ নির্গত বাণী যে গাথার চামড়ার ওপর লিপিবদ্ধ হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক এবং সেই কারণেই এই বিশেষ লিপির নামকরণ হয় খরোষ্ঠী স্ক্রিপ্ট।

বইটি পাশ্চাত্য দেশের প্রাচ্য ভাষাবিদ পণ্ডিতদের যথা—অধ্যাপক আর এল টারনার (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপকটি বারো (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক

এইচ ডারউ বেলী (কোম্প্রজ বিশ্ববিদ্যালয়)-র কাছ থেকে ভূরসী প্রশংসা লাভ করেছে। অধ্যাপক টারনার বলেছেন:

This work is a most careful and exhaustive consideration of the development of the Khorosthi Script and in my view will be a most useful contribution to our knowledge of the subject.

আর প্রফেসর বারোর মতে:

This script has been studied previously in various basic publications dealing with sections of the material—Asokan inscriptions, later inscriptions, coins, the central Asian documents, and so forth. Dr. Das Guptas work is distinguished from that of his predecessors in as much as the Khorosthi Script as it appears in all the documents from the earliest to the latest period is dealt with in his book. It can, therefore, claim to be completely exhaustive, since the script as it appears in each successive period is dealt with in the greatest possible detail. Any student wishing to acquaint himself with the Khorosthi Script in order to read the various documents that have survived in it, will find all that he wants in this book, both in the detailed descriptions—furnished by the text, and also in the accompanying plates.

ইতিহাসেব যে বিশেষ দৃষ্টি দিক নিয়ে ভট্টর দাশগুপ্ত তাঁর উপরিউক্ত বই দুটি লিখেছেন তার জন্য বিরাট অধ্যয়ন, অমানুষিক পরিশ্রম এবং প্রচুর কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ননী গোপাল মজুমদার। এঁদেরই আরম্ভ পথে সুযোগ্যতার সঙ্গো অগ্রসর হয়ে নিজের গবেষণায় যে পরিপূর্ণ সার্থকতা ভট্টর দাশগুপ্ত অর্জন করতে পেরেছেন তারই সাক্ষ্য দেবে উপরিউক্ত বই দুটি।

প্রতিলিপি—মানবেন্দ্র পাল। বিদ্যাভারতী; ৮-সি, টামার লেন, কলকাতা-৯। মূল্য: ০.৫০।

মাঘের প্রতিলিপি হচ্ছে কন্যা। সুদূরমাব কন্যা মঞ্জু-উভয়ের চরিত্রে অকাশ-পাতাল প্রভেদ বলা যায়। কিন্তু মঞ্জুর কন্যা কৃষ্ণা পেয়েছে মায়ের ধ্যান-ধারণা, একগুঁয়েমি আর কমপ্লেক্স। অবশ্য মঞ্জুর জীবন-পরিচ্ছেদের প্রতি অংশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। মাতৃ-হারা কৃষ্ণার কৈশোর রূপটিই ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। কৃষ্ণাব বাল্যাবস্থায় তার মা (যে সময় কৃষ্ণা ধীরে ধীরে তার মাকে বুকে উঠেছিল) আত্মহত্যা করেছিল। কৈশোর পর্বন্ত তাকে মানদ্ব করছিল তার পিতামহী—যাকে কৃষ্ণা মা বলেই জানতো। পিতা সোমনাথ সদা আতঙ্কিত ছিল এই কারণে যে, মাতার আসল মৃত্যুর খবর পেয়ে কন্যা কৃষ্ণার না জানি কি মানসিক প্রতিক্রিয়া সূর্য হতে পারে। পিতার প্রতি কন্যার ক্রোধ হওয়াও অসম্ভব নয়। নানা কার্যকারণ ঘটিত সংবাদে কৃষ্ণার মনে পিতার প্রতি কন্যার প্রচণ্ড এক মানসিক বিরূপতাও সূর্য হয়েছিল। পিতা সোমনাথ যদিও কোনো মতেই স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল না তবু সে চেষ্টা করেছিল মিথ্যার স্বারা কিভাবে কন্যাকে মিথ্যা প্রবোধ দেওয়া সম্ভব হয়। যাক তার আর প্রয়োজন হয় নি। কারণ সোমনাথও অনুপমের সঙ্গে দেখা করার পর টেনে বসে শেষ পর্বন্ত যেন সত্যের সম্মান পায়—তাই সত্য দিয়েই সে সত্যের মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক হয়। উপসংহারে সোমনাথের মানসিক পবিত্রতা যেভাবে দেখানো হয়েছে—তা শৃঙ্গর ঔপন্যাসিকের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই নয়, সেখানে প্রয়োজন হয়েছে কবির মত কল্পনাশক্তির।

মন বড়ই বিচি। ‘প্রতিলিপি’ উপন্যাসটিতে শ্রীমানবেন্দ্র পাল বিচিত্র মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ছেঁকে তুলে দেখিয়েছেন সংসার জটিল আকার ধারণ করে কিভাবে। যে রঙ্গু মায়ের শত অনু-রোধেও বিয়ে করে নি, ইঠাৎ সে একদিন রাজী হয়ে গেল। যে অনুপমকে মঞ্জু এতোদিন প্রত্যা করে এসেছে সেই অনুপম—না-বলা বেদনার বিদায় দিল মঞ্জুকে। অনুপম বিদ্রোহী নয়, বিরহী শিল্পী। তার অন্ধর আমাদের মনে নিদারুণ ধ্বংসের সৃষ্টি করে। মঞ্জুর জীবনেও কি বিরাট উত্থান-পতন। এর জন্যে তার স্বামী কতোটা দায়ী কিংবা তার নিজের মন কতোটা দায়ী—সেই জটিলতার নিপুণ

বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীপাল। মঞ্জু “প্রথম থেকেই কি-একটা আদর্শ প্রবণ মনোভাব নিয়ে এসেছিল, স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল দু-চোখ ভরে। তাই তো অত সহজে তা ভেঙে গেল। শৃঙ্গর কি স্বপ্নই ভেঙে গেল?” এই মানসিক দংশন থেকে মঞ্জু পাবার জন্যই কি সে আত্মহত্যার আশ্রয় নিয়েছিল—যার জন্যে কাউকে সে দোষী সাব্যস্ত করে যায় নি। মোট কথা, এই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসটি পড়ে পাঠকেরা নানান জটিল জীবনের সম্পর্কে এসে যেমন ব্যাখ্যা বিমর্ষিত হবেন তেমনি হালকা চালের উপন্যাসের বাজারে একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস পাঠের গৌরবে পুঙ্খানুপুঙ্খ করেবেন। উপন্যাসের ছোট্ট চরিত্রগুলিও উপন্যাসিকের আন্তরিকতার গুণে হৃদয়-স্পর্শী। দেবনাথ, অলক, গৌরীর মা প্রভৃতি চরিত্রও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অবশ্য গৌরীর মা উপন্যাসের গতিবেগ বৃদ্ধিতে বিরাট অংশ গ্রহণ করেছে। চরিত্রাঙ্কন ছাড়াও মধ্য-বিত্ত সমাজের চিত্রও শ্রীপাল দক্ষ শিল্পীর মতই অঙ্কন করেছেন। বর্তমান জীবন রূপায়ণে সেন্সিটিভিটির স্থান স্থান হয়ে গেলেও সেই সেন্সিটিভিটিকে ছাটাই না করে মানবেন্দ্রবাবু যে সংসাহস দেখিয়েছেন তার জন্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

কাটা ও রক্তগোলাপ—সম্মাসী সাধুখাঁ, মেরিট পাবলিসার্স, ৫১, বিধান সন্নয়ী, কলকাতা-৬, মূল্য: ০.০০ টাকা।

সম্মাসী সাধুখাঁ তৃতীয় দশকের কবি। এই দশকের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। স্বভাবতই সে সময় আধুনিক বাংলা কাব্যে যে নতুন প্রাণ তিনি সঞ্চার করেছিলেন, সেই রকম প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিকে অনেকেই ঝুঁকিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর মতো সার্থক উত্তরণ আর সম্ভব হয় নি। তবে সম্মাসী সাধুখাঁও যে নিরুৎসাহ ছিলেন না তার প্রমাণ, তাঁর ‘কবিরের প্রতি’, ‘আমাদের গলি’ প্রভৃতি কবিতা। তিনি বলেছেন, ‘তোমাদের মতো ঘরছাড়া ভাই ঘরভরা পৃথিবীতে, / নাই শৃঙ্গর ঘর বাঁধার আকণ্ঠন।’ শ্রীসাধুখাঁ কবিরনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন নন। প্রকৃতি তাঁকে আহ্বান করে, প্রেম তাঁকে মুগ্ধ করে ভবু তাঁর সাধনা সুন্দরের প্রতি। এবং সেখানেই ঝুঁকে পেরেছেন তিনি জীবনের সার্থকতা। এই কারণে তাঁর ০৫টি কবিতা পড়ে পাঠকেরা তৃপ্ত লাভ করবেন।



—মৃত্যু নাহি মরণোপায়—

গৌহাটীর খণ্ডস্বন্দ
১-১-১৯১৮

"The stars are blotlied out,
Clouds are covering clouds,
It is darkness, vibrant,
sonant."

(Kali The Mother—Swami
Vivekananda)

রবি গ্রহ তাবা নিভে যায়,
কালো মেঘ পবে কালো ছায়,
স্বত্ব গভীর অধিরেব বৃকে
ফটিকা বজ্রা বেগে ধায়।—

আলোচ্য সময়ে বাংলার বিপ্লব-ঙ্গতের
আবহাওয়া ছিল অনেকটা এইরূপ।
গ্রেপ্তার, নির্বাসন কিংবা আত্মগোপন—
আর তারই মাঝে মাঝে এক-একটা মরণ
কামড়ের অভিব্যক্তি। গৌহাটীর খণ্ড-
স্বন্দকে এই জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই
একটি বিচ্ছিন্ন সংঘটন বলা যেতে পারে।
অন্য আলোচিত(ক) চন্দননগরের আশ্রয়
কেন্দ্র থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়ে আপন-
ভোলা বাংলার বিপ্লবীগোষ্ঠী সৈদিন
দেশের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন।
“আমরা এখন বাংলা, বিহার ও আসামের
ষষ্ঠত্রয় যাওয়া আরম্ভ করি”—লিখেছেন
শ্রম্বেয় ডাঃ যাদুগোপাল মূখার্জী।
(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—পৃঃ ৪৩৫)।
অন্য আলোচিত ডি.এস. পি বসন্ত
চ্যাটার্জীর হত্যার পরে (সাপ্তাহিক বসন্ত-
মতী.....সংখ্যা) পুলিশ ডাইনে-বায়-
ষাকে পেয়েছে গ্রেপ্তার করে সূর্য করে-
ছিল তাঁর ওপরে নির্বাসন। আর শেষে
স্বীকারোক্তি না পেয়ে বিনা বিচারে আটকে
রাখা। এই ব্যাপারে কোন দল ঐ কাক
করেছে, অনুশীলন না যুগান্তর, সেই

বিচারের তারা প্রয়োজন বোধ করে নি।
তারা সৈদিন চেয়েছিল গ্রেপ্তার আর
নির্বাসনের ভিতর দিয়ে একদিকে বসন্ত-
বাবু হত্যার প্রতিশোধ নিতে, আর
অপরদিকে এমন একটা ভীষণ সন্ত্রাসের
দৃষ্টি করতে, যার দ্বারা দেশের যৌবন
আর বিপ্লবের কথা কখনও ভাবতেই না
পারে। কিন্তু বিপ্লবী মনোভাবকে যে এই
পন্থায় দমন করা যায় না, তার প্রমাণ পর-
বর্তীকালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে
—১৯৪২-এর আগস্ট মন্ডমেন্ট, আর
১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ। যথাস্থানে
সেই আসোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় ফিরে এসে দেখা
যায়, ‘ডালা-ডা হাউসে’ এমন কড়া
পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে দু’জন বিপ্লবী
পালিয়ে গেলেন। আবার বাংলার বাইরে
—লাহোর, দিল্লী, বেনারস ইত্যাদি ষড়-
বন্দ মামলা—তাতেও সেই বাঙালীব নেতৃত্ব,
এই সমস্ত মিলে সৈদিন বাংলার আব-
হাওয়া উদ্ভূত হয়ে ওঠে। নলিনী ঘোষ
বলেন, তখন আসামের দিকটা বেশ শান্ত
ছিল, তাই তাবা ঐ অঞ্চলে কয়েকটি
আশ্রয় কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করেন।
অবশ্য এই সমস্ত ব্যবস্থা, কখন কিভাবে
কোন দলের সাহায্যে হতোছিল বা হোত,
সে কথা আজ সঠিকভাবে বোঝবার উপায়
নেই। তবে শ্রম্বেয় নলিনী ঘোষ (অনু-
শীলন) যে এই বিষয়ে একজন প্রধান
উদ্যোক্তা ছিলেন সেই আভাস যথেষ্ট
পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট
বিপ্লবীদের বিভিন্ন বিবৃতির কিছু কিছু
অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—শ্রম্বেয়
শ্রীপ্রভাস লাহিড়ী লিখেছেন—

“তাই চন্দননগর থেকে গৌহাটিতে
কেন্দ্র সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েই
নলিনী ঘোষ, প্রবোধ বিশ্বাস-আর
জিতেশের সাথে আমি মোকামা,
কাটিহার হয়ে গৌহাটিতে পাড়ি
দিলাম।” (বিপ্লবী জীবন—পৃঃ
১০৬)।

শ্রম্বেয় শ্রীপ্রবোধকুমার বিশ্বাসের বিবৃতিতে
দেখা যায়—

“এই সময় একদিন খবর আসে যে
চন্দননগরে একটা বড় সার্চ হবে।
তখন ঐস্থানে, কিছু দূরে শেঠেদের
একটি বাড়ি-তৈরি হচ্ছিল।.....সেই
বাড়িতে উপরের দুটি ঘরে আমরা
সৈদিন আশ্রয় পাই। এখানে আগে
থেকেই আমাদের কিছু অস্ত্র-শস্ত্রও
রাখা ছিল।.....ঠিক হয় পুলিশ এই
বাড়ি ঘেরাও করলে আমি ও কৃষ্ণ
মাহা ‘মশার’ পিস্তল নিয়ে পালিশকে

মাথা দেব—আর সেই সুযোগে বাকিরা
পিছন দিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা কর-
বেন।.....কিন্তু ভোর পর্যন্ত
পুলিশের আক্রমণ হয় নি। তখন
ভোরের আলোতে আমরা সকলেই সেই
বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। এই সময়
যাদুগোপালবাবু (ডাঃ) ও শ্রীনলিনী
করও আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং
তাঁদের কাছে আত্মগোপনের জন্যে
পূর্ববঙ্গের ছাতাওয়ালা মুসলমানের
পোষাক ছিল। তাঁরা দু’জন্যই এই-
ভাবে ছদ্মবেশে আগে আগে যাচ্ছিলেন
এবং চন্দননগরের ব্যান্ডেল গেট দিয়ে
বেরিয়ে যান। বাকি আমরা.....তার-
পর রাস্তায় চলা পথে এসে চন্দননগর
ত্যাগ করি।.....সম্মুখ আবার
চন্দননগরে হাজির হই। তখন
সেখানে সম্মুখ ৬টা থেকে সকাল ৬টা
পর্যন্ত পুলিশের কিছু করার অধি-
কার ছিল না।.....অতঃপর আমরা
গৌহাটীর দিকে রওনা হই। এই সময়
শেষের দিকে যান অমরবাবু এবং সব
শেষে যাই আমি, বিনায়ক রাও
কাপলেকে সঙ্গে নিয়ে। তারপরে
মোকামা ঘাট পার হয়ে বারোনি
জংশনের ভিতর দিয়ে কাটিহার হয়ে
গৌহাটিতে চলে যাই। গৌহাটিতে
দু’তিন দিন থেকে আমি নহর-
কাটিয়ার স্টেশন-মাস্টার যামিনী
দত্তের(খ) আশ্রয়ে হাজির হই।.....
গৌহাটীর স্বদেশের সময় আমি সেখানে
ছিলাম না।.....” (শ্রীপ্রবোধকুমার
বিশ্বাসের স্বাক্ষরিত বিবৃতি, তাং ৬ই
ডিসেম্বর, ১৯৬৪)।

শ্রম্বেয় শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষের কথা—

“...অতঃপর গৌহাটি থেকে
শ্রীমণীন্দ্র রায় এসে আমাকে
গৌহাটিতে নিয়ে যান। সঙ্গী হয়ে-
ছিলেন শ্রীপ্রবোধ বিশ্বাস।”
(শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষের স্বাক্ষরিত
বিবৃতি—১৩।১৯৬৫)।

শ্রম্বেয় ডাঃ যাদুগোপাল মূখার্জী এই
বিষয়ে লিখেছেন—

“মুম্বাধ বিশ্বাস, রাসবিহারী ভারত
ছেড়ে যাবার পর চন্দননগরে
ছিল। এইবার সে, নলিনী কব, আমার
সঙ্গে আসাম চলল ১৯১৭ সালে।”
(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—পৃঃ ৪৩৫)।

এই সমস্ত তথ্য থেকে এখন অবশ্য
আমাদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে আসা
সুকঠিন নয় যে চন্দননগরে পুলিশের
উৎপাত বাড়ার আন্দাজ করেই বিপ্লবীরা
তখন ভারতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শান্ত,
আসাম অঞ্চলে যথাসময়ে কয়েকটি আশ্রয়

(খ) যামিনীবাবু ছিলেন এপুবার
সঙ্গী, দলীয় লোক। (নলিনী ঘোষ)।

(ক) ‘ডালা-ডা স্কপ’ দৃষ্টব্য।

কেন্দ্রের ব্যবস্থা যেভাবে ও যার সাহায্যেই হোক করে রেখেছিলেন: এবং যথাসময়ে সকলেই মৃত দল নির্বিশেষে সেই দিকে পাড়ি জমাতে আরম্ভ করেন।

নলিনী ঘোষ চন্দ্রনগর ছেড়ে আসামে পৌঁছে প্রথম আশ্রয় নেন গোহাটি উজান-ঘাটার অঞ্চলের এক আশ্রয় কেন্দ্র। সেখানে তখন থাকতেন অনুশীলনের নরেন ব্যানার্জী আর মণীন্দ্র রায়। পরে উপস্থিত হল যুগান্তরের সত্যীশ চক্রবর্তী। অপরাধকে অন্যত্র আলোচিত ডালাডা হাউস থেকে নলিনী ঘোষ আর প্রবোধ বিশ্বাসের অস্থানীয়ের পরে, উক্ত বন্দীশালার আর একজন আটক বন্দী প্রবোধ দাশগুপ্তের প্রাণে সদাই সৈদন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে কবির গানের সুর—
“পারিবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে,রে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই—আনন্দে।

জুলাইয়ে আগুন ধরে ধরে
জ্বলবারই আনন্দে।”

(১৮ই ডায়, ১৩১৬ সালে রচিত ৩৪নং গান—গীতাঞ্জলি)।

এইভাবেই সেই ভাঙবার ছন্দে আর জ্বলবার আনন্দে যোগ দিয়ে বন্দী প্রবোধ দাশগুপ্তও তাঁর নির্জন কক্ষের পিছনদিকের জানালার কাঁচ ভেঙে একটি রাত্রের অন্ধকারে জানালার সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে সরে পড়েছিলেন জুন ১৯১৭ সালের কোন সময়ে। তখন কলকাতা অনুশীলনের চার্জ—এ ছিলেন সুরেশ ভরম্বাজ। (গ) এই সুরেশবাবুর ইংগিতে প্রবোধ দাশগুপ্তও শেষে গোহাটিতে গিয়ে হাজির হন উজান বাজারের আশ্রয়ে। অতঃপর কাকের তাগিদে যুগান্তরের সত্যীশ চক্রবর্তী ঐ আশ্রয় ছেড়ে দিলে, অমর চট্টোপাধ্যায় এসে সেই স্থান পূরণ করেন।

এইভাবে উজানবাজারের আশ্রয়ে বিপ্লবীদের সংখ্যা বেড়ে ওঠার আবেদনটি শেল্টার খোলা হয়—শহরের দক্ষিণ প্রান্তে আটগাঁ নামক স্থানে একটি, আব অপরটি জনবহুল ফার্সিবাড়ী (আসল নাম ফার্সী বাজার) মাড়োয়ারী মহল্লায় একটি টিনের বাড়ির দোতলায়। শেষোক্ত আশ্রয়ে তখন থাকতেন নরেন ব্যানার্জী (বেনারাস ষড়যন্ত্র মামলার অ্যাস্কেন্ডার), তারাপ্রসন্ন দে (নারায়ণগঞ্জ, লাখুরচর নামক গ্রামের লোক), আর নলিনী বাগচী (মুর্শিদাবাদের আধিবাসী), পরে ঢাকার

কলতাবাজারে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান। (ঘ)

আটগাঁ রোডে অবস্থিত শেল্টারটি ছিল স্থানীয় জেলখানার পূর্বে দিকে—বাড়ির সামনে কিছু খোলা মাঠ, তারপরে টিনের শেড দেওয়া একটি বড় ঘর, আর তারপরে কচুগাছের জঙ্গলে ভরা কিছু খোলা জমি। ঘরটি পাটিশনের দ্বারা তিন ভাগে ভাগ করা ছিল। শেষের ভাগে থাকতেন অনুশীলন দলের নেতা নলিনী ঘোষ আর যুগান্তরের নেতৃস্থানীয় অমর চট্টোপাধ্যায়, মাঝের ভাগে থাকতেন অন্যেরা, তথা প্রভাস লাহিড়ী, মণীন্দ্র রায় (ময়মনসিং), (ঙ) আর প্রবোধ দাশগুপ্ত (জেল্লা, বরিশাল)। এই গ্রুপটির চার্জে ছিলেন নলিনী ঘোষ। আশ্রয়টি সারা রাত বাই রোডেশন পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নলিনীবাবু বলেন—তখন তাঁর কাছে একটি মশার পিস্তল(চ) ছিল, তা ছাড়া আরো কয়েকটি রিভলবারও ছিল। অস্ত্রগুলি সকল সময়ই লোডেড তথা গুলীভরা থাকতো। ১১ই জানুয়ারী ১৯১৮ তারিখের শেষ রাত্রে পাহারার কাজে ছিলেন মণীন্দ্র রায়। হঠাৎ তিনি খবর জানান যে বাইরের বড় রাস্তা ধরে বহু লোক তাঁদের বাড়ির দিকে আসছে। পরক্ষণেই লক্ষ্য হয়, লোকগুলি বাড়ির সামনের দিকে না এসে, পাশের দিকে চলে গিয়ে ডালাবন্ধ পূর্বোক্ত টিনের দরজার দিকে দিতে সুরু করেছে। লোকগুলির উদ্দেশ্যের বিষয় নলিনী ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ভৈরবের করাল মূর্তি তাঁদের মনের কোণে এসে যেন কবির ছন্দ বলে যেতে থাকে—

“নাচো যখন ভীষণ সাজে
তাঁর ভালের আঘাত বাজে
পালায় হাসে পালায় লাজে
সন্দেহবিহীন।”

(৪ঠা আষাঢ়, ১৩১৭ সালে রচিত ৮১নং গান—গীতাঞ্জলি)।

(ঘ) “তারিণী মজুমদার (কুমিল্লা) নলিনী বাগচী (মুর্শিদাবাদ), হরিচৈতন্য দে (বরিশাল) একটি ক্ষুদ্র বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকতেন। পুলিশ...একদিন...বাড়ি ঘেরাও করিল।.....দুইপক্ষে গুলী চলিল.....মৃত্যুর সময়.....বলিয়াছিল, ‘শান্তিতে মরিতেও দিবে না’ (জেল্লা গ্রন্থ বছর—ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, পৃঃ ২০২)।

(ঙ) পরে ইনি কলাভবন, শ্রীলঙ্কেন্দ্রের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন।

(চ) রজা কোম্পানীর সরান অস্ত্র (সাপ্তাহিক বস্তুমতী ২৬।৮।১৬ ও ৩।১১।১৬)।

নলিনী ঘোষের উক্তি—“আমাদের সকলে ডংকনাং একটি করে লোডেড রিভলবার হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নেন। আর আমি মশার পিস্তলটি নিয়ে ডালাবন্ধ টিনের দরজার দিকে এগিয়ে যাই। আমার পিছনে ছিলেন রিভলবার হাতে শ্রীপ্রভাস লাহিড়ী। তারপরে দরজার কাছাকাছি হয়ে আমি তাদের বলি—‘ডোমরা কে, আর কি চাও বল, নইলে মব।’ এ-ও যেন সেই কবিরই ভবিষ্যদ্বাণী—

“সহস্রধারায় ছোটে দূরন্ত জীবন-নির্ঝরণী
মরণের বাজারে কিস্কন্দী।”

(৩রা কার্তিক, ১৩২১ সালে রচিত—বলাকা)।

দলের নেতা শ্রম্বেয় নলিনী ঘোষ বলতে থাকেন—এই বলেই তিনি মাটিতে শূন্যে পড়ে গুলী ছোড়া আরম্ভ করে দেন। “প্রভাসবাবুকে বারবার বলছিলাম শূন্যে পড়, কিন্তু তিনি তখন এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, সেই কথা তাঁর শোনবার সময় ছিল না। উভই পক্ষেই গুলী চলছিল। এইভাবেই একটি গুলী এসে প্রভাসবাবুর উরুতে বেধে।” (শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষের স্বাক্ষরিত বিবৃতি—১।৩।১৯৫৬)। উভর পক্ষে বেশ ধানিকরণ গুলী চলে আর অপর পক্ষ থেকে ‘বাপরে বাপু’ শব্দও নাকি শোনা গিয়েছিল মহিমহু—তবে তাঁদের ভেতর হতাহতের সংখ্যা জানবার উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ পরে পুলিশের তরফ থেকে গুলী ছোড়া বন্ধ হয়ে যায় আর তারা ঐ আশ্রয়ের সামনের লনটি পার হয়ে বড় রাস্তার দিকে রীট্রিট করছে বলে আন্দাজ হয়। তারপরে সেই পুলিশ বাহিনী উক্ত আশ্রয়টি ঘেরাও করে স্লো ফায়ার করা আরম্ভ করে।

উপায়ান্তর না দেখে নেতা নলিনী ঘোষ তাঁর বিপ্লবী সাথীদের এবার আদেশ দেন—“স্কোয়ার্ড ফল্ ইন্” (সব্ব—সার দা-ও)। নেতাব তরফ থেকে অবস্থা বিবেচ্যে কর্তব্য তখন মহুতেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। সেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংকল্পের পূর্নরুতি—‘জ্যান্ত মরা দেব না’। সকলকে গুলী করে, শেষে নিজেকে নিজে গুলী কবে আত্মহত্যা কববেন, যাতে মানুষের মনের দুর্বল মহুতে কোন প্রকারে কোনব প স্বীকারোক্তির সম্ভাবনা না থাকে। এ যেন কবির আশীর্বাদেরই স্বভঃস্ফূরণ—

“জীবন মৃত্যু পায়ের ভূতা
চিত্ত ভাবনা হীন।”

নেতার আদেশে উপস্থিত বিপ্লবীরা পর পর দৃঢ়চিত্তে অমনি দাঁড়িয়ে যান—অমর চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ দাশগুপ্ত, প্রভাস

(গ) পরে তিনি বাঁকুড়ার হোমিও-প্যাথিস্ট ডাক্তার। (নলিনী ঘোষ)।

তেল জ্ঞান সংরক্ষণ করে

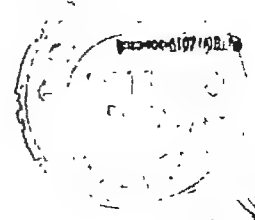
কৃষিশিল্প এবং বাণিজ্য কার্যে তেলের ব্যবহার। বাজার বাজার
কেন্দ্রের কাছে, প্রাচীন দিনের মতো বাজারের কাছে থেকে প্রস্তুত কার্বন ও
তেল মিশ্রিত করে কালি প্রস্তুত করেছিলেন। আজও বাণিজ্য কালি
প্রস্তুত করে তেল-একটি অত্যন্ত প্রচলিত উপাদান। এই যে লক্ষগুলি বাণিজ্য
প্রদান পদ্ধতি, এর পিছনেও রয়েছে সেই অমূল্য উপাদান—তেল, যার
উপস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ কার্য সম্ভব।

তেল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
আমাদের শিল্প, পরিবহন ও বাণিজ্য কার্যে তেলের ব্যবহার।

পেট্রোলিয়াম ও সুরিকার মত বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন ধরনের
করে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ভারতের অর্থনীতিতে এক প্রথম ভূমিকা রেখে
করেছে।



—প্রাথমিক সমৃদ্ধির জাতীয় ঘাস
ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড



লাহিড়ী আর সেই সুপ্ত লক্ষ্য হয়েছিল
প্রতিটি চিত্রে তীর ব্যাকুলতা—

“আগে কেবা প্রাণ

করিলেক দান

তারি সাগি তাড়াতাড়ি।”(ক)

এমন সময় লক্ষ্য হয় মণীন্দ্র রায় সেই
সারিতে নেই। নেতার মনে এবার একটা
আশার আলো ঝিলিক মেয়ে যায়, নলিনী-
বাবু ভাবেন—তা’ হলে তো গল্পকে
ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ার রাস্তাও কোথাও
না কোথাও নিশ্চয় আছে। চকিতে তাঁর
মনের সম্বন্ধ ফিরে আসে, চতুর্দিকে
জাকিয়ে নিয়েই বৃষ্টি ফেলেন, পাখ্যানার
পাশে নিমগ্নাঙ্কুর ডাল ধবে মণীন্দ্র রায়
নিশ্চয়ই পাশেই বাড়িতে নেমে গিয়ে সরে
পড়েছেন। আর সেই পথই অনুসরণ করার
জন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ অপব সাক্ষীদেরও
নির্দেশ দেন একটা মৃদু গুঞ্জনের সুরে—

“চির জনমের বেদনা,

ও-হে চিরজনমের সাধনা,

তোমার আগুন উঠুক হে
জ্বলে।”

(২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ রচিত ৭৭নং
কবিতা—গীতাঞ্জলি)।

এভাবে গাছের ডাল ধরে সকলেই
তখন সেই বিপদসঙ্কুল স্থানটি ত্যাগ
করেছিলেন সত্য কিন্তু পরক্ষণেই সকলে
পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।
প্রভাসবাবু রক্তাক্ত দেহে কামাখ্যা পাহাড়ের
ওপর পূর্ব পরিচিত মহি দত্ত নামে এক
পান্ডার আশ্রয়ে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু
এইবারে পূর্বের সেই আশ্রয়দাতাই তাঁর
গ্রেপ্তারের কারণ হয়। মণীন্দ্র রায় শ্মশান-
ঘাটেব দিকে গিয়ে ওয়েটিং-রুমে ক্রান্ত
দেহে ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঐ অবস্থাতেই
তিনিও গ্রেপ্তার হন। অমরবাবু তখন
ওল্ড শিলিং রোড ধরে রেল লাইনে
পৌঁছে উত্তরদিকে চলতে থাকেন আর
নলিনীবাবুও সেই পথই অনুসরণ করে
চলতে চলতে হঠাৎ লক্ষ্য করেন অমর-
বাবুকে। শেষে দু’টি বন্ধুতে আবার

মিলিত হয়ে একটি ছোট পাহাড়ের জঙ্গলের
মধ্যে গিয়ে হাজির হন। মানুষের প্রাণ
তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উৎকর্ষিত হয়ে উঠেছে
আর সেই সঙ্গে নেতা নলিনী ঘোষের
মন অপর সাথীদের জন্যে ব্যাকুল। নলিনী
ঘোষের উক্তি—“এই সময়ে আমার কাছে
একটি ১০০ টাকার, আর একটি
১০ টাকার নোট ছিল। ১০০ টাকার
নোটটি অমরবাবুর কাছে রেখে ১০
টাকার নোটটি আমি সঙ্গে রাখি। তারপরে
অমরবাবুকে সেই স্থানে অপেক্ষা করতে
বলে, আমি আবার বেরিয়ে পড়ি অপর
সাথীদের খুঁজে বার করার জন্যে।
কারণ তাঁদের আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল,
যে বাড়ি যদি সাচ’ হয় আর তাঁরা যদি
সরে পড়তে সক্ষম হন, তা’ হলে তাঁরা
যেন ঐ পাহাড়েই একটি পূর্ব নির্দিষ্ট
স্থানে এসে যথাসময়ে আবার মিলিত
হন। অতঃপর পূর্ব স্থানে ফিরে এসে
অমরবাবুকে আর সেখানে দেখতে পাই
না।” (শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষের
স্বাক্ষরিত বিবৃতি—১৩।১১.৬৫)।

এই অবস্থায় নলিনীবাবুর মনের অবস্থা
উপলব্ধ করা শক্ত নয়। কিন্তু অমরবাবুর
মত মামলিটি বা সেদিন কেন, কখন আর
কোন পিবিপ্রেক্ষিতে ঐ স্থান ত্যাগ করার
নিশ্চয়্য নিয়েছিলেন সেই দিকেও একবার
তাকান যাক। ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী
এই বিষয়ে তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন—“এ
সময় দলের নেতা নলিনী ঘোষ ছিলেন।
অমরদা সবে পড়তে পারেন। নলিনী
বাগচী পদার্থ অন্যত্র পালিয়ে যান।
অমরদা ছিটকে একলা হয়ে পড়েন। জঙ্গলে
পথহারা হন। এক আশ্চর্য ঘটনার কথা
—একটা বাঘ তাঁকে পথ দেখায়।” (পৃঃ
৪০৬)। উক্ত সত্র ধরে লেখককে যেতে
হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ বিপ্লবী
বরেন্দ্রনাথের কাছে ২১-১১-৬৪ তারিখে।
কারণ দাদার হাতে গড়া, সম-আদর্শ
উদ্দেশ্য পাপ কনিষ্ঠের কাছে তাঁর দাদার
অস্বকামিনী যত্নাঙ্কুর সংগ্রহ করা তথ্যই
অধিক নির্ভরযোগ্য হতে পারে এই
বিশ্বাসে। এখানে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা
করা গেল।

নলিনীবাবুর দ্বাবাঘ গাছিত ১০০
টাকার নোটটি হাতে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ
সেই নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের এক
পাশে বসে বেশ কিছু সময় অপেক্ষাবত
হন সঙ্গীদের প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে।
এইভাবে যতই সময় যায় ততই তাঁর মনে
নানা দৃষ্টান্তাব উদয় হতে থাকে। এদিকে
সন্ধ্যাব কালো ছায়া ঘনিয়ে আসতে শুরু
কবে দেখ। তখন তিনি হতাশ ও নিঃসঙ্গ
অবস্থায় অনির্দিষ্টের পথে আবার যাত্রা
করেন পাহাড়ী জঙ্গলের সংকীর্ণ পথ

ধরে। এইভাবে চলতে চলতে বেশ কিছু
দূর এগিয়ে পড়েছেন, এমন সময় লক্ষ্য
হয় দূর থেকে একটি বাঘ চলে যাচ্ছে
আপন মনে। স্বভাবতই তিনি একটু
ধমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। বাঘটি
কিন্তু তাঁর দিকে নজর না দিয়ে নিজের
পথেই এগিয়ে যায়। অমরেন্দ্রনাথও শেষে
সেই বাঘের পথই অনুসরণ করা সাব্যস্ত
করেন। এইভাবে চলতে চলতে দূরে
একটি ছোট স্টেশনের আলো তাঁর নজরে
পড়ে। তখন তিনি ঐ স্টেশনে পৌঁছে
রেলের কুলি ও অন্যান্য গরীব যাত্রীদের
সঙ্গে, নিজের সম্বল একটি কন্সলের দ্বারা
আপাদমস্তক ঢেকে, শূন্যে পড়েন। সময়
আপন গতিতে চলতে থাকে, আর সেই
সঙ্গে চিন্তার লহরী অমরেন্দ্রনাথের মনকে
নিষে তোলপাড় করতে থাকে। এমনই
উৎকট মূহুর্তে দু’টি মানুষের স্বর তাঁর
কানে ভেসে আসে—“অপর লোকগুলিকে
না হয় চেনা শব্দ, কিন্তু সেই মোটা
লোকটি কোথায় গেল?...মোটা লোকটি
যে সামনে কুলিব বেশে সেইখানেই পড়ে-
ছিলেন, সেই সত্য নির্ণয় করা তাদের
তখন সাধ্যো কুলায় নি। কাজেই এইভাবে
তাঁরা কিছু সময় স্টেশনের আশেপাশে
ঘোরাফেরা করে সেই মোটা লোক তথা
অমরবাবুর খোঁজে অন্যত্র চলে যায়, আর
তাদের সেই অনুসন্ধিৎসু স্বর দূর থেকে
দূরে সরে গিয়ে ক্রমে রাত্রের অন্ধকাবে
মিশে যায়। তারপরে আবার একটা
নিঃশব্দ নিশ্চলতা এসে চারিদিক ধমধমে
করে তোলে। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে
যাবার পরে আবার এক কলরবের আবির্ভাব
হয়। তবে তাঁর মধ্যে মিশে ছিল কোন
রেল কর্মচারীর স্বর—“হাটে যাবার লোকেরা
উঠে পড়—গাড়ি এসে গেছে!...”যাত্রীরা
জেগে ওঠে। কেউ টিকিট কাটার, কেউ বা
তাঁর আসবাবপত্র গুছিয়ে নেওয়ার ব্যস্ত,
গাড়ির ঝিকঝিক শব্দ ক্রমে স্তিমিত হয়ে
যায়, প্ল্যাটফর্মের রেল এসে থেমে গেছে।
এই সুযোগে কুলির বেশে অমরবাবুও
নিজের কন্সলটি আপাদমস্তক জড়িয়ে
নিরে, বিনা টিকিটেই গাড়ির মধ্যে উঠে
বসেন। হাটেব যাত্রীতে ভরা গাড়ি যথা-
সময়ে হাটেব পাশে এসে পৌঁছে যায়।
অমরবাবুও যিকি যিকি গতিতে গাড়ি
থেকে নেমে হাটের ভেতরেই ঢুকে
পড়েন। বারি শেষ হয়ে এলেও ভোরের
আলো তখনও দেখা দেয় নি। হাট
বসবার তখন তোড়জোড় চলছিল মাত্র।
এই সুযোগে অমরবাবু, নলিনীবাবুর
দ্বারায় তাঁর কাছে গাছিত সেই ১০০
টাকার নোটের সাহায্যে এইবারে কিছু
জামা-কাপড় কিনে, নিজের বেশ পরিবর্তন
করে নিয়ে আবার আশ্বগোপন করার

(ক) শ্রদ্ধেয় প্রভাস লাহিড়ী লিখে-
ছেন—“নলিনীবাবু, প্রবোধ ও
আমি এক সাবে দাঁড়িয়েছি—
অমরবাবু, নলিনীবাবুর সামনে
বুক টান কবে গর্বোন্নত শিরে
দাঁড়িয়েছেন।” * (* বিপ্লবী
জীবন—পৃঃ ১৫৯)।

আবার নলিনীবাবুর বিবৃতি
—“প্রবোধ দাশগুপ্ত এগিয়ে এসে
বলে, আমাকে আগে গুলী
করুন।” (তাং ১৩।১১.৬৫)।

কণ্ঠের যাত্রী হন। এইভাবেই তিনি সে যাত্রায় গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনা অন্যরূপে উল্লেখ করা গেছে। এবার ফিরে যাওয়া যাক আবার নলিনীবাবুর দিকে। তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে না পেয়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এসে যখন অমরেন্দ্রনাথকেও আর দেখতে পেলেন না, তখন নেতার কঠোর মনও একটু চিন্তা-চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর এইটাই স্বাভাবিক! এইরূপ চিন্তার ঝড়ে আলোড়িত মনকে, মনোবৈকল্যে চেপে ধরে, দিনের বেলাটা সেই জঙ্গলে কাটিয়ে দেন তিনি।

তারপরে সম্ভাব্য অন্ধকারে নেতা নলিনী ঘোষ চিন্তার জোয়ারে ভাসতে ভাসতে আবার রওনা হয়ে যান উজ্জান-স্বাক্ষরের আশ্রয়ের দিকে, আর সেখানে উপস্থিত, দেখতে পান মণীন্দ্র দত্তকে। আরো জ্ঞানতে পারেন যে, সেই বাড়িতে তখনও 'লিচ' হয় নি। অতঃপর ১০-১-১৯১৮ তারিখে তিনি উক্ত মণীন্দ্রের সাহায্যে খবর সংগ্রহ করেন যে, গোঁহাটিব বেল স্টেশনে স্থানীয় কর্মচারী দ্বিজেন দত্তের কাছে তখন আশ্রয় নিবেছিলেন নবেন ব্যানার্জী, নলিনী বাগচী তারা প্রসন্ন প্রমথ বিপ্লবীরা। এই খবর পেয়ে নেতা নলিনী ঘোষ নির্দেশ পাঠান, দিল্লী-গাউন্ড দিকে যে বাস্তা গেছে তার পর্বতদিকে ওলুদ শিলং রোড ও ডিল্লি-গাউন্ড বোডের ধারে একটি পাহাড়ের ওপর ১১ই জানুয়ারী ১৯১৮ তারিখে বোডের তাঁরা সকলে যেন মিলিত হন।

১২ই তারিখের সকাল ৮টা। নেতার নির্দেশে বিপ্লবীরা যথাস্থানে উপস্থিত, মণীন্দ্র দত্তও হাজির ছিলেন। তাঁকেই তাই পাঠান হয়েছিল কিছু আহার সংগ্রহের কাজে। নলিনীবাবু বলেন—মণীন্দ্র দত্ত কিন্তু আর ফিরে আসেন নি। যাই হোক বিপ্লবীরা এবার স্থির করেন যে সম্ভাব্য আডালে বেল লাইন ধরে তিনসুকিয়ার দিকে রওনা হবেন। এব পথে তাঁরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে, দুটি বিভিন্ন স্থানে বসে পরবর্তী কর্তব্যের বিষয় আলোচনা লিপ্ত (খ) এমন সময় এক সাধু এসে বলেন—‘আবি ভাগ।’ আর সেই ভাগবান তথা সবে পড়বার জন্যেও একটি কিলেব অপার পাড়ে পাহাড়ের পাশে একটি স্থানের ইঙ্গিতও

(খ) এক স্থানে ছিলেন নবেন ব্যানার্জী, তারা প্রসন্ন আর নলিনী ঘোষ, এবং অপর গ্রুপে একটু দূরে বসেছিলেন নলিনী বাগচী আর প্রবোধ দাশগুপ্ত। (নলিনী ঘোষের উক্তি)।

তিনি করে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের সেই দিকে কর্তব্যপাত করার তখন সময় ছিল না, অথবা ঐ সাধুর ইঙ্গিতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করার তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেন নি। যৌবনের জলতরঙ্গে এই জাতীয় দুটি চন্দ্রের কলঙ্কের মতই সত্য, আর সেটা অবহেলার বিষয়। কিন্তু সেই কারণেই আবার উজ্জল যৌবনকে চিরকালই তার পূর্ণ খেসারত দিতে হয়েছে, আর ঐ আসামের পাহাড়ের তাব ব্যতিক্রম হয় নি। বেলা বেড়ে ক্রমে মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে গেছে, আর কিছুক্ষণ পরেই আবার তাঁদের যাত্রা সুরু হওয়ার সব ঠিক। বেলা ২টা ২৫টার সময় হঠাৎ লক্ষ্য হয়, এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ওপরের দিকে এগিয়ে আসছে। নেতার কর্তব্যও তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে যায়। নলিনী ঘোষ সঙ্গীদের বলেন যে, তিনি গুলী ছুঁড়ে পুলিশ বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবেন আর সেই সুযোগে বাকিরা যেন সরে পড়বার চেষ্টা করেন। বলা আব কাজ। সঙ্গে সঙ্গে নির্গত হতে থাকে নলিনী ঘোষের হাতের মশার পিস্তল থেকে আগুনের ঝলক। পুলিশ দলের সব প্রথমে ছিল ‘দন্ড’ আর ‘চন্ডী’ নামে দুটি সেপাই(গ) আর তারাই প্রথমে আহত হয়েছিল উক্ত মশার পিস্তলের গুলীতে। চন্ডী কিন্তু সেই অবস্থাতেই ছুটে এসে তার রাইফেলের বাঁট দিয়ে নলিনী ঘোষের মাথা আঘাত করে আর ফলে নলিনীবাবু মাটিতে পড়ে যান, প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। এ যেন—হতাশের স তদা দৈত্যাক্ষমুখা বিশারথিঃ। জগাহ মঙ্গলং ঘোরমাম্বিকানিখনোদ্যতঃ॥

(শ্রীচন্ডী—১৮।১০ অধ্যায়)

অর্থাৎ অস্বহীন, ভয়ানক ও সারথি-শূন্য হয়ে শূন্য অম্বিকাকে বধ করার জন্যে ভীষণ মঙ্গল গ্রহণ করেছিল। যাই হোক নেতার অবস্থা দেখে প্রবোধ দাশগুপ্ত আর নলিনী বাগচী ফিরে এসে তাঁরাও তাঁদের বিভলভারের বাঁট দিয়ে চন্ডীকে আঘাত করতে আবশ্যক করেন। কারণ তাঁদেরও তখন গুলী ফুটিয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই তাঁরা আবার নেতার অক্ষুণ্ণ ইঙ্গিতে স্থানত্যাগ করে সবে পড়তে চেষ্টা করেন নিকটস্থ কিল পার হয়ে। তাবা-প্রসন্নও তাঁদের সঙ্গ নেন। এমন সময় অপর পক্ষের একটি গুলী এসে তারা-প্রসন্নবাবুর পেটে বোঁধে, আর তৎক্ষণাৎ তাঁর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। নরেন ব্যানার্জীও কিলের পাড় দিয়ে সবে পড়ার সময় গ্রেপ্তার হন। নলিনীবাবু প্রায়

(গ) এই নাম মামলাব শুনানীর সময় প্রকাশ পেয়েছিল। (নলিনী ঘোষ)।

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আসেই তাবের দিকে ছিলেন।

এইভাবে তাঁদের নিয়ে বিচার হবে, হয়েছিল আসামের ফাস্ট স্পেশাল ট্রিব্যুনালের সামনে(ব) ২২শ এপ্রিল ১৯১৮ সালে, আর বিচারের বার নবেন ব্যানার্জী, মণীন্দ্র বাব ও প্রভাব সাহিত্যিক তিন বছর কয়ে এবং নলিনী ঘোষ সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশঃ—

“Police & Absconders

“An armed struggle

“More arrest at Gauhati

“A party of police while surrounding last week a house in Gauhati said to have been harboured by some important absconders from Bengal, were fired on by the inmates on ... The Police returned fire but the inmates succeeded in breaking through the mat walls and escaping in the darkness. They were pursued and one was captured that night & another who was shot in the leg was caught next morning. Late on receipt of a clue that strangers had been seen hiding near a tank a party of police went out in pursuit & came upon five men. An unarmed constable was hit on the chest with a revolver bullet which was luckily stopped by the constables number plate. A constable coming up was hit on the head with the butt of a revolver by another of the absconders. A struggle ensued, the police eventually secured three of the five men including a notorious absconder(ঙ). Who the been badly wanted. All the men arrested were from Bengal.” (Bengali—18.1.1918).

(ঘ) উক্ত ট্রিব্যুনাল গঠিত হয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট জজ, অ্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ আর শ্রীভবানন্দ ফুকন বার এ্যাট-লোয়ে নিবে। (নলিনী ঘোষ)।

(ঙ) এই নটোরিয়াস আবসকন্ডারই ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ।



সুবর্ণলতা

দ্বারা বাহ্যিক উপন্যাস

আশাচূর্ণা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধুলে হঠে গেল আজীবনের সমুদ্র, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরকালের গোপন ভালবাসার ধনগুলি। সুবর্ণলতার আর কোনো খাতা রইল না।

যে খাতাগুলি দীর্ঘকাল সঙ্গী ছিল, তিলে তিলে ভবে উঠাছিল বহু সুখ দুঃখের অনুভূতির সম্মিলে। লোকচক্ষুর অন্তরালে কত সাবধানেই লেখা আব তাদের বাখা। এক-একখানি খাতা সংগ্রহের পিছনেই ছিল কত আগ্রহ কত ব্যাকুলতা কত চেষ্টা আব কত রোমাঞ্চময় গোপনতার ইতিহাস।

হাতে পরসার অভাব তাব কখনই ছিল না একথা সত্যি, উমাশশীব মত বিম্বুর মত দৃঃখময় শূন্যহাতের অভিস্রুতা কদাচ না, প্রবোধের ভালবাসার প্রকাশই ছিল 'খরচ কোবো'—বলে কিছু টাকাপরসা হাতে গুঞ্জে দেওয়া। কিন্তু দেওয়াটা লোকের চোখের আড়ালে হলেও সেই 'খরচটা' তো আড়াল দিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। সুবর্ণ তো আর নিজের দোকানে মাঝে না?

কাউকে দিয়ে আনানো?

তা' সদর বাস্তার পথ ধরে যে বেরোবে আর চুকবে সে তো মশা-মাছি হয়ে কবাবে না সেই কাজটা? প্রথমবার যখন সুবর্ণ অবোধ ছিল, অতএব অসতর্কও ছিল, দু'লোকে আনতে দিয়েছিল মলাট বাঁধানো খাতা একখানা, সহস্র 'কথা'র জনক হলো সেই খাতা!

কেন কি দরকার, এমন দামী আর সৌখিন খাতা কোন কাজে লাগবে, পরসা

থাকলে ধোবা-গয়লাব হিসেবও তা'হলে চার আনা ছ' আনার খাতায় ওঠে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই থেকে সাবধান হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণ।

গোপনতা সে ভালবাসে না। কিন্তু এমন—উদ্‌ঘাটিত হতেও ভাল লাগে না। তাই ঘরের জানলা থেকে পাশের বাড়ির একটা ছোট ছেলের হাতে সুকৌশলে খাতাব পরসা এবং তার ঘাড়ি লাটুর পরসা চালান করে কবে মাঝে মাঝে খাতা আনানো। বাঁধানো খাতা রুল-টানা।

লোকচক্ষুর আগোচরে আনিয়েছে তাদের মালিক, লোকচক্ষুর অন্তরালেই রেখে দিয়েছে। লালন কবেছে হৃদয়রস দিয়ে, পুষ্ট কবেছে জীবন বেদনার আবেগ দিয়ে।

কতদিন কত নিভৃতক্ষেণে ভালবাসার হাতে হাত বুলিয়েছে তাদের গায়ে, ভালবাসার চোখে তাকিয়েছে। যেন তারা শূন্য প্রাণতুল্য কোনো বস্তুই নয়, প্রাণাধিক কোনো জীবন্ত প্রিয়জন।

সেই তাদের অহঙ্কার হলো, আলোর মূখ দেখতে চাইল তারা।

অহঙ্কারের জীব তোর, কি না আলোর মূখ দেখবার বাসনা? অতএব পেতে হলো সেই দুঃসহ স্পর্শের শাস্তি।

সেই ভালবাসার হাতই তাদের গায়ে আগুন লাগালো, সেই ভালবাসার চোখই নিম্পলকে বসে বসে দেখল তাদের ডস্ম হয়ে যাওয়া।

ছাতের সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল সুবর্ণ, ভেবেছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী না থাকে।

কিন্তু সিঁড়ির ওই দরজাটার ছিট-কিনি আলগা ছিল, দরজাটা ধবে টানতেই খুলে গিয়েছিল। তাই—রয়ে গেল একজন সাক্ষী।

হঠাৎ স্তম্ভ দৃপ্তরে কাগজ-পোড়া গন্ধে আশঙ্কিত হয়ে এখব ওঘর দেখে-ছুটে ছাতে উঠে এসেছিল সে।

দরজাটা টেনে খুলেছিল, আর স্তম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

এখানটা চিলেকোঠার দেওয়ালের ছায়া পড়েছিল, তাই এই প্রচণ্ড বোদেব মাঝ-খানও তার মূখে আগুনের আভার স্ফলক দেখা যাচ্ছিল। সেই আভাষ চির-পরিচিত মূখটা যেন অস্বভূত একটা অপরিচয়ের প্রাচীর নিয়ে স্থির হয়ে ছিল।

কিন্তু ওই অপরিচিত মূখটার প্রত্যেকটি রেখায় বেখায় ও কিসের ইতিহাস আঁকা?

জীবনব্যাপী দুঃসহ সংগ্রামের?

না পরাজিত সৈনিকের হতাশার ব্যর্থতার আত্মধিকারের?

কে জানে কি।

যে দেখেছিল, তাব কি ওই রেখার ভাষা পড়বার ক্ষমতা ছিল?

হয়তো ছিল না। তাই মূহূর্তকাল বিহবল বিচলিত দৃষ্টি মেলে দেখেই ভয় পাওয়ার মত ছুটে পালিয়ে এসেছিল সিঁড়ি বেয়ে!

তারপর?

তারপর সেই হত্যাকাণ্ডের দর্শক এক
মিনিট চেতনার অধি পদ্মে হাতড়ে
বোড়িয়েছে সেই রেখার ভাবন পাঠোখারের
আশায়।

অজ্ঞাতে কখন তার চোখ দিয়ে জল
গাড়িয়ে পড়েছে মনে মনে উচ্চারণ করেছে
সে, 'চিরদিন তোমাকে ভুল বন্ধে এসেছি
আমরা, তাই অবিচার করেছি।'

টেউটা আনলেন জয়াবতী।

সুবর্ণলতার সঙ্গে বীর চিরকালের
কথার বন্ধন।

নিত্য দেখা হয় তা নয়, চিঠিপত্রের
নেতৃ রচনা করেছে যে হৃদয়ের আদান-প্রদান
বজ্রাঘ তাও নয়, অথচ আছে সেই বন্ধন
অটুট অক্ষর। সেই শৈশবের মতই নির্মল
উজ্জ্বল স্নেহ আর সম্ভ্রমের সীমারেখার
সুন্দর।

জয়াবতী এখানে কদাচিৎই আসেন।

যদিও বাপের বাড়িতেই থাকেন অধি-
কাশ সময়, এবং সে বাড়িটা বড়লোকের
বাড়ি, কাজেই তাঁর গতিবিধির উপর যেমন
কোনো নিয়ন্ত্রণাদেশের চাপ নেই, তেমনি
আসা-যাওয়ার অসুবিধেও নেই, তথাপি
যোগাযোগ রাখার কৃতিত্বটা বরং সুবর্ণ-
লতাকেই দিতে হয়। অনেক কাল দেখা
না হলে—সুবর্ণই গিয়ে পড়ে একদিন
জয়াবতীর বাপের বাড়ি।

প্রবোধ একে মান অভিমানের প্রশ্ন
ভুললেও সুবর্ণ সেটা গ্রাহ্য করে না।
সুবর্ণ সে প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'ও এসে
হবেটা কি? আমার এই নিরবচ্ছিন্ন
সংসারের মধ্যে নিশ্চিন্দ হলে দুটো গল্প
করবার সময় পায়? এই এটা, এই সেটা,
চোন্দবীর উঠছি আর ছুটছি। তার থেকে
আমি যে সংসারের দায় থেকে খানিক
ছাড়া নিয়ে চলে গিয়ে বসি সেটা অনেক
স্বস্তির। ওর তো ওখানে কোনো কাজেব
দায় নেই!.....তোমার যদি গাড়িভাঙার
পরস্যাটা গায়ে লাগে তো বল, মান সম্মানের
কথা তুলতে এসো না।'

কুটুম্ববাড়ি?

তাতে কি?

আপন পব নির্ধারণের বাধা সড়ক
ধরে কোনোদিনই চলেতে পাবে না সুবর্ণ,
কাজেই ও কথা বলে লাভ নেই। সামান্য
একটা অনুষ্ঠানের সূত্রে মুক্তকেশীর
সংসার পরিজনের পোষা বিভ্রাটটি পর্যন্ত
সুবর্ণের 'আপন', দুনিয়ার আর কেউ
'আপন' হতে পারবে না এ নিয়মে বিশ্বাসী
নয় সুবর্ণ।

কাজেই 'মন কেমন' করলে সুবর্ণই
গিষেছে প্রবোধের খংখংতোমি উপেক্ষা
করে।

কিন্তু ইদানীং বহুকাল বৃষ্টি যায় নি।

তাই জয়াবতীই এলেন একদিন।

উকিল ভাই কোর্টে যাবার সময়
গাড়ি করে এনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।
ফেরার সময় নিয়ে যাবেন।

সুবর্ণের দাদাও উকিল, আর তারও
নাকি গাড়ি আছে। কিন্তু থাক সে কথা।
জয়াবতী এলেন, আর একটা টেউ নিয়ে
এলেন, সেটাই হচ্ছে আসল কথা।

জয়াবতীরা কয়েক জনে দল বেঁধে
বদরিকাশ্রম যাচ্ছেন, সুবর্ণলতাও চলুক
না! বাইরের কেউ নয়, জয়াবতীর দুই
বোন, একজন ভাই, আর একটা বিধবা
নন্দ। তা সে তো সুবর্ণেরও নন্দ।

সঙ্গে বাবে বাড়ির এক পুরনো সরকার
আর ওখানের পাঁচ। অভাব দলটা
ভালোই।

আর জয়াবতীরও খুব হচ্ছে হচ্ছে।

সুবর্ণলতার জ্বরের মত যাচ্ছে কদিন,
সুবর্ণলতা শুরোছিল, উঠে বসলো, বললো,
'হ্যাঁ যাবো!'

জয়াবতী হাসলেন, 'দাঁড়া বাবু আগে
বরের মত নে, তবে দলিলে সই কর। যাব
বলেই তো হবে না।'

সুবর্ণ সংক্ষেপে বললো, 'হবে। তুমি
আমার ব্যবস্থাও কর। আর কি কি সঙ্গে
নিতে হবে, কত কি লাগবে সেটাও—'

'মেজ ঠাকুরপো আবার এতদিনের
বিরহে চোখে অশ্রুকার দেখবে না তো?'
জয়াবতী হেসে বললেন, 'তাড়াতাড়ি কিছু
নেই, ভেবে চিন্তে বললেই হবে, এখনো
মাসখানেক সময় হাতে আছে।'

সুবর্ণলতা বলে, 'ভেবে চিন্তেই
বলেছি। ভেবে ভেবেই মরিছিলাম, কোথায়
পালাই, তুমি ভগবান হয়ে এলে।'

জয়াবতী ভগবান হয়ে এলেন সুবর্ণকে
দু'দিনের জন্যে কোথাও পালাবার জায়গা
খুঁজে দিতে। কিন্তু সুবর্ণের ভাগ্যের
ভগবান? দুঃসাহসী সুবর্ণ যাকে
জিগোস না করেই দলিলে সই করে
বসলো? সে কি চূপ করে থাকবে?

না কি আহ্লাদে গলে গিয়ে বলবে,
'তা বেশ তো। এমন একটা সুযোগ যখন
এসেছে। যাও নি তো কখনো কোথাও।'

তা বললে হয়তো মহত্ব হতো, কিন্তু
অন্ত মহৎ হওয়া সবাইয়ের কৃষ্টিতে লেখে
না। বাড়ি ফিরে খবরটা শুনে উদ্ভাল
হলো প্রবোধ, 'টেউটি আনলেন কে?
টেউটি? ও বাড়ির নতুন গিন্নী? তা
তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন, চিরটা কালই
তো মনসাব মন্দিরে ধনোব ধোঁয়া দিয়ে
এসেছেন তিনি। বলে দিও 'হাওয়া
সম্ভব হবে না।'

সুবর্ণ শান্তগলায় বলে, 'বলে দিয়েছি
যাব।'

'বলে দিয়েছে? একেবারে কথা দেওয়া
হয়ে গেছে?' প্রবোধ ক্ষুব্ধ ক্রোধেব গলায়
বলে, 'আমি একটা বড়ো যে আছি

বাড়িতে, তা বৃষ্টি মনেই পড়ল না?
বলতে পারলে না—না জিগোস করে কি
করে বলবো?'

সুবর্ণ অনেকদিন পবে আবার আঙ
একটু হাসলো, বললো, 'তা আমিও তো
বুড়ো হয়েছি গো! নিজেব ব্যাপারে
নিজের একটা ইচ্ছে অনিচ্ছে চলবে না,
এটাও তো দেখতে থাবাপ?'

একটা ইচ্ছে অনিচ্ছে!

প্রবোধ যেন মাথায় লাঠি খায়।

'একটা ইচ্ছে অনিচ্ছে? কোন কাজটা
না তোমার ইচ্ছের হচ্ছে?'

সুবর্ণ আবারও হাসে, 'তাই বৃষ্টি?

তা হলে তো গোল মিটেই গেল। সবই
হচ্ছে, এটাও হবে।'

'না না হবেটবে না?'

প্রবোধ যেন ফুঁ দিয়ে জুলোর ফুলকি
ওড়ায়।

'এই শরীর খারাপ, নিত্য জ্বরের
মতন, এখন চলবেন, মরণবাচনের তীর্থে।
তীর্থ পালিয়ে যাচ্ছে।'

'তীর্থ পালিয়ে যাচ্ছে না সত্যি',
সুবর্ণ মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, 'আমি তো
পালিয়ে যেতে পারি?'

সহজ কথাব পথ অনেকদিন রুদ্ধ
ছিল, হঠাৎ একবার এক অলৌকিক মন্ত্রে
খুলে গিয়েছিল সেই বন্ধ দরজা। শ্যামা-
সুন্দরী দেবীর ছেলে জগন্নাথ চাটুসোর
নিচের তলার একটা সান্থসেতে ঘরে প্রাণ
পাচ্ছিল সেই মন্ত্র, তারপরে ভেসে গেল
'সব, মন্ত্র গেল হারিয়ে। আবার বন্ধ হবে
গেল দরজা। শৃঙ্গ আবরণ একটা থাকলো।



গৌর মোহন দাস এও কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার ফ্রিডি
কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৫৮০

জরতাব। নিতাই যদি জরতাব হয় মনুষ্যের সহজতাব আর আসবে কোথা থেকে?

আজ আবার অনেকদিন পরে হেসে কথা বললো সুবর্ণ, 'আমি তে পালিয়ে যেতে পারি।'

কিন্তু প্রবোধ কি এই ছেলেভোলানো কথাটায় ভুলবে? প্রবোধ হাঁ হাঁ করে উঠবে না? বলবে না, 'মেজাজ খারাপ করে দিও না মেজবো ওই সব ছাইভস্ম কথা বলে। আমি বলে দিচ্ছি—এই শরীর দিয়ে কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবে না তোমার। জানু কাল কোটে নতুন গিমারী দামার কাছে খবরটা দিয়ে আসবে।'

'তা হয় না—' সুবর্ণ বলে, 'কথা দিয়েছি। শরীর বরং পাহাড়ে হাওয়ায় ভালই হবে।'

'ভাল হবে? বললেই হল?' প্রবোধ হু-পাক ধরে হঠাৎ বলে ওঠে, 'যাব কিছো মানে? বড়বোমার ছেলেপুলে হবে না?'

সুবর্ণ শ্রান্ত গলায় বলে, 'সে হবে, ওর মার কাছে হবে। ও নিয়ে তুমি পুরুষ মানুষ মাথা ঘামাছো কেন?'

'আমি মাথা ঘামাব না! আমি বাড়ির কেউ নই?' হঠাৎ জামার হাতটা একবার চোখে ঘসে প্রবোধ, তারপর ভঙা গলায় বলে, 'বোমা বাপের বাড়ি চলে যাবে, আর আমি আমার কাজকর্ম ফেলে তোমাব ওই বাড়ি আইবুড়ো মেরেকে আগলাবো?'

সুবর্ণর ইচ্ছে হয় চাদরটা মুখ অবধি টেনে পাশ ফিরে শোয়, তবু সে ইচ্ছে বন্ধ করে আস্তে বলে, 'আগলাবার কথা উঠছে কেন? ছোট বোমা তো কোথাও আছে না? দু'জনে থাকবে—'

'থাকবে!' হঠাৎ যেন গর্জন করে ওঠে প্রবোধ, 'থাকবে কি উড়বে তা ভগবানই জানে। তোমার রাগের ভরে বলি না কিছু বোঝাকালো সেজে বসে থাকি। কিন্তু এই বল দিচ্ছি তোমার এই ছোট মেরেটির চাকবন্দী ভাল নয়। পরিমলবাবুর ছেলেটার সঙ্গে তো যখন তখন গুজগুজ। কেন? ওর সঙ্গে এত কিসেব কথা? আমি বলে দিচ্ছি মেজবো তুমি যদি তীর্থ তীর্থ করে উধাও হও। এসে মেয়েকে ধরে দেখতে পাবে কি না সম্ভব। হয়তো—'

সুবর্ণ উঠে বসে, সুবর্ণ প্রবোধের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায় একটু. তারপর তেমনি স্থির গলায় বলে, 'তা যদি দেখি, সে সাহস যদি দেখাতে পারে ও যাবো আমার রক্তমাংস একেবারে বখা হয় নি। একটা সম্মানও মাতৃশ্রম শোধ করেছে।'

শরে পড়ে আবার।

প্রবোধ সহসা যেন একটা চড় খেয়ে

স্তম্ভ হয়ে যায়। তারপর ভাবে কথা দোষ দিচ্ছি, মাথাটা খারাপই। ছটফট করে বেড়ায় খানিক, তারপর আবার ঘুরে আসে। আর আবারও নিলক্ষের মত বলে ওঠে, 'রাগের মাখায় বলে তো দিলে একটা কথা। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে তবে তো পরের কথায় নাচা—'

হয়তো ঠিক এভাবে কথা বলার ইচ্ছে তার ছিল না, তবু অভ্যাসের বশে এ ছাড়া আর কিছু আসে না মুখে।

সুবর্ণ এবার সত্যিই পাশ ফিরে শোয়।

শুধু তার আগে আরো একবার উঠে বসে। মুখকণ্ঠে বলে, 'তোমার কাছে হাতজোড় করে কটা দিন ছুটি চাইছি. সেটুকু দাও তুমি আমাকে! সব চাকরীরই তো কিছু না কিছু ছুটি পাওনা হয়, তোমার সংসারে এই ছটিশ বছর দাসত্ব করছি আমি। দুটো মাসও কি ছুটি পাওনা হয় নি আমার?'

অভিমানিনী পারুল স্বেচ্ছায় স্বর্গের টিকিট ত্যাগ করেছিল। একদা তাব আর বকুলের স্কুলে ডাতি হওয়া নিয়ে যখন সংসারে বড় উঠেছিল, তখনি পাবল বেকের বসেছিল, বলেছিল, 'এত অপমানের দানে রুচি নেই আমাব।'

অথচ ওই 'স্কুল' নামক জায়গাটা সত্যিই তার আজন্মের স্বপ্ন-স্বর্গ ছিল। সামনে পিছনে আশেপাশে যে বাড়িগুলো দৃষ্টিগোচর হতো, সকালের দিকে সেই বাড়িগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা একটা কাজই ছিল পারুল—

সেই সব বাড়ির যে সব মেরেরা স্বপ্ন-রাজ্যের প্রবেশপথ পেয়েছে, তাবা কেনন করে বেণী ঝুলিয়ে বইখাতা বকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাদের দেখবার জন্যে চেষ্টার আর অন্ত ছিল না পারুলর।

আর বাদের বাদের বাড়ির দরজার সেই একটি খড়খড়ি আটা টানা লম্বা গাড়ি এসে দাঁড়াতো, পোষাক পরা চালক বিশেষ একটি সুরে হাঁক দিত, এবং একটু বড় বয়সের মেরেরা ধোঁপাবাধা বাড়টা একটু হেঁট করে তাড়াতাড়ি বেরিয়েই গাড়িতে গিয়ে উঠতো।

তাদের দিকে ছিল বৃদি বড়জ্ঞার দৃষ্টি, ঈশ্বার দৃষ্টি।

'জগত্তের আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ।' নিমন্ত্রণ নেই শুধু পারুলদের।

মেহেতু তারা ভারি একটা পণ্যময় সনাতন বাড়ির মেয়ে। তাই পারুল শুধু তাদের জানলার খড়খড়ি ভুলে সেই নিমন্ত্রণ-যাত্রার দৃশ্য দেখবে।

বড় হওয়া অবধি বারান্দায় দাঁড়ানোর শাসন দৃষ্টি পড়েছিল, তাই ভরসা ওই 'পাখী' দেওয়া জানলা। পারুল বকুলের মা চেয়েছিল ওই টিকিট তাদের জন্যে জোগাড় করে দিতে। সম্পূর্ণ কৃতকাবি হয় নি।

বড় উঠেছিল, সেই ঘড়ের ধুলোর অম্ম হয়ে গিয়েছিল অভিমানিনী পারুলের পায়ের বগেছিল, 'আমায় দরকার নেই।' বকুলের অভিমান অত দুঃস্বপ্ন নয়। বকুল অবজ্ঞা আর অবহেলায় ছুটো দেওয়া টিকিটখানা পেয়েই ধন্যবোধ করেছিল।

তা হয়তো ওটুকুও জুটতো না, যদি বকুলের সামনের লাইসে তার দিদি থাকতো।

সেজদি।

দুঃস্বপ্নের দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুবর্ণ, সুবর্ণর বৃদ্ধভীত স্বামী মাঝে মাঝে রফা করতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'বকুল যায় থাক, পারুল আবার যাবে কি?'

আর তার বিশ্বাস বিজ্ঞ ছেলেরা বলেছিল, 'বিদ্রোহী হয়ে হবেটা কি? কলাপাতে না এগোতেই তো গ্রন্থ লিখছো।'

অতএব পারুল সেই রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছিল। আর এক কড়া স্কুলে ডাতি হয়ে চলে গিয়েছিল সেখানেই বোর্ডিঙে।

নিঃশব্দচারিণী নিঃসঙ্গ বকুল নীরবে তার স্বর্গে যাওয়া-আসা করছিল।

কিন্তু সেই আসা-যাওয়ার পথের দিকে যদি কেউ চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি চোখাচোখি হওয়া মাত্র আনন্দে ভাস্কর হয়ে ওঠে সেই চোখ, বকুল কি করবে?

বকুল বড়জোর বলতে পারে, 'রোজ রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকো যে? কলেজ নেই তোমার?'

সে তো সগে সগে জবাব দেবে, 'স্কুল বসবার পরে কলেজের টাইম, এই একটা মুস্ত সুবিধে।'

বকুল যদি লাল লাল মুখে বলে, 'ব্যা তাই বলে তুমি রোজ রোজ—'

সে সপ্রতিভ গলায় বলে ওঠে, 'পাকি তা কি? তোর কি ধারণা তোকে দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি?'

আর কি বলতে পারে বকুল?

আর কিভাবে প্রতিকার করতে চেষ্টা করবে?

ওর সগে কথা কইতে যাওয়াতেও বে

দাঙ্গাহক বসুমতী

ভয়। ওর চোখের তারায় বেন অজস্র
কথার জোনাকি, ওর কথার ভঙ্গীতে বেন
এক অসীম রহস্যলোকের ইশারা।

তবু ওর বেশি নয়।
বেন উদ্ঘাটিত হতে রাজী নয়
কোই।

যা বলবে কৌতূহলের আবরণে।
কিন্তু বলবে অনেক ছলে, আর দেখা
করবে অনেক কৌশলে।

তবু সে কৌশল ধরা পড়ে যাচ্ছে
অপরের চোখে।

অন্তত বকুলের বাপের চিরসন্ধানী

সন্নেহের চোখে। আর সে ওই নুড়ির
মধ্যেই পর্বত দেখছে, চারা গাছের মধ্যেই
মহীরুহ।

অতএব সূর্যনাশের ভয়ে আতঙ্কিত
হচ্ছে।

[ক্রমশঃ]

আপনিও কি

ভাবছেন না

কয়েক বছর পরেই

- মেয়ের বিয়ে দিত হাব
- ছেলের পড়াশুনা রাখাচ্ছে
- একথানা বাড়ী করতে
পারলে ভালো হয়...

এই প্রকল্প প্রয়োজনগুলি মেটাবার পক্ষে জন্মবর্ধমান নির্দিষ্টকালীন
জমা পরিকল্পনা হ'ল একটা বেশ ভালো এবং প্রমাণিত পদ্ধতি।

প্রতি মাস পোষ্ট অফিসে নিয়মিতভাবে ৫ টাকা বা এর জুগিতাক ৩০০ টাকা
পর্যন্ত ৫, ১০ বা ১৫ বছর পর্যন্ত জমা দিলে, ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনি যত
টাকা জমা দিয়েছেন (সঞ্চালিত) তেরং পাবেনই তার সঙ্গে ঐ টাকার সুদ ও বোনাস
পাবেন আর তার জন্য কোন আয়কর দিতে হবেনা। দশ বছরের নির্দিষ্টকালীন
হিসেবে প্রতি-মাস ১০ টাকা জমা দিলে ঐ সময়ের পর আপনি সুদ ও বোনাসসহ
আয়করমুক্ত ১৫০০ টাকা পাবেন এবং ১৫ বছরের হিসেবে পাবেন ২৬০০ টাকা।
১০ বা ১৫ বছরের হিসেবে আপনি যে টাকা জমা দেন তাতে মোট আয়কর
গ্রানিকটা রোহাই পাওয়া যায়।

আপনার কাছাকাছি

পোষ্ট অফিসে

জন্মবর্ধমান নির্দিষ্টকালীন জমাদানী

একটা পাশ বই কলুন



জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্বাভাস]

৥ দুই ৥

দুর্বেই বলোছি—“স্বাধীনতা এল কিন্তু ভাবত ভেঙে” দা’ভাগ—ভারত ও পাকিস্তান হল।” ছিল, অথচ এক ও দ্বিভাজ্য ভারতবর্ষ। কিন্তু স্বাধীনতার দু’ সত’ অনুদায়ী তাকে কেটে দা’ভাগ করতে হল—ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করে ক্ষয় নিল, পাকিস্তান। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পূর্ব সত’ ছিল—হিন্দু-মুসলমানের মিলন চাই; অথবা উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক রাষ্ট্র! সাম্প্রদায়িকতাবাদী “মুসলিম লীগের” প্রধান জিগিরাই হল—মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্র চাই—ই—হিন্দু-মুসলমান এক সাথে এক জাতীয় পতাকাব নিচে বাস করতে পারে না। মুসলমানদের “অধো-প্রাণ” সংখ্যক জাতীয়তাবাদী ছাড়া অধিকাংশের মধ্যেই এই বি-জাতীয় বি-জাতিতত্ত্ব বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। একদিনে এই মনোভাব গড়ে নি। হঠাৎও নয়। আজ থেকে ৬০ বছর আগে, অর্থাৎ দেশ-বিভাগের কিছু-কম-বেশ ৪০ বছর আগে—ভারতবর্ষের মাটিতে এই বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয়—রোপণ করেন, সাম্প্রদায়িকতাবাদী তৎকালীন জনকরেক তৎকালীন মুসলমান নেতা; আর, প্রোথিত বীজ-ক্ষেতে ৪০ বছর ধরে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার জল-সিঞ্চন করে চলল। তখন সরকারের প্রয়োজন ছিল, সাম্রাজ্য-রক্ষার। সাম্রাজ্য বজায় রাখতে গেলে ভেদ-নীতির দরকার। বিদেশী শাসিত দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ভেদ-নীতিকে রাজ-নীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করে থাকে। ইংরেজও এখানে তা-ই করেছিল।

ইংরেজ, ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তা প্রধানত মুসলমান-নবাব-বাদশাহদের হাত থেকে রাজ্য দখল কবে করেন; সুতরাং সাধারণ মুসলমান, ইংবেজ বিরোধীই ছিলেন। তাই, মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু লোক সংঘবৎস হয়ে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে বিদ্রোহও করেছেন। মোল্লা-মোলবীরাও ‘ফতোয়া’ দিয়েছেন, কেউ যেন ইংরেজের দক্ষা শিখে সরকারের সাথে সহযোগিতা

না করেন। মুসলমানগণ, সেই সব ‘ফতোয়া’ মেনে তৎকালীন ইংরাজ শিকার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েন। হিন্দুরা মনে করেন—তারা ছিলেন; মুসলমানের অধীন। এখন হলেন ইংরেজের অধীন। মুসলমানের অধীন থাকাকালে মুসলমানের ভাষা আরবী-পার্সি তারা শিখতেন। এখন যখন ইংরেজ রাজার অধীন হলেন, তখন তাঁদের ভাষাই শিখতে হবে; তাই, হিন্দুরা ইংরেজি শিখতে এগিয়ে গেলেন; ফলে, রাজকাবের দপ্তরে হিন্দুদেরই স্থান হল—মুসলমানরা—সৈদিক দিয়ে পিছিয়েই থাকলেন। কিন্তু অবস্থা তো চিরদিন একইরূপ থাকে না। পরিবর্তন, জগতের নিয়ম। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেয়। সৈয়দ আহমেদ খান (পরে, সার) শিক্ষার-সীক্ষার বড় হয়েছেন—পদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর দহবম-মহরমও হয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রধানদের প্রয়োচনাতেই তিনি আরম্ভ করলেন, মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সেই আন্দোলনের প্রধান উপজীব্যই হোল হিন্দু-বিশেষ প্রচার। তিনি দেশময় তুললেন ধর্মের জিগির। মানুষের সব আকর্ষণের সেরা আকর্ষণ হল, ধর্ম—বিশেষ করে, এই ধর্ম-প্রাণ ভারতবর্ষে। মুসলমানদের মধ্যে সভা-সমিতি চলতে লাগলো। টাকাও উঠতে লাগলো। একটা আন্দোলন গড়ে উঠলো। এই আন্দোলনকে বলা হয়—আলিগড়-আন্দোলন। আলিগড়-আন্দোলনের “তাহজিবুল-ইখলাক” নামে এক-খানি সংবাদপত্র বের হল। এই সংবাদপত্রে মুসলমানদের নবজাগরণের আহ্বান জানিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বের হতে থাকলো। এই আন্দোলনের ফলেই গড়ে ওঠে—“আলিগড় মুসলিম কলেজ।” বর্তমানে একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—“আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।” আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শেতাঙ্গ ইংরেজ সন্তান। তাঁদের শিক্ষার ভিত্তিও ছিল হিন্দু-বিশেষ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে সব সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমান নেতৃবৃন্দের আসনে গিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই হলেন, “আলিগড় মুসলিম

কলেজের” প্রাক্তন ছাত্র। মরহুম লস্কাৎ আলি খান ও শেখ আব্দুল্লা প্রমুখ ছিলেন, আলিগড়েরই ছাত্র। শিক্ষা, মানুষকে ভালও বৈষম্য করতে পারে, আবার শিক্ষার নামে কু-শিক্ষা মানুষকে খারাপও তৈরী করতে পারে। তার প্রমাণ আমরা ভারত-বিভাগের মধ্যে দিয়েও দেখেছি—আজও তার বিষময় ফল ভোগ করে চলেছি। পরাধীন ভারতে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করতেন বিদেশী শাসক, অথবা তাঁদেরই ‘জো-হু-কুম’ তাঁবোদাগরণ। এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে না-বলে পারছি না। দেশ, এখন স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মূলনীতির যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে তা মনে হয় না। সবই যেন সেই বৃটিশ সরকারের আমলাতান্ত্রিকতার গন্ডালিকা-প্রবাহেই চলছে। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মহম্মদ করিম চাগলা সাহেব শিক্ষাকে অসাম্প্রদায়িক করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। আলিগড় ও কাশ্মীর দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের “মুসলিম” ও “হিন্দু” বিশেষণটি বাদ দিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক জনমত বিক্ষুব্ধ হল—স্বাধীন ভারতের সরকার তার মধ্যে দেখলেন, আগুনের ফুলকি! সেই আগুনের ফুলকিতে হয়তো, সাধারণ নির্বাচনে ভোটের বাজ পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে; সুতরাং, ভোটের স্বার্থ দেশের স্বার্থকে ছাঁপিয়ে উঠলো—গণতান্ত্রিক সংসদের অধিকাংশের ভোটে চাগলা সাহেবের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতার আর, আরও কিছুকাল থেকেই গেল। অতীত দেখেও যে আমাদের শিক্ষা হল না—এইটাই আফশোষ। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ভেদ-নীতি ছিল রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ; আর, স্বাধীন ভারতের ভোট-নীতিই হয়েছে, রাজনীতির মূলনীতি! এখানে সরকার পক্ষীয় ও বিরোধী পক্ষীয় রাজনীতিকদের চলছে ক্ষমতা-ভোগ ও ক্ষমতা-দখলের রাজনীতি। এই রাজনীতির পাল্লায় পড়ে দেশের স্বার্থও সময়ে সময়ে ক্ষয় হচ্ছে। হয়তো এই অবস্থারও পরিবর্তন আসবে। বত তাড়াতাড়ি আসে,

পাঠ্যাহিক বসুমতী

ততই মঙ্গল। সাম্প্রদায়িকতাই দেশের
সবচেয়ে বড় শত্রু—তা' হিন্দুই হোক,
বা মুসলমানেরই হোক। সমাজ-জীবনের
প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে একে নির্মম
হাতে কেটে বাদ দিতে না পারলে খণ্ডিত

ভারতের স্বাধীনতা বিপর্য হবে। ঘটনা-
চক্রে ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে যেতে হয়েছে
কিন্তু ফিরে আসার আশা মনের কোণ
থেকে ছেড়ে ছিল না। সেই জন্যই
অ-সাম্প্রদায়িক ভারতের পাশে, গড়ে রেখে

গিয়েছে এক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র—পাক-
স্তান। সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ রাজ-
নীতির এই খেলা খেলার জন্যই ইংরেজ-
শাসক সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়েছে।
শুদ্ধ প্রশ্রয়ই দেয় নি—প্ররোচনাও দিয়েছে।

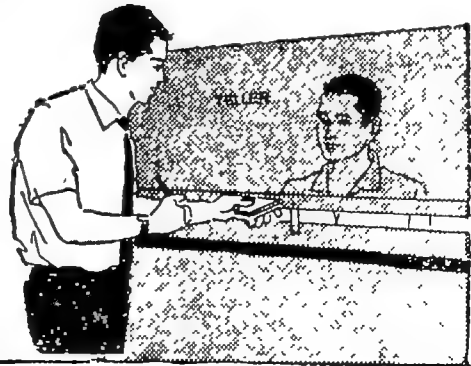
টোকেন-এর
দরকার হয় না...



হয়রান হয়ে অপেক্ষা
করতে হয় না...



আপনার চেক সন্তে-সন্তেই
ক্যাশ হয়ে যায়
আমাদের চমৎকার
টেলার সিস্টেমে



গ্রাঞ্জার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১০ ৮ ৩ ৭

উৎপাদন বৃদ্ধি—আত্মনির্ভরতার একমাত্র উপায়।

এই প্রশ্ন ও প্রবোচনার ফলই হচ্ছে, সৈয়দ আহমদ খান ও তাব আলিগড় আন্দোলন।

এই আলিগড় আন্দোলনের সাথে এসে পরে যোগ দিলেন, আরও একজন গোঁড়া ধর্মাবলম্বী মুসলমান নেতা। তিনি হলেন, মেহেদি আলি খান। উত্তরপ্রদেশের এটোষায় তাব জন্ম হয়। খুব দরিদ্রের ঘরের সন্তান। তিনি তাঁর মামার আশ্রয়ে থেকে আরবি, পার্শী ও ইসলামের ধর্মতত্ত্ব পড়া শেষ করে উত্তরপ্রদেশের কালেক্টারিতে একটি কেরানীর পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁর অধ্যবসায় ও মূবদ্বিশ্বের জোরে তিনি ডেপুটি সেক্রেটারি পদে পদোন্নতি হয়েছিলেন। পরে সৈয়দ আহমদ খানের সুপারিশে তিনি হায়দরাবাদে নিজাম সরকারের অধীনে উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। ২০ বছর কাল তৎকালীন হায়দরাবাদের সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়ায় নিজাম-সরকারের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক বিভাগের সচিবরূপে কাজ করে যখন পাকা-পোষ একজন সাম্প্রদায়িক নেতা হলেন, তখন তিনি সেই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে আলিগড় গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন এবং সৈয়দ আহমদ সাহেবের সহকারী রূপে আলিগড় আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুললেন।

এই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতে প্রতি-নিধি মূলক শাসন-সংস্কার করতে চান। ঘোষণাটি জনাব মেহেদি আলি খানকে (পরে, নবাব মহসিন-উল-মূলক বলে পরিচিত) বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। তিনি চিন্তা করে ঠিক করেন যে এই ঘোষণাকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে কাজে লাগাতে হলে প্রতিনিধি মূলক সরকার গঠনের আইনের মধ্যে মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু করতেই হবে। কিন্তু কবন কি করে? অবশেষে দৃষ্টি পড়লো আলিগড় মুসলিম কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লিউ. এ. জে. আকি'বউ সাহেবের ওপরে। সাহেব অধ্যক্ষকে নবাব মহসিন-উল-মূলক মেহেদি খান সাহেব ধরলেন যে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মন্টগের সাথে একটি মুসলমান প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দিতেই হবে। ইংরেজও তা-ই চায়। সে ইংরেজ পাটকলের সাহেবই হোক, বা রাজপ্রতিনিধিই হোক। সুবাহই উদ্দেশ্য তো একই। সাম্রাজ্য রক্ষা। অধ্যক্ষ সাহেবও তখনই ভাইসরয়কে মুসল-মানদের একটি 'ডেপুটেশন'কে আলোচনার সুযোগ দিতে অনুরোধ জানানেন। হাতে হাতে ফলও মিললো। ভাইসরয় লর্ড মন্টগো রাজ্যই হয়ে গেলেন। ৩৫ জন

মুসলমান নেতার সমবায়ে গঠিত এক তথাকথিত প্রতিনিধি দল ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর তাবিখে রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মন্টগের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এক সম্মানপত্র দিলেন—ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই সম্মানপত্রটি তাঁর করেছিলেন নবাব মহসিন-উল-মূলক সাহেব, নবাব ইমাদুল মূলক সাহেবের সহযোগে। এই সম্মানপত্রে অবশ্য, মুসলমানের জন্য শালন-সংস্কারে পৃথক নির্বাচন প্রথা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার ভেতরেই ছিল, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশ-বিভাগের বিষাক্ত বীজ। স্মারকলিপির এক স্থানে বলা হয়েছিল যে, যে সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা, রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের যে কোনও প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি, সেই সম্প্রদায় নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণেই তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণের স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। স্মারকলিপির ভাষাটাই এখানে উদ্ধৃত করছি:

"A community in itself more numerous than the entire population of any first class European Power except Russia may justly lay down adequate recognition."

এই প্রতিনিধিদলের মূল্যপায় হয়ে কথা বলেছিলেন, মহামান্য আগা খান। এই প্রতিনিধিদল যখন 'ভাইসরয়ের' কাছে তাঁদের স্মারকপত্র দেন, তখন পশ্চিম মুসলমানদের কোনও প্রতিনিধিমূলক রাজনীতিক সংস্থা গড়ে ওঠে নি। সম্ভবত প্রতিনিধিদল, রাজপ্রতিনিধির কাছে থেকেই প্রেরণা পান। একটা রাজনীতিক সংস্থা গড়ে তোলার। তার ফলেই, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কতিপয় নেতা ঢাকাব নবাব বাড়িতে মিলিত হয়ে গড়েন—"মুসলিম লীগ"—মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান।

মহামান্য আগা খান সাহেবের নেতৃত্বে তো ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধির কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হল। বড়লাট সাহেবও প্রতিনিধিদলকে যথেষ্ট উৎসাহ ও আশা দিলেন। তাহলেও বিলাতেও তো তাম্বির করা দরকার। নবাব মহসিন-উল-মূলক, তাই এখানেই চূড়চাপ খেয়ে থাকলেন না। তিনি লন্ডনে সৈয়দ আমীর আলি সাহেবের কাছে পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখে তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাম্বির করার অনুরোধ জানাতে থাকেন। ফলও ফলে। সৈয়দ আমীর আলি সাহেব সেখানে একটি 'কমিটি' গড়ে ভারত-সচিব ও ব্রিটিশ

এরকারের কাছে ভারতে প্রদত্ত স্মারক-লিপির সারমর্ম উপস্থিত করেন। অবশেষে ব্রিটিশ সরকারও প্রস্তাবটি স্বীকার করে নেন। তাঁরাও তো এই-ই চাইছিলেন!

ভারতে মহামান্য আগা খানের নেতৃত্ব সফল হল। ব্রিটিশ কুটনীতির জয় হল। মাননীয় আগা খান সাহেবও যথেষ্টই আনন্দ-প্রসাদ অনুভব করলেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সেটিও মহামান্য আগা খান ঘটিত ব্যাপার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। মিত্রপক্ষ তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। প্রগতিপন্থী মহান বিপ্লবী নেতা কামাল পাশা (পরে, "আতা-তুর্ক"—তুর্কী জাতির জনক) তুর্কী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়ে 'খেলাপ', তথা ইসলামের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বের আধার ও ধর্মের গোড়ামি ভেঙে দিয়েছেন। তুর্কীকে তিনি আধুনিকতম দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এক নতুন তুর্কী গড়বেন। এটাই তাঁর পরিকল্পনা। ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গলেন। অশিক্ষা ও কু-সংস্কারই হল, ধর্মের গোড়ামির ধারক ও বাহক। ধর্মের গোড়ামির সাথে সাথে অশিক্ষা ও কুসংস্কার দেশ থেকে উচ্ছেদ কবছেন, মহান নেতা আতা-তুর্ক কামাল পাশা। তুর্কী আবার শক্তিশালী হয়ে উঠুক—ইংরেজ তা চান না। তাই, পাঠালেন সেখানে মহামান্য আগা খানকে। আতা-তুর্কের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বিপ্লবী নেতা যে সহস্রলোচন—তাঁর যে দৃষ্টি সব দিকেই সে খবর তো আগা খান সাহেব জানতেন না। আতা-তুর্ক কামাল বললেন—"ইংরেজের দালাল হটো। ২৪ ঘন্টার মধ্যে তুর্কীর সীমানার ওধারে চলে যাও।" আগা খান সাহেব চলে যেতে বাধ্য হলেন। ভারতে মহামান্য আগা খান ব্রিটিশের সৌজন্যে যে সাফল্য লাভ করেছিলেন, বিপ্লবের পক্ষে পিচ্ছিলিত ভূরস্ক তা করতে পারলেন না। ভারতে তিনি পূর্বোদ্দেশ্যই সফল হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রদত্ত স্মারকলিপি ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ভাবতের শাসন-সংস্কার আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথারই ব্যবস্থা হল। এই তথাকথিত শাসন-সংস্কারের মধ্য দিয়ে সৈয়দ যে বিশ্ববিক্ষের অতি ক্ষুদ্র বীজটি ভারতের মাটিতে রোপিত হয়েছিল, তা-ই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ্যে মহারত্নরূপে দেখা দেয় এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪।১৫ই আগস্টে তাতে ফল ফলতে সুরু করে।

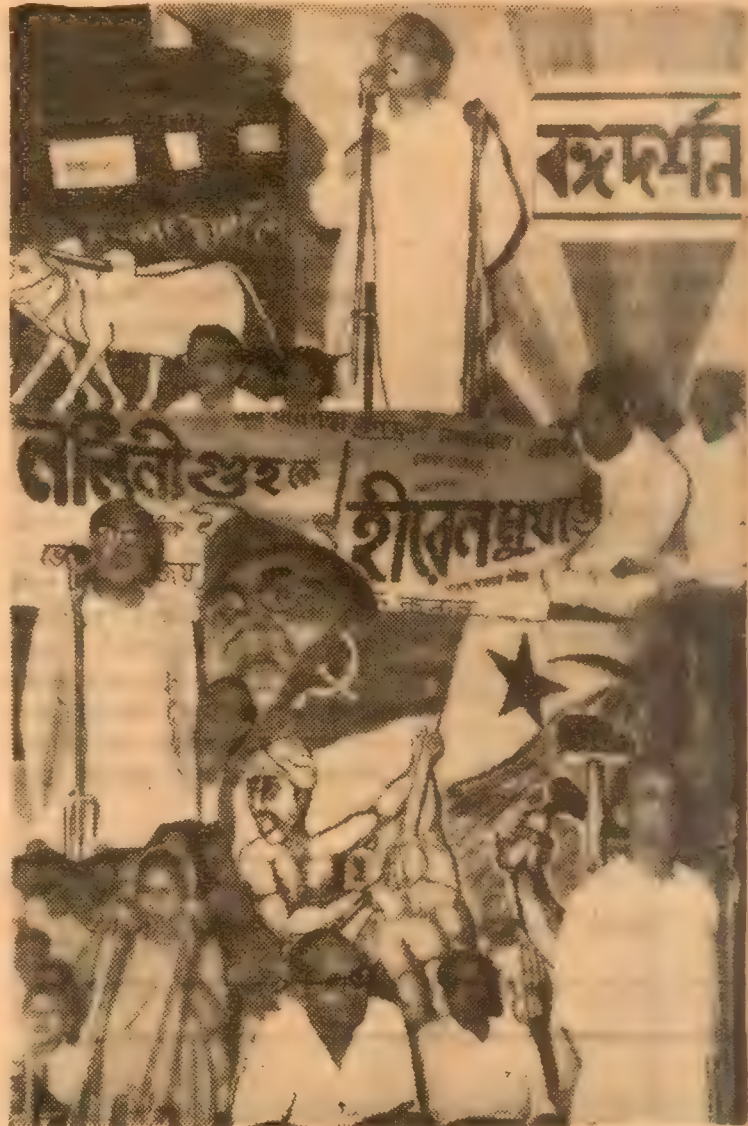
আজ সব বিষয়কে ছাপিয়ে যে বিষয়টি মূখ্য হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে ইলেকসান। এই বিষয়টির গুরুত্বের সঙ্গে অন্য কোন বিষয়ের কোন তুলনাই হতে পারে না, কেন না জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এই নির্বাচনের উপরেই যে নির্ভরশীল সে কথা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এ শব্দে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরই জীবনমরণের প্রশ্ন নয়, প্রতি দেশবাসীর ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ এই নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু বঙ্গদর্শন লেখকের শোচনীয় অবস্থাটা আপনারা এবারে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। যখন এই সংখ্যার সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শনী আপনাদের হাতে পৌঁছাবে তখন ইলেকসান শেষ হয়ে গেছে, বোম্ব হয় ফলাফলেরও অনেকটা প্রকাশিত হয়েছে। যার জন্য কয়েক মাস ধরে এত তোড়জোড়, এত উদ্দীপনা, এত প্রচার, এত অনুমান, সব কিছুরই সেদিন নিবৃতি ঘটে গেছে। আজকের উৎসাহ, আজকের জল্পনা-কল্পনার কোন অস্তিত্বই সেদিন থাকছে না।

অথচ যখন এ সংখ্যার বঙ্গদর্শন লিখতে হচ্ছে, তখন কিন্তু নির্বাচন শুরুর হয় নি। এখনো দুদিন বাকি আছে। কাজেই এই মূহুর্তে কোন কথাই বলা চলবে না। কে বলতে পারে যে রবিবারেই নির্বাচন হচ্ছে কি না? কে বলতে পারে হাঙ্গামা হবে না, নির্বাচন ব্যর্থ হবে না? কেন না এই রচনা লেখার সময় পর্যন্ত তা ভবিষ্যতের গর্ভে, আর দেশের যা আবহাওয়া তাতে নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না।

অথচ নির্বাচন ভিন্ন এ সংখ্যার আর কিছু লেখা চলে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে কি লিখব? আজকের প্রাক-নির্বাচনী আবহাওয়ার যদি কোন চিহ্ন আঁকতে হাই, তা যখন আপনাদের হাতে গিরে পৌঁছাবে তখন তার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। জয়-পরাজয় নিয়ে যদি আজ স্পেকুলেশন করি তাও নিরর্থক হবে, কেন না তখন ফলাফলের অনেকটাই প্রকাশিত হয়ে যাবে। কাজেই বর্তমান নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন কতকগুলি সমস্যার কথা আলোচনা করাই সঙ্গত বেগুলির গুরুত্ব নির্বাচন হয়ে গেলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

এবারে যে দুর্লক্ষণটি সারা ভারত জুড়ে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাবের জাগরণ। বস্তুরা নিজেদের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে রাখতে



এত তোড়জোর, এত প্রচার, সব কিছুরই নিবৃতি ঘটে গেছে আজ।

পারছেন না। উত্তর ভারতের সর্বত্রই নির্বাচনী প্রচার সভায় হাঙ্গামা হয়েছে। উড়িষ্যা প্রধানমন্ত্রী প্রস্তরাহত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের একজন বান নেতা ইচ্ছাকৃত হয়েছেন। ভবানী সেনের মত নেতা জানিয়েছেন যে, তাঁদের সুপারিকম্পিত উপায়ে হত্যা করার জন্যই অ্যাকসিডেন্ট ঘটানো হয়েছিল। মধু লিমায়ের মত সর্বভারতীয় নেতা ছুরিকাঘাত হলেন। এই জাতীয় ঘটনাসমূহের নিদর্শন দেখে মনে হয় যে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলি গতবারের তুলনায় অনেক বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বর্তমান নির্বাচনে কোন পক্ষ জয়ী হল, সেটা বড় কথা নয়, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যার ভিত্তিতে এই নির্বাচন, জনসাধারণের মত প্রকাশের ও প্রতিনিধি

প্রেরণের ব্যবস্থা, সেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহের ভবিষ্যৎ কি? এ পর্যন্ত শাসকদল বা বিরোধীদলসমূহ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টির কি নমুনা রেখেছেন? নির্বাচনের পরেও প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বার্থ কি করা হবে, কতটুকু করা হবে, সভ্যই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকবে কি না, বা চিরদিনের জন্যই তার অকালমৃত্যু ঘটবে এটাই নির্বাচনোত্তর ভারত তথা পশ্চিম-বঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

মনে রাখতে হবে নির্বাচনও একরকম মাথাগুরুণীত এবং এই মাথাগুরুণীতের স্বাভাবিক হিতলাভও ক্ষমতার এসেছিল। আমাদের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে এখানে সচেতনভাবে ভোট দানের কোন শিক্ষা নেই। ভোটারদের স্থূল আবেগ-

কম্বুহের প্রাচ্য আবেদনই ভারতীয় ভোট প্রার্থীর বৈশিষ্ট্য। অব্যাহত অধুনাশ্রিত প্রাথমিক এলাকায় নিজে ঘুরে দেখেছি যে, প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তিকে কিভাবে ভোটের স্বার্থে কাজে লাগানো হয়েছে। অমুকদের ভোট দিলে তোমাদের এদেশে থাকতে দেবে না, সেয়ে ত্যাগিয়ে দেবে এইরকম কথা হস্তদম বলা হয়েছে, বা বিশ্বাস করানো হয়েছে। মুসলমানপ্রধান এলাকাগুলিতে ভোটের স্বার্থে তুমুল সাম্প্রদায়িকতার আমদানী করা হয়েছে। আজ যারা ভোটের জন্য এই সব জঘন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যে বিষয়বস্তুর চারা এভাবে রোপণ করেছেন, তার ফলভোগও একদিন তাঁদের করতে হবে অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থায়।

এইভাবে ভোটের স্বার্থে যে নীতি-হীনতার আমদানী করা হয়েছে তাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই উত্তাল গণতন্ত্র-বিপ্লবী যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে তার সুদূরপ্রসারী ফল এখন থেকে উপলব্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নির্বাচন রণনীতির প্রথমেই ধরে নিয়েছে যে, গুরুত্ব আর প্রেমে অন্যায় বলে কিছু নেই, উদ্দেশ্যই উপায়ের ন্যায়তা নির্ধারণ করে।

১০১

বহুত পরিষদীয় গণতন্ত্রে দেশবাসী

রেকর্ড ভোট

রিবিবার সম্মুখ পর্বস্ত নির্বাচন সম্বন্ধে যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এবারকার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ অতীতপূর্ব শৃংখলা ও শান্তিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়ে সমগ্র ভারতের নিকট পশ্চিমবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। সমগ্র কলকাতা শহরে সংঘ ও শৃংখলার এক আশ্চর্য নিদর্শন স্থাপিত হয়েছে। দু-একটি সামান্য ঘটনা ছাড়া সর্বত্রই ভোটদাতারা অভ্যন্ত সংঘত আচরণ করেছেন। আমরা এ পর্বস্ত যে সব ভোটকেন্দ্রের খবর জেনেছি তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এবারের রেকর্ড সংখ্যক ভোট মানে পড়েছে। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এবারে শহরাঞ্চলে ভোটদাতারা নিজের বিবেচনা-বোঝের দ্বারা চালিত হয়েছেন, দলীয় প্রচারকদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন নি, বা তাদের বড় একটা পাতা মেন নি। ভোট-গণনা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা শহর এ-সংখ্যার সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু এখন আপনার হাতে পড়বে, তখন আপনার অনেকগুলি কেন্দ্রেই কলাফল জেনে থাকবেন।

আস্থা হারাচ্ছে। অভিজ্ঞতার দেখা গেছে যে, বিরোধীপক্ষ আইনসভা অপেক্ষা গণ-

আন্দোলনের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে বেশি। অভিজ্ঞতার দেখা গেছে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি শাসকদলেরও বিশেষ আস্থা নেই, মেজরিটির জোরে আইন বা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়া ছাড়া আইন-সভায় যেন আর কোন কাজ নেই। ইংল্যান্ডের পরিষদীয় গণতন্ত্রের আদর্শ, নীতিনিষ্ঠা, পদ্ধতি কোন কিছুই এখানে অনুসৃত হয় না, এখানে যুক্তির স্থান অধিকার করে গালিগালাজ ও অসৌজন্য, দাশ্ভিকতা ও ঘৃণা, যা দেশে চেতনাবান লোক শিউরে ওঠেন, পরিষদীয় গণতন্ত্রের অন্য বিকল্পের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বহুত গণতন্ত্রের নামে যেখানে গণতন্ত্রের ব্যভিচার চলে সেখানে গণতন্ত্র আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হবে এ ধারণা কিভাবে করা যায়? অর্থাৎ বর্তমান নির্বাচন আমাদের দেশের মূল সমস্যা, অর্থাৎ গণতন্ত্রের টিকে থাকার সমস্যা, শৃংখ টিকে থাকার সমস্যাই নয় কার্যকরী হবার সমস্যা সমাধানে কোন আলোকপাতই করতে পারছে না।

ভোটের স্বার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কিছুটা গ্রেস দেবার যে নীতি অবলম্বিত হয়েছে তা বেশকিছু কোষার নিরে থাকে বলা শক্ত। আমরা এখানে খাদ্যনীতি নিয়েই এই প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

পশ্চিমবঙ্গে বহুদিন হল রেশনপ্রদা প্রবর্তিত হয়েছে। রেশননিকে সাধক করতে হলে সরকারকে অবশ্যই ধান-চাল সংগ্রহ করতে হবে, যেমন গতবারে তা করা হয়েছিল। নইলে সরকার প্রতি সপ্তাহে জনসাধারণকে খাদ্য যোগাবেন কি করে? এ বছরে সরকার নিজে থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেন নি, ফুড কর্পোরেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছেন। এই ফুড কর্পোরেশন কার্যত একদানা ধানও সংগ্রহ করতে পারে নি। চালকল ও গালাদের কাছ থেকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জোড় আদায়ের কথা ছিল, আদায় হয় নি। চাষীর কাছ থেকে লেভী নেওয়া হয় নি। কড়নিং দৃঢ়ভাবে করা হয় নি। অব্যাহত চাল পাচারের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে। কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় চাল বিক্রী হয়েছে। কৃষকেরা সরকারের পরিবর্তে মহাজনদের কাছে ধান-চাল বিক্রী করে দিয়েছে এবং এবারে যে দাম পেয়েছে, ধান পচিশ টাকা থেকে তিরিশ টাকা মত, তা জীবনে কোনদিন পায় নি। এই যে আকস্মিক টাকা লোট-বার একটা ব্যাপক সন্মোহন করে দেওয়া হল, একদিকে কৃষকদের অপরাধকে চালের চোরাকারবারীদের তার পিছনে একটিমাত্রই স্বার্থ আছে তা হচ্ছে ভোটের স্বার্থ। এ কথা আমরা পূর্বে বহুবার বর্ণনামূলক

আপনার দেহলাবণ্যের
মৌলিকতা পূর্ণ করবে



লাবনি
কোল্ড ও ভ্যানিশিং ক্রীম

লুবনি
COLD CREAM
BALNEO-PRODUCT

লুবনি
VANISHING CREAM
BALNEO-PRODUCT

ডি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ

সংস্কার। কিন্তু নির্বাচনপর শেখ হবার
কি হবে? রেশনে চাল যোগাবার
বিষয় কে নেবে? চাষী তার সব চাল
সেই দিয়েছে, সরকারের পক্ষে, তা যে
কোন সরকারই পক্ষীতে আসুক না কেন,
চাল সংগ্রহ করা অসম্ভব হবে। বলে
হয় রেশনিং প্রথা ভুলে দিতে হবে না হয়
চোরাকারবারকে প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতে
হবে। সরকার যাই করুন না কেন,
নির্বাচনের পর স্বাক্ষর নিয়ে যে হাফাকার
শুরু হবে তার কোন ভুলনা থাকবে না।
গভার্নার জেনারেল দল তিন চারগুণ বেড়ে
যাবে। বর্তমানে যে দল ক্ষমতায় আসীন
রয়েছে সেই দলের হাতে যদি ক্ষমতা
আবার আসে তাহলে সেই দল এই বিষয়ে
সোজাদাঙ্গি দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে কেন না
ভোটের কৃপায় তারা পাঁচ বছরের জন্য
নিশ্চিন্ত। পক্ষান্তরে যদি বামপন্থী
কমিউনিস্ট হাতে ক্ষমতা আসে, তাহলেও
তারা এই অবস্থায় চোখে সরষের ফুল
দেখবে। তারাই বা কোথা থেকে চাল
সংগ্রহ করে রেশন যোগাবে? সংগ্রহ-
নীতির পরিবর্তনের দ্বারা কৃষকদের ভোট
টানার এই বিশালজনক প্রচেষ্টার ফলাফল
যে কত দূর পৌঁছানীয় হবে তা সহজেই
অনুমেয়।

১৪১

আগেই বলেছি এবারের নির্বাচনে যে
সাম্প্রদায়িকতার বিষয় ছড়ানো হয়েছে তার
ভুলনা নেই। পূর্ববর্তী তিনটি নির্বাচনের
ফলাফল তা এবারে বহুগুণে বর্ধিত।
সাম্প্রদায়িক প্রচারের চরম স্তর খুঁজে
বাস্তবহাটে। এখানে আসামের জনৈক
কুখ্যাত সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাকে আম-
দানী করে তাঁকে দিয়ে প্রচারকার্য চালানো
হয়েছে। কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্প্র-
দায়িকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সে কথা
আমরা আগেই বলেছি। এই বিশেষ
ঘটনাটি অর্থাৎ আসামের ওই সাম্প্র-
দায়িকতাবাদী নেতাটির কথা উল্লেখ করার
প্রয়োজন ছিল।

বিগত খাদ্য আন্দোলনে নিহত মুরুল
ইসলামের দরিদ্রা মাতাকে নিয়ে এমন
অশোভনভাবে ঐশ্বর্য প্রচার চালানো হয়েছে
যা কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই বরদাস্ত
করতে পারবেন না। একটি কাগজে সংবাদ
বেরল যে ওই ভদ্রমহিলাটি নাকি নিজ-
গৃহে কংগ্রেসের অফিস খুলতে দিয়েছেন।
পুরে জানা গেল সংবাদটি ভুল, ভদ্রমহিলা
নিজেও একটি বিবৃতি দিয়ে সে কথা
জানালেন। বস্তুত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের
নির্বাচন হওয়া উচিত যদিও প্রোগ্রামের
ভিত্তিতে। সেখানে কতকগুলি স্টাণ্ড
দেওয়া খবর ছড়িয়ে কিছু লোকের ভোট

আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা শুধু হাস্যকরই
নয়, উদ্ভট।

এবারের ভোটের আরও একটি বৈশিষ্ট্য
হচ্ছে ব্যাপকভাবে অসামাজিক ব্যক্তিদের

এই কূর্মে নিয়োগ। আমি ব্যক্তিগতভাবে
বহু জায়গায় দেখেছি যে ইলেকশানের
পূর্বমুহূর্তে তারাই যেন রাজা-বাদশা হয়ে
বসেছে। কোন কোন দরিদ্র এলাকার



জাতীয় পরিকল্পনা ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার

সকল যুগেই, বিশেষতঃ এই জাতীয় পরিকল্পনার যুগে,
দেশের সমৃদ্ধিসংবন বহুলাংশে বহির্বাণিজ্যের প্রসার
সাধনক। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের প্রসার বর্তমানকালে
নির্ভর করে দেশের উন্নত ব্যক্তি ব্যবহার উপর।

বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অ্যান্ড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ববিধ সাহায্যদানে
পারদর্শী। পৃথিবীর যাবতীয় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিজস্ব এজেন্ট ও কন্সাল্টেন্ট
আছে।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস : ৪, ফাইন ঘাট স্ট্রিট, কলিকাতা-১
আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

পশ্চিমবঙ্গে ৮০টির অধিক শাখা আছে

নেখি যে এই সকল দ্বারা প্রকাশ্যভাবে শাসিয়ে বেড়িয়েছে যে ওই এলাকার ভোট-গুলি কোন বিশেষ দলের বাজারে না পড়লে দেখে নেওয়া হবে। যদিও এরা শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিদের কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না, কিন্তু শিক্ষার ও চিন্তার অনগ্রসর দরিদ্র শ্রেণীকে বহুক্ষেত্রেই তারা ভীতির দ্বারা প্রভাবিত করতে পারে। তদুপরি ধানায় এবং পুষ্টিশী মহলে এদের যা দাপট তা দেখে এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে অনেকেই সাহস করে না। নির্বাচনের ক্ষেত্রে এইসব উপাদানের আম-দানী ঘটলে নির্বাচনের যে আর গণতান্ত্রিক চরিত্র পায় না সে কথা বলাই বাহুল্য।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই গুণ্ডাইজম প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে বেলঘরির কথা এসে পড়ে। এই জায়গাটি সম্বন্ধে সংবাদ আপনারা প্রাতিদিনই সংবাদপত্র মারফৎ অবগত হচ্ছেন। সকল দলের নেতারা সরকারী কর্মচারীরা বেলঘরিতে শান্তি বজায় রাখা ও নাগরিকের মনে নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে আনবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন যাতে এখানে নির্বাচনের সময় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, এ সংবাদ তো বহুদিনের পুরানো।

আসলে এই বেলঘরিয়া হচ্ছে একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। আগামী দিনের ফাসী-

বাদী সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব রূপটা কেমন হবে সেটা পরীক্ষা করার জন্যই বোধ হয় এই কেন্দ্রটি বেছে নেওয়া হয়েছে। কয়েক বছর ধরেই এখানকার শাসনকার্যের দায়িত্ব গুণ্ডাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নরহত্যা, লুটপাট, ছিনতাই, রাজনৈতিক কারণে হত্যা ইত্যাদি এখানে নাগরিক জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। ল' এ্যান্ড অর্ডারের সমস্যা নিয়ে যে সরকার সর্বদাই চিন্তিত সেই সরকার বেলঘরির ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চিরকালই নারাজ। পুষ্টিশ থেকেও কিছু কর্মের নয়, বরং স্থানীয় লোকেরদের ধারণা, থানাই যত দক্ষকর্মের মূল কেন্দ্র।

বেলঘরির বর্তমানে যে দ্বারের রাজ্য চলছে তা আগামী দিনের সারা পশ্চিমবঙ্গেরই ছবি। নির্বাচনের স্বার্থে যে সমস্ত অসামাজিক, ন্যায়নীতিবিরোধী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী উপাদানসমূহকে প্রেস দেওয়া হয়েছে তারা তাদের পাওনা ঠিকই আদায় করে নেবে। তখন সরকার থাকবেন উদাসীন এবং নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে। বস্তুত আজ বেলঘরির আবহাওয়া সারা দেশেই বিরাজ করছে, তবে বেলঘরির কৃতিত্ব এই যে সে এই আবহাওয়ার সর্বাধিক ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে।

১৬১

একটু আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম-বঙ্গের সাধারণ নির্বাচন নির্বিঘ্নে চুকেছে এটুকু আশা নিয়েই বর্তমান বঙ্গদর্শন রচনাটি শুরু করা হয়েছে। সতেরই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে যা জানা যায়, ভারতের বহুস্থলেই নির্বাচনপর্ব সমাপ্ত হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে হাঙ্গামা হওয়া সত্ত্বেও মোটামুটি নির্বিঘ্নে। পশ্চিমবঙ্গের জন-সাধারণের উপর আমাদের আস্থা আছে এবং সেই হিসাবে এখানে নির্বাচন উপলক্ষে চূড়ান্ত অশোভনতা কখনই আশা করা যায় না।

ভারতের কয়েকটি স্থানে জাল ভোট-পত্র ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে পোস্টাল ব্যালট পাঠাবার খামে প্রেরকের নাম থাকাটা বাধ্যতামূলক সেই হিসাবে ভোটের গোপনীয়তা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে রক্ষিত হচ্ছে না। ফলে বহু সরকারী কর্মচারী ভোটদান থেকে বিরত আছেন।

আগামী সপ্তাহে ভোটগণনাকার্য সমাপ্ত হবে, কাজেই পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ নির্বাচনে কোন দল কতখানি সাফল্য বা বিফলতা অর্জন করল তার হিসাব-নিকাশ করা যাবে। এবারের মত এখানেই ছেদ টানা হোক।



নির্বাচনের পূর্বদিনে কলকাতার রাজপথে পোস্টাল-কোর্টের ছড়াছড়ি



আমরুয়ার একাট মধ্যাহ্ন



ভাসন্ত ট্রিট

খাস বটিশ অফিসিয়ালী কোলো-
সামরিক ঘাঁটি অধিকার

আমাদের শেড়োলে গাড়ি যখন শুলিশ লাইনের দ্বারা রাস্তা দিয়ে নিচে নেমে এল তখনও ঘন ঘন বন্দেমাতরম ও ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি আকাশ বাতাস মূখ্যরিত করছে। আমার সঙ্গে তিনজন তরুণ বন্ধু, উৎসাহে উদ্দীপনায় মেতে উঠেছে—কটিবন্ধ পিস্তল, হাতে রাইফেল, মধ্যে তাদের বন্দেমাতরম। মরণ পাগলের দল সব সময় মিলিটারী কায়দা কানুন মেনে চলে না। সামরিক কৌশলের সঙ্গে দেশ-প্রেমের দূর্জয় প্রেরণা হলো তাদের বিজয়ী শক্তির প্রধান উৎস। গাড়ি আমি চালাচ্ছিলাম। এই গ্রুপটির নেতৃত্ব তখন আমার হাতে। A.F.I. হেডকোয়ার্টার দখলকারী দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার দায়িত্ব এখন আমার ওপর। কি এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবো কে জানে? আমি আমার গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে দিলাম। তরুণ সাথীদের স্লোগান দিতে ব্যরণ করলাম, খুব সতর্কতার সঙ্গে চুপে চুপে A.F.I. হেডকোয়ার্টারের যত নিকটে উপস্থিত হতে পারি তারই চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

এই সংযোগ স্থাপনে—বিশেষ রণকৌশলের নিভুল প্রয়োগ না হলে অনেকখানি বিপদের সম্ভাবনা। দুই প্রকার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা সচেতন ছিলাম। আমাদের জঙ্গীদল জয়ী হয়ে সেখানে ঘাঁটি আগলে বসেছে—আর নয়তো শত্রুরা তাদের পরাজিত করে আবার কোন মতুন বিপদের আশঙ্কায় অতি সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে আছে। এইরূপ উভয় সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আমাদের প্রথমে বুঝে নিতে হবে—A.F.I. হেডকোয়ার্টার কার দখলে আছে—আমাদের না শত্রুদের? এই সম্বন্ধে চরম বিপদের আশঙ্কা ছিল—যদি নির্মলদারা আমাদের নিঃশব্দে গোপন আগমনে—শত্রুদলে গুলী

করার আদেশ দেন তবে স্বপক্ষেরই ক্ষতি। আর আমরা যদি একবার নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, এই আর্মারী আমাদের অধিকারে আছে, তবে তৎক্ষণি পূর্বনির্ধারিত সংকেত-ধ্বনি করব—বিশেষভাবে টচের আলো দেখিয়ে ও মোটরের হর্ন বাজিয়ে আমাদের আশঙ্ক জ্ঞানাব।

গাড়ির আলো না জ্বালিয়ে কোনরকম শব্দ না করে চুপে চুপে গাছের অন্ধকার ছায়ার সাহায্যে অফিসিয়ালী ফোর্সের মিলিটারী ঘাঁটির প্রায় একশ' গজের মধ্যে এসে পৌঁছলাম। একটু দাঁড়িয়ে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করে মনে হলো আমাদের বন্ধুরা সেখানে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে—বোঝা গেল এই মিলিটারী ঘাঁটিও আমাদের বন্ধুরা অধিকার করেছে। যখনই বুঝতে পারলাম এখানেও আমরা জয়ী—তখনই নির্ধারিত স্লোগান দিলাম—টচের আলো ও মোটরের হর্ন—সংকেত জ্ঞানলাম। বিজয়ী বন্ধুরা ইনক্লাব জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম রণধ্বনি দিল। আমাদের সকলের মিলিত রণহুঙ্কার সম্মুখের বাটারি পাহাড় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো। নিকটবর্তী কয়েকটি পাহাড়ের ওপরে উচ্চপদস্থ সাহেবদের বাংলো। সেই সব বাংলোর ইংরেজ প্রভুরা প্রমাদ গুরুত্ব—ভরে দিশেহারা হয়ে নিরাপদ স্থানে পালাবার চেষ্টা করছে। যখন আমাদের এই দলটি লোকনাথদের গ্রুপের সঙ্গে যোগ দিল—তখন আশে-পাশের সবাই বুঝলো যে, সেখানে আমাদের শক্তি আরো বেড়েছে। রেলের কোয়ার্টার আর বড় বড় সাহেব কর্তাদের বাংলো ছাড়া সাধারণ লোকের বাস সেখান থেকে অনেক দূরে।

আমাদের রণধ্বনি শেষ হওয়ার পর—লোকনাথের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—“Who comes there?” ইংরেজীতে প্রশ্ন এসেছিল—উত্তরও ইংরেজীতে দেল—“General Singh and the party?” লোকনাথ ইংরেজীতে আবার

বললো—A few men of enemy camp are hiding there. Take the side track on your left and join us.” (শত্রুপক্ষের কয়েকজন ঐ দিকে লুকিয়ে আছে। তোমরা বাঁদিকের রাস্তায় এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।)

জেনারেল বল (লোকনাথ বল) সেখানকার কমান্ডার। তাঁর আদেশ মেনে নিয়ে আমরা তাঁর নির্দেশমত রাস্তা দিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। রাস্তার ওপর গাড়ি রেখে প্রায় সাত আট হাত নিচে নামতে হলো। তারপর সমতল মাঠ দিয়ে হেঁটে আর্মারীর কাছে এলাম। সোজা রাস্তায় না আসতে লোকনাথ বেশ আমাদের হুঁশিয়ার করে দিল এবং কারা সেখানে লুকিয়ে আছে তার বিশদ বিবরণ আমরা পরে তাদের কাছে জেনেছি। আক্রমণ কিভাবে করা হবে এবং কোন রাস্তা ধরে গাড়িটি আর্মারী কম্পাউন্ডে প্রবেশ করবে তার প্রায় আগ থেকেই করা ছিল—এবং অনেকবার রিহাসালও দেওয়া ছিল।

রাত দশটার সময় লোকনাথদের উচ্চ গাড়ি A.F.I. হেডকোয়ার্টারের কম্পাউন্ডে ঢুকলো। পূর্বপ্রান্তে কম্পাউন্ডের গেট একমাত্র প্রবেশ পথ। এই রাস্তা দিয়ে এসে সার্জেন্ট মেজর ফেরেলের কোয়ার্টার বার্নিকে রেখে গাড়িটি ডানদিক ঘুরে আর্মারীর সামনে এসে দাঁড়ালো। মাখন ঘোষালের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল। গাড়ি এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে অইট নিভিয়ে দেওয়া হলো। মাখন ছাড়া গাড়িতে আরো পাঁচজন ছিল, —লোকনাথ, নির্মলদা, রজত, সুরোজ চৌধুরী ও ফলিস্ত নন্দী। হেঁটে আসছিল আরো চারজন—শান্তি নাগ, নিতাই, ক্ষীরোদ ও প্রভাস বল। তারাও গাড়িটিকে অনুসরণ করে পিছনে পিছনে দ্রুত এসে পড়ল। তারা পজিশন নিল আর্মারীর পূর্বদিকের কোণে—সার্জেন্ট মেজরের কোয়ার্টার লক্ষ্য করে ও প্রবেশ

পরের দিকে চোখ রেখে। অন্ধার রেক-
কমার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের মধ্যে একজন
নামে গাড়ির পিছনের দরজা খুলে বেশ
কায়দা করে দাঁড়ালো—যেন কোন অফিসার
গাড়ি থেকে নামছেন।

বারান্দার ওপর সেন্ট্রী বেরনেটের
রাইফেল ঘাড় পেছায় দাঁড়িয়ে। জেনারেল
বল গাড়ি থেকে নেমে তার দিকে এগিয়ে
গেলেন। সেন্ট্রী প্রায় হ' ফুট উঁচু
বারান্দার ওপর আর্মারীর দরজা খোল করে
দাঁড়িয়েছে। লোকনাথ ও সেন্ট্রীর মধ্যে
ব্যবধান মাত্র দশ-বারো ফুট। লোকনাথের
ভান হাতে রিভলবার। হাতেধরা রিভল-
বারটি পিছনের দিকে লুকানো আছে।
লোকনাথের চোখ সেন্ট্রীর দিকে নিবন্ধ—
সেন্ট্রীর কোন উগারাই ছিল না যে বাড়ি
থেকে রাইফেলটি নামিয়ে গুলী ছোড়ার
পজিশনে আনবে—তার আগেই লোক-
নাথের গুলী লক্ষ্য ভেদ করবে। জেনারেল
কলের পিছনে পিছনে হুকুন "সৈনিক"
খুব স্বাভাবিকভাবে বাড়িগাড়ের ভগিতে
এলো। তার তিনজন উঁচু, বারান্দার
সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। সিঁড়ির
সর্বোচ্চ ধাপে যখন জেনারেল বল পা
রেখেছে—সেন্ট্রী তড়াক করে বুটের
গোড়ালীতে গোড়ালীতে ঠকর দিয়ে
এলোনিশান পজিশনে বন্দুকের ওপর চাঁটি
মেরে মিলিটারী কায়দার কোন সামরিক
অফিসার ভ্রমে—লোকনাথকে স্যালুট দিল।
সৈনিকের বুটের শব্দ ও বন্দুকের ওপর
চাঁটি মেরে সেলাম দেওয়ার আওয়াজ
মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বেই লোকনাথের
পিষ্টল গজর্ন করে উঠল। প্রথম ফায়ার
করার সংকেত পেয়ে নির্মলদা ও রজতের
হাতের দুটি পিষ্টল থেকেও এক মগেই
সশব্দে গুলী ছুটে গেল—সেন্ট্রী বারান্দার
ওপর লুটিয়ে পড়ল। অন্যান্য পাঠান
সেপাইরা যে যেদিকে পেরেছে ছুটে
শালিয়েছে। যে সেপাইটি বন্দুক নেওয়ার
জন্য বা অন্ধরে গাড়িরমের দিকে দৌড়ে
যাচ্ছিল—সেও আহত হয়ে মাঠে পড়ে
রইল। আর্মারী মূহুর্তে অধিকৃত হলো।
অশ্বকারের নিজস্বতা ভগ্ন করে তারা
দশজন এক সঙ্গে জয়ধ্বনি দিল—“বন্দে-
মাতরম—ইনক্রাব জিন্দাবাদ!” ঘন ঘন বিজয়
নিঘোষে তারা আর্মারী প্রাঙ্গণ কাঁপিয়ে
ফুলেছে। পিষ্টলের শব্দ, বন্দেমাতরম
ধ্বনি, আহত সেপাইয়ের আতনাদ
কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে সার্জেন্ট মেজরকে
বিস্মিত করে তুলেছে। তিনি ও তার
স্ত্রী তখন খাবার টেবিলে উপবিষ্ট ছিলেন।
ফেরেল সাহেব তার বেয়ারা আবদুল
শোভানকে জিজ্ঞাসা করলেন—“কিসের
আওয়াজ?” বেয়ারা তার নিজের বৃষ্টিতে
কল—“হয়ত কোন গটকা ফেটেছে।”

অভিজ্ঞ সার্জেন্ট মেজর বুঝছিলেন যে
গটকা নয়—পিষ্টলের শব্দ।

“Sergt. Major Farrell—
had sat down to dinner with
his wife when suddenly a shot
was heard outside. Sergt.
Major asked the witness who
was waiting at table, what was
the noise and Abdul Sovan
replied that it was possibly a
craker. The Sergt. Major was
positive it was the report of
a pistol and he went out on
the verandah of his quarter”
.... (Judgement, Chittagong
Armoury Raid Case).

আমাদের বন্দুকের কত্যা—সার্জেন্ট
মেজর বীরবীর সঙ্গী বেরিয়ে এসে সদর্শে
হাঁকলেন—“কোন হাম? ক্যা মাগতা?
What do you want?” দৃশ্য
বহরের প্রভুয়ের নেশায় উন্মত্ত সাহেব
তখনও বুঝতে পারেন নি—বিপ্লবী
সৈনিকেরা গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্র
দীক্ষিত শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দো-
লনের স্বেচ্ছাসেবক নয়! সাহেবের মনের
নেশা বা প্রভুয়ের উন্মাদনা তখনই টুটলো
যখন হুকুম হোল “Fire! shoot
him.” শান্ত নাগের ব্রীচলোডার বন্দুক
অশ্বকারে ঢাকা আর্মারীর পূর্ব কোণ থেকে
সার্জেন্ট মেজরের বুক লক্ষ্য করে গজর্ন
করে উঠল। সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি
পিষ্টল সাহেবকে লক্ষ্য করে ফায়ার করা
ইলো। সার্জেন্ট মেজর রক্তাক্ত দেহে
আর্মারী থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে তার
বাগানে লুটিয়ে পড়লেন।

সার্জেন্ট মেজর ফেরেল খুব বালিস্ত
ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। তিনি
মাটিতে পড়ে গিয়েও বুক ঘষে ঘষে তার
বাড়ির সামনে দাঁড়ানো একটি মোটরের
আড়ালে গিয়ে লুকোলেন। সেখান থেকে
তিনি খুব চাপা স্বরে তার স্ত্রীকে ডেকে
বললেন—“Darling phone to the
police!” আর যায় কোথায়! হুকুম
হোল—“Charge!” বারান্দার ওপর
সুগান চড়ানো চার-পাঁচটা রাইফেল ছিল।
দুজন বিপ্লবী সৈনিক তৎক্ষণি দৃশ্য
বহরের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল
—সার্জেন্ট মেজরের বুক বেরনেটের ঘায়ে
বিদীর্ণ করল।

ইংরেজ রমণী মিসেস ফেরেল করুণ
আতনাদ করে উঠলেন। করুণ দৃশ্য
সম্মুখে নেই! কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভাবিত-
রমণীর করুণ ইতিহাস ভোলা যায় না।
আমাদের মাতাজাতির ওপর—সাম্রাজ্যবাদী
ইংরেজের এর চেয়ে সহস্র গুন বেশি

পারাবিক অত্যাচারের দৃশ্যের কথা আর
ফুলিয়ে লোক বা।

আমরা মনে মনে অনেক ভেবেছিলাম
স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ
সম্মুখে হতর করব—জাতিমান-ওরালাবাগের
নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নেবো। তবু—
তবু আমরা অত নিষ্ঠুর হতে পারি নি।
কবীর ইংরেজের মত অসহায় নারীর গারে
হুকুমী ছুঁতে পারি নি। লোকনাথ উচ্চ
কণ্ঠে সিসিস ফেরেলকে সম্বোধন করে
বলল—“Stay in. Don't come out
—then you are safe.” (ভেতরে
থাকুন, বাইরে আসবেন না, তাহলে আপনি
নিরাপদ।)

এই সমস্ত ঘটনা দুর্ভাগ্যবশত মিনিটের
মধ্যে ঘটে গেছে। শত্রুপক্ষের দুটি মৃত-
দেহ ও একজন আহত হয়ে গড়ে রইল।
এখন নির্মলদাদের প্রধান কাজ আর্মারীর
দরজা ভেঙে ফেলা। আর্মারীর বাইরে
প্রহরীদের ব্যবহারের জন্য মাত্র চার-পাঁচটা
রাইফেল ছিল বন্দুরা তাই তুলে নিয়েছে।
এই বন্দুকগুলি দশ শট ওয়ালা ৩০০
বোরের ম্যাগাজিন রাইফেল বা সৈন্যেরা
ব্যবহার করে থাকে। সুগান-সুগুন-
ম্যাগাজিন রাইফেল কণ্ঠ হাতে নিয়ে
আমাদের বন্দুকের আনন্দের সীমা ছিল
না—কিন্তু যখন দেখা গেল একটার সঙ্গেও
কাতৃজ নেই তখন সবাই হতাশার ভেঙে
পড়ল। আমাদের দশজন বন্দুর সঙ্গে
ছিল মাত্র গোটা ছয়েক পিষ্টল বা
রিভলবার আর হয়ত ছিল গোটা দুই
ব্রীচলোডার বন্দুক। সেপাইদের চারটি
ম্যাগাজিন রাইফেল পেয়েও যে কোন
কাজে এলো না তাতে যথেষ্ট নিরাশার
কারণ ছিল।

তারা কলবিলম্ব না করে আর্মারীর
দরজা দুটি ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল।
বাইরের দিকে খোলা যায় এ রকম
আর্মারীর নিরেট লোহার দরজাটি
ভাঙার কৌশল ও বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার
কথা আগে লিখেছি। তারা সর্বপ্রথম
মোটরের সঙ্গে ও দরজার হাতলের সঙ্গে
দড়ি বেঁধে হ্যাঁচকা টানে নিরেট লোহ-
কপাট খোলার কৌশল অবলম্বন করল।
অনুরূপভাবে জাহাজ বাধার দড়িটি দিয়ে
মোটরের সঙ্গে দরজার হাতলটি বাধা
হোল। রাখন ঘোষাল গাড়িতে স্টার্ট
দিয়ে একটু এগোতেই দুটুবন্ধ লোহার
দরজাটি মূহুর্তে চিচিং ফাঁক—সামান্য
একটু টেনেই প্রবল শক্তিশালী দরজাটিকে
আত্মসমর্পণ করতে হল! আর্মারীতে
আমরা সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই মাথান
আমাকে বললেন—“আমি ভাবতেই পারি
নি কখন দরজাটা খুলে গেছে।” একটু
টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরেট লোহার



“এতদিনে
আমি আবিষ্কার
করেছি।
কুসুম
বনস্পতিতে
রাঁধলে
খাবারের স্বাদ
হয় সেরা”



“তার কারণ, সুখাচারের স্বাভাবিক স্বাদ কুসুমে বজায় থাকে। সব কুসুম রান্নাও আমি
কুসুমে রেখে দেখেছি...প্রত্যেকটাই খেতে হয়েছে বেশ সুস্বাদু।”

“তবে মনে হচ্ছে সত্যিকার ভাল বনস্পতি—কুসুম।
সহজে পাওয়া যায় তো? আর টাটকা কিনা?”

“একবারে টাটকা এবং ঝাঁটি। সীল-করা ২ কেজি, ৪ কেজির টিন—যানতে নিজে
সুবিধে। কোনো কল্যাণ নেই—সব জায়গায় পাবেন।”

“বা, তাহলে তো কুসুম বনস্পতি কিনে দেখতে হবে।”

কুসুম বনস্পতি ‘এ’ আর ‘ডি’ ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এ বিকর
বিস্ফোরিত থাকতে পারেন—কিন্তু ভাল হবে। কারণ,
কুসুম বনস্পতি উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে ল্যাবোরেটরিতে
পরীক্ষা করে বায়ুশূন্যভাবে টিনে ভরে কারখানার
সীল করে দেওয়া হয়। সব জায়গায় টাটকা কুসুম পাবেন।

ঝাঁটি স্বাদ পেতে হলে
কুসুম
বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন



কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১

JWT&PK 3963A

দরজা আর্মারী রক্ষা করার কোন কাজেই এল না।

ব্রিটিশ আর্মারীর এই শোচনীয় পরিণতির কথা শব্দরা আগে হয়ত ভাবতে পারে নি। নিরেট লোহার দরজার আত্ম-সমর্পণের পরও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেন হার মানতে নারাজ। ভিতর দিকে পাল্লা খোলা যায় এরূপ আরো একটি লোহার বোম্বের দরজা বিপ্লবীদের দিকে তাকিয়ে যেন তাচ্ছিল্যের উপহাস করছে! প্রথম নিরেট লোহার দরজা খুলে যাওয়ার পর বোম্বের দরজার ফাঁক দিয়ে ধরে ধরে সাজানো লম্বা শটগুলা আর্মি রাইফেল বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রত্যেকটি রাইফেলের নিচে একটি করে বাক্স আছে। দেখে মনে হয়—এক আমাদের সংবাদও তাই ছিল—নিচের বাক্স রাইফেলের টোটা রাখা আছে।

বিপ্লবীদের এতদিনের সাধনার ধন রাইফেল, লাইসেন্স, রিভলবার ও কত শস্ত্রভর্তি কাতুজ আর্মারীর মধ্যে সাজানো আছে আর এই “সামান্য” একটি লোহার বোম্বের দরজা কখনও বাধা সৃষ্টি করতে পারে? দুটি বড় বড় আলতাকার ওপর দুটি বৃহৎ আকারের ডালা যেন তাদের দিকে দ্রুত চলে আসছে। রাইফেল চাই—টোটা চাই—কোন বাধাই তারা মানবে না! দরজার ডালা ভাঙার সব রকম সরঞ্জাম আমাদের কাছে ছিল। কিন্তু তারা রাইফেল ও টোটা পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। লোকনাথ রজতকে ডাকল—“চল রজত একসঙ্গে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ছুটে গিয়ে ধাক্কা মারি!” দুটি বলিষ্ঠ দেহের ধাক্কা ব্রিটিশ আর্মারীর দরজা সহ্য করতে পারে নি। ধন্বন করে সবগে পাল্লা দুটি খুলে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে চটকাতে আঘাত করল। খুব অকিঞ্চন্য মনে হলো—এই বাস্তব সত্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আর্মারীর দরজা দুটি তিন-চার মিনিটের মধ্যে কৌশল এবং লোকনাথ ও রজতের সিংহবল প্রয়োগে ভাঙা হল। সবাই রাইফেল তুলে নিল। অনেক আর্মি রিভলবার সাজান আছে—তারা প্রত্যেকেই দুটি করে রিভলবার নিল—তিনটি লাইসেন্স ছিল—সেগুলিও তাদের অধিকারে এলো। ম্যাগাজিন, রাইফেল ও লাইসেন্সগানের চম্বারের ছিদ্রের মাপ এক তাই—৩০০ সাইজের একই কাতুজ উভয়টিতেই ব্যবহৃত হয়। রাইফেল লাইসেন্স, রিভলবার পাওয়া সত্ত্বেও তারা একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। প্রত্যেকটি রাইফেলের সঙ্গে যে বাক্স ছিল সেগুলি খুলেই সকলে একেবারে বোকা! কোনটোতেই

কাতুজ নেই! এই সব বাক্সে ছিল বেল্ট, পাউচেন, হ্যাভার স্যাক, ক্লশ বেল্ট প্রভৃতি। সারা আর্মারী ধরে অস্ত্র ছাড়া কোথাও একটিও টোটা ছিল না!

আজ স্বীকার করতে লজ্জা করছে—তবু আমাদের অমার্জনীয় “অজ্ঞতার দৃষ্টি” আজ সবাইকে জানাতে হবে। আমরা কত বিশদভাবে খতিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করেছি—কতদিন ভেবে চিন্তে ব্যাপক ও বিস্তারিত গ্যান করেছি—সাংগঠনিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কত কি-ই না করেছি! আমাদের এতসব রণনীতি কৌশল ও চাতুর্য কোনটাই কাজে এলো না। আমাদের অক্ষমতা চিরকাল আমাদের ব্যঙ্গ করবে যতদিন ইতিহাসে এই সত্য লেখা থাকবে—“চট্টগ্রামের স্বাধীনতার নেতারা একটি অতি সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন—তারা জানতেন না আর্মারী ও ম্যাগাজিন সামরিক রীতি অনুসারে কখনও একত্রে রাখা হয় না।” স্বাধীনতার পর আমাদের মামলার সময় আমরা এই তথ্য জানতে পারি।

আমরা যখন অফিসার্স ফোর্সের আর্মারী সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করেছি তখন যদি এই বিষয়টি আমাদের জানা থাকতো তবে কখনই ঐ বাক্সগুলি দেখে সন্দেহিতভাবে অনুমান করতাম না যে—বাক্সে কাতুজ আছে। আমাদের সংবাদের ওপর নির্ভর করে নির্মলসাদের দল বৃদ্ধি হল—রাইফেলের সঙ্গে রীক্ষিত বাক্সগুলি কাতুজের বাক্স ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পর যখন সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না যে আর্মারীতে একটিও কাতুজ নেই তখন তারা অবসাদে একেবারে ভেঙে পড়েছে! আর্মারী অধিকার করার পর তাদের কাছে কয়েকটি রিভলবার ও গোটা দুই-তিন রাইচলোডার বন্দুক ছাড়া আরেককিছু জিনিস আর কিছুই ছিল না। এদিকে সেখানে পৌঁছতে আমাদের অসমর্থতায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে তাদের অনেক বিপদে পড়তে হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ও উপযুক্ত অস্ত্র ছাড়া সেখানে এতক্ষণ ধরে প্রতি আক্রমণের সম্ভাবনার মধ্যে থাকা সতাই তাদের উৎকণ্ঠার কারণ হয়েছিল।

সার্জেন্ট ব্ল্যাকবার্ন সেইদিন রাতে মিঃ কুলেন ও আরো দুজন জাহাজের অফিসারের সঙ্গে ট্যাক্সি করে পাহাড়তলী ক্লাব থেকে ফিরছিলেন। A.F.I. হেডকোয়ার্টারের গেটে ট্যাক্সি থামার পর সার্জেন্ট ব্ল্যাকবার্ন দেখতে পান কয়েকজন খাকী পোষাক পরা লোক টেক্সি আলোতে আর্মারীর মধ্যে কি যেন খুঁজছে। তাই দেখে সার্জেন্টের সন্দেহ হয় এবং তিনি ডেকে জিজ্ঞাসা করেন—“কে তোমরা?” সঙ্গে সঙ্গে তাকে লক্ষ্য

করে গুলী ছোঁড়া হয়। তার পর সার্জেন্ট ব্ল্যাকবার্ন নারেক বাগদাদ সাহাকে নাম ধরে ডাকেন। কিন্তু বাগদাদ সাহা অনেক আগেই পালিয়ে বেঁচেছে। সাহেবকে তাই বাগদাদ সাহা আর উত্তর দিল না—উত্তর দিল তিন-চারটি রিভলবার। সাহেবেরা বুঝলেন যে অবস্থা বেগতিক। বুদ্ধিমান সার্জেন্ট স্ট্রীমারের দুজন সাহেব সঙ্গীকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালালেন। পালাবার সময়—সঙ্গী মিঃ কুলেনের কথা তাদের মনে ছিল না কুলেন সাহেব ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে মরার মত ভান করে সেখানে পড়ে রতলেন। সয়করী ভাষা এইভাবে বলা হয়েছে—

“Sergt. Blackburn, lived in a bungalow close to the A.F.I. headquarters building, was returning home from Pahartali Institute in a taxi which he shared with Mr. Cullen and two officers from a ship, then in port. On arrival at the gate of the armoury compound Sergt. Blackburn noticed with surprise that several electric torchlights were being flashed ... His shouts of “who is there?” was immediately answered by a revolver shot from the verandah. He then called out for Naik but the only reply was another shot from the same direction. Noticing then that the light of an electric torchlight was moving across the compound towards the car he called on his companions inside the taxi to follow him and started to run back along the road towards Pahartali.” (From the Judgement, in the Chittagong Armoury Raid case).

সার্জেন্ট ব্ল্যাকবার্ন ট্যাক্সির দিকে আর এগোলেন না। ট্যাক্সি পরিচালনা করে তাঁর সঙ্গীদের ডাক দিয়েই ছুটে দিলেন পাহাড়তলীর দিকে। তাঁর তিনজন সঙ্গীই তাঁর সঙ্গে পালাবার সুযোগ নিতে পারলেন না। মিঃ কুলেনের দিকে আরও কয়েকটা গুলীবর্ষণ হওয়াতে তিনি সেখানেই পড়ে রইলেন। জজ সাহেব মামলার রায়ের মিঃ কুলেনের বক্তব্য এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

“Mr. Cullen’s story is somewhat more detailed as he

remained longer in the vicinity of the armoury. When the first shot was fired at their taxi on arrival at the gate, he saw seven or eight men on the armoury verendah. Immediately after Blackburn had made off, the two ship's officers followed Suit and Cullen was left in the car. He also got out bent on flight but as he did so five or six shots were fired and he forthwith threw himself on the road way and rolled over under the hedge which bordered the armoury compound. Some three or four minutes later he became aware of a beam of light shining over the hedge on to his body and then a shot was fired which lodged in his left hip. Realising his danger and apprehending that worse might ensue, he flung out his arms and lay still as if he had been killed. As he lay there two cars, he says, went swiftly past along the road towards Pahartali. Then he heard the noise as if the door of the armoury was being broken open. Presently he heard two more cars come along the road and heard the raiders rushing to intercept them and more shouting and firing. Just at that time he heard the armoury door being burst open....” (Judgement, Chittagong Armoury Raid case)

জঙ্গসাহেব বলছেন—মিঃ কুলেন আমরার কাছাকাছি অনেকক্ষণ ধরে পড়ে ছিলেন তাই তার কাছ থেকে অনেক তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। সার্জেণ্ট ব্র্যাকবান ও মিঃ কুলেনের দু'জন সাথী যখন প্রাণ বাঁচাতে ছুট সিল তখন কুলেন সাহেবও পালাবার জন্য চাক্সী থেকে নামলো। কিন্তু চাক্সী থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিক লক্ষ্য করে পাঁচ-ছয়টা রিভলভার ফায়ার হয়। হাজার হলেও ইংরেজ—তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটিতে লম্বা হয়ে সটান শূন্যে পড়লেন এবং গাড়িয়ে গাড়িয়ে আমরার কম্পাউন্ডের লেন্সন একটি বোমের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন। তিন-চার মিনিট পর বোমপটার ওপর টর্চের আলো এসে পড়লো এবং

একটা রিভলভারের গুলী এসে তাঁর বাঁ কোমরে বিদ্ধ হলো। অবস্থা আরো সংগীন বৃদ্ধে তিনি হাত পা ছাড়িয়ে মরার ভান করে সেখানেই পড়ে রইলেন। সেখানে শূন্যে শূন্যে দেখলেন দু'টি মোটর পাহাড়-তলীর দিকে দ্রুত ছুটে গেল। তখন আমরার ভাববার শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তারপর আরও দু'টি মোটরগাড়ি পাহাড়-তলীর দিকে বাড়িল। “আক্রমণকারীরা” সেই দু'টি গাড়ি রুদ্ধবার জন্য ছুটে গেল এবং তিনি গুলীর শব্দ ও চীৎকার শুনতে পান। ঠিক সেই সময় আমরার দরজা সশব্দে উন্মুক্ত হলো বলে তাঁর মনে হয়। ব্র্যাকবান ও কুলেন সাহেবের বর্ণনা পাওয়া গেল। তারপর সার্জেণ্ট মোর্শেড আসরে এলেন। তাঁর অনেক বীরত্বপূর্ণ কাহিনী আছে। শত্রুপক্ষের কথা খুব ভালভাবে জানা দরকার, তাদের কাছ থেকেও আমাদের অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যথাস্থানে তা লিখব। এখন জঙ্গসাহেব তাঁর মামলার সারসংক্ষেপে লিখেছেন সেখান থেকে সার্জেণ্ট মোর্শেডের বিবরণ পাচ্ছি। বিশেষ লক্ষ্য করার আছে মোর্শেডও লোকনাথকে ক্যাপটেন টেট বলে বার বার ডুল করেছেন।

Sgt. Marshead appears to have displayed that night conspicuous courage, resource and presence of mind....when near the gate across the Pahartali Road he heard fire or six reports in quick succession from the direction of the A.F.I. armoury and immediately after two more shots....The figures were moving about and three or four of them were flashing torchlights about. At first he took them to be members of the Auxilliary Force as they were dressed in Khaki and were inside the armoury compound one man among them he noticed in particular who was dressed in Khaki wore a Khaki topi and Sam Brown belt and appeared to him to be A.F.I. Adjutant, Capt. Taitt. He was bending over a prostrate form on the verendah, and held a revolver in his hand. Marshead mounted his cycle, went along the road to the main gate of the armoury compound which is near the drill Hall, cycled through it, put his

cycle up against the wall of Sgt. Blackburn's bungalow and from there walked towards the armoury. As he approached two figures dressed in Khaki suddenly appeared on the verendah, one of them being the shout man he had taken for Capt. Taitt. This individual pointed a revolver at him and his companion pointed a rifle or musket at him and they shone a powerful electric torch on him and one of them shouted, “Hands up”, Marshead did not do so but being still under delusion that they were members of the Auxiliary Force, who were playing a rather crude practical joke on him, cried ‘Don’t be a bally ass’. The answer was a repetition in a louder and more peremptory tone of the order to put his hands up. He did so, saying “All right they’re up—what’s the matter?” He was then about 7 or 8 yards off from them. after a pause of a few seconds the man with the torch and revolver whom he still thought to be Capt. Taitt said, ‘That is one of them—shoot.’ He spoke in English but with an unmistakable Bengali accent. Realising then that they could not be members of the Auxiliary Force Marshead ducked and ran back and simultaneously they both fired at him. As he reached the main gate they again fired but again missed. Not stopping to pick-up his cycle he ran along the road and turning up towards Piccadilly Circus, met a car in which was Capt. Carter, the master of a B. I. ship. He asked Capt. Carter to take him to the police lines. By this time he realised that the man who had attempted to shoot him was not Capt. Taitt and he had come to the conclusion that the A.F.I. armoury had

been attacked by local revolutionaries and that the stout man in question was one of them, Lokenath Bal, whom he knew by sight." (Judgement, Chittagong Armoury Raid case).

জঙ্গসাহেব যা লিখেছেন তার সারমর্ম এইরূপ—সার্জেণ্ট মোর্শেড বিশেষ সাহস ও প্রত্যাশাপূর্ণমতীর পরিচয় দেয়। তিনি পাহাড়তলীর রাস্তা দিয়ে সাইকেলে আসছিলেন। রাস্তার ওপর থেকে খাঁকি পোষাকে আমরার বারান্দার ওপর সাত-আটজনকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন। তাদের মধ্যে একজনকে মিলিটারী পোষাকে ক্যাপ্টেন টেট বলে মনে হচ্ছিল। মোর্শেড ঘুরে প্রধান গেট দিয়ে সাইকেলে চেপে ঢুকলেন। ব্র্যাকবান সাহেবের বাংলার পাশে সাইকেল রেখে ডব্লি-হলের পাশ দিয়ে আমরার দিকে এগোচ্ছেন, হঠাৎ দু'জন লোক এসে তাঁর পথ রোধ করে। তাদের হাতে রিভলভার ও বন্দুক ছিল। তারা মোর্শেডকে মাথার ওপর হাত তুলতে আদেশ দিল। মোর্শেডের তখনও ধারণা তারা তাঁর সঙ্গে এক প্রকার-উগ্র তামাশা করছে। তাই মোর্শেড বিরক্ত হয়ে বললেন—‘যত সব গর্দভ—এ হচ্ছে কি?’ এই কথার পর তারা মোর্শেডকে আরও কঠোর স্বরে হাত তুলতে আদেশ করে। মোর্শেড তাদের আজ্ঞা মেনে নিলে হাত তুললেন এবং বললেন—‘এই নাও বাবা হাত তুললাম—ব্যাপাবানা কি বলত?’ এই সময় মোর্শেডের সঙ্গে তাদের ব্যবধান মাত্র ৭।৮ গজ। টেট দিবে মোর্শেডকে দেখে একজন হুকুম দিল—‘এ ওদেরই একজন—গুলী কর!’ যে হুকুম দিল তাকে আগের মর্হুত পর্বন্ত ক্যাপ্টেন টেট বলে মোর্শেডের ভ্রম হয়েছে। এখন বাংলা উচ্চারণে ইংরেজী শব্দে মোর্শেড

সুনিশ্চিত হলেন যে এ টেট নয়। অবস্থা বেগতিক দেখে মোর্শেড বন্দুক পড়ে বন্দম ছুট-দিলেন। তাঁর গায়ে গুলী লাগল না। সাইকেল না নিয়েই তিনি পালালেন। তিনি যখন মেন-গেটে পৌঁছিলেন তখন আরও কয়েকটা ফায়ার হয়েছে। কিন্তু সবই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পিকার্ডিল সার্কারের কাছে জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন মিঃ কার্টারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মোর্শেড কার্টারের মোটরে পদাশ্রয় লাইনের উদ্দেশ্যে গেলেন। এতক্ষণে সব ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি বদ্বতে পারলেন এ কাজ এই জেলার বিপ্লবীদের এবং সেই বলশালী ব্যক্তি টেট নয়—স্বয়ং লোকনাথ বল, যাকে সামনে দেখে তিনি চিনতে পারলেন।

আমরার দখল করার পর এভাবে তাদের সেখানে প্রায় চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ তিন-চার মিনিটের মধ্যেই আমরার দরজা ভাঙা হয় এবং তারপর এই সব ছোট ছোট ঘটনা ঘটে। এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে আকুল উৎকণ্ঠায় তারা আমাদের উপস্থিতি প্রতি মর্হুতে প্রত্যাশা করেছে। আমরার দখল করার একঘণ্টা পরেও আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছই নি। যেখানে আমাদের তৎপরতার প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি সেখানে শত্রুপক্ষের গতিবিধি ক্ষিপ্ততার দেখা গেছে। তারা ব্যাপক আক্রমণের বিষয় তখনও অনুধাবন করতে পারে নি, তাই এই আমরার হেডকোয়ার্টারটি আক্রমণ ও দখল করে নেওয়া একটি বিজ্ঞান ঘটনা বসেই প্রথমে তাদের ধারণা হয়েছিল। সেই কারণে ক্যাপ্টেন টেটও একজনকে কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে একটি ছোট দল সঙ্গে নিয়ে আমরার সামনে পাহাড়তলীর রাস্তার ওপর নিজের গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়। বীরপদে গাড়ি থেকে নেমে সে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে চীৎকার করে বললো—“তুমলোগ কোন হায়? ক্যা মাংগতা?” প্রড্যান্ডের জেনারেল বল কঠিন কণ্ঠে জানান—

“Halt, not a step further—or I will shoot you!”

আগেই বলেছি ক্যাপ্টেন টেট প্রায় লোকনাথের মত দেখতে ছিল। তেমন লম্বা-চওড়া ও বলিষ্ঠকায়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতবাসীকে কথায় কথায় বড়ের লাখি মেরেছে ও হুকুম দিয়ে অভ্যস্ত সে কেন আজ তাদের আদেশ মানবে? ব্যঙ্গের সুরে ক্যাপ্টেন টেট বলল—“Halt? বাঙালী কুতা Halt?”

আমাদের জাঙ্গমেন্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—

“Then we stood up on the verandah on both sides. I was on the verandah facing the road. I heard Loknath challenging saying ‘Halt’. Then I heard a Saheb’s voice, ‘Bengali dog, halt!’”

আজ তাদের আমরার বিধ্বস্ত। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির মর্বাদা আজ “ভারতীয় গোলাম”দের পায়ের তলায় দলিত। ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে তা একেবারে অসহ্য। আভিজাত্যের স্বভাব-বশত উদ্ভত ক্যাপ্টেনের মূখে ব্যঙ্গের হাসি—“বাঙালী কুতা Halt!”

লোকনাথ নিজে আমাকে বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছে—“আমাদের যখন এইভাবে রাস্তার ওপর থেকে সামনে দাঁড়িয়ে সাহেবের দল সৈনিকের পোষাকে চালাচ্ছে করল তখন আমার মনে হয়েছিল যদি একবার তারা বদ্বতে পারে আমরা ভয় পেয়ে দাবড়ে গৌঁছি তবে হয়ত প্রতি-আক্রমণ করবে। তা’ ছাড়া তখনও আমি ঠিক করতে পারি নি তাঁদের পেছনে গোপনে আরও লোকবল আছে কি না। জানি না কি করে তখন হঠাৎ একটি উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। আমি উচ্চকণ্ঠে শত্রুপক্ষকে শুনিয়ে আমার সৈনিক সাধীদের উদ্দেশ্যে আদেশ দিলাম—

“Get ready with bombs! Ready—follow me—charge!”

“আমার এই বুদ্ধি ও সেইরূপ একটি “বাস্তব-ভান” শত্রুকে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি ও ভীতিগ্রস্ত করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক সঙ্গে তিন-চারজন ফায়ার করে সেইদিকে কয়েক পা এগোতেই সাহেবদের অত দুঃসাহস, অত বিক্রম, অত দর্প, অত লক্ষ্যবশত সব মর্হুতে বদ্বদের মত মিলিয়ে গেল। সাহেবগোষ্ঠী ম্যাকবেথের ডাইনী বৃদ্ধিদের মত কোথায় যেন স্পিরিটের মত উবে গেল—তার পাতা আর আমরা পেলাম না। তারা আমাদের লক্ষ্য করে একটা গুলীও যে ছোড়ে নি তার একমাত্র কারণ এখন আমার মনে হচ্ছে—বীরপদে সাহেবের দল ভব করেছিল গুলী করলে হয়তো আমরা বোমা ছুঁড়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব।”

শত্রুর ভক্ত নরমের ঘম। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সিংহের অত আশঙ্কাল গেল কোথায়? “বাঙালী কুতা!”—বলে বৃটিশ সিংহের গোষ্ঠী এতদিন ধরে যে ইতর মন ও জ্বলন্ত রক্তের পরিচয় দিয়ে এসেছে তারা এখন কতকগুলো তেড়া ও শেম্বালের মত পালাল কেন? এই হচ্ছে সেই খাঁটি সাম্রাজ্যবাদী-চরিত্র—শত্রুর ভক্ত নরমের ঘম।

[কমশ:]

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

কল্যাণে দেখিয়ে

মূল্য : এক টাকা

ছেলেদের জন্য আর একখানি সহযোগিতা। পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

উপহার দিবার যোগ্য বই

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

শ্রীশৈল চক্রবর্তী দ্বারা সুচিত্রিত।

চাপা ও বাঁধাই মৃদুকর।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

জীবনাম্ন

তন্ময় বাগচী



পল্লী উন্নয়ন পরিদপ্তরের প্রথম
গ্রেণ্টার শ্যামপুর গ্রাম ডাকঘরটা সাব
পোস্ট অফিসে রূপান্তরিত হ'ল। সেই
অল্পপাড়ারগায়ে এবার থেকে রোজ
নিয়ম করে লাল গাড়িটা স্মৃতস্মৃত করবে—
ঘার মাথায় ইংরাজীতে লেখা আছে—
'MAIL'.

অন্যদিনের মত সেদিনও ডাকের
ধলোটা নিয়ে যাবার জন্য রঘু পোস্ট
অফিসে আসতেই বড়বাবু তাকে মিনমিনে
'গলায় বললেন—'আজ থেকে' তোমাকে
'আর ডাক নিয়ে যেতে হবে না রঘু। বড়
পোস্ট অফিস থেকে তোমার জবাবের
নোটিশ এসেছে।'

আদিবাসী আর নিরক্ষর রঘু। তাই
বড়বাবুর কথাগুলোর মনে ঠিক বুদ্ধিতে
না পেরে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তার
মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কি করব বল। ওপর থেকে আদেশ
এসেছে এখানে মেল রান্যের আর দরকার
নেই। এবার থেকে ঐ 'মেল বাস' সব ডাক
নিয়ে যাবে—রঘুর দৃষ্টি থেকে আড়াল
করবার জন্য নিচু হয়ে বড়বাবু সিলের
তারিখ বদলাতে লাগলেন।

অস্ফুট এক আত্নানাদ করে উঠল
রঘু! শব্দটা স্বীকৃতিরই যেন মনে হোল।
বারান্দার এক কোণে নববধূর সলজ্জ হাসি
মেখে হলদে রং-এর ব্যাগগুলো জড়সড়
হয়ে পড়ে আছে। রঘু বার বার উদাস
চোখে সেই ব্যাগগুলোই স্মৃতিতে লাগল।

খানিক পরে বড় অফিসের হলদে
রং-এর নির্দেশনামা রঘুর হাতে তুলে
দিলেন বড়বাবু। তারপর একটা লম্বা
খাতা সামনে তুলে ধরলেন। রঘু বাঁ
হাতের বড়ো আঙুলে কালি মেখে খাতার
এককোণে টিপসই দিল। সেই হতেই দশ
টাকার নতুন চকচকে দু'খানা নোট রঘুকে
দিয়ে মাথা নিচু করে আবার নিজের
চেনারে বসে পড়লেন।

চাকরি শেষ। এখানে দাঁড়বারও
অধিকার নেই রঘুর। তবু চুপচাপ
স্বাগতের মত দাঁড়িয়েই রইল। এখানের
কোন কিছই সে স্পর্শ করতে পারবে না;
তবু নিজের আঙুলের কালিই দেখল কিছু-
ক্ষণ। কি ভেবে সেই কালিটা কপালে
ছুইয়ে নিল, আর হলদে কাগজখানা
কাপড়ের খুঁটে ফেলল বেঁধে। চকচকে
নোট দু'টো থেকে কেমন যেন এক সৌন্দা
গন্ধ বের হচ্ছে। ঠিক যেন বাঁশপাতা
পচার গন্ধ। নাকের কাছে তুলে ধরে গন্ধ
শুকলো রঘু। কাপড়ে নোট দু'খানা
বাঁধার আর উৎসাহ রইল না। একবার
ভাবল উড়িয়ে দেয় হাওয়াতে। কিন্তু কি
ভেবে জামার পকেটে সবলে ভাঁজ করে
রেখে দিল।

'এবার বাড়ি যাও রঘু'—বড়বাবু
ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠতেই রঘু
চমকে উঠল। যেন বাঘের গর্জন শুনল সে।
একরাশ ব্যথা আর মিনতি চোখের তারায়
এনে বড়বাবুর দিকে তাকালো। একটু দয়া,

একটুকুও সহানুভূতি কি পারে না?
ঘরের কোণে নববধূর লজ্জা মেখে জড়সড়
হলদে ব্যাগগুলোর দিকে একবার তাকালো।
নাঃ এবার ওবাও বুদ্ধি বাগ্ম কন্যেই তাকে।
আজ আর অন্যদিনের মত সন্দের হাসিতে
ওকে ডাকছে না কাঁধে তুলে নেবাব জনো।
শেষবারের মত ঘরের চারিদিক দেখে নিয়ে
ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো।

সামনে অক্ষরন্ত বিস্তীর্ণ পথ। পিছনে
রয়ে গেছে মূঠো মূঠো বাঁশের টেউ।
একরাশ স্মৃতির উৎস! কোথায় যাবে
সে? এই মূঠো মূঠো মনে করতে পাচ্ছে
না যাওয়ার জায়গাটা। তবু রাস্তায় নেমে
হাঁটতে লাগল। একসময় একটা বট-
গাছের শিকড়ের ওপর বসে পড়ল রঘু।
এখন খুব ক্লান্ত লাগছে। অথচ এতদূরে
কুড়ি মাইল ছুটেও এতটুকু শ্রান্ত হ'ব নি
কোনদিন। সেদিন ক্লান্তি জিনিসটা ওর
অভিধান থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল।
শিকড়ের ওপর বসে পড়তেই ছাড়াছড়ির
মত ভেসে উঠল জীবনের সদা-সদাপ্ত
অধ্যায়ের নানা রং-বেরং-এর টুকরো
টুকরো স্মৃতিতরঙ্গ। স্বপ্নভরা জীবন
এখন যেন নিরক্ষর অন্ধকারে ডুবে গেছে।
তবু সেই তবলগগুলোই যেন এখন স্পষ্ট
হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে মনে পড়ে
যায়.....

বয়স তখন কতই বা হবে? ভের
কিংবা চোন্দ। বাবার সাথে জংগলে

গিরেছিল আসামের পাগলা হাতী ধরবার জন্য। ছ' মাস ঘুরে বেড়ান মাহুতদের সাথে। প্রতীক মাহুতের মৃত্যুর আশংকা; তবু প্রতি মাহুতেরই বেন বেঁচে থাকার চরম আশ্বাস রয়েছে জীবনের মধ্যে। ফেলে আসা দিনগুলো কত বর্ণসমাবেশেই না উজ্জ্বল.....

সামান্য একদিনের অসুখে বাবা মারা যেতেই আবার নিজের গায়ে ফিরে এলো রঘু। কয়েকটা বছর নিরুপদ্রব একটানা একঘেয়ে জীবন। জংগলে কাঠুরে আর মাহুতদের সাথে ঘুরে কাটিয়ে দিল কয়েকটা বছর। এর মধ্যে বিয়ে করল। কিন্তু দু' বছর যেতে-না-যেতেই বৌ আর এক ভীলের সাথে কোথায় বেন পালিয়ে গেল। খোঁজবার অনেক চেষ্টা করেও ওদের খুঁজে পায় নি। তারপর আর বিয়ে করে নি—উৎসাহ পায় নি, আর প্রয়োজনও হয় নি। ছোটবেলা থেকেই মাহুত হবার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু সে স্বপ্ন আকাশকুসুমের মত আকাশেই মিলিয়ে গেছে।

এর পরের অধ্যায় খুবই বৈচিত্র্যময়। কুতলপুরের চা-বাগানে একটা নতুন ডাকঘর খোলা হয়েছে। মেল রানারের প্রয়োজনে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও একটা দরখাস্ত এলো না। না আসার কারণও ছিল অনেক। রাও অফিস আর সাব অফিসের দু'রকম মাইল পাঁচেক হবে। কিন্তু পথটা জংগলে ভর্তি। আর বুনো হাতীরাও মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াত। মাইনে ছিল মাত্র দশ টাকা। ঠিক কার উৎসাহে মনে নেই তবু কি ভেবে সেই কাজটাই নিয়ে নিল রঘু। বড়বাবু প্রথম প্রথম বেশ ইতস্তত করেছিলেন। এবড় একটা যন্ত্রিপূর্ণ কাজে একজন নিরক্ষরকে যাগানে উঠিৎ হলো কি না তা নিয়ে মনে মনে ভেবেছেন। ডাকের খেলতে গ বাগানের চিঠিপত্র ছাড়াও অনেক মূল্যবান জিনিসও আনা-দেওয়া করতে হবে। কিন্তু দিন কয়েক রঘুর কাজের উৎসাহ দেখে কেমন বেন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এবার তার মনে হোল মেল রানারের কাজে রঘুর মত লোক পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা। ডাকের খলে কাঁধে নিয়ে সেই জংগল ভর্তি পথ দিয়ে নির্ভয়ে ঝড়ের মত ছুটে চলত। এই জীবন রঘুর কাছে ষড় আনন্দের আর বড় আশার।

নিজেকে রক্ষার প্রয়োজনে বড় অফিস থেকে রঘু একটা বর্শা আর অধিকার চিহ্ন পেয়েছিল। একটা ঘুঙুরও বাঁধা ছিল বর্শার ফলায়। বুনো জন্তুদের ভয় দেখাবার জন্যেই হোক বা নিজের পদ-মর্যাদা প্রকাশের জন্যেই হোক এ পথে হটিবার সময় বেশ জোরে জোরে ঘুঙুর বাজাতো। দৌড়বার দরকার না হলেও

দৌড়ত। রঘু ভাবত সরকারের চাকর সে তাই না দৌড়লে সরকারকেই বৃষ্টি অপমান করা হবে! তাই বেশ ভারি-চালে সবাইকে জানাতো তার বর্শার ডগায় ঘুঙুরের আওয়াজ শুনলে কেউ যদি তার পথ আগলে রাখে তবে তাকে বর্শা দিয়ে অনায়াসে দুটুকরো করে দিতে পারে। সরকার তাকে তার জন্যে কোন শাস্তিই দেবেন না। এক-একদিন আপ-শোস করে—এরকম ঘটনা আজ পর্যন্ত একটাও ঘটল না। এই অধিকার না ফলাবার মত দুর্ভাগ্য আর কি থাকতে পারে?

হঠাৎ এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রঘুর বুক চিরে।

বুনো জন্তুদের প্রধান ঘাটি বাশ-বনের কাছে আসতেই আনন্দের সীমা থাকতো না রঘুর। উৎসাহ আর উদ্দীপনা শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরাকে রীতিমত উত্তেজিত করে তুলত। মাঝে মাঝে দু-চারটে বুনো হাতীরও দেখা পেত। ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে তাদের কাছে এসে নানারকম শব্দ করে তাদের নাচাতো। আসামের জংগলে ঘুরবার সময় হাতীদের সব কায়দা কানুন আর স্বভাব চরিত্র জেনে নিয়েছে। তাই তাদের দেশে পালিয়ে যেত না। বরং কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে তাদের আরো রাগিয়ে দিত। তবু কোন হাতী তাকে কোনদিন স্পর্শও করতে পারে নি।

বট গাছের ছায়ার বসে সেই স্মৃতি-গুলো মনে করতে চেষ্টা করল। একটা হাতীর কথা মনে পড়ে রঘু। পথের একটা গরুবাগাড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো কবে শব্দ দিয়ে লঠনটা তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সওদাগর হাজিকেও ভুলতে পারে না রঘু। একেবারে উলঙ্গ করে ফেলে ঘোড়ার দৌড়ের মত সমস্ত বন ছুটিয়ে বেড়িয়েছিল। এদেব নিষেই খেলা করেছে অথচ আজো বেন অক্ষত! বরং তাদের অক্লিম বন্ধু বেন সে! তার জীবনের এই বাইশটা বছর বেন এক অপূর্ণ সৌন্দর্যমাখানো সুসময় ভরা। সেই মধুর জীবন আজ তার কাছে শূন্যই স্বপ্ন! সেই সব পেয়েছি বঙ্গ থেকে আজ যেন সে বিভাঙিত। এখন চোখের সামনে একরাশ নিবন্ধ অন্ধকার। পথ কোথায়? বাঁচর আশ্বাস কোথায়? জীবনের ভরসা কোথায়.....

পৌ.....পৌ.....পৌ.....

বাসের হর্ন কানে যেতেই চমকে উঠল রঘু। সেই সংগে নিজেকেও সামলে নিজ স্বপ্নের জীবন থেকে। বিকট শব্দ করতে করতে বাস তার আগমন বাতী জানিয়ে ডাকঘরের সামনে এসে স্থির হয়ে

দাঁড়িয়ে পড়ল। বাসের রংটা এখান থেকে নারকালের পেটির মত কালো দেখাচ্ছে। আর তার নিচে বেন চারটে চাকা লাগান। বাসের ভেতর কয়েকজন বসে আছে!

বাস থামতেই বড়বাবু নববাবু লম্বা মাথানো সেই হলদে ব্যাগগুলো ল্লাইভারের হাতে তুলে দিলেন। আবার একটা বিকট গর্জন তুলে বাসটা কয়েক মাহুতেরই মিলিয়ে গেল জংগলের মধ্যে। রঘু ভাবে বাসটা শব্দ ডাক নিয়েই গেল না, তার জীবনের শেষ খবরটুকুও বোধহয় নিয়ে গেল এ ব্যাগের মধ্যে পুরে।

রঘু মনে মনে কল্পনা করছে বাস এতক্ষণে জংগলে পৌঁছে গেছে। বাঁশের ঝাড় আর বড় বড় পাথরের সাথে শাল গাছ ভরা বনপথ ধরে বাস যখন এগুতে থাকবে তখন হাতীগুলো কি চপ করে থাকবে?

হঠাৎ রঘুর মনে পড়ে যায় দিন কয়েক আগে একটা হাতী দলছাড়া হয়ে এদিকে এসে পড়েছিল। হাতীটার ডান কানে কি রকম বেন সাদা সাদা দাগ। তাকে প্রায় একমাস ধরে রঘু দেখেছে। রঘু ভাবে মেল রানারের ষাওয়া-আসার খবর ওর মুখস্থ। সমস্ত ভুল করে না। তারই আশায় সে বনের ধারের কোপে লুকিয়ে থাকতো। তবু রঘুর নিপুণ হাতের খেলোয়াড়ী চাল তাকে খেঁপিয়ে দিত। দু-তিনবার লেজ ধরে রাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কাল তার সব চাল ব্যর্থ হয়ে যায়। রাগাতে আর খেপাতে গিয়ে হাতীটা তার এত কাছে এসে গিবেছিল যে কোন মাহুতের তাকে ধরে ফেলতে পারতো। কিন্তু অনেক কৌশলে কোনরকমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যায়। বন-জংগলে ঢাকা আঁকা-বাঁকা পথে ওর পিছনে ধাওয়া করা সম্ভব হয় নি হাতীটার। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলছিল এই খেলা। শেষে ডাকঘরে পৌঁছবার সময় হয়ে যেতেই অনেক কৌশলে পালিয়ে এসেছিল। তবু দূর থেকে রঘু দেখেছে সে কোথাও লুকিয়ে আছে কি না দেখবার জন্যে হাতীটা শব্দ তুলে হাওয়ার মধ্যে গন্ধ পাবার চেষ্টা করছে। রঘুর মনে হো হাতীটা বোধহয় আজো তার অপেক্ষা ওখানে লুকিয়ে থাকবে।

অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে হাটিয়ে লাগল। কাঁধে ব্যাগ, হাতে আত্মরক্ষা হাতিয়াব আজ নেই—তাই দু' পা ধে এলোমেলো হয়ে যায়। ঠিক স্বাভাবিক ভাবে হাটিতে পারছে না। শেষে দীর্ঘ দিনের অভ্যাস কখন যে এসে যায় চলায় ছন্দে তা নিজেই টের পায় না। একসময় সত্যি সে দৌড়তে লাগল।

শীতলেনে নেমেছে নিবিড় নিস্তব্ধতা। এলোমেলো বাতাসে গাছের পাতা দুলছে। ময়নার দল গাছের পাতায় বসে আপনমনে দোল খাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাখির কিচির-মিচির শব্দ। তার পরই সব নিস্তব্ধ। পথের ওপর বাসের চাকার দাগ কেটে বসে গেছে।

হঠাৎ রঘুর চোখে পড়ল বাঁশবনের একটা ঝোপের ভেতর ভাবি পাথরের মত কি যেন নড়ছে। খানিক পরে স্পষ্ট হয়ে উঠল অর্ধ চন্দ্রাকাব দাগ নেওয়া দু'টো কান—ধীরে ধীরে দুলছে।

স্থানদূর মত দাঁড়িয়ে রইল রঘু। হাতীটা কাছে এসে পড়েছে তবু সামান্য নড়াচড়া করার মত সাহস হ'ল না। ক্রমে বিচলিত হয়ে পড়ে—পালাবার সুযোগ খোঁজে। কিন্তু দু'পা যেন শমশানী বোঝা হয়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করল পালাবার—এবার বুঝি সত্যি ব্যর্থ হোল রঘু। সেভাবে কতক্ষণ ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ অনুভব করল একটা রবারের নলের মত কি যেন সে স্পর্শ করেছে। রবারের পুতুলের মত হয়ে গেছে সে।

সেই হাতীটা শূঁড় দিনে তাব কোমর ছাড়িয়ে ধরেছে সেটা অনুভব করলেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্তব্ধ হয়ে একবার শূঁড়টাও যেন স্পর্শ করে নিল। এবার সে বারো ফুট উচ্চতায় উঠে আড়া-আড়িভাবে শয়ে সমস্ত জগলটা দেখতে পেল। রঘু জানে এই মুহূর্তেই সে মাটির ওপর সজোরে আছড়ে পড়বে।

এক মুহূর্তের জন্যে মৃত্যুর রূপটা উদ্ভল হয়ে উঠল রঘুর চোখের সামনে। পকেটের নোট দু'খানা আব কাপড়ের খুঁটে বাঁধা হলদে কাগজখানা যেন হাওয়ার দুলছে।

বারো ফুট ওপর থেকে এবার রঘু নিচে নামল। আগের ক্ষিপ্ততা নেই, তবু চোখের সামনে যেন নিরস্ত্র অশ্বকাব। সামান্য একটু রসিকতা কর্তেই হাতীটা তার এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। ওর ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা সেও বোধ হয় জেনে ফেলেছে।

শরীরে মাটির স্পর্শে চোখ খুলল রঘু। তাবপর সমস্ত শরীরটা মাটিতেই এলিয়ে দিল। হাতীটা তখনও দূরে দাঁড়িয়ে শূঁড় দোলাচ্ছে আব বা পাটা নাচাচ্ছে। দু' কান দুলছে আর দু' চোখ যেন কিনকিব মত জ্বল জ্বল করছে।

অবাক বিস্ময়ে স্থিরভাবে দেখতে লাগল রঘু। ব্যস্ত অক্লোশে হাতীটা এবার সজোরে পদাঘাত করল। সমস্ত বন যেন ভগ্নাঙ্গের মত কেঁপে উঠল। তাবপর বিজ্ঞানী বীবেব দৃষ্ট ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বন্যে মধ্যে। রঘু তবু চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে মাটিতে।

নিজের সব সত্তা যেন হারিয়ে ফেলেছে। বেঁচে আছে কি না সে বোধশক্তিও নেই তার। একটি মুহূর্তে কত বড় ঘটনা ঘটে গেল সেটা অনুমানও করতে পারে না। একবার মনে হয় শরীরের সমস্ত অনুভূতি একেবারে নিঃশেষিত। আবার মনে হয়, তার মাথার মধ্যে থেকে কিসের যেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাঁশবনের পিছনে ক্রান্ত অবসরের মত বসে থাকে শূঁড়...

চমক ভাঙল বাসের আবার সেই পৌ পৌ শব্দে।

মাথার ওপর 'মেল' তিলক একে ঝড়ের মত উদ্ভবসে ছুটে আসছে বাস। কুতূলপুত্রের ডাক দিয়ে শ্যামপুত্রের ফিরছে বাস। বাস তো ওর সঙ্গী নয়, তার প্রয়োজনের অঙ্গও নয়। বরং তার শত্রু। তার জীবনেব সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। নৈরাশ্যের জ্বালা ফুটিয়ে তীব্রভাবে বাসের দিকে তাকালো রঘু। ঝড়ের গর্জনে তার দিকেই ছুটে আসছে। তবু স্থির হয়ে চুপচাপ বসে রইল রঘু। নির্বিকার নিশ্চিন্ত নিশ্চল। জীবনের সব দেনা-পাওনা সব চাওয়া-পাওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে যেন। জ্বাইভারের তীর হন শূন্য রঘু—কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই ওর চোখে মুখে। যে তার জীবনের চরম সর্বনাশ ঘটিয়েছে আজ তার সাথে সে

মুখোমুখি বোঝাপড়া কববে। কি তার অপরাধ? কোথায় ঘটেছে তাব চুটি? এমনিভাবে তার জীবন থেকে আনন্দ আবেগের সব রং ধুবে মুছে নিশিচ্ছ হয়ে যাবে কেন? জীবন যুদ্ধে পরাজিত তবু আজ সে জেনে নেবে তার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর।

কাস.....কাক.....কাস.....

সজোরে ব্রেক কবল ড্রাইভার! তবু শেষরক্ষা হোল না। সামনের চাকা নিখুঁতভাবে এগিয়ে গেছে পথে বসা মানুষটার ওপর দিয়ে। লাফিয়ে নেমে পড়ল ড্রাইভার আর সঙ্গীরা। বুদ্ধকে পড়ে দেখল গাড়ির চাকার একেবারে পিষে গেছে মানুষটা। পরনে লুঙ্গি গায়ে খাকি কোট—বোতামগুলোয় সরকারী দপ্তরের নির্দেশনামা।

লোকটা আর কেউ নয় শ্যামপুত্রের ছেল রানার রঘু মাহাতো। এত বড় আঘাতে এতটুকু বিকৃত হয় নি মূখখানা। যেন জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়ে এখন গভীর প্রান্তিতে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।*

* (মূল কাহিনী বিখ্যাত আলয়দুর্গ লেখক এস কে পোট্টাকার্ত অবলম্বনে)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেঙ্গলুরু - জীবনগর - গোহাটী

ভাষা-আন্দোলনে পূর্ববঙ্গ

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

বলতে গেলে পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া থেকেই পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলনের শুরু। কিন্তু এর বীজ নিহিত হয়েছিল আরও আগে—১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে। লাহোর অধিবেশনে বলা হয়েছিল পাকিস্তান হবে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি নিয়ে। 'Sovereign and independent states' সেখানে প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শৃঙ্খলিত বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা ও মুদ্রা-সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন পূর্ব বাংলার তরুণ, বুদ্ধিজীবীমহল বিশেষ করে ছাত্রাবলক অনেক আশা করেছিল; নতুন রাষ্ট্র তাদের আত্মবিকাশের স্ফূর্তি খুলে দেবে—সাম্প্রতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে।

কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর মাত্র আট মাস বেতে না যেতেই পূর্ব বাংলার জনগণের বহু আশার ভিত্তি ধসে গেল। মুসলিম লীগ নেতাদের আসল রূপ প্রকাশ পেল। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম-উদ্দীন ঘোষণা করলেন, Pakistan is a sovereign and independent state. 'States' কথাটার 's' তুলে দিলেন। কৈফিয়তে জানালেন লাহোর প্রস্তাবের 'states' কথাটা টাইপ করতে ভুল হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, উদ্ভূত হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ছাত্রাবলক প্রতীতি জানালো, না। ঢাকার কাক্সন হলর সেই 'না' শব্দের চেউ সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

চারদিন সংগ্রাম করবার পর ছাত্রদের ৮ দফা দাবি মেনে নিয়ে খাজা নাজিম-উদ্দীন এক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। ১৫ই মার্চ তারিখের সেই চুক্তিপত্রে তিনি অঙ্গীকার করলেন, বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা করা হবে এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে কেন্দ্রের নিকট সুপারিশ জানাবেন। কিন্তু মাত্র তিন দিন বাদেই ঢাকার রেনকোর্স মাঠের জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, 'Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan.' পূর্ব বাংলার জনসাধারণ এর প্রতিবাদ জানালো।

প্রাদেশিক পরিষদ এক প্রস্তাবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি জানালো। লাহোর প্রস্তাবের চুক্তির খেলাপের জন্য তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান শাসনতন্ত্রের মূলনীতি-নির্ধারক কমিটির রিপোর্টে উদ্ভূত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ জানালেন।

লিয়াকত আলী খানের রিপোর্টের প্রতিবাদে বিক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রণয়নের জন্যে ঢাকায় প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র, রাজনীতিবিব ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এই সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হলো লাহোর প্রস্তাব কার্যকরী করতে হবে আর বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। এই সম্মেলনেই আওয়ামী লীগের জন্ম হলো। এই নবগঠিত রাজনৈতিক দলটির ওপর সম্মেলনের প্রস্তাবগুলো কার্যকর করবার জন্যে জনমত সংগঠনের দায়িত্ব দেয়া হলো।

ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলে আভ্যন্তরীণ স্বন্দর প্রকট হয়ে উঠেছে। একদিকে গণ-বিক্ষোভ, অন্যদিকে দলীয় কোন্দলের ফলে অবশেষে লিয়াকত-রিপোর্ট প্রত্যাহত হলো।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। লিয়াকত আলীর পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান অন্যপথে পা বাড়ালেন। 'তিনি প্রস্তাব করলেন, 'বাংলা ভাষা লেখা হবে আরবী হরফে।' অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা তো দু'রের কথা, বাংলাকে আর বাংলাই রাখা হবে না। আবার অসন্তোষ দেখা দিল।

অসন্তোষ তখনো পুরোপুরি স্তিমিত হয় নি। ঢাকায় নিখিল পাকিস্তানের মুসলিম লীগের অধিবেশন বসল। সভাপতিত্ব ভাষণে নাজিমউদ্দীন জানালেন, উদ্ভূত হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। নাজিমউদ্দীন তাঁর পনেরই মার্চের চুক্তিপত্রের কথা ভুলে গেলেন।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে খাজা নাজিমউদ্দীনের সেই ঘোষণা ছাত্রদের মাঝে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে দিল। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে ঢাকার ছাত্রাবলক নাজিমউদ্দীন-এর এই ঘোষণার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করল। বিকেলে স্কা বার লাইব্রেরী হলে আতাউর রহমান

খানের সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা হয়। সভায় আন্দোলন পরিচালনার জন্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ, শ্রম লীগ, খিলাফতে রস্বানী, ছাত্র লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি, নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। কাজী গোলাম মাহবুব, এর আহ্বায়ক হলেন। এই কমিটির প্রথম সভাতেই স্থির করা হলো হরতাল সভা শোভাযাত্রার মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা-দিবস হিসেবে পালন করা হবে।

রাষ্ট্রভাষা-দিবস সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট পালন, শোভাযাত্রা বের করা ও সভা-অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। আর সংগ্রাম পরিচালনার অর্থ সংগ্রহের জন্যে ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী পতাকা-দিবস হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রমঘট ঢাকাতেই নয়, প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও ধর্মঘট পালন করে।

ভাষা-আন্দোলনে পাকিস্তান অবজারভার ও সাম্প্রতিক ইন্ডেক্স ইত্যাদির যথেষ্ট দান রয়েছে। এই পত্রিকাদুলাই প্রদেশের সংগ্রামী ছাত্রদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। দেশবাসীকে ভাষা-আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রমীর অজ্ঞাহতে ক্ষমতাসীন সরকার পাকিস্তান অবজারভার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। আর সম্পাদক আব্দুল সালামকেও গ্রেপ্তার করে।

এর মধ্যে বিক্ষোভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে সারা প্রদেশে। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ধর্মঘট পালন করবার জোয় প্রস্তুতি চলতে লাগল। ২০শে ফেব্রুয়ারী সম্মুখ ৬টার সময় ঢাকায় ১৪৪ ধার্য জারি করা হলো। সারা শহর উত্তেজনার থম থম করতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবলকগুলো ও কেন্দ্রীয়-সংগ্রাম পরিষদ জরুরী বৈঠকে মিলিত হলো। আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদেরও এক বৈঠক হলো। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সদস্য দেশে ঘাসের রাজ্য সৃষ্টি করে জরুরী অবস্থায় অজ্ঞাহতে আসন্ন নির্বাচন বাতিল করবার ভয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট বাতিল করার সিদ্ধান্ত জানাল। শ্রম লীগ নেতা

ওলি আহাদ ১৪৪ থারা অমান্য করবার পক্ষে মত দিলেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলো।

২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বেলভলায়' মিলিত হলো। এখন আর-বেলভলা নেই—হয়েছে আমতলা। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সামদুল হক ছাত্রদের শোভাযাত্রা বের না করবার পক্ষে স্বীকৃতি দেখালেন। কিন্তু ছাত্ররা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইলো। তবে রাতে ক্যাপক গোলাযোগ দেখা না দেয় তার জন্যে ৪জন ৪জন করে বের হতে সম্মত হলো। কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অমান্য করার সেখানেই উক্ত সংস্থার মৃত্যু হলো।

বেলা ১টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪৪ থারা অমান্য করে ৪জন ৪জন করে ছাত্ররা বেরতে লাগলো। পুলিশ গ্রেপ্তার শুরুর করল। ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পুলিশ ফাঁদে গ্যাস ছুঁড়ল। ছাত্রদের উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। ছাত্ররা টিল নিয়ে পুলিশদের পাশ্চাৎ আক্রমণ করল। কিছুক্ষণের ভিতরই এই খণ্ডবৃক্ষের স্থান মেডিকেল কলেজের গেট, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এসব জায়গায় বৈপ্লবীরা লাঠিচার্জের ফলে বহু ছাত্র আহত হলো।

বেলা ৪টার সময় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলী চালালো। গুলীতে জখ্মার আর স্নায়িক প্রাণ হারালো। একটু পরেই এম-এ, ফাইনাল ইয়াব-এর ছাত্র আবুল বরকতের উরুদেশে বুলেট বিদ্ধ হলো। স্নাত আটটার সময় বরকতের প্রাণবিয়োগ হলো।

বরকত, জখ্মার আর রফিকের মৃত্যুর বর দাবাশির মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এদিকে প্রাদেশিক অধিবেশন চলছে। স্থানেও উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল। পুলিশ গুলী-চালনার ব্যাপারে খয়রাত হাসেন বিরোধী দল থেকে মূলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। সরকারপক্ষীয় সদস্য মৌলানা তক্বাশিশ ও শামসুদ্দীন মূলতুবী প্রস্তাব সমর্থন করলেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন পুলিশের গুলী-চালনা সমর্থন করলেন। ফলে মুসলিম লীগ থেকে কয়েকজন পরিষদ-সদস্য পদত্যাগ করলেন।

ওদিকে বিক্ষুব্ধ ঢাকা নগরীর হাজার হাজার লোক ছুটে চলেছে মেডিকেল হাসপাতালের দিকে। শোকাভিভূত জনতা

প্রস্থা জানালো বাংলা ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহীদদের।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিচ্ছিন্ন হবে পড়ার পরের দিন থেকে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্ব কাঁধে নেয়। তারা কণ্ট্রোলরুম স্থাপন করে বিভিন্ন ছাত্রাবাসগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করলো।

২২শে ফেব্রুয়ারী কয়েক লক্ষ লোক শহীদদের প্রতি প্রস্থা জানাবার জন্যে উপস্থিত হলো। দুপুরের দিকে বিরাট শোভাযাত্রা বেরুল। হাইকোর্টের সামনে পুলিশ আবার গুলী চালাল। ফলে আইন-কানূনের ছাত্র শফিকুর রহমান প্রাণ হারালেন।

এদিকে আর একটা ঘটনার উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেল। ২২শে ফেব্রুয়ারী 'মনিং নিউজ' পত্রিকায় এই মর্মে এক খবর বেরিয়েছিল যে ভারতীয় দালাল ও হিন্দুরা পাকিস্তানকে ধরস করবার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে। 'Dhoties roaming streets'—এই ছিল হেড লাইন। সদরঘাট এলাকায় বিক্ষুব্ধ জনতা ও ছাত্ররা 'মনিং নিউজ' পোড়াতে থাকে। সেখান থেকে এক শোভাযাত্রা নবাবপুরের দিকে এগুতে থাকে। নবাবপুরে পুলিশ শোভাযাত্রার ওপর গুলী চালায়। ফলে একজন রিস্কাচালক মারা যায়।

এদিন ছাত্রদের সঙ্গে জনসাধারণও যোগ দিয়েছে। রেলওয়ে ও ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরা পুলিশ গুলী-চালনার প্রতিবন্ধে কাজে যোগ-না দিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল।

বিকাল ৩টার পরিষদ-অধিবেশন বসল। বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের সুপারিশ করে এক প্রস্তাব পাশ করা হলো।

২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরুর হলো। পুলিশের সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ছাত্ররা রাতারাতি বরকত যেখানে খুঁদ হয়েছিল—সেখানে শহীদ মিনার তুলে ফেলল। বাংলা ভাষার বীর শহীদদের প্রতি ছাত্ররা প্রস্থা জানালো।

পুলিশ নিরাপত্তা-আইনে ছাত্রদের সঙ্গে-সঙ্গে বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করলো। পুলিশ আবুলহাসেম, খয়রাত হাসেন, অধ্যাপক মুজাফর আহম্মদ, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জী প্রমুখকে গ্রেপ্তার করলো। মৌলানা ভাসানীও গ্রেপ্তার হলেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষদ-অধিবেশন মূলতুবী ঘোষণা করা হলো। পুলিশ শহীদ মিনার ভেঙে ফেলল। প্রদেশব্যাপী নির্বাচনে গ্রেপ্তার অভিযান শুরুর হলো।

২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হবে দেওয়া হলো।

২৭শে ফেব্রুয়ারী রাতে নূরুল আমীন এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন, ভাবতীয় এজেন্ট ও নাশকতা কার্বে লিপ্ত রাষ্ট্র-বিরোধী ব্যক্তিদের তিনি সাফল্যের সঙ্গে দমন কবেছেন।

এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। মুসলিম লীগ সরকারের চরমতম পরাজয় ঘটলো। আন্দোলনের সাফল্যজনক ফলশ্রুতি হলো ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে। সেই শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। ছাত্রদের আত্মদান সার্থক হলো।

প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা-দিবস পালন হয়। শহীদ মিনার সন্মুখে পুস্তকার্ঘ্য দেয়।

বাংলা ভাষার জন্যে পূর্ব বাংলার ছাত্রদের এই আত্মদান সমস্ত বাঙালীর গর্ব। আজ পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষায় টেলিগ্রাম চালু হয়েছে। ঢাকার রাজপথে মোটর গাড়ি, বাস, জরিতে বাংলায় নম্বর পড়েছে। পথের দু-পাশে দোকান-পাশারের নামও বাংলায় লেখা হচ্ছে। অথচ পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষার অনাদর দিন দিন বেড়েই চলেছে। পূর্ব বাংলায় ছাত্রদের আত্মদানের কথা স্মরণ করে আমাদের দৈন্য দূর হবে কি?



ইউথেরিয়া

বেদনা নাশক মালিশ

বাত, কোমরে বেদনা, হাত-পা-কাঁধজানি, যচকানি ইত্যাদি উৎকৃষ্ট মালিশ।

বেঙ্গল

কেমিক্যাল

ফলিকাতা

বোম্বাই ● কানপুর

নির্বাচনে বিজ্ঞান-বৃন্দাবন

সন্দেহ হয়, আটঘাট বেঁধে যারা ভোটখুঁড়ে নমেন, অথবা যারা কোমর বেঁধে নির্বাচন-বৈতরণী ডিঙিবার কথা ভাবেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি খুঁদে বিজ্ঞানী। প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতোই ওঁরা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেন। স্বীকার করি, এই অভিজ্ঞতা ওঁদের সকলকেই সিঁথির স্বর্ণশিখরে বসায় না; বরং অনেক ক্ষেত্রেই করে শিখরচ্যুত। অনেক ক্ষেত্রেই জয়ের প্রশ্ন মরীচিকার মতো আচ্ছন্ন করে ভোটভিক্ষুদের। যথার্থ বিজ্ঞানভিক্ষুব পক্ষেও এ ধরনের মরীচিকা-দর্শন স্বাভাবিক কি না, তা' নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু তবু নির্বাচনের সমস্কার রোমাঞ্চ-সুখ ও শিহরণকে নিশ্চয় কোনো ভোটমোন্ধা অস্বীকার করতে পারবেন না। নিশ্চয় তাঁরা বলবেন, এইটুকু বিশিষ্টতা আছে বলেই তো আমরা খুঁদে বিজ্ঞানী; মহাবিজ্ঞানী নই।

ঠিক কথা। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যার, ভোটভিক্ষুরা প্রয়োজনমাত্তিক ছোটকে বড় আর বড়কে ছোট করে দেখাবার কায়দাটা প্রতিস্বন্দ্বীর দোষগুণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করলে কি ভালো করতেন না? অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে শক্তিশেল হিসেবে ব্যবহার না করলে কি চলতো না?

এর উত্তরে অনেকেই হয়তো বলবেন, —চলতো, কিন্তু ভোটখুঁড়ের ক্ষেত্রগুলো তবে সত্যিকারের এক-একটি ল্যাবরেটরী হয়ে উঠত না। খুবই গুল্যবান কথা। কে অস্বীকার করবেন এই ল্যাবরেটরীকে? সেখানে আমরা কি দেখি না যে, প্রচার নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে অসাধা-নাখনেব কাজ চলছে? আমাদের মধ্যে অনেকেই কি পল্লিকিত হন না এই ভেবে যে, এই প্রচার-যন্ত্রের সাহায্যেই নির্বাচনে বিজ্ঞান-বৃন্দাবন বড় রকমের হেরফের ঘটে থাকে?

এর জবাব হল, পল্লিকিত নিশ্চয়ই হন। তা' না হলে নির্বাচন-অভিযানকে ঘিরে এত সব কান্ডকীর্তি ঘটত না। আর নির্বাচন-কমিশনও বিজ্ঞান-সিন্ধ উপায়ে কাজ চালাবার জন্যে এতটা উত্তলা হতেন না।

এদিকে দেখতেই পাচ্ছি, কমিশনের

কার্যক্রম থেকে বিজ্ঞান-রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে। সারা দেশে প্রায় একই সঙ্গে নির্বাচন-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এঁরা। ডাকযোগেও ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। করেছেন টেলিভিসন-মারফৎ নির্বাচন-উৎসব প্রচারের ব্যবস্থাও। আকাশবাণীও পিছিয়ে থাকেন নি। ভোট-খুঁড়ের ফলাফল ঘন ঘন ঘোষণা করে নির্বাচনী-ভোট দেশময় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। আকাশবাণীর বুলেটিনগুলো ধার্মোমিটারের সঙ্গে তুলনীয় নিশ্চয়। ওঁদের দিয়েই প্রথমে বোঝা যাবার কথা তাপাঙ্ক কোথায় কত দূর উঠল। সংবাদ-পত্রও আড়ালে নেই। সাক্ষাৎ ব্যারো-মিটারের মর্তি ধরে হামেশাই সংকেত দিয়েছে ঝড়-তুফানের। জানিবে দিয়েছে, নির্বাচনী-সংগ্রাম কোথায় টর্নাডো আর কোথায় টাইফুনের সৃষ্টি করে ভরাডুবি ঘটতে পারে।

সন্দেহ নেই, উন্নত দেশগুলোতে নির্বাচনে বিজ্ঞান-বৃন্দাবন প্রয়োগটা আরও ব্যাপক। টেলিভিসন ঘন ঘন ব্যবহৃত হয় সে সব দেশে। নির্বাচনী প্রচারে এমন কি বিমান পর্যন্ত যোগ দেয়। বহু জায়গাতেই ভোটগ্রহণ করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে, যা'ব নাম হল 'ভোটিং মেশিন'। শুনোছি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গত সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৬০ জন মেশিনের মাধ্যমে ভোট দিয়েছিল।

আমরা অবশ্য 'ভোটিং মেশিন' অবধি এখনও এগোতে পারি নি। কিন্তু নির্বাচনী-স্বপ্নে বিজ্ঞান-বৃন্দাবন দৌড়ে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণেই এগিয়েছি বৈকি!

পশ্চিমবঙ্গ উন্নত দেশগুলোর মতো আমাদেরও ভোটমোন্ধারা পরীক্ষাসিন্ধ বিজ্ঞানী'ব মহৎ ধর্মকে আত্মস্থ করেন।

তাঁরা হাতে-কলমে নির্বাচনী প্রতীক-প্রদর্শনের কৌশল সংবরণ করতে পারেন না। অর্থাৎ শূন্য 'থিয়োরী' নয়, 'প্রাকটিকসে' নিম্বাসী হয়ে ওঠেন প্রার্থীরা। যা' ছিল কম্পলোকের, তা'কে বিবালোক টোন আনেন। নিজের প্রতীকটি'ব জীবন্ত উদাহরণ দশজনের সামনে রেখে বলেন, দ্যাখ এইবাব।

দেখেন অনেকেই: এবং অনেকেই-মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞান-বৃন্দাবন এ এক বিশ্বয়কর প্রয়োগ। 'একস' নামে যা' এককাল কম্পনার বস্তু ছিল, তার

আসল চেহারাটা দেখিয়ে দেবার এই চমৎকার কায়দা।

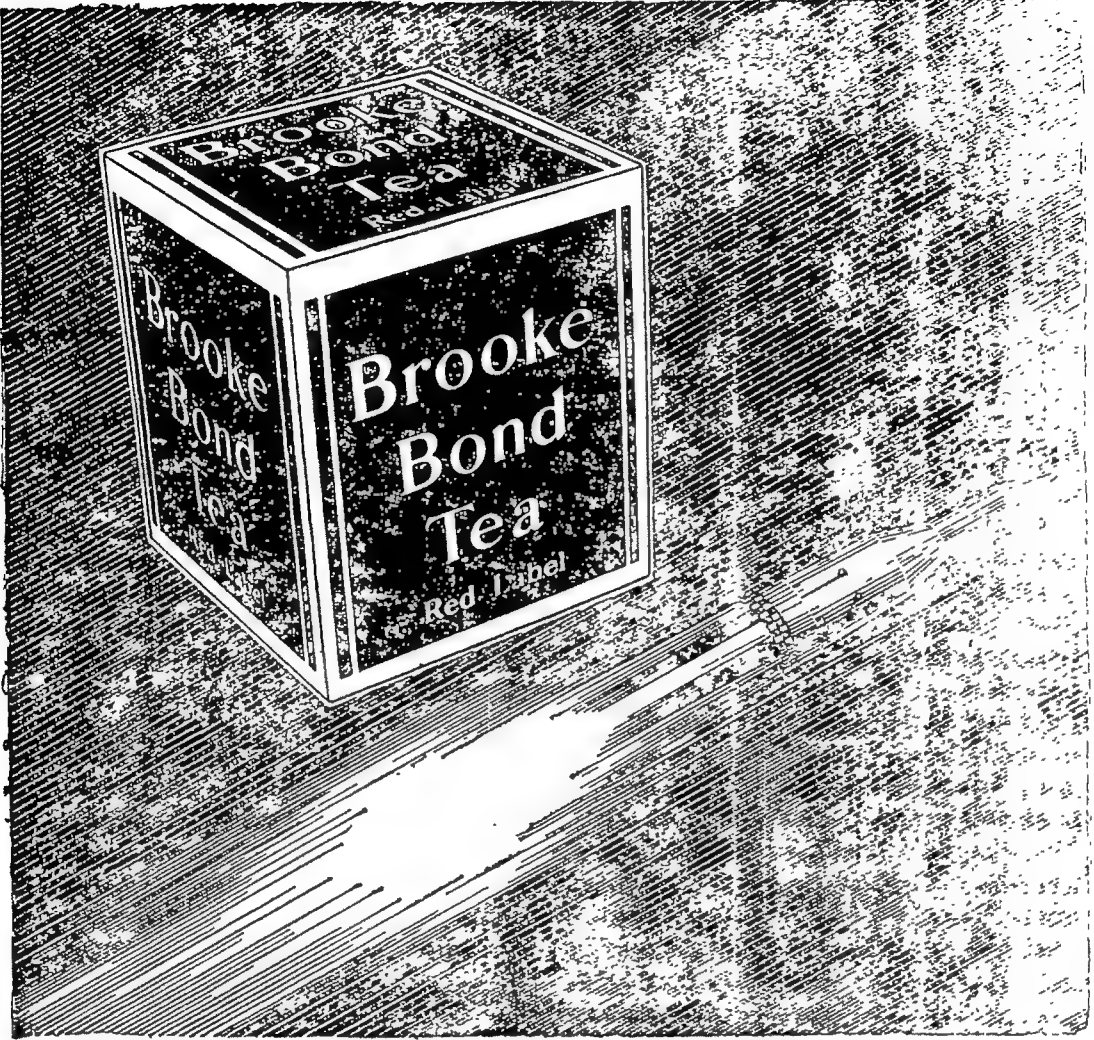
এই কায়দা দেখাতে গিয়ে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ঝড় ওঠে। উত্তর-প্রদেশের এক প্রার্থীর কথা শুনোছি। তাঁর নির্বাচনী প্রতীক ছিল সিংহ। নির্বাচনের প্রাকালে বিরাট এক শোভাযাত্রা বের করলেন তিনি; পুরোভাগে নিলেন হুস্টপুস্ট এক পশুরাজকে। পশুরাজের গর্জন শুনো শোভাযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হল অনেকেই। অনেকেই বলল, তোফা! তোফা! কিন্তু বিরুদ্ধ দলগুলো ছাড়লে তো! পরের দিনই সংবাদপত্রে দেখলাম, জোয়াল কাঁধে-জোড়া বলদ নিয়ে আধ মাইল লম্বা এক শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। তাঁর পরের দিন এক মাইল লম্বা শোভাযাত্রার খবর শুনো কেউ কেউ উঠল, কেনা বাং! শোনা গেল, শোভাযাত্রীদের এক হাতে ছিল ধানের শীষ, অপর হাতে কাস্তে।

এই সব খবর শুনো আমাদের পরিচিত এক নির্দলীয় প্রার্থী দ্বন্দ্ব করে বলে-ছিলেন, বড় ভুল হয়ে গেল। এমন জানলে সূর্যকে প্রতীক করতুম না।

তাকে সান্ধনা দিমে বললুম, এর পরের নির্বাচনে আপনার প্রতীক হোক ফুল। সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন; আর দিতেও পারবেন অনেকে। এবং দিলেই নেবাব প্রশ্ন। চোখ বন্ধ করে বলে ফেলবেন একবার, 'আমি তোমাকে দিয়েছি আজ, তুমি আমায় দিও।'

তাকে আরও বললুম, উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার সামান্য একটু হের-ফের। কিন্তু হোক কবিতা। 'কবিতার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ নেই',—বলোছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই বন্ধু জগদীশচন্দ্র। অতএব মাইঃ। কবির বিজ্ঞানীবন্ধুর উক্তিকে স্মরণ করে নতন আবিষ্কারের পথ ধরুন আপনি। রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত কবে বলুন, 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে'। এসব কথা শুনো কেউ যদি প্রতিবাদ করে তো বলবেন, কেন? রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কি বিজ্ঞানের কম প্রভাব পড়েছে? আর বলবেন, 'গতবারে সূর্য' ছিলুম আমি, তাই না আলোকের দৌলতে এবার রাশি রাশি ফুল ফুটিয়েছি'!

আর একজন প্রার্থীকে জানি। ঘটনা-



পরিভূষ্টির নতুন জগতে পাড়ি দিন

মন-মেজাজ চাঙ্গা করতে হলে চাই ব্রক বণ্ড রেড নেবেল চা ।
প্যাকেট পিছু ঢের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন ।
ব্রক বণ্ড রেড নেবেলের অপূর্ব স্বাদগন্ধ আপনাকে পরিভূষ্টির
এক নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবে ।

ট্রামে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

দিনকাল কিছু অন্যায়কর
মুখে লাগাম কষবেন।
দেখছেন ত' অবস্থাটা—
কোথায়, মশাই, বসবেন?

আরে, আবে পলটুদা যে—
বলুন, তাই বলুন।
ভিড় আছে ত' কি হয়েছে?
যা হোক করে গলুন।

সরপর কি খবরটকর,
ছেলেপুলে ক'টি?
আমার কথা না-ই ধরলেন—
এই যে ছেঁড়া চটি!

তা ডাইনে না বাঁয়ে যাচ্ছেন,
আসাই বা কোথ' থেকে?
আমি বলি বাকি ধরবেন
ইলেকশন্টা দেখে?

চক্রে তারিও প্রতীক সূর্য। তৃতীয়
নির্বাচনে স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী ছিলেন
তিনি। প্রতীক ছিল তারা; কিন্তু এবার
তিনি স্বাভাব্য বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন।
দাঁড়িয়েছেন নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে।
তাই প্রতীক বদলাতে হয়েছে।

একজন ভোটদাতা তাঁকে শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা,
তারা থেকে সূর্য নেমে এলেন যে ষড়?
তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কই নামি নি তো।
যেমন ছিলুম ঠিক তেমনই তো আছি।
সূর্য আর তারার প্রভেদ কোথায়?

ভোটদাতাটির 'বিজ্ঞান-বুদ্ধি' ভোতা।
এ ব্যাখ্যার মন ভরল না তার। বললেন,
ঠিক বুললুম না। খোলসা করে বলুন।

প্রার্থী বললেন, সূর্যও কি তারা
নয়? তারার মতোই কি সে নিজেব
আলোকে ঝলমল করে না?

এদিকে ৯ই ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্র
থেকে উড়িষ্যার এক নির্দলীয় প্রার্থীর
কীর্তিকথা জানা গেল। দেখলুম, সংবাদে
স্পর্শই বলা হয়েছে, প্রার্থীটি তার
নির্বাচনী প্রতীক দুটি করে গাছেব পাভা
ভোটাবদের মধ্যে অকাতরে বিলোচ্ছেন।
সংবাদটি পাড়ে অতিমাত্রায় উত্তরিত হয়ে
উঠলো। মনে হল, প্রতীক বিলিয়ে
দেওয়ার মানেই হচ্ছে নিজেকেও বিলিয়ে
দেওয়া; আর এ তো বৈজ্ঞানিকব নিস্কাম-
ধর্মের একেবাবে জলজ্যান্ত উদাহরণ।

বলা বাহুল্য, এমন উদাহরণেব স্থান
কদাচিৎ মেলে। অতএব এ নিয়ে মাথা
ঘামিয়ে লাভ নেই। বরং থাক আপাতত
এই পাভা-প্রসঙ্গ। এর চেয়ে বরং
নির্বাচন-ব্যবস্থাকেব অন্যান্য শাখা-
প্রশাখার দিকে তাকান যাক।

সেখানে দেখি, ভলান্টিয়ারদের গলা-
বাজীতে সব সময় কলোষ না। বরং
ওদের চেয়ে অনেক বেশি কাজ কবে থাকে
বিজ্ঞান। মাইক বলি, অথবা বলি
এম.প্রিফারার, হ্যান্ডবিল বলি, অথবা বলি
পোস্টারিং সব কিছুতেই বিজ্ঞানের
স্বাক্ষর হতে হয়। নিয়ন আলোকে
নিজের নাম বা প্রতীকটুকুকে ঝলমলাবার

আয়োজন করতে হলেও বিজ্ঞানের কাছে
ধনী দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ ছাড়া
প্রচারের আরও আছে অনেক উপকরণ;
আছে রেডিও, সিনেমা-স্লাইড, সংবাদপত্র।

প্রতীক-নির্বাচনেও বিজ্ঞান-বুদ্ধিরই
জয়-জয়কার। ভোটগ্রহণ বা ভোট-গণনায়
অজ্ঞানের স্থান নেই। আর ব্যালট-
শাঙ্কগুলো তো এক-একটি ব্যালেন্স। কাঁটা
কোন দিকে হেলছে, তা' ওই ব্যালেন্সের
ম্যাটার দেখেই নির্ধারিত হয়। ম্যাটারে
ভুলদ্রাস্তি থাকে না, এমন কথা বলছি নে;
কিন্তু প্রশ্ন, দ্রাস্তি কোথায় নেই? অতি
ঝড় বিজ্ঞানীও কি হলপ করে বলতে
পারেন, আমার ব্যালেন্সটি নিখুঁত? তা'
যখন পারেন না, তখন আর ব্যালট-
পেপারের ভুলদ্রাস্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ
নেই। বরং বলে রাখা ভাল, এই বিশ্ব-
সংসারে 'অ্যাবসোলিউট' সরলরেখা যেমন
নেই, ঠিক তেমনই 'অ্যাবসোলিউট'
কোনো ভোট-সংখ্যা।

অতএব দেখছি, মোষ-দুটি সব দিক
মিলিয়েই সাধারণ নির্বাচনে বিজ্ঞান-
বুদ্ধির জয়যাত্রা।

অজ্ঞানতার পরিচয় ভোটদাতারা অবশ্য
মাকে মাঝে দিয়ে ফেলেন। গরুব শিং-এ
ব্যালট-পেপার বুলিয়ে দেন কেউ। কেউ
আবার বেলান ধানের শীষে। অনেকে
আবার নিশ্চিন্ত হবার জন্যে গাছের মাথায়
বা ঘরের চালে ভোট রেখে আসেন। এ
ছাড়া প্রদীপকে ভোট দিতে গিয়ে তার
শিখায় প্রতি নির্বাচনেই কয়েক হাজার
ব্যালট-পেপার আত্মাহুতি দেয়।

অনেকেই একনো আক্ষেপ করতে
দেখেছি। বলতে শুনছি, গণতন্ত্রে জন-
সাধারণ শিক্ষিত হয়ে না উঠলে সাধারণ
নির্বাচন ব্যর্থ।

কথাটা পরোপরি উড়িয়ে দিতে
পারলে খুশি হতুম। কিন্তু তা' যে
পারলুম না, সেজন্যে—দায়ী সেনসাস
বিপোর্ট। সেখানে দেখছি, ভারতের তিন-
চতুর্থাংশ লোক এখনও নাম সই করতে
পারে না। তাহলে তো বলতে হয়,

নির্বাচনের ব্যাপারে বিজ্ঞান-বুদ্ধিটা
অজ্ঞানদের ওপর জোর করে চাপিয়ে
দেওয়া হচ্ছে। যে আদৌ চোখে দেখে
না, তাকে বলা হচ্ছে, বর্ণালী বিশ্লেষণ
করে রিপোর্ট দাখিল করো।

সে কারণেই রিপোর্টে সব সমর
বিজ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় মেলে না এবং
ভোট-গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে অনেকেই যে সব
দৃশ্যের অবতারণা করেন, সেগুলোকে
একত্রিত করলে স্বচ্ছন্দে চালির যে কোনো
শ্রেষ্ঠ ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা
হায়।

অতএব দেখছি, একদিকে প্রচার নামক
প্রদীপের মধ্য থেকে 'বিজ্ঞানের কৌশল'
নামক দৈত্যটা বেরিয়ে এসে সাধারণকে
দিশাহারা করছে; এবং অপরদিকে ভোট-
গ্রহণের কায়দা দুজনের গবেষণাগারের
মতো রহস্যের এক মারাজাল সৃষ্টি করছে।
ফলে, গবেষণাগারের দিকে ভিড়ছে না
অনেকেই এবং অনেকেই বিজ্ঞানবিদ্যার
কায়দা দিয়ে গড়া দৈত্যের দিকে তাকিয়ে
আঁকে উঠছে। অর্থাৎ, সাধারণ নির্বাচন
অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত
হচ্ছে; কিন্তু সাধারণরা সেখানে ঠিক
কলকে পাচ্ছে না। বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও
স্বাধীনবুদ্ধির ধোঁবাশা সৃষ্টি করে
সাধারণকে যেন বলা হচ্ছে, 'তফাৎ যাও'!

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কোথায়
যাবে তা'রা? নিজেদের ঘরে? পান্ডু
প্রশ্ন উঠতে পারে এখানে, ঘবে গিয়ে ওরা
নিশ্চিন্তে টিকতে পারলে তো? ভোটের
ক্যানভাসারবা ওদের বেরাই দিলে তো?

এক কথায় এব উত্তর হল,—না।
বেহাই ওবা কোনোদিনই পাবে না। যত-
দিন অশিক্ষা নামক জগন্দল পাখবটা
ওদের বুকের ওপর চেপে থাকবে, ততদিন
রেহাই পাবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি
নে। ততদিন অশিক্ষানিকও ওদের কাছে
খিয়োরী অব বিলটিভিটি ব্যাখ্যা করার
স্পর্শ পোষণ করবন। ওবা বুঝবে না
কিছুই এবং কদাচিৎ কেউ কখনও হয়তো
নিরুপায় হয়ে বলবে, 'সব বুট' হায়'!



বিখ্যাত ইটালীয়ান নাট্যকার পিরান্দেল্লো জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৭ সালে—কিন্তু তিনি সত্যিকার নাটক লিখতে শুরু করেন বিগত প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় থেকে। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর—ড্রামা অভ আইডিয়াজের শেষ শক্তিশালী রচয়িতা বলতে পিরান্দেল্লোকেই বোঝায়—এই ধরনের নাটকের প্রবর্তক হচ্ছেন ইবসেন এবং এ জাতীয় রচনাকে সর্বাঙ্গিক থেকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন বার্নার্ড শ।

জার্মানী এবং স্যারিওনিভার্সিটিকে বাদ দিলে ইবসেনের নাটক সব থেকে বেশি প্রচলিত হয়েছে ইটালীতে। এদেশের গবেষকেরা কেন যে বার বার প্রচেষ্টা করেছেন পিরান্দেল্লো এবং ইবসেনের নাটকের ভেতর সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে তাও ঠিক বোঝা যায় না—আসলে এই দুই নাট্যকারের ভেতর লক্ষণীয় সাদৃশ্য খুবই কম। পিরান্দেল্লোর দুই পূর্বসূরী—জিউসেপ গিয়াকোসা এবং রবার্টো ব্রাকো—এবং ইবসেনের বচনায় বহু অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়—কারণ এঁরা দুজনে ইবসেনের বচনারীতি প্রায় দাস মনোভাব নিয়ে তখন করণ করবার প্রয়াস কবেছেন। আর পিরান্দেল্লো নিজেই বলেছেন, তিনি নাট্যকার হিসাবে স্ট্রীটবার্গেরই অনুরাগী এবং স্ট্রীটবার্গের সঙ্গেই তাঁর সমাধি চিন্তা।

ন্যাচারেলিস্ট স্কুলেই পিরান্দেল্লো তাঁর নাট্যলীলন শুরু করেন। অশুভ শব্দভাণ্ডারে লাগলও এ কথা সত্যি যে, পিরান্দেল্লো ছিলেন 'ন্যাচারেলিস্ট ইন থিওরী' এবং মেতারলিস্টের 'সিম্বলিস্ট' রচনারীতির বিরুদ্ধবাদী—আর দার্শনিকও ছিলেন ঐ জাতীয় সাত্ত্বিক নাটকের পরিপোষক। তবে পিরান্দেল্লো কিন্তু সে শ্রেণীর বাস্তববাদী ছিলেন না, যাঁরা প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর বর্ণনার স্বারা বাস্তব-সাহিত্য রচনা করেন। রচনার কাহিনী হিসাবে তিনি বাছাই করে নিতেন অ-সাধারণ এবং অতি অশুভ ঘটনাবলীকে।

অ-সাধারণ ঘটনাকে যে বাস্তববাদী রীতিতে ফুটিয়ে তোলা যায় ('সিল্ক ক্যাবেটাস' ইন সাচ' অভ এ্যান অথর' নাটকে যা করা হয়েছে) এর মূলে ছিল পিরান্দেল্লোর মানুষের ঐশ্বর্য্যবোধে দৃঢ় বিশ্বাস। পিরান্দেল্লো বার বার এই মতবাদ প্রচার করতেন। বলতে—আমরা প্রত্যেকেই ঐশ্বর্য্যবোধে যাপন করি, 'one in reality and one in a world of illusion'—আমাদের প্রত্যেকের ভেতর দুটি ব্যক্তি থাকে, একটি আমাদের বাস্তব সত্তা। অর্থাৎ আমরা আসলে যা তাই, এবং অন্যটি হচ্ছে

আমরা যেভাবে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভাবি বা ধোঁয়াবে নিজেদের প্রতিভাভ করতে চাই।

Those who wish may of course try to trace this theory back to the doctrine of the 'life-lie'. But there can never be any real connexion, because Pirandello with the quick and subtle mind of Southern Italy, and the light and airy imagination which is a national heritage, is made of quite different stuff from Ibsen.

[Martin Lamm.]

পিরান্দেল্লোর বিষয়ে এভাবে যা কিছু আমরা জানতে পেরেছি, তার মূল্যায়ন হল একজন ইটালীয়ান আর্কিটেক্টের লেখা তাঁর জীবনী। এই জীবনীটি লিখতে ওই আর্কিটেক্ট পিরান্দেল্লোর কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেরেছিলেন। তাঁর নাট্যিক রচনার অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায় এই জীবনীটি থেকে। প্রথমতঃ যে সব ঘটনাকে মনে হয় অসম্ভাবিক এবং নাট্যকারের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত, ঐ জীবনী পড়লে বোঝা যায় তার বেশির ভাগই পিরান্দেল্লোর নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া।

Some of his own experiences were indeed as fantastic as those of the heroes in his plays.

[Lamm.]

পিরান্দেল্লোর বাবা ছিলেন সিসিলির কয়েকটি গম্বুজের খনির মালিক। তিনি যখন লক্ষ্য করলেন যে, ছেলের ব্যবসার ব্যাপারে কোন দক্ষতা নেই, তখন তাকে লেখাপড়া করবার জন্য রোম এবং বনে পাঠিয়ে দিলেন—তারপর পিরান্দেল্লো পরীক্ষা পাশ কবে ডিগ্রী নিলেন। বাবা তাঁর বোবনে গ্যারিবন্ডীর হয়ে যুদ্ধ কবন। তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবাহী এবং একটু অস্বাভাবী প্রকৃতির লোক ছিলেন—স্বাক্ষর দাবি করে রাখতেন এবং চরিত্রও তাঁর খুব ভাল ছিল না। বহু গুণ সমন্বিত তাঁর এক বন্ধু ছিল—এঁর নাম পোট্টোলানো। দুই বন্ধুতে ঠিক করলেন

তাঁদের ব্যবসাকে যুক্তভাবে চালাতে পাবলে সুফল অবশ্যম্ভাবী এবং সেই কারণে ঠিক করা হল পোট্টোলানোর ঘরে এ্যান্টোনিয়োটিকে লুইজি বিয়ে করবে। এঁদের দুজনে এনগেজমেন্ট হবার আগে কেউ কাউকে দেখেন নি এবং বিয়ে হবার আগে কখনও একলা একঘরে বসে আলাপ করবার সুযোগ পান নি।

এ্যান্টোনিয়োটো ছিলেন কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী—বাবার কড়া গার্জিয়ানশীপে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে লুইজির বিয়ের ব্যাপারে দুজনের বাবার ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতেই এর গুণাগুণ বিচার করেছিলেন এবং এর ফলে লুইজির সংসারের প্রতি বীতশ্রুতা আনও বেড়ে যায়। পিরান্দেল্লোর শ্বশুর ছিলেন মৃতদার। তাঁর স্ত্রী সূতিকা রোগে মারা যান।

অসুখের সময় মহিলা কোন ডাক্তার দেখাতে রাজী হন নি—কারণ তিনি জানতেন ডাক্তারকে আসতে দেখলেই তাঁর অস্বাভাবিক সন্দেহ প্রকৃতির স্বামী জেল্লাস হয়ে উঠবেন।

ষতদিন নিজেদের টাকাকড়ি ছিল কোনরকমে দম্পতি নিজেদের পাবস্বপিক সম্পর্ক বজায় রেখে চললেন। তাবপর বন্য়ার ফলে পিরান্দেল্লোর বাবাব গম্বুজের খনিগুলো গেল নষ্ট হয়ে। পিরান্দেল্লো স্ত্রীর দিক থেকে যে ধোঁককের টাক পেরেছিলেন তাও তাঁর বাবার ব্যবসার খাটানো ছিল এবং এই সংগে সে সবও গেল। এর ফলে এ্যান্টোনিয়োটো এমন মানসিক আঘাত পেলেন যা কিছুতেই ঠিকভাবে সেরে উঠল না। জীবিকার্জনের জন্য এই সময়ে পিরান্দেল্লো সিসিলীতে ইটালীয়ান ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং ঘন্টার পাঁচ লিরা হিসাবে চার্জ করতেন। তাছাড়া তিনি এক মহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ নিলেন এবং পরস্যা রোজগারের জন্য লিখতে শুরু করলেন। এদিকে স্ত্রী মানসিক সমতা হারানোর পর বাপের মত সম্ভবতঃ হতাশ হয়ে উঠলেন এবং স্বামীর জীবন করে তুললেন দুর্ভিষহ। বাধ্য হয়ে পিরান্দেল্লোকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মোলমোশা পর্যন্ত বন্ধ করতে হোল। স্বামীর প্রতি পদক্ষেপ পর্যন্ত কড়াভাবে পরীক্ষণ করতেন এ্যান্টোনিয়োটো। পিরান্দেল্লো যা

সাংবাদিক বসন্ত

রোজগার করতেন তার প্রতিটি সলডো শ্রীর হাতে তুলে দিতে হোত এবং এ্যান্টোনিয়োটো প্রতিদিন গাড়িভাড়া এবং সিগারেটের খরচ বাবদ স্বামীকে ৫০ সেন্টেসিম হিসাবে দিতেন। জীবনের এই দুঃখের দিনগুলোতেই পিরানদেল্লো ঔপন্যাসিক হিসাবে বশ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্মার্টা ইউরোপে নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

"His plays sound like improvisations—and so they are. He has said himself that in one year he wrote nine plays, and two of the best of these only took him a few days to write."

[Martin Lamm.]

এ থেকে মনে হতে পারে যে পিরানদেল্লো মাস্ট্রো প্রোডাকসন করছিলেন—কিন্তু ব্যাপাবটা ঠিক তা নয়। তাঁর অনেকগুলো নাটক রচিত হয়েছিল তাঁর আগের লেখা ছোট গল্পের ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ সারা জীবন সাহিত্যের বাগিচায় যেসব নানা রঙের ফুলগুলি ছোট গল্পের আকারে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেগুলোকে পঞ্চাশ বছর বয়সে নাটকে রূপ দিতে লাগলেন। এই বার্ধক্যেই তিনি প্রচুর বশ, অর্থ এবং সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন—অথচ এ টাকা যৌবনে পেলে অত কচ্ছ-সাধন করে তাঁকে সে সময় জীবন কাটাতে হোত না। এই ব্যাপারটাকে—দু-একটি আত্মজীবনীমূলক নাটকে একথা তিনি পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—তিনি ভাগ্যের পরিহাস হিসাবেই গণ্য কবেছেন।

কিন্তু সে যাই হোক যে বিরাট অর্থ এই সময় পিরানদেল্লো রোজগার করলেন ভবিষ্যতে সে টাকাও সবই নষ্ট হয়ে যায়। পিরানদেল্লো ১৯২৫ সালে রোমে একটি ম্যাগাজিন খিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, এখানকার অভিনেতার দলকে নিয়ে তিনি ইংল্যান্ড এবং কন্টিনেন্টে টুরে যান। এই পরিক্রমায় তাঁর ৬০০,০০০ লিরার লোকসান হল। শেষ বয়সে গৃহহারা এবং কপদকশূন্য অবস্থায় তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন এবং নিজের রচনার স্টেজ বা ফিল্ম প্রোডাকসনের ব্যবস্থা কবতেন।

তাঁর এইসব দেশ পরিভ্রমণ পিবানদেল্লোকে অনেক সময়েই শুনতে হোত যে তাঁর নাটকগুলো অত্যন্ত জটিল এবং ইন্টালেচুয়াল। এই বকম এক পরি-স্থিতিতে তিনি বলেছিলেন আধুনিক নাটকে তাঁর অবদান হল—“বিচারবুদ্ধিকে” “আবেগে” রূপায়িত করা।

"But his logic is more devastating than Shaw's, and

sometimes leads to conclusions which seem even more hair-raising to conventional morality."

[Martin Lamm.]

এর একটি ভাল উদাহরণ হচ্ছে পিরানদেল্লোর মজাদার এবং চমকপ্রদ কমেডি থিওট ইট ওভার, জিয়াকোমিনো।

এ নাটকে একটি উৎকট চরিত্রের সিসিলিয়ান স্কুলমাস্টার আছে—তার নাম হচ্ছে টোটো। সে সত্তর বছর বয়সে যুবতী স্ত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে—কারণ স্ত্রীটি বিধবা হলে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টকে বহুদিন ধরে তাকে পেনসন দিতে হবে। টোটো জানতে পারল যে স্কুলের পোর্টারের মেয়েটির সম্মানসম্ভাবনা হয়েছে এবং এর জন্য দরী তারই এক পূর্বাতন ছাত্র জিয়াকোমিনো। মেয়েটির বাপ-মা ঐ যুবকের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী নয়। টোটো নিজেই মেয়েটিকে বিয়ে করল এই সর্তে যে জিয়াকোমিনো বরাবর তার শ্রেণিক হিসাবে থাকবে এবং টোটোর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে বিয়ে করবে। এই ব্যবস্থামত সবকিছু সুন্দরভাবে করা হোল এবং টোটো শিশুটির প্রতি অত্যন্ত অনুবৃত্ত হয়ে পড়ল। শহরের লোকেরা কিন্তু এ-ঘটনাটা নিয়ে ছিঁ ছিঁ করতে লাগলেন এবং শেষকালে জিয়াকোমিনোর বোন একজন অত্যন্ত সদাশর ধর্মবাজককে ভেঙে তাঁর সাহায্যে ভাইকে সম্পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করলেন। এরা জিয়াকোমিনোর সঙ্গে অন্য এক যুবতীর বিয়ের ঠিক করলেন এবং টোটোকে দিয়ে বলাতে চেষ্টা করলেন যে জিয়াকোমিনো শিশুটির বাবা নয়। টোটো একথা বলতে রাজী হল না এবং ভয় দেখালো যে জিয়াকোমিনোর ভাবী স্ত্রীকে সব কথা জানিয়ে দেবে। এতে কাজ হল—জিয়াকোমিনো শিশুটিকে নিয়ে টোটোর বাড়িতে চলে গেল। ধর্মবাজক মৃত্যু করলেন। এটা একটা অত্যন্ত ভাবাবহ প্রাপক্য করা হচ্ছে। টোটো ঘৃণাভরে উত্তর দিল : তুমি আসলে ক্রাইস্টেও বিশ্বাস কর না বলে, একথা বলছ। ক্রাইস্টেও উপদেশের সারমর্ম না বুঝে, স্কুলমাস্টারের মত উপদেশ দিচ্ছ।

এই নাটকটি এবং অন্যান্য কয়েকটি নাটক প্রচলিত নীতিবোধকে ধূলিসাৎ কবে দিয়েছে। আবার অন্যান্য কয়েকটি নাটকে তিনি জগতে আসল সত্য বলে কিছ্ আছে এ-কথাও স্বীকার করেছেন। মজার হাস্যরসাত্মক নাটক রাইট ইউ আর—ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ আর—এ পিরানদেল্লো প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন পৃথিবীতে ‘পূর্ণ সত্য’ বলে কিছ্ নেই। মানব-প্রকৃতি এবং পরিবেশকে বোঝাবার বাঁধাধরা কোন

নিয়মকানুন নেই। এই নাটকটিকে অনেকেই প্যারাবল্ আখ্যা দিয়েছেন।

প্রিফেটের নবনিষ্কৃত সেক্রেটারী পজা স্ত্রী এবং শাশুড়ি সিনেরা ফ্রোলাকে বিভিন্ন বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এদের একের অপরের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ থাকল না। যে ছোট শহরটিতে নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার লোকজন এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য কবে এর রহস্য জানবার জন্য কৌতূহলে প্রায় ফেটে যাবার যোগাড়।

পজা প্রচার করল যে তার প্রথম স্ত্রী একটি ভূমিকম্পের সময় মারা যায় প্রায় চার বছর আগে। এর দু'বছর বাদে সে আবার বিয়ে কবে। তার প্রথম স্ত্রীর মা-পাগল এবং তাঁর দিগ্ভাস তাঁর মেয়ে মারা যায় নি। এই অলীক কল্পনাকে নগ্ন না কবে দেবার জন্যই পজাকে বাধ্য হয়ে ভান কবে চলতে হচ্ছে যে সে উন্মত্ত এবং মত জেলাস এবং স্ত্রীর মাকেও তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা কবতে দিতে রাজী নয়। কাণ দেখা করলে যদি শাশুড়ি বুঝতে পারেন যে পজার দ্বিতীয় পাক্ষর স্ত্রী তাঁর মেয়ে নয়, তাহলে তাঁর পাগলামি জাবও বেড়ে যাবে।

শাশুড়ি আবাব এ ব্যাপারের এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিলেন। পজা তাঁর প্রথম স্ত্রীকেই আবাব বিয়ে করেছেন। পজার ভাবাব জেলাসীর জন্য ডাক্তারের উপদেশে তাঁর স্ত্রীকে স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং পজাকে বলা হয় যে সে মারা গেছে। পরে স্ত্রীসঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরও পজা তাকে চিনতে পারে না—তখন সেই প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গেই একটি নকল বিবাহের অনুষ্ঠান করে তাঁদের বিয়ে দেওয়া হয়। এখন পজার সব সময় একটা ভয় যে তাব নতুন স্ত্রীকেও তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সেই জন্যই সে কাউকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না।

শাশুড়ি এবং জামাইয়ের কাহিনী থেকে লোকে কিছ্ আসল সত্যকে বুঝতে পারে না। আর এ রহস্য উন্মোচনের জন্য যেসব কাগজপত্র থেকে সাহায্য পাওয়া যেত তাও দেখা যায় কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

শেষে কৌতূহলী লোকেরা কৌশলের সাহায্যে সিনেরা পজা অর্থাৎ স্ত্রীটির সঙ্গে দেখা করে। মহিলা ভেইলে মৃগ ঢাকা অবস্থায় এদের সামনে এসে দাঁড়ান এবং বলেন যে তিনি সিনেরা ফ্রোলার কন্যা এবং পজার দ্বিতীয় স্ত্রী। এতে রহস্য আরও বেড়ে ওঠে। শহরবাসীরা তাঁকে তাঁর স্বামী বা মা, এদের দু'জনের একজনের বর্ণিত কাহিনী সত্য বলে মনে নেবার জন্য জোর দিতে থাকেন।

মহিলার তাকে রাজী না হয়ে বলেন: আমার বক্তব্য হচ্ছে—লোকে আমার সম্বন্ধে যেভাবে ভাববে আমি হিচ্ছ তাই। তারপর তিনি স্বামী এবং সিনোরো ফ্রোলার বিষয় বলেন:

“Their misfortune is such that it should remain concealed from the world, for it would be too heavy to bear if it was not hidden by the merciful veil with which pity has covered it.”

পিরানদেল্লো তাঁর নাটকগুলোতে বার বার এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে সার্বভৌম সত্তা বলে কিছু নেই—বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে এবং বিভিন্ন পরিবেশে সত্যের বিভিন্ন রূপ। একের পক্ষে অন্যের কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করাটা সম্ভব, কিন্তু “মনোভাব” আর “আসল সত্য”র মধ্যে পার্থক্য থাকে। জগতে চিন্তার সাম্য এবং সমতা বলেও কিছু নেই।

পিরানদেল্লো হচ্ছেন বাস্তবধর্মী লেখক। তবে তাঁর বাস্তববোধের সঙ্গে প্রচলিত বাস্তববাদের অনেক পার্থক্য আছে। এমন কি বলা যেতে পারে—বাস্তবতা বলতে সাধারণত যা বোঝা যায় তার মূলে গিয়ে আঘাত হেনেছেন পিরানদেল্লো। ইবসেন তাঁর নাটকে চরিত্রের অবতারণা করেন—সে চরিত্র জটিল হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে চরিত্রকে তিনি আঁকতে চান তার একটা বিশেষ রূপ থাকে।

পিরানদেল্লো মানুষরূপ অণুকে ভেঙে-চুরে একাকার করে ফেলেন তাঁর নাটকে—তার ফলে যেন বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। পিরানদেল্লো বলেন—আমরা প্রত্যেকেই মনে করি আমাদের নিজেদের এক-একটি পৃথক সত্তা আছে। কিন্তু এ আমাদের অত্যন্ত ভুল ধারণা। আমাদের প্রত্যেকে “এক নয়, বহু”—যার ভেতর যত ধরনের সম্ভাবনা থাকে সেই অনুসারেই সে বহু-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। নিজেদের একটি রূপের সম্বন্ধেই সাধারণত আমরা অবহিত থাকি—আর আমাদের নানারূপের ভেতর এই রূপটিই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বহীন। মানুষের অন্তরের চেহারা এবং বাহ্যিক মূখ্যোসের তফাৎটাকেই বিস্মৃতভাবে দেখাতে চেয়েছেন পিরানদেল্লো এই ধরনের উত্তির ভেতর দিয়ে। অবশ্য মানুষ নিজের অন্তরকেও মূখ্যোসের মাধ্যমেও দেখতে পারেন। চরিত্রের বাহ্যিক মূখ্যোস (এক বা বহু) দেখেই বাইরের লোক (যে যে মূখ্যোস দেখতে পান সেই অনুসারে) চরিত্র সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা আনেন। বাইরের মূখ্যোসটা চরিত্রের নিজেরও সৃষ্টি

হতে পারে, অথবা সামাজিক কারণে এটা তাকে বাধ্য হয়ে ধারণ করতে হয়। এইসব কারণেই পিরানদেল্লো নাটকের মাধ্যমে প্রশ্ন তোলেন—“মানুষ যখন এত জটিলতার জালে আবদ্ধ, সেক্ষেত্রে অবজ্ঞিত হুঁশ বা রিয়ালিটিকে আমরা কি করে খুঁজে

পাব? সমস্তই যখন আপেক্ষিক, তখন ব্যক্তিবিশেষের বেলা নয়, ব্যক্তিচরিত্রের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধেও তখন মানুষ সম্পর্কে কোন কিছুই জোর দিয়ে বলা যায় না।”

[কবিতা]



এক ঝাকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি

সাদনা
দশন

সাদনা দশন নিয়মিত ব্যবহার
করিলে কোন দন্তরোগের ভয়
থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, স্বেচ্ছা
ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে
ইহা প্রস্তুত হয়।

সাদনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ঔষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. অধ্যাপক শ্রীমতী, এফ.সি.এস. (লন্ডন),
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ডাঃ ললিত কলিতের উপায়ক
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র: ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি.) প্রচারক



বাংলা ছবির সমস্যা

সংবাদে প্রকাশ, সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন—বাঘা বায়েন' ছবির কাজ আপাতত স্থগিত আছে। প্রকাশ, প্রযোজক আপাতত এরূপ ছবিতে উৎসাহী নন। যদিও 'গুপী গায়েন—বাঘা বায়েন'কে চিত্ররূপ দেবার সংবাদে বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী থেকে বড়রা পর্যন্ত কৌতুহলী হয়ে উঠছিল এবং ছবিটির নির্মাণ সংবাদের জন্য উৎসুক ছিল। কিন্তু প্রযোজক না কি আপাতত অগ্রসর হতে রাজী নন, এমন একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক বড় বড় প্রযোজক এখন বাংলা ছবি ছেড়ে হিন্দী ছবিতে উৎসাহ প্রকাশ করছেন বেশি। কয়েক বছর আগে 'অধিক বাংলা ছবি দেখুন' বলে কোন কোন প্রযোজক জন-সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিলেন। সিনেমার পত্রিকাগুলিতে তাঁদের অনেক প্রচার হয়েছে। এখন তাঁরা হিন্দী ছবিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাবার জন্যই না কি তাঁদের হিন্দী ছবি প্রযোজনা। এসব প্রযোজকের প্রচারের কথায় সংসারী প্রচার 'অধিক খাদ্য ফলাও'-এর কথা মনে পড়ে। সেই প্রচারে যেমন আন্তরিকতা নেই, কেবল লোক দেখান তড়ং, এসব প্রযোজকরাও মনে বাংলা ছবির কথা বলে আসলে হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে প্রসারিত করছে। বাংলা প্রযোজকরা এখন হয় হিন্দী ছবির পেছনে, নতুন হিন্দী ফর্মের বাংলা ছবির পেছনে ছুটছেন। এরূপ মানসিকতার পেছনে রয়েছে অতি লোভ। এই অতি লোভের জন্য বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প সংকট উপস্থিত হয়েছে। বাংলা ছবির প্রেক্ষাগৃহগুলি ক্রমে হিন্দীর পরিবেশকদের কুক্ষিগত হচ্ছে এবং প্রথমশ্রেণীর পরিচালক ও প্রতিভাবান শিল্পী ও টেকনিশিয়ানরা কাজ পাচ্ছেন না।

বাংলা চলচ্চিত্রের এই সংকট দিন দিন বাড়বে—যদি এভাবে অসংগঠিত প্রযোজক-

দের ওপর শিল্পকে নির্ভর করে থাকতে হয়। এখানে অধিকাংশ প্রযোজক বিচ্ছিন্ন-ভাবে আসেন, এক-একটা ছবি এক এক

নামে। টেকনিশিয়ান থেকে শিল্পী সবাই এখানে ভাড়া করা, ঠিকার কাজ করেন। সুতরাং প্রযোজকদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম, সুচিন্তিত প্রযোজনার জন্য মাথা ঘামাতে হয় না, ওরা ভাগ্যপরীক্ষার মত একটা ছবি করেন। লাভ হলে আর একটা করেন, লাভ না হলে সরে পড়েন। আবার অনেক সময় লাভ হলেও পরিবেশকদের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করতে গিয়ে আর এমুখী না হবার প্রতিজ্ঞা করেন।

এরূপ নৈরাজ্যের ফলে পশ্চিম বাংলায় খুব ভেবে-চিন্তে কাহিনী নির্বাচন এবং ভাল ছবি করার সুযোগ কমে আসছে। প্রযোজকরা চিন্তা করছেন 'বিবর'-এর মত কাহিনীর চিত্ররূপ দেবার, অথবা যোনিতাকে আগ্রহ করে ছবি করার। তার জন্য অর্ধ-শিক্ষিত একদল নতুন পরিচালক তৈরি হয়েই আছেন। যাদের কোন ঐতিহ্যবাহী



‘এ রুডস লাভ’ ছবির নায়িকা হানা রেজভানো



দি হাইম এট দি গার্লস স্কুল ছবিতে নাইট ক্লাবের একটি দৃশ্য।

নেই, উপযুক্ত রুচিবোধ, এবং সম্মানবোধ নেই। এই হট্টমেলায় প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরা—ছবি করার সুযোগ পাচ্ছেন না। যেমন 'গুপ্তী গায়েন—বাঘা বায়েন'-এর মত একটা ছবি দেখার সৌভাগ্য থেকে বাঙালী দর্শকরা আপাতত বঞ্চিত হলেন।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে রক্ষা করতে হলে সরকারী উদ্যোগ না থাকলে চলবে না। এক সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থে 'পথের পাঁচালী'র মত ছবি হয়েছিল। 'গুপ্তী গায়েন'-এর মত ছবি সেভাবে সরকারী অর্থে হতে পারে। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রয়োজনায় এই নৈরাজ্য দূর করার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। 'পথের পাঁচালী' থেকে অর্জিত অর্থকে তাঁরা একাজে লাগাতে পারেন। প্রয়োজনার ক্ষেত্রে সরকার অর্থ বিনিয়োগ না করলে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরা অনেকেই ভাল ছবি করার সুযোগ পাবেন না। যাঁদের ছবি নিয়ে সারা ভারত গর্ব করে। —সুজন।

‘মধুর রাজনী’ তেতো হল

মধুর রাজনী আপাতত তেতো বলে বিবেচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে নয়টি বিদেশী ছবি

প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। এই নয়টি ছবি : আমেরিকা বাই নাইট, ইউনিভার্স বাই নাইট, ওরিয়েন্ট বাই নাইট, উইমেন অব দি ওয়াল্ড, প্যারিস শ্যামপেন, সুইট সুইট নাইটস্, টোকিও বাই নাইট, কোপা কাবানা প্যালেস, ওয়াল্ড বাই নাইট। এই নিষেধাজ্ঞার কথা কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, ওই সব ছবির ব্যাপক প্রদর্শন সম্পর্কে নানা জায়গা থেকে মন্ত্রকের দপ্তরে অভিযোগ এসেছে।

ছবিগুলি সম্পর্কে আপত্তির কারণ নৈতিক। তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত সেন্সর বোর্ড এই ছবিগুলিকে ভারতে প্রদর্শনের যোগ্য বলে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। এই ছাড়পত্র পাবার পূর্বে এ-ধরনের ছবি এক শ্রেণীর ধনী ও বিকৃত-রুচির মানুষ গোপনে দেখতো। বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লীতে এরূপ ছবি দেখার সড়ঙ্গপথে সুযোগ ছিল বলে শোনা যায়। সেন্সর বোর্ড এই অশ্লীল ছবিগুলিকে ভদ্রসমাজে দেখাবার ছাড়পত্র দিয়েছিল। এই ধরনের ছবির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র সাপ্তাহিক বসুমতীতে রংজঙ্গং বিভাগে সুজন অবিরাম বিরুদ্ধতা করে এরূপ ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ করার দাবি করেছিলেন।

ছবি ত্র্যলোচনা

গার্লস চেকোস্লোভাক ছবি

গত ১০ থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা ও ভারতে চেকোস্লোভাক দূতাবাসের যুক্ত উৎসবে পশ্চী সিনেমায় সাতদিনব্যাপী এক চেক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবে সাতটি পূর্ণাঙ্গ ছবি ও কয়েকটি সম্পূর্ণ ছবি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। উৎসবের পূর্বে চেক দূতাবাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনিক সম্মেলনে স্থানীয় কনসাল জেনারেল এই ছবিগুলিকে চেক নবতরঙ্গের ছবি বা নতুন চিন্তাধারার ছবি বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গ উত্থাপনে তিনি বলেছিলেন স্টালিনের মৃত্যুর পর চেক চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার পথে বাধা দূর হয়েছে ইত্যাদি।

এই স্বাধীন চিন্তার প্রথম চিহ্নই দেখলাম 'রুডস লাভ' ছবিতে। এই ছবির নায়িকা এক চেক বালিকা, যে এক উৎসব ভালবাসা পাওয়া সত্ত্বেও তার এক মাসের অনুপস্থিতিতে বান্ধবীদের সঙ্গে নাইট

ক্লাবে, ও রেস্টুরেন্ট ঘুরে বেড়ায় নতুন পুরুষের সংলাভের জন্য। একদা মধ্যবয়সী তিনজন দৈনিক তাদের আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু দু'জন বাস্তবীকে ফেলে সে গেল তরুণ পিয়ানো বাদকের কাছে। যার প্রতি তার নজর পড়ছিল। এই পিয়ানো বাদকের সঙ্গে সে রাত কাটাল। পরিচালক এই দৃশ্য দর্শকদের দেখালেন সম্পূর্ণ নশন ও শৃঙ্গাররত অবস্থায় তাদের দীর্ঘক্ষণ পর্দায় দেখিয়ে। তারপরে অবশ্য দেখা গেল দৈহিক সম্পদের পরে তরুণীর মনে প্রেমের উদয় হয়েছে(!) এবং সে তরুণের বাড়িতে গিয়ে রুঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হল। এই ছবিতে পরিচালক যে সময়স্নাকে উপস্থিত করেছেন তা আজ সারা ইউরোপের। যুদ্ধের পরে যে সব দেশে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। পরিচালকের আঙ্গিক সৃষ্টিতে যথেষ্ট শ্লেষ প্রকাশ পেয়েছে। একে একে তিনি মধ্যবয়সী পুরুষদের—যারা নিজেদের বিবাহিত জীবন গোপন করে তরুণীসম্পন্ন যুঁজে বেড়ায়, দায়িত্ববোধহীন তরুণরা যারা নিজ-নতুন জেদের সংগঠন লাভ করে এবং পুরুষসঙ্গ কামনা-কাতর মেয়েদের প্রতি শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার মত সমাজতান্ত্রিক দেশের সমাজজীবনের এটা একটা দিক হতে পারে। এই দিকটাকে এত নশন করে দেখাবার কি সার্থকতা থাকতে পারে? নিছক বাস্তবজীবনের এই সময়স্নাকে এত



'ডাউনগো' ছবির নায়িকা ইভা সলকোভা

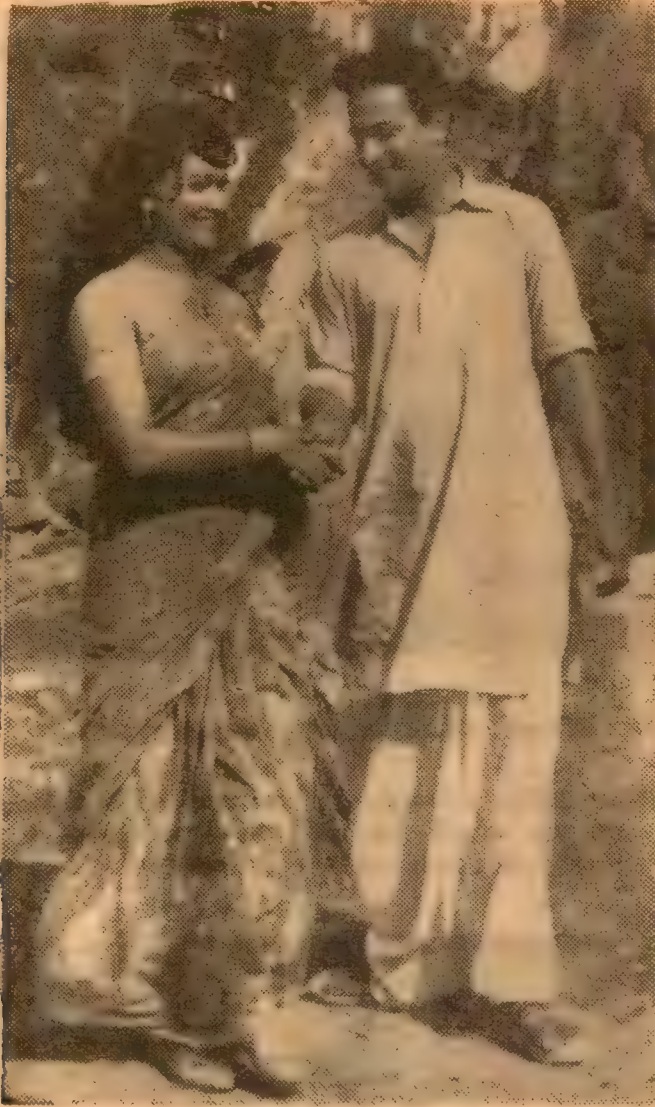


'ইফ এ থাউজেন্ট ক্র্যারিনেস টল' ছবির একটি দৃশ্য

শূলভাবে দেখিয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার সমাজতন্ত্র গঠনের পথে কি সহায়তা হবে? এই পর্যায়ের আর একটি ছবি 'ক্রাইম ইন দি গার্লস স্কুল'। তিন খণ্ডের এই ছবির প্রথম খণ্ড 'ডেথ অব দি নিডল'-এ তিনজন পর্বতারোহী ও এক তরুণীকে নিয়ে প্রেমের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলা হয়েছে এক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে। দ্বিতীয় খণ্ড 'এ উম্যান ইন দি সাওয়ার'-এ নাইট ক্লাবের নর্তকীদের মধ্যে এক সুন্দরীকে স্তানরতা অবস্থায় হত্যা করা হয়। এখানেও প্রেম ও প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করা নিয়ে ঈর্ষা প্রধান কথা। তৃতীয় খণ্ড 'ক্রাইম ইন দি গার্লস স্কুল'-এ একটি বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সেখানে অন্তঃসলিলা যৌনতা ও ভণ্ডামীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

এই তিনখণ্ড ছবির একটি মূখ্য চরিত্র ডিটেকটিভ। এই ডিটেকটিভ তিনটি ঘটনা অনুসন্ধান করেছেন। তিন খণ্ড ছবি পরিচালনা করেছেন তিনজন পরিচালক। এ'রা যথাক্রমে—ইভো নোভাক, লাডিস্লাভ শ্লাইচম্যান, জিঁরি মেনজেল।

সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে আমাদের দেশে এক বকমের উচ্চ ধারণা



‘নারিকা-সংবাদ’ ছবিতে উত্তমকুমার ও অজনা চৌধুরী

শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রিয়ালিজমকে আমরা শিল্পের মহৎ বিকাশ বলে জানি। কিন্তু এ দুর্দৃষ্টি ছবিতে দেখা গেল চেকোস্লোভাকিয়ার মত সমাজতান্ত্রিক দেশেও নাইট ক্লাব, হুজুড়াবাজী, নর-নারীর দৈহিক মিলনের ব্যাপারে শিথিলতা ও মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর একরকম বেশ্যা-প্রতি বলা যায়) ইত্যাদি রয়েছে। সাম্প্রতিক মার্কিন জীবনধারার সাথে তাদের তফাৎ কোথায়? ধনতান্ত্রিক জগতের নিউ ওয়েল্ড-ধর্মী ছবি কোনটা প্রধান। এখানেও মানুষের নিম্ন প্রবৃত্তি-গুলিকেই প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। এই ছবিগুলি ইউরোপ-আমেরিকার যে কোন ধনতান্ত্রিক দেশের ছবি হতে পারত। সমাজতান্ত্রিক চেকোস্লোভাকিয়ার কোন বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় এখানে নেই।

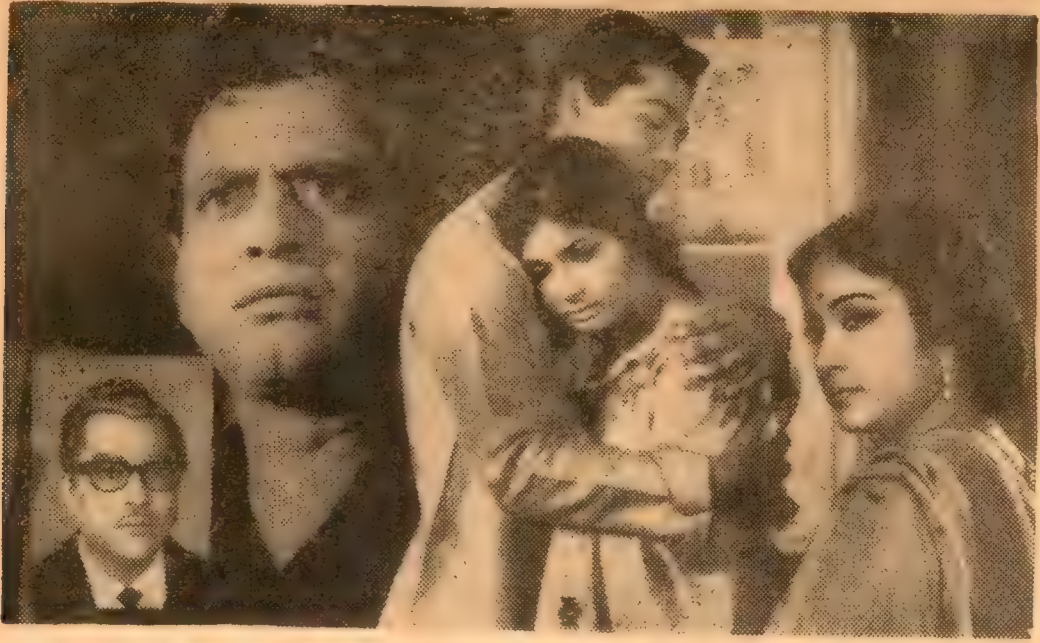
শেষ দিনের ছবি ‘ইক এ থাউজেন্ড ক্যারিগেটস’—একটি নতুন ধরনের কমেডি চিত্র। এই ছবিতে ‘হাসি-কৌতুকের মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার বৈদেশিক নীতি বা বন্ধু ও শান্তির প্রস্নের একটি জবাব দেওয়া হয়েছে। এক দলভাগী সৈন্যকে ধরতে গিয়ে দেখা গেল বন্দুকগুলি সব বাঁশী হয়ে গেছে। সৈন্য ব্যারাকের সৈন্যরা বন্ধুর পরিবর্তে সঙ্গীতের শিক্ষা নিচ্ছে, আর টেলিভিশনের পরিচালিকা এই ঘটনাকে তার প্রোগ্রাম করেছে। পরে সেই দলভাগী সৈন্যটিকে যখন খুঁজে বার করা হল তখন দেখা গেল তার বাঁশী আবার বন্দুক হয়ে গেছে। আক্রমণের সময় বন্দুকগুলি হল বাঁশী, আর আত্মরক্ষার সময় বাঁশী হয়ে গেল বন্দুক। অর্থাৎ চেকোস্লোভাকিয়া কাকেও আক্রমণ করবে

না, সে আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করবে মাত্র। এখানে আঙ্গিকের দিক থেকে হলিউডের কমেডি চিত্র এবং ‘জলভিত্তিক প্রেসলিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে অভিনন্দনীয় ‘সেন্ট এলিজাবেথ স্কয়ার’। যেমন কাহিনীর দিক থেকে তেমন আঙ্গিকের দিক থেকে এ ছবির তুলনা হয় না। বাস্তবিক পক্ষে এরকম ছবিই গর্ব করে দেখানো যায়। চেকোস্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্র যে কত উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল—এ ছবি তখন একটি নিদর্শন। এই ছবির পাশে ‘রুডস লাভ’ বা ‘লাইম ইন দি গার্লস স্কুল’ চেক চলচ্চিত্রের বিকৃতি মনে হয়েছে। ‘সেন্ট এলিজাবেথ স্কয়ার’ ছবির পরিচালক ভ্যাডিমির বাহনা একজন পুরনো পরিচালক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তিনি আর্ট কো-অর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করেছেন। তার পরে প্রাথমিক চিত্র নির্মাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। সাহিত্যিক রুডলফ জাসিকের উপন্যাস অবলম্বনে তিনি এই ছবির চিত্রনাট্য নির্মাণ করেছেন। একটি ছোট স্লোভাক শহরের কাহিনী। ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় আসতে অনেক দেশপ্রেমিক সেজে সূর্যোগ স্থান করছে, ইহুদীদের বিদ্বেষ জড়িয়ে বিবেষ ছড়াচ্ছে, একদিন ফ্যাসিস্ট সহৃদয় প্রতিবেশী রাতারাতি তার হয়ে গেল পরস্পরের শত্রু।

ছবির নায়ক ইগোর খুস্টান, নায়িকা ইভা ইহুদী। তারা পরস্পরকে ভালবাসে। ইগোর ইভার বাবার একজন কর্মচারী। হঠাৎ শহরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। ফ্যাসিস্ট প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহভাদের দাপট বেড়ে গেল। একটা অজুহাত তৈরি করে ইহুদীদের বন্দীশাসন চালান দেওয়া শুরু হল। ইগোর চেষ্টা করল ইভাকে রক্ষা করতে। ধর্মসংক্রান্ত কাজে গিয়ে ইভাকে ধর্মান্তরিত করে পিঠে করার বাসনা জানাল। ধর্মভাঙ্গক যে দক্ষিণা চাইল তা দেবার শক্তি তার নেই। তবুও চেষ্টা করে অর্থ সংগ্রহ করে—সে অর্থ যোগাড় করে ধর্মসংক্রান্ত কাজ থেকে একটা সার্টিফিকেট আদায় করল। কিন্তু ফ্যাসিস্টদের কাছে এই সার্টিফিকেটের কোন দাম নেই, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইভাকে ধরে চালান দিল। ইগোর পাল্লার মত খোঁজাখুঁজি করে মালগাড়ির মধ্য থেকে বন্দী ইহুদীদের তিনজনকে এক উদ্ধার করে পাল্লার সময় সমস্ত গুলীতে ইভার জীবন শেষ হয়।

মূল কাহিনী অনুসারী আরো একটা ঘটনা থাকার কথা। সর্বস্বহারা ও ফ্যাসিজমের আসল চেহারা বুঝতে পেয়ে ইগোর স্থানীয় ফ্যাসিস্ট চীফকে খুন



দিলীপ নাগ পরিচালিত 'বহুবরণ' ছবিতে প্রদীপকুমার, অডি ভট্টাচার্য, অজয় বিশ্বাস ও গীতা দত্ত

করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল। এই বিভাগ—কে কেটেছেন জানি না। সৌন্দর্য। গীতার ঘণ্টা-ঘরের বড় বড়
 আশে ছবিতে বাদ দেওয়া হয়েছে। তা এরূপ অনেক কাহিনী নিয়ে ছবি দাঁত বার করা যন্ত্রের আলো-আঁধারীর
 চক্ৰ সরকার অথবা আমাদের সেন্সার হয়েছে। এই ছবির বৈশিষ্ট্য আঙ্গিক মধ্যে ইগোর আর ইভার গোপন মিলন;



প্রসন্ন সান্যালের 'স্বাক্ষর' ছবিতে সন্ধ্যা রায় ও সৌদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়



নির্মারমাণ 'পান্না' ছবিতে ভারতী দেবী ও অর্পেন্দ্র নন্দাভূষণী

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে ফাইন আর্টস একাডেমি হলে পাঁচটি চেক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

নাটকের কথা

অনুশীলন সম্প্রদায়

প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা "অনুশীলন সম্প্রদায়" ইস্পাত, শেষ-সংবাদ, কার, লী-ওয়ালা ও বিধি ও বাস্তবতার সফল অভিনয়ের পর তাঁদের নতুন এবং বিনোদন নাটক "একা একা" (সত্যের অবলম্বনে) নিয়ে দর্শকদের সামনে প্রথম আসছেন ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা সাতটার মতঅঙ্গন মঞ্চে। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় অভিনয় ৮ই মার্চ।

স্টুডিও গ্রন্থ

আরোগ্য নিকেতন

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'আরোগ্য নিকেতন'-এর চিত্র গ্রহণের কাজ অরোরার নিজস্ব স্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। 'রাজা রামমোহন'-খ্যাত বিজয় বসু ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবির কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করবেন : বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা, দিলীপ রায়, শম্ভুদেব চ্যাটার্জী, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, সন্ধ্যা রায়। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করছেন রবীন্দ্র চ্যাটার্জী।

বার্ঘনী

সমরেশ বসুর 'বার্ঘনী'র চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিজয় বসু। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, রবি ঘোষ, শমিতা বিশ্বাস, রাসমণী নন্দী, তপতী দেবী, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা, রাখী বিশ্বাস, জহর রায়।

কখনো মেঘ

অপ্রমত্ত গোস্বামী 'কখনো মেঘ'-এর সংগীত গ্রহণের কাজ সন্ধ্যা দাশগুপ্তের পরিচালনায় সমাপ্ত হয়েছে। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন : অঞ্জনা ভৌমিক, উত্তমকুমার, ফালী ব্যানার্জী, শোভা সেন, সুব্রতা চ্যাটার্জী, বিনয় ঘোষ, নগণিত চ্যাটার্জী, তরুণ মিত্র প্রমুখ।

মন্দের দাঁতগালি একটার পর একটা ঘুরে চলেছে—তার সঙ্গে চলেছে সময়। বিকট মন্দের সঙ্গে এক বিকট সময় এগিয়ে এসে যা সুন্দর, রমণীয়, বা মানবিক তাকে শেষ করে দিচ্ছে। তথাকথিত সুযোগ-সুধানী থেকে ধর্মের স্বজ্ঞাধারীদের পরিচালক চিনিয়ে দিয়েছেন, মানবতার আলোকে। এই ছবি দর্শকদের মনে বহু এক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে, জাতি-বিশেষ ও ফ্যাসিস্ট ভাবধারা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। 'এ ব্লান্ড লান্ড'-এর পরিবর্তে এই ছবিটিকে পুনর্বীর দেখাবার জন্য আমরা সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটাকে অনুরোধ করছি।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ছবি 'ভার্টিগো'। এই ছবি নবতরঙ্গের মত গতানুগতিক নয়। পরিচালক কারেল কাচিনা সুন্দর রুচিবোধ নিয়ে একটি প্রেমের জন্মকথা ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে নায়িকা এক ষোড়শী—বাবার সরাইখানার সর্বময় কন্যা। নায়ক এক ট্রাক ড্রাইভার। নায়ক এক পরস্রীতে আসক্ত ছিল। এই ষোড়শী তার মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে প্রেম জাগিয়ে তুলল তারই এক মধুর কাহিনী। এই প্রেম দেহ সম্পর্কহীন, সংযত এবং আপন মাথুর্বে বিকশিত। পদ্মের মত সুন্দর। যে প্রেম প্রত্যেক নর-নারীর কাম্য। ট্রাক ড্রাইভারের মধ্যে বহন প্রেম জাগ্রত হল তখন ষোড়শী ট্রেনে চড়ে পাড়ি দিয়েছে আগের পথে। এই ছবিতেও কাহিনীর

অনুপমায়ের সঙ্গে আঙ্গিক সৌন্দর্যের সন্মিলন ঘটেছে। অসাধারণ ক্যামেরার কাজে নায়ক-নায়িকার অন্তরদেশ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। একটি মধুর স্বাদের ছবি হিসাবে এই ছবিটি দর্শকদের হৃদয় দান করেছে।

এ ছাড়া দেখান হয়েছে 'লোমোনেড জো' নামক ব্যঙ্গচিত্র এবং 'জেন্স্টার্স-টেল'—প্রাচীন কাহিনীভিত্তিক ছবি। এ দুটি ছবি পূর্বে দেখান হয়েছিল।

এ কয়টি চেক ছবি দেখে সাধারণভাবে যে ধারণা হয়েছে, তাতে চেক নবতরঙ্গ ছবিকে অভিনন্দন জানাবার মত কিছুই পাওয়া যায় নি, বরঞ্চ একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুদ্ধোন্মাদ ধ্যান-ধারণা ও বুদ্ধোন্মাদ জীবনের প্রতি আসক্তি দেখে আমরা হতাশ ও শঙ্কিত হয়েছি। তবে এটুকু আশার কথা যে আজো চেকো-স্লোভাকিয়ার 'সেন্ট এলিজাবেথ স্কয়ার'-এর নির্মাতা ভ্যাডিমির বাহনার মত পরিচালক আছেন, এবং কারেল কাচিনার হাতে 'ভার্টিগো'র মত ছবি হয়ে থাকে। সংগীত চেক ছবির একটি বৈশিষ্ট্য—'সেন্ট এলিজাবেথ স্কয়ার'-এ তার শক্তি বোঝা গেছে। চেক অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই উচ্চমানের শিল্পী। এঁদের অনবদ্য অভিনয়ে ছবিগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শিল্পী মণীন্দ্রনাথের শিল্পশৈলী

শিল্প কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য নয়। তবুও বলব, শিল্পীর রং, তুলি আর ভাব-ভাবনার পারস্পরিক অনুবণ্ড যে আবেগ উৎস আপনাকে নির্ধারিত করে দেয়—সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী মানুষের কাছে তাকে “শিল্প” বলা যেতে পারে। এই শিল্প হল দেবশিল্পের অনুকৃতি, সৃষ্টির দেবতা রক্ষা। উদার সৃষ্টি সৌকর্যে আপনাকে প্রকাশ করেছেন। সেই সৃষ্টির ব্যাপ্তি, তার গভীরতা, তার সীমাহীন বৈচিত্র্য মানুষকে মগ্ন করেছে, বিস্মিত করেছে। সেই বিস্ময় ছন্দ আশ্রয় করে কাব্য-রূপ পরিগ্রহ করেছে। রং-রেখার আশ্রয়ে তা ছবি হয়েছে। অপরূপ দেহ-ভাঙ্গমাগতা নৃত্যরূপ নিয়েছে। সুর এসে ছন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংগীত সৃষ্টি করেছে। তাই যে শিল্পকর্ম বিস্ময়ের দোলায় মনকে দুলিয়ে দেয়, পরিচিত জগতের বাইরে নিয়ে গিয়ে অচেনার সঙ্গে বহু পরিচয়ের গ্রন্থিবন্ধন করে দেয়, তা সহজেই রাসিক-জনের স্বীকৃতিলাভ করে। অচেনার মধ্যে অতি পরিচয়ের দোহাতা শিল্প-মূল্যকে এক অননুমোদিত মর্যাদা দেয়। সেই মর্যাদাটুকু শিল্পী মণীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মে সহজলভ্য। ডাল লেকে নিখর জল, হঠাৎ লে যাওয়া “শিকারার” বিলীয়মান কর্ণ-

চিহ্ন, দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়া পাহাড়, মেঘ, রোদ্দুর, গাছপালার অন্তহীন সবুজ, এরা কত না পরিচিত। তবু যখন শিল্পীর আঁকা নিস্তরঙ্গ, স্পন্দনময় ছবির জলে রৌদ্র মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখি, তখন কেমন যেন একটা অচেনার আকর্ষণ অনুভব করি, প্রকৃতি চেনা দিয়েও যেন অপরিচয়ের সমস্ত বাধাটুকু হাত দিয়ে সরিয়ে দেয় না। তাই বিস্ময়েরও শেষ হয় না। কবির স্বপ্নে দেখা ইয়াবো নদীতে যে পলকবিস্ময় ছড়িয়ে থাকে তা যখন চর্মচক্ষে দেখা নদীতে খুঁজে পাওয়া যায় না, তখনই কবিমন রূঢ় বাস্তবের ধাক্কা আহত হয়ে প্রশ্ন করে—

“Is this yarrow this the
strem.
Of which my fancy
cherished?”

মণীন্দ্রনাথের স্বপ্ন—শিল্পীর চোখে দেখা জলহৃদ এই স্বপ্নকে আশ্রয় করেছে বলেই তা তাঁর শিল্পকর্মে এতখানি মর্যাদা দিয়েছে। রং-তেলে জলের সঙ্গে পাথরের, আকাশের সঙ্গে সবুজের যে মিতালি গড়ে উঠেছে তা প্রকৃতির মধ্যে দুলভ। এই সমন্বয় বা হার্মনিটুকু হয়ত কখনো কখনো প্রকৃতির কৃতির মধ্যে অগোচর হয়ে পড়ে। শিল্পীর শিল্প-

কৃতিতে কিন্তু তার অসম্ভাব ঘটতে দেন নি বিনি যথার্থ শিল্পী। তাই দেখি তাঁর কাণ্ডনজঙ্ঘার বর্ণবিন্যাস সেই হার্মনিটুকুর প্রতিষ্ঠা, এপারে গাছের ঘন সবুজ আর ওপারে কাণ্ডনজঙ্ঘার চুড়ার ওপর গলে-পড়া রদ্দুরের সোনা মাঝে সাদা মেঘের দৃশ্যের পারাবার। এই দৃশ্য হাজার বার দেখেছেন বিদগ্ধ পাঠক, তবু তিনি বলবেন যে যা দেখলাম তা এর আগে কখনো দেখি নি। শিল্পীর প্রতিভার জাদু এই অতি পরিচিত নিসর্গ শোভার মধ্যে যে চারুতাটুকু সম্পাদন করলো, তার অভাব ত’ রয়েছে খাস প্রকৃতির মধ্যে। কোথা থেকে শিল্পী তাকে আহরণ করলেন? কেমন করে, শিল্প-সৃষ্টির কোন নিগূঢ় রহস্য-পথে এই রমণীয়তাটুকু শিল্পকর্মে আমদানী করলেন শিল্পী? সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় নন্দনভবুর অন্যতম পথিকৃৎ আচার্য জগন্নাথ এই “রমণীয়” কথাটির ব্যবহার করেছেন সৌন্দর্যের সমার্থক শব্দ হিসেবে। ধানি এবং অর্থের সমন্বয়ে কাব্য “রমণীয়” হয় বলে তিনি বলেছেন। শিল্পীর আঁকা ছবিতে শিল্পের ভাষা ও তৎকথিত অর্থ সমন্বিত হয়ে যখন আর এক নতুনতর অর্থকে ব্যঞ্জিত করে তখনই সেই শিল্পকর্মে “রমণীয়” আখ্যায় ভূষিত করলে সত্যের অপলাপ হয় না। এই প্রসাদগুণটুকু থাকার ফলে রাসিকের মনে আনন্দের প্রস্রবণ অনাবৃত করে দেয় শিল্পীর শিল্প-কৃতি। সেই আনন্দধারায় স্নান, পান করে গোড়-জন ধন্য হয়। শিল্প বাস্তব অনুসারী হয়েও তা প্রকৃতিকে অতিক্রম করে, এমন কথা শিল্প সমালোচক বলেছেন। শিল্প-শাস্ত্র বলেছে, শিল্প হল “নিয়তকৃত নিয়মরহিত”। মণীন্দ্রনাথের “ভাগীরথীর কক্ষে সূর্যোদয়” ছবিটার মধ্যে এই তত্ত্বটিকে প্রমুদ দেখি। শিল্পীর আঁকা ছবিতে রং-এর বাহার খোদার ওপর খোদগারী করেছে। Naturalist বা প্রকৃতিবাদীদের সব শাসন উপেক্ষা করে, তাদের শাসনের উদাত্ত তর্জনীকে আমল না দিয়ে শিল্পী তাঁর আপন খুশিতে ভর দিয়ে দৃ-হাতে রং ছড়াতে ছড়াতে ক্যানভাসের ওপর দিয়ে নিরন্তর গভীরতায় করেছেন আর সৃষ্টি হয়েছে “ডালহুদের নিখর স্পন্দন”—কাণ্ডনজঙ্ঘার আকাশের “সোনা গলানো নীল”। ধনক্ষেতের হলুদ সবুজ। মণীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখতে দেখতে মনে হয় যেন কবি জীবনানন্দের কবিতা পড়ছি। প্রত্যক্ষ করছি কবির অলৌকিক বর্ণনানুভূতির সবটুকুকে। শিল্পী মণীন্দ্রনাথের সেই রং দেখার চোখ আছে যা কবি জীবনানন্দকে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দিয়েছিল। মণীন্দ্রনাথের তুলিতে সেই বলিষ্ঠতা দেখছি যা জীবনানন্দের কাব্যকে শালজয়ী করেছে। —ডঃ সুধীরকুমার নন্দী



কুল, ভ্যালি

নিরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কিত সাপ্তাহিক বসুমতীতে (২১-১২-৬৬) প্রকাশিত রচনা পাঠান্তে নীরদবাবুর এক বন্ধুর আত্মীয়া তাঁর মামাকে একখানা চিঠি লেখেন। সেই চিঠির নকল নীরদবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন, পড়ে আমার আনন্দ হবে এই আশায়। পত্রলেখিকা সম্পর্কে নীরদবাবু আমাকে জানিয়েছেন, তিনি ঘরেই যা কিছু পড়াশোনা করেছেন। চিঠিখানি পড়ে এর প্রতি ছত্রে যে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। বিশেষ করে এ চিঠি ব্যক্তিগত চিঠি, কোথাও ছাপাবার জন্য নয়, সেজন্য এর মূল্য আমার কাছে অনেক। পত্রলেখিকার আন্তরিকতার গুণে পত্রখানি পত্রসাহিত্যরূপে বিশেষ মর্যাদালাভের উপযুক্ত মনে করি এবং সেই জন্যই সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমনে এর স্থান হলে আমি আনন্দলাভ করব। তা ছাড়া নীরদচন্দ্রের চরিত্রের একটি মানবিকতার দিক এতে এমন সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে যা আমার রচনায় অনুপস্থিত ছিল।

—পরিমল গোস্বামী]

শ্রীচরণেশ্বর,

মামা, প্রথমে কাজের কথা সেয়ে নিই। আপনার বই (বসুমতী) ২খানা বিশুদ্ধের অফিস থেকে নিয়ে এসেছে। আগামীকাল পাঠাচ্ছি। এতে পরিমলবাবুর লেখাটা পড়লাম। নীরদবাবুকে আমরা যেমনভাবে চিনেছি, উনিও ঠিক তেমনভাবেই ওঁকে উপলব্ধি করেছেন। ওঁর লেখার প্রতিটি ছত্রে যেন আমাদেরই অন্তরের কথা ব্যক্ত হয়েছে। লেখাটা আমার শুব ভাল লাগল। ভাল লাগল এই জন্য যে এত সহজ সরলভাবে কোনো বাঙালী লেখক নীরদবাবু সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁর পাণ্ডিত্যই নয় "বাঙালী নীরদবাবু"কে উপলব্ধি কোরে আর কোনো লেখা বোধ হয় লেখেন নি। পরিমলবাবুর এই লেখার প্রতিটি লাইন যেন আমার মনের কথা। যদি আমার লেখার ভাষা থাকত, জ্ঞান থাকত, তা হলে এই কথাগুলোই নীরদবাবু সম্বন্ধে আমিও লিখতাম। আমি একদিকে যেমন গর্ববোধ করি যে, নীরদবাবুর মত একটা চরিত্রকে সামান্য সামনি দেখার সুযোগ আমার ঘটেছে, আবার আর একদিকে দুঃখ বোধ করি যখন মনে হয় মহাকালের নিয়মে একদিন এই মানবটিকেও আমাদের বিদায় দিতে হবে! মামা, এমন অনেক সময় আসে যখন দেখি সংসারের কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার জটিলতায় আমরা কোনো সমাধান খুঁজে পাই না, সামান্য একটা বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতাও যখন আমাদের ব্যক্তিগত থাকে না তখন সর্বপ্রথমে মনে



পড়ে আমার নীরদবাবুর কথা। একটা মানুষকে যখন দেখি সামান্য একটা বিভ্রান্তিহীনতার প্রাণের জন্যও কি ব্যাকুলতা তখনও বিস্ময় জাগে, আবার সেই মানুষকেই যখন দেখি সামান্যতম অন্যায়ের বিরুদ্ধেও সিংহের মত লড়াই করতে, তখনও অবাধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। একটা চরিত্রের মধ্যে এই বিশাল কেন্দ্র করে এল—এটা সত্যিই আমার কাছে চিরকালের বিস্ময় হোলে থাকবে।

শ্রীবেলা ভট্টাচার্য

গত ১৯শে জানুয়ারীর 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারতে ছাত্র-উচ্ছ্বলতা' প্রবন্ধখানি পড়লাম। তাঁর সুদীর্ঘ ব্যক্তি-সম্মত আলোচনাটি প্রায় প্রত্যেকেরই ভাল লাগবে। তিনি প্রায় নিরপেক্ষভাবেই ছাত্রসমাজের উচ্ছ্বলতার সম্ভাব্য দিক-গুলো যথাযোগ্য বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন।

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাত্রদের কথা লিখতে গিয়ে কোথাও বেশি বলার বা কাউকে দোষারোপ করার কোন চেষ্টাই করেন নি। তিনি শুধু নিখুঁতভাবে ছাত্রসমাজের ভেতরের গলদগুলো বের করে নেবার চেষ্টা করেছেন এবং ছাত্রসমাজের উচ্ছ্বলতার কারণগুলো ব্যক্তি, বিচার ও জধ্য দিয়ে পটভূমিতে ব্যাখ্যা করার দিকে বেশি করে কোঁক দিয়েছেন। এক তরফা-ভাবে গালিগালাজ দিয়ে, সুশ্রাব্য ভাষা লাগিয়ে আলোচনাকে বিশদ করার প্রবণতা আজকাল অনেকেরই আছে। তাঁরা শুধু সম্মানের কাঙাল, আলোচনাটিকে বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং অকাটা ব্যক্তি ও চিন্তাধারার কাছ দিয়েও তাঁরা ঘেঁষতে চান না। তবে বিচারবুদ্ধির স্মার্যাদি অন্যায় এবং একতরফা দোষই প্রতিপন্ন হয়, সেক্ষেত্রে গালিগালাজ এবং সুতীর ভাষার প্রতিবাদই শ্রেয়। এক্ষেত্রে বলবার কিছু থাকে না। আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এদিক দিয়ে তাঁর আলোচনাটির মধ্যে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করেছেন।

ছাত্রসমাজ আজ সত্যি ঘন ঘন আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র-উচ্ছ্বলতা, এটা একটা বিশ্বজনীন সমস্যা। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র-গুলোতেই ছাত্র-আন্দোলনের ঢেউ ছাড়িয়ে পড়েছে। ছাত্ররা কোন অবস্থাতেই আজ সুস্থির নয়। অস্থির, উদ্দাম এবং উচ্ছ্বল। তারা সকল সমালোচনাকে উপেক্ষা করে, বাধা ডিঙিয়ে সকলের নিরন্তরণের বাইরে চলে যেতে বসেছে। এ নিয়ে আমরা শুধু ছাত্রদের দোষ দিতে গাই না। গলদ সর্বত্র সংক্রামিত।

আমাদের ভারতবর্ষের পরিস্থিতি আজ এমন এক কোঠার এসে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে পাঠা দিয়ে মানুষ আর স্বস্তির নিশ্বাস কৈলতে পারছে না। জীবনযাত্রা তার ফলে জটিল হয়ে পড়েছে। দেশের দুঃস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের প্রতি জনসাধারণের সমালোচনার মনোভাব ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এমনতাবস্থায় ছাত্রসমাজের এ-ধরনের উচ্ছ্বল আচার-আচরণে দেশের চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবীর একটা চিন্তিত হবেন বৈ কি।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আজকাল ছাত্রশিক্ষকের সম্বন্ধে সম্পর্কটি ক্রমশই বিলুপ্ত হতে চলেছে। ছাত্ররা শিক্ষকদের প্রশংসা জানাচ্ছে না, সম্মান দিচ্ছে না, এমন কি গুরুস্থানীয় বলে আমলই দিতে চাইছে না। এদিকে শিক্ষকরা না দিচ্ছে ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা, না দিচ্ছে তাঁদের স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা এবং পিতৃস্নেহ সন্দেহ, নিবিড় সান্নিধ্য। শিক্ষকরা কোন মতে দায় সেয়ে শিক্ষাদানের সময়টুকু অতিবাহিত করে ক্লাস থেকে চলে যান। এখানে প্রত্যক্ষভাবে আমরা লক্ষ্য করছি ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই দোষী। কিন্তু এখানেই কি শেষ? আমরা একবার ছাত্র এবং শিক্ষকের এসব আচার-আচরণের গভীরে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তি ও চিন্তা নিয়ে প্রবেশ করে দেখব না? এসব গলদের মূল উৎসগুলো একবার খোঁজ নিলেই আমরা দেখতে পাব দোষ ছাত্র-শিক্ষকের শুধু একা নয়, দোষী আমরা সকলেই। আমাদের প্রত্যেকের বাড়ুই বিন্দু বিন্দু হুটি জমা হয়েছে এবং হচ্ছে।

কতগুলো রাজনৈতিক দল নিজদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাত্রদের লালায়িত করে। তাদেরকে পুণ্য, পবিত্র জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে তাদের ক্রমোন্নত বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাধারার অপমৃত্যু ঘটিয়ে টেনে নিয়ে আসে দলগুলোর ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষেত্রে। তারা ছাত্রদের লেখার কিভাবে স্বার্থ আদায় করতে হয়, ক্ষমতাসীন হতে হয় এবং কিভাবে পৈশাচিকতা দিয়ে, গুণ্ডামী দিয়ে অর্থ দিয়ে এ সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে

হয়। হাজার ডাল বাক আপন শিক্ষকে, অসুখ এবং উদ্বেগের।

ছাত্রসমাজ ছােখের সময়ে দেখেছে, প্রাথমিক নেতাদের ক্ষমতা নিয়ে হে-টে, কাঙ্ক্ষিত এবং স্বাধীন নিয়ে কাঙ্ক্ষিত। সে ব্যক্তি অসং কাল করছেন, অসং উপরে উপার্জন করছেন, সে ব্যক্তিই সূখ, ভোগ-বিন্যাস একচেটিয়া করে নিচ্ছেন। সে ব্যক্তির চারিদিকে কোনরূপ কৌশল নেই; দু'চরিত্র যে ব্যক্তি সে ব্যক্তিই আজ সবার চোখে আলো-স্বাধীন, মহাত্মাগণী সজীব পুরুষ। তিনিই দেশ চালাচ্ছেন, শাসন করছেন, অগ্রগতি আনছেন। এ অবস্থায় কিসের ওপর আস্থা রেখে আমাদের ছাত্রসমাজ এগিয়ে যাবে? কাল আদর্শ খাড়া করে, কিসের উপর ভিত্তি করে জোর পদক্ষেপে নবীন-ছাত্রসমাজ অগ্রসর হবে? কিসে তাদের নিষ্ঠুরতা? তাদের শিক্ষা-মন যখন দেখেছে, তাদেরই ছােখের সময়ে দেশের এক-একজন কর্ম-ধার প্রতি ক্ষেত্রেই মূখে আদর্শের বুলি জড়িয়ে জালমানের সঙ্গে, ভেতরে ভেতরে যতসব অসুচারিত খেল চলেছে, তখন কিভাবে ছাত্রসমাজ ধীর-স্থির হবে, আপন জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে? এসব কারণে ছাত্রদের মনের মধ্যে স্বাভাবিকই একটা প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি হচ্ছে।

আজ দেখতে পাচ্ছি দেশের আর্থিক অবস্থা, অবস্থলতা কি নিদারুণভাবে প্রতিফলিত করছে দেশের জনসাধারণকে, তাদের চিন্তাকে। শৃঙ্খলায় দু'বেলা ভাত

জোয়ারেই ব্যক্তি বতীর হিম্মত খেতে যান। তার ওপর হঠাৎ বত বরষার চিন্তা-ভাবনা, অশান্তি। এসব অবস্থায় স্বপ্ন করে কত-ব্যক্তির মতো প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি করে, এ অবস্থায় এর প্রভাব থেকে ব্যক্তির মনোভাবেরও বাদ যায় না। তারা এটুকু বুঝে থেকেই তখন সচেতন দৃষ্টি-ভঙ্গীর অধিকারী হয়ে ওঠে। অপর বয়সেই পরিপক জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাস্তব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে নেয়। দেশে অনটন, দুর্নীতি, চালবাজী ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করলেই ছেলেমেয়েরা মনের মধ্যে বিদ্রোহের দান বাঁধিয়ে তোলে। গরীবরা গরীব হচ্ছে, ধনীরা ক্রমান্বয়ে ধনী হয়েই চলেছে, নেতারা ভোগবিলাস, সূখের মধ্যে থেকে নীতির কথাই করে চলেছে, গরীব শ্রেণীদের জন্যে দরদে ফেটে পড়ছে এসব বজরাদার মন আমাদের ছাত্ররাই দেশের মধ্যে থেকে প্রত্যক্ষ করছে, তখনই সামান্য-তম কারণকেই উগলক করে বিদ্রোহের বীজ, রিক্স মন নিয়ে জেগে ওঠে। তখনই ছাত্ররা চরম উচ্ছ্বলতা শুরু করে দেয়।

এবার আমাদের শিক্ষকদের কথা ভাবি। তারা কিভাবে শিক্ষা দেন? জীবনব্যাপী শৃঙ্খলার তারা নিজেরাই অর্জ-রিত। তাদেরও পরিবার-পরিজন রয়ে-ছেন, সকলের সংস্থানের কথা একজন আদর্শভরা সং-শিক্ষকেই ভাবতে হয়। দেশের অবস্থার সঙ্গেও তাল মিলিয়ে চলতে হয়। দেশে যেখানে অনটন, অভাব-অভিযোগ, দুর্নীতি, গল্প, সেখানে কি করে সামান্য একজন বেতনভুক (তন্ম্বারা প্রতিপালিত একটি বৃহৎ পরিবার), আদর্শ-বান দরিদ্র শিক্ষক আপনাকে নিয়ন্ত্রণে আপন লক্ষ্যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে স্থির রাখতে পারেন? সেটাই ভাববার বিষয়। আদর্শভরা প্রতিটি শিক্ষকের হৃদয় আজ শুষ্ক, মলিন। অসচ্ছল জীবন-যাত্রা তাদের মুখের হাসি, বুকের স্নেহ, প্রাণের মমতা সমস্তই কেড়ে নিয়েছে। এ অবস্থায় ছাত্রদের নিবিড় সান্নিধ্য এসে স্নেহ-প্রতি দিয়ে শিক্ষাদান করতে পার-ছেন কে? তবে এর মধ্যে কিছু সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন দেশের এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট সুযোগ নিয়ে ছাত্র-দের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। এসব শিক্ষকদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

আজ এ সমস্ত বিচার করার সময় এসেছে। ছাত্র-উচ্ছ্বলতার জন্যে কে দায়ী, কে সম্মান করবে? সকলেই ছাত্রদের ইশান জোগাচ্ছে, কিন্তু তাদের নিবৃত্ত হবার জন্যে কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। কারা উদ্যোগী হচ্ছেন এ নিয়ে? এটাই

আমরা ছাত্রদের সমস্ত চিন্তাধারা, ব্যক্তি-ধারী ব্যক্তির তাল করে, ধীর-স্থিরভাবে জড়িয়ে রাখতে দেখবার বিষয়।

সুজন রায়
টাইন কলোয়ালী, আগরতলা
(রিপোর্টার)

গত দু'দিন সপ্তাহ ধরে 'সাম্প্রতিক কলমে'তে সমগ্র ভারতবাসী ছাত্র-উচ্ছ্বলতার সমীক্ষা প্রকাশনার জন্য ধন্য-বাদ জানাচ্ছি। এই সময়েপযোগী বিষয়টির উপর বিভিন্ন লেখা বিভিন্ন রকমের এবং বড় স্বাভাবিক কারণেই যেহেতু সমীক্ষা-গণ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে দেখেছেন ও সমাধানের উপায় খুঁজছেন। কিন্তু একমাত্র গত ১৯শে জানুয়ারীর শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য মহা-শয়ের লেখা প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও ব্যক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্য। এর পূর্ববর্তী লেখাগুলো যেন অতিক্রমদূরত্ব অবশ্যাক বাগাড়ম্বরেই পর্যবসিত বলে মনে হল। ছাত্র-উচ্ছ্বলতাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যাক না কেন, তাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ, এর সমাধানের সহজতর ও গ্রহণীয় মতামতই অধিকতর প্রয়ো-জনীয়। এ বিষয়ে শ্রীভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি প্রশংসার ও রমা চৌধুরীর অকপট স্বীকা-রোক্তিটিও অবিসংবাদিতরূপে প্রশংসার দাবি রাখতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রবন্ধে শিক্ষকদের এ বিষয়ে সর্বপ্রাে দায়ী করেছেন। ছাত্র-উচ্ছ্বলতার মূলে শিক্ষক-শিক্ষিকা-দের কিছুটা দায়-দায়িত্ব থাকলেও বর্তমান ছাত্র-জগৎ একটা ছমছাড়া আদর্শহীন পারিপার্শ্বকে বাস করছে বলেই আজ আদর্শ ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণা অধিকাংশ ছাত্রদের নেই। উপযুক্ত পরিবেশ না হলেও, উপযুক্ত শিক্ষা ও ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আরও নিকটতর না হলে প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ সম্ভব নয়। হাজার দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেও ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শৃঙ্খলার অভ্যাসই ধীরে ধীরে ছাত্রকে আদর্শবান করে তুলতে পারে। প্রাত্যহিক জীবনে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই এ বিষয়ে প্রতি পদক্ষেপে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। নিজে মনে-প্রাণে সং ও নিঃস্বার্থ হলে অপরে তা দেখে দেখে শিখবে ও শিখতে বাধ্য। বর্তমান ভারতের ছাত্র-উচ্ছ্বলতার রূপ দেখে মনে হয় সমগ্র দেশের ছাত্র ও শিক্ষকমহলে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং তা না হলে বর্তমান অবস্থা দেখে বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমরা এক অন্ধকার আশাহীন গর্তে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছি।

শ্রীস্বদেশকুমার ভট্টাচার্য
কলিকাতা-৫৬

সাম্প্রতিক বসুমতীর গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বার্ষিক	চাঁদা (সডাক)	১৪.০০
ষাণ্মাসিক	" "	৭.০০
ত্রৈমাসিক	" "	৩.৬০

দিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপনাকে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠ্যাবলি নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাম্প্রতিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নান-টিকানামসহ ডাকটিকিটসহ খরচ থাকবে একমাত্র মনোনীত গল্প কেবল পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা কেবল পাঠাবার সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

এবার ক্রে-ফোল লড়াই

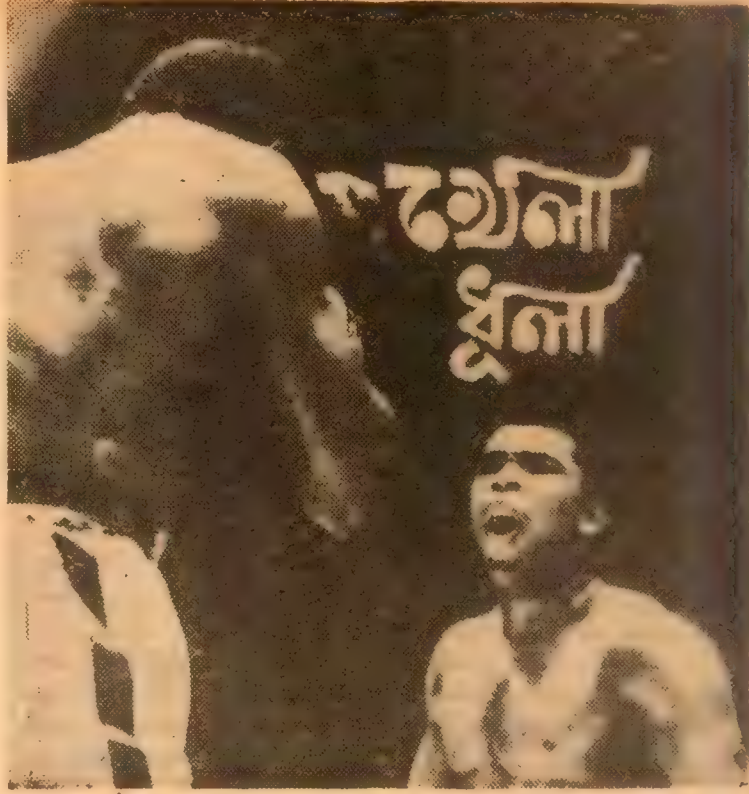
বিশ্ব হেভী ওয়েট খেতাব অক্ষর রাখার জন্য ক্রে আগামী ২২শে মার্চ নিউ ইয়র্কে জোরা ফোলির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য রিংয়ে অবতীর্ণ হবেন। ১৯৬৪ সালে সোনী লিস্টনকে পরাজিত করে বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ানের খেতাব লাভের পর এই লড়াই তাঁর নবম লড়াই। আর আজ পর্যন্ত পেশাদার গ্রহণের পর ক্রে লড়াইয়ে মোট আঠাশটি লড়াই। বিশ্ব হেভী ওয়েট খেতাব রক্ষার জন্য নিউ ইয়র্কে ক্রে এই প্রথম লড়াইয়ে।

১৯৬৩ সালে আর্ন টেরেলের কাছে পরেপেটে পরাজিত হবার পর জোরা ফোল আর পরাজিত হন নি; কিন্তু ১৯৬৪ সালে জার্মানিতে মিল্ডেনবার্জের সঙ্গে তাঁর লড়াই ড্র হয়। এই মিল্ডেনবার্জ-কেই গত বছরের শেষের দিকে ক্রে নক আউটে পরাজিত করেন। জোরা ফোল সম্বন্ধে ক্রে পূর্বে কয়েকবার প্রশংসা করেছেন। ৩৪ বৎসর বয়স্ক ম্যাণ্টেবোম্বা জোরা ফোলি কিছুদিন পূর্বে ক্রে-টেরেলের ম্যাণ্টেবোম্বের সময় দশক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

গ্র্যাক মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন পাণ্ডা মহম্মদ আল ক্রে মকা যাবার কথা ছিল সৌদি আরবের রাজার আমন্ত্রণে আতিথি হিসাবে, কিন্তু জোরা ফোলির সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য মকা যাত্রা আপাতত তিনি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিদায়ের পথে সিম্পসন

সবে কি ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়েই ববি সিম্পসনকে ক্রিকেটের অঙ্গন ছেড়ে যেতে হবে? বিশ্বখ্যাত অস্ট্রেলিয়ার অতীত টেস্ট খেলোয়াড় কিথ মিলার একেবারে বাতিল বলে মন্তব্য করেছেন অধিনায়ক সিম্পসনকে। মিলারের মত সিম্পসনের মত এমন ব্যর্থ অধিনায়ক অস্ট্রেলিয়া পায় নি বললেই চলে। কিথ মিলার একটু স্পষ্টভাবে, কথা তিনি কখনও ঘুরিয়ে বলেন না, সাক্ষা ক্রিকেটারের মত সোজাসুজি মনের কথা বলে দেন। ডেইলি এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে কিথ মিলার লিখেছেন যে, 'সিম্পসন একজন কুশলী ক্রিকেটার বটে, কিন্তু অধিনায়ক নন।' ববি সিম্পসনের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ২-১ ম্যাচে অগ্রগামী হয় তৃতীয় টেস্টের পর। চতুর্থ টেস্টে নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন হয় অস্ট্রেলিয়া, ভাগ্যের জোরে বৃষ্টির জন্য কোনক্রমে রক্ষা পায় তারা। চতুর্থ টেস্টে টেসে জয়ী হয়ে সিম্পসন এক বিরাট ভুল করে বলেন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে।



ক্রে কাছে পরাজয়ের পূর্ব-মুহুর্তে, আর্ন টেরেল

অবশ্য প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর সিম্পসন স্বীকার করেন যে তিনি পিচ ঠিক বুঝতে পারেন নি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়কের এই ধরনের মারাত্মক ভুলের কি কোন ক্ষমা আছে।

কিথ মিলার বর্তমানে ডেইলি এক্সপ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করছেন। তিনি পোর্ট এলিজাবেথের

মিলার বলেছেন যে, গত তিনটি সফরে সিম্পসনের অধিনায়কত্ব দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে এবং তাঁর মতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের মঙ্গলের জন্য বর্তমানে তাঁর বিদায় গ্রহণ করা উচিত। ব্যাটসম্যান হিসাবে সিম্পসন অতুলনীয়, তাঁর মত স্লিপ ফিল্ডারের জুড়ি মেলা ভার আর বদলী বোলার হিসাবে সিম্পসন যে কোন দলেরই সম্পদ।

কিথ মিলার অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের মানের অবনতির জন্য নির্বাচকমণ্ডলীকে দোষ দিয়েছেন। মিলার বলেছেন যে, নির্বাচকমণ্ডলী সিম্পসনকে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলের অধিনায়কের পদে কার্যকর অর্পণ করেছেন বটে, কিন্তু টেস্টের আসরে তাঁর যোগ্যতা দেখেন নি, কারণ অস্ট্রেলিয়া দল কয়েক বছর বিদেশ সফর করছে। মিলারের মতে একমাত্র বিল লরীই সিম্পসনের হাত থেকে অধিনায়কত্বের ভার গ্রহণ করতে পারেন নিজের হাতে যদিও তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে কিংবা সন্দেহ অবশ্য বর্তমান।

সোবার্গ ওরেন্ট-ইন্ডিজ

শেখমেন

গ্যারাকিন্ড সোবার্গ বারবাডোজের ব্রিজ টাউনে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, ভারতের ক্রিকেট মানের কয়েক

প্রীতিমিত্র

পঞ্চম এবং শেষ টেস্টের পূর্বে সিম্পসন সম্বন্ধে একেবারে চরম মন্তব্য করে বসেছেন তাঁর ওই দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখায়। তিনি বলেছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলার অস্ট্রেলিয়া জয়ী অথবা বিজয়ী হোক না কেন অবিলম্বে সিম্পসনকে অধিনায়কের পদ থেকে সরান উচিত। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট নির্বাচকমণ্ডলীর এই চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। রিচি বেনোর নেতৃত্বে যে অস্ট্রেলিয়া দল মাত্র কয়েক বছর আগেই বিশ্ব জয় করেছিল, সিম্পসন বেনোর স্থান গ্রহণ করার পর সেই অস্ট্রেলিয়াই একেবারে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে।

জন্মিত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ইংলন্ড সফরের চেয়ে এবারের ভারত সফরে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বয়ং গ্যারী। ভারতের খেলোয়াড়দের ফাস্ট বোলার তীর্থে যে কেটে গিয়েছে তা বেশ বোকা গিয়েছে কয়েকটা খেলার ইল-গ্রীফিথের দৃষ্টিতে দেখে। সোবার্সের মতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা বর্তমানে যে ফলাফল প্রদর্শন করছেন তাতে অস্বাভাবিকভাবে তারা অনেক শক্তিশালী দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারবেন। এই প্রকল্পে ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক পর্তোনিরও প্রশংসা করেছেন সোবার্স।

এবার ভারত সফরে এলে বোম্বাইয়ে সতেরো বৎসর বয়স্কা ভারতীয় সিনেমা তারকা অজয় মহেন্দ্রর সঙ্গে সোবার্সের পরিচয় হয় এবং এই প্রথম দর্শনে ভাল-বাসার পর দু'জনের বিবাহের প্রস্তাব হয়। ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ভারত সফরের শেষে দেশে ফেরার সময় অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স দলের সঙ্গে না গিয়ে কিছুদিন বোম্বাইয়ে অবস্থান করেন।

ব্রিজ টাউনে সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে গ্যারী সোবার্স জানান এ অজয় মহেন্দ্রর সঙ্গে বিবাহের কথা তারা ইংলন্ডে অথবা বারবাডোজে অবস্থান করবেন। তবে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ক্রিকেট দল যতদিন তাঁর প্রয়োজন অনুভব করবে ততদিন তিনি ওয়েস্ট-ইন্ডিজের হয়ে খেলবেন। এ বছর গ্রীষ্মকালে ইংলন্ডের স্ট্যাফোর্ড-শায়ার ক্রিকেট লীগে নট্টনের পক্ষে খেলার জন্য সোবার্স চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

বিশ্ব একাদশে বোরদে

ভারতের টেস্ট ক্রিকেট দলের মধ্যমণি চান্দ্র বোরদে বিশ্ব ক্রিকেট একাদশে স্থান লাভ করেছেন: এ ছাড়া পাকিস্তানের মুস্তাক মহম্মদ এবং অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকজিককেও দলভুক্ত করা হয়েছে। আগামী মাসে বারবাডোজে বিশ্ব ক্রিকেট একাদশ এবং বারবাডোজের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হবে। পূর্বে ঠিক ছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রীম গোলক, পিটার গোলক এবং কলিন ব্র্যাড বিশ্ব

একাদশের হয়ে খেলবেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার একজন মন্ত্রী একটি বিবৃতি ঘটল যত বিপত্তি। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের মতুপায় হিসাবে ওই মন্ত্রী জানানেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার জন-গ্রহণকারী ইংলন্ডের অস্বাভাবিক টেস্ট খেলোয়াড় বেসিল ডি ওলিভেরেরাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না ইংলন্ড টেস্ট দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের এই 'মত' বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতিবাহে বিশ্ব একাদশের দলভুক্ত তিনজন দক্ষিণ আফ্রিকান খেলোয়াড়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

বিশ্ব একাদশের নির্বাচক গ্রায়র অন্যতম বিশ্বব্যাপ্ত খ্রীড়া সাংবাদিক সোয়ার্টস জানান যে, ম্যাকজী এবং মুস্তাক আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তবে বোরদের খবর এখনও তারা পান নি।

রোভার্স কাপ

জোর কদমে এগিয়ে চলেছে বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপের খেলা। কলকাতার শক্তিশালী দলগুলি এখনও রোভার্স কাপের আসরে গিয়ে উপনীত হয় নি। কলকাতার দু'টি দল ইতিমধ্যে অবশ্য রোভার্সের খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এই দু'টি দল হল মহামেডান স্পোর্টিং এবং বালী প্রতিভা।

মহামেডান স্পোর্টিং দল বিস্তারিত রাউন্ডে মহারাজ কুটুবল এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে রোভার্সের প্রথম খেলায় মিলিত হয়। মহামেডান দল ৩-২ গোলে জয়ী হয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়। মহারাজ দল প্রথমার্ধের সূরুতেই প্রথম গোল করে অগ্রগামী হয়। মহামেডান দল প্রথমার্ধে একেবারেই তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারে নি। দু'টি সহজ গোল করার সুযোগ এই সময় অর্জন করেন মহামেডান দলের ফরোয়ার্ডরা।

দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু মহামেডান আক্রমণ-ধারা রচনা করতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে গোল পরিশোধ করে দ্বিতীয় গোল দিয়ে অগ্রগামী হয়। গোল দু'টি করেন লতিফ এবং বাসির। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই মহারাজের নাইডু গোলটি পরিশোধ করে দেন। খেলা শেষ হবার মাত্র পাঁচ মিনিট পূর্বে মহামেডানের পক্ষে বিজয়সূচক গোলটি করেন বাসির।

কলকাতার বালী প্রতিভার পরাজয় ঘটে ব্যাংগালোরের সি, আই, এল-এর কাছে। সি, আই এল ৩-১ গোলে বালী প্রতিভাকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়েছে। বালী দল পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু ভাল খেলেছে সি, আই



ববি সিংসন



সোবার্ন

এল-এর বিপক্ষে। খেলার প্রথমার্ধে কোন গোল হয় নি। প্রথমার্ধে সি, আই এল একটি পেনাল্টির সুযোগ লাভ করে কিন্তু সি, আই, এল-এর অধিনায়ক ব্যারের ওপর দিয়ে সট মারেন। সি, আই, এল-এর পক্ষে প্রথম গোল করেন পাম্পানা কিন্তু অসুস্থতায় দুই মিনিট পরে গোলটি পরিশোধ করেন। ব্যাংগালোরের পক্ষে পরবর্তী দুটি গোল করেন পাম্পানা এবং আমজাদ খান।

ককানের নতুন সন্মান

নব্য পঞ্চাভূষণ সন্মান লাভের পরই "হেলমস ওয়াল্ড ট্রফি" লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ টেনিস



বোরণে



জ্যাকোবী

খেলোয়াড় রমানাথন কুকান। ক্যালিফোর্নিয়ার হেলমস স্পোর্টস ফেডারেশন ১৯৬৬ সালে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসাবে তাঁকে এই সন্মান প্রদান করেছেন। ইতিপূর্বে আরও দু'জন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ এই ট্রফি লাভ করেছেন। হেলসিংকি অলিম্পিক হকি বিজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক কে ডি সিং (বাবু) এবং উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং।



রোভার্স কাপের খেলায় বালী প্রতিভার মৌলরক্ষক শ্রী সি, আই এল-এর রোভার্ড গাম্পানার সট প্রতিহত করছেন।

এ বছর আরও পাঁচজন ক্রীড়াবিদ এই সন্মান লাভ করেছেন—অস্ট্রেলিয়া থেকে টেনিস খেলোয়াড় এবং বর্তমানে পেশাদার খেলোয়াড় ফ্রেড স্টোলে; স্পেনের টেনিস তারকা উইমবলডেন বিজয়ী মানুয়েল সান্তানা ইউরোপ থেকে; আফ্রিকা থেকে বিশ্বখ্যাত কিশোরী সাভার, দক্ষিণ আফ্রিকার কারেন মুর; উত্তর আমেরিকা থেকে দৌড় বীর জেমস রায়ন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কলম্বিয়ার দূর পাল্লার দৌড়বীর আলভারো মেজিয়া!

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ব্যাখ্যাবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু পুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঘরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা সুশোভিত।

মূল্য—১২ পংক্তির দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

বাংলা হকির সমস্যা

বাংলার হাকির ভাগ্যাকাশে বর্তমানে ঝলছে জোর ক্ষমতার লড়াই। এই ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্য এই মরশুমের হকি খেলা সম্বন্ধে এক বিরাট অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল, অবশ্য বর্তমানে সেই অনিশ্চয়তার মেঘ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। এমনই অবস্থা জটিল আকার ধারণ করেছিল যে, ভারতীয় হাকি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জিমি নাগরওয়াল্লা সভাপতি অশ্বিনীকুমারের দৃঢ় হিসাবে কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন বিবাদ মেটোতে।

বাংলা হকির চেহারা খুব একটা আশাপ্রদ নয়। কারণ ডজন ডজন বাইরের খেলোয়াড় ছাড়া কলকাতার মাঠে হাকি চলে না। নামী দলগুলিতে খুঁজলে একটাও স্থানীয় খেলোয়াড় পাওয়া যাবে না। বড় বড় দলগুলির অবশ্য ধারণা যে বাংলার ছেলেরা হাকি খেলতে পারে না; আর চোখ তাদের ট্রফির মোহে আচ্ছন্ন বলেই তাদের লক্ষ্য বাংলার বাইরের খেলোয়াড়দের প্রতি। কলকাতার দলগুলির এই ধরণের মনোভাব যখন, তখন বেঙ্গল হাকি এ্যাসোসিয়েশনেরও কিছু কর্তব্য ছিল।

বাংলার হকির উন্নতির জন্য বি, এইচ, এ কি করেছেন? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হলে উত্তর হবে 'কিছুই না'। অবশ্য বি, এইচ এ-র কর্তব্যাক্ষিরা বলতে পারেন যে ময়দানের বড় বড় দলগুলির মনোভাব অন্য রকম হলে তাঁরা কি করতে পারেন। কিন্তু বি, এইচ, এ কি আমাদের বাংলার ছেলেরা হকির প্রতি আকৃষ্ট হবার জন্য কোন পরিবেশের সৃষ্টি করতে পেরেছেন? বাংলার বাইরের খেলোয়াড়দের এখানে খেলার ব্যাপারে কিছু বাধা-নিষেধের সৃষ্টি করতে পারলে অবশ্য কাজ হতে পারত কতকাংশে। দল বদলের ব্যবস্থা এবং আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল এই ক্ষেত্রে। যেমন ধরা যাক কোন দলে পাঁচজন বা দু'জনের বেশি বহির্বাংলার খেলোয়াড়দের খেলতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে বাংলার ছেলেরা সুযোগ লাভ করতেন। এবং একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই ধরণের সুযোগ লাভ করলে বাংলার ছেলেরা হকিতেও সুনাম অর্জন করতে পারতেন নিশ্চয়।

এবার কলকাতা হকির কপাল যে মন্দ তা বেশ বোঝা গিয়েছিল দুই পেশাদার ক্রীড়ারাজনীতিকের প্রচ্ছন্ন ছায়া দেখেই। পঞ্চজ গুপ্তের দলবল বেশ অনেকদিন থেকেই মনের আনন্দে রাজস্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতা হকির জগতে। ফুট-

বল থেকে পাজা লড়াইয়ে পরাস্ত হয়ে পঞ্চজ গুপ্ত নির্বিবাদে দলবল নিয়ে বেশ ছিলেন। হঠাৎ কি হোল দস্তারায়ের দলবলের নজর পড়ল হকির দিকেও। দস্তারায় সাহেব করিৎকর্মা লোক। নিজের লোকজন নামিয়ে দিলেন আসরে, বাংলা হকির জগতে উপদলের সৃষ্টি হল। প্রমাদ গুণলেন গুপ্তমশাই গেল বাকি সব মান-সম্মান ক্ষমতা। হাকি খেলার কি হবে, বা লীগ খেলা সুরু করতে হলে এসব কথা চিন্তা করার সময় কোন দলেরই থাকল না। দুইদল তখন ল্যাং মারতে বাসত, একমাত্র



ইনামুর রহমান

লক্ষা অপর পক্ষকে ল্যাং মেরে কিভাবে ক্ষমতা হাতে রাখা যায়, গদী আঁকড়ে থাকা যায়। দুটো ক্লাব তো মামলাই ঠুকে দিল আদালতে, অবশ্য দুটি মামলাই প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

দস্তারায় হকির জগতে পা বাড়িয়েই কিছু বাজমাং করে দিয়েছেন, ভোটের জোর তাঁর হাতে। দস্তারায়ের দলের মতে কাউন্সিলের বাইশটা ভোটের মধ্যে ১০টা

ভোট তাঁদের হাতের মৃত্যুর মধ্যে। এই সত্যটা অনেক দৃষ্টে অবশ্য পঞ্চজ গুপ্তের দল স্বীকার করেছেন।

ভারতীয় হাকি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশ্বিনীকুমারের ব্যক্তিগত দৃঢ় হিসাবে জিমি নাগরওয়াল্লা কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন বিবাদের অবসান করার জন্য। শ্রী নাগরওয়ালার কঠোর মনোভাবের জন্যই দুটি মামলাই আদালত থেকে প্রত্যাহৃত হয়। জিমি নাগরওয়াল্লা কলকাতায় উপনীত হয়ে দস্তারায়ের উপদলের কাছ থেকে যথেষ্ট সম্বর্ধনা লাভ করেছেন; কিন্তু পঞ্চজ গুপ্তের উপদল কিন্তু নাগরওয়ালার আগমনে খুব সন্তুষ্ট নয়। তাদের অভিযোগ যে নাগরওয়াল্লা এসে অন্যদিকের প্রতিই ঝুঁকে পড়েছেন। মধ্যস্থতা করতে এসে এই একচক্র মনোভাবের জন্য নাগরওয়াল্লা সাহেবের ওপর চটে গিয়েছেন পঞ্চজ গুপ্তের উপদল। এছাড়া গতবছর ইনামুর রহমানকে নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে বি, এইচ, এ'কে এই নাগরওয়াল্লা সাহেবই লোকচক্ষে হেম প্রতিপন্ন করেছেন বলেও গুপ্ত উপদলের একজন মুখপাত্র অভিযোগ করেন।

অবশেষে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়দানস্থ তালতলা তাঁবুতে অনুষ্ঠিত বি, এইচ, এ'র সভায় নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং দেড়মাসব্যাপী ক্ষমতার লড়াইয়ের অবসান হয়। দুইদলের মধ্যে আপোষ রফার ব্যাপারে জিমি নাগরওয়াল্লা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কর্মপরিষদে বেশ কিছু রদ-বদল হয়। বি, এইচ-এর সভাপতি রঞ্জিত গুপ্ত এবার অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁর স্থানে পঞ্চজ গুপ্ত সভাপতি নির্বাচিত হন। সহ সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীজ্যোতিষ গুপ্ত এবং শ্রীধীরেন দে।

সম্পাদকের পদটি নিজেই গুণ্ডাগোলের সৃষ্টি হয়েছিল বেশ। কারণ দস্তারায়ের উপদলের পক্ষ থেকে সন্তোষ গাঙ্গুলী সম্পাদক পদের প্রার্থী ছিলেন কিন্তু গুপ্ত উপদল সন্তোষ গাঙ্গুলীর নির্বাচনে তাঁর বিরোধিতা করলে ঠিক করা হয় যে কাস্টমসের ফাটোডো অথবা আমেরিনাসের এয়ারাটনের মধ্য থেকে একজনকে সম্পাদকের পদে বসান হবে। উভয় দলের সম্মতি অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন জে. ডি. এয়ারাটনই। সহ সাধারণ সম্পাদক পদ দেওয়া হয় সন্তোষ গাঙ্গুলীকে।

—মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

দিনবদলের পালা

শান্তিপ্রিয়
বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রিকেটে যেমন বাস্বে, ফুটবলে তেমনি ছিলো বাংলা।

অর্থাৎ ক্রিকেট আর ফুটবল এই দুটি বিষয়ে বস্বে আর বাংলার প্রাধান্য এতোদিন ছিলো একত্রে। ভারতীয় ক্রিকেট দলে তাই দেখা যেতো বস্বেব খেলোয়াড়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর ভারতীয় ফুটবল দলে বাংলায়। তাই এতোদিন ক্রিকেটের কথা বললে বস্বে আর ফুটবলের কথা বললে বাংলাদেশের নামই সবার আগে সকলের মনে আসতো।

কিন্তু দিনকাল বদলিয়েছে। তাই একচেটে প্রাধান্যের বন্ধ বোঝ হতে শুরু করেছে। আর তার সঙ্গে ভাল দিয়ে বাংলা আর বস্বে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিজেদের প্রেরণ।

তবে এই পালা বদলের পেছনে রাজনীতিও যে বেশ ভূমিকা রেখেছে তা অস্বীকার করা যায় না। আর তা নেই বলেই এই লক্ষ্যাকর সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া ভার। তবে তাতে কারো কিছু যায় আসে না। কারণ আমাদের ছাড়া কত পক্ষের কানে শব্দ তুলেই দেওয়া নেই, তাঁদের নেই কোন লক্ষ্য সরমের বাংলাই।

কিন্তু বায়না তাঁদের সীমা ছাড়া। অনেকটা সেই জঙ্গসাহেবের মতো! নতুন জঙ্গ হয়েই জঙ্গসাহেব বায়না ধরলেন যে, তাকে তার ওকালতি ব্যবসাও করতে দিতে হবে।

আমাদের দেশের ক্রীড়া কত পক্ষের বায়নাও তাই। ওরা খেলাধুলার উন্নতির জন্যে লম্বা-চওড়া কথা বলে নিজেরাই আগে ভাগে খুলে রেখে দেবেন অবনতি আর নেহেরামির দুয়ারগালা!

কলকাতার কথাই ধরা যাক।

ইডেন উদ্যানে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের সময় খেলোয়াড়দের আচরণ আর স্বভাব-চরিত্র নিয়ে অনেক কথাই উঠেছে। পত্র-পত্রিকার বেশ হৈচৈও হয়েছে। কিন্তু খেলোয়াড়রা ভয়ানক অখেলোয়াড়ী আচরণ করার মতো সাহস যে কোথা থেকে পেলেন সে কথা নিয়ে আমরা এতটুকুও চিন্তা করি নি। আমরা একবারও চিন্তা করে দেখি নি যে, বাঁদের ওপর খেলোয়াড়দের সামলানোর ভার ছিলো তাঁরা কি করেছিলেন? কেন খেলোয়াড়রা তাঁদের মেনে

চলেন নি? এ সাহস তাঁরা পেয়েছিলেন কোথা থেকে?

সেইটাই প্রশ্ন, সেইটাই জিজ্ঞাসা। অঞ্চল ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে একজন পেড-ম্যানেজার ছিলেন। তিনি খেলোয়াড়দের সঙ্গে একই হোটেলের থাকতেন, প্রেনে যাতায়াত করতেন, তা ছাড়া পাবেন একটা মোটা ভাতা। লোকাল ম্যানেজারদের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ভারতীয় দলের ঐ পেড-ম্যানেজার-এর বক্তব্য আমাদের কড় জানতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে কোন সাহসে খেলোয়াড়রা তাঁকে পরাস্ত পাওয়া দেন নি।

সাঁতাই তো খেলোয়াড়রা পাত্তা দেননি কাকে! আমরা তো শুনেছি যে খোদ ম্যানেজার সাহেবই হোটেলের বসে ড্রালক-হলের নেশায় বসে হয়ে থাকতেন। যদি ওপর অতোদুলো খেলোয়াড়কে সামলানোর ভার, তাঁকেই যে কে সামলানোর ভার দিত



শান্তিপ্রিয়

নেই। আর সেই সুযোগটাই ভারতীয় খেলোয়াড়রা নিয়োজিতেন পুরোপুরি।

এবার অবশ্য মিলিয়েছো ভালো। একদিকে ম্যানেজার মশাই-এর ঐ অবস্থা আর অপরদিকে দলের অধিনায়ক

পতৌদির নবাবের অবস্থা তো আরো শোচনীয়। বলা বাহুল্য শোচনীয় না বলে রসনীয় বলাই বাহুল্য। তিনি শুধু প্রেমসাগরে ডুব দিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন অথৈ জলে। তবে সে জল আগে থেকেই বোলা হয়েছিলো—তাই রক্ষে।

এরপর যদি ভারতীয় খেলোয়াড়রা একটু বেশি 'ইয়ে' হয়ে ওঠেন তাহলে কি কিছু বলার আছে? কারণ, কি আর বলতে পারেন ম্যানেজার আর দলের অধিনায়ক। কিন্তু সেখানে তো আপর্নি আচারি ধর্ম অপর শিখাও-এর প্রশ্ন।

কিন্তু এ সব করলে খেলার মান যে নেমে যায় সে কথা কে বলবে, আর কলবেই বা কাকে! একান্তই যদি কেউ বলতে যান তো তাঁর কথা শুনে কে!

আর শুনেছে না বলেই ফুটবল খেলার এমন দুরবস্থা। ভারতীয় দল গঠন করতে হলে আজও বাংলাদেশের খেলোয়াড়রাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারী হবেন। কিন্তু তা দিয়ে কি যায় আসে! বাংলাদেশের ফুটবল খেলার মান যে উন্নত হচ্ছে না অন্তত এ কথাটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। করবেনই বা কি করে। জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপের পুরস্কার সন্তোষ ট্রফি বাংলার ভাগ্যে জুটছে না আর। ডুরান্ডে খেলতে গিয়ে বাংলাদেশের নামী দলগুলো দিয়ে এসেছে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়। এখন চলছে রোডার্স কাপের খেলা। দেখা যাক বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা সেখানে কি খেলা দেখিয়ে আসেন।

কিন্তু একটা জিনিস বড় বিগ্রীভাবে আজ আমাদের দুঃখ দেয়। স্বাধীনতা লাভের এতো বছর পরে আজো খেলাধুলায় আমাদের জাতীয় চেতনা এতটুকুও জাগে নি। আজো আমাদের কাছে প্রথমে ক্লাব, তারপরে রাজ্য আর সব শেষে রাষ্ট্র। এ কড়ই পরিতাপের বিষয়।

ফুটবল খেলার বাংলাদেশ আজও সবার সেরা। কলকাতা আজো সমস্ত ভারতের ফুটবল খেলোয়াড়দের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের যেমন লর্ডস মাঠে খেলার শখ, ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের তেমনি শখ কলকাতার মাঠে খেলার। এই শখ মিটতে আর নামী ক্লাবের দামী অহরানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে খেলোয়াড়রা কলকাতায় মেলতে আসেন। তাঁদের অখণ্ড

অবসর। থাকেন আধুনিক আদবকায়দার সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের মধ্যে। কেউ কেউ আবার সামকায়দার চাকরীও করেন। এক কথায় তাঁরা থাকেন রাজার হালে রাজসিক কায়দায়।

আর আমাদের ভেলো, সকালবেলায় বাজার করে কিম্বা রায়শান এনে কোন-



পি লি পোন্দার

রকমে নাকে-মুখে দুটো ডাল-ভাত গুঁজে লোকাল ট্রেনে বুলতে বুলতে হাজির হয় কলকাতায়। তারপর ট্রাম-বাসে বাদড় কোলা বুলে হাজিরা দেয় অফিসে। টিফিনে কোনদিন কিছু জোটে, কোনদিন জোটে না। এরপর বিকেলে আবার তারাই গিয়ে রাজসিক আরামে থাকা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাল্লা দেয় খেলায়। এরপরও কি আমরা আশা করবো তারা খুব ভালো খেলবে।

তবে এ কথা ঠিক বাংলাদেশে অর্থাৎ কলকাতায় এসে না খেলে ভারতীয় ফুটবল দলে স্থান লাভ করা খুবই দুশ্কার। ফুটবল খেলায় বাংলাদেশের প্রেস্টেজের মর্যাদা এখন বোধ হয় এটুকুতেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ফুটবল খেলায় বাংলা আজও অন্য কোন রাজ্যকে বিশেষ পাতাই দেয় না।

আর ঠিক সেইরকমভাবে ক্রিকেট খেলার বাংলা পাতা পায় না এতটুকুও। ভারতীয় ক্রিকেট দলে বাংলার খেলোয়াড়দের স্থান পাওয়া সত্যিই দুশ্কার। তা যদি না হতো তাহলে ভারতীয় দলের হয়ে এতোদিন টেস্ট খেলার সুযোগ পেতেন সুব্রত গুহ, অম্বর রায়, প্রকাশ পোন্দার, ডি এস মুখার্জী এবং আরো কেউ কেউ। কিন্তু ক্রিকেটের রাজনীতির কাছে বাংলাদেশকে চিরকালই হার স্বীকার করতে হয়েছে। যদিও বাংলাদেশেরই কয়েকজন আছেন ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের ওপরমহলে। শব্দ তাই নয়। ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যানই হলেন একজন বাঙালী।

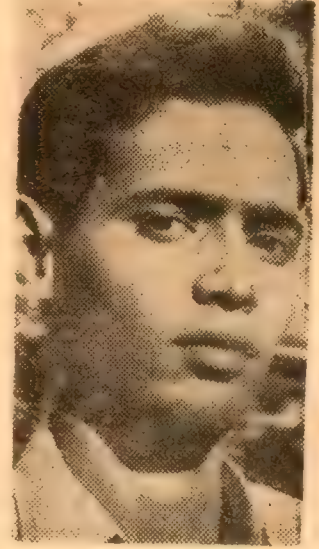
তবু সুব্রত গুহ এবার চাম্প পেলেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায়। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের সাম্মান্য এই যে সুব্রত ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যান্ড বেড়াতে যাবার সুযোগ পেয়েছে। বাংলার পক্ষে বোধ হয় এই যথেষ্ট।

কিন্তু ভারতের পক্ষে যথেষ্ট নয় শ্বেত সফরে রাজী হয়ে ইংল্যান্ড খেলতে যাওয়া। এই সফর হলো ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ। টোপ ফেলেছিলেন ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ, দেখিয়েছিলেন টাকার লোভ। আর সেই মোহেই ভুলে ভারত চলেছে ইংল্যান্ডে আধখানা মরশুম খেলতে!

ভারতের কোনমতেই আধা সফরে সম্মত হওয়া সঙ্গত হয় নি। বছর কয়েক আগে ভারত যখন ইংল্যান্ডে গিয়ে পাঁচটা টেস্টেই হেরে এলো, তখন ইংল্যান্ডের সমালোচকরা—ভারতের পুরো সফর খেলা উচিত নয়, ভারত পাঁচদিনের টেস্ট খেলার যোগ্য নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি সব আবোল-তাবোল কটাক্ষ করেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে। আর আজ মাত্র কয়েক বছর পরে ভারত তাঁদের সেই অর্বাচীন সমালোচনা পরোক্ষভাবে মেনে নিয়ে বৃক ফুলিয়ে চলেছে ইংল্যান্ড শ্বেত ভ্রমণে। কি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

কিন্তু এ কথা ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষকে বোঝাবে কে? ধূমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তোলা সহজ। খুব তাড়াতাড়ি

ভাঙিয়ে দেওয়া যায় তার ক্ষমতা। কিন্তু যে লোক জেগে জেগে ঘুমোয়, তার ঘুম ভাঙবে কে? তার ঘুম তো সহজে ভাঙানো যায় না। ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ এখন জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন। তাই হাজার চেষ্টা করলেও তাঁদের এ ঘুম সহজে ভাঙবে না।



অম্বর রায়

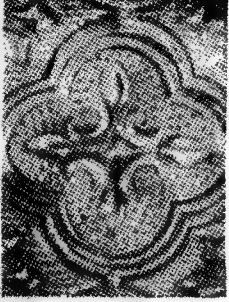
কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না। দিন বদলের পালা আসছে। আসছে অতি ধীরে ধীরে। খালি চোখে সহজে এ পরিবর্তন বোঝার উপায় নেই। উপায় নেই বলেই আজ সাবধান হবার বড় বেশি প্রয়োজন। আর তা না হলে কোনদিন হয়তো ইডেন উদ্যানে এবার যে আগুন জ্বলবে তারই রেশ অপ্রত্যাশিতভাবে ছড়িয়ে পড়বে ময়দানে ময়দানে। আর সে আগুন নিভবে না সহজে। হাজার ফায়ার ব্রিগেডের চেষ্টায়ও না।

তাই আসুন আজ আমরা নতুন কিছু চিন্তা করি, নতুন কিছু ভাবি। নতুন কিছু গড়ায় নেশাই আজই অগ্রণী হই আমরা। আসুন সেই নতুন পথে পা বাড়িয়ে আজ আমরা সকলে গলায় গলা মিলিয়ে বলি, 'অয়মারমন্ত শূভায় ভবতু...'

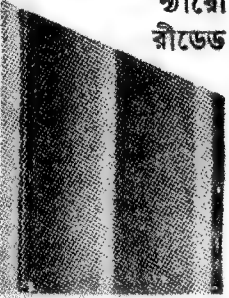
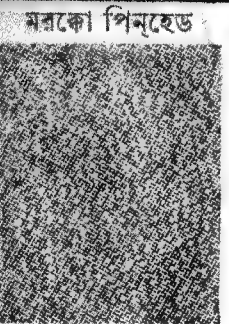
সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

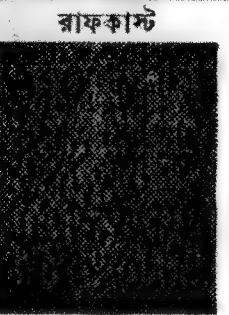
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



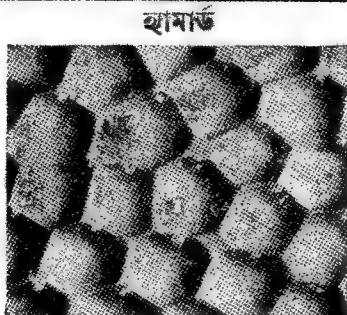
মরেক

চারো
রীডেড

মরকো পিনহেড



রাফকাট



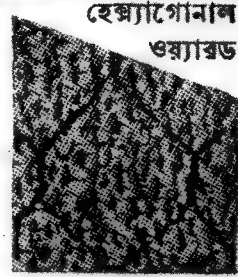
হামাড

আজকালকার
স্থপতিরা
নৃহনির্মাণে
এইচ পি জি
গ্লাস
ব্যবহার করেন

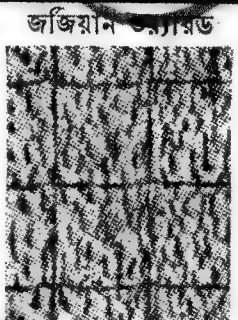
আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-
কাছারি, কলকারখানা, ইমুল ও
হালপাতালে স্থপতি ইঞ্জিনিয়াররা
সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান,
কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি
গ্লাস উৎকর্ষের নিরুত্ত মান বজায়
রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক
বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান
পিলকিংটন ড্রাবার্স-এর কারিগরী
কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান
পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ
পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর-
যোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্লাস ওয়ার্কস
লিমিটেড

হেল্যাগোনাল
ওয়ার্ড

শিট গ্লাস



জর্জিয়ান ওয়ার্ড

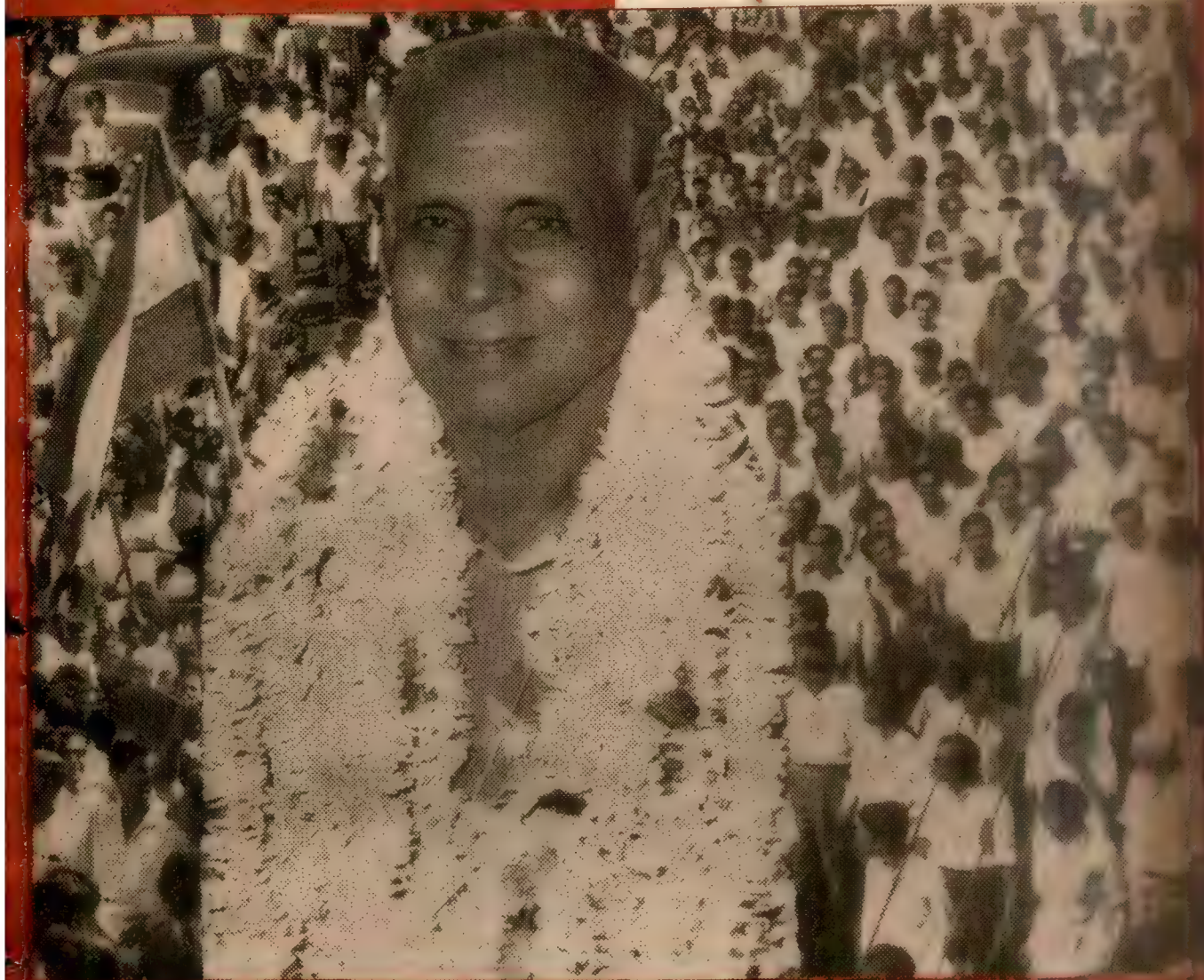
ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ
তালুকদার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন আভে নিউ,
কলিকাতা-১৩

BVRMP 1775A

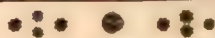
24 FEB 1967

সাপ্তাহিক বসুমতী

বীরের সম্বর্ধনা



বর্ষ : ৩৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ



2nd March, 1967 * Vol. 71, No.



ফেমিলা ক্রিম

একালের রূপ-কথার শেখ বখা

ফেমিলা ক্রিম, কলিকতা



বিষয়	প্রমাণ						পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৭১
আজকের মানুস	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৭২
ভারতদর্শন	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৭৩
জাতকীয়ত্ব	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৮১
চতুর্থ নির্বাচনের পরে (কাবিতা)	— প্রফুল্লকুমার দত্ত						২৩৮৩
স্মৃতির সমাধি (কাবিতা)	— রবিরূপ হোসেন						২৩৮৩
রাজা-উজীর (কাবিতা)	— অরবিন্দ ভট্টাচার্য						২৩৮৩
গ্রন্থমেলা	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৮৪
অলস প্রহর (গল্প)	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৮৬
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৮৯
গ্রাম বাংলার কথা	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৯১
সকল স্পর্ধার শেষ (কাবিতা)	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৯৬
বন্দন	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	২৩৯৭

শৈললাল মনিলাল

সিদ্ধ ও তাঁত বস্ত্র
*
ছোট কাপড়

শৈললাল মনিলাল

বহুবাজার শ্যামবাজার
ফোন-৩৪-২১২৬ টেমজিগার দক্ষিণ

শিখারি
বিছানা

*
শাল ও আলোয়ান

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা-হাস্যরসাবতার-
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক-রস-সাহিত্যের প্রস্টা-
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে-জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিস্মে পাগলা বড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে-সম্ভার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুস, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোষ্ঠ, লীলাবতী, সুন্দরনী কাব্য, প্ৰাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসাহিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাংলায় নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বৈষ্ণবসাহিত্যের জাদিগব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২৪০১
দুবর্ণভাষা (ধারবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	২৪০৪
২১শের সুরে... (কবিতা)	— বিধু চক্রবর্তী	২৪০৬
অগ্নিদেবের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৪০৭
দিল্লী থেকে -	— বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৪১২
পাক-ভারতের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	২৪১৫
চোম্বা নামার চোম্বা উত্তরবঙ্গ	— ...	২৪১৯
কেমন করে আবার হবে (কবিতা)	— মনোরমা সিংহরায়	২৪২২
রা'জগু—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	২৪২৩
রংগজগৎ	— ...	২৪২৬
বেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	২৪২৯

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান
ভাস্করগণের কৌশলভর, ভগবদ্ভগবৎ সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
সদাশ মহাপরিভূক্ত ভক্তিমান সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রলাপ ও শিক্ষাগতক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণভক্তের জন্য যে উৎকর্ষ, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমদ্ভগবদ্গীত 'শিক্ষাগতক শ্লোক' তাহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুদলিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মধুর লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস
বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুলভসার
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপৃক্তিত।

আত্মতত্ত্ব
বৈষ্ণব দর্শনের সুক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা
শ্রীপ্রমোদন দাস ঠাকুর বিরচিত।
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভক্তের নিগূঢ় মনঃসাহিত্য।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুদলিত পদ্যানুবাদ।

পাশ্চাত্য-দলন

মুর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-লীলা।

ভক্তিভক্তসার

হাটপসন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌদ্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের ষড়োত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুদলিত নামগায় মূল্যে বিতরিত।
মূল্য : ৩ টাকা।

শ্রীহেমচন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেনা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির দিনে, বৃন্দদেবের বৃন্দ, কঠোরের কপাল, হাঙর মানুসের চোখের জল, ভুলের ভুল, মৃগী চাচা, বৃন্দদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইন্দুরের কীর্তিকাহিনী, বাদরের মেটলিচকড়ি।

ছড়া—হট্টমালায় ষড়বাড়ী, হোহোহো বৃষ্টি ঝরে, পালোয়ান প্যালারাম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের ব্যায়রাম, হাবুবাবুর মনের কথা, আন্দ কালের বান্দ বৃষ্টি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সূর্য রায় কর্তৃক সূচিত

উপহার দিবস দ্বি-বই।

হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মজুসা

২০০



৭১ বর্ষ : ৩৮শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
মঙ্গলবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 2nd March, 1967

লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক

সুশ্রুত সিংহ আবার জেগে উঠেছে। দীর্ঘদিনের হতাশার বহুক্ষণ সে যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কেউ কম্পনা করতে সাহস পায় নি যে, সুশ্রুত সিংহ আবার জাগবে, তার অন্তরের অসীম শক্তি আবার জেগে উঠবে। আর তার জাগার সঙ্গে ঘটেছে এক এক মূহুর্তে রথী-মহারথীদের পতন। এদের পতনের সঙ্গে মূহুর্তা গেছে কেউ বা, কারণ মানুষের রক্ত শোষণে অভ্যস্ত সেই জীব কোনদিন চিন্তা করতেই পারে নি যে তার চোখের সামনে টাকার পাহাড়ে বসে রথের ঢাকায় এইভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে রথী-মহারথীর দল। কিন্তু ইতিহাস যারা পাঠ করেন, তারা জানেন এভাবেই দিন বদলায়। আর দিন বদলের জন্যে দায়ী মদ্যোপদ্রব্য ক্ষমতাগব্বী সেই রথী-মহারথীরাই—যারা ইতিহাসের পাতা থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে আমরা বারবার প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি। সারা দেশব্যাপী দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং জনবিরোধী যে সব কাজ হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বরং সুবিধা-বাদীরা তাদের সমর্থনই জানিয়ে এসেছে। তবু হতাশায় বিক্ষুব্ধ, দারিদ্র্যে নিমগ্ন জনতার সরল বুদ্ধিকে শেষ পর্যন্ত আচ্ছন্ন করা সম্ভব হয় নি। তারা তাদের রায় দিয়েছে। আজ জনমতের কাছে পরাজিত হয়েছে বহুদিনের দম্ভ, অত্যাচারের অম্ভতা,

লুণ্ঠনের প্রয়াস ও দলের নামে বজ্রাতি। কল্লোলিত কলকাতায় শূন্য নর, সারা পশ্চিম বাংলায় এমন কি বাংলা দেশের বাইরেও সেদিন কি উল্লাস, যে বিজয়োল্লাস একমাত্র যুদ্ধ জয়ের পরেই লক্ষ্য করা যায়। অথচ ক্ষমতার আসীন নেতারা তাদের বক্তৃতায় এমন ভান করে আসাছিলেন যেন একমাত্র তাঁরাই জনদরদী। ভোট তাঁরাই পাবেন। কিন্তু জনতা ভুল করে নি বলেই জনস্রোত জলস্রোতের মতোই সেই দিন নবকল্লোল শুনিয়েছিল এবং মাত্র এক মাস আগে যারা অজস্র মূখোপাধ্যায়কে বঙ্গোপনাগরের জলে নিক্ষেপ করার দম্ভোক্তি করেছিলেন, আজ তাঁরাই ডোবার জলে নিজেরাই ডুবে গেলেন।

অথচ এই ভরাডুবিতে কম্পনা কি তাঁরা নিজেরাই করেছিলেন? শোচনীয় পরাজয়ের একদিন আগেও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে, এবার কে মূখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন।

সেই সাথে বাদ সাধল একমাত্র জনতাই। আর সেই রকম সাধ করার সম্ভাবনা হয়েছিল এই কারণে যে, বিপক্ষ দলগুলি যখন পরস্পর একমত হয়ে নির্বাচনে নামতে পারে নি তখন কংগ্রেসের জয় অবশ্যম্ভাবী। কোন দল নয়, গণতান্ত্রিক দেশে জনতাই সব কিছুর মাপকাঠি—এই বোধ এতকালের শাসকদল ভুলে গেছিলেন বলেই জনসাধারণ এক মূহুর্তে জেগে উঠে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে, ধূলিসাৎ করে দিয়েছে দলীয় স্বার্থ। এতকাল ধরে কংগ্রেসী অপশাসনে সমাজের সর্বস্তরে

যে দুঃশাসনের ছত্রি চালনা করা হবোঁছিল, আজ তার অবসান হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র, কেরানী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক আজ মৃত্তিকার নিশ্বাস ফেলছে। তাদের আশা-ভরসা, বাঁচবার অধিকার এতকাল ধরে অস্বীকৃত হয়েছে। এতকালের সেই অস্বীকৃতির পরিবর্তে তারা চায় মূহুর্তা অন্ন, বোঁচে থাকার জন্যে সহায়তা ও সহানুভূতি। তাদের দাবি কোনদিনই বেশি নয়, সেই সঙ্গে তারা এও চায় না যে, তাদের চোখের সামনে তাদের রক্তে গড়ে উঠবে মূনাফালোভীদের টাকার পাহাড়। আজ তাদের দাবি, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বীকৃতি লাভের পথে।

পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রীর পদে এবার যিনি অধিষ্ঠিত হচ্ছেন, তাঁর নিঃস্বার্থপর আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামী জীবনের প্রতি জনগণের অপরিসীম প্রশংসা আছে। তাই তারা তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা জানিয়েছে এবং জনসাধারণের সেই আস্থার প্রতি আমরাও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, জনতার রক্তরোধে ফলে অপসারিত ক্ষমতাসীল দলের নানা অপচেষ্টা, কারসাজি ও আমলাতান্ত্রিক নানা চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে গ্রীষ্মের মূখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে সত্যিকারের লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

সম্পাদিকা

আজকের মানুষ

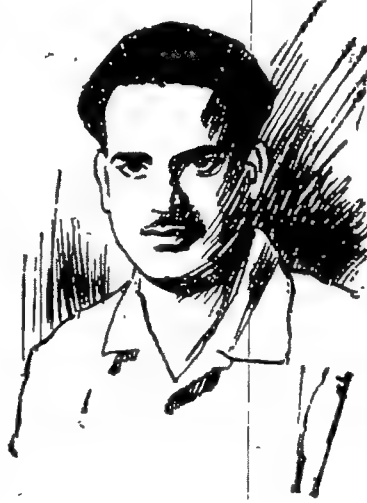
‘বাঁচতে চাইলে লড়তে হবে, অন্যথায় মরতে হবে—’ এই শ্লোগান নিয়ে ‘৪৭ সনে লড়াই জিতেছিলেন। ২০ বছর পরে যে-লড়াই তিনি জিতলেন তার শ্লোগানও যেন অনেকটা এক সুরে বাঁধা। বাংলা দেশের বৃক্কের ওপর যেন জগন্মল এক পাখর চেপে বসেছিলো। সে-পাহাড় টলিয়েছেন, প্রগতির পথে যে-বাধা এতদিন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলো, তাকে অপসারণ করেছেন। আর তা অপ-সাধন করেছেন শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, যিনি বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে দুর্ধর্ষ অত্যা ঘোষকে পরাজিত করে ‘জায়াশ্রী-কিলার’ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেন।

বন্দিত্ব জিতেন বিশ্বাস নেহাতই সাধারণ মানুষ, এবং সাধারণ মানুষ বলেই, পা দু’টি তার কঠিন মাটির ওপর রয়েছে বলেই, সংগ্রামী জনতার সঙ্গে তার আত্মিক ও কারিক যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন বলেই ভোটার জনগণের তাঁদের আপনার লোককে বেছে নিতে কষ্ট হয় নি। জনতার সঙ্গে শ্রীবিশ্বাসের এ যোগাযোগ আজ থেকে বা এ নির্বাচন উপলক্ষেই কেবল নয়, কিংবা জনতার বিশ্বাস তিনি আজই প্রথম অর্জন করলেন না, শ্রীবিশ্বাস জনতার প্রতিনিধি সিকি শতাব্দী আগে থেকে। ১৯৪২ সালে যখন গান্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ‘ভারত ছাড়ো’ নোটিশ দিলেন, যখন সারা ভারত আগস্ট আন্দোলনের তরঙ্গে উদ্বেলিত তখন ফলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রণীরা ছাট শ্রীবিশ্বাসও সে তবল্লম্প্রোতে গা না ভাসিয়ে পারেন নি।

আগস্ট আন্দোলনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে শ্রীবিশ্বাস প্রথম কারাগার দর্শন করেন। তারপর ১৯৪৫ সনে শহীদ ব্রাহ্মস্বর দিবস পালন বা ছাত্র-আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার কারাবাস করতে হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যু পেলে বটে, কিন্তু ঘোষণার আবার মৃত্যু কি? ‘৪৬ সনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাক্স যখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এ-এলাকা থেকে সে-এলাকায়, এ-রাজ্য থেকে সে-রাজ্যে, শ্রীবিশ্বাস ছুটে গেলেন দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে, নিজেস্ব বিপদ হলো, দাঙ্গাকারীদের হাতে প্রচণ্ডভাবে আহত হলেন তিনি, কিন্তু শান্তি পতাকা তাঁর নোয়াতে পারে নি কেউ। শান্তি-সৈনিকের বেশে রোর-

ক্কোতেও দেখা গিয়েছিল শ্রাবশ্বাসকে। প্রাণভয়ে ভীত মানুষদের, আশা-ভরসার স্থল হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিলেন সৈদন শ্রীবিশ্বাস।

দেশ স্বাধীন হলো, দেশ গঠনের পালা এলো, আর এলো রাজনৈতিক কর্মী-দের বিশ্রামের সুযোগ। কিন্তু বিশ্রামের অবসর জিতেনের কোথায়? পূর্ববঙ্গ থেকে হাজার হাজার উদ্ভাস্ত এলো, তাদের পুনর্বাসনের, নতুন করে ঘর বাধার ব্যবস্থা করতে হবে যে। শ্রীবিশ্বাস বিএ পড়-ছিলেন তখন, তরুণ সমাজকর্মী শ্রীবিশ্বাস পৃথিবীর তুলে রেখে আজ নেহাট্টা কাল সোদপের, এ-বেলা স্বাধীন



জে এম বিশ্বাস

ও-বেলা টালিগঞ্জ করতে লাগলেন। তারা এদেশের লোক—এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন, নিখিল বঙ্গ বাস্তুহারা পরিষদের প্রথম সম্পাদকরূপে।

সামসারিক চাপে শ্রীবিশ্বাসকে শিক্ষকতা নিতে হয়েছিল, কিন্তু সে বেশি দিনের জন্যে নয়, একটার পর একটা আন্দোলনের ঢেউ এলো, আর তিনি গেলেন ছুটে। নেতাগিরি তাঁর পেশা নয়, দিন তাঁর চলবে কি করে। শ্রীবিশ্বাসকে কাজের স্থানে বেরতে হলো। রেল বিভাগে কাজ নিয়ে শ্রীবিশ্বাস প্রথমে কেরানী ও পরে গার্ড-এর পদ পেলে, কর্মস্থল পাটোতে হলো তাঁকে বাংলা দেশ ছেড়ে পূর্বলিঙ্গম। পূর্বলিঙ্গম উদ্ভাস্ত সমস্যা নেই, রেল দপ্তরেও এ সমস্যা অবাস্তর, কিন্তু তাই

বলে কি এখানকার জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের? বাঙালী অধরাষিত পূর্বলিঙ্গাকে পাশ্চাত্যবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে তখন এখানকার লোকসেবক সংঘ ছোড়দার আন্দোলন চালাচ্ছে, শ্রীবিশ্বাসের সংগ্রামী মন সহজেই আকৃষ্ট হলো এ যুক্তিসংগত ও ন্যায্য আন্দোলনের প্রতি। আর রেল সমস্যার অন্ত নেই। দুর্নীতি এখানে বাসা বেঁধেছে। শ্রীবিশ্বাসের মন বিদ্রোহ করলো এ অন্যায় ও দুর্নীতি-পরায়ণতার বিরুদ্ধে। রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের আন্দোলন গড়ে তুললেন তিনি। একজন সহকারী স্টেশন মাস্টারকে বিহার কৃৎপক্ষ অন্যায়ভাবে কারাবাস করলে শ্রীবিশ্বাস আমরণ অনশন করেন। কৃৎপক্ষ বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা দেখে ১২ মাস্টার মধ্যে ওই সহকারী স্টেশন মাস্টারকে মৃত্যু দিতে বাধ্য হন।

রেল কর্মচারী ও শ্রমিকদের দাবি-মাওয়া নিয়ে শ্রীবিশ্বাস অচিরে আন্দোলন গড়ে তুললেন। সারা আদ্রা ডিভিশনে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো কুশলী সংগঠক এবং দরদী বন্দু ও গরীবের সুখ-দুঃখের শরিক হিসাবে। কিন্তু এ বাবদে তাঁকে লাঞ্ছনাও কম পোহাতে হয় নি। প্রথমে কারাবাস, পরে বদলী, সাসপেন্সন এবং সবশেষে চাকরি থেকে বরখাস্ত ইত্যাদি। রেল দপ্তর শ্রীবিশ্বাসকে অস্বীকার, অগ্রাহ্য করেছে, ঘোষণা করেছে দপ্তরের সংগে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই বলে; কিন্তু তাঁকে কি বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন, সরকারী-ভাবে, কাগজে-কলমে রেলের তিনি কেউ নন, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব রেল পথ বা আদ্রা বিভাগ তো জানে রেল-কর্মচারীদের তিনি কে ও কতখানি নিবিড় যোগাযোগ, তিনি যে তাঁদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য এক বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৫৬ সনে শ্রীবিশ্বাস নিখিল ভারত রেলওয়ে গার্ডস কাউন্সিলের সভাপতি হন, দক্ষিণ-পূর্ব রেল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটিরও সহকারী সম্পাদক হন, নিখিল ভারত রেল কর্মচারী সমিতিরও তিনি আঞ্চলিক সম্পাদক। বন্দিত্ব আদ্রা-পূর্বলিঙ্গায় এমন কোন গণ-সংগঠন নেই যার সঙ্গে শ্রীবিশ্বাস জড়িত নেই, সে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনই হোক, বা বাঁমা কর্মচারী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যঙ্ক কর্মচারী সংগঠনই হোক।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীবিশ্বাস অত্যন্ত সাধাসিধে, সরল ও অমায়িক প্রকৃতির এবং সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই তাঁর প্রধান বা একমাত্র পুঞ্জি। এ পুঞ্জিকে সর্বল করেই তিনি বাঁকুড়ার ভোটার-সাধারণের মন জয় করেছেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষের মতো বাধা প্রাধীকে পরাজিত করে বাংলা দেশের রাজনৈতিক জীবনে সুস্থ ও কলুষমুক্ত হাওয়া বওয়ার পথ খুলে দিয়েছেন:



আমাদুরাই সাংবাদিক সম্মেলন

বিশিষ্ট পতন

রাজনীতির পথ বড় বন্ধুর পথ। কিন্তু ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকলে সে কথা কত একটা মনে থাকে না। গণ-শুভেচ্ছার মালা পরে তাই একবার মননদ অধিকার করে যাঁরা ইতিকর্তব্য বিস্মৃত হন, কাল-ক্ৰমে তাঁদের সে দর্প হরণ করে দর্পহারী গণশক্তি।

বিগত উনিশ বছর ধরে আরামের সংসার পেতেছিল কংগ্রেস দল। কংগ্রেসী সমরাস্থানে ছিলেন গান্ধীবধারী জওহরলাল। কংগ্রেস তাঁরই ছত্রচ্ছায়ার নিশ্চিন্ত ছিল; ছিল নিরুদ্বেশ। কিন্তু কালের হুয়েত পরিগ্রাণ নেই কারও। সেই ছত্রচ্ছায়া কালপ্রবাহে অপসারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয় গণসংযোগ বিচ্ছিন্ন কংগ্রেসকে নাস্তানাব্দ করে ছাড়ল।

কংগ্রেস সরে এলো তার প্রতিদ্রুত আন্তর্জাতিক প্রেরস্কর নীতিগুণি থেকে; স্বার্থ হল সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকার রক্ষা করতে; লোভ এবং ব্যর্থতা ব্যক্তিহীন নেতৃত্বের দাপটে দেশীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিয়ে এলো নিদারুণ হতাশা। নিঃস্ব ক্ষমতাসীন দলের আত্মপ্রত্যারণার সুদূর ঐখানে; গণ-বণ্ডনার প্রকাশ্য প্রচেষ্টার সুদূর-পাতল ঐখানেই; অথচ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ভাল রাখার সাধ্য ছিল না অবচীন নেতৃত্বের। তাই না এসপার না ওসপার—চিরকলে স্বান্দিক নীতি কংগ্রেসের বিপক্ষে যে শক্তিজোট সৃষ্টি করল, তার এক কোটিতে স্থান পেলো চরম দক্ষিণ-

পন্থীর উদগ্র লালসার অতৃপ্তি এবং অপন্ন কোটিতে চূড়ান্তভাবে লালিত ও হতাশ জনগণের অন্তর্মর্মে প্রচণ্ড বিক্ষোভের অহরহ প্রদাহ। কংগ্রেস জাতির জীবনে একটি থেমে-পড়া ইতিহাসের পিঙ্কল আবর্তে আটক পড়ল।

প্রধানত উত্তর ভারত বেছে নিল চরম প্রতিক্রিয়ার উদ্ভোরথ। চেপে বসল জন-সংঘ এবং স্বতন্ত্র দল। দক্ষিণে কেরালা এবং পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিক্রিয়ার পথে আত্মহননের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের বিপর্যয় আর ঠেকানো গেল না। হয়ত আরও পাঁচ বছর আগেই বিমুখ জনগণ শাসন-যন্ত্রের মোরসীপাটায় আঘাত হানতেন। কিন্তু সে পথে প্রধান বাধা ছিলেন জওহরলাল। তিনি ভারতবাসীর অপপ্রত্যাশিত স্নেহের উপহারে অভিভূত ন্যায়ক ছিলেন। আর ভারতের গণশক্তির নড়াচড়ার সময় বড় বেশি লাগে। তাই বিপর্যয় এ ক্ষেত্রে দেরি করেই এলো। প্রাক স্বাধীনতা যুগের কৃতজ্ঞতার জনগণ তখনও বিচলিত। নেহরু-অন্তর্ধানের পর কংগ্রেসী নেতৃত্বের নিঃস্ব স্বদলবিরোধী ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা জনগণের মদ্রিত আঁখি উন্মোচিত করল। কংগ্রেসী করণার দক্ষিণ্যে আর তৃপ্তি মানে না ভারতবাসী। কিন্তু তাই বলেই কি সে সামনের পথই ধুব বলে মেনে নিতে পারে। পথের মোড়ে বিপথও তো হাতছানি দেয়। ডাকেই বা অস্বীকার করা যায় কেমন করে। বাপ-ঠাকুরদার আমলের সংস্কার পিছ ডাকে। কেবল

পিছ ডাকে। সে ডাকেও যে সাড়া দিতে হবে। আর সে ডাকের মধ্যেই নাকি 'ভারতীয়তা' এখনো অবশিষ্ট আছে। তাই বিদ্রাস্তির মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ভারতের সত্তর শতাংশ অর্শিকিত এবং দ্বিশ শতাংশ সাক্ষর জনগণ গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। সেই ঐতিহাসিক ভাবনার কংগ্রেসী অতি-আধুনিক নেতৃত্বও বিদ্রাস্ত সাধারণকে পেছনের পথটাই দেখিয়ে দিলেন; সামনের পথ সম্পর্কে বিভীষিকার ভয় দেখিয়ে। এর দ্বারা কংগ্রেস যে দল হিসেবে খুব একটা উপকৃত হল এমন নয়। কেন না তার গৃহীত নীতির মধ্যে সম্মুখ-যাত্রারই প্রতিদ্রুতি ছিল। তবু কংগ্রেসকে উল্টো পথের মদতদার সাজতে হল কেন? কারণ বর্তমান নেতৃত্ব উল্টো-পথের সওয়ার। জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার নেশায় তাঁদের অগ্র পশ্চাৎ শূভা-শুভ জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়। তাঁরা তাই প্রধান আক্ৰমণ রচনা করলেন জওয়ান চিন্তার বিরুদ্ধে। বরং পিছটানে দেশ বিদ্রাস্তির পথে প্রত্যাবর্তন করলে আগামী ক্ষেপে কংগ্রেস তার বর্তমান দৃমুখো নীতির প্রলোভন নিয়ে জনতার সামনে পুনশ্চ ভোটভিক্ষাপাত্র নিয়ে হাজির হতে পারবে। কিন্তু সামনের পথ নিষ্কণ্টক হতে দিলে আর ততদূরে গিয়ে ধরা যাবে না গতির দ্রুততাকে।

উত্তর ভারতে জনসংঘ, স্বতন্ত্রের বিজয়ভেরী যখন বেজে উঠেছে, কংগ্রেস হয়ত তখনও স্বাস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারত কেরালার

জনন নয়া সভ্যতার আহ্বান শোনা বাচ্ছে। কিন্তু পূর্ব ভারতে পশ্চিমবঙ্গ যখন জন্মায় আবিচার দৃষ্টি এবং পরাম্পর-হরণের বিরুদ্ধে জোটপত্রের মাধ্যমে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছে তখন কংগ্রেসী গণস্বার্থ বিরোধী বর্তমান নেতৃত্ব দিশে-হারা হয়ে পড়ছে।

পতনের মুখেও কংগ্রেসের এই মোহাচ্ছন্ন অপদার্থতা বাদে সংবেদনশীল মনকে আহত করেছে—তারা কংগ্রেসের প্রগতি-বিরোধী স্বরূপ সম্পর্কে আরও বেশি আলোকিত হয়েছেন।

কংগ্রেসী ভারতের মানচিত্রে কেৱলা ও পশ্চিমবঙ্গ আজ বিশ্বফোটকের মত, একথা সরকার পরিচালিত আকাশবাণীও কত সহজেই বুঝে ফেলেছিল।

বিশিষ্ট পতনের আলোকে আকাশবাণীর কীর্তি

কেৱলা বারম্বারে চিহ্নিত দৃষ্টকৃত। তাকে কোনমতেই আর বাগে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রণমঞ্চে নতুন পালার স্ববিন্যাস উঠছে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্যসংবাদ। আকাশবাণীর কর্ম-কর্তারা এতটা আঘাত ভালো মনে হজম করতে পারলেন না। কেন? কংগ্রেসী বিপর্যয় কি তাঁদেরও কপাল পড়িয়েছে! তারাও যেন খাবি খেতে শুরু করলেন। রাত বারটার সংবাদে (ইং) আসাম, বিহার, উড়িষ্যা মধ্য পশ্চিমবঙ্গ নামক একটি দূর্বিনীত রাজ্য ভারতের মানচিত্রেই বর্তমান (এবং যে অশুভ বঙ্গ না থাকলে কংগ্রেসী রাজ্যে কোন বাবুকেই করে খেতে হত না), একথা দিল্লীর ইংরেজি সংবাদ শাঠক বেহালুদে ভুলে মেরে দিতে চাইলেন। কী মহৎ বিস্মরণ, কী প্রচণ্ড সর্বভারতীয় সংবাদপাঠ!

কিন্তু এতস্বারাও বিশিষ্ট পতনকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তবে বিশিষ্ট মরণেরই বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে গলায় দাড়ি পড়ে। সে শেষ মূহুর্তেও খিঁচুনির প্রভাবে নড়ে ওঠে। ভারতবর্ষের সংবাদ পরিক্রমায় পশ্চিমবঙ্গের নামোচ্চারণে বিস্মরণ তেমনি এক খিঁচুনি কি না কে জানে। যাই হোক কেৱলার পর কংগ্রেসের বিশিষ্ট পতন পশ্চিমবঙ্গেই শুরু। দিল্লীতে মেট্রোপলিটান নির্বাচনে জন-সংঘী সংখ্যাগুরুত্বও নয়। কেন না সেখানে কংগ্রেসীয়ানার ভবিষ্যৎ চাঁটি হতে বসে নি। বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতার কায়দে দিল্লীরই বিশিষ্ট অযোগ্যতা সূচিত হয়েছে।

রোডিও Indo-স্থান বা আকাশবাণী উড়িষ্যার স্বতন্ত্রী স্বাধিকারও যথেষ্ট সোচ্চারে ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রদেশের খিঁচুনিটি বাদ পড়ে নি। রাজস্থানের

জায়াগাণীরা বিশিষ্ট উদ্যোগ তালিকায় জমিয়ে বসেছে। কিন্তু হায়, কোথায় পশ্চিমবঙ্গ! পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তথাপি রাণি বারটা অবধি রোডিও আগলে বসেছে। কিন্তু কলিকাতা 'ক' কথা কয় নি।

অবশেষে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ যখন টপাচপ লোকসভা বিধানসভা থেকে খসে পড়তে লাগলেন, যখন উল্কাপাতের আঘাতে সরকারী কর্মচারীদের ওপরতলা সংশয়ে এবং জনগণ বিপুল উৎসাহে একটি দাঁপিত দম্ভী সরকারের পতনকে আপন গণতান্ত্রিক ক্ষমতায় বথাসাধ্য রূপ দিয়ে উল্লাসে আনন্দে আসমুদ্র হিমালয় মুখারিত করে তুললেন, তখন ক্ষমতার আজ্ঞাবাহী-রাও সংশয়ে কণ্ঠস্বর বদলাতে শুরু করলেন।

উল্টো সুর শোনা যেতে লাগল একে একে প্রভাতী পত্রিকাগুলিতেও। জনতার রোষ কোন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, গণ-বিক্ষোভকে এতকাল কতদূরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, একচক্ৰ হরিণের দল যেন তা ভোটবাক্সের আঘাতে ঠেকে শিখলেন। ঘুম ভাঙল কংগ্রেসী কুন্ডকর্ণেরও।

যে কংগ্রেস কেৱলাকে নিয়ে বহুকাল বহুতর কায়দা করে আসার মধ্যে নিজের অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা-দম্ভকেই প্রকাশ করে আসছিল, সে অকস্মাৎ জাগ্রত হয়ে বলতে বাধ্য হল, জনগণের রায়কে গণতন্ত্রের খাতিরে কংগ্রেস দল মেনেই নেবে। এ যেন প্রহসনের উল্টো পিঠ। এতাবৎকাল জনগণকে নিয়ে নিমর্ম পরিহাস করে এসেছে দম্ভী (নিরকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ) কংগ্রেস। আজ সে নিজে চরম বিদ্রূপের স্ফারা আপাদমস্তক মসীলিঙ্গ। আজ নতুন কথা বলার মত কণ্ঠস্বরও তার নেই। এমন নিঃসীম নিঃস্বভার সঙ্গে ১৯৬৭ সাল কংগ্রেসের মূখ্যমুখী পরিচয় করিয়ে দিল। ঠিক সেই পরিমাণেই ভারতের নাগরিকবৃন্দ হৃদয়গম্য করলেন, কল্লুতপক্ষে অসহায় তারা নন, এবং এতকাল নাগরিক অধিকারকে সাহসের সঙ্গে ব্যবহার না করে তারা কংগ্রেসী দৌরাণ্ডা, দুরাচার ও দূর্বিনীতকে কেবল-মাত্র প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছিলেন।

কংগ্রেসের ক্ষমতা-উন্মাদনার জন্য কংগ্রেস যে পরিমাণে দারী সেই পরিমাণ দায়িত্ব থেকে জনগণের স্থবিরতা-প্রিয় সংস্কারেরও রেহাই নেই। নেহরু-বাস্তবের ছায়ায় জনগণ এক বই স্ববিত্তিকে বাছাই করতে ভয় পেয়েছিল। ফলত দম্ভী কংগ্রেসকে রাজতান্ত্রিক মনোভাব ক্রমশ গ্রাস করেছে। জনগণকে প্রতি পদক্ষেপে বশুনা ও বিদ্রূপ করার মোহ তাদের পেয়ে বসেছিল। আজকের কংগ্রেসী পতনের মূলে যে কারণই মূখ্য।

জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি

ভঙ্গকারী কংগ্রেস যতকাল নেহরুজীর বিরাট ছায়ায় দাঁড়িয়ে গণপ্রভাষণ করেছে, জনরোষ ততকাল শূন্য অস্ত্র নে বিক্ষোভকে পূজীভূত করছিল। নেহরু-প্রভাব মূর্তির পরই সেই গণরোষ প্রচণ্ড বিক্ষোভে তার অন্তর্দাহকে প্রকাশ করতে শুরু করে। বিস্ফোরণ যাদ বিলম্বিত হয়ে থাকে তবে তার মূলে ছিল অন্ত-বর্তীকালীন পাক-আক্রমণ। সহিষ্ণু জন-সাধারণ সৌদন সব কিছু ভুলে সবারকমের কুছতাসাধনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বহু অত্যাচারিত দিন-লিপি-বিস্মৃত হয়ে মাথায় তুলে নিরোহিল আজকের এই অব্যাহীন কংগ্রেসী নেতৃত্বকেই। অবশ্য স্বয়ং লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছিলেন নেহরু উত্তরাধিকারের গণাবলী নিয়ে।

কিন্তু তারপর কংগ্রেসী নেতৃবর্গের অপরিণামদর্শী অপদার্থতা করেকটি ক্ষমতালোভী দম্ভী শাসকের হাতে পড়ে একদিকে আপন সংগঠনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করল; অপর দিকে কান্ডজানহীন ক্ষমতাদম্ভ গণশক্তির পরিমাপ করতে পুরোপুরিই ভুলে গেল।

কংগ্রেসী নেতৃবর্গে বিশিষ্ট পতনের শুরু হল এখানেই। এই পর্যায়ের পতন দেখা দিল সেই সমস্ত নেতৃবর্গের মধ্যে, যারা গণ-অসন্তোষকে কিছুমাত্র অনুভব করেছিলেন এবং যারা কংগ্রেসী নেতৃবর্গে দুরাচারী লোভী লালসার পথে প্রতিবাদের মতো মাথা তুলতে শুরু করেছিলেন। কংগ্রেসের অপরিণামদর্শী কুচক্রী ক্ষমতা-জোটে একে একে তাঁদের বিদায় করতে শুরু করলেন, কিন্তু সে সময় একবারও ভেবে দেখলেন না যে, বাদে অত্যাচারী লোভ প্রকৃত উপদেশকে পর্বন্ত অসহ্য জ্ঞান করছে—তাঁদের পায়ে রক্তলার মাটি কতদূর শক্ত। অথচ ভাবা উচিত ছিল। কেন না নেহরুজীর পর সত্যিই দূর্বিনীত-গ্রস্ত কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সত্যিই ক'জন জনগণের আস্থাভাজন তা কণ্ঠিপাথরে বিচার করে কংগ্রেস একবার গণনা করে নিতে চেষ্টা করে নি। অথচ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলনেই উপস্থি-পরি প্রমাণিত হয়েছিল যে বর্তমান নেতৃবর্গ স্বয়ং কংগ্রেসীরা-ও সকলে সমান আস্থা-শীল নন। কিন্তু নিরকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কংগ্রেসী ঠেতনো যে রাজতান্ত্রিক মনো-ভাবের বিষ অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছিল তাতে কংগ্রেসী নেতৃত্ব ও সেই সমস্ত কংগ্রেসী কর্মীরা (যারা নিজেদের রাজার জাত বলে ক্রমশ ভাবতে শিখছিলেন) এমন হত-ঠেতন্য যে দেশের হাওয়ার গতিক পর্বন্ত তারা অনুভব করতে পারেন নি; সাধারণ লক্ষ লক্ষ মানুুষের ন্যাতিশ্রাস তারা অনুভব করেন নি; জনগণের কণ্ঠ-স্বর যে মানবকণ্ঠ ছাড়া গোজাতির হাস্য-

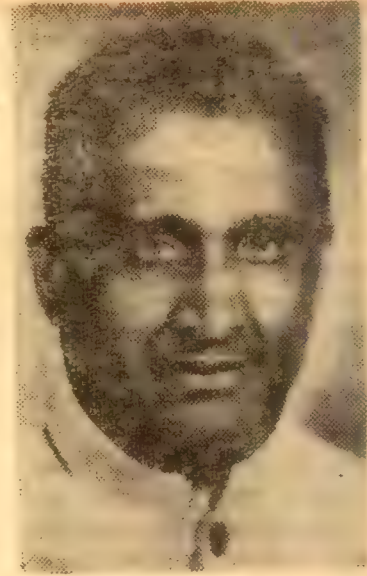
রন নয়, একশতাধি বিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ফলত বৈসারং দিতে হ'ল। চুবু নামাশ্রম নিবাসী কংগ্রেসের একশতাধি মন্বা মাড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বৈসারং নে বাক-বগা কংগ্রেসকে জনপ্রিয়তার এবং ভাববানার আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিলে করে জাতীয় কংগ্রেসকে একটি অত্যাচার। প্রাথমিক স্বাধীনতা শাসক সংগ্রামে গারগত করতে চেয়েছিলেন, জনগণ তাদের একজনকেও ক্ষমা করেন নি। গণপ্রাণী হারিয়ে কংগ্রেস আজ নিঃশব্দ এবং নিঃসম্মল।

অথচ কংগ্রেসের শূন্যতাক্ষীরা বার-বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন; জন-গণ চাইকার করে জানাতে চেয়েছে, তারা কংগ্রেস-বিরোধী নয়, অত্যাচারী অনুভূতি-হীন গলিত নবদত্তরাজি-সম্মল স্বাধীন শাসক-নিরো বিরোধী। কেউ কণপাত করেন নি। বিরোধী নেতার যখন ব্য-স্বার অনাস্থা প্রস্তাব এনে বাক্য নেতৃত্বকে বোঝাতে চেয়েছেন, পল্লীমেন্ট সরকারী ভবন, রাজ্য আইনসভা, মন্ত্রিবর্গের অফিস ও বাড়ি এবং কংগ্রেস ভবনগুলির বাইরে যে অগণিত জনসাধারণ কংগ্রেসী শাসন-যন্ত্রের চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছে তাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা হোক, তাদের বক্তব্যকে একবার গুরুত্ব দেওয়া হোক, তখন দম্ভী কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ-তার দর্পে বিরোধী সতর্কীকরণকে বিদূষ করেছে। সমগ্র ব্যাপারটিই কংগ্রেসী নেতৃত্বের কাছে একটি প্রচণ্ড প্রহসনের মতো মজাদার ঘটনা হিসেবে তাজিল্য লাভ করেছে। যে প্রচণ্ড মৃত্যু নেতৃত্বকে গ্রাস করেছিল, নেহরুহীন চতুর্থ নির্বাচন জারী প্রাথমিক প্রত্যুত্তর। অথচ আশ্চর্য

নির্বাচনের প্রাকালেই কংগ্রেস এই প্রত্যুত্তরের নিষ্ঠুর নিষেধ দিয়েছিল। কিন্তু বাক-বহুরের অত্যাচার কণপাত করতে চায় নি গণহতের বাক-বহুর আওরাজে। উল্টে প্রচণ্ড ব্যক্তি ও স্বত্বপূর্ণ সঙ্গো অক্ষম ও অসদাচার নেতৃত্ব এ সত্বের জবাব দিয়েছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মদগর্বে।

জনগণের ভাগ্যে ইমলেছে মৃত্যু, অত্যা-চার, পালিশ মিলিটারি বট লাথি ডান্ডা গুলি; বিরোধী নেতার ধমক খেয়েছেন স্পীকারী দম্ভের আশ্চর্য; মার্শাল এসেছে গলা ধাক্কা দিতে, আদেশ এসেছে সাসপেনসন এবং কারাগারবাসের। আর কংগ্রেসের সচেতন নেতৃত্ব ও কর্মীমহলকে দোষায় দেওয়া হয়েছে বাইরের দরজা। এ সম্মেলের সঙ্গো সঙ্গোই ক্ষমতাসীন চক্রের অস্বাভাবিক তত্ত্ব গদির স্থলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের কেউ দেশ জবাবিয়ে গান গেয়েছেন; কেউ দেশকর্মীকে সাগরজলে নিক্ষেপ করার বাসনা উচ্চারণ করেছেন; কেউ বা প্রগতিশীল চিন্তাকে গলাধাক্কা দেওয়ার জন্য আ-দিমী স্যাচি কয়েছেন।

জনগণ কিছুই ভোলেন না। যদিও গণস্বায়ের ফাইলটি সেইসবদ হয়ে লাল ফিতের ফানি ভাঙ্গ করতে সময় নেয়। কিন্তু তা যে একেবারেই অক্ষম একথা



এস কে পাতিল

যা জানে তারা ইতিহাস কিস্তি। কংগ্রেসী ক্ষমতাদম্ভও ইতিহাসকে আমল দেয় নি। এমন কি দুই নেতা গান্ধী-নেহরুর উদ্দেশ্যকেও তাজিল্যের মতের পরিহার করেছে। সাক্ষাৎ নিদর্শন গান্ধী-



রাজ ফার্নান্ডেস-ইনি পাতলাকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করেছেন।

খবি দাসের	দীনেশকুমার রায়ের
সোভিয়েত দেশের ইতিহাস ১২-৫০	মৃত্যুসংকট ... ২-৫০
প্রমথনাথ পালের	গুরুত্বপূর্ণ ... ২-০০
দেশপ্রাণ শাসন-৬-০০	দুরন্ত দস্য ... ৬-০০
শরণ সাহিত্যে নারী-৪-০০	মরণ ফাঁদ ... ২-০০
দত্তা পরিচয়-২-০০	শয়তান ... ৫-০০
বিনয়জীবন ঘোষের	রাজপ্রোহী ... ২-৫০
অনিয়মের অন্তর্গত, হেমচন্দ্র-৩-০০	দুর্ভাগ্য ... ৩-০০
ফণিভূষণ বিশ্বাসের	পেত্নীদেহের হীরা ... ৫-৫০
শিশু শিকার গোড়াগুন-৩-০০	কলির ভীমের কাণ্ড ... ৩-০০
ডাঃ হরিশাধন গোস্বামীর	দীপান্তরের আসামী ... ২-৫০
মাহাত্মিক শিকার পুনর্গঠন-৩-০০	কালো বিড়াল ... ২-০০
নন্দগোপাল সেনগুপ্তের	ডাক্তার সালিয়া ... ৬-৫০
রবীন্দ্রচার ভূমিকা-৪-০০	চীনের চক্র ... ৫-০০
ধীরেন্দ্রলাল ধরের	দস্যু-গোয়েন্দা ... ৫-৫০
আমাদের রবীন্দ্রনাথ-৮-০০	
জানন্দ (১৩৭০)-৫-০০	শিবরাম চক্রবর্তীর
অসমগ্র মধুপাধ্যায়ের	কিশোর গ্রন্থাবলী : ২-৫০
হাসির গল্প-৫-০০	
কিশোর গ্রন্থাবলী-২-৫০	অখিল নিয়োগীর
	কিশোর গ্রন্থাবলী : ২-৫০
	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের
	কিশোর গ্রন্থাবলী : ২-৫০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

এই ৬৬ খেচর ও অজর মুখাঙ্কার পাশ্চাত্য-জগৎ বিক্ষোভিত। এখানে নেতৃত্বের উত্তরাধিকার। মেননের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বিদায়। মেনন লোকসভায় ফিরে যেতে পারেন নি, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়; কিন্তু মেনন বিরোধী এস, কে, পাতিলকে জনগণ ক্ষমা করে নি। পাতিলের পরাজয়েই মেননের জয় সূচিত হয়েছে। যেমন অতুল্যাবাবুর বিদায়ে অজরবাবুর প্রতি আস্থাকে জনগণ সোচ্চারে প্রকাশ করেছে। গুলজারিলাল নন্দাকে লোকসভায় ফেরৎ পাঠানো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিপক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য গণরায়। এমনতর নজির একাধিক, যার সার্বিক পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বর্তমানে সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের স্বাণ্টিক নীতি, বিদেশ-মুখাপেক্ষিতা, দেশের স্বাধীনতা সমা-ধানে চরম ব্যর্থতা; দোটা না অর্থনীতির বিপরীত; জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি চরম উদাসীন্য এবং প্রদত্ত প্রতি-শ্রুতি প্রত্যাহারের দ্বারা প্রতিরোধী শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে আনুত্যা জাতির জীবনে ইত্যাশাজনিত দুর্নীতিপ্রবণতার সঞ্চার করার দায়িত্ব, ভুল পরিসংখ্যানের দ্বারা জাতির আয়ের ভেদে আরও তুলে ধরে আত্মপ্রসাদ লাভ ও দেশকে স্বাধীনতা নিমজ্ঞন; দেশীয় সমস্যাবলীকে বিদেশী সমস্যায় ধামা দিয়ে চাপা দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস; এ সমস্তই কংগ্রেসের সর্বস্বাসী বিপর্যয়ের মূলীভূত কারণ।

কিন্তু কংগ্রেসের এই পতনকে বিশিষ্ট পতন রূপেই দেখতে চাই। কারণ এই পতন দলীয়ভাবে কংগ্রেসের বিপর্যয় আনয়ন করলেও এর দ্বারা কংগ্রেসের আত্মদম্ভী নেতৃত্বের পরিবর্তনে কংগ্রেসকে নবগঠিত করার একটি সুযোগ কংগ্রেস-কর্মীরা লাভ করলেন। আজকের নির্বা-চনীচক্রও যদি এদের জমিদারি মনো-ভাবের পরিবর্তন সাধন না করতে পারে, যদি কংগ্রেস এইবারও সচেতন হয়ে লোভী ক্ষমতাচক্রকে সাগর জলে বিসর্জিত করতে বিশ্বাসিত হয়, যদি আজকের কংগ্রেসী পতন একটি বিশিষ্ট ইংগিতকে অব-মাননা করে, তবে কেরালায় যেমনভাবে নিশিচয় হয়ে যেতে হয়েছে কংগ্রেসকে (১৩৩ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা কংগ্রেসের কপালে জুড়েছে মাত্র ৯টি আসন)। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও তেমনভাবেই বিদায় নিতে হবে।

গ্রন্থকীট কম্যুনিষ্ট রাজনীতির পরাজয়

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন যেমন ক্ষমতা-অধিকার কংগ্রেসী অপরিণামদর্শী অক্ষম নেতৃত্বের কাছে বহুতর শিকড়ের বিপরীত

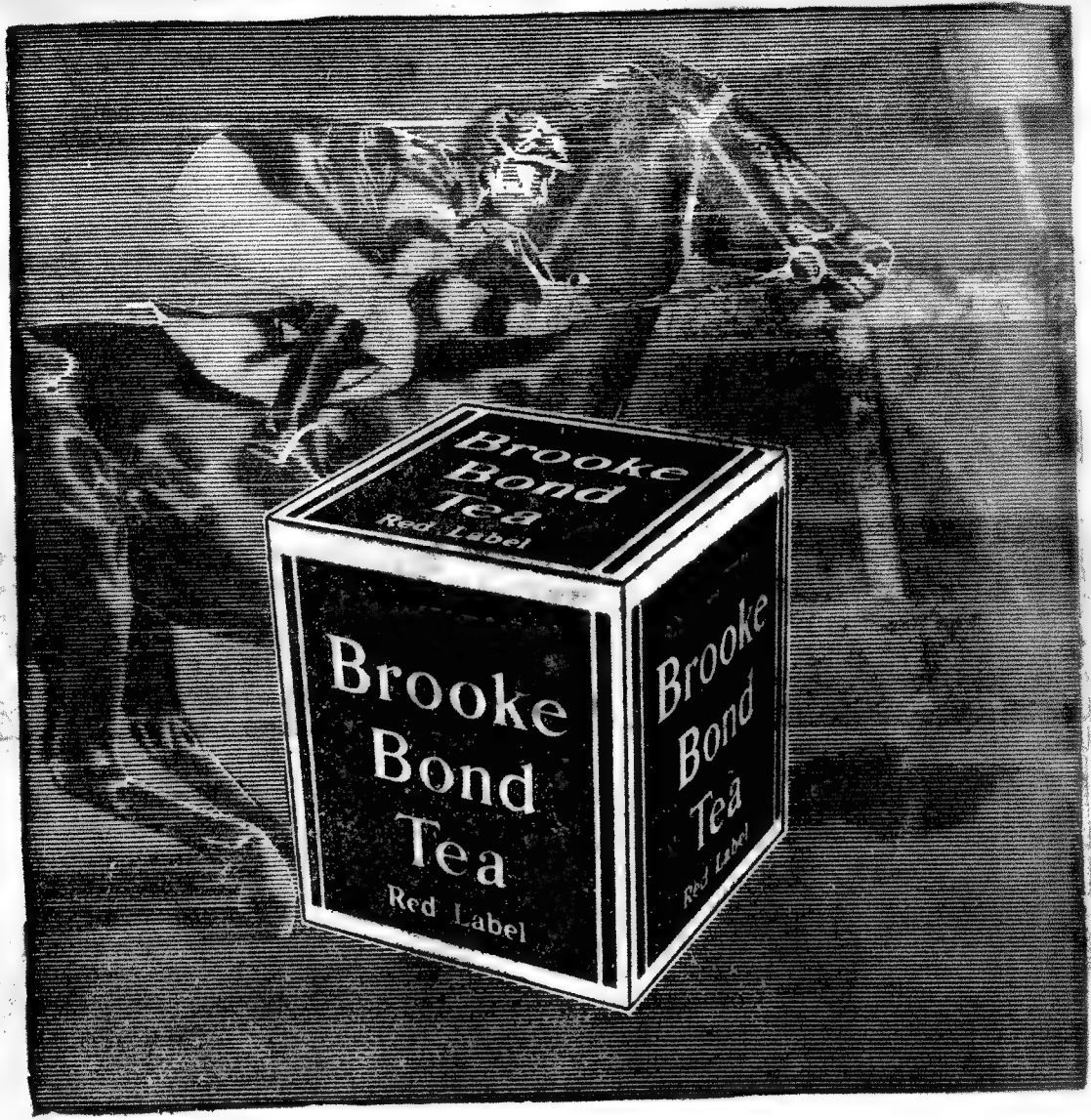
স্থাপন করল, তেমনই বিরোধীদের সামনে জনগণের মনোভাবকে ধ্বংস প্রচেষ্টা এবং সুদৃষ্টান্তে মেল খেয়েছে।

উত্তর ভারত ও উড়িষ্যাকে প্রতিক্রিয়ার হাতে এবং মাদ্রাজকে আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ গণ্ডিতে ঠেলে দেওয়ার মূলে যে পরিমাণে কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়াশীলতা কাজ করেছে, ঠিক সেই পরিমাণেই এই গণ-বিদ্রোহিত সংক্রমণে সহায়তা করেছে। তথাকথিত প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজ-নৈতিক দল,—ভারতের দুই শাখা কম্যুনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস জনতার ভাবকে আদর্শে আমলই দেয় নি, দম্ভের প্রাসাদচড়ায় বসে সে শুনেছে কিলাসী নবাবীয়া না বীণার ঝংকার; ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ, শুধু যে গণবাতীকেই উপেক্ষা করেছেন তাই নয়, কম্যুনিষ্ট গ্রন্থকীট রাজনীতির ভাষা জনগণের মনের দ্বারে প্রবেশের কিছু-মাত্র চেষ্টাও করে নি। কংগ্রেস জনতার সর্বস্ব ভ্রমশ অপহরণ করার জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছে, আর কম্যুনিষ্ট দল জনতাকে বাদ দিয়েই জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠনের গ্রন্থকীট স্বপ্ন দর্শন করেছে। এদের কেউই ভারতের মাটি ও মানুষের বিশেষ প্রকৃতির খোঁজ-খবর নেন নি। প্রথম দল ভেবেছেন, অশিক্ষা এবং সংস্কারই মার-খাওয়া মানুসকে চিরকাল 'বাবুশায়া' বলতেই 'অভ্যন্তর' রাখবে। এবং দ্বিতীয় দল ভেবেছেন, আমদানীকৃত বুলি-সবস্বভা ভারতের মানুসকে রাত পোহালেই খাঁটি থিয়োরিস্টে পরিণত করবে। প্রথম দল এ জন্য বুট, গুলী, ডাণ্ডা এবং প্রলোভনকে অস্ত্র করে শাসনদণ্ডটি কৃষ্ণগত করে রাখার দৃষ্টান্ত দেখেছেন। দ্বিতীয় দল তাদের অভি-ধানে বাবহৃত চোখা শঙ্কাবলীকে পাখী-পড়ার মত জনতার মস্তিস্কে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম দল মাথাভার আমলের রাজনীতিতে ভরসা রেখেছেন, আর দ্বিতীয় দল অতি অগ্রসর নয়। সমাজের শঙ্কাবলী অনগ্রসর জন-সাধারণের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন বহুতর লাড়াই-এ। প্রথম দলের পতন ইতিহাসের নিম্নমেই অনিবার্য। দ্বিতীয় দলের জন-বিচ্ছিন্নতা পুঙ্খসর্বস্ব রাজ-নীতিতে পরম বিশ্বাস ও আস্থা। অথচ এই আস্থা তাঁরা যে কার ভরসায় এমন সময়ে লালন করে আসছেন সেটাই বিস্ময়কর।

যে দেশে অশিক্ষা এবং কুসংস্কারই জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত সেখানে 'নিউ এজ' 'পিপলস ডিমোক্রাসী'র নৈতিক লাড়াই নিয়ে জনগণ যে মাথা ঘামান না, সম্ভবত বর্তমান চতুর্থ নির্বাচনও সে শিক্ষা পাণ্ডিত্যময় গ্রন্থকীট কম্যুনিষ্ট মস্তিস্কে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।

এ দেশে গান্ধী-বিরোধের দেশ। এ দেশে মোটো মানুষ সহজ সারলতার সঙ্গে এসে জনতার হৃদয়রাজ্যটিতে প্রথম অধিকার বিস্তার না করলে গণমনে কমিশনকালেও সমাদৃত হবে না। একথা জেনেও কম্যু-নিষ্ট দল দেশের লোকের সেই পর্বারে নেমে এসে তাঁদের হাত ধরে প্রকৃত সাধীর মতো অসহায় জনতাকে আলোকের পথে নিয়ে যেতে, মনে হয়, লজ্জা পেয়েছেন। তাঁদের জ্ঞানের দম্ভ, কুপমণ্ডুক গ্রন্থকীটের দম্ভ, তাঁদেরকে কখনো জনতার পাশে গিয়ে বসবার শিক্ষা দেয় নি। মুখে কুবক, শ্রমিক করলেও, কুবক শ্রমিকের ভাষায় এঁরা কোনকালে কথা বলতে পারেন নি। ভারতের মাটির গন্ধ, তার ঐতিহ্য, তার সংস্কারকে সহানুভূতির সঙ্গে আমল দিয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ না করে, মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ, স্ট্যালিনবাদ ও সর্বশেষে মাওবাদের নির্দেশ নিয়ে জনতার হৃদয় জয়ের দৃষ্টান্ত দেখে-ছেন এঁরা। এ জন্য অজ্ঞেতে দ্বিতীয় দলের মর্বাদ লাভ করেও আজ কম্যুনিষ্ট দল যে জনগণের থেকে কত দূরে সরে গেছেন, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ভারতই আজকালমান প্রমাণ স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। যাঁরা ইতিহাসের গুরুত্বকে বিশেষ স্থান দিয়ে থাকেন, তাঁরাই গ্রন্থ-নির্ভর রাজনীতির ভারে ইতিহাসের স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারাকে অস্বীকার করে অতি দ্রুত একটি মনগড়া অবস্থা সৃষ্টির জন্য ব্যর্থ উৎসাহ প্রকাশ করে এসেছেন। যদিচ ভারতের সাধারণ মানুষের ইতিহাস এই আরোপিত দ্রুততার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সে একটি ক্রমবিকাশের ধারাকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে, পারে না সত্যের আরোপকে সহ্য করতে। কম্যুনিষ্ট পার্টি তার মতা-দশকে জনতার সহজপাচ্য ভাষায় তুলে ধরতে সক্ষম হয় নি। কাগজে বক্তব্যের দ্বারা ভারতের মতো কুসংস্কারাজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণকে দলে টানতে চেয়েছে। ব্যর্থতা তাই কোন ব্যাখ্যা মানে নি। দেশী জনতা অতি সহজে রাজনির্দেশকে মেনে নিতে জানে; জানে পুরোহিতের মন্তো-চারণকে না বন্ধেও ধুব বলে শ্রদ্ধা জানাতে; জানে একটি চালু নিয়মকে বিনা প্রশ্নে তারিফ করতে; কিন্তু তার সমস্ত সংশয় পুঞ্জীভূত হয় যদি বিদেশী-য়ানার গন্ধ মিশিয়ে তাকে কেউ জ্ঞান দিতে যায়।

ভারতীয় জনগণের মনে মিরজাফরী কুর্কীতির যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাতে সে যে-কোনপ্রকার বিদেশীয়ানাকেই সহজে প্রত্যাখ্যান করবে, রাজা রামমোহনের আমল থেকেই সংস্কারের স্বাজোও এ সত্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে। কিন্তু চরম



বাজি ধরলেই জিতবেন

স্বাদ-গন্ধের দোড়ে ক্রক বগু রেড লেবেল না জিতেই
পারে না। সেরা সেরা চায়ের ব্রেণ্ড। প্যাকেট পিছু
চের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন। আপনার জন্য
ক্রক বগু রেড লেবেল চা।

মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায়, দুর্দান্ত রাজ-
তান্ত্রিক ভূস্বামী-প্রশাসিত দেশেও নিজস্ব
মানুষের মৃত্যুদাজ প্রীতিভ্যাক্যে তারাই
দেবতা বলে পূজা করেছে, স্বামী বিবেকা-
নন্দকে উজাড় করে দিয়েছে অন্তরের
সমস্ত ভক্তি, সবধর্ম সম্ভবের স্বপ্নমন্ডল
সাম্রাজ্যকে ঠাকুর বলে মাথার করে নিয়েছে
গংসারাজ্যের ভারতবাসী।

কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রসঙ্গে
উল্লেখ্য তিনজনের উপস্থাপনাতেই, মনে
হয়, কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা এ রচনা আশঙ্কিত
বিসর্জন দেবেন। কিন্তু সমস্ত বক্তব্যই
ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। কম্যুনিষ্ট
হঠকারিতা এককথায় এই যে বিসর্জনের
কাসির-ঘণ্টা বাজায়, আর ইতিহাসের
শিকড়টি গ্রহণ করতে নারাজ হয়, এত-
দূরই জনপ্রীতির আলিঙ্গন থেকে তারা
কমেই দূরে সরে যেতে বাধ্য হন। গ্রন্থকর্তা
অতি-উগ্রতা তাঁদের সামনের পথ দূরের
কথা পিছনেই শিথিলে দিচ্ছে। কথায়টির
মধ্যে সংশোধনবাদী নিরুত্তাপ আছে কি না
জানি না, কিন্তু বর্তমান আলোচকের মনে
শুভবুদ্ধির কিছুমাত্র অভাব কে নেই তা
বুঝে চিত্তের কবল করতে পারি। বলতে
পারি, চতুর্থ নির্বাচন প্রমাণ করেছে,
ভারতের বকে কম্যুনিষ্ট দল একটি মুষ্টি-
মোহা-গ্রন্থকর্তা রাজনীতিজ্ঞের দলে পর-
বাসিত হয়েছে এবং মহামতি লেনিনের
নির্দেশ অনুসারে জনগণের কাছে লিন্দা
গ্রন্থে কম্যুনিষ্ট আত্মবিশ্বাস যদি এখনও
নিজেকে আহত বিবেচনা করে, তবে
আগামী কালের বছরের মধ্যে চরম-প্রতি-
ক্রিয়া হাতে গণঅভিযাতকে ছেড়ে দিয়ে
এই কলকে কোপেরসা হয়ে পড়তে হবে।
যার ফলে বিপ্লব দূরে থাক জনগণতান্ত্রিক
রাষ্ট্রের স্বপ্নও বিবরে প্রবেশ করে আত্ম-
রক্ষার বাধ্য হবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে
জামা ভারতবর্ষের নির্বাচনী ফলপ্রসূতিকে
ধীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করলে এবং গ্রন্থা-
গারের বাইরে যে বিস্তৃত প্রান্তর শস্যে
শ্যামল, খরায় চৌচির হয়ে আছে তার প্রতি
দৃকপাত করলে এ সত্য মাত্রাণীয় পণ্ডিত-
দেরও দৃষ্টিগোচর হবে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে যদি
কোন দল চূড়ান্ত আঘাত পেয়ে থাকেন,
তবে সে দল কংগ্রেস নয়, কম্যুনিষ্ট পার্টি।
দুই শাখা কম্যুনিষ্ট পার্টি আপন
অন্তর্ভাবের মাধ্যমে জনগণ থেকে শুধু
যে দূরে সরে গেলেন তাই নয়, একটা
প্রচণ্ড রাজনৈতিক আঘাতকে তাঁদের মুখ
বুজে সহ্য করে নিতে হল।

কম্যুনিষ্ট পার্টির আর একটি কথা
মনে রাখার বিষয়। দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া-
চক্র এখন এক শাখার হারণযাত্রা বসেন,
তখন অপর পক্ষও তার থেকে পার পেয়ে
যান না। প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারণা চাতিয়ার

অনেক বেশি শক্তিশালী। দুই শাখা
কম্যুনিষ্ট দল সেই প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে
নিজেবাই জোরদার করেছেন। এমন কালি-
দাসীর পাণ্ডিত্যে নিরপেক্ষ প্রগতিবাদী জন-
গণকে চূড়ান্তভাবে হতাশাই করা হয়েছে।
নির্বাচনে চীনকে টেনে আনার শব্দ
কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তি জোটের দুরভি-
সম্বই কাজ করে নি, দুই শাখা কম্যুনিষ্ট
পার্টিও অত্যাশাহী ইন্ডিওলজির জীতাকলে
ভারতব্যাপী নির্মমভারে নিজেবাই পিষ্ট
হয়েছেন। নির্বাচনোত্তর কলাফলের দিকে
তাকিয়ে এ সত্য উপলব্ধি করার সময়
হরত এসেছে। আর এই দ্রাস্ত নির্বাচনী
কৌশল অবলম্বনের জন্য যে অপরিণাম-
দশী নেতৃত্ব মারা ভারত দুই শাখা কম্যু-
নিষ্ট পার্টির ক্ষতিসাধন করেছে, তাঁদের
দ্রাস্ত পথ-প্রদর্শনের জন্য জবাবদিহি
করতে আহ্বান জানানো দরকার।

প্রসঙ্গত একটি কথা সর্বশেষে উল্লেখ্য:
কংগ্রেস বা অপরাপর দলকে যত সহজে
সমালোচকের প্রশ্নের কাঠগড়ের দাঁড় করানো
যায়, গ্রন্থকর্তা কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বকে তত
সহজে আলোচনার বস্তু করার আলো-
চকের আশংকা চের বেশি। কম্যুনিষ্টরা
নিজে যে পরিমাণ স্পর্শকাতর, অন্যের
স্পর্শকাতরতা তারা সেভাবে অনুভব
করতে অক্ষম। এখানেও সেই একই প্রশ্ন:
উগ্র অথ উন্মত্ততা। এই বিশেষ চরিত্রও
জনগণের মনে কম্যুনিষ্টভািতিকে স্থান
করে দিচ্ছে এবং সেই ভািতই আজ
যেখানে শ্রবণে পেরেছে সেখানেই কংগ্রেস-
বিরোধী মনোভাবকে প্রকাশের জন্য
যথেষ্ট দলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ভারতের
বুকে একটা শাসনতান্ত্রিক সংকটকে
উপস্থিত করেছে। অতি উগ্র নীতিবিলাস
অসহায় জনগণকে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গী
করেছে কেবলমাত্র কম্যুনিষ্টরা-জনগণের
মনের ভাষাকে কখনো বুঝতে চান নি এবং
নিজের ভাষাকেও জনতার বোধগম্য করে
তুলতে পারেন নি বলেই। সে ক্ষেত্রে
স্বভাব এবং জনসংখ্যার মতো দল, ডি-এম-
কে বা বাংলা কংগ্রেসের মতো দল অন্যায়সে
জনগণের কাছে প্রবেশাধিকার পেয়েছে।
অথচ এতকাল জনগণের সঙ্গে সমস্ত
রক্ত অতিমানের গো-রক্ত নয়) সাক্ষী
হয়েও কেন কম্যুনিষ্ট দল চতুর্থ নির্বাচনে
প্রচণ্ড ক্ষতিকে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।
গ্রন্থসর্বস্বতার মায়াজাল সরিয়ে বাস্তব
অবস্থার একটা হিসেব-নিকেশ বসলে
সুবুদ্ধিসম্পন্ন মাত্রাবাদী তার স্বার্থ উত্তর
পেতে পারেন বৈকি। আর সে উত্তর
খোঁজার জন্য প্রগতিবাদী নিরপেক্ষ জনগণ
যদি দাবি তোলেন, তাহলেও কি কম্যুনিষ্ট
নেতৃত্ব সে দাবিকে ত্যাগ করা করেন! নাকি
মুখ বন্ধ করার জন্য অতি উগ্র অপ-
কৌশল অবলম্বন করেন।

নির্বাচনী জয়-পরাজয়ে গণশক্তি

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্রতিটি জয়-
পরাজয়ের জন্য কোন দল উপদল বা
ব্যক্তিবিশেষ যদি স্বদল অথবা নিজেকে
উপাদানস্বরূপ গণনা করেন তবে তিনি যে
ভুল করছেন একথা বলতেই হবে। দেশ-
ব্যাপী কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব, মনুষ্য-
সম্মত খাদ্যভাব, অসহনীয় অর্থনৈতিক
চাপ এবং নিরুত্ত নিপীড়নে জনগণই এই
প্রথম (চতুর্থ) নির্বাচনকে মূল্যায়ন পরি-
চালনা করেছেন। সুতরাং ফলপ্রসূতিও
হয়েছে শুধুশব্দে মিলিতভাবেই।

উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ,
পাঞ্জাব (দিল্লী মেট্রোপলিটন কাউন্সিল)
যেখানে চরম প্রতিক্রিয়াপন্থীদের আলি-
ঙ্গন করেছে; মাদ্রাজ যেখানে হিন্দী-বিরোধী
আঞ্চলিকতাবাদী ডি এম কে-র হাতে
নিরঙ্কুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা তুলে দিয়েছে;
পশ্চিমবঙ্গে যেখানে দল হিসেবে বাম
কম্যুনিষ্টরা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও
কংগ্রেসী পরাজয়ের ওপর জনগণ বাংলা
কংগ্রেসকেই জয়ী করেছেন; এবং কেরালা,
যেখানে মাত্রাবাদী কম্যুনিষ্টদের শক্তি
কমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে সমস্তই একত
বিচারে প্রমাণ করে যে ভারতের জনগণ
চতুর্থ নির্বাচনে দল বা ব্যক্তির বিচার
না করে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস বিরোধিতার
জন্যই একটি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের
প্রয়োজনে তাঁদের ঐকান্তিক ইচ্ছাকে যেখানে
যেমন রূপদান করেছেন। এবং যেখানেই
অ-কম্যুনিষ্ট কোন দলকে শক্তিশালীপে
পাওয়া গেছে, নির্বাচকরা সেখানেই সেই
দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন সমাধিক যদিচ
কম্যুনিষ্ট পার্টিই এতদঞ্চল বিতরণ
সর্বভারতীয় দলের মর্বাদায় আসীন ছিল।
কম্যুনিষ্ট নীতিবাগিশতা জনগণের কাছে
থেকে এইভাবে পার্টিকে বহু দূরে
নিক্ষেপ করল। বর্তমান নির্বাচনী ফল-
ফল যেহেতু বিশেষভাবে জনগণেরই রা।
সেজন্য এবারের নির্বাচনেই জনমনে কো।
দল কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছে কিন্তু
কোন দল প্রভাব বিস্তারে বাধ্য হওয়ার
জনগণ বিশেষচালিত হয়েছে তার অনেক
সুস্পষ্ট পরিচয় ধরা পড়বে।

মাদ্রাজে ছাত্রনেতা প্রীতিবাসনের কাছে
কামরাজের, পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানব
জ্ঞে এম কিশোরের কাছে বগাইর কংগ্রেসের
জননেতা অতুল্য ঘোষের এবং উড়িষ্যা
মাত্র ২১ বছরের জনৈক স্কুল শিক্ষকের
কাছে প্রাক্তন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী প্রীতিবজ্জ
পটনারকের এবং এতাদৃশ আরও অনেক
চীটকা উদাহরণে জনগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন
যে, চতুর্থ নির্বাচনে তারা যেমন দল
রাহেন নি, তেমন ব্যক্তির গুরুত্বও তাঁদের

কাছে নগণ্য হয়ে গেছে। এই নির্বাচনে রাজনৈতিক চেতনা তেমন কোনও ভূমিকাই গ্রহণ করে নি, কংগ্রেসের প্রতি তাঁর বিশ্বাসই একমাত্র কারণ হয়েছে।

মাদ্রাজ :

১৩১ আসন বিশিষ্ট মাদ্রাজ রাজ্যে ডি এম কে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পর বিজয়ী নেতা শ্রী সি এন আম্মাদুরাই কেবলমাত্র ডি এম কে সদস্য-বিশিষ্ট মন্ডিসভা গঠন করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ উল্লেখ্য, ডি এম কে দ্রাবিড়স্থানের দাবিকে পূনরায় উত্থাপিত করবে না এবং শ্রীআম্মাদুরাই ডি এম কে-র ধারণামত সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবেন বলেও আশা পোষণ করেছেন। হিন্দী-বিরোধী ডি এম কে আঞ্চলিক ভাষাগুলির বখাযোগ্য সরকারী মর্যাদা লাভ না করা পর্যন্ত ইংরেজকেই সরকারী ভাষা হিসেবে চালু রাখার চেষ্টা করবেন। রাজ্যের অধিকতর

স্বায়ত্তশাসনের জন্যও ডি এম কে তার শক্তি প্রয়োগে কাপুরুষ করবে না।

ভারতদর্শনের আগামী কয়েকটি সংস্কার নির্বাচনোত্তর বিভিন্ন রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ মারাবাহিক আলোচনার চেষ্টা করা হবে। বর্তমানে স্থানাভাব-বশত সামগ্রিক আলোচনার ওপরই আম্মাদের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করা হল। দেশব্যাপী কংগ্রেসী মন্ত্রণালয়ের অবসানে জনগণ যেভাবে তাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন, ভারতদর্শন লেখক সেজন্য এই বিভাগীয় রচনার প্রতি প্রীতিমূলক সমস্ত পাঠকবর্গের তরফে গণশ্রুতির জন্মে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে একান্তভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর আশী-বর্ষ নিয়ে ডি এম কে তার মতিসভা

গঠনের আয়োজন করেছে। শ্রীআম্মাদুরাই বলেন, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে ডি এম কে নবাগত সুতরাং ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের আরম্ভ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

মাদ্রাজ উত্তর ভারতের বিপরীত কোটিতে বিপরীত শ্লেগান নিয়ে প্রতিষ্ঠা-লাভ করলেও, জনসংখ্যা উত্তর ভারতের উগ্র হিন্দী ও হিন্দুয়ানা প্রেমের সঙ্গে দক্ষিণীয়ানা ও হিন্দী হটাও আন্দোলনের যজ্ঞধারী ডি এম কে যে সাপে-নেড়লে সম্পর্ক স্থাপন করবে এমন মনে হয় না।

শ্রীআম্মাদুরাই ইতিমধ্যেই উত্তর ভারতের সঙ্গে কোনরূপ বিচ্ছিন্নতার মনো-ভাবে লালন করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রের সঙ্গেও বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একদিকে বাম মাগণীয় দলের সমর্থন আশা করছেন আবার অন্য দিকে রাজাজীর আশীর্বাদকে পাথের করেছেন আম্মাদুরাই।

এই মহোর্তে ডি এম কে-র আগামী রূপ সেজন্যই গণনা করা যায় না। তবে আমরা শ্রুতফলেরই আশা করব।

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বন্ধে
তিষ্ঠ ক্লণকাল এ সমাধিস্থলে।



এক নজরে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬৭

লোকসভা

(রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত)

বিধানসভা

রাজ্য	আসন সংখ্যা	কংগ্রেস	কম্যুনিষ্ট	কম্যুনিষ্ট-মার্কিস্ট	স্বতন্ত্র	পি এস পি	জনসঙ্ঘ	অন্যান্য দল	নির্দলীয়	মোট	আসন সংখ্যা	কংগ্রেস	কম্যুনিষ্ট	কম্যুনিষ্ট-মার্কিস্ট	ফরোয়ার্ড ব্লক	পি এস পি	বাংলা কংগ্রেস	স্বতন্ত্র	জনসঙ্ঘ	অন্যান্য দল	নির্দলীয়	মোট
অন্ধ্র	৪১	৩৫	১	—	৩	—	—	—	২	৪১	২৮৭	১৬৫	১০	৯	—	—	২৯	৩	৩	৬৮	২৮৭	
আসাম—	১৪	৯	১	—	—	২	—	—	—	১২	১২৬	৭২	৭	—	৫	—	২	—	১৪	২৪	১২৪	
বিহার—	৫৩	৩৪	৫	—	—	১	১	১০	২	৫৩	৩১৮	১২৮	২৪	৪	১৮	—	৪	২৬	৯২	২২	৩১৮	
গুজরাট—	২৪	১১	—	—	১২	—	—	১	—	২৪	১৬৮	৯২	—	—	৩	—	৬৬	১	২	৩	১৬৭	
হরিয়ানা—	৯	৭	—	—	—	—	১	—	১	৯	৮১	৩	—	—	—	—	৩	১২	২	১৬	৩৬	
জম্মু ও কাশ্মীর ৬	২	—	—	—	—	—	—	—	—	২	৭৫	৩১	—	—	—	—	—	১	—	৩	৩৫	
কেরল—	১৯	১	৩	৯	—	—	—	৩	৩	১৯	১৩৩	৯	১৯	৫২	—	—	—	—	৩৮	১৫	১৩৩	
মধ্যপ্রদেশ—	৩৭	২৪	—	—	১	—	১০	—	২	৩৭	২৯৬	১৬৭	১	—	৯	—	৭	৭৮	১০	২৪	২৯৬	
মাদ্রাজ—	৩৯	৩	—	৪	৬	—	—	২৬	—	৩৯	২৩৪	৪৯	২	১১	—	৪	—	২০	—	১৪০	৭	২৩৩
মহারাষ্ট্র—	৪৫	৩৭	২	—	—	১	—	৪	১	৪৫	২৭০	২০২	১০	১	৮	—	—	৪	২৮	১৬	২৬৯	
মহীশূর—	২৭	১৮	—	—	৫	৭	—	১	১	২৭	২১৬	১২৬	২	—	২০	—	১৬	৪	৮	৪০	২১৬	
উড়িষ্যা—	২০	৪	—	—	৭	—	—	১	—	১২	১৪০	৩০	৭	১	২১	—	৪৯	—	২৮	৩	১৬৯	
পাঞ্জাব—	১৩	৯	—	—	—	—	১	৩	—	১৩	১০৪	৪৮	৫	৩	—	—	—	৯	৩০	৯	১০৪	
রাজস্থান—	২৩	১০	—	—	৮	—	৩	—	২	২৩	১৮৪	৮৯	১	—	—	—	৪৯	২২	৮	১৫	১৮৪	
উত্তরপ্রদেশ ৮৫	৪৭	৫	১	১	১	১২	৯	৮	৮	৮৫	৪২৫	১৯৮	১৪	১	১১	—	১২	৯৭	৫৩	৩৭	৪২৫	
পশ্চিমবঙ্গ ৪০	১৪	৫	৫	—	১	—	১১	৪	৪	৪০	২৮০	১২৭	১৬	৪৪	১৩	৭	৩৪	১	১	২৭	১০	২৮০
নাগাল্যান্ড—	১	—	—	—	—	—	—	১	—	১	৪৬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল											আঞ্চলিক কাউন্সিল											
দিল্লী—	৭	১	—	—	—	—	৬	—	—	৭	৫৬	১৯	—	—	—	—	—	৩৩	১১	৩	৫৬	
হিমাচল	৬	২	—	—	—	—	—	—	—	২	৬০	৩৩	২	—	—	—	—	৭	—	১৩	৫৫	
মণিপুর—	২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৩০	৭	১	—	—	—	—	—	৩	২	১৩	
ত্রিপুরা—	২	২	—	—	—	—	—	—	—	২	৩০	২৭	১	২	—	—	—	—	—	—	—	৩০
গোয়াদমনদিউ ২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৩০	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
আন্দামান ও	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
নিকোবর	১	১	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
চণ্ডীগড়—	১	—	—	—	—	—	১	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
দাদরা ও	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
নগর হাভেলি ১	১	১	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
লাক্ষাদ্বীপ ও	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
মিনিকয়—	১	—	—	—	—	—	—	—	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
পণ্ডিচেরী—	১	১	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভায় ৩০জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইরাছেন, ইহাদের রাজ্যভিত্তিক হিসাব—অন্ধ্র—২, আসাম—৫, মণিপুর—১, মহারাষ্ট্র—১, মহীশূর—২ এবং জম্মু ও কাশ্মীর—২২।

* অন্যান্য: আসামে সর্বদলীয় পার্শ্বতা নেতৃসম্মেলন—৮, বিহারে কাড়খড় দল—২০, কেরলে মসলেম লীগ—১৪, মাদ্রাজে ডি-এম-কে—১৩৭, মসলেম লীগ—৩, মহারাষ্ট্র পি-ডি-ইউ-পি—১৯, উড়িষ্যা জন (মাস্টার)—২, পশ্চিমবঙ্গ—বাংলা কংগ্রেস—৩৫, ফরোয়ার্ড ব্লক—১৩। কংগ্রেস—২২, পাঞ্জাব—আকালী দল (সন্ত)—২৪, আকালী দল

যাই যাই করেও সুকর্নের যাওয়া আর হয়ে উঠছে না। যাবার ইচ্ছে অবশ্য তাঁর মোটেই নেই— কাজেই শুধু রবই উঠেছে, থাকে নিয়ে সে হৈ-ঠে তাঁর কিন্তু প্রক্ষেপও নেই। বহালতবিয়তে প্রেসিডেন্টের তখত-এ রয়েছেন তিনি। কিন্তু একথাও ঠিক যে গত ১৭ মাস হেসে-থেলে দিন গেলেও, আগামী দিন প্রেসিডেন্ট সুকর্নের অত সরল হবে না। সামনের সপ্তাহের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট সুকর্নের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে যখন এই মার্চ সর্বোচ্চ আইন পরিষদ পিপলস কনসালটেটিভ কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে।

অবশ্য ইতিমধ্যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট নাকি তাঁর সমস্ত দেশ শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা জেনারেল সুহর্তোর হাতে তুলে দিয়েছেন, তিনি কেবল পোষাকী প্রেসিডেন্ট পদ নিয়েই রয়েছেন। কিন্তু এতে সেনাবাহিনী বা বর্তমান শাসকগোষ্ঠী খুশি হতে পারবে কিনা বলা শক্ত। কারণ পোষাকীই হোন আর গদিসর্বস্বই হোন, শাসকগোষ্ঠী বা জেনারেল সুহর্তোকে যদি প্রতি কাজের জন্যে প্রেসিডেন্ট সুকর্নের কাছে দায়ী থাকতে হয় তবে সে আপোষে শাসকগোষ্ঠী কিছুতেই রাজী হবে বলে মনে হয় না। কারণ, সুকর্ন যতদিন না পদত্যাগ করছেন ততদিন সেনাবাহিনী বা বর্তমান সরকারের বৃকে তিনি একটা দুরন্ত কাঁটার মতই খচ্-খচ্ করে বিধতে থাকবেন। কাজেই শাসনকর্তৃপক্ষ চান প্রেসিডেন্ট সুকর্নকে এখুনি পদত্যাগ করতে হবে এবং দেশ ছেড়ে চিরতরে নির্বাসনে যেতে হবে। দেশে তাঁর উপস্থিতি ভবিষ্যতে হাঙ্গামা-বিশংখলা ডেকে আনবে বলে শাসকগোষ্ঠীর আশঙ্কা।

প্রেসিডেন্ট সুকর্নের বিরুদ্ধে জেনারেল সুহর্তো বা সামরিক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ কি তার বিস্তৃত ইতিহাস আবার নতুন করে বিবত করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ১৯৬৫ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর এখানে যে ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয় যার ফলে হাজার হাজার নিহত হন এবং কয়েকজন আহত হন, সেই অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার সপক্ষে প্রেসিডেন্ট সুকর্নও জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। জঃ সুকর্ন সে অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করলেও সামরিক আদালতের সাক্ষ্যে কয়েকজন অপরাধী কবলে করেছেন যে প্রেসিডেন্ট সুকর্ন একেবারে নিরপরাধ ছিলেন না, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক, তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই সেনাবাহিনীর একাংশ বা কমিউনিস্টরা সেদিন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। সেই থেকে ছাত্র উত্তেজন-গণিল এবং মুসলিম জনতার একাংশ পেসি-



আন্তর্জাতিক

অতীতের স্মৃতি—
সুহর্তোর বৃকে একটি পদক এঁটে দিচ্ছেন সুকর্ন

ডেস্টের পদত্যাগ দাবি করে আসছিল, কিন্তু এখনও তার কোন মীমাংসা হ'তে পারে নি। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের পথে বাধা ছিল এই যে মধ্য ও পূর্ব জাভায় তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেশি যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটলেই গৃহ-যুদ্ধ বেধে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। সেনাবাহিনী জানে, ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর দেশে একটা হাঙ্গামা বড় হয়ে গিয়েছে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ১০ লক্ষেরও বেশি কমিউনিস্টকে নিধন করতে হয়েছে এবং এই নিধন-যজ্ঞে একাদিকে যেমন সেনাবাহিনী ছিল, তেমনি অনাদিকে অসামরিক মুসলিমরা ছিল। এই প্রচণ্ড লোকক্ষয় ও রক্তপাতের পর সে পথে এগুনো আর যুক্তিবদ্ধ মনে না করাটা সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই তারা চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট সুকর্ন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করুন, দেশ ছেড়ে চলে যান। কারণ, কর্তৃপক্ষ এটাও জানেন যে দেশের মধ্যে সুকর্ন-বিরোধী আন্দোলন এবং মনোভাব যেভাবে প্রবল হয়ে উঠছে একে যদি এখনই

উপশম করা না যায়, দাবি যদি এখুনি মিটিয়ে ফেলা না হয়, তাহলে অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর বাইরে চলে যাবে, গৃহযুদ্ধ তখনও অনিবার্য হয়ে পড়বে। বাস্তবিক, এরই মধ্যে সুকর্ন-পক্ষী ও সুকর্ন-বিরোধীদের মধ্যে হাতাহাতি থেকে গুলীবর্ষণ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে—যার ফলে দু'পক্ষেই কয়েকজন হতাহত হয়েছে। নৌবাহিনী এবং ছত্রীসেনানীরা যখন এ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তখন এ আশঙ্কা করা অসম্ভব হবে না যে, কর্তৃপক্ষ সুকর্নের ব্যাপারে যে-সিদ্ধান্তই নিন না কেন, তা অবিলম্বে নিতে হবে এবং কার্যকর করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ন যেমন পদত্যাগে অসম্মত তেমনি দেশবিরাগী হতেও পর-রাজী। অর্থাৎ বড়বল্ল বা অভ্যুত্থানের সপক্ষে তাঁর কোনরকম সম্পর্ক যে ছিল না, একথাটার ওপর জোর দিয়েই তিনি বলতে চান যে—তিনি কোন অপরাধ করেন নি যে পদত্যাগ করতে হবে তাঁকে। নির্বাসনে যেতে তিনি অস্বীকার করলেন এজন্যে যে

ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবের প্রতি, তার স্বাধীনতার প্রতি ডঃ সুকর্নের যে অবদান রয়েছে, তাতে দেশের স্বতন্ত্র হবার যোগ্যতা তাঁর অন্য কারও চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। কাজেই দেশ ছেড়ে চলে যাবার কোন প্রশ্নই তাঁর পক্ষে ওঠে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়ে পড়েছেন বিপদে। কারণ, সুকর্ন যদি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকেন তবে মালয়েশিয়া, ভারত এমন কি চীনের সঙ্গে যে সম্পর্ক নতুন করে তারা স্থাপন করতে চান তাতে বাধা দিতে পারেন তিনি। বঙ্গভূত মালয়েশিয়ার প্রশ্নে এ-বাধা এসেও ছিল। কাজেই কর্তৃপক্ষের নতুন বৈদেশিক নীতির পক্ষে যিনি বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে অপসারণের চেষ্টা তো চলবেই।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল, প্রাথমিক স্তরে সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্ট সুকর্নের দেশত্যাগের দাবি তুললেও এক্ষণে এ প্রস্তাব তাঁরা বাতিল করে দিয়েছেন। এক সময়ে শোনা গিয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট সুকর্ন জাপানে গিয়ে বাকী জীবন কাটাবেন। কিন্তু বর্তমানে কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বিদেশে গিয়ে ডঃ সুকর্ন আবার নতুন করে হাঙ্গামার সৃষ্টি করতে পারেন, কাজেই দেশের সীমানা ছাড়ানো তাঁর চলবে না, প্রেসিডেন্টের গর্দি থেকে অপসারণ করে সাধারণ নাগরিক হিসেবেই তাঁর বিচার হবে।

কী হবে না হবে তা নির্বাচিত হবে আগামী ৭ই মার্চের পিপলস্ কনসালটেন্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে।

ভিয়েতনাম

চান্দ্র নববর্ষ উপলক্ষে যখন ভিয়েতনামে চারদিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয় এবং মোটামুটি নির্ব্বাদে তা পালিত হয় তখন মার্কিন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একটা শুভবুদ্ধি দেখা গিয়েছিল। সে চারদিনে যুদ্ধবিরতির যে কোন লঙ্ঘন হয় নি তা নয়, কিন্তু কোনটিই মারাত্মক ধরনের হ'তে পারে নি। আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ রেখেছিল, উত্তর ভিয়েতনামও পাশ্চাত্য আক্রমণ থেকে ক্ষান্ত ছিল। কিন্তু সকলেই যখন আশা করেছিলেন যে, আমেরিকা এই শান্তির আবহাওয়ার সুযোগ নেবে এবং স্থায়ী শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, তখন দেখা গিয়েছে যে মার্কিন তরফে সে-জাতীয় কোন আগ্রহই নেই।

এ-প্রসঙ্গে সেনেটের ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান সেনেটর ফুলব্রাইট বলেছেন যে, আমেরিকা যে সুযোগ হারাল তা আবার শীগগির পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব

এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, তাঁরা ভিয়েতনাম সমস্যাটির আপোষ-রফা চান না, উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার আসতে তাঁরা নারাজ, তাঁরা চান যুদ্ধজয় করতে, উত্তর ভিয়েতনামকে পরাজিত করে তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে। কিন্তু এই চেষ্টা আদৌ কখনও ফলবতী কবে কিনা, কিম্বা এই নীতির প্রতিক্রিয়া অন্য দেশের ওপর কী হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্য দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং জনসাধারণ কী চোখে দেখবে তা বোধ হয় মার্কিন কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখছেন না। স্বতীয়ত প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েতনাম নীতি এখন পৃথিবীর সর্বত্রই নিশ্চিত হচ্ছে, যেসব বশব্দ রাষ্ট্র আমেরিকার যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে সেসব রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরা তাদের সরকারের নীতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আর একটি বিষয় প্রেসিডেন্ট জনসনের ভুলে যাওয়া কোনমতেই উচিত হবে না যে,



জনসন

সামনেই প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচন আসছে। গত বছরের প্রতিনিধি নির্বাচনে তাঁর দলের বিপর্যয় ঘটেছিল। যদি এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট জনসন ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ না দেখান তবে আসন্ন নির্বাচনে তাঁর এবং তাঁর দলের ভরাডুবি হবার আশংকাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রেসিডেন্ট জনসন একটা আলোয়ার পেছনে ছুটে চলেছেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে। তিনি মনে ভাবছেন যে, আমেরিকার হাতে উন্নত ধরনের অস্ত্র আছে বলেই সে যুদ্ধে জিতবে, উত্তর ভিয়েতনাম পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হবে। উত্তর ভিয়েতনামীদের, দিয়োন বিয়োন ফু'র বোম্বারদের সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জনসনের

ধারণা অস্পষ্ট বলেই এ-ধরনের ধারণা তাঁর মনে বাসা বাঁধতে পেরেছে। ওদিকে চীনের একটা খবরে প্রকাশ যে চীন সরকার নাকি ভিয়েতনামে কোনরকম আলোচনার মাধ্যমে শান্তির বিরোধী, তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে উত্তর ভিয়েতনাম সরকারের কাছে নির্দেশ দিয়েছে। পিকিংয়ের সংবাদ-পত্রগুলিতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে নাকি বলা হয়েছে যে, চীন উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য করার জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত। সে চায় যেন উত্তর ভিয়েতনাম এবং ভিয়েত কংরা আমেরিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকে। কারণ তার স্থির বিশ্বাস যে, আমেরিকা দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না, তাকে পিছু হটতেই হবে। শান্তি আলোচনার বিরোধিতা করে চীন বলেছে যে, আলোচনার উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে হ্যানয়ে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার মূল্য হিসেবে এক কোটি চিল্লিশ লক্ষ দক্ষিণ ভিয়েতনামীকে সাহায্য পাঠানো বন্ধ করা—তবে সে আলোচনা বৈঠক না হওয়াই ভাল। কারণ সংগ্রামী ভাইদের ত্যাগ করা, বিভক্ত ভিয়েতনামের রায়কে মেনে নেওয়া উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হবে না। কারণ, দুই ভিয়েতনামের অস্তিত্বের সুযোগে আমেরিকা আবার এখানে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবে।

চীনের এই মোড়লী ডঃ হো চি মিন কতখানি মেনে নেবেন বলা শক্ত। তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা গিয়েছে। চীন যতই গরম গরম বুলি আওড়াক, উত্তর ভিয়েতনাম জানে যে, এ পর্যন্ত চীন থেকে সে সামরিক সাহায্য বিশেষ পায় নি, বরং সোভিয়েট সাহায্য আসতে সে বাধা দিয়েছে। সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঠেলায় চীনে এখন প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি চলছে। খোদ মাও সে-তুঙের বিরুদ্ধেই চরম বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছে, যাকে দমন করতে মাওকে চরম পন্থা নিতে হচ্ছে। পূর্বনো বন্ধুদেরও সে একে একে হারাচ্ছে, তার সর্বনাশা নীতির জন্যে। জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি, উত্তর কোরিয়া, বহিম'গোলিয়া প্রভৃতি চীনের পূর্বনো সহৃদয় চীনের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এই বাস্তব অবস্থা মনে রেখে ডঃ হো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে খুব একটা উৎসাহিত হবেন বলে মনে হয় না। অবশ্য, উত্তর ভিয়েতনামীদের মনোবল এত বিপর্যয় সত্ত্বেও এখনও অটুট রয়েছে। কাজেই আমেরিকার পক্ষ থেকে যদি কোন সাড়া পাওয়া না যায় তবে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সে প্রস্তুত।

চতুর্থ নির্বাচনের পরে

প্রফুল্লকুমার দত্ত

আলো জ্বলে উঠবে, আমি জানতাম! আনন্দ করো ভেঁমিরা;
আমি আশু
একটিবার গত বিশ বছরের অন্ধকার দুর্গে ঢুকতে চাই,
যেখানে কক্ষালসার আমাদের অসংখ্য সঙ্গীর
মুখ-ধুবড়ে রয়েছে পড়ে, বাঁচতে চেষ্টা। দেখে আসতে চাই—
সেই সব সঙ্গীদের কোনো স্মৃতিচিহ্ন আজ চোখে পড়ে কি না।

অন্ধকারে শব্দ একটু আলো জ্বলতে চেষ্টা, অন্ধকারে
মিশে আছে যারা, দেখবো, তাদের নিঃশব্দ সব মুখের আদল
চোখে পড়ে কি না; না কি ধূসর জল্লাদেরা দুর্গের
দুর্গের অন্ধকারে
আলোটা জ্বলতেই সব স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলে পালিয়েছে!

তাই
একটিবার গত বিশ বছরের অন্ধকার দুর্গে ঢুকতে চাই।

অন্ধকার দুর্গে ভেঙে অন্যকার এ-আলোর আসতে চেষ্টা যারা
মুখ-ধুবড়ে রয়েছে পড়ে সে-অন্ধকারেই, সেই সঙ্গীদের
অতৃপ্ত আত্মা

তৃপ্ত-শান্তি কামনায় এখন ধ্যানস্থ হতে চাই।
কেন্দ্রে শান্ত হতে চাই;

তৃপ্ত-শান্তি পেতে হলে অন্ধকারে ঢুকে কাঁদতে হয়! সুতরাং
একটিবার গত বিশ বছরের অন্ধকার দুর্গে ঢুকতে চাই!

আলো জ্বলে উঠবে, আমি জানতাম! এবং তার ভবিষ্যৎবাণী
কবিতায়, গানে আর গত বিশ বছরের ছবিতে বিধৃত—
অন্ধকারে ঢুকে আজ সে-সব কবিতা-গান-ছবি সঙ্গীদের
মুখের আদল যদি চোখে পড়ে, দেখবো নেড়ে-চেড়ে। আজ তাই
একটিবার গত বিশ বছরের অন্ধকার দুর্গে ঢুকতে চাই।

সৃষ্টির সমাপ্তি

রবিয়াল হোসেন

রাগির অশ্বনয়ন মেলে দেখি সকালে
কে যেন আলোর অর্বা নিয়ে
দাঁড়িয়ে দূরারে
ঘটা-ঘট শব্দ করে বলে :
“চেষ্টা দ্যাখো.....চেষ্টা দ্যাখো আমি এসেছি।”

দেয়ালে ক্যালেন্ডারের ছবি, ঘরের আসবাব
মশারি, বালিশ, বিছানা, খাট
জানালা খুলতেই একচিলতে আকাশ
দু-একটা বেহানা গাছ, অজানা পাখীর অচেনা ডাক
সমস্বরে ঘোষণা করলো যেন : “সে আবার এসেছে
সে আবার এসেছে আজ.....!”

আমি কিন্তু রাগত এক অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করি
এতো একই আলো—একই রূপ—একই দৃশ্যের
পুনরাবৃত্তি, শব্দ!.....তবুও তার আসার
ভাষ্য আমি বুঝতে পারি;—কিন্তু
নিজেকে তো ক্ষীরমাগ এবং অনুর্বর একটা
বাগান বলে মনে ভাবি, যেখানে—নীরব
একটি বৃক্ষ কুড়ি-ফুল-ফলের অস্তিত্বহীন বিবর্ণ চোখে
উষ্মকোশে শব্দ চেষ্টা আছে.....।

অনুর্বর বাগানে উপবাসী বৃক্ষের মত আমার প্রাণ
সেখানেও ফুলের উদ্ভিদ সে আশা করে—আশ্চর্য!
সেখানেও সৃষ্টির সমুদ্র দেখবে সে ভাবে—অবাক কান্ড

বরং অন্য কোথাও চলে যাও রূপবতী
যারা নৌকো ভর্তি সোনার ফসল তুলে দেবে।
আমাকে এখন উপোসী পেটের জন্য
খাদ্যের স্থানে বেরতে হবে.....!

রাজা-উজীর

অরবিন্দ দত্তাচার্য

আজ রাতে যাত্রা হবে গাঁধে। আজ রাতে
রাজা-উজীরের বেশে গুটিকয় বিনিময় প্রহর
লগ্ন দেবে ইতিহাস, হাসি-কান্না শত বছরের
লুপ্ত-লুপ্ত কেটে যাবে কাহিনীর শাঁখের
ওরা, কেউ রাজা হবে, হবে মন্ত্রী, সেনা, ভদ্র
এ যুগের ভাত খেয়ে ক্ষয়ে যাওয়া ক্ষীণ নজর
কোণে জ্বলে রান, স্নেহ, অনুরাগ, ভালোবাসা, প্রীতি
ধীর হবে ক্রমশঃ বুকে নিয়ে বাঁচার তাগিদ।

আব কোনো দামে আজ বিক্রয় না রাজার জীবনী—
শব্দ, দুটো অর্থ ছাড়া। কাল প্রাতে শিবাজীর নীতি,
শাহজাহানের প্রেম মুছে দিয়ে, প্রাণের উদ্ভিদ
ওরা সব কাঙালীর ক্ষুধা নিয়ে টাকা আনা গাঁদা
এই শতকের কোন অভিশপ্ত কোণে যাবে মিশে।
রাজা-উজীরেরা হাটে মাছ, ডাল, ভরকারি নিয়ে
বসে কেউ ভাববে না মোগলের রাজ্য গেছে কিন্তু
কিন্তু বাট ক্রাইভ স্বাধীনতা নিয়েছে হিন্দু।

ঐশ্বর মেলা

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর—ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম : আট টাকা।

যাঁর 'হৃদয় সুন্দর,' 'বাক্য সুন্দর,' 'হাস্য সুন্দর' সেই সব সুন্দর গ্রন্থেদী রামেন্দ্রসুন্দরের "সমগ্র জীবন ও সাহিত্য-সৃষ্টি" নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ" রচনার স্বাধীন নিয়ে যখন কোন লেখক তথা প্রকাশক হাজির হন, সাহিত্য-সমালোচক যাদেরই তখন অবহিত ও উৎকর্ষ না হয়ে উপায় থাকে না; কারণ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বাঙালীর অপরিণীত মণি আজও সঠিকস্বীকৃতি পায় নি। তাই 'পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর' নামের চরিত্র পর্যালোচনাটি বিদগ্ধ বাঙালী পাঠককে উৎসুক করে তুলবে।

প্রথমেই বলে রাখি—"অসামান্য প্রতিভাধর এই মনীষী সম্পর্কে ইতস্তত বাক্য কিছু কিছু আলোচনা হলেও... তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ... রচিত হয় নি।"—আমরা এই উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করলেও "আলোচ্য গ্রন্থে সেই অভাব দূর হল" বলে মনে করি না।

সাহিত্য কথা ভাগের সুচীপত্র ও অন্যান্যশীর্ষ দেখে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, পথিকৃৎ রামেন্দ্র চরিত্রের দিশারী ভূমিকাটি সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রশংসনীয় হলেও, আলোচনায় গভীরতা নেই। একাধিক স্থানে আলোচনা পল্লব-গ্রাহিত্যের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এর প্রধান কারণ আলোচনায় বিস্তারের অভাব।

জীবন কাহিনী ভাগের কাহিনীর গতি মল্ল। আখ্যায়িকা ও ব্যাখ্যান যথেষ্ট ময়। কারণ—কাহিনীকালের পটভূমিকার চিত্রিত হলেও প্রধানত বিষয়ানুক্রমিক। এতে জীবন-চরিত্রকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টির সামগ্রিকতা ব্যাহত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আশঙ্কা মিরদুজির ও পুনরাবৃত্তির। দৃষ্টান্তরূপে—'সাহিত্য কথা' অংশে বিধৃত আচার্যের 'শিক্ষা-চিন্তা' প্রসঙ্গটি 'জীবন-কাহিনী'

অংশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ অনিবার্যরূপেই এসে পড়েছে। রিপন কলেজ পরিদর্শন উপলক্ষে, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি স্যার মাইকেল স্যাডলার আচার্যের সঙ্গে পরিচিত ও তাঁর বিদ্যাবৃত্তা ও কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার ও তার পরিচালনাপন্থি সম্বন্ধে যে প্রশ্নাবলী পাঠান, তার উত্তরে আচার্যের মতামত বাংলার উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে এক অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল। স্থান সংক্ষেপের প্রাণান্ত পরাসে তার কাঁচি-কাটা যে-অংশটি 'কাহিনী' ভাগে উপস্থাপিত হয়েছে, তার বিস্তারিত আলোচনার স্থান 'সাহিত্য কথা'র 'শিক্ষা-চিন্তা'য়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা-চিন্তার আর এক দিশারী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার আর এক দিকপাল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের যোগাযোগ সামান্য উল্লেখ শেষ হয়েছে। অথচ প্রসঙ্গটি কাহিনীভাগে ব্যক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্রচিত্রণে বর্ণাঢ্যতা দিত।

এ পর্যন্ত আমরা পর্যালোচনা গ্রন্থটির দুইটির সমালোচনা করছি। উপসংহারে তার সাধকতার কথা অকুঠিচিতে স্বীকার করা অবশ্য কতবা। পথিকৃৎ পুরুষের জীবনচরিত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক সামাজিক ইতিহাস। বহুস্তর জাতীয় ইতিহাসের এ অমূল্য উপাদান জীবনচরিত্র পর্যালোচকের কর্তব্য এর সুবিন্যস্ত আলোচনা। লেখকের বিষয়বিন্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। জাতীয় জীবনের এক যুগ-সমীক্ষণে আবির্ভূত এই পথিকৃৎ পুরুষের জীবন ও চরিত্র পরিক্রমা তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাঙালীর পূজ্য কর্তব্যই নয়; স্বাধীনতার মূল্যদানে বিভক্ত, ধর্ম সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় বিভ্রান্ত, জীবনযন্ত্রণার জর্জর বাঙালীর আজ প্রধান প্রয়োজন পথের সম্মুখে দিশারীর পথনির্দেশ। আলোচ্য পর্যালোচনা শ্রদ্ধা শিক্ষার্থী ও শিক্ষারত্নর নয়, চিন্তানায়ক ও বিদগ্ধ

বাঙালী যাদেরই—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্র ও চিন্তাপরিক্রমার দিক্‌দর্শিকার কাজ করবে।

গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—জনাথান সুইফট। অনুবাদঃ লীলা মজুমদার, সাহিত্য অকাদেমী, ববীন্দ্র-সবোবর স্টেডিয়াম, ব্লক-৫বি, কলিকাতা-২৯। পৃঃ ৩৫২। মূল্য : ১০.০০।

ইংরেজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতক প্রধানত গদ্য রচনার যুগ। ম্যাথু আর্নল্ড-এর মতে এ যুগ হচ্ছে "অতি-প্রয়োজনীয় যুক্তিবাদ ও গণ্যের" যুগ। এ যুগেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাষা লেখকদের স্বচ্ছ চিন্তাধারার স্বাধীন প্রথব ইয়ে উদ্ভূত ছিল। অ্যাডিসন, স্টীল তাঁদেব বচনার মাধ্যমে এ যুগের প্রতিনিধিত্ব করলেও আর একজন লেখক যিনি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেও ইংরেজী ভাষায় এক নতুন ও চমকপ্রদ (পরবর্তী লেখকদের স্বাধীনতার অনুকৃতি সম্ভব হয় নি) সাহিত্য সৃষ্টি করলেন যা সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করলেও ক্লাসিক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ইংরেজী ভাষা যাঁরা জানেন না, তাঁদেরও এখন অজানা নয়। তবু সেই জ্ঞান যথেষ্ট নয়। কাবণ তাঁরা তা জেনেছেন প্রায়শঃ মূখ থেকে কিংবা সংক্ষিপ্তাকারে অথবা পৃথক খণ্ডে ভাষান্তরিত কোন গ্রন্থের সাহায্যে। আলোচ্য গ্রন্থটি অনুবাদ। কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্য অকাদেমী যোগ্য সৌখিকার-স্বারা গালিভার্স ট্র্যাভেলস-এর সম্পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। সেই কারণে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকেরা মূল গ্রন্থের রস গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন একথা অনায়াসে বলা যায়। গালিভার্স ট্র্যাভেলস-এর অনুবাদকর্ম সহজ ব্যাপার নয়। দুটি পৃথক খণ্ডে সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা এক ব্যাপার, আর সম্পূর্ণ গ্রন্থকে সামনে রেখে রস কোথাও ক্ষয় না করে তার অনুবাদ করা অন্য ব্যাপার। মিতব্যয় ব্যাপারটি আবার গালিভার্স ট্র্যাভেলস-এর মত পুস্তকের অনুবাদ কর্মে আরও কঠিন ও জটিল। জনৈক আধুনিক ইংরেজ সমালোচক মূল গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"... his prose is clear, but it is a clarity sustained by the most vigorous mind of the century. It defies imitation. Never is the meaning obscure, and each argument is developed with a deadly certainty, not through rhetoric, but by

putting the proper words in the proper places.”

ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের যে নৈপুণ্য ছনাথান সুইফট্ দেখিয়েছেন, শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার তার যথার্থ প্রয়োগ দেখিয়েছেন। আমরা মাত্র একটি উদাহরণ তুলে দেখাচ্ছি। এর দ্বারা আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। ‘হুইন্স-দে’র দেশে’ পরিচ্ছেদে আছে—“প্রভু জ্ঞানতে চাইলেন সাধারণত কি কারণে ও কি উদ্দেশ্য নিয়ে এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে যায়। আমি বল-লাম—অসংখ্য কারণ থাকে, তবে তাব মধ্যে প্রধান কয়েকটির কথা বলছি। কখনো কখনো কারণটি হল রাজাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাঁদের কখনই মনে হয় না যে, তাঁদের স্ব-রাজ্য বা প্রজাসংখ্যা আছে সেই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। মাঝে মাঝে যুদ্ধের কারণ হল মন্ত্রীদের নষ্টামি; তাঁদের কুশাসনের বিরুদ্ধে, প্রজাদের বিক্ষোভকে হয় মুখ চেপে বন্ধ করবার নয় অন্য দিকে চালিত করবার জন্যে রাজাকে তারাই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখে। মতভেদের দরশ লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দেয়, যথা মাংস-ই রুটি, না রুটি-ই মাংস; একবকম ফলের রস রক্ত না মদ... ইত্যাদি।

যা হোক, গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট, রূপকথা, জাতীয় রূপকধর্মী কাহিনী বলে মনে হলেও এই কাহিনীর প্রতিটি ছন্দে লেখকের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা উপেক্ষণীয় নয়। সবচেয়ে বড় কথা, শিশুসুলভ হৃদয় নিয়েও উচ্চমাগণী চিন্তার অধিকারী সুইফট্-ই একমাত্র দেখাতে পেরেছেন যে, মানুষ যে ঘোড়াকে বাহন করেছে সেই মানুষই কিভাবে ঘোড়াকে বহন করতে শাধ্য হয়েছে।

সুইফট্-এর মত প্রতিভার স্থলাভি-বিশ্ত আজো সম্ভব হয় নি। কাহিনীর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের ক্ষুদ্রতার ও ভুলতার পরিচয় দিলেও বামনদের দেশ লিলিপুটে কিংবা ব্রবডিংনোগের অতিকায় মানুষগুলির মধ্যে গালিভারেব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জ্ঞানার উদগ্র কৌতুহল এই মহা-কাশ জয়ের স্বর্গেও অটুট বয়ে গেছে। আমরা আশা কবি, লীলা মজুমদার অনাদিত গ্রন্থটি পড়ে অল্পবয়স্কবাবু যেমন খুশি হবেন, তেমন পরিণতবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও সত্য দর্শনে সক্ষম হবেন। এই জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের জন্য সাহিত্য অকাদেমী অবশ্যই ধন্যবাদার্থ। পরিচালক উল্লেখযোগ্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পারস্পরিক সপ্রশংস-গ্রহণেচ্ছা পরিবর্ধনের জন্য গ্রন্থটি ইউনে-স্কোর সহায়তায় প্রকাশ করা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্য সাধক করার জন্যে গালিভার্স ট্রাভেলস-এব মত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে সাহিত্য অকাদেমী যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

পম্ফিল প্রণয়-বীর, চট্টোপাধ্যায়। সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ; ২২, স্ট্রাউ রোড, কলিকাতা-১। মূল্য : তিন টাকা।

যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে সৈন্যরা। কিন্তু দেশকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় গুপ্তচরের বুদ্ধিমত্তা। আর গুপ্তচর নিয়োগ করাই সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। সত্যিকারের বিশ্বাসভাজন গুপ্তচর কে তা নির্ণয় করাও সহজ ব্যাপার নয়। তবে গুপ্তচরবৃত্তি যারা করে তাদের দৃষ্টে ভাগ করাই উচিত। একদল গুপ্তচর হচ্ছে তারা—যারা দেশের স্বার্থে শত্রুর দেশে গুপ্তচরবৃত্তি অবলম্বন করে। আর একদল হচ্ছে তারা—অর্থলালসার স্বদেশের বিরুদ্ধে যারা গোপনে গুপ্তচর-বৃত্তি অবলম্বন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘৃণ্য জীব হচ্ছে পিনেৎ। শ্রীচট্টোপাধ্যায় তার আসল রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। আসলে সে ফরাসী। গুপ্তচরবৃত্তি করে জার্মানদের হয়ে। জার্মান কনেল কন্যােকে সে বিয়েও করে, তার কন্যাও হয়। এদিকে ফরাসী জেনারেলের মেয়েও তার দ্বারা প্রভাবিত। জার্মানদের যখন খারাপ অবস্থা তখন নতুন খবর সংগ্রহের জন্য পিনেৎ যায় আস্কারায়। সেখানেও জার্মানদের গুপ্তচরবৃত্তিতে রত সুন্দরী মহিলা ম্যাডাম ফ্লোরাও তার হাত থেকে রক্ষা পায় না। মোট কথা গুপ্তচরবৃত্তি যারা করে তারা মনুষ্যত্ব বিবাক্ত। পশু ‘ম’ কারেই তাদের আসক্তি। দেশের মানুষের কাছে তারা ঘৃণিত, আবার যে দেশের হয়ে তারা গুপ্তচরের কাজ কবে সে দেশের বিশ্বাসভাজনও নয়। যা হোক হিটলার ও জার্মান স্বশত্রুর মশায়ের কাছে বিশ্বাসভাজন বলে পিনেৎ প্রমাণিত হয়েছে,—পরিবর্তে পুরস্কারও পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল—সে হারিয়েছে স্ত্রী, কন্যা এবং স্বদেশকেও। ওই ব্যর্থতাটুকু ফুটিয়ে তুলেই বীরবাবু পিনেৎ-এর প্রতি পাঠকের মনে কিছুটা সহানুভূতির সৃষ্টি করেছেন। টেন ওল্টানো, শত্রু নিপাত, খুন-জখম—সবই এই গুপ্তচর কাহিনীতে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি সংবাদকে ভিত্তি করে কাহিনী রচনার লেখক নৈপুণ্যই

দেখিয়েছেন। তাছাড়া বইটির অন্য মূল্য এই যে, গুপ্তচরদের আসল স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

নির্জন প্রহর—শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম। পোঃ নরেন্দ্র-গুর, ২৪ পরগনা। মূল্য : তিন টাকা।

কবিকে নতুন নামে ‘নির্জন প্রহর’ গেলেও এই কবি যখন গাহ’স্থাপ্রমে ছিলেন তখন মৃণালকান্তি নামেই পরিচিত ছিলেন। তখন আমরা তাঁর কিছু কবিতা পত্র-পত্রিকায় পাঠ করে তাঁর কাব্যশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলাম। আনন্দের কথা, বর্তমানে তিনি গাহ’স্থাপ্রম ত্যাগ করলেও তাঁর কাব্য রচনাশক্তি পূর্বের মতো অটুটই আছে। শ্রীসরস্বতীর চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত। তবু হৃদয়োগসারিত তাঁর কাব্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য সৃষ্টি। অবশ্য প্রেম, প্রকৃতি নানান অনুভূতি তাঁর কাব্যের উৎস। সুতরাং ‘নির্জন প্রহর’ পড়ে আমরা নানান অনুভূতিতে অবগাহন করে মুগ্ধ হয়েছি। শ্রীসরস্বতীর সুগভীর অনুভূতি যুক্ত হয়েছে তখনই যখন তিনি ছোট ছোট কবিতা রচনা করেছেন। এই সব কবিতা বার বার পড়ার ও মনে রাখার মতো। মনে হয়, আমরা অ-সুখের জগতে কিছুটা শান্তির মধ্যে বিরাজ করছি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটও সুন্দর।

সাপ্তাহিক বসুমতীর গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

	টাকা	পয়সা
বার্ষিক	১৪.০০	
ত্রৈমাসিক	৭.০০	
পৌরুষিক	৩.৫০	

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মসূচক

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানা সহ ডাকটিকিটযুক্ত খাম থাকলে একমাত্র অননোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

অলসপ্রহর

অমনোজ্ঞানাপ্র ঘটক

সকালের রোদটা যেন দীর্ঘশ্বাসে ভরা। ফাল্গুনের টান পড়েছে চারদিকে। একটা অস্থির হতাশ ভাব। ভারী একটা পাথর লিরিয়ে মানুষগুলো যেন হাঁপাচ্ছে। রোদেও সেই হাঁপানো ক্লান্তি। শূন্য-শূন্য হয়ে আছে বায়ুমণ্ডল। সকালের তিথ্যক রোদটা মনে করিয়ে দিচ্ছে—অনেক কিছুর করবার ছিল হয়ত—কিছুই করা হয়ে উঠল না। আলসেমিতে ভরা রোদ—অতৃপ্তির চাদর।

বেতের চেয়ারটার বসে অলকেশ ভাবছিল। টেবিলের ওপর খবরের কাগজটা ভাঁজ করা রয়েছে। আজকাল কাগজ পড়তেও ভাল লাগে না। নতুন কোন সংবাদ নেই। কোন প্রান্তে একটা যুদ্ধ হচ্ছে। সৈন্য পাঠান হচ্ছে। নিশ্চয় উঠছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে। যুদ্ধ খিঁচিয়ে পড়ছে। শান্তির আলোচনা হচ্ছে। সব একঘেয়ে। গতানুগতিক। সুবোধ আর সুবাস্তবের মত। দাড়ি কামাবার সরঞ্জামগুলো একপাশে পড়ে আছে। এগুলো দৈনন্দিন কাজ। তবু আলসেমি লাগছে। বিরক্তি লাগছে অনেক অসুখের পর শরীরটা যেমন হালকা হয়ে যায়, খিঁচিতে হয়ে যায়। একটা পুরনো রেড বের করে আঙুলের নখগুলো কাটতে লাগল অলকেশ।

কোলের ওপর রোদটা এসে পড়ল। অলকেশের সরে যেতে ইচ্ছে হল না। রোদটাকে বড়ো বরসেব স্ত্রীর মত মনে হল। রাখতেও ঝামাট—ছেড়ে যেতেও মায়ী লাগে।

একটা সিগারেট খেলে মন্দ হয় না। সিগারেট ধরালো অলকেশ। মাঝে মাঝে কতগুলো চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভিসেট করা রোগীর মত মনে

হয় নিজেকে তখন। সমাধান পায় না অনেক চিন্তা করেও। মনে হয় অলকেশ যেন অনেক বড়ো হয়ে পড়েছে। জীবনের

ভার নিজের কাছেই অসহ্য লাগে। হেঁচকি বেলার ছিন্ন ছিন্ন স্মৃতিগুলো ভিড় করে আসে। সেই তিস্তানদীর চর। ওপায়ে

বানেশ জংসনের অস্পষ্ট আলো। ছেলে-বেলার বন্ধুদের। ইস্কুলের মাটার মশায়দের। এই স্মৃতিচিহ্নকে অলকেশ প্রাণীতার লক্ষণ বলে মনে করে।

আবার ভাবে—প্রেম-ভালবাসা—পাপ-পুণ্য—দয়া-মায়ী—এ সবার কি মূল্য আছে সামাজিক জীবনে? কোনটা আসল—মুখ না মুখোশ? মনে হয় মুখোশ। মুখোশ অবিকৃত থাকে অনেকদিন। পর্বশত-তার রূপ একটাই। কিন্তু মুখ—বয়স এবং কাৰ্যভেদে বদলায়। কোনগুলো মানুষের সদগুণ—আর কোনগুলো—ই বা অসৎ। মানুষের মধ্যে এই গুণগত প্রশ্নকে অসুস্থ ভাবনা বলে মনে হয়। সব গুণগুলোই যেন নিজ নিজ পরিখা খনন করে চলেছে—রচনা করছে ভবিষ্যতের কুস্তীপাক।

এ-ও মনে হয় কোনটা জ্ঞানতব—কুস্তলার ভালবাসা না বনানীর বিড়কা। সারাজীবন হয়ত এর মূল্যায়ন করতেই কেটে যাবে অলকেশের। নতুন কোন চিন্তা প্রশ্নর পাবে না। তবু অলকেশ বলবে বনানী-ই সনাতন পৃথিবীর রীতি। বিশৃঙ্খলাই নিয়ম—বিদ্রোহটাই দাবি। ভালবাসা, দয়ামায়া চিরকাল থাকবে। কুস্তলা, বনানী—দু'জনেই থাকবে। ভিন্ন কক্ষপথে তারা ঘুরবে—শুধু অলকেশ যেন কক্ষচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কুস্তলার কথা মনে পড়ে। ভরা ভরা দেহ, আঁট-সাঁট গড়ন। শিউলির আধ-ফোটা লাবণ্য নিয়ে অলকেশের দিকে তাকাত। অলকেশ নির্বিকার হাথ ওর কথা শুনত। মাঝে মাঝে দু'জনেই চুপ করে থাকত। কুস্তলার সঙ্গে বিয়ে হলে বোধ হয় ভালই হত। হল না। বিয়ের আগে কুস্তলার চোখেব জলে অলকেশের বাড়ির নাইলন ব্যান্ডটা ভিজে গিয়েছিল। শেষ চিঠির কথা এখনো মনে পড়ে।

.....ও-সব ন্যাকা সতীপনায় আমার বিবেক নেই। আমি আগের মতই তোমার কাছে আসব। জান আমাব খুব ভয় করছে। আমাকে ঘিরে কি সব কান্ড হাত চলেছে—আমি বসন্তে পাবিচি না। একটা অজানা আতঙ্কে অবশ হয়ে পড়াছি। তর্গি ভাল থেকে। একটা নিলে করে ফেলো। তোমার বো-অনেক সন্দেহী হবে। আমাব চেয়েও।

অলকেশ হেসে উঠল আপন মনে। একশ বছর আগের ঘটনা বলে মান চল যেন। সত্যি কুস্তলার জন্য কষ্ট হয়েছে অনেকদিন। মনে হ'ত বিকেল হলেই কুস্তলা আসবে। হয়ত একসঙ্গে বসে চা খাবে একটা দোকানে। নয়ত সিনেমা হলে গিয়ে বসবে। অলকেশ বেশ বুঝতে পারত—তারা দু'জনেই যেন ফুরিয়ে গেছে। নতুন কিছু আর বলবার ছিল না কোন

পক্ষেরই। এ যেন একই দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে শততম রজনী।

অলকেশ জানে কুস্তলা সুখেই আছে। হয়ত বা মোটা হয়েছে। মেয়েরা মোটা হলে বেঁটে দেখায়। রমলাদিকে বিয়ের পর বেঁটে দেখাত। কুস্তলার সংসারটা চিন্তা করার চেষ্টা করল অলকেশ। আসামের কোন এক শহরের কাঠের বাড়ির ভেতরটা এতদূর থেকে কম্পনা করা যায় না। তবু অলকেশ যথাসাধ্য চেষ্টা করল। অনেকদিন আগে একটা ক্যালেন্ডারে এ রকম কাঠের বাড়ি দেখেছিল—সেটাকেই মনে আনবার চেষ্টা করল। কুস্তলা ভালই সংসার করবে। গিন্নীপনা আছে। সংসারে টানও আছে।

কুস্তলার কথা মনে করতে কখন যে কড়ে আঙুলের নখটা একটু বেশি কাটা হয়ে গেছে—খেয়াল ছিল না। জ্বালা করতে লাগল। দহন-জ্বালা—কুস্তলার ওপর রাগ হল।

আজ একটা কিছু করা উচিত। এভাবে ঘরে বসে থাকলে মনটা আরও অবসন্ন হয়ে পড়বে। বেলেঘাটা গেলে হয়। রমলাদির বাড়ি অনেকদিন যাওয়া হয় নি। রমলাদি নিজের বোন নয়—মাসতুতো বোন। বছর কয়েকের বড়। আগে মাঝে মাঝে যেত অলকেশ। এখন আর যাওয়া হয় না। সময় পার না। বেলেঘাটার ঐ স্যাংসেতে বাড়িটার যে কিসেব মোহে পড়ে আছে রমলাদি আজও অলকেশ বুঝতে পারে না। আগে অনেকদিন মনে হত অলকেশের—আরবা উপন্যাসেব দৈত্যের মত বাড়িটাকে উপড়ে ফেলে। অনেক রোদ—অনেক বাতাস নিয়ে বাড়িটা প্রাণ পাক। তবু বাড়িটাষ একটা মায়ী আছে, আকর্ষণ আছে। সে রমলাদির স্নেহ। সব কিছুকে ভুলিয়ে দেয়।

দু'পুত্র গাড়িয়ে বিকেল এল। খসখসে বিকেল, স্বকের মসৃণতা অনেকখানি নষ্ট করে দিচ্ছে। একটা গরম হাওয়া দিচ্ছে।

স্ট্রীট, জিভ—যেন শূঁকিয়ে যাচ্ছে অঙ্গেতে। রমলাদির বাড়ি আসতেই যেন একটা ছায়া পেল অলকেশ। স্যাংসেতে বাড়িটা ক্রমশ যেন স্নেহময়ী হয়ে উঠতে লাগল।

বাড়ি ঢুকতেই যেন একটা চাপা চীৎকার কানে এল। বি আসে নি। রমলাদি নিজেই বাসন মাজতে লেগে গেছে। বি-এর চোন্দ পুরুষ উদ্ধার করছে। করেকটা অশালীন মন্তব্য করছে। অলকেশকে দেখে সামলে নিল।

—আয়, অনেকদিন পর এলি! ভাল আছিস তো। রমলাদি এই আন্তরিকতা-টুকু ভাল লাগল অলকেশের।

—এত চেঁচামেচি করছিস কেন?

—আর বলিস না। মাসের মধ্যে সাত-দিন বি আসে না। একটা না একটা লেগেই আছে। অথচ মাইনের বেলার মাস পেরোতে দেয় না।

রমলাদির ছোট ছেলেটা অলকেশের কাছে আসতে ইতস্তত করছিল। মার বিক্রমে সে যথেষ্ট হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সাহস পেল। অলকেশের কাছে এসে বলল—মামা, তুমি বলাইলে আমাকে সাইকেল কিনে দেবে।

আজ দু' বছরেও ছেলেটা সাইকেলের কথা ভুলল না। অলকেশ অনেক বুঝিয়ে দশটা পরসা হাতে দিল। ছেলেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পরসাটা—দশ পরসায় সাইকেল হয় নাকি?

রমলাদি গর্জে উঠল—আর কিছু না পাক—বাপ-কাকাদের মেজাজ পেয়েছে। জানিস অলক, এদের সংসারে এসে জ্বলে মরলাম। মনে হয় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বনে গিয়ে বসে থাকি।

অলকেশ হাসতে লাগল। রমলাদির মেজাজ তার জানা। একটু পরেই সব ভুলে যায়—তখন সে অন্য মানুষ।

—দেবুদা কখন ফেরে?

—ওর কথা বলিস না। রাত আটটার আগে তো নরই। রাতটা যদি অফিসে

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং প্লেটিং

কারিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শ্রী রুম ২—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কালি-১২। ফোন : ৩৪-৩১৭৩

৩, রাধামোহন পাল লেন, কালি-১২।

অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

থাকতে পারত তবে ভাল হ'ত। হ্যাঁ রে, তোর অফিসেও কি এত কাজ থাকে।

অলকেশ দেখছিল রমলাদির গায়ের রঙটা অনেক ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চুড়ি, শাখা অনেক ঢলঢলে লাগছে। গলার হাড়টাও অনেক উচু হয়ে গেছে।

পাশে রমলাদির মেখে শিখা জড়ো-মড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

—শিখার কোন ক্রাস হল?

শিখার উত্তরের আগেই রমলাদি ধলল—সেভেন। একটা মাস্টার দেখে দে না অলক, একেবারে পড়তে বসতে চায় না।

অলকেশ দেখল রমলাদির সংগে শিখার মুখের অনেক সাদৃশ্য আছে। তাদের বাড়িতে যে অনেকদিন আগেকার একটা গ্রুপ ছবি আছে—সেখানে রমলাদির ছোটবেলার চেহারা হুবহু শিখার মত। অলকেশ অভয় দিল—বৃদ্ধি-সুদৃষ্টি হলেই পড়বে।

রমলাদি কাঁথিয়ে উঠল—বারো বছর বয়স হতে চলল—আবার কবে বৃদ্ধি হবে! একটু সাহায্য করতে পারে না অতবড় মেয়ে। আজ মেবেছি খুব।

সেই খসখসে বিকেলটা কখন যে সম্মার ঘোমটা পবল—অলকেশ বুদ্ধিতে পারল না।

দেবদা সকাল সকাল ফিরে এল। অলকেশকে দেখে একটু আশ্চর্য হল।

—কি ভায়া, আজকাল যে একেবারে ডুমুরের ফল হয়ে পড়েছে—দেখা পাওয়াই ভার। আজ অফিস যাও নি?

—না, মন-মেজাজ ভাল নেই। কদিন ছুটি নিয়েছি।

—মন তোমাদের এখনও আছে?

ধীরে ধীরে জামা খুলল দেবদা। খাড়ের মাংস অনেক শল্য হয়ে বুদ্ধের দিকে বুলে পড়েছে। একটু কুঁজো হয়ে পড়েছে যেন বয়সের ভাবে। কানের পাশে মাথার চুলগুলোও অল্প অল্প পেকেছে। রমলাদি, দেবদা—শিখা—ছোট ছেলেটা সমাই যেন অন্ধকারে চাপা পড়েছিল অনেক দিন। মাটি-আলো-বাতাস রোদ—এদের স্পর্শ কবে নি যেন। বুদ্ধশূন্য প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মত লাগছে এদের।

—তোমাদের সকলের চেহারা বেজায় খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। কদিন বাইরে কোথাও ঘুরে এসো না।

—বাইরে মানে—চেজ—? দেবদা মাথা দিল। এই লটবহর নিয়ে বাইবে! তোমাব দিদিব জিনিসপত্রের জন্যেই ত' একটা রেলের ওয়াগন লাগবে!

দেবদা আপন মনে হাসতে লাগল।

—আর তোমার জিনিসপত্র বুদ্ধি

কম—না? ও সব না নিয়ে বাবার অজু-হাত! আমি আজ দশ বছর ধরে এ সব শুনছি।

—বৈরাগী মানুষ আমি, আমার কিই বা আছে। একটা ভাঙা সেতার, তাও এবার উনুনে জ্বলবে। বুদ্ধলে ভায়া, এরা মানুষটাকে দাম দিলে না। সারা জীবন ঝগড়া করেই কাটিয়ে দিলে তোমার দিদি!

অলকেশ বাবার প্রস্তুতি করল।

—বনানীর আর কোন খবর পাস নি? রমলাদির কথায় কেমন যেন আঁতকে উঠল অলকেশ। সারা ঘরে একটা নিস্তব্ধতা। ফুটন্ত জলের কেটলীর ওপর ঢাকনাটা অবিরত লাফাচ্ছে। শব্দটা গাঢ়তর হল।

অলকেশ সংক্ষেপে বলল—না।

রমলাদির বাড়ি থেকে ফিরতে রাত হল। অলকেশ অসুস্থবোধ করতে লাগল। মনে হল তার জ্বর হয়েছে। বনানীর ব্যাপারটা এতদিন পর কেন জানতে চাইল রমলাদি। ওরা ত' সবই জানে। অলকেশের সংগে বনানীর ডিভোর্স হয়ে গেছে। সে খবর ত' পুরনো হয়ে গেছে অনেক কাল। কোন ঘটনাই রমলাদির অজানা নয়।

তবে কি মেরেলি কোঁতা হল। চিরাচরিত বিধিকে বনানী অস্বীকার করেছে বলেই হয়ত সে এদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে পড়েছে। অলকেশ-বনানীদের সমাজে এসব ঘটনা অবিরত ঘটে না। দু'একটা উচ্কাপিডই দৃষ্টান্তের পক্ষে যথেষ্ট।

অলকেশের মনে হল পাগ-পুণ্য-দয়া-মায়া-ভালবাসা, প্রেম সব যেন লুকিয়ে থাকে আত্মগোপন করা নিশাচর জীবের মত—প্রতীক্ষা করে সুবর্ণগ্রহণের—হঠাৎ রাগির।

এক বছরও বনানীর সংগে তার বিবাহিত জীবন টিকল না। বনানী এসেছিল বিদ্রোহের আগুন হাতে নিয়ে। সুবর্ণরোষার ওপারে কোন এক শিল্প-নগরের ফোরম্যান তার জন্যে অপেক্ষা করছিল—কেন প্রথমেই তাকে গ্রহণ করল না বনানী। কি বাধা ছিল তার! কি অধিকার ছিল অলকেশের জীবনকে তোল-পাড় করবার। বিয়ের পর সেই যে বনানী চলে গেল—আর ফিরে এল না।

বনানীর অমতে এ বিয়ে হয়েছে, তাকে ভাববাব যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নি। অলকেশের মত নিজীব মানুষকে নিয়ে সে সারাজীবন কাটাতে পারবে না। বনানী ধরে নিয়েছে তার বিয়ে হয় নি।

অলকেশ জানে সুবর্ণরোষার ওপারে শিল্পনগরের ফোরম্যান বনানীকে নিয়ে ঘর

বাঁধতে পারবে না। বনানী একজাতীয় কমপ্লেক্স। কোন বন্ধন এরা চায় না। একজাতীয় মজ্ঞ পাখীর মত নিজের স্বাধীন সত্তাকে জ্বিয়ে রাখতে চায়।

অলকেশ ব্যাপারটা মীমাংসা করে নিতে চেয়েছিল—নিজের উদারতা দিয়ে, লিখেছিল—তোমার মন্থোমুখি হতে চাই—তোমার অভিযোগ সামনেই বলবে।

উত্তর এসেছিল—ক্রেদান্ত জীবের প্রতি যে ঘৃণা—সে ঘৃণা ছাড়া কিছই করি না তোমাকে। তা সই করবার শক্তি যদি থাকে তবেই এসো—উপযুক্ত জবাব দেব।

অলকেশের মনে হয়েছিল—সন্তপদী মিথ্যা, সুবর্ণ-সাক্ষী মিথ্যা। বিয়েটা শুধু দুটো-গাটছড়ার রক্তদান। কতকগুলো বিধিকে মন্ত্রের আর আচারের আকার দেওয়া হয়েছে। নবনারীর মনকে আবদ্ধ করতে পারে নি।

এর পরই অলকেশ ডিভোর্স-এর আবেদন করেছিল আদালতে। ওপার থেকে সম্মতি আসতে দেরি হয় নি। অলকেশ মেনে নিয়েছে তাবা দুটি আলাদা সত্তা। কেউ কাউকে জানে না—চেনে না। যেমন ছিল বিয়ের আগে।

মনের আদালতকে ফাঁকি দিতে পারে নি অলকেশ। অলকেশ শুনছে ধান-বাদার কাছে একটা মেয়ে-স্কুলে চাকরী নিয়েছে বনানী। চশমার প্যুওয়াটা হয়ত আরও বেড়ে গেছে। বিবেকের সংগে বৃদ্ধ করতে করতে শরীরটা হয়ত ভাঙনের দিকে এগিয়ে গেছে। মুখে-চোখে হয়ত তারই প্রতিফলন। সারাদিনের ক্রান্তি নিয়ে বনানী ঘরে ফিরে এসেছে। অলকেশের মনে হল বনানী যেন অনেক পরিশ্রম করেছে—এখন বিশ্রাম চায়।

অলকেশ-বনানী, দেবদা-রমলাদি—সবাই যেন নিজেকে আবর্তে দমহীন লাটুর মত ঘুরছে। বুদ্ধশেষের হতবল সৈনিকের মত অতলান্ত ক্রান্তিতে ডুবে যাচ্ছে।

অলকেশের মনে হল পৃথিবীর বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। অনাদি-পরিক্রমার সে যেন ক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর পারছে না নিজ আবর্তে সৌরপথকে অতিক্রম করতে। ম্যারাধন বীর যেন শেষ লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছবার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

গ্রহ-নক্ষত্র-ছায়াপথ চোখ মেলে তাকা-বার আগেই পৃথিবী যেন সীমাহীন ঘূর্ণ-মাগরে ঢলে পড়বে।

পাউলিঙ্-এর ডাক

ডাক এসেছে আবার। এবার পাউলিঙ্-এর কাছ থেকে। ইনি কোন্ পাউলিঙ্? আমেরিকার সেই মহাবিজ্ঞানী? যিনি কোয়ানটাম তত্ত্বকে রসায়নবিজ্ঞানে প্রয়োগ করে বিশ্বমানবের জ্ঞানের ভাণ্ডারটিকে হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম স্ফীত করে দিলেন? যিনি বিশ্বশান্তির স্বপ্ন দেখতে গিয়ে প্রতি মহৎ জ্বলপটু মরলেন? যাকে দু-দুবার নোবেল পুরস্কার দেবার পরেও কল্যাণরতীরা বলছেন, এ কোনো কথাই নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠা কর আগে, সেই হবে তাঁর সবচেয়ে বড় পুরস্কার? হ্যাঁ, ইনি সেই লাইনাস কার্ল পাউলিঙ্।

সেদিন তাঁর ডাক শুনতে পেলুম। আশ্চর্য এক ডাক। স্বার্থপরতার খোলস-টুকু ছেড়ে মহত্তর জীবনসাধনার পাদপীঠে পৌঁছবার ডাক। সমষ্টির মঙ্গলধর্মকে ছবতারা করে অন্ধকার অশান্ত বিশ্বে শান্তির প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসার ডাক। রাজধানী দিল্লীতে দাঁড়িয়ে এই ডাক দিলেন পাউলিঙ্।

অবাক লাগল। কারণ, রাজধানীতে তখন কালি ছিটোবার খেলা চলছে এবং নির্বাচনী লড়াইকে কেন্দ্র করে ভোট-মোছার একে অপরের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ বিষ ঢালছেন তা একান্ত করলে বিশ্বীয় আর একটি বমুন্যর জন্ম হতে পারে। আর সে বমুন্যর জলস্রোতের পবিত্র গরলের প্রবাহ যুগযুগান্তকাল ধরে তার সমস্ত জালা, বিশেষ ও মন্থনা নিয়ে অটুট, অব্যাহত ও অস্পন্দ থাকতে পারে।

তাই বিস্মিত হলুম পাউলিঙ্-এর কথা শুনে। অর্কাবাক্য পথে চলাটাই যখন সত্য হয়ে উঠেছে, তখন সোজা পথের নিশানা পেয়ে সচকিত হলুম। পাউলিঙ্ বললেন, আর নয় ছলনা। সত্যের বিকৃতি নয় আর। এবার এগিয়ে এসো। সভ্যসম্প্রদায় বৈজ্ঞানিকের দল মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। যে জ্ঞানের প্রদীপ তোমরা জ্বালছ, তা রাষ্ট্রনায়কদের হাতে ছেড়ে দিও না। কেন-না ওই জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে পেলে ও'রা তা দিয়ে কাউকে পথ দেখাবেন না; পথের দু'পাশে আছে যেসব ঘরবাড়ি সেগুলোতে আগুন ধরাবেন। ঘরবাড়িতে আছে যেসব মানুষ, তাদের পুড়িয়ে ছাই করবেন। অতএব, রাষ্ট্রনায়কদের হাত থেকে ফিরিয়ে নাও

শক্তি। ওঁদের সাবধান করে দিয়ে বল, ছেলেখেলা আর নয়। আর নয় আগুন নিয়ে খেলা। পারমাণবিক শক্তিকে শান্তির কাজে লাগাবার সময় অতি দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। আলোকের মত তীব্র গতিতে পৃথিবী ছুটে চলেছে চরম সর্বনাশের দিকে।

সন্দেহ হয়, পাউলিঙ্-এর এই কথা শুনে রাষ্ট্রনায়কদের অনেকেই অস্বস্তি অনুভব করবেন। ক্ষমতা ও দম্ভের পাশাপাশি দিয়ে গড়া ওঁদের অনেকেই চোখ-বল-সান ইয়ারতে ঐশ্বর্যের জলসা-ঘর যখন জম-জমাট, এখন একজন উঠে দাঁড়িয়ে উল্টো কথা বলছে দেখে অনেকেই হয়তো রুষ্ট হবেন।

কিন্তু উপায় কি! আর্কিমিডিস, নিউটন ও গ্যালিলিওদের আদর্শ এখনও যে পৃথিবী থেকে চিরাবদায় নেয় নি, সেটা ওঁদের দুর্ভাগ্য।

ওঁদের দুর্ভাগ্য, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের যে সৌভাগ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, ওই আদর্শ-বানদের কথা শুনেই আমরা মাঝে মাঝে নতুন কবে উপলব্ধি করি, এখনও বেঁচে আছি; অপমৃত্যুর হাত থেকে সভ্যতাকে বাঁচাবার পথ খোলা আছে এখনও।

প্রশ্ন উঠবে, সে পথ কোথায়? উত্তরে বলব, পাউলিঙ্-ই দিয়েছেন সে পথের নিশানা। বলেছেন, বিজ্ঞানের শক্তিকে ব্যাষ্টির কৃষ্ণগত না করে সমষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিজ্ঞানীকে রাষ্ট্রনায়কদের হাতিয়ার না হক্কে বহুস্তর কল্যাণবোধ নিয়ে জাগ্রত হতে হবে।

এইখানে গুরুতর একটি সমস্যার গুরুত্বমুখি হই আমবা। আমাদের সন্দেহ জাগে, বিজ্ঞানীরা জাগ্রত হবেন রাষ্ট্রনায়করা দিলে তো! আসলে চোখের সামনে কি দেখছি আমরা? আমবা দেখছি, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সমস্ত শক্তিকে আত্মসাৎ কবে বসে আছে। এক-একটি রাষ্ট্রের কর্ণধাররা স্থির করছেন, পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ কি হবে। ক'টা পরমাণু বোমা তৈরি করলে এবং ক'টা স্পোর্টনিক ছুঁড়লে শান্তির নামে যে গোলটেবিল বৈঠক হবে সেখানে বসে ফুলিয়ে আর মাথা উঁচিয়ে যেতে পারবেন। জনসাধারণকে প্রায়ই ধাম্পা দিয়ে ডুলিয়ে রাখেন ও'রা। বলেন, আত্মরক্ষার জন্যে এগুলো দরকার। স্বাদেশিকতার মহৎ মন্ড্রে সর্বাপেক্ষ দীক্ষা লাভ করতে

হলে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। আর স্পোর্টনিক! ও হল বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বড় সুন্দর একটি কণ্ঠস্বর। ওতে বসে ঘষেই তো যাচাই করছি আমরা বিজ্ঞানের গড়া সোনার পথটি কতদূর অবধি গেল।

আমরা, পাউলিঙ্-এর অনুরাগীরা কিন্তু এর উত্তরে কিছুর তিস্ত কথা বলব। আমরা বলব, কিসের যাচাই কবছ তোমরা? স্বাদেশিকতার নামে কোন্ ফাঁকা বুলি আওড়াছ? নিরপরাধ, শান্তিপ্ৰিয় মানুষকে মৃত্যু ও মৃত্যুর গুণে ঠেলে দিয়ে তোমরা কেন বলছো, এরই নাম দেশপ্রেম? তোমার দেশ কি পৃথিবী নয়? তোমার প্রথম পবিচয় কি এই নয় যে, তুমি মানুষ?

বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রনায়কদের অনেকেই এসব প্রশ্নেব কোনও সাদৃশ্য দেন না। অনেকে আবার আসল প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে পাঁচ কথেন। বলেন, আন্তর্জাতিকতা ইডেন বা স্বর্গোদ্যানের গতই একটি কল্পিত বস্তু। নিজের ঘর সামলাও আগে; আগে নিজের উদ্যানটির পবগাছা সাফ কর। পবে স্বর্গোদ্যানেব কথা ভাববে।

অস্বীকার কব না, নিজের ঘর সামলাবার প্রশ্ন সকলের আগে। নিজের উদ্যান সাফ রাখার প্রয়োজন সকলের প্রথমে। কিন্তু যুগে যুগে নিজের ঘর ও নিজের উদ্যানবাটির সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা কি অশান্ত ও বিরোধ ডেকে আনিছি না? এই গুরুত্ববোধের সুড়ঙ্গ দিয়েই রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষুধা ও ঔষ্মতা বিজ্ঞানবিদ্যার রাজদববাবে অনাধিকার প্রবেশ করছে না?

অকপটে বলতে পারি, করছে। তা' না হলে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যখন বুদ্ধক, তখন কেন গড়া হয় জের্মিনি প্রকল্প? কেন তেইশ শ' কোটি ডলার

সব চেয়ে ভাল
কাকার প্রোডাক্টসের
বানীধুপ
প্রতি যুগ কাকার প্রোডাক্টস দেখে নবন

সাপ্তাহিক বসমতী

শুধুমাত্র একটি প্রকল্পের পিছনে বরাদ্দ করা হয়? অথচ এ দিয়ে কি হবে! না, দূরের গ্রহে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন।

এইখানে একটি প্রশ্ন করতে মন চাইছে। আপনার ঘরের কোনো মানুষ যখন উপবাসী, তখন যদি আপনি সিমলায় হাওয়া খেতে যান, তো কেমন হয় কাজটা? খুবই স্বার্থপরের মত নয় কি?

স্পোর্টনিকের স্বর্গরাজ্য আমেরিকার জের্মিনি প্রকল্প বা রাশিয়ার লুনা প্রকল্পও ঠিক তাই। পৃথিবীর অগণিত মানুষ যখন অভাবে-অভিযোগে, দুঃখে-দারিদ্র্যে নিমেষিত, তখন কোটি কোটি টাকা জলের মত ব্যয় করা হচ্ছে চাঁদে যাবার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলাবার জন্যে। এ কি সেই ঘরের মানুষকে উপবাসী রেখে সিমলা যাবার আয়োজন নয়? অথবা ঘরের রোগী যেখানে এক টাকার ওষুধ পাচ্ছে না, সেখানে একশো টাকার বিলাসবহুল কিনে মানুষকে বসুন্ধা করা নয়?

জানি, লুনা বা জের্মিনি-প্রকল্পের উদ্যোক্তারা বলবেন, আমাদের ঘরের কেউ তো বিনা চিকিৎসায় নেই বস্তু। কেউ তো

উপবাসী নেই। বেশ সুখেই তো আছি আমরা।

আমরা বলব, এই যে আত্মপ্রসাদ ও স্বার্থদৃষ্টি—এই হল সকল সমস্যার মূলে। বলব, তোমরা সুখে আছ, কিন্তু পৃথিবীর অনেকেই নেই। আর ঘর বলতে শুধুমাত্র নিজেরটিকেই ভাবছ কেন? পৃথিবীর অন্য সব দেশের কথা কেন ভুলে বসে থাকছ?

আমাদের এই ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে আমরা যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে পেরেছি, শুধুমাত্র একটি জের্মিনি-প্রকল্পের তেইশ শ' কোটি ডলাব টাকার হিসেবে তার চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোক অধ্যুষিত বিরাট একটি দেশের পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় আমরা বা বরাদ্দ কবতে পারি নি, ওরা একটিমাত্র সৌখীন প্রকল্পে তার চেয়ে বেশি বরাদ্দ করার সাহস রাখে।

আশঙ্কার কথা, এই সাহসকে ফিকার জ্ঞানাবার মত লোকেরও আত্ম অভাব। সোদিন তিন-চারজন নভোচরের মতকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের উদ্যোক্তা বা প্রকরালতরে

বাহবাই পেলেন! সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বেদীমূলে আত্মহুতি দিয়েছে নভোচররা। ওদের বীরত্ব ও সাহসের তুলনা নেই। অজানাঞ্জে জানতে গিয়ে যুগে যুগে আত্মোৎসর্গ করেছে যারা, ওরা তাদেরই দলে।

আমরা পাউলিঙ-এর সমর্থকবা কিন্তু অন্য কথা বলব। আমাদের বস্তুবা, ওদের সাহসিকতা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। ওদের অকালমৃত্যুতে নিশ্চয়ই আমরা গম্বাহিত। আমবা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করছি, ফুসের মত করেকটি সুন্দর নিম্পাপ জীবন মধ্যাহ্ন-সূর্যের দীপ্তিকে প্রত্যক্ষ করার আগেই অসময়ে ঝরে গেল। কিন্তু একটা কথা, এমন আরও কত-শত জীবন সকলের অলঙ্ঘ্য ঝরে পড়ছে। কত-শত মানুষ ক্ষুধায়, দারিদ্র্যে তিলে তিলে মরছে। কত অভিযোগ ঘরে আলো জ্বলছে না। কত বৃশ্ণ সামান্য একটু ওষুধের অভাবে আত্ননাদ করছে! কে ওদের খবর রাখে? ওরা মরে গেলে কোন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওদের আত্মীয়দের কাছে সম-বেদনার বার্তা পাঠান? কটা সংবাদপত্র আট 'কলামে' 'ব্যানার' করে ওদের সংবাদ ছাপেন?

তা' যখন ছাপেন না, তখন বুঝতে হবে, ঘর-বিশেষের রোশনাইয়ের প্রতি মানুষের পক্ষপাতিত্ব। বিশেষ এক-একটি পবিত্র উদ্যানের প্রতি সকলের দৃষ্টি।

সেই দৃষ্টিকে আরও একটু সম্প্র-সারিত করার সময় হল এবার। শুধুমাত্র নিজের ঘর বা ঘর-বিশেষের মধ্যে যা আবস্থ ছিল তাকে আরও একটু ছড়িয়ে দেবার সময় হল।

জানি, অনেক রাষ্ট্রের কর্ণধার-ই এ-ধরনের কথার আঁধারে উঠবেন। স্বাদেশিক-তার সনাতন মন্ত্রটা উচ্চারণ কবে আবার সাধারণ মানুষকে ভোলাবার আয়োজন করবেন ও'রা। আবার দেশপ্রেমের নাম করে পৃথিবীকে যুদ্ধ ও অশান্তির পথে ঠেলে দেবেন। গাইবেন আবার সেই যুদ্ধের ঘুমপাড়ানী গান, বলির সময়কার বাজনার মত যা প্রাণীদের দিশেহারা করে।

কিন্তু বিজ্ঞানীকে এত সহজে দিশা-হারা হলে চলবে না। ও'দের মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের ধর্ম জাতীয়তাবাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীব মধ্যে আবদ্ধ নেই। মনে রাখতে হবে, ডাক এসেছে আবার। আশ্চর্য এক ডাক। স্বার্থপরতাব খোলসটুকু ছেড়ে মহত্তর জীবনসাধনাব পাদপীঠে পৌঁছ-বার ডাক। সমষ্টির মঙ্গলধর্মকে ধ্রুবতারা করে অন্ধকার অশান্ত বিশেষ শান্তির প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসার ডাক।

আমি গীতা দত্ত বসন্ত

গান শুনিয়া আপনাদের স্নেহলাভে
ধন্য হয়েছি, আমার এসেছি
অভিনয়ের জালি সাজিয়ে-
আপনাদের আশীর্বাদ চাই।

ডি.এস.প্রডাকশন্স
বসন্ত

প্রযোজনা: দিলীপ নাগ সঙ্গীত: কমন দাশগুপ্ত চিত্রমালা: ক্রিস্টান পলিবেসিট

শ্রে: প্রদীপ ॥ বিকাশ ॥ অভি ॥ জহব ॥ অজয় ও রাখী বিদ্যাস
প্রত্যহ
৩, ৬, ৯ **রূপবাণী ০ অরুণা ০ ভারতী**
সুচিত্রা ॥ লীলা ॥ যোগামায়া ॥ মায়াপুরী ॥ গৌরী (উত্তরপাড়া)
মানসী ॥ কল্যাণী ॥ শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া) ॥ বাটা সিনেমা
বিঃ দ্রঃ এই ছবির গানগুলি কল্যাণিয়া রেকর্ডে শুনুন

ইটাচুগা

ইটাচুগা

লোকে বলে ইট আর চুণের ভাটি ছিল কবে নাকি। তাই নাম হয়েছে ইটাচুগা। এখন ইটও নেই, চুণও নেই। আছে সর্বাপেক্ষে সর্ববিষয়ে সুন্দর সুসম্পূর্ণ গ্রামখানি গ্রাম, যা শব্দে আজ নয় সর্বকালের বঙ্গপঞ্জীর স্বনামধন্য।

পূর্বে রেলের ব্যাডেল-বর্ধমান লাইনের চতুর্থ স্টেশন বন্যান। অঞ্চলের নামও খন্যান। এপাশে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ওপাশে মগরা-খানপূর রোড। আশেপাশে মান্দারগ, দাদপূর, হালুসাই, বড় সরবা প্রভৃতি গ্রাম। মাঝখানে ইটাচুগা। মাত্র ষোল শত অধিবাসী নিয়ে খন্যান অঞ্চলের সম্ভবত কনিষ্ঠতম গ্রামসভা। আকারে ক্ষুদ্র, আয়তনেও অবহুঁ।

কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র হলেও, প্রকারে উপেক্ষণীয় নয়। বরং একডাকে চিনে নেওয়া যায় এমন একটু বেশিই উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য এর চমৎকার চেহারা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আর সুন্দর বক-বকে বাঁধানো—আম, জাম, কাঁঠাল, বাদামের ঘন শস্যের আড়াল করা ছায়ানিবিড় পথখানির

আকর্ষণে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধকারি শিক্ষাক্ষেত্রে এর বহুবিধ কু-মুখী অবদানে। বস্তুত হরেক বুকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গারে গারে ঘেঁসাঘেঁসি এমন একত্র নিবিড় সমাবেশ গ্রামে তো পরের কথা শহরেও সুলভ নয়।

বাংলা আন্দাজ ১১৭০ সালে বর্ধমান জেলার কৈচড় গ্রাম ত্যাগ করে কুলদেবতা

পারুল ভট্টাচার্য

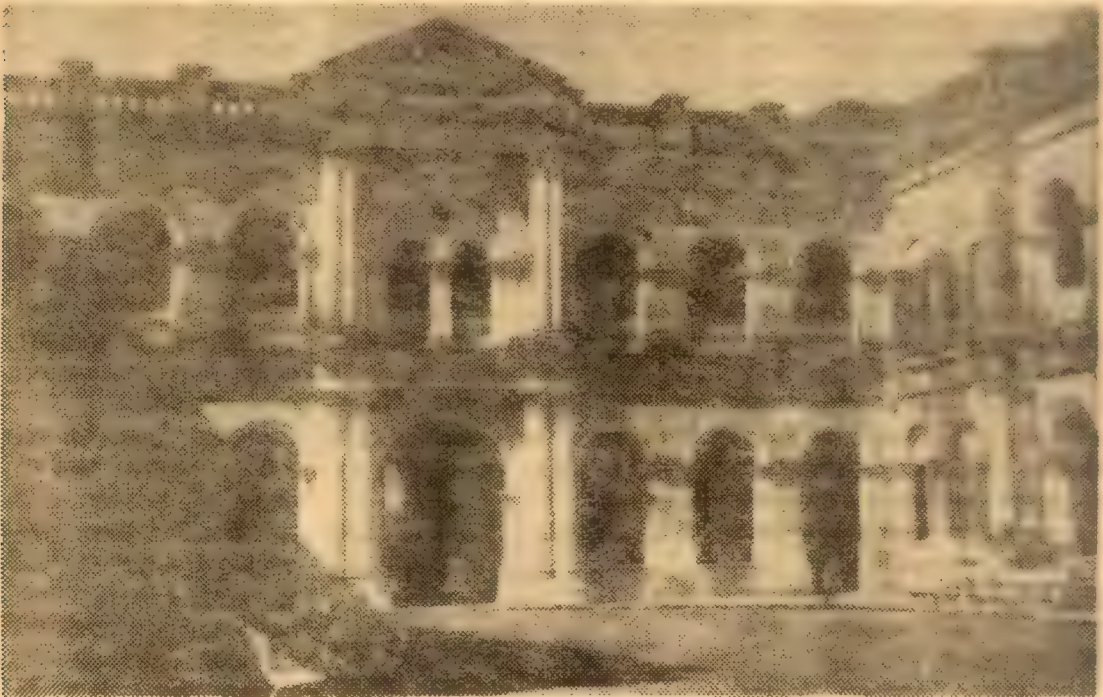
শ্রীধরজীউ শ্রীসাকল্যারাম কুন্ড, ইটাচুগায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। বর্ধমান ছেড়ে ইটাচুগায় কেন এলেন তিনি তা' আজ আর বলা যাবে না সঠিক করে। তবে সম্ভবত বর্গাভয়ে, কিংবা বিদ্রোহী শোভা সিংহের তাণ্ডব এড়ানোর তাগাদায় হতে পারে।

ইটাচুগার কুন্ড পরিবারের তিনিই আদিপুরুষ। তার আগে ইটাচুগার অবস্থা কিংবা সামাজিক ব্যবস্থা কেমন ছিল আজ আর তা' জানবার উপায় নেই। তবে অনুমান করা যায় পাণ্ডুরায় তখন শাহী

অধিকার। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের মসৃণ কেন্দ্র পাণ্ডুরায় একেবারে প্রান্তবর্তী এই গ্রামখানিতে ইট আর চুণ পোড়ানোর বড় বড় ভাটি আর ঘাটি থাকলেও থাকতে পারে—অসম্ভব কিছুর নয়।

সাকল্যারামেরই এক উত্তরপুরুষ শ্রীনারায়ণ কুন্ড। নারায়ণের দুই পুত্র—বিজয়নারায়ণ ও অক্ষয়নারায়ণ। ইটাচুগার উন্নতির আদি উদ্যোগ এই বিজয়নারায়ণের কালে। তাঁরই অর্থ শ্রম এবং সক্রিয় কর্মক্ষেপে।

১২৬৭ সালের আশ্বিন মাসে বিজয়নারায়ণের জন্ম। ছাত্রজীবন অতি সংক্ষিপ্ত। ব্যাডেল চার্চ স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। বিদ্যার অভাব পূরিয়ে নিয়েছিলেন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শ্রম এবং অধ্যবসায়। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে ঠিকাদারীর কাজ নিয়ে চলে যান বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে, বাঙ্গালোরে। ইংরাজ আমলে নতুন রেলপথ পাতা হচ্ছে তখন। এই রেলপথ পাতার কাজে প্রায় সমস্ত পুঁজি খাট পর্বতমালা এবং আসামের দুর্গমতম অঞ্চলগুলি ভ্রমণ করেন বিজয়নারায়ণ।



ইটাচুগার কুন্ডপ্রাসাদের একদৃশ্য

বলাই বাহুল্য—অর্থও উপার্জন করেছিলেন প্রচুর। স্বগ্রামে ফিরেছিলেন প্রায় কমলার দরপত্র হয়ে। এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ নির্মাণবিদ্যুৎ আবার মন দিলেন এক নতুন-তর নির্মাণে। এই প্রভূত সম্পদ ব্যয় করে যেমন তিনি জমিদারী কিনলেন, সম্পত্তি ঘাড়ালেন, শ্রীধরের মন্দির এবং আপন হাসভবনখানিরও সংযোজন ও পরিবর্ধন করলেন অনেক—তেমনি পিতৃ-পিতামহের ঘাসভূমি এই গ্রামখানিরও উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হলেন একান্ত আগ্রহে। আজকের ইটাচুণা সেই সক্রিয় চেষ্টারই ফলশ্রুতি। আজকের ইটাচুণাকে নামমূল্যে একখানি গ্রামমাত্র না বলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উপনগরী বলেই ঠিক হবে। একদা কুন্ড পরিবারের দানে ও উদ্যোগে যার শ্রুতভারম্ভ, ইদানীং সরকারী সহযোগিতায় যার ষোলকলা সমৃদ্ধি।

বিজয়ের পিতা শ্রীনারায়ণ এবং দ্রাভা অক্ষয়নারায়ণের প্রদত্ত অর্থ প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীনারায়ণ ট্রাস্ট ফাউন্ডেশন। পিতা ও দ্রাভার মৃত্যুর পর বিজয়নারায়ণও তাঁর সম্পত্তির একটি বিপুল অংশ দান করেন এই 'ফাউন্ডেশন'। উদ্দেশ্য—দেশসেবা, অর্থায়ন সংকার, রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা—এক কথায় জনকল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়ন।

আদি প্রতিষ্ঠান শ্রীনারায়ণ ইনস্টিটিউট-দন। অর্বেতনিক বিদ্যালয়। ১৯০৫ সনের ১লা এপ্রিল ১১টি শ্রেণীতে মোট ১০ জন শিক্ষক ও ১০২ জন ছাত্র নিয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় বিদ্যালয়টির। জননীর স্মৃতিরক্ষায় গোকুলমণি ছাত্রাবাস ও দ্রাভার স্মৃতি স্মরণে অক্ষয়কুমার হাসপাতালেরও প্রতিষ্ঠা প্রায় এই সঙ্গে সংগেই করেন বিজয়নারায়ণ। বিদ্যালয়টি বর্তমানে উচ্চ-মাধ্যমিক মানসম্পন্ন এবং দুগলী জেলার মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে। ছাত্রসংখ্যা ৫৫০। পাঠ্যবিষয় কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা।

গোকুলমণি ছাত্রাবাস আজও রয়েছে। ৪৮টি ছাত্র আবাসিক সন্নিবিধ পেয়ে থাকে। এখানে পরিচালনব্যবস্থা ভালই। কিন্তু ছাত্রদের খাদ্য-তালিকায় দুধের স্থান নেই দেখা গেল। বিনা দুধে শিশু-পালন বা দুধবর্জিত শিশুখাদ্য-তালিকা এমন কিছুর নতুন বা আশ্চর্য নয়, হামেশাই দেখা যায় আমাদের দেশে। তথাপি প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রাবাসে এ ঘাটতি বড়ই স্কন্ধ তথা মনোপীড়াকর। কর্তৃপক্ষকে অবহিত হতে বলি। ব্যবহারিক পদ্ধতি পর্যদ কি বলেন?

অক্ষয়নারায়ণ হাসপাতাল আদিত্তে ছিল শ্রীনারায়ণ ট্রাস্ট ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান।



সাক্ষ্যারাম কুন্ড, প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা শ্রীধরের মন্দির (ইটাচুণা)

২৫টি শয্যা ছিল রোগীদের জন্য। ঔষধপত্র এবং সেবা সবই পাওয়া যেতো বিনামূল্যে। ইদানীংকালে সেটি নেই। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারী পরিকল্পনার স্বাস্থ্যদপ্তর পরিচালিত অঞ্চল স্বাস্থ্য-কেন্দ্র। বিছানা ১০টি। বিলি-ব্যবস্থা আর পাঁচটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রই মতো।

তারপর অনেককাল গেছে। আদি সেই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গজিয়ে উঠেছে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়। বর্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ। প্রতিষ্ঠা ১৯৫০ সনে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৮০০। পাঠ্যবিষয় কলা-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে গণিত, রসায়ন। কলা বিভাগে ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস। ছাত্রীদের জন্য প্রাতঃ-কালীন ব্যবস্থা। এখানেও সংখ্যা প্রায় ২০০। অনার্স শৃঙ্খল ইংরাজীতে আছে। ছাত্রাবাস আছে।

সারদা গৃহ। ৩৪ জন ছাত্র আবাসিক সন্নিবিধ পেয়ে থাকেন এখানে। বিলি-ব্যবস্থা ভারি সুন্দর। এঁরা যেন সবাই একই পরিবারের, সুখে-সুখে অংশভাগী। এমন কি মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে সকলেই অশোচ পালন করে থাকেন এখানে। পারস্পরিক প্রীতি ভাতে বর্ধিত হয় নিঃসন্দেহে।

সারদেস্বরী কন্যা বিদ্যাপাঠ। একটি উচ্চ-মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে।

অপর একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে এখানে বালকদের জন্য। প্রতিষ্ঠা ১৯৫৫-য়। ছাত্রসংখ্যা ১৫০। সহশিক্ষা এখানকার কর্তৃপক্ষ সম্ভবত খুব কঠোর-

ভাবেই অপছন্দ করেন। তাই পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বস্তরে দেখা গেল।

জুনিয়র বেসিক স্কুল। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১২০।

প্রি-বেসিক নার্সারী স্কুলও রয়েছে একটি। ৩ থেকে ৬ বৎসরের শিশুদের পড়ানো হয়। পল্লীগ্রামে সাধারণত দুর্ভিক্ষ ব্যবস্থা। এবং ব্যবস্থাপত্র ভালও বটে।

নিম্ন বৃন্দাশ্রমী শিক্ষণ কেন্দ্র। আবাসিক ব্যবস্থা। ইংরাজীতে একে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ বলা হয়। বৃন্দাশ্রমী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ১ বছরের বিষয় শিক্ষা নিতে হয় এখানে। সহ-শিক্ষা নয়, তাই মহিলা শিক্ষার্থীরাই নেই। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকমণ্ডলী বাদে শৃঙ্খল শিক্ষার্থীই আছেন ১৫০ জন। পাঁচিল ঘেরা প্রকাণ্ড এলাকা। গেট দিয়ে ঢুকতেই চোখ জুড়ানো রংবাহার। চোখ কলসানোও বটে। অজস্র ফুল, দেশী-বিদেশী, চেনা-অচেনা এবং আশ্চর্য চেনা। এখন শীতের শেষ। বাইরের প্রকৃতি ধূসর রক্ততায় স্নান। শৃঙ্খল এইটুকু এলাকা যেন অদূরগত বসন্তের স্বর্ণোজ্জ্বল পাতা।

শৃঙ্খল ফুলই নয়, ফলও আছে। শাক-সব্জীও অনেক। তাজা সব্জ মটর শাকে, সাদা সাদা ফুলের ফলবৃদ্ধি। সুপুষ্ট শৃঙ্খল হুড়ানো লোভ। ফুল-কাঁপের ক্ষেত শূন্যপ্রায়। বাঁধকাঁপ এখনও অনেক আছে। আলু, টমেটো, শালগম আর ওলকাঁপতেও অনেক ঐশ্বর্য।

মুরগী আছে। বড় বড় ঝুঁটিদার লেগহরন আর আরও সব কি যেন বড় বড় ডিম; কোঁ করে ডাকে। গলার আওয়াজে বেশ হাঁক দেওয়া বলিষ্ঠতা।

■ মৃত্যু ঘটে মোমাছিরা। দংশন করে
দংশিতকে সে শব্দ জ্বালায়। আর
নিজের ডেকে আনে মরণ।

দেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় মাস্টার
মশাইদের। ছাত্র-ছাত্রী ৯০ জন।

সকল বয়সের পুরুষদের জন্য নৈশ

মডেল তৈরী করে স্বল্পব্যয়ে বাস্তবের
সঙ্গে বিজ্ঞানের সংযোগ কেমন করে
করতে হবে বোঝানো আছে। কৃষির

প্রায় তারই বিষয়-মাপের শরীর আরকে
ডোবানো আছে। পৃথকভাবে তাদের
দাঁতের গঠন ও মানবদেহে বিষ প্রবেশ

উপহার সম্বন্ধে সমস্যা?

क्या कहें :

ব্যাক্তের যে-কোন শাখা অক্ষিসেই কিনতে
পারেন ।

গিফট চেক ইউবিআই গিফট
ইউবিআই গিফট চেক ইউবি

RETURN

গিফ্ট

চৈব

দেখুন না...



122/UBI/BEN

চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক
ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
 রেজিষ্টার্ড অফিস : ৪, হাইড ঘাট স্ট্রিট, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ৮০টিও অধিক শাখা আছে

2020



ইটাচুগা বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের একাংশ

ধরণের প্রচেষ্টা অশেষ উপকার সাধনের হেতু হবে বলে মনে করা যায়।

'প্রবন্ধ ভারত' সংঘ প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪০ সনে সভ্যসংখ্যা ২২। শ্রীরাম-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচার এবং প্রতিষ্ঠিত করাই এই সংঘের উদ্দেশ্য। সংঘের একটি শিক্ষা সংসদও আছে। ছাত্রদের ভজন গান, স্তোত্র পাঠ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের সহজ সরল ব্যাখ্যা বৃকিয়ে দেওয়া ছাড়াও স্বাধীনতার সংকল্পিত জীবনে দয়া ও মানবপ্রেমের মূল আদর্শটিও শিশুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবার সাধ্যমত চেষ্টা করে থাকেন এরা। উদ্দেশ্য্য মহৎ। একদা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মূর্তি-শোভিত প্রবন্ধ ভারত সংঘের এই মন্দির দর্শন করেই পশ্চিম বাংলার তৎকালীন শিক্ষাসচিব শ্রী ডি. এম. সেন বলেছিলেন—“হেয়ার ইজ দি সোর্স অফ ইনস্পিরেশন”। আজ এতদিন পরেও ঠিক সেই কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

একটু ভিতরে গিয়ে কুন্ডু পরিবারের বাসভবন সংলগ্ন মস্ত মন্দির শ্রীধরের। সাফল্যরাম কুন্ডু প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা। কয়েক পুরুষ ধরে নিভাসেবা পেয়ে আসছেন নিয়মিত। প্রকাশ্যে চহর, বাঁধানো বারান্দা, সামনে নাটমন্দির। এখনও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি বাজে সময়ের নির্দেশ জানিয়ে। উৎসব আছে জন্মাষ্টমীতে, দোলযাত্রায় যাত্রাগান হয়, মেলাও বসে থাকে দু'দিন। আরও একটি মেলা আছে ইটাচুগায়। কাঁপান উপলক্ষে। ছোট্ট মেলা মাত্র একদিনের জন্য। ভিড় কিন্তু কম হয় না তাই বলে।

অতিথিসেবা, টোলার পণ্ডিত এবং

অনাথ-আতুর অসমর্থদের বৃত্তি দেবার বিন্যাস ছিল শ্রীনারায়ণ ট্রাস্ট ফান্ড থেকে। আজও আছে। শিক্ষা সংস্কৃতি ছাড়াও বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে বিজয়নারায়ণের দান বড় কম নয়। বিলাতী জিনিস বর্জনে তাঁর সক্রিয় অবদান ছিল। নিজ ব্যয়ে চরকা কিনে গ্রামের ঘরে ঘরে বিতরণের কাহিনী আজও স্মরণ করেন প্রবীণ মানদ্যেবরা। শোনা যায় শ্রীধরের মন্দির প্রাণেশে সূত্রধরও নাকি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে সময়।

এই এতগুলি প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রিকভাবে প্রায় সমগ্র গ্রামখানির প্রাথমিক আর্জিত হচ্ছে দু'টি মাত্র ব্যক্তি-অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে। রাজনারায়ণ এবং ইন্দু-নারায়ণ। বিজয়পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের এ'রা যুগ্ম উত্তরাধিকারী। সংগঠন-সার্থকতায় বিজয়নারায়ণের যোগ্য অধিকারীও বটে।

ইটাচুগার অভ্যুদয় প্রসঙ্গে আর একজনের কথাও বিশেষভাবে স্মরণ-যোগ্য—শ্রীনারায়ণ বাণীমন্দিরের অবসর-প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রতুল চৌধুরী। এই শিক্ষা-উপনগরীর সংগঠনে এ'র চেষ্টা নিষ্ঠা এবং শ্রমও ব্যায়ত হয়েছে অনেক।

আর এক বিগত-নায়ক মহাপ্রাণ মনীষীর কথা গভীর বিষাদের ছায়া-স্বাক্ষরে স্মরণ করতে হচ্ছে আজ। শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার। বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। আজন্ম চিরকুমার দেশপ্রাণ হিতরতী তিনি নিজেই ছিলেন এক সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সারাটি জীবন শিক্ষা আর শিশুদের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। অন্তিমে উৎসর্গিত সেই প্রাণ আর এক শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে দানও করে গেছেন তিনি। বেশি বিবরণের

প্রয়োজন নেই। মাত্র সৈদিনের ঘটনা। সর্বনাশা লেভেল ক্রিশিষ্ট আঞ্জও আছে। ওভার রীজ হয় নি। আদৌ কোনদিন হবে কিনা তারও ঠিক নেই। আর আছে অর্গাপিত গুণমুগ্ধ করুণাকৃত ছাত্র তথা মানদ্যেবর দল। একটি মহত্তর স্মৃতি, আর একটি অন্তহীন হাহাকার ছাড়া আর কিবা রইল তাদের।

চাষ-বাসের অবস্থা তেমন ভাল নয় ইটাচুগায়। উত্তরের মাঠে সেচের জল আসে, দক্ষিণের মাঠ শুকনো। অধিবাসীর কয়েক ঘর চাকুরিজীবী বামুন, কয়েত, বৈদ্য পরিবার বাদ দিলে বাদবাকী সবাই কৃষিজীবী। কিছু কৃষক, কিছু কৃষি-জমিতে কৃষি-মজুর, চাষী আর ভাগচাষী। হাটপুকুরে বাঁরা আছেন তাঁরা একদা এসেছিলেন শ্রমিক হয়ে। সারি সারি প্রতিষ্ঠানগুলির পর পর নির্মাণের কাজ চলছিল তখন। তারপর কাল গেছে, স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে এখানেই বসে গেছেন তাঁরা। তাঁদেরও জীবিকা এই কৃষি।

ইটাচুগার জনসংখ্যা দিনে বাড়়, রাতে কমে। অধিবাসী পরখ করে দেখতে পারেন। রাতে ষোল শত অধিবাসী স্থায়ী বাসিন্দা। দিনে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক অধ্যাপক মিলিয়ে বেড়ে যায় অনেক, হয় প্রায় তেতাল্লিশ শো।

রাস্তাটি চমৎকার। ইটাচুগা থেকে বন্যান স্টেশন অভিমুখী রায় শ্রীবিজয়-নারায়ণ কুন্ডু বাহাদুর রোড। ঘনপত্র বনস্পতির শাখায় ঢাকা, ছায়ায় আড়াল করা সুন্দর পরিচ্ছন্ন তকতকে আশ-পাশে সারি সারি নতুন বাড়ি, স্কুল, হোস্টেল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রন্থাগার, মহা-বিদ্যালয়ের মস্ত ভবন। এখন বিকেল। ছুটি হয়েছে অনেককণ। ছেলেরা হাসছে খেলছে দৌঁদৌঁদি করছে। শেষ শীতের বেলা যাই যাই করেও থেমে আছে পশ্চিমের প্রান্তে। দিগন্তের দুয়ার খুলে করছে রাশি রাশি রং-এর বরণ। গাছে গাছে রসত কাঠবিড়ালীর নাচানাচি, ঘরে ফেরা পাখীদের চকিত চিংকার। ডালে ডালে, পাতার ডগায় আমের মকুল উঁকি দিয়েছে কি না দিয়েছে, কচি এ'চোড়ের গন্ধ আর ঘেরা বাগানের বেড়ার ওপাশে কাঁঠালিচাঁপার ঘন ঝোপে লুকিয়ে ফুটে থাকা অসময়ের একটি-দুটি ফুলের তীর মিষ্ট গন্ধ থমকে থেমে আছে বেলা-শেষের হিম বাতাসে। চারিদিকে বিষয় বৈকাল দিন অবসানের গম্ভীর ব্যাকুল-বিধুর ছবি—

আমি ভাবছিলাম প্রকাশ্যে বনস্পতি দাঁড়িয়ে থাকে আকাশের মুখ আড়াল করে। তলায় তার অনেক ছায়া, ডালে ডালে অনেক আশ্রয়, পড়ে-পুড়ে, আশায়-আলোয় জীবনের তিক্তাতিত প্রকাশ।

সকল স্পর্ধার শেষ

বীরেন্দ্র চক্রোপাধ্যায়

II এক II

আছে, আছে, তারো শেষ আছে—

মাম্বিকের আশঙ্কান, খুনির বাহবা
বিধবার চাপা কন্ঠা, গুলী-খাওয়া কুমার^১ শিশুর রক্তাক্তা মাথা
যেন দেশ জুড়ে আর কোনো শব্দ নেই কন্ঠা ছাড়া, আর কোনো কল নেই শব্দ, রক্তাক্তা...

কে হাটো রক্তাক্ত মাথা তেকে? কে শব্দে জীবন ধরে?—সকলেরই কঠিন অপেক্ষা
‘খেতে পাই না, পরনে কাপড় নেই, কী-সে হবে, হাত পাতে মাঝে মাঝে কাছের’

আছে, আছে, এমন দিনেরও শেষ আছে।

তুমি কি ভেবেছ ওরা সন্ধ্যার সিন্ধুর সিন্ধুর মাঝে দিয়ে.....

‘সমস্ত স্বদেশ যেন স্বর্গ’ আর নরকের বিবাহ বাসর’.....

তুমি কি ভেবেছ ওরা সত্যিই ঈশ্বর?

III দুই III

কে ওখানে মাটি বের করে হাসছে? শয়তান! ভেবেছে কুমাকে

গলা টিপতে বড় মজা! ভেবেছে বাংলার মাটি, বাংলার জল বায়ু, আলো

এক পরসার কিনে নেওয়া যায়! দেশ, দেশ, নষ্ট পচা দুর্ভিত কতের মধ্যে আজ তার ওকে

ছুড়ে ফেলে দেন বলে ঐ আসে, শত-সহস্র উলঙ্গ নটরাজ, সাপখেলানো জটায় জ্বলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ;

মার কামা নর, বেজেছে মানল, আজ বাঘলের সাথে বড় খেলবে; নাচে, নাচে, শিব নাচে—

অনেক বজ্রার প্রতিরোধ, অনেক আশঙ্কার
আড়াল।

কিন্তু তারপর একদিন দিন আসে।
আড়াল সরে। আশ্রয় হয় অন্তর্হিত।
শাখায় পাখায় গুমরে ওঠে মৌন আত-
নাদ। বহু যুগের বনস্পতি হার হার
ছাছাকারে লুটিয়ে পড়ে ধূলায়।

আমি ভাবছিলাম এই ইটাচুশা মামুলি
একখানি গ্রামস্নাত নয়। একটি উপনিবেশ।
বর্তমান বাংলার শিক্ষা তথা সংস্কৃতির
প্রাণস্রোতের একটি ধারা এইখান দিয়েও
বয়ে গেছে।

এবং শৃঙ্খলা—সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের
মাঝে সম্ভবত এই একটাই স্কুল কিংবা
কলেজ যেখানে ছাত্রদের কোন ইউনিয়ন

নেই। শিক্ষকদের কোন ধর্মঘট হয় নি।
ছাত্র-আন্দোলনের দোলা এসে পৌঁছতে
পারে নি কোনদিন এবং আশ্চর্য এই যে
ছাত্রদের তরফ থেকে কোন রকম খারাপ
আচরণের নজিরও পূর্বে কোনদিন স্থাপিত
হয় নি এখানে।

কিন্তু এইমাত্র সেদিন তেমন একটি
ঘটনা ঘটেছে। এই বিজয়নারায়ণ মহা-
বিদ্যালয়েই। ঘটনাটি সূত্রের নয়, বেদনার।
তাই অধিক বিবরণে কাজ নেই। ‘অধ্যক্ষ
অসম্মানিতঃ ছাত্রদলের উচ্ছৃঙ্খলতা’—
এই মর্মে প্রায় সব সংবাদপত্রেই প্রকাশিত
হয়েছিল সংবাদটি।

আমি ভাবছিলাম অঘটন কি তবে
ঘটলো? ঈশানের আড়াল কি সরলো?

গোপালবাবু, ছিলেন এই সব নাল-
শিশুদের কণীমনসার বেড়া। তাঁর অন্ত-
গমন কি দেওয়ালের লিখনকেই স্পষ্টতর
করে তুলবে? সৌদানের সেই একটুখানি
কি আগামী অনেক কিছুর ইঙ্গিত? কিন্তু
ঈশ্বর করুন যেন তা না হয়, না হয়,
না হয়। যেন তেমন না ঘটুক, না ঘটুক,
না ঘটুক। এই উচ্ছৃঙ্খল আত্মনাশী
উন্মত্ততার দিনে একটি আলোকের ইশারা,
একটি আশার আশ্রয় বেঁচে থাক, সূত্র
থাক, অপরাজিত হোক।*

* [আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীতঃ
আগছেবারে ডাঙ্গারহাটী]



অত্যাচারের পরাজয়ের সংবাদে জনতার উল্লাস

জনসাধারণের বিজয়

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের বহুদিনের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন আজ চতুর্থ নির্বাচনের পর সার্থক হতে চলেছে। এবারের নির্বাচনে উনিশ বছরব্যাপী কংগ্রেসী শাসনের অবসান হয়েছে। কংগ্রেসী শাসকদের দ্রুত নীতি ও স্বৈরাচারী ক্রিয়াকলাপের উপযুক্ত জবাব জনসাধারণ এবারে দিয়েছেন, এইজন্য তাঁরা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে জনমনে বিকোভ দিনের পর দিন ধরে পূর্জীভূত হয়েছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসেই এই বিকোভ এক সর্বব্যাপী খাদ্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়েছিল। তারপর থেকেই জনসাধারণ চতুর্থ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেসী সরকারকে হটিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের সৈদিনের সংকল্প আজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

বহুত কংগ্রেসী সরকারের প্রতি জনসাধারণের আন্তরিক বিতৃষ্ণাই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বামপন্থী দলগুলির কাছ থেকে জনসাধারণ যে প্রত্যাশা করেছিলেন সে প্রত্যাশা বামপন্থী দলগুলি পূরণ করেন নি। জনসাধারণ চেয়েছিলেন বামপন্থী এক। বামপন্থী দলগুলি পরস্পর

বিবদমান দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পরোক্ষে কংগ্রেসেরই সুবিধা করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জনগণের ইচ্ছাই জয়ী হল। কংগ্রেসের অপশাসনের প্রতি জনসাধারণের আন্তরিক ঘৃণার চরম বিস্ফোরণ ঘটল ব্যালট বাক্সে। শৃঙ্খলিত কংগ্রেসকে পরাজিত করেই জনসাধারণ তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন নি, এই নির্বাচনেই তাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বামপন্থী নেতাদের



প্রদ্যুম্ন সেন

২০৯৬

নির্বাচনী রণনীতির ভুলটা কোথায় ছিল, এবং সেই ভুলকে সংশোধন করারও সুযোগ দিয়েছেন। এইজন্য তাঁদের পুনরায় অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নতুন প্রত্যাশা

চতুর্থ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিপর্যয়ে আনন্দ ও উল্লাসের যেন বান ডেকে গেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিশেষ করে শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রীঅত্যাচার ঘোষ ও শ্রীশচীন চৌধুরীর পরাজয় সারা পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তার তুলনা নেই। এই তিনজন যেন বিগত উনিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। আজ জনসাধারণের শিরদাঁড়া সোজা হয়েছে। তাঁদের আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। 'কংগ্রেস অপরাধের'—এই ধারণা যে মানুষের মনে শিকড় গেড়ে বসেছিল, তা আজ সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ নতুন করে বিশ্বাস করতে শিখেছেন যে, তাঁরা রুইবন, তাঁরা চেষ্টা করলে অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন। এটাই চতুর্থ নির্বাচনের সবচেয়ে বড় লাভ। বিকল্প সরকার কতদূর সার্থকতার সঙ্গে কাজ-কর্ম চালাতে পারবে সেটা আজ বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে যে জনসাধারণ

আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন, ইচ্ছা থাকলে অভ্যাস ও উৎপীড়নকারী শাসনব্যবস্থার মূল যে ধ্বংস করে দেওয়া যায়, এই বিশ্বাসটির নবজন্ম হয়েছে।

চতুর্থ নির্বাচনে জনসাধারণ সতর্কতার সঙ্গে যথেষ্ট বিবেচনা করে যে ভোট দিয়েছেন, সেটা নির্বাচনের ফলাফলের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখেছি যে এ দেশে বেশির ভাগ লোকই ভোট দেন না, তাঁদের ভোট দেওয়ানো হয়। এবারে পশ্চিমবঙ্গ তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। জনসাধারণ, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, এবার রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারে ভোলেন নি, তাঁরা বহু পূর্বে থেকেই মনঃস্থির করে ফেলেছেন। এবারে রেকর্ড সংখ্যক ভোটদাতা যে ভোট দিয়েছেন তা থেকেই এ সম্বন্ধে ভোটারদের আগ্রহ ও সচেতনতা প্রমাণিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে যে নিরুত্থাপ আবহাওয়া বিরাজ করেছিল তার মূল কারণ এটাই। জনসাধারণের বেশির ভাগ অংশই বহু পূর্বে থেকে স্থির করে নিয়েছিলেন যে আগ কংগ্রেসকে নয়, এবং সেই সংকল্প তাঁরা বরাবর বজায় রেখেছিলেন কোন হেঁচনা করেই। জনসাধারণের রায় যে এই রকম হবে তা কেউই আশা করতে পারেন নি।

আমরা আনন্দিত

কংগ্রেসের পরাজয়ের ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী যে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়েছে তার জন্য আমরাও আনন্দিত। আমাদের আনন্দের একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীর পাতায় আমরা জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে পেরেছি। তাঁদের মনের কথাগুলি আমরা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছি এবং আমরা বরাবর যে নীতি অনুসরণ করে এসেছি, তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমাদেরও কিছুটা গর্ব করার কারণ আছে বৈকি।

বিগত খাদ্য-আন্দোলনের বহু পূর্বে থেকেই আমরা জনসাধারণের যন্ত্রণাকর দিনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাস্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছিলাম। খাদ্য-আন্দোলনের পর থেকেই এই প্রয়োজন আমরা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম এবং এ কথাও স্পষ্টভাবে বোষণা করেছিলাম যে, জনসাধারণ চাইছেন কংগ্রেসী অপশাসনকে দূর করার জন্য বামপন্থী দলগুলি যেন একত্র হন। দলবিরোধ, আমাদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়



অতুল্য ঘোষ

নি। অনেক তোড়জোড়ের পরেও প্রত্যাশিত 'বামপন্থী একা' ঘটে নি। কাদের গোঁরাচুঁড়ির জন্য এত বড় একটা সম্ভাবনার বিলুপ্তি ঘটেছিল তা আমরা "প্রত্যাশার মৃত্যু ও জাতির প্রতি বিশ্বাস-হাতকতা" এই শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলাম। এই রচনাটি প্রকাশ করার ফলে মার্কিনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপা হন, কিন্তু জনসাধারণের একটি বড় অংশই আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফল এটাই প্রমাণ করেছে যে, আমাদের বক্তব্যই সঠিক ছিল, বাম কমিউনিস্টদের ইলেকশন স্ট্রাটেজি সার্থক হয় নি। তাঁদের "পোলারাইজেশন" খণ্ডের বার্থ হয়েছে।

আমরা আশা করব, অতীতের এই



শচীন চৌধুরী

ভ্রান্তি থেকে শিক্ষালাভ করে তাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন সরকারের গঠন ও পরিচালনার অংশগ্রহণ করবেন। নির্বাচনের পূর্বে দুই ফ্রন্টের যখন মিলন হয় নি তখন আমরা সন্মোহিত হলেও হাল ছাড়ি নি। আমরা এই বঙ্গদর্শন নিয়মিত পড়েন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমরা এ কথাটা বার বার বলেছি যে, দুই ফ্রন্টের বিরোধ সত্ত্বেও কংগ্রেস এবারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। জোর দিয়ে আমরা এ কথা বলতে পেরেছি এই কারণেই যে, আমরা জনসাধারণের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের তীব্রতা যথার্থভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলাম, কাজেই আমাদের আনন্দের ও গর্বিত হবার কারণ আছে বৈকি।

আজকের হারা নয়ও

জনসাধারণের মধ্যে মুখে মুখে আজ একটি নামই ফিরছে, তা হল শ্রীঅজয় মাধব-পাধ্যায়ের নাম। একদা কংগ্রেস-ভবন থেকে বিতাড়িত, অপমানিত ও লাঞ্চিত এই মানদুর্ঘটিই আজ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের চরম বিপর্যয়ের কারণ হয়েছেন। অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেন-চক্রকে সম্মুখে উৎপাটিত করার যে সংকল্প তিনি একদা ঘোষণা করেছিলেন তা কার্যে পরিণত করে তিনি আমাদের চোখের সামনে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা তুলনাহীন। এবারের নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের বিস্ময়কর সাফল্যের মূলে এই দৃঢ়চেতা মানদুর্ঘটির অদম্য আদর্শনিষ্ঠা ও নিরলস কর্মই একমাত্র দায়ী।

স্বভাবতই যে মানদুর্ঘটি আজ জনসাধারণকে বিস্মিত করে অতুল্য ঘোষকে ধ্যায়শায়ী করেছেন তিনি হচ্ছেন রেলের একজন বরখাস্ত সাধারণ কর্মচারী দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বিশ্বাস। বর্তমান সংখ্যার "আজকের মানদুর্ঘ" পৃষ্ঠায় এর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, কাজেই এখানে পুনরায় তা উল্লেখ করা নিঃপ্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরীকে পরাজিত করে সারা ভারতের সামনে যিনি এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি হচ্ছেন নেতাজী সুরেন্দ্রনাথ বসু, এককালের বিখ্যাত বাঙালী নেতা শ্রীশঙ্করচন্দ্র বসুর পুত্র শ্রীঅম্বিনাথ বসু। ইনি ফরোয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে কংগ্রেসের সামগ্রিক নীতির প্রতি জনসাধারণের অনাস্থাকে প্রকটিত করেছেন।

আমরা এখানে বিশেষ করে এদেরই কথা উল্লেখ করছি, কারণ এদের মধ্যে এক অজয়বাবু ছাড়া বাকি দশজন

রাজনীতিকেরে বিশেষ সুপরিচিত নন। অথচ এঁরাই কংগ্রেসের মূল স্তম্ভগুলি জড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসুদেব কথ্য ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেন না তিনি নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী টি ম্যানিয়েনকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছেন। অবশ্য শ্রীমতী কসু রাজ-নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিতা।

এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভরা-ডুবির যার কারণ হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত। কাজেই পৃথক করে তাদের কথা আপাতত এখানে উল্লেখ করছি না। আমাদের ইচ্ছা আছে পরবর্তী সংখ্যা-গুলিতে তাদের প্রত্যেকেরই পরিচয় দেব।

অভ্যাসিক মূল্য

একথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বাম-পন্থী শক্তি যদি দুটি পরস্পর বিবদমান শিবিরে বিভক্ত না হয়ে যেতেন তাহলে বাংলাদেশ থেকে কংগ্রেস একবারে কেরলের ন্যায় উচ্ছেদ হয়ে যেত। এই দুটি শিবিরের বিরোধে বামপন্থীদের অনেক-গুলি নিশ্চিত আসন নষ্ট হয়ে গেছে। দক্ষিণ ও বাম কমিউনিস্ট দলের বিরোধে উভয় পক্ষেরই চূড়ান্ত ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি সর্বাধিক হয়েছে ভাগীরথীর দুই তীরের কেন্দ্রগুলিতে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি “সিওর সীট” নষ্ট হয়েছে। এইজন্যই আমরা বলছি যে, কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য এবার প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে বামপন্থী শক্তিগুলিকে।

তথ্যাপি মনে হয়, এ যেন ভালই হয়েছে। এই নির্বাচনে বিবদমান দুটি বামপন্থী শিবির নিজদের শক্তি-সামর্থ্য পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। ভবিষ্যৎ মন্ত্রিসভা গঠন ও কার্যক্রম অনুসরণ করতে এর ফলে কোন অসুবিধা হবে না। ইতিমধ্যেই মনোভবের সংগে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নির্বাচনের পরে এই দুই শিবিরের মনোভাব পরিবর্তিত হতে চলেছে এবং একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হস্ত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। বাংলা কংগ্রেসের প্রতি বাম কমিউনিস্টদের যে প্রতিকূল মনোভাব ছিল তার অবসানের লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। অজয়বাবুকে নেতা হিসাবে সর্ব-সম্মত নির্বাচন তারই প্রমাণ।

কয়েকটি নির্বাচনী অভিযোগ

বিগত চতুর্থ নির্বাচনে সম্বন্ধে জন-সাধারণের কয়েকটি অভিযোগ সোচ্চার হয়েছে। পোস্টাল ব্যালট সম্বন্ধে এবার অনেকেই রীতিমত সন্দেহ করেছেন।



জিতেন্দ্রমোহন বিশ্বাস

একজন প্রার্থী, যিনি পোস্টাল ভোটেই পরাস্ত হয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের নিকট নাকি এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর কেন্দ্রে যতগুলি পোস্টাল ব্যালট থাকার কথা তার চেয়ে নাকি অনেক বেশি



মৈত্রেয়ী বসু

পোস্টাল ব্যালট সেখানে সুপরিচালিত-ভাবে আমদানি করা হয়েছে। আরও একটি মারাত্মক ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে যে, হুগলী জেলার চন্দননগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যবর্তী একটি নির্বাচন-কেন্দ্রে নাকি ভীতি প্রদর্শন করে ভোট

দাওয়া করা হয়েছে, সেখানে নাকি অনেক-গুলি বৃদ্ধ অশ্লীলস্বভাৱে সজ্জিত গুন্ডা-বাহিনী দিয়ে একটি বিশেষ দল ছাড়া অন্য কোন দলকে অফিস পর্যন্ত থলতে দেওয়া হয় নি এবং অবাঙালী ভোটারদের শাসানোও হয়েছে যে, যদি একটি বিশেষ প্রার্থীর অনুকূলে সর্বাধিক ভোট যদি সেই সব বৃদ্ধগুলি থেকে ঐ বিশেষ প্রার্থীটির অনুকূলে না গড়ে তাহলে ঠোঁড় দিয়ে উৎখাত করা হবে। সেখানে কর্মরত পোলিং ও প্রিসাইডিং অফিসারেরা তথা অপরাপর সরকারী কর্মীরা পর্যন্ত এদের ভয়ে মূগ্ধ থলতে পারেন নি। আমাদের বিবেচনায় এটি একটি গুরুতর অভিযোগ; নির্বাচন কমিশনের এক্ষেত্রে বিশেষভাবে তদন্ত করা উচিত। সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই এই বিষয়টা ভাল করে বোঝা যাবে। মনে রাখতে হবে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচনে যে কোন অবৈধ পন্থা গ্রহণই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

নির্বাচনে দলগত অবস্থা

এবারে চতুর্থ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভায় আসনের সংখ্যা ছিল ২৮০টি। কংগ্রেস পেয়েছে মোট ১২৭টি আসন এবং সৌদিক থেকে বিচার করলে কংগ্রেসের পক্ষে এ এক মারাত্মক বিপর্যয়।

মাক্সপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছে ৪০টি আসন পক্ষান্তরে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছে ১৬টি আসন। তাঁরা প্রার্থী দিয়েছিলেন যথাক্রমে ৫৭ ও ১০৩টি আসনে। বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিলেন ৮০টি আসনে, জয়লাভ করেছেন ৩৪টি আসনে। ফরোয়ার্ড ব্লক ৪৭টি আসনের মধ্যে দখল করেছেন ১৩টি, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছেন ৭টি, পি, এস, পি, ৪৫টি আসনের মধ্যে দখল করেছেন ৭টি, আর, এস, পি, ১৬টির মধ্যে ৭টি, এস, ইউ, সি, ৮টির মধ্যে ৪টি, জনসংঘ ৬৩টির মধ্যে ১টি, স্বতন্ত্র ৭টির মধ্যে ১টি, লোকসেবক সংঘ ৬টির মধ্যে ৫টি। তাছাড়া গোষ্ঠী লীগ পেয়েছে ২টি আসন, ওয়াকারস পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক মার্জিন্ট যথাক্রমে ১টি করে ও নির্দলীয় মোট ১০টি আসন।

তুলনামূলক বিচারে উল্লেখ (সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট) ও পূলফ (বামপন্থী গণফ্রন্ট) উভয়েরই কৃতিত্ব প্রায় একই, রকম, যথাক্রমে ৬৩ ও ৬৪টি আসন। নবগঠিত বাংলা কংগ্রেসের সাফল্য এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গতবারের তুলনায় পি, এস, পি, ও ফরোয়ার্ড ব্লকের অবস্থার উন্নতি এবারে যথেষ্ট ভাল। এস,

ইউ, সি ও কেরোয়ার্ড ব্লক (মাক'সিস্ট) গত-
বারে কোন আসনই লাভ করতে পারে নি।
এবার তারা আসন পেয়েছে যথাক্রমে ৪টি
ও ১টি। লোকসেবক সংঘ ও গোবা
দাঁসের অবস্থা গতবারের তুলনায় এবারেও
একই রকম।

কমিউনিস্ট পার্টি (দক্ষিণ ও বাম)
গতবারের তুলনায় এবারে বেশি আসন
সংগ্রহ করলেও উভয় ভরফেরই বিশেষ
ক্ষতি হয়েছে পারস্পরিক বিবাদে।
যে সব আসন পূর্বে কমিউনিস্টদের একে-
করে বাঁধা আসন ছিল সেগুলি তারা
শুইয়েছে। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে
আমরা এই খোয়ানো আসনগুলির বিস্তৃত
হিসাব-নিকাশ দেব।

এবারে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায়
একজন স্বতন্ত্র ও একজন জনসংঘের প্রার্থী
জনপ্রবর্তিত হলেন। অবশ্য এঁদের নিয়ে
আপাতত আশংকার কোন কারণ নেই।

লোকসভার ৩০টি আসনের মধ্যে
কংগ্রেস মোট ১৪টি আসন দখল করতে
পেয়েছে, পক্ষান্তরে বিরোধীরা দখল করে-
ছেন ২৬টি আসন। গত নির্বাচনে
লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের ছিল
৩৬টি আসন, তার মধ্যে কংগ্রেস

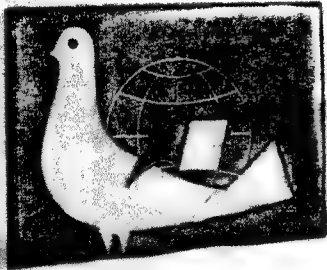
লাভ করেছিল ২২টি। এবারে ঢাকা
থরে গেছে। মাক'সিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি
লোকসভায় পেয়েছে মোট ৫টি আসন,
ডায়মন্ডহারবার, ব্যারাকপুরে, কলকাতা
দক্ষিণ, হুগলী ও আউশগ্রাম থেকে।
দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিও পেয়েছে
৫টি আসন; বারাসত, মধুরাপুর,
আলিপুর, কলকাতা উত্তর-পূর্ব ও
বাঁকুড়া। বাংলা কংগ্রেসও পেয়েছে
৫টি আসন। যথাক্রমে নবম্বীপ বসির-
হাট, তমলুক, মৌদীনীপুর ও কাড়গ্রাম
কেন্দ্র থেকে। কেরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছে
লোকসভায় দুটি আসন কুচবিহার ও
আরামবাগ থেকে এবং আর, এস, সি
পেয়েছে একটি আসন বহরমপুর কেন্দ্র
থেকে। এস, ইউ, সি, পেয়েছে একটি
আসন জরনগর কেন্দ্র থেকে; সি, এস, পি,
পেয়েছে একটি কাঁথি থেকে; লোকসেবক
সংঘ পেয়েছে একটি পূর্বুলিয়া থেকে;
এবং এস, এস, পি, পেয়েছে একটি
আমানসোল থেকে। নির্দলীয় মোট
চারজন লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন
যথাক্রমে রায়গঞ্জ, হুশিাদাবাদ, কুন্দনগর
ও বর্ধমান কেন্দ্র থেকে।

কলকাতার নির্বাচন

বিস্তৃত তিনটি নির্বাচনে দেখা গেছে
যে বিধানসভার ও লোকসভার নির্বাচনে
কলকাতা থেকে কংগ্রেস বিশেষ সুবিধা
করতে পারে নি। এবারে কিন্তু বিধান-
সভার নির্বাচনে কলকাতা বামপন্থীদের
হতাশ করেছে, পক্ষান্তরে বামপন্থীরা
গ্রামাঞ্চলেই বিশেষ সুবিধা করেছেন।
সমগ্র ব্যাপারটাই এবার একটা 'টপসি-
টারিভ'।

কিন্তু লোকসভার ক্ষেত্রে কলকাতা তার
চিরাচরিত ট্রাডিশন বজায় রেখেছে। কল-
কাতার চারটি লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রে
দুটি আসন দখল করেছেন দক্ষিণপন্থী
কমিউনিস্ট প্রার্থীরা একটি আসন বাম
কমিউনিস্ট প্রার্থী ও অবশিষ্ট আসনটি
কংগ্রেস।

দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে সরাসরি
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাম কমিউনিস্ট প্রার্থী
শ্রীগণেশ ঘোষ জয়লাভ করেছেন। জপার
দুটি কেন্দ্রে, আলিপুরে ও কলকাতা
উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রে হিম্মতী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
দক্ষিণ কমিউনিস্ট প্রার্থীম্বর শ্রীই-প্রসি
গুপ্ত ও শ্রীহীরেন মুনোপাধ্যায় বিজয়



গ্রাহক হোন ও পড়ুন সৌভিয়েত দেশ

সচিত্র পাঞ্জিক পত্রিকা

বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরাজী ও নেপালীতে
প্রকাশিত হয়।

- * ভারত-সৌভিয়েত মৈত্রীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত
- * সৌভিয়েত ইউনিয়নের বর্ষবহুল জীবনযাত্রার দর্শন
- * আপনার পরিবারের সকলের জন্য একটি পত্রিকা

৩১।৫।৬৭ তার পর্বন্ত নীচের

সমত

হারের সুযোগ লউন

ভাষা	এক বৎসর	তিন বৎসর
(১) ভারতীয় ভাষাগুলি ও নেপালীতে—	৫.০০	১০.০০
(২) ইংরাজীতে—	৬.০০	১২.০০

এই সঙ্গে নতুন গ্রাহকদের জন্য

বিনামূল্যে উপহার

নতুন এক বৎসরের গ্রাহকেরা কেবলমাত্র ১৯৬৭ সালের একখানা সচিত্র ১০ পৃষ্ঠার দেওয়ান্য ক্যালেন্ডার পাবেন।

নতুন তিন বৎসরের গ্রাহকেরা ১৯৬৭ সালের একটি ক্যালেন্ডার ও একটি প্লাস্টিক-কভার পকেট ডায়ারী এবং ১৯৬৮
ও ১৯৬৯ সালের প্রতি বৎসর একখানা করে ক্যালেন্ডার পাবেন। একমাত্র ফটোসই আমাদের অনুমোদনপত্র আছে। এইরকম
আমাদের অনুমোদিত এজেন্টদের কাছে অথবা আমাদের অনুমোদিত এজেন্টদের প্রতিনিধিগণকে তাঁদের যথাবিধি এজেন্সি করা
হিসাবে টাকা দেবেন অথবা মানি অর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে আমাদের কাছ থেকে রেজিস্টার্ড ডাকে আপনার উপহার গ্রহণ করুন;
অথবা আপনার উপহার ভি পি-তে পাঠানোর জন্য আমাদের কাছে লিখুন। কোন
ভাষায় কয় বৎসরের গ্রাহক হতে চান সব সময়ই তা উল্লেখ করবেন।

সৌভিয়েত দেশ

১/১, উড স্ট্রীট, কলকাতা-১৬।



হারেন মখোপাধ্যায়

হয়েছেন। হীরেন মখোপাধ্যায়ের বিজয় নানান কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর কলকাতার চতুর্থ লোকসভা কেন্দ্রটি, অর্থাৎ কলকাতা উত্তর-পশ্চিম বরাবরের মত এবারেও অধিকার করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅশোককুমার সেন, এটিও বলতে গেলে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংসদ বামপন্থী ফ্রন্ট সমর্থিত একজন নির্দলীয় প্রার্থী ও জনসংঘের অপর একজন প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি গত দু'বারের মত এবারেও নির্বাচিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা আসনে কলকাতা থেকে এই

একটিমাত্র প্রার্থীই 'চিরকাল' কংগ্রেসের মর্যাদা রক্ষা করে এসেছেন।

লোকায়ত্ত সরকার গঠনের পথে

নির্বাচনোত্তর সমীক্ষা আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলি থেকে আরম্ভ করব। নির্বাচন প্রসঙ্গ আজকে এখানেই স্ফুটত থাক।

কংগ্রেসের শোচনীয় বিপর্যয়ে আপামর সাধারণের সার্বজনীন আনন্দের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কংগ্রেস দল ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, এবারে তারা বিরোধী দল হিসাবেই থাকবেন কেন না তাঁদের পক্ষে সরকার গঠন করা একেবারেই অসম্ভব।

কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সমবার হিসাবে বাংলা কংগ্রেস সহ অপরাপর বামপন্থী দলগুলির পক্ষেই সরকার গঠন করার সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল। তা' ছাড়া দেশবাসীও চান যে এবারে বামপন্থী দলগুলির সমবারে লোকায়ত্ত জনপ্রিয় সরকার গড়ে উঠুক। সারা পশ্চিমবঙ্গে এই কথা আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

আজ এই বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তা' থেকে জানা যায় যে, বামপন্থী দলগুলি একমত হয়ে শ্রীঅজয় মখোপাধ্যায়কে নেতৃত্বপূর্ণে নির্বাচিত করেছেন। এই সংখ্যার সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু বখন আপনাদের হাতে পৌঁছাবে তখন হয়ত নতুন মন্ত্রিসভার



অশোক সেন

পূর্ণ তালিকাই আপনারা পেয়ে যাবেন। কংগ্রেস শাসনের অবসানে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে আশার সঞ্চার হয়েছে, দেশ জুড়ে যে প্রাণসঞ্চার হয়েছে, আশা করি নতুন লোকায়ত্ত সরকার তার বোগ্য মর্যাদা দেবেন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। অরমারম্ভঃ শুভায় ভবত।



রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনার পর রাজত্বন থেকে বেরিয়ে এলে বিপুল জনতা শ্রীঅজয় মখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে।

বিশ্বমাহাত্ম্যের * প্রাদির্ভাব

ডঃ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য

॥ ১৭ ॥

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

উপনিষদ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলেছিলাম যে উপনিষদের সারাংশ ক্ষত্রিয়দের দ্বারা রচিত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে যে বিরোধ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের দ্বারা সূচিত হতেছিল তার উৎস উপনিষদেই পাওয়া যায়। ফলে সাধারণত এই কৌতূহলই জাগবে যে উপনিষদ আসলে এমন কি কথা বলে গেছে যা ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ বিরোধী। উপনিষদসমূহের বিষয়বস্তু আলোচনাকালেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। তার আগে উপনিষদসমূহের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উপ-নি-সদ কথাটির অর্থ 'কারো নিকটে বসার'। অর্থাৎ গুরুর নিকটে বসে লক্ষ্য যে জ্ঞান তা উপনিষদ শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। সাধাবণভাবে উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়, কেন না এই গ্রন্থগুলি বৈদিক যুগের শেষ পর্ষায় রচিত হয়েছিল। বেদান্তদর্শন বলতে আমরা যা বুঝি তা অবশ্য অনেক পরবর্তীকালের, যদিও উপনিষদের কিছুটা অংশই সেই দর্শনের ভিত্তি।

আমরা আগেই বলেছি কয়েকটি উপনিষদ গ্রন্থ পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের ধারানুসারী। এগুলি হচ্ছে ঐতরেয়, কৌষীতকি, তৈত্তিরীয়, মহানারায়ণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও কেন। এগুলির মধ্যে এক মহানারায়ণ ছাড়া বাকি সবগুলিই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির কিছুটা সমকালীন এবং নিঃসন্দেহে গোতমবুদ্ধ ও পার্থিবীর পূর্ববর্তী।

দ্বিতীয় স্তরের উপনিষদগুলি যে পরবর্তী যুগের তা ভাষাগত বিচারে সহজেই বোঝা গেছে। এগুলি হচ্ছে কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, ইশা, মণ্ডুক ও

প্রশ্ন। এগুলি বুদ্ধ পরবর্তী যুগের, এবং পরবর্তীকালের দার্শনিক চিন্তাধারা যেমন সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত মতবাদসমূহ এগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। অবশিষ্ট আর দুটি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ হচ্ছে মৈত্রায়ণীয় এবং মাণ্ডুক্য।

এরপর সেগুলি বাকি থাকল, তা নেহাৎ কম নয় কেন না উপনিষদের সংখ্যা ১০৮টি, সেগুলিকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনাছি না, এগুলিকে উপনিষদ বলে স্বীকৃতি দিওঁও কুণ্ঠিত। কেন না সর্বশেষ উপনিষদ রচিত হয়েছিল সম্রাট আকবরের সময়। তবুও এই ১০৮টির মধ্যে যেগুলির উল্লেখ একান্ত না করলে অবিচার করা হয় সেগুলি হচ্ছে জাভাল, পরমহংস, সুবাল, গর্ত, অধর্বাশির, বস্তুসূচিকা ইত্যাদি।

উপনিষদের বিষয়বস্তু

উপনিষদের আসল বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহলের অন্ত নেই। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী রাজা ও ক্ষত্রিয় রাজপুত্র্যদের মনে এই চিন্তা জেগেছিল যে, যোগযজ্ঞ, ত্রিয়াকলাপ, পুরোহিত ও দেবদেবীদের মাধ্যমে কি এবং কোথায়। তারই উত্তর খুঁজতে গিয়ে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, এবং সেই হিসাবে জগতের প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুই সেই এক অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী পবনব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। বাস্তব-আত্মা ও বিশ্ব-আত্মা, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম, এক ও অভিন্ন। শান্তিলোভ ভাষায়, হৃদয়-পদ্মমধ্যস্থিত আমাষ এই আত্মাই, যা একদিকে একটি ধান্য বা সর্ষপের চেয়েও ক্ষুদ্র এবং অপবাদের আকাশ ও সর্বচরাচরের চেয়েও বৃহৎ, এই আত্মাই ব্রহ্ম। উপনিষদে এই ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে নেতিমূলক ভঙ্গীতে। তিনি এটা নন, তিনি ওটা নন, তিনি সেটা নন, এইভাবে।

এই উপনিষদ কথিত ব্রহ্মবিদ্যাই পরবর্তীকালে দার্শনিক অবৈতবাদের

জন্মদান করেছিল। অবৈতবাদের অবশ্য বহু ধারা যেমন কেবলাবৈত, বিশিষ্টা-বৈত, শ্বেতাশ্বত, শূদ্রাবৈত ইত্যাদি, সবগুলিই নিজ বক্তব্যকে প্রতিপাদন করার জন্য উপনিষদকেই আশ্রয় করেছিল।

কিন্তু ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতা প্রতিপাদনই উপনিষদের একমাত্র বিষয়-বস্তু নয়। বহু অনুচ্ছেদ বিভিন্ন উপনিষদ থেকে উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে যে শ্বেতবাদেরও বহুস্থানে ছড়াছড়ি। ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে শ্বেতবাদের উদ্ভব হয়েছে প্রাক-বৈদিক যুগে, এই অবৈদিক ধারাটি পরবর্তীকালে সাংখ্য দর্শনে পূর্ণশীলাভ করেছে, এবং বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে এই ধারাটিও কিছুটা স্থান করে নিয়েছে।

দেব-দেবীও যে উপনিষদে নেই তা নয়, ইন্দ্র আছেন, বায়ু আছেন, অগ্নি আছেন, সর্বোপরি আছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, যিনি ইতিমধ্যে দেবগণের পিতামহ গর্বে উন্নীত হয়েছেন, যার কাছে দেবতার আসেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়ে। যোগযজ্ঞের কথাও যে একেবারে অনুপস্থিত তাও নয়, পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলবাদও উপনিষদে খুব ভালভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলির সঙ্গে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার সমন্বয় ঘটাবার, আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন অল্প পণ্ডিত সেযুগ থেকে এযুগ পর্যন্ত। কিন্তু এ সব প্রচেষ্টা সচরাচর সফল হয় না।

সহজ বুদ্ধিতে বিচার করলে, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা স্বীকার করলে সর্বশক্তিমান ইশ্বর থেকে আরম্ভ করে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, দেব-দেবী, যোগ-যজ্ঞ, জন্মান্তর, কর্মফলভত্ত্ব কোন কিছুই শেষ পর্ষতে ধোঁপে টেকে না। এখানে বোঝা যাবে উপনিষদ ব্রাহ্মণ প্রভাবিত বৈদিক সমাজের কোন জায়গায় আঘাত দিয়েছিল। পরবর্তী-যুগে একমাত্র শংকরই উপনিষদ ব্যাখ্যা; সত্যের কাছাকাছি পৌঁচেছিলেন যে কারণে তাঁর সমালোচকদের কাছে তিনি 'নাস্তিক', 'প্রজ্ঞান বোম্ব' ইত্যাদি আখ্যায় ঘ্রাণ নিষ্পত্ত হয়েছিলেন।

সূত্রসাহিত্য

বীজগণিতের কুপার যে অর্থে ইংরাজী ফরমুলা কথ্যটিকে বাংলায় সূত্র বলা হয় ঠিক সেই অর্থেই বৈদিক যুগের একেবারে শেষ পর্যায়ে সূত্রসাহিত্য নামে একপ্রকার সাহিত্যের উদ্ভব হয়। এই সাহিত্যের সৃষ্টি হনোছিল বিশেষ করে ছাত্রসমাজ ও সাধারণ পাঠকের জন্য, মূল বিষয়-গুলিকে যেখানে সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে পারিবেশন করা হয়েছে। এগুলিকে এই জন্য বেদাঙ্গণও বলা হয়, কেন না এগুলি বেদ পদবাচ্য নয়, বেদ পাঠের সোপান। বিধবস্ত্র হিসাবে এই সূত্রসাহিত্য ছয়টি ভাগে বিভক্ত : শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ।

শিক্ষা

এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিবন্ধন সম্বন্ধে শিক্ষাদান, যাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে ছাত্র বৈদিক গ্রন্থসমূহ পড়তে পারে। তা ছাড়াও এগুলিতে 'আচার-অনুষ্ঠান' যাগযজ্ঞ ইত্যাদির কথাও আছে। এই জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাতিশাখ্য এই শিরোনামায় রচিত গ্রন্থগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। শৌনক রচিত ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য, ও কাত্যায়ন রচিত বাহুবলী প্রাতিশাখ্য সূত্র ছাড়াও আমরা তৈত্তিরীয় ও অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্য সূত্রের উল্লেখ পাই। সামবেদের ছাত্রদের জন্য দুটি বিশেষ ধরনের প্রাতিশাখ্য রচিত হয়েছিল পুণ্ড্রসূত্র ও পণ্ডরিক সূত্র। ধর্মনিবন্ধের উপর পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যেন্নুলির লেখক হিসাবে আমরা ভবস্বাজ, ব্যাস, বিশিষ্ট ও বাজবল্যকার নাম পাই। ব্যাস-শিক্ষা এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে একটি। আরও একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় যার নাম পার্গনীয় শিক্ষা যেটি, পণ্ডিতদের মতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রাচীন হলেও রচনাকালের দিক থেকে অনেক পরবর্তীকালের। শিক্ষা সিরিজের সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অনুক্রমণী বা ভালিকা সাহিত্য, যাকে ইংরাজীতে বলে ক্যাটালগ। এই প্রসঙ্গে সর্বাঙ্গ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঋগ্বেদ-সর্বাঙ্গানুক্রমণী। এতে ঋগ্বেদের প্রতিটি সূক্তে হ্রস্বের নাম, যে দেবতার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিটি বচিত তাব নাম, সূক্তটির ছন্দ ও প্রথম লাইনটি দেওয়া হয়েছে। শৌনক রচিত বৃহস্পতিব্রতা গ্রন্থে ঋগ্বেদ বর্ণিত দেবগণের কথা ও কাহিনী বলা হয়েছে, এটি বর্ণনামূলক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে এবং সেই হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। অনুক্রমণ আর একটি

গ্রন্থের নাম কর্মস্বধান; এটিও শৌনকের নামে প্রচলিত।

কল্প

এই শ্রেণীর রচনাগুলি সূত্রসাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে আচার-অনুষ্ঠান যা পূর্ববর্তী যুগের ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মোটামুটি তিনটি ভাগে এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে ভাগ করা যায় গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শ্রোত সূত্র।

গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে ধর্মসূত্রের পার্থক্য অতি সামান্য, বিবর্তীয়টি প্রথমটিরই অনুসারী, তফাৎ হচ্ছে এইটুকু যে গৃহ্যসূত্রে যেখানে পারিবারিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে—ধর্মসূত্রে তার এলাকা কিছুটা বর্ধিত হয়েছে মাত্র। আমরা এ বিষয়ে পরে আলোচনা করছি। প্রধান প্রধান গৃহ্যসূত্রগুলির নাম হচ্ছে শাংখ্যায়ন, আম্বল্যায়ন, পারশ্কার, বাদির, গোভিল, হিরণ্যকেশী, আপস্তম্ব ইত্যাদি এক প্রধান প্রধান ধর্মসূত্রগুলির নাম হচ্ছে আপস্তম্ব, গোভিল, বশিষ্ঠ, বোধায়ন প্রভৃতি। বলা বাহুল্য এগুলির নামকরণ রচয়িতাদের নামেই হয়েছে।

গৃহ্যসূত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে পারিবারিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠানসমূহের টেকনিকাল দিকসমূহ। বিবাহ থেকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আরম্ভ। বিবাহিত মানবের প্রধান কর্তব্য দৈনিক পণ্ড-মহাব্রতের অনুষ্ঠান; দেবতা, অপদেবতা, পিতৃগণ, মানুষ ও ব্রাহ্মণের জন্য। বিবাহের পর চতুষ্টীকর্ম, গভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, সন্তান জন্মালে জাতকর্ম, চূড়াকরণ, অম্বপ্রাশন, উপনয়ন, মৃত্যুর পবে শ্রাদ্ধ, প্রতি বছবে। অর্থাৎ সন্তান গর্ভে আসার পর থেকে তার মৃত্যুর পবে পর্যন্ত অনুষ্ঠানের শেষ নেই, আর সেগুলিই গৃহ্যসূত্রসমূহে বিশেষ করে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মসূত্রসমূহে এবং উপরে বর্ণাপ্রথম্য বিশেষ করে বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং বিশেষ করে নারীদের কর্তব্য কি সে কথাও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রোতসূত্রসমূহের বিষয়বস্তু হচ্ছে যাগযজ্ঞ এবং সেই হিসাবে চব্বিটির দিক থেকে এগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহেরই অনুক্রম। এতে বিশেষ করে তিন প্রকারের যজ্ঞাগ্নি রক্ষা, অম্বাস্যা-পূর্ণিমার যজ্ঞসমূহ, পশুর্বাণ ও বিভিন্ন ধবনের সোমযাগের কথা বলা হয়েছে। প্রধান প্রধান শ্রোতসূত্রসমূহের নাম হচ্ছে আপস্তম্ব, আম্বল্যায়ন, বোধায়ন, কাত্যায়ন,

শাংখ্যায়ন, ষাটায়ন, ব্রাহ্মায়ন, সত্যায়ন ইত্যাদি। তিন প্রকার সূত্রগ্রন্থেরই রচনাকাল ৬০০ থেকে ২০০ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

আরও এক শ্রেণীর সূত্রগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় যেন্নুলির বলা হয় শূদ্রসূত্র। এতে যজ্ঞবেদী নির্মাণের মাপজোষ দেওয়া আছে, সেই হিসাবে ভাবতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের আদি উৎস। উপরি উল্লিখিত চার শ্রেণীর সূত্র গ্রন্থগুলিকে বিভিন্ন সংহিতার এলাকায় পরবর্তীকালে নিয়ে আসা হয়েছে। অনুমান করা যায় যে বিভিন্ন সংহিতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়তন ছিল। যেমন ধরা যাক যে ছাত্র কৃক-যজুর্বেদ গ্রুপে শিক্ষালাভ করবে তাকে ওই বেদেরই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ এবং ওই বেদেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বোধায়ন বা আপস্তম্বের ধর্ম, শ্রোত ও গৃহ্যসূত্রসমূহ পড়তে হত।

এই সব সূত্রগ্রন্থেরও অনেক টীকা-টিপ্পনী বা নোটবই পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল যেমন প্রাম্ধকল্প ও পিতৃমেষসূত্র। প্রাম্ধকল্পসমূহের রচনাকার হিসাবে মনু, শৌনক, পৈম্পলাদ, কাত্যায়ন, গোতম প্রমুখের নাম পাওয়া যায়, এবং পিতৃমেষসূত্রসমূহের রচয়িতা হিসাবে বোধায়ন, হিরণ্যকেশী, গোতম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আরও এক শ্রেণীর নোটবই ছিল যেন্নুলিকে বলা হত পরিদিশ্ত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কর্মপ্রদীপ, গৃহ্যসংগ্রহ পরিদিশ্ত ও প্রায়শ্চিত্তসূত্র। প্রথম দুটি গ্রন্থ গোভিল গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। তা ছাড়া শূলবর্দ্ধি ছাত্রদের জন্য ছিল প্রয়োগ, পঞ্চাতি ও কারিক্য সিরিজ।

ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ

এই বেদাঙ্গণটি সম্বন্ধে একটামাত্র গ্রন্থের কথাই আমরা জানি যা হচ্ছে পার্গনীর অষ্টাধ্যায়ী, যদিও এই গ্রন্থটির রচনাকাল পরবর্তী যুগে। পার্গনীর ব্যাকরণের দুটি বিশেষ দিক আছে। একটি হচ্ছে উগাদিসূত্রসমূহ—যেন্নুলিতে বিশেষ্য পদসমূহ এবং সেগুলির মূল শব্দ, প্রত্যয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফিট সূত্রসমূহ যাতে আলোচিত হয়েছে ধর্মনিবন্ধ। পার্গনীর প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব। নিরুক্ত হচ্ছে শব্দতত্ত্ব, ও শব্দার্থতত্ত্ব, রচয়িতা হচ্ছেন যাস্ক, সংহিতাসমূহের যে সকল শব্দের অর্থগুলি কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলির উপর

আলোকপাত করা হয়েছে। সেই অপ্রচলিত সঙ্কসমূহের তালিকাগুলির নাম নিষ্পষ্ট, এবং যাস্কের কৃতিত্ব হচ্ছে এগুলির উপর আলোকপাত। যাস্কের রচনাতেই তাঁর পূর্বসূরীদের কথা বলা হয়েছে যদিও তাঁদের রচিত কোন গ্রন্থ আমরা পাই নি। ছন্দ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন প্রাচীন গ্রন্থ নেই। নিদানসূত্র নামে যে গ্রন্থটিকে এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায় তা পরবর্তী যুগে রচিত। জ্যোতিষ সম্বন্ধে একই কথা খাটে। জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ নামক যে গ্রন্থটির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে সচরাচর করা হয় তা নিতান্তই অবাচীন।

ব্যাকরণকার পাণিনি ছিলেন বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শলাতুর গ্রামের অধিবাসী। তাঁর অষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণ গ্রন্থটি ৪,০০০ সূত্র ও আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পাণিনির ব্যাকরণে তাঁর দু'জন পূর্বসূরীর উল্লেখ আছে যারা হচ্ছেন শাকটায়ন ও শৌনক। পাণিনির তারিখ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না, তবে তিনি খৃস্টপূর্ব সপ্তম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে কোন সময় জীবিত ছিলেন। তিনি অবশ্যই যাস্কের পরবর্তী এবং পতঞ্জলি ও কাত্যাননের পূর্ববর্তী। তাঁর ব্যাকরণের ভাষা পূর্ববর্তী যুগের ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের ভাষার সঙ্গেই সঙ্গতি-পূর্ণ, কিন্তু চলিত সংস্কৃতের সঙ্গে যেন অমিলটাই বেশি যা থেকে বোঝা যায় পরবর্তীকালের প্রতিনিধিমূলক ভাষার কোন গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি। পাণিনির ব্যাকরণে দক্ষিণ ভারতের কোন উল্লেখ নেই অথচ অশোকের যুগেই দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের পরিচয় ঘটেছিল। তা ছাড়া পাণিনি বর্ণিত সংকলনগণের সঙ্গে আলেকজান্ডার কর্তৃক ধ্বংস হয়ে যাওয়া সংকলনকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তই দাঁড়ায় যে পাণিনি আলেকজান্ডারের আক্রমণের কথা শোনেন নি, অর্থাৎ আলেকজান্ডারের আক্রমণের পূর্ববর্তী ছিলেন। সব মিলিয়ে বিচার করে পাণনিকে খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ফেলা যায়। গোল্ডস্ট্রুকের অন্যভাবে পাণিনির তারিখ নির্ধারণ করে তাঁকে ওই পঞ্চম শতকেই স্থান দিয়েছেন। বংকিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণ-চরিত্র গ্রন্থেও নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব করে ওই একই তারিখ বহাল রেখেছেন।

পাণিনির উস্তরাধিকারী ছিলেন কাত্যানন যিনি ছিলেন খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের লোক। পাণিনির ব্যাকরণের টীকা

লিখেই তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি পাণিনির সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। কাত্যাননের পব বৈয়াকরণ হিসাবে যিনি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন পতঞ্জলি যিনি খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক। তাঁর গ্রন্থের নাম মহাভাষা, পাণিনি ও কাত্যাননের তুলনামূলক আলোচনাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। রচনাপদ্ধতির দিক থেকে এই গ্রন্থটি পরবর্তীকালের বহু লেখকেরই আদর্শ হয়েছে। এই গ্রন্থটির টীকা রচনা করেছিলেন কৈয়ট, অনেক পরবর্তীকালে খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকে।

আগেই বলছি ছন্দের উপর কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বৈদিক যুগে রচিত হয় নি, যা হয়েছে তা' অনেক পরবর্তীকালে। পিঙ্গল রচিত ছন্দসূত্রই ছন্দের উপর রচিত আদি গ্রন্থ। প্রচলিত ছান্দিশ রকম ছন্দের তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। পিঙ্গলের তারিখ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি মহাকাব্যের অনুষ্ঠাভ ও দ্বিষ্ঠাভ বা উপজাতি ছন্দের বিকাশের পরবর্তী, অপর দিকে তিনি শবরস্বামীর মীমাংসা-সূত্রের ভাষ্যে উল্লিখিত হয়েছেন। এই সব

বিবেচনা করে পশ্চিমেরা তাঁকে খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে স্থান দিয়েছেন। পিঙ্গলের গ্রন্থে রাত, মাণ্ডব্য, কাশ্যপ প্রভৃতি ছন্দকারের উল্লেখ আছে, যদিও তাঁদের রচনা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে) দু'টি অধ্যায়ে ছন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে। পিঙ্গলের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই ভবতের মতপাখ্য লক্ষ্য করা যায়। আরও উল্লেখযোগ্য যে ভবত প্রতিটি ছন্দের উদাহরণ দিয়েছেন যা পিঙ্গল দেন নি। এর পর ছন্দেব উপর যে লেখকের নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন জয়দেব। ইনি খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম জয়দেব ছন্দঃ। গ্রন্থ রচনায় তিনি পিঙ্গলকেই অনুসরণ করেছিলেন। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে তিনি বৈদিক ছন্দসমূহের প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে মাত্রাবৃত্ত, পঞ্চম অধ্যায়ে বিষম ও অর্ধসম বর্ণবৃত্ত, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে সমবর্ণবৃত্ত এবং অষ্টম অধ্যায়ে পিঙ্গল বর্ণিত ছয়টি প্রত্যয়ের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন। জয়দেবের এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেছিলেন হর্ষট।

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H



M&H

পিত্তরস প্রবাহ, পাকস্থলীর দুগ্ধ, ক্রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের প্রশসোদন্য একটি অব্যর্থ ঔষধ।

MARTIN & HARRIS
PRIVATE LTD.
MERCANTILE BUILDING, LALLBAZAR
CALCUTTA.

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H



ধাতাবাহিক উপন্যাস

আশাধূনা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কিন্তু শাসন দিয়ে কি সর্বনাশকে ঠেকানো যায়? বালির বাঁধ দিয়ে সমুদ্রকে? তথাকথিত সেই সর্বনাশ তো এসে যাচ্ছে নিজের বেগে। বন্যার জল যেমন মঠ-পথ গ্রাস করে ফেলে বাড়ির উঠানে এসে ঢোকে।

সব দিকেই উর্কি মারছে সে, যখন-তখনই সমাজে সংসারে গণ্ডিভাঙাব ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

আর মজা এই, সেই ভাঙনে যেন কারুব ভয় লজ্জা নেই বরং গর্ব আছে। পরিমলবাবুর ডান্নী যে বাড়িতে গুস্তাদ রেখে কালোরাতি গান শিখছে, সেই যেন পরিমলবাবুর গর্বের বিষয়, সামনের বাড়ির যোগেনবাবুর নতুন জামাই যে বিলেত ফেরত, সেটা যেন যোগেনবাবুর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক, ভান্ডুর কোন মামাতো শালার ভায়রাভাই যে বো নিয়ে বিলেত গেছে সেটা যেন রাজ্যসম্মত লোককে বলে বেড়াবার মত প্রসঙ্গ। আর বিরাজের দ্যাওরকি যে শব্দ একটা পাশ ফেরেই ক্ষান্ত হয় নি একটার পর দুটো, এবং দুটোর পর তিনটে পাশ করে ফেলে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসলো, এটা রীতিমত একটা বুক ফুলিয়ে বলবার খবর। এ খবর যেন বিরাজের সনাতন বনেদী শব্দবাজিকে একটি গৌরবময় উচ্চস্তরে তুলে দিয়েছে।

মেয়েদের ঘোমটা খুলেছিল ওদের কবেই; যবে থেকে জড়ি গাড়ি বাতিল করে মোটরগাড়ি কিনেছে, তবে থেকেই ওরা খোলা গাড়িতে মৃদু শব্দে বসে

হাওয়া খেতে সুন্দর করেছে, তবু সেটা যেন অনেকটা শব্দ 'পরসা থাকার' চিহ্ন। আর এটা হচ্ছে প্রগতিশীলতার চিহ্ন।

যদিও খবরটা বিরাজ নিশ্চিন্তেই শুনিয়ে গেল, কারণ জা-দ্যাওরের নিন্দে করে হাল্কা হবার জন্যেই মাঝে মাঝে মেজদার বাড়ি বেড়াতে আসে বিরাজ, অতএব সুদটা নিন্দে 'মতই শোনাগো, তবু তার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন রইল ওই প্রগতির গর্বটুকু, তা' প্রচ্ছন্ন থাকলেও ধরা পড়তে দেরি হল না।

কিন্তু প্রগতি যে ক্রমশই আপন বাহু প্রসারিত করছে, বিস্তার করছে আপন দেহ। নইলে কান্ডুর শালী মাস্টারনী হয়ে বসে?

পাশ অবশ্য করেছে সে মাত্র দুটো কিন্তু তাতে মাস্টারনী হওয়াটা বর্ধাপ্রাপ্ত হয় নি। নিচু ক্লাশেও তো আছে ছেলে-মেয়ে তাদেরই পড়াবে।

তা' উচু ক্লাশ নিচু ক্লাশটা তো কথা নয়, কথাটা হচ্ছে—কান্ডুর পিসতুতো শালী নিত্য দু'বেলা পিরিল করে শাড়ি পরে, কাঁধে রোচ এ'টে, আর পায়ে জুতো মোজা চড়িয়ে একা রাস্তায় যাওয়া-আসা করছে।

আর পিসমশব্দ বাড়ির এই প্রগতিতে কান্ডু নিশ্চয় পণ্ডমুখ না হয়ে, গৌরবে মহিমাবিত হছে। কথায় কথায় বিচ্ছুরিত হছে সেই গৌরব।

অতএব ধরতেই হবে যে প্রগতি নামক ওই সর্বনাশটা প্রথমেই নাশ করছে ভয় আর লজ্জা।

নচেন ভান্ডুও একদিন বড় মৃদু আর বড় গলা করে তার এক বড়লোক বন্ধুর ভাইবির জলপানি পাওয়াব গল্প করে।

এম্বেন্স পাশ করে জলপানি পেয়েছে বন্ধুর ভাইবির, সেই উপলক্ষে ভোজ্য দিচ্ছে বন্ধু, সেই গৌরবের সন্মানে টুকু পরিবেশন করে ভান্ডু তার নিজের ছোট বোনকে একহাত নেয়।

স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের সুদে বলে, 'তার বয়েস কত জানিস? মাত্র পনেরো! আর তুমি খাড়ি মেয়ে এখনো খার্ড ক্লাশে ঘসটাচ্ছে! লজ্জাও কবে না!'

বকুল আনন্দোজ্জ্বল মূখেই দাদার বন্ধুর ভাইবির গুণকীর্তন শুনছিল, হঠাৎ এই মন্তব্যে উজ্জ্বল চোখে জল এসে গেল তার। আর হঠাৎ সম্মিত হওয়ার দরুনই বোধহয় সামলাতে না পেয়ে বড় ভাইয়ের মূখের ওপর বলে বসে, 'নিজেই তো বললে তোমার বন্ধু ভাইবির জন্যে চিল্লিশ টাকা খরচ করে তিন-তিনজন মাস্টার রেখেছিলেন—'

তা' ভান্ডু অবশ্য বোনের এই উচিত-বাক্যে চৈতন্যলাভ করে না।

জগতে কেই-বা করে?

উচিতবাক্যের মত অসহনীয় আর কি আছে?

ভান্ডুও তাই অসহনীয় ক্রোধে বলে, 'ওহে, মাস্টার? তোমার জন্যে যদি চারশো টাকা খরচ করেও মাস্টার পোষা হয় কিছ, হবে না বুদ্ধলে? ওসব আলাদা রেন! তোমার জন্যে মাস্টার

গ্রামে দুই আঁঠু একটু ঠুঁটুয়া শিখবে, আর একটু অসভ্যতা! হুঃ!

বকুল আর কিছু বলে না, বোধকরি অশ্রুজল গোপন করবার চেষ্টাতেই তৎপর হয়, বলে বকুলের মা। যে এতক্ষণ নিঃশব্দে একটা লেপের ওষাড় সেলাই করছিল দালানের ওপ্রান্তে বসে।

হয়তো বেছে বেছে এইখানটাতেই এসে বন্ধুর ভাইবির গোরবগাথা শোনানোর উদ্দেশ্য ছিল ভানুর, মাকে ডেকে বসতে হচ্ছে না করলেও মাকে শোনানোর ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। মেয়েদের 'পড়া পড়া' করে কত কান্ডই করেছেন, বালি এইরকম মেয়ে তোমার? ক্লাশে একবারো ফাস্ট ভিন্ন সেকেন্ড হয় নি, আর এখনও এই দেখ।

তা' বতক্ষণ সে সব বলছিল ভানু বোনকে এবং বোকে উপলক্ষ করে ততক্ষণ কিছুই বলে নি সুবর্ণলতা। মনে হচ্ছিল না শুনতে পাচ্ছে, হঠাৎ এখন কথা করে উঠলো। বললো, 'ওঘরে গিয়ে গল্প করগে তোমরা, আমার বস্তু মাথার বস্ত্রগা হচ্ছে, কথা ভাল লাগছে না।'

মাথার বস্ত্রগা?

যে মানুষ ছুঁচ-সুতো নিয়ে সেলাই করছে তার কি না কথার শব্দে মাথার বস্ত্রগা!

ভানু বোধকরি এই অসহ্য অপমানে পাখর হয়ে গিয়েই কোনো উত্তর দিতে পারে না, শুধু 'ওঃ' বলে গট গট করে উঠে চলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ভানুর বৌও।

শুধু বকুলই বসে থাকে ঝাড় হেঁট করে।

হয়তো অন্য কিছুই নয়, তাকে উপলক্ষ করে দাদার এই যে অপমানটা ঘটলো, তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তাই ভাবতে থাকে দিশেহারা হয়ে।

সুবর্ণ হাতের কাজটা ঠেলে রেখে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'সুনির্মলকে একবার ডেকে দিতে পারাবি?'

সুনির্মল!

তাকে ডেকে দেবার আদেশ বকুলকে?

এ আবার কোন রহস্য!

আর বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে সুনির্মলের সম্পর্ক কি! এ যে অবোধা।

শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে মার দিকে তাকায় বকুল! সুবর্ণ সেইদিকে এক পলক তাকিয়ে বলে, 'একটা মাস্টারের জন্যে মলবো ওকে!'

মাস্টার!

বকুলের জন্যে মাস্টার!

ধরণী বিশ্বধা হচ্ছে না কেন?

ছেলের সঙ্গে হার-জিতের খেলায় মা কি এবাং বকুলকে হাতিয়ার করবেন? হুঃ! বিশ্ব এ দম্পতি কেন হচ্ছে মার?

অথচ দাদার থেকে মা'ও কিছু কম ভীতি-কর নয়। তবু ভয় জয় করে বলে ফেলে বকুল, 'না না ওসবে দরকার নেই মা—'

'দরকার আছে কি নেই সে কথা আমি বুঝবো তুই ডেকে দিবি!'

হাতের কাজটা আবার হাতে তুলে নেয় সুবর্ণ।

আ' তো হলো।

কিন্তু সুবর্ণর সেই কৈদারবদরী মাবার কি হল? এটা কি তার ফিরে আসার পরের কাহিনী?

দূরে যাওয়াই হল না তার ফিরে আসা!

সুবর্ণলতার ভাগাই যে বাদী তা' তাব তীর্থ হবে কোথা থেকে?

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যাত্রা করে, দু'ঘণ্টা পরেই আবার ফিরে আসতে হল সেই বাড়িতে।

কথা ছিল মারা মারা যাবে, জয়াবতীর বাপের বাড়িতে এসে একত্র হবে, সেখান থেকেই রওনা, সুবর্ণও তাই গিয়েছিল। জয়াবতীর মার কাছেই খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, তীর্থপথের প্রাকালে একবার খাওয়াবেন সবাইকে এই তাঁর বাসনা।

অনেক রাগের আর অনেক নিষেধের পাহাড় ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল সুবর্ণ, মনের মধ্যে অপরিসীম একটা ক্লান্তি ছাড়া আর যেন কিছুই ছিল না। তবু এদের বাড়িতে এসে পেঁছে যেন বদলে গেল মন।

যাত্রাপথের সংগীরা সবাই আগ্রহে আব উৎসাহে, আনন্দে আর ব্যাকুলতায় যেন জ্বল জ্বল করছে। তার হোঁচ লাগলো সুবর্ণর মনে।

নিজেকে যেন দেখতে পেল অনন্ত আকাশের নিচে, বিরাট মহানের সামনে, অক্ষরন্ত প্রকৃতির কোলে।

চির অজানা পৃথিবীর মধুমধুি হবে সুবর্ণ, চিরকালের স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ পাবে।

আনন্দে চোখে জল আসাছিল সুবর্ণর।

ত' চোখ মুছছিল সবাই।

আর থরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বল-ছিল, 'বাবা বদরীবিশালের কী কৃপা! আমার মত এই অধমকেও করুণা করছেন—'

সুবর্ণ চোখ মুছছিল না, সুবর্ণর চোখের জল চোখের মধ্যেই টলটল কর-ছিল। সুবর্ণ ওদের গোছগাছ দেখাছিল।

যখন খেতে বসতে যাচ্ছে—তখন—

তখন এল সেই ভয়ঙ্কর খবর।

সমস্ত পরিবেশটার উপর যেন বজ্রা-ঘাত হল। কপালে করাঘাত করলো সবাই।

সুবর্ণলতার স্বামীর কলেরা হয়েছে কলেরা!

দলের মধ্যে একজন গাত্র সধবা যাচ্ছিল, তারও এই! তা' যাওয়া তো আর হতে পারে না তার এ যাত্রা!

কিন্তু রোগটা হলো কখন? এতবড় একটা মারাত্মক বোগ! এই ঘণ্টা দুই তাত্রা এসেছে সুবর্ণ বাড়ি থেকে!

তাতে কি, এ তো 'তড়িঘাড়ি' রোগ।

তা' ছাড়া সুচনা তো দেখেই এসেছিল সুবর্ণ! যে খবর দিতে এসেছিল, সে বললো সেকথা।

দেখে এসেছিল!

সুচনাটা দেখেই এসেছিল।

সুবর্ণর দিকে ধিক্কারের দৃষ্টিও তাকায় সবাই, দেখে এসেছে, তবু চলে এসেছে। তা' ছাড়া বলেও নি একবার কাউকে।

ধন্য মেয়েমানুষের প্রাণ তো।

পাছে যাওয়া বন্ধ হয়, তাই স্বামীকে যমের মুখে ফেলে রেখে চলে এসে মুখে জালা-চারি এটে বসে আছে।

বিস্ময়ের সাগরে কূল পায় না কেউ? জয়াবতীর দাদা শুধু বিস্মিতই হন না, বিরক্তও হন। বলেন, 'রোগের সুচনা দেখেও তুমি কি করে চলে এলে সুবর্ণ?'

সুবর্ণ মৃদু গলায় বলে, 'বুঝতে পারি নি, ভাবলাম অহং মত হয়েছে—'

তথাপি জয়াবতীর দাদা অসন্তুষ্ট-গলায় বলেন, 'সেই ভেবে নিশ্চিন্দ হয়ে চলে এলে তুমি? না-না এ ভারি লজ্জার কথা! এ ক্ষেত্রে তো তোমার



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২০৩, ওল্ড চীনা বাজার ফ্রন্ট

কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৫৮০

২১শের সূরে

বিষয় চক্রবর্তী

এ পাশে দাঁড়াল রাইফেল হুড়
ও পাশে সঙীন আরও দৃষ্টি
মৃত্যুর মূখে শত্রুর সাথে
মৃত্যুই শব্দে বিনিময়।

দৃষ্টিতে দৃশ্যপাশে গড়াল ধ্বংস
নতুন নামেরই দৃষ্টি বাংলায়
শেষ কথা সেতুবন্দন করে
তামস তপস্যায়।

দৃষ্টি ডাই একই স্তন্যে লালিত
দৃষ্টি পাশে মৃত অশ্ব কারায়
হাঁকে কান্ডারী 'ভোর হবে কবে'—
একশের সূরে ডাক দিয়ে যায়।

আর তীর্থে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, এখন
শীগগির চল, গাড়ি বার করেছে।

তথাপি নিঃশব্দ আর হৃদয়হীন
সুবর্ণ বলেছিল, 'ভগবানের নাম করে
বেরিয়েছি, আমি আর ফিরবো না দাদা!
ছেলোরা তো রয়েছে, বোম্বায়া রয়েছে—'

এবার একযোগে সবাই ছি ছি-কার
করে ওঠে, এ কী অনাসুচি কথা! ছেলে-
বো রয়েছে বলে তুমি স্বামীর কলো
শুনেও যাবে না? কলোরা রুগীর
সেবাটাই বা করবে কে?

ভগবান!

স্বামীর আগে তোমার ভগবান?

জয়াবতী মৃদুস্বরে বলেন, 'বুঝতেই
পারছি তোর ভাগ্যে নেই, যা এখন তাড়া-
তাড়ি দাদা রাগ করছেন। চল বাই তোর
সঙ্গে দেখে আসি একবার—'

যাত্রা স্বগিতের কথা কেউ তোলে না।

অন্য সকলের পক্ষেই ওই যাত্রাটা—
অলম্ব্য অপরিহার্য অমোঘ, শব্দ সুবর্ণ-
জতার যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না!

কই এ কথা তো কেউ বলল না,
সুবর্ণ, তোকে ফেলে কি করে যাবে, আজ
মাই গেলাম, দেখি তোর ভাগ্যে কি
লিখেছে ভগবান।

না তা' কেউ বলল না।

বরং সুবর্ণ যে স্বামীর এই আসন্ন
মৃত্যুর খবর শুনেও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটে
রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল না, বরং কথা
কাটলো, তীর্থের লোভটিকে আঁকড়ে
রইলো, এতে ধিক্কারই দিল।

'ছেলোরা আছে ডাক্তার-কবরজ দেখাবে
সেরে যাবে—' এ একটা কথা?

বলি কোন প্রাণে হিমালয় ভাঙবে
তুমি? তাছাড়া আর সকলেই বা কোন
স্বস্তিতে সঙ্গে নেবে তোমাকে? যে

জায়গার যাছ সেখানে তো শব্দ আনা-
গোনার পথও নেই, তবে?

তার মানে ভূমি বিধবা হয়েও শাড়ি-
চাড়ি পরে ঘুরবে সবাইয়ের সঙ্গে, সব
কিছু ছোঁবে নাড়বে।

হলেই হল। আহ্লাদ?

দাদা আর একবার অসহিষ্ণু গলায়
প্রায় ধমক দিয়ে গেলেন, 'কি হল? সুবর্ণ,
তুমি কি আমার দোষের ভাগী করতে চাও?
বেশ তো—এদের তো এখনো যাত্রার ঘন্টা-
তিনেক দেরি রয়েছে, গিয়ে দেখো কি
অবস্থা—'

'অবস্থা আমার জানা হয়ে গেছে
দাদা—' বলে আস্তে গিয়ে গাড়িতে ওঠে
সুবর্ণ। জয়াবতীকে সঙ্গে আসতে দেয়
না।

কেন, এই শব্দযাত্রার মূখে একটা
কলোরা রোগীকে দেখতে যাবে কেন
জয়াবতী? তাছাড়া বিপদের ভরও তো
আছে। শব্দ একা নিজেই নয়। অন্য
পাটজনেরও।

গাড়িতে ওঠবার সময় জয়াবতী আর
একবার মৃদু প্রশ্ন করেন, 'ভেদবর্মী তুই
দেখে এসেছিলি?'

সুবর্ণ ওর চোখের দিকে নির্নিমেষে
ভাকিয়ে দেখে বলেছিল, 'এসেছিলাম।'

জয়াবতী কপালে হাত ঠেকাল।

গাড়ি ছেড়ে দেয়।

কে জানে রোগীরও এতক্ষণে নাড়ী
ছেড়ে গেছে কি না।

সুবর্ণ চলে যাওয়ার পর অবিরত
সুবর্ণের সমালোচনাই চলতে থাকে, এবং
একবাক্যে স্থির হয় এ রকম হৃদয়হীন
এবং আক্কেলহীন মেয়েমানুষ পৃথিবীতে
আর দাঁটি নেই।

শবর দিতে এসেছিল সুবর্ণের বি।
সে বারবার কপালে হাত ঠেকাচ্ছিল আর
বলেছিল, 'হে মা কালী গিয়ে যেন বাবুকে
ভাল দেখি—'

তবে তার বলার ধরণে মনে হয়েছিল,
গিয়ে ভাল তো দূরস্থান বাবুকে জ্যান্ত
দেবার আশাও সে করছে না।

সুবর্ণের সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা
করলো সে অনেকবার, বাবুর রোগের
ডয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে
চেষ্টা করলো বারকয়েক, এবং শেষ অবধি
বিরক্ত হয়ে বললো, 'আমি মা পথেই নেমে
পড়বো। ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি,
মা ওলাবিবি বুঝবেন সেটা।'

তথাপি সুবর্ণ নির্বাক নিস্তব্ধ।
স্তব্ধতা ভাঙলো বাড়ি এসে,
দোতলায় উঠে।

যেখানে একলা ঘরে বিছানায় পড়ে
কাংরাছিল প্রবোধ, আর দরজার বাইরে
আশে-পাশে ঘুরছিল মেয়ে-ছেলোরা।

ভাঙার নিষেধে ঘরে ঢোকে নি-
কেউ। অপেক্ষা করছিল কখন সুবর্ণলতা
এসে পড়ে। কলোরা রুগী বলে ভয় খেলে
যার চলবে না। ভয় খাওয়াটা যার পক্ষে
ঘোরতর নিষ্পত্তি।

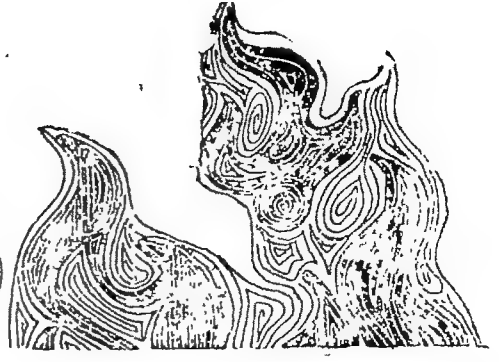
গাড়ি থেকে নামা দেখেই সবাই
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, কেউ কিছু
বলল না, দেখল মা উঠে গেল নীরবে।

হ্যাঁ একবারে নীরবে।

ঘরে ঢুকে রোগীর মৃদোমুখি
দাঁড়ালো সুবর্ণ, নীরবতা ভাঙলো, স্থির
গলায় প্রশ্ন করলো, 'ক' আউন্স ক্যান্টর
অয়েল খেয়েছিলে?'

[ক্রমশঃ]

মোগলযুদ্ধ একটি মহাকাব্য



খান ব্রিটিশ অস্ত্রাগার ভস্মীভূত
জেনা ম্যাজিস্ট্রেট উদ্যোগ

ব্রিটিশ আমলে ভারতের Internal Security Force সংগঠিত হয়েছে বিশেষ পদ্ধতিতে। বিভিন্ন জাতি-গুণী শিখ, পাঠান প্রভৃতিকে নিয়ে বিভিন্ন রেজিমেন্ট গঠন করেছে। ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনাগত বলে ঘাদের মনে করেছে তাদের মেশিন-গান, আর্টিলারি, ট্যাঙ্ক, সাঁজোরা গাড়ি প্রভৃতি দক্ষিণাশীল মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের সমাবেশে সুসজ্জিত করে তোলে। তাছাড়া, বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের পর, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শক্তি ভারতবর্ষে অক্ষুণ্ণ রাখবার অভিপ্রায়ে, ভারতে অবস্থিত প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ইংরেজকে নিয়ে বিভিন্ন রেজিমেন্ট (বা ব্যাটালিয়ান) গঠন করার এক অপরিহার্য নীতি গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের নিয়ে যে সব রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছে সেইগুলির নাম দিল A.F.I. (Auxiliary Force of India), অর্থাৎ, ব্রিটিশ সরকারের ভাবতীর্ষ Regular সৈন্যবাহিনীর সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে তাবা কাজ করবে। অর্থাৎ যদি ভারত-বাসীকে নিয়ে গঠিত কোন রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে তবে তাদের দমন কববে এই অরিলিয়ারি ফোর্স। সেই কারণে সামরিক কূটনীতি অনুসারে ব্রিটিশ অরিলিয়ারি ফোর্সের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ অন্ত্যাদি থাকত।

এইজন্যে চট্টগ্রামে পুষ্টিগণ বাহিনীর হাতে তারা দিয়েছে Musketry। এতে প্রতিবার মাত্র একটা করে গুলী ছোঁড়া যায়। গুলীর পাল্লা দু'শ' গজের বেশি নয়। কিন্তু ম্যাগাজিন রাইফেলের এক-সঙ্গে দশটা কাতুজ ভর্তি করা হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি ফায়ার করার ব্যবস্থা আছে। ম্যাগাজিন রাইফেলের নলের মধ্যে এমনভাবে প্যাঁচ কাটা থাকে, যার

পাহাষে বিশেষ ধবণের শব্দশালা কাতুজ ফারারের সঙ্গে পাক খেয়ে নিকেল করা সীসার গুলী বেগিয়ে যায় বলে তার পাজা হাজার গজের ওপরে। চট্টগ্রামে A.F.I. আর্মারিতে তাই ইংরেজদের জন্য রাখা ছিল প্রায় চারশ' ম্যাগাজিন রাইফেল আর তুলনামূলকভাবে ভাবতীর্ষ কনস্টবলের জন্য ছিল দু'-তিন শ' মার্জেট্রি মার। A.F.I. হেড কোয়ার্টারে পাঁচটি লুইস-গানও ছিল। ম্যাগাজিন রাইফেলের একই সাইজের কাতুজ লুইসগানেও ব্যবহার করা হয়। সেই একই পক্ষপাতিত্ব বশত পুর্লিশ লাইনে লুইসগান ছিল মাত্র দু'টি।

ব্রিটিশের সামরিক কূটনীতি ব্যবস্থার আরও অনেক বিশেষত্ব ছিল। সেই যুগে চারটি কোম্পানী নিয়ে সাধারণত একটি ব্যাটালিয়ান গঠিত হতো। প্রায় ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যাটালিয়ানে, চারটি কোম্পানী ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেন্ট থেকে আনা হতো—তিনটি ভিন্ন জাতের ভারতীয় কোম্পানী ও একটি ইংরেজ কোম্পানী। ভারতীয় তিনটি কোম্পানী একত্রে মিলিত হয়ে একযোগে যেন বিদ্রোহের অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র করতে না পারে তারই জন্য এই ব্যবস্থা। আরও সাবধানতার জন্য প্রত্যেক ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে একটি করে ইংরেজ কোম্পানীকে যুক্ত করা, তাবা অপরিহার্য মনে করেছে। বিভিন্ন জাতের তিনটি ভারতীয় কোম্পানী ঝগড়া করুক, ইংরেজ কোম্পানী তো আছেই—ঝগড়া মেটাবে!

সেইহেতু চট্টগ্রাম যুদ্ধ-বিদ্রোহে আমবা খাম ইংরেজের অরিলিয়ারি ফোর্স আর্মারি দখল করা একেবারে অপরিহার্য বলে ভেবেছিলাম। প্ল্যান মত অরিলিয়ারি ফোর্স আর্মারি দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের হস্তগত হ'ল। আমি ক্ষুদ্র দল নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পবে সেখানে উপস্থিত হয়েছি। ইতিমধ্যে প্রথম আক্রমণ ও অস্ত্রাগারটি দখল করার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি ঘটনা ঘটে

গেল। ঐ সব বর্ণনা—যাঁবা দাঁতের অংশ গ্রহণ করেছেন সেই সব বর্ণনার কাছ থেকেই ভালভাবে জেনেছি এবং এ' এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। সবকাণী লেখকের উক্তি কিছু বিকৃত হলেও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাও প্রকাশ করলাম।

কেউ কেউ আমাকে বলেছেন আমার A.F.I. হেড কোয়ার্টারের সবগুলি বর্ণনা পড়ে মনে হয় যেন পর্বতপ উত্তরে মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে। তারা আমবা কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন—(১) আপ-নাবা তো ঠিক কবোঁছিলেন কোন দফতরকে রেহাই দেবেন না; তবে ব্র্যাকবর্ন, কুলেন, মোর্শেড প্রমুখ ইংরেজকে হত্যা করলেন না কেন? (২) কুলেন মৃত্যুর ডল কবে শূন্যে পড়ে রইল। সে এল কখন? তার আগেই তো আমাবি ভেঙে ফেলা হয়েছে। সে দুটো মোটর গাড়ি পাহাড়-তলীর দিকে ছুটে যেতে দেখল। তা'পর আমাবি ভাঙার শব্দ শুনল। আমার কিছুক্ষণের মধ্যে দু'-তিনটি গাড়ি পাহাড়তলীর দিকে যাচ্ছিল সেই সব গাড়িকে বন্ধুতে বিপ্লবীবা ছুটেছে, ইত্যাদি। এইসব কখন কিভাবে ঘটনা তা' যেন পরিষ্কার হচ্ছে না। (৩) ক্যাপ্টেন টেটের দলই বা কখন এল—স্টারবোর্ন, কুলেন, মোর্শেডের ঘটনাব পুর্ন না পবে—কতক্ষণ পরে?

যখন কারও না কারও দল হয়েছে যে ঘটনাগুলি বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট পরিষ্কার হয় নি তখন আরও এতদু বিশদভাবে বলা উচিত। ইংরেজ হত্যা আমাদের প্রোগ্রামে ছিল তা' খুঁই নয়। যা'বা গুলীর মুখে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে তা'বা নিষ্কৃতি পেয়েছে আমাদের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলেই। চান্সারী প্র্যাকটিস কবে দক্ষতা অর্জন করলেও যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ করে সম্মুখদলের বাস্তবে একটি চাঁদমাণী প্র্যাকটিস নয়। চাঁদমাণীর লক্ষ্যভ্রষ্ট

কথা আর যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থেকে
শত্রুর বক বাক্য করে গুলী ছোড়া সম্পূর্ণ
ভিন্ন জিনিস। সামরিক শিক্ষার শিক্ষিত
সৈন্যবাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবী-
দের বাক্য করে প্রায় তিন হাজারেরও
অধিক ফায়ার করেছে—বিপ্লবীরা মরেছে
মাত্র বারোজন। পুলিশ-লাইন ছোট
জায়গায় বিপ্লবীরা সবাই প্রায় পাশাপাশি
শুয়েছিল। দক্ষ ইংরেজ সৈনিক তাদের
লক্ষ্য করে দু'শ' গজের মধ্যে মেশিন-
গান ফায়ার করেছে—তাদের মধ্যে কেউ
আহতও হয় নি। বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে
চাঁদমাঝি শিকারী নর—তাই বিপ্লবীরা
ফায়ার করা সত্ত্বেও সাহেবরা বেঁচে গেল।
আর্মারি চম্পিশ গজ উত্তরে পাহাড়-
তলী বান্ডা বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে
গেছে। আর্মারি দখল হওয়ার মিনিট
তিন-চারের মধ্যে পাহাড়তলী দিক থেকে
পূর্ব দিকে টাউনে সেই একই রাস্তায়
ব্র্যাকবান' সঙ্গীদের সঙ্গে ট্যান্ক করে
ফিরছিল। আর্মারি কম্পাউন্ডের পূর্ব-
প্রান্তের মেন গেট দিয়ে ঢুকে পশ্চিম দিকে
ব্র্যাকবান' আসছিল। বিপ্লবীরা তাতে
চ্যালেঞ্জ করে ও ডাকে লক্ষ্য করে গুলী
ছোড়ে। ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে সে
কছু পড়ে পালিয়ে গেল। পালাবার সময়
তার সাথীদেরও ডাক দিয়ে গেল তাতে
অনুসরণ করবার জন্য। জাহাজের দু'জন
অফিসার পালাতে সমর্থ হয়, কিন্তু কুলেন
আর পালাতে না পেয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ
করে। আর্মি আমার প্রত্যেকটি বন্দুর
কাছে জেনেছি তারা তেমন কোন সাহেবকে
পড়ে থাকতে দেখেন নি। টাউনের আলো
তার ওপর নিবন্ধ ছিল আব সাহেব মৃত্যুর
মত ভান করল ও গাড়ির গাড়ির
ঝোপে গিয়ে লুকোলে—এই বস্তান্ত
আর্মি বিশ্বাস করল না। কুলেন যখন এই
অবস্থায় ঝোপে গিয়ে লুকিয়ে ছিল তখন
খুব বেশি হলো প্রথম আক্রমণের পর
থেকে মিনিট তিন-চার হবে। এই সময়
থেকে আমাদের আসা অবধি—প্রায় চম্পিশ-
পশ্চাশ মিনিট বা এক ঘণ্টার মধ্যে সে বা
বা' দেখেছে বা বুঝেছে তারই বর্ণনা
দিয়েছে। আর্মি-চম্পিশ মিনিট-থেকে এক-
ঘণ্টা সময় আমাদের এখানে আসতে
লেগেছে বলছি তার কাণ, লোকনাথ
আমাকে বলেছে এক ঘণ্টারও বেশি দেরি
করোঁ। আমার ধারণা মিনিট চম্পিশের
মধ্যেই আর্মি ছোট একটি দল নিয়ে সেখানে
উপস্থিত হই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে
তাদের সেরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক
নয়।

পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শী একই স্থানে একই
স্থানে থাকার পর যদি একই ঘটনার বর্ণনা

দের তবু তাদের বর্ণনার মধ্যে সামান্য
তফাৎ থাকা আশ্চর্য নয়। সেই কারণে
বর্ণনাগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও
মোটামুটি সবগুলিই প্রায় ঠিক। পাহাড়-
তলীর রাস্তা দিয়ে রাত দশটা-এগারোটায়
সময়েও মোটর গাড়ি চলছিল। প্রত্যেকটি
মোটর গাড়িকে আমাদের বন্দুরা রুদ্ধ করে
আদেশ দিয়েছে। কুলেন এই সব মোটরের
কথাই উল্লেখ করেছে। সেখানে আতঙ্ক-
গ্রস্ত হয়ে শুয়ে পড়ে সব সময় তার
কানে নানা শব্দ প্রবেশ করেছে প্রতিবারই
শব্দ শুনে কুলেন সাহেব হতভম্ব হয়েছেন—
এই বাকি আর্মারি ভাঙল! কাজেই কুলেন
সাহেব শুনতে পাবে বা নাও শুনতে
পারে ঠিক কখন আর্মারির দরজা সশব্দে
ভেঙে পড়ল।

কুলেন সেইভাবে মৃত্যুবরণ করে
পড়ে থাকার পর কিছুক্ষণের মধ্যে সাই-
কেল চেপে মোশেড আসে এবং গুলীর
মর্মে থেকে সেও বেঁচে গেল। এই সব ঘটনা
হয়ে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন টেটের দল
সদর্পে বণাঙ্গনে প্রবেশ করে, আর আমার
উপস্থিতির কিছু আগে, মেয়ালের মত
পালিয়ে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে
মনে করে লোকনাথ আমাদের নিরাপন
রাস্তায় গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে
বলল।

আর্মি গিয়েই তাদের অভিনন্দন
জানাই—“Hearty congratulations.
You have done well.”

লোকনাথ—“আমরা অস্ত্র গেরোঁ,ি,
একটিও কার্তুজ এখানে নেই।”

নির্মলদা—“এখন কি হবে? এত সব
অস্ত্র একটিও কাজে লাগবে না।”

সবার মধ্যে বিবাদের ছায়া। আর্মি
শুনে তো একেবারে হতবাক হয়ে পড়ল।
তবে ঐ সব বাক্যে ছিল কি—কার্তুজ নয়?
আমাদের এতদিনেব সংবাদ সংগ্রহ তবে
নিষ্ফল হ'ল। আমার বৃদ্ধ প্রবল বড়
বইছিল। এ কি করে হতে পারে?
কোথায়ও কার্তুজ গোপনে সংরক্ষিত নেই
তো? আর্মি নির্মলদাকে প্রশ্ন করি—
“সব জায়গা ভালভাবে খুঁজে দেখা
হয়েছে?”

নির্মলদা—“হ্যাঁ, প্রতিটি স্থান খুঁজিয়েছি
—কোথাও কার্তুজের চিহ্ন নেই।”

আর্মি—

“That's strange! How that
can be? Are you sure all the
nook and corner of the Ar-
moury building has been
thoroughly searched?”

(অবাক লাগছে। সব স্থান ভালভাবে
খুঁজে দেখা হয়েছে বলে আপনারা কি
একেবারে নিঃসন্দেহ?)।

লোকনাথ—

“I am sure, all the places
have been searched.”

আমার দুইহাতে দুটি রিডলভার বরা।
আর্মি আর্মারির সামনের বারান্দার ওপর
ধীরে ধীরে পারচারি করছিলাম। আর্মি-
রির ঠিক দক্ষিণ পাশের কামরায় ঢোকায়
কাঠের দরজার ওপর মস্ত বড় একটি তাল
ঝুলেছিল। এই কামরাটির দরজা ভেঙে
তখনও দেখা হয় নি। তালামারা কাঠের
দরজার অভ্যন্তরে রাইফেলের টোটা বে
রাখা হয় নি সেরূপ ভাবা তাদের পক্ষে
কিছু অস্বাভাবিক নয়। আর্মিও জাবি নি
বে ওয়াই মধ্যে কার্তুজ রাখা আছে। তবু
কোন দুটি না থাকা উচিত। সন্দেহ-
ভজন করা অনেক আগেই উচিত ছিল।
তাই আর্মি রক্ত ও মাখনকে প্রশ্ন
করলাম—

“Why haven't you broken yet
the lock and opened the door?
Immediately break the door
open.”

(তোমরা এখনও এই তালটি ভেঙে
দরজাটি খোল নি কেন? একদৃশি দরজা
ভেঙে ফেল)।

বলতে না বলতেই দমাদম দশ পাউন্ড
ওজনের হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। তাল
কোথায় ছিটকে উড়ে গেল। দরজা খুলে
দেখি ঐরাতি প্রেট, কাপ, গ্লাস, জলের
জাগ, ছুরি, কাটা প্রভৃতি ধরে ধরে সাজান
বয়েছে, অনেকগুলি ডিস্, কাপ আবার
প্যাক বাক্সে বোঝাই করে বেছেছে। এই
কাঠের দরজার ধরের মধ্যে রাইফেলের
কার্তুজ না পেয়ে খুব একটা নিরাশ হওয়ার
কিছু ছিল না। সকলে আগেই নিবাস
হয়েছে বহন অনুসন্ধান করে দেখে নিষ্ফল
হয়েছে—একটি কার্তুজও পায় নি।

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর
নিডান্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন বা দেখা হওয়া
মাত্রই আমাকে তাদের করা উচিত ছিল,
তা' করতে তারা ভুলে গেছে এতক্ষণ।
কার্তুজ না পেয়ে তারা যে উৎকণ্ঠার মধ্যে
ছিল সেই অবস্থার স্বাভাবিকতা নষ্ট হলে
আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এই কাঠের
দরজা ভেঙে কামরার ভেতর বাসনপত্র,
কাপ, ডিস্ প্রভৃতি দেখার পর শেষবারের
মত আমরা সবাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস বৃদ্ধ
চেপে রাখলাম। ম্যাগাজিন বাইফেলের
কার্তুজ না পাওয়ার অর্থ—চট্টগ্রাম যুব-
বিদ্রোহের সামরিক স্ট্রাটোজির পরাজয়।
যদি ৩০০ বারের কার্তুজ আমরা পেতাম,
যদি সাতটি মেশিনগান ও চারশ' ম্যাগা-
জিন রাইফেল সক্রিয় থাকত আমাদের
হাতে তবে বিদ্রোহের ইতিহাস যে সম্পূর্ণ
অন্যভাবে লেখা হ'ত তাতে আমরা
নিঃসন্দেহ।

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
নতুন-বেদনা তড়াতাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়

নতুন

মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা 'অ্যাসপ্রো' যিহাত হার্বিস্টিকটের
সৈন্যসিদ্ধি। অনেক গৃহস্থগৃহস্থ ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন
নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার
নতুন উপায়।

মাইক্রোফাইণ্ড কলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-
বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০-৩৫ বেলী
তুল্য করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেট এখন গ্রাম-গাও
জুড়ে কল কল করছে। এর সঙ্গে বেদনা দূর করার শক্তি বিজ্ঞানের বেলী
দ্বারা পরীক্ষা করে দেখে গড়ে এবং শরীরের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

শরীরের মধ্যে কল কল করে যায়—অনেকজন শরীর কল কলতে থাকে।
নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই
অন্য দুই মিলিয়ন শরীরের সঙ্গে মিশে নিয়ে ৪-থেকে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের
মধ্যে থাকে। সেইভাবেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা
দূর করে দেয় এবং তার ফল অনেকজন স্বাস্থ্য হয়।

কিভাবেই আপনি খেতে পারেন—ওকলো, কলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস কল বা
বে কোনো সরল পানির সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের ব্যর্থার নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যবহার:
ব্যথা-বেদনা • মাথাব্যথা • গা-ব্যথা • হাতব্যথা • ঘাঁটে বেদনা • অর-মহা-জ্বর • কু
বল • অর • গলাব্যথা।

জাতি: প্রাপ্তবয়স্ক: হাইট ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে সবার ব্যাবহার। নিওনর
কল: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

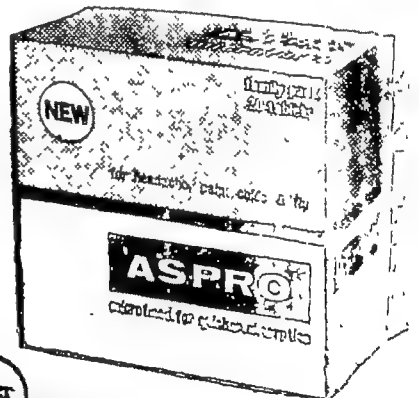
নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিতাবে কল করে দেখুন



ট্যাবলেটের ফ্যাকসি প্রকারের বসে বসে
হয়, তবুও শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেয়।
হট—আপনার স্বাস্থ্য সোজা করে দেয়।
মানে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার জন্য নতুন মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেট আর ১০ বেলী ছাড়া
হচ্ছে। তাই শরীরের মধ্যে অর-মহা-জ্বর মিশে যাওয়া
দুই তড়াতাড়ি ব্যথা উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার মার্বাটমিত উপায়।



নতুন

মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

সিইএলএস-এর ৩৩ তৈরী

নির্দেশনা এত নিবারণের মধ্যেও প্রশ্ন কবলেন— পদ্রিশ লাইন, টেলিফোন ভবন, ক্লাব হাউস প্রভৃতি প্রায় মত অধিকৃত হয়েছে তো?”

আমি— নিখুঁতভাবে প্রায় অনুযায়ী সব হয়েছে। ক্লাব হাউসে কোন ইংরেজকে Good Friday-র রাতে পাব নি। তারা নাকি অনেক আগে চলে গেছে।

লোকনাথ—

“How lucky they are! Tell me is there any casualty on your side?”

(কি ভাগবান তারা! আমাদের দিকে কি কেউ হতাহত হয়েছে?)।

আমি—

“No—none even injured.”

(না—এমন কি কেউ একজন আহতও হব নি)।

লোকনাথ—

“Any casualty on enemy side?”

আমি— কেবল একজনমাত্র সৈনিক পদ্রিশ লাইনে প্রাণ হারিয়েছে।

তখন আমবা বাবান্দার নিচে মাঠে নেমে এসেছি। এইভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের বিনিময় চলছিল সামান্য একটুক্ষণ এমন সময় কিছুক্ষণ বাদে বাদে দুই-তিনটি মোটর গাড়ি পাহাড়তলী দিকে যাচ্ছিল। প্রতিবারই তাদের হাঁক দিবে তরুণ বন্ধুবা গাড়ি থামাতে বলেছে। যাবা তাদের আদেশ শোনে নি তক্ষুণি মাস্কেটি নিয়ে তাদের ফাসের কথা হয়েছে। গাড়ি ক’টি তক্ষুণি নিশ্চল হয়ে গেছে। আমার এখনও মনে আছে একটা গাড়ির ড্রাইভার স্টিকারিং হুইলেন ওপর গুলে পড়ল এবং গাড়িটি পেছনের দিকে স্লেপে গড়তে গড়তে গিয়ে আর একটি নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকা মোটর গাড়ির ওপর সজোর খাড়া দিল এবং সম্বন্ধে ফলে একটা ওপর একটা চেপে বসল।

অতঃ কিং কর্তব্য? কাতরুজ পাই নি—এমন কি করা যায়? অর্ডার হল—

“Take all the revolvers and as many rifles and Lewis-gun possible. Destroy the rest!”

(আমাদের সঙ্গে সব ক’টি বিভলভাব এবং যতগুলি সম্ভব বাইফেল ও লাইস-গান নেওয়া হোক। ব্যক্তি সব ধংস কর)।

খটখট ঠকাঠক। রাইফেলগুলি আছড়ে আছড় ভাঙা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনবরত সবচেয়ে ভারী হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল মতপীকৃত বাইফেলের ওপর। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় সব বাইফেল ও তিনটি লাইসগান ভেঙে ফেলা হল। কতগুলো রাইফেল ও দুটি লাইসগান গাড়ি দুটিতে

পৌঁছাই করে নেওয়া হল। তারপর নির্দেশ হল—

“Set the armoury on fire!”

চাবটে ছটা পেট্রলের টিন খুলে সব স্থানে পেট্রল ছড়ান হল। তারপর কিভাবে পেট্রল ছিটানোর পর নিজেকে বাঁচিয়ে পেট্রলে আগুন দেওয়া হয় সেই-রূপ শিক্ষা অনুযায়ী সুবোধ চৌধুরী ও রক্ত সেন আর্মারিতে আগুন ধরালো। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বল উঠেছে।

লোকনাথদের ডজ গাড়িটি আর্মারি থেকে এগিয়ে গিয়ে পূর্বদিকের মেন গেট অতিক্রম করে আমাদের শেড্রোলে গাড়ির সঙ্গে এসে রাস্তার ওপর যোগ দিল। A.F.I. আর্মারি কম্পাউন্ড পারিত্যাগ করে যাওয়ার সময় সমবেত কণ্ঠে আমরা জয়ধ্বনি দিলাম—“বন্দে মাতরম্, ইনক্রাব জিন্দাবাদ।” ঐ দিকে দাউ দাউ করে আর্মারি জ্বলছে—আগুনের লেলিহান জিহ্বা সারাটা আর্মারি গ্রাস করে ফেলার উপক্রম—মাঝে মাঝে আগুনে পড়ে শব্দে কি যেন ফাটছে। সেই সব ফাটার শব্দ, বন্দে মাতরম্, আগুনের ভষাঝ দৃশ্য, অল্প স্থানের মধ্যে মৃতদেহের ছড়াছড়ি, ছ’-সাতটি মোটর গাড়ি বিধ্বস্ত অবস্থায় রাস্তার ওপর পড়ে থেকে ছোটখাট একটি বণাংগনের চিত্র সৃষ্টি করেছে।

জজ সাহেব মামলার ব্যয় লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন—

“Among the Europeans who had come up was Dr. Weldone, Chief Medical Officer of the Assam Bengal Railway. In the armoury compound and on the road adjoining it were six corpse. The constable Jara-sindhu Barua was lying dead in the back seat of Mr. Wilkinson’s car which was standing near the Drill Hall entrance to the compound, while beside it in the ditch lay his chauffeur Birman Thapa badly wounded. A little further along the road another car was standing with a dead man in the driver’s seat and another dead man in the back seat and lying on the running board the dead body of an Anglo-Indian. Between the armoury and the Sergt. Major’s bungalow, lay the corpse of Sergt. Major Farrell and between the armoury and the sentry’s quar-

ters lay the corpse of one of the A.F.I. sentries. Another sentry Golam Jhilani was found badly wounded. He and Birman Thapa were removed to the Pahartali hospital.” (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case).

তার পূর্বদিন সকালে আসাম-বেঙ্গল রেলের প্রধান ডাক্তার মিঃ ওয়েলডন সেখানে গিয়েছিলেন। আর্মারির কম্পাউন্ড ও রাস্তার ওপর ছ’টি মৃতদেহ পড়েছিল। জেলাশাসক মিঃ উইলকিনসন সাহেবের বিধ্বস্ত মোটর গাড়িটির পেছনের আসনে কনস্টেবল জবাসিন্দুর মৃতদেহ পাওয়া যায়। মিঃ উইলকিনসন সাহেবের গাড়ির পাশে এক নন্দমায় তাঁর ড্রাইভার বীরমন থাপা গুরুতর আহত হয়ে আশ্রয় নেন। একটু এগিয়ে অন্য একটি গাড়ির ড্রাইভারের সিটে একটি লাস পড়েছিল এবং পেছনের সিটেও আর একজনের মৃতদেহ ছিল। পাদানীর ওপর আর একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সার্জেন্ট মেজর ফেবেলের মৃতদেহ তারই কোয়ার্টারের সামনে এবং আর্মারি ও প্রহরী দেব কোয়ার্টারের মাঝখানে একজন সেন্ট্রিও প্রাণহীন দেহ পড়েছিল। আর একজন সেন্ট্রি—গোলাম জিলানিকে গুরুতর আহত অবস্থায় বীরমন থাপার সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আমাদের দুটি গাড়ি যখন পদ্রিশ লাইনের দিকে প্রায় বওনা হচ্ছে, এমন সময় পাহাড়তলী রাস্তার ওপর, আমাদের প্রায় ব্রিশ-চল্লিশ গজ সামনে হেড-লাইট জ্বালিয়ে একটি মোটর গাড়ি আসতে দেখি। সেই সময় আমাদের সবাই গাড়িতে ওঠেও নি। যাবা তখনও রাস্তার ওপর ছিল তারা একসঙ্গে তিনটি পদ্রিশ মাস্কেটি উর্চিয়ে ধবে হুকুম দিল—

“Halt! Who comes there?”

মাত্র তিন সেকেন্ড উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা কবেছে, কারণ, সেই সময় আমাদের খোঁজে পদ্রিশ লাইন থেকে অন্য কোন দল আসবার সম্ভাবনাও ছিল। মোটরের তীর হেড-লাইটের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না—কোন গাড়ি বা তাতে আবাহী কারা তা বোঝাব উপায় ছিল না। কিন্তু হুকুমের জবাব সঙ্গে সঙ্গে না পোয়ে দাঁদি করা গুরুত্ব। তাই আবার নিশীথের নির্জনতা ভগ্ন করে আদেশ হল—

“Fire!”

তিনটি মাস্কেটি একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। তারপর load ও fire করতে করতে আমাদের চাব-পাঁচজন মোটর গাড়ির দিকে ছটে গেল। আমিও দ’ হাতে থোলা রিভলভার নিয়ে দৌড়ে গেলাম।

আমরা চিনতে পারলাম—ম্যাজিস্ট্রেটের মোটর। পেছনের সীটে তার আদালতী মরে পড়ে আছে। আদালতীর মৃতদেহের পাশে মিঃ উইলকিনসনের দোনলা বন্দুক ও এক বাস্তব কাঁচুজ পড়ে আছে। সামনের সীটে ড্রাইভার ছিল। তাকে আমাদের মধ্যে একজন টেনে বার করল। প্রধান শিকার পালিয়ে গেল—জেলা শাসক উধাও। কাঁদের মোটর গাড়ি তা' বুকো নিতে ঐ দু'-তিন সেকেন্ড সময় দিয়েছি, তারই মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হেড-লাইটের সাহায্যে আমাদের রণসজ্জা দেখে সমূহ বিপদ আশঙ্কা করে পেছনের দিকে ছুটে পালিয়েছে। আমাদের দৃষ্টি হেড-লাইটের জন্য কিছু দেখতে পায় নি। এখন বুদ্ধলাম সভকর্তার জন্য যে দু'-তিন সেকেন্ড আমরা দৌঁর করেছি সেটুকু সময়ের মধ্যেই হেড-লাইটের সাহায্যে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট উধাও হয়েছে। তরুণ বন্দুরা খুব উত্তেজিত। সব রাগ গিবে পড়ল বেচার ড্রাইভার বীরমন থাপান ওপর। একদিকে হিম্মত আর একদিকে টেগেরা মাস্কটি হাতে কঠোর কণ্ঠে বীরমন থাপাকে গুলী করবে বলে ভয় দেখাচ্ছে—“ম্যাজিস্ট্রেট কোথায় গেছে বল—নইলে গুলী করব।” এই বলতে বলতে কারও বন্দুক থেকে গুলী বেরিয়ে গেল। বীরমনের বুকোর মাংসপেশী বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বিদীর্ণ হল। আর এক বন্দু অন্য পাশ থেকে একেবারে বুক লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে আর কি। আমি নিম্নে তাদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব তীক্ষ্ণ স্বরে তাদের বিপ্লবী আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে বললাম—

“Stop. What are you doing ? He is Indian. He is a poor driver ! How can he say which way the Magistrate has gone ?”

(খাম, এ কি করছ ? ও তো ভারত-বাসী—বেচার ড্রাইভার একজন ! সে কি করে বলবে ম্যাজিস্ট্রেট কোন দিকে পালিয়েছে ?)।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বন্দুরা তাদের বন্দুক নামিয়ে নিল। তারা তাদের ভুল বুকো লজ্জা পেল। আমার খুব ভাল লেগে ছিল—আজও লিখতে গিবে খুব আনন্দ পাচ্ছি—সেইরূপ উত্তেজনার মুখেও একজন নিবীহ লোকের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করতে পেরেছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেটের ড্রাইভার বীরমনের কথা সাহেব জঙ্ঘ লিখছেন—

“Birman Thapa, the District Magistrate's chauffeur,

says that five or six persons dressed in Khaki standing by the gate of the armoury compound shouted to them to go back and then opened fire on them and he was hit on the leg and the chest and he fell down in the driver's seat. The headlights of the car continued burning until the right one was put out by a bullet. As he lay there, dazed but not unconscious, five or six of the raiders came up and looked into the car and shone an electric torchlight on him. One of them said, 'This is the District Magistrate's driver' and another said, 'kill him'. Then they questioned him who had been in the car and where he was taking them and he replied that he was taking the Shahebs to Pahartali. Then one of them said in Bengali, 'He is a liar—kill him' and another pointed a pistol at him and pulled the trigger but as he did so he (Birman) switched round and the bullet only grazed his chest causing a flesh wound. Then they prodded his body with their guns and pushed him out on the road and as he fell out one of them said, 'Do not do him any further injury' and they turned and went away. (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case. Page—35).

জাজমেন্ট কপিতে পাচ্ছি, বীরমন বলছে—পাঁচ-ছয়জন তাকে গাড়ি ফিরিয়ে নিতে বলে ও ফাটার করে। তার পায়ে গুলী লাগে। বুকোর মাংস খেঁবে গুলী চলে যায়—ইত্যাদি। হেড-লাইট জ্বলছিল, কিন্তু বন্দুকের গুলীতে ডানদিকের হেড-লাইট চরমাব করে দেওয়া পর থেকে লাইট নিভে গেল। সে যখন গাড়িতে পড়ে থাকছে, পাঁচ-ছয়জন আক্রমণকারী তাব দিকে ছুটে এল এবং টর্চের আলোতে তাকে তারা দেখে। তাদের মধ্যে একজন তাকে দেখে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল—“একে মেরে ফেল”। তারা তাকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল যে সাহেবদের নিয়ে

সে কোথায় যাচ্ছিল। সে বলল পাহাড়-তলীর দিকে। তারপর একজন বাংলায় বলল—“মিথ্যাবাদী সে, তাকে গুলী কর।” একজন রিভলভার দিয়ে গুলী করে, সে সরে যাওয়াতে গুলী ঠিকমত লাগল না—বুকোর মাংস খেঁবে চলে গেল। তারপর তারা বন্দুক দিয়ে তাকে গুলীতে লাগল এবং রাস্তার ওপর টেনে বার করল। সে পড়ে গেল। তখন একজন বলল—“বাস্, আর না—আর জখম কোর না তাকে।” এই কথা শুনে সবাই চলে গেল। কিন্তু বীরমনের সবকথা ঠিক নয়। আমি প্রত্যক্ষ-দর্শী এবং এই ঘটনার নিজে অংশগ্রহণ করেছি। আমি যে বর্ণনা দিয়েছি সেটাই প্রকৃত সত্য ঘটনা।

অক্ষত দেহে জেলাশাসক, মিঃ উইলকিনসন পালালো। ফায়ারিং লাইন থেকে কোঁশলের সঙ্গে পালাতে পারা পরাজয় নয়—বরং তা successful retreat—সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। মিঃ উইলকিনসন সেখান থেকে তৎপরতাব সঙ্গে পালালো কেবল তা' নয় জেলাশাসকের গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য কতব্যে অটল ছিল। সেইসব বিবরণ আমি পরে দেব। ইংবেজ শাসকগোষ্ঠীর বীভৎস, দায়িত্ব-বোধ ও কর্তব্যজ্ঞানকে ইতিহাসে বিকৃত করে হয়ে প্রতিপন্ন করতে আমি চাই না। সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র সঠিক জানতে হলে তাদের দুর্বল বলে অভিহিত করলে চলবে না—তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও ব্যক্তিগত সাহসের ইতিহাসও আমাদের জানা উচিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার লেখায় শত্রুপক্ষের তৎপরতা ক্রমশ প্রকাশ পাবে।

শেষবারের মত A.F.I. আর্মারিটিকে আমাদের দৃষ্টি গাড়ি বিদায় জানিয়ে পলিশ লাইনের দিকে অগ্রসর হল। আর্মারির বিরাট অগ্নিকাণ্ডে চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল। গাছের মাথায় পাহাড়ের গায়ে আলোর ছটা এসে পড়েছে। চারিদিক ত্রিকমিক্ কবে উঠেছে। ওপরে আকাশ লাল হয়ে চট্রগ্রামের বিজয়বাহী ঘোষণা করছে। আমাদের বিজয়নিনাদে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—ইনক্কাব জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম্ ! তবু কেন আমাদের মুখে হাসি নেই ? কেন আমাদের মুখ মলিন ? আমাদের চোখে লাল আকাশটিকে কেন ফিকে মনে হচ্ছে ? A.F.I. আর্মারির অধিকারের বিজয়-গৌরবে আমাদের মনে আনন্দ নেই কেন ? বিজয়ের কোন আনন্দই আমাদের মনে ছিল না। বাইফেল ও লুইসগানের কাঁচুজ না পেয়ে আমরা বুঝেছিলাম আমাদের ক্ষতির পরিধি কতখানি।

[ক্রমশঃ]



জাহান্ আরা এতক্ষণ আপন দীক্ষার দিনটির কথাই ভাবছিলেন। মঞ্জিল-ই-নিগমবোধে যে তিনি সমস্ত সাম্রাজ্যের কথা ভুলে যান। ভুলে যান ঐশ্বর্য-গরিমার কথা।

মিন্না মীরগত প্রাণ মুর্তা শাহকে দীর্ঘদিন থেকে পত্রযোগে আবেদন-নিবেদন করেও কোন ফল হলো না। বারংবারই পীরসাহেব দেন প্রতীক্ষার নির্দেশ। অবশেষে অনুমতি এসে। পীরসাহেব লিখলেন, “আধ্যাত্মিক শক্তিতে যুবরাজকে আমি আমার প্রতিনিধি বিবেচনা করি। তাই আমার নির্দেশনাসারে যুবরাজই তোমাকে দীক্ষিত করবেন।”

দারাশিকো পবিত্রক্ষেত্রে বাদশা-বেগমকে বিম্বপিতা পরমেশ্বরের মহান্ মন্ড্রে দীক্ষিত করেন। মাঝে মাঝে দারাশিকোর দিকে তাকালে জাহান্ আরা যেন পবিত্র পীরের উপস্থিতি অনুভব করেন। জাহান্ আরার দীক্ষার দিনটির ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে। যেন স্বপ্ন।

নিরালা একাকীয়ে যেন একটা নতুন অনুভূতি এসে সম্রাট-নিদ্দিনীর প্রাণে নতুন স্পন্দন জাগায়। রাজকাষের কোলাহলের অবসাদে, বিষয়-সম্পত্তির তাপানলে, ঘোবনের উত্তাল তরঙ্গমল্যায় প্রাণটা যখন আইটাই করে ওঠে, প্রিয় দুলেরার দীর্ঘ বিবাহ ব্যথায় মন যখন ভাবাক্রান্ত হয়ে ওঠে—তখন যে মহাজীবনের শরণে মন শান্ত হয়—তার মন্ত্র-দাতা দারাশিকো সত্যিই কি সসাগরা হিন্দুস্থানের যুবরাজ না ছদ্মবেশী পরম পবিত্র কোনো পীরসাহেব? প্রাসাদের নিরালা শব্দক্ষেত্রে অবিনশ্ত-কুন্তলা দীপ্তলোচনা বেগম জাহান্ আরা আর ভাবতে পারছেন না!

মঞ্জিল-ই-নিগমবোধ। যুবরাজ দারার পাঠগৃহ। দিল্লীর কাম্বীরী গেটে। অদূরে যমুনা কলকল নিনাদে প্রবাহিত। ছদ্মা মসজিদ লাল-কিলা দুটোই অদূরে। দুরদূরত্ব নিশ্চয়ই দূ-ফাল্গু হবে।

প্রাসাদের কর্ণাঘব, মসজিদের জন-সমাগম থেকে সামান্য দূরে সরে গেছেন যুবরাজ দারাশিকো।

আজকাল প্রায় তাঁকে প্রাসাদে পাওয়া যায় না। প্রেম-পাগলিনী জাহান্ আরা মনের কথাটুকু বলার একটি ক্ষেত্রে পাচ্ছেন না। এতবড় প্রাসাদ, এত লোকজন, তবু যেন শূন্য পুরী।

সেদিন বহুদিন পরে দুলেরা এসে-ছিছেন রাজসভায়। দূর থেকে যে উজ্জ্বল প্রতীকায় সম্রাট-নিদ্দিনী প্রহর গুণিছিলেন, সে শূন্য মন্দির এসে-ছিল তাঁর জীবনে। ক্ষণস্থায়ী। তবুও মধুময়।

লাল-কিলার দেওয়ান-ই-খাসের সাইপ্রাস বীথিকায় দুলেরা সম্রাট-

প্রীতিবেকরণের ভট্টাচার্য

নিদ্দিনীকে দূর থেকে জানিয়েছেন অভিবাদন।

জাহান্ আরার বাক-শক্তি হঠাৎ রহিত হয়ে গেল কেন? শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হয়ে গেল হিমশীতল। এতদিন ধরে এত বিনয়-রজনীতে সম্রাট দুহিতা যে প্রেমাস্পদের সূক্ষ্মবশে সময় কাটিয়ে-ছেন, তাঁকে যে মনের কথাটুকু কিছুই জানানো হলো না। জাহান্ আরা তাঁব না-বলা-বাণী মনের গোপন গহনে নিয়ে আর কত বিনয় যামিনী কাটাবেন বলতে পারো কেউ?

দারাশিকোর হৃদয় আছে। ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান মানবপ্রীতি। দুলেরাকে প্রাণভরে ভালবেসে সম্রাট-নিদ্দিনী নিশ্চয়ই করেন নি কোনো তপরাধ। কিন্তু এ বিরাট প্রাসাদে একটি প্রাণীও নেই জাহান্ আরা বেগম প্রাণ খুলে যাব সাথে দুলটো মনের কথা বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

যুবরাজ আজকাল শূন্য সাহিত্য

সাধনায়ই মগ্ন। সাহিত্য। জীবন-দর্শনের নতুন ইঙ্গিত দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন সাহিত্য। নতুন ধর্ম। নতুন জীবন। মানবের মহামিলনের পরম ধর্ম—প্রেমের নব বাণী।

দার্শনিক দারা আপন পাঠগৃহের এ্যাসেমারি হলে নিজের মনে আবৃত্তি করছিলেন—

আগার কাকির আজ ইসলাম-ই-

মাজাজি গশত বেজায়।
কে রা কুফর-ই-হাকিক শূন্য পাদদার,
দরুণ হার বদতে জান্ ইস্ত পিন্ হান,
বাজের-ই-কুফার ইমান্ ইস্ত পিন্ হান।

এই বিরাট স্তম্ভাঙ্কে কেই বা কাকের কেই রা ধার্মিক। প্রতিটি জীবনের ভিতর পরম পিতা বিরাজমান।

আপন রচিত রিসালা-ই-হকুনুয়া আবৃত্তি করে যুবরাজ গাইলেন—

“তোমার কাছে অচিন কে গো
কে বা পর তোমার,
বিশ্বজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে
(হে মহান) লও গো নমস্কার।”

পণ্ডিত, মৌলভীদের কলহে প্রান্ত ক্রান্ত দার্শনিক দারা সেদিন গোয়েছিলেন—

“সারা বা উসুলাম-ই-ইন হর দো কোয়াম্ করে নিশ্চ।”

নিজেদের ভিতর কলহ করে যারা অন্ধ ভেদাভেদ এনে মরছে তাদের উজ্জ্বল কারদর সাথেই আমার নেই কোন সম্পর্ক।

বারাণসী থেকে যে সব বিদগ্ধ সূফী-জনকে যুবরাজের আমন্ত্রণে আনা হয়ে-ছিল তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সংখ্যায় তাঁবা ছিলেন দেড়শোরও অধিক। যুবরাজ তাঁদের সহায়তার বেদ ও উপনিষদের অনুবাদ শেষ করেছেন। নিজেই অনেকটা হালকা মনে হচ্ছে। তারিখটা মনে আছে? ষোলশো সাতাম্বর আঠাশে হুঁম।

ইতিহাস যদি সত্য হয়, আত্ম-জীবনীতে যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে ভারতের ইতিহাসে পাঠকবৃন্দের নিশ্চয়ই সন্ধান আছে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রচনা কালে এই মঞ্জিল-ই-নিগমবোধ গৃহকোণেই দারাশিকো ধ্যানে বিশিষ্টের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। পুণ্যাত্মা দারা তখন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের পার্সিয়ান অনুবাদে রত। এই রামায়ণ তাঁরই সম্পাদনায় পরে ‘তজ্জুমা-ই-যোগ-বাশিষ্ঠ’ নামে প্রকাশিত। এই অনুবাদে যুবরাজ শেখ সূফীর সহায়তা গ্রহণ করেন।

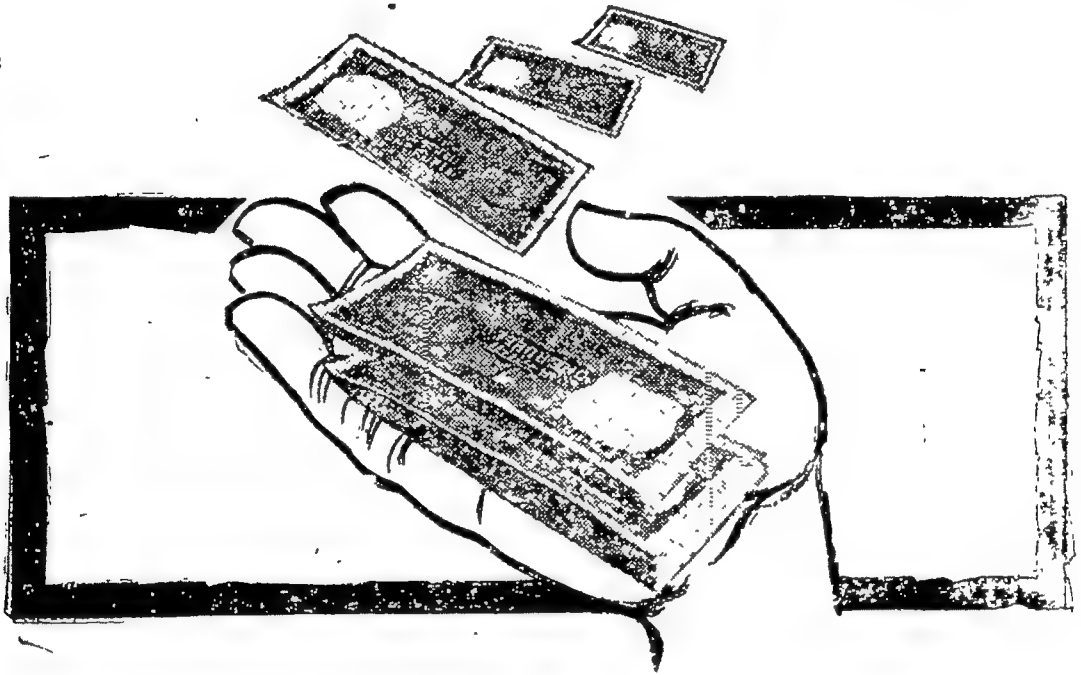
একদিন গভীর নিশীথে আপন পাঠ-

গৃহে যুবরাজ অধীনস্থিত অবস্থায় দেখলেন তাঁর সম্মুখে দু'জন সৌম্য-কান্তি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। একজন একটু উঁচুতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে তাঁরা যেন

মোহাবিষ্টাবস্থায় কাছে টেনে নিলেন। অপরিচীত স্নেহসিঞ্চিত স্পর্শে বাশ্চল্য আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, “রামচন্দ্র, ইনি তোমার মত একজন পরম সত্যব সাধক। তুমি একে আলিঙ্গন-পাশে

আবদ্ধ করবে কি প্রদু?” তৎক্ষণাৎ যোগবাশিষ্ঠের ভূমিকার দাবা এ “বিব ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে বিস্মৃত হন। যুবরাজ লিখছেন, “রামচন্দ্র আমাকে গভীর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করলেন

হাতে টাকা থাকলেই খরচ হয়ে যায়



হিসেব করে বাড়ীর খরচপত্র করা এবং অত্যন্ত ব্যয়বশত খরচ করার প্রয়োজন দৃষ্টমানে যত বেশী, তেমন আর কখনও হয় নি। হাতে যদি নগদ টাকা রেখে দেন তাহলে তা খরচ করার লোভ অনেক বেশী বেড়ে যায়। তার চাইতে বরং হাতের টাকাটা পোস্ট অফিসের পাশ বইতে রেখে দিন আর যখন প্রয়োজন হবে তখন ছুলবেন।

আপনার কাছাকাছি কোন পোস্ট অফিসে অতি নহজেই আপনি স্বেভিংস ব্যাঙ্কের একটা হিসেব খুলতে পারেন। আজকাল পোস্ট অফিসে স্বেভিংস ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমেও টাকা পয়সার লেনদেন করা যায় বলে আপনার বাড়ীর প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করা এবং সংরক্ষণ করার জন্য পোস্ট অফিসের স্বেভিংস ব্যাঙ্ক ততান্ত সন্নিবেশনক। তাছাড়াও পাশ বইতে যদি কিছু জমা থাকে তাহলে তা সন্নিবেশন করতে পারে।



জাতীয় সংসদ সংস্থা

DA 66/519 Bengal

তখন বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের হাতে কিছু মিশ্র দিলেন। আমি রামচন্দ্রের হাত থেকে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করলাম।”

দারাগিকোর এই ভজ্জ-মা-ই-যোগ-ধাশিষ্ঠের উদ্দেশ্য অনুবাদ মিন্‌হাজ-উস-সালিকিন্‌ উত্তর ভারতে আজও বিশেষ সমাদৃত।

ধা-নাম-ই-আকে উ নাম-এ না দরদ
ধা-হার নাম-ই কে থোয়ানি সর বর আরদ।

যাঁর কোনো নাম নেই যে কোন নামেই
যিনি সাড়া দেন তাঁকে শত কোটি
নমস্কার।

নামটাই তো দুনিয়াতে সব গন্ড-
গোলের মূল। যে বিশ্বপিতা সমগ্র
পৃথিবীকে চালিত করছেন, যিনি
সবার অন্তরে বিরাজমান, বিভিন্ন
দেশে বিভিন্ন নামে তাঁকে ডাকা
হয় তিনি কি কখনও সন্তানদের
প্রতি বিমূঢ় হতে পারেন? তবুও এ
জটিল পৃথিবীতে তাঁরই নাম নিয়ে কতই
না নিরর্থক অশান্তি।

‘অল্লা হো আকবর’ কত প্রিয় নাম।
প্রভু কথাটার ভেতর কতখানি শক্তি রয়েছে
লিপ্ত। কে বলে ঈশ্বর বিভিন্ন।

এই তো সৈদিন বারাগসীর পাণ্ডিত-
প্রবর এই মঞ্জিলে বসে আবাস্তি কর-
ছিলেন উপনিষদের মহান্‌ মন্ত্র—একো
দেবঃ সর্বভূতেশ্চ গৃঢ়—এক ভগবান, সর্ব-
দেহে অধিষ্ঠান সর্বময়, এক, অমিত্যয়।
তবু কেন এ বৃথা ধর্মের জেহাদ,
কেন বৃথা মনোমালিন্য? বলতে পারে
কেউ?

আজও সমগ্র বিশ্বে একজন মহামানব
অবতীর্ণ হন নি কেন আপন জীবনের
অনুভূতিতে—যিনি এ সর্বধর্মসম্বন্ধকে
রূপায়িত করে পৃথিবীর ভ্রাতৃদের পবিত্র
বন্ধনকে করে দিতেন মহিমামণ্ডিত।
কোথায় সেই পরমযোগী?

দারা খুটধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান
সংগ্রহ করেছিলেন।

মহামতি যীশুর চরণাশ্রিত মিশনারী-
বৃন্দ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে
এসে পৌঁছেছেন ভারতবর্ষে। কথিত
আছে যীশু বারাগসীতে এসেছিলেন
এশিয়ার মহান্‌ পীঠভূমিতে। এবার
এলেন যীশুর সন্তানবৃন্দ। সৌম্যকান্তি।
দারাগিকো আপন মঞ্জিলে একে একে
তাঁদের জানালেন নিমন্ত্রণ। শান্ত-
সমাহিত স্নাতকের মতন তাঁদের পদপ্রসন্ন
বসে অধ্যয়ন করলেন পরম পবিত্র
যাইবেল।

রেভারেন্ড ফাদার এস্টানিলাস
ম্যালপিকা এ বিষয়ে সর্বপ্রথম দারা-
গিকোর মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। ধীরে

ধীরে সাগর পাড়ি দিয়ে এলেন রেভারেন্ড
ফাদার পেদ্রো জুজারে, এলেন ফাদার
হেনরি বৃজিও, এলেন হেনরি রথ।

এ যে একই কথা। এ যে মহামিলনের
সেই একই মহামন্ত্র—শান্তি। চাই।
পৃথিবীতে শান্তি হোক। শুল্-ই-কুল।

ফাদার হেনরি রথ এ কি বলছেন?
“রেসেডু আর দি পিস্‌ মেকার্স, ফর, দে
শ্যাল বি কম্‌ড চীল্ড্রেন অব গড।”

মহাসম্প্রদায়ের এ যে একই সুর।
কাতরকণ্ঠে হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাট
নতজানু হয়ে প্রার্থনা পেশ করেন, “হে
পরম দয়ালু খোদাভালা, হে প্রভু,
জগদীশ্বর শক্তি দাও। সমগ্র বিশ্বে আমি
ছড়াতে চাই এ শান্তির এ মহামিলন
বাণী। সর্বধর্মসম্বন্ধের পরম শক্তি
দাও প্রভু।”

“সমগ্র বিশ্বে শৃঙ্গ একটা কথা বলবার
সাহস দাও সব পথ সত্য—প্রাণের দেবতা
প্রাণেই বিরাজমান। কোথায় তাঁকে খুঁজে
মরি বৃথা? হে বিশ্বপিতা শক্তি দাও।
জ্ঞান দাও। সর্বধর্মসম্বন্ধের মহাবাণী
প্রচারের কণ্ঠ দাও।”

আপন মঞ্জিল-ই-নিগমবোধে একাকী
বসে যুবরাজ আপন মনে প্রার্থনার রত
ছিলেন।

হঠাৎ কার করম্পর্শে চমক ভাঙলো।
কার এত সাহস? প্রার্থনাকালে এ
মঞ্জিলে নেই কারুর প্রবেশাধিকার। সে
কথা দিল্লীবাসীর কে না জানে?

কোমল করম্পর্শে যুবরাজ হেন অন্য
জগৎ থেকে ফিরে এলেন। ভগিনী
জাহান্‌ আরাকে এ অসময়ে এ প্রার্থনা-
গৃহে দেখে যুবরাজ অবাক-কিম্বরে তাঁর
দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখে চোখে
শৃঙ্গ কথা হলো। দুজনের কেউই যেন
প্রার্থনাগৃহের স্তম্ভতা ভাঙতে চান না।

মনোরম পরিপার্শ্ব। যেন প্রাচীন যুগের
মুনি ঋষির তপোবন। গাছের পাখীটিও
কলরব স্তম্ভ করেছিল। মৃদু হাওয়ার
মাঝে মাঝে ইউক্যালিপটাসের পাতাগুলো
হেলে-দুলে নাচছিল। তাদের মৃদু
দোলার কোরাণপাঠরত স্নাতকদের কথাই
স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রার্থনাগৃহে এখন
তারাও নেই। সমস্ত মঞ্জিলটি সম্পূর্ণ
জনশূন্য। প্রবেশম্বারে শৃঙ্গ দাঁড়িয়ে
সমস্ত প্রহরী। অধ্যয়নরত স্নাতক, জ্ঞান-
পিপাসু দার্শনিক হলেও ভুললে চলবে
কেন দারাগিকো সাগরা হিন্দুস্থানের
ভাবী সম্রাট।

অদূরে পূর্ণধৌবনা যমুনা একদল-
ওকুল দৃকুল ভাসিয়ে চলেছিল—কল-কল
ছল-ছল শব্দে। মাঝি সান্থা আজানের
কণ্ঠ দূর থেকে ভেসে আসছিল। দিল্লী-
বাসীর বিলাসের জন্য দূ-পাটখানা নৌকা
লাগানো আছে ঘাটে। শৃঙ্গ বর্ষাভেই

তার কাজ পায়। গ্রীষ্মে যমুনার শীর্ণ-
কায়ার ওপর নৌকা চলে না। তখন তারা
পান্‌কী চালাবার কাজ ছাট্টিয়ে নেয়।
নৌকার কাজটায় একটা সুবিধা আছে।
রাতে হতভাগাদের মাথা গেজিবার
জায়গাটুকু জোটে।

শিবিকাবাহকদের সাথে সাথে যে
ফকীরটা আসছিল তার মনখোলা গানটা
কানে আসছিল। দিল্লী শহরে ফকীরকে
সবাই জানে। তার নামটাও নেহাৎ
অপরিচিত নয়। বেগমসাহেবার শিবিকা
অবরোধের জন্য অন্য যে কোন দিল্লী-
বাসীর মাথাটি কাঁধ থেকে আলাদা রেখে
জরিমানা দিতে হতো। ফকীর খসরুকে
সবাই জানে। অন্যমনস্কভাবেই হয়তো
সে রাজপথের মাঝখান দিয়ে চলাছিল।
জাহান্‌ আরার কানে এখনও যেন ফকীরের
গানটা লেগে রয়েছে। বাঁগাবিন্দিত
কণ্ঠ। প্রাণ মন দিয়ে আপন সংগীত-
লহরীতে যেন সে অসীমের সাথে মিশে
গেছে। এখনও সে মঞ্জিলের বাইরে
গাইছে—

হিন্দু কহে শৃঙ্গ হাম্‌ বড়
মুসলমান কহে হাম্‌
এক মৃগ-কা দো ফাদি হায়
কোন্‌ জেয়াদা কোন্‌ কম্‌
কোন্‌ জেয়াদা কোন্‌ কম্‌
করনা নাই কাজিয়া
এক রামকা ভক্ত হায়,
দুজ্ঞে রহমান সে রাজিয়া
কহে দীন দরবেশ দোরে সারিতান
মিল এক সিন্ধু
সাহিব সব দা এক হায়
এক মুসলমান হিন্দু।

হিন্দু বলছে আমি বড়, মুসলমান
বলছে না আমি—আস্ত মৃগের দটো মৃগ,
কেই বা বেশি, কেই বা কম। একজন
রামের ভক্ত, অন্যজন রহমানে। দীন
দরবেশ বলে সবই গিয়ে সিন্ধুতে মিলে
বাবে। হিন্দু মুসলিম উভয়ের আরাধ্য
দেবতা একই দয়ালু পরমেশ্বর।

মঞ্জিলের অলিন্দে দাঁড়িয়ে যুবরাজ
ও জাহান্‌ আরা দুজনেই ফকীরের গান
শুনছিলেন। যুবরাজ দারা দিল্লীর
সিংহাসনে বসবেন কবে। হিন্দুস্থানের
তখত তাউস কবে হবে তাঁর করতলগত?
কবে তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানকে দীক্ষিত
করবেন হিন্দু-মুসলিম একতার মহামিলন
গানে?

কবে হিন্দু সেনাধিনায়কের গলার
মালা পরাবেন মুসলিম শাহান্‌ শাহ কন্যা
জাহান্‌ আরা?

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্বাভাস]

II ভিন II

১৯৪৬ খৃস্টাব্দ। ভারতবর্ষের ইতি-
হাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। সর্ব-
ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন। ভোটগ্রহণ
হবে, পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে। প্রতি
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মুসলমান ও অমুসল-
মানগণ পৃথক পৃথক ভোট
দেবেন। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ দেখতে
পারেন না; মুসলমানও, হিন্দুর স্বার্থ
দেখতে পারেন না। গণতন্ত্রের পূজারী
ইংরেজের দেওয়া ভারতে ইহাই গণতন্ত্রের
নমুনা। ১৯০৯ সালের মিল-মিন্টো
শাসন-সংস্কারে ভারতকে এই গণতন্ত্রই
উপহার দিয়েছেন, বিলাতের ব্রিটিশ
সরকার। সেইদিন যে বিশ্বব্দের চারাটি
রোপণ করা হয়েছিল, ভারতবর্ষের মাটিতে
সেই চাষা এখন ডালপালা বিস্তার কবে
প্রকাশ্যে একটা মহারূপে পরিণত হবে
সারা ভারতের আকাশ বাতাস ঢেকে
ফেলেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে
নির্বাচন। মুসলমানগণের রাজনৈতিক
প্রতিষ্ঠান—মুসলিম লীগের—শ্রেষ্ঠ নেতা
(কায়েদ-ই-আজম) মিঃ মহম্মদ আলি
জিন্নাহ সাহেব, মুসলমান নির্বাচক-
মন্ডলীর কাছে ঘোষণা করেন, তিনি
নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে ‘কলাগাছকে দাঁড়
কবালে তাঁকেই যদি নির্বাচকমন্ডলী ভোট
দেন, তাহলে তিনি মুসলমানদের জন্য
পৃথক একটি বাসভূমি—“পাকিস্তান”—
অবশ্যই দেবেন। এদিকে ভারতীয় জাতীয়
কংগ্রেসের নেতারাও ঘোষণা করলেন যে
ভারতবর্ষের বিভাগ তাঁরা কিছুতেই মেনে
নেবেন না; সুতরাং ভারত-বিভাগ করে
পাকিস্তানও কোনদিনই হবে না। মহাত্মা
গান্ধী তো বললেন যে, দেশবিভাগ যদি
হয় তা হবে, তাঁর মতদেহের উপর দিয়ে
—তিনি জীবিত থাকতে দেশ-বিভাগ
কিছুতেই তিনি মানবেন না। পণ্ডিত
জহরলাল নেহরু ১৯৪৬ সালের সর্বোচ্চ
লক্ষ্য—এর এক বৃহৎ জনসভায় দৃষ্ট কণ্ঠে
ঘোষণা কবলেন—“মুসলিম লীগ হাজার
ঘুঘু চেষ্টা করলেও ভারত-বিভাগ হয়ে
‘পাকিস্তান’ কিছুতেই হবে না।
মুসলমানরা, মুসলিম লীগের এবং
অমুসলমানরা কংগ্রেসের ঘোষণায় পুরো-
পুরাই বিশ্বাস করলেন। সারা ভারতে
উৎসাহ-উদ্দীপনার অস্ত নেই। কংগ্রেসের
খরচায় এবং কংগ্রেস কর্মীদের পরোক্ষ

সাহচর্যে মুসলমান প্রার্থীও বে-নামে দাঁড়
কবান হই। অন্য প্রদেশের খবর জানি
না। কিন্তু বাংলাদেশের খবর বিশেষ
ভালভাবেই জানি। এখানে হুমায়ুন
কবীর প্রমুখের মাধ্যমে মুসলমান প্রার্থী
মনোনয়ন করে মুসলিম লীগ প্রার্থীর
বিবৃদ্ধে দাঁড় করান হয়। প্রাদেশিক
কংগ্রেসই সেই সব প্রার্থীর জন্য খরচা
যোগান। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়
তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির
সভাপতি ছিলেন। আমার জেলা রাজ-
সাহার ঐরূপ চারজন প্রার্থীর নির্বাচন
চালানোর জন্য আমার হাত দিয়েই তাঁদের
কাছে টাকা পাঠান হয়। কিন্তু নির্বাচন
শেষে দেখা গেল যে ঐ সব প্রার্থীদের
মধ্যে কেউই নির্বাচিত হতে পারেন নি—
জিন্নাহ সাহেবের মনোনীত “কলাগাছকেই”
মুসলমান ভোট বেশি পড়েছে। হুমায়ুন
কবীর সাহেবদের মনোনীত কংগ্রেস
সমর্থিত বে-নামী মুসলমান প্রার্থীদের
জামানতের টাকাও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই
প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলিঃ
পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ কংগ্রেসমহল থেকে আজ
একটা কথা উঠেছে যে, কবীরসাহেব
স্বাধীনতার আগে কোনওদিনই কংগ্রেস-
সদস্য ছিলেন না। তিনি আনুষ্ঠানিক-
ভাবে কংগ্রেসের চারি আনার সদস্য ছিলেন
কি না, তা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু
এইটুকু জানি যে, তিনি একজন জাতীয়তা-
বাদী এবং কংগ্রেসের নীতির সমর্থক
মুসলমান ছিলেন।

যক, রাজসাহী জেলায় শমু কেন,
বাংলাদেশের কোনও জেলা থেকেই কংগ্রেস
সমর্থিত একটি মুসলমানও নির্বাচিত
হতে পারেন নি। একমাত্র জামালসাহেব
সেবারের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেস
দলে ছিলেন। কিন্তু তিনিও নির্বাচিত
হয়েছিলেন শ্রমিক-কেন্দ্র থেকে।

সেবারের নির্বাচনে একমাত্র উত্তর-
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান
কংগ্রেস সদস্যগণ অধিকাংশ সংখ্যায়
নির্বাচিত হয়ে সেখানে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা
গঠন। সমস্ত সম্ভবপর হয়েছিল, কেবল-
মাত্র সীমান্ত গান্ধী নামে খ্যাত খান
আব্দুল গফর খানের এবং তাঁর ভাই
ডাক্তার খান সাদাতের ব্যক্তিগত প্রভাবে।
পাঞ্জাবে অবশ্য মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ
লাভ করতে পারে নি—সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ

লাভ করেছিলেন, স্যার দেবেন্দ্রনাথ হুয়ান
খান ও তাঁর ‘ইউনিয়নিস্ট’ দল। হুয়ান
জিগির তুলে এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে নান-
রূপ কল্পিত অত্যাচার ও নিপীড়নের
কাহিনীর মাধ্যমে হিন্দু-বিশেষ প্রনয়
করে জিন্নাহ সাহেব ও তাঁর দল—মুসলিম
লীগ—যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে
কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার
একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন হচ্ছে, ১৯৪৬
খৃস্টাব্দের সর্বভারতীয় সাধারণ নির্বাচন।
মুসলমানদের মধ্যে মুষ্টিমেয় জাতীয়তা-
বাদী মুসলমান ছাড়া সকলেই মুসলমানের
জন্য পৃথক বাসভূমি—পাকিস্তানের—
ডাকে ও আওয়াজে মনে প্রাণে সাড়া দিচ্-
ছিলেন। এমন কি উত্তরপ্রদেশের ও
দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণও যাদের,
‘পাকিস্তান’ হলেও সেই পাকিস্তান
পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তাঁর ও
পাকিস্তানকেই সমর্থন করে মুসলিম
লীগের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। আজও
তার জের যে নিঃশেষ হই গিয়েছে, তা
বলা যায় না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে
মুসলিম লীগ সংগঠন হিসাবে গ-
থাকলেও বহু মুসলমানের মধ্যেই
অতীতেব সেই মুসলিম লীগের মনোভাব
ছাই-চাপা আগুনের মত এখনও দ্বি-
ধিক জ্বলছে। কেবলমাত্র তো এখনও
মুসলিম লীগ সংস্থা হিসাবেই বহান
তবিলতে আছে: আব, তাবা এতই
সেখানে শক্তিশালী যে নির্বাচনের
কখনও বা অসম্প্রদায়িক কংগ্রেস, কখনও
বা কম্যুনিস্ট সহ প্রগতিশীল বাগ্মণ
দল তাঁদেরই সাথে হাত মেলাচ্ছেন। নীতি-
বলোই কোন দলেরই দেখতে পাচ্ছি না
সাবা দেশময় এই যে মনোভাব গড়ে
উঠেছে, এটা পৃথক নির্বাচনরূপী বিষ
বৃক্ষেই কল্পিত হাওয়াব অবনাম্তার
পরিণতি।

এই তো গেল, মুসলমান নির্বাচক
মন্ডলীর কথা। হিন্দু নির্বাচকমন্ডলী
কংগ্রেসের দেওয়া আশ্বাস পরিপূর্ণ
বিশ্বাস করে কংগ্রেস প্রার্থীদেরই সকলে
ভোট দিয়েছিলেন। অ-মুসলমানদের মধ্যে
সর্বত্রই ‘কংগ্রেসের’ জয়-জয়কার: আবার
অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যেও মুসলিম
লীগের জয়কার। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও
এইটাই চাইছিলেন। এর জন্যই তাঁদের
৪০ বছরের—১৯০৬ খৃস্টাব্দ থেকে

১৯৪৬ খৃস্টাব্দ পর্বন্ত—সাধনা ও যত্নবশত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে গিয়েছে। ইংরেজ সহ মিত্রপক্ষের জয় হয়েছে। যুদ্ধে জিতলেও নিজ দেশে ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। তার উপর, ১৯৪২ সালের কংগ্রেস কতৃক পরিচালিত “ভারত ছাড়” আন্দোলনে দেখা গিয়েছে যে, ভারতীয় জনগণ আর ভারতে বিদেশী-সরকারকে চায় না। ভারতের সাম্রাজ্য বজায় রাখতে হলে ব্রিটিশ সরকারকে সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করতে হয়; ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশের উপরে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ যে মরণজয়ী স্বাধীনতার সংগ্রাম করেন, তাঁদের সেই দেশ-প্রেমের মনোভাব ভারতের তৎকালীন বেতনভূক সৈন্য ও পুলিশ দলের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাইয়ে নৌ-বাহিনী ও বিহারে পুলিশবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী সরকার দেখলেন, তাঁদের ভারত ছাড়তেই হবে। ছাড়তেই যখন হবে, তখন সম্প্রদায়িক হত্যা (?) দেখিয়ে সবে পড়াই ভাল। তাতে ভারতীয় সংগ্রামী কংগ্রেস নেতাদের অন্তরে একটা প্রীতির ও সদিচ্ছার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সেই প্রীতি ও সদিচ্ছার ফাঁক দিয়ে আবার সময় মত যাতে কখনও ফিরে আসতে পাবেন তার জন্য ব্রিটিশ জাতি ও তাঁদের সরকার একটা ‘মতলব’ ঝুঁজছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফল দেখে তাঁরা উৎসাহিতই হলেন। তাঁরা, বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই নির্বাচনের ফলাফলকে একটা প্রকাণ্ড হাতিয়ার হিসাবেই পেলেন। অ-সাম্প্রদায়িক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসের নেতারা, মুসলিম লীগই যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, যা মুসলিম লীগের নেতারা দাবি করতেন, তা মেনে নিতেন না। ১৯০৬ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড মিল্টো এক সুদৃবপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়েই মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে যে মুসলমান প্রতিনিধিদলটি পৃথক নির্বাচনের দাবি নিয়ে দেখা করেন তাঁদের এক প্রতিনিধি স্থানীয় রাজনীতিক সংস্থা মুসলমানদের মধ্যে গড়ে তোলাব আভাবে উপদেশ দেন। তার ফলেই গড়ে ওঠে, “মুসলিম লীগ”। সেদিন, ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, সাম্রাজ্য বজায় রাখতে ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ; এখনকার উদ্দেশ্য হল, ভারতে ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ভাবতাকে দৃষ্টিভাগ করে মুসলমান ও অ-মুসলমানের দুটি পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি ও রাষ্ট্র গড়ে দেওয়া। একই দেশের দুই-খন্ডের একটি প্রগতিপন্থী অ-সাম্প্রদায়িক

ও অপরটি, প্রগতি বিরোধী সাম্প্রদায়িক। এই মনোভাব নিয়ে দুইটি রাষ্ট্র পাশাপাশি থাকলে তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকবে এবং সেই বিবাদের ছিন্ন পথ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা আবার এসে “বানরের পিঠে ভাগেব” সুযোগ পাবেন? ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কয়েক হাজার বছর ফলে এবং ক্ষমতা-হস্তান্তর করে চলে যাওয়ার সময় দেশ-বিভাগ করাও একই উদ্দেশ্য সাধনের এক সুদৃবপ্রসারী যত্নবশত ছাড়া আর কিছু নয়। কংগ্রেস-নেতারা ও আমরা দেশবাসীরাও সেই যত্নবশতের ফাঁদেই পা’ দিলে। আমরা কেউ-ই প্রতিবাদ করলেই না। নিঃশব্দে কিছু অশান্ত মনে সেই ভারত-বিভাগ মেনে নিলে। মহাত্মা গান্ধীর মৃতদেহের উপর দিয়ে দেশ-বিভাগ হল না। তাঁর জীবিতকালেই ভারত-বিভাগ হল। ভারত-বিভাগের পরে যে স্বল্পকাল—প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস কাল তিনি জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর প্রতিদিনের প্রার্থনাত্মক সাধনা ভাষণে দেশের অবস্থা দেখে তাঁর অন্তরের বেদনা স্পষ্ট হয়ে অশ্রুরূপে ঝড়ে পড়েছে; আর, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, যিনি দৃষ্ট কণ্ঠে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন যে, হাজার বছর চেষ্টা করলেও দেশ-বিভাগ, তথা পাকিস্তান হবে না, তিনিও দেশ-বিভাগ, তথা পাকিস্তান মেনে নিলেন। জিন্নাহ সাহেবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মুসলমানদের কাছে সফল হল। সফল হতে নেহরুর ঘোষণা মত হাজার বছর লাগলো না। লাগলো, মাত্র কিশোরদিক দেড় বছর।

ভোটের ফলাফলের উপর কূটনীতিক ক্ষেত্রে যত্নবশতই চলে! দেশ-বিভাগের কোন ঘোষণা তখনও হয় না। সেই যত্নবশতের ফলেই, ‘মুসলিম লীগ’ ঘোষণা করেন সম্মুখ সমর। ঐ সম্মুখ সমর কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়। তা’ হল, প্রধানত হিন্দুর বিরুদ্ধে। কলকাতার রাজপথ হিন্দু-মুসলমানের রক্তে গেল ভেসে। কত বাড়ি ঘর পড়লো। কত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হল, তার ইয়ত্তা নেই। এই লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড একতরফা হয় নি। প্রায়শই ছিল একতরফা কবরই কিন্তু অ-সংহত মুসলমান জনতার একাংশের অতি উৎসাহে অনমন্যে কাজ আবদ্ধ হওয়ায়, হিন্দুরাও সতর্ক হওয়ায় সুযোগ পান: ফলে, উভয়-পক্ষেই সমানভাবে দাঙ্গা চলে। কলকাতায় বোধহয় মুসলমানই বেশি নিহত হন। সেই সময়কার দৈনিক বঙ্গবর্তীর সম্পাদকীয় স্তম্ভের একটি বাক্য এখনও আমার মনে পড়ে। বাক্যটি ছিল—“লিয়া কত, (লিয়াকত আলি খান) আর দিয়া কত।” মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লিয়াকত আলি খান সাহেব ঐ “ডাইরেক্ট আকশন ডে” ঘোষণা

করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট শত্ৰুবারের জন্য, ঐ দিনটি ধার্য হয়েছিল। কলকাতায় ঐ দিনটি সু-সম্পন্ন করাব প্রায় করেছিলেন, তৎকালীন মুসলিম লীগের দূরধর্ম নেতা ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাব্দ সাহেব। তাঁর ‘প্রায়’ ছিল, জুম্মার নামাজের পর, সকালটা নিরুশ্বাসে কাটায় হিন্দুরা যখন আশ্বস্ত হয়ে বিশ্রামসুখে থাকতেন, তখন হুসপং হিন্দু বাড়ি আক্রমণ করে সব শেষ করে দেওয়া। উদ্দেশ্য ছিল, ঐ হত্যা-কাণ্ডের বীভৎসতা দেখে অহিংস কংগ্রেস নেতারা অধিক উঠবেন এবং দেশ-বিভাগে, তথা, পাকিস্তান-স্বীকারে রাজী হয়ে যাবেন। প্রায়-মারফক কাজ হল না। সকালেই একদল মুসলমান লুণ্ঠ-পাট সুদূর করে দিল। সেইদিন সকালে আমি আমাদের কংগ্রেসের এবং ব্যবস্থাপক সভার বিরোধীদের নেতা শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের বাড়িতে যখন ছিলাম, তখন কিরণবাবুর কাছে প্রথমে আমাদের বন্ধু—অনুশীলন সান্নিহি নামক বিপ্লবী দলের নেতা শ্রীরাবী সেন মহাশয় ফোন করে জানান যে, মারিগতলায় একটি কবিরাজের দোকান লুণ্ঠ হচ্ছে। তাব পরেই ফোন করেন, জনাব ফজলুল হক সাহেব। তিনি জানান যে, তাঁর বাড়ির সামনের পাইক-পাড়ার রাজবাড়ি লুণ্ঠ হচ্ছে; আর সেই লুণ্ঠে পুলিশের লোকও অংশ গ্রহণ করছে। সেই খবর দুটি শুনেই আমি আমার “স্যাডল হোটেল”—এব বাসস্থানে ফেনার পহেই দেখি, ‘পূর্ববী’ সিনেমা হাউসের সামনে দাঙ্গা সুদূর হল। এই দাঙ্গা কয়েকদিন ধরে চলে। ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় “Great killing” অর্থাৎ “প্রকাণ্ড হত্যাকাণ্ড” আখ্যা একে দেয়। কলকাতায় সোহরাব্দ সাহেব বার্থ হলেন; সুতরাং বেপরোয়া সোহরাব্দ সাহেব মোল্লা-অধ্যুষিত সাম্প্রদায়িক বিধে জর্জরিত নোয়াখালি জেলাকে বেছে নিলেন। সুদূর হল সেখানে নারকীয় বীভৎসতা! জমিদার রাজেন বাবেব ছিন্ন মস্তক থালায় সাজিয়ে গুঁড়ারা উপহার দিল নেতা গোলাম সাবওয়ালের কাছে। সেই সময়ে নিমিত্তা নান্নী একটি নাবালিকা মেয়ের মায়ের সোহরাব্দ সাহেবের উদ্দেশ্যে কবণ এক আবেদন “আনন্দবাজার পত্রিকায়” প্রকাশিত হয়েছিল, দেখেছি। সেই আবেদন, সোহরাব্দ সাহেবের পাষণ হৃদয় গলাতে পাবে নি। আমার প্রাণে কিন্তু সেই আবেদন এমনই একটা নাড়া দিয়েছিল যে, আজও তার দোলা স্তম্ভ হয় নি।

নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডেই বদলা নিল, হিন্দু-অধ্যুষিত বিহারের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক অংশ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুসলমানদের উপরে। শোনা যায় সেখানে

অন্যদিকে বিশ হাজার মুসলমান শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিচারে নিহত হয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতার নির্মম পাশনিক আঘাতে।

বাংলা থেকে বিহার পর্যন্ত রক্ত আর আগুনের ঢেউ খেলে গেল। কংগ্রেস-নেতার স্তম্ভিত, হতভম্ব। মুসলিম লীগের শ্রেষ্ঠ নেতা কায়দ-ই-আজম জিন্নাহ ঘোষণা করলেন—বিশাল ভাষ্যতবর্ষ থেকে শুধু একটুকরো বাসভূমি মুসলমানদের জন্য দিলেই চিরশান্তি, পাক-ভারত উপমহাদেশে। শান্তি ও আতঙ্কিত—কংগ্রেস-নেতার অবশেষে বললেন—তথ্যসূচী, দেশ-বিভাগই হোক, তবু শান্তি আসুক।

দেশ-বিভাগ হল, কিন্তু শান্তি এল কি? না, আসে নি—আসতে পারে না। মুসলিম লীগের নীতির ভিত্তিই ছিল, হিন্দু-বিশেষের উপর। একেবারে ‘ফ্যাসিস্ট’ নীতি, জাতি-বিশেষের উপর। মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ সাহেব তার স্বপ্নেই ঘোষণা করেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান এক রাষ্ট্রে এক পশ্চাৎকার নিচে বাস করতে পারে না। পাকিস্তানে আজও সেই নীতিই চলছে। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফয়সল মারশাল মহম্মদ আয়ুব খান এই সেদিনেও বলেছেন, “হিন্দু-মুসলমান এক সাথে বাস করতে পারে না।.....” পাকিস্তানে তাই হিন্দুরা এখনও নিরন্তরে বাস করতে পারছেন না। পাকিস্তান সৃষ্টির দিন থেকে যে বাস্তবতা সূচ্য হয়েছে, তার শেষ আজও হয় নি। কোনও দিনই হবে কি না তা ভগবানই জানেন!

রাজনীতিক নেতা হিসাবে নেতাজী সত্যচন্দ্র তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের এই চিত্র চোখের সামনে নেখোঁচলেন। দেখে তিনি তাঁর অতি প্রিয় দেশবাসীকে—ভারতের জনগণকে সতর্কও করেছিলেন মিতব্যয়ী বিশ্ববিশ্বের শেষ সন্ধ্যা। তাঁর কণ্ঠস্বর আকাশপথে ভেসে এসে আছড়ে পড়েছিল ভারতবাসীর দুঃস্বপ্নের দুয়ারে। তিনি বলেছিলেন—যুদ্ধে ইংরেজ জিতলেও তাকে ভারত ছেড়ে যেতেই হবে এবং যাওয়ার আগে তারা দেশ-বিভাগ করে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কিন্তু ভারতবাসী যেন সেই ধাম্পার ফাঁদে প না দেন; ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যেতেই হবে—ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে।

নেতাজীর আবেদনে আমরা সাজা দিই নি—তার কথা আমরা শনি নি। আবও একজন দেশবরেণ্য অতীতের রাজনীতিক নেতা ও বর্তমান যুগের খ্যাতিশ্রী অরবিন্দ খান্ডিত ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিনে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বলেছিলেন যা’ তা’ তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করছি:

“The old communal division

into Hindu and Muslim seems to have hardened into the figure of a permanent political division of the country. It is to be hoped that the Congress and the nation will not accept the settled fact as for ever settled or as anything more than a temporary expedient. For if it lasts, India may be seriously weakened, even crippled, Civil strife may remain always possible, possible even a new invasion and foreign conquest. The partition of the country must go. It is to be hoped by a slackening of tension by a progressive—understanding of the need of peace and concord, by the constant necessity of common and concerted action, even of an instrument of Union for that purpose. In this way unity may come about under whatever form—the exact force may have a pragmatic but not a fundamental importance. But by whatever means, the division must and will go. For without it the destiny of India might be seriously impaired and even frustrated. But that

must not be.”

উপরে উদ্ধৃত শ্রীঅরবিন্দের বাণীর মূল কথাই হল, কংগ্রেস ও জাতি (nation) যেন এই দেশ-বিভাগকে চিরস্থায়ী বলে কিছুতেই না মেনে নেন; ইহাকে যে-কোনভাবেই হোক, রদ করতেই হবে। তার পশ্চাৎ হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব সমূলে দূর করতে হবে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা হৃদ্যতার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তাঁর শেষ কথা, যে-ভাবেই হোক, দেশ-বিভাগ রদ করতেই হবে; নচেৎ, ভারতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অশুভকার—এমন কি, আবার বিদেশী আক্রমণ ও পরাধীনতাও আসতে পারে।

ভারত-বিভাগের পূর্বে নেতাজী যে সতর্কতার বাণী আমাদের জন্য রোড-ও-র মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন, তা আমরা শুনিনি। দেশ-বিভাগে সম্মতি আমরা দিয়েছি—সকলে সম্মতি না দিলেও তা প্রতিরোধ করার জন্য কোন বাধাও আমরা দিই নি। দেশ-বিভাগের পর আজ প্রায় কুড়ি বছর হতে চললো। শ্রীঅরবিন্দের বাণীর প্রতিশ্রুতি বা আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে চলিছি, তা-ও আজ জাতির ও জাতির নেতাদের ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের পথে আমরা এগুতে না পারলে, বিদেশী আক্রমণ ও পরাধীনতার আশঙ্কা আমাদের সামনে আছে। পাকিস্তানের শাসকরা ভারতের সাথে পাকিস্তানের হৃদ্যতার সম্পর্ক কিছুতেই গড়তে দেবেন না। তাঁরা বেশ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - আগ্রা

বেঙ্গলুরু - জীবনগর - গোহাটী

ভালভাবেই জানেন যে, এই হৃদয়-সম্পর্ক গড়ে উঠলেই পাকিস্তান টকবে না। জন্ম যাব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উপরে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও বজায় রাখতেই হবে। সেই জন্যই পাকিস্তানে থাকাকালে আমরা সেখানকার হিন্দুরা—যাঁরা সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়—যখন বোধ নির্বাচন দাবি করেছিলেন, মুসলিম লীগ সরকার যৌধ-নির্বাচনে তো রাজী হন-ই নি, উপরন্তু অমুসলমানদের মধ্যে বোধ, খুস্টান ও অনন্যত সম্প্রদায়ের (Scheduled Caste) জন্য পৃথক পৃথক গোষ্ঠী-নির্বাচন প্রথা চালু করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ-পন্থী শাসকগোষ্ঠী তাঁদেরই রাষ্ট্রের নাগরিক—হিন্দুদের মনে কবেন, ভারতের প্রতিনিধি। তাই, ভারত-বিশেষ প্রচারের অবশ্যম্ভাবী পিণ্ডিততে সেখানে দেখা দেয় হিন্দু-নিধন বা হিন্দু-পীড়ন? এই সত্যটা ভারতের শাসককুল ও ভারতের নাগরিকরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেই পথের সম্মান ও তাঁরা খুঁজে পাবেন পাকিস্তানে চৌদ্দ বছর থেকে—সর্বকিছু দেখে ও জেনে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমি যে পথের সম্মান পেয়েছি, তা যথায় স্থানে পরে বলবো। তবে, আমার অভিজ্ঞতাতে আমি নারা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি যে, পাক-ভারত ব্যতীত মধ্যে অন্তত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে যদি না ওঠে, তাহলে ভারতের সমগ্র বিপদ ঘটবে।

ইংরেজ সেই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশ-বিভাগ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানে পড়েছে, বেলুচিস্তান, সিন্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, খণ্ডিত পাল্লাবের পশ্চিমাংশ এবং রাহাবালপুর প্রভৃতি কয়েকটি ভূতপূর্ব রাজ্য-শাসিত দেশীয় রাজ্য; আব পূর্ব-পাকিস্তান গড়েছে, অখণ্ড বাংলাব দুই-তৃতীয়াংশ ও সিলেট জেলা নিয়ে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট আয়তন ও লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৩,৬৩,৭০৭ বর্গ-মাইল ও ৭৫, ৮৪২, ১৬৫ জন। এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের আয়তন সমগ্র পাকিস্তানের আয়তনের মাত্র শতকরা হোল ভাগ, কিন্তু লোকসংখ্যা ৪,২০,৬৩,০০০ অর্থাৎ জনসংখ্যা এখানে পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। সুতরাং গণতান্ত্রিক পন্থাতি অনুসরণ করলে পূর্ব-পাকিস্তানেরই পাকিস্তান শাসন করা উচিত, কিন্তু তা' তো ইসলামিক সংবিধানের মাহাত্ম্য হতেই পারল না, বরং পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তানের 'কলোনি' হিসাবেই আজ পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে। এই তথ্যটি জানা থাকলে পাকি-

স্তানী শাসকদের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়নের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার পক্ষে পাঠকদের কাছে সহজ হবে, এই আশাতেই এইখানে এই তথ্যগুলো তুলে ধরাছি। যথাকালে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান ১,১০০ মাইল। ভারতের উপর দিকে ছাড়া এই দুই অংশের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের আর কোন পথ নেই। সমুদ্র পথে যোগাযোগ অনেক সময়-সাপেক্ষ। তা' সত্ত্বেও ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দুই সীমান্তে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজ-ই এটা কুট-কৌশল। বর্তমান ভারতের দুই দিকে যেন দুইটি "হাউইয়ার" কামান পেতে রাখা হয়েছে। এর ফলাফল আমরা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়ে মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত কোন সংঘর্ষ বাধায় নি; তবু পশ্চিমবাংলার বোমা পড়েছে, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা বোমারু বিমানের সাহায্যে। চীনের সাথে পাকিস্তানী শাসকদের দহরম-মহরম ও মিথালিও ভারতকে সায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই। এ্যাংলো-আমেরিকাও পাকিস্তানকে নানাভাবে মদদ দিয়ে চলেছেন। উদ্দেশ্য যে সাদু (!) সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এবারে চীন যদি ভারতকে আক্রমণ করে, তাহলে ভারতকে ত্রি-মুখী অর্থাৎ তিন ফ্রন্টে লড়াইতে হবে। যুদ্ধ ঘনায়মান হয়ে উঠলে, ইংরেজ-আমেরিকাও হয়তো এগিয়ে আসবেন ভাবতকে সাহায্য করার নামে; ফলে, ভিয়েতনামে যেমন আমেরিকা জে'কে বসেছেন, এখানেও তাঁরা তাই কবতে পারেন; ফলে, শ্রীঅরবিন্দ যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, অর্থাৎ স্বাধীনতা আবার হাবানোর তা' হওয়াব সম্ভাবনা খুবই আছে বলে আশঙ্কা হয়।

১৯০৬ সালে ইংরেজ সরকার ও ভারতবর্ষের একদল সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে যে ষড়যন্ত্র শুরুর হয়েছিল, সেই ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি হচ্ছে দেশ-বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি। পাকিস্তান আন্দোলন ও সৃষ্টির নেপথ্যে ছিলেন ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়, আর সামনা-সামনি ছিলেন কাশেদ-ই-আজম মিঃ জিন্নাহ ও তাঁর মুসলিম লীগ দল। জিন্নাহ সাহেবের কবধা বুদ্ধি ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও যুক্তি-তর্কের ক্ষমতা পাকিস্তান আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিল। তাই তিনি আজ পাকিস্তানের জনক বলে খ্যাত। আন্দোলনের প্রেবণা দিয়েছেন জিন্নাহ সাহেব; তাই তিনি শুরুর পাকিস্তানের জনকই নন, আমার মতে তিনি পাকিস্তান-আন্দোলনের এটর্নি জেনারেলও। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ আল-বখান হয়েছেন "ফিল্ড মার্শাল"। দেশ-

বিভাগের প্রাক্কালে তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান হিসেবে তাঁর অধীনস্থ সৈন্য-সামন্ত দিয়ে দেশত্যাগী হিন্দু-শিখদের যে ধংসলীলা সংঘটিত করেছিলেন, তাতে পাকিস্তানের "ফিল্ড মার্শাল", তিনি যোগ্যতাব সাথেই দাবি করতে পারেন। এই দিক দিয়ে অবিস্তৃত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সোহরবুদ্দিন সাহেবের দানও কম তো নয়-ই, বরং সবচেয়ে বেশি। তিনি যদি কলকাতায় ও নোয়াখালিতে হত্যাকাণ্ড না ঘটাতো পারতেন, তাহলে বিহারেও নির্বিচারে মুসলমান নিধন হ'ত না এবং এত নিরীহ লোকের জীবন না গেলে, এত রক্ত ও অশ্রুর বন্যা ভারতবর্ষে না বয়ে গেলে কংগ্রেস নেতারা দেশ-বিভাগে কিছুতেই রাজী হতেন না—পাকিস্তানও তাহলে হ'ত না; সুতরাং সোহরবুদ্দিন সাহেবেরও "ফিল্ড-মার্শাল" খেতাব পাওয়ার অবশ্যই যোগ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি পান নি। তাঁর মত শক্তিশালী ও বেপরোয়া রাজনীতিক নেতা আমি দেখি নি। দেশবন্ধু চিত্তবজ্রন দুইজন শক্তিশালী নেতাকে বেবি কবে-ছিলেন; উভয়েই ছিলেন মহাশক্তিশালী, কিন্তু বিপরীতমুখী ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের শক্তি প্রয়োগ করেছেন। সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর আপনার বলে কিছুই রাখেন নি—তাঁর দেহ-মন-জীবন পর্যন্ত দেশমাতৃকার চরণ-কমলে নিবেদন করেছিলেন; আব সোহরবুদ্দিন সাহেব সেই মহান দেশকে ভেঙে তাকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে গেলেন। একজন তাঁর শক্তি নিয়োগ করলেন দেশ-গড়াব কাজে, আর অপবজন তাঁর আসন্নিকর্শক্তি প্রয়োগ করলেন দেশের ধ্বংসের কাজে। শক্তিশালী উভয়েই। অস্বীকার করার উপায় কারোবই নেই, কিন্তু উভয়ের মত ও পথ বিপরীতমুখী।

এত কবে অবশেষে দেশ-বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি হল, কিন্তু সোহরবুদ্দিন সাহেবের নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা অদৃশ্যে বসে হাঁসজিলেন। যখন বাংলার অংশ কেটে পূর্ব বাংলা (তখনও পূর্ব-পাকিস্তান নাম হয় নি) হল, তখন কিন্তু চেণ্টা সত্ত্বেও সোহরবুদ্দিন সাহেব তাব মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারলেন না। তলেন, খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব। সিলেট এসে যোগ দেওয়ায় সিলেটের সদস্যরা ও খণ্ডিত বাংলাব এসেম্বলির সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে নাজিমুদ্দিন সাহেবই নেতা নির্বাচিত হলেন।

এটাই হল "পাক-ভারতের বপরেখা"-র পূর্বাভাস। এই পূর্বাভাসটা জানা থাকলে "পাক-ভারতের রূপরেখা"-য় আমি যা বলতে চেয়েছি, তা বোঝাব পক্ষে সহজতর হবে বলেই এত কথা বললাম।

‘মেঘনাদ’ের সাথে

উত্তরবঙ্গ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৬ পশ্চিম দিনাজপুর—স্থানগত পরিচয় ৥

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে পশ্চিম দিনাজপুরের নদীগুলি সাধারণভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। দেশের নদীপ্রকৃতির সঙ্গে এই সামঞ্জস্য পশ্চিম দিনাজপুরের বেলায় ঘটেছে—এটা সবিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার না হলেও—এই জেলার নদীগুলির স্রোত-ধারার সঙ্গে ভূ-প্রকৃতির গঠনভঙ্গী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর ফলে জেলার উত্তরাংশ থেকে দক্ষিণাংশ ক্রমশ অসমতল হয়ে পড়েছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, উত্তরের হিমালয় পর্বতের সান্দ্রদেশের সমস্ত জেলার গঠনভঙ্গী এইরূপ হলেও, পশ্চিম দিনাজপুরের বেলায় একটু বৈচিত্র্য আছে বৈকি। জেলার প্রধান শহর বালুরঘাট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র চারশি ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। নদীগুলি সাধারণভাবে নাব্য। বর্ষার সময়ে সমস্ত নদীগুলি জলাবিত হয়—এবং উক্ত সময়ে জেলার সর্বত্র জলযান হিসাবে নৌকার অবাধ চলাচল হয়ে থাকে। অন্যান্য সময়ে মাত্র কয়েকটি নদী ছাড়া প্রায় সবগুলির গভীরতা কমে যায়।

জেলার প্রধান নদী হল নাগর, পদনভবা, আটাই বা আট্রয়ী, মহানন্দা প্রভৃতি। হ্যামিলটন বুকাননের মতে পশ্চিম দিনাজপুরের আট্রয়ী এবং পদনভবা এক সময়ে সরাসরি তিস্তার জলধারা বহন করত এবং করতোয়া ও যমুনেশ্বরীর মারফৎ তিস্তার সঙ্গে সংযোগ ছিল। কালক্রমে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং জেলার অন্যান্য নদীগুলির সঙ্গে বিভিন্নভাবে যোগাযোগের ফলে নদীর গতিপথ ও বিশালতা পরিবর্তন হলেও নদীগুলি এখনও বহমান। এই জেলার নদীগুলির মধ্যে একমাত্র মহানন্দার উৎপত্তিস্থল পর্বতে—তাছাড়া অন্যগুলিকে শাখানদী বলা চলে। যদিও মহানন্দা পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করবার পূর্বে দার্জিলিং ও পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। ইটাহার থানার মদুন্দপুর গ্রামের নিকট নাগর নদীতে এসে মহানন্দা মিলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে অন্য জেলার বিবরণীতেই লেখা হয়েছে

যে মহানন্দা পশ্চিম দিনাজপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নদী। মহানন্দা ও নাগরের সঙ্গমস্থলের কিছু পূর্বে নাগর থেকে একটি ছোট উপশাখা বেরিয়েছে; লোকে বলে ‘সাই নদী’ বা ‘সাই নদী’। অথচ ছোট হলেও এতদগুলের কৃষি এবং আবহাওয়ার ক্ষেত্রে সাই নদীর অবদান নেহাৎ কম নয়, কেন না নাগর থেকে বের হয়ে এইটি মহানন্দা নদীর সমান্তরালে বয়ে চলেছে, ফলে মহানন্দা ও নাগরের ধারা ও গতির ভারসাম্য রক্ষা করার ফলে এই অঞ্চলটিতে সেচ-এর জন্য বিশেষ কোনও সময়ের জন্য আকাশের মুখাপেক্ষী না হলেও চলে। সাই নদীর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পশ্চিম দিনাজপুরে—এবং তার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। এইরূপ আর একটি নদী হল গমর। পূর্ববঙ্গের পীরগঞ্জ থেকে

প্রবাহিত হয়ে এসে হৈতমাবাদ থানার নিকট কুলিক নদীতে মিশেছে।

শ্রীমতী, স্থানীয় উচ্চারণে ‘ছিরামতী’ কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, বংশীহারী থানার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মালদার প্রদেশ করেছে, এবং জেলার মধ্যে প্রবাহিত অংশের পরিমাণ বিশ-পঁচিশ মাইল মত। নামে শ্রীমতী হলেও নদীটির প্রীচ্ছাদি বিশেষ কিছু নেই এবং গুরুত্বও কম। শ্রীমতীর তীরে একমাত্র পতিরাজপুর নামে একটি সমৃদ্ধ বন্দরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মাত্র।

জেলার অন্যতম প্রধান নদী টাঙ্গনের গতিপথ এত বিচিত্র এবং বিভিন্নমুখী যে—এর উৎসস্থল এখন কোথায় তা বলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পূর্ববঙ্গের পশ্চিম কোনও স্রোতধারা থেকে এর প্রথম গতিমুখ বলে অনুমান করে নেওয়া যেতে



পশ্চিম দিনাজপুরের একটি শিবমন্দির। পাল যুগের নিদর্শন হলেও বহুবার সংস্কারকার্য করা হয়েছে।



ইসলামপুরের হাসপাতাল

পারে। অবশ্য একমাত্র পূর্ববঙ্গেরই বহু নদীকেই স্পর্শ করে টাঙ্গন পশ্চিম দিনাজপুরে প্রবেশ করেছে। পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়গঞ্জ, বংশীহারী, কুশমান্ডি থানাকে আবর্তন করে মালদহে প্রবেশ করেছে। পশ্চিম দিনাজপুরের দু'টি বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র গ্রামিকাপুর এবং সিওলা টাঙ্গন নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বেই বলা হয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর নদীসমৃদ্ধ জেলা। ছোট-বড় নদীর সংখ্যা অগণিত। তার মধ্যে নাম করা যেতে পারে আগরা, ইছামতী, ঘড়া, যমুনা, ডাহক, উজাড় প্রভৃতি ছোট ছোট নদীগুলির। এগুলির ফলে জেলা কৃষিতে প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিম দিনাজপুর জেলা যেভাবে গঠিত হয়েছে তাতে মোটামুটিভাবে জনপদসমৃদ্ধ বঙ্গা যেতে পারে। যদিচ উন্নত এবং আধুনিক শহর এখনও এই জেলায় কোনটাই বিশেষ পড়ে উঠতে পারে নি—তবুও রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় এখানেও যে উন্নয়ন চলছে, তাতে এই জেলার ক্ষেত্রকটি জনপদ অন্তত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহর হিসাবে গড়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই জেলা মোটামুটিভাবে কৃষি-নির্ভর। উর্বর জেলা। পার্শ্ববর্তী ঘাটতি জেলাগুলিতে খাদ্যের জোগান দিতে সক্ষম। যদিচ এই জেলায় কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি, তবুও ইতিমধ্যেই কয়েকটি মহকুমা শহরের উন্নয়ন শুরু হয়েছে।

এই সংখ্যায় পশ্চিম দিনাজপুরের কতগুলি স্থান এবং তার আনুপূর্বিক পরিচয় তুলে ধরা হল।

বালুরঘাট—জেলার ছোট কোরাচা এবং মহকুমা শহর। বালুরঘাট শহর আগ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। বীরগত জনগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছাব্বিশ হাজার নতুনো নিরানব্বই জন। বালুরঘাটে ফোঁজদারী ও দেওয়ানী আদালত, রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একটি কলেজ ও হাইস্কুল সহ কয়েকটি প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বালুরঘাটে একটি পুরনো সুপ্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল রয়েছে। হাসপাতালটি প্রথমত প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় একজন বদান্য জমিদার। কিন্তু বিভাগান্তর ফলে শহরের শ্রেষ্ঠ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রোয়জনানুযায়ী এই হাসপাতালটির আমূল সংস্কার ও সম্প্রসারণ কাজ শেষ করতে হয়েছে। এখনও পশ্চিম দিনাজপুরে একটি সাধারণ স্তরের শহর পর্যায়েরই রয়েছে। অবশ্য নদীর তীরে এই শহরটিকে একটি সুন্দর হাবির মত দেখা যায়। সমগ্র পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্যে রেলপথের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। বালুরঘাট শহর থেকে রেল স্টেশন কালিয়গঞ্জ পঞ্চাশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর উত্তরবঙ্গ যখন মূল পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন প্রয়োজন অনুসারে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বিমান যোগাযোগের জন্য বালুরঘাটের সমীকটে একটি বিমান ঘাঁটি নির্মিত হয়। বর্তমান বিমান ঘাঁটিটি বালুরঘাট শহর থেকে দু' মাইল দূরে অবস্থিত। শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এখনও সঙ্কটাপন্ন গ্রহণ করে নি। শহরের অভ্যন্তরে এখনও রাস্তাগুলি সুসংস্কৃত—নি। শহরের ভিতরকার সাধারণ গৃহ-

ব্যবস্থার মধ্যে এখনও পল্লীর আভাস সুপরিষ্কট। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, বালুরঘাট একটি প্রাচীন ইতিহাস সম্বলিত স্থান। মধ্যযুগীয় ধ্বংসাবশেষ এখনও বালুরঘাটের নিকটবর্তী স্থান-গুলিতে সহজপ্রাপ্য। পাল ও সেন যুগের বহু নিদর্শন এখনও যথেষ্ট খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বংশীহারী—পশ্চিম দিনাজপুরের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হল বংশীহারী। মালদা-বালুরঘাট এবং বালুরঘাট-কুশমান্ডি সড়কের সংযোগমুখে জনপদটি অবস্থিত। বংশীহারীও একটি ঐতিহাসিক স্থান বলে চিহ্নিত। বংশীহারীর নিকটে টাঙ্গন নদীর পশ্চিম তীরে বহু পুরাতন কীর্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই থানায়ই আধারমাণিক ও কালিয়া-খালিতে অনুব্রত বহু নিদর্শন ইতিমধ্যে খুঁজিয়ে গিয়েছে। মালদা-বালুরঘাট সড়কের পাশে মুসলমান আমলেরও পুরাকীর্তির সন্ধান পাওয়া যায় এবং এখনও স্থানীয় নামগুলির মধ্যে যথেষ্ট প্রাচীন ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে।

বংশীহারী-বর্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট ধান-চালের জন্য উত্তরবঙ্গে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। বংশীহারী থানার জমিতে উৎপাদন অত্যন্ত উৎসাহযজ্ঞক। থানার সমগ্র অংশেই টাঙ্গন নদী এবং ছোট ছোট উপনদীর ফলে প্রায় সর্বত্রই সেচব্যবস্থা যথেষ্ট এবং জমিতে উর্বরশক্তিও প্রচুর। এখানে বিধা প্রতি ধানের ফলন জেলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশি। বংশীহারীর চাল উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

চুডামন—পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্তী মহানন্দা নদীর তীরে একটি বৃহৎ ও উন্নত ধরনের গ্রাম হল চুডামন। রায়গঞ্জ থেকে সাত মাইল দূরে এই গ্রামটি ধান ও চালের কারবারের জন্য বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে। চুডামন থেকে নৌকা-যোগে এই জেলার রপ্তানীযোগ্য উল্লেখ্য খাদ্যশস্য দেশের অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করা হয় বলে এখানে একটি বৃহৎপ্রকার বন্দর গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রচুর। চুডামনের জমিদারবংশ প্রাচীনকালের ঐতিহ্য বহন করে এখনও বর্তমান। এখানে বালকদের ও বালিকাদের জন্য পৃথক দু'ইটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

গংগারামপুর—বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত একটি উন্নত পর্যায়ের গ্রাম। যদিচ এখনও পশ্চিম গ্রামের পরিচর দিয়েই-বলা হয়ে থাকে তবুও গংগারামপুরকে আধা-শহরের মর্যাদাও দেওয়া যেতে পারে। এই গ্রামের সমীকটবর্তী অনেকগুলি রমণীয় ও দর্শনীয় স্থান

আছে। তার মধ্যে কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। গঙ্গারামপুর থেকে এক মাইল দূরে মুসলমান আমলের খলদীঘি নামে একটি মজ-বাওয়া দীঘির নাম করা যেতে পারে। গৌড়ের কোনও এক বদন্তি মুসলমান নৃপতি এটি কনন করিয়েছিলেন গ্রামের অধিবাসীদের পানীয় জলের কষ্ট নিবারণের জন্য। বর্তমানে এই দীঘির নিকটে বছরে একবার করে জেলার শব্দ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীটি, শোনা যায় অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে গঙ্গারামপুরের নাম ছিল হুমদমা এবং সীমান্তবর্তী এলাকার একটি সুদৃঢ় এবং উল্লেখযোগ্য দুর্গ বা সামরিক ঘাট ছিল। সামরিক বাহিনীর কমান্ডার-গণ বা 'ওয়ার্ডার' খলদীঘির নিকটবর্তী স্থানসমূহে বসবাস করতেন এবং সেইসব নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। মহাভারতের যুগের কাহিনীও এই স্থানটির সঙ্গে বিজড়িত। কথিত আছে—মহারাজা বাণ এখানে তাঁর ইন্দ্ৰদেবতা শিবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং প্রতাহ শব্দভাষা থেকে স্নান সেরে শিবমন্দিরে গিয়ে পূজা করতেন। পুরাতত্ত্ববিদরা বর্তমান গঙ্গারামপুর এবং নিকটবর্তী স্থানসমূহ থেকে বহু প্রাচীন ধর্মসামগ্র্য সংগ্রহ করে এই মিষ্টান্তে পৌঁছেছেন যে—এই স্থানে যেমন বাণরাজের শিব-মন্দির, পালরাজ কীর্তিসমূহের নিদর্শন, সৈন্যবাহ ও মুসলমানগণের স্থাপত্য দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল।

বিগত ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই স্থানে এক ব্যাপক অনুসন্ধানকর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগৃহীত হয়। নিদর্শনগুলিকে সময় ও তৎকালীন সামাজ্য-ব্যবস্থা এবং ধর্মমত সম্পর্কে নানানভাবে বিভক্ত করার ব্যবস্থাও হয়। ওই সকল প্রাচীন ধর্মসামগ্র্যের অধিকাংশই আশ-ভের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে, কিছু কিছু বালুরঘাটের প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যভারতীতে।

হিলি—ফনো নদীর বাম তীরে হিলি বন্দর অবস্থিত। হিলিকে যদিও এখনও পর্যন্ত বন্দর বলা হয়—তথাপি এই স্থানটি বিভাগের সময়ে স্থিতিবিভক্ত হয়ে গেছে। হিলি প্রধানত ধান ও চালের ব্যবসার জন্য বন্দর হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং নৌকা-যোগে রপ্তানীর এক ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। দেশ বিভাগের পূর্বে হিলিতে মোট আঠারোটি রাইস মিল ছিল। স্থিতিবিভক্ত হওয়ার ফলে বন্দরটির কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে গেল এবং উক্ত রাইস মিলের অধিকাংশ

করদাই, বংশীহারী, কালিয়াগঞ্জ ও রায়-গঞ্জ স্থানান্তরিত করা হল।

হিলি প্রাক্তন আসাম-বেঙ্গল রেল লাইনে অবস্থিত। নিম্নে যমুনা জেলার অন্যতম প্রাণ-প্রবাহিনী। পূর্বে শব্দমাত্র বন্দরই নয়—অবিভক্ত দিনাজপুরের সাংস্কৃতিকেন্দ্র হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে আনুপাতিক হারে জেলার পশ্চাদগত স্থান হিসাবে গণ্য করা যায়। যদিও বিভাগান্তর কালে স্থানটির লোক-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলেও পূর্ববঙ্গ থেকে শব্দমাত্র শ্রম-জীবী সম্প্রদায়ই হিলিতে এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন বলে সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপক উন্নয়ন এখনও সম্ভব হয় নি।

ইটাহার—ইটাহারও পশ্চিম দিনাজ-পুরের একটি উল্লেখযোগ্য এবং সমৃদ্ধ জনপদ। ইটাহার থানা কৃষিপণ্যের জন্যই নাম করা যেতে পারে। ইটাহারের আশে-পাশে চতুর্দিকেই প্রাচীন ধর্মসম্পদ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের অনেকগুলির সম্মান পাওয়া যায়। ইটাহারের পান্ডেই সুই নদী এবং এই নদীর তীরবর্তী স্থানগুলিই প্রাচীন কীর্তিসমূহের নিদর্শন। এই সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে অমৃতখণ্ড, রুদ্রখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কালিয়াগঞ্জ—রায়গঞ্জ থানার সদর দপ্তর। জেলার সদর দপ্তর বালুরঘাট থেকে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। পশ্চিম দিনাজ-

পুরে রেল যোগাযোগ অত্যন্ত দীর্ঘ। তার মধ্যেই কালিয়াগঞ্জ একটি উল্লেখযোগ্য রেল স্টেশন। এর পরেই নাম করা যেতে পারে রায়গঞ্জ ও রাধিকাপুরের। রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের জন্যও কালিয়াগঞ্জ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। কালিয়াগঞ্জও প্রধানত কৃষি-নির্ভর। বিভাগ-পূর্ব সময়ে কালিয়াগঞ্জের সবিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য তো নয়ই—রেল স্টেশন হিসাবেও নয়। অধিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগ রাজবংশী কৃষিজীবী প্রজাতি। দেশ বিভাগের পর রংপুর, রাজসাহী ও মৈমন-সিংগের উল্লেখ্যকৃতই বেশির ভাগ এই অঞ্চলে এলে-ও বর্তমান সময়ে পাঁচ-শেখারী অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত। এখনও পর্যন্ত আধা-শহর হিসাবে পরিগণিত, তবে জেলার সীমান্তবর্তী জনপদ হিসাবে কালিয়াগঞ্জের গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্ত-মানে এক সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অল্প-সংখ্যক রাইস মিল এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কয়েকটি ক্ষুদ্র ধরনের শিল্প প্রতি-ষ্ঠান এখানে আছে। উক্ত বাংলার বৃহত্তম শহর শিলিগুড়ির সঙ্গে রেল ছাড়া সরাসরি বাস সংযোগ থাকার ফলে উন্নয়ন ব্যবস্থাও দ্রুতগতিতে চলেছে।

করদাই—পূনর্ভার নদীর পূর্বে তীরে অবস্থিত এবং গঙ্গারামপুর থেকে আট মাইল ব্যবধান। কথিত আছে, ব্রীকক ও

কেশ পরিচর্যা
অপরিহার্য...

**বেঙ্গল
কেমিক্যালের
ক্যান্সারাইডিন**
হেয়ার অয়েল

চুলের গোড়া হ্রাস ও
শব্দ রাখে, চুলের গোড়া
ঝড়তে সাহায্য করে,
ও চুল ওঠা বন্ধ করে।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা-বোম্বাই
কানপুর

কেমন করে আবার হবে

মনোরমা লিখেছেন

আমি চাই এমন এক পথে চলতে
যেখানে আমি সহজ আমি সম্পূর্ণ।
ক্ষমার মানুষের কান্না যেখানে গুমরিয়ে গুমরিয়ে কাঁদে
বন্দুহীনের লজ্জা যেখানে শ্যামল ঘাসের আন্তরগে
মুখ লুকাতে চায়,
যেখানে শিশু পায় না খাদ্য পায় না শিক্ষার রসদ
আর তার প্রাণেজ্বল খেলার খেলনা,
আমার সেই দরিদ্র দেশ
সেখানেই আমি সম্পূর্ণ।
তার কাছে থেকে দূরে গিয়ে নব্বু।

বেদ বেদান্তের কথা আমাকে শুনিয়ে না।
শুনিয়ে না উপনিষদের বাণী সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম।
তথাগত, তুমি আজ দূরে থাকো।
নীল আকাশ আজ ধোঁয়ায় কালো। ফুলগুলি
রোদে কলসিয়ে উঠছে। কে তুলবে?
খোঁপায় আমি ফুল দেবো না, চোখে দেবো না ফাজল,
আমার দূর চোখ আজ শুষ্ক। জলও নেই সেখানে॥
মা, তোমার দরিদ্রবেশ, এরপর আর কী দেখার আছে?
তোমার হৃদয়বেদনার মুখ ডুবিয়ে আমি
অপার বাৎসল্য অনুভব করছি।

মা, কী করে আমি তোমার সেই বেদনা
নিরাময় করে তুলবো, কী করে?
কী সেই কাজ যাতে তোমার দরিদ্রবেশ দূর হবে?
মা আমার মা, কেমন করে আবার হবে তুমি
সেই শসা শ্যামলা বাংলা দেশ, কেমন করে?

কুল-এর সঙ্গে যুদ্ধে উভয়পক্ষে এত সৈন্য
নিহত হয়েছিল যে, সমস্ত শব্দ দাহ করা
কম্পন হয়ে ওঠে নি। সুতরাং গ্রীকদের
আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক নিহত সৈন্যের
মৃত্যু একটি করে আগুন সংগ্রহ করে
একত্রে দাহ করার ফলে স্থানটি সেই
সুপ্রাচীনকাল থেকেই উত্তম নামে অভিহিত
হয়ে আসছে। বর্তমানে করদাহ জেলার
একটি উল্লেখযোগ্য খাদ্যশস্যের বেচা-কেনার
কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত।

কুমারগঞ্জ—দিনাজপুর-বালুঘাট রোডের
উপর আগ্রাই নদীর তীরে একটি বিশেষ
কেন্দ্র। ধান ও চালের কারবারই প্রধান।
কাঁচামাল ও ভূষিমালের ব্যবসায়ের জন্যও
হুগ্গেট গুরুত্ব আছে। অধিবাসীদের মধ্যে
রাজবংশী সম্প্রদায়ই সংখ্যায় অধিক। এ
ছাড়া অন্য কোন বিশেষ উন্নতি হয় নি।

কুশমণ্ডি—কালিয়াগঞ্জ ও বংশীহারীর
সম্মিলন একটি ন্যতিবৃহৎ জনপদ। কুশ-
মণ্ডিও একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান।
কুশমণ্ডি থানার পাশ দিয়ে এখনও যে
প্রশস্ত সড়কটি বিদ্যমান—এটিকে এখনও
লোকে উষাহরণ সড়ক বলে। কথিত আছে
বাণকন্যা উষা যখন উষাবনে অবস্থান কর-
ছিলেন—তখন গ্রীক পৌত্র অনিরুদ্ধ
উষাবন থেকে উষাকে নিয়ে এই পথ দিয়েই
পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
অবশ্য বাণ তাঁকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়ে-
ছিলেন। আবার পাল যুগের নিদর্শন
হিসাবে রয়েছে মহীপালদীঘি। কুশমণ্ডি

থানার পশ্চিমগণ স্থানে বিরাট দীঘিটি
এখনও পালবংশকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
এ ছাড়াও একডালা, বাহিরহাটা প্রভৃতি
স্থানও প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্য নানাভাবে
উল্লেখযোগ্য। স্থানটি দ্রুত উন্নয়নশীল।
পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্যভাগে যতগুলি
উন্নয়নশীল স্থান আছে—কুশমণ্ডি
সেগুলির মধ্যে অন্যতম। অধিবাসী-
দের মধ্যে রাজবংশী ও অন্যান্য
মিশ্র জাতির প্রাধান্যই রয়েছে।
পশ্চিম দিনাজপুরের এই অংশে ফসলের
ফলন অপেক্ষাকৃত কম—ফলে কোনও
উল্লেখযোগ্য বন্দর গড়ে ওঠে নি। দেশ
বিভাগের পর এখানে বেশ কিছুসংখ্যক
উৎসাহ আসার ফলে দ্রুত উন্নয়ন ব্যবস্থা
অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

মহীপালদীঘি — মালদা-দিনাজপুর
রোডের মধ্যবর্তী স্থানে কুশমণ্ডি থানা
থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে মহীপাল-
দীঘিও একটি প্রাচীন স্থান। এখানেও
পালবংশের মহীপাল একটি দীঘি খনন
করেন—যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এখনও আটটিশ
শ' ও এগারো শ' ফুট। এই দীঘির জল
এখনও পানীয়রূপে ব্যবহার করা চলে।
দীঘির পাড়ে কতগুলি হিন্দু দেবমন্দির
ও মুসলমানদের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ
বিদ্যমান। নিকটবর্তী গ্রামের নাম মহীপুর।
মহীপুরের এলাকা জুড়ে ভূস্ট ইট ও পাথর
স্তুপাকৃতিরূপে দেখতে পাওয়া যায়।
অনেকে মনে করেন, এখানে মহীপাল তাঁর

প্রমোদভবন নির্মাণ করেছিলেন, আবার
অনেকে এটা কোনও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
হিসাবে অনুমান করেন। কতকগুলি সম
আকারের পাথরের স্তুপ থেকে এই
অনুমান করা হয়।

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মালদহের একটি
নীলচাষ প্রতিষ্ঠান মহীপালদীঘিতে
একটি কারখানা নির্মাণ করেছিল বলে
কথিত আছে। মিঃ টমাস—যিনি পশ্চিম
দিনাজপুরে নীলচাষের দায়িত্ব নিয়ে এসে-
ছিলেন তিনি একাধারে নীলকর এবং
ধর্মপ্রচারক। মহীপালদীঘির উত্তরদিকে
এখনও নীল-এর বৃহৎ বৃহৎ ভাটিগুলির
ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য
মিঃ টমাস যে তাঁর মিশনারী কাজকর্মে
কিংবা নীলচাষে কোনরূপ কৃতকাব্যতা
লাভ করেছিলেন ইতিহাস সেরূপ সাক্ষ্য দেয়
না। বৃন্দানন হ্যামিলটনের মতে, উনিবিংশ
শতাব্দীর প্রথমভাগে মিশনারী ও ভাবা-
বিদ উইলিয়ম কেরী তাঁর মিশন ও প্রিন্টিং
প্রেস এখানেই স্থাপিত করেছিলেন।
বৃন্দানন হ্যামিলটনের এই অভিমান সত্য
হলে—উইলিয়ম কেরী সম্পর্কে সাধারণ
প্রচলিত একটি ধারণাকে পরিবর্তন করতে
হয়। কেন না ইতিহাস বলে কেরী সাহেব
তাঁর প্রেসটি শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠা করেন
সর্বপ্রথম।

[ক্রমশঃ]

মালদাকর্তা: পূর্ববন্দ, পালচৌধুরী

জীবিত পিরানদেল্লো : যে পদার্থ আবরণে সত্যকে আবৃত রাখা হয়, তার অপসারণেই ট্রাজেডির উদ্ভব হয়—এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন পিরানদেল্লো তাঁর কয়েকটি নাটকে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'নেকেড' বা 'ক্রোড়িত দি নেকেড' নাটকটির কথা ধরা যেতে পারে। নাটকের নায়িকা একজন নার্স, তাকে রোমের একটি পার্কে অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। সে বিষপান করে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। অসুস্থ অবস্থায় নার্সটির ধারণা হল সে নিশ্চিত মারা যাবে—তাই সে বিনা বিধায় একজন জার্মানিস্টকে তার জীবনের সব ঘটনা জানালো। সে বললে—স্মার্নাতে একজন কন্সালের বাড়িতে সে চাকরী করত। কন্সালের স্ত্রী অত্যন্ত সন্দেহবাতকগুস্ত—তিনি ওকে চাকরী এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া তার 'ফি'য়াসী—একজন ন্যাভেল অফিসার—তাকে পরিভ্রাণ করে অন্য এক সুবতীর সঙ্গে এনগেজড হয়েছেন। এই সব কারণেই সে বিষপান করে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল।

হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফেরবার পর নার্সটি দেখল যে তাকে নিয়ে রোম শহরে বিরাট হৈ হৈ পাড়ে গেছে। একজন রসিক নামডাকওলা লেখক তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। লেখকের ইচ্ছা তার জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন। এরপর তার আগের 'ফি'য়াসী' এসে বারবার অনুরোধ করতে লাগল তাকে বিয়ে করতে। কারণ অন্য যে মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল, কাগজে নার্সটির জীবনকাহিনী পড়ে সে ন্যাভেল অফিসারটিকে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের বিয়ে হবে না। এরপর সেই কন্সাল এবং তাঁর স্ত্রী স্মার্না থেকে ফিরে এলেন। তখন জানা গেল নার্সটি ছিল ঐ কন্সালের মিস্ট্রেস। একদিন যখন কন্সাল এবং নার্সটি অবৈধ প্রেমে আত্মমগ্ন হয়েছিল তখন কন্সালের ছোট মেয়েটি টেরেস থেকে নিচে মাটিতে পড়ে যায়। এ'রা একটু নজর রাখলে এই ভীষণ দুর্ঘটনাটা ঘটিতে পারত না। এই কাহিনী প্রচারিত হবার পর শহরের লোকদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যারা আগে তার জীবনের সমস্যা-পূর্ণ কাহিনী শুনে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, এখন সব জানবার পর চণায় মাথ ফিঁদিয়ে নিতে লাগল। নার্সটি আবার বিষপান করল। মরবার আগে সে জানিয়ে দিল অনেক চেষ্টা করলেও সে ক্রীসনে নিজেকে বিশেষ স্বাধীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাই সে আত্মহত্যার সাহায্যে নিজের ক্রীসনের একটা করণ্য আলেখ্য সৃষ্টি করে সমান মনে একটা স্থান করে নিতে চেয়েছিল। *mariti* অনুরোধ

বন্দনা ও দেশে মিলন

করেছিল তাকে কবরস্থ করবার আগে যেন সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তার এই অনুরোধও পালিত হয় নি। ভেইলহাইন, নন্দ, কনাকার অবস্থায় তাকে কবর দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার দেহ এবং মন সম্পূর্ণ নন্দ অবস্থায় উদ্ঘাটিত করে দেওয়া হয় শহরবাসীদের কাছে।

আমাদের আসল সমস্যাতে গোপনে রেখে আমরা অন্য ভূমিকায় অভিনয় করতে ভালবাসি এই সত্যই রয়েছে পিরানদেল্লোর বিখ্যাত নাটক 'এন'রিকা কোয়ার্টের' মূলে। এ নাটকটির ইংরাজী অনুবাদের নামকরণ হয়েছে 'হেনরী দি ফোর্থ'। একটি বৃক একবার এক ফ্যান্সী ড্রেস উৎসবে 'হেনরী দি ফোর্থ' সেজে অংশগ্রহণ করতে যান। পথে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। ফলে তার এক ধরনের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং তিনি মনে করতে থাকেন যে তিনিই আসলে সম্রাট হেনরী। তাঁর বোন ছিলেন অত্যন্ত ধনী। তিনি একটি বাগানবাড়িতে ভাইকে রাখলেন—এখানে একটি ঘরে সিংহাসন ইত্যাদি বসানো ছিল এই উন্মাদ-সম্রাটের ব্যবহারের জন্য। চারজন উপদেষ্টাকে নিয়ে সম্রাট এখানে গোপন পরামর্শ করে কাটান—আসলে ঐ চারজন উপদেষ্টা হল চারজন নার্স। যেসব দর্শনপ্রার্থী আসেন তাদের পরিচয়নে থাকে 'পিরিয়ড' কন্সিটউয়—অর্থাৎ তারা যেন সবাই একাদশ শতাব্দীর লোক। নাটকের শুরুতেই বোঝা যায় যে বিগত কুড়ি বছর ধরেই এই অশান্ত উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। একদল দর্শনপ্রার্থী এসে হাজির হয়—এর ভেতর একটি বৃকতী আছে যাকে সত্য অবস্থায় বৃকতী ভালবাসতো, কখন আছে সেই সমস্যার তার ভালবাসার প্রতিশ্রুতী বেল-ক্রেডি—সবাই মধ্যযুগীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে এসেছে। ডাবা দেখতে এসেছে সবকিছু এখনও উন্মাদ অবস্থায় আছে কিনা। স্বকৃত 'হেনরী দি ফোর্থ' স্বীকার করে যে গত আট বছর থেকে তার মস্তিষ্কবিকৃতি সেরে গেছে। তবে কেন সে উন্মাদের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে এই আট বছর ধরে? এর কারণ হচ্ছে অনেক আগে থেকেই তার বন্ধ-বান্ধব এবং তার বাকদত্তা তাকে পরিভ্রাণ

করেছে—একথা সে বেশ ভালভাবেই জানে যে সে যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেত লোকে তাকে বিদূষ এবং অনুকম্পার গায় হিসাবেই দেখত। সে বলে:

"I realized that I was standing there like a man who arrives ravenously hungry at table, to discover that the guests have gone and the table has been cleared."

দর্শনপ্রার্থীরা এই কথা ভেবে বিরম্ব হয়ে ওঠে যে সে তাদের আট বছর ধরে প্রতারণা করে এসেছে এবং বোকা বানিয়ে এসেছে। বেল-ক্রেডির মন্তব্যগুলো হয় সব থেকে বেশি তীক্ষ্ণ। একটা প্রশান্ত মন্তব্য নিয়ে 'হেনরী দি ফোর্থ' জবাব দেয়—'ভদ্রমহোদয়গণ! আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি—কারণ একথা এখন আর আমার সজ্ঞানা নয় কিভাবে পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, আমি ধীরে সুস্থে মস্তিষ্কেই এখন উন্মাদ সাহসে পারি। কিন্তু তোমাদের উন্মত্ততা এতদূর বিস্তৃত যে তোমরা নিজেরাই বৃকতে পার না এবং স্বীকার কর না যে তোমরা বন্ধ-পাগলের দল। এই প্রদর্শন বার্ষিক শ'—এর মধ্যে একজন কাগজের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের কাহিনীটি মনে পড়ল। এই প্রতিনিধি শ'কে প্রশ্ন করেছিলেন, ট্রেম্পো-রার ইন্সল্যানটি সম্পর্কে তাঁর মতামত কি? তাকে শ' উত্তর দেন—'ট্রেম্পো-রার ইন্সল্যানটি' বলে কিছু আছে কিনা জানি না—তবে একথা ধ্রুব সত্য যে all men are permanently insane.

শাই তোমার কানে কানে সবকিছু বেল-ক্রেডি সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তর করে উঠে—তার মনে পড়ল যে ঘোড়াটি তাকে সম্রাটের পোষাক ছিটকে ফেলে দিয়েছিল বেল-ক্রেডি তার আগে খোঁচা দিয়ে একাশটি ঘটেছিল। এরপর বেল-ক্রেডি তাকে অপমান করতে বৃক বিদ্যাহ পণ্ডিতে পার্শ্বচরের কোমর থেকে তরোয়ালটা ফলে নিয়ে বেল-ক্রেডির পোশাক খেঁচা দিয়ে দিল। কয়েকজন লোক বেল-ক্রেডিকে এখন থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল—দর্শনপ্রার্থীরাও ভয়ে পালাল, leaving "Henry IV" in terror because he has played

as part too well, and become a criminal.

“আর ফেরবার পথ নেই, এখন থেকে আমার চিরকালের মত উদ্ভাদের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে”—বৃদ্ধ এই কণ্ঠি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নাটক শেষ হয়। এক মৃহতের জন্য সে প্রলুপ্ত হয়েছিল তার পাগলামীর মতোস অপসারণ করতে, কিন্তু তার ফলে যে দৃষ্টান্ত ঘটল তার জন্য তাকে আজীবন মৃত্যুদণ্ড পরেই থাকতে হবে।

১৯২২ সালে প্রকাশিত এই নাটকটিকে পিরানদেল্লোর মাস্টোরাপিস বলা হয়। তাঁর অন্যান্য নাটকের থেকে এ নাটকের পরিধি অনেক বিস্তৃত। এ নাটকে তার বাস্তব সমীক্ষা “ম্যাজনুস” এবং “স্যানিটি” উভয় বিষয়কেই আলোচ্য বস্তু হিসাবে পরীক্ষা করে দেখেছে। নাটকের অনেকটা দূর অবস্থি না আসা পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি না হেনরী পাগল, না স্থিরবসিত্বের লোক। আর একথাও জানি না সে এর আগে কখনও পাগল হয়েছে কিনা। এইদিক দিয়ে এ নাটকটি হ্যামলেটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে বাই হোক, হেনরী দি ফোর্থ” যে সত্যিকারের ট্রাজেডি সে বিষয় কারও সন্দেহ নেই।

বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যবিদ ই. মার্টিন হেনরী দি ফোর্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

Henry IV is true tragedy, the tragedy of a man whom time has passed by, for whom there is no place in life to-day, since he was put out of life years ago. This reveals another aspect of Pirandello's concern with reality: is time, as much as matter, what the human mind makes it for each one of us? Pirandello is always apt to give long monologues to his principal characters; in this play, the practice is developed to a point which recalls the Shakespearean soliloquy; and this again enlarges the character of the hero and deepens the size of the tragedy.

যে নাটকটি লিখে পিরানদেল্লো জগৎ-বিখ্যাত হলেন তার নাম হচ্ছে ‘সিঙ্গ ক্যারেটাস ইন সার্চ অব এ্যান অথর’। এর মূল বস্তু একটি ছোট গল্পে তিনি আগেই বলেছিলেন। এতে পিরানদেল্লো বর্ণনা করেছেন তাঁর ভবিষ্যতের ছোট

গল্পের চরিত্রেরা কিভাবে তাঁর দর্শনপ্রাণী হয়ে হাজির হোত। একদিন সম্মানবোধের তিনি একটি বড় নভেল গড়ছিলেন—এই বইটি কেউ তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই দিনই গভীর রাত্রে এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এল তাঁর দর্শনপ্রাণী হয়ে—সে জানালে লেখক উপন্যাসে তার প্রতি কি ধরনের দৃব্যবহার করেছেন। এখানে সিঙ্গ ক্যারেটাসের আসল চাবিকাঠিটা আমরা দেখে আসতে এসে পড়ি। এ নাটকের ক্ষাদার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাকিয়েছেন যে—যে-মৃহতে একটি জীবন্ত চরিত্রের জন্ম হয়, তারপর আর তার মৃত্যু নেই। প্রত্যেক মানুষকেই মরতে হয়, লেখকরাও মারা যান, কিন্তু তাঁদের কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট চরিত্র চিরকাল বেঁচে থাকে। যতদিন পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকবে, সাপেক্ষ-পালা চরিত্রটিও অমর হয়ে থাকবে।

একজন সমালোচক সিঙ্গ ক্যারেটাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন উপহাসাত্মক ট্রাজেডি বলে। এ এক নতুন ধরনের বিবাদাত্মক নাটক। ব্যক্তিগত জটিল জালের চাকার তলায় পড়ে মানুষ কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, আসল সত্যের আন্সিকারের অসম্ভব প্রচেষ্টা কিভাবে তাকে অসহায় অবস্থায় টেনে আনছে। মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তা—এইসব জটিল প্রশ্নই সিঙ্গ ক্যারেটাস এবং হেনরী দি ফোর্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

আসলে পিরানদেল্লো নাটকের মাধ্যমে ফ্রেড, ইয়ং এবং আইনস্টাইনের দ্বিগুণীর পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষের জীবনকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

He dramatises the subconscious; his events are the discoveries, the realisations and the awarenesses of the mind. From them he has constructed a drama of experience, subtle and lucid, and penetratingly human.

পিরানদেল্লোর নাটক পড়তে বা দেখতে গিয়ে পাঠক এবং দর্শক দেহমনের দিক দিয়ে এক অবচেতনতার স্তরে গিয়ে উন্নীত হন। কিন্তু এ অবচেতনতা মানুষকে নিষ্কর বা নিজীব করে দেয় না—যেমনটা হয় মেতারলিস্কের নাটক দেখলে বা পড়লে। অর্থাৎ পিরানদেল্লোর নাটকে মানুষের চেতন-মনের বিলুপ্তি বা অবসান ঘটে না। বরং বলা যেতে পারে চেতন-মন অবচেতন-মনের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে বিরাজ করতে থাকে।

নাটক লেখার ফর্ম বা টেকনিকটাই পিরানদেল্লোর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য

নয়। এ সব নাটকের বক্তব্যের দিকটাই গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবার বিষয়। আজকাল কলকাতাতেও পিরানদেল্লোকে কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের বাংলা ভাবানুবাদ মণ্ডল্য হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিচার করে দেখা দরকার ওই সব অনুবাদ নাটকে সত্যিকার পিরানদেল্লোকে আমরা কতোটা দেখতে পাচ্ছি এবং বাহ্যিক ফর্মের দিকটাই অনুবাদ নাটকে গ্রাস করে ফেলেছে কি না।

সিঙ্গ ক্যারেটাস নাটকটিকে এখন ইওরোপীয়ান সাহিত্যের একটি জ্যানিস বলে ধরা হয়। এ নাটকটি চিরকালের সাহিত্যের শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে ফর্মের অভিনব এবং মৌলিকতার জন্য। যে এটা হয়েছে তা নয়। নাটকটিতে আছে জীবনদর্শনের গভীরতা এবং ব্যাপকতা—তাহাড়া মানুষের পূর্ণজীবন নিয়েই নাট্যকার বিদগ্ধ গবেষণা করেছেন এই রচনায়। ফর্মের জগৎগে নাটকের বিষয়বস্তু গড়ে ওঠে নি—বিষয়বস্তুর সত্য প্রকাশের সহজ মাধ্যম হিসাবেই ফর্ম রূপ নিয়েছে।

নাটকটিতে প্রতি মৃহতেই আমরা একই সঙ্গে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে দেখতে পাই—দেখতে পাই পর পর বিভিন্ন স্তরের বাস্তবতাকে। নাটকের মূহ হচ্ছে ট্রাজিক—কিন্তু তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে রোমান্টিক ড্রামা, হাই কমিডী এবং ফার্সের স্যাটায়ার।

পিরানদেল্লো এবং মেতারলিস্কের নাটকের তুলনা করলে দেখতে পাই, মেতারলিস্কের আবেদন হচ্ছে হৃদয় বা অন্তরের কাছে। পাঠক বা দর্শকের মনে যদি ফেথ না থাকে, তবে তিনি কিছুতেই মেতারলিস্কের নাটকের সারমর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না। পিরানদেল্লো মানুষের বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা জ্ঞানকে রাস-আপ করে তোলেন। তাঁর পর এই কৃতিত্বের একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় বেকেরের নাটকগুলিতে—এ নাটকগুলোও তেমনি রসঘন, তেমনি গভীর জ্ঞানের আকর এবং ঠিক এই রকমই চিন্তা এবং প্রজ্ঞা জ্ঞানের উদ্দীপক।

এই সব সিম্বলিক নাট্যকারদের লেখার আলোচনা করতে গিয়ে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত সাবজেকটিভ—বস্তু বা বিষয়কে বিশেষ ভঙ্গীতে বিশেষভাবে বলেন—সেইটেই এঁদের স্টাইল। এ স্টাইলকে অনুসরণ বা অনুসরণ করা যায় না—কেউ যদি তা করতে চান, তবে তাঁর রচনা হয়ে উঠবে অত্যন্ত মেকানিক্যাল এবং প্রাণহীন।

বঙ্গভ্রমর

মধুর রজনীর ছবি নিষিদ্ধ হয়েছে---

এবার রাজনৈতিক গোয়েন্দাচিত্র সম্পর্কে সতর্ক হও

প্রায় বৎসরাধিক কাল লেখালেখির পর অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার নাইট ক্লাব সম্পর্কিত ছবিগুলি নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। যে সরকারের নেত্রী একজন মহিলা সে সরকারের এ বিষয়ে শত্রুতাই হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। বিশ্বের কোন দেশে নারীদেহকে কি ভাবে পর্ন্যাসাবে ব্যবহার করা হয়—এ নিয়ে যে ছবি সে ছবি সমগ্র নারীসমাজের পক্ষে নিষ্পত্তীয়। কিন্তু অনেক লেখালেখি করা সত্ত্বেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চৈতন্যোদয় হয়েছে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে মাত্র। সম্ভবত তিনি দেওয়ালের লেখন বদলতে পেরেছিলেন। এই ছবিগুলি তাঁরই বাণিজ্যমণ্ডীর এক অপকীর্তির মজার। সেই মন্ত্রী মানুড়াই শা আজ জনগণের দ্বিধারে সংসদ থেকে আকর্ষণীয় পতিত হয়েছে। যেখানে তার উপযুক্ত স্থান। এই মানুড়াই শা শিক্ষামূলক ছবির পরিবর্তে এবার নোংরা ছবি আমদানি করার অনুমতি দিয়েছিল। নাইট ক্লাবের এই ছবিগুলি আগেও গোপনে আমদানী হত। তখন লম্পট ও বিকৃতরুচির লোকেরা গোপনে এসব ছবি দেখত। এসব ছবি দেখাবার এক বে-আইনী ব্যবস্থা ভারতের বড় বড় শহরে আছে। মানুড়াইরা প্রকৃতপক্ষে ধাপে ধাপে এই বে-আইনী অশ্লীল ছবির ব্যবসাকে আইনী করার মতলবে ছিল। এসব ছবি যখন কলকাতায় দেখান হয় তখন সর্বপ্রথম দৈনিক বঙ্গমতীতে বিদেশী ছবির পর্যালোচক এই ছবিগুলির তীব্র নিন্দা করে প্রদর্শন বন্ধ রাখার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন। সাম্প্রতিক বঙ্গমতীতে সৃজন বার বার সরকার, গোরাপিতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এসব ছবির পেছনে যে দৃষ্টবুদ্ধি কাজ করছে সে কথাও তিনি প্রকাশ করেছেন। বহু পাঠক-পাঠিকা সৃজনকে সমর্থন করে চিঠি পাঠিয়েছেন, কিন্তু গোরাপিতার নীরবই ছিলেন। অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সিনেমার পাতায় এই ছবিগুলির রসাল আলোচনা প্রকাশ হয়েছে মাত্র। কয়েকজন শিক্ষারতরী এই ছবিগুলির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এবং তাঁরা তীব্র নিন্দা করেন।

অবশেষে মাত্র কয়েক মাস আগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের চৈতন্য উদয় হয়। কেন্দ্র থেকে রাজ্যসমূহে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান হয়, যেসব পত্রিকা সমালোচনা করেছে তার কাটিং চাওয়া হয়। তার কিছুদিন পরে দেখা গেল ফিল্ম সেন্সর অফিসে কিছু পরিবর্তন। এসব ছবি বোম্বাইতেই সেন্সর করা হয়েছে। সম্প্রতি দশটি ছবিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে শ্রীমতী ইন্দিরাজীর সরকারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানে —সাপও মরে লাঠিও ডাঙে না নীতি মেনে কাজ করা হয়েছে। গত দু' বছরে এসব নাইট ক্লাবের ছবি দেখিয়ে ব্যবসায়ীরা বহু টাকা লাভ করেছে, অজ্ঞান লোক দেখেছে, তার কলংকর ফলাফল যখন ঘটেছে এবং ছবিগুলির আকর্ষণ কমে এসেছে তখন তিনি নিষিদ্ধ করে কর্তব্য সমাপন করেছেন। এতে ব্যবসায়ীরা লাভ করার সুযোগও গেল, দেশবাসীও খুশি হল।

মধুর রজনীর ছবিগুলির পরময়্য শেষ হল, কিন্তু আর এক মরশুর আপদ এখনো আছে। বিদেশী ছবির মধ্যে এখন রাজনৈতিক গোয়েন্দা কাহিনী চিত্রের শৃংখলাও ব্যবসা দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় একটি হিন্দী সিনেমাতে কেবলমাত্র এ মরশুর ছবি দেখান হচ্ছে। এসব গোয়েন্দা ছবিতে দেখান হয় মার্কিনদের গুণাবলী, সারা বিশ্বে নিয়ন্ত্রণের রাখার জন্য তাদের বাহাদুর গোয়েন্দার কত সজাগ। মার্কিন গোয়েন্দাগিরির প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ এসব ছবির উদ্দেশ্য। কোন কোন ছবিতে ভারতের বঙ্গরাস্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে বোকা প্রতিপন্ন করা হয়, কোন কোনটির এশিয়ার ঔপনিবেশিক মন্ত্রি-সংগ্রামকে ছেঁয় করা হয়েছে। সপ্তে রয়েছে উগ্র যৌনতামূলক ম্যাসমহ। বাস্তবিকপক্ষে এই ছবিগুলি মার্কিনদের স্বেচ্ছুর রাজনৈতিক মতলব-বাজীর ছবি। ভারত যদি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয় তবে ফিল্মের সারফণ এই চতুর প্রচার চালাতে দেওয়া উচিত নয়। দেশবাসী আশা করে নাইট ক্লাবের নোংরা ছবির মত রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরির এই ছবিগুলির প্রদর্শনও বন্ধ করা হবে। —সৃজন।



এলিট চিত্রগৃহে সদ্যমুক্ত 'ডালি' চিত্রের একটি দৃশ্যে লরেন্স হারভে

চিত্রশ্রমালোচনা

বঙ্গবরণ

(পরিচালনা: দিলীপ নাগ)

বঙ্গবরণ ছবিটির নির্মাণ সংগঠনে অনেক তরুণের উদ্যোগ আছে। এই উদ্যোগে এখানে নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে বোম্বাইয়ের সুপরিচিত প্রদীপকুমার ও নেপথ্য গায়িকা গীতা দত্ত চরিত্র রূপায়ণে উপস্থিত হয়েছেন। এই ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ এবং গীত রচনার দায়িত্ব একাই পালন করেছেন শ্যামল গুপ্ত। আর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন সঙ্গীত জগতের সুপরিচিত কমল দাশগুপ্ত। এককালে চলচ্চিত্র-সঙ্গীত পরিচালনার মার খাতি ছিল। দীর্ঘ দিন পরে এই ছবিতে তাঁর দেওয়া সুর শোনা গেছে, এবং এ কাজ তিনি সাফল্যের সঙ্গেই করেছেন।

চিত্রনাট্যে দৃষ্ট কাহিনী স্থান পেয়েছে, আপাতভাবে শাস্বতী রায় আর শ্রুভেন্দ্র প্রেমের কথার মশকরা যখন পরিণতি আশা করছেন, তখন শত্রু হয়েছে মূল কাহিনীর। যে কাহিনী দীর্ঘ বছর পর্বন্ত কেবলমাত্র দৃ-জন্যর মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। এই কাহিনীর নামক নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান শাস্বতীকে সম্মানের মধ্যে মানুস করার জন্য দীর্ঘ বছর



আগতপ্রায় 'সবা' ছবিতে তৃপ্তি মিত্র, কালী ব্যানার্জী ও অসিতবরণ

জয়ন্তীর স্নায়ুর অভিনয় করেছিল, অথচ প্রতিদ্রুতি অনুযায়ী তাকে স্ত্রী বলে দাবি করতে পারে নি। আর জয়ন্তী সব জেনে-শুনে নীরবে এই ব্যবস্থা বজায় রেখেছে।

সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল তখন যখন শাম্ভবতী আর শূভেন্দ্রের বিয়ের জন্য শূভেন্দ্রের বাবাকে খবর দেওয়া হল। তার বাবা ভক্তার আদিনাথ এসে বিয়েতে অমত করলেন। কারণ তিনি ছিলেন নির্মলেন্দুদের বন্ধু এবং সমস্ত ঘটনা তাঁর জন্য ছিল। তাঁর এবং জয়ন্তীর অমত সত্ত্বেও নির্মলেন্দু সমস্ত কথা যখন শাম্ভবতী এবং শূভেন্দ্রের কাছে খুলে বললেন তখন সমস্ত জমানো মেঘ কেটে গেল। ভক্তার আদিনাথই এগিয়ে এসে বধুবরণ করলেন, আর এই বধুবরণ উৎসবে নির্মলেন্দু-জয়ন্তীর এতদিনের অভিনয় জীবনেরও শেষ হল।

ছবিতে জয়ন্তীর ভূমিকায় গীতা দত্ত এবং নির্মলেন্দুর ভূমিকায় প্রদীপকুমার মথায়থ অভিনয় করেছেন। একটি ছোট ভূমিকায় অতি ভট্টাচার্যকেও দেখা গেছে। ভক্তার আদিনাথের চরিত্রে রূপ নিয়েছেন বিকাশ রায়। শাম্ভবতী আর শূভেন্দ্রের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন নবাগতা রাখী বিশ্বাস ও অজয় বিশ্বাস। রাখী বিশ্বাস

ক্যামেরাম্যান ও পার্শ্চালকের আরো সহায়তা পেলে আরো ভাল করতেন। অজয় বিশ্বাস কিছুটা আড়ষ্ট মনে হয়। গীতালি রায়, জহর রায় এবং ভারতী কৈবীও সু-অভিনয় করেছেন।

ছবিতে ছোটখাটো অসঙ্গতি দোষও আছে। তবে এরূপ মিলন-মধুর ছবি মঞ্চবলে খুবই সম্মদর পাবে।

বঙ্গবন্ধু

ইনকাম ট্যাক্স রিপোর্টস এন্ড

রিজিয়েশন ক্লাব :

উৎসব সম্ভার

ইনকাম ট্যাক্স রিপোর্টস এন্ড রিজিয়েশন ক্লাব (সাংস্কৃতিক শাখা), গত ১৬ই থেকে ২১শে জানুয়ারী ১৯৬৭, উৎসব সম্ভাররূপে পালন করেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল—একাংক নাটক, ছোট গল্প, কবিতা, আবৃত্তি, বিতর্ক ও

রবীন্দ্রসংগীত প্রাতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারকরূপে বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী গঙ্গাপদ বসু, গুণাল সেন, কম্পতরু সেনগুপ্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য, কুমার রায়, অসীম সোম, অরবিন্দ বসু, অশোক ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, সুবিনয় রায় ও সন্তোষ সেনগুপ্ত। ছোট গল্প ও কবিতা বিচার করেছেন যথাক্রমে সর্বশ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও রাম বসু। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীমন্তথ রায়। সমাপ্তি দিবসে প্রাতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন ক্লাবের সভাপতি শ্রী আর, এন, বসু ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ-সভাপতি শ্রীমনীষীনাথ ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীমদুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্বোধন দিবসে গতবারের প্রাতিযোগিতায় অভিনীত এবং শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা পুরস্কৃত একাংক নাটক (কাব্যনাট্য) কাব্য মংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত "একলব্য" অভিনীত হয়। নাটকটি পার্শ্চালন্য করেন শ্রীরঞ্জৎ মদ্যোপাধ্যায়।

একাংক নাটক প্রাতিযোগিতায় দশটি নাটক অভিনীত হয়। শ্রীসমরেশ বসুর গ্রুপ অবলম্বনে শ্রীমিহির সেন কর্তৃক নাট্যরূপায়িত "আদ্যব" নাটকটি শ্রেষ্ঠ

অভিনীত নাটকরূপে বিবেচিত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীমোহর চট্টোপাধ্যায়। আলোক নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীপ্রদীপ চক্রবর্তী। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী হিতেশ ঘোষ, রমেন আচার্য, গুরুদাস ভট্টাচার্য, সন্তোষ বিশ্বাস ও গোষ্ঠাবিহারী ঘোষ। নাটকটি প্রযোজনা করেন শ্রীহিতেশ ঘোষ। নাট্যকার শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "আজকের উত্তর" নাটকটি পরিচালনার জন্য শ্রীসুনীল সরকার ও শ্রীরঞ্জিত মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় "আর এক চড়াই তেড়ে" নাটকে 'স্বতী' চরিত্রাভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে, শ্রীদিলীপ বসু "আজকের উত্তর" নাটকে 'ঐদ্যনাথ' চরিত্র অভিনয়ের জন্য শ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে ও শ্রীমতী মীরা দাস "শুধু ছায়া" নাটকে 'দীপা'র চরিত্র অভিনয়ের জন্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। শ্রীসুনীল সরকার "আজকের উত্তর" নাটকে 'ফণিকৃষ্ণ' চরিত্রাভিনয়ের জন্য এবং শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় "মুনল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" নাটক রচনার জন্য বিচারকগণ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। বিচারকগণের মতে অভিনয়ের মান খুবই উন্নত। অন্যান্য প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতা-গণের মানও যথেষ্ট উন্নত।

ছবিতে স্টাট গল্প, আবৃত্তি, বিতর্ক

ও রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম, শ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী জীবিতেশ চক্রবর্তী, সুপ্রিয় ঘোষ, সুধারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রভাত হালদার, অরুণ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, মিহির চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু রায়চৌধুরী, জহরলাল চট্টোপাধ্যায়; কুঞ্জবিহারী সিংহ, দিলীপ বসু ও কৃষ্ণা মজুমদার এবং দীপালি চক্রবর্তী।

বিভিন্ন দিনে কণ্ঠসংগীতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুবিনয় রায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, সুমিত্রা সেন, শ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, বলাই চক্রবর্তী, নীরেন্দ্র চৌধুরী ও নির্মলেন্দু চৌধুরী।

শাস্ত্রীয় যন্ত্র-সংগীতের অনুষ্ঠানে শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সেতার বাজিয়ে শোনান, সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন ওস্তাদ ফেরাখউল্লা খাঁ।

দো বন্দু আস

বোম্বের ডিয়ার ফিল্মস লক্ষ্যণ স্নায়ের ব্যবস্থাপনার কলকাতায় একটি সম্পূর্ণ ইন্সটিয়ান কলারে রঞ্জিত হিন্দী ছবি আরম্ভ করছেন, মার্চ মাস থেকে। সুব শর্মা রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন গোরা সেনরায়। তরুণ গীতিকার শ্রীসিং

রচিত গানে সুর দিচ্ছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক রাবি। এতে বিভিন্ন ভূমিকায় থাকছেন ধর্মেন্দ্র, আশা পারেশ, প্রাণ, হেলেন, নাজির হোসেন ও জয়ন্ত। সংলাপ লিখেছেন এস, কে, আবদুল্লা খালিস। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন বোম্বের বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীবিক্রম কাপুদর। ছবিটির নাম "দো বন্দু আস"।

আই, আই, টি স্টাক ক্লাবের নাট্যানুষ্ঠান

গত ২৪শে জানুয়ারী আই, আই, টি থিয়েটার স্টাক ক্লাবের স্মারোহ্মাট্টে উৎসব সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ক্লাবের সভার কিমল রায় রচিত "অভিনয়" একাঙ্কিকাটি মঞ্চস্থ করেন। বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর মতে নাটকটির অভিনায়শই এর প্রাণসম্পদ ছিল। কয়েকটি খুঁচা চরিত্রে অভিনয় করেন—শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবনাথ মিত্র ও শ্রীঅমিতাভ রায়। পাশ্চাত্য-গদ্যলি অভিনয় নাটকটির সার্থক অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে। এদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীতরুণ ঘোষ, শ্রীচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীভবেন চ্যাটজী। শ্রীঅমল সাহার মণ্ডসজ্জা তাঁর শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে অনুষ্ঠানটিকে সর্বাপেক্ষা সন্দর করেছিল। নাটকটির ব্যবস্থাপনার ছিলেন—ক্লাবেরই সাহিত্য বিভাগীয় সম্পাদক—উদয়কুমার হালদার।



'আভিশ্য চন্দল' ছবির একটি দৃশ্যে প্রতীকী ভূমিকায় মজা দে ও সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রদীপকুমার

মস্তকথা

কেন্দ্রাবাড়ি হাটে সার্বজনীন দৃষ্টিগোচর। অশ্রুচর্মীরা রায়ে কবিগানের ব্যবস্থা হয়েছে। সুবিখ্যাত কবিবাল নটবর সরকার এবং তাঁরই শিষ্যা মহিলা কবিবাল চম্পা রায়ের মধ্যে হবে কবির লড়াই। কাজেই আশে-পাশের কালীগ্রাম, মহানগর, কালীসিকা, গোবিন্দপুর, রামনগর, পাকুড়িয়া প্রভৃতি দশ-বিশ গাঁয়ের লোক কবিগান শোনার জন্যে সন্ধ্যা হতেই আসতে শুরু করেছে। রায়ে দশকের প্রচুর ভিড় হলো। এতো ভিড়ের কারণ হলো, প্রথমত গুরু ও শিষ্যা দুজনের মধ্যে কবির লড়াই; দ্বিতীয়ত বৃন্দ কবিবাল নটরাজ সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবিবাল একজন যুবতী রূপসী মহিলা।

আমরাও প্রোত্যদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়লাম। রাত্রি নয়টার কবিগান আরম্ভ হলো। আসরে নটরাজ সরকার এসেই গেলেন। সর্বশেষ এলেন চম্পা রায়। চম্পা রায় স্বাস্থ্যবতী, যৌবনবতী, দীর্ঘাঙ্গী রমণী। চম্পা রূপবতী। চম্পার টানা টানা নয়ন—দুটি নয়নে উজ্জ্বল তারা। তার নাক টিকালো, কপাল ছোটে। সর্বোপরি তার বুক দুটি সুউন্নত, যেন দুটি বিককল লুকিয়ে রেখেছে তার বসে। চম্পার সারা মুখখানি কমলা, স্বপ্নময়। চম্পার লালভাত অধর আর শূন্য দাঁতগুলি মনোহর। তদুপরি নিতম্বিনী চম্পা কুমারী। গ্রামীণ অঞ্চলে কবিবাল চম্পা রায়কে জন-গণ-মনের তারকা (People's actress) হিসাবে গণ্য করা হয়।

কবির আসরে চম্পা রায় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জন-গণ-মানসে এক অপূর্ব আনন্দের ছোঁয়াড় লাগে।

সর্বপ্রথমে চম্পা রায় আগমনী গান গেয়ে কবিগানের আসরের উন্মোচন করলেন—

"বল না আমার কাছে
জামাই শিব এখন কেমন আছে?
গিরি প্রাঙ্গণ বাঁচলে
তোমার এনে
পূর্ণ হলো বাসনা
ঘুচেলে বেলায় সকল কল্যাণ।
তুমি না এলে এখন
যেতো মা জীবন
মায়ে কিরে দেখা হতো না।
এখন জড়াল হৃদয়
দুঃখ মোল সমুদয়।
হলো কোটি চন্দ্র উজ্জয়
এ শিরিশপুরে।"

চম্পা রায়ের সুন্দর মিষ্টি স্বর। প্রোত্যদের অনুরোধে চম্পা রায় একটি আগমনী গান গাইলেন—

"আমি জিজ্ঞাসা করি
যগো তারিণী

কেমন কইরা হরের ঘরে
আছিলে তুমি
রাণী দেও গো জয়ধনি
তোমার উমা নইরা আসিল নন্দিনী।"

অতঃপর কবির লড়াই শুরু হলো। চম্পা রায় কবিবাল নটরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমনে হলো কলাবো নাম?

প্রত্যুত্তরে নটরাজ বলেছেন—কলাবো বা কলাবধুর নাম নবপত্রিকা। দুর্গা-পূজার প্রথম দিবসে কলাগাছের বধূর নয়ম শাড়ি ও সিন্দূরাদিতে ভূষিতা করে পল্লার বিধি। এই বিহিত্তি কলাগাছই কলাবো নামে খ্যাতা হন। গণেশের বাসনিকে কলাবোকে স্থাপিত করা হয় বলে কেউ কেউ কলাবোকে গণেশের স্ত্রী বলে থাকেন। আসলে কলাবো হলো নবপত্রিকা অর্থাৎ নরটি গাছের পাতা যেমন, কলা, ধান, হলুদ প্রভৃতি।

তখন নটরাজ সরকার কবিবাল চম্পা রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন—গণেশের শড় কেন?

প্রত্যুত্তরে চম্পা রায় বলেছেন—পার্বতী তাঁর পুত্র গণেশকে কৈলাস-পর্বতের স্মার রক্ষা করতে নিযুক্ত করেন। শিব কৈলাসপর্বতে ঢুকতে পারেন না, গণেশ বাধা দিতে থাকে। শিবের অন্ড-চরয় গণেশের সঙ্গে বৃন্দ করল কিন্তু পরাজিত হলো। বিক্র, ত্রা, ইন্দ্র, কার্তিক প্রমুখ দেবতার শিবের হয়ে বৃন্দ করলেন কিন্তু হেরে গেলেন। অগত্যা বিক্র, সুন্দরিন চক্রে সাহায্যে গণেশের হুঁত কেটে দিলেন। পার্বতী এতে ক্ষেপে গেলেন, তিনি পৃথিবী ধূসে হরার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু দেখে ত্রা, বিক্র, প্রমুখ দেবতার পার্বতীর আরাধনা করতে লাগলেন। পার্বতী বললেন, গণেশ যদি জীবিত হয়ে সব দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পায়, তবে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। কাজেই দেবতার হাতীর শড় গণেশের কাঁখে লাগিয়ে দিলেন। গণেশ জীবিত হলেন। সকল দেবতা স্বীকার করলেন যে, দেবজগত গণেশের পূজা সর্বোত্তম হবে। পার্বতী রাশি হলেন।

তখন চম্পা রায় কবিবাল নটরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—বৈষ্ণব কে?

প্রত্যুত্তরে নটরাজ সরকার বলেছেন—ব্রহ্মসংসার নৌকার পরাশর যুগের বহুনা পার করে সেরে। নৌকা বহন বহুনার মাঝামাঝি এল, তখন পরাশর যুগে ব্রহ্মসংসার রূপলাবন দেখে কল্যাণ হইলেন। পরাশর যুগে ব্রহ্মসংসারকে

মহানন্দে উপভোগ করলেন। ইন্দ্রা কন্যা ব্রহ্মসংসার গর্ভে সন্তান এলো। পরাশর যুগে আশীর্বাদ করলেন—তোমার গর্ভের সন্তান পরাশরকর্তা ও বেদজ্ঞ হবে। স্বীকৃতি প্রসূত হলো ব্রহ্মসংসার সন্তান। নামকরণ হলো বৈষ্ণব।

এইভাবে দুই কবির মধ্যে লড়াই চললো প্রায় চার ঘণ্টা। কবিরা প্রশ্ন এবং উত্তর দেন কবিতার মাধ্যমে।

প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে কবির আসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ভাগবৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারতের কত কথা আলোচিত হয়। কবিরা প্রয়োজন বোধ করলে সমসাময়িক সামাজিক ঘটনার আলোচনা করতেও ছাড়েন না। কবিবালদের এই সঙ্গ গ্রন্থের বিরুদ্ধে সঙ্গ্রাম করার দরকার হয়।

পূর্বে সামন্ত রাজারা অথবা জমিদাররা কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। জমিদারদের যুগ অতীত হওয়ায়, বর্তমানকালে জনসাধারণই কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহদান করেন। কবিবালরা এখন জনতার সভাকবি।

কবিগানের আসরের বিচার করলে দেখা যায়, (১) গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে আধুনিককালের আমোদ-প্রমোদের বেমন, সিনেমা, থিয়েটার, মার্কার্স প্রভৃতি ব্যবস্থা নেই, সেখানে কবিবালরাই জন-গণ-মানসে আনন্দ পরিবেশন করে থাকেন, (২) গ্রামীণ অঞ্চলে লোক-শিকার প্রচুর হয়, (৩) লোক-সাহিত্যের ধারাটি প্রবলমান থাকে, (৪) কবিগানের মাধ্যমেই বৈদ্যাস, বাঙ্গালী, কৃতিবাস, কাশীরাম দাস প্রমুখ মহাকবির গ্রামের শিক্ষিত, অশিক্ষিত নর-নারীর নিকট অদ্যাপি অজ্ঞ হতে রয়েছে, (৫) সর্বোপরি পরিবেশ, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যে যে ভারতীয় সংস্কৃতি-কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটি কবিগানের মাধ্যমে আজও গ্রামীণ নর-নারীর মধ্যে প্রচারিত হয়।

নিম্নলিখিত বক্তব্যে পারা রায়, মদ্রা-বস্তুর সাহায্যে পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে আধুনিককালে যে প্রচার পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তার চেয়ে কবিগানের মাধ্যমে যে প্রাচীন প্রচার পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে, তার শক্তি যথেষ্ট গুণে বেশি। কারণ, মহিলা পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থ শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমিত, অপর দিকে কবিগানের আসর অশিক্ষিত, অসংশিক্ষিত, শিক্ষিত সকল নর-নারীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কবিগানের আসরকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা জনসাধারণে স্বল্প ব্যয়ে বহুল প্রচার করা সম্ভবতর ও দ্রুততর হতে পারে।

খেলাধুলা



মোহনবাগান এবং বো, এ, সির প্রথম ডিভিশন হকি লীগের খেলার দৃশ্য

না. আঁচালে বিশ্বাস নেই

জিমি নাগরওয়ালার খুশি মনে কলকাতা ত্যাগ করলেন। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ অশ্বিনী-কুমারের ব্যক্তিগত দূত হিসাবে জিমি নাগরওয়ালার কলকাতায় এসেছিলেন বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশনের দুই উপদলের বিবাদ মেটাতে। দত্তরায় উপদল এবং গুপ্ত উপদলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত কাজকর্ম অচল করে দিয়েছিল। জিমি নাগরওয়ালার দুই উপদলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে অবশেষে দু'দলের বিবাদ মিটিয়েছেন। কলকাতা ময়দানে সূর্য হয়েছে হকি খেলা।

নাগরওয়ালার সাহায্যে কলকাতা ত্যাগের পূর্বে বি, এইচ. এ তাঁর সম্মানার্থে একটি ভোজসভায় আয়োজন করেন। এই ভোজসভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আই, এফ, এ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের ভাগ্যবিধাতারা। আমাদের সন্মানসম্পন্ন ক্রীড়াপরিচালক শ্রী এম. দত্তরায় তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলেছেন। এর মধ্যে দু'টি কথা অনেক ক্রীড়ামোদীকেই চমকে দিয়েছে। অনেকের কাছে ইচ্ছা করছে এ কি কথা শুনি আজ.....! তবে শ্রীদত্তরায় যে কথা বলেছেন তা যদি তিনি কার্বে পরিণত করতে পারেন তবে বাংলার হকির উন্নতির পথ কিছুটা সহজ হয়ে। শ্রী দত্তরায় বলেছেন যে তিনি বি, এইচ, এ-কে

পনেরো হাজার টাকা সাহায্য দেবার জন্য আই, এফ, এ-কে অনুরোধ করেছেন। আই, এফ, এ বার্ষিক সাহায্য হিসাবে বি, এইচ, এ-কে যাতে কিছু অর্থ মজুদ করে সে ব্যবস্থাও তিনি করছেন। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলকেও কিছু অর্থ বি, এইচ, এ-কে সাহায্য করবার জন্য শ্রী দত্তরায় অনুরোধ করেছেন। এই অর্থ

শ্রীঅমিত্রাভ

সাহায্য থেকে বাংলার ছেলেদের হকি খেলা শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে বলেও তিনি জানান।

উদ্দেশ্য খুবই শক্ত সম্ভব নেই। কিন্তু এই ধরণের লম্বা-চওড়া বৃষ্টি আমরা এঁদের মুখ থেকে অনেক শুনতে আসছি। যতক্ষণ না আসল কাজ তাঁরা করছেন ততক্ষণ কিছু বলা চলে না, কথায় আছে—“না আঁচালে বিশ্বাস নেই।”

রোভার্স ক্যাম্প

বোম্বাইয়ের রোভার্স ক্যাম্পের খেলা প্রায় মধ্যপথে উপস্থিত। রোভার্সের আসরে ভেতন ভেতন উল্লেখযোগ্য পরাজয় এখনও পর্যন্ত হয় নি। প্রথম রাউন্ডের খেলায় পাজাব পুলিশ দল মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপকে ২-১ গোলে পরাজিত করে এবং গোয়ার ভাস্কা ফুটবল ক্লাব ১-১ গোলে খেলা অমীমাংসিতভাবে

খেলা শেষ করে দেরানুন জেলা একাদশের সাথে। দ্বিতীয় দিন ভাস্কা ক্লাব ৪-০ গোলে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়েছে।

কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব শেষ পর্যন্ত শেষ আজকের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। প্রথমদিনের খেলায় মহামেডান স্পোর্টিং অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে কেরলার এ্যালিন্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিপক্ষে। ফিরাজি খেলার কিছু মহামেডান দল ৩-০ গোলে পরাজিত করে এ্যালিন্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবকে। এই খেলার কলকাতার মহামেডান দল সম্পূর্ণভাবে খেলার ওপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে। খেলার প্রথমার্ধে কোন গোল হয় নি, দ্বিতীয়ার্ধে নিজামুদ্দিন প্রথম গোল করেন মহামেডানের পক্ষে। দ্বিতীয়ার্ধে একটি পেনাল্টির সুযোগ অপচয় করে মহামেডান স্পোর্টিং দল।

ব্যাংকলোরের সি, আই, এল, দল হায়দ্রাবাদ টোলফোনকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। ফিরাজি প্রথম দিনের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় স্থান এয়ারফোর্ট দল জয়ী খেলার মধ্যপ্রদেশ একাদশের কাছে ৪-২ গোলে পরাজিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করেছে। ব্যাংকলোরের সি, আই, এল, দল পরমহীন খেলার গতবারের বিজয়ী মফস্বাল স্পোর্টিং ক্লাবের সম্মুখীন হল।

জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব ব্যাংকলোরের এল. আর. ডি, এ-কে ৩-১ গোলে পরা-



যোগীন্দর সিং

জিত করে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেন্ট্রাল রেলওয়ে দল রোভার্সের আসর থেকে বিদায় নিয়েছে। পাজাব পুর্লিশ দল অতি সহজে ৪-১ গোলের ব্যবধানে সেন্ট্রাল রেলকে পরাজিত করে তৃতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়েছে।

ময়দান হক লীগ

কলকাতা হক লীগের খেলা সুরু হয়েছে অবশেষে। ময়দানের প্রধান দল-গুর্লি লীগের খেলায় ইতিমধ্যেই আবির্ভূত

হয়েছে পূর্ণ শক্তি নিয়ে এবং আশানুরূপ ফলাফলও প্রদর্শন করেছে তারা। অন্যান্য-বারের মত এবারেরও হক লীগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য অচেনা মুখ। গাড়ি-গাড়ি বাংলার বাইরের খেলোয়াড় নিয়ে সব কটি নামী দলই তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

মরশুমের প্রথম খেলায় বি, এন, রেল দল শোচনীয়ভাবে ১০-০ গোলের ব্যবধানে রাজস্থান ক্লাবকে পরাজিত করে। মরশুমের প্রথম হ্যাটট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন যোগীন্দর সিং, জি, ভি, সিং চারটি গোল দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

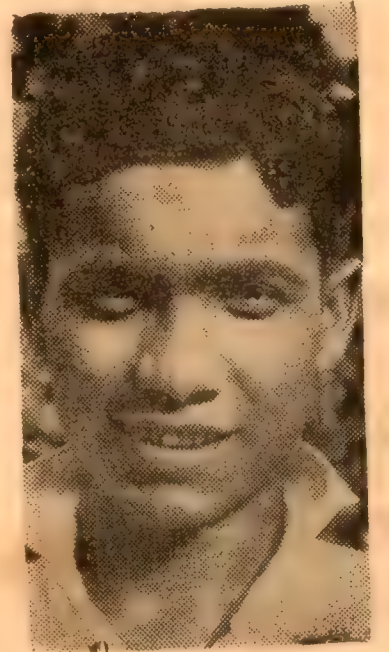
গতবারের রানাস আপ জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাব ৪-০ গোলে বো, এ, সি-কে প্রথম খেলায় পরাজিত করে লীগে যাত্রা সুরু করে। মোহনবাগান দলে নতুন আর্টস্ট মুখ দেখা যায় এবং নবাগত খেলোয়াড়রা আশানুরূপ ফলাফল প্রদর্শন করতে সক্ষম হন।

ইস্টবেঙ্গল দলও ৪-০ গোলে এন্টালী এ, সি-কে লীগের প্রথম খেলায় পরাজিত করেছে। ইস্টবেঙ্গল দলে নতুন দৃজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা যায়। ইনামদুর রহমান লীগের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। কিন্তু শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আরও বেশি গোলের ব্যবধানে জয়ী হওয়া উচিত ছিল।

লীগের সুরুতে দু'টি বাধা পেল কাস্টমস ক্লাব। জ্যাভেরিয়ান্স এবং খালসা রুজের বিপক্ষে কাস্টমস হারিয়েছে দু'টি মূল্যবান পয়েন্ট।

রবীন মুখার্জীর কৃতিত্ব

বাংলার তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় রবীন মুখার্জী মরশুমের স্টিসহস্র রান সংগ্রহ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন মুখার্জী এবছর বাংলার পক্ষে প্রথম রঞ্জী ট্রফির খেলায় আত্মপ্রকাশ করে উড়িষ্যার বিপক্ষে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। কলকাতা ক্রিকেটে এই মরশুমে ময়দানে প্রথম সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন রবীন মুখার্জী। রঞ্জী ট্রফির খেলায় তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ভারতীয় রেলদলের পক্ষে। রঞ্জী ট্রফির খেলায় প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী করার সৌভাগ্য থেকে রবীন মুখার্জী অপেক্ষা জন্মাবিগত হন। জম্মু-কাশ্মীরের বিপক্ষে তিনি ১০ রানে অপরাধিত অবস্থায় প্রায় সেঞ্চুরীর সম্মান করায়ত্ত করে এনেছেন, এমন সময় ভারতীয় রেল দলের অধিনায়ক ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। রবীন মুখার্জী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলেরও একজন নিতরযোগ্য খেলোয়াড়। স্টেট ব্যাঙ্ক ক্রিকেট দলের সদস্য রবীন মুখার্জী, অফিস লীগের খেলায় এয়ার কর্পোরেশনের বিপক্ষে ১০৮ রান সংগ্রহ করে



রবীন মুখার্জী

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক - বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচরিত-বঙ্গনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গদ্য ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আয়োজক করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঘরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস ভ্রমধ্যে অন্যতম—বিনি সহজ সরল ভাষায় পুণ্ডিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা সুশোভিত।

করিয়াজেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চরিত্র সেই বঙ্গনা-গানের সুসজ্জিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম-বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নতুন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু যুগীন চিত্রে

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

মরশুমে ২১০০ রান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

সমালোচনার মধ্যে ক্রে

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য ক্যাসিয়াস ক্রে'র ডাক পড়েছে অনেক-দিন পূর্বেই। কিন্তু নানা ছুতোর মহম্মদ আলি ক্রে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিলম্ব ঘটান। আসল কথা হল ব্যাক মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তিনি আমেরিকার সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভিয়েতনামে যুদ্ধ করার তীর বিরোধী। দায়িত্ব এড়াবার জন্য ক্রে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ক্রে'র এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়েছে আমেরিকায়।

ইলিনয়সের সেনেটর রবার্ট মাইকেল তীর ভাষায় ক্রে'র এই আচরণের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ক্রে সকলের সঙ্গেই মনের আনন্দে লড়ে বেড়াচ্ছেন আর ভিয়েতনামে ভিয়েত কংদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই তাঁর যত আপত্তি। তাঁর মতে আগামী মাসে জোরা ফোলীর সঙ্গে লড়াইয়ে নামার আগেই ক্রে'কে ধরে সেনা-বাহিনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার।

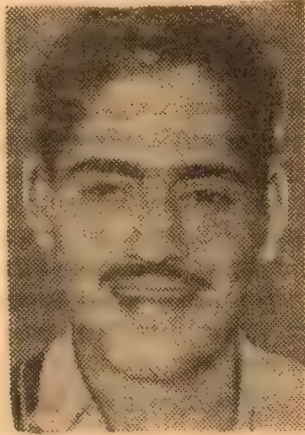


ক্যাসিয়াস ক্রে

দল বদলের পালা

ফুটবলে দল বদলের পালা শুরু হয়েছে। প্রতি বছরই ফুটবলের মরশুমের পূর্বে এই সময় বিভিন্ন দলের সমর্থকরা নানান জল্পনা-কল্পনায় আসর গরম করে তোলেন। দল বদলের শেষ সময়ের দিকের দিনগুলি আই, এক, এ অকিসের সামনে ফুটবল অনুরাগীতে পূর্ণ থাকে।

এ বছর দল বদলের দিকে এখনও পর্যন্ত খেলোয়াড়দের তেমন ঝোঁক দেখা যাচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত দু'টি মাত্র উল্লেখযোগ্য দল পরিবর্তন হয়েছে এবং এই দুই পরিবর্তনের ফলে লাভবান হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। মোহনবাগানের সেন্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক ইস্টবেঙ্গলে পুনরায় প্রত্যাভর্তন করেছেন। গত বছর অসীম মৌলিক ইস্টবেঙ্গল থেকে মোহনবাগানে আসেন। ইস্টার্ন রেলের নির্ভরযোগ্য স্টপার সঞ্জীব বসু এবছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলার জন্য



চন্দ্রশেখর

ছাড়পরে স্বাক্ষর করেছেন। মহম্মদ নঈম ছাড়পরে স্বাক্ষর করে আবার তা' প্রত্যাহার করার ফলে আর এক বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলবেন। হাওড়া ইউনিয়নের ফরোয়ার্ড প্রবীর গাঙ্গুলী এবং এরিয়ালস ক্লাবের গোলরক্ষক কানাই সরকার মোহনবাগান ক্লাবে এসেছেন।

এবছর বিভিন্ন দল যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষত কয়েকটি বড় দল। কারণ এইসব দলগুলি বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপের খেলার অংশগ্রহণ করছে বর্তমানে এবং আগামী মাসের পনেরো তারিখে দল পরিবর্তনের শেষ দিন। ফলে অনেক ওলট-পালটের সম্ভাবনা জল কিছটা ঘোলা করবে এবং পরোক্ষভাবে হাওয়া গরম করবে।

যমজ ভাইয়ের কীর্তি

দুই যমজ ভাই আলেক বেডসার আর



হেনরী রইনল

এরিক বেডসার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। খেলার মাঠে এই দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে অনেক মজা ঘটনা ঘটেছে। অল্প কয়েকদিন আগে ফুটবল মাঠে দুই যমজ ভাইকে নিয়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রান্সের সেজ শহরে।

দু'টি দলের মধ্যে একটি ফুটবল গ্যাচ চলার সময় এক পক্ষ এক গোলে অগ্রগামী ছিল, বিপক্ষে একজন খেলোয়াড় এই সময় আহত হয়ে মাটিতে পড়ে কতগায় হুটফুট করতে থাকেন এবং তাঁকে মাঠের বাইরে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা যায় সেই আহত খেলোয়াড় আবার মাঠে নামলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই খেলতে শুরু করলেন। এই খেলোয়াড়ই দলের পক্ষে পরিশোধকমূলক গোলটিও করলেন। এই সময় আবিষ্কৃত হল যে আহত খেলোয়াড়ের মত হুবহু দেখতে তার যমজ ভাই মাঠে নেমে গোল করেছেন। এই অন্যান্য কার্যের জন্য উক্ত খেলোয়াড়কে তিন মাসের দণ্ড দেওয়া হল এবং ওই খেলোয়াড় দল হারাতে শাস্তি-স্বরূপ দু'টি পয়েন্ট।

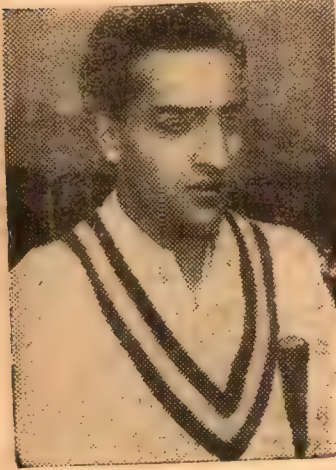
‘গুলাবি চা’

তাজা ও সেরা। একবার
থেয়ে দেখুন।

৪৫নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের
পথ)।

ভারতীয় টেস্ট দল

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ভারত সফর শেষ করে দেশে ফিরে গিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট দল বর্তমানে প্রস্তুত হচ্ছে আগামী ইংল্যান্ড সফরের জন্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারত বোম্বাই এবং কলকাতায় পরাজিত হয়েছে, মাদ্রাজের মাঠে খেলার ফলাফল হয় অসমীয়াসিত। তবে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা আশাপ্রদ ক্রীড়া-ধারা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। আগামী ইংল্যান্ড সফরের জন্য যে ভারতীয় টেস্ট দল গঠন করা হয়েছে, তাতে বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলার তরুণ পেস বোলার সুব্রত গুহ, পাঞ্জাবের স্পিনার বিধান সিং বেদী,



পতোদির নবাব

দিল্লীর তরুণ চোকস ব্যাটসম্যান রমেশ সাক্সেনা প্রমুখ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলী এই দল গঠন করে ক্রীড়ামোদী মহলের বিরাট এক আশংকার প্রশংসা লাভ করেছেন। মন্টি-মেয় কয়েকজন অবশ্য এই দল নির্বাচনের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে কেন জয়সীমা, সেলিম দুরানী এবং আব্বাস আলি বেগকে দলভুক্ত করা হয় নি। এই অবস্থায় মন্টিমেয় সমালোচক কি নতুনকে ভালবাসেন না, পুরাতনকে আঁকড়ে ধাক্কা এই অর্থহীন আসক্তি দেখে অবাক লাগে।

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরের শেষে আবার দেশে ফিরে যাত্রা করবে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের দিকে। নতুন সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের এই সুবর্ণ সুযোগ। এই দিক থেকে পুরাতন কয়েকজন যারা নিঃশেষিতপ্রায় তাঁদের পরিবর্তে কয়েকজন তরুণ উদীয়মান ক্রিকেটারকে সুযোগ দিয়ে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ভালই করেছে।

ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়েরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভারত সফরের ফলে অনেক শিক্ষা লাভ করেছেন। অভিজ্ঞতার অভাবে এবং প্রয়োজনীয় মনোবৃত্তি দৃঢ়তার অভাবে ভারত মাদ্রাজের চাঁপকে এই সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছে। ক্রিকেটে কথায় আছে—‘ক্যাচেস উইন ম্যাচেস’। এই সত্যটিকে সেদিন চাঁপকের মাঠে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারলে বোধহয় সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম পরাজয় ঘটত ভারতের হাতে।

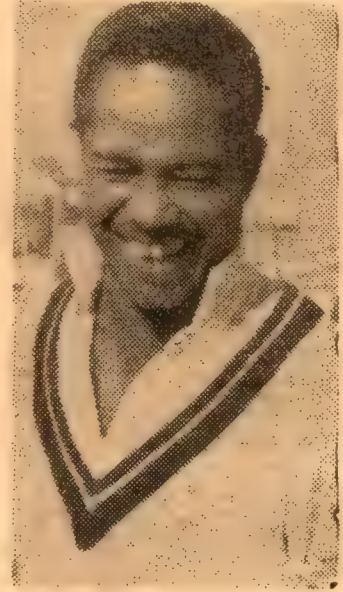
ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বোলার হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের ঘূর্ণি বলের দৌরাণ্ডো সবচেয়ে বেশি কাবু হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা। তাই ইংল্যান্ডের কাগজে পর্যন্ত ক্রিকেট সমালোচকরা লিখেছেন যে আগামী ইংল্যান্ড সফরে চন্দ্রশেখর যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার করবেন। এমন কি তাঁরা চন্দ্রশেখরকে বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেগ স্পিনার বলতেও সন্দেহ করেন নি।

ভারতের অধিনায়ক সমস্যা বরাবরই। কোন দিনই ভারত বলতে গেলে যোগ্য অধিনায়ক লাভ করতে সক্ষম হয় নি। পূর্বে তো রাজা-মহারাজা ইলে টেস্ট অধিনায়ক হওয়া সহজ ছিল। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক হার্ভে ডেব একটি লেখায় এই মন্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি বলেছেন যে ভারত আজ পর্যন্ত এমন কোন অধিনায়ক পায় নি, যার সবল এবং সফল নেতৃত্ব জয় লাভ করতে পারে। বর্তমানে পতোদির নবাব ভারতের অধিনায়কত্ব করছেন। কিন্তু পতোদি অধিনায়ক হিসাবে এমন কিছু অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন নি। হার্ভে ডে বলেছেন

যে পতোদির নবাবের পরিবর্তে অন্য কোন একজন যোগ্য অধিনায়ক নিয়ে ভারতীয় দল ইংল্যান্ড সফরে এলে খুবই ভাল ফলাফল প্রদর্শন করতে পারে। কারণ তাঁর মতে ভারতীয় টেস্ট দল বর্তমানে যে কোন দেশের বিরুদ্ধে যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম।

ভারত ফাস্ট বোলিংয়ের বিপক্ষে খেলতে পারে না বলে এতদিন একটা অপবাদ ছিল। কিন্তু এ বছর হল-গ্রিফিথের ফাস্ট বোলিং ভারতীয় খেলোয়াড়েরা যেভাবে পিটিয়েছেন তাতে সেই অপবাদ ঘুচে গেছে। এমন কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক গ্যারিফিল্ড সোবার্স একথা স্বীকার করেছেন।

তবে একথা ঠিক যে, ভারতীয় ফিল্ডারদের ফিল্ডিং আরও উন্নত করতে



সোবার্স

হবে। বর্তমানে ভারতীয় খেলোয়াড়দের গ্রাউন্ড ফিল্ডিং মন্দ নয়, কিন্তু ক্যাচ ধরতে গিয়েই তাঁরা যত গাউগোল করে বসেন। মাদ্রাজ টেস্টের পর স্যার ফ্রাংক ওরেল পর্যন্ত ভারতীয় দলের ক্যাচ ফেলা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এই ফিল্ডিং উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা এমন কিছুই সমস্যার নয়, প্রয়োজন শুধু একটু অনুশীলনের।

—প্রভুল সরকার

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চ্যবনপ্রাশ

17 MAR '67



চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী
দেহের পুষ্টিসাধনে ও ক্ষতবাহ্যে
আমলকীর অত্যন্ত গুণাবলী সর্বজন
বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যদুগ্ধ—
কৃষ্ণতিল তৈল, মিহরী ও অন্যান্য হস্তাশ্রয়
ও বহু মূল্যবান ভেষজ সমিগ্রণে ইহা
প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ
হাস্যন।

সর্দি, কাশ ও স্বরভাঙ্গর মহাঔষধ



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

মহালা উৎসাহ রোড, লাবনা নগর কলিকাতা-৪৬

অধ্যক্ষ - প্রিয়ব্রজেন বোস, এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী,
এক. সি. এস. (গওন) এম্. সি. এস. (আমেরিকা)
ঔষধগুরু কলকাতার হাসান শাহের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

অধিকারক - ডাঃ বরেন্দ্রনাথ বোস,
এম্. বি. বি. এস. (কলিং) আয়ুর্বেদশাস্ত্রী।

বঙ্গমতী

অজয় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ



১ বর্ষ : ৩৯শ সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

*** ● ***

9th March, 1967 * Vol. 71, 1



ফেমিলা ক্রীম

একালের রূপ-কথায় শেখ কবী

কোরোলাইন হাউস, কলিকতা ১



বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২৪০৬
আজকের সন্ধ্যা	...	২৪০৬
ভারতবর্ষ	...	২৪০৭
আন্তর্জাতিক	...	২৪৪২
পঞ্চাশ বৎসর আগে ও পঞ্চাশ বৎসর পরে (প্রবন্ধ) — নীরদচন্দ্র চৌধুরী		
এক চৈরাসুজীর মেঘ (গল্প)	— সত্যজিৎ সমাজদার	২৪৪৭
অনুভব	— চন্দ্রশূকর	২৪৬২
বিজ্ঞান-বিচিত্র	— ডাঃ বৃন্দাবন ভট্টাচার্য	২৪৬০
স্বপ্নাবলী	...	২৪৬৭
অনির্বচনীয় একটি ভ্রম	— অনন্ত সিংহ	২৪৬০
১৯৬৬ ডাক ভূগোল প্রতি পুরস্কার (প্রবন্ধ)	...	২৪৬২



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাববৃত্তি বৈষ্ণবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভক্তির সম্প্রদায়

প্রেমের অলঙ্কার

জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই

চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্প্রদায় সংস্করণ

মূল্য পনের টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বসুনাথস্বামী

মণিলাল ঐক্যাবলী

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃষ্ঠা—৩

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩০০ পৃষ্ঠা—৩

বাল্মীকিচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারের)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ভূত—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে দেহল—

পুরুষ—ইংরেজ ? একবার পেলে হর—

মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাশা—এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রভাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী বাগদলী স্ট্রীট, কলি-১২



বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রথম বাংলা কবিতা	- পার্শ্ব ভট্টাচার্য	২৪৭০
কথারা (কবিতা)	- শক্তি ভট্টাচার্য	২৪৭২
কিবলবিভেদে আদিপর্ব	- ডঃ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য	২৪৭৩
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	- আশাপুর্ণি দেবী	২৪৭৭
বিষম প্রচেষ্টার একটি কিস্তি অবসর	- সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৪৮৩
প্রথমোক্ত	-	২৪৮৬
কপালভ-ওয়েশে এবং ওয়েশে	- শিল্পী	২৪৮৭
কপালভ	-	২৪৮৯
বলাহুলা	- শ্রীমানসিংহ	২৪৯০

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কালিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)
মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডী কবিতা বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কবিতা পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলোক। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত বাঙ্গালীরা মুকুন্দরাম দ্বারা ও বৈদ্যনাথের বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি-ব্যক্তি দ্বারা কি করিয়া স্বর্গজনের দ্বারা হইতে পারে বাঙ্গালার সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কবিতা, ১। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৪। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচয়, ৫। কবিকঙ্কণ বঙ্গের বঙ্গভাষা (কবি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। কিস্তি কবিতা সমালোচনা এক ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য পাঁচকোটি টাকা

উপসাহক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভাষ্যাবলী-সমিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আমমনী, বিজয়া, অশ্বমেধ প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একটি মূল্য ১৪.

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিন্তয়ী কবিবিমোহন মহাকাব্য-
সারস্বতকুঞ্জের পুষ্পাঞ্জলি—সাহিত্য-জগৎজ্যোতি-
প্রতিভা ও মনীষীর অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকাব্য—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্ববিদ্যাসুন্দর রাজাধিরাজ মুকুন্দরাম
অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুধাসিক
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিহারীচন্দ্র

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, কৃত্তবীজ, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসান্তক। ৪.৫০
দ্বিতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, প্রভাবোদ, দ্ব্যধিবেশ-
পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৪.৫০

প্রাচীন সাহিত্যের সৌরভ-সুধু

সাহিত্যের চির-সমৃদ্ধ কোকিল—
রামপ্রসাদ

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অম্বদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সভাপীর, খেড়োভেদে কোকিল, কদম্বক, হিন্দী কবিতাবলী, কবিতাবলী, চণ্ডী, নাগান্তক, সংস্কৃত, পার্শ্ব, হিন্দী নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, কৃত্তবীজ, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালোপ, কবিতাবলী।

মূল্য দুই টাকা

কলকাতা প্রাইভেট লিমিটেড: ১৪০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



সাপ্তাহিক বসুমতি



সম্পাদিকা : জয়ন্তী সেন

জাত্যর্থিক

৭১ বর্ষ : ৩১শ সংখ্যা—মূল্য-২৫ পয়সা
হুস্পতিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 9th March, 1967

অজ্ঞেয় অজয়-মন্ত্রিসভা

যুক্তফ্রন্ট মান্দামণ্ডলী গঠিত হয়েছে
ময়দানের অবিস্মরণীয় সমাবেশে যুক্তফ্রন্ট
আঠারো দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।
বলা বাহুল্য, দপ্তরগুলিতে যারা
অভিযুক্ত হয়েছেন জনসাধারণ দীর্ঘকাল-
ব্যাপী তাদের সংগ্রাম ও সাধনা প্রত্যক্ষ
করেছেন। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে
রূপদানের জন্য এতোদিন তারা প্রবল
প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করেছেন, কয়েকটি
স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। পশ্চিম-
বঙ্গের নিপীড়িত বঞ্চিত জনগণ যে বিপ্লবের
আশা করেছেন তা এখন আর স্বপ্ন নয়,
জড়ের মতো সমুপস্থিত। আঠারো দফা
কর্মসূচীর মধ্যে বৈশ্ববিক নীতি গ্রহণের
যে ঘোষণা জানানো হয়েছে তা সার্থকতা-
মণ্ডিত হবে আমরা বিশ্বাস করি। অবশ্য
সং, বোম্বা ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির
মন্ত্রিত্বের আসনে বসলেও এমন আশা
করা অন্যায় যে, স্বাভাবিক পরিবর্তন
সাধিত হবে। কারণ, এতোকাল কংগ্রেস যে
অনাসুজি করে গেছে তা একদিন ডাস্ট-
বিনে নোংরা পচা বস্তুর মতোই নিক্ষেপিত
হবে কিন্তু তাঁদের শাসনে দুর্নীতির স্বারা
দেশের সম্পদ অপহৃত হয়েছে। সেই
হৃত বস্তু উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত
আমাদের মন্ত্রির নিবাস ফেলার সময়
নেই। তবে আশা এই যে, বর্তমান
মন্ত্রিমণ্ডলী সম্বন্ধিসম্পন্ন, বৈশ্ববিক
পন্থা গ্রহণে সূদৃঢ়। তাহাড়া যে আমলা-
তান্ত্রিক শাসন এতোকাল পশ্চিমবঙ্গের

দুঃখ-দুঃশাকে তীরতর করেছে সেই
ধরনের শাসনের অবসান হতে চলেছে।
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যে-শাসনের পরি-
বর্তন চাচ্ছিলেন, তাই যে বর্তমান
শাসনব্যবস্থাকে যান্ত্রিকতা থেকে উদ্ধার
করতে পারবেন—একথা এখন আর
অবিশ্বাস্য নয়। কারণ আশা ও আনন্দ
নিরে ভীরাও আজ এগিয়ে এসেছেন।
একমাত্র তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার
ফলেই সমস্ত বাধা অপসারিত হতে
পারে। গ্রাম থেকে শহরে, তাই তাঁদের
বুদ্ধি, প্রাণ ও জেগেছে অবিশ্বাস্য জীবন-
চাপল্য। মাঠে-ঘাটে-কারখানায়—জীবনের
সর্বক্ষেত্রে হতে হবে তাঁদের জাগ্রত
প্রহরী।
বিগত শাসনযন্ত্রের নিষ্ঠুরতার শেষ
হয়েছে। প্রশাসনিক অব্যবস্থা দুর্নীত
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রে-খামারে
মিলিত মানুষগুলির মধ্যেও সংগঠনী
শক্তি গড়ে উঠুক। তাই করে তুলবেন
লোকায়ত্ত সরকারকে শক্তিশালী। কারখানার
মধ্যে ফার্নেসের অগ্নিকুণ্ডে দুঃখের দাহ
এতোদিন বাদের জীবনপাত করতে হয়েছে
সেখান থেকে উৎসারিত জীবনীশক্তির
প্রচণ্ড অগ্নিশকলিলে জন্মীভূত হয়ে
যাবে লোভীদের মনোকার অজংলিহ
পাহাড়। শক্তিশালী হবে তাঁদের
প্রাণেশ্বর্যে আমাদের লোকায়ত্ত সরকার।
লুপ্তিত সম্পদ ও লুপ্তায়িত পাহাড়-
প্রমাণ খাদ্যবস্তুর সন্ধান করা আশা
প্রয়োজন। বিগত দিনের শাসনকে অনেকে

পারামিট-এর রাষ্ট্র বলে অভিহিত
করতেন। সেই পারামিট-এর রাষ্ট্রের
অবসান হয়েছে। বর্তমান সরকারকে
দেখতে হবে দুর্নীতির পথে কারা সেই
পারামিট ইস্যু করেছে আর কারাই বা গ্রহণ
করেছে। আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের
বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আশা করছি
আমলারা নির্দোষ হবেন এবং বিগত
দিনের জটিল শাসনে সে দোর থেকে দূর
হুত নয়, তাদের সেখান থেকে বিদায়
দিতে হবে। নোংরা, পচা ও দূষিত মনো-
ভাবাপন্ন ব্যক্তির যদি শাসনের ক্ষেত্রে
থাকে, তাহলে তার ভিত্তি শিথিল হবে
স্বাভাবিক। সুতরাং তাদের বিদায় হতেই
আসন্ন হবে, ততোই আনন্দ।
যাহোক বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী প্রথম
দিবসেই যেসব কাজে হাত দিয়েছেন তা
অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচায়ক। ছাটাই
সরকারী কর্মচারী, স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পো-
রেশনের বরখাস্ত কর্মচারীদের পুন-
বহালের ব্যবস্থা করে প্রশংসনীয় কাজ
করেছেন।
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারী
কর্মচারী, শিক্ষক, পরিগত বুদ্ধিজীবী,
মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের
স্বপক্ষে। সুতরাং এই সরকারের অগ্রগতি
রোধ করার মতো অব্যাহত দুঃসাহস চূর্ণ-
বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

সিদ্ধান্তকীর্ণ

আজকের মানুষ

মস্তিষ্ক আর নেতৃত্ব এক জিনিস নয়। কেউ ক্ষমতার আসন পেয়েছেন বলেই তাঁকে বীর আখ্যা দিতে পারি নে। প্রকৃত জননায়ক তাঁকেই বলবো যিনি জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, সাধারণ লোকের দুঃখ-দৈন্যের পরিক। অজয় মুখার্জি সেই প্রকৃত অর্থেই নেতৃত্বের আসন লাভ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের লক লক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী প্রীত্বেন্দ্র সেনকে পরাজিত করে অজয় মুখার্জি মুক জনতার দুঃস্বপ্ন ইচ্ছেকেই যেন ভাষা দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন। মহানন্দে তাই তারা তাঁকে নতুন নেতা বলে বরণ করে নিয়েছে।

অথচ প্রবল পরাক্রমশালী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়বার মতো অজয়বাবুর কী ছিল উল্লেখ করার মতো? না ছিল অস্ত্রবল না গাড়ি-খোড়ার সহায়। অজয়বাবুর একমাত্র পুঁজি তাঁর সত্যতা ও কর্মনিষ্ঠা, আর একমাত্র ভরসা বাংলা-দেশের সাধারণ মানুষ। আজ আরাম-বাগের মানুষ তাই ছল করে নি লোক চিনে নিতে, শিখা ছিল না তমলুক কেন্দ্রের ভোটেরদেরও মনে। অজয় মুখার্জির ভাষা, তাঁর দেশসেবার রোমাঞ্চকর কাহিনী বাংলাদেশের প্রাসাদ-কুঠির কোন মানুষটির মজানা আছে আজ?

রাজনীতি করতে নেমেছিলেন অজয় মুখার্জি যদি বা মস্তিষ্কের লোভে নয়, নেতৃত্বের প্রতি কোন মোহ কোনকালেই ছিল না তাঁর। দেশসেবা, দেশকে স্বাধীন করার তাগিদেই অজয় মুখার্জি রাজনীতির মঞ্চে আসেন। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক যখন গান্ধীজী দিয়েছিলেন, তখন অজয় তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বি এসসি ক্লাসের ছাত্র। অজয় দেখলেন পরীক্ষাগার তাঁর দেশ জুড়ে, কেবল সাময়িক লেবরেটরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সেই থেকে প্রত্যেক রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে অজয়বাবুর জীবন একাকার হয়ে গিয়েছে।

বহুজনহিতার চ বহুজন সুখার—এই হলো অজয় মুখার্জির জীবনাদর্শ। নিজের দিকে ফিরে চাওয়ার অবকাশ পান নি কোনদিন, সে-অবকাশ চানও নি কখনো। তা যদি চাইতেন আরামের জীবন পেতেন ফেলে নির্বাতনের পথ বেছে নিতেন না। উত্তরপাড়ার

সম্রাট জমিদারবংশে জন্ম নিয়ে তমলুকের সাধারণ লোকের মধ্যে সম্যক জীবন বাপন করতে রাজী হতেন না। বিদ্যারম্ভ উত্তরপাড়াতেই, পরে তমলুক এবং কলকাতায়। রাজনৈতিক জীবনও প্রধানত তমলুকেই কাটে তাঁর। বাংলা-দেশের মধ্যে তমলুকের বা মেদিনীপুরের রাজনীতি-সচেতনতা আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এর জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব অজয় মুখার্জিরই প্রাপ্য। ১৯৪২ সনের আগস্ট আন্দোলনের সময় একমাত্র মেদিনীপুরেই স্বাধীনতার কাণ্ডা উঠেছিলো, দুর্ভাগ্য ইংরেজ শাসন একমাত্র এখানেই কিছুকালের জন্যে শত্ৰু হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর



অজয় মুখোপাধ্যায়

অপূর্ব সংগঠনী শক্তির ফলেই আগস্ট বিপ্লবের সময় এখানকার ব্রিটিশ শাসনের সমস্ত চিহ্ন—পোস্ট অফিস, কোর্ট-কাছারি, রেলস্টেশন, অফিস-দপ্তর সব নিশ্চয় হয়ে গিরোছিলো বিপ্লবের আগুনে। অজয় মুখার্জির সৌদিংকার সগ্রাম-কাহিনী হুল-কথার মতো শোনার, কিন্তু এতকু বাক্যে তেরি হয় না যে, এই উজ্জ্বল অতীত যার, তাঁর পক্ষে কোন বিপাকই অপরাধের নয়।

১৯৪২ সনে শেষ বার, কিন্তু তার আগেও অজয় মুখার্জিকে কারাবাস করতে হয়, অনেক নিষাভূত, নিষীড়ন সহ্য করতে হয়। প্রলোভনও কম আসে নি তাঁর কয়েক উচ্চ পদের এক মোটা বাঁনের

চাকরি, রঙিন জীবন ইত্যাদির। কিন্তু পূর্বত টলানো মাঝে তো অজয়কে জয় করা থাকে না। এমন কি তমলুক ছেড়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক আসরেও আসতে চাইলেন না তিনি, গ্রামসেবার মধ্যেই তাঁর নিজেকে ঢেলে দিলেন। অজয়বাবুকে তাই কংগ্রেসের উচ্চ পদের দিকে হাত বাড়াতে দেখা যায় নি কখনো, উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বরাবর মন থেকে দূরে রেখেছেন। তমলুক মহকুমা বা মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের প্রধান পদে তাঁকে দেখা গিয়েছে বটে, কিন্তু প্রদেশ বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কেউকেও কখনো তাঁর লিপ্সা ছিল না। সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে একান্ত সেবকের জীবনযাপন করাই ছিল তাঁর ক্রাম্য। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস অফিসই ছিল তাঁর ঘর-বাড়ি দুনিয়া সব। কিন্তু উর্ধ্বে তাঁকে উঠতেই হলো।

১৯৫২ সনে ডাঃ রায় তাঁর মস্তিষ্কভার যোগদানের জন্যে অজয় মুখার্জিকে ডাক দিলেন। গ্রামের মানুষ শহরে এলেন, সেচদস্তরের মস্তিষ্ক পেলেন, গাড়ি, সরকারী বাসভবন, বিলাসসামগ্রী সবকিছু। কিন্তু ত্যাগী পুরুষের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল না কিছু। সেই থেকে ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিলেনই ক্ষমতার আসনে—তারপর কামরাজ পরি-কল্পনায় যদি ত্যাগ করে আবার তমলুক করে গেলেন। কিন্তু বৃহত্তর সংগঠনের দায়িত্ব এলো এবার তাঁর ওপর, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ পেলেন ১৯৬৪ সালের জুন মাসে।

১৯৬৬ সালের ২০শে জানুয়ারী দিনটি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ইতিহাসে কালো দিবস বলে চিহ্নিত হওয়ার মতো। এই দিনই অতুল্য-প্রফুল্ল-চক্ৰ চরম লাঞ্ছনা ও অপমান বরণ করে ৪৫ বছরের কংগ্রেসসেবী অজয় মুখার্জিকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করেন, আর তাঁদের পতনের নীতিটিরও রোশন করা হয় সেই মহাত্মে। অজয়বাবু সৌদিং কংগ্রেস হাই-কমান্ডের সেরা সেরা নেতার কাছে গিয়ে প্রত্যাবর্তন হয়ে বসেছিলেন, তাঁর শেষ আবেদন সুপ্রীম কোর্টের কাছে, পশ্চিমবঙ্গের জন-সাধারণের দরবারে। 'বাংলা কংগ্রেস' নামে নতুন রাজনৈতিক দলের পতন করেন এবং অঙ্গকালের মধ্যেই বহু সং কংগ্রেসী এম-এল-এ কংগ্রেস ছেড়ে অজয়বাবুর পেছনে এসে দাঁড়ান। সুপ্রীম কোর্ট সুবিচার করেছেন, রায় গিয়েছে আবেদনকারী অজয়বাবুরই পক্ষে। তমলুকে থেকে রেকর্ড ভাঙে জয়ী হয়েছেন তিনি, আরামবাগে প্রফুল্ল সেনকে ধরাশায়ী করেছেন। সেই নিরহংকার, সরল ও মাটির মানুষটিই আজ পশ্চিমবঙ্গের জননেতা অজয় মুখোপাধ্যায়।

মাদ্রাজে নতুন অধ্যায় :

ডি এম কে'র পেছনে রাজাজীর ছায়া

[স্বতন্ত্র দলের পিতৃপ্রতিম চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর আশীর্বাদ-পুষ্ট ডি এম কে নেতা শ্রীআম্বাদুরাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মাদ্রাজে এক নতুন মন্ত্রিসভা তথা নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে চলেছেন। কালের কঠিন বিচারে ভারতের সর্বত্র কংগ্রেসী অপশ্যাসনের যে তীর পরাজয় ঘটেছে, কতিপয় রাজ্য তা' প্রায় অপ্রত্যাশিত কংগ্রেসী পতন আনয়ন করলেও তামিলনাড়ু যেমন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে অন্যত্র তা' সম্ভব হয় নি।

মাদ্রাজকে নিয়েই অতএব আমাদের আলোচনা শুরুর। আগামী সংখ্যায়—উড়িষ্যা।]

ছাত্র হত্যার জের

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তামিলনাড়ুর ছাত্র সম্প্রদায়। সাল ১৯৬৫। ভাষা নিয়ে এমন লড়াই এবং সেই তের মাসের লড়াইকে মনে রেখে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসী সরকারের ছাত্র-দমন নীতির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্ষণশাসন অপেক্ষার এমন নজির অদ্বিত-পূর্ব। মাদ্রাজ সেদিনের নির্বাচন হত্যা এবং অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে কামরাজ-সহ কংগ্রেসী নেতাদের চূড়ান্ত-ভাবে পরাজিত করে। ছাত্ররা কলেজ-হস্টেল ছেড়ে দলে দলে গ্রামে-গ্রামান্তরে কংগ্রেসবিরোধী প্রচারে নেমে পড়ে-ছিলেন। সভা ডেকে প্রস্তাব ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেসকে নির্বাচনের মাধ্যমে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য। তাদের সে প্রতিজ্ঞা ফলবর্তী হয়েছে। 'মরের ছেলে' কামরাজ নামারকেও কমা করে নি ভিরুধুনগর। তুল হয়ে গেছে কংগ্রেসী হিসেবে। কামরাজকে হাতে রাখলেই তামিলনাড়ুকে বাগে রাখা যাবে, এই মারাত্মক ভ্রমের মশাল দিতে হচ্ছে এখন কংগ্রেসী রাজনীতিককে।

নির্বাচনোত্তর হিসাব-নিকাশে বসে কামরাজ-অনুরাগী কংগ্রেসীরাও কংগ্রেসী মহীরুহ পতনের এবিস্বিধ ব্যাখ্যাই করে-ছেন। হিন্দীবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি আর সেই সময় ভক্তবৎসলম মন্দিরসভার জনগণের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত লড়াই, ফলত ছাত্রদের প্রতি কঠোর ও নিষ্ঠুর নীতির প্রয়োগই তামিলনাড়ু কংগ্রেসী পতনের মূখ্য কারণ। বস্তুত, কামরাজ-অনুরাগী-দের এ ব্যক্তিটির সারবস্তা অনস্বীকার্য। পশ্চিম বাংলার সেন মন্দিরসভাও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মদগর্বে বিগত খাদ্য আন্দোলনের সময় জমিদারসুলভ মনো-



শ্রীমোহরজী দেশাইয়ের সঙ্গে আলোচনারত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ভাব প্রদর্শন করে জনতার প্রবল বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন। ভক্তবৎসলম মন্দির-সভাকেও মারকুটে স্বভাবে গ্রাস করেছিল। তখন জন-প্রতিনিধিরা বারংবার বলে-ছিলেন কংগ্রেস গণদাবিকে কিছুমাত্র আমল না দিয়ে পদলিপ-নির্ভর যে শাসনকে আলিঙ্গন করছে তন্দ্বারা কমতাসান দল আপন চিতায় কাঠ সাজাচ্ছেন মাত্র। কমতাসন সরকার না কেন্দ্রে না রাজ্যে, এ উপদেশে কর্ণপাত করেন নি। পতন অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছে। গণ-বিভূকা কোথাও খাদ্য, কোথাও ভাষা, কোথাও সম্পদ কারণ ব্যতিরেকেই অপশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিকোভ প্রদর্শন করেছে। কংগ্রেসীরা নির্বাচকমণ্ডলীকে আবহমান-কালের ভাড়ি হিসেবে গণনা করে, দেশ বখন জ্বলছে তখন উস্মাদ নিরোর মতো কোথাও তুড়ি দিয়ে দিয়ে গান গেয়েছেন, কোথাও লম্বা কবুতা বমন করেছেন। মাদ্রাজের তরুণতম নেতৃর্ষে পরিচালিত ডি এম কে দল, হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ধারকবাহক উত্তর ভারতীয় নিগীড়নের জবাব দেওয়ার জন্য ঐকান্তিকতার সঙ্গে প্রস্তুত হয়েছে। শ্রদ্ধা ডি এম কে-ই নয়; প্রস্তুত হয়েছিলেন ধর্ম-বর্ণ নির্বি-

শেষে অহিন্দীভাষী জনগণ। ফল ফলেছে ১৯৬৭ সালে। অপ্রত্যাশিত ফল। স্বয়ং ডি এম কে নেতা বলছেন, কংগ্রেসের এ হেন পরাজয় তাঁকেও বিস্মিত করেছে। বিস্মিত হয়েছেন, কংগ্রেস-প্রধান কৌশলী নির্বাচনবিদ কামরাজ নামার তথা সমগ্র কৌতুহলী দুনিয়া।

ডি এম কে ছাত্র হত্যার জন্য মূখ্যত দায়ী করেছে রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি কাকানকে। কাকান পরাজয় বলল করেছেন ভরুণ আইনজীবী ডি এম কে সদস্য ও পি রমণের হাতে। উভয়ের ভোট সংখ্যার ব্যবধান কুড়ি হাজার।

কামরাজ-অনুরাগীরা মনে করেন, যে ছাত্র প্রতিনিধিদল ভক্তবৎসলমের সাধারণ-প্রার্থী ছিলেন, মূখ্যমন্ত্রী দান্তিকতার সঙ্গে তাঁদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করলে পরিস্থিতি ভিন্নরূপ গ্রহণ করত।

মূখ্যমন্ত্রী হাসের প্রায় উদ্যোগের অন্যতম কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সি সুব্রহ্ম-নিরম অন্যপক্ষে তামিলনাড়ু কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে বাড়ী করেছেন কামরাজের তুল নির্বাচনী কৌশলকে। তার মতে, কামরাজের ভ্রান্ত নির্বাচনী কৌশলই বত নষ্টের মূল। কিন্তু এ যুক্তি

রূপে টেকে না। যদিও স্বল্প কাম-
রাজের পরাজয়ের মূলে তাঁরই দ্রাস্ত
নির্বাচনী কৌশল কিছু পরিমাণে প্রভাব
বিস্তার করেছে বলেও মনে করেন
অভিজ্ঞমহল। রাজ্যের অন্যতম প্রভাব-
শালী কংগ্রেসী নেতা এস রামস্বামী
নাইডুকে কংগ্রেস মনোনয়ন না দেওয়ার
ইনি গিয়ে স্বতন্ত্র দলের টিকেট সংগ্রহ
করে কামরাজ-বিরোধিতায় আপন শক্তি
নিয়োগ করেছিলেন। আর ভিরুধুনগরের
পার্ববতী সাতুরই ছিল নাইডুর
নির্বাচনী এলাকা। তিনি শ্রদ্ধ সাতুরে
রাজ্য কংগ্রেস প্রধান পি কৃষ্ণস্বামীকেই
পরাসূত করেন নি, ভিরুধুনগরে কামরাজ-
প্রতিদ্বন্দ্বিতা তরুণ শ্রীনিবাসনের পক্ষে
তার প্রভাবও কাজে লাগিয়েছিলেন। নাইডু-
প্রভাবিত নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে আবার
শ্রীনিবাসনের স্বজাতিগোষ্ঠীর আত্মীয়তাও
ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে
ভিরুধুনগরে কামরাজী কৌশল কিছুটা
চোট খেয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু
রাজ্যের সামগ্রিক নির্বাচনী ফলাফলের জন্য
একা কামরাজকে দায়ী করা অর্থহীন।
অবশ্য তামিলনাড়ু কংগ্রেস ভূস্বামী
ও ধনিকগোষ্ঠীর ওপর শ্রদ্ধ বেশ
নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, জম্বীকার করা
যায় না। কিন্তু ধনবানরা টাকা চেনেন।
কংগ্রেসী নীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর
প্রয়োজন তাঁদের আদৌ নেই। যদিও
সরকারী নীতি ধনিক স্বার্থের পরিপন্থী
কি না তা তারা সবদাই তুলানো উল্লেখ
করে দেখেন। তামিলনাড়ু কংগ্রেস ধনীর
অর্থভাণ্ডারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে
ধনীমহলে মনোনয়ন বিলিয়ে যদি নীতি-
চ্যুতির দ্রাস্ত পথ অবলম্বন করেই
থাকেন, তবে তার জন্য সামগ্রিকভাবে
নেহরু-পরবর্তী কংগ্রেসের উন্নত ধনিক-
বোঝা নীতিই দায়ী, কোন রাজ্যের
বিশেষ নির্বাচনী কৌশল নয়।
মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসকে কংগ্রেসী মনোনয়ন-
প্রাপ্ত রাজন্যবর্গ পাস্তাই দেয় নি। তবু
কংগ্রেস সেখানে নিজের মান খুইয়েও
কোনরকমে নির্বাচনী বৈতরণী পার
হওয়ার চেষ্টা করেছে। শিয়রে শমন
উপস্থিত হলে নিমজ্জমান অস্তিত্ব এই-
ভাবেই টিকে থাকার প্রয়াস পায়। একা
কামরাজ কি করবেন। সমাজতন্ত্র
বিস্মরণের ভয়াবহ ফলশ্রুতি সম্পর্কে
কামরাজ নিজে বরং বহুস্থানে সতর্কী-
করণ ভাষণ দিয়েছেন। কংগ্রেসী নেতৃত্ব
কর্ষণাত করে নি। এই সুব্রহ্মনিয়ম-
গোষ্ঠীই কামরাজকে চেপে গিয়ে মদ্রামল্যা
হাস করে দেশবাসীর কাছে সর্বশেষ
সহনীয় কুটোটির ওপর আরও ভার
চাপিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেসী বিপর্যয়
সে সব কারণেই এসেছে। দায়িত্ব

স্বলম্বিত করে সুতরাং এখন কোন
কেন্দ্রীয় নেতাই পার পাবেন না। বরং
কংগ্রেস যদি আজও অক্ষয় বৃক্ষ নেতৃত্ব
পরিহার করার চেষ্টা না করে পল্লভকেই
আঁকড়ে থাকতে চায় এবং গণতন্ত্রে পতন-
অভ্যুদয়ই রাজনৈতিক দলগুলির ভাগ্য-
লিপি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়
তবে ঠুটো নীতি ও বৃক্ষ নেতৃত্বের ভারে
আগামী পাঁচ বছরে আরও প্রচণ্ড 'আঘাত'
সহ্য করার জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত।
সুব্রহ্মনিয়ম নিজে ভাবার প্রশ্নে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ডি আলেকসেন্ডারের সঙ্গে
একটা লোকভোলাদো পদত্যাগের
কৌশল গ্রহণ করে আপন রাজ্যে আগামী
নির্বাচনে তুরে যাবার পথ পরিষ্কার
করে রাখতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়
তাঁদের মতো 'ভাবাদরশীকেও (?)
'নিম্ন' নির্বাচকমণ্ডলী খুব সতর্কতার
সঙ্গেই বিচার করেছিলেন এক পরিশেষে
কমা করেন নি। উভয়েই ভক্তবৎসল ও
কামরাজের মতই প্রতিনিধিষের আসন
ছেড়ে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছেন।
সুব্রহ্মনিয়ম-গোষ্ঠীর মার্কিনী প্রীতি
দেশকে ঋণভারে আকুষ্ঠ ভুবিয়েছে;
দারিদ্র্য আরও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত এবং
ধনীকে আরও ধনসম্পত্তে উৎসাহিত করেছে।
দেশের মানুষকে বলাদ ঠাউরে এবং তাদের
কাঁধে কংগ্রেসী জোয়াল চাপিয়ে আত্মতৃপ্ত
নেতৃত্ব বিলাস-বাসনের মধ্যে কালাতিপাত
করে গণকিবাসকে আহত করার যে
অমার্জনীয় কু-নীতি অনুসরণ করেছে,
বিপর্যয়ের মূলে সেটাই মূখ্য কারণ।
অন্যান্য কারণ আনুযায়িক মাত্র।
সুব্রহ্মনিয়ম মতই ফলাও ব্যাখ্যার আশ্রয়
নিম্ন, তন্দ্রানার কংগ্রেসী দ্রাস্ত নীতিকে
কোন ব্যাতিবিশেষের ঘাড়ে ফেলে তরে
বাওয়া আর সম্ভব নয়। কংগ্রেসের
সামগ্রিক পতনের অন্যতর ব্যাখ্যা নেই।

ডি এম কে-র অগ্রগতি

স্বতন্ত্র দ্রাবিড়স্থানের বায়না নিয়ে
দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম দলের জন্ম।
কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়,
নিত্যন্ত দক্ষিণী স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গিতে
এই আঞ্চলিক রাজনীতির প্রবক্তারা তামিল-
নাড়ু প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে
এবং ১৯৫৭ সালেই সর্বপ্রথম নির্বাচনে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পনেরটি আসনও
দখল করে। ১৯৬২ সালে ডি এম কে-র
অধিকারে আসে অপ্রত্যাশিত আসন সংখ্যা,
পঞ্চাশটি। লোকসভার তামিলনাড়ু
ডি এম কে সদস্য প্রেরণ করেছিল
আটজন। ডি এম কে-র এই অভিনব
সামফলা আঞ্চলিক দলটিকে ১৯৬৭ সালের
নির্বাচনে অধিকতর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

জয় ভরসা দান করে; আর বিগত ভাষা
আন্দোলন এতদ্বিধায়ে ডি এম কে-র জন্য
রাস্তাও পরিষ্কার করে রাখে। বিগত
মিউনিসিপাল ও স্থানীয় নির্বাচনে
ডি এম কে বেশ দর কষাকাঁষ করে
জাঁদরেল রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে
নির্বাচনী আঁতাতও করেছিল। যোগ
দিয়েছিল স্বতন্ত্র এবং মদ্রামল্যা লাগের
সঙ্গে একটি নির্বাচনী মোচায়। এইভাবে
পূরো মাত্রায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের
মাধ্যমে বিশিষ্ট দলের সঙ্গে নিজেকে
পাণ্ডিত্যের করে নেয় ক্ষুদ্র আঞ্চলিক
স্বার্থসচেতন দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম
দল। আর এই সময়ে থেকেই রাজ্য রাজ-
নীতিতে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার
প্রয়োজনে শক্তিজোট সৃষ্টির আলোচনার
ডি এম কে-ই লাভ করে বিশিষ্ট মর্যাদা।
কংগ্রেসবিরোধী জোট গঠন একক
আহ্বানকের ভ্রামকায় ডি এম কে-র
আবির্ভাব ঘটল। দুই বিপরীত কোটির
নীতিবাদ, একদিকে প্রতিজ্ঞাপনশী
স্বতন্ত্র-লীগ, অন্যদিকে প্রগতিশীল বাম
কম্যুনিষ্ট দলকে একই আঁতাতের
আওতায় এনে চাতুর্ঘ্যের সঙ্গে ডি এম কে
আপন দলের স্বার্থকে সর্বোপেক্ষা রক্ষা
করার সুযোগ পেয়ে গেল। স্বতন্ত্র
বিপরীত কোটির বাম কম্যুনিষ্টদের
কিন্তু বাম কম্যুনিষ্টরা ধনিক স্বার্থ
রক্ষক স্বতন্ত্রকে নির্বাচনে সাহায্য না
করলেও ডি এম কে-র ভাগ্যে জুটে গেল
দুই তরফেরই সমান সাহায্য। স্বল্প
আত্মদুরাইকে মন্ত্রণা দিয়ে এবং স্বতন্ত্র
দলের মারফৎ আর্থিক মদদ দিয়ে
নেপথ্যে কলকটি নাড়তে লাগলেন
প্রতিজ্ঞার বৃক্ষ রক্ষক চক্রবর্তী
রাজাগোপালাচারী।

ডি এম কে-ও রাজ্যে তার বিশিষ্ট
মর্যাদা লক্ষ্য করে বিগত নির্বাচনের
প্রাকালেই স্বতন্ত্র দ্রাবিড়স্থানের দাবি
তাগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।
আঞ্চলিকতামুত্ত একটি দলের জন্ম
ক্রমবিকাশিত হল নির্বাচকমণ্ডলীর
সামনে।

হিন্দী-বিরোধী যে মনোভাব রাজ্যে
ডি এম কে দলকে প্রাধান্য দিয়েছে,
মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেখা দিলে
অবশেষে আত্মদুরাই সেই হিন্দী-
বিরোধিতাকেও পরিভাষে স্বীকৃত হলেন।
বর্তমানে তিনি চান, আঞ্চলিক ভাষাধর্মী
স্বার্থযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ না করা
পর্যন্ত ইংরেজিকেই ব্যবহার করে যেতে।
এবং অধিকতর রাজ্য স্বায়ত্তশাসন লাভ
করতে।

ডি এম কে-র শরীর থেকে এই-
ভাবেই আঞ্চলিকতার পোষাকটি ধীরে
ধীরে অপসারিত হতে চলেছে, যাকে

শুভ লক্ষণ বলেই গণ্য করা উচিত।

কিন্তু মাদ্রাজের মানুষ ডি এম কে-র দক্ষিণী আঞ্চলিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আজ আমাদুর্নাই উপলব্ধি করেছেন, কেবলমাত্র আঞ্চলিকতার দাবি সম্বল করে বসে থাকলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পেছিয়ে পড়তে হবে তাঁর দলবলকে।

রাজনীর অশুভ হারা

কম্প আঞ্চলিক নীতি ভাঙ্গা করে বৃহত্তর দেশীয় সমস্যা নিয়ে ডি এম কে ভারতীয় রাজনীতির আসনে পাওনের হতে চাইলে কিন্তু অন্যতর সমস্যা দেখা দেবে। যে সমস্ত ভারতীয় রাজনৈতিক দল আঞ্চলিকতার গণ্ডিভুক্ত হওয়ার জন্য মন্ত্রাজে আঞ্চলিক প্রসঙ্গে ডি এম কে-র পারশ্ব এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বৃহত্তর রাজনীতির আসরে তাঁরা কিন্তু ভুত সহজে ডি এম কে-র সাহায্যে আসতে পারবেন না। তখন নীতির প্রসঙ্গে প্রত্যেককেই পুনর্বিবেচনা করতে হবে। বামপন্থীর দলগুলির সামনে তথা আশাওয়াদী প্রগতিশীল তরুণ ভারতের চোখে ইতিমধ্যেই ডি এম কে সরকারের পেছনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যর্থ রক্ত চক্রবর্তী রাজ্য-গোশালাচারীর অশুভ হারা ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে। সকলেই জানেন, নির্বাচনে ডি এম কে-র নির্বাচনী তহবিল পরিপূর্ণ অর্থের গ্রহণ করেছে ধনিক স্বার্থবাদী স্বতন্ত্র দলের আর্থিক সাহায্যে। উত্তর ভারত থেকে টাকা এসেছে। সন্তাণা এবং আশীর্বাদ এসেছে। স্বতন্ত্র—জনসংগঠন রাজ্যের কান থেকে। রাজ্যের ক্ষেত্রক্ষেত্র ডি এম কে নেতা আমাদুর্নাইও কৃতজ্ঞতার বিদলিত হয়ে বেতবে রাজ্যের পল্লী সর্বোপে লেপন করে তামিল-নাড়ুর দ্বিতীয় জনসাধারণের দ্বারা অর্পিত মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরি হচ্ছেন, তাতে দ্বিতীয় তামিলনাড়ুর অস্বাভাবিক আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

বিস্তৃত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যের ডি এম কে-র যে ভবিষ্যৎ রিত আঁকিত করেছেন—তা বাস্তবায়িত হলে দল হিসেবে ডি এম কে-র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কতদূর টেকসই হবে সে বিষয়েও কয়েক সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদুর্নাই-এর এমন অনেক অনুপ্রাণ প্রবীণ কূট রাজনীতিজ্ঞ রাজ্যগোপালাচারী হাসিমুখে ক্ষেত্রক্ষেত্রে তাঁর নিজের সমভাগালিত স্বতন্ত্র দলকেই অনেক ভাগ্য স্বীকার করতে হয়েছে এবং হচ্ছেও। কিন্তু রাজ্যগোপালীর স্নেহ সূক্ষ্ম আদায়ের আশ্রয়েই যে স্বার্থভাগীর ভূমিকায় আমাদুর্নাই-এর পেছনে তাঁর ছায়া বিস্তার করছে, গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কৃতজ্ঞ

তাঁর আভাস পাওয়া গেল। তিনি বলেছেন, পরিণামে ডি এম কে অবশ্যই স্বতন্ত্র জনসংগঠনের সঙ্গে একটি উদ্দেশ্য-ভিত্তিক আঁততে উপনীত হবে। তিনি মনে করেন, স্বতন্ত্র জনসংগঠন ও ডি এম কে-র মধ্যে যেটুকু নীতিগত পার্থক্য বর্তমান, তা নিতান্তই বাহ্যিক। আসল মূলগত উদ্দেশ্য প্রায় সমভূমির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতির প্রসঙ্গে দল-দ্বারীর মধ্যে বড় একটা উল্লিখ-বিশ নেই। অবশ্য কূটনীতিক রাজ্যের দ্বী মিলনে তাকুহুড়ো করে সমস্ত ব্যাপারটা কাঁচির দিতে চান না। ডি এম কে-কে তাই সবচেয়ে পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁর বর্তমান লক্ষ্য।

আমাদুর্নাই ওদিকে নিয়ে এক অভিনব ডি এম কে সমাজতন্ত্রের উচ্চাশা পোষণ করছেন। শুধু তাই নয়, ব্যর্থ রাজ্যগোপালকেও পরিবর্তমান বিশেষ সমাজতান্ত্রিক ভৌতিক গুরুত্ব বুঝিয়ে পরিপূর্ণ বাসে আনা সম্ভব হবে বলেও আমাদুর্নাই-এর প্রকাশ্য দুরাশা আছে। কিন্তু যে রাজ্যের গান্ধী-নেহরুর সহকর্মী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণের স্বার্থের প্রতি কখনো দৃষ্টি দেখান নি, তিনি অকস্মাৎ তাঁর জীবনের অন্তিম পাদে এসে কিবরূপ ধর্মন করে ফলা হবেন, এতবড় যারাম আমরা লালন করার মতো কারণ বুঝে পাচ্ছি না। অবশ্য আমরা এখনও আমাদুর্নাই সমাজতন্ত্রের চেহারাটোও সঠিক জানি না। তিনি তামিলনাড়ু রাজনীতিতে এক অভিনব ইতিহাস রচনা করেছেন; অন্যতর কোন অভিনব উপহার নিয়ে তিনি অপেক্ষার আছেন কি না আমাদের তা জানা নেই।

আমাদুর্নাই যেভাবে রাজ্যের-নির্ভর হয়ে পড়ছেন তাতে তাঁর সরকারের পেছনেও রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও যে হারাতে পারে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। আমাদুর্নাই স্বীকার করেছেন, রাজ্য পরিচালনায় তাঁর দল আনকোরা নতুন। শুভরাং তাবা যেতে পারে, আমাদুর্নাইকে কোনও অভিজ্ঞ দক্ষিণী নেতার ওপর অতন্ত প্রথম দিকে নির্ভর করতেই হবে। আমাদুর্নাই সেক্ষেত্রে নিজেই রাজ্যের নির্বাচন করে নিয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ইতিমধ্যে আমাদুর্নাই চালের মূল্য হাস করা, সিনেমা-থিয়েটার ও বাস জাতীয়করণ, মোড়োদাঁড় করা কথ প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। রাজ্যের উপশোধনীর অন্যতম হল, সরকারী কর্মে দলীয় প্রভাব পরিহার করা। এগুলি হরত প্রথম প্রথম

নাড়াচাড়া করা হবে। কিন্তু স্বতন্ত্র দলের সহায়তা গ্রহণ করে মোড়োদাঁড়ের ফর্তি বন্ধ করা কতদূর সম্ভব তা স্বয়ং আমাদুর্নাই-ই জানেন। আমাদুর্নাই উত্তর ভারতের সঙ্গে পুনশ্চ সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের আশা ব্যক্ত করেছেন। মুখে না বললেও এ কাজ তাঁকে করতেই হত, কেন না উত্তর ভারতের মানচিত্র আজ দক্ষিণী প্রতিদ্বন্দ্বিতার করতলগত হতে চলেছে।

গণনির্দেশ কোন পথে

নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৬৭ সাল সর্বদলের সমক্ষে যে গণনির্দেশ স্থাপন করল তাকে খুব একটা জটিল কল্পনা করার কারণ নেই। সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসী অংশাঙ্গনের প্রতি কৃষ্ণ চোখ-বশতই জনগণ কংগ্রেসকে আরামের গণি থেকে টেনে নামিয়ে দিয়েছেন। যেখানেও বা কংগ্রেস সর্বোচ্চাধিকার লাভ করেছে, সেখানেও পূর্ববং জমিদারী আরামে প্রদর্শিত হতে থাকলে কংগ্রেসী ভাবিভাবে প্রত্যাজাত আসবে। কিন্তু যেখানে কংগ্রেস গদি হারালো সেখানে কি বিশেষ কোন গণনির্দেশ বালট পেপারের মধ্যে প্রদত্ত হয়েছে? অ-কংগ্রেসী সরকার-গুলির দিকে তাকালে জবাব অস্বাভাবিক হয় না। রাজ্যের ব্যতীত অন্য কোথাওই জনগণ একটি মাত্র উদ্দেশ্যের ধারক-বাহক কোন দলকে সংগঠিত করার আসনে সমাসীন করান নি। অবশ্য সেক্ষেত্র বহুতর বাস্তব অসুবিধাও ছিল। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, ভারতের জনগণ আজও বামপন্থী চিন্তাকে নিতান্তে গ্রহণ করতে পারছেন না। কোলাস এবং পশ্চিমবংগই কিছুটা ব্যতিক্রম। এখানে বামপন্থীরা গণহৃদয় জয়ে অনেকদূর অগ্রসর। কিন্তু জনগণ এদের হাতে পুরো ক্ষমতা দেন নি। তাতে ভাল হল কি মন্দ হল, এ প্রশ্ন এখানে বহুতর নয়। বলতে চাই, এর দ্বারা বালটের মধ্যে একটিই সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গেছে, তা হল, জনগণের সঙ্গে প্রতিকার কল্প, দৌরিতে হলেও, হারাওকভাবে ফলবে। কংগ্রেস এতদিন জনগণের সঙ্গে যে মস্করা করে এসেছেন তাঁর জবাব বিলম্বিত হয়েছে। কেন না কংগ্রেসের প্রতি জনতার একটি অচলা ভক্তি ছিল। কেন না ভারতের জনসাধারণ নাগরিক অধিকার প্রয়োগে সাহসের পরিচয় এতাবৎকাল রাখতে পারেন নি। এখন পটপরিবর্তন হল। পেছনে কিরাট প্রতিকার এবং সর্বভারতীয় প্রত্যাবর্তন উত্তরাধিকার থাকার কংগ্রেস যেভাবে জমিদারী করে গেছেন; অন্য কোন দলের পক্ষে সে পথ মারাত্মক ধ্বংসের পথই হবে। এই প্রশ্ন জনগণ উপলব্ধি করলেন সরকার

এইভাবে তাদের স্ব স্ব ভূমিকা। এরপর আরও সতর্ক আরও কমান্বিত হবেন তারা। একটি নির্দিষ্ট নির্দেশ রাখতেও নির্বাচক-মণ্ডলীর তরফে সংশয় দেখা নাও দিতে পারে। বর্তমানে কুশাসন অবসানের নির্দেশ এবং অল্প বয়স বাসস্থানাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান ও মদ্রাস্কীতি-জনিত কষ্টের অবসানই জনগণের মুখ্য কামনা বলে মনে হয়। নির্বাচকমণ্ডলী তাই অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন সেই সব দলের প্রতি—যারা তাদের নির্বাচনী শ্লোগানে তাত্ক্ষণিক দেশীয় সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিতে মোটা প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। গণনির্দেশ একান্তভাবে ঘরমুখী। আপন কুটিরের সমস্যাটি তাকে বিশেষ বিচলিত করেছে। পাহাড় প্রমাণ অভাব-অভিযোগের মধ্যে জনসাধারণ বড় করে ভাববার অবসর পান না। মাদ্রাজ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

যারা কমান্বিত এলেন, এই মোটা গণ-নির্দেশকেই তাদের প্রথম পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে অন্যায়ের তথ্যভারত কংগ্রেসী প্রত্নদের থেকে তাদের ওপর দায়িত্ব ও জনদায়িত্ব অনেক বেশি। সামান্য বেচাল হলোই, ভারতের সর্বমাত্র অক্ষুণ্ণিত গণচেতনা ভীষণভাবে মার খাবে, যার জন্য ওং পেতে বসে থাকবে গণস্বার্থ-বিরোধী দলস্বার্থবাদীরা।

পশ্চিমবঙ্গে কোয়ালিশন সরকার এই প্রথমটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন বলে (তাদের কর্মসূচীতে দৃষ্টি রেখে) মনে হয়।

আমাদুয়াই সরকারও স্বাধীন চিন্তা-জ্ঞানবলন করে গণস্বার্থের প্রতি গুরুত্ব রেখে এগিয়ে গেলে দক্ষিণ তামিলনাড়ুর জাম্মা অর্জনে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস।

গণতন্ত্রের পদক্ষেপ

খণ্ডিত দেশে সনদী স্বাধীনতা লাভের পর চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এসে ভারতের নাগরিকবলন কেন সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে দেশীয় সরকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেন। সাংবাদিকগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবেশ থেকে জানিয়েছেন, চতুর্থ নির্বাচনে জনগণ যে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঙ্গে তাদের ভোট প্রদান করেছেন, নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর যে প্রচণ্ড উদ্দীপনা এবং উজ্জ্বল পরিলাভিত হয়েছে—নিতান্ত গণভ্রামেও তা অভূতপূর্ব। এই উদ্বেজনা স্বাধীনতা লাভের পদ্যক্ষেপেই একমাত্র লক্ষিত হয়েছে।

এরপর ভারতের অগণিত মানুষ যেন হতাশার ন্যূনত্ব এবং অকিবাসে স্থাবির হয়ে পড়ছিলেন। ১৯৬৭ সাল আনল গণজীবনে নবতম চাপল্য। এই উৎসাহের কারণ খুবই প্রত্যক্ষ। জনগণ এই প্রথম ব্যালট বাগের মাধ্যমে তাদের একটিমাত্র

ঐকান্তিক ইচ্ছাকে রূপ দিতে পারলেন, গণতন্ত্র-বিশ্বস্ত দণ্ডী সরকারকে কমান্বিত করে। দেশে যে গণতন্ত্র-বিরোধী নৈরাজ্যের লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল ব্যালটের শক্তি, সন্তরাং, তাকেও খতম করল।

পি এস পি নেতার আবেগ

এই গণ-উৎসাহকে অতঃপর নানা মূর্নি নানাভাবে ব্যাখ্যা করছেন। সব থেকে চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন পি এস পি সভাপতি শ্রী এন জি গোয়ে। দৃষ্ট হেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি ভারতব্যাপী উদ্দেশ্যহীন নির্বাচনের মহোজ্ঞাসকে। বলছেন, এ বেন ঠিক পুরানো পদতুল হুড়ে ফেলে দৃষ্ট হেলের নতুন পদতুল গ্রহণের অবদ্বয় উজ্জাস। ১৯৬৭ সাল বহুতপক্ষে বড় করে কোন গণনির্দেশ রাখা নি। এজন্য উদার উৎসাহ প্রকাশে বর্তমান প্রবন্ধকারও স্বেচ্ছাস্থিত। সেকথা আমরা অন্যভাবে ভুলে খেয়েছি আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার। বর্তমান আলোচনার শেষ দিকেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা রাখা হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের ফলপ্রসূতি পরিণামে বিমিশ্র হলো জনগণের সিদ্ধান্তে একটি উদ্দাম শিশুর কীড়ামোদ মাত্রই বর্তমান এমন কথা স্বীকার করতে পারি না। জনগণ কারমনোবাক্যে একটি উদ্দেশ্যকে রূপদানে সক্ষম হয়েছেন, তা হল, কংগ্রেসের বিপর্যয়কে অপ্রত্যাশিতভাবে সার্বিক প্রতিষ্ঠা দান করে সরকারী তরফে জনগণের প্রতি ভাঙ্কিত ও ওদাসীন্যের জবাব দেওয়া। টেনক নড়িয়ে দিয়েছেন তারা কংগ্রেসসহ সকল রাজনৈতিক দলগুলির। এখন নেতাদের আশাসমুদ্রিত আশ্বিনের অক্ষম্যে উদ্দোচিত হয়েছে। বহু কংগ্রেসী লৌহ মানব (আইরন মান) পর্যন্ত নির্বাচনী ফলপ্রসূতির উত্তাপে গলতে শুরু করেছেন। তারা হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে, এবার কংগ্রেসীদের ভল্লোলক বনতে হবে। জনসাধারণের কংগ্রেস-নির্ভর অসহায় দাস ভ্রনোভাবের ওপর মননহ চাপিয়ে ভবিষ্যতে আর যা খুশি তাই করা যাবে না। এককাল ভোটভাঙানী সংখ্যা-লঘু সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে, সংখ্যাগুরু সাধারণের প্রতিনিধিবর্গকে যেভাবে অপমান এবং লাঞ্ছনার কটকটুটে কংগ্রেস শোভিত করে এসেছে—অতঃপর সেই দাম্ভিকতা পরিবর্তনেরও সময় এলো। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই সুস্থ গণতন্ত্রের পরিচায়ক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমভারী নেতারা যে সুস্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিতে না পেরে আইনসভা ও সভার বাইরে হিমসিম খাচ্ছিলেন, জনগণ নিজের হাতেই তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য ১৯৬৭ সালে প্রথম নিজেদের

নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। 'এক্সপেরিমেন্টাল' হলো ১৯৬৭ সালেই নাগরিক অধিকার প্রয়োগের প্রথম পদক্ষেপ বলে তর্কাতীতভাবে স্বীকার।

শ্রীগোরে মন্তব্য করেছেন: কোয়ালিশন গঠনকারী বিরোধী নেতারা খাদ্য, জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর গভীরভাবে কোনও বক্তব্য রাখছেন না। শ্রীগোরে এই উক্তিও সর্বতোভাবে স্বীকার নয়। শ্রীগোরে কি জানেন না, বিরোধী সরকারগুলি সর্বত্রই খাদ্যের ওপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে এ বিষয়ে প্রত্যেকটি রাজ্যই কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য রাজ্য সরকারের শ্রুতজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান নির্বাচনে বিলুপ্তপ্রায় পি এস পি বেশ কিছু আসনের অধিকার লাভ করেছে। পি এস পি অতঃপর খাদ্যসমস্যা সমাধানে প্রগতিশীল বক্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চেষ্টা করলেই বরং বিরোধীদের খাদ্যচিন্তাকে তথা দেশের খাদ্য সমাধানে সহায়তা করা হবে। অর্থ-নীতি ও জনসংখ্যার সমস্যার ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলির শ্রুত ইচ্ছা কেন্দ্র মধ্যপেক্ষী। পি এস পি যদি বিরোধীদলগুলির সঙ্গে আগের মত হুঁসুটি বাঁচিয়ে না চলে এবং একত্রে দাবি উত্থাপন করে তবে এই সব সমস্যা সমাধানের পথও পরিষ্কার হবে। চতুর্থ পরিচালনা নির্বাচনের আগেই শিকের উঠেছিল। অবশ্যই গোরে ঠিকই বলেছেন যে, এ বিষয়ে এখন কেউ কোন উত্থাপনা করছেন না। তবে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। ডিভালুয়েশনের উদ্যোক্তা হরীর একজন, অশোক মেহতাকে জনগণ (ড্রমকমে নাকি?) আবার ফেরৎ পাঠিয়েছেন। প্রসঙ্গটা উঠবে বৈকি। কেন্দ্রে রাজ্য এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার জন্য শ্রীগোরে আহ্বান জানিয়েছেন। সুস্থ গণতন্ত্রের সপক্ষে এটা খুবই সাধু প্রস্তাব। এ বিষয়ে কেন্দ্র-ভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হয় নির্বাচনী নয়। এক্সপেরিমেন্ট তাই দেখতে চেরেছে। আশা করা যায় বিভিন্ন দলও এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন এবং তারা আইনসভার টেবিল-ভাঙা কর্মসূচী কাজে কাজেই এবার নিজে থেকেই ত্যাগ করবেন। বর্তমানে সব কটি দলের ওপরই জনগণ দায়িত্ব জোরালো তুলে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্তী শ্রীঅজয় মধ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, আগে জোড়া বলদের কাঁধে ছিল দায়িত্বের জোয়াল, এখন একাধিক বলদেই সে ভার তুলে নিয়েছে ('বলদ' শব্দটি অবশ্য তিনি উচ্চারণ করেন নি। শব্দটির সাত্ত্বিক প্রয়োগ করা হ'ল মাত্র)। সন্তরাং মা ভৈঃ। আইনসভাগুলি বেশ দায়িত্বপূর্ণ গান্ধীর্ষের সঙ্গে কার্য পরিচালনার নির্দেশ পেয়েছেন নাগরিকবলনের কাছ থেকে। এই নির্দেশ

অমান্য করার অর্থ হবে পাঁচ বছরে আবার ভাগ্য ভাঙা-গড়ার অনিশ্চিত।

এক রাজার বদলে গণতন্ত্র বহু রাজা, এক মতের স্থানে বহু মতের প্রাধান্যকেই স্বীকার করেছে। ভারতের সুবিকশিত গণতান্ত্রিক চিন্তা সেই বহুমতকে একটি সম্মিলিত চিন্তার সূত্রে বেঁধে দিয়ে বিচ্ছিন্ন চিন্তা নৈরাজ্যের মধ্যে হারত একটা সমতা সৃষ্টিরই প্রয়াস পেল। এখন শূভাশুভ বাছাই করে নেতাদের পা ফেলতে হবে। দলীয় মোহ ত্যাগ করে দেশের স্বার্থকে স্থান দিতে হবে সর্বপ্রথম, অন্যথা দেশই দলবাজ দলীয়দের কংগ্রেসের মত বিভাঙিত করতে কুণ্ঠিত হবে না। নাগরিকবৃন্দ একবার যখন তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগের বিচিত্র অপ্রত্যাশিত ফল প্রত্যক্ষ করেছেন, তখন পুনর্বীর তাঁরা তার আরও সতর্ক প্রয়োগে সন্দিগ্ধ করবেন না।

কেন্দ্রীয় সমস্যা

নাগরিক নির্দেশনী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছে। কেন্দ্রে রাজ্যসভার উপ-অধ্যক্ষপদ বিরোধীদের ছেড়ে দেবার মতো নরম চিন্তা কংগ্রেসী মস্তিষ্কে স্থান পাচ্ছে দেখে তা সহজেই হৃদয়গম্য করা যায়। মোরারজী সি বি গুপ্তের মতো শক্ত মানবধারা (পাতিলাজাতীয় নেতারা বর্তমানে 'পপাত ধরণীতলে') যখন কংগ্রেসকর্মীদের চোখ খুলে চলবার উপদেশ দিতে সুরু করেছেন, তখন তাঁদের কণি কণ্ঠধ্বনি গণতন্ত্রের অব্যবহৃত ক্ষমতাকেই মাথা পেতে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

কেন্দ্রে বিরোধীশক্তির ক্ষমতাবিশ্বির বিকে তাকিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে শেষ পর্যন্ত লোকসভার ভাঙাটো অধিবেশন খাতিল করতে হয়েছে। যে সার্বিক কংগ্রেসী বিপর্যয়ের চেহারা সর্বত্র প্রত্যক্ষ এবং তারও ওপর কেন্দ্রেও কংগ্রেস বখেট পড়ি সমুদ্রে অকম, তাতে ঠিক এই মূহুর্তে শক্তিমত্তা বিরোধীপক্ষের মূখো-মুখী হওয়াটা বর্তমান নেতৃত্বের পক্ষে বাস্তবায়নও ছিল না। বিরোধীপক্ষের ধোপাশুদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে না পারলে প্রীমতী গান্ধীর পক্ষে আগামী নেতা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বেশ বেকারখার পড়তে হ'ত।

লোকসভার আগামী অধিবেশন তাই নতুন সদস্যবর্গকে নিয়ে বসছে ১৬ই মার্চ। রাজ্যসভার অধিবেশন সুরু ১৮ই

মার্চ। মার্চপাতি ১৮ই মার্চ বৃহৎ সভার তারিখ তাকন দেকেন। আর ঠিক এই মূহুর্ত থেকেই জনগণ দেখতে চান একটি দ্বারিফলী গান্ধীবিশ্ব পরিবেশে গণসদীয় অধিবেশন সুরু হচ্ছে।

লোকসভার অধ্যক্ষপদটি নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। শোনা যাচ্ছে, প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনকে এই পদটি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শ্রীসেনকে ইন্দিরা-মন্দিরসভার গ্রহণ করা হয় নি। বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শচীন চৌধুরীকে, যিনি অমিরনাথ বসুর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুভদ্রা ক্যাভিনেটে কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি শ্রীসেন ব্যতীত কংগ্রেসী ভাড়ায়ে নিশ্চয়ই আর কেউ নেই।

ক্যাভিনেট মন্ত্রীদের অনেকেই এবার নির্বাচিত হতে পারেন নি। শচীন চৌধুরী, এস কে পাতিলা, সুরেন্দ্রানিয়ম, মানুভাই শাহ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছেন। সজিবায়ার রাজ্যপরিষদের সদস্যপদ থাকায় এবারে তিনি পরাজিত হয়েও সংসদে আসন রক্ষা করে গেছেন। চাগলা নির্বাচনে দাঁড়ান নি।

ক্যাভিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে বিপর্যয় উদ্ভীর্ণ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন : শীর্ষ-স্থানীয়া প্রীমতী গান্ধী, চাবন, স্বরূপ সিং, জগজীবন রাম, সঞ্জীব রেড্ডি, অশোক মেহতা, সত্যনারায়ণ সিং এবং ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন

নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন দলের পরিষদীয় নেতা নির্বাচনের রেওয়াজ ভারতে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার এখন নেতা নির্বাচনের পর্ব সমাধা করতে হবে। কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের মূখ্য রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন প্রাক্তন আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন। নেতা নির্বাচনে দুইকক্ষ সংসদের চারশ আটত্রিশ জন কংগ্রেসী সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে। দু'জনের বেশি প্রার্থী থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোনও একজন নিরক্ষুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ না করা পর্যন্ত বারম্বার ভোট গ্রহণ ও গণনা চলবে। প্রথমবারেই কোনও প্রার্থী

নিরক্ষুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে, নেতারূপে নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন। আগামী ১২ই মার্চ এই নির্বাচনপর্ব সমাধা করতে হবে।

এবারেও মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। গতবারের মতই ইন্দিরা, মোরারজী সমর্থন লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন। কংগ্রেসপ্রধান ও অন্যান্য অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু তা বাস্তবে সম্ভব নয়। বর্তমানে কংগ্রেসে কেউই নেতৃসদৃশ ব্যক্তিকে অবিসংবাদী নেতার আসনে লম্বানীন নন।

প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত মন্দিরসভার দুর্বলতার জন্যই আর কংগ্রেসের বিপর্যয় হুশা দিচ্ছে এবং তাঁকেই পুনশ্চ নেতৃপদে স্বরণ করা হলে মন্দিরসভা কিছুকালের মধ্যেই ডেডে পড়বে—মোরারজী-সমর্থকদের কণ্ঠে এরূপ সমালোচনা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা আরও বলছেন, সংসদে এবার কংগ্রেস পক্ষ অত্যন্ত দুর্বল। সবল প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে পারেন এমন শক্ত মানব চাই।

ইন্দিরা-সমর্থকদের বক্তব্য, কংগ্রেসী বিপর্যয়ের জন্য সার্বিকভাবে কংগ্রেসী নীতিই দায়ী, কোন ব্যক্তির প্রভাব নির্বাচনে ছাড়াপাত করে নি। কেবলমাত্র প্রীমতী ইন্দিরার ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে কংগ্রেসের নীতিনিয়ন্ত্রণ দলের পক্ষে সাবধানে নিজেদের বাঁচানোই যে কোন উপায় নেই, তার আলোচনা আমরা করছি বর্তমান নিবন্ধের মাধ্যমে সম্পর্কিত আলোচনায় কামরাজ প্রসঙ্গে। সেই হিসেবেই কংগ্রেসের বাস্তবতার জন্য প্রীমতী গান্ধীকেও দোষ দেওয়া যায় না। তবে দুর্বল সংসদে প্রীমতী গান্ধীর উপস্থিতি কতখানি এ বিষয়ে গান্ধী-সমর্থক কোন ব্যক্তি এগিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। আবার 'শক্ত মানব' শব্দটার ওপরও যথেষ্ট প্রশ্না রাখার পক্ষপাতী নই। বর্তমান নির্বাচনের ফলাফলে শক্ত মানবদের দুর্বলতা চোখের সামনেই দেখা গেছে। তবে শক্ত মানব বলতে যদি তেমন কাউকে বোঝায় যিনি বিরোধীপক্ষের তীব্র যুক্তিবাণকে খণ্ডন করতে পারবেন, তবে বলা যেতে পারে, বিতর্কের সময় তেমন পরিষদীয় ব্যক্তির কংগ্রেস দলের পক্ষে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।



জনসন ও ইউ থাট

ভিয়েতনাম :

এখানে আশু শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা যে ক্রমেই ক্রীণ হয়ে আসছে তা' এখন বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সম্প্রতি সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাট দমন ও জাঙ্গল বিমানঘাটিতে দু'বার সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশাবাদিতার বিশেষ কারণ নেই। ইউ থাট কয়েকদিনের ছুটিতে নিজের দেশ রংগানে এসেছিলেন। এখানে উত্তর ভিয়েতনাম দূতাবাসে দু'জন উচ্চ-পদস্থ কূটনীতিকের সঙ্গে তাঁর আলোচনাও হয়েছিল ভিয়েতনামে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্ভাব্য পন্থা আবিষ্কারে। যদিও সে আলোচনা সফল বা আশাপ্রদ বলে সেক্রেটারী-জেনারেল প্রথমে মন্তব্য করেছিলেন কিন্তু পরে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, আপাতত শান্তির পথে কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

এই হতাশার প্রধান কারণ হলো, শান্তির ব্যাপারে বাদের আগ্রহ ও মতৈক্য সবচেয়ে বেশি দরকাব ছিলো, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মতামতের মধ্যে দূতর ফারাক থেকে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গত মাসে চান্দ্রবর্ষ উপলক্ষে যে চারদিনের যুদ্ধ-বিরতি পালিত হয় তার সময়সীমা বাড়িয়ে যদি দু'পক্ষের মধ্যে শান্তি বৈঠকের অনুষ্ঠান করা যেত তবে তার ফল হয়তো ভালোই হতো।

কারণ, তখন উত্তর ভিয়েতনামেও আমেরিকা বোমা ফেলা থেকে বিরত ছিল আর দক্ষিণ ভিয়েতনামেও হ্যানয় সৈন্য বা রসদ যোগানো থেকে বিরত ছিলো। অর্থাৎ এমন আবহাওয়া বা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিলো যখন দু'পক্ষের মধ্যে ব্যবধান অনেকটা হুটে গিয়েছিলো। কিন্তু সে সুযোগের সম্ভাবহার আমেরিকা করে নি, অর্থাৎ হ্যানয়ে বোমাবর্ষণ আরো কদিন বন্ধ রেখে শান্তি টেবিলে আসতে রাজী হয় নি সে।

বরং উটে আলোচনা টেবিল থেকে সে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অসামরিক এলাকার বোমাবর্ষণ ও অস্ত্র মজুদ করা সুরু করে দিয়েছে এবং মার্কিন নৌবাহিনীও যুদ্ধে নেমে পড়েছে। উত্তর ভিয়েতনামের দক্ষিণ প্রান্তের সমগ্র আমেরিকা মাইনও স্থাপন করছে। এর পক্ষে অবশ্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনসন এ-যুক্তি দেখাচ্ছেন যে উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধরত আমেরিকান সৈন্যদের সাহায্য করার জন্যেই এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে যুদ্ধের এলাকা কি বিস্তৃত (escalation) হচ্ছে না?

শান্তির প্রতি মার্কিন আগ্রহ বলে যে কথাটি প্রচার করা হয়ে থাকে সেটা যে একটা প্রকাশ্য ধাম্পা মাত্র এটা আরেক-বার প্রমাণিত হলো প্রেসিডেন্ট জনসনের সাম্প্রতিক বক্তব্য। জনসন আবার নতুন

করে ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, উত্তর ভিয়েতনাম ১৯৫৪ ও ১৯৬২ সালের জেনেভা চুক্তি লঙ্ঘন করেছে বলেই নাকি আমেরিকানরা সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জনসন এ কথাও বলেছেন যে, কোন রকম শর্ত আরোপ না করে আমেরিকা যুদ্ধ-বিরতি আলোচনার বোম দিতে রাজী; কিন্তু উত্তর ভিয়েতনাম যদি ভিয়েত কংদের সাহায্য পাঠাতে থাকে তবে তার জবাব দেবার জন্যে মার্কিন সৈন্যরা সব সময়েই প্রস্তুত। প্রেসিডেন্ট জনসন ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে লেখা জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলরের এক চিঠির উল্লেখ করে বলেন যে, ভিয়েত কংদের যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের উৎসস্থলে বোমাবর্ষণ না করলে ওরা চিট হবে না।

অথচ সেনেটর রবার্ট কেনেডি শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে বাস্তববুদ্ধি ভিন-দফা প্রস্তাব দিয়েছেন—মার্কিন প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রদপ্তর তাকে কোন পাতাই দিতে চাইছেন না। সেনেটর কেনেডি বলেছিলেন যে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ করে কয়বাহুল্য ঘটানো হচ্ছে এবং যুদ্ধকে আরো জটিল এবং বেদনাদায়ক করে তোলা হচ্ছে। ভিয়েতনামে আমেরিকার সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদূতের ভূমিকা নয় যে সে কেবল এখানে মৃত্যু ও ধ্বংস আনবে। সেনেটর কেনেডি তাঁর প্রস্তাবে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এবং অন্যান্য নেতাদের কথা ও আগ্রহ কতদূর আন্তরিক তা পরীক্ষা করার জন্যে আমেরিকা হ্যানয়ে বোমাবর্ষণ বন্ধ করে শান্তি আলোচনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। এবং সম্ভাব্যতঃ অপেক্ষা করার পরেও যদি ওপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া পাওয়া না যায় তবে সে আবার বোমাবর্ষণ সুরু করতে পারে। দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে যে, একটা আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ বাহিনী গঠন করে তার ওপর এ ভার দেওয়া যেতে পারে যে তারা যেন ভিয়েতনামী কন্ডর ও সীমান্তগৃহী পূর্ববেক্ষণ করে এবং কোথাও যুদ্ধকার্য চলছে কি না তার রিপোর্ট দেয়। তৃতীয় দফায় সেনেটর কেনেডি প্রস্তাব করেছেন যে, রাষ্ট্রসংঘের অধীনে এমন একটা সেনাবাহিনী গঠন করা উচিত যা' ক্রমে মার্কিন সৈন্যদের স্থান দখল করবে যাতে মার্কিন সৈন্যরা দেশে ফিরতে পারে।

কিন্তু পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক এর জবাবে বলেছেন যে হ্যানয়ের আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্যে আমেরিকার বোমাবর্ষণ বন্ধ করা কোন কাজের কথা নয়। কোসিগিনের মনোভাব এখানে প্রধান বিচার্য বিষয় নয়, হ্যানয়ের মনোভাবের ওপরই মার্কিন কার্যক্রম নির্ভর করবে বলে ডীন রাস্ক বলেছেন। রিপাবলিকান



মডেল ৬৯৬



মডেল ১০৯৬

মৌসুমী নকশা

Bata

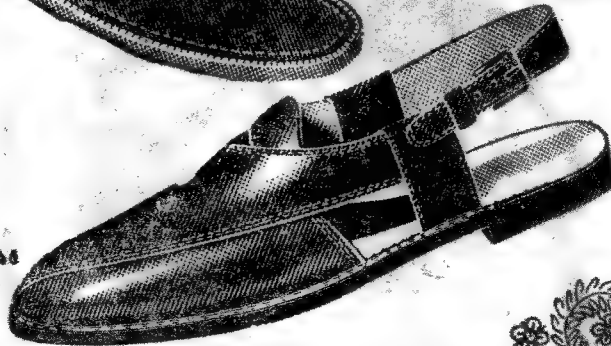


মডেল ১১৬

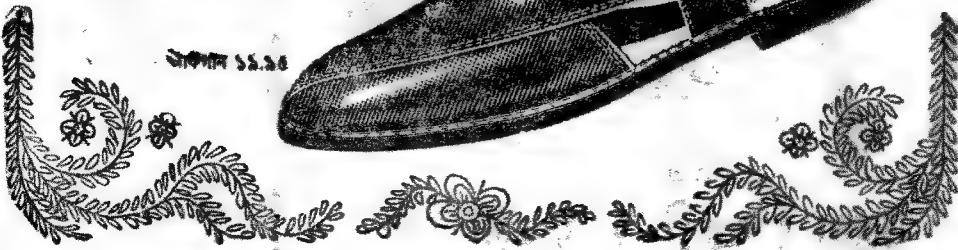


মডেল ১১৬

উপরে হাওয়া খেলবে
আর নিচে তাপ আটকাবে—
নকশার এই যে পরিকল্পনা তারই
নিশ্চয় নমনো বাটার স্যান্ডাল বা চম্পল।
একেই বলি গরমকালের আরামকর।
বাহাই চামড়া, কোমল—সুঠাম। সোল,
হিল, মুখভাগ—বহু পরীক্ষার ফল।
সেই সঙ্গে আধুনিক নির্মাণ
কৌশল। ফলে বাটার এই জুতো
এমন মজবুত থাকে প্রায়
অবিনাশ বলা চলে।



মডেল ১১৬



সেনেটের ড. সেন আরো তাঁর ভাষায় সেনেটের বৈজ্ঞানিক আক্রমণ করে বলেছেন শান্তির জন্য প্রেসিডেন্ট জনসন যা করছেন সেটাই ঠিক এবং অসম্ভব। সেনেটের ফুলব্রাইট ও সেনেটের ওয়েন মর্স প্রমুখ সেনেটের কেনেডির প্রস্তাব সমর্থন করলেও প্রেসিডেন্ট জনসন, প্রতিরক্ষা-সচিব ম্যাকনামারা-বা ডীন রান্স প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কথাবাতা শুনে মনে হয় না যে আমেরিকা তার ভিত্তিভূমির নীতির কোন পরিবর্তন চায়। বরং প্রেসিডেন্ট জনসন একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, হ্যানর নিবৃত্ত না হলে আমেরিকা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেই। সেজন্যে সেনেটে প্রতিরক্ষা বাজেটও আবার বাড়ানো হয়েছে।

ওদিকে ভিয়েত কংদের হ্যানরস্ব প্রতিনিধিও পরিস্থিতি বদলাতে পেরে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, তাঁরা শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ “আমেরিকানদের চূড়ান্ত পরাজয়” না হওয়া পর্যন্ত লড়ে যাবেন। এবং চীনের পক্ষ থেকেও সরকারী নিউজ এজেন্সি আবার বলেছে যে, কোমার্বাশ যুদ্ধের শর্তে শান্তি আলোচনার যোগ দেবার জন্যে সে খেন ব্যগ্র হয়ে না ওঠে। এ অবস্থায় ভিত্তিভূমির আকাশে শান্তি-কপোত দেখতে পাবার আশা জন্মায় করতে পারছি কি?

ইন্দোনেশিয়া :

প্রেসিডেন্ট সূকর্নো-এ-মারা বেঁচে

গেলেন বলে মনে হচ্ছে। মঙ্গলবারের সার্বাঙ্গ আইন পরিষদ পিপলস্ কনসালটেটিভ কংগ্রেসের সভায় সূকর্নোকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অপসারণের প্রস্তাব নেবার কথা ছিলো। কিন্তু এ সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত পরিস্থিতি যা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, যদি আর তাঁর গেল না, প্রেসিডেন্ট পদ সূকর্নোর অক্ষরই থাকছে।

অন্য ইতিপূর্বে সহাতের হাতে প্রেসিডেন্ট সূকর্নোকে যে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে হয়েছে সে খবর গত সপ্তাহেই দিয়েছি। জেনারেল সুহাতো এতেই খুশি, ব্যক্তিগতভাবে সূকর্নোর বিরুদ্ধে তাঁর খেন বলবার কিছু নেই, আপত্তি করারও বিশেষ নেই কিছু, আপত্তি ছিলো প্রেসিডেন্টের অপরাধী ক্ষমতার। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টের সে ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করে দেওয়া হয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট সূকর্নো কার্যত তাঁর প্রাসাদে বন্দী-জীবন যাপন করছিলেন। বাইরের কারোর সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো খেন প্রেসিডেন্ট এখানকার শৌখীন বিপক্ষে না মান বা তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা না করেন। শৌখীন বিপাণি বা বান্ধবীর কথা শুধু বহির্জগতে সূকর্নো সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা—তিনি যে অতিরিজ্ত বিলাসী এবং নারী-সম্প্রিয় এটা যোকাবার জন্যেই

করা হয়েছে। আসলে ইন্দোনেশিয়ার সূকর্নো-ভক্তের সংখ্যা যে মোটেই অগ্রাহ্য করার মত নয়—একথা সেনাবাহিনী খুব ভালো করেই জানেন। সূকর্নো যদি এখানকার জনসাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করার সুযোগ পান, তবে সেনা-বাহিনী-বিরোধী একটা আন্দোলন যে গড়ে উঠতে পারে একটা সেনাবাহিনী জানতেন। সেই জন্যেই সূকর্নোর বন্দী-দশা।

সূকর্নোকে বিদেশে চিরাদিনের জন্যে চালান করে দেবার প্রচেষ্টার মধ্যেও সেনাবাহিনীর একই পরিকল্পনা থাকতে পারে। মধ্য জাভা এবং পূর্ব জাভার সূকর্নো-সমর্থকদের সংখ্যা গণনাতীত। সাধারণ লোকের মধ্যে সূকর্নো এখনো দেবতার সম্মান পেয়ে আসছেন। তাই সূকর্নোকে ছেড়ে করে যদি থেকে নামানোর চেষ্টা হলে দেশের মধ্যে সূকর্নো-বিরোধী এবং সূকর্নো-সমর্থীদের মধ্যে যে একটা গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে এটুকু বদলাতে সেনাবাহিনীর কষ্ট হয় নি। সূকর্নোকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে—এ উপ-লব্ধিও তাঁদের ছিল। সেজন্যেই সূকর্নোর বিরুদ্ধে চরম কোন ব্যবস্থা নিতে সেনাবাহিনী চেষ্টা করে নি। সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন শোয়েল্ডাদপ্তর সি-আই-এ’র মতে নাকি প্রেসিডেন্ট সূকর্নোকে সরানো না হলে এখানে মার্কিন সাহায্যপ্রাপ্ত আন্দোলন সহজ হবে না। কিন্তু গৃহযুদ্ধ বামানোও কেন কাজের কথা হতে পারে না—বিশেষত ১৯৬৫ সালের মার্চ অভ্যুত্থানের পরে যখন লক্ষ লক্ষ লোককে নিধন করা হয়েছে তখন আর লোককর করা যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারছেন না সেনাবাহিনী। সেইজন্যেই যতই সূকর্নো-বিরোধী শ্লোগান উঠুক না কেন, জেনারেল সুহাতো বলেছেন যে, সূকর্নোকে অপসারণ করা মোটেই সমীচীন হবে না। প্রেসিডেন্টের সমস্ত ক্ষমতা যখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সূকর্নো যখন একজন ক্ষমতাহীন ঠুটো জগন্নাথ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন তাঁকে আর ভয় কি? জনসাধারণও তাঁদের প্রিয় সূকর্নোকে শুধু প্রেসিডেন্টের পদটিতে দেখতে পেলেই খুশি, তিনি কতখানি ক্ষমতার অধিকারী—তা নিয়ে তাদের বিশেষ মাথা-ব্যথা তো নেই।

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাপূহ জয়মালা ভূষিত !

তৃপ্তি মিত্র
কালী ব্যানার্জী
অভিনীত

স্বদেশী
কল্যাণ



প্রভাষ
৩, ৬, ৯

উত্তরা : পূর্ববী : উজ্জ্বলা

ও
অন্যত্র

“বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার”

পঞ্চাশ বৎসর আগে ও পঞ্চাশ বৎসর পরে // শ্রী বীরদত্ত চৌধুরী

ষট্টিশ পূর্বে ১৯১০ সনে কি ১৯১১ সনে তাহা ঠিক বলিতে পারি না, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার” এই নাম দিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে উহা তাহার কোনও বক্তৃতার বা প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

আমি তখন শুল্কের উপরের ক্লাসে পড়ি। প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্যটা আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা মোটা কথায় এই—বাঙালীকে আইন বা দশনের কচুকাচি ছাড়িয়া, চাকুরি বা দাসত্বের মোহ কাটাইয়া, সাহিত্য ও ধর্মের বিলাস বর্জন করিয়া শিল্প-বাণিজ্য, অর্থাৎ ইকনমিক কার্যকলাপের দিকে মন দিতে হইবে।

পুরাতনপন্থীরা প্রফুল্লচন্দ্রের এই লেখাটাকে “আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাহার মস্তিষ্কের অপব্যবহার” এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য বাঙালীর উহা ভালই লাগিয়াছিল, লাগিবারও কথা। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তখন বাঙালীর মন শিল্প-বাণিজ্যের দিকে বদলিয়াছিল। আজিকার দিনে অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙালীর শিল্পপ্রচেষ্টা ও টেকনিক্যাল শিক্ষার সুপ্রপাত স্বদেশী আন্দোলনের জনাই হয়। আজ যাহা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া এম-আই-টির অনুসরণের মত হইয়াছে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল বৈদান্তিক ও থিওসফিস্ট হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে, একেবারে নির্ভাজ স্বদেশীর প্রভাবে।

বালক হইলেও আমার উপরেও এই চিন্তার ধাক্কা আসিয়া লাগিয়াছিল। তখন আমরা শ্রদ্ধা অভিনেত্রীর মৃদু-চন্দ্রমা ধ্যান না করিয়া, ভারতমাতার মলিন মৃদুচন্দ্রমা স্মরণ করিয়া গান গাহিয়া কাঁদিতে পারিতাম। যে পথের নির্দেশ প্রফুল্লচন্দ্র দিয়াছিলেন, ভাল লাগিলেও নিজের জীবনে যে উহা ধরি নাই তাহা অন্য কাণে, তখন উহাকে অক্ষমতাই বলিতাম।

শিল্প-বাণিজ্য ও দেশের আর্থিক

উন্নতির প্রতি এই উদ্বেগভার পিছনে আর একজন মহান বাঙালী ছিলেন। বিনিবাঙালীর জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন-কর্তা তিনিই আবার বাহ্যিক জ্ঞান ও কর্মের থিওরীরও প্রবর্তনকর্তা। বিষ্ণুচন্দ্রের কথা যে আমি ভাবিতেছি তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ইংরেজই মুসলমানের জায়গায় আবার ভারত-বর্ষের রাজা হইবে এই কথা শুনিয়া সত্যানন্দ কাঁদিয়া বলিলেন—

“হায় মা! তোমার উন্মাদ করিতে পারিলাম না—আবার তুমি স্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রূপ-ক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!”

তখন তাহার গুরু “চিকিৎসক” তাহাকে প্রবোধ দিলেন,—

“সত্যানন্দ, কাতর হইও না..... প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহি-বিশ্বক ও অন্ত-বিশ্বক। অন্ত-বিশ্বক যে-জ্ঞান সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহি-বিশ্বক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্ত-বিশ্বক জ্ঞান জন্মবার সম্ভাবনা নাই। শুল্ক কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহি-বিশ্বক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহি-বিশ্বক জ্ঞানের প্রচাৰ করা আবশ্যিক। এখন এদেশে বহি-বিশ্বক জ্ঞান নাই—শিক্ষা এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষার পটু নহি। অত-এব ভিন্ন দেশ হইতে বহি-বিশ্বক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহি-বিশ্বক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্ব সুশিক্ষিত হইয়া অন্ততত্ত্ব বৃদ্ধিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না।”

প্রফুল্লচন্দ্রের যুক্তি ও উপদেশ এই চিন্তাধারারই অন্তর্ভূত, বিষ্ণুচন্দ্র-

চন্দ্রের থিওরীকে কাৰ্যক্ষেত্রে প্রয়োগের নির্দেশ।

এই উপদেশ তখনকার বাঙালী বহুল অংশেই মানিয়া লইয়াছিল। ইহার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বাঙালীর চিন্তা ও কর্মের ধারায় একটা বৃহৎ পরিবর্তন দেখা দেয়। উহা আজ বিস্ময়ে পর্যবসিত হইয়া বাঙালীর আধুনিক জীবনযাত্রার মূল সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বাঙালীকে আজ আর অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবার আবশ্যক নাই, উল্টা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে; এই বিস্ময়টা বাঙালীর ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের পক্ষে সব দিকেই কল্যাণকর হইয়াছে কি না তাহাই এখন বিচারের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার মনে এই সন্দেহ ও প্রশ্ন ১৯২৬-২৭ সন হইতে জাগিতে আরম্ভ করে, ও দশ বৎসরের মধ্যে একটা উত্তরও পরিষ্কার হইয়া যায়। তাই আমাদের ‘ডায়নামিট মাইনরিটি’র অর্থপরায়ণতা সম্বন্ধে আমি ১৩৪৪ সনের আষাঢ় সংখ্যা (১৯৩৭ জুলাই) ‘শনিবারের চিঠি’তে একটি প্রবন্ধ লিখি। উহা আরম্ভ করি একটা প্রশ্ন করিয়া,—

“আমরা সুপ্রাচীন কাল হইতে আধ্যাত্মিক জাতি বলিয়া খ্যাতি। ঐহিক সম্পদ আমাদের নিকট তুচ্ছ; নির্বেদ আমাদের অস্থি-গাঞ্জায় মিশিয়া আছে বলিয়াই সকলো বলে।..... আমাদের জীবনে আর্থের স্থান কতটুকু? অর্থ ও পবমার্গে যে অনিরসনীয় স্বদেশের উপর হিন্দু ধর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত আজও কি তাহা বর্তমান? না, আমরা অর্থক্ষেই সমস্ত মানবীয় চিন্তা ও কর্মের চরম নিয়ন্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি?”

ত্রিশ বৎসর আগেও এই প্রশ্নের্য সোজা উত্তর দিতে আমি ইতস্তত করি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙালী ধর্ম, নীতি, বিদ্যা, সাহিত্য, কলা সব ছাড়িয়া একটা অর্থপরায়ণ জীবনযাত্রার চাপে শ্রদ্ধা টাকার দিকে ঝুঁকিয়াছে।

ইটা ছাড়া আমি আবও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, এই অর্থপরায়ণতা পার্থিব বা লৌকিক ঐশ্বর্যের দিক হইতেও বড় কোনও ব্যাপার নয়। আমার এই কথাগুলিও উদ্ভূত করিতেছি,—

“রাষ্ট্রাচার্য অর্থপরায়ণতা আমে-
বিলান অর্থপরায়ণতা নয়; এমন কি
সামান্য্যাদায় অর্থপরায়ণতাও নয়;
উত্তর প্রাণ আনন্দ ক্ষুদ্র পরিধি অনেক
সংস্করণ। আঁকাব দিনে [১৯৩৭
সনে। বাঙালী ভদ্রসমাজের অর্থ-
পরায়ণতাকে বিশ্লেষণ করিলে উহার
দুইটি বস্তু চোখে পড়ে। ইহাদের
একটি সবকারী চাকুরিজীবী যথেষ্ট
শ্রমসাধ্যভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে
বলিয়া সবকারী ‘টাইপ’ বলিয়া
আখ্যাত হইবার যোগ্য; অপবীতি নব্য
বাঙালী ব্যবসায়ীর মধ্যে বেশি দেখা
যায়—সেজন্য ব্যবসায়ী ‘টাইপ’
বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে।”

তার পর আমি দুইটি ‘টাইপের’
একটু বর্ণনা দিয়াছিলাম। প্রথম বর্ণনা
সরকারী ‘টাইপের’, উহা এইরূপ,—

“সরকারী অর্থপরায়ণতার বিবেক-
বুদ্ধি আছে, কিন্তু উহা উদারতা
পর্যন্ত পৌঁছে নাই। তাই সঞ্চিত
অর্থকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া
যন্ত্রের মত আগলাইয়া থাকিবার
কল্পনাই এই শ্রেণীর অর্থসাধকের
একমাত্র স্বপ্ন। কাহাকেও এই ধনের
অংশ না দিয়া, নিঃপ্রয়োজনে ব্যয় না
করিয়া কিভাবে অর্থকে বাঁচাইবা
রাখা যাইতে পারে এই ধ্যান করিতে
করিতে ইহাদের মনে এমন একটা
স্থানের ছবি জাগিয়া উঠে যেখানে
দস্যু-ভক্ষকের ভয় নাই, লোকাবাস
আছে, অথচ সামাজিক কতব্য নাই,
অর্থব্যয় করিবার দায়িত্ব নাই।
এতখন আমি নতুন বালিগজের কথা
ভাবিয়াছিলাম, এখন আবও সব
মহল্লা হইয়াছে।)

ব্যবসায়ী ‘টাইপের’ বর্ণনা নিম্ন-
লিখিতরূপ ছিল,—

“ব্যবসায়ী ‘টাইপের’ প্রকৃতি ইহার
সম্পূর্ণ বিপরীত। উহার উদারতা
আছে, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি নাই। তাই
এই শ্রেণীর অর্থসাধক একটি পয়সাকে
একটি রক্তবিন্দুর মত জ্ঞান করেন
না, তেমনই তাহার একটি পয়সার
জন্য কাহারও গলায় ছুরি দিয়া এক
বিন্দুর বেশি রক্তপাত করিতেও শ্রব
বেশি স্বেচ্ছা বোধ করেন না।”

এই দুই ‘টাইপের’ আর একটি
পার্শ্বকোর কথাও তখন উল্লেখ
করিয়াছিলাম,—

“সরকারী ‘টাইপের’ অর্থসাধকগণ
সাধু প্রকৃতির হইলেও অপরের
সততা সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দেহ-
পরায়ণ। ব্যবসায়ী ‘টাইপের’ সাধকের
এই অবিশ্বাসপ্রবণতা নাই। তাঁহারা
গোপনে পক্ষপাতকে চোর নামে
অভিহিত করিলেও সম্মুখে কখনও
ভদ্রতার চুটি করেন না।”

সর্বশেষে ১৯৩৭ সনেও আমি
বাঙালীসমাজে যাহা দেখিতাম, তাহার
একটা আভাস দিয়াছিলাম,—

“ইহারা দুই দলে মিলিয়া বাঙালী
ভদ্রসমাজের প্রায় সবটুকু ব্যাধিয়া
আছেন। এই সমাজে যেখানেই
গিয়াছি, তা’ সে সভাসমিতিতেই
হউক কিংবা মাঠে-ময়দানেই হউক,
আপিসে ও কর্মস্থলেই হউক আব
রাস্তায় ও বাজারেই হউক—সর্বত্রই
হয় ইহাদের একটি শ্রেণীর গম্ভীর
ও আত্মতৃপ্ত মুখ, নয় আর একটি
শ্রেণীর সহাস্য ও আত্মতৃপ্ত মুখ
দেখিতে পাইয়াছি। দেখিতে দেখিতে
আমাদের সমাজের পরিণতি সম্বন্ধে
বহু কথা মনে হইয়াছে: আমাদের
সংস্কৃতির কথাও ভাবিয়াছি।”

এই কথাগুলি লিখিয়াছিলাম
১৯৩৭ সনে, এখন ১৯৬৭ সন—বিশ
বৎসর পবে আর ভাবিবার অপেক্ষা নাই,
সবই প্রকট হইয়া গিয়াছে। বাঙালীর
অর্থপরায়ণতা আজ নিম্নতম তামসিক
মূর্খতার ধরিয়া দেখা দিয়াছে। আমি
সাত্ত্বিক গুণের বড়াই করি না,
সাত্ত্বিকতাই একমাত্র কাম্য তাহাও বলি
না, রাজাসিকতা আমার শ্রদ্ধা ও কামনার
বস্তু। রাজাসিকতার প্রতি এই আসক্তির
জন্যই আরও উচ্চকণ্ঠে বলিব, বর্তমান
যুগের বাঙালীর এই অর্থপরায়ণতা
অতি ঘৃণ্য, তামসিক ব্যাপার। উহার
মধ্যে কোথাও অর্থের গৌরব দূরে
থাকুক, অর্থের অহংকার পর্যন্ত নাই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশের কি
কল দাঁড়াইয়াছে তাহার একটু হিসাব
লওয়া থাকুক। আজকাল যদি কোনও
সুদৃষ্ট, হাস্যোজ্জ্বলমুখ বাঙালী
দেখা যায়, তাহা পরিচয় না লইয়াও
অনুমান করা যায় যে, তিনি হয় সাক্ষাৎ-
ভাবে ব্যবসা বা কারখানার মালিক,
অথবা—মোটো মাহিনার টেকনলজিস্ট
অথবা উচ্চস্তরের মিস্ত্রি, অথবা
তেমনই মোটো মাহিনার কভেনান্টেড
অফিসার অথবা বিদেশী সওদাগরের
উচ্চস্তরের কেরানী। যদি হাসি ছাড়া

শব্দ সম্পূর্ণ মুখ দেখা যায় তাহা
হইলে তিনি উচ্চবেতনের সরকারী
কর্মচারী না হইয়া যান না—শব্দ
কাগজের উপর সই করিতে করিতে
ইহাদের হাসির ক্ষমতাও তাঁহাদের
কলমের কালির মতই ঝরিয়া পড়িয়াছে।

পক্ষান্তরে, শব্দ মুখ অথচ উগ্র
মূর্তি কাহাকেও যদি লোলুপ বা ভীত
দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে দেখা যায়,
তাহা হইলে অনুমান করা যায় যে, তিনি
‘ইন্টেলেক্চুয়েল’ অথবা অর্থের
অভাবে বামপন্থী বা লেফ্‌টিস্ট।

রাজনৈতিক নেতাদের চেহারা,
কংগ্রেসদলীয় হইলে ব্যবসায়ী বা
চাকুরিজীবীর মত হয়, আর অপোজি-
শানের হইলে ইন্টেলেক্চুয়েলের মত
হয়। অধ্যাপকদের চেহারাও তেমনই
দুই ধরনের। রীডার ও প্রোফেসররা
এক রকম, লেকচারাররা অন্য রকম। এক
কথায় বলা যাইতে পারে, সমগ্র বাঙালী-
সমাজে সকলের মুখেই বিস্ত বা বিস্ত-
হীনতার ছাপ সুস্পষ্ট, অন্য কোনও
ধ্যান-ধারণার চিহ্নও দেখা যায় না।

এই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করা
প্রয়োজন, বাঙালী কি অর্থপরায়ণ
হইয়া মস্তিষ্কের সম্ভাবহার করিতেছে,
না অপব্যবহার করিতেছে? নৈয়ায়িক না
হইয়া এবং দোকানদার হইয়া কি
স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছে, না স্বধর্মভ্রষ্ট
হইয়াছে? আমার মনে এই প্রশ্নের
উত্তর সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। কিছু-
দিন হইল একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির
কাছে বলিতেছিলাম যে, টাকার পিছনে
ছুটিয়া আমার অতিপরিচিত ব্যক্তিদের
মধ্যেই অন্তত পঁচিশ জন নিজেদের
প্রতিভাকে বলি দিয়াছেন। একজনের
নামও এই প্রসঙ্গে করিয়াছিলাম। তখন
ভুলোকাটি বলিলেন,—

“যাই বলুন, রশ্ময়, পয়সা করেছে!”

তিনি যেন ইংগিত করিলেন যে,
বিস্তহীন হওয়াতে আমি ঈর্ষাপরায়ণ
হইয়া এই ধরনের কথা বলিতেছি।
তাই আমি না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলাম
না,—

ন-চ। “কত পয়সা?”

ভুলোক। “অনেক পয়সা।”

ন-চ। “এক কোটি টাকা?”

ভ। “আরে, না না!”

ন-চ। “পঞ্চাশ লক্ষ?”

ভ। “আরে, না না!”

ন-চ। “দশ লক্ষ?”

ভ। “তাও নয়।”

ন-চ। “পাঁচ লক্ষ?”

ভ। “না, বোধ হয়।”

তখন আমি না বলিয়া পারিলাম
না,—

“দেখুন, এক লাখ বা ৭৫ হাজার টাকা করে শহরভরীতে একটা বাড়ি ভুলে অর্ধেক ভাড়া দিয়ে থাকাকে আমি টাকা করা বলি নে।”

ধ্যাতগত ব্যাপারে তো টাকা করার দৌড় এই পর্যন্ত। জাতিগত ব্যাপারে টাকার পিছনে ছুটিয়া আবার এক স্লেচ্ছ জাতির দাস হইতে চলিয়াছি, বাহি-বিশ্বক জ্ঞান অর্জন করিয়া লাভ বিশেষ হয় নাই। সত্যানন্দ আজও কার্দিভেন, চিকিৎসক তাঁহাকে কোনও প্রবোধ দিতে পারিতেন না।

এখন স্পষ্ট কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। বেশির ভাগ লোক দাংসাবিক প্রতিষ্ঠা ও সম্পন্নতার দিকে ঝুঁকিবে এ কথা বলার আবশ্যক রাখে না। আমি একমাত্র তাঁহাদের কথাই বলিতেছি যাঁহাদের ভিতরে কিছু পদার্থ আছে। তাঁহারা যেন বাঙালীর সত্যকার ধর্ম কি মনে রাখেন। আমি আজ পঞ্চাশ বৎসর দিল্লীপ্রবাসী। এ অঞ্চলের লোকের টাকা উপার্জনের ক্ষমতা দেখিয়াছি। সামান্য পাঞ্জাবী দোকানদার। যে উৎসাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারও নজুলতা ফিরাইয়া

আনিবার কি ক্ষমতা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এবং রোজ দেখিতেছি। যে সব অর্থবান পাঞ্জাবী দিল্লী আসিয়াছিল, তাহারা অর্থের ক্ষেত্রে কি করিতে পারে তাহাও দেখিয়াছি। অন্য সম্প্রদায়ের অর্থোপার্জনের ক্ষমতারও কিছু খবর রাখি।

আমি বলিব পাঞ্জাবী অডোড়া বা ক্ষত্রি, গুজরাটি, বা কাঠিয়াবাড়ী বা মাড়ওয়ারী, ও হিন্দুস্থানের বাণিজ্যর মত অর্থসাধনা করিবার ক্ষমতা বাঙালী ভুল্লোকের কখনও হইবে না। বাংলা দেশেও অর্থোপার্জনের ‘স্পেস্যালিস্ট’ ছিল—নবশাখ সোনার বেনে, অথবা সাহা সম্প্রদায়। অর্থোপার্জনে ইহাদের তৎপরতা ও ক্ষমতা সুস্পষ্ট। কিন্তু বাঙালী ভুল্লোকের এই ক্ষমতা নাই।

“স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহঃ”—এই উক্তি স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া নিধনের কোনও প্রশ্নই নাই। প্রবাসে থাকিয়া আমি একদিকে যেমনই বৃদ্ধিতে পারিয়াছি যে, বাঙালীর অর্থোপার্জনের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ—অসংপথে গেলেও অন্যের তুলনায় সীমাবদ্ধ—তেমনই ইহাও

দেখিয়াছি যে, আর একটা ক্ষেত্র বা জন্ম আছে যাহাতে বাঙালীকে ছাড়াইয়া ভারতবর্ষের অন্য কাহারও অগ্রসর হইয়া যাওয়া সহজ এমন কি সম্ভবও নয়! সেটা মানস জগৎ।

শুধু পরিশ্রমবিমুক্ততা, ও স্বার্থ-শ্রষ্ট হইয়া তুচ্ছ পরসার লোভে হুটিবার জন্য আমরা আমাদের স্বার্থ কীর্তি ও কৃতিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতেছি। বাঙালী সাহিত্যিক যদি ছোট্টরকণের বড়লোক হইবার লোভে নিজের নভ্য-কার কাজ না ছাড়েন, বাঙালী অধ্যাপক যদি যে-মাহিনাকে তাঁহারা হাড়া আঁয় কেহ মোটা মাহিনা বলিবে না সেই বেতনের লোভে অধ্যয়ন ত্যাগ না করেন, বাঙালী বৈজ্ঞানিক যদি বৈজ্ঞানিক না হইয়া মিস্ত্রি হইবার প্রলোভন ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বাঙালী এখনও শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা জগতের যেখানেই মানসজগতের কোন ক্ষমতা না মূল্য আছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের জীবনের ও জাতীয় জীবনের সার্থকতা অবিচল রাখিতে পাবেন। আজ জীবনের শেষে বাঙালী হিসাবে এই কথা বলিতে আমি কোনও সন্দেহ বোধ করিতেছি না।

খ্যাপা খুঁজে ফেরে---





ছন্দময় শ্রমজগৎ

সুস্মিতাকে বেশ ক্রান্ত মনে হচ্ছে।

সেই কোন সকালে শিলং শহর দেখতে বেরিয়েছে। ওয়ার্ড লেকের জলে বাড় বাড় রুই মাছ দেখে আনন্দে কিশোরী মেয়ের মত উচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়ে উঠেছে। হ্যাফি ভ্যালীতে, ক্লিনোলিন, বিশপ আর এলিফ্যান্ট ঝরনায়, উমিয়াম হাইডেল প্রজেক্টে যেখানে গিয়েছে, সেইখানেই সে যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে রঙীন প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু—

দিনের শেষে লেবণ্ডে এসে কি হলো তার! বাতাস বের হয়ে যাওয়া বেলুনের মত একেবারে চুপসে গেল কেন? লেবণ্ডের এই ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা উঁচু-নিচু জমি, নির্বিড় পাইনবনের দীর্ঘবাসেব মত হু-হু বাতাস, চারিদিকের এই কুয়াশাচ্ছন্ন বিপুল ও অনাবরণ প্রকৃতিই ওর মনটাকে কি প্রভাবিত করেছে। দীপক ভাবে। ভাবে আব মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়।

কি যে হয়। থাকে থাকে বেশ,— হঠাৎ সুস্মিতা গম্ভীর ও বিষন্ন হয়ে যায়। কেমন যেন শামুকের মত শক্ত খোলের ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একেবারে চুপ করে থাকে—সে কিছুই বুঝতে পারে না। শূন্য মনে মনে উদ্ভিষ্ট হয়। আর জ্বালাধরা একটা অস্বস্তিতে ভেতরটা একেবারে পড়ে যায়,—কি-কি এমন করেছে সে। কেন মাঝে মাঝে এইরকম করে সুস্মিতা।

—এই যে বাবু, খুব ভাল ভাল কপি আছে। একবার দেখে যান—

লেবণ্ডের পাশে কুয়াশায় ঢাকা একটি কপি বন্ধে। সারি সারি সবুজ পাতার আড়ালে সাদা সাদা ফুলকপি যেন হাসছে। কিন্তু দীপক সেদিকে তাকালো না। সে দেখল, কপির ক্ষেত আলো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি খাসিয়া মেয়ে। বোঁটে-খাটো চেহারা। দুখে-আলতা মেশানো গায়ের রঙ। পাহাড়ী কায়দায় আঁট করে পরা সবুজ শাড়ির আড়ালে স্নাধ্য ও যৌবন জেগে আছে প্রখর হয়ে। গোল মুখে ছোট ছোট চোখে হাসি কিকমিক করছে—কপি নেবে না কি দূ-একটা। খুব সস্তা কিন্তু—

এবারও একটা কথা বলল না সুস্মিতা। দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছবির মত শিলং শহরের বাড়িগুলোর দিকে তার শূন্য দৃষ্টিটা ভাসিয়ে দিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

কি হয়েছে তোমার বলো তো—একটা কথাই যদি বলবে না; তাহলে—এ সব কথাই চিৎকার করে বলতে চাইল দীপক। কিন্তু বলল না। বলতে ইচ্ছে করল না। বরং নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজতে লাগল—সুস্মিতার

এই নিরুদ্ভাপ ব্যবহারের কারণ। কোন কারণই নেই। এটা নতুন কিছু নয়। বছর তিনেক ধরেই সে যেন তার সঙ্গে মেঘলা আকাশের সূর্যের মত লুকোচুরি খেলছে। সেই কোন সকালে মংপো থেকে ছুটে এসেছে সে। যেমন মাঝে মাঝে আসে। আসতে যেমন বাধা নেই, তেমনি তার সঙ্গে দেখা করতেও কোন বাধাই নেই। সে মংপোর সিলভি কালচার সেন্টারে কাজ করে। আউটডোর ডিউটি। বাধাধরা দশটা-পাঁচটার অফিস নয়। আর গোহাটী-শিলং রোড দিয়ে লিল্যান্ড বাস আর ট্যাক্সিও ছুটেছে অহরহ।

ওদিকেও যে সব সময়ই নিষ্ঠুর ও করুণ ঔদাসীনা আছে তা নয়। এক সপ্তাহ না গেলেই আসে অনুযোগ : কাছেই ভেে থাকো। যাও না কেন। মংপোর ফরেষ্ট অফিসারস মেসের মোহ কি এতই বেশি—বোঁদি—। তার নিজের বোঁদি পাণ্ডু থেকে চিঠি দেয়!

শূন্যই যে নিঃস্বার্থ আমন্ত্রণ তা নয়। বোঁদিব এই ব্যাকুল অনুরোধেব আড়ালে একটি মিষ্টি আর বেশ রোমান্টিক চক্রান্তেব আভাসও আছে। আর—

সুস্মিতার মা-বাবার তো কথাই নেই। সে শিলং-এ তাদের বাড়িতে গেলে তাকে নিয়ে যে কি করবে তার ঠিক নেই। সে বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে। আদরের দৃষ্টি দেখে রীতিমত লম্বিতও হয়। এক এক-বার ভাবে, আর বাবে না। কেন বাবে? বোঁদির অনুরোধ, তার মা-বাবার সব অভিধানার জন্য সে নিজের মর্ষাদা বিসর্জন দিতে পারে না।

—তুমি এখানে কি করছো—যাও— যাও এখনি চলে যাও—কেমন আত্ননাদের মত শোনালো খাসিয়া মেয়েটির কণ্ঠস্বর।

কিন্তু কাকে বলছে? যাকে বলছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো কপির ক্ষেতের পাশেই পাহাড়ের ঢালতে যেখানে অনেকগুলো পাইন গাছ জড়াজড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই কেউ আছে! উদয় আগ্রহে প্রতীক্ষা কবছে।

একটু পরেই লেবণ্ডের এই পাইন বনে সন্ধ্যা নামবে। নির্জন, জনমানবহীন এই পাহাড় দিয়ে ঘেরা আরণ্যক রাজ্যে সেই সন্ধ্যাকে গভীর রাত্রির মত মনে হবে। আর ঠিক তখন—তখন ওবা দু'জন পরস্পরের কাছে খন হয়ে এসে বসবে। ওদের হাসি আর গল্পে ছন্দোদ্বীভিত হয়ে উঠবে এই পাইন বন!

হঠাৎ তাব দৃষ্টি হলো। অস্বস্তিতে জ্বলে যেতে লাগল তাব মনটা। ওদের মত সহজ-সরল অব্যাহত জীবন যদি তাদের হতো! তাহলে—তাহলে সেই অভিশপ্ত গ্রীক দেবতা ট্যাণ্টালেশ'র মত বৃক ভয়া ভুজা নিয়ে বসে থাকতে হতো

না! অথচ তার চোখের সামনে বিশাল সরোবর জলের ঐশ্বর্যে টলমল করছে।

আশ্চর্য—খুবই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। শিলং-এর আলো হাওয়ার বৃক হওয়া বলিষ্ঠ পাইনগাছের মতই দীর্ঘ ঝড় দেহ সুস্মিতার। বর্ষার জলে ভরা দীঘির মত স্বাস্থ্যের লাষণে টলমল করছে তার সারা শরীর। কিন্তু তার মনের চেতনে এতটুকু সরসতা নেই। শূন্য ধূ-ধূ নিস্তৃণ মরুভূমির মত অভিশপ্ত বালির নিস্তার। এতটুকু ছায়ার দাক্ষিণ্য নেই। সবুজের ছোঁয়া নেই। তা না হলে এই রকম হয় কখনও?

সে সিনিয়র ফরেষ্ট অফিসার। টিম্বার স্পেশালিস্ট। কাঠের গুণাগুণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অর্থাৎ সিলভি কালচারে সে একজন এক্সপার্ট বলে ডিপার্টমেন্টে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। দেখতে শূন্যতেও খারাপ নয়। পাণ্ডুটে নিজেদের বাড়ি আছে। বলতে বাধা নেই। সুস্মিতার মত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এবং স্কুলের শিক্ষিকার জন্য তার গড় মোটা মাইনের গেজেটেড অফিসার পার রীতিমত ঈর্ষার ব্যাপার।

বোঁদি তাই জানে। তাব বাবা-মা তে প্রকাশ্যেই সে কথা বলে। কিন্তু সেপাল থেকে সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া উচিত সেইখানেই কেমন রহস্যময় আলো-অর্ধা-রির মত। শূন্য ছায়ার জটলা। কিছুই বুঝতে পারে যায় না। বাইবেব লোক তে! বুঝের কথা। সে নিজেই কিছু ধরতে পারে না। কখনও মনে হয়—দূর—বহু-দূর আকাশের কাপসা কুয়াশাময় নীহারিকাপুঞ্জের মত। কোটি কোটি যোজন মাইল দূরে তার অবস্থান। আবার মনে হয়—

—মনে হয় টিম্বার নাড়াচাড়া কবে করে তাব মনটাও বৃষ্টি কাঠের মত শক্ত আব স্থল হয়ে গিয়েছে। তাই সুস্মিতার মনের স্বন্দটা কি ব্যাধাটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। পাহাড়ের অনেক-অনেক ওপরে যেখানে শূন্য হিমশীতল জমাট বরফের স্তূপ, তা গলাতে হলে চাই সূর্যের প্রচণ্ড তাপ। তার ভয় হয়। ভয় হয় নিজের কথা ভেবে হয়তো জীবনের উত্তাপই সে হারিয়ে ফেলেছে—কেমন

সব চেয়ে ভাল
কাকার প্রোডাক্টসের
বানীধূপ
প্রতিধূপ কাকার প্রোডাক্টস দেখেন

হানিমত্যায় ছেয়ে যায় তার সারা মন।
তাই—

এক-একবার দূরে সরে যেতে চেয়েছে। কিন্তু যেই বদলীর জন্য ডাইরেট্টোরেটে দরখাস্ত করতে গিয়েছে অমনি একাটি—একটি মাত্র মূখের ছবিই ভেসে উঠেছে মনের ভেতরে। জন্ম করতে না হয়, নাই পেরেছে। কিন্তু সে পালাবে কেন—কিসের ভয়ে পালাবে? উঠে প্রচণ্ড একটা জেদ মনের ভেতরে জ্বালা ধাঁড়িয়ে দেয়—দেখে নেব তুমি কতবড় স্নেহ! এর নাম বুদ্ধি ভালবাসা। তবীর একটা টানে আর বিবাহত যন্ত্রণার একটু, একটু করে সে পড়ে যাচ্ছে। পড়ে চলেছে তিন ঘর ধরে। আজও—

আজও আসন্ন সম্ভার বিষয় ও কোমল ছায়ার ভরা লেবণের নির্জন মাঠে তার শামনে বসে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরকের মত নিজের ভেতরে সে ধুমায়িত হতে লাগল। আর মনে মনে ঠিক করল সেও গায়ে পড়ে কথা বলবে না। দেশবে ও কতক্ষণ বোবার মত চাপ করে থাকতে পারে—

—কে ওখানে—কে—কে?—হেঁড়ে গলার চিৎকার করে উঠল কপিল ক্ষেতের ভেতর থেকে কে একজন।

হাতে ভোজালী নিয়ে বোরিয়ে এল এক বড়ো। অশ্লীলচর্মসার চেহারা। রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছে। খপ করে সেই খাসিবা মেয়েটির হাত ধরে দাঁতে দাঁত ঘসে বলল—বল কে—কে এসেছিল ভোর ফড়ে?

বনহারিণীর মত ভীরা ভীরা চোখে তাকালো মেয়েটি তার মালিকের রক্তবর্ণ চোখদুটোর দিকে। কিছু বলল না।

হাত ছেড়ে দিল বড়ো। অশ্লীল শব্দ করে হাসল। মেয়েটির গায়ে হাত বুলিয়ে মিস্তি করে বলল—লক্ষ্মী সেনাই জুই কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাস না—

সেনাই চাপ করে থাকল। কিন্তু কৌতুকের একটা হাসিতে চোখদুটো জোনাকীর মত মিট মিট করে জ্বলতে লাগল।

ভোজালী দিয়ে ভয় দেখানো যায়। কিন্তু উনিশ-কুড়ির উখাল-পাখাল যৌবনকে কি বাগ মানানো যায়! দীপকের মনে হল, বড়ো যেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকবে তখন লেবণের ওই উচ্চ চিবিব আড়াল পাইনবনের দিকে সে বড়ের বেগে এগিয়ে যাবে। যেতেই হবে। সেখানে যে একটি ছাষামুড়ি উদয় আগছে প্রতিটি মিনিট গুপছে!

হ্যাঁ। এই রকমই হয়। হাষ থাকে। ভালবাসার মানুষের জন্য প্রতীক্ষা যেমন মিস্তি তেমন যন্ত্রণার। এই যে ছাষাশ বছরের তরুণীটি তার সামনে গম্ভীর আর কঠিন মুখ নিয়ে বসে আছে

তার জন্যও একদিন সে এলিফ্যান্ট ফলসের পাশে পাইনবনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

স্কুল থেকে সোজা চলে এসেছিল সুস্মিতা। আর সঙ্গে সঙ্গে কুরাশার ভেজা ভেজা পাইনবনের সাঁ সাঁ বাতাস, বরনার একটানা বর বর শব্দ তার বৃকের রক্তে কলধনি বাজিয়ে তুলেছিল।

তার দৃষ্টিতে করনার পাশেই খাড়া পাহাড়ের গা কেটে কেটে তৈরি করা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। দূ-পাশে বড় বড় পাইনগাছ হুমুড়ি খেয়ে পড়েছে। সেখান থেকে ভাল করে আকাশ পর্যন্ত দেখা যায় না। মেঘলা দিনের মত অন্ধকার অন্ধকার জায়গাটা। পাইনের দীর্ঘ পাতা থেকে টপ টপ করে জল বরছে। হঠাৎ মনে হয় যেন নিরবচ্ছিন্ন বর্ষার একটা পৃথিবীতে তারা চলে এসেছে।

তারা নেমে এল সেইখানে যেখানে স্বরনা পাহাড়ী নদীর মত বড় বড় পাথরের নিচ দিয়ে সাধা বকবকে এক-একটা নুড়ি টপকে টপকে চলে গেছে অনেক-অনেক দূরে সমতলে। সেই নির্জন আরণ্যক পরিবেশে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা আদিমতার সাদা জেগেছিল। যেই তার কাছে এসেছিল অমনি তবীর ভরে আভঙ্কে একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতা।

—আমার ভয় করছে—খুব ভয় করছে—চলুন—শীগগির ওপরে চলুন, এক রকম জোর করেই ঝড়ের বেগে এক-সঙ্গে দু-তিনটা সিঁড়ি টপকে টপকে ওপরে চলে গিয়েছিল সে। সেনিন—সেনিনও আজকের মতই তার মর্ষাদায় ধা লেগেছিল। অশচ—

কেউ না জানুক। সে তো জানে মংপোর ফরেষ্ট অফিসারস মেসের ঠিকানায় লেখা সেই ছোট চিঠিটা... শনিবার দুপুরে ঠিক দেড়টার সময় আশি এলিফ্যান্ট ফলসের পাশে অপেক্ষা করবো। আপনার সঙ্গে সেই পাইনবনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে নিচে নেমে যাবে.....

...আরও একদিন। আরও একবার। সেই ঘটনার পর আর সে শিল্প-এ যায় নি। কিন্তু এক মাস ধ্যেতে না যেতেই আবার আমন্ত্রণের হাতছানিঃ রাগ করে-ছেন? আর ওরকম হবে না! এবার আসুন। আপনার সঙ্গে যাবো বর্ষার দেশ চেবাপুঞ্জীতে। যাবো সেখান থেকে তিন মাইল দক্ষিণে মৌসমী উপত্যকার নাহোকালিকাই বরনার ধারে।

গিয়েছিল। মেঘোঢাকা চেবাপুঞ্জীর আকাশ। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। বেশ মনে আছে। সুস্মিতা বেশ খুশিই হয়ে-ছিল। যেমন আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর দোলানো খোঁপা আর হাসি

হাসি মুখ নিয়ে সে অনঙ্গল কথা বলছিল। সেনিনও চেবাপুঞ্জীর মিশনারী কলেজ, স্কুল সব দেখে তারা এসেছিল মৌসমী উপত্যকায়। ঠিক সেই সময় চেপে নেমে এসেছিল বৃষ্টি। অকোরে বৃষ্টির শারীর চারিদিক ব্যাপসা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তাদের দুজনের গায়েই দামী বর্ষাতি ছিল।

তাই বৃষ্টিতে কোন অসুবিধা হওয়ারই কথা নয়। কিন্তু মৌসমী উপত্যকার পাশেই বিখ্যাত পুবন গুহার সামনে আসতেই কেমন একটা ভয়েব ছায়া পড়ল তার চোখে। যেমে যেমে বলল, কিছু মনে করবেন না। চলুন যাওয়া যাক।

কেন—কেন সুস্মিতা? পুবন গুহার ভেতরটা খুব সুন্দর। দেশ-দেশান্তর থেকে কত লোক দেখতে আসে—

কোন কথা বলল না সুস্মিতা। দূরে বহু দূরে ব্যাপসা কুরাশায় শ্রীহট্টের বিশাল সমতলভূমির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মনের ভেতরে কিসের যেন নাড়া-চাড়া চলছে। আন্তে আস্তে বলল, এত নির্জন আর জনমানবহীন জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে কেমন গা ছমছম করে। মনে হয় যদি—

আর কিছু বলল না। অশ্লীল অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। সেনিনও আহত হয়েছিল। পৌরুষে বা লেগেছিল। খুব বেশি মনের মিল থাকলে নির্জনতাই তো কাম্য। ভয় কিসের—কিসের ভয়? সে কি বাঘ না ভালুক? আর এতটুকু বিশ্বাসই না করবে যদি তাহলে কেন—কেন লিখেছিল—এইবার আসুন। আপনাকে নিয়ে যাবো বর্ষার দেশ চেবাপুঞ্জীতে। যাবো.....

আকে নিয়ে খেলছে না কি! বানর নাচ নাচাচ্ছে। না কি মনটা রোমান্টিক। কাব্যময়। কিন্তু 'ম্যারেজ ফ্রাইট'—আকে বলে বিবাহতর্কিত—তাই আছে। খুব বেশি লেখাপড়া শিখলে আর বয়স হলে নানা-রকম দেশেদুর্দেশে মেয়েদের এবং ছেলেদেরও হয় এই ম্যারেজ ফ্রাইট! হয় তাই—তা না হলে তাকে সে একটুও ভালই বাসে না। তিন বছর—তিন-বছর ধরে শূন্য ভালবাসার অভিনয় করে চলেছে। তার মাথার ভেতরে আগুনের ঝড় বয়ে যেতে লাগল। ইচ্ছে হল—দু'হাতে গুর টুটি শক্ত করে টিপে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—

ওরে—বাবা—রে—মেয়ে ফেলল—হঠাৎ তাক্য একটা আর্ত চিৎকারে চারিদিকের নিখর স্তম্ভতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল।

চমকে উঠল তারা। এতক্ষণ একা নির্লব্ধ দাবদাহের পৃথিবীতে যেন বাস করছিল তারা। কখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি

নেমেছে; কখন আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে তা বুঝতেই পারে নি।

সুস্মিতা ধর ধর করে কাঁপছে। ভয়ে ভয়ে সেই ঘন কুয়াশায় ঘেরা লেবনের ঝাঠের এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ তার সম্মুখে পড়ল, অদূরে সেই কপিপ ক্ষেতের পাশে পাইনবনের আড়ালে তিনটি ছায়া-মূর্তি ছুটছে। পাইন, নাহর আর ওক গাছে গাছে মড়মড় শব্দ হচ্ছে—ডাল ভেঙে পড়ছে—গুম গুম করে মেঘ ডাকছে। সব মিলিয়ে যেন একটা মহাপ্রলয় নেমে এসেছে পৃথিবীতে। আর—

সেই অতল অন্ধকারে ভরা ভয়ঙ্কর দুর্যোগের পটভূমিতে ওরা যেন হিংস্র বন্য জন্তুর মত পরস্পর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। বোধহয় মেয়েটাকে মেরেই ফেলবে বড়ো—

—যা খুঁশি করুক—যা ইচ্ছে হোক—
যাবেন না কিন্তু আপনি—

—এই কে কোথায় আছে—বাঁ—চা—ও—
—আবার সেই আকুল বুকফাটা আত্ননাদ—
—আপনার পায়ে পাড়ি—আমাকে ফেলে যা-বে-ন না কিন্তু—তীব্র ঝড়ো ঝাড়াতে তার কথাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দূরে—বহু দূরে।

দীপক ছুটল। ছুটল কপি ক্ষেতের দিকে সেই খাসিয়া মেয়েটির চিৎকার লক্ষ্য করে। মূহুর্তে যেন কালো অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে গেল। সুস্মিতাও দ্রুত পায়ে তাকে অনুসরণ করল। আর ঠিক সেই মূহুর্তে—

সেই মূহুর্তে ঘটে গেল কান্ডটা। ক্ষেতের মালিক বড়োর হাতে খিলক দিয়ে উঠল ধারালো অস্ত্র। সামনে দীপক...

—উঃ—মা—গো—ড়কবে উঠল সুস্মিতা। ভরে চোখ বুজল। তারপর আর জানে না সে। ভাবতেও পারে না—

ভাবতে পারে না সে নিজেও। কেমন করে কোথা থেকে সে এই দানবীর শক্তি পেল, কেমন করে ঝটকা টান মেখে বড়োর ভোজালীর মুখ থেকে সবিয়ে নিল। কেমন যেন নেশাখোর মানুষের মত একটা ঝাঁকের ওপরে সব কিছুর কবে চলেছে সে। বুকতে পারছে—বেশ বুকতে পারছে—সে কেমন অস্বাভাবিক মৃদু—অনন্দব প্রগলভা হয়ে উঠছে। পারছে না—কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছে না।

—কেন—কেন আপনি ওদের মারা-
হারির ভেতবে গিয়ে পড়লেন শুনিন?

দীপক চুপ। একটা কথাও বলছে না। ব্যাডেজ বাঁধা হাত নিয়ে মাথা নিচু করে ট্যান্সির অন্ধকার কোণে নিজেকে মিশিয়ে নিয়ে বসে রয়েছে। যেন নিজের অস্তিত্বটাকে পবনকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে চায়।

—খুব বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিল, তাই না?

এইবার—এইবারও একটা কথা বলল না দীপক।

—কি ব্যাপার—চুপ করে আছেন কেন?

—বাথা করছে?

হঠাৎ বুকু পড়ে সেই অন্ধকারে তার নির্বিকার পাথুরে মূখের দিকে তাকিয়ে সুস্মিতার অস্বাভাবিক মৃদুস্বভাব, তীব্র চাপলা সব—সব একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিদ্যুৎ চমকের মত অনুভব করল, হয়তো ওর এই বিপদের ভেতরে কাঁপিয়ে পড়াটা আকস্মিক আবেগ নয়। উন্মত্ততা নয়—তার সামনে বসে নিঃশব্দে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল বলেই মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়ে-
ছিল।

ভাল—ভালই করেছিল। তার জড়তা ছিল কঠিন। মনটাকে একেবারে পাথরের মত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল জমাট একটা ভয়। এসব ভেঙেচুরে দীর্ঘ-বিদীর্ণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল এই রকম একটা দুর্ঘটনার—প্রয়োজন ছিল এই রকম দুর্যোগময় ভয়াল একটা পরিবেশের। যত

বেশ করে বুকতে পারল তত বেশি কথা বুকুর ভেতর থেকে অস্ফুট একটা বাথা পাক দিয়ে দিয়ে গলার কাছে উঠে আসতে লাগল। তার মনে হল—

মনে হল তার মনের জড়তা, তার সংস্কার তার কঠিন্য তার মনের ভেতরের সব আবির্ভাবকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে বিপুল একটা বন্যার মত তুমুল কান্দা আসছে।

পুলিশ বাজারের বলমলে আরো তার চোখদুটো চিক চিক করে উঠল।

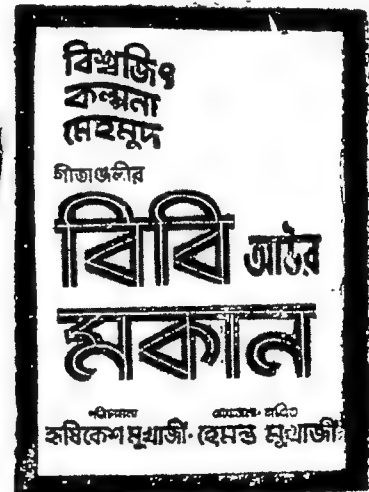
—এ কী সুস্মিতা তুমি কাদছো?

আর পারল না। এইবার মৃদু চেপে ধরে হৃদয় করে কেঁদে উঠল সে। কেঁদে কেঁদে হয়তো নিজের সব দোষ, সব দীনতাকে একেবারে ধুয়ে মছে ফেলে নিজেকে সহজ আশ হালকা করতে চাইল। কিন্তু—

দীপকের মনে হল। মনে হল সেই কথাটাঃ তোমাকে নিয়ে যাবো বর্ষার দেশ চেরাপুঞ্জীতে.....

শিলং—এ নয়। এইবার যেন সে সত্যি সত্যি চেরাপুঞ্জীতে চলেছে।

বৃত্যগীত সম্বলিত এক রসঘন কাহিনী... হাস্যলাস্যে জম্জমাট



প্রত্যহ
৩, ৬, ৯ নিউ এম্পায়ার

লোটার্স ০ মেনকা ০ রূপালী ০ প্রভাত ০ থান্না
নাছ ০ তসবীর মহল ০ চিত্রপুরী ০ কমল ০ গ্যামাশী ০ নবভারত
অশোক ০ ঝর্ণা ০ পূর্বাশা ০ লক্ষ্মী ০ শ্রীকৃষ্ণ ০ লীলা
শ্রীবাসপুর টকীজ ০ মুক্তি ০ বেটকীজ ০ নিউ গিনেশ ০ গোধূলি

বস্তুত যে-জনসাধারণকে কেন্দ্র করে
পেশাদারী রাজনীতিকদের আবর্তন, সেই

এবারেব নির্বাচনে মথারিস্ত ও নিম্ন-মথারিস্ত সমাজের বেশ কিছু সংখ্যক প্রার্থী'ব সাফল্য আ'ব একটি চিন্তাক্ষরক ঘটন। বিপদে অর্থায়ন করেও বহু প্রার্থী সাধারণ দরিদ্র প্রার্থীর কাছে পরাজিত হওয়াতে এষ্ট কথাই প্রমাণিত

অঙ্কুর মন্থোপাধ্যায় দীর্ঘজীবী হোন।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

ডঃ বৃন্দেন ভট্টাচার্য

ওপেনহাইমার

সংবাদটা আলোক-রশ্মির মতোই তাঁর গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। শোনা গেল, ওপেনহাইমার নেই; এক সুবর্ণের দেশ এই পৃথিবী ছেড়ে 'সহস্র সুবর্ণের জ্যোতির্ময়'-লোকে মহাপ্রস্থান করেছেন। এ সংবাদ শোনা মাত্রই একসঙ্গে অনেক কথা মনে এল। মনে এল, এক ভীষণ বিজ্ঞানীর কথা যিনি তাঁর দোষ-গুণ, দ্বন্দ্ব-সংশয় ও ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে বিশ শতকের বৃহৎ-বল্লভগারই মূর্তিমান প্রতীক। যিনি কখনও রাষ্ট্রের তাড়নায় চাকর সেজে পারমাণবিক বোমা গড়েছেন; আবার কখনও প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও সত্য-দৃষ্টির আলোকে হয়ে উঠেছেন মহিমমর। যিনি কখনও প্রয়োজনের তাগিদে কক্ষত্রুট জ্যোতিষ্কের মতো উদ্ভাসিত, আবার কখনও বিবেকের নির্দেশে ধ্যান-সমাহিত ছাটির মতো অচঞ্চল।

সত্যি ওপেনহাইমারের তুলনা নেই। বিপরীত ও পরস্পর-বিরোধী গুণাগুণের সমাবেশে তিনি এ যুগের এক পরম বিস্ময়। এ ছাড়া আজকের দিনে বিজ্ঞানী যে রাষ্ট্রের হাতে কতখানি অসহায়, তাঁর জীবনের বহু-বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে ভিলে ভিলে তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, বিজ্ঞানীদের অনেকেই রাষ্ট্রের চাপে পড়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র গড়েন; নিরুপায় হয়ে বলেন, হ্যাঁ, আছি আমি ডোমাদের পেছনে। কিন্তু যে মূহুর্তে চাপ একটু আলগা হয়, যে মূহুর্তে মনুষ্য-বোধ পথ দেখায় তাকে, তখনই তিনি বলে ওঠেন, না; আর নেই আমি। পরমাণু-বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের সার্বাঙ্গী জীবন এই 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর সমন্বয়ে গড়া।

অথচ কী বিরাট প্রতিভা ছিল তাঁর। কোয়ান্টাম থিয়োরী'কে তিনি কত অল্প বয়সে আয়ত্ব করত পেরেছিলেন! পদার্থবিদ্যার জয়যাত্রা-পথের সব ক'টি পথকে কী সুন্দরভাবে পর্ববেক্ষণ করে-ছিলেন কত সহজে!

কিন্তু এই প্রতিভার প্রদীপটি থেকে সর্বনাশের আগুন জ্বলান হল। হিরোসিমা এবং নাগাসাকি জ্বলল। জ্বললেন বিজ্ঞানী নিজেও। পরিচিত হলেন 'পরমাণুবোমার জনক' বলে। সবাই মেনে নিল, রবার্ট ওপেনহাইমার এ যুগের এক মহাবিজ্ঞানী।

এই বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল ১৯০৪

খৃস্টাব্দের ২২শে এপ্রিল, নিউইয়র্কে। তাঁর পিতা জুলিয়াস মাত্র ১৪ বছর বয়সে জার্মানী ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসেন। পরবর্তীকালে ব্যবসারে বেশ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন তিনি। কিন্তু শৃঙ্খলায় ধন-দৌলতে তাঁর মন উঠত না। সুযোগ পেলেই তিনি ছবি কিনতেন; নিজের সংগ্রহশালাটিকে ডারিয়ে তুলতেন মনোজ্ঞ সব চিত্রকলার। কাজেই রবার্ট ওপেনহাইমার বেড়ে উঠলেন একদিকে

ব্যবসায়ের কাঠিন্য এবং অপরদিকে শিল্প-সৌন্দর্যের কোমলতার মধ্যে। তাঁর মা ইল্লা ফ্রীডম্যানও সুন্দর চিত্রশিল্পী ছিলেন। ছবি-আঁকা তাঁর নেশা এবং পেশা দুই-ই ছিল। কিন্তু তিনি বাচলেন না বেশ দিন। ৮ বছরের শিশুপুত্র রবার্টকে রেখে ইহলোক থেকে ছুটি নিলেন।

শিশুপুত্রটির জীবনে অপরিসীম শূন্যতা ঘনিবে এল। কিন্তু কিছুতেই



ওপেনহাইমার

হার মানল না সে। অনুজ লেখাপড়া নিয়ে মেতে রইল। শূন্যতাকে ভরাবার চেষ্টা করল কাজ দিয়ে। সদু হল বিজ্ঞানশিক্ষা। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে রবার্টের সম্পূর্ণ হল তাঁর অনুজ ফ্রাংক। দাদা এবং ভাই মিলে স্থির করল বিজ্ঞান-চর্চাই হবে ওদের জীবনের রত।

অবশ্য এই রত-পালনের কাজ রবার্ট ওপেনহাইমার সদু করছিলেন অনেক আগে থেকেই। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন থেকেই রঙ-বেরঙের সব পাখর এবং ভূ-বিদ্যার নানাবিধ উপকরণ-সংগ্রহে মেতে উঠেছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ দিতেন তাঁর পিতামহ।

শেষ অবধি এই উৎসাহ-উদ্দীপনা স্বার্থ হয় নি। রবার্টের সংগৃহীত খাতব পদার্থ এবং পাথরগুলোও কাজে লেগেছিল। ওগুলোকে দেখিয়েই মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি 'মিন্যাসোলজিক্যাল ক্লাব অব নিউইয়র্ক'-এর সভ্য হন।

ওদিকে বিদ্যা-চর্চা চলেছে পুরোদমে। 'এডিক্যাল কালচার স্কুলে' ওপেনহাইমার সেখানকার ছাত্র হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কিশোর রবার্ট ভাবছেন, ভবিষ্যতে রসায়ন-বিজ্ঞানী হবেন।

অবশ্য শৈশবে কবি হবার স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন। একবার মনে হয়েছিল তাঁর স্বপ্নাতিবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করলে কেমন হয়। কেমন হয়, যদি তিনি শহরে শহরে অকস্মাৎ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেন।

ভরা শৈশবে টিক এমনিভাবে আরও কত যে স্বপ্ন দেখতেন ওপেনহাইমার, সীমাসংখ্য নেই তার। স্বপ্ন দেখতেন কখনও; কখনও আবার একমনে বই পড়তেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, ইতিহাস,—বহু বিষয়ে অসম্মত কৌতূহল ছিল তাঁর। এছাড়া এত দ্রুত পড়তেন তিনি যে, মধ্যে অনেকেই অবাক হয়ে যেত।

একবার নিউইয়র্ক চলেছেন কিশোর ওপেনহাইমার। ট্রেনে উঠেছেন সান-জোসিসকো থেকে। হাতে একটি বই। গিবন-এর 'দি ডিক্রাইন অ্যান্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার'। অনেকেই জানেন, বিরাট বই সেটি। কিন্তু আশ্চর্য! নিউইয়র্ক পৌঁছবার আগেই বইটি পড়ে শেষ করলেন কিশোর।

কিন্তু কিছতেই তৃপ্ত নেই তাঁর। বলেন, আরও পড়বো, আরও। পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়াই এতদিন; এইবার প্রাচ্য-দর্শন পড়বো।

পড়লেন তিনি। বৌদ্ধ ও হিন্দু-দর্শন পড়লেন, সংস্কৃত শিখলেন। বয়স বত বাড়ল, প্রাচ্য ধ্যান-ধারণার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় তত নিবিড় হয়ে উঠল।

অনেকেরই প্রশ্ন, প্রাচ্যের প্রতি ওপেনহাইমারের এই আকর্ষণের কারণ কি? এক-কথায় এর উত্তর হল, প্রাচ্য-দর্শনের মধ্যে এই বিজ্ঞানী তাঁর কতকগুলো জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি? বিজ্ঞান কোথায় নিয়ে যাবে মানবসভ্যতাকে?—এ সব প্রশ্নের জবাব প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শন বহু ভাঁকে দিয়েছিল। কিন্তু এই জবাব যে কি, ওপেনহাইমার খোলসা করে তা কখনও বলেন নি। ফলে, তাঁর জীবনদর্শন আমাদের কাছে কিছুটা অব-গুপ্ত থেকে গেছে।

যাক সে কথা। ওপেনহাইমার-এর ছাত্রজীবন-প্রসঙ্গ ফিরে আসা যাক আবার। সেখানে দেখি, অতি দ্রুত তিনি সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উঠছেন। চার বছরের পাঠক্রম তিনবছরে শেষ করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন ১৯২৫ খৃস্টাব্দে।

গ্র্যাজুয়েট হবার পর কেম্ব্রিজে গেলেন ওপেনহাইমার। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ডের অধীনে ক্যারো-ডিস ল্যাবরেটরীতে গবেষণা সদু করলেন।

গবেষণার এই তরুণের নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হ'ত অনেকেই। অনেকে আবার ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরত। সহকর্মীদের কেউ কেউ 'ককো' বা কুমীর বলত ওকে। যেই দেখত, ওপেনহাইমার আসছে, অমনি বলে উঠত, 'এ যে! ককো!'

এই নামকরণের পেছনে অবশ্য কারণ ছিল। ওপেনহাইমার পকেটে বেশ বড় আকারের একটি ঘড়ি নিয়ে খুঁজে বেড়া-তেন। ঘড়িটা টিক টিক করে বাজত। খানিকটা দূর থেকেও শোনা যেত সে বাজনা।

এদিকে জে. এম. ব্যারীর 'শিটার প্যান' গল্পটি তখন খুব জনপ্রিয়। সে গল্পে আছে, এক কুমীর ভুল করে একটি 'এলার্ম ক্লক' গিলে ফেলেছিল। কুমীরটি চলবার সময় ওই 'ক্লক' বেজে উঠত। অন্তত 'শিটার প্যান' গল্পের কথা স্মরণ করেই যে সহকর্মীরা ওপেনহাইমারকে 'ককো' বলতো, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ওপেনহাইমার কিন্তু চটতেন না মোটেই। বরং চলতেন সত্যিকারের 'ককো'-র মতোই সোজা পথে।

অবশ্য পথ-চল্য মাকে মাকে দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। ক্যারো-ডিস ল্যাবরেটরীতে দারুণ অর্থাভাব চলছে তখন। অর্থের জন্য বিজ্ঞানীরা কখনও রাজদরবারে আবার কখনও মনীষীদের দরজায় ধর্না দিচ্ছিলেন। গবেষণার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকেই হচ্ছেন অপদস্থ।

ওপেনহাইমার দেখলেন এসব। নীরবে প্রত্যক্ষ করলেন, অভাবের রাহ,

কিভাবে প্রতিভার প্রদীপ্ত সব সূর্যকে গ্রাস করার উপক্রম করে।

এ অভিজ্ঞতা কোনোদিনই তিনি মনে থেকে মনে ফেলতে পারেন নি। তাই দেখি, পরবর্তীকালে সাময়িক শক্তির কাছ থেকে যখন ল্যাবরেটরী গড়ার ডাক এল, যখন রাষ্ট্র কোটি কোটি ডলার ব্যয় করবার সংকল্প ঘোষণা করে পারমাণবিক অস্ত্র গড়ার ভার তাঁকে দিল, তখন তিনি সেই লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রের দেওয়া দায়িত্ব।

অবশ্য এর অনেক আগেই তিনি 'কোয়ান্টাম' থিয়োরীতে অসাধারণ ব্যাপ্তি অর্জন করেছিলেন। জার্মানী থেকে ম্যাক্স বর্নের আহ্বানে গিয়েছিলেন গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯২৭ খৃস্টাব্দে উট্রেখট ডিগ্রী তিনি গটিনজেন থেকেই পান। ম্যাক্স বর্ন ভূয়সী প্রশংসা করেন তাঁর গবেষণার। এরপর কয়েক মাস জুরিখ ও লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে তিনি আমেরিকায় ফিরে আসেন ১৯২৮ খৃস্টাব্দে।

স্বদেশে ফিরে ওপেনহাইমার দেখলেন, আর একা নন তিনি। আর অজ্ঞাত নন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রশংসায় মুগ্ধ। ইয়োরোপের বিজ্ঞানী-মহলে যে খ্যাতি তিনি অর্জন করেছিলেন, আটলান্টিক পেরিয়ে তা এসে আঘাত করেছে আমেরিকায়।

সেদিন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ওপেনহাইমারকে। কিন্তু ওপেনহাইমার বেছে নিলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কেন বেছে নিলেন, তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "ওখানকার গ্রন্থাগারে বোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদের সংগ্রহ দেখে আমি প্রলুব্ধ হয়েছি।"

কবিতার প্রতি কৌতূহল অবশ্য ওপেনহাইমার-এর নতুন নয়। কিশোর বয়সে মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন তিনি। কেম্ব্রিজে থাকবার সময় কাব্য-চর্চা করে কণ্ঠের অবাক করে দিতেন। কিন্তু এসব কাহিনী তো ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের জানবার কথা নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন সোদিন ওপেনহাইমার-এর মন্তব্য শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন।

এছাড়া এই তরুণ বিজ্ঞানীকে ঘিরে ছাত্রদের বিস্ময়ও বড় কম ছিল না। বিজ্ঞানীটির গাঢ় নীল চোখের মধ্যে ওরা প্রতিভার দীপ্ত খুঁজে পেতে। আর তাঁর তীক্ষ্ণ ও উন্নত নাক এবং সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভুরু দু'দিকে তাকিয়ে ওদের মনে হত, এই যে মানুষটি, পদার্থবিজ্ঞানের দু'দুই সব তত্ত্বকে যিনি যখন-তখন জলের

মতো সহজ করে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন, তিনি যেন সন্দেহের কেউ। যেন জ্ঞানরাজ্যের কোন সন্দেহের বন্ধুর পথ ধরে চলেছেন তিনি। চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন এক-একবার; জ্ঞানের আলোককে বিকীর্ণ করে দিচ্ছেন বিদ্যার্থীদের চলার পথটুকু প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে বলে।

এগিয়ে চললেন ওপেনহাইমার। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গেলেন পাসাডেনা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। গেলেন বটে; কিন্তু পুরনো ছাত্রদের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। ছাত্রদের অনেকেই পিছু নিল তাঁর; গেল পাসাডেনা অবধি।

লস এঞ্জেলস্-এর কাছাকাছি একটি অঞ্চল এই পাসাডেনা। নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হল এখানে। গবেষণা চলল। ক্রাশে ভিড় করল ছাত্রের দল। অনেক তরুণেরই আদর্শ হয়ে উঠলেন ওপেনহাইমার। ভক্তরা তাঁর চাল-চলন অনুকরণ করত। কখনও ঠিক তাঁরই মতো মাথা একদিকে একটা হেলিয়ে দাঁড়াত ওরা; কখনও আবার তাঁর অনুকরণে ওরা কাশতো; দুটো বাক্যের মাঝখানে থামত কিছুক্ষণ করে; কথা বলবার সময় ঠোঁটের সামনে একটি হাত তুলে ধরত। এছাড়া অনুরাগীদের মনেক্ষেই ওপেনহাইমারকে ডাকত 'ওপি' বলে। সিগারেট খেত ঠিক যেমন করে 'ওপি' যায়।

এইভাবে দেখতে দেখতে তরুণ বিজ্ঞানীদের ওপর ওপেনহাইমার প্রভাব বিস্তার করলেন। কিন্তু বহুদিন তারগণের একটি প্রধান ধর্ম রাজনীতি-চর্চার কোনো উত্তাপ তাকে স্পর্শ করে নি। রাজনীতি সম্পর্কে তিনি প্রথম সচকিত হয়ে উঠলেন ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে। এর মূলে ছিল স্পেন গণতন্ত্রের ওপর 'ফ্যাসিজম'-এর আক্রমণ। এই আক্রমণের সংবাদ যখন তিনি শুনলেন, তখন মনো-বিজ্ঞানের একটি ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় পরিণয়ের দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। ছাত্রীটি ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু কমিউনিস্টের মধ্যে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন।

এদিকে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে ওপেনহাইমারের পিতা জুলিয়াসের মৃত্যু হল। মৃত্যুকালে তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তি রেখে গেলেন। পত্র রবার্ট কাজে লাগালেন ওদের; অকাতরে অর্থসাহায্য করলেন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে। এছাড়া কমিউনিস্টদের জয়গান করে কিছু সংখ্যক প্রচার-পত্র ও পুস্তিকা রচনা করলেন তিনি এবং ওগুলোকে ছাপালেন নিজের খরচায়।

তবে এ উৎসাহ ছিল সাময়িক। কিছুদিন পরেই এতে ভাটা পড়ল।

জীববিজ্ঞানের এক ছাত্রী প্রেমে পড়লেন ওপেনহাইমার এবং ১৯৪০ খৃস্টাব্দে তাকে বিয়ে করলেন। এদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে তখন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কয়েকজন পদার্থ-বিজ্ঞানীর ওপর অত্যাচার চলেছে। স্ট্যালিনের প্রকোপে পড়ে রাশিয়া ছেড়ে আসতে ওরা বাধ্য হইলেন।

এই সংবাদে দারুণ আঘাত পেলেন ওপেনহাইমার। কমিউনিজম থেকে অনেকটা দূরে সরে এলেন তিনি। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির সভা তিনি কোনোদিনই ছিলেন না; আবার পার্টি থেকে দূরে যখন ছিলেন তখনও কমরেডদের কথা একেবারে ভুলে থাকতে পারেন নি। কাজেই সোভিয়েট ইউনিয়নের দুঃসংবাদ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর ব্যবধান বাড়ান বটে, কিন্তু সম্পর্ক ফিস করল না। পার্টির অনেকেই তাঁর কাছে আগে যেমন তখনও ঠিক তেমনি বন্ধু থাকল। এই বন্ধু ও সহকর্মীদের একজন হচ্ছেন রবার্টের অনুজ ফ্রাংক ওপেনহাইমার।

এদিকে ইয়োরোপে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন। জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য মিত্রশক্তি ইংল্যান্ডকে সাহায্য করার কথা ভাবছে আর জেনারেল গ্রোভস্ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটন প্রকল্পের সর্বময় কর্তা।

১৯৪২-এর শরৎ কাল। চিকাগো থেকে ট্রেন ছেড়েছে একটি। চলেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের দিকে। এ ট্রেনের এক সংরক্ষিত কামরায় বসে দু'জনে ফিস ফিস করে কথাবার্তা বলছেন। একজনের পরনে মিলিটারী পোশাক। অপরজন সাধারণ নাগরিকের বেশভূষায় সজ্জিত। মিলিটারীটি নাগরিকের কাছে হঠাৎ এক লোভনীয় আর আতঙ্ককর প্রশ্নব কর

বসলেন। বললেন, পারমাণবিক বোমা গড়তে হবে এবং এ কাজের দায়িত্ব নিতে হবে তাঁকেই। নাগরিকটি রাজী হলেন এবং সে মর্মেতেই হিরোসিমা এবং নাগাসাকির কয়েক লক্ষ লোকের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। নির্ধারিত হল, ভাগ্যের চাবিকাঠি তৈরি করার দায়িত্ব করবেন ওপেনহাইমার; আর সে কাঠিটি হাতে নেবেন জেনারেল গ্রোভস্।

কাজ শুরু হল আচিরেই। ট্রেনের কামরায় যা ছিল শৃঙ্খলা একটা পরি-কল্পনা—নিউ মেক্সিকোর লস আলামোস উপত্যকার ধীরে ধীরে তা বাস্তবে রূপ পেতে লাগল। নিভৃত ঐ অঞ্চলটিতে গড়ে উঠল এক বিরাট ল্যাবরেটরী। দেখতে দেখতে পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের এক শাক্সে কারখানা লস আলামোসের জনপরিভ্রম উপত্যকাটিকে কোলাহলমুখর করে তুলল। এক বছরে ওখানকার লোক-সংখ্যা দাঁড়াল ৩,৫০০।

ওপেনহাইমার নিজে সব কিছুর তদারকি করতেন। ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করতেন তিনি। একজন কঠোর পরিপ্রভম করতে হয়েছে তাঁকে; ট্রেনে এবং বিমানে করে হাজার হাজার মাইল ছোটাছুটি করতে হয়েছে। অনেক কষ্টে বিজ্ঞানীদের বোঝাতে হয়েছে যে, জনমানবহীন লস আলামোস বিজ্ঞান-বিদ্যার এক মহিমময় সাফল্যের সাক্ষী হয়ে থাকবে।

অপর কেউ হলে এমন করে বোঝাতে পারতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ওপেনহাইমার অসাধাসাধন করলেন। গ্রোভস্-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞানীদের দ্বিধা ছুটিপয়ে স্মারক করালেন তিনি। ছুটিপে ছিল, যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি বিজ্ঞানীরা লস আলামোসে থাকবেন; কারও কাত



আইনস্টাইনের সঙ্গে ওপেনহাইমার

ল্যাবরেটরীর গোপন কথা প্রকাশ করবেন না। যাবেন না কোথাও। বাইরের পৃথিবীর কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না।

১৯৪০ খৃস্টাব্দের এক বসন্তের দিনে পরমাণুবিজ্ঞানীর প্রথম দলটি এল। প্রাচীন শহর সান্তা-ফি হয়ে ধীরে ধীরে ওরা এগোল লস অ্যালামোস উপত্যকার দিকে।

ওপেনহাইমারকে যখন পারমাণবিক অস্ত্র-উৎপাদনের নেতৃত্ব দেওয়া হল, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৮ বছর। এরই মধ্যে বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সন্দেহ নেই; কিন্তু এমন কিছু মৌলিক আবিষ্কার তিনি করেন নি যা তাঁকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মর্যাদা দিতে পারে। অথচ আমেরিকায় তখন নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী কয়েকজন বিজ্ঞানী রয়েছেন। রয়েছে এনারিকো ফার্মির মতো বিশ্ববিখ্যাত মনীষী। এঁদের সকলকে ধাদ দিয়ে ওপেনহাইমার-এর মতো একজন যুবককে কেন পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হল, তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। দীর্ঘদিন পরে এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জেনারেল গ্রোভস্ জ্ঞানালেন, “আমাকে তিরস্কৃত করে বলা হয়েছিল, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী কোনো বিজ্ঞানীকে অথবা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে এই কাজের ভার দিলে ভাল হ’ত। তা’ হলে তিনি প্রয়োজন অনুসারে সহকর্মীদের ওপর কতৃষ্ণ ফলাতে পারতেন। কিন্তু আমি ওপেনহাইমারকেই বেছে নিলাম; এবং এ ব্যাপারে আমি যে কিছু ভুল করি নি, ওপেনহাইমারের সাক্ষ্যই তার প্রমাণ।”

ঠিক কথা। যোগ্য ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছিলেন জেনারেল গ্রোভস্। অবশ্য সন্দেহ নেই, শ্রেষ্ঠতর কোনো ব্যক্তিকে এ ভার দিলে তিনি হয়তো অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরও কিছুকর কিছু করতে পারতেন। হয়তো বিজ্ঞানবিদ্যাকে এগিয়ে দিতে পারতেন আরও অনেকদূর। কেন না পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিল সে পরিকল্পনায়। সেখানে সমবেত হয়েছিল সে দেশের সেরা বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি সত্যকে ভুলে গেলে চলবে না। সত্যটি হল এই যে, পারমাণবিক বিজ্ঞানে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হোক, পরিকল্পনার উদ্যোগের তা’ তো চান নি। তারা চেয়েছিলেন, আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যকে কাজে লাগাতে; এমন কোনো কাজে যা থেকে বিশ্বদেবী অস্ত্র তৈরি করে শত্রুকে জয় করা যায়। অতএব, মৌলিক প্রতিভার চেয়েও ওখানে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল

সংগঠন-শক্তি এবং সে শক্তি ওপেনহাইমার-এর বোল আনাই ছিল। তিনি তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত করতে পারতেন এবং এর চেয়েও বড় কথা, প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সম্ভবমত্নভাবে কাজে লাগাতে জানতেন ওদের।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে, পারমাণবিক অস্ত্র-গড়ার দায়িত্ব কেন নিলেন ওপেনহাইমার? কেন তিনি সত্যমুখী মহৎ বিজ্ঞানীর আদর্শ থেকে দ্রষ্ট হন?

এর উত্তর হল, নতুন কিছু করার আকাঙ্ক্ষায়; নিজেকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লোভে। ওপেনহাইমার-এর কাছে যখন পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণের প্রস্তাব এল, তখন তিনি নতুন কিছু আবিষ্কার করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের স্বপ্ন দেখছেন; এবং সেই সঙ্গে এ সত্যও অনুভব করছেন যে, এখন অবধি এমন কিছু মহৎ আবিষ্কার তিনি করেন নি, যা তাঁকে অমর্য দিতে পারে। পদার্থ-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বিভিন্ন পথ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল বটে, কিন্তু এখন অবধি সেই পথগুলোর বিশেষ কোনো একটিতে ধরে এগিয়ে গিয়ে আবিষ্কৃত কোনো বিরাট সত্যের নিশানা তিনি বিশ্ববাসীকে দিতে পারেন নি।

অতএব, গ্রোভস্-এর প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন এবং বছর দু’য়েকের মধ্যে তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠল পৃথিবীর সর্বকালের নৃশংসতম অস্ত্র,—পারমাণবিক বোমা।

অস্ত্র-পরীক্ষার আয়োজন হ’ল প্রথমে। প্রথমে পরীক্ষার সব সাজ-সরঞ্জাম আলমাগার্ডের মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। ১৯৪৫-এর ১২ই ও ১৩ই জুলাই হঠাৎ কলম্বুস হয়ে উঠল আমেরিকার এক রুদ্ধ ও উষ্ণ প্রান্তর। পরীক্ষার সময় নির্ধারিত হল ১৬ই জুলাই, রাত দু’টোর।

পরীক্ষা-কেন্দ্র ‘পয়েন্ট জিরো’ থেকে মাইল দশেক দূরে রইলেন ওপেনহাইমার ও জেনারেল গ্রোভস্। ওরা সঙ্গে নিলেন কয়েকজন কিস্তি ফ্রুচের। রাত বারোটার পর থেকেই ‘লাউড-স্পীকার’-এ ‘ড্যান্স-মিউজিক’ বেজে উঠল। ধীরে ধীরে পরীক্ষার সময় ধনিয়ে এল। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সবাই। কিন্তু হঠাৎ আবহাওয়া ঝাপা হওয়ার পরীক্ষার সময়কে শেষ অবধি পিছিয়ে দিতে হল। স্থির হল, সকাল সাড়ে পাঁচটার পরীক্ষা হবে।

পাঁচটা গানের বাজতেই ‘সান-গ্লাস’ পরে নিলেন সবাই। সবাই মাটির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। সকলেরই

দাঁড় পয়েন্ট জিরোর দিকে নিবন্ধী ওপেনহাইমার ‘কন্ট্রোল রুম’ে বসে আছেন। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছেন চরম মূহূর্তটির।

অবশেষে সাড়ে পাঁচটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যাহ্ন সূর্যের চেয়েও অনেক বেশি উজ্জ্বল সাদা আলো চোখে পড়ল সকলের। সবাই বিমূঢ় হয়ে দেখল, ‘পয়েন্ট জিরো’ থেকে যে শ্বেতশত্রু রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার প্রভাব প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস। সেই মূহূর্তে শ্রীমন্তগবর্ণীতার একটি শ্লোক আবিস্কৃত করলেন ওপেনহাইমার। আত, ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন,—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদৃ

যুগপদাধিতা।

বদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাস্তাসন্তস্য

মহাখনঃ॥

অর্থাৎ, “বদি আকাশে, একসঙ্গে উজ্জ্বল সহস্র সূর্যের দীপ্ত প্রকাশ পায়, তবে সেই মহান আত্মার তুলনা সম্ভব হয়”।

গীতার এই শ্লোকে মহান আত্মা বলতে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, অর্জুন যখন বিশ্বরূপ-দর্শন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণই ‘সহস্র সূর্যের দীপ্তি’ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলেন।

পারমাণবিক বোমা-বিস্ফোরণের মূহূর্তে সেই দীপ্তিকে খুঁজে পেলেন ওপেনহাইমার। উদ্ভূত করলেন গীতার আর একটি শ্লোক,—

কালোহস্মি লোককয়কং প্রবৃন্দো,

লোকনু সমাহতৃমিহ প্রবৃন্দঃ।

অর্থাৎ, “আমি লোককয়কারী বিরাট-রূপে বর্ধিত দেহ, কাল, এই সমস্ত লোক ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছি”।

অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের সময় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন একথা। ওপেনহাইমার ঠিক এই একই কথার প্রতিধ্বনি করলেন। প্রশ্ন উঠবে, কেন করলেন তিনি? কেন তিনি বলে উঠলেন, “লোক ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছি”? বিবেক-দংশনের জ্বালায়? না কি মহামত্যুর সহস্র সূর্য-প্রতিম দৃতকে প্রত্যক্ষ করে?

জানি নে। তবে এইটুকু নিশ্চিত জানি যে শেষ অবধি নিরুপায় হয়ে তিনি ঐ মৃত্যুদৃতকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগের সম্মতি দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ৬ই আগস্ট কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হিরোসিমা কর্তৃক লক্ষ লোক নিঃশেষিত হয়েছিল। আর ৯ই আগস্ট সহস্রসূর্যের দীপ্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিল নাগাসাকি।

জেনারেল প্রোভু-এর উদ্যোগ তখন দেখে কে! তিনি নিরস্ত্রের মতো বললেন, পারমাণবিক বোমা-বিস্ফোরণের সময় যে-তাপরশ্মি বিকিরিত হয়, তা' হল মৃত্যুবরণের একটি সহজ ও সুন্দর পথ'।

কিন্তু বিজ্ঞানীর দল দারুণ উৎকণ্ঠিত হলেন। হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধের অপমৃত্যু অসংখ্য মমবেদনার আচ্ছন্ন করল তাঁদের। লস অ্যালামোসের পরমাণু-বিশেষজ্ঞরা বেকে বসলেন। নিউইয়র্ক ও চিকাগোর বিজ্ঞানীরা যোগ দিলেন ঐদের সঙ্গে। সকলেরই চেষ্টা হল, পারমাণবিক গবেষণাকে সামরিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত করা। বিজ্ঞানীদের সহযোগিতার জনমত গড়ে উঠল অচিরেই। পরমাণু-গবেষকদের সঙ্গে কঠিন মিলিয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষ বলে উঠল, পারমাণবিক অস্ত্র-প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোক।

কিন্তু ওপেনহাইমার কি করলেন তখন? সবাই স্বপ্ন তাকে জাগানী-বুদ্ধির বিজয়ী বলে সম্বোধিত করল, তখন তিনি সম্বন্ধনর উত্তরে কি বললেন?

সবাই জানি আমরা, কিছুই তিনি বলেন নি। অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ ও বিবর দেখাচ্ছিল তাঁকে। পারমাণবিক অস্ত্রের ভবিষ্যৎকে তিনি অনেক দূর অবধি দেখতে পেরেছিলেন যেন। কেন তিনি যেন-প্রাণে অনুভব করেছিলেন, আগুন নিয়ে কেলার বিধংসী পরিণতিতে।

তাই লস অ্যালামোসের ডিরেক্টর পদে ইস্তফা দিলেন তিনি। ১৯৪৫-এর অক্টোবর মাসে সবাই চমকে উঠল শুনে যে, ওপেনহাইমার পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণের কাজ ছেড়ে আবার অধ্যাপনার ফিরে আসছেন।

বিজ্ঞানীর জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল বটে; কিন্তু বিজ্ঞানশক্তির নিয়ন্তা রাষ্ট্রনায়ক ও সামরিক কর্মকর্তারা মেতে উঠলেন নতুন পরিকল্পনায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

এই নতুন অস্ত্রটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে ওপেনহাইমার প্রথমে নিরস্তর রইলেন। তিনি সমর্থনও করলেন না একে। আবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করলেন না।

এদিকে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে তিনি প্রিন্সটনে ইনস্টিটিউট অব অ্যাড-ভান্সড স্টাডিজ ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। ১৯৪৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নতুন এক দায়িত্বভার দেওয়া হল তাঁকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 'থার্মোনিউক্লিয়ার' অস্ত্র গড়বে কি না, তা নিয়ে পরামর্শ দেবার জন্য যে কমিটি গঠিত হল, ওপেনহাইমার হলেন তার সভাপতি।

কমিটির সভারা সর্বসম্মতিক্রমে জানিয়ে দিলেন যে, এই ধরণের অস্ত্র গড়লে বিশ্বের দরবারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক পরাজয় ঘটবে। কিন্তু বিদ্রূত বিজ্ঞানী কার্মি 'থার্মোনিউক্লিয়ার' প্রকল্পের তাঁর বিরোধিতা করলেন। আর ওপেনহাইমার সহ কমিটির অন্যান্য দ্বয় জন সভ্য লিখলেন,—

"আমরা সকলেই জ্ঞাপা করি, কোনো না কোনো উপায়ে এই ধরণের অস্ত্র-গড়ার প্রকল্পকে এড়ান যেতে পারে। আমরা বাঞ্ছিত হচ্ছি এই দেখে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে সকলের আগে এগিয়ে আসছে। এ ব্যাপারে আমরা সকলেই একমত যে বর্তমান মুহূর্তে 'থার্মোনিউক্লিয়ার' অস্ত্র-গড়ার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা ভুল হবে"।

এই স্মারকপত্রে শেষ অবধি রাষ্ট্র-শক্তিরই জয় হল। আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৫০ খৃস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী নির্দেশ দিলেন যে, 'আর্টামিক এনার্জি' কমিশনকে হাইড্রোজেন বোমা গড়ার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

আবার নতুন উদ্যোগে কাজ শুরু হল। ওপেনহাইমারও ওতে যোগ দিলেন। কিন্তু তাঁর আচরণে পরস্পর-বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল এবার। এদিকে তিনি যেমন 'থার্মোনিউক্লিয়ার' অস্ত্র-গড়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করলেন, অপরদিকে তেমনি আবার জোর দিলেন এই অস্ত্রকে নিষিদ্ধ করার কাজে। ১৯৫১ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আর্ট-ল্যাটিক অঞ্চলে আমেরিকার প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ার-এর কাছে তিনি লিখলেন, ইরোরোপে যদি যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধমাত্র তবুই কেন কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর হাইড্রোজেন বোমাকে প্রয়োগ করা হয়। অন্যত্র এর ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয় যেন।

হাইড্রোজেন বোমা সম্বন্ধে ওপেনহাইমার-এর এই বিরূপ মনোভাব রাষ্ট্র-নায়কদের অনেকেরই ভাল লাগে নি। এ ছাড়া গোড়ার দিকে কেন তিনি বোমা-নির্মাণের বিরুদ্ধতা করলেন, তা নিয়েও অনেক জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। সরকারীমহলে ক্রমেই হাস পেল

ওপেনহাইমার-এর বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি। এদিকে ১৯৫২ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি 'আর্টামিক এনার্জি' কমিশন-এর 'অ্যাডভাইসারি কমিটি'র সভাপতির পদ থেকে অবসর নিলেন। জেনারেল আইসেনহাওয়ার রাষ্ট্রপতিও হলেন আমেরিকার; এবং এরপর থেকেই ওপেনহাইমার-এর প্রতি রাষ্ট্রের অবজ্ঞা আরও নমনভাবে প্রকাশ পেল। এই বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করে বলা হল, যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় কমিউনিস্টদের সঙ্গে কয়েকবারই তাঁর নিকট-সংযোগ ঘটে। কমিউনিস্টদের কথা তিনি এক তাঁর স্ত্রী আগে কমিউনিস্ট ছিলেন। ১৯৪০ থেকে শুরু করে ১৯৪২-এর এপ্রিল অবধি কমিউনিস্টদের তহবিলে তিনি দরজা হাতে অর্থ সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কেও তাঁর দুর্বলতার অন্ত নেই। এ সম্পর্কে সিনেটর ম্যাকমোহন স্পষ্টই বললেন, ওপেনহাইমার সম্ভবত "হয়-বেশী এক সোভিয়েট দূত"।

কিন্তু পৃথিবীর অগণিত শান্তিপ্রেমী মানুষ সৌদিয় ম্যাকমোহন-এর কথা বিশ্বাস করে নি। বরং হাইড্রোজেন বোমা-নির্মাণের বিরুদ্ধতা করেছেন বলে ওপেনহাইমারকে অস্ত্র থেকে ওরা সাধুবাদ জানিয়েছিল।

এই সাধুবাদের পরিণতি অবশ্য ভাল হয় নি। কেন না এর কিছুদিন পরেই ঘোষণা করা হল, ওপেনহাইমার আমেরিকার রাষ্ট্র ও সামরিকশক্তি সঙ্কলিত সর্বপ্রকার কাজে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ওপেনহাইমার এবার নতুন দিকে চোখ ফেরালেন। বিজ্ঞানীর সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক কি, তা নিয়ে লিখতে শুরু করলেন তিনি। বললেন,—

"বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে নিয়ে সমাজ যে ধর্মসাম্বন্ধ কাজ করে এজন্যে কি বিজ্ঞানী দায়ী? না, বিজ্ঞানীকে এজন্য দায়ী করা চলে না। কেন না তাঁর কাজ হল জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা, সমাজ বা রাষ্ট্রের ঘটনাকে পরিচালিত করা নয়"।

ঠিক কথা। সমাজ বা রাষ্ট্রের ঘটনাকে পরিচালিত করার ক্ষমতা বিজ্ঞানীর নেই। কিন্তু এ কথাটিও কি ঠিক নয় যে বিজ্ঞানীর জীবন ও সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে থাকা চলে না?



জনগণের মগন গ্রহণের পর অমর মন্ত্রিসভার ঘরোয়া বৈঠক

বিজয় সমাবেশ

গত বুধবার ১লা মার্চ মনমোহন মুখোপাধ্যায়ের ডাকে, নতুন প্রশাসন-স্থাপনা তৈরি হবার প্রাকালে যে জন-সমাবেশ ঘটেছিল সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সাধারণ মানুষের এমন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস ও ঐক্য দীর্ঘকালের মধ্যে মরনানের কোন সভায় দেখা যায় নি। সেদিন এখানে জমায়েত হয়েছিলেন সমাজের সকল স্তরের মানুষ—প্রাচীন, মধ্যবিত্ত, কেরানী, স্কুল শিক্ষক, অধ্যাপক, মডে, মজদুর, রাজনৈতিক কর্মী এক কথায় বিগত উনিশ বছর ধরে যাঁরা শব্দ শোঁত, বস্তিত, উপনীত হয়েছেন।

এই বিশাল সমাবেশে জনগণতান্ত্রিক নতুন সরকারের মধ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসী সরকারের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয় এবং নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে রাজ্যের সম্মিলিত বামপন্থী দল এবং বিশিষ্ট নির্দলীয় নেতারা বিজয় উৎসবে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভোটপত্রের মারফত কংগ্রেসকে পরাজিত করে দেশবাসী একটি নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে বিপ্লবের শব্দ হল, তা নতুন থেকে নতুনতর জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলবে।

এই সমাবেশের পূর্বে থেকে কোন প্রস্তুতি ছিল না। শুধুমাত্র কয়েকটি সমবাদপত্রের বিজ্ঞাপিত, কিন্তু তবু কলকাতা মহানগরী এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। স্বাধীনতার মানদণ্ড এসে মিলিত হল এই অপরূপ সমাবেশে। ভাবার ভেদ নেই, জাতির ভেদ নেই, বর্ণের ভেদ নেই। মধ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় জনসাধারণকে

অভিনন্দিত করে বললেন যে, যুক্তফ্রন্টের উপর জনগণ যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা উপায় করার জন্য জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। যুক্তফ্রন্ট যাতে খাদ্যসমস্যা ও বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে, এবং পশ্চিমবঙ্গকে দুনীতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে তার জন্য জনসাধারণের আশীর্বাদ তিনি প্রার্থনা করলেন। শ্রীমোহন বসু বললেন যে, নির্বাচনে জনতার দ্বারা প্রকাশিত হবার একঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তি একাবদ্ধ হয়ে সরকার গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস এখনো অকলুষ হয় নি, বরং পূর্বাভাসিতদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে। জনগণের সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। সরকারী কর্মচারীদের প্রতি যে আবিচার করা হয়েছে তা দূর করা হবে এবং পুলিশকে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হবে। নতুন সরকার স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করবেন না, কিন্তু যদি ব্যবসায়ীরা কালোবাজার করে বা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, তাহলে তাদের ট্যাক্স টিপে ধরা হবে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ বললেন যে, জনসাধারণ চান দুনীতি দূর হোক, বেকার দূর হোক, দুবেলা দুমুঠো আহার জুটুক, অসুখ হলে চিকিৎসা হোক। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় দুই বছরের মধ্যে ধনবৈষম্য দূর হবার পথে অগ্রসর হওয়া এবং খাদ্য-সম্পদের সমাধানের পথে চলা সম্ভব। শ্রীহেমন্তকুমার বসু বললেন যে, এই থ্রিট জর কোন কোন দলের বা কোন ব্যক্তির নয়, সমগ্র জনসাধারণের। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বললেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিপ্লব অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়েছে।

সাধারণ মানুষেরা আজ একাবদ্ধ হয়েছে। একেটিয়া পূর্বাভাসিতগোষ্ঠী বিদেশী পুঁজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যেভাবে দেশের সর্বনাশ করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ তার বিরুদ্ধে একাবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করবে। শ্রীমাখন পাল বললেন যে, সারা ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গলাকে সেই সংগ্রামের পথে অগ্রগামীরা ভূমিকা নিতে হবে। কুড়ি বছর আগেও এই দিনের মত উৎসবমুখর দিন এসেছিল, কিন্তু সতর্ক সংগ্রামের অভাবে সেই দিন ব্যর্থ হয়েছে। এবার তাই চাই সঙ্গীত প্রহর। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বললেন যে, বামপন্থীরা একাবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের সমস্ত আশা ব্যর্থ করে দিয়েছে। এখন কংগ্রেসের আশা—বামপন্থীরা সরকার চালাতে পারবে না। কংগ্রেসের এই আশাও ব্যর্থ হবে।

বহু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী কলকাতার ময়দানে বহু লক্ষ উদ্ভীষ্ট মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা ভাবার রূপান্তরিত হল; ঘোষিত হল দুনীতি, খাদ্য ও বেকার সমস্যার বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিব্যক্তির সংকল্প।

নতুন সরকারের কর্মসূচী

আগামী পাঁচ বছরের জন্য যুক্তফ্রন্ট যে কর্মসূচী রেখেছেন তার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে। মোট আঠার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে তাঁরা কাজ করতে ইচ্ছুক।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও মিতব্যয়িতা আনয়ন বর্তমান সরকারের প্রথম লক্ষ্য। প্রশাসনিক কাঠামোর হয়ত কোন বড়রকমের রদবদল এই মূল্যে ঘটানো সম্ভব নয়। তবে মাথাভাঙ্গা শাসনব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনসাধ্য

করতে নতুন সরকার ইচ্ছুক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একগাদা উপদেষ্টা রয়েছেন, যারা আসলে গুড ফর নাথিং। এঁরা সকলেই হলেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ বেতনধারী কর্মচারী, এই শ্বেতহস্তাদের পুষ্টিতে মাসিক ব্যয় বড় কম হয় না। এদের ক্ষেত্রে নতুন সরকার বোধ হয় কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চান।

নতুন সরকার সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দিয়েছেন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চাকুরীর ব্যাপারে জনসাধারণের প্রাথমিক চাহিদার ক্ষেত্রে। তার পরেই আসছে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে দুর্নীতি কালোবাজারী, মদ্যবাজারী, ভেজাল ও অসামাজিক আচরণ বন্ধ করার প্রসঙ্গ। তৃতীয় কাজটি হল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি সংস্কার, কৃষকদের উৎসাহ

দেবার জন্য সেট, সার ও বাজ সরবরাহের উন্নত ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে ক্ষেত-মজুরদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়াস করা। এর পরেই আসছে ধানচালের পাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রীয়করণ এবং খাদ্য সংগ্রহ। তা ছাড়া থাকবে বেকার সমস্যার সমাধান করার সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহের উন্নতি বিধান, উদ্ভাস্ত পুনর্বাসনের বধ্যবন্ধ ব্যবস্থা, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, সংখ্যানঘদের ভাষা ও কৃষ্টির প্রতি মর্যাদা, অনুন্নত জাতি ও উপশীল-দের জীবনযাত্রার উন্নতি, নারীজাতির বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ, কলকাতা ও পূর্বদিল্লী এবং সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের ন্যায় অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন, ফরাঙ্গী ও হলান্দী প্রকল্পের জন্য বধ্যবন্ধ চেষ্টা, বাংলা ও নেপালী ভাষাকে সরকারী

ভাষার মর্যাদা দান, শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের দাবি স্বীকার, কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের হাতে আরও অধিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা, বেড়ুবাড়ীর প্রশ্নটি পুনরায় তোলা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস।

বলা বাহুল্য এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করা রীতিমত প্রম, ধৈর্য ও নিষ্ঠাসাপেক্ষ। শ্রদ্ধে সরকারী প্রশাসন-বস্ত্রের ম্যারাই সব কিছু সার্থক হতে পারে না। এজন্য জনগণেরও সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। আশা করা যায় সে সহযোগিতা তারা পাবেন। মধ্যমস্তরী বোষণা করেছেন, চোদ্দটি অকংগ্রেসী রাজ-নৈতিক দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দেশের সেবা করবার জন্য তারা সমস্ত বিভেদ ভুলে এক হয়ে কাজ করবার জন্য ব্যক্তগত পন্থা করে-ছেন। জনসাধারণ তাঁদের হাতে যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালন করবার জন্য তারা সদাসর্বদা জনসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করবেন এবং একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবেন।

যাত্রা হল শ্রদ্ধে

বৃহস্পতিবার, ২রা মার্চ, ১৯৬৭। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সকাল ১টাখ বক্তৃতাটির নেতা শ্রীঅজয়কুমার মধ্যোপাধ্যায়কে শপথ বাক্য পঠি করলেন। তার পর একের পর এক মুখ্যমন্ত্রীর পাঁচজন সহকর্মী শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীসোম-নাথ লাহিড়ী, শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রীজাহাঙ্গীর কবীর রাজ্যপালের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন।

এই পনেরো মিনিটের অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর রাজভবনের গেটে উদ্বেল জনতা পদাধিকার বেস্টনী ভেঙে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের প্রিয় নেতাদের বরণ করল। নেতারা জনতাকে সঙ্গে নিয়ে রাজভবন থেকে গভর্নমেন্ট হাউস নর্থ ধরে এগিয়ে চললেন। রাজপথে আনন্দিত জনসমষ্টি। পদাধিকারবাহিনী দূরে নীরব দর্শক।

অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, উৎসাহ ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্যানের মধ্য দিয়ে নতুন মধ্যমন্ত্রী ও তাঁর পাঁচজন সহকর্মী রাইটাস বিল্ডিং-এ প্রবেশ করলেন। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার হেঁটে তাঁরা হৃদয়ধনি ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে রাইটাস বিল্ডিং-এর পোর্টিকোতে এলে দাঁড়ালেন। অরপর সকলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকেন এবং তাঁদের পিছনে জনতার একাংশ। পদাধিকার বা সিকিউরিটির কোন বাধ্য-নিয়ম নেই। লেন্ডাল গেটে এবং



শপথ গ্রহণান্তে মধ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মধ্যোপাধ্যায় কলেজ স্কোয়ারে শহীদ বেদীতে মালাদান করেন।

সেতলার সংরক্ষিত এলাকায় সরকারী কর্মচারী ও জনতার মধ্যে যে উল্লাস দেখা গেছে তা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর আর দেখা যায় নি।

সেতলার বারান্দায় বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মচারীরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের স্বাগত জানান। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীরা নমস্কার জানাতে জানাতে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের দিকে ভিড় টেলে এগুতে লাগলেন। তারা কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী ও জনতার একাংশ কক্ষে প্রবেশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চেয়ারে বসলে অন্যান্য মন্ত্রীরা তাঁর মুখোমুখি বসলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ডেপুটি সেক্রেটারীকে একটি ফাইল আনতে বললেন।

শুরু হল চতুর্থ নির্বাচনোত্তর ভারত-বর্ষের এক প্রান্তে নতুন সরকারের কর্ম-ধারা। এদিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গ এক এবং অন্য। এখনো অন্যান্য রাজ্যে কোন মন্ত্রিসভা কাজে যোগ দিতে পারেন নি, যা পেরেছেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার, আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সমবেত জনতাকে বললেন, “এবার আমাদের কাজ করতে দিন, অনেক কাজ জমে আছে।”

প্রতিক্রিয়া

কংগ্রেসের পরাজয়ে একদিকে যেমন শাসিত জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে

তেমনি কোন কোন মহলে ইতিমধ্যে আতঙ্ক ও দুর্য্যবসন দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসের পরাজয়ে কার্যে স্বাধীনতার দাবী উৎকণ্ঠা দেখা গেছে। তাই নতুন ব্যবস্থাকে বানচাল করবার জন্য কোন কোন মহলে কোমরে গামছা বেঁধে লেগে গেছেন এখন থেকেই।

মজুতদার ও বড় বড় ব্যবসায়ীমহল রীতিমত দুর্য্যচেষ্টায় পড়েছে। অনেকে ভয় পেয়ে নিজদের সঞ্চিত গোপন স্টক বাজারে বার করতে পথ পাচ্ছে না। চালের দাম সব্বত্র কমে গেছে, সরষের তেলেরও ওই একই অবস্থা। অন্যান্য জিনিস-পত্রের দামও কমতির দিকে। কালো-বাজারী ও মজুতদারদের নাতিশ্রাস ওঠার কারণটা সহজেই অনুমেয়। কারা পণ্য স্টক করে রেখে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জনসাধারণ যে তাদের চেনেন না তা নয়, তবে কংগ্রেসী আমলে তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করা কঠিন কাজ ছিল। কেন না সেই সরকার ছিল এদেরই পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু এখন জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা কিভাবে আতঙ্কিত হবে? এটা উপলব্ধি করেই অনেক মজুতদার গোপন স্টক বাজারে ছাড়ছে। যার ফলে জিনিস-পত্রের দাম কমছে।

কিন্তু যদি এ থেকে এই ধারণা করা যায় যে, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এরা নতুন আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে, আর চেয়ে আর বড় ভুল কিছু নেই। কিন্তু, কালো-বাজারী মজুতদার হস্ত ভয় পেয়েছে, বাকি সকলে কিন্তু অন্যভাবে চিন্তা করছে। তারা ভলে ভলে চেষ্টা করছে কিভাবে এই নতুন সরকারকে ধারাল করা যায়। এদের অর্ধের অভাব নেই, জোরাল সংগঠনও আছে, কাজেই বর্তমান সরকারকে ওষ্ঠাধর জন্য এরা এখন থেকেই কোমর বেঁধে লেগে গেছে। তদুপরি বিগত শালককুল এদের গিহনে আছে। কৃত্রিম অভাব হাট্টে, দ্রব্যমূল্যের দাম চড়িয়ে জনসাধারণকে দুর্য্যবসন থেকে এরা বর্তমান সরকারকে হের করতে ব্যস্তপরিচর। বর্তমান মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, তিনি বিগত যুগে একদা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি এদের শক্তির কথা ভাল করেই জানেন, কেন না কার্যে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য করতে গিয়েই এদের চাপে তাঁকে অপসারিত হতে হয়েছিল। এ তো সাম্প্রতিক ইতিহাস।

বড়বাজারের কারবারীদের চোখের নিয়া ছুটে গেছে। জীবন অর্ধের আকর তাদের হাত থেকে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় ঘন ঘন শলাপরীক্ষা চলছে। এরা শত্রু বিগত শালকদেরই প্রজ্ঞা পাচ্ছে না, পশ্চিমবঙ্গের আমলাতন্ত্রের মজলিষা

এদের মনস্ত যোগাচ্ছে। কাজেই এই শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে যথেষ্ট সাবধানতা ও দ্রুততার সঙ্গে। সংবাদ-পত্রের রিপোর্টে যা প্রকাশ, অনেকেই অন্যান্য রাজ্য থেকে পণ্য আমদানী করা এরই মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে। কাজেই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগানের অভাব অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে কংগ্রেসী আমলে এরাই ছিল মজুতদারী সন্ত্রাস। শালককুলের প্রজ্ঞা জনসাধারণের মাধ্যমে কঠোর ভেঙে এতদিন যারা ক্ষীণতার হয়ে এসেছে, তারা শেষ কামড় দেবেই।

কিন্তু জোরে, কোন ডরমার বিগত শালকগোষ্ঠী হুমাসের মধ্যে আবার ক্ষমতার আসীন হবার দাবি করতে পারে? একমাত্র বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। তা তারা করতে পারে আমলাতন্ত্র ও এই ব্যবসায়ী প্রেণীর সাহায্যে। কাজেই নতুন সরকারকে চোড়া থেকেই এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। যে সব রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার স্থাপিত হয়েছে সেই সব রাজ্যের সঙ্গে চুক্তিতে আসতে হবে যাতে সেই সব স্থান থেকে পণ্যের যোগান পশ্চিমবঙ্গে অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যেই হস্তাক্ষরিত একটি বিবৃতি, যে উক্তিয়া পশ্চিমবঙ্গকে চাল দেবে এবং প্রয়োজন হলে মাদ্রাজ থেকেও তিনি পশ্চিমবঙ্গের জন্য চালের যোগাড় করবেন, জনসাধারণের মধ্যে বহুখণ্ড আশ্রয় ও নতুন সরকারের প্রতি বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। আমরা আশা করব যে, নতুন সরকার এ সব বিষয়ে আমাদের চেয়েও বেশি সজাগ, এবং কোন কোন দিক থেকে যারা আসবে তা তারা নিশ্চয়ই ভালভাবে বুঝবেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত

একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গের বিগত শালককুল থেকে বেড়াচ্ছে যে, ছয় মাসের মধ্যেই তারা গণীতে ফিরে আসবে, অপর-দিকে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সেক্রেটারী-চক্রের মজলিষা অনুরূপ সুরেই পর্বত বলে বেড়াচ্ছে যে, ছয় মাসের বেশি এই নতুন সরকার টিকতে পারবে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছে যে, তারা কিছুতেই বর্তমান সরকারকে টিকতে দেবে না।

এই স্পর্শ তারা কোথা থেকে অর্জন করেছে? অতীতের ইতিহাস ঘটিলে দেখা যাবে যে, এরাই ছিল একদা বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠাবলসেহাক, তাদের সকল কুর্কীতির অপসীমার। তারপর মনিবের বখন পরিবর্তন হল, সাদা চামড়ার স্থান বখন বাগদী চামড়া অধিকার করল এরাও রাডারিটি ভোল ববলে ফেলল। সেই

শিশু সাহিত্য সংগ্রহ বই

- ১। রজনী—বোম্বাই বিশ্বনাথ— ২.৫০
- ২। নিম্নোক্ত—অনুবাদক—
নিখিল সেন— ৭.০০
- ৩। মূল্যের ভিত্তি—খগেন্দ্র মিত্র ও
রামেন্দ্র দেশমুখ্য— ৪.০০
—কিশোরদের জন্য—
- ১। বাঘের আত্মজ্ঞা—
রামেন্দ্র দেশমুখ্য— ২.০০
- ২। ছোটদের গোপীনাথ—
খগেন্দ্রনাথ মিত্র— ২.০০
- ৩। লেখাপত্রের নাটকের গল্প—
খগেন্দ্রনাথ মিত্র— ২.০০
- ৪। আমাদের মেয়ের—
নিখিল সেন— ২.৫০
- ৫। হিন্দিতে বন্ধুত্বের (বাংলা ও
হিন্দী)—ব্রজ রায়চৌধুরী— ১.৫০

পরিবেশক

শরৎ বুক হাউস

১৮-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২।

থেকে এরা কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতির প্রধান বাহক, লাইসেন্স পারমিটবাজের দৌলতে এরা শুল্ক নিজেদের শুল্ক-সুবিধা, অর্থসংগৃহী বাড়ায় নি, কারেমী স্বার্থের সঙ্গে যোগসাজসে এরা জনজীবনে অশেষ দুর্গতির কারণ হয়েছে।

বর্তমান আমলাতন্ত্রের কংগ্রেস-প্রীতির আধিক্য দেখে সন্দেহ হয় যে, নতুন শাসনব্যবস্থায় তারা কি ভূমিকা অবলম্বন করবে। আমার ধারণা আছে হুগলী জেলার জনৈক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিনয় সংবর্ধনা উপলক্ষে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারা সভা করে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা “আত্মীয়-বিরোগ-বাধা” অনুভব করছেন। তাঁদের এইরকম আত্মীয় আজ মহাকরনের উপরতলার ভজন ভজন বলে আছে, যারা নতুন সরকারের সমস্ত শুল্ক-কাজকে পুত করতে বশ্যগত।

শুল্ক আমলাতন্ত্রই নয়, পুলিশ-বিভাগের বড় বড় কর্তারাও যেভাবে বিগত শাসকদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়েছে তাও উল্লেখ করা যায় না। জনৈক ডি-আই-জি কংগ্রেসী রাজনীতিতে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছিলেন যে তাঁরই জমীন্দার আই-পি-এস অফিসারেরা তাঁর এই রাজ-নৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। অতএব যা দেখা যাচ্ছে শাসনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে পূর্বতন শাসক সম্প্রদায় নিজেদের দলীয় রাজনীতিকে অনুপ্রবর্তিত করে রাখতে চোলে নি, এবং নতুন আমলে এই দুই শিকড়গুলিই অলক্ষ্যে ফাটল ধরানোর কাজে লেগে থাকবে।

কংগ্রেসের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আমলাতান্ত্রিকগোষ্ঠী নিজেদের অতীত কুর্কীতির নিদর্শনসমূহ বিনষ্ট করে ফেলেছে। সংবাদে প্রকাশ যে রাইটার্স রিভিউস-এ ফাইলপত্র পোড়ানোর কাজ ইতিমধ্যেই সেরে ফেলা হয়েছে। এই একটি ঘটনা থেকেই বর্তমান আমলাতন্ত্রের চরিত্র মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

প্রতিটি পদব্ধ সরকারী কর্মচারীর, তথা আমলাতন্ত্রের সমস্তাংশের গত উনিশ বছরের কাজের হিসাবনিকাশ গ্রহণ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। সমগ্র ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে সাজাতে হবে, খোল নলচে পাশ্চাত্যে হবে। জনসাধারণের দাবি, এই ক্ষুদ্র-ভেদে একটি উচ্চসমতাসম্পন্ন কমিশন বসানো হোক। কংগ্রেসী আমলে লাইসেন্স-পারমিট ঘুরের রাজত্বে সেক্টরী থেকে প্ররম্বিত করে বি-ডি-ও পর্যন্ত প্রত্যেকে যে জ্বাঠের বখরার তুরপের তাল মেয়ে চলাছিল তার ফলে কে কত লাভ করেছিল আর অপরাধকে কে কিভাবে জনসাধারণের জীবনধারণ দুর্বল করে তুলেছিল তার সার্থক রিপোর্ট প্রস্তুত করা হোক এবং

তারই ভিত্তিতে এদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক।

ব্যক্তিগতভাবে হয়তো অনেক সংস্থানুষ আমলাতন্ত্রের মধ্যে আছেন এবং এমন অফিসার হয়ত দুর্লভ নয় যিনি দুর্নীতি-পরায়ণ নন। কিন্তু আমাদের আপত্তি সমগ্র ব্যবস্থাটাই বিরুদ্ধে এবং সেই সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যারা বিগত কংগ্রেসী আমলে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধি করেছে এবং কারেমী স্বার্থের স্বপক্ষে কাজ করেছে। তাদের



গ্রীহরেকৃষ্ণ কোটার

চিহ্নিত এবং সনাক্ত করা হবে শুল্ক কাজ হবে না। জনসাধারণ তাদের চেনেন, এবং জনসাধারণ আজ যদিও তাদের চেনেন। এরই আজ নতুন সরকারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছে এবং প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে যে, তারা দেখে নেবে কিভাবে নতুন গভর্নমেন্ট কাজ করতে পারে। তাদের এই ঐশ্বর্য্যের জন্য শিকাদান এই মর্মে প্রয়োজন।

নতুন মন্ত্রিসভা

শুল্কবার রূপে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, এবং কাকে কি দপ্তর দেওয়া হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। মোট আঠারজন সদস্য নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভার অবশ্য এস-এস-পি ও পি-এস-পির দু'জনের নাম ঘোষণা করা হয় নি, কেননা তা উত্তর পার্টির আনুমান্য সাপেক্ষ।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় স্বরাষ্ট্র, পুলিশ ও দুর্নীতিদমন, ক্ষুদ্র শিল্প, কুটিরশিল্প, পশুপালন ও মৎস্য-দপ্তরগুলির দায়িত্ব নিয়েছেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু নিয়েছেন অর্থ

ও পারিবহন দপ্তর। কৃষি ও খাদ্যের দায়িত্ব আপত্তি হয়েছে প্রবণ নেতা ডঃ প্রব্রতেন্দ্র ঘোষের উপর এবং শ্রীহেমন্ত বসু পেরে-ছেন পুত্র ও গৃহনির্মাণ দপ্তরের দায়িত্ব। শিক্ষামন্ত্রীর পদ পেয়েছেন অধ্যাপক শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য, পারকল্পনা ও উন্নয়ন-দপ্তরের ভার পড়েছে শ্রীজাহাঙ্গীর কবীরের উপর। শ্রীসোমনাথ লাহড়ী পেরেছেন স্বাক্ষরশাসন, পরিষদীয় বিষয় ও প্রচার-দপ্তর। ভূমি ও ভূমিরাজস্বদপ্তরের ভার পেয়েছেন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোটার, জলসেচ ও বিদ্যুতের দায়িত্ব পড়েছে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর। আইন ও বিচার এবং আবগারিদপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীঅমর চক্রবর্তী এবং শ্রীসুশীল ঘাড়া পেয়েছেন সমষ্টি উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্যদপ্তর। স্বাস্থ্যদপ্তরের দায়িত্ব বর্তেছে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের উপর। উপজাতির কল্যাণদপ্তর নিয়েছেন শ্রীদেও-প্রকাশ রায়, শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত পেয়েছেন পণ্যরত ও সমাজ উন্নয়নদপ্তর এবং শ্রীনিরঞ্জন সেন পেলেন কলা, সাহিত্য ও পুনর্বাসনদপ্তর। শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ভার পেয়েছেন শ্রমদপ্তরের। পি এস পি-এর শ্রীনিশীথ কুন্ডুর মন্ত্রিসভার যোগদান এখনো পর্যন্ত দলীয় অনুমোদন সাপেক্ষ।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদের প্রের্ত লোকগুলিকে মন্ত্রিসভার জন্য অনুমোদিত করেছে। আশা করা যায় তাঁরা প্রত্যেকই পূর্বতন মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে অধিকতর সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবেন। যদিও বিগত উনিশ বছরে জমে ওঠা “ইজিয়ানের আস্তাবল” সাফ করা বড় সহজ কথা নয়, তবুও যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে তা সর্বাংশে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হবে।

প্রকাশিত হচ্ছে :

কবিতা '৬৬

এক বছরের বানো কবিতার পূর্ণাঙ্গ সংকলন

সম্পাদনা :

সুনোরজন চট্টোপাধ্যায়

চুয়ার প্রকাশনী

২৬, বিধান সরণী

কলকাতা-৬

সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব



শ্রীশশীল ঠাকুর



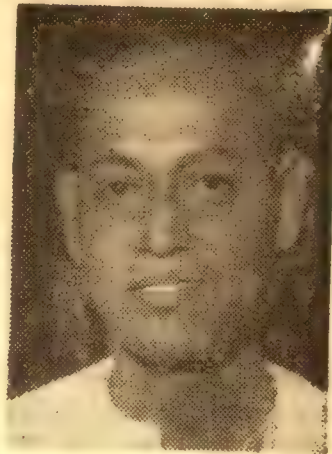
শ্রীবিষ্ণুনাথ ভট্টাচার্য



শ্রীগোপকৃষ্ণ রায়



শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য



শ্রীভবনাথ ভট্টাচার্য



শ্রীনানী ভট্টাচার্য



শ্রীনিরঞ্জন সেন



শ্রীঅম্বর চক্রবর্তী



শ্রীবিভূতি দাসগুপ্ত

আমুখোকাচ বিষয়



ভাস্কর প্রিয়

কতক
—আমরিক বিরোধী কবিতার সৌন্দর্য—

দুটি অরিন্দারী ফের কবিতার
এলাকা পরিভ্রমণ করে দুটি মোটরগাড়ি
আমাদের প্রধান ঘাঁটি—আধিকৃত পুলিশ
লাইনের দিকে ছুটলো। রাত তখন প্রায়
যারোটা হবে। পাহাড়ের আশ্রয়নের পথ
ধরে আমাদের গাড়ি দুটি আগে পিছে
চলেছে। রাস্তাটি একেবারে জনশূন্য—
নির্জন নিজন। দুটি গাড়িরই হেড
লাইট নেভানো ছিল। রাস্তা দুই ধারাপ
একদিকের। তাই গাড়ির গতি হবে
ধীর ও সতর্কতাপূর্ণ। ইয়োয়োসীয়ার
ক্রাব হাউসের মোট টিলাটির পশ্চিম-
দিকের কোল ঘেঁসে এই রাস্তাটি পুলিশ
লাইনের টিলার পানকেশ পর্যন্ত গেছে।
এখান থেকে পুলিশ লাইনের দূরত্ব বেশ
হয় দু'শ গজের বেশি হবে না। আমাদের
গাড়ি দুটি এ পর্যন্ত একেবারে নিশাচর
এসে পৌঁছেছে। সব সন্দেশে মনে
হল আবহাওয়া শান্ত—পুলিশ লাইন
আমাদের দখলেই আছে।

তখন আমরা পূর্ব-নির্ধারিত
সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের আকস্মিকতা
তাদের জানালাম। সুইস, সুইস, রপর্মান
দেওরা হোল, বিশেষভাবে মোটরের হর্ন
থেকে উঠলো ও কল কল হেড লাইট
জ্বালিয়ে নিভিয়ে কেঁদু সম্মেলন দেওরা
হোল তাতে আমাদের আশ্চর্য সন্দেশে
তাদের সন্দেশের কোন অবকাশ রইল না।
পুলিশ লাইনের উপর থেকে বিজয়নিবাদের
বন্দুকা আমাদের অভ্যর্থনা জমালা।
তাদের সূণ্যে মিলিত হয়ে সম্মেলনের পশন-
বিদারী রণরোল উঠলো—বন্দোস্ততরম—
ইনক্রাব জিন্দাবাদ!

আমরা গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ
লাইনের টিলার উপর উঠলাম। আজও
আমরা মনে আছে, যখন আমি সামান্য
উঁচু টিলাটির উপর উঠিলাম তখন
আমরা দু' হাতে দুটি খোলা রিভলবার

ছিল। এই কি nervousness না কি
excitement— অল্প চিন্তা করে ঠিক
দু'হাতে পারছি না কেন আমি সে সময়ে
দু' হাতে দুটি খোলা রিভলবার রাখা
প্রয়োজন মনে করেছিলাম? nervous-
ness বা excitement ছিল বলে
অবশ্য আমরা মনে হয় না—খোলা
রিভলবার দুটি-হাতে ধরে রাখতেই মনে
ভালো লাগছিল। আমি তখন একেবারে
ক্রান্ত হয়ে পড়েছি। দু' হাতেই খোলা
রিভলবার নিয়ে টলে টলে টিলার উপর
উঠছি। পা দুটি একটির সঙ্গে একটি
যেন জড়িয়ে আছে—হঠাৎ কিসে যেন
একটা হেঁচট খেলান—মনে হোল যেন
মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। তখন নিম্নের
কানে শুনতে পাবার মত শব্দ উঠি
করাইলাম—“এই অবস্থায় যদি আমি
পুলিশের হাতে ধরা পড়ি তবে ক্রান্তিবলে
উপবৃত্তভাবে আত্মরক্ষা করতে পারবো না
—আর তারা জাহির করবে অন্যতম নিকে
দুটি রিভলবার সহ প্রাণত্যাগ করেছে।”
নিকে নিকে বমোহি আর অবজ্ঞাভরে
হেসেছি।

টিলায় উপর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে
মাস্টারদা আগে এসে সবার কুশল সংবাদ
জানতে চাইলেন। নির্মলাদা মাস্টারদাকে
সংকীর্ণ কিল্প দিলেন ও আমরা সবাই
অকৃত দেহে ফিরে এসেছি জানালেন।
তারপর মাস্টারদাকে বিম্মিত ও স্তম্ভিত
করে দিয়ে আমি বললাম—“মাস্টারদা—
আমাদের জয়ের গোবিন একেবারে স্থান
হয়ে গেছে। A.F.I. আধারিত রিভল-
বার, ম্যাগাজিন, রাইফেল ও লাইসেন্স
আমরা প্রচুর পেয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য!
সেখানে একটিও রিভলবার বা রাইফেলের
কাবুজ পাই নি!”

মাস্টারদা—“কি? কি? একটি
কাবুজও পাও নি?”

লোকনাথ—“না—একটিও না!”

“তা কি করে সম্ভব হতে পারে?”—
এই প্রশ্নটুকু করে মাস্টারদা একেবারে চুপ

করে গেলেন। দেখতে দেখতে কথারা
হবে হবে আমাদের সবার মধ্যে ছাড়িয়ে
গড়ল—“একটি কাবুজও পাওরা যায় নি।
সব কাউ লাইসেন্স ও ম্যাগাজিন রাইফেল
একেবারে এককো হয়ে রয়েছে।”
অবিক্রম্য অবসাদগ্রস্ত হয়ে প্রশ্ন
করলেন—“এখন কি উপায়? ম্যাগাজিন,
লাইসেন্স, রাইফেল আমরা কাজে
লাগাতে পারবো না?”

গণেশের তখন খুব করে। সে
আমারি গমের এক পাশে পেরেছিল।
এই নিদ্রাঘন সন্দেশে সে উঠে বসল—
আমি তার কাছে রিসার্চ করলাম—
“আমাদের সবার অসম্পূর্ণ রাইফেলের
সঙ্গে রাবা এসব রাইফেল কাবুজ ছিল না
—ছিল তাদের হাতারামক, কলকৌ
প্রভৃতি।” গণেশ এই রিসার্চ শুনে খুব
চিন্তিত হয়ে পড়ল।

আগামীকাল প্রাতে চতুর্থদিকের দু'ককরা
মলে মলে ভারতীয় গণতান্ত্রিকবাহিনীতে
যোগ দিতে আসবে। প্রায় চার-পাঁচশ
ম্যাগাজিন রাইফেল এককো হয়ে পড়ে
রইল। একটি লাইসেন্সও কাজে আসবে
না! কেবল মাস্টারদা নিয়ে সজ্জিত
করেকশন যুবক শত্রু প্রতি-অভ্যর্থনের
বিরুদ্ধে কতখানি কি করতে পারবে?
যুব-বিরোধের রণনীতি ও রণকৌশল
নির্ভর করছিল দুটি অপরিহার্য অনুকূল
অবস্থার উপর। যুব-বিরোধের প্রথম
পর্বেরে আমরা আমাদের গোপনে সংগৃহীত
অস্ত্র ও সংগঠনের সাহায্যে শত্রুর প্রধান
প্রধান ঘাঁটি ও অস্ত্রাগারগুলি দখল বা
ধ্বংস করেছি। দ্বিতীয় পর্বেরে শত্রু-
পক্ষের অস্ত্র অধিকার করে নিয়ে আমাদের
সুসজ্জিত হওঁর কথা এবং ম্যাগাজিন
রাইফেল ও লাইসেন্স প্রকৃতির উপযুক্ত
ব্যবহারের ব্যবস্থা করে শত্রুর আক্রমণ
প্রতিরোধ করে আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী
গণতান্ত্রিক সরকারকে সুরক্ষিত করার জন্য
শক্তিশালী মোর্চা গড়ে তোলার একান্ত
প্রয়োজন প্রাথমিকভাবে অনুভব করেছি।

এই দ্বিতীয় পর্বের ব্যস্ত অবস্থা আমাদের ঘোর প্রতিকূলে—উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত অস্ত্র ব্যতিরেকে সন্দেহ বৃদ্ধি সন্দেহবশত নয়।

উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত অস্ত্রের উপর যেমন রণনীতি ও রণকৌশল নির্ভর করে—তেমনিই আবার অবস্থা অনুযায়ী—বিশেষ করে প্রতিকূল অবস্থায়—রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত ও পরিচালিত করা সামরিক নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব। তেমন সন্ধিক্ষণে মাস্টারদা, নিমলদা, জিম্বিকাদা, গণেশ ও আমার খুব পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল। বিপরীত নেতৃত্ব সেইরূপ ঘোর প্রতিকূল অবস্থায় একটি পরিষ্কার সিদ্ধান্ত দাবি করে। আমাদের দুটি স্বীকার করতেই হবে—আমরা কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করি নি; কোথায় যেন কি একটা প্রতিকূল প্রতিজ্ঞা কাজ করেছে—আমরা নানা কারণে যেন ইতস্তত করেছি। পরে বহুস্থানে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে আলোচনা করব। বর্তমানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট—কাড়ুক না পেয়ে সেইরূপ দারুণ সন্ধিক্ষণে যখন পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল তা তখন আমরা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছি।

তরুণ সান্থীদের মনে দুর্জয় সাহস। তারা সার্বিক প্রাণের ধার ধারে না। তাদের বহু দিনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। তাদের হাতে নাই বা এলো ম্যাগাজিন রাইফেল, নাই বা তারা পারল লুইসগান ব্যবহার করতে। তারা প্রত্যেকে আজ ক্ষত পেয়েছে রিভলভার, মাস্কেটি ও হাতে ব্যবহারের জন্য প্রচুর কাড়ুক। তরুণ বিদ্রোহীর হাতে মাস্কেটি ও রিভলভারের শক্তি যে কত প্রবল, কত দুর্জয়—কত শত্রুসংহারী—আমাদের দূরদর্শিতার অভাবে তখনও তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। আমাদের তরুণ সান্থীদের morale সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ছিল না। তাদের হাতে দারুণ—কেবল তারা ইচ্ছা-ব্রত হয়ে পড়ে—ভেবে যেন কিছু ঠিক করতে পারছিল না।

সবাই শূরে পজিশন নিয়ে শত্রুর প্রতীক্ষার আছে। আমি চিন্তামগ্ন হয়ে এক কোণে বসে আছি। নরেশ রায় আমাকে এসে জানালো—“একজন লোক পাগলামির ভান করে এদিকে আসছিল। আমরা তাকে হাতকড়া পরিয়ে বেঁধে রেখেছি। মনে হচ্ছে সে পুলিশের লোক শাদা পোষাকে এসেছে—একে নিয়ে কি করবো”

নরেশের প্রশ্ন শুনে আমার মনে হয়েছিল—সে আমার অভিযন্তা চাইছে—লোকটিকে কঠোর সাজা বা প্রাণদণ্ড

কেন্দ্র দেওয়া হবে। আমি নরেশকে বললাম—“চল গিয়ে দেখি সে কে।” ম্যাগাজিন কক্ষের একটি কোণে সে হাতকড়া পরা অবস্থায় বসেছিল। তাকে দেখে শাদা পোষাকে পুলিশ বলেই মনে হলো—তবু তাকে কোনপ্রকার সাজা দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের হল না—ভারতীয় একটি কনস্টেবলের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি নি। নরেশকে বললাম—“থাক সে পড়ে। তার পরিচয় দিলে তাকে ছেড়ে দিও।”

সে তার পরিচয় কিছু দেয় নি। তাকে ছেড়ে দেওয়াও হয় নি। আমরা পুলিশ লাইন ছেড়ে যাওয়ার পর সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সত্যি-মিথ্যা বিবরণ সে তার নিজস্বাধে দিয়েছে এবং আমাদের মামলার ব্যয়ে জঙ্গসাহেব লিখেছেন—

In the busti, Azim met constable Jogendra Ghosh who handed him a pair of handcuffs, saying, that the raiders had captured him and handcuffed him with them... He was returning to barracks about 10-30 p.m. at the wooden bridge in front of the magazine he was challenged and on hearing shouts of 'Bandemataram' threw his tunic and pagri behind him. Fifteen or twenty persons variously dressed and armed with pistols and torchlights surrounded him and questioned him. To the suggestion that he was a policeman he replied with a vehement denial. They then seized him handcuffed him... and threatened to kill him if he made the slightest noise. As he sat, he could hear sounds of firing outside and orders to load and re-load. Later on when all the noise had ceased, he ventured forth from the magazine and finding the raiders gone, slipped the handcuff off his right wrist and ran... The witness has demonstrated before us the Houdini-like facility with which he can slip his hands out of locked handcuffs... (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case).

যার কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি তার নাম যোগেন্দ্র ঘোষ এবং সে একজন

কনস্টেবল। সে রাত সাড়ে দশটার সময় ব্যারাকে ফিরছিল। সে বলেছে বিভিন্ন পোষাক-পরা বিশ-ত্রিশজন লোক পিস্তল ও ‘টর্চ’ হাতে তাকে ঘিরে ফেলে। ‘বান্দে-মাতরম্’ শুনিয়ে শুনে সে অবস্থা বুঝতে পারল। খোপাখানা থেকে সে তার পাগড়ি ও শাকি পোষাক খুঁয়ে আনছিল। বিপদ বুঝেই সে সেগদলি তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে ফেলে দেয়। আক্রমণকারীরা পুলিশ বলেই তাকে প্রশ্ন করেছে। সে খুব জোরের সঙ্গে পুলিশ নয় বলে প্রতিবাদ জানায়। যখন আক্রমণকারীর দল চলে গেছে বলে তার সন্নিবিষ্ট ধারণা হল তখন হাতকড়া থেকে তার ডান হাত টেনে বার করে নিয়ে সেখান থেকে পালায়। বিপরীতভাবে বাদুকের হুন্ডিনীর মত বন্ধ অবস্থায় কি করে হাতকড়া মুক্ত হওয়া যায়—এই সাক্ষী (যোগেন্দ্র) আদালতে সবসমক্ষে তা প্রদর্শন করেছে।

বহু ঘটনার মধ্যে এইটিও একটি ঘটনা—তাই এইটিরও উল্লেখ করলাম। তা ছাড়া লোকসাহ ও নিমলদা আমাকে বলেছিলেন আমরা প্রথম আক্রমণের অনেক পরে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি। আমার নিজের মনে হয়েছিল পুলিশ লাইনের প্রাথমিক কতকগুলি কাজ দেবে ছোট দলটি নিয়ে আমি খুব দেরি হলেও আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছি। তবু যেহেতু লোকসাহারা বলেছিল আমরা তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে অনেক দেরি করে ফেলেছি এবং যেহেতু রণকৌশলের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি নিজের মনে করি আধ ঘণ্টা দেরি করাও আমাদের পক্ষে অন্যায় হয়েছে তাই আমি মনে মনে এতদিন সব সময়ে সন্দেহ বোধ করেই এসেছি। সেইহেতু নিজের দুটিই বেশি করে দেখতে চেয়েছি এবং বহুস্থানে আগে বলে এসেছি—A.F.I. আর্মারিতে পৌঁছাতে আমাদের হয়ত প্রায় এক ঘণ্টা দেরি হয়েছে।

এখানে দেখছি কনস্টেবল যোগেন্দ্র বলেছে সে রাত সাড়ে দশটার সময় ব্যারাকে ফিরছিল। মাস পচিশ সময়ের মধ্যে সে সাক্ষী দিয়েছে এবং যেহেতু সে ব্যারাকে ফিরছিল তাতে মনে হয় তার পক্ষে ঠিক সময়টি বলাই অনেক বেশি সম্ভব। এই বর্ণনা থেকে আমার মনে হয় আমরা A.F.I. আর্মারি দখলকারী দলের সঙ্গে আধ ঘণ্টার আগেই একত্রিত হয়েছি। পুলিশ লাইন থেকে মোটের A.F.I. হেড-কোয়ার্টারে যেতে পচিশ মিনিটের বেশি সময় লাগে না; আর আমি ছোট দল সঙ্গে নিয়ে ওখানে পৌঁছবার পরে যোগেন্দ্র ধরা পড়ে ও বন্দী হয়।

পুলিশ লাইনে আমাদের অনেক সময় কেটে গেল। কিসের প্রতীক্ষার সময়

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ন্যাথা-বেদনা তড়াতাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়



মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' বিদ্যুৎ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার কত আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোফাইণ্ড কাকে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপায়ে 'অ্যাসপ্রো'তে যেমনো হয়, তা ৩০ মিনিটের মধ্যে করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন আর ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে যেমনো বেশি করার শক্তি বিজ্ঞানেরও বেশি দারুনী শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুদূরত্ব মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

সুদূরত্বের মধ্যে কান শুদ্ধ করে যায়—অনেককণা দূর কান ঢলতে থাকে। নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র ব্যথা দূর করার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই দীর্ঘদিন শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইকালেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে দেয় এবং তার কণা অনেককণ দূরী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি হোকারে খুঁটা খেতে পারেন—চকলে, কলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস কল বা যে কোনো দ্রব পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত একাধারের ব্যপার নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' থাকেন: ব্যথা-বেদনা • হাডাবা • গা-ব্যথা • হাতব্যথা • খাঁটে বেদনা • জ্বর-জ্বর-জ্বর • হু-জ্বর • গলাব্যথা।

জান্না: অ্যাসপ্রো: হুইট ট্যাবলেট। একোজন হলে আবার পানেন। বিত্তের ক্ষয়: একটি ট্যাবলেট বা আপনার তড়াকরের নির্দেশনত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কভাবে কাজ করে দেখুন



ট্যাবলেটের কণাগুলি প্রকারে হত হত হত, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেয়। হু—আপনার ব্যায় পোড়ক হলে খুব তড়াতাড়ি ব্যথা উপশম হয়।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র একটি ট্যাবলেটে আর ১৫ কোটি কণা দূর করে দেয়। তাই শরীরের সঙ্গে সহজে মিশে গিয়ে এবং খুব তড়াতাড়ি ব্যথা উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সবচেয়ে নতুন উপায়।



নতুন
মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

সিডাকাস-এর ২০ তৈরী

৬.৬.৬৬

কাজী? কেন তখনও positive, সুনিশ্চিত, সুস্পষ্ট ও সক্রিয় সামরিক সিদ্ধান্ত নিলাম না? প্রধান ঘাটি সব আমাদের দখলে, টেলিফোন ভবন বিধ্বস্ত—টেলিগ্রাফ লাইন বহির্ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন, রেলপথ দুটি স্থানে ধ্বংস করা হয়েছে, পুলিশ কনস্টেবল সব প্রাণভরে পালিয়েছে—আমরা জয়ের আমেজে ছিলাম! ম্যাগাজিন রাইফেলের কাউন্স না পেয়ে বতখানি চিন্তিত হয়েছিলাম ততখানি অস্ত্রের আয়তনকমার মধ্যে মন ছিলাম বলে মনে হয়। আমরা কাউন্স পাই নি কটে—তারাও যেন রাইফেল ও লাইসেন্স পাবে না। আমাদের কাছে রাইফেল ও লাইসেন্স ঘেরপ একেজো হয়ে রইল সেইরূপ তাদের হেপাডমে কাউন্স আবহুত হয়ে পড়ে থাকবে। এইরূপে কৈশা ও অস্ত্রের হাড়া—টেলিফোন ব্যবহারে বাধিত হয়ে গুটিকতক ইংরেজ ও উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারী আমাদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের জন্য বতখানি শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে?

যুব আমরা—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলাম না। কিনা মেয়ে কেন কল্যাণত! এ কি? টাট, টাট, টাট! যুব নিকট থেকে লাইসেন্স ফায়ার হচ্ছে। অবিরাম ধারায় গুলী চলেছে। আর্মারির অবস্থান শত্রু-গুলির জন্য। সেইদিক লক্ষ্য করে তারা যুব কাছাকাছি গোপন স্থান থেকে মৌসিন-গান চালাচ্ছে। বড়ের মত গুলী এসে লাগছে আমাদের আশে-পাশে, মাঠে, বাগে, জিলার ঘাসে, আর্মারি, গার্ডহাউস ও ম্যাগাজিন ঘরের জানালা দরজা ও দেওয়ালে। আমাদের সবার position শোয়া অবস্থায় ছিল। টিলাটি যুব বড় কর। তাই প্রয়োজন মত extension order-এ আমরা ছিলাম না। প্রত্যেকের মধ্যে এক হাত বতখানি ছিল কি না সন্দেহ। যখন হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে যুব কাছ থেকে শত্রু-মৌসিনগান ফায়ার শুরু করল তখন আমাদের মধ্যে দু'-তিন জন দাঁড়ান অবস্থায় ছিল—ভরসার মধ্যে আমিও একজন। ফায়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেউ শূন্যে অথবা দেওয়াল বা চৌবাচ্চের আড়ালে আশ্রয়কার ব্যস্ততা করলাম।

কখন শত্রু-পক্ষ গোপনে এসে position নিয়েছে তা আমরা জানতে পারি নি। দৃষ্টিকোণ্য তারা অবস্থান করছে তারও হৃদিস পাই নি। শব্দ লক্ষ্য করে আমরা ভেবেছি পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ওয়াটার ওয়ার্কসের দিক থেকে গুলী আসছে। স্বল্পকণ্ঠে আমাদের মধ্যে থেকে হকুম হক—'Aim Water Works—Rapid fire!'—ওয়াটার ওয়ার্কস লক্ষ্য করে দ্রুত

গুলী চালাও। আমাদের চৌবাচ্চাট মাস্কোটি একসঙ্গে গুলন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বতখানিভাবে 'বলেন্মাতরন্', ইনক্রাব জিন্সাবাদ' প্রভৃতি স্বকরোল ধ্বনিত-প্রাত-ধ্বনিত হয়ে মাস্কোটি ও লাইসেন্সগানের শব্দকে ডুবিয়ে দিল। জানি না সাম্রাজ্য-বাদী ফিরিশকারী দল তাহলে কতখানি বিচলিত হয়েছিল—কতখানি আতঙ্কিত হয়েছিল। তাদের হৃদয়স্পন্দন কি কণিকের জন্য বন্ধ ছিল? রক্তপ্রবাহের কীর চাপে তাদের দৃষ্টি-বিত্রম কি ঘটেছিল? আমাদের Volley fire ও সমস্বরে 'বলেন্মাতরন্' ধ্বনি শব্দে তাদের হাত কি ধর ধর করে কাঁপছিল? চাঁদমারি অভ্যাস করা শিক্ষিত হাতের একটি গুলীও আমাদের কাউকে স্পর্শ করল না কেন?

আমাদের আক্রমণের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"...They could also hear occasional shots from there so they decided to approach through the Water Works compound. From the north-west corner of the compound they could see a light of the armoury and figures moving about. So from there Mr. Johnson ordered Barracklough to open fire in short bursts with Lewis gun. This evoked an intensive fire from the direction of the armoury and magazine. Most of the bullets passed over their heads but as several came uncomfortably close to them and the position was very exposed, they withdrew to the roof of the Water Works Engineer's bungalow..."

(Judgement, Chittagong Armoury Raid Case).

সেখান থেকে সাহেবের দল বন্দুকের শব্দ শুনোছিল। তাই তারা ওয়াটার ওয়ার্কসের কম্পাউন্ডের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া সার্বাস্ত করল। ওয়াটার ওয়ার্কসের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে আর্মারি এলাকায় একটি আলো দেখতে পায় ও কয়েকজন স্নানকে তারা ঘুরে বেড়াতেও দেখে। মিঃ জনসন, ব্যারাকলো সাহেবকে এদিক লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে বলে। এই গুলীবর্ষণ বিপ্লবীদের উচ্ছ্বাসিত করে তোলে তারা আরও তীব্রভাবে আর্মারি ও ম্যাগাজিনের দিক হতে ফায়ার শুরু করে। বেশির ভাগ গুলীই তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। কয়েকটা

গুলী তাদের আশে-পাশের স্থানে আঘাত করে। অবস্থা নিরাপদ নয় মনে করে তারা ওয়াটার ওয়ার্কসের হাজরীঘরের বাংলোর ছাদের উপরে যাওয়া বাধ্য হতে মনে করে।

আমাদের মাস্কোটির গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাদের মাথার উপর দিয়ে গেছে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, আমরা সবাই আন্দাজে শব্দ লক্ষ্য করে blind fire করোছি—তাই গুলী ব্যর্থ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পাকা শিক্ষিত হাতে, আমাদের এখানে আলো ও কয়েকজন বন্দুকে ঘুরে বেড়াতে দেখে তাদের এবং আর্মারি লক্ষ্য করে লাইসেন্স ফায়ার করা সত্ত্বেও আমাদের কাউকে স্পর্শ না করে সব গুলী মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়াটা অনেক বেশি আশ্চর্যের। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি—'তোমাদের তো ইংরেজদের হত্যা করবার সিদ্ধান্ত ছিল, তবে মিঃ রয়কবার্ন, মিঃ মোরশেড, প্রমুখ ইংরেজ নিশ্চুতি গেল কি করে?' তার উত্তরে বলেছি—যুদ্ধক্ষেত্র ও চাঁদমারি প্রায়কটিস এক জিনিস নয়। আমরা প্রায় তিন-চারশ ফায়ার করছি। তারা লাইসেন্স গানে প্রায় তিনটি ম্যাগাজিন ব্যবহার করেছে, ১৪১ রাউন্ড ফায়ার করেছে—সবটাই ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা বিগুণ উৎসাহে গুলী ছুঁড়ছি। আমাদের রণ-স্থান এক মহাতের জন্যও স্তম্ভ হয় নি। শত্রু-পক্ষ বুকোছিল তাদের লাইসেন্স তরুণ বিপ্লবীদের প্রচণ্ড শক্তির কাছে ব্যর্থ হবে। তারা মশে কান্ড হ'ল। আমরা তখনও ভাবি নি তারা আবার আক্রমণ করতে চেষ্টা করবে না। তবে তাদের অস্ত্র ও সৈন্যবল কোথায়? A.F.I. হেড-কোয়ার্টারের অধীনস্থ পাহাড়তলী ও ডবলমর্ডির জেটীর আর্মারি থেকে তারা বড় জোর দুটি লাইসেন্স আনতে পারে। তাছাড়া ম্যাগাজিন রাইফেল বা লাইসেন্স গান তাদের আর কোথাও ছিল না। সামান্য দু'-একটা লাইসেন্স নিয়ে মাত্র গুটিকতক ইংরেজ আমাদের প্রতি-আক্রমণ করেছে। তাদের বীর্য, সাহস, সামরিক অভিজ্ঞতা ও সারিযবোধকে হের বা অবজ্ঞা করে নিজেদের প্রবলনাই করা যায়—বাস্তব শিক্তা নেওয়া হয় না। কিভাবে গুটিকতক চট্রগ্রামের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ একেবারে অসহায় অবস্থায় সীমিত শক্তি নিয়ে আমাদের প্রতি-আক্রমণ করতে এসেছিল তার বিবরণ আমি পরে লিখব।

এই স্বল্পস্থায়ী মিনিট চার-পাঁচ চলেছে। এই চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই পক্ষে প্রায় হরশ গুলীবর্ষণ আমরা করছি। শত্রু-পক্ষ যখন একেবারে নিস্তম্ভ হয়ে গেল

তখন মাস্টারদা সামরিক বিপ্লবী পদত্যাগ
সরকার গঠন করে একটি procla-
mation দিলেন। ঘোষণাটি ইংরেজীতে
লেখা ছিল, যার মর্ম নিম্নে লেখা হচ্ছে।
প্রায় চার বছর আগে গণেশ, অম্বিকাদা ও
আমি—তিনজনে মিলে যতদূর সম্ভব
recapitulate করে এই ঘোষণাটি
আমাদের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছি।
গণেশের হাতের লেখা এই ঘোষণাপত্রটি
আমার কাছে আছে। সেইটি নিম্নে দিলাম।
মাস্টারদা ঘোষণা করলেন—

“Dear soldiers of Revolution !

“The great task of revolution in India has fallen on the Indian Republican Army.

“We, in Chittagong, have the honour to achieve this patriotic task of revolution for fulfilling the aspirations and urge of our nation.

“It is a matter of great glory that today our forces have seized the strongholds of the Government in Chittagong. The enemy armoury has been captured; the Central Telephone Exchange of the town has been destroyed; external telegraphic communication has been destroyed; external telegraphic communications have been snapped; railway lines have been removed and goods trains have been derailed; train communications with the outside have been cut off. The enemy force has been defeated. The oppressive foreign Government has ceased to exist. The National Flag is flying high. It is our duty to defend it with our life and blood.

“The Indian Republican Army declares today for universal information and recognition the end of predatory rule and control by the British Imperialist bandits on Indian soil in Chittagong.

“Chittagong is a tiny part of India, but it is hoped and expected the achievement of today will inspire and impel our countrymen to do likewise

everywhere in India and free our entire Motherland from the unholy clutches of the British bandits before long.

“I, Surya Sen, President of the Indian Republican Army, Chittagong Branch, do hereby

proclaim the existing Council of the Republic Army in Chittagong to form itself into a Provisional Revolutionary Government to carry out the following urgent tasks :—

“(1) To defend and main-



এক ঝাকে দাঁড়
তার সুন্দর হাসি

**সাদনা
দশন**

সাদনা দশন নিয়মিত ব্যবহার
করিলে কোন দস্তবোগের ভয়
থাকে না। দস্তবাজী সুস্থ, সবল
ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে
ইহা প্রস্তুত হয়।

সাদনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ঔষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ., অধ্যাপকসদস্য, এফ.সি.এস. (লণ্ডন),
এম.সি.এস. (অনন্যবৃত্তি) ডাঙলপুর কলেজের কৃষ্ণচন্দ্রনাথের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি) প্রাক্তন অধ্যাপক।

Gain the victory gained today;

"(2) To extend and intensify the armed struggle for national liberation;

"(3) To suppress the enemy agent within;

"(4) To keep the criminals and looters in check";

"(5) And to take further course of action what this Provisional Revolutionary Government will decide later.

"This Provisional Revolutionary Government expects and demands full allegiance, loyalty and active co-operation from every true son and daughter of Chittagong. And desires sympathy and active support from all patriots and nationalists and from every person who has the well-being and liberation of India in his or her heart.

"With full confidence in victory in our holy war of liberation !

"No mercy to the British bandits !!

"Death to traitors and looters !!!

"Long live Provisional Revolutionary Government !!!
"BANDEMATARAM !"

বাংলা কবিতা মোটামুটি এইরূপ—

"প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ!

"ভারতের বিপ্লবের পদক্ষেপ ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর উপর আরো ন্যস্ত হয়েছে;

"ভারতবাসীর অন্তরের বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করার জন্য আমরা চট্টগ্রামে স্বদেশপ্রেমে উদ্বেগ্ন হয়ে বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন করার পৌরব অর্জন করছি।

"আজ বিশেষ পৌরবের কথা আমাদের বাহিনী চট্টগ্রামে ব্রিটিশ সরকারের শক্ত দাঁড়িটুকি অধিকার করেছে। শত্রুর অস্ত্রাশার দখল করছি; শহরের কেন্দ্রীয় টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে; বাইজগতের সঙ্গে ভারতবাহিনী বিচ্ছিন্ন; রেল-লাইন উৎপাটন করে মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করা হয়েছে; বাইরের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিসংখ্যান ঘটেছে। শত্রুর সেনাবাহিনী পরাস্ত হয়েছে। অত্যাচারী বিদেশী সরকারের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। জাতীয় পতাকা আজ উড়ে উড়ীয়মান। আমাদের কঠিন জীবন ও মৃত্যুর বিনিময়ে ইহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা।

"বিশ্বের গোচরার্থে ও স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনী চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর শাসন

এ মোক্ষের পরিসংখ্যান যেন করবে।

"চট্টগ্রাম ভারতবর্ষের একটি কদর অংশ। তবু আশা ও ভরসা করা যায় আজকের জয় ভারতমাতাকে আঁচরে ব্রিটিশ দস্যুর হীন প্রভাব থেকে মুক্ত করতে ভারতবাসীকে সারা দেশে অনুরূপ বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করার উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে।

"ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি আমিন-মুর্শিদ সেন, এতদ্বারা ঘোষণা করছি চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্রবাহিনীর বর্তমান পরিষদই সাময়িক বিপ্লবী সরকারে পরিণত হয়ে নিম্নলিখিত জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে—

"(১) আজকের জয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে;

"(২) ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করে তুলতে হবে;

"(৩) আন্তর্জাতিক শত্রুদের দমন করতে হবে;

"(৪) সমাজদ্রোহী ও লুণ্ঠনকারীদের শাসনে রাখতে হবে;

"(৫) এবং এই সাময়িক বিপ্লবী সরকারের পরবর্তী নির্দেশগুলি সম্পন্ন করতে হবে।

"আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার চট্টগ্রামে প্রত্যেক সাক্ষা ভরুণ-ভরুণীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ বাধ্যতা, আনুগত্য এবং সক্রিয় সহযোগিতার আশা ও দাবি রাখে; এবং দেশসেবক ও যাদের অন্তরে মজিষ্মের আগুন প্রজ্জ্বলিত আছে তাদের কাছ হতে সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহচর্য প্রত্যাশা করে।

"মহান মজিষ্মে সুনিশ্চিত জয়ের অকুণ্ঠ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে চল আমরা সমস্তের বলি—

"ব্রিটিশ দস্যুর প্রতি বিদ্‌মাত কদ্রুণা নয় !!

"বিশ্বাসঘাতক ও লুণ্ঠনকারী দল সমূলে নিশ্চিহ্ন হউক !!!

"সাময়িক বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবী হউক !!!

"বন্দেমাতরম্ !"

মাস্টারদা ঘোষণাপত্রটি ধীরে ধীরে ও জোরের সঙ্গে পাঠ করলেন। ঘোষণাপত্রটি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডার এল—"In honour of our Provisional Revolutionary Government—Three Rounds Fire!" আমরা পর পর তিনবার গুলী ছাড়লাম। বিউগল বেজে উঠল। তারপর তিনবার জয়ধ্বনি দিলাম—বন্দেমাতরম্!

[সমাপ্ত]

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকার তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের কন্দনা-গানে ভারতবর্ষের করিয়াছেন সমুদ্রের সংসীতের মাধ্যমে। স্ব. গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমূল্য লেখনীর প্রতিভা-নিবন্ধ ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্মৃতি বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। ভক্তকার গোস্বামী তুলসীদাস ক্রমশঃ অন্যতর-মিনি নরক সন্তান ভাবায় পাতিতগাবর সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করেছেন।

হল—১২ বর্ষ বয়সে

বনমতী গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দেই গান্ধীজী সীতা, বলি-১২

১৯৬৬ ডাফ কুপার স্মৃতি পুরস্কার: শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী

ফার্স্ট ভাইকাউন্ট নবউইচ (১৮৯০-১৯৫৪)-এর স্মৃতিস্মরণ এবং অনুরাগ-গণ বন্ধুর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করবার অভিলাষে নিজেরা কিছু অর্থ বিনিয়োগ করে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। ডাফ কুপার স্মৃতি পুরস্কারের এইভাবে সূত্রপাত হয় ১৯৫৬ সালে। ইংরেজি অথবা ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য-কীর্তির যথোপযুক্ত মূল্যায়নের পর এই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই বন্দোবস্তে পূর্ববর্তী চব্বিশ মাসের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ সকলই বিচার্য। গ্রন্থ-বিচারের মানদণ্ড বাদ্যের হাতে তাঁদের মধ্যে দু'জন স্থায়ী বিচারক আছেন। বর্তমান লর্ড নবউইচ এবং অরফোর্ডের নিউ কলেজের ওয়ার্ডেন। অপর তিনজন বিচারক প্রতি তিন বছর অন্তর পরি-যাতিত হয়ে থাকেন। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য দু'শো পাউন্ড।

১৯৬৬-র বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন লর্ড নবউইচ; স্যার উইলিয়াম হেটোর (নিউ কলেজের ওয়ার্ডেন); ডি এস নইপল; সিরিল কনোলী ও জন বেলী। এঁদের বিচারেই এবার ডাফ কুপার স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে শ্রীনারদচন্দ্র চৌধুরীর ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ 'The Continent of Circe' (যাদুকরী মহাদেশ)।

ডাফ কুপার স্মৃতি পুরস্কারের শর্তটিকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মূল ইংরেজি অথবা ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত জীবনী, ইতিহাস, রাজনীতি বা কাব্যগ্রন্থের সাহিত্যকীর্তির বিচারে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। পুরস্কার ঘোষিত হবার দিন থেকে পূর্ববর্তী চব্বিশ মাসের মধ্যে পুরস্কৃত পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়া একান্ত দরকার। এবং ডাফ কুপার প্রাইজ কমিটিই পুস্তকের গুণাগুণ বিচারের যোগ্যতম অধিকারী।

১৯৫৬ সাল থেকে প্রতি বছর এই পুরস্কার দিয়ে আসছেন ডাফ কুপার প্রাইজ কমিটি। এবারই সর্বপ্রথম প্রায় থেকে বাঙালী লেখক শ্রীনারদচন্দ্র চৌধুরী মূল ইংরেজিতে 'The Continent of Circe' লিখে এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

এ পর্যন্ত বারা পুরস্কৃত হয়েছেন, তাঁরা হলেন:—

- | | | |
|------|--------------------------------|-------------|
| ১৯৫৬ | আলান মুরর হেড—গ্যালিপলি | প্রদত্ত নার |
| ১৯৫৭ | লরেন্স ডুরেল—বিটর লেমনস | |
| ১৯৫৮ | জন বেটজেম্যান— | |
| | কলেজটেক পোয়েমস | |
| ১৯৫৯ | পাব্লিক লোরা কেরমর—মানি | |
| ১৯৬০ | অ্যানড্রু ইয়ং— | |
| | কলেজটেক পোয়েমস | |
| ১৯৬১ | জোসেলিন বেনস—জোসেফ কনরাড | |
| ১৯৬২ | মাইকেল হাওয়ার্ড— | |
| | দি ফ্রাংকো প্রুশিয়ান ওয়ার | |
| ১৯৬৩ | আইলীন ওয়ার্ড—জন কীটস. | |
| ১৯৬৪ | আইভ্যান মরিস— | |
| | দি ওয়ার্ল্ড অব শাইনিং প্রিন্স | |
| ১৯৬৫ | জর্জ পেনটার—মার্সেল প্রুস্ত | |
| ১৯৬৬ | নারদচন্দ্র চৌধুরী— | |
| | দি কন্টিনেন্ট অব সার্সি | |

শ্রীনারদ চৌধুরীর অন্যান্য অনেক দৃষ্টিভঙ্গির মতন 'The Continent of Circe'-তে সংস্কারবিমুক্ত মৌলিক মতবাদের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সুপ্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের আলোচনার তিনি ব্যক্তি-পূর্ণ, অনুভূত, মোহমত্ত নিরাসক্ত মনের পরিচয় রেখেছেন। প্রসঙ্গত ভারতীয় ধর্মদর্শনের ও প্রধানদর্শনের তাঁর প্রতিবাদমুখর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন আছে, পাশ্চাত্য ধর্মচরণের হ্রুটি ও দুর্বলতাও তাঁর আলোচনার স্থান পেয়েছে। নীরদ চৌধুরীর বর্তমান গ্রন্থটিতেও প্রতিবাদ-মুখরতা হবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। তবুও এক্ষণে কলা বাস্তব নির্বিশ্বাস তিনি আলোচ্য গ্রন্থে যথেষ্ট চিন্তার ও ভাবনার খোরাক রেখেছেন ব্যক্তিগত ও চিন্তা-শীল মানবের কাছে।*

[* তথ্যটি পরিচালনা গোম্বারী নৌকো প্রান্ত।]



শ্রীনারদচন্দ্র চৌধুরী

লোকে বলে মহারাজ হরিপালের রাজকীয় ভাণ্ডার ছিল এখানে। তাই নাম হয়েছে ভাণ্ডারহাটী। প্রমাণ কিছু নেই। দারে পড়লে ঐতিহাসিক-দলিলও দাখিল করা যাবে না কিছ। প্রাচীন প্রত্নকীর্তি বা পরিভাষ্য ধ্বংসস্থাপও পাওয়া যাবে না পৃষ্ঠবল স্বরূপ। বিশেষভাবে এই মতটিকেই প্রাতিষ্ঠা করতে। সম্বল শব্দ অনুমানের আয়নায় ধরা ছায়া। আর মানুষের মনে মনে মূখে মূখে ছড়িয়ে-পড়া কল্প-কাহিনী।

তথ্যাপ-অনুমান হয়তো একেবারে মিছেও নয়। রাজভাণ্ডার থাক অথবা নাই থাক, ভাণ্ডারহাটীর প্রাচীনত্ব অপ্রমাণিত হয় না তাতে। এখন যেখানে সাবিত্রী আর জয়চন্ডী দেবীর মন্দির, সেই দুই মন্দিরের মাঝামাঝি যে দীর্ঘ বিস্তীর্ণ এলাকা অনুমানে যা এক মাইল হবে, অপেক্ষাকৃত নিচু তার তলভূমি, আর উঁচু ঢালু দু-পাশের গড়ানে গড়ন দেখে মনে হয়, একদা এখানে ছিল একটি গভীর এবং বিস্তীর্ণ জলধারা। কিংবদন্তী বলে বাণিজ্যের শব্দ স্রোতস্বিনী সরস্বতী বয়ে গিয়েছিল এখান দিয়ে। আর তার দু-পাশে গড়ে উঠেছিল একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা।

প্রমাণপত্রও কিছু আছে। আজকের ঐতিহাসিক লোকবসতি বখন ছিল না, তখন—এবং এখনও মাঝে মাঝে বাড়ি-ঘরের ভিত খুঁড়তে কিংবা পুকুর পাতকুরো কাটাতে গিয়ে হামেশাই পাওয়া যায় নৌকোর হাল, লোহার নোঙর, জাহাজ বাঁধা মস্ত কাছির টুকরো এবং মানতুলের অংশবিশেষ। আরও পাওয়া গেছে বহু পুরনোকালের খেলনা পতুল, চ্যাপটা কানা উল্টানো হাড়ির গড়নের অশুভ মংপাত্র, ছোট বড় কাল পাথরের অনেক বিগ্রহ—বোশির ভাগই শিব অথবা বিকটর। গঠন-বৈচিত্র্যে বা পাল যুগের বলেই সন্দেহ হয়। এবং নবাবী কিংবা বাদশাহী আমলের অঁকা স্বর্ণ-রৌপ্য মূদ্রা। মদ্রাগড়ালি রক্ষিত আছে ভাণ্ডারহাটীর চৌধুরী পরিবারে। মূর্তি-গড়ালি যাদুঘরে, মদ্রাগড়ালি সংরক্ষিত আছে ভাণ্ডারহাটীর চৌধুরী পরিবারে। খেলনা পতুল মংপাত্রও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ভাণ্ডারহাটীর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হলেও নাজ-নাড়ি খোঁজ-তলাস হয় নি

কিছ। বোধ করি হবেও না আর কোনদিন।

আজকের ভাণ্ডারহাটী নদী-নীর-ধারা-ধোত না হয়েও সম্পদে সমৃদ্ধ। আর বাণিজ্যের বিকিকিনি নাই থাক, লক্ষ্মী হেথায় বসত করেন। তার পরিচয় তার পথেঘাটে, ক্ষেতখামারে, ধানের মাঠে।

চোন্দ হাজার লোকসংখ্যা আর পাঁচ বর্গ মাইলের এলাকা নিয়ে আজকের ভাণ্ডারহাটী প্রায় একটি আধা শহর। স্কুল আছে, ডাকঘর আছে, হেলথ সেন্টার

আছে। পাকা রাস্তার বাস সারভিস আঠার নম্বর—চুচুড়া-হরিপাল। রাস্তার বিজালি ছিল। এখন ঘরে ঘরে তার বসানোর খটখট, ঠুকুর-ঠুকুর। ওয়ারিং চলছে, ইলেকট্রিক এলো বলে।

অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় চার হাজার মুসলমান। আর বাদ বাকী পাঁচ-মিশেলি হিন্দু। বেশির ভাগ কৃষিজীবী। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পসার এবং চাকুরে ডেল প্যাসেঞ্জারও আছেন কিছ, কিছ। ডেল প্যাসেঞ্জারদের একটি বাস্তবিক অসুবিধা এখান থেকে রেল-স্টেশনের অতি দূরত্ব। সবচেয়ে কাছের স্টেশন বেলমুড়ি। ব্যবধান তিন মাইল। (লোকে বলে মাঝের

গাঁ, কারণ প্রবাদ নামটি নাকি অবাধ্য। সকালবেলা মূখে আনলে সারাদিনে অল জোটে না আর। ব্যক্তিগতভাবে লেখিকার অভিমত অল না জুটেলেও রাজভোগ জোটে এবং দই। বেলমুড়ি এবং ভাণ্ডারহাটীর রাজভোগ, দই প্রসিদ্ধ। এবং দাঁধ খ্যাতিতে অম্বিতীয় হরিপালের ইদানীংকালের শরিক হয়েছেন ভাণ্ডারহাটী)।

আর আছে হরিপাল। আঠার নম্বর বাসে সোজাসুজি যাওয়া যায়, কিন্তু দূরত্ব আরও বেশি। প্রায় ছ' মাইল। বিশেষত এই এলাকার একমাত্র বাস আঠার নম্বরের সারভিস তেমন সুবিধের নয়। চোচল ৪০ মিনিট অন্তর, সঠিক চললে যেটা প্রায়ই ৫০ মিনিটে গিয়ে দাঁড়ায়। আর তারই মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে আবার যদি বা একখানা বিগড়োল বা আটকে গেল কোন যান্ত্রিক গোলযোগে (যা নাকি হামেশাই হচ্ছে), তাহলে তো ঘণ্টা দেড়েকের থাকা চোষ বুদ্ধে। ডেল প্যাসেঞ্জারের তাই অশেষ দুর্ভোগ এখানে। তথ্যাপ ডেল প্যাসেঞ্জার আছেন এবং থাকবেনও।

চাষের জমি অনেক। সেচের জল পাচ্ছে তিন হাজার একরে। যদিও ডি ডি সি-র হরিপাল-চাঁপাডাঙা সেকশনের ইরিগেশন ক্যানেলটি বয়ে গেছে ভাণ্ডারহাটীর ওপর দিয়ে, তথ্যাপ দুর্ভাগ্য ক্যানেল গেছে নিচু জমির ওপর দিয়ে। (সম্ভবত একদা যেখানে নদীখাত ছিল



সেবিকাকুলদহ ভাণ্ডারহাটী স্মারক



চৌধুরীদের অর্থানুকূলে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন দাতব্য চিকিৎসালয়

এবং অধুনা মা শূঁকিরে সমভলে পরিণত হয়েছে)। ফলে জলও পাচ্ছে নিচু জমিতে। যেখানে নাকি বর্ষার খারা রিমঝিম করলেও মাটিতে জল জমে কাদা হয়। তার পরিমাণ তিন হাজার একর। আর বান বাকী উঁচু জমি পড়ে থাকে আকাশের করণার মুখ চেয়ে। সে করুণা করলো তো আবাদ হলো। মাঠ ভরে হাসলো ফসলের সোনা। নইলে রইলো পড়ে ব্রহ্মভাঙা, খরার খসর শুকনো, রুক্ষ। ক্যানেল রইলো, সেচও হলো, কাগজে কলমে পরিকল্পনা রইলো নিষ্প্রভ। শূঁখ, বান্ধবের মাটিতে নেমে এসে সূর্য্য রূপায়ণ তার হলো কি না দেখলো না কেউ চোখ চেয়ে। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।

প্রধান ফসল—ধান, পাট, আলু—আখও বলা যেতে পারে। বাড়ন্ত ফলন। প্রায় আঠার হাত করে লম্বা হয় এক এক গাছ আখ। গুড়ের বান বসে। আখ চাবে উৎসাহ আছে এ অঞ্চলের চাষীর। কিন্তু প্রধান অঙ্গুবিধা—বিক্রয়কেন্দ্র নেই উপস্থিত। পুরোপুরি উৎপাদন হলে কেবলমাত্র গুড়ের বান করে সমস্ত আখের সম্ভাবহার সম্ভব নয়। ছোট ছোট চিনির কল প্রয়োজন তার জন্য।

বনিক্য, শাকসব্জি আছে কিছু কিছু। কুমড়া হয়। প্রকৃত বড় বড় প্রায় জোলকের আকারে মাঠকুমড়া। বৈশাখ মাসে তারকেশব্রে মেঘার বাজারে যে কিস্তির কুমড়োর আমদানি দেখতে পাওয়া যায়, তার একটা মোটা অংশই চালান যায় এই ভান্ডারহাটী ও তার আশপাশের এলাকা থেকে।

আম, জাম, কাঁঠালের গাছপালা কম। ফলবাগানের পাঠ বিশেষ নেই এদিকে। থাকবার উপায়ও নেই। ভয়ানক হনুমানের উৎপাত। পুঁহ-পোঁহ-কলগাদি সহ প্রায় বংশানুক্রমিক বান্ধ তাদের এখানে। ভান্ডারহাটীর মাটিতে পেঁপে-কলার ফলন হয় ভাল। কিন্তু হওয়ার জো নেই। ফসলের মহাশত্রু চাবের পরম সংকট এই হনুমানেরা। ঝাঁক বেঁধে দলসূচক ক্ষেতে নামে, ফল-ফসল, শাকসব্জি এমন কি কাঁঠাদার গোলাপের গাছ পর্বন্ত মড়িরে খেয়ে যায়। ভাড়া দিলে আগে দাঁত বিঁচিয়ে, তারপর তেড়ে আসে। সুবিধে বুঝলে চড়টা-চাপড়টাও যে বেয়ে না এমনও নয়। ধরবার করে করে হার মেনে গেছেন গ্রামবাসী। সরকারী বান্দর মারাদের পাতা নেই। কিছুদিন পূর্বে শোনা গিয়েছিল হনুমান বধের জন্য কয়েক হাজার বেন বাড়তি কন্দুকের গুলী আমদানী করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সে সব কোথায় গেল ঈশ্বর জানেন। আপাতত গ্রামবাসীদের ভ্রমের ফসল হনুমানের পেটে চলে যাচ্ছে।

আশপাশে তাল খেজুরের গাছ অনেক। শীতকালে খেজুর রস গ্রাম-বাংলার মানুষের এক উত্তম পানীয়। তাল কিংবা খেজুরের গুড়েরও চাহিদা আজও আছে। তথাপি আজকের পল্লী বাংলার তাল খেজুরের সম্ভাবহার ক্রমেই কমে আসছে মনে হয়। ভোর সকালের হিম হাওয়ার ফুঁতত তাতরসির মিঠে গন্ধ আমেজ ছড়ার না আর। জারি গান, সারিগান আর পৌষ-পূর্নমীর ভাসানের গান গাওয়া, ছেলে-শুঁদে বাছা-বড়েরা

ভিড় জমানো প্রকান্ত বানতলার সাক্ষাৎ কদাচিত্র মেলে। পরিবর্তে উৎকর্ষ অঙ্গ-গন্ধে বাতাস বিব করে গৌঁজাণো রসের ফেনার উপচানো কলাসর বাকি বদালয়ে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে অবাঙালী তাঁড়-ওয়াল। না—বে-আইনী নয়, এরা সব সরকারের লাইসেন্সধারী ব্যবসাদার। পাইকারীহারে দেশের যত খেজুরগাছ ইজারা নিয়ে নিচ্ছে, নিয়ে চলে যাচ্ছে তাল রস, খেজুর রস, শীতকালের আপন সম্পদ। রুক্ষ মাটির বুক ফুড়ে গাছ-গাছালির শিরায় শিরায় বইতে-থাকা প্রকৃতির এক আশ্চর্য অবদান। গাছের মাথা পর্বন্ত মড়িয়ে শেষ বিন্দুটি পর্বন্ত নিংড়ে নিয়ে তৈরি করছে যে বস্তু তার নাম জানি, নিশান চিনি না। যে নাকি আকারে তরল, প্রকারে গরল। বিক্রেতার ঘরে আসছে অর্থ, জমছে সম্পদ, লক্ষ্যুরি আসনে অটিন-বাঁধন, হচ্ছে শক্ত থেকে শক্ততর। আর ক্রেতার ঘর থেকে পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে অর্থ, সামর্থ্য যথায় সম্পদ; তার শরীরের স্বাস্থ্য, তার মানসিক শান্তি।

ভান্ডারহাটীর বাজারে দুধের দাম আজও ১০ পরসা কিলো। আর সে দুধের রং রূপ কিছুটা এদিক-ওদিক হলেও গণ্যাবতরণ প্রত্যক্ষ করবার সম্ভাবনা নেই কোন। গোয়াল আছ এখানে; প্রায় শতাধিক পরিবার। উপজীবিকা দুধ। প্রধান কারবার ছানা। ছানা নিরন্তর আইনের আওতার পড়ে বেশ বিপদগ্রস্তই হয়েছিল তারা। আপাতত কিছুটা আশ্বস্ত। দুধের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভবত এটাও একটা কারণ।

হাট বসে মস্ত বড়। বড় এবং জমাট। ৩০ পরসা করে ডিমের জোড়া। দেশী ডিম। আকারেও খুব ছোট বলা যাবে না। সাড়ে তিন টাকা করে যে পোনা মাছের কে-জি, তা শূঁখ টাটকাই নয়, ওজনেও বেশ ভারী। বড় বড় ছাঁকা মোরলা—দেড় টাকা কে-জি। আলু ৫০ পরসা, ফুলকাপি বেশ প্রমাণ সাইজ ৩০ পরসা। বাঁধাকপির কে-জি দরও বেশ সস্তাই মনে হলো। ভাল রসগোল্লা ৩ টাকা কিলো এবং ৫ কে-জি আন্দাজের একটি খেজুর গুড়ের নাকরী সাড়ে নটাকার বিকোতে দেখলাম চোখের সামনেই। সব মিলিয়ে ভান্ডারহাটীর বাজার দর সম্ভাই বলা যেতে পারে। কিন্তু খুব বেশি দিন আর থাকবে না বোঝ হয়। ভিনদেশী পাইকারের উপস্থব এখানেও বধেট। তারা মামূলি ব্যাপারী নয়, বেশ পাকা কালো-বাজারীও বটে। ৩০ পরসার ডিম তারা ডেকে ডেকে ৪৫ পরসা জোড়া দিতে চায়। সাড়ে তিন টাকার মাছ—উপযাচক হয়ে কিনে নিতে চায় ৪ টাকার। আগে পসার জমায়

কথারা

শ্রী অমল

রাতের রাঙাশ্রোতে উঠলো কড়
অচেনা আততায়ী অশ্বকার
রঙে লুপ্তিত আমারই শব
কোথায় ভেসে গেলো চিহ্নহীন
রাতের পরে রাত দিনের পরে দিন।

অথচ কথা ছিল একটি দিন
আমাকে ডুলবে না একটি রাত
একলা যাবে নাকো নিঃশরীর
তারার চেয়ে চেয়ে বড়নার
ডবুও চলে যার রাগি যার।

আজ যে প্রিরতন, অশ্বকার—
কড় যে ভরানক বনা কড়,
শ্রোতের তোলপাড়, শ্রুতে পাও
একটি ন্বর শব্দেহের ন্বর—
রঙে যত কিছ, কথা ছিল॥

বাজার ভাঙার। তারপর দাবন শাওরার
পর্যব চাষী; ডিম, মাছ কিংবা সসিজ-
ওরালকে। তারপরেই তার সুদিন আর
হ্যাগারীদের সর্বনাশ। ৩০ পরসার ডিম
২৫ পরসার নামে তখন। ন্যায্য পাওনা
পড়ে থাকে দিনের পর দিন। আর এই
লবের ফলাফল সবটুকুতেই অন্যতর
সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয় দু' পরসার
লক্ষ্য দরে জিনিস পাওয়ার তাদের এই
সামান্য সুবিধাটুকু থেকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭টি। ১৪ হাজার
জনতার পক্ষে নিত্যন্তই কম। বনিরাদী
বিদ্যালয় নেই। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
একটি। মেয়েদের জন্য প্রাতঃকালীন
স্বাস্থ্য। ছাত্র সংখ্যা ৭৫০।

গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। লোকমান্য
তিলকের নামে—তিলক পাঠাগার। প্রায়
৬০।৭০ বছরের পুরনো। পুস্তক আছে
৮ হাজারের কাছাকাছি। সরকারী গ্রামীণ
গ্রন্থাগার পরিকল্পনার আওতায়।

ক্লাব আছে—বেঙ্গল অলিম্পিক এসো-
সিয়েশনের এক্সিকিউশন পাওরা ভা-ডার-
হাটী ইউনিয়ন ক্লাব। ভা-ডারহাটী কল্যাণ
সমিতি একটি নাম করা সমাজসেবী
প্রতিষ্ঠান। এ অঞ্চলে অনেক রকম কাজ
করেন এ'রা। একটি মহিলা সমিতি,
একটি দুঃস্থ বিতরণ কেন্দ্র এবং যক্ষ্মা
রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র একটি চালিয়ে
যাচ্ছেন এ'রা। গ্রামের রাস্তাঘাটের সংস্কার
এবং দরিদ্র ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক কিনে
দেবার জন্য বাৎসরিক একটি বায় বরাদ্দ
আছে এ'দের।

রাস্তাঘাট মোটামুটি ভালই এদিক-
কার। বেলমুড়ি-ভা-ডারহাটী রোড
ভা-ডারহাটীর ওপর দিয়েই গেছে।
হরিভাল-ভা-ডারহাটী বিধমণী আড়া
রোড। অতুলচন্দ্র চৌধুরী রাস্তাটি
সুবিধের নয়। মেরামত হওয়া দরকার।

পুলিশী ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই
এখনকার। পুলিশী চৌকী একটি এলাকার
মধ্যেই আছে। যদিও চুরি হয়ে চোর
ধরা পড়েছে এমন নজির খুব কম, তবু
পুলিশ হাতের গোড়ার আছে এই এক
মস্ত সাক্ষ্য গ্রামবাসীর।

চিকিৎসা এবং রোগী পরিচর্যা
সুন্দর আছে ভা-ডারহাটী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের।
মাসে ৫০ থেকে ৬০টি প্রসূতির পরিচর্যা
অনেক ধানার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব
হয় না। একটি অঞ্চল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের
পক্ষে এ নজির বিস্ময়কর। কিন্তু সব
চেয়ে আনন্দ এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি করে
বোধ করি সংলগ্ন সসিজ এবং ফল
বাগানটির বাহারে। স্কুল কলেজ স্বাস্থ্য
কেন্দ্র এবং মহকুমা হাসপাতালের সংলগ্ন
শত শত একর জমি অনাবাদি পড়ে
গ্যাকে চিরকাল। তাই দেখতেই অভ্যস্ত
আয়রা। সম্ভবত সরকারী বাজেটে এইসব
জমি আবাদ করার জন্য কোন রকম খরচ-
পত্রের বরাদ্দ থাকে না বলেই এই অব-
হেলা। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে যে উপায়ের
অভাব ঘটে না ভা-ডারহাটীতে তার প্রমাণ
জালদা। শীতের সসিজ শেষ হয়েছে,
এখন চলেছে পটল ফলাবার ডোড়জোড়।
ছোট ছোট ইটের খেজার মধ্যে আর এবং

অন্যান্য ফলের গাছের চাষও হয়ে গিয়েছে
এবং এসবের চেয়েও যেটি উল্লেখযোগ্য
সেটি হলো এই যে—এই বিস্তীর্ণ এলাকা
ঘেরা ও চরা-খোড়ার প্রয়োজনে সরকারী
কোন আর্থিক সাহায্য নেন নি এ'রা।
পল্লেশ্ব গ্রামবাসীই ভালবেসে স্বেচ্ছায়
উপহার দিয়ে গেছে তাদের শ্রম, সময় এবং
আরও অনেক কিছ। এককথায় সব
মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে সমস্ত স্বাস্থ্য-
কেন্দ্রটির সর্বত্র একটি চেপ্টা, নিষ্ঠা ও
কর্মতৎপরতার ছাপ পড়েছে। আরকের
এই হতাশ-ক্লান্ত অবসাদের যুগে বা একটি
আশার আশ্বাস একে দেবে মানুষের মনে।

গ্রামে ঢুকতে প্রথমেই সিনেমা হাউস।
প্রকাণ্ড হাটার ঘেরা। দেওয়ালে মস্ত
পোস্টারে প্রায় ন'ন নায়িকার সাহু, ধরে
লারে-লান্সা নায়কের পালোয়ানী পাচ।
শোনা দেল এই সুন্দর পল্লীগামেও বাংলা
ভবি ভাল চলে না। হিন্দী ছবিরই কদর
বেশি। আর সে ছবিও যত বেশি নাচ,
গান, জাজ, টুইস্ট এবং মারামারি খুনো-
খনিতে ভরা থাকবে ততই হিট করবে।
অভিযোগ করবার কিছ নেই। রাস্তার
ডাকলেই নজরে পড়বে চোঙা প্যাট,
খাটো-হাতের আঁটো জামা আর উচ্চকো-
করে চুল আঁচড়ান মস্তান ছেলের দল
এখানেও আছে। ঠোঁটে শিস, গলার গান
এবং চোখে যে দৃষ্টি সে দৃষ্টি দেখে
নৃকের মধ্যে শিউরে ওঠে ভয়। মূলে তার
একটাই কারণ। অন্ত জিজ্ঞাসা। চলেছি
কোথায় আমরা? এর পরিণতি-ই কি?

বিশ্বসাহিত্যের * প্রাদিপর্ব

ডঃ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য

॥ ১৮ ॥

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে আমরা বৈদিক যুগ এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরবর্তী যুগের রচিত সাহিত্য-কর্মের কিছুটা পরিচয় দিয়েছি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কাল নির্ণয়ের সমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই বিষয়টি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যেও মতভেদের অন্ত নেই। এই বিষয়ে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত মতবাদ-গুলির কথাই এখানে উল্লেখ করছি। যশ্বেদের সর্বনিম্ন তারিখ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, অপরাপর সাহিত্য ও কয়েকখানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ভাগ অংশ রচনার সর্বনিম্ন তারিখ ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান উপনিষদগুলির সর্বনিম্ন তারিখ ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, পানিনি, কাভ্যায়ন ও পতঞ্জলির ব্যাকরণের তারিখ যথাক্রমে সমগ্র সূত্রসাহিত্যের তারিখ ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

মহাকাব্যসম্বন্ধ

এবারে আমরা ধর্মীয় ও টেকনিকাল সাহিত্যের ক্ষেত্র পৃথকভাবে করে বিশ্লেষণ সাহিত্যের জগতে চলে আসব। ভারতীয় মহাকাব্যসম্বন্ধ বলতে আমরা মহাভারত ও রামায়ণকে বুঝি, যদিও মহাকাব্যের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় এই দুটি গ্রন্থ পড়ে না। এমন কি যে অর্থে গ্রীক ইলিয়াড ও অডিসিকে এপিক বা মহাকাব্য বলা হয়, সেই অর্থেও মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্য নয়। বরং রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, এ দুটি গ্রন্থ ভারতবাসীর স্বরচিত ইতিহাস। রামেশ্বরসুন্দর ত্রিবেদী এই দুটি গ্রন্থকে বিশেষ করে মহাভারতকে, পিবা-মিডেব সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনী-সমূহের অনেকগুলিরই উৎস-ঋজুতে হবে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে, আমার

বিবেচনায় ক্ষেত্র বিশেষে বেদেরও সীমানা পেরিয়ে প্রাক-বৈদিক যুগে। রামায়ণের মূল কাহিনীটির আদি উৎস নিঃসন্দেহে প্রাক-বৈদিক। বৈদিক সাহিত্যের প্রভাবও মহাকাব্যসম্বন্ধের দেহ গঠন করতে কম সাহায্য করে নি। সংহিতাসমূহ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও গৃহ্যসূত্রসমূহে অনেক গাথা, কাথা ও কাহিনী আছে যেগুলি থেকে এই মহাকাব্য দুটিতে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রীসে যেমন ছিল র্যাপসোডিস্ট বা চাণক কবি যারা দেবগাথা ও বীরগাথা-সমূহ সর্বত্র গেয়ে বেড়িয়ে দুঃপয়সা বোজগার করত—এদেশেও সেই রকম একটি পেশাদার কণক বা চারণ শ্রেণী ছিল যাদের বলা হত সূত। যুদ্ধকালে এরা আবার রথের সাবধিও হত। এবং যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকত না তখন বিভিন্ন যুদ্ধের কাহিনী তারা প্রোতাদের মধ্যে পরিবেশন করত। এই বলে যাবার ট্র্যাডিশনটি মহাকাব্যসম্বন্ধের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাচ্ছে সঞ্জয়, এবং সমগ্র কাহিনীটিই অশ্বপার্বসরে 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের' মধ্যেই ব্যক্ত। কিন্তু সমগ্র মহাভারতটি পাঠ করে শোনাচ্ছেন ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের রাজসভায়। আবার সেই কাহিনীটিই শোনাচ্ছেন সূত উগ্রস্রব নৈমিষারণ্যে ঋষিদের নিকট।

মহাকাব্যসম্বন্ধের বিশেষ করে মহাভারতের বর্তমান যে রূপ আমরা দেখি তা কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠে নি। প্রায় আটশো বছর ধরে মহাভারতের বিষয়বস্তু বিবর্তিত হয়েছে। অতি সুপ্রাচীনকালে, সম্ভবত যশ্বেদের যুগে, দুটি টাইব, কুব্জ ও পাণ্ডালদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যে যুদ্ধের স্মৃতি দীর্ঘকাল ধরে জনমানে স্থায়ী হয়েছিল এবং যে যুদ্ধের কাহিনী যুগের পর যুগ ধরে চারণগণ কর্তৃক সর্বত্র গীত হয়েছিল। এও সম্ভব যে পরবর্তীকালে

হস্তিনাপুরের সিংহাসনে ঘটনাচক্রে কোন মাতৃতান্ত্রিক বহুপতিক (পলিগামিয়ার) সমাজভুক্ত জাতি রাজত্ব করাব সুযোগ পেয়েছিল, এবং তাদেরই রাজত্বকালে কোন সভাকবি সুপ্রাচীন কুরুবংশের নামের সঙ্গে এই নতুন শাসকবংশকে সংযুক্ত করে কোন একটি ক্ষুদ্রাকার কাব্য রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে নানা উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি পর্বতাকার কেমিকাল কম্পাউন্ডে রূপান্তরিত হয়েছে।

মূল কাহিনী ছাড়াও মহাভারতে অননুপ্রবর্তিত আরও অল্পসংখ্য কাহিনী আছে যেগুলি পরবর্তীকালের সাহিত্যিকেরা কাজে লাগিয়েছেন। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—রামোপাখ্যান যা অবলম্বন করে পরবর্তীকালে রামায়ণ রচিত হয়েছিল বলে অনেকেরই অনুমান। অনসন্দেহ নয়, তবে রামায়ণের কাহিনীই বা মূল কথা সে তো সর্বযুগের সর্বকালের, নায়ক ও নায়িকার প্রগাঢ় প্রেম, দুর্বৃত্ত কর্তৃক নায়িকাকে অপহরণ ও নায়ক কর্তৃক সেই দুর্বৃত্তের হাত থেকে নায়িকাকে উদ্ধার, এ কাহিনী সকল দেশে, সকল যুগের, সকল সমাজের অধিকাংশ কথা ও কাহিনীর বিষয়বস্তু। মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলাব কাহিনীটি পরবর্তীকালে কালিদাস কাজে লাগিয়েছেন, অপর একটি কাহিনী, নল ও দময়ন্তীর কাহিনী, অনেকাংশে মহাভারতের মূল কাহিনীটিরই অনুরূপ! সাকিনী ও সত্যবানের আখ্যানটিও একটি নিটোল কাহিনী। এই বকম কাহিনী শত শত সংখ্যায় মহাভারতে আছে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সেগুলিকে অননুপ্রবর্তিত করান হয়েছে। মহাভারত শুধু রামায়ণের আঁগুকের বিবর্তন সর্বশেষে বিভিন্ন গণতাবদসমূহের সংক্ষিপ্তসার শ্রীপুণ্ডলিকার তাঁর স্টাডিজ ইন এপিক্স এন্ড পদ্রানন্ নামক গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। কোতহলী পাঠকদের বইটি পড়ে নিতে অনুরোধ করি।

মহাভারতের রচনাকাল সম্পর্কে বলা চলে যে, ৪০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহাভারতের বর্তমান রচয়িতারা গড়ে উঠেছে। ভাষা ও ছন্দের বিচারে মহাভারতে সম-জাতীয়তার একান্ত অভাব। আর তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে মহাভারত কোন একটি বিশেষ যুগে রচিত হয় নি। মহাভারতে যখন ও বৌদ্ধদের উল্লেখ যেমন মূল্য ও আলোকজ্ঞানভারের পরবর্তী যুগকে নির্দেশ করে, অপর দিকে তেজনি বাণভট্ট ও কুমারিলের রচনার তথা পঞ্চম শতকের লেখ্যমালাসমূহে মহাভারতের উল্লেখ দেখে মনে হয় যে, অন্তত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বে মহাভারতের আদ্যভাগ ছিল।

রামায়ণ অবশ্য আকারের দিক থেকে মহাভারতের মত বিশাল নয়। মহাভারতের মত সর্ব অধ্যায়েই শাখা পত্রাবিত নয়। রামায়ণের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দুটি, অর্থাৎ বালকান্ড ও উত্তরকান্ড নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের রচনা—যেগুলির সঙ্গে মূল কাহিনীটির সম্পর্ক সামান্যই। এই দুই অংশেই অজয় বাড়তি উপাখ্যান আছে, যেগুলির মধ্যে অনেকগুলি মহাভারতেও বর্তমান। তবে রামায়ণের অধ্যায়গণের কাহিনী, বিশ্বেশ্বর-বিশ্বকর্মে দ্বন্দ্বের কাহিনী ইত্যাদি উপাখ্যানসমূহ কিছুটা মৌলিকভাবে দাঁড় করতে পারে। রামায়ণ যে মহাভারতের পরবর্তীকালে রচিত তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ভাষা ও ছন্দ যা মহাভারতের প্রাচীনতর অংশগুলির তুলনায় অনেক অবাচীন। পার্শ্বানি তাঁর গ্রন্থে বাসদেব, অর্জুন, যুধিষ্ঠির প্রমুখ নামের উল্লেখ করেছেন কিন্তু রানারণের কোন চরিত্র তার গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, রামায়ণের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ মহাভারত রচনার বিবর্তন শুরুর হবার ২০০ বছর পর থেকে রামায়ণ রচনার বিবর্তন শুরুর হয়েছিল, আব রামায়ণ তার বর্তমান মাকাবে উপনীত হলে যাবার পথেও মহাভারত রচনার বিবর্তন শেষ হয় নি।

মহাভারত ও রামায়ণের মূল কাহিনী প্রতিটি ভারতীয়ের নিকট এতই সুপরিচিত যে তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

ভগবদ্গীতা ও হরিবংশ

ভগবদ্গীতা (সাধারণত যে গ্রন্থটিকে গীতা বলা হয়) মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত, যদিও আসলে তা একটি পৃথক গ্রন্থ যা পরবর্তীকালে রচিত এবং যা পরবর্তীকালে মহাভারতে

অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থের আদিয় আকার এবং প্রকৃতি কিরকম ছিল তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে অনেক মতবাদ আছে। সম্ভবত আদিতে গীতা একটি উপনিষদজাতীয় গ্রন্থ ছিল, যাকে পরবর্তীকালে বিষ্ণু-উপাসনার উপযোগী করে পরিবর্তিত করা হয়েছিল।

বর্তমানে গীতায় যে রূপ আমরা দেখি তাতে ভারতীয় দর্শনের অনেকগুলি পরম্পর-বিরোধী ধারার সম্মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে উপনিষদ কাঁথিত ব্রহ্মবাদও আছে, সাংখ্য কাঁথিত পুরুষের ধারণাও আছে, তা ছাড়া আছে আত্মপালিশ্বর যোগশাস্ত্রসম্মত প্রণালী, বাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপের কথা, যজ্ঞের রহস্যাত্মক ব্যাখ্যা, দেবদান ও পিতৃদান সম্বন্ধীয় মত প্রভৃতি। এখানে উল্লিখিত বিভিন্ন পরম্পর-বিরোধী আদর্শসমূহের সমন্বয় সাধন করা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুর অতিপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে গীতা সর্বত্র প্রশংসার সঙ্গে পঠিত ও আলোচিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে পরম্পর বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও সব কিছু ছাপিয়ে এখানে ভক্তিবাদ ও নিষ্কাম কর্মযোগ প্রধান হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালের আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশে এই গ্রন্থোক্ত কয়েকটি আদর্শ বিশেষ অনুকূল হয়েছে। আদি গীতা সম্ভবত রচিত হয়েছিল ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং গীতার যে বর্তমান রূপ আমরা দেখি তা খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে।

একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ মহাভারতের পরিণতি (খিল) রূপে কল্পিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির নাম খিল-হরিবংশ, আকারে প্রায় মহাভারতের অর্ধেক এই গ্রন্থটি অবশ্য পরবর্তীকালের রচনা। মহাভারতের মত এই গ্রন্থটিও কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি বা যুগের রচনা নয়। এই গ্রন্থে কৃষ্ণের জীবনীতহাস বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম অংশের নাম হরিবংশপর্ব যাতে পুরাণের ভঙ্গীতে—স্মৃতিতন্ত্র থেকে শুরুর কবে যদুবংশের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে পৌরাণিক ধরনের কথা ও কাহিনীর সমাবেশ প্রচুর। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের নাম বিষ্ণুপর্ব যাতে গোপকন্যাদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয়োপাখ্যানসমূহ বর্ণিত হয়েছে। শেষ অংশটির নাম ভবিষ্যপর্ব, যাতে অন্যান্য পুরাণসমূহের মতই কলিকালের কুৎসা গুণ্ডা হয়েছে।

ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে রচিত ধর্মসূত্রগুলিকে অনুসরণ করে পরবর্তী-

কালে ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিগ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলি খ্রিস্টীয় প্রথম শতক ও তার পরবর্তীকালে রচিত। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে মানব যমশাস্ত্র বা মনুস্মৃতি। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে শাস্ত্রোক্ত পন্থাতিতে জীবনধারণের নিয়ম-কানুনগুলি শিক্ষাদান। মানুস্মৃতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ কিভাবে পালন করতে হবে তার নির্দেশ এই গ্রন্থগুলিতে দেওয়া আছে। ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রগুলির মত এই সকল স্মৃতি-গ্রন্থও বিবাহ, ঋতুসংগমন, চতুর্থাধর্ম, জাতকর্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্ত্রাশন, দৈনিক পণ্ডিতহাযজ্ঞ, বাৎসরিক শ্রাদ্ধবিধি প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। স্মৃতিগ্রন্থসমূহে বিভিন্ন সামাজিক আইন-কানুন, বিভিন্ন শ্রেণীর অপরূপ ও দণ্ডবিধি আলোচিত হয়েছে। স্মৃতি-গ্রন্থসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতিই সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমান। এই গ্রন্থের ভাষা রচনা করেছিলেন নবম শতকে মেঘাতিথি, একাদশ শতকে গোবিন্দরাজ ও দ্বাদশ শতকে কুঞ্জক। মনুস্মৃতি ধরনের আরও কয়েকটি বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ আছে যেমন : বিষ্ণু, বাজবলকা, নারদ, বৃহস্পতি, কাভ্যায়ন ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আরও অজস্র স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছে যেমন : আপস্তম্ব, অত্রি, যম, বৃহদ্রথ, লঘুযম, পরাশর, বৃহদ্রাশর, আশ্বিনর, অশ্বিনর, হারীত, দালভ্য, বলিস্ত, বৃহদ্রাশর, বামল ইত্যাদি। এগুলি অবশ্যই অবাচীন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

একান্তভাবেই রাজনীতি ও অর্থনীতিক কেন্দ্র করে রচনা প্রাচীন ভারতে একান্তভাবেই অনুপস্থিত। একমাত্র ব্যতিক্রম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। এই বিখ্যাত গ্রন্থটির কাল নির্ণয় নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। একদল পণ্ডিত মনে করেন যে, এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন কৌটিল্য—যিনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত ছিলেন এবং যিনি মৌর্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন, এবং সেই হিসাবে তাঁরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের রচনা বলে গণ্য করেন। যাবা এই মতবাদ পোষণ করেন তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে দণ্ডী এবং পণ্ডিতের লেখকের মত প্রাচীন লেখকেরা অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন, এবং বাণভট্টও, যিনি হর্ষবর্ধনের সমকালীন ছিলেন, কৌটিল্যের অর্থ-

শাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন; কামন্দক রচিত নীতিসার এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্র কোটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রের মাডেলেই গড়ে উঠেছিল এবং সেই হিসাবে অর্থশাস্ত্র এই সকল লেখকদের পূর্ববর্তী। এমন কি কালিদাসও যে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর

রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। কোটিল্য রচিত আইন-কানূনের ধরণ দেখে মনে হয় যে, সেগুলি মনুস্মৃতিতে বর্ণিত আইনকানূনের চেয়ে বেশি প্রাচীন এবং অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ বহু ক্ষেত্রেই হুবহু

মিলে যায়।

পঞ্চমস্তরে যারা অর্থশাস্ত্রকে পরবর্তী-কালের রচনা বলে মনে করেন—তাদের যত্নব্যবস্থা হল যে, অর্থশাস্ত্রের সর্বত্রই কোটিল্যের উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম পুরুষে, উত্তম পুরুষে নয়; অর্থাৎ “আমি বলি” নয় “কোটিল্য বলেন”; অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের

“মাথাধরায় সব ট্যাবলেটই একরকমের ফল দেয়
যদি আপনি তাই মনে করেন



তাহলে পরীক্ষা করে দেখুন



সুইব-এর

অবেদন

আশ্চর্যজনক ‘অ্যাপেপ’যুক্ত ট্যাবলেট
আপনাকে দ্রুত, নিরাপদ, নিশ্চিত আরাম এনে দেবে।



‘অ্যাপেপ’যুক্ত অবেনন কয়েক মিনিটের মধ্যেই
কাজ করে—বলুক্ষণের জগ্রে আরাম দেয়।

মাথাধরায়, দাঁতব্যথায়, পিঠের ব্যথায়, পেশীব বেদনায়,
সর্দিতে, ফুতে, বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলিতে ও অস্থায়ী
সাধারণ পীড়ায় অবেনন ব্যবহার করুন।

WATERBURY SQUARE সারাতাই কেমিক্যালস

® হচ্ছে ই. আব. সুইব এন্ড সন্স, ইনকর্পোরেটেড-এর রেজি-
স্টার্ড ট্রেডমার্ক। করমন্ডাল প্রাইভেট লিমিটেড উহার
সাইকেলপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

WATERBURY SQUARE

কথাগুলি কোঁটি নামে প্রচলিত কিন্তু তা' রচনা করে অন্য কেউ অনেক পরবর্তীকালে। কোঁটিলের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে বাৎসর্যনের কামসূত্রের নানান সাদৃশ্য আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে উভয়েই একই অর্থারটিকে উদ্ভূত করেছেন, সেই হিসাবে দুটি গ্রন্থ সমকালীন। অর্থশাস্ত্রে চীনের উল্লেখ আছে, কিন্তু খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চীনের সঙ্গে ভারতবাসীর যোগাযোগ ছিল না। পূর্বাশ্রমসমূহে কোঁটিলের কোন উল্লেখ নেই। মহাভারতেও রাজনীতিশাস্ত্র প্রসঙ্গে বৃহস্পতি ও শূদ্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোঁটিলের কোন উল্লেখ নেই। পতঞ্জলি মৌর্যগণ ও চন্দ্রগুপ্তের সভার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোঁটিলের কথা তাঁর গ্রন্থে অনুজ্ঞিত। মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা গ্রন্থের সঙ্গে কোঁটিলের অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর কোন প্রকৃত সাদৃশ্য নেই, জোর করে তা টানা হয়েছে। এই সঙ্কট কারণে তাঁরা অর্থশাস্ত্রকে খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে স্থান দিতে চান। দু'তরফেই আরও অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু সে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনার পরিসর এখানে নেই। মোটের ওপর কোঁটিল্যসমস্যা আজও অমীমাংসিত।

সমগ্র অর্থশাস্ত্র ১৫টি অধিকরণ এবং ১৮০টি প্রকরণে বিভক্ত। পর্বতীকালে অবশ্য অধ্যাভিত্তিক ভাগ করা হয়েছে। এখানে ১৫টি অধিকরণের বিষয়বস্তুর উল্লেখ করছিঃ (১) রাজপদগ্রণের শিক্ষা, মন্ত্রীদের যোগ্যতা, গুপ্তচর ও রাজার দৈনন্দিন কর্তব্য; (২) বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষসমূহ, তাঁদের কাজ, নগর শাসন ও প্রতিরক্ষা, শিল্প, গণকাব্য; (৩) অসামরিক আইন-কানুন; (৪) ফৌজদারী আইন-কানুন; (৫) শত্রু বিনাশ ও রাজকোষ তথা রাজপদগ্রন্থের বেতন ইত্যাদি; (৬) রাজতন্ত্রের সাতটি উপাদান; (৭) ছয় প্রকার রাজনীতি; (৮) রাজার অযোগ্যতা ও তার পরিণামসমূহ; (৯-১০) সামরিক অভিযানসমূহ; (১১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাসমূহ; (১২) যুদ্ধ জয়ের কৌশল; (১৩) অধিকতর দেশে জনপ্রিয় হবার উপায়সমূহ; (১৪) যুদ্ধজয়ের অপকৌশলসমূহ; (১৫) অর্থশাস্ত্রের সামগ্রিক পরিকল্পনা।

কোঁটিলের অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে বস্তুর স্পষ্টতা। প্রাচীন গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও অর্থশাস্ত্রে পরস্পরবিবোধী কথা বড় একটা নেই। কোঁটিলা বিশুদ্ধ বাজ্ঞান্য ও আমলাতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক, কিন্তু সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগতত্ত্বে বিশ্বাসী। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ওপর

কোঁটিলা বিশেষ জোর দিয়েছেন। আমলাতন্ত্রের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই ব্যবস্থার দোষগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। রাজকর্মচারীর পক্ষে অসাধু হওয়া খুবই সম্ভব একথা কোঁটিলা স্বীকার করতেন, তিনি রাজকর্মচারীদের ঘৃষ্য নেবার সঙ্গে মাছের জল খাওয়ার তুলনা করেছেন, এবং এই জন্যই তিনি রাজকর্মচারী নিয়োগে যথেষ্ট সাবধানতার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। রাজা কান দিয়ে দেখেন এটি কোঁটিলাই কথায় যে জন্য তিনি রাজার তরফে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশেষ ধরনের গুপ্তচর ব্যবস্থার বিধান দিয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সে যুগের অপরাপর আইন প্রণেতার তুলনায় কোঁটিলা অনেক উদার ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের অপরাধের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন কোন অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ বধ্য নয়। কোঁটিলা কিন্তু ব্রাহ্মণের সবাসরি প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছেন যদি সে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করে। নারীজাতির প্রতিও কোঁটিলায় সহৃদয় মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থানদ্বারী তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ এবং বিধবাবিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজা রাষ্ট্রের প্রতীক নয়, রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ। কোঁটিলায় মতে রাষ্ট্র মানবদেহের মত, যার অঙ্গ সাতটি—রাজা, মন্ত্রিমণ্ডলী, ভূভাগ, দুর্গ, রাজকোষ, সেনাবাহিনী এবং সুহৃদবর্গ। কোঁটিলায় মতে রাষ্ট্রের পরবাস্তবীতি ছয়টি মূল আদর্শ মেনে চলবে—সমৃদ্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), আসন (নিরপেক্ষতা), যান (যুদ্ধ প্রস্তুতি, অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা না করে), সংশ্রয় (অপরের আগ্রহ অব্যবহা) এবং ঐক্যবোধ (অর্থ)। একে সঙ্গো মিত্রতা কবে অপবের সঙ্গো যুদ্ধ। সর্বগ্রহী কোঁটিলায় দুর্ভিক্ষাণী রূঢ় বাস্তবের সঙ্গো সঙ্গীত রেখে গড়ে উঠেছে। অন্যান্য নানা বিষয়েও কোঁটিলা মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন কৃষির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে রাজা একজন সীতাক্ষ (কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর) নিযুক্ত করবেন, কৃষিকার্যের খুঁটিনাটি বিবরণ সম্বন্ধে যার প্রভূত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁর ওপর বার্ষিক কৃষিগত উৎপাদনের সাফল্য ও বৈফল্য দু'ঘেবই দৃষ্টি বর্তাবে। এমন লোককে কদাচ জমি দেওয়া হবে না, সে যে কোন জাতিভুক্ত লোকই হোক না কেন, যে স্বহস্তে চাষ করবে না। কোন ব্যক্তি তার জমি অপরকে ভাগে চাষ করতে দিতে পারবে না, একমাত্র সবকারী জমিগুলিই ভাগে চাষ করতে দেওয়া চলতে পারে। সীতাক্ষ কৃষককে ভাল বীজ, সার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবেন, জলসেচের

জন্য খাল খনন করাবেন, এবং কৃষির উন্নতির জন্য আরও বহুবিধ চেষ্টা করবেন। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরেরও আগে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতির জন্য কোঁটিলা যে সুপারিশ করেছিলেন তা এই বিশ শতকেও দেশের সর্বত্র কার্যকরী হয় নি।

কোঁটিলায় অর্থশাস্ত্রের অনুসরণে পরবর্তীকালে (আনুমানিক ৮০০ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে) কামন্দক নীতিসার নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু উৎকর্ষের দিক থেকে সেই গ্রন্থের সঙ্গে কোঁটিলায় কোন তুলনাই হয় না।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র

ভরতের নাট্যশাস্ত্র সম্ভবত খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে বা তার কিছু পূর্বে রচিত হয়েছিল। মণ্ড, অভিনয়, নৃত্য, গীত ইত্যাদির তাত্ত্বিক দিকসমূহের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। মোট ছত্রিশটি (পরবর্তীকালে আর একটি সংযোজিত হয়েছে) অধ্যায় রচিত এই গ্রন্থটি প্রাচীন যুগে বিশেষ আদৃত ছিল। নাট্যশাস্ত্রকে ভারত পঞ্চম বেদরূপে আখ্যাত করেছেন। নাটকের কাহিনী, চরিত্র এবং বিভিন্ন ভাবসমূহের ওপর এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দৈহিক ভাবভঙ্গী, তাদের বাচনভঙ্গী, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কি রকম হওয়া উচিত সে সকল বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। মণ্ড, দৃশ্যগত ও দর্শকদের কথাও ভারত ভোলে ন। নাটকের অঙ্গ হিসাবে কাব্য, ছন্দ, সঙ্গীত এবং নৃত্যের ওপরেও যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। রস, গদ্য এবং অলঙ্কারই হচ্ছে ভারতের মতে নাটকের সাধকতার মাপকাঠি, যেগুলি মধ্য আবার রসই প্রধান। রস বলতে তিনি ভাবকেই বোঝাচ্ছেন, যা তাঁর মতে আট ভাগে বিভক্ত। সংলাপের অলঙ্কারের জন্য তিনি ছত্রিশটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। সংলাপের কোন কোন স্থানে সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহৃত হবে তাবও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও ভাস্কর মত শক্তিমান নাট্যকাব্যের তাঁর নির্দেশ মেনে চলেন নি। ভবত নিজেও স্বীকার করেছেন যে সব কিছুই বাঁধা ছক ধরে হওয়া সম্ভবপর নয়, এবং নাটকের দর্শকরাই শ্রেষ্ঠ বিচারক। নাটক অভিনীত হবার আগে পূর্বরংগ নামক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ধ্রুপদী নাটকসমূহে ভারত বর্ণিত পূর্বরংগ একান্তভাবেই অনুপস্থিত। সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে পর্বতী অধ্যায়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব।



ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাশুনা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হুম, এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কথাটা বলেছিল সুবর্ণ সেই মরণোন্মুখ লোকটার মৃত্যুর উপর। যার জন্যে তার নিজের পেটের মেয়ে চাঁপা বলেছিল, 'বুঝতে পারি না মাকে, মানদুশ না কসাই? আমাদের ভাগ্যে বাবা এ-যাও বেঁচে উঠলেন তাই, যদি সত্যিই একটা কিছুর ঘটে যেত! ওই মৃত্যু তুমি আবার লোকসমাজে দেখাতে কি করে?'

'তুমি' দিয়ে বললেও আড়ালেই ধলেছিল অবশ্য, চম্পন ছিঁস শ্রোতা। চম্পন বেশি কথা বলে না—সে শব্দ মূঢ়াকি হেসে বলেছিল, 'মা'র আবার মৃত্যু দেখানোর ভয়?'

বত্দের অসুখ শব্দে ছুটে এসেছিল তারা, আব অনেকদিন পরে আসা হয়েছে বলেই দু-চারদিন থেকে গিয়েছিল। থেকে গিয়েছিল অবিগ্যা ঠিক বাবার সেবাতে নয়, দুই বোন এক হয়েছে বলেই। 'রাজ্য-রাজ্য দেখা হয় তো বোনে বোন দেখা হয় না তো?' এই তো পারুলের সঙ্গে কি হল? সে তো সে কোন বিদেশে।

বিস্তৃত প্রবোধচন্দ্রের অসুখের কারণ সম্পর্কে এই নিলঞ্জ সন্দেহ কি একা সুবর্ণভ্রাতাই হতোছিল? সুবর্ণভ্রাতার প্রথর-বুদ্ধি ছেলেদের হ'ল ন? হতোছিল বৈ কি—তা'ছাড়া গোমাপুত্রই তো ছিল তাদের হাতে। কিন্তু তবু তারা এত নিষ্ঠুর হতে পারে নি, হতে পারে নি এত নিলম্ব। তাই তারা প্রবোধের যে যেখানে আছে তাদের 'তড়িৎ' খবর দিয়ে

বসেছিল। অবিগ্যা সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিল, 'খবর দেওয়া উচিত তাই জানালাম, তবে বোগটা ছোঁয়াচে, সেই বুঝে—'

তা' সেই 'বুঝ'টা সুবোধে আব উমাশশী বাদে আর সকলেই বুঝেছিল, বুঝেছিল বিবাহের বাড়ির সবাই, বুঝেছিল প্রবোধের জামাইরা তবে মেয়েরা বোঝে নি, আব বোঝে নি—পাগলা জগৎ।

শ্যামাসুন্দরীও অবশ্য একটু অবুঝ হাঙ্গলেন, জগৎ নিবৃত্ত করে এল মাকে। হাউমাউ করে কেঁদে বললো, 'যা হবে তা' তো বুঝতেই পারছি, শিবের অনাখ্য ব্যাধি, তুমি আশী বছরের বুড়ি সে দৃশ্য দেখতে পাবে?'

'দেখতে পাবো—' এ কথা আর কে বলতে পারে? অতএব জগৎ একাই কাদিতে কাদিতে এসে হাজির হয়েছিল।

এসে দেখে বিচার-সভা বসে গেছে।

বুগী আছে শব্দ বকুলের হেফাজতে, সুবর্ণভ্রাতাকে ঘিরে বাকি সবাই।

না কটু কথা বলছে না কেউ কিছুর শব্দ এইটুকুই বলছে, 'পাবলে তুমি এ কথা বলতে? কি করে পাবলে? 'জন্ম' বলে বস্তুটা কি সত্যিই নেই তোমান?'

শ্রান্ত সুবর্ণভ্রাতা একবার শব্দ বলেছে, 'তাই দেখছি। সত্যিই নেই এত দিনে টেব পেলাম সে কথা।'

উমাশশী কাঠ হয়ে বসেছিল, সুবোধচন্দ্র বললেন, 'তুমি এখন যাবে না থাকবে? আমার তো আবার—'

অফিসের দেবির কথাটা আর মৃত্যু

ফুটে বলেন না। গেন্সন হয়ে খাবো পর ধরাধার করে চাকরির মেয়াদ আরো দু' বছর বাড়িয়ে নিয়েছেন, কিন্তু কোথাও যেন সুন্দর একটা লজ্জা আছে সেটা জেনো। তাই পাবতপক্ষে 'অফিসের দেবী' কথাটা উচ্চারণ করেন না সুবোধচন্দ্র। যেন ওটা এলেবেলে, ওটা অন্যের কাছে অবজ্ঞায় ব্যাপ্য।

উমাশশী চকিত হয়।

উমাশশী যাবার জন্যে ব্যগ্র হল।

কলারাকে ভয় করছে না উমাশশী, ভয় তার এই পরিস্থিতিটাকে, ভয় তার মেজাজকে। চিরটা দিন যাতে বুঝতে পাবল না সে। সেই দুর্যোধকে চিরদিনই ভয় তার। নইলে ইচ্ছে কি করে না যাতে মাঝে আসে, দু' দণ্ড মেজবোনের এই নাজানো-গোছানো চকচকে সংসারটার এলো বসে। লক্ষ্মী ওখলানো সংসার দেখতেও তো ভাল লাগে।

কিন্তু কি জানি কেন মনস্তি পায় না? মনে হয় তার পিঠোপিঠি ওই জাঁপি যেন সহস্র বোজন দুবে বসে কথা বলে তার সঙ্গে।

অথচ বলে তো সবাই?

ছেলে-মেয়েদের খবর কি? নাতির, কে কোন ক্লাসে পড়ছে, মেয়েদের আর কব কি ছেলে-মেয়ে হল, সবই ভিজিয়ে কবে। আদব-যত্ন করে, খাওয়ায় মাখনা সাঙ্গ মিষ্টি বেঁধে দেয় তবু কে জানে কোথায় ওই দুঃখটা।

গরিবালী বিন্দু ওবা তো বড়জামে একেবারেই পোছে না, এক ভিটের বাস

করেও প্রায় কথা বন্ধই। নেহাৎ উমাশশী সেই 'মরুভূমি'টা সহ্য করতে পারে না বলেই যেতে যেতে দু'টো কথা কইতে যায়। তবু ওদের সঙ্গেও যেন নেই এতটা ধাবধান, ওরা কাছাকাছি না হলেও—ফাছেই মানুষ। তাই উমাশশী এখানে সসেই ভাবছিল, রোগটা ছোঁরাচে বলে আসতে পাবল না বটে, খবরটার জন্যে হাঁ করে আছে ওরা। গিষেই জানাতে হবে তাড়াতাড়ি ভয়ের কারণটা নেই আর, রোগী সামলেছে একটু।

কদিন কথা নেই, এ একটা বরং সুযোগ এল।

তাই তাড়াতাড়ি বললো, 'না আমিও চলেই যাই তোমার সঙ্গে। থাকা মানেই তো আবার পেঁছানোর জন্যে ছেলেদের খ্যস্ত করা! চাঁপা চমন এসে গেছে, মেজবো এসে গেছে, আর ভাবনা করি না। উঃ, ভগবানের কী অনন্ত দয়া যে মেজবো রওনা দেয় নি।'

আজকাল এটুকু উন্নতি হয়েছে উমাশশীর, ঘোমটা দিয়ে হলেও সকলের সামনে বরের সঙ্গে কথা কয়। সেই সকলটা যে সকলেই তার কনিষ্ঠ এতদিনে যেন সে খেরাল হয়েছে উমাশশীর।

তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে উমাশশী। সুবর্ণকে একটু বলে গেলে ভাল হতো, কিন্তু পরিস্থিতিটা যে বড় গোলমালে। এসেই তো শুনেছে চাঁপার মখে—কি কথা বলেছে সুবর্ণ তার স্বামীকে।

হতে আঁর্বিশ্য পারে। মেজ ঠাকুরপো চিরদিনই তো ওই রকম বোঁ-পাগলা, বোঁকে একবেলার জন্যে চোখের আড় করতে পারে না। সেই বোঁ একেবারে বদরিকাত্রম বাবার বায়না করে বসেছে দেখেই করে বসেছে এই কেলেকারী কান্ড। জানে তো বারগ শোনবার মেয়ে নয় মেজবো।

তবু সত্যিও যদি তাই-ই হয়, বড় বড় ছেলে, ছেলের বোঁদের সামনে মানুষটাকে এমন হয়ে করবি তুই? তা' ছাড়া যে কাবণেই হোক, বলতে গেলে প্রায় তো মবতেই বসেছে। নাড়ী ছাড়বার জোগাড়! তাকে লাঞ্ছনা?

ছি ছি, এ কি নির্মায়িকতা।

গাড়িতে উঠে বসে ঘোমটাটা একটু খাটো করে সেই কথাই বলে ফেলে উমাশশী।

সুবোধের দিকের জানলাটা খোলা ছিল, সুবোধ সেই জানলার বাইরে তাকিয়েছিলেন, হঠাৎ সচকিত হয়ে বলেন, 'কার নির্মায়িকতা কথা বললে?'

'মেজবোয়ের কথাই বলছি—'

হঠাৎ সুবোধ স্বভাব-বহির্ভূত তাঁর বেন; সুবোধের প্রোচ চোখে যেন দপ

করে একটা আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে, বলে ওঠেন, 'মেজবোয়ার কথা? মেজবোয়ার নির্মায়িকতার কথা? মেয়েমানুষ হয়েও শব্দ ওই দিকটাই দেখতে গেলে বড়বোঁ? পোবো লক্ষ্মীছাড়ার নিষ্ঠুরতা তোমার চোখে পড়ল না? অবস্থার গতিকে আমি তোমায় কখনো কোনো তীর্থ-ধর্ম করাতে পারি নি। আমার বলা শোভা পায় না, তবু পোবোর 'অবস্থা' ছিল বলেই বলছি, অবস্থা সত্ত্বেও তুই মানুষটাকে কোনোদিন আকাশ-বাতাসের মত দেখতে দিলি না; নিজের স্বার্থে খাঁচার পুরে রেখে দিয়েছিস, লম্বা করল না তোর এই বড়ো বয়সে এই কেলেকারীটা করতে! স্বামী হয়ে তুই ওর এতবড় একটা তীর্থ-যাত্রার সুযোগ পণ্ড করলি? সুযোগ বারবার আসে? বোঁটা যে চিরদিন আকাশ-বাতাসের কাতাল, তা' জানিস না তুই? আর তাও যদি না হয়, হি'দু বাঙালীর মেয়ে তো বটে? 'বদরীনারায়ণ' যাত্রা করছিল, কত বড় আশাভঙ্গ হল তার, সেটা তুমি বুঝতে পারলে না বড়বোঁ?'

একসঙ্গে এত কথা কইতে, সুবোধকে জীবনেও কখনো দেখেছে কিনা উমাশশী, সন্দেহ, তাই সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে, আর বোধকরি কথাগুলো অনুধাবন করতে চেষ্টা করে; সুবোধও বোধহয় এই আবেগ প্রকাশ করে ফেলে লম্বিত হলেন, তাই এবার শান্ত গলায় বলেন, 'মেজবোমা মানুষটা আলাদা ধাতুর, ঠেকে তোমরা কেউ বড়লে না। আর পোবোটা হচ্ছে—' চুপ করে যান।

তা' কেউ যদি সকলের দুর্বোধ হয় তো সে দোষ কার? তার, না সকলের?

বিন্দু আর গিরিবালা 'নে সে' করে রামা সেরে তাড়াতাড়ি হাঁড়ির ভাত চুকিয়ে নিচ্ছিল, কে জানে কখন কি খবর আসে! মল্লিকা নেই, কদিনের জন্যে শব্দরবাড়ি গেছে, শাশুড়ীর অসুখ শুনে। কাজেই চক্ষু লম্বা করবার মত কেউ নেই। নইলে যা কটকটে মেয়ে, খুড়ীদের এখন ভাতের কাঁসি নিয়ে বসা দেখলে কটকট কবে কথা শোনাতো। নেই বাঁচা গেছে।

অতএব দু'জনে ছেলে-পুলেকে ভাত দিবেই একই রান্নাঘরের দু'প্রান্তে দু'কাঁসি ভাত বেড়ে নিয়ে বলাবলি করছিল, 'যা হবে তা তো দেখাই যাচ্ছে, তবে মেজদির এবার কি হবে তাই ভাবনা? চিরদিন তো ওই একটা মানুষের ওপব দাপট করে তেজ আসপন্দাব ওপরই চালিয়ে এলেন, এখন পড়তে হবে ছেলে বোঁয়ের হাতে।'

এরা দু'জনে যে পরস্পরের প্রাণের সখী তা নয়, দু'জনের আলাদা অবস্থা, আলাদা কেস। পাড়া-পড়শী

দু'জনেরই গলায় গলায় ভাব, (যেটা মুক্ত কেশরী আমলে সম্ভবপর ছিল না) হলেও সেই পড়শীরা ভিন্ন ভিন্ন দলের এবং সেখানেই নিশ্চিত হয়ে পরস্পরের সমালোচনা করে বাঁচে। তবু একেবারে কথা বন্ধ মত দেখাদেখি বন্ধটা নেই এবং মিলই আছে। ক্ষুদ্রতার সঙ্গে ক্ষুদ্রতার, সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে সঙ্কীর্ণতার, স্বার্থবোধের সঙ্গে স্বার্থবোধের এক ধরনের হৃদয়তা থাকে, এ সেই হৃদয়তা। গিরিবালা আছে তাই বিন্দু, বিন্দুকে ঈর্ষা করতে পায়, বিন্দু আছে, তাই গিরিবালা তার অহমিকা বিকাশের একটা ক্ষেত্র পায়—এদের কাছে এরও মূল্য আছে বৈ কি।

তা ছাড়া কেউ তো উদার নয় যে, একে অপরের কাছে 'ছোট' হয়ে থাকার প্রশ্ন আছে। উমাশশীর পরসা নেই, তাই সে পরসা খরচে কুপ, কিন্তু হৃদয়ে কুপ নয় উমাশশী। তাই উমাশশীকে ওরা দেখতে পারে না।

তবু উমাশশীই যেতে যেতে আসে। বলে, 'কি রে মেজবোঁ আজ কি রাঁধিল? ও মা ছোটবোঁ তো খাসা মৌরলা মাছ পেয়েছিস!'

ওরা গ্রাহ্য করে উত্তর দিলে গল্পটা এগোয়, ওরা অগ্রাহ্যভাবে দেখালে উমাশশী আস্তে সরে আসে। আজ ভাবছিল মেজবোঁয়ের বাড়ির খবর নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ গল্প চালাবোঁ বাবে, কিন্তু হঠাৎ মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। বার বার মনে বাজছে, 'মেয়েমানুষ হয়েও শব্দ এইটাই তোমার চোখে পড়লো বড়বোঁ—'

বোঁশ কথা আর বলল না, রুগী সামলেছে, প্রাণের ভয় নেই, শব্দ এইটুকুই জানিয়ে দিয়ে আস্তে চলে এল।

'জবে আর সাত-সকালে গিলে মরি কেন' মনে মনে এই কথাটুকু উচ্চারণ করে বাড়াভাতে এক-একখানা গামলা চাপা দিয়ে, দুই জা দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, 'ভাগ্যটা দেখলে? এ বাবা স্রেফ মেজদির ভাগ্যের জোরে—নইলে এ হল শিবের অসামিথ্য ব্যামো।'

তা জগৎও সেই কথাই বলতে বলতে এসেছিল এবং রুগীর বিছানায় থাকে বসে পড়ে কে'দে বলে উঠেছিল, 'কি রে পোবো, মাঝের ছেলে মাঝের কাছে চললি?'

প্রবোধ কষ্টে বলছিল, 'যেতে আর পাবলাম কই? এ হতভাগাকে যমও ছোঁয় না। তোমাদের ভাববোঁ তো বলে গেল, রোগ নয় ছল।'

গোষ্ঠিয়ে গোষ্ঠিয়ে বললেও বুঝতে পারা গেল এবং বলা বাহুল্য অবাকই হল জগৎ। মেজবোঁমা কি তাহলে সত্যিই 'মাথা খারাপ'

হুগা? নচেৎ এই ঘরের ঘরে পৌঁছনো মানুষটাকে এই কথা বলে।

অবিশ্যি মাথা খারাপ হলে কথা নেই, কিন্তু না হলে? না? মাথাটাই ঠিক নয়, দেখলাম তো—

কিন্তু খানিক পরে সহসা এই হুগার বাড়িতেই সেই মানুসেরই হা হা হাসির শব্দ ছাদে গিয়ে ধাক্কা খায়। 'আঁ! তাই না কি? মেজবোমা বদরীনারায়ণ ষাঙ্খলেন, চলে আসতে হল! ও, তাহলে আর দেখতে হবে না কান্দু, এ স্রেফ আমার মগজওলা ভায়ার কারসান্জি। উৎ, বৃষ্টি একখানা বার করেছে বটে।.....কিন্তু ভারি অনায়াস, ভারি অনায়াস। ষাঙ্খলেন একটা মহাতীর্থ! তা ছাড়া নিজেরও ব্যয়স হয়েছে, যদি হয়ে যেত একটা কিছু? তখন তুমি পরিবারের হিন্সী দিল্লী যাওয়া বন্ধ করতে আসতে? থাক গে ছল-ই হোক আর সত্যিই হোক, তারা পটকে গেছো-খুব। এখন স্রেফ কলবালি! পুরো তিনটে দিন স্রেফ কলবালি! বকুলের, বাবা ভাত খেতে চাইলেও দিবি না। ঘাই সেই আশী-বছরে বড়িটা মরছে ধড়ফড়িয়ে, বলি গে তাকে।'

একে একে সকলকেই ধড়ফড়ানো থেকে রক্ষা করা হল। শব্দ জয়বতীব বাড়িতে খবর দেবার কিছু নেই। জয়বতীর রওনা হয়ে গেছে। হঠাতো এখন তাদের বিশ্বাস আর ভক্তির গলা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে 'জয় বাবা বদরীনারায়ণ! জয় বাবা বদরীনাথ! কি জয়!' পাশ্চাত্যকুরের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিশে হঠাতো উদাস হয়ে আকাশে উঠছে সেই স্বর।

কে জানে সুবর্ণলতার ওই ভক্তির ঘরটায় শাঁক ছিল কি না। নইলে তার কণ্ঠস্বরটুকু আকাশে ওঁঠবার সুযোগ পেল না কেন?

জয়বতীব নন্দ, অভাব সুবর্ণরও সম্পর্কিত নন্দ সেই কথাই বলাবলি করে কেবলই তো হিমালয় দেখবো, হিমালয় দেখবো চিন্তা দেখলাম, খাবার নাম তো একবারও শুনলাম না।.....ঠাকুর অন্ত-হিম্মী, দেখছেন সব।'

আশ্চর্য ওই কথাই বলে লোকে। কোটি কল্পকাল ধাব বলে আসছে। হঠাতো বা আবার কোটি কল্পকাল ধরে বলবে। যারা উল্টো কথা বলতে চাইবে, তারা সমাজে পতিত হবে।

কিন্তু চিরাদিনের ঈশ্টা-পাল্টা সুবর্ণ-লতা কি সোদিন উল্টো কথা বলছিল? না ওই কোটি কল্পকালের কথাটাই একবার উচ্চারণ করেছিল?

কে জানে। তারপরে তো আবার দেখা যাচ্ছে সুবর্ণলতা দুঃসহ স্পর্ধায় তার

ঘোল বছরের আইবুড়ো মেয়েকে বলছে, 'সুদর্শনকে একবার ডেকে দে তো! যে ছেনোটো-না কি বাইশ বছরের।'

প্রবোধের নিজের আর সাহস হয় নি। এবার ছেলেকে এসে ধরেছিল, কিন্তু ছেলে মুখের ভঙ্গীতে একটা তাচ্ছিল্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মুখের ওপর জবাব দিল, 'আমার দ্বারা হবে-টবে না। আমার কী দরকার? যে তার নিজের ছাগল ল্যাঞ্জে কাটবে, আমি বামা দেবার কে?'

'তা' ও যদি পাগল হয় সবাইকেই তাই হতে হবে?'

'হবে। পাগলের কক্ষীর মধ্যে থাকতে হলোই হবে তাই।'

'ঠিক আছে, আমি পরিমলবাবুকেই বলছি গিয়ে।'

'কী বলবেন?'

আগে বলত না, ইদানীং বাপকে 'আপনি' বলছে ভান্দু।

'বলব আবার কি!' প্রবোধ ক্রুদ্ধ গলার বলে, 'বলব, তোমার ওই জ্ঞান ছেলের এসে এসে আর আমার ওই ধাড়ী হিন্সী মেয়েকে পড়াতে হবে না।'

'পরিমলবাবু যদি বলেন, নিজের মেয়েকে না সামলে আমার বলতে এসেছে কেন?'

কথাটা প্রাণমানবোগ্য, তাই প্রবোধ গুম্ব হয়ে বয়, তারপর আবার বলে ওঠে, 'ঠিক আছে ওই ছেলেটাকেই শাসিয়ে দিচ্ছি।'

ভান্দু কেন একটা মজা দেখছে, এইভাবে বলে, 'দিতো পারেন। তবে সেখানেও অপমানিত হবার ভয় আছে। এ যুগের ছেলে, ওদের গব্দ লঘু জ্ঞানটা তো ঠিক আপনাদের হিসেব মত নয়।'

প্রবোধের একটা কথা মুখে এসেছিল, সামলে নিজে বলে, 'তবে ওই হারামজাদা মেয়েকেই শাসন করা ছিলাম আমি রোসো। সুদর্শনদার কাছে পড়া করছেন! পড়ে আমার গর্ভীর মাথা উন্মার করবেন!! কী করবো—শাখের কসাতের নিচে পড়ে আছি আমি, নিজের সংসারে চোর, তা নইলে—'

তা নইলে কি হতো তা' আর বলে না, চলে যায়।

ভান্দু কেমন একটা ব্যক্তি মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কী ফুটে ওঠে সেই দৃষ্টিতে?

মানুষটা কী অপদার্থ!

যাক ভান্দু দৃষ্টিতে কিছু গেল এল না, সুদর্শন সেই কক্ষকে পড়াতে আসা নিয়ে সংসারে একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি

করলেন প্রবোধচন্দ্র এবং 'পদার্থের' পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সেটি বন্ধ করতেও সমর্থ হলেন। কে জানে কি কলকাঠি এ'র নাড়লেন, পরিমলবাবুর স্ত্রী দীর্ঘদিন পরে এ বাড়িতে বেড়াতে এলেন এবং ঘি আর আগুনের সেই চিরন্তন উদাহরণটি নতুন করে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললেন—'বৃব্যোজ, যদি মেয়েকে বোঝান বামনের ঘরে দিতে। শব্দ শব্দ কেন আমার ছেলেটাকে চণ্ডল করা ভাই! একেই তো ছোট থেকে—'

সুবর্ণ সহসা প্রতিবেশিনীর একটা হাত চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, 'নেবে ভূমি বকুলকে?'

ভ্রমহিলা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'আমি নিতে চাইলেই কি বকুলের বাবা দেবেন? তুমি না হয় আলাতোলা মানুস, অত ধরবে না, তোমার ছেলেরা? তোমার কত? না ভাই গৃহবিচ্ছেদ বাঘাতে চাই না আমি। মেয়ে পাহাড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে দিয়ে ফেল, আর পড়িয়ে কি হবে? চাকরী করতে তো যাবে না? মনে কিছু কারো না ভাই, 'সুদর্শন' আর আসবে না।'

এরপরও কি বলবে সুবর্ণ, 'হ্যাঁ তাকে আসতে হবে।'

তা' বলা সম্ভব নয়, তবে সেই সুদর্শনকে ধরেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল সুবর্ণ। মাইনে করা মাস্টার ঢুকিয়েছিল বাড়িতে ঘোল বছরের মেয়ের জন্যে। বৃদ্ধ ভ্রমলোক, কোন এক সরকারী



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার ফ্রিড
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন টিউ-
শানি করে চালাচ্ছেন। চরিত্রপটে সই করে
হাত-ছাত্রীকে তালিম দেন। অনেক মেয়েই
তো প্রাইভেট পড়ে পাশ দিচ্ছে আজকাল।

বকুলের জ্যাঠামশাইয়ের চাইতে বয়েস
বেশি, এ মাস্টারকে নিয়ে আর কিছ্ বলবার
আছে?

বাস্তায় দেখার সুযোগ ক্রমশই কমছে,
বাড়িতে আসাব পাটটাও এই একটা
ক্রেদান্ত আলোড়নে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে,
তবু এক সময় মৃদু হাসলো বকুল, 'কি
সুনির্মলদা পেয়েছ খুঁজে নিশ্চিন্ত
নিরাপত্তা?'

সুনির্মল এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক-
করে ওব মাথায় একটা টোকা মেরে বলে,
'পেলান! ওদের জন্যে না হোক, আমার
নিজের জন্যেই খুঁজতে হলো!'

'তোমাদের বাড়িটি তো আমাদের
বাড়ির থেকে এক তিলও অগ্রসব নয়,
সাইস করেছিলে কি করে তাই ভাবছি।
হয়েছে তো এখন জন্ম?'

'জন্ম আবার কি, ভারি ফাজিল হয়ে-
ছিন।' বলে চলে যায় তাড়াতাড়ি। তবে
জন্ম সে সত্যিই হয় নি। আগে থেকেই
আট-ছোট বেঁধেছিল।

সুবর্ণলতা যখন প্রস্তুতাব করছিল,

তখন সুনির্মল বিপুল পলক গোপন
বেখে, 'আচ্ছা, আসবো সময় করে। এই
আহ্লাদী, নভেল পড়ানো একটু কমাস—'
বলে চলে গেলেও, বাড়ি গিয়ে মা'র কাছে
বলেছিল, 'এই এক হল ঝাট! এমন সব
অন্যায় অনুরোধ করে বসে মানুষ! ও-
বাড়ির খুঁড়িমা ডেকেডেকে অনুরোধ করে
বসলেন কি জানো? রোজ গিয়ে ওই
মেয়েটাকে পড়াতে হবে!'

বলা বাহুল্য, সুনির্মলের মা এতে
পলকিত হলেন না, ক্রুদ্ধই হলেন। বল-
লেন, 'তার মানে?'

'মানে আর কি! ঘসটাচ্ছে তো এখনো
খার্ড ক্রাশে? অথচ বুদ্ধি-সুস্থি আছে মন্দ
নয়। তাই বাসনা গড়িয়ে-পিটিয়ে সামনেব
বহুবেই প্রাইভেট পাশ দেওয়াবেন!'

'পাশ দেওয়াবেন! মেথেকে পাশ দিইয়ে
কী চতুর্বার্গ হবে শুনি?'

'তা কে জানে বাবা! বললেন! কথা
এড়ানো কি করে?'

'কথা এড়ানো কি করে? চমৎকার!
কেন—বললেই তো পারতিন আমায় এখন
এম-এ ক্রাশের পড়া—'

'বলিছিলাম—বললেন একটু সময়-
টময় করে। মূখের ওপর 'না' কল্পা যায়?'

পরিমল-গৃহিণীও এটা স্বীকার করেন।
তাই শেষতক বলেছিলেন, 'বেশ পড়াও

তো ওর মা'র সামনে বসে পড়াবেই
ছেড়ে দিয়ে।

তাই চলছিল, এটাই জ্ঞানভেন পরিমল-
গিম্মী। কিন্তু জল অনেকদূর গড়ালো।
অতএব রত্নগমণ থেকে বিদায় নিতে হল
তাকে, বাঘটি বছরের গণেশবাবুকে আসন
ছেড়ে দিয়ে। —

গণেশবাবু সম্পর্কে কী আপত্তি তুলবে
সুবর্ণ'র সনাতনী সংসার?

এদিকে তো চতুর্দিক থেকে রকম রকম
খবর আসছে ঝপাঝপ।

সুদ্রাজের ছোট ছেলে বিলেতে ব্যারি-
স্টারী পড়তে গিয়ে মেম বিয়ে করে
এনেছে, সুদ্রাজ সেই মেমবৌকে সমাদরে
ঘবে তুলেছে। বৌ ছেলের জন্যে আলাদা
বাবুচি ঢুকেছে বাড়িতে।

এদিকে সুবালা মে সুবালা সেও নাকি
একটা মেয়েকে বাবেশ্বর বামনের ঘরে বিয়ে
দিয়ে বসেছে, আর অমূল্য বলছে, 'ঠিক
আছে বাবা, আমায় সবাই জাতে ঠেলে
তো বাকি যে কটা পড়ে আছে ওই
বারেশ্বর-টারেশ্বর দেখেই দিয়ে দেব!'

এদিকে—

উনিশ বছর বয়েস থেকে হবিষ্যা গিলে
আর শূচিবাই করে করে মল্লিকার জন্মের
শোধ আমাসাব ধাত, হাতে পায়ে হাজা,
অথচ মল্লিকার নিজের খুঁড়বশুর ব্রাহ্ম-
ধর্ম না নিয়েও বিধবা মেয়ের বিয়ে দিলেন।
আত্মীয়রা বলুক 'বেশ্ম', করুক 'পতিত'
অগ্নি নারায়ণ সাক্ষী করেই হলো সে
বিয়ে।

তা' ছাড়া হবদমই তো পথে-ঘাটে
মেয়ে দেখা যাচ্ছে, ট্রামগাড়িতে মেয়ে উঠে
বসছে, মেয়ে ইস্কুলের বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে
মেয়ে মাস্টারবনীও বাড়ছে, এই বন্যার মুখে
মাস্টার নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করে আর কি হবে?

শেষ চেষ্টা করেছিল প্রবোধ 'আমার
অত পয়সা নেই' বলে, সুবর্ণ সংক্ষেপে
বলেছে, 'তোমায় দিতে হবে না। তাবপর
সুবর্ণ ঈশ্বর জ্ঞানের কাকে দিয়ে দু'খানা
গহনা বিক্রি হবে ফেলেছে।

কে জানে গিরি তাঁতিনী এই কাজে
সহায় হয়েছে কি না। বৌদের তো তাই
বিশ্বাস। নইলে আজকাল এত আসে কেন
ও?

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরাডা - শ্রীনগর - গোহাটী



১৯১৬-২৬শে ডিসেম্বরের সংবাদে বড় হরফে প্রথম প্রকাশ—“Escape of Political Suspect”—“Dullanda House Sensation”, অর্থাৎ “রাজ-নৈতিক সন্দেহভাজনদের অন্তর্ধান—ডালান্ডা হাউসের চাঞ্চল্যকর খবর”। ইংরাজীতে “ডাল্” অর্থে বোকার বোকা, নির্বোধ তথা পাগল ইত্যাদি। ২৪০নং লোয়ার সারকিউলার রোডের বাড়িটি ১৯১৬ সালের আগে আসলে ছিল “পাগলা গারদ” আর তাই তার ইংরাজী নাম “ডালান্ডা হাউস”, তবে আলোচ্য সময়ে উক্ত বাড়ির কিয়দংশে রাখা হোত তখনকার দুর্ধর্ষ বিপ্লবীদের ডি আই অ্যাঙ্কের বলে সন্দেহে গ্রেপ্তার করে, বাদেই সেদিনকার আয়রণ সঙ্কল্প ছিল “জ্যান্ত ধরা দেব না”, আর যারা সেদিন গণে ধরেছিলেন কবির সুরে—

পরাবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দরে,
খসে যাওয়ার ভেসে যাওয়ার
ভাঙবারই আনন্দে।

(৩৬নং কবিভা—গীতাজালি)

এই থেকেই প্রমাণ, রাজশক্তি সেদিন বাংলার বিপ্লবীগোষ্ঠীকে কতখানি আতঙ্কের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন বা দেখতেন। কারণ এই দলের তো কোন অভিমানের কামা ছিল না, আর ভাতের হাড়ি বা নুনের কড়া ধরে চোখ বুজে, মূখে রামনাম বলতে বলতে, তাই নিয়ে পদলিখের সঙ্গে চানচানি করা, আর শেষে বুকের লাথি খেয়ে অহিংসভাবে ছ’ মাস থেকে দু’ বছরের জন্যে জেল থেকে ঘুরে এসে নেভা হওয়ার পরিকল্পনাও তাদের মনে কখনও স্থান পায় নি। তারা তো সেদিন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শের বাস্তব অনুভূতি হৃদয়ে ধরে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশের নিষ্কর মুক্তি-কল্পে। তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে সেদিন কেবলই প্রতিধ্বনিত হোত—

ভয়ান্ রপাদপুতং মস্যন্তে
ঈদং মহাধর্মঃ।
যেষা চ ঈং বহুমতো ভূতা
সস্যাসি লাধবন্।

(গীতা—২।১০৫)

এই মন্ত্রের সরল অর্থ, কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিককল্পিত ব্যাখ্যা নয়।

যাই হোক, খবরের উপরোক্ত শিরোনামার নিচে আরও লেখা ছিল এই মর্মে যে—“পদলিখ এখন দু’টি রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের অনুসন্ধানে তৎপর, যারা

লোয়ার সারকিউলার রোডের ডালান্ডা হাউসে অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন, নাম নলিনী ঘোষ আর প্রবোধ বিশ্বাস।” অন্য আলোচিত ডি এস পি বসন্ত চ্যাটার্জীর সমাধি রচনায় এই নাম দু’টি লক্ষ্য হয়েছে—নলিনীবাবু (ক) বয়স তখন অনধিক দ্বিশ বছর, আর প্রবোধ-বাবু (খ) উনিশ বছর হবে।

১৯১০ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রথম সংগঠক বিপ্লবী পদলিখ-বিহারী দাস ঢাকা বড়লুঙ্গা মামলার

(ক) পিতা জয়চন্দ্র ঘোষ ও মাতা মনোমোহিনী দেবীর গর্ভে নলিনীকান্তের জন্ম হয়েছিল ঢাকার আড়াই হাজার থানার অন্তর্গত ঝাউগড়া গ্রামে। আড়াই হাজার হাই স্কুল থেকে ১৯১০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি তখন গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। বিপ্লবমগ্নে দীক্ষা হয়েছিল তাঁর স্কুলের হেড পিণ্ডিত সত্যীশচন্দ্র কাব্যতীর্থের কাছে, আর সেই-সুত্রেই তাঁর সান্নিধ্যলাভ ঘটে মহারাজ শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তীর স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই।

(খ) যশোহর জেলার কিনাইদা মহ-কুমার (ভাতুড়িয়া) গ্রামে, পিতা রামলাল বিশ্বাস আর মাতা হেমন্তকুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন প্রবোধকুমার ১৮৯৭ সালে। শৈশবেই মাতৃহারা ছেলে প্রবোধ-কুমার দিনাজপুর জেলা স্কুলে পাঠ শেষ করে কলকাতার রিপন কলেজে (বর্তমান সুব্রহ্মনাথ কলেজ) পড়তে আসেন ১৯১৪ সালে। স্কুলে পাঠাভ্যাসের সময়ই অমৃত হাজরা গুরুত্বপূর্ণ হাজরার কাছে তাঁর বিপ্লবমগ্ন দীক্ষা হয়। বসন্ত চ্যাটার্জীর নিধনের সময় তিনি থাকতেন আমহাস্ট রোডে একটি ছোট ঘরে বিপ্লবী মোহিনী ভট্টাচার্যের সঙ্গে, কলেজের ছাত্র হিসেবে।

গ্রেপ্তার হওয়ার পরে উক্ত সমিতির পরি-চালনার ভার নেন বিক্রমপুরের মাখন সেন। ঐ সময়ে এই সংস্থার প্রধান সংগঠক ছিলেন জমিদার প্রভাত সেনের পুত্র নরেন্দ্রমোহন সেন, ভারলেন্স বিভাগের চার্জ ছিলেন ময়মনসিং-এর কিশোরগঞ্জ অধিবাসী মহারাজ শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী, আর সাধারণ সংগঠক হিসেবে ছিলেন উক্ত কিশোরগঞ্জ অধিবাসী রমেশ চৌধুরী আর বিক্রমপুরের উকিল মোহিনী গাঙ্গুলীর পুত্র স্বনামধন্য প্রতুল গাঙ্গুলী। কলকাতার চার্জ ছিলেন রাজা-বাজার বোমার মামলার অমৃত হাজরা, রবীন সেন আর ক্ষিতীশ চ্যাটার্জী। আলোচ্য সময়ে ঢাকা অনুশীলনের বৈশিষ্ট্যকর কাজকর্ম পদলিখ-বন লাভ করে-ছিল। অপরদিকে নলিনীবাবু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তখন ঢাকায় এসে গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন ও ঢাকার বাবুবাড়ারে অবস্থিত জনসন মেডিক্যাল মেসে থাকতে শুরু করেন।

কলকাতা রাজাবাজারের বোমার মামলার আগে অমৃত হাজরার গৃহ খানা-ভগ্নাসীর সময় অনুশীলনের সভাদের একটা সাইফার লিস্ট পদলিখের হস্তগত হয়, আর সেই লিস্টের মাধ্যমে পদলিখ নলিনী ঘোষের খবর পেয়ে ঢাকার পদলিখ বিভাগকে সেটা জানিয়ে দেয়। ঢাকার পদলিখ বিভাগও তদনুযায়ী নলিনীবাবু সম্বন্ধে খুব তৎপর হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় দলীয় নির্দেশে নলিনীবাবুকে চট্টগ্রামে সরে যেতে হয়, সেখানকার সংগঠক চন্দ্রশেখর দে-র আশ্রয়ে। এইভাবেই শুরু হয় নলিনীবাবুর আত্মগোপনের পালা, নিখিলনাথ রায় নাম গ্রহণ করে। ঢাকা বড়লুঙ্গা মামলার রাজসাক্ষী হয়েছিলেন হেমেন্দ্র সেন আর নগেন্দ্র সেন, দুই ভাই। হেমেন্দ্র তখন চট্টগ্রামে ছিলেন। কলকাতা থেকে নলিনীবাবুর ওপরে নির্দেশ যায় হেমেন্দ্রের গতিবিধির ওপরে নজর রাখার জন্যে। নলিনীবাবু তদনুযায়ী তাঁর সহ-কাব্যী যোগেন ভট্টাচার্য ওরফে জ্যোতি মহা-রাজের সহায়তায় সেই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর প্রতুল গাঙ্গুলী চট্টগ্রামে পৌঁছালে—প্রতুলবাবু আর নলিনীবাবু হেমেন্দ্রের ওপরে গুলী ছোঁড়েন। কিন্তু হেমেন্দ্র কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে যান। পদলিখ বিপ্লবীদের নাম জানতে পেয়ে ভাদেব প্রত্যেকের গ্রেপ্তারের জন্যে ২৫,০০০ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করে দেয়। কাজেই উক্ত বিপ্লবীরা তখন সুরে আসেন কুমিল্লা জেলায়। এইবারে

নলিনীবাৰু সিংহৰাজ্যৰ পৰা বাল্যসাহিত্য বিভাগে চৰ্চা নেন। শেষে নগেন্দ্ৰনাথ মল্লিক ওৱাৰে গিৰিজাবাবুৰ গ্ৰেপ্তাৰেৰে পৰে ১৯১৫ সালেৰে জুন মাস বৰাবৰ সময়ত মলিনীবাৰু সমস্ত অনাৰ্জীলৈ সমিতিৰ (পূৰ্ববৰ্ণা শাখাৰ) সৰ্বাধিনায়ক হৈ গৈছে। এই সময়ত তঁৰ পোষাক ছিল খাৰ্চি প্যান্ট, খাৰ্চি কোট, পায়ে বুট, মাথাত হ্যাট—অৰ্থাৎ পুৰোদশতুৰ সৈনিকৰ। এইভাবে তিনি উক্ত সমিতিৰ এলাহাবাদ বিভাগ পৰিদৰ্শনে গিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হন। পৰে তাকে বন্দী অবস্থায় ঢাকায় এনে এক টাইবিউন্যালৰ (ক) সামনে হাজিৰ কৰা হয় বিচাৰেৰে জন্ম। প্ৰমাণ অভাবে উক্ত বিচাৰে তিনি মুক্তি পেলোও কথাত ডি আই আৰ্জী তঁৰ জন্মে অপেক্ষাৰ ছিল। এই আৰ্জীৰ বলে তাকে তৎক্ষণাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাজবন্দী হিচাবে প্ৰথম চালান দেওৱা হয় ঢাকা জেলে। পৰে কলকাতায় এনে ডালালী হাউসেৰ এক নিৰ্জন কক্ষ (solitary cell-এ) আটকে ৰাখা হয়। সংবাদে প্ৰকাশ—“No sooner did Nalini Kanta Ghose came out he was again arrested by the City Superintendent under Rule 12A of the Defence of India Act.” (A. B. Patrika 14.11.16).

অপৰাদিকে ডি এস পি বন্দন চাট্‌জীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে কাক্স সমাপন কৰে

(ক) নলিনীবাৰু বলেন ডি আই আৰ্জী বিচাৰেৰে জন্মে এইটাই হৈছে প্ৰথম টাইবিউন্যাল। - সংবাদেও তৰ আভাস পাওৱা যায়—

“Special Tribunal Case at Dacca—... Consisting of Mr. Smither, D.I., Mr. P. K. Bose, Bar-at-law and Kumar Suresh Chandra Singha, Addl. Magistrate, Dacca sat for the first time today for the purpose of hearing the case against Nalini Kanta Ghose.. the accused was an absconder in a political murder case at Chittagong. After that there was an order of internment against the accused.... The accused escaped and was arrested at Allahabad station last August. He gave his name as Satya Charan Sen...”

(A. B. Patrika—10.11.1916)

ছাৰ প্ৰবোধ বিশ্বাস তখন বৈশ্বকিছদিন নিৰ্বিবাদে আমহাট্‌ ৰোৱা বাসা ছেড়ে ৬০নং মিৰ্জাপুৰ স্ট্ৰীটে অবস্থান কৰে নিজৰ পড়ানুৱাৰ মন দিয়েছিল। এমনই সময় পুলিশ এসে এই স্থান থেকে তাকেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সন্দেহেৰে বশে। পৰে কিড্‌ স্ট্ৰীটে ১৫ দিন আটকে ৰেখে তঁৰ ওপৰে চলে অকথা অত্যাচাৰ। (খ) শেষে কিছুতেই কিছু বলাতে না পেৰে তাকে প্ৰথম পুৰে দেওৱা হয় প্ৰেসিডেন্সি জেলেৰ এক নিৰ্জন কক্ষে। অতঃপৰ তাকে অন্তৰীণ কৰা হয় কেন্দ্ৰগ্ৰাম ইত্যাদি স্থানে। অবশেষে আনা হয় সেই ডালালী হাউসেৰ লক্‌ আপে এক নিৰ্জন কক্ষে। এ যেন—

“পাগল হাওৱা নৃত্যে মাতি

হল আমার সাধেৰ সাধী

অটহাসে ধাম কোথা সে

বাৰণ না মানে।”

(১৯১৫ সালে ৱচিত ০নং কবিতা, গীতাঞ্জলি)।

১৯১৬ সালে ডালালী হাউসেৰ পূৰ্ব পাশে ছিল পুলিশেৰ ট্ৰেনিং স্কুল, আৰু এই বাড়িৰ পশ্চিম দিকে অৰ্ধ চক্ৰকাৰে ছিল অনেকগুলি আলো-বাতাস বন্ধিত কক্ষ তথা ‘সেল’, যেখানে ৰাখা হোত পুলিশেৰ চোখে যাৱা ভীষণ প্ৰকৃতিৰ বলে বোধ হোত তাৰেই আটকে, চান্দৰ-ঘণ্টাই ক্ৰমান্বয়ে তালাবন্ধ কৰে। তৰে তাৰেই মধ্য পুলিশেৰ দৃষ্টিতে ৰাৱা হতেন কাম সাংঘাতিক প্ৰকৃতিৰ অথবা পুলিশেৰ কাছে ৰাৱা স্বীকাৰোক্তি কৰতেন, তাৱা ৰূৰে-বাইৰে আৰু সামনেৰে ‘লেন’ ঘোৱাফেৰা কৰবাৰ সুযোগ পেতেন। কিছুসংখ্যক পুলিশ অবশ্য তাৰে ওপৰে পাহাৰা দেবাৰ জন্মে নিয়ন্ত্ৰিত থাকত। আৰু চান্দৰ ঘণ্টাই আবদ্ধ কৰেদীৰে প্ৰত্যেক সেলেৰ সামনে একজন কৰে সৈন্য নিযুক্ত ছিল। এইভাবে চান্দৰ ঘণ্টা আবদ্ধ কৰেদীৰে মধ্য নলিনী বোধ ও প্ৰবোধ বিশ্বাস অন্যতম।

ডালালী হাউসেৰ আবাসিক ভাৱপ্ৰাপ্ত অফিসাৰ (Residential-in-charge) ছিলেন এডোয়ৰ্ড সাহেব, একজন অবসরপ্ৰাপ্ত সৈনিক, পৰে পুলিশেৰ আৰ্মড্‌

(খ) যেমন টেবিলেৰ ওপৰ উলঙ্গ অবস্থায় উপড় কৰে শূইয়ে, দু-তিন জনৰ তাকে চেপে ধৰতো, আৰু তাৰপৰে চলতো তঁৰ ওপৰে সৰু বেতেৰে আঘাত মহম্মদ ৰুৱেল বাড়ি মাখে মাখে, আৰো অন্যান্য জঘন্য অত্যাচাৰ ঘণ্টাৰ পৰা ঘণ্টা ধৰে, স্বীকাৰোক্তি আদাৰেৰে জন্মে। (প্ৰবোধবাবুৰ মূখৰ কথা)।

ফোৰেৰে ইন্সপেক্টৰ আৰু ডালালীৰ অবস্থিত পুলিশ শক্তিৰ অধিনায়ক। ৰাজবন্দীৰে ওপৰ লক্ষ্য ৰাখাই ছিল তঁৰ প্ৰধান কাজ। তা’ ছাড়া এ কাজে স্পেশাল ৱাষ্টেৰ ডেপুটি কমিশনাৰ ‘মিস্টাৰ শ’ ছিলেন পুলিশ-ট্ৰেনিং স্কুল ও ডালালী হাউসেৰ ৰাজবন্দীৰে সৰ্বমুখ কৰ্তা।

ডালালী হাউসেৰ মেন গেট ছিল লোয়াৰ সাৰিকউল্লাৰ ৰোডেৰ পাশে। ফটক পাহাৰায় সকল সময় নিযুক্ত থাকত দুজন সশস্ত্ৰ পাহাৰা আৰু ফটকেৰে ভেতৰে ছিল ৱিজাৰ্ড আৰ্মড্‌ পুলিশেৰ তবি। এই সময় একদিন বাংলা সরকারেৰে পলিটিক্যাল সেক্ৰেটাৰী মিস্টাৰ জে, জি, কামিং আৰু ডেপুটি কমিশনাৰ মিস্টাৰ শ সেলেৰ সামনে এসে নলিনীবাৰুকে জিজ্ঞাসা কৰেন যে তিনি কেমন আছেন ইত্যাদি। নলিনীবাৰু বলেন—চান্দৰ ঘণ্টাই লক-আপে থাকোৱা জন্মে স্বাস্থ্য তঁৰ ভেঙে পড়েছে। উত্তৰে কামিং সাহেব মন্তব্য কৰেন—“You are kept how you ought to be kept”—তোমাকে যেমনভাবে ৰাখা দৰকাৰ সেইভাবেই ৰাখা হৈছে।

অতঃপৰ নলিনীবাৰু বলেন যে—আইনভঙ্গকাৰী হিচাবে তাকে বিনা বিচাৰে বন্দী কৰা হৈছে। ফাঁসীৰ হুকুমপ্ৰাপ্ত কৰেদীৰে জন্মেও জেল মান্দ-ৱালে সকাল-বিকেল আৰু ঘণ্টা কৰে বেড়াবাৰ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাঁৰা সেই সুযোগ থেকেও বন্ধিত। এইভাবে বলতে বলতে তিনি একটু উত্তেজিতভাবেই বলে ওঠেন—“অৰ্জী হৈছে আমাদেৰ ডালালী হাউসেৰ আওতাৰ আটকে ৰাখাৰ জন্মে, তা’ সত্ত্বেও আমাদেৰ সেলেৰ মধ্য চান্দৰ ঘণ্টাই বন্ধ কৰে ৰাখা হয় কেন?” এই সমস্ত যুক্তিপূৰ্ণ কথোপকথনে কামিং সাহেবেৰে মনটা হয়তো একটু নরম হৈছে আসে আৰু তিনি শেষে মিস্টাৰ শ-কে বলে যান যে সেলে আটকে বন্দীৰেৰে জন্মেও সকাল-বিকলে প্ৰহৰাধীনে সেলেৰ সামনেৰে বড়-বাৱান্দায় একটু চলে বেড়াবাৰ ব্যবস্থা কৰতে।

তিনি বেড়াতে বেড়াতে প্ৰত্যহই পালাবাৰ স্কীমেৰে কথা ভাবতে থাকেন। বন্ধু ধীৰেন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী(ক) তখন ডালালী আটকে ছিলেন, তৰে কতৃপক্ষৰে তঁৰ ওপৰ

(ক) “কুমিল্লাৰ ধীৰেন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী” ওৱাৰে ৱাৰি ও প্ৰবোধ সেন বাইৰে ঘোৱাফেৰা কৰাৰ সুবিধে পেৰেছিল। এইৰূপে আৰো অনেক ছিল, তাঁৰে নাম সঠিক মনে নাই। ধীৰেন্দ্ৰ ওৱাৰে ৱাৰি ছিল বিশ্বাসী লোক। (নলিনী বোধ)।

হারণা ছিল অল্প বিপজ্জনক বন্দী হিসেবে। বেড়াবার সময় নলিনীবাবু একদিন বন্ধু ধীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে প্রস্তাব করেন, বাইরে থেকে তাকে ১০টি টাকা আনিয়ে দিতে চেষ্টা করার জন্যে। পাহারাদার পুলিশের মধ্যে একজনের সঙ্গে ধীরেন্দ্রবাবুর বেশ আলাপ জমিছিল। ঐ সেপাইটির ভেতরের মানুষটা তখন ধীরেন্দ্রের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে। ধীরেন্দ্র সেই সুযোগে আশ্বীরের বাসায় তারই মাধ্যমে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চালাচ্ছিলেন। বিনিময়ে পুলিশ কনস্টেবলটিও কিছু লাভবান হতো। এই বোম্ব ছয় পৃথিবীর ধর্ম।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা
ভাবয়ন্তু যঃ।
পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ প্রেরঃ
পরমবাপ্ স্যাম্॥
(গীতা—৩।১১)।

এই সুত্র অনুসারেই সেই সেপাইরূপ দেবতার মাধ্যমে, আর ধীরেন্দ্রনাথের দেবত্বের ভেতর দিয়ে নলিনীবাবু তাঁর ব্যক্তি ১০টি টাকা কোনক্রমে সংগ্রহ করে নিজের খাতি প্যাণ্টের পকেটে রেখে দেন স্বয়ং করে, ভবিষ্যতের তাগিদে জন্মে। ইতিমধ্যে ফটক নিষ্পত্তি পাহারাদারের কর্তব্যপারায়ণতাও বেশ করে লক্ষ্য করতে থাকেন নলিনীবাবু দূরে বেড়াতে বেড়াতে। তিনি দেখেন, পুলিশ-ট্রেনিং স্কুলের অফিসাররা বাইরে যাবার সময় “ফটক খোল” বললেই পাহারাদার সেপাইটি ফটক খুলে দিয়ে বন্দুকের সেলাম দিত। আবার ঐ ফটকে নিষ্পত্তি পাহারাদারদের সঙ্গে বন্দীমহলের কোন চেনা-পরিচয় ছিল না, কারণ তারা থাকতো অনেক দূরে, আর তাদের কাজ ছিল ফটক পাহারা দেওয়া মাত্র। সরকারী ইন্টেলিজেন্স ট্রাফের সঙ্গে সংযুক্ত তখনকার ডালান্ডা হাউসের পরিচালকেরা হয়তো সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, যে তাঁদের অপেক্ষা অনেক প্রথমবৃদ্ধি ছিলেন ঐ বাংলা দেশের তখনকার বেপারোয়া বিপ্লবীর দল। ডালান্ডা হাউসের বারান্দায় আধ ঘণ্টা কবে বেড়াবাব সময় কতৃপক্ষের পাহারা সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনার এই ফাঁক-টুকুও নলিনীবাবুর দৃষ্টি এড়ায় নি। অতঃপর পূর্বোক্ত প্রস্তুতি চিন্তা ও কাজের স্ফারায় শেষ করে নিয়ে সম্মুখ দিকে বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে, প্রহরীরা যখন বাবান্দার এক প্রান্তে ধাঁড়িয়ে জটলা করছিল, তিনি তখন অপর

প্রান্তে পৌঁছে দেখেন প্রবোধ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছেন। কোন প্রেরণায় বলা কঠিন, নলিনীবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রিয় ভাই প্রবোধকুমারকে বলে ওঠেন—“বাইরে যাবে তো চল”। নলিনীবাবুর মনের কথা প্রথমটাতে প্রবোধকুমার বুঝে উঠতে অসমর্থ হন, খতমত খেয়ে যান, কারণ নলিনীবাবুর সন্ধান তথা মনের কথা তিনি আগে জানতেন না। নলিনীবাবুও সেটা পূর্বাহ্নে—কারো কাছেই প্রকাশ করেন নি। মন্ত্রগদ্যস্তির অভুলনীয় দৃষ্টান্তই বটে।

প্রবোধকুমার নেতার মূখের দিকে অপ্রতিভ অবস্থায় তাকিয়ে থাকেন। নলিনীবাবু অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন, তখন সকল কথা খুলে বলার তাঁর সময় কোথায়। নেতা আবার বলেন—“যেতে হয়তো চল, এক মূহুর্তও দেরি চলবে না, আমি চললাম।” বলতে বলতে নলিনীবাবু আগিয়ে যান ফটকের দিকে আপন মনে, মিলিটারী কায়দায়। প্রবোধ-কুমারও আসল বিষয় হয়তো একটা আন্দাজ করে নেন মনে মনে, আর মস্তের গতি চলতে থাকেন নলিনীকান্তকে অনুসরণ করে। এইভাবে খাতি কোর্ট-প্যান্ট বৃট ইত্যাদি পরিহিত সৈনিকের সাজে তিনি যখন ফটকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কে তাঁকে বলবে চম্পশ ঘণ্টা সেলে আটক একজন রাজবন্দী যাচ্ছেন, না ডালান্ডা হাউসেরই কোন মিলিটারী অফিসার চলেছেন। প্রবোধ-কুমারের পরিধানে কিছু ছিল মতি-পাজাবি-চিটি, আর গায়ে জড়ান ছিল একটি চাদর। কাজেই তখনকার যে সেট আপ বা দৃশ্য সেটা স্বভাবতই হয়ে উঠেছিল অনেকটা যেন—উক্ত সংস্থার কোন সাহেব চলেছেন আগে আগে, আর তাঁরই পি়য়ন তথা প্রবোধ বিশ্বাস সেই সাহেবকে অনুসরণ করছেন। সাদাসিধা মন পাহারাদারদের এ-ছাড়া আর কিছু বুঝবার উপায় ছিল না।

এইভাবে সেদিনকার ডালান্ডা হাউসের রক্তমাংসে সাহেব-সাজা নলিনী ঘোষ গট-মট কবে মেন্ গেটের কাছে হাজির হয়ে বলে ওঠেন—“ফটক খোল”। সেন্সিও অমনি হকচকিয়ে গিয়ে, নলিনীবাবুকে কোন পুলিশ অফিসার আর প্রবোধবাবুকে তাঁর পি়য়ন গোছের কিছু ভেবে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফটক খুলে দিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুকের কায়দায় সেলাম জানায়। বিপ্লবী দুটিও গম্ভীরভাবে ফটক পার হয়ে রাজপথে বেরিয়ে আসেন, বহুদিন

পরে মৃত আলো-হাওয়ার একটা আশ্বাস নিতে। আমাদের দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এটা যে এক অভিনব প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি সে বিষয়ে আর সন্দেহ কেবা। ধন্য নলিনীকান্তের অটল আত্মবিশ্বাস। আলোচনা প্রসঙ্গে মনে হয় তিনি সেদিন যেন তুলসী দাসের দৌহাকেই সক্রিয় রূপ দিয়েছিলেন—

“বোলকে মোল্ নেহি,
যো কহনে জানে বোল্।
জদঙ্গ তরাজ্, তোল্কে,
ত’হু বোলকে খোল”॥ ১৩॥

অর্থাৎ পরিস্থিতি বিবেচনা করে, অপরের মনোভাব বুঝে, ঠিক ঠিক শব্দ উচ্চারণ করতে পারলে তার শক্তি হয় অপারিসীম। বাই হোক, তারপরেই সূর্য হয় সেই বিপ্লবীরাগলের অক্লান্ত পদযাত্রা। সেদিন ছিল রেস-ডে। বোড়-দোড় সব শেষ হয়েছে, চারিদিক লোকে লোকাংগ —কেবল দিগ্বিদিকে ছোটোছোটো, হুড়া-হুড়ি। তাঁরাও সেই জনশ্রোতে মিশে গিয়ে পাড়ি জমিয়ে দেন চৌরঙ্গী রোডে

সালফার গায়েরমাখা সাবান



দ্রবক চর্মরোগে বিশেষ উপকারী।
সেজন্য এই সাবান নিত্য ব্যবহারে।
বিশেষতঃ গরমের দিনে, খোয়া
কোড়া, চুলকানি, বামাচি প্রভৃতি
চর্মরোগ নিবারণ করে।

বেতহলেন বৈজ্ঞানিক ব্যাংক

ধরে ধর্মতলার দিকে।(ক) এদিকে পুলিশের চোখে সেই ভীষণ-চরিত্র বিপ্লবীদের পালাবার খবর তখন লাল-সাজারে পৌঁছে গেছে। বিপ্লবীরা চলতে চলতে লক্ষ্য করেন, কয়েকটি আর্মার্ড-কার ছুটিছিল চৌরঙ্গী বোডের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। অপরদিকে তাঁদের সামনে তখন প্রধান সমস্যা—এবার যাবেন কোথায়। সেই সময় গ্রেস্‌তারের হিড়িকে দলীয় সংগঠন প্রায় ভেঙে পড়েছিল—বহু লোক বন্দী হয়েছিলেন। কাজেই বাইবে কে কোথায় থাকেন কিছুই তাঁদের জানা ছিল না। এইভাবে হাটতে হাটতে তাঁরা প্রথমে পৌঁছান বাদুড়বাগানে অবস্থিত সেদিনকার বিদ্যাসাগর কলেজের এক ছাত্রাবাসে, নলিনীবাবুর এক বন্ধু ভূপতি-কিশোর রায়ের(খ) আশ্রয়ে। অতঃপর

(ক) এই সম্পর্কে যে পুলিশ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল সেটাও এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

“Police Notification—On the occasion of all future Race Meetings the conveyances of Members only will be permitted to approach the Royal Calcutta Turf Club's Gates along the Lower Circular Road from West to East. All other conveyances approaching from the West will be directed along the Kidderpore Road and round the North of the Race Course.

Calcutta the 5th Dec. 1916

Sd. J. G. Wilson

Dy. Commissioner of Police.”

(A. B. Patrika, 9.12.1916).

“পুলিশ বিজ্ঞপ্তি—ভবিষ্যতে সমস্ত রেস মিটিং উপলক্ষে সভ্যদের আসা-যাওয়া কলকাতা বরাল টার্ম্‌ ক্লাবের লোয়ার সাউথইউলার বোডের ফটকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নির্বাহিত হবে। আর পশ্চিম দিক থেকে যে সকল গমনাগমন তার সমস্তই খিদিবপুর রোড ধরে রেস কোর্সের উত্তর সীমা পৰিভ্রমণ কবে পরিচালিত হবে।

শনিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৬

স্বাঃ জে জি উইলসন

ডেঃ কমিশনার অফ পুলিশ।”

(খ) ঢাকা জেলার নাবায়গঞ্জ মহকমার, অধুনা আড়াই হাজার থানার অধীনে আড়াই হাজার গ্রামের অধিবাসী শ্রীভূপতিকিশোর ওরফে কালুবাবু। তিনি

ভূপতিবাবুর সাহায্যে অনতিবিলম্বে তাঁদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়ে যায় তখনকার মত। তাঁরা তৎক্ষণাৎ পোষাক-পরিচ্ছদ সব বদলে ফেলেন এবং একটি হারিকেন সংগ্রহ করে সেই সহদয় বন্ধুর কাছে বিদায় নেন। তারপরে কনওয়ালিশ স্ট্রীটে পৌঁছে (বর্তমান বিধান সরণী) তাঁরা একটি ট্যাক্সি ভাড়া করেন। পূর্ব-পরিচয় জামা-কাপড়গুলি আগেই তাঁরা পুটলি বোঁধে একটি খানার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। ঐ ট্যাক্সির সাহায্যে তাঁরা এবার টালার বাজারের কাছে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন, আর তখনকার সম্বল হারিকেনটি জুড়ালিয়ে নিয়ে পবনজে পৌঁছান গিয়ে বেলঘরিয়া স্টেশনে। তারপরে একটি করে রেলের টিকিট কেটে তাঁরা যখন কাকিনাড়ার পৌঁছান গিয়ে, রাত তখন প্রায় ৯টা হবে। তিন-চার ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এইবারে তাঁরা ক্ষমিবস্তির প্রয়োজনবোধে একটি খাবারের দোকানে বসে কিছু আহার করে, আবার চলতে থাকেন গঙ্গার তীরের দিকে। তাঁদের লক্ষ্য তখন—সেদিনকার বিপ্লবীদের জন্যে, মত-দলনির্বিষেবে একমাত্র আশ্রয় ও বিশ্রামভূমি, চন্দননগর। রাত বেড়েই চলেছে, নৌকা একটি জোগাড় হয়, কিন্তু রাত্রি ৯টার পরে খেয়া পার করতে মাঝি হয় নারাজ।

মাঝি বলে রাতটা নৌকায় কাটিয়ে নিতে, ভোর হলেই তো সে খেয়া পার করে দেবে, মজুরি লাগবে দু' আনা। বিপ্লবীরা গুলের মজুরি কামনাও প্রগাঢ় আকুতিতে একটা আশার আলোর বাস্তব স্পর্শ ও প্রথম অনুভূতি হয় এইভাবে সেদিন গভীর রাতে গঙ্গার বুকে। কোনক্রমে রাতটা কাটিয়ে পবের দিন ভোরের আমেজে নলিনীকান্ত ও প্রবোধকুমার শেষে হাজির হন চন্দননগরে গিয়ে আচার্য মতিলাল রায়ের আশ্রয়ে।

বহুদিন পবে অপ্রত্যাশিতভাবে দুটি হারা মাণিক ফিরে পেয়ে আশ্চর্য বিহবল হয়ে পড়েন আচার্য মতিলাল, আর আনন্দাশ্রুবিগলিত চোখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন একবার নলিনীকান্তকে, পবের বার প্রবোধকুমারকে। আনন্দ করে নিরে যান বাড়ির ভেতরে, তাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কবে দেন সন্মত। তাবপবে সন্ধ্যার আগমে প্রবর্তক সঙ্ঘের

তখন বিদ্যাসাগর হোস্টেলে থাকতেন—নলিনীবাবুর বাল্যের সহপাঠী, অনুশীলন দলেব সভ্য। তবে কলকাতার সংগঠনের কেউই তাঁকে চিনতেন না। সেই কাবণেই এই আশ্রয়টি তাঁদের নিরাপদ মনে হয়েছিল। (নলিনী বোষ)।

কথেকজন বিশিষ্ট সভ্যকে নিবে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানানাব “ব আয়োজন কবেন এক প্রার্থনা সভার।” ভাবেই তিন-চার দিন কেটে যায় তাঁরা আচার্যের বাড়িতেই অফুরন্ত আশ্রয়-আপায়ন গ্রহণ করতে কবতে। সেই সময়ে চন্দননগরে বিপ্লবীদের আশ্রয়গণ নব জনো একাধিক আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা হয়েছিল মতিলাল রায়ের সৌজনে। অবশেষে নলিনীবাবু আর প্রবোধবাবুকে নিয়ে যাওয়া হয় তাবই মধ্যে একটি বিশিষ্ট আশ্রয় কেন্দ্র। এই সময়ে যুগান্তরের অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, সত্য চক্রবর্তী, অমর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীরা চন্দননগরে আশ্রয়গোপন করে ছিলেন। তাই মনে হয় অদ্ভুতই যুগ দিয়েছিল যেন আবাব একটি সর্বদল সমন্বয়ের ব্যবস্থা। সুব্দ হযেছিল তাঁরা মধ্যে তখনকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে আন্তরিক ব্যথার আদান-প্রদান, আর চলতে থাকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্যে অগ্নিগর্ভ গ্লান্য অস্ত্র আমদানি সম্পর্কীয় হতাশা, বিরক্তি, দেশভরা কষ্টকালের অবমাননা, গুমরানি, আব ইংবেজের আত্মসমর্পণ ক্ষত হৃৎকার, সবাগুলি একসঙ্গে মিলে ঐ আশ্রয়গোপনকারী বিপ্লবীদের পর্ব-চেষ্টার বাথ্যাব তীব্রতাকে সোঁদর কেবলই উদ্বেলিত কবতে সুব্দ করেছিল। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের দলগত মতবাদ সেদিন অনেকটা কমে আসে। যুগান্তর ও অনুশীলনের সভ্যবা বিভিন্ন বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করার জন্যে প্রতিশ্রুত হন। এই সময়েই বিহারে অবস্থানকারী নলিনী বাগচী, আর আসামে প্রেরিত নর্বেন ব্যানার্জী, নলিনীবাবুর নির্দেশে ঐ সকল অঞ্চলেও কতকগুলি সুসজ্জিত আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করার সচেষ্ট হন। কারণ ঐ সকল অঞ্চলে পুলিশের নজর তখন কম ছিল। এইভাবেই তিন-চার মাস কেটে যায় তাঁদের ক্ষমাহীন নীতির আলোচনা আর সমালোচনা, একটি ডুবন্ত নৌকাকে রক্ষা করে, তুফান ঠেলে পারে নেবাব উপায় উদ্ভাবনের তাগিদে।

১৯১৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস বরাবর সুব্দ হযে ক্ষয় পুলিশের থানা-তল্লাসীবা হিড়িক, এইভাবে চন্দননগর অঞ্চলে। তবে এখানেও ছিল বিশ্বাস-ঘাতকতাব এক কলঙ্কময় অধ্যায়, আর সেই সঙ্গে লোভের উলঙ্গ তাড়না। এবা যেন ছিল পরাকালে মার্কণ্ডেয় পূরণে বর্ণিত রক্তবীজের দল। চন্দননগরে অবস্থিত যুগান্তর ও অনুশীলন দলেব অধিকাংশ আশ্রয় কেন্দ্রই অক্লান্ত হয়। অনুরূপ অবস্থাতেই এক গভীর রাতের অস্পষ্ট

আলোচনার ভেতর দিয়ে তাঁদের নজর পড়ে, দু'খানা লণ্ড এসে নদীর তীরে ভিড়বার ব্যবস্থা করছে। (ক) তারপরেই তাঁদের লক্ষ্য হয় টেগার্ট, ডেনহাম, ফেরার ওয়েদার, লোম্যান প্রমুখ ডেপুটি কমিশনাররা একে একে লণ্ড থেকে নেমে প্রবেশ করেন চন্দননগরের পলিশ হেড অফিসে, আর একটি বিরাট সশস্ত্র পলিশ ঘাইনী বাইরে এসে অপেক্ষারত থাকে হুকুমের প্রতীক্ষায়। বিপ্লবীদের দলীয় পাহারাদার সাইকেলে এসে এই একই থর পরবেশন করায় তাঁদের আশঙ্ক দৃঢ় হয়ে যায়। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরাও তৎক্ষণাৎ রাতের অন্ধকারে নিজেরদের আশ্রয় গৃহ ত্যাগ করে গভীর পথে বার হয়ে যান চন্দননগরের ফরাসী এলাকার বাইরে, আর দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন পলিশের হতাশাবিহীন খানা-ডল্লাসীর উদ্ভাস নৃত্য। এইভাবে তাঁরা দিনের বেলাটা ফরাসী এলাকার বাইরে কাটিয়ে, সন্ধ্যার পরে আবার ঋণাত্মক ফিরে আসেন। কারণ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত তখন চন্দননগরে রাজ-নৈতিক কারণে খানাতল্লাসীর বা প্রেস্তার করার আইন ছিল না। এবারে তাঁরা আবার লোক পাঠান মতিলাল রায়ের কাছে, সাহায্য ও পরামর্শের জন্যে। কিন্তু তাঁর বাড়িতেও সেদিন খানাতল্লাসী হয়েছিল। স্বভাবতই তিনি তাঁর সেই সময়কার অক্ষমতার কথা বিপ্লবীদের জানিয়ে দেন।

(ক) "Once again on Friday last, 4-houses were searched in Chandannagore. On Thursday night a steam launch from Calcutta anchored before the 'quay' on the Strand Road and long before it was drawn, several Indian and European C.I.D. Officers headed by Mr. Tegart proceeded to the several houses they meant to search... No arrest made." (A. B. Patrika, 5-12-1916). "গত শুক্রবারে আবার চন্দননগরে চারটি গৃহে খানাতল্লাসী হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবারের রাতে কলকাতা থেকে একটি স্টীম লণ্ড এসে স্ট্রান্ড রোডের ওপরে অবস্থিত জেটিতে নগ্নাব কবে এবং সেটি জেটিতে ভিড়বার আগেই মিস্টার টেগার্টের দ্বারায় পরিচালিত বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান গোয়েন্দার দল খানাতল্লাসীর জন্যে নির্ধারিত একাধিক গৃহের দিকে এগোতে থাকে.....কোন প্রেস্তার হয় নি।"

আত্মগোপনকারীদের অবস্থা আরো সংগীন হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে অটল সেদিনকার বিপ্লবীগোষ্ঠীর মনে তখনও সেই বেদমস্তুর প্রতিধ্বনি চলছিল একই সুরে—

পুষ্পকর্ষে স্বয়ং সূর্য্য প্রজ্ঞাপত্য
বাহু রক্ষ্মান্।
সমূহ ভেজো স্বপ্নে রূপে কল্যাণভরম
ভস্মে পশ্যামি।
স্বাস্থ্যবানো পুরুষ সোহহমস্মি ॥
(ঈশোপনিষৎ—মন্দ ১৬)।

অর্থাৎ "হে পুত্র, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিঃস্বপ্ন, প্রজ্ঞাপতিতনয়, হে সূর্য, আপনি কিরণ সংবরণ করুন, ভেজ উপসংহার করুন, আপনীর কল্যাণভরম রূপ আমাদের দেখতে দিন। আমরাও তো সেই আদিত্যমন্ডলেই অবস্থান করি, তা হতে আগবাও যে অভিমুখ।" ব্যবস্থা হয়ে যায়। কলকাতার এম-এসসি ক্রাসের ছাত্র নটবর দাস নামে চন্দননগরের অধিবাসী প্রবর্তক সঙ্ঘের এক সভ্য ছিলেন। সেই সময় প্রবর্তক সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর মনো-মালিন্য চলছিল। চন্দননগরে সেই ব্যাপক খানা-ডল্লাসীর ঝড়ের মধ্যেও সেদিন কিছু এগিয়ে এসেছিলেন এই তেজস্বী পুরুষ নটবর দাস—সংগঠনের আব অনশীলনেব প্রায় ত্রিশজন আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে। নটবরবাবু সহজে তাঁদের নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের গৃহে, বালিস্ত সমস্ত বিপদের কথা ভাল-ভাবে অবহিত করে। একটা অভিশপ্ত, নিগৃহীত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত জাতির মজিকম্পে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, সর্বত্যাগী এই বিপ্লবীর প্রতি প্রশ্রম্য নটবর দাসের এই সৌজন্য প্রকাশ, আত্মকের বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার লক্ষ্যপাতার আমরা এখন সমস্ত্রমে স্মরণ করি। (খ) তাঁর উদ্দেশ্য বিনীতভাবে মার্জনা প্রার্থনা করি এই বলে—

(খ) প্রেমের প্রবোধকুমার বিশ্বাসও বলেন—"আমরা সকলে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেছিলাম শ্রীমটবর দাসের বাড়িতে, দোতলার একটি বড় ঘরে। পরে একে একে যে যেখানে সম্ভব চলে যাবাব ব্যস্ততা করা হয়েছিল। আমি (তখন প্রবোধ-বাবু) এবং অমর চ্যাটার্জী সর্বশেষ এই গৃহ ত্যাগ করি ও পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। নটবরবাবুর সৌজন্যপূর্ণ আতিথেয়তার কথা মনে হলো আজও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।"

(৬-১২-৬৪ তারিখে শোনা)।

*ভোর-ভোর সময় গঙ্গার ঘাটে একটা

"তোমার গিয়েছিনু ভুলে।
ভূমি যে নিয়েছ বাসা জীবনে মূলে
তাই ভুলে।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে বি ফুল।
ভুলি নে কি তারা।
ভব ও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সদৃশ
ভুলের শূন্যতা মাঝে
ভরি দেয় সদৃশ।
(৬নং কবিতা—বলাকা, ওরা হারিতক, ১০২১)।

লণ্ড এল। তাতে টেগার্টকে চেনা গেল। আমরা.....বেরিয়ে পড়লাম। সারাদিন গেল।.....এরপর...সোদলপাড়ায় নিরাপদ-বাবুর খোঁজ করলাম। সেইখানে আমাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার লোক খোঁজাম। সে পৌঁছে দিল নটবরবাবুর বাড়িতে। (বিপ্লবের স্মৃতি—ডাঃ যাদুগোপাল মজুমদার, পৃ ৪০৪—৪০৫)।

আত্ম-জীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
মৃত্যু—দুই টাকা
"এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া নাভালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন"—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী
"একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কর্মী সচরাচর দেখা হয় না। কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী মনোহর সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।"

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীমদ গোবিন্দী বিচারিত

নিদ্রা-মাল্য

। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকাসহ ।
শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-জীবার স্বরূপ প্রকাশ কবিবার জন্যই শ্রীমদ গোবিন্দী দ্বারা শ্রীবিদ্য-মাধব নাটক রচনা করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"মধুর প্রসন্ন হৃদয় কাব্য সাজাবার।
এছে কবিতা বিনা নহে রসের প্রচর।"

মূল্য : তিন টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

ঐশ্বর্য মেলা

দেহলি প্রান্তে—শ্রীবিকরজন ভট্টাচার্য। এ. মৃধাজী আন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বর্ষিক চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : সাড়ে আট টাকা।

দেহলি প্রান্তের সঙ্গে পঠকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সাপ্তাহিক বসুমতীতে দেহলি প্রান্তের রচনাসমিতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

একালে দেশের লোকের এক চোখ যেমন স্ব-রাজ্যের প্রতি, তেমনি আর এক চোখ দিল্লীর দিকে প্রসারিত। রাজনীতির সব কিছুই রাজধানীকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হচ্ছে। সেই রাজধানীর সুন্দর অতীত থেকে একালের কথা যিনি রম্য-রচনার রীতিতে লিপিবদ্ধ করে শুনিয়েছেন তিনি বিবেকরজন ভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্য দিল্লীতেই থাকেন, সুতরাং দিল্লীর নাড়ী-নক্ষত্রের সঙ্গে তার এক হৃদয় যোগাযোগ অনস্বীকার্য। আর একদিকে তিনি ইতিহাস-চেতন হওয়ার ইতিহাস-মুখর দিল্লীকে তিনি উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন। অবশ্য দিল্লীর ইতিহাস শুধুমাত্র রাজনীতির ইতিহাসেই সম্পূর্ণ নয়, শিল্পকলা সংগীত—সব কিছু নিয়েই রাজধানী দিল্লী। তবে 'দেহলি প্রান্তে' গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, দিল্লী প্রবাসী বাঙালীদের কৃতিত্বও এতে সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এতদসঙ্গেও বলা প্রয়োজন যে, গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দানের জন্যে একটি পরিকল্পনা শ্রীভট্টাচার্যকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই কারণে প্রথমেই পাই—কিভাবে রাজ্য ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে ইন্দ্র-প্রস্থের পর গড়ে উঠল সুবকুন্ড। আজমীরের বাকপুত্র বিগ্রহবাজ দখল করলেন দিল্লীর সিংহাসন। আর দিল্লীর ইতিহাসে পৃথ্বীরাজের পবাক্য। যেখানে এসেছিল পাণ্ডব। রাজপুত্র, দাস, পাঠান, মোগল সেখানে এলো ইংবেজ বাকদন্ড নিয়ে। সেই রাজদন্ডও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। স্বাধীন ভারতে নয়াদিল্লী হোল নবজীবনে মূর্খরিত। সেই দিল্লীই সঙ্গে বাংলা-দেশের সম্পর্ক গভীরভাবে গড়ে উঠলেও—মিলনগ্রন্থি তো আমরা খসরু, বগরা খাঁ সন্ন্যাসী জাহাঙ্গীর সেই কবে বেঁচে

গেছেন। তবে একালে সেখানে অনু-স্থিত হয় স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসব। এই উৎসবে দিল্লীর প্রাণ যেন আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে মিলনোৎসব ঘটে সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের। সেই সঙ্গে সারা ভারতের জীবন-প্রবাহ যেন রাজধানী দিল্লীতে অনুভব করা সম্ভব হয়।

অবশ্য শ্রীভট্টাচার্য মনোরম ভাণ্ডারে নিউ দিল্লীর নতুন কলোনির জীবন-পরিচয় দিয়েছেন। আবার তার পাশে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে দেশ-বিদেশের ডিপ্লোম্যাটদের বাসস্থান চাকপদুরী। দিল্লীর সাইকেল-খাটীরাও শ্রীভট্টাচার্যের দৃষ্টি এড়ান নি। নয়াদিল্লীতে বাঙালীর সংখ্যা ৪০ হাজার। আর এঁদের প্রাণকেন্দ্র হোল নয়াদিল্লীর কালীবাড়ি। কালীবাড়ির সঙ্গে যার যোগ নেই সে বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গেও যোগাযোগ শূন্য। আর সংস্কৃতি-বান বাঙালীরা কিভাবে নয়াদিল্লীতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে সে কথা শ্রীভট্টাচার্য চমৎকার ফুটিয়েছেন। ফলে, যাবা উত্তর-সাধক তারা অনুপ্রাণিত হবে, বাংলা দেশের বাঙালীরা সুখী হবে।

'দেহলি প্রান্তে' পড়তে পড়তে যা আমাদের মুগ্ধ করে তা হচ্ছে দার্শনিকের কাহিনী, গালীব সাহেবের কবর প্রসঙ্গে তার কবিতার অনুবাদসহ উদ্ধৃতি। অপূর্ব এই সব কবিতা। এ কথাও ঠিক—দিল্লী হচ্ছে 'এ সিটি অব টেম্পস'। কিন্তু এই সব কবরের তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করেছেন শ্রীভট্টাচার্য। তাই কবর শুধু কবর নয়। কবরেই শব্দ শায়িত হয় নি রাজ্য। কবরস্থ হয়েছে গণতান্ত্রিক ভারতে রাজত্বের ঔষ্মতা।

'দেহলি প্রান্তে' গ্রন্থটিতে সেই সব কৃতী বাঙালীদের পরিচয় আমরা পাই—বারী স্বগোরবে উজ্জ্বল করেছেন বাঙালীদের মুখ। এঁদের অনেক কথাই আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল, এঁদের অসাধারণ মহিমা সাধারণের কাছে নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গ্রন্থটিতে বহু ঘটনার সমাবেশ আছে, এমন কি সমসাময়িক ঘটনাও স্থান-চ্যুত হয় নি—জয় রচনার কৌশল এমনই

যে, কোথাও ধারাবাহিকতা কম হয় নি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটও চিত্তাকর্ষক।

যুগে যুগে ভারতশিল্প—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। পরিবেশক : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ-৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য : সাত টাকা মাত্র।

শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী কিশোর-মনে ভারতের শিল্প-সম্পদ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে উপরি উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আমরা প্রাইই ভাবত-সংহতির কথা বলে থাকি। কিন্তু ভারত-সংহতির জন্যে ভারতের শিল্পগুরুলি যে আমাদের নতুন পথ দেখাতে পারে একথা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই। ইহতো প্রোপাগান্ডার স্থূল রুচির কারণে একালে সুক্ষ্ম রুচির আর স্থান নেই। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে মহাভারত রচনাব্যবসায় সফল হওয়ার আশা সুদূরপর্যায়ত।

তাছাড়া শিল্পবস্তুতে যাদের আগ্রহ আছে, তাদের পক্ষে আর্থিক দুরবস্থার জন্যে শিল্পমূর্তিগুলি দর্শন করা সম্ভব হয় না। এইসব কারণে আমরা মনে করি, আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কিশোরদের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পের ইতিহাস লেখা সম্ভব না হলেও পূর্ণচন্দ্রবাবুর 'যুগে যুগে ভারতশিল্প' শিল্পগ্রন্থীদের মনে প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

পাঁচ হাজার বছরের ভারতশিল্পের ইতিহাসকে সংক্ষেপে এবং সহজভাবে বলা সহজ ব্যাপার নয়। আনন্দের কথা পূর্ণচন্দ্রবাবু শুধু তুলিতেই দক্ষ নন, তার কলমও স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য। তিনি যথাসম্ভব জটিল বিষয়ের অবতারণা না করে মহেজোদাড়ার সময় থেকে মোগল যুগের ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার ধারাবাহিক পরিচয় দিয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি, 'যুগে যুগে ভারতশিল্প' কিশোরপ্রাণকে শিল্পানুরাগী করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। গ্রন্থটিতে লেখার পাশাপাশি ছবি দিয়ে বস্তব্য বিষয়কে আরো সুন্দর করা হয়েছে। অবশ্য গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি ভয়ে 'আর্ট পেপার' ও 'হাফটোন' ব্লক ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু কম দামী কাগজ ও হাতে আঁকা লাইনের ছবি ব্যবহৃত হলেও লেখক-শিল্পীর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় নি। গ্রন্থ প্রকাশে অর্থেক ব্যয়ভার বহন কবেছেন ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ। শিক্ষামূলক এই গ্রন্থের জন্যে সে অর্থ ব্যয় নিরর্থক হয় নি। প্রচ্ছদপটও আকর্ষক।

সাতটা থেকে দশটা ও ন'টা থেকে ষারোটা—শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, ১-১-এ-বি বর্ষিক চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

পিরান্দেল্লো : নাট্যকারের
তার বড় ছেলেকে লেখা একটি চিঠি থেকে
আমরা জানতে পারি—১৯১৫ সালেই তিনি
একটি উপন্যাস লেখবার পরিকল্পনা করে-
ছিলেন যার নাম হবে 'সিল্ল কারেইস'
ইন সাচ' অভ এন অথর'। এর সাত
বছর বাদে নাটকটি রচিত হয়—নাটকের
“অথর” যে তিনি নিজে এ বিষয়েও কোন
স্বিধা থাকে না। যাই হোক, ছটি
চরিত্রের ভেতর প্রাণ-সঞ্চার করে, তাদের
দিয়ে যে কাজ করাবার জন্য তাদের সৃষ্টি
করেছিলেন, সে কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ
করলেন না, বা করতে অসমর্থ হলেন
পিরান্দেল্লো।

এ নাটকের ‘কাহিনীর’ সঙ্গে সারা
বিশ্বের নাট্যনাট্যগীদে—সবাইই ঘনিষ্ঠ
পরিচয় আছে। একটি মঞ্চে রিহাসাল
হচ্ছে, এমন সময় ছদ্মন চরিত্র এসে হাজির
হয়ে দাবি জানালো অভিনয়ের ভূমিকার
জন্য। এই সব চরিত্র তাদের প্রস্তুত কাছ
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একটা কাল্পনিক
অস্তিত্বের রাজ্যে বিবাজ করছিল। তাদের
প্রতিভা হচ্ছে ‘দি ফাদার’—যে মনে করে
এ্যাঙ্কররাই নিজেদেব চরিত্রের বাস্তবতা
সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলবার একমাত্র অধিকারী।
কারণ, আজ যে চরিত্রকে বাস্তব এবং
প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে, কাল তাকে অবাস্তব
এবং কাল্পনিক মনে হতে পারে। এক
হিসাবে শিল্পীর সৃষ্ট চরিত্র সত্যিকার
মানুষের থেকে অনেক বেশি স্বেচ্ছাধীনক
অবস্থায় বিচরণ করে।

শিল্পীর দ্বারা সৃষ্ট চরিত্র মানুষের
মত দিনে দিনে বদলায় না, বা মৃত্যুর
দ্বারা পৃথিবী থেকে অপসারিত হয় না।
তারা চিবকালের জন্য অপরিবর্তনীয়।

এ নাটকের পালাটি চরিত্রেরা উপস্থিত
করছে অভিনেতাদের কাছে—জিন্নোভান্নি
গ্রাসোর ইমপ্রভাইজড সিসিলিয়ান

বন্দনা ও দেশে শিল্পী এবং এদেশ

প্রে-গুলির সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে।
এর সব থেকে আকর্ষণীয় দৃশ্য হচ্ছে
সেইটি, যেখানে দি ফাদার—যিনি দি
মাদারের থেকে দশ বছর আলাদাভাবে
বসবাস করেছেন এবং যে মাদার তিনটি
সন্তানের জননী হয়েছেন তাঁর ভূতপূর্ব
সেক্রেটারীর দ্বারা—মাদামা পেন্সের বিখ্যাত
ফ্যানশানসে গিয়ে হাজির হয়েছেন।
ওখানকার একটি পিছনের ঘরে দি ফাদারের
সঙ্গে তাঁর অপরিচিত স্টেপ ডটারের
আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়—ইহাৎ এখানে
দি মাদার এসে হাজির হন এবং তখন
সব কিছুর সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে
যায়।

এই যে কাহিনী, এটা যখন চরিত্রদের
দ্বারা বর্ণিত হচ্ছিল তখন ভারি
আকর্ষণীয় লাগছিল। কিন্তু অভিনেতা,
অভিনেত্রীর দল যখন এ কাহিনীকে
অভিনয়ের মাধ্যমে রূপায়িত করতে গেল
সমস্ত ব্যাপারটা বিকৃত মেলোড্রামাতে
পরিবর্তিত হোল। দি ফাদারটি হবে
দাঁড়ালো একটি বৃদ্ধ ভাড়া জাতীয় চরিত্র,
আর এখানকার প্রাইমডোনা স্টেপ ডটারের
চরিত্রটিকে এমন সাধারণ লেডী অভ দি
ক্যামেলিয়াসে পরিণত করলেন যে তা শুনে
মূল চরিত্রটি হাসিতে ফেটে পড়ল।
পরিণতিটাও হোল খানিকটা মেলোড্রামাটিক

—এব ফলে প্রডিউসার “আসল” এবং
“নকল” উভয় ঘটনাকেই বিব্রীভাবে
গালাগাল দিতে শুরু করল—কারণ এই
ব্যাপারে তার একটা পুরো দিনের
রিহাসাল মাটি হোল।

The fundamental idea
about the Superiority of poetry,
over reality is worked out in
Six Characters with an irresis-
tible logic, and the actual
mise-en-scene is masterly.

In contrast to the
actors, who are merely
doing their daily jobs,
the characters seem like dis-
embodied apparitions from
another world. Without being
any of the dramatic tension of
the play, Pirandello manages
to introduce his personal philo-
sophy into it. This play con-
tains more ideas than any of
his others, but it perhaps lacks
some of their intensity.

এমন অমূল্য বিষয়বস্তু নিয়ে এ
ধরনের জমাটবাঁধা নাটক লেখা পরে বা

উপরি উক্ত গ্রন্থের দুটি নাটকই
একাঙ্কের। অবশ্য একাঙ্ক নাটকের জন্যে
যে স্বল্প সময়সীমা প্রয়োজন সাতটা থেকে
দশটার তা’ রক্ষা করা সম্ভব নয়। তবু
যে দ্রুতগতি ও প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত
একাঙ্কের প্রাণ তা’ সাতটা থেকে দশটা’
এবং ‘নটা’ থেকে বাবোটা’য় রক্ষিত হয়েছে।
একাঙ্ক নাটক দুটিতে এ যুগের কথাই
পরিষ্কৃত হয়েছে।

‘সাতটা’ থেকে ‘দশটা’—বৈজ্ঞানিক
ডাঃ ঘোষ যিনি বিজ্ঞানবলে নারীর কলঙ্ক
উন্মোচন করতে পারেন তিনি শেষ পর্যন্ত
নিজের পন্থাবোধে কলঙ্ক আবিষ্কার করে
কিভাবে গমগদ্যবদী হস্তগায় বিশ্ব
হয়েছেন, সে কথাই বাস্তব হয়েছে। বিজ্ঞান-
বলে সব কিছুই সম্ভব হয়, কিন্তু সত্যকে

প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যক্তিজীবনে তা কি
রকম ওলট-পালট এনে দেয়—এই বিষয়টি
যেন নাট্যকাবের আবিষ্কার। নাটকের
মানদণ্ড ‘নির্ভর’ করে বহুলাংশে চরিত্র-
গুলির ওপর। ডাঃ ঘোষের চরিত্র সৈদিক
দিয়ে সার্থক কিন্তু ডাঃ ঘোষের কন্যাদেব
চরিত্র শুধু নাটকের বক্তব্যকে প্রকাশ
করতেই সাহায্য করেছে—তা’ পাঠকমনে
গভীরতর আলোড়ন সৃষ্টিতে খুব বেশি
সহায়ক হতে পারে নি। আর একটা কথা
বলা প্রয়োজন ডাঃ ঘোষ বৈজ্ঞানিক হয়েও
শেষ পর্যন্ত মর্গবিডিটিতে আচ্ছন্ন হয়েছেন
বলেই তিনি বলেছেন, “নারী চিরকালই
তো বিশ্বাসঘাতক”। অবশ্য তিনি সত্যও
দর্শন কবেছেন।

‘নটা’ থেকে বাবোটা’য় এক নৃত্য-
শিল্পীর জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। তার
জীবনের দুটি ভাগের একদিকে নৃত্য-
পটীয়সী কলঙ্কিতা স্মরণী, আর এক
দিকে সে পবিত্রমুখা নারী। নৃত্য-জীবন
তার কাছে এখন অতীতের বস্তু। তবু
মুক্তির পথ কৈ? তাব মেথেকে দিতে
হবে ফর্মের মধ্যে পিতৃপরিচয়। কিন্তু
কে তার পিতা? এগিয়ে এলেন মেঘমল্লার
কাগজের সম্পাদক আনন্দ পিতৃপরিচয়
নিয়ে। নাটকটি বাস্তবধর্মী এবং এতে
যে সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে আনন্দের
সত্যবাদিতার দ্বারা তা’ সার্থক হয়ে
উঠেছে। মানবীর হৃদয়স্পন্দনও আমরা
নাটকটি পড়তে পড়তে অনুভব করতে
সক্ষম হয়েছি।

আগে ইউরোপীয় সাহিত্যেও আমাদের মজরে পড়ে নি। ইসারায় এবং ইঙ্গিতে চিন্তা করার যথেষ্ট প্রচুর বিষয়বস্তু এ মাটিকে পিরানদেল্লো পাঠক এবং দর্শকদের উপহার দিয়েছেন তারও কোনও তুলনা পাওয়া যায় না। তাছাড়া এ্যাষ্টরসের দল এবং ক্যারেক্টাররা দর্শকের মানসপটে কাব্য এবং বাস্তব এই দুটি স্তরের সৃষ্টি করে এবং মিলন ঘটিয়ে এক অশ্লুত অনন্দ-রসের সৃষ্টি করে।

পিরানদেল্লোর শেষের দিকে কয়েকটি নাটক আত্মজীবনীমূলক। জীবনের শেষের দিকে অল্প সময়ের জন্য তিনি যেন কসমের অভ্যাগম অনুভব করছিলেন মনে পড়ে। কারণ, এই পরিণত বয়সে তিনি তাঁরই নাট্যসংস্কার প্রধান অভিনেত্রী মার্টা অম্বার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সাবা পৃথিবীতে এই সময় তাঁর নামডাক ছাড়িয়ে পড়েছে। এই জন্যই বিগত বোবনকে ফিরে পাওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের মনকে সংযত করে রাখলেন। এরই উপর ভিত্তি করে একটি মূল্যবান নাটকও রচনা করলেন 'হোয়েন ইউ আর সামবাইড' নামে। নাটকের কাহিনী হলো এই—একজন লেখক তাঁর জীবদ্দশাতেই এত বশস্বী হয়ে উঠলেন যে, তাঁর একটি স্ট্যাচু করে সেটিকে স্থাপিত করা হল। এর পর ইচ্ছা হলো তিনি এমন কিছু করতে পারছেন না, যা ফলে লোকে তাঁর সম্বন্ধে অন্য-রকম ধারণা করবেন। আসলে তিনি তাঁর ভাইপো ভেরোচিয়ার শালীর সঙ্গে প্রেম পড়েছিলেন। মেরেটিকে উদ্দেশ্য করে এ সময় তিনি যে সব কবিতা রচনা করলেন তাঁর লেখক হিসাবে একটি ছদ্মনাম—“ডেল্যাগো”—ব্যবহার করলেন। প্রকাশক হলেন ভাইপোটি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর এই সব কবিতা একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করল। সাহিত্য-বিশ্বকে মত প্রকাশ করলো তাঁর লেখবার

স্টাইলটা পুরনো হয়ে গেছে এবং এখনকার নবীন পাঠকেরা ডেল্যাগোর কবিতারই অকৃত্রিম ভক্ত। ভেরোচিয়ারা তাঁকে বার বার অনুবোধ করতে লাগল ছদ্মনামের ব্যাপারটা প্রকাশ কবে দেবার জন্য। লেখক কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজী না হয়ে বললেন—আমি যদি সবাইকে জানিয়ে দিই যে, আমিই ডেল্যাগো—তাহলে তাঁর নিজের পরিচয় কিছু আর থাকবে না। সে হয়ে দাঁড়াবে আমার মৃত্যু—অর্থাৎ যে যুবকের মৃত্যুসংস্কার আমি এখন ঠাট্টাচ্ছি ব্যবহার করছি।

তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ একই ভঙ্গীতে লেখা তাঁর আর একটি বই প্রকাশিত হোল তাঁর ভাইপোব উদ্যোগে এবং সবাই জেনে ফেললো যে ‘ডেল্যাগো’ ঐ লেখকেরই ছদ্মনাম। জনমত এবার অন্যরূপ ধারণা করলো এবং সবাই বলতে লাগল যে তাঁর মত একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে যুবকদের মত প্রেমের কবিতা লিখতে যাওয়াটাই আনন্ডজনিক। এ নাটকটিতে পিরানদেল্লো নিজের জীবনের একটা গভীর ব্যথা দিককে হাসি-ঠাট্টার আড়ালে রেখে ফুটিয়ে তুলেছেন। জনমত ব্যাপারটা যে কি অশ্লুত, কত সহজেই যে তারা কালকের প্রিয়পাত্রকে আজকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করতে পারে—আবার আজকে যাকে তারা মাথায় তুলছে তার প্রতিও প্রায় বিনা কারণে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—এসব সত্যের প্রতিই পিরানদেল্লো অতি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন।

মানুষের বিভিন্ন সম্ভার দিক দেখাতে গিয়ে পিরানদেল্লো আভাষ ইঙ্গিতে আর একটি গভীর সত্যকে পাঠক এবং দর্শকদের কাছে তলে ধরে চেখেছেন—সেটি হচ্ছে এইঃ প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই একটা গভীর দুঃখের দিক আছে—সেই বেদনার ক্ষতকে লুকিয়ে রাখবার জন্যই সে অন্যের কাছে মাস্কের ব্যবহার করতে লাগল। তাই বলে হাসি মনে করেন হয়, পিরানদেল্লো পেরিসিস্টেন্ট, বা ব্যক্তিকে সমাজের পরিবেশ থেকে আলাগ করে নিয়ে বিশ্লেষণ কবে দেখাতে চেয়েছেন তাঁর নাটকে—তাঁরা অত্যন্ত অন্যায় করছেন এই ধারণা বিচার করে। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মানুষ কিভাবে প্রতিপদে ফ্রাস্ট্রেটেড হয় সেট কথার অতি সুন্দর এবং স্পষ্টভাবে পিরানদেল্লো তাঁর নাটক-গামিতে বোঝাতে চেয়েছেন। যে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রতি পদক্ষেপে এক অন্যকে ধ্বংস করে নিজের স্বার্থের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারই বর্ণনা ব্যয়হীন হেনবী দি ফ্লোরেন্স। সত্যবাদী চিন্তাশীল দর্শকদের কাছে এ নাটকের আবেদন অন্য দিক থেকে। আজকের দিনের নাট্যকারদের ভেতর পিরানদেল্লোর উৎসাহবোধের মধ্যে

প্রথমেই সামুয়েল বেকট এবং আওনেস্কোর নাম মনে পড়ে। বেকটের ওয়েটিং ফর গোডোর কথাটাই ভেবে দেখুন না। ট্রাম্প দুটির কথাবার্তা এবং চালচলনে এই কথাটাই কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি যে, আজকের সমাজব্যবস্থায় “কোন কিছুই ঘটেছে না—না কেউ আসছে, না কেউ যাচ্ছে—সব যেন স্থির হয়ে আছে?” বেকটের আর একটি নাটক আছে ‘এ্যাষ্ট উইদাউট ওয়ার্ডস’—এতে একটামাত্র চরিত্র—তার মুখে কথা নেই। সে ক্রমাগত যে সব কাজ করছে তার ভেতর কোন ভারসাম্য বজায় থাকছে না—ফলে কোনো কিছুই সে করতে পারছে না। এই ধরনের আচরণই তো মানুষ করে থাকে ক্যাপিটেলিস্টিক সোসাইটিতে। আওনেস্কোর রাইনেসেরস নাটকটিও এই ধরনেরই সাম্প্রতিক নাটক।

আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। পিরানদেল্লোর নাটকেই প্রথম আমরা কার্যকরীভাবে মেটাফিজিক্স অভ দি থিয়েটার ব্যবহার দেখতে পাই। কিন্তু দার্শনিক বীতিতে তাঁর নাট্যরচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল, যদি না তাঁর রচনার ভেতর অসাধারণ ড্রামাটিক ইন্সটিঙ্কটের পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁরই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রিন্টলে লিখলেন ‘জনসন ওভার জর্ডন’ নাটকটি—কিন্তু এ নাটকটি ফল করেছিল এই কারণে যে, এর ভেতর দার্শনিক বচনারীতিকে প্রাধান্য কবে তোলবার মত শক্তি নাটককে দেখাতে পারেন নি। থিয়েটারে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে কিভাবে নাটকীয় করে তোলা যায়, এ বিষয়েও পিরানদেল্লোর জুড়ি পাওয়া যায় না।

He could gauge to a nicety how curious and complicated ideas should be shaped if they were to tell in a theatre.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থিয়েটারে যে অভিব্যক্তিবাদী নাটকের প্রচলন শব্দ হয়েছিল তারও মূল সূত্র পাওয়া যায় স্ট্রিটবার্গ, চাপেক এবং পিরানদেল্লোর রচনা থেকেই।

আজকাল অনেকেই পিরানদেল্লোর টেকনিক অভ রাইটিংকে অনুকরণ করে নাটক লেখবার চেষ্টা করেন। তাঁরা একথা ভুলে যান যে, পিরানদেল্লোর নাট্যরচনারীতি তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সত্যবাদী বিষয়বস্তুকে অগ্রাহ্য কবে বচনারীতিকে অনুকরণ করলে তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না—সে জনাই এসব লেখকের লেখা কখনও দর্শকদের দ্বারা আদৃত হয় না।

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

মূল্য : দুই টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চ-কল্প উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

বঙ্গভাষা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬০, বিপিনবিহারী রাস্তা, কলি-১৬



নতুন দিনে সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র-চিন্তা



লতাজিৎ রায়

পশ্চিমবঙ্গ সম্প্রতি শাপমুক্ত হয়েছে। উনিশ বছরের দৃশ্যশাসনের অবসানে জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। আমলাতন্ত্র ও বৈষ্যচাচারের দাপটে যে জনজীবন অবমানিত ও লান্হিত হয়েছিল সেই জনতা আজ তাদের বিশ্বাসভাজন পার্টি ও নেতাদের মন্ত্রিত্ব গঠনের সুযোগ দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন অবসানের পর ডাঙা বাংলার রাজনৈতিক জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই নতুন অভিজ্ঞতার দীপ্তিতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতি-বিরোধী একাবন্ধ নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই শূভ সূচনা মুহূর্তে জনতার উৎসব সমারোহে আমরাও যোগদান করছি। পশ্চিমবঙ্গের ডাঙ্গাকাশে নতুন দিনের জয়যাত্রা শুরু হোক, এই কামনায় নবগঠিত একাবন্ধ মন্ত্রিসভাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই গণ-এককের মন্ত্রিসভা জনসাধারণের নিকট তাঁদের ন্যূনতম কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছেন। এই কর্মসূচী কার্যকরী করার মতোই পশ্চিমবঙ্গের বখাৰ্হ রাহুদ্রুতি ঘটবে। কংগ্রেসী বৈষ্যচাচারের বিরুদ্ধে জনতার জয়লাভে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। পবে-ঘাটে নাট্য-মর্যাদে এই সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি পথনাটিকা ও সংগীতে দৃশ্যশাসকদের অপকীর্তির সুখোশ খুলে দিয়েছিল, বহু বিজ্ঞান্হিত জবাব দিয়েছিল এবং জনতার মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। কত অনান্য কবি পথে পথে ছড়া রচনা করে জনতার মধ্যে ভাষা যুগিয়েছে। আজকের জয়যাত্রার দিনে এই সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিল্পীদের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে দৃশ্যশাসকরা বার বার কল্যাণ করতে চেয়েছিল। দৃশ্য ও সেকী সন্ধান-

দানে যখন কল্যাণ নি, তখন নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন দিয়ে নাটকের সংস্থাগুলিকে শাসন করতে চেয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা ও জনসাধারণ সেই আক্রমণকে পরাজিত করেছে। মিনার্ভা থিয়েটারে 'কল্লোল' নাটকের ওপর ফ্যানিস্ট পদ্ধতিতে আক্রমণ করেছিল, সেই আক্রমণও জনতা পরাধীন করেছে। দৃশ্যশাসকদের সর্বশেষ কীর্তি—জোছন দাস্তিদারের 'অমর ডিয়েতনাম' নাটক অনুদানে পুঁলিশের অনুমতি না দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গে কাব্য ও সাহিত্যজগতে কদম্ব যৌনতার প্রোত বইরে দিয়ে জনজীবনকে বিজ্ঞান্হিত করার এক অপচেষ্টা দীর্ঘদিন থেকে চলছে। এই অপচেষ্টার পেছনে যে প্রতিশ্রুতিশীলদের অর্থ ও প্ররোচনা রয়েছে এ বিষয়ে অস্মৃত কিছু সংখ্যক কবি ও সাহিত্যিক সচেতন। তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও এই প্রতিশ্রুতিশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আজকের এই পরিবর্তনের দিনে আমরা সেই মূর্তিসের প্রগতিশীলদের কথাও স্মরণ করি।

জাতির জীবনে সংস্কৃতির বিষয় এক ভূমিকা আছে। সংস্কৃতি একের ও প্রগতির বাহন, জাতিকে ঠিক পথে এগিয়ে নেবার সহায়। জাতির সম্মান ও জনতার স্বাৰ্হ রক্ষার কাজে একজন রাষ্ট্রনেতার চেয়ে একজন বখাৰ্হ শিল্পীর সম্মান কম নয়। সংস্কৃতির এই ভূমিকার কথা মনে রেখে বর্তমান মন্ত্রিসভা যদি সংস্কৃতিকে বিশেষ মৰ্হাদার সঙ্গে স্বীকার করেন, তবে তা জাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে। একজন মন্ত্রিকে সংস্কৃতি বিষয়ে চিন্তা, যোগাযোগ ও দেখাশোনা করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রক দপ্তরের দাবি ইতিপূর্বে উঠেছিল, কিন্তু দৃশ্যশাসকদের সেই দাবি মনে নেবার সাহস ছিল না। কারণ সংস্কৃতিকে ওরা ভয় করত।

নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প সারা বিশ্বের সম্মান ও স্বীকৃতি আনয় করেছে। কিন্তু কংগ্রেসী দৃশ্যশাসকদের অবহেলা ও দুর্নীতিতে এই শিল্প আজ চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। এখানে শত শত কলা-কুশলী অৰ্হবেকার হয়ে আছে, বাংলা ছবির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, বাংলার সিনেমাগুলি অবাঙালীদের কৃকিগত হয়েছে, বাংলা ছবি মুম্বাইয়ের জন্য প্রেক্ষাগৃহ পায় না, বাঙালী কৃতী পরিচালকরা উপযুক্ত প্রযোজকের অভাবে ছবি করতে পারে না। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত শত শত ব্যবসায়ী মন কাটাচ্ছে। আর এই সুযোগ গ্রহণ করেছে বোম্বাই ও মাদ্রাজের শিল্পমাল্যাতীন ছকি-গুলি। দূর গ্রামাঞ্চলে পৰ্হত আজ হিন্দী ছবি দেখান হয়। হিন্দী ছবির মাল্যাতার চলচ্চিত্র বালকরা বিজ্ঞান্হিত। এই সঙ্গে রাজনৈতিক অভিসম্বিহ্বলন এক ধরনের গোলেম্বা ছবি অভ্যন্ত সন্ধান্হিত মার্কিন প্রাধান্য প্রচার করেছে। নিবন্ধক (?) ভারত সরকারের সহায়তার মার্কিনরা তাদের রাজনীতি প্রচারে সিনেমাকে ব্যবহার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র বাজার আজ অত্যন্ত ছোট। পৰ্হবর্তন বাংলা ছবি যেতে পারে না, আসাম, উড়িষ্যাও আগের মত দেখানার সুযোগ নেই। অখচ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দী ছবির অবাধ প্রাধান্য। বাংলা ছবির স্বাৰ্হরক্ষা করার জন্য, শত শত ব্যবসায়িক কর্ম-সংস্থান এবং শিল্পমাল্যাসম্পন্ন ছবি নির্মাণে সুযোগদানের জন্য বাংলা ছবি



বঙ্গাল চক্রবর্তী পরিচালিত 'তিন অধ্যায়' ছবিতে বিনিনা চৌধুরী, মীরা চ্যাটার্জী, ইন্দিরা দে, জ্যোৎস্না বসুনাজী, মিতা দত্ত

প্রদর্শন প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহে বাধ্যতামূলক করা সরকার। ইতিপূর্বে এই ঘাট করা হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয়াধিকারায়ন মন্ত্রিসভার হিন্দী ছবির পরিবেশকদের অসন্তুষ্টি করার সাহস ছিল না। যদি প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহে কমপক্ষে বার সপ্তাহ বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে দেখা যাবে বাংলা ছবির নির্মাণ প্রায় শ্বিগুণে হয়ে যাবে; বহু টেকনিশিয়ান, শিল্পী ও আনুষ্ঠানিক কাজের লোকের কর্মসংস্থান হবে।

এই সূত্রে বিদেশী ও পশ্চিমবঙ্গের বহিরাগত ছবির ওপর প্রতি শোভে জন-প্রতি বহু-পরমা হারে লোভ স্বার্থ করা বেড়ে পড়বে। ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের আরো কতক দেশে এরূপ লোভ ব্যবস্থা আছে। এরূপ লোভ থেকে যে আয় হবে তার একটা বড় অংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করা যাবে। বাংলার কৃতী পরিচালকরা যদি সরকারী সহায়তা লাভ করে তাহলে তাঁদের অর্থনৈতিক সমাজবোঝাই প্রযোজকদের

স্থাপনাকী হয়ে থাকতে হবে না। তারা নির্ভয়ে নিজেদের সৃষ্টিকর্মতাকে কাজে লাগাতে পারবেন। চলচ্চিত্রে এরূপ নীতি গ্রহণ করা হলো সমাজজীবনে কিছুটা পরিবর্তন আনা করা যায়। সিনেমা তখন আমকের মত অনেকের কাছে আড়িনাপের ব্যাপার না হয়ে নৃত্যকার আনন্দ ও সংস্কৃতির ব্যাপার হতে পারবে। নবগঠিত মন্ত্রিসভা এ ব্যাপারে বিবেচনা করবেন— এই আশা আমাদের আছে।

—সুধেন



হুসানা আলী পরিচালিত 'সেবা' ছবিতে জহর রায়, অনিতবরণ ও তপস্বী বসু

চিত্রশ্রী

বিবি অণ্ডর মকান
(পরিচালনা—হুমায়ুন কবীর)

গীতাঞ্জলি পিকচার্সের হেমন্ত মদখাজী প্রযোজিত হিন্দী ছবি 'বিবি অণ্ডর মকান' মুক্তিলাভ করেছে। বহু পূর্বের একটি বাংলা ছবি এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন। ছবির কাহিনীর মূল অবলম্বন গৃহসমস্যা। গৃহসমস্যাকে কেন্দ্র করে হিন্দীর রুচি রূপ ও রীতি অনুযায়ী 'বিবি অণ্ডর মকান'-এর কাহিনী গল্পবিত ও কুসুমিত হয়েছে। পাঁচ বন্দ এক মেসে থাকত, হৈ-হুয়োড় করে। এদের হৈ-হুয়োড় ও ফুর্তি হোটেল মালিকের পছন্দ হয় না। সে তাদের ছলে বলে তাড়াবার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তাড়ায়। পাঁচ বন্দ তখন বাড়ির জন্যে হনো হয়ে ওঠে, যদিও যা বাড়ি পায় অবিবাহিতকে কেউ বাড়ি ভাড়া দেয় না। অগত্যা এদের মধ্যে বদ্বিমান শর্মার মাথায় এক বদ্বিমান আসে। পাঁচজনের মধ্যে দু'জনকে স্ট্রীলোক সাজিয়ে তারা একটা বাড়ি যোগাড় করে। স্ট্রী সেজে ওরা বেশ চালিয়ে দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে বাড়ি-ওয়ালার দুই মেয়ের সঙ্গে দু'জনের প্রেম জমে ওঠে। তারপরে শেষ পর্যায়ে একদা আর্টিস্ট শোভনের বাবা, আর শর্মার বাবা ও স্ট্রী এসে উপস্থিত হয়। শর্মাকে খুব একচোট কাটা পেটের পর শেষ পর্যন্ত আপোস হয়। এ-পক্ষ কবল করে যে



হিন্দী ছবি 'বিবি অণ্ডর মকান' ছবিতে কম্পনা ও শবনম



নাগা মেয়ের রূপলজায় ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউটের ছাত্রী মহম্মা ভৌমিক।

একটা বাড়ির জন্য তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল, আসলে তাদের চারজনই বিবাহিত নর, আর স্ট্রী দু'জন আসল স্ট্রীলোক নয়। বাড়িওয়ালার মেয়ে দুটির মন তো ওরা আগেই পেয়েছিল, গিমি এবং কর্তার মন পেতেও অসম্ভব হলে না। দুই কন্যার সঙ্গে দু'জনের দ্বন্দ্ব বিবাহে এই হাসির কাহিনীর চরম পরিণতি হল।

ছবিতে বিশ্ববিজয় স্ট্রী ও পদুম বেশে শ্বেত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন কম্পনা, শবনম প্রমুখ। সবার ওপরে টেকা দিয়ে অভিনয় করেছেন মেহমুদ। ছবির সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মদখাজী পূর্ব, মধ্য, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন সুরে গান পরিবেশন করিয়ে সঙ্গীতের দিকটিকে কৌতুককর করেছেন।

নাটকের কথা

ভাসের দেশ



বিল সে বিল ইয়া কিয়া ছবিতে নৃত্য।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বরাহনগরের খেলাঘর সাংস্কৃতিক সংস্থার সভারা রবীন্দ্রনাথের 'ভাসের দেশ' মঞ্চস্থ করে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছে বিভূতি চক্রবর্তী, মন্দিরা বসু, গীতশ্রী রামচোদ্রী, শীলা দাস, শ্রুতেন চক্রবর্তী, মঞ্জুশ্রী রামচোদ্রী, মৈত্রেয়ী বসু। নৃত্য, গীত ও নাট্য পরিচালনা করেছেন অন্ননাথ চৌধুরী ও পিরাল চৌধুরী। নৃত্যনাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে সঙ্গীত ও আবৃত্তি করেন সুশেখর সরকার, দেবাংশু চক্রবর্তী, রজা সরকার, দাদা বসু, শ্রী চক্রবর্তী।



অগ্রদূত পরিচালিত 'কখনো সে'—এ অজানা ভৌমিক ও কালী বানার্জী

আর একটি ক্ষুদ্র মণ্ড

শিক্ষণ কলকাতার ১১৯ জ্যাম্‌সডাউন বোডে আর একটি ক্ষুদ্র নাট্যমণ্ড তৈরি হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটারের উদ্যোগে। গত বছর ৭ই আগস্ট তারিখে এই মণ্ডের উদ্বোধন হয়েছে। এই ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে ১৫০ জন দর্শক বসে নাটক দেখতে পারেন। সাড়ে বাইশ ফুট ও সাড়ে এগার ফুটের ছোট মণ্ডে শিল্পীরা নাটক অভিনয় করেন। এই মণ্ডকে অভিনয় উপযোগী করে রূপ দিয়েছেন শিল্পী খালেদ চৌধুরী। এ পর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটারের সত্তার বার রজনী এবানো নাটক অভিনয় করেছে। গত ১৫ই জানুয়ারী শ্রীমতী শীতা বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আরো দুটি নাটক অভিনীত হয়েছে।

সুটি ও শব্দ

অভিশপ্ত চন্দ্র

মধ্যপ্রদেশের চন্দ্রের ডাকাতদের খুন, জবন, লুটপাট, প্রতিহিংসা ও প্রেম এবং এই ডাকাত দলের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশ পুলিশের অভিযানের কাহিনী অবলম্বনে সাংবাদিক তরুণ ভাদুড়ী বে উপন্যাস লিখেছিলেন এবং খ্যাতিলাভ করেছিলেন, সেই বহুলপঠিত উপন্যাস হতে নারী-মুদ্রা পুতলীবাঈ ও দস্যুসদার মূলতানের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে পশ্চিম-বঙ্গের প্রখ্যাত অভিনেত্রী, প্রযোজক ও

পরিচালিকা শ্রীমতী মজু দে যত্ন অর্ধবৃত্তে 'অভিশপ্ত চন্দ্র' ছবির কাজ শেষ করেছেন। শ্রীমতী দে তার সমস্ত ইউনিট নিয়ে চন্দ্রের পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। শ্রীমতী দে বলেন, ছবির দৃশ্যগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে বেকম্ভ সাহা করতে হয়েছে ছবিটির সামগ্রিক শিল্প-নৈপুণ্য দেখে তিনি তাকে আর কষ্ট মনে করেন না। আগামী মাসে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে। অভিনয়শ্রেণী আছেন: শ্রীমতী মজু দে, প্রশান্তকুমার, শেখর চ্যাটার্জী, সুনীল ভট্টাচার্য, পঙ্কজ চ্যাটার্জী, শম্ভু ভট্টাচার্য, শিশির বটব্যাল, সরযু দেবী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, গীতা দে,

সাধনা রায়চৌধুরী, গীতা মুনোজী, মনোজী (বোম্বাই)।

দূর্গাদীপ

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী শাখা ফিল্মস স্টুডিওতে আর এন কল্যান এবং নিয়োগী পিকচার্সের উদ্যোগে 'দূর্গাদীপ' ছবির মহরল অনুরোধন হয়েছে। শ্রীমতী মজুলা দেবী লিখিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন নগেন নিয়োগী।

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ

দীপক পুস্তকের পরিচালনার এ কে বি ফিল্মস 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ছবি নির্মাণ করছেন। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সম্প্রতি কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই দৃশ্য গ্রহণে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস। ছবিটিতে সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুনোজী।

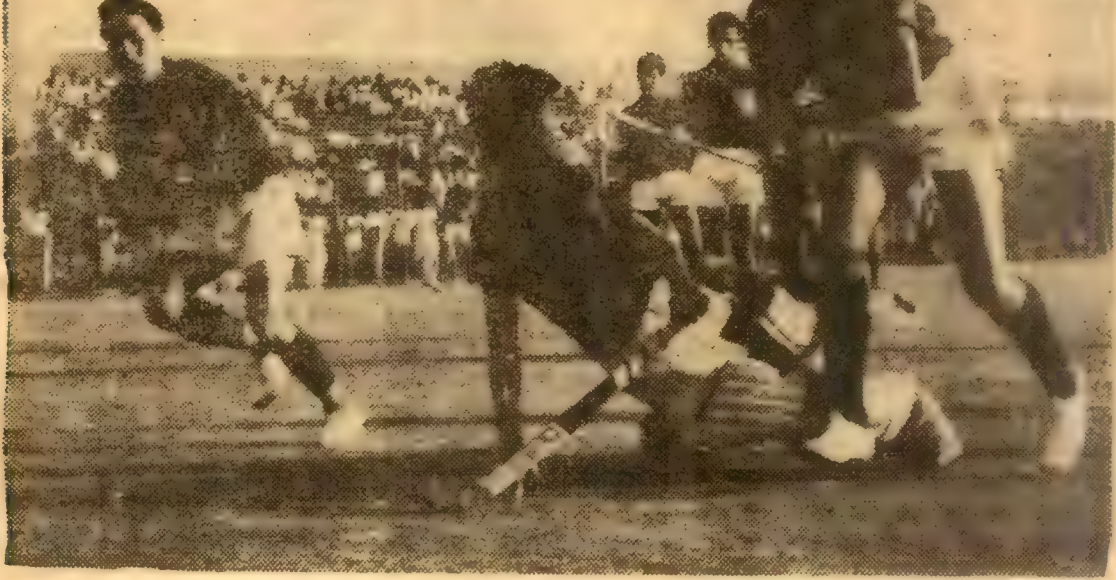
নজরুল সন্ধ্যা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নজরুল সন্ধ্যার চতুর্থ অধিবেশন গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কবির সন্মুখে গান করেন প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী দীপালি নাগ, বিমলভূষণ এবং প্রভাতভূষণ। তাঁদের কণ্ঠে গীত সুললিত নজরুল সঙ্গীতের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন বিজয়ভূষণ।



বিবাহ বিলাট ছবিতে অনুপকুমার ও রবি

খেলাধুনা



প্রথম ডিভিশন হকি লীগে মোহনবাগান এবং রোজার্স দলের খেলার একটি দৃশ্য

দল-বদলের সীমা

আমরা বড় বড় কথাবাতী বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি; কথায় কথায় রাজা-উজীর বধ করে লম্বা-চওড়া বুলি দিয়ে আসল সত্যকে নিলম্বভাবে ঢাকার চেষ্টা করার দিকেই লক্ষ্য আমাদের। প্রতিবাদ করতে গেলেই হয়ে যেতে হয় নিষ্পদ, উত্তর আসে লক্ষ্য আমাদের অনেক উচ্চে, আদর্শ আমাদের অনেক নির্মল। অন্যায় কোন কাজ করে বসলে অজুহাতের অভাব হাতের কাছে থাকে না।

আমাদের ফুটবল মাঠের ঘটনা-দুর্ঘটনা নিয়ে আমরা প্রায়ই তুলনা করি অন্য দেশের সঙ্গে। রেজিলের বিশ্বজয়ী ক্লাব দল স্যান্টস, স্পেনের রিয়েল মাদ্রিদ প্রভৃতি দলের সঙ্গে আমাদের কলকাতার দু-একটি দলের তুলনা করে বিরাট আশ্ব-প্রসাদ লাভ করি। আর মাঝে মাঝে সেই নেশার ঘোরে পেলে-ইউসেবিওর সঙ্গেও আমাদের দেখা কলকাতা মাঠের তথাকথিত দু-একজন ফুটবল তারকাদের তুলনা করতেও এতটুকু স্খিয়া বোধ করি না। কারণ লক্ষ্য আমাদের অনেক উচ্চে!

কলকাতার মাঠে বর্তমানে বড় দল-গুণির সীমা থাকলে দু-এক গুলি ইন্ট আফ বোতল বৃষ্টি প্রায় নিতান্তই নৈমিত্তিক সঙ্গার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই

অন্যায় আচরণের প্রতিবাদের উত্তরে এও শুনছি যে, এ আর কি দেখছি এতো কিছুই নয়, বাইরে বিদেশের মাঠে চলে গোলা-গুলী। খেলার মাঠের চারধারে থাকে কাটা তার আর পরিখা কাটা,

প্রীতিমিত্রতা

কোথাও কোথাও বুলেট-প্রুফ কাঁচের দেওয়াল। সুতরাং বাইরে যখন ফুটবল মাঠে এত ব্যবস্থা একেবারে রক্ষণের মত, তখন কি বা কী যদি আমাদের সবুজ গ্যালারীর অবুধ দর্শক কিছু ইন্ট আর বোতল বর্ষণ করে।

খেলোয়াড়দের দল-বদল নিয়ে সব দেশেই বেশ মাতামাতি হয়। কিন্তু আমাদের কলকাতায় উত্তেজনার ঝাঁজ বড় বেশি এবং মাঝে মাঝে এই উত্তেজনার এমন নশন বহিঃপ্রকাশ হয় যে প্রতিবাদ না করে উপায় থাকে না। এই দল-বদলের মরশুমে প্রায় প্রতিদিনই উৎসাহী দলসমর্থকেরা ভিড় করে থাকেন আই, এফ, এ অফিসের সামনে এবং নিজেদের দলের খেলোয়াড়কে দেখলে এবং দল-বদলের সম্বন্ধে কোন কঠোর সংবাদ পেলে লক্ষ্যাকাণ্ড বাধিয়ে দিতেও স্খিয়া বোধ করেন না তারা।

কয়েকদিন পূর্বে আই, এফ, এ অফিসের সামনে তরুণ খেলোয়াড় হাবিবের

উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে ময়দানের দুটি নামজাদা দলের সমর্থকদের মধ্যে এক খণ্ডবৃদ্ধ বৈষ্যে বার।

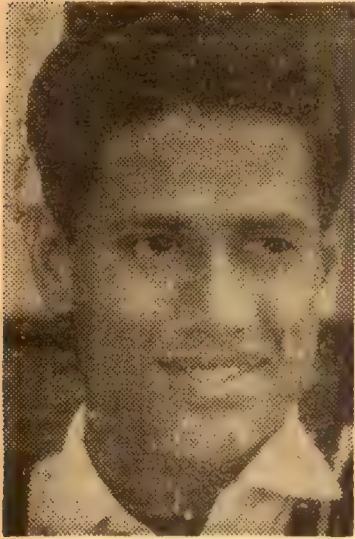
ঘটনার প্রকাশ যে ইন্সটেব্লিশ ক্লাবের হাবিব ছিলেন বোম্বাইয়ে ভারতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরে। হঠাৎ তিনি সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন, কলকাতার কার এসে পৌঁছাল। ইন্সটেব্লিশ ক্লাবের সমর্থক এবং কর্মকর্তারা শ্যেন দুর্দীপ্ত রাখলেন আই, এফ, এ অফিসের ওপর। এই সময় একদিন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ক্লাবের কর্মকর্তার সঙ্গে হাবিবের আবির্ভাব ঘটে আই, এফ, এ অফিসে। হাবিব স্বাক্ষর করতে যাবেন, ঠিক সেই সময় সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন এক দশা-সই চেহারার খেলোয়াড় হাবিবকে বল-পূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ভিড়ের মাকখান দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। এই ঘটনার সূত্র ধরেই লেগে যায় খণ্ডবৃদ্ধ দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে। পুলিশ এসে অবস্থাকে আরও আনন্দে আনে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে হাবিবের পুনরায় আবির্ভাব ঘটে আই, এফ, এ অফিসে। এদিন হাবিব বোম্বাইয়ের ওয়াই, এম, এ-র পক্ষে খেলার জন্য আনন্দন করে পরে তা প্রত্যাহার করে নেন। ফলে ইন্সটেব্লিশ ক্লাব আর এক বছরের জন্য হাবিব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকল।

বাংলা সেমি-ফাইনালে

রঞ্জী ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতীয় রেল দলকে পরাজিত করে বাংলা উন্নীত হয়েছে সেমি-ফাইনালে। বাংলা দলের এই জয়ের পশ্চাতে দু'জন খেলোয়াড় শ্যামসুন্দর মিত্র এবং সুব্রত গুহের বিরাট অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। একমাত্র শ্যামসুন্দর এবং সুব্রত ছাড়া বাংলা দলের অন্য খেলোয়াড়েরা একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন। আসল সময়ে যদি সকলেই একসঙ্গে ব্যর্থতাকে অনুসরণ করে তবে সুযোগ পেলেও কোনদিন বাংলা বেশিদূর এগোতে পারবে না। উড়িষ্যা, আসামের বিপক্ষে সেগুদুরী পিটিয়ে আশুপ্রসাদ লাভের চেয়ে বড় খেলার একটু উইকেটে অবস্থান করে কিছু রান সংগ্রহের চেষ্টা করলে দলেরও মঙ্গল, নিজেরও মঙ্গল।

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত এই খেলায় প্রথমদিন মোট খেলাটি উইকেটের পতন ঘটে। প্রথম ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে বাংলা মাত্র ২০২ রানে ইনিংস শেষ করে। শ্যামসুন্দর মিত্র ৯১ রান করে দুর্ভাগ্যবশত রান আউট হওয়ার মাত্র নয়



সুব্রত গুহ

রানের জন্য সেগুদুরী লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। এরপর উল্লেখযোগ্য হল সি, গোম্বামীর ৩২ রান। বাংলা দলের প্রথম ইনিংস সমাপ্তির পর রেল দল সুব্রত গুহের তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা প্রায় দিনের শেষে। বাংলার সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ফাস্ট বোলার সুব্রত গুহের মারাত্মক বোলিংয়ের সম্মুখে রেল দল চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মাত্র আঠাশ মিনিটে দলীয় ৩১ রানে রেল দল হারায় ৪টি উইকেট। এরপর প্রথম-

দিনের শেষে দলীয় ৩৮ রানে রেল দল হারায় ৬টি উইকেট।

দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতির চরিত্র মিনিট পর রেল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৬৩ রানে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পারমারের ৫৪ রান এবং মনুজাক আলির অপরাধিত ৩৭ রান। সুব্রত গুহ ৫৯ রানে সংগ্রহ করেন ৫টি উইকেট। দিনের শেষে বাংলা দল ৪টি উইকেট হারিয়ে ১১০ রান সংগ্রহ করে। বাংলা দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩১ রান সংগ্রহ করে ৩৭০ রানে অগ্রগামী থাকে। বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান সংখ্যার জন্য সমস্ত কৃতিত্বই প্রাপ্য শ্যামসুন্দর মিত্র ও সুব্রত গুহের। অবশ্য অধিনায়ক পঙ্কজ রায়ের ৩০ রানও প্রশংসার দাবি রাখে। দ্বিতীয় ইনিংসে শ্যামসুন্দর মিত্র সেগুদুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। শ্যামসুন্দর সংগ্রহ করেন ১৪৬ রান এবং সুব্রত ৬১ রান। রেল দল দিনের শেষে ৫৭ রানে দুটি উইকেট হারায়। চতুর্থ এবং শেষদিন সারাদিন খেলে রেল দল ৮ উইকেটে ২৬৪ রান সংগ্রহ করলে খেলার চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ার প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বাংলা দল সেমি-ফাইনালে উন্নীত হয়। গুরুদ-পাল সিংয়ের অপরাধিত ৫২ রান এবং মনুজাকার ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। সুব্রত গুহ ৭৪ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন।

বাংলা দল সেমি-ফাইনালে রাজস্থানের সম্মুখীন হল। বাংলা-রাজস্থানের চারদিনের খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে ৯ই থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত কলকাতার ইডেন উদ্যানে।

বড় দলগুলির বিদায়

রোভার্স কাপের আসর থেকে তিনটি সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন দলের বিদায়ে ক্রীড়ামোদীমহলে কিংবদন্তি বিস্ময়েরই সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকদিন পূর্বে জানা গিয়েছে যে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব রোভার্স কাপের প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

প্রথম খেলাতেই কলকাতার বি, এন রেল দলের এবং অম্ব প্রদেশ পদলিশের পরাজয় এ বছর রোভার্স কাপের আসরের সবচেয়ে বড় গুলট-পালট। এ ছাড়া কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং দলও বিদায় গ্রহণ করেছে রোভার্স কাপের আসর থেকে।

বি, এন রেল দল দিল্লীর সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের কাছে ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়। সেক্রেটারিয়েট দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আজিজ প্রথমবারের ফ্রান্স মিনিটের সময় বিজয়-

সূচক গোলটি করেন। বি, এন রেল দলে এইদিন সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় বলরামকে বহুদিন পর খেলতে দেখা যায়। বলরামের সেই পুরাতন ক্রীড়া-শৈলীর ছাপ যদিও তাঁর খেলার মধ্যে দেখা যায় নি, তবুও তাঁর অভিজ্ঞতার মূল্য ছিল। অনামী সেক্রেটারিয়েট দলের কাছে গোল খাবার পর রেল দলের খেলোয়াড়েরা মাথা গরম করে খেলতে গিয়ে নিজেকেই দলের বিপদ ডেকে আনেন, পদে পদে দুটি-বিচ্ছিন্নতা তাঁদের খেলার মানের অবনতি ঘটায়।

অম্ব প্রদেশ পদলিশ দল ২-০ গোলে পরাজিত হয় গোয়ার ভাস্কা ক্লাবের কাছে। ভাস্কা ক্লাব অবশ্য ভাল খেলেই জয়ী হয়, অপরাধিকে অম্ব পদলিশ দল তাদের সুনাম অনুযায়ী একেবারেই খেলতে পারে নি। খেলার প্রথমার্ধে কোন হয় নি। গোয়া দলের দ্রুতগতি, সুদৃঢ় রক্ষণভাগ এবং সুসংগঠিত আক্রমণ-যারা রচনার কৌশল তাদের জয়ের পথ সুগম করে। এই দুই দলের খেলা দেখার জন্য মাঠে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।



আজিত ওরাদেকার

গোয়া দলের পক্ষে বিজয়সূচক দুটি গোল করেন জর্জ এবং এ্যান্ড্রু।

কোয়ার্টার ফাইনালের খেলার কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ২-১ গোলে পরাজিত করে জলন্ধর লীডার্স ক্লাব সেমি-ফাইনালে উন্নীত হয়। মহামেডান দল প্রথম গোল করে অগ্রগামী থেকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। দু'পক্ষই খেলায় অবস্থা বলপ্রয়োগ করার খেলার মান নষ্ট হয়। মহামেডান দলের পক্ষে গোল করেন আবদুল্লাহ এবং লীডার্স ক্লাবের পক্ষে দুটি গোলই করেন শ্রীকিশান।

বোম্বাই ফাইন্যান্সে

রঞ্জী ট্রফির সেমি-ফাইনালে মহীশূরকে এক ইনিংস এবং পাঁচ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে বোম্বাই দল উপবর্ধপারি নবমবার ফাইনালে উন্নীত করার সৌভাগ্য অর্জন করল। বোম্বাই এ পর্যন্ত মোট উনিশ বার ফাইনালে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

এই খেলায় উল্লেখযোগ্য হল অজিত ওয়াদেকারের ব্যাটিং নৈপুণ্য। মহীশূর দল তাদের প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে মোট ৩৪১ রান। মহীশূর দলের অধিনায়ক সুরেশ্বরনাথ দেগুরী করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রঞ্জী ট্রফির খেলায়

বোম্বাইয়ের বিপক্ষে মহীশূরের মাত্র দুটি সেঞ্চুরী আছে এবং সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব দু'বারই লাভ করেছেন সুরেশ্বরনাথ।

বোম্বাই প্রথম ইনিংসে সাত উইকেটে ৬০২ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সরদেশাই করেন সেঞ্চুরী ১১১ রান সংগ্রহ করে, আর অজিত ওয়াদেকার ট্রিপল সেঞ্চুরী ৩২০ রান সংগ্রহ করে। মহীশূর দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে মাত্র ২৫৬ রানে। ফাইনালে বোম্বাই দল এখন বাংলা এবং রাজস্থানের বিজয়ীর সঙ্গে মিলিত হবে।

ময়দান হকি লীগ

ময়দান হকি লীগ ধীরে ধীরে পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। কোন অপ্রত্যাশিত ফলাফল এখনও পর্যন্ত ঘটে নি বলেই বোধ হয় আসন্নটা তেমন জমছে না। ময়দান হকির নামী দলগুলি অন্যান্য দলের বিপক্ষে জয়ী হবে সহজেই, কারণ বাংলার



শ্যামসুন্দর মিত্র

বো এ সিকে। বি, এন, ক্রলের সেন্টার ফরওয়ার্ড গুরুদর্শন সিং একাই চারটি গোল দিয়ে লীগের তৃতীয় হ্যাটট্রিক লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। মহামেদান স্পোর্টিং দল লীগের দ্বিতীয় খেলায় কোনক্রমে ১-০ গোলে পুর্লিশ ক্লাবকে পরাজিত করে।



দিলীপ সরদেশাই



হাবিব

হাইকো খেলোয়াড় পুন্ট দলগুলির প্রতি অনেক বেশি।

ইস্টবেঙ্গল ৪-০ গোলে রেজার্স ক্লাবকে অনায়াসে পরাজিত করে। কিন্তু রেজার্সের রক্ষণভাগের দুর্বতার জন্য মোহনবাগান ক্লাবকে বাথেন্ট বেগ পেতে হয় রেজার্সকে পরাস্ত করতে। মোহনবাগান কোনক্রমে ১-০ গোলে জয়ী হয়ে সম্মান রক্ষা করে।

লীগের তৃতীয় খেলায় ইস্টবেঙ্গল জ্যোভেরিয়াসকে অতি সহজেই ৫-০ গোলে পরাজিত করে। এই জ্যোভেরিয়াসই পূর্ববর্তী একটি খেলায় কাস্টমসের কাছ থেকে একটি মূল্যবান পয়েন্ট ছিনিয়ে নেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। বি, এন, ক্রেলদল ৬-০ গোলে পরাজিত করে

সঙ্গীত-নাটক
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
ভারতীয় সম্রাটের ইতিহাস
প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ
প্রতি ভাগ-৫।

হারমোনিয়াম শিক্ষা
মূল্য-০.
বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ময়দানের রান্ধমুক্তি চাই

আমরা এখন নীরবে প্রতীক্ষা করছি সেই দিনটির জন্য, যেদিন আমাদের কলকাতার ক্রীড়াঙ্গণের রান্ধমুক্তি ঘটেবে। ক্রিকেট, ফুটবল এমন কি হকির ক্ষেত্রেও মণ্ডিমেয় স্বার্থান্বেষী চারিত্রের অনুপ্রবেশের দ্বারা সর্বনাশের আর কিছুই বাকি নেই। বাংলার ফুটবলের পরিচালক সংস্থা আই, এফ, এ'র সম্বন্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু আই, এফ, এ'র পরিচালকদের চরম বেচ্ছাচারিতা এবং চরম অন্যায় কার্যাবলীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধার্মিক উত্তেজিত কাজে কিছুই করা সম্ভব হয় নি এতদিন। পরম প্রভাবশালী একজনকে খাতি হিসাবে আঁকড়ে থেকে আই, এফ, এ'র দুঃস্বপ্ন মনের আনন্দে অনেক কেলেঙ্কারীই করে গিয়েছেন।

আই, এফ, এ'র তহবিলের বিপুল অর্থ তহরুপের ঘটনা ক্রীড়ামোদীদের মনে আছে। এই ঘটনার সময় আই, এফ, এ'র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন শ্রীঅতুল ঘোষ এবং আই, এফ, এ'র বেতনভুক সম্পাদক ছিলেন শ্রী এম দত্তরায়। অর্থ তহরুপের ওই বিরাট কেলেঙ্কারীর পর কর্মকর্তাদের সকলের উচিত ছিল পদত্যাগ করা। যদিও অবশ্য শ্রীদত্তরায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেতনভুক সম্পাদকের পদ থেকে সরে আসেন। অন্য কোন দেশ হলে ওই চরম কেলেঙ্কারীর পর শ্রীবেচু দত্তরায়কে আর আই, এফ, এ'র গ্রীসীমানায় ঘেষতে দেওয়া হতো না। কিন্তু আমাদের বাংলার ক্রীড়াঙ্গণের দুর্ভাগ্য যে বেচুবাচু পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে এখনও আই, এফ, এ'র ওপর স্বরদারী করে চলেছেন।

কয়েক বছর পূর্বে খেলার মাঠের কর্তৃত্বভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করলে আই, এফ, এ'র শক্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়। কারণ মাঠের দেখা-শোনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে ভার হেওয়ার্ডস কোম্পানীর কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেবার ফলে আই, এফ, এ'র অর্থাগমের পক্ষে অনেকটা বাধার সৃষ্টি হয়। এরপর সরকার চ্যারিটি খেলার কর্তৃত্বভার নিজের হাতে নেবার উদ্যোগ করতেই আই, এফ, এ'র কর্মকর্তারা মরীয়া হয়ে ওঠেন। সভাপতি শ্রীঅতুল ঘোষের কাছে দরবার করে অনেক জল খোলা করে চ্যারিটির কর্তৃত্বভার নিজদের হাতে রাখার ব্যবস্থা পাকা করে নেন তারা। চ্যারিটি মাঠের সংগৃহীত

প্রচুর অর্থ দিয়ে যে কি চ্যারিটিই না করেন আই, এফ, এ তা ভগবানই জানেন এবং জানেন ওই সংস্থার দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা।

আই, এফ, এ-তে কিছুদিন যাবৎ এমন ধরনের লোকেদের আমদানী হয়েছে যাদের ফুটবলের সম্বন্ধে কোন পরিচয় ছিল কিনা কোনদিন তা বলা শক্ত। এ'রা বর্তমানে ক্ষমতার লোভে এবং আরও অনেক আশায় এসে ভিড় করেছেন। তাই বর্তমানে সত্যিকারের ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়ামোদীদের স্থান হয় নি আই, এফ, এ-তে। যাদের সঙ্গে ফুটবলের ক্ষণ পরিচয় ছিল বা কোন সম্পর্কই ছিল না তারা বাংলা দেশে ফুটবলের পরিচালনা করছেন অর্থের জোরে, খুঁটির জোরে এবং ক্ষমতার জোরে। সেইজন্য স্বার্থদুষ্ট বিগঞ্জে পরিচালিত



বাপু, নামকান।

হচ্ছে বাংলার ফুটবল। আমাদের প্রশ্ন যে আজ গোমস্ত পাল, উমাপতি কুমার বা ছোটেন মজুমদারদের স্থান হয় না কেন আই, এফ, এ-তে। অতীতের এইসব খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় বাঁরা ফুটবলের ক্ষেত্রে বাংলাকে উজাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজদের বৃক্কের রক্ত জল করে, ডাঁদের চাইতে ফুটবলকে বেশি ভালবাসেন, বেশি রোবেন বর্তমানের আই,

এফ, এ'র পরিচালকবৃন্দ। একথা চিহ্নিত করতেও দৃষ্টি লাগে। কিন্তু আই, এফ, এ-কে দোষমুক্ত করা বর্তমানে খুব সহজসাধ্য নয়। কারণ অনেক মোমাছি-ই মধুর লোভে এখানে ভিড় করে আছেন এবং আই, এফ, এ থেকে শেষ রসবিন্দুটুকু শুষে না নিয়ে তারা বিদায় নেবেন না কোনমতেই।

১৯৬৩ সালে সরকার খেলার মাঠের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করার পর চ্যারিটির কর্তৃত্ব হাত দিলে আই, এফ, এ'র কর্মকর্তারা কলহের সৃষ্টি করে নোংরা পক্ষে ক্ষমতা নিজদের হাতে রাখেন। বাংলার ফুটবল জগতের সত্যিই মংগল হবে যদি আমাদের নবগঠিত সরকার ফুটবল জগতের দুর্নীতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। প্রথমেই সরকারের শিক্ষানবস্তরের ক্রীড়াবিভাগের গ্রহণ করতে হবে চ্যারিটি খেলার ভার। আই, এফ, এ'র চ্যারিটির ক্ষমতা হাতে রাখার এত বাসনা কেন? রাজ্যের ফুটবল পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত সংস্থার কর্তব্য হওয়া উচিত অন্য অর্থের লালসা তাদের থাকবে কেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে চ্যারিটির ভার সরকার হাতে তুলে নিলে, অনেক অব্যক্তি চরিত্র খসে পড়বে আই, এফ, এ থেকে। আই, এফ, এ থেকে দৃঢ় প্রতিরোধের চেষ্টা হবে যদি চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন, কিন্তু অগণিত ক্রীড়ামোদীর শূভেচ্ছা নিশ্চয়ই থাকবে সরকারের প্রচেষ্টার প্রতি।

খেলার মাঠের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই কোন। নির্মল আনন্দের এবং চিত্তবিনোদনের স্থান ক্রীড়াঙ্গণের বহুদূরে থাকা উচিত রাজনীতির। ক্রীড়াঙ্গণে যদি রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে তবে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। ক্রীড়াঙ্গণে রাজনীতির অনুপ্রবেশের বিষম ফল দেখা গিয়েছে ১৯৬২ সালে জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমসের আসরে।

রাজনীতিবিদদের মধ্যে অনেকে অবশ্য ক্রীড়ানুরাগী হতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় ক্রীড়াঙ্গণের বিভিন্ন পরিচালক সংস্থা থেকে তাদের দূরে সরে থাকাই উচিত। ক্রীড়াঙ্গণের সবচেয়ে বড় শত্রু হল কিছু পেশাদার রাজনীতি ঘেষা ক্রীড়াপরিচালক। আমাদের প্রতিটি ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়ামোদীদের এখন এগিয়ে আসা উচিত বাংলার ক্রীড়াঙ্গণকে এই সমস্ত স্বার্থান্বেষী বহুদূরপার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য।

—সুদর্শন

সম্পাদক—জয়ন্তী সেন

বসন্তী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১২

বসন্তী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ম হা ভা র ত

প্রথম খণ্ড বোড বাঁধাই (মূল্যস্থ) : মূল্য—বার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড " " : মূল্য—বশ টাকা

চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—হর টাকা

পঞ্চম খণ্ড : মূল্য—(বোড বাঁধাই) আট টাকা

অল্প-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা

চাকরীর উমেদারী না করিয়া বিজ্ঞানবলে
বলীরাল হউন

বাণিজ্যে লক্ষ্যী লোভ

করিয়া সৌভাগ্যবান হউন

হাজার জিনিষ

সহস্র পণ্য প্রস্তুত করিবার সহজ ও
সরল উপায়

প্রতি ভাগ এক টাকা

—প্রথম ভাগে আছে—

রন্ধন-প্রক্রিয়া ১৫৬ রকমের। ফলপ্রদ মৃদুটিযোগ
৩৪১ প্রকারের। চাকপ্রদ যাদু-বিজ্ঞান ৮৫
প্রকারের। মনোহারী আতসবাজী ৪১ প্রকারের—
এতদ্ভিন্ন

বস্ত্ররঞ্জন—ধাতুরঞ্জন

কার্পাসরঞ্জন—ধাতুশিল্প

পেন্ট ও বাণিশ—প্রভৃতির

ব্যবহারিক উপদেশ সহ বিস্তৃত ব্যবহারিক
প্রস্তুতপ্রণালী।

—দ্বিতীয় ভাগে আছে—

প্রসাধন সূত্রভি ১০২ রকমের; বিস্তৃত সাবান প্রস্তুত
প্রণালী; সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী; মোমবাতি প্রস্তুত
প্রণালী; ফলপ্রদ গৃহ-চিকিৎসা—হেঁকিমী ও
হোমিওপ্যাথি; মস্ত-তন্ম; ভাগ্যফল; বুননির প্যাটার্ন।
সংসারসাধার যে কিছু, বত কিছু, বাহা কিছু, আবশ্যিক তাহা
শিখিবার ও শিখাইবার একমাত্র পুস্তক।

জনসাধারণের বর্তমান অসচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
নামমাত্র মূল্য নির্ধারিত।

শ্রীমদানন্দমঠের অমর অনন্দমঠ

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বাল্মীকিচন্দ্রের অমর অনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবৃত্ত

- ০ অনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পুস্তিকা
- ০ অনন্দমঠে—‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের পুস্ত-প্রকাশ।
- ০ অনন্দমঠে—ঋষি বাল্মীকি ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সম্বন্ধে
অনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অংশশতাব্দীর সাধনে ভারতের
স্বাধীনতা অর্জিত
ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক
মূল্য—তিন টাকা

গীতিনাট্য-সম্রাট

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

৪র্থ ভাগে—রজাবতী, নারায়ণী, দুর্গা, ফজলিয়া, আলিয়ার,
জয়ন্তী, ফুলী।

৫ম ভাগে—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাজাদি, শূন্যমাকল,
বৃন্দাবনবিলাস, রূপের ডালি।

৬ষ্ঠ ভাগে—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুলভঙ্গ,
খাজাহান, বিরাটকুঞ্জ, রামাকুঞ্জ।

৭ম ভাগে—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদোয়া, কুমারী, বহুলা,
কবিকাননিকা, রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

৮ম ভাগে—আহেরিয়া, উলুপী, দৌলতে দুনিয়া, নিরালি,
প্রেমাজলি, মন্দাকিনী, গুহামাধো, পতিভার
সিদ্ধি, ধ্রুব। মূল্য প্রতি খণ্ড ২০০ টাকা।

হাত-হাতী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষার্থী
স্বাধীনতার ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ

৥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রেস্ট সহায়ক ৥

* * স্বল্পপত্রমে পর্ণাপ্ত ফল অবশ্যস্ভাবী *

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা যা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অস্বিতীয় সাহায্য গ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - লক্ষ্যার্থ

ইংরাজী হইতে বাংলা—(বোড বাঁধাই) ০.৫০

ইংরাজী হইতে উর্দু—০.০০

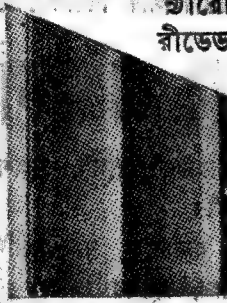
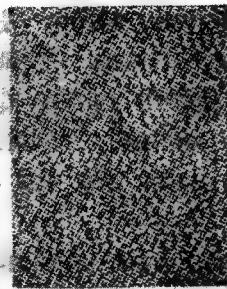
বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলি-১২

11 MAR '67

11 MAR '67



মরেক

আগো
রীডেড

মরকো পিন্‌হেড



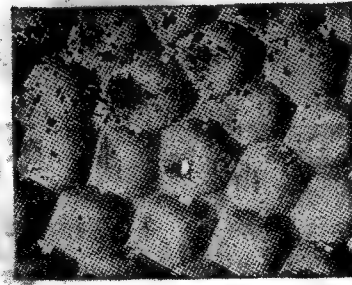
রাফকাট

আজকালকার স্বপতির গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন

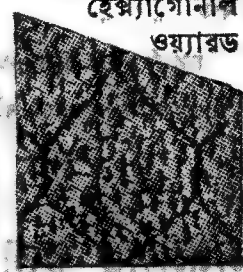
আজকের দিনের বাড়ীর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইন্ডু ও হাসপাতালে স্বপক ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিবৃত্ত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিশাভের শতাব্দিক যুগের কাচনির্মাণকারী প্রতীক পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর-যোগ্য ভাগ কিনিস কেনা।

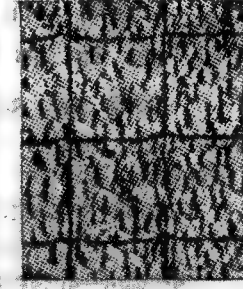
হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্লাস ওয়ার্কস
লিমিটেড



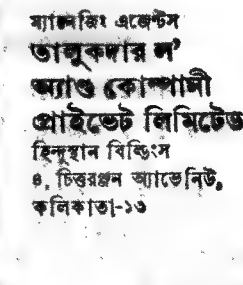
ছর্মির্ড

হেপ্যাগোনা
ওয়ার্ড

সিট গ্লাস



জজিয়ান ওয়ার্ড

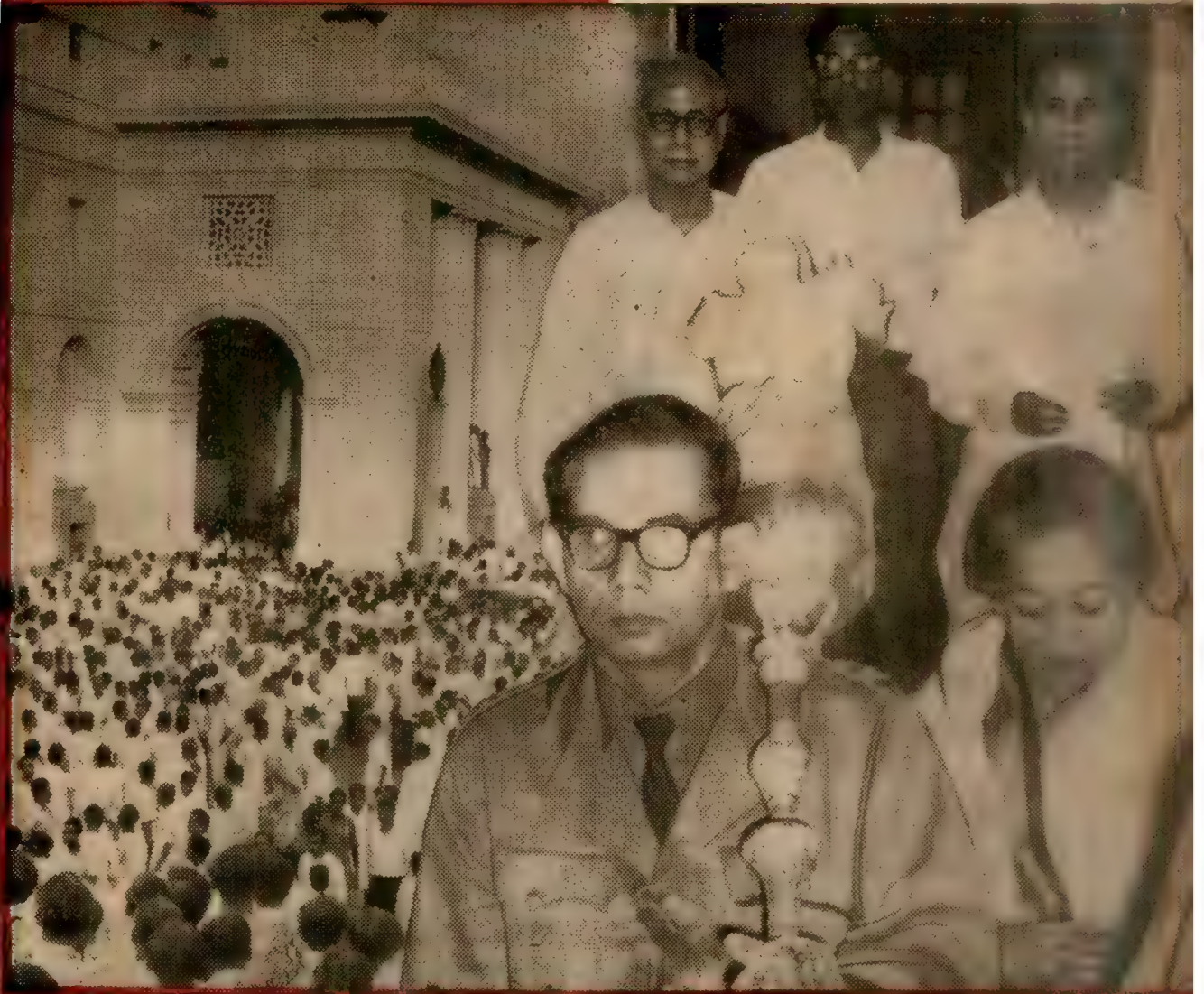


ম্যানজি এজেন্টস
ভালুকদার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন আভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

BVTMP 1275A

সাপ্তাহিক বসুমতী

অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্বোধনার মধ্যে
রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বাজেট
অধিবেশন শুরু



বর্ষ : ১০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২রা চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ



16th March, 1967 • Vol 71



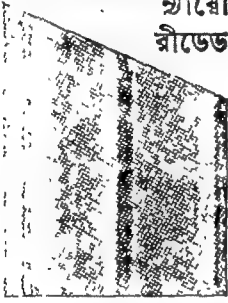
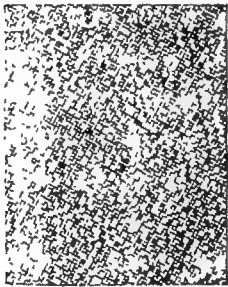
ফেমিলা ক্রীম

একাত্তরের রূপ-কথার শেষ কথা

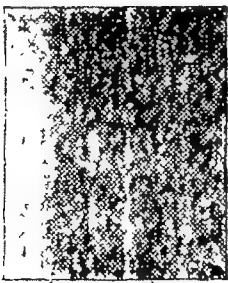
বোম্বাইয়ের হাটস, কলিকাতা-৩



মরেক

স্মারো
রীডেড

মরকো পিন্‌হেড



রাফকাস্ট

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন

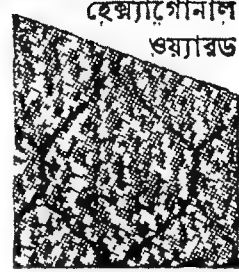
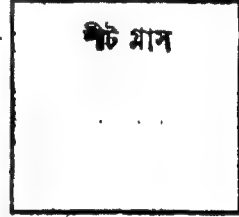
আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইন্ড্রল ও হাসপাতালে সুদৃক ইঞ্জিনিয়াররা লক্ষ্যই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিৰ্মিত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর-যোগ্য ভাস জিনিস কেনা।

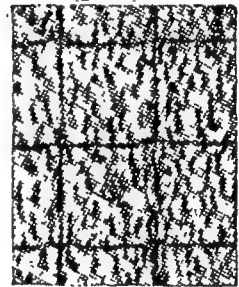
হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্লাস ওয়ার্কস
লিমিটেড



হাৰ্মিড

হেপ্যাগোনাল
ওয়ার্ড

শিট গ্লাস



জজিয়ান ওয়ার্ড

ম্যানজিং এজেন্টস
ভালুকদার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিজিৎস
৪, চিত্তবন্দন অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

প্রথম খণ্ড বোর্ড বাঁধাই (বন্দুস্ত) : মূল্য—বার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড " " : মূল্য—দশ টাকা

চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—দুই টাকা

পঞ্চম খণ্ড : মূল্য—(বোর্ড বাঁধাই) আট টাকা

অন্ন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা

চাকরীর উমেদারী না করিয়া বিজ্ঞানবলে
বলীমান হউন

বাণিজ্যিক লক্ষ্য লভ

করিয়া সৌভাগ্যবান হউন

হাজার জিনিষ

সহস্র পণ্য প্রস্তুত করিবার সহজ ও
সরল উপায়

প্রতি ভাগ এক টাকা

—প্রথম ভাগে আছে—

রন্ধন-প্রক্রিয়া ১৫৬ রকমের। ফলপ্রদ মৃদুষ্টিযোগ
৩৪১ প্রকারের। চমকপ্রদ যাদু-বিজ্ঞান ৮৫
প্রকারের। মনোহারী আতসবাজী ৪১ প্রকারের—
এতদ্ভিন্ন

বস্ত্ররঞ্জন—ধাতুরঞ্জন

কাষ্ঠরঞ্জন—ধাতুশিল্প

পেন্ট ও বাণিশ—প্রভৃতির

ব্যবহারিক উপদেশ সহ বিস্তৃত ব্যবহারিক
প্রস্তুতপ্রণালী।

—দ্বিতীয় ভাগে আছে—

প্রসাধন সূত্রাভি ১৩২ রকমের; বিস্তৃত সাবান প্রস্তুত
প্রণালী; সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী; মোমবাতী প্রস্তুত
প্রণালী; ফলপ্রদ গৃহ-চিকিৎসা—হেঁকিমী ও
হোমিওপ্যাথি; মন্ত্র-তন্ত্র; ভাগ্যফল; বুননির প্যাটার্ন।
সংসারসাধারণ যে কিছু, যত কিছু, যাহা কিছু অবশ্যক তাহা
শিখিবার ও শিখাইবার একমাত্র পুস্তক।

জনসাধারণের বর্তমান অসচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
নামমাত্র মূল্য নির্ধারিত।

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বর্ষিকমন্ডনের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- ০ আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাস
- ০ আনন্দমঠে—‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রের পুঁত-প্রকাশ।
- ০ আনন্দমঠে—ঋষি বর্ষিকমন্ডন ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বিত
আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অমরশতাব্দীর সাধনে ভারতের
স্বাধীনতা অর্জিত
ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক
মূল্য—তিন টাকা

গীতিনাট্য-সম্মাট

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

কারোদ গ্রন্থাবলী

৪র্থ ভাগে—রঞ্জাবতী, নারায়ণী, দুর্গা, ফুলশয্যা, আলাদিন
জয়ন্তী, ফুলী।

৫ম ভাগে—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাজাদি, পুনরাগমন,
বৃন্দাবনবিলাস, রূপের ডালি।

৬ষ্ঠ ভাগে—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুলভগ
খাজাহান, বিরাটকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদেরো, কুমারী, বরুণা
কবিকাননিকা, রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

৮ম ভাগে—আহেরিয়া, উলুপী, দৌলতে দুর্নিয়া, নিয়তি
প্রেমাজলি, মন্দাকিনী, গৃহামধ্যে, পতিতার
সিঁথি, ধ্রুব। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৫০ টাকা।

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষান-
রাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

* * প্রত্নপুস্তকে পর্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী *

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা বা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অম্বিতীয় সাহায্য গ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—(বোর্ড বাঁধাই) ৩.৫০

ইংরাজী হইতে উর্দু—৫.০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



বিষয়	লোক						পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৪৯৯
আজকের মানব	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫০০
ভারতদর্শন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫০১
জাতকজাতিক	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫০৭
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচরন)	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫১০
ছায়াপথ (কবিতা)	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫১৭
নব মনিসভা সমীপে	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫১৮
বড় দিনের কাহিনী (অনুবাদ গল্প)	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫২০
বঙ্গদর্শন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫২৩
দীনবন্ধুর একটি অধ্যায়	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	২৫২১

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দে মাতরম্—মন্ত্রের স্বাধি

বন্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিশ্ববন্ধ, মৃগলাভগুরী, মৃগালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারানী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩ টাকা

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকসহস্রা, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মৃচিরাম গড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান সহস্রা। মূল্য—তিন টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরভাগনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাধাই)—সাত্বে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিস্তা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, স্বজাভাগনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী বিবিধ কাব্য, মামা কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাধাই) সাত্বে ভিন টাকা

৩ঃ মতিলাল দাস প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

- ১। চলার পথে (উপন্যাস)
- ২। মনুষ্য (উপন্যাস)
- ৩। বিদ্রোহিনী (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
- ৪। দীপিকা (কবিতা সংকলন)
- ৫। চার্বাক (নাটক)



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অবসর (গল্প)	— পূর্ণেন্দু ভৌমিক	২৫০০
দিল্লী থেকে	— শ্রীবিক্রমজ্ঞান ভট্টাচার্য	২৫০৮
পাক-ভারতের 'রূপরেখা' (প্রবন্ধ)	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সাহিড়ী	২৫৪২
সুবর্ণালতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা	২৫৪৬
রূপমণ্ড—ওয়েস্ট এবং এসেয়ে	— শিলালি	২৫৪৯
রূপসঙ্গ	—	২৫৫১
লনির দশা	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৫৬
বেলাখুলা	— শ্রীঅমিতাভ	২৫৫৭

ডক্টর পদ্মানন্দ ঘোষাল এম. এ. সি. প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য প্রেমারঞ্জনের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার রূপদান'। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবতা ন জানন্তি। কাহিনী নামক নুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উন্মোচন ও যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্য বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের অদ্যোগান্ত রুম্মবাস উন্মেষ ও অনিশ্চয়তা।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

সার ওয়াণ্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

গরুচন্দ্র মিত্র অনূদিত

সাইড্যানহো, হাইল্যান্ড উইডো, ফেমার

মেড অফ পার্থ, সার্জনস' ডক্টর

মূল্য—০.০০

তৃতীয় ভাগ

সরোজনামা ঘোষ অনূদিত

দি রাইড অব জ্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোল, ক

দি এ্যান্টিকোয়ারি

মূল্য ১৫০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত মূল্যবান বাংলা পম্বারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর

'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ

এবং শ্রীগোরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য

রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমভরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীমদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...দুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।

আবির্ভূত হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃষ্ণবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের নাম বাংলায় প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন।

এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



৭১ বর্ষ : ৪০শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২রা চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 16th March, 1967

প্রধানমন্ত্রীর দায়-দায়িত্ব

কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতৃত্ব লাভ করেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নেতৃত্ব লাভ করায় কংগ্রেসের সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। শ্রীমোরারজী দেশাইকে উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ তদুপরি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার না দিলে ঐষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানো সম্ভব হতো না একথা বলাই বাহুল্য। তবে বর্তমানে কংগ্রেসের যে দুঃসময় রাজ্যে রাজ্যে চলেছে, তাতে কেন্দ্রে আগামী পাঁচ বছরের জন্য কংগ্রেস-এর নির্বিবাদ নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এটাও অনুধাবনযোগ্য।

ম্যাপার যে, মোরারজীর মতো শক্ত লোক এখন 'দেশ ও দলের স্বার্থে' নমনীয় হতে পেরেছেন, তখন শাসন-পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর নামে গোড়ামির যে কথা শোনা যায়, তাও কিছুটা শিথিল হতে পারে। অবশ্য প্রকৃত জনস্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে কঠোরতার বাধা নেই, কিন্তু তাতে বিব্যাট জ্বরভের সাড়ে সাতচল্লিশ কোটি লোকের আন্তরিক সাহায্য আছে কি না তার বিচার-বিবেচনা করতে হয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেরেই অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন। উপ-প্রধানমন্ত্রীও তাঁর নিয়োজিত। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরই উপ-প্রধানমন্ত্রীর যে বিচক্ষণ বুদ্ধি ও দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা থাকা দরকার—তার সবই শ্রীমোরারজীর আছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদের উল্লেখ সংবিধানে নেই। এই না থাকা সত্ত্বেও নেহরুব সময় শ্রীব্রজভাই প্যাটেল উপ-প্রধানমন্ত্রীরূপে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে গেছেন। বলা যেতে পারে, বোম্বাই থেকে আগত শ্রীমোরারজী, দীর্ঘকাল পর হলেও, তাঁরই উত্তরাধিকারী হতে পেরেছেন।

ব্রজভাই সম্পর্কে আর যা মিমত থাকুক না কেন—তিনি যে ভারতের সার্বভৌমত্বের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, এ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দলের শাসন। সুতরাং বর্তমান সময়ে আরো বেশি বিচক্ষণ বুদ্ধির প্রয়োজন। বৈচিত্র্যের মধ্যে একা স্থাপনই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শচেতনার প্রধান দিক। দলীয় স্বার্থ ত্যাগ করে ভারতীয় আদর্শকে গ্রহণ করতে পারলেই বৈচিত্র্যের মধ্যে একা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীরূপে সে আদর্শ রূপায়ণে হয়তো সার্থক হতে পারবেন। ভরসার কথা, যে সব রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার শাসনভার গ্রহণ করেছেন, সে সব রাজ্যের মধ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রের সাহায্য অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন এবং তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। কেবালার সমস্যা দ্রুতীকরণের নামে সেখানে অ-কংগ্রেসী সরকারকে সরিয়ে রাজ্যপালের শাসন চালু করা হয়েছিল। এবার অবশ্য কেবালার শাসনব্যবস্থার রাজ্য কংগ্রেস দলের মাথা গলবার কোনো ক্ষমতা নেই।

আমরা মনে করি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীগান্ধীর সামনে আজ বিরাট দায়-দায়িত্ব। মন্ত্রী নিরুপণেও সেই দায় কম নয়। এ ব্যাপারে দলের ও প্রভাবশালী মতের নির্দেশ যথাসম্ভব পরিহার করে কুশলী ও কার্যক্ষম ব্যক্তিদের মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা দরকার। ভুল নীতির জন্যে সমগ্ররূপে মন্ত্রিসভার যদি দায়িত্ব থাকে তাহলেও সেই ভুল নীতি

গ্রহণের জন্য অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরীকে বিপুল ভোটার ব্যবধানে পরাজিত হতে হয়েছে। বিশেষত যাদের নামে জন-বিরোধী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শোনা গেছে, এবারের নির্বাচনে তাঁদের অনেককে পরাজিত হতে হয়েছে। এ নিশ্চয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। দেশ এখন সমূহ সঙ্কটের মধ্যে চলেছে। মাদ্রাসা হাঙ্গামার দ্ব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যসঙ্কট, গরীব-বড়লোকের আয়ের মধ্যে চরম বৈষম্য প্রভৃতি নানা সমস্যা এখন প্রধান-মন্ত্রীর সামনে রয়েছে। ভাষা সমস্যাটাও কম সমস্যা নয়। হিন্দী ভাষার রোলান্ড চলেছে এখন ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলির ওপর। দেশের নাগরিক হবে দেশের জন-বায়তে মানুষ হয়ে, দেশের নাগরিকদের স্বারা নির্বাচিত হলেও (যদি হিন্দী ভাষা মাতৃভাষা না হয়) মাতৃভাষায় দেশ ও দেশের কথা লোকসভায় ব্যক্ত করার অধিকার নেই। এ সমস্যা এখন প্রধানমন্ত্রীর নামে। মাদ্রাজের মধ্যমন্ত্রী ভাষায় ব্যাপারে তাঁদের দাবি জানিয়েছেন। অন্যান্য ভাষাভাষী রাজ্যের নাগরিকদের মনের কথাও এখন অজানা নয়। তবে কর্তব্যাক্তিদের ঘুম ভাঙে নি। ফলে দেশের একা বিনষ্ট হচ্ছে।

আমরা দাবি করি, সারা ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রাণের কথা, মনের ভাষা প্রধানমন্ত্রী অনুধাবন করুন। পেরোয়া হয়ে চলার দিন আর আছে কংগ্রেসের নেই। অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করলেই সংকট থেকে মৃত্তিলাভ করা সম্ভব।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সরকারকে ঘা দিতেই চেয়েছিলেন, নিজে সরকার গঠন করবেন—এতটা বোধ হয় কম্পনাও করতে পারেন নি আগে। এমন কি নির্বাচনপ্রার্থী সৈদিন হলেন সৈদিনও রাজ্যের ভার নেবার কথা ভাবতে পারেন নি, বরং ভেবেছিলেন তাঁর অভিযোগ বা দাবি-দাওয়া শুধু রাজ্য সরকারকে জানালেই হবে না, কেন্দ্রের কানেও পৌঁছতে হবে। তাই লোকসভার প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, নিজের বা দলের আশাতিরিক্ত সাফল্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলে আগের মতো বিধানসভার সদস্যপদের জন্যেই প্রতিশ্রুতি করতেন। কিন্তু ভোটের রা ডি-এম-কে'র আঁজলা ভরে উঠেছেন, আমাদুয়াই-এর পক্ষে যা স্বপ্নেরও অতীত ছিল, বাস্তবে তাই রূপায়িত হলো। ডি-এম-কে দল নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ট্যাক্সে। ক্ষমতার আসনে যখন ডি-এম-কে, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গদিটিও যে আমাদুয়াই-এব—এ তো প্রেক্ষারত স্বভাবসিদ্ধেব মতো।

শ্রীকৃষ্ণপুরম নটরাজন আমাদুয়াই তিন দশকের angry young man বা ক্রুদ্ধ যুবক; তবে গঠনমূলক। ছোটখাট এবং প্রায় আঙুলিক সমস্যা নিয়েই তিনি চিন্তা করতেন বেশি, বিরাট নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। খানিকটা সঙ্কীর্ণ ও বলা চলে, আধুনিক মতবাদ তাঁকে সৈদিন বিশেষ আকর্ষণ করতে পারে নি। তাঁর সৈদিনকার মতাদর্শকে স্বাভাবিকবাদ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ হলেও স্বতিনিভিন্ন, প্রাচীন ঐতিহ্য বক্ষায় অগ্রসর বলে সাধারণ লোকের সমর্থনও মিলেছে প্রচুর। দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই, কিন্তু আঁর্বো এসে সে-সভ্যতা কিনাশে উনাত হই। তামিলনাগদেই দ্রাবিড় সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল, তাই এই অঞ্চলের স্বাভাবিক বজায় রাখতে হবে, উত্তর ভারত থেকে আগত তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-দের শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের হাত থেকে তামিলভাষী ও তামিলনাগকে রক্ষা করতে হবে। এই স্লোগানগুলিকে মূল-ধন করে মাদ্রাজে জন্ম নেয় দ্রাবিড় কাক্সাম দল, জনক প্রখ্যাত জননায়ক ই-ভি-রামস্বামী নাইকার। একই চিন্তা-ধারা ও আদর্শে স্নাত তরুণ আমাদুয়াই ডি-এম-কে একজন গুরুত্বপূর্ণ স্থান কর-

ছিলেন, স্কুল-মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেলেন তিনি নাইকার-সামিথ্যে।

কৃষ্ণপুরমে ১৯০৯ সনে আমা (মানে দাদা, মাদ্রাজের তরুণরা তাঁকে অগ্রজের সম্মান দেন)-র জন্ম, এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান, তাই আদর-আশ্রয় সবই পেয়েছিলেন, কিন্তু তার সম্ভাবহারও করেছেন। ভালো ছাত্র হিসেবে মাদ্রাজের পচাইয়াপ্পা-কলেজে আজকের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র দলনেতা অধ্যাপক এন-জি-রঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম-এ পাশ কবে শিক্ষকতার কাজ নিষ্ঠাছিলেন স্বপ্নকাকুর জন্যে।



আমাদুয়াই

কিন্তু গুরু নাইকারের খোঁজ পেয়ে সব ছেড়ে তার আশ্রমে ছুটলেন—অর্থাৎ 'কুদি আরসু' সাময়িকপত্রের অফিসে। গুরু নাইকার ছিলেন তার সম্পাদক, শিষ্য আমাদুয়াই পেলেন সহকারী সম্পাদকের পদ। অসুবিধে আমাব ছিলো না কিছুই, ছাত্র বয়স থেকেই সভা-সমিতি, বিতর্ক-সভা ও নকল সংসদ ইত্যাদিতে বক্তৃতা দিয়ে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ লিখে মজবুত করেছিলেন সাংবাদিকতার ভিত, আর 'কুদি আরসু' যে-আদর্শ সৈদিন প্রচার করছিলো সে তো আমাদুয়াই মনের কথা। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মিশ্র বিবাহ, তামিল ভাষার প্রের্ত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়েই তো তিনি

দ্রুতকাল বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন।

নাইকার নতুন দল গড়লেন আমা এবং সমাদর্শী আরো বহু তরুণ সমর্থক পেয়ে। কিন্তু দ্রাবিড় কাক্সাম দলে যোগ দেবার আগেও আমার রাজনৈতিক জীবন ছিলো। তবে জাতীয় কংগ্রেস-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়াটা সৈদিন পরম সম্মানের বলে বিবেচিত হলেও আমা-যুগ ছিলেন জাস্টিস পার্টির সঙ্গে। ভাবতে অবাক লাগে, আজ মাদ্রাজ যাকে প্রধান নেতা বা মুখ্যমন্ত্রীর গদি এগিয়ে দিলো সাগ্রহে, তাঁকে সম্মান্য করপোরেশনের একাধি আসন দিতেও রাজী হয় নি ১৯৩৫ সালে, আমাকে সৈদিন নির্বাচনে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিলো।

দ্রাবিড় কাক্সাম নাইকারের "আখ্য-সম্মান-আন্দোলন"—এরই বিমূর্ত পরিণতি। মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহীশূর ও কেরালা নিয়ে পুরোদস্তুর তামিলভূমি গঠনই এ-দলের প্রধান কর্মসূচী। এ ছাড়া ছিল দ্রাবিড় সভ্যতার উন্নতিসাধন; তামিল ভাষার প্রসার প্রচেষ্টা, হিন্দী-প্রতিরোধ, বিলাসিতা, মদ্যপান, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি বর্জন, শ্রমিক ও কৃষকদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিরোধ ইত্যাদি। কিন্তু ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতার প্রাক-মুহুর্তে নেতা নাইকারের সঙ্গে আমার বিরোধ বাখলো—প্রচারিত আদর্শের বাবহারিক দিক নিয়ে। ক্রুদ্ধ যুবক আমা বেশ কিছু তরুণ সমর্থক নিয়ে দল ত্যাগ করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই নতুন দল দ্রাবিড় মুন্নেত্রা (প্রগতি) কাক্সাম গঠন করলেন।

উগ্র হিন্দী-বিরোধিতার জন্য ডি-এম-কে দল আঁচরেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। হিন্দীর বিরুদ্ধে আমার জেহাদ প্রায় তিন দশক ধরে এবং এ-বাবদে তাঁকে বিদেশী ও স্বদেশী সরকারের হাতে লাঞ্ছনাও সহিতে হয়েছে। ১৯৩৭ ও '৩৮ সালে দু'বার তাঁকে হিন্দী-বিরোধী সভ্যগ্রহ পরিচালনা করার জন্যে কারাবাস করতে হয়। স্বতন্ত্র দ্রাবিড়স্থানের দাবিতে ডি-এম-কে একদিন দক্ষিণ ভারতে ঝড় বইয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা আমা বুঝতে পেরেছেন, তাই শাসনভার পেয়ে সে-দাবি মূলতুবী রেখেছেন। কিন্তু ডি-এম-কে'র অন্যতর আদর্শ মদ্যপান ও ঘোড়দৌড় বর্জনের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী আমাদুয়াই এখনো সঙ্কল্পে অটল। গরীব চাষী ও কৃষকদেরও তিনি ভোলেন নি ক্ষমতা পেয়ে,—ভূমি-রাজস্ব বাতিল করে দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। ডি-এম-কে মাদ্রাজের শাসনভার গ্রহণ কবে তার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করছে, প্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে সে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণে মন দিয়েছেন আমাদুয়াই। এটা আশার কথা বৈকি।

ভারতের সকল রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভা কার্যারম্ভ করতে সুযোগ পান নি এখনো। যে দু-একটি রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কার্যারম্ভ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন। আর এই সংবাদে দেশে একটা সুস্থ আবহাওয়া সবে গড়ে উঠছিল। এমন সময় আঘাত এলো রাজস্থানের রাজ্যপাল ডাঃ সম্পূর্ণিনন্দের প্রাসাদ এবং কংগ্রেসী পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীসুখাভিয়ার ঝুল বারান্দা থেকে। উভয় ক্ষেত্রেই আঘাত হানা হ'ল জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত এবং একত্র গণনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অকংগ্রেসীদের ওপর। আলোচ্য রাজ্যে যেন একটা মিলিটারি কুপ-টুপ হতে চলেছে। রাজপথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে গেল সশস্ত্র সিপাহী। হরতাল বিক্ষোভ এবং মিছিল বিপর্যস্ত করল নির্বাচনোত্তর রাজস্থানকে। গ্রেপ্তার করা হ'ল নির্বাচিত বিরোধী সদস্যদের। জনতার ওপর পুলিশ যখন চড়াও হয়েছে, শ্রীযুত সুখাভিয়া এন্ড কোম্পানী তখন সুখাভিয়া ভবনের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্বাচক-পেটানো 'কংগ্রেসাইনে'র নমুনা দেখছেন এবং উপভোগ করছেন।

আইন, না কংগ্রেসাইন : রাজস্থানের বর্তমান ঘটনাবলী এই প্রশ্নের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। আইন বলে, রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই মন্ত্রিসভা গঠনে প্রথম আহ্বান জানাবেন। কংগ্রেসাইন বলে, যখন যেমন সুবিধা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সেই যুক্তিতেই কার্যে করতে হবে। তাই লড়াই। বাদানুবাদ। বিক্ষোভ। দমন। এবং গ্রেপ্তার।

১৯৬৭-র নির্বাচনে রাজস্থানে দল হিসেবে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি আসন অধিকার করেছে। ১৮৩টির মধ্যে ৮৮টি আসন। কিন্তু অন্যান্য দল ও নির্দলীয়দের মিলিত আসন সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে সুখাভিয়ারা জনা তিনেক নির্দল সদস্যের সমর্থন লাভ করেছেন বলে দাবি করছেন। সেই দাবিকে ধরলেও কংগ্রেস ৮৮ যুত ৩ সমান ১১টি আসনের মালিক। অন্যান্যরা সেখানে ৯২টির। এক আসনে অকংগ্রেসীয়গণই সংখ্যাগুরু।

কিন্তু রাজস্থানের মননদ সুখাভিয়া বিনা যথেষ্ট ছাড়তে গররাজি। রাজ্যপালও সেই সূত্রে সূত্র মিলিয়ে বলছেন। নির্দলীরা গণনীয় নন। নির্দলীয় সদস্য সংখ্যা পনের জন। এরা কোন বিশেষ কমিউটি নিয়ে আইনসভায় আসেন নি। এদের বিচারবিহীন সংখ্যারূপে গণ্য করাই বিধেয়।



ভারতদর্শন

ইন্দিরা গান্ধী : নেত্রী নির্বাচনের পরে

পৌ-ধরা পরিচর আনন্দ-অগ্র

মুদ্রিকল হ'ল এই বিধানটি সম্পূর্ণ-মন্দস্য তথা কংগ্রেসস্য। তাম্জব বিধান। কংগ্রেসী আইন বা 'কংগ্রেসাইন'। আর এই বিধান হাতের কাছে পেয়ে কংগ্রেসের পৌ-ধরা কাগজগুলিও লক্ষ্যবস্তু সূত্র করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় একটি সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক তো উৎসাহের আতিশয্যে

রাজস্থানে নয়া পরিস্থিতির দরুন আনন্দের পূর্ব-যোষিত বিভ্রান্তিতে রদ বদল করতে হ'ল। উদ্ভিয়ার পরিবর্তে বর্তমান সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনার স্থান দখল করল রাজার স্থান - রাজস্থান। আগামী সংখ্যা থেকে সূত্রাৎ পূর্বদান্দ্যেই রাজ্যগরী বিস্তারিত আলোচনা রাখা হবে।

'কংগ্রেসাইনে'র যৌক্তিকতা এবং "ন্যায্য সিদ্ধান্ত" সাধারণ্যে প্রচারের জন্য পরিগ্রমে গলদঘর্ম হ'য়ে উঠেছিলেন। সম্পাদকীয় নিবন্ধের গোটা স্তম্ভ জুড়ে তাঁরা প্রাণপণ প্রসার্সে চর্চাকার করতে চেয়েছেন, গণ-তন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ডঃ সম্পূর্ণিনন্দ বড়ই নিরপেক্ষ বিচার করেছেন; এমন

বিচার যথার্থ দুর্লভ; এমন সংবিধান-সম্মত উপায়ের অন্যথা কিছতেই করা যেত না। বরং পশ্চিমবঙ্গ এবং ক্বিয়ারেও যে কেন এই বিচারের আলোকে কংগ্রেসী দল জনগণের সরকার কেড়ে নেন নি, এই জনপ্রিয় দৈনিকটির সম্পাদকীয় কলমে তার জন্য বড়ই গোপন বেদনা সুযোগ পাওয়া-মাত্র করবর করে করে পড়েছে।

নির্দলীয় সদস্যদের গণনার বাইরে রাখার অধিকার কোন্ আইনে সিদ্ধ তা অবশ্য ঢেঁকুর তুলেও অথবা কংগ্রেসী-পদলেহনের ফলে হিঙ্কা উগ্গার করতে করতেও প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র কংগ্রেসাইনের জবরদস্তিই সুবিধামত নির্দলীয়দের আলিঙ্গন করায় এবং সর্বনাশ সমুৎপন্নে গলাধাক্কা দেওয়ায় সক্ষম

প্রথমত, অন্যান্য সদস্যবর্গের ন্যায় গণ-সমর্থন নিয়েই নির্দলীয়গণ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি মন্বিতার সুযোগদানের দ্বারাই অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁদের সমমর্যাদাকে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নে এদের কেমনভাবে সরিয়ে রাখা যেতে পারে, তা তাই আদৌ বোধগম্য নয়।

স্বাভীয়ত কংগ্রেসের পরই সদস্য-সংখ্যার হিসাবে নির্দলীরাই স্বাভীয় স্থানের অধিকারী। অন্যান্য দলের স্থান তৃতীয় পর্যায় থেকে সূত্র। ভারতের

শ্রীমত রাজ্যের দলভিত্তিক সদস্য সংখ্যাকে প্রকাশ করে গণনা করলে মোট বিধানসভা আসন, ৩,৩৫২-এর মধ্যে প্রাপ্ত দোষিতদের যে চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে নির্দলদের স্থান ঠিক কংগ্রেসের পরেই। ৩,৩৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছেন, ১,৬৯০। আর নির্দলরা দখল করেছেন ৩১০টি আসন। সেক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানাধিকারী জনসংঘের আসন সংখ্যা ২৬৪। চতুর্থ স্থানীয় স্বতন্ত্রের পর প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে অন্যান্য দল বিভিন্ন রাজ্যে যে হারে নিজস্ব সদস্য প্রেরণ করতে পেরেছেন, তাতে তাঁদের স্থান হয়েছে :

(৫) এস এস পি (৬) ডি এম কে (৭) সি পি আই (এম) (৮) সি পি আই (আর) (৯) পি এস পি (১০) বাংলা কংগ্রেস ইত্যাদি।

সুতরাং প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় যেখানে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের নির্দলীয় সদস্যদের মিলিত সংখ্যাই বিভিন্ন দলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সেখানে কোনো ব্যক্তিই নির্দলীয়দের অস্তিত্বকে ভাঙ্গা সম্পূর্ণনির্দলীয় বৃত্তিতে ঠেলে সরিয়ে রাখা যায় না।

তৃতীয়ত, ১৯৫২ এবং ১৯৬২ সালে আজকের এই বৃত্তিবাদী কংগ্রেসই রাজ্যস্থানে তার মন্ত্রিসভা গঠন করতে নির্দলীয়দের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হয়। আজ সম্পূর্ণনির্দল সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলে নির্দলদের নগণ্য করতে চাইছেন কংগ্রেসী রাজ্য ক্যাম্পে রাখার জন্যই। তিনি বলেছেন, পূর্বনো নজির (গ্যানালজি) সর্বত্র খাটে না। বাস্তবিক। খাটলে আবার সর্বত্র কংগ্রেসী মননদ টেকে না। এ বৃত্তি সমুদ্রের যেমনি চমকপ্রদ তেমনি চমকপ্রদ। আর একেই বলতে চাইছিলাম, 'কংগ্রেসাইন' বা কংগ্রেসী আইন।

কংগ্রেস-প্রধান শ্রী কে কামরাজও বৃত্তি দেখিয়েছেন। একই রকম কংগ্রেসী কোলে কোলটানা বৃত্তি। তিনি বলেন, বিবাদের দরকার কি বাপু। কংগ্রেসকে মন্ত্রিস্ব নিয়ে প্রথমে গুঁড়িয়ে বসতে দাও। তারপর ক্ষমতা থাকে বিধানসভার আধিবেশনই উত্তর পক্ষের শক্তি পরীক্ষা করে নিলেই হবে।

বাহ্যত বড়ই সাধু, প্রস্তুতাব। অস্তিত্ব অসাধু কংগ্রেসাইন যদি বৃকে চেপে বসেই তবে এ প্রস্তুতাব বাস্তবিক সাধুই বলতে হবে। কিন্তু এর মধ্যেও অনেক পাঁচ অনেক কুটনীতি। রাজ্যস্থানের বিরোধীরা মনে করেন, কংগ্রেস এমনভাবে জবরদস্তি ক্ষমতা দখল করলে জনগণের কান মলে টিকে যাওয়ারও চেষ্টা করবে। অর্থাৎ ক্ষমতা প্রদর্শন করে সংখ্যাধিকার জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য ভাঙিয়ে নেবে। ফেলনা নয় এ বৃত্তি। বৃকটিত পাল্লার দিকে

অবতরণেই টান আছে। তার ওপর এটা রাজ্যস্থান। এখানে রাজ্য-রাজ্যীরা ক্ষমতা কাড়াকাড়ির স্বপ্নে লোমছেন। সাধারণ মানুষের মতের দিকে কংগ্রেস বা বিরোধী কেউ যে খুব একটা তাকিয়ে আছে এমন নয়। রাজতন্ত্র কামিনিকালেও গণতন্ত্রী মাহাত্মা রক্ষায় উদ্ভূত নয়। বিরোধীরা স্বতন্ত্রী আধিপত্যে ক্ষমতালোভের প্রত্যাশী। ক্ষমতালোভই মূখ্য কথা। হাতে ক্ষমতা পেলে স্বতন্ত্র দল যে কী পরিমাণ জনদরদ প্রদর্শন করবেন তা নির্বাচনের আগেই ম্যানিফেস্টো ছেপে বলেও দিয়েছেন। স্বীকার করি ফাঁকি নেই। জন-গণমন্দের খার খারেন না এঁরা। সুতরাং জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের আহবান ঠেকিয়ে গণ-প্রতিনিধিই করবেন এমন গণপাজলে খোওয়া প্রতিনিধি অন্যত্রই দুর্লভ, রাজ্যস্থানে তো কখাই নেই। এসব কারণে সমুদ্র দলের ভয় পাওয়ারই কথা। দল ভাঙানোর কংগ্রেসী কৃত্রিমের কথাও কারও অবদিত নেই। পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাকালে এমন চেষ্টাও হয়েছিল এবং এখন তা ফাঁস হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে জমতা ভরানক সজাগ। প্রতি-নিধিদের নিজের প্রতি মমতা আছে। চট করে দল ভাঙার দৃষ্টিসাহস করাও সেখানে হবে না। কিন্তু রাজ্যস্থান। এই রাজ্যের স্থানে, জনতার দৌড় যে কতদূর তা গণতান্ত্রিক ভারতে রাজ্যরাণীদের সেলাম বাজিয়ে ফিরিয়ে আনাতেই ডের বোকা গেছে। এখানে কংগ্রেসী অকংগ্রেসীর লড়াইটা দৃশ্যমানের সঙ্গে গণস্বভেদ্যের লড়াই বলে ধরলে ভুল হবে। এ লড়াইটা হয়েছে কোণঠাসা রাজ্যরাজড়া, জাদীর-ওমরাহের সঙ্গে জিন্ন গোষ্ঠীর আমীরী স্বার্থের লড়াই। স্বার্থই যেখানে এমন সিদ্ধান্তমূলক উপাদান, সেখানে কংগ্রেস ক্ষমতারূঢ় হলে সমুদ্র দলের দল ভাঙতে পারে। নির্দলীয়দের মধ্যেও যারা আজ 'সিদ্ধার্থ' সেজে বসে আছেন, টপাটপ তাঁদের মুখোশ খসে পড়বে। ভয় তাই অমূলক নয়।

ভয়ের অন্যতম কারণ, রাজ্যপালের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ, কংগ্রেস সভাপতির পক্ষপাতিত্ব এবং গণসমর্থন লাভের পরও গণতন্ত্রের মর্যাদা নষ্ট করে সংখ্যা-লম্বিত কংগ্রেসী দলের দ্বারা পুঁজিশী ক্ষমতা ব্যবহার এবং অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে আটক করা।

সংসদ সদস্য শ্রী এন সি চ্যাটার্জি রাজ্যস্থানের ঘটনার কংগ্রেস-প্রধান কাম-রাজকে প্রভাব বিস্তার করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে সজাগ থাকতে হবে রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে সতর্ক

করে দিতে হবে এই মর্মে বেন, কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোটদানের জন্য কারও প্রতিশ্রুতির দৃষ্ট মানিয়ে দেওয়া না হয়।

নির্বাচনের ঠিক অব্যবহিত পরে গণ-রায়ের গলা টিপে ধরার জন্য সৈন্যবাহিনী তলব করলেন সেই কংগ্রেস যে কংগ্রেস কোলায় নাম্বদ্রিপাদকে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দান করতে পারেন নি এবং যে কংগ্রেস একাধিক ক্ষেত্রে নির্দল সদস্য টেনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নিজে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে অনেক নতুন জিনিসের সঙ্গে সুখ্যাতির মন্ত্রিস্ব-আকাঙ্ক্ষাও আরও একটি নয়া নজির রেকর্ড করল।

নয়া বিধানসভা

১৯৬৭ সালে একশত চর্যাশিটি আসনবিশিষ্ট রাজ্যস্থান বিধানসভার প্রতি-নিধি নির্বাচনের অধিকারী ছিলেন এক কোটি বাইশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশ একষাটি জন নাগরিক। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনান্ত চেহারা নিম্নরূপ : মোট আসন সংখ্যা—১৮৪।

দল	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	শতকরা ভোটের হার
কংগ্রেস	১৮২	৮৯	৪১.৪৪
স্বতন্ত্র	১০৮	৪৯	২২.৪৫
জনসংঘ	৬০	২২	১১.৬১
নির্দল	৪০৭	১৫	১৬.৬৬
ডান			
কম্যুনিষ্ট	২০	১	০.৯৫
এস এস পি	৩৮	৮	৪.৭৬
বাম কম্যু	২১	—	১.১৫
পি এস পি	১৭	—	০.৮১
রিপাবলিকান	৬	—	১.৬
মোট	৮৯২	১৮৪	

বাতিল ভোটের হার ছিল ৪.৮৫ শতাংশ। অর্থাৎ, ৩,৪৩,৮৯৫।

১৯৬২ সালে রাজ্য বিধানসভার ১৭৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসী দখলে ছিল ৮৮টি আসন।

প্রতিনিধিদের আসনে টাকার খলি

রাজ্যস্থানে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে কংগ্রেস দরিদ্র জনগণের শোষিত রক্ত মাংস (দুধ-কলা) দিয়ে এতোকাল যে কালসর্প লালন করে আসছিল, ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সেই কালনাগিনীর তীর দংশন-কতই দুর্বল করে দিয়েছে সুখ্যাতির স্বপ্নকে। আগে আগে দুহাতে টাকা ছড়িয়ে কংগ্রেসই রাজ্যস্থান অধিকার করে আসছিল; এবার

কংগ্রেসী প্রসাদে ফেঁপে-ওঠা শেঠিয়া সমাজ টাকার ছড়ানোর কংগ্রেসকেও টেকা দিয়ে গেছে। রাজনৈতিক পর্ববেক্ষকগণের কলমে রাজস্থানী নির্বাচন, সুতরাং একটা টাকার খেলায় বলেই উল্লেখ্য হয়েছে। অভিযোগ, ভারতের অর্থনৈতিক জগতে ভ্যামপায়ারের মত পক্ষ বিস্তার করে আছেন এমন এক রোডপতি টাকা ছড়িয়ে আর বেকার যুবক-বৃন্দকে চাকরীর আশ্বাস দিয়ে হাজার হাজার ভোট ক্রয় করেছেন। কয়েক হাজার যুবককে ব্রীতিমত পরস্যা দিয়ে এবং ভবিষ্যতে রোডপতির ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে তাঁর মনোনীত প্রার্থীদের জন্য প্রচারে নামিয়েছিলেন। এই অর্থ অপচয়িত হয় নি। কংগ্রেসী মদতে গড়ে ওঠা শেঠিয়া সমাজ স্বতন্ত্র জনসংস্কার প্রার্থিকুলকে কুবেরের ছাত্তার থেকে মৃত্যু মৃত্যু অর্থ ছাড়িয়ে বিজয়মালা ক্রয় করে সেই মালায় সাজিয়ে দিয়েছেন। তবে মন্ত্রিসভা দখলের স্বপ্ন পূরণ হল না। এই না-হওয়াটা হয়ত রাজস্থানের কপালে আশীর্বাদস্বরূপ। তব্রাচ আমাদের বলতেই হয়েছে কংগ্রেসাইনই ক্ষমতা দখল করেছে সেখানে। যে রাজার স্থানে মানুষ তার নিজের প্রতিনিধির বদল বিধানসভায় টাকার খলিয়া প্রেরণ করে, সেখানেও আইন মানতে হলে টাকার খলিয়াকেই আসন ছেড়ে দিতে হবে; কেননা যে জনগণ নিজের বিকোতে চেয়েছেন তাঁদের আত্মবিক্রয়কেই তাঁদের ইচ্ছা বলে গণনা করতে হবে। টাকা কীভাবে উড়েছে তার ফিরিস্তি এখানে হাজির করা অব্যবহৃত। শব্দ এইটুকুই যথেষ্ট যে, প্রচারক বাহিনীর জীপ, সাইকেল, স্কুটার টেম্পো এবং মোটরকার ও লরির খুলোয় সমগ্র ভোটারকুলই চোখে অন্ধকার দেখেছেন। যানবাহন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মল বেঁধে শেঠিয়া নির্দেশে রাজপথে তাঁদের গাড়ি নামিয়ে দিয়েছিলেন। প্রভাবশালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিসার থেকে কর্মচারিকুল প্রত্যেকেই ভোট সংগ্রহের দালালে পরিণত হয়েছিলেন এবং অর্থের নাগপাশে রাজস্থানের মৃত্তিকা বন্দিনী হয়েছিল। তাই স্বতন্ত্র জনসংস্কার টিকট হাতে নিয়ে জনগণের সামনে স্বার্থের সোনার হরিণ খেলিয়ে বারিা বিধানসভা গুলজার করতে গেলেন, তাঁরা চমচকে জনপ্রতিনিধি; কিন্তু প্রতিনিধির আসন আসলে বারিা দখল করল তারা এক-একটি টাকার খলি। কংগ্রেসী অকংগ্রেসী উভয়-পক্ষই। শব্দ টাকা ওড়ানোর উনিশ-বিশ মাত্র তফাৎ।

কংগ্রেস সুতরাং যে কুবেরগোষ্ঠীকে এথাবৎকাল পোষণ করে এসেছে, সেই কুবেররাই এবার কংগ্রেসী বিপর্যয়ে লন্ড



জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন প্রিমোরার জী দেশাই

কোমর বেঁধেছিলেন। দেশব্যাপী কংগ্রেসী কুশাসন মানুষের শব্দবৃন্দকে এতাবৎকাল যেভাবে ছাটাই করে এসেছিল, ভিখারী ভারতের আত্মবিক্রয় তারই নির্মমতম ফলশ্রুতি।

কংগ্রেসের চৈতন্য লাভ?

চৈতন্যলাভ করার পর কংগ্রেসী মাত-স্বরসাত তাজব বনে গেছেন রাজস্থানের টাকার খেলায়। সুখাড়িয়া স্বয়ং মনে করেন, রাজস্থানে দেশীর সঙ্গে বৈদেশিক মন্ত্রারও খেল খেলা হয়েছে, অর্থাৎ বিদেশ থেকেও এসেছে কয়েক কোটি টাকা। পর্ববেক্ষকদের ধারণা এক-একটি লোকসভা নির্বাচনী এলাকায় স্বতন্ত্র জনসংস্কার প্রার্থীদের জন্য এক কোটি টাকা পর্বন্ত খরচ হয়েছে। যেমন দেশী বিদেশী পানীয় মার আফিম পর্বন্ত বিলাসো হয়েছে, তেমনি কাঁচা টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে গানের মোড়ল এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর শ্রাতস্বরদের হাতে। শহরে মাসাধিক কালের জন্য ব্যবসায়ী শকট ভাড়া করে নির্বাচনী কাজে লাগানো হয়েছে। জানি না জনসন-গোল্ডওয়ার্ডারী নির্বাচনেও এমনতর তাজব ব্যাপার হয় কিনা।

আর এস এস, কুবেরকুল এবং গরু

একদিকে সোনা-চাঁদির চকমকানি অন্যদিকে আর এস এস বাহিনীর নাৎসী ভীতি প্রদর্শন রাজস্থানের মানুষকে ইচ্ছামত প্রতিনিধি বাছাই করার সুযোগ দেয় নি। রাজনৈতিক পর্ববেক্ষকরা অনেকেই তাই মনে করছেন, আর এস এস বাহিনীকে রাজস্থানে দিনের পর দিন প্রভাব বিস্তার করতে দিয়ে কংগ্রেস শ্বিতীর নম্বর ভুল করেছে। প্রথম ভুলটি অবশ্য ভুল বলে গণনা করাই ভুল। কারণ কংগ্রেস কুবেরের ধনবৃন্দ, কালো টাকার পাহাড় বানানোতে নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতই আশ্রয় করেছিল। ফল উল্টো হয়েছে এখন। হকেই। কালসাপ আর ধনকুবের একই জাতের বিষাক্ত সরীসৃপ। এদের লালন করলে এক্স পালকের সর্বস্ব গ্রাস করে। কংগ্রেসের সৌভাগ্য, সে মধ্যপ্রদেশে চোট সামলে নিয়েছে অনেকটা এবং বৃন্দেতে পেরেছে ব্যাপক জাতীয়করণ করে একচোটয়া ব্যবসায় বর্ধ করে কুবের শ্রেণীর দাপট না কমালে দেশটা পুরোপুরি কুবের শ্রেণীর বংশধর দিয়েই পড়বে; তাদের বোনামদার হয়ে

রাজ্য শাসনের মজাটাও আর উপভোগ করা থাকবে না। কংগ্রেস তার মিশ্র অর্থনীতি নামে নিয়ে দু'পক্ষ বজায় রেখে চলতে চেয়েছে। ফলত আজ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সেই দু'পক্ষই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এক পক্ষে চরম লুণ্ঠনকারী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া, অপর পক্ষে চূড়ান্তভাবে শোষিত সর্বহারা জনসাধারণ। কংগ্রেস স্বাধীন-সলিল রচনা করেছে মিশ্র অর্থনীতির কোদাল ধরে। এখনো তার চৈতন্যোদয়ের সময় আছে। আগামী চারটি বছরেও যদি কংগ্রেস কুবেরকুলের লেজুড় হয়ে চামড়া বাঁচাবার চেষ্টা ত্যাগ না করে তবে ভবিষ্যতে পতন অনিবার্য। কুবেরের ভাণ্ডার বাজালে মস্তিষ্ক ছেড়ে তাদের ঘরে ঢাকরী জোটাতে হবে বোহিসেবী রাজনীতিককে। কিন্তু জনগণের স্বার্থরক্ষা করতে গেলে কুবের আসবে সেলাম বাজাতে।

সপ্তপরিবর্তনের পালা

সুখাডিয়া স্বয়ং কুবেরাত্মক কাকে বলে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তার কষ্ট অপ্রত-র্ন্য ভাষণ শোনা গেছে। তিনি স্বতন্ত্র জনসংঘের বিরুদ্ধে মার্কিনী ভাবেদারির অভিযোগ এনে গণহত্যার জর করেছেন; কুবের পোষাদের আক্রমণাত্মক নাৎসী কার্য-কলাপকে জনগণের সামনে তুলে ধরে স্বত-ন্ত্র সম্ভব তাঁদের সমঝে দেওয়ারও চেষ্টা পেয়েছেন। কিন্তু ধনিক-শ্রেণীস্বার্থে পৃষ্ঠ কংগ্রেস অন্যত্র এ সত্যকে গোপন করে জনগণকে প্রভারণা করেছে একই ধারায়। ধনকুবের গোষ্ঠীকে তৈলাক্ত-করণের দ্বারা কংগ্রেস অবশ্য এখনো পর্যন্ত নিজেকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে নি, কিন্তু গণশক্তিই কুবেরকুলকে পাতা দেয় নি। কিন্তু কংগ্রেসী প্রচার প্রগতিশীল শক্তিকে আঘাত করতে চেয়েছে চীন রাশিয়া পাকিস্তান দৌঁধয়ে এবং উত্তর ভারতে আর এস এসকে কায়দা করতে না পেরে অন্যত্র প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধেই নাৎসী বর্বরতা আগ্রের মিথ্যা ও সাজানো অভি-যোগ খাড়া করেছে। সুত্বের কথা, সজাগ নির্বাচকমণ্ডলী অনেক ক্ষেত্রেই প্রভারণায় ভোলে নি। কংগ্রেসী প্রচারের অন্তিমতলে যে প্রভারণার বিষ নীল হয়েছিল, জন-গণের সজাগ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে গেছে। কংগ্রেসের অবস্থা তাই নির্বাচনান্তর সময়ে বেশ কাহিল। এ সমস্ত বৃক্কে কংগ্রেসী নেতৃত্বে আজ বড় রকমের রদবদল অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অন্যথা দেশের রাষ্ট্র থেকে কংগ্রেসকে পাততাড়ি গোটাতে হবে।

কংগ্রেস নিজের কোলে কোল টানবে বলে দেশে শিকার সুব্যবস্থা করে নি। দেশের মানুষকে অজ্ঞানের অন্ধকারে রেখে

তথ্য জাগালেই দিন কেটে যাবে ভেবে এসেছিল কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। তারই একটা পাট্টা আঘাত এসেছে রাজস্থানে। নিরক্ষর অজ্ঞান মানুষের কাছে দেশের স্বর কখনো পৌঁছায় না। মজার ব্যাপার এই যে রাজ-স্থানে গোহত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু এ স্বর গণ্ডগ্রামে পৌঁছায় নি। কংগ্রেসকে ভোট দানের অর্থ গোহত্যা স্বীকৃতি দান এমন প্রচার চালিয়েও তাই বহু গোড়া মনে কংগ্রেস-বিরোধিতা জাগ্রত করতে পেরেছে দক্ষিণী শক্তিকুল (Right Reaction-aries)।

মোবের জাগী

সাধারণ মানুষ দেশের বাতীর শোষণের জন্য এক কথার কংগ্রেসকে দায়ী ভাবতে পেরেছে। কিন্তু ধনিকগোষ্ঠী ও রাজপরিবার অর্থাৎ শোষক চূড়ামণি শাসন-বশ্তের ওপর কেমনভাবে প্রভাব কিস্তার করেন তা পরিমাপ করতে পারে নি। জন-গণকে অন্ধকারে রেখে গণতন্ত্রে ধর্মি-আসীন থাকার চক্রান্ত সুতরাং কালক্রমে কংগ্রেসেরই ক্ষতিসাধন করেছে। কংগ্রেসের গণস্বার্থবিরোধী নীতি শিক্ষিত জন-সাধারণের মন থেকেও কংগ্রেসপ্রীতি উৎখাত করেছে। কিন্তু শিকার আলোকে দেশ সমুদ্রজলে হলে রাজারানী ও ধনকুবেরদের ভোট খরচের বাজারও মিলত না। ভিত্তিরী দেশ দুহাতে কুবেরী কালো টাকা সংগ্রহ করলেও গোপন ব্যালট পেপারটি নিশ্চয় তাদেরই শোষণকারী স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে প্রদান করে আসত না।

রাজস্থানে কংগ্রেস তাই স্পষ্টতই স্বাধীন সলিলে ডুবেছে। এতো সড়ুও কংগ্রেস যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল হিসেবে বেঁচে গেছে। আসতে পেরেছে, এটাই পরমাশ্চর্যের বিষয়। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ এবং অনন্যত শ্রেণী আর মুসলিম সম্প্রদায় প্রধানত কংগ্রেসের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। যদিও বিড়লা প্রতিষ্ঠানের 'জাকজমকপূর্ণ' প্রচার এবং বিড়লা গাড়ির ধোঁওয়া ও ধুলো তাঁদেরও চোখ ধাঁধিয়ে দেয়; যদিও তাঁদের মোড়ল-শ্রেণী ধনিকশ্রেণীর ঘৃণ গ্রহণ করেছে, তবুও ধনিক ও ভূস্বামীদের পীড়নে অভ্যস্ত মানুষ দেবোচ্ছল, স্বকর্ণে শ্রু-ছিল, রাজস্থানে কংগ্রেস এবার নির্বাচনে ধনিকস্বার্থের পরিপন্থী বক্তব্য হাজির করেছে, দিয়েছে একাধিক মোড়লীয় প্রতি-শ্রুতি। সুতরাং পরিচিত তম্বকর অপেক্ষা যে কংগ্রেস 'তম্বকর'-র দালালি করে আজ নিজেই কমতাত্যুত হতে চলেছে, সেই কংগ্রেসকেই বরং আশ্চর্য্যের জন্য আরও একটি সুযোগ দেওয়া জনসাধারণ শ্রেয় বিবেচনা করেছেন। বিড়লা বাড়ির সোনালী দাক্ষিণ্যে অবহেলিত এবং চরম-ভাবে শোষিত জনসাধারণ ভোলে নি।

কংগ্রেসী প্রতিশ্রুতি

স্বতন্ত্র দল যখন দু'নীতির দ্বারে কংগ্রেসকে আসামীরূপে খাড়া করেছে, সুখাডিয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তখন সেই প্রবাদবাক্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন—হার, হার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। এবং সঙ্গে সঙ্গে আর দেরি না করে সেই অনিবার্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে কংগ্রেস, শ্রেণীস্বার্থকবলিত রাজনীতি চূড়ান্ত পর্ব্বারে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য সংঘাতে নামতে বাধ্য। সুখাডিয়াকে পরা-জিত কর' ধর্মির অপর পিঠে কংগ্রেসী ধর্মি শোনা গেছে, বিড়লা বাড়ির ত্রীড়নক থেকে সাবধান।

সুখাডিয়া স্বয়ং ভূস্বামী-ধনিক স্বার্থ-বিরোধী শ্লোগান এবং স্বাধীনতাপূর্ব্ব যুগের মধুরোচক কংগ্রেসী প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর সমুদ্রবীন হয়েছেন। না, আর ভুল করবেন না তাঁরা। ধর্মির ওপর ট্যান চাপিয়ে এবার সত্যিই তাঁদের পুরনো ভুল সংশোধন করবেন। কৃষিমন্ত্রী মৃধা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কমতার প্রত্যাবর্তন করলে ব্যাপ্ক জাতীর-করণ করে কুবেরের ফেঁপে ওঠার পথ বন্ধ করবে কংগ্রেস।

কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিতে অবশ্য সর্ব-স্তরে সকলে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তবুও ধনকুবেরদের কংগ্রেস-বৈরিতা লক্ষ্য করে অনেকে ভেবেছেন এবার হয়ত আর কংগ্রেসী প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের পর ভাঁওতামাত্র পর্ব্ববসিত হবে না।

রাজন্যবর্গ এবং বিড়লা প্রতিষ্ঠানকে ধনবাদ, তাঁরা অবক্ষয়ী শ্রেণীসংঘাতকে প্রত্যক্ষভাবে অনেক তাড়াতাড়ি নির্বাচনী আসরেই পেড়ে ফেলেছেন। ফলত নিজেদের যেমন মূখোশ খুলে দিয়েছেন তাঁরা একই-ভাবে মূখোশ খুলেছেন কংগ্রেসেরও। কংগ্রেস খোলাখুলি দ্রান্তপথে পা বাড়ানোর জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে কমাপ্রার্থী হতে বাধ্য হয়েছে।

রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসকে সচেতনও করেছে যথেষ্ট। দু'নোকায় পা দিয়ে কাণ্ডারী সাজার ফন্দী কংগ্রেস ত্যাগ করবে এবার। না করলে স্বাধীন সলিল কেবল গভীরতাই লাভ করবে এবং স্বতীয়বার জনগণের কাছে তার কমা প্রার্থনার মধুও থাকবে না।

এক মোহানার বহু মত

১৯৬৭ সালের নির্বাচন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন মতবাদের মস্তিস্কা গঠন করে বহু দলে বিভক্ত ভারতীয় রাজনীতিক বিশেষ চিন্তা ও গভীর সংকটাবর্তে নিক্ষেপ করেছে। নির্বাচনী ফলপ্রসূতি সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী

রাজনীতিক একাধিক বসিয়ে রাজ্য শাসনের গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছে তাঁদের ওপর। ফলত প্রত্যেকটি দলই বেশ সজ্ঞাপন্ন অবস্থায় বিমূঢ় বোধ করছেন। তাঁদের চিন্তা, অতঃপর পরস্পর বিরোধী মীতি ও কর্মভাবনা নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কেমনভাবে তাঁরা রাজ্য শাসন করবেন।

বর্তমান অবস্থায় দলীয় গোড়ামী এখন শিকের তুলে রাখতে হবে; অন্যথা বেশ কিছুকালের জন্য গোড়া মতবাদকে জনগণের দোর থেকে বিদায় নিয়ে এক-গুঁয়েমীর কোটে বসবাস করতে হবে। এমন বিপাকে ইতিপূর্বে কাউকে পড়তে হয় নি। তাই প্রত্যেক পার্টির উচ্চতর কেন্দ্রীয় মহল এখন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে স্ব স্ব দলকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য গভীর চিন্তা ও আলোচনার প্রতিটি ক্ষুদ্রতম ব্যয় করছেন। নির্বাচনী ফলাফলের দিকে তাকিয়ে অনেক দল এই বলে আশ্বস্ত হয়েছেন যে, বৃহত্তর দল ভেঙে ক্ষুদ্রতর অস্তিত্বে পরিবর্তিত না হলে আজ হয়ত নির্বাচনে অনেক বেশি আসন অধিকারের সম্ভাবনা থাকত।

পি এস পি:

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির তিন দিবসব্যাপী উত্তর-নির্বাচনী বৈঠকে বহু সদস্য এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পি এস পি, এস এস পি ভাঙন না হলে উত্তরপ্রদেশে আজ সোস্যালিস্টরাই বৃহত্তম অকংগ্রেসী দল হিসেবে জয়লাভ করত। শ্রীকামাধ অদুর ভবিষ্যতে ওই দুই দলের মিলন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন না বটে, তবে দুই দল যে নির্বাচন পরবর্তী অবস্থায় পরিস্প্রেক্ষিতে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবেন এমন আশা গোষণ করছেন।

অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় পি এস পির যোগদান প্রসঙ্গে

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখনো (১১।১০।৬৭) কোনো রকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য কর্মিটগালি স্ব স্ব রাজ্যের অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় অবিলম্বে যোগদানই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করছেন। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে পি এস পির জাতীয় সাধারণ পরিষদের বিগত লক্ষ্যী অধিবেশনে গহীত প্রস্তাবটি নিয়ে। গত অক্টোবর মাসে লক্ষ্যী-এ পার্টির প্রস্তাব ছিল পি এস পি সাধারণ নির্বাচনের পর কোন কোয়ালিশন সরকারে যোগদান

করবে না। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রস্তাবটির হুবহু অনুসরণ অসম্ভব। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ইউনিট অজয় মন্ট্রি-সভায় যোগদানের জন্য উচ্চতর কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে অনুমতি চেয়েছে। বিহারের মহামায়াপ্রসাদ মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য সেখানকার সদস্যবর্গ উদ্বুদ্ধ; তবে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের ইউনিটের অনুরূপ কোন প্রস্তাব এ পর্যন্ত পি এস পির জাতীয় সাধারণ পরিষদে পেশ করেন নি। মহাশূর ইউনিট কিন্তু অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন রাজ্যের পি এস পি শাখার যোগদান বাঞ্ছনীয় বলে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ প্রমেন যে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে, পি টি আই-এর সংবাদে প্রকাশ, তাতে পি এস সি নেতৃত্বেই ভাঙন ধরার অবস্থা। অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা নিয়ে পার্টি স্তরে ভয়ানক আন্দোলন।

শিববৈদীর আবেদন

পি এস পি নেতা শ্রী এস এন শিববৈদী অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার স্থায়ী সম্পর্কে সন্দিহান। তিনি মনে করেন, ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে গঠিত কোয়ালিশন সরকার কিছুকাল শাসনকার্য চালিয়ে গেলেও পরিশেষে বিভিন্ন দলের সহাবস্থান ব্যাহত হতে পারে। শ্রীশিববৈদী এজন্য কংগ্রেস বিরোধী একটি গণতান্ত্রিক শক্তি গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন

সাগরসংগমে নদনদী

ভারত দেশের বিভিন্ন আলোচনায় বর্তমান লেখক বারম্বার একটি কথা বলতে চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেসকে তার গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য চরম প্রত্যুত্তর তখনই দেওয়া সম্ভব যখন ক্ষুদ্র স্বার্থচর দেশে একাধিক ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল গঠনে সক্ষম হবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দলের অস্তিত্ব জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে যত না সাধক হোক, গণ আশাকে নির্মমভাবে হতাশ করতে এদের অস্তিত্ব অনেক বেশি সক্ষম। এদের জন্যই বহুখা বিভক্ত জনসাধারণ একটির পর একটি নির্বাচনে বিভ্রান্ত হয়ে আসছে। ক্ষুদ্র দলগুলি যদি তাঁদের জাপন মতাদর্শের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা স্বধর্ম-বিশিষ্ট বৃহত্তর রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি বহু গণে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়, যে দলেই অন্ততপক্ষে তিনজন নেতা আছেন, সেখানেই তেরজন সদস্য নিয়ে এক একটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে এবং জোরদার কংগ্রেস-বিরোধিতার সব রকম সূত্রায়ণ নষ্ট করে দিচ্ছে। লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, জনসাধারণ যত বেশি সচেতন হবেন, সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির মত নির্বাচনে নাম-লেখানো

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে ততই তাঁরা বিদায় করলে থাকবেন। ক্ষুদ্র দলে সমস্যাকে কেবলমাত্র বহু গুণিত করে। সামান্য মতানৈক্যই যেখানে মর্দকিমের দল গঠনের প্রেরণা দেয়, সেখানে রাজনৈতিক দলে শৃঙ্খলার রক্ষা করাও মুস্কিল। জনগণের সক্রিয় সাহায্য না পেলে এই সব দলের টিমটিমে অস্তিত্ব তিনিদিনেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অন্যপক্ষে যে দল থেকে মতাদর্শের ভিত্তিতে বের হয়ে আসা, জন্মদায়ী সেই দলই নতুন দলের সত্যানিষ্ঠার ঔজ্জ্বল্যে ম্লান হয়ে একদিন নিজেই অবলুপ্ত হবে। এদেশে রাজনৈতিক দলে সেই জন্ম-মৃত্যুর দৃষ্ট অগ্নিগতি নেই। এখানে গভীর ধারিতার সঙ্গে ছানাপোনারাও সবাই টিকে যাচ্ছেন; সুতরাং বহু দলের স্থায়ী সংকলন করতে দেশীয় রাজনীতির অপানে বিপর্যয় সম্প্রসৃত হচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বহু মতকে বহু দূর সম্ভব একই মোহানায় এসে মিলিত হতে পারে এবং তন্দরায় যোগ-বিরোগের মাধ্যমে শক্তি-শালী সর্বভারতীয় দল গঠন করতে হবে।

বর্তমান নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে বহু রাজ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে বাধ্য হচ্ছেন অকংগ্রেসীরা। এর ফল হয়ত ভালই হবে। হয়ত একই সর্বসম্মত কর্মসূচীর ভিত্তিতে সাফল্য লাভ করলে, আগামী নির্বাচনেও একই কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটিমাত্র কংগ্রেস বিরোধী জোট গণসমর্থন লাভ করে আরও শক্তিশালী মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। এবং আশা রাখতে পারি, সচেতন নজরবিধির চাপে পড়েই সার্বজনীন পূজা কমিটির মত পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে-ওঠা রাজনৈতিক দলের অবসান হবে।

পুরানো নেকড়ে নবকলঙ্ক

কংগ্রেস সভাপতি শ্রী কে কামরাজ নাদারের বিশিষ্ট প্রচেষ্টায় অতঃপর কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান সম্ভব হল। প্রধানমন্ত্রীর আসনে ফিরে আসছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, যদিও এবার উপ-প্রধানমন্ত্রীর একটি পদ সৃষ্টি করিয়ে নিয়ে সঙ্গে আসছেন কামরাজ পরিকল্পনার পদভাগকানী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। দেশাই-গান্ধীর সমর্থক দলের মধ্যে ঘন ঘন তৎপরতা ও চাপ্তলোর অঙ্গানে অতঃপর রাজধানীর রাজনৈতিকমহল স্বস্তির নিঃশ্বাস ভাগ কলঙ্কন।

শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীদেশাই উভয়েই জানিয়েছেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াতে উভয়পক্ষের মধ্যে যে রফা বান্ধাবস্ত হয়েছে তা নিঃসত্ত এবং উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদসৃষ্টির ফলে কেন্দ্রে কোন নৈত নেতৃত্ব

গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। তবে প্রীদেশাই বলেন, দুই নম্বর মন্ত্রী অপেক্ষা উপ-প্রধানমন্ত্রী খেতাবের স্বভাবতই সম্মানিক গুরুত্ব থাকবে। এই গুরুত্ব কিন্তু কোনরকম অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে বলে অন্যপক্ষে সাক্ষর জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। তাঁরা দুজনেই কংগ্রেস প্রধান কামরাজের প্রচেষ্টার উল্লেখ করে তাঁর প্রতি নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শ্রীমতী গান্ধীই দলনেতা রূপে তাঁর

কার্যনিষ্ঠা মণ্ডন করবেন, এ বিষয়ে প্রীদেশাইয়ের সরাসরি কোন প্রভাব থাকবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে প্রীদেশাই বলেছেন, শ্রীমতী গান্ধীই কর্তা।

রাজনৈতিক পর্ববেক্ষকগণ কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটিকে এতোটা সরল দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে পারছেন না। স্বভাবতই তাঁদের প্রশ্ন, এতো বড় জটিল প্রশ্নটা কি এতই সহজে মিটে গেল। কিন্তু এ জাতীয় কৌতূহলের উত্তরে প্রীদেশাই বলেছেন, তিনি মনে করেন প্রকৃত মঠকাই

মিটেছে। কেউ যদি তাতে সন্দেহাব্যত থাকেন, তবে তিনি নিজের মত খা খুঁটি ভাবতে পারেন।

সন্দেহের প্রশ্নে সরাসরি প্রবেশ না করলেও পর্ববেক্ষকমহলের ধারণা। বর্তমান সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে উত্তরণপক্ষেই কঠিন সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে, এবং সেখানে লাভ অলাভের প্রশ্নও গুরুত্ব সহকারেই উত্তরণপক্ষে বিবেচনা করে দেখতে হয়েছে।

(১১।১০।৬৭)

নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তেরিশজন সদস্য

(বিগল্বে প্রাপ্ত)

১৩ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নতুন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করেছেন। এই মন্ত্রিসভায় শ্রীমতী গান্ধী সহ মোট ৩৩ জন সদস্য আছেন। এবারের মন্ত্রিসভায় বহু তরুণ ও নতুন সদস্য স্থান লাভ করেছেন।

নতুনদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুণা সেন। ইনি শিক্ষা কমিশনের সভ্য ছিলেন। আর আছেন ডঃ করণ সিং, শ্রী কে কে শা, ডঃ ডি কে আর ডি রাও ও ডঃ চেমা রেন্ডী। ডঃ করণ সিং জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন। শ্রীমতী কামরাজের প্রাক্তন জ্যেঃ সেক্রেটারী, ডঃ রাও পরিকল্পনা কমিশনের ভূতপূর্ব সভ্য এবং ডঃ চেমা রেন্ডী ছিলেন অশ্বের অর্থমন্ত্রী।

আগেককার মন্ত্রিসভার পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং, শ্রী সি এম পুনাজা, শ্রীশমসুন্দরী গোবিন্দ সেনন, শ্রী জে এল হাতী এবং শ্রীরামসুন্দর সিং এবার পুরা কতী হয়েছেন।

১৯৬০ সালে কামরাজ পরিকল্পনায় মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় গ্রহণকারী শ্রীমোহরজী সেনাই হয়েছেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী।

আগের মন্ত্রিসভার শ্রীএন সন্নীর রেন্ডী এবং জি এস পাঠককে এই মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয় নি।

রাষ্ট্রমন্ত্রীদের দলে যারা নতুন প্রবেশ লাভ করলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সন্ন্যাসের জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান বিশেষজ্ঞ ডঃ এল চন্দ্রশেখর, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সেক্রেটারী শ্রী কে সি পণ্ড, শ্রীমদ্রাধ রেন্ডী, অধ্যাপক শের সিং, শ্রীপরিমল ঘোষ এবং জঃ ফুলরেন্দ্র গুহ। শ্রীমতী গুহই মন্ত্রিসভায় একমাত্র মহিলা সদস্য।

পূরামন্ত্রী

১। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—প্রধানমন্ত্রী ও পারমাণবিক মন্ত্রণালয় ২। শ্রীমোহরজী সেনাই (সহকারী প্রধানমন্ত্রী)—অর্থ ৩। শ্রীফকরুদ্দীন আলী আমেদ—শিল্পোন্নয়ন ও কোম্পানী বিষয়ক ৪। শ্রীএল, সি, চাগলা—পররাষ্ট্র ৫। শ্রীওরাই, বি, চ্যবন—স্বরাষ্ট্র ৬। শ্রীদীনেশ সিং—বাণিজ্য ৭। জয়সুন্দর হাতী—প্রস ও পুনর্বাসন ৮। শ্রীজগজীবন রাম—খাদ্য ও কৃষি ৯। ডঃ করণ সিং—পর্বটন ও অসামরিক বিমান চলাচল ১০। শ্রীঅশোক মেটা—পরিকল্পনা, পেট্রোল, রাসায়নিক ও সমাজকল্যাণ ১১। শ্রীশি, গোবিন্দ সেনন—আইন ১২। শ্রীসি, এম, পুনাজা—রেল ১৩। ডঃ রামসুন্দর সিং—পার্লামেন্টারি বিষয়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৪। ডঃ ডি, কে, আর, ডি, রাও—স্বাস্থ্যসেবা ও জাহাজ চলাচল ১৫। ডঃ এম, চেমা রেন্ডী—ইস্পাত, বনি ও হাটু ১৬। ডঃ ত্রিগুণা সেন—শিক্ষা ১৭। শ্রীকে, কে, শা—বেতার, তথ্য ১৮। শ্রীসত্যনারায়ণ সিং—মন্ত্রিবাহিনী ১৯। সর্দার স্বরণ সিং—প্রতিরক্ষা

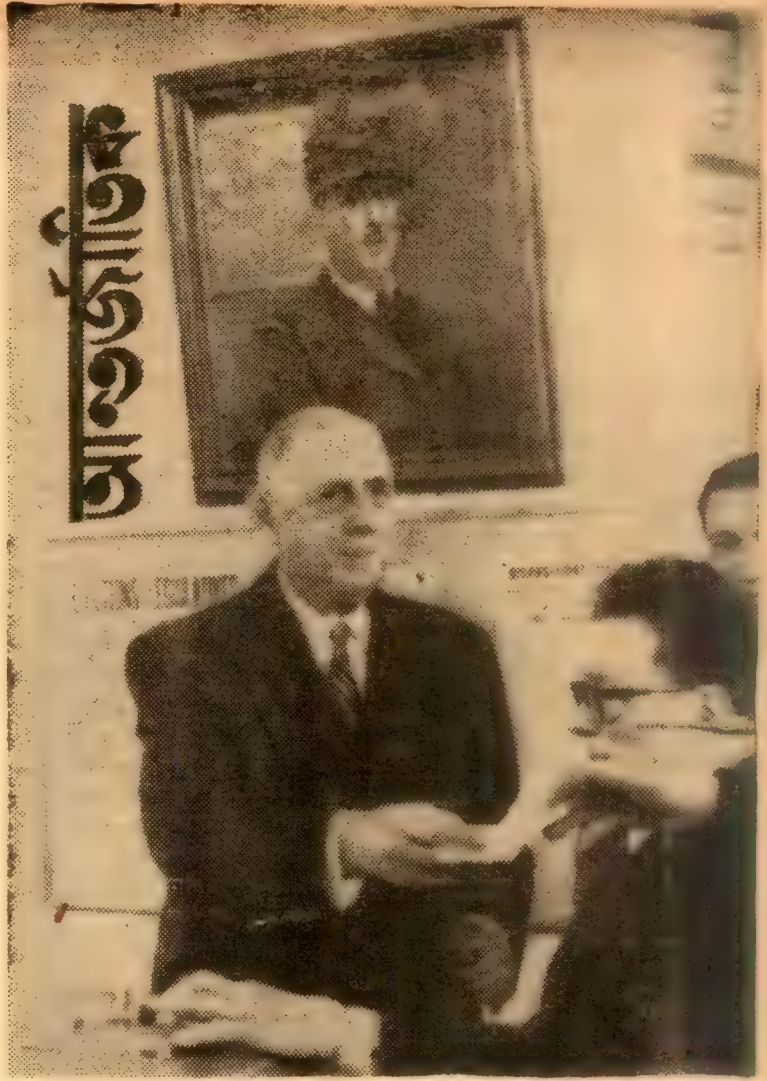
২। শ্রীবি, আর, ভগত—প্রতিরক্ষা ২। ডঃ এল, চন্দ্রশেখর—স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ৩। শ্রীপরিমল ঘোষ—রেল ৪। শ্রীমতী ফুলরেন্দ্র গুহ—সমাজকল্যাণ ৫। শ্রীজগমোহ রাও—পূর্ত, গৃহ নির্মাণ ও সরবরাহ ৬। শ্রীএল, এন, মিত্র—প্রস ও পুনর্বাসিত ৭। শ্রীকে, সি, পণ্ড—অর্থ ৮। শ্রীকে, রঘু, রামারা—আইন ৯। ডঃ কে, এল, রাও—সেচ ও শক্তি ১০। শ্রীমদ্রাধ রেন্ডী—শিল্পোন্নয়ন ও কোম্পানী বিষয়ক ১১। শ্রীসি, সি, শেঠী—ইস্পাত, বনি ও হাটু ১২। অধ্যাপক শের সিং—শিক্ষা ১৩। আমোলাদেব সিং—খাদ্য ও কৃষি ১৪। ডি, সি, শত্ৰু—স্বরাষ্ট্র ১

পার্লামেন্টের নির্বাচন শেষ হলো এখানে। যদিও ফ্রান্সের নির্বাচনে ভারতের নির্বাচনের মতো অতটা উত্তেজনা নেই, তবুও এবার ফ্রান্সে এমন কয়েকটি দৃশ্য দেখা গিয়েছে এবং মনোভূমির সৃষ্টি হয়েছে যা লক্ষ লক্ষ ভোটারকে চঞ্চল করে তুলেছিলো।

উত্তেজনার কারণ কম এজন্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ফ্রান্সে প্রেসিডেন্টই সমস্ত শক্তির উৎস, সে-তুলনায় পার্লামেন্টের ক্ষমতা সামান্যই। প্রেসিডেন্ট দ্য গল প্রায় অসীম ক্ষমতার অধিকারী, এবং ১৯৫৮ সাল থেকে ক্ষমতায় এসে পঞ্চম রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের যে-মর্যাদাহানি ঘটেছিলো, প্রেসিডেন্ট দ্য গল কি জাতীয় ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা অনেকাংশে পুনরুদ্ধারই শৃঙ্খল করেন নি, সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও সে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে কয়েকটি বিষয়ে। কাজেই সেই প্রেসিডেন্ট দ্য গলের আসন নিয়ে যখন কোন সংশয় দেখা দেয় নি, যখন দ্য গল গত বছর ৭ বছরের জন্যে আবার প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন, তখন দৃষ্টিচ্যুত হবার একটা কারণ ছিলো না।

কিন্তু নিশ্চিত হতেও পারলেন কৈ দ্য গল? না হতে পারার কারণ হলো দ্য গল শৃঙ্খল নিজের কথাই ভাবছেন না, তাঁকে ভাবতে হচ্ছে দ্য গলোত্তর ফ্রান্সের কথাও, *After De Gaulle, what?*—এ-প্রশ্নের জবাবও খুঁজতে হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট দ্য গল ফ্রান্সে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, তাঁর অবর্তমানেও যাতে সে-নীতি অক্ষয় থাকে—দ্য গল সে-চিন্তায় নিমগ্ন। পার্লামেন্টে যদি তাঁর দল ন্যাশনাল রিপাবলিকান ইউনিয়ন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে, তবেই ‘গলিজম’ বাঁচবে, তা নইলে তার অবলুপ্তি অনিবার্য।

পার্লামেন্টের আসন সংখ্যা হলো ৪৮৬টি। কিন্তু গত '৬২-র নির্বাচনে বা বিদায়ী পার্লামেন্টে দ্য গলের ইউ-এন-আর-এর মাত্র ২৪টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কাজেই দ্য গলকে ভাবনার পড়তে হয়েছিলো, এটুকু সংখ্যা-ধিকার বজায় রাখা যায় কিনা। তবে দ্য গলের পক্ষে সুবিধে হলো এই যে, ভারতের মতো ফ্রান্সেও রাজনৈতিক দলের ছড়াছড়ি। এবং পরিস্থিতি দ্য গলের অনুকূলে গিয়েছিলো আরো এজন্যে যে, এই বিরোধী দলগুলি এক-জোট হতে পারে নি, এমন কি,



দ্য গল ভোট দিচ্ছেন

নির্বাচনী আঁতাতও প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। এখানে কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট দল যেমন আছে, তেমনি রয়েছে জাঁ লেকানুয়ের সেনিট্রিস্ট বা মধ্যপন্থী দল। তাছাড়া ইউ-এ-এস-এস-এস রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন বলেও দুটো দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। দলের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্য বা বিভেদের পুরো সুযোগ নিয়েছে ইউ-এন-আর যার ফল প্রথম ভোটের দিন ওই মার্চ তারিখে পাওয়া গিয়েছিলো। ফ্রান্সের পার্লামেন্টের নির্বাচনের নিয়ম হলো, কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত হতে হলে শতকরা ৫০ ভাগ ভোট পেতে হবে। এই প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট না পেলে দ্বিতীয়বার নির্বাচন হবে এবং শেষের নির্বাচনে যিনি বেশ ভোট পাবেন তিনিই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে। প্রথম দিনের নির্বাচনে দেখা

গেল যে, দ্য গলের দল মোট ৭০টি আসনের মধ্যে ৬২টিই দখল করে নিয়েছে। বিরোধীরা এ-শোচনীয় পরাজয়ের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু তখন নিজেদের শোধরাবার বিশেষ উপায় ছিলো না। তবুও তারা ঠিক করলেন যে, গলিস্টদের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির যে-প্রার্থীর জয়ের আশা সবচেয়ে বেশি, ১২ই মার্চের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে তাঁদের রেখে বাকী প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করা হবে। এই একা প্রচেষ্টা দেখে পশ্চিমবংগের বিরোধী দলগুলির নির্বাচনোত্তর অবস্থা ও ঘোষণার কথাই মনে পড়ে। বামপন্থী দলগুলি নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ফ্রন্ট গঠনে ব্যর্থ হলেন, কিন্তু কংগ্রেসের পরাজয়ের পর তাঁরাই আবার একই প্ল্যাটফর্ম থেকে বক্তৃতা করলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলেন। অথচ ফ্রান্সের বিরোধী দলগুলির দ্য

গলের বিরুদ্ধে প্রচার করার মতো বিষয়ের কোন অভাব ছিলো না। দ্য গলের আমলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে, কমন মার্কেটভুক্ত দেশগুলির মধ্যে একমাত্র লাক্সেমবুর্গ ছাড়া আর বাকী ৫টি দেশের মধ্যে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উৎপাদনই সবচেয়ে কম। এখানকার জীবন-ধারণের ব্যয় গত বছরে ১৪% বেড়ে গিয়েছে, বেকার সমস্যাও ইরোরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে এখানে বেশি এবং গত নভেম্বর থেকে বেকারের হার শতকরা ১১ ভাগ বেড়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বেড়েছে অথচ উৎপাদন সমানুপাতিক হারে বাড়ে নি বলে, শ্রমিক ও সাধারণ চাকরদের মাইনে বাড়ে নি। কাজেই সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের অসন্তোষ ছিলোই।

দ্য গলও জানতেন দেশের অবস্থা এবং ভোটারদের মনোভাব। তাই তিনি কোনরকম ঝুঁকি না নিয়েই নির্বাচনক্ষেত্রে ঘাঁটিয়ে পড়েছিলেন তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে। বাস্তবিক, রেডিও টেলিভিশন মারফৎ এমন প্রচারব্যবস্থা এবার তিনি সুবন্দ করেছিলেন এবং সরকারী অর্থ এমন অচেনা টোলেছিলেন যে সাধারণ ভোটার এ-দৃশ্য দেখে স্বভাবতই হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচনে নামিয়েও ছিলেন দ্য গল খ্যাতিনামা সব রাজনীতিকদের, কারণ বিরোধীপক্ষে সোশ্যালিস্ট দলের গাস্টোঁ দেফের ও ফ্রান্সোয়া মিতেরাঁ, মধ্যপন্থীদের জাঁ লেকানুয়ে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাপ্রিয় নেতা মেন্দে ফ্রান্স ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই খুব সহজ হবে না—তা তিনি জানতেন। প্রেসিডেন্ট দ্য গলের আরো ভয়ের কারণ ছিলো এই যে, গত ৭ই জানুয়ারী থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এখানে যে জনমত সংগ্রহ করা হয়েছিল, তাতে দেখা গিয়েছে যে তাঁর সমর্থকদের শতকরা হার ৪১ থেকে ৩৮-এ নেমে এসেছে এবং আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ম' রোজার ফ্রে পর্বন্ত আশঙ্কা করেছিলেন যে ৪৮৬টি আসনের মধ্যে শাসকদল ইউ-এন-আর ২০০টির বেশি আসন পাবে না।

তাই প্রেসিডেন্ট দ্য গল কেন নির্বাচন জেতার জন্যে মরীয়া হয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচনপ্রার্থী এবং প্রচারে নামলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জর্জ পম্পিদু, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরিস কুত দ্য মারভি, রাষ্ট্রমন্ত্রী লুই জোকস ইত্যাদি প্রধান রাজনীতিকরা। ম' পম্পিদুকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে নির্বাচনী প্রচার পরিচালনায়, না করে উপায়ও তাঁর ছিল না অবশ্য। কারণ, দ্য গলের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁরই নাম শোনা যাচ্ছে এখানে, অথচ তাঁর দল যদি জাতীয় পরিষদে জয়লাভ করতে না পারে তবে প্রেসিডেন্টের

গদির দিকে তাঁর হাত বাড়ানোর আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু খ্যাতিনামা ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করে নির্বাচনে নামার লোকই দ্য গল নন। তিনি সাধারণ ভোটারের মন পাবার জন্যে চমকদার কিছু কাজ বা নীতিও নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী পম্পিদুর মারফৎ দেশবাসীকে তিনি জানানলেন যে নির্বাচন শেষ হওয়ার আগে আমরকের হিসেব কাউকে দাখিল করতে হবে না, ফরাসী ছেলে-মেয়েরা আরো এক ক্লাশ ষিনা বেতনে পড়তে পারবে, সরকারী কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ের একমাস আগে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ঘোষণা করা হলো।

এগুলো তো ছিলই, তা ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের পুনর্গঠনে দ্য গলের অবদান তো কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আমেরিকার প্রভূষ অস্বীকার করে এবং ঐক্যবন্ধ ইরোরোপ গঠন করার ডাক দিয়ে দ্য গল সাধারণ ফরাসীর মন বহুদিন আগেই জয় করেছিলেন। কমন মার্কেটে ব্রিটেনের প্রবেশাধিকার না দিয়েও ফ্রান্সের মর্যাদা তিনি বাড়িয়েছেন বলে সাধারণ লোক মনে করেন। আবার পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার ও পরীক্ষা, ন্যাটো থেকে ধাপে ধাপে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েও ফ্রান্স প্রাক-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছেন। আবার সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইরোরোপের দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বা স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রবর্তন করে দ্য গল সহজেই সাধারণ ফরাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং অনেকেই ভাবতে সন্দেহ করেছেন দ্য গল না থাকলে ফ্রান্স আবার চতুর্থ শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হবে।



অবস্থা এত অনুকূল থাকা সত্ত্বেও যদি দ্য গলের দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করে তবে তা অবিবাস্য ও ও বিস্ময়জনকই হতো।

ইন্দোনেশিয়া :

যাই-যাই করছিলেন গত একবছর ধরে, এবার সত্যি সত্যি গেলেন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ। বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়েছিল তাঁকে, স্বয়ং সুহার্তো তাঁর জন্যে ওকালতি করেছিলেন, বলেছিলেন, প্রেসিডেন্টের পোষাকী উপাধিটুকু নিয়ে থাকুন তিনি, ক্ষমতা সমস্ত কেড়ে নেওয়া হোক। কিন্তু রাজী হয় নি সুকর্ণ-সংক্রান্ত জন-উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ কমিটি। কমিটি সুপারিশ করেছে যে, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের সমস্ত ক্ষমতা তো কেড়ে নেওয়া হলেই, উপাধিও তাঁর থাকবে না, এখন থেকে তিনি আর পাঁচজনের মতই ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ নাগরিকমাত্র। জেনারেল সুহার্তো হবেন তাঁর জায়গায় দেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে নিয়ে গত এক বছর ধরে সারা ইন্দোনেশিয়া তোলপাড় হচ্ছে। ১৯৬৫ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর থেকেই দেশে সুকর্ণ-বিরোধী ঝড় উঠেছে। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ জড়িত ছিলেন—এই অভিযোগ দিয়ে তাঁর গদিচ্যুত এবং বিচারের দাবি উঠেছিল। সে দাবি কেবল ছাত্রদের বা জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংস্থা নাহদাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে এ-দাবি এলে হয়ত ঠেকিয়ে রাখা যেত, কিন্তু সেনাবাহিনীর একাংশ এবং তার প্রাক্তন জেনারেল নাসুশন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক যখন অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করলেন তখন সুকর্ণের শেষ যে ঘনির্মে এসেছে তা বুঝতে সময় লাগে নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও জেনারেল সুহার্তো শেষ চেষ্টা করেছিলেন। ৭ই মার্চ তারিখে পিপলস কনসালটেন্টস কংগ্রেস বা জন-উপদেষ্টা কংগ্রেসের যে পাঁচ দিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়েছে তাতে বলেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের অতীত ইতিহাস স্মরণে রেখেই যেন তাঁর প্রতি সবিচার করা হয়। ডঃ সুকর্ণ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা, জাতীয় মর্দতি ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ডঃ সুকর্ণই ছিলেন দেশের অবিসম্বাদী নেতা। ওলন্দাজদের হাত থেকে পশ্চিম ইরিরানও দখল করা হয়েছিল ডঃ সুকর্ণেরই নেতৃত্বে। জাতীয়তাবাদের মন্ত্র দেশকে যেমন তিনি উদ্ধৃত্ত করেছিলেন তেমনি দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনেও তাঁর

গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। জেনারেল সুহার্তো যখন প্রেসিডেন্ট সুদর্শনকে গদিতে রাখার সুপারিশ করেছিলেন তখন এই কথাগুলিই তাঁর মনে এসেছিল। তা ছাড়া সুদর্শনের জনপ্রিয়তা সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। সুদর্শনকে প্রেসিডেন্টের গদি থেকে অপসারণ করলে একটা গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে—এ ভয় সুহার্তোর ছিল, তাই সে ঝুঁকি তিনি নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু জন কংগ্রেসের বিশেষ কর্মসূচিতে দেখা গেল সুদর্শন-বিরোধীদের পালাই বেশি ভারী।

সুদর্শন যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় একটা যুগেরও অবসান ঘটলো। ১৯৪৫ সাল থেকে দীর্ঘ ২২ বছর কাল ধরে তিনি ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন। দীর্ঘকাল ক্ষমতা ভোগ করার ফলে ক্ষমতালিপ্সা জন্মে গিয়েছিল তাঁর। তাই ১৯৫৭ সালে দেশে Guided Democracy বা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র চালু করার নামে সমস্ত বিরোধী দলের বিলোপ সাধন করেন তিনি। কিন্তু তাতেও যেন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। নিজেকে ইন্দোনেশিয়ার যাবজ্জীবন প্রেসিডেন্ট নিশ্চিত করে তিনি কার্যত ডিক্টেটর হয়ে বসলেন।

দেশের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তিনি নিলেন বটে, কিন্তু সে ক্ষমতা প্রয়োগ করার শক্তি তাঁর ছিল না। একে তাঁর বার্ষিক্য তার ওপর ভরানক বিলাসী। এই বিলাসিতা এবং নারীসঙ্গের জন্যে তিনি দেশের কোন সমস্যার প্রতিই ব্যক্তিগতভাবে নজর দেবার ফুরসৎ পেতেন না। ফলে তাঁর অধস্তন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দুরো প্রমুখ নেতৃবৃন্দই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। কমিউনিস্টদের সঙ্গেও তিনি এতটা দহরম-মহরম সুরু করে দিলেন যে সেনাবাহিনীর একাংশ তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে নি। তাই ১৯৬৫ সালে যখন এখানে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা হয় তখন সে প্রচেষ্টা বার্থ হয় আর তার সঙ্গে ডঃ সুদর্শনকে জড়ানো সেনাবাহিনীর পক্ষে কঠিন হল না। কারণ সে অভ্যুত্থানের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক যখন খুঁজে বার করা গিয়েছে তখন কমিউনিস্ট-দরদী প্রেসিডেন্টের গা পরিষ্কার রাখার জো রইলো কোথায়?

প্রেসিডেন্ট সুদর্শন এখন থেকে ডঃ সুদর্শন নামেই শুধু পরিচিত হবেন। ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যে উপাধি তিনি পেয়েছিলেন সেটাই কেবল থাকবে—বাকী সব রাষ্ট্রীয় সম্মান থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। এক সময় তাঁকে চিরতরে দেশ-ত্যাগ করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন বোধ হয় সে সম্ভাব্যও আর দেওয়া হবে না। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে



অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সুহার্তো

বিচার-বিভাগের তদন্তের সুপারিশ করেছে বিশেষ কর্মসূচি। জেনারেল সুহার্তোও এই সুপারিশের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করা সমীচীন মনে করেন নি। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সুদর্শন-বিরোধীরা যখন সংখ্যার বেশি, তখন তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ নিজের বিপদ থেকে আনা। তাই ইন্দোনেশিয়ার অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার নায়ক, তার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি ডঃ সুদর্শনকে একলাই তাঁর ভাগ্যের জন্য কপালে করাঘাত করতে হবে।

সুদর্শন-সমর্থকদের মধ্যে এই সুপারিশের প্রতিক্রিয়া কী হবে বলা যায় না, তবে উত্তেজনা দেখা যাবে না এ-কথা জোর করে বলা যায় না। তবে সেনাবাহিনী তার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুতও রয়েছে। প্রথমত সুদর্শনকে কড়া পাহারায় বোগোর চালান করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত সমস্ত প্রদেশে সেনাবাহিনীকে যে-কোন অবস্থার জন্যে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও হাঙ্গামা হলে তা যে শক্ত হাতেই দমন করা হবে তা বোঝাই যাচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক রণমঞ্চে

এখন নতুন পালা অভিনীত হবে। জেনারেল সুহার্তোকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে বটে, তবে তিনি কতদিন এ পদ রাখেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট সুদর্শনের অপসারণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এখানকার নতুন নেতৃবৃন্দ যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে বিপুল ক্ষতি দেখা দিয়েছিল, যার জন্যে সুদর্শনের দায়িত্বও কম ছিল না। এ সুযোগে আমেরিকা পুরোমাত্রায় নেবে মার্কিন পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটবে এবার এখানে, তার সঙ্গে যদি রাজনৈতিক প্রভাবও বিস্তৃত হয় তাতেও বিস্মিত হবার নেই কিছু।

তবে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বিনষ্ট হবার লক্ষ্য ইতিপূর্বেই দেখা গিয়েছে। শেষের দিকে চীনের পরামর্শে প্রেসিডেন্ট সুদর্শন চরম ভারত-বিরোধিতা সুরু করে দিয়েছিলেন। এবার ঢাকা উল্টো দিকে ঘুরতে সুরু করবে। তবে সুদর্শনের বিদায়ের পর সামগ্রিকভাবে ইন্দোনেশিয়ার লাভ হল কি কীত হল তা বুঝতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

(১২/১০/৬৭)

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

"স্বাভাবিক দিনে এই কথাটি
বলে যেতে চাই
যা দেখেছি, যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।"
—রবীন্দ্রনাথ

উপলব্ধি

সচরাচর এটা হয়ে ওঠে না কিন্তু সেবার এটা ঘটেছিল। আমাদের সব নাতি-নাতনীরাই একসঙ্গে আমাদের সঙ্গে কাঁদন ছিলেন। বেশ জমেছিল আড্ডা তাঁদের সংগে। একদিন সম্মান সমর আমার আফিস ঘরের বড় চওড়া সোফাটার উপর ঠেসান দিয়ে পা ছাড়িয়ে আমি শূন্যে ছিলাম। আমাদের বড় ছেলে সুব্রজ (খোকন)-এর বড় মেয়ে রঞ্জিতা (আমাদের ছোটদি মণিভাই) সোজা এসে খুব স্মাভাবিকভাবেই আমার গায়ের সংগে লেগে টান হয়ে শূন্যে পড়লেন বেন আমার পাশের খালি ফালি জায়গাটুকু ঠিকই প্রাপ্য। তাঁর ভাই সুদীপ্ত (আমাদের ভাইটি) এসে বসলেন আমার হাঁটুর পাশে। আমাদের মেয়ে অঞ্জনা ওরফে কাজল (আমাদের মাটার দুটি মেয়ে ও দুটি ছেলে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে দেখলেন যে সোফাটা ভর্তি। বড় মেয়েটি কৃষ্ণা (আমাদের দিদু) একটা চেয়ার কাছে এনে বসে পড়লেন। শ্যামলী (আমাদের মেজদি মণিভাই)-ও নিলেন আর একটা চেয়ার। মাটার বড় ছেলে অনিন্দ্য (আমাদের বড়বাবু) যাকে আমরা মাঝে মাঝে ডাকতাম সুপার ফাইন বলে তিনি বসলেন আমার পাশের কাছে আমার পা দুটাকে একটু ঠেলেঠেলে সরিয়ে। আর ছোট ছেলে আদিত্য (আমাদের ছোটবাবু) যাকে আমি অনেক সময় ডাকি 'একস্ট্রা স্পেশাল' বলে তিনি কোনো দিকে না চেয়ে সোজা বসলেন আমারই বসবার বড় চেয়ারটার। এ চেয়ারটার একটু ইতিহাস আছে। আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে প্র্যাকটিস আরম্ভ করলাম তখন আমার বোঁঠান (বাসন্তী দেবী) আমাকে সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং গোটা ছ'রেক চেয়ার

দিয়েছিলেন আফিস সাজিয়ে বসতে। বোঁঠানকে বললাম যে দাদাবাবু (চিন্ত-রঞ্জন)-এর ব্যবহার করা একটা কিছু আফিস ঘরে থাকলে পরমন্ত হবে। তখন শূন্যে-পেতে গুদাম থেকে পাওয়া গেল ঐ চেয়ারটা। মন্ত মোটা কাঠের ভীষণ ভারী চেয়ার—পেছনটা খাড়া উঁচু। সেটাকে পালিশ করিয়ে নতুন চামড়ার গদি বসিয়ে বোঁঠান আমাকে বললেন—“তোমার দাদা ঐ চেয়ারটাতে বসে কাজ করতেন। তুই নে এটা।” সেই থেকে আমি ঐ চেয়ারে বসে বছরের পর বছর ধরে কাজ করেছি। এখনো সেই চেয়ারটি আমার আফিস ঘরের টেবিলে রয়েছে। আমাদের ছেলেরা কেউই ব্যারিস্টার হলেন না। আমাদের ভাইটি ছোট বয়স থেকেই তাঁর বাপের মত ইঞ্জিনিয়ার হয়ে হাওয়াই জাহাজের ডিজাইন করবেন এবং ঢালা-বেন বলে মন ঠিক করেছেন। বড়বাবু, সুপার ফাইন শেব পর্যন্ত ঠিক করেছেন তিনি ডাক্তারই হবেন। ছোটবাবু তাঁর বাপের মত একটা বড় ব্যারিস্টার হয়ে টাকা রোজগার করবেন বলে রটনা করলেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য হোল যে ঐ পরমন্ত চেয়ারটাতে ঠিকই দাবি ন্যায়সংগত। সে জন্যে আমি ওটাতে বসে নেই দেখলেই তিনি ওই চেয়ারটাতে বসবেনই। অন্যরা তাঁর এই দাবিটা এখন সবাই মানেন কিনা ওজরে। আমাদের ছোট ছেলে সুহৃদরঞ্জন (মাণিক)-এর দুটি মেয়ে মাটিতে বসে কি খেলছেন আর স্কুলে শেখা ইংরেজী ছড়া বলছেন। ছোটজেন (আমাদের মণিদাদি) তাঁর ঠাকু'মার অনুকরণ করে হঠাৎ আমার কাছে এসে—“দাদু জল খাবে?” কিংবা “দাদু তুমি এত কথা বোলো না” বলেই আবার তাঁর বড় বোন আমাদের রাণীদিদির সংগে গিয়ে খেলতে বসলেন। মাণিকের বোঁ আমা-দের মাণি রমা তাঁর শাশুড়ির সংগে বসে উপরে কি কাজ করছেন।

এই রকম পরিস্থিতিতে আমার আফিস ঘরে যখন সোনার হাট বসে গেছে এমন সময় মেজদিমণি কথাটা পাড়লেন। “দাদু ভাই একটা গল্প বল।” সকলে

সমস্বরে বলে উঠলেন—“হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা গল্প বলতেই হবে।” আমি বললাম—“আমি কি ভাই গল্প জানি? কি গল্প বলব?” ছোটদিমণি বললেন—“দাদু শুনোছ যে আমাদের বংশে অনেক ভাল ভাল ছেলে-মেয়ে জন্মেছেন। বড়দাদু (দেশবন্দু)-র কথা ত' শুনোইছ। তাছাড়া এই ত' সেদিন লেডী বোসের জন্মশতবার্ষিকী হয়ে গেল। তিনিও ত' তোমার দিদিই ছিলেন। তাছাড়া আরো কত নাম শুনোছ। তাঁদের গল্প বল না, ভাই।” আমি বললাম—“সে ত' খুব বড় হবে। তা ছাড়া সেটা ত' ইতিহাস হবে।” ছোটদিমণি বললেন—“ইতিহাস ত' সবচেয়ে ভাল গল্প।” ভাইটি আমার হাঁটুর পাশ থেকে বললেন—“দাদু, আমি বাঁচি কি? তুমি একটা বেশ এ্যাডভেঞ্চারের গল্প বল।” আমি মাথা চুলকিয়ে বললাম—“এ্যাডভেঞ্চারের কি গল্প জানি মনে করতে ত' সময় লাগবে।” ছোটবাবু ঈষৎ মৃদুকি হেসে বললেন—“দাদু, দিদাভাইয়ের সংগে তোমার কোথায় আলাপ হোলো, কেমন করে তাঁর সংগে ভাব হোলো—সেই সব কথা একটু রসিয়ে রসিয়ে বলোই ত' একটা রোমাণ্টিক গল্প হয়ে যাবে।” বড়বাবুর রোমান্সের ধারণা বোধ হয় একটু কম। তিনি বললেন—“তুমি ত' শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে পড়েছ। তাঁর এবং সেই সময়ের কথাই না হয় বল।” মেজদিমণি বললেন—“দাদু, তোমার বিলেতে যাওয়া, পড়া, বেড়ান—এই সবের গল্পই না হয় বল।” আমাদের দিদু দিল্লীতে ল কলেজে পড়লেন। তিনি বললেন—“দাদু, এই ত' সেদিন আমাদের ক্রাশের স্যার তোমারই একটা জাজমেণ্টের ব্যাখ্যা করছিলেন, আচ্ছা, তুমিও ত' প্র্যাকটিসের সময় অনেক মজার মজার কেস করেছ এবং জজ হয়ে অনেক মামলার ফয়সালা করেছ। তার থেকে বেছে বেশ চটকদার দু-একটা মামলার গল্পই বল না।” আমি বললাম—“ভাই, তোমরা যে সব ঢালা অর্ডার দিচ্ছো—আমার বংশের ইতিহাস,

জ্যোতিষগার, রোমান্স, আমার জীবনী—
এ সব ত' বলতে গেলে আমার জীবনীই
হয়ে থাকে। সেটা গল্প হবে কি?"
ছোটাবাবু আবার মৃচকি হেসে বললেন—
"কেন হবে না? একেবারে জ্যান্ত গল্প
হবে।" সবাই বলে উঠলেন—"সে বেশ
হবে। আমরা তাই শুনব—সেই আমাদের
ভাল লাগবে।" একটু গম্ভীর হয়ে
মললাম—"গল্প ত' বলব, কিন্তু গল্পের
নারিকা না হলে বে ক্রমবে না।"

অমনি সবাই "দিদাভাই, দিদাভাই"
বলে চোঁচিয়ে উঠলেন। মেজদিদিগণ ত'
নিজে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে
গিয়ে তাঁদের দিদাভাইকে একবারে বগল-
ধাওয়া করে হিড়হিড় করে সিঁড়ি দিয়ে
মামিরে নিয়ে এলেন। দিদাভাইয়ের
চোখে হাসি, মুখে ঝগ। গজ গজ করতে
করতে বললেন—"বড়ো মানুষের কাজ নেই
বলে যেন আর কাজই কাজ নেই।" বলে
মেজদিদি পাশে একটা চেয়ার নিয়ে
বসলেন। আমি গলা খেকুর দিয়ে
মললাম, "তবে শোন আমার গল্প।" ল'
কলেজে পড়ুয়া দিদা ভাঁর টোঁটের উপর
জান হাতের তর্জনীটা রেখে বললেন—
"দিদাভাই, তুমি এখন সাক্ষীর কঠিনভাষা
—সত্য বই মিথ্যা বলবে না—কোনো কথা
গোপন করবে না।" ছোটাবাবু চেয়ারে
একটু নড়েচড়ে বসে মৃচকি হেসে
জ্ঞপ্তি করলেন—"হ্যাঁ, মনে রেখো—
কোনো কথা গোপন করবে না।" আমি
মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমার
সুদীর্ঘ জীবনের স্মৃতিচরন শুরু
করলাম :—

"আমার পূর্বপুরুষেরা বিক্রমপুরবাসী
ছিলেন।"

১ প্রথম পর্ব

জাতি নিকল ও বঙ্গপরিচয়

(প্রথম অধ্যায়)

বিক্রমপুর

আমার পূর্বপুরুষেরা বিক্রমপুরবাসী
ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিক্রম-
পুরের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে
সেখানকার জন-জল-বায়ুতে দেহমন
পরিপুষ্ট করে বিক্রমপুরেই দেহরক্ষা করে
গেছেন। বিক্রমপুরের প্রাচীন গৌরব-
কাহিনী আমার মা বাবার কাছে অনেক
শুনোছি। তাঁরা যে বিক্রমপুরবাসী এই
গৌরব বোধ যেন তাঁদের মস্তজাগত ছিল।
আমি বিক্রমপুরে জন্মাই নি বটে, কিন্তু
শৈশবে বিক্রমপুরস্থ স্বগ্রামে বাস করোঁছি
ও গ্রামের স্কুলেও পড়েছি। আমি যে
বিক্রমপুরের সন্তান এই বোধ সেই ছেলে-

বেলা থেকেই আমার মনের মধ্যে সঞ্চার
ছিল। একটু বড় হয়ে স্বপ্ন কলকাতার
ও শাস্তিনিকেতনে পড়ুয়া এবং বিশেষ
করে পরে স্বপ্ন কলকাতায় কলেজে
পড়ুয়া তখন কলকাতার ছেলেরা আমাকে
'বাঙাল' বলে পরিহাসের চেষ্টা করত।
সেই পরিহাসে দমে যাওয়া ত' দুইয়ের কথা
আমি যে 'বাঙাল' এবং বিশেষ করে
বিক্রমপুরের বাঙাল সেই কথাটা বেশ
জোর গলাতেই আমার পশ্চিমবঙ্গের
সত্যিখঁদের—হাদের আমি ও আমার মত
অন্যান্য বাঙালরা 'হাট' বসতাম—তাঁদের
গারে পড়েই বুঝিয়ে দিতাম। এই কারণে
আমার জীবনকাহিনী সম্যক উপলব্ধি
করতে হলে বিক্রমপুরের বিষয় কিছুটা
জানা দরকার। আমার জীবনকথা বিক্রম-
পুরের পটভূমিকাতেই অনুধাবন করতে
হবে।

বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন নাম না কি
ছিল 'সমতট'। সমতট বলতেই তট-
ভূমির আভাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ
কি না বিক্রমপুর বা সমতট সমুদ্রের পারেই
অবস্থিত ছিল। কিন্তু সেই তটভূমি
ঐতিহাসিকদের মতে হিমাচলের পাদদেশ
থেকে অল্পই দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল।
বঙ্গোপসাগর তখন যেন তার আঙুল-
গুলি প্রসারিত করে স্বল্পপারিসর সম-
তটকে আঁচড়ে ফেলবার চেষ্টা করত। ক্রমে
শত শত শতাব্দী ধরে পূর্বে মেঘনাদ বা
মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা-প্রশাখাগুলি,
উত্তরে ধলেশ্বরী বা ধলেশ্বরী নদী এবং
পশ্চিমে গঙ্গা ও পদ্মা নদীর শাখা-
প্রশাখাগুলি নিরন্তর পলিমাটি বহন করে
এনে প্রলেপের পর প্রলেপ লাগিয়ে সেই
সমতটের দক্ষিণ ভীতভাগকে ব্রহ্মপুত্র
দক্ষিণে বিস্তৃত করে সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে
নিরে গেছে। বর্তমান সময়ে বিক্রমপুরকে
আর সমতট বলা চলে না, কেন না বিক্রম-
পুরের দক্ষিণ সীমানা ছাড়িয়ে বাংলা
দেশে অনেক নতুন জেলা দেখা দিয়েছে।

সমতটের নাম পরিবর্তিত হয়ে কবে
কি করে বিক্রমপুর হোলো সে কথা নিয়ে
ঐতিহাসিকমহলে অনেক মতভেদ আছে।
তা নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।
এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সমতট
কোনো না কোনো সময়ে বিক্রমপুর নাম
পেরে হিন্দু রাজাদের আমলে পৌণ্ড্র-
বর্ধনভূক্তির মধ্যে মুসলমান রাজত্বকালে
পরগনে বিক্রমপুর নামে সোনারগাঁয়ের
মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইংরেজ আমলে
বিক্রমপুর পরগনার উত্তরাংশ ঢাকা জেলার
মাঝে এবং দক্ষিণাংশ ফরিদপুর জেলার
মাঝে পড়ে। একটা কথা খালি মনে
রাখতে হবে যে বিক্রমপুরের সীমা ও
আয়তন সব সময়ে এক ছিল না। দেশের
সীমা নানা কারণে বদলার। প্রথমত

প্রাকৃতিক কারণে এবং দ্বিতীয়ত রাজ-
নৈতিক বা প্রশাসনিক কারণে। বিক্রমপুর
নদীমাতৃক দেশ। নানা নদী, নালা, বিল,
খাল এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
নদীর গতি পরিবর্তনে বিক্রমপুরের বহু
স্থান ভেঙে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে।
উত্তরে ধলেশ্বরীর ভাঙনে এবং পশ্চিমে
পদ্মার উদ্ভাম গতিবোগে বিক্রমপুরের
সীমানার অনেক অদল-বদল হয়ে গেছে।
সবচেয়ে বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছিল
আনুমানিক দুই শ' বছর পূর্বে। আগে
পদ্মা নদী বা গঙ্গারই একটি শাখা—তা
দক্ষিণবাহিনী ছিল। কিন্তু সে নদী
মোড় ফিরে পূর্ববাহিনী হয়ে একটি
প্রাচীন মরা নদীর—কেউ কেউ বলেন তার
নাম ছিল কালীগঙ্গা—আরই শুনেন
খাতে দুর্বার স্রোতে প্রবাহিত হয়ে
বিক্রমপুরকে স্থিতিবিভক্ত করে পূর্ব-
দিকান্তে মেঘনার সংগে গিয়ে মিলিত
হয়েছে। এই গতি পরিবর্তনে প্রাচীন
বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশের অনেক জমি
পদ্মার জলগর্ভে অন্তর্ভূত হয়ে গেছে।
তারপর এই দুই শ' বছর ধরে কত
যে পল্লী, কত যে দেবমন্দির, মঠ ও
মসজিদ পদ্মার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে তার
ইসত্তা নেই। বিক্রমপুরের স্বাধীন রাজ-
ত্বইসার মধ্যে চাঁদ রায় ও কেরার রাজের
রাজধানী গ্রীষ্মের ও তরীর মাতৃস্বর্গীর
চিতার উপর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত রাজ-
বাড়ির মঠ ও মহারাজা রাজবল্লভের
রতনমাণ্ডিত রাজনগর গ্রাম ও কাটিক-
পুরের মসজিদ, গ্রাম নষ্ট করে পদ্মা নদী
কাঁঠিনাশা নামে অভিযাতি অর্জন করেছে।
১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে পদ্মার দক্ষিণ তীরে
অবস্থিত বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ ঢাকা
জেলা থেকে আলাদা হয়ে দক্ষিণ বিক্রমপুর
নামে ফরিদপুর জেলার মধ্যে অন্তর্গত
হয়েছে নেহাৎ প্রশাসনিক কারণে।
প্রাচীন বিক্রমপুর উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রম-
পুর নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও
দুই ভাগের বাসিন্দারা আচারে ক্রিয়ারে
একই ব্রীতিনীতি অনুসরণ করে
আসছেন। সুতরাং এই দুই ভাগকেই
আমরা উনিশ শ' সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে
পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পূর্বে পর্যন্ত
একই বিক্রমপুর বলে ধরে নিতাম।
বঙ্গ বিভাগের সময় পর্যন্ত বহু
বিক্রমপুরের চৌহান্দ ছিল মোটামুটি এই
রকম—পূর্বসীমা মেঘনাদ বা মেঘনা নদ,
উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, পশ্চিমে পদ্মা নদী
ও চন্দ্রপ্রতাপের কতকাংশ দেহার,
গাধামপুর প্রভৃতি স্থান ও দক্ষিণে
ইদিনপুর। আরতনে উত্তর বিক্রমপুর
ছিল ৩৮৬ বর্গ মাইল এবং তার মধ্যে
ছিল প্রায় ১০১২টি গ্রাম। দক্ষিণ বিক্রম-
পুরের আয়তন ছিল ৩৫০ খানা গ্রাম

নিম্নে ১০০ বর্গ মাইল। দুইভাগ হবার পর কালক্রমে উত্তর বিক্রমপুরে আবার পূর্ব ও পশ্চিমে দুই ভাগ হয়ে যায় কেন না কীর্তিনাশা নদীটির একটি শাখা উত্তরবাহিনী হয়ে বহর, বলিগাঁও, ভাল-তলা দিয়ে উত্তরে ধলেশ্বরীর সংগে মিশে গেলে।

নদ নদী ছাড়া অনেক প্রশস্ত খালও বিক্রমপুরের মধ্যে প্রবাহিত হোতো। তার মধ্যে তালতলার খাল, যা বহরের পাশ দিয়ে গেছে, মীরকাদিমের ও হলদিয়ার খাল উল্লেখযোগ্য। বিলও ছিল অনেক যার মধ্যে আইরল বিলই ছিল সবচেয়ে বিস্তৃত ও প্রসিদ্ধ। হাসাড়ার বিল এই আইরল বিলের একটি অংশ মাত্র। নদ, মদী ও খালের পারে বেশ বড় বড় হাট থাকত ছিল যার মধ্যে ভাগ্যকুল, লোহজঙ্গা বা তারপাশা, তালতলা ও মীরকাদিমের কন্দর নামকরা বাণিজ্যের জায়গা ছিল। বিক্রমপুরের হাটে-বাজারে বাইরের থেকে লেনা, রূপা, লোহা, কাপড়, জামা, জুতা, ছাতা ও বহু মনিহারী প্রবাদি আমদানী হোতো। তা ছাড়া আসত কাঠ, ভাল, তামাক, নারকেল, চিনি, গুড় ইত্যাদি। আর বিক্রমপুর থেকে রপ্তানী হোতো পিতলের বাসন, জোয়ার কাপড়, ছিট, পাট, চামড়া, ঘি, মাছ ও মাটির বাসন এবং রামপালের বিখ্যাত কলা ও হলো। সেখানে বিদেশাগত বহু ব্যবসায়ী স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকানপাট সাজিয়ে বসাতেন। এর মধ্যে অনেক পুরানো হাট ও বন্দর নদীগর্ভে চলে গেছে বা ভাঙনের জন্যে সরে গেছে। এ ছাড়া খালপাড়ের হাটগুলিতেও বড় বড় বাজার বসত এবং বিদেশের বণিকদের আত্মরাত হোতো। এই সব হাট ও বন্দরের মাধ্যমে বিক্রমপুরবাসীদের বাইরের লোকদের সংগে বাণিজ্য ও ভাবের আদানপ্রদান করবার সুযোগ সুবিধে হত। এতে করে বিক্রমপুরের লোকেরা কৃশ-ভুজ না হয়ে বাইরের জগতেরও লোকদের সংগে যোগাযোগ করতে সমর্থ হতেন। তাঁরা বাইরের লোকদের সংগে পরিচিত ছিলেন এবং বিদেশকে তাঁরা ভয় করতেন না। প্রয়োজন বাধে তাঁরা অবাধে বহু দূর দূর দেশে গিয়েছেন ভাগ্য-মক্যুরি সন্ধানে। এই কথাটা মনে রাখা

দরকার বিক্রমপুরবাসীদের চরিত্র বুঝতে গেলে।

সমুদ্রের উপকূলে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার 'ব' স্বেপের উত্তরাংশে বিক্রমপুর অবস্থিত ছিল। 'ব' স্বেপের যে অংশ-টুকুকে বিক্রমপুর বলা হোতো তা' সমুদ্র থেকে খুব বেশি উঁচু ছিল না। প্রাচীন-কালে বিক্রমপুর ও তন্মধ্যস্থিত গ্রামগুলি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সাপ, বাঘ ও অন্যান্য বন্যজন্তুর উৎপাতও ছিল প্রচুর। এই সকল শত্রু থেকে নিজেদের রক্ষা করা বিক্রমপুরবাসীদের নিত্যকর্ম ছিল বলা যায়। গ্রামে পানীয় জলের অবস্থাও একেবারেই ভাল ছিল না। বর্ষার সময় গ্রামের আশে-পাশের খালগুলি স্ফীত হয়ে পুকুরের মধ্যে ঢুকে পড়ে পুকুর-গুলিকে দূষিত করে তুলত। তাছাড়া নদীতে প্রাবন হলেই বর্ষাকালে সমস্ত বিক্রমপুর একেবারে জলে থৈ থৈ হয়ে যেত। গ্রামগুলি ছোট ছোট স্বেপের মত কোনোমতে মাথা উঁচু করে থাকত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বর্ষাকালে নৌকা করে যাওয়া ছাড়া অন্য গতি ছিল না। অত্যন্ত গরীব, বাদের নৌকা ছিল না, তারা মাটির পোড়ানো গামলা—যাকে বলা হত "চাড়ি"—তাইতে চড়ে বাতায়ত করত। এমন কি জল-স্রোত বেশি উঠলে বাড়ির উঠানও জলে ভরে যেত এবং তখন একবাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে হত নৌকা বা চাড়ি বেয়ে। বিক্রমপুরে বর্ষাকাল আষাঢ় মাস থেকে কাঠিক মাস পর্যন্ত একটানা পচি মাস ধরে চলত। তারপর জল সরে গিয়ে কাদা দেখা গেলে মাঠে-ঘাটে বাতায়ত দৃশ্য হয়ে উঠত। এই সময়ে বিক্রম-পুরের স্বাস্থ্য চরম দুর্দশাপ্রাপ্ত হত। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্তাদি সংক্রমক ব্যাধিতে বহু লোক প্রাণ হারাত। বর্ষার সময় মৃতদেহের সংকারও দুর্দহ হয়ে উঠত। পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ছ' মাস খরা থাকত। তখন ইচ্ছে করলে পারে হাঁটা পথে এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম বাতায়ত চলত। সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষ বা মেয়েরা পাল্কী যোগে যেতে পারতেন

এক গরীব ঘরের মেয়েরা ডুলী করেই যেতেন। বাকী সকলে পদরজেই যেতেন। কেউ কেউ নৌকা করে ঘুর পথে নদী ও খাল বেয়েও যেতেন।

বছরে পচি মাস দেশ জলে ডুবে থাকত বলে পাকা সড়ক বা রাস্তাও বলাই তেমন ছিল না বিক্রমপুরের। দু-একটি রাস্তা যে ছিল না তা-ও না—তবে নেহাৎ আঙুলে গোনা যায়। একটি রাজপথ ছিল যা বিক্রমপুরের মূলফতগঞ্জ থেকে রাজগঞ্জ হয়ে একেবারে ঢাকা পর্যন্ত চলে যেত। আরেকটি রাস্তাকে বলা হত কাচকীর দরজা। এ ছাড়া কিছু কাল পরে একটি নতুন রাস্তা—যার নাম হয়েছিল মুন্সিগঞ্জের রাস্তা—মুন্সিগঞ্জ থেকে ধলেশ্বরীর তীরবর্তী বারুণী ঘাট পর্যন্ত যেত। আরো যে ছোটখাটো সড়ক ছিল না তা-ও নয়। তবে বিক্রমপুর বছরের প্রায় অর্ধেক সময় জলে ও কাদায় ভরা থাকত বলে নদী ও খালের মধ্যে নৌকা করেই বাতা-য়াতের রেওয়াজ ছিল। এতক্ষণই যা বললাম তার থেকে সহজেই অনুমান করা যাবে যে প্রাকৃতিক শত্রু, যেমন বাদল ও বন্যা ও তার আনুসঙ্গিক অসুখ-বিসুখ এবং দস্যু-তস্কর ও হিংস্র জন্তুর অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে বিক্রমপুরবাসিগণের সর্বদাই সতর্ক থাকতে হত এবং সেইজন্যে স্বভাবতই তাঁদের কন্টসহিষ্ণু ও আত্মনির্ভরশীল হতেই হত। তাছাড়া হাটে, বাজারে বন্দরে তাঁদের সংগে বাইরের লোকদের যোগাযোগ হওয়ার তাঁদের মনের প্রসার ও বিকাশ ত' ঘটতই, তাঁদের বাইরে যাবারও কোন ভয় থাকত না। এই দুই কারণে বিক্রমপুরের অধিবাসীরা ইংরেজীতে যাকে বলে এন্টারপ্রাইজিং তা-ই হয়ে উঠতেন।

উনিশ শ' সাতচাল্লিশ সালে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হবার আগেই দুইটি আদমশুমারী রিপোর্ট থেকে বিক্রমপুরের জনসংখ্যার যে খবর পাওয়া যায় তা দু' মোটামুটি অনেকটা এই রকম—

মুসলমান

অমুসলমান

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
১৯৩১	২,৪৩,১৮৭	২,৫১,৪৮২	৪,৯৪,৬৬৯	২,০১,৬৫৮	২,১৭,৪০৯	৪,১৯,০৬৭
১৯৪১	৫,০৭,১৮৮	৫,২০,২৩৪	১০,২৭,৪২২	৩,৩৮,৯৭০	৩,৭৬,৬০৭	৭,১৫,৫৭৭

**বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তড়াতাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়**

নতুন

**মাইক্রোকোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'**

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা 'অ্যাসপ্রো' বিশিষ্ট ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার ক্ষমতা আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোকোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়!

মাইক্রোকোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোকোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'তে যেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশি দ্রুত ক্রিয়া করে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেট এখন প্রায় ১৫ কোটি মানুষ কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা দূর করার শক্তি দ্রুতগতির বেগে যায়। শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

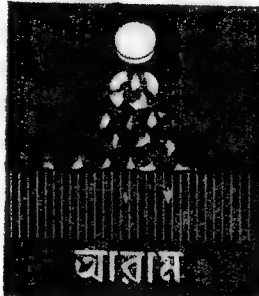
মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু করে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে। নতুন মাইক্রোকোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র ব্যথা দূর করার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীঘ্রির শরীরের সঙ্গে মিশে নিয়ে ৫ থেকে ৭ মিনিট পৃথক শরীরের মধ্যে থাকে। সেইঅজ্জাই মাইক্রোকোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে দেয় এবং তার কণা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোকোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুসী খেতে পারেন—চকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস কল বা যে কোনো গরম পানিরের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত একারের অধীনে নতুন মাইক্রোকোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' থাকেন:
ব্যথা-বেদনা • মাথাব্যথা • হা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • গাটে বেদনা • জ্বর-জ্বর-জ্বর • জু
জেন্দু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রত্যেকের: চাইট ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার থাকেন। বিতরণের
স্থান: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশনত।

নতুন মাইক্রোকোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিতাবে কাজ করে দেখুন



আরাম

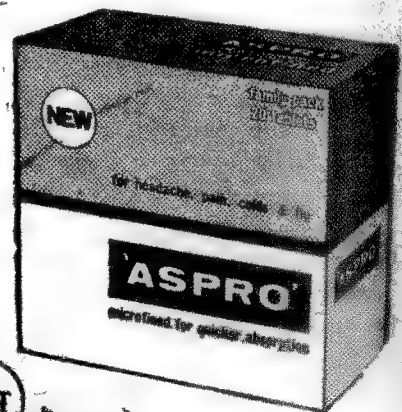


আরাম

ট্যাবলেটের কণাগুলির জাকার বড় বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেয়। হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোকোফাইণ্ড বড়দার ফলে নতুন মাইক্রোকোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র প্রতিটি ট্যাবলেটে আর ১৫ কোটি কণা কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে।

নতুন মাইক্রোকোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।



নতুন

মাইক্রোকোফাইণ্ড

'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

বিকোলাস-এর ৯০ তৈরী

A.C.I. ১/৭৫

উল্লিখিত সংখ্যাগুলি থেকে দু'টি জিনিষ জানা যায় যে বিক্রমপুরে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলমান, কি অমুসলমান এদের মধ্যে শ্রীলোকের সংখ্যাই বেশি পুরুষদের চেয়ে। শেষোক্ত বিষয় থেকে পুরুষের একাধিক বিবাহের স্বপক্ষে হুজি বা সমর্থন পাওয়া যায় কি না তা সমাজতত্ত্ববিদরাই বলতে পারবেন।

বিক্রমপুরে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে প্রথমত পট্টন রাজত্বের বিস্তারের সংগে সংগেই অনেক মুসলমান পরিবার পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসে বিক্রমপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে বসেছিলেন। দ্বিতীয়ত শ্রীহটে সাধু শাহ জালাল এবং বিক্রমপুরের বাবা আদম প্রমুখ ধর্মপ্রচারক মুসলমানদের উদার ধর্মমত ও তার প্রচারের জন্যে অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুসমাজের মধ্যে তাদের স্থান অতি নিচে ছিল বা বারাকৃতকর্মের জন্যে পতিত হয়েছিল তাদের অনেকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে পট্টন রাজার জাতভাই হয়ে গিয়ে সামাজিক নির্বাসন থেকে মুক্ত হয়ে সামাজ্য লাভ করত। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন। এইটাই লক্ষ্য করার বিষয় যে বিক্রমপুরে দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকই পাশাপাশি একত্রে বসবাস করে একে অপরের উপর যে ভাল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে আজকালকার দিনের অসহন মনোভাব ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ছিল। পট্টন কর্তৃক অবসানে সুদূর দিল্লীর মোঘল বাদশাহগণ যখন বঙ্গদেশে আপন শাসনাধীনে আনবার প্রয়াস পান তখন বাংলা দেশের ছোট ছোট রাজ্যবর্গ একে একে সর্বোচ্চ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বিক্রমপুরের বারভূইঞা চাঁদ রায় ও তার ভ্রাতা কৈদার রায় এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্য নীতি স্বীকার করেন নি। চাঁদ রায় ও কৈদার রায়ের নেতৃত্বে বিক্রমপুরবাসী হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ সম্রাট অকবরের বিক্ষুব্ধ সেনাপতি দিল্লীজয়ী মানসিংহের মোঘল ও রাজপুত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করে যে অশ্রুত রণকৌশল, বিশেষ করে নৌযুদ্ধের পারদর্শিতা ও নিয়মানু-বর্তিতা এবং অসাধারণ সংঘবন্দ্যতার পরিচয় রেখে গেছেন তা বাঙালী জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এক বিক্রমপুরবাসী নরনারী, হিন্দু ও

মুসলমানদের আরম্ভমান কালতক উল্লিখিত ও উল্লেখ করবে। তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের অদম্য সাহস ও সংঘবন্দ্যতা যে হিন্দুসমাজের জনগণের মনেও সাহস ও নিয়মানুবর্তিতা এনে দিয়েছিল একথা কোন রকমেই অস্বীকার করা যায় না। সংক্ষেপে হিন্দু গৃহসম্পদ ও সাহসী ও বীররান হয়েছিলেন এবং ভীতে করে তাদের চরিত্র গঠনে বিস্তার সাহায্য করেছে।

বিক্রমপুরবাসীদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গী আর একটি কারণে নতুন করে উদ্ভূত হয়েছিল। বিক্রমপুর অত্যন্ত জনবহুল পরগনা ছিল। যেখানে ঢাকা জেলার প্রতি বর্গ মাইলে সাধারণত ৯০৫ জন লোকের বাস করত সেখানে বিক্রমপুরের বিভিন্ন খানার অনেক বেশি লোকের বসতি ছিল। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় টাঙ্গিবাড়ি খানার ৩০৪৪, লোহজঙ্গ খানার ৩২২৮, মুসিগঞ্জ ২৪১০ এবং শ্রীনগরে ১৮১৫ থেকে ২০০০ লোক বাস করত প্রতি বর্গ মাইলে। এই জনাকীর্ণতার দৃশ্য অচিরে প্রশ্ন দেখা দিল যে কি করে এতগুলি লোকের ভরণপোষণ চলবে। বিক্রমপুর ছিল কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু বেশির ভাগ পরিবারেই চাষের জমি এমন পর্যাপ্ত ছিল না যাতে করে কেবল উৎপন্ন পণ্যে সেই পরিবারের সকল ব্যয়ভার মেটে। তাছাড়া নদীর গতি পরিবর্তনের জন্যে অনেকের পৈতৃক জমিজমা যা-ও বা ছিল তা-ও জলগর্ভে বাওয়ার অনেক পরিবারকেই পুনঃ পুনঃ এক জায়গা থেকে উঠে অন্য জায়গায় গিয়ে বহু অর্থব্যয়ে নতুন বাড়ির করে নিতে হয়েছিল। এই কারণে এই সব বিধ্বস্ত পরিবারের নগদ অর্থবল বা ক্ষেতখামার তেমন কিছুই থাকত না। এঁরা তবে করেন কি? কেমন করে এঁরা সংসার চালাবেন? একমাত্র উপায় তখন ছিল নগদ টাকা উপার্জন করে আনা। সুতরাং দলে দলে এই সব পরিবারের সন্তানদের বাপ-পিতামহের ভিটা ফেলে সুদূর বিদেশে অর্থোপার্জনের জন্যে যেতেই হত। আগেই বলেছি বিক্রমপুরবাসীদের সংগে হাটে, বাজারে, কদরে বাজির মাধ্যমে বাইরের লোকদের সংগে বেশ বোলাষোল হত। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কারণে তাঁরা সংসাহসী কণ্ঠস্বীকৃৎ এবং আত্মবিশ্বাসের আত্মনির্ভরশীল ও উৎসাহী-এঁদের প্রাইজিং-মানুষ ছিলেন। তাঁরা ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে রওনা হতেন, বিদেশ-পানে অকৃতোভয়ে ও উন্নত মনে। এই জয়যাত্রার তাঁদের দুই মহারাজা করেছিল তাঁদের পরিবারের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিক্রমপুরে বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। দেশের নানা স্থানে অনেক টোল ও পাঠশালা ছিল। ন্যায়, জ্যোতিষ, কাব্য, ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ সুবিখ্যাত ছিলেন। বস্তুত বিক্রমপুরের বৈদ্যগণ আয়ুর্বেদীর চিকিৎসার পরাক্রাণ্য দেখিয়ে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে খুব প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও বৌদ্ধধর্মের ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা দেশে এবং বিশেষ করে বিক্রমপুরের অধিবাসীদের উপর যে পড়েছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং এক সমভটের সহকর্তা ৩৯৫টি বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেছিলেন বলে লিখে গেছেন। শ্রীবিক্রমপুরী-বিহার সে সময়ে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার বলে প্রখ্যাত ছিল। এই সকল বিহারগুলির প্রত্যেকটিই আবাদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। পরপর দুইটি রাজবংশ, যথাক্রমে পাল ও কর্ম রাজবংশ, বিক্রমপুরে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করে আপন বংশের ধর্ম, বৌদ্ধধর্মকে, বিশেষ করে নিজ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এতে করে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিক্রমপুরে ও সারা বাংলা দেশে অক্ষুণ্ণ ছিল। এই রাজ্যবর্গ শ্রীবিক্রমপুরে রাজধানী থেকে রাজশাসন করতেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে এই রাজধানী রামপাল নামক জায়গাতেই ছিল। সে বই হোক, এ কথায় ভুল নেই যে এই সকল রাজাদের শাসনকালে বিক্রমপুরে লোকসংখ্যার চর্চা বেশ ভালভাবেই চলছিল।

গণ্যাতীরে অবস্থিত শ্রীবিক্রমপুরী-বিহার অনুমান করা যায় মহারাজ গোপালদেবের জীবিতকালেই নির্মিত হয়েছিল। এই কালেরই মহারাজ নরপালদেবের রাজত্বকালে সুবিখ্যাত জ্ঞানী ও ধর্মপ্রচারক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আনুমানিক ১৮৩ কিংবা ১৮২ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুরে বহু-বোগিনী গ্রামে ব্রাহ্মদণ্ডেশ্বরী কল্যাণেশ্বরী গুরসে ভদ্রী পত্নী প্রভাবতীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহাতার প্রদত্ত নাম তাঁর হোলো চন্দ্রগর্ত। প্রভাবতী বিদ্বান্নী মহিলা ছিলেন এবং পরে এই সন্তানই বলেছেন যে তাঁর মাই তাঁকে বেদ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। বাল্যজীবন থেকেই চন্দ্রগর্তের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এবং বয়সের সংগে সংগে সেই প্রতিভারও ক্রমবিকাশ হতে লাগল। উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুত্রী-বিহারের আচার্য পর

পাণ্ডিত শ্রীলক্ষিতের কাছে এই যুবক ভিক্ষুরূপে দীপঙ্কর নামে পরিচিত হন। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করে কতখিনী অন্য়ান্য প্রধান পাণ্ডিতদের পরাস্ত করে 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি প্রাপ্ত হন। ভিক্ষু হবার কিছুকাল পরেই দীপঙ্কর বিক্রমশীলা-বিহারের আচার্যদের কাছে নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে সুবর্ণস্বীপ (ব্রহ্মদেশ) গিয়ে অভীষ্ট বিদ্যালাভ করে দেশে ফিরে আসেন এবং বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষ হন। সকলেই জানেন এর পর দীপঙ্কর তিব্বতের অধিপতির একান্ত অনুরোধে সেখানকার তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্য ৫৯ বছর বয়সে বিপদ-সঙ্কুল পার্বত্য পথে তিব্বতে যান। সেই যাত্রাপথের কাহিনী রোমাঞ্চকর। তিব্বতের অধিপতি দীপঙ্করকে 'অতীশ' অর্থাৎ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করলেন। দীপঙ্করের পুরো উপাধি সম্বলিত নাম হল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। তিনি তিব্বতে গিয়ে কি কি কাজ করেছিলেন এখানে তার আলোচনার প্রয়োজন নেই। এই বললেই যথেষ্ট হবে যে দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধ-ধর্ম সংস্কার করে মহাযান মত প্রচার করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রমাহুর্বে তিব্বতীয় লোকেরা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দেবতার আসনেই বসিয়েছিল। তিব্বতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতন দীপঙ্করের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। যে মহাপুরুষের নাম উল্লেখ হলেই দালাই লামা ও চীনের সম্রাট পর্যন্ত সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যে প্রণাম করতেন তিনি বিক্রমপুরেই সুসন্ধান, জ্ঞানী ও পাণ্ডিত-সমাজের অগ্রণী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। দীপঙ্করের কাহিনী একটু বড় মনে হলেও উল্লেখ না করে পারা গেল না, কেন না বিক্রমপুরের শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে দীপঙ্করের নাম ও কীর্তি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক তা নয়-ই সে নাম ও কীর্তি বিক্রমপুরবাসীদের কাছে এক অবিস্মরণীয় গোববের বস্তু।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনেকটা কমে গিয়েছিল সেনরাজবংশের রাজা বল্লাল সেনের আমলে। তখন কিন্তু আবার হিন্দুদেব বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচনা ও প্রচার খুব জোরে সংগে আবার চালু হল। বিক্রমপুরেই এই শেষ হিন্দু রাজবংশের লোপ হবে এলো পাঠান ও মোগল রাজত্ব। হিন্দুদের টোল, পাঠশালা ও বৌদ্ধদের বিহারেব পরেই স্থাপিত হল মন্দির, আরবী ও পারস্যী শিক্ষাদানের জন্য। তারপরে এলো ইংরেজ আমল। ইংরেজী শিক্ষা

বিস্তারের জন্য কত পাঠশালা ও স্কুল খোলা হল গ্রামে গ্রামে। গ্রামের উন্নতিকল্পে বিক্রমপুরের বহুদূরদর্শী জমিদার আপন আপন গ্রামে এই সব বিদ্যালয় স্থাপন করে রাজভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। সংক্ষেপে সমাপ্তি করবার জন্য এই বললেই যথেষ্ট হবে যে হিন্দু আমলের টোলে ও পাঠশালায়, বৌদ্ধবিহারে, মুসলমানের মসজিদে ও ইংরেজ শাসনকালে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসাতে বিক্রমপুরবাসী অসংখ্য নরনারী উচ্চ বিদ্যা লাভ করে উন্নতির পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই অর্জিত বিদ্যাশিক্ষা খুবই কাজে লেগেছিল যখন বিক্রমপুরবাসী ভাগ্যানুসন্ধানীরা বেরিয়ে পড়লেন জীবনের জয়যাত্রায়। বিক্রমপুরবাসী নরনারী অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও মেধাবী হওয়ার এবং তাঁদের কর্ম-তৎপরতা অসাধারণ ছিল বলে তাঁরা বাইরে গিয়ে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। তখনকার দিনে বিক্রমপুরবাসীরা যে অনুপাতে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তেমন অন্য কোন জায়গার লোকই হতে পারে নি। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন বর্ধিষ্ণু জায়গা এখনো খুব কমই আছে যেখানে অন্তত দুই-তিন ঘর বিক্রমপুরবাসী লোক নেই। এরা কেউ বা নদীর ভাঙনে বাস্তুহীন হয়ে অন্য জেলায় বা প্রদেশে গিয়ে নতুন বসতি স্থাপন করে সেইখানেই কাজে লেগে গেছেন, কেউ বা কর্মব্যপদেশে অর্থোপার্জনের জন্যে বিদেশে বসবাস করছেন। কিন্তু সর্বদাই দেখা যায় এই সব প্রবাসী বিক্রমপুরের বাসিন্দারা বিবাহাদি সম্বন্ধে বিক্রমপুরবাসীদের সঙ্গেই বহুলাংশেই কবে থাকেন। এবং নিজেদের বিক্রমপুরবাসী বলে পরিচয় দিতে তাঁরা খুবই গৌরব বোধ করেন। বিক্রমপুরবাসিগণ পিতৃপুরুষের বাসস্থানকে কি

রকম অন্তর দিয়ে ভালবাসেন তা' বোঝা যায় ১৩২৩ সালের পৌষ মাসে বিক্রমপুর সম্মিলনীর ব্ষিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বিক্রমপুরের সুসন্ধান ও ভারতের অন্যতম প্রধান জননায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর সভাপতির ভাষণে স্চকণ্ঠে যা বলেছিলেন তার থেকে—

“যে দেশেই থাকি না কেন, যত বিদেশেই ঘুরিয়া বেড়াই না কেন, যখন মনে করি আমি বিক্রমপুরবাসী তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব অনুভব করি বিক্রমপুর যে আমার শরীরের শিরায় শিরায় আমার অস্থিমজ্জাগত। বিক্রমপুরের শত শত কাহিনী যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছে। আমরা যে কিছুতেই তুলিতে পারি না যে আমরা বিক্রমপুরবাসী। এই যে ভাব যাহা সকল ভাব ভাবনা, সকল সাধনার মধ্যে আপনাকে জানাইয়া দেয়, এই যে স্মৃতি যাহা ফলের সংগে জড়ান গন্ধের মত আমাদের জীবনে জড়াইয়া আছে এই ভাব ও স্মৃতিকে সর্বদা জাগ্রত সবতার মত আমাদের হৃদয়মন্দিরে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।...যেমন সমস্ত বাঙ্গালা দেশের একটা চিত্রস্তন বাণী আছে, আমাদের বিক্রমপুরেরও সেইরূপ একটা বিশিষ্ট বাণী আছে। আমরা কান পাতিয়া তাহা শুনিতে চাই। সে বাণী শ্রুদ্দ আমাদের জন্যে। কর্মক্ষেত্রে সে বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সে বাণীকে বুঝা চাই, শুন্য চাই, তাহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা চাই।”

এই ভাষণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে অসংখ্য বিক্রমপুরবাসীদের মন-বাণীটিকে ভরা দিয়ে প্রকাশ করেছেন—আমি নিজেই তাহাদের একজন বলে গণ্য করি।

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং জেনেট্রিং
করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম :—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন : ৩১-৩১৭০

০. রাধামোহন পাল জেন, কলি-১২ : অফিস-ফোন-৩৪-৪৮৪৪

“বাঘের সংগে যুদ্ধ করিয়া
আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলার নাগেরে খেলাই,
নাগের মাথায় নাচি।

* * *

এক হাতে মোরা মগেরে মুখোঁষি,
মোগলেরে আর হাতে-
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে
হয়েছে দিল্লীনাথে।

* * *

বাঙ্গালী অতীশ লম্বিল গিরি
তুবারে ভয়ঙ্কর
কর্মিল জ্ঞানের দীপ্তি ভিষ্মতে
বাঙ্গালী দীপঙ্কর।”
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(শ্রবতীর জয়্যায়)

তেলিরবাগ

আগেই বলছি খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বিত্তীয় বিক্রমপুত্রের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ প্রবাহিনী পদ্মা নদী একদিন তার গতি পরিবর্তন করে হঠাৎ পূর্ব-বাহিনী হয়ে একটি মরা নদীর প্রাচীন খাতে পড়ে দুর্বার স্রোতে বিক্রমপুত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করে কত জনপদ ও পল্লীকে বিধ্বস্ত ও কত প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস করে পূর্বদিকে প্রবাহিত মেঘনা নদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছিল। এই কীর্তিনাশা পদ্মার উত্তর পারে বহর নামে একটি বর্ধিক গ্রাম ছিল। ‘ছিল’ বলছি এই জন্য যে সে গ্রামের চিহ্ন পর্যন্তও আজ আর নেই। এই গ্রামটি আর্যতনে বেশ বড়ই ছিল। প্রখ্যাত হিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘বিক্রমপুত্র’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট থেকে জানা যায় যে, যখন তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেই সময়ে অর্থাৎ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ বরাবর বহর গ্রামের ঘর ও লোকসংখ্যা ছিল মোটামুটি এই ধরনের:—

মোট ঘরের সংখ্যা	৪০৭
মোট জনসংখ্যা	২১৭৪
হিন্দু পুরুষ	৪৫১
হিন্দু স্ত্রী	৪৮১
মুসলমান পুরুষ	৬০৫
মুসলমান স্ত্রী	৬০৭

এই গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে একটি

বেশ বড় জলপথ—ছোটখাট নদী বললেই চলে—পদ্মা নদী থেকে উত্তর দিকে গিয়ে খলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হোভো উত্তর বিক্রমপুত্রকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে ভাগ করে। এই খালটি বিখ্যাত তালভলার খাল বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আমরা বলতাম বহরের খাল। পদ্মা ও এই খালের সংগম কোণে ছিল প্রখ্যাত বহরের বন্দর। এখানে বহু লক্ষ টাকার আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায় হত এবং বহু স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকানপাট ছিল যেখানে খুচরা ও পাইকারী বেচাকেনা চলত। বহু বিদেশী বণিক এখানে আসত তাদের পশরা নিয়ে। এককথায় বহর গ্রাম ও বন্দর বিক্রমপুত্রের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ও ব্যবসায়কেন্দ্র ছিল।

কীর্তিনাশা পদ্মার উত্তর পারে প্রখ্যাত বহর গ্রামের উত্তর-পূর্বে ছিল ছোট একটি গ্রাম যার নাম ছিল তেলিরবাগ। তেলিরবাগের বসতি অঞ্চলটুকু আর্যতনে বেশ ছোটই ছিল। দৈর্ঘ্য আধ মাইল ও প্রস্থে সিকি মাইলের সামান্য একটু বেশি হয়ত হবে। তারই চারিপাশে কতকগুলি ক্ষেত ছিল পাট, ধান ইত্যাদির চাষের জন্যে। বহরের পশ্চিম পাশে যে বড় খাল ছিল সেইখান থেকে একটি অনতিপ্রশস্ত খাল তেলিরবাগ গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে এসে মোড় ঘুরে তেলিরবাগের বসতি অংশের পশ্চিম ধার ঘেঁষে সোজা উত্তরের সীমান্তে পৌঁছে আবার ডাইনে বেকে বসতি অংশের উত্তর দিক প্রদক্ষিণ করে পূর্বদিকান্তে ধান ও পাট ক্ষেতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। এই খালেরই একটি প্রশাখা গ্রামের বসতি অংশের মাঝামাঝি বরাবর পূর্ববাহিনী হয়ে গ্রামটিকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে ধান ও পাট ক্ষেতে মিলিয়ে যেত। এই খালে বর্ষার সময় বেশ জলস্রোত আসত এবং নৌচা চলচলও বেশ অনায়াসেই হতে পারত। কিন্তু শীতকালে জল নেমে গেলে খরা দেখা দিলে খালটি একেবারে শুকিয়েই যেত এবং তখন—হেঁটেই—এগাব-ওপার করতে হত, বাঁশের সাঁকোর প্রয়োজনই হত না। এই খালের উপর বাঁশ পুতে পার থেকে তার উপরে দাঁটো বাঁশ ফেলে—সব্বা গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন বাড়ির অনেক পায়খানা থাকত সামান্য ছিটেবেড়ার আর্যর অন্তরালে। দাঁটো বাঁশের উপর বাস সমানে একটা বাঁশের হাতল ধরে স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকাদের প্রাতঃকৃত্য সমাধা কবতে হত এক এক কবে। সময় সময় যে পা পিছলিয়ে নিচে পড়ে যাওয়ার অঘটন ঘটত না তা-ও খলা যায় না। যে বালক পড়ত তাকে নাকি দুর্দিন শৃঙ্খল চিড়ে দই ছাড়া আর কিছু খেতে দেওয়া হত না।

তার যে খাবার ইচ্ছে দুর্দিন হত না সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। শীতকালে যখন খাল শুকিয়ে যেত তখন এই সব পায়খানাগুলি পুতিগন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর স্থান হয়ে নানা রোগের বীজাণু ছড়াত। কিন্তু বর্ষার প্রাবনে সমস্ত সঞ্চিত আবর্জনা ও ময়লা ধুয়ে সাফ হয়ে যেত।

খালপারে অসংখ্য বেত গাছ ছিল। তাদের ছড়ান ডালগুলি অনেক সময় নৌকার উপর এসে পড়ে আবাহীদের গায়ে কাঁটা বিধিবে দিত। কিন্তু বেত গাছে ফল খবলে খুব সুন্দর দেখতে হত। পাকা বেথইন ফলের উপরে চমৎকার চিকনপাটীর বোনটের মত একটা খোসা থাকত। পাকা বেথইনের সেই খোসা ছাড়িয়ে ডালায় ভরে অল্প নুন দিয়ে ডালায় মৃদুটা কোঁচার কাপড় দিয়ে ঢেকে কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে ছেলেরা ছড়া বলত সমস্বরে—

“আম পাকে জাম পাকে মামা বাড়ির বেথই...ন পাকে।” কাঁকানির চোটে ও নুনের সংস্পর্শে ফলগুলি সত্যি সত্যি নরম হয়ে সুস্বাদু ও উপাদেয় হয়ে উঠত। খালের মধ্যে বর্ষাকালে পুটি, টাংরা, বেলে, ভাদা ইত্যাদি নানা ছোট ছোট মাছ পাওয়া যেত অল্প এবং বিনি পরসায়। আলপিন বোঁকিয়ে কাঁটা তৈরি করে ছিপের সুতাষ সেই কাঁটা বেঁধে ছিপ হাতে বসে যেত বত গ্রামের ছেলে বড়োয় দল। তাদের হাতে থাকত একটু মাত্র পিঠালি। ছিপ ফেলত, টনত পুটি মাছ উঠত এবং সেই পিঠালি কাঁটায় একটু লাগিয়ে আবার ছিপ ফেলত। এই রকম চলত ঘণ্টাভর। কয়েকজন ব্যাখা দেখেছি এ ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ পটু। গ্রামে বেশ বড় ও মাঝারি আয়তনের কর্কাট পুকুর ছিল। তাতে গ্রামবাসীদের পানীয় জল বেশ চল বেত। এ ছাড়া ডোবা ও কচুখোলা ত ছিলই। পুকুরপানীদের মধ্যে বেশ বড় মাছও থাকত। বর্ষাকালে টাটা অর্থাৎ সরু বাঁশের আগায় বাঁধা লোহাব ধাবাল গ্রিশূল ছুড়ে মাছ মারা এক অদ্ভুত ব্যাপার। অবাক হয়ে ছোটবা দেখত।

গ্রামের খাল এ পুকুরপানী কেটে মাটি তলে জমি উচু করে সেই উচু জমির উপরে ঘর তলে গ্রামবাসীরা বসবাস করত। সাধারণত বাড়িগুলি হোত মাটির দেয়ালের উপর খড়ের বা টিনের চোচালা। অবস্থাপন্ন বাড়িতে টিনের দেয়ালও কেউ কেউ করে নিত। গোটা গ্রামটার মাত্র একটি বাড়িতে চুন সুরকি ও ইট দিয়ে গাঁথা পাকা দোতলা বাড়ি ও তৎসংলগ্ন পাকা ঠাকুরদালান ছিল। গ্রামের মধ্যে বিস্তর ও নানা রকমের আম, কাঁঠাল, জাম, ফলসহ ও অন্যান্য বড় ছোট গাছ

গ্রামটিকে ছায়াশীতল করে রাখত। বেশ কটা কদম ফুলের গাছও ছিল। ঘোর বর্ষাকালে গ্রামের চতুর্দিকে মাঠ ও ক্ষেত-গুলি জলে ডুবে যেতো প্রায় মানুষের কোমর পর্যন্ত কিন্তু গ্রামখানি ছোট একটি স্বীপের মত মতো উঁচু করে থাকত কোনমতে। বর্ষার প্রাবন কোন বছর প্রচণ্ড হলে গ্রামের বাড়ির উঠানেও জল থৈ থৈ করত। আশেই বেলোছি বর্ষাকালে এ গ্রাম ও গ্রাম যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল নৌকা বা চাঁড়। চাঁড় বলতে বোঝায় ভাল করে পোড়ান মাটির বেশ বড় গামলা। তাতে বসে দুই হাতে সামনের দিকে বৈঠা দিয়ে বেয়ে এগিয়ে চলা এক অশুভ মজার ব্যাপার। কিছুটা বিপজ্জনক হলেও ছেলেরা চাঁড় চালাতে খুবই আগ্রহী ও উৎসাহী ছিল বলে মনে পড়ে। দারুণ বর্ষার সময়ে মৃতদেহের সংস্কার এক দুর্মুহ ব্যাপার হয়ে পড়ত বলে মধ্যের বাড়ির মেজবাবু দুর্গামোহন নিজ খরচায় গ্রামের বাইরে পুর্দিকে পাকা ইটের মোটা, উঁচু ভিতের উপর মাটি ফেলে প্রশস্ত শ্মশানঘাট করিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামের ও আশেপাশের লোক-দের সুবিধের জন্যে।

তেলিবাগ গ্রামখানি আরও ছোট হলেও তারই মধ্যে বাস করত একাধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজ। সেখানে গ্রামের ভূঁইয়ারা বা জমিদারেরা বাস করতেন। বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভূঁইয়াদের এক-একটি শাখা তেলিবাগের এক-একটি প্রান্তে আলাদা আলাদা বাড়িঘর তুলে-ছিলেন। প্রত্যেক শাখা থেকে যে প্রশাখা বের হত সেই সব প্রশাখার লোকেরা তাদের মূল শাখার কাছাকাছি স্থানেই বাসা বেঁধে নিতেন। এই রকম করে ভূঁইয়ারা গ্রামের পাঁচ দিকে ছড়িয়ে বসেন। ভূঁইয়ারা ছাড়াও গ্রামে অন্য লোকেরও বসতি ছিল। সমাজে বাস করতে হলে অন্যান্য লোকের সাহায্য ও

সহায়তা প্রয়োজন হত বাবুদের। সেই জন্যেই বাবুরা নানা কাজে লাগে এমন নানা সম্প্রদায়ের লোকদের তাঁদের গ্রামে স্থান দিয়েছিলেন। গৃহবিগ্রহ কালাচাঁপ ঠাকুরের নিত্য পূজার জন্যে ছিল এক সব পূজারী। পূজা, পার্বণ, দোলা, দুর্গোৎসব বিবাহ, চুড়া ও শ্রাদ্ধাদির জন্যে লাগে পুরোহিত। সেই জন্যে কয়েক ঘর পুরোহিত বসান হয়েছিল “পুরুত-পাড়া”তে। গ্রাম পরিষ্কার রাখতে ও পুজুমন্ডপ লেগনের কাজে খুবই প্রয়োজন হয় যে শ্রেণীর লোক তারা স্থান পেল “ভূঁইমালী পাড়া”য়। পূজার সময় এবং বিরে চুড়োতে বাজনা না হলে চলে না; সুতরাং তাদেরও থাকার বন্দোবস্ত করতে হল। তাদের পাড়ার নাম পড়ল ‘কাওলি-বাড়ি’। বাবুদের চাকর বেহারা নিতান্তই প্রয়োজন—তারা ঠাই পেল ‘সিকদার-বাড়ি’তে। এরা বংশানুক্রমিক ভূঁইয়াদের ভূতের কাজ করে গেছে। দুধ, দুই, হি সরবরাহ করবার জন্যে এলো ‘গোয়াল-বাড়ি’র লোকেরা। কলুর ঘানির বলদ ঘুরত ‘তেলিবাড়ি’তে এবং খাঁটি সিরিষার তেল পাওয়া যেত তাদের কাছে ন্যায্য দামে। পরনেব কাপড় বুনত যে সকল তাঁতি তাদের পাড়ার নাম ছিল ‘জোলা বাড়ি’ বা ‘ঘুগীবাড়ি’। এ ছাড়া ধোপা, নাপিত, চাঁড়লপাড়া ত ছিলই। ঐটুকু গ্রামের আবাব তিন তিনটি দেওয়ানজী ছিলেন এবং তাঁদেরও বাসের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। আর একটি শিক্ষিত অবস্থাপন্ন পরিবার গ্রামের দক্ষিণাংশে থাকতেন, তাঁদের বাড়িকে বলা হত ‘উকিলবাড়ি’। তাঁরা পেশাদার ব্যবহারজীবী ছিলেন বলে যে তাঁদের বাড়িকে ‘উকিলবাড়ি’ বলা হত তা মোটেই নয়। তাঁদের পদবীই ছিল ‘উকিল’। তাঁরা কোন সুবাদে এবং কখন তেলিবাগ গ্রামে বসতি করলেন তার হাদিস আজ পর্যন্তও জানতে পারি নি। এ সব ছাড়া ছিল বেশ কয়েক ঘর মুসলমান

ও চাঁড়াল, গ্রামের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু-দে-বসতি অংশের বাইরে। মুসলমান ও চাঁড়ালেরাই চাষের কাজ করত। ভূঁইয়াদের ছাড়া গ্রামেব অন্যান্য অধিবাসীরা ভূঁইয়াদেরই প্রজা ছিলেন। পুরোহিত-গোষ্ঠী এবং দেওয়ানজীবা বোধ হয় নিম্নের প্রজা এবং অন্যান্য সকলে না মাঠ একটু খাজনা দিত—সেকালে যেম রেওয়াজ ছিল। প্রেম্বর হিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিক্রমপুর’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট থেকে তেলিবাগ গ্রামের ঘর ও লোকসংখ্যা ১৩৩৮ সন বরাবর এই রকম ছিল বলে জানা যায়—

মোট ঘরের সংখ্যা	৩১১
জনসংখ্যা—হিন্দু পুরুষ	৪০৬
হিন্দু স্ত্রী	৩৫১
মুসলমান পুরুষ	২৯৩
মুসলমান স্ত্রী	২০৭
মোট জনসংখ্যা	১২৫৬

এই যে নানান ‘বাড়ি’ বা ‘পাড়ার’ নাম করলাম সেগুলি কোনটা কোন জায়গায় ছিল তা বোঝবার সুবিধের জন্যে মন থেকে অপটু হাতে আঁকা একটি অস্তিত্ব খসড়া নক্সা পরের সংখ্যায় দেওয়া হবে।

এই ছোট তেলিবাগ গ্রামেই ছিল আমার পূর্বপুরুষদের বসতি। এই গ্রামের মধ্যেই তাঁরা জন্ম গ্রহণ করে, এরই জল বাতাস ও অগ্নি তাঁরা পূর্ন হইবে এই গ্রামেই তাঁদের দেহ বক্ষা করে গেছেন। তাঁদের নম্বর দেহ মিলিয়ে গেছে এই গ্রামেরই মাটিতে। বড় পুণ্যময় এই লতা-গুল্ম সুশোভিত, নয়নাভিরাম ছোট গ্রামখানি।

“সপ্ত পুরুষ বেধায় মানুষ
সে মাটি সোনার বাড়ী।”

—রবীন্দ্রনাথ

[চমক]

ছায়াপথ

মনেরজন চট্টোপাধ্যায়

ছায়াপথ ক্রমশই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হোক।

পাথরে-ফোটা-ফুল

ইচ্ছে আমি তুলে রাখবো মনের ইচ্ছে

জুগুহু অতঃপর বার বার পড়ে ছাই হোক।

রূপা ভূমি নির্বাসনে দুর্মুখ হোয়ো না,

আকাশ এখন খুব নীল নয়

এ মেঘ আনবে না কোনো জল বাঁট ভালোবাসা,

আহত চাঁকরগরলো ভেসে আসছে, আচ্ছন্ন পড়বে দুয়ের পায়ে

সমতলভূমি হবে যন্ত্রণার স্থিতধী আকাশ

রূপা ভূমি নির্বাসনে দুর্মুখ হোয়ো না,

অজ্ঞাতবাসের আয়ু ক্রমশ ফুরিয়ে এলো

হিটেফোঁটা যে যন্ত্রণা বিধছে শরীরে

মনে করো সব কিছু একান্তই করুণা মেঘের।

রূপা ভূমি সূর্যের আড়ালে আর বারবার মুখ ঢেকে নাফো,

এখনো সময় আছে

সূর্যের শরীর থেকে কিছু আলো, কিছু স্নেহ, শুধুমাত্র কেড়ে

যে কেনা রূপারটপ মতো

জং-ধরা কলজেটা অস্তিত্ব একবার শক্তিয়ে নাও সূর্যের আলোয়

নব মন্ত্রিসভা প্রত্যাশা

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। উনিশ বছরের একটানা দুঃসহ কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটেছে। ভোটের বাস্তবে রক্ত-পাতহীন বিপ্লব ঘটে গেল তা' কোন পক্ষই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি। ভোটের আগের দিনও ভোটের পরেও নিরুদ্ভাষ ছিল। অথচ অবিস্বাস্য ঘটনার মত ভারতের দিকে দিকে শাসক-দলের ক্ষমতা ধুলিসাং হয়ে গেল। এই শিক্ষাই দিয়ে গেল যে ভারতের জন-সাধারণেরও এই শিক্ষা আছে যে বোকা দুঃসহ হলে কখন নামিয়ে ফেলতে হয়। বিরূপ ঐতিহ্যের অধিকারী ও পূর্ণ ক্ষমতাবাহী কংগ্রেসকে ছুঁড়ে ফেলতে এখন পেরেছে তখন অপেক্ষাকৃত নবীন নব নব রাজনৈতিক দলগুলির আশঙ্কা করার কারণ আছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের নব-গঠিত মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ কার্যাবলী অত্যন্ত সতর্কতার অপেক্ষা রাখে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ ভরাডুবির পথে পৌঁছেছে। তাই ভোটের পরে কোন বিরোধী একজনকে নিয়ে ডুবন্ত লোকের ছল আঁকড়ে ধরার মত পরিচালনার চেষ্টার ফলশ্রুতি কংগ্রেসের পরাজয়। তাই দ্রোণদশানন দুই বামপন্থী ফ্রন্ট ছাড়াও পি এস পি, এল এস এস, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টিও জয়গা পেয়েছে। মত ও পথের হাজার বিভ্রমতা ও নির্বাচন দিনের ছত্রিশ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি যে অজ্ঞান কটুক্তি ও গালিগালাজ ছোটছিল তা' সত্ত্বেও এই নবগঠিত সম্মিলিত মন্ত্রিসভার দিকে সারা পশ্চিম-বঙ্গের জনসাধারণ অসীম আগ্রহে ও অকৃত্রিম আশায় তাকিয়ে আছে। নিঃসন্দেহে এ পথে তুফান ভারি কিন্তু দিতে হবে পাড়।

আমরা রাজনীতিচর্চাধিকারীরা স্বভাবতই সন্ধিস্থান। তাই কট্র বিপ্লবী, উগ্র বাম ও মধ্য বাম নির্বিষ গণতন্ত্র-বিশ্বাসী ইত্যাদি সাড়ে বত্রিশ ভাজার এই নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করেও সন্দেহ বেড়ে ফেলতে পারছি না। সদা অতীত পাঁচ বছরের কংগ্রেসী শাসনকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে দেশের দুঃসহ অবস্থার জন্য আজকের ক্ষমতাসীন ও তদানীন্তন বামপন্থী দলসমূহ কোন-ক্রমেই তাদের দায়িত্ব বেড়ে ফেলতে পারে

না। কংগ্রেসী যুষ্টির ধুলোয় তারা মোহাবিশ্ট হয়ে আটকে পড়েছেন এবং সেই কুযুষ্টিতে সোচ্চারে সমর্থন করেছেন। খাদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে সবিস্তারে বলার চেষ্টা করব। ফলে কংগ্রেস তার কুশাসন সেই ফাঁকে কায়েমী করে তুলেছে। অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা দেশের দুর্দশার অন্যতম কারণ। বিশেষত মন্ত্রীদের অযোগ্যতাই মূলত দায়ী বললে অত্যুষ্টি হয় না। কংগ্রেসী মন্ত্রী নির্বাচনে সবই দেখা হয়েছিল—গোষ্ঠী, দল, জাত, ধর্ম ও এলাকা কিন্তু যোগ্যতাটুকু বাদ দিয়ে। সূতীক্ষ্ম কৃপাণ তুলে দেওয়া হয়েছিল কৃপাণধারীর ক্ষমতা বিচার না করে। ফলে নির্বাচন প্রসঙ্গে দেশের সকল সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ ঘটেছে। আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। তাঁরা একটু সুবিবেচনা করে দেখলে দেশের উপকার হতে পারে—এ বিশ্বাস রাখি।

মন্ত্রীর নিজ নিজ দপ্তরের অন্যতম প্রশাসকও বটে। দেশপ্রেম ও দেশ পরিচালনা করা এক জিনিস নয়। সুবজ্ঞা বা সুপশ্চিভ হলেই সব সময় যোগ্য প্রশাসক হবেই এমন কোন গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। দেশের সমস্যা ও সমাধান বুঝলেও তাকে প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে নামিয়ে এনে জনকল্যাণে নিয়োজিত করার দক্ষতাই প্রশাসকের যোগ্যতার মাপকাঠি। ভূতকে ছাড়িয়ে তাকে চিরন্তনে দূর করে দেওয়াই ওয়ার সাফল্য। কিন্তু উনিশ বছরের প্রশাসনিক ইতিহাস আমাদের দেশে ব্যর্থতার পুস্তক রচনা করেছে। লক্ষ্য জনকল্যাণ থাকলেও লক্ষ্যপ্রশ্টি হয়েছে বারে বারে এবং তা' পর্বতাকৃতি ধারণ কবেছে। উনিশ বছরে অনেক অনুসন্ধান, অনেক কর্মটি ও কমিশন বসেছে কিন্তু প্রশাসনিক যন্ত্র সম্বন্ধে প্রায় দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। ব্রিটিশ ভারতে লাল ফিতার বিরুদ্ধে বিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল। আজ সে অভিজ্ঞতা আরও বিস্তৃততর হয়েছে। দেশ গঠনের জন্য কয়েকটি পচিসালা পরি-কল্পনা হয়েছে। শত শত নতুন দপ্তর সৃষ্টি ও হাজার হাজার বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী নিয়োগ হয়েছে। মাথাভারী শাসনযন্ত্র পাক্সা দিয়ে আরও বেড়েছে ও আরও কায়েমী হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এদের বেশির ভাগের

ভূমিকা অপ্রয়োজনীয়। কংগ্রেস মান্তদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা এই বিষয়ের প্রতিকার না করে বরং মাথাভারী শাসন-যন্ত্র বাড়াতো সাহায্য করেছে। কিছু উচ্চ-পদস্থ অফিসার মন্ত্রীদের তোষামোদ করে স্বজন-পোষণ ও অনুগাহীতদের বদান্যতা দেখিয়ে প্রশাসনিক যন্ত্রের মধ্যে নিজ নিজ গোষ্ঠী তৈরি করেছে। এই গোষ্ঠীচক্র অস্বীকার করে কেউই এগিয়ে যেতে পারবে না। দুর্নীতি পোষকতার এই মধুচক্র ভাঙতে না পারলে কোন কল্যাণকামী কাজ সম্ভব নয়। আবার সময়মত এই অফিসার-দের গোষ্ঠীর মধ্যে মন্ত্রীদের যোগ্যতা ও অনুপযুক্ততা নিয়ে রাসিকতা করতে দেখেছি। এই অফিসারদের এক শ্রেণীর মধ্যে এক ভুরা ভ্যানিটি জন্মেছে যে তারাই সব, ও মন্ত্রী-টলী কিছু না। তাদের এ কথা বলতে শুনছি যে, মন্ত্রী মানে তা' পাঁচ বছরের আমরুক্ষাল।

সবার উপরে প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসনিক পদ্ধতির আঙ্গু পর্বন্ত পরি-বর্তন হল না। ব্রিটিশ আমলে যে ব্যবস্থার জন্য দেশের নেতারা সমালোচনা ও দায়ী করতেন সেই পদ্ধতিকে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর আরও আঁকড়ে ধরল। এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্যাটেলকে এক সময় তাদের সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করতে দেখা গেল। সেক্রেটারিয়েট ও ডিরেক্টো-রিয়েটের মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্য এবং অসহযোগিতা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্ববৃহৎ দুটি। পশ্চিমবঙ্গে এই অসহযোগিতা ক্রমবর্ধমান বিবাদে পরিণত হয়েছে। সেক্রেটারিয়েটের কাজ মূলত মাতব্বরী করা ও কাজকে অনাবশ্যক বাধা দেওয়া আর মন্ত্রণ করে দেওয়াতে নিবন্ধ। এর উপর ডিরেক্টর ও সেক্রেটারীর মধ্যে কৌলীন্য নিয়ে আছে বিবাদ। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মধ্য থেকে আই সি এস-রা বেছে নেন কিন্তু আই এ এস-দের দলে এমন সব ব্যক্তি ভিড় জমিয়েছেন যে, যাদের মান নিঃসন্দেহে সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু কৌলীন্যের দাবিতে এরা অত্যন্ত মূর্খ। তাঁরা পূর্বনো ব্রিটিশ আমলের সেই চিন্তাধারাকে আঁকড়ে আছেন যে, সেক্রেটারী মানে সরকার। সেক্রেটারী মানে সরকার নয়। এখন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন নির্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলী এবং কোনক্রমেই সচিবরা মন এমন কি রাজ্যপালও মন। এই সত্যটা

অনুদান না করার জন্য ঠান্ডা কোলোনিয়া নিয়ে সচিবরা দূর কষাকষি করছেন। টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসাররা, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের মধ্য থেকে এসেছেন তাঁরা প্রকৃত-পক্ষে পান্ডা পান না। সেক্রেটারীকে ডিঙিয়ে যাবার উপায় নেই। মন্ত্রীরা চাইলেও তাঁরা যেতে পারেন না সরাসরি। অনাবশ্যক সূক্ষ্ম ও অপ্রীতি কুড়োতে কেউই চান না। মন্ত্রীদের সেই রাজ্য কর্ণে পশ্যতি অবস্থা সেক্রেটারী ছাড়া কিছ্ শুনতে চান না। ফলে প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি ও স্বাভাবিকভাবে মন্থরতা বাড়ছে। পশ্চিম-বঙ্গের ডিরেক্টরমন্ডলী এই সব বিষয়ে গুত হ' মাস ধরে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রীতক্লম্ব সেনের সঙ্গে বার বার দেখা করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এমন কি ডিরেক্টরেটের একজন প্রধান ত' পদত্যাগ প্রার্থিত করে বসে আছেন। আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার একটা ফাইল পাঁচ বছরে মন্ত্রীর টেবিলে হাজির করতে পারি নি। একটা কাজকে সুপারিকম্পিতভাবে মন্থরতা দিয়ে দিয়ে কেনন করে বাবা দেয়া যায়, এরকম মন্থরতা খুঁজলে হাজার হাজার মিলবে। সবার উপরে ফাইন্যান্স দপ্তরের অপারেশান ছাঁচির ব্যবহার সংঘত করতে না পারলে কোন উন্নয়ন সম্ভব হবে না। সংযোগ-কারী সহযোগিতার পরিবর্তে অনাবশ্যক বাধাদানকারী একসাইজ ইন্সপেক্টরের মনোবৃত্তি এই দপ্তরের আপার ডিভিশান ইকরানী থেকে সেক্রেটারী পর্যন্ত প্রসারিত। এমন কি টেকনিক্যাল জ্ঞানের অক্ষর পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও টেকনিক্যাল বিষয়ের উপর বিরাট বিরাট মন্থরতা লিখে রাখা দেওয়া হয়। বাধা দেওয়া মানে মন্থর করে দেওয়া আর মন্থরতার একমাত্র পরিণতি দুর্নীতির সুদৃঢ় সৃষ্টি করা। প্রশাসনিক দুর্নীতির বার আনা লুকিয়ে আছে এই মন্থরতা সৃষ্টিকারী পন্থার মধ্যে। তাই লোকপ্রিয় সরকারকে এই পন্থার পরিবর্তন করতে সর্বাত্মে এগিয়ে আসতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ডিরেক্টরেট বা সেক্রেটারিয়েটের দেহের আয়তন বিপুলকার লাভ করেছে ও করছে। তাদের পিরামিড স্ট্রাকচারের নৈচের আয়তনে এত বিস্তৃতি ঘটেছে যে উপরের থেকে সংযোগ রক্ষা করা সহজ-সাধ্য থাকছে না। ফলে চিঠিপত্রের অনাবশ্যক ব্যবহার বেড়েছে ও প্রশাসনিক নিন্মল খরচা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত উন্নয়নার্থে যে বি, ডি, ও অফিস হয়েছে শেষ স্তরের নিবাহী আধিকারিক হিসাবে,

সেখানকার কাজের বদলে চিঠিপত্রের উত্তর দিতেই সকল সময় ব্যয় হচ্ছে। প্রশাসনিক দক্ষতা ও মূল্যবান সময়ের এই অপচয় সৃষ্টিকারী ব্যবস্থাকে এখনই নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। সংক্ষিপ্ত ও সহজ যোগা-যোগকারী পন্থার প্রবর্তন করতে হবে। প্রতি ডিরেক্টরকে অতিরিক্ত সচিব করে দিয়ে সেক্রেটারিয়েটের সংগে কাজ সহজ-সাধ্য হতে পারে। বিপুলায়তন প্রশাসনিক দপ্তরের জেলা অফিসগুলোকে সচেতন ও সক্রিয় করার কথা চিন্তা করতে হবে। প্রতি জেলা অফিস পর্যায়ে থৈথৈ, অবহেলা দূর করার জন্য একটি করে 'তদারিক শাখা' খুলে দেওয়া দরকার। এখানে সম্ভাব্য 'ক্যালেন্ডার অব রিটার্নস' পন্থার চালু করলে সক্রিয় তদারিক সম্ভবপর হতে পারে ও অপচয় সৃষ্টিকারী সকল ব্যবস্থা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হবে। আমি নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে এই বিষয়ে একটু চিন্তা করতে অনুরোধ করি।

এবারে মন্ত্রীদের দক্ষতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সুনাম ও দুর্নাম উভয়ের ভাগী তাঁরা। ভাল কিছু হলে সে কৃতিত্ব আশ্রয় করেন তাঁরা, আর দুর্নাম হলে তা রেড়ে ফেলতে তাই তাঁরা কোনমতেই পারেন না। নিঃসন্দেহে এ মন্থরতা করা যায় যে, গত উনিশ বছরে ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ প্রশাসনিক দক্ষতার নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারেন নি। ক্ষমতার মদমত্ততার চোরাবালির উল্লেখ্যতাকে অকৃত্রিম জলাশয় মনে করে বার বার ভুল করেছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কল্যাণে অসাধারণ ক্ষমতা ও অপরিমিত অর্থ নিয়ে নাড়াচাড়ার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু যথার্থ প্রয়োগে তাকে জনকল্যাণপ্রসূ করে তুলতে পারেন নি। সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠির পার্থক্য ধরতে পারেন নি। জনকল্যাণ ও দুর্দশার দাঁড়িপাল্লার দুর্দশার পাল্লা ভারী হয়ে ঝুলে পড়েছে। দেশের মঙ্গলের জন্য একের পর এক পঞ্চবার্ষিক যোজনা হল। লক্ষ্য ঠিক হল কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ আবিষ্কার হল না। ফল ফটেতে না ফটেতে মরতে করে পড়ল, গর্ভকোয়ে আর ফলের জন্মলাভ হল না। অনভিজ্ঞতার দরুণ পলিসি ও প্রয়োগ দুটোই পঙ্গু হয়ে পড়ল। তাই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে। নেতৃবৃন্দের ইতিহাসও সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষাদেন্যই প্রয়োগবিদ্যায় অক্ষমতার পাহাড় জমিয়ে তুলেছে। ব্যক্তি, সমাজের

ও সরকারের কাজের ও কর্তব্যে পার্থক্য থাকে এবং বিভিন্ন স্তরভেদ বর্তমান। একপক্ষের কর্তব্য অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়, একপক্ষের সহজ-সাধ্য অপরের পক্ষে দুরতিক্রম হয়। ক্ষমতার স্তরভেদ আছে। রাষ্ট্রের সমাজের ও ব্যক্তির সাধ ও সাধের পরি-মাপ করার মধ্যে লুকিয়ে থাকে নেতৃত্বের হাদুদন্দ। অল্প ভোটারদের কৃপায় আর পার্টির বশুপ্রিয়তায় তার সৃষ্টি হয় না। নীতি নির্ধারণে স্বাভাবিক নিয়মের স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ ও ভীতিভাঙ্কিত বা শাসিত আরোপিত অস্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পার্থক্য ধরার ক্ষমতা নেতৃত্বের হাতে থাকে। এই ক্ষমতার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মেল করেছে। আইনের এক খোঁচা খ্রীমে-বাসে ধুমপান বন্ধ হয়েছে অথচ এত চেষ্টা সত্ত্বেও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ সম্ভব হল না। কেন? কেবলমাত্র সরকার আইন ও আদেশের বলে দেশকে নিয়ন্ত্রিত বা সচল করা যায় না। দেশের ব্যস্তর মানুষ কেবল আইনের ভয়ে পরচ্যামিত হয় না। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলেও কখনও দেশের শাসনব্যবস্থা কল্যাণ-প্রসূ হয় না। আর এই শ্রদ্ধাশীলতা আসে মূলত সদাচারের অনুদরবে। নেতৃবৃন্দ যদি এই সত্য না ধরে ফেললমাত্র আইন, আর্ডার ও নোটিফিকেশনের উপর দিয়ে চালাতে চেষ্টা করে তা ভার বাই করাক মঙ্গলকামী হবে না। তাই প্রশাসনিক ব্যর্থতা এত প্রক' হয়ে উঠেছে।

একসময় ভারতবর্ষের চিন্তাবিদরা চিন্তা করছিলেন যে বোধহয় ভারতীয় সংবিধান ও তার গণতন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে মৌলিক ত্রুটি। এবং এঁই জনাই ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনা দ্রুত ফললাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবুও এই মন্থরতার জন্য পরিষদীয় গণতন্ত্রকে দায়ী করছিলেন। অনেকেই প্রিভাইভিস-রাল গণতন্ত্র, এমন কি ডিরেক্টরিয়াল শাসনব্যবস্থা অধিকতর কাম্য বলেই মনে করেছেন। কিন্তু নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতাই যে একমাত্র কারণ সেটা অনুদান কবেন নি। ১৯৬৩ সালে চীন আক্রমণের পর বশুত দেশে ডিরেক্টরী চালু হয়েছিল ডিক্লেস অব ইন্ডিয়ায় কল্যাণে। তারিমের অপ্রতিহত ক্ষমতা হাতে পেয়ে যা মন্ত্রি-মন্ডলী। কিন্তু সুব্যবহার না হয়ে সর্বাধিক অপব্যবহার হয়েছে। অর্থায় পরিষদীয় গণতন্ত্রের একটা পরীক্ষা দেখে হয়ে গেছে।

—দীনবর্ড

(চলবে)

বড়দিনের কাহিনী



সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেটা ছিল বড়দিন। আমার এই বছর পুরীতে উপস্থিত হওয়ার পর এটা ছিল দ্বিতীয় বড়দিন। এই উপলক্ষে সব অপরাধীকেই ছুটি দেওয়া হয়েছে। যদিও এই ছুটি খুব আনন্দের নয় মোটেই, কারণ চিন্তা কবার চেয়ে কাজ করা অনেক আনন্দের। যখন হাতে কোন কাজ থাকে না তখন চিন্তা করা ছাড়া আর কি কাজ আছে। আর চিন্তা কবাবু? ভয়ঙ্কর আর কি হতে পারে? চিন্তার ভয়ঙ্করতাকে কে অগ্রাহ্য করতে পারে? কোন মানুষের পক্ষেই বুঝি তা সম্ভব নয়।

সেই বড়দিনে সমগ্র কারাগারই ছিল নিশ্চৈতন্য আর নিঃশব্দ। কারাগারের সব বাসিন্দাই পরস্পর ফিসফিস করে আলোচনা করছিলেন, যেন তারা কারাগারের নিয়ন্ত্রণকে ভগ্ন করতে ভয় পাচ্ছিল। কেবলমাত্র আসামীদের পায়ের শব্দগুলোর দ্বারা মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। যখনই প্রায় চলার কথা বলত তখনই কনকন

করে বেজে উঠছিল ঐ শব্দ। আর সেই শব্দ তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল তারা বন্দী। তাদের মৃত্তি নেই। যতক্ষণ না মৃত্যুর হিম-পরশ তাদের চিরমৃত্তির সংবাদ বহন করে আনছে।

বন্দীরা এবারও ময়াল, মানুষের কাছ থেকে কিছু কিছু উপহার পেয়েছে। যেমন তারা প্রতিবারেই পেয়ে থাকে। তাদের গির্জাতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর ভাল খাদ্যও সরবরাহ করা হয়েছে। আর এই সব কাজের পর একসঙ্গে জমায়েত হওয়ার পর পরস্পর আলোচনা করা ছাড়া তাদের আর কবাব-কিই বা আছে। প্রকাশ ঘরটায় সকলে জমায়েত হয়েছে তাই। রক্ষীর হাতের অস্পষ্ট আলো ছাড়া এখানে আর কোন আলোর চিহ্ন নেই। ঘরের অপার্থিব অন্ধকার যেন বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে এরা অন্ধকারের জীব, এরা অপরাধী। রক্ষীর কাজ আজ শিথিল, তাই প্রকাশ কাঠের পাটাতনের ওপর সকলে আগ্রহ নিয়েছে।

একজন একটা ভাঙা বেহালার নুদ্র তেলার চেষ্টা করছিল। আরেকজন বড়দিনের কাহিনী শোনাচ্ছিল আরেকজনকে। ওর নাম ছিল টিমফি। সে ছিল চোর। ও বলত কারাগারেই ওর আনন্দ। কারণ একমাত্র এখানেই ও আহা আর আগ্রহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। এই টিমফিকে কারাগারে নায়কের সম্মান দিত কয়েদীরা। টিমফি কখনও খুন করে নি। কিন্তু এত বেশি রকম চুরি আর ডাকাতিতে ও অংশগ্রহণ করেছিল যে কারাগারে ওর সম্বন্ধে আলোচনার শেষ ছিল না। টিমফি সর্বদাই হাসিমুখি থাকত আর অন্যদের সাহায্যের চেষ্টাও করত। বহু মজার মজার কাহিনী বলতে পারত ও। ওর জীবনের নানা ঘটনা ও শোনাতে বন্দীদের। রক্ষীরাও পছন্দ করত টিমফিকে। কারণ ও কখনও তাদের আদেশ অমান্য করত না। তাছাড়া বোধহয় আরেকটা কারণও ছিল। সকলেই শুনেন ছিল টিমফি রেগে উঠলে অতি সাংঘাতিক

পাণ্ডাব কাশতাল ব্যাক। ভারতের সবচেয়ে পুরোনো এবং বড় ব্যাকতালি
মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত। ৪৮০টির উপর এদের শাখা আছে।

কিন্তু এই কড়াননে ইলিয়াকে কেন
অস্বস্তি মনে হল আমার। কারণ এই-
বারই প্রথম ওকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে
শুনলাম। এই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে এমন
অস্বস্তির আভাস ছিল কেন মনে হল এই শব্দ
ওর হৃদয়-ফুড়ে বেরিয়ে এল। আমি ওর
কাছ ঘেঁসে বসলাম ইচ্ছে করাই। ওকে
প্রশ্ন করলাম কিসের চিন্তায় ওর এই
দীর্ঘশ্বাস।

‘ও আমার ছোট কবুতর’ ইলিয়া
বলল, ‘তুমি বুঝবে না আমার দুঃখ।
আমি আমার ছোট সেই ছাগলটার কথা
চিন্তা করছিলাম। তার নাম ওয়াসিয়া।
ওয়াসিয়ার কি হয়েছে আর সে এখন
কোথায় কে জানে। ও, কেউ যদি আমাকে
বলতে পারে আমার ওয়াসিয়া এখন ভালো
থাকে তাহলে ঈশ্বরের কাছে আমার অন্য
কিছুই প্রার্থনা নেই।’

‘ওয়াসিয়া কে?’ বললাম। অবলম্ব
হয়ত বলবে সে কোন ভাই বা ওর কোন
প্রেমিক।

ও আমার দিকে তাকাল। তারপর
বলে, ‘কেন এইমাত্র যে বললাম ওয়াসিয়া
আমার ছোট ছাগল।’

তবুও বুঝতে পারলাম না। তবুও
যেন ওর অন্তরে হালকা করার জন্যই
বললাম, ‘আজ বড়দিন, তোমার কাহিনী
কল আমাকে হয়ত তাতে একটু শান্তি
পাবে।’

ও আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

‘আঃ ছোট কবুতর আমার। তুমি
আমার বাথা বুঝবে না। তবুও তোমাকে
সব কথাই বলব।’

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখ
দিয়ে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

‘তোমাকে সব কথাই বলছি বন্ধু।
এর আগে কারও কাছে এ-কাহিনী বলি
নি। এমন অনেক কথা আছে যা না বলে
পারা যায় না। এও সেই রকম। আমার মা
ছিল না—আমাকে করেকদিন বরষের সময়
একজন কবরখননকারী একটা বুড়ির মধ্যে
খুঁজে পায়। সেই লোকটি ছিল ভালো।
সে আমাকে তার বাড়ি নিয়ে যায়। সে
আমার নামকরণ করে ইলিয়া। কারণ
লজ্জাসী ইলিয়া আর আমাকে একই দিনে
পাওয়া যায়। আমার কেউ ছিল না।
লোকে বলত বিয়ের আগেই মা আমার
জন্ম দেওয়ার লজ্জায় আমাকে ফেলে
গেছে। সকলে আমাকে অপমান করত এ
জন্য। আমি ওদের ঘৃণা করতাম।
তবুও আমি অসুখী ছিলাম না। সেই
কবরখননকারী আর তার স্ত্রী ভালো
লোক ছিল। তারা আমাকে বড় করত।
আমার যখন দশ বছর বরষ তখন তাদের
একটি মেয়ে জন্মাল। সেই মেয়েটিকে
আমি খুব ভালবাসতাম। তার নাম ছিল

এ্যানিসিয়া। এ্যানিসিয়ার মা বড় করত
গেলে আমিই ওকে দেখতাম। তারপর ও
হঠাৎ শিশু। একবার একটা কুকুর ওকে
কামড়াতো গেলে আমি বাধা দিই আর
কুকুরটা আমাকে কামড়ায়। আমি ওকে
আদর করতাম আর বলতাম ও বড় হলে
ওকে বিয়ে করব। একজন প্রতিবেশী এ
কথা শুনে ওর মাকে বলে আর তাই
এ্যানিসিয়ার মা বলে আমি আর কখনও
যেন ওই কথা না বলি। কারণ এ্যানিসিয়া
কোনদিন আমাকে বিয়ে করবে না।
তবুও আমি এ্যানিসিয়াকে ওকথা বলতে
থাকি এমনভাবে যাতে অন্য কেউ না
শুনতে পায়।

তারপর একদিন ক্ষেতে বৃষ্টিতে
ভিজে কাজ করার পর আমি অসুস্থ হয়ে
পড়লাম আর জনৈক চিকিৎসক আমাকে
দেখে বললেন আমার বসন্ত হয়েছে।
সে আমাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে
গেল। আজ আমার মনের যে অকথা
দেখছি এ রোগে তাই হয়ে যায় আর
আমার একটা চোখও নষ্ট হয়ে যায়।
আমাকে দেখে কোন মেয়ে যে আনন্দ পাবে
না বুঝতে পারলাম। তাই যখন বাড়ি
ফিরে এলাম আর কখনও এ্যানিসিয়াকে
বললাম না যে তাকে বিয়ে করব। আমি
শব্দ চেপ্তা করতে লাগলাম ওকে খুশি
রাখতে। আমার কামান কিছু টাকা হলে
ওকে একটা বড় শব্দ করা ছাগলছানা
কড়াননের সময় কিনে উপহার দিলাম।
ছানাটা এত সুন্দর ছিল যে ওর নাম
দিলাম আমরা ওয়াসিয়া। এ্যানিসিয়া
ওর সঙ্গে খেলা করত।

ইলিয়া একটু ধামল। দেখলাম ওর
চোখ জলে ভরে উঠেছে। ও বলল,
‘ছোট কবুতর তোমার বিরক্তি ধরছে না তো
আমার কাহিনী শুন?’

‘না-না তুমি বল’ আমি বললাম।
ততক্বে আমার আগ্রহ জেগেছে।

‘বেশ। সময় এইভাবে কেটে চলল।
এ্যানিসিয়া বড় হয়ে উঠল। অনেক
ছেলেই তাকে বিয়ে করার জন্য পিছনে
ঘুরতে লাগল। এ্যানিসিয়ার চেয়ে
সুন্দরী মেয়ে গ্রামে আর ছিল না।
কোমা নামে একজন সরাইখানার মালিককে
সর্বদাই এ্যানিসিয়ার সঙ্গে দেখা যেতে
লাগল। লোকটা খুব ধনী। তবুও
আমার ভাল লাগে না। কারণ আমি
জননতম কোমা লোকটা অপদার্থ আর
বড় মেয়ের সঙ্গেই ও ঘুরে বেড়ায়।
এ্যানিসিয়াকে সাবধান করতে গেলাম সে
শুনল না। বলল, কোমার সম্বন্ধে কোন
কথা বললে ও আমার সঙ্গে আর কথা
বলবে না।’ বন্ধুলাম ও বদলে গেছে।
ওয়াসিয়াকে ও আর তেমন বড় করে না।
ওয়াসিয়াও কেন বড়ো হয়ে পড়েছে।

আমি তাই ওয়াসিয়াকে বড় করত
লাগলাম। অন্তত মনে হল একজনও
এই পৃথিবীতে আছে যাকে আমার
নিজের বলে ভাবতে পারি।

‘এই পৃথিবীতে একা হওয়া বড়
ভয়ঙ্কর। আমার অবস্থা ছিল তাই।
একদিন এ্যানিসিয়া এসে বলে ও কোমাকে
বিয়ে করছে। যদি ওয়াসিয়া না থাকত
তাহলে বোধহয় এ সময় আমি নদীতে
কাঁপিয়ে আত্মহত্যা করতাম।

‘সময় কেটে চলল। গ্রীষ্মকাল শেষ
হলে একদিন কোমাকে বিয়ে করল
এ্যানিসিয়া। ও ওর বিয়ের উপহার
দেখাল আমাকে। কোমাও নতুন জুতো
আর পোষাক পরে এসেছিল। সকলেই
ভাবল ওরা আদর্শ দম্পতি। এ্যানিসিয়া
বলল, ও ওয়াসিয়ার ভার আমার ওপর
ছেড়ে দিচ্ছে। যেন ও মস্ত দয়া দেখাচ্ছে
বলে বোধহয় মনে করল। হয়ত তাই
হবে কে জানে।

‘ছোট কবুতর, এরপর ওকে কমই
দেখতাম। ওয়াসিয়াই ছিল আমার সব।
আমরা এক জায়গায় ঘুমুতাম। ও
আমার কাঁধে মাথা রেখে জিভ দিয়ে চেটে
দিত আমার মুখ। আমি তখন খুব
সুখী ছিলাম। মনে হত বুঝি এ্যানিসিয়াই
আমার আদর করছে। কিন্তু এ-সুখ
বোশিদিন রইল না। একদিন এ্যানিসিয়া
এসে বলল ও ওয়াসিয়াকে নিয়ে যেতে
চায়, ও ওর সঙ্গে আবার খেলা করবে।
বন্ধুলাম এ্যানিসিয়া সুখী হতে পারে
নি। কিন্তু তাই বলে ওর একাজ করার
অধিকার নেই। আমার ওয়াসিয়া ছাড়া
যে আর কেউ নেই। আমি বললাম
ওয়াসিয়া বড়ো হয়েছে ওর আরও বেশি
বড় দরকার আর ওই আমার একমাত্র
সম্বল। ও আমাকে এ্যানিসিয়ার কথাই
মনে করিয়ে দেয়। এ্যানিসিয়া এ কথায়
হেসে উঠল। বলল, ওয়াসিয়াকে ও ওর
স্বামীকে দিয়ে দেবে। সে ওকে নিয়ে
যাবেই।

তারপর কি যে হল জানি না।
আমার হাতের কাছে একটা কুঠার পড়ে
থাকত। তাই দিয়ে আমি হত্যা করলাম
এ্যানিসিয়াকে।’

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল
ইলিয়ার বুকে চিরে।

‘এই বোকা কোথায় তুই’ বন্দীরা বলে
উঠল।

‘যাচ্ছি, যাচ্ছি, এই যে আমি’ ইলিয়া
চলে গেল। শোনা গেল ও বলছে,
‘আমার ওয়াসিয়া, হায় সে কোথায়?’*

প্রথমেই করেকটি বিশেষ কথা বলার প্রয়োজন আছে যা আমাদের এই পত্রিকার পালিসি সংক্রান্ত। নতুবা আমরা কি ভূমিকায় অভিনয় করেছি এবং করতে যাচ্ছি সেটা পাঠকদের নিকট তুলে ধরা যাবে না।

আজ থেকে তিন বছর আগে নব-পর্মায়ে সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়া থেকে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে চলেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মোট চারটি। (১) প্রগতি-শীল দৃষ্টিভঙ্গীসমূহকে অকুণ্ঠ সমর্থন; (২) সরকারী ও বেসরকারী মহলের অন্যায্য, অনাচার ও দুর্নীতিসমূহের মূখোস্তা খুলে দেওয়া; (৩) গঠনমূলক বিভিন্ন প্রস্তাবের সাহায্যে দেশের নানা সমস্যা সমাধানের দিক-নির্দেশ; এবং (৪) জনসাধারণকে নিজেদের জন্য সঠিক পথে চিন্তা করতে সাহায্য করা।

এই আদর্শ থেকে আমরা কোন দিনই বিচ্যুত হই নি। নিজেরা যুক্তি দিয়ে বা সত্য মনে করেছি তা লিখতে কখনোই স্বেচ্ছাবোধ করি নি, এবং কোন অবস্থাতেই, বেশির ভাগ পত্র-পত্রিকার যা বৈশিষ্ট্য, আমরা ভিগবাজী খাই নি। ‘রাতারাতি বগলে গেল মতটা’—আমাদের ক্ষেত্রে এ কথা কোন দিনও সত্য হতে পারে নি।

আমরা চিরকালই সরকারী অপ-শাসনের বিরুদ্ধে সমানে লেখনী চালিয়েছি, এবং সবিনয়ে এ কথাও জানাচ্ছি যে বর্তমানে যে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূলে আমাদের অবদান বড় কম নয়, বরং বলব যে কোন দৈনিক ও সাপ্তাহিকের চেয়ে অনেক বেশি।

আমাদের এই পত্রিকা সংবাদ সাপ্তাহিক এবং আমরা এখানে এমন বহু সংবাদ, এমন বহু গোপন তথ্য প্রকাশ করি যা অনেক দৈনিক পত্রিকাও সক্ষম নয়। অথচ রাইটস বিল্ডিং-এ বা বিধানসভায় বা সরকারী অন্য কোন মহলে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই। বিধান কংগ্রেসী আমলে সরকারের কাছ থেকে আমরা যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার পেয়েছি আশা করি নতুন সরকার সে বিষয়ে অবহিত হয়ে আমাদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করবেন। আমরা কোন অনুগ্রহ নবগঠিত সরকারের নিকট প্রত্যাশা করছি না। আমরা চাই আমাদের কাজ সুদৃঢ়-ভাবে সম্পন্ন করতে, তাতে যেন আমরা কোন বাধা না পাই বা আমলাতন্ত্রের খামখেয়ালের শিকার না হই।

আমাদের পত্রিকার প্রচারের সংখ্যা সপ্তাহে বিয়াল্লিশ হাজারের চেয়েও বেশি। মাত্র তিন বছরের মধ্যে এ এক আশ্চর্য সাফল্য, যার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। এ থেকেই বোকা যায় জনসাধারণের স্নেহ ও ভালবাসা এই পত্রিকার যথেষ্ট



বিধানসভা ভবনের বাইরে উদ্ভেল জনসমূহের সামনে শ্রীঅজয় মূখোপাধ্যায়

পেয়েছে এবং জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের ওপর আমাদের পত্রিকার যথেষ্ট প্রভাব আছে। বোধ হয় কিছুটা শক্তিও আছে।

এবারে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থার কথা বলি। বর্তমান মন্ত্রি-সভার প্রতি দৃঢ় আস্থা আমাদের আছে এবং আমরা মনে করি বিভিন্ন বিভাগ থেকে দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্য বর্তমান সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করবেন। কংগ্রেসী আমলে বিভিন্ন বিভাগের অজস্র দুর্নীতির উদাহরণ আমরা তুলে ধরেছিলাম এবং প্রতিকারপ্রার্থী হয়েছিলাম, কিন্তু তদানীন্তন সরকার আমাদের কথায় কর্ম-পাত করেন নি। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রি-সভা এদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেবেন বলে আমরা আশা করি, বশুত তাঁরা ইতি-মধ্যেই তার কিছু কিছু নিজের রেখেছেন। আমরা এর পর থেকে প্রতিটি বিভাগের চিত্র তুলে ধরব, এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের অনুরোধ করব যাতে তাঁরা সেই সকল বিভাগীয় দুর্নীতিসমূহ দূর করতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বেলার ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মূখোপাধ্যায় বিগত ৫ই মার্চ তারিখে তাঁর প্রথম বেলার ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যা বলেছেন তা প্রত্যেককেই বিশেষভাবে অভিভূত করেছে। প্রথমেই তিনি মন্ত্রি-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে এই রাজ্যের শহরে, বন্দরে ও গ্রামে, সমতলে ও পার্বত্য এলা-কায় যারা বাস করেন এবং যারা ক্ষেতে

খামারে ও কলকারখানায় কাজ করেন তাঁদের সকলকে অভিবাদন জানিয়েছেন। জনসাধারণ তাঁদের ওপর যে আস্থা স্থাপন করেছেন এবং যেভাবে তাঁদের হাতে জন-সেবার দুরূহ দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন সেজন্য তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর তরফ থেকে জনসাধারণের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে অতীতে যা কিছু করা হয়েছে বা করা হয় নি, তার ফলে যে দুর্দশাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার মোকা-বিলা করার জন্যই তাঁরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দেশ যখন মানবাত্মার সংকট এবং জাতীয় পরিকল্পনা, কর্মনীতি ও প্রশাসনের চরম ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে চলেছে—সেই মুহূর্তে জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা দেশসেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সেই কারণেই নতুন মন্ত্রি-সভা জনসাধারণের পরামর্শ, নির্দেশ, সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর নির্ভর করছে। জনসাধারণই সরকারের সকল শক্তি ও সম্পদের মূল উৎস ও ধারক। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সম্মুখে যে সব সমস্যা বিদ্যমান সেগুলি সম্বন্ধে বর্তমান সরকার পূর্ণ সচেতন। এই সমস্যাসমূহের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, গৃহসংস্থান, অত্যাধিকারী পণ্যসামগ্রী ও সমাজসেবা কৃত্যের তীব্র অভাব, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, এখনো পুনর্বাসনের সুযোগ পান নি এমন বহু উন্মাদিত নরনারী, বর্ষিত পণ্যমূল্য, কৃষি ও শিল্পপণ্যের উৎপাদন হ্রাস, রপ্তানি-বাণিজ্য হ্রাস, মদ্যমূল্য হ্রাস প্রভৃতি। বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার

দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ও কর্মক্ষমতার অভাব আছে, ব্যবসাবাণিজ্যের বহু শাখায় আছে বড় ধরনের মনোফ্যাব্রিজ, মজুতদারী ও কালোবাজারী। এ সবের সম্মিলিত ফলস্বরূপ দৃষ্টি হয়েছে দুর্দশা ও হতাশার, বেড়ে গেছে সরকার ও জন-সাধারণের মধ্যে ব্যবধান, পরিকল্পনা ও কার্য সম্পাদন এবং লক্ষ্য ও অগ্রগতির মধ্যেও সমতার অভাব দেখা দিয়েছে। এগুলি হল ভুল-ভ্রান্তি, সুযোগের অপব্যবহার—নিষ্ফল ও অবাস্তব পরিকল্পনার পূর্জীভূত থাকার দায়। মধ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন :

আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের কর্ম-দৃষ্টি ঘোষণা করেছি এবং কর্মসম্পাদনের এগ্রাধিকারও ঘোষিত হয়েছে। তবে, কোন ভেটিকবাজি আমরা দেখাতে পারব, এ প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি না। এই মর্মেই আমরা আপনাদের শ্রদ্ধা এ কথাই বলতে পারি যে, মানুষের পক্ষে যত কম সময়ে সম্ভব তত কম সময়ে আমরা সম্মিলিত সেবা, চরম আত্মত্যাগ, অকুণ্ঠ প্রয়াসের দ্বারা এই

অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করব। আমরা খোলা চোখ ও মন নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে চাই। আমরা পরিপন্থিত পদ-বেশ্য করে দৃষ্টি-বিচ্যুতি আবিষ্কার করতে চাই। তারপর বাধা সম্প্রসারিত করে, কর্মপন্থার সংস্কার করে ঠিক পথে দেশকে পরিচালিত করতে চাই, আমরা চাই অপব্যয় নিবারণ করতে, দুর্নীতি ও কর্মক্ষমতার অভাবের মূলচ্ছেদ করতে এবং সরকারী লাভ ক্ষতির বিলম্ব দূর করতে। কৃষিজীবী ও শ্রমিকসমাজের কাজের পরিবেশ ও জীবনের উন্নতি সাধন করতে চাই আমরা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তপশীলী সম্প্রদায় ও উপজাতিদের এবং অনন্যত জনসমাজের উন্নতিসাধনও আমাদের লক্ষ্য। নারীসমাজের সমস্যা-বলীর দিকে এবং এই রাজ্যের কতকগুলি অনন্যত এলাকার উন্নয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার অভিপ্রায়ও আমাদের আছে। এককথায় প্রত্যেক নাগরিক যাতে সুবিচার পান সেদিকে আমরা সব সময় দৃষ্টি রাখবো। প্রত্যেকের নিজস্ব জীবনপন্থা

অব্যাহত রাখার মৌলিক অধিকার আমরা রক্ষা করতে চাই। আমরা শ্রদ্ধা দেখতে চাই যে, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের চেয়ে জাতীয় কল্যাণের দিকে যেন এই ধরনের কার্যাবলীর লক্ষ্য বেশি পরিমাণে থাকে।

এই অনবদ্য ভাষণের মধ্যে কোন অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর নেই, সমস্যার গুরুত্ব গোপনের কোন চেষ্টা নেই, অথচ অত্যন্ত সহজভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা করার এবং অবস্থার উন্নতি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মধ্যমন্ত্রীর বক্তার ভাষণের শেষ কণ্ঠি বাক্য প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত।

‘যে কাজের দায়িত্ব আমরা নিয়োছি সে কাজ শ্রদ্ধা, একা সরকার কিংবা জনগণের একাংশ কিংবা কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ কাজ সমগ্র রাজ্যের সকল অংশের জনগণের, এ কাজ আমাদের প্রত্যেকের। এ কাজ সম্পাদনে আমরা দেশের সকলের এবং দেশের বাইরে যারা আমাদের মাতৃভূমির কল্যাণ কামনা করেন তাঁদের সকলের সহযোগিতা ও সমিচ্ছা কামনা করি। আজ আপনাদের কাছে শ্রদ্ধা, একটি আবেদনই জানাবো। সে আবেদন হল—আমাদের ওপর আস্থা রাখুন, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা দিন—আমরা আপনাদের সেবায় নিশ্চয়ই সফল হব। আপনারা ধৈর্য ধরলে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে আমরা নিশ্চয়ই সক্ষম হব।’

নতুন বিধানসভার উদ্বোধন

অতীতপূর্বে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত বুধবার ৮ই মার্চ নতুন বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন হল। প্রথম দিনে অকংগ্রেসী সরকার জনতার জন্য বিধানসভার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। গ্যালারী, অলিম্প, হলঘর, ফটক ছাপিয়ে ভিড় মাঠে ও রাস্তায় উপচে পড়েছিল। উৎসাহী জনতার ভিড়ে বিধানসভার ভিতর ও বাহির এক হয়ে যায় এবং উদ্বোধনী ভাষণ শেষে রাজ্যপালের বাওয়ার সময় জনতা করতালি ও ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ ধ্বনি দিয়ে হর্ষপ্রকাশ করে।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম জনসাধারণ বিধানসভার চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশাধিকার পেলেন। সংবাদপত্রের ভাষ্যকারদের মতে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে যা প্রকাশ—নতুন বিধানসভার উদ্বোধনকালে জন-সাধারণের এত আগ্রহ, এত উদ্দীপনা ইতিপূর্বে কখনো চোখে পড়ে নি। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম জন-সাধারণ বিধানসভাকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতে পারলেন। বৃটিশ আমলে আইনসভা ছিল প্রোটেজ্টেড প্রেস বৈধানিকার রিসীমানায় সাধারণ মানুষ



কৃষ্ণশিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, পশুপালন ও বন্য দপ্তরের মন্ত্রী প্রীকাশীকান্ত মৈত্র শপথ গ্রহণ করছেন।



বিধানসভা ভবনের ভেতরে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের ভোট গণনা করা হচ্ছে

যাওয়ার কথা কল্পনাতেও আনতে পরতেন না। কংগ্রেসী আমলে বরাবরই বিধানসভা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী ছিল, অর্থাৎ সেই ব্রিটিশ ট্রাডিশান, সেই একই দুরত্ব সত্বে বজায় রাখা হয়েছিল, জনগণের প্রতিনিধিসভায় জনগণের কোন স্থান ছিল না। এই প্রথম সেই প্রাচীরের ব্যবধান ঘুচে গেল, জনগণ উপলব্ধি করলেন তাঁরাই আইনসভা, সার্বভৌমত্ব তাঁদেরই। এই প্রথম সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার আশ্বাদ লাভ করলেন।

বলাবাহুল্য প্রাক্তন শাসকবাহিনী, বর্তমানে নখদন্তহীন কংগ্রেস ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখতে পারে নি। বর্তমান বিরোধী দলের নেতা অভিযোগ করেছেন যে বিধানসভার চৌহদ্দির মধ্যে তাঁরা জন-সমাগম সহ্য করতে পারবেন না। জন-গণের মনোভাবকে সম্মান না দেওয়ার দুর্গতি হাড়ে হাড়ে ভোগ করেও এঁদের যে এতদিনেও কেন শিক্ষা হল না সেটাই

ভাববার বিষয়। পক্ষান্তরে সরকার পক্ষের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, জনতার ভিড় যথেষ্ট হয়েছিল, এটা সত্য, কিন্তু তাতে কাজের কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। একথা সকনেই স্বীকার করবেন যে, জনতা কোন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে নি।

এবারের রাজ্যপালের ভাষণেও নতুন সুর শোনা গেছে এবং তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন যা অতীত দিনে তাঁর মুখ থেকে আশা করা অসম্ভব ছিল, বিগত খাদ্য আন্দোলনের উল্লেখ করে তিনি সেই স্মৃতিকে বেদনাদায়ক বলে অভিহিত করেন, তিনি স্বীকার করেন যে জনগণের সেই বিক্ষোভ অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর ছিল এবং অনেক মূল্যবান জীবন নষ্ট হয়েছিল। আরও একটি বিষয় যা তাঁর ভাষণে স্বীকৃতিলাভ করেছে তা হচ্ছে যে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ সরকারিভাবে দুর্গতি

সত্তোর স্বীকৃতি ঘটল; প্রথমটি হচ্ছে যে, গত বছরের খাদ্য আন্দোলন প্রকৃতই জন-সাধারণের আন্দোলন ছিল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে টাকার মূল্য হ্রাস দেশের ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়েছে।

ওই দিন স্পীকার নির্বাচনের কাজটিও নির্বিবাদে সম্পন্ন হয়। কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র এবং বিধানসভার দুইবার নির্বাচিত প্রবীণ নির্বাচনী সদস্য শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীহরিদাস মিত্র যথাক্রমে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত হন তাঁদের কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতার ১৫৪-১২১ ভোটে পরাজিত করে। তারা উভয়েই অভিনন্দনের উত্তরে বলেন যে ওই ঐতিহাসিক বিধানসভার সম্মান লাভ করবেন, কোন ব্যক্তি বা দলের প্রতি ক্ষম্-মাত্র পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

সেদিন অপরাহ্নে পশ্চিমবঙ্গের চৌদ্দটি বামপন্থী দলের যুগ্মসভার

উদ্যোগে কলকাতা ময়দান থেকে হাজার হাজার মানুষের এক বিরাট মিছিল নদীর প্রান্তের মত বিধানসভার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের নতুন অকংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানান, সম্মুখের বাড়িটিকে উপেক্ষা করে জনতা বার বার 'জনগণের সরকার জিন্দাবাদ', 'অজয় মুখার্জী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেন। জনতার প্রবল হর্ষ ও করতালিধ্বনির মধ্যে নতুন মন্ত্রিমণ্ডলী শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অপর্যাপন্ন মন্ত্রীরা বিধানসভা ভবন থেকে পশ্চিম দিকস্থ গেটের সম্মুখে জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়ান এবং নতমস্তকে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করেন। তখন ক্ষমতাস্বত্ব করে বৃষ্টি পড়েছে, জনতার সঙ্গে মন্ত্রীরাও ভিজছেন। একটি মোটরের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জনতার অভিনন্দনের উত্তরে বললেন যে পশ্চিমবঙ্গে আজ সভ্যতার জনকল্যাণমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওই দিনই দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে জনতার অনুরোধে মন্ত্রিমণ্ডলী সহ বিধানসভার গেটের বাইরে এসে জনসাধারণের অভিনন্দন গ্রহণ করতে হয়। মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই তাঁদের বক্তব্য জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করেন।

বিধানসভার উন্মোচনের এই দিনটি পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রথম জনতার মন্ত্রিসভা জনতাকে বিধানসভার আসার ব্যাপারে সকল বাধা-বন্ধন তুলে দিয়ে সম্মানে সেখানে তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন, পুলিশের দুল্লভ্য প্রাচীর অপসৃত করেছেন, জনসাধারণও এই আহ্বানের মর্মীদা দিয়েছেন। তাঁরা এসেছেন শতে শতে, সহস্রে সহস্রে, বিশাল জনতা উৎসাহ-উল্লাসে মন্ত্রীর অধচ শান্ত সংযত, স্বয়ং শাসিত। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য ভারত ইতিহাসে একক।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পেশ

নতুন বিধানসভার অধিবেশনের ষষ্ঠীয় দিনে বৃহস্পতিবার ১৫ই মার্চ তারিখে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট পেশ করেন। বাজেট উদ্বোধনকালে দেশের পরিকল্পনা রচনা-কারদের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, তাঁদের পরিকল্পনার ফলে ব্যক্তিগত সম্পদ ও মুনাকা একদিকে যেমন বিপুলভাবে সঞ্চিত হয়েছে, অপরদিকে তেমন তাঁদের অর্থনীতির দ্রাব্য পৃথকী ধনীকে আরও ধনী করেছে, গরীবকে করেছে আরও গরিব। নিম্ন আয়ের লোকেরা মদ্রা-

স্বাধীনতার পাশচক্রে পড়ে তাঁদের দ্বারা পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

খাদ্যসমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বৃহৎকালীন ভিত্তিতে খাদ্যসমস্যার সমাধানের সিদ্ধান্তের কথা আমরা এতাবকাল শুনে আসছি, কিন্তু একটা জাতীয় খাদ্যনীতির কোন চিহ্নই কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। খাদ্যসমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতকে কোনদিনই অর্থ-ও সামগ্রিকরূপে দেখা হয় নি। দোষটা নীতি-নির্ধারণের, জনগণের নয়। এ যাবৎ খাদ্যনীতি যেভাবে অনুসৃত হয়ে এসেছে তাতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সমূহের জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয় নি, প্রত্যেকটি রাজ্যে শব্দ একদল মুনাকাশিকারী ও রাজনীতিকই তাতে লাভবান হয়েছে।

বাজেট প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী জানান যে, সরকার যাতে মাস চারেকের মত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্য বর্তমানের সাময়িক ব্যয়-বরাদ্দের দাবির ওপর ভোট গ্রহণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। বিধান-মণ্ডলীতে যে আনুমানিক হিসাব পেশ করা হচ্ছে, সময়োপযোগী তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভবপর হয় নি। পরবর্তী পর্ষায়ে এই সভায় সারা বছরের ব্যয়-বরাদ্দের দাবি নিয়ে আলোচনা ও তা মঞ্জুর করার জন্য মিলিত হবার সুযোগ পাওয়া যাবে। তখনই যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন।

চতুর্থ পরিকল্পনার বিনিয়োগের কথা বলতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রীবসু বলেছেন যে, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ একান্তই অপ্রচুর এবং যেটা সবচেয়ে দৃষ্টান্তের বিষয় তা হচ্ছে এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য বিদ্যায় সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের বা প্রাপ্য তার অতিরিক্ত প্রাপ্য হিসাবে, বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে মাত্র ৩৫ কোটি টাকা, যেখানে অতিরিক্ত হিসাবে অন্য পেয়েছে ৭৭ কোটি, গুজরাট ৪৭ কোটি, মহাপ্রদেশ ১০২ কোটি, মাদ্রাজ ৬০ কোটি, মহাশূর ৮৭ কোটি, পঞ্জাব ৬৮ কোটি, রাজস্থান ১০৫ কোটি এবং উত্তরপ্রদেশ ৮৬ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি-অবিচার করেছেন এবং বিগত শাসকেরা কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এই বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার আগ্রহ চেষ্টা করবেন বলে শ্রীবসু জানিয়েছেন।

পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে শেষ যে চিঠি পাওয়া গেছে তদনুযায়ী ২০৫ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য যদি

বরা যার তাহলে ৪৬০ কোটি টাকার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রাক্তন সরকার ৫২২ কোটি টাকার পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন এবং তাঁদের মতে সেটাই ছিল তাঁদের ন্যূনতম দাবি। প্রাক্তন সরকার ব্যাপারটিকে আলোচনার স্তরেই রেখে গেছেন যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনার রূপ ও আকৃতি এখনো নিশ্চিত হয় নি। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রশ্নটি আবার নতুন করে তুলতে হবে।

বাজেট বক্তৃতায় আরও যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে সব-ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের, কৃষি-উৎপাদনের, সকল পণ্যের পাইকারী দরের, আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের বিগত কয়েক বছরের সূচক মান উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, দ্রব্যমূল্যে সূচকমান থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে দেশ এখন ক্রম-বর্ধমান মদ্রাস্বাধীনতার কবলে পড়েছে। প্রতিভূত শিল্পোৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে নি, দ্রব্যমূল্যও স্থিতিশীল হয় নি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সৃষ্টি ও শিল্প-প্রসার ঘটে নি। পূর্ববর্তী সরকারের অর্থসংক্রান্ত নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। উন্নয়নমূলক নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে বহুবার অর্থনৈতিক কারণগুলি রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কথা বলে তাঁরা এতাবৎ পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে তুলেছেন।

কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের সমস্যা-গুলির প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গঠিত 'ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগানাইজেশন' কর্তৃক কলকাতা উন্নয়নের পরিকল্পনাটি তৈরি হয়েছে পড়ে আছে, কিন্তু তা কার্যকরী করার জন্য কোন বরাদ্দ করতে পরিকল্পনা কমিশন অস্বীকার করেছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই আনসেটেলড বিষয়টিকে সেটল করবেন এবং যাতে কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন ঘরিত সম্ভবপর হয়। পরিশেষে শ্রীবসু মন্তব্য করেছেন যে, জনগণের সেবা ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের যথাযথ স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করাই হবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সব-ক্ষেত্রের চেষ্টা।

বাজেটের মূল বক্তব্য

বর্তমান বাজেটে অর্থমন্ত্রী রাজ্যের আর্থিক অবস্থার যে চিত্র এঁকেছেন তা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কংগ্রেসী আমলে ১৯৬৫-৬৬-র বাজেটে রাজস্ব ও মূলধনী হিসাব মিলিয়ে নীতি উল্লংঘন ঘরা হয়েছিল

২২ লক্ষ টাকা; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা ১৫.০৭ কোটি টাকায় উঠেছিল। বাজেট সংকলনের দ্রুত পদ্ধতি এর জন্য দায়ী। বস্তুত বাজেট রচনার সঠিক পদ্ধতিই কখনো এদেশে অনুসৃত হয় নি। বাজেট তৈরি করে আমলারা—যাদের আদৌ অর্থনীতিবিদ বলা যায় না। তারা আয়ের অংক কম করে দেখায় এবং ব্যয়ের অংক অনাবশ্যক কাঁপিয়ে তোলে। ফলে ব্যাপারটা নিছক লোক দেখানোতে পর্যবসিত হয়। গতবারের বাজেটে এই একইভাবে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এই রাজ্যের একটা রঙীন আশা প্রদ চিত্র তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু তা' নিতান্তই ছিল মায়্যা, নিছক বৈদ্যাস্তিক ধরণের।

বর্তমানে যে বাজেট অর্থমন্ত্রী শ্রীবসু পেশ করেছেন তা' কিন্তু পূর্বতন কংগ্রেস সরকারেরই বাজেট। বাস্তবের সঙ্গে এই বাজেটের মিল আছে কি নেই তা' বলা খুবই শক্ত। অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার গোড়াতেই বলেছেন যে, যে বাজেট হাজির করার ভার তাঁর ওপর বর্তেছে—তা' ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ তাঁরা পান নি। সুতরাং আগামী চার মাসের জন্য ১০৯ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দের দাবি তিনি পেশ করেছেন।

১৯৬৭-৬৮ সালের কংগ্রেস নির্মিত এই বাজেটে দেখা যায় যে আগামী বছর রাজস্ব খাতে আয় হবে ২০৬ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হবে ২০৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, সুতরাং ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ২ কোটি ০৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু সামগ্রিক ঘাটতি আরও বেশি হবে, কেন না রাজস্ব খাতের বাইরে ঋণ, সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাব থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালে আদায় হবে ৪৭৭ কোটি ১০ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা এবং এই খাতগুলি থেকে ব্যয় হবে ৪৮২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। রাজস্ব খাতের এবং রাজস্ব বহির্ভূত খাতের ঘাটতি মিলিয়ে পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। চলতি বছরের প্রারম্ভিক উৎস্বৃত্ত তহবিল ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এ থেকে বাদ গেলে ১৯৬৭-৬৮-র বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

বর্তমান অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর মতে এই ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে চিরা-চরিত নিয়মানুযায়ী কর চাপানোর কোনই যৌক্তিকতা নেই। বস্তুত পুরাতন বাজেট নিছকই গতানুগতিক ছকে বাঁধা একটা আনুষ্ঠানিক ফিরিস্তির পুনরাবৃত্তিমাত্র। কাজেই বর্তমান মন্ত্রিসভা সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন যে তাঁরা আর চার মাস পরে নতুন বাজেট পেশ করবেন। আর ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার এই ঘাটতি

তাঁরা কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকেই পূরণ করে নিতে ইচ্ছুক।

এই বাজেটে কতগুলি জরুরী কাজ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে যাতে এই রাজ্যে অধিকতর পরিমাণে



শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় তার জন্য চেষ্টা করা হবে। এই জন্য রাজ্যের একটা বিশেষ অঞ্চলে এই-গুলির উন্নত ধরণের বপন করা



শ্রীহারদাস মিত্র

হবে। তা' ছাড়া পাট, মস্তা, শণ, চা, আখ, গোল-আলু, তামাক ইত্যাদি অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করা হবে। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেও ঝুঁকতে গুরুত্ব দেওয়া হবে। মোটের ওপর নতুন অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। যাঁরা অব-হেলিত ও সাধারণ মানুষের কিঞ্চে

সেবাও করতে চান, তাঁরা সকলেই এবার-কার বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাগত জানাবেন। ভাববাতে ঘাটতি মেটাতে হলে কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য দরকার। শ্রীবসু যথাযথি বলেছেন : কেন্দ্রীয় সাহায্যের এই অসম বণ্টনের প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সর্বশক্তি দিয়ে তুলে ধরতে হবে।

ই, এস, আই, স্কীম প্রসঙ্গে

আমলাতন্ত্রকে আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না কেন না প্রকৃত ঘটনাসমূহের সঙ্গে মন্ত্রীদের সোজাসুঁজি পরিচিত হবার পথে এরাই সবচেয়ে বড় অন্তরায়। বঞ্চন-দর্শনে আমরা দীর্ঘকাল ধরেই বিভিন্ন দপ্তরের অযোগ্যতা, অনাচার ও দুর্নীতির কথা লিখেছি, সেগুলির প্রতি বিভাগগুলির জরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর বা সেক্রেটারী তথা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই দপ্তরগুলিকে চেলে সাজানোর প্রয়োজন এই মর্মেতেই আছে, বিশেষ করে এইসব বিভাগের কর্তাবিত্তরা এমন কিছু গুণ-পদার নিদর্শন এ পর্যন্ত দেখান নি যার জন্য তাদের অনুদক্শা প্রদর্শন করতে হবে।

নতুন মন্ত্রিসভা দুর্নীতি দমনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলেই বিভিন্ন দপ্তরের কয়েকটি দুর্নীতির উৎস আমাদের নির্দেশ করা প্রয়োজন। আমরা সর্বপ্রথম ই, এস, আই, স্কীমের কথা উল্লেখ করছি। চৌদ্দ নম্বর চাঁদনী চকের বাড়িটি দুর্নীতির একটি বৃহৎ আকার হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েক বছর ধরে। সেই কথাই আজ এখানে কিছুটা বলতে চাই।

ই, এস, আই, স্কীমটি প্রাথমিকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছিল এবং মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই স্কীমে প্রমিকেরা প্রভুতভাবে উপকৃত হবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু দুর্নীতিপূর্ণ পরিচালনার দোষে সমস্ত পরিকল্পনাটিই মাঠে হারা যেতে কমেছে। ই, এস, আই, স্কীম কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়েরই প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকার দরজা হাতে টাকা বিতরণ করেন, কিন্তু এই স্কীম পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু বলার নেই, যদিও এই স্কীমের বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা আছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেরিত রিপোর্ট সত্ত্বেও পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব যেভাবে পাঁচমুখের সরকারের কর্তৃত্বভাৱে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ কখনোই কার্যকরী হয় না।

চৌদ্দ নম্বর চাঁদনীচকে ই, এস, আই, এর সদর দপ্তর জুড়ে আছে এ, এম, ও, অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ মৌড-

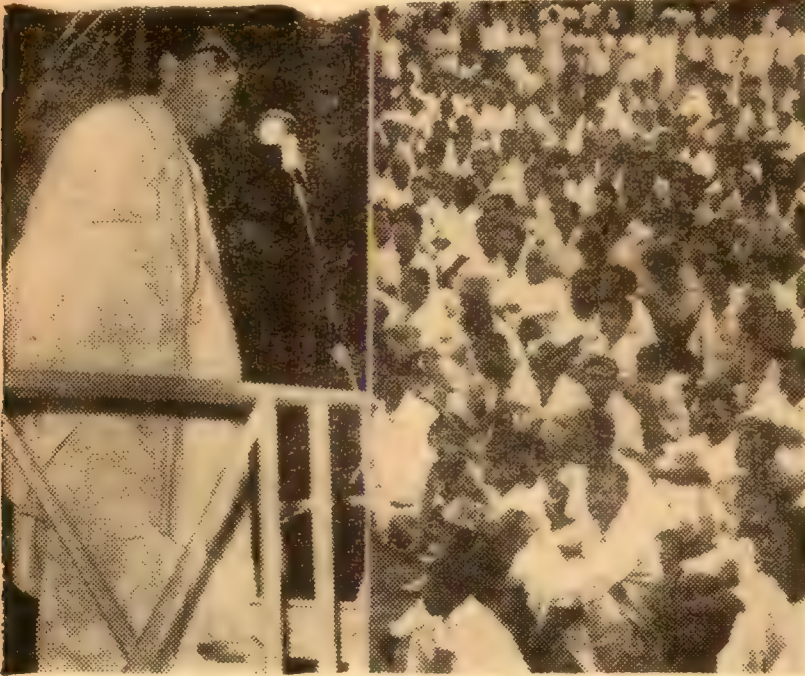
কাল আফসার। এঁদের কয়েকটি বিশেষ কাজ আছে বার মধ্যে একটি প্রধান কাজ হচ্ছে ই, এস, আই, স্কীমে যে সব ডাক্তার কাজ করতে চান তাঁদের মনোনয়ন দান। এই স্কীমে নিযুক্ত ডাক্তারদের কোয়ার্টারলি পাওনাটা নেহাৎ কম নয়, কাজেই প্রাথীও অনেক। কতকগুলি বিশেষ গুণ ও পরিবেশের ভিত্তিতে এই ডাক্তারদের নিযুক্ত করা হয়। একটা নির্দিষ্ট পরিসরের ডিসপেন্সারী, সম্ভাব্য রোগীর সংখ্যা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখে মনোনয়ন দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে মনোনয়নপ্রার্থী ডাক্তারদের এই সব সত্যাবলী পূরণ করা সম্ভব হয় না, কাজেই স্বাভাবিক নিয়মে তারা বাতিল হয়ে বেতে বাধ্য। কিন্তু কিঞ্চিৎ মদ্যুর ব্যবস্থা থাকলে কোন কিছু আটকায় না। পরিদর্শনের জন্য অনেক ইন্সপেক্টর আছেন। তারা বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরে আসেন, এবং পকেটে নগদ কিছু এলেই তারা অনুকূল রিপোর্ট দেন।

এই স্কীমে যে সব রোগীরা সোস্যালিস্টদের দ্বারা চিকিৎসিত হবার সুযোগ পান, তাদের যে প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয় তা স্থানীয় ঔষধালয়গুলির দ্বারা সর্বদা সরবরাহ করা হয় না এবং একটু মূল্যবান ঔষধ হলেই সেই স্পেসি-লিস্টকৃত প্রেসক্রিপশন এ এম ও-র দ্বারা কাউন্টারসাইন করাতে হয়। অর্থাৎ রোগীকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে বার বার দুর্-

দ্রান্তর থেকে কলকাতার চাঁদনীচকে হাজির হতে হয় এবং ওই দুর্লভ সইটির জন্য কিছু দক্ষিণাও খরচ করতে হয়। এ ছাড়া আরও একটি সট-কার্ট আছে। স্থানীয় ডিসপেন্সারীতে প্রেসক্রিপশনটি জমা দিলে এবং তৎসহ নগদ একটি বা দুটি টাকা দিলে ঔষধটি তারা সরবরাহ করে এবং এই জাতীয় অনেকগুলি প্রেসক্রিপশন জমা পড়লে ডিসপেন্সারীর তরফ থেকে একজন এসে সবগুলি এ এম ও কে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। প্রতিটি প্রেসক্রিপশন স্বাক্ষর করানোর জন্য তারা যে টাকা রোগীর কাছ থেকে নেয় তার আবার কিছু অংশ চোন্দ নম্বর চাঁদনী-চকের কর্তাদের ভোগে লাগে।

ই, এস, আই, স্কীমের অনুমোদিত ডিসপেন্সারীগুলির বেশির ভাগই দুর্নীতির উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমন ঘটনা দেখা গেছে যে, ডাক্তার দুটি ঔষধের প্রেসক্রিপশন করেছেন। একটি পাওয়া যায় এক দোকানে, অপরটি পাওয়া যায় আরেক দোকানে, এবং এই দুই দোকানদারের মধ্যে বোঝাপড়া আছে। ফলে রোগীর পক্ষে দুটি ঔষধ এক সঙ্গে পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাকে একটি নিয়েই খুশি থাকতে হয়, এবং প্রেসক্রিপশনটি ঔষধের দোকানে জমা পড়ে। দোকানদার কিন্তু দুটি ঔষধই দেওয়া হয়েছে দেখিয়ে আর একটি ঔষধের মূল্য সরকারের ঘাড় ভেঙে আদায় করে নেয়।

চোন্দ নম্বর চাঁদনীচকে কোন প্রয়োজনে ডাক্তারেরা গেলে তাঁদের প্রতি অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয় বলে বহু চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত রিজিওনাল অফিসগুলিতে গেলে তারা সত্যি ভাল ব্যবহার পান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে এটা মোটেই ভাল কথা নয়। বস্তুত আরও বহু প্রকারের দুর্নীতির বিষয় এই স্কীমে অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে যা এই মর্মেতেই তদন্ত করা উচিত। আমরা তা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করব। অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা, যারা এই স্কীমে রয়েছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, চোন্দ নম্বর চাঁদনীচকের ওই ঘুমুর বাসাটি ভাঙতে হবে, এবং ই, এস, আই, স্কীমটির পরিচালনা বিবেচনিত করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের রিজিওনাল অফিসের প্যাটার্নে তা গড়তে হবে, যাতে রোগীদের অথবা কলকাতায় দৌড়া-দৌড়ি না করে নিকটবর্তী রিজিওনাল অফিসগুলিতে গেলেই কাজ হয়। ডাক্তার নির্বাচন আরও সতর্কতার সঙ্গে করা দরকার, যাতে যে-কোন ডাক্তারই তার ডিগ্রী থাক আর না থাক, কয়েকটি কাল্পনিক সতর্ক পূরণ করে, কিঞ্চিৎ ব্যয় করেই এই স্কীমে ঢুকতে না পারে। এই স্কীমে অনুমোদিত ঔষধের দোকানগুলিতেও যাতে সবরকমের ঔষধ থাকে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং স্পেশালিস্টদের প্রেসক্রিপশনও যাতে নিরীক্ষাটে সার্ভ করা যায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে রোগীদেরও কথায় কথায় চাঁদনীচকে দৌড়তে হবে না। কাজ-কর্মের জটিলতাও অনেকটা দূর হবে, এবং দুর্নীতির একটি বৃহৎ উৎসও বন্ধ হবে। ই, এস, আই, স্কীমে বড় কম টাকা ব্যয় হয় না, কাজেই সেই টাকার যাতে সন্ধ্যা হয় তার চেষ্টা করতে হবে। রাজ্যের শ্রম ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী-ম্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রথম নিবেদন এই যে, তারা যেন আমলাতান্ত্রিক মূর্খত্ববাদের কথায় কান না দিয়ে নিজেরা বিষয়টি ভালভাবে অনুসন্ধান করেন, এবং শ্রমিকশ্রেণীকে যাতে চিকিৎসার নামে চিকিৎসার প্রহসনে না পড়তে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্কীমের প্রতি শ্রমিকদের আগ্রহ আছে, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ টি বি রোগাক্রান্ত শ্রমিকের জীবন-যন্ত্রণা থেকে মৃত্তির সুযোগ আছে, শ্রম পরিচালনার ঘৃণিগুণ সাধকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে এবং সেই মত ব্যবস্থা করতে পারলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও শ্রম-মন্ত্রী শ্রমিক শ্রেণীর অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হবেন।



উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দুর্নীতি তদন্ত কমিটি গঠন : যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় শ্রীঅমিয়নাথ বসুর প্রভাব

আমরা গুলি একটি শব্দ আমরা



বিপ্লব ও বিশ্বাস

কিছু আগে মেশিনগানের মর্দুখ্য আমাদের একটি খণ্ডিত হয়ে গেছে। সাময়িক গণতন্ত্রী বিপ্লবী সরকার—মাস্টারদা ঘোষণা করলেন। শত্রুর তৎপরতার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। খণ্ডিত—যুদ্ধে তারা পশ্চাদপসরণ করেছে—তাদের লুইসগান নিসৃত। তবু শত্রু নিশ্চিন্ত হয় নি—বা নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ তখনও আমরা পাই নি। মাস্টারদা আমার সামনে এসে বললেন—“মেশিনগানের বিরুদ্ধে আমাদের মাস্কেট্রী কি করতে পারবে?” আমি কোন উত্তর দিলাম না—কেবল দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইলাম। ইতিমধ্যে নির্মলদাও কাছে এলেন। তাঁর সেই স্বাভাবিক ভাষাতে বললেন—“ভাইরে ভাই তারা ব্যাগগুণ বেন্ড বাজাইয়াছে mobilise হবে।” (ভাইরে ভাই ওরা সবাই ব্যান্ড বাজিয়ে সম্বন্ধ হচ্ছে)। এবারে আমি আর উত্তর না দিয়ে পারলাম না—“কি যে বলেন নির্মলদা!—কি নিয়ে তারা mobilised হবে?” নির্মলদা আমার বললেন—“শুনছ না ব্যান্ড বাজছে? ঐ শোন—শোনা যাচ্ছে।” আমি অবশ্য তাঁর কথামত শুনতে চেষ্টা করেছি—ব্যান্ডের কোন শব্দ আমার কানে পৌঁছায় নি, তাছাড়া ব্যান্ড বাজিয়ে mobilised হওয়ার পশ্চিৎ আমার কাছে একবারেই অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। যদি কোন ব্যান্ডের আওয়াজ আমি শুনতে পেতাম তবু নিঃসন্দেহেই তা কোন বিয়ের বাজনা বলে মনে করে নিতাম। নির্মলদার কথায় আমার আমি প্রতিবাদ করলাম—“আপনার যতসব উল্টট কল্পনা। শহরের টেলিফোন ব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে, প্রধান অস্ত্রঘাটি আমরা দখল বা ধ্বংস করেছি। কোন রকম বড় mobilisation করা তাদের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। বাজ্ঞে চিন্তা ছাড়ুন। আমি ও নির্মলদা বেশ জোরেই কথা বলছিলাম। সব কথা—

বার্তাই গণেশ শুনছে। পরে গণেশের সঙ্গে যখন এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে তখন গণেশ আমাকে বলেছে নির্মলদার সঙ্গে আমার এইরূপ আলোচনা সে শুনছে। মাস্টারদাও পায়চারি করতে করতে আরও তিন-চার বার কাছে এসে বলেছেন বা স্বগতোক্তি করেছেন—“মেশিনগানের কাছে আমরা আর কতক্ষণ? মাস্কেট্রী নিয়ে কতখানি কি করতে পারবো? যদি আমাদের হাতে ম্যাগাজিন রাইফেল থাকতো। লুইসগান যদি একটিও ব্যবহার করতে পারতাম!” আমি তাঁর সব কথাই শুনছি। চুপ করেই ছিলাম। ভাবতে চেষ্টা করছি—তিনি কি বলতে চাইলেন। মনের মধ্যে কোন সঠিক উত্তর পাই নি।

মাস্টারদা পায়চারি করতে করতে আমাকে এই সব বলেছেন জেনে অনেকের মনে হবে—মিনিট পাঁচ-সাত আগেও শত্রুপক্ষ থেকে মেশিনগানের গুলী চলেছে তবু মাস্টারদা পায়চারি করছিলেন তাও কি সম্ভব? কেবল মাস্টারদা নন—নির্মলদা, আব্বিকাদা, আমি ও আরো কেউ কেউ বৃকে গোল্লার পজিশন থেকে বা আড়াল থেকে সর্ব্ব এসেছি—পায়চারি করেছি। অর্থাৎ আবার যে মেশিনগান চলতে পারে—সেইরূপ ধারণা থাকা সত্ত্বেও—কি জানি কেন যেন সেইদিকে আমাদের প্রক্ষেপ ছিল না। আমার নিজ মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় তাঁরাও অত্যন্ত শত্রু আক্রমণের কথা ভেবে খুব বিচলিত বোধ করছিলেন না।

মাস্টারদা যখন শেষবারের মত বললেন—“মেশিনগানের বিরুদ্ধে আমাদের মাস্কেট্রী কি করতে পারবে?” ঠিক সেই সময়ে আমার শত্রুর মেশিনগান গর্জন করে উঠল—ট্যাট! ট্যাট! ট্যাট! সেই একই দিক থেকে যেন গুলী আসছিল! জানি না কেন সেবারেও আমাদের অনেক দাঁড়ানো অবস্থায় পেয়েও শত্রুর গুলী লক্ষ্যপ্রস্ট হোল। মর্দুখ্যে যে যেখানে

পারলাম শত্রু পড়লাম বা শত্রু আড়ালে পিছনে আশ্রয় নিলাম। আমি আমারি একটি পিলারের পিছনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। দ্বিতীয়বার শত্রুর অত্যন্ত আক্রমণের প্রত্যুত্তরে আমাদের পক্ষ থেকে volley fire চললো। মর্দুখ্যে অববত “বন্দেমারতম” ও “ইনক্লাব জিন্দাবাদ” ধ্বনি ও অবিরাম ধারায় আমাদের গুলী-বর্ষণ চললো। আমাদের তুলনায় শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অনেক কম। তবে তাদের কাছে আছে লুইসগান আর আমরা তাদের সেই মেশিনগানের অজস্র গুলীবৃষ্টি জবাব দিচ্ছি মাস্কেট্রী দিয়ে। তবু বেচারাইংরেজগোষ্ঠী কি আর করে!—at this juncture Mr. Farmer ordered Mr. Johnson to go back to the A.F.I. armoury for more ammunition.” (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case.)

সাহেবদের কাঁচুজ ফুরিয়ে গেল। কাজেই তাদের আবার যুদ্ধ বন্ধ করতে হোল। মাঝমা চলাকালীন সবসময়ই সাক্ষীদের ভাষে জানতে পেরেছি—সেই ইংরেজ দলটি সেখানে আর বোধিস্থ ছিলেন না। খুবই স্বাভাবিক। সামরিক শিক্ষার শিক্ষিত ইংরেজরা বৃদ্ধিতে পেয়েছিলেন যে সেখানে বসে থাকলে তাদের বিপদের আশঙ্কা আছে। তাঁরা স্বভাবতই ভেবেছিলেন—আমরা যখন টিলার ওপর থেকে volley fire চালাচ্ছিলাম তখন হযত আমাদের আর একটি ছোট দল হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হবে। এইরূপ একটি সম্ভাব্য আশু বিপদাশঙ্কায় সেখানে থেকে প্রস্থান করাই তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিলেন। মিঃ লুইস আমাদের মাঝমা চলাকালে একদিন টিফনের সময় কথায় কথায় আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন; সেই দিন মিঃ লুইসের কাছে এই কথাগুলি জানতে পেয়ে নিজেকে আমি দভ

ধিকার দিয়েছি। সত্যিই—সামরিক কৌশল অনুযায়ী আমাদের যা করা উচিত ছিল আমরা তা করি নি—আমাদের সাহস ও চরম আত্মবলির অভিনায় সম্বন্ধে যদি কোন প্রশ্ন নাও বা করি তবু আমাদের সামরিক জ্ঞানের অজ্ঞতাকে অস্বীকার করা যায় না।

এবারেও প্রথম ষপ্টবৃদ্ধির মিনিট দশ পরে তারা আমাদের আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছে। মেশিনগান আবার একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্য! এবারেও আমাদের কারো গায়ে একটি আঁচড়ও লাগল না।

এখন আমাদের কি কর্তব্য! আর দেরি করা যায় না। শত্রুপক্ষ যত বেশি সময় পাবে—তত বেশি সুযোগ তারা নেবে। হুকুম হোল—“পেট্রোল ঢালো—আগুন দাও!” হিমাংশু ও তার সঙ্গো আরো একজন চারিদিকে পেট্রোল ছড়াতে লাগলো। আবার হুকুম হোল—“টিলার নিচে নেমে যাও”। সবাই পলিশ-লাইনের উত্তর-পূর্ব দিক হতে টিলার নিচে নেমে এলো। টিলার দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে শত্রুপক্ষের গুলী আসছিল সেই কারণে উত্তরপ্রান্তে নেমে আসাই যুক্তি-যুক্ত ছিল। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে দক্ষিণপ্রান্তের কোন এক স্থানে তারা মেশিনগনে বসিয়েছিল। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নেমে আসার আগে আর একটি হুকুম হোল—“যে বন্দী অবস্থায় আছে তাকে ছেড়ে দাও।” সে মৃদুটি পেল। আবার আদেশ হোল—“লুইসগান তিনটি ভেঙে ফেল?” সঙ্গো সঙ্গো দমাদম হাতুড়ির ঘায়ে লুইসগান তিনটি চরমার হয়ে গেল।

এবারে হিমাংশু পেট্রোলে আগুন দেবে। সারা আর্মারি, গার্ডরুম ও ম্যাগাজিনরুমে খুব ভালো করে পেট্রোল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় যে কোন স্থানে আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গো সব জাঙ্গার পেট্রোলের surface-এ মপ করে একই সাথে আগুন ধরে যাবে। পেট্রোলের মত দাহ্য পদার্থের এইরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলকে বলা হয়েছিল। যারা আগুন ধরাবার জন্য নিযুক্ত হবে তাদের আরও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল কি করে নিজেদের বাঁচিয়ে দূর থেকে পেট্রোলিস্ত স্থানে আগুন লাগাতে হবে। সামান্য দূর থেকে রিভলবার বা বন্দুক দিয়ে গুলী ছুঁড়লে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে মপ করে পেট্রোলে আগুন জ্বলে ওঠা সম্ভব। তা ছাড়া অব্যর্থভাবে দূর থেকে অগ্নিসংযোগ করতে/হলে ছোট্ট একটি আগুনের বল ছুঁড়ে দিলে—কিন্তু পেট্রোলিস্ত স্থানে

মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠবে তা সকলের মত হিমাংশুরও খুব ভালোভাবে জানা ছিল। তবু অতি উৎসাহী যুবক হিমাংশু উদ্দীপনার মাধ্যম অতি প্রাথমিক নিয়মটিই ভগ্ন করে পেট্রোলিস্ত আর্মারি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গ্যাচ ধরা দিয়ে আগুন ধরাতে গেল। টিলার ওপর বিস্তৃত স্থান ছুড়ে আর্মারি, গার্ডরুম ও ম্যাগাজিনরুম সব ক’টিতেই একসঙ্গে মপ করে একটি জোর শব্দ হয়ে আগুন জ্বলে উঠল। হিমাংশুর পোষাক পেট্রোলে বেশ ভিজ্ঞে ছিল—খুব অসাবধানতার সঙ্গোই সে বিস্তৃত স্থানে পেট্রোল ছাড়িয়েছে। তাছাড়া পেট্রোলিস্ত এলাকা হতে নিরাপদ স্থানে সরে এসে দূরে দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট অগ্নিগোলক ছুড়ে দিলেই আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু তা’ আর হ’ল না—ভাগ্যদেবী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন নন। অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে ভাগ্যদেবী হয়ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর দিকে পক্ষপাতিত্ব করলেন—আমাদের কোন ক্ষতি হবে না একেবারে অক্ষতদেহে চলে আসব তা’ যেন তাঁর সহ্য হ’ল না। ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন ছিলেন কি ছিলেন না তা যদিও অদৃষ্ট-বাদীদের গবেষণার বিষয়, আমার অভিমত হিমাংশু এইরূপ অসাবধানতার সঙ্গো আগুন দিল বলেই তার অপরিণামী সাজা তাকে পেতে হ’ল। মপ করে যেমন সারাটা আর্মারিতে আগুন লেগে গেল তিক তেমনি হিমাংশুর সমস্ত পোষাকে চক্ষুর পলকে আগুন ধরে গেছে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে একটি মানুষের সাইজের বৃহৎ মশাল যেন জ্বলে উঠল। হিমাংশুকে আর দেখা যাচ্ছিল না। প্রজ্বলিত একটি বৃহৎ অগ্নি-মশাল যেন দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটছে। হিমাংশুর আত্ননাদ শুনতে পেলাম। নরেশ ও বিধু দুজনেই সদ্য পাশ করা ডাক্তার। তারা হিমাংশুর কাছে ছুটে গেল। আগুন নেভাবার সহজ কোন উপায় ছিল না। অন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলে তারা হিমাংশুকে মাটিতে শুয়ে গড়াতে বলল—হিমাংশু তাই করে এবং তারাও তাকে তার পোষাকের আগুন নেভাতে সাহায্য করে। আগুন অবশ্য নিভে গেল। প্রায় এক মিনিট ধরে হিমাংশু দগ্ধ হয়েছে—ক্ষত কতখানি গুরুতর তা’ তখনও আমি আন্দাজ করতে পারি নি।

যখন এই শোচনীয় দৃশ্যটো ঘটলো তার কয়েক মিনিট আগে আমি নতুন শেড্রোজে গাড়িটি স্টার্ট দিয়ে আর্মারির টিলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে নিয়ে এসেছি। গণেশের খুব জ্বর। তাকে সঙ্গো করে গাড়িতে নেব এবং নতুন গাড়িটিও আমাদের সঙ্গো রাখা প্রয়োজন মনে করি।

এমন সময় দৃশ্যটোটি ঘটে। হিমাংশু ছুটে এসে গাড়ির পেছনের সিটে উঠে পড়ে ও তার সঙ্গো সঙ্গো এসে উঠেছে আনন্দ ও মাখন। গণেশ আমার পাশে। গাড়িটি চালাচ্ছিলাম আমি। ওয়াটার ওয়ার্কসের উত্তরপ্রান্তের কম্পাউন্ড ঘরে যে রাস্তাটি শহরে গেছে সেই পথ অনুসরণ করে আমি গাড়ি নিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগোতে থাকি। হেড-লাইট জ্বালানো ছিল। রাস্তাটি খুব ভাঙা-চোরা, ইচ্ছে করলেও জোরে গাড়ি চালাবার কোন উপায় ছিল না—তাছাড়া যেহেতু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা তাই লাইট নিভিয়ে অগ্রসর হওয়াও সম্ভব ছিল না।

মাস্টারদা, অস্কারদা ও নির্মলদা প্রধান দলের সঙ্গো রইলেন। তারা তিনজনেই সার্বিক প্রায়শ্চিত্ত জানতেন—আমাদের শহরে আসতে হবে। চৌষট্টিজনের খাবারের অভ্যাস দেওয়া ছিল মুলকেশ্বর রহমানের রেস্টোরাঁতে। এ ছাড়া মোটর গাড়ি নিয়ে হেড-লাইট জ্বালিয়ে আমরা যে শহরের দিকে এগিয়েছি তার নির্ভুল পথ নির্দেশ তাঁরা পেরেছেন। আর গাড়ি নিয়ে শহরে যাওয়ার অর্থ মাত্র একটি—পূর্ব-নির্ধারিত প্ল্যান কার্যে পরিণত করা। গাড়ি নিয়ে আত্মগোপন করা যায় না—আমাদের সকলের জানা ছিল নিরাপদে আত্মগোপন করার মত সন্দেহাতীত স্থান শহরে আমাদের ছিল না, কারণ সব বাড়িগুলি ও সেই সব বাড়ির ছেলেদের আমাদের দলের ছেলে বলে পলিশ চিনত। এই কারণে আমরা, অস্তিত্ব আমি, এক মুহূর্তের জন্যও ভাবি নি যে সমস্ত দলটি পায়ে হেঁটে আমাদের অনুসরণ করে শহরে আসবে না।

শহরে উত্তরপ্রান্তে পার্কেড গ্রাউন্ডের কাছে আনন্দের বাড়ির টিলাব নিচে হিমাংশুকে নামিয়ে দিলাম। হিমাংশুর বাড়ি আনন্দের বাড়ির খুব কাছে। গাড়িতে হিমাংশু পিছনের সিটে ছিল, তাই আমি তাকে ভাল করে দেখি নি বা কন্ট্রোলিত তার কোন গোষ্ঠানির আওরাজ আমাব কানে আসে নি। হয়ত নিজ জ্বলের জন্য হিমাংশুর পরিতাপের সীমা ছিল না। সেই কারণে বোধহয় আগুনে পোড়ার জ্বালাও সে মৃদু বজ্র সহ্য করছিল। তাকে যখন গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলাম তখন সামান্য বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় অনন্তান বা কোনরূপ বিদ্যায়-অভিনন্দনও কেউ কাউকে জানালাম না। এ আমার রাগ নয়, কারণ প্রতি অভিমান বা অভিযোগও নয়। সেইরূপ একটি যথেষ্ট আবহাওয়া—প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা, শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের প্রতীক্ষা, ক্ষত, দগ্ধ, আহত ও মৃত্যুর কঁরাল ছায়া যখন চোখের সামনে ভাসতে থাকে, যখন

আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের নানান বিষয় ও ধাঁধা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় তখন মনে হয় সকল প্রকার কোমল আকর্ষণ, স্নেহ, ভালবাসা—সব যেন দূরে সরে যায়। নাগরখানা পাহাড়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড খোঁয়ার পর (মাস্টারদা ও অস্মিকাদাকে,) যখন মৃত অবস্থায় ফেলে এলাম তখনও চোখের জল পড়ে নি। সাজেন দাসও চিরবিদায় জানিয়ে নাগরখানা পাহাড়ের কোলে শুয়ে পড়ল—তবু একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলি নি! ফেনী স্টেশনে ফ্যারিং-এর মুখে আনন্দ, মাখন ও গণেশের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে একা একা পথ চলার সময় তাদের সমূহ বিপদের কথা ভেবেও নীরব কন্ডায় আমার বুক ভেঙে যায় নি। আমার মনে হয় বণ-প্রাণের ভয়াবহ দৃশ্য বা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসন্ন বিপদের চিন্তা মানুষের হৃদয়ের সুন্দর স্ফূর্তি অনুভূতিগুলিকে বোধহয় সাময়িকভাবে বিনষ্ট করে ফেলে।

হিমাংশুকে গণেশ বা আমি বা মাখন কেউই তেমন কিছু সাম্প্রদায়িক দিলাম না বা বিদায় সম্ভাষণ জানালাম না। হিমাংশু নীরবে নেমে গেল। তার সঙ্গে আনন্দও নেমে পড়ল। এতক্ষণ আমি নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। আনন্দের গাড়ি থেকে নেমে পড়া উচিত হবোঁছিল বা হয় নি তা' নিয়ে আমি গবেষণা কবব না। আমাব কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমি কেন তাকে গাড়ি থেকে নামতে নিষেধ করি নি?

আমাব দৃঢ় মত, কোন স্থিতি মনে না রেখে আনন্দকে তখন আমার পরিষ্কার একটি নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। তা' আমি দিতে পারি নি। আমি মনে করি এইটি আমার অক্ষমতা।

তাদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে, বলাই মাহুদা, শরৎপক্ষ ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত হয়েছে। তার প্রমাণ আমরা পুর্লিশ-লাইনে কিছু আগে পেয়েছি। লাইসগান দিয়ে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে ভাবা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে জেলা কতৃপক্ষ তাদের শক্তি অনুযায়ী সংগঠিত হতে চেষ্টা করেছে এবং সেই কারণেই যে-কোন সময়ে আকস্মিকভাবে শহরের রাস্তায় তাদের সঙ্গে মূখোমুখি সাক্ষাৎ হতে পারে। বিপদ ও নানারূপ আশঙ্কার কারণ বর্তমান ক্ষেত্রেও আমরা সোজা শহরের বৃক্কে এসে ঢুকলাম। জেলা-শাসকের বাড়ির পাহাড়ের পাদদেশ হতে অনতিদূরে আমাদের নিজ বাড়ি। স্থায়ী সময় মা-বাবার কাছ হতে বিদায় নিয়ে এসেছি। তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করছেন বেশে এসেছি। ভেবেছিলাম বাড়ি নিশ্চয়ই খালি থাকবে।

আমরা খুব ক্লান্ত। পিপাসায় বৃক্কের ছাঁড়ি ফেটে যাচ্ছে। গাড়িটি সোজা বাড়ির কম্পাউন্ডের ভেতর নিয়ে গেলাম। শাসক-গোষ্ঠী কারও সাথে দেখা হল না। অবশ্য সব রকম অবস্থার জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। শহর কিন্তু একেবারে খালি। সামান্য আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হওয়া খুব স্বাভাবিক কিছু নয়। তবে শাসকবর্গ তাদের চূড়ান্ত পরাজয় হয়েছে বৃক্কে পেয়ে যে আশ্চর্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি কেউ নেই—একজন ভূত্যও উপস্থিত ছিল না। বাড়ি একেবারে নির্জন। সব ঘরগুলিতে তালা দেওয়া। কেবলমাত্র রান্নাঘরটিতে তালা দেওয়া ছিল না। রান্না ও খাবার ঘরে ঢুকে কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা দেখলাম। যতদূর মনে পড়ে কিছুই ছিল না। ক্ষুধার চোখে তৃষ্ণা ছিল প্রচুর। প্লাসে প্লাসে জল খেলাম। তারপর পরি-প্রান্ত হয়ে রান্নাঘরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম।

আমরা আসবার পর প্রায় চল্লিশ মিনিট অতিবাহিত হতে চলল। কিন্তু আমাদের প্রধান বাহিনী তখনও এসে পৌঁছায় নি। খুব অবাধ লাগল—নিশীথের স্বস্থতা ভঙ্গ করে 'বন্দেমাতরম' 'ইনক্লাব' ধ্বনিতে তখনও চট্টগ্রাম শহর মূর্ছারিত হয়ে উঠছে না কেন? কেন বন্দুকের শব্দ শুনতে

পাচ্ছি না? কোথায়ও তাদের কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যাচ্ছে না কেন? ক্রমেই আমরা অস্থির হয়ে পড়লাম। প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল তবু তারা শহরে এল না তবে গেল কোথায়? নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে আর সময় অতিবাহিত করা সম্ভব নয়।

আমরা আমাদের সাময়িক পোষাক পরিবর্তন করলাম। ভারী বুটপাটি, লেগিং ও খাঁকি পোষাক আমাদের বড়ই ক্লান্ত করেছিল। এই কারণেও আমাদের প্রধান বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হয়ত অনেক খোঁজাবুজি করতে হবে সেই হেতু ভদ্র বাবুদের পোষাক পরিবর্তন করে আমরা তিনজন আবার মোটবে উঠে পড়লাম। তখন রাত প্রায় তিনটে হবে শেলোলে গাড়ি করে খুব তড়িৎবেগে আবার পুর্লিশ লাইনের দিকে ছুট দিলাম প্রত্যেকেই আমরা বিভলভার হাতে প্রস্তুত ছিলাম কোন আকস্মিক আক্রমণকে প্রতি-হত করবার জন্য। মিনিট সাতেকের মধ্যে পুর্লিশ-লাইনের কাছাকাছি এসে পড়ি। পুর্লিশ লাইন তখন প্রকাণ্ড এক অগ্নি-কুণ্ডে পরিণত হয়েছে। একনাগানে কাঁড়জ ফাটছে। প্রচণ্ড শব্দে বারুদো বিস্ফোরণ হয়েছে কয়েকবার। বারুদ দিয়ে কাঁড়জ ভাঙ করে নেবার ব্যবস্থা পুর্লিশ ম্যাগাজিনে ছিল। তাই ব্ল্যাক-গানপাউন্ডা বোবাই করা অনেকগুলি কাঠের বাহ

কবি দাসের		দীনেন্দ্রকুমার রায়ের	
সোভিয়েত দেশের ইতিহাস	১২.৫০	মৃত্যুসংকট	২.৫০
প্রমথনাথ পালের		মৃত্যুবাচক	২.০০
দেশপ্রাণ শাসন—৬.০০		দুরন্ত দস্যু	৬.০০
শরণ সাহিত্যে নারী—৪.০০		সরণ ফাঁদ	২.০০
দত্তা পরিচয়—২.০০		শয়তান	৫.০০
বিনয়জীবন ঘোষের		রাজদ্রোহী	২.৫০
অনিয়মের অন্তঃগদ্য হেমচন্দ্র—০.০০		দুর্ভাগ্য	৩.০০
ফণিভূষণ বিশ্বাসের		পেতনীরের হাঁরা	৪.৫০
শিশু শিক্ষার গোড়াপত্তন—০.০০		কলির ভীমের কান্ড	৩.০০
ডাঃ হরিশাধন গোস্বামীর		দীপান্তরের আসামী	২.৫০
মাস্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন—০.০০		কালো বিভাল	২.০০
নন্দগোপাল সেনগুপ্তের		ভাস্কর সাঁচিয়া	৬.৫০
রবীন্দ্রচাঁর ভূমিকা—৪.০০		চাঁনের চক	৪.০০
দীনেন্দ্রলাল ঘরের		সদ্য-গোয়েন্দা	৫.৫০
আমাদের রবীন্দ্রনাথ—৮.০০			
আনন্দ (১৩৭৩)—৫.০০			
অসমঙ্গ মূখোপাধ্যায়ের			
হাসিহ গল্প—৫.০০			
কিশোর গ্রন্থাবলী—২.৫০			
</			

স্বপ্নেতে পাই! সেইগুলিই কারণ শেষ ফেটে আগুন আরও ছড়িয়ে দিয়েছে। আগুনের ছটায় চারিদিক আলোকিময় হয়ে গেছে। পদলিখ-লাইনের আশে-পাশে অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। সেখানে কোথাও আমাদের প্রধান দলের অস্তিত্ব দেখতে পেলাম না। তাই আশঙ্কায় শহরের বাইরে উত্তর দিকের একটি কাঁচা রাস্তা ধরে মোটরের হেড-লাইট জ্বালিয়ে খুব ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে আমরা এগোতে লাগলাম। আশা করেছি হয়ত তারা এইদিকে পর্বতশ্রেণী লক্ষ্য করে চলেছে। সুবিধে মত আশ্রয় নেওয়ার জন্য। আর বাসনা ছিল তারা দেখতে পেয়ে আমাদের সংকেত দিয়ে ডাকবে—সংযোগ স্থাপন করবে।

নিজদের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য ভাগ্যকে দোষারোপ করে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। আমাদের মোটরের হেড-লাইট কি তারা দেখতে পার নি? অত রাতে সেই নির্জন পথে কার বা কাদের মোটরগাড়ি খুব ধীরে সেই কাঁচা পথ বেয়ে চলেছিল—সেই প্রশ্ন কি তাদের মনে জাগে নি? গুটিকতক

ইংরেজের পক্ষে খোলা রাস্তার লাইট জ্বালিয়ে নিজদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়ে অতজন বিপ্লবীর অন্তর্ভুক্তি যাওয়া কি সম্ভব? হয় রে! তবু যাজ্ঞান বিপ্লবী আমাদের মোটর দেখতে পেয়েও সংযোগ স্থাপন করল না কেন, তার জবাব বিশ্লেষণ করে কে দেবে? তারা আমাদের মোটর দেখতে পেয়েও শহুর মোটর বলে ভ্রম করেছে ও মাঠে শূন্যে পড়ে পজিশন নিয়েছিল। এই তথ্য আমরা পরে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে জেনেছি।

আমাদের গাড়ি সেই কাঁচা রাস্তা ধরে প্রায় মাইল চার এগিয়ে গেল। কোন হিন্দুসই তাদের পেলাম না। কোথায় যাব? কোন দিকে তারা গেছে? এমন কি হতে পারে যে ইতিমধ্যে অন্য কোন রাস্তা ধরে তারা শহরে প্রবেশ করেছে? আবার শহরে ফিরে এলাম। তখনও শহর একেবারে ফাঁকা। অন্দরকিল্লার প্রধান রাজপথ ধরে বসিরহাট-পদলিখ বিট, জেলখানা, কোত-ওয়ালী ও গুপ্ত পদলিখ বিভাগের ইনস্পেক্টর সারদাবাবুর বাড়ির গা ঘেঁষে আমরা ফিরিঙ্গীবাজারের দিকে এলাম। তখন ভোর প্রায় সাড়ে চারটে বেজেছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল হবে। একটি-দুটি কাক ডাকতে শুরু করেছে।

আমরা ফিরিঙ্গীবাজারের শেষপ্রান্তে নদীর ধারে এসে উপস্থিত হয়েছি। সারা শরীব ক্লান্তিতে ভরা। মানসিক ক্লান্তি অনেক বেশি অনুভব করছিলাম। হল কি? সার্বিক প্রায় রূপ গ্রহণ করল না। এতক্ষণে বিপ্লবী সরকার শহরের বৃকে বসে বিপ্লবী প্রোগ্রাম কাজে পরিণত করত। জেলখানা অধিকার করে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হ'ত। ইন্সপিরিয়াল ব্যাংক হস্তগত করতাম। কোর্টমার্শাল আদালত স্থাপন করাও কাজও বাকি থাকত না। এই পবিত্রপনা সুস্পষ্টভাবে আমাদের সার্বিক প্রানের অঙ্গ হিসেবে ছিল। পরিতাপের বিষয় যে তা' আর কাজে পরিণত হ'ল না।

সমস্ত অভ্যুত্থানের বিষয়ে Lenin-এর বিভিন্ন লেখা তখনও আমরা পড়ি নি। তবু সাধারণ বুদ্ধি ও সামান্য জ্ঞান যা ছিল তা' দিয়ে সেইদিন যা' বুঝেছিলাম তার আংশিক সমর্থন পরে লেনিনের লেখার মধ্যে পেয়েছি—“The release of prisnoers from jail, the confiscation of government funds and the necessity of speedy organisation of Court-martial on the spot are of considerable importance from the very outset.”—Lenin.

সেই যুগের বিপ্লবী ইতিহাস লিখতে গিয়ে Lenin প্রথম মূল বিপ্লবী লেখকের বৈজ্ঞানিক লেখা উল্লেখ করে

অশ্লিষ্টদের যে অধ্যায়টি সম্পর্কে আমি লিখছি সেটিকে অধিক জটিল করে নিন্দিত করার ব্যতীলতা আমার নেই। এই সম্পর্কে আমি সচেতন; তবু সামান্য একটু লেনিনের লেখা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারলাম না, কারণ, মাস্টারদার নেতৃত্বে আমরা বৈপ্লবিক তাগিদে ধর্মপ সামরিক প্রোগ্রাম রেখেছিলাম তার ইংগিত Lenin ১৯০৫ সালে লিখে গেছেন। আমাদের বিপ্লবী সরকারের সামরিক প্রোগ্রাম কাজে লাগল না। সব যেন লন্ড-ডন্ড হয়ে গেল!

শহর একেবারে No man's land—ইংরেজ শাসকবর্গ পালিয়েছে, আর আমরা যারা শহুর প্রধান প্রধান ঘাঁটি অধিকার কবে সামরিক বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেছি তারাও শহরের ওপর অধিকার স্থাপন করলাম না—এর চেয়ে মর্মস্পর্ষিতক আর কি হ'তে পারে।

নদীর ধারে মোটরগাড়িটি পরিত্যাগ করে আমরা তিনজন একটি সাম্পান (এক প্রকার নৌকা) ভাড়া করে সমুদ্রের দিকে পতঙ্গা নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখান থেকে পতঙ্গা প্রায় বারো-চোদ্দ মাইল হবে। ডবলমুড়িং জেটির পাশ দিয়ে যখন নৌকা করে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের নদীর ধারের বাসারটি লক্ষ্য করে দেখে বুঝেছিলাম যে মা-বাবা সেই বাসাও পরিত্যাগ করেছেন।

সকাল হয়ে এল। পূর্ব আকাশ লাল করে সূর্য উঠছে। নদীর তরঙ্গ সোনালি আভায় রাস্তা দেখাচ্ছে। নদীবক্ষে নৌকায় ভেসে ভোরের এই মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করার মানসিক অবস্থা তখন কারও ছিল না। আজ থেকে প্রায় দশ বছর পূর্বে কলকাতার নদীতটে মাস্টারদার ছোট্ট কুটির যেদিন আমার প্রথম দীক্ষা হল সেইদিনও নদীতীরে দাঁড়িয়ে ভোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি—মন ব্যগ্র ছিল একটি রিভলভার প্রাপ্তির আশায়। আজ অন্তরে রিভলভার বা আশ্রয়ের অস্ত্রের অভাব বোধ করার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু যে নিদারুণ অভাবে আজ অন্তর দগ্ধ হচ্ছে তার উপশম হবার কি কোন সম্ভাবনা আছে? আমাদের প্রধান দলের সৃষ্টি না পাওয়ার অভাব যে কতখানি গভীরভাবে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করেছে তা' আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

১৯শে এপ্রিল আবার সূর্য উঠেছে। গতকাল ভোরে প্রভাত-সূর্যকে নয়ন ভরে দেখেছি। মনে হচ্ছিল শেষবারের মত সেই দেখা। কে জানত আজও বেঁচে থাকব—আবার আজ পূর্ব-দিশান্তের নব্য-রূপ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হবে?

[সমাপ্ত]

আত্মজীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র স্ক্রবতী
মৃত্যু—৫ই টাকা

“এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন”—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী
“একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কর্মী” সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই তাহার আত্মজীবনী অত্যন্ত লক্ষ্যপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।”

—রায় বাহাদুর শ্রীগঙ্গেনাথ মিত্র

শ্রীমদ গোস্বামী বিচারক

বিদগ্ধ-মাধব

[বিশ্বনাথ স্ক্রবতীকৃত টীকালঙ্কার]

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-দীপার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমদ গোস্বামীর দ্বারা শ্রীবিদগ্ধ-মাধব নাটক রচনা করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বাল্যলঙ্কার—

“মধুর প্রসন্ন ইহার কণ্ঠ মালম্কার।

এছে কবিতা বিনা নহে রসের প্রচার॥”

মৃত্যু : তিন টাকা।

স্বদেশী প্রাইভেট লিমিটেড
১৮৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২



সকালের আকাশ ঘোলাটে হয়েছিল। পূর্বদিকে-শুধু ধানিকটা তামাটে আভাস। চালের খড় বেয়ে বেয়ে দু-চার ফোটা জল ধরাছিল, টসটস করে। ভিজ্জে উয়ানটা তখনও নিকর হয়ে পড়েছিল। নারকেল পাতার ঘন সবুজ জমাট বাঁধা কুয়াসার পাংশুটে মনে হচ্ছিল।

সব যেন মল্লখ। সকালটা অন্য দিনের চেয়ে বিলম্বিত। রাত গড়িয়ে গড়িয়ে আরও যেন দু-এক দুন্ড তার জের টেনে চলবে। শীতের আলস্য আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বেশ কিছুক্ষণ দোহে মনে জড়িয়ে থাকবে।

সমস্ত রাত ঘুম হয় নি অবিনাশ-বাবুর। তাই সাত সকালে উঠবার প্রয়োজন না থাকলেও উঠে পড়তে হয়েছে। যদিও জীবনের গতি তারও মল্লখ হয়ে গেছে। কোন ভাড়া নেই। ঠিক এই সকালের মতই মল্লখ। এমন করেই প্রতিটি দিন, মাস হয়তো বছরও বিলম্বিত লয়ে চলবে।

ঘটা করে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাজের জগৎ থেকে তুমি ব্যতিল হয়ে গেছে। তোমার নাম খারিজ। এখন শুধু বসে বসে শেষ দিনটির জন্যে মনোহত হুমে বাও।

অবিনাশবাবুর চোখে দৃষ্টি কাশসা

হয়ে উঠল। যেন অনেকগুলি বছর পেরিয়ে ছানিপড়া চোখের নিলিপ্ত দৃষ্টি তুলে শিখিল সংসারটার দিকে তাকিয়ে আছেন। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে ওঠে। দেহ অবশ্য হলে আসে। দাওয়ার খুঁটিটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে বসে পড়েন।

একটা অবলম্বন চান বাকি অবিনাশ-বাবু। দৃঢ় ভিত্তি ওপর পা ফেলে ফেলে জীবনের অবশিষ্ট কটি পল কাটিয়ে দিতে চান। বেশ দিন বাঁচার আগ্রহ নেই। কর্ম-হীন জীবনের ভর বয়ে বেশ দিন বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা। নিশ্চিত নিভরতাই বা কোথায়?

নিভর তিনি কারও ওপর করতে পারছেন না। রোজগারে ছেলে, তিনটি ওপরও নয়। যদিও তাদের আচরণে এমন কিছু লক্ষ্য করেন নি অবিনাশবাবু। বউরাও আজকালকার তুলনায় ভালই বলতে হয়। যা নব শোনা যায় তাতে গা রি-রি করে ওঠে। এদিক থেকে তিনি ভাগ্যবান। একান্ত আপন লোকজনকে একথা বলে স্বস্তি পেয়েছেন। গর্বও বোধ করেছেন। তবে তখন তাঁর রোজগার ছিল। নিজের পক্ষে গাংগিটপে হেঁটেছেন।

কিন্তু এখন। কটা দিন তো অবসর

নিয়েছেন। এরই মধ্যে বড়বউমা একদিন রেশনকার্ড আর টাকা নিয়ে এসে হাতে দিল।

—বাবা, রেশনটা আজ আপনি আনবেন?

হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে এই ভিক্ষাসব তাৎপর্য কি? ভা ছাড়া, কোনদিন বাজর অবশি যান নি অবিনাশবাবু। ছেলেরই করেছে। মাঝে মধ্যে কলকাতা থেকে ফেরার মুখে শেখালদা বাজার থেকে দুটো কাঁপ কিম্বা ইলিশ মাছ হাতে চলে বাড়ি চুকেছেন। ওই দোকান বাজার খাতে হয় না অবিনাশবাবু। অবাক হবে কিছুক্ষণ চেয়েছিলেন বড়বউমার মুখের দিকে।

—কেন, ওরা যেতে পারবে যা? আস্ত রবিবার তো। অবিনাশবাবু একটু বিবস্ত হয়ে বলেছিলেন।

এমন সময় স্ত্রী মৃণালী এসে খাব চুকল।

ওদের আজ একটু কান আছে। তুগি খাও না কেন। একটা দিা বৈ তো নয়।

ওদের কাজ আছে। কাজ নেই খালি অবিনাশবাবুর। আজ সকালে মনোতেষ বারের বাড়িতে ধর্ম আলোচনা হবে। সেরা কাজের মধ্যে পড়ে না। রেশন নিয়ে কি

জাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন। কত বড় লাইন হয়েছে কে জানে। মনটা ক্ষোভে ভরে উঠেছিল। কিন্তু একটা কথাও বলতে পারলেন না অবিনাশবাবু। রেশন আনতে চলে গেলেন।

একটা পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করছেন। আজ নয়, অবসর নেবার কিছুদিন আগে থেকেই। তিনি অবসর নেবেন, মাস গেলে অনেকগুলো টাকা আর ঘরে আসবে না, সংসারের অভাব-অনটনের চিরকোলা ফটিলটা দিনে দিনে কিছুটা করে জ্বালগা দখল করবে—এই বোধটুকু জাগবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধ একটা শৈথিল্য এসেছে। প্রচ্ছন্ন অবস্থে একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে।

মৃন্ময়ীর কাছে কিছুদিন আগে প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন। অফিস থেকে ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে ভ্রাতৃ দেহটা বিছানার এলিয়ে দিয়ে বসেছিলেন, রিটার্নের তে করেকটা দিন মায় বাকী। কি হবে তাই শুধু ভাবছি।

—এত ভাবনার কি আছে। মৃন্ময়ী বলেছিলেন।

স্বাীর কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। দুটি অবিবাহিতা মেয়ে পাখরের মতন বুক জুড়ে বসে। প্রতিভেণ্ট ফাউন্ডর ওই তো কটা টাকা সম্বল। দু’জনকে এখনও কতদিন বাঁচতে হবে কে জানে। ছেলেদের ওপর ভরসা আর কতটুকু। সকালেই তো অফিস যাওয়ার মধ্যে ছোট্ট উমা পান দিতে ভুলে গেল। নিতাকার কাছে এমন ভুল তো হবার কথা নয়। সোদিন বিছনা তিনি নিজে পেতে নিয়েছিলেন। আগে মৃন্ময়ী পেতে বাখত। বউমা’রা ঘরে আসাব পব থেকে সময় করে তারাই পাতে। অবিনাশবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। ওদের হাসি-গল্প পাশের ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন। রাত্রাঘরে মৃন্ময়ী বোধহয় একটানা খেতে চলেছিল। ফাউন্ডর কিছু বলেন নি অবিনাশবাবু। নিজেই বিছানা পেতে নিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মেজবউমা ঘরে ঢুকে বসেছিল, বাবা, আজ এত সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। হয়তো বিছানা করতেই চুকেছিল। কিম্বা বুড়ো কি করে সেই মজা দেখাব জেনো ইচ্ছে করেই দেরি করছিল। অবিনাশবাবু কোন জবাব বেন নি। খুব রাগ হয়েছিল। মনে মনে হিসাব করে দেখেছিলেন, এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে কি না। না, অবসর নেওয়ার সময় স্বত এগিয়ে আসছে, তত ওদের ছুটি বাড়ছে। এসব স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা। সংসারে তাঁর অস্তিত্বের আলাদা কোন মূল্য বোধহয় আর থাকবে না। সকলের করুণা আর উপেক্ষা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বিষম

মুহূর্তগুলো শীতে রাগের মত মশ্বর পায়ে চলবে। চরম মুহূর্তটাকে দ্রুততর করার জন্যে আকুল প্রার্থনা জানাতে হবে।

এতটা অবিনাশবাবু ভাবতে পারেন না। ছেলেরা তাঁর অবাধ্য নয়। অন্তত এতদিন তো তাই মনে হয়েছে। তবে তখন তিনি রোজগারে মানুস। সংসারের অবিসংবাদী কর্তা। তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর হাল ঘুরেছে। সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার সাহস কেউ রাখে নি।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সংসার খরচের টাকা আর তাঁর কাছে থাকে না। তিনি ইচ্ছে করেই রাখেন নি। ভূতের বেগার খেতে লাভ কি। ষাদের টাকা তারাই খরচ করুক।

—আমি তো অবসর নিচ্ছি। সংসার চলবে কেমন করে ভেবেছি কিছু? একদিন ছেলেদের ডেকে অবিনাশবাবু বলেছিলেন।

—চলবেই কোনরকমে।

কি কথার কি জবাব। যেন এড়িয়ে যাওয়ার ভাব। স্বাী মৃন্ময়ীও পরিষ্কার বলে দিল, ভাবনার কিছু নেই।

স্বাীর কথায় অবিনাশবাবু যথেষ্ট ক্ষুদ্র হয়েছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমরা নিভাবনার ঘুমাও, আর আমার ব্যস্ত ঘুম হয় না। বেকার জীবনের দুর্ভাবনার কাটা হয়ে থাকি সব সময়।

মৃন্ময়ী পায়ে হাত বুলিয়ে বিচ্ছিল। একটু সময় নিয়ে বলেছিল, অনেকদিন তো কাজ করলে, এবার কটা দিন বিশ্রাম নাও।

—ঘরে ভাত থাকলে বিশ্রাম নেওয়া সাজে। সুখও হয়। অবিনাশবাবু কথাব ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মৃন্ময়ীর এতটা নিশ্চিন্ততা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। মৃন্ময়ীও গায়ে মাখে নি অবিনাশবাবু কথায়। স্ভাবিকভাবে বলেছে, কেন, ছেলেবা রয়েছে। হয়তো একটু কষ্ট হবে, ভেসে তো যাবে না।

অবিনাশবাবু হেসেছিলেন। মৃদু হ্যারিকেনেব আলোয় স্বাীর মুখখানা অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। সেই মুখে দুর্শ্চিন্তার কোন ছায়া নেই। আগের মতই নির্বিকার, প্রশান্ত। স্বাীর বোধ-বুদ্ধির ওপর কোনদিন তিনি কোন ভরসা রাখেন নি। মৃন্ময়ীও কোন অনুযোগ করে নি। তার নিরুত্তাপ মনোভাবে অবিনাশবাবু মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়েছেন। আবার মাঝে মাঝে ভেবেছেন, এটা তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের প্রতি মৃন্ময়ীর একান্ত আনুগত্য। এই ভাবনার মধ্যে পরম তৃপ্তিও অনুভব করেছেন। কিন্তু সোদিনের এই অনাসক্ত্য অবিনাশবাবুকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

চাপা গলায় স্বাীকে বলেছিলেন, ছেলেদের ওপর তোমার খুব বিশ্বাস, কিন্তু আমার নেই।

মৃন্ময়ী বিস্মিত হয়েছিল। ছেলেদের ওপর আস্থা হারাবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না। হয়তো অনেক টাকা উপায় করে না। তবু চালাবেই তারা। তাই মৃন্ময়ী একটু জোর দিয়ে বলেছিল, কেন, ছেলেরা কি দোষ করল? তারা কি খেতে-পরতে দেবে না?

অবিনাশবাবু প্রথমটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। পরে নিজেকে সংযত করে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বলেছিলেন, কোন রকমে খেয়ে-পরে বাঁচাটাই সব নয়। মান, সম্মান, প্রতিপত্তি এ সব নিয়েই মানুস। রোজগার বন্ধ হয়ে গেলে কেউ আর জিজ্ঞাসা করবে ভাবছ?

মৃন্ময়ী কোন জবাব দেয় নি। কারণ এত সব বোঝে না। বুঝতে চায়ও নি কোন দিন। এ সংসারে আসার পর খেবে মুখ বুজে কাজ করেছে। আর মোটামুটি খেয়ে-পরে দিন কাটিয়েছে। যদিও বা কখনও মুখ খুলতে চেষ্টা করে, অবিনাশবাবু ‘তোমরা কি বোঝ’ বলে খোলা মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এবং এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে মৃন্ময়ী। অন্য কিছু ভাববার অবকাশ খোঁজে নি কখনও।

অবিনাশবাবুই আবার বলেছিলেন, ছেলেদের ওপর ভরসা কে না করে। তবে দিন-কাল কি পড়েছে। দিন দিন সব দাম বেড়ে চলেছে। চাল কিনে খাওয়া আমাদের ক্ষমতার বাইরে। রেশনে দিন চলে না। আর ছেলেদের মনোভাবও পাশে গেছে। সবাই যে যার নিয়ে থাকতে চায়। স্বতক্ষণ সংসারে কিছু দিতে পারছ ততক্ষণ তোমার দাম। দিতে না পারলেই বোঝা হয়ে গেলে। একটা হাড়িতে এক স্লেগে আজকাল কটা লোক খায়?

অবিনাশবাবু যেন একটু দম নেওয়ার জন্যে থামলেন। তারপর আবার শুধু করেন।

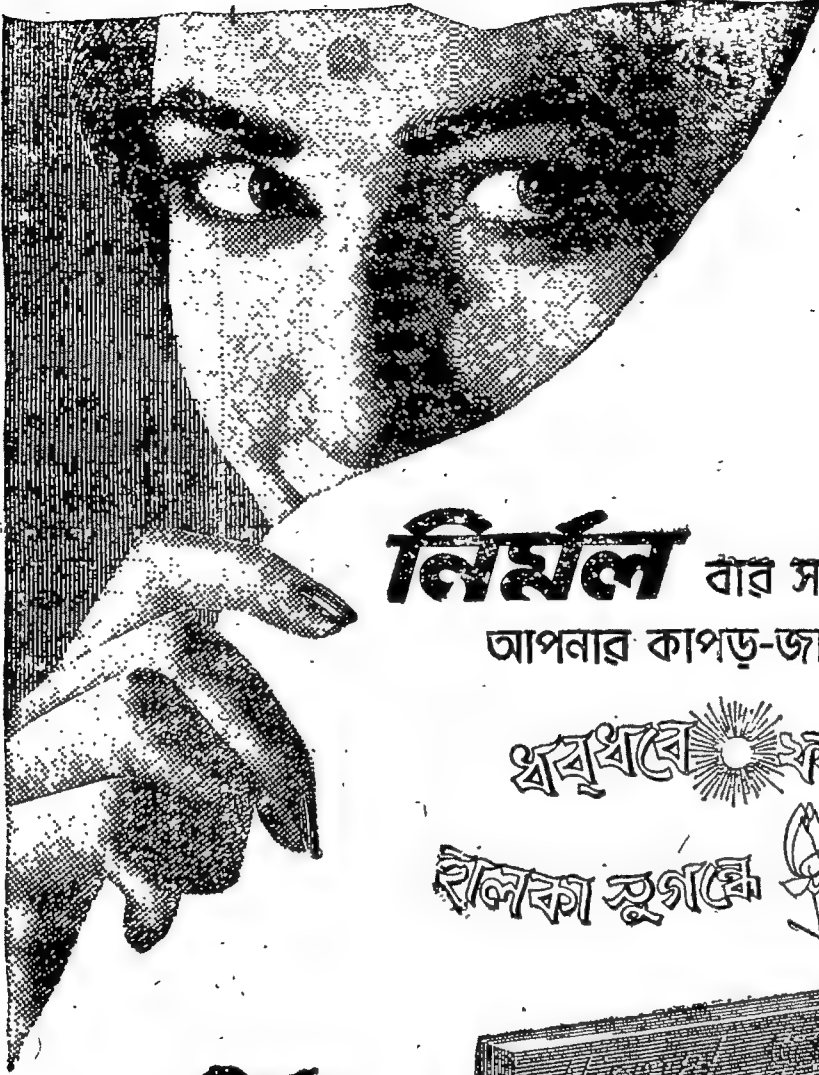
—ভাবনা মেয়ে দুটোর জন্যে। ও দুটোকে যদি পার করতে পারতাম তো গটগটিয়ে চলতাম।

—ভাবছ কেন, মেয়ে দুটো পার হয়ে যাবে কোনরকমে। মৃদুকণ্ঠে মৃন্ময়ী বলেছিল।

—তোমার ওই কোনরকমের ওপর আমার কোন আস্থা নেই।

—কেন, তোমার আপিস থেকে পাওয়া টাকায় মেয়ে দুটোর বিয়ে দেওয়া যাবে না!

—বলিহারি তোমার বুদ্ধি! এ না হলো স্বাীবুদ্ধি বলে! প্রতিভেণ্ট ফাউন্ডর সামান্য কটা টাকা। এতে দুটো মেয়ে পার হবে কি না সন্দেহ। আর সব কটা টাকা



নির্মাল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে

প্রবৃথবে ফরসা

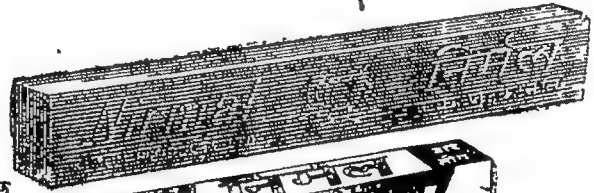
বিলকা সুগন্ধে উরপুর

নির্মাল

বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে
ঝকঝকে পরিষ্কার হয়,
আর সত্ত্ব ধোয়ার সুগন্ধে ভরে ওঠে।

নির্মাল বার সাবানে চটপট সেদাব ফেনা হয় আব সেই ফেনায়
তেলকালি ও ধুলোময়না জড়ন্ত বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা
ঝকঝকে ভকভকে দেখাবে, সত্ত্ব ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকবে।
দিন দিন দিয়ে কাচলে পরনাবও সাক্ষ্য হয়। চেন বেশী দিন চলে—সাবানটি
শক্ত থাকে, ভাড়াভাড়া করে যায় না।

হুজুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-৬



© 1967 NIRMAL

নির্মাল

পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে

ধরা কবে ফেললে তো পথে দাঁড়াতে হবে।

একটুখানি থেমে আবার বলেছিলেন অবিনাশবাবু, ছেলেদের কাছে এতটা আশা করা না। তোমার ছেলে-বউদের ইদানীং যা ব্যবহার তাতেই সব বোঝা যাচ্ছে। এখনও তো রিটার্নার করি নি। ইতিমধ্যে হেলা-ফেলা শুরুর হয়ে গেছে।

—ওটা তোমার মনের ভুল। ওরা আমাদের বেশ মানি-গণ্য করে।

—এখনও হয়তো কিছুটা করে, রিটার্নার কবলে সেটুকু আস্তে আস্তে চলে যাবে। ছেলেদের কালের গোড়ায় ফিস্‌ফাস্‌। বাস্‌, তোমার সাধের সংসার ভেঙে গেল।

—বাই বল, এটা মানতে পারব না। আমি ওদের নিয়ে দিনরাত ঘর করছি, আমি ওদের মন বুঝি না! খালি সাত-পাচ ভাবছ আর মন খারাপ করছ।

মুম্বায়ীর নির্বাসিতা অবিনাশবাবুকে পীড়িত করে তুলেছিল। এটাই স্বাভাবিক। নিজের সংসারের বাইরে কোন কিছুর দিকে কখনও তাকিয়ে দেখে নি। কি ঘটছে আজকাল সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাও নেই। স্ত্রীর কথা ভেবে অবিনাশবাবু করুণা বোধ করছিলেন। সংসারভাবে বলেছিলেন, কতটুকু আর ভূমি দেখছ। আমাদের অকিসের রমাপদবাবুর সংসার ছেলের বউ ভেঙে দিল রিটার্নার কবার হ' মাস—এক বছরের মধ্যে। অথচ এই রমাপদবাবু ছেলে আর বউ—এর কত প্রশংসা আমাদের কাছে করেছিলেন। এখন গিয়ে দেখ কি কষ্ট ভুলোকের।

—কেন, আপিস থেকে টাকা পান নি?

—হ্যাঁ, পেয়েছিলেন। আমার চেয়ে কিছু বেশি পেয়েছিলেন। ছেলে কি কারবার করত, বাপের টাকাগুলো তাতে লাগিয়ে দিল। রমাপদবাবু বলতেন, আমার শান্তি দিন যাওয়া নিয়ে কথা। ক'টা টাকা নিয়ে ছেলের যদি সুবিধা হয় তো শূন্য শূন্য তাতে বাধ সাধব কেন। সরল বিশ্বাসে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। এখন সময়ে খাওয়া-দাওয়া পান না। অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলেও কেউ খোঁজ-খবর করেন না।

—স্ত্রী থাকলে হয়তো—

বেচে গেছেন, মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। ছেলের বউ-এর গল্পনা শুনতে হয় নি। অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। ডান পাশ ফিরে শুলেন। রমাপদবাবুর করুণ অসহায় মুখখানা যেন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। অনেকটা যেন আপন মনেই বললেন, তাই আমি কারো ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। দৃষ্টিস্তার বৃদ্ধের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে।

মুম্বায়ী কোন জবাব দিতে পারল না। হাত দুটো কোলের ওপর রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। একান্ত নির্ভরতার ভিতটাও বোধ হয় ক্ষণিকের জন্যে হলেও টলে উঠেছিল। কমল, অমল আর পরিমল। নিজের পেটের ছেলে। কত যত্নে মানুষ করেছে। ওরা অমন হতে পারে তা চিন্তায় আনা যায় না। আপিস থেকে আসলে ছেলেমেয়ে তিনটিকে নিয়ে হৈ-হুলা করে। বেল দুটিকে খেপায়। বিশেষ করে পরিমল তো পিছনে লেগেই আছে। ছড়া কেটে কেটে কত কি যে বলে ওদের। কান্ড দেখে মাঝে মাঝে মুম্বায়ী নিজেই হেসে সারা হয়। রমা আর উমা রোগে যায়। মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য রেখে মুম্বায়ী সরে পড়ে। নিতাই এমনিধারা রাত দশটা অব্যাহত চলে। তারপর যে যার ঘরে শুরুর পড়ে। সকালে উঠেই তো আপিসের হাঁকডাক। এর মধ্যে সাত-পাচ ভাবনার কি আছে বুকে উঠতে পারে না মুম্বায়ী। অথচ উনি যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। ছেলে আর বউদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। খালি ভাবছেন, এই বুঝি শুকে হেলা-ফেলা করল, অবজ্ঞা করল। কিন্তু মুম্বায়ী জানে তা সত্য নয়। তাই জোর দিয়েই বলেছিল, তুমি মিছিমিছি ভাবছ। আমার ছেলেরা এমন নয়। অবিনাশবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুম্বায়ী আর বসে নি। কাজের অছিলায় উঠে গিয়েছিল।

মুম্বায়ীর কথায় অবিনাশবাবু খুশি হতে পারেন নি। তাঁর মনে সংশয়ের ছায়া নামল। নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। মুম্বায়ীও তাঁকে বুঝতে চাইল না। অবসরপ্রাপ্ত স্বামীর মূল্য স্ত্রীর কাছেও বোধহয় কমে আসে। শাস্ত্রবাক্য মনে পড়ে যায়। বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী আর বার্ষিক্য পুত্র। একটা প্রচণ্ড অভিমান অবিনাশবাবুর মনে দানা বেঁধে উঠল। তাঁর আর কি। তিনি এত কিছুর ধার ধারেন না। আর যত কাল হয়েছে মেয়ে দুটো। যদি বিদায় হয়ে যেত তো বাঁচা যেত। সোজা কাশী চলে যেতেন। বাবা বিশ্বনাথের পায়ে শেষের ক'টা দিন কাটিয়ে দিতেন। মুম্বায়ী ছেলেদের সংসারে থাকতে চাষ থাকুক। সুখেই বাস করুক। কিস্বা দাসীবৃত্তি করে দিন কাটুক। তাতে অবিনাশবাবুর কিছু এসে যায় না।

গত পবন দিন কমলের কথায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রাগে একসঙ্গে খেতে বসেছিলেন। খেতে খেতে কমল বলছিল, বুড়ো গাইটা তো এক বছরের ওপর দুধ বন্ধ করেছে। ওটার পেছনে খরচও কম নয়। বেচে দিলে কি হয়। অবিনাশবাবু অরাক হয়ে গিয়ে-

ছিলেন। এতদিন কোন কথা ওঠে নি। সংসারের এ বোধটুকু যেন হঠাৎ জেগে উঠল কটা দিন তো হল অবসর নিয়েছেন। যে গরুর দুধ খেলেন এতদিন ধরে, প্রতিপালন করলেন, তাকে কবাইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। কেন, গত রবিবার যে বউ নিয়ে কলকাতায় সিনেমা দেখে এল, তাতে খরচ হয় না। কই, তিনি ছেলে সিনেমা-বায়স্কোপ দেখেন নি। হলে গরুর মতন জোয়াল বইলেন জীবনভোর এ সংসারের।

কমল নিজের কথার জোর টেনে বাড়ি দিয়ে বলতে চেয়েছিল, সব জিনিসের দাম দিন দিন বেড়ে চলেছে, তাই বলছিলাম—

কমলের কথা শেষ না হতেই অবিনাশবাবু বলছিলেন, তোমাদের ইচ্ছে হয় বেচে দিতে পার। আমার মতামতের আদ্য দাম কি বল।

এই বিষয় নিয়ে আর কোন কথা হয় নি। কিন্তু অবিনাশবাবু অনেক কিছু বুকে নিয়েছিলেন। তিনিও কি বসে বসে খাচ্ছেন ওই বুড়ো গরুটার মত। ওটার মত তিনিও আর সংসারের প্রয়োজনে যোগান দিতে পারছেন না। অফিসের খাতার নাম খারিজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরেও বাড়িল হয়ে যাচ্ছেন।

ভদ্র চূপ করেছিলেন। ভেবেছেন। মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। শব্দ বোকার মতন চেপেছিল। কিন্তু গতকাল দুপুরের ঘটনার পর থেকে একান্তলও স্বস্তি পান নি। সারা রাত ঘুমতে পারেন নি। অবিনাশবাবু বুঝতে পারছেন না ভুল করছেন কি না। মনটাকে এ সব থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে কিছুটা শান্তি পাওয়া যায়। পাচজনে বলবেও তাই। কিছু মনে করলেই যত গোল, না করলেই কিছু না। অবিনাশবাবু গান্নে মেখেছেন বলেই যত অশান্তি।

এসব যে তিনি না ভেবেছেন তা নয়। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেও চেয়েছেন। কিন্তু ঝেড়ে ফেলতে চাইলেই তো মন মানতে চায় না। এ তো নতুন কিছু নয়। রোজকার রুটিন মারফি কাজ। আর এরাও বাড়িতে কিছু নতুন নয়। খেতে বসে কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষার থাকে অবিনাশবাবুর খাতে নয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর এই স্বভাব। ভাত তরকারি দিতে দেরি হলে ভয়ানক রেগে যান। অথচ কাল দুপুরে খেতে বসে একটুখানি দুধের জন্যে কতক্ষণ বসে থাকতে হল। প্রথমটা মানিয়ে নেওয়ার জন্যে চূপ করেই ছিলেন। দু-একবার ডেকেছিলেন। রান্নাঘরের ধারে-কাছে সম্ভবত কেউ ছিল না। আর সংসার রক্ষা করতে পারেন নি। খাওয়া ফেলে উঠে পড়েছিলেন।

মৃন্ময়ী কোথা থেকে যেন ছুটে এসেছিল।

—এ কি, উঠে পড়লে যে। বউমা দুধ নিয়ে আসছে।

উত্তর দিতে গিয়ে অবিনাশবাবু দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠেছিলেন। কান-মুখ গরম হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দেহটা যেন কাঁপছিল।

মৃন্ময়ী হতবাক হয়ে গিয়েছিল। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, দুধ খুব গরম, তাই বউমা জলে বসিয়ে ঠান্ডা করছিল। এত তাড়ার কি আছে বুঝি না। এখন চুপা আর আপিস নেই যে গাড়ি ফেল হতে হবে। সকলেরই তো কাজকর্ম আছে—

—ধাম। অবিনাশবাবু সমস্ত শক্তি দিয়ে গর্জন করে উঠেছিলেন।

তার আর কাজকর্ম নেই। অফিসের ছাড়া নেই। সেকেন্ড লোকাল ধরার জন্যে দৌড়-কাঁপ করবার প্রয়োজন নেই। কেউ আর তার খাওয়া-দাওয়ার জন্যে সম্ভ্রান্ত হয়ে নেই। যখন হোক খেতে দিলেই হবে। একটু দুধের জন্যে হা-পিতোশ করে বসে থাকতে হবে। যে যা বলে শব্দে যেতে হবে। কারণ, অবিনাশবাবুর আর অফিসের ছাড়া নেই।

এই কাদিনের মধ্যে যেন কত পরিবর্তন হয়ে গেল। যেন জীবনের অনেক কটা বছর পার করে দিয়ে এলেন। চল্লিশ বছরের ওপর তিনি কাজ করেছেন 'রবার্ট এন্ড স্মিথ' কোম্পানীতে। দেশের বাড়ি থেকেই নিত্য ষাওয়া-আসা করেছেন। এখান থেকে কলকাতা আর কত দূর। জেলালাদা যেতে নোয়া ঘণ্টার মত লাগে। যদি বালিগঞ্জ অরধি হিসাব করা যায় তবে আরও দশ-পনের মিনিট কম লাগে। বালিগঞ্জ থেকে পাকপাড়া। এতেও সময় ধর-চেরে কম লাগে না। সেকেন্ড লোকালে গেছেন। আবার লক্ষ্মীকান্তপুর-লোকালে ফিরে এসেছেন। মোটামুটি এভাবেই তার নিত্য ষাওয়া-আসা চলেছে। বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু এবার ঘটছে। ব্যতিক্রম ঘটছে সব ক্ষেত্রে। এ মাসের পয়লা থেকে অফিসের হাজিরা বইতে তার শাস্ত আর ওঠে নি। তার চেয়ারে অন্য লোক বসছে। এমনি করে মাস বদরবে। বছর বদরবে। অবিনাশচন্দ্র 'চক্রবর্তী' একেবারে হারিয়ে যাবেন। সময়ের আবর্তে কোথায় ভলিয়ে যাবেন। এই কাদিনেই হয়তো তাঁকে অনেকেই ভুলে গেছে। হয়তো বোসবাবু মাকে মাঝে অভ্যাগের ধশে বলে ফেলছেন, কই অবিনাশবা, লেজারটা একবার দাও।

রিটারারমেন্টের চিঠি পেয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আর কিছুদিন স্থাল-স্বাখার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ

জানিয়েছিলেন। কাজ করার মত মানসিক ও দৈহিক সমর্থ্য অবিনাশবাবুর যথেষ্ট ছিল। সাহেব তাঁর আর্জি শোনে নি। বয়সের সীমানা পেরিয়েছেন। সামর্থ্যের প্রশ্ন তাই বিবেচনায় আসে নি। আব দুটি বছরও যদি থাকতে পাবতেন, কিছুটা অস্তত গড়িয়ে নেওয়া যেত। এতটা অসহায় হয়ে পড়তেন না।

অবিনাশবাবুর মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। শ্রুদ্দ সংসারের ওপর নয়। অফিসের সাহেবের ওপর। গোটা জগতের ওপর।

সমস্ত দুপুর অবিনাশবাবু গদম হয়ে-ছিলেন। বিকেলের চা বাড়িতে খান-নিং স্টেশনের মোকানে গিয়ে থেকেছেন। ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়েছেন। সম্ভ্যার অশ্বকার যখন পাকা খানের শিষ ছুয়ে ছুয়ে এগিয়ে আসছিল, তখন তিনি ফিরেছেন। রাত বত গভীর হচ্ছিল মনের মধ্যে একটা আশঙ্কাও জমাট বাঁধছিল। নিজেকে বড় দুর্বল, বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। রাত কটা হবে? আটটা নাগাদ লক্ষ্মীকান্তপুরের ট্রেন এসে পৌঁছবে। ছেলেরা একে একে বাড়ি ফিরবে। আসার সঙ্গে সঙ্গে কান ভারী করবে।

এখন মনে হচ্ছে, এতটা না করলেই ভাল হত। ঘরে এসে দুধ মদুহতে মদুহতে চিৎকার করেই বলেছিলেন, বউমা! রাতের সব নবাবের ঘোঁটা। লাট-বেলাটের বউ। কেন আগে ব্যবস্থা করে রাখতে পারে নি। ফপালে অনেক দুঃখ আছে। হেনস্তার আর হয়েছে কি, সব তো শ্রুদ্দ। কি যে মাঝার মধ্যে রক্ত তোলপাড় করে উঠল, আরও অনেক কথা বলে গিয়েছিলেন। ছোটবউমা পান দিতে আসে নি। মৃন্ময়ী পান দিলে গিয়েছিল। সমস্ত বাড়িটা যেন ধমধম করছিল।

বড় নাতি দুটো অবিনাশবাবুর পাশে এসে শ্রুদ্দ। অবিনাশবাবু বড়টিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যা রে, অফিস থেকে সব ফিরেছে?

—হ্যাঁ, দাদা।

—তোর বাবা তোর মাকে কি বলছিল রে?

—কই, কিছু বলে নি তো।

চুপ করে গেলেন অবিনাশবাবু। নিজেকে বড় ছোট মনে হল। নাতির কাছ থেকে এসব খবর নেওয়া। এত দুর্বল হলেন কেন? এটা তাঁর বাড়ি। পোষায় থাক, না পোষায় না থাক। কার পরোয়া করেন তিনি।

তবু অবিনাশবাবু অনেকক্ষণ কান পেতেছিলেন। যদি কোন চেঁচামেচি শোনা যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য, তেমন কিছুই ঘটল না। একটু বুঝি হতাশ হয়েছিলেন।

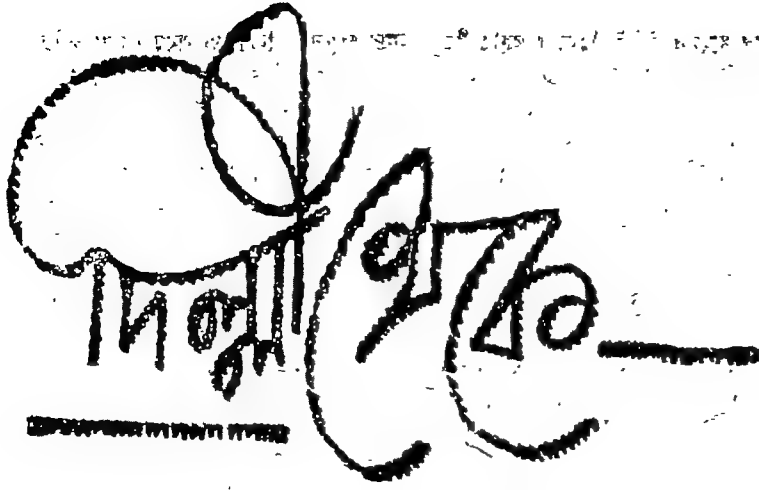
যাতের খাওয়া খেয়েছিলেন অবিনাশবাবু। মাথা নিচু করেই খেয়েছিলেন। দুধ তুলে তাকান নি। এমন কি স্বীয় মুখের দিকেও নয়। কেমন সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। অথচ এই সঙ্কোচের স্গত কোন কারণ তিনি খুঁজে পান নি। সময়ের কাঁটা ধীরে ধীরে ঘুরে চলেছিল। আর অবিনাশবাবুর মনটা ততই মৃদু পড়ছিল। কেমন যেন কোমল হয়ে উঠতে চাইছিল। কেমন একটা অনুভূতি সব অভিযোগ ছাড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রাগে শ্রুতে এসে মৃন্ময়ী বলেছিল, ছি, কি কান্ডটা আজ করলে। বউগুলো ভয়ে যেন মবে আছে। বি যে তোমার ব্যতিক্রম হয়েছে, দিনরাত গালি দোষ ধরে আছে।

সমস্ত রাত ধরে অবিনাশবাবু ভেবে-ছেন। ব্যতিক্রম মন নিয়েই কি তিনি সব বিচার করছেন। তাঁর বিশেষণ সবটাই ভুল তবে। হয়তো এমন আগুও ঘটেছে। তখন সেটা প্রকট হয়ে ওঠে নি। রবিবার বা অন্য ছুটির দিন সব কিছু জিমে তালে চলেছে। ওস্তাদী গনের বিলম্বিত লয়ের মতন। তখনও এমন ছুটি অনেক ঘটে থাকতে পারে। এখন তাঁর রোজই ছুটি। জীবনের এই পর্বব প্রতিটি দিনই আলস্যের চাদর মড়ি দিয়ে গাড়িয়ে গাড়িয়ে চলবে। সামান্য ব্যাঙ্গার নিয়ে এতটা উত্তোজিত হওয়া বোধ হয় ঠিক হয় নি।

কিন্তু, তবু তাঁর মন সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে না। রিটারার করার ঘরই সংসারের চাকা ঘুরে গেছে। মমতা, শ্রুদ্দ, কৃত্তব্য সবই তো আজকাল অর্থমূল্যে বিক্রিয়ে যায়। তাঁর ক্ষেত্রেও এব ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই। না-কি তিনিই পাগলে গেছেন। নিজের ভারটাকে নিজেরই বোকা বলে মনে করছেন। রাতভোর সময়ের কাঁটার সঙ্গে জেগে জেগে প্রতিটি মৃদুত ভেবেছেন। সকলের ওপর প্রচ্ছন্ন অভিমানে মন ভরে উঠেছে মাত্র।

শীতের কুয়াসা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পূর্ব দিকে আলোর সমারোহ শ্রুদ্দ হয়ে গিয়েছে। নিরুদ্ভাপ সংসারে একটু একটু করে প্রাণের স্পর্শ লাগছে। কেবল অবিনাশবাবুর দু-চোখ নিশ্চিন্ত ঘুমে জড়িয়ে আসতে চায়।

সব চেয়ে ভাল
কাকার প্রোডাক্টসের
বানীধূপ
প্রতিধূপ কাকার প্রোডাক্টস মোহনগেমন



লেখক: শ্রী বৈষ্ণব চন্দ্র শাস্ত্রী

খোদাভালার অপার মহিমার কথা বিশ্বাস না করার পথ নেই। লোকে যে যা বলে বলুক, জাহান্ আরায় বেগম মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন তাঁর পুনর্জীবন হয়েছে শুধু সম্রাট শাহজাহানের দিব্যামিনী অবিরত প্রার্থনার জন্য। প্রার্থনার কি না হয়? মৃককে বিনি বাচাল কবন, পঙ্গুকে বিনি গিরি লঙ্ঘন করান—সেই দয়ালু পরমেশ্বরকে কসবীকার করার শক্তি কার আছে?

মনে পড়ে একবার যুবরাজ দারা-শিকোর ভারি অসুখ। জীবনের কোনো আশাই ছিল না। শুধু দিল্লীর কেন? সমগ্র হিন্দুস্থানের হাকিমের দল এনে দাঁড় কবানো হয়েছিল এই লালকিলার রাজপ্রাসাদে।

মুখ গম্ভীর করে সম্রাট শাহজাহান নিজে সব হাকিমদের প্রশ্ন করেছিলেন।

শোন, হাকিম। টাকা-কাড়ির চিন্তা করো না। দিল্লীর প্রাসাদে যখন তোমাকে এনে হাজির করা হয়েছে তোমার সেলাম-নামা ঠিক পাবে। হাকিমের সেলামী কবিরাজের দক্ষিণা কোনটায় খাজাণ্ড সাহেবের কাপণ্য থাকবে না। এটা আমার শুকুম। তবে, খোদা কসম, অসুখ ধরতে না পারলে আমার পবিত্র জ্ঞানিয়ে দাও। আমি অন্য চেষ্টা করব। এই যুবরাজ শুধু হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ নন, জনবে এই সুপণ্ডিত পুত্রই আমার কলিজা, জ্ঞান, আমার চোখের মণি। দোহাই তোমার, নির্ভয়ে বলতে পাবো আমি অসুখ ধরতে পারছি না সম্রাট। তোমার কোনো অপবাধ নেওয়া হবে না। জানবে আমার হুকুম, তোমার কোনো শাস্তি হবে না। বোগীর ওষুধ দিতেই হবে তার কোনো মানে নেই। আগে তোমাদের জানতে হবে অসুখটা কি? সেটাই যদি না ধরাত পারলে তাহলে তোমার ওষুধপত্র কাজ হবে কি হবে? তবে সেটা যদি জাগ্র না ধরতে পাবো তাহলে বা তোমার কসব কি?

ভয়ে ভয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে

হাকিমের দল বলেছিল, 'গুরুত্বাক্ষি মাফ জাহাপনা। কিছু মনে করবেন না। এ গোলাম বান্দা ঠিক ধরতে পারছে না যুব-রাজ কেন এত দুর্বল হয়ে পড়ছেন।'

কবিরাজের দল হাত জোড় করে বলে-ছিল, 'ক্ষমা করবেন ধর্মবিতার। যুবরাজের অসুস্থতার কোন কারণ নির্ণয়ই সম্ভবপর হচ্ছে না।'

যে মার সেলামী, দক্ষিণা নিয়ে চলে গিয়েছিল। সাথে একটা আবও জিনিস নিয়েছিল মাথায় করে। সেটা ছিল, দুশ্চিন্তার ঝড়।

নিজেদের ভেতর অনেক আলাপ-আলোচনা করেছেন তারা। মনেক পুঁথি খেঁচেছেন। অনেক ষড়যন্ত্র পুঁথিয়েছেন এই অসুখের বিশ্লেষণে। কোন হাদিসই

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

পান নি তাঁরা। রাজপ্রাসাদে কাবু চোখে বসে নেই। সম্রাটের সাথে সাথে চিন্তা করে জাহান্ আবা বেগমেরও চোখের ঝুম গিয়ে-ছিল ছুটে।

দিব্যামিনী শুধু চিন্তা সাহেবেব ধ্যানে কাটিয়েছেন রাজকন্যা। ইঠাৎ নিজের একটা খেয়াল হল। ভোরের তাবা তখনও লোকায় নি আকাশের কোলে। দূরের মসজিদের আজানে চাবিদিক তখন মুখ-বিত। যমনাব ভীবে মন্দিরের কাঁসব ঘণ্টা ধ্বনির সাথে ভেসে আসাছিল সমবেত মন্ড-ধ্বনি। বিনিময় বজ্রনী কেটেছে বাজপ্রাসাদে যে দৃষ্টি প্রাণী, বাজপ্রাসাদের ঝরোকাব তাঁবা যেন অন্তর কবলেন নতুন মৃদু মন্দ হাওয়াব নাচন। অথকার ভেদ কবে এলো রাজপ্রাসাদে নতুন আশার আলো।

ধীবে ধীবে সম্রাট শাহজাহানের কক্ষে প্রবেশ কবলেন রাজেন্দ্রনন্দিনী। জানাতেন প্রভাতী-বন্দনা।

উৎসব নয়নে তাকান সম্রাট। তিনি জানেন এ সমগ্র শাহজাহানাবাদে যদি তাঁর

এ দুদিনে কেউ কোন নতুন পথের ইঙ্গিত দিতো? পারেন তাহলে তিনি বাদশা বেগম জাহান্ আরাই শুধু। তাঁর দুশ্চিন্তার সাথী। শুধু সাধারণ পিতা-কন্যার সম্বন্ধে যে নয়। চিন্তায় ভাবনায় দুটো প্রাণ যে এক, দেহই শুধু দুটো।

গুরুত্বাক্ষি মাফ জাহাপনা। একটা চিন্তা কদিন থেকে আমার মাথায় খেলছে। যুবরাজের এ নিদাঘ অসুস্থতার আমাদের মনস্থির নেই জানি। তবুও ভাবছিলাম যখন সব হাকিমই জবাব দিয়ে যাচ্ছে তখন একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?

ব্যাকুল নয়নে সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার কথা বলছো তুমি জাহান্ আরায়?'

মাটির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত চিন্তা-কুলভাবে জাহান্ আরায় বললেন, 'যদি ভুল হয়, অপরাধ নেবেন না সম্রাট। আমার মন বলছে, যুবরাজের অসুখ সারাবার শক্তি সমগ্র হিন্দুস্থানে আজ বার আছে তিনি হলেন লাহোরের পীরশ্রেষ্ঠ মিয়া মীর। একবার তাঁর কাছে দোয়া মানলেই হতো না কি?'

সম্রাট এই রকমই একটা কিছু আশা করেছিলেন। তিনি যে জানেন জাহান্ আরায় দৈবশক্তিতে কতখানি বিশ্বাস রাখেন। জাহান্ আরায় এ বিশ্বাসের উৎস যে কোথায় তাও তিনি জানেন। এ দৈবশক্তিতে এ প্রাসাদে যুবরাজ দারার চেয়ে কোন পুণ্যাত্মা বেশি নির্ভরশীল? কার হৃদয় এতখানি স্বষ্টিকের মতন স্বচ্ছ?

মাত্র উনিশ বছর বয়স। যুবরাজ এরই ভেতর অধ্যাক্ষগতে যে জায়গায় পৌঁছে-ছেন, সম্রাটের মনে হয় এ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তার কাছেও যেসতে পারেন নি। মিয়া মীর?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মুন্সী শাহ-এর গুরুদেব সাধকশ্রেষ্ঠ লাহোরের মিয়া মীর।

সমগ্র জীবনে ভাবতসম্রাট শাহজাহান্ মাত্র দু'জন সাধকের পদপ্রান্তে নিজেই লুটিয়েছিলেন। সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজ-মুকুট স্পর্শ করেছে শুধু দু'টি পীরশ্রেষ্ঠের চরণ। সম্রাট রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ছুটে গিয়ে-ছিলেন তাঁদের দরিদ্র পর্ণ-কুটির। একজন ছিলেন বারহনপুরের শেখ মুহম্মদ ফজলুল্লাহ। দ্বিতীয়জন? দ্বিতীয়জনের নামই এক্ষণি উচ্চারণ করলেন না কি জাহান্ আরায়?

এতক্ষণ এদিকে তাঁর চিন্তা যায় নি কেন? আমি কে? কে সম্রাট? কে পিতা? কে আমি? তাই তো? অনেক আগেই পীরসাহেবের শরণাগত হওয়া উচিত ছিল।

আব্দুল কাদির গিলানি সাহেব যে কাদিয়র সম্প্রদায় প্রবর্তন করে দুনিয়াতে মরিয়মা সফীাদের প্রচার করেছিলেন এ মহান ভাপস যে তারই উত্তরসাধক।

য়ে চলেছে। তার গতির কোন বিবায়
নই। আকাশের নীলিমা উজ্জ্বলতার
চর ভাস্বব। ধূপের গন্ধে নদীতীর
পরূপ পাত পবিষ্ট। অদূরে একতারা
জিয়ে বেন্ দরবেশ আপন মনে গান
গয়ে চলেছে—

আই তীব্র ঘামাৎ রা দিলে
উশ্বাক নিশানা
খালকু বাতো মশ্‌গুলা
ওয়াতু ষায়াব জে মিয়ানা
গর মোতাকিফে দয়রাম
ওয়া সাকিনে মস্‌জিদ
ইয়ানি কি তৌরা মি তলুবমু
খানা রা খানা
মক্‌সুদে মদন আজ কাবান্দ
বুখানা তু বুদ্ধি
মক্‌সুদ তুই কাবা
ওয়া বুখানা বাহানা
হাজি রাজাহে কাবা
ওয়া মদন তলিবে দিদার
আউ খানয়ে হামি জোয়াদ
ওয়া মদন সীহবে খানা

তোমার প্রেমে আমি মশগুল,
আমাব সাথে সাথে তামাম জগৎ
খুঁজে মরে কেন? সে কি ভুল?
মন্দিবে খুঁজি, মন্দিজিদে ছুটি,
যেথা যাই শব্দে তব পারে লুটি
তব কেন ওগো না পাই কুল।
হাজি চলে ছুটে কাবার পানে,
অরণী ছাডিয়া ছোটো ঘর পানে,
আমি চাই না তীর্থ,
চাই না মোক্ষ
তোমাকেই চাই বিলকুল॥

গানটা কোন সুফী কবির রচনা?
কে জানে?
কি আশ্চর্য দেশ এই হিন্দুস্থান। এর
আকাশে বাতাসে দর্শন। এর গহন গিরি-
কন্দরে দর্শন। এর পর্বতশ্রেণী, নদীর
প্রবাহে, পাখীর কলকলিতে দর্শন।
কোন দেশের কোন ফকির গাইতে পারে
সুফী দর্শনের এ সারমর্ম? বেদান্ত
দর্শনের শেষ কথা? জাহান আরো বহু
দেশের কাহিনী শুনছেন। পড়েছেন তার
চেয়েও বেশি। কোন হৃদয় পান না এ

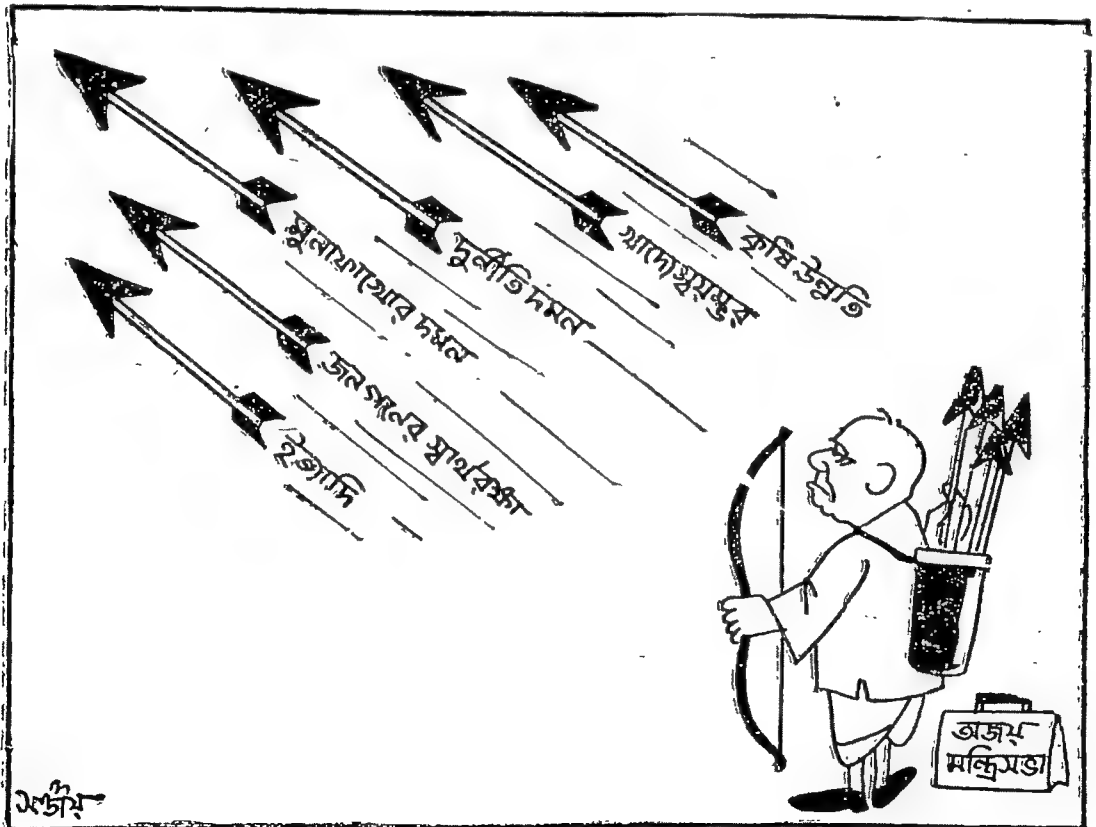
প্রশ্নের। হিন্দুস্থানের রেখাতে যেন কোন
তাপসের বাদবলে মেলানো রয়েছে নতুন
নতুন জীবনদর্শন। যে দর্শনের পথ
শব্দে ভর কাছেই খোলা যে পর্য্যক খোলা
চোখেও অশ্বের মতন চলে না।

বিষাভার আজব সৃষ্টি এই হিন্দুস্থান।
তার ভেতর আজব শহর শাহজাহানাবাদ।
লালকেন্দ্রার রাজপ্রশাদের ফকিরের গান
এখনও ভেসে আসছে দূর থেকে—

আমি চাই না মৃত্যু
চাই না শাস্তি
চাই না সুখ স্বর্গীয়
প্রেমবেদনার কণাটুকু পেলে
আবে এ জীবন হেসে খেলে খেলে
তাতেই প্রবাস ডালি ঢেলে ঢেলে
(ওগো) সার্থক হবে জীবনিয়ে॥
কুফর কারিকর রা ওয়া
দিন দিনদার রা
জারে দর্দে দিন
আস্তার রা॥

জাহান আরার জীবনে এই প্রেমের
দহন আর কতদিন জ্বলজ্বাবে?

লক্ষ্যভেদ—



পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

প্রথম স্বাধীনতা-দিবস

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ।
ভারতের আধার তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি।
পাখিরা বাসা ছাড়ে নি—বাসাতে থেকেই
হাজির সুরু করেছি। লক্ষ্য-নল্লী নব-
বধু বেন তার সূদীর্ঘ ঘোমটার আড়াল
থেকে মিটি-মিটি চান, (উপমাটি কিন্তু
অনেককাল আগের দিনের নব-বধু
লক্ষ্যকে!), পূর্ব দিগন্তে সবিভাও
তেমনই, শারদ আকাশের পাতলা শাদা
হালুকা মেঘের ঘোমটার আড়াল থেকে
উকি-বুকি মারার চেষ্টা করছেন—তার
দৃষ্টি তখনও ফটে ওঠে নি—গাঢ় জালিয়া
কেবল ফুটি-ফুটি করছে। সাধারণত
মানুষ এই সময়ে প্রারম্ভিক শীতের নতুন
আমেজে সুখ-নিদ্রার আরাম উপভোগ
করতেই অভ্যস্ত কিন্তু আজ অবস্থা
বদলে গিয়েছে। সারা শহর (রাজসাহী)
জেমে উঠেছে—পাখি কাকলিকে ছাপিয়ে
উঠেছে, ঘরে ঘরে মানুষের উৎসবের কল-
ধ্বনি। ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে শত
শত তরুণ-তরুণী। তাঁদের উল্লাস ও
জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে
উঠেছে। মুহম্মদ-ই-আজম
জিন্দাবাদ” ও “পাকিস্তান জিন্দাবাদ”
ধ্বনি। হাসি-কল্লায় ভরা মন নিয়ে
আমিও ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামি। ইরেক-
শানন শেষ হল, তাই মনে আপোনার
হাসি; আর, আমাদের মাতৃভূমি—
ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই
ছিল আমাদের জাগরণের চিন্তা ও নিদ্রার
স্বপ্ন সেই ভারতবর্ষ, খণ্ডিত হল, তারই
ব্যথার বুকভরা কান্না। এই মনোভাব
নিয়ে রাস্তায় বের হই। পথ-পরিভ্রমায়
দেখি, রাস্তায় রাস্তায় স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড
প্রকাণ্ড তোরণ উঠেছে। ফুল ও পাতার
তাকে অপূর্ণ সম্ভার সাজান হয়েছে—
লানা রং-বেরং-এর কাগজের ফুল ও মালা
তার গায়ে শোভা পাচ্ছে। সে এক অপূর্ণ
উৎসবের দৃশ্য। মন ছুটে যেতে চায়
উৎসবে মাতোয়ারা ভাই-বোনদের হাতে
হাত মিলিয়ে চলতে কিন্তু কোথায় যেন
একটু খটকা লাগে—একটু ব্যথা পাই—

অন্তরের অন্তস্তলে যেন একটা কাঁটা
বেঁধাব ব্যথা ও যাতনা অনুভব করি।
এ কী আমার মনের ক্ষুদ্রতা—নীচতা!
হয়তো কিছুটা, হয়তো বা অভিমানী
মনের একটা নিরর্থক অহংকার মাত্র!
জনতা যে মুহম্মদ-ই-আজম জিন্দা-
বাদ” —“কায়দ-ই-আজম জিন্দাবাদ” ধ্বনি
দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, কই আমি তো
তাঁদের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে চীৎকার
করে ঐ ধ্বনি দিতে পারছি না—কোথায়
যেন বিবেকে বাধে। দেশ স্বাধীন হয়ে
একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হল—
আমি সেই স্বাধীন দেশেরই একজন
নাগরিক; অর্থাৎ সেই দেশেরই জয়ধ্বনি
দিতে পারছি না। এ কী কম দুর্ভাগ্য—
কম দুর্ভাগ্য! কে বুঝবে, দৃশ্য এই
মরমের ব্যথা? নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ
নেতারা হয়তো বোঝেন নি—বুঝলে তাঁরা
পরিদর্শনই, ১৫ই আগস্ট তারিখেই খণ্ডিত
ভারতের স্বাধীনতার উৎসবে মেতে উঠতে
পারতেন না—জী-জমকের মধ্যে সেই
উৎসব পালন করতে পারতেন না। হয়তো
নেতাদের মধ্যে একজন মাত্রই মহা-মানব—
মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা
সংগ্রামীর মর্মবেদনা বুঝেছিলেন; তাই
তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট
তারিখে যখন ভারতেরই স্বাধীনতা
উৎসবে কলকাতার রাজপথ জন-ভরগে
উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি তাঁর
বেলেঘাটার ভাড়া অস্থায়ী শিবিরে
মৌনবলম্বন করে উপবাসী হয়ে দিন
কাটিয়েছিলেন। সবার অন্তরের ব্যথার,
তাঁর এই অনুভূতি-প্রবণতার জন্যই তিনি
তাঁর দেশবাসীর কাছে হতে পেরেছিলেন,
‘মহাত্মা’।

যাক, আমি সেদিন উৎসব-মুখর
জনতার মধ্যে মিশেও তাঁদের একজন
পূর্ণাঙ্গ শরিক হতে পারি নি। এ
কথা আজ অবপটে স্বীকার করছি।
এখানেই হয়তো আমার মনের ক্ষুদ্রতা—
আমার মনের নীচতা! সেদিন মনে পড়ে-
ছিল, বাল্যকালে শোনা পশুপূরার
‘মনসা-মঙ্গল’ গানের একটি কালি। চাঁদ-
সদাগর মনসা দেবীর ঘোরতর বিরোধী।
তিনি মনসা দেবীকে ‘দেবী’ হিসাবে
কিছুতেই স্বীকার করবেন না—তাকে

পূজো তিনি কিছুতেই কববেন না।
মনসা দেবীও না-ছোড়-বন্দা। প্রাচী-
হিসার তিনি তাকে বশে আনার জন্য
সদাগরের “সপ্ত-ভিত্তা” সমুদ্রে ডুবিয়েছেন
—একের পর এক করে সাতটি পুরাতন
সর্পিঘাতে হত্যা করেছেন—সংসারে কান্নার
রোস উঠেছে; তবু—তবু চাঁদ সদাগর
অটল-অচল। তিনি কিছুতেই মনসা
দেবীকে পূজো করবেন না—তাঁর মূর্খে
পূর্বাপর শব্দ একই কথা—“যে হাতে
পূজি আমি শিব শূলপাণি, সেই হাতে
পূজিব আমি বেগুন-খেফো-কানি”
আমারও তখন মনে হবোছিল, যে মূর্খে
ভারত-মাতার বন্দনাগান করে “বলো-
মাতঙ্গম” ধ্বনি দিয়েছি, যে-মূর্খে
স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সেনাপতি
নেতাজীর সংগ্রামী বজ্রধ্বনি—“জয়হিন্দ”
(ভারতবর্ষের জয়ধ্বনি) দিয়েছি, সেই
মূর্খেই খণ্ডিত ভারতবর্ষের অঙ্গ নিয়ে
গঠিত পাকিস্তানের জয়ধ্বনি দিই কী
করে? মন সংশয়-দোলার দুর্লোহিল—
তখন তা’ কাটিয়ে উঠতে পারি নি।
এটাকে যদি আমার মনের ক্ষুদ্রতা বলতে
হয়, তবে বলুক তা’ বিশ্ববাসী-জনে।
কোন ক্ষোভ নেই, কোন দুঃখ নেই।
সত্যকে সত্য বলেই সেদিনও মনে নিয়ে-
ছিলাম; আর আজ এতদিন পরেও সত্য,
চিরদিন সত্য হয়েই আছে—মনের ঐ
স্বপ্নের কোনও মীমাংসার সূত্র আজ
খুঁজে পাই নি। এটা শব্দ আমার
কথা নয়। আমার মত আরও যারা
স্বাধীনতা-সংগ্রামী সৈনিক, আজও পাকি-
স্তানে আছেন, তাঁদের কেউ-ই জানে
পশ্চিম-পাকিস্তানের জনতার সাথে
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারেন নি—
“কাশ্মীর আমাদের চাই-ই চাই!”
স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের এই মানসিক
স্বপ্নের শেষ যে কবে এবং কোথায়, কে
জানবে?

প্রথম স্বাধীনতা উৎসবের দিনে
আমার মনে অত্যন্ত প্রবলভাবেই ঐ স্বপ্ন
দেখা দিয়েছিল। এটা ছাড়াও আরও
একটি ভাব সেদিন আমার মনকে নাড়
দিয়েছিল। সেটা হচ্ছে—আমি যে এক
জন স্বাধীনতা-সংগ্রামী সৈনিক এবং
আমাদেরই সংগ্রামের ফলেই ভারতবর্ষ

থেকে হংরেজ চলে যেতে বাধ্য হ'ল এবং ইংরেজ গেল বলেই ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়েও, উভয় অংশই আজ স্বাধীন হল; আমার মনে সৈদিন সেই অভিমানে পুরো-মাদ্রাজেই ছিল এবং সেই অভিমানেই মনের নিরর্থক অভিমানে আমার আহত হয়েছিল, যখন দেখেছিলাম যে, জনতার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা। তাঁরা যেন আমাকে এড়িয়ে চলতেই চাইছেন। তখন বুঝি নি, যেন তাঁরা আমাকে এড়িয়ে চলতে চান? পরে, পূর্ববঙ্গ পরিষদ মুখ্যমন্ত্রীর ডায়েরী জেনেছি যে আমরা, যা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি, তাঁরা তো 'পাকিস্তান'-এর জন্য সংগ্রাম করি নি, বরং পাকিস্তান-সৃষ্টির পক্ষে বাধাই দিয়েছি। সুতরাং, আমরা বোধ-হয় পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু (মুসলমান) সম্প্রদায়ের কাছে কমুনারাই পাত্র-প্রস্থার পাত্র নই। মনের এইরূপ সংশয়-সকল অবস্থায় জনতার মধ্যে থেকেও আমি যেন বিচ্ছিন্ন হয়েই পথ চলতে থাকি।

কমলা আকাশ সূর্য দেখা দেয়—দিন সূর্য হয়। দিনের আলোয় দেখি, কোথাও বা গৃহে গৃহে পাকিস্তানের নতুন সূর্য জাতীয় পতাকা সকলবেলায় বারু হিম্মালে মৃদু-মন্দভাবে হিম্মালিত হচ্ছে, কোথাও বা সবে মাত্র পতাকা উত্তোলনের তোড়জোড় চলছে। 'পাকিস্তান' হয়েছে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র। স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি জাতীয় পতাকা অবশ্যই থাকবে। পাকিস্তানেরও জাতীয় পতাকা হয়েছে। সেই পতাকার গোড়ার অংশ, অর্থাৎ যে অংশ পতাকা-দণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। সেই অংশ সাদা। সেই অংশটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতীক; আর, বাকী অংশের রং হল সবুজ এবং তার ওপরে, ইসলামের প্রতীক তারকা ও অর্ধচন্দ্র। সেই অংশটি, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতীক। এই পতাকা পরিকল্পনা নিয়ে কেউ কেউ, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দৃষ্টি-দৃশ্য দেখে পরবর্তীকালে বলেছেন যে পতাকার পরিকল্পনা ঠিক ঠিকভাবেই করা হয়েছে—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্বেশে দৃষ্ট চুকিয়ে দিয়ে তাঁদের ও বিশ্ববাসী সকলকে প্রকাশ্যভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন যে ইসলামিক রাষ্ট্র—পাকিস্তান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা কী ও কেমন হবে। তাঁরা পতাকা পরিকল্পনার ঐরূপ ডাখা করেন, তাঁদের আমি আর একটি ভাষাও (সেটি আমার নিজের) চিন্তা করে দেখতে বলি। সেটি হচ্ছে :—পতাকার ঐ সাদা অংশটি, যা হচ্ছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতীক, সম্পূর্ণ পতাকাটাকেই ধরে রেখেছে—ঐ অংশটি লোপ পেলে গোটা

পতাকাটাই ভু-লুপ্ত হ'বে। আমার কাছে এই ভাষাটিই বেশি ব্যস্তিসহ মনে হয়। পাকিস্তান থেকে এ যাবৎ যত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক দেশ-ভ্রাণ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরাই ভারতে এসে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। এখানে উষত ধরণের পাট তৈরি করছেন, ভূতপূর্ব পাকিস্তানী কৃষকেরা। তাঁরাই বন-জঙ্গল কেটে পতিত জমিকে শস্যশালিনী করে তুলেছেন—বিচ্ছিন্ন ধরণের তির-তরকারী ফাটিয়েছেন। বন ও জলাশয়ে শহরে পরিণত করেছেন। তাঁরা এদিকে চলে আসার ফলে এদিক-কার-উন্নতি যে পরিমাণে হয়েছে, পাকিস্তানের আর্থিক ক্ষতিও সেই পরিমাণেই হয়েছে। পরে, এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় সম্পর্কে আরও বিশদভাবে আলোচনা করবো।

যাক, কথা প্রসঙ্গেই এই কথাগুলো অবান্তর হলেও এখানে এসে পড়েছে। আমি বৌদনের কথা বলছিলাম, অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের কথা—সৈদিন কিন্তু আমার মনে এসব কথা ওঠে নি—তখন শুভার উপবৃত্ত সময়ও আসে নি। পরবর্তী কালের ঘটনা-প্রবাহই এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখেই আমার বস্তুমূল ধারণা হয়েছে যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে কলমের খোঁচায় দেশভাগ করলেও হাজার হাজার বছর একই আবহাওয়ায় একত্র বাসের ফলে মানুষের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও একত্বের লৌহ কাঠামো গড়ে উঠেছে, তাকে ভাগ করা সহজ তো নয়ই বরং তা অসাধ্য এবং করতে গেলে ধ্বংসই ডেকে আসে। তাই, আমি মনে করি যে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও যে সেই সেই দেশের নাগরিক এই বোধ জাগিয়ে তোলার পূর্ণ সুযোগ দুই দেশেরই শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের দেওয়া একান্ত উচিত। কিন্তু দুঃখের সাথে আমি লক্ষ্য করেছি যে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ সেই স্বাধীনতার প্রথম দিনেও যে ব্যর্থতা দেখিয়েছেন, সেই ব্যর্থতার ইতিহাস তাঁদের ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেড়েই গিয়েছে। কর্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাবের প্রতিফলন ব্যাপকভাবে হয়েছে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের (মুসলমান-দের) জনতার মধ্যে। স্বাধীনতার প্রথম দিনে আমার প্রতি জনতার যে তাজিল্য-ভাব দেখেছিলাম, তা রাজনৈতিক নেতাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের—বিশেষ করে, প্রাক্তন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের প্রতিফলন মাত্র। আমার অহমিকায় আঘাত লেগেছিল—আমি, অন্তরে বাধ্য বোধ করেছিলাম ঠিকই কিন্তু তবু জনতার সাথেই এগিয়ে

চলি। বেলা বাড়তে থাকে। মকস্বলের দূর-দূরান্তের গ্রামগুলো থেকে ট্রেনে ভর্তি লোক আসতে থাকে। যেনের কামরার ভেতরে তো তিল ধারণের স্থান নেই—কামরার ছাদেও লোক ভর্তি। কারো টিকিট কেনার প্রশ্ন নেই—কেউ টিকিটও কাটে নি, কর্তৃপক্ষও বিনা-টিকিটে সৈদিন রেল-চরণে বাধ্য দেন নি। সৈদিন আর রেলের কামরার প্রাণী বিভাগের কোনই জুলা ছিল না। বেলা যতই বাড়তে থাকে, দ্বারা শহর ততই লোকে লোকারণ্য—জম-জমাট হয়ে উঠে। সারা শহর জুড়ে যেন একটা মেলা জমে উঠেছে—সকলের চোখে মৃদু কী আনন্দ—সকলের মনেই কী একটা অনির্বচনীয় আনন্দের যেন ডেউ খেলে যায়! নানানস্থান থেকে গরীব-দুখী ভিক্ষকেরাও এসে ভিড় জমিয়েছে। তাঁদের পরিতোষ সহকারে খাইয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই ছিল। দুপুরে তাদের খাওয়ানোও হল। তারা সকলেই পরিতুষ্ট। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোককেই সৈদিন যে দেখেছে, সেই বুকেছে যে তাদের চোখ-মুখ দিয়ে মনের আনন্দ যেন উপছে পড়ছে—ফেটে পড়ছে। তাদের আনন্দ একটা চূড়ান্ত বিজয়ের আনন্দ—প্রকাশ্য বড় একটা সূর্যে যেন তারা জয়লাভ করেছে। সত্যিই তো তারা যথেষ্ট জয়লাভ করেছে—তাদের আনন্দের, তাই, ব্যস্তিসঙ্গত কারণ অবশ্যই আছে। তাদের নেতা—কারেদ-ই-আজম জিমাহ সাহেব এই তো সৈদিন মাত্র ১৯৬৪ সালের নির্বাচনের আগে বলেছিলেন যে মুসলমানগণ যদি তাঁর মুসলিম লীগের প্রার্থীদের ভোট দেয়, তাহলে তিনি তাদের মুসলমানের জন্য পৃথক বাসভূমি পাকিস্তান দেবেন। একটা বছর বেতে না যেতেই তিনি 'পাকিস্তান' দিলেন। এটা কি কম গৌরবের—কম গর্বের কথা। মুসলমান আজ, তাই, বিজয়েল্লাসে মত্ত। আর, অপর দিকে অ-মুসলমানদের অবস্থা কী? তাদের নেতারাও বলেছিলেন, দেশ-বিভাগ কিছতেই তাঁরা মেনে নেবেন না। নেহরুজী বলেছিলেন—হাজার বছর চেষ্টা করলেও 'পাকিস্তান' হবে না। গান্ধীজী বলেছিলেন, তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে ছাড়া পাকিস্তান হবে না। গান্ধীজীও মরেন নি, নেহরুজীও মৃত বদলাতে হাজার বছর লাগে নি। মাত্র দেড় বছর সময় তার পরে কেটেছে। এর মধ্যেই 'পাকিস্তান' একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখা দিল। তাই, মুসলমানের মধ্যে যেমন বিজয়ের গর্ব, অ-মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি একটা পরাজয়ের শ্লানি। অ-মুসলমানদের মধ্যে সূর্য নেই কিন্তু মৃদু হাসি কুটিয়ে তুলতে হয়েছে। মুসলমানদের

দায়িত্ব বহন

মধ্যে কেউ কেউ হুজুতে সৈনিক বর ছেড়ে রাস্তায় নামে নি কিন্তু অ-মুসলমানরা গুললেই রাস্তায় নেমেছেন। নেমেছেন, প্রাণের ভয়ে—দেশদ্রোহী বলে বিকৃত হওয়ার ভয়ে। মুসলমানের মনে সে ভয় নেই। অ-মুসলমান সমাই আতঙ্কিত। রাস্তায় ও বৈকালিক জনসমাবেশে আজ, তাই, অ-মুসলমানের সংখ্যা অল্প। তাঁদের চোখে পরাজয়ের শ্মশান, মৃত্যু কিন্তু জোর করে আনা কঠিন হাঙ্গাম।

অনেক দিন পরের কথা। আজ লিখতে বসে মনে পড়ছে, ভারতের প্রধান-মন্ত্রী নেহরুজী যিয়ার। ভারতীয় পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের জনৈক দেশ ত্যাগ করে, চলে আসায় নেহরুজী যিয়ার দিয়ে তাতে পরাজিতের মনোভাব বলে বলেছিলেন। পরাজিতের মনোভাব তো নিশ্চয়ই কিন্তু এই পরাজয়ের শ্মশান কালিমা ঐ বাস্তবত্যাগীদের মৃত্যুকে কে মাথিয়ে দিয়েছিলেন? আমি চোখ বন্ধ পাকিস্তানে থেকে অ-মুসলমানদের মধ্যে এই পরাজিতের মনোভাব যে আরও কতভাবে দেখেছি, তার লব্ধে বন্ধাকালে বলবো। আজকে শুধু প্রথম স্বাধীনতা দিনে রাজসাহীতে অ-মুসলমানদের চোখে-মুখে যা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তাই বললাম। বলতে গিয়ে মনের আবেগ কোথাও কোথাও অব্যক্ত কথারও উল্লেখ করছি কিন্তু কথা অব্যক্ত হলেও অপারসঙ্গিক নয়। আশা করি, পাঠকরা আমাকে সেজ্ঞা ক্ষমা করবেন।

বিকলে কলঙ্ক মাঠে জনসভা। মাঠের বিরাট চত্বর লোকে লোকে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। কেবল মাথা, আর মাথা—যেন মাথার সমুদ্র। এতবড় বিশাল সভা রাজসাহী শহরে আর কোনও দিন দেখি নি। স্বাধীনতার আগেও না, পরেও আর কোনদিন না। সেই সভায় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। করবেন, জেলা মুসলিম লীগের ও জেলা কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপ একসাথে মিলে—বোধভাবে। তখন জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, মোল্লাভি আমদুল হামিদ, এম. এল, এ ও কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, শ্রীক্ষিতানন্দমোহন চৌধুরী। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দিকেই আমাকে তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ১৮ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে একই দিনে বন্দী করে তৎকালীন সবকার জেলে নেন। তার পরে আমি মুক্তি পাই। ১৯৪৫ সালের শেষার্শ্বে। আমি জেলে যাওয়ার আগে আমার ও আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণের কতৃৎসেই জেলা কংগ্রেস কমিটি ছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও শ্রীযুক্ত সূভাষচন্দ্র বসুর ও আমার সহপাঠী বন্ধু—মোল্লাভি আব্রাহাম-

দ্দিন চৌধুরীর কর্তৃত্বাধীনে। কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি, নিখিল ভারত কমিটির নির্দেশে বাংলার সূভাষ-পন্থী সব কংগ্রেস কমিটিকে বাতিল করে দিয়ে “এড হক” কমিটি সর্বত্র করেন। রাজসাহীতেও তাই হয়। ১৯৪৭ সালে সেই “এড হক” কংগ্রেস কমিটিই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন কি না জানি না। ফেল থেকে ফিরে এসে দেখি, ক্ষিতীনবাবু জেলা কংগ্রেসের সভাপতি।

মোল্লাভি হামিদ ও ক্ষিতীনবাবু এগিয়ে যান, পতাকা তুলতে। হামিদ সাহেবের বাবা—হাজি লাল মহম্মদ সাহেবকে আমিই কংগ্রেসে নিয়ে আসি। তিনি কংগ্রেসের অনেক জন-সভাতেও বক্তৃতা করেছেন এবং পরে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের শ্রুতি শাসনব্যবস্থার বাংলা কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। হামিদ সাহেবও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মুসলিম লীগ-প্রাধীনরূপে নির্বাচিত হন। তার বড় ছেলেও বর্তমান পাকিস্তানের পার্লামেন্টের সদস্য। এরা তিন পুরুষের সংসদ-সদস্য। মানুষ হিসাবে বেশ ভালই কিন্তু মুসলিম লীগের আয়োজিত জনসভায় যখন বক্তৃতা দেন, তখন বোঝা যায় না যে এই হামিদই হিন্দুর সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব রক্ষাকারী সেই হামিদ-ই কি না। রাজনীতি এমনই বিচিত্র। হামিদ কিন্তু আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বরাবরই বড় ভাই-এর সম্মান

দিয়েছে। হামিদের সাথে এগিয়ে যান ক্ষিতীনবাবু মশায়। ক্ষিতীনবাবু সাহেব রাজনীতিক্ষেে কখনই আমার মতের ও পথের মিল হয় নি। তাঁর চরিত্র সব সময়ই আমার কাছে প্রহেলিকা ময় মনে হয়েছে। তিনি এগিয়ে যান। হামিদ ও তিনি—দুজনে পতাকার দাঁড় ধরে একসাথে টেনে পতাকা তোলেন। সম্ভবত উভয়েই একটা করে ভাষণও দিয়েছিলেন। কী যে ভাষণ তাঁরা—বিশেষ করে ক্ষিতীনবাবু—দিয়েছিলেন তা আজ আমার এতদিন পরে মনে হোই। আর তখন আমার মনের অবস্থাও এমন ছিল না যে তাঁদের সারগর্ভ (১) বক্তৃতায় মনোনিবেশ করি। পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, যে সব হিন্দুরা গবেষণা-আন্দোলন সহকারে পাকিস্তানের গবেষণা-অনুভব করে বক্তৃতায় জনতার হাততালি ফুড়িয়েছেন, তাঁরাই কিন্তু সর্বপ্রথমে দেশত্যাগ করে এদিকে ঘাট ভারতে এসেছেন। ক্ষিতীনবাবু সৈনিক কী বলেছিলেন, মনে নেই কিন্তু এটুকু জানি যে তাঁকে বহু আগেই সম্ভবত ১৯৫০ সালে বা তার আগেই দেশত্যাগ করে এদিকে আসতে হয়েছে। অল্প করেকদিন আগেই তাঁর সাথে আমার কলকাতার একটি হাসপাতালে দেখা হব। তাঁর কাছে সৈনিক শূন্য, তিনি এদিকে একখানি কুটির নির্মাণ করতে পেরেছেন। রাজসাহীতে তাঁর অনেকখানি জামগর ওপরে দালান বাড়ি ছিল। সে সব ফেলেই

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

গ্র্যান্ডবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্ব - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গল - শ্রীহর - গোহাটী

তাকে চলে আসতে হয়েছে। সেখানে সুখের সংসারই ছিল কিন্তু এখানে তাকে স্নান ধান্দায় অর্থাপার্জন করে সংসার চালাতে হচ্ছে। পাকিস্তানী হিন্দুর—বিশেষ করে, যে সব হিন্দু রাজনীতির মাঝে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই আজ কিতাবাবুর মতই দুর্ভাগ্যবশত অবস্থা।

পতাকা তোলা হল। মুসলিম লীগের ও কংগ্রেসের সভাপতিত্বের মিলিতভাবে পতাকা তুললেন। বাংলার অন্যান্য জেলায়ও এই ব্যবস্থাই হয়েছিল কি না, জানি না। রাজসাহীতে কিন্তু এই ব্যবস্থাই দেখেছি। এই ব্যবস্থার পেছনে কত পক্ষের মনে সৈদীন হে মতলবই থেকে থাকুক না কেন—তা' ভালও হতে পারে। আবার মন্দও হতে পারে—আমার মনে কিন্তু এর পেছনের উদ্দেশ্য কু-মতলব বলেই মনে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, কংগ্রেস-সেবীদের গালে ঘেন চড় মেরে ছুকিয়ে দেওয়া হল—“তোমরা বলেছিলে, পাকিস্তান কিছুতেই হতে দেবে না কিন্তু আজ দেখ, তোমাদেরই জেলা-প্রধান আজ পাকিস্তানী পতাকা তুলতে বাধ্য হলেন।” আমি ও আমার করেকটি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক বন্ধু একসাথে আমরা পতাকাপাণ্ড থেকে দূরে—বহুদূরে সভার এক প্রান্তদেশে বিমর্ষচিত্তে কসেছিলাম। ঐ সব সংগ্রামী বন্ধুদের মধ্যে সৈদীন সেখানে ছিল, শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী,

(আমার ছোট ভাই, যাকে প্রায় ১৮ বছরকাল জেলে কাটাতে হয়েছে) শ্রীবীরেণ চক্রবর্তী, ওবফে বীরু মায়া (গত বছর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ক্যান্সার রোগে মারা গিয়েছে), শ্রীসুখাংশু মোহন চৌধুরী ওরফে চেরু, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার (বর্তমানে রাজসাহীর প্রসিদ্ধ এডভোকেট), শ্রীকৃষ্ণগোপাল লাহিড়ী (কলকাতার বর্তমানে এডভোকেট) শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রের, ওরফে বাগু (পরলোকগত সুবেশ্বরমোহন মৈত্রের মহাশয়ের ছোট ভাই) প্রমুখ আরও কয়েকজন বন্ধু। একমাত্র শেবেজ বন্ধুটি বৃটিশের কারাগারে যান নি কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু রসদই তিনি পেছেন থেকে জুগিয়েছেন। তাঁর দানও যে-কোনও সৈনিকের দানের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। তাঁর বাড়িটাই ছিল, আমাদের একটি ঘাটি। বাগুর ভাইপো—শ্রীমান গোরা, (বর্তমানে পরলোকগত) সাধন ও সমর ওরফে ছোট থোকা আমাদের দলেরই সহকর্মী ছিল। আর ঐ সব বন্ধুদের সকলেরই কপালে বহু বছর জেল-বাসের ছাপ আঁকা ছিল। আমরা বসেছিলাম, জন-সমাবেশের এক প্রান্তে অত্যন্ত বিরসবদনে—চিন্তাশ্রিত মনে। মূখে কারুরই কথা নেই। সকলেই আপন আপন চিন্তায় বিভোক্ত। আমি, আমার নিজের জীবনের অতীত চিন্তায় মগ্ন। মনে হচ্ছিল, অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেমেছিলাম, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে। তখন যে বাংলাকে ভাগ করা হয়েছিল, তাতে তো ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করে কোন নতুন রাষ্ট্র হয়েছিল না—ভারতের মধ্যেই হিন্দু-বাংলা ও মুসলমান-বাংলা—এই দুই ভাগে দুইটি পৃথক প্রদেশ হয়েছিল মাত্র। সেই বিভাগের পরিণাম কি হতে পারে সেই চিন্তা করেই নেতারা গড়ে তুলেছিলেন, প্রবল আন্দোলন; আর সব রকমের বৈধ আন্দোলন যখন সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ ও বিঘ্নিত হয়েছিল, তখন বাংলার ভরূণের মৃদুটিমের কয়েকজন একহাতে বোমা ও অপর হাতে রিভলভার নিয়ে সংগ্রামের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ করেই আমিও ঐরূপ একটি সংগ্রামী গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের—অনুশীলন সমিতির—সদস্য হই। তার পর থেকে দুই দশকের বেশি বছর জেলে কাটিয়েছি, পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধে রাইফেলের গুলীতে আহত হয়েছি, তবু সংগ্রামের পথ ছাড়ি নি। আর, আজ?

দেশ ভাগ হয়ে ভারত থেকে একটা পৃথক দেশ হয়ে গেল—আমি ছিলাম, ভারতের একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী,—ভারতবাসী বলে মনে মনে একটা গর্ব আমার ছিল, সেই আমিই আজও থাক্লেম কিন্তু আমি আর ভারতবাসী নই—আমার পরিচয় হ'ল, আমি একজন পাকিস্তানী! এই কলঙ্কের—এই কালিমাব পসরা মাথা পেতে নিলাম। একটা বোমা কোথায়ও ফাটলো না—একটা রিভলভারের আওয়াজও কোথায় হল না! মনে মনে প্রশ্ন ওঠে কেন—কেন, এমন হ'ল? বঙ্গ-ভঙ্গের দিনে নেতারা আন্দোলন গড়েছিলেন—আর, আজকের সর্বভারতীয় অহিংস নেতারা দেশ-বিভাগ আপোষে মেনে নিয়েছেন এবং দেশকে বলেছেন, মেনে নিতে; তাই, আজ, কোথাও আন্দোলন নেই—সহিংস বিপ্লবীরাও আজ নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় আমি কিন্তু মন তো আমার ঘোরতর অশান্ত। স্বাধীনতার সংগ্রামী আমরা কিন্তু আজ যখন স্বাধীনতা এল, তখন আমাদের মন এত অশান্ত কেন? আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম—স্বাধীনতাকে প্রাপ্তির চেয়েও প্রিয় মনে করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু এই স্বাধীনতা—স্বাধীনতার এই রূপ—খণ্ডিত ভারতের এই স্বাধীনতা তো আমরা চেয়েছিলাম না, আমার ও আমার সহকর্মী সংগ্রামী বন্ধু সকলেরই মন, তাই, আজ ভারাক্রান্ত ও চিন্তাক্রান্ত। সভায় সমবেত অ-মুসলমান সম্প্রদায়েরও কারো মনেই শান্তি নেই—সকলেরই মন চিন্তাক্রান্ত। তাঁদের সকলের মুখেই একটি প্রশ্নের সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। প্রশ্নটি হচ্ছে :—“আমরা ইসলামিক এই রাষ্ট্রে স-সম্মানে বাস করতে পারবো তো?” সভা শেষ হল। বন্ধুগণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজ নিজ বাসায় গেলেন। আমি একাকী পদ্মা-সৈকতের দিকে চিন্তাক্রান্ত মন নিয়ে গিয়ে বসি। কত কথাই মনে আসে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম থেকে একটি চিত্র ও তার নায়ক-নায়িকারা তাঁদের জ্বলন্ত ও জীবন্ত রূপ নিয়ে যেন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠেন—ছায়াছবির পর্দার যেমন চিত্র-তারকারা ও ঘটনার্শমুহ একের পর এক আসেন ও যান। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের সেই চিত্রটিই পরবর্তী সংখ্যায় দেওয়ার ইচ্ছা থাকবে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

ট, প,	
বার্ষিক টাঙ্গা (সড়ক)	১৪.০০
বার্ষিক " " "	৭.০০
ত্রৈমাসিক " " "	৩.৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিজ্ঞারীকে পাঠাতে হবে। —কর্মব্যাক্ষ

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানাসহ ডাকটিকিটসহ খালি থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না। —সম্পাদিকা



সুবর্ণলতা

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাশুনা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হ্যাঁ চলছিল গিরির আনাগোনা।

মাঝে মাঝেই কাপড়ের বোঁচকা নামিয়ে পা ছাড়িয়ে বসে জল খেতে দেখা যায় তাকে, এ বাড়িতে পান চাইতে দেখা যায়। কাপড় না গিঁহিয়েও চলে যাচ্ছে, আবার আসছে।

গিরি এখনো যেমনটি ছিল বেন ঠিক তেমনটিই আছে।

সুবর্ণলতার চেহারায় কত ভাঙচুর হলো, সুবর্ণলতার স্বাস্থ্যে কতই ক্ষয় ধরলো, গিরি অটুট অক্ষয়। শূঁধু কাপড়ের মোটের মাপটা একটু ছোট তার হয়েছে ইদানীং। তা সে বেশি বইতে পারে না বলে, না বেশি গছাতে পারে না বলে, তা কে জানে। আজকাল বেন লোকের তাঁত-নীর কাছে কাপড় কেনার থেকে দোকানের উপরই বেশি ঝোঁক।

তাই গিরি আর মোটা আটপোঁবেব বোঝা বেশি বয়ে বেড়ায় না, বাছাই বাছাই জরিপেড়ে শান্তিপূর্বী মিহি মিহি ফরাস-ডাকার আধুনিক ধরণের পাড়ের দু'-চার-খানি এই নিয়ে বেবোয়।

আর এসেই বলে, 'শ' বাজারের রাজ-বাড়িতে দিয়ে এলাম এককুড়ি শাড়ি, ওতোবপাডাব রাজাদের বোমাইবাড়িতে দিয়ে এলাম এককুড়ি সাতখানা শাড়ি নাটোরের মহাবাণীব বাপের বাড়িতে দু'কুড়ি শাড়ি বরাত আছে যেতে হবে সেখানে।'

রাজবাড়ি ছাড়া কথা নেই আজকাল গিরির মখে। দিন 'গত' হয়ে আসবার আভাষ যত স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই কি

শূঁধু প্রচারের জোরে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখ-বার চেষ্টা গিরির?

ঘটকালী তো গেছেই, এ ব্যবসারটাও বেন গেল গেল।

কিন্তু ঘটকালীটা কি একেবারে গেছে?

এ বাড়িতে তবে আজকাল কোন্ কাজে আনাগোনা গিরির? হ্যাঁ সেই পূরনো ব্যবসারটাই আবার ঝালাতে বসেছে গিরি।

সুবর্ণলতার সঙ্গে ছেলে মানুর জন্যে একটি কনের সন্ধান এনেছে।

মানুর বিয়ের ব্যয়স আগেই হয়েছিল, বছরের আড়াআড়ি পিঠোপিঠি ভাই তো ওরা, ভানু কানু মানু। তবে মানু কৃতী হয়ে বিদেশে চাকরী করতে চলে যাওয়ার দরুণ বিয়েটা পিছিয়ে গেছে। আর হয়তো বা সুবর্ণলতার অনাগ্রহও গেছে।

নচেৎ মেয়ে-বাপেদের তো মেয়ে নিয়ে ধবাবির কামাই নেই।

সুবর্ণলতা বলে, 'ছেলে ছুটিতে বাড়ি আসুক, তখন কথা হবে। আজকাল ছেলে-দের নিজের চোখে দেখে নেওয়া রেওয়াজ হয়েছে।'

ইচ্ছে করে ছেলেকে এই বেহামাপনা শিক্ষা দেবার ব্যাপারে বাড়ির কাবুয়ই অনুমোদন নেই। 'যে দম্পতিযুগলের না দেখেই বিয়ে হচ্ছে, তারা সববে বলে, 'কেন বাবা আমবা কি নিয়ে ঘর করছি না?'

তবু সুবর্ণ বলে, 'তা হোক! যেকালে যা ধর্ম।'

ওই বলে বলে তো ছেলেটাকে বিদেশ-যাত্রায় প্ররোচিত করলো সুবর্ণই। এই যে

ছেলেটা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিল্লীতে গিয়ে পড়ে আছে তাতে কি খুব সুখ হচ্ছে তোমার? প্রবোধ কি আপত্তি করে নি' বলে নি কি 'এ বংশের কেউ কখনো 'ভাত ভাত' করে দেশ ছাড়া হয় নি।'

সুবর্ণ বলেছে, 'কখনো হয় নি বলে কখনো হবে না? তোমার ঠাকুন্দা প্র-ঠাকুন্দারা তো কখনো গারে কাটা ব'পড় তোলেন নি, পায়ে চামড়াব চুতো ঠেহান নি, তুমি মানছো সেই সব নিয়ম? নিম্ন জিনিসটা কি হিমালয় পাহাড়, যে সে নড়বে না?'

অতএব মানু দিল্লীতে চলে গিয়েছিল।

ছুটিছাটায় যখন আসে, মানুকে 'আব এক বাড়ির ছেলের মত লাগে। বেপত্রেবা বেপবোয়া, ফুঁর্তিবাঝ আমুদে। আর সোঁখিন তো ছিলই চিবকাল। এনেব এই সনাতনী বাড়ির প্রলেপ বেন আর বাঁত রাখতে পাচ্ছে না তাকে।

সুবর্ণ'ব এটায় বেন আলাদা সুখ।

বললে লোকে 'ছি ছি' কববে, তবু মাকুস্নেহের মূখ রাখে না সুবর্ণলতা।

মানু বরাবর বাইরেই থাকুক, ওখায়েই সংসার পাতুক, এই তাব একান্ত ইচ্ছে

তা সম্প্রতি মানু'ব চিঠিপত্রে বেন ওই 'সংসার পাতা'র ইচ্ছেটা উঁকি মাঝে। রাঁধুনে ঠাকুরের হাতে যে খাওয়া-দাওয়া ভাল হচ্ছে না এটা প্রায়শই জানাচ্ছে।

তবু সুবর্ণলতা ওদাসীন্দের খোঁচস ত্যাগ করে বিয়ের ভোড়জোড় কবছিল।

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

২৫৪৬

দোষের কিছু দেখে না সে।

কিন্তু কেউ যদি কেবলমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই দোষ-গুণের বিচার করে, সেটা তো সংসার সুন্দর লোক মানতে পারে না?

সুবর্ণ যদি ছেলের মা হলেও হ্যাংলার মত মেয়ের বাড়িতে যায়, তারা তো এ কথাও ভাবতে পারে নির্বাণ ছেলের কিছু গলদ আছে, নচেৎ এত গরজ কিসেব?

কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। কোনো সংসারী লোকেরা তো এইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। যেখানেই দেখবে চুলচেরা হিসেবের বাইরে কিছু ঘটছে, সেখানেই ধরে নেবে নিশ্চয় কোথাও কোনো গলদ আছে, নচেৎ এমন বেহিসেবী কেন?

পারাপক্ষ সিংহাসনে আসীন থাকবে, পারাপক্ষ জুতোর শুকতলা ক্ষয়াবে, এই নিয়ম। এর বাইরে যেতে চেষ্টা না তুমি সুবর্ণ।

অতএব যাওয়া হয় না।

শুধু সুবর্ণ ভবিষ্যৎ বাংলার ছবিতে মেয়েদের জন্যে 'মড়ক' প্রার্থনা করে। 'বাংলাদেশের মেয়েদের ওপর এমন কোনো মড়ক আসে না গো, যাতে দেশ মেয়ে শূন্য হয়ে যায়। তখন দেখি তোমরা মহানুভব পুরুষসমাজ কোন সিংহাসনে বসে ক্রীত-দাসী সংগ্রহ কর। এ অহংকার-ঘৃসেবে তোমাদের। তোমাদেরই জুতোর শুকতলা ক্ষয়তে হবে, এই আমি অভিশাপ দিচ্ছি।' নিজ মনে এই ভয়ানক কথা উচ্চারণ করে সুবর্ণ, বলে, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করিছ অপমান—'

তবু এই বিয়ে উপলক্ষে আবার কেন বেড়ে উঠছে সুবর্ণ। আশ্চর্য, কোথায় শুকনো আছে তার এই অদম্য প্রাণশক্তি, যে শতবাব ভেঙে চুটিয়ে পড়ে পড়েও আবার ওঠে খাড়া হয়ে?

কতবারই তো মনে হয় এইবার বুঝি ফুরিয়ে গেল সুবর্ণলতা, আবার দেখা যায় আরে এ যে আবার জীবন্ত মানুষের ছমিকা নিম্নেছে।

বকুলের বড়ো মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে তো দিবি কথাবার্তা সুবর্ণ করে দিয়ে মেয়ের পড়ার তত্ত্ব-বার্তা নিচ্ছিল, আবার তাকে ধরেই আলাদা এক অঙ্কর মাস্টার রাখিয়েছে বছরের মধ্যেই মেয়েকে এণ্ট্রেন্স একজামিন দেওয়াবে বলে।

ভানু আর ভানুর বোঁ হাসে আড়ালে।

বলে, 'মা তাঁর ছোট কন্যাটিকে গার্গী মৈত্রের লীলাবতী না করে ছাড়বেন না।'

কানু আর কানুর বোঁ হাসে আর বলে, 'এ হচ্ছে সেই দাদার বন্ধুর বোনের ওপর আক্রোশ।'

আর কানুর বোঁ আর ভানুর বোঁ আড়ালে হাসাহাসি করে, 'মেয়ের সাধন,

শরীর পতন। মেয়েকে জলপানি না নি-ইয়ে ছাড়বেন না। তবে কি না কথায় আছে 'হিংসের সব করতে পারে—বাজা পুত বিয়োতে নারে।' মগজে ঘি থাকলে তবে তো জলপানি?'

ধরে নেয় নেই ঘি।

কিন্তু ওরাই কি পরম পাপে পাপী? সংসার তো এই নিয়মেই চলে।

বহির্দৃশ্য নিয়েই তো তার কারবার। কে কি করছে, সেটাই দেখে লোকে, কেন করছে তা' কি অত দেখতে যায়? দেখতে যায় না তাই নিজেদের হিসেব অনুযায়ী একটা কারণ নির্ণয় করে নিয়ে সম্মা-লোচনার স্রোত বহায়।

সুবর্ণর এই ব্যবহারটা হিংসুটে মনের আক্রোশের মতই তো দেখাচ্ছিল।

আবার মানুর বিয়েতে বেশি উৎসাহ দেখলেও নির্বাণ লোকে বলবে, বেশি রোজ-গেরে, আর দুবে-ধাকা ছেলে কি না। জগতের রীতাই তো 'বাইবের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মোদো।'

এ ছেলে বাইরে আছে, নগদ নগদ-টাকা পাঠাচ্ছে, অতএব মানু দামী ছেলে।

তবে দামী বোঁ হচ্ছে না, এই যা।

এ কথা জনে জনে বলছে।

চাঁপা তো গাড়ি ভাড়া করে এসে বলে গেল, 'রূপ নিয়ে কি ধরে জল খাবে মা? মেয়ে তো শূন্য ডোমের চুপড়ি ধোয়া। মানুর মতন দামী ছেলেকে তুমি কাণ-কড়িতে বিকিয়ে দেবে? অথচ আমার পিসমশুর অত সাধাসাধনা করলেন, তখন গা করলে না তুমি। উনি মেয়েকে মেয়ের ওজনে সোনা দিতেন, তার ওপর খাট বিছানা আশি, আলনা, ছেলের সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটি, সোনার বোতাম—'

সুবর্ণ হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠেছিল।

বলেছিল, 'তা' হলে তো স্যাকবার দোকানের সঙ্গে বিয়ে দিলে আরো ভাল হয় বৈ চাঁপা!'

চাঁপাব এই জমিদার পিসমশুর সম্পর্কে সমীচিব শেষ নেই। তাই চাঁপা রাগ করে উঠে যায়।

সুবর্ণ ভাবে জঞ্জালের বোঝাকে এত বেশি মজা দেখে কেন মানু। সুবর্ণ ভাবে চাঁপাটা চিবকেলে মধুদ্র।

তা' হয়তো সত্য। মধুদ্র চাঁপা মধুদ্র মত কথা বলেছে।

কিন্তু মানু?

মানু তো মথ্য নয়?

মানু তো বিদ্যার জোরেই তিন তিন-শো টাকা মাইনেব চাকরী করছে।

সে তবে এমন চিঠি লেখে কেন?

মানুর চিঠির ভাষা কৌতুকের। তবে বস্তবায়ী অভিন্ন। সেও বলেছে এ যুগে

রূপের চেয়ে রূপের আদর বেশি। তা ছাড়া হাড়দুখী বিধবার মেয়ে বিয়ে করে চিরকাল যে তাদের টানতে হবে তা'তে সন্দেহ মান্দি। কাজ কি বাবা অত স্বাম্যেলায়। বরং নিজেরই এখন নগদ কিছু টাকা হাতে পেলে ভাল হয় তার। একটা ভাল চাকরীর সম্ভান পেয়েছে দিল্লী সিমসের কাজ—ভবিষ্যতের আশা আছে, তবে নগদ পাঁচটি হাজার জমা দিতে হবে। অতএব এই বিয়েটাকেই তাক্ কবে আছে মানু ওই টাকার সুরাহার ব্যাপারে। তা' সে সুরাহার মধুও একটু দেখা যাচ্ছে। বর্তমান অফিসেব বড়কর্তার নাকি তাকে জামাই কবে ফেলবার দায়ুণ হচ্ছে এবং নেই ইচ্ছের খাতে ওই টাকাটি দিতে পারেন। অবশ্য বিয়ের আনুষ্ঠানিক দান-সামগ্রী বরাভরণ মেয়ের গহনা ইত্যাদিতে কিছু ঘাটতি হতে পারে, কিন্তু কি লাভ কতকগুলো জঞ্জালের স্তুপে?

জঞ্জালের স্তুপ!

সুবর্ণলতার কথাটাই তো বলেছে তার ছেলে। তবে আর এমন সাপে-খাওয়ার মত চতুষ্ট হবার কি আছে সুবর্ণলতার?

ছাটি নিয়ে এল মানু, বিয়ে কবেও গেল।

কারণ বড়কর্তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার সবই কলকাতায়। সত্যিই তাঁরা জঞ্জালটা বেশি দিলেন না। তবে ঘটা-পটার চুটি হল না। এ পক্ষেও হল না। বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হচ্ছে বলে, মান বন্ধার ব্যাপারে তৎপর হলো মানুর বাপ ভাই।

সনাই বাজলো তিনদিন ধরে, আলো



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার ফ্রিট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

জ্বললো অনেক গ্রাসিটিলিন গ্যাসের লাইন চললো। সঙ্গে সঙ্গে, এদিকে ছাদ জুড়ে হে। ছাওয়া হলো, এ'টো গেলাস কলাগা। এ ফুটপাথ ডর্ভি হয়ে গেল, কাকেবা নয় কুসুরেবা সমারোহের ভোজ খেয়ে নিচয় শতমুখে আশীর্বাদ করলো।

চাঁপা চমন তো কাছের মেয়ে এলোই, দুয়ের মধ্যে পারুলও এলো।

আর মাবের সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই ধমকে উঠলো সে, 'এ কী চেহারা হয়েছে না তোমার?'

তারপর গল্প প্রসঙ্গে বললো, 'বেশ করছে ওকে লেখাপড়ায় এগোচ্ছে। বিদেটা করে ফেলতে পারলে তবে তো এ প্রশ্ন তোলা যাবে মেরেমান্দুই বা চাকরী করবে না কেন? মেরেমান্দুই বা চির-কুমারী থাকতে ইচ্ছে করলে সে ইচ্ছে পূরণ হবে না কেন? বলা যাবে—'মেরেদেরই বিয়ে না হলে জাত যায়, পুরুষের যায় না, এ শাস্তাটা গড়লো কে?'

তারপর বকুলের সঙ্গে একান্ত দেখা হলে হেসে বললো, 'প্রেমের ব্যাপারে কতদূর এগোলি?'

বকুল বললো, 'আঃ সেজ্জিদি!'

'আঃ কেন বাপু! তবু একজনেরও ঘনি জীবনে কোনো নতুন ঘটনা ঘটে দেখে ঘটিচি।'

'খুব কবিতা লিখিছিস বড়ি আজ-কাল?' বকুল হাসে। অনেক দিন পরে সেজ্জিদিকে পেয়ে মনের দরজা খুলে যায় যেন তার। কতদিন একটু সরস কথার মুখ দেখে নি। তাই হেসে হেসে বলে, 'প্রেমের কবিতা? তাই এত ইয়ে—'

পারুল একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'নাঃ কবিতা আর লিখি না।'

'লিখিস না? মূর্তিমান কবিতাই একে-বাবে নিমগ্ন হয়ে আছি?'

'তাই আছি।'

পারুলের মুখে কৃষ্ণপঙ্কেব জ্যোৎস্নার মত একটা স্মান হাসির আভা।

'এই শোন সেজ্জিদি বেশি চালাকি করিস না, ইতিমধ্যে কটা খাতা ভরালি দেখবো। এনেছিস তো?'

পারুল উড়িয়ে দেয় সে কথা। তারপর এক সময় হেসে উঠে বলে, 'প্রেমের কবিতা বড় ভাষনক বস্তুয়ে, ও লোকবিশেষকে জলবিছাটি দেয়। প্রেম ব্যতীত প্রেমের কবিতা এ তার বিশ্বাসের বাইরে।'

'হু! বকুল আস্তে বলে, 'তার সানে— উচ্চাশঙ্কা জিনিসটা শব্দ একটা শার্ট-কোটের মত। গাষের ওপরে চাড়িয়ে বাহার দেবার?'

পারুল একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'কি জানি, সবটাই তাই, না কোথাও কোথাও

সেটা অস্থিমজ্জায় গিয়ে মিশে চিক্কে উঠে তোলে।'

'এই সত্যি, সেজ্জামাইবাবু প্রেমের কবিতা দেখলে চটে?'

'চটে, উ'হু না তো—' পারুল হেসেই বলে, 'চটে না। শব্দ বলে 'গুপ্ত প্রেম' না থাকলে এত গভীর প্রেমের কবিতা আস-তেই পারে না। পাতায় পাতায় এই যে "তুমি" আর "তোমার" জনো হাহাকার, তার লক্ষ্যস্থল যে হতভাগা আমি নয় সে তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে, তা' এই প্রেমটি যখন আইবুড়া বেলা-থেকেই আছে, তখন আর এ হতভাগার গলায় মালা দেওয়া কেন?'

'চমৎকার! কবিরা সব প্রেমে পড়ে পড়ে তবে—'

'থাক বকুল, ও কথা রাখ। তোর কথা বল। এতদিন এখানে কি হলো-টলো বল।'

'সো তো মহাভারত!'

পারুল হাসে। পারুল তার ভেতরের সমস্ত বিকোভকে নিজের মধ্যে সংহত রেখে স্থির থাকবে, এই বড়ি পারুলের পণ। অভিমানের কাছে সব 'পরম'কে বলি দেবে এই বড়ি ওর জীবনদর্শন।

তাই পারুল সব কিছুকে চাপা দিয়ে বলে, 'তবে তো হাতে সুন্দুরি হরতুকী নিয়ে বসতে হয় রে। মহাভারতের কথা অমৃত সমান—কাশীরাম দাস ভনে শ্বনে পুণ্যবান।'

তা' যে যেভাবেই হোক, এই বিয়েটার উপলক্ষে আমোদ আহ্লাদটা করলো শব্দ, নববিবাহিত মান্দ একদিন নিজের পরস্য খরচ করে সবাইকে নতুন একটা জিনিস দেখালো, বাংলা বায়োস্কোপ।

চমন একদিন নতুন বোয়ের ছুতোয় গুদীচর্বণ সবাইকে নেমন্তন্ন করলো। শব্দ সব কিছু আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত থাকলো সুবর্ণ। সুবর্ণকে আবার ঘুঘুঘু করে ধরে ধরেছে।

আর সুবর্ণ কোনো আমোদে বোণ দেয় না তাব স্বভাবগত কুনোমিতে।

তবু সুবর্ণের বেন মনে হয় অসুস্থ মা একা বাড়িতে পড়ে থাকবে এটা অনুমোদন করছে না বলেই সুবর্ণের এতটা কুনোমি। নইলে সেজ্জিদি ছোড়ির সঙ্গে তো আছে হুদ্যতা।



নতুন দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধযুক্ত

উষা

ট্যালকম পাউডার

বেনজালকোনিরাম ক্লোরাইড সহযোগে প্রস্তুত
যা মাটি স্থায়ীভাবে দূর করে

উষার দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধ আপনাকে সারাদিন মিষ্ট, প্রফুল্ল ও সজীব রাখবে। বেনজালকোনিরাম ক্লোরাইড থাকায় ইহা অতি সস্ত্র ঘামাচি দূর করিয়া আপনাকে অব্যবহিক অবস্থা হইতে রক্ষা করে। শিশু ও বয়স্ক সকলের পক্ষে প্রমাণ উপযোগী।

বেঙ্গল

কেমিক্যাল

কলিকাতা
বোম্বাই - কানপুর



আমাদের বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চ—আর এদেশের রঙ্গমঞ্চ বলতে প্রধানত বাংলার রঙ্গমঞ্চকেই বোঝায়—ইউরোপীয় পিকচার ফ্রেম স্টেজের অনুরূপেই গড়ে উঠেছে। ম্যাট্যাচার্শ শিশিরকুমার শেষ বয়সে দৃষ্টি করে বলেছিলেন যে আমাদের চিহ্নিত ছিল ইংরাজদের অনুরূপ না করে যাত্রাকে আধুনিক রূপে গড়ে তোলা। যাই হোক, যা হয় নি তা নিয়ে এখন আর খেদ করে লাভ নেই। মোট কথা আমরা মোটামুটি গিরিশ-অর্ধেন্দ্রের যুগ থেকে আজও অবধি ইউরোপীয় স্টেজের বিবর্তনের দিকটাই আদর্শরূপে সামনে রেখে আমাদের জাতীয় স্টেজকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে চলেছি।

ইউরোপের প্রথম প্রডিউসার বলতে গর্ডন ক্রেগকেই বোঝায়। তাঁর আগে মোটামুটি এ দায়িত্ব বহন করতেন এ্যাক্টর ম্যানেজারেরা। কিন্তু সে দায়িত্ব বোঝবার ক্ষমতা বা সামর্থ্য এসব এ্যাক্টর ম্যানেজারদের বিশেষ ছিল না। এঁরা বিশেষভাবে নজর দিতেন কিভাবে অন্য সবারিকছুকে দাবিয়ে রেখে নিজেদের তুলে ধরা যায় অভিনয়ের মাধ্যমে। নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ করে ruling idea of the play-টাই যে দর্শকদের কাছে পরিষ্কার করে তোলা দরকার সে বোধ এঁদের ছিল না।

গর্ডন ক্রেগই প্রথম নাট্যন-রাগীদের হুকিয়েছেন যে—আট আট দি থিয়েটার হলতে অভিনয়, নাটক, দৃশ্যাদি বা নভ্যক পৃথকভাবে বোঝায় না—but it consists of all the elements of which these things are composed. স্মিত এইসব উপাদানের ভেতর একটা হারমনি সৃষ্টি করার দরকার—সেটাই হোল প্রডিউসারের কাজ। এইজন্যই বলা হয়—The Producer is analogous to the orchestral conductor : রিহার্সালের ভেতর দিয়েই প্রডিউসারকে সব কিছু করে নিতে হয়—অভিনেতাদের মডেলিংস, মধ্যে কে কিভাবে পজিসন নিয়ে কি ধরনের গ্রুপিং হবে, কি চম্বে এবং কি ভিজুয়ে সংলাপ বলবে, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসজ্জা, শব্দ-নিয়ন্ত্রণাদি কিভাবে হবে এসব বিষয়ে সব রকমের নির্দেশ এবং পরি-কল্পনা সবই করতে হবে নাট্য-প্রযোজককে।

ইংলণ্ডে বলা হয় Producer must be something of a Poop Bah of the theatre—অর্থাৎ Holder of many offices at once. অভিনয় সম্প্রদায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। সঙ্গীত এবং চিত্রকলা সম্প্রদায় ধারণা থাকা উচিত—আর সবার



ওপরে তাঁর ভেতর থাকা চাই নেতৃত্ব করার মত গুণাবলী এবং কল্পনাশক্তি। কিন্তু এইসব গুণাবলীকে আসল কাজের সময় অত্যন্ত সংযতভাবে এবং কৌশল-সহকারে ব্যবহার করতে হবে। প্রডিউসারকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে অভিনেতারা তাঁর Gramophone নন—অর্থাৎ অভিনেতাদের মাধ্যমে তিনি নিজে কখনও এ্যাক্ট করবেন না—He must not impose his rendering of the parts upon them, but must draw from them, almost without their knowing it, the very best that is in them.

প্রডিউসারকে সমস্ত অভিনয় ব্যাপারটাকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে team-acting স্মিনিসটা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে এবং প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁদের অভিনয়ে নিজেদের শক্তির একটা চরম উৎকর্ষ দেখাবার সুযোগ পান। প্রডিউসার যদি অভিনেতাদের bully করতে শুরু করেন বা তিনি নিজে অভিনয় করলে যে পাট যেভাবে করতেন, ঠিক সেইভাবে তাঁর এ্যাক্টরদের অনুরূপ করিয়ে পাট করার চেষ্টা করেন, তবে অভিনয় কোন রকমেই সার্থকতা লাভ করবে না। এক কথায়—He must control—but he must not command.

সত্যিকার প্রডিউসার জানেন যে নাট্য-প্রযোজনায় দৃশ্যসজ্জার আভিলাষ, নানা ধরনের trick-এর অবতারণা করে দর্শকদের তাক লাগানো, বা আলোর বেলা দেখিয়ে সস্তায় কিস্তিমাং করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে করে সত্যিকার কলাসম্মত প্রোডাকশন হয় না। নাটকের বস্তবকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য যতোটা আলোছায়া, দৃশ্যসজ্জা বা sound effect-এর দরকার তার থেকে বেশি কিছু করলেই নাটকের rhythm এবং balance নষ্ট হয়ে যাবে একথা প্রডিউসারের সবসময়েই মনে রাখা কতখানি।

ভাল প্রডিউসারের কি কি গুণ থাকা দরকার ?

১। - বিরাট কল্পনাশক্তি এবং সুক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা।

২। - নাটক সম্প্রদায় সহজাত ধারণা।

৩। - চিত্রসমীক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী।

এইসব গুণ হওয়া দরকার সহজাত। পরিষ্কৃত অবস্থায় হয়তো এগুলো থাকে না—বীজরূপে সুস্থ অবস্থায় থাকে—অনুকূল পরিবেশে তার পরি-স্ফুটন হয়। আরও কয়েকটি গুণের দরকার—চর্চা এবং অনুশীলনের দ্বারা যার কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়—যেমন মানুষ্যের প্রকৃতিকে সহানুভূতিব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করার ক্ষমতা, কৌশল, ধৈর্য, নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং সর্ববিষয়ে একটা ছন্দবোধ। শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে টেকনিক্যাল স্কিল আপনা-আপনিই এসে যায়।

সাধারণত প্রযোজকদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়—যদি বা তাঁকে অভিনয় করতে হয় সেন্সেয়ে অপ্রধান চরিত্রেই তাঁর নামা উচিত। একথা প্রযোজকের সব সময়ই মনে রাখা উচিত যে অভিনেতার কাজ এবং প্রডিউসারের কাজের ভেতর যথেষ্ট তফাৎ আছে। প্রডিউসারকে সব সময়ই নিলিপ্তভাবে তাঁর নিজের কাজের বিচার করতে হবে। তার ওপর আবার যদি অভিনয়ের গুরুদায়িত্ব দেন, তবে দুই কাজের কোনোটাই ঠিক সুস্থভাবে করে ওঠা সম্ভব হবে না। অবশ্য নাট্যমঞ্চে এমন এক-একজন বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে, যাদের স্ফা চলতে পারে এই নিষমের ব্যতিক্রম—যেমন নাট্যাচার্শ শিশিরকুমার, স্ট্যানিস-লাভস্কি, বা জন গিলগুড। কিন্তু এঁরা কেউই তো ঠিক সাধারণের পর্যায়ে পড়েন না—এঁরা হচ্ছেন নিয়তিকৃত নিষম-রহিতের দলে। সাধারণের বেলায়—যিনি ভাল প্রডিউসার হতে চান তাঁর মনে-প্রাণে অনুভব করা উচিত তাঁকে পার-দর্শিতা দেখাতে হবে শুধুমাত্র প্রোডাক-শনের ক্ষেত্রে—অন্য বিভাগে নয়।

He must have a sense of rhythm, and a sense of something akin to music ; he must have a feeling for the meaning and the beauty of words, as well as a sense of composition and of pictorial values—John Fernald.

আজকের দিনের দর্শক দেখতে চান

নাটকের—সুসামঞ্জস্যপূর্ণ—মণ্ডাভিনয়। অভিনয়ের সময় নাটকের ব্যালান্স যাতে সব দিক থেকে বজায় থাকে সেদিকে ভীষণ দৃষ্টি রাখতে হয় প্রযোজকের। অভিনেতাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং মনোবৃত্তি হয় স্ব স্ব চরিত্রের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা—অর্থাৎ তাঁরা ব্যক্তিগত ভূমিকাগুলিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বেশি প্রকট করে তুলতে চান। এইখানেই প্রযোজকের কাজ হল তাঁদের কন্ট্রোল করা—তা না করতে পারলে, বিশেষ বিশেষ অভিনেতার পার্ট হয়তো অন্য সবাইকে ছাপিয়ে উঠবে। কিন্তু নাটকের নাট্যিক রূপটি সঠিকভাবে ফুটে উঠবে না। প্রত্যেক নাটকেরই একটি অন্তর্নিহিত রূপ আছে—নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত সেই রূপটিকেই মণ্ডাভিনয়ের মাধ্যমে পরিষ্কৃত করে তুলতে হবে প্রযোজককে। হং, তুলি, পট এবং আপন কল্পনাশক্তির সাহায্যে সুন্দর শিল্পী যেমন শ্রেষ্ঠ চিত্রের সৃষ্টি করেন, তেমনি ভাল প্রযোজকও নাটক, অভিনেতা, দৃশ্য-সজ্জা, আলোক এবং শব্দ-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে অভিনয়কলাকে একটা পরম পরিপূর্ণতর পথে নিয়ে যান।

স্টেজ ডেকোরেশন সাধারণত দুইভাবে হতে পারে—স্বাভাবিকভাবে অথবা সাস্কেতিক ধরণের। মাঝে মাঝে এই দুই পদ্ধতিকে মিশ্র-আপ করেও ব্যবহার করা হয়।

স্বাভাবিক পদ্ধতিতে একটি ঘরের স্টেজ-সেটিং করতে গেলে, প্রাডিউসার চান বাস্তবজীবনে যেভাবে ঘরটিকে আমরা দেখি ঠিক সেইভাবে মঞ্চে ঘরের দৃশ্যটি সৃষ্টি করতে—এক্ষেত্রে একমাত্র ঘরের চতুর্ভুদেয়ালটিকে বাদ দেওয়া হয়।

এই ধরনের দৃশ্যই আবার সাস্কেতিক প্রথার অন্যরূপ ধারণ করে। কারণ এখানে প্রাডিউসার চান ঘরটির বিশেষত্ব কয়েকটি ইঞ্জিনের ভেতর দিয়ে ফুটিবে তুলতে—

সেই সাহিত্যজগৎজ্যোতি—প্রতিভা ও মনুষ্যের অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাণ্ডনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, গাঙ্গাধর জয়, ভারত-মহিলা, বাগালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-মালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধ-গ্রন্থ, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জগৎজ্যোতি মাত্র ১৫।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

যেমন খাড়াভাবে দুটি কান্ডদণ্ড দাঁড়ি করিয়ে দিয়ে দরজার সাজেশান দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই থর্নটন ওয়াইল্ডার-এর নাটক-গুলির কথা মনে হয়। এ ধরণের নাটকে প্রধানতই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাস্কেতিক দৃশ্যসজ্জার দিকটা।

প্রতীকবাদীরা মনে করেন যে, রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভেতর দিয়েই থিয়েটারের ভবিষ্যৎ ইতিহাস তৈরি হবে। এ যুগের সবথেকে সেরা নাট্যকার এবং প্রযোজক বিশ্বাত বেরটল্ট ব্রেকট অবশ্য উপরোক্ত মতে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে সাস্কেতিক পদ্ধতির ভেতর প্রকট হয়ে ওঠে প্রাডিউসারের শিল্পকৌশল ও শিল্পচাতুর্য জাহির করে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা। একটা চেয়ারকে মোটবগাড়ি হিসাবে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে আর্থিক ও আর্টিস্টিক ইকনমি হয় যথেষ্ট—কিন্তু দর্শক বোচারীদের কল্পনাশক্তির ওপর অত্যন্ত বেশি জুলুম করা হয়। এর থেকে সত্যিকার গাড়ি দেখানোটাই সর্বাধিক দিয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক।

ব্রেকটিয়ান প্রাডিউসার ঘরের দৃশ্য দেখাতে গিয়ে ফটোগ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশনও করেন না, বা অশুভ সব সপ্লেটের সাহায্যও নেন না। বাস্তব দৃশ্যের কয়েকটি খুব বাছাই করা জিনিসের সাহায্যেই তিনি মঞ্চে দৃশ্য সৃষ্টি করেন। ঘরের সমস্তটা না দেখিয়ে হয়তো একটা দিকের দেওয়াল, দরজা এবং কিছু আসবাবপত্র সাজিয়ে দিলেন — অতি-বাস্তবতাকেও পরিহার করা হল—আবার সাস্কেতিক কৌশলকেও প্রকট করে তোলা হল না।

বাস্তববাদী ইলিউশনিস্টিক প্রাডিউসার, মণ্ডাভিনেতা এবং দর্শকের মধ্যে সব ব্যবধান দূর করার দিয়ে তাদের এক করে দিতে চান। ইলিউশন সৃষ্টির ফলে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং দর্শক নিজেকে নাটকের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে আইডেনটিফাই করে ফেলে—নাটকের সাসপেন্সের প্রভাবে দর্শক নিস্তব্ধ সন্তোকে হারিয়ে ফেলে। বেষ্টের এপিক থিয়েটার চায় এর ঠিক উল্টো দিকটা—অর্থাৎ দর্শক থাকবে নিজের মধ্যে—মঞ্চে থেকে দূরে—মণ্ড-চবিত্রের সঙ্গে নিজেকে আইডেনটিফাই করবে না—কাহিনীর ভেতর নিজেকে আত্মহারার মত মগ্ন করে ফেলবে না। একেই বলা হয় ব্রেকটের থিওরি অব এলিয়েমেনশন—স্ট্যানিস-লাভস্কির সিস্টেমের সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি।

জন বয়েটন প্রিন্স্টলে বলেছেন :

“আজকের দিনের প্রযোজকের প্রধান উদ্দেশ্য হল এমন একটা কিছু সৃষ্টি — যাকে এক কথায় বলা যায় “নাট্যিক

অভিজ্ঞতা”। নাট্যিক অভিজ্ঞতার একটি সহজ এবং স্বল্প উদাহরণ দিচ্ছি : ধরুন কোকটোউনে থিয়েটার রয়লে বসে আমরা সবাই একটি পুরানো আমাদের ড্রামা দেখছি। নায়িকা হচ্ছেন একজন সুন্দরী, নিম্পাপ যুবতী—তাকে হাত-পা বেঁধে রেল লাইনের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। আমরা আমাদের সিটে বসে দূর থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন আসবার শব্দ পাচ্ছি। আমরা ভাবছি ট্রেনটা ঠিক সময়ে যেমে পড়বে তো? মেয়েটি বেঁচে যাবে তো? এই সময়ে আমরা কি করি? বিশেষ কিছু করি না, হয়তো নিশ্বাস বন্ধ করে সিটের ওপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসি। সামনের দিকে ছুটে গিয়ে স্টেজে উঠে ট্রেন থামাবার চেষ্টা করবো, বা মেয়েটির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেব এসব চিন্তা আমার মাথায় আসে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বেশ ভাল-ভাবেই জানি আসল কোনো লোকোমোটিভ থিয়েটার রয়লের স্টেজেব ওপর এসে ঝাঁপবে পড়বে না, স্টেজের ওপরকার রেলের লাইনগুলোও সত্যিকার রেললাইন নব এবং যে মহিলাকে রেলের চাপা পড়ার জন্য বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে অর্থাৎ সফরকারী থিয়েটার পার্টের গ্র্যাটর-ম্যানেজারের স্ত্রী, তিনিও এখন যুবতী, সুন্দরী বা নিম্পাপ রমণী নন—এবং সত্যি কথা বলতে গেলে এসব রোলে অভিনয় করার বয়সও তাঁর অনেকদিন চলে গেছে। ভেতরে ভেতরে একথাও আমরা বুঝি ঐ মহিলা এখন মধ্যবয়সী, কাঠের টুকরো কেটে তৈরি করা রেল লাইনের ওপর তিনি পড়ে আছেন এবং উইংসের ওপাশে সহকারী স্টেজ-ম্যানেজার বাস্তব রয়েছেন ট্রেন একেই সৃষ্টি করার জন্য। এইসব কারণেই আমরা নায়িকার জীবন বাঁচানোর জন্য স্টেজের ওপর ছুটে বাই না। কিন্তু এ তো গেল একটা দিক। তাহলে রুশ্বনিবাসে বসে বসে উৎসুকভাবে ঐ দৃশ্য দেখি কেন—তার থেকে তো অন্য কাজ করতে পারি। এবং নায়িকা যখন ভীষণতম মর্হর্তে উন্মাদ-প্রাপ্ত হন তখন হাততালি দিয়ে উঠি কেন? এর কারণ হচ্ছে থিয়েটারের ভেতর যখন আমরা থাকি তখন আমাদের মনটা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে স্কিজোফ্রেনিক (split-mind) হয়ে পড়ি। আমাদের মনের এক অংশ বাস্তবভাবে শীতের রাতে স্টেজের রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকে, অপরাংশ কোকটোউনের থিয়েটার রয়লের স্টলে আবামে চেয়ারে বসে অভিনয় দেখাটা উপভোগ করে।



লোকরঞ্জন শাখার পুনর্গঠন হোক

দক্ষিণবঙ্গ কংগ্রেসী রাহুলদত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে জনমনে প্রবল আশার সঞ্চার হয়েছে। গত ১ই মার্চ বিধানসভা ভবনে এবং চতুঃপার্শ্বে জনতার যে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গিয়েছিল—তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চারদিক থেকে জনজীবনকে মনোনিবেশিত ও আমলাভ্রষ্ট খেঁচাবে বেঁটন করে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল জনতা আজ নেই অবস্থা থেকে মৃত্তির আনন্দেই এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। জনতা আশা করছে সম্মিলিত বলের এই মনিসভা আর কিছ্ করতে পারুক বা না পারুক, অন্তত মনোনিবেশিত, জাল-ফিতা ও অপমার্গ আমলাদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করবে। গত সপ্তাহে আমরা চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপ্ত করেছিলাম। যে প্রস্তাব কার্যকরী করলে বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্প পুনরুজ্জীবিত হবে, বহু বাঙালী টাকা খাটাবার সুযোগ পাবে, বহু টেকনিসিয়ান ও শিল্পীর আয়ের পথ সুগম হবে, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। অর্থাৎ বাংলা ছবি প্রতি প্রেক্ষাগৃহে অন্তত তিন মাসকাল প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার কথা আমরা বলেছিলাম।

এ সপ্তাহে আমরা সরকারের লোকরঞ্জন শাখা সম্পর্কে মনিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সরকারী অর্থে ও সরকারী দায়িত্বে এই লোকরঞ্জন শাখা পরিচালিত হয়। এই লোকরঞ্জন শাখার শিল্পী ও টেকনিসিয়ান হিসাবে যারা নিযুক্ত আছেন তাঁদের সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য নয়। আমরা জানি অভিনয়ে, সংগীতে ও নৃত্যে তাঁরা খুবই যোগ্য। প্রশ্ন হচ্ছে এই সংস্থার পরিচালনা ও প্রযোজনার বিষয়ে। এই সংস্থায় কিভাবে অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উচ্চপদে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে এবং কি ধরনের নাটক ইত্যাদি প্রযোজনা হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করার প্রয়োজন আছে। এই তদন্তে অনেক মনোনিবেশিত প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা আছে। এতদিন কংগ্রেস সরকারের দ্বারা তাঁদের দায়িত্ব, মনুষ্যদের আশে-পাশে যারা মোসাহেবি করত—তাদের কেউ কেউ এখানে অনুগ্রহ লাভ করেছে। তার একটি দৃষ্টান্ত কংগ্রেসী মনিসভা কর্তৃক বাড়িলা হবার মূহুর্তে তাড়াহুড়া করে এমন এক ব্যক্তিকে এখানে মোটা বেতনে নিয়োগ করা হয়েছে যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেস সংস্কৃতি সংঘ নামক এক দলীয় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ এক ধরনের দলীয় ও ইতিহাস বিকৃত প্রচারে রত ছিলেন এবং তাঁবেদারীতে ওস্তাদ ছিলেন। এ ছাড়া শিল্পগৃহের দিক থেকে এই ব্যক্তির কোন গুণাবলী বা যোগ্যতা কারো জানা নেই।

আজ কংগ্রেসী দলীয় শাসনের অবনান হয়েছে। পূর্বে যে দৃষ্টান্তগণী নিয়ে লোকরঞ্জন শাখা পরিচালিত হত আজ তা হতে পারে না। আজকের লোকরঞ্জন শাখাকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত রেখে কাজ চালাতে হবে। তবেই জনগণের জীবনে লোকরঞ্জন শাখা বিশ্বাস লাভ করবে এবং প্রকৃত আনন্দ ও প্রেরণা জাগাতে পারবে। কিন্তু যারা এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার বাহক ছিল, যাদের একমাত্র যোগ্যতা ছিল জনবিরোধী মন্যী বা নেতার তাঁবেদারী করা—তারা কি করে সত্যতার দ্বারা তাদের চিন্তার পরিবর্তন করতে পারে? প্রকৃত লোক মনোরঞ্জন করা তাদের কাজ নয়। বরঞ্চ এমন সম্ভাবনা আছে যে, লোকরঞ্জন শাখার মধ্যে থেকে গোপনে তারা তাদের পুরান মনিসভার পক্ষে নাবোড়াজ চালাবে। উল্লেখযোগ্য যে লোকরঞ্জন শাখা সরকারী নীতির অংশত এর মধ্যে প্রতিফলিত ও প্ররোচিত হয়। শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে আশ্রয়ের সম্পর্ক গভীর। এতদিন দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের দেবা করেছে আজ তারা জনগণের আদর্শ বা প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে কার্যকরী করতে পারে না। সুতরাং পরিচালনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের তাঁবেদার লোকগুলির কর্তৃত্ব থেকে লোকরঞ্জন শাখাকে মুক্ত করা দরকার। —লজ্জন।



নির্মলী বানিয়ার 'ছবি' ছবির নায়িকা

চিত্রআলোচনা

এ প্যাচ অব ব্লু

মোটো সিনেমায় গত সপ্তাহে 'এ প্যাচ অব ব্লু' নামে একটি উপভোগ্য ছবি মুক্তি লাভ করেছিল। বিদেশী ছবির সমূহে সচরাচর যে ধরনের ছবি মুক্তিলাভ করে এই ছবিটি তার মধ্যে ব্যতিক্রম। ছবিটির কাহিনী মানবিকতার পরিপূর্ণ, সুস্থ মানসিকতার বলিষ্ঠ আঙ্গিক রসোত্তীর্ণ। ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে এক অল্প বালিকাকে নিয়ে। মা এবং দাদুর সঙ্গে সে বাস করে। দৃষ্টিতেই তার সুখ ও আনন্দের প্রতি নিরাসক্ত; মা এককটি ওপরে—তার ওপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। অথচ তাকে ছাড়া ওদের সংসার চলে না। সারাদিনে তার একমাত্র আনন্দের মূহুর্ত পাকের এক গাছের তলায় বাস সে মালা গাঁধে, সে মালা নিয়ে বায় এক ব্যবসায়ী। এই সামান্য আয়টাও সংসারের প্রয়োজনে আসে।

পাকের বসতে বসতে একদিন তার পরিচয় হল গর্ভবতীর সঙ্গে। সে নিরো, সহৃদয়। অল্প বালিকাকে সাহায্য করতে তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে যেন একটা বড় কাজ পেল। জগৎ যদিও



মেয়ে 'এ প্যাচ অব ব্লু' ছবিতে এলিজাবেথ হার্টম্যান ও সিডনী পয়টার

সেলিনার কাছে অশ্রুকার, কিন্তু তার মনে
কি আছে কোটোনো মায় না? গর্ডন তার
প্যাকেট মুহূর্তে আনলে শুধু ভোলে।
মজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, পঞ্চচলার
এক অংশ সেলিনাপে নতুন জীবনের

আশ্বাদ দেয়। রুমে সেলিনার মনে
প্রেমের জন্ম হয়েছে; গর্ডনও তাকে
ভালবাসে—তবে তার ভালবাসা স্বতন্ত্র।
নিষ্কাম, মমতা ও মানবতার ভালবাসা।
দু-জনার ঘনিষ্ঠতা একদিন তার মায়ের

নজরে পড়ল। সে সেলিনাকে গর্ডনের
অন্তরঙ্গতা থেকে ছিনিয়ে আনতে
চাইল। ওকে কালো চামড়া বলে প্যাকেট
লোকজনের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে
চাইল। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না।
গর্ডনের সঙ্গে সেলিনা চলে গেল তার
বাড়িতে, সে সেলিনাকে এক আবাসিক
স্কুলে ভর্তি করে দিল। যাবার মুহূর্তে
সেলিনা ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমাকে
আমি ভালবাসি, তুমি কি আমাকে ভালবাস
না? উত্তরে গর্ডন বলেছিল—সেও ভাল-
বাসে, তবে সব ভালবাসার একরকম মানে
হয় না।

গর্ডনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন
একাডেমি পুরস্কার বিজেতা সিডনী
পয়টার। তাঁর অভিনয় চমৎকার। সেলিনার
মায়ের ভূমিকায় এক বিরক্তিকর চরিত্রে
অভিনয় করেছেন অস্কার পুরস্কার
বিজয়িনী সেলী উইনটার। সেলিনার
ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবাগতা
এলিজাবেথ হার্টম্যান। সুন্দর অভিনয়ে
এলিজাবেথ দর্শকদের সহানুভূতি লাভ
করেছেন।

ছবিটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে
এলিজাবেথ কাটার উপন্যাস 'বি রেডি
উইথ বেলস এন্ড ড্রামস' অবলম্বনে।
ছবিটির পরিচালক লাই গ্রীন। নাটকীয়
স্বল্পে রসোত্তীর্ণ, মানবিক পূর্ণতায় ভরা
ছবি হিসাবে 'এ প্যাচ অব ব্লু' দর্শনীয়।



পরিচালক ছবির একটি দৃশ্যে ডব্লু.কুমার ও সুনন্দা চৌধুরী

নাটকের কথা

রাজা

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা সন্ধ্যানীড়ের উদ্যোগে গত ৫ই মার্চ শ্রীশঙ্করজনে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক অভিনীত হয়েছে। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন শ্রীঅশোক সেন ও শ্রীমতী বিনতা রায়। পরিচালকস্বরূপ মূর্তা নাটকটিকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করেছেন। এই সংক্ষিপ্তকরণে সুরঙ্গমা চরিত্রটি ঠিক বিকাশ ঘটেতে পারে নি। সুরঙ্গমার গানের অংশও নাটকে বাদ গেছে। 'রাজা' রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের তুলনায় অত্যন্ত আয়াসসাধ্য নাটক। যার দার্শনিক তত্ত্ব ও চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি প্রকাশ করা একান্ত-ভাবেই সার্থক শিল্পীর কাজ। সন্ধ্যানীড় এমাবৎ বিভিন্ন রসের নাটক অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে চাঁদের 'রাজা' নাটক অভিনয় এই সংস্থার আর একটি অভিনন্দনীয় প্রয়াস। এবং এই প্রয়াসে তারা সার্থকতার দাবি করতে পারেন। অভিনয়ে সর্বাধিক সার্থকতা প্রদর্শন করেছেন সূদর্শনার ভূমিকায় শ্রীমতী বিনতা রায়। অভিনয়ে ও সঙ্গীতে তিনি সূদর্শনার জিজ্ঞাসাও অন্তরের আকৃতিকে প্রকাশ করেছেন। তার পরে ঠাকুরদার চরিত্রে প্রভাতভূষণ গানে গানে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। রাজার (অশোক সেন) কণ্ঠ প্রথমে যান্ত্রিক প্রাতিতে কিছুটা জড়ানো মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমতী দীপ্তি চক্রবর্তী (সুরঙ্গমা), শ্রীমতী প্রণতা নন্দী (রোহিণী), দিলীপ দে (কাণ্ডরাজ), অশ্রু-মুকুল সেনগুপ্ত (রাজবেশী), পরিমল রায়, শঙ্কর চক্রবর্তী, দেবু চট্টোপাধ্যায়, নন্দ মুখোপাধ্যায়, অমিয় মৈত্র, অরুণ চ্যাটার্জী প্রমুখ। নাটকে মঞ্চে ও নেপথ্য-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন বিনতা রায়, চন্দনা রায়, প্রভাতভূষণ, নর্যনিকা দাশগুপ্ত।

জার্মান স্টেট অপেরায় রেকর্ড উৎসব জার্মান স্টেট অপেরায় ১৯৬৬-৬৭ বছরটি শুরুর হয়েছে দু'জন সমসাময়িক রচয়িতার দুটি অপেরা মঞ্চস্থ করে।

অক্টোবরে বিখ্যাত বার্লিন উৎসব হয়ে থাকে। জার্মান স্টেট অপেরায় মঞ্চস্থ হয়েছিল হানেল-এর নতুন অপেরা 'এসখার'। হাংসী বন্দী-শিবিরে দুটি তরুণ-তরুণীর



'অতিশয় চমক' ছবিতে মজা দে ও প্রদীপকুমার

প্রেম ও তার অস্বাভাবিক পরিণতি এই অপেরার উপজীব্য।

তারপরে নভেম্বরে মঞ্চস্থ হয়েছিল সম্পূর্ণ একটি অন্য ধরনের সঙ্গীতপ্রধান অপেরা: পাউল ডেসাই-এর 'পুনটিলা'। অপেরাটি রেকর্ডের সুপরিচিত নাটক হের পুনটিলা আন্ড হিজ ম্যান মাটি অবলম্বনে রচিত। সমসাময়িক কালের সঙ্গীত নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই অপেরার বিশিষ্ট স্থান। আনন্দের সুরে বাঁধা এই অপেরা দেখে মনে হয় জগতের পরিবর্তন সাধনের কাজটি চিন্তাকর্ষক হতে পারে।

সঙ্গীত-নাট্যটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় জার্মান স্টেট অপেরায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটি একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। সঙ্গীত

রচয়িতা ডেসাই-এর এটি দ্বিতীয় রচনা। এদিক থেকেও ঘটনাটির গুরুত্ব আছে। ডেসাই-এর প্রথম রচনার নাম ছিল লুকু লাসের বিচার।

'পুনটিলা' অপেরার মূল চরিত্রে রয়েছেন একজন ধনী ব্যক্তি, হের পুনটিলা। তাকে বান্ধব বলে চেনা যায় একমাত্র বন্ধু তিনি মস্ত অবস্থায় থাকেন। মস্ততা কেটে গেলেই জমিদারসুলভ শ্রেণী-চেতনার আড়ালে আত্মগোপন করেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আছে তার ভৃত্যরা, বিশেষ করে তার মোটর গাড়ির চালক মাটি। নাটকে দেখা যায় অনেক ঘটনার পরে মাটি তার প্রভুকে ত্যাগ করে চলে বাচ্ছে। অনুষ্ঠানটি বিপুল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

তারপরে জার্মান স্টেট অপেরায়

প্রযোজনায় 'ব্রেজট' ও সংগীত নাট্য' এই শব্দাংশে পর পর অল্পের নটি নাটক মণ্ডল হয়। জার্মান স্টেট অপেরার মণ্ডলবল ব্রেজটীয় নাটকের ভাষার থেকেই এই নাটকগুলি সংগৃহীত। যেমন: মাহাগোনি নগরের উত্থান ও পতন, লুকুলাসের বিচার, পোট বর্জোয়াদের সাতটি মারাত্মক পাপ, ইত্যাদি।

১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রেজটের ৭০তম জন্ম দিবস উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে, এবারকার উৎসবকে বলা চলে তারই প্রস্তুতি। সে সময়ে কী কী নাটক মণ্ডল হতে পারে তার খানিকটা আভাস এবারে পাওয়া গেল।

বঙ্গবন্ধু

মানবদূর বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র উৎসব
মানবদূর বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসাই-
টির উদ্যোগে গত ১লা মার্চ হতে ৯ই মার্চ
এক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব
করেছেন উপচার্য অধ্যাপক এইচ. সি. গুহ।
উৎসব উপলক্ষে গত ৫ই মার্চ এক বিশেষ

সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল।
আলোচনার বিষয় ছিল 'আধুনিক চলচ্চিত্র
রূপ'। এই আলোচনার আহুত হয়েছিলেন
অধ্যাপক গুরুদাস ভট্টাচার্য, চিত্র-সমালোচক
কল্পতরু সেনগুপ্ত, শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী,
অধ্যাপক আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মেট্রো
সিনেমার ম্যানেজার হাফেজজী এবং
অধ্যাপক নরেশ গুহ। বক্তাগণ বিভিন্ন
দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক ছবির আঙ্গিক
ও বক্তব্য আলোচনা করেন।

৬ই মার্চ ওয়ার্ল্ড ডিজনের স্মরণে
ডিজনে দিবসরূপে উদ্‌যাপন করা হয়।
এই ডিজনের চারটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।
এই ছবিগুলি ছিল—'বিশ্বাইন্ড দি সানস',
'ফোর আর্টিস্ট গেইট ওরান হি', 'মারস'
'ও বিশ্ব'। 'ইয়েলো স্টোন কাবল'। এই
ছবিগুলি প্রথম প্রদর্শিত হল। এই দিনে
কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী উৎসবে
উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবে যে পূর্ণাঙ্গ ছবিগুলি প্রদর্শিত
হয়েছে তার মধ্যে ছিল: দি রাজ, কোমল
প্রাথমিক, লালাবাই, ভার্টিগো, টু হেল এন্ড
বাক, টু নাইট এ সিটি ডাইজ, ইফ এ
ম্যান এনসারস ইত্যাদি।

পর্তোদী-শর্মিলার বাগদান অনুষ্ঠান
পর্তোদীর নবাবের সঙ্গে শর্মিলা
ঠাকুরের বাগদান অনুষ্ঠান গত ১লা মার্চ
নয়াদিল্লীতে সম্পন্ন হয়েছে। বাগদান
অনুষ্ঠানের পূর্বে শর্মিলাকে ইসলাম ধর্মে

দীক্ষিত হতে হয়েছে এবং তিনি নতুন
নাম গ্রহণ করেছেন আয়েসা সুলতানা।

বোম্বাইতে প্রত্যাবর্তনের পর শর্মিলার
সহকর্মীরা তাকে অভিনয়দান জানান।
তিনি এখন 'ইতানিং ইন প্যারিস' ও 'মিলন
কি রাত' দুটি ছবিতে অভিনয় করছেন।
১৯৬৮ সালের জুন মাসে দিল্লীতে অথবা
কলকাতায় তাঁদের বিয়ে হবে।

গীতালি রায়ের বিয়ে

গীতালি রায়ের সঙ্গে সম্প্রতি পরিচালক
সলিল দত্তের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর
গীতালি নাকি আর চলচ্চিত্র অভিনয়ে
ইচ্ছুক নন, তিনি সংসারে নিজেকে আবশ্য
বোধে গান।

সুটি ও খবর

চৌরঙ্গী

পশ্চিম ফিল্মসের দ্বিতীয় প্রয়াস
'চৌরঙ্গী'-র চিত্রগ্রহণ সূর্য হুছে আগামী
১৪ই মার্চ গ্রাণ্ড হোটেলে। শঙ্কর লিখিত
ওই নামের বহুপৃষ্ঠিত উপন্যাসটি এ ছবির
ভিত্তি। ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্র-
গামী গোষ্ঠী। ছবিতে অংশগ্রহণ করছেন—
মাধবী, উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া, দীপ্তি রায়
ও চারপ্রকাশ ঘোষ।

রক্তরেখা

পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র স্বরচিত
কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে 'রক্তরেখা'-র
চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন।
বোম্বাইয়ের বিজয়া চৌধুরী ও শ্রুভেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে দার্জিলিং-এ ছবির
বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে। 'রক্তরেখা'-র
অভিনয়ে অছেন—ললিতা চট্টোপাধ্যায়,
কালী ব্যানার্জী, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ
মুখোপাধ্যায়, সবিতারত দত্ত। নচিকেতা
ঘোষ এ ছবির সংগীত পরিচালক।

মুকাদিনেতা শ্রীঅরুণাত মজুমদার

মুকাদিনেতা অরুণাত মজুমদার
সম্প্রতি বিহারের বিদেশী সংস্কৃতি সংস্থার
আমন্ত্রণে মায়হলার সঙ্গে কয়েকটি অনু-
ষ্ঠান করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন।
বিহারের সুখী দর্শকবৃন্দ তাঁর ফিচার-
গুলির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। বিশেষ করে
তাঁর ফিচারগুলির ভেতর "রোগাক্রান্ত স্ত্রী
ও অসহায় স্বামী"-র কারণে চিত্র মুকাদি-
নায় জগতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা
বলে স্বীকৃত হয়েছে।

শ্রীমজুমদার এবার অনুষ্ঠান করতে
চলছেন কাম্বী পাঞ্জাব, দিল্লী ও দেহা-
দলে।



'প্রান্তর স্বাক্ষর' ছবিতে গীতালি রায় ও জানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম কালী-
ঘাটের এঁদো গলিতে সেই বাড়ির
সামনে। বাড়িটা বোধহয় লড' ক্রাইভের
আমলের। চুন-সুরাকির গাথনির ওপর
হাড় জিরাজিরে ইঁইগুলো মূখ বার করে
ভেঁচি কাটছে। শীত শেষের ফাণ্ডানী
হাওয়া ঐ ভাঙা ইঁটগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
ঘুরপাক খেয়ে হোলি খেলাছিলো রাঙা
ধুলোয়। তাই বাড়িটার সামনে দাঁড়াতে
না দাঁড়াতে আমার চোখ জ্বালা করে
উঠলো, আর সোঁদা সোঁদা গণ্ডে ভারি
হয়ে উঠলো নাক।

পকেট হাতড়িয়ে সাততাত্তাতিড়
বের করলাম ঠিকানা লেখা কাগজটা।
যদিও তার দরকার ছিলো না। কারণ
ঠিকানা লিখে দিয়ে দুলাল বলেছিলো যে
দরজার ওপর খড়ি দিয়ে লেখা বাড়ির
নম্বর আর দরজার সামনে দূ-চারটে গাড়ি
দেখলেই বুঝতে হবে ঠিক জায়গাতেই
এসে পৌঁছোছি। ভদ্র ঠিক সাহস হলো
না। তাই নম্বরটা মিলিয়ে নিলাম।

আর যে মূহুর্তে বুঝলাম যে আমি
এসে গেছি, অমনি অস্বস্তিতে ভরে
উঠলো মন। কেমন যেন একটা ভর ভর
ভাব। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে
'নারভাস' হয়ে যাচ্ছি। তাই মনে মনে
দি সাউন্ড অফ মিউজিকের সেই গানটা
আউটে নিলাম, 'আই হ্যাভ কনফিডেন্স
ইন মি.....'

শেষ পর্যন্ত ভেজানো দরজাটা খুলে
চুকে পড়লাম ভেতরে। আর সংগে সংগে
জনা বারো নারী-পুরুষের দৃষ্টি এসে
পড়লো আমার ওপর। কারো কারো
চোখে আবার বিরক্তির আভাস। ভাবখানা
এই—এ আবার কে এসে জুটলো, আগে-
ভাগে কাজ গুছাবে না তো?

বসতে বলার কেউ নেই দেখে আমি
সেই মাথাটা আমলের ছেঁড়া মাদুরটার
এক কোণে বসে পড়লাম। ঘরটা মাঝারি
গোছের। আনবাবপত্রের বালাই নেই।
ছেঁড়া মাদুরটা ছাড়া পাতা আছে একটা
সতরঞ্চি। গাড়িগুলোর মালিকদের
অধিষ্ঠান ঐ সতরঞ্চিটারই ওপর। প্রাস্টার-
খসা দেওয়ালে চুন পড়ে নি কম করেও
বছর দশেক হবে। সেই দেওয়ালের
মাঝখানে ঝুলছে কালীঠাকুরের ছবি
সম্মিলিত বছর চারেক আগের একটা
ক্যালেন্ডার। দেওয়াল বরাবর বাঁ-
দিকে একটা ভেজানো দরজা। দরজার
ওপাশ থেকে দূ-চারটে কথা ভেসে
আসছে! কান পেতে শুনলে বোঝা
যাবে যে সে সব ঐ রাশি-নক্ষত্রের হিসেব
সংক্রান্ত!

মিনিট দশেক পার হয়ে গেছে।
ঘরের মধ্যের পরিবেশ বড়ই অস্বস্তিকর।
কেউই কথা বলছে না কারো সংগে। কিন্তু
সবার চোখেই বিরক্তির ছোঁয়া। বোধহয়
অনেকক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছে বলে! কে

শনির দশা

জ্ঞানপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জানো হয়তো তাই! না কি আমার এই
অহেতুক প্রবেশ ঠাঠিক বরদাস্ত করতে
পারছেন না! আর তখনই আমার মনে
হলো যে না এলেই ভালো হতো! কি
দরকার ছিলো আমার আগ বাড়িয়ে এখানে
আসার! নিজের ওপরই রাগ হয়
নিজের। উঠে চলে যাবো কি না ভাব-
ছিলাম।

আর তখনই ভেজানো দরজা খুলে
বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক! বসে-
থাকা লোকদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে
গেছে। এবার কার পালা কে জানে।
ভদ্রলোকের পেছনে আর একজন এসে
দাঁড়ালেন দরজার সামনে। চুল-দাড়ি
পেকে গেছে। বরেন্স ঘাটের কাছাকাছি,
গরদের দাঁতির ওপর নামাবলী গায়।
দু'চোখে তাঁর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা! বসে-
থাকা সকলের মূখের ওপর দৃষ্টি ঘুরে
এসে তাঁর চোখ দুটো ধমকে দাঁড়ালো
আমার মূখের ওপর।

বরসটাই যে আমার বড় খারাপ। এই
বরেন্সে ওখানে বোধহয় বিশেষ কেউ আসে
না। বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাস আর সব-
কিছুই ভালোলাগা বোধহয় এই বরেন্সের
ধর্ম! তাই আমাকে দেখে তিনি ঝুঁকুচকে
তাকালেন। আমার ভীষণ অস্বস্তি
হাঁছিলো! মনে হচ্ছে উনি যেন আমার মনের
কথা টেনে বার করতে চাইছেন। ঠাঠিক
দেখাদেখি ঘরসমূহ লোক চেয়ে আছে
আমার দিকে। সকলের চোখেই বিশ্বাস-
অবিশ্বাসের দোলা!

এইবার উনি মূখ খুললেন, "কি চাই
তোমার?"

আপনি নয় প্রথমেই তুমি বলে
সম্বোধন। ভারী গলায় অমন একটা প্রশ্নে
বিভ্রান্ত হয়ে আমি ঢোক গিলে বললাম,
"এই মানে, এসেছিলাম একটা
দরকারে..."

"কি দরকার? হাত দেখাবে?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"কুন্ঠি করাবে?"

এবারেও না বলতে রীতিমত রোলে
গিয়ে বললেন তিনি, "তবে এখানে চাইটা
তোমার কি?"

আমি আবার ঢোক গিললাম, "মানে,
এই একটু ব্যক্তিগত ব্যাপার..."

ঘরসমূহ লোকের দৃষ্টি তখন
আমার ওপরে। তার ওপর আবার উঁকিলে

মতো একটানা জেরা। ধামতে শব্দ কর-
লাম আমি! এমন জ্ঞানলে এখানে কে
আসতো?

আমি আমতা আমতা করে কিছু
বলতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে তাঁর চোখের
তীক্ষ্ণতা কিছুটা কমে এসেছে। আমার
মনে হলো তাঁর দু'চোখে হাসির প্রলেপ।
আমার বরেন্স দেখে বোধহয় কিছু একটা
ভেবে বসেছেন।

যা ভেবেছি ঠিক তাই! আমার
ইশারায় ঘরে ডেকে নিয়ে এসে প্রথমেই
বললেন, "বুঝেছি, প্রেনে পড়েছো জে
জানতে চাও শেষ পর্যন্ত কি হবে?"

কি সর্বনাশ! এমন বিপদেও মানুষ
পড়ে। কিন্তু ঠাঠিক ঐ সবজ্ঞান হাঙ্গির
হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে আমার
'রা' ফোটে না।

আমার চাপ করে থাকতে দেখে উনি
আবার বললেন, "কই, হাতটা দেখি!"

এবার তো কিছু বলতে হবে! তাই
একটু নারভাসভাবে বলে উঠলাম, "আমি
হাত দেখাতে আসি নি!"

চমকে উঠে উনি জিজ্ঞেস করলেন,
"তবে কি করতে এসেছো?"

"আজ্ঞে জানতে এসেছিলাম!" আমি
সহজ হতে চেষ্টা করি।

"কি জানতে চাও বলো!" ভদ্র-
লোকের মূখ আবার সেই নিরাসক্ত গম্ভীর
ভাব ধারণ করলো!

আমি বিনীতভাবে তাঁকে জানালাম
আমার জিজ্ঞাসা! প্রথমে বোমার মতো
ফেটে পড়লেন উনি। তারপর ইঠাৎ কি
ভেবে বললেন, "তা' তোমার এতো মাথা
বাথা কেন?"

"মানে, এই দেশের লোকের তরফ
থেকে আমি এসেছি। আপনার কথা লিখে
সকলকে জানাবো!"

"ও, আচ্ছা!" মনে হলো তাঁর মুখ
ভাবটা কেটে গেলো!

এরপর আমাকে ঐ বিষয়ে নানা প্রশ্ন
করে হিসেব কষতে বসে গেলেন। ও
হিসেবের মাথা-মশু কিছুই আমার মাথার
চোকে না! তাই চোখ ফেরালাম অন্য-
দিকে।

সামনের তুলনার এ ঘরটা কিছুটা
ছোট। পরিষ্কারও বটে। একটা মাঝারি
গোছের তক্তপাশ। তার ওপর রঙিন
চাদর পাড়া। দেওয়াল ঘেঁষে খাটো।

এককোণে একগাদা রং-বেরং-এর কাগজ-পত্র। বাণ্ডিল বাঁধা ঠিকুজি-কুন্টি আরো অনেক কিছু।

জ্যোতিষী মশাই কি সব আঁক যোগ করছিলেন। আমি ভাবছিলাম এই কাকি

হাঙকা একবার দেখিয়ে নিই। ভাবিবাং জানা থাকলে ভুতের ভয়ও থাকবে না। অর্থাৎ ভুত-ভাবিবাং বন্ধন আয়ত্তের মধ্যে তখন কারো পরোয়া করার দরকারও নেই। আমার আর কিছু ভাবার অবকাশ না

নিরে জ্যোতিষী মশাই বলে উঠলেন, "সেয়েছে, এবে দেখছি শনির দশা!"

আমি উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "শনির দশা.....?"

"হু, তোমাদের খেলার জগতে একটা লোককে কেন্দ্র করে চলেছে শনির দশা!" আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন জ্যোতিষী মশাই।

"লোকটা কে বলুন তো?"

"কে তা কি করে বলি, তবে ফুটবল-ক্রিকেটে তাঁর অবস্থান অনেকদিনের, এখন তিনি হকিতেও নাক গলিয়েছেন!"

আমি লাফিয়ে উঠলাম, "চেনা চেনা মনে হচ্ছে!"

"হু! কিন্তু বাবা সাবধান। বড় ধুরন্ধর লোক। তাঁর জন্যে আই, এক, এ-র আশি হাজার টাকা গুণায় গেছে, ইডেনের টিকিট কেলেকারীতেও তাঁর হাত থাকতে পারে। আর পারে এবারে হকির ইঠকানিতায়!"

"চিনেছি, চিনেছি!" আমি কিছু বলার আগেই আমার ঘামিয়ে দিলে জ্যোতিষী মশাই বললেন, "তোমরা কি করবে তার! সে যে খেলাধুলার পলিটিক্‌সে সর্বভারতীয় নেতা! নিজের রাজ্য থেকে সরালেও সে মাথা তুলে তোমাদের বড়ো আঙুল দেখাবে অন্য রাজা থেকে মনোনয়ন পেয়ে। আর তারপর তোমাদের ওপরেই এসে কতৃষ্ ফলাবে!"

"কিন্তু দাদু, খেলাধুলার জগতেও কোন জে, এম, বিম্বাসের আবির্ভাব হবে। দিনবদলের পালা যে এসে গেছে।"

পাওনা-গুণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে কালী-ঘাটের এঁদো গালি থেকে বেরিয়ে এসে বসলাম শ্যামবাজারের পাঁচ-মাথার মোড়ে ন্যাশানাল ইকনমিক রেস্টুরেন্টে আমাদের আন্তার।

কিন্তু জ্যোতিষী মশাই-এর ভবিষ্যাবলী নিয়ে কিছু একটা করার যে বড় দরকার!

কিছু করা না করার ভার বাংলা-দেশের ব্রীডার্সকদের। আমার কাজ আমি করেছি। জ্যোতিষী মশাই-এর ভবিষ্যাবলী জানিয়ে দিলাম সকলকে। তবে দৈনিক বসুমতীর খবরে প্রকাশ যে এই নাটের গুরু, বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনে জনগণের রায়ে তাঁর গুরুত্ব পরাজয় দেখে, না কি গা-ঢাকা দিয়েছেন।

তবে কি খেলার মাঠেও আসছে দিন-বদলের পালা। হালপ করে বলতে পারি যে শনির দশা তাহলে নিশ্চয় কেটে যাবে। তবে ভয় শূন্য যে শনির দশা কাটাতে গিয়ে বহুস্পতির রোষে শেষ পর্যন্ত মরদাম না ফোস ফোস করে ওঠে.....!!

দৃশ্য কাব্য - পরিচয়

সত্যজীবন মৃণোপাখ্যায়

দল : দশ টাকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক-কালের সম্পর্ক ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীর তুলনামূলক বিচারিত। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই গ্রন্থখানি সম্পাদ্যে করেছেন : —

"* * * তথাকথিত জ্যোতিষতাত্ত্বিক জাতীয় অকাল-পক এবং বিচারশক্তিহীন আত্মহারা ও প্রিয়-চামী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন কিছুই অবসানিত বোধ করছিলাম। এতদিন পরে এই বিভ্রম বইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা দৈনিক বসুমতীতে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে * * * স্থিতীয়খানির নাম 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মৃণোপাখ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা নাটক নিয়ে এমনভাবে মস্তিস্কচালনা করবার বলম্ব যে আমাদের দেশে আরেহন, এ তথ্য আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সূদীর্ঘকালের সাধনা ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেন না।

* * * অথচ বাঙালীর স্মৃতি নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন কেউ রচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন এবং দৃশ্যকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্য-জীবনবাবু, অগ্রসর হয়েছেন আধিক্যের।

* * * হারা জ্যোতিষতাত্ত্বিক ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক নন, এই পুস্তকখানি পাঠ্য করলে তারা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্য সম্প্রদায় একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত

খুঁটিয়া খুঁটিয়া আর কোন লেখকই বাঙালীর নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পারেন নি। এইটিই হল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গৌরব।

* * * তাঁর সমালোচনাও পরম উপভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী সূক্ষ্ম দৃষ্টি, নিরপেক্ষতা ও ব্যক্তিগত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি আমাদের আনন্দিত করেছেন। তিনি কেবল গুণই দেখেন নি, দোষও দেখেছেন। কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে আতিরিচ বাক্য ব্যয় করে বক্তব্য-বিষয়কে করে তোলেন নি খোঁচাটে। * * * হারা বাংলা

নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * * যাদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক সুপারিত শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থখানি সম্প্রদায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

"* * * বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্প্রদায় এই ধরণের বই বাংলা ভাষার আর আছে কিনা জানি না, থাকিলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত ইতিহাসিকের দৃষ্টি দিরাই তাহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সংগে সংগে তিনি তাহার সমালোচনা-শক্তির ও পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় নাট্যদর্শ সম্প্রদায় রাখিয়া তিনি এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে কেমন তাহার অসাধারণ পরিচয় ও অধ্যয়ন, তেমন তাহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। অন্য সাহিত্য-পাঠ্যসূত্রও এই বই হইতে কত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। তাহা এই ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী—গান্ধী-পূর্ণ ও প্রাজ্ঞ।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক, নাট্যশালার ইতিহাসলেখক ও নাট্যকীর পরিমলখানাবিদ শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :—

"এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির ইতিহাস সংকলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। * * * সত্যজীবনবাবুর পক্ষে ল্যায়র বিষয় এই যে, তাহারই অন্তর্গত পরিচয়ের কলে অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। * * * 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব বিদূরিত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্য-মোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।"

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৯৯, বিন্দুবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলি-১২



খেলাধুলা

মোহনবাগান এবং পূর্বাঞ্চল দলের খেলায় নাশারুল গোল করছেন :

রোভার্স কাপের আসরে

অবশেষে ইন্সটেব্লেগল ক্লাব বোম্বাই উপনীত হয়েছে, রোভার্স কাপের খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য। কিছুদিন পূর্বে ইন্সটেব্লেগল ক্লাবের পক্ষ থেকে জানান হয় যে, তারা একটি দৃষ্টবলক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রোভার্স কাপের আসরে থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এই সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ফুটবল এসোসিয়েশন। কারণ ঐতিহ্যশালী ইন্সটেব্লেগল ক্লাবের অনুপস্থিতি রোভার্স কাপের আসরের জৌলুশ অনেকাংশে ক্ষয় হয়ে পড়বে। ডবলিউ, আই, এফ, এর সম্পাদক জিরাউন্ডিন সাহেব ইন্সটেব্লেগল ক্লাব কতৃপক্ষের কাছে তাদের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অনুরোধ জানালেন।

ইন্সটেব্লেগল ক্লাবের নাম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হয় হাবিবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। হাবিব বোম্বাইয়ের জর্নিয়ার ফুটবল ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে উধাও হন। এর বোধ হয় দু'দিন পর তাঁকে আই, এফ, এ অফিসে আসতে দেখা যায় কলকাতার একটি নামজাদা ক্লাবের কজন কর্মকর্তার সঙ্গে, উদ্দেশ্য ছাড়াপথে স্বাক্ষর। হাবিবের আবির্ভাবে আই, এফ, এ অফিসের সম্মুখে বড়বৃক্ষ সূর্য হয় এবং মাঝখান থেকে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বোলোয়ড় হাবিবকে ছিনিয়ে নিয়ে প্রস্থান করেন। কেন হাবিবকে বোম্বাইয়ের ট্রেনিং ক্যাম্পে আসার অন্তিমত কতৃপক্ষ দিয়ে-

ছেন। এর প্রতিবাদে রোভার্স কাপ থেকে ইন্সটেব্লেগল নাম প্রত্যাহার করে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক মিঃ জিরাউন্ডিন জানান যে, হাবিবের ট্রেনিং ক্যাম্প পরিত্যাগ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতে পারেন নি এখন। এই ঘটনার জন্য তিনি দৃষ্ট প্রকাশও

শ্রীঅজিত

করেন। ইন্সটেব্লেগল ক্লাব কতৃপক্ষ মিঃ জিরাউন্ডিনের এই বিবৃতির ভিত্তিতে মত পরিবর্তন করে রোভার্স দল প্রেরণ করেছেন।

মোহনবাগান ক্লাব ইতিমধ্যে রোভার্স কাপের আসরে পর পর দু'টি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। প্রথম খেলায় মোহনবাগান বোম্বাইয়ের স্টেট ব্যাঙ্ককে কোনক্রমে ১-০ গোলে পরাজিত করে তৃতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়। গতবারের বিজিত দল মোহনবাগান স্টেট ব্যাঙ্কের বিপক্ষে একেবারেই সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারে নি। মোহনবাগানের দলগত ক্রীড়াধারা অত্যন্ত নিম্নমানের হয়, পুরোভাগে একমাত্র অশোক চ্যাটার্জীর খেলার মধ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল। কয়েকটি সুযোগের অপব্যবহারের পর খেলা শেষ হবার মাত্র পাঁচ মিনিট পূর্বে অশোক চ্যাটার্জীই দলের পক্ষে একমাত্র বিজয়সূচক গোলাটি করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

তৃতীয় রাউন্ডের বাধাও সহজে অতিক্রম করে মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনালে উপনীত হয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডে মোহনবাগান বোম্বাইয়ের প্রথম ডিভিশনের শক্তিশালী দল মাহীন্দ্র এন্ড মাহীন্দ্রকে ২-০ গোলে পরাজিত করে এই খেলার মোহনবাগানের দলগত ক্রীড়াধারার কিছুটা উন্নতি হয়। মাহীন্দ্র এন্ড মাহীন্দ্র পরাজিত হলেও বোলোয়ড়ের সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে খেলার ওপর সম্পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হলেও মোহনবাগানের পক্ষে প্রথমার্ধে কোন গোল করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম গোল করেন দুলাল মন্ডল এবং দ্বিতীয়টি নিজা ঘোষ কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ই, এফ, ই সেল্টান দলের সঙ্গে।

দলবদলের পালা

স্থানীয় খেলোয়াড়দের দলবদলের পালা সমাপ্তির পথে। এই দলবদলের শেষ তারিখ পনেরোই মার্চ। এখনও পর্যন্ত দলবদলের ফলে দুই প্রধান মোহনবাগান এবং ইন্সটেব্লেগলের লাভ এবং লোকসানের পরিমাণ প্রায় সমান সমান। তবে সন্ধানের দুটি দল এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি কঠিন হারিয়েছে, এ দুটি দল হল মহামেডান স্পোর্টিং এবং ইন্সটেব্লেগল। মহামেডান দল তবুও তাদের কঠিন পরিস্থিতিতে সক্ষম হবে কলকাতার

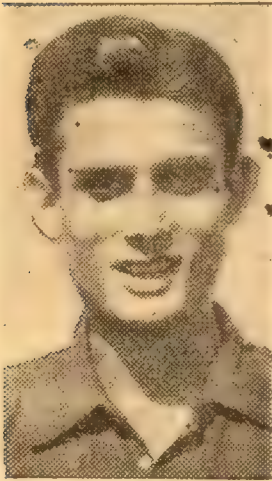
সাধারণ বস্তু

বাইরের খেলোয়াড় সংগ্রহ করে, কিন্তু ইন্টার্ন রেলদলের সে রকম কোন আশা নেই। ইন্টার্ন রেলওয়ে দল খেলোয়াড় তাঁর করে, তাদের আবার তরুণ খেলোয়াড়দের গড়ে নিতে হবে আগামী ফুটবল মরশুমে যুববার জন্যে।

ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক দুর্জয় সমাজপাত এবং তরুণ ফরোয়ার্ড সীতেশ দাশ এবং মহামেডান স্পোর্টিং দলের রক্ষণভাগের সৈয়দ আলতাফ আমেদ ও আবদুল লতিফের আগমনে মোহন-বাগানের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। আলতাফ এবং লতিফ ভারতীয় দলে খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মোহনবাগানের প্রবীণ খেলোয়াড় বিদ্যুৎ মজুমদার মহামেডান স্পোর্টিং দলে খেলার জন্য ছাড়পত্র স্বাক্ষর করেন।

মহামেডান স্পোর্টিং দলের সারমাদ খান এবং এরিসাসের তরুণ খেলোয়াড় শিবরাম সরকার ইস্টবেঙ্গল দলের অনুকূলে ছাড়পত্র স্বাক্ষর করেন। এরিসাসের আর একজন খেলোয়াড় বিনু চ্যাটার্জী ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

ইস্টবেঙ্গল দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড



অশোক চ্যাটার্জী

গুরুদ্বাপাল সিংকে এ বছর মোহনবাগানের পক্ষে খেলতে দেখা যাবে। গত বছর প্রথম গুরুদ্বাপাল সিংকে কলকাতার মাঠে খেলতে দেখা যায়। গুরুদ্বাপালের আগমনে মোহনবাগানের পুরোভাগ লাভবান হল। স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে আর বড়রকমের কোন দল পরিবর্তনের সম্ভাবনা বর্তমানে কম। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাব রোভার্সের

আসরে উপস্থিত হবার ফলে দু-একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের সম্পর্কে দল-বদলের গুজব সভ্য হবার সম্ভাবনা কম।

হকি মার্চের নানান কথা

হকি লীগের চতুর্থ খেলাতে মোহন-বাগান একটি মূল্যবান পয়েন্ট হারাতে বাধ্য হল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুর্লিশের কাছে। লীগের সম্মানের অপূর্ণ দুই দাবিদার ইস্টবেঙ্গল এবং বি, এন, রেল দল কিন্তু তাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। হকি লীগের আসরে মর্যাদার লড়াইয়ে একটি পয়েন্টের মূল্য অনেক, বিশেষত একেবারে সূর্যুতে একটি পয়েন্ট অপচয় করা মানে অনেকটা পেছিয়ে পড়া।

এ বছর কলকাতার বাইরের কোন হকি প্রতিযোগিতায় কলকাতার কোন দল অংশগ্রহণ করবে না। বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্লাবগুলি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যের জন্য। এ বছর হকি লীগের খেলা সূর্যু হয়েছে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে। হকি লীগের খেলা শেষ করার সাথে সাথে শেষ করতে হবে বাইটন কাপের খেলা। এদিকে বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশনের হাতে সময়ও অল্প। বিভিন্ন ক্লাবগুলির বাইরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, বি, এইচ, এ-র পক্ষ থেকে বাংলার বাইরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা কর্মটির কাছে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে।

বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশন তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতি দৃষ্টিদানের এবং তাদের হকি খেলা শিক্ষার এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন। অল ইন্ডিয়া কার্ভিসল অফ স্টোর্টসের সভাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা এবং পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসের অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল চোপারার সম্মানার্থে একটি সম্বর্ধনা সভা এবং দুটি স্কুল দলের মধ্যে একটি প্রদর্শনী হকি খেলার আয়োজন করেন বি, এইচ, এ। বি, এইচ, এ-র সাধারণ সম্পাদক মিঃ এয়ারটন জানান যে আগামী এপ্রিল মাসে বাইটন কাপের সঙ্গে স্কুল-গুলির জন্যও একটি প্রতিযোগিতা সূর্যু করবেন তাঁরা। মেজর জেনারেল চোপরা স্কুলের ছেলেদের শিক্ষাদানের জন্য পাতিয়ালায় ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসের একজন হকি কোচ প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

এখন হকি লীগের বিভিন্ন ফলাফলের সম্মুখে আলোচনা করা যাক। মোহনবাগান এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুর্লিশের অমীমানে খেলাই লীগের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। মোহনবাগানের পুরোভাগের ব্যর্থতা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুর্লিশের রক্ষণভাগের দৃঢ়তা খেলার ফলাফল ঠিকভাবেই নির্ধারিত করেছে। অবশ্য মোহনবাগান দলের দুর্ভাগ্য যে শুধুর একটি গোল স্ট্রিকের অজু-হাতে নাকচ এবং গোল লাইন থেকে একটি নিশ্চিত গোল রক্ষা হয়, এ ছাড়া অজু সূযোগ অপচয়ের কাহিনী।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পুর্লিশের কাছে হেঁচট খাবার পর, পুর্লিশ এ, সি-র বিপক্ষে মোহনবাগান কোনক্রমে ২-০ গোলে জয়ী হয়। মোহনবাগানের পক্ষে গোল দুটি করেন বৃন্ডেল এবং রামবাবু। খেলার ওপর প্রধান্য বিস্তার করলেও পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা ব্যর্থতা প্রদর্শন করায় মোহনবাগানের পক্ষে বেশি গোলের ব্যবধানে জয়ী হওয়া সম্ভব হয় নি। লীগের ষষ্ঠ খেলায় মোহনবাগান পাজাব স্পোর্টসকে পরাজিত করে ২-০ গোলের ব্যবধানে। মোহনবাগান প্রথমার্ধে দুটি গোল করে। প্রথম গোল করেন রামবাবু এবং দ্বিতীয় গোল ডায়াস।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লীগের খেলায় সহ-জেই এগিয়ে চলেছে। এরিসাসকে ইস্টবেঙ্গল পরাজিত করে ২-০ গোলে।



গুরুদ্বাপাল সিং

ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে গোল দুটি করেন ইনামদুর রহমান এবং শুরাজিৎ সিং। রিজার সাইডারের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অন্যায়সে ৪-০ গোলে জয়ী হয়। প্রথমার্ধে প্রথম গোল করেন ইনামদুর এবং মাম্মা এবং দ্বিতীয়ার্ধে শেষ দুটি গোল দেন সুরিন্দার লাল এবং ইনামদুর। বিপক্ষেও ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয় ০-০ গোলের ব্যবধানে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে

প্রথম গোল করেন ইনামদুর, দ্বিতীয় গোল করেন পি ফোব এবং শেষ গোল করেন জর্নাল সিং।

লীগ চ্যাম্পিয়ান বি, এন, রেল দল সাফল্যের সঙ্গেই তাদের লক্ষ্যের প্রতি এগিয়ে চলেছে। বি, এন, রেল দল লীগের পঞ্চম খেলায় জ্যোভেরিয়াসকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। পাঁচটি খেলায় রেল দল মোট ২০টি গোল দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। চতুর্থ খেলায় পাজাব স্পোর্টসকে ৩-০ গোলে পরাজিত করতে তেমন বেগ পেতে হয় নি বি, এন, রেল দলের। বি, এন, রেল দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড গুরুদর্শন সিং একাই তিনটি গোল দিয়ে উপর্যুপরি দু'টি হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। পূর্বের একটি খেলায় বি, এন, রেল দল কোন-ক্রমে ২-০ গোলে পরাজিত করে এন্টালী এসিকে।

জাতীয় হকিতে বাংলা দল ইনামদুর রহমানের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হবেন। ইস্টবেঙ্গল এই খ্যাতিনামা ফরোয়ার্ড ইনামদুর রহমানকে জরুরী প্রয়োজনে ভূপালে যেতে হবে বলে তিনি বাংলা দলের সঙ্গে যেতে পারছেন না। ইস্টবেঙ্গল দলের ওয়াহিদাও ব্যক্তিগত কোন কারণে দলের সঙ্গে যেতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। বাংলা দলে মোহনবাগান দলের মধুসূদা এবং বি. এন, রেলের সৈয়দকে দলভুক্ত করা হয়েছে।



ন.কুমার সমাজপতি

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফরসূচী

ভারতীয় ক্রিকেট দলের আগামী ইংল্যান্ড সফরসূচী রচিত হয়েছে।

ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা একসঙ্গে বোম্বাইয়ে মিলিত হবেন। ২০শে এপ্রিল ভারতীয় দল ইংল্যান্ডে অভিমুখে যাত্রা করবেন। সফরের প্রথম খেলায় ভারতীয় দল মিলিত হবে ইন্ডিয়ান জিমখানা দলের সঙ্গে। ভারতীয় দলের তিন মাসের সফরের মধ্যে আট পাঁচ দিনের তিনটি টেস্ট ম্যাচ। সফরসূচী এমনভাবে রচিত হয়েছে, যার ফলে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা এফ, এ কাপের কাইন্যাল খেলা দেখার সুযোগ অর্জন করবেন।

সফরসূচী :- ২৯শে এপ্রিল— ইন্ডিয়ান জিমখানা; ৩রা, ৪ঠা, ৫ই মে— ওরচেস্টারশায়ার; ৮ই এবং ৯ই মে— শ্ল ক্রিকেট ক্লাব; ১০, ১১ এবং ১২ জুলাই; ১৩, ১৪, ১৫—নর্দাম্পটনশায়ার;



ইনামদুর রহমান



বেনজি বড়দলে

১৭, ১৮, ১৯—ওয়ারউইকশায়ার; ২০ ২২, ২৩—এম, সি সি; ২৪, ২৫, ২৬— গ্ল্যাসারগন; ২৭, ২৯, ৩০—অক্সফোর্ড; ৩১শে মে, ১লা জুন, ২রা জুন—সারে; ৩, ৪, ৫—ল্যাংকশায়ার।

৮, ৯, ১০, ১২ এবং ১৩ই জুন— লীডসে প্রথম টেস্ট ম্যাচ।

১৪, ১৫, ১৬—কেন্সিংজ; ১৭, ১৮, ১৯—হ্যাম্পশায়ার; (২২, ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৭শে জুন—লডসে দ্বিতীয়

টেস্ট ম্যাচ।) ২৮, ২৯, ৩০—ডার্বিশায়ার; জুলাই ১লা, ২, ৩—ইয়র্কশায়ার; ৪, ৫, ৬—নটিংহামশায়ার; ৮, ৯, ১০— লিন্স্টারশায়ার; (১০, ১৪, ১৫, ১৭ এবং ১৮ই জুলাই—এগবাস্টন কৃতিত্ব এবং শেষ টেস্ট ম্যাচ।)

সফরের শেষ খেলায় ভারতীয় দল মিলিত হবে ডাবলীনে আয়ারল্যান্ড একাদশের সঙ্গে ২১ এবং ২২শে জুলাই।

সংগীত-নারক
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস
প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ
প্রতি ভাগ—৫।

হারমোনিয়াম শিক্ষা

মূল্য—৩।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

একটি নতুন পথের সন্ধান

কয়েক বছর পূর্বে ইংল্যান্ডের একজন খ্যাতনামা ক্রীড়া-সাংবাদিক স্বপ্ন দেখেছিলেন। ক্রিকেটে একটি বিশ্ব একাদশের। মাত্র দু'বছরের মধ্যে তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হল। ইংল্যান্ডে প্রথম বিশ্বের সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড় নিয়ে গড়া একটি বিশ্ব একাদশ ইংল্যান্ড একাদশের সঙ্গে প্রদর্শনী একটি খেলায় মিলিত হয় স্করবরোতে। ফুটবলেও বিশ্বের বাছাই করা সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে বিশ্ব একাদশের খেলা হয়েছে। ইংল্যান্ডের ফুটবল খাদ্যের স্যার স্ট্যানলী ম্যাথুজের অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে, এই বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়ের সম্মানার্থে ইংল্যান্ডে বিশ্ব ফুটবল একাদশ এবং ইংল্যান্ড একাদশের মধ্যে একটি ফেস্টিভ্যাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ফুটবলের কালো মাণিক পেলে এই খেলা উপলক্ষে ইংল্যান্ডে উপনীত হন। কিন্তু কোন কারণে তাঁর পক্ষে খেলায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। ইংল্যান্ডের ফুটবল পাগল শ্বেতকারীরা পেলেকে সারাক্ষণ ঘিরে রেখেছিলেন। এমন কি শোনা যায় যে, 'ব্ল্যাক পাল' পেলেকে স্পর্শ করার জন্য ফুটবল অনুরাগীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ইংল্যান্ডের মাটিতে পেলেক একপা করে এগিয়েছেন আর অটোগ্রাফ শিকারীরা তাকে উত্তাক করে মেরেছে।

ফুটবলে অবশ্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিচারের সুযোগ আছে। অপেশাদার জগতে শ্রেষ্ঠ দল বিচারের মাপকাঠি হল অলিম্পিক আসরের খেলা। আর পেশাদার ফুটবল জগতের মাথার মণি হল স্বর্ণ-মণ্ডিত জুলে রিমেন্ট কাপ। ফিফা বা কিং ফুটবল সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি জুলে রিমেন্ট সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই বিশ্ব প্রতিযোগিতার গোড়াপত্তন। জুলে রিমেন্ট সাহেব নিজেই এই প্রতিযোগিতার জন্য সোনার মূল্যবান কাপটি দান করেন।

বিশ্বের বোধ হয় সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হল ফুটবল। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে ফুটবলের প্রবেশ ঘটে নি। এমন কি যে আমেরিকার এতদিন পর্যন্ত ফুটবলের দিকে কোন দৃষ্টিই ছিল না, সেই আমেরিকাতে ফুটবল বলতে গেলে রীতিমত চালু হয়ে গিয়েছে। বলা যায় না আর হয়ত কয়েক বছর পর দেখব ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল আর রাশিয়ার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আমেরিকা ফুটবল মাঠে প্রবেশ করেছে।

বিশ্বকাপের খেলা অনুষ্ঠিত হয় চার বছর অন্তর। কিন্তু বিশ্বকাপের খেলায় এত বেশি সংখ্যার বিভিন্ন জাতীয় দল অংশ গ্রহণ করে যে প্রায় তিন বছর লেগে যায় বাছাই পর্বের শেষে মূল প্রতিযোগিতার জন্য দল বাছাই করতে। খুবই আনন্দের কথা যে কোন নোংরা রাজনীতির ছায়া এই বিশ্বকাপের খেলাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা একই সূত্রে আবদ্ধ হতে পেরেছে ফুটবলের মাঠে।

ক্রিকেটের দিকে দৃষ্টি ফেরালে কিন্তু দেখা যাবে সম্পূর্ণ অন্য এক চিত্র। ফুটবলের মত বিশ্বব্যাপী এমন জনপ্রিয়তা লাভের সৌভাগ্য ক্রিকেটের হয় নি। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না, যে ক্রিকেট আবার সব দেশে সব সময় খেলা সম্ভব নয়। পরিবেশ, পরিমিত, আবহাওয়া প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে ক্রিকেট খেলা। ক্রিকেট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহলে। আরও কয়েকটি স্থানে ক্রিকেট খেলা হয় বটে, কিন্তু সেখানকার ক্রিকেটের তেমন আভিজাত্য নেই, নেই তেমন আদর।

ক্রিকেটের প্রচলনের জন্য ইংল্যান্ডের অমূল্য অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ইংরেজরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উপনিবেশে ক্রিকেটের প্রচলন করেন। ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচের মধ্যেই হচ্ছে ক্রিকেটের আসল মাধুর্য, আসল আকর্ষণ, আসল আভিজাত্য।

ক্রিকেট খেলার নিয়মকানুন এমন ধরণের যে বিশ্বকাপের মত কোন প্রতিযোগিতা অথবা অলিম্পিকের আসরের মত কোন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রিকেট খেলায় দেশগুলিকে একত্রিত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ফলে নির্দিষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান কোন দেশকেই দেওয়া সম্ভব নয়। তার ওপর আর একটি ক্রিকেট জগতের সমস্যা হল দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাধীনতা বর্ষবৈষম্য নীতির একমাত্র গোড়া সমর্থক দক্ষিণ আফ্রিকা একমাত্র শ্বেতকারী দেশগুলির সঙ্গেই খেলার সুযোগ পায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলে না। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বর্তমানে ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা যথেষ্ট শক্তিশালী। সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা নিজের দেশের মাটিতে সিম্পসনের নেতৃত্বে সফর-

কারী অস্ট্রেলিয়া দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রাবারও দক্ষিণ আফ্রিকার দখলে। ইংল্যান্ডও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তেমন সুবিধে করতে পারে নি, নিজের দেশের মাটিতে।

বর্তমানে ক্রিকেটে কে শ্রেষ্ঠ ওয়েস্ট ইন্ডিজ না দক্ষিণ আফ্রিকা এ সম্বন্ধে বিশ্বের ক্রিকেট অনুরাগীমহলে বিরাট জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে বিশ্বজুড়ী দল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তিকেও উপেক্ষা করা চলে না।

ইংল্যান্ডের একজন খ্যাতনামা সিগারেট ব্যবসায়ী এই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে এসেছেন। তিনি এম-সি-সির কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার একটি খেলার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেছেন। ব্যবসায়ী ভুল্লোক বলেছেন যে, এই দুই দলের দুটি কিংবা একটি পচিদিনের খেলার ব্যাপারে আর্থিক গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত আছেন। এম-সি-সির পক্ষ থেকে সহকারী সম্পাদক মিঃ ডোনাল্ড কার বলেছেন যে, তাঁরা এই প্রস্তাবটি আগ্রহের সঙ্গেই পরীক্ষা করবেন। আগামী ১৯৬৮ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড সফরে আসবে এবং তখন এম-সি-সি তাদের সঙ্গেও এই ব্যাপারে আলোচনা করবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একজন কর্মকর্তা মিঃ সিসিল মার্লেকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি কিন্তু এই প্রস্তাবকে ততটা গুরুত্ব দেন না। তবে তাঁর মতে এই ধরণের খেলা অনুষ্ঠিত হলে, তা হওয়া উচিত দক্ষিণ আফ্রিকার অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে এই ধরণের খেলা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার বেরাফা মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বেসিল ডি ওলিভিয়েরাকে নিয়ে। এছাড়া মাত্র কিছুদিন পূর্বে একজন শ্বেতকারী মুষ্টিযোদ্ধা কোন অজ্ঞাত কারণে সরকারিভাবে অশ্বেতকারী হিসাবে স্বীকৃতি হারান। বেসিল ডি ওলিভিয়েরার প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার কঠোর এবং অনমনীয় মনোভাবের কথা এক-বিবৃতিতে বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের একজন মন্ত্রী। বহির্বিশ্ব যতই জল্পনা-কল্পনা করুক না কেন—ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে সব কিছুই নির্ভর করছে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের ওপর।

—সুদর্শন

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গভূমি (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২

বঙ্গভূমি প্রেস হইতে প্রিন্ট্রমার শ্রমিকসমূহের কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

প্রথম খণ্ড বোর্ড বাঁধাই (বন্দ্যুখ) : মূল্য—বার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড " " : মূল্য—দশ টাকা

চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

পঞ্চম খণ্ড : মূল্য—(বোর্ড বাঁধাই) আট টাকা

অন্ন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা

চাকরীর উদ্দেশ্যে না করিয়া বিজ্ঞানবলে
বলীয়েল হটন

বাণিজ্যিক লক্ষ্যে ক্রমশঃ

করিয়া লেখাশ্রাবান হটন

হাজার জিনিষ

সহস্র পণ্য প্রস্তুত করিবার সহজ ও
সরল উপায়

প্রতি ভাগ এক টাকা

—প্রথম ভাগে আছে—

বস্ত্র-প্রকৃতি ১৫৬ প্রকারের। ফলপ্রদ মৃদুটিযোগ
৩৪১ প্রকারের। চমকপ্রদ বাদ্য-বিজ্ঞান ৮৫
প্রকারের। মনোহারী আতসবাজী ৪১ প্রকারের—
এতদ্বিধা

বস্ত্ররঞ্জন—ধাতুরঞ্জন

কাষ্ঠরঞ্জন—ধাতুশিল্প

পেস্ট ও বার্ণিশ—প্রভৃতির

ব্যবহারিক উপদেশ সহ বিস্তৃত ব্যবহারিক
প্রস্তুতপ্রণালী।

—দ্বিতীয় ভাগে আছে—

প্রসাধন সূত্র ১০২ প্রকারের; বিস্তৃত সাবান প্রস্তুত
প্রণালী; সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী; মোমবাতি প্রস্তুত
প্রণালী; ফলপ্রদ গৃহ-চিকিৎসা—হেঁকিমী ও
হোমিওপ্যাথি; মস্ত-তন্ত; ভাগ্যফল; বুননির প্যাটার্ন।
সমোরবারের যে কিছ, বস্ত কিছ, বাহ্য কিছ, আবশ্যিক ভাষা
শিখিবার ও শিখাইবার একমাত্র পুস্তক।

জনসাধারণের বর্তমান অসচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
নামমাত্র মূল্য নির্ধারিত।

বিশ্ব-সাহিত্যে বহুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

অধি বাল্মীকিসংগৃহীত অমর আনন্দমঠের অমর ইংরেজী

০ আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পুস্তক

০ আনন্দমঠে—বন্দোবস্তমন্ডলের পুস্তক-প্রকাশ।

০ আনন্দমঠে—অধি বাল্মীকি ও অধি অরবিন্দের আদর্শ

আনন্দমঠের এই মহামণ্ডলের অমরশতাব্দীর সাবনে

স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাইল

মূল্য—তিন টাকা

গীতিনাট্য-সম্রাট

পাণ্ডিত কীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

কীরোদ গ্রন্থাবলী

৪র্থ ভাগে—রজাবতী, নারায়ণী, মৃগী, কুমারিকা, অমর
জয়ন্তী, মূল্য।

৫ম ভাগে—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাহাদি, পুনর
বন্দাবনবিলাস, রূপের ভাষা।

৬ষ্ঠ ভাগে—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুল
খাজাহান, বিরাটকুল, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদোয়া, কুমারী, ক
কবিকাননিকা, রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

৮ম ভাগে—আহেরিয়া, উলুপী, দৌলতে মুনিয়া, মি
প্রোমাজি, মন্দাকিনী, গৃহামধ্যে পবিত্র
সিদ্ধি, মূল্য। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৫০ টাকা

হাত-হাতী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও বি
রাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ

৥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সহায়ক

* * স্বল্পপত্রমে পর্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী *

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা যা

(ইংরেজী ভাষা সহজে শিক্ষার অম্বিতীয় সাহায্য গ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - লক্ষ্য

ইংরেজী হইতে বাংলা—(বোর্ড বাঁধাই) ০.৫০

ইংরেজী হইতে উর্দু—০.৫০

রূপ সাধনায় সাধনা

দুটি অনবদ্য অবদান

17 MAR 1967



সাধনা বিউটি ক্রিম

প্রতিদিন স্বক চর্চায় একান্ত
প্রয়োজন। কুহুম কোমল
পেলব ত্বক ও যৌবন স্থলভ
লাবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথপেস্ট

দন্তরোগ মুক্তার মত শুভ
ও উজ্জ্বল, স্বাস্থ্য ও সুগন্ধ
মুখ দুর্গন্ধমুক্ত ও স্বচ্ছ করে।

শীঘ্রই পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, ঢাকা-১০০



অধ্যক্ষ - সীমোৎসবগোত্র বোম, এম. এ.
অধ্যক্ষ-সাহায্যী, এফ. সি. এম. (বিওন)
এম. সি. এম. (আমেরিকা) ভাণ্ডারপুত্র
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র বোম,
এম. সি. বি. এম. (কলিঃ) প্রাক্তন-প্রিন্সিপাল।

বঙ্গমতী

রাষ্ট্রপতি ও নতুন কেন্দ্রীয়
মন্ত্রিসভার কয়েকজন



৭১ বর্ষ : ৪৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ই চৈত্র, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ



23rd March, 1967 * Vol. 71, N



ফেমিলা
ক্রীম

একালের রূপ-কথার শ্রেষ্ঠ বস্তু

বোম্বাইয়ের হাটলি, কলিকাতা-১০



বিষয়	লেখক						পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৬৩
আজকের মানাষ	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৬৪
ভারতদর্শন	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৬৫
জান্তর্জাতিক	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৭২
মা দেখেছি, মা পেয়েছি (স্মৃতিচরন)	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৭৩
মারা রাতারাতি রঙ বজ্রায় (কবিতা)	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৭৮
নব মন্দিরসভা সমীপে	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৭৯
পিচ রোড (কবিতা)	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৮০
অবজ্ঞা	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৮২
স্বপ্নলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৫৮৪

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক) মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলোক। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ধাতিত বাস্তবচ্যুত মুকুন্দরাম দ্বন্দ্ব ও বেদনাক্রান্ত বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—যাতির দ্বন্দ্ব কি করিয়া সর্বজনের দ্বন্দ্ব হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ১। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৮। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পট্টচিত্রিত, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

ভিত্তাসনক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভক্তিমায়ারী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য ১১।

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পদ্মজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনোবীর অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ
অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুদ্রাসিক

পাণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে ১—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহান, পদ্যবাণবিলাস, শৃঙ্গার-উল্লাস, শৃঙ্গার-রসান্তক। ৪-৫০
দ্বিতীয় ভাগে ১—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, স্বাগ্নিবংশ-পদ্যলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৬-৫০

প্রাচীন-সাহিত্যের গৌরব-মুকুট—

সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—

রামগদ্যাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপণ্ডাশং, রসমঞ্জরী সত্যপীর, খেড়েখেড়ের কোড়ক, ফদরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী বলিরাজা, চণ্ডী, নাগান্তক, সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালোপ, কবিতাবলী।

মূল্য দুই টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রশ্নোত্তর		২৫৮৮
বঙ্গদর্শন		২৫৮৯
আমাদের খান	ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	২৫৯০
অগ্নিবর্গের একাট অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	২৫৯৭
দুই পাখী (গল্প)	অশোক সেনগুপ্ত	২৬০০
বিত্তীয় স্বাধীনতা (কবিতা)	অমিরকুমার হাটি	২৬০৬
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	ডঃ বৃন্দাবন ভট্টাচার্য	২৬০৭
আপেক্ষিক (কবিতা)	রমা অধিকারী	২৬১০
রূপমণ্ড—ওমেসে এবং এসেসে	শিল্পালি	২৬১১
রূপমণ্ড		২৬১৩
বেলাহুলা	শ্রীঅমিতাভ	২৬১৮
রাজপুত্র হারা রাজ্য	শান্তিপ্ৰিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬২২



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাস্কর্য দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরাচিত

ভক্তির মন্ডাকিনী

প্রেমের অলকানন্দা

জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে একদল মহাগ্রন্থ আর নাই
চিহ্নসমূহ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনব টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মাণিলাল গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩।

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩।

বাল্মীকিচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্য-
কারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ যারে নে গেছল—

গুরুগণ—ইংরেজ ? একবার পৈলে হয়—

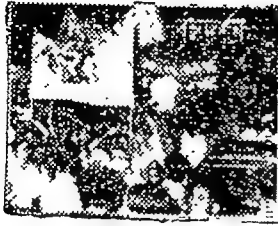
মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে
বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করবে।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য-
ইংরেজদের বিক্রম করবে।

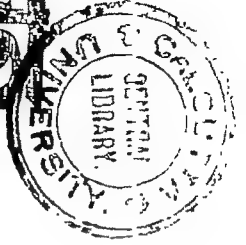
প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে
তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য ৪ দুই টাকা

বঙ্গমতী গ্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী ঝাংগুদানী স্ট্রীট, কলি-১২



সাপ্তাহিক বসুমতী



সম্পাদিত জয়ভীসেন

৭১ বর্ষ : ৪১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৯ই চৈত্র, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 23rd March, 1967

সাপ্তাহিক বসুমতীর চার বছর

নব পর্বায় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হলো। এই অল্প সময়ের মধ্যে নব পর্বায় সাপ্তাহিক বসুমতী যে জনপ্রিয়তা, যে শুভেচ্ছা ও যে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন লাভ করেছে—তা' খুব কম পত্রিকার ভাগেই ঘটে। জনপ্রিয়তার এই গৌরবে আমরা গর্বিত। আশা করি, আমাদের পত্রিকার আদর্শের সঙ্গে যারা পরিচিত হয়ে আসছেন, তাঁরা বিগত ক' বছর ধরে অনুধাবন করেছেন যে, সমস্যাযুক্ত মানবের—দুঃখ-বেদনা ও সংগ্রামের ভাষাকেই নিভীকতার সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সঙ্গোই মূর্ত করে এসেছি।

পত্রিকার নব পর্বায় প্রকাশকালে মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীণ দিক প্রকাশ করা ছিল আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। সেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত—পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য ও তার ভাষা এবং আন্তর্জাতিকতা। প্রথমেই বলা প্রয়োজন মনে করি যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করলেও এই ভাষার মর্যাদা সন্দেহভাবে স্বদেশেই স্বীকৃত হয় নি। নতুন মণ্ডলী এই ব্যাপারে সচেতন হয়েছে দেখে আমরা খুশি হয়েছি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ভারতের জাতীয় ভাষাগুলি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত—এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে আমরা একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছি। সেখানে জ্ঞানী-গুণী ও ভাষাতাত্ত্বিকদের যে সব মতামত উপস্থাপন করা হয়েছিল, তা' অবশ্যই দৃষ্টিনির্ভর হতে পারে।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে উভয় বাংলার মানুষ সচেতন হবেন, এটাই আমাদের কাম্য। কিন্তু দেশ যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত ও জনসাধারণের স্বাধীন আশা-

আকাঙ্ক্ষা বিগত দিনগুলিতে পদদলিত হয়েছে তখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে, চিন্তার প্রসারে, ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হবার সাধনার আমরা বলিষ্ঠ সাহিত্যই জনসাধারণের সামনে নানা বাধা-বিপত্তিতে অগ্রাহ্য করেও তুলে ধরেছি। বিগত যুগের বিপ্লবীদের মরণজরী সংগ্রাম-এর কাহিনী পশ্চিম বাংলার মানুষকে কিভাবে নতুন প্রেরণা, সাহস ও শক্তি দিয়েছে—তা' আমরা আজ সানন্দে স্মরণ করছি।

বিগত দিনগুলিতে অধিকাংশ চলচ্চিত্রের দ্বারা ভারাক্রান্ত মানুষের মনে আরো যে ভার ও অশ্রুকার সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রায় প্রতি মূহুর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি। আপাতত সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ এই ব্যাপারে কিছুটা সচেতন হয়ে ভাল মানুষ সেজে "অশ্রুকার রজনী" গুলির যবনিকাপাত ঘটালেও শিক্ষণ ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে জীবনবাদী সৃষ্টির অভাব বোধ করছি। অবশ্য এই জীবনবাদী সৃষ্টির বিরুদ্ধে এতোকাল যারা চরম নৈপুণ্য দেখিয়ে এসেছেন—বর্তমানে দেশের প্রাণ-ময় পরিস্থিতিতে তাঁরা রাতারাতি রঙ বদলে ফেলে সংগ্রামী সেজে বসবেন। আমরা বিশ্বাস করি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ও নতুন সরকার এদের চিনে রাখবেন।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার পুরাতন আবর্জনার পথ ত্যাগ করে নতুন পথে চলবেন—একথা অহরহ উচ্চারিত হলেও আমরা আরো কিছু বেশি লাভের প্রত্যাশী। আমরা প্রত্যাশা করবো, তাঁরা জঞ্জালও দূর করবেন। দূর্নীতির দ্বারা ধারক ও বাহক তাদের জনকল্যাণমূলক স্থানগুলি থেকে উৎখাত করতে হবে। ডিলমার

অভিযোগে যে অভিযুক্ত হবে, তাঁর দৃষ্ট-বিধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রশাসনযন্ত্রটি এমনই বিরাট ও জটিল যে, সেখানে কোনো ত্রুটি আপাত নগণ্য বলে মনে হলেও পরে তা' সমস্ত যন্ত্রকে বিকল করে দেবে। তখন নিজেদের নিঃস্বার্থ-পরায়ণতা কতটুকু কাজে লাগবে? গাঝখান থেকে যে জনগণ বহু আশা নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে—তা'রাই হ্যাঁ নির্বাচনে উপনীত। আমরা জাতি, ধারা রঙ বদল করে কিংবা দূর্নীতি পক্ষে ডুব থেকে সাময়িকভাবে দূর্নীতি কথা শোনার—তা'রা সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। তাদের ভয়াল রূপ এতোদিন ধরে দেখে এসেছি বলেই তাদের সম্পর্কে সরকারকে জাগ্রত করে রাখাই আমরা কর্তব্য বলে মনে করি।

এই কর্তব্যের পথ থেকে অতীত দিনগুলিতেও আমরা বিচ্যুত হই নি সেই কারণে সেই সব দিনে সরকারের কাছে বিমোক্ষসুলভ আচরণ লাভ করেছি। কিন্তু জনচেতনা উদ্বেগ করার আদর্শে বঙ্গ দর্শন, ভারতদর্শন প্রভৃতি বিজ্ঞ বিচারে আমরা জনস্বার্থের কথা উপস্থাপন করতে দূর্নীতির গোপন অলি-গলি পথে সন্ধান দিতে কোনদিনই পিছপা হই নি আমাদের পত্রিকার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে আমরা স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে, জনগণ আছেন আমাদের সঙ্গে। আগামী দিনের চরম পথে সকলের স্নেহ, ভালবাসা, আন্তরিকতা, সমর্থন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যথার্থ সমালোচনা লাভ করে আমরা আরো বেশি উৎসাহিত হবো বলে মনে করি।

সম্পাদকীয়

ভোজকের মানুষ

যোগ্য কাজের জন্য যোগ্য লোক মনোনীত—ডঃ ত্রিগুণা সেনের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর পাওয়া প্রসঙ্গে এ উক্তি উদ্ধারিত হয়েছে সহস্রকণ্ঠে। শূন্যে সবাই চমকিত হয়েছেন। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বহু মন।

কিন্ময়ের ঘোর ডঃ সেনেরও কাটতে সময় লেগেছে। বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি জটিল সমস্যার জট খুলতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি, খবর এল আচার্যদে, বিনা নোটিসে। অবাক হবারই কথা। তিনি চান নি কখনো। পাবার প্রশ্নও ওঠে না তাঁর। লোকসভা-রাজ্যসভা—কোনটারই সদস্য নন তিনি। এমন কি কংগ্রেসের চার আনা চাঁদা দাখিল-করা প্রাথমিক সদস্যও নন। অথচ সরকার তো কেন্দ্রে কংগ্রেসেরই। বরং পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্বে যে দুর্নীতি-পরাস্রগতা ও একনায়কতন্ত্র চলেছে তার তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন প্রকাশ্যে। মাত্র কয়েকমাস আগে। রাজ্যের সরকারী পদস্থদের বিরাগভাজনও হয়েছিলেন এ বাবদে। পরোয়া করেন নি, ব্যক্তিগত, আত্মমর্জাদা বা নিজের চিন্তাধারাকে বিসর্জন দিতে পারেন নি।

বরাবরই এমনিধারা, সহস্র সাদা-সিঁদে, হাঁসি-খুঁশি ভাব যুঁখে-চোখে। আবার কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর নীতি-পরায়ণও। মধ্যবর্তী কাজের লোক, কাজ ছাড়া আর বোঝেন না কিছু, সে কাজ প্রধানত দেশগঠনের, জাতির শিরদাঁড়া সত্ত, মজবুত করার সম্পর্কে রূপ দেওয়া। এই করে এসেছেন একটানা বাইশ বছর ধরে।

জাতীয় নেতাদের স্বপ্ন সফল হল, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে উঠল যাদব-পুর্বে। দেশগঠনে ইঞ্জিনীয়ার দরকার, দুটো-একটা নয়, শত শত। স্বদেশী চূ-এ দেশ গড়তে হবে। কিন্তু কে ভার নেবে, কঠোর দায়িত্ব, বশুধর পথ। শূন্যে বিদ্যে থাকলে হবে না, বুদ্ধিও চাই তার সঙ্গে, চাই উদ্যোগ, নতুন চিন্তাধারা। তার চেয়েও বেশি দরকার জাতীয় ভাব-ধারা, নিখার দেশপ্রেম। নির্ভুল ছিল সেদিনের নিবানও। ১৯৪৪ সালে প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন যাদবপুর্বে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। নামেই

কলেজ। ছাত্র কোথায়? পড়বে কে? কার আছে সে আর্থিক সংগতি? ত্রিগুণা সেন সব আশঙ্কা ঘুচিয়েছেন, সব অভাব দূর করেছেন। যাদবপুর্বে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আজ আদর্শ পঠি-স্থানে পরিণত।

পূর্বে পাকিস্তানের শ্রীহট জেলায় শ্রীত্রিগুণা সেনের জন্ম ৬২ বছর আগে। কলকাতার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ডিগ্রি নিয়ে গেলেন জার্মানী উচ্চতর শিক্ষা তথা ডক্টরেট নেবার জন্যে। বৃত্তি পেয়ে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন



ডঃ ত্রিগুণা সেন

আকাল্পিত ডক্টরেট। দেশে ফেরা এবার। কাজ কিছু করতে হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ নিলেন। মাত্র কিছুদিনের জন্যে। তারপরেই যাদবপুর্বে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের দায়িত্বভার চাপল কাঁধে।

শূন্য বিদ্যালয় তৈরি করেই ক্রান্ত থাকেন নি ডঃ সেন, গুচ্ছের ছেলে পাশ করানোর মধ্যে কৃতিত্বের কী আছে? শিক্ষার মানও সঙ্গে সঙ্গে উন্নত করতে হবে, যদি পশ্চিমের উন্নত দেশের সঙ্গে শিক্ষাসংগঠনে পাল্লা দিতে হয়। যাদবপুর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজ্টার হবার পর থেকে

তিনি এক মন এক ম্যান নিয়ে এ দেশের পঠন-পাঠন, শিক্ষাব্যবস্থা ও রীতি-পদ্ধতির উন্নতি সাধনে রতী হলেন। তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকত্ব এখানে যে, তিনি শিক্ষা-সম্পর্কিত যে কোন সমস্যাকে দুর্দিক থেকেই বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেন—ছাত্র ও শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে। সেজন্যেই ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে মানের অবনমন পর্যন্ত প্রতিটি প্রশ্নে বা সমস্যায় ডঃ সেনের চিন্তাধারা যেমন বলিস্ত, বিশিস্টতার উজ্জ্বল, তেমনি নতুন বা মৌলিকত্ব তুলনাহীন। এর সর্বশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল সমস্যা-কণ্টকিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তুলকালাম কান্ড হয়ে গিয়েছিল এখানে। বিশ্ববিদ্যালয়টি কি তুলে দিতে হবে? একটা-না-একটা কারণে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল বার বার। পড়াশুনো বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরিত হয়েছিল সেনা-শিবিরে। অনেকেই এলেন অবিরোধ মীমাংসাপ্রচেষ্টায়। কিন্তু রোগ সারে না। রোগ ধরতে না পারলে ঠিক ওষুধ পড়বে কোথেকে? ছাত্র-বিক্ষোভ থেকেই যায়। ওরা মানবে না উপাচার্যকে, কিংবা শিক্ষা অধিকর্তাকে। ওদের কথা কেউ না মানলে ওরা কেন রাজী হবে? সাগ্রহে, ধৈর্য ও সহানুভূতি নিয়ে শুনলেন ডঃ সেন। যাদবপুর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজ্টারের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি কয়েক মাস আগে। আশ্চর্য! ডঃ সেনের হাতে কি যাদুদণ্ড রয়েছে? কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেল সব কিছু। প্রাচীন ঐতিহ্য-মণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয় বেঁচে উঠল।

দেশের প্রতি শ্রদ্ধা-অনুরাগ অকৃত্রিম বলেই ডঃ সেনের আত্মবিশ্বাস অমন দুর্লভ হতে পেরেছে। এ অনুরাগ ছাত্রবয়স থেকেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে সৈনিকের ভূমিকা ছিল তারও। কুখ্যাত বেশল রেগলেটিং অ্যাক্টের বলে তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছিল সাম্রাজ্যবাদীর পুলিশ। কারালন্তরালে যেতে হয়েছিল তাঁকে দুবার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাড়াও দেশ-সেবার অন্যতর ভূমিকায়ও তাঁকে দেখা গিয়েছে। কলকাতা করপোরেশনের মেয়র পদে বৃত্ত হয়েছিলেন তিনি দুবার—'৫৮ ও '৫৯ সনে।

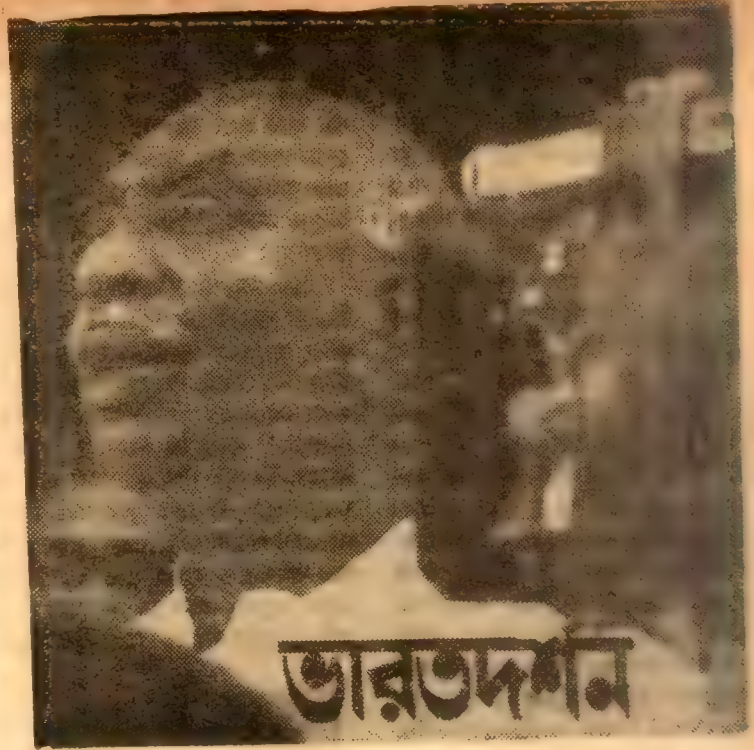
ডঃ ত্রিগুণা সেনের আজ নতুন দায়িত্ব, বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্র। শিক্ষাবিদ হিসেবে ডঃ সেনের প্রতিষ্ঠা অবিসম্বাদী, পশ্চিমের বহু দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত আজও পুরোনো চিন্তাধারার দাসত্ব করছে। ডঃ সেনের সুযোগ্য নেতৃত্বে তার পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটবে—এ প্রত্যাশা সকলেরই

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দিকে তাকিয়ে এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাকালে শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের বক্তব্য লক্ষ্য করে আর একবার ভারতের জনগণ উপলব্ধি করলেন, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা কৃষকগণের নিদ্রা কেমনভাবে ভাঙিয়েছেন; যেই অসতর্কভাবে নাগরিকবৃন্দ তাঁদের কংগ্রেস-বিরোধী বিক্ষোভ প্রকাশ করে থাকুন-না-কেন, তন্মারা যে স্থবিরতাপ্রিয় ভারতবর্ষে, নবতর প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া জেগেছে আজ তাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল।

ভারতদর্শনের স্তম্ভে এ-কথাই বারম্বার বলার চেষ্টা করেছি যে, জনগণ একবার সাহসে বুক বেঁধে একটা নাড়া দিন; যেই যাবে লঙ্কায়, সেই হবে রাবণ, এমত মান্ব্যাতার আমলের চিন্তাধারার পরিবর্তন করে দোসরা 'রাবণ'কে একবার বাজিয়ে দেখার অনুরোধও রেখেছিলাম। অতটা না হলেও জনগণ এবার যেভাবে তাঁদের মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তাতেই সমস্ত দেশে একটা চিন্তার বিপ্লব ঘটতে সূচ্যুত হয়েছে। আমাদের অবহমানের স্থবিরতাপ্রিয় মন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছে যে, সামান্য হেরফেরেই পণ্ডা নেতৃত্বকে কেমনভাবে খাড়া করে তোলা যায়। আশা হচ্ছে, নেতৃত্বকে পণ্ডা করার মূলে আমাদের আশংকাতুর পণ্ডা চিন্তাধারা এতোকাল যে সহায়তা দান করে আসছিল কেবল কয়েকটি আবহমান সংস্কারের বশবর্তী হয়ে, অতঃপর তার আমূল সংস্কার সাধিত হবে। লক্ষ্যমিথ্যের পরিবর্তন আশংকায় যে হৈঁহৈ-রৈঁর পক্ষে গেছে ভায়েত সকলেই এখন অনুভব করতে পারছেন যে তথাকথিত 'রাবণ' রাজ্য খুব বেশি শক্তিশালী জীব নয় এবং তাঁর শব্দে অস্তিত্ব গ্রন্থে বিশ্বাস রাখা করে চলাটাও মোটেও গণ-তান্ত্রিক মনোভাবের লক্ষণ নয়। আমরা আনন্দিত যে, আমাদের আবেদন লক্ষ্যে হয় নি। অংশত সফল্য লাভ করেছি।

নতুন মন্ত্রিসভা

শ্রীমতী গান্ধীকে এবার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতিরেকে নেতৃত্বের পদে বসানো সম্ভব হল এজন্য কামরাজের সঙ্গে আরও বৃদ্ধির নেপথ্য সহযোগিতা ছিল, তাঁরা হলেন চরম দক্ষিণপন্থী-বিরোধী ভারতের ভরলু প্রগতিশীল গণমনোভাব। এই মনোভাবের তাঁর প্রতিফলন নির্বাচনের মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশিত না হলে শ্রীকামরাজের দৌত্য কতদূর সফল হত এবং অনেক টানা-পেরড়েন সত্ত্বেও শ্রীমতী গান্ধী এমন বলিষ্ঠ মনোভাবের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভা আদৌ গঠন করতে পারতেন কি না সন্দেহ।



কথার চিঁড়ে ভেজে নি
কংগ্রেস-প্রধানের ব্যাখ্যা

প্রতিদ্বন্দ্বিতা বে শেষ পর্যন্ত একটা মিটমাটের মধ্যে সুবৃষ্টির পরিচয় রাখল এজন্য ব্যক্তি-প্রচেষ্টা ছাড়াও গণশক্তির চাপকেও স্বীকৃতি জানানো উচিত। প্রধান-মন্ত্রী হরত বা শ্রীকামরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মূহুর্তে একবার চাকিতে সেই সব মূঢ় ম্লান মূষককেও মনে করিয়ে, যাঁরা মূখর হয়ে নির্দেশ রেখেছেনঃ ঢেলে সাজাও এবং ঘর বাঁচাও বলে।

আজ কংগ্রেসের মধ্যে সব দলাদলিকে ধামা চাপা দিতে হল তাঁদেরই পরোক্ষ চাপে। শ্রীমতী গান্ধী সিঁড়িফেট বা কোনও বিশেষ প্রভাবশালী নেতাকেও যে নিতান্ত প্রত্যাশিত মর্যাদা দিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন, এক কথায় এ প্রশ্নের 'হ্যাঁ'-কালান্ত উত্তর রাখা সম্ভব নয়। সজীব রৈখিকে মন্ত্রিসভায় স্থান না দিয়ে এবং মোরারজী দেশাই উপ-প্রধানমন্ত্রী হলে-ও তিনি কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নয়, একথা ঘোষণা করে, কিম্বা আনকোরা নতুন রক্ত সঞ্চারিত করে শাসনমন্ত্রের হৃৎস্পন্দন স্ফূর্তিত করার সংসাহস প্রদর্শন করে শ্রীমতী গান্ধী নয়া মন্ত্রিসভায় যে চেহারা প্রকট করে তুলে ধরেছেন, তাতে একথাও মনে করা যেতে পারে যে, গতবার অপেক্ষা এবার তিনি অধিকতর মানসিক দৃঢ়তা এবং স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা পরিচালিত। অর্ধাঙ্গের ধারণা, এই মনের জোরটুকু অন্যান্য শক্তির সংগে একইভাবে যোগান দিয়েছে গণশক্তির

নবচেতনা। ফলত শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কংগ্রেস দলেও বিশ্রু প্রতিক্রিয়া বিক্ষোভিত হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। অনেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দু-একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অস্বভাবিকতাও বিরক্ত। কেমন কংগ্রেস পালামেটেরী পার্টির প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দ্বিপ্র স্পষ্টই বলে ফেলেছেন যে, সংসদ সদস্য নয় এমন সব কাকিৎ পুশ্পা মন্ত্রী করা অনুচিত কাজ হয়েছে। দত্তর বর্তনও অশালনীয় নয়। দলের মধ্যে এতদ্বারায় সুস্থ আবহাওয়া গড়ে ওঠা কঠিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীমতী গান্ধীর পছন্দে শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট কৃষিজগৎসংগঠন ডঃ ত্রিগুণা সেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিক্ষা-মন্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি সংসদের কোন সভারই নির্বাচিত সদস্য নয়। অন্যপক্ষে তাৎ দৈন্যবাসী ডঃ সেনকে শিক্ষামন্ত্রীরূপে পেরে আনন্দিত। কংগ্রেস সংসদীয় দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণা সিং ডঃ সেনের মনোনয়নে আনন্দ প্রকাশ করে বলেছেন, এই মনোনয়ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিঁড়িফেটের দু-একজন প্রধান-শালী সদস্যের চতুর্থ নির্বাচনে পতন না হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি বৈশ্বিক পরিবর্তন কতদূর সম্ভব হত, অসম্ভবত শ্রীসঞ্জীব রৌদ্রের অস্বভাবিকতা গররাজি হওয়া শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে সম্ভব হত কি না তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আভিজ্ঞানহলের মন্তব্যে প্রকাশ, স্বয়ং কাম-
রাজ নাদারও নার্কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট
সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

আভিজ্ঞান পর্ববৈষ্ণবকগণ অন্যদিকে
আবার এমন কথাও বলছেন যে, মন্ত্রিসভায়
শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠমহল এবার জাঁকিয়ে
বসার সুযোগ পেয়েছেন। শ্রীঅশোক
মেহতার (অর্থমন্ত্রীর হ্রাসের অন্যতম
কারণকর্মী) হাতে পরিকল্পনা ছাড়াও অন্য
দায়িত্ব তুলে দেওয়ায় অনেকে ততো বেশ
অসন্তুষ্ট। অনেকে যথার্থই মনে করেন
যে মন্ত্রিসভায় ডঃ ভি কে আর ভি রাও
অন্তর্ভুক্ত, সেখানে তাঁকে যানবাহন দপ্তর
দিয়ে বসিয়ে রাখার অর্থ তাঁর কাছে দেশ
যা পেতে পারত সে পথ রুদ্ধ করে দেওয়া।
শ্রীরাও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি-
বিদ, তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যও
ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠমহল
বলতে মেহতা ছাড়া আর যাদের বিশেষ
করে লক্ষ্য করা যায়, তাঁরা হলেন, নবশ্রী
ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ (শিল্পোন্নয়ন
ও কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রী), দীনেশ সিং
(বাণিজ্য), কে কে শাহ (বেতার ও তথ্য)।
এঁরা প্রত্যেকেই ক্যাবিনেট মন্ত্রী।
তরুণতম ক্যাবিনেট মন্ত্রী ডঃ করণ সিং
(৩৬) পেয়েছেন পর্বটন ও বেসামরিক
বিমান চলাচল বিভাগের ভার। তিনিও
শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠমহলেরই অন্যতম।

ডঃ সেনের মত শ্রীসিং এবং অল্প
মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্মা রোডিও
(ইনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এখন ইম্পাত,
খনি ও ধাতু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত) সংসদের
কোন কক্ষেরই সদস্য নন। ছ'মাসের মধ্যে
তাঁদের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে হবে।
প্রবীণ শ্রীজগজীবন রামের ওপর সব
থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল দপ্তরটি
দেওয়া হয়েছে। খাদ্য এবং কৃষিদপ্তর।
প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার কর্মসূচীতে
অগ্রাধিকার দেবেন খাদ্য ও মূল্য হ্রাসের
ওপর। সদুভাব শ্রীজগজীবন রামকে



শ্রীঅশোক মেহতা

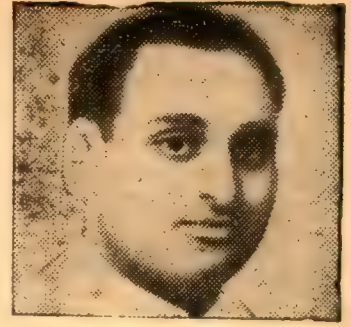
খাদ্যের মত একটি সমস্যা সমাধানের উপায়
উদ্ভাবন করতে হবে। শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম তো
এই দপ্তর নিয়ে বার পর নাই হিমসিম
খেরেছিলেন এবং 'সংগ্রহমন্ত্রী' রূপে নাম
ডাক অর্জন করেছিলেন। শ্রীরাম নতুন কি
করবেন সেটাই দেশবাসীর উদ্গ্রীব লক্ষ্যের
বিষয় হ'ল।

শ্রীচাণলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এবং
শ্রীচাবন স্বরাষ্ট্রদপ্তর নিয়ে টিকে গেছেন।
এবার পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইন্দিরা-
মন্ত্রিসভার উল্লেখ্য নয়া প্রচেষ্টা হবে চীনের
সঙ্গে সমঝোতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।
ইতিপূর্বে, এমন কি নির্বাচনের আগেও
একথা বলা খুব সহজ ছিল না। বাম
কম্যুনিষ্টরা এই প্রশ্ন তুলে মহা নিন্দার
পাত্ররূপে পরিগণিত হয়েছেন। নতুন মন্ত্রি-
সভা বামপন্থীর অনেক যুক্তিকেই স্বীকৃতি
দিতে প্রস্তুত। এটাও যে জনগণের নির্বা-
চনী রায়েরই ফলশ্রুতি এতে সন্দেহ নেই।



ডঃ ভি কে আর ভি রাও

শ্রীমতী গান্ধীর অ-কংগ্রেসী সরকারগুলির
সঙ্গে সহযোগিতার আশ্বাসও আর একটি
সুস্থ মনোভাবের লক্ষণ। তিনি নির্বাচনী
রায়কে জনগণের প্রাণশক্তির পরিচায়ক বলে
উপযুক্ত সময়ে গ্রহণ করতে পেরেছেন দেখে
আমরা বিশেষ পুলাকিত বোধ করছি।
পূর্বনো ইন্দিরা-মন্ত্রিসভার শেষ ক'টা দিন
চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির দাপাদাপি
কংগ্রেসের আসন যেভাবে টলিয়ে দিয়েছে
তাতে জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ
ছাড়া কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের গতানুগতিক নেই।
অতএব কংগ্রেসকে এখন কিল খেয়ে কিল
হজম করতেই হবে। শ্রীমতী গান্ধী
এই হজমশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন
মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের
কাছে তাঁর নয়া বক্তব্য রেখে।



শ্রীকরণ সিং

বাঁরা বাস পড়লেন

নতুন মন্ত্রিসভায় পুনশ্চ আসন লাভে
বঞ্চিত হলেন তাঁরাঃ শ্রীসঞ্জীব রোডি,
ইনি বিগত মন্ত্রিসভায় পরিবহন ও
অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী ছিলেন,
বর্তমানে যে দপ্তরের দায়িত্ব ডঃ করণ
সিং-এর ওপর ন্যস্ত। স্থান পান নি
পূর্ববর্তী আইনমন্ত্রী শ্রী জি এস পাঠক।
নতুন আইনমন্ত্রী হয়েছেন শ্রীগোবিন্দ
মেনন। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী
সুশীলা নাক্সারের স্থলে গ্রহণ করা হয়েছে
ডঃ এস চন্দ্রশেখরকে। তিনি স্বাস্থ্য ও
পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ
করবেন।

উপ-প্রধানমন্ত্রীর পজিশন

শ্রীযুত মোরারজী দেশাই বর্তমান
মন্ত্রিসভায় খুবই একাকী বোধ করতে
পারেন। তাঁর নির্ভরযোগ্য সমর্থক
বলতে মন্ত্রিসভার কেউ স্থান পান নি,
তবে শ্রীদেশাই কংগ্রেসপ্রধান শ্রীকামরাজের
অধিকতর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে-
ছেন বলে প্রকাশ। তাঁর হাতে অর্থ দপ্তর
তুলে দেওয়া হয়েছে বটে, তবে এই
দপ্তরের ব্যাপারে শ্রীমেহতা, শ্রীফকরুদ্দিন
আলি আহমেদ এবং শ্রীদীনেশ সিং-এরও
বেশ কিছু কার্যত নিয়ন্ত্রণ থাকবে বলে
আশা করা যায়। এঁরা যথাক্রমে পরি-
কল্পনা, শিল্পোন্নয়ন এবং বাণিজ্য
দপ্তরের প্রধান। আগেই বলা হয়েছে,
শ্রীদেশাই পদাধিকার বলে কোন বিশেষ
ক্ষমতারও অধিকার লাভ করছেন না।
কেন্দ্রে এর ফলে শ্বেত নেতৃবৃন্দেরও সম্ভাবনা
নেই।

অন্যান্য কয়েকটি দপ্তর

শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ বর্তমানে দপ্তর
বিহীন। সমস্যাপীড়িত এবং দুর্নামাঙ্কিত



শ্রীকৃষ্ণ সিং

রেলদপ্তর গ্রহণ করছেন শ্রী সি এম পুনাচা। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী শ্রীপতিলাল নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছেন। প্রতিরক্ষা বিভাগের ভার পূর্বের মত সর্দার স্বরণ সিং-এর হাতেই রাখা হয়েছে। ডঃ রামসুভা সিং পার্লামেন্টারী বিষয়ক ও বোগাবোগ বিষয়ক মন্ত্রী। শ্রম ও পুনর্বাসন দপ্তরের দায়িত্ব বহন করবেন শ্রীজয়সুখলাল হাতি। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রিসভার মোট সদস্য সংখ্যা আঠারজন।

বিভিন্ন রাজ্যের ভাগে

শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভার ৩৬ সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে নিম্নলিখিত হারে সদস্য গ্রহণ করা হয়েছে :

মহাঃ:

মহারাষ্ট্র—চার, বিহার—চার, গুজ-রাট—দুই, মহীশূর—তিন, উত্তরপ্রদেশ—দুই (শ্রীমতী গান্ধীসহ), জম্মু ও কাশ্মীর—এক, কেরল—এক, অন্ধ্র—এক, পশ্চিমবঙ্গ—এক, দিল্লী—এক, পঞ্জাব—এক ও আসাম—এক।

রাষ্ট্রমন্ত্রী :

অন্ধ্র—তিন, পশ্চিমবঙ্গ—দুই, বিহার—দুই, মধ্যপ্রদেশ—দুই, মাদ্রাজ—এক, উড়িষ্যা—এক, উত্তরপ্রদেশ—এক, হরিয়ানা—এক ও মহারাষ্ট্র—এক।

সভা বসলে প্ৰধান বসলার না

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভার ঘণ্টেট রদবদল করেছেন, যার প্রতি দৃক-পাতন্যর অনেকেরই একবাক্যে বলেছেন, বাঃ। শুধু কি তাই, সভানেত্রী বেশক

কথা বলেছিলেন তাতে মনে পড়ে যাচ্ছিল বহু পুরাতন বিরোধী বক্তৃতাগুলিকেই। ভেবেছিলেন, প্রবাদ না কল্প কালে। পরীক্ষা কথা বাসি হলো খাঁটি হয়। কিন্তু মন্ত্রিসভার চমক দান করার পরই প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দান করলেন তাতে নতুনই কিছুই পাওয়া গেল না।

কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিকে পূর্ণ সহযোগিতার ভরসা দেওয়ার বিষয়টি যেভাবে অভিনন্দন সহকারে উল্লিখিত হচ্ছে, তাতে যে কেউ হরত এই ধারণা করবেন যে, সহযোগিতাদানটা নেহাউই কেন্দ্রের বদন্যতা মাত্র। আদৌ কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। কেজারেল খাঁচের সরকার পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন অগ্রসর হতে পারে না। কয়েকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কেন্দ্র কেন্দ্রীয় প্রতি ন্যায্যত হাত গুটিয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। সহযোগিতা কেন্দ্রকে দিতেই হবে, সেটাই প্রত্যক্ষিত; বিপরীত ব্যবহার নিভান্ত 'পা-জরারী' হতে পারে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর একমুখ প্রতিক্রিয়া একটা ভরস্কর উল্লেখ্য বিষয় বৈলে বর্তমান আলোচক মনে করেন না। বরং বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকারের চাপটুকু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত দুর্বল কংগ্রেসী সরকারের ওপর এসে পড়লে তারই ভাল সামলাতে হিম-সিম খেতে হতে পারে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে। প্রধানমন্ত্রী সেই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেছেন।

শ্রীমতী গান্ধী উপলব্ধি করেছেন, দেশ চায় কাজ, দলগত আধিপত্য নয়। সামাজিক কাঠামোয় একটা পরিবর্তন সুতরাং আজ দেশের দাবি। প্রবীণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কাজে কাজেই নবীনের কর্মশক্তিকে ওতপ্রোত করার প্রয়োজনটুকু গান্ধী-সরকারের মনে ধরেছে। বলা বাহুল্য, কথাগুলি বহুবার বহু ক্ষেত্রে বিরোধী নেতারা এবং দেশের প্রগতিশীল সংবাদসেবীরা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে এসেছেন। দেশের দাবি বিগত উনিশ বছর কংগ্রেসী আধিপত্যে অবহেলিত ও লাহিত হচ্ছিল। আজ কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মূখে এমত বাণী শুনলে অবাক না হয়ে আশ্চর্য হওয়া গেলে। শাক, এতদিনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গণদাবির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন বলে সন্দেহ হচ্ছে।

শ্রীমতী গান্ধী এ-ও উপলব্ধি করেছেন যে, দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা নিশ্চিত পরিবর্তন প্রয়োজন। ডঃ হিগ্গা সেনের মত বার্তাশ্রবকগ্রহণ করায় তাঁর প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। কিন্তু বড় কথাটা হল, শিক্ষা-সংস্কারটা

কোন কোন প্রশ্নকে স্পর্শ করে শুরু হবে?

শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠান ক্ষেত্রে দেশব্যাপী যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধা বর্তমান শিক্ষা-সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত সেই সব বাধার দ্রুত অপসারণ। শিক্ষার আলোক সবার কাছে সমান সুযোগ-সুবিধাসহ পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।

সুস্থ গণতন্ত্রের জরগান নিভান্তই হাস্যকর ঠেকে এদেশে, বন্ধন দেশের পনের আনা লোককেই অজ্ঞানের অন্ধকারে বাড় গুঁজে চোখে ঝুলি কেঁদে বলবার করতে সের্বি। লক্ষ লক্ষ নিবোধ নিরক্ষর সজীব শব্দাধীর সম্মুখে সুস্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে বারি বক্তৃতা করেন—তাঁরা সভাকে পাশ কাটতে চান। কিন্তু কোন প্রকৃত সংস্কারই এখনতর চালাকির দ্বারা সম্ভব নয়।

আমাদের স্বীকার করা ভালঃ জন-গণের প্রতি আবিচার কোনো ক্ষত্রর দ্বার করে নি বলেই এবং দেশের বিরোধী নেতৃত্ব কৃতিত্বের সলো নির্বাচনের প্রাকালে ব্যাপক গণ-আন্দোলনে একনজ্ঞা অংশ গ্রহণ করায়—এবার অপ্রত্যাশিতভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অসম্ভাব্য দেশের মানদণ্ডকে অতি স্মরণ বিচারবুদ্ধি টেঁটির সামান্যতম সুযোগও দেওয়া হয় নি। হঠাৎ দেশ-বাসী ভীষণ সচেতন হয়ে উঠেছেন বলে হাঁক-ডাক করা তাই অর্থাহীন। এর দ্বারা আমরা আমাদের দুর্বলতা ঢাকাই প্রয়াস পাচ্ছি। আমরা প্রচার করতে চাইছি, রাতারাতি দেশবাসীকে আমরা 'মানুষ' করে তুলেছি; সুতরাং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও কোনো দ্রুতি রাখি নি। কথাটা কিন্তু আদৌ বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।



শ্রীপুনাচা

আমরা বরং শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধার পর্বত সৃষ্টি করে রেখেছি। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী তাই নিদারুণ হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে। ছাত্র-ভর্তি সমস্যা, শিক্ষার ব্যয়ভার, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষান্তে বিশেষ পাঠ্যক্রমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের অভাব—এসব কথা পুনশ্চ ভাবতে হবে। ভাবতে হবে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নি-খরচার প্রত্যেকের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির কথা। প্রতিদিন ব্যয়াদিক্যের চাপে অভিভাবককুল প্রতিটি মহত্ব অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন। অবসরের মহত্ব বলে তাদের কিছুই সপ্তয় নেই। নাবালকদের ওপর, সুতরাং, এদের নজর রাখার সময় নেই। দেশের তাবৎ নাবালকবৃন্দ তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই বিধনছাড়া স্বাধীনতা ভোগ করছে। শহরে আত্যন্তিক গৃহ-সমস্যাও ভবিষ্যৎ নাগরিকবৃন্দকে রাজ-পথে নামিয়ে দিয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ ধরবরে করার পক্ষে এই সমস্যাগুলি অতিক্রম ছায়া বিস্তার করে চলেছে এবং সেই অশুভ ছায়ার অন্ধকারে সমাজ-জীবনে নৈরাজ্য প্রবেশ করতেও শুরু করেছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যে সমৃদ্ধ নয়া সরকার গঠিত হয়েছেন, তাঁরা যদি জনকল্যাণের কর্মসূচী গ্রহণ করে আপনাপন প্রভাব বজায় রাখতে চান তবে তরুণ ভারতের সমস্যাকে অবশ্যই তাদের অগ্রাধিকার দান করতে হবে। অন্যথায় কংগ্রেস আজ যে কথা নিয়ে বাগাড়ম্বর করছে, অর্থাৎ তাঁরাই দেশের স্বাভাবিক মঙ্গল করে যাচ্ছেন, কিন্তু বিপথচালিত জনগণ এই মহৎ কার্যের ধর না রেখে বিরোধী প্রভাবের শিকার হয়েছেন, (পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী সদস্য-দের গত কয়েকদিনের বয়ানে এই মনো-ভাবের উত্তরোত্তর প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে)। এই বাগাড়ম্বরকে তাঁরা যদি সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকেন, তবে কংগ্রেসী সরকারগুলির এবং বিশেষত কেন্দ্রের কর্তব্য হবে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তরুণ ভারতের মনে বিচার-ক্ষমতা সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া।

শ্রীমতী গান্ধী শিক্ষার প্রশ্নটিকে এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রশংসনীয় দূরদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন, অবশ্য যদি আবহমানকালের কংগ্রেসী বক্তব্যের মত তা মৌখিক গুরুত্বমাত্রে পর্যবসিত না হয়।

প্রধানমন্ত্রী অধিক খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কে গতানুগতিকভাবে উৎপাদন বর্ধিত সম্পর্কে উচিত্যমূলক বক্তৃতা রেখেছেন। বলেছেন নয়া বংশধরদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে নয়া সমাজজীবন, যেখানে সমান সুযোগাদিও থাকবে। এইসব বহুশ্রুত বক্তৃতার ওপর

কোন আলোচনার স্থান না রাখাই প্রের।

তবে তিনি যা বলেন নি, অথবা চেপে গেছেন সেগুলি হলঃ নেহরুজীর উল্লেখ থাকলেও তাঁর আধা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ব্যর্থ হয় নি পুনর্বীর। 'কাজে'র কথা থাকলেও, বেকার সমস্যা দূরীকরণে কেন্দ্রের কোন কর্মসূচীর উল্লেখ নেই। দ্রব্যমূল্যের উদ্ভগতি বৃদ্ধিতে হবে বলে ভবিষ্যতের মধ্যে তাকাবার চিরাচরিত রীতিতে বিস্মরণ ঘটে নি, কিন্তু দ্রব্যমূল্য রোধের জন্য সরকার কি সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করতে পারেন তার কোনও আভাস-ইঙ্গিত নেই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশী আর্থিক স্বাধীনতা বলতে কতটুকু তাঁর কী বক্তব্য তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি এবং জীবনের সুন্দর বৃত্তিগুলির বিকাশ কেমন করে সম্ভব করে তোলা হবে তার কোন বাস্তব কর্মপন্থা বা সে কারণ চিন্তার লক্ষণ শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্যে প্রকট হয়ে উঠতে পারে নি। আগেই বলেছি, দিন আনতে দিন কুলোচ্ছে না বলে মানুষ উদ্ব-অন্ত অর্থসম্মানে ব্যাপ্ত। এমতা-বিশ্বাস মানবিক সুন্দর বৃত্তির বিকাশ কেমনভাবে সম্ভব তা বোধগম্য নয়। মানবিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য যেটুকু অবসর এবং সংস্কৃতি চিন্তার জন্য যেটুকু সময় প্রয়োজন তার থেকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নির্মমভাবে বঞ্চিত। সাংস্কৃতিক চিন্তার নামে ধন-বানের নানান ধরণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক জীবনে কেবলমাত্র ব্যাধি ও ফ্যাশানের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং মানবমনের শূন্য ও কল্যাণকামী চিন্তার ও অনুভবের সুযোগে বঞ্চিত অধিকাংশ মানুষই আজ ব্যস্তিক 'এক-চালিশের ফ'। বক্তৃতার মাধ্যমে এই অচলায়তন অপসারণের সম্ভাবনা নেই। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তাই 'বো-বো-বো'র আধিক্যে তাঁর মূল্যবান ভাষণটি মাঠে মারা গেছে। কথায় ও কাজে যাদের গরমিলই সমধিক। তাঁদের হিতৈষ্যদেশ মনকে স্পর্শ করে না। করছেও না।

মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু হয়েছিল ঠিকই, বদলায় নি কংগ্রেসী নেতৃত্বে সুভাষিতাবলী সৃষ্টির প্রচেষ্টা। তগ্রাচ, আশা করা যাক, প্রবীণ-নবীনের একত্র যাত্রায় টাঙানো সমস্যাগুলির যেন কিয়দংশের-ও সুরাহা হয়।

কথায় চিড়ে ভেজে নি
কংগ্রেস-প্রধানের ব্যাখ্যা

আমরা দিনের পর দিন পাতার পর পাতা ভরিয়ে বলে আসছি যে, কথায় ও কাজে কংগ্রেস সরকার সমতা রাখতে

না পারলে কংগ্রেসী ভাবম্বা অন্ধকারের গভীর অতলে তলিয়ে যাবে। শূন্য সাংবাদিকরাই নন, বিরোধী নেতৃবৃন্দ এমন কি অনেক কংগ্রেসী সদস্য ও কংগ্রেস হিতৈষীদের মধ্যেও একথা ধর্নিত-প্রতিধর্নিত হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্পপাত করেন নি। ভবিষ্যৎকে যেন দেওয়াল আলমারিতে ঢাবি বন্ধ করে রেখেছিলেন তাঁরা। হারাবার ভয় ছিল না, এমনি আত্মপ্রত্যয়। কিন্তু সে বিশ্বাস ধোপে টেকে নি। এবারের নির্বাচন কংগ্রেসকে বেশ করে মালুম করিয়ে দিয়েছে যে, অতঃপর 'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হতে হবে'। অন্যথা ত্যাগ করতে হবে জনস্বার্থরক্ষার দায়দায়িত্ব বহন করার উচ্চাভিলাষ। স্বয়ং কংগ্রেস-প্রধান শ্রী কে কামরাজের কাছে এই সত্যের স্বীকৃতি মিলেছে এতদিনে। কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, কংগ্রেস তার প্রতিশ্রুত সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনে ব্যর্থ হয়েছে, পরন্তু দেশকে চরম অর্থনৈতিক হতাশা ও নৈতিক অধঃপাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থাও হারাতে হয়েছে এই সর্বভারতীয় সংগঠনটিকে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও এই স্বীকৃতির ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। এ সবই আশার কথা। চরম দক্ষিণপন্থার ক্রীড়নকে ক্রমশ পর্যবসিত হয়ে কংগ্রেসকে আজ যা হারাতে হয়েছে, তা কেবলমাত্র গদি নয়। হারাতে হয়েছে, জনগণের মনে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের মর্যাদার আসনটি। হারাতে হল গণ-আস্থা ও বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যদি বা সাংগঠনিক কর্মে সংশোধনের স্ভারা কংগ্রেসও ইতি-কর্তব্যে নিষ্ঠার স্ভারা কংগ্রেসী সরকার পুনরায় অর্জন করতে সক্ষম হন, তগ্রাচ একটি দলভ বস্তু-পুনর্লভে একটি বংশধারার জন্য (Generation) কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে হবে; অর্থাৎ জনমনে সেই হারিয়ে-যাওয়া মর্যাদার আসনটি সহজে ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে না। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা সুবিধে এই যে, হাওয়া বড় দ্রুত পাল্টায়। কংগ্রেস যদি আজ থেকে মর্যাদাজনক নেতৃত্বের অপসারণে ও নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্ভারা কর্মনিষ্ঠা ও সত্য-ভাষণের পথ গ্রহণ করে, তবে তার অন্ধকার ভবিষ্যতে পুনরায় রাজ্য সূর্বের আবির্ভাব সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু 'খোড় ইন্ডি খাড়া আর খাড়া বড়ি খোড়' নীতি অনুসৃত হলে কংগ্রেসী ভবিষ্যৎ খতম হতে খুব বেশি দেরি করতে হবে না।

আশা করব কি, কংগ্রেসী নেতৃস্থানীয় আঙ্গ যা উপলব্ধি করলেন, গদির আরামে পুনরায় তা বিস্মৃত হবেন না অতঃপর।

বড় দুঃসময় বড় দুর্বিপাক

সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস কেননভাবে টাল খাচ্ছে, টোল খাচ্ছে, কেন্দ্রে লোক-সভার অধ্যক্ষ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে আরও একবার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত হল।

শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডিকে ইন্দিরা মন্দি-সভায় গ্রহণ করা হয় নি বলে কংগ্রেস-প্রধান শ্রীকামরাজ গভীরভাবে মর্মহিত এবং গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন। সিঁড়িকেট ও কংগ্রেস সভাপতিতে এমনভাবে টোকা মেঝে শ্রীমতী গান্ধী ঝেড়ে ফেললেন দেখে তাঁর পক্ষে আঘাত পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এবার বেশ প্রত্যয়-দৃঢ় ব্যবহারের দ্বারা তাঁর মন্দি-মন্ডলী গঠন করে প্রথমেই তাঁর আগামী নেতৃত্বের সামর্থ্যকে সপ্রমাণিত করেছেন। অতঃপর এলো শ্রীরেড্ডিকে স্পীকার পদটি প্রদানের প্রশ্ন। শ্রীমতী গান্ধী এ প্রশ্নে শ্রীকামরাজের সঙ্গে একমত হয়ে শ্রীরেড্ডিকে তাঁর মনোনীত প্রার্থী করলেন। বোঁকে বসলেম যুগপৎ বিরোধীরা ও কংগ্রেসের একাংশ। রেড্ডি-বিরোধী কংগ্রেসীরা চাইলেন প্রবীণ পার্লামেন্টারিয়ান শ্রীখাদিলকারকে উক্ত পদমর্যাদায় মনোনীত করাতে। বিরোধীরা বললেন, কংগ্রেসের উচিত কোনও নির্দলীয় প্রত্নেয় ব্যক্তিকে ঐ পদটিতে নির্বাচিত করা। শ্রীমতী গান্ধী টললেন না একচুল। বিরোধীরা যত্নভাবে চেয়েছিলেন শ্রীতেমোঁতে বিস্বনাথনকে। কিন্তু কংগ্রেসের নিজের ঘরে ভাঙন থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস পক্ষে শেষ পর্যন্ত শ্রীখাদিলকারের নাম আর তুলতে হল না। শ্রীরেড্ডিকেই একান্তর ভোটার সংখ্যাধিক্যে কংগ্রেস পক্ষ জয়ী করে নিয়ে গেলেন। এর কারণ ব্যাখ্যায় বিরোধী পক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শোনা গেছে। তাঁদের বিশ্বাস গোপন ব্যালটে নির্বাচন হলে বহু কংগ্রেসীও (যারা শ্রীরেড্ডিকে চান না) বিরোধী প্রার্থীর পক্ষে ভোট দান করতেন এবং সে ক্ষেত্রে শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে তাঁর বর্তমান পদমর্যাদায় আসীন করা সম্ভব নাও হতে পারত। বস্তুতপক্ষে, উন্মুক্ত নির্বাচনের প্রকৃতপক্ষে কোন অর্থই হয় না। এর থেকে একটা এক্সারসাইজ বৃকে বিভিন্ন দল দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশমত সদস্যদের দিয়ে সহি করিয়ে সেটাই সাবমিট করলে যা হয়, কিম্বা আদৌ নির্বাচন না করে নেতৃত্বের স্তরে মনোনয়ন দান করলে যেখানে

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্তমান) যা হয়, উন্মুক্ত নির্বাচনও তাই। দলীয় নির্দেশের বাইরে সদস্যগণের মনোবাঞ্ছা প্রকাশের সুযোগ নেই উন্মুক্ত নির্বাচনে। কংগ্রেসী ঘরে সুস্পষ্ট ভাঙন এবং বিরোধীপক্ষে শক্তিশালী সংখ্যাগুরু উন্মুক্ত নির্বাচনের জন্যই কোন কার্যকরী ফলাফল রাখতে সক্ষম হয় নি। বিরোধিগণ গোপন ব্যালট দাবি করেছিলেন। সে দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু শেষ-বেশ বিরোধী দাবিকেও



শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি

শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি একপ্রকার মেনেই নিয়েছেন। স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি ঘোষণা করেন যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর চৌত্রিশ বৎসরের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করছেন। বলা বাহুল্য, এহ বাহ্য।

অধ্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিস্বস্তিতা এবার নিয়ে লোকসভার ইতিহাসে দু'বার ঘটল। প্রথম প্রতিস্বস্তিতা হয় স্বর্গত জি তি মবলস্কর এবং শ্রী এস এস নোরের মধ্যে। শুরুরেই বিসম্বাদ প্রকাশের দ্বারা লোকসভার উন্মোচনপর্ব লক্ষ্য করে অনেকেই হতাশ হয়েছেন। অধ্যক্ষ নির্বাচনকে ঘিরে এবং রাজস্থানের প্রশ্নে কেন্দ্রে উত্তাপ সৃষ্টির আয়োজন করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যয়ের প্রস্তাবনা খুব আশাপ্রদ নয়।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ বর্জন

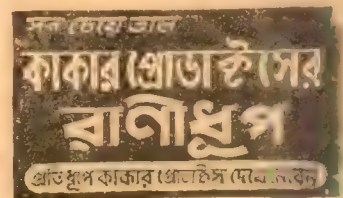
রাজস্থানে অ-কংগ্রেসী মন্দিসভা গঠনের সুযোগ থেকে বিরোধীদের বঞ্চিত

করে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন কার্যে মন্দির প্রতিবাদে বিরোধীরা জোটবদ্ধভাবে যুক্ত-সভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রাজস্থানে অ-কংগ্রেসী মন্দিসভা গঠিত হলে যারা তার কর্ণধার হবেন সেই স্বতন্ত্র দল বিরোধীদের সঙ্গে একত্র আন্দোলনে অংশ নিতে গররাজ। যদিও রাষ্ট্রপতির ভাষণ বর্জনের দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শনের অভিপ্রায় নেই তবে বিরোধীপক্ষ জানিয়েছেন, কয়েকজন নির্দলীয়সহ স্বতন্ত্র দল বিরোধীদের সঙ্গে যোগদান করেন নি। বিরোধীরা অধিবেশন বর্জন করেন রাজস্থানে কংগ্রেসী আন-চারের প্রতিবাদে। এই প্রসঙ্গে জনসম্মুখ নতুন সরকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাবও এনেছেন যার বিতর্ক চলবে দু'দিন ধরে।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে জানান যে, রাজস্থানে অনুরূপ পরিস্থিতির শীঘ্রই রদবদল হবে। এই মুহূর্তে সরকার তাঁদের নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী সমাপ্ত করে উঠতে পারেন নি।

রাষ্ট্রপতি নতুন সরকারে কমিশনী হিসেবে খাদ্য, অর্থনীতি, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিছু দুরাভাস রেখেছেন। যেমন খাদ্যে পরিনির্ভরতার শ্লানি থেকে জাতিতে মৃত্যুদানের জন্য যারা সরকার ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সমর্থন গাইছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আর্থ-নির্ভরতা আনয়ন করতে কুড়ি বছর বয়স্ক কংগ্রেসকে আরও দশ বছর সমর্থন দিতে হবে দেশবাসীকে। এবং মূল্যস্ফোটার নামে আনার জন্য সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ না করে সরকার কম সময়ের মধ্যেই মূল্যভারে নিপীড়িত জনসমাজকে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগের সুযোগ দেবে বলে রাষ্ট্রপতি আশ্বাস দিয়েছেন।

বৈদেশিক নীতির আলোচনা শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণ আলোচনা অংশেই উপস্থাপিত করোঁহ। রাষ্ট্রপতি অধিকতর কোন আলোকপাত করেন নি। রাষ্ট্রপতির ভাষণে অধিকতর কিছু জানাবার উপায় বা জানাবার উপায়ও নেই। তিনি সরকারী নীতির একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন মাত্র।



নতুন মন্ত্রিসভা তাঁদের পূর্বসূরী
অনুসৃত কোন নীতির রদবদল করতে
সক্ষম না। তবে এয়ার কাজ করার যে
আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে তার পূর্য্য সমাধিক।
কেন না কংগ্রেস সরকারকে অতঃপর কথায়
ও কাজে যতদূর সম্ভব সমতা আনতেই
হবে। জাপানের নির্বাচনী রায় সম্পর্কে
শ্রীমতী মাকিনো সরকার 'ফ্রাল্ড' ও 'ফাঁকা'
বুসিয়া আওরাজ 'হুড়িয়ে' মেরজিটির দাপট
শনিবার প্রদর্শন করবেন বলে মনে হয়
না।

আশ্বাস ও আশ্বা বস্তুত রাষ্ট্রপতি
বা প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় আমরা পাই নি,
যদিও আশ্বাস জনমনে যেটুকু
আশার আলোক উদ্দীপ্ত করেছে তার জন্য
গণস্বার্থ দায়ী। কিন্তু যদি পরিবর্তন
ঘটে তবে তার জন্য অভিনন্দন-প্রাপ্ত
জটবে জনগণের কপালে। কংগ্রেসের
কপাল মন্দ। এখন তার সব প্রচেষ্টাই
চাপে পড়ে সম্ভব হল বলে পরিগণিত
হবে এবং সেই গণনাই হবে নির্ভুল।

হরিয়ানা লংকট

কেন্দ্রে দুঃসময় এবং দুর্বিপাকের
প্রথম ধাক্কা নীলম সঞ্জীব রেডিক্কে পার
করে কাটিয়ে উঠেছেন ইন্দিরা গান্ধী,
কিন্তু হরিয়ানায় মুখ্যমন্ত্রী ভগবৎদয়াল
পারেন নি তাঁর মনোনীত প্রার্থী দয়া-
কিষণকে নির্বাচনে বিজয়মালা পরিয়ে
স্পীকারের আসনে সমারূঢ় করতে।
ভগবৎদয়াল মন্ত্রিসভার পরাজয় সূচনাতেই
শুরু, যদিও মুখ্যমন্ত্রী নিজে এ ব্যাপারে
এখনো হতাশ নন, যেমন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও
জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

হরিয়ানায় দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত
ঘটনার জন্য শ্রীভগবৎদয়ালের বিরুদ্ধবাদী
গ্রুপের সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার অনেকাংশে
দায়ী।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা কৌশল
করে এমনভাবে নির্বাচনী ছক সাজিয়ে-
ছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের অনেককেই
পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু
অনেকে নির্বাচনের বরমালাও লাভ করে-
ছিলেন। শ্রীশর্মা অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না
করেই এঁদের ওপর দ্বিতীয় কোপ
বসালেন মন্ত্রিসভা গঠনের সময়। রাদ
পড়ে গেলেন সেই সমুদয় নির্বাচিত
কংগ্রেসী সদস্যবর্গ—যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর
বিরোধী গ্রুপের নায়ক। শর্মা-বিরোধীরা
মুখ্যমন্ত্রীর এবম্বিধ আত্মপর্থা বরদাস্ত
করলেন না। যোগ দিলেন বিরোধীদের
সঙ্গে এবং প্রথম ধাক্কাই তিন ভোটের
মধ্যখানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী শ্রীদয়াকিষণকে
পরাজিত করে স্পীকার নির্বাচিত করলেন
বিরোধী মনোনীত প্রার্থী রাও বীরেন্দ্র
লিংকো। কেন না সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস
দল কমজোরি হয়ে পড়ল তেরজন সদস্য

দলত্যাগী হয়ে বিরোধীপক্ষে যোগদান
করায়। নচেৎ একাশি আসনবিশিষ্ট রাজ্য
কংগ্রেসের কোলে ছিল ৪৮টি আসন।
দয়াকিষণ 'দেখ দেখ' বলে উৎরে যেতেন।
শ্রীশর্মা নিজের হাতে নিজের হাত
কাটলেন। বিরুদ্ধবাদী দলীয়গণকে দলে
না টেনে, সাফ করে দিতে চাইলেন তাঁদের
প্রতিপত্তি। বিপত্তি তাই অনিবার্যরূপে
দেখা দিল। এখন সভায় বারটি আসনের
অধিকারী জনসমূহই বিরোধী দল হিসেবে
সংখ্যাগুরু। কার্যত কিন্তু শর্মা-বিরোধী
কংগ্রেসীরাই বিরোধী দলের নেতৃত্ব করায়ত্ত
করে বসেছেন।

বিস্তৃত আলোচনার প্রবেশের আগে
রাজ্যের বিধানসভার চিত্রটি এখানে তুলে
ধরার প্রয়োজন :

রাজ্য বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা
একাশিটির মধ্যে বিভিন্ন দলের অধিকারে
এসেছে :

দল	কত আসনে প্রার্থী	কত আসনে জয়লাভ	ভোট প্রাপ্তির শতকরা হার
কংগ্রেস—	৮১	৪৮	৪১.৪০
জনসমূহ—	৪৮	১২	১৪.৪৪
রিপাবলিকান—	২৫	২	২.৯২
এস এস পি—	২০	—	০.৪৭
দঃ কম্যুনিষ্ট—	১৩	—	১.০১
স্বতন্ত্র—	১২	৩	০.১৯
বাম কম্যুনিষ্ট—	৭	—	০.৪৪
পি এস পি—	২০	—	০.২১
নির্দলীয়—	৭৮	১৬	০২.৯২

সুতরাং কংগ্রেস থেকে তেরটি বাদ
পড়লে রইল বাকি ষোলটি। বিরোধীরা
তাই শ্রীশর্মার নাছোড় গদি টলাবার জন্য
অনাস্থা প্রস্তুতবের সহায়তা গ্রহণ করবেন



শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা

২৫৭০

আর তাই এ বিষয়ে রাজ্যপাল শ্রীধরম-
বীরের সঙ্গে তাঁদের বাক্যালাপও হয়ে
গেছে। শ্রীধরমবীর বিরোধীদের শক্তি
পরীক্ষার আয়োজন করতেও বলেছেন।

আপোষ প্রচেষ্টা

অন্যপক্ষের কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতারা
চেষ্টা করছেন শর্মা ও শর্মা-বিরোধীদের
মধ্যে একটা রফা বন্দোবস্ত করে গদি
টিকিয়ে রাখতে। শ্রীশর্মাও একটা
আপোষের জন্য আগ্রহী। অন্যথা পথও
নেই।

রিগত শনিবার প্রধানমন্ত্রী ভবনে
শ্রীকমরাজের সভাপতিত্বে হরিয়ানা
বিষয়ক কংগ্রেস পরিষদীয় দলের একটি
আলোচনা বৈঠক বসেছিল। সভায় মুখ্য-
মন্ত্রীকে বিরুদ্ধবাদীদের মন্ত্রিত্ব দিয়ে
সন্তুষ্ট করার উপদেশও নাকি দেওয়া
হয়েছে।

উদ্ভার কারণ

শর্মা-বিরোধীদের উদ্ভার কারণ জানিয়ে
পদত্যাগপত্রে তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে,
শ্রীশর্মাকে দুঃদ্বারার সর্বসম্মতিক্রমে
দলনেতা নির্বাচনের পরও তিনি দলের
কতিপয়ের বিরুদ্ধে যে প্রতিহিংসামূলক
আচরণ করে আসছিলেন তা তাঁরা আর
সহ্য করবেন না। তাঁরা বলেন, শ্রীশর্মা
কৃষক শ্রমিক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে
এবং দলের মধ্যেও তাঁর শৈবত শাসননীতি
ও অপশাসনের দ্বারা ভাঙন সৃষ্টি করে-
ছেন। শ্রীশর্মা হরিয়ানা রাজ্যের প্রতিষ্ঠারও
বিরোধী ছিলেন বলে তাঁরা অভিযোগ
করেন। অভিযোগে একথাও সুস্পষ্ট-
ভাবে উল্লেখ আছে যে, শ্রীশর্মা তাঁর
বিরুদ্ধবাদীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য
নির্বাচনী অপকৌশল অমলম্বন করেন ও
তার ফলেই অনেক জনপ্রিয় কংগ্রেসী
নেতাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। এ বিষয়ে
গ্রন্থন তোলা হলেও কংগ্রেস হাইকমান্ড
কিছুমাত্র কর্পপাত করেনি। এ সমস্ত
কারণেই সদস্যগণ দল থেকে অনন্যোপায়
হয়ে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস হাই-
কমান্ড আর নির্বাচনশূন্য মতিগতি নিয়ে
বলে থাকতে পারবেন বলে মনে হয় না।
কংগ্রেস পাঞ্জাবে পূর্বাভাসে তখনই হয়ে
পড়েছিল। এখন বিভক্ত পাঞ্জাব মুখ
ফিরিয়ে নিয়েছে। হরিয়ানায় গদি
ছাড়লে হারানোর দশটি ছেলের হাত
কংগ্রেসী রাজ্যপাল একে একে গদিভিত্তিক
দাবি-দাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় একে একে
খসে পড়তে থাকবে।

(১৯।৩।৬৭)

জেমস মেরেডিথের সম্মতি ফিরেছে মনে হচ্ছে। কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত আদম পাওয়েলের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যে সিদ্ধান্ত তিনি এর আগে নিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার করেছেন। সারা দেশ জুড়ে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে বিরূপ সমালোচনার ঝড় বইছে তা থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, পাওয়েলের বিরুদ্ধতা করার অর্থ নিগো সমাজে তাঁর যেটুকু জনপ্রিয়তা আছে, তা সম্পূর্ণ খোয়ানো।

কংগ্রেস থেকে নিগোদের প্রিয় নেতা আদম পাওয়েলের সদস্যপদ হরণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নিগো অঞ্চল হার্লেমের অবিসম্বাদী নেতা পাওয়েল। বারো বার তিনি নিউ ইয়র্কের এই কেন্দ্র থেকে সেনেটে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। কিন্তু হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস কিছুদিন আগে পাওয়েলের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব নিয়োজিত হয়ে, পাওয়েলের সদস্যপদ খারিজ করা হোক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, পাওয়েল হাউসের শিক্ষা ও শ্রম কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করেছেন এবং প্রচুর অর্থ নিজের লোককে বা বোনামীতে নিজে আত্মসাৎ করেছেন। অভিযোগের তদন্ত করার জন্যে ওয়েন হেজ-এর নেতৃত্বে যে সাব-কমিটি নিযুক্ত হয়, তাঁরাও এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে অর্থের অপব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ সত্য। এরই ওপর ভিত্তি করে পাওয়েলের জরিমানা হয় এবং সেনেট থেকে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া হয়।

আদম পাওয়েল অবশ্য ছাড়বার পাঠ নন। কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি মামলা রুজু করেছেন এবং একটাতে জিতেছেনও। আর একটি মামলা এখনো চলছে। একথা সত্য যে, পাওয়েলের বিরুদ্ধে কিছু বিক্ষোভ বেশ কিছুদিন থেকেই ধর্মারিত হয়ে উঠছিল। পাওয়েল সরকারী অর্থ নিয়ে চিনিমিনি খেলছেন, এ সম্পর্কে অনেকের মনেই ছিল। কিন্তু এ অপরাধে তাঁর সদস্যপদ খারিজ করাকেও অনেকেই বাড়াবাড়ি বলে মনে করেছেন। যদিও কংগ্রেসে ৩০৭-১১৬ ভোটে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করার পদতাল নেওয়া হয়, নিগো সমাজ তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। পাওয়েল তো বলেছেন যে, তিনি নিগো বলেই তাঁর এ শাসিত পেতে হল, কংগ্রেসে সদস্য বলে নয়।

যদিও পাওয়েলের সদস্যপদ আর রইল না, তবুও তিনি মনে করেন যে আবার নির্বাচনপ্রার্থী হলে তাঁর জয়লাভ কেউ



আন্তর্জাতিক

মেরেডিথ (বামে) ও পাওয়েল (দক্ষিণে)

ঠেকাতে পারে না। কিন্তু জেমস মেরেডিথ যেন নিজের সম্পর্কে একটু উচ্চাশাই পোষণ করেছিলেন। পাওয়েলের বহিস্করণের প্রতিবাদ তিনিও করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নাকি মনে করেছিলেন যে, পাওয়েল ছাড়াও দেশে আরও লোক আছেন যারা নিগোদের স্বার্থে কথা বলতে পারেন তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। নিগোদের সে সুযোগ দেওয়া উচিত। তাঁর জাতিমত হল, এককালে পাওয়েলের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ছিল বটে, কিন্তু এখন তিনি তা হারিয়েছেন। মেরেডিথ বলেছিলেন একটি অন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে কোনো বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে পারে না। কেবল নিগো হওয়ার জন্যেই এবং কংগ্রেসের

অভিযোগ অগ্রাহ্য করে পাওয়েলকে নির্বাচিত করা সমীচীন হবে না। নিগোদের আরও কিছু পাওয়া উচিত।

কিন্তু মেরেডিথ, যিনি মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নিগো ছাত্র হিসেবে প্রবেশাধিকার অর্জন করে সংবাদপত্রের শিরোনামা দখল করেছিলেন, বোধ হয় নিজের প্রার্থীপদ সম্পর্কে নিজেই নিঃসন্দেহ ছিলেন না। কারণ, ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য হয়েই তিনি এককাল কাজ করে এসেছেন। কিন্তু সে-দলের মনোনিবেশ যখন তিনি পেলেন না (পাওয়েল নিজেই যে সে-দল প্রার্থী), তখন নিজেই নিজেকে স্বতন্ত্র ডেমোক্র্যাট বলে পরিচয় দিলেন। তারপর যখন রিপাবলিকান দলের একজন নিম্নস্তরের নেতার আহ্বান পেলেন তখন বোধ্যা করলেন যে, রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবেই তিনি পাওয়েলের বিরুদ্ধে লড়বেন। কিন্তু রিপাবলিকান দলের উচ্চ-স্তরের নেতারা তাঁর প্রার্থীপদ অনুমোদন করেন নি।

তার চেয়েও বড় কথা তাঁর নির্বাচনপ্রার্থী হবার কথা শুনে ইতিমধ্যে দেশে সমালোচনার বান ডাকলো। 'মেরেডিথ আবার কে'—বলে পাওয়েল তাঁকে বিদ্রূপ করেছেন। আরও বলেছেন, মেরেডিথের যখন ইজের পাল্টে দিতে হতো আমি তখন হার্লেমের রাস্তায় রাস্তায় পিকট করতাম।' কাজেই এহেন শিশু তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে দেখে পাওয়েল কৌতুক বোধই করেছিলেন। সমস্ত নিগো নেতা মার্টিন লুথার কিং, রয় উইলকিন্স প্রমুখ প্রত্যেকেই মেরেডিথের কাজের নিন্দা করেছেন। প্রখ্যাত নিগো



রয় উইলকিন্স

স্বাক্ষর রুড রাউন বলেছিলেন: 'মেরেডিথ একটা গাথা, একটা আস্ত গাথা।' আরও বলা হয়েছিল কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নিগ্রো এ ব্যাপারে নিজেকে জড়িতে পারে না। রুড উইলকিন্স এই বলে মেরেডিথের নিন্দা করেছেন যে, 'রাজনীতির ক্ষেত্রে মেরেডিথ বলে কারোর নাম ভেে আমি কখনো শুনিনি।' পাওয়েল নিজেও বলেছেন যে, মেরেডিথ হলেন আসলে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিনিধি তাই সে আমার বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে। ওর নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে ইত্যাদি।

নিগ্রোদের মধ্যে পাওয়েলের জনপ্রিয়তা স্বীকা করার মত। যতই বাই করুন—নিগ্রোদের কাছে তিনি নিষ্পাপ, নিরপরাধ। কাজেই নির্বাচনে আবার জয়ী হয়ে তিনি যে সেনেটে আসবেন এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পাওয়েল নিজেও তা জানেন, সে-জন্যই তিনি বলেছেন, আমার কোন নির্বাচনী প্রচারণা লাগবে না।

ইন্দোনেশিয়া :

বেচারার সুকর্ন! চিরদিন প্রেসিডেন্টের সিঁদিতে থাকতে চেয়েছিলেন—নিজেকে চিরদিনের প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করে-

ছি—১৯৭৭ সালে। কিন্তু ১০ বছরের মধ্যে কি নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল তাঁর জীবনে। আজ প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সম্মান পাবার অধিকারও তাঁর নেই, "ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের মহান নেতা" বলেও তাঁকে কেউ আর শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে না। সুকর্ন কেবল এজিনীয়ার, ডক্টর। বাও কর্ন! ভাগ্যের পরিহাস আর কাকে বলে!

অবশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে এ ধরনের উত্থান-পতন হামেশাই চলেছে। আজ যিনি রাষ্ট্রের কর্তব্যর, কালই তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। সুকর্ন রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষিত হন নি, কিন্তু এখানকার গণ-উপদ্রোহ কংগ্রেসের চোখে তিনি বিশ্বাসহন্তা। ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের নায়ক তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ প্রতিলম্ব। স্বভাবতই, প্রেসিডেন্টের সমস্ত ক্ষমতাই তিনি হারিয়েছেন, সমস্ত খেতাবও। তাঁর জায়গায় এখন জেনারেল সুহর্তো দেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট।

জেনারেল সুহর্তো একজন দক্ষ সৈনিকই নন, কূটনীতিতেও যে তিনি হাত পাকিয়েছেন কংগ্রেসের অধিবেশনে তারই অদ্রান্ত স্মারক রাখলেন তিনি। তিনি মনের স্থৈর্য হারান নি হাজারো

প্রয়োচনা সত্ত্বেও। সুকর্ন-সমর্থকেরা নেতার কোনরকম অবমাননাকে সহজভাবে নেবে না, অন্যদিকে ছাত্রেরা সুকর্নকে গর্দন-ছাড়া করবেই। এ দুটো অবস্থাই সত্যি এবং জেনারেল সুহর্তো দুটোর সংগেই মোকাবিলা করেছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতা হারিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে তাঁকে ব্যর্থ অভিযানের সংগে জড়িত থাকার অপরাধে এখনি কাঠগড়ায় টেনে আনাও হয় নি। কারণ জেনারেল সুহর্তো জানতেন যে, সুকর্নকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অর্থ হলো সুকর্নপন্থীদের ক্ষেপিয়ে তোলা এবং গৃহযুদ্ধ না হোক দাঙ্গাহাঙ্গামার পথ প্রশস্ত করা। সুহর্তো যে হিসেবে ভুল করেন নি তার প্রমাণ মধ্য জাভাতে ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। এখানে সমস্ত সুকর্নপন্থীদের সংগে এক সংঘর্ষে কমিউনিস্ট বলে পরিচিত ৮০ জন লোক সেনাবাহিনীর গুলীতে নিহত হয়েছে অন্যদিকে ছাত্রেরা এবং জেনারেল নাসদুখ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সুকর্ন-বিরোধিতা এর প্রবল যে তাকে যদি "অক্ষত" বা অপরিবর্তিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে ছাত্রেরাও দেশে একটা-না-একটা গোলমালে মেতে থাকবে।

সেজন্যই কংগ্রেসে ভাষণ দেবার সময় জেনারেল সুহর্তোকে অনেক ভেবে-চিন্তে বলতে হয়েছে। কংগ্রেসে তাঁর বাক্যমত দেখে মার্ক এন্টনির কথাই মনে পড়ে যাবার কথা। সুহর্তো গোড়া থেকেই সুকর্নের বিরুদ্ধে চরম কোন পন্থা নেবার বিরোধী, তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ারই পক্ষপাতী তিনি। কংগ্রেসের বক্তৃতায়ও তিনি বললেন যে, সুকর্নকে প্রেসিডেন্টের পদে কেউ রাখতে চায় না, সেটা ঠিকও হবে না। কিন্তু তাই বলে দেশে গৃহযুদ্ধ আমন্ত্রণ করাও কোন কাজের কথা নয়। সুহর্তোর ভাষণে মৃদু হলো প্রোতুবন্দ। সুকর্নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সমস্ত ভার দেওয়া হলো জেনারেল সুহর্তোর ওপর। এটাই চেয়েছিলেন তিনি।

ফলে সুকর্ন দেশের প্রেসিডেন্ট আর নন। তাঁর সমস্ত ক্ষমতা অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহর্তো নিয়েছেন, একথাও সত্যি। কিন্তু সুকর্ন সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত যে সুহর্তো কবে করাবেন, তার কি ঠিক আছে? এর অর্থ, সুকর্নকে আর ঘাঁটাতে উৎসাহবোধ করছেন না তিনি। সুকর্ন আজ প্রেসিডেন্ট নেই, কিন্তু আপাতত তাঁর বিপদের বিশেষ কারণও নেই। ইতিহাসের বস্তুতে পরিণত হলেন সুকর্ন, স্থান হলো তাঁর হরতো বাদুঘরে, কিন্তু পেছনে যে ইতিহাস রেখে গেলেন তা কোনদিনই মুছেবে না।



বেচারার সুকর্ন

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

খ্রীস্টাব্দ ১৭৮৩

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(তৃতীয় অধ্যায়)
তেলিরবাগের দাশ গোষ্ঠী

তেলিরবাগের ভূঁইয়ারা যদুনন্দন বংশ-
জাত মৌদগল্য গোত্রীয় বৈদ্যসন্তান।
এঁদের পদবী 'দাসগুপ্ত'। বেশির ভাগ
বাবুসাই পুরা 'দাসগুপ্ত' পদবী-ই লিখে
ধাকেন, তবে কেউ কেউ 'গুপ্ত'টি উহা রেখে
কেবলমাত্র 'দাস'-ই লেখেন। এইখানে বলা
আবশ্যক যে প্রথমে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র
বিদ্যারত্নের এবং আরো পরে স্বর্গীয়
কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে
বৈদ্যগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি কর-
বার যে আন্দোলন সূত্র করেছিলেন সেই
বৈদ্যব্রাহ্মণ আন্দোলনের আগে 'দাসগুপ্ত'
পদবীধারী বৈদ্যগণ নিজেদের পদবীর
মানান দস্ত 'স' দিয়েই করতেন অর্থাৎ
'দাসগুপ্ত' বা 'দাস' লিখতেন। ওই আন্দো-
লনের সমস্ত থেকেই 'দাসগুপ্ত' বা 'দাস'
পদবী বেশির ভাগ বৈদ্যসন্তানই তালব্য
'শ' দিয়ে 'দাশগুপ্ত' বা 'দাশ' লিখতে
সুরু করেন। তেলিরবাগের বাবুদের
মধ্যে অনেকেই সেই হতে 'শ' দিয়ে 'দাশ-
গুপ্ত' বা 'দাশ' লিখে আসছেন। কেউ কেউ
—আমি তার মধ্যে একজন—পূর্বনো
অভ্যাসমতে দস্ত 'স' দিয়েই 'দাস' লিখে
ধাকেন এবং 'গুপ্ত' কথাটাও পদবীর সঙ্গে
ধাবহার করেন না। এই বংশ বয়সে সে
পূর্বনো অভ্যাস বদলান সহজসাধ্য নয়।
তবে এই জীবনকাহিনীতে তেলিরবাগ
বৈদ্যগোষ্ঠী সম্পর্কে বেশির ভাগ জ্ঞাতি-
দের মতানুসারে তালব্য 'শ' দিয়েই 'দাশ'
লিখব যেমন লিখেছি এ অধ্যায়ের মাথায়।
যদুনন্দন বংশজাত 'দাশ' গোষ্ঠীর
সন্তানরা কোন সময়ে, কেমন করে তেলি-
ব-বাগ গ্রামে বসতি করতে এসেছিলেন তা
সঠিক এখনো জানি না। বহুকাল পূর্বে
শুনিয়েছিলাম—কোথায় এবং কার কাছে তা
মনে নেই—যে মহারাজা রাজকুলত সেনের
আমলে তাঁর এক বোন কি অন্য কোন এক

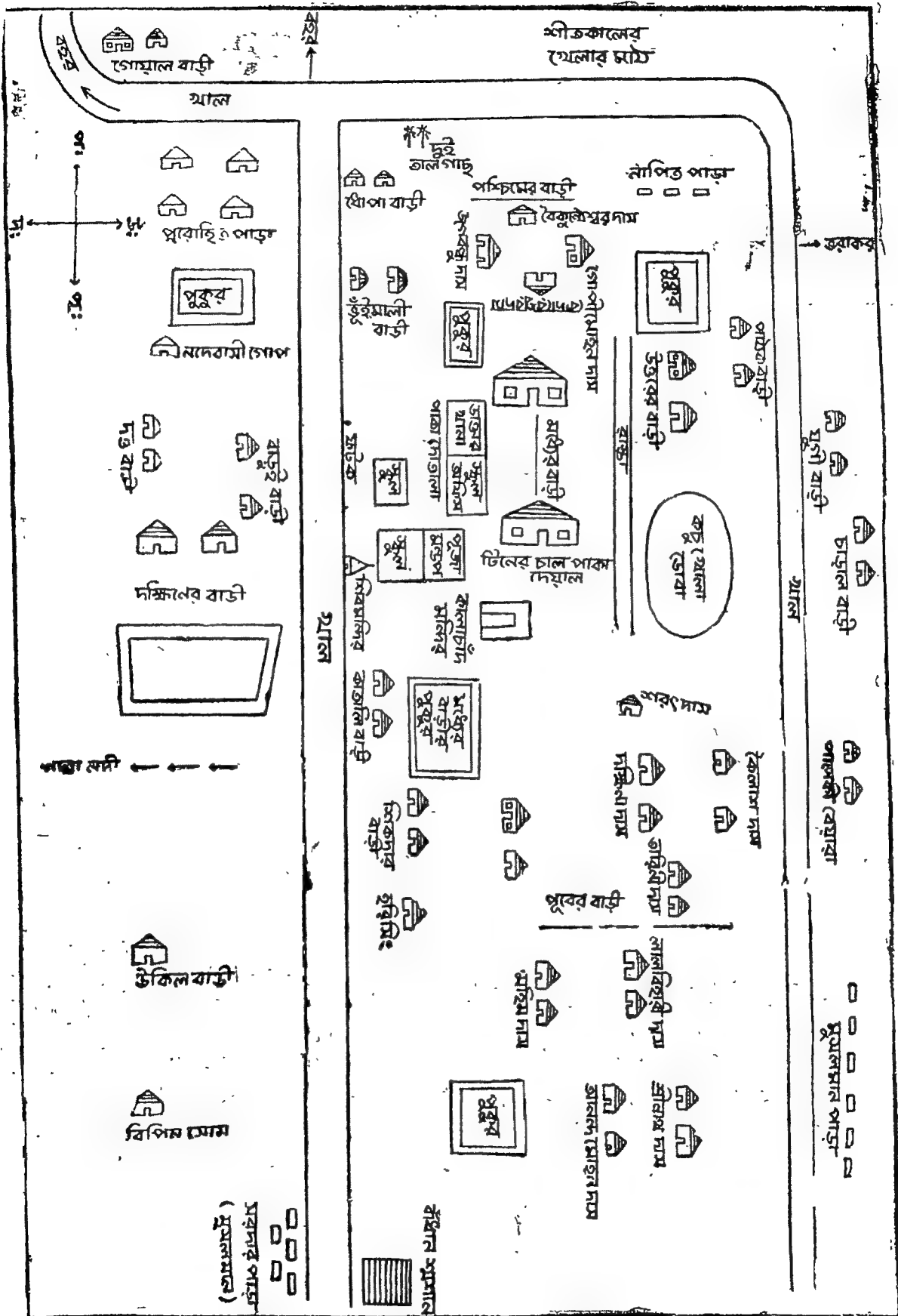
আজ্ঞার সঙ্গে যদুনন্দন বংশের কোন
এক সন্তানের বিবাহ হয় এবং সেই
বিবাহের ষোড়শবর্ষ নাকি তেলিরবাগ
গ্রামখানিকে নতুন জামাইকে দান করা হয়।
সেই থেকে নাকি দাশবাবুরা তেলিরবাগে
আস্থানা স্থাপন করলেন পুরোহিত,
সিকদারাদি সাংগোপাঙ্গ নিয়ে। এই জীবন-
কাহিনী লিখবার আগে এই শোনা কথাটাকে
যাচাই করে দেখবার চেষ্টা করেছি কিন্তু
সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে। কথাটা সত্য
হলে তেলিরবাগের বাবুদের এই গ্রামে
আসার আগে যে অন্য কোথাও একটা
আস্থানা ছিল তা স্বীকার করতেই হয়।
কিন্তু সে পূর্বনো আস্থানকে কোন হৃদিসই
পাওয়া গেল না। এই শোনা কথা স্বপক্ষে
কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেল,
কোনো দলিলে, কি বইয়ে কিংবা নির্ভ-
যোগ্য কোনো ব্যক্তির মৌখিক ভাষণে।
এমতাবস্থায় শোনা কথাটাকে সত্যতা সম্বন্ধে
সন্দেহের ষষ্ঠেট অবকাশ আছে বলে এ
বিষয়ে গবেষণা করে সম্ভব নষ্ট করা
নিঃপ্রয়োজন মনে করি।

তেলিরবাগের দাশ গোষ্ঠী-ই ছিলেন
সেই গ্রামের ভূঁইয়া বা জমিদার। এই বংশ
যেমন বাড়তে লাগল বংশের বিভিন্ন শাখা
তেলিরবাগ গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন দিকে আলাদা
বাড়ি তুলে বসতি করতে লাগলেন। এই
রকম করে এই বংশের সন্তানরা গ্রামের
পাঁচ দিকে ছড়িয়ে পড়েন এবং সেই মূল
পাঁচটি বাড়ির নাম ছিল—মধ্যের বাড়ি,
দক্ষিণের বাড়ি, পশ্চিমের বাড়ি, উত্তরের
বাড়ি ও পূর্বের বাড়ি। যদুনন্দন বংশের
যে করাট শাখা গ্রামের পূর্ব দিকে বসতি
করেছিলেন তাঁদের সবগুলি বাড়িকেই
সমষ্টিগতভাবে 'পূর্বের বাড়ি' আখ্যায়
মখোই ধরে নিতে হবে। প্রত্যেকটি বাড়িতেই
আবার একাধিক ভিটা ছিল। এর পরের
অধ্যায়ে সেই সব বাড়ির কর্তাদের ও
তাঁদের বংশধরদের কথা বলব।

মধ্যের বাড়ির মেজবাবু দুর্গামোহনের

কনিষ্ঠপুত্র জ্যোতিষরত্নের উৎসাহে ও
চেষ্টায় তেলিরবাগের দাশ গোষ্ঠীর একটি
বংশাবলী বহুদিন আগে তৈরি করা হয়ে-
ছিল। পরে সেটিকে পরিশোধিত ববেন
দক্ষিণের বাড়ির শ্রীশব্রজ। ইদানীং সেই
বংশাবলীটিকে পবিবর্তিত করে ১৯৬০
সাল পর্যন্ত টেনে এসেছেন পূর্বের বাড়ির
উষানাথ। সেই সম্পূর্ণ বংশাবলী একটি
কপি এই জীবনকাহিনীর পরিশিষ্টে সন্নি-
বেশিত করা গেল উষানাথের অনুমতি-
ক্রমে। সেই বংশাবলী দৃষ্টে জানা যাবে
এই বংশ পান্থ নামক এক ব্যক্তি থেকে
উদ্ভূত। সেই আদিপুরুষ পান্থ থেকে
স্বাক্ষর পুরুষ নিচে এক সন্তান ছিলেন
হৃদয়ানন্দ নামে। সেই হৃদয়ানন্দের
দুইটি সংস্কার ছিল। প্রথম পুত্রের গর্ভে
জন্মে দুটি সন্তান—যদুনন্দন ও জগদা-
নন্দ। এঁরা দুজন এ বংশতালিকার
দ্বয়োদশ পুরুষ বলে বর্ণিত হয়েছেন।
যদুনন্দনের উত্তরবংশীয়েবা বসতি কবতেন
বিক্রমপুরে এবং জগদানন্দের বংশধররা
গেলেন মানিকগঞ্জে। হৃদয়ানন্দেব দ্বিতীয়
পুত্রের গর্ভে যে একটি পুত্রসন্তান জন্মে
তাঁর নাম ছিল বতিনাথ। আগেই বলেছি
তেলিরবাগের দাশ গোষ্ঠী যদুনন্দনের
বংশজাত। সুতরাং জগদানন্দ ও বতিনাথ
অথবা তাঁদের বংশধরদের কথা এখানে
আর উল্লেখ করা নিঃপ্রয়োজন, কেন না এই
জীবনকাহিনীর সঙ্গে তাঁদের কোনো
সম্পর্ক-ই নেই। তা ছাড়া তেলিরবাগের
সর্বত্র দাশ গোষ্ঠীভূক্ত জ্ঞাতিবর্গেরও
অনেকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এবং বনিষ্ঠ
পরিচয় হয় নি। তেলিরবাগ গ্রামে কিংবা
অন্যত্র যে সকল জ্ঞাতিদের দেখেছি বা
যাঁদের কথা খবর বিবস্তসূত্রে জেনেছি
এবং যাঁদের চরিত্রের উৎকর্ষ আমাব মানস-
পটে ছায়াপাত কবেছে আমার এই জীবন-
কাহিনীতে তাঁদেরই কথা আমি বলে যাব।

আগেই বলেছি তেলিরবাগের বাবু-
বাগের পাঁচ দিকে আলাদা বাড়ি কবে



বসতি করেছিলেন। সেই পাঁচ বাড়ির মধ্যে মধ্যের বাড়ি, দক্ষিণের বাড়ি ও পশ্চিমের বাড়ির বাবুরা জ্ঞাতি হিসেবে উত্তরের ও পূর্বের বাড়ির বাবুদের চেয়ে ঢের বেশি নিকট সম্পর্কীয় ছিলেন এবং আসা-যাওয়ায় ও মেলামেশায় তারা বেশি ঘনিষ্ঠই ছিলেন। এই তিন বাড়ির বাবুদের সম্পর্কটা সহজে বোঝাবার জন্যে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত বৃহৎ বংশাবলী থেকে কিছু বাদসাদ দিয়ে একটি অপ্রেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত বংশাবলী সঙ্কলন করে পাশের পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। এই সংক্ষিপ্ত বংশাবলী থেকে দেখা যাবে যে, যদুনন্দনের অশ্বতন পাঁচ পুরুষ পর্বারে ছিলেন একজন যার নাম ছিল রমানাথ দাশ। বড় বংশাবলীতে কথিত আমাদের আদিপুরুষ পান্থ থেকে এই রমানাথ দাশ ছিলেন অষ্টাদশ পুরুষ নিচে এবং যদুনন্দন থেকে ইনি পাঁচ পুরুষ অশ্বতন ছিলেন। বড় বংশাবলী থেকে আরো জানা যাবে যে, এই রমানাথ দাশের ছিল ছয় পুত্র এবং তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ পুত্রের বংশালোপ পেয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তান ছিলেন রতনকৃষ্ণ ও চন্দ্রনাথ। শেষোক্ত চন্দ্রনাথের ছিল দুই ছেলে—কাশীশ্বর ও বীরেশ্বর। রমানাথের পৌত্র এবং চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র কাশীশ্বর ও তাঁর সন্তানেরা গেলেন মধ্যের বাড়িতে এবং কাশীশ্বরের কনিষ্ঠ সহোদর বীরেশ্বর বাস বাঁধলেন দক্ষিণের বাড়িতে। রমানাথের পুত্র রতনকৃষ্ণের চারিটি পুত্র জগবন্ধু, গোপীমোহন, কেদারেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বর গেলেন পশ্চিমের বাড়ির চার ভিত্তি। প্রথমে এই তিন বাড়ির বাবুদের কথা বলে তারপর উত্তরের ও পূর্বের বাড়ির কর্তাদের ও তাঁদের সন্তানদের কথা বলব।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, তেলিরবাগে বাবুরা নামেই মাত্র ডুইগ্রা ছিলেন। জমিদারী তাঁদের খুব বেশি ছিল না। গ্রামের আশেপাশে সংলগ্ন কিছু কিছু ক্ষেতখামার ছিল বটে, তবে জমিদারী বলতে যা বোঝায় তেলিরবাগে দাশেরের তা ছিল না। যেটুকু ক্ষেতখামার ছিল তাতে কয়েক ঘর প্রজা বাস করত এবং চাষের উপযুক্ত জমিতে সেই সব প্রজারাই ধান, পাট, খেসারী ইত্যাদি কৃষিপণ্য উৎপাদন করত। বাবুরা নিজে কখনো হাতে লাঙল নিয়ে চাষ কবেছেন বলে শুনিনি। চাষ করত মুসলমান ও চাঁড়াল প্রজারাই। জমি বিলি করা ফলে যে মুসলমান আসত আদারী খাজনা থেকে তাতে বাবুদের সংসার চলত না। বড় জোর দোল দুর্গোৎসবে খচাড়া কুলিয়ে যেত কোনমতে। যদি পূজাপার্বণে গাঁট থেকে

টাকা বের করে দিতে না হত তবেই বাবুরা খুশি থাকতেন। নিজ নিজ সংসারের ব্যয়ভার বহন করবার উদ্দেশ্যে তারা বাইরে যেত বাধ্য হতেন টাকা রোজগারের খান্দায়। অনেকে কর্মস্বত্বেই নতুন বাসা বেঁধে হস্তত রয়েই গেছেন। বাইরে টাকা রোজগার করা সেকালেও খুব সহজসাধ্য ছিল না। এই জন্যে তেলিরবাগের বাবুরা লেখাপড়ার দিকে খুব মনোযোগী হতেন এবং তাঁদের অর্জিত বিদ্যা ও ঈশ্বরদত্ত মেধার জোরে তারা নিজ নিজ কর্মজীবনে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বিক্রমপুরবাসীদের স্বাভাবিক অধ্যবসায় ও অদম্য সংসাহনের বলে তারা কঠিন প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পেরেছিলেন। পরে পরিচ্ছেদগুলিতে তেলিরবাগের বাবুদের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী পড়লেই অতি অনায়াসে বোঝা যাবে যে, কিরকম শিক্ষিত, বিদ্বান ও মেধাবী পুরুষ তারা ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে বিক্রমপুরবাসীদের সকল সদগুণরাজিই ফুটে উঠেছিল এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রবাসী হলেও তারা যে বিক্রমপুরস্থ তেলিরবাগ গ্রামের যদুনন্দন বংশজাত খ্যাতনামা দাশ গোষ্ঠীর সন্তান এ আভিজাত্যভিমান তারা কখনোই কিস্মত হন নি।

(চতুর্থ অধ্যায়)

মধ্যের বাড়ি

(১)

রমানাথ দাশের পঞ্চম পুত্র চন্দ্রনাথের বড় ছেলে কাশীশ্বর ছিলেন তেলিরবাগের মধ্যের বাড়ির কর্তামশায়। তিনি বেশ উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তিনি ওকালতী পাশ করে ভাষ্যবেষণ করতে বরিশালের সদর কোর্টে গিয়ে ওকালতী সুরু করলেন। আচর্যেই তাঁর সেই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তাঁর অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহে। কালক্রমে তিনি বরিশালের সরকারী ডাকিলের পদে নিয়োজিত হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে কার্য করে গেছেন। ওকালতী করে তিনি বেশ পসার জমিয়েছিলেন এবং প্রভূত অর্থোপার্জন করে বিবশাল অগুণে কিছু বিষয় সম্পত্তিও কিনেছিলেন। কাশীশ্বর খুবই অতিথিবৎসল ছিলেন। নিজ গ্রামে তেলিরবাগে আপন গৃহে বিনা আড়ম্বরে কিন্তু অভ্যন্ত নিষ্ঠাসহকায়ে তিনি একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র কালীমোহন ও দুর্গামোহন আজীবন সেই অতিথিশালার কাজ চালিয়ে গেছেন এবং তাঁদের মৃত্যুর পর যাতে সে পূন্যকর্ম অব্যাহত থাকে সে-

জন্যে বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন। আমিও এই অতিথিশালা চান্দ দেখেছি শৈশবে।

কালক্রমে মধ্যের বাড়ির বাবুরা সঙ্গতিপন্ন হয়ে উঠলে তারা তাঁদের বসতিবাড়িকে চুন সুরকি ইটো পাক দ্বিতল বাড়ি করে নিয়েছিলেন এই দোতলা বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা থেকে অদূরে দেখা যেত পদ্মানদী ও তাতে ভ্রাম্যমাণ পালতোলা জেলে নৌকা ও সময় সময় কোম্পানীর যাত্রী ও মালবাহী স্টীমারে চলা বড় বড় জাহাজ। সেই দোতলা বাড়ির দক্ষিণে ছিল প্রকাণ্ড উঠান এবং বারের মধ্যের খাল পর্যন্ত বিস্তৃত। খালপাড়ের ছিল একটি মঠ বা সিনেমিন্স। সামনের উঠানের পূর্বদিকে ছিল পূজামন্ডপ এবং উঠানের ডাইনে ও বাঁয়ে পড়ে হয়েছিল স্কুলের বড় বড় গোট দুই টিনের চালওয়ালা ঘর। দোতলার উত্তরে ছিল অনেকখানি জমি একেবারে উত্তরে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত। উত্তর-পূর্ব কোণায় ছিল একটা পাকা পরখানা। উত্তরদিকের এই বিরাট জমির উত্তর দিকে ছিল দুটি পাকা দেওয়ালে উপর টিনের চাল দেওয়া দুটি প্রকাণ্ড ঘর। আমি ছোট বয়সে যখন তেলিরবাগে থাকতাম তখন সেই দুটি ঘরের পশ্চিমের ঘরটিতে থাকতেন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার অখিলচন্দ্র সেন মশায়। দোতলার পূর্বে একটি পাকা ঠাকুর দাঙ্গা ছিল গৃহদেবতা কালচাঁদ বিগ্রহের নাট্যমন্দির। সেই ঠাকুর দালান ছাড়িয়ে আরে পূর্বে ছিল পাকা মান বাঁধান ঘাটওয়ালা প্রশস্ত দীঘি যাকে বলা হত 'মৈথোর বাড়ির পুঁথের'। আশেপাশের সব বাড়ির গাঙ্গী জল সরবরাহ হত এই পুঁথুর থেকে।

কাশীশ্বরের ছিল তিন ছেলে—কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন। পিতৃব্য চন্দ্রনাথের অগ্রজ ভুবনমোহন দাশের জ্যেষ্ঠপুত্র জগবন্ধু নিঃসন্তান ছিলেন। সেই পিতৃব্য পুত্র জগবন্ধুর বংশরক্ষার্থে কাশীশ্বর তাঁর আপন কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহনকে জগবন্ধুর কোটো দত্তকপুত্ররূপে দান করেন। এই দত্তকসূত্রে আইনত ভুবনমোহন মধ্যের বাড়ি থেকে পশ্চিমের বাড়িতে গেলেন বটে, তবু রক্তের বন্ধন ছিল হয় নি। তিন ভাইয়ে বরাবরই খুব কাছাকাছি এবং হৃদয়তার সঙ্গেই জীবনযাপন করে গেছেন।

কাশীশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র কালীমোহন জন্মগ্রহণ করেন ১৭৬০ শকাব্দের ১৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবারে। তাঁর প্রাথমিক লেখাপড়া স্বগ্রাম তেলিরবাগেই গুরুদ্বারদের কাছেই হয়েছিল। পরে কলকাতার হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন শেষ করে আইন পরীক্ষার পাশ করে তিনি

তেজিহবাগের মধ্যে বাডি, দক্ষিণের বাডি ও পশ্চিমের বাড়ির বাবদের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী

পাষ (১)
 ঋনন্দন ১৩/
 শিবরাম (১৪)
 ব্রাহ্মবিন (১৫)
 কুরুদাম (১৬)
 শ্যামরাম (১৭)
 রমানাথ (১৮)

রতন কৃষ্ণ (১৯)

চন্দ্রনাথ (১৯)

জগবন্ধু (২০)

গোপীমোহন (২০)

কোদারেশ্বর (২০)

বৈকুণ্ঠেশ্বর (২০)

ভুবনমোহন (২১)

রাধানন্দ (২১)

ভক্তি (২১)

কলিত (২২)

অবনী (২২)

স্বরেন (২২)

চিত্ররঞ্জন ধর্ম্ম বসন্ত (২২) (২২) (২২)

স্বামী নিশীথ প্রদোষ (২২) (২২) (২২)

স্বামী স্ববোধ কৃষ্ণ (২২) (২২) (২২)

নলিনী আশু রবি (২২) (২২) (২২)

সুনীল (২২) (২২) (২২)

সুকুমার নীহার প্রভা (২২) (২২) (২২)

কানীশ্বর (২০)

বীরেশ্বর (২০)

কালীমোহন (২১)

দুর্গামোহন (২১)

ভুবনমোহন (২১)

ক্ষিতি (২২)

উপেন্দ্র (২২)

রাধামোহন (২২)

জ্ঞানেন্দ্র (২২)

মনোরঞ্জন নিভারঞ্জন বসন্ত (২২) (২২) (২২)

নাত্য সতীশ জ্যোতিষ (২২) (২২) (২২)

চিত্র ধর্ম্ম বসন্ত (২২) (২২) (২২)

বিশু (২২)

দক্ষিণ প্রিয় স্বরেশ (২২) (২২) (২২)

প্রাণ গারদা (২২) (২২) (২২)

রাধিকা স্বরূপ বিমল কীর্তন (২২) (২২) (২২)

পিতা কাশীশ্বরের কর্মক্ষেত্র বরিশালেই ওকালতী আরম্ভ করেছিলেন। কিছুদিন পরেই তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দরকারী উকিল পদ লাভ করেছিলেন। বরিশালে তাঁর বেশ পসার জমার পর ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় নতুন হাইকোর্ট খুললে কালীমোহন কলকাতায় এসে হাইকোর্টের উকিল হলেন। হাইকোর্টের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কালীমোহনের অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। আপন চেষ্টা, অধ্যবসায় ও মেধার গুণে কালীমোহন ধীরে ধীরে ওকালতীর উচ্চশিক্ষার আরোহণ করেছিলেন। ইনি প্রথিতযশা জজ স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও স্যার চন্দ্রমাধব বোষ মহাশয়দের সমসাময়িক উকিল ছিলেন। তখনকার দিনে এমন কোন বড় মামলা ছিল না যাতে কোন না কোন পক্ষে কালীমোহন না নিযুক্ত হতেন। পূর্বনো ল রিপোর্টে প্রায়ই দেখা যাবে 'বাবু কালীমোহন ডস'-এর নাম উকিল হিসেবে। কালীমোহন আইনজ্ঞানে ও বাস্তবতার খুব উচ্চদরের উকিল তা ছিলেনই, তিনি অসমসাহসী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। একবার হাইকোর্টের একজন ইংরেজ জজের সঙ্গে আইন সংক্রান্ত কোন একটি বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয়ে, তিনি জজসাহেবের আইনের ব্যাখ্যাটিকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন—“এমন সহজ আইনের কথাটা যা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররাও বোঝে তা ধর্মবিতার কেন বুঝছেন না তা বুঝি না।” আর যার কোথায়। আদালতের অবমাননার জন্যে তাঁর উপর নোটিশ জারি হল। বিষয়টা অনেক দূর-এগুচ্ছে দেখে অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁকে পরামর্শ দিলেন—“কাজ কি ঘাঁটিয়ে, একটু মাপ চেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ হবে।” কিন্তু কালীমোহন ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। তিনি অটল হয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত চীফ জাস্টিস স্যার বার্নস পীকক তাঁকে খালাস দিলেন এই কণ্ঠী কথা বলে—

“No doubt Kalimohan Babu was intemperate in his language but the principle of law he was arguing was right. So no action is called for.”

জয়জয়কাব পড়ে গেল দেশময় এবং সুদূরপ্রসারী হয়ে গেল কালীমোহনের বাস্তবতা। বড় হয়ে দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন) -এর মধ্যে কালীমোহনের এই তেজস্বিতার কথা অনেকবার শুনেনি। এ বিষয়ে কালীমোহন ছিলেন দাদাবাবুর আদর্শ পুরুষ। চব্বিশের দৃঢ়তা ও আচরণের মাধুর্যে কালীমোহন সমসাময়িক সত্যর্থমন্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং

তাঁরা সকলেই তাঁকে অগ্রণী বলে স্বীকৃতি ও সম্মান দিতে এতটুকুও মিথ্যা বোধ করেন নি। এখনো তাঁর তৈরীচরণানি কলকাতা হাইকোর্টে বার এ্যাসোসিয়েশনের বড় ঘরের পশ্চিমের দেয়ালটি সন্মোচিত করে রেখেছে।

আইন ব্যবসারে কালীমোহন বিস্তর অর্থোপার্জন করেছিলেন। এত অল্প বয়সে এত আর্থিক উন্নতি কম লোকের ভাগ্যে ঘটে। তিনি ভবানীপুরে বিস্তৃত জমি কিনে একটি চকমেলান সুবহুৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন নিজের বসবাস করবার জন্যে। সেই বাড়িটির পরে নম্বর হল ১৪৮, রসা রোড, সাউথ। সেটি ছিল বেলতলা ও রসা রোডের মোড়ে অবস্থিত। পরে সেই বাড়িটির নাম হয়েছিল “কালীমোহন আলয়” এবং উত্তরকালে সেইখানেই প্রথম পল্লী করা হয় “চিত্তরঞ্জন সেবা সদন”। বাড়ির মধ্যে ছিল দুটি পুকুর ও অসংখ্য নারকেল ও অন্যান্য ফলের গাছ। পুকুরের বাঁধান ঘাটের উপরেই ছিল শিবমন্দির। ভবানীপুর পল্লীপুকুরের মন্দির পাড়ার রমেশ মিত্রের বাড়ি, হরিশ মদুসুন্দর রোডের চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ি ও রসা রোডের কালীমোহন দাশের বাড়ি লোকজনের মধ্যে খুবই হৃদ্যতা ও যাতায়াত ছিল। বড়দের মধ্যে শুনেনি যে কালীমোহনের বাড়ির প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘর তৎকালীন সাহিত্যিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগমে মূর্খবিত হয়ে উঠত। আরো শুনেনি যে সেই সকল মনীষিমহলে সমাগত হতেন বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ মহা মহা সাহিত্যিকগণ।

কালীমোহন ও তাঁর অন্য দুই ভাই এক সময়ে ব্রাহ্মধর্মের দিকে খুবই আকৃষ্ট হয়ে সেই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা দেশের উন্নতি ও সমাজ সংস্কারের কাজে পরম উৎসাহী ছিলেন। আপন গ্রাম তেলিবাগ ও তার চারিদিকের গ্রামের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্যে কালীমোহন স্বগ্রামে আপন পাকা বসতবাড়ির একতলায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। কত দূর দূর গ্রাম থেকে লোকেরা আসত ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে বিনা পয়সায় ঔষধ নিতে। বর্ষার সময় মধোর বাড়ির সামনে খাল কত নৌকা ভিড়ত-বোগী নিয়ে তা নিজের চোখেও দেখেছি। তাছাড়া একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজ বাসগৃহ মধ্যব বাড়ির দক্ষিণের মস্ত উঠানটায় গ্রামের ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্যে। সেই গ্রামের স্কুলে আমিও শৈশবে কিছুকাল পড়েছি বলে স্পষ্ট মনে পড়ে। আব ছিল একটি অতিথিশালা পিতা কাশীশ্বরের আমল থেকেই। সেখানে দুরাগত

অতিথিরা আহার ও বিদ্রাঘ পেতেন। কালীমোহন নিয়মিত স্বগ্রামে আসতেন ও আত্মীয়স্বজন, প্রজা, সিকদা, চাঁদাল সবাইকে দেখতেন ও সাহায্য করতেন। অচিরেই তিন ভায়ের সংস্পর্গে পরীক্ষার দিন এলো। নিজ গৃহেই উল্ল সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন। বিষয়টা শুনেনি বলি।

কাশীশ্বর শেষ বয়সে তৃতীয় দার পরিগ্রহ করেন। সেই তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে তাঁর একটি কন্যা শ্যামাসুন্দরী জন্মাবার অল্প পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতার কি ব্যবস্থা হবে সেই চিন্তা নিয়ে কালীমোহন ও তাঁর ভাইয়েরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মশায়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলন ব্রহ্মসমাজের লোকদের উপর দুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেক চিন্তার পর ও দুর্গামোহনের নিবন্ধাতিশয্যে তিন ভাই ঠিক করলেন যে, তাঁরা সেই বালবিধবা বিমাতার পুনর্বিবাহ দেবেন। বিমাতাও সন্মত হল। চারিদিকে হৈ হৈ গড়ে গেল। জ্ঞাতমহলে ঘোর আনন্ডি উঠল। কিন্তু তাঁরা তিন ভাই তাঁদের সংকল্প অটল হয়ে রইলেন এবং বরিশালের ডাক্তার জগৎগুপ্তের সঙ্গে বিমাতার পুনর্বিবাহ হলেন। কত কুংসা ও হৃদয় যামে রটল এবং কত ছড়া এঁদের মত্নে মত্নে চলে গেল। ছোট বয়সে যে সব হড়া শুনেনিলাম তার একটা এখনো মনে আছে।

কালীমোহন, দুর্গামোহন
মা বলিনা কারে
তোমার মায়েবে বিধা দিছ
কৈলকাতা শহরে।

আপন পিতৃব্য বাঁশ্বরের তাঁদের একঘবে করে ধোপানাপিত বধ কবলেন। কিন্তু এই সব অত্যাচারেও তাঁরা আপন সংকল্পপ্রস্তুত হলেন না। এই ববাহের পর বিমাতার শতনিটি ছেলে হবোঁছল এবং উত্তরকালে তাঁরা নিজ নিজ বর্গক্ষেত্রে খ্যাতিমানও হয়েছিলেন।

কালীমোহনের দুইটি ছেলে হয়েছিল—মনোরঞ্জন ও নিত্যরঞ্জন। নিত্যরঞ্জন খুব অল্প বয়সেই মারা যান বড় ছেলে মনোরঞ্জন দেখতে বেশ সুপুরুষ ছিলেন ও লেখাপড়ায় এবং বিশেষ হবে ইংরাজী ভাষায় সুদক্ষ বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মনোরঞ্জনকে বিবাহ হয়েছিল ব্রহ্মপুত্রের অন্তর্গত সোনাবড় গ্রামের লস্কর বাড়ির এক অপবদ পুন্ডরী কন্যা দুর্গাসুন্দরীর সঙ্গে। সেই বড় বড় ঠাকুরবাণীক আমি যখন-দেখি তখন তিনি গায়বরসী বিধবা, কিন্তু তখনো তাঁর কী রূপলাবণ্য ছিল—দেখে দেখে চোখ ফেরান যেত না। একসময় সুদূরী রমণী

যারা রাতারাতি রঙ বদলায়

সুর্গদাস-সন্দর

সবীন্দ্রনাথের নবজাতক আজ আর
স্মৃতিতেই নয়,
মর্ত্যজীবিতে মৃত।
দিন-বদল হোল।
বিশ শতকের বিশটা বছর
অর্থভোজনে তর্কপথেই শূন্য হয়ে গেল।
দিন বদলালো।
সেই বদলের সঙ্গে চুপিসারে সুখ হয়েছ রঙ বদল।
নতুন ভেক।
যেন হত্যকারী করবে ফুল ফুটিয়ে
প্রমাণ করতে চায় সেও ফুলের বাঁসল্লা।
অথচ তার মনের ভিতরে সেই হারিয়ে যাওয়া
রাজ্য, রাজ-সিংহাসন।
অন্তের খাড়াও বদলে নিয়েছে
গোপন ছত্রিকাঘরের জন্যে।

রঙ বদলালেও
সবাই জানে,—
সাপটা যদিও বেদের সূঁচের ভিতর,
তার বিষদাঁত এখনো ভাঙা হয় নি,
কালোবাগেরীর খোজল এখনো গায়ে স্লেটে।
বিবরবিলাসী এই সপ্ন ছিলেন
এতোদিন শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে প্রাচীনা,
জীবনশিল্পকে হত্যা করবে বলে।
প্রতিবাদ করার তখন স্বার্থ যদি বা ছিল ধ্যানবের
সাহস ছিল না।
হঠাৎ, তবু, দিন-বদল হোল
প্রবীণের মধ্যে এসেছে নবীন, নবীনের মধ্যে প্রবীণ। প্রাচ্য,
হুঁসিয়ার থেকে বন্দ্যুঃ যারা রাতারাতি রঙ বদলায়।

বাংলাদেশে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু
ভগবানের মারকে খণ্ডাতে পারে। চম্বিশ
বছর বয়সে মনোরঞ্জন তদীয় পত্নী দুর্গা-
সুন্দরী ও একমাত্র কন্যা কুসুমকুমারীকে
রেখে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। এই
নিদারুণ পরিশোক শেলসম আঘাতে কালী-
মোহনকে জীক্ৰান্ত করে দিয়েছিল।
কৃৎকারে যেন প্রদীপ নিভে গেল। কালী-
মোহনের সাজান-বাগান এক নিমেষের
মধ্যেই শূন্য হয়ে গেল। এই বিষম
দুর্বিপাকে প্রথমত কালীমোহন রাগে ও
ক্ষোভে এমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন
যে, শূন্যেই সেবারকার পূজার সময় দুর্গা-
প্রতিমাকে তিনি আপন বিষয়া-পুত্রবৎ
দুর্গাসুন্দরীর মতই সাদা খান কাপড়
পুথিরে দেবার নিদেশ দিয়েছিলেন। এতেও
তিনি বাগ মেটে নি। সেই বছর থেকে
মথুরা, বাড়ির দুর্গাপূজার জীব বলি
নিষেধ করে দিয়ে তিনি দেবীকেও আপন
পুত্রবৎ মত নিবাসিবাশী করার ব্যবস্থা
করেছিলেন। মথুরা বাড়িতে দুর্গাপূজার
সময় জীব বলির পরিবর্তে আখ, চাল-
কুমড়া ইত্যাদি বলি হতে আগুও দেখেছি
স্বচক্ষে।

জ্যোতপুত্রের মৃত্যুর সময় কালী-
মোহনের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছর।
কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তিনি যে দু বছর
বেঁচেছিলেন সে সময় তিনি নিজের
স্বাস্থ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে
পড়েছিলেন। মৃত্যুর কয় বছর পূর্বেই
তিনি শাস্ত্রাবিশিষ্ট অনুসারে ঘটা করে
প্রার্থিন্ত করে হিন্দুধর্মে ফিরে যান
সমাজের সকলের সঙ্গে একত্র যান করত।

কিন্তু পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি কাজকর্ম
ছেড়ে বাইরের কারুর সঙ্গেই মিশতেন না।
সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের থেকে সম্পূর্ণ
বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি যেন একাকী তাঁর
মৃত্যুর দিন গুণতেন। অবশেষে ১৮৮৭
খৃষ্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব-
কালের জুবিলা অনুষ্ঠানের দিনে সেই
তেজস্বী পুত্রকে নিজেকে শান্তিময় মৃত্যুর
মধ্যে বিলীন করে দিলেন। বিক্রমপুত্রের
একটি কৃতী সম্ভান তাঁর জীবনের কাজ
শেষ না করেই মোটে পঞ্চাশ বছর বয়সে
সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করলেন পত্নী
চন্দ্রমণি ও জ্যোতপুত্র মনোরঞ্জনের বিষয়া
পত্নী দুর্গাসুন্দরী ও তাঁর একমাত্র কন্যা
কুসুমকুমারীকে রেখে।

কালীমোহনের উইলে প্রদত্ত অনুমতি
বলে চন্দ্রমণি ভুবনমোহনের কনিষ্ঠপুত্র
বসন্তকুমারকে আপন স্বামীর দত্তকপুত্র-
রূপে গ্রহণ করেন। এই দত্তক গ্রহণের
বিশেষ কুসুমকুমারীর নামে তাঁর স্বামী
সত্যেন্দ্রনাথ রায় কোটে মামলা করে
ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে মামলা শেষ
পর্যন্ত আপোষে মিটে যায়। বসন্তকুমার
বড় হয়ে উর্দু বিদ্যেতে গিয়ে ব্যারিস্টারী
শিখে দেশ ফিরে এসে কলকাতা হাই-
কোর্টে পঞ্চাতিশ আবেশ্ত করেন। এর
পরই তিনি বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত
জমিকর স্যার রজেন্দ্রনাথ শীলের শিক্তা
কন্যা সবধ্বালাকে বিবাহ করেন। বসন্ত-
কুমার ছিলেন খুবই হাসিখুশি আমদে
মানুষ। আমি তাঁকে ভোলাদাদা বলে
ডাকতাম। অত্যন্ত দয়ালু, হৃদয়বান
যুবক ছিলেন ভোলাদাদা। পরের দশকে

তিনি নিরতিশয় পীড়া বোধ করতেন এবং
যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। তাঁর সম্বন্ধে
শ্রবণের হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর দেশবন্ধু
স্মৃতি গ্রন্থে লিখে গেছেন—‘কালীমোহনের
ন্যায় তেজস্বী, দুর্গামোহনের ন্যায়
সামাজিক, ভুবনমোহনের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক,
সববিশেষেই কালীমোহনের বংশ উজ্জ্বল
করিতেন এই গৌর, সৌম্য ও উজ্জ্বলতম
মুগ্ধ।’ জীবনের সর্বশেষ সফলতার সকল
উপাদান নিয়েই তিনি জীবন সংগ্রামে
নেমেছিলেন। কিন্তু হায়, বিশ্বর বিধান
কে খণ্ডাতে পারে। ১৯১০ সালের এপ্রিল
মাসে তাঁর শরীর অসুস্থ হওয়ার তাঁকে
বারু পার্শ্ববর্তনের জন্যে দার্জিলিং পাঠান
হয়েছিল। সেখানে অল্প একটু সেরে
উঠবার পরই তাঁর টাইফয়েড জ্বর হয়
এবং সেই কাল ব্যাধিতে যে মাসে ২৯শে
তারিখে বাপ, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী ও
আত্মীয় স্বজনদের শোকসাগরে ডুবিয়ে
তিনি পৃথিবী হতে বিদায় নিলেন।
ভোলিরবাগ দাশ গোষ্ঠীর একটি উজ্জ্বল
তারার উদয় হতে না হতেই অস্ত-গেল
এবং কালীমোহন দাশের বংশে যাতি
দেবার আর কেউই রইল না। এখানে
বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সে
সময়ে দার্জিলিং শহরের শ্মশানঘাটে যাবার
পথটি ছিল দুর্গম। পায়ে হাঁটা কাঁচা
পথ বেয়ে খাড়া নামতে হত শববাহীদের
অত্যন্ত অসুবিধা ও বিপদের মধ্যে দিয়ে।
এই কথা জানতে পেয়ে পরে চিত্তরঞ্জন নিজ
খরচায় সেই শ্মশানের পথটিকে পাকা ও
সুগম করে দিয়েছিলেন সর্বসাধারণের
সুবিধার জন্যে। [সমাপ্ত]

নব মন্ত্রিসভা প্রতীপে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার মত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এই নবগঠিত মন্ত্রিসভা। প্রতিটি পার্টির সেরা ফুল চয়ন করে পশ্চিমবঙ্গের এই ক্যাবিনেট মালা গাঁথা হয়েছে। সবাই নেতৃত্বের অধিকারী—বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও সাংগঠনিক কৌশলে দক্ষ। তাই জনসাধারণ অসাধারণ আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। লেখকের মত লোকেদের অবশ্য ঘরপোড়া গরুর অবস্থা। বার বার আশাহত হয়ে এই ক্যাবিনেট সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করেও অধিক সময়সীমায় গাজন নষ্ট প্রবাদ কথাটির আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। হয়ত মন্ত্রিসভার ওপরে যে সুপার ক্যাবিনেট গড়া হয়েছে তাব অস্তিত্বহীন উদ্দেশ্য আছে যে, এই ক্যাবিনেটের বিপথগামিতা থেকে সতর্ক করে দেওয়া ও প্রয়োজন মত সাহায্য ছাড়াও প্রতিরোধের এক নতুন পথ খুলে রাখা। নিঃসন্দেহে এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু এ ব্যবস্থার মধ্যেও বিরোধের বীজ লুকিয়ে আছে। প্রতিটি পার্টির স্ফিটের পিছনে পরস্পরের মত ও পথের পার্থক্য বিদ্যমান। তাই অতীতে কখনও একজোট হতে পারে নি বা একটি পার্টি গড়া সম্ভব হয় নি। আশঙ্কা এই যে—এই পার্টি সুপার ক্যাবিনেটের ছায়াপাত হতে পারে আসল ক্যাবিনেটের ওপর। তা ছাড়া প্রশাসনিক দায়িত্বের অধিকারী ও নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে কৈফিয়তহীন সুপার-ক্যাবিনেট সুপারিশের দাবি কল্পে সংঘাত অনিবার্য। অবশ্য যদি ভূষণসর্বস্ব হয়ে থাকে তাহলে কোন প্রশ্ন উঠবে না।

অঠার দফা কমসূচী ছাড়া আর কিছু বিষয়ে এ মন্ত্রিসভার কিছু করণীয় থাকবে না একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। যে সময়সীমা গুরুত্বের এই মন্ত্রিসভার মাঝার ওপরে চেপেছে সে সময়সীমা সমাধানের জন্য নতুন পবিকল্পনা রচনার প্রয়োজন হতে পারে। কংগ্রেস সরকারের পরাজয়ের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের রচিত পরিকল্পনার ব্যর্থতা স্বীকৃত হয়েছে। মানুষের আশ-আকাঙ্ক্ষার রূপদান করতে না পারার মধ্যে পরিকল্পনার বেশ কিছু পরিমাণ ত্রুটি আছে—এ কথা কি অস্বীকার করা যায়? অবশ্য কোন রাজ্য একক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে না। কিন্তু ভারতের ফেডারেল স্ট্রাকচারের মধ্যে

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যখন বিভিন্ন পার্টির সরকার গঠিত হয়েছে তখন একটি পার্টির কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তাদের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। তাই প্রয়োজনে সকল বিষয়ে সংশোধন ও সংবর্জন অপরিহার্য হয়ে উঠবে। তাই পঞ্চবার্ষিক যোজনার রূপরেখার পূর্ণ নির্ধারণ অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেবে।

যুক্তফ্রন্টের বিজয় উৎসবে ঘোষিত নীতির সময় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেছেন যে খাদ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা এই তিনটি বিষয়ের ওপর তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। কিন্তু কংগ্রেসী সরকার কি এই তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয় নি? পবিকল্পনা কমিশন কি এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই প্রশংসের নয়। তবে কেন ব্যক্তি ফললাভে দেশ বণ্ডিত হল—এ সম্বন্ধে আজ নতুন করে নেতাদের চিন্তা করার সময় এসেছে। এদের ব্যর্থতার কারণ আবিষ্কার হলে আগামী দিনের সাফল্যের সিঁড়ি তৈরি সহজসাধ্য হবে। তবে যদি কংগ্রেস সরকারের সকল প্রচেষ্টাকে কার্যমী স্বার্থ-কোণ থেকে প্ররোচিত ও ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির একমাত্র উৎপাদন বলে নিশ্চিন্তে রায় দান করে তাহলে আর শিক্ষণীয় কিছু থাকে না। যে কোন

দেশের অগ্রগামিতা বা প্রগতি নির্ভর করে দেশের অগণিত জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার ওপর। কোন দেশ কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টা ও তাব প্রশাসকবৃন্দ দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। প্রশাসনিক ব্যস্তের এগিয়ে যাওয়ার একটা সীমারেখা আছে এবং সে সীমারেখা অতিক্রম করলে তখন সেটার পরিচয় হয়ে দাঁড়াবে আগ্রাসী। আর আগ্রাসী হস্তক্ষেপ যত বাড়বে, তত পরিমাণে মানুষের স্বতন্ত্রস্বত্ব সহযোগিতা সংকুচিত হয়ে পড়বে। তামলা-তন্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেই স্মিট-উদ্যম ও সেই সঙ্গে সমিটি-উদ্যমও উত্তরোত্তর দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। আমাদের দেশের সরকার ও নেতৃবৃন্দ সমাজ ও ব্যক্তি সহযোগিতা কামনা করেছিল দেশোন্নয়নের কাজে কিন্তু সহযোগিতার দরজা খোলাব মন্ত্র আয়ত্তে আনতে পারে নি। তাই ক্রমশঃ আমলাতন্ত্র নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে প্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল আর সংগে সংগে আমলাতন্ত্র নির্ভরশীলতার ফলে সীমাহীন দুনীতি সহস্র বাহু নিয়ে অতিকায় দৈত্যের মত আত্মপ্রকাশ করল। আন এই দুনীতির সংগে সহযোগী হয়ে এগিয়ে এল হয়রানি, লাঞ্ছনা ও অবমাননা। এদের সম্মিলিত প্রেতভ্যে মানুষের মধ্যের সহযোগিতা সম্বন্ধ মানসিকতার উর্বর

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

শ্রীহরিশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। The House of the Tagores	২.০০
ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী। Studies in Aesthetics	১০.০০
Tagore On Literature and Aesthetics	১.৫০
ডঃ ননীলাল সেন। A critique of the Theories of Viparyaya	১৫.০০
ডঃ মানস রায়চৌধুরী। Studies in Artistic Creativity	১৫.০০
শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ। রবীন্দ্র-সুভাষিত।	১২.০০
‘হরিশচন্দ্র সান্যাল। চৈতন্যোদয়। ২.৫০	জ্ঞানদূর্গা। ৫.০০
ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু।	৫.০০

॥ যন্ত্রস্থ ॥

শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন। Indian Classical Dances	
‘গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত চন্দ্রিকা	
শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ও শ্রীনির্মলকুমার বন্দ্য। গান্ধী-মানবী	
ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ।	

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪, স্মারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা, ৩৩, কলেজ রো, ১৩৩এ, রাসবিহারী এ্যাডভিন্ট

পিচ রোড

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পিচ-রোডের গ্রহসন দেখে মূখ লুকেই।
বেশ ছিল পথটা, তাকে কালো বোরবা দিয়ে ঢাকলে।
সে বোবাব ভূমিকা নিল, খুলোর ভাষা হারালো।
খুলো উড়িয়ে জানিয়ে দেবে কিছ; না, তা আর হবে না।
ট্রাক ভরা শাদা পাথর কুচি চলেছে-সমবে;,
সেমাই হস্তে মেমাই হবে ময়দার-সাথে।
যে শিশুর জন্মলগ্নে শীথ বেজে ওঠে নি,
সে এসেছে চুপি চুপি,—সে মূখ ঢেকে পড়ে আছে
পিচ রাস্তার পাশের ড্রেনে, যেন মাংসপিণ্ড।
বিয়েগামন্ত নাটকের সূচ্যপট রোডে হাবুডুদু খাচ্ছে।
মৃত, আহত মানুষ, ভাঙা টায়ার, ধাক্কা লাগা কার,
সব, সব, ঐ কালো পিলাচের বুকে গড়াগড়ি খাচ্ছে।
দুনিয়ার পাপেব বিশ্ববদুপ যদি দেখতে চাও
এলো, দেখে যাও এই কালো মুখো-পরা দৈত্যের হাঁ-করা মুখে।
ও কিন্তু বোবার ভূমিকার নিখুঁত অভিনয় করে যাচ্ছে।

ক্ষেত্রে মহাশ্মশানে পরিণত হল। দেশের নেতৃবৃন্দ এ দুটি অবিস্কার করতে আদৌ চেষ্টা করল না বরং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার যথেষ্টা সঙ্গকারী হস্তক্ষেপ এতন্ত অভিপ্রেত মনে করে উটপাখীর মত সমাজবাদের বালিতে মূখ গুঁজে দূর্বোপের সংকেত উপেক্ষা করে এযাবৎ চলে এসেছে। পঞ্চবার্ষিক বোজনায় যখন অজস্র দেওলালীর রোশনাইয়ে দিগন্ত আলোকিত করার চেষ্টা চলছে তখন জাতির ফলপ্রসূ মানসিকতার প্রদীপটা জৈলাভাবে নির্বাণিতপ্রায় হয়ে উঠেছে। যদিও এ মানসিকতা বারবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে চলেছে। আমরা দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির, চীন আক্রমণের সময় ও পাকিস্তান আক্রমণের সময় তা প্রত্যক্ষ করেছি। বৈদিক সহযোগিতার অব্যত বাহু এগিয়ে এসেছিল কিন্তু নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতায় আবার তা গভীর নৈরাশ্যে ফিরে গিয়েছে। অর্থাৎ: “পোটেনসিয়ালিটি অব প্ল্যান” সম্বন্ধে ধারণা ও শিক্ষার অভাবই নেতৃবৃন্দের চোখ খুলতে সাহায্য করল না। এবার আমরা এক-একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে আমাদের বস্তুব্যকে পরিষ্কার করে দেখতে চাই।

ভারতবর্ষে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে শাদা ঘাটতিই হল প্রধানতম সমস্যা। আমি খাদ্য অর্থে সূক্ষ্ম খাদ্য বলতে চাই। অবশ্য প্রথমে শস্যজাতীয় খাদ্যের ঘাটতি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। দেশের বৃহত্তর মানুষ শস্যজাতীয় খাদ্যে দুর্বোলা পেট ভরাতে পারলে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করে। আর এই একমাত্র

সমস্যায় মোকাবিলা করতে না পারার জন্য বস্তুত রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটেছে। আমি কিন্তু এ বিষয়ে সন্ধিনে নিবেদন করব যে এই সমস্যাকে অব্যাহতভাবে ‘ম্যাগনিকাফি’ করা হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতি বলে যে চিহ্ন ভুলে ধরা হয়েছে তা বাস্তবের ঠিক বিপরীত। এ সংকট মনুষ্যসৃষ্ট। দেশে খাদ্য ঘাটতি যদি কিছু থাকেও তার পরিমাণ কত তা আজ পর্বন্ত পরিকল্পিতভাবে নির্ণীত হয় নি। খাদ্য নিয়ে এক বিরাট জুয়াচুরি চলছে বা ধাপ্পা চলছে পরিসংখ্যান দপ্তরের পাতায়। পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির মধ্যে কিছু ভুল থাকতে পারে কিন্তু প্রকৃত পরিসংখ্য ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তিত হয় না। গত বছরের এক চিত্তাকর্ষক ঘটনাকে আমার বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরতে চাই। গত বছরে যখন লোভ প্রবর্তন হল তখন আমার এলাকার বিপন্ন কৃষকদের বাঁচাতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলুম। এই এলাকার দারুণ অজন্মা ঘটে। পাছে কৃষকরা নিপীড়িত হয় এই জন্য আমি জেলাশাসককে সমস্ত বিষয় খুলে বলি এবং বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান ও পরিদর্শন করতে বলি। জেলাশাসকও অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি বিশিষ্ট দরদী বলে পরিচিত। আমি আশংকা প্রকাশ করে বলি যে সরকারের রূপ কাটিং বিভাগের রিপোর্টে তিনি যদি পরিচালিত হন তা হলে কৃষকরা নিশ্চিত নিপীড়িত হবে। কেন না এই বিভাগ যে সম্পূর্ণ ভুয়া অথবা পরিকল্পিতভাবে ভুয়া রিপোর্ট

দাখিল করে তা বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি। জেলাশাসক রূপ কাটিং বিষয়টি সরেক্সমিনে দেখার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অনুমতি নিতে চেষ্টা করেন। অনুমতি ত মেলে নি উপরন্তু তাঁর এই বিষয়ে নাক গলানোর জন্য তিরস্কৃত হতে হয়।

দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিসংখ্যাই একমাত্র ভুয়া নয়, যাবতীয় পরিসংখ্যাকে অবলম্ব্যক্রমে এই পর্বায়ে ফেলা যায়। গত বছরে লাহিড়ী কমিশনে পশ্চিমবংগ কংগ্রেসকর্মী সংঘের নামে আমরা খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে “পাট রকমের জুয়াচুরি”-র অভিযোগ করেছিলাম এবং বার সন্দের বিভাগীয় কর্তারা দিতে পারেন নি। আমরা (১) উপপাদন জুয়াচুরি, (২) ব্যবহার জুয়াচুরি, (৩) বর্জন জুয়াচুরি, (৪) জনসংখ্যার জুয়াচুরি ও (৫) পরিসংখ্যান জুয়াচুরির অভিযোগ করেছিলাম এবং আশ্রয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এখনও নিভুলতা দাবি করে। এমন কি খাদ্যের মূল্য নিধারণেও স্বার্থ ও বাজনীতির খেলা আছে। লাহিড়ী কমিশন চলাকালীন হাওড়া জেলায় ও বাংলা দেশে স্বনামে পরিচিত কোন বিশিষ্ট শিল্পপতি আমার সংগে যোগাযোগ করে বলেছিলেন যে ধান থেকে চাল তৈরির জন্য যে ৪.০০ টাকা ‘ভাঙানী খবচা’ দেয়া হচ্ছে তা তাদের কাছে আশাতিরিক্ত মূল্য। তবে এর একটা বিরাট অংশ দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের দান করতে বাধ্য হতে হয়।

—শ্রীসর্বজ
[চলবে]

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার

ব্যথা-বেদনা তড়াতাড়ি দূর

করবার আধুনিক উপায়



মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা! 'অ্যাসপ্রো' বিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়!

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী দ্রুত কাজ করে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি কণা রয়েছে। এম ফলে বেদনা দূর করার শক্তি বিজ্ঞপূর্বক বেশী জারায়। শরীরে হজিমে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

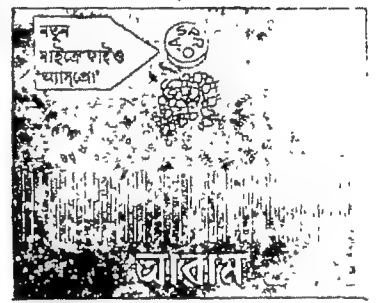
মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে ও নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শিশুর পর্বীর সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে দেয় এবং তার ফল অনেকদূর ছাড়া হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পাবেন—নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুসী খেতে পাবেন—চকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' বাবেন :
ব্যথা-বেদনা • মাথাব্যথা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • গাঁটে বেদনা • অর-অর-ভাব • হু-ভেদ • অর • গলাব্যথা।

স্বাস্থ্য : প্রাপ্তবয়স্ক : ছোট ট্যাবলেট। এরোজন ফলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য : একটি ট্যাবলেট বা আপনাব ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' বিভ্রান্তি কাড় ফরে দেখুন



টারলেটের ক্যাগটির আকার খত খত হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে গেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি কণা থাকে। তাই শরীরের সঙ্গে সহজে-সহজে মিশে যায় এবং খুব তড়াতাড়ি ব্যথা দূর হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বসুবিধ উপায়।



নতুন

মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

নিউকোম-এস (সি) ১৫৫১

আবজ্ঞা

চন্দ্রশুভ্র

সংবাদপত্রের প্রথম কর্তব্য কি? নিভুল সংবাদ পরিবেশন করা। অন্যান্য অঞ্চলের কথা জামি না, কিন্তু বাংলা দেশের বহু সংবাদপত্র প্রায়শ অন্ত্য পরিবেশনে অপরাধী। মনে পড়ছে, একটি বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের সম্পাদকীরতে একবার লেখা হয়েছিল : “বৃন্দদেব ‘মক্কাবিন নিকায়’ অনুসরণের উপদেশ দিয়াছিলেন।” এ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পাদকীর-লেখকের ছাপাখানার ভূত বেচারাকে আশ্বর্যকার্থে টেনে আনার উপায় নেই, কারণ ‘মক্কাবিন নিকায়’ একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থ (‘নিকায়’ অর্থ সঙ্কলন) এবং ত্রিপিটকের অন্যতম ‘সুত্তপিটক’ের অন্তর্গত। অল্পবিদ্যার অধিকারী পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়ে কি বিভ্রান্ত ঘটন, এটি তার উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত : ‘মক্কাবিন মঙ্গ’ অর্থাৎ ‘মধ্যম মার্গ’ বোঝাতে গিয়ে লিখে-ছিলেন ‘মক্কাবিন নিকায়’। আশ্চর্য লাগে, এই দৈনিকেই পরীক্ষার খাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের এবং ইন্টারভিউর সময় চাকুরি-প্রার্থীদের কৃত বিচিত্র ভুলের ফসল বা ‘হাউলার’ প্রকাশিত হ’তে দেখেছি। এবং পরে জেবেছি, পত্রিকা-পরিচালক ও কর্মীদের যে ‘হাউলার’ চন্দ্রশুভ্রের ভাঙারে বিদ্যমান, সেগুলি প্রকাশের সাহস কি তাঁরা কোনদিন দেখাবেন?

যে-সূত্রে এই প্রসঙ্গের অবতারণা : সম্প্রতি উক্ত পত্রিকা-প্রতিষ্ঠানের একটি জনপ্রিয় প্রকাশনে পশ্চিমবঙ্গের নব-নিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রীর পরিচয়ে লেখা হয়েছে : “কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীতে এম. এ।” একটু কট করে হাতের কাছে টেলিফোনের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিলেই এই পরিচিত-লেখক জানতে পারতেন, শিক্ষামন্ত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীতেই এম. এ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম. এ-র পক্ষে ইংরেজীতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করতে লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া উক্ত সংবাদ-পরিবেশকের কাছে যত সহজ, আসলে তত সহজ ব্যাপার নয়। এবং বাস্তবে এ ঘটনা

আদৌ সম্ভব কি না সে বিষয়ে চন্দ্রশুভ্রের অসীম সন্দেহ।

*

বাংলা সংবাদপত্র-জগতে সাংবাদিক-সুলভ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্নতার অভাব খেদ-জনক ঘটনা। আকর্ষক বা উত্তেজক খবর ছাপানোর মোহমত্তি না ঘটলে বাংলা সংবাদপত্রের মানোন্নয়ন অসম্ভব বলেই মনে করি। খবর ছাপানোর আগে খবরের সত্যতা যাচাই করে নেওয়া দরকার এবং অনেক সময় টেলিফোনের সাহায্যেই তা করা সম্ভব। উপরে যে-দৈনিকের উল্লেখ করেছি, সেই দৈনিকেই কয়েক বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ট্যাবলেট’ের কীর্তি শিরোনামের একটি খবর বেরিয়েছিল। খবরটি এই : সদ্য এম. এ. পাশ-করা জনৈক ভ্রাতার মাক-শীটে একটি বিষয়ে ১০০-তে ২০ নম্বর দেখানো হয়েছে, অথচ যোগের সময় এ ২০ বাদ পড়ে গেছে। কি মারাত্মক ভুল, কি ঘোর-তর অনাচার। কমসে-কম ২০ নম্বর বাদ! এ ক্ষেত্রেও সংবাদ-লেখক হাতের কাছে টেলিফোনের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলারের অফিসে খোঁজ নিলে জানতে পারতেন, ১০০-তে ২৫-এর নিচে নম্বর পেলে ঐ নম্বর যোগ হয় না।

এ তো গেল তথ্যপ্রাপ্তি বার জন্ম সাংবাদিকের অশিক্ষিত মন এবং দুঃসহ ঔদাসীণ্য ও পবিত্র-বিমুখতার। এই অশিক্ষা ও ঔদাসীণ্যের সোনার সংবাদকে সাহিত্যায়িত করার চেষ্টা সোহাগার কাজ করছে। সংবাদ সংবাদই, সাহিত্য নয়। ধরুন, আপনার বন্ধুর পিতৃবিয়োগ হয়েছে এবং বন্ধুকে এই দুঃসংবাদ জানাবার দায়িত্ব আপনার। আপনি কিভাবে বন্ধুকে এই খবর জানাবেন? হয়তো বলবেন : “ভাই, তোমাকে যে এত বড় দুঃসংবাদ জানাতে হবে, কখনো ভাবতেই পারি নি। গতকাল রাতে তোমার বাবা মারা গেছেন।” কিন্তু আপনি যদি বলেন : গতকাল রাতে হঠাৎ এক বিদ্রী় ম্বল দেশলুম। দেশলুম, আমার আঁত প্রিয়জন,

মুখটা স্পর্শ মনে নেই, শেষ শ্বাসের শাসিত। চারপাশে ফুল, ফুলগুলিও যেন কাঁদছে! শব্দ্য চারপাশে দাঁড়িয়ে অনেক লোক, সেই ভিড়ে মনে হলো তাকেও দেশলুম। তোরও চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত। স্বপ্ন ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে পড়লুম। তারপর! তারপর ছুটেতে ছুটেতে তোর কাছে আসছি। মনে হচ্ছে আমি যেন আমার বাবাকেই হারিয়েছি। ওঃ, তুই বুঝতেই পারছি, তোর বাবা সব-পেরিয়েছির দেশে চলে গেছেন।

আপনার প্রতি আপনার বন্ধুর মনো-ভাব কি হ’তে পারে, হয় আপনার বন্ধু স্বয়ং কিংবা তিনি অতি ভদ্র হলে আপনার অন্য কোন বন্ধু, যথাসময়েই জানিয়ে দেবেন।

বাংলা সংবাদপত্রে সাহিত্যের মোড়কে খবর পরিবেশনের যে চটুল প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তা’ যথার্থই উদ্বেগের কারণ। উপরের স্বরচিত দৃষ্টান্ত ছেড়ে বাস্তব দৃষ্টান্তই দেওয়া বাক। কয়েক বছর আগে এক মারাত্মক ট্রেন-দুর্ঘটনার স্টাফ-রিপোর্টার প্রেরিত সংবাদের সূর্য ছিল এবকম : ‘মনে হচ্ছে বসে আছি যেন প্রলয় পয়োদ্বিজলে। চারপাশে অসংখ্য মৃতদেহ, মৃত আত্মারিস্বজনের কান্না, অবিরাম কান্না।’

বিশ্বাস করুন, বাংলা সংবাদপত্রে খবর পরিবেশনের এই নিয়ম ন্যাকামিতে আমি অনেকক্ষণ অদৃশ্য কান্নাই কেঁদে-ছিলাম।

বাঙালী সাংবাদিকতার ঐতিহ্য সুখ্যাত ও প্রাচীন। সেই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবার লক্ষ্য সমুপস্থিত। এবং সেই দায়িত্ব পালনে অবশ্যসম্ভব্য সূত্র : সংবাদ সংবাদই, সাহিত্য নয়। সংবাদকে সাহিত্য করতে গেলে সংবাদ মরে, সাহিত্যও জন্ম নিতে পারে না।

প্রশ্ন উঠবে : সংবাদ-রচনার শিল্প-সৌন্দর্যের কি কোন স্থান নেই? আছে। কিন্তু শিল্পের নামে অলঙ্কার যখন সংবাদকে আচ্ছন্ন করে, তখন সংবাদ তার মৌল রূপ হারায়। সব শিল্পের বা মূল কথা, সংবাদ-শিল্পেরও (সাংবাদিকও আমার মতে শিল্পী) তাই : সামঞ্জস্য। নিভুল তথ্যের প্রত্যক্ষ অবদান অলঙ্কারের বাহুল্যে নষ্ট হয়, সংবাদ হ’লে দাঁড়ায় বাগাড়ম্বর। নিটোল তথ্য যিনি প্রকাশ-ভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য-সূত্রে বিধৃত করেন, তিনিই সাংবাদিক, অন্যভাবে সংবাদ-শিল্পী।

যথার্থ সাংবাদিক নেপথ্যচারী, সংবাদের মাধ্যমে তাঁর আশ্বপ্রকাশ উদয়

গান্ধাহিক বসুমতী

হলেই তিনি তাঁর শ্রম্বেয় আসন থেকে বিচ্যুত হন। অথচ বাংলা সংবাদপত্র-জগতে হলে এমন অনেক ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যাদের স্থান অন্যত্র হওয়া উচিত ছিল। এঁদের সম্পর্কে সমালোচকদের প্রতি বিরূপ আনাতোল ফ্রাঁসের বিখ্যাত মন্তব্যটি একটু বদলে বলা যায়, লেখক হরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'য়ে এ'রা এখন সাংবাদিক হয়েছেন। যে সংবাদপত্রে এই ব্যর্থ লেখকের বাহুল্য, সেইখানেই সংবাদের নামে বাগাড়ম্বর, সময়বিশেষে প্রলাপোত্তি। এবং বেদনাত্মক মন্তব্যে সংবাদও যে কি নিম্নম ন্যাকামি'রূপে দেখা দেয়, তার প্রমাণ পূর্বোক্ত টেন-দুর্ঘটনার সংবাদের প্রথম পাণ্ডি : 'মনে হচ্ছে বসে আছি যেন প্রয়ল-পর্যোদিত', কিংবা কোন কয়লা-খনির দুর্ঘটনায় : 'দুর্ঘটনা-স্থল থেকে কয়েক মাইল দূরের এক বাংলোয় বসে এই খবর লিখছি। চোখে সামনে নীল দিগন্ত, সেখানে নেই ফুলের আগুন, সেখানে কেবল ধোঁয়া, কেবল ধোঁয়া। মৃত্যুর খতিয়ান নেব, উপাষ নেই, কাবণ দুর্ঘটনা-স্থলে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। খবর পেলাম, অঙ্কলিট নাকি এখনও বিপন্ন হয় নি। অগত্যা এই বাংলোয় বসেই খবর লিখতে হচ্ছে, শূনে অবশ্য।.....সত্যি, এতবড় দুর্ঘটনা ইদানীং খুবই কম হয়েছে। দুর্ঘটনা-স্থল থেকে দূরের এই বাংলোর চারপাশেও

উদ্বেগ আর আশঙ্কা হেঁটে বেড়াচ্ছে। চারপাশে থমথমে ভাব।...ধোঁয়া উঠছে ধোঁয়া। এই ধোঁয়াকে সরিয়ে শিশু-সূর্য কি কাল উঠবে না?'

এই সংবাদ পড়ে বিভ্রান্ত পাঠকের জিজ্ঞাসা : এ কি সংবাদ, না চম্পুকাব্য? এ রচনা কি সাংবাদিকের না ব্যর্থ কবি-যশঃপ্রার্থী নিম্নম সংবাদ-ব্যবসায়ীর?

*

মানী লোকের মান রাখতে না পারা এক ধরনের অক্ষমতা। এর ইদানীং এই অক্ষমতার পরিচয় সাংবাদিক নামধারী কিছু সংবাদজীবীর রচনায় পরিলক্ষিত হয়। সর্বজনমান্য মনীষীর কোন মত বা মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারণ করতে গিয়ে কোন সংবাদজীবী যদি লেখেন : '.....বাবুরা ভেবে দেখবেন তাঁদের যুক্তির দুর্বলতা, তা' হলে রুদ্ধ হ'য়ে ভ্রমলোক পেশা নির্বাচনে ভুল করে ফেলেছেন কিংবা একক ক্ষেত্রে নামের বহুবচনায়ন যে নামধারীর পক্ষে অগৌববের, এই সামান্য ভাষাজ্ঞানটুকু তাঁর নেই। অন্যক্ষেত্রে বশব্দী, ধরুন তিনি মন্টী সদ্য নিবৃত্ত, তাঁর সম্পর্কে যখন কোন সাংবাদিক অন্য লিখে বসেন : '.....তিনি সাংবাদিকও বটেন,' তখন কি বর্ষা? বর্ষা এই, ভ্রমলোক মন্টীমহোদয়কে ছোট কবতে গিয়ে নিজেই হেঁটে ক'রে ফেলেছেন।

স্মৃতির বদলি থেকে দূর চলেই নমুনা দিলাম এবং ঐতিহ্যবান বাংলা সাংবাদিকতা যে 'চরিত্রভ্রষ্ট হ'তে চলেছে, এই নমুনা ক'টাতেই সপ্রমাণ বলে চন্দ্রগুপ্তের বিশ্বাস। অধুনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, বাংলা সংবাদপত্র না কি আজকাল বাড়াই-বাছাই করে লোক নেওয়া হয়। এই বাড়াই-বাছাইয়ে ব্যাপার যদি সত্য হয়, তা'লে নির্বাচ-মন্ডলী'র স্বীকৃতির পরিবর্তে নীর গ্রহণে ক্ষমতার তারিফ করতে হয়। বহিঃগো পরিপাটে বা প্রচার-সংখ্যায় বাংলা সংবাদপত্রে সাফল্য গৌরবের বিষয়, কিন্তু পাঠ্যবস্তুর বিচারে বাংলা সংবাদপত্রে উৎসর্গ কতখানি বেড়েছে, তা' নিয়ে ভাব বাব দিন সমাগত। ভ্রান্ত বা অসমর্থ সংবাদ, সামান্য সংবাদ-প্রকাশে সাংবাদিকের রাজনৈতিক দলীয়তা, সংবাদে বিকৃতি ঘটানো, সংবাদকে সাহিত্যায়িত করার চেষ্টা ইত্যাদি যে-সমস্ত উপসর্গ সম্প্রতি বাংলা সংবাদপত্রে দেখা দিচ্ছে, তাতে এক এক সময় সন্দেহ হয়, শিশিবকুলার ঘোষ সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদের সেন প্রমুখ গহীতনামা সংবাদ-শিল্পীরা কত কি সভাই বাংলা দেশে ঘটেছিল?



আপনার দেহলাভগণের মৌলিকতা পূর্ণ করবে

লাবনি কোল্ড ও ভ্যানিশিং ক্রীম

লাবনি কোল্ড ক্রীম

কক্ষ চানডায় কমলীষ লাবণ্য বোগাষ। এই স্নিগ্ধ কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহারে আপনার ত্বকে ফুটে উঠবে স্বাভাবিক দীপ্তি ও স্বকুমার বাগুর্ষ, আর আপনাকে দেখে ধরবণিনীর দেহবর্ণের অগিত গৌরব।

লাবনি ভ্যানিশিং ক্রীম

আপনার সাক্ষ্য প্রসাধনকে অপরূপ মায়ূর্ষে ভরে তুলবে। 'মেক-আপ' আরম্ভের আগে মুখের ওপর সংস্কার বুলিয়ে নিন। 'লাবনি' নিজেই অবাক হবেন যখন দেখবেন কত সহজে আপনার 'মেক-আপ' গুলেছে। লাবনি ভ্যানিশিং ক্রীম ত্বকের আদ্রিতা বজায় রাখে।

দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল কোং লিঃ



CTC-I BEN



ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাভূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বায়োস্কোপ দেখতে, নেমন্তন্ন খেতে, দুদিনই মাঘ প্রবোধ সবাই বেরিয়ে যায়। সুবর্ণ ঘন্টার পর ঘন্টা দেওয়ালের দিকে মূখ্য করে শূন্যে থাকে, যেন দেওয়ালে কত কি লেখা আছে, পড়ছে সেই সব।

সুবর্ণর ছোট ছেলে সুবল কোথায় থাকে বোঝা যায় না, শুধু হঠাৎ এক একবার এসে ঘরের মাঝখানে স্ট্যান্ডের মত দাঁড়িয়ে পড়ে আস্তে বসে, 'ওষুধ-চিহ্ন কিছা খাবার ছিল না কি?' নয় তো বলে, 'বলছিলে নাকি কিছা?' অথবা বলে, 'খাবার বেখে গেছেন ওরা? ...জল আছে?'

তোমার খাবার—এত স্পষ্ট করে বলে না। শুধু 'খাবার'।

তবু মাঘের জন্যে যে উৎকণ্ঠিত সে, এটা যেন বোঝা যায়।

কিন্তু সুবর্ণর এই ছোট ছেলে যদি এসে বিছানার ধারে বসে পড়ে বলতো, 'আ তোমার কি বেশি জ্বর এল না কি?' ...কিংবা নীরবে কপালে হাতটা রেখে অনুভব করতে চেষ্টা করতো উত্তাপের মাপটা কতখানি?

হয়তো সুবর্ণ বেঁচে যেত।

আ' সে কবে না।

শুধু মা'র ধাবে-কাছে কোথায় যেন ততস্থ হবে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু কাসির শব্দ পেলেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। হয়তো ওব ইচ্ছে হয়, মা'র বিছানার ধারে বসে মা'র গায়ে হাত রাখে, অনভ্যাসের বশে পারে না। তাই শুধু

তার চোখে-মুখে একটা বিপন্ন উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে ওঠে।

দেওয়ালের দিকে মূখ্য করে শূন্যে থাকলেও সুবর্ণ অনুভব করতে পারে সেই মূখচ্ছবি। তবু সুবর্ণও তো বলে না, 'আমি না সুবল, আমার কাছে এসে একটু বোস না।'

বলে না নয়, বলতে পারে না।

সুবর্ণর সমস্ত অন্তরাগ্না বলবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। তবু বোঝা হয়ে থাকে বাগবন্দ।

যেন ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত সুবর্ণর হাতেই মজুত রয়েছে তার ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার জল, কিন্তু রয়েছে একটা সীল কবা বাল্লি, আর সেই সীল ভেঙে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মোটাবার ক্ষমতা সুবর্ণর নেই।

মেয়েরা একে একে বিদায় নিল।

পারুলের যাত্রাকালে বকুল আস্তে বলে, 'ভুল করিস না সেজ্জি! চোরের ওপব রাগ করে মাটিতে ভাত খাবি তুই?'

পারুল ঈষৎ কঠিন হাসি হেসে বলে, 'চোরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে থালায় দখলটা নেবার প্রবৃত্তিও নেই।'

'তা' বলে তুই কবিতা লেখা ছেড়ে দিবি? অত ভাল লিখাতিস।'

'বকিস না', পারুল হেসে ওঠে, 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! ভারি তো লেখা! ছেড়ে দিলে পৃথিবীর ভারি লোকসান।'

পৃথিবীর না হোক, তোর নিজের তো অনেক লোকসান।'

পারুল অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'লবণ সমুদ্রে বাড়তি একমুঠো নুন ফেললে, কি ইতর-বিশেষ হয় বল তো? জীবনটাই তো লোকসানের।'

'কিন্তু সেজ্জি, অমলবাবু তো—'

'আরে কী মুন্সিকল, তোদের অমলবাবুর নিন্দে করাছি নাকি আমি? মহাশয় ব্যক্তি, স্মারি একটু আবাম-আয়েসের জন্যে ভাড়ার ভেঙে খবচা করতে পারেন, শুধু ওই প্রেমের কবিতা চলবে না।'

'বেশ তো ভগবানের বিষয় নিয়ে লিখিবি—'

পারুল ওর মাথাটা একটু আদরের নাড়া দিয়ে বলে, 'ভারি তো লেখা, তার জন্যে ভেবে ভেবে মূচ্ছটা তোব গেল দেখছি। 'বিশ্বান-মুখ্যদেব' নিবে আবার অনেক জ্বালা রে! ঈশ্বরই যে মানুষের আদি-অন্তকালের প্রেমাস্পদ, এ শুদেব মগজে ঢোকে না। আবেগ আব ব্যাকুলতা, এ দেখলেই তাব মধ্যে আঁশটে গন্ধ পায় ওরা। যাক্ গে মরুক গে মা'ও তো জীবনভোর কত কি লিখলেন তার পরিণতি তো নিজেই বললি।'

যদিও মা'র ওই 'লেখা' সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না পারুল, বরং মা'র তীব্রতা, মা'র আবেগ, মা'র সব বিষয়ে তাল ঠুকে প্রতিবাদ আব বিদ্রোহ করা, এসবকে পারুল খুব অবজ্ঞাব চোখেই দেখতো, জানতো মা'র লেখাও ওই পর্যায়ের,

কাজেই মূল্যবোধ কিছু ছিল না তার সম্বন্ধে, তবু এখন একটু উল্লেখ করলো। ব্যর্থতার তুলনা করতে করলো উল্লেখ।

বকুল চুপ করে থাকলো।

বকুলের হঠাৎ সেই এক লহমার জন্য দেখা আগুনোর আভাষ স্পষ্ট হয়ে ওঠা মৃৎটা মনে পড়লো।

সে মৃৎ পরাজিত সৈনিকের, না অপরাধের কাঠিন্যের, আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারে নি বকুল।

তা হয়তো পরাজিতেরই।

হয়তো সুবর্ণ ওই দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেওয়ালের লেখা পড়ে না, লেখে সেখানে। অদৃশ্য কালিতে লিখে রাখে বসুনা-জজ্ঞের পীড়িত আত্মাদের ইতিহাস। না, শব্দ তার নিজের কথা নয়, লক্ষ লক্ষ আত্মার কথা। পরবর্তীকাল পড়বে ওই লেখা।

কে জানে তখন আবার তার প্রতি-ক্রিয়ায় জন্ম নেবে কি না আর এক নতুন জাতি—উন্মত্ত, অবিবরণী, অসহিষ্ণু, অসন্তুষ্ট, আত্মকেন্দ্রিক!

দেওয়ালের লেখাও তো শেলেটের লেখার মত একবার লেখা হয়, একবার মেছা হয়।

আজ হয়তো এক জটসর্বস্ব সৈনিক পরাজয়ের কথা লিখে রেখে বাচ্ছে, আগামীকাল—

কিন্তু সত্যিই কি তবে এবার যাচ্ছে সুবর্ণলতা? তা' নুইলে এত ভেঙে পড়েছে বেন? উঠতে যদি পারেও উঠতে চায় না।

বিছানাতেই রাতদিন।

মেঝের মাদুরের ওপর পাতা বিছানা, ধরমোছা কি জ্ঞানদা এসে বলে, 'একটু যে উঠতে হবে মা—'

আগে আগে উঠছিল সুবর্ণ, আজ-কাল বলে, 'আর উঠতে পারি না বাপ, পাশ থেকে মূছে নিয়ে যাও।'

আর মাঝে মাঝে বলে, 'দক্ষিণের ওই বারান্দাটায় একটা চিক্ টাঙিয়ে দিলে শূতাম—'

প্রবোধ শুনতে পেয়ে রাগ করে বলে, 'ওই খোলা বারান্দার শোবে? এই নিত্য জ্বর—'

'ঘুমঘুমে জ্বরে খোলা হাওয়া ভাল,' সুবর্ণ একটু হেসে বলে, 'তাছাড়া দক্ষিণের বারান্দার মরবস্ত্র যে বড় সাধ আমার।'

'ওসব অলঙ্কারে কথা বোলো না মেজবো—' প্রবোধ গম্ভীর হয়ে যায়।

সুবর্ণ বলে, 'অলঙ্কারে কি গো? এখন মরলে ভয়জয়কার! যাক্ গে মরিছি না তো—মরবোও না। তবে রাত্তিরে কেনে মরি, তোমার ঘুম হয় না।'

তা' কথাটা মিথ্যে নয়।

ও দেওয়ালের একেবারে ও প্রান্তে উচ্চ খাটে-কালর দেওয়া বালিশ তাকিয়ায় ঘেরা যে বিছানাটি বড় অরামের শয্যা ছিল প্রবোধের, সেখানে আর নিশ্চিন্ত ঘুমেনো যাচ্ছে না।

ওই কাসি!

কাসির শব্দ হলেই কেমন যেন ঘরে টিকতে পারে না প্রবোধ, দরজা খুলে বেরিয়ে দালানের চৌকিতে এসে বসে।

তবু প্রতিবাদ করে প্রবোধ, 'বাঃ শব্দ আমার ঘুমটাই বড় হলো? তুমিও তো কেসে কেসে—' কিন্তু প্রতিবাদের সূত্রটা যেন দুর্বল দুর্বল মোনায়।

সুবর্ণ দেওয়ালের দিক থেকে মৃৎ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'তা' নিজেকে ভো নিজের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার উপায় নেই?'

আজও আবার সেই কথাই ওঠে।

কারণ গতরাতে প্রবোধ প্রায় সারারাতই ভিতর দালানে কাটিয়েছে।

তবু আজ যেই সুবর্ণ দক্ষিণের বারান্দায় 'চিক' ফেলার কথা বলে, প্রবোধ পাড়া জ্ঞানিয়ে চৌকিয়ে চৌকিয়ে বলে, 'এই বকুল, দাদাদের বল মূটে ডেকে আমার খাটখানা ওই ছোট ঘরে নিয়ে যাক! ওখানেই শোবে। আমি আজ থেকে কাসির জন্যে নাকি ঘুমের ব্যাঘাত হয় আমার, তাই একটা রুগী যাবে খোলা বারান্দায় শূতে!'

ঘরে দাঁড়িয়ে নয়, ঘর থেকে বেরিয়ে চোঁচায়। সুবর্ণ যেন সেই চোঁচানিটার দিকেই একটা রহস্যময় ব্যঙ্গ হাসির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

ব্যবস্থাটা করে দিল সুবল।

বাবার নয়, মা'র।

কোথা থেকে যেন খানিকটক চিক আর ত্রিপল এনে বারান্দায় ঝুলিয়ে দিয়ে মা'র বিছানাটা তুলে নিয়ে গেল সেখানে। নিঃশব্দে, সকলের অগোচরে।

সুবর্ণ কি ভেবেছিল হাতে মজুত এই বালিশটার সীল আমি ভাঙবই? তাই বলেছিল সুবর্ণ, 'কখনো তো কিছু অনুরোধ করি নি বাবা, একটা অনুরোধ রাখবি? দক্ষিণের বারান্দার মরবার বড় শখ হয়েছে। করে দিবি ব্যবস্থা?' সুবল উত্তর দেয় নি, বোকা যায় নি করবে কি না, কিন্তু খানিক পরেই দেখা যায় সুবল বারান্দায় পর্দা ঘিরছে।

কেদার-বদার ফেরৎ মাসখানেক বারান্দাসীতে কাটিয়ে, দীর্ঘদিন পরে কল-কাতায় ফিরলেন জয়াবতী। আর এসেই দু'দিন পরে দেখতে এলেন সুবর্ণকে।

দেখলেন নতুন ব্যবস্থা।

দেখলেন জীর্ণ অবস্থা।

ধাছে বসে পড়ে বললেন 'মানুষ ওপব অভিমানে সাজে সুবর্ণ, ইট-পাথরের ওপর অভিমানে করে নিজেকে শেষ করার বাড়ি বাকামী আর কি আছে?'

সুবর্ণ হেসে বলে, 'জানোই তো চির-কেলে বোকা! কিন্তু অভিমানে ইট-পাথরের ওপর একথা কে বললো? যদি বলি সৃষ্টিকর্তার ওপর?'

'তা সে সোকাটাও তো ইট-পাথর!'

'তবে নাচার!'

'বোঁরা বসছিল শরীরের ওপর অব-হেলা করে করেই নাকি রোগটি বাধিয়েছে?'

'ওরা 'মা' বলে ব্যস্ত হয়, তাই ওকথা বলে, মরণকালে তো একটা কিছু হবেই!'

'তা 'কাল'টাকে তো স্বেচ্ছায় স্বয়ংক্রিয় করছি। শুনলাম ওষুধ খাস না, পানি খাস না, বোঁরা সেবা-ময় কবতে এলে নিস না—এটা তো ঠিক নয় ভাই!'

সুবর্ণের ব্যাধি-ম্লান চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠলো, তারপর ছায়া হয়ে গেল। বললো, 'ওই তো বললাম, চিরকালে বোকা!'

জয়াবতী বললেন, 'তা' তো জানি। সংসারে যে পুরো খাঁটিতে কাজ চলে না, ন্যারে আর অন্যত্রে, সত্যিতে আর মিথ্যেতে আপোন করে নেওয়া ভিন্ন যে সংসার অচল, এ কথা তো কখনো বুঝিয়ে পারি নি তোকে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নাই বা সরে পড়ি? একজন তো কেন-কালে ফেলে চলে গেছে, তুই গেলে যে একেবারে নির্বাসিব!'



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং

২০৩, ওল্ড টীনা বাজার স্ট্রীট

কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৫৮০

সুদৰ্ণৰ সেই দীৰ্ঘ কালো চোখ দুটো কোঠৰে বসে গৈছে, তবু বৃষ্টিৰ সৈ চোখ আঁজুও কথা বলতে চুলে যায় নি। সেই চোখৰ কপাল সপোন মূখৰ কথাও মেশায় সুদৰ্ণ, 'যে ফেলে চলে গৈছে, সে তোমাকে আঁজুও ভৰে রেখেছে জয়াদি, তোমাকে নিৰ্বাসনৰ হবার ভয় নেই।'

'বুঝলাম, খুব জ্ঞান দিনি! তবু দুটো মনের কথা বলারও তো সঙ্গী দরকার? আর তুই কি শেষটা হার মেনে চলে যাবি?'

'পূণ ছিল হার, মনৰ না। কিন্তু স্মৃতিকর্তাৰ যেন সুদৰ্ণৰ ওপৰ বড় আকোশ, আর পারছি না। সেবা-স্বস্তিৰ কথা বলছো জয়াদি? যে যা করতে আসে, কেউ কি অন্তর থেকে করে? সবই লোক দেখানো।'

জয়ানতী হেসে ফেললেন। বললেন, 'চোখে যেটা দেখা যায়, সেটাই দেখতে হয় সুদৰ্ণ, অন্তরটা দেখতে চাওয়া বিধাতার, বিধানের ব্যক্তিগত।'

সুদৰ্ণ কতক লেকেজ চাপ করে, থেকে বলে, 'থাক জয়াদি, ও নিয়ে ভাব করা বৃথা। এ বাঠামোহা নতুন করে আর কিছু হবে না। তার ঘাইতে তুমি যা সব দেখে এলে তার কথা বলো।'

জয়ানতী কতক গলায় বলেন, 'সে আর বিশদ করে বলতে ইচ্ছে নেই সুদৰ্ণ। তোর কাছে চিবকালের লজ্জা রয়ে গেল আমার। জীৰ্ণ বৈধি না। রাত-দিন অপরাধের ভারে মরমে মরে থেকেছি—'

'ও ম' শোনো কথা— সুদৰ্ণ ও কথা চাপা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জয়ানতী কখনো শেষ করেন, 'সুদৰ্ণ আমি একা হলে, তেরকে ফেলে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু 'দল' বড় ভয়ানক জিনিস! ও জিনিসের মাস্তা থাকে না, মমতা থাকে না, চক্ষু-লজ্জা থাকে না। 'যাব না' বললে থেকে ফেলতো আমার। আমিই তো উষ্মগণী।'

সুদৰ্ণ বলে, 'যাবে না কি বল?' তীর্থ বলে, কথা! মহাত্মী! জীবনে দু'বার সুযোগ আসে না। আমার ভাগ্য আমার— হ্যাঁ, এই একটা জয়গা। তোমানে সুদৰ্ণ সাধারণ মানুষের মত কথা কয়। ভাগ্য নিয়ে আক্ষেপ করে।'

'ঠাকুপোয়া অসুখ যে শব্দ নয় সে আমি বুঝিছিলাম।' জয়ানতী একটু চাপ করে থেকে বলেন, 'তবু যাওয়া আটকাতে না যদি ছেলেবা প্রতিবন্ধ না হতো।'

সুদৰ্ণ হঠাৎ হেসে ওঠে।

খাপছাড়া ভাঙা ভাঙা।

'শোনো কথা! জন্মগ্রহণের প্রতিবন্ধ, জন্ম আবার কে অনুভব হবো?'

তা, এইটাই হয়তো ঠিক কথা।

জন্মলগ্ন না কি তার রাশি-নক্ষত্রের

সেন্য-সামর্য নিয়ে আজীবন ত্যাগ করে বেড়ায় মানুষকে, এটা একটা অজ্ঞানতার কথা।

কথায় ছেদ পড়লো।

এক হাতে গেলাস, এক হাতে রেকার্ট নিয়ে এসে ঢুকলো ভানুর বো। সহাস্যে বললো, 'জ্যেষ্ঠমা তীর্থ থেকে কিরেনে, আজ কিন্তু আপনাকে জল না খাইয়ে ছাড়বো না। দেখুন আমি তসর কাপড় পরে পাথরের বাসনে করে নিয়ে এসেছি।'

জয়ানতী স্থিত মূখে বলেন, 'না জ্যেষ্ঠমা করে এসব কবতে গেলে কেনা গো পাগলী মেয়ে?— অজ্ঞ যে আমার 'সংকটা' কিছু থাক না তো।'

'কিছু থাকে না?'

'না গো মা জ্ঞানী, কিছু না। দেখো দিক শব্দ শব্দ কষ্ট পেলে।'

দুঃখের আর অবাধ থাকে না বড়রোমার। কানমুখে চলে যায়।

চলো গেলে সুদৰ্ণলতা বলে, 'তুমিও তো বেশ অভিনয় করতে পারো জয়াদি!'

জয়ানতী হেসে বলেন, 'উপায় কি? জয়গো তো থিয়েটারই— তুমি করতে পারলে না বলোই হোক মরলে!'

সুদৰ্ণলতা আন্তঃ ঠর হাতটা মটোমটো চেপে ঈষৎ চাপা দিয়ে বলে, 'হেরেছি, কিন্তু হার মনি না।'

জয়ানতী উঠছিলেন, প্রবোধ দাঁড়ালেন, 'হেঁচক করে বলে উঠলেন, 'এই যে নতুন বোঁটান, তীর্থটিই হলো? ভালো ভালো! তা' দেখছেন, তো আপনাকে সইয়ের অসুখ? অথচ এক পদুরিয়া ওষুধ থাকে না, সেরা-স্বস্তি নেবে না! আরোব, এই খোলা জায়গায় এসে শোওয়া। নিজের দোষেই প্রাণটা খোওয়াবে মানুষটা।'

সুদৰ্ণলতা হঠাৎ দরদর কাসতে থাকে।

খামতেই চায় না।

প্রবোধ ভরার্জ মূখে চোঁচিয়ে ওঠে। 'এই বকুন্ড কোথায় থাকিস সব? রোগা মানুষ! একটু জল—আচ্ছা আমি দেখছি—' বলে বোধকরি নিজেই জলের চেষ্টায় বেরিয়ে যায়।

গঙ্গার জল কত বাড়লো, পৃথিবীর গতি কত বদলালো তবু 'সমাজ সামাজিকতা'র লৌহ নিগড় থেকে ছুটি নের না বড়ো-বড়িরা। শ্যামাসুন্দরীকে এখন কেউ 'সামাজিকতা' করলো না বলে নিন্দে করবে না, তবু তিনি কানুর খোকা হয়েছে শুনে রূপোর কিন্নর বাঁটি নিয়ে মূগ্ধ দেখতে এলেন। অর্থাৎ চিরকাল যা করে এসেছেন, তা করবেন। সবাই বকতে লাগলো।

বললেন, 'তা' হোক তা' হোক।

প্রবোধ পাড়ায় লোক সমীহ কম, প্রবোধ তির্যকি গলায় বলে ওঠে, 'অসুখ নেই? অথচ সমানে শুনছি ঘুঘুঘুঘু, জ্বর, কেসে কেসে অস্থির—'

সুদৰ্ণলতা মাথা নেড়ে বলে, 'ও কিছু না।'

'কিছু না' বলে তো জেদটি দেখাচ্ছে, এদিকে আত্মীয়জন এসে আমায় গালমন্দ করে যায়। কবরজ মশাই যখন এসেইছেন, একবার না হয় দেখেই যান না? খামোকা দিন দিন শূন্য হয়েই বা যাচ্ছে কেন সেটাই তো দেখা দরকার।'

সুদৰ্ণলতা আরো দৃঢ় গলায় বলে, 'না দরকার নেই। আপনাকে বৃথা কষ্ট দেওয়া হল, কবরজ মশাই! আপনি আসুন গিয়ে।'

অর্থাৎ 'আপনি বিদায় হন।'

প্রবোধের এই প্রথম পোতুর। বড় নাভাবো তো প্রথম 'মেয়ে' দেখিয়েছে।

পোতুর! তাই বটে।

জিনিসটা আরামনার।

অথচ সুদৰ্ণলতা বেহুশ হয়ে বসে ছিল। সোনার হার দিয়ে গুথ দেখার কথা যার। নিজের দুটি দেখে না সুদৰ্ণ, কেবল পরের দুটি টের পায়।

সে, বাক, শ্যামাসুন্দরীর ছানি পড়ে আসা চোখেও অরুণাটা ধরা পড়লো! প্রবোধকে ডেকে বললেন কথাটা, 'বোমার কি হাল প্রবোধ? ডাক্তার-বাদ্য কিছু দেখিয়েছো?'

প্রবোধ, মাথা চুলকে বলে, 'ডাক্তার বাদ্য, মানে পাড়ার একজন খুব ভালো হোমিওপ্যাথ—তার কাছ থেকেই ওষুধ এনে দিয়েছিলাম। কিন্তু খেলেই না সে ওষুধ। পড়ে থাকলো। চিরকালের জ্যেষ্ঠ তো? ওই মনের গুণেই কখনো শান্তি পেলে না। তুমি তো দেখেছো মামী, চিরকাল সাধের অতিরিজ করলাম। তবু কখনো মন উঠলো না।'

শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত গলায় বলেন, 'আচ্ছা 'মন মন' করেই বা দোষ দিচ্ছ কেন? বাবা? মানুষের দেহেই কি ব্যাধি হয় না?'

শ্যামাসুন্দরী চলে যেতেই প্রবোধ পাড়ার রঞ্জন কবরজকে ডেকে আনলো। সুদৰ্ণলতাকে উদ্দেশ্য করে দরজা গলায় বললো, 'এই যে কবরজ মশাই এসেছেন! নাও এখন বলো তোমার অসুখটা কী।'

এদের দেখেই চমকে উঠে বসে মাধম, কাপড় টেনে দিয়েছিল সুদৰ্ণ, কবিরাজ মশাই 'কই, দেখি তো মা হাতটা—' বলে নিজের হস্ত প্রসারণ করতেই দুটুকুটে বলে উঠলো; 'আপনাকে অকারণ কষ্ট দেওয়া হল কবিরাজ মশাই, কোথাও কোনো অসুখ আমার নেই।'

কবরজ পাড়ার লোক সমীহ কম, প্রবোধ তির্যকি গলায় বলে ওঠে, 'অসুখ নেই? অথচ সমানে শুনছি ঘুঘুঘুঘু, জ্বর, কেসে কেসে অস্থির—'

সুদৰ্ণলতা মাথা নেড়ে বলে, 'ও কিছু না।'

'কিছু না' বলে তো জেদটি দেখাচ্ছে, এদিকে আত্মীয়জন এসে আমায় গালমন্দ করে যায়। কবরজ মশাই যখন এসেইছেন, একবার না হয় দেখেই যান না? খামোকা দিন দিন শূন্য হয়েই বা যাচ্ছে কেন সেটাই তো দেখা দরকার।'

সুদৰ্ণলতা আরো দৃঢ় গলায় বলে, 'না দরকার নেই। আপনাকে বৃথা কষ্ট দেওয়া হল, কবরজ মশাই! আপনি আসুন গিয়ে।'

অর্থাৎ 'আপনি বিদায় হন।'

সাংসারিক বন্দনতী

এমনি কটা একদিন কুলাপদ্রোহিতকে
তাড়িয়েছিল।

ব্রজেন কবরেক্স ফর্সা - মানুষ, আরক্ত
মুখটা আরক্ত করে বলেন, 'বাড়িতে
পরামর্শ' করে তবে ডাক্তার-বদিকে 'কল'
দিতে হয় প্রবোধবাদ।'

প্রবোধবাদ, ঘাড় হেঁট করে সঙ্গে সঙ্গে
নেমে যান।

'কবরেক্স এসেছিলেন দেখানো হয় নি
কেন?'

বহুকাল আগে যে বাড়ি ছেড়ে এসেছে
ভানু, আজও অবিকল সে বাড়ির এক-
জনের মত মুখভঙ্গিমায় বলে উঠলো,
'এটার মানে?'

সুবর্ণলতা সে মূর্খের দিক থেকে
মুখ ফিরিয়ে বললো, 'দরকার নেই বলে।'

'দরকার আছে কি নেই, সেটা চিকিৎ-
সকের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলেই ভালো
হতো না?'

সুবর্ণ উঠে বসলো, স্থির গলায়
বললো, 'সেই ভালোটা অবশ্যই তোমা-
দের? কিন্তু বলতে পারো আজীবন
কেবলমাত্র তোমাদের ভালোটাই ঘটবে
কেন পৃথিবীতে?'

কবরেক্সের মত মুখ করে ভানুও উঠে
গেলো। বলে গেলো—'সংসারে অশান্তির
আগুন জ্বালাটাই এখন প্রধান কাজ হয়েছে
তোমার! আর এখনই বা কেন?
চিরকালই।'

খাতার নিচে চিরদিনের মত ঢেরা টেনে
দিয়ে চলে গেল বলেই মনে হলো।

আশ্চর্য, একটা মানুষ শব্দ মনে
সোবেই থাকে করলো সবাইকে।

'রোগ হয় নি' বলে কবরেক্স তাড়ালে।
অথচ চিরশয্যা পেতে শূন্যে আছে।
মানোটা কি?

তা' মানোটা আবিষ্কার করে বোঁরা।

চুপিচুপি বলাবলি করে সেটা তারা।

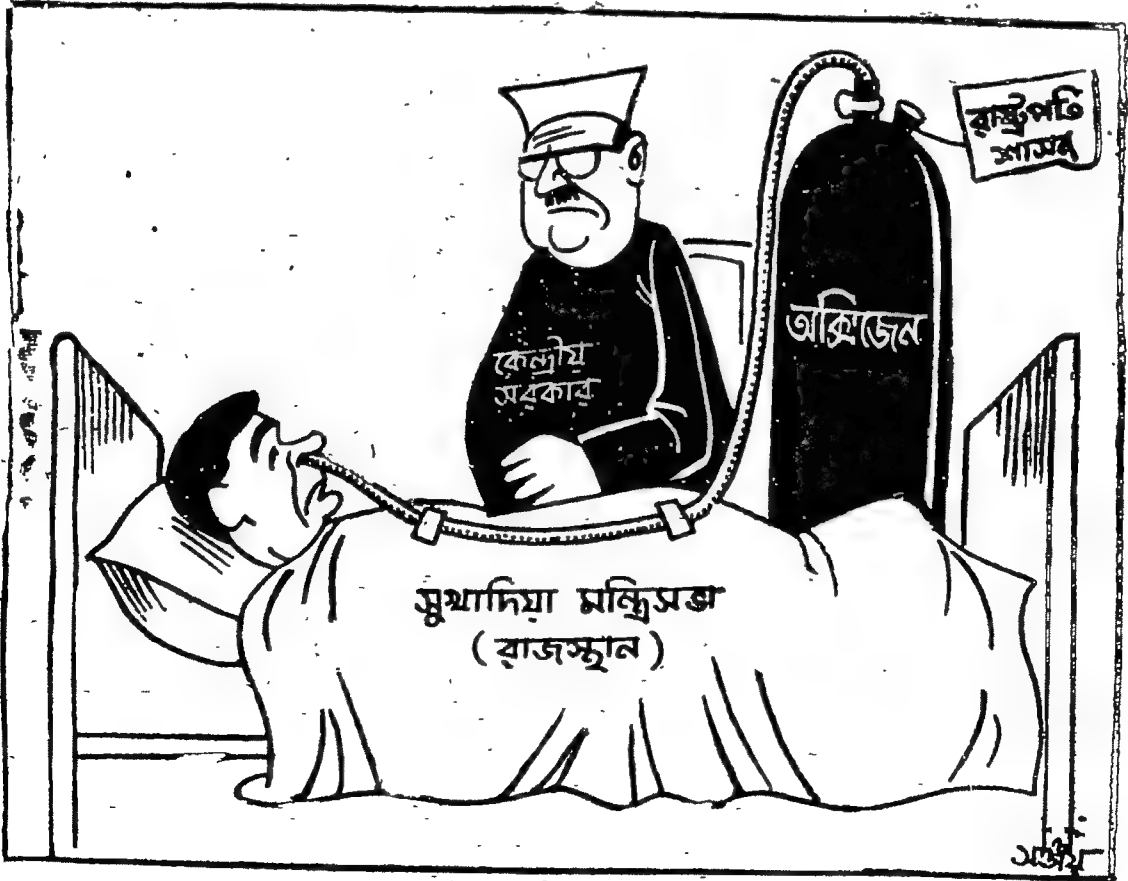
দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে রোগটা
ভালো নয়, কাসি রোগ ছোঁরাচে রোগ,
ভদ্র ডাক্তার-কবরেক্স দেখালেই তো হাতে-
নাতে খরা পড়া, স্নেহের বিয়ে দিতে বেগ
পেতে হবে, তাই—

ভদ্র মানে একটা আবিষ্কার করেছে
তারা, ষটির মধ্যে সুবর্ণলতার সংবাদ
আর সংসারের প্রতি শূন্যে দেবতে
পেরেছে তারা। পরের মেয়ে হয়েও
হাস্যেছে তারা। পরের মেয়ে হয়েও
শ্রীতিরক্ত অভিমানী মানুষ! অথচ বাবা
একবারে অন্য ধরনের—

কিন্তু এসব তো তারা সুবর্ণলতার
সামনে বলে মা যে, সুবর্ণলতা টের পাবে।
তাকে কেবলমাত্র 'মন্দবুদ্ধি' ছাড়াও অন্য
কিছু তবে কেউ কেউ।

[কবরেক্স]

শেষ চেষ্টা—



শ্রীমদ্রো

কিরাতী কাহিনী সঙ্গ্রহ—নলিনীকুমার ভদ্র। কথাকল্প প্রকাশক, ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দামঃ আড়াই টাকা।

কিরাতী জীবন অশেষ মহাম্মা ভেরিয়ার এলু উইনের কথা প্রথমেই মনে পড়ে যখন আমাদের প্রতিবেশী ও জাতি এই বন্ধুদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রিত্রে এদের জীবন-পঙ্খতি, পরিবশ, সমাজের কথা জানার অদম্য কৌজুল সম্পর্কে বিদেশী পণ্ডিতদের নাম সমাদরে উদ্ধৃত করেছেন। সেইসব পণ্ডিতের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ কাজ চাণ্ডাল্যকর ও বিস্ময়জনক। হিংস্র জন্তুর আবাসে বস্তার মধ্যে লুপ্ত থেকে রায়ির আধারেও তাঁরা অনুসন্ধান করতে সক্ষম হন নি।

আনন্দের কথা অধুনা গবেষক বাঙালী পণ্ডিতরাও এই কঠিন পথে পা বাড়িয়েছেন। এদের মধ্যে নলিনীকুমার ভদ্র উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্পর্কে প্রমথের শ্রীমদ্রোভিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: “শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র এই-সকল ক্ষেত্রে প্রচুর আদিবাসীদের সঙ্গে বাঙালী পাঠক-সমাজের পরিচয় ঘটাবার কাজে আত্মনিয়োজিত হয়েছেন। তাঁর দেখবার চোখে আছে, উপভোগ্য কববার মত ভাষা মন আছে, দরদী হৃদয় আছে। তিনি নিজেকে অনেক ছুঁয়েছেন, প্রাণ ভরে দেখেছেন।”

যা হোক, মনীষী ভেরিয়ার এলু উইনের চেষ্টায় নেফর মানুষদের যেসব লোককথা সংগৃহীত হয়েছে সেই সংগ্রহ-শালা থেকে মিকিরদের দুটি, কাছাড়দের দুটি, গারোদের একটি, খাসিরাদের একটি ও মিনিয়ঙদের একটি—মোট সাতটি কাহিনী নিয়ে “কিরাতী কাহিনী সঙ্গ্রহ” গ্রীডর বাঙালী পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর তথ্যবহুল ভূমিকার্তিও অনেক তথ্যের ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করেছে।

এই উপাখ্যানগুলি আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ আমাদের প্রতিবেশীর জীবন সম্বন্ধে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকার দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। অথচ কিরাতী কাহিনীতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা গ্রাম্য সংস্কৃতি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল। ইংর তদের পতিত রেখে অনেক স্থলে তাদের চেতনায় ভুল ধারণার-ই সৃষ্টি হয়েছে। তবে তাদের কাহিনীগুলি পাঠ

করলে ধারণা হয়, জীবনের প্রতি তাদের কি ধারণা এবং আমাদের সমাজের সঙ্গে তাদের কি পার্থক্য। তাদের সংস্কার, ধারণাও কাহিনীগুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিরাতীসমাজের গান, প্রায় ধারণা সমতুল কবিতাগুলিও গ্রীডরের হাতে আক্ষরিকভাবে অনূদিত হয়েছে। উপকথার মত মনে হলেও কিরাতী জীবন-রস-রসিকতার সরল প্রকাশ দেখে পাঠকরা তৃপ্তি বোধ করবেন।

বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রক্ষাকর (বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ)—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ; ৩২, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা-৩৫। দামঃ ছ' টাকা।

আমরা ইতিপূর্বে ‘বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রক্ষাকর’-এর প্রথম খণ্ডের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য আমরা তখনই স্বাগত জানিয়েছি। আলোচ্য বৃহদাকার গ্রন্থটি দ্বিতীয় খণ্ড।

‘বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রক্ষাকর’ মূলত বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ। এই কোষগ্রন্থ প্রণয়ন ও ব্যবহার টীকা-টিপ্পনী রচনা ঐতিহাসিক আলোচনা অত্যন্ত দূরূহ কাজ। কাজটি দূরূহ হলেও অসাধ্য সাধন করেছেন লোক-সাহিত্য বিষয়ক সর্বাঙ্গগণ্য পণ্ডিত ও ব্যাতিমান গবেষক, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় খণ্ড কোষগ্রন্থ ‘জ’ থেকে ‘ন’ পর্যন্ত আশু অক্ষরবিশিষ্ট লোক-সঙ্গীত-গুলি স্থান পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতের নিবঁচনের ব্যাপারে বিবরের দিকেও শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য লক্ষ্য রেখেছেন। অধিকন্তু কুমুদর সম্পর্কে যারা গবেষণা করতে ইচ্ছুক, তারা এই কোষগ্রন্থের সাহায্যেই একটি নতুন গ্রন্থ প্রণয়নে সক্ষম হতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ, বহু অজ্ঞাত কুমুদর এই খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে। বিপুল এই আয়োজনকে অধ্যাপক ভট্টাচার্য সমাজ-তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা আরো রসসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। আর একটি ধারণা সাধারণ প্রচলিত আছে যে, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গে লোক-সঙ্গীতের প্রাচুর্য, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বেশি। পূর্ববঙ্গের লোক-সঙ্গীত জাতীয় সম্পদ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোক-সঙ্গীত সেই তুলনায় কোনমতেই পঞ্চাঙ্গামী নয়,

তার স্বাক্ষরিত প্রমাণ দিয়েছেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য। অবশ্য এই কাজটি সমাধানের জন্যে তাঁকে নিজেকে যেমন সংগ্রহের কাজে নামতে হয়েছে, তেমনি তাঁর তত্ত্বাবধানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের কাজে লাগাতে হয়েছে। অবশ্য কাজে লাগানো ব্যাপারটি সহজ নয়। অন্তত ডক্টর শহীদুল্লাহ সেই কথা আমাদের অখণ্ড বাংলাতে বসেই শুনিয়েছিলেন। তাঁর কথ্য মনে রাখলে, স্বীকার করতে হবে যে, লোক-সঙ্গীতের সংগ্রহ কাজে একালে যত লোক-ই কৃতিত্বের দাবি করুক না কেন, শ্রীভট্টাচার্যের সংগ্রহ-নিরুপণ পদ্ধতি ও কাজ অসাধারণ এবং তারই স্বাক্ষর বহন করছে খণ্ডাকারে প্রকাশিত লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থগুলি। আশা করি, সঙ্গীত-পিপাসু বাঙালী-চিত্ত সমাদরে এই কোষ-গ্রন্থ গ্রহণ করে আনন্দিত হবে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। গ্রন্থটি দামেও সুলভ।

ভালবেসেছিল যারা—শ্রীনরেন্দ্র দেব। এস, সি, সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিঃ; ১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দামঃ সাড়ে ছ' টাকা।

ব্যাতিমান প্রবীণ কবি নরেন্দ্র দেবের উপন্যাসের মধ্যে যে নবীন জগতের জয়-সুখ প্রকাশমান—তা উপরি-উক্ত উপন্যাসের নামের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। বঙ্গীয় উপন্যাসপত্রের ভাষাতে তিনি অত্যাধুনিক নন, কিন্তু তাঁর বস্তু-বিষয় অত্যাধুনিকদেরও হার মানিয়ে দেয়। এ রকম হবার প্রধান কারণ এই যে, জগৎ, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে শ্রীনরেন্দ্র দেব অত্যন্ত সচেতন। যুগধর্মকে তিনি অস্বীকার তো করেন নি বরং আগামী যুগের সত্যকেও তিনি অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করার জন্যে চঞ্চল আর সে পরিচয় “ভালবেসেছিল যারা” উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র রূপরেখার মধ্যে জাজ্জল্যমান। উপন্যাসটির মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে প্রকাশ, বিভা ও নিভাকে নিয়ে। প্রকাশ ভালবেসেছিল বিভাকে, বিভা ভালবেসেছিল প্রকাশকে। কিন্তু হ্রস্ব সমাজ ও ধন-বৈষম্য নিদ্রা-ভাবে তাদের পৃথক করে দিয়েছিল। বিভার বিয়ে হয়েছিল নিমলের সঙ্গে। প্রকাশ আকস্মিকভাবে গৃহত্যাগ করেছিল। তারপর অনেক ঘটনা। প্রকাশের পুনরায় আবির্ভাব। নিমলের মৃত্যু। পরে প্রকাশের সঙ্গে বিভার মিলনসুখ গড়ে দেয় বিভাই। বিভা তার মনের কথা নিঃসঙ্কেতে খুলে বলে প্রকাশকে। তবে যে ত্যাগ সে স্বীকার করে তাও তার মত চরিত্রেরই উপযুক্ত। তবে উপন্যাসটির সাব-প্লটে যে-সব চরিত্র রয়েছে তারা সামাজিক বিধান অনায়াসে অতিক্রম করে সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করতে পেরেছে। শ্বৈর ও রাণীর সম্পর্ক সেখানে সার্থক। আবার অক্ষয় কবির মত ব্যর্থ প্রেমিক-এর জন্য আমাদের করুণাই হয়।



পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছেন গত ২রা মার্চ তারিখে, ৬ই মার্চ থেকে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয়েছে, এবং তার পরদিন অর্থমন্ত্রী প্রিয়ম্বদী বসু বিধানসভায় একটি অস্থায়ী বাজেট পেশ করেছেন। গত মঙ্গলবার ১৪ই মার্চ বিধানসভার চার মাসের এই অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটের অর্থব্যয়ের জন্য আনীত অর্থপ্রয়োগ বিল বিনা ভোটেই গৃহীত হয়েছে।

বাজেট বিতর্ক শুরু হয়েছে সোমবার ১৩ই মার্চ থেকে। অনেকেরই ভেতরেই ছিল যে, প্রাক্তন শাসক দল কংগ্রেস বিরোধীপক্ষের ভূমিকা কিভাবে পালন করে তা দেখবার জন্য। কিন্তু বিধানসভার বিরোধীপক্ষ হিসাবে কংগ্রেসের ভূমিকা সকলকেই হতাশ করেছে। তাঁদের আচরণ দেখে মনে হয়েছে যে, নির্বাচন যুগ্মে পরাজয়ের জ্বালাটা তাঁদের একান্তই মারাত্মকজনক করে তুলেছে।

তারা বাজেট বিতর্কে এলোমেলো অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিরোধী দল হিসাবে পরিচিত হবার পরিবর্তে জনসাধারণের কাছে অনাবশ্যকভাবে নিজেদের হয়ে প্রতিপন্ন করলেন। অজয়বাবু বা হেমন্তবাবু কেন জ্যোতিবাবুর সঙ্গে ভিড়লেন বাজেট প্রসঙ্গে এ সকল কথা যে একান্তই অপ্রাসঙ্গিক এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানটুকুও তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই সব এলোমেলো প্রশ্নের মূখর মত জবাব দিতে অর্থমন্ত্রীর বিন্দুমাথই অসুবিধা হয় নি।

প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার উনিশ বছরে যে 'ইঞ্জিনিয়ারের আন্দোলন' তৈরি করে গেছেন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা মাত্র এক সপ্তাহে

কেন তা সাফ করতে পারেন নি, এ কৈফিয়ৎ তলব করা নিশ্চরই সাজে না। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, নিজেদের নিকপ্ত কর্ম তাদেব নিজেদেরই গায়ে লেগেছে। কংগ্রেসীদের মধ্যে পণ্ডিত বলে খ্যাত একজন বিশিষ্ট সদস্য গোড়াতেই প্রশ্ন তুলে বসেছেন যে, নতুন মন্ত্রিসভা নিজেদের তৈরি বাজেট হাজির করেন নি কেন? তারা নাকি জনতার অভিনন্দন কুড়োতেই এ কর্মদিন এত ব্যস্ত ছিলেন যে, এদিকে মন দেবার প্রয়োজনীয়তা বড় একটা করেন নি।

এগুলি নিছকই জ্বালাগার অভিযান্ত্রিক। বস্তুত এই কর্মদিনে যুক্তফ্রন্ট সরকার যা করেছেন তার কৃতিত্বের তুলনায় অন্যান্য অপরাজয়গুলি জ্ঞান হয়ে গেছে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়া মাত্রই অনেকেরই উন্মাদিক অনুমান ব্যর্থ করে দিয়ে নির্বাচনোত্তর ভারতে সর্বপ্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করলেন। নেতা নির্বাচনে বিন্দুমাথ অসুবিধা হয় নি। যেখানে কংগ্রেস একক দল হিসাবেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জন্য নেতা নির্বাচন করতে গিয়ে পনের দিন ধরে হিমসিম খেয়ে যে লজ্জাকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গঠনের নিরিখে সেটাকে মিলিয়ে দেখতে কংগ্রেসী সদস্যদের অনুরোধ করি। এর পরেই আসে বাজেটের কথা। মাত্র সাতদিনের মধ্যে আর কোন সরকার বাজেট পেশ করতে পেরেছেন? বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীরা ইতিমধ্যেই এত অভ্যস্তভাবে কাজ করছেন যেন মনেই করা যায় না যে, এই মন্ত্রিসভার বয়স মাত্র পনেরা দিন। ইতিমধ্যেই অনেক ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়েছে। প্রশাসনিক ও আরো নানাপ্রকার দূর্নীতির বিরুদ্ধে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে

লেগেছেন জনসাধারণ তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। কংগ্রেস সদস্যরাও এগার বছরে পারছেন না তা নয়, কিন্তু জেনে শুনেও নিছক না বোকার ভান করছেন।

বাজেটে কোন খাতে কত ব্যয় হয় বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেসের সেলু মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিধানসভায় তাঁদের বক্তব্যসমূহ এই একটি বিষয়কেই ভিত্তি করে পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু জবাবে অর্থমন্ত্রী প্রিয়ম্বদী বসুই তাৎপর্যকর উত্তর করেছেন। তিনি বলেছেন, টাকা, জমকটা বড় কথা নয়, আসল কথা দাঁড়তল্লা। কংগ্রেস সরকার সামান্য মানদণ্ডকে শোষণ করেছে, ধনী আর চোরাকারবারীদের গায়ে হাত ছোঁয়নি। প্রিয়ম্বদী জিজ্ঞাসা করেন, অর্থব্যয়ের পরিমাণে কি হবে যদি ধনী আরও ধনী হয়, আর গরীবকে আরও গরীব করা হয়ে থাকে? মাথা পিছু আয়ের হিসাবে তে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের গড় হিসাবের পিছনে পড়ে আছে।

বাজেট বিতর্কের তৃতীয় দিনে সরকারী ভরফ থেকে এই কথা তুলে যা হয় যে, প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে সরকারী অর্থের অপব্যবহার করেছে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রীনির্মলেন্দু দেব হাতে সিলিফেন টাকা দেবার অভিযোগ উত্থাপন করে অর্থমন্ত্রী প্রিয়ম্বদী বলেন যে, খরা অঞ্চলে সাহায্য দেবার জন্য মধ্যমশ্রীর তহবিল থেকে তাঁকে দু' লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই টাকা প্রাক্তন মধ্যমশ্রীর নিজের টাকা নয়, পার্টির সাধারণ সম্পাদকের মারফৎ এইভাবে টাকা খরচ করা কংগ্রেসী দূর্নীতির একটি ভীত প্রকট নিদর্শন। কংগ্রেসী সদস্যরা এই সম্পর্কে

অভিযোগের জবাব দেবার কোন চেষ্টা করেন নি।

প্রাক্তন গ্রামমন্ত্রীর নামেও নির্বাচনের স্বার্থে গ্রাম ওহাবলের অপব্যয়ের অভিযোগ উঠেছে। এই প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আরও বলেছেন যে, অতিরিক্ত ব্যয়সহ 'দুর্ভিক্ষ গ্রাম' খাতে মোট এগারো কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। যতক্ষণ না পুরো তদন্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জানা যাবে না ওই টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে। ভাব্যভাবে যাতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা হিসাবে অতীতের দুর্নীতির অভিযোগ সম্বলিত সকল অভিযোগেরই তদন্ত করা হবে, এ কথা অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন।

খাদ্যনীতি ও যুক্তফ্রন্ট সরকার

এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে কোন খাদ্যনীতির কথা জনসাধারণকে জানানো হয় নি। তার অর্থ এই নয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে উদাসীন। বরং এ কথা বলা যায় যে, মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর একটি সুস্থ খাদ্যনীতি প্রবর্তনের জন্য যে পরিমাণ চিন্তা ও আলোচনা করা হয়েছে এতখানি গুরুত্ব দিয়ে ইতিপূর্বে কোন বিষয়কেই গ্রহণ করা হয় নি।

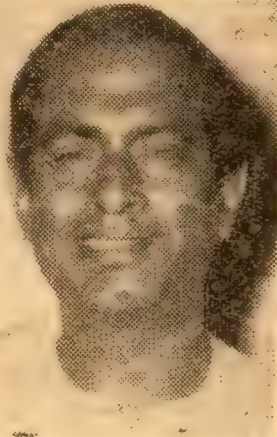
খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ তথা মন্ত্রিসভা এই বিষয়ে মন্ত্রগৃহপুত্র পথ অবলম্বন করেছেন। তাড়াহুড়ো করে নীতিসংক্রান্ত কোন বিবৃতি দিলে বাজারের উপর সূক্ষ্মের চেয়ে কুফলই বেশি পড়ে। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার যুগে প্রতি মাসেই একবার করে নতুন খাদ্যনীতি অবলম্বিত হত, আর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর খাদ্যনীতি সংক্রান্ত ঘন ঘন ঘোষণা ব্যবসায়ীদের আগে থেকেই সতর্ক করে দিত, এবং ঘোষণার পরদিনেই ঘোষণার ফল জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারতেন।

নতুন সরকার সব দিকে প্রস্তুত হয়েই খাদ্যনীতি নির্ধারণ করতে চলেছেন। এই কারণেই খাদ্যনীতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় কিছু বিলম্ব হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-বস্ত্রের সঠিক চিত্রটি তাঁরা সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। মনে রাখতে হবে এবারে নির্বাচনের স্বার্থে, গ্রামের ভোট পাবার জন্য, বিগত কংগ্রেস সরকার কার্যত কোন লোভি আদায় করে নি। এদিকে চাষীদের সঞ্চিত ধানচালের সর্বাধিক পরিমাণটাই মহাজনদের গুদামে চলে গেছে। গতবারে খরার জন্য আশানুরূপ ফলনও হয় নি। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারও পশ্চিমবঙ্গকে যথোপযুক্ত খাদ্যস্যা সরবরাহ করে নি।

সমগ্র খাদ্য পরিস্থিতিটাই একটা জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এই কারণেই বহু আলোচনার পর পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা স্থির করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতিকে চূড়ান্ত রূপ দেবেন। এই কারণেই নতুন মন্ত্রিসভা খাদ্যনীতি সম্বন্ধে কোন আভাস দিতে চাইছেন না। তাঁরা বলেছেন যে, জল্পনামূলক সংবাদ প্রকাশিত হলে তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সম্ভবত আগামী ২২শে মার্চ মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী রাজধানীতে যাবেন। তারপর মন্ত্রিসভা আর একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে খাদ্যনীতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন, তারপর তা বিধানমণ্ডলীতে সরকারিভাবে ঘোষিত হবে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩ লক্ষ টন চাল ও ১২ লক্ষ টন গম চেয়েছেন আগামী নয় মাসের



শ্রীননী ভট্টাচার্য

জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদন গ্রীষ্মপেশ গৃহস্থ এম-পি কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রকাশ যে, শ্রীরাম সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করতে রাজী হয়েছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গেলেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরও বেশি খাদ্যস্যা এবং আরও বেশি টাকা চাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করার জন্য অর্থ সংস্থানের কথাও তাঁদের ভাবতে হচ্ছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন

স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করার পরেই শ্রীননী ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন যে, আউটডোরের রোগীরা যাতে একটু ভদ্রভাবে চিকিৎসা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে বৈকালেও আউটডোর চালু রাখা সম্ভব কি না সেই বিষয়ে চিন্তা করছেন। বস্তুত যেভাবে ভিড়ের জন্য গবাদি পশুদের চেয়েও অধম অবস্থায় হতভাগ্য যন্ত্রণাকাতর রোগীদের চিকিৎসিত হবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে থাকতে হয়, তা লক্ষ্য করেই হয়ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী এইরকম একটা সংকল্প নিয়েছেন।

কিন্তু এ তো একটা বাহ্যিক অবস্থা মাত্র। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় যদি তাঁর দপ্তর তথা পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাটা আরও গভীরভাবে দেখেন তাহলে তিনি সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হবেন যে, এই বিভাগটি কয়েকটি স্বার্থ তথা আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির জালে অকোপাশের কামড়ের মত এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সমস্ত বিভাগটিকেই কঠোর হস্তে চেলে নাজানো ভিন্ন আর কোন গতান্তর নেই।

আমরা এখানে খোলাখুলিভাবে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করছি। এ সংখ্যায় আমরা শৃঙ্খমাত্র সাধারণ অবস্থাগুলি বর্ণনা করব, কোন স্পেসিফিক ঘটনা নয়।

* * *

প্রথমেই ডাক্তারদের কথায় আসতে হয়। একথা বলাই বাহুল্য যে দেশে রোগীর সংখ্যা ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশি, এই কারণে আরও অধিক সংখ্যক ডাক্তারের প্রয়োজন, এবং তার জন্য প্রয়োজন মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো। তবে বর্তমানে বোধ হয় তা সম্ভবপর নয়, কাজেই সেদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আপাতত টানছি না। বর্তমানে যে সব ডাক্তার পাশ করে বের হচ্ছেন বা বেরিয়েছেন তাঁরাই একমাত্র ভরসা।

কিন্তু একান্ত দায়ে না পড়লে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যদপ্তরে কোন ডাক্তারই কাজ নিতে চান না, কেন না বেতন অল্প। আর যে সব ডাক্তার অল্প বেতন সত্ত্বেও স্বাস্থ্যদপ্তরে চাকরি নেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের কাছেই হাসপাতালটি গোণি বিষয় হয়ে যায়, সকলেই প্রাইভেট প্রাকটিশের দিকে বোঁকেন।

ভাগ্যশেষী ডাক্তারদের কাছে হাসপাতালগুলি হয় উপলক্ষ্য মাত্র। মাত্র আধ ঘণ্টার চেষ্টায় কয়েকশত বিখ্যাত ডাক্তারের নামের উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁরা এক-ঘণ্টার বেশি হাসপাতালে অ্যাটেন্ড করেন না, ফলে হাসপাতালে চিকিৎসক এবং

গাড়ি ফাড়া স্পেসটিস্ট থাকলেও তা রোগীর বিশেষ কোন প্রয়োজনে লাগে না। কয়েক মাস পূর্বে একজন বিখ্যাত ডাক্তারের কথা এই বঙ্গদর্শনেই লেখা হয়েছিল, এখন যিনি স্বাস্থ্যদপ্তরের একজন হোমো-চোমরা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে থাকাকালীন তিনি রোগীদের নামনে খোলাখুলিই বলতেন, “যাঁরা আমার চেম্বারে আমার পয়সা দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁরাই শব্দ, এই ঘরে থাকুন, বাকি সব বেরিয়ে যান।”

হাসপাতালে নিযুক্ত ডাক্তারদের প্রাইভেট প্রাকটিশ বন্ধ করতে না পারলে, রোগীদের চিকিৎসিত হবার কোন সুযোগই থাকবে না। এবং এই কারণেই প্রয়োজন এঁদের বেতন বৃদ্ধি করা। সাধারণ এম-বি-বি-এস-রা বর্ধিত বেতন পেলে তাঁদের সমগ্র সময়টাই হাসপাতালে ব্যয় করতে পারবেন। ফলে রোগীকে লাইন দিয়ে চিকিৎসার জন্য হাপিতোশ করতে হবে না।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিন্তা করে দেখুন, একজন সাধারণ এম-বি-বি-এস ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে চাকরী নিয়ে কোন মফস্বল শহরে বা গ্রামের হেলথ সেন্টারে চাকরী নিনেন। মাত্র চারশে টাকা বেতনে দূর অঞ্চলে গিয়ে সেখানে তাঁরা ওই অল্প টাকায় কিভাবে জীবনযাপন করবেন? ফলে একদিকে তরুণ ডাক্তারেরা হাসপ্রেসন রূপ ব্যাধিতে ভুগে কর্তব্য কর্মে মন দিতে পারছেন না, অপর দিকে যাঁরা গৃহস্থিয়ে নিতে পেরেছেন তাঁরা হাসপাতালরূপ নাম-মাত্র বাড়ি ছুঁয়ে গাড়ি বাড়ি হাঁকাচ্ছেন। আর রোগীর অবস্থা ১৯০০ সালেও যা ছিল ১৯৬৭তেও তার চেয়ে কিছুমাত্র ভাল হয় নি।

তরুণ ডাক্তারদের আরও একটি সমস্যা বিশেষ করে উল্লেখ করার মত। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্র তাঁদেরো নিকট একান্তই সম্বুচিত। একটা এম-ডি বা এম-এস হওয়ার চেয়ে বিলাত থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসা বোধ হয় অনেক বেশি সহজ, যদি সেখানে যাওয়ার এবং থাকার মত সংস্থান থাকে। এদেশে ইচ্ছা করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটিকে সম্বুচিত করা হয়েছে। কেন না গাদা গাদা এম-ডি বা এম-এস হলে কার্যেমী স্বার্থে যা পড়বে। এই কারণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পাশই করানো হয় না। ওই ডিগ্রীগড়লি বর্তমানে পেতে বিদ্যা লাগে না, লাগে খুঁটি। কাগজে কলমে এ কথাটাকে অবশ্য প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু যে কোন ভুক্তভোগী ডাক্তারই আমার কথায় সায় দেবেন।

ডাক্তারী লাইনে যে কার্যেমী স্বার্থটি বাসা বেঁধে আছে তার আবার আসল জিস্মাদার হচ্ছেন তাঁরাই। অর্থাৎ স্বাস্থ্য-

দপ্তরের সেই দুই তিনজন আত্মা, যাঁরা ফাইল হাতে সবদাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘরে ছুটোছুটি করছেন। এঁরা দুটিকেই লক্ষ্যীকেই ঘরে তুলছেন। একদিকে সরকারী কাগজপত্রে সই করে মাসান্তে মোটা অঙ্ক ঘরে ঢুকেছেন অপরদিকে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে দরাজ প্রাইভেট প্রাকটিশ বজায় রেখেছেন। ডাক্তারদের কত ডেপুটেশন এঁদের কাছে গেছে, এঁরা নির্বিকার। কংগ্রেসী অল্পম্বে স্বাস্থ্যদপ্তর সম্বন্ধে অল্প অভিব্যক্তির প্রতি এঁদের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি। ...কিন্তু আসাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নতুন আসলে এঁরা ভোল অবশ্যই বদলাবেন। কিন্তু এঁদের চরিত্র বদলাবে না। কাজেই এঁদের সম্বন্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেন সাবধানতা অবলম্বন করেন। মনে আছে প্রাক্তন কংগ্রেসী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি এই দপ্তরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে হয়, তাহলে তা যেন সরাসরি তাঁর কাছে করা হয়, তিনি নিজেই সেগুলির প্রতিকার করবেন। প্রথম প্রথম উৎসাহ দেখিয়ে কাজও আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে দপ্তরের সচিব এবং অধিকর্তা ও সহ-অধিকর্তাদের পাল্লায় তিনিও শেষ পর্যন্ত ধরা দিলেন। তাঁর উৎসাহ শূন্যে মিলিয়ে গেল। এই আমলাতান্ত্রিক চক্র বড় মারাত্মক, যার বহু-রূপী চরিত্র চিনে ওঠা দুঃসাধ্য। আশা করি নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে পোড়া থেকেই সতর্ক হবেন।

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় নার্সদের কথা। এখানেও একটি কার্যেমী স্বার্থ বাসা বেঁধে আছে। কিছুদিন আগে আমরা এই সাপ্তাহিক বসুমতীতে জনৈক শিক্ষার্থীণী নার্সের বিনা চিকিৎসায় ও শোচনীয় অবহেলায় মৃত্যুর কথা লিখেছিলাম। সেই কাহিনী প্রকাশিত হবার পর বহু নার্স আমাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের বহু চিঠিপত্র এই পত্রিকায় ছাপা হয়, যা থেকে তাঁদের জীবনযাত্রার অসহনীয় দিকটা ফুটে ওঠে। নিজেদের অভিযোগ জানানোর কোন রাস্তা নেই। কর্তৃপক্ষের অন্যান্য আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার কোন উপায় নেই। এবং তা জানাতে গেলে যে পরিমাণ বিভ্রমনার সম্মুখীন হতে হয় তার তুলনা নেই। বিনা কারণে এখানে ওখানে পোস্টিং, শোচনীয় খাওয়া-দাওয়া, ডিউটির সময়ের কোন সীমা নেই, বিশেষমহলের প্রিমপাট্রী না হলে নিয়ত অত্যাচারভোগ সব মিলিয়ে তাঁরা এমন এক নরককূন্ডে পড়ে আছেন যেখানে থেকে আর হাই হোক রোগীর সেবা সম্ভবপর নয়। এঁদের অভাব অভিযোগ দেখার জন্য রাইটাস ব্রিডিং-এ একজন আছেন, কিন্তু

তার কাছে কোন কিছু নিবেদন করতে গেলেই সর্বনাশ, যিনি বা যাঁরা যাবেন তাঁদের নির্ধারণ জলপাইগুড়ি বা পূর্বদুলিয়া বদলী হতে হবে। এই অফিসারটি বিরুদ্ধে নার্সমহলের নানান ধরণের অভিযোগ আছে। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে তা করতে যাবার অর্থই ছিল নার্সদের পক্ষে নিজের কবর নিজেই খোঁড়া। কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে জনৈক নার্স আত্মহত্যা করেছিলেন এবং তাঁর মৃতদেহ কোর্টার্সে পড়ে ছিল তিনদিন। অথচ কোন হিদ্দিশ করা হয় নি। এতো সেদিনের অভিযোগ। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা স্পেসিফিক কেসগুলি তুলে ধরব যেগুলি পূর্বে আমরা এখানে প্রকাশিত করেছিলাম। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিবন্ধ আমাদের অনুরোধ যেন তিনি এই হতভাগিনী নার্সদের একটা ইন্টারভিউ নেন। তাহলেই তিনি বৃদ্ধিতে পাবেন-কী অসহনীয় অবস্থার মধ্যে এঁদের কাট করতে হয়। সব ক্ষেত্রে বেতনটাই বা কথা নয়। কাজের পরিবেশই হল আসল জিনিস।

মুক্তফল্ট সরকারকে উৎখাতের চক্রান্ত

৯ই মার্চ সংখ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমরা লিখেছিলাম যে বর্তমান সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা বিভিন্ন মহলে রীতিমত দেখা গিয়েছে এবং তার সঙ্গে আমলাতন্ত্রের একাংশের রীতিমত যোগসাজস আছে। আমাদের সেই আশংকাটি যে নভা তাব পরিচালনা গেল গত বৃহস্পতিবার বিকাল পরিষদে শ্রীযতীন চক্রবর্তীর অভিযোগে—যেখানে বলা হয়েছে যে, এই সরকার বহু গঠিত হল তখন তাকে বালচাল ও উৎসাহ করার জন্য এক কার্যেমী স্বার্থ তৎপর শিল্পপতি চক্র খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে এবং মহাকরণের কয়েকজন প্রবীণ তফসিল এতে মদত দিয়ে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, আই ডি পুন্ডলিস ও বর্তমান রেঞ্জের ডি আই সি প্রমুখের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে নতুন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে একজন উদ্ভট আমলাবিশিষ্ট অশালীন মন্তব্য ইতিপূর্বে জনসাধারণের দৃষ্টিপথে এসেছিল এবং তার জন্য অনেকেই বিক্ষুব্ধ, এমন কি মহাকরণের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে। ডি-আই-জি-কথা আমরা ইতিপূর্বে করেব বা আলোচনা করেছি। তাঁর বিবৃতি নির্বাচনে ডায়মন্ডহাবার এবং কংগ্রেস প্রার্থীর জন্য সরকারী মেসিনারী ব্যবহারে অভিযোগ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তাঁর এই রাজনীতি প্রবণতা নিয়ে

কংগ্রেসী আমলেই তাঁর বিরুদ্ধে কথা উঠাছিল এবং তাঁর অধীনস্থ আই-পি-এস আফিসাররা তাঁর এইসব ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিলেন। এ সব কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

আই-জি ও চীফ সেক্রেটারীর নির্দেশে বহু ফাইল পোড়ানো হয়েছে বলে শ্রীযতীন চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন। উভয়ের হাতে তদ্রাসী করলে এখনো বহু জরুরী ফাইল মিলতে পারে এ কথাও শ্রীচক্রবর্তী বিধান পরিষদে বলেছেন। এ ছাড়া তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, বিদায়ী কংগ্রেসী সরকার কতক অন্যায্যভাবে একটি ক্যাডাব পোস্টকে ডি-ক্যাডার করে মধ্য-মহাদীর সেক্রেটারীর পদে বসানো হয়েছে এবং প্রাইভেট বাস কেলেকারী ফাঁস হয়ে যাবার পূর্ব কুৎসিত দ্রুততার সঙ্গে তদানীন্তন পরিবহন কমিশনারকে অন্যত্র বদলী করা হয়।

এই ধরনের আরও কয়েকটি অভিযোগ করে শ্রীচক্রবর্তী বলেন যে, এই চক্র এখন নতুন ম্যুংস পরেছে; কিন্তু এই চক্রকে চাঙতে হবে। এদের সরানো না হলে স্বতন্ত্র সরকার চলতে পারে না। মহাকরণের এই চক্রান্ত ব্যর্থ না করতে পারলে সব বানচাল হয়ে যাবে। সমগ্র ব্যবস্থা সুস্থানুপস্থানভাবে তদন্তের জন্য তিনি অবিলম্বে একটি প্রশাসন সংস্কার কমিটি স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন।

কাল কানুন বাতিল

১৯৫০ সালের নিরাপত্তা আইনকে পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রেমিক মানুষকে স্বস্তি দিয়েছেন এ জন্য তাঁরা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের পাত্র। ওই কুখ্যাত 'কাল কানুন'টির জন্য প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতার আশ্বাদ থেকে জনসাধারণ বঞ্চিত ছিলেন। গণতন্ত্রে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই কোন রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ, পোষণ ও প্রকাশের অধিকার আছে। কিন্তু সেই অধিকারকে এই নিরাপত্তা আইন দিয়ে খব ও কব করা হয়েছিল। কেন না এই আইনের দ্বারা সরকার যে কোন লোককেই বিনা বিচারে আটক রাখার অধিকারী ছিলেন এবং এই আইন নির্বিচারে প্রত্যেকের অ-কংগ্রেসী কর্মীদের উপর প্রযুক্ত হয়েছে। যে কংগ্রেস বরাবর মুখে গণতন্ত্রের বুলি কপটে এসেছে, সেই গণতন্ত্রের ধ্বংসকারীরা কোনদিনই এই আইনটিকে হাতছাড়া করেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৭ সালে

কেরলে কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তারাও এই অগণতান্ত্রিক আইনটিকে তুলে দিয়েছিলেন, যদিও গণতন্ত্রের তথাকথিত ধ্বংসকারী কংগ্রেস সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে সেই সরকারকে উৎখাত করেছিল।

গত বৃহস্পতিবার, ১৬ই মার্চ, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠকে উক্ত নিরাপত্তা আইনকে কার্যকরী না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা আইনে আটক বন্দীদের মুক্তি ও মামলাগুলি প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এই আইনটি ১৯৫০ সালে গৃহীত হয় এবং ১৯৬৬ সালে মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অর্ডিন্যান্স যারফত পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৬৬ সালের বর্ষাকালীন অধিবেশনে অর্ডিন্যান্সকে আইনসভার মাধ্যমে নিয়মিত করার চেষ্টা হয়, কিন্তু প্রবল গণবিক্ষোভের জন্য প্রাক্তন সরকারের পক্ষে বিধান সভায় পেশ করে অর্ডিন্যান্সকে আইনে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার উক্ত অর্ডিন্যান্সকে বিধান সভায় পেশ করে প্রাণ সংস্কারের চেষ্টা করবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন

১৯৪৯ সালে নৈহাটি ও চাঁচুদার মধ্যে গঙ্গার একটি লগ সার্ভিস খোলা হয়েছিল। পারাপারের যাত্রিসংখ্যা প্রতিদিন বিশ হাজার, যা থেকে বোঝা যায় এই কেন্দ্রটি কত দূর গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘকাল ধরে এই লগ কোম্পানী জনসাধারণের সেবা করে আসছে। নানা দিক থেকে এটি একটি জনসাধারণের নৈহথ্য প্রতিষ্ঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লগ কোম্পানী স্থাপিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এরা এক পরমা ভাড়া বাড়ান নি, অনেক সুযোগ পেয়েও। তা ছাড়া যাত্রীদের সঙ্গে এরা যে ব্যবহার করেন তাও আদর্শস্থানীয়।

কিন্তু সম্প্রতি এই কোম্পানীটি উঠে যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছুই নয়, গঙ্গা নদীর জল এত কমে গেছে যে, ভাটার সময়ে লগ চালানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কাজেই কোম্পানীর তরফ থেকে জনসাধারণকে নোটিশ দিয়ে বৈঠা হয়ে গেছে।

গঙ্গার জল নায্যতা হারিয়ে ফেলেছে তার দরুণ প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার অনেকটা দায়ী, ফরাক্ষা প্রকল্প এতদিনে সমাপ্ত হলে গঙ্গার উন্নতি হওয়া সম্ভবপর ছিল। কিন্তু সে কথা এখন থাক। সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে এই যে, এই হাজার হাজার যাত্রী

এখন কিভাবে পারাপার করবেন। নৈহাটি সহ সমগ্র গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরটি শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্য কেন্দ্র, পঞ্চাশত্রে পশ্চিমদিকে চাঁচুড়া একটি জেলার সদর। নৈহাটি ও তার সমীপস্থ শিল্পাঞ্চলসমূহে কোন হাসপাতাল নেই। প্রতিদিন অল্প রোগীকে চাঁচুড়া হাসপাতালে গঙ্গা পার করে আনতে হয়। লগ সার্ভিস উঠে গেলে সাধারণের জীবনযাত্রার তার যে প্রতিক্রিয়া পড়বে তা ভাবতেও আতঙ্ক হয়।

এমন দাবি অবশ্যই করা হচ্ছে না যে, গঙ্গার জলের উচ্চতা বাড়িয়ে দেওয়া হোক। তবে এমন কতকগুলি কাজ করা চলতে পারে যাতে এই লগ সার্ভিসকে বজায় রাখা যায়। জলের গভীরতা হ্রাস পেয়েছে শুধু একটি দিকে। অর্থাৎ চাঁচুড়ার দিকে। লগঘাটের ওপর একটি দীর্ঘ জেটি করে দিলে লগের পক্ষে নোঙর করার কোন অসুবিধা নেই এবং সেই জেটির ওপর দিয়েই জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে হেঁটে কিনাবায় আসতে পারেন।

শোনা যায় যে, লগ কোম্পানীর তরফ থেকে এইরকম চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তার অনুমতি মেলে নি। বলা হয়েছে লগঘাট দিলে অন্যান্য নৌকা বা স্টীমারের যাওয়া আসা করতে অসুবিধা হবে। কিন্তু এটা কোন বুদ্ধি নয় কুসুদ্ধি, কেন না জেটি এলাকাটুকুতে একটু গভীর জল দিয়ে ঘুরে যেতে সাধারণ নৌকার কোনই অসুবিধা নেই।

হুগলী চাঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি একটু চেষ্টা করলেই এ সমস্যার সমাধান হত। এই ঘাটটি ইজারা দিয়ে ওই মিউনিসিপ্যালিটি বছরে বড় কম মূল্যফা তোলে না। কিন্তু তার বিনিময়ে জনস্বার্থের মুখ চেয়ে সামান্যতম প্রচেষ্টাও যদি ওই প্রতিষ্ঠানটি করত তাহলে কিছু বলার থাকত না। কিন্তু এত উদাসীন ও নিষ্কর পৌরসভা বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

আগামী ৩১শে মার্চ লগ কোম্পানী উঠে যাচ্ছে। জনসাধারণ যারা নানা কার্ষোপলক্ষে প্রত্যহ গঙ্গা পারাপার করেন। তাঁদের সামনে আজ মহা দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়েছে। তাহলে কি আবার সেই মধ্যযুগে ফিরে যেতে হবে। সকলের এইটাই আজ জিজ্ঞাসা। ছাত্রছাত্রী অফিস ও কারখানার কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ব্যবসাদার, চিকিৎসক, বোগী সকলেরই এক চিন্তা, কি করে অফিসে, কারখানায়, ইন্সকুলে কলেজে হাসপাতালে কিভাবে হাজিরা দেবেন। আমরা এ বিষয়ে নতুন মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১৮/৩/৫৭)

প্রকৃষ্ট খাদ্য কি তার উল্লেখ পাই
শ্রীমন্তগবদগীতায়—

আরঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ

প্রাতিবর্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্পিরাহদ্যা আহারাঃ

সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥

—এই সকল আহার আরঃ, উদ্যম, বল,

আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং

জরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও মনোরম, সেই-

গুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়—অর্থাৎ

খাদ্য হিসাবে প্রকৃষ্ট বা সর্বোত্তম। সংক্ষেপে

এর চেয়ে প্রকৃষ্ট খাদ্যের লক্ষণ ও গুণাগুণ

বর্ণনা অসম্ভব। খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যও

এখানে সুস্পষ্ট। গীতা ধর্মপুস্তক, খাদ্য-

বিজ্ঞানের পুস্তক নয়। এই পুস্তকে খাদ্য

সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মানুষের জীবনে

উত্তম খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও

সাধকতা সুপ্রমাণ করে। গীতার বর্ণনায়

আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানের কোন শব্দ ব্যব-

হৃত হয় নি, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-

সম্মত। আমরাও এই প্রবন্ধে আধুনিক

বিজ্ঞানের কোন শব্দ ব্যবহার না করে

মানুষের কি কি খাদ্য কি পরিমাণে প্রয়ো-

জন তার আলোচনা করব। এক তো সেই

সব শব্দ বর্তমানে বাংলা দেশে তথা ভারত-

বর্ষে হাজার কয় ১১৯ জনের নিকট

দুর্বোধ্য আর সেই সব শব্দ ব্যবহার না

করেও সাধারণের নিকট খাদ্যতত্ত্ব সম্যক

ও সরলভাবে বুঝান যায়। অতএব উহাই

সঙ্গত।

গীতায় অন্যত্র এ কথাও আছে যে,

অতিরিক্ত ভোজনকারী ও একান্ত অনাহারী

হওয়া সঙ্গত নয়। নিয়মিত আহারী

হওয়াই গীতার নির্দেশ। ইহাও সম্পূর্ণ

বিজ্ঞানসম্মত। গীতায় অবশ্য কি কি

জিনিস কি পরিমাণে খেতে হবে তার

নির্দেশ নেই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যদি

নিজের প্রয়োজনের নিয়মক হয় তবে তাই

সর্বোত্তম। মানুষের শরীর একটা নিরীক্ষা

কাজের নল নয়, সকলের বেলায় একই

নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তথাপি বিজ্ঞানীরা

সকল সাধারণ পরিপ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের

জন্য একটা মোটামুটি খাদ্যতালিকা প্রস্তুত

করেছেন। তাকে বলা হয় সুখম খাদ্য।

সুখম খাদ্য আমিষ বা নিরামিষ দুই

প্রকারেরই হতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্ক একজন পুরুষের দৈনিক

খাদ্যতালিকা—

১। চাউল বা আটা—৮—১০ ছটাক

২। ডাল —১ ”

৩। তরকারী —৬-৮ ”

৪। দুধ —৪ ”

৫। তেল —১ ”

৬। গুড় —১ ”

আমাদের খাদ্য

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

৭। মাছ বা মাংস—২ ”

অথবা ১টা ডিম ও ১ ছটাক মাছ

৮। ফল —২ ”

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার চাউল বা

আটার পরিমাণ পুরুষের চার-পঞ্চমাংশ

হবে অর্থাৎ ৬-৮ ছটাক। অন্য সব

জিনিসের পরিমাণ হবে সমান। কিন্তু

গর্ভবতী ও মাদের কোলে মায়ের দুধ

খাওয়ার মত অর্থাৎ দশ মাস বয়স পর্যন্ত

শিশু আছে তাদের দৈনিক দুধের প্রয়ো-

জন এক লিটার। এতে গর্ভস্থ শিশুর

এবং মায়ের বৃদ্ধি পর্যাপ্ত দুধ হওয়ার

মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যের ব্যাপারে

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে বৈজ্ঞানিক মতামত

পোষণ করেন, তা জ্ঞানার জন্যে জন-

সাধারণ অভ্যস্ত আগ্রহী। এখানে খাদ্য-

নীতির কথা তিনি বলেন নি।

সর্বস্তরের মানুষের বাঁচার জন্যে যে

পরিমাণ খাদ্যের দরকার সেই কথাই ডঃ

ঘোষ তথ্যসহ এখানে পরিবেশন করেছেন।

—সম্পাদিকা

নবজাত শিশুরও যথাযথ পুষ্টি সাধন হয়।

মাকে দুধ না খাইয়ে শিশুর জন্য দুধের

বা বেবীফুডের ব্যবস্থা করা ভুল। মায়ের

দুধের গুণে গরুর দুধে বা বেবীফুডে

নেই। মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে সর্বোত্তম।

অতএব মাকে উপযুক্ত পরিমাণ দুধ খাওয়ান

মা এবং শিশু উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর।

মায়ের দুধ খাওয়া বন্ধ হওয়ার পর শিশুকে

ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তিন-চতুর্থাংশ

লিটার খাঁটি গরুর দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা

করা দরকার। তারপর ১৬ বৎসর বয়স

পর্যন্ত দৈনিক ১ লিটার। এতেই

জাতির কল্যাণে দুধ উৎপাদনের নিত্যন্ত

আবশ্যকতা সুস্পষ্ট। পশ্চিম বাংলার

প্রয়োজনীয় দুধের এক-দশমাংশও উৎপন্ন

হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ

আছে। আর দুধ হলেই হয় না। দুধের

গুণাগুণও নির্ভর করে খাদ্যের উপর।

গরুরও পুষ্টিকর খাদ্য চাই। তবেই দুধ

প্রথম শ্রেণীর হবে। দুধের বেলায় যে

কথা খাটে অন্য সব খাদ্যবস্তু বেলার

তা। যে জমিতে তরিতরকারী উৎপন্ন হয়

ততত উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া হল

তরকারীর গুণ যথাযথ হয়। সার না

দেওয়া বা কম দেওয়া জমিতে উৎপন্ন

তরকারী পুষ্টির দিক দিয়ে নিকৃষ্ট।

অতএব শিশু পরিমাণ হলেই হয় না,

মানও যথাযথ হওয়া চাই।

দুধ বদে বয়স হিসাবে প্রাপ্তবয়স্ক-

দের খাদ্যের পরিমাণ কম হবে। ২ বৎসরের

শিশুর প্রাপ্তবয়স্কের এক-পঞ্চমাংশ, ৫-৬

বৎসর পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ, ৭-৯ পর্যন্ত

প্রায় অর্ধেক, ১০-১০ পর্যন্ত সত-

দশমাংশ। ১০ বৎসরের উপর সনাই

খাদ্য গ্রহণ ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্ক।

এরা পরিপ্রম বোধ করে তাদের বেশ খাদ্যের

প্রয়োজন।

সমস্ত জাতির লোকসংখ্যাকে ৮

দিগে গুণ করে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সম্মত

নির্ধারণ করা হয়। পশ্চিম বাংলার

বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ৩০.১৬

কোটি। অতএব ৩০.৭৫×৮ অর্থাৎ ৩

কোটি প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রয়োজনীয়

খাদ্য উৎপন্ন ও সরবরাহ আবশ্যিক।

উপরে যে খাদ্যতালিকা দিয়াছি তত

মাছ, মাংস ও ডিম আছে। যান মাংস বা

ডিম খায় না তাদের দুধের পরিমাণ

দৈনিক ৪ ছটাক হতে বাড়িয়ে ৮-১২

ছটাক করা প্রয়োজন। অন্য সব জিনিস

সমানই থাকবে।

এখন তালিকাভুক্ত বিভিন্ন জিনিস

সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা

করতে চাই। তালিকার প্রথম জিনিস

চাউল বা আটা। বাংলা দেশে জোয়ার বা

বাজার হয় না, সামান্য কিছু পরিমাণ হুটা

হয় কোন কোন অঞ্চলে। স্বচ হয় কিছু

পরিমাণে। কিন্তু বাঙালীর মূখ্য খাদ্য

ভাত। কারণ বাংলা দেশে খনিই অধিক

পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যে কারণে যে

জিনিস উৎপন্ন হয় তাই সে অঞ্চলের

লোকের পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য এর অর্থ

এই নয় যে, প্রয়োজনমত অন্য জিনিস

খেতে হবে না বা খাওয়া সঙ্গত নয়।

পাঞ্জাবীরা রুটি খায়, তাদের শারীরিক

সাধারণিক সমস্যা

শক্তি ভাত খাওয়া বাঙালীর চেয়ে বেশি। অতএব গম চাউলের চেয়ে পুষ্টিগুণে খাদ্য। এরূপ অবৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের অনেক বিজ্ঞানী সাহায্য করেছেন। ভাত-রুটির চেয়ে কম পুষ্টিগুণ নয়। যার পক্ষে ভাত হজম করা সহজ এবং মৃৎরোচক সে-ভাত থাকে। একজন পাক্ষাবী দুই বেলারই রুটি খেতে চায় আর বাঙালী দুই বেলারই ভাত খাওয়া পছন্দ করে। আবহাওয়ার উপরও তা অনেকটা নির্ভরশীল। পাক্ষাবী পরিবার বেশ দীর্ঘকাল বাংলা দেশে থাকার পর ভাত খাওয়া পছন্দ করে। জাপানের প্রধান খাদ্য ভাত। কিন্তু জাপানীরা বেশ বলিষ্ঠ ও সবল।

চাউলের মধ্যে আমন ধানের চাউল অধিক ধানের চাউলের চেয়ে অধিক পুষ্টিগুণ। সাধারণত কল-ছাটি চাউলের চেয়ে ঢেঁকি-ছাটি চাউল অধিক পুষ্টিগুণ। আতপ ও-সিম্ব এই দুই প্রকারের চাউল প্রচলিত। যদিও বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, কোরালা প্রভৃতি অঞ্চলে সিম্ব চাউলই অধিক প্রচলিত তথাপি অনেক প্রদেশে গ্রাম্য পরিবারে সিম্ব চাউল ব্যবহৃত হয় না। বাংলা দেশেও গ্রাম্য কারখানা ও বৈদ্য পরিবারের বিধবারা আতপ চাউলই ব্যবহার করে। পাশ্চাত্য খুব কম হলে আতপ ও সিম্ব চাউলের গুণে কোন তারতম্য হয় না, কিন্তু পাশ্চাত্য অপেক্ষাকৃত বেশি হলে সিম্ব চাউল আতপ চাউলের চেয়ে পুষ্টিগুণে। বাংলা দেশে ভাতের মাড় গেলে খাওয়ার রেওয়াজ। তাতে মাড়ের সঙ্গে অনেক পুষ্টিগুণ জিনিস চলে যায়। অতএব এইরূপ ভাত পাকের প্রথা ক্রান্তিকর। নূর্যে যখন প্রত্যেক বাড়িতে গরু থাকত এবং মাড় গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত তখন বৃহত্তর দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু আজ অত্যন্ত শহরের অধিকাংশ মাড় অপচয় হয়। তবে বাংলা দেশে মাঝে মাঝে কেনাভাত এবং খিচুড়ি খাওয়ার চলন আছে, তা খুবই ভাল। বাংলা দেশে মাড় না গেলে করতলে ভাত রান্না করতে-বিশেষ করে আতপ চাউলের-খুব কম মেয়েই পারে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমার মনে হয় এ কাজে মহারাষ্ট্রের মেয়েরা সর্বাধিক দক্ষ। এমন সুন্দর স্বরকরে মাড়-না-গালা আতপ চাউলের ভাত অন্য কোথাও খাই নি।

ধান হতে শুধু চাউল তৈরি হয় না চিড়া, মুড়ি, খেও হয়। আর চাউল হতেও শুধু ভাত হয় না—নানা প্রকারের মৃৎরোচক পিঠা, পারসান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এতে পুষ্টিগুণ জিনিসের কোন অপচয় হয় না। পিঠা শীতকালেই তৈরি হয় বেশি। শীতকালে মানুষের অধিকতর

খাদ্যের প্রয়োজন। অতএব তখন এ সব সমরোপযোগী। শীতপ্রধান দেশে লোকের অধিক খাদ্যের প্রয়োজন।

আটা ময়দার চেয়ে অধিক পুষ্টিগুণ। সম্পূর্ণ গমের আটা সবচেয়ে পুষ্টিগুণ। গ্রামাঞ্চলে খুব কম বাঙালী পরিবারেই আটা হতে ভাল রুটি (চাপাটি-ফুকা) তৈরি করতে পারে। চাউলে—পশ্চিম বাংলা প্রায় ৯০ ভাগ স্বাবলম্বী।

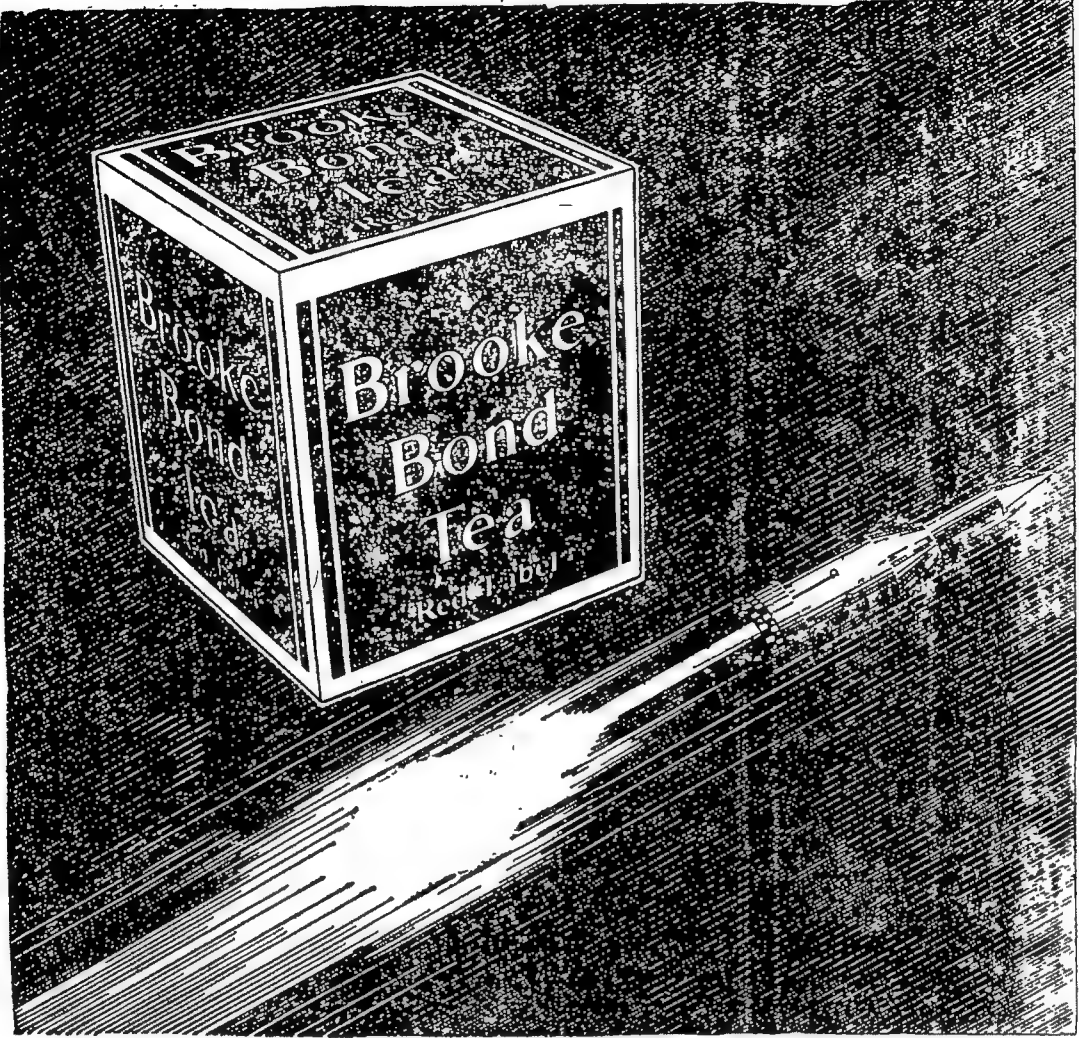
সাধারণ বাঙালী ভাতের পরেই খায় ডাল, তরকারী ও মাছ।

ডালের মধ্যে মগ, মসুর, ছোলা, কলাই, বিউল, মটর, খেসারী, অড়হর প্রভৃতি প্রচলিত। মগডাল সর্বোৎকৃষ্ট, আর খেসারী ডাল সবচেয়ে কম গুণ সম্পন্ন। বিহারে কোন কোন বিজ্ঞানী গবেষণা করে এই স্থির করেছেন যে, খেসারী ডাল নিয়মিত অধিকাংশ দিন খেলে একপ্রকারের রোগ হয়। কিন্তু মেদিনীপুর জেলার সুতাছাটি থানা অঞ্চলে (যেখানে আমি বাস করি) অধিকাংশ লোক ডাল হিসাবে খেসারী ডালই ব্যবহার করে। অন্য ডাল ব্যবহার খুবই কম। এখানে তেমন বিশেষ কোন অসুখ এদের নেই। হয়তো এদের খানো এমন কোন জিনিস আছে যাতে অসুখ নিবারণ করে। এ বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন। সব রকম ডালই খাওয়া প্রয়োজন—এক প্রকারের ডাল নয়। ভাতের মাড়ের সঙ্গে যে সব জিনিস চলে যায়, ডালে তার কোন কোন জিনিস থাকে। এই হিসাবে ডাল খাওয়া বাঙালীর পক্ষে ভাল। পশ্চিমবঙ্গের তার প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশ ডালও উৎপন্ন হয় না।

তরকারি যতটা খাওয়া প্রয়োজন (দৈনিক ৬-৮ ছটাক) তার ২ অংশ হওয়া চাই শাকপাতা। সে শাকপাতাও এক প্রকারের না হয়ে বিভিন্ন প্রকারের হওয়া ভাল। পালং, মূলা, নটে, খেসারী, মটর, সরষে, মেথি, লাউ, কুমড়া, পিড়ি, শুল্কি, পুই প্রভৃতি যে সব শাক উৎপন্ন করা সম্ভব সবই ব্যবহার করা উচিত। আলু এক ছটাক হলেই চলে বাকী সব অন্য তরকারি। উচ্ছে, করলা, লাউ, কুমড়া, কেশন, কাঁচকলা, চালকুমড়া, কিলে, ঢেঁড়স, মূলা, বরবটি, সীম, কাঁচা পেঁপে, কচু, মিষ্টিআলু, বাঁধাকপি, বাঁট, ওল-কপি, গাজর, শালগম, টমাটো, পেঁয়াজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তরকারি যখন বা ভাল উৎপন্ন হয় তা সবই খাওয়া উচিত। প্রত্যেক তরকারির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। টাটকা তরকারি সব সময়ই উৎকৃষ্ট। দূরত্বের বিষয়, পশ্চিম বাংলার রোজ গ্রামে বাজার নেই। তাই শুল্কনো তরকারি খেতে হয়—বা গুণের দিক দিয়ে অপকৃষ্ট। যথাসম্ভব দূরত্বের ও রাতে এক রকম তরকারি না খেতে হলেই

ভাল। দেশে আজ তরকারিরও খুব অভাব। পশ্চিমবঙ্গের তরকারির প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশও উৎপন্ন হয় না। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অনেকে চাউলের অভাবে আলু খাওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তা অবাস্তব। প্রথমত এক সের চাউলের অভাব পূরণের জন্য প্রায় চার সের আলু খাওয়া প্রয়োজন কারণ আলুতে জলের ভাগ বেশি। এ পরিমাণ আলু খাওয়া অসম্ভব আর সাধারণত আলুর দাম যা তাতে আলু দিয়ে চাউলের অভাব মোটামুটি অন্তত ব্যয়-বহুল। শতকরা ৯৫ জনের সাধ্যাতীত। আলু পুষ্টিগুণে তরকারি। আমরা তা খাওয়ার বিরোধী নই, বরং কিছু খাওয়া ভাল মনে করি। আমাদের বস্তু্য হচ্ছে এই যে, আলু ভাতের স্থান দখল করতে পারে না।

মাছ একটি বেশ পুষ্টিগুণ খাদ্য। বাঙালীর খুব প্রিয় খাদ্যও। সহজে হজম হয়। ছোট-বড়, মিঠাজলের মাছ, নোনাজলের মাছ, সামুদ্রিক মাছ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মাছ আছে। কিন্তু সাধারণ বাঙালী সামুদ্রিক মাছ বড় একটা পছন্দ করে না। মিঠাজলের মাছই বেশি পছন্দ করে। পাশ্চাত্য ভেটিকারী নোনাজলের মাছ। মিঠাজলে কখনো কখনো বড় ভেটিকারী দেখা যায় বা নোনাজল হতে আসে। কিন্তু পাশ্চাত্য বা ভাঙন মাছ মিঠাজলে দেখাই যায় না। রায়ের, টাটকানি, রিটা প্রভৃতি মাছও নোনাজলে দেখা যায় না। কিছু কিছু ছোট মাছ আছে যা মানুষ প্রায় সবটা চিবিরে খায়—সেগুদলি শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। বড় মাছের মধ্যে রুই, কালা, মগেল, কাল-বোথ ছোট পোনা হিসাবে পুকুরে ছেড়ে বড় করে খাওয়া হয়। এই সব মাছও স্বাভাবিকভাবে মিঠাজলের নদীতে বড় হলে যেসব সুস্বাদু হয় পুকুরের মাছ তত সুস্বাদু হয় না। বাঙালী যত মাছ খায় পরিমাণে তার অধিকাংশই ছোট মাছ। সেগুদলি সহজে হজম হয় এবং বেশ সুস্বাদু। কই, মাগুর, সিঁচি প্রভৃতি মাছ জ্বিয়ে রাখা যায়। এগুদলি বেশ পুষ্টিগুণ ও পেটরোগা লোকের পক্ষে ভাল। তরকারির বেলায়ও যেমন সব রকমের তরকারি খাওয়া ভাল—মাছের বেলায়ও তেমনি। যে সময়ে যে মাছ বেশি পাওয়া যায় সেই সময় সেই মাছ খাওয়াই শ্রেয়। ইলিশ মাছ বাঙালীর একটি অতি প্রিয় মাছ। কিন্তু পশ্চিমবাংলা হতে তা একপ্রকার লোপ পেতে বসেছে। বর্ষাকালে ইলিশ মাছই অনেকটা মাছের চাহিদা মেটাত। তার অভাবে পশ্চিমবঙ্গের এই সময় দারুণ মাছের সঙ্কট। ফলে যে সব মাছ ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা হয় তাতে



পরিভূষ্টির নতুন জগতে পাড়ি দিন

মন-মেজাজ চাঙ্গা করতে হলে চাই ব্রক বণ্ড রেড লেবেল চা।
প্যাকেট পিছু ছের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন।
ব্রক বণ্ড রেড লেবেলের অপূর্ব স্বাদগন্ধ আপনাকে পরিভূষ্টির
এক নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবে।

দাণ্ডাধিক বন্দনতী

মাছের সংকট আরো বাড়বে বই কমবে না। সারা পশ্চিমবাংলায় যে পরিমাণ মাছের প্রয়োজন তার ৬ অংশও উপেক্ষা হয় না।

ফলের মধ্যে বাংলা দেশে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, পেঁপে, বেল, বাতাবী লেবু, আনারস, সফেদা, নারিকেল প্রভৃতি হয়। আমকেই বাঙালী শ্রেষ্ঠ ফল বলে মনে করে। তা ঠিকই। কলা প্রায় সারা বৎসরই হয়। যে সময়ে যে ফল প্রচুর উৎপন্ন হয় সে সময় সে ফল খাওয়াই বিধেয়। আমদানী করা দামী কোন ফল না খেয়েও এই সমস্ত ফল খেলেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট। বাঙালীদের ফল খাওয়ার অভ্যাস কম। প্রতিদিনই কোন না কোন ফল খাওয়া উচিত। অথচ ফল উৎপন্নের পরিমাণ পশ্চিমবাংলায় খুব কম। প্রয়োজনের দশ ভাগের এক-ভাগ বড় জোর হতে পারে।

বাংলাদেশে সাধারণত গরু, মহিষ ও ছাগলের দুধ পাওয়া যায়। এর মধ্যে গরুর দুধই অধিক প্রচলিত এবং সবচেয়ে ভাল। পেটরোগা শিশুর পক্ষে ছাগলের দুধ ভাল। দুধ হতে দই, ক্ষীর, ছানা মাখন ও ঘি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। দই শরীরের পক্ষে বেশ উপকারী। দই হতে মাখন তুলে যে ঘোল হয় তাও উপকারী। অনেকের দুধ হজম হয় না, কিন্তু দই বেশ হজম হয়। তাদের পক্ষে দই খাওয়া বিধেয়। নিরামিষাশীর পক্ষে ছানা বেশ পুষ্টিকর খাদ্য—মাছ-মাংসের অভাব ছানা হতে পূরণ হয়। ছানার জলেও পুষ্টি-কর পদার্থ থাকে। তাও খাওয়া উচিত। ছানা হাতে প্রস্তুত সন্দেশ, কাঁচাগোলা, কুসগোলা, পানতোয়া, রাজভোগ প্রভৃতি বেশ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য। গুঁড়া দুধ কখনো টাটকা খিটি গরুর দুধের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। গুঁড়া দুধ আমদানী করে দেশে দুধ উৎপাদনের রাস্তায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে সরকার। এটা তাদের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। সমস্ত জাতিকে এর কুফল ভুগতে হয়েছে এবং আরো দীর্ঘকাল ভুগতে হবে। যদি গুঁড়া দুধ আমদানী বন্ধ হয় তবে তা জাতির পক্ষে বরস্বরূপ হবে।

বাংলাদেশে সাধারণত তিন প্রকারের গুড় প্রচলিত। খেজুর গুড়, তালের গুড় ও আখের গুড়। প্রথম কথা বলতে চাই যে, গুড় খাদ্য হিসাবে চিনির চেয়ে উৎকৃষ্ট। গুড়ে শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক এমন সব জিনিস আছে যা চিনিতে বর্তমান নেই। উপরোক্ত তিন প্রকারের গুড়ের মধ্যে তাল গুড় (তাল গাছ হতে নিষ্কাশিত রস হতে তৈরি) সর্বোৎকৃষ্ট। তিন গুড়েই অবশ্য দানাদার চিনি একই। অতএব আখের গুড়ের চিনি, খেজুরের

গুড়ের চিনি বা তালের গুড়ের চিনি হতে প্রস্তুত মিছরিতে গুড়ের কোন তারতম্য নেই। আখ পিষিয়ে টাটকা রস, ঠান্ডা খেজুরের রস ও তালের রস উত্তম পানীয়।

বাংলা দেশে রান্নার জন্য সরষের তেল সর্বাধিক প্রচলিত। তিল তেলও অল্প পরিমাণে চালু আছে। গত বৎসর সরষের তেলের অভাবে বাদাম তেল খাওয়াও চালু হয়। রান্নার জন্য এইসব তেলের যে কোন একটা ব্যবহার করাই উচিত। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিজ্জ তেল হতে প্রস্তুত দালদা বা বনস্পতি তেলের চেয়ে নিকৃষ্ট, ক্ষতিকরও হতে পারে। কাজেই বনস্পতি ব্যবহার না করাই সঙ্গত। ইউরোপে মার্গারিন (দালদা জাতীয় জিনিস) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইউরোপের লোক প্রতিদিন দুধ, মাখন, মাছ, মাংস প্রভৃতি পায়। আমাদের দেশ তা পায় না। অতএব ইউরোপের উদাহরণ দেওয়া বুদ্ধিসিদ্ধ নয়। যাদের একমাত্র স্নেহ-পদার্থ রান্নার ব্যবহৃত জিনিস তাদের পক্ষে অর্থাৎ দরিদ্রের পক্ষে দালদা অবশ্য স্বজনীয়। দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে কেরালায় নারিকেল তেল রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন হলে যে সব জায়গায় নারিকেল বেশি উৎপন্ন হয় সেখানে রান্নার জন্য নারিকেল তেল ব্যবহার করা সঙ্গত।

ঘি, মাখন দিয়ে রান্না করার কথা বাঙালী কোনদিন ভাবতে পারে নি, আজ তা আরো ভাবতে পারে না। কিন্তু মদ্যরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে অল্প ঘি খাওয়ার প্রথা বাংলা দেশে বরাবর ছিল। এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ছোটবেলার ঠাকুরমার কাছে শুনেছি—‘ঘি ছাড়া ডাল আর লক্ষ্মীছাড়া গাল’ অর্থাৎ লক্ষ্মীছাড়া বলে গাল বেওয়া যেমন অসঙ্গত, ঘি ছাড়া ডাল খাওয়াও তেমনি অসঙ্গত। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য লিখেছেন ‘ভোজ্যং যথা সর্বরসংবিনা জ্যং’—সর্বরসময় খাদ্যও যেমন ঘূতবিনা নিরর্থক। তাঁর মতে ঘি খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ।

পশ্চিমবাংলায় তৈলবীজ প্রয়োজনের ৬ অংশের মত উৎপন্ন হয়।

বাঙালীর খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী খুব সর্বাঙ্গীণ। সুত্তো হতে আরম্ভ করে ডাল, ঘণ্ট, আল, বোল, টক, মিষ্টি প্রভৃতি খেতে বাঙালী ভালবাসে। এক কথায় বাঙালী খুব ভোজনবিলাসী, সারা ভারত-বর্ষের মধ্যে এমন ভোজনবিলাসী আর

কোন প্রাপ্ত নয়। এরও কারণ আছে। বাংলা দেশে হাওয়ায় জলের পরিমাণ যথেষ্ট অথচ গরম দেশ। এ অবস্থায় হজম-শক্তি কম হওয়া স্বাভাবিক। তাই বাঙালী খাদ্যকে নানাভাবে মদ্যরোচক করতে চেষ্টা করেছে। বাঙালী মেয়েদের প্রতিভার বিকাশ হয়েছে এদিকে—পরিবারের সকলের কল্যাণ বৃদ্ধিতে। প্রকৃতিকে জয় করার কাজে এদের দান অপরিসীম। প্রশংসা করি তাদের।

বাঙালী রোজ ভাতের সঙ্গে লেবু খাওয়া পছন্দ করে। অন্য প্রদেশে পাকা লেবু ব্যবহৃত হয় বেশি। বাংলা দেশে সুপদ্ধি সবুজ লেবু পছন্দ করে বেশি। তার গন্ধ চিত্তবিনোদক। নানারকমের লেবুও আছে—পাতিলেবু, আগজি-লেবু, গম্বলেবু প্রভৃতি। এ ছাড়া টক খায় নানারকমের। কাঁচা আম, তেঁতুল, করমচা, চালতা, আমড়া, কুল, কমরাঙা, রোয়াইল (শিঁসাকুল) প্রভৃতি হতে বিভিন্ন সময়ে টক তৈরি করে। এ সবেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। সুত্তো তৈরির জন্যও উচ্ছে, করলা, হিণ্ডে, পাটপাতা, পলতা (পটল পাতা), শিউলি পাতা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যাতে বারমাসই সুত্তো তৈরি করা যায়। নিম্ন-বেগুনও খায় বসন্তকালে। এ সমস্তই বিজ্ঞান-সম্মত।

বাঙালী-ঘরে রান্নার জন্য সাধারণত হলুদ, ধনে, লস্কা, আদা ও জিরা ব্যবহার করে। হলুদ ও আদা পেটের পক্ষে উপকারী। অন্য সব মসলাও পরিমিত ব্যবহারে ফলদায়ক। কিন্তু আমার মনে হয় মধ্যবিন্ত বাঙালীর ঘরে মসলা বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তা’ অনিষ্টকারক।

তবে এ কথা ঠিক যে, বাংলার মায়েরা খাদ্যকে রসাল, স্নিগ্ধ মনোরম, পুষ্টি-কারক এবং আম্র, উষ্ম, বল ও আরোগ্য-বর্ধক করতে চায়। বর্তমানে জিনিসের অভাব তাদের সে চেষ্টাকে ব্যাহত করে। যদি জিনিস পাওয়া যায় বাঙালীর খাদ্য গীতার প্রকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য। বাংলার আবহাওয়ার পক্ষে বাঙালী যে খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তা’ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। অবস্থাগতিক পরিবর্তন করতে হবে না, তা’ বলাই না। কিন্তু নতুন কিছু একটা করবার অথবা সরকারের অক্ষমতাকে চাকবার জন্য হামেশা পরিবর্তন করার কথা বলা অসমীচীন ও অবৈজ্ঞানিক।*

আমরা যাক একটি শ্রমিক আন্দোলন

আলোচনা, সমালোচনা ও শিক্ষা

কটিকালেগে শহর আমরা দখল করছি। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা নিশ্চিত। দুটি স্থানে রেললাইন বিধ্বস্ত করে মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করা হয়েছে। চট্টগ্রামে সৈন্য আমদানীতে বাজে বিধি ঘটে তার জন্য রেলপথে সকলভাবে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা বিক্ষুব্ধ! সামরিক বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেছে—চট্টগ্রাম শহর একেবারে জনমানব শূন্য! চট্টগ্রামে অস্ত্রত ইংরেজ সরকারের অস্তিত্ব সামরিকভাবে লোপ পেয়েছে। এইরূপ একটি অনুকূল অবস্থায় আমাদের প্রধান বাহিনী শহরের উত্তরে পর্বতশ্রেণীর ক্ষতরাতে আগ্রহ নিয়েছে—আর আমরা তিনজন—গণেশ মাখন ও আমি পতেঙ্গার সমুদ্রতীরে বিশ্রাম নিচ্ছি! এ বেন যুদ্ধ কবে সিংহাসন দখল করে স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দিয়ে বনবাস গ্রহণ। এই করুণ পরিস্থিতির জন্য কে বা কারা দায়ী? এই প্রশ্ন স্বভাবতই সকলের মনে জাগবে। লেখার দায়িত্ব আজ যখন আমি স্বেচ্ছায় নিয়েছি তখন এই জিজ্ঞাসার উত্তরও আমাদেরই দিতে হবে!

নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করাই আমার ইচ্ছা। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি জড়িত বলে ভয় হয়, পাছে নিরপেক্ষ সমালোচনা করতে অক্ষম হই।

প্রায় পাঁচ বছর আগে—ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডে এই বিষয়ে সমালোচনা করছি। আজও সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করবো সন্দেহ নেই। কাকেও অসম্মান করা বা কারো প্রতি কোন কটাক্ষ করা আমার অভিপ্রায় নয়। তবে বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কিছু বলার একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বিষয়বস্তুটিকে বোঝবার চেষ্টা করাই অধিকতর সমীচীন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর থেকে বহু-

বার আমি একই ধরনের কতগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু উত্তর বা সাফাই দিতে কখনও চেষ্টা করি নি—নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছি। ভেবেছিলাম যে যাই ভাবুক না কেন দোষ-দুটি তো আছেই, আমিই না হয় সবচেয়ে বেশি অপরাধী! এই ভেবেই কোন উত্তর দেওয়ার চেষ্টাই করি নি। আজও মূখ্য বশ্ব করে থাকতে আমার কোন আপত্তি ছিল না—সব বাস্তব সত্য অনুদৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে—তাই যে ফলের করেকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তার উল্লেখ করে আমার স্বাব দাঁড়ি।

(১) হিমাংশু আগুন পড়ে যাওয়ার পর কেন আমি তাকে গুলী করে মেরে ফেলি নি?

(২) মোটেই আমরা তিনজন হিমাংশুকে নিয়ে কেন শহরে এলাম?

(৩) আমরা তিনজনই বা কেন গাড়ি করে শহরে গেলাম?

(৪) প্রধান বাহিনী থেকে কেন আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম?

সব করটি প্রশ্নই বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে খুব সত্য বলেই মনে হবে; কিন্তু বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে এগুলির অন্তর্নিহিত অসারতা ধরা পড়ে—যেমন

(১) কোন বুদ্ধিতে হিমাংশুকে গুলী কবে মেরে ফেলা উচিত ছিল? সে বেঁচে থাকলে আমাদের কি কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত? ভবিষ্যতে হিমাংশু কোন স্বীকারোক্তি দেবে বা দেবে না তাতে আমাদের তো মাথা ঘামাবার কোন কারণ ছিল না। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল মৃত্যু। সেই কারণেই আমরা নিজেদের বাড়ির গাড়ি ও license করা বন্দুক বিন-স্বিচার ব্যবহার করছি; নিজেদের বাড়ির ড্রাইভারকে বেঁধে রাখতেও কুণ্ঠিত হই নি; সেই রাতে একই ক্রাবের ছেলেবা একসঙ্গেই উধাও হওয়াও বিপজ্জনক মনে করি নি। তাই হিমাংশুকে মেরে ফেলার মধ্যে কোন বৌদ্ধিকতা খুঁজে পাওয়া যায়

না। তাছাড়া তারক ও অর্ধেন্দ্র বিচ্ছারণে গুরুতরভাবে দখল হওয়ার পর সংগঠনের নিরাপত্তার জন্য আমিই তাদের মেয়ে ফেলার প্রস্তাব করেছিলাম। গণেশ সে সময়ে দৃঢ় বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দিতে পেরে-ছিল বলে আমি একটি অমার্জনীয় বিচার্যতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি—না হলে সারাজীবন ফেলার প্রায়শ্চিত্ত করেও বিপ্লবীদের কাছে মার্জনা পেতাম না। অর্ধেন্দ্র ও তারক দুজনেই আরোগ্যলাভ করেছে—সুস্থ হয়ে উঠেছে—গুলি লাগে আজ অর্ধেন্দ্র আমাদের পাশে উপস্থিত। যাকে মেরে ফেলার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেই অর্ধেন্দ্র কিহুক্ষণ আগেই মেশিনগানের বিরুদ্ধে সহস্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া যা হওয়া সম্ভব তা উপলব্ধি করার বিষয়—বর্ণনা দিবে বোঝানো যাবে না। মনোমূল্য অতীত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আমাকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে হিমাংশুকে গুলী করার কথা আমার মনে এক মহত্বের জন্যও স্থান পায় নি। তাছাড়া গুলী করে হিমাংশুকে হত্যা করার প্রয়োজন কোথায়? তবে বহু লোক কেন যে এরূপ চিন্তা বা মত পোষণ করেন জানি না। আমার মনে হয় তাঁরা স্বদেশী যুগের অতীত কাহিনীতে এইরূপ তথ্যের সম্মান পেয়েছেন যে, স্বদেশী ভাষাভি করতে গিয়ে কোন ক্ষেত্রে নিজেদের সাধী ভীষণ আহত হয়েছেন—তাকে সঙ্গে নিয়ে আলাও সম্ভব নয়;—এমন অবস্থায় নিজ সাধীর মৃত্যু কেটে নিয়ে তাঁরা চলে এসেছেন যেন পদলিশের পক্ষে তদন্ত করা সহজসাধ্য না হয়। এইরূপ রোম-হর্ষক ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে রোমাণ্ট অনুরণন করা যায় সত্য, কিন্তু কোন বৈপ্লবিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

(২) স্থিতীয় প্রশ্ন—আমরা তিনজন কেন হিমাংশুকে শহরে নিয়ে এলাম?

আমি খুব শারীরিক ক্রান্তি অনুভব

করিলাম। আর কি কেউ সেরূপ ক্রান্ত বা আমার চেয়ে অধিক পরিগ্রাস্ত ছিলেন না? তারাও নিশ্চয়ই আমার চেয়ে কম প্রাস্ত ক্রান্ত হন নি। আমি তাঁদের ক্রান্তির কথা অস্বীকার করছি না। নিজের সম্বন্ধে বলতে হচ্ছে বলেই আমার শারীরিক ক্রান্তির কথা উল্লেখ করতে হোল। গাড়ি নিয়ে শহরে আসার প্রধান কারণ আমার শারীরিক ক্রান্তি। শ্বিতীয়ত নতুন মোটরগাড়িটি আমাদের দলের সঙ্গে রাখা খুব প্রয়োজন মনে করেছিলাম। তৃতীয় কারণ—গণেশের অসুস্থতা, তার খুব বেশি জ্বর ছিল, পরের দিন সকালে ভাব সারা শরীরে জল-বসন্ত দেখা দেয়। তাই তাকে মোটরে তুলে নিতে হয়েছে। গাড়ি বন্ধন স্টার্ট দিয়েছি তখন হিমাংশু দৃষ্টান্ত পড়ে গেছে। কারো বলা কওয়ার অপেক্ষা না রেখে হিমাংশু মোটরে উঠে বসল। তার সঙ্গে আনন্দ ও মাখন গাড়িতে উঠেছে। বিশেষ চিন্তা বা কারো সঙ্গে পরামর্শ করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন কাজ করা হয় নি। স্বতন্ত্রভাবে এই সব ঘটেছে।

কেন পবিস্কার নির্দেশ দেওয়া হলো না সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। বাস্তবে যা ঘটেছিল তাই লিপ্যন। হিমাংশুকে দম্ব অবস্থায় শহরে নিয়ে আসার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের শহরে আসতে হবে বলেই গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম; এবং গাড়ি আনছি বলেই গণেশকে গাড়িতে তুলে নিলাম আর হিমাংশুকে দম্ব অবস্থায় নিয়ে আনন্দ ও মাখন গাড়িতে উঠে বসল।

(৪) চতুর্থ প্রশ্ন—কেন আমার প্রধান বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম?—“এটা আমাদের দুর্ভাগ্য” বলে প্রশ্নের উত্তর এড়ানো যায়। কিন্তু ভাগ্যের দোষাবোপ করে সাম্রাজ্য হস্ত পাওয়া যায়—অক্ষমতাকে চাকা যায় না। মাটজেন টিলার ওপর থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। তাদের গা বেঁধে আমাদের গাড়ি ধীরে ধীরে শহরের দিকে গেল। কারো ভুল হবার কথা নয় যে গাড়ি শহরে না গিয়ে অন্যত্র যেতে পারে। আমাদের পূর্ব নিশ্চিন্ত অনুযায়ী শহরে আসা ছাড়া অন্যত্র যাওয়ার কোন কথাই ছিল না। যুব-বিরোধের পূর্বে আমাদের সামরিক স্ট্রাটেজী অনুসারে পাহাড়ে গিয়ে পজিশন নেওয়ার কথা কখনও আলোচনাও হয় নি। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একবারও আমার মনে হয় নি যে কোন অকস্মাৎ আমাদের প্রধান বাহিনী শহরে না এসে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে। কিন্তু সত্যি তারা পাহাড়ের দিকে চলে গেল—শহরে এলো না।

কিছুদিন পরে—মামলা চলাকালে—যখন তাদের সঙ্গে জেলে আমাদের দেখা হয়—তখন প্রত্যেকের কাছে বিশদভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চেষ্টা করেছিলাম কে বা কারা শহর ছেড়ে দূরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বা কিভাবে তাঁরা পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন?

তাঁদের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে এই বুঝেছি—আমরা চলে যাওয়ার পর তাঁরা সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। অম্বিকাদা, মাস্টারদা ও নিমলদা তেমন গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন নি। সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বুঝেছি ম্যাগাজিন রাইফেলের কার্তুজ না পেয়ে তাঁরা খুব দমে গিয়েছিলেন—অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় তাঁরা শুনতে পান অম্বিকাদা অগ্রদূত হয়ে সবাইকে বললেন—তাকে অনুসরণ করতে। সবাই বন্দুচালিতের মত অম্বিকাদার পিছনে পিছনে গেলেন।

উপরি লিখিত চারটি প্রশ্নের উত্তর আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দিয়েছি।—সমস্ত ঘটনা অবিকৃত রেখে। মোট কথা প্রধান বাহিনী শহরে না আসার জন্য কার কতখানি দোষ বা কে কতখানি দায়ী সে হিসাব কে নেবে বা কি করে তা নেওয়া যায়? আমি বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনেছি। আমার প্রতি কোন প্রশংসার ভাব না রেখেই তাঁরা অনুবোধ জানিয়েছেন—দল ছেড়ে শহরে চলে আসার জন্য আমিই প্রধানত দায়ী এবং আমার জন্যই এই বিপর্যয় ঘটেছে।

এই অভিযোগের উত্তরে আমার বক্তব্য প্রথমত আমি যুগাক্ষরেও চিন্তা করতে পারি নি যে, অসুস্থ গণেশ এবং অগ্নিদম্ব হিমাংশুকে নিয়ে আমরা গাড়িতে শহরে দিকে রওনা হবার পর প্রধান দলটি আমাদের অনুসরণ করে শহরে আসবে না। কারণ শহরে আসা ছাড়া আমাদের আর কোথাও যাওয়ার কোন পরিকল্পনাই ছিল না। আরও একটা কথা, আমরা তো সাহস হারিয়ে ভীরুর মত দল ছেড়ে গ্রামে বা পাহাড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম না, শত্রু প্রহাণ ঘাঁটি শহরের দিকেই গিয়েছি এবং প্রধান দলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শহরে এবং পাহাড়ে রাস্তায় তাদের বৃদ্ধি বেড়িয়েছি। শ্বিতীয়ত আমার একার চলে যাওয়ার জন্য এত বড় একটা পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে নিজেকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া যে আমি অহঙ্কার বলেই মনে করি এবং আর কেউ দেন তাও আমি সমীচীন বলে মনে করি না। আমি যদি তখন দল ছেড়ে এসে অন্যায় করে থাকি, ডিসিপ্রিন ভঙ্গ করে থাকি তাহলে শহরে এসে মাস্টারদার আমার বিচার করতে

পারতেন, court martial করে আমাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারতেন। আমার অপরাধের জন্য তাঁদের শহরে না এসে দূরে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার কি কোন মূল্য আছে? প্রথম আক্রমণের সময় বা মেশিনগানের গুলীতে যদি আমার বা গণেশের মৃত্যু হতো, তবে কি আমাদের সমস্ত পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করে বিজয়ী দলের শহরে প্রবেশ না করে সদ্য পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া সমর্থনযোগ্য হতো?

যদি কেউ সমস্ত বাস্তব ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ ও গবেষণা করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং—এই দুজনের প্রধান দলের সঙ্গে সব সময় থাকা উচিত ছিল—কোন অবস্থাতেই প্রধান দল থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে, এবং এই কারণেই এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটেছে—যুব-বিরোধ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। যদি কেউ আমাদের দুজনকে এইরূপ প্রাধান্য দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করেন, তবে আমার কিছু বলার থাকে না।

কি হলে কি হতো এবং বাস্তবে কেন ঐরূপ ঘটলো এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন ইতিহাসবিদ এইরূপ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তা যাই হোক না কেন, আমরা প্রধান দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না বলে শহরে না এসে তাঁদের পাহাড়ে চলে যাওয়ার দায়িত্ব থেকে তাঁরা কোন মতে মুক্তি পান না। ‘কেন সেইরূপ ঘটলো?’ তা হলো এক কথা—আর আমি বা আমরা কেন শহরে না এসে পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আমাদের মধ্যে কে বেঁচে থাকবে বা থাকবে না, কে দুর্বলতা দেখাবে বা দেখাবে না, কে দলত্যাগ করবে বা করবে না তার ওপর শহরে এসে সামরিক বিপ্লবী সরকারের সামরিক প্রোগ্রাম কার্যকরী করার দায়িত্ব নির্ভর করবার কথা নয়—শহরে আসতেই হবে, এই ছিল পাটজনের ওপর সমান দায়িত্ব, কারণ সার্বিক প্রাণ তঁরাই কেবল জানতেন। একজনের দুর্বলতা বা অক্ষমতার জন্য অন্যের অক্ষমতাকে কি ক্ষমা করা যায়? ইতিহাসবিদ সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে কেন বিপর্যয় ঘটল, সে সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব conclusion এইভাবে টানতে পারেন—গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং প্রধান দলের সঙ্গে ছিল না বলেই তা ঘটেছে। যদি কাউকে এইরূপ প্রাধান্য দিয়ে কেউ ঘটনা বিশ্লেষণ করেন, তবে সেই দায়িত্ব তাঁর নিজের।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওপরে যা সমালোচনা করেছি, তা থেকে মনে হবে আমি কেবল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, সেইরূপ অমার্জনীয় বিপর্যয়ের জন্য

আমি দায়ী নই—অন্য কেউ। এইরূপ মনোভাবের ইতিহাস যদি আমাদের দেশের মধ্যে কেউ পেয়ে থাকেন, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তাই এতক্ষণে পূর্ব বর্ণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমালোচনা আমি করেছি তাতে আমার নিজ দৃষ্টির স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে না। এখন আমার নিজ দৃষ্টির স্বীকারোক্তি করছি।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার অন্তরের কাছে প্রশ্ন করে এসেছি—(১) কেন আমি একটি নির্ভুল নির্দেশ দিয়ে শহরে আসি নি? (২) কেন মাস্টারদাদের বলে আমি নি প্রধান বাহিনীকে নিয়ে যেন আমাদের অনুসরণ করেন? (৩) যতই ক্রান্তি আসুক না কেন তবু প্রধান বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হলাম কেন?

আমার নিজেকে আমি কখনও ক্ষমা করি নি—করবও না। যুব-বিদ্রোহ কি যে একটি রূপ নিতে পারত! সব যেন আমার জন্য নষ্ট হয়ে গেল! নিজেকে নিজের গভীরতম অন্তরের নিভৃতে শত সহস্রবার দায়ী করেছি। মনে হয়েছে আমার এই অপরাধের জন্য আমি একাই দায়ী! অন্যকে কেন আমি দায়ী করতে বাব? আমি দায়ী করব আমার নিজেকে—যদি আমি দুটসঙ্কল্প নিয়ে চলতাম—যদি স্পষ্ট নির্দেশ দিতে অক্ষম না হতাম তবে কি আমাদের পরিচালনা এইভাবে নষ্ট হয়ে যেত? আমি—আমিই দায়ী! মনের নিভৃতে এইরূপ বহু চিন্তা আমি করেছি। কাজেই নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যের ওপর তা চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই—তবে নিঃসঙ্গ অহঙ্কার প্রকাশ পেলে স্বভাবতই মনে সঙ্কোচ আসে, সেই কারণে বিপর্যয়ের সব দায়িত্ব নিজ স্বেচ্ছা নিয়ে খুব অশোভন বাহাদুরী করার অনারতায় মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে অন্যের অগোচরে আত্মবিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নিজেকে উপযুক্ত করা অনেক বেশি প্রয়োজন বলে মনে করেছি। আমার এই অক্ষমতার স্বীকারোক্তি আমাকে ভবিষ্যতের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করুক এই আশা নিয়ে নিজের কথাটুকু বলে ফেললাম।

এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে আলোচনা ও সমালোচনা বা' করেছি তা' থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করব। "শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করব"—কথাটা হয়তো একটু বাড়িবাড়ি মনে হচ্ছে। Paris Commune, Moscow Insurrection, Shanghai Uprising—প্রভৃতির বৈপ্লবিক ইতিহাস ও মহান বিপ্লবীদের লেখনীপ্রসূত যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পেরেছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদি চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ থেকে

শিক্ষালাভের প্রস্তাব করি, তবে তা' কারো কাছাকাছে হাস্যস্পদ বলে মনে হতে পারে। তবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান নেতা লেনিন লিখেছেন—

"... Consequently, to regard a militant revolutionary organisation as something specifically Narodovolist is absurd both historically and logically, because no revolutionary tendency, if it seriously thinks of fighting, can dispense with such an organisation. But the mistake the Narodovolists committed was not that they strove to recruit to their organisation all the discontented and to hurl this organisation into the decisive battle against the autocracy; on the contrary, that was their greatest historical merit. Their mistake was that they relied on a theory which in substance was not a revolutionary theory at all, and they either did not know how, or circumstances did not permit them, to link up their movement inseparably with the class struggle that went on within developing Capitalist society. And only a gross failure to understand Marxism (or an 'understanding' of it in the spirit of Struvsism) could prompt the opinion that the rise of a mass spontaneous labour movement relieves us of the duty of creating as good an organisation of revolutionaries as Zamlya-i-Volya had in its time, and even an incomparably better one. On the contrary, this movement IMPOSES this duty upon us, because the spontaneous struggle of the proletariat will not become a genuine 'class struggle' until it is led by a strong organisation of revolutionaries. (What is to be done?—Lenin).

রুশ দেশে জারতন্ত্রের আমলে লেনিন কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের সময় শোখনবাদীদের সঙ্গে আদর্শগতভাবে সংগ্রাম করেছেন। শোখনবাদী দল মাস্ত্রবাদের ভোল নিয়ে বিভ্রান্ত ঘটাচ্ছিল—তাদের মতে বিপ্লবী সংগঠন ছাড়াই কম্যুনিষ্ট পার্টি

গড়ে উঠতে পারে। শোখনবাদীদের সেইরূপ আত্মপ্রবঞ্চনামূলক প্রচারণার বিরুদ্ধে ওপরের কথাগুলি লেনিন লিখেছেন। লেনিন বলেছেন যে বৈপ্লবিক প্রবন্ধতার মধ্যে সত্যিই যদি কারও আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও যুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ পায় তবে কম্যুনিষ্ট পার্টির সংগ্রামী সংগঠনকে বিশেষ করে নারদভলিস্ট (সন্ধানবাদী) সংগঠন বলে আখ্যা দেওয়া ঐতিহাসিক সত্যতা ও বৈজ্ঞানিকতার অপলাপ করা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং লেনিন দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করছেন যে সশস্ত্র সংগ্রামের সুনিশ্চিত ধারণা যাদের থাকবে তারা নারদভলিস্টদের সংগঠনের মত সংগঠনকে পরিহার করে চলার কথা ভাবতেই পারে না। নারদভলিস্টদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন যে, অনুপ্রাণ ও অতৃপ্ত দলকে সংগঠিত করে স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রম ছিল না; বরং সেটাই তাদের সর্বপ্রধান ঐতিহাসিক যোগ্যতার প্রমাণ। তাদের ভুল ছিল Theory-তে (মতবাদে)—যে মতবাদের ওপর তারা নির্ভর করেছে তা একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবী মতবাদই নয়। কিন্তু লেনিন তাদের প্রতি খুব সহানুভূতির সঙ্গে লানছেন—নারদভলিস্টরা হঠাৎ করে নি বা বাস্তব অবস্থা তাদের বোঝার অনুকূলে ছিল না বলেই তাবা হৃদয়ঙ্গম করে নি যে কি করে ধনিকসমাজের ক্রমবিকাশের পথে তাদের সংগ্রামকেও অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত করা সম্ভব। তারপর লেনিন শোখনবাদীদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন—মাস্ত্রবাদ বুঝতে না পারা তাদের এক মারাত্মক নিষ্ফলতা এবং এই জন্যই স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন দেখে তাবা মনে করে কাম্‌লিয়া-ই-ভয়লা (সন্ধানবাদী সংগঠনের) মত সুগঠিত বিপ্লবী সংঘের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু লেনিনের মতে কাম্‌লিয়া-ই-ভয়লা তাদের সময়ে বেরূপ সশস্ত্র সংগঠন গড়েছে তার চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী সেই ধরণের সংগঠন কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বেও গঠিত হওয়া প্রয়োজন। আরও বিশদভাবে লেনিন বলেছেন—যেহেতু স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন সত্যিকার শ্রেণীসংগ্রামে কখনই পরিণত হতে পারে না যদি নাকি শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়, সেই হেতু এই বৈপ্লবিক কতরা ও দায়িত্ব আমাদের ওপর আরও বেশি করে ন্যস্ত হয়েছে।

লেনিনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকে লক্ষ্য রেখে আমার মনে হয় চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সাময়িক নীতি, কৌশল ও সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা ও শিক্ষা

সাপ্তাহিক বসুমতী

গ্রহণের অন্তর্গত আছে। লেনিনের লেখার পরিপ্রেক্ষিতে (perspective) বিচার করলে আমাদের দৃষ্টি-বিচ্যুতি থেকেও যে আমরা আতঙ্কিত ও শিক্ষা লাভ করতে পারি একথা মনে ভাবা অনুচিত হবে না। আমি এতদূর আলোচনা করার পর উপসংহারে এই বলতে চাইছি যে আমাদের জয়, বিশুদ্ধতা ও পরাজয়ের জন্য কেউই এককভাবে দায়ী নয়। জয়ের সৌরভ ও পরাজয়ের প্লামি আমাদের সবাইকে সমান ভাগেই ভাগ করে নিতে হবে। এই দৃষ্টান্তগণী নিয়ে আমি বলতে চেষ্টা করছি কি কি শিক্ষা পেলাম—

(১) আমাদের প্রাথমিক আক্রমণ-পর্ব যুব-নিষেধভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

(২) আর্মারি গৃহের মধ্যে যে ম্যাপা-জিন থাকে না সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম বলেই আমাদের A.F.I. আর্মারি তথ্য সম্পূর্ণভাবে যোগাড় করতে পারি নি। তথ্য অনুসন্ধান সম্বন্ধে এত বড় দৃষ্টি থাকা অসম্ভব নয়।

(৩) গড-ফ্রাইডেতে যে এত রাটে ইউরোপীয়ানর আমোদে মত্ত থাকবে না সেই তথ্য আমাদের জানা উচিত ছিল।

(৪) সামরিক দূরদৃষ্টির অভাবে আমরা বিপ্লবী-সৈন্যবাহিনীকে আমাদের close command-এ (নিকট আধিপত্যের মধ্যে) রেখেছিলাম, তা না রেখে পুলিশ লাইন দখল করে নেওয়ার পর শহরের বিভিন্ন ট্যাকটিক্যাল পয়েন্টস-এ তাদের পাঠানো উচিত ছিল। তা যদি আমরা করতাম—আমরা যদি যুব দ্রুত ছোট ছোট দলে ভাগ করে আমাদের তরুণ বিপ্লবীদের শহরে পাঠিয়ে প্রথম থেকেই একটার পর একটা আক্রমণ চালিয়ে যেতাম, অর্থাৎ পুলিশ-বট, বন্দুকের দোকান কুঠি, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, জেলখানা প্রভৃতি আক্রমণ ও জয় করে নিতাম বা জয়ের জন্য চেষ্টা করতাম তবে গুটিকতক ফিরিঙ্গী আমাদের লুইসগান নিয়ে আক্রমণের সুযোগ পেত না।

(৫) আমরা পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ ও ডবলমুন্ডিং জেটির দৃষ্টি আর্মারি কথ্য জানতাম। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ইংরেজ হত্যার প্রোগ্রাম সর্বসম্মতিক্রমে যখন গ্রহণ করা-ই হল তখন প্রথম জয়ের পর আমাদের শতগুণে সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল এই দৃষ্টি আর্মারি দখল করে নেওয়ার জন্য। পুলিশ লাইন ও A.F.I. আর্মারি দখল করে নেওয়ার পর তৎক্ষণি দৃষ্টি দল যদি মোটরযোগে গিয়ে এই দৃষ্টি আর্মারি আক্রমণ ও দখল করত তবে আমরা ৩০০ বোরের কার্তুজ না পেলেও যুব অসুবিধায় পড়তাম না। সেখানে কার্তুজ পাওয়া যেত। আর সবচেয়ে বড় কথা শত্রুপক্ষ এই দৃষ্টি আর্মারি থেকে মেশিনগান আনবার কোন সুযোগই পেত না।

(৬) প্রধান প্রধান শত্রুদৃষ্টি দখল করে নেওয়ার পর জয়ের সুযোগ আমরা পুরোপুরি গ্রহণ করলাম না। আমাদের যখন initiative নেওয়ার কথা তখন close command-এ সর্বশক্তি নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সামরিক নীতি অনুযায়ী মারাত্মক ভুল। আর আমাদের সেই ভুলের সুযোগ নিল গুটিকতক শাসক। শত্রুপক্ষ initiative নিয়েছে। তারা দ্রুত কাজ করে গেছে। তারা সাহসের সঙ্গে offensive নিয়েছে। Offensive is the best defence. (আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ রণ-কৌশল)। শত্রুপক্ষ অপেক্ষা আমাদের সুযোগ ছিল প্রচুর, তবু তা আমরা গ্রহণ করতে পারি নি।

(৭) এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা আমাদের force deploy করি নি? আমার মনে হয় সামরিক কৌশল সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা, জড়তা ও ভীড়-তাই এই নিষ্ফলতার জন্য দায়ী। ভয়টা কি? আমরা তো সবাই ময়তাই গিয়েছিলাম। যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে সাথীরা। গুলীর মুখেও গেছে সবাই। তবে ভীড়তা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল? আমার মনে হয় মৃত্যুভয় না থাকলেও—মৃত্যু তুমি একটা বিলম্বে এস—এই ভয়টি বা গোপন ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জড়তা ও নিষ্ফলতা সৃষ্টি করেছিল।

(৮) আমার মনে হয় ছোট ছোট দলে ভাগ করে সবাইকে deploy না করার মধ্যে আর একটি কারণ ছিল। তরুণ বন্দুকের ওপর পূর্ণ আস্থা আমরা রাখতে পারি নি। সব সময়ে ভয় হয়েছে পাছে তারা same-side করে বসে। উদ্বেজনা ও উদ্দীপনার মাঝে পরস্পরের মধ্যে হয়ত শত্রুদ্রমে গুলী বিনিময় করে প্রাণ দেবে। এইরূপ ভয় যে করছি তা মিথ্যে নয়। তবে সেদুপ ভয় করবার কোন বাস্তব কারণ ছিল কি?

(৯) আমাদের সীমিত সামরিক শিক্ষার দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম। কেবল যে সামরিক শিক্ষা ও জ্ঞানের স্বল্পতা আমাদের ছিল তা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থানের (Insurrection) নীতি আমরা জানতাম না। যদি সময়-বিজ্ঞান ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নীতিকৌশল ও বিজ্ঞান আমাদের ভালভাবে জানা থাকত তবে যুব-বিদ্রোহের ফল, আমার বিশ্বাস, শত্রুদ্রুপ বেশি সার্থকতা অর্জন করতে সমর্থ হতো। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সময়-বিজ্ঞান আমাদের মোটেই জানা ছিল না বললে একটুও অত্যুক্তি করা হবে না।

(১০) যুবক বন্দুকের গোপনে সামরিক শিক্ষা দিতে হয়েছে। তা ছাড়া নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট দল নিয়ে শহরে আগে থেকে আক্র-

মণ ও আত্মরক্ষার পদ্ধতি নিয়ে না পেরেছি manoeuvre করতে না পেরেছি rehearsal দিয়ে নিজেদের শিক্ষিত করে রাখতে। সেই কারণে তরুণ বন্দুকের ওপর আমাদের confidence বা আস্থা রাখা বাস্তবে সম্ভব হয় নি—তাই তাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দ্রুত শহরে পাঠাতে সাহস করি নি। যে পরিমাণে সশস্ত্র আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষিত হওয়া যায় সেই পরিমাণেই যে আত্ম-প্রত্যয় ও সংগঠনের ওপর আস্থা বেড়ে যায়, এই সত্যতা অনস্বীকার্য। আমাদের সংগঠনে এই দুর্বলতা ছিল—আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবের জন্য সার্থকতার সঙ্গে যুব-বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে নি।

(১১) আমরা initiative নিয়ে প্রথম থেকে শত্রুর চলাচল ও গতিবিধি বন্ধ করার ব্যবস্থা করি নি। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেল ব্যবস্থার বিলোপ-সাধন করে শত্রুকে সহজে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দিতে যেমন আমরা চাই নি, ঠিক সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রধান শত্রুদৃষ্টি দখল করার সাথে সাথে শহরের বিশেষ আবশ্যকীয় পথগুলি বন্ধ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আমাদের সক্ষীর্ণ সামরিক চিন্তা ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের দ্রুপ সেটা করে উঠতে পারলাম না বলে শত্রুর initiative নিয়েছে ও লুইসগান দিয়ে আমাদের আক্রমণ করার সুযোগ নিল। এরূপ সাহস ও তৎপরতার সঙ্গে শত্রুপক্ষের মাত্র কয়েকজন ইংরেজ সম্বন্ধে হয়ে আমাদের প্রতি-আক্রমণ করেছে। তাদের সামরিক শিক্ষা ও সংগঠনশক্তি আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল বলেই তারা তা করতে পেরেছে—এই সত্য স্বীকার করতেই হবে। পরে আমি যথাস্থানে ব্যক্ত করব যে কিরূপে জেলাব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী মর্টিমের ইংরেজ প্রধানেরা আমাদের চোখের অন্তরালে সংগঠিত হয়েছে ও সাহসের সঙ্গে তাঁরা আমাদের প্রতি-আক্রমণ করেছে। শত্রুর কাছ থেকে এই বিষয়ে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(১২) ৩০০ বোরের কার্তুজ না পেয়ে আমরা demoralised হয়েছিলাম, তা অনস্বীকার্য। শত্রুপক্ষ মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ করার পর, যাদের ওপর পরিচালনার ভার ছিল, তারা সকলেই যে কম-বেশ morale হারিয়েছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। বেশির ভাগ তরুণদের morale আমাদের অর্থাৎ নেতাদের চেয়ে অনেক উচ্চ ছিল। আমরা morale হারিয়েছিলাম বলে আমাদের হেড-কোয়ার্টারের মধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। আমাদের উচিত ছিল ছোট একটি দলকে সামরিক কায়দায় গুঁড়ি মেরে বৃকে হেঁটে গোপনে মেশিন-কামানের অস্তিত্ব খুঁজে বার করার জন্য পাঠানো।

এখন

ন্যাশনাল একো

মডেল
এম-বি-টি-১৫০৪

ভারতের একমাত্র
ট্রানজিস্টর ও

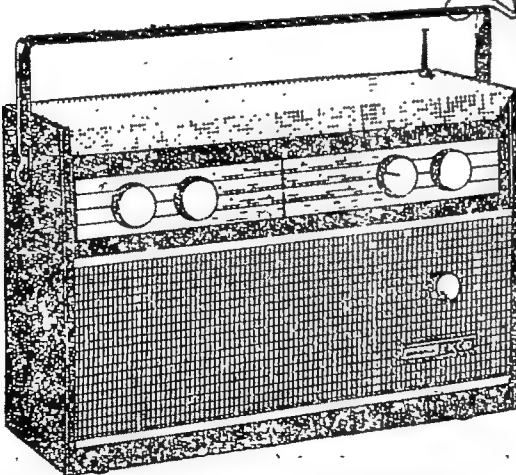
মেনইনস্‌ সেট আর
সেইসঙ্গে পাবেন অতুলনীয়
অপূর্ব টিউনিংয়ের
ব্যবস্থা!

গতবছর আমরা প্রথম ট্রানজিস্টর ও মেনইনস্‌ সেট, মডেল
এম-বি-টি-১৫০৪ উপস্থিত করেছিলাম। এবছর আমরা আরও
এগিয়ে গেছি। এখন এম-বি-টি-১৫০৪ মডেলের সঙ্গে আপনি
পাবেন এক অতুলনীয় অপূর্ব টিউনিংয়ের ব্যবস্থা, যার কলে যে
শর্ট এরেরড স্টেশন ধরা কখনো-কখনো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে তা
টিউন করা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে। আরামে বসে স্পষ্ট,

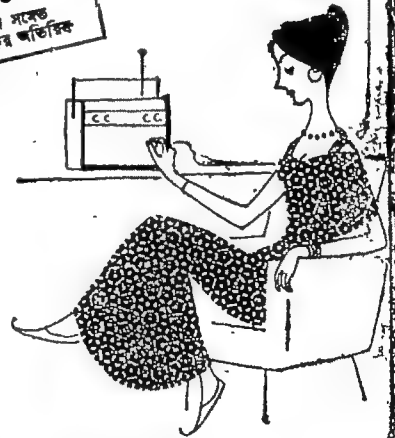
চমৎকার আওয়াজে শুনতে পাবেন।
অন্তান্ত বৈশিষ্ট্য: ১৩টি ট্রানজিস্টর ও ডায়োড; ৪ টি ব্যাণ্ড;
টোন কন্ট্রোল; ইলিপটিক্যাল স্পীকার; মেয়র, টেইপ রেকর্ডার
বাড়তি স্পীকারের জন্য সংযোগ-ব্যবস্থা। ৬ টর্চ সেল,
ব্যাটারি প্যাক বা ২৩০ ডোন্ট এ-সি মেনইনস্‌-এ কাজ করে।

GRA

কেনারেল রেডিও এন্ড অ্যান্টেনাকেন্স লিঃ
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাস • দিল্লী
• বাঙ্গালোব • সেকেন্দ্রাবাদ • পাটনা



দাম মাত্র
৫৪১ টাকা
একটিই সবচেয়ে
অন্যসাধারণ অতিথি



আমি ন্যাশনাল-একোব প্রকৃতি
প্রতিটি সেটের স্বাক্ষর প্রতীক

LPE-Altart NE 96 8N

আকস্মিক আক্রমণ করে তাদের পবাস্ত করার জন্য এইভাবে চেষ্টা করা আমাদের উচিত ছিল, তা আমরা করতে পারি নি। পরন্তু নিজেরাই পরাজয়ের মনোভাব নিলাম। আমরা বিশৃঙ্খলার মধ্যে আর্মিরিতে আগুন দিলাম, হিমাংশু পেট্রলের আগুন নিজে অসাবধানতার জন্য পড়ে গেল, আমরা চারজন মোটরে করে হিমাংশুকে নিয়ে শহরে এলাম, আর বাকী সবাই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। এই সমস্ত ব্যাপারটার মূলে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, বিশ্বা ও হয়তো “একপ্রকার মৃত্যুভয়”-ও কান্ন করেছে। “একটি” যুদ্ধে মরে না গিয়ে “ষড়-দেব” করে রণাঙ্গনে সেই মৃত্যু আসে,—এইরূপ আশু মৃত্যুভয় থেকে সাময়িকভাবে পরিণাম পাওয়ার জন্য “পর্বতযুদ্ধ বা গোরিলা-যুদ্ধের” পথে সুপ্ত মনের তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে গেলাম।

(১৩) পর্বতযুদ্ধের জন্য আমাদের কোন প্রায়ন ছিল না বলেই আমরা কোন ব্যবস্থাই আগে থেকে করে রাখি নি—প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়, আহাৰ্যবস্তু ও জ্বলের ব্যবস্থা ছিল না, এমন কি অতি আবশ্যকীয় জিনিস—দিশ্-নির্ণয়ের জন্য কম্পাসও তাদের সঙ্গে ছিল না।

(১৪) এই সমস্ত ব্যাপারটার বিভিন্ন স্তরের দুটি বৃদ্ধিতে হলে সমর-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমাদের বিশৃঙ্খলা ও মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বৃদ্ধিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। জার্মানির সামরিক শিক্ষার দক্ষ, Major General Eswald Banse, ‘German Prepares for War’ গ্রন্থটিতে লিখেছেন—

“Two fundamentally different phases have, however, to be distinguished here. The FIRST, consisting of mobilisation and deployment, can be planned beforehand and demands lengthy preparation, ... The SECOND phase, which consists of the approach to the battle, ‘manoeuvres during battle,’ and the pursuit or retirement cannot be completely determined beforehand, for quite apart from the life of the land and the sudden change for the worse in the means of communications, the enemy also has his little say in the matter, and his ideas remain concealed till the moment when they become facts. The Commander whose mind does not move fast

enough here, will also lessen the mobility of his army. This lack of mobility may have serious, even fatal, effects in the first phase too...” (Emphasis nine).

Major-Gen. Banse যুদ্ধের দুটি অপরিহার্য ভিন্ন স্তরের (phases-এর) কথা উল্লেখ করে বলেছেন—প্রথম স্তরে mobilisation ও deployment সম্বন্ধে বহু পূর্বেই ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং তার জন্য প্রচুর সময় দিয়ে তা করার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। আসন্ন যুদ্ধের সময়টিকে তিনি দ্বিতীয় স্তর বলেছেন। যুদ্ধে manoeuvre, অর্থাৎ কৌশলে সৈন্য-রচনা ও পরিচালনা করা, আর শত্রুর পশ্চাদপসরণ ব্যাপার আগে থেকে অঙ্ক কষে ঠিক করে রাখা যায় না। অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইঠাৎ সৈন্যরা পাহাড়, নদী, শহরের রাস্তা, জংলা পথ প্রভৃতির সম্মুখীন হতে পারে এবং পূর্ব নির্ধারিত যাতায়াত ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এই বিষয়ে কোন পক্ষই আগে থেকে কিছু স্থির করে রাখতে পারে না—তাদের রণ-কৌশলের idea তাদের মস্তিষ্কেই নিবদ্ধ থাকে। মেজর জেনারেল বলেছেন, যদি সৈন্যাধ্যক্ষের মানসিক চিন্তা এইরূপ নতুন নতুন পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত চালিত না হয় তবে সৈন্যবাহিনীর গতি মন্ডর হতে বাধ্য। তিনি উপ-সংহারে দৃঢ় মত প্রকাশ করে বলেছেন—সৈন্যবাহিনীর এইরূপ গতিহীন নিষ্ক্রিয়তা যুদ্ধের প্রথম অবস্থারও দারুণ ক্ষতি, এমন কি মারাত্মক দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদেরও ঠিক তাই ঘটল। আমরা—নেতারা মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ছিলাম। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারি নি। প্রথম স্তরে তাই আমরা মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন ছিলাম। শত্রুপক্ষ তৎপরতার সঙ্গে আমাদের প্রতি-আক্রমণ করল।

(১৫) আমার প্রধান শিক্ষা—যদি যুদ্ধে নেতৃত্ব করবেন তাঁদের যতদূর সম্ভব কম শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত। শরীর ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত থাকলে দ্রুত চিন্তা করা এবং অনেক ক্ষেত্রে নিভুল কার্যক্রম স্থির করতে না পারার সম্ভাবনা থাকে।

মোটামুটি এই কতকগুলি দুটি-বিচ্ছিন্নতার জন্য আমরা দায়ী এবং এইসব দুটি-বিচ্ছিন্নতা ও চটপট যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনার মধ্যে থেকে আমরা বিপ্লবী সামরিক অভিযানের কতগুলি নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

যদিও শিক্ষা যদি প্রয়োগ করা না যায় তবে সমস্ত অভ্যুত্থানের সামরিক দিকটার বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা।

এই পরিচ্ছেদের শেষে সামান্য বক্তব্য রেখে আমি আমার আলোচনা ও মতামত শেষ করব। আইরিশ বিপ্লবের আগে লেলোব বলেছেন—

“...If anybody tells you that an act of armed resistance, even if offered by ten men only—even if offered by men armed with stones—any, and every such man, who tells that such an act of resistance is premature, imprudent or dangerous, shall at once be spurned and spat at for the remark he thus puts, and recollect that somehow somewhere and by somebody a beginning must be made and that the first act of resistance is always and shall ever be premature, imprudent, unwise and dangerous.” (Emphasis nine).

(এমন কি মাত্র দশজন লোকও যদি শুধুমাত্র ইটপাটকেল নিয়েই সমস্ত প্রতি-রোধ গড়ে তোলে—আর যদি কেউ তোমাকে বলে যে সেইরূপ সক্রিয় প্রতি-রোধ ব্যর্থ রচনা অসমরোচিত, অপরিণামদর্শিতাপ্রসূত অথবা বিপজ্জনক, তাহলে সেই ধরনের মন্তব্যের প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ তাকে পদাঘাত ও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে; এবং স্বরণ রাখতে হবে কাউকে না কাউকে যেভাবেই হোক না কেন কোন না কোন স্থানে প্রথম আরম্ভ করতেই হবে এবং সেই প্রথম সক্রিয় প্রতিরোধ সর্বকালে ও ভবিষ্যতেও যে অপরিপক্ব, অবিবেচনাপ্রসূত, নির্বোধের মত ও বিপজ্জনক কাজ বলে গণ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।)

মাত্র একটি জেলা-শহরে এই ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহের এই আমাদের প্রথম চেষ্টা! অক্ষমতার জন্য ভুল-দুটি হয়েছে। প্রথম স্তরেও আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম স্তরের ভুলের কি প্রায়শ্চিত্ত আমরা করি নি? জালালাবাদের যুদ্ধে মরণঞ্জয়ী বীরেরা কি শত্রুর ম্যেসিনগানকে স্তম্ভ করে দেয় নি? শত্রুর বিশাল সৈন্যবাহিনী কি পরাস্তব স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ করে নি? প্রথম স্তরের বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতির পূরণ আমরা করেছি জালালাবাদের রণপ্রাঙ্গণে।



দুইপাখী

আশোক মেন্ডু

আসবার দিনটা এমন ছিল না। সোনাকরা রোদ্দুরে ছেয়ে গিয়েছিলো পৃথিবী। খুশিতে ভরে উঠেছিলো প্রাণের আকাশ-বাতাস। খুশি হয়েছিলেন জীবনবাবুও। পকেটে ইন্টারভু লেটারটা সন্ধ্যে চেপে ধরে হাওড়ায় এসে ট্রেন ধরেছিলেন। ভিড় ছিল ট্রেনে। তবু বিরক্ত হন নি। মনে হয়েছিলো জীবন-সমুদ্রে প্রায়-ডুবুডুবু নৌকাটাকে তিনি এতদিনে বুকি বাগে আনতে পেরেছেন। হোক না কলকাতার বাইরে, হোক না অজ পাড়া গাঁ, তবু তো মাসের শেষে করকরে নব্বইটা টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু সাহাপদুর কো-অপারেটিভ সোসাইটির অফিস ঘরে পৌঁছেই সেই খুশি খুশি

মনটা একটু একটু করে ঝুঁক বদলাতে শুরু করেছিলো। জীবনবাবু শুধু একাই নন, আরো জনা পঁচিশেক নানান বয়সী মানুষ বসে আছে একই কারপে। জীবনবাবুর বিশ্বাসের ভিত নড়তে শুরু করেছিলো। এই ছেলেছোকরাদের সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন কি না কে জানে! অভিজ্ঞতা অবশ্য তাঁর আছে। তবু—। নিয়ম-মাফিক ইন্টারভু দিয়ে বোরিয়ে এসেছিলেন যথাসময়ে। ফলাফল ওরা চিঠিতে জানানোর বলেছে। বোরিয়ে এসে বাইবে দাঁড়াতেই দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর মনের সঙ্গে তাল রেখে পৃথিবীর চেহারাও বদলে গিয়েছে। সোনাকরা রোদ্দুর নয়, ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে আকাশ।

ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হতে পারে। আসবার সময় স্টেশন থেকে দেড় মাইল পথ হেঁটে এসেছিলেন। এখন আর সে সাহস নেই। পাঁচটা পয়গিশের লোকালটা ধরতই হবে। একটা সাইকেল রিক্সায় চেপে নন্দ চার আনা পয়সা খরচ করে যে মুহূর্তে ছোট্ট স্টেশনটিতে এসে পৌঁছালেন, বৃষ্টিও নামলো মৃদুলধারায়। যেন বাজীতে জিতেছেন এমন একটা খুশির আমোজে ছেয়ে গেলো মনট। টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মের কাঠের বেঞ্চে এসে বসলেন। এখনও একঘণ্টা দৌড় আছে ট্রেনের। বসেই পকেট থেকে বিড বের করে ধরালেন। শুধু বৃষ্টি নয়, দম্কা

বাস্তবিকভাবেই—কিন্তু মাঝে-মাঝে কেমন শিরশির করে সর্বাপেক্ষে সেই বাতাসে। গুটি-গুটি হয়ে বসলেন। তারপর কিছু টানতে টানতে ভাবনার সমুদ্রে ভেসে চললেন অচিরেই। ভাবছিলেন, ইস্টার্নের খবর পেয়ে যে খুশির রং ছাড়িয়ে পড়তে দেখেছিলেন সাধনার চোখে-মুখে, শূন্য হাতে কিরে গেলে কি অশ্রুত বিবর্ণ হয়ে উঠবে সেই রং মৃদুতের মধ্যে। জীবন-বাবু জানেন মৃদু কিছুর বলবে না সাধনা। বরং তাকে উৎসাহ দেবে। বলবে,—‘এত ভাবছো কেন বাবা তুমি?’

জীবনবাবু লজ্জিত, কুণ্ঠিত সুরে বলবেন,—‘কি-সে বলিস মা। তোর একার ঘাড়ের ওপর সাত-সাতটি প্রাণী বসে বসে থাকি, আর তুই বলছিস ভাববো না কিছুর।’

সাধনা মৃদু হেসে অন্য কাজে ফিরে যাবে। সত্যি কথা। সাধনার একার ওপর বসে বসে খেতে হচ্ছে সাতটি প্রাণীকে। বড় ছেলে কিছুটা থাকলে কিছুটা সাহায্য হতো। কিন্তু বছর কয়েক আগে সেই যে ছেলে না বলে-কয়ে কোথায় উধাও হলো। কে জানে। প্রথম প্রথম অনেক খোঁজ করেছেন। এখন আর করেন না। মেজ ছেলেটা অকালেই বয়ে গিয়েছে। ‘স্কুল ফাইনাল পাশ করতে পারে নি। বার তিনেক চেষ্টা করে ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে প্রায়ই থাকে না বললেই চলে। যখন থাকে, বড় উৎপাত করে। চাঁৎকার করে গলগল দেয় সবাইকে, নয় তো মদের দোশায় অঘোরে ঘুমায়। ওর আশা ছেড়ে দিয়েছেন জীবনবাবু। বাপ হুয়ে এখন ওর মৃত্যু কামনাই করেন। আরগুজি সব মেয়ে। ওদের কথা ভেবেই মাঝে-মাঝে এদিক-সেদিকে চেষ্টা করেন জীবনবাবু, যদি একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারেন কোথাও। কিন্তু বয়সের জন্য কোথা থেকেও আর ডাক আসে না। বয়স যে খুব একটা বেশি, তা নয়। যাতে পা দিয়েছেন। কিন্তু অভাব, রোগ আর শোক সবই মিলে তাঁকে আরো কাবু করে ফেলেছে। তবু, সব বুকেও চেষ্টা করেন ভাঙা নৌকার হাস ধরবার। এবং সেই জন্যই তো এতটা দূরেও ছুটে আসতে বিধা করেন নি। কিন্তু—

চিন্তাটা হঠাৎ থেমে যায়। সেই মৃদল-ধারা বৃষ্টির মধ্যে ভিজে চুপসে হাওয়ার বেগে উলটে উলটে একটা মানুষ আসছে। কি সর্বনাশ! এমনভাবে রক্ত-জলের মধ্যে কেউ পথে বেরোর। ভয়ে, আর কৌতূহলে চোখদুটো বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন সেই মানুষটির দিকে। অনেকটা কাছে এসে পড়েছে মানুষটা। এবং চিনতেও পেরেছেন। সেই ছেলেটি।

আজ সাহাপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটির অফিস ঘরে কাঁঠর বেগুনের ওপর ঠিক জীবনবাবুর মৃদুখোমৃদু বসে-ছিলো। বছর একশ-বাইশের ছোকরা। ওর মেজ ছেলেটার বয়সী। এই চাকরিটার জন্য এসেছে। জীবনবাবুর প্রতিশ্রুতি। করুণা নয়, বিরক্তিতে আর রাগে জ্বলে উঠেছিলো অনেক আশা নিয়ে আসা জীবনবাবুর মনটা। দাঁতে দাঁত ঘষে নিচু স্বরে বলেছিলেন—‘শালা আপদ।’

ছেলেটি বুকেতে পারে নি কি বলে-ছেন জীবনবাবু। তবে কিছু একটা বলেছেন যে তাকে তা’ বুকেতে পেরে-ছিলো। বলেছিলো,—‘কিছুর বলছেন আমাকে?’

‘না।’

ছেলেটি তাঁর এই নিরাসক্ত কণ্ঠস্বরে বিরক্ত হয় নি। অপমান বোধ করে নি। বরং আরো ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছিলো। বলেছিলো,—‘আপনি কি করুর কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন লেটার নিয়ে এসেছেন?’

‘না।’

—‘আমিও না। কিন্তু একটা কিছুর আনতে পারলে ভালো হতো। ঐ যে লম্বা মত কুর্সী ছেলেটি, ও একজন ডেপুটি মিনিষ্টারের চিঠি নিয়ে এসেছে। আর ঐ চমাপারা ভুলোক সোসাইটির চেয়ারম্যানের ভূমীপতির কাছ থেকে একটা পার্শোনা লেটার এনেছেন।’

এত কথা পরও প্রাণথসে সামু দেন নি জীবনবাবু। অসহ্য লাগছিলো ছেলেটিকে। কে কি এনেছে ন। এনেছে তা’ দিয়ে তোমার দরকাব কি। ছেলেটি বললো—‘অচ্চ চাকরিটা পেলে ভালো হতো। বস্তু ঠেকার পড়েছি।’

জীবনবাবু ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছিলেন। আব কোনো কথা বলে নি ছেলেটি। ওর আগেই ডাক পড়েছিলো জীবনবাবুর। ওদেব যে কি হলো, তা’ আব জেনে আসতে পারেন নি। একটু পরেই ভিজে চুপসে এসে পেরাছলো ছেলেটা। সার্ট আর ধুতি ভিজে লেপ্টে গিয়েছে গায়ের সঙ্গে। প্রথম ঘোঁষনের কাঁচ লাগবা ফুটে বেরুচ্ছে। হি-হি করে কাঁপছে ও। একবার দূর থেকে তাকিয়ে দেখলো জীবনবাবুকে। একটু হাসলো। তারপর এদিকে-ওদিকে চেয়ে একেবারে কোণের চায়েব স্টলটা’ব কাছে এসে দাঁড়ালো। দূর থেকে জীবনবাবু আড়চোখে দেখতে লাগলেন ওর গতিবিধি। আশ্চর্য! এককাপ নয়, পর পর দু’কাপ চা খেলো ছেলেটি। একসঙ্গে এত চা কেউ খায়! মববে না কি? এবারে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন

জীবনবাবু। ছেলেটা একটা সিগারেট কিনে ধরালো। তারপর গুটি গুটি পায়ে ঠিক জীবনবাবুর পিছনে, কিন্তু একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলো।

এখন আর জীবনবাবু ওকে দেখতে পাচ্ছেন না। আবার তিনি ভাবনার সমুদ্রে ভেসে চললেন। মেজ মেবে বকুলেব গতিবিধি ইদানিং আর ভালো ঠেকেছে না তাঁর। সাজ-পোষাকের দিকে বড় বেশি নজর দিচ্ছে। বন্ধুদের বাড়ি যাবার নামা করে প্রায়ই যেন কেথায় যাব। একদিন বাসে যেতে যেতে ওকে চোরগাঁর একটা সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। সঙ্গে আরো একটি মেয়ে এবং দু’টি ছেলে। একটি ছেলেকে চিনতে পেরে-ছিলেন। তাঁর বাড়িওয়ালার সহদেব চাট্যোয় ছেলে। এই ছেলেটিই কিছুর দিন আগে পাড়ার একটি মেবেব অবৈধ মাতৃস্বেরা কামরায় হুয়েছিলো। পরে অবশ্য টাকা-পয়সা আর ডাক্তারে সর্কিছুর মিট-মিট হয়ে গিয়েছে। জ্বর আর সন্দেহে তোলপাড় করতে সুরু করেছিলো বুকের সমস্ত রক্ত। ইচ্ছে হচ্ছিলো বাস থেকে নেমে পড়ে মেয়ের চুল ধরে টেনে বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু সে ইচ্ছে দমন করতে হয়েছিলো। সারাজীবনই তো এই অন্যায় আর আশালীনতাকে সহ্য করে যেতে হবে। যুগটাই এমনি। এর ওপর ভাঙা তো কামর ভাঙা। হঠাৎ জোরে বাঁশ বেজে উঠলো। চমকে উঠলেন জীবনবাবু। টেনে আসছে না কি। তাকিয়ে দেখলেন দূরে, লাইন বরাবর। না, টেনের হুইসেল নয়, লাইনের ওপারে চালকলের বাঁশ। কিন্তু ছেলেটা কোথায় গেলো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। দেখতে পেলেন। ছেলেটি গুটি গুটি পায়ে ওর কাছে এসে দাঁড়ালো। একটুও বিধা না করে বেগে বসে পড়লো। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো,—‘আজ আর বৃষ্টি ধরবে বলে মনে হচ্ছে না।’

জীবনবাবু নীরব।

—‘বড় বিপ্লীভাবে ভিজে গেছি। ঠিক মারপথে যখন এসেছি, তখনই মৃদল-ধারায় নামলো বৃষ্টি।’

এতকণে কথা বললেন জীবনবাবু। বললেন,—‘তা’ একটু দাঁড়িয়ে গেলেই তো পারতে কোথায়।’

—‘আ’ পারতাম। কিন্তু ট্রেনটা ফেল করবার ভয় ছিলো। এই পিচটা পাইনিশের লোকালগায়া ফিরে গিয়ে টিউশানীতে যেতে হবে। টাকা বেশি দেয় অবশ্য, কিন্তু যুগ-সেজাজী লোক।

স্বাস্থ্যকর কল্যাণ



এই হল মশা।



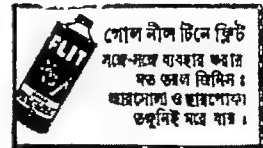
এই হল মশার যম-লাল টিনে ফ্লিট

মশা আছে সবর। মশা মশাগুলো কোন কতি করে না, মেয়ে-মশা-গুলোই রক্ত খেয়ে থাকে। ওরা যখন কামড়ায়, ওদের মুখের লালা আপনার রক্তে প্রবেশ করে। ওতে বীজাণুও থাকতে পারে এবং সেই থেকে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বা কালসিকারিয়াসিস (গোষ্ঠ) দেখা দিতে পারে।

মশা, মাছি ও অন্যান্য উদ্ভেদক। পোকামাকড় ধ্বংস করার ক্ষেত্রে আপনার বাড়িতে প্রবেশ করে ফ্লিট ছড়িয়ে দিন। পাঁচটি শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরী লাল টিনের ফ্লিট ছ'ভাবে কাজ করে : পোকামাকড়গুলোকে সঙ্গে-সঙ্গে কানু ক'রে মারিতে ফেলে এবং একটু পরেই ওরা মরে যায়।

আপনার ঘরবাড়ী রক্ষা করে ফ্লিট
— পৃথিবীর সেরা কীটনাশক!

এসো স্ট্যাণ্ডার্ড ইন্সটান, ইন্সক. (সীমিত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যেই নির্মিত)



CHB-1287

দ্বিতীয় স্বাধীনতা

অমিয়কুমার হাট

আমরা আরেকবার স্বাধীন হলাম। পুঞ্জীভূত
পাপের প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে এলাম। অতি দ্রুত
দুর্ভাবিত দস্যুরা কলুষ শৃঙ্খল আত্মকে বেঁধে
আমাদের করতে চেয়েছিল শয়তানের দাস।
প্রাণপূরুষ বিদ্রোহে কতবার যে উঠেছে কেঁদে
নরকের অন্ধকাবে ব্যর্থবার খুঁজেছে আশ্বাস।

আমাদের বক্তাব্দে ওদের অত্যাচারের রথ
ডুবে গেল শেষ পর্যন্ত। রক্তিম আশ্রয়ের শপথ
ইতিহাস সাক্ষ্য রেখে জয়ী হ'ল রূপান্তর এনে
শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করে বৈপ্লবিক পদাঘাত হেনে।

ওই মৃতরাজ্যে হাসি ছিল না, ছিল না প্রেম, প্রাণ,
ছিল নাহো আনন্দ উজ্জ্বল সত্তা। মহাদ্যুতিময়
দ্বিতীয় স্বাধীনতা সকল দুঃখদৈন্য হতে দূর
করবে এবার। দ্বিতীয় স্বাধীনতার হোক জয়!

একদিন কামই হলে বড় কড়া কথা
শোনান।

এসব তথ্য তো জীবনবাবুর জানা।
সাধনাই বলেছে তাঁকে। সেও অফিসে
হাবার আসে আর অফিস থেকে ফিরে
এসে এমনি ছুটে ছুটে টিউশানীতে
হাজিরা দেয়। বাদ যায় না একদিনও।

—‘তুমি কি আর কোথাও কাজ
করছো?’

—‘না।’

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন
জীবনবাবু। ছেলেটা হঠাৎ নীরব হয়ে
গেলো। অকোরে বৃষ্টি হচ্ছে। হাওয়া
দিকে জোরে। শীতে কাঁপছে ছেলেটা।

একটা চা-ওয়ালার মাছলো, ছেলেটা
ভাকলো। জীবনবাবুকে বললো—
‘আপনি চা খান তো?’

জীবনবাবু, কিছু বলবার আগেই
ছেলেটা দু’ভাঁড় গরম চা নিলো। এক
ভাঁড় জীবনবাবুর হাতে তুলে দিয়ে নিজে
আরো চমুক দিতে লাগলো অন্যটার।
বড় অস্বস্তি বোধ করলেন জীবনবাবু
সেই মূহুর্তে। যাক গে। বেশি ভেবে
লাভ নেই। ভালোই হয়েছে বরং।
চারের পিপাসা পেরিয়েছিলো তাঁর। ওকে
বরং একটা বিড়ি দিয়ে শোধ-বোধ করে
দেবেন। চা পাওয়া শেষ হলো। ভাঁড়টা
দূরে লাইনের ওপর ছুড়ে ফেললো
ছেলেটা। জীবনবাবুও। তারপর পকেট
থেকে টিনের চাশ্টা কৌটোটা খুলে বিড়ি
বের করলেন দু’টো। একটা বিড়ি
এগিয়ে দিতে গিয়ে একটু ইতস্তত
করলেন। ছেলের বয়সী একটা বাচ্চাকে
বিড়ি দিতে কেমন রুচিতে বাধছে। তার-
পর কি ভেবে এগিয়ে ধরে বললেন,—
‘নাও।’

ছেলেটির মূখচোখে একটু ইতস্তত

ভাব। তারপর সলজ্জ কণ্ঠে বললো,—
‘না, বিড়ি-সিগারেট আমি খাই নে।’

মিথ্যে কথা। একটু আগেই ওকে
আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ
করতে দেখেছেন। আসলে বাপের বয়সী
মানুষটার হাছ থেকে বিড়ি নিয়ে পাশা-
পাশি বসে খেতে অভ্যস্ত নয়। খুশি
হলেন জীবনবাবু। ওর দেওয়া এই
সম্মানটুকুর স্বাদ প্রাণভরে গ্রহণ
করলেন। একটা সুখী অনুভূতিতে
ওরে উঠতে লাগলো মনটা। বৃষ্টির
তালে-তালে পা নাচাতে লাগলেন। তার-
পর বিড়িটা শেষ হতেই ছুড়ে ফেলে
দিয়ে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—
‘কি নাম তোমার?’

—‘আজ্ঞে গৌতম রায়।’

—‘বাড়িতে কে কে আছেন তোমার?’

—‘মা, দিদি আর দু’টি ছোটো
ভাই।’

—‘বাবা নেই?’

—‘মাথা নাড়লো গৌতম।’ আর কয়েকটা
মূহুর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটলো।
বসে বসেই জীবনবাবু একটা ছোট
সংসারেব ছবি দেখতে পাইলেন। যে ছবি
তাঁর বেলেঘাটার মহেশ মিত্রের লেনের
সংসারেব নয়। এ-এক নাম-না-জানা
সংসার। যে সংসারে বিধবা মা, একটি
অবিবাহিত দিদি আর দু’টি নাবালক
ভাইয়ের ভারে ভরাডুবি হতে চলেছে। যে
সংসারের মাঝি গৌতম রায় নামের একটি
ছেলে। যে বয়সে ছেলেরা বিড়ি ফোঁকে,
সিনেমা, ফুটবল আর ক্রিকেট নিয়ে রক-
বাজী করে, কিংবা বাপের পয়সায়
রেস্তোরাঁতে বসে আড্ডা মারে, সেই বয়স-
টাই ওর অলঙ্ঘ্য পার হয়ে যাচ্ছে চুপি
চুপি চোরের মত। নিজের মেজ ছেলেটার

কথা মনে পড়লো। আকাশ-পাতাল
পার্থক্য, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।
গৌতমের দিকে তাকাতেই ওর সঙ্গে
চোখাচোখি হয়ে গেল। গৌতম একটু
হাসলো। তারপর বললো,—‘আপনার
জনা দুঃখ হচ্ছে।’

‘কেন বলত?’

—‘এই বড়ো বয়সে এতটা পথ
এসেছেন চাকরীর জন্য।’

হাসলেন জীবনবাবু। বললেন,—‘তুমি
নিতান্ত ছেলেমানুষ। তাই সংসারকে
এখনও চেন নি। সংসার ছোটো-বড়
মানে না। যতদিন বাঁচবে, বলদের মত
খাটিয়ে নেবে।’

—‘এই চাকরীটা আপনার হলে আমি
খুশি হবো।’

আবার চমকালেন জীবনবাবু। তার-
পর উদাস নমনে, দূরে দিগন্তের দিকে
তাকালেন। দেখলেন সিগন্যাল পড়েছে।
ট্রেন আসছে। গৌতমও দেখতে পেয়ে-
ছিলো। উঠে দাঁড়ালো। ট্রেনটা ছোটো
থেকে বড় হলো। তারপর মূহুর্তের মধ্যে
সম্পূর্ণ এসে প্রায়ফর্ম দাঁড়ালো।
ভিড়-ভিড়-ভিড়। সেই ভিড়ে ছেলেটা
কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। দু’চোখ
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেক খুঁজলেন ওকে।
পেলেন না। ট্রেন ছেড়ে দিলো। আর,
ট্রেনটা ছাড়তেই জীবনবাবুর মনে হলো
ছেলেটাকে একটা কথা বলা হলো না।
এ চাকরীটা তাঁরও হবে না। তিনি যে
কোনো রেকমেন্ডেশন লেটার সঙ্গে আনতে
পারেন নি। আর তাছাড়া—

তাছাড়া আরো একটা কথা বলবার
ছিলো ওকে। কোনো রাগ নয়, দ্বেষ নয়,
সর্বান্তরকরণে তিনি কামনা করছেন
গৌতমের একটা চাকরী হোক অচিরেই।

আইনস্টাইনের আলোকে

সেদিন ওপেনহাইমার চলে গেলেন। তাঁর এই চলে যাওয়া দেখে একসঙ্গে অনেক কথা মনে এলো। মনে এলো তাঁর কথা; আর তাঁরই পূর্বসূরী আইনস্টাইনের কথা। পূর্বসূরীর আলোকোন্মাসিত পথ ধরেই ওপেনহাইমার এগিয়েছিলেন। পথে যে আগুন ছলে উঠতে পারে, তা তিনি ভাবেন নি। ভাবেন নি আইনস্টাইনও। যদি ভাবতেন, তবে আপেক্ষিকতাবাদের কথা নিশ্চয় তিনি প্রকাশ করতেন না।

প্রশ্ন উঠবে, তবে কি সত্যকে প্রকাশ কবে আইনস্টাইন অন্যান্য কিছু করেছিলেন? উত্তরে বলবো,—না, মোটেই নয়। বরং আঁধারে আলোক জ্বালান যদি বিজ্ঞানীর ধর্ম হয়, তবে আইনস্টাইনের মতো ধার্মিক বিজ্ঞানী পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। কারণ, একা যে পরিমাণ আলোক ছাড়িয়েছেন তিনি, অনেক যুগের অনেক বিজ্ঞানী মিলেও তা ছড়ান নি। একা যতদূর পথ-পরিভ্রম্য করেছেন তিনি, অনেক যুগের অনেক মনীষী মিলেও তা করেন নি। অলৌকিক করবো না, জ্ঞান-রাজ্যের দুর্গম বন্ধুর পথ ধবে ওপেনহাইমারও এগিয়েছিলেন। কিন্তু সে পথের দিকে তাকালেই 'সহস্র-সূর্য'কে দেখি। হিরোসিমা এবং নাগাসাকির কামা শব্দেতে পাই। পোড়া মাংসের গন্ধ পেয়ে আঁধারে উঠি। মনে হয়, একজন হতভাগ্য অসহায় বিজ্ঞানী বলসে-ওঠা লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের দিকে নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে আছেন। বিবেকের প্রশ্ন অহরহ জর্জরিত করছে তাঁকে। কিন্তু দ্ব্যর্থ বয়েসনেট উঠিয়ে ধরেছে বলে ভয়ে তিনি কিছুই করতে পারছেন না।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে, ওপেনহাইমারের পূর্বসূরী আইনস্টাইন কি কিছু করেছিলেন? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আইনস্টাইনের জীবনকথা পর্যালোচনা করতে হয়। সর্বদিকে তাকালে দেখি, আশ্চর্য এক জীবনরঙ্গমণ্ডলের পর্দা আমাদের সামনে থেকে সরে গেছে। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের জার্মানীতে ফিবে গোছি দামরা। ১৪ই মার্চের ব্যাডেরিয়ায় জন্মগ্রহণ। এই ব্যাডেরিয়ায়ই এক শহর আলম। ওখানে হেরম্যান ও পাউলিন

আইনস্টাইনের ঘর আলো করে এল এক শিশু। এই শিশুটিই যে একদিন জ্ঞানে ও মহিমায় বিশ্ববাসিত হবেন, তা কিন্তু সেদিন কেউ ভাবতে পারে নি।

অথচ অসাধারণ করল শিশু। একদিন সর্বকালের এক সেরা বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

এজন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। ছেলেবেলা থেকেই দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। তাঁর মা-বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই অভাবের মধ্যেই বেড়ে উঠলেন এলবার্ট ও তাঁর ছোট বোন ম্যাক্স। গুয়া পড়তে গেলেন মিউনিক-এর এক স্কুলে। জার্মানীতে তখন বিসমার্ক-এর শাসন চলছে। উদ্ভূত সামরিক-শক্তি তার নতুন স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে গ্রাস করতে চাইছে মিউনিক-এর নাগরিক-জীবনকে। আর এই জর্জরিতবাজারী প্রভাব এসে পড়েছে এমন কি স্কুলেও। নিশ্চয় নিয়মানু-বর্তিতার রাজত্ব ওখানে। ওখানে ছেলে-মেবেদের হাসিখুশি ধাকা নিষেধ। প্রশ্ন করা মানে আইন অমান্য করা। আর শিক্ষকদের হালচাল? আইনস্টাইন লিখছেন, “প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের দেখলেই মনে হ’ত আমার, যেন সাজেস্ট।”

এই সাজেস্টদের কবল থেকে মুক্তি পেলেই আনন্দে উল্লাসিত হতেন এলবার্ট। ছুটতে-এক আত্মীয়ের কাছে। আত্মীয়টি তাঁকে অংক শেখাতেন। এলবার্টের খুব প্রিয় ছিলেন তিনি। অংকের সঙ্গে এলবার্টের দোস্তি গড়ে উঠল তাঁরই সহযোগিতায়। সবাই অবাক হয়ে দেখল, সময় পেলেই অংক নিয়ে বসে কিশোর; বলে, “এ একটা মজার শাস্ত্র। যখন কোনো পশুকে ধরবো বলে আমরা হন্যে হয়ে ঘুরছি, অথচ কিছুতেই ধরতে পারছি না, তখন ঐ পশুটাকে সাময়িকভাবে এক্স (X) ধরা হয়। তারপরেই আবার চলে অন্বেষণ। যতক্ষণ অবধি না ঐ পশু ধরা পড়েছে, ততক্ষণ ধবে চলে।”

সম্প্রতি ছেলেই অন্য এক অন্বেষণে মেতে ওঠে কিশোর। তারকাদীপ্ত নীহারিকাখচিত আকাশের দিকে তাকায়। বলে, “এ যে দূরবেদ জগৎ! কত বিশ্ব আছে ওখানে! আছে কত মানুষ-জ্ঞান। আমাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা হয়েছে

টিকে আছে ওরা। ওদের ভাবনা আঁধারে যেন মৃত্তির সন্ধান দেয়।”

এইভাবে ছোটবেলা থেকেই দূরের দেশের যাত্রী হলেন আইনস্টাইন। স্বয়ং-চন্দ্র সাজেস্ট-শিক্ষকদের শাসনকে উপেক্ষা করে কম্পনায় নিয়ন-ভূম নীহারিকালোকে অভিযাত্রা করলেন।

ওঁদিকে নতুন এক সুযোগ এল। মিউনিক-এর বাস ভুলে দিয়ে সুইজার-ল্যান্ডে গেলেন তাঁর মা-বাবা। আইনস্টাইনও ওঁদের সঙ্গী হলেন। ভর্তি হলেন গিবে সুইজারল্যান্ডের এক স্কুলে। এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। জার্মান সামরিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। অংকশাস্ত্রটা এখন আরও প্রিয় হয়ে উঠল যেন। আর প্রিয় হল সুইজার-ল্যান্ডের মৃদু ও আনন্দময় পরিবেশ। কালক্রমে এই রাষ্ট্রেরই নাগাবিকল্প নলেন তিনি। স্বেচ্ছায় তাঁর জার্মান-পরিচয় টুকু ত্যাগ করলেন।

১৮৯৬ খৃস্টাব্দে জুরিখ শহরের ‘সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুল’ থেকে গ্র্যাজুয়েট হলেন আইনস্টাইন। ভাবলেন, এবার শিক্ষকতার কোনো একটা কাজ পেলে ভাল হয়। প্রাণভরে অংক কথা ধার তাহলে। আর বিজ্ঞান নয়ও মেতে থাকা যাবে। কিন্তু কাজ ফোঁষায় তখন। শেষ অবধি তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে বার্নে এক অফিসে কেরানীর কাজ নিতে হল।

সে অফিসে মাইনে ছিল খুবই মসৃণ। স্ত্রী মিলিভা ও দুটি শিশুসন্তানকে নিয়ে আইনস্টাইনের সংসার তাই কাব্য-রূপে চলত। কিন্তু দারিদ্র্যের তড়নায় পরাজিত হবার মানুষ আমাদের এই বিজ্ঞানীটি ছিলেন না। তাই এবাদিকে যখন অভাবের তর্জন-গর্জন লেগে, অপরদিকে তিনি তখন গবেষণায় নিবিষ্টচিত্ত। একদিকে অফিস যখন তাঁর সময়কে নিলাম করতে চাইছে, অপরদিকে তিনি তখন নিউটনের সহ-পুত্রলোকে সমীক্ষণ করছেন। ভাবছেন, কী দিয়ে গড়া এই বিশ্বজগৎ? কতদূর অবধি এর ব্যাপ্তি? কোন বহনময় সূত্র এই বিরাট সৃষ্টিকে অখণ্ডতা দান করেছে? ভাবতে ভাবতে সত্যসন্ধান এক অদৃষ্টপূর্ব ভীষণ যাত্রী হলেন তিনি, জ্ঞানসাত্ত্বজ্যোত্স্ন জ্যোতির্ময় চরা-চরকে প্রত্যক্ষ করলেন। আর ফাব

যখন এলেন, সমস্ত পৃথিবী তখন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনে স্তম্ভিত। তিনি জমায়েত,

$$E=mc^2$$

অর্থাৎ, আলোকের গতির বর্গকে (C²) কোনো বস্তুর উপাদান (m) দিয়ে গুণ করলে গুণফল সেই বস্তুর শক্তির (E) সমান হবে।

এই হ'ল আইনস্টাইনের বিশ্ববিখ্যাত আপেক্ষিকতার সূত্র বা 'থিয়োরী অব রিলেটিভিটি'। এর সাহায্যে সময়, ক্ষেত্র এবং বস্তুর মধ্যে যে সংযোগ আছে, তা প্রতিষ্ঠিত হল। এই 'থিয়োরী অব রিলেটিভিটি'কে কেন্দ্র করে আইনস্টাইন প্রতিপন্ন করলেন, বস্তু হল শক্তিরই সহিত প্রতিমূর্তি।

অমৃত কথা এটি। নতুন কথা। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে জার্মানীর এক বিজ্ঞান-পত্রে যখন এ কথা প্রকাশিত হল, তখন থেকে আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে নবযুগের সূচনা। দেখতে দেখতে আইনস্টাইনের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্ব-বিজ্ঞানীর জয়মাল্য পেলেন তিনি। খ্যাতিনামা ইংরেজ বিজ্ঞানী জে. জে. থমসন লিখলেন, "আইনস্টাইনের আবিষ্কার সমগ্র মানবজাতির চিন্তা ও সাধনার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অবদান।"

এদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহ্বান আসতে লাগল। সকলেরই ইচ্ছে, আইনস্টাইনের কাছ থেকে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু শোনেন। অনেকে আবার এই তরুণ বিজ্ঞানীটিকে শিক্ষকতা করবার জন্যে আহ্বান জানান।

বিজ্ঞানী সাড়া দিলেন। প্রথম গেলেন সুইজারল্যান্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯১৩ খৃস্টাব্দে গেলেন বার্লিনে, 'কাইজার উইলহেল্ম-ইনস্টিটিউট'-এর ডিরেক্টর হয়ে।

জার্মানী পৌঁছে আইনস্টাইন দেখলেন, সবাই লেখা 'স্বাগতম'। পূর্বনো বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়রা তো বটেই, সাধারণ মানুষ পর্যন্ত তাঁকে অভ্যর্থনা করতে উদগ্রীব।

এই আনন্দময় পরিবেশে হঠাৎ খুব খুশি হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানী। মিশলেন শ্রদ্ধাভাজীদের সঙ্গে। দূর-সম্পর্কে বোন এলসা আইনস্টাইনও এসেন। ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী এলবার্টকে কাছে পেয়ে মেতে উঠলেন ঘেন।

এই মাতামাতি অচিরেই গিয়ে ঠেকল প্রেমে। প্রেম থেকে পরিণয়। এলসাকে বিয়ে করলেন আইনস্টাইন।

খুব সুখী দম্পতি ছিলেন গুঁরা। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে এলসার মৃত্যুর আগে

অবধি এ সুখ ছিল হয় নি। কিন্তু প্রথম বিবাহে সুখী হতে পারেন নি আইনস্টাইন। বার্লিনে পৌঁছবার আগেই মিলিভার সঙ্গে তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করে এসেছিলেন।

ওদিকে অন্য এক বিচ্ছেদ ঘনিয়ে উঠেছে তখন। ইংল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানী সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এছাড়া রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে মেতেছে ফ্রান্স।

ইয়েরোপেব আকাশে-বাতাসে যুদ্ধের বিষবাপ্প ছাড়িয়ে পড়েছে দেখে আতঙ্কিত হলেন আইনস্টাইন। দেশে দেশে অশান্তি ও উপদ্রবের আগুনকে প্রত্যক্ষ করে দিশাহারা হলেন।

আইনস্টাইন ছেলেবেলা থেকেই যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন। সবাই জানি আমরা, সামরিক শক্তির ঔন্ম্যতা কোনো-দিন তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। কিন্তু এবার সরাসরি বিদ্রোহ-ঘোষণার সময় এল। এবার সম্পূর্ণ ঘোষণা করলেন মহাবিজ্ঞানী, "আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেও যুদ্ধের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে পারবো না।" জার্মানীর যে সব বিজ্ঞানী মাতৃভূমির প্রশস্তির নামে যুদ্ধের জয়গান করছিলেন তিনি তাঁদের সাবধান কবে দিয়ে বললেন, "যুদ্ধ হল কান্ডজ্ঞানহীন বর্বরতা।"

অপর কেউ এরকম কথা বললে নিশ্চয় তাকে রাজ্যেরাষে পড়তে হ'ত। নিশ্চয় দশজনের সামনে গুলী করে হত্যা করা হ'ত তাকে। কিন্তু আইনস্টাইন রেহাই পেলেন। তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতিই যে তাঁকে সামরিক আদালতের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অবশেষে যুদ্ধ শেষ হল। আইনস্টাইন গজ্ঞন করছেন তখনও, "ঘৃণ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির খেলাটা-আপাতত বন্ধ হ'ল তবে।"

কিন্তু খেলা বন্ধ হলে কি হবে। খেলাব মাঠ থেকে তখনও গোলা-বারুদের গন্ধ ভেসে আসছে। এমন সময় জার্মান সরকার আইনস্টাইনের কাছে এক লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে এলেন। জানালেন, নতুন ধবণের আপনেশাস্য তৈরি কবতে পারলে অনেক অর্থ দেওয়া হবে তাঁকে।

আইনস্টাইন এ প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, "বিজ্ঞানকে মনোফা করে অর্থ-সম্ভয় করবো না আমি। আমার সম্মান বিক্রি কবাব জন্যে নয়।"

—"সম্মান কিসের জন্যে তবে?" জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই বক্রোষ্ঠি করলেন। আইনস্টাইন দমলেন না তবু। ওদের লক্ষ্য করে চাবুক হাঁকালেন; বললেন, "আমাদের যদি ধৈর্যহীন, নীচ-

মনা এবং হিংস্র প্রকৃতির লোকদের মধ্যে বাস করতে না হত তবে হয়তো সকলের আগে আমিই জাতীয়তাবাদকে জোর করে দূরে সরিয়ে দিতাম।"

আইনস্টাইন বললেন বটে এ কথা। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, ইহুদী-দের জন্যে তাঁর একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আকাঙ্ক্ষা জাতীয়তাবাদ থেকেই উৎসাহিত। ইহুদী-রাষ্ট্র এবং ইহুদী-বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার স্বপ্নকে সফল করার জন্যে চাঁদা-সংগ্রহে বোঝেরে ছিলেন আইনস্টাইন। ১৯২১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে যে বিপুল জনসম্মেলন পেয়েছিলেন তিনি, পৃথিবীর কোনো যুগেব কোনো বিজ্ঞানী কোনো দেশে তা পান নি।

অবশ্য আমরিকাতেও দৃ-একজন পেছনে লেগেছিল তাঁর। কেউ কেউ বলোছিল, আপেক্ষিকতাবাদ বিরাত একটা ভাওতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ আবার তাঁকে কমিউনিষ্ট প্রতিপন্ন করে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু ছোট-খাট সব বিপদ-আপদ, তুচ্ছ সব বাধা-বিপত্তি অভ্যর্থনা বজোয়ারের মধ্যে খড়-কুটোর মতোই ভেসে গেল।

কোটি কোটি মানুষের সম্বর্ধনা কুড়িয়ে নিয়ে বার্লিনে ফিরে এলেন আইনস্টাইন। এসে দেখলেন, যুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও হাহাকার।

নিরুপায় হয়ে এবার কাজে ডুব দিলেন মহাবিজ্ঞানী। উইলহেল্ম-ইনস্টিটিউট-এ আবাব গবেষণায় নিমগ্ন হলেন। কিন্তু গবেষণা আগের মতো আর জমল না। অসংখ্যের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে উতলা করে তুলল। বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন তিনি, মানুষ মানুষকে ছলনা করছে পৃথিবীর দেশে দেশে। জার্মানী যুদ্ধে হেরে গিয়ে সব দোষ চাপাচ্ছে ইহুদীদের ওপর; আমেরিকার শ্বেতকাষরা কালা-আদমী নিগ্রোদের মানুষ বলে ভাবতে কুণ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া জার্মান সৈন্যদের অত্যাচারে ইহুদীদের জীবন প্রতি মূহুর্তে হচ্ছে ক্ষত-বিক্ষত।

আইনস্টাইন যুদ্ধে দাঁড়ালেন। বললেন, "ইহুদীদের দৃবকথা দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে আমাব।"

এর ফল দাঁড়াল ড়াবাব। জার্মান সরকার ক্ষেপে গেল তাঁর ওপর। গোয়েন্দা-পদ্রিশের 'বিপপ্জনক' লোকের খাতায় তাঁর নাম উঠল। অনেক জার্মান নাগরিক প্রকাশ্যে ঘোষণা করল, "লোকটাকে এখনও ফাঁস দেওয়া হচ্ছে না কেন?" এমন কি ১৯৩২ খৃস্টাব্দে যখন তিনি নোবেল পদ্রস্কার পেলেন, জার্মানীর অনেকেই

জাত্যাত্মিক বঙ্গমতী

তখনও তাঁকে ফাঁস দেবার চিন্তায় মগন। হিটলার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গীরা ফ্যাপা কুকুরের মতো তাঁর পিছদ নিয়েছে।

আইনস্টাইন জার্মান রাষ্ট্রনায়ককে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন, “যতদিন নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে আমার, ততদিন এমন দেশকেই আমি থাকবার জন্যে নির্বাচিত করবো যেখানে আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকৃত।”

অনেক দেশই থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আইনস্টাইনকে। কিন্তু আইনস্টাইন শেষ অবধি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রিন্সটনে—পৌছলেন তিনি। পৌছবার পর ওখানকার ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের কর্তৃপক্ষ আইনস্টাইনকে বললেন, “নিজের মাইনে নিজে স্থির করুন আপনি।”

আইনস্টাইন জানালেন, “বছরে তিন হাজার ডলার হলেই যথেষ্ট।”—এর চেয়ে কমেও বোধ হয় আমার চলতে পারে?—ইন্সটিটিউটের এক প্রতিনিধিকে শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ছিলেন আইনস্টাইন।

প্রতিনিধি সবিস্ময়ে ছবাব দিয়েছিলেন, না, না; এতে আপনার কি করে চলবে? শেষ অবধি আইনস্টাইনের মাইনে স্থির করলেন ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষ। ঠিক হল, বছরে ১৬,০০০ পাউন্ড করে পাবেন তিনি।

প্রস্তাব শুনে আইনস্টাইন অবাক। তিনি ভেবেই পেলেন না, এত অর্থ দিয়ে কি করবেন। বেশি কিছুর তো প্রয়োজন নেই তাঁর। ফ্রিজিডার, রৌণ্ড, বাড়ি, গাড়ি না হলেও তাঁর চলে। বারবার তাঁকে কোট কিনতে হয় না। কারণ, পবে থাকেন যে চামড়ার জ্যাকেটটি বছরের পর বছর ধরে সেটি তাঁর সঙ্গে পরম বন্ধুর মতো ব্যবহার কবে আসছে। বস্ত্রটির চেহারা হয়তো সন্দেহ্য নয়; কিন্তু কাজ চালিয়ে দেয় ঠিক। দেখতে দেখতে কত শরৎ কত শীত পেরিয়ে যায়; কিন্তু ছেঁড়বার নাম করে না। এ ছাড়া আরও অনেক সুবিধে আইনস্টাইনের। মোজা পরেন না তিনি। চুল কাটেন না।

এই চুল কাটার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রিন্সটন-এর ছাত্ররা আড়ালে রসিকতা কবত। এ নিয়ে ছড়াও লিখেছিল ওরা। সেটি বাংলায় অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়,—

ছাত্ররা সব আসে
আইনস্টাইনের পাশে।
বাস্থ্য ওদের মগজে
অংক শেখে সহজে।

দুর্ভাগ্য এই শিক্ষা
দিতেন গুরু দীক্ষা;
একটু হাওয়া হলে
গুরুর জীবন চলে।

কাটেন না চুল তিনি
সবাই এটা জানি।
প্রার্থনা এক তাই
জানিয়ে রাখি ভাই।

হে ভগবান, যেন
না থাকে চুল হেন;
কাটুন তিনি চুল,
আর না করে ভুল।

কিন্তু ভুল আইনস্টাইন করতেনই। মাস পেরিয়ে বছর গড়াত; অথচ চুল কাটার নাম করতেন না।

এদিকে সময় বাঁচাবার আয়োজন। আবার অপরিদকে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বরাদ্দ সময় প্রচুর। যে যখন খুশি আসুক; যা খুশি প্রশ্ন করুক উত্তর দেবার জন্যে সব সময়েই তিনি প্রস্তুত। ছাত্রদের লক্ষ্য করে তিনি বলতেন, “তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে সব সময়েই আমি রাজী। যদি কোনো সমস্যা থাকে, তবে নিশ্চয় আসবে আমার কাছে। মনে রেখো, এতে আমার কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, যে কোনো মুহূর্তে আমি কাজ বন্ধ রাখতে পারি।”

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এমন কি স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যেও তাঁর ছিল অবিরত-স্বার। জ্যামিতিব ‘একস্মি’ পারছে না কেউ; আইনস্টাইন কবে দিলেন। অংকের উত্তর মিলছে না কারও; মূর্খকিল-আসান আইনস্টাইন উত্তর মিলিয়ে দিলেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি এই-যে দরদার মনোভাব, এর মূলে ছিল মানবপ্রেম। আবার এই মানবপ্রেমই শেষ অবধি এক সর্বনাশা ঘটনার সঙ্গে পরোক্ষভাবে তাঁর সংযোগ-স্থাপন করল।

আইনস্টাইনের ববাবরই সংশয় ছিল, হিটলারের জার্মানী পাবমাণবিক বোমা গড়তে পারে। আশঙ্ক ছিল তাঁর, যদি একবার ঐ বিধ্বংসী অস্ত্র হাতে পায় হিটলার, তবে হয়তো পৃথিবীতে প্রলয় ঘটবে। এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর কাছে তিনি একটি চিঠি লিখলেন। ঐ চিঠিতে আমেরিকায় পারমাণবিক গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হল।

চিঠি পেয়ে বিস্মত হলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। নির্দেশ দিলেন, “অবিলম্বে এ

কৃষ্ণবস্ত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।”

সবাই জানি আমরা, ব্যবস্থা প্রতি মৃত হয়েছিল। দেখতে দেখতে গড়ে উঠেছিল বিরাট ম্যানহাটন প্রকল্প, এবং এ প্রকল্পের পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করেছিল হিরোসিমা আর নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ।

১৯৪৫ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে হিরোসিমা-দহনের পর ‘ন্যাটু ইয়ক’ টাইমস্’ মন্তব্য করল, “এ থেকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রমাণ পেল মানুষ; পরমশ্রুত্ব মধ্যে যে বিরাট শক্তি লুকিয়ে আছে, তাকে উদ্ধার করার চাবিকাঠি হাতে পেত।”

কিন্তু আইনস্টাইন শিউরে উঠলেন। বললেন, “যদি জানতাম যে জার্মানরা পারমাণবিক অস্ত্র গড়তে পারবে না, তবে হয়তো এই বোমা-গাড়ার ব্যাপারে কিছুই করতাম না আমি।.....এখন পাবমাণবিক শক্তি মানুষের কাছে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ।”

এই অভিশাপকে নির্মূল কববেন—লে বস্ত্রপরিষ্কার হলেন আইনস্টাইন। প্রচার সুরু করলেন সর্বনাশা যুদ্ধের বিরুদ্ধে। লিখলেন, “আমাদের স্কুলপাঠ্য বইগুলো যুদ্ধের জয়গান করে। যুদ্ধের ভয়বহ

॥ শিশু সাহিত্য সংঘের বই ॥

- ১। রমণী—বোম্বানা বিশ্বনাথম্— ২০.০০
- ২। নিগ্রোছেলে—অনুবাদক—
নিখিল সেন ৭.০০
- ৩। রূপময় ভারত—খগেন্দ্র মিত্র ও
রামেন্দ্র দেশমুখ্য ৪.০০
—কিশোরদের জন্য—
- ১। বাঘের আশ্রয়ত্যা—
বামেন্দ্র দেশমুখ্য— ২.০০
- ২। ছোটদের গোকর্ষ মা—
খগেন্দ্রনাথ মিত্র— ২.০০
- ৩। সেঙ্গিপায়ারের নাটকের গল্প—
খগেন্দ্রনাথ মিত্র— ২.০০
- ৪। আমাদের নেহেরু—
নিখিল সেন— ২.০০
- ৫। ছবিতে বুদ্ধদেব (বাংলা ও
হিন্দী)—ব্রজ রায়চৌধুরী— ১.০০

পরিবেশক

শরৎ বুক হাউস

১৮-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২।

আপেক্ষিক

রমা অধিকারী

একটা কবিতা লিখেছিলাম, প্রেমের কবিতা
চাঁদ আর ফুল নিয়ে। দাদা দেখে বলল
“এ তো পলিটিস্। ওই যে সিংহেইস্—
‘ফুল বুধা কেঁদে মরে চাঁদের বিরহে’—
ওর মতোই তো রয়েছে খাদ্য সমস্যার
প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ।”

চাঁদ আর ফুল,

তাতেও রাজনীতির গন্ধ। আমাকে ছাড়তে হল,
প্রেমের কবিতা। ভাবলাম, হাক্ গে প্রেম,
এবার ধর্মের কবিতা লেখা থাক দোঁষ।
তাই পরমরহস্যকে নিয়ে পড়লাম,
প্রকৃতি পুরুষ থেকে রম্মা-বিশ্ব-শিব,
সাকার নিরাকার তত্ত্ব, শৈবত শৈবতবাদ,
অখণ্ড পরমানন্দ, চিন্ময়, অব্যয়,
কিছুই বাদ দিলাম না। বন্ধু বলল,
“সাবাস, সাবাস। সরকারকে চমৎকার
ঠক্কে তো হে। ওই যে আইনটা—
‘সুশীল-স্থিতি শূন্যে লয়, মূল মহেশ্বর
প্রকাশ পূর্ণ শূন্য মহিমায়’—
ওরই মতোই তো রয়েছে দেশের
বর্তমান পরিস্থিতির সুগভীর ব্যঞ্জনা,
পরিবার-পারিকল্পনার কঠোর ব্যঙ্গোক্তি।”

সুস্কন্ন দৃষ্টিতে বেশ ধরা পড়ে।” অভাব
কবিতার খাতাগুলো আগুনে পুড়িয়ে
আদ্যপ্রাশ্ন থেকে সপিণ্ডকরণ করলাম।
এখন পড়ছি শঙ্করের মোহমন্দার।
কি করব, মহাভারত, রামায়ণ, গীতা
সবই তো রাজনৈতিক ভাষা ভরপূর।
তাই সে সব ছেড়ে আবৃত্তি করে চলছি
‘মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বম।’
কিন্তু কি সর্বনাশ! ওর মধ্যেও যে
রাজনীতির গন্ধ! বৈরাগ্যের মধ্যেও শেষে
রাজনীতি ঢুকিয়েছেন ভদ্দলোক। আচ্ছা
বান্দ তো! ছুড়ে ফেলে দিলাম মোহমন্দার।
জানালা গলিয়ে। যত সব হিপোক্রিট।
দাদা নয়, বন্ধুও নয়, এবার আমি
স্বয়ং এই তথ্য আবিষ্কার করেছি।
আমার চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণু
গিজগিজ করছে রাজনৈতিক বীজাণুতে।

পরিণামের কথা কড়কে জানতে দেয় না
ওরা। ওরা শিশুদের শিরা-উপশিবার
মধ্যে বিবেচ-বিশ ঢুকিয়ে দেয়। ‘আমি
যুদ্ধ নয়, শান্তির শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী।’
ঘৃণা নয়, প্রেমের প্রচার করতে উৎসুক।”
স্বাধীন-মানবপ্রেমিক ছিলেন বলেই
নিগ্রোদের রোদনকে তিনি হৃদয় দিয়ে
উপলব্ধি করেছিলেন। বিরূপ সমালোচনা
হবে জেনেও বলতে পেরেছিলেন, “আমি
বিশ্বাস করি, যে কেউ সম্ভাবে ভাবলেই
দেখতে পাবে, নিগ্রোদের বিরুদ্ধে চিরা-
চরিত বিবেচনাই অবশ্যিক এবং
মারাত্মক।”

জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে রাষ্ট্র-
নায়কদের সরাসরি আক্রমণ করলেন তিনি।
বললেন, কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে
অকারণে মানবকে ওরা ধাপ্পা দেয়।
“ক্ষমতার জন্যে ক্ষমতার ঐ সব রাজ-
নীতিবিদদের আর কতকাল আমরা নহ
করব?”

আইনস্টাইনের এই সব স্পষ্টোক্তি
আমেরিকার কর্মকর্তাদের মনে ধরল না।
তারা বার বার দোষারোপ করলেন এই
মহাবিজ্ঞানীকে। অনেকে বললেন,
“আমেরিকার এই শত্রুটির বিচার হওয়া
উচিত।”
কিন্তু আইনস্টাইন নির্বিকার। তিনি
আর একবার সাবধান করে দিলেন
পৃথিবীকে; বললেন, “হাইড্রোজেন
বোমাকে বেআইনী ঘোষণা না করলে
যুদ্ধই অব্যাহত।”

কিন্তু কেউ শুনল না আইনস্টাইনের
কথা। যখন তিনি বললেন, “আমি
ইহুদী নই, জার্মানও নই। একজন
মানুষ”, যখন জানালেন, “স্বাধীনতাবাদ
মানবসভ্যতার শৈশব থেকে সংক্রামক
রোগের কাজ করছে”, তখন অনেকেই
হেসে উড়িয়ে দিল তাঁকে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্ব-

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার কম্পটন শব্দ
বললেন, “আইনস্টাইন মহৎ।”

আমরাও ঠিক এই একই কথা বলবো।
আমরাও বলবো, আইনস্টাইন মহৎ। তাঁর
আলোকে দূরের জগৎকেই শূন্য নয়,
কালের জগতেরও সত্যস্বরূপকে জানতে
পেরেছি আমরা। তাঁর চলার পথে কামা
নেই, গোড়া মাংসের গন্ধ নেই, স্বাসে-
ষ্ঠা হতভাগ্যদের ভিড় নেই। সে পথে
শুধুই আলো। এত আলো যে তার
দৌলতে বিশ্বজগতের শেষপ্রান্ত অবধি
চোখে পড়ে। চোখে পড়ে, শান্ত ও
পরহিতরতী এক মহাবিজ্ঞানীকে, যিনি
অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে সারা জীবন-
ব্যাপী সংগ্রামের পরেও সদানন্দময়।
রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুকে তিনি পরোয়া করেন
নি; উদ্ভূত বেয়োনেটকে তিনি পুরুষ
দেন নি। চিরদিন তিনি আপন অন্তরের
আদর্শের লিখাটিকে অনিবার্য রেখে
অবিচলিতচিত্তে পথ চলেছেন।

আধুনিক নাটক পরিচালনা: আমরা যেন কসে সেই সব লোকের কথা শুনি যাদের আমরা জানি অভিনেতা ও অভিনেত্রী বলে—যারা মিডল্যান্ড হোটেলে এসে উঠেছে, এরাই আবার অভিনয়ের সময় হয়ে দাঁড়ায় সুন্দরী নিষ্পাপ কৃষককন্যা এবং বড় শহর থেকে আসা চাকচিক্য-সম্পন্ন বদমায়েসের দল।

স্টেজের উপরের প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বস্তুই থাকে এই বৈচিত্র্য—তাদের দেখা হয় অদ্ভুত আলো-ছায়ার অর্থাৎ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে—they belong to a heightened reality that we know to be unreal. It is this experience, unlike any other, that I call dramatic experience, and that the theatre exists to provide for us.

বললাম বটে যে অন্য অভিজ্ঞতার থেকে এ অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র—তবে সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে এ কথাটা ঠিক নয়। সাধারণ অন্য পাঁচটা অভিজ্ঞতার থেকে এটা স্বতন্ত্র বটে, তবে জীবনে কচিকদাচিং এমন মুহূর্তও আসে—হয়তো তখন আমরা দৈহিক দিক থেকে অত্যন্ত ক্রান্ত থাকি—কিন্তু সঙ্গো সঙ্গো হয়ে যাই alert in spirit. হয়তো ভয়ানক বিপদ এগিয়ে এসেছে আমাদের সামনে—যখন অতি বাস্তব জীবনটাই আমাদের সামনে নাট্যিক অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের মনে হয় সারা পৃথিবীটা একটা জয়েন্ট থিয়েটার এবং আমাদের জীবনটাই হচ্ছে একটা নাটক, এবং সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের অজ্ঞাত গভীর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তব নাট্যভিনয়ের সঙ্গো ভুলনীর।

And I suspect that it is this strange link with these moments of mystical insight that has given the theatre, no matter how Tawdry and Trivial it may appear to be, a central place in most civilised societies, and has brought the drama close to religion.

বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের সুক্ষ্ম সম্পর্কের উপর, নাটকের কল্পিত জীবন এবং মধ্যে উপস্থাপিত বাস্তব জীবনের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে নাট্যিক অভিজ্ঞতা। ভেতরকার সমতা যদি নষ্ট হয়, তাহলে নাট্যিক অভিজ্ঞতাও বাহ্যত হতে বাধ্য। সুতরাং কোন থিয়েটারে গিয়ে যখন বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি অমূলক অভিনেতার ভূমিকা সম্পর্কে স্বাধীন ভাষায় আছে কি না,

বঙ্গদেশে নাটক

নতুন আলোকপাত পদ্ধতি ঠিকমত কার্যকরী হয়েছে কি না, স্থিতিশীল অঙ্কে যবনিকা একটু বেশি মন্থরভাবে পড়ল কি না—তখন আমি নাট্যিক অভিজ্ঞতার গভীর বাইরে চলে যাই। কিন্তু এর বিপরীত দিকটাতেও এই একই ব্যাপার ঘটে। অর্থাৎ আমরা বিস্মৃত হই যে থিয়েটার দেখছি এবং সেই সদাশয় মহিলার মত আচরণ করি, যিনি একবার ওখেলোর প্রদর্শনীর সময় মূরের হিংসাজাত সন্দেহ দেখে বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলেছিলেন—হতভাগা, বিরাট দেহবিশিষ্ট মুখ—ভূমি কি দৃষ্টিহীন যে কিছুই বুঝতে পার না?

অনেকের মনে একটা প্রান্ত ধারণা আছে যে দর্শক যদি এভাবে থিয়েটার দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে তাহলেই বোধহয় নাট্যভিনয় চরম সার্থকতা লাভ করে। এ অবস্থায় নীত হলে দর্শকের নাট্যিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয় না। উপরি-উক্ত দর্শকের ক্ষেত্রে—The essential balance, the crucial inner-relation between play and reality, had not been achieved. অভিনেত্রী এবং নায়িকা সংক্রান্ত উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করা যাক—অভিনেত্রী পলি ব্রাউন কৃষকের নিষ্পাপ মেয়ে ম্যাগী স্মিথের ভূমিকায় অভিনয় করবে। আমি যদি থিয়েটার দেখতে গিয়ে শুধু পলি ব্রাউনকে দেখতে চাই, ম্যাগী স্মিথ এবং তার দৃষ্টান্ত বিষয়ে আমার যদি কোনও কৌতূহল না থাকে, তাহলে ঐ থিয়েটার দেখতে গিয়ে আমার কোন নাট্যিক অভিজ্ঞতা হবে না। আবার যদি পলি ব্রাউনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে খালি ম্যাগী স্মিথকেই দেখি এবং বিশ্বাস করি, যার ফলে মধ্যে অভিনেত্রী পলি ব্রাউনের কোন অস্তিত্ব থাকবে না, থাকবে শুধু কৃষককন্যা ম্যাগী স্মিথ—সেক্ষেত্রেও নাট্যিক অভিজ্ঞতার (Dramatic experience) গভীর বাইরেই আমি পড়ে থাকব। নিখাদ এবং অতুলনীয় নাট্যিক অভিজ্ঞতা তখনই হবে যখন মণ্ডাভিনয় দেখতে দেখতে আমার স্মৃতিপথে থাকবে যে, অভিনেত্রী পলি ব্রাউন লে করছেন ম্যাগী স্মিথের চরিত্রে।

And this important Polly-Brown playing Maggie-Smith contribution to dramatic experience explains our attitude towards actors and acting.

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাস্তব যত মনোমুগ্ধকরই হোক না কেন, তাঁদের দক্ষতা বা অভিনয়-ক্ষমতা যত বড়ই হোক, যারা এই সমতা রাখতে পারবেন না, যারা অত্যধিক পলি ব্রাউন বা ম্যাগী স্মিথ, তাঁদের অভিনয়ে আমরা কখনই পৌনত্ব হতে পারি না। কারণ তাঁরা আমাদের মধ্যে সত্যিকার নাট্যিক অভিজ্ঞতা সঞ্চারে অকৃতকার্য হন। কিন্তু যারা এই সমতা রাখতে পারেন, তাঁরাই আমাদের অভিনয়ের মাধ্যমে অনাবিল আনন্দ দান করেন, আমাদের চাহিদামত প্রকৃত নাট্যিক অভিজ্ঞতা সঞ্চারে।

A Ralph Richardson, a Laurence Olivier, an Edith Evans, a Peggy Ashcroft—are precisely those actors and actresses who are always tremendously themselves and yet at the same time somebody else—Polly-Brown playing Maggie-Smith. That is what the Theatre demands if it is to fulfil its peculiar function.

আমাদের দেশে এই ক্ষমতার অদ্ভুত প্রকাশ দেখা যেত শিশিরকুমার, রথিকানন্দ, নরেশচন্দ্র প্রমুখ অভিনেতার অভিনয়ে।

নাটকের মণ্ড-রূপায়ণের সঙ্গো সঙ্গো দর্শকমনে তার আবেদন হওয়া উচিত। এ তো বই নয় যে কোন অংশ ভুলে গেলে আবার পেঁছিয়ে গিয়ে পড়ে নেবে। দর্শক যাতে সব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা কবতে পারে সেজন্য নাটকের সমস্ত অংশ সহজভাবে দর্শকদের বোধগম্য হওয়া দরকার। না করতে পারলে দর্শকদের ধারণাও হবে অস্পষ্ট। সব দেশের প্রভিউসবরাই নাটকের মণ্ড-রূপায়ণকে সহজ, সরলভাবে দর্শকদের কাছে উপহার দিতে চান। ভাল প্রডাকসন যত স্বতঃস্ফূর্ত এবং জটিলতা-বর্জিত বলে মনে হয় যে দর্শক ভাঙতেই পারেন না এর পেছনে প্রযোজককে সতর্ক

কিছু পরিচালনা করতে হয়েছে। দর্শকদের হাসানো এবং কাদানোর জন্যও যে অভিনেতাকে টেকনিকের সাহায্যে কাজ করতে হয় একথা কখন থিয়েটার-দর্শক বুঝতে পারেন!

অভিনেতা হয়তো ভাবাবেগের জাপে ফরা ফান্দুস। কিন্তু তবুও তিনি দর্শকদের কাদাতে পারছেন না। হাস্যরস সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অন্য একজন অভিনেতা অভিনেত্রীকে হাসাতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন। এই দুই ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ অভিনেতার টেকনিক সম্বন্ধে অজ্ঞতা—দর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার মত যোগ্যতার অভাব।

অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে শূন্য নিজের অভিনয়কে ভাল করলেই চলে না—অন্যান্য যাদের সঙ্গে অভিনয় করছি তাদের উপরও অনেক কিছুই নির্ভর করে। ধরুন একজন বিখ্যাত অভিনেতা চাণক্যের ভূমিকায় খুবই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন—কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠবে না—যদি তাঁর সহযোগী অভিনেতার তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত এমন ভাবটা না দেখান। অভিনয়ে এই সমতা আনবার দায়িত্ব প্রযোজকের। কারণ প্রত্যেক অভিনেতা স্ব-স্ব ভূমিকা নিয়েই ব্যস্ত—সমগ্র অভিনয় নিয়ে ভাবার কাজ ইনিভিভুয়াল অভিনেতার নয়—সে কাজ পরিচালকের।

নাটকে দলের কে কোন ভূমিকায়

অভিনয় কবেন তা সঠিকভাবে ঠিক করে দেওয়াও প্রযোজকের কাজ—একেই বলা হয় কাস্টিং। ঠিকভাবে কাস্টিং করতে না পারলে নাটক এবং প্রযোজনা যতই ভাল হোক অভিনয় কিছুতেই জমবে না।

কিভাবে অভিনয় করতে হবে এটা শেখানো পরিচালকের কাজ নয়—যদিও অপেশাদারী দলে পরিচালককে অভিনয় শিক্ষাও দিতে হয়। ওদেশে এলোকেউশন টিচার এবং ড্রামটিক স্কুলগুলিই অভিনয় শিক্ষা দিয়ে থাকে। নাটককে সুন্দরভাবে মণ্ডস্থ করতে গেলে প্রডিউসারের যে যে বস্তুর দরকার হয় অভিনেতা তাদের অন্যতম। প্রডিউসার ধবেই নেন যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এ্যাক্টিং সম্বন্ধে পারদর্শী বলেই তাঁর সঙ্গে কাজ করতে এসেছেন, যেমন শিল্পী ধরে নেন, যে সব রং নিয়ে তিনি কাজ করছেন তার ভেতর কোনো ভেজাল নেই, তেমনি পরিচালকও ধবে নেন নটনটীরা সত্যিকার অভিনয়-ক্ষমতার অধিকারী, তাদের ভেতর ভেজাল নেই।

The Producer has to employ their qualities to the best advantage for the proper expression of the play to be presented. His actors are a company of Soloists whose performances he has to mould into a proper ensemble.

প্রডিউসারকে প্রথমেই ভালভাবে নাটকটি পড়ে পরিকল্পনা কবে নিতে হবে

কিভাবে এ নাটকের মূল্য—আইডিয়াকে তিনি দর্শকদের কাছে উপহার দেবেন। এই জন্য নাটকটি সঠিকভাবে বোঝা দরকার। ধরুন প্রযোজক চেম্বের চেরী অর্চার্ড নাটকটি মণ্ডস্থ করতে যাচ্ছেন। চেম্বের প্রথমেই এ নাটকের বর্ণনা দিয়েছেন—এ কমিডি ইন ফোর এ্যাক্টস বলে। প্রযোজক যদি নাটকটিকে মণ্ডাভিনয়ে ট্রাজেডি হিসাবে উপস্থাপিত করেন, তা হলে দর্শক যতই হাততালি দিয়ে নাটককে অভিনন্দন জানাক, তবু বিশেষজ্ঞরা বলবেন নাটকের যথার্থ রূপায়ণ হয় নি—প্রযোজক নাটকের আসল চেহারা ফুটিবে তুলতে পারেন নি। তেমনি ইবসনের 'এ ডলস্ হাউস'-কে যদি পরিচালক ট্রাজেডি হিসাবে মণ্ডে রূপ দেন, তবে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়া—কারণ এটি একটি প্রেমের গল্প এবং সেইভাবেই দর্শকদের কাছে এ নাটককে তুলে ধরতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি সেক্ষেত্রে ধর্মী আধ্যাত্মিক নাটক। দ-একজন স্বল্প-দৃষ্টিসম্পন্ন ক্রিটিক নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্য 'রাজা' নাটকে বিপারিক্যানইজম-এবং যে আভাস দেখতে পেয়েছেন সেটা সত্যিই হাস্যকর। স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি (জ্ঞানযোগ পুস্তকে) পড়লেই 'রাজা' নাটকের মূল বস্তু পরিষ্কার হবে যায়। স্বামীজী বলেছেনঃ "বেদান্ত বলেন, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিরাছে। তুমি আশা, তুমি সন্নাট-স্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ? যদি রাজা পাগল হইয়া আপন দেশে 'রাজা কোথায়', 'রাজা কোথায়?' বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার উদ্দেশ্য পাইবেন না, কারণ তিনি স্বয়ংই রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি প্রত্যেক গৃহ পর্বন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন। তিনি মহা চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজ্যের উদ্দেশ্য পাইবেন না; কারণ তিনি নিজেই রাজা। আমরা যদি জানিতে পারি, আমরা রাজা, আর এই রাজার অস্ব-যন্ত্ররূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। বেদান্ত বলেন, এই-রূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট ও সুখী হইতে পারি।"

কর্মজীবনে বেদান্ত—"জ্ঞানযোগ" [ক্রমঃ]

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বাসে - মাদ্রাজ - দিল্লী - লাগপুর

বেঙ্গলোয়াডা - শ্রী নগর - দোহাটী

সংস্কৃত

যুক্তফ্রন্ট মন্টিসভার কাছে নাট্যজগতের আশা

যুক্তফ্রন্টের মন্টিসভার কাছে নাট্যজগতের কর্মী, দিল্লী ও নাট্যমোদীদের অনেক আশা করার আছে। এ আশা পূর্ণ করা খুব বেশি আশ্বাসনাথ ব্যাপার নয়। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধি ও নাট্যজগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলো এই আশা পূর্ণ করা যায়। কংগ্রেস মন্টিসভার কাছে নাটকের দলগুলি যুক্তভাবে বার বার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু তাঁদের অবস্থা ছিল গুরুভোজনের পর নরম বিছানায় গড়াগড়ি দেবার মত। কাজেই সংস্কৃতিজগতের কথায় কান দেবার বা ওসব নিয়ে চিন্তা করার তাঁদের অবস্থা ছিল না।

যুক্তফ্রন্ট মন্টিসভা নিশ্চয় জানেন, কংগ্রেসকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের মন্টিস গঠনের পথে নাটকের দলগুলির কি অবদান আছে। ইংরেজ আমলে যেমন মুরুন্দ দাস থেকে আরো অনেক নাট্যকার দেশাত্মবোধ জাগানোর কঠোর গ্রহণ করে রাজনির্বাসন ভোগ করেছিলেন। কংগ্রেসী আমলেও নাটকের দলগুলি মানুষের স্বাধীনতা, কষ্ট, শিকার দাবিকে নাটকের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য জনগণের মূর্তি-সংগ্রামের ইতিহাসকে অধিকৃতভাবে প্রকাশ করার নির্ধারিত হয়েছেন। নাটকের দলগুলি মানুষের মানবস্বাধীনতা কথা নিয়ে শব্দে, প্রাণে নাটক অভিনয় করেছেন, পথ-নাট্যকার কংগ্রেসী শাসকদের মুখোমুখি উদ্‌যোতন করেছেন। খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভের সময় যেমন, তেমন নির্বাচনের সময় নাটকের দলগুলি জনগণের সংগে থেকে দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের চেহারা মানুষকে ধরিয়ে দিয়েছেন। যুক্তফ্রন্টের মন্টিসভা গঠনে এই নাটকের দলগুলির অবদান আজ বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার। অবশ্য নাট্যজগতে এমন দু-চারটি দল ও গণ্ডি যে ছিল না এমন নয়—যারা দুর্নীতির শাসনকে সমর্থন করেছে। মন্টিসদের পদলেহন করে কিছু আর্থিক সাহায্য লাভের আশায় প্রগতির বিরোধিতা করেছে। সেই পদলেহনের কেউ কেউ রাতারাতি ভোলা পাল্টিয়ে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক সাজার চেষ্টা করছে, কিন্তু জনগণ জানে দিনবদলে কয় কি ভূমিকা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে নাট্যজগতে নতুন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করার অবস্থা দৃষ্টি করার দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টের মন্টিসভাকে নিতে হবে। ইংরেজ আমল থেকে নাটকের ক্ষেত্রে সেসব বাধা আছে সেই বাধা অপসারণের দায়িত্ব এই মন্টিসভাকে নিতে হবে। এই বাধা অপসারণ করা এমন কোন বড় কাজ নয়, কেবলমাত্র সাহস করে কাজগুলি করা, এবং নাট্যজগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা করা। যুক্তফ্রন্ট মন্টীর পেছনে প্রগতিশীল চিন্তাধারার নাটকের দলগুলি রয়েছে। এই সমর্থনকে আরো ব্যাপক ও দৃঢ় করার জন্য যুক্তফ্রন্ট মন্টিসভাকে নির্মলীকৃত কাজগুলি করতে হবে।—

(১) ১৮৭৬ সালের নাট্যকানুন নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল ঘোষণা করতে হবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেটের এই আইন বাতিল ঘোষিত হয়েছে, পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নালবাহাদুর শাস্ত্রী দিল্লী অঙ্গনে এই আইন বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে এই আইন বাতিল ঘোষণা করতে আর কোন বাধা নেই। কেবল একটু সাহসের প্রয়োজন।

(২) অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে প্রমোদক থেকে রেহাই দিতে হবে। কপোতেশ্বর ট্যাঙ্কের বর্ষিত হার থেকেও রেহাই দিয়ে পরনো হাতে ট্যাক্স আদায় করতে হবে।

(৩) নাটক মঞ্চায়ন করার পলিশ কর্তৃক পান্ডুলিপি মঞ্জুর করার সাম্রাজ্যবাদী আমলের ব্রীটিশ তুলে দিতে হবে। রাজসরকার একটা মার্কার জারী করে সরকারী, বেসরকারী হলগুলিকে জানিয়ে দিন যে পলিশ কর্তৃক পান্ডুলিপি মঞ্জুর করার প্রয়োজন নেই।

(৪) সরকারী, রেলওয়ে এবং সিটি টাউন ইন্সটিটিউটস হজগুলিতে কম ভাড়া ও আরও সহজভাবে যাতে নাটক অভিনয় করা যায় তবু জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) রবীন্দ্রসদন, রবীন্দ্রভারতী এবং মহাকাব্য সন্দের পরিচালনা কর্মিটি ইত্যাদি পুনর্গঠন করে, এমন ব্যবস্থা করা হোক যাতে সকলের ক্ষেত্রে একই রকম ব্যবহার করা হয়। কেউ একটোকা ভাড়া জমা করলে অন্যর সন্ধান পাবেন, কেউ পাঁচশ টাকা ভাড়া দেবেন এমন বাস্তবিকতা না থাকবে উচিত।

(৬) লোকরঞ্জন শাখার পরিচালনায় এবং প্রযোজনার ব্যাপারে আদর্শ ও চিন্তার পরিবর্তন করা দরকার, যাতে এই সংস্থা জনগণের কল্যাণকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আশা করি যুক্তফ্রন্ট মন্টিসভা অবিলম্বে এই দাবিগুলি কার্যকরী করবেন।—সুজন



‘শি’ জাল বটম বোট’ হাতিতে দিব্যবাসিনী
মহাতে’ মাতাহীর পোষাকে চোরাঙ্গি ডে।

নাটকের কথা

ললিতা

থিয়েটার ওয়াকশপ নামক এক নব্য-গঠিত সংস্থার উদ্যোগে গত ১৬ই মার্চ মজাখন মঞ্চে ‘ললিতা’ নাটক অভিনীত হয়েছে। থিয়েটার ওয়াকশপ নামটি বিশেষ অর্থবাহক মনে হয়েছিল আমার কাছে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিশ্ববের পরে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে বৃজেনী সংস্কৃতির পাল্টা প্রলোভনমান সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। স্বর্গহারা মানুষের ভাবধারা ও জীবনের রূপমণ্ডলে সেই সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছিল পরবর্তী সময়ে। সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারাসম্পন্ন সংস্কৃতিকর্মীরা থিয়েটার ওয়াকশপের



শীঘ্র বস, পরিচালিত 'অসামাজিক' ছবির একটি দৃশ্যে প্রশান্ত চ্যাটার্জী ও গমিতা বিশ্বাস।

মৃত নাম পছন্দ করতেন, এবং তাঁরা সংস্কৃতিকে বিলাসের পরিবর্তে সৃষ্টি-শীল কর্মের সঙ্গে যুক্ত করতেন। কাজেই এই নামটি আমাকে যেমন আকর্ষণ করেছে, তেমন কিছুটা বিভ্রান্ত করেছে।

এঁদের প্রথম নাটক জাঁ পল সার্তর 'দ্যা পুট্যা রেসপেক্টিউজ' অবলম্বনে 'ললিতা'। সার্তর নাটকের ফরাসী নামের ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে 'দি রেসপেক্টফুল প্রিন্সিটিউট'। এর বাংলা অনুবাদ ইতিপূর্বে হয়েছে—'বরণীয়া বারনারী'। এই নামের নাটক কলকাতায় অভিনীত হয়েছে। ফরাসী বা ইংরেজী নামের অর্থে মাননীয় বারনারী অথবা বরণীয়া বারনারী গোছের কিছু হওয়া দরকার। শ্রদ্ধামাত্র ললিতা মূল নাটকের বস্তবের অর্থবাহক নয়। উপরন্তু ললিতা বলতে নভিকভের ললিতাকে মনে করে সেদিন অনেক দর্শক নাটক দেখতে এসেছিলেন। মূল নাটকে সার্ত আমেরিকার কালোদের বিরুদ্ধে শাদাদের ঘৃণা ও আক্রমণের কথা বিশ্বকে জানিয়েছেন। বৃজ্জীয়া সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত এই নাটকে রয়েছে। সেই কশাঘাতের জ্বালায় একদল লোক এই নাটকের বিরুদ্ধে অবাস্তব ও বিকৃত বলে অভিযোগ তুলেছিল, তা সত্ত্বেও নাটকটি ফরাসী মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল

এবং বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে।

মূল নাটকে শ্বেতাঙ্গ টম অন্যার-ভাবে খামোকা এক সরল নিগ্রোকে হত্যা করেছে এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজ তাকে বাঁচাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী বারবনিতা লিঞ্জি।

তাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত বক্তৃতার তোড়ে বিভ্রান্ত করে তার বিবেককে কিনে নেবার চেষ্টা হয়েছে। একদিকে একজন নিগ্রো—ওদের কাছে তার জীবনের কি দাম! আর একদিকে একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের নেতা হবার জন্য যে জ্বলছে, সাম্যবাদের বিরুদ্ধে, প্রমিতদের বিরুদ্ধে, ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে এক জ্বরদস্ত দগের মত। তার কতবাই হচ্ছে বেঁচে থাকা। দুনিয়ায় ক্ষমতাবানদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে বৈকি! এই যুক্তিতে কত পণ্ডিতের মাথা ঘুরে যায়, আর লিঞ্জি তো এক সাধারণ বারবনিতা। কাজেই বক্তৃতার তোড়ে পড়ে মস্তমস্তের মত এক নিরপরাধ নিগ্রোর মৃত্যু-পরোয়ানায় সে স্বাক্ষর করেছিল। অবশ্য তার মোহ ভুগ হতেও দেরি হয় নি, এবং ক্ষণিক উন্মাদনায় সে তার প্রতিশোধ নিতেও উদ্যত হয়েছিল। তবু প্রবল ধাম্পা-বাজিতে সে নীতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। সার্তর এই নাটকের অনুসরণে বাংলার নাট্যরূপ লিখেছেন সত্যেন্দ্র মিত্র। কিছুটা নাট্যরূপায়ণের চরুটিতে মূল নাটকের সম্পূর্ণতা, রস ও বক্তব্য এখানে দুর্বল। বিশেষ করে ইংরেজী অনুবাদ নাটকের চমৎকার সংলাপ ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতা এখানে তেমনভাবে পাওয়া যায় নি। এখানে পরিচালনা দুর্বলতায় যৌন রসের ককটিলে বক্তব্য গোপন হয়ে উঠেছে। অভিনেত্রীর অপভ্রংশগত, মাঝখানে অপয়োজনে আলো নিভিয়ে মৃগ অন্ধকার করে 'সেক্স'-এর পুরো সুযোগ নিয়ে নাটককে কিছুটা দূরে সরিয়ে নেওয়া



'বোয়োরিং বোয়োরিং' ছবির একটি দৃশ্য।



দুলাহন এক রাত কি ছবিতে মিস্টার ও নতুন

হয়েছে। যাতে ব্যবসায়িক দিক থেকে এই সংস্থা লাভবান হবেন কিন্তু সত্যের পরিচয় দর্শকেরা পাবেন না। বরং সত্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধিরারা যে অভিযোগ তুলেছিল—মৌনতার প্রাবল্যে সত্যকে সেই অভিযোগে এনে ফেলা হয়েছে বলা চলে, কারণ বর্ণবিশেষ সাম্প্রদায়িক বিশেষের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের মানবতা এখানে যোগ্যভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। বাংলায় নাট্যরূপদাতা বর্তমান বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক বিশেষের রূপ প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। এই বাস্তব-দৃষ্টি যৌক্তিক। কিন্তু বলিষ্ঠ সংলাপ-গুলির যথার্থতা রক্ষা করলেই ভাল করতেন। দ্বিতীয়ত প্রতিপত্তিশালী এম, পি প্রভু পাল ইত্যাদি সমগ্র ধনী-সমাজের প্রতিভূ হবার চেয়ে অনেকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অভিনয়ে ব্যর্থতার এদের কৃগ্রিম মনে হয়েছে। অভিনয়ে বিশেষ সাধক শ্রীমতী মায়া ঘোষ—বারবনিতা ললিতার চরিত্রে। তবে তাঁকে দিয়ে পরিচালক অনেক অপ্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নিয়েছেন যাকে সেজ্ঞ এজ্ঞপ্রেট করা বলা উচিত। মায়া ঘোষ 'নাট্যকারের' স্থানে ছয়টি চরিত্র নাটকে অভিনয়ের পর থেকে এ

ধরণের চরিত্র অভিনয়ে পারদর্শিনী বলে নাটকের দলগুলির কাছে বিবেচিত হচ্ছেন, এবং পরিচালকেরা তার সুযোগ অনেক সময় বেশি আদায় করছে। মুসলমান শ্রমিকের ভূমিকায় চন্দ্রময় রায় সাধক অভিনয় করেছেন। রতন, বনাই, জগাই চরিত্রে মামিক রায়চৌধুরী, বিমলেন্দু ঘোষ, শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ রূপদান করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে উপস্থিত হয়েছেন বিভাস চক্রবর্তী, সত্যেন মিত্র এবং মহেশ সিংহ। নাটকের সমাপ্তি কিছুটা আকস্মিক মনে হয়। কারণ ললিতার মোহভগ্ন ক্ষণিকের জন্য প্রতিশোধে উদ্ভূত হবার ঘটনাটা এখানে দৃশ্যে আসে নি বলা চলে। হতাশায় ললিতা বিছানায় ভেঙে পড়েছে। অথচ সত্যের সব নাটক হতাশায় বিরুদ্ধে।

বিশ্বরূপা মঞ্চে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সম্বর্ধনা গত ১৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রীদের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীনন্দী ভট্টাচার্য, মৎস্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, প্রচারমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, পুত্রমন্ত্রী শ্রীহেমন্ত বসু, ভূমি-

রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোণ্ডার, উন্নয়ন-মন্ত্রী শ্রীজাহাঙ্গীর কবির, শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল খাড়া, বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জী ও চীপ হুইপ শ্রীকমল গুহ উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্বরূপা থিয়েটারের মালিক ও শিল্পীদের পক্ষে শ্রীরাসবিহারী সরকার নাটকের সর্বাঙ্গীণ উদ্ভিতির জন্য মন্ত্রিসভার সাংস্কৃতিক মন্ত্রিদপ্তর সন্নিবেশ করার আবেদন করেন। অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রিবর্গ বিশ্বরূপার 'জাগো' নাটক দেখেন।

অভিনেতৃ সঙ্ঘের কর্মকর্তা নির্বাচন

গত ১৪ই মার্চ শ্রীকান্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অভিনেতৃ সঙ্ঘের সাধারণ সভার আগামী বছরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন : সভাপতি—বিকাশ রায়, সহ সভাপতি—উত্তমকুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী। সাধারণ সম্পাদক—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। যুগ্ম সহ-সম্পাদক—তনুপকুমার, সুশীল দে। কোষাধ্যক্ষ—শ্যাম লাহা। কার্য-করী কমিটির সভা—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখার্জী, মৃণাল মুখার্জী, সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য, তরুণ-



উত্তমকুমার প্রযোজিত 'গন্ধাহ' ছবির এক দৃশ্যে সূচিয়া সেন, প্রদীপকুমার ও প্রসাদ মদ্যাজী।

কুমার, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, তৃপ্তি মিত্র।

সুদীপ্ত ও শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা

ইকনমিক প্রোডাকসন্সের 'পারিশোধ'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ অর্ধেন্দ্র সেনের পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। গত মাসে ডি, ভি, সি-তে কয়েকদিন চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। বিভূতি মদ্যোপাধ্যায়



পোকামাকড় মারক
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায়

মারকিট

আরসোলা, ছারপোকা, মশা প্রভৃতির
নির্ধাত প্রাণ-ঘাতক

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

লিখিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মদ্যাজী, তরুণ চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, সুলতা চৌধুরী, জহর রায়, শীতল ব্যানার্জী, সত্য ব্যানার্জী প্রমুখ।

আরোগ্য নিকেতন

ভার্যাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন'-এর চিত্রগ্রহণের কাজে পরিচালক বিজয় বসু সদলে বীরভূম অঞ্চলে বহির্দৃশ্য তুলতে গিয়েছিলেন। এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন—বিকাশ রায়, ছান্না দেবী, শ্রুভেন্দ্র চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, রুমা গৃহঠাকুরতা, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ দাস, বঙ্কিম ঘোষ, কালী সরকার, ছান্না দেবী, সন্ধ্যা রায়।

খেয়া

শ্যামল মিত্র প্রযোজিত 'খেয়া' পরিচালনা করছেন রূপকগোষ্ঠী। জগন্নাথ চ্যাটার্জী এই ছবির পরিচালনার দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন জানা গেল। এই ছবিতে অভিনয় করবেন—মাধবী মদ্যাজী, অনূপ-কুমার, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মদ্যাজী, জ্ঞানেশ

মদ্যাজী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শ্যামল মিত্র। নেপথ্য সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করছেন হেমন্ত মদ্যাজী, নীতা সেন।

লতার স্বপ্ন

কম্পনা প্রোডাকসন্সের 'লতার স্বপ্ন' ছবির কাজ আবার আরম্ভ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কম্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানে সুর দিয়েছেন বিমল ভূষণ। অভিনয়ে আছেন : পাহাড়ী সান্যাল, সন্মিতা সান্যাল, বিকাশ রায়, বিপিন গুপ্ত, ভারতী দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, নির্মলকুমার, অশোক সোম।

সংবাদ বঙ্গ

ভাল্লাদোলিড উৎসবে 'নায়ক'

আর, ডি, বনসাল প্রযোজিত সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'নায়ক' ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যের দ্বাদশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহে প্রদর্শনের জন্য স্পেনের ভাল্লাদোলিড'এ আমন্ত্রিত হয়েছে। ১৬ই থেকে ২৩শে এপ্রিল এই উৎসব হবে।

উদ্বোধন

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

গত ১১ই মার্চ (শনিবার) সন্ধ্যা ৭টায় সুসংহতি ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে নৃত্যবিদ শ্রীনিবাসনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

সঙ্গীত পরিচালনা করেন : শ্রীপ্রণব চৌধুরী। সঙ্গীতাত্মক উমা দাশগুপ্তা, দেবিকা দত্ত, অঞ্জনা লাহিড়ী, সুপ্রিয় ঘোষ, প্রবীর গুপ্ত, দীপান কুন্ডু, তাপসী ঘোষ ও স্বপ্না সেনগুপ্ত।

মন্তসঙ্গীতে শ্রীঅরবিন্দ মিত্র, অনিলা

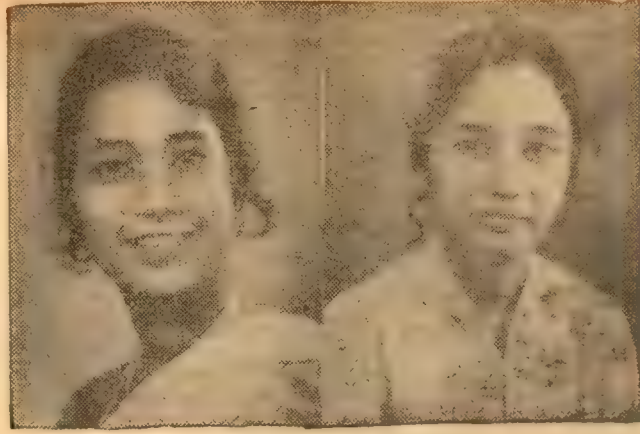
ঘোষ, কালাচাঁদ চ্যাটার্জী, শঙ্কর পাণ্ডিত,
স্বপ্নাপদ সেনগুপ্ত, নন্দদুলাল হানদার,
বিক্রম মিত্র।

সুদক্ষা নৃত্যপরিচালনার শ্রীঅনুপ-
শঙ্কর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্ত।

নৃত্যে—আলো বাগচী, শ্রদ্ধা সেন-
গুপ্তা, পার্ণাডি বোস, সুপ্রিয়া বোস, মানসী
ঘোষ, সূচরিতা ঘোষ, রত্নাবলী ঘোষ,
মলয়া ঘোষ, নন্দিতা চক্রবর্তী, মহদ্রা
ভৌমিক ও নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

কলাভারতীর বার্ষিক সম্মেলন

গত ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার সম্মুখ
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট
হলে উত্তর কলিকাতার কলাভারতী সংগীত
শিক্ষায়তনের উভয় শাখার এক মনোজ্ঞ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে
প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি ও প্রধান
অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে
শ্রীপ্রণব চক্রবর্তী ও শ্রীকর্তিকচন্দ্র পাণ্ডা।
এইদিন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ কর্তৃক
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের “ভাসের দেশ”
গীতিনাট্যটি মঞ্চস্থ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের
শিশু-শিক্ষণগণের নৃত্য, কণ্ঠ, যন্ত্রসংগীত
ও অভিনয়াদি দেখে উপস্থিত দর্শকগণ
আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষ আকর্ষণের
ছিল কথক-নৃত্যশিল্পী কুমারী তপতী
পাল ও দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য শিল্পী
গুরুগোপাল পিল্লাইর নৃত্য।



হিন্দোলী আয়োজিত নৃত্যানুষ্ঠানে বিশ্বভারতী ঘোষাল ও অর্চনা দত্ত সকলের
প্রশংসা অর্জন করেছেন।

মুকুলবীথির বাৎসরিক উৎসব

গত ১২ই মার্চ কাশী বিশ্বনাথ মণ্ডে
মুকুলবীথির বাৎসরিক পারিতোষিক
বিতরণ উৎসব হয়ে গেল।

এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাকন্যা বিদ্যালয়ের
প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী রায়
প্রধান অতিথির ভাষণে মুকুলবীথির
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

প্রথমে মুকুলেরা মুকুলসংগীত ও
সৈনিকের গান পরিবেশন করে। তারপর
সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রীরা ভজন গান করে।

শিশু ছাত্রছাত্রী কর্তৃক প্রভাত

মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প “মাস্টার ব্রহ্মাই”-
এর নাট্যরূপ ও রামায়ণ হতে নৃত্যনাট্য
“জটায়ু বধ” মঞ্চস্থ হয়।

পাঠকের চিঠি

সবিনয় নিবেদন,

সম্প্রতি কয়েকটি চিঠিগেছে দিলীপ
নাগ পরিচালিত “বধুবরণ” প্রদর্শিত হচ্ছে।
কিন্তু অতীব বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে এই
ছবির কেন্দ্রবিন্দু এবং বক্তব্যের সঙ্গে,
বেশ কিছুদিন আগে “বসুধারার” প্রকাশিত
মানবেন্দ্র পালের “তৃতীয় পুরুষ” নামক
একটি বড় গল্পের আশ্চর্য রকমের মিল
থেকে গেছে। ছবিটি দেখতে দেখতে
কেবলই মনে হচ্ছিল এ গল্প আমি কোথায়
যেন পড়েছি। অথচ কাহিনীকার হিসাবে
শ্যামল গুপ্তের নাম ছবির শুরুরভেই
জানানো হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল
এ গল্পের লেখক মিত্রীর একজন।
বাড়ি ফিরে পুরনো পত্রিকার বাঁধল
ঘেঁটে সে গল্পটি খুঁজে বার করলাম।
দেখলাম লেখকের নাম মানবেন্দ্র পাল।

আরো একটি জিনিস বুঝে নিতে
অসুবিধা হ'ল না যে, গল্পে, উপন্যাসে,
যেটাকে “এপি সেন্টার” বলে ধরা হয়,
তার ওপরে রঙচঙে বতাই পদ্ম-
পল্লবের বিপরীত সমাবেশ হোক না
কেন, ভূকম্পনের কেন্দ্রটি হচ্ছে আদি
এবং অকৃত্রিম।

বিনীত—

দুর্গাদাস ভট্ট,

৪৮/১, সারপেনটাইন লেন,

কলিকাতা—১৪।



কলাভারতীর অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে কথক নৃত্যে কুমারী তপতী পাল



ভ্যানিয়াস কে এবং জোরা ফেলী লড়াইয়ের জন্য চুক্তিগত স্বাক্ষর করেছেন

পরিবর্তন প্রয়োজন

রঞ্জী ট্রফির সেমি-ফাইনালে বাংলা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল রাজস্থানের কাছে। অনেকেই হয়ত বলতে পারেন যে, ১৫৪ রানের পরাজয় কি শোচনীয় হতে পারে! কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের একশো রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসের চতুর্দশো রান কি খুব একটা উজ্জ্বল চিত্র? ফকরবাজারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বেশ বোকা বাবে যে, বাংলার স্বীকৃত ব্যাটসম্যানেরা কি শোচনীয় ব্যর্থতা প্রদর্শন করেছেন।

বহুবার বলেছি এবং এখনও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বাংলার ক্রিকেট নির্বাচক-মণ্ডলীর পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষত একজন সদস্যের। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে, এই ভদ্রলোক দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচকমণ্ডলীতে আসন আঁকড়ে আছেন। অতীতের ছাঁড়ে বল-করা এই ভদ্রলোক যদি সত্যিকারের ক্রিকেটার হতেন তবে নিশ্চয় তিনি নোংরামি পছন্দ করতেন না, কিন্তু দলাদলি এবং নোংরামি সৃষ্টির মূল নায়ক হলেন এই ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোকের এত দাপট, কারণ তিনি খেলার জগতের একজন তথাকথিত ক্রীড়া রাজনীতিবিদ কর্মকর্তার লাউভূপীকার। এত সঞ্চর পারা যায়, এই ভদ্রলোককে নির্বাচকমণ্ডলীর আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। পূর্বে অবশ্য এই বিষয়ে সাহসী হয়ে কোন কিছু করার মত সদস্য সি, এ, বি-তে ছিলেন না, কিন্তু এখন

আর ভয়ের তেমন কিছু নেই। হাওয়া বদলেছে, এই সুবোধে সি, এ, বি-র সাহসী এবং আদর্শবাদী সদস্যরা এগিয়ে আসুন বাংলার ক্রিকেটের মঙ্গলের জন্য, অবিলম্বে 'হাওয়া' ক্রিকেটকে পাপমুক্ত করুন।

রাজস্থানের বিপক্ষে বাংলা দলে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে। রবীন মুখার্জীকে এই খেলায় খেলতে দেখা যায় নি; কারণ ভারতীয় রেলদলের বিপক্ষে খেলায় তিনি হাতে আঘাত পান। কিন্তু

শ্রীঅনিভাভ

তরুণ খেলোয়াড় দেব মুখার্জী এবং তপনজ্যোতি বানার্জীকে দল থেকে বাদ দেওয়া খুবই দৃষ্টিকটু লেগেছে। দেব মুখার্জীর পরিবর্তে নিমাই রায়কে দলভুক্ত করে নির্বাচকমণ্ডলী কি খুব বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে করেন! দেব মুখার্জীর পরিবর্তে নিমাই রায়কে খেলানোর পেছনে একটি অদৃশ্য হাতের বিরাট কারসাজী আছে তা আমাদের জানতে বাকি নেই।

মনে হচ্ছে প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় এবং বাংলা দলের অধিনায়ক পঙ্কজ রায়ের একছরই শেষ খেলা। বাংলার ক্রিকেটে পঙ্কজ রায়ের বিরাট অবদান দীর্ঘদিনের। তবে মনে হয় এবার তাঁর কোন যোগ্য খেলোয়াড়ের হাতে অধিনায়কত্বের ভার অর্পণ করা হবে আসা উচিত। অবশ্য

একথা ঠিক যে, বাংলার ক্রিকেট পার-চালকেরা পঙ্কজ রায়ের মত যোগ্য এবং অভিজ্ঞ অধিনায়ককে অবসর গ্রহণ করতে দিচ্ছেন না। কিন্তু একজন খেলোয়াড় আর কতদিন একটি দলকে সাহায্য করতে পারেন? পলি উল্লিগড়ের মত খেলোয়াড় বেশ ভাড়াভাড়িই অবসর গ্রহণ করলেন; এখনও তিনি ব্যাট হাতে মাঠে নামলে রঞ্জী ট্রফি বা দলীপ ট্রফির আসরে নয়, টেস্টেও উত্তরে যেতে পারেন। তাই মনে হয় বাংলার গৌরব পঙ্কজ রায়কে আর অন্যায়ভাবে চাপ দিয়ে আটকে রাখা বাংলার ক্রিকেট পরিচালকদের উচিত হবে না।

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত সেমি-ফাইনালের এই খেলায় প্রথম ব্যাট করতে মাঠে নামে রাজস্থান দল। রাজস্থান-বাংলা দলের চারদিনের খেলার প্রথম দিনের বেশ কিছু সময় নষ্ট করেছে অকালবর্ষণ। প্রথম দিন রাজস্থান চার উইকেটে সংগ্রহ করে মাত্র ৮৬ রান। দ্বিতীয় দিন রাজস্থানের ইনিংস শেষ হয় ২০৪ রানে। হনুমন্ত সিং সংগ্রহ করেন ৫১ রান। বাংলা দলের নবাগত বোলার এস নাথ ৪৪ রানে সংগ্রহ করেন ৪টি উইকেট।

বাংলা দল প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে মাত্র একশত রান। রথী-মহারথী ব্যাটসম্যানেরা ধরাশায়ী, একমাত্র ৩৭ রান সংগ্রহ করেন শ্যামসুন্দর মিত্র। রাজস্থানের পক্ষে যোশী সংগ্রহ করেন পাঁচটি উইকেট এবং সেলিম দুরানী তিনটি উইকেট।

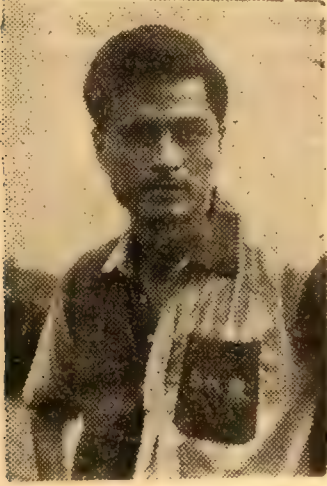
রাজস্থান দল দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ করে মাত্র ২০০ রানে। হনুমন্ত সিং সংগ্রহ করেন ৪১ রান। দীপঙ্কর সরকার সংগ্রহ করেন পাঁচটি উইকেট এবং গুহ ও নাথ যথাক্রমে ২টি করে উইকেট। বাংলা দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫০ রান সংগ্রহ করে ১৫৪ রানে পরাজিত হয়। অম্বর রায়ের ৪৮ রান এবং চুনি গোস্বামীর ৩১ রান হল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত অবদান।

রাজস্থান দলের দুই ইনিংসের দলীয় রানসংখ্যা দেখে একথাই প্রমাণিত হয় যে বাংলার বোলাররা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন, কিন্তু বাংলার ব্যাটসম্যানেরা ব্যাট হাতে কিশোর উইকেটে অবস্থান করতে পারলে রাজস্থানের প্রাক্ক ফাইনালে উন্নীত হওয়া খুব সহজসাধ্য হত না।

ইন্ডোনেসিয়ার পরাজয়

কলকাতা ময়দানের ক্রীড়ামোদীর বকন আই, এফ, এ, অফিসের সম্মুখে দলবল্লের পাল্লায় মশগল, ঠিক তখনই বোম্বাইয়ের মাঠে লীগ-শীতল বিজয়ী ইন্ডোনেসিয়া ক্লাবের পরাজয় ঘটেছে। কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানের অন্যতম মোহনবাগান ক্লাব কিন্তু সেমি-ফাইনালে

জিত হয়েছিল। সর্বভারতীয় খ্যাতি-সম্পন্ন শক্তিশালী ইন্স্টেবল ক্লাবের তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় বিদায় গ্রহণ প্রতিটি বিস্ময়ের সঞ্চার করে। বাংলা



রাজেশমোহন

ফুটবলের মান-সম্মান অনেকাংশে নির্ভর করে ময়দানের দুই প্রধান মোহনবাগান এবং ইন্স্টেবলের ওপর।

দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় ইন্স্টেবল ক্লাব বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান নেশনাল দলকে



হনুমন্ত সিং

২-১ গোলে পরাজিত করে। খেলা সূর্য হবার তিন মিনিটের মধ্যেই অসীম মৌলিক দলকে অগ্রগামী করেন। কিন্তু প্রথমার্ধের ৩২ মিনিটে স্বামী গোলটি

পরিশোধ করেন। খেলা শেষ হবার মাত্র চার মিনিট পূর্বে পেনাল্টি থেকে পরিমল দে বিজয়সূচক গোলটি করেন। পরিমল দে'র একটি নিশ্চিত গোল উচল হাত দিয়ে প্রতিহত করলে রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দেন। ইন্স্টেবল ক্লাব তৃতীয় রাউন্ডে ব্যাংগালোরের ৫১৫ আর্মি বেস ওয়ার্কশপের সঙ্গে প্রথম দিন খেলা ১-১ গোলে অসীমবাংসিতভাবে শেষ করে। আর্মি দলের সাদাতুল্লা প্রথম গোল দিয়ে দলকে অগ্রগামী করেন। অসীম মৌলিক দর্শনীয় হেডের সাহায্যে গোলটি পরিশোধ করেন। ফিরতি খেলায় ১-০ গোলে আর্মি দল ইন্স্টেবলকে পরাজিত করে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। ইন্স্টেবল দল খেলার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেও জয়ী হতে পারে নি এবং পরিশোধমূলক গোল করতে ব্যর্থ হয়। প্রথমার্ধের তেরো মিনিটের সময় সাদাতুল্লা বিজয়সূচক গোলটি করেন।

ব্যাংগালোরের আর একটি খ্যাতনামা দল ই, এম, ই, সেন্টারকে ২-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। মোহনবাগান এবং ই, এম, ই, সেন্টারের প্রথম দিনের খেলা ১-১ গোলে অসীমবাংসিতভাবে শেষ হয়। ই, এম, ই, সেন্টারের শ্রীনিবাস প্রথমার্ধে একটি বিভ্রমূলক গোলে দলকে অগ্রগামী করে এবং অশোক চ্যাটার্জী মোহনবাগানের পক্ষে গোলটি পরিশোধ করেন। দ্বিতীয় দিনে অন্যায়সে মোহনবাগান ২-০ গোলে জয়ী হয়। মোহনবাগানের পক্ষে বিজয়সূচক গোল দুটি করেন সুকুমার সমাজপতি এবং অশোক চ্যাটার্জী। পরবর্তী খেলায় মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে খেলবে জলম্বরের লীডার্স ক্লাবের সঙ্গে।

হকির সমাচার

কলকাতা ময়দান হকি লীগে প্রধান দলগুলি বর্তমানে বিশ্রাম গ্রহণ করছে; কারণ এই দলগুলির নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়েরা বাংলা দলের পক্ষে মাদুরাইয়ে জাতীয় হকিতে অংশগ্রহণে ব্যস্ত। এই সপ্তাহের লীগে দুটি হ্যাট্রিক সম্পাদিত হয়েছে। রিভারসাইডারের বিপক্ষে এণ্টালী দলের তরুণ খেলোয়াড় জয়ন্ত নন্দী লীগের ষষ্ঠ হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। এণ্টালী রিভারসাইডারকে পরাজিত করে ৫-০ গোলে। লীগের সপ্তম হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব লাভ করেন মহাশেখানের টমসন বো, এ সি'র বিপক্ষে। এ ছাড়া লীগ হকিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল বা ঘটনা নেই। মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় হকির

খেলায় ১-০ গোলে দিল্লীকে পরাজিত করে বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। বাংলা নূনতম গোলে জয়ী হলেও যোগ্য দল হিসাবেই তারা জয়ী



বি দেবনাথ

হয়, কারণ দিল্লী অপেক্ষা বাংলার খেলোয়াড়েরা অপেক্ষাকৃত উন্নত বীজাধারা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ার্ধের পনেরো মিনিটের সময় প্রধানের একটি তৈরি করা নিশ্চিত গোলের সুযোগ থেকে



আর না

পিরয়ার সিং একমাত্র বিজয়সূচক গোল করেন। এর পর প্রধান বাংলার পক্ষে আর একটি গোল করলে, স্ট্রিকের অঙ্ক হাতে গোলটি নাকচ হয়।

জাতীয় হকির দ্বন্দ্ব বিজয়ী বেশ

দলের সঙ্গে বাংলা দল কোয়ার্টার
ফাইনালের খেলা অসমীয়াসিতভাবে শেষ
করে। বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় সমন্বিত
ব্রেলওয়ে দলের বিপক্ষে বাংলা দলই প্রথম
গোল করে অগ্রগামী হয়। বাংলা এবং
ব্রেল দলের খেলাটি তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার
মধ্যে শেষ হয়। প্রথমার্ধের কুড়ি মিনিটের
সময় পেনাল্টি কর্নার থেকে বল পেয়ে
আর শা গোল করে বাংলা দলকে অগ্রগামী
করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ছয় মিনিটের সময়
পেনাল্টি কর্নারের একটি স্ট গোলের
সম্মুখে পা দিয়ে কৃষ্ণকুমার প্রতিহত
করলে রেকার্ড পেনাল্টি স্ট্রোকের নির্দেশ
দেন। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে রাজস্কার
সিং গোলটি পরিশোধ করেন।

ময়দানের দল ববলের পালা সঙ্গ হয়

দল ববলের পালার শেষ অঙ্কে দু'টি
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। ইস্ট-
বেঙ্গল দলের নির্ভরযোগ্য ব্রক্ষণভাগের
খেলোয়াড় বিক্রমজিৎ দেবনাথ মোহন-
বাগানের পক্ষে ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেছেন।
বি. এন. রেলের রাজেন্দ্রমোহন আগামী
মরশুমে খেলবেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে।
এ ছাড়া মোহনবাগানের রাইট আউট যিনি
বোম্বাইয়ের রোভার্স ক্যাপের খেলার
অংশগ্রহণ করছিলেন, তিনি হঠাৎ
কলকাতায় চলে আসেন এবং ইস্টবেঙ্গল
ক্লাবে যোগদানের জন্য ছাড়পত্রে স্বাক্ষর
করেন। রাজস্বস্থানের প্রবীণ খেলোয়াড়
শ্রীকান্ত ব্যানার্জী এ বছর মোহনবাগানে
খেলবেন। রাজস্বস্থানের অপর একজন
খেলোয়াড় প্রশান্ত সরখেল স্পোর্টিং
ইউনিয়ন ক্লাবে যোগদান করেছেন।
মহামেডান স্পোর্টিং দলের খ্যাতনামা
খেলোয়াড় সালাউদ্দিন বার্নপুর্ন খেলার
জন্য ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেন।

এ ছাড়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দল
পরিবর্তনের সংবাদ দেওয়া হল। প্রণব
সরকার (এরিয়ান্স) ইস্টবেঙ্গলে; সুকুমার
সেন (এরিয়ান্স) মহামেডান স্পোর্টিংয়ে;
সন্তোষ চ্যাটার্জী (এরিয়ান্স) ইস্ট-
বেঙ্গলে; আলেক্সা ঘোষাল (খিদিরপুর)
বাটায়; শ্যামল বসু (রাজস্বস্থান) বাটায়
খেলার জন্য ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেন।
এবছর রেকর্ড সংখ্যক খেলোয়াড়
ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেছেন; মোট ৬৯০
জন খেলোয়াড় ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেছেন।

এখনও আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে স্বাক্ষরের
পালা সুরু হয় নি। বাংলার বাইরের
কয়েকজন সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন
খেলোয়াড়ের কলকাতার মাঠের কয়েকটি
খ্যাতনামা দলে খেলার সম্বন্ধে জল্পনা-
কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এক্ষণে ঠিক
যে ময়দানের দুই প্রধানের শক্তি বৃদ্ধি
করার জন্য বাংলার বাইরের কয়েকজন
খ্যাত খেলোয়াড় আসছেন।

বিশ্ব হেভী ওয়েট খেতাব অক্ষর
রাখার জন্য মহম্মদ আলি ক্রে নিউ ইয়র্কে
২২শে মার্চ রিং-রে অবতীর্ণ হচ্ছেন
জোরা ফেলীর বিপক্ষে। চৌত্রিশ বৎসর
বয়স্ক মন্টিমোম্বা জোরা ফেলী মন্টি-
মোম্বা হিসাবে উপেক্ষার পাত্র নন।
১৯৬০ সালে আর্নি টেরেলের কাছে
পয়েন্টে পরাজিত হবার পর জোরা
ফেলী আর পরাজিত হন নি। ১৯৬৪
সালে জোরা ফেলী জার্মানীর শ্রেষ্ঠ মন্টি-
মোম্বা মিডেলবার্জারের বিপক্ষে একটি



শ্যামসুন্দর মিত্র

লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন, লড়াইয়ের ফলা-
ফল হয় ড্র।

জোরা ফেলী সম্পর্কে কিন্তু মহম্মদ
আলি ক্রে বেশ উচ্চ ধারণা গোষণ করেন।
১৯৬৪ সালে সোনি লিস্টনকে পরাজিত
করে বিশ্ব খেতাব লাভের পর ক্রে তাঁর
নবম লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবেন; যদিও
পেশাদার হিসাবে এ পর্যন্ত তিনি
আটটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্যার ফ্র্যাংক ম্যাগলিন ওরেলের
মৃত্যুতে বিশ্ব ক্রিকেটের এক অপূরণীয়
ক্ষতি হয়েছে। বিশ্ব ক্রিকেটের খ্যাতনামা
খেলোয়াড়রা এবং রাস্ট্রনায়কেরা ওরেল-
পত্নী শ্রীমতী হেলেন ওরেলের কাছে
সমবেদনা বার্তা প্রেরণ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিচি
বেনো বলেছেন—“পৃথিবীতে অনেক ভাল
মানুষ আছেন, আমি তাঁদের কয়েকজনকে
জানি; আর মহান চরিত্র কয়েকটিই আছেন
এবং ওরেল ছিলেন তাঁদের অন্যতম।”

তিনি ডবলিউয়ের অন্যতম ক্লাইড
ওয়ালকট বলেছেন—“ক্রিকেট হারাল একটি
ছন্দ চরিত্রকে, ওরেল ছাড়া ওয়েস্ট
ইন্ডিজ ক্রিকেটে এত বিরাট অবদান অন্য
কোনও আছে বলে আমি জানি না।”

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন টেস্ট অধি-
ক এবং বর্তমানে ইংল্যান্ডে ত্রিনিদাদ
বা টোবাগোর রাষ্ট্রদূত স্যার লিয়ারী
লেন্ডানটাইন বলেছেন, “বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন
ওরেলের নয়র একজন মহান খেলোয়াড়
এবং সম্ভ্রান্ত চরিত্রের মহাপ্রয়োগে
শোভিত।”

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক গোলাম
আমেদ বলেছেন, “স্যার ফ্র্যাংক ওরেলের
মৃত্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট হারাল একজন
সত্যকারের সুহৃদ এবং শ্রদ্ধাকাল্পীকে।”

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিবি সিম্পসন
বলেছেন, “স্যার ফ্র্যাংকের মৃত্যুতে বিরাট-
ভাবে কতিপ্লত হল বিশ্ব ক্রিকেট এবং
বিশ্ববত ওয়েস্ট ইন্ডিজ।”

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক
আয়ান জনসন বলেছেন, “নিঃসন্দেহে
স্যার ফ্র্যাংক ছিলেন আধুনিক ক্রিকেটের
শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক।”

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের
সম্পাদক এ্যালান বার্লস বলেন—“ওরেল
আমাদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছেন।”

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা
প্রীমতী ওরেলকে সমবেদনা জানিয়ে একটি
বার্তা প্রেরণ করেন। এ ছাড়া স্যার
ফ্র্যাংকের ব্যক্তিগত, সুমধুর ব্যবহার এবং
মহানুভবতার কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধার্জলি
জানান টেড ডেক্সটার, কলিন কাউড্রে,
ব্রায়ান ক্রোজ, ফ্রেড ট্রুম্যান, প্যারী
গোমেজ, বিলি গ্রীফিথ এবং আরও
অনেকে।

ক্রিকেটের অমর চরিত্র ফ্র্যাঙ্কা

এই নিম্নম সত্যকে বিশ্বাস করতে পারি নি; পারে নি সারা বিশ্ব! স্যার ফ্র্যাঙ্ক ম্যাগলিন ওরেল আর নেই; ১০ই মার্চের এক অশুভ ক্ষণে নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সর্বজনপ্রিয় ফ্র্যাঙ্ককে অকালে পৃথিবীর বুক থেকে।

ওরেল বিপ্লবী, ওরেল বীর মুক্তি-সৈনিক, ওরেল দার্শনিক ক্রিকেটার। ওরেল বিপ্লব এনেছেন ক্রিকেটের অঙ্গনে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মাথা উঁচু করে লড়েছেন কালোদের নতুন পথের আলো দেখাবার জন্য। ক্রিকেটের অঙ্গে নতুন শোণিতের ধারা প্রবাহিত করেছেন ফ্র্যাঙ্কা। ওরেল ক্রিকেটকে গ্রহণ করে-ছিলেন খেলার জন্য নয়, অন্তর দিয়ে ক্রিকেটকে ভালবেসেছিলেন ওরেল।

দীর্ঘ ষোল বছর টেস্ট ক্রিকেটের আসরে ওরেল তাঁর জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করেছেন, বিভিন্ন সময়ে ওরেলকে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন রূপে। আসল মানুষ ওরেলকে, ফ্র্যাঙ্কার অন্তরের মানবটিকে সারা বিশ্ব জানতে পেরেছে অনেক পরে, ওরেলের খেলোয়াড়ী জীবনের প্রান্তসীমায়।

বিশ্ববিখ্যাত তিন ডবলিউয়ের অন্যতম, ক্রিকেটের মাঠে অনেক ইতিহাস রচনা করেছেন। ওরেল - উইকস - ওয়ালকট ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ফ্র্যাঙ্ক ম্যাগলিন ওরেলের জন্ম বার্বাডোজের রিজটাউনে ১৯২৪ সালের ১লা আগস্ট। ওরেলের পিতা ছিলেন রয়্যাল মেল লাইনের চীফ স্ট্রাকার। ওরেলের বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর, তাঁর পিতামাতা বার্বাডোজ পরিত্যাগ করে আমেরিকা যাত্রা করেন নতুন জীবিকার সন্ধানে। ওরেল বার্বাডোজে তাঁর দীর্ঘদিনের কাছে প্রতিপালিত হতে থাকেন। ফ্র্যাঙ্কার স্কুলজীবন কাটে বার্বাডোজের কান্সারমোরার স্কুলে।

ওরেল যখন আঠারো-উনিশ বছরের যুবক, আমেরিকা থেকে পিতামাতা তাঁকে তাঁদের কাছে চলে আসার জন্য বলেন। কিন্তু ওরেল তখন ক্রিকেটকে ভালবেসে ফেলেছেন আর ভালবেসেছেন মাঝুভূমি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। তাই তাঁর আর আমেরিকা যাওয়া হল না। ওরেল এর-পর চললেন ইংলন্ডে; ম্যাগেস্তার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে দেশে ফিরলেন।

এরপর কিন্তু নানা কারণে ওরেলকে বার্বাডোজের পরিবেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল জ্যামাইকার। ওরেলকে তখন অনেকেই ভুল বুঝেছিলেন; কারণ ওরেল চিন্তা করতে ভালবাসতেন, তাঁর চিন্তার

মাঝে প্রতিফলিত হত নানান সমস্যা। ক্রিকেটার ওরেল, আর চিন্তাশীল দার্শনিক ওরেলকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ বিরাট ভুল করে বসত।

ওরেল মাত্র আঠার বছর বয়সে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন বার্বাডোজের পক্ষে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ওরেল আত্মপ্রকাশ করেছেন ৫১টি টেস্ট খেলায়। ওরেলের বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি ব্যাট করতেন ডান হাতে আর মিডিয়াম পেস বল করতেন বাঁ হাতে। বয়স যখন ওরেলের ছত্রিশ তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় ওরেলের ওপর।

অধিনায়ক ওরেলের চিন্তাধারা, অধিনায়কত্ব এবং কলাকৌশল বিপ্লব আনে, ইতিহাস সৃষ্টি করে ক্রিকেটের অঙ্গনে। অধিনায়ক ওরেল যে কতবড় উঁচুদের খেলোয়াড় ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলন্ডের মাঠে তাঁর নেতৃত্ব থেকে।

পূর্বে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ওপর অনেক বাধানিষেধ ছিল, স্মৃতিতে হোটেলের বাইরে বাতায়নের ওপর ছিল নিষেধাজ্ঞা। ওরেল এসেই এইসব বাধানিষেধ ভুলে দিলেন, কিন্তু তাস খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। তাস খেলার ওপর ওরেলের অনেক দিনের বিতৃষ্ণা। তাঁর মতে ঘরের মধ্যে মশলালোকে ঘটার পর ঘন্টা তাস খেললে ক্রিকেটারদের দৃষ্টিশক্তি কতি হয়; শারীরিক পরি-শ্রমও কম হয় না! ওরেল অবসর সময়ে বাড়িতে বসে বিভিন্ন সফরে বিভিন্ন খেলার সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের বাছাই করার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি এই তথ্য আবিষ্কার করেন; ওরেল একসময় দৃষ্টি-বিজ্ঞানে কিছ্র পড়াশোনা করেছিলেন। ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে ওরেল অনেক বাধানিষেধ শিখিল করেছিলেন।

মাঝামাঝি আমলের বন্ধমূল ধারণা আর পুরাতন একঘেয়ে বাধ্যধারা রীতি-নীতিকে অবহেলাভরে ঠেলে কেলে দিয়ে ওরেল তাঁর দল নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন বিপ্লবের পথে। এই প্রসঙ্গে ওরেলের অধিনায়কত্বের চিন্তাশীল এবং বুদ্ধি-দীপ্ত কৌশলের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ ভুলে ধরাছ। ইংলন্ডের একটি টেস্টে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ইংলন্ড পাঠিয়েছে তাদের ওপনিং ব্যাটসম্যান। এঁরা ইনিংসের শুরুর দিকে ফাস্ট বোলিংয়েই খেলতে শিখেছেন; হল আর গ্রাফিথের

দ্রুত বল প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। হঠাৎ দেখা গেল ওরেল বল ভুলে দিয়েছেন গ্যারী সোবার্ণের হাতে। ন্যাটো বোলার সোবার্ণের ছোবলমারা প্রায় ফাস্ট বোলিংয়ের মধ্যে সংকটে পড়লেন তাঁরা। স্ট্রাকার সোবার্ণের প্রথম ওভারের শেষ বলে আউট হলেন।

অসাধারণ ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের অনন্য-সাধারণ মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনের শেষ টেস্টের কয়েক মহুতের মধ্যে। ১৯৬৩ সালে ইংলন্ড সফরে ওভালের পঞ্চম ও শেষ টেস্টের শেষ দিন, দীর্ঘ প্রায় ষোল বছর টেস্ট জীবনের শেষ কয় মহুত। শেষদিন কানহাই আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিশ্চিত জয়ের পক্ষে। এখন সকলেই চাইছে সাত নম্বর ব্যাটস-ম্যান ওরেলকে মাঠে শেষ দশকের জন্য। উত্তর দলের খেলোয়াড়েরা এবং ওভালের কয়েক সহস্র দর্শক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ক্রিকেটের এই অমর চরিত্রকে বিদায় অভিনন্দন জানানোর জন্যে। নির্বিকার নিশ্চিত ওরেল তখন ট্রেসিংবুমের এক-কোণে আপন চিন্তার মগ্ন। কানহাই এলেন, ওরেলের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসলেন তাঁকে প্যাড পরিবর্তনের জন্য, অন্যায় খেলোয়াড়েরাও করলেন অনেক অনুরোধ, কিন্তু ওরেল বললেন সাত নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রয়োজন হলোই তিনি মাঠে নামকেন। পরে অর্ধেক ওরেল বলেন যে, বিদায়ের লগুন চোখ জল, গলার বাষ্প আর আবেগের জন্য মাঠে নামা অস্বাভাবিক মনে হয় তাঁর কাছে।

টেস্ট খেলার ওরেল সংগ্রহ করেছেন ৩৮৬০ রান আর ৬৯ উইকেট; প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আছে তাঁর ঐতিহাসিক টাই সেক্চুরী। রিসবেলের ঐতিহাসিক টাই টেস্টের অধিনায়ক ছিলেন ওরেল। একান্তে ওরেল এসেছেন তিনবার ১৯৫৯ সালে কমনওয়েলথের সঙ্গে প্রথম, ১৯৬০ সালে আবার কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে, আর এই বছরের প্রথমদিকে ভারতীয় বিপক্ষে বিদ্যালয়ের মজুরী কমিশনের আমন্ত্রণে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে।

ইংলন্ডের রাণী নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন ওরেলকে। অস্ট্রেলিয়া তাদের দেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে টেস্ট মাঠে বিজয়ী দলকে প্রদত্ত রত্ন গ্রন্থ ওরেল ট্রফি দান করেছেন।

মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে ওরেলের জীবনের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। আমরা ওরেলের স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করছি। ক্রিকেট কোর্দানই ভুলবে না অমর চরিত্র স্যার ফ্র্যাঙ্ক ম্যাগলিন ওরেলকে।

—কাজলকৃষ্ণ

রাজপুত্র হারা রাজ্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ মন আমার ভেসে যেতে চায় নারকেল গাছে ভরা ছোট একটি ন্বীপে। সমুদ্রের জল দিন-রাত সেখানে অবিরাম-ভাবে উঁচু হয়ে ছুটে গিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয় বালুকাবেলায়। সেখানে বাদামী পাতার ভিড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কৃষ্ণকায় লোকগুলো উচ্ছল জীবনের মাদকতায় গলা ছেড়ে হেসে ওঠে হাঃ হাঃ করে। নাচে, গান গায়—জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তারা সুদে-আসলে উজাড় করে দেয় সময়ের পায়। বোতল ভরা আঙুর রসে তারা মেটায় তৃষ্ণা। কিন্তু পদচোখে অনাবিল স্বপ্ন নিয়ে তারা ছুটে বেড়ায় নিজেকে নতুন করে চেনার নেশায়।

সে নেশায় মশগুল হয়ে কেউ নিজের হাতে খোঁড়ে নিজের কবর, আবার কেউ অস্মানবদনে নিজেকে বিলিয়ে দেয় সার্বজনীন প্রয়োজনের খাতিরে। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি উদাসীন। এতটুকুও ঐশ্বর্য নেই, নেই আগ্রহের সিকি ফোটাও। শুধু আছে নিঃস্বার্থ সেবার প্রতীক। কাজের প্রতি গভীর অনুরাগ।

আর সেই অনুরাগরঞ্জিত দেহ নিয়ে স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল সবার অলঙ্ক্যে অপ্রত্যাশিতভাবে সরে গেলেন এ বিশ্ব থেকে। গত ১৩ই মার্চের বিষয় সম্মুখ ক্রিকেটের বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে শেষনিবাস ত্যাগ করেছেন ক্রিকেটের রাজপুত্র স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল।

কি বা হয়েছিলো তাঁর বয়সে। চঞ্জিশের কোটার দু'টি বছরও তো পার হলো না। পার হলো না খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনটি বছর! কে জানতো যে ঐ দুরারোগ্য রোগ অমন নধরকান্তি শরীরে বাসা বাঁধার তালে আছে। কে জানতো যে ঐ রোগের প্রকোপে মানুষের জীবনীশক্তি রক্তকণিকাগুলো সংগ্রামে প্রতী হয়ে মানুষটাকে তেলে দেবে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে!

তাই মন চায় নি খবরটাকে প্রথমে বিশ্বাস করতে। মন-প্রাণ একসঙ্গে হাহাকার করে উঠেছিল—না, না এ সংবাদ মিথ্যে হোক! কি করে সম্ভব! এই তো কিছুদিন আগে তাঁকে দেখেছিলাম কলকাতা শহরেই। দেখেছিলাম খুব কাছ থেকে।

দেখেছিলাম গল্প-কথার নায়ক কালো পাথরে কঁদা নিখুঁত এক পুরুষকে। কালো রূপে মন ভোলান চেহারা! মনে হয়েছিলো বুঝি কোন শিল্পী কালো পাথর কঁদে সৃষ্টি করেছেন এই অপূর্ণ মূর্তি। গোড়া মোটা ছোট ছোট কোঁক-

ড়ানো চুল, ভরাট মুখ, টানা টানা চোখ, নিটোল শরীর। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয় না! বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো হাসি চমক লাগায় মনে। অমৃত একটা ভালো-লাগা ভাবের আনন্দে নেচে ওঠে হৃদয়। ইচ্ছে করে ঐ মুহূর্তটাকে চিরকাল ধরে রাখতে।

কিন্তু ধরে রাখা হবে কাকে! নিজের সম্বন্ধে বড় বেশি উদাসীন তিনি, বড় বেশি নিরাসক্ত। তাই গোরবের শিখরে যখন উঠেছেন ওরেল, খবরের কাগজে দিনের পর দিন যখন পাচ্ছেন হেড লাইন তখনও উন্মত্ত দেখতেন না কাগজ! কেউ এনে দিলে অবহেলা ভরে তেলে দিতেন!

আর খেলার মাঠে ব্যাটিং করতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ঘুমোতেন বসে বসে। ছোটবেলা থেকেই এই ঘুমোন স্বভাবটা বড় বেশি রপ্ত করেছিলেন ওরেল! কিন্তু তাই বলে ব্যাটিং করতে



স্যার ফ্রাঙ্ক ম্যুগার্লিন ওরেল

নামার আগে পর্যন্ত ঘুমোন...! এমন কথা তো কেউ কোনদিন শোনে নি! কেউ কোনদিন শোনে নি যে ব্যাটসম্যান প্যাড পরে এককোণে বসে বসে ঘুমোছে। খেলার মাঠে তখন কি হচ্ছে কিম্বা বোলাররা কেমন বোলিং করছেন অথবা পিচের অবস্থা.....না কোন বিষয়ে এতটুকুও কৌতূহল নেই তাঁর। তিনি তখন ঘুমোতে বাসত! সময় এলে তাঁকে ঘুম থেকে তুলে পাঠাতে হবে মাঠে। শ্লাভস পরা হাতে চোখ মুছতে মুছতে তিনি নামবেন ব্যাটিং করতে। তাকাবেন না কোন দিকে। সোজা গিয়ে দাঁড়বেন উইকেটের সামনে! তারপর.....! তারপর তাঁর ছন্দায়িত ব্যাটিং-এর ছন্দে ছন্দিত হবে ক্রীড়াঙ্গন। দর্শকদের মনে লাগবে আনন্দের হিল্লোল! অবাধ-বিস্ময়ে সকলে

দেখবেন এক প্রতিভাবানের প্রতিভার স্বাক্ষর! খুশিমতো খেলবেন তিনি! তারপর যে মুহূর্তে ইচ্ছে হবে উইকেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গট গট করে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসবেন ওরেল! হয়তো আরো অনেক রান তিনি করতে পারতেন, হয়তো দলের স্বার্থে প্রয়োজন ছিলো আরো কিছু রানের। কিন্তু সে সব দিকে নজর দেবার মতো অবসর তাঁর কোথায়! ঐ সময়টা ঘুমোলে কাজ দেবে।

কিন্তু ওরেলের হাসি, ওরেলের ঐ স্বভাবসুলভ স্বাভাব্যবোধ—সব কিছুই লুকিয়ে আছে অপারিসীম আনন্দের খোরাক। ওরেল হাসছেন, যেন শুধু হাসতেই জানেন! আর এই হাসিই বোম্বই তাঁকে জুগিয়েছিলো সবকিছু সহজভাবে নেবার শক্তি!

ডব্লিউ, জি, গ্রেস যদি ক্রিকেট খেলার জনক হন, তা'হলে ওরেল হবেন রাজপুত্র। আর তাঁর দুই সঙ্গী উইকস-ওয়ালকট—তাদের বলতে হবে মন্ত্রীপুত্র আর কোটালপুত্র! তিনজনে মিলে বেরিয়েছিলেন বিশ্ব বিজয়ে! কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! মনের ইচ্ছা কার্বে পরিণত করার আগেই দেখা গেলো সমস্ত ক্রিকেট জগৎ এসে গেছে তাঁদের হাতের মুঠোয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সংগে ওরেল-উইকস আর ওয়ালকট সেবার গেছেন ইংলন্ডে। টেস্ট খেলা নাট্যহামশালায়। ব্যাট করতে নামলেন তরুণ ব্যাটসম্যান ফ্রাঙ্ক ওরেল। এরিক হোলিজ তখন নামকরা বোলার। বোলিং করার ভার তখন তাঁর ওপর।

এরিক বল করলেন, অবহেলাভরে পিচ্ছিয়ে গিয়ে ওরেল বলটা মারলেন উঁচু করে। স্ট্রোক বোর্ডের ওপর দিয়ে চলে গেলো বলটা। বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় করে আম্পায়ারের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের মনে এরিক বলে, “আই ভোস্ট বিলিভ...!”

ফ্রাঙ্ক চেস্টার ছিলেন আম্পায়ার। এরিক হোলিজের কথা কানে যেতে তিনি বললেন, “আমি কিন্তু ছ' রানই দিচ্ছি!”

পরের বল! হতবাক এরিক দেখলেন সে বলটাও একইভাবে ভেসে গেলো মাঠের ওপর দিয়ে।

লিস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে খেলায় নাজেহাল হয়ে গেছেন কাউন্টি দলের খেলোয়াড়রা। শুধু ওরেলকে সামলাতেই অসমর্থ। উইকেট পড়তে আম্পায়ার

চেস্টার বললেন, "ব্যস্ত হয়ে তো না, এবার আসবে উইকস!"

এলেন উইকস। মাত্র ৬৫ মিনিটে করলেন নিজস্ব শত রান। আর এক শ' পঞ্চাশ মিনিটের কিছু বেশি সময় নিয়ে ওরেল আর উইকস করলেন ৩৪০ রান!

আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক চেস্টার তখন হাসছেন! বিধবস্ত প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের বললেন, "এরও পর আছে—আসবে ওয়ালকট!"

সত্যে আতর্নাদ করে ওঠে ফিল্ডাররা! এরও পর আছে। না জানি সে জিনিস কেমন!

ফিল্ডারদের আতর্নাদে বোধহয় দয়া হলো অধিনায়ক গ্যাডার্ডের। ২ উইকেটে ৬৮২ রানের মাথায় তিনি ইনিংস সমাপ্ত ঘোষণা করলেন। কিন্তু লিস্টারশায়ার কার্ভিট দলের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম দিনেই করেছিলেন ৬৫১ রান মাত্র দু'টি উইকেট হারিয়ে। ২৪১ রান করে অপরাধিত ছিলেন ওরেল।

ওরেল-স্মৃতির সংগে জড়িয়ে আছে একটি অবিস্মরণীয় টেস্ট ম্যাচের কথা। পৃথিবীর একমাত্র টাই টেস্ট। ওরেলের অধিনায়কত্বের সেবার অস্ট্রেলিয়ার গিরে ক্রিকেটে খেলার কি চাপল্যাকর দু'পই না দেখালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। প্রথমে ওরেলের খেলোয়াড়সমূহ মনোভাবের সামনে ক্রিকেট দুর্নীতি বোধহয় লঙ্কার পালাবার পথ খুঁজিয়েছিলো। তাই যে আম্পায়ার ইগারের জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারাল নিশ্চিত জয়লাভের সুযোগ, যে আম্পায়ার ইগারের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশ-জুড়ে উঠলো প্রতিবাদের ঝড়, খেলোয়াড় মহলে চললো তুমুল সমালোচনা, সেই আম্পায়ার ইগারকেই পরের টেস্টে আম্পায়ারিং করার জন্যে আহবান জানানলেন অধিনায়ক ওরেল। একে শৃঙ্খল ওরেলের মহানুভবতা বলে ভাবলে ভুল করা হবে, এ হলো ওরেলের ক্রিকেটের পবিত্র রূপ প্রকাশের প্রচেষ্টা!

তাই ১৯৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার রিসবেন মাঠে ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে যে টেস্ট খেলা শুরু হয়েছিলো, তার চূড়ান্ত ফলাফল বৃষ্টি ক্রিকেট খেলার মহিমাকে জ্বলন্তরূপে প্রকটিত করে তুললো! ওরেল ছিলেন সেই অবিস্মরণীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক, আর রিচি বেনোর ওপর ভার ছিলো অস্ট্রেলিয়া দল পরিচালনার। সেই টেস্টের শেষ দিনে খেলার শেষ কয়েকটি মূহুর্তের কথা এখানে বর্ণনা করবো ওরেলকে স্মরণে চেনার জন্যে।

বাড়ির কাটা ঘুরছে। বেলা তখন দুটো থেকে তুড়ি মিনিট। অস্ট্রেলিয়ার ৫ উইকেটে ৫৭ রান, সাড়ে দশ ওভার

বল করে হল ৩৭ রানের বিনিময়ে পেয়েছেন ৪টি উইকেট। ওরেল দেখলেন হল ফেপে গেছে। এখনই সে যেন একটা কিছু আভবনীর অঘটন ঘটতে চায়, তাই আর দু' ওভার বল করার পর হলকে সরিয়ে নিলেন ওরেল। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। জিততে গেলে অস্ট্রেলিয়াকে এখন ২০০ মিনিটে করতে হবে ১৭৬ রান। তাও আবার শেষ পাঁচজন খেলোয়াড়কে দিয়ে। সুতরাং জয়...! বিজয়লক্ষ্মী তাঁর গতি পরিবর্তন করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার ৮০ রানের সময় রামাধীনের বলে শ্লিপে ক্যাচ তুললেন ম্যাকে। কিন্তু গিবস্ ধরে রাখতে পারলেন না সে ক্যাচ। জীবন ফিরে পেয়ে ম্যাকে ডেভিডসনের সঙ্গে যোগ করলেন ৩৫ রান। কিন্তু ম্যাকে এগলেন না বেশি দূর। অস্ট্রেলিয়ার ৯২ রানের মাথায় ২৮ রান করে ম্যাকে বোল্ড হলেন রামাধীনের বলে। বেনো এসে যোগ দিলেন ডেভিডসনের সঙ্গে। কিন্তু তিনিও যেন ঠিকমত খাপ খাওয়াতে পারলেন না। চা পানের সময় ডেভিডসন (১৬) আর বেনো (৬) রানে অপরাধিত থেকে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়নে। অস্ট্রেলিয়ার হাতে তখন ৪টি উইকেট। কিন্তু জিততে গেলে করতে হবে ১২০ মিনিটে ১২০ রান।

কোন আশা নেই অস্ট্রেলিয়ার। ৬ উইকেটে ১১০ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা বাকী চারটে উইকেট দখল করার জন্যে চালালেন প্রাণপণ সংগ্রাম। কিন্তু ডেভিডসন আর বেনো হুঁরিয়া দিলেন খেলার মোড়। উঠতে লাগলো রান। খেলা শেষ হতে তখন বাকী আর

মাত্র ৩০ মিনিট। কিন্তু জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার দরকার আর ২৭ রান। বেনো আর ডেভিডসন জেতার দিকে লক্ষ্য রেখে খেলছেন।

বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। ওরেল নিলেন নতুন বল। তুলে দিলেন হলের হাতে। বাকী আধঘণ্টার ২৭ রান করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। কিন্তু নতুন বল কখন কাজই হলো না। কমতে লাগলো রানের ব্যবধান। ৫-৪৫ তখন ১৫ মিনিটে অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে ১০ রান। হলের আরও একটা ওভার শেষ। কেটে গেছে পাঁচটা মিনিট। হয়েছে ১ রান। দরকার এখন ৯ রানের। সোবাসের পরের ওভারে হয়ে গেলো ২টি রান। আর ৭ রানের প্রয়োজন। মাঠে তখন তুমুল উত্তেজনা। হঠাৎ একটা মারাত্মক শর্ট রান নিতে গিয়ে ডেভিডসন রান আউট হয়ে গেলেন। সলোমনের অব্যর্থ লক্ষ্য ভেঙে দিলো উইকেট। ৮০ রান করে প্যাভেলিয়ানে ফিরে এলেন ডেভিডসন।

খেলা শেষ হতে তখনও ৬ মিনিট বাকী। অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ৭ রান। বজ্রজার আর দু' ওভার খেলা হতে পারে। তবে ১৬টা বলে ৭ রান করা অসম্ভব নয় (৮ বলে ওভার ছিলো)। সোবাসের সপ্তম বলে গ্রাউট একটা রান নিলেন। কমলো আর এক রানের ব্যবধান। কিন্তু পরের ওভার যে হলের। গ্রাউট এ কি তুল করলেন!

হলের আট বলের ওভার। বোধহয় খেলারও শেষ আট বল। জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার চাই ৬ রান। হাতে আছে তিনটি উইকেট। হলের প্রচণ্ড জোরালো বল এসে লাগলো গ্রাউটের পেটে। চোখে

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কৃত্তক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের করিয়াছেন সমুদ্রের সঙ্গীতের মাধ্যমে। বহু গদ্য ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আশ্চর্যসঙ্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঘরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্মর্য বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তদ্ব্যয় অনন্তম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন নীতা-রাসের চরিত্র বর্ণনা

সম্প্রদিত।

মূল্য—১৪ পত দুই টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৫৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

অন্ধকার দেখে পেটে হাত চেপে বসে পড়তে থাকলেন গ্রাউট, হঠাৎ দেখলেন বেনো ছুটে আসছেন। সেই অবস্থায়ই পেটে হাত চেপে গ্রাউট এক ছুটে পৌঁছে গেলেন অপর প্রান্তে। মেজাজ বিগড়ে গেলো হলের। এ বলে কি রান হয়। তখন সাতটি বল বাকী। অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ৫ রান। ওরেলের নিষেধকে উপেক্ষা করে হল ছাড়লেন বাম্পার। উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলো মাঠ। বেনোর ব্যাটে বল লেগেছে আর সে বল আলেকজান্ডারের হাতে। আউট, বেনো আউট। ৫২ রান করে আউট হয়ে গেলেন রিচি বেনো।

মেকিফ নামলেন ব্যাট নিয়ে। হলের তৃতীয় বল ঠেকালেন ব্যাট দিয়ে। চতুর্থ বল ফসকালেন। বল আলেকজান্ডারের গ্লভস-এর মধ্যে। আর তারই ফাঁকে গ্রাউট পৌঁছে গেলেন উইকেটে। রাগে জ্বলছিলেন হল। আলেকজান্ডার বল ছুড়ে দিলেন হলের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে হল বলটা ছুড়ে মারলেন উইকেটে। লাগলো না। মিড অন থেকে কাঁপিয়ে পড়ে ওভার প্রের রান বাঁচালেন ভ্যালেন-টাইন। অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের জন্যে তখনও দরকার ৪ রান। আর হলের ওভারের বাকী আছে চারটি বল।

হলের পঞ্চম বল। গ্রাউট উচ্চ করে মারলেন। সমস্ত মাঠ শিউরে উঠলো। ক্যাচ ধরার জন্যে কানহাই স্মিথ হয়ে পাঁড়িয়ে। বল নেমে আসছে তার হাতে। গ্রাউট অবস্থারিত আউট। কিন্তু ও কি? বিরাট এক লাফ দিয়ে নিজে ক্যাচ লোফার জন্যে কানহাই-এর ওপর কাঁপিয়ে পড়লেন হল। সঙ্গে সঙ্গে বলটাও মাটিতে। রেহাই পেলেন গ্রাউট। এই ফাঁকে নিয়ে নিয়েছেন একটা রানও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড় সন্তোষিত।

আর মাত্র ৩টি রান দরকার। হলের ষষ্ঠ বল। প্রাথমিক লেগের দিকে ব্যাট চালালেন মেকিফ। বল ছুটলো বাউন্ডারীর দিকে। নিষাৎ চার। সতরাং অস্ট্রেলিয়া জিতলো। গ্রাউট আর মেকিফ রান নিচ্ছেন। কিন্তু কোথা থেকে ছুটে এসে চিলের মতো ছোঁ মেরে বলটা তুলে নিয়ে আলেকজান্ডারের হাতে ছুড়ে দিলেন হাল্ট। আলেকজান্ডার কাঁপিয়ে পড়লেন উইকেটের ওপর—গ্রাউটের আগেই। গ্রাউট আউট। কিন্তু দুই রান হয়ে গেছে ততক্ষণে। দু'দলের রানসংখ্যা তখন সমান সমান—৭০৭ রান। জিততে হল

অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে এখনও ১ রান। হলের ওভারের দ্বিতীয় বাকী। শেষ খেলোয়াড় ক্রাইন তখন উইকেটের সামনে।

হলের সপ্তম বল। ক্রাইন কোন রকমে বলটাকে লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন। স্কোরার লেগে ছিলেন সলোমন। বলটা তুলে নিয়ে তিনি ছুড়ে মারলেন উইকেটে। অব্যর্থ লক্ষ্য। আর একটি রান যোগ হবার আগেই আউট হয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার দশজন খেলোয়াড়।

রান হলো দু' দলের সমান সমান, দু' ইনিংসে মিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭০৭ রান, অস্ট্রেলিয়ারও তাই, টাই হলো খেলা। পৃথিবীর টেস্ট ইতিহাসে সর্বপ্রথম টাই। আনন্দে সেই ঐতিহাসিক খেলার খেলোয়াড়রা নাচতে লাগলেন খেই খেই করে। দর্শকরাও ঝগা দিলেন তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু ক্রিকেটের রাজপুত্র ফ্রাঙ্ক ওরেল সেদিনও ছিলেন একান্তই স্বাভাবিক।

ওরেল সম্বন্ধে লিখতে গেলে আমার এ লেখা শেষ হবে না। কারণ ক্রিকেট আমার মতো প্রিয় তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি প্রিয় ব্রহ্মক। আমি আজও চোখ বুজে দেখি নারকেল গাছে ঘেরা স্বর্গে সেই ছোট্ট ছেলেটাকে। যে তার ছোট্ট সাইকেলটা নিয়ে ঘুরে বেড়াতো শহরময়, যে বন্ধুদের নিয়ে বাড়ির ছাদে বসে আপেল চিবোতে চিবোতে দেখতো খেলা, আর ভাবতো একদিন এ মাঠে সে খেলবে।

কিন্তু আজ ওরেলের মৃত্যুর পর আমি লিখতে বসেছি এই লেখা, যা কোন দিন ভাবি নি, যা কোনদিন কল্পনাও করি নি, সেই অপ্রত্যাশিত আঘাতের ঘা এখনো সামলে উঠতে পারি নি। কিন্তু সাংবাদিকদের নাকি সূখ-দুঃখে বেচাল হওয়া চলে না। তাই আজ এই পরিস্থিতি! পরিশেষে রিসবেন টেস্টের পর এক অল্প ক্রিকেট রসিক ওরেলকে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি হুবহু তুলে দিই শঙ্করীদার (শঙ্করীপ্রসাদ বসু) লেখা থেকে।

ফ্যামিয়েসন অ্যাভিনিউ,
ফেরার লাইট, সিডনি, ফেব্রুয়ারী-১২

প্রিয় ফ্রাঙ্ক,

আমি সিডনির এক অল্প অধিবাসী।
আমার এবং আমার অনেক অল্প সঙ্গীর

পক্ষ থেকে আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তুমি এবং তোমার দলের খেলোয়াড়রা বহু ঘণ্টার আনন্দদায়ক ক্রিকেট আমাদের দান করেছেন।

ফ্রাঙ্ক, বহু বছর ধরে আমি অল্প। কিন্তু আমার অন্ধের জন্য আমি একবার মাত্র দৃষ্টি পেয়েছি—যখন রিসবেনে গারফিল্ড সোবার্স তাঁর অবিস্মরণীয় ব্যাটিং করছিলেন এবং তার বিবরণ আমি শুনছিলাম। হায়! যদি তার ব্যাটিং-এর সময়টুকু আমার দৃষ্টি ফিরে দেওয়া হতো, জীবনের পূর্ণ সন্তোষ তাহলে আমি পেতাম।

আমার কিছু অল্প সঙ্গী কানহাইকে তাঁর পূর্ণোচ্ছ্বাসের সময় দেখতে চান। অন্যরা চান ডায়নামিক ওপেনার স্মিথ ও হাল্টকে দেখতে। গিবসের বোলিং আমাদের কাছে সদা আলোচনার বস্তু এবং আলেকজান্ডার যে সর্বকালের সেরা উইকেটকীপার—ব্যাটসম্যান সে বিষয়ে আমাদের কারোরই কোন সন্দেহ নেই।

তোমার কুশলী নেতৃত্ব এবং মনোহারী মারের কলক শোনার চেয়ে দেখতেই আমাদের ইচ্ছে হয়। বাদে উল্লেখ করছি, তাদের সঙ্গে থেকে তোমার দলের সকল ছোকরায় এই মরশুমকে স্মরণকালের প্রেরণ ক্রিকেট মরশুম করে তুলতে মহান ভূমিকা নিয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে জানাই, আমার এক অল্প বন্ধু স্বাকীর করেছেন যে, বাড়ি ফিরতে কখনো কখনো রাত হলে তাঁর স্ত্রী যে গতিতে জেরা করেন, তার চেয়েও জোরে বল করেন ওয়েসলি হল। বিশ্বাস কর, হলের পক্ষে এটা একটা বিরাট প্রশংসা—আমি আমার বন্ধুর স্ত্রীকে জানি, সে বাস্তবিক জেট বিমানের গতিতে প্রস্রবণ করে থাকে।

লক্ষ্য করো, শেষ টেস্ট শেষ হবার দু'দিন পরে এই চিঠি লেখা হয়েছে। কাগজে কলমে অস্ট্রেলিয়া শক্তিশালী দল, কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, প্রত্যেক যথার্থ ক্রিকেট-প্রেমিক তোমাদের জয় কামনায় অধীর।

আজ এই পরিস্থিতি ফ্রাঙ্ক! তোমার ছোকরাগুলিকে তাড়াতাড়ি আবার নিয়ে এসো। তারা ক্রিকেটকে ঠিক তার নিজের জায়গাটিতে পৌঁছে দিয়েছে—পৃথিবীর এক নম্বর খেলার জায়গায়। তাদের ধন্যবাদ।

একান্তই তোমার
লেন হ্যালেট।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসত্ৰুমার গৃহমঞ্জুমার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ক্রমশঃ
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে অকৃতির সৈন্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখায় জন্ম সাধনার
অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ সুভসজীবনী সঙ্গে
চার চামচ মহাজীকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে রাস্তা দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

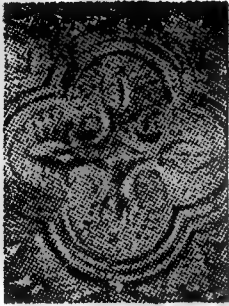


কলিকতা ডাঃ বোসের চলে খেল, এম-এস,
আম্বুর্বেদ্যাদী, এক, সি, এস, (সকল),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), কলিকতা
কম্বোজের রসায়ন শাস্ত্রের কল্যাণ
সমাপ্ত।

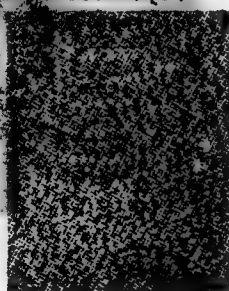
কলিকতা কলেজ ডাঃ নরেন চন্দ্র বোস,
এম-বি, বি-এস, আম্বুর্বেদ্যাদী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় বোম্বে
সাধনা নগর, কলিকতা ৩৬

28 MAR '987



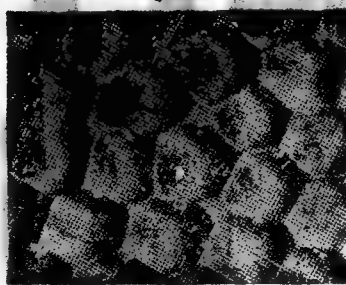
মরোক্ষ

স্মারো
সীডেড

স্মারো পিম্বেড



স্মারকাল



স্মারক

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে এইচ পিজি গ্লাস ব্যবহার করেন

আমাদের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইকু ও হাসপাতালে প্রবল ইজিনিয়াররা সর্বত্রই এই পি জি গ্লাস আগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পিজি গ্লাস উৎকর্ষের নিবৃত্ত দাম বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাব্দিক বংশের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন গ্রাভার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্তান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

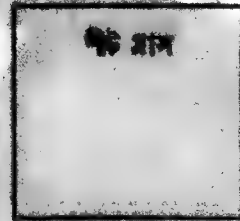
এইচ পি জি কেনা যাবেই মিউজ-বোম্ব ডাক বিনিস কেনা।

হিন্দুস্তান
পিলকিংটন
গ্লাস ওয়ার্কস
লিমিটেড

হেয়্যাগোনাল
ওয়্যারড



সিউ গ্লাস



জজিয়ান ওয়্যারড



ম্যানেজিং এজেন্টস
ভালুককার ল
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্তান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩

বঙ্গমতী

দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী-
প্রতিনিধিদল

বাদ্য পরিষিদ্ধি ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে
সঙ্গে হস্তাক্ষর আদায়



৭১ বর্ষ : ৪২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

*** ● ***

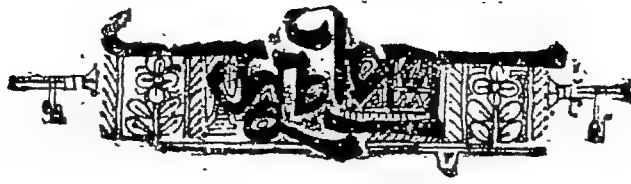
30th March, 1967 * Vol. 71. N



ফেমিলা
ক্রিম

একালের রূপ-কথায় স্নেহ কথায়

বোম্বাইয়ের হাটস, কলিকাতা-৩



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	—	২৬২৭
আজকের মানুষ	—	২৬২৮
ভারতদর্শন	—	২৬২৯
সাম্প্রতিক	—	২৬৩৬
যা দেখেছি, যা পেরেছি (স্মৃতিচরন)	— শ্রীসুধীরজম দাস	২৬৩৭
অবসর	— চন্দ্রগুপ্ত	২৬৪৪
নব স্মৃতিসভা সমীপে	—	২৬৪৫
দিল্লী থেকে	— বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৬৪৭
ফুল ফুটেছে ফুল (কাব্য)	— রবীন মুখোপাধ্যায়	২৬৪৯
কিছুক্ষণ বাংলাদেশ (কাব্য)	— অনিল বসু	২৬৪৯
গোক-ভারতের রূপরেখা	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	২৬৫০
বঙ্গদর্শন	—	২৬৫৩

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান
জিজ্ঞাসাতের কৌস্তুভরস, ভগ্নভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
সদৃশ মহাপরিচয় ভক্তিশাস্ত্র সম্ভব।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্রামপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাচক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে
উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত।
শ্রীমদ্রামপ্রভুর শ্রীমদ্বিনিঃসৃত 'শিক্ষাচক'
শ্লোকই' তাহার একমাত্র রচনা। শ্রীল
কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুদলিল পদ্যানু-
বাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস
বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য
ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার
শ্রীচৈতন্যমণ্ডল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস
বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আজ্ঞাতত্ত্ব
বৈষ্ণব দর্শনের সুস্বাত্মম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা
শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত।
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ়
মর্মসাহিত্য।

শ্রীচমৎকার চম্পিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার
সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণ-
দাসের সুদলিল পদ্যানুবাদ।

পাশ্চাত-দলন

মুর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপন্ডন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-
সংকীর্তন, চৌদিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের
অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের
প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চম্পিকা। সুদলিতে
নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩ টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

নোহন মেহনা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-
শিক্ষণীয় রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে
ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির দিনে, বৃন্দদেবের
বৃন্দ, কাঠেরের কপাল, হাঙর মানুষের
চোখের জল, ভুলের ভুল, মৃগী চাচা,
বৃন্দদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো,
নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইন্দুরের
কীর্তি-কাহিনী, বাদরের মেটলিচকাড়।

ছড়া—হট্টমালার যন্তবাড়ী, হোহোহো
বন্দি করে, পালায়ান প্যালায়াম, উলটো
বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের
বায়রাম, হাবুবাখুর মনের কথা, আন্দ
কালের বান্দ বড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী লক্ষ্মী রায় কর্তৃক
সুচিত্রিত

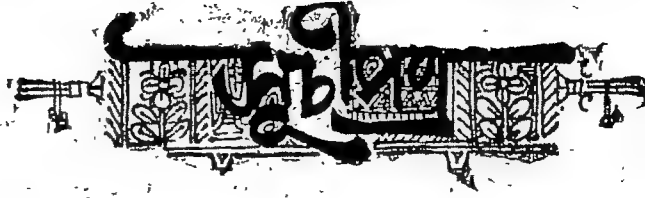
উপহার দিবার মত বই।

হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মজুবা

২০০

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



বিষয়	লেখক	পাতা
অগ্নিনির্যাসের একটি অধ্যায়	— জনক সিংহ	২৬৫৭
অগ্নিবিজ্ঞান (কবিতা)	— জয়কান্ত সাহা	২৬৬৯
হৃদয়ের অশ্রু (কবিতা)	— শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৬৬৯
হৃদয়বলিতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	২৬৬৯
বিশ্বনাথবিশেষের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য	২৬৬৯
অমর (গল্প)	— মানবেন্দ্র পাল	২৬৬৯
প্রথমবারের কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	২৬৭২
চোম্বা লামার চোখে উত্তরবঙ্গ	—	২৬৭৩
পাঠকমন	—	২৬৭৭
স্বপ্নমন্ড—ওমেগা এবং এসেলে	— শিলালি	২৬৮৬
স্বপ্নমন্ড	—	২৬৮৭
বেলাহালা	— শ্রীঅমিতাভ	২৬৮৮

সাহিত্য-সম্রাট—বঙ্গদেশের প্রথম

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিদ্যাবতী, স্বপ্নমন্ড, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাখারাগী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩ টাকা

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকহর্ষা, বিবিধ প্রবন্ধ (১৫)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মৃচিরাম গদ্য, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান গ্রন্থ। মূল্য—তিন টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাধাই)—সাত্বে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিস্তা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, ময়্যা কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাধাই) সাত্বে তিন টাকা

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

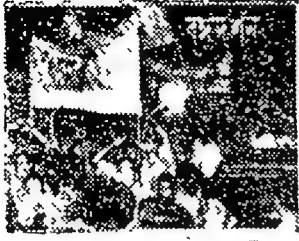
মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

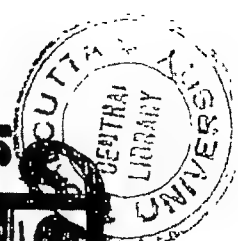
—ইহাতে আছে—

- ১। চলার পথে (উপন্যাস)
- ২। মনীষা (উপন্যাস)
- ৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খণ্ড গল্প সমষ্টি)
- ৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
- ৫। চাবাক (নাটক)

বঙ্গদেশী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



সাপ্তাহিক বঙ্গমহা



সম্পাদিকা জয়ন্তী সেন

৭১ বর্ষঃ ৪২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 30th March, 1967

জনতা ও যুক্তফ্রন্ট

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একদল মতলববাজ রাজনৈতিক গণৎকার যুক্তফ্রন্ট-মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নিয়ে ভাগ্য গণনা শুরু করেছিলেন। যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূলে আছেন পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনতা। এই জনতার নির্দেশে যে যুক্তফ্রন্টের গঠন—তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারাই সিদ্ধান্ত হতে পারে এতদিন ধরে যারা জনতার স্বার্থকে আমল না দিয়ে কারেমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

মাত্র এই কদিনের মধ্যে মন্ত্রিসভার কাজ-কর্ম, ও কর্মপ্রণালী অবশ্যই অভিমতানুযায়ী। যে আঠারো ধারার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তা এই জাতীয় একনিষ্ঠ কতবাসাধনের ম্যারাই সাফল্যমণ্ডিত হবে।

অবশ্য রাতারাতি সাফল্য জনগণ আশা করে না, আর তা সম্ভবও নয়। কারণ বিগত বিশ বছর ধরে যে অত্যাচার, শোষণ, ও জনবিবোধী কাজ চলেছে, তার অবসান ঘাট হলেও যে ক্ষত-র সৃষ্টি হয়েছে, তা দ্রুতবেগে বিলম্ব হবেই।

খাদ্য-সমস্যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী সর্বাঙ্গী মনোযোগ দিয়েছেন। মন্ত্রিমহল থেকে কোনো সংবাদ সরবরাহ করা না হলেও অনুমানের উপর ভিত্তি করে খাদ্য-নীতি সম্পর্কে নানা রকম সংবাদ কোনো কোনো পত্রিকায় সাততাত্ত্বিক প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এরা একবারও ভেবে দেখেছেন না যে, খাদ্যের ব্যাপারে পূর্বতন সরকার দেউলিয়া নীতি অবলম্বন করেছিলেন। যে পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করা কোনোমতেই অসম্ভব ছিল না—তা করতও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগেই আমরা

‘বঙ্গদর্শনে’ স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলাম—‘সরকার যাই করুন না কেন, নির্বাচনের পর খাদ্য নিয়ে যে হাহাকার শুরু হবে তার কোন তুলনা থাকবে না।.....বর্তমানে যে দল ক্ষমতায় আসীন রয়েছে সেই দলের হাতে যদি ক্ষমতা আবার আসে তাহলে সেই দল এই বিষয়ে সোজাসুজি দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে, কেন না ভোটের কুপায় তারা পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। পক্ষান্তরে যদি বামপন্থী দলগুলির হাতে ক্ষমতা আসে, তাহলেও তারা এই অবস্থার চোখে সরবের ফুস দেখবে। তারাই বা কোথা থেকে চাল সংগ্রহ করে বেশন যোগাবে?’ ইত্যাদি। (পৃষ্ঠা ২৩৩৪—৩৫, ৩৭ সংখ্যা, ৭১ বর্ষ)।

আনন্দের কথা, আমরা যেটুকু ভয় পেয়েছিলাম তাও দূর করে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার খাদ্য-সমস্যা সমাধানে বঙ্গপরি-কর। তাই জনতা আজ বিরোধীদের অপপ্রচারের শিকার হয় নি। এতদিন তারা অত্যাচারের মূখে চোখ বুজেই ছিল। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে তাদের জয়লাভের পর চোখ বুজেছে। তাই যেখানে অন্যায় তারা লক্ষ্য করেছে—সেখানেই নিতয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সত্ত্বেও কেউ কেউ একে জনরাজ্যের কার্যম বলে ব্যঙ্গ করেছে। জানি না জনগণকে নিয়ে এ ধরনের বাঙ্গ করা কিভাবে সম্ভব হয়। তবে, গুন্ডারা যদি চোখের সামনে ঘোরা-ফেরা করে, সেখানে পুঁলিশ দল যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই জনতার পক্ষে একালে চুপ করে সহ্য করে থাকার মতো অসহনীয় অবস্থা আর কিছুই নেই। বরং চোখ বুজে থাকলেই

একের পর এক দুনীতিকে প্রহর দেওয়া হবে—যা গত বিশ বছর হয়েছে। সেই বিশ বছরের অপশাসনের অবসান ঘটাতে পেরেছে বলেই দেখা যাচ্ছে বেহালা অঞ্চলে পুঁলিশ যেখানে নিষ্ক্রিয় ছিল—সেখানে জনতার দাবিতে নামী গুন্ডারা ধরা পড়ছে। হাওড়ার গাড়ি অচল হয়ে পড়লে জনতার হস্তক্ষেপে গাড়ি সচল হচ্ছে। হাওড়ার দায়িত্বপূর্ণ পুঁলিশ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, সেখানে পুঁলিশ-বাহিনী আহ্বান করলে মারাত্মক কিছু ঘটতে অসম্ভব ছিল না।

সর্বাপেক্ষা আশাব্যঞ্জক সংবাদ হচ্ছে এই যে, জনসাধারণেরই সহযোগিতায় পুঁলিশ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধান-চাল-গম প্রভৃতি লুকানো খাদ্যদ্রব্য বেহা করার জন্য অভিযান শুরু করেছেন এবং শুরুরতই নবম্বীপ ও ২৪ পবগনার বিভিন্ন অঞ্চলে জব্দাসীব পব বহু শস্য-জাত দ্রব্য, চিনি প্রভৃতি উদ্ধার করেছে।

এই কারণে আমরা মনে করি, জনগণের সত্যিকারের এই সরকার প্রতিটি কাজে সাফল্য লাভ করবেন। আপ এ কথাও সত্য যে, এই সরকার জনগণের মর্মানের প্রতি সচেতন বলেই জনগণকে সব সময় সক্রিয় ও নিজেদের কতব্যকর্মের প্রতি সর্বদা হুঁসিয়ার থাকতে হবে। জনগণের এই সতর্কতার ম্যারাই যেন রাজনৈতিক গণৎকারের স্ব-ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য খড়ি পেতে নিজেদের ভবিষ্যৎ অঙ্গুলিমের দিনগুলি দেখতে পাব। কারণ যে-গোপের পক্ষে তারা নিমজ্জিত তাতেই তাদের ভরাডুবি হবে।

সম্পাদিকা

আজকের মানুষ

স্বেতলানা! মহান নেতার মেয়ের নাম স্বেতলানা, আমার মেয়ের নামও স্বেতলানা রাখলাম। সামনের মাসে আমার বোনঝির সন্তান হবে। যদি মেয়ে হয় তবে নিশ্চয়ই স্বেতলানা নাম রাখবে। স্ট্যালিনের মেয়ের নামে অল্প দিনের মধ্যে সোভিয়েট বাণিজ্য হাজ্জাবটা মেয়ের নামকরণ হয়ে গেল। একটা সুগন্ধি এসেন্সেরও নাম দেওয়া হলো স্বেতলানা। সোভিয়ত রাশিয়ার মেয়েমহলে এ-নামটিই ছিলো সবচেয়ে জনপ্রিয়।

কিন্তু প্রায় ১৪ বছর সে নাম কেউ মূখে আনে নি বিশেষ। স্বেতলানা প্রায় ছাব্বিষে গিয়েছিল ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর। বিশেষত ব্রুশ্চভ প্রধানমন্ত্রী হয়ে যখন ইতিহাসের পাতা থেকে স্ট্যালিনের নাম মুছে দেবার ব্যবস্থা করলেন de-Stalinization-এর নামে। আবার সেই স্বেতলানা নামটি আরেকবার সবার মূখে মূখে ফিরলো। স্বেতলানা পালিয়েছে। সোভিয়েট মূল্যবোধ থেকে পশ্চিমী দুনিয়ার defect কবেছে। ভারতবর্ষে এসে রুশ নাগরিক স্বেতলানা স্বাস্থ্য ত্যাগ করেছে। ক্রান্ত স্বেতলানা ইতালী হয়ে সুইজারল্যান্ডে বিশ্রাম নিচ্ছে। দেশে আব ফিরবে না ও।

কেন ফিরবে না বা আমেরিকার আশ্রয়-প্রার্থী হি বা সে হয়েছিল কেন স্বেতলানা তার কোন কৈফিয়ৎ কারুর কাছে দেয় নি। আজো। তবে এটুকু বড়ি, স্বেতলানার কোমল প্রাণ আঘাতের পর আঘাত পেয়ে বিকৃত হয়ে গিয়েছে। মস্কো হয়তো তার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। যে তাব সব কেড়ে নিয়েছে তার কাছে সে হয়তো আর ফিরে যেতে চায় নি।

বাবা-মার একমাত্র মেয়ে স্বেতলানা। স্ট্যালিনের প্রাণের পুতলী ছিল। ডিক্টেটর স্ট্যালিন নিম্নমুখ্যে তার রাজনৈতিক শত্রুদের খতম করেছিলেন। কিন্তু কন্যা স্বেতলানার কাছে স্ট্যালিন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। শিশুর মত খেলতেন তার সঙ্গে, গল্প করতেন। সাম্প্রতিক স্বেতলানা না থাকলে স্ট্যালিনের হৃদয়ে মায়ামমতার স্থান আছে বলে জানাই যেত না।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মোবোভের সঙ্গে দেখা স্বেতলানার। ওদেরই প্রদেশ জর্জিয়ারই ছিলো। স্বেত-

লানার ভাল লাগল ওকে। ভালবাসল। তারপর একদিন ওকে নিয়ে ঘরও বাঁধল। কিন্তু সে ক'দিনের জন্যে? স্ট্যালিন সে-বিষয়ে নাকচ করে দিলেন। কমাহীন ডিক্টেটর সেখানেই থামেন নি, মোরোভকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেখানেই মৃত্যু। কিন্তু স্বেতলানার প্রথম শোক নয়, এর আগে মাত্র ৭ বছর বয়সে সে মাতৃহারা হয়। স্বাভাবিকভাবে নয়, ওর বাবাই নাকি মাকে টুটি টিপে হত্যা করেছিলেন। মা নাকি বাবার নিষ্ঠুর কাজের কঠোর সমালোচনা করতেন প্রায়ই। শেষ পর্যন্ত ঘরে-বাইরে নিষ্ঠুর সহ্য করতে না পেরেই



স্বেতলানা

নাকি স্ট্যালিন নিজের পক্ষীকেও পথের কাটা স্তান কবে খতম কবেন।

মনে আঘাত পেয়ে মেয়ে যে তার মন-মরা হয়ে গিয়েছিল এটা বোধ হয় স্ট্যালিন বুঝতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করাও দরকার মনে করেছিলেন হয়তো। তাই বন্ধুদের মাঠাল কানডের ছেলের সঙ্গে স্বেতলানার আবার বিয়ে দিলেন তিনি। কী জাঁজমক সে বিয়েতে।

স্বামী-সুখ পেয়েছিল স্বেতলানা কিছুদিন। কিন্তু কিছুদিন মাত্র, বাঁভিল হল সে-বিয়োগ। এরপরে নাকি

এক চির প্রযোজকের গলার মালা দিয়েছিল, ক্যাপলার নাকি তার নাম। কিন্তু তাকেও অল্প দিনের মধ্যে সাইবেরিয়ায় নিবাসনে যেতে হয়েছিল। পর পর এতগুলো কঠিন যা হজম কবার মত শত্রু হৃদয়-মন স্বেতলানার কখনই ছিল না। সে সব ভুলে থাকতে চাইলো, ডুববে থাকতে চাইলো কাজের মধ্যে।

ইংরেজী শিখেছিল স্বেতলানা মন দিয়ে। সেই সুবাদে মস্কো ফরেন ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট হাউসে ৬০ পাউন্ড মাইনেব চাকরী জুটে গেল অনুবাদকের। এখানে দেখা পেল সে ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞান সিং-এর। স্বেতলানার জীবন নতুন মোড় নিতে চাইল। সহকর্মীর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের আলাপে গল্প-গুজবে সে ভালবেসে ফেললো বিজ্ঞানকে। কিন্তু স্বপ্নই রচনা করল কেবল, তাকে সার্থক করে তুলতে পারে নি। বিজ্ঞান অসুস্থ হয়ে পড়ল, প্রাণ দিয়ে সেবা কবল স্বেতলানা। কিন্তু সবই বিফলে গেল। তাকে দেখতে হল তার প্রাণাধিক প্রিয় বিজ্ঞান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

বিজ্ঞানশেষ শেষ-ইচ্ছে ছিল, তার চিতা-জ্বল যেন প্রমাণসঙ্গমে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেই অমূল্য স্মৃতি নিয়ে স্বেতলানার ভারত আগমন। কিন্তু কর্তব্য সম্পন্ন করেও সে মস্কো ফিরতে পারল না। মন চাইল না তার মস্কো ফিরতে, বিজ্ঞান-বিহনে যেন মস্কো শূন্য, অর্থহীন। এখানে আবার কিছুদিন থাকতে চাইল। হয়তো একেবারে থেকে যেতেই চেয়েছিল মন ওর বিজ্ঞানের দেশে মাটিতে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জানায় নি ভাবত সরকারের কাছে। কে জানে কী মনে করে। কিন্তু স্বেতলানার আশ্রিতার পুরো সুযোগ নিল সি-আই-এ, মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর। ও যখন নরাদিক্সার মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে আশ্রয় চাইল, তখন সেকেন্ড আফ-সার রবার্ট রোবেল তাকে নিয়ে নিউ ইয়র্কের পথে রোম রওনা হয়েছিল নিজের পকেট থেকে প্লেনের টিকিট কেটে। রবার্ট নাকি সি-আই-এর মাইনে করায় লোক।

কিন্তু মার্কিন সরকার সোভিয়েটের সঙ্গে তার সদ্য গড়ে-ওঠা বন্ধুত্বের বন্ধনে পাচ্ছে ফাটল ধরে সেই জয়ে স্বেতলানাকে আশ্রয় দিতে রাজী হয় নি। গেল সে সুইজারল্যান্ড। সুইস সরকার জানিয়েছেন যে স্বেতলানা অরাজনৈতিক মহিলা। সে ক্রান্ত, পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম চাই তার। সে বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে বাধ্য নেই তাঁদের।

বিশ্রাম কত দিনের? আপাতত তিন মাসের। কিন্তু তিন মাসে কি স্বেতলানার ক্রান্তি দূর হবে? যা হারিয়েছে ফিরে পাবে আবার তা?

ব্রতদর্শন



অজয়-ইন্দিরা শ্রুভেচ্ছা বিনিময়

রাজধানীতে
পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবল

অজয় মন্টিসভার তিন প্রধান পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষত খাদ্য-সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে রাজধানীতে এক আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হন। শ্রীমতী গান্ধীর পাশে উপস্থিত ছিলেন অর্থ-মন্ত্রীর ভারপ্রাপ্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম। প্রকাশ, কংগ্রেসী অ-কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের এই সাক্ষাৎকার যথেষ্ট হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয় এবং কেন্দ্রীয় সহযোগিতার বহু বহু মৌখিক প্রতিশ্রুতিও মেলে। কিন্তু কার্যত সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে বলে এ পর্যন্ত প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের বিধিবদ্ধ রেশন তার দ্বারা কোনপ্রকারে চালু রাখা যেতে পারে কিন্তু আংশিক রেশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই মুহূর্তেই কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না।

গত বছর পশ্চিমবঙ্গের কপালে কেন্দ্রীয় সাহায্য গমের ক্ষেত্রে ছিল দশ লক্ষ টন। যতদূর জানা যায়, এবার কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছে নয় মাসের জন্য মাত্র তিন লক্ষ টন গম; চালের পরিমাণ অর্ধেক, প্রায় দেড় লক্ষ টন। পশ্চিম-

বঙ্গকে বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হলে কিন্তু সপ্তাহে আট হাজার টন সংগ্রহের ব্যবস্থা বহাল রাখতে হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি যে পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষে খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরেছে তেমন কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিস্তারিত আলোচনা মন্টিসভার বৈঠকেই হবে। কেন্দ্রীয় আশ্বাস সন্তোষজনক। যদিও রাজ্যের চাহিদা পূরোপূরি মেটাবার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া মধ্যমন্ত্রী আর কিছু প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান।

তবে বর্তমান সংখ্যায় ভারতদর্শন বখন প্রকাশিত হবে তখন পশ্চিমবঙ্গের নতুন খাদ্যনীতি এবং তৎসহ খাদ্য-সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ বিধানসভায় হয় আলোচিত হচ্ছে নতুবা হয়ে গেছে।

জনপ্রিয় নেতৃবর্গের
সম্বর্ধনা

পশ্চিমবঙ্গ চিরকালই কেন্দ্রের অবহেলিত অঙ্গের মতো উপেক্ষিত হয়ে আসছিল। কিন্তু কেরলের মধ্যমন্ত্রী যেমন বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গও আজ তেমনি কথায়নিশ্চিত বোধ করতে পারে এই ভেবে যে, ১৯৬৭ সাল তার পূর্ববর্তী

বৎসরগুলির অনুরূপ নয়। এখন পশ্চিম-বঙ্গে একটি জনপ্রিয় সরকার কার্যভার গ্রহণ করেছেন। এই সরকারের সমস্ত কার্যের পিছনে আছে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। সেজন্যই পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্যক মিটিয়ে দিতেই হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

নতুন সরকারের তিন জনপ্রিয় শীর্ষস্থানীয় নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, উপ-মধ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র খের পালাম বিমান বন্দরে অন্তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপুল স্বাগত অভিনন্দন লাভ করেন—জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে তা' সত্যই লক্ষ্যণীয়। এই তিন প্রধানকে তাই যথোচিত সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েই ফেরৎ পাঠাতে হয়েছে দিল্লী থেকে। মধ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সফরান্ত প্রতিবেদনেও তেমন কথা অনুমান করা সম্ভব। এ সমস্ত কার্যকৌশল মনে হয়, হতাশ হওয়ার মতো প্রচণ্ড কোন সংবাদ আমরা শুনছি না।

ইতিমধ্যে ডঃ খের নাকি প্রাক্তন মধ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বন্দোবস্তের বৈঠকেও মিলেছিলেন।

নয়াদিল্লীতে রাজ্যের মন্ত্রী-প্রতিনিধি-বর্গ চায়ের আসরে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন।

শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাও এইর
সম্মানার্থে একটি চা-আসরের ব্যবস্থা
করেন। মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের সংসদ
সদস্যগণ এবং রাষ্ট্রপতি প্রমুখের উ
রাধাকৃপণের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিন প্রধান

নয়াদিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে
বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে পশ্চিম-
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন,
পশ্চিমবঙ্গের এজেন্সীয়ারিং শিল্প আজ
এক গভীর সংকটের সম্মুখীন। বিগত
কয়েকমাস ধাবৎ কেন্দ্রীয় রেলদপ্তর এই
শিল্পসংস্থাপনগুলির ওপর নতুন চাহিদা
তালিকা পেশ না করার প্রমিত ছাটাইয়ের
সম্ভাবনা উর্কি দিচ্ছে। ফলত শ্রমজীবী-
বহলেও একটা অনিশ্চিতের ভাব লক্ষণীয়
হয়ে উঠছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় জানান,
এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সুরাহার জন্য রাজ্য
সরকার চেষ্টা করছেন। এই সম্মেল-
নমুখ্যমন্ত্রী একথাও জানান যে, শিল্প-
বিরোধের ক্ষেত্রে কোন পক্ষকেই আইন
নিজের হাতে নেওয়ার ও নৈরাজ্য সৃষ্টি
করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

শস্য-কর্তনের আর মাত্র মাসাধিককাল
সময় আছে। পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার
এই সামান্য সময়ের মধ্যেই যথাসম্ভব
সংগ্রহের চেষ্টা করবেন। সেন মন্ত্রিসভা
এ ব্যাপারে যথেষ্ট না করার মুখ্যমন্ত্রী
শ্রীমুখোপাধ্যায় দৃঢ় প্রকাশ করেন।

জনগণের সহায়তায় রাজ্যে ইতি-
মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত গুদাম থেকে
উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্ধার করা
সম্ভব হচ্ছে। কেবলমাত্র পুর্লিশী
প্রচেষ্টার এটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নয়া
সরকার জনগণকে সমাজ সংস্কারে একটি
মূল্যবান ভূমিকা প্রদান করবেন বলে
ঘোষণা করার এবং কার্যত পুর্লিশী
হস্তক্ষেপ কমে যাওয়ার, জনতা
দিগ্বিদিকে (রাজ্যের) বিপুল সম্ভব
ক্ষমতাকে প্রদর্শিত করেছেন ও করছেন।
গুপ্ত শস্যভান্ডার উদ্ধারের সঙ্গে প্রসঙ্গত
হাওড়া স্টেশনে সভাব্য ট্যাক্সী ধর্মঘটের
উল্লেখ করছি। এমন শৃঙ্খলাপূর্ণ জনতার
কথা ইতিপূর্বে কেউ কখনো চিন্তা করেন
নি। উপস্থিত পুর্লিশী অফিসরগণও,
(যাঁরা জনশক্তির মণ্ডলময় কর্মক্ষমতা লক্ষ্য
করে ঘটনাবলীতে নিজেদের অসম্পূর্ণ
রাখেন) এই অভূতপূর্ব ঘটনার বিমূর্খ
প্রসংশা করেছেন।

জনগণের মধ্যে এইভাবেই আসে
নাগরিক দায়িত্ব ও কতব্যবোধ। উপ-
নিবেশিক শাসনে যেমন মানুষকে কতক-
গুলি সম্ভরণ জীবনবৈশেষ্য দেখা হয়,
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার ভবা ভাবৎ
কংগ্রেস সরকারী নীতিও সেই দৃষ্টান্ত

নিরে বেশ শাসন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের
নয়া সরকার উপলব্ধি করেন, আমলাতন্ত-
নিত্য সেই উপনিবেশিক শাসনের ধারা
জনগণকে দেশের ভালমন্দ সম্পর্কে
উদাসীন করে। তাই তাঁরা গণসহযোগিতার
জন্ম আহ্বান জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে
সাড়ো মিলেছে আশ্চর্যকর। বোকা
বাচ্চ, নাগরিকগণ হচ্ছে করলে দেশ থেকে
সমস্ত প্রকার অন্যায়, দুর্নীতি এবং
অ-নাগরিকসুলভ ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে
দিতে পারেন, আমলাতন্তের সরকার যা
শতবর্ষের চেষ্টায়ও করে উঠতে কখনোই
পারবেন না। বলা বাহুল্য, প্রথমাবস্থায়
হয়ত বা কোথাও কোথাও নাগরিকদের মধ্যে
অতি-উৎসাহের লক্ষণ ধরা পড়তে পারে,
কিন্তু তাকেই অব্যবস্থার লক্ষণ বলে
না ধরে উপযুক্ত নেতৃত্ব যদি সেই উৎসাহকে
অভিনবিত্ত করে তাকে সুপথে পরি-
চালিত করেন তবে সুফল অবশ্যম্ভাবী
বলে বর্তমান লেখক দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন।
হাওড়া স্টেশনে তার প্রাথমিক পরিচয়
মিলেছে; লোকনো শস্য উদ্ধার অভিযানেও
তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং
এই গণসহযোগিতায় পূর্ণ আস্থা রেখে
একমাত্র অজয়-জ্যোতির নয়া সরকারই
বৃক ফুলিয়ে বলতে পারেন, সংগ্রহের
ব্যাপারে কোথাও ঘাটতি থাকবে না। না,
থাকবে না। জনগণ বৈদিন দেশের
ভালমন্দের জন্য আপন দায়িত্ব অনুভব
করবেন, সোঁদন অশ্বকরের মানবগুলিও
ভট্টস্থ হয়ে উঠবে। লোকনো গুদাম ও
কালো টাকা অনুভব করবে দেশের লোক
মেরে কোনরকম আত্মপরিচয় সৃষ্টিভোগের
অধিকার কোন বিশেষ মানুষেরই নেই।

জালিকাবন্ধ কর্মসূচীর একটি : অনাস্থা

ইন্দ্রা-মন্ত্রিসভা সভাগৃহে গৃহি-
বসতে না বসতেই চতুর্থ লোকসভার খেত্রে
খাত্য প্রথম অধ্যায়েই অনাস্থার অভি-
যোগ খুলে ধরা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী
শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য ব্যাপারটা সম্পূর্ণ
অবহেলা করেই স্বাধীনতা বলেছেন,
অনাস্থা প্রস্তাব একটি নৈমিত্তিক ঘটনা-
বলীর অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলত তার
মূল্যও হাস পেয়েছে। “আমি এ নিয়ে
আদৌ মাথা ঘামাই না।”

বহুত এবারও প্রধানমন্ত্রীর মাথা
ঘামাবার কোন কারণ দেখা দেয় নি। চতুর্থ
লোকসভার প্রথম অনাস্থা প্রস্তাবটি
২৫৭-১৬২ ভোটে বাতিল হয়ে গেছে।

কমিউনিষ্ট নেতা শ্রী এস এ ডায়ে
কিন্তু প্রধাব্যভাবেই সরকারকে সতর্ক
করে দিতে ভোলেন নি। নয়া সরকার
গদি লাভ করার পরমুহূর্ত থেকেই যে
নীতি গ্রহণ করেছেন তা গণসমস্যা সমা-

ধানের প্রতি কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ না
করে রাজস্থানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু
করেছে। এই কার্যের স্ফারাই কংগ্রেস
তার পুরাতন জনস্বার্থস্বকারী রূপটিকে
পুনশ্চ প্রকট করে তুলল। শ্রীডায়ে
অভিযোগ, রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের
উদ্দেশ্য, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা
গঠনের অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করা।
কংগ্রেসের আজ উত্তর ভারতে গদি
হারানোর ভয়ই মুখ্য। রাজস্থানে অর্ড-
ন্যান্স জারি করে কংগ্রেস প্রাক্তন রাজ-
রাজ্যের সুযোগ-সুবিধে খর্ব করতে ও
একচেটিয়া ব্যবসায়ের বাড়ানো শতম
করতে পারতেন।

উপরোক্ত দুই কারণেই রাজস্থানে
অকংগ্রেসী চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান
সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস দক্ষিণ-
পন্থী শক্তি খর্ব করার অভিযান শুরুর
না কেন? কারণ এই ‘ভারতদর্শন’ের
পাতাতেই ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।
দক্ষিণপন্থাকে কংগ্রেস ডরায় না। এরা
কংগ্রেসের কাছের মানুষ-গণ-আত্মস্বকার
গলা টিপে ধরার ব্যাপারে এরাও কংগ্রেসী
দোসর। সুতরাং বামপন্থী শক্তি যত খর্ব
হয় ততই কংগ্রেসী নেতৃত্বের সুবিধা।
এজন্য রাজস্থান মধ্যপ্রদেশে স্বাধীন সলিল
রচনা করতেও কংগ্রেস পিছপাও হয় নি।
এটা কংগ্রেসী রাজনীতির ব্যর্থতা না বলে,
“সর্বনাশে” সম্মুখপক্ষে চাঞ্চ তাজ্জিত
পশ্চিম? নীতি বলাই উচিত। শ্রীডায়ে
ততদূর বলেন নি। বলতে পারতেন।

শ্রীডায়ে বলেছেন, যে সরকারে
মোরারজী-মেহতার ব্যক্তি বর্তমান, সে
সরকারের পক্ষে শ্রমজীবী মানুষের ভাল-
মন্দ দেখা ও তাঁদের সহায়তায় দেশ
গঠনের পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নয়।
কংগ্রেস বরং একচেটিয়া কারবারী ও
শেঠীয় সমাজের সাহায্যে বামপন্থী রাজ্য
সরকারগুলিকে উৎখাত করার শেষ চেষ্টা
করবে এবং সম্ভবত অধিকতর রাজ্যে
রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করে গণতান্ত্রিক
শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে দেবার প্রয়াস
পাবে। বহুতার উপসংহারে শ্রীডায়ে
প্যারীর গণবিশ্ববের নিজের উদ্ধার করে
ভবিষ্যতের একটি সম্ভাব্য চিত্র তুলে
ধরেন এবং নয়া সরকারকে সতর্ক করে
জনস্বার্থের খাতিরে কাজ করে যাওয়ার
আহ্বান জানান।

লি আই এ:

“জালিকে খবর দিন, আমি খবর নেব”

ভারতে কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা
দপ্তরের জাতীয় স্বার্থবিধ্যকারী কার্য-
কলাপের যে ইঙ্গিত মার্কিন দেশের
দু-একটি নির্ভরযোগ্য পত্রিকায় প্রকাশিত

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সম্ভার

৷ জীবনী - প্রসঙ্গ ৷

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিক্সেলি ১৬.০০ ৷ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় দুই মনীষী ৬.০০ ৷ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ভগিনী নির্মোহিনী ও রাংলায় বিপ্লববাদ ৫.০০; শ্রীশ্রীরাঙ্গকৃষ্ণ ও জগৎ কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫.০০ ৷ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় শৈলী ২.৫০ ৷ সুধা সেন অহাপ্রভু যৌরোগ্যসুন্দর ৮.০০ ৷ দিলীপ মল্লোপাধ্যায় সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত-কল্পতরু ৬.০০ ৷ বলাই দেবশর্মা ব্রহ্মবান্ধব উপাখ্যান ৫.০০ ৷ মণি বাগচি শিশিরকুমার ও বাংলা ধিয়েটার ১০.০০; রামমোহন ৬.০০; প্রহরী দৈবদ্রষ্টা ৮.৫০; কেশবচন্দ্র ৮.৫০; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৮.৫০; রমেশচন্দ্র ৫.০০; দময়ানী বিবেকানন্দ ৫.০০; শিক্ষাবিদ জগদীশ ৫.০০; রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ৬.০০; ব্যক্তিচন্দ্র ৬.০০ ৷ সীতা দেবী পদ্মকুমারি ১০.০০ ৷ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত বরিশি ৬.০০ ৷ সুনীল রায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০.০০ ৷ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গের প্রাচীন কবি ১.০০ ৷ প্রভাতকুমার মল্লোপাধ্যায় রবীন্দ্র বঙ্গী ৮.০০ ৷ ভবলতা দেবী ভক্তকবি মহাদেব রায় ও উৎকলে নবযুগ ৬.০০ ৷ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় The House of the Tagores ১.৫০ ৷ খাজা আহমেদ আব্বাস ফেরে নাই শব্দ একজন ৮.০০ ৷ স্বদেশরঞ্জন দাস আনন্দেন্দ্রনাথ ১৫.০০ ৷ অমল্যচন্দ্র সেন অনোকচরিত ২.৫০ ৷

৷ সাহিত্য - বিবরণ ৷

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বপ্ন-প্রয়াণ ৬.০০ ৷ ভবতোষ দত্ত কাব্যবাণী ১০.০০; চিন্তানারক বঙ্কিমচন্দ্র ৬.০০ ৷ বিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য বাগর্থ ৮.০০ ৷ প্রবোধচন্দ্র সেন স্বপ্ন-পরিভ্রম ৮.০০ ৷ প্রমথনাথ বিশী বাংলা সাহিত্যের সন্ন্যাসী ৬.০০ ৷ বিনয়েন্দ্রনাথায়গ সিংহ রবীন্দ্র-সুভাষিত ১২.০০ ৷ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কাব্যপরিমিত ৩.০০ ৷ বালেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাসগ্রন্থ (রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত) ৭.৫০ ৷ বিমানবিহারী মজুমদার ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীসাহিত্য ১৫.০০; পটিলত বঙ্গের পদাবলী (পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫.০০ ৷ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘদূত ৫.০০ ৷ অজিত দত্ত বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ১২.০০ ৷ শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনূদিত অ্যারিওপ্যাটিকা ৩.০০ ৷ বিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য মনসামঙ্গল ৩.০০ ৷ মদন-মোহন গোস্বামী ভারতচন্দ্র ৩.০০ ৷ অরুণকুমার মল্লোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকব্য ৮.০০ ৷ সাধনকুমার ভট্টাচার্য নাটক লেখার মূলসূত্র ৫.০০; নাটক ও নাটকীয়তা ২.৫০ ৷ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য ৮.০০ ৷ নারায়ণ চৌধুরী আধুনিক সাহিত্যের মূলময়ন ৩.৫০ ৷ সত্যরত্ন দে চর্যাপীঠ পরিচয় ৫.০০ ৷ ধীরেন্দ্র দেবনাথ রথীন্দ্রনাথের দর্শিত মূল্য ৬.০০ ৷ অরুণ ভট্টাচার্য কবি তার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ক্ষুদ্রবন ৮.০০ ৷ আজহাব-উদ্দীন খান বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ৫.০০ ৷ রথীন্দ্রনাথ রায় সাহিত্য-বিচিত্রা ৮.৫০ ৷ লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত তাত্ত্বিক ৮.০০ ৷ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনূদিত আন্তঃগোনে ২.৫০ ৷ প্রবাসজীবন চৌধুরী Tagore On Literature and Aesthetics ৮.৫০; Studies in Aesthetics ১০.০০ ৷ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য কালিদাস ও রথীন্দ্রনাথ ৬.০০ ৷ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মন্মথ (রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত) ৮.০০ ৷ অমিত্রসুন্দর ভট্টাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১০.০০ ৷

৷ বিবিধ ৷

বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও অনূদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (লীলাশুক শ্রীবিষ্মমঙ্গল বিরচিত) ১২.০০ ৷ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া ৬.০০ ৷ গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত জ্ঞানেশ্বরী গীতাভাষা ২০.০০ ৷ সুধামা সেন সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত ১০.০০ ৷ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ হিন্দুসাধনা (Hindu View of Life) গ্রন্থের স্বর্ণপ্রভা সেন কৃত বঙ্গানুবাদ ৩.০০ ৷ কাকা সাহেব কালেকর জীবনগীতা ১০.০০ ৷ প্রবোধচন্দ্র সেন রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি ৩.০০ ৷ তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা রামায়ণতত্ত্ব ৮.৫০ ৷ কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী ভক্তিরসপ্রসঙ্গ ২.৫০ ৷ শিশিরকুমার নিয়োগী সহজ কৃতিবাসী রামায়ণ ৩.৫০ ৷ ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী রামায়ণের কথা ১.৫০ ৷ ভারতজিজ্ঞাসা ৩.০০; অনাবিহা ও দৈনন্দিন জীবন ২.৫০ ৷ সুভাতিরঞ্জন বড়ুয়া বৃন্দাধর্ম ৬.০০ ৷ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক অনাবিহা ৮.০০ ৷ বিশেষবর মিত্র পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ ৩.৫০ ৷ দীনেশচন্দ্র সেন পৌরাণিকী ৬.০০; রামায়ণী কথা ৮.০০; বেহুলা ১.৫০; জড়ভরত ১.৫০; ফুল্লরা ১.৮০; সত্যী ১.৩০; বরাহোপ ও কুশধনু ১.২০ ৷ বিমল রায় ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ ৬.০০ ৷ প্রফুল্লকুমার দাস রথীন্দ্রসঙ্গীত-প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৬.০০ ৷ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও প্রফুল্ল-কুমার দাস হিন্দুধর্মের সংগীতের ইতিহাস ২.৫০ ৷ সন্তোষকুমার দে কবিকর্তৃ ৫.০০ ৷ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় আফ্রিকার চিত্র ১.৫০ ৷ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় লাইব্রেরির উপকথা ১.৫০ ৷ সুনীলকুমার গুহ স্বাধীনতার আবেলতাভোল ৫.০০ ৷ জন স্ট্র্যাচ মহাজাগরণ ১.৫০ ৷ সত্যকৃষ্ণকর সাহানা মহাভারতের অনূদীত তত্ত্ব ২.৫০; চন্দ্রীদাস প্রসঙ্গ ২.৫০; হিন্দুধর্ম ১.৫০; শকুন্তলা রহস্য ২.৫০; বিবিধ প্রবন্ধ ২.৫০; বিচিত্র প্রবন্ধ ২.৫০ ৷ মানবেন্দ্রনাথ রায় মার্কসবাদ ১.৫০; ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ ১.৫০; দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কিশোর বিজ্ঞানী (হাতেকলমে বিজ্ঞান-গবেষণা বিষয়ক পুস্তক) ২.৫০ ৷ জাকির হোসেন ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠন ১.০০ ৷ সুনীলচন্দ্র সরকার রথীন্দ্রনাথের শিক্ষাবর্ন ও সাধনা ৬.০০ ৷ শশাঙ্কমোহন চৌধুরী কালপরিভ্রম ৬.০০ ৷ অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ল্যান্ড-স্ক (কনফুসিয়াসের কথোপকথন) ৫.০০ ৷ হরিশচন্দ্র সান্যাল চৈতন্যোদয় ২.৫০; জ্ঞানদর্পণ ২.৫০ ৷

জিজ্ঞাসা ৷ ১০০এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯ ৷ ১ ও ৩০ কলকাতা ৯

হয়েছে, তাই নিয়ে লোকসভায় তুমুল ঝড়ক উপস্থিত হলে পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী শ্রীচাগলা বলেন, 'সি আই এ' তৎপরতার কোন সংবাদই সরকারের গোচরে নেই, তবে কেউ যদি এ বিষয়ে তাঁকে খবর দেন, তিনি কতবোয় খাতিরে তাহলে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন।

অবশেষে সরকারী ও বিরোধী পক্ষের যুগপৎ উদ্বেগ ও উত্তেজনা লক্ষ্য করে শ্রীচাগলা বলেছেন, দেশের স্বার্থের জন্য সর্বস্বতরে এই উদ্বেগ লক্ষ্য করে তিনি পরম সন্তোষ লাভ করেছেন, অতঃপর নিশ্চয়ই বিশেষভাবে বিষয়টির অনুসন্ধান-কার্য চালানো হবে।

সি আই এ-র অর্থপূর্ণ বিভিন্ন সংস্থা ভারতের সর্বস্বত্বের ক্রিয়াকলাপের ওপর পব্যাক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ এই সব সংস্থার সঙ্গে সংযোগ আছে দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং রাজ ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের। প্রকাশ, বিশেষ বিশেষ সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের ওপরও সি আই এ তার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় সচেষ্ট থাকে। তবে, শ্রীচাগলার বক্তব্য, সি আই এ-র দুরভিসন্ধি সম্পর্কে কেউই জানত সচেতন নন।

বিরোধীগণ্য থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন শ্রীমোবারজী দেশাই ও শ্রীদীনেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়েছে, কংগ্রেসপক্ষ থেকে শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ তেজিন প্রশ্ন করেন, সি আই এ-পুঙ্খ সংস্থার সঙ্গে কি শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননেরও যোগাযোগ ছিল না? কংগ্রেসী সদস্য শ্রীশশিভূষণ জ্ঞানতে চান, জনসম্মুখনে শ্রীমোবারজী-করমোজা ভ্রমণের টাকাই বা এলো কোথেকে; আর এস এস বাহিনীর বিদ্যার্থী পবিত্রদের খরচ-খরচাই বা কারা-বহন করেন? সি আই এ কি এখানেও তার উর্গনাভজাল বিস্তার করে নি।

বিতর্কের মাঝেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট নেতা মার্কিন পদস্থ কূটনৈতিক দূত জন কর্মচারীকে সম্মানে ভারত থেকে ফেরৎ পাঠাবার দাবি তোলেন।

সব মিলে একটা পৃথিবীবিখ্যাত কুখ্যাত গোয়েন্দাবাহিনীর কীর্তিকলাপের আলোচনার সরগরম হয়ে উঠেছিল সভাগৃহ। আলোচনায় এইটুকু বেশ পবিত্রকার হয়েছে যে, ভারতের আভ্যন্তরিক নিরাপত্তায় হস্তক্ষেপে সি আই এ বেশ তৎপরতা চালিয়ে আসছে। সি আই এ ডঃ সোয়েবানোর পতন, ইরানের মোসাদেকের অপসারণ, গুল্লাতেমালার কর্নেল আরবেঞ্জের অপসারণ, সোভিয়েটে গোয়েন্দা বিমান প্রেরণ, কিউবার ক্ষেপণাস্রের উপস্থিতি চিহ্নিতকরণ

প্রভৃতি ব্যাপারের সঙ্গে নিজের কুর্কীতির উদাহরণ রেখেছে। শোনা যাচ্ছে, ভারতের পারমাণবিক অগ্নিগতি সম্পর্কেও নাকি সি আই এ-র দপ্তরে অনেক সংবাদ আছে।

সুতরাং একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে একটি বিদেশী গুপ্তচরবাহিনীর এই ক্রিয়াকলাপ সহ্য করতে কেউই রাজী নন। দাবি তাই, কুখ্যাত সি আই এ-র গুপ্ত কাজকারবার সম্পর্কে আশু তদন্ত করে কুখ্যাত সি আই এ বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়া দরকার; এবং কোন সংস্থা, সরকারী বা বেসরকারী থাকে কোন সূত্রে বৈদেশিক অর্থসাহায্য অর্থের মত গ্রহণের পরে দস্তরাঞ্জি বিকশিত করে না বলে যে, আমি তো স্যার জ্ঞানতাম না, টাকা পেয়েছি আর নির্দোষের মতো পকেটে পুরেছি— এমনতর অবস্থাতে ঘটনা ঘটে না ঘটে, তার জন্য সর্বস্বতরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

হিরিয়ানা হাতছাড়

অবশেষে শ্রীভগবৎদয়াল শর্মাকে তাঁর তেরদিনের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পদত্যাগ করতে হ'ল। (পূর্ববর্তী সংখ্যায় হিরিয়ানার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য)। হিরিয়ানাকে নিয়ে ভারতে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সংখ্যা সাত।

হিরিয়ানা লোকসভার বর্তমান স্পীকার রাও বীরেন্দ্র সিং তাঁর বর্তমান পদে ইস্তফা দিয়ে সংযুক্ত দল গঠিত মন্ত্রিসভার প্রধানরূপে রাজ্যের শাসনক্ষমতা অধিকার করলেন। দলের স্পীকার পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবেন শ্রীচাঁদ। একাধি আসনবিশিষ্ট হিরিয়ানা রাজ্যে দলের বর্তমান সদস্যসংখ্যাও বর্ধিত হয়ে ৪৮-এ দাঁড়াল। ভগবৎদয়াল-মন্ত্রিসভার দু' নম্বর মন্ত্রী শ্রীহরদেবারিলাল, শ্রীহর-কুল সিং এবং শ্রীমোহনলাল ঠাকুরের সঙ্গে দ্রুশ্বে যোগদানের ফলেই দলের সদস্যসংখ্যা স্ফীততর হয়েছে।

মন্ত্রিসভা

মন্ত্রিসভার কলেবর মধ্যমন্ত্রী সহ একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও দু'জন ডেপুটি মন্ত্রীর দ্বারা অলঙ্কৃত হ'ল। দয়াল-মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা ছিল এগার।

মন্ত্রিসভার দলভিত্তিক সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে গরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন হিরিয়ানা কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দই। মন্ত্রিসভার এই প্রাক্তন কংগ্রেসীদের সংখ্যা নয়জন। নির্দলীয়দের দেওয়া হয়েছে পাঁচটি মন্ত্রীর পদ। জনসম্মুখ, স্বতন্ত্র এবং রিপাবলিকান পার্টি পেয়েছে একটি করে আসন। অথচ জনসম্মুখের বিধান সভায় মোট আসন বার।

দলত্যাগী কংগ্রেসী মধ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং বলেন, স্থায়ীত্বের জন্যই তাঁর মন্ত্রিসভায় কলেবরকে এইভাবে সাজাতে হল। তিনি মনে করেন, বর্তমান মন্ত্রিসভা হিরিয়ানাবাসীকে খুব ভালো-ভাবেই সেবা করতে পারবে—কেন না বিভিন্ন দলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগকেই মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয়েছে।

ভাঙাগড়ার কারিগর রাও বীরেন্দ্র সিং

মধ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং আজ বলেই নয়, লোকান্তরিত অশ্রু পাঞ্জাবের কাহারো মন্ত্রিসভার আমল থেকেই মন্ত্রী ভাঙাগড়ার কারিগর হিসেবে পরিচিত পুরুষ। কার্যরো মন্ত্রিসভায় তিনি পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব সমাঙ্গীন ছিলেন। মধ্যমন্ত্রী কার্যরোর ডান হাত বলেও তাঁর প্রখ্যাত ছিল। কিন্তু কার্যরো মন্ত্রিসভা থেকে বীরেন্দ্র সিং বৈদিন পদচ্যুত হলেন, প্রতাপ সিং কার্যরোর পতনও সেইদিন থেকেই শুরু। রাজনীতির পাকা খেলোয়াড় বীরেন্দ্র সিং-কে সহজে কাৎ করা যায় না। প্রতাপ সিং কার্যরোকেও তাই রাও বীরেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছিল। কার্যরো ছুটে গেছিলেন বীরেন্দ্র সিং-এর আবাসে। আবেদন ছিল বন্ধুত্বের। মঞ্জুরও হয়েছিল সে আবেদন।

পদত্যাগী কংগ্রেসী মধ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মার সঙ্গে কিছু শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসা সম্ভব হ'ব নি। মন্ত্রিসভাই সেজনা হারাতে হয়েছে শ্রীদয়ালকে।

১৯৫৪ সালে আইনসভায় রাও বীরেন্দ্র সিং-এর প্রবেশ। এই বছর তিনি পাঞ্জাব লোকসভালোটিভ কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত হন। পাঞ্জাবের সঙ্গে পেপসু সংযুক্ত হলে তিনি হলেন পাঞ্জাব মন্ত্রিসভায় উপমন্ত্রী। তারপর কার্যরো মন্ত্রিসভায় অনেক কূটনৈতিক চাল চলে শ্রীদয়ালের ওপর-চালাকি খতম করে রাও বীরেন্দ্র সিং আজ হিরিয়ানার মধ্যমন্ত্রী। দল গড়তে জানেন তিনি। জানেন কেমন কবে দল ভাঙতে হয়। সুতরাং রাও বীরেন্দ্র সিং যে হিরিয়ানার হাল ভাল-ভাবেই ধরতে পারবেন এ বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। তবে বীরেন্দ্র সিং নিজেকে মিলিটারি। তাঁর মেজাজও বেশ চড়া সুবেই বাঁধা। তাই পাঁচমিশেলি দলের আধিপত্যে তিনি এবার কেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাও যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্বেক করবে।

ব্রহ্মা ভাতা সম্পর্কে কেরলা সরকারের দিম্বান্দ

কেবালার যুক্তফ্রন্ট সরকার নয়। গ্যাসনের বোধন গুরুত্বই সরকারী

সাপ্তাহিক বসুমতী

কর্মচারীদের ন্যায় পাওয়া মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বণ্ডিত রাজ্য সরকারী কর্মচারীমহলকে সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ করতে পেরেছেন। সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশব্যাপী যে কর্মচারী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, সেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অন্যতম দাবি ছিল মূল্য-বৃদ্ধির দ্রুপ আর্থিক চাপের মোকাবিলা করার জন্য বর্ধিত হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে সরকারকে।

একথা আমরা সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় বারম্বার উল্লেখ করে এসেছি যে, একই মূল্যস্তরের আওতায় একই দেশে সরকারী কর্মচারিবৃন্দ বসবাস করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য যে মহার্ঘ ভাতা চালু আছে, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের তদপেক্ষা কম মহার্ঘ ভাতা প্রদানের কোন যৌক্তিকতা তো নেইই; যার এর দ্বারা সমাজতন্ত্রের বুলিসর্বস্ব সরকার আপন কর্মচারী স্তরেই আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। কেবলমাত্র মহার্ঘ ভাতার ক্ষেত্রেই একই সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বহুস্থলে বিভিন্ন বেতন-হার একই স্তরের কাজের জন্যও চালু রাখা হয়েছে। এই বৈষম্য বাখার দ্বারা সরকার কোন আঙ্গব সমাজবাদের স্বপ্ন দেখেন আমাদের তা বোধের অতীত। সুতরাং বিষয়, নান্দুদ্রিপাদ-সবকাব ক্ষমতা পাওয়ামাত্রই এই বৈষম্য বিলোপের সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য রাজ্য সরকারকে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অর্থেই পরিমাণ বাৎসরিক ছয় কোটি টাকা। মদ্যামশ্রী নান্দুদ্রিপাদ এ বিষয়ে একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি একটি সর্ব-ভারতীয় সমস্যা। সুতরাং মহার্ঘ ভাতাব প্রশ্নটিও সর্বভারতীয় সমস্যাব আলোকে বিচার। আর সে কারণ যখনই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্ন দেখা দেবে তখনই কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েরই একই স্তরে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। মহার্ঘ ভাতা প্রদানের জন্য অর্থ সংস্থানের দায়িত্বও উপবোদ্ধ কাবণে কেন্দ্রের ওপরেই থাকা হবে।

যুক্তিটি অনস্বীকার্য। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় নীতিরই ফলশ্রুতি। কেন্দ্রীয় নীতির জন্য যখন কেন্দ্র-রাজ্য উভয় স্তরের কর্মচারীই ভুক্তভোগী তখন কেন্দ্র কোন যুক্তিতেই নিজেব স্বর সামলে অর্থমূল্য হ্রাসের (দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানেই তাই) সমগ্র বোঝাটি রাজ্য সরকারী কর্ম-চারীদের ঘাড়ে তুলে দিয়ে মজা দেখতে পারে না।

বিভিন্ন বাজ্যের অকংগ্রেসী সরকার প্রিন্সিপালদের যুক্তিতে কেন্দ্রের কাছে একই দাবি উত্থাপন করে বহুকাল বণ্ডিত

এবং উৎপীড়িত স্বল্প বেতনভুক্ত রাজ্য কর্মচারীদের বাঁচার মত ব্যবস্থা করতে অতঃপর সাগ্রহী হবেন বলে আশা রাখতে পারি। বিভিন্ন রাজ্যের যুক্ত প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকারকেও তার কৃতকর্মে ক্রিষ্ট রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক বরাদ্দের জন্য অবশ্যই অর্থ সংস্থানের পথ খুঁজে বার করতে হবে। এই বৈষম্য অধিককাল একতরফা সহ্য করার জন্য রাজ্য সরকারী কর্মীদের বাধ্য করা যার না, একথাও উপলক্ষ্য করার সময় এসেছে।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ (রাজনৈতিক দল : কংগ্রেস)

অতএব “ভারতদর্শনকার” এতদিন বৃথাই কাগজ ও কলসের মাধ্যমে চিৎকার করেন নি। আপাতত দেখা যাচ্ছে, কলির কুম্ভকর্ণ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাথমিক নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। অবশ্যই সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রতি সংখ্যায় “ভারত-দর্শনের” দ্বন্দ্ব ভাঙননা প্রবন্ধাবলীর জন্য নয়, সেই প্রবন্ধে যে ভাষিত ভারতের কথা বাবম্বার প্রতিফলিত করে তোলা হয়েছিল,

সেই ভাষিত ভারতই আজ কলির কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের কাবণ হয়েছেন।

ঠান্ডা ঘরে আরেসী ডানলোপিলোয় নাইট ক্রাফ ফেরৎ কংগ্রেস উনিশ বছর যাবৎ মহানিদ্রায় সুস্থ ছিল। ১৯৬৭-ব এক শব্দায় এখন দুই হাতের পাতা উল্টে দুই চোখ রগড়ে রাঙা করে তুলেছে সে। আর রগড় শব্দ হলেছে বাজ্যো রাজ্যো।

রাজধানীর একটি দৈনিকের বিশেষ সংবাদদাতা কংগ্রেস ও কংগ্রেস-প্রধান শ্রীকান্তবাজের উত্তর-নির্বাচনী চিন্তার নিম্নলিখিতরূপ চিত্র তুলে ধরেছেনঃ

ষাট কেন্দ্রীয় সরকারী মহলের অদ্যাপি আয়তুষ্টি এই যে, এবারকাব নির্বাচনে কার্যত কংগ্রেসের পতন হয় নি। কারণ কংগ্রেস পূর্ববর্তী নির্বাচনে অপেক্ষা এবার কিছু কম ভোট টেনেছে মাত্র। এবং যেহেতু কংগ্রেসী পতন বলতে কতি-পয় কংগ্রেসী নেতা ও সাংগঠনিক কার্যে পুরোধা ব্যক্তির পতনই সর্বশেষ উল্লেখ-যোগ্য এবং যেহেতু কোথাও কোথাও কয়েকজন কংগ্রেসী পান্ডার জনাই সেইসব রাজ্যে দুর্বল দুনীতিগ্রস্ত ও ক্ষমতা-লোভী চক্রকে অপসারিত করা সম্ভব হব নি, কংগ্রেসী পতন মূলত সেইসব

গুডমর্কি : ৩১শে : মার্চ : শুক্রবার !

মহাতারতের বিবাট-পর্ব অবলম্বনে জীকজয়কপূর্ণ ছবি---

নবোদয় পিকচার্সের
বাংলা পৌরাণিক চিত্র নিবেদন

**দশ্যু পাণ্ডবের
ত্রাজাতবাস**

গণনাগ
চন্দ্রপ্রভা রায়
পরিচালনা
উমাপ্রসাদ চৌধুরী
সীমিতকাল
গৌরীপ্রসাদ মজুমদার

লাইফ-সিবিএন
বিলিউ

রূপবাণী : সুরশ্রী : রূপময় : আলোছায়া : আলোছায়া

অশোকা : পাবিজাত : যোগমায়া : শাপুরী : নেত্র : নিউতকণ :
শ্রীমা ও অন্যত্র ॥

কংগ্রেসই ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে: উত্তরপ্রদেশে “অক্ষয়” মধ্য-মন্ত্রীকে ধরে রাখার চেষ্টা; বিহারে পুনর্নির্বাচিতকালীন শাসনযন্ত্রকে জিইয়ে রাখা; পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজর মদ্য-পাধ্যায়ের সঙ্গে (বর্তমান মধ্যমন্ত্রী) একটা আপেক্ষ মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পথে কংগ্রেসী ক্ষমতাচ্যুতায়ণকর্তৃক নানাবিকল্প বাহ্যাসুপ্তি করা প্রভৃতি।

শ্রীকামরাজ নাদার কিন্তু এই আশ্ব-সন্তুষ্টিতে গলগলান করিতে রাজী হন নি। তিনি সেই সমস্ত পাক ঘেঁটেছেন, যে পাক কংগ্রেস আকর্ষণ ডুবছে বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ‘ভারতদর্শনে’ সত্যকীর্ত্তন প্রবন্ধমালা সাজিয়ে গেছি আমরা।

সেই বক্তব্যই কংগ্রেসপ্রধান এতদিনে স্বীকার কবে বলছেন: বস্তুত কংগ্রেসের ক্ষমতামর্দ কংগ্রেসকে দিনের পর দিন জন-সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ফলেই আজকের অঘটন সম্ভব হয়েছে।

অঘটনই। এ এমন একটা দেশ যেখানে কোন একটা ঘটনা ঘটানোর ধকল বড় বেশি। আমাদের স্বাধীনবাহুর প্রতি আত্মনিত্যক প্রীতিবশত আমরা মরীয়া হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত কোন একটি চলিত প্রথাকে পরিবর্তন করতে ভয়ঙ্কর ভয় পাই। অর্থাৎ একপেরিমেন্টে আমাদের সাংঘাতিক অনীহা। এজন্যই আমাদেরই প্রত্যয়ে লালিত অত্যাচারী ওমর-ওমরাহ, বাদশ-বেগম, রাজা-রাণী এবং অবশেষে কংগ্রেসী কর্তাদের ঘাড় গুঁজে আমরা সহ্য করে এসেছি। আজকের চিহ্নও (আগেও বহুবাহর বলোছি) খুব সুবিধের নয়।

গুরাতনী টানে উত্তর ভারতকে আমরা তাঁদের হাতেই তুলে দিয়েছি যারা সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাব বিরোধিতা করে জনগণকে পুনশ্চ কতিপয় প্রাসাদবাসীর পদানত করতে সোৎসুক। তাই নির্বাচন করে সরকার গঠনের অধিকার পাওয়া সত্ত্বেও আমরা গরু-ভেড়া-ছাগলের মতো নিজেরদের সপে দিয়ে আসছিলাম এক-শ্রেণীর ব্যক্তিগতখাদ্যীদের খুপরে, যারা জমিদারী মেজাজে আমাদের সম্পদ নিয়েই আমাদের দারিদ্র্যের ও হতাশার-অন্ধকারে দিনের পর দিন ঠেলে দিয়ে আসছিলেন। আজ সেই চিত্রের সামান্য উনিশ-বিশ হওয়ার আমরা সাধারণ মানুষ যেমনি উত্তেজনারে ধর ধর করে কাঁপছি; গদি-চুত জাতীয় কংগ্রেস তেমনি এ কাঁ অঘটন ঘটল ভেবে ভয়ে ধর ধর করে কাঁপছেন। ভোটের মাধ্যমে এই হেরফেরই যেন একটা সাংঘাতিক বিপ্লববিশেষ। অথচ অন্যর যেখানে গণতান্ত্রিক শাসন বর্তমান, সেখানে বিপ্লববিশেষ বিজয়ী চার্চিল সাহেবকেও দেশের লোক হুট করে বিরোধী আসনে গিয়ে বসার নির্দেশ দেয় অক্লেশে। তাতে এমন হে-হে রৈ-রৈ পড়ে যায় নি। কন-জারভেট্ট বা লেবার, লিবারেল বা ডেমোক্র্যাট কেউ কপাল চাপড়ে মরে নি। আমাদের দেশটাকে তাই একটা অশ্চর্য বিরাট গণতান্ত্রিক দেশ বলে গর্বে ডগমগ হওয়ার কারণ নেই। এখানের মেজাজটাই রাজতান্ত্রিক আজও। তাই গণতান্ত্রিক দেশে জাতির প্রতি তত্বো অবহেলার দরুণ কোন দলকে মাথা গুঁড়িয়ে মসনদ থেকে মাঠে নেমে যেতে হলে মনে হয়,

আসন্ন হিমাচলই বুঝি চলকে উঠল। যেন একটা সাংঘাতিক বিপ্লব হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই হয় নি। যা কিছু হওয়ার তা সবই পড়ে আছে হওয়ার অপেক্ষায়। যা হয়েছে তা হল, আত্মসুখপরায়ণ আয়েসী একশ্রেণীর তথাকথিত দেশনেতার পতন। এখন যা হওয়ার দরকার নবগঠিত সরকারদলিকে সেদিকেই দৃষ্টি রাখতে হবে। গণস্বার্থ রক্ষার দিকে সত্যক নজর দেওয়া এবং সরকারের সঙ্গে ও সরকারী দল কিম্বা দলগুলির সঙ্গে নিয়মিত গণ-সংযোগ বজায় রাখা। নতুবা কংগ্রেস যেপথে পা পিছলেছে, অন্যরও সেই একই ইতিবৃত্ত রচিত হবে।

গণ-সহযোগিতাকে ভয় পেয়েছে ঔপ-নির্বোধিক শাসন। আর গণ-সহযোগিতাকে আহ্বান জানিয়েছে কল্যাণমূলক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকার। ফলাফলও দুরূহ। প্রমাণ সমেত পৃথিবীর বহু স্থানেই তা হাজিরও আছে। সম্প্রতি শহর কলকাতায় হাওড়া স্টেশনের সামনে ট্যান্ডি ধর্মঘট এবং (পুলিশ নয়) জনগণের হস্তক্ষেপে সমস্যা সৃষ্টির মীমাংসা এক নয়া ব্যবস্থার সাক্ষ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। স্মার্তব্য যে, পশ্চিম-বঙ্গের নতুন সংস্কৃত সরকার আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরতা ভাগ্য করে গণ-সহযোগিতা আহ্বান করেছিলেন। রাজ্যের নাগরিক-গণ কর্তব্যবানগণতার সুন্দর নজির হাতে হাতে উপহার দিয়েছেন। সংবাদটি বর্তমান লেখককে চমকিত এবং মৃদু করেছে।

কংগ্রেস অতবড় একটা স্বাধীনতা-সংগ্রামে জনগণের পাশে পাশে থেকেও সামান্য মসনদের তাপে জনগণের প্রচণ্ড শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। প্রতি-দানে দেশের লোকও এই কংগ্রেসকে আজ বিশ্বাস করতে নারাজ।

কংগ্রেস-প্রধান এসব ব্যাপার এখন তলিয়ে বোঝার ক্ষমতা পেয়েছেন। কংগ্রেসী সংগঠনের মনে পড়ে গেছে (উপরোক্ত সংবাদে প্রকাশ), বোম্বাই-এ এ-আই-সি-সি-র বিগত অধিবেশনে বিলাস-বাসনের চাড়া লাগে হয়েছিল। বিদেশী কেডায় নাইট ক্লাব এবং প্রাগমাতানো উৎসবের আয়োজন ছিল। কাজগুলো ভাল হয় নি। সংগঠনে মাথাওয়ালা লোক ছিলেন বলেই ধারণা ছিল আমাদের। তা এদের মস্তিষ্ক যে নির্বচন-পূর্ব আমলে নিষ্কিয় হয়ে পড়েছিল এমন কথা ভাবতে ভাল লাগে না। ওরা আবাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বোধহয়। আরাম চেয়ে আজ লক্ষ্য পেয়েছেন।

এবার কার্যনির্বাহক কমিটি সব দিক তলিয়ে ভাববেন অর্থাৎ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। ভাল। দেরি হোক, ভাব কাজ হোক।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ঝগোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গদ্যী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল জ্ঞান লেখনীর প্রতিভা-নির্ভরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—বিনি সহজ সরল ভাষায় পণ্ডিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র কবিতা

করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুসুন্দর বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের অগ্ণিব-কীর্ত্তির নতুন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১য় খণ্ড দুই টাকা

সমুদ্রী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী ঝাংগলী স্ট্রীট, কলি-১২

ভিয়েতনাম :

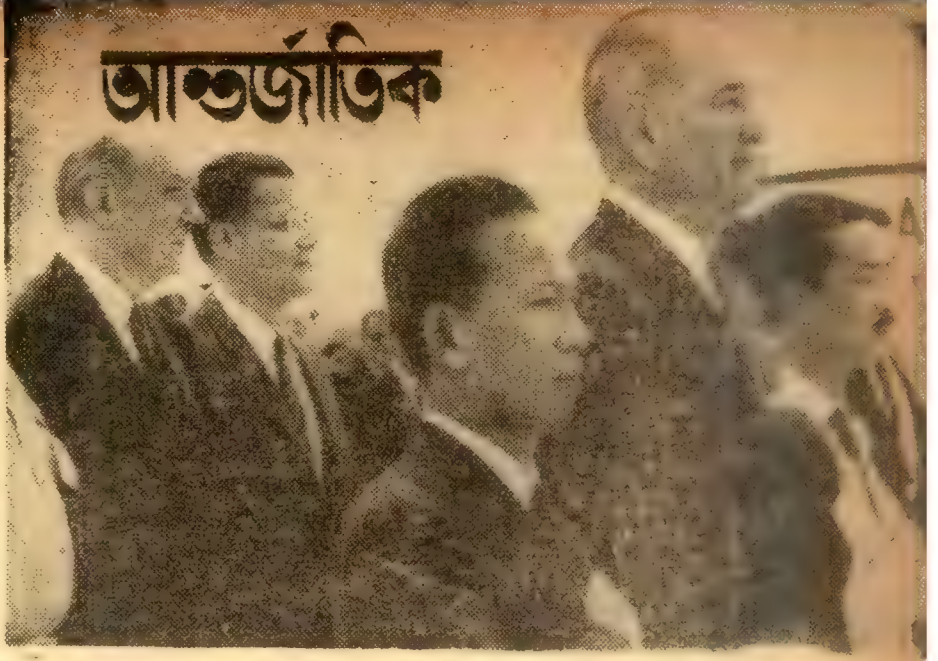
প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়াম দ্বীপে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট জনসন শান্তির পথ-সম্মানে। এখানে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট জুয়েন ভান থিউ, প্রধানমন্ত্রী কাও কী-র সঙ্গে দু'দিন ধরে সম্মেলন হলো। এঁরা ছাড়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ডীন রাস্ক, প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা, সায়গনস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরি ক্যাবট লজ, ভিয়েতনামের মার্কিন সেনামণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্টমোরল্যান্ড প্রমুখ।

সম্মেলনের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার করা হয়েছে তাতে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সম্পর্কে নতুন কিছু বলা হয় নি, শুধু যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং সম্মানজনক শান্তির সম্মান করার কথাই বলা হয়েছে। এ কথাও উত্তর ভিয়েতনামকে স্বরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে জোর-জবরদস্তি করে তারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম দখল করতে পারবে না। কিন্তু নতুন কোন যুদ্ধনীতি বা সৈন্যসংখ্যা বায়ানো সম্পর্কেও যুক্ত ইস্তাহারে কিছু বলা হয় নি।

অবশ্য সম্মেলনে আরো অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যুক্ত ইস্তাহারে যা স্থান পায় নি। কারণ গুয়াম থেকে প্রেসিডেন্ট থিউ উত্তর ভিয়েতনামের কাছে যে শান্তি প্রস্তাব করেছেন তার বয়ান খে মার্কিন কতৃপক্ষই তৈরি করে দিয়েছেন এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের নির্দেশেই করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রেসিডেন্ট থিউ উত্তর ভিয়েতনামের কাছে সরাসরি শান্তি আলোচনার জন্য এক প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে স্খিয়া করেন নি যে, তাঁর কাছে শান্তির অর্থ হলো, দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক শান্তি। তিনি একথাও বলেছেন যে হ্যানয় সরকার যদি শান্তি টেবিলে জাতীয় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিকেও আনতে চান তাতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার কোন বাধা দেবেন না।

কিন্তু গুয়াম সম্মেলন বা প্রেসিডেন্ট থিউ-র শান্তি প্রস্তাবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রেসিডেন্ট জনসন ও প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের পত্রবিনিময়। গত ২রা ফেব্রুয়ারী এই চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট জনসন ডঃ হো চি মিনের কাছে ভিয়েতনামের যুদ্ধে অহেতুক লোক-ক্ষয়, সম্পত্তি নাশ ও জাতীয় অর্থনীতির বিপর্ষয় ঘটেছে তার উল্লেখ করে শান্তি প্রস্তাব করেন। তিনি তাঁর চিঠিতে একথাও বলেন যে, উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে আমেরিকা রাজ্য

আন্তর্জাতিক



গুয়াম সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ—ডীন রাস্ক, রবার্ট ম্যাকনামারা, জনসন ও কাও কী প্রমুখ

আছে যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হয়। এ পত্রবিনিময় গোপন রাখা হবে বলে প্রেসিডেন্ট জনসন আশা করেছিলেন, বাস্তবিক দেড় মাস তাই ছিলো, কিন্তু ডঃ হো চি মিন বথন দেখলেন যে, প্রেসিডেন্ট জনসন পৃথিবীকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করছেন, তাঁর শান্তি প্রস্তাব ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন চিঠিগুলি প্রকাশ করে দেওয়াই তিনি সমীচীন মনে করেন। ডঃ হো চি মিন তাঁর জবাবে বলেছেন যে ভিয়েতনামে যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে, কারখানা ধ্বংস হচ্ছে, ক্ষেত-খামার নষ্ট হচ্ছে তার প্রধান দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ভিয়েতনামের সমস্যা মিটাবার ভার ভিয়েতনামীদের হাতে ছেড়ে দিতেন, যদি অনায়ভাবে তাঁরা সাত হাজার মাইল দূর থেকে এসে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্বময় কর্তা সেক্সে না বসতেন তবে ভিয়েতনামের যুদ্ধ বহু আগেই মিটে যেত। এমন কি ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি কার্যকর করার ব্যাপারেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পদচ্যুত ও নিহত দিয়েমের মারফৎ। শান্তির কথা আগেও বহুবার উঠেছে, কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে অপর পক্ষের সমর্থন এবং সহযোগিতাও অতাবশ্যক এ-সত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার স্বীকার করে নিতে চান নি। তাই জাতীয় মুক্তিবাহিনীকে তাঁরা শান্তি টেবিলে বসার অধিকার দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু এখন বাস্তব সত্যকে তাঁরা খানিকটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। কিন্তু ওই বাণীটাই কেবল, সম্পূর্ণটা নয়।

কারণ, তা যদি পারতেন তবে প্রেসিডেন্ট থিউ-র শান্তি প্রস্তাবে গ্রহণের অযোগ্য শর্ত থাকতো না। প্রথমত তিনি যে শেখানো বুলি আউড়ে গিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন না থাকলে প্রেসিডেন্ট থিউ যে এ-প্রস্তাব দিতেও সাহসী হতেন না তা আর কাউকে বৃথিগে বলতে হবে না। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? জেনেভা চুক্তিতে (১৯৫৪) কিন্তু দুই ভিয়েতনামকে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট থিউ কি তবে প্রকাশ্যে সে-চুক্তি বাতিল করার গ্যারান্টি চাইছেন উত্তর ভিয়েতনামের কাছে? জেনেভা চুক্তিকে লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে সৈন্য মোতায়েন করেছেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, সে-পাশে এখন উত্তর ভিয়েতনামকেও জড়ানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনাম যে সে ফাদে পা দেবে না তা ডঃ হো চি মিনের চিঠিতেই প্রকাশ পাচ্ছে। ডঃ হো বলেছেন যে, উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ না হলে, ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ করে না নিলে কোন শান্তি বৈঠক ফলপ্রসূ হতে পারে না। উত্তর ভিয়েতনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সৈন্য অনুপ্রবেশ করেছে বলে যে অভিযোগ মার্কিন পক্ষ বা দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে করা হয়েছে সেটা আসলে জাতীয় মুক্তিবাহিনীকে পণ্ডা করারই মতলব। জাতীয় মুক্তিবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মার্কিন প্রভাবমুক্ত করার জন্যে অমিতব্যয়ী লড়ে চলেছে সাত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্ভূত সামরিক অস্ত্র দিয়েও পেরে

উঠে না এদের কাবু করতে বরং দাঁকিল ভিয়েতনামের দুই-তৃতীয়াংশই ভিয়েত কংদের দখলে চলে গিয়েছে। এ-অবস্থায় ভিয়েত কংদের শান্তি আলোচনার যোগ দিতে না দিয়ে উপায়ই বা কি?

সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাও আবার ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে নতুন উদ্যম দেখাচ্ছেন। কিন্তু ইউ থাও'র প্রস্তাব তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানতে রাজী নয়। অর্থাৎ বিনা শর্তে হয়ানরে ১০-১৫ বছর বন্ধ করতে তো তাঁরা সম্মত হচ্ছে না। একথা সত্যি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ১৫-ব ভিয়েতনাম যদি সরাসরি শান্তি আলোচনা করে তাতে অনেক বিষয়ই পরিষ্কার হবে, দর কষাকষিটা ও মধ্যবর্তী কারুর মাধ্যমে করতে হবে না। কিন্তু নিঃশর্তভাবে হয়ানরে বোমাবাজ বন্ধ করতে রাজী না হলে উত্তর ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহবোধ করবে বলে মনে হয় না।

সিয়েরা লিওন :

আফ্রিকার এই ছোট রাষ্ট্রটিতে একটা আকর্ষণীয় পালা-নাটক হয়ে গেল। অবশ্য নাটক বলে তাকে তুচ্ছ করা সঙ্গত হবে না, বরং এর ফলে একটা জরুরী প্রশ্ন চিন্তাশীল মানবদের মনে দেখা দিয়েছে। প্রশ্নটি হলো : আফ্রিকার গণতন্ত্র টিকবে কি না। কারণ, সিয়েরা লিওনকে নিয়ে গত দু'বছরে আফ্রিকার ১০টি দেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

এখানকার সামরিক অফিসারেরা দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। দেশের সংবিধান তাঁরা বাতিল করে দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ভেঙে দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক নেতাদের পাহারাধীন অবস্থায় কনট্রোল রেখেছেন। সামরিক অভ্যুত্থানটি নীরবে ও নিঃশব্দেই সংঘটিত হয়, এক ফোটা রক্তপাতও ঘটে নি। “নতুন সংস্কার পরিষদের” নেতা মনোনিীত হয়েছেন একটেনাণ্ট কর্নেল আমরোজ প্যাট্রিক শেডা—যিনি ছোটদের চাচা আমরোজ নামে সর্বাধিক পরিচিত এবং যিনি বর্তমানে তাঁর রাষ্ট্রের সেকেন্ড সেক্রেটারী হিসাবে রাষ্ট্রসংঘে রয়েছেন।

নাটক বলা হচ্ছে প্রধানত এজন্য যে, সেনাবাহিনীর যে অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার ডেভিড লানসানা দু'দিন আগে সিয়েরা লিওনের সমস্ত কতৃৎ কার্যত নিজের হাতে নিয়েছিলেন, তাঁরও এখন বন্দিদশা। ক্ষমতার লড়াই-ই এ নাটকের কারণ যদিও সে-লড়াই সরাসরি সূত্র হয় নি। মাত্র কদিন আগে এখানে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেলো এবং সে-নির্বাচনে তারতের

শাসকদল কংগ্রেস এবং জুসেসের দা গলের শাসকদল ইউ-এন-আর-এর মতো এখানকার শাসকদল পিপলস পার্টিরও বিপর্যয় ঘটেছে। কংগ্রেস কিম্বা ইউ-এন-আর-এর তবু মান রক্ষা হয়েছে, কিন্তু এখানে বিরোধী দল অল পিপলস কংগ্রেস-এর বিরাট জয়লাভ এবং শাসকদলের পরাজয়ের ফলে সেনাবাহিনী যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। একথা সত্য যে, গভর্নর-জেনারেল স্যার হেনরি-লাইটফুট গৃহবিরোধ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে দুই প্রধান দলের কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বিজয়ী অল পিপলস কংগ্রেসের নেতা মিঃ সিল্লাকা স্টিভেন্স এ অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হন নি। তখন পার্লামেন্টারী রীতি অনুযায়ী গভর্নর-জেনারেল মিঃ স্টিভেন্সকেই প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন।

কিন্তু এতটা যেন সেনাবাহিনী সহ্য করতে পারছিলো না। সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ কালবিলম্ব না করে এখানে সামরিক আইন জারী করলেন এবং নব-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী মিঃ স্টিভেন্সকে বন্দি করেন। তাঁর এই কাজের সমর্থনে ব্রিগেডিয়ার লানসানা এ সাফাই দিয়েছিলেন যে, গভর্নর-জেনারেলের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার কোন অধিকার নেই। নির্বাচন তখনো অসমাপ্ত রয়েছে, কাজেই প্রধানমন্ত্রী বা সরকার গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না বলে সেনাধ্যক্ষ জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন।

কিন্তু গভর্নর-জেনারেলের অধিকার অধিকার নিয়ে যে ডেভিড লানসানা চিন্তিত ছিলেন না পরবর্তী ঘটনা তার প্রমাণ দিয়েছে। নতুন প্রধানমন্ত্রী মিঃ স্টিভেন্সও অভিযোগ করেছিলেন যে, পরাজিত দলনেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার আলবার্ট মারগাই-এর নির্দেশ পেয়েই সেনাধ্যক্ষ এ গর্হিত কাজ করতে সাহসী হয়েছেন। আগের দিন রায়েই দু'জনের মধ্যে দেশের অস্থিতির পরি-স্থিতি নিয়ে দু'জনের মধ্যে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মিঃ স্টিভেন্স বলেছেন। দু'জন একই ট্রাইব বা উপজাতিরও লোক বটেন।

১৯৬১ সালে দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই স্যার আলবার্ট মারগাই-এর দল দেশ শাসন করছে। কিন্তু এ-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্যার মারগাই সাধারণ লোকের শ্রম্যা অর্জন করতে পারেন নি, তাঁর দলের নীতি তীর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। স্যার মারগাই প্রথম জীবনে ছিলেন চিকিৎসক, জীবনের ২৩টি বছর তাঁর

ব্রিটিশ সরকারের চাকরিতে কেটেছে। মনে-প্রাণে তিনি রক্ষণশীল, তাঁর রাজনীতিতে আবেগের স্থান নেই। সেজন্যেই তিনি প্রবীণদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, দেশের তরুণসমাজ মারগাইকে অপছন্দ করে, তারা তাঁকে বৃটেনের রাজকীয় সম্মান মনে করে। এটা মনে করার কারণ স্যার মারগাই-এর ব্রিটিশ-ঘেঁষা নীতি। এখানকার উপজাতি-প্রধানদের সমর্থন নিয়েই স্যার মারগাই এতদিন দেশ শাসন করে এসেছেন।

কিন্তু এবারে ভোটারদের ভালো-মন্দ বেছে নেবার সুযোগ ছিলো। মিঃ স্টিভেন্স দীর্ঘদিন দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছেন এবং তাঁর স্বাধীনতা বৃটেনের প্রভাব-মুক্ত স্বাধীনতা। বৃটেনের সঙ্গে সিয়েরা লিওনের প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে মিঃ স্টিভেন্স বরাবরই তার বিরোধিতা করে এসেছেন। তাঁর রাজনীতিতে এবং তাঁর দলের নীতিতে যথেষ্ট গতিশীলতা রয়েছে, তাই দেশের তরুণ-সমাজ তাঁর দিকে বৃটেনকে এবং নির্বাচনে জয়যুক্ত করতে সহায়তা করেছে। স্যার আলবার্ট এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না; তাই যেন-তেন-প্রকারে প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে মিঃ স্টিভেন্সকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন এবং এ-ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর সাহায্য চেয়েছিলেন। স্যার আলবার্টের ক্ষমতালিপ্সার আভাস গত বছরেই পাওয়া গিয়েছিলো যখন তিনি পার্লামেন্টে একদল বিশিষ্ট সরকার গঠনের জন্যে একটা বিল এনেছিলেন। মিঃ স্টিভেন্সের দল অবশ্য পার্লামেন্টের ভেতরে বিতর্কের মধ্য দিয়ে এবং বাইরে বিক্ষোভ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সে বিলের বিরোধিতা করেন।

কিন্তু মারগাই-লানসানা জুটি যে কাজটা ভালো করেন নি তার দুঃখজনক পরিচয় পেতে দেরি হয় নি। তবে তাঁরা পেছন থেকে বৃটেনের মদৎ পেয়েই এ-গর্হিত কাজটা করেছেন বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। সে যাই হোক, ব্রিগেডিয়ার লানসানার বেতার ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী ফ্রি টাউনে দু'পক্ষে দাঙ্গা বেধে গিয়েছে যার ফলে কয়েকজন হতাহত হয়েছে। সাম্ভা আইন ভঙ্গ করার জন্যেও পুলিশ গুলী করে দু'জনকে হত্যা করে যার ফলে নিহতের সংখ্যা সরকারীসূত্রে দাঁড়িয়েছে ৪-এ।

কিন্তু মারগাই-লানসানার মধ্যস্থিত্ত্বই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। অধস্তন সামরিক অফিসারেরা এখানে ক্ষমতা দখল করে নিয়ে দেশকে একটা অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিয়েছেন।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুখীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ২ ॥

কাশীশ্বরের মিত্রীয় পুত্র দুর্গামোহন জন্মেছিলেন ১২৪৮ বঙ্গাব্দে ইংরেজী ১৮৪১ সালে তেলিরবাগ গ্রামেই। শৈশবেই মাতৃহীন হয়েছিলেন দুর্গামোহন। তিনি বরিশালেব উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সংগে পাশ করে বৃত্তি পেয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন এবং পড়াশুনা করতেন আপন পিতৃব্য বীরেশ্বরের কালাীঘাটের বাড়িতে থেকেই। যথাকালে ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করে তিনিও কালাীমোহনের মতই বরিশালেই প্রথম কাজ সুরু করেন। সেখানে বেশ পসার জমার পরই বোধ হয় তিনি কলকাতা হাইকোর্টে এসে যোগ দেন। অন্যতকাল পরেই তিনি হাইকোর্টে নিজ ধর্মশাস্ত্র-ধর্ম নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে প্রভূত ষণ ও অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি প্রফেসার কাওয়েল বলে একটি সংস্কৃতজ্ঞ ও ধর্মিক খৃষ্টান অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন এবং সে সময় খৃষ্টধর্মের দিকে ঝুঁকি আকৃষ্ট হন। বরিশালে প্র্যাকটিস আরম্ভ করার পর অগ্রজ কালাীমোহনের নির্দেশে দুর্গামোহন মার্কিন দেশীয় ঈশ্বরবিশ্বাসী ও নামকরা চিন্তাশীল লেখক থিওডোর পার্করের রচনাবলী অতি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলন তখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল কেবল বাংলা দেশেই নয়, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশেও। দুর্গামোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে ব্রাহ্ম-ধর্মের সেই মহান আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। পরে কালাীমোহন ও দুর্গামোহন দুই ভাই-ই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়ে নানা জনহিতকর কাজে লেগে গিয়েছিলেন। নিজের গ্রামেব বাড়িতে অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও উচ্চ

ইংরেজী বিদ্যালয়—যার পরে দুই ভাইয়ের নামে নাম হয়েছিল তেলিরবাগ কে এম ডি এম এইচ ই স্কুল—এই সব কাজেই তিনি কালাীমোহনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। অর্থে, সামর্থ্যে তিনি সবদাই সাহায্য করেছেন এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে। তা ছাড়া বর্ষার সময় যখন জলে সমস্ত দেশ ভেসে যায় তখন মৃতদেহ সংকারের সুবিধের জন্যে দুর্গামোহন গ্রামের পূর্ব-দিগন্তে মাঠের মধ্যে খুব উঁচু করে পাকা দেওয়াল দিয়ে ঘিরে মাটি ফেলে একটি পাকা শ্মশানঘাট তৈরি করে দিয়েছিলেন দুর্গামোহনের মৃত্যুর পর তাঁর সন্ধ্যোগ্য সন্তান সত্যীশরঞ্জন ও ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তবঞ্জন মৃত-হস্তে এই সব অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাই স্কুলেব ব্যবসায়িক ব্যয়ভাব বহন করেছিলেন যতদিন তেলিরবাগ গ্রামেব অস্তিত্ব ছিল। এই সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তেলিরবাগ ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের যে কত উপকার হয়েছিল তা বলে শেষ করা যায় না। তামাদেব পিতৃদেব পরলোকগত রাখালচন্দ্র ও এই স্কুলের সেক্রেটারীরূপে অক্লান্ত পবিত্র্য করে গেছেন। গ্রামেব ও সর্বসাধারণের কল্যাণকর এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছাড়াও দুর্গামোহন কত অনাস্থায়, অনাস্থায় স্বগ্রামবাসীদের সুখে-দুঃখে অর্থে ও সামর্থ্যেও সমবেদনা দিয়ে আত্মবিনয় সেবা করে গেছেন তাব ইয়ত্তা নেই। আত্মীয়দের মধ্যে আমাদের পিতামহ ও পিতামহী যে দুর্গামোহনের মমতা পেয়েছিলেন সে কথা আমাদের মায়ের মুখে শুনেছি বড় হয়ে। তিনি স্বাধীনতার জন্যে অনেক চিন্তা ও অর্থব্যয় করে গেছেন। নিজের কন্যা তিনটিকে ত' উচ্চশিক্ষা দিয়েই-ছিলেন, অন্য অনেক সহায়সম্মতহীন নিরাশ্রয় বালিকা ও বঙ্গবিধবাদের আপন গৃহে রেখে দুর্গামোহন তাদের শিক্ষার

ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং আপন উইলপত্রেও বালিকাদেব উচ্চশিক্ষার জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। দুর্গামোহন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। যখন তিনি ব্যাতি ও ঈশ্বরের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তখনও গোলপাতার ঘরে পুরান গোয়ালী বন্ধুর সংগে অনেক সময় গল্প করে আদতেন। সেই বন্ধুর মৃত্যুর পর তাব সন্তানদের সাহায্য কবতেন।

স্বগ্রামের সীমাবদ্ধ গাভীর বাইরে দেশেব বৃহত্তর ক্ষেত্রেও দুর্গামোহনেব যথেষ্ট অবদান ছিল। তৎকালীন ব্রাহ্ম-সমাজেব প্রতিটি জনকল্যাণ কাজে দুর্গামোহনেব পূর্ণ সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্যতা ছিল। তিনি ধর্মপরিচয়, পূর্বোপকারী ও নিষ্ঠার মানুষ ছিলেন। সমাজ সংস্কারেব কাজে ছিল তাঁব আদম্য উৎসাহ ও সংসাহস। তাঁবই আগ্রহাতিশয্যে তাঁদেব অস্পৃশ্যবস্থা বিধবা বিমাতার পুনর্বিবাহ হয়েছিল। এই ঘটনায় তাঁদের পিতৃব্য যে তাঁদের একত্রে করে ধোপা নাপিত বন্ধ করেছিলেন এবং আত্মীয়-স্বজনেরা নানা কুৎসা, ছড়া ও মিথ্যাগব্যাদ দিয়ে তাঁদের বিবর্ত করাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন তাব কথা আগেই বলেছি। এই সমস্ত সামাজিক উৎপীড়ন সত্ত্বেও ব' তিনি কতব্য বিবেচনা করেছেন সে সঙ্গত কর্ম থেকে দুর্গামোহন একচলও বিবর্ত হন নি।

এইখালে আমার মায়ের মুখে শোনা একটি ঘটনা যাব থেকে দুর্গামোহনের সংসাহসেব সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় তা না বলে পারছি না। ববদানাপ হালদার যিনি উত্তরকালে বিজ্ঞানী বাণী-দেব বিশ্বেশ্বর দেওয়ান বলে সম্মানিত হয়েছিলেন, তিনি তখন তব' ব্রাহ্ম যুবক। তাঁর এক জ্ঞাত ভগিনী বিধবামুখীর তখনো বিয়ে না হওয়ায় সেই কন্যার আভিভাবকেবা সমাজে পতিত হবার ভয়ে তাকে একজন বহুবিবাহিত বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণেব সংগে বিয়ে দেবার বন্দোবস্ত

পাকা করে ফেলা ছিলেন। মেম্বেরটি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং সেই কারণে তাঁরও যে এই বিষয়ে একেবারেই সায় ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায়। লংসাহসী যুবক বরদানাথ এই খবর পেয়ে ভগিনীর অনুরোধে বিয়ের পূর্বাহ্নেই সেই ভগিনীটিকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে নৌকাযোগে পালিয়ে গিয়ে একেবারে দুর্গামোহনের বাড়িতে নিয়ে উপস্থিত করেন। গ্রামে সোরগোল পড়ে গেল এবং বরদানাথের ওপর কত যে অকথ্য অশ্লীল ফুৎসা আরোপিত হল তার সীমা ছিল না। এমন কি শুনিয়ে যে কন্যাটির আত্মীয়রা আক্রোশ ভরে গুন্ডা লাগিয়ে লাঠির ঘায়ে বরদানাথের মাথাও ছাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সকল নোংরা নিন্দা, তিরস্কার ও অত্যাচার চরিত্রবান বরদানাথকে কত ব্যচ্যুত করতে পারে নি এতটুকুও। দুর্গামোহন সেই কন্যাকে পূর্ণ সহানুভূতি দিয়ে আশ্রয় দিলেন নিজ গৃহে। কন্যার অভিভাবকে রায়ে জুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়ে অভিযোগ করলেন বরদানাথ, দুর্গামোহন ও অন্যান্য কয়েকজনকে নামে ফোজদারী আদালতে। মামলা অনেক দিন ধরে চলে। শেষ পর্যন্ত রায়ে সাব্যস্ত হল যে কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা এবং নিজে রাজস্বী, যুগ্ম মতে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে গেছেন। সুতরাং আনায়াঁরা সবাই বেকসুব স্থালাস হলেন। তখন প্রশ্ন উঠল এই ভগিনীর কি ব্যবস্থা হবে। একটা নব্য ব্রাহ্ম যুবক, রজনীনাথ রাথ, যিনি তখন ডাক ও তার বিভাগে কাজ করতেন, তিনি বিধুমুখীর পাণিগ্রহণেচ্ছ হওয়ায় তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঘটা করে। সেই বজনীনাথ রাথ কালক্রমে পোস্টমাস্টার জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিস্তর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং পরে তাঁর ভবানীপুত্রের বাসভবনের সামনের রাস্তাটির নাম হয়েছিল 'বে স্ট্রীট'। এঁদের একমাত্র পুত্র রজনীনাথ রাথ ব্যারিস্টার হয়ে ফিবে এসে কলকাতায় দিনকতক কাজ করবার পরে নিতান্ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনা থেকেও দুর্গামোহনের চরিত্রবলের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মনিষ্ঠ আচার্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় লিখে গেছেন যে— 'দুর্গামোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক পর্যায়ের স্রষ্টা ছিলেন।'

দেশের সর্বজনীন উন্নতির দিকেও দুর্গামোহনের প্রখর দৃষ্টি ছিল। দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দিকে দেশবাসীদের আগ্রহশীল করে তোলাই ছিল সে সময়কার শিক্ষিত লোকদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সেই সময়ে দেশের চা ব্যবসায় ইংরেজ

ধীগকদের একচেটিয়া ছিল। পূর্বে নীলকর কুঠিতে আড়কাঠিদের সাহায্যে প্রলোভন দেখিয়ে যেমন কুলী নিয়ে যাওয়া হত, চা বাগানেও পরে সেই রকম করে কুলী চালান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। বিদেশী কোম্পানীগুলির ইংরেজ ম্যানেজারের কুলীদের উপর অত্যাচারের কত যে কাহিনী শোনা যেত তার ইয়ত্তা ছিল না। লোকে বলত যে কুলীদের খাটিয়ে রক্তশোষণ করে কোম্পানীগুলা নিজেদের মোটা মুনুফা লাভের জন্যে লালায়িত হয়ে থাকত। বিখ্যাত ব্যবহার-জীবী ও দেশনেতা আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন একযোগে কয়েকটি চা বাগান কিনে দেশী চা ব্যবসায় ও কুলীদের অবস্থার উন্নতিসাধনে যত্নবান হয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্য একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সে সময়ে এ দেশের জীবনবীমার ব্যবসায় বিদেশীদের হাতেই ছিল। বোম্বাই অঞ্চলে একটি দেশী জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠানের সুত্রপাত হয় 'এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া লাইফ ইন্সুরেন্স' নামে। দুর্গামোহন সেই কোম্পানীর কাছ থেকে সারা বাংলার চীফ এজেন্টসী নিয়ে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জনকে সেই কাজে লাগিয়েছিলেন।

দুর্গামোহনের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মময়ীর কথা যে কত শুনিয়ে আমার মায়ের মুখে তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি রূপে ও গুণে সকলের চিত্তবহরন করেছিলেন। এই রকম দয়াময়ী, আশ্রিতবৎসলা মহিলা সচবাচর দেখা যায় না। বছর চারেক বয়সের সময় না কি বিবাহ হয়ে তিনি তেলিরাগের দাশবংশে এসেছিলেন যুগ্ম-রূপে। সেই থেকে তিনি আজীবন তাঁর স্বামী দুর্গামোহনের সকল শুভকাজেই উৎসাহ দিয়ে ধর্মপরায়ণা সাধনী রমণীর কর্তব্যকে মহিমাম্বিত করে গেছেন। তাঁর গৃহে অগণিত নিরাশ্রয়া আত্মীয়া ও অনাথীয়া বালিকা ও বালবিধবাদের তিনি জননীস্বরূপিণী হয়ে সন্মহে লালন-পালন করে গেছেন। কি করে এই মহিলাটি তাঁর আজন্মের সকল সংস্কারকে বর্জন করে স্বামীর সমাজ-সংস্কারের কাজে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করতে পেরেছিলেন সে কথা ভাবলেও বিস্ময় বোধ হয়। স্বগ্রামে, ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মময়ীর স্নেহাশীর্বাদ পায় নি এমন লোক ছিল না। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মময়ী মহাপ্রাণ করেছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে এই মহীয়সী নারীর ভূমসী প্রশংসাবাদ করে গেছেন। দুর্গামোহন ও তদীয় পত্নী ব্রহ্মময়ীর চরিত্র-মাধুর্য্যে ও ন্যায়পরায়ণতাব-প্রভাব খুব বেশি রকম প্রাতিভাত হয়েছিল

তাঁদের স্বীয় পুত্রকন্যাদের এবং তখনকার দিনের দাশবংশের সকল ছেলেমেয়েদের জীবনে। ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর অনেকদিন পরে দুর্গামোহন দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন কাওরাইডের ধর্মপরায়ণ কালীনারায়ণ গুপ্ত মশায়ের বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমন্তশর্মাকে। এই বিবাহে যে তাঁর পরিবারের অনেকেই মত দিতে পারে নি তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক, এই বিবাহের অল্পকাল পরেই বাংলা ১৩০৪ সনে দুর্গামোহন ছাপান্স বছর বয়সে মহাপ্রাণ করেন। তিনি যে তেলিরাগের দাশ গোষ্ঠীর একজন উল্লেখ্য রত্ন ছিলেন এ কথা তাঁর স্বগ্রামবাসী ও বিক্রমপুরের অনেক অধিবাসীই অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেন আজ পূর্বন্তত।

১৩৩

দুর্গামোহনের প্রথমা সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ী রত্নগর্ভা ছিলেন। তিনি ছয়টি সন্তানের জননী হয়েছিলেন। এই সন্তানদের মধ্যে তিনটি ছিলেন ছেলে— সত্যরঞ্জন, সত্যীশরঞ্জন ও জ্যোতিষরঞ্জন এবং তিনটি ছিলেন কন্যা—সরলা, অবলা ও শৈলবালা। এই ছয়টি সন্তানের প্রত্যেকটিকে নিষ্কলঙ্ক মৃত্তা বললেও অতুল্য হয় না। যে কোন দেশের যে কোন অভিজাত বংশের সন্তানদের তুলনায় এঁরা প্রত্যেকেই সম্মানার্থ। এঁদের প্রত্যেককেই আমি দেখেছি এবং এঁদের স্নেহও আমি কিঞ্চিদধিক পরিমাণে পেরেছি। সম্পর্কে তাঁরা আমার দাদা ও দিদি হলেও আমি তাঁদের ছেলেদের সমবয়সী ছিলাম। তাঁদের চরিত্রের মহানুভবতা ও উদারতা ও তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্ত যে ভিতরে ভিতরে আমার অজানিতে আমাকে অনেকটা উদ্ভুদ্ধ করেছে তা স্বীকার করবই।

দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করেন। তিনি বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন। বেশ লম্বা ও বাইরে থেকে দেখতে বেশ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর চেহারা। অতি অমায়িক, হাস্যরসিক ও উদার, চরিত্রবান মানুষ ছিলেন সত্যরঞ্জন যাকে আমরা বড়দা বলতাম। তিনি বিবাহ করেন কাওরাইডের সুবিখ্যাত জমিদার ও পরম ধার্মিক ব্রাহ্ম কালীনারায়ণ গুপ্ত মশায়ের একটি বিদুষী কন্যা বিমলাকে। সত্যরঞ্জন গোড়ার দিকে সেন্দ্রীল প্রদেশের খাণ্ডেয়া কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। তিনি আইন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিখ্যাত 'গ্রেগর ল' লেকচারার' পদে বরণ করে

বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেছিলেন। এ সম্মান যে কোন আইনজীবীর একান্ত কাম্য ছিল। সত্যরঞ্জনর বক্তৃতামালার বিষয়বস্তু ছিল 'দি ল' অব আর্গুমেন্টাইরিস ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'। সেই বক্তৃতাদুর্লভ পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে এখনো আইনজীবীদের বিশেষ কাজে লাগে এবং আইনজ্ঞদের প্রশংসা আকর্ষণ করে। সত্যরঞ্জন বেশি দিন আইন ব্যবসায় করতে পারেন নি। দুর্গামোহন যখন এম্পায়ার অব ইন্ডিয়া লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর চীফ এজেন্সী মেন তখন সেই কোম্পানীর কাজ দেখানুনা করবার দায়িত্ব সত্যরঞ্জনকেই দেন। সেই সুদূর অবস্থা থেকে সত্যরঞ্জন সেই ব্যবসায়টিকে আপন অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে দ্রুত উন্নতির পথে দাঁড় করিয়ে যান। সত্যরঞ্জনর সহযোগিতা আমাদের বিমলা বৌঠাম ছিলেন খুবই শিক্ষিতা মহিলা। তিনি সদাহাস্যময়ী, কাব্যরসগ্রাহী ও সজ্ঞবৎসলা ছিলেন। উত্তরকালে তিনি হৃদয় প্রশম করে এসেছিলেন। তিনি কিছু কিছু বইও লিখে গেছেন। 'মালিকানীমিত্র' কাব্যের যে বাংলা ভাষ্য তিনি করেছিলেন তার খুব সুনাম হয়েছিল। সত্যরঞ্জন বেশ কম বয়সেই তদীয় স্ত্রী বিমলা ও একমাত্র কন্যা মারাকে বেখে পবলোকগমন করেন। পবে মারার বিয়ে হয়েছিল সুবিখ্যাত আনন্দমোহন বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অজিতমোহন বসুর সঙ্গে। বিমলা গোঠান ও মারা এখন আর ইহজগতে নেই। মারার ছেলে দিলীপ দার্জিলিং শহরেই বসবাস করছেন।

দুর্গামোহনের স্ত্রী সত্যীশ-রঞ্জন তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের মত লম্বা-চওড়া চেহারা পান না। বলতে গেলে তিনি বেশ বেস্টেই ছিলেন। শেষ বয়সে আবার তার উপর কিছু মোটা-সোটাও হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যীশরঞ্জনর মৃত্যুর দিকে চাইলে প্রথমেই চোখে পড়ত তাঁর টানাটানা বড় দুইটি চোখের ভাবব্যঞ্জনা। মৃত্যু একটি সুন্দর হাসিহাসি ভাব লেগেই থাকত। কণ্ঠস্বর ছিল মিষ্ট এবং ব্যবহার ছিল সৌজন্যপূর্ণ। এঁর গলার টেনিসল অপারেশনের জন্য এঁকে বার বছর বয়সে বিলেতে পাঠান হয়। অস্ত্রোপচারের পরে তিনি সেইখানেই রয়ে গেলেন এবং প্রথমে স্কুলে পাঠ সাঙ্গ করে ব্যারিস্টারী পাশ করে বার বছর পরে দেশে ফিরে আসেন বয়স যখন চব্বিশ। কি পঁচিশ।

সুদীর্ঘ বার বছর বিলেতে বাস করে সত্যীশরঞ্জনর বাহ্যিক চাল-চলন ও জীবনযাত্রা প্রজাণী কিছুটা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু তাঁর

ভিতরের বাঙালীঘটা একেবারেই স্মান হয় নি। আত্মবিশ্বাস তিনি তাঁর গরীব দুঃখী আত্মীয়, অনাত্মীয় গ্রামবাসীদের সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। বহু দুরূহ ছাত্রদের তিনি পড়ার খরচ, বই কেনার টাকা, পরীক্ষার ফিস ইত্যাদি দিতে এতটুকুও শ্বশুর বোধ করেন নি। তেগির-বাগের দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা ও হাই স্কুলের ব্যয়ভার বহুলাংশে তিনি স্বীয় উপার্জন থেকেই বহন করে গেছেন। তিনি ছেলেমেয়েদের ভাল ও উচ্চ শিক্ষা দেবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। এখন যেটিকে আমরা ডুন পাবলিক স্কুল বলে জানি সে স্কুলটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার আলিপুরের হেস্টিংস হাউসে এবং সত্যীশরঞ্জনই ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। সেই স্কুলেই তাঁর ছেলে দুঃখনের প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়। পরে সেই স্কুলটি ডুরাডুনের বিস্কৃত প্রান্তরে ভুলে নিজে যাওয়া হয়। ঐ স্কুলের জন্যে সত্যীশরঞ্জন অনেক পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী সরলা রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'গোথলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এর জন্যে তিনি অকাতরে অর্থ জুটিয়ে গেছেন। বসন্ত সত্যীশ-রঞ্জনর সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ মেয়ে স্কুলটি দাঁড়াইত না। ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সংস্কার ও অন্যান্য কাজেও তাঁর দান কম ছিল না। নিজেকে দেখেছি তাঁর অফিস ঘরের টেবিলের একধারে একটি চাঁদার বাক্স থাকত যার মধ্যে মজেলদের সাধ্যমত কিছু দিজেই হত, নইলে কাজই আরম্ভ হত না।

সত্যীশরঞ্জন আপন প্রতিভা, কলকাজ হাইকোর্টে প্রভুত খ্যাতি ও মশ অর্জন করেছিলেন। প্রথমে হাইকোর্টের স্টাডিং কৌন্সিলী এবং পরে এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে তিনি ব্যারিস্টারদের মধ্যে অগ্রণী বলে সম্মান লাভ করেছিলেন। এ্যাডভোকেট জেনারেলের কার্যকাল শেষ হতে না হতেই তিনি দিল্লীতে ভাইসরয়ের অর্থাৎ বড়লাটের একজ্যিকিউটিভ কাউন্সিলের ল' মেম্বর অর্থাৎ আইন সদস্যপদে নিযুক্ত হন। হাইকোর্টের আইনজীবীদের অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিচূপ্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতারই মত ধর্মপরায়ণ, নিষ্ঠা ও সদাশর ব্যক্তি ছিলেন। স্বভাবটি ছিল তাঁর খুবই শান্ত গম্ভীর এবং অত্যন্ত নম্র মধুর ছিল তাঁর ভাষা। নিজ স্বভাবগুণে তিনি সত্যীর্থ-মহলে খ্যাতিমান পুরুষ বলে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত, সত্য ও সৌজন্যের জন্যে জজেরাও তাঁকে খুবই সম্মান ও প্রশংসা দিতেন। বিলেত থেকে ফেরার পর হুদুদিন আমি সত্যীশদাদার

চেম্বারে কাজ শিখতে যেতাম এবং তাঁর ব্রীফ পড়ে তাঁর সংগে সংগে কোর্টে গিয়ে তাঁর কাজের ধারাটা লক্ষ্য করতাম। কোর্টের কাজে তাঁর অসাধারণ পটভূতা ছিল। কখনো তাঁকে ধাম্পা দিয়ে জজদের মন বিভ্রান্ত করবার প্রয়াস করতে দেখি নি। তাঁর কাজের মান সর্বদাই উচ্চদরের ছিল এবং তিনি সবসময়ে বেশ তৈরি হয়েই কোর্টে যেতেন। কোর্টে তাঁকে কখনো বিচলিত হতে অথবা কাগজ হাতড়ে বেড়াতে দেখি নি। কখনো কোন হাকিম উচ্চ গলায় অর্থৈষ হয়ে তাঁর বক্তৃতায় ব্যাঘাত ঘটালে তিনি ঈষৎ হেসে কিছু অত্যন্ত সংযতভাবে তাঁকে বলতেন—“আপনি অনর্থক অর্থৈষ হচ্ছেন—উত্তেজনার কোন কারণই তা ঘটে নি।” অমনি রাগান্বিত হয়ে যেত। একবার অপর পক্ষের কৌন্সিলী যখন সওয়াল জবাব করছিলেন সত্যীশ-রঞ্জন চোখ বুজে শুনিছিলেন। তাঁর সংগে সেবার দাদাবাদ চিভরজনেব জামাতা সুদীর্ঘ রায় ছোট কৌন্সিলী ছিলেন। তিনি মনে করলেন যে সত্যীশরঞ্জন বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রায় সাহেব সত্যীশরঞ্জনর কনুইয়ে খেঁচা দিয়ে বললেন—“দেখুন, দেখুন, ওঁরা অবান্তর কথা—যা রেকর্ডে নেই তা বলে যাচ্ছেন।” সত্যীশরঞ্জন একটু নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন—“বলতে দাও। আমরাও বলব এখন।” বলেই তিনি আবার চোখ বুজে রইলেন। উল্টো দিকের কৌন্সিলীকে তিনি পারতপক্ষে ওজর তুলে তার সওয়াল জবাবের ব্যাঘাত কবতেন না। সত্যীশরঞ্জন ব্যারিস্টারদের মধ্যে খুব প্রিয় ছিলেন। আজও তাঁর বড় ছবি বার লাইব্রেরীর ছোট ঘরে বেখানে এ্যাডভোকেট জেনারেল বসেন সেই চেয়ারের পেছনে পুঁবের দেওয়ালে টাঙান রয়েছে।

রাজনীতিকক্ষেে তিনি নিবারণে অর্থাৎ নরমপন্থী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে স্বাধীনতা লাভের আগে দেশবাসীদের শিক্ষার-দীক্ষার উৎকর্ষ লাভ করতে হবে, স্বভাবকে সুসংযত করে মনকে শক্তিশালী করতে হবে। এই জন্যে তিনি আগে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান প্রয়োজন মনে করতেন। তিনি খুবই স্বাভাবিকভাবে সমানে সমানে ইংরেজদের সংগে যিনতে পারতেন। তাঁর বাড়িতে বহু গণমান্য ইংরেজ অতিথি দেখেছি। ইংরেজদের সংগে দহরম-মহরম এবং তাঁর নিবারণে রাজনৈতিক মতের জন্যে তাঁকে ‘খয়ের খা’ ইত্যাদি নানারকম কটুক্তি শুনতে হয়েছে। তিনি কিন্তু এ সব অপপ্রচাবে একেবারেই বিচলিত হতেন না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মহলে তাঁর এত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল

যে তিনি ইচ্ছে করলেই নানা খেতাবই পেতে পারতেন। বহুব্যবসায়ী কৃষ্ণপক্ষ তাঁকে স্মারক উপাধি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তাঁর ধারণা ছিল যে ঐ সব খেতাব নিলে দেশের জনতার থেকে তিনি দূরে সরে যাবেন। সেই আমলে এই মানসিক শক্তি খুব কম লোকেরই ছিল।

সতীশরঞ্জন যে অসাধারণ বুদ্ধবৎসল ছিলেন তার একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। পূর্ববঙ্গের একটি সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মুসলমান জমিদারের সংগে দুর্গামোহনের খুবই সম্ভাব হয়েছিল। দুই পরিবারের শ্রদ্ধা ছেলেদের নয় মেয়েদের মধ্যেও আসা-হাওয়া ছিল। সেই জমিদারের ছিল দুটি ছেলে। বড় ছেলের সংগে ছিল সতীশরঞ্জনের বিশেষ বন্ধুত্ব। এই হিন্দু-মুসলমান প্রীতির নিদর্শন-রূপে সতীশরঞ্জনের বড় ছেলের নামকরণ হয়েছিল ধ্রুবরঞ্জন আহমেদ দাশ। সেই জমিদারের ছোট ছেলে করতেন পাটের না কিসের ব্যবসায়। কাবাবাবের প্রয়োজনে তাঁকে ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষাধিক টাকা ধার করতে হয়। উপযুক্ত জামিন না থাকলে ব্যাঙ্ক অত টাকা আগাম দিতে অস্বীকৃত হলে তিনি সতীশরঞ্জনকে স্মরণাপন্ন হলেন। বলা মাত্র সতীশরঞ্জন সেই ঋণের জামিন হয়ে কাগজে দরখাস্ত করলেন অনেক আত্মীয় ও শ্রদ্ধার্থীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে। হা বাড়ির লোকেরা ভেবে-ছিলেন হলও তাই। অচিরে সে কারবার ফেল পড়ল। ব্যাঙ্ক কড়ায়-গন্ডায় তার গাওনা টাকার জন্যে নালিশ করে ডিক্লি পেলেন লক্ষাধিক টাকার জন্যে। সমস্ত দেনাদার দায় পড়ল একা সতীশরঞ্জনেরই ঘাড়ে। সতীশরঞ্জনের কলকাতার ময়রা, স্ট্রীটস্থ নতুন সুন্দর বসত বাড়িটি বেচে দিতে হল সে দেনার দায়। সেই বাড়ি বেচা টাকা দিয়ে বন্ধুর ভায়ের ব্যাঙ্কের কাছে দেনা শোধ দিয়ে সতীশরঞ্জন ঋণমুক্ত হলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর মূখে সেই বন্ধু পরিবার সম্বন্ধে কটু কটু কথা শোনে নি।

সতীশরঞ্জনের প্রথমে বিবাহ করেন রেঞ্জনের নামকরা ব্যবহারজীবী পি. সি. সেনের ছোট্টাকন্যা সরলাকে। কিন্তু সবলা অল্প বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। কিছুকাল পরে সতীশরঞ্জন প্রবীণ আই. সি. এস. বিহারীলাল গুপ্ত (বি. এল. গুপ্ত) মহাশয়ের এক কন্যা বনলডাকে বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে সতীশরঞ্জনের দুইটি ছেলে জন্মে—ধ্রুবরঞ্জন ও মহীরঞ্জন। ধ্রুব প্রথম ডুন স্কুলে, পরে বিলেতে একটি পাবলিক স্কুলে পড়ে শেষে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে ডিগ্রি নিয়ে ও লন্ডনে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় প্র্যাকটিস সুরু করেন। তিনি আমার চেস্বারে মাঝে মাঝে আসতেন কাজ শিখতে এবং সেই সূত্রে তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখবার ও জানবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। ধ্রুবরঞ্জনের মনটি ছিল খুবই সাদা ও নরম। আত্মীয়-স্বজনদের তিনি জানতেন এবং সামাজিকতা তিনি সর্বদা রক্ষা করতেন। এদিকে নরম হলেও ধ্রুবরঞ্জন অস্পন্দবদনে লোককে হক কথা শুনিয়ে দিতে পারতেন দরকার হলে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তিনি স্বেচ্ছা করতেন না। বিক্রমপুর তেলিরবাগ গ্রামের জন্যে তাঁর বিশেষ মমতা ছিল। তিনি যে তেলির-বাগের দাশ গোষ্ঠীর সম্ভ্রান্ত এই গোঁরব বোধ ছিল তাঁর অজ্ঞ। “আমরা দাশেরা”—এই কথাটা প্রায়ই তাঁর মূখে শুনতাম ও আনন্দে আমার মন ভরে উঠত।

তাঁর পিতা কৃষ্ণ প্রাতিষ্ঠিত ডুন স্কুলে ধ্রুবরঞ্জন নিজেও পড়েছিলেন তা আগেই বলেছি। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি সেই স্কুলের স্বার্থের দিকে সর্বদা মনোনিবেশ করতেন। ষড়দূর মনে আছে তিনি সেই স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি নয়ত একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। মনে পড়ে একবার তাঁর অনু-রোধে আমি ডুন স্কুলে প্রতিষ্ঠা দিবসের বার্ষিক অধিবেশনে একটি ভাষণ দিয়ে-ছিলাম ও একটি বড় হলের শিলান্যাস করেছিলাম। আমি যেতে রাজী হয়েছিলাম বলে ধ্রুব খুবই খুশি হয়েছিলেন। ধ্রুবরঞ্জনকে সরকার ডিস্ট্রিক্ট জজ পদে নিয়োজিত করে কিছু মেডিক্যাল পরীক্ষায় তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। হাইকোর্টে ভাল কবে প্রতিষ্ঠা লাভের আগেই অতি অকালে তিনি মারা যান।

সতীশরঞ্জনের দ্বিতীয় পুত্রের নাম মহীরঞ্জন। মহীরঞ্জনও প্রথমে ডুন স্কুলে ও পরে বিলেতে পাবলিক স্কুলে পাঠ শেষ করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে ট্রাইপজ পাবার পরেই তিনি জগন্নিখ্যাত জাহাজ কোম্পানী পি এ্যান্ড ও-র ম্যানিজিং এজেন্টস ম্যাকিনিন ম্যাকোজি কোম্পানীতে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হয়ে যোগদান করেন। এইরকম নামী কোম্পানীতে বাঙালী ছেলের ভর্তি হওয়া সে সময়ে এক দুর্লভ ব্যাপার ছিল, এমন কি কেউ ভাবতেও পারত না। কিন্তু মহীরঞ্জন ঐ প্রতি-ষ্ঠানে স্থান পেয়েছিলেন এই কারণে যে সেখানকার কর্মকর্তা লর্ড ইণ্ডেক্সের সংগে সতীশরঞ্জন খুবই সম্ভাব ছিল। দেশে ফিরে এসে মহীরঞ্জন ম্যাকিনিন ম্যাকোজি কোম্পানীর কাজে লেগে গেলেন। তাঁর কাজের ক্ষেত্র এবং আমার কর্মক্ষেত্র

পৃথক হওয়ায় মহীরঞ্জনকে খুব কাছাকাছি দেখবার সুযোগ-সুবিধে আমার হয় নি। তিনি ধ্রুবর মত আত্মীয়স্বজনদের সংগে তেমন মেলামেশা করতে পারেন নি। এমন কি অনেক জ্ঞাতিবর্গ যাঁদের তাঁর বাবা মা এবং দাদা জানতেন এবং অনুগ্রহ করতেন মহীরঞ্জন হয়ত তাঁদের জানতেনই না। কিন্তু মহীরঞ্জনের মধ্যে তাঁর পিতার কতকগুলি সদগুণ দেখেছি। যাঁদের পছন্দ করতেন তাঁদের সংগে বেশ হাসি-মুখে মিষ্টি কথা বলতেন এবং সোহাগ ও জানাতে পারতেন। তাঁর মধ্যে একটা দৃঢ়তা ছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে স্বেচ্ছা করতেন না। একবার কোন ইগা বণ্ড ক্লাবে এক বিদেশী সভ্য ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে একটা ইতর মন্তব্য করায় মহীরঞ্জন তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও যখন সেই ব্যক্তি সেই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন তখন মহীরঞ্জন তাঁকে খুঁচি মেরে ঠেলাতে ঠেলাতে ক্লাবের বাইরে তাড়িয়ে দিবে আসেন। ইংবেজ কোম্পানীর চাকুরে হয়ে মহীরঞ্জন ইংবেজকে এককম-ভাবে শিক্ষা দেবেন একথা কেউ ভাবতেই পারেন নি। দুই দলের কতিপয় বন্ধু মহীরঞ্জনকে বললেন যে তাঁর রাগ হবার ষষ্ঠেন্ট কারণ থাকলেও তিনি ঘৃণোদ্ভূত না করলেই ভাল করতেন। সেই ইংবেজের সংগে একবার হাত মিলিয়ে দুটো কথা বললেই ব্যাপারটা মিটে যেত। মহীরঞ্জন বললেন—“কোন অপরাধই করি নি, তবে কেন আপশোষ করব।” ব্যাপারটা ফৌজদারী কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল এবং মহীরঞ্জন বেকসুর খালাস হলেন। এটা খুবই সূখের বিষয় যে এই ঘটনায় মহীরঞ্জনের আফিসের উপরওয়ালারা একে-বারেই বিচলিত হন নি। মহীরঞ্জন নিজের কর্মতৎপরতার ও সততার ম্যাকিনিন ম্যাকোজি কোম্পানীর কলকাতা আফিসের সর্বাধ্যক্ষ কর্তা হয়ে-ছিলেন এবং এখন তিনি অবসর নিয়েছেন। ম্যাকিনিন ম্যাকোজি কোম্পানীর পয়লা নম্বরের পদ বাঙালীর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। মহীরঞ্জন সে পদ লাভ করেছিলেন। মহীরঞ্জনকে সংগে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেসার ও তাঁকে জানাবার সময় ও সুযোগ আমার ঘটে নি। তবু তাঁর কর্ম-কৃতিত্বের জন্যেও তিনি যে তেলিরবাগ দাশ গোষ্ঠীর সম্ভ্রান্ত ও আমার জ্ঞাত সেই কথা ভেবে ষষ্ঠেন্ট গর্ব অনুভব করি। মহীরঞ্জন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাতি সুন্দর সেনের কন্যাকে বিবাহ করেছেন। দুর্গামোহনের কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষ-রঞ্জনকে আমি খুব কাছাকাছি থেকে দেখি নি। তবে তাঁর সম্বন্ধে আমার বাবার কাছে অনেক কথাই শুনেছি এবং তাঁর

চারিচর উৎসবের কথা জেনেছি। তিনি বেশ লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। গায়ের রং তিন ভাইয়েরই শ্যামবর্ণই বলতে হয়। জ্যোতিষরঞ্জনও বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে কলকাতা হাইকোর্টে কাজ শুরু করেন। প্রথম দিকটার তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সত্যীশদাদা ছিলেন লিবারেল বা মডারেটের দলে, কিন্তু জ্যোতিষদাদা জাতীয় কংগ্রেসের দিকে ঘেঁষা ছিলেন এবং বাবার কাছে শুনেছি একটু চরমপন্থী হয়েই উঠেছিলেন। এ বিষয়ে জ্যোতিষরঞ্জন অনেকটা চিত্তরঞ্জন মতাবলম্বীই ছিলেন। সত্যীশরঞ্জন রেঙ্গুনের নামকরা আইনজীবী পি. সি. সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে বিয়ে করেছিলেন, জ্যোতিষরঞ্জনও সেই পি. সি. সেনের দ্বিতীয়া কন্যা সুশীলাকে বিয়ে করেছিলেন। জ্যোতিষরঞ্জন রাজনৈতিক প্রাবল্যে ভেসে বাবার ঘোঁরাড়ে আছেন দেহেই বোধ হয় তাঁর শব্দ মশায় তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে কাজে যোগ দেবার জন্যে সনির্বন্ধ আহ্বান পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষরঞ্জনকে যেতেই হল। রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি কলকাতার এটর্নিদের মত আফিস খুলে অংশীদার নিয়ে ফারম করতে পারতেন। সেখানে গিয়ে জ্যোতিষরঞ্জন অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে তিনি বম্বের এক পাশী আইনজীবীর সংগে মিলে একটি বোম্ব ফারম গড়ে তুলেছিলেন “কাওলাসজী” গ্র্যান্ড দাশ” নাম দিয়ে। এ সময়ে পসারও তাঁর হয়েছিল প্রচুর এবং রেঙ্গুনে ইংরেজ, বর্মী ও বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি অশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। আইনজীবীরা তাঁদের গেশায় সাফল্য অর্জন করলে যা ঘটে থাকে জ্যোতিষরঞ্জনের ভাগ্যও তাই ঘটল—অর্থাৎ অনতিবিলম্বে তাঁর ডাক পড়ল রেঙ্গুনে হাইকোর্টের জজীয়তী পদে। বিস্তারিত আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও তাঁকে সে ডাকে সাড়া দিতে হয়েছিল। নেহাৎ কোন অনিবার্য কারণ না থাকলে ব্যারিস্টারেরা কতব্যের এই ডাককে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। খুব সুনামের সংগে কয়েক বছর জজীয়তী করে জ্যোতিষরঞ্জন অবসর গ্রহণ করেন এবং তার অল্প পরেই তিনি পরলোকগমন করেন।

জ্যোতিষরঞ্জনের ছেলে ছিল না। হয়েছিল চারটি কন্যা। সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা সকলেই জীবিত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা রমাকে খুব কাছাকাছি ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। প্রথমে তাঁকে দেখি শিলং শহরে। সে বছর পূজাবকাশে আমি সপরিবারে

শিলং-এ গিয়েছিলাম ছুটি কাটাতে। সেখানে তখন রমার স্বামী কনেন্স প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত কাজ করছিলেন সিভিল সার্জেনরূপে। শুনলাম জ্যোতিষদাদা ও তাঁর স্ত্রী থাকে আমরা সিসি বোর্ডান বলতাম তাঁরা দুজনেই রমার বাড়িতে রয়েছেন। তখনো তিনি জজ হন নি। তেলিরাগের একজন বিশিষ্ট মাননীয় জ্যোতিষ শিলং-এ রয়েছেন জেনে তাঁকে দেখবার ইচ্ছে হল। এইরকম রক্তের টান পুরনো দিনের দাশ গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বেশ সহজভাবেই প্রকাশ পেত। মনে হল তাঁর সংগে দেখা করা কতব্য। রেঙ্গুনে হাইকোর্টের খবর জানবার ঔৎসুক্যও যে একেবারে ছিল না তাও বলতে পারি না। চলে গেলাম তাঁর সংগে দেখা করতে আমার স্ত্রীকে সংগে নিয়ে। সেখানে গিয়ে দেখি তিনি পাজামা ও রাতকোটের উপর একটা ট্রেনিং গাউন গায়ে দিয়ে বর্মী চুরট মুখে করে চিট একটা গম্পের বই পড়ছেন। পরে জেনেছিলাম যে ছুটি-ছাটার দিনে তিনি হালকা বরণের গম্পের বই, ডিটেকটিভ উপন্যাস ইত্যাদি পড়তে ভালবাসতেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের সংগে কথাবার্তা বললেন—কত পুরনো দিনের কথা—আমার বাবা-মায়ের কত কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। সেই দিনই বোধ হয় রমাকে প্রথম দেখি। রমার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানিতে শান্ত ভাব ফুটে উঠেছিল। পরে রমা ও তার স্বামীর সংগে যে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল সিমসা পাহাড়ে সে কথা পরে বলব। জ্যোতিষদাদার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে সেটা বলেই ফেলি। একবার কথা উঠেছিল যে আমি রেঙ্গুনে গিয়ে জ্যোতিষদাদার ফার্মে যোগ দেব। তিনি লিখেছিলেন—“ইচ্ছে করলে আসতে পার, তবে এ্যাসিস্ট্যান্টের মত হয়ে আসতে হবে এবং আমার আঙ্গুর বলে কোন অতিরিক্ত সুবিধে চাইতে পারবে না।” কি কারণ

ঠিক মনে নেই আমার রেঙ্গুনে যাওয়া ঘটে ওঠে নি। এখন মনে হয়—ভাগ্যস্বাভাব্য হয় নি। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।

॥ ৪ ॥

দুর্গামোহনের কন্যাদের কথা না বললে আমার এই স্মৃতিচরন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁদের যে ছবি আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে তার আভাস দিয়ে মধ্যের বাড়ির কথা শেষ করব।

দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা তাঁর সন্তানদের মধ্যে সবজ্যেষ্ঠা। দুর্গামোহনের পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁর পিতৃব্য বীরেন্দ্রবরের কালীঘাটের বাড়িতেই দুর্গামোহনের প্রথম সন্তান সরলার জন্ম হয়। মায়ের মুখে শুনেছি যে সরলা অতি অপূর্ণ সুন্দরী রমণী ছিলেন। সচরাচর তেমনটি নাকি চোখে পড়ে না। তিনি দেহসৌন্দর্যে ও লাবণ্যে নাকি তাঁর মায়েরই মত ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ আমার দিদি হলেও আমি কেন আমার বাবাও তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। বস্তুত তাঁর পঞ্চম সন্তান, একমাত্র পুত্র সরলার চেয়েও আমি ছোট ছিলাম। আমি তাঁকে সরাদিদি বলে ডাকতাম। বড় হয়ে যখন সরাদিদিকে দেখি তখনো তাঁর কি উজ্জ্বল রঙ এবং মুখ-চোখের কি অপূর্ণ সুসমা ছিল। দৈহিক সৌন্দর্যের সংগে মিশেছিল বিদূষী নারীর জ্ঞানোজ্জ্বল দীপ্তি। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মেয়েদের এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়। সে বছর যে দু’টি মেয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন সরলা ছিলেন তার মধ্যে একজন। তাঁর সর্বাপেক্ষা যেন ছিল একটা উচ্চ আভিজাত্যের ছাপ। বহুজন সমাগমে মদুখরিত সম্মেলনে হাজার লোকের মধ্যে



উৎসবে
অনুষ্ঠানে, নিত্যপ্রয়োজনে
বেঙ্গল
কেমিক্যালের
উৎকৃষ্ট

রোজ ওয়াটার

(গোলাপজল)
ব্যবহার করুন



কলিকাতা
বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

তাকে চোখে পড়তই এবং তিনি ঘরে ঢুকলে উপস্থিত সবাই সম্মুখে উঠে দাঁড়াইত এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব। অথচ কোন বাহ্যিক জ্বাক তাঁর ছিল না। অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল মহিলা তিনি ছিলেন। তেমনি যোগ্য পাঠেই পড়েছিলেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর বয়স ছিল সতের তখন তাঁর সংগে বিয়ে হয়েছিল স্বনামধন্য বিখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার (পি কে রায়) মহাশয়ের। সকলেই জানেন ডক্টর পি কে রায়ের বিদ্যাবস্তার কথা। শুনেনিহি বিলেতে দর্শন পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় পরে বিনি লর্ড হ্যালডেন বলে খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁকেও ইনি হার মানিয়ে দিয়েছিলেন। ডক্টর রায় বোধ হয় আই-ই-এস. পরীক্ষায় প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের তিনি প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক বা প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। নামকরা দার্শনিক ও সুদক্ষ অধ্যাপক বলে ডক্টর রায়ের খ্যাতি ভারতবর্ষের ছড়িয়ে পড়েছিল। সরদারদি তাঁর স্বামীর সংগে যখন যেখানে গেছেন সেই জায়গার ছাত্রদের কল্যাণের জন্যে তাঁকে অনেক ভাবতে ও পরিশ্রম করতে হত। তিনি ডক্টর রায়ের সংগে বেশ কয়েক বছর লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের সুখে-দুখে নানা রকম সাহায্য করে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

সরদারদি নিজে বিদ্যাবী ছিলেন এবং দেশের নারী-শিক্ষার বিস্তারের জন্যে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করে গেছেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। বহুদিন তিনি বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদক-রূপে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল “গোথলে স্নেমোরিয়াল গার্লস স্কুল”—এর প্রতিষ্ঠা। অতি ধামান্যভাবে নিজের ৭ নং বালিগঞ্জ সাকুল্লাব রোড বাসভবনে এই স্কুলটি প্রথম খোলা হয়। কিছু পরে বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে সেই বিদ্যালয়টি ছাত্রীদের কল্যাণার্থে হাজারিবাগে তাঁর আপন বাড়িতে তুলে নেওয়া হয়। বোর্ডিংয়ের লব মেয়েদের সেই হাজারিবাগের বাড়িতে রেখে তাদের খাওয়া-দাওয়া গড়ানুনা দেখতেন সরদারদি নিজে। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব সেই সময়কার বহু প্রাক্তন ছাত্রীবা তাঁর হৃদয়ের মহানুভবতা ও পবন স্নেহশীলতার সাক্ষী দিয়েছেন অকুণ্ঠ-ভাষায় ও ভক্তি-গদগদচিত্তে। এই স্কুলের কাজে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিলেন তাঁর মহামায়া সত্যীশবর্জন। এই দুই ভাইবোনের অক্লান্ত চেষ্টায় স্কুলটি কয়েই উন্নতির সোপান বেয়ে উঠতে লাগল। তারপরে হল হরিশ

মুখার্জি রোডে প্রেসিডেন্সী হাসপাতালের পূর্ব দিকে এই স্কুলের বিরাট পাকা গৃহ নির্মাণ। চাঁদা তুলে এবং নিজের গাতি থেকে অল্প আর্থিক সাহায্য করেছিলেন সত্যীশবর্জন। সেই গৃহ নির্মাণকাজে অত্যন্ত পরিশ্রম করেছিলেন সরদারদি ও তাঁর মেয়েরা। আমরা আজকে চোখের সামনে সেই স্কুলের যে বিরাট অট্টালিকা দেখছি সেটা একদিনে হয় নি। বহু বৎসরের পরিশ্রমে, বহু বিনিদ্র রজনীর চিন্তায় এটি গড়ে উঠেছে। সমস্ত জিনিষটি গড়ে উঠেছিল ক্রমে এবং অনেক সাধনার পর। এর পিছনে ছিল দেশের মেয়েদের জন্যে সরদারদির অপরিণাম ও অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতা। আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের শিক্ষার জন্যে যারা নীরবে কাজ করে গেছেন সরদারদিকে তাঁদের মধ্যে পৃথক বলা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আরম্ভ কর্মভার তুলে নিয়েছেন তাঁর কন্যা—বিশেষ করে স্বর্গীয় সত্যীশচন্দ্র মুখার্জির সহধর্মিণী, স্বর্গত প্রশান্ত ও স্বর্গত এয়ার চীফ মার্শাল সূত্রের জননী চারুলতা মুখার্জি যার ডাকনাম মিনি এবং স্বর্গীয় স্বতীন্দ্রনাথ রায়ের পত্নী কনকলতা রায় যার ডাকনাম বুদ্ধ। এরা দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত এবং পিতামাতার হৃদয়ের উদারতা ও চরিত্রের মাধুর্য যেন উত্তরাধিকাসূত্রে পেয়েছেন। মিনি বোধ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম ছাত্রী বিনি ছেলেদের সংগে ক্লাশে বসে পড়া শিখে বি-এ পাশ করেছিলেন। এঁদের আগ্রহাতিশয্যে এবং সরদারদির প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চানে আমি এক বছর এই স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে তৃপ্তি লাভ করেছিলাম। সরদারদির একমাত্র পুত্র সরল যাকে সবাই খোকা রায় বলে ডাকত তিনি সরদারদির জীবদ্দশাতেই মারা যান।

সরদারদির কথা শেষ করবার আগে একদিনের কথা যা আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল তা বলা প্রয়োজন মনে কবি। সে আজ থেকে অনেক দিনের কথা। সরদারদি তখন কম ক্রান্ত। কিন্তু তৎসঙ্গেও তিনি তখনো হাবিশ মুখার্জি রোডে তাঁর স্কুলের একাংশে বাস করতেন এবং রোগ-শয্যা থেকেই স্কুলের বাবতীয় কাজে পবামর্শ ও নির্দেশ দিতেন। আমি তখনো কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছিলাম এবং উদীয়মান ব্যারিস্টার বলে সামান্য একটু খ্যাতিও বোধ হয় হয়েছিল। একদিন শুনলাম সরদারদির শরীর মোটেই ভাল নেই। কি রকম একটা ইচ্ছে হল তাঁকে দেখে আসতে—রক্তের চানই হবে বোধ হয়। কোর্ট ফেরতা

নাগলাম স্কুলের গেটে এবং উপরে উঠে গেলাম তাঁর ঘরের দিকে। খবর দিতেই ডাক পড়ল ভিতরে যাবার। ঘরে ঢুকলাম। কী খুশি যে হলেন আমাকে হঠাৎ দেখে তা বলতে পারি না। বড় বড় চোখ দুটি তাঁর জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি খাটে বালিস ঠেসান দিয়ে একটু উঁচু হবে শুলে ছিলেন। আদব করে খাটের পাশে একটা যে চেয়ার ছিল ইসাবা বসে তাতে বসতে বললেন। তারপর সরদারদি কথা বলতে আরম্ভ করলেন—যেন মনের মধ্যে তাঁর আনন্দের বান ডেকে গেল এবং অল্প জলধারার মত তাঁর কথা বের হতে লাগল তাঁর মুখে। কতকালের কথা—তাঁর বাবা-মায়ের কথা, ঠান খুড়ি (চিন্তরঞ্জনের মা)—এর কথা, নিজের ভাইবোনের কত প্রাচীন স্মৃতি-কথা, দাদাবাবু (চিন্তরঞ্জনের)—এর এবং আস্তে আস্তে আমার বাবা-মায়ের কত বিস্মৃত কাহিনী—সরদারদি বলেই চললেন এবং আমি অবাক হয়ে নীরবে তা শুনতে গেলাম মনমুগ্ধের মত। প্রত্যেকটি কথার বাপের বাড়ির গৌরব কীর্তনে তাঁর ভাবব্যঞ্জক চোখ দুটির উজ্জ্বলতা যেন ঠিকরিয়ে পড়ছিল। কেমন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ যেন গড়ে উঠল আমাদের দুজনের মধ্যে ক্ষণিকের মত। ক্রান্ত হয়ে শেষ করলেন এই বলে—“দেখ সুধী-রঞ্জন, আমার বাপের বাড়ি তেলিরাগের দাশ বংশ খুব উঁচু বংশ। যারা এই বংশের সন্তানস্বরূপ ছিলেন তাঁরা নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম সেরে একে একে চলে গেছেন। তোমার কথা কিছু কিছু শুনেনি এবং মনে মনে খুশি হয়েছি। এই বংশের গৌরব অক্ষয় রাখবার ভার এখন তোমাকেই নিতে হবে। বংশের নাম উজ্জ্বল রেখো।” স্তম্ভিত হয়ে গেলাম সেই মহীয়সী নারীর পিতৃভক্তি ও বাপের বাড়ির গৌরব বোধ দেখে। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। সেই শেষ দেখা তাঁর সংগে। রাস্তায় তখন গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। আকাশে দু-চারটে তারা ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। কেবল কানে বাজতে লাগল সারাটা পথ এবং তারও পরে সরদারদির শেষ কথাগুলি—“তেলিরাগের দাশ বংশ খুব উঁচু বংশ—বংশের নাম উজ্জ্বল রেখো।” সার্থক হয়েছে কি সে বাণী আমার জীবনে? ভগবানই জানেন।

বিজ্ঞানচর্চা ডক্টর স্যার জগদীশ-চন্দ্র বসু ও তাঁর সহধর্মিণী লেডি অবলা বসুকে বাংলা দেশ কেন সারা ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে না চেনে এমন লোক খুবই কম পাওয়া যায়। সেই লেডি অবলা বসুই ছিলেন দুর্গামোহনের

শ্রীমতী কন্যা। ১৮৬৫ সালের ৬ই আগস্ট তারিখে অবলা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশাল শহরে। আমরা তাঁকে ডাকতাম অবুদিদি বলে। গায়ের রং সরদিদির মত ফরসা ছিল না। বলতে গেলে শ্যামবর্ণই বলতে হয়। কিন্তু চোখে-মুখে একটি আশ্চর্য রকম লাভণ্যের দীপ্তি ছিল এবং কণ্ঠস্বর ছিল মিষ্টি আর নরম। অবুদিদির ককর্ষণ করে কথা বলতে আমি 'ত' কখনো জুটিন নি। তিনি অত্যন্ত বিদুষী রমণী ছিলেন। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেছিলেন এবং দুই বছর পরে তখনকার দিনের এফ-এ পাশ করেন। সে আমলে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় তিনি মাদ্রাজের মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়তে যান। কিন্তু সেখানে ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষা তাঁর দেওয়া হয় নি। কেন না ১৮৮৭ খৃস্টাব্দেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায় বিলেত থেকে সদ্য প্রত্যাগত সুদর্শনকান্তি জগদীশ বসুর সঙ্গে। বিবাহের পর অবুদিদির সংসারের কাজ-কর্মে শিক্ষানবিশী হয় তাঁর স্বামীর কাছেই। তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি উৎকৃষ্ট সুগৃহিণী। সংসারের সকল কাজেই ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি এবং তাঁর স্বামীর সেবার তিনি ছিলেন অনন্যমনা। স্বামী একনিষ্ঠ সাধকের মত তাঁর গবেষণাগারে বিজ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন থাকতেন আর এই সাধনী নারী তাঁর স্বামীর শারীরিক সুসুবিধা বিধানের জন্যে নিরন্তর যত্নবতী থাকতেন। স্বামী কখন কি চাইবেন বা চাইতে যাবেন আগে থেকে তা ভেবে নিয়ে তিনি সব ব্যবস্থা করে রাখতেন যাতে করে মৃদু-থেকে কথা বের না হতে হতই স্বামী হাতের কাছে ঈশিসত জিনিষটি পান। অবুদিদির বাড়িতে বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আত্মীয়তার কথা সকলেই জানে। তাঁদের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হত তা পড়লেই তাঁদের সৌহার্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় বসুপরিবারে বাড়িতে যেতেন দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা করতে এবং বসু-দম্পতীও কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের পালসী নৌকায় বা শিলাইদা কুঠিবাড়িতে গিয়ে দেখা করে এসেছেন। সিন্ধুর নিবেদিতা বেশ কিছুদিন বসুপরিবারে বাস করেছেন। অধ্যাপক গেডিস ও অন্যান্য বহু মনীষী ব্যক্তিরা বসুপরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করে গেছেন। অবুদিদির বাড়ি বিবস্বজন সমাগমে মৃগীরত হয়ে উঠেছে এবং মাননীয় অতিথিগণ তাঁর আদর-আপ্যায়নে বিমোহিত হয়েছেন। বসুগৃহ

জ্ঞানচর্চা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্যে শিক্ষিতমহলে প্রভুত খ্যাতি লাভ করেছিল। অবুদিদি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। ভগবৎ উপাসনা তিনি সাগ্রহে ও শ্রদ্ধার সংগে প্রত্যাহ করেছেন। অসুখ-বিসদৃশেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। ব্রাহ্মসমাজের সকল সদনুষ্ঠানেই তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল।

ভগবান এই বসুদম্পতীকে যে একটি সন্তান দিয়েছিলেন তার শিশুকালেই তাকে এরা হারান। তারপর এঁদের আর কোন সন্তান হয় নি। হয়ত তারই ক্ষতিপূরণস্বরূপে ভগবান দেশের দুঃস্থ শোকাহুর ও অসহায় নারীদের ভার এই মহীয়সী মহিলার উপরই দিয়েছিলেন। তিনি আজীবন পরিশ্রম করে গেছেন মেয়েদের শিক্ষা ও তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টায়। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ১৯১০ সালে সরদিদি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিলেতে চলে যাওয়ার অবুদিদিকেই সেই শিক্ষালয়ের সম্পাদিকার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল বহু বছর ধরে। অবুদিদি তাঁর স্বামীর সংগে ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহুবার ভ্রমণ করে সে সব দেশের নারী কল্যাণ কর্মের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এসেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্যে তিনি "নারী শিক্ষা সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে নারী শিক্ষা সমিতির আওতায় কিছু কিছু স্কুল খোলা হয়েছিল মেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার জন্যে। পরে এই সমিতির কার্যক্রম ক্রমশ বিস্তারলাভ করে মেয়েদের হাতের কাজ শিখিয়ে তাদের অর্ধোপার্জন-কর্ম করার প্রচেষ্টা সুদূর হয়েছিল। "বিদ্যাসাগর বাণী ভবন," "শিল্প ভবন" ও অন্যান্য কত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল অবুদিদির অনুপ্রেরণায়। এই সকল নারী-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান দ্বারা কত যে অসহায়, বিধবা নারীর শিক্ষা ও জীবিকাজনের পথ সুগম করে গেছেন তা দেশবাসী সবাই জানে। এই প্রতিষ্ঠানে গোড়াব দিকে আমার সহধর্মিণী জ্যোতা ভগিনী প্রতিভা সেনগুপ্তা অক্লান্ত পরিশ্রম কবেছেন তাঁর স্বল্পপারিসর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এই সৌন্দর্য লোভ বসুর শতবার্ষিকী উৎসবে সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশবাসী সকলে যে সজ্জন্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সেটা তাঁর প্রাপ্যই ছিল। সরদিদির মত অবুদিদির মধ্যেও শুনছি তাঁর বাপের বাড়ি গৌরবের ভূমসী প্রশংসাব কথা।

দর্শনমোহনের কনিষ্ঠা কন্যার নাম ছিল শৈলবালা। বড়রা তাঁকে ডাকতেন

"খুসী" বলে আর আমরা বলতাম "খুসীদিদি"। খুসীদিদি শ্যামবর্ণ, বেশ মোটাটো মহিলা ছিলেন। তিনিও খুব উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি সমবয়সী মহিলাদের সংগে বেশ মিশতে পারতেন এবং তাঁর অনেক সহপাঠী বান্ধবী ছিলেন। শুনছি স্বর্গীয় স্যার চন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা ও স্যার অশোক রায়ের জননী যাকে আমাদের দাদারা ও দিদিরা 'দিদিমণি' বলতেন তাঁর সংগে খুসীদিদির খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। পিতব্য ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা তরলা যাকে আমি দিদিমণি বলে ডাকতাম তিনি খুসীদিদির সহপাঠী ছিলেন। খুসীদিদি সাতেও ছিলেন না পাঁচোও ছিলেন না। তার সংগে বিবাহ হয়েছিল তাঁর বড় ভগিনীপতি পি কে রায়ের ছোট ভাই স্বরিকনাথ রায় (ডাক্তার ডি এন রায়)-এর সংগে। সদাহাস্যময়ী খুসীদিদির মর্নিট সত্যিই সাদা ও খুশিতে ভরা ছিল। তিনিও সুগৃহিণী ছিলেন। স্বামীর অর্থবলের অভাব ছিল না। হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারের পেশার উচ্চশিল্পে তিনি উঠে প্রভুত অর্থ উপার্জন করে গেছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য খুসীদিদির চরিত্রের মাধুর্য খর্ব করে নি। তাঁর একমাত্র কন্যা মালতীর বিবাহ হয়েছিল সুব্রহ্মনাথ বসুর সংগে। সুব্রহ্মনাথ বিদেশে বিদ্যাশিক্ষা করে দেশে ফিরে 'ডাকব্যাক' ওয়াটার প্রুফের কাবখলা স্থাপন করে খুব বিস্তৃত ব্যবসায় করে বিস্তর অর্থ ও যশ অর্জন করে গেছেন। ছেলে দু'টি—রঞ্জিত ও অমিয়নাথ দু'জনেই—চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে এসে 'রে এ্যান্ড রে' নামে ফার্ম করে খুব সুখ্যাতির সংগে কাজ করে অল্প-বয়সেই মারা গেছেন। এঁরা দুই ভাই-ই আমাকে অল্প ভালবাসতেন এবং আমার জীবনের প্রতিটি উজ্জ্বলিতে এঁরা খুশি হতেন। বিশেষ কবে অমিয় হার ডান্স-নাম ছিল পটু তাঁর সংগে আমার বেশ সম্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তেলিরবাগের মধ্যের বাড়ি এই একটি শাখা থেকেই কতজন খ্যাতিমান সন্তান ছেলে ও মেয়ে উদ্ভূত হয়েছিলেন তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এই শাখার ছেলেরা তাঁদের স্বগ্রাম তেলিরবাগ ও সেই গ্রামবাসীদের কখনো ভোজেন নি। এই শাখার প্রত্যেকটি মেয়েই বিদুষী এবং সুগৃহিণী এবং তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের বাপের বাড়ির গৌরব আজীবন গরবিনী ছিলেন এবং তাঁরা যে দাশ গোষ্ঠীর কন্যা এই কথা ভেবে নেন এবং বাক্যে স্ফাঘা বোধ করতেন।

এবজ্য

চন্দ্রশুভ্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন চরিত্র যেন বলেছিল : ইহা এমনিই হয়, এমনিই বটে! শিল্পী সাহিত্যিকদের চরিত্র চরিত্র-বদলও এমনিই হয়, এমনিই বটে! অন্তত একালের বাংলাদেশে অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গে। এ চরিত্র-বদল হয়তো কম-বেশি অন্যদেশেও ঘটে, এবং হয়তো অল্প-বিস্তর সর্বকালেই। বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবের পথ তৈরি করেন, পথ নষ্ট করতেও কম সিম্ভহস্ত নন। আর এই-জনাই তারা সংগ্রামী মানুষের সন্দেহভাজন।

তা' না হ'লে গত উনিশে মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এ পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রলীগের সংবর্ধনা-সভায় কেন এমন কিছু মুখ দেখব, যে-মুখ এক মাস আগে, ভুল বললাম আর আটশ দিন আগে, উনিশে ফেব্রুয়ারী ঈশ্বরুক দিনেও ছিল পরাজিত সন্ত্রাসের বন্দনায় মুখের? সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করেছিলেন বাঙালী শিল্পী ও সাহিত্যিক। সেই হিসাবে দল-মত-নির্বিশেষে সকল সাহিত্যিক ও শিল্পীর সমাগমই উক্ত সভায় অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু চন্দ্রশুভ্রের মতো একজন সাধারণ নাগরিক মস্তের ওপর কংগ্রেসীয় সাহিত্যিকদের যখন অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব বন্দনায় আগ্রহ হতে দেখেন, তখন কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হবেন বৈ কি, তা' হোক তাঁর সাধারণ বুদ্ধি যতই প্রখর! অবশ্য চন্দ্রশুভ্রের বিপ্লবের ঘোর কাটতে বেশি-কম সময় লাগে নি, কারণ সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের কিছু ছাত্র-স্বল্পখ্যাত লেখক এবং শিল্পীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞপ্তি দেন। এবং তাঁদের কাছাকাছি সাম্প্রতিক কার্য-কলাপ দ্রুতবিধির সংবাদ তাঁর নথিপত্রে!

গম্ভ হ'লেও সত্যি! বাংলাদেশের একজন কীর্তিহীন সাহিত্যিক, সাহিত্য-প্রমত্তা হিসাবে যিনি চন্দ্রশুভ্রের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন, একসময় প্রচণ্ড অর্থিক দুর্যোগের সন্মুখীন হন। উক্ত সাহিত্যিকের জৈনিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তখন দিল্লীর দরবারে প্রতিপত্তিশালী। বন্ধুর বিপদেব কথা শুনে তিনি তাঁর জন্য একটি সজ্জন মাইনের চাকরি জোগাড় করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি

বছর গাড়নে গেছো উক্ত সাহিত্যিক সম্ভাব্য সব আখের গাড়িরে নিয়েছেন, আর তাঁর দিল্লী-প্রবাসী বন্ধুর প্রতিপত্তি অনেক কমে এসেছে। দিল্লীর ভদ্রলোক সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দেখা করতে গেছেন পুরোন বন্ধুর কাছে। তাঁদের অবাস্তব সংলাপের কিছু অংশ তুলে দিই :

‘আ রে আসুন, আসুন, তা' ইলেকশন চলেছে কেমন?’

‘ভালোই।’

‘কিন্তু! কিন্তু! কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলেন কেন?’

‘আপনার কি মনে হয়, কংগ্রেস এবারে মেজিবিটি পাবে?’

‘নিশ্চয়ই! আপনি দিল্লীর লোক



হ'য়ে রাজনীতি করে এটুকু বুঝতে পারছেন না, অন্যান্যবাবের চাইতে কংগ্রেসের পক্ষন এবারে অনেক বেশি ভালো।’

‘আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। আমার ধারণা, আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে অন্তত কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ফর্ম করবে না।’

‘যাক গে, তর্ক ক'বে লাভ নেই, ফলেন গরিচীরতে।’

‘আমিও তাই বলি। আপনার কাছে

আমার একটা অনুরোধ আছে। আমার নির্বাচনী আবেদনে আপনার একটা সই চাই।’

‘সই? কী বলছেন? না না আমি পারব না। দেখুন, আমি সাহিত্যিক মানুষ, রাজনীতি-টাজনীতি ব্যক্তি না, ও সবের মধ্যে আমি নেই। কিছু মনে করবেন না, সই আমি দিতে পারছি না।’

স্থানাভাব। সময়ভাব। অনিচ্ছাও প্রবল। ব্যক্তি সংলাপটুকু আর দিলাম না। একদা-উপকৃত সাহিত্যিক-বন্ধুর ব্যবহারে আহত নির্বাচনপ্রার্থী অন্য এক সাহিত্যিক-বন্ধুর কাছে গেলেন। এই সাহিত্যিক-বন্ধুও নানাভাবে তাঁর স্বারা উপকৃত। ‘ভারতবর্ষের কোন - ব্যাপারে রাজনীতিতে তো নরই, আজ আর আমার ইন্টারেস্ট নেই, মার্কিনী আকাশ বে আজ আমার চোখে অনেক বেশি নীল কাব্যময় প্রাণবন্ত তা' আপনি জানেন, সুতরাং আপনার অকংগ্রেসী নির্বাচনী ইস্তাহারে স্বাক্ষর দিতে আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করুন—’ এই ধরনের সাহিত্যোপেত সংলাপে পুনর্বীর আহত, দিল্লীর ভদ্রলোক যখন তাঁর ডেরার ক্রান্ত দেহে ফিরে এলেন তখন কলকাতার সম্মার আকাশে অনেক উজ্জ্বল তারাই মেঘের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল।

তাবপর কয়েকটি তপ্ত দিন। বন্ধু-প্রত্যাখ্যাত দিল্লীর ভদ্রলোক নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। কংগ্রেসীয় সমস্ত সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেসকে অপদম্ব কবেছে। যাঁরা একদিন অজয় মুখোপাধ্যায়কে দলত্যাগী বলে বিদ্রূপ করেছিলেন, আজ তাঁরাই তাঁকে তমলকের দুলাল বলে অভিনন্দিত করছেন। এই সব সাহিত্যিকের উজ্জ্বলিত লেখনীতে অজয় মুখোপাধ্যায় আজ ‘জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক’, ‘সংগ্রামী জনতার মূর্তিমান ভাষা’। এই অসাধারণ মানুষগুলির কাছে চন্দ্রশুভ্রের মতো সাধারণ মানুষের একটি বিনীত হয়তো নিবেদন জিজ্ঞাসা : ‘অজয় মুখোপাধ্যায় হে-দিন চোরপীর শৌখিন কংগ্রেস-ভবন থেকে নিঃশঙ্ক পদ-চারণায় চৌবাগাতে এবং তারপরে ধূলি-ধূসর তমলকের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিন তাঁরা কোথায় ছিলেন? সেদিন তাঁদের প্রতিভাবহ কলম থেকে কেন একটি প্রতিবাদও নিগত হয় নি, এমন কি অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি সামান্য বাক্যও?

কলকাতা যেদিন ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক রাজধানী ছিল, সেদিন থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। যে-যুগে ভারতীয় সাহিত্যিকের পক্ষে ‘নাইটহুড’ সম্মানে পদাঘাত করা সম্ভব ছিল, সে যুগ

নব মন্ত্রিসভা প্রতীপে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

খাদ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহারের জরাজীর্ণ অধিভোগ ছাড়াও খাদ্য নিয়ে রাজনীতিও চলেছে। আর এ রাজনীতির প্রধান সহায়কের ভূমিকায় খাদ্য ও কৃষিদপ্তরের প্রশাসকমণ্ডলীকে দেখা যায়। দেশের ভাগ্য নিয়ে এক চরম জুয়াখেলা চালানো হচ্ছে। এদের সংগে 'কারেমী' ও 'ব্যবসায়িক স্বার্থের অশুভ হাতের অদৃশ্য খেলাও চলেছে। গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রিপত্রের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, '১৯৬৭ সালের খাদ্য উৎপাদন ১৯৬৬ সালের উৎপাদনের চেয়ে এমন কিছু খারাপ নয়। আউস ও আমন মিলিয়ে ১৯৬৬-৬৭ সালের তুলনায় ৭১,০০০ টন কম হয়েছে।' বিবৃতিতে খাবি গ্রাহ্য না হুই পানি নীতির ও এক চাফুরের পবিচয় সুস্পষ্ট। কত উৎপাদন হয়েছে সেটা সম্বন্ধে নিরুত্তর। কিন্তু অন্যান্য বছরে এই মন্ত্রিপত্রের সরবে ফসল কাটা হবার আগেই উৎপাদন অঙ্ক ঘোষণা কবতে শোনা যেত। ১৯৬৫-৬৬ সাল বা ১৯৬৬ সালের গোড়ায় পশ্চিম-বঙ্গে খাদ্যের দাবিতে গুলী ও গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই বছরে ফসল ওঠার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কৃষিদপ্তর ও কৃষিমন্ত্রী তারস্বরে ফসল হয় নি বলে মানুষের মনে অহেতুক ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ কি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নয়? এই ১৯৬৭ সালে পশ্চিম-বঙ্গে খরার আক্রমণে প্রায় প্রতি জেলায় ফসল হানি ঘটেছে ও কয়েকটি জেলায় স্ৰীতিমতো আশঙ্কাজনকভাবে অল্পস্বা ঘটেছে—এ চিত্র আমরা বাস্তবে লক্ষ্য করছি। তবুও ফসলের দাম ও তজ্জনিত সঙ্কট এখনও দেখা দেয় নি। এ প্রসঙ্গে আজ ইতিহাসে পর্ববিস্ত। একালের সাহিত্যিক সাহিত্য-ব্যবসারী, অনেক ক্ষেত্রে বাচ্যার্থেও।

*

আবার ফিরে যাই ইনস্টিটিউটের সভায়। মণ্ডের ওপর তথাকথিত গণ্য-মান্য বহু লেখক ও শিল্পী। এবং শ্রোতৃসামার-ণের মধ্যে চরিত্রবলে অধিকতর প্রবেশ অধিকতর সংখ্যক শিল্পী-সাহিত্যিক। মণ্ডের ওপর সমাসীন একজন লেখককে দেখলাম যিনি জাতি সম্প্রতি, নির্বাচনের মাত্র দু-এক মাস আগে, পরাজিত দলটাকে 'মহামানব' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

আমরা ১৯৬৫-৬৬ সালের খাদ্য বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে স্মরণ করে দেখতে পারি। প্রফুল্ল সেন ঘোষণা করেছিলেন পশ্চিম-বঙ্গে আমন ধান উৎপন্ন হয়েছে ৪৪ লক্ষ টন আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়ম ঘোষণা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন হয়েছে ৫৪ লক্ষ টন। এই বছরে প্র্যানিং কমিশনের যোজনা পত্রিকায় বলা হয়েছিল সারা ভারতবর্ষের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ কৌ-লমেই ৫০ লক্ষ টনের বেশি হতে পারে না। অথচ কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর প্রথমে ৬০ লক্ষ টন, পরে ৮০ লক্ষ টন তারপরে ১ কোটি টন ও শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ২০ লক্ষ টন ঘাটতি হবে বলে চিৎকার করে ঘোষণা করেছিল। 'আশ্চর্যের কথা যে ১৯৬৫ সালের পর ১৯৬৬ সালে ভারত সরকারের হাতে ৮০ লক্ষ টন খাদ্য মজুত ছিল পশ্চিমবঙ্গে যখন গুলী চলছিল তখন পাজ্রাবে গম বিক্রির অভাবে স্তূপী-কৃত হয়ে পড়েছিল—পার্লামেন্টে অভিযোগ এনেছিলেন আচার্য কপালনী। এখানে আপাত অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে এই ১৯৬৫ সালে আমেরিকার গম আনতে আমাদের জাহাজ ভাড়া দিতে হয়েছিল ৭৭ কোটি টাকা আর আমেরিকার গমের মূল্য পরিশোধের কোটি কোটি টাকার এক বিরাট অংশ এদেশের আমেরিকার এমবাসীতে তহবিলে জমা থাকে এবং যে তহবিল ভারতের জাতীয় স্বাধীবিরোধী বহু কাজে ব্যয়িত হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এই কোটি কোটি টাকার সংগে অনেক অদৃশ্য হাতের যোগাযোগ আছে ও অনেক বাজনীতিব খেলা আছে এ আশঙ্কা কি অমূলক?

আর দেখলাম সি. আই. এ-র সাহায্য-পুষ্ট কিংবা সমর্থনহীন 'বীট' লেখকদের অনেককেই যারা সদলবলে গত কয়েক বছর দেশময় বিবর খুঁড়ে গেছেন, দেশে দেশে নান্দিত করি যাদের ভেরী সঞ্চিত হয়েছে এতকাল, আজ তাঁরাও 'প্রগতিশীল'।

কংগ্রেসস্বাক্ষর সাহিত্যিক থেকে ক্যাপিটালিস্ট-পন্থী সকলেই আজ অকংগ্রেসী-সোস্যালিস্ট সরকারকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি তাড়াতাড়ি।

ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়।

২৬৪৫

খাদ্য বণ্টন ও ব্যবহারের চিত্রটি অনুধাবন করা হোক। পশ্চিমবঙ্গে যখন চালের কিলো তিন টাকা হল তখন পাজ্রাবে গম স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে ক্রেতার অভাবে। আর যখন ২৪ পরগনা জেলার ১০০ টাকা মণ চালের দাম উঠেছে তখন হুগলী নদীর ওপারে মেদিনীপুর জেলায় চালের মণ বিক্রি হয়েছে ৩৫ টাকায়। কি বৈজ্ঞানিক বণ্টন ব্যবস্থা! রাজ্য কর্ডন, জেলা কর্ডন ও থানা কর্ডন সবই পরীক্ষিত হল কিন্তু বাস্তব ফললাভের বদলে দুর্দশা বৃদ্ধি হল। আব খাদ্য ব্যবহারের ব্যবস্থাটি আরও চমৎকার। যুক্তি দেখান হল দেশে যখন খাদ্যাভাব প্রকট তখন সকলে মিলে কৃচ্ছসাধন করা দরকার। দেশের জনসংখ্যাকে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ এই পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হল নিম্ন, অম্পবিস্ত, নিম্নবিস্ত, মধ্যবিস্ত ও বিস্তশালী এই পর্বায়ে। আর গোটা বছরটাকে এই রকম কয়েকভাগে ভাগ করা হল যেন ঐ শ্রেণীর লোকেরা ক্রমান্বয়ে খাদ্য পেতে পারে। আবার ব্যবহারকারীদের ব্যবস্থাপনায় আব এক দফা কৃচ্ছসাধন করা হল। ঘাটতির যখন হিসাব করা হল তখন মাথাপিছু ১৬ আউন্স বা এক পাউন্ড দ্রা হল কিন্তু দেবার বেলায় দেখা গেল শহরের লোকেরা পাবে দু' হাজাব গ্রাম আর গ্রামের লোকেরা পাবে আঠার শ' গ্রাম। এখানেও মাথাপিছু সপ্তাহে দু-তিন পাউন্ড পর্যন্ত কম দেওয়া হল। সুদীপ্ত বিনোদন ও সুদীপ্ত বিন্যাস। খাদ্য ঘাটতির জটিল অঙ্কের কেমন সরল সমাধান তৈরি কবলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু সব গরমিল হয়ে গেল।

কয়েকদিন আগে ধর্মতলা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় রাস্তার রেলিঙে টাঙানো ক্যালেন্ডার-মালায় একটি বিচিত্র দৃশ্য দেখেছিলাম : একটি উত্তেজক প্রায়-উলঙ্গ নারীমূর্তির এক পাশে সৌম্য বিষ্ণুমূর্তি, অপরপাশে নিরুত্তাপ লালবাহাদুর। এই ক্যালেন্ডার-মালায় মতো সেদিনের মন্ত্র-সংবর্ধনা-সভাতেও ভারত-সভ্যতার সম-স্বয়ী ধর্মের আবিষ্কারে পুলাকিত চন্দ্রগুপ্তের মূখে উচ্চারিত হয়েছিল নিম্নগ্রাম অবস্থ্য : এমন দেশটি কোথায় হুঁজে পাবে নাকো তুমি।

বিসমিল্লায় গলদ হয়ে উঠল। তেনে এই ব্যর্থতা? এই প্রশ্ন জনসাধারণের ও এই প্রশ্ন এই নবগঠিত সরকারের হওয়া উচিত। এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে আবার বিপর্যয় এড়ানো যাবে না। তাই এই মন্ত্রিসভাকে প্রশাসন দপ্তরের স্বকপৌলিকগণিত এই তথ্যনির্ভরতামুগ্ধ হতে হবে সকলের আগে।

এই কন্ট্রোল ও স্যারশনিং প্রথা প্রবর্তনের পেছনে যে রাজনৈতিক ও দলীয় রহস্য লুকিয়ে আছে তা ধরার অনুরোধ করি। আমি আগেই বলতে চেয়েছি এ ব্যবস্থা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কংগ্রেস ক্ষমতা করাস্ত্র স্বাধীন জন্য এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করত আর ঘাটতির আশঙ্কাজনক চিত্র সূচিপটুভাবে তুলে ধরে বিরোধী পক্ষের ক্ষমতা আদায় করত। এইভাবে বিধান সভার বিরোধী পক্ষের সমর্থন আদায় করত কিন্তু কংগ্রেস পরিষদীয় সভায় কখনও এ বিষয়ের অবতারণা করত না এবং এ প্রসঙ্গ কোনরকমে উত্থাপনের সুযোগ দিত না। পাছে এই পার্টি পরিবেশে বিশদ আলোচনা হয়, সেই ভয়ে কংগ্রেস পরিষদীয় পার্টিতে আলোচনা করার সুযোগ দিত না ইচ্ছাকৃতভাবে সভার আহ্বান না জানিয়ে। দু'একজন কিছু বলতে চলে বিনিময়ে তৎসনা ও শ্রাসনের রক্তচন্দ্র পেয়েছে। ক্ষমতা করার সুখাচার জন্য কন্ট্রোলই একমাত্র দাব্যবাই এটা পার্শ্চমবঙ্গের কংগ্রেসের উচ্চতম নেতারা হুঁকতে পেরেছিলেন। তাই প্রফুল্ল সেন শ্রমাই মন্ত্রিসভার গোড়ার দিন থেকে শেষ পর্যন্ত খাদ্যদপ্তর হাজার ভিত্তি সমালোচনা লেখু ও ছাড়েন নি। আর কংগ্রেসের সংগঠনও বেঁচেছিল এই কন্ট্রোলকে আঁকড়ে ধরে। চার আনা চাঁদার কংগ্রেসপ্রেমিক সদস্য খুঁজে পাওয়া যেত না আর সক্রিয় সদস্য ত'দুল'ভ ছিল। তবুও মণ্ডল কংগ্রেস ও জেলা কংগ্রেসের ঠাট বজায় ছিল। কিন্তু বিনা স্বার্থে যে কেউই কংগ্রেস করবে না—এ সত্য কংগ্রেস নেতৃসমূহ মনে পেরেছিলেন। তাই গ্রামেব রাজনীতি করার জন্য এই মোচাক তৈরি অপরিহার্য ছিল। ডিলার ও তার সংগে জড়িত পণ্ডায়েত সদস্যরাও সংশ্লিষ্ট বে-আইনী কারবারী দোকানদার-ই ছিল একমাত্র কংগ্রেসপ্রেমিক। আর এই সদস্যরাই ত'গ্রামের প্রভাবশালী নিরস্ত্রণকারী নেতা! তাই এদের খাওয়ানো বা 'ফিড' করার জন্য সেন সরকার সারা দেশেব কংগ্রেসের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী সবকাব ছিল। কিদোয়াই সাহেবের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার ব্যাপারে তাই সেন মশাই সবচেয়ে প্রতিবন্ধক ছিলেন।

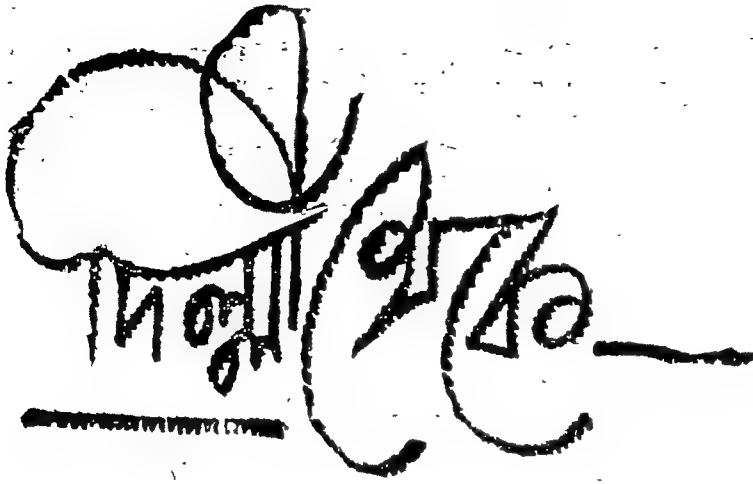
যে কারণগুলি দেখিয়ে আমরা কন্ট্রোল ও রেশনিং সমর্থন করি তার মধ্যে খাদ্য-

দ্রব্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি অন্যতম। যখন মূল্যবৃদ্ধি আতঙ্কজনক অবস্থায় পৌঁছায় তখন মূল্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য রেশনিং প্রবর্তন শেষ উপায় বলে শেষ রায়দান করি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে বাস্তব চিত্র ঠিক বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়। কন্ট্রোলের সাথে সাথে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য না কমে বরং বাড়তে থাকে। ১৯৫২-৫৩ সালে খাদ্য-মূল্যের সূচক ১০০ ধরলে ১৯৫৬ সালে মূল্যসূচক কমে ৭০ হয়েছিল ও এই বছর কিদোয়াই সাহেব কন্ট্রোল তুলে দেন। ১৯৬২-৬৩ সালে সূচক সংখ্যা ছিল ১০৫। আবার কন্ট্রোলের কড়াতিড়ি হওয়াতে ১৯৬৪ সালে দাঁড়াল ১৪৩ ও এই সূচক ও মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক ঘটায় সরকার আরও নিম্নমভাবে কন্ট্রোল ও প্রৌকিওরমেন্ট চালু করতে চেষ্টা করল। ফলে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই সূচক সংখ্যা হল ১৭৬। ১৯৬৬-৬৭ সালে এই সূচক সংখ্যা সকল সম্ভাব্য অঙ্ক ছাড়িয়ে গেল যখন চালের কেজি ৩.০০ টাকা হল। কিন্তু নির্বাচনের কিছু আগে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ভোটের বাস চিন্তা করে কংগ্রেস সরকার কন্ট্রোল ব্যবস্থা শিথিল কবে দিল তখন চালের দাম হু-হু করে কমে গিয়ে ১.৪০ পর্যন্ত নেমে যেতে দেখেছি। কেন এমন হল? মুনাক্ষাখোররা রাতারাতি সাধু বনে গেল? তিন টাকা কে-জির লোভ ছেড়ে দিলে? অথচ সকলেই জানে কার্তিক মাসে চিরদিনই চালের দাম বাড়ে।

আরও একটি বিষয়ের জন্য কন্ট্রোল সমর্থন আদায় করে—সেটা মজুতদার প্রতিরোধ। অস্বাভাবিক মুনাক্ষাকারী জন-দুর্দশা সৃষ্টিকারী এই সামাজিক অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন সকলেই বোধ করেন। সরকার খাদ্যের ওপর ব্যাপ্তের দানদান বন্ধ, খাদ্যের ফটকাবাজি বন্ধ ও মজুত করার পরিমাণ নির্দিষ্টকরণ প্রভৃতি বহু আইন করেছিলেন এবং ডি আই আর হাতে থাকায় সপ্তাহে সপ্তাহে নানা শাস্তিমূলক অর্ডার জারী করেছেন। সকল প্রচেষ্টাই হয়েছে কিন্তু অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই বয়ে গেল। যেখানে যত ফাঁক আছে মনে হয়েছে তখনই তা প্রতিকার করতে গেজেট নোটিফিকেশন বেরিয়েছে। তাহলে গলদ কোথায়? তাহলে কি এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না যে, সমস্ত আইন অর্ডার ও নোটিফিকেশন প্রয়োগকারী সরকারী প্রশাসনবল্য আন্ত-বিকভাবে সাহায্য করে নি ও প্রয়োগ-নীতিতে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল? এই প্রশাসন-বল্য আন্ত ও ভবিষ্যতে থাকবে। এদের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে চলতে হবে। তা হলে এদের ওপর নির্ভর করা কি নিরাপদ? একজন বলেন যে এই অর্থ-

ভুক্ত প্রশাসকমণ্ডলীর কাছে এর বেশি সার্ভিস চাইতে গেলে ভুল করা হবে। কেন না মনে-প্রাণে তারা সবাই অসম্মোষে ভুগছে। এই প্রশাসকমণ্ডলী সাহায্য তো করে-ই নি উপবস্তু প্রয়োগনীতির অজু-হাতে সারা দেশে অত্যাচারের আগুন জ্বলতে দিয়েছে। কয়েকটি বহু মজুত-দারদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় ও কন্ট্রোলবে কার্যকরী কবাব প্রশ্নে কড়নিং, চেকপোস্ট ও লেভি প্রবর্তন করা হল। কিন্তু চেক-পোস্টের ওপারে ও এপারে হাজারে হাজারে বালক কিশোর যুবা ও বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গোপন কারবারে হাত পাকিয়ে তুলল। রাতারাতি হাজার হাজার সমাজ-বিরোধী শক্তির সৃষ্টি হল—রবীন্দ্রনাথের সেই ভ্রমশেষের মত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া হল। জীবিকা অর্জনের এই সস্তা পথের লোভে আমাদের অঞ্চলে দেখেছি ছোট-খাট মৃদি পান-বিড়ি ব্যবসায়ীরাও নিজস্ব ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে গোপন ব্যবসায় মেতে উঠেছিল। তাহলে কন্ট্রোলের নীট লাভ মুনাক্ষাকারী ও মজুতদার নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে হাজার হাজার সমাজ-বিরোধী জন্ম দেওয়া হল। লেভিও আর এক প্রশাসন-দুষিতকারী ব্যবস্থা। লেভি নির্ধারণ ও লেভি ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রশাসনবল্য কি খেলা দেখাতে পারে তা বোধ হয় কারো জানা ছিল না। লেভি-হানিকে লেভি ধরা, যতটা হওয়া উচিত তার অতিরিক্ত ধরা ইত্যাদি কৌশলে নিরীহ নাগরিকের অস্ত্র হস্তরাশি আর তা মুগ্ধ হওয়ার জন্য নানা দুর্নীতির আশ্রয় নিতে দেখেছি। এখানে জনসাধারণকে আর এক প্রস্ত অসাধু করতে দেখেছি। আমাদের অভাগা সরকার বোধিকে চার সেখানে শূন্য সত্যতা শুনিয়ে যায় না বরং অসাধু-তাব কাটাগছে গাঁজিয়ে ওঠে। নেতৃবৃন্দের বোকা উচিত যে হলে ধরার ক্ষমতা যেখানে নেই সেখানে কেউতে ধরে খেলা দেখাতে যাওয়ার পরিণাম মর্মস্ফূট হয়। নেতৃবৃন্দের এই স্বাভাবিক সমাজ-বিজ্ঞানের জ্ঞানের অভাবই প্রশাসক দলের ওপরের অসাধু কয়েকজনের পক্ষে তাঁদের হাতে গাঁজা খেয়ে যাওয়ায় সৃবিধা হয়েছে। ছোলা ও সরিষার তেলের যে ক্রলেস্কারির চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা নমুনা মাত্র। অনু-সন্ধান করলে এ রকম সত্য ঘটনা হাজারে হাজারে বেবুবে। একটা প্রবাদ আছে যে ভাগ্য ফেবাবার প্রশস্ত সময় হল দর্ভিঙ্ক ও রাষ্ট্রবিপ্লব। আমরা বলতে পারি যে কন্ট্রোল কথাটি তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। তাই নতুন মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করি যে খাদ্যনীতি নির্ধারণে যা নয় তাই নয় এই প্রাচীন বাক্যটি যেন দয়া করে মনে রাখেন।—শ্রীসর্বপ্র

(চলবে)



কি অপূর্ব সমন্বয়।

খোদাভালায় জন্মাই যেন সমগ্র হিন্দু-স্থান থেকে বাছা বাছা গুলবাগিচার ফুল নিয়ে তৈরি হয়েছে এই অপূর্ব গুলদিন্দিতা। যেমন শব্দিতে সম্রাট শাহজাহান নিজেই জীবনের সাতাশটা বছর রণক্ষেত্রে কাটালে চিরবিজয়ী বীর, তেমন রাজধানী দিল্লীর রাজভাণ্ডারের অক্ষরস্তম্ভাবে যেন লক্ষ্যীর হাসিমুখ ঠিকরে পড়ছে। ঠিক দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ গুলীজন সমবেত হয়েছেন মজিল-ই-নিগমবোধে। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ষোণী কবি শারমাদ, সাথে সাথে শ্রেষ্ঠ সাধক মিয়া মিব। কি অপূর্ব সমাবেশ।

তবুও মাঝে মাঝে ভয় হয় জাহান আরার। গুলী কবি। সর্বধর্মের সারমর্ম ফুরেছেন হৃদয়ঙ্গম। তাই ভয় জাগে মনে। নিভে যাবার আগে এটা প্রদীপের উজ্জ্বল-তম শিখা নয়? মোগল সাম্রাজ্য শোঁবে বীর্ষে, সাহিত্যে, দর্শনে, ঐশ্বর্যে, মর্যাদার কোনদিন এ উচ্চ-শিখরে উঠেছিল কখনও। শব্দ মোগল কেন? কোন সম্রাটের রাজত্ব দেখা গেছে এ স্বতন্ত্রত্ব শতমুখী প্রতিভার বিকাশ? না বোধ হয়। অতত জাহান আরার বেগমের জানা ইতিহাসটুকুতে তো নেই তার কোন নজীর।

তাই এ ভয়।

জীবনটা যেখানে একটা কণ্ঠস্বর মরশুমী ফুলমাত্র, সেখানে উজ্জ্বল দেখলেই বৈজ্ঞানিক ভয়। ফুটন্ত গোলাপি যে শব্দ তার করে যাবার আগেই দেখায় তার পূর্ণ জৌলুস। তুর্বাড়ী নিভে যাবার আগেই যে শেষ চেষ্টা করে গগনস্পর্শী হতে। তাই চারিদিকের এই প্রতিভা বিকাশের অপূর্ব সমাবেশে, এই মহা একতানে, হিন্দুস্থানের সম্রাট শাহজাহান, ভাবী সম্রাট ভাগ্যবান শাহজাদা দারা-শাহ বুলন্দ ইকবাল যতই ঋণী হন না কেন, কবিগত প্রাণ জাহান আরার মন কেন কোন অকারণ শিহরণে কেঁদে ওঠে? এ মহা সমস্যার সমাধানটুকু যার জানা সাধকশ্রেষ্ঠ

লাহোরের মিয়া মির সাহেব এখন নাগালের বাইরে। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন এ প্রশ্নের ছোট্ট জবাবটুকু।

আপন মনে জাহান আরার আবৃত্তি করেন ছোট্ট রুবাই—

“হর কস্বহবিস বাগে

জহাঁ দীদ গুলস্ত”।

খারো গুলে পজমুরদা

বহম চান গুলস্ত”॥

ই সুরতে হস্তা কি

তমাসগ মানী অস্ত”।

অফসোস বর অকস

কি ন ফহ্মান গুলস্ত”॥”

কত দরদ কত ভালবাসা, কত ব্যাকুলতা নিয়ে পথিক দুনিয়ার বাগিচার চারিদিক দেখাছিল চেয়ে। বাগিচা থেকে সে দুচারটে ফুলও করল আহরণ। তাতে তার

শ্রীবিবেকবজ্রন ভট্টাচার্য

গল্পে কয়েকটা কাটাও গেল বিধে। তারপর সে এ হরণী থেকে নিল চিরবিদায়। এ দুনিয়াটা সত্যিই একটা আজব রহস্য। এর সত্যস্থানে যে মনে কৌতূহল নেই তাকে অনুকম্পা ছাড়া কি করা যায়?

কি আশ্চর্যময় ছিল এই মিয়া মিরের জীবন। দিল্লী কেন? হিন্দুস্থানের কেনা জানে লাহোরের এই তাপস সন্ত জীবন্ত জানোয়ারের প্রতিটি ভাষা বুঝতে পারতেন। তিনি ব্যস্ত পারতেন গাছপালা ফল ফলের আনন্দঘন হিন্দোল। তিনি গাছপালা সাথে কথা কইতেন। কথা কইতেন সন্ত জানোয়ারের সাথে। এ কাহিনী দিল্লীর কেনা জানে? শব্দ রাজ দারা এ কথা প্রথমে কিছতেই বিশ্বাস হয় নি। নিজের চেখে লাহোরের পর্ণ কুটীবে এসব ঘটনা দেখে এসে বলেছেন জাহান আরাকে। জাহান আরার সর্বশবীর আজ্ঞা একথা

ভাবলে কেঁপে ওঠে। কিন্তু সে তো কাহিনী নয়। ঘটনা। শব্দ রাজ দারা নিজেই এসব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন আগামী কালের হিন্দুস্থানের তাপসদের জ্ঞান ভিতরণের জন্য।

মিয়া মির সম্বন্ধে আজও দিল্লীর ঘরে ঘরে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। লাহোরে যে মক্কারায় এ তাপস বাস করতেন সেটা ছিল দোতলা। একতলাতে থাকতেন মিয়া মিরের এক শিষ্য ও সেবক। তাঁর নাম ছিল মিয়া নাথাসা। নাথাসাহেব গুরু সেবাতেই দিন কাটাতে। পীরের অশীর্বাদে অধ্যাক্ষগতে তিনি অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। এর প্রতিদিনের কাজের ভিতর একটা কাজ ছিল নামাজের পূর্বে মিয়া মিরের হাত পা ধুইয়ে দেওয়া। মিয়া মির ওপরভাষা থাকতেন। একদিন নিজের ধ্যান-ধাবণায় মিয়া নাথাসার জল নিয়ে গুরুর চরণ ধোয়াও একটু দেরি হয়েছিল। গুরু প্রতিদিন নিজেই নাথাসার জন্য অপেক্ষা করতেন, শিষ্যের দেরি হয়ে গেলে তিনি নিজেই হাঁক দিবে তাঁকে ডেকে নিতেন। তাই মিয়া নাথাসা জল নিয়ে ওপরভাষা গিয়ে গুরুর ডাকের অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও গুরুর ঘর থেকে কোন আওয়াজ না পেয়ে নাথাসাহেব পীরের ঘবে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকে দেখে অবাক। সেখানে কেউ নেই।

অথচ তিনি তাঁকে নিচেও ষেতে দেখেন নি। কেউ দেখে নি।

এদিক-সেদিক গুরুর অনেক শব্দে নাথাসাহেব নিরুপায় হয়ে আপন গুলস্তা-কিব জন্য অনুশোচনা করতে লাগলেন। নিজের শাস্তিস্বরূপ নিজে থেকেই গুরু-গৃহের ঠিক দরজায় জল নিয়ে বসে বইলেন। সারাটি রাত তিনি জেগেই কাটালেন।

অবাক কাণ্ড। শেষরাত নামাজের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ঘরের ভিতর থেকে ডাক এলো, “নাথাসা! পানি লাগ। জল আনো। নামাজের সময় হয়েছে।”

তাঁতো! এ কি করে হয়? সারাটি রাত এই দরজার পাশে বসে কাটিয়েছেন ভক্ত শিষ্য নাথাসাহেব। এখানে বসাব আগে তিনি পবিত্র দেখেছেন ঘরে কেউ নেই। সেখানে এ কি কাণ্ড? এ যে পীর সাহেবের কণ্ঠস্বর।

তাজাতাভি জল এনে হাত পা ধুয়ে দেন গুরুদেব। মনে শব্দ ঐ একই প্রশ্ন ছাপক খাচ্ছে। এ কি করে হল?

নামাজ শেষ করে এসে বসলেন মিয়া মির। দূরের মসজিদগুলো থেকে তখন এক এক করে ভেসে আসছে প্রভাতী আজানের মৃদু রেশ। সাথে সাথে মন্দিরের কাসির-ধ্বনির সাথে পাণ্ডিত্যরামদের সঙ্গীত মস্তোচ্চারণ।

অবাক হয়েছিস না রে?

বিস্মিত শিষ্য পাশে নতজানু হসে
বসে থাকেন সপ্রশ্ন নয়নে।

সত্য পীর সাহেব আমি সেই থেকে
শুধু এই কথাই ভাবছি আপনি রাতে
কোথায় গিয়েছিলেন। তার চেয়েও বড়
প্রশ্ন আপনি ফিরলেন কেমন করে? কোন্
পথ দিয়ে? আমি যে সারাটি রাত এই
পথ আগলে বসেছিলাম?

মুদু হাসেন পীর মিয়া মির।

তোরা বোধ হয় কেউই জানাতিস না
এতদিন রাতে আমি কখনই এ মকবারার
থাকি না। রাতে আমি চলে যায় মক্কার
কাছে হীরা পর্বতে। জানিস তো
জীবনের প্রারম্ভে এই হীরা পর্বতেই পদ্যাস্থা
হজরত মহম্মদ সাহেব তপস্যা করতেন।

সে কি কথা?

কোথায় হীরা পর্বত? সে যে কত
জহ্ন যোজন দূরে? সেখানে আপনি
প্রতিরাতে যান কি করে?

মুদু হাসেন পীর সাহেব। এ
যুগের শ্রেষ্ঠ তাপস নিশ্চয়ই মিথ্যা
বলছেন না। তবুও এ যে সম্পূর্ণ
অবিশ্বাস্য ঘটনা! লাহোর থেকে মক্কার
হীরা পর্বতে প্রতি রাত?

প্রশ্ন করেছিলেন জাহান্ আরা,
“আচ্ছা যুবরাজ, ভুল বুঝে না। তুমি
এ কাহিনী কিবাস করো?”

কেন নয়? এর শত সহস্র প্রমাণ
রয়েছে হিন্দুশাস্ত্রে। যোগবলে মানুষ
যেখানে খুশি চলে যেতে পারে যে।
তাছাড়া, তাছাড়া আমি নিজে যে
শুনছি পীর সাহেবের মুখে এ কাহিনী!
মিয়া মিরের এ গভীর তপস্যার গোপন
রহস্যটুকু লিপিবদ্ধ করে গেছেন
যুবরাজ দারাইশিকো। বহু তাপসের
পদধূলিতে পুত এ হিন্দুস্থানের বহু
যোগী ঋষি পীর পয়গম্বর, সন্ত ফকীরের
গোপন তপস্যার রহস্যটুকু উদ্ঘাটনই
যে এ উদার যুবরাজের জীবনের সর্ব-
শ্রেষ্ঠ কৌতুহল। এ বিষয়ে জাহান্
আরা তাঁর চিন্তাধারার সাথে যেন
কোথায় পান পূর্ণ মিল। যেন একই
ধমনীর রক্তপ্রবাহ। যেন একই উৎসবে
স্বচ্ছ কণাধারা।

সৈদিন যুবরাজ শোনাচ্ছিলেন বেগম
জাহান্ আরাকে মিয়া মির সাহেবের
অন্তর্দৃষ্টির কথা। শুধু যুবরাজকে
দেখেই তিনি তাঁর মনের গদনে প্রবেশ
করেন নি। শুধু তাঁর মনের ভীত
আকাঙ্ক্ষাটুকু নিমেষে ধরে ফেলেন নি।
যুবরাজ তো দার্শনিক। চিন্তাশীল
মানুষ। মানুষের চিন্তাধারা, একটু
কল্পনাশক্তির প্রয়োগেই ধরা যায়, একটু
দৃষ্টিপ্রদীপ, একটু ইন্সট্রিশন, একটু

স্বচ্ছ সরল মনই তার পক্ষে যথেষ্ট।
সৈদিন যুবরাজ বলছিলেন জাহান্
আরাকে মিয়া মিরের অন্তর্দৃষ্টির কথা।
একাকী ছাদে পাগচারী করছিলেন মিয়া
সাহেব। তাঁর গভীর মনোযোগে ব্যাঘাত
হতে পারে দেখে যুবরাজ দারা অত্যন্ত
শান্ত পদক্ষেপে গোপন পদসঞ্চারে উঠ-
ছিলেন ওপরে। অতি সন্তর্পণে। ছাদের
এক কোণে ইঠাৎ মিয়া সাহেব দাঁড়িয়ে
পড়লেন। এক ঝাঁক পাখী পাশের
গাছের ডালে চেঁচামেচি করছিল। তাদের
দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন
বললেন। পাখীগুলোর কয়েকটা উড়
চলে গেল। কয়েকটা এসে বসলো মিয়া
সাহেবের ঘাড়ে, হাতে, কাঁধে, মাথায়।

অত্যন্ত স্নেহের সাথে মিয়া সাহেব
তাদের কি যেন বললেন। যুবরাজ আর
স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তাড়া-
তাড়ি মিয়া মিরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।
“এ কি হচ্ছে হুজুর। একা একা কথা
কইছেন কেন?”

কেন রে? ভুল পেয়েছিস? ভেবেছিস
আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছি? না না।
মোটের তা নয়। তুই কি আমাকে একা
দেখাচ্ছিস এখানে? দেখতে পাচ্ছিস না
এই পাখীর দল? এরা যে মকবারার
পোষা পাখী। অন্য পাড়ার একদল পাখীর
সাথে দানা নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়েছিল।
তাইতো ডেকে ধামিরে দিলুম। জানবি
পাখী, পশু, গাছপালা, তৃণ, মহীরুহ সব
তাঁর সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি
তাদের সবাইকে তাই অতি আপনজন
হিসেবে ভালবাসবি, স্নেহ করবি, আদরের
চোখে দেখবি। তাহলেই তো তাকে
পাবি।

হতবাক যুবরাজ মিয়া মিরের আরও
কাছে এগিয়ে আসেন। স্নেহস্পর্শে
যুবরাজকে ধন্য কবে মিয়া সাহেব বলেন,
দেখ শাহ্ বুলন্দ ইকবাল, তুই রাজার
ছেলে। তোর সাথে এ পথের ভিখারির
সৈদিন কোন তফাৎ দেখবি নি, জানবি
সৈদিনই তোব প্রতি তাঁর অপার কবুনা
বর্ষিত হয়েছে। তাকে তিনি অসীম
করুণা করেই একটা রাজস্ব দিয়েছেন।
তোর পরীক্ষা অপরাপরের পরীক্ষার চেয়ে
অনেক বেশি রকমের শক্ত জানবি। যে-
দিন এ রাজস্ব, এ পার্থিব সুখসম্ভার,
এ অতুল ঐশ্বর্য তোব কাছে এই মাটি-
টুকুর সমান হয়ে দাঁড়াবে সৈদিন তুই
দেখতে পাবি তোর সামনে দাঁড়িয়েছেন
বিশ্বপিতা—দয়ালু পরমেশ্বর খোদাতালা
স্বয়ং। সেই আশ্চর্য্যজনক আলো প্রতিটি
মানুষের অন্তরেই জ্বলছে, জানবি। কেউ
সেই আলো দেখেও দেখে না, কেউ বা
সে আলোর তলাতে থেকেও থাকে

By Profs. S. Basu, B. E. & S. Mukherjee M.A.

1. B. E. College, Shibpur, Durgapur, Jalpaiguri.
Jadavpur etc. 7 years Ques. & Ans. up to 1966. Rs. 8'50
Science in Bengali, 4.

2. I. I. T. Kharagpur, Kanpur, Bombay, Madras,
Delhi etc. previous 7 years Ques. & Ans. up to 1966,
Extra Gen. Knowledge, 55 Essays, Precis, Interview
etc. Rs. 7'50. Current Affairs '50.

3. Special Class Rly. Apprentice Selection Guide
Rs. 7'50

4. Marine Engg. Guide, Calcutta & Bombay Rs. 8'50.

5. B. O. A. T. Admission Guide 9'50.

6. Do Final Questions Rs. 5.

7. Interview and Vivavoce Test : By Miss Dorothy
Parker Rs. 2'50.

8. Career Selection for a hundred Jobs with
Prospectus and Scholarship also for Studies Abroad
Rs. 4'50.

A. M. I. E. Sec A, Previous 5 years' Question &
Ans. (10 Terms) of all Subjects, Price list on request.

রূপসাধনা, ব্যায়াম ও চরিত্র গঠন

নারীর গায়ের বর্ণ, নাক, মুখ, চুল, বক্ষ ও সর্বত্রের শ্রীবাণ্ড করিতে এ বইয়ের সাহায্য
গ্রহণ করুন। লিডিকা বসু প্রণীত ২৫ খানা চিত্র সম্বলিত। ৪'৫০

ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সী

২ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফুল ফুটেছে ফুল

রবীন মৃধোপাধ্যায়

আজ এখানে ফুল ফুটেছে—ফুটেবে না?
আজ ওখানে চিরকালের অনভ্যাস,
গাইছে পাখী, ছুটেছে হাওয়া—ছুটেবে না?
আজ সেখানে পথ বদলের সর্বনাশ।

মরণ কোলে মৃত্যু যারা করলো নিম্নল
আজকে তাদের নাইবা নিলেম নাম,
এখন শব্দ ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটেছে—ফুল
সব শহীদের সফল সর্বনাম॥

কিছুক্ষণ বাংলাদেশ

অনিল বসু

কিছুক্ষণ অগ্নিময় হয়ে রইল চতুর্দিক—
গ্রাম-গঞ্জ-বন্দর-নগরঘেরা আমাদের এই বাংলাদেশ,
হোমায়িনর দীপ্তি নিয়ে কিছুক্ষণ যেন এক রণচণ্ডী প্রতিমার মূর্তি
জ্যোতির্ময় হয়ে রইল চোখের উপর।
যেন সে নতুন দেশ, মনে হ'ল, সেই শান্ত নদী-মাঠ ছানামোড়া পথ
কী ভীষণ জ্বলে উঠলো রী-রী ঘৃণা, দারুণ বিক্ষোভে।
অশকার সারাদেহে রক্ত মেখে চলতে থাকলো, ধূলি হ'ল রক্তাক্ত-চন্দন।
আর কিছু, অজ্ঞ-দৃঢ়-উজ্জ্বল জীবন, মাটির তিলক পরে চলে গেল
মৃত্যুর অতীতে।
রক্তাক্ত সিঁদুর পরা, মনে হ'ল, কিছুক্ষণ বাংলাদেশে যেন এক
গরীবিনী—
বীরের জননী॥

তিমিরাবৃত। একটা বিরাট জাল ফেলে-
ছেন মেহেরবান খোদাতালা। সে জালটা
হল মায়ার জাল, মোহের জাল। সেই
জালটা ছাড়িয়ে বাইরে যে বেরিয়েছে তার
পথ খোদাতালা নিজে এসে দেখান। তুই
সেই দলের। এ পার্থিব সুখসম্ভার,
এই রাজস্ব, এই সম্ভোগ ঐশ্বর্যরাশি
তোকে বাঁধতে পারবে না। তুই জন্ম-
যোগী। তোর সামনে আলোর ঝলক নিজে
এসে দাঁড়াবে—সত্যজ্ঞানের আলোর ঝর্ণা।
যুবরাজ সৈদিন অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে
এক অপূর্ব স্বর্গীয় সুখের আশ্বাদনে
ধন্য হয়েছিলেন। মনে-প্রাণে জাহান্ আরা
বেগম অনুজকে সৈদিন সত্যি সত্যি ঈর্ষা
করেছিলেন। কেন তাঁকেও একখাটুকু
বলবার কেউ নেই?

তুই কোথায় বসে ধ্যান করিস?

যুবরাজ কম্পিতকণ্ঠে জবাব দি-
য়েছিলেন, পীর সাহেব আগে ইচ্ছার
বাগিচায় বসে ধ্যান করতাম।

সেটা ছাড়াল কেন? বড় গন্ডগোল
হোত। না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গাছপালার আশ্রয়ালনে
বিরক্ত বোধ করতাম। পাখীর কলতানে
ধ্যান ভেঙে যেত। তাই আজকাল মোহম্বা
জুনাইদ খলিফার মকরার একটা কোণে
বসে ধ্যান করি।

স্নেহসিঁগড় ভর্ষনায় সূরে মিয়া
সাহেব দারাকে বলেছিলেন, একটা এত
বড় পান্ডিত হলে হবে কি? তুই
পয়লা নম্বরের বেকুব! আরে বেটা,
গাছপালা পশু পাখী এরাও যে ধ্যান
করে জানিস না কি? যোগীদের বট

অশ্বের তলার কেন ধ্যান করতে বলা
হয়? তারাও দীর্ঘকাল পরমেশ্বরের
ধ্যান করে। তাই সম্ভার পর যখন-তখন
গাছে হাত দিতে নেই। তোর ধ্যানে
তারাও পরমেশ্বরের বন্দনায় উৎসাহ
পেত। নব প্রেরণার আন্দোলিত হয়ে
নব হিসোলো পল্লবে পল্লবে তারা নাচতে
শুরু করত। তুই তো টের পেলি নি?
অবাক নয়নে শব্দ তাকিয়েছিলেন
যুবরাজ দারা।

এ কাহিনী শুনে জাহান্ আরা না
দেখা যোগীর পদপ্রান্তে নিজেকে লুটিয়ে
দিতে চেষ্টাছিলেন। এ চিন্তাধারা, এ
বিশ্বপ্রেম, এ সূক্ষ্মবাদের চরম দর্শন যে
তাঁর চিন্তাধারার অগুণ্ডে পরমাগুণ্ডে।
তিনি যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন গুরু
নির্দেশ ছাড়াই এ উপলব্ধিতে এসে
পৌঁছিয়ে গেছেন।

বহুদিন এ আশা ছিল মনে মিয়া
পীর মির সাহেবের চরণ স্পর্শ করে
জীবনকে ধন্য করে তোলায়। আশা আছে,
ভরসা কোথায়? কে নিয়ে যাবে লাহোরের
সে যোগীর পর্ণকুটীরে তাঁর চরণতলে।
বহু চেষ্টা করেও জাহান্ আরা বেগম
মিয়া মিরের চরণ স্পর্শ করতে পারেন
নি। এ দুঃখ যে তাঁর রাখবার জায়গা
নেই।

মিয়া মির দেহরক্ষা করে গেছেন।

মুন্সাহ সাহেব বাদাক্ষী তাঁর উত্তরা-
ধিকারী। মিয়া মিরের জ্ঞানালোকবর্তিকা-
টুকু তিনিই জ্বালিয়ে রেখেছেন। তিনি
যে আরও কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর। তিনি

যে নারীদের মৃশটুকুও দেখেন না।
একই বিশ্ববিপতা জগদীশ্বর যে জীবজন্তু
পশুপাখী। গাছপালা সৃষ্টি করেছেন,
নারীকেও তো তিনি গড়েছেন নিজ হাতে।
তাঁর সৃষ্টিতে নারীদের এ অবহেলা কেন?
ইচ্ছে করে মুন্সাহ সাহেবকে গিয়ে একবার
এই প্রশ্নটুকু পেশ করে আসতে। ইচ্ছে
করে। সাহস হয় না। এমন কি যুবরাজ
দারার সামনেও এ প্রশ্নটুকু উত্থাপন করতে
তাঁর মনে সাহস জাগে না কেন?

আজ বারংবার তাঁর মনে যোগীপ্রেম
নিজার কবিবর শারমাদের একটা রুবাই
তাঁর মনে আসছে কেন? কেন এ রুবাই
তাঁর মনের গহনে বারংবার উঁকিঝুঁকি
মারছে এমন ব্যাকুলভাবে?

তজ্ সোহবতে হমদমা

ওয়ো বাগো সাহার।

জোকে সুখনে বদ

ওয়ো হবারে মীনা॥

আখির সুখনে মানদ

ওয়ো অক্ষীজা রফতন্দ।

মীনায়ে ফলক ফগন্দ

উরা অজ পা॥

বাগিচায়, পথঘায়ে

প্রিয়তম হাত ধরে

কেটেছে দিবসগুলো হাসিতে

চলনে

মদিরার সে আমেজ

মনের সে দৃষ্ট তেজ

হারিয়েছে কিগো সখা

দুরের গগনে?

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[দেশ-বিভাগের পটভূমি]

পশ্চা নদীর তীরে। আজ নির্জন। প্রতিদিন এখানে লোকের ভীতি থাকে। কেউ বা করেন গাম্ভীর্য, কেউ বা দল-বল সহ এক জল্পনায় বসে গুলতান করেন—আসর জমান। আজ এখানে কেউ নেই। সারাদিনের উৎসব-রাস্তা মান্দ্র, জন-সভার শেষে নিজ নিজ গৃহের দিকে ছুটছেন। এখানে আজ কেউ আসেন নি। আমি একা। অত্যন্ত একা। অস্তর-বাহিরে একা। নদী-সকতে গিয়ে বসি। পারের পাশে নদী কলতান তুলে বসে চলেছে। মন্দ-মন্দ বায়ু-হিজরলে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে ও পড়ছে। আমার মনের আঁজকের প্রতিচ্ছায়া-ই বেন এই নদী। আমার সারা অন্তর জুড়ে আজ কলতান উঠছে। অন্তরের নয়। সারা অন্তর বেন হাহাকার করে গুম্মারিয়ে কান্দছে। অন্তর জুড়ে ভার-ভরগের ঢেউ উঠছে, পড়ছে ও দূরে সরে যাচ্ছে। ভাবের অন্ত নেই—বিষাদ নেই—বিচ্ছেদ নেই। একের পর একটি আসে—আবার পরেরটির জন্য স্থান ছেড়ে দিয়ে সরে যায়। মনের ভাব রূপ নিয়ে আমার চোখের পুরসায় ভেসে ওঠে।

প্রথমেই দৌধি, বিদেশ থেকে এক এক-বার আক্রমণকারীর দল আসেন। আসেন আর্ষরা, আসেন মোগল, আসেন পাঠান। তাঁরা দেশ জয়ও করেন কিন্তু পরে ঘরিয়াগত আক্রমণকারী আর থাকেন না। এই দেশেরই মানুষের সাথে মিশে যান—হয়ে যান—এই দেশেরই একজন। পরস্পরের মধ্যে যে মিলন ঘটে, সেই মিলনের ফলে গড়ে ওঠে এক নতুন সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতি আর্ষ-অনার্ণের, হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত সংস্কৃতি। প্রথমে যে আর্ষ-অনার্ণের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার মূল কথাই ছিল—গ্রহণ, বর্জন নয়। তাঁরা আত্ম-রক্ষার জন্য পরস্পর পরস্পরের সাথে লড়াই করেছেন ঠিক কিন্তু যুদ্ধ-শেষে, বিজ্ঞতা, জেতাকে সমাজ-দেহে গ্রহণও করেছেন। জেতা, ফিরায় লুট-পাট করে চলে যায় নি। সমাজ-দেহে মিশে গিয়েছেন; ফলে, গড়ে উঠেছে তাঁদের নতুন জীবন-দর্শন। সে দর্শন, গ্রহণের দর্শন—বর্জনের নয়। তাই, হিন্দু-দর্শন

আছে আনুষ্ঠানিকবাদ, আছে তাতে নাস্তিক্য-বাদও। আছেন সেখানে শক্তির উপাসক শাস্ত্র, আবার, দীনাত্তম সেবকের গৌরব নিয়ে সেখানে আছেন বৈষ্ণবও। সকলেই একই সমাজ-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর্ষরা এদেশে আসার আগে যখন এখানে শব্দ, অনার্ণরাই ছিলেন, তখন তাঁদেরও একটা গৌরবোজ্জ্বল ঈশ্বাক-সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছিল। সে সভ্যতার ইতিহাস যে কত পুরনো, তা আজও পুরোপুরি নির্ণীত হয় নি। তার বহু নিদর্শন বেদ-পুরাণে ও ভূ-গতস্থ প্রত্ন-তাত্ত্বিক গবেষণাগারে ধরা পড়েছে। খুঁজা ধরা পড়েছে, তাতেই পাওয়া যায় তার বয়স খুঁজের জন্মের অন্তত তিন হাজার বছর আগে। অনার্ণ ও আর্ষের মিলিত চেষ্টার ফলে, যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তার মূলে কথায় হল—বাঁচো এবং বাঁচতে দাও (Live and let live.) এই সংস্কৃতির সাথে এসে আবার যুদ্ধ হল, মুসলমানের সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। মোগল-পাঠান এলেন—দেশ জয়ও করলেন, কিন্তু লুণ্ঠন করে তাঁরা চলে গেলেন না। ভারত-দেহেই তাঁরাও বিলীন হয়ে গেলেন। আর্ষ-অনার্ণের গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি আবার নতুন রূপ নিল। গড়ে উঠলো আবার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই হল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এটা শব্দ, অনার্ণের বা আর্ষের নয়—এটা শব্দ, হিন্দুর বা মুসলমানের নয়—এটা হল, একান্তভাবে ভারতের-ই জীবন-দর্শনে গড়া নিজস্ব এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি (Synthesis of all cultures of the victors and the vanquished). এই নতুন জীবন-দর্শনে গড়া সংস্কৃতির ছাপ সমাজ-দেহের সর্বাঙ্গে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কেউ কাউকে শোষণ করে না—কেউ কাউকে হত্যা করে নিজে বড় হতে চায় না; শিক্ষা-সভ্যতাও যেমন, জাতীয় ধন-সম্পদও তেমনই অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে যায়—সমাজ-দেহে একটা গণতান্ত্রিক চেতনাবোধও জেগে ওঠে। শাসনব্যবস্থারও গ্রামে ও শহরে দেখা যায় বহু গণতান্ত্রিক সমাজের নিদর্শন। এ সবই মুসলমান সভ্যতা এসে মিলিত হওয়ার আগেকার অবস্থা। মুসলমান শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য যে

অত্যাচারী একনায়ক ছিলেন না, তাঁর নয়; ওর, তাঁরা গ্রাম্য ও পৌর সমাজ-ব্যবস্থায় যে স্বায়ত্তশাসন চালু হয়েছিল, তার বিশেষ কোন পরিবর্তন করে নি, তাঁরা বিদেশী শাসকের মত দেশের ধন-সম্পদ লুট-পাট করে বিদেশে পাড়ি দেন নি। তাই, দেশের সম্পদ—ভারতের সম্পদ—পৃথিবীর কাছে বিশ্বায়ের বস্তু হয়ে উঠেছিল। এই সম্পদের আকর্ষণই ইউরোপ থেকে ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজগণকে ভারতের দিকে আকর্ষণ করে। তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল, ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা। ব্যবসার অজুহাতে তাঁরা এলেন এদেশে। কেউ বা ব্যবসা সুরু করলেন। ভারত থেকে কাঁচা মাল কম দামে নিয়ে যেতে লাগলেন এবং নিজ নিজ দেশ থেকে সৌখিন প্রবাসস্তার এনে ভারতীয় জনগণের চোখ বলসিয়ে দিতে লাগলেন। কেউ বা আবার ব্যবসার সাথে সাথে জল-দস্যুতা করে লুণ্ঠনও সুরু করেন—বিশেষ করে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা। ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজরা ব্যবসায়ের কুঠী-নির্মাণের জন্য আরোহণ নিয়ে নবাব-দরবারে ধর্নাও দিতে লাগলেন।

আমার চোখে ভেসে ওঠে ইংরেজের সেই দৃশ্য। দৌধি, ইংরেজ কুঠীমাল সাহেব (তখনও তাঁরা কুঠীমাল) নতজানু হয়ে নবাব-দরবারে গিয়ে জোড়হাতে কলকাতার ভাগীরথীতীরের বন্দরে কুঠী নির্মাণের জন্য একটা স্থান, স্বাধীন ব্যবসায়ের জন্য একটা ছাড়পত্র ভিক্ষা করছেন! ইংরেজের সেই এক অবস্থা। তার পরের অবস্থা দৌধি, ইংরেজ কুঠী তৈরি করে সেখানে সৈন্যের তালিম দিচ্ছে—দেশীয় পদস্থ কর্মচারীদের সাথে যড়যন্ত্র করছে। এই সবই ঘটেছে, বাংলা দেশে। ফরাসীরা দক্ষিণ ভারতে ঘাটী করেছেন কিন্তু কুট-কৌশলে ইংরেজের মত জঘন্য নিচতা ও শঠতা দেখাতে পারেন নি। ইংরেজের শঠতা কিন্তু খরে ফেলেন, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার তৎকালীন নবাব—নবাব সিরাজদ্দৌলা। নবাব বসে উরুণ—মাত্র ২২।২৩ বছর বয়স, তাঁর দেশপ্রেম যথেষ্ট ছিল কিন্তু ইংরেজের মত কুট-কৌশলে পারদর্শী ছিলেন না। ইংরেজ লোভের টোপ ফেললেন, নবাব সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে। সিপাহসলার মীর-

জাফরকে দেখালে নবাবের গদির লোভ। মীরজাফর জগৎ শেঠ, রায়দুল্লভ প্রমুখ মহা মহা রথীরা সেই চৌপ ও গিললেন। যড়যন্ত্র চললো। ইংরেজ পক্ষে যড়যন্ত্রের নায়ক হলেন ক্রাইড—ওয়াটসন প্রমুখ। অবশেষে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর মাঠে নবাব-ফৌজের যুদ্ধের একটা অভিনয় হয়। এখানে শতভার ও যড়যন্ত্রের-ই জয় হ'ল—মোহনলাল, মীর মদন প্রমুখের শৌর্ঘ্য ও দেশপ্রেমের পরাজয় হ'ল! এই হ'ল ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা।

পরবর্তীকালে আমরা যখন ভারত থেকে বিদেশী ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের চেষ্টা করেছি, তখন ইংরেজ শাসকগণ আমাদের বন্দী করে আইনের বিচারে যে অভিনয় করেছেন, তা' দেখে আমরা মনে মনে হেসেছি। ইংরেজ শাসকগণ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, আমরা আইনের দ্বারা অর্জিত প্রতিষ্ঠিত সরকারকে অস্ত্রের সাহায্যে উচ্ছেদ করার জন্য 'যড়যন্ত্র' করেছি। যে বিদেশীরা গদির লোভে দেশের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুগ্ম যড়যন্ত্র করে ক্ষমতা-দখল করলেন, তাঁরাই কি না অভিযোগ আনছেন যড়যন্ত্রের (!), দেশের দেশপ্রেমিক সন্তানদের বিরুদ্ধে বাঁরা পরদেশী শাসন থেকে, দেশকে মৃত্যু করতে চান! এও অদ্ভুতের এক নিষ্ঠুর পরিহাস। যাক, আজ এই সব কথাই একের পর এক করে চোখের সামনে খেলে যায়। আমি ভাবি, আর ভাবি—আর দেখে বাই।

এখানে ইংরেজের কথাই কেবল বলছি। অন্যান্য বিদেশীদের কথা পূর্ণাঙ্গভাবে বলতে গেলে, প্রবন্ধের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। তাই, শূন্য এইটুকু বলেই ক্রান্ত থাকলেম যে, ইংরেজের শতভার সাথে পাক্সা দিয়ে ফরাসী, পর্তুগীজ ও ওলান্দাজগণ—কেউই বেশিদূর এগুতে পারেন নি।

পলাশীর মাঠের যুদ্ধ-জয়ের পর থেকেই ক্রমশ ইংরেজের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ এবং তার মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থা করার সুযোগ করে ভারত-জয়ের যড়যন্ত্রের সুচপাত হয়। ব্যবসায়ীর 'মানদণ্ড'-কে শাসকের 'রাজ-দণ্ড' রূপান্তরের কল্পনা ও যড়যন্ত্র, ভারতে বৃটিশ ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়। ইংরেজ শাসক হ'য়ে ইতিহাসকে নিজ সুবিধামত বিকৃত করেছেন। ইংরেজ ভারত-জয়ের বে কল্পনা করেছেন, তার সার্থক রূপায়নের জন্য তাঁকে যড়যন্ত্রের বিন্তীর্ণ জাল সারা ভারতে ফেলতে হয়েছে। ইংরেজের রাজ্য-জয়ের যড়যন্ত্রের একটা প্রধান অংশই নেন, ইংরেজ ধর্ম-বাজকগণ। এই ধর্মবাজকদের মাধ্যমেই

দেশীয় লোককে ধর্মান্তরিত করে তাদের এতদিনের কৃতি ও সভ্যতা সমূলে ধ্বংস করা এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে বি-জাতীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশ করে, এক সম্বন্ধ জাতি সৃষ্টি করা এই যড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য। ইংরেজ ক্রমশ শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক স্বায়ত্ত-শাসন, যা এতকাল ধরে গড়ে উঠেছিল, তাঁকেও বিকৃত করে তুলতে থাকেন। একদিকে যেমন শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর নিঃশেষে আঘাত চললো, অপর দিকে আবার শাসন-ক্ষমতা হাতে পেয়ে শাসনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আইনের নামে লুণ্ঠন সুরু করে দেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের ও দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দের কথা ইতিহাস বিখ্যাত হ'য়ে আছে। শাস ইংলণ্ডেও কিছু সংখ্যক লোক এইসব অরাজক ব্যবস্থার অনেকই সমালোচনা করেছেন। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ক্রাইডকেও নিজ দেশে এমন সমালোচনার স্বাধীন হ'তে হয় যে লক্ষ্মাহাঁনেরও লক্ষ্মা হয়—ক্রাইড ঘৃণা ও লজ্জায় বারংবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

ভারতে যখন ইংরেজ প্রথম ব্যবসায়ীর ভূমিকা নিয়ে আসেন, তখন ভারতীয়েরা তাঁদের জীবন-দর্শনের নীতি অনুসরণ করে ইংরেজকে গ্রহণই করেছিলেন। অতীতেও ভারতীয়রা আরও অনেক বিদেশী-ই দেখেছেন—তাঁরা এসেছেন, দেশ জয়ও করেছেন কিন্তু অবশেষে সেই সব বিদেশীরাও তাঁদের মত দেশের মানুষই হ'য়েছেন। ইংরেজ সম্পর্কেও ভারতীয়রা প্রথমত তা-ই ধারণা করেছিলেন। কেউই তাই তাঁদের সম্মুখের চোখে দেখেন নি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো—ইংরেজ রাজত্ব যতই বেড়ে ও পাকা-পোক্ত হ'য়ে চললো এবং ইংরেজের দুর্নিবার লোভের লুণ্ঠন যতই বেড়ে চললো এবং সর্বোপরি, ধর্মবাজকগণের মাধ্যমে ইংরেজ যতই এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে সুরু করলেন, ততই দেশের মানুষ, ইংরেজ আসায় বিপদ কোন পর্বারে চলতে সুরু করেছে, তা' ক্রমশ বুঝতে আরম্ভ করলেন। ইংরেজ এদেশে বাস করেও এদেশের মানুষ হলেন না—তা'ও তাঁরা দেখতে ও বুঝতে লাগলেন। ফলে দেখা দিল, লোকের মনে অসন্তোষ। এর ফলেই নানামুখ্যে দেখা দেয়, আঞ্চলিক ও স্থানিক বিদ্রোহ। হিন্দু-সম্মাণীয়া মোহন গিরির ও পরে, ভবানী পাঠকের এবং মুসলমান ফকিরেরা শেখ মজনুর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইংরেজের অ-রাজক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মুসলমান সম্প্রদায়ের এক উপ-সম্প্রদায় ওয়াহাবিরাও আমীর খানের নেতৃত্বে

বিদ্রোহ করেন; উনিবাংশ শতাব্দীতেই পাজাবে গদুরাম সিং-এর নেতৃত্বে নান-ধারী শিখরা বিদ্রোহ করে একটি সমান্ত-রাল স্বাধীন সরকার চালিয়ে যান। এগুলো সবই ছিল স্থানিক বিদ্রোহ; তবে, এইসব বিদ্রোহের মূলে ছিল কিন্তু গণ-অসন্তোষ। এই বিদ্রোহগুলো সম্পর্কে "পূর্বাভাষ"—ই কিছটা লিখেছি কিন্তু এখানে তাই, আর তার পুনরাবৃত্তি করলেম না।

এই গণ-অসন্তোষের পটভূমিতেই ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান হয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে বিকৃত করে একে "সিপাহী-বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়ে এই গণ-অভ্যুত্থানের গুরুত্বকে ঘাটো করে দেখাতে চেষ্টা করেন। আসলে কিন্তু সেটা ছিল এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান, সেটা ছিল, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে শূন্য সিপাহীরাই ছিলেন, না—তা'তে ভারতের নানা স্থানের দেশীয় প্রধান প্রধান হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও অনেক তৎকালীন রাজন্যবর্গও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধে পরাস্ত হন। ইংরেজের উন্নত যন্ত্রণের, শস্ত্রবলের ও কুট-কৌশলের নিকট প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরাজয় ঘটে। এই যে সংগ্রাম সুরু হয়েছিল, তা' ঘটেছিল হিন্দু-মুসলমানের সমবেত মিলিত চেষ্টায় এবং দিল্লীর মসনদের এক মুসলমান নবাব বাহাদুরকেই কেন্দ্র করে। সৈদীন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষেষ কিন্তু দেখা দেয় নি। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার জন্য গড়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমান-শিখ-মাদ্রাজী প্রভৃতি নিয়ে এক সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী—"আজাদ-হিন্দ-ফৌজ"। তাঁরা উজাড় করে বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন। ইতিহাসে সে সংগ্রামের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সৈদীন কিন্তু প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে বা নেতাজীর আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মধ্যে বা সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৃদ্ধি দেখা দেয় নি। আল কথা, ইংরেজ শাসকগণ যেখানে কল-কাঠি নাড়তে পারেন নি, সেখানে—সাম্প্রদায়িকতা বা আঞ্চলিকতাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে ভারতের অশান্ততাকে ফুটিয়ে করতে পারে নি।

সিপাহী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের শক্তি ও ব্যাপকতা দেখেই ইংরেজ শাসকবৃন্দের টনক নড়ে। তার পরেই তাঁরা ভারতবাসীকে ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র করেন এবং যেহেতু বাংলাই ছিল সব বিদ্রোহগুলোর মূল কর্মস্থল সেহেতু বাংলাকে ইংরেজ

শাসকগণ অ-সামরিক জাতি, বলে ঘোষণা করেন। এত সব ব্যবস্থা করেও কিন্তু তারা একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সেই দিন থেকেই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তারা ভেদ-নীতি প্রয়োগের এবং কিভাবে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে সেই চিন্তাই করতে থাকেন। এই চিন্তাই অবশেষে পৃথক নির্বাচন প্রথার উদ্ভাবনে রূপ নেয়। এই প্রথার রূপায়ণের আগেই ভারতের তৎকালীন রাজ-প্রতিনিধি ও গভর্নর-জেনারেল লর্ড কার্জন, বাংলাকে দু'বল করার জন্যই হিন্দু-বাংলা ও মুসলমান-বাংলা পৃথকভাবে গড়ার জন্য বাংলা বিভাজন করেন কিন্তু বাংলার প্রবীণ নেতারা শাসকের এই বিভাগের পেছনের অভি-দুর্নিধি ধরে, ফেলেন। আরম্ভ হয় এর বিরুদ্ধে নিরমতান্ত্রিক রেষা আন্দোলন। এই বৈধ আন্দোলনকেও নানারূপ আইনের নামে বে-আইনী আইনের মাধ্যমে বন্ধ করেন। এমন কি দেশ-মাতার বন্দনার মন্ত্র—“বন্দে মাতরম্” ধ্বনিও—বে-আইনী না হলেও জুলুমবাজিতে বন্ধ করেন। এই অবস্থার পটভূমিতেই বাংলা দেশে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠে। বাংলার একদল বে-পরোয়া তরুণ এক হাতে বোমা ও অপর হাতে রিভলভার নিয়ে মরণ-মারগের রক্সে হোতা হয়ে এগিয়ে আসেন। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠেন—প্রফুল্ল চাকী, কাদিরাম, সত্যেন বোস, ফনাইলাল থেকে এ যুগের শহীদ দীনেশ, রামকৃষ্ণ, প্রদ্যোৎ প্রমুখ কত বীরের সৌম্য শান্ত নিভীক মূর্তি। প্রদ্যোৎকে দেখেছিলাম, মৌদীনীপুর জেলে। যেদিন সে প্রথম জেলে আসে, সেদিনও দেখে-ছিলাম; আবার যেদিন তার ফাঁসী হয় তার পূর্বদিন সম্মুখভেদে তাকে দেখে-ছিলাম। জেলে আসার দিন তার দেহের শুভ্র ছিল, ১০৭ পাউন্ড এবং ফাঁসীর আগের দিন তার ওজন হয়, ১৪২ পাউন্ড, ফাঁসির হুকুমের পরও যে আসামীর ওজন বাড়ে, তা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা দেখিয়েছেন। জীবনে তারা এমনই

বে-পরোয়া ছিলেন—তাদের কাছে জীবনটা ছিল—“জীবন-মৃত্যু - পায়েয় ছুতা, চিন্তা - ভাবনাইন।” এই ‘ভাবনাইন’ দামাল ছেলেদের নিয়ে কি করা যায়, সে চিন্তা ইংরেজ শাসকের রাতের ঘুমেও বাধা সৃষ্টি করে। আইনের নিগড়ে পরে নিগড়ে তৈরি হয়ে চলে কিন্তু বিপ্লববাদ বন্ধ হয় না—তার প্রসারতা বেড়েই চলে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রামের অসহযোগ স্মৃতি ক’রে চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ কবল-মুক্ত করার বিপ্লবের নতুন এক জয়যাত্রা সুরু হয়। একদিকে বিপ্লবীরা শাসকের জীবন দুর্বিষহ ও অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। অন্যদিকেও তাদের মনে শান্তি নেই। যে ভেদনীতিকে সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান অবলম্বন হিসাবে নিয়ে ভারতের রাজনীতিতে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রচলন তারা করেছিলেন, তারও ফল পুরোপুরি তারা পান নি। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে লক্ষ্মী কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এক আপোষ হওয়ার কেন্দ্রীয় সংসদে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দল একযোগে সরকার-বিরোধী প্রস্তাব সমর্থন করে চলে। বাংলারও দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার তদানীন্তন সরকার পর্যন্ত হ’য়ে পড়েন। তার পরে, ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের নতুন শাসন-সংস্কার ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে প্রদেশে প্রদেশে রূপ নেয়। তখন দেখা যায় কংগ্রেস, ৮টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে—এমন কি মুসলমান-প্রধান, উত্তর-পশ্চিম সামান্ত প্রদেশেও কংগ্রেস সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। ইংরেজের তুচ্ছ বত অস্ত্র ছিল, সব অস্ত্র প্রয়োগ করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না! এই অবস্থার মধ্যে আসে ইংরেজের জীবন-মরণ সংগ্রাম—বিভিন্ন বিপ্লব। ১৯৪২ সালে নেতাজী, তাঁর আজাদ-হিন্দ-ফৌজ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারত-আক্রমণ করেন; আর ভারতে কংগ্রেস, ইংরেজ সরকারকে বলেন—“ভারত ছাড়—ছাড় ভারত।” চতুর্দিকের আক্রমণে ইংরেজ মার খেয়ে ধুকছে, এমন সময়ে মিত্রশক্তির আমেরিকা জাপানের হিরোসিমায় ফেললেন, “এটম বোমা”—শহরকে শহর বিধ্বস্ত হয়ে গেল। জার্মানীও ভেঙে পড়লো। মিত্রপক্ষের জয়ে ইংরেজের জয় হল। এই জয়ের মধ্যেই ইংরেজের পরাজয়ের স্মারক ফুটে বের হয়—যুদ্ধে জিতেও তাকে ভারত সাম্রাজ্য ছাড়তেই হয়। ভারত সাম্রাজ্য যে ইংরেজকে যুদ্ধ-শেষে হারাতে হবে, ইংরেজ তা আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। ভারতের জাতীয় মূর্তি-আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি দেখে তারা বহু পূর্বেই এটা

অনুমান করতে পেরেই ভারতের জাতীয় জীবন-ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচনের বিপ্লবের চারা রোপণ করেছিলেন। এটাই ছিল, ভারতকে শক্তিশালী ও দুর্বল করার প্রথম সোপান মাত্র—শেষ নয়। এখন তারা তাদের বুদ্ধির মধ্যে থেকে শেষ ভৌতিক বের করলেন। পৃথক নির্বাচন-প্রথা চালু করেও যখন দুটি সম্প্রদায়কে পৃথক জাতি (nation)-তে পুরো পুরো রূপান্তরিত করা গেল না। তখন শেষ ভৌতিক হিসাবে ভারতবর্ষকে ভাগ করে দুটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র করে দিয়ে দুই অংশে দুটি পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি গড়ার খেল দেখালেন। এই খেল দেখানোর ব্যাপারে জনাব মহম্মদ আলি জিন্নাকে দোসর হিসাবে আগেই ইংরেজ শাসকেরা বেছে নিয়েছিলেন।

কয়েক বছর আগে বিলেতে থাকাকালে রহমত আলি নামক এক তরুণ ছাত্র প্রথমে ‘পাকিস্তান’ পরিকল্পনা করেন। তাঁর পরিকল্পনা তিনি জিন্নাহ সাহেবকে বলান সেদিন কিন্তু জিন্নাহ সাহেব বিদ্রূপের হাসি হেসে পরিকল্পনাটিকে “অবাস্তব” বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই জিন্নাহ সাহেব-ই ‘পাকিস্তান’ আন্দোলনের পুরোধার এসে দেশকে ইংরেজ কুট-কৌশলের এক ক্লাইভার্মি ক’রে রেখে গেলেন। এও এক বিচিত্র ব্যাপার। কিন্তু অতিরিক্ত দাম্পত্য ও আত্মাভিমানে জিন্নাহ-চরিত্র বারি জানেন তারা এর মধ্যে বৈচিত্র্য কিছুই দেখবেন না।

এই সব চিন্তা আমার মনে সেদিন একের পর এক উঠেছিল। সেদিনে ঘটনার নামকরা আমার চোখের সামনে জীবন্ত রূপ নিয়েই যেন দেখা দিয়েছিল। পক্ষার ধারে বসে এইসব চিন্তাস্রোতে একদম ভেসে চলেছিলাম। পক্ষাতীরের ঠান্ডা হাওয়ায় যে শীত ধরে গিয়েছিল, সে খেলালও তখন আমার ছিল না। যখন খেলাল হল, তখন দৈর্ঘ্য রাত ১২টা বেজে গিয়েছে। শহরের রাস্তা-ঘাটও যেন নীরব ও নির্জন হ’য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শহর নিদ্রিত। জেগে আছি শব্দ আমি—ঘুম-নেই আমার চোখে। আরও হয়তো স্বাধীনতা-সংগ্রামী বন্ধুদের অনেকেই সে রাতে আমার মতই জেগে বসেছিলেন। তাঁদের জীবনের চরম ও পরম ঈর্ষিত স্বাধীনতা আঙ্গ এসেছে; তবু তাঁদের চোখে আঙ্গ ঘুম নেই। এ যে কতবড় দুঃখ—এ যে কতবড় দুর্ভাগ্য তা’কে বুঝবে? তিনি একমাত্র বুঝবেন, যিনি সমব্যথার ব্যথী—একমাত্র ভুগভোগী।

কি যাতনা বিবে, বুঝবে সে কিসে কলু আশীবিবে দংশনি যারে?

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত
কলু দেখিছে
মূল্য : এক টাকা
ছেলেদের জন্য, আর একখানি মহাসোপান্যাস। পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।
উপহার দিবার যোগ্য বই
প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী
শ্রীশৈল চক্রবর্তী দ্বারা সুচিত্রিত।
ছাপা ও বাঁধাই মুদ্রকর।
বঙ্গমতী প্রাইন্ট প্রেস
১০০, বিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

সরকারী কর্মচারী ও বর্তমান শ্রমসভা

গত ১৮ই মার্চ অপরাহ্নে বিধানসভার প্রাঙ্গণে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটি বিশালাকার সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকার কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের ওপর প্রদত্ত সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার ও ছাটাই কর্মচারীদের চাকুরীতে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

বিধানসভা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই সভায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আর একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর নজীর স্থাপিত হয়। সহস্র সহস্র সরকারী কর্মচারীকে 'ভাই ও সহ-কর্মী' রূপে সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে অতঃপর আর সরকারী কর্মচারীদের দাবি আদায়ের জন্য রাজপথে নামতে হবে না। তিনি আরও বলেন যে রাজ্যের সকল সরকারী কর্মচারী ফুলের মত একই সুগন্ধে বাঁধা থেকে দেশের সেবা করবেন। এই মাল্যময়ী থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সকলেই এক-একটি ফুল। যেমন বা পদে কোন ছোট বড় বিচার হবে না, নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলেই শ্রেষ্ঠ ও সমান মর্যাদার অধিকারী।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ওই সভায় বলেন যে বর্তমান সরকার সরকারী কর্মচারীদের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে নেন। তিনি আরও বলেন যে রাইটস বিল্ডিংসের কিছ, কিছ, বদনাম আছে, কর্মচারীদেরই সেই বদনাম দেয় করতে

হবে। নতুন সরকারের সামনে শত-সহস্র বাধা যা অতিক্রম করার জন্য সরকারী কর্মচারীরাই প্রধান সহায়। ওই সভায় অন্যান্য মন্ত্রীরাও বক্তৃতা করেন।

নানান কারণে সরকারী কর্মচারীদের এই সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীসহ অপরাপর মন্ত্রীদের মততা অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তফ্রন্ট সরকার সরকারী কর্মচারীদের প্রতি একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছেন বা স্বভাবতই সকলের চোখে পড়বে। পূর্ববর্তী কংগ্রেসী আমলে সরকারী কর্মচারীদের প্রতি, বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতি যে হৃদয়হীন আচরণ করা হয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে তার প্রতিকার করতে চান তা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেই প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেসী আমলে স্বেচ্ছাকৃতভাবে এঁদের জীবন ধারণোপযোগী যেমন থেকে বঞ্চিত করে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলার একটি মারাত্মক প্রবণতা ছিল। এই জন্য সরকারী কর্মচারীরা সর্বদা জনসাধারণের নিকট প্রশংসা বলে গণ্য হতেন না। কিন্তু আজ চাকা ঘুরছে।

বিস্তৃত কংগ্রেসী আমলের শেষ দিকেই সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। গণতান্ত্রিক পন্থাভিতে তাঁরা নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলেছেন এবং নিছক প্রাণধারণের দাবিতে তাঁরাও রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৪৬-র ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে ব্যাপক গণছটি নিয়ে তাঁরা সর-

কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড পন্থায় বিগত কংগ্রেস সরকার তাঁদের দাবি-দাওয়ার প্রতি যে প্রবল অবজ্ঞা জানিয়েছিলেন, সেদিনকার সেই তিত্ত স্মৃতি সরকারী কর্মচারীরা তুলে বান নি। নির্বাচনের প্রাক-মুহুর্তে কংগ্রেস সরকার নিজেদের স্বার্থে সরকারী কর্মচারীদের সামান্য কয়েক টাকা যেমন বর্ধিত করেছিলেন, কিন্তু সেদিনকার সেই সুবিধাবাদী চালটা সরকারী কর্মচারীদের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল।

বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের সম্মুখকালেও সাধ্য কম, তা ছাড়া এই সরকারকে কাজ করে যেতে হচ্ছে প্রবল প্রতি-কূল পরিবেশে। প্রতি পদে পদে অসমর্থ-তান্ত্রিক বাধা। এই একটি শ্রেণী চিরদিনই পিছন থেকে সকল পরিকল্পনাকে সাবোটাজ করে এসেছে। তা সত্ত্বেও কমতা হাতে পাওয়া মাত্র যুক্তফ্রন্ট সরকার যে স্বেচ্ছায় সর্বাগ্রে সরকারী কর্মচারীদের কথা স্মরণ করেছেন, তাঁদের অভাব-অভিযোগ দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তাতে সরকারী কর্মচারীদের মনে যথেষ্ট আশ্বাস ভাব ফিরে এসেছে। কুখ্যাত সার্ভিস রুলকে অগ্রাহ্য করে যুক্তফ্রন্ট সরকার সরকারী কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহকে যেভাবে মর্যাদা দিয়েছেন তাও লক্ষ্য করার মত। তা ছাড়া জীবনধারণের মৌলিক দাবিতে সরকারী কর্মচারীদের রাস্তায় নামতে হবে না মুখ্যমন্ত্রীর এই

কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সুদিনের যে ইঙ্গিত রয়েছে তা কোন লোকেরই দৃষ্টি এড়াতে না। বাল্যবিক্রয় বন্ধকরণ সরকার সরকারী কর্মচারীদের প্রতি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছেন।

পক্ষান্তরে সরকারী কর্মচারীদেরও মধ্যমস্তরীর সঙ্গে ও বর্তমান মন্ত্রিসভার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত। আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি যে অতঃপর তারা নিজদের কাজকর্মে অধিকতর দ্রুত, মনোযোগী ও নিষ্ঠাবান হবেন। উভয় পক্ষের সহযোগিতার ওপরই ভবিষ্যতের সাফল্য নির্ভর করে। সরকারী কর্মচারীরা নিজদের মনোমত সরকার পেরেছেন এবং এই সরকারের মর্যাদা যাতে অটুট থাকে সেদিকে প্রথম দৃষ্টি রাখা তাঁদেরও কর্তব্য।

মধ্যমস্তরীর নিকট একটি খোলা চিঠি

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত আই-এ-এস অফিসার পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমস্তরীর নিকট একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন। বর্তমান সরকার কার্যক্ষেত্রে কাদের ম্বারা কি কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই চিঠিটির মধ্যে আছে। এই কারণে আমরা মূল চিঠিটিরই বঙ্গানুবাদ এখানে দিচ্ছি।

মহাশয়,

ভারতীয় শাসন বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি পেশ করছি, কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণের মূখে চেয়ে।

ঈশ্বরের কৃপায়, সুদীর্ঘ কষ্টভোগ ও সংগ্রামের অবসানে পশ্চিমবঙ্গে একটি জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। আমাদের আশা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের কামনাসমূহ যা কংগ্রেসী অপশাসনে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে সেগুলি নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কিন্তু আপনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় কেন না আপনার সকল প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য নৈরাশ্যপীড়িত কংগ্রেসীরা, রাজনৈতিক শকুনিরা এবং বিভিন্ন কায়দা ম্বারা প্রাণপণ শক্তি নিয়োগ করবে। এই জন্য আপনার সংগ্রাম শূন্য বাইরেই নয়, ভিতরেও।

একজন অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে আমি মনে করি যে, ভিতরকার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন আপনারদের হতে হবে, এবং যা আপনারদের সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবে তা সম্বন্ধে আপনারদের ওয়াকি-বহাল করা আমার কর্তব্য। আমার অভিযোগ বিশেষভাবে কয়েকজন মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পারসোনাল

অ্যাসিস্ট্যান্টদের কেন্দ্র করে। এরা কংগ্রেসী আমলে নিযুক্ত এবং পালিত হয়েছে এবং নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য এদের এই-মুহুর্তে অপসারিত করা প্রয়োজন :—

(১) এরা সকল দুনীতির অগ্রদূত এবং প্রকৃতির দিক থেকে দালাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

(২) দালাল হিসাবে মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে উৎকোচ গ্রহণে এবং সেই সুবাদে নিজদের পকেট স্ফীত করতে এরা অভ্যস্ত।

(৩) কারো পরোয়া না করে এরা এতাবৎকাল শাসনযন্ত্রে নোংরামিকেই প্রবর্তিত করিয়ে এসেছে।

(৪) তারা এমন সব আচরণ করে যা সরকারী কর্মচারীদের আচরণবিধি বিরোধী এবং এই সব দৃষ্টান্ত তারা করে তাদের প্রভুদের অর্থাৎ মন্ত্রীদেরই নাম করে।

(৫) এই তোষামুদের দল কোন অবিচার বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে সব প্রমাণপত্র লোপাট করে দেয়, এবং এইভাবে তারা শূন্য শাসন ব্যবস্থাকেই কলুষিত করে না, সর্বত্রই দুনীতি ও দস্যুবৃত্তির প্রদর্শন দেয়।

(৬) তাদের এই প্রতারণামূলক কার্য-কলাপের ম্বারা তারা জনসাধারণের অর্থের যেমন একদিকে অপচয় ঘটচ্ছে অপর দিকে তারা নিজদের জন্য প্রভূত ধনসঞ্চয় করেছে।

(৭) যেহেতু আপনারা জনকল্যাণের জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন, এই দুনীতি-গ্রস্ত কর্মচারীরা প্রতিকূল শক্তিসমূহের সঙ্গে যোগসাজসে আপনারদের সঙ্গে প্রতারণা করবে, যে জন্য এই লোকগুলিকে সাঁরয়ে তাদের জায়গায় অন্য বিভাগ ও দপ্তর থেকে সং লোকদের এনে বসানো আশু প্রয়োজন।

মহাশয়, এক শতাব্দীর চতুর্থাংশের অভিজ্ঞতার নিরিখে এই সকল পিচ্ছিল চরিত্রের সম্পর্কে এসেছি। যে কোন গোপন ও চতুর তদন্তই তাদের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

সেই জন্য আশা করি এই সকল কর্মচারীদের তৈলাক্ত প্রকৃতি ও কথাবার্তার বিদ্রোহ না হয়ে দৃঢ় হাতে শাসন বিভাগের এই জঞ্জাল দূর করুন। জনসাধারণ আপনারদের পশ্চাতে আছে এবং সং প্রচেষ্টায় ঈশ্বর চিরকালই সহায় থাকেন।

আপনার বিশ্বস্ত

একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তা বীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশংকার সঙ্গে লক্ষ্য করছি বর্তমান মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই

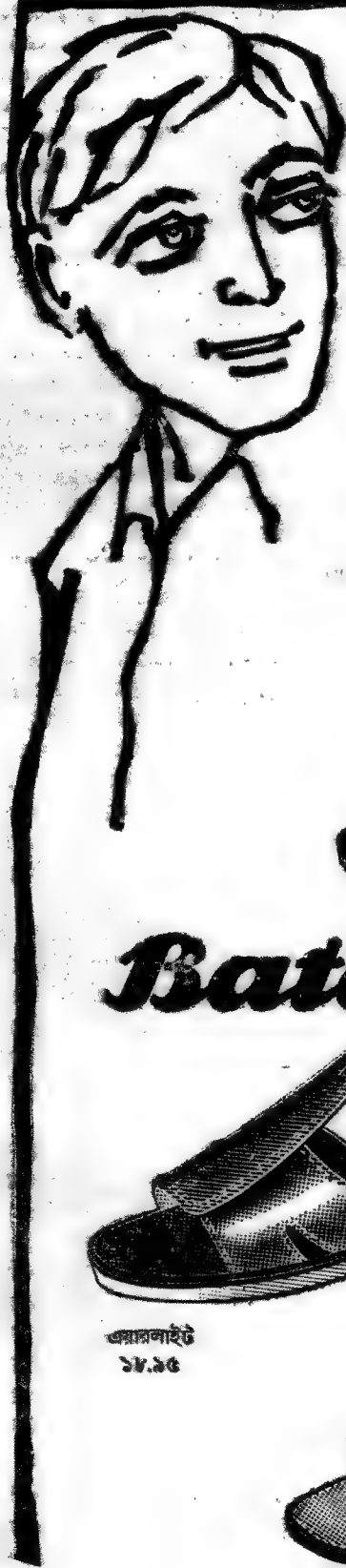
এদের কবলে পতিত হয়েছেন। এই অশুভ উপাদানসমূহ বিভিন্ন ছিদ্রপথে প্রবর্তিত হয়ে রয়েছে এবং এরাই সরকারের সকল সং উদ্দেশ্য এবং কর্মম্বারা বানচাল করে দেবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তর সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই বহু স্থানে বিশেষ করে অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে, এই গুজব উঠেছে যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয় নাকি এই জাতীয় আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের ওপর যেন বড় বেশি নির্ভর করছেন। এ বর্ণনা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমরাই সকলের চেয়ে বেশি খুশি হব, কেন না এই বর্ণনোত্তরা গিরগিটির চিনে ওঠা বড়ই কঠিন। এই সব কর্মচারীদের অনেকের সঙ্গেই প্রতি-ক্রিয়ামূলক শক্তিসমূহের বিশেষ যোগাযোগ আছে, এবং অনেক কিছু গোপন তথ্যই এদের হাত দিয়ে ইতিমধ্যেই পাচার হচ্ছে। কাজেই এদের সম্বন্ধে আমরা আবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন (২)

সংবাদে প্রকাশ যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের প্রাত্যহিক কামেলাটির স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সাধক হোক।

বর্তমান সংখ্যায় আমরা কয়েকটি বিশেষ বিষয় তুলে ধরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বিষয়গুলি নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীতে ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হয়েছিল, এবং আমরা কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে আমাদের এই সব অভিযোগে কেউ কর্ণপাত করে নি। কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমীপে, বিশেষ করে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আমরা বিষয়গুলি পুনর্বার পেশ করছি। সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৯৬৬ সালের ৬ই জানুয়ারীর সংখ্যায় চুচুড়া থেকে শ্রীহরদয়াকিশোর ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তির একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রে ভদ্রলোক নীলরতন সরকার হাসপাতালের জনৈক প্রাক্তন হাউস সার্জনের বিরুদ্ধে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনেন। অভিযোগটি হচ্ছে এই যে, উক্ত হাউস সার্জনের অনবধানতা ও দায়িত্বহীনতার দরুন তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু (নাকে সামান্য ধরনের অস্ত্রোপচারের পর) ঘটে। অস্ত্রোপচারের সময় ছেলেটির নাক দিয়ে প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছিল, কিন্তু তা বন্ধ করার চেষ্টা না করে, বা সেই অবস্থায় অন্য কাউকে না ডেকে, অপারেশনের টেবিলে হতভাগ্য ছেলেটিকে নাকি ফেলে রাখা হয়েছিল।

শোচনীয় অবহেলার ফলে শ্রীভট্টাচার্যের তরুণ পুত্রের (বি-এস-সি

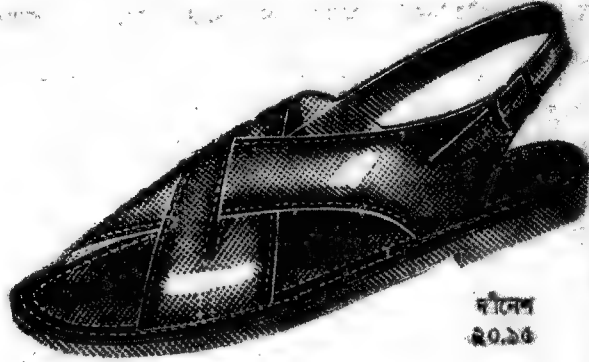


বাটার এই স্যাণ্ডাল চটকদার, স্বচ্ছবাবু, চম্পকসুলভ
নয়। অথবা পলকা, গা-হালকা সেলিমসুলভ জুতোও নয়।
আবার, এমনও নয় যে কেহনা মহিলা সহজে পরবেন।
(পছন্দ হবে নিশ্চয়, তবে চরণসেবার লাগবে কিনা সন্দেহ!)

সুগঠিত পুরুষালি বাটার স্যাণ্ডাল

বাটার এই পুরুষালি স্যাণ্ডাল বহু
মহলে আর সমর্থ, নতুন যুগের পুরুষের জন্য পরিকল্পিত।

কারণ - জুতো নির্মাণে বাটার অভিজ্ঞতা অস্বীকার্য।
এরই বলে বাটার নাম আর উৎকর্ষ, আরো
আর স্বচ্ছতার প্রতিদান। বাটার জুতো পারে দিয়ে
এমন অপারদায়ী আরাম।

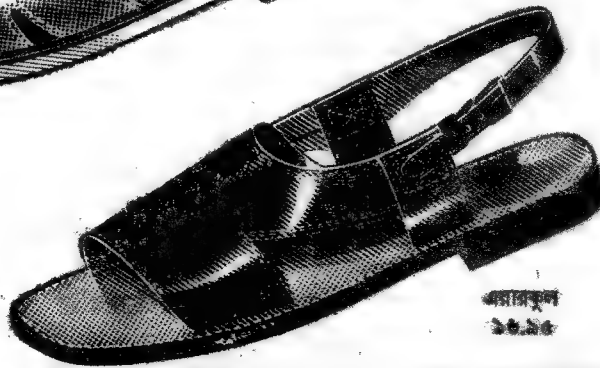


দাঁদেশ
২০.৯৫

Bata



এয়ারলাইট
১৪.৯৫



এয়ারকুল
১৫.৯৫

অনার্স ক্লাসের মেধাবী ছাত্র) মৃত্যুর এই কর্মসূচিক কাহিনী তখন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং মৃত রোগীর পিতা ওই ডাক্তারের বিরুদ্ধে তৎকালীন স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর নিকট অভিযোগ করেছিলেন। একটা নিয়মমারফিক তদন্তও হয়েছিল এবং ওই হাসপাতালের প্রিন্সিপাল মৃত রোগীর পিতাকে জানিয়েছিলেন যে, ওই অপরাধী ডাক্তারকে চাকুরী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কি রকম সরিয়ে দেওয়া? সেই ডাক্তারকে নাকি পরে সশ্রীক কুকানগজ হাসপাতালে ভাল চাকরী দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চমৎকার শাস্তিই বটে। এখন উক্ত ডাক্তার “Study leave” নিয়ে নাকি বিলাতে উচ্চতর শিক্ষালাভ করছেন। বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি এই বিষয়টি সংবন্ধে কিছু অনুসন্ধান করবেন? এই প্রশ্নটি বোধ হয় বিধানসভাতেও উঠেছিল। কিন্তু আলোচ্য ডাক্তারটি স্বাস্থ্যদপ্তরের একজন বড় কর্তার বিশেষ স্নেহভাজন হবার কারণে সমস্ত অভিযোগই ‘হাস আস’ হয়ে যায়।

এর পর আরও একটি পুরোনো অভিযোগের কথা তুলি। ১৯৬৫ সালের ২৪শে জুন সংখ্যায় বর্তমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালের অভ্যন্তরে দুর্নীতির এক বিশদ চিত্র আমরা প্রকাশ করেছিলাম। ওই হাসপাতালের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ সম্বলিত একটি পত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব শ্রী বি আর গুপ্তের নিকট প্রেরিত হয়েছিল। সেই পত্রের কি গতি হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেন তা অনুসন্ধান করেন। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কথা ১৯৬৬-র ৮ই ডিসেম্বরের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল, এখনো পর্যন্ত তার কোন প্রতিকার হয় নি।

তারও আগে ১৯৬৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের বঙ্গদর্শনে খোদ স্বাস্থ্য-দপ্তরের মধ্যেই একটি দুর্নীতির সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল, স্বাস্থ্য অধিকর্তার অধীনে কার্যরত একজন কর্মচারীকে কেন্দ্র করে, কিভাবে তিনি মেদিনীপুরের সি-এম-ও অফিসের একজন নন-ম্যাট্রিক কর্মচারীকে একটি টি-বি আরোগ্যোত্তর কলোনীতে অফিসার বানিয়েছেন, কিভাবে স্বাস্থ্য বিভাগের পরিবহন শাখার স্টোর সংক্রান্ত একটি পড়ে ৩০০-৬০০ টাকা স্কেলে একজন নন-ম্যাট্রিককে ঢোকান। এই মহাপুরুষের বহু কার্যাবলীর বিবরণ দিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের সচিব ও স্বাস্থ্য অধিকর্তার দৃষ্টি বৃথা আকৃষ্ট করা হয়েছিল।

১৯৬৬-র ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় আমরা নার্স জীবনের বিড়ম্বিত দিকদৃষ্টি

সংবন্ধে অনেকদলীয় আভিযোগ তুলে ধরেছিলাম, অনেক উদাহরণ দিয়ে। স্বাস্থ্য-দপ্তরের প্রতিটি রম্ভে রম্ভে কি রকম দুর্নীতি ও অন্যায়ের লীলাখেলা চলে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে তার বিশদ পরিচয় সেখানে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এই বিভাগের আমলাতান্ত্রিক কর্মকর্তাদের দূরদৃষ্টি ও কর্মশক্তির অভাবের ফলে সমগ্র দপ্তরটিতে যে বিবাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সকল কর্মতালিকার সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া উচিত।

উদাহরণ দিতে গেলে শেষ পর্যন্ত তা মহাভারতের আকার ধারণ করবে এবং বেহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় পূর্বে সমাজের ওপরতলার বিচরণকারী ছিলেন না, সাধারণ মানুষ হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন এই বিভাগটিকে ভদ্র-লোকের উপযোগী করতে হলে বিভাগের সর্বাগ্রে কি প্রকার কাড়ুর প্রহার দিতে হবে।

টেকনোক্রাট দিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তর চলবে না, অর্থাৎ নামকরা ডাক্তারদের বিভাগীয় বড় বড় পদে বসিয়ে রাখলে স্বাস্থ্যদপ্তরের উন্নতি হবে না। যারা ব্যক্তিগত জীবনে চিরকালই কেরিয়ারিস্ট তাঁরাই আজ দপ্তরের চড়ায় বসে আছেন। এ কথা আজ শিশুতেও বোঝে যে, কর্তব্যকর্মে গুরুতর অবহেলা না করলে ডাক্তারী মার্গের শিখরে ওঠা যায় না। অর্থাৎ আজ যারা এই লাইনে কেটেবিস্ট হয়েছেন, স্বাস্থ্যদপ্তরের চড়ায় এসে বসেছেন, তাঁরা যে মাইটি বেয়ে ওপরে উঠেছেন, সেদিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, হাসপাতালের সংগে সংযুক্ত হবার সুযোগ নিয়ে, হাসপাতালে নিজেকে প্রকৃত কর্তব্য না করে, ওই পূর্বাব্দে জমকালো প্রাইভেট প্রাকটিশ জমিয়ে আজ তাঁরা মাতাম্বর ব্যক্তি হয়েছেন। এটা খুল সভ্য কথা। একের পর এক উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায়, যিনি যতবড় ডাক্তারই হোন না কেন, যত বিদেশী ডিগ্রীতেই পেশীপা-মান হোন না কেন, হাসপাতাল ছাড়ার সংগে সংগে প্রাকটিশের পরিমাণ শোচনীয়ভাবে কমে গেছে। এই কারণে বলছি, যে কর্তব্য করার জন্য তাঁরা একদা হাসপাতালের সংগে সংযুক্ত হয়েছিলেন, হাসপাতালের প্রতি সেই কর্তব্য না করে, হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবে সুযোগ নিয়ে যারা আর্থের গাছিয়েছেন, সেই ফাঁকিঝাজের দল যদি স্বাস্থ্যদপ্তরটির চড়ায় উঠে বসে থাকেন তাহলে কি কোন জমে এই বিভাগটির উন্নতি হবে?

ভূমি ও ভূমিরাজস্বদপ্তরের সিদ্ধান্ত

ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেক্ষ

কোঙার জানিয়েছেন যে, জমিদারী দখল আইন অনুযায়ী রাজা সরকারের হাতে যে সব জমি ন্যস্ত রয়েছে, বর্তমান সরকার ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে তা চিরস্থায়ী-ভাবে বণ্টনের সিদ্ধান্ত করেছেন।

এখনো পর্যন্ত সরকারের হাতে নয় লক্ষ বিঘা জমি ন্যস্ত রয়েছে। কংগ্রেসী আমলে এতদিন পর্যন্ত ওইরূপ এক বিঘা জমিও বণ্টন করা হয় নি। বর্তমান সরকারের ইচ্ছা যে ওই জমি ভূমিহীন কৃষকদের হাতে তুলে দেবেন।

এজন্য জমি বণ্টনের ব্যাপারে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন এবং সরকারের তরফ থেকে সেই রকম নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নতুবা প্রকৃত কৃষকেরা কোনদিনই জমি পাবে না।

ব্রহ্মভিত্তিক যে সব জমি বণ্টন পরামর্শদাতা কমিটি আছে সেগুলির কার্যকরী ক্ষমতা বাড়ান করে দেখার নির্দেশ নাকি শ্রীকোঙার দিয়েছেন। কেন না, ওই সব কমিটিগুলিতে অঞ্চলপ্রধান এবং কায়দা-স্বার্থ মনোনীত কিছু সদস্য আছে, যারা চিরকালই পরম্পরে ফলাহারে অভ্যস্ত।

সর্বোচ্চ জোতের সীমা বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও বিশাল বিশাল জোতের মালিকরা কিভাবে বেনামে সমস্ত জমিই নিজেদের কৃৎসিগত করে রেখেছে তা নিশ্চয়ই ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রীর অজানা নয়। সে জরি তাদের হাত থেকে বার করে আনতে হলে এখন একটি আদর্শবান প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। এখন নতুন দেউল-মেটের প্রয়োজন আছে।

শ্রীকোঙার জানিয়েছেন যে, কংগ্রেসী আমলে জোতের যে সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও ৬০টি চা-বাগানের মালিক তাঁদের বাড়তি জমি হস্তান্তরিত করে নি। এই রকম একটি বাগানের ছয় হাজার বিঘা বাড়তি জমি আছে।

সরকারের হাতে যে নয় লক্ষ বিঘা জমি রয়েছে তার এমন বিলব্যবস্থা হওয়া উচিত যাতে ভূমিহীন কৃষকদের হাতেই জমি চিরস্থায়ীভাবে গিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের কয়েকটি বিশেষ সর্তে জমি দিতে হবে। প্রথমত তারা এই জমি সরকার ছাড় আর কারো নিকট বিক্রয় করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত বন্ধক দেবার প্রয়োজন থাকলে তা একমাত্র যেন সরকারের কাছে দেওয়া যায়। তৃতীয়ত যারা জমি পাবে তাদের মৃত্যুর পর সেই জমি যাতে ভাগ না হয়। সামবায়িক ভিত্তিতে ভূমিহীন কৃষকদের জমি দিলে হয়ত আরও ভাল দেখাত কিন্তু বর্তমানে বোধ হয় তা উচিত হবে না, কেন না প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী সমবায়ের ক্ষেত্রে বেনো জল ঢোকানই সম্ভাবনা বেশি।

আমুখোবাক্ষ শত্রু আনন্দ চিত্র

শত্রুপক্ষের তৎপরতা

আমাদের অক্ষমতা—ক্ষুণ্ণ জিজ্ঞাসা

আমাদের আক্রমণ কতখানি ব্যাপক ও সফল হয়েছে জেলা কর্তৃপক্ষ প্রথমটা তা বুঝতে পারে নি। কর্তৃপক্ষ বলতে আমি এখানে মাত্র গুটিকতক ইংরেজ প্রধানের কথা মনে বেখেছি, যথা—জেলা-শাসক, পদলিস, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও তাঁর সহকারী, বরিশাল রেঞ্জের D.I.G., AFI HQ.-এর Adjutant ও ক্যাপ্টেন টেট প্রভৃতিব ছোট ছোট দূ-একটি দলকে। আমাদের আক্রমণের পর তাঁরা সবাই সব খবর একসঙ্গে পান নি। কেউ জানতে পেরেছেন পদলিস-লাইন আক্রান্ত হয়েছে, কেউ জেনেছেন AFI আর্মারি বিপ্লবীরা অধিকার করেছে, আবার তাদের মধ্যে কেউ খবর পেয়েছেন টেলিফোন ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে। এই-সব খবর টেলিফোনযোগে তাঁদের পাওয়া সম্ভব ছিল না। লোক মারফৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এইসব বস্তান্ত জেনেছেন এবং একস্থানে বিপর্যয়ে খবর শুনাই তাঁদের মধ্যে কেউ গেছেন ছুটে AFI আর্মারিতে, আবার কেউ গিয়েছেন পদলিস-লাইনে অস্ত্র ও পদলিস বা অস্ত্রলিবারী ফোর্সের সাহায্যলাভের আশায়। এইরূপ-ভাবে ছোটছোট করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে পরস্পরের দেখা হয় এবং আক্রমণে ব্যাপক তখন বুঝতে পেরে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

তখনও তাঁরা জানেন না বহির্জগৎ হতে টেলিগ্রাফ লাইন ছিন্ন হয়েছে। তাঁরা আরও ভাবতে পারেন নি যে, দুর্দৃষ্টি স্থানে রেললাইন বিধ্বস্ত হয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে ও বেশ কিছু সময়ের জন্য নিশ্চল হয়ে থাকবে। চট্টগ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের রেল ও টেলিগ্রাফ সংযোগ ছিন্ন হওয়ার সংবাদ তাঁরা না পেলেও শহরের অবস্থা অনুধাবন করে

ভাল করেই বুঝেছিলেন তাদের সার্বিক নিরাপত্তা বেশ বিপন্ন হয়েছে। ইম্প্রিয়ারাল ব্যাঙ্ক, জেলখানা, সদর কোতোয়ালী প্রভৃতি বাদ তখনও আক্রান্ত না হয়ে থাকে, তবে এইসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান সুরক্ষিত রাখবার দায়িত্ব তাঁদের ওপর এসে পড়ে। ইংরেজ পরিবারবর্গকে কাল-বিলম্ব না করে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনও তাঁরা উপলব্ধি করেছেন।

সমর শিক্ষার অভিজ্ঞ ও দক্ষ ইংরেজ অবাধে রাজত্ব করেছে বছরের পর বছর। সিপাহী বিদ্রোহের পর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রায়ে চট্টগ্রামে, আসন্ন মৃত্যুর মধ্যে সেরূপ বিপন্ন বোধ করেছে, বোধ হয় এতদিনেব মধ্যে ভারতের অন্য কোন স্থানে আর কখনও সেরূপ বিপদগ্রস্ত তারা হয় নি। তবু এত বিপদের মধ্যেও তারা আমাদের চাইতে অনেক বেশি ধীর স্থির ছিল—অনেক বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে গেছে—খুব বিপদ ও অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে থেকেও দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা কবেছে।

শত্রু হলেও, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর কাছ থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে—চট্টগ্রাম জেলার প্রধান সৈন্য-ঘাঁটি ও পদলিস-ঘাঁটি দু'টি তাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার পরও কোন সন্দেহ প্রাপ্তে পরিবারবর্গের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্য বাহু রচনা করে তারা বসে থাকে নি। নারী ও শিশুদের নিয়ে পালাবার জন্যই কেবল ব্যস্ত হয় নি, অল্প কয়েকজন সাহসের সঙ্গে খুব নিকটে এসে আমাদের বিপ্লবী ঘাঁটি আক্রমণ করেছে। রণকোশে অভিজ্ঞ ইংরেজ, তাদের বিপক্ষ শত্রুঘাঁটি তৎপরতার সঙ্গে আক্রমণ কবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারলে যে আত্মরক্ষার সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি পাবে তা' বুঝেছিল। যুদ্ধের নীতি অনুসারে offence is

the best defence—বাস্তবেও তাই ঘটলো, সাহস ও তৎপরতার সঙ্গে গুটি-কতক ইংরেজ আমাদের নিষ্কণ্টকতা ও স্থিতির জন্য অনেক বেশি সুযোগ পেলে—খুব - বিদ্রোহের সম্পূর্ণ মোড়টাই আমাদের প্রতি-কূলে ঘুরে গেল। সেই turning point থেকে তাবা গেল—Offensive position-এ আর আমরা নিলাম Defensive position.

প্রবল শত্রু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তাবা ভারতের বুকে যুগ যুগ ধরে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছে। Preparation, mobilisation ও deployment পর্যন্ত আমাদের সব ঠিক ছিল। তারপরে, যুদ্ধের প্রথম স্তরেই বিপ্লবী 'জেনারেলদের' চিন্তা খুব দ্রুত এগোয় নি এবং দ্রুত চিন্তার সঙ্গে তাঁরা শত্রু-শিবিরের পরিশিষ্ট ছোট ছোট ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে অধিকার করাব ব্যবস্থা করেন নি। তাই ভায় স্বাভাবিক পিণ্ডিত—শত্রুবা নিল অনেক বেশি initiative।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিন্সন'সব পেলেন টেলিফোন অফিস ধ্বংস হয়েছে, পদলিস-লাইন বিপ্লবীরা অধিকার করে নিয়েছে; তিনি টেলিফোনে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না—কি বিপদ! কি সংকটময় অবস্থা! সেই রাতে তিনি তাঁর শিকাব করাব দোনলা বন্দুকটি ও একজন আদালীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসেন। মোটর নিয়ে ছুটলেন AFI আর্মারিতে। সেখানে তাঁব মোটর আক্রান্ত হল। আদালী মারা গেল, ড্রাইভার আহত হল ও তিনি নিজাম পল্টনের মাঠটি দৌড়ে অতিক্রম কবলেন। চট্টগ্রামের প্রধান স্টেশনের ইংবেজ স্টেশন-মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে রেল এঞ্জিন করে মিঃ উইলকিন্সন ও টেট ডবলমুড়ি জেটী আর্মারিতে উপস্থিত হলেন। সেবার

থেকে লাইস-গান প্রভৃতি অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে প্রতি-আক্রমণ করার ব্যবস্থা করলেন।

জঙ্গসাহেব আমাদের মামলার বিবরণ লেখবার সময় লিখছেন—

“Mr. Wilkinson...was awakened....He hurriedly dressed and set forth in his car....When they arrived at the Junction known as Piceadilly Circus...they found there a car standing in which were Capt. Taitt and his wife, Mr. Lodge, the District Judge and his wife, and Mr. Wighton and Mr. Farrell. The ladies were sent on to Mr. Bliss's bungalow near by while the District Magistrate went on to the bungalow of Mr. Johnson also close by, but finding that he had already gone to the AFI Armoury he returned forthwith to Piceadilly Circus where Capt. Taitt was waiting. From there Mr. Wilkinson went on in his car towards the AFI Armoury.”

(জেলা-শাসক মিঃ উইলকিন্সন খবর পাওয়া মাত্র প্রস্তুত হয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পিকাডিলী সার্কাস নামক জায়গাটির কাছে এসে তিনি ক্যাপ্টেন টেটের গাড়ি দেখতে পান। গাড়িতে টেটের স্ত্রী, জেলা দফতর ও তাঁর স্ত্রী, এবং মিঃ ওয়েটন ও মিঃ ফারেল উপস্থিত ছিলেন। মিঃ রিসের বাংলা নিকটেই ছিল—সেখানে মহিলাদের পাঠানো হল। জেলা-শাসক মিঃ জনসনের গাড়ি ছুটে গেলেন। ইতিমধ্যে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট AFI আর্মারির দিকে গেছেন শুনে মিঃ উইলকিন্সন আবার ক্যাপ্টেন টেটের কাছে এলেন। সেখান থেকে মিঃ উইলকিন্সন AFI আর্মারির দিকে এগিয়ে গেলেন।)

তারপর মিঃ উইলকিন্সন সাহেবের গাড়ি আক্রান্ত হয়। গুলীর আঘাতে গাড়ি বিকল হয়ে পড়ে। আদালী মারা যায়। মোটরচালক আহত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ছুটে পালান। এইটুকু আমি আগে লিখেছি। ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি অন্তরঙ্গ করে ক্যাপ্টেন সাহেবের গাড়িও আসছিল। মিঃ উইলকিন্সনের এইরূপ অকস্মাৎ দেখে ক্যাপ্টেন ও তাঁর সাক্ষী আর এগোলেন না। তাঁরাও জেলা-শাসকের সঙ্গে চট্টগ্রাম মেইন রেল-স্টেশনে ছুটে এলেন।

জাজসেট কপিতে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট, জজ, লিখছেন—

“...By the shots fired by the AFI Armoury raiders, the radiator of Mr. Wilkinson's car was riddled beyond repair and a headlight was smashed and a hole drilled through the back of it....Capt. Taitt's car was also hit in several places, one or two bullets actually perforating the window screen...”

জেলা-শাসক ও ক্যাপ্টেন টেটের গাড়ি দুটি একেবারে অকস্মাৎ হয়ে পড়ে রইল। তবু তাঁরা কতকটা অটল। ছুটে গেলেন রেল-স্টেশনে।

জাজসেট কপিতে লেখা আছে—

“At the Chittagong Railway station Mr. Wilkinson and Capt. Taitt commandeered an engine and in it went to the Jettie's armoury from which Capt. Taitt as many men as he could obtain, while the District Magistrate went aboard a ship and despatched a message by wireless. Then, while the armed party followed by train they both returned to the AFI headquarters by car to find the building on fire and a number of Europeans including Major Baker already assembled there. These set about getting the ammunition out of the magazine into a place of safety. The magazine-room in which all the ammunition was kept was a small room at the opposite end of the building from the armoury....which had providentially been completely overlooked by the raiders.”

AFI আর্মারির আক্রমণকারী দল ক্যাপ্টেন টেট ও মিঃ উইলকিন্সনের মোটরের ওপর অজস্র গুলীবর্ষণ করে। গাড়ি কেলে রেখে মিঃ উইলকিন্সন ও টেট রেল-স্টেশনে গিয়ে একটি রেল এঞ্জিন সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য নিজেদের অধীনে নিলেন। তাতে করেই তাঁরা জাহাজঘাটের ভেতী আর্মারিতে গেলেন। ক্যাপ্টেন সেখান থেকে অস্ত্রাদি নিয়ে যতজনকে সম্ভব সুসজ্জিত করলেন। ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট নদীর দিকে কোন একটি জাহাজে গিয়ে বেতারে সংবাদ পাঠালেন ও পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা মোটর করে আবার AFI

আর্মারিতে ফিরে এলেন এবং পেছনে টেনে এল সামান্য সশস্ত্র সৈন্য। তাঁরা এসে দেখলেন সেজর খেঁকার লোকজন নিয়ে ইতিমধ্যে কাচুগের রাস্তা সব নিরাপদ স্থানে সরিয়েছেন। আর্মারি গৃহের অপর দিকে দ্রোণ, একটি কোঠায় কাচুগের দল সংরক্ষিত ছিল। তারপর জঙ্গসাহেব লিখছেন—ভগবানের অশেষ কৃপা যে আক্রমণকারীর দল এই কোঠাটি লক্ষ্য করে নি। চট্টগ্রামের ইংরেজরা সেইদিন সতাই ভেয়েছল ইশবের দয়া ছাড়া এইরূপ হতেই পারে না—যদি ৩০০ কাচুগ আমাদের হাতে পড়ত, তবে কে বলতে পারে। ইংরেজের রক্তপ্রবাহে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে চট্টগ্রাম যুব-যাত্রীদের ইতিহাস লেখা হোত না। আমরা আজ ভাগ্যকে দোষ দিয়ে আক্ষেপ করতে পারি—এই আমাদের সাক্ষ্য। ইংরেজের দল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে নি। তাঁরা ও কম্প্রহেনসিভ প্রাতি ভাগ্য উপহাস করে। Fortune favours the brave! নেপোলিয়ান বলতেন—বীরেরাই ভাগ্যের অধিকারী।

বে সময় অবশিষ্ট বঙ্গবাহ্য শক্তি সম্ভব করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ক্যাপ্টেন টেট AFI আর্মারি পুনরুদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করছিলেন সেই সময় জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডি আই জি, মিঃ ফারমারের নেতৃত্বাধীনে ছোট আর একটি দল কিভাবে ক্ষিপ্ততার সঙ্গে কাজ করে গেছে তার বিবরণ জাজসেট কপিতে পাচ্ছি—

“...At the same time the Superintendent of Police Mr. Johnson with Mr. Farmer the D. I. G. hurriedly got into uniform and after despatching constable Jorasindhu Barua to inform the District Magistrate and their orderly constables to warn Capt. Taitt, Adjutant of the Auxiliary Force, and Mr. Lewis, the Assistant Superintendent of Police, proceeded by motor car to the AFI Armoury in the hope of obtaining assistance there. As he approached the AFI armoury and was just about to enter the gate, rapidly coming to the conclusion that this armoury was being attacked as well, he drove at speed straight on towards Pahartali....Some 200 yards further along the road he overtook, running along the road towards Pahartali. There

persons, one of whom he discovered to be Sergt. Blackburn of the AFI Headquarters staff. He further elicited from Sergt. Blackburn that the keys of the Pahartali subsidiary AFI Armoury were kept by Mr. Barraclough. So taking Blackburn and his companions inside the car, he got Blackburn to show him the way to Barraclough's house. There Barraclough was aroused and sent with Sergt. Blackburn to open the Pahartali Armoury while Mr. Johnson went on to rouse other Pahartali residents, viz., Messrs Francis, Thomas, West, Provan, Tyers, etc. Returning with them to the Armoury, rifles and ammunition, etc., were obtained and a Lewis Gun with the gunner, Barraclough was placed in Mr. Francis's car while three or four riflemen got into Mr. Johnson's car along with him and Mr. Farmer. They then drove to the AFI Headquarter's Armoury to find the raiders had already left and some Europeans had assembled....Leaving the AFI Headquarters Mr. Johnson and Mr. Farmer went on to visit the Imperial Bank and Kotwali P.S. as they thought that these might have been attacked as well. They took with them the Assistant Superintendent of Police Mr. Lewis, who in the meantime had arrived at the AFI Headquarters, his orderly, and gunner Barraclough with his Lewis Gun....At the Imperial Bank Messrs Farmer and Johnson found all was quite and at Kotwali that the alarm had already been received, so they motored to the European club garage and thence proceeded on foot across the Golf

course towards the Police line...."

(খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে D.I.G. এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্যাক পোশাক পরে নিলেন। তাঁদের আর্মারী কনস্টেবলদের ম্যাজিস্ট্রেট, ক্যাপ্টেন টেট ও সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ লুইসকে সংবাদ দিতে পাঠালেন। তাঁরা কালঙ্কর না করে সাহায্য পাবার আশায় মোটরে AFI আর্মারির দিকে ছুটলেন। AFI আর্মারির কাছে এসে বুঝলেন যে, এই আর্মারিও আক্রান্ত হয়েছে। উপায় নেই দেখে দ্রুত পাহাড়তলীর ছোট আর্মারির উদ্দেশ্যে তীব্রবেগে মোটরে যাচ্ছিলেন। পথে মিঃ ব্র্যাকবান সাফেটিকে ও তাঁর সাথীদের গাড়িতে তুলে নিলেন। মিঃ ব্র্যাকবানের সঙ্গে মিঃ জনসন ব্যারাকলো সাহেবের বাগলোতে গেলেন। মিঃ ব্র্যাকবান ও মিঃ ব্যারাকলো সাহেবকে পাহাড়তলীর আর্মারি থেকে অস্ত্রসম্পদ বার করে নিতে বলে মিঃ জনসন স্বয়ং অন্যান্য ইংরেজ বন্দুকের হুঁসিয়ার করে দিতে ছুটলেন। লুইস-গান ও রাইফেল নিয়ে সম্বলিত হয়ে তাঁরা সবাই AFI আর্মারিতে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে আক্রমণকারীর দল প্রস্থান করেছে আর আর্মারি দাউ দাউ করে জ্বলছে। পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ লুইসও এসে AFI আর্মারিতে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সবাই তখন পুলিশ-লাইনের দিকে যাওয়া স্থির করলেন। মিঃ জনসন ও মিঃ ফারমার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও কোতওয়ালিতে সব ঠিক আছে এই খবর পেয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাবের মোটর গ্যারেজের পাশ দিয়ে ও গলফ কোর্সের মাঠ অতিক্রম করে পুলিশ-লাইনে বিপ্লবীদের আক্রমণ করতে এসে উপস্থিত হলেন।)

তারপরের ঘটনা আমরা জানি। তারা ওয়াটার ওয়ার্কসের বিভিন্ন স্থান থেকে মেশিন-গান চালিয়েছে এবং আমরা তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়েছি। প্রথমবার আক্রমণের পর তাদের মেশিন-গান নিসৃত্য হয়ে গেল। মাস্টারদা সাময়িক গণতন্ত্রী বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার শত্রুপক্ষ থেকে ফায়ারিং আরম্ভ হল। তারা আবার রণে ভগ্ন দিল। এই তথ্য আমি আগে লিখে গেছি। বিস্তারিত বর্ণনা চলার পর শত্রুপক্ষ যদিও পরাস্ত হয়েছিল আর যদিও আমরা সবাই তখনও একেবারে অক্ষত ছিলাম তবু আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং আমরা আর্মারিতে অগ্নিসংযোগ করে সেখানে থেকে প্রস্থান করি।

এর পরের ঘটনা—“...Azim

and his companions emerged from the basti near the Water-Works where they met D. I. G. and S. P. and their party. At the same time about twenty Europeans including Capt. Taitt and Messrs Bliss, Lodge, Keating and others arrived from the Tiger Pass direction. It was then 3-30 or 4 a.m. They advanced upon the lines in two parties—one party going through the basti and the other along the road—to find that the raiders had made off.”

(কোতওয়ালীর ইনচার্জ আজিম তাঁর এক পার্টি নিয়ে ‘দামপাড়া’ বসিত থেক এসে ওয়াটার ওয়ার্কসে জনবল সাহেবের দলের সঙ্গে একত্র হলেন। অন্য দিক থেকে ক্যাপ্টেন টেট প্রায় জনা বিশ ইংরেজকে সংগ্রহ করে টাইগর-পাসের দিক ধরে পুলিশ-লাইনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তখন প্রায় ভোর চাটা বা এটা বেজেছে। দুই দিক থেকে দুটি বল পুলিশ-লাইনের ওপর এলো। ইতিমধ্যে আক্রমণকারীর দল উধাও হয়েছে।)

শত্রুপক্ষ যখন অতিক্রম আক্রমণে প্রায় বিধ্বস্ত তখনও মরীয়া হয়ে তাঁরা যে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে পশ্চাৎপদ হন নি তা অভ্যন্তর প্রশংসনীয়—এইরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। শত্রুকে ছোট ভেবে হেয় প্রতিপন্ন করা যায় বটে, তবে তাতে বিপ্লবী মর্যাদা বাড়ে না, প্রকৃত রণকৌশলও শেখা যায় না।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা যে এইরূপ অসীম শক্তিশালী ও তদ্রূপ ক্ষমতা যে প্রচুর তা বাংলার জ্বলন্ত বিপ্লবীদের অজানা ছিল না। তদ্রূপ শক্তির পরিধি জেনে আমরা ভীত প্রসন্ন ও বিধাগ্নস্ত হই নি। স-জেনেশনও আমরা মৃত্যুপণ করে যুব-নিগ্রোহের দাবী নিয়ে আসরে নেমেছিলাম একমুগে চকিতে যুগপৎ আক্রমণ হবে বল প্রভাপশালী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিনিধিদের চট্টগ্রামে প্রথম পর্যায়ে পরাস্ত করতও সক্ষম হয়েছিলাম।

আমরা যখন আমাদের প্রথম জয়ের পর নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যস্ত আছি, যখন প্রত্যেক দল নিজ নিজ কাজ সমাপ্ত করে পুলিশ-লাইনে ফিরে আসছিল, AFI আর্মারি ধ্বংস করে আমাদের অন্যতম প্রধান দলটিও পুলিশ-লাইনে উপস্থিত হল এবং সাময়িক বিপ্লবী স্বাকার ঘোষণা করার জন্য আমরা তোড়জোড় করছি—

কখন পদার অস্তরালে, অর্থাৎ, আমাদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ অগোচরে শত্রুপক্ষ অতি দ্রুত ও তৎপরতার সঙ্গে তাদের অবশিষ্ট শক্তি সংগঠিত করে আমাদের আক্রমণ করেছে। আমরা বিশৃঙ্খলার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত AFI আর্মারির মত পুলিস-লাইনও ভঙ্গীকৃত করে প্রস্থান করছি।

এত বছর ধরে মাঝে মাঝে আমার কানে এসেছে কখনও বা কারও সেখা আমার চোখে পড়েছে, তাতে যুবোচ্চ চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রতি অকুণ্ঠ আন্তরিক প্রত্যাশা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের হৃদয় ব্যথিত হয়ে গুমরে ওঠে যখন ভাবেন কেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা মাস্টারদার নেতৃত্বে অত অল্প সব ফেলে গেলেন। বাংলার বিপ্লবী তরুণদের ব্যথিত অন্তরের ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসার প্রতি সমবেদনার আমার অন্তরও বিচলিত হয় তাই সেই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করে আমার অভিমতগুলি বিচার করে দেখার জন্য সর্বসমক্ষে উপস্থিত করছি।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে এই কয়টি প্রধান—কেন সু্য সেন গেরিলা যুদ্ধ শ্রেয় মনে করে প্রধান দল নিয়ে পাহাড়ে চলে গেলেন? যাওয়ার সময় কেন তাঁরা রাইফেল, মাস্কেটি, লুইস-গান ও অসংখ্য কাচুজ্ঞ সঙ্গে নিয়ে গেলেন না? অতসব অস্ত্র সেখানে ফেলে আসা কি তাঁদের উচিত হয়েছে? বিপ্লবীদের চির আকাঙ্ক্ষার অতি মূল্যবান অস্ত্র সব আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা হল কেন? যখন বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা অস্ত্রের অভাব অনুভব করেছে প্রাতিদিন, প্রাতিমুহুর্তে, তখন কোন অধিকারে বিপ্লবী তরুণদের সেই সব অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করা হল? কেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী তরুণ দল যুব-বিদ্রোহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো না—কেন তারা বঙ্গদেশে যারওভী বিদ্রোহীদের ও তাদের বীর জনতা সায়সের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখেন নি? আপাতদৃষ্টিতে - বিচার করে তরুণ বিপ্লবীদের মনে এ প্রশ্ন হয়ত আসতে পারে কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে অভিজ্ঞ বিপ্লবীরাও যখন এইরূপ প্রশ্ন করেন তখন তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। অবশ্য এই সংশয় থাকা সত্ত্বেও তাদের ভাবপ্রবণতার প্রতি আমার আন্তরিক প্রত্যাশা বিন্দুমাত্র অভাব নেই। আমার অন্তে হয় ভাবপ্রবণতা দিয়ে বিচার করলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়, আবার তাতে হয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি। ভাবপ্রবণতার ওপর নির্ভর করে বিচার-বিশ্লেষণ করলে মিথ্যা যৌক্তিকতার প্রভাবে আত্মপ্রবণতার লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে!

Anology has its limitations

—প্রত্যেক উপমাতেই একটি গাণ্ডী আছে। সেটি মনে রেখেই উপমা স্বরূপ যদি এই ধরনের প্রশ্ন তুলি—১৯০৫ সালে প্রধানত কেবল মস্কোতে ইনসারেকশন নিবন্ধ না রেখে তা কেন অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হল না? অথবা কেন লেনিনের নেতৃত্বে সমস্ত রুশদেশে সেই বিপ্লব পরিচালনা করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করা হল না?—তবে কি তা ঐতিহাসিক বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে একান্ত subjective — নিছক ভাবপ্রবণতাপূর্ণ নিজস্ব একটি সাধু ইচ্ছা বলে মনে হবে না?

অগ্নিযুগের এই অধ্যায়টি লিখতে গিয়ে প্রথম থেকে বলে এসেছি বাংলাদেশে বহু বিপ্লবী দল ও পার্টি ছিল; কিন্তু এসব সংগঠন সমান স্তরের ছিল না। বাংলা, আসাম ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় একসঙ্গে যুব-অভ্যুত্থানের জন্য মাস্টারদার ও শচীন সান্যাল পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তা কাজে আসে নি। যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য ইন্দো-জার্মান যুদ্ধসম্মত হয়েছে—তাৎক্ষণিক মিলিয়ে গেল। রাসবিহারী বোসের পরিচালনার সারা ভারতে সিপাই ও গদর পার্টিকে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রচেষ্টা অল্পকয়েক বিনষ্ট হয়েছে। এই সব ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ঠিকই করেছিলাম যে অন্তত একটা জেলাতেও আমাদের যুব-বিদ্রোহ, বৃটিশ পুলিশের চক্রান্তকে পরাস্ত করে যতদূর সম্ভব সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করতেই হবে। সেই কারণে অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ করে চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহ ঘোষণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাছাড়া ছোট শহরে পুলিশের তৎপরতা বেজায় বেড়ে গিয়েছিল; রামকৃষ্ণ, অধেশ্বর ও তারকেশ্বর বিস্ফোরণে ভয়ানকভাবে আহত হওয়ার পর পুলিশের ক্রমাগত অতর্কিত হামলার হাত থেকে তাদের নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের সংগঠনের বহু সময় ও শক্তি ক্ষয় হয়েছে; আমাদের রাত্রো-দিনে ব্যস্ততা এত বেড়ে গিয়েছিল যে অভিভাবকেরাও আমাদের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন অভিভাবক আমাদের বিরুদ্ধে মামলাই রুজু করলেন। এইরূপ আরও প্রতি-কূল অবস্থার মধ্যে আমাদের পড়তে হয়েছে। তাই প্রতিকূল অবস্থা ও সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে আমাদের যা সামান্য শক্তি ছিল তাই নিয়ে প্রস্তুত হতে হয়েছে এবং অতর্কিত কোন বিপদের আশঙ্কায় আর বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি

নি। এইসব কারণে ধারওড়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগের কোন কথাই ওঠে নি—নিজেদের শক্তির পরিধি ছাড়িয়ে কেবলমাত্র কাগজে-কলমে স্ল্যান করার ইচ্ছাও আমাদের কখনও ছিল না।

এই বাস্তব পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যাবে প্রচুর অস্ত্র যা আমরা পেয়েছিলাম তা' সঙ্গে নিয়ে এসে কিছুর করার ছিল না। বাংলা দেশের অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের হাতে যদি অস্ত্র তুলে দেওয়ার প্ল্যান আমাদের আগে থেকে থাকত তবেই তা' করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। স্বাভাবিক বাংলা বিপ্লবী দলের মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করার প্রশ্নটি যদি বাদও দিই তবু কেবল চট্টগ্রামের তরুণদের জন্য অস্ত্র এনে মজুদ রাখার ইচ্ছা থাকলে তার জন্যও আগে-হতে প্ল্যান না করে শেষ মুহুর্তে অস্ত্র নিয়ে আসা সম্ভব হতো না। অত সব নিয়ে আসা ও ভবিষ্যতে সেগুলির সম্ভাব্যহার করার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার প্রকৃত ইচ্ছা থাকলে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সাক্ষা-তিক বার্তা বিনিময়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে হতো; তাদের চট্টগ্রামে এসে নিরাপত্তার সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে নিরাপদে রেল বা নদীপথে নিজ জেলার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে করে রাখতে হতো; (সামান্য অসুস্থি স্মাগল করতে গিয়ে বা ছোটখাটো স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়ে বন্দুরা ধরা পড়ে গেছেন। মেছুসাবাজারের বাড়িতে অস্ত্র নিয়ে যুবক বন্দুর আসবাব খবর পুলিশ আগে থেকে জানতে পেরে তাদের গ্রেপ্তার করেছে—এইরূপ নজির বর্তমান ছিল)। বাংলা দেশের বিভিন্ন দলের এইরূপ সাংগঠনিক দুর্বলতার ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পরে সদা-জাগ্রত বৃটিশ পুলিশের সতর্কতাকে উপেক্ষা ও বিভ্রান্ত করে অস্ত্র পাচার করা, গোপনে রাখা, গোপনে শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করার মত নির্ভরশীল সংগঠন না থাকায় চট্টগ্রামের যুবকেরা যে অস্ত্র সেই বিদ্রোহের রাতে পেয়েছিল এই উপায়ে তার সম্ভাব্যহার করার কথা কল্পনাই করা যায়—তা' বাস্তবে পরিণত করা সে অবস্থায় কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

বাংলা দেশে কোন একটি বিপ্লবী দলও সেরূপ সুদৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না—এ কথা আমি কিন্তু একবারও মনে করি না। আর তা' মনে করবও বা কেন—কারণ, পরে দেখেছি বাংলা দেশে অনেক সফল বৈপ্লবিক কার্য (action) ঘটেছে। কিন্তু সেইসব সংগঠনকে আগে বেছে নেওয়া কি সম্ভব ছিল? কেন আমরা অন্যান্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে একত্র হয়ে একটি সুপারিকল্পনা

বিলাসে নিবন্ধ দৃষ্টি লালসার স্থূল কারিগর
ফালনোমি স্বপ্নে উজাগর;
কীচকের ক্ষুধার উন্মাদ
কীচকের ভ্রম-চোখে শোষণের স্বাদ।

দক্ষিণ সমুদ্রে মৃদু ফিরেছে নৌকার
উত্তাল সমুদ্রে নৌকা চলবে ভাটার অথবা উজানে; বৈঠার
শব্দ গুণে গুণে
ঝড়ো হাওয়া ঘূর্ণি স্রোতে ঢেউ ভেঙে ভেঙে;
নিষ্ঠার কীর্তি
আত্মভোলা আকাশের নিচে।

একটানা চিমে স্রোতে ফরিয়াদ-জ্বালা বৃকে
ঘুরেছি অনেক কাল মনের তালুকে।
অন্বীক্ষার সচেতন আলোয়
উন্মাদ বৈঠার আজ বিদ্যুতের খেলা শব্দ হবে
ঘুমকাতুরে অলস সূঁচটার ঘুম ভেঙে যাবে
বৈঠার তাড়বে।

ঘুমের মধ্যে অশথগাহ, গাছের পাশে নদী,
নদীর পাশে বিচল মাঠে পাখি উড়ছে।
পাখি-উড়ছে স্মৃতির পাখি, বৃকের ভিতর
বিশাল আকাশ.....

আমায় এখন কেউ ডেকে না, জ্যোৎস্না রাতে আমি এখন
আমায় প্রিয় জন্মভূমি আমার প্রিয় বাংলাদেশে
করছি একা স্মৃতিভ্রমণ; বাসক ফুলে
গঙ্গাফড়িং পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে যেমন আসে
তেমনি আমার চোখের কাছে উড়ে উড়ে
কত ছবির গঙ্গাফড়িং পালিয়ে গিয়ে ফিরে আসছে.....

ঘুমের মধ্যে বিচল পথ, পথের পাশে বাড়ি,
বাড়ির পাশে পুরনো তালগাভা কাঁপছে।
পাতা কাঁপছে স্মৃতির পাতা, বৃকের ভিতর
গভীর হাওয়া.....

আমায় এখন কেউ ডেকে না।

নিজে বিভিন্ন জেলায় একই দিনে বিপ্লবী
অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করি নি তা
আমি আগেই বিশদভাবে আলোচনা
করেছি। যদি আগে থেকে বিশেষ গবেষণা
ও চিন্তা করে এই পরিকল্পনা আমরা
বর্জন না করতাম তবে কোন ভারতম্য না
রয়েই, বিভিন্ন দলের সঙ্গে আমাদের
গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স টেবিলে একসঙ্গে বসতে
হোত। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কয়েক মাস
আগেই মেছুস্বামীর দলের হেড কোয়ার্টারের
মত বিপ্লবী ঘাঁটিও বিশ্বাসঘাতক
ও পুলিশের চক্রান্তে বিধ্বস্ত হওয়ার
নজির আছে তখন কি উপযুক্ত বিপ্লবী
দলকে সঠিক বেছে নেওয়া সম্ভব হোত?
তাই উপযুক্ত সংগঠন বাংলা দেশে থাকা
দলকেও ভাবের বেছে নিতে গেলে জুলের
সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। সেই যুগে বাস্তব-
তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি ক্ষেত্রেও
ভুল করার চাইতে কোন দলের সঙ্গেই
পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা না করাই
প্রায় মনে করেছি—ভেবেছিলাম সারা
বাংলা দেশ জুড়ে বিপ্লবী প্রচেষ্টা করতে
গিয়ে অতীতের নিষ্ফলতার পুনরাবৃত্তির
চাইতে অন্তত একটি জেলায়ও যুব-
বিদ্রোহের নজির স্থাপন করার প্রয়োজন
অনেক বেশি।

অস্ব স্ব সঙ্গো না নিয়ে এসে সেখানেই
সেইসব ধবংস করে আসা প্রসঙ্গে আরও
একটি কথা উঠতে পারে। সেইসব অস্ব
এনে কোন গোপন স্থানে—এমন কি পর্বত-
গুহা প্রভৃতিতেও কি রাখা সম্ভব ছিল

না? তা হলে তা বাংলার বিপ্লবী তরুণরা
কোন সময় সেইসব হয়ত উদ্ধার করে
আনতো। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ চিন্তার
যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একটু
তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় প্রচুর
অস্ব সেইরূপভাবে সরিয়ে রাখাও বাস্তবে
সম্ভব হোত না। প্রথমত আমরা ৩০০
বোরের রাইফেল ও লাইসেন্স-গানের কার্তুজ
পাই নি। তাই ম্যাগাজিন রাইফেল ও
লাইসেন্স-গান সবগুলিই একেজো হয়ে রইল
বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয়ত চারশ
ম্যাগাজিন রাইফেল ষাট জনের পক্ষে
বাস্তবে বয়ে নিয়ে যাওয়া যে কতখানি
দুঃসাধ্য ব্যাপার তা ভেবে দেখা দরকার।
তার ওপর যদি ঐ “অস্বা” রাইফেল
(পিষ্টল নয়) গোপনে লুকিয়ে রাখার
ব্যবস্থা করতে হোত তাহলে পাহাড়ের
ওপর এসব বয়ে নিয়ে উঠতে চেষ্টা করতে
হোত, কিন্তু বাস্তবে তা যে সম্ভব নয়
(physically impossible) তা
একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে।

আলোচনার উপসংহারে তবে এখন
বলি যদি ৩০০ বোরের কার্তুজের নির্ভুল
সংবাদ আমাদের থাকত আর যদি কোন
কারণেই পূর্ব-পরিকল্পনা বাতিল করে
দিয়ে পাহাড়ে না গিয়ে সমস্ত শক্তি নিয়ে
শহরের বৃকে এসে সদৃষ্টভাবে আমরা
পাতিশন নিতাম তাহলে ১৯শে তারিখ
সকালে চট্টগ্রামের তরুণরা বিপ্লবী
বাহিনীতে দলে দলে যোগ দিত। সেই

ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে আমরা
অনেক সময় ও সুযোগ পেতাম বাংলার
অন্যান্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ
স্থাপন করার এবং তা যদি না-ও পূর-
তাম তবু পোস্টে দাঁড়িয়ে আমাদের বর-
বার পর বাংলার তরুণরা যেন অস্বাস্ত
পেতে পারে তার জন্য কোন না কোন
বন্দোবস্ত করার প্রচুর সময় ও সুযোগ যে
পেতাম তাতে সন্দেহ নেই। আগেই স্বীকার
করেছি আমাদের সামরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞ-
তার অভাবের জন্য এবং সর্বোপরি
আমাদের morale নষ্ট হয়ে গিয়েছিল
বলে সঠিক নেতৃত্ব দিতে না পারে
বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে
পড়লাম ও প্রধান বাহিনী পাহাড়ে গিয়ে
পাতিশন নিল।

কেন অক্ষম হয়ে পড়লাম তা নিয়ে
আক্ষেপ করা চলে—অক্ষম না হওয়া উচিত
ছিল ভেবে subjective mind এর
অভিযান্ত্রিক প্রকাশ করা যায়, তবু sum-
total-এ বা fact তা fact-ই ঢেকে
যাবে। সেইজন্য চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে
প্রথম অধ্যায়ের সফলতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের
বিশৃঙ্খলা ও তৃতীয় অধ্যায়ে জালসা-
বাদের পর্বতযুদ্ধ তাদের সম্পূর্ণ জয়ের
ইতিহাসে আইরিশ বিপ্লবী নেতা লেনিনের
দৃষ্টান্তগী নিয়ে বিচার করে দেখতে হবে
—তবেই মনে কোন সংশয় বা অভিযোগ
হয়ত থাকবে না।



স্বাভাবিক উপন্যাস

আশাচূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভড়িভড়ি রোগ নয়, তাই হুড়মুড়িয়ে দেখতে আসার কথা নয়। ভবু চন্দন আজকাল মাঝে মাঝেই আসে। শব্দর-ছাড়িতে মনোমালিন্য চলছে, তাই ছুতো করে পালিয়ে আসে।

এসে মা'র কাছে বসে খানিকটা কুশল প্রশ্ন আর খানিকটা হা-হুতাশ করে উঠে যায়। খিয়েটার দেখবার ঝোঁকটা প্রবল তার, সেই ব্যবস্থা করতেই ভাজেদের কাছে আসা। ওখান থেকে যেতে গেসেই তো একপাল জ্ঞাননদের টিকটের দাম গুণতে হবে, ভেতরে ঝুটই মনোমালিন্য থাক, বাইরে সৌন্দর্য না রাখলে চলে না।

এখানে ও বালাই নেই, বৌ দুটোকে নাচালেই হয়ে যায় ব্যবস্থা। গিরীবান্ধী একটা নন্দ সপেে যাচ্ছে দেখলে আপত্তি করে না বরেন্দ্র। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স তো হলো চন্দনের। ঝিয়ের সপেে চলে যায়, টিকট কেনার ঝামেলা ঝিকে দিয়েই মেটে।

খিয়েটার দেখে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেয়ে তবু বিদায় গ্রহণ। কদাচ চাঁপ:ও এসে জ্বাটে। তবে তার ফুরসৎ কম। শব্দর-ছাড়িতে ভারি শাসন।

চন্দন এসেছিল—

যাবাব সময় আবার মা'র কাছে একটু ঘসে গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে-বিদায় নেয়, একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আবার সময় পেলেই আসবো মা'।

সুবর্ণলতা মেয়ের কথাব উত্তর দেয় না। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কান্দুর দিকে

ডাকিয়ে বলে, 'ওদের সব বলে দিও কান্দু, আমার মরার আগে আর কারুর আসার দরকার নেই। মরলে পরে যেন আসে।' বললো এই কথা।

মরতে বসেও স্বভাব যায় নি।

পেটের মেয়েকে এই অপমান করলো। মান্দ্রকে অপমান করে করে ওটাই যেন পেশা হয়ে গেছে ওর।

কিন্তু মেয়ে বলে তো এই অপমানটা নীরবে হজম করতে পারে না চন্দন। ভাবতে পারে না রোগা মান্দ্রের কথা খত'ব্য নথ।

দেও 'আচ্ছা মনে থাকবে—' বলে গটগটিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে। কান্দু স্তম্ভিত হয়ে যায়। পিছ পিছ যায় পেঁছতে। কথা জোগায় না মূখে।

পরদিনই শবরটা চাঁপার কাছে পেঁছে যায়। এবং বহুবাব বলা কথাটাই আবার বলে দৃ'জনে। 'আমরা হিচ্ছ সতীন-কি! আসল মেয়ে পারুলবালা আর বকুলবালা।'

তদবধি মায়ের আদেশ পালন করেই চলাছিলো তারা, কিন্তু মরতে যে বড় বেশি বিলম্ব করলো সুবর্ণলতা।

কান্দুর ছেলের অন্নপ্রাশন ঠেকিখে ঠেকিয়ে আটমাসে তুলেও যখন বিছানা থেকে তোলা গেল না সুবর্ণকে, আবার নামানোও গেল না, তখন প্রবোধ নিজেই হাল ধরে ঘটান আয়োজন করলো। নইলে লোকসমাজে যে মূখ থাকে না। প্রথম পোষ্ট বলে কথা।

সেই সময় অনেক সাধা-সাধনা করে

মেয়েদের নিয়ে এল প্রবোধ। তা তারা আমোদ আহ্লাদে যোগ দিলেও মা'র কাছে ভার-ভার হয়েই থাকলো। শব্দ বা একটু প্রশ্ন, তাও তো শোওয়া মান্দ্রকে প্রশ্ন নিষেধ।

বকুল বেচারী একবার দিদিদের দিকে, আর একবার মা'র দিকে, ছুটোছুটি করতে লাগলো। পাছে কোনো এক পক্ষ চির-দিনের মত বেকে বসে।

কিন্তু বকুলের পরীক্ষা?

বকুলের জলপানি পাওয়া? তার কি হলো?

কিন্তু সে দুঃখের কথা থাক।

পড়া আর এগোলো কই তার? সুবর্ণই কারণ।

সুবর্ণলতা পৃথিবীর দিক থেকে পিঠ ফিরিয়েছে, তবু বা বকুলকেই এখনো খুব ঠেলে সরায়-নি। বকুল যদি দুঃখটা সাবুটা এনে দাঁড়ায় হাত বাড়িয়ে নেয়। আর কেউ আনলেই তো বলে, 'রেখে যাও খাবো।'

তবু মাঝে মাঝে সুবর্ণ খোঁজ নেয় 'তো'র লেখাপড়ার কি হলো? মাস্টারকে বিদেয় করে দিয়েছে বৃষ্টি?'

বকুল মনে মনে বলে, 'ভগবান মিথ্যা কথার দোষ নিও না—' মূখে বলে, 'অসুখ করেছে মাস্টারমশাইয়ের।'

সুবর্ণ আর কথা বলে না, চোখটা বোজ়ে।

বুঝতে পারা যাচ্ছে এবার শেষ হয়ে আসছে। যে মান্দ্র চিরতদিন শব্দ কথাই বলেছে, 'আর বলবো না' প্রতিজ্ঞা করেও

না বলে পারে, নি, শুধু সংসারটি নিয়েই নয়, দেশ নিয়ে, দশ নিয়ে, সমাজ নিয়ে, সম্ভ্রুতি নিয়ে, রাজনীতি ধর্মন্যাত, পুরাণ উপপুরাণ, সব কিছু নিয়ে কথা বলেছে, আর অপর কেউ তার বপরীত কথা বললে তাল ঠুকে তর্ক করেছে, সে মানবের যখন কথায় বিতর্ক এসেছে, তখন আর আশা করার কিছু নেই।

নেশাখোরের 'কাল সন্নিফট' ধরা যায় তখন, যখন তার নেশার বস্তুটায় অনাসক্তি আসে।

সুবর্ণলতার কথা নেই, এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা নিয়ে যেন ছটকাটের বেড়ায় তার চিরদিনের সব দুর্ভাবার প্রোতা, সব অভিযোগের আসামী। কালীঘাটে পুজো মানত কবে আসে সে, ঠনঠনিলি কালীর খাঁড়ি-ধোয়া জল চেয়ে নিয়ে আসে।

মাটির ভাড়টা বিছানার অদূরে নামিয়ে রেখে, ভাঙা-ভাঙা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, 'এটুকু বকে মাথায় বুলিয়ে খেয়ে ফেলো দিকি, কণ্টের উপশম হবে।' 'উপশম হবে?' সুবর্ণ বলে, 'রাখো, রেখে দাও।'

বেশিক্ষণ ওই রুগীর সামনে বসে থাকতে পারে না প্রবোধ, আসে যায়।

আবার ঘুরে এসে বলে, 'অভক্তি কোর না মেজবো, একেবারে সদা খাঁড়া-ধোওয়া!'

সুবর্ণ একদিন উঠে বসে হাত বাড়িয়ে নিল জলটা, অনেকদিন পরে একটু হেসে বললো, 'তুমি আমার খুব ভালোবাসো, তাই না?'

তা প্রবোধ চমকে গেল বৈ কি।

ভালবাসার কথা তুলছে সুবর্ণ।

চমকে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকালো ধার-কাছে কেউ আছে কি না দেখলো। তারপর কাছে সরে এসে কাঁদো-কাঁদো ব্যাকুল গলায় উত্তর দিল, 'এতদিন পরে এই প্রশ্ন তুমি করছো আমার? শুধু ফুটে বলতে হবে সে কথা?'

নাঃ সত্যিই সুবর্ণ বদলে গেছে।

হয়তো সুবর্ণ পৃথিবীকে ক্ষমা করে ধাবে সংকল্প করেছে, তাই বলে উঠলো না, 'তা' শুধু ফুটে বলতে হবে না বটে, সারাজীবন কাটা ফুটিয়ে ফুটিয়েই তো সত্যি জ্ঞান দিয়ে এসেছো।'

সুবর্ণ শুধু আব. একটু হাসলো। তারপর বললো, 'না বলতে হবে না অবিশ্যি। তবে ভালোই যখন বাসো, আমার একটা শেষ ইচ্ছে পূরণ করা না?'

'শেষ ইচ্ছে? প্রবোধ গিজিটা তুলে চোখ মোছে, তারপর বলে ওঠে, 'একশোটা ইচ্ছে কথা বল না তুমি মেজবো-'

'একশোটা মনে আসছে না। আপাতত একটাই বলছি—মেজঠাকুরাণকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

মেজঠাকুরাণ।

তার মানে সুবাল।

প্রবোধ যেন শূন্য থেকে আছাড় খায়।

মেয়ে নয়, জামাই নয়, নাত-নাতনী নয়, ভাই ভাইপো নয়, দেখতে ইচ্ছে হল কি না মেজঠাকুরাণকে।

তাম্বব।

তা জাম্বব করাই পেশা ওর বটে।

বেশ, সেটাই হবে।

তড়বড় করে বলে উঠল প্রবোধ, 'এমন একটা আজগুবি ইচ্ছেই যখন হয়েছে তোমার, তো সেই ব্যবস্থাই করছি।'

প্রবোধের কথাটা অযৌক্তিক নয়, যে সুবর্ণ শেষ ইচ্ছে শুনলো, অবাকই হলো। আজগুবি ছাড়া আর কি! এত দেশ থাকতে—চারটে ননদের মধ্যকার একটা ননদকে দেখাবো, এই হলো একটা মানুষের জীবনের শেষ ইচ্ছে? স্বামীর কাছে এই আশ্বাসটুকু করেছে মূখ ফুটে?

তাও যদি সম্বন্ধসী নন্দ হতো।

তাও যদি জলজল্লাট অবস্থার হতো! হাসতের।

কিন্তু অভাগার ভাগ্যে বাকি তুচ্ছও দলভ।

সেখানেও তো মস্ত বাধা।

সুবাল। যে তার শেষ দিকের মেয়ে-গুলোকে বপাক্ষপ বা তা বিয়ে দিচ্ছে। একটাকে চক্রবর্তীর ঘরে, একটাকে ঘোষালের ঘরে, একটাকে বারেন্দ্রের ঘরে, আবার শোনা যাচ্ছে ছোটটাকেও না কি ওইরকমই একটা কিছু ঘরে দেবে বলে তোড়জোড় করছে।

শহুরে নয়, ফ্যানানি নয়, পরসাতলা নয়, তবু এত সাহস। দেশে গ্রামে বসে এত স্বেচ্ছাচার।

মরুক গে বা খুঁশি করুক গে। ছেলে-মেয়ের বিয়েতে পোস্টে একটা পত্তর দেওয়া ছাড়া বোধ্যাযোগ তো ছিলই না, কে ওই রাবণের গুণটিকে 'এসো বোসো' বলে ডাকবে? আসতে যেতে ভাড়া গুণতেই তো ফতুর হতে হবে। সবাই ভেবে ঠিক করে ছিল, অতএব ওই পত্তরখানাও এবার বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু এখন আবার এই সমস্যা।

অথচ ঝপ করে কথা দিলে ফেলা হয়েছে মৃত্যু-পথযাত্রীরা কাছে, তার উপায়? এ সমস্যার সমাধান করলো কান্দু। বললো, 'এ তো আর আপনি কোনো সামাজিক কাজে আনছেন না বাবা, এতে আর কি হচ্ছে? না যখন মৃত্যু ফুটে বসেছেন—'

ছেলের সমর্থন পেয়ে ভরসা পেলো কান্দুর বাবা।

অতএব সুবাল। এল।

আনতে গেল ও বাড়ির বদো।

যে না কি আশ্রয়প্রার্থী সবেলবই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। 'কারে পড়ে প্রবোধ নিজে গিয়ে খরচপত্তর ধরে দিয়ে-অনুরোধ করে এল তাকে।

'মেজ জ্যোতির শেষ অবস্থা। তোমায় দেখতে চেয়েছে।'

এ খবর শুনে পর্যন্ত সেই যে কান্দা সুর, কবোঁছিল সুবাল।, সে আর থামে না। চোখ মুছে মুছে আঁচলটা তার ভিজে সপ্পসপে হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো ফুলে লাল।

আরো দুটো দাঁত পড়ে তার মুখটাই যেন আজকাল হাস্যকর বিকৃতির একটা প্রতীক। কেঁদে আরো কিম্বৃত।

বাড়ি ঢুকেই প্রবোধের পায়ে একটা প্রণাম ঠুকে উঠলে উঠে বলে, 'আছে?'

প্রবোধ উল্লে বলে, 'আছে এখনও, তবে বেশি দিন থাকবে না।'

'বেশিক্ষণ' নয়, 'বেশিদিন!' তবু ভালো!

'জ্ঞান আছে?'

'তা টনটনে।'

'ঠাকুর রক্ষ কোরো! কথাটখা বলছে?'

'বলছে অল্প স্বল্প।'

অতএব একটু ঠান্ডা হয় সুবাল।, চোখমুখে জল দিয়ে রুগীর কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। প্রবোধ এবার চড়া গলায় বলে, 'মেয়েগুলোর অবর-কুথবে বিবে দিচ্ছি শুনলাম—'

সুবাল। ওর স্বভাবে, কান্নার ফোলা চোখেও হেসে ফেলে।



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৬৮০

‘অঘর-কুঘর নয় মেজদা, তবে স্বঘর
কি?’

‘তার মানেই তাই। তা’ এ মতিচ্ছন্নের
ফারস?’

‘কারণ আর কি?’ সুবালা দিব্য
সুপ্রতিভ গলায় বলে, ‘অভাবেরই স্বভাব
নম্র! হাতে নেই কানাকড়ি, ঘরে এক
গুঁড়া বিয়ের যুগ্ম মেয়ে! নিচু ঘরেরা
অমনি হাতে নিয়ে গেল—’

‘গলায় দড়ি তোর! এর থেকে মেয়ে-
গুলোকে গলায় পাখর বেঁধে পুকুরে
ফেলে দিলেই হতো!’

সুবালা শিউরে উঠে বলে, ‘দুগুগা
দুগুগা! কি যে বল মেজদা! আমার
কুলিনীগরিটা ওদের প্রাণের থেকে বড়
হলো? ভাল ঘরে পড়েছে, খেয়ে পরে
সুখে আছে, এই সুখ। তাতে লোকে
আমার ‘একঘরে’ করে করুক!’

বোনের সম্পর্কে কোনোকালেও কোনো
দারিদ্রবোধ না থাকলেও স্তার এই
দুঃসাহসী কথায় খিঁচিয়ে ওঠে দাদা,
‘একঘরে’ করে করুক? ভারি পুরুষার্ধ
হলো! অমূল্যটাও বুঝি এমনি গাড়োল
হয়ে গেছে আজকাল?’

সুবালা এ অপমান গায়ে মাখে না।
শালা-ভঙ্গীপতি সম্পর্ক, বলেই থাকে
অমন। সুবালা তাই হেসে বলে, ‘তা যা
বলো! মোটকথা, নিজের কুলের বড়াইটি
‘নিরে বসে থাকবো, ওদের মুখ চাইবো না,
এতো স্বার্থপর হতে পারলাম না মেজদা!
স্বঘরের কেউ কি আমার মুখ চাইলো?
আর আমার এসব কুটুমরা? একেবারে
পায়ের কাদা! থাক্ গে বাবা ওসব কথা,
এখন থাকে দেখতে এসেছি দেখি। বাড়ি
তো খাসা করেছে—মেজবোয়েরই ভোগে
নেই—’ আর একবার উষলে ওঠে সুবালা,
আর একবার সে জল ঘসে ঘসে মুছে ফেলে
দোতলায় উঠে যায় মেজদার পিছ পিছ।

‘কে’দেই মলো!’

সুবর্ণ বহুদিন পরে তারি মিষ্টি

হাসি হাসে। মুখের লাভণ্যের কিছুই
অবশিষ্ট নেই, তবু কাঠামোটা আছে।
সেই কাঠামোখানাই যেন উজ্জ্বল দেখায়।

সুবালা এসেই ওর বিছানার ধার চেপে
বসেছিল, সুবর্ণ ‘নিবেশ করে নি।

সুবর্ণ তার একখানা হাত নিজের
হাতে তুলে নিয়েছিল। সুবালার কান্না
দেখে সেই হাতে একটি নিবিড় গভীর চাপ
দিয়ে মিষ্টি হেসে বলে, ‘কে’দেই মলো!’

‘ভাল থাকতে আমি মরতে একবারও
এলাম না!’

বুজ্জে আসা গলায় আক্ষেপ করে
সুবালা।

—অন্যকে অভিযোগ করে না, বলে না,
‘এত ছেলেমেয়ের বিয়ে গেলো, একবার
আনলে না আমরা!’ ও অভিযুক্ত করলো
নিজেকে, ‘ভাল থাকতে একবার এলাম না
আমি!’

সুবর্ণ হাতে ধরা হাতটার আর একটু
চাপ দিয়ে বলে, ‘তোমার মতন মনটা যদি
সুবাইরের হতো মেজঠাকুরকি! কাউকে
দোষ দেওয়া নেই, কোথাও কোনো
অভিযোগ নেই, সুন্দর!’

তারপর জিগ্যাস করে ওর ছেলেমেয়ে-
দের কথা।

কে কত বড় হলো, কার কার বিয়ে
হলো। কিন্তু উত্তরের দিকে কি মন ছিল
সুবর্ণের? এ সব প্রশ্ন করছিল যেন
উপযুক্ত প্রশ্নের অভাবে। এক্ষণে সে-কথার
পর হঠাৎ বলে ওঠে, ‘আচ্ছা তোমার সেই
বাউন্ডলে দ্যাওরাটির খবর কি? সেই
যাকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দিই নি, দরজা
থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম?’

‘দুগুগা দুগুগা! তাড়িয়ে আবার কি।
...অম্বিকা ঠাকুরপোর কথা বলছো তো?’
সুবালা ব্যস্ত গলায় বলে, ‘তুমি বলে তাকে
কতো ভালোবাসা! সেও মেজবোদি বলে—’
খেমে যায় সুবালা নেহাৎই গলাটা বুজ্জে
আসায়।

‘জানি!’ সুবর্ণ একটু ধামে, তারপর
যেন কোঁতকের গলায় বলে, ‘তা সে ঘর
সংসারী হয়েছে? না আবার জেলে ঢুকে
বসে আছে?’

‘হায় আমার পোড়া কপাল!’ সুবালা
বলে, ‘সে আবার ঘর সংসারী হবে! সে
তো বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে।’

‘বিবাগী!’

হাত ধরা মূঠোখানা শিথিল হয়ে
এলিয়ে পড়ে। প্রশ্ন-হারানো-বিস্ময়

চোখে জাকিয়ে থাকে সুবর্ণ, যেন ওহ
অশ্রুত কথাটার দিকেই।

সুবালা আঁচলের ভিজে কোণটা দিয়েই
আবার চোখটা মুছে নিয়ে ধরা গলায় বলে,
‘তা বিবাগী ছাড়া আর কি! কোথায়
কোথায় ঘোরে, নমাসে ছমাসে একখানা
চিঠি দেয়। পায়ে হেঁটে না মি ভারত
ঘুরছে! তোমাদের ননদাই বলে, ‘আবার
হয়তো লাগবে বুটিশের পেছনে, তাই দল
জোগাড় করছে।’ আমার তা বিশ্বাস হয়
না ভাই। গেরুয়াই নেয় নি, নচেৎ ও
তো সত্যিই একটা বৈরগী উদাসীন! এ
জগৎ ছাড়া, অন্য এক জগতের মানুষ।
নিজের জন্যে কানাকড়ার চিন্তা নেই, অথচ
কোথাও কিছু অন্যায় অবিচার দেখলে তো
আগুন! সেই বৈবার এখানে এসেছিলো—’
হঠাৎ একটু সামলে নেয় সুবালা। অবোধ
হলেও যেন বুঝতে পারে, সে দিনের কথা
আর না তোলাই ভালো। তাই বলে, ‘সেই
তার কদিন পরেই বাড়ি ঘর বেচে দিয়ে
চলে গেল। বলে গেল, ‘এই ভারতবর্ষে’
বাংলাদেশের মতন অভাগা দেশ আরও কটা
আছে তাই দেখবো!...মনে মনে তাই ভাবি
মেজবো, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিল, গরিদে
ভরা আছিল, কী আর করবি। তুই যদি
বেটাছলে হতিস, নির্ধাৎ ওই অম্বিকা
ঠাকুরপোর মতন হতিস! সংসার-বন্ধনে
বেঁধে রাখা যেত না তোকে। সেরেফ
কোনদিন ‘জগৎ দেখবো’ বলে পথে বেরিয়ে
পড়তিস!’

‘মেজঠাকুরকি!’

সুবর্ণ যেন আতঁনাদ করে ওঠে।

সুবর্ণ আবার ওর হাতটা চেপে ধরে।
আর সুবর্ণর সেই আতঁস্বরটা যেন
দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আস্তে আস্তে
পড়ে, ‘এই কথা ভাবো তুমি? অথচ
কদিনই বা দেখলে তুমি আমাকে। আর
যারা জীবনভোর দেখলো—’

সুবালা বৃষ্টিহীন, কিন্তু সুবালা
অনুভূতিহীন নয়। তাই সেই করা স্বরের
মৃদু, মুছনার ওপর আর কথা চাপায়
না। শব্দ চূপ করে বসে থাকে। অনেক-
ক্ষণ বসে থাকে।

তারপর, অনেকক্ষণ পর সেই নীরবতা
ভেঙে উন্মিশ্র গলায় বলে, ‘হাতটা যে
তোমার বন্ড ধামছে মেজবো!’

গণমাচারে সমাপ্য।

সব চেয়ে ভাল
কাকার প্রোডাক্টসের
বানীধূপ
কাকার প্রোডাক্টসের বানীধূপ

বিশ্বসাহিত্যের*

প্রাদীপ

ডঃ নরেন ড্রাচার

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব ঠিক কিভাবে হয়েছে এ বিষয়ে ঠিক স্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের প্রকৃতি হিসাবে রসনার নাম করা হয়েছে এবং নাটকে পঞ্চম বেদরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নাটকের আদি উৎস পণ্ডিতগণ অশ্বমেধের কথোপকথন সূত্রগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করেন, যেমন বিশ্বামিত্র ও নদীগণের কথোপকথন, উবশী ও পুরুষবীরের কথোপকথন, যম-যমীর কথোপকথন ইত্যাদি। গৃহসূত্রসমূহে এবং মহাভারতে কিছু কিছু নাটকীয় সংলাপ আছে। পাণিনি তার ব্যাকরণে নটসূত্র কথটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ থেকে বোকা যায় না যে তিনি নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি যে নাটক সম্বন্ধে ওয়াকিহাল ছিলেন তার স্বেচ্ছা প্রমাণ আছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যা খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত। নাট্যশাস্ত্রের উপর আরও একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তা অবশ্য অনেক পরবর্তী যুগে, খ্রিস্টীয় দশম শতকে। গ্রন্থটির নাম দশরূপ, লেখক জনৈক ধনঞ্জয়। সংস্কৃত নাটকসমূহ বিশেষভাবে মণ্ডে অভিনয় করার জন্যই রচিত হত।

অশ্বমেধ

আদিতম সংস্কৃত নাটকের যে পরিচয় আমরা পাই তা আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্য এশিয়ার তুরফান নামক স্থান থেকে। এই নাটকটি হচ্ছে অশ্বমেধ বিরাচিত শারিপুত্রপ্রকরণ এবং ওই একই লেখক রচিত আরও দু'টি নাটকের অংশবিশেষ। শেষ দু'টি নাটকের নাম অজ্ঞাত। তবে তাদের মধ্যে একটি রূপকধর্মী; বাদ্য, কীর্ত, ধতি প্রভৃতি এই নাট-

কের চারগ্রন্থমূহ। দ্বিতীয়টি সম্ভবত একটি প্রহসন যার চরিত্রসমূহের মধ্যে আছে একজন নায়ক, একজন বিদ্বৎ, একটি দুষ্টলোক, একজন রাজকুমার ও দু'জন বৃদ্ধের শিষ্য শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যান। তবে নাটক দু'টির অংশবিশেষ এত অল্প পরিমাণে পাওয়া গেছে যে তা থেকে নাটকের বিষয়বস্তু কি ছিল তা বোকা যায় না।

অশ্বমেধে শারিপুত্রপ্রকরণ নামক নাটকটিরও শেষ অধ্যায়টুকু মাত্র পাওয়া গেছে। এই নাটকের কাহিনীটিতে মোটামুটি শারিপুত্রের বৈশিষ্ট্যমূলক দীক্ষাগ্রহণের কারণগুলি বর্ণিত হয়েছে। দীক্ষাগুরু হিসাবে বৃদ্ধের কি বোগ্যতা আছে এই প্রশ্ন শারিপুত্রের বন্ধু অশ্বমেধ তাকে করেছিল এবং অপর একজন এই প্রশ্ন তুলেছিল যে ব্রাহ্মণ হয়ে সে কেন ক্ষত্রিয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করবে। উত্তরে শারিপুত্র জানিয়েছিল যে অসুস্থ মানুষ যেমন ঔষধ গ্রহণের জন্য জাতি বিচার করে না, সেইরকম কারণেই সে বৃদ্ধের নিকট দীক্ষাগ্রহণে কিছু আপত্তির কারণ দেখে না। তার বক্তিতে মৌদ্গল্যানও মন্থ হয় এবং তারা উভয়ে দীক্ষা গ্রহণের জন্য বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধ তাদের দীক্ষা দেন ও বলেন যে, তারা পরম জ্ঞান ও ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী হবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে বৃদ্ধের সঙ্গে শারিপুত্রের একটি দার্শনিক সংলাপ আছে। শারিপুত্রপ্রকরণ নাটকেও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে তা ভারতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়মসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রচিত হয়েছে। বিশুদ্ধ প্রকরণের নিয়মানুযায়ী নাটকটি নয় অংকে রচিত। এই নাটকে বৃদ্ধ ও তার শিষ্যগণ, তথা নায়কসমূহ, সংস্কৃতে বলেছেন, শব্দ বিদ্বৎদের ক্ষেত্রে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাস

১১১০ খ্রিস্টাব্দ পূর্বন্ত ভাসের রচনাবলী জনসাধারণের নিকট অপরিচিত ছিল। ১১১২ সালের প্রথম খ্রিস্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ভাসের নামে রচিত তেরটি নাটক প্রকাশিত হয়। তবে নাটকগুলি যে ভাসেরই রচিত একথা হলুদ করে বলার সম্ভব এখনো আসে নি।

বাই হোক না কেন, এই নাটকগুলি আবিষ্কৃত হবার পূর্বেও ভাস নাম জনৈক নাট্যকারের নামের সঙ্গে পণ্ডিতেরা পরিচিত ছিলেন। কালিদাস তার রচনায় পূর্বসূরী হিসাবে ভাসের উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকের প্রসিদ্ধ লেখক বর্ণভট্ট, অষ্টম শতকের বাকপতি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকেরা ভাসের উল্লেখ করেছেন। কাব্যমীমাংসা নামক গ্রন্থেও রচনাকারী রাজশেখর, যিনি খ্রিস্টীয় দশম শতকে আবিষ্কৃত হয়েছিলেন, ভাস সম্পর্কে লিখেছেন যে, তার নাটকগুলি অগ্নিশর্মা হয়েছিল যাতে একমাত্র স্বপ্নবাসবদন্তই অদম্ব ছিল। ভাসের নামে আরোপিত রচনাবলীর ভাষার ধরণ দেখে এবং অন্যান্য আরও বহুপ্রকার সাক্ষ্য মিলিয়ে পণ্ডিতেরা ৩০০ খ্রিস্টাব্দকে ভাসের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে আমরা ভাসের নাটকগুলির কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

বিষয়বস্তু অনুসারে ভাসের নাটকগুলিকে মোট চারভাগে বিভক্ত করা যায়। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে ত্র্যপাচিট একাক্ষ নাটক রচনা করেছিলেন। এই পাচিটি নাটক হল মধ্যমব্যয়োগ, দত্তবাক্য, দত্তচৌকচ, কণ্ডার এবং উদ্ভটগণ।

মধ্যমব্যয়োগ নাটকটির শব্দ হচ্ছে একটি ব্রাহ্মণের আত্ম চিংকার দিয়ে। এই ব্রাহ্মণটি তার স্ত্রী ও তিন পুত্রকে নিয়ে বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল। পথে ঘটোৎক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ নরমাংসের জন্য তাদের আটক করে। এই ঘটোৎক হচ্ছে

মধ্যমপাণ্ডব ভীমের পুত্র। ভীম হাড়িম্বা নামক এক রাক্ষসীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তারই গর্ভে এই ঘটোৎকচের জন্ম হয়। রাক্ষস পরিবারটি ঘটোৎকচ কর্তৃক মৃত হবার পর শেষ পর্যন্ত সাবাস্ত হল যে ঘটোৎকচ তাদের ছেড়ে দেবে এবং বিনিময়ে ওই রাক্ষস তার মধ্যমপুত্রকে ঘটোৎকচের হাতে সমর্পণ করবে। তখন ঘটোৎকচ 'মধ্যমপুত্রটিকে নেবার জন্য 'ওহে মধ্যম এদিকে এস' বলে ডাকাডাকি শুরু করল। ঘটোৎকচ সেই বনপথ দিয়ে ভীম কোথাও গিয়েছিলেন। ভীম-মধ্যম পাণ্ডবরূপে পরিচিত, কাজেই-মধ্যম এদিকে এস-এই ডাক শুনেই তিনি ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার দেখে ঘটোৎকচকে বললেন, 'ওহে রাপু রাক্ষস পুত্রটিকে ছেড়ে দাও।' ঘটোৎকচ রাজী হল না কেন না তার মায়ের জন্য সে খাদ্য সংগ্রহে বেরিয়েছে। ভীম জানতেন না যে এই ঘটোৎকচ তাঁরই পুত্র। অনেক রিভ্রুডা, হুম্মারিগহর পর সারাস্ত হল যে ওই রাক্ষস পুত্রের বদলে ভীমই রাক্ষসীর আহ্বারের সামগ্রী হয়ে ধারেন। ভীমকে নিয়ে ঘটোৎকচ তার মায়ের সামনে হাজির হল। তখনই সকলে সকলকে চিনল এবং সমস্ত বিষয়টির মিলনান্তর সমাধান ঘটল। রাক্ষস-পুত্রটিও ছাড়া পেল।

এই ঘটোৎকচ ভাসের আরও একটি একাংক নাটকের নায়ক যার নাম মৃতঘটোৎকচ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবদের তরফ থেকে একটি শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে দূত হয়ে কৌরবসভায় ঘটোৎকচ উপস্থিত হয়। সেখানে কৌরবগণ তাকে অপমানিত করল, ফলে ক্রোধে উদ্ভস্ট হয়ে কৌরবদের আসন্ন ধ্বংস সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী সে করেছিল সেইগুলিই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

দূতবাক্য নামক নাটকের কাহিনীও মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে। পাণ্ডবদের দূত হয়ে কুরু এসেছেন কৌরবদের সভায়, এদিকে দুর্যোধন নিষেধ করেছেন যাতে কৃষ্ণের প্রতি কোন সম্মান দেখানো না হয়। তা' ছাড়া তাঁকে অধিকতর অপমানিত করার জন্য দ্রোণদীর নিগ্রহের একটি চিত্রও সেখানে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। কুরু সভাগৃহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যসেনা থেকে দুর্যোধনের পতন হল যা সকলেই দৃশ্যকণ বলে মনে করলেন। কুরু সভাস্থ সকলকে কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে শান্তির জন্য বিশেষ করে বোঝালেন। দুর্যোধন তো তাঁর কথা শুনলেন না উপরন্তু তাঁকে রন্দী করার চেষ্টা করলেন। পাপিষ্ঠ কৌরবদের সাজা দেবার জন্য কুরু তাঁর অর্থোক্ষিক শাস্তিসম্পন্ন অস্ত্র-

সমূহকে স্মরণ করলেন, শেষ পর্যন্ত অবশ্য মৃত্যুরাজের আকুল আবেদনে তিনি শান্ত হলেন।

এর পরে আসছে কণ্ঠার নাটকের কথা। নাটকের সূচনায় দেখা যাচ্ছে যে কণ্ঠ অজ্ঞানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর সারথি মদ্ররাজ শল্যকে তিনি বলছেন তাঁর গুরু পরশুরামের অভিশাপের কথা। পরশুরাম কণ্ঠকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তাঁর চরমতম সংকটকালে তাঁর সমুদয় অস্ত্র কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। কণ্ঠের ছিল সহস্রাভ্যুত কবচকুণ্ডল যার জন্য তিনি ছিলেন অবধ্য। অজ্ঞানের মশলাধর্মে ইন্দ্র জনৈক রাক্ষসের ছদ্মবেশে কণ্ঠের নিকট সেই কবচকুণ্ডল প্রার্থনা করলেন। কণ্ঠ তৎক্ষণাৎ তা দান করলেন। তার পরেই শল্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়লেন এবং অজ্ঞানের রথের স্বর্ঘরধ্বনি শোনা গেল। এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

ভাসের পাঠম একাংক নাটকটি সংকৃত সাহিত্যের একমাত্র বিরোগান্ত নাটক। নাটকটির নাম উরুভঙ্গ, কাহিনী পুর্বের চারটি নাটকের মতই মহাভারত থেকে সংগৃহীত। গদাধর ঋষি রাজা দুর্যোধন উরুভঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর নাবালক শিশুপুত্রকে সেই যশ্রণাকর অবস্থার মধ্যেও আদর করছেন। তাঁর পিতামাতা ও পত্নীরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন, দুর্যোধন তাঁদের সান্নিধ্য দেবার চেষ্টা করছেন। দুর্যোধনের নিষেধ সত্ত্বেও অশ্বখামা পাণ্ডবদের সমুদয় ধ্বংস করার জন্য প্রীতজ্ঞা করলেন। এই অবস্থায় দুর্যোধন প্রাণত্যাগ করলেন। উরুভঙ্গ নাটকের এই হল বিষয়বস্তু।

মহাভারত অবলম্বনে ভাস আরও একটি নাটক রচনা করেছিলেন যার নাম পঞ্চরাত্র। আর্ষী কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের ফলাফল চিন্তা করে এই দুই শত্রুর মধ্যে মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন উভয় পক্ষেরই রণগুরু দ্রোণ। তাঁর উপদেশে দুর্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন এবং যজ্ঞ শেষে দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। দুর্যোধনের নিকট থেকে তখন দ্রোণ অর্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে তা' তিনি পাণ্ডবদের দেরেন। দুর্যোধন এই সর্তে রাজী হলেন যে দ্রোণ পাঁচদিনের মধ্যে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সংবাদ এনে দেবেন কেন না যার বছর বনরাসের পর পাণ্ডবদের তখন এক বছর অজ্ঞাতবাসের পালা চলেছে। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় যে ভীম ও দ্রোণ উভয়েই সপ্লেহ করেছেন যে পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই মৎস্যরাজ বিরাতের রাজ্যে আছেন। বিরাত রাজার শ্যালক

কীচকের রহস্যজনক মৃত্যুই এই সপ্লেহের কারণ এবং তাকে হত্যার পিছনে ভীমের হাত আছে এটা উভয়েরই বিশ্বাস। কাজেই এই বিষয়ে অধিকতর অরগত হবার জন্য 'ভীরা বিরাত রাজার রাজ্য আক্রমণ করলেন। তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় যে কুরুবাহিনী সেই আক্রমণ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে, এবং সেই যুদ্ধে যে ভীম ও অজ্ঞান রাজা বিরাতের পক্ষে লড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল, যদিও দুর্যোধনের কাছে তা নিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে হল না।

ভাসের আর একটি বালচরিত হরিবংশ নামক গ্রন্থকথিত কৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত, কৃষ্ণের জন্ম ও তাঁর অর্থোক্ষিক কার্যকলাই থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ এই নাটকের সমাপ্তি হয়েছে। এটি একটি পঞ্চাংক নাটক। প্রথম অঙ্কে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণের জন্মকথা; দ্বিতীয় অঙ্কে কংসের কারাগার থেকে শিশু-কৃষ্ণকে অন্যত্র প্রেরণের কাহিনী; তৃতীয় অঙ্কে গোপগৃহে-কৃষ্ণের বাস, দৈত্য ও ব্রাহ্মস বধ, গোপীগণের সঙ্গে বিহার; চতুর্থ অঙ্কে কালীদমন; পঞ্চম অঙ্কে কৃষ্ণ ও বলবামের মথুরা গমন ও কংসবধ।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে ভাস দুটি নাটক লিখেছেন। এই দুটির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রতিমা নাটক-এর কথা। রামায়ণের সমগ্র কাহিনীটি কুই এই নাটকে ব্যস্ত হয়েছে, তবে কয়েক ক্ষেত্রে নাট্যকার কাহিনীর একটু অদল-বদল করেছেন। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এখানে একটি হলঘরে রঘুবংশীর মৃত রাজাদের মূর্তির পাশে মৃত দশরথের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং ভরতকে তা দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনীটিও এই নাটকে ভিন্নরূপে পরিবেশিত হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে বনবাসকালে রাম 'পিতৃশ্রাদ্ধ' করছেন, এবং ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাম সেখানে পৌরোহিত্য করছে। পরিণামে সে রাম-লক্ষ্মণকে আদেশ করল একটি স্বর্ণমণ্ডপ ঘরে আনতে যা রামচন্দ্রের পিতার আত্মার উদ্দেশ্যে দান করা হবে। সেই ফাঁকে রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিল। রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানোর ব্যাপারে কৈকেয়ীর প্রতি নাট্যকার নরম মনোভাব অবলম্বন করেছেন কেন না দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণ হারাবেন সে তো আগে থেকেই একজন ঋষি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কৈকেয়ী রামকে মাত্র চোদ্দ দিনের জন্য বনবাসে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মধু কন্যকে তিনি চোদ্দ বছর বলে ফেলেছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় ভরতও নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন না, তিনিও রামের সাহায্যার্থে একটি বিরাত

বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন যে বাহিনী লক্ষ্যে গিয়ে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

রামায়ণ অবলম্বনে ভাসের বিভিন্ন নাটকটি হচ্ছে অভিক্ষেপ নাটক। রামায়ণের কীৰ্ত্তিমাধ্যাকান্ড, সুন্দরকান্ড ও যুদ্ধকান্ডকে অবলম্বন করে এই নাটক রচিত। রামের হাতে বলির মৃত্যু, হনুমানের লংকা প্রবেশ ও সীতার অনুসন্ধান, সেতুবন্ধ, রামের কর্তৃক সীতাকে রাম-লক্ষ্মণের নকল মূর্তি প্রদর্শন, রাবণ বধ ও রামের অভিক্ষেপ-এইগুলিই হচ্ছে আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু।

ভাসের অবশিষ্ট নাটকগুলি বিভিন্ন প্রাচীন আখ্যানসমূহকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এই নাটকগুলির মধ্যে নবপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অবিমারক। এই নাটকের কাহিনী হচ্ছে এই যে ঋষি দীর্ঘতমার অভিভাষণে সৌবীররাজ বিষ্ণু-সেনা এক বৎসরের জন্য চণ্ডালস্ব প্রাপ্ত হন এবং এই সময় তাঁর পুত্র রাজা কুন্তীভোজের রাজ্যে বাসকালে অবি নামক এক অসুরকে বধ করে অবিমারক নামে পরিচিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি রাজকন্যা কুরঙ্গীকে একটি মন্তহস্তীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, এবং এর ফলে রাজা কুন্তীভোজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অবিমারকের হস্তে কুরঙ্গীকে সমর্পণ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু পরে যখন জানা গেল যে অবিমারক নিচ জাতি তখন রাজা মত পরিবর্তন করলেন। ইতিমধ্যে কুরঙ্গীর সঙ্গে অবিমারকের প্রেম অধিকতর জোরাল হলে, একজন খাত্রীর সহায়তায় কুরঙ্গীর সঙ্গে প্রতি রাতে তার গোপন মিলনও চলছে। কিন্তু একদিন ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন ঠিকাসম্মত না দেখে অবিমারক আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন। হঠাৎ একটি বিদ্যা-ধরিত্র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল যিনি তাঁকে একটি অঙ্গুরী দিলেন যার সাহায্যে তিনি প্রতি রাতেই কুরঙ্গীর সঙ্গে পেতে পারেন। শেষ পর্বন্ত নারদের মধ্যস্থতায় অবিমারকের সঙ্গে প্রকাশ্যেই কুরঙ্গীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এর পরই উল্লেখ করতে হয় প্রতিজ্ঞা-বৌগন্ধ্যরায়ণ নাটকের কথা। এই নাটকটি গুণাঢ্যের পৈশাচী প্রাকৃত লিখিত স্বংকল্প গ্রন্থের একটি আখ্যান অবলম্বনে চার অঙ্কে রচিত। বৎসদেবের রাজ্যে উদয়ন মগয়্যার যাত্রা করেছিলেন। তিনি বীণাবাদনেও বিশেষ পটু ছিলেন এবং তার মারা তিনি মন্তহস্তীকেও বধ করতে পারতেন। পাম্ববতীর রাজ্যে অবন্তীর রাজ্য প্রদ্যোত মহাসেনা একটি নকল হস্তী নির্মাণ করে তাঁর পক্ষে রেখেছিলেন, এবং উদয়ন সেটা বধ করে না পেয়ে বীণা

বাজিয়ে যখন সেই নকল হস্তীকে বশীভূত করার চেষ্টায় ছিলেন সেই অবসরে প্রদ্যোতের লোকজন তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যায়। প্রদ্যোতের মন্তহস্তী ছিল যে তিনি তাঁর কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের বিবাহ দেবেন, এবং যাতে উভয়ের মধ্যে প্রেম জন্মায় তার জন্য আগে থেকেই এই ব্যবস্থা। বন্দী অবস্থায় উদয়ন বাসবদত্তাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং উভয় উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এদিকে উদয়নের মন্তহস্তী বৌগন্ধ্যরায়ণ চোরের 'পর বাটপাড়ি' করলেন এবং বাসবদত্তা সহ উদয়নকে প্রদ্যোতের রাজভবন থেকে বার করে নিয়ে এলেন। শেষ পর্বন্ত ব্যাপারটার মধুরতম নিষ্পত্তি ঘটল।

ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা বা স্বপ্ননাটক পূর্ববর্তী নাটকটিরই অনুসৃতি। আরুণি নামক জনৈক ব্যক্তি বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে উদয়ন সিংহাসনচ্যুত হন। তখন উদয়নের মন্তহস্তী বৌগন্ধ্যরায়ণ তাঁর কাছে - প্রস্তাব করেন যে তিনি যেন মগধরাজকন্যা পম্মাবতীকে বিবাহ করে স্বতঃসিংহাসনে মগধ-রাজশাস্ত্র সহায়তায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু উদয়ন পম্মা বাসবদত্তাকে পরিত্যাগ করতে রাজী হলেন না। ফলে ওই মন্তহস্তী বাসবদত্তাকে বন্ধিয়ে বললেন যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই বিবাহ উদয়নের করা উচিত এবং এই বিষয়ে তিনি বাসবদত্তারই সাহায্য চাইলেন। বাসবদত্তা রাজী হলে তিনি তাকে নিজ ভাগিনী পরিচয় দিয়ে মগধরাজকন্যা পম্মাবতীর হেপাজতে রেখে এলেন। এদিকে তিনি খবর রটিয়ে দিলেন যে তিনি ও বাসবদত্তা দাবানল দগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। তখন বাধ্য হয়েই রাজা উদয়ন পম্মাবতীকে বিবাহ করে মগধ রাজশাস্ত্র সহায়তায় সিংহাসনে পুনরায় আসীন হওয়ার মনস্থ করলেন। পম্মাবতী উদয়নকে ভালবাসতে রাজী ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি জানলেন যে উদয়নের মনোমাজ্য জুড়ে তখনো বাসবদত্তা বিরাজ করছে তখন তাঁর মাথায় যন্ত্রণা হতে শুরু করল। সেই যন্ত্রণা প্রশমন করার জন্য উদয়ন পম্মাবতীর কক্ষে হাজির হলেন। কিন্তু সেখানে পম্মাবতীকে না পেয়ে ক্রান্ত হয়ে নিজেই বৃদ্ধিমেয়ে পড়লেন। এদিকে বাসবদত্তা, যিনি পম্মাবতীর আশ্রয়েই ছিলেন, সেই কক্ষেই এসে হাজির হলেন, এবং হৃদমন্ত উদয়নকে পম্মাবতী মনে করে তাঁর পাশে বসে রইলেন। হৃদমন্ত অবস্থায় উদয়ন তখন বাসবদত্তারই স্বপ্ন দেখেছেন এবং স্বপ্নাবস্থায় উদয়ন তাঁকেই উদ্দেশ্য করে নিজের ভালবাসার কথা বলে যাচ্ছেন। কিন্তু 'তা' শোনবার পর বাসবদত্তা সেই স্বপ্ন থেকে নিষ্কলন্ত হলেন। পরদিন

প্রভাতে সংবাদ এল যে তাঁর নতুন আত্মীয়দের সহায়তায় উদয়নের জয়লাভ ঘটেছে এবং অবন্তীরাজ প্রদ্যোত মহাসেনা উদয়ন ও বাসবদত্তার দু'টি প্রতিকৃতি পাঠিয়ে উদয়নকে অভিনন্দিত কবেছেন। বাসবদত্তার প্রতিকৃতি দেখেই পম্মাবতী চিনতে পারলেন যে এই সেই মেয়ে যাকে তাঁর হেপাজতে রেখে যাওয়া হয়েছে। ওদিকে উদয়নের মন্তহস্তী বৌগন্ধ্যরায়ণ ঘটনা-স্থলে হাজির হলেন এবং কেন তিনি নিজের ও বাসবদত্তার মৃত্যুব কাহিনী রটিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করে বললেন।

স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকটি রীতিমত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং রাজশেখরের মত পরবর্তীকালের লেখকরা যে এই নাটকের সঙ্গে বীতিমত পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। ভাসের অবশিষ্ট নাটকটি হচ্ছে চারুদত্ত। এটি চার অঙ্কে রচিত এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই নাটকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। বিষয়বস্তু হচ্ছে দরিদ্র বণিক চাবুদন্ত ও গণিকা বসন্তসেনার প্রণয়। এই কাহিনীটিই তার পরবর্তীকালের মূচ্ছকটিক নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছে।

সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে ভাসই সর্বাধিক লিখেছেন। বচনশৈলীর বিচারে ভাস ভারতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়মাবলী উৎকর্ষভাবে লম্বন করেছিলেন। প্রচুর রচনায় তিনি বহু ক্ষেত্রেই কণ্টকপনার আশ্রয় নিয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেছেন। অলৌকিক ঘটনাবলীও তাঁর নাটকসমূহে বিশেষভাবে উপস্থিত। ভাসের সংস্কৃত মূলত পাণিনি অনুসারী, তবে কয়েক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। বহুক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োজনে তিনি ব্যাকরণ লঙ্ঘন করেছেন।

গ্রীক গোপালী বিবচিত

লিঙ্গ-মাধব

[' বিশ্বনাথ চন্দ্রভট্টাচার্য টীকা সহ]

গ্রীকচন্দ্রভট্টাচার্য গ্রীকীরাঙ্গকৃষ্ণের অপ্ৰাকৃত প্রেম-লীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই গ্রীক গোপালীর দ্বারা গ্রীকলিঙ্গ-মাধব নাটক রচনা কবাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিযাছেন—

“মহা প্রসন্ন ইহার কাব্য সালংকার।

এই কবিতা-বিনা নহে রসের প্রচার॥”

মূল্য : তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ভাস ব্যবহৃত প্রাকৃত নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক পরবর্তী, কিন্তু কালিদাসের পূর্ববর্তী (সংস্কৃত নাট্যকারগণ সাধারণ মানবের সংলাপগুলি প্রাকৃতিকই দিতেন)। ভাস যে প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন তা' শৌর-সেনী ধরণের।

শব্দক

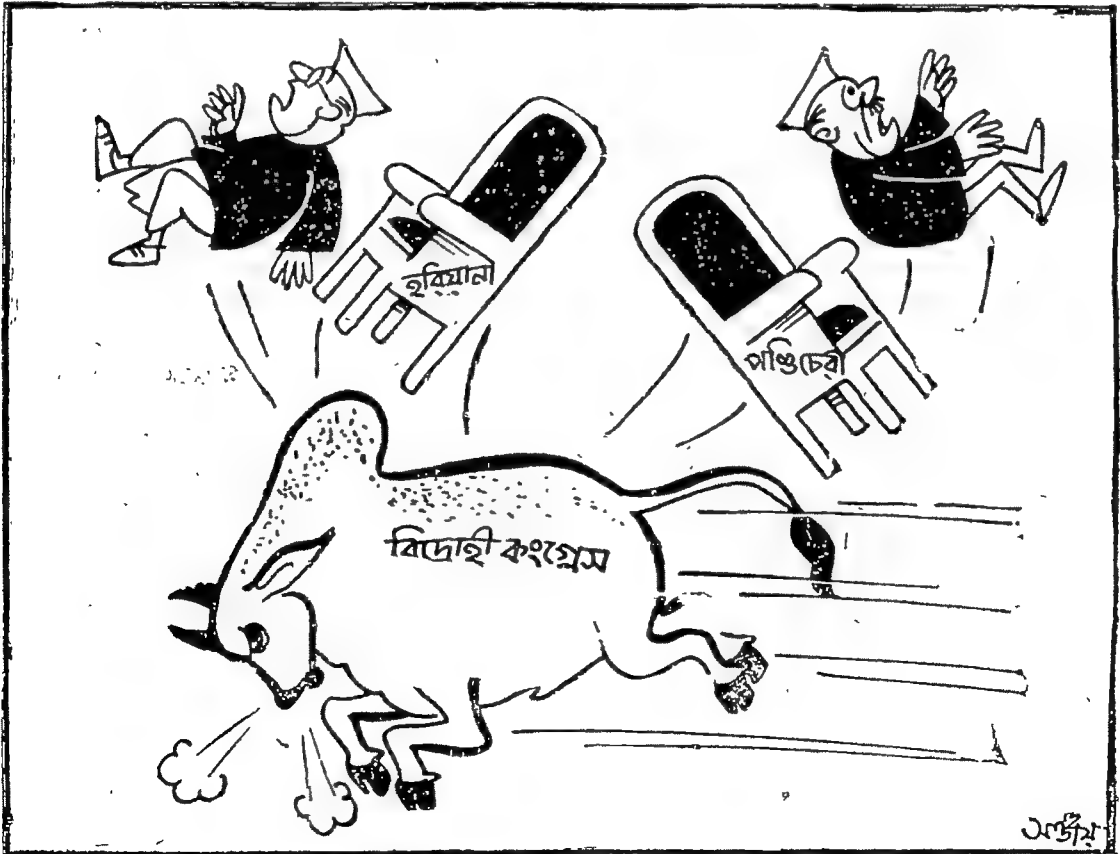
রাজা শব্দকে মৃচ্ছকটিক নামক বিখ্যাত নাটকের রচয়িতা হিসাবে মনে করা হয়। কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত রাজা শব্দকও একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, তিনি কখন, কোন্ যুগে, কোথায় জন্ম করেছেন তা' জানার কোন উপায় আপাতত নেই। ওই নাটকেই বলা হয়েছে যে শব্দক বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, এবং তিনি একশত বৎসর দশ দিন বয়সে অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। স্কন্দ-পুরাণ, কাদম্বরী, হর্ষচরিত, দশরূমার

চরিত, কথাসরিৎসাগর ও রাজ-তরঙ্গিণীতে শব্দকের উল্লেখ আছে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও শব্দক অথবা তাঁর রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকের তারিখ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। এমন কি এই নাটকটি কালিদাসের পরে অথবা পূর্বে রচিত হয়েছিল সে বিষয়ও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়, যদিও অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে শব্দক কালিদাস পূর্ববর্তী।

মৃচ্ছকটিক নাটকটির পটের জন্য নাট্যকার নিঃসন্দেহে ভাসের নিকট ঋণী। কিন্তু ভাস যেখানে বিশদ্ব প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেখানে শব্দক চারদন্ত ও বসন্তসেনার প্রেমকাহিনীর পিছনে একটি রাজনৈতিক কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। সেই কাহিনীটি হচ্ছে চারদন্তের বন্ধু আর্ষকের সিংহাসনলাভের কাহিনী। বহুবিশ ঘণ্টার ম্বারা নাটকটি

চারণিত যোগেশ্বর মধ্য দিয়ে চারদন্তের মানসিক ঔদার্য এবং গণিকা বসন্তসেনার নির্মল প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটির নামকরণ হয়েছে ষষ্ঠ অঙ্কের একটি দৃশ্য থেকে যেখানে দরিদ্র চারদন্তের পুত্র একটি মৃত্তিকানির্মিত খেলনা গাড়ির জন্য বায়না ধরেছে। নাটকটির পরিণতি মিলনান্তক।

এই নাটকটি আসলে একটি দশ অঙ্কের প্রকরণ। কাহিনী উদ্ভাবনের এবং বহু বিচিত্র চরিত্রের দক্ষতা নাট্যকারের আশ্চর্য। এই নাটকের বাস্তব-ধর্মিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি এই নাটকে পাওয়া যায়। এই নাটকের প্রাকৃত সংলাপগুলি বৈচিত্র্যের দিক থেকে অতুলনীয়। বহু ধরণের প্রাকৃত এতে ব্যবহৃত হয়েছে। মৃচ্ছকটিক রচনায় নাট্যকার ভরত কথিত নাট্যশাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করেছেন।





স্বপ্ন

মানবের পক্ষে

আপনাদের হয়তো আজ আর শোভাকে মনে নেই, মৃত্যুঞ্জয়ের কথাও হয়তো ভুলে গেছেন। ভুলে যাবাবই কথা। কারণ দেখতে দেখতে একটা বছর তো কেটে গেল! এই এক বছরের মধ্যে কত সুখ-দুঃখ হাসি-বেদনার ঘটনা ঘটে গেছে আপনার-আমার ব্যক্তিগত জীবনে। নিজেদের নিয়েই এত বিবর্ত ছিলাম যে, এক বছর আগে কবে কার কি হয়েছিল সে খেয়াল নেই।

কিন্তু মুশকিল কি জানেন? অনেক জিনিস ভুলে গেলেও কিম্বা ইচ্ছে করে ভুলে থাকবার চেষ্টা করলেও সময় সময় সেই মানুষগুলো অকস্মাৎ বিস্মৃতির ফালো পর্দা ঠেলে একেবারে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন আর কিছুতেই তাদের অস্বীকার করা চলে না।

ঠিক তেমনিভাবেই সেদিন শোভার সঙ্গে হঠাৎ পথের মধ্যে দেখা হয়ে গেল। শোভার চেহারার কোনো পরিবর্তন হয় নি। সেই ফ্যাকাশে রঙ—শীর্ণ শরীর—মুখের ওপর সেই জ্বলজ্বলে দৃষ্টি চোখ। সে চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে।

আপনাদের মতো প্রথমে আমিও তাকে চিনতে পারি নি। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি থেকে তাকে চিনতে পারলাম। কলকাতায় একটা গৌণ কারখানায় কাজ করে। সকাল আটটার প্তেনে যায়, আর ফেরে রাত দশটার।

এর সম্বন্ধেই ওর ভাই মৃত্যুঞ্জয় একদিন আক্ষেপ করে বলেছিল, “কাজের প্রথম দিন দিদি আমাকে সঙ্গে হবে নিয়ে গিয়েছিল। উঃ সে কি ভয়ঙ্কর জায়গা! একগাদা লোক ঘাড় গুঁজে মেশিনে কাজ করে যাচ্ছে—মাথা তোলবার সময় পর্যন্ত

নেই। ওঁদিকে মেয়েরা গোঁজ কাটছে। ফুরোনে কাজ। এক মূহুর্ত হাতকে বিশ্রাম দেবার উপায় নেই।”

সেই একদিন সে গিয়েছিল, আর কোনদিন যায় নি। কিন্তু একদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই সে বুঝে নিয়েছিল তার দিদি যে কাজ কবে—অন্য অনেক শিক্ষিত মেয়েদের চেয়ে তা’র বেশ কষ্টের।

“তবু জানেন, দিদি যখন সকাল-বেলায় ছুঁড়া স্লিপার টানতে টানতে স্টেশনের দিকে যায় তখন পাড়ার ঐ ষিফ্টদার মদ্রু টিপে টিপে হাসে। হাসে কেন জানেন? দিদিব বড়ো দুর্নাম। রাত দশটাব পৰ যখন দিদি একা একা স্টেশন থেকে তিন মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফেরে

তখন অন্য পাড়ার একটা লোক প্রায় বোজ দিদির পিছ পিছ আসে। সেই লোকটার জন্যেই দিদির যত নিদ্বে। দিদিকে কেউ ভালোবাসে না। আমিও এখন ভালো-বাসি না। এমন কি মাথালি কেটে দিতে বলেছিল আমি দিদি নি!”

আপনারা এই মৃত্যুঞ্জয়কেও ভুলে

গেছেন! কিন্তু মোহাই আপনাদের, এত নিদ্রা হবেন না। একটু চেষ্টা করে দেখুন না যদি ওকে মনে করতে পারেন।—সেই যে বারো-তেরো বছরের ছেলেটি। ছোট ছোট করে চুল-কাট। 'হরিচরণ বিদ্যালয়ের' ক্লাস এইটে পড়ত।

সেদিন সকালবেলাতেই এক পশলা গারামারি হয়ে গেল। শোভা মৃত্যুঞ্জয়ের চুলের মূঠি ধরে উন্মত্তের মতো মেঝে চলল—হতভাগা, পাঞ্জি, বদমাস! কেবল থাকে? একটা কাজে পাওয়া যাবে না!

মৃত্যুঞ্জয় জ্বন্ধ মোষের মতো ফুসে উঠে বলল, মুখ সামলে কথা বলবি। আমি তোব খাই?

শোভা মুখভঙ্গি করে বললে, না, দূবেলা খাটন জুটছে কার পরসায়?

—তোর অমন চাকরির পরসায় লাখি মারি।

শোভা বিবগুণ উত্তেজনার কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে নিরঞ্জন গায়ের জ্বর নিয়েই বিছানা থেকে উঠে এলেন। পায়ের খড়ম খুলে মৃত্যুঞ্জয়ের মাথায় বসিয়ে দিলেন কয়েক ঘা।

—হারামজাদা, জানো না কার পরসায় যাচ্ছ? আমার কি আর চাকরি আছে যে খাওয়াবে? ঐ যে—ঐ তোব দিদির দরায়—

বলতে বলতে নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বর ধ্বংসপ্রসূ হল। শীর্ণ দেহটা কেঁপে উঠল। খড়মটা মাটিতে ফেলে দিয়ে হঠাৎ মেঝের ওপর বসে দূহাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

এই ঘটনাটা সেদিন কেন ঘটেছিল জানেন? বাড়িতে সেদিন একদানা চাল ছিল না। শূদ্র বাড়িতে কেন। চরপাশে কোথাও চালের চিহ্নমাত্র নেই। বাজারে যদিও বা চাল আসে তার দাম দু' টাকা কে-জি। এমন সময় কাল রাত্তিরে কে বেন শ্বর দিয়ে গেল, কোথায় চাল দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু চাল আনতে যাবে কে? মাস পক্ষে সম্ভব নয়, বাবা শয্যাসারী, শোভাকে আটটার ট্রেন ধরতেই হবে। এক আছে মৃত্যুঞ্জয়। ছেলেমানুষ—সেও বোঁকে বসল। বলল, আমি পারব না। সে তখন মন দিয়ে একটা অন্ধ কষবার চেষ্টা করছিল। এমনতে তো পড়াশোনা বন্ধই হয়ে এসেছে। রেশনে জাইন দেওয়া, গম ভাঙানো—তা' ছাড়া আর এটা নেই, ওটা নেই—দ্যাখ না একটু ঘুরে যদি কোথাও পাস। ময়লা ভাঁজ করা একটা এক টাকার নোট অতি সাবধানে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে মৃত্যুঞ্জয় কতবার এখানে-সেখানে ঘুরেছে, তাতে করে কখনো একটু, আটা, কখনো একটু, সূজি, কখনো সরষের তেল হয়তো বা মিলেছে, কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেছে

কুড়িশোনার। তাই আজও শোভা যখন তাকে চালের কথা বলল, তখন মৃত্যুঞ্জয়ের ওপর একটু উদ্বেগভাবই 'না' বলে দিল।

শোভারও মেজাজ ভালো ছিল না। সেও ছুটে এসে মৃত্যুঞ্জয়ের চুলের মূঠি চেপে ধরল।

এসব ঘটনা আপনাদের জানা। এক বছর আগে এদের কথা আপনাদের কাছে বলেছিলাম। আপনারা ভুলে গেছেন। যেমন আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। ভাগ্যি আজ অসময়ে শোভার সঙ্গে দেখা হল।

মৃত্যুঞ্জয়ের মা রামাঘর থেকে অভ্যাস-মতন ডাকলেন—মিতুন! ভাত খেয়ে যা।

চাল সত্যিই সেদিন ছিল না, কিন্তু না খেয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠান কি করে? মা তাই কোনোরকমে পাশের বাড়ি থেকে মিতুনের জন্যে একমুঠো চাল ধার করে এনেছিলেন।

কিন্তু সে ডাকে মৃত্যুঞ্জয় সাড়া দিল না। তার দূচোখে অভিমানের জ্বল। প্যাণ্টের ওপর বেন্ট বাঁধছিল আর ফোঁপাচ্ছিল।

মা আবার ডাকলেন—মিতুন!

—কি! বলে উদ্বেগ জবাব দিল মৃত্যুঞ্জয়।

—ভাত খেয়ে যা।

—আমি ভাত খাব না।

মা রাগের কারণ বন্ধুতে পারলেন। রামাঘর থেকে নিজেই বেরিয়ে এলেন।

—খাবি না কেন?

মিতুন কোনোরকমে বই-খাতাগুলো নিয়েই ছুটে মায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মা তাড়াহাড়া ছেলের পিছনে পিছনে ছুটলেন—খেয়ে যা বাবা, লক্ষ্মী মাশিক আমার। তোর জন্যে কত কষ্ট করে এই একমুঠো চাল—

দূবে দাঁড়িয়ে কিশোর মৃত্যুঞ্জয় বেন কঠিন শপথ করার সুরে বললে—যদি ইস্কুল থেকে ফিরে এসে চাল আনতে পারি, তা' হলেই ভাত খাব। নইলে নয়। বলে ছুটেতে ছুটেতে পুকুরপাড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় যদিও ইস্কুল যাবার জন্যে বেরিয়েছিল, কিন্তু সে জানত সম্ভবত ইস্কুল হবে না। আজ কদিন ধরেই চারিদিকে গন্ডগোল চলেছে।

সে গন্ডগোলের কথা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে, গন্ডগোল নয়—গণ-আন্দোলন। দেশে চাল নেই, চিনি নেই, তেল নেই। জিনিসপত্রের দাম প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে—অথচ কোনো প্রতিকার নেই। দেশে বে কোনো শাসন আছে তা' তো মনে হয় না। এই নিরুই চারিদিকে

আগুন জ্বলে উঠল। মানুষ কেঁপে উঠল। এই তো সেদিন স্বরূপনগরের তেতুলিয়া হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মৃত্যুঞ্জয় ইসলাম গুলী খেয়ে মরল। চালের দাবিতে ইস্কুলের তিন শো ছেলের সঙ্গে সেও তার কচি হাতে মূঠো তুলে বি. ডি. ও আপিস ঘেরাও করতে গিয়েছিল।

আপনারা নিশ্চয়ই ভোলেন নি—বিসরহাটে আগুন জ্বলল প্রথম। তার পর মনগাঁ, নৈহাটী, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর, ডায়মন্ডহারবার, গড়িয়া, চাঁদপাড়া, গোবরভাড়া, হাবড়া, যাদবপুর, বেহালা, উলবেড়ে, ব্যারাক-পুর, বাঁকুড়া, সোনামুখী—গোটা বাংলা দেশে জ্বলে উঠল।

ঘোলাই ফেব্রুয়ারী গুলী চলেছে বিসরহাটে, স্বরূপনগরে গুলী চলেছে সতেরোই—আব আঠারোই ফেব্রুয়ারী গুলী চলল বাদুড়িয়ায়। সেই গুলীতে মারা পড়ল আবদুল হামিদ আর কালু মন্ডল। আবদুল হামিদও নাকি ছাত্র!

কিশোর ছাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধু কেঁপে উঠেছিল সেদিন। তার এই বয়সে ইতিপূর্বে আর কখনো এমন হত্যার খতিয়ান দেখে নি। এমন আশ্চর্য কথা শোনে নি। সে বরাবর দেখেছে, লাইনেব দু'পাশে ক্ষেতভরা ধান। অথচ দেশের সাধারণ লোকের ঘরে সে ধান ওঠে না। সেই বইয়ে পড়েছে—স্বাধীন ভারত নাকি নানা দিক দিয়ে দ্রুত উন্নতি কবে যাচ্ছে। অথচ রোগীর পথ্যের জন্যেও এক শিশি হরলিক্স পাওয়া যায় না। বিদ্রোহ শাস্তি বাড়ানোর জন্যে তাঁর হচ্ছে ধার্মিক প্র্যাণ্ট। অথচ তারই ঘরে ইলেকট্রিকের আলো পৌঁছয় না। লস্টন জ্বলবে তারও উপায় নেই। ভোজবাজির মতো কেরোসিন তেল উবে গেল দেশ থেকে—বেমন কিছদিন আগে উধাও হয়েছিল সরষের তেল—বেমন সেদিনও হয়েছিল চিনি। বাদুড়িয়ার ব্যাপারটা কি মনে আছে আপনাদের?

বাদুড়িয়ায় দু'মাস ধরে চাল নেই। এ অবস্থায় হঠাৎ জানা গেল বাদুড়িয়া থানার চাল এসেছে। এক-আধ মণ নয়, বেশ কিছু মণ। কিন্তু এ কোন চাল? বিক্রি হাট-বাজার থেকে এই চাল পুলিশ দখল করেছে বে-আইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগে (আহা, পুলিশের কি আইনের প্রতি দরদর!)

বাদুড়িয়ার ক্ষুধার্ত মানুষ দেখল, রেশনের দোকানে চাল নেই, হাটে-বাজারেও চাল মেলে না—তখন তারা বললে, ঐ চাল ন্যায্য দরে তাদের কাছে বিক্রি করতে হবে।

—জানায় বড়বাবু, বললেন, এ ব্যাপারে

তার হাত নেই (বড় দায়বদ্ধ হওয়া)।

হাত নেই বললে বটে—কিন্তু তিনিই মাকি এ মজুত চাল বেহাত করেন নিজের আর ধানার পলিশদের জন্যে।

এ ব্যাপার চাপা রইল না। সতেরোই ফেব্রুয়ারী ক্ষুধার্ত জনতার বিরাট এক মিছিল দুপুরে রোদে ভিড় করে দাঁড়ালো ধানার সামনে। বললে, এ চাল তাদের দিতে হবে।

বড়বাবু অবস্থা বেগতিক দেখে বললেন, কাল এসো, দেব।

চাল পাবার আশ্বাসে বাদাড়িয়ার ধানার সামনে পনের দিন আশ-পাশের গায়ের মানব ভেঙে পড়ল। বড়বাবু কিন্তু চাল দিলেন না। বললেন, এ চাল দেওয়া চলবে না।

—কেন চলবে না? এ চাল পলিশ পেতে পারে, আমরা পাব না কেন? জনতা গজ্ঞে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল—কেন তা'হলে মিথ্যা আশা দিয়ে ডেকে আনা হল?

বলতে বলতে তাদের গলার স্বর বদলে গেল। মাথার রক্ত চড়ল।

অমনি বন্দুকের আওয়াজ। পলিশ গ্রাস্তায় নেমে এসেছে। রাউন্ডের পর রাউন্ড গুলী চালাতে লাগল সেই ক্ষুধার্ত শাণিকার মানবগুলোর ওপর। দুটো দেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আরও কতজন হল আহত। তাদের রক্তে বাদাড়িয়ার খুলো-ভরা পথ ভিজে গেল।

এ সব ঘটনা মৃত্যুঞ্জয়ও জানে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই সে ইস্কুলে যাচ্ছিল। তাদের গ্রামেও আজ চাল নেই। চাল চাই—চাল চাই—চারিদিকে শব্দ এই একটি চিৎকার। হ্যাঁ, এ তো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে—কারা যেন দূরে চিৎকার করতে করেছে। ও তো তাদেরই ইস্কুলের ছেলের গলা।

বাদাড়িয়া, বনগাঁ, বসিরহাটের চেউ কি তা'হলে এখানেও এসে লাগল? আনন্দে উত্তেজনার তার ক'চি বুক কেঁপে উঠল। মৃত্যুঞ্জয় ছুটেতে লাগল ইস্কুলের দিকে। এ যে ছেলের দল ইস্কুল-কম্পাউন্ড ছেড়ে মিছিল করে বেরিয়ে পড়েছে। আর সে বক্তৃতা করে কেলেছে। মৃত্যুঞ্জয় প্রাণপণে ছুটল মিছিলে যোগ দেবার জন্যে।

ওরই এক বন্ধু মিহির। মৃত্যুঞ্জয়কে হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে দেখে বললে, মিহির এত দৌর করলি কেন?

মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে অন্য কথা তুলল—আজ ইস্কুল হবে না?

পাগল! দেশের এই অসুস্থ ইস্কুল। চারিদিকে তো আগুন জ্বলে উঠল।

মৃত্যুঞ্জয় সে কথার সমর্থন করে শব্দ মৃদু কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ।

—কলকাতার খবর শুনিয়েছ তে? সেখানেও ছাত্ররা বেরিয়ে পড়েছে। ডায়মন্ডহারবারে ছাত্র-ছাত্রীরা কেবোসিন ভেঙে, পূর্ণ রেশনের দাবিতে আর বসিরহাটে ছাত্রদের ওপর গুলীচালনার প্রতিবাদে ধর্মঘট করছে। কুসনপুর, রাণাঘাট, শান্তিপুর, কালনা, কল্যাণী—চারিদিকে বিক্ষোভ—শব্দ বিক্ষোভ। আর এই বিক্ষোভের অগ্নিদূত হল ছাত্র-সমাজ! বলে মিহির হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরে একটা বাকানি দিল।

—হ্যাঁ ব্রে, তোর মৃদু এমন শব্দকলি কেন? কিছু খাস নি?

মৃত্যুঞ্জয় তার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল—তোরা এখন মিছিল করে কোথায় যাবি?

—বোধ হয় এসে ডি. ও-র বাংলোয়। মৃত্যুঞ্জয় চুপ করে রইল।

চলতে চলতে এক সময়ে মিহির মৃত্যুঞ্জয়ের কাঁধে হাত রেখে বললে, তাকে বড়ো অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে আজ। তুই কি ভাবিয়ে বসিরহাটে, বাদাড়িয়ার যা হয়েছে এখানেও তার পুনরাবৃত্তি হবে? হয় তো হোক না।

জীবন-মৃত্যু পারের ভূতা

চিন্তা ভাবনাহীন।

ভয় কি?

সামনের দিকের কতগুলো ছেলে যেন মূর্খের সামনে দূ' হাত দিয়ে চিৎকার করছে—“লাঠি নয়, বুলেট নয়—খাদ্য চাই।”

অমনি: সম্মুখে: তাঁর প্রতিধ্বনি উঠেছে—“খাদ্য চাই।”

মৃত্যুঞ্জয়ও সেই সুরে সুর মিসিয়ে চোঁচিয়ে উঠল—“খাদ্য চাই—খাদ্য চাই।”

সৈনিক এসে ডি. ও-র বাংলোয় পিছনে আম-কাঁঠালের বাগানের ওপাশে আকাশ রক্তবর্ণ করে সূর্য অস্ত সেল। কিন্তু সৈনিকের সূর্যাস্তসম্প্রদায় রঙে যেন ঘোর লেগেছিল।

তার পরের দিনের কথা স্মরণ করে দেখুন। কালকের প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা হল—বিক্ষোভের আর এক পদক্ষেপ। অশান্ত, বিক্ষুব্ধ উচ্ছ্বল ছাত্রদের ওপর পুলিশের পুনরাবৃত্তি গুলীবর্ষণ। তিনজন নিহত।

মৃত্যুঞ্জয় তাদের মধ্যে একজন।

শোভা বড়ো একটা কাজ কামাই করে না। একদিন কাজ কামাই করা মানে তার নিজেরই ক্ষতি। তাই বিনয় নমস্কার করে বললাম, আজ কলকাতা যাও নি?

শোভা স্মান হেসে বললে, না। আজ আমি ছুটি নিলাম।

—হঠাৎ? শরীর অসুস্থ না কি?

শোভা তেমনি স্মান হেসে বললে, না। আজ কতবড়ো আনন্দের দিন বলুন তো। আজ জনসাধারণের সত্যিকারের দরদী মানবরা বাংলা দেশে নতুন মানবসভা গঠন করেছেন। আজ থেকে এঁদের যাত্রা শব্দ। সেই আনন্দেই আজ আমার ছুটি।

শোভা একটু ধাক্কা। তারপর বলল—সামনে এঁদের এখন বহু দায়িত্ব। কতদূর কি পেয়ে উঠবেন তাঁ জানি না। শুধু আমি আশাবাদী।

আমি বললাম, আশা করাটা একেবারে নিরর্থক হবে না। দেখুন না এরই মধ্যে মজুতদার আর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীমহল রীতিমতো দৃষ্টিচ্যুত হয়ে গেছে। অনেক ভর পেয়ে গোপন স্টক বজ্বারে ছাড়তে আরম্ভ করেছে। সরষের তেলের দাম কমে গেছে—চালের দাম নেমে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো কথা—চাল আজ পাওয়া যাচ্ছে।

হঠাৎ শোভার দূ' চোখ জলে ভরে উঠল। অক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল—বিশ্ব মিহিরনা তা' দেখতে পেল না ভগিতবাবু। ওবা পেটে ক্ষিদে নিয়ে মরল।

শোভা একটু খেমে বললে, কিন্তু আমি আজ এতদূর কেন এসেছিলাম জানেন? যে পলিশেরা সেদিন আমার ভাইকে মেরেছিল তারা রাতারাতি ভোগ বদলে আজ এখানে কত আবারে আছে তাই দেখবার জন্যে। জানেন তো এরই একদিন বৃটিশের দাসত্ব কবোঁছিল, স্বাধীনতা পাবার পর এরই বহাল তবিয়তে থেকে গেল কংগ্রেসী শাসন—কোনো বিচার হয় নি।

হঠাৎ শোভার দূ'ই চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। খপ করে আমার হাত দুটো ধরে বলে উঠল, অমিতবাবু, সেই নরহত্যাকারী পলিশ অফিসার কি তেমনি স্বচ্ছন্দেই থাকবে? তাদের কি আশ্ব ও কিচর হবে না?

আমি সে কথার জবাব দিতে পারি নি। শোভার সেই তাঁর দৃষ্টি থেকে লক্ষ্য সরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইলাম এসে ডি. ও-র বাংলোর পাশের এক টুকরো জমির ওপরে—যেখানে দাল পলাশ করে পড়েছে অজস্রপ্রাণ।

ওখানেই মৃত্যুঞ্জয় গুলী খেয়ে মৃত্যু খুঁজে পাচ্ছিলেন।

— भाग्यदूता —

সম্ভবত তাদের কারও কারও কাজ সুরুও হয়ে গেছে। মান্দড়বাসীর দুর্ভাগ্য, স্থান নির্বাচন তালিকায় তাঁদের এলাকার উল্লেখ ছিল না। কেন ছিল না তা তাঁরা জানেন না। এবং কবে, কিভাবে, কোন্ উপায়ে এইসব স্থান নির্বাচন একেবারেই শেষ হয়ে গেছে সে সম্বন্ধেও তাঁরা অজ্ঞ।

জনতা যেখানে স্বয়ং চায়, কার্যভার সেখানে ছেড়ে দিলে পরিকল্পনা—(তা' সে যেমনই হোক) সফল হয়। মান্দড়ায় একটি পরিবার-পরিকল্পনা শাখা-কেন্দ্র অবশ্যই হতে পারে। হওয়ার প্রয়োজনও আছে। জেলা-পরিবার-কল্যাণ-পরিকল্পনা অধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এ-প্রসঙ্গে।

কুটিরশিল্প অনেকরকম আছে মান্দড়ায়। কামার কুমার তাঁতী—এবং ডোমপাড়া রয়েছে। আপন আপন জাত-ধাবসাতেই—লেগে আছেন আজও অধিবাসীরা। কিন্তু অবস্থা বড়ই প্রতি-কূল। ছতোরের কাজের কিছু কদর আছে। কামার ও তাঁতী একেবারে নিরালম্ব নিরাশ্রয় নয়, কিন্তু মৃৎশিল্পী আর বাঁশ-বেতের কারিগর ডোম—এদের অবস্থা বড়ই শেচনীয়। সংসার চলে কি না চলে, প্রসংসংস্থান হয় কি না হয়।

ভারতবর্ষের মতো প্রাকান্ত দেশে—যেখানে অসংখ্য গ্রাম, অগণিত গ্রামবাসী, এবং ১-ই তুফান সেখানে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মান্দড়বের কমসংস্থান বা অসংস্থানের মতো ভারী শিল্প খুব বেশি গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি, এবং হয়ে ওঠা সহজও নয়। সেখানে ছোট ছোট সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম্য কুটিরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা ছাড়া দেশব্যাপী এই বেকারী-সমাধানের আর কোন উপায় যে নেই, এ তথ্য প্রমাণিত সত্য। কিন্তু দুরূহের বিষয়, এ নিয়ে আলোচনা যেতো হয়েছে কার্যকরী হস্তক্ষেপ তার চেয়ে অনেক কম। মান্দড়বাসীকে অনুরোধ করি—এই পথেই তাঁরাও একবার চেষ্টা কবে দেখতে পাবেন।

ব্যক্তিগত মূলধনের বিনিয়োগে গড়ে-ওঠা ছোট ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও এ সমস্যার কতকটা সমাধান করতে পারে। উদাহরণ একটি রয়েছে পাশের গ্রাম খনটিকুরীতে—একটি স্প্রিং তৈরিব কারখানা। ছোট কারখানা, তবু জনপ্ৰাণ কমীর অসংস্থান হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকেই।

প্রধান ফসল ধান পাট আলু। কিছু মৃৎশিল্প শাক-সব্জীও আছে। বিশেষ করে প্রাকান্ত ঢোলকাকার বৈশাখী কুমড়া অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ডি-ভি-সি'র সেচখাল এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই গেছে।

এইদিক দিয়ে মান্দড়বাসী ভাগ্যবান। জমিতে জলসেচ সম্ভব তাঁদের পক্ষে। খরায় ধূসর বন্যা জমি পড়ে থাকে না খুব বেশি।

এলাকাটি কিছু নিচু এবং পদুস্করিণী প্রধান। কাজেই মাছের চাষ রয়েছে। মাছ চাষে উৎসাহও রয়েছে মান্দড়বাসীর। কিন্তু শোনা গেল—জেলা মৎস্যচাষ বিভাগ থেকে কোনো আর্থিক বা সক্রিয় সাহায্য পান না এরা। খুবই অসুবিধার কথা। গ্রামের মানুষ মাছ চাষ করতে গিয়ে প্রথম মার খায় মাছের পোনা। রুই ভেবে বাকে জলে ছাড়া হলো, কার্যকালে দেখা যায় হয় সে সরলপুটি নয় সে কুরচি বাটা। চাষীর বিপদ, লোকসানের চূড়ান্ত। এবং এর পরেও রয়েছে পদুকুরের পাঁক পরিস্কাব, সময় মতো মাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের প্রশ্ন। গরীব গ্রামের মানুষ একা হাতে এত কুলিয়ে উঠতে পারে না। সরকারী মৎস্য-খণ এবং ভাল মাছের বাজার সরবরাহের ব্যবস্থা সরকারিভাবে থাকলেই ভাল হয়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা-খুলো করার বড়ই অসুবিধা এই সব গ্রামাঞ্চলে। মানুষ এখন কৃষিতে সচেতন হয়েছে। আঁস্তাকুড়টিতেও দেখতে পাওয়া যাবে দূটো বেগুন-লস্কার গাছ। পতিত জমি, পড়ে-থাকা মাঠ বিরল হয়ে আসছে ক্রমেই। কিন্তু বিপদ হয়েছে ওদের। নিন্দেবো এই চঞ্চল ক্রীড়া-সমুদ্রস্রু শিশুর দল-যায় কোথায়, কবে

কি? এর আমতলায় কিংবা ওয় পদুকুরপাড়ে বসে দুর্ভিক্ষ করে দুর্দশ। মালিকরা বিরক্ত হন, পদুকুরের মালিক তাড়া দেন। দৌড়ে পালিয়ে যায়, জটলা করে অন্য কোথাও, হয়তো তাড়া খায় সেখানেও, খুঁজতে হয় আবার নতুনতর কোনো ক্রীড়াঙ্গন।

এ শূন্য মান্দড়াতেই নয়, গ্রাম-বাংলার যেখানে যখন গিয়েছি, দেখতে পেয়েছি এই সমস্যা। ছোট ছোট বাচ্চারা সকালে থাকে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে, দুপপুরের গার্জনে মাস্টারমশাই। দিন-শেষে সেই স্কুল-কারাগার থেকে মুক্তির পর তারা চায় একটু খোলা আকাশ। একখানি মৃত্ত মাঠ। একটু অব্যব-স্বাধীন মৃত্ত অবসর। আর সেই অবসরে সারাদিনের জমিয়ে-রাখা লাফ-ঝাঁপ, দৌড়-দুর্ভিক্ষ একসঙ্গেই করে নিতে চায় তারা। এতে তাদের শারীরিক ক্ষতিই শূন্য নয়, মানসিক মৃত্তিও হয় পরিপূর্ণ।

আজকের শিশু তা পাচ্ছে না। পাচ্ছে মা অবসর আর পরিবেশের অভাবে। অবসরের অভাব—কারণ সকালে তার পড়াশুনা, দুপুরে স্কুল, সন্ধ্যায় মাস্টার-মশাই, কিংবা দাদা-কাকা-বাবা—পরিবেশের অভাব—কারণ এই আঁটসাঁট ঠাস-বুনোন প্রোগ্রাম ছেকে যেটুকুও বা সময় পাওয়া যায়—তাও এ আমতলা কিংবা পদুকুরপাড়ের জিম্মায় সাঁপে দিতে হয়। নেই কোনো খেলার মাঠ, নেই খেলা-খুলোর ব্যবস্থা। নেই উপযুক্ত সংগী,

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের এগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্ব - মাদ্রাজ - দিল্লী - লাহোর

বেঙ্গল - কলিকাতা - শ্রীহর - গোহাটী

শিশু বা শিশু-মনোরঞ্জনক অপর কোন আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা। ফলে—

ফলে আজকের শিশু নিজীব, আজকের শিশু নিপ্ৰাণ। আজকের শিশু দ্বন্দ্ব কাতর প্রাণশক্তিহীন নিজীব। বণ্ডনা আমাদের অনেক। বণ্ডনা আমাদের ঘরে-পরে, অন্দরে-বাইরে। কিন্তু সবচেয়ে বণ্ডিত বোধ করি আমাদের এই শিশুকুল। স্থানের অভাব, আর কালের অপ্ৰতুলতা সৃষ্টি করে আমরা বাদের আনন্দ অপহরণ করেছি। ছিনিয়ে নিয়েছি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সুন্দর শৈশবের আশ্চর্য উপলব্ধিটুকু!

কদিন আগেই প্রাক-নির্বাচনী কলঙ্কে মগ্ন ছিল এইসব গ্রামাঞ্চল। সভায় আর শোভাযাত্রায়, পোস্টারে আর ফেস্টনে, মাইকে আর গলাবাজিতে যেন ছড়াছড়ির যান ডেকেছিল। এখন সব শান্ত। জড়ের পরে শান্ত আকাশে উজ্জ্বল এক-টুকি তারা—নতুন মন্ত্রিমণ্ডলী। হ্যাঁ, হুঁশ হয়েছে মানব। অনেক দুঃশাসন অন্ধকারের বন্ধপীড়ন থেকে মুক্তির স্বাধীনতায় মুখ তাদের উজ্জ্বল। তবু—তবু প্রশ্নও আছে। আশায় আশ্বাসে, উদ্বেগে আব আশঙ্কায় জড়ানো অলো-ছায়ার দোলার দোলানো কুণ্ঠিত কামনার কুণ্ডিগুণ্ডিল দল মেলবে কি না মেলবে, অদৃষ্টের খাতে আশার জোখাব বইবে কি না বইবে। প্রশ্ন ওর—এ যে বধু মন্ত কলসীর ঘরে ঘারে জ্বলে ঢেউ দিয়ে জল ভরে নিয়ে চলে গেল, নরম ধলো

ভিলে পায়ের আলতো ছাপ এঁকে এঁকে, দুটি বেলে বেলে হাতে যার কড়া পড়েছে, কোলের ছেলোটো কোঁদেছিল বাড়তি দু-মুঠো ভাতের বারনা নিয়ে। দুটো চড় দিয়ে থামাতে হয়েছে যাকে, প্রশ্ন তার চাল পাব তো? ছেলেপুলের মুখে দুটো অন্ন তুলে দেবার শান্তি আর তো কখনো কেড়ে নেবে না কেউ?

প্রশ্ন ওরও—এ যে কিষাণ মন্ত কোদালে কুপিয়ে কুপিয়ে আলগা করে দিল ক্ষেতের শুকনো শস্ত খরা মাটি। কপালের ঘাম আঙুলে মুছে, আগুন-হানা সূর্যপানে চেয়ে কাতর প্রশ্ন ওরও চোখে, জল পাব তো? খরায় ধূসর বন্ধ্যা মাটি আর দেখতে হবে না জোখ। সবুজ ফসল শুকিয়ে বড় হয়ে শূন্যে পড়বে না তো ক্ষেতের আলো! পাতাল-ফুড়ে উপচে-ওঠা ভোগবতীর ধারায় ধারায় ধূস্রে যাবে কিষাণের-সব দড়ি, সব ব্যথা, নৈরাশ আর নিরানন্দ—

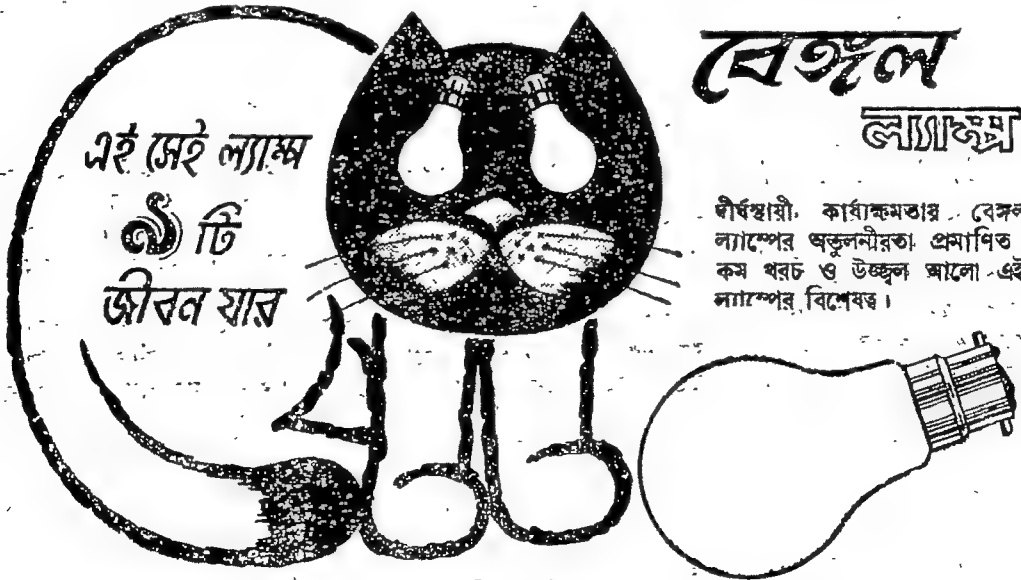
এ যে বিধবা, আজাই বছরের শিশু কোলে স্বামীহারা হয়েছিলেন একসা। তারপর অনেক দশকের দুস্তর পঞ্চ পার করে আজ সেই শিশু বড় হয়েছে। মায়ের মুখপানে তাকাতে লিখেছে প্রশ্ন ওরও—চাকরি পাবে তো ছেলোটুকু? বড় কিছন্ন নয়। বেঁচে থাকার, টিকে থাকার খেটে খণ্ডার আর খেটে তোলার আশা আর অম্বাস?

আর এ যে শিশু—উলঙ্গ কোমরে কালো কানের ঘনসিতে গাখা ছোট একটি

ডামার পরস। বুলো-মাথা হাতের দুটি আঙুল মুখে পুরে ডানবড়বে চেয়ে আছে বিস্মিত চাউনি। সে চাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু যে প্রশ্ন তার চোখে নেই, সে প্রশ্ন সহস্রগুণ হয়ে বাজল আমার মনে। নিরাপত্তা পাবে তো ও? এ যে নবীন, এ যে নতুন, এ যে আমাদের কাঁচা—ওদের জন্য থাকবে তো স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আশ্রয়? জন্য মেলে দেবার একটি উদার আকাশ, জন্য গুটিয়ে নেবার এক-টুকু নিভৃত নীড়?

মনে পড়লো সেই বৃদ্ধার কথা। দুঃহাত উঁচু করে ষাঁন বলেছিলেন, রাজা হয়েছে হোক বাবা। আশীর্বাদ করি বেঁচে থাক, সুখে থাক আমার মাথার পাকাচুলের মতো। একশো বছর পেরমাই হোক তাদের। শূন্য দুটো খেতে পরতে যেন দেয়। পাঁচ বাজান দুধের বাটি নর, দুটো মোটা ভাত আর দুখানা মোটা কাপড়, মানব এই চায়। এর বেশি আর কিছন্ন নয়।

প্রার্থনা করি তাই যেন হয়, তাই যেন হোক। দুটি মোটা ভাত, দুখানা মোটা কাপড়, আর দিনান্তে মলিন মাদুবে অঙ্গ ঢেলে শান্তির বিশ্রাম। সে অন্ন কেউ যেন না কাড়ে, সে প্রাণে কেউ যেন না আঘাত দেয়, সে বিশ্রাম কেউ যেন না বিঘ্নিত করে তোলে গর্বিত নিষ্ঠুর অত্যাচারে। চির আশুতোষ জনগণের তাতেই পরম সুখ, প্রভূত পরিতৃপ্তি।



এই সেই ল্যাম্প
১ টি
জীবন যাত্রা

বেঙ্গল
ল্যাম্প

দীর্ঘস্থায়ী, কার্যক্ষমতার বেন্গল
ল্যাম্পের অকুলনীয়তা প্রমাণিত।
কম খরচ ও উজ্জ্বল আলো—এই
ল্যাম্পের বিশেষত্ব।

সেলিং এজেন্টস:

বেন্গল ল্যাম্প ইন্ডিয়া লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • আমেদাবাদ

হেড অফিস: ১০, প্রিন্সিপাল স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩

গৌড়ের মুসলমানের সাথে উত্তরবঙ্গ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

II পশ্চিম দিনাজপুর II

পুণ্ড্রাচীনকাল থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতির বিবর্তনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। গৌড়ের পালরাজবংশের উত্থান এবং পতন, ইসলাম ধর্মের আধিপত্য থেকে সূত্র করে মধ্যযুগের মোগল আমল পর্যন্ত পশ্চিম দিনাজপুরের একটি জাতিগত ধারাবাহিকতার বিষয় উল্লেখ করা যায়। গৌড়ের পালবংশের রাজন্যবৃন্দ যখন তাদের রাজধানী ও রাজত্ব সূত্র করবার উদ্দেশ্য নিয়ে পাম্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেছিলেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই পাম্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাসী বিনিময়ের প্রয়োজন অবশ্যই দেখা দিয়েছিল। গোড় সমৃদ্ধ হয়েছিল নিঃসন্দেহে এবং সেই সময় থেকেই অধিবাসী, জাতি ও ধর্মের বিবর্তনের সূত্র বলা যেতে পারে। গৌড়ের পরিধিও সুবিস্তৃত করা হয়েছিল। অগ্রাই, পুনর্ভবা, মহানন্দা টাঙ্গনের তীর দিয়ে নতুন সংস্কৃতির গোড়াপত্তনের সেই ইতিহাসের কোনও প্রামাণিক তথ্য অবশ্য এখন আর অনুসন্ধান করে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই অনুমান। তারপর সেন আমল। কামাল সেন কর্তৃক মিথিলা থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আমদানি ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন সূত্র বা রাঢ় অঞ্চলে যে সব অধিবাসী ও সম্প্রদায়ের কথা ইতিহাসে উল্লেখ আছে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাবধারার মিলন অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে পূর্ব এশিয়া থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও নিরীশ্বরবাদ ধর্মতত্ত্বগুলি স্থান হয়ে আসছিল। আর তার পরিবর্তে লৌকিক মত ও আচরণবিধি বিবেচনা করে বঙ্গদেশ বা সূত্র অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করেছিল বলে অনেক অভিমান দিয়েছেন। এই ধর্মতত্ত্বই ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে এবং ভাগীরথীর অববাহিকা ধরে উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

ইসলাম প্রাধান্যের সময়েও এই ধর্মের জোরার খেমে থাকে নি। হিন্দু ও ইসলাম

ধর্মের বিস্তৃতি একই সপ্তে চলছে। পূর্বেই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলাম সম্প্রদায় যখন এদেশে তাদের রাজ্য ও ক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটিয়ে চলছিল, তখন তারা ধর্মমত প্রচারের জন্য আদৌ ব্যগ্র হয় নি। ক্ষমতা অধিকার করেই তারা সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল আর অপরদিকে হিন্দু ধর্মের কঠোর অনুশাসনের ফলে মূল হিন্দু ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ছিল একথা যেমন সত্য, তেমনি আঞ্চলিক ও লৌকিক ধর্মমতের উত্থান ঘটে চলছিল।

বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুরের অধিবাসী ও জাতি-বিন্যাসের ধারা একটু মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করলে প্রাচীন বঙ্গদেশেরই গোষ্ঠী-বিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পশ্চিম দিনাজপুরের মিশ্র জাতি ও অধিবাসীদের আচার-আচরণ, রাজবংশী ও সাঁওতাল জীবনধারার বিবর্তন, মুসলমান অধিষ্ঠান ও উচ্চশ্রেণীর জাতিগুলির প্রাচীন অস্তিত্ব উপরোক্ত অভিমানকে সমর্থন করবে বলেই বিশ্বাস। মধ্যযুগে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে যে দ্রাবিড় জাতিগোষ্ঠীর বিবর্তিত ধারার একটি শাখা ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে এবং সমৃদ্ধ রাজবংশের পতন করে—তারও অবলম্বিত সাক্ষ্য পশ্চিম দিনাজপুরে স্পষ্টত প্রতীয়মান। কথিত আছে, অহোম রাজ্য থেকে অসংস্কৃত একটি জাতির সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে উত্তরবঙ্গে প্রাচীন জাতির অবলম্বিত এবং রাজবংশী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। কালক্রমে রাজবংশী সম্প্রদায়ও অন্য একটি আগন্তুক জাতির সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে উত্তরবঙ্গের বা গৌড়ের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম দিনাজপুরের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকগাথা ও প্রাচীন পুঁথির সাহায্যে সে সব কাহিনী এখনও উদ্ধারযোগ্য। উত্তর বাংলার বিশিষ্ট জাতি গবেষক ডাঃ চার, চন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের অভিমান অনুযায়ী—এই জাতি অতি পুঁথিপ্রাচীনকালে—বর্তমান গৌড় রামায়ণ মহাভারতের যুগে—পূর্ব এশিয়ার দুর্ভাগ্য পর্বতশ্রেণী লঙ্ঘন করে সমভল অংশে, যেখানে পার্বত্য নদীগুলি তাদের

স্রোতবেগ সংবরণ করে, সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এইভাবে মেচী নদীর তীরবর্তীরা মেচী নামে পরিচিত হয়।

বাই হোক—পশ্চিম দিনাজপুরের জাতি ও অধিবাসী সম্পর্কে তাহলে দেখা যাচ্ছে, দুইটি ভিন্নমুখী গতির সংগম-স্থল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এই বিস্তৃত অঞ্চলকে। প্রাচীনযুগের আর্য ও অনার্যের সংঘাত ও সংমিশ্রণে এই অঞ্চলে এবং সমগ্র বঙ্গদেশে যে উন্নততর জাতি ও সংস্কৃতির উত্থান ঘটেছিল—প্রায় বারো শতক পরে দেখা যাচ্ছে শূদ্ধ্যময় প্রাগজ্যোতিষ, গোড় প্রভৃতি অঞ্চলেও ঠিক তেমনি ধরণেরই এক ভাব-সংঘাত সূত্র হয়েছিল। যার ফলে বাংলা-দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে উত্তরবঙ্গের জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি পৃথক স্রোতধারা সূত্র হয়েছিল এবং এখনও তা বয়ে চলেছে পরিপূর্ণ বেগে। বর্তমান কালে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে উত্তরবঙ্গের এই ভিন্নমুখ জীবনগড়িকে উপলব্ধি করতে চান না অনেকেই। গ্রাম্য-নাট্যেরা তা বটেই—সংস্কৃতির ধারা ধারক এবং বাহক, তারাও নন। ফলে উত্তর-বঙ্গের সুখিসমাজ, সংস্কৃতিসেবিকা এবং গবেষকবৃন্দ এ নিয়ে প্রায়শ আক্ষেপ করেন। উত্তর বাংলার প্রাচীনকালের যে ভাব-সংঘাত ও ভাব-সংগতি ঘটেছিল একদা তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ গৌড়ের মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, পরিখা ও নানা প্রাচীন গ্রন্থ রচনার মধ্যে। বিমর্ষ ধর্মের প্রবলগণ যেমন ইসলাম ধর্মের অধিনায়ক ও অধিপতি মসজিদ নির্মাণ করে সেই মসজিদের সর্বাপেক্ষে হিন্দু দেব-দেবীগণের নানাতর মূর্তির অলঙ্করণ কেন করেছিলেন, সে কারণ আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। হিন্দু নরপতি মসজিদ নির্মাণ করে—কেন সেই মসজিদ তাঁর পিতৃপুরুষের নামে উৎসর্গ করেছিলেন সে কাহিনীও অজ্ঞাত।

মোটের ওপর প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির এক বিচিত্র জীলাভূমি এই উত্তরবঙ্গ। সূত্র রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে কত বিচিত্র জাতি এসেছে,

রাজ্য, নগর, দর, দুর্গ, পরিখা গঠন করেছে, তৎকালের নিয়মে তারা নিশ্চয় হয়ে গেছে। আবার এসেছে নতুন দল—বিধি-নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাদের অস্তিত্ব—তারপর তারাও হয়তো মিলিয়ে গেছে কালগর্ভে। আজ উত্তর বাংলার ক্ষেত-খামারে, কারখানায়, চা-বাগানে, পাহাড়, সমতলে যে অসংখ্য জাতির মানুষ—তাদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে হয়তো প্রাচীনকালের এক-একটি গৌরবময় কাহিনী। রাজবংশী, সাঁওতাল বা অন্যান্য জাতির কথা ছেড়েই পেওয়া যাক—ডুয়ার্সের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অব-লুপ্তির পথে যে টোটে জাতি, যাদের কয়েকজন মাত্র এখন আঙুলের গণনার মধ্যে—আজকের দিনে এসে কেউ কি অনুসন্ধান করবার উৎসাহ পান—কারা তারা? কোথা থেকে এদের আগমন? এদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে কোনও জাতিরই সাদৃশ্য নেই। অথচ এরা ছিল। ছিল এদের নিজস্ব অস্তিত্ব নিজে। কিংবা ডুয়ার্সের ঘন অরণ্যের গারো বা মেচ্চ এদের সম্পর্কেও একই বক্তব্য।

পশ্চিম দিনাজপুরেরও কোন কোনও অঞ্চলে এইরূপ বিরল-দর্শন জাতিগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যবহারিক জীবনে এরা খাপ খাইয়ে চলতে শিখছে যে, ইটাং দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে, এদের ভাষা ও আচার-আচরণ, বিবাহ, মৃত্যু, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি ক্রিয়া-কর্ম আমাদের পরিচিত অনুষ্ঠানগুলির থেকে পৃথক।

অথচ এরা চিরকালই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু কতদিন আর থাকবে—সেটা সম্ভবের বিষয়। কেন না বর্তমানকালে এসে এরা এখন আর নিজদের জীবন-চর্চার প্রতি খুব বেশি উৎসাহ পায় না। নানা জাতি ও ধর্মের আচার-আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রবণতা খুব বেশি-রকমেই দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত এদের মধ্যে দ্রুত হারে বয়সের সীমারেখা কমে আসছে। একজন পুরুষ গড়ে চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচে না। তাছাড়াও আধুনিক সভ্যতার সম্পর্কে এলেও কতক-গুলি কারণে এরা এখনও এদের জাতিগত প্রথা ও বিশ্বাসের ওপর এত বেশি অবিচল যে—আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করতে নারাজ। যেমন—এরা সিগারেট খুব ভালবাসে কিন্তু সেই সিগারেট দিয়াশলাইয়ের কাঠি জেঁলে ধরাবে না।

তপশীল সম্প্রদায় সহ আদিবাসী ও উপজাতি মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ১৯.৭ আদিবাসী সংখ্যাই হল সমগ্র আদিবাসীর হার। এর মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুরেই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, পশ্চিম দিনাজ-পুরের সমগ্র সংখ্যক উপজাতি ও নানাতর অনুন্নত সম্প্রদায়ের শতকরা ৬৪ ভাগই রায়গঞ্জ মহকুমার আদিবাসী। এর পরেই উল্লেখযোগ্য হল কুশমান্ডি ও ইটাহার থানার আদিবাসী। এমনিভাবে বলা যায় তপন, গগারামপুর, হেতমাবাদ, কুমারগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নাম।

বিহারের পূর্ণিমা জেলা থেকে যে অংশ পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে (ইসলামপুর—নতুন বাংলা) সেই সমস্ত স্থানগুলিতে এই হার অত্যন্ত কম—মাত্র ৫ ভাগ। এই সব অঞ্চলে বঙ্গ ভাষাভাষী মুসলমান আদিবাসীদের সংখ্যাই উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম দিনাজপুরের সমগ্র আদিবাসীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশই রাজবংশী এবং তার পরেই নাম করা যেতে পারে পলিয়া জাতির। বাম্পী নামে অন্য একপ্রকারও উল্লেখ করা চলে এবং জেলায় তারাও নগণ্য নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিগুলির মধ্যে রয়েছে দোয়াই, গোড়ী প্রভৃতি। যে জাতিগুলির উল্লেখ করা হল—এরা সাধারণভাবে পশ্চাদবর্তী সম্প্রদায়। যদিচ অন্যান্য জেলায়—এই সব সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নব্যবস্থার কাজ সুরু হয়েছে, এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত সন্তোষজনক অগ্রগতিই পরি-লক্ষিত হয়—তথাপি পশ্চিম দিনাজপুর জেলা এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের একটি পশ্চাদবর্তী জেলা হিসাবে এই উপ-জাতিগুলিরও উন্নতিবিধান সম্পর্কে ততখানি আশাপ্রদ খবর সরবরাহ করা সম্ভব নয়। পশ্চিম দিনাজপুরের এই সম্প্রদায়ের মানুষের এখনও শতকরা নব্বই ভাগই “এ্যালের গাড়ি” দেখে নি।

পশ্চিম দিনাজপুরে রাজবংশী জাতির প্রথম বসতি স্থাপনের কোনও ইতিবৃত্ত সংগৃহীত নেই। তবে ঐতিহাসিকরা মনে করেন—মধ্যযুগে যখন সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে ‘কোচ’ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়—তখন থেকেই পশ্চিম দিনাজপুরে প্রথম রাজবংশীদের আগমন ঘটে। ঐতিহাসিক ভূটান যুদ্ধের সময় কোচবিহার এবং পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন দুয়ার থেকে রাজ-বংশী সম্প্রদায় রংপুর ও দিনাজপুরের দিকে চলে যেতে থাকে। অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্যের ফলে—এই সব ছোট ছোট দল কালক্রমে তাদের আপন আপন সংস্কৃতি ও জীবন-চর্চারও পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হয়। যেমন রংপুর ও নিম্ন উত্তর-বঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত পরিবর্তন হয়ে ওঠে দ্রুতগতিতে আর অন্য দিকে দার্জিলিং পশ্চিম দিনাজ-পুরের কিংবা জলপাইগুড়ির আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব ভাষাকে অবিচল রাখতে সক্ষম হয়। এখানে একটি বিষয় প্রসঙ্গ-ক্রমেই উল্লেখযোগ্য। রাজবংশী সম্প্রদায়ের লেখা ভাষা বাংলা। কথ্য ভাষাও বাংলা—কিন্তু অঞ্চলগত টানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এমন কি পূর্ব-বঙ্গের টানেরও কোনও সাদৃশ্য নেই। সেই ধারাটি পশ্চিম দিনাজপুরের আদিবাসীরা এখনও বজায় রাখতে সক্ষম



পশ্চিম দিনাজপুরের একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির
জালোকাচর—পূর্ণেশ্বর, পালকৌন্দুরী

পাঁজারি বসন্তী ১৮ ১৬ই মার্চ
প্রকাশিত ৪০ম সংখ্যক সপ্তাহিক প্রকাশ
আপনি লিখেছেন : 'হিন্দী ভাষার রোলার
চলেছে এখন ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলির
ওপর' একথা অত্যন্ত খাঁটি কথা। আমি
একজন রেলওয়ে কর্মচারী। কিছুদিন
থেকে দেখছি, অধুনা যে সব নতুন ওয়া-
গন এবং বগি কারখানা থেকে বেরিয়ে

আসছে তার গারে নম্বর, রেলের নাম
(অর্থাৎ কোন রেলের), টন ইত্যাদি সব
কিছুই হিন্দীতে লেখা হচ্ছে। আমরা
হিন্দী না জানার কাজ করতে ভীষণ
অসুবিধা হচ্ছে। তা ছাড়াও ওয়াগনগুলি
সাধারণত মাল নিয়ে সারা ভারতময়
ঘোরাফেরা করে কাজেই আপনি নিশ্চয়
অনুমান করতে পারছেন অহিন্দীভাষী
লোকেরা এইসব ওয়াগনের রেকর্ড রাখার
ব্যাপারে কি সাংঘাতিক অসুবিধার
সম্মুখীন হচ্ছে। এবং এভাবেই হিন্দীর
রোলার আমাদের ওপর চালান সুরু
হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের হিন্দী
শিখতে উৎসাহিত করার জন্যে সরকার
খুব দিচ্ছেন। সেটা হচ্ছে—হিন্দী শিখতে
পারলে একটি 'ইনক্রিমেন্ট' অগ্রিম দেওয়া
হচ্ছে—এটা আমি মনে করি খুব।

বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকার কিছুদিন
যাবৎ হিন্দীর বিরুদ্ধে উচ্চব্যাচ না দেখে
হতাত হচ্ছিল। আপনার উক্ত প্রবন্ধের
মালুমত বক্তব্য দেখে যেন আবার একটু
আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। অনুরোধ
জানাই হিন্দীর বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ



তুলে জনমত গড়ে তুলুন এবং হিন্দীর এই
রোলারকে স্তম্ভ করার প্রয়াস পান।

—অরবিন্দ রায়
কলকাতা—১২

চলতি সপ্তাহের সাপ্তাহিক লোক-
রঞ্জন শাখা সম্পর্কে আপনারদের সূচিচিত
ও সঙ্গত মন্তব্য আমার খুব ভাল লেগেছে।
উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই কয়েকটি
বক্তব্য আপনার সামনে তুলে ধরছি।

লোকরঞ্জন শাখা বাংলা দেশের
জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত। সঙ্গীত,
নাটক, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে
বাংলা দেশের গ্রামীণ জনসাধারণের
মনোরঞ্জন এদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু
কয়েক মাস যাবৎ এদের দৃষ্টিভঙ্গির
বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের জনসংযোগ দফতরের জনৈক
কর্মকর্তা গত জুলাই মাসে লোকরঞ্জন
শাখার ভারপ্রাপ্ত হন। এর পর হতেই

উক্ত শাখা আরিস্তোক্রাট মহলে অভিনয়
প্রদর্শনে অধিক আসক্ত হয়। শাখার
ভারপ্রাপ্ত হবার অব্যবহিত পরেই উক্ত
কর্মকর্তার নেতৃত্বে এই শাখা ফিল্মসবহুল
মঞ্চ রবীন্দ্রসদনে "গণ্যমান্য ব্যক্তিদের
(বিশেষত কংগ্রেসী মন্ত্রীমহোদয় ও
তাদের সাংগোপাঙ্গদের) জন্য নির্দিষ্ট"
ভিত্তিতে সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব পালন
করেন। এর জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করা
হয়েছিল। নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত
এই কয় মাসের মধ্যেই উক্ত অফিসারের
অনুগ্রহপুষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণো-
দিত কয়েকটি ক্লাবের জন্যে (১) নিউ
আলিপদ্রের ন্যায় সম্প্রদায় এলাকার
চারটি (২) লোক টাউনে তিনটি ও
(৩) রিজার্ভ পার্কে দুটি অনুষ্ঠান
পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য একটি
অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন "নরেন্দ্রনাথ
সেন অভ্যর্থনা কমিটি"। অসমর্থিত
সংবাদে প্রকাশ, উক্ত অফিসার নরেন্দ্রনাথ
সেনের নির্বাচনী যুদ্ধে নেপথ্যে অন্যতম
পরাজিত সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ
করেছিলেন।

উক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা
যদি গ্রহণ করা নাও যায়, নতুন সরকারের
কাছে এটুকুই আশা করি যে, লোকরঞ্জন
শাখা সম্প্রদায় উচ্চবিত্তের অঙ্গান ভাঙ্গা করে
আবার গ্রামের কৃষক ভাইদের মনোরঞ্জে
অবতীর্ণ হোক। আশা করি আগামী এ
আবেদন ব্যর্থ হবে না।

—শতদল

হয়েছেন। রাজবংশী সম্প্রদায় প্রাচীনকাল
থেকে সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগী।
মধ্যযুগ থেকে রাজ-পোষকতার ফলে এই
অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল সন্দেহ নেই—
চর্চার ধারাবাহিকতাও এই কাল পর্যন্ত
বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বিস্ময়ের বিষয়
রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই সংস্কৃতি-
চর্চার মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও
রচনাশৈলী, ভাবগত পার্থক্য, শীলনের
ও মানসিকতার গভীরতার বৈশিষ্ট্যও
যথেষ্ট। মধ্যযুগ থেকেই আজ পর্যন্ত
সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের
মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট কবির সাক্ষাৎ
পাওয়া যায়—বীরী রামায়ণ ও মহাভারতের
খণ্ড কাহিনী নিয়ে এক-একটি দীর্ঘায়িত
কাক্য রচনা করেছেন—এবং সেগুলি এখনও
উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সমভাবে
সমাদৃত। অবশ্য সূত্র, প্রচার ও
প্রকাশনার অভাবে সেগুলি এখন পর্যন্ত
গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে রয়েছে। পশ্চিম

দিনাজপুরের রাজবংশীদের মধ্যে কিছু
কিছু কথাকারের রচিত পালা গান, পাঁচালী
গান, বারানিয়া গান যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য বজায়
রেখেছে।

পশ্চিম দিনাজপুরে কটাই বা কটাই
রাজবংশী নামে আরও এক ক্ষুদ্র সংখ্যক
উপজাতির সম্ভান পাওয়া যায়—অথচ উত্তর
বাংলার অন্য কোনও জেলাতেই এদের
অস্তিত্ব নেই। মনে হয় আঞ্চলিকভাবে
কোন কারণে মূল সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন
একটি অংশ এইভাবে নতুন নামে
অভিহিত হয়েছে। আচার-আচরণে ও
ধর্মনিষ্ঠানেও মূল সম্প্রদায়ের সঙ্গে
অসংগতি খুবই সামান্য। জীবিকার ক্ষেত্রেও
এক।

পাল্লার বা পল্লার কিংবা গোড়ী
শ্রেণীর ধারা ভিন্নতর। পল্ল বা রেশমের
চাব পশ্চিম দিনাজপুরে নেই। তবুও
মালদহ থেকে আগত মূল পল্লার
স্থানান্তরের ফলে ভিন্নতর জীবিকা গ্রহণ

করলেও জাতি-পরিচিতি হিসাবে
পল্লারই রয়ে গেছে এবং কালক্রমে এই
অংশও বিভিন্ন জীবিকা ও জীবন-
চর্চার লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সেই সেই
জীবিকা বা আচরণের পরিচিতিও জাতি
পরিচয়ের মধ্যে যুক্ত করে নিয়েছে। যেমন
সাদু পল্লার বা বাবু পল্লার।

এ হল অর্থনৈতিক কারণে স্থানান্তর
ও রূপান্তর। রাজনৈতিক কারণেও
প্রাচীনকাল থেকে আরও এক বিচিত্র ধারা
এসে মিলেছে পশ্চিম দিনাজপুরে। কথিত
আছে পালযুগে কৈবর্ত বিদ্রোহের পর—
নামক দিবেবাকের আপাত সাফল্য সত্ত্বেও,
গৌড়ের একশ্রেণীর লোক মহানন্দা নদীর
অববাহিক ধরে পশ্চিম দিনাজপুরের
দিকে চলে আসে। কালক্রমে এরাই
গোড়ী নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

[কম্বাঃ]

বঙ্গদেশে মঞ্চনাট্যের বর্তমান অবস্থা

অভিনয়ের সময় দর্শকেরা যাতে একাগ্রভাবে মগ্নানুষ্ঠানের প্রাপ্ত মনঃসংযোগ করতে পারেন তার জন্য একাদিকে যেমন সংলাপ বলবার সময় অভিনেতাদের কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য আনা দরকার, তেমনি আবার এক্ষেত্রে কথার বলবার ভাবটা ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট মূভমেন্টের আবশ্যিকতা দেখা দেয়—পর্যাপ্ত পরিমাণে মূভমেন্ট না থাকলে নাটকের ড্রামাটিক ফোর্স যায় নষ্ট হয়ে।

কিন্তু এই মূভমেন্টকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে ফল হয় উল্টো—অনুচিত মূভমেন্টের ফলে দর্শকের মনঃসংযোগে বাধার সৃষ্টি হয়। এই জন্যই প্রডিউসারকে আগে থেকেই ভালভাবে ভেবে ঠিক করে নিতে হয় “কোথায় এবং কেন” তিনি মূভমেন্টের অবতারণা করবেন। মূভমেন্ট ব্যাপারটাকে আমরা তিন দিক থেকে বিচার করে থাকি। প্রথমত প্রডিউসারের দিক থেকে—কারণ তিনিই নাটকের পরিচালনা এবং প্রযোজনার জন্য দায়ী। দ্বিতীয়ত দর্শকের দিক থেকে—যেহেতু তাঁরাই নাট্য-অভিনয়ের পর্যবেক্ষক—তাঁরাই চোখের ওপর সমস্ত ব্যাপারটাকে ঘটতে দেখছেন এবং তৃতীয়ত চরিত্রের দিক থেকে—অর্থাৎ যিনি মূভ করছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে।

প্রডিউসার নিম্নোক্ত যে কোন একটি অথবা একাধিক কারণেই মূভমেন্টের আবশ্যিকতা বোধ করতে পারেন—(১) মঞ্চে মূভ সৃষ্টির স্বাভাবিক নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের অব-

তারণার তাগিদে। (২) চরিত্রের মূভ করাটার ভেতর দিয়ে সহজ, স্বাভাবিক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে। (৩) নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিষ্কৃত করে তোলবার জন্য।

দর্শকদের দিক থেকে বিচার করলে মূভমেন্টকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) নাটকের উৎকর্ষকে মূর্ত করে তোলবার জন্য মূভমেন্ট অফ ইনট্রিনজিক ড্রামাটিক ভ্যালু। (২) এ ছাড়া বাকী সব মূভমেন্ট হচ্ছে মূভমেন্ট অফ নো ইনট্রিনজিক ভ্যালু।

চরিত্রের দিক থেকেও মূভমেন্ট দুই জাতের—(১) বিবেচনাপ্রসূত বা কনসাস মূভমেন্ট। (২) বিবেচনাবিজর্জিত বা আনকনসাস মূভমেন্ট।

বিবেচনাপ্রসূত মূভমেন্ট

প্রডিউসারের তরফ থেকে ঐ জাতীয় মূভমেন্টের সাহায্যেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সবচেয়ে সহজসাধ্য ব্যাপার। প্রযোজক চান মূভমেন্টের পেছনে সব সময়েই একটা কারণ বা হেতু থাকবে—বিবেচনাপ্রসূত জিনিসের বেলার তাঁকে আর এই কারণ খুঁজে বেড়াতে হয় না। দরজা খোলা বা বন্ধ করা—প্রবেশ বা প্রস্থান করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো অবশ্য নাট্যকারের নির্দেশ মত হয়ে থাকে। কিন্তু বারবার তেঁা আর এ ধরনের দরজা খোলা বা প্রস্থান করবার দরকার হয় না—সেজন্য প্রডিউসারকে ভালভাবে নাটকের সংলাপ পড়ে এবং পরিস্থিতি ইত্যাদির বিচার করে বিবেচনাপ্রসূত মূভমেন্টের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করতে হয়। এর জন্য সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দরকার হয়। The producer must look for subtler excuses—excuses which are psychological rather than practical.

মূভমেন্ট সংক্রান্ত কয়েকটি আনুষঙ্গিক নিয়মাবলীর কথা এখানে বলে রাখি:

(১) যেখানে মূভমেন্টের একটা নিজস্ব নাটকীয় সার্থকতা আছে, সেখানে মূভমেন্টের সময় অভিনেতা সজাগ হওয়া উচিত।

(২) যেখানে নাট্যরস সৃষ্টিতে সংলাপের একটা বিশেষ কার্যকারিতা আছে, সেখানে সংলাপ বলবার সময়টার অভিনেতা মূভ করবেন না।

(৩) যেখানে সংলাপ সাধারণ পর্যায়ের সেখানে একই সঙ্গে সংলাপ বলা ও মূভমেন্ট করার কোন বাধা নেই।

(৪) তেমনি, যেখানে মূভমেন্ট সাধারণ পর্যায়ের সেখানেও মূভমেন্ট ও সংলাপ বলা একই সঙ্গে চলতে পারে।

মঞ্চে প্রবেশ এবং প্রস্থানের ব্যাপারেও ওপরের অনুশাসনগুলিই মনে রাখা উচিত। প্রডিউসারকে দেখতে হবে, এক্ষেত্রে জন্য মঞ্চে ঢোকা বা বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাই প্রধান, না যে সংলাপ চরিত্রটিকে বলতে হবে সেটাই প্রধান। যদি ঢোকাটার ওপর দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, তবে অভিনেতা মঞ্চে এসে পজিশন নিয়ে তবে সংলাপ শুরু করবেন। তেমনি বেরিয়ে যাওয়ার ওপর দর্শকের মনঃসংযোগ করতে হলে, অভিনেতা আগে তাঁর বক্তব্য শেষ করে তবে দরজার দিকে যাবেন। আবার যদি এমন হয় যে নাট্যকার সংলাপের শুরু বা সমাপ্তির ওপরই জোর দিয়েছেন, তবে অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করে দরজার কাছ থেকেই সংলাপ শুরু করবেন। (সম্পূর্ণভাবে মঞ্চে আসবার আগেই)—অথবা, চলে যাবার সময়, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলে মঞ্চ ত্যাগ করবেন। মূভমেন্ট অথবা সংলাপের ওপর যেখানে খুব জোর নেই, সেখানে অভিনেতা সংলাপ বলতে বলতেই ঢুকতে বা বেরিয়ে যেতে পারেন।

বিবেচনাবিজর্জিত মূভমেন্ট

অভিনয়ের সময় বেশির ভাগ মূভমেন্টই হয় বিবেচনাবিজর্জিত বা আনকনসাস। প্রডিউসার চান প্রদর্শনীর ভেতর সীমাহীন বৈচিত্র্য আনতে—এবং সে বিষয়ে এই ধরনের মূভমেন্টের থেকেই তিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পান। আবার এর থেকেই বিপদের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। কারণ বিবেচনাপ্রসূত নয় বললেই এ ধরনের মূভমেন্ট দর্শকের চোখে অস্বাভাবিক এবং ক্লান্তিকর হতে পারে।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বার্ষিক টাকা (সভাক)	১৪-০০
ষাণ্মাসিক " "	৭-০০
ত্রৈমাসিক " "	৩-৬০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মাবলী

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বঙ্গমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই মধ্যমেরে পাঠিয়ে থাকি। নাম টিকানাসহ ভাষাটিকটক্স খালি থাকলে একমাত্র মনোনীত নম্ব কেবল পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা কেবল পাঠিয়ে লম্বত নয়। —কর্মাবলী

পারে। সুতরাং সব সময়েই প্রডিউসারের লক্ষ্য রাখা উচিত আনকন্সাস্ মূভমেন্ট যেন এমনভাবে করা হয় যাতে সেটা দর্শকের চোখে স্বাভাবিক এবং অকৃত্রিম বলে মনে হয়।

বিবেচনাবর্জিত মূভমেন্টের যে আসল নাটক সংক্রান্ত কোন মূল্য নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। অতএব এর ব্যবহার সেই-সব ক্ষেত্রেই যুক্তিসম্মত যেখানে একে দৃষ্টিকটু বলে মনে হবে না। কিন্তু তাই বলে তা এর ব্যবহার চলতে পারে না। নাটকের বেশব জায়গায় সংলাপের ধারা অতি সাধারণ ধরনে সেখানেই এ জাতীয় মূভমেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অর্ধহীন মূভমেন্টের ব্যবহার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবার অন্য ধরনের অর্থ-পূর্ণ অর্থ আরোপিত হতে পারে চরিত্রের ওপর। একটি অর্ধহীন মূভমেন্ট হরতো কতিপয়ক নয়—কিন্তু কয়েকটি অর্ধহীন মূভমেন্টের সমাবেশ হরতো চরিত্রের অর্ধহীনতা বা নাচারসনেস বা আনন্দভরত অশ্রিততা কিংবা অন্তরের ভীতি অভিব্যক্ত হতে পারে, যার সঙ্গে চরিত্রটির কোনই মিল থাকে না। ভালভাবে সংলাপের বিশ্লেষণ করেই প্রডিউসার এ ধরনের মূভমেন্টের অবতারণা করবেন।

মূভমেন্টের সময়ের পরিমাপ, সংলাপের সময়ের পরিমাপের সঙ্গেই খাপ খাইয়ে করতে হবে। মন্থরগতি সংলাপের মূভমেন্টও হবে মন্থরগতিতে। তেমনি আবার দ্রুতগতি সংলাপের সঙ্গে মূভমেন্টও হবে দ্রুত। তবে এই সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রম হতে পারে—সময় সময় বৈষম্যের অবতারণা করতে গিয়ে কন্সাস্ মূভমেন্টের দ্বারা সংলাপ ও মূভমেন্টের স্বাভাবিক স্পন্দকে ছেঁতে দেবার প্রয়োজন হয়।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। মূভমেন্ট বলতে শুধু হাতটিকেই বোঝান না—অভিনয় করবার সময় নট দেহ দ্বারা বা কিছু করছেন, তাকেই বলা হয় মূভমেন্ট। এই অর্থে হাতের কাজ বা দৃষ্টি-ভঙ্গী, মাথা নাড়া, পা-টা একটু সরিয়ে রাখা প্রভৃতি সামান্য অঙ্গভঙ্গী বা পরিবর্তনকেও বলা হয় মূভমেন্ট।

ইংল্যান্ডের 'রয়েল আকাদেমী অফ ড্রামাটিক আর্টস'-এর প্রিন্সিপাল মিস্টার জন ফারনল্ড মূভমেন্ট সম্বন্ধে দুটি সাধারণ উপদেশ দিয়েছেন:

(1) As far as possible, all movements in a performance should have some sort of significance, or some sort of excuse.

(2) For the rest, which have neither, let them be such as to pass unnoticed.

জেসচার

অভিনয় এবং প্রথম শ্রেণীর শিপ্পীর পক্ষে জেসচার শব্দটির সংলাপের অর্থ পরিস্ফুটনেই সাহায্য করে না, জেসচারই ভাব প্রকাশের ভাষা এবং মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

আভিধানিক অর্থে জেসচার বলতে ভাব প্রকাশের জন্য যে-কোন ধরনের পৈহিক এবং আঙ্গিক মূভমেন্টকে বোঝায়—কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত জেসচার বলতে হাত এবং বাহুর মূভমেন্টই বোঝায়। তাহলে জেসচার হচ্ছে হস্তমস্তকত—



অন্যায়জন্যপূর্ণ হাতের ভঙ্গী

এবং

আনন্দজন্যপূর্ণ হাতের ভঙ্গী

“Gesture is the language of the hands. It is speech-in-action.—John Bourne. আবার Miss Frances Mackenzie-র মতে —“Gesture cannot be separated from movement, it is a detailed part of it, if by gesture we mean mainly the movements of hands and arms.”

জেসচারের প্রধান বিশেষত্ব হল যে এটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কখন, কেন এবং কতটা জেসচার ব্যবহার করতে হবে সেটা নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ অভিনেতার ভাবোপলব্ধি এবং ব্যক্তিত্বের ওপর। ছাঁচে ফেলে জেসচার তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে না, যে তাই দেখে সেটাকে আয়ত্ত করে নিজে অভিনেতা স্টেজে গিয়ে তার অনুকরণ করে আসবেন—In this sense gesture cannot be learned; all that any training can supply is an awareness of gesture and a basis for its correct execution. Its practice must be left to the individuals ex-

pressive feeling; economy and timing are as far as teacher and director can influence its use, except for an occasional suggestion as to its interpolation from the pictorial angle.

The parts of the body used in this kind of expression are the hand, arm and shoulder, and though all play a very great part in expressing ideas, by far the most work is done by the hands... the hands should be as supple and expressive as possible.

—Gwenda Sayre.

সুতরাং জেসচার প্রত্যক্ষভাবে হাত এবং বাহুর সাহায্যেই করতে হয়। হাতের কাজ সব সময়েই সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে করতে হবে (হাতের মূভমেন্ট হবে কাঁধ থেকে—কনুই থেকে নয়)। তবে জেসচার যাতে কার্যকরী হয় তার জন্য পরোক্ষভাবে সমস্ত অঙ্গ, মূখ এবং বিশেষভাবে চোখের সাহায্য নিতে হয় অভিনেতাকে। চোখের ভেতর ভাব-ব্যঞ্জনা বা থাকলে জেসচার একেবারেই মাটি হয়ে যায়। মণ্ডাভিনয়ের সময় এই সব গুণে আমরা এক নাট্যাচার শিল্পী-স্বামীর ভেতরই দেখেছি। শিল্পীরোত্তর যুগের অভিনেতাদের ভেতর হাতের কাজ এবং মূখচোখের কাজ প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হলে, পাঠকেরা এর পর যখন অভিনয় দেখতে যাবেন এ বিষয়ে একটু নজর দিতে দেখলেই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবেন। নাট্যাচার শিল্পীরকুমার বালুজেন—বিশ্বনাথ যে কত বড় অভিনেতা ছিলেন তা স্পষ্টভাবে বোঝা যেন অভিনয়ের সময় তাঁর জেসচারের ভঙ্গী দেখে।

[সমাপ্ত]

সঙ্গীত-নামক

গোপালকবর কল্যাণাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ

প্রতি ভাগ-৫।

হারমোনিয়াম শিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ

কলকাতা প্রাইভেট লিমেটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২



বহুনির্দিত একটি বাধা অপসারণ

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অসংখ্য হুমাবাদ তাঁরা নাট্যজগতের একটি অপমানজনক বাধা অপসারণ করেছেন। এখন থেকে আর নাটক অভিনয় করবার জন্য পুলিশের ছাড়পত্র নিতে হবে না। নাটকের পাশ্চাত্য পুলিশকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নেবার আর প্রয়োজন হবে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কালে এই বিধি প্রবর্তন করা হয়। এই বিধির বলে সাম্রাজ্যবাদী আমলে প্রগতিশীল নাট্যকারদের অনেক দুর্ভাগ্য ভুগতে হয়েছে। দেশপ্রেমমূলক নাটক অভিনয় প্রায় অসম্ভব ছিল। কয়েকজন নাট্যকারকে দমননীতির কবলেও পড়তে হয়েছিল। এই বিধির বলে লালবাজারের পুলিশ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের লেখার ওপর পর্যন্ত তাদের নোংরা কালির দাগ দিয়েছে। তারা নীলদর্পণের নাট্যকার বীনবন্ধু স্মিতকে লালবাজারে হাজির হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে, যদিও তার বহু পূর্বে তিনি পরলোকগমন করেছেন। এই বিধির দ্বারা পুলিশের এমন অনেক কুকীর্তি আছে যা আজকে হাসির ব্যাপার হয়েছে, কিন্তু একদিন ছিল বড় বেদনার, বড় অপমানের জন্মলাভ ডরা।

দেশ স্বাধীন হবার পর নাট্যকার ও নাটকের দলগত পুলিশ স্বাধীন দেশের সরকারের কাছে এই বিধি নাকচ করে দেবার জন্য বার বার আবেদন করেও কোন সাড়া পায় নি। ইংরেজ আমলের এই বিধি নাকচ করবার মত সাহস কংগ্রেস সরকারের ছিল না। নাটকের দলগত যখন এই দাবি করেছে তখন কংগ্রেস সরকারের পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে। গত কুড়ি বছর পর্যন্ত এই বিধি—নাটকের জগতে একটা অপমানের পাখা-ভারের মত হয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন কয়েকজন নাট্যকার ও নাটকের দল পুলিশের মঞ্জুরী ব্যতীত নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু পেশাদার দলগত পুলিশ বিনা মঞ্জুরীতে নাটক অভিনয় করতে দিতে রাজী হয় না। পরাধীনতার শৃঙ্খলের একটি পরিশিষ্টকে বর্জন করবার মত সাহস তাদের ছিল না। খুব বেশি দিনের কথা নয়, গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে রূপান্তরীর ‘অমর ভিয়েতনাম’ নাটকটি পুলিশের মঞ্জুরী না পাওয়ায় নিউ এম্পায়ার-এ অভিনীত হতে পারে নি। স্বাধীনতা লাভের পরও কংগ্রেস সরকারের দাস মনোভাবের জন্য নাট্যজগৎ এবং নাটকের দর্শকরা স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে পারে নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার মাত্র সতের দিন পরে নাট্যজগৎ এই প্রথম স্বাধীনতার একটি সোপানে আরোহণ করতে পারল। গত কুড়ি বছর কংগ্রেস সরকার যা পারে নি যুক্তফ্রন্ট সরকার সতের দিনেই তা করতে পারল। আজ আর নাটকের দলগত পুলিশকে লালবাজারে ও থানায় দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না, রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক নাট্যকারদের লেখা পুলিশের টেবিলে দেবার মত অসম্মানের কাজও আর করতে হবে না। পাবলিক হলগুলির কর্তারা আর পুলিশের দোহাই দিয়ে প্রগতিশীল নাট্যসংস্থাগুলির জন্য দরজা বন্ধ করতে পারবে না। গত সপ্তাহে আমরা নাট্যজগতের যে বাধাগুলি অপসারণের জন্য দাবি করেছিলাম—যুক্তফ্রন্ট সরকার এক প্রেসনোট জারী করে তার একটি বড় বাধা দূর করেছেন। সকলে আশা করছেন অন্য দাবিগুলি সম্পর্কেও তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ১৮৭৬ সালের নাটক অভিনয় আইন—এই প্রেসনোটের ফলে অনেকটা অকার্যকরী হয়ে গেলেও এই আইন পশ্চিমবঙ্গে বাতিল, এমন ঘোষণা হওয়া প্রয়োজন।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই নির্ভীক পদক্ষেপ নাটকের জগতে এক নতুন চেউ তুলবে। এসময় নাটকের দল, সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীদের কর্তব্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শক্তিশালী করবার জন্য, প্রতিজ্ঞার বিদ্রোহ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নাটক রচনা করা। যুক্তফ্রন্ট সরকার সমর্থনে এবং তাদের গণসমর্থনের ভিত্তিকে আরো মজবুত করার জন্য শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমাবেশ করা। —সংজন।



ইন্সপেক্টর রহমান
২৯শে ও ৩০শে মার্চ নিউ এম্পায়ারে
নৃত্যগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্রশ্রীমালা

অনুপমা

[পরিচালনা : হৃষীকেশ মুখার্জী]

এল, বি, ফিল্মসের ‘অনুপমা’ আজ কালকার হিন্দী ছবির জগতে সত্যিই অতুলনীয়। হিন্দী ছবি যেভাবে হলিউড ছবিকে অন্ধ অনুকরণ করেছে, দেশের মাটি, মানুষ ও মনের সঙ্গে সম্বন্ধ আশ্রয় হয়ে গেছে, যেভাবে কেবল পাঁচমেশালী রসের জোপান দিয়ে ছবি করেছে সেফ্রেয়ে অনুপমার মত ছবি করা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অবশ্য এই ছবিতে যে স্থূলতা নেই এমন কথা বলছি না, অথবা সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ এমনও নয়। হিন্দী ছবির বর্তমান অবস্থা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই তুলনা। এইদিক থেকে ‘অনুপমা’ যদি হিন্দী ছবির দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয় তবে সেটা ভবিষ্যতের পক্ষে আশার কথা হবে। বলা যাবে—ভবিষ্যতে ভাল হিন্দী ছবি করার মত অবস্থা ফিরে আসবে। অর্থাৎ প্রয়ো-



‘অনুপমা’-র নায়িকা—শর্মিলা ঠাকুর

জকরা ইচ্ছা করলে ভাল ছবি করতে পারে। দর্শকদের ওপর দোষ চাপিয়ে আসলে তারাই হিন্দী ছবির জগৎকে বিকৃতির পথে নিয়ে গেছে।

উমা এক হতভাগ্য্য তরুণী। সে জন্মকণে মাকে হারিয়েছে। তার পিতা মোহন উমার জন্মের সময় স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য মেয়েকে কখনো স্নেহের চোখে দেখতে পারে নি। প্রেমময়ী স্ত্রী তার সমস্ত অন্তর জুড়ে আছে। উমা বড় হয়েছে পরিচারিকা সরলার কাছে। পিতার তাচ্ছিল্যে গভীর বেদনায় প্রায় মৃক উমার নিঃসঙ্গ জীবনে পিতৃবন্ধুর কন্যা অতি আধুনিকা অনিতা বা এ্যানি প্রায় ঝড়ের মত এসে উপস্থিত। এই ঝড়ের বেগে চলার তার সাথ্য না থাকলেও সে তাকে দেখে আনন্দ পায়। অনিতার সামাজিকতার পথ ধরে উমার জীবনে -উপস্থিত হয় অশোক। এক আদর্শবাদী লেখক। এই প্রায়মৃক মেয়েটি অশোকের মনে গভীর রেখাপাত করে। উমাও অশোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দু-জনার নীরব প্রণয়কে সার্থক করে তুলতে অতি আধুনিকা হরও এ্যানির মনে মানবিকতার যে বলিষ্ঠতা দেখা গেলে তারও বৃদ্ধি তুলনা হয় না। এই প্রণয়ের সূত্র প্রকাশ পেল অশোকের নতুন লেখা উপন্যাস অনুপমায়। তার কল্পনার অনুপমা উমার জীবনে মূর্ত

হয়ে উঠলো। উমাও বাবার আশীর্বাদ নিয়ে তাদের বড়লোকের সমাজ থেকে বেরিয়ে এল অশোকের গরিবী সংসারে।

ছবিতে মোহন ও তার স্ত্রীর প্রণয়-জীবনের ঘটনাবলী, হাসিখুশি ভরা মোসেসের সারল্য, অনিতার চাপল্য ও মানবিকতা ইত্যাদি খুব উপভোগ্য রূপেই উপস্থিত হয়েছে। সরলা এবং অশোকের পরিবারকেও দর্শকদের ভাল লাগে। কাহিনীকার ও পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জী যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে চরিত্রগুলি উপস্থিত করেছেন। ছবিতে উমার চরিত্রে অভিনয় করেছেন শর্মিলা ঠাকুর। প্রায়-সংলাপহীন এই চরিত্রটিকে শ্রীমতী শর্মিলা যথেষ্ট সংবেদনশীল করে তুলেছেন। অশোকের চরিত্রে ধর্মেন্দ্রকেও ভাল লাগে, সিনেমার চলিত রীতি অনুসারে তিনি এক লেখক ও ন্যায়বুদ্ধিসম্পন্ন যুবককে রূপ দিয়েছেন। অনিতার চরিত্রে শশিকলা আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এক চণ্ডলা তরুণীর চরিত্রে। যদিও গলার নিচের ভাজে তাঁর বয়স গোপন করা সম্ভব হচ্ছিল না কিন্তু তাঁর অভিনয় বাস্তবিকই দেখার মত। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে ডেভিড, সুব্রত, পশুভ, দুলারী, নায়না, দুর্গা খোটে, দেবেন ভার্মা, ব্রাহ্মভরম্বাজ, তরুণ বোস, অমর প্রমুখ সকলেই নিজ নিজ ভূমিকা সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন।

সঙ্গীতের অংশে হেমন্ত মুখার্জীর কাজ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। চিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা প্রভৃতি বিভাগের কাজ-গুলি সন্তোষজনক হওয়ায় ছবিটি সর্বদিক থেকে সফল হয়েছে।

যদিও ছবিতে ‘উদয়ের পথে’ ‘শুভা’ প্রভৃতি ছবির প্রভাব দেখা যায় তথাপি এরূপ ছবি করতে পারার জন্য হৃষীকেশ মুখার্জী ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

অভিশপ্ত চম্বল

[পরিচালনা : মজু দে]

মজু দে প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি ‘অভিশপ্ত চম্বল’ মৃতিলাভের পূর্বেই যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকায় চম্বলের ডাকাতদের কাহিনী পাঠকমহলে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। সর্বোদয় নেতা বিনোবা ভাবে মানবিক দিক থেকে মধ্য-প্রদেশের দস্যুদের বিষয়ে জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর থেকে এই অঞ্চলের ডাকাতদের নিয়ে হিন্দীতে কয়েকটি ছবি হয়েছে। পশ্চিম-

বঙ্গে শ্রীমতী মজু দে প্রথম উদ্যোগী হয়েছেন তরুণ তাদুড়ী রচিত ‘অভিশপ্ত চম্বল’—কাহিনীকে অবলম্বন করে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শ্রীমতী দে এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন

কেবল মধ্যপ্রদেশে নয়, সব রাজ্যে ডাকাতদের ব্যাপারটা মূলত ভূমি-সমস্যা, সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্য ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট। কিন্তু শাসকশ্রেণী কখনো এই সমস্যাকে মূলগত দিক থেকে বিচার করতে পারে নি। কোনকালে ভার্য এদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, কোন-কালে তাদের পুলিশ দিয়ে দম্বন করতে চেয়েছে। ফলে ডাকাতদের হিংস্রতা বেড়েছে, অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে যেসব ছবি হয়েছে এবং উপন্যাস লেখা হয়েছে তার কোনটাতাই মূল সমস্যাকে তুলে ধরা হয় নি। এই ধরনের ডাকাত দল সৃষ্টি যে শ্রেণী শোষণজনিত কারণে হয় এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। এরা কেবল মানবতার দিকটাকেই প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ এরাও মানুষ, স্বাভাবিক জীবন-যাপনের প্রয়াসী, কিন্তু পরিস্থিতি তাঁদের ডাকাত করেছে ইত্যাদি। ভবিষ্যতের ছবি ও লেখার সময়ায় মূলে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।



‘অনুপমা’-র নায়ক—ধর্মেন্দ্র



‘জীবন-মৃত্যু’ চিত্রের একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সূদীপ্তা দেবী

করে, কিন্তু নিজেও জীবন দিয়ে জানিয়ে যায়, পাপের পথে পাপের শেষ হয় না।

এরূপ অ্যাকশন ছবি বাংলাতে সাধারণত হয় না। এদিক থেকে ছবিটি দর্শকদের কাছে আকর্ষক হবে। রোমাঞ্চকর ছবি দেখতে যারা ভালবাসেন তারা এই ছবিটি পছন্দ করবেন। শ্রীমতী দে চিত্র পরিচালনা ক্ষেত্রে প্রথম হলো এখানে তিনি যে কম্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসাজনক। তবে শেষ অংশে পুতলীর জীবনাবসানের পর ঘোষকের মন্তব্যটুকু না বললেই ভাল। কারণ ছবিতে এই সমস্যার মূল কথা যখন বলা হয় নি, তখন সহানুভূতিসূচক কথাটি বলে লাভ কি? ছবিটির দৃশ্য গ্রহণের জন্য মধ্যপ্রদেশে বহির্দৃশ্য গ্রহণ এবং অভ্যন্তরীণ দৃশ্যের কাজের সমন্বয় ভালই হয়েছে। এতে বাস্তব পরিবেশ রচিত হয়েছে।

ছবিতে পুতলীবাঈ-এর চরিত্রে শ্রীমতী মঞ্জু দে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। সুলতানের চরিত্রে প্রদীপকুমারের অভিনয়, এবং বাবু লোহারীর চরিত্রে শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাধনা রায়চৌধুরী, গীতা দে, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সীতা মুখার্জি, নবকুমার দাস, শম্ভু ভট্টাচার্য, প্রমথ আরো বহু জন।

চিত্র গ্রহণে রামানন্দ সেনের কাজ বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। ছবিটির সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি ও বিপ্লব রায়চৌধুরী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মঞ্জু দে ‘অভিশপ্ত চন্দল’-এর নায়িকা পুতলীবাঈ—ছিল বাইজী। এক নাচের জলসা থেকে সুলতান সিং ডাকাতির দল ভাঙে লুটে নিয়ে আসে। ক্রমে দু’জনে প্রণয়বন্ধনে বাঁধা পড়ে এবং পুতলীর গর্ভে জন্ম দেয় সুলতানের সন্তান। এ সময় দু’জনার মধ্যেই এই সন্তানকে কেন্দ্র করে খর বাথার স্বপ্ন জেগে ওঠে, কিন্তু উপায় নেই। পুতলী সমাজে গিয়েও আবার ঘিরে আসতে বাধ্য হয়। কিছুদিনের মধ্যে দলের বিশ্বাসঘাতকতার সুলতান নিহত হয়। পুতলী নিজের চোখে তা দেখে। সে হিংস্র বাঘিনীর মত হয়ে ওঠে। মানসিংহের সঙ্গে দেখা করে সে নিজে দল গঠন করে এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ



পল্লি ফিল্মসের ‘চোরগা’-র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সূদীপ্তা দেবী

সুটি ও গল্প

জীবন-মৃত্যু

বি. এম. ডি মন্ডির প্রথম ছবি 'জীবন-মৃত্যু' আগামী ১৪ই এপ্রিল উত্তরা, পূর্ববঙ্গী, উজ্জ্বলা এবং অন্যান্য সিনেমায় মুক্তিলাভ করবে জানা গেছে। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের লেখা গল্প অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য লিখিত হয়েছে। অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে প্রেমকাহিনীর সংমিশ্রিত এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী। এঁদের সঙ্গে আছেন কমল মিত্র, তরুণ-কুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জি, সুমিতা বিশ্বাস, দীপক মূখার্জি, অমর মল্লিক, এন বিশ্বনাথন, মিহির ভট্টাচার্য, প্রশান্তকুমার প্রমুখ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন হেমেন নাগ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

আকাশছোঁয়া

চলচ্চিত্রায়নের 'আকাশছোঁয়া' মুক্তি-লাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সার্কাসের পটভূমিকায় এই ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনীর রচয়িতা শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী। পরিচালক রাজেন

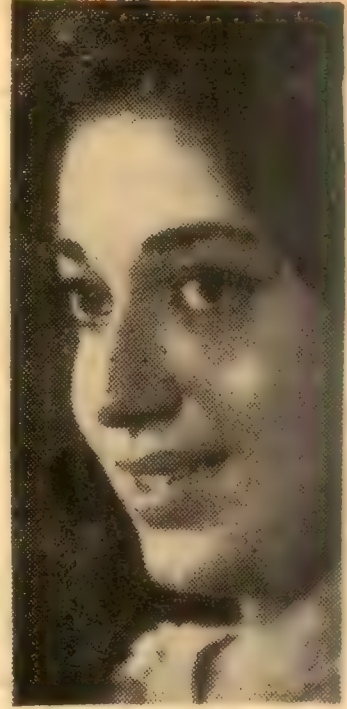
সুন্দর চিত্রনাট্য রচনা এবং ছবিটি পরিচালনা করেছেন। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন: সুপ্রিয়া দেবী, দিলীপ মূখার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, এবং অন্যান্য ভূমিকায় আছেন বিনতা রায়, ছায়া দেবী, শিখা ভট্টাচার্য, চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ এবং একদল সার্কাসের খেলোয়াড়। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন রেণুকা ঘোষ ও দিলীপ মূখার্জি। চণ্ডীমাতা ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

প্রতিদান

এম. বি প্রোডাকসন্সের 'প্রতিদান' ছবিটির কাজ অজিত গাঙ্গুলীর পরিচালনায় শেষ হয়েছে। ছবিটি বর্তমানে সম্পাদনা হচ্ছে। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন: অনিল চ্যাটার্জি, কালী বানার্জি, জহর রায়, অনুভা গুপ্তা, কাজল গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, মলিন্য দেবী, ছায়া দেবী প্রমুখ।

বৈজয়ন্তীমালার বাগদান অনুষ্ঠান

এক সংবাদে প্রকাশ প্রথাতা চলচ্চিত্র তারকা বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে ডাঃ সি এল বালির বাগদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বোম্বের খেপীয়ান সী রোডের অশোকা অ্যাপার্টমেন্টে বৈজয়ন্তীমালার নিজস্ব গৃহে এই বাগদান অনুষ্ঠিত হয়েছে।



'দশ লাখ' হিন্দী ছবির নায়িকা বিবিতা

বিয়ের দিন এখনো স্থির হয় নি। ডাঃ বালি বৈজয়ন্তীমালার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। প্রকাশ ডাঃ বালি বিবাহিত এবং চার সন্তানের জনক।

ইয়ুথ সেমিনারের উৎসব

ইয়ুথ সেমিনারের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব ১৭ই ও ১৮ই মার্চ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসুধাংশু বসু এম-এ, সম্পাদক, হিন্দু-স্থান স্ট্যান্ডার্ড, এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে বোম্বে দস্তর মুকাভিনয়, অজয় গাঙ্গুলীর আবৃত্তি, শ্বপেন কলভের গীটার এবং নবনশাখা সিংহ ও সম্প্রদায়ের নৃত্য দর্শকচিহ্ন জর করে। দ্বিতীয় দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌকর্যজন শাখার নাটক জমুডলাল বসুর 'বিবাহ বিপ্রাট' এবং হিম্যাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের যন্ত্রসঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য



জাপানী ছবি 'দিল কু ফাই' ছবির একটি দৃশ্য

হয়। অনুষ্ঠান দুটি পরিচালনা করেন
শ্রীমতী মজুমদার এবং শ্রীঅশোক
চট্টাচার্য।

সোভিয়েট সংস্কৃতি কোন্ডে সেক্সপীয়র চলচ্চিত্র উৎসব

“ওথেলো”, “হ্যামলেট” ও “টুয়েলফথ্
নাইট”—সোভিয়েট ইউনিয়নে তোলা
সেক্সপীয়রের এই তিনটি অবিস্মরণীয়
নাটকের চলচ্চিত্ররূপ গত ১৩ই মার্চ থেকে
দিবসীতে সোভিয়েট সংস্কৃতি কেন্দ্রে দেখান
সুরু হয়েছে। নয়াদিহীর রুশ ভাষা
ইনস্টিটিউটের অধ্যাপিকা শ্রীমতী এলেনা
অ্যালেক্সেয়েভনা অ্যালেক্সেভনা সেক্সপীয়র
চলচ্চিত্র উৎসবের উন্মোচনী ভাষণে
সোভিয়েট ইউনিয়নে মহাকাব্য সেক্সপীয়রের
অসাধারণ জনপ্রিয়তার উল্লেখ করেন।
এরপর “ওথেলো” ছবিটি দেখান হয়।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী অ্যালেক্সেয়েভনা
বলেন, সেক্সপীয়র চর্চা তাঁর দেশে বহু-
দিন থেকে চলে আসছে। পুস্কিন ও
তুর্গেনেফ ছিলেন সেক্সপীয়রের একান্ত
অনুরাগী। মস্কায় মহাকাব্যের এক প্রতি-

মূর্তি স্থাপিত রয়েছে এবং তাকে ঘিরে
রয়েছে মহাকাব্য সৃষ্ট সেই চারটি অবি-
স্মরণীয় চরিত্রঃ হ্যামলেট, লেডী ম্যাকবেথ,
ফলস্টাফ ও অস্টম হেনরী। সেক্সপীয়রের
নাট্যাবলম্বনে চাইকোভস্কী থেকে প্রোকো-
ফিয়েফ প্রমুখ বহু বিখ্যাত সরকার সঙ্গীত
রচনা করেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সেক্সপীয়র-

নাটকের চলচ্চিত্ররূপ তোলা হয় : ১৯৫৫
সালে “ওথেলো”, ১৯৬০ সালে “টুয়েলফথ
নাইট” ও এর পাঁচ বছর পরে “হ্যামলেট”।
সোভিয়েট ইউনিয়নে সেক্সপীয়র-নাট্যের
চলচ্চিত্ররূপ বিশ্বব্যাপী উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা
লাভ করেছে। সোভিয়েট “হ্যামলেট”
চলচ্চিত্রের কপি পৃথিবীর ৯৮টিরও বেশি
দেশ ক্রয় করেছে।



‘পান্না’ হাবির একটি দৃশ্যে আরতি কুন্ড ও রমাপ্রসাদ



‘আকাশছোঁয়া’ হাবির একটি দৃশ্যে দিলীপ মদ্যাজী ও সুপ্রিয়া দেবী।

অগ্নিবীণা

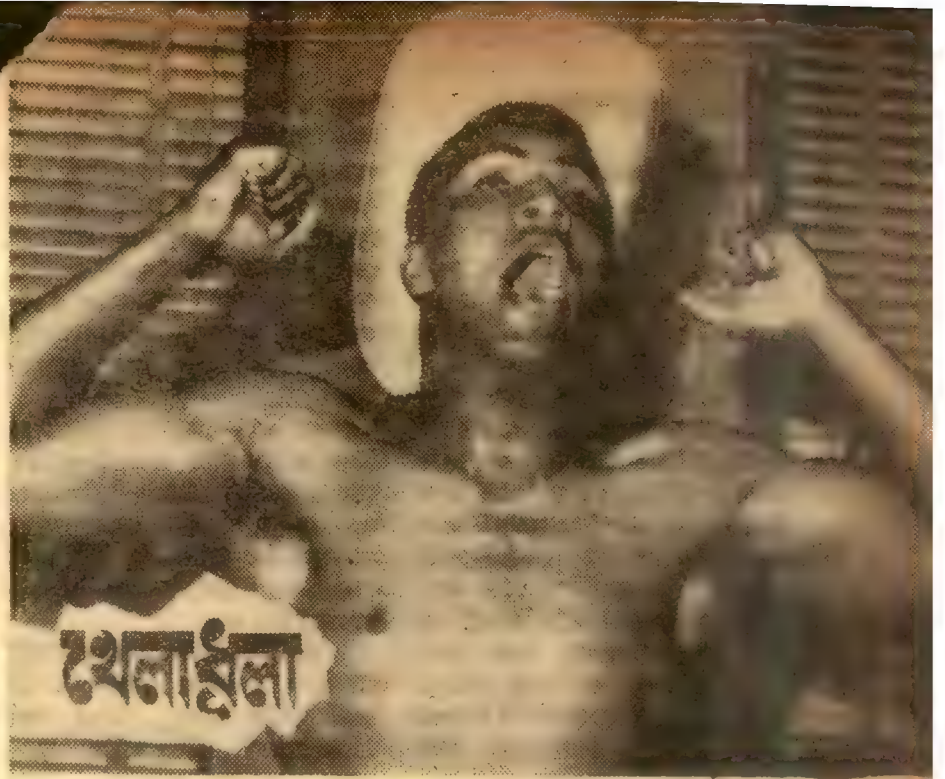
অল ইন্ডিয়া রোডও আগামী মে
মাসে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী
অবলম্বনে এক গীতি-আলেখ্য প্রচারের
উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই অনুষ্ঠানের
নাম ‘অগ্নিবীণা’। বাংলা, হিন্দী, মারাঠি
অবলম্বনে এক গীতি-আলেখ্য প্রচারের
হবে জানা গেছে। কলকাতা বেতার
কেন্দ্রের শ্রীগোপাল দাশগুপ্ত ‘অগ্নিবীণা’
প্রযোজনা করেছেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
করেছেন কাজী সব্যসাচী, বিখ্যাত চলচ্চিত্র
অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী, অভিনেত্রী
কপিকা মজুমদার, নির্মলা মিশ্র, শ্বিজন
চৌধুরী প্রমুখ আরো বহু শিল্পী।
‘অগ্নিবীণা’-র বাংলা রেকর্ডিং হয়ে
গেছে :

স্কুল
আমাদের
ইংল্যান্ডের
আর সদ্য ভারত
অস্ট্রেলিয়া স্কুল একাদশ।
একাদশের আমন্ত্রণেই এবার
স্কুল একাদশ ইংল্যান্ড সফরে
ছে। বিদেশে ভারতীয় দলের সফরে
যাওয়া এবং বিদেশী দলের ভারত সফরে
আসা বর্তমানে কিংবা বাধা এবং সমস্যা-
সংকুল হয়ে উঠেছে। প্রধান এবং একমাত্র
সমস্যা হল বৈদেশিক মদ্রা সংক্রান্ত!
ভারতীয় অর্থদপ্তরের মদ্রার ফাঁক থেকে
খেলাধুলার জন্য বৈদেশিক মদ্রা গলে না
বলেই চলে! একথা অবশ্যই স্বীকার্য
যে, ভারতের বর্তমানে বৈদেশিক
মদ্রার ভান্ডারের সত্ত্ব প্রায় তলায়
ঠেকেছে। তাই খেলাধুলার জন্য বৈদেশিক
মদ্রা আদায়ের জন্য অর্থদপ্তরের কাছে
বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা কয়েকবার কিরূপ
নাজেহাল বে হয়েছে, তা প্রত্যেক ক্রীড়া-
মোদীই জানেন ভালভাবে।

যাই হোক ভারতীয় অর্থদপ্তর সর-
কারিভাবে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের
ইংল্যান্ড সফরের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক
মদ্রা মঞ্জুর করেছেন। অথচ অল্প কয়েক-
দিন পূর্বে ভারতীয় ফুটবল ফেডারে-
শনের পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্মুখের
বৈদেশিক মদ্রা মঞ্জুরের আবেদন নাকচ
করে অর্থদপ্তর। এশিয়ান ফুটবল প্রতি-
যোগিতা এ বছর ভারতে অনুষ্ঠিত করার
জন্য ওই বৈদেশিক মদ্রার প্রয়োজন ছিল।
বৈদেশিক মদ্রা নামঞ্জুর হওয়ায় এশিয়ান
ফুটবল প্রতিযোগিতা ভারতে অনুষ্ঠিত
করার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল।

স্কুলের ছেলেদের এই ক্রিকেট
দলটিকে বৈদেশিক মদ্রা মঞ্জুর করে অর্থ-
দপ্তর খুবই ভাল করেছেন। কারণ, এই
সব ছেলেদের মধ্য থেকেই ভারতীয়
ক্রিকেট পাবে ভবিষ্যতের টেস্ট খেলোয়াড়।
আর বিদেশ সফরের মূল্য; বিশেষত এই
তরুণ স্কুল ক্রিকেটারদের কাছে সত্যই
অসীম। এই ধরনের সফরের ফলে তরুণ
খেলোয়াড়েরা ক্ষেত্র অনুপ্রাণিত হবে
নিঃসন্দেহে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রায় চার্বিশ
জন স্কুলের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মধ্য
থেকে চূড়ান্ত বোলজন খেলোয়াড় নির্বা-
চিত হবে। প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক লালু
অমরনাথের পুত্র সুব্রহ্মণ্য অমরনাথের
অধিনায়ক মনোনীত হওয়া প্রায় নিশ্চিত।
ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলটি জুলাই
মাসের ষোল তারিখে ইংল্যান্ড যাত্রা করবে
এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ইংল্যান্ড সফর
করবে।



খেলাধুলা

জোনা ফোলির সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার পূর্বে অনুশীলনরত ক্যারিয়ার ক্রু

ওরেলের মরদেহ সমাহিত

বিশ্ব ক্রিকেটের অবিস্মরণীয় নায়ক
স্যার ফ্র্যাঙ্ক ম্যাগলিন ওরেলের শবধারের
ওপর একটি উইলো কাঠের ক্রিকেট ব্যাট
স্থাপন করা হয়, ক্রিকেটের সঙ্গে তাঁর
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতীক হিসাবে।
১৯শে মার্চ দিনটি সারা ক্যারিবিয়ান
কমনওয়েলথে শোক দিবস হিসাবে পালিত
হয়; ওয়েস্ট ইন্ডিজের গৌরব স্যার

প্রীতিমিত্রতা

ফ্র্যাঙ্কের স্বর্গত আত্মার সম্মানার্থে
স্থানীয় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা
হয়।

স্যার ফ্র্যাঙ্কের মরদেহ সম্পূর্ণ
রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়
ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস
এন্ড সায়েন্স কলেজের প্রাঙ্গণে। পূর্বে
ব্রিজটাউনের সেন্ট মাইকেলস গ্র্যাংগলে-
ক্যাল চার্চে এক প্রার্থনা সভায় শেষকৃত্য
সম্পন্ন হয়। স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের জন্ম
এই ব্রিজটাউনে এবং কৈশোরে এই চার্চের
উপাসনা গায়ক দলের একজন সভ্য
ছিলেন। ব্রিজটাউনে একটি হলে ওরেলের
মরদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শায়িত ছিল।
অগণিত অনুরাগীরা দল তাঁদের অতি
প্রিয় ফ্র্যাঙ্কের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি
নিবেদনের জন্য আসেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের
কয়েকজন বিশ্বখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় সহ

বহু খেলোয়াড় বারিা বিভিন্ন সময়
ওরেলের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা
ওরেলের মরদেহ প্রদক্ষিণ করেন এবং
তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ওরেলের মরদেহ সমাহিত করার
সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ
উপস্থিত ছিলেন, এঁদের মধ্যে উল্লেখ-
যোগ্য হল ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া,
কানাডা, ব্রিনিদাদ, গায়ানা প্রভৃতি রাষ্ট্র।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা
গান্ধী এবং ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ
ওরেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর শোক-
সন্তপ্ত পরিবারের কাছে শোকবার্তা প্রেরণ
করেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বে রোডও স্টেশন-
গুলি ধারাবিবরণী প্রচার করেছে ওরেলের
খেলার মাঠের উজ্জ্বল চিত্রের প্রদর্শন।
সেই স্টেশনগুলি ওরেলের তরুণ-
ক্রিয়ার ধারাবিবরণী প্রচার করে এবং
টেলিভিশনের ক্যামেরাও ক্রিকেটের
অমর নায়কের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সম্মুখ
চিত্র গ্রহণ করে।

ধীরে ধীরে স্যার ফ্র্যাঙ্ক ম্যাগলিন
ওরেলের মরদেহ স্থাপিত শবধারটি
নামিয়ে দেওয়া হয় কবরের মধ্যে; কান্নায়
ভেঙে পড়েন লর্ড ওরেল; কান্নায়
ভেঙে পড়েন ওরেলের দীর্ঘতীর্থ বিশ্বখ্যাত
টেস্ট খেলোয়াড়ের দল, কান্নায় ভেঙে
পড়ে অগণিত ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান।

বাংলা পরাজিত

গতবারের জাতীয় হকির যাদু মনোহর রেলওয়ের কাছে শেষ পর্যন্ত নতুনতম গোলের ব্যবধান পরাজিত হয়ে বাংলা দলকে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হল। ডুবের ছোঁয়াচ রোগ ধরেছে মাদুরাইয়ের জাতীয় হকির আসরকে।

কোয়ার্টার ফাইনালের খাপে রেলওয়ে এবং বাংলা দলের খেলার মীমাংসা হল চতুর্থ দিন। রেলওয়ে এবং বাংলা দলের প্রথমদিনের খেলার বিবরণ ইতিপূর্বে গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। এবার সূত্র করছি দ্বিতীয় দিনের খেলার বিবরণের সূত্র ধরে। বর্ষপিসিক মাদুরাইয়ের হকি মাঠে দ্বিতীয় দিন দুই দল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। প্রধানত অলিম্পিক খ্যাত ব্যাক গুরুবঙ্গ সিংয়ের অনবদ্য ক্রীড়াধারার জন্য রেলওয়ে দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা গোল করতে পারেন নি। অন্যদিকে বাংলা দলের সমস্ত আক্রমণধারা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করেন রেল দলের অধিনায়ক অলিম্পিকখ্যাত হাফ মহীন্দার লাল। তৃতীয় দিনের খেলাটিও দারুণ বর্ষণের জন্য পরিত্যক্ত হয়। উভয় দল প্রথমার্ধে একটি করে গোল করেন।

চতুর্থ দিন রেলওয়ে এবং বাংলা দলের খেলার মীমাংসা হয়। খেলার প্রথমার্ধে কোন দলই গোল করতে পারে নি। দ্বিতীয়ার্ধে ৩১ মিনিটের সময় রেলওয়ে দলের লেফট হাফ পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে বিজয়সূচক গোলটি করেন। পরাজিত হলেও বাংলা দল যে উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াধারার পরিচয় দেয় তা সত্যি প্রশংসনীয়। মাদুরাইয়ের মাঠে বিপুল দর্শক সমাগম হয় এবং বাংলা দলের

আহত হয়ে বাংলার রক্ষণভাগের স্তম্ভ গুরুবঙ্গ সিং মাঠ পরিত্যাগ করেন। এই সংঘর্ষে গুরুবঙ্গের জন দিকের কণ্ঠের হাড় ভেঙে গিয়েছে। খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শেষ হয়। বাংলা দল এইদিন সাতটি পেনাল্টি কর্নারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। রেলওয়ে দল সেমিফাইনালের পরবর্তী খেলায় মিলিত হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে।

অপর একটি কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় মধ্যপ্রদেশকে ১-০ গোলে পরাজিত করে মাদ্রাজ সেমিফাইনালে সার্ভিসেসের সঙ্গে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। সার্ভিসেস এবং মাদ্রাজ দলের প্রথম দিনের খেলা ১-১ গোলের ফলাফলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ময়দান হকি লীগের খেলায় হ্যাট্রিকের ছড়াছড়ি। এ পর্যন্ত লীগের খেলায় আটটি হ্যাট্রিক হয়েছে। লীগের অষ্টম হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন খালসা ব্রুজের জাগমিন্দার সিং। খালসা ব্রুজ এই খেলায় ৩-১ গোলে বো এ সিকে পরাজিত করে। লীগের নয়টি খেলায় বোল পয়েন্ট সংগ্রহ করে অপরাধিত অবস্থায় বর্তমানে খালসা ব্রুজ লীগের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। জাতীয় হকিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কলকাতার প্রধান দলগুলির খেলোয়াড়েরা মাদুরাইয়ে যাবার ফলে বড় বড় দলগুলি বর্তমানে লীগের খেলায় অংশগ্রহণ করছে না।

বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশনের লীগ কমিটি একটি সভায় লীগের তিনটি খেলা প্রদর্শনী খেলা হিসাবে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই তিনটি সমর্থকই ছিল বেশি। রেলওয়ে দলের লেফট-ইন ইন্ডার সিংয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে

মোহন বারোয়া বোলিং করেছিলেন। ভারতীয় হকি ফেডারেশন কাপের প্রতিযোগিতা আগামী ১৫ই এপ্রিল কাপে অংশগ্রহণের আবেদনের ১০ই এপ্রিল। এবারের বাইটন প্রতিযোগিতাকে নতুন রূপ দেবার বি, এইচ, এর লীগ কমিটি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। খেলাটি বহিরাগত দলের মধ্যে দশটি দলকে আমন্ত্রিত দল হিসাবে প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাঁরা। বহিরাগত দলগুলির মধ্যে গতবারের বিজয়ী পাকিস্তান পলিশ এবং রানাস আপ জলন্ধরের কর্পস সিগন্যালসও আছে।

পক প্রণালী স্তর প্রত্যাগতা

প্রথম পক প্রণালী স্তর প্রত্যাগতা যোগিতার আয়োজন প্রায় সমাপ্তির পথে। সিংহলের তালাইমার থেকে এই প্রতিযোগিতা সূত্র হবে আগামী ৩রা এপ্রিল ভোর চারটের সময়। ভারতের হ'জন কৃতি দুরপাল্লার সাতার এই প্রথম প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করবেন। হ'জন প্রতিযোগী হলেন বাংলার বৈদ্যনাথ দাস এবং দেবী দত্ত; রেলওয়ের কে, কে, মন্ডল এবং এল, এন, ভৌমিক; সার্ভিসেসের এন, সি, পাল; মহারাষ্ট্রের সুভাষ পট্টবর্ধন; উত্তরপ্রদেশের উমেশ ভান্সি এবং মহারাষ্ট্রের সাতার। আরও হ'জন সাতার প্রতিযোগীদের সংগদানের জন্য সাতার কাটবেন।

এ বছর প্রথম এই প্রতিযোগিতা সূত্র করা হচ্ছে বলে প্রতিযোগীদের সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে। মহিলা প্রতিযোগীদের



ভারতের দুই দুরপাল্লার সাতার : লক্ষ্মী ভৌমিক এবং দেবী দত্ত



গোবিন্দ সিং

অংশগ্রহণের কোন বাধা ছিল না এবং কয়েকজন মহিলা সার্ভার, অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও প্রাতিযোগিতা কর্মীরা এয়ার মহিলা প্রতিযোগী গ্রহণ করেন নি। দেবী দত্ত, বৈদ্যনাথ দাস, এল ভৌমিক এবং কে. কে. মন্ডল দুইপাক্সার সার্ভার হিসাবে খাতি। মহাকাশের তরুণ ছাত্র সুভাষ পট্টবর্ধন কিছুদিন পূর্বে আগ্রা সাগরে বাহাঙ্গ মাইল সার্ভার দিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাল্লাইমান্নার থেকে ধনুক্ষেত্রের দূরত্ব কুড়ি মাইল বটে, কিন্তু স্রোতের গতি মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয় বলে প্রতিযোগীদের আরও পনেরো মাইলের মত বেশি সার্ভার মিতে হতে পারে।

জয়দীপ জয়দীপ জয়দীপ

ডেভিস কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় ভারতের অধিনায়ক করবেন জয়দীপ মুখার্জী। ভারত আগামী ২৮শে থেকে ৩০শে এপ্রিল তেহরানে ইরানের বিপক্ষে অবতীর্ণ হবে। সিংহলের যিশক্ষে ভারতের যে দল ছিল, ইরানের বিপক্ষে সেই দলই অংশগ্রহণ করবে। ভারতীয় দলে আছেন জয়দীপ মুখার্জী, শিবপ্রসাদ মিশ্র এবং রবি ভেঙ্কটেশ্বরন।

ইরানের বিপক্ষে ভারতীয় দলের অধিনায়ক রমানাথন কুকানের অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। কিন্তু জয়পুরে একটি প্রদর্শনী খেলায় শিরের পুরাতন বাধা পুনরায় অনুভব করায় তিনি আরও কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইরানের বিপক্ষে জয়ী হলে আগামী গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলিতে কুকানের সাহায্য ভারত লাভ করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ফাইনালে মোহনবাগান ও ডাল্ফা ক্লাব

শেষ পর্যন্ত রোডার্সের ফাইনালে

উন্নীত হয়েছে গোবিন্দ সিং ক্লাব এবং গুজরাটের রানাস' কলকাতার মোহনবাগান এম্পায়ার টেনিস ক্লাব। রোডার্স কাপের ইতিহাসে এক নজরী সৃষ্টি করে 'উস' জয়ী হয়ে মোহনবাগান ক্লাব ফাইনালে উপনীত হয়। মোহনবাগান এবং জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবের সেমি-ফাইনালে খেলা তিনদিন অসমীয়াসিতভাবে শেষ হলে, রোডার্স কাপে খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

এ বছর রোডার্স কাপের আসরে পরিচালনার যে পরামর্শ দৃষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে রোডার্স কাপের জৌলুম কম হতে পারে। বিশেষত, এ বছর খেলার পরিচালনার ব্যাপারে রেফারীর ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে কয়েকটি দলকে। কলকাতার দলগুলির ওপর কোপটা একটু বেশিই পড়েছে। কলকাতার প্রধান দলগুলি না গেলে কোন ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরই জমে না; আর কলকাতার দলগুলিকে যদি অন্যায়াভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, তবে ভবিষ্যতে দু-একবার বাইরের ফুটবলের আসর কলকাতার প্রধান দলগুলির বরকত করা উচিত।

সেমি-ফাইনাল খেলার প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারে লীডার্স ক্লাবের সঙ্গে খেলা 'হ' করে কোনভাবে মানরকা করে মোহনবাগান। প্রথমার্ধের তেইশ মিনিটে গ্রীকিবেগ লীডার্স দলকে অগ্রগামী করেন, কিন্তু মোহনবাগান খেলার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেও শেষ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। খেলা শেষ হবার মাত্র তিন মিনিট পূর্বে একক প্রচেষ্টায় অশোক চ্যাটার্জী অগ্নির হয়ে গোলটি পরিশোধ করেন।

দ্বিতীয় দিন দুর্ভাগ্যক্রমে মোহনবাগান জয়লাভে অসমর্থ হয়। রেফারীর দৃষ্টিপূর্ণ এবং নিকট পরিচালনার ক্ষতিগ্রস্ত হয় মোহনবাগান। মোহনবাগানের দুর্ভাগ্যের জন্য ফরোয়ার্ডদের লক্ষ্যবস্তুতা দমরা। মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী আত্মঘাতী গোলে লীডার্স ক্লাবকে অগ্রগামী করেন এবং মোহনবাগানের পক্ষে গোলটি পরিশোধও করেন মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীই। এইদিন লীডার্স দলের খেলোয়াড়েরা অবস্থা এবং অবৈধভাবে বলপ্রয়োগ করে খেলাতে থকক; কিন্তু রেফারী এইদিকে ঠিকমত দৃষ্টিপাত করেন নি।

তৃতীয় দিনের খেলাও গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। নির্ধারিত সময় ছাড়ও অতিরিক্ত কুড়ি মিনিটে খেলার ভাগ্য নির্ধারিত

না হওয়ায় 'উস' করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং জর্নেল সিং 'উস'-এ ঠিক ডাক দিয়ে ফাইনালে দলকে উন্নীত করার উভয় ক্লাই ৪-২-৪ প্রথায় খেলে।

গোবিন্দ সিং ক্লাবও দুদিন খেলা অসমীয়াসিতভাবে শেষ করে তৃতীয় দিন বোম্বাইয়ের রিকার্ড ব্যাংককে ২-১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার বোম্বায়া অর্জন করেছে। ডাল্ফা ক্লাব এই সর্বপ্রথম রোডার্স কাপের ফাইনালে উন্নীত হবার সৌভাগ্য লাভ করল। বোম্বাইয়ের রিকার্ড ব্যাংক দল ভাল খেলেও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষণভাগের দোষে পরাজিত হয়। ফাইনালে গোবিন্দ সিং ক্লাব কলকাতার মোহনবাগানের সঙ্গে ফুটবল রূপে অবতীর্ণ হচ্ছে।

আবেদন প্রত্যাহার

সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ফরোয়ার্ড বি এন রেন দলের রাজেন্দ্রমোহন এ বছর ইন্টবেগলে ক্লাবে খেলার জন্য গত পনেরোই মাস ছাড়পত্র আবেদন করেন। আবেদন প্রত্যাহারের সময় হল দশ দিন এবং এই নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রাজেন্দ্রমোহন ইন্টবেগলে যাবার আবেদন প্রত্যাহার করায় আগামী মরশুমে তাকে পুনরায় বি এন রেনের পক্ষে মাঠে অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে।



মহেশ্বর লাল

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের আর একটি বিজয়

কয়েক বছর পূর্বে ক্রের সমালোচকরা ক্রের উদ্দেশ্যে বদ্বাপণ নিক্ষেপ করেছিল কারণ তখন জোরা ফোলির সঙ্গে ক্রে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে ইচ্ছুক হন নি। সমালোচকরা এই ভেবে হত সৈদিন আশ্ব-প্রসাদ লাভ করেছিল যে, নিছক পরাজয়ের ভয়ে ভীত ক্রে ফোলিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রতিভার বরপত্র ক্যাসিয়াস ক্রের সঙ্গে যে কারুর তুলনাই হয় না, তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে তাঁর পরবর্তী লড়াইগুলির ফলাফলে। সেনী লিস্টন, ফ্রয়েড প্যাটার্ন, আর্নি টেরেল, হেনরী কুপার, মিল্ডেনবার্জার প্রমুখ কৃতী মৃদুশোষা ক্রের বিপক্ষে রিংয়ে উঠে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

জন্মদিনের শতবর্ষে মহম্মদ আলি ক্রে নউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারের রিংয়ে জোরা ফোলিকে সপ্তম রাউন্ডে নক-আউটে পরাজিত করে অপরাধিত আখ্যায় যুক্ত করলেন আর একটি বরমালা। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে চোদ্দ হাজার দর্শকের সম্মুখে জোরা ফোলিকে ধরাশায়ী করতে ক্রের সময় লাগে মাত্র এক মিনিট ৪৮ সেকেন্ড। গত কয়েকটি লড়াইয়ে একমাত্র ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ান জার্মানীর কার্ন মিল্ডেনবার্জার এবং বিশ্ব বক্সিং সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান আর্নি টেরেল ক্রের বিপক্ষে লড়াইতে পেরে-ছিলেন উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস দিয়ে।

পাঁচাল বৎসর বয়স্ক বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান মহম্মদ আলি ক্রের প্রতিদ্বন্দ্বী জোরা ফোলির বয়স চৌত্রিশ বৎসর। নয় বছরের বড় ফোলির কিন্তু ওজন ক্রের চাইতে নয় পাউন্ড কম। ক্রের ওজন ২৫.১০ কে-জি এবং ফোলির ওজন ১১.৮৫ কে-জি।

আটটি সন্তানের জনক জোরা ফোলির বহুদিনের আশা, বহুদিনের লক্ষ্য বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ানের খেতাব। কিন্তু ফোলির মৃদুশোষা জীবনে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সাফল্য নেই। ১৯৬০ সালে ফোলি আর্নি টেরেলের কাছে পরাজিত হন এবং তারপর অবশ্য ক্রের কাছে পরাজিত হলেন, মাঝের সময়টিতে কিন্তু ফোলি আর পরাজিত হন নি। ফোলির দীর্ঘ মৃদুশোষা জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় লড়াই হল এই লড়াই; যদিও এই পরাজয়ের আঘাতে তাঁকে ঘরে যেতে হবে রিং থেকে। জীবনের বোধহয় শেষ

লড়াইয়ে তিনি খেতাব রক্ষায় অবতীর্ণ হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন। ক্রে এই লড়াই থেকে পকেটস্থ করলেন তিন লক্ষ ডলার; আর ফোলি পেলে পঁচাত্তর হাজার ডলার, বোধহয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশি এবং শেষ পাওনা বাক্সিংয়ের রিং থেকে।

লড়াইয়ের শুরুতে স্বভাবসিদ্ধ ভীষণমার ক্রে একটু দূরে দূরে সরে থাকেন। ফোলি প্রথম রাউন্ডে সববেগে ক্রের দিকে গিয়ে দুটি দুর্বল আঘাত হানেন এবং প্রত্যুত্তরে গ্রহণ করেন মাথায় একটি জোরালো আঘাত। দ্বিতীয় রাউন্ডে কিন্তু অথবা রিংয়ে ঘোরাফেরা না করে ফোলি স্থির হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। এরপর ক্রেকে অনুসরণ করে আঘাত হানার চেষ্টা করতে থাকলেও অসম্মত ফিগু ক্রের নিকটে পৌঁছানো অসম্ভব হয় ফোলির পক্ষে। তৃতীয় রাউন্ডে দু-পক্ষেরই পাল্টা আক্রমণে সমান



ক্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নক-আউট হবার পর জোরা ফোলি ধরাশায়ী

সমান অবস্থার সৃষ্টি হয়।

চতুর্থ রাউন্ড থেকে ক্রে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর রাঁ হাতের প্রচণ্ড একটি আঘাত অপের জন্য লক্ষ্যচ্যুত হয়, কিন্তু ঠিক পরক্ষণেই আর একটি প্রচণ্ড আঘাত মাথায় হেনে ফোলিকে ধরাশায়ী করেন। আট গণনার পূর্বেই উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত ফোলি ক্রের দিকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ক্রেকে রিংয়ের দাঁড়িতে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ফোলির মাথায় দুটি ডানহাতের ঘূর্ণি মেরে ক্রে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। পঞ্চম রাউন্ডে রিংয়ের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করতে থাকেন ক্রে এবং ফোলির সমস্ত আক্রমণের চেষ্টাই চাতুর্ঘ্যের সঙ্গে ব্যর্থ করেন। ফোলি এই সময় যন্ত্রের মত লড়াইতে থাকেন। তাঁর এই প্রাণহীন প্রচেষ্টা দেখে বেশ বোকা যায় যে, তাঁর পরাজয় নিকটবর্তী।

ষষ্ঠ রাউন্ডে ক্রের আক্রমণের ধারায়

বিপর্যস্ত হন জোরা ফোলি। ক্রে প্রায় অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ করতে থাকেন প্রচণ্ড ডান হাত এবং বাঁ হাতের ঘূর্ণি সপ্তম রাউন্ডের শুরুতেই ক্রে ফোলির মাথায় লক্ষ্য করে আঘাত হানতে থাকেন। এ সময় ক্রের একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণি মাথা লাগলে বিশালদেহী ফোলি ভূপতিত বৃক্ষে ন্যায় ধরাশায়ী হন। রেফারী গণনা করতে থাকেন, ছয় গণনার সময় ফোলি মূর্খ তুটে উঠতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুটা উঠে আবার রিংয়ে পড়ে যান। রেফারী মহম্ম আলি ক্রেকে জয়ী বলে ঘোষণা করেন।

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার আগাম ১১ই এপ্রিল ক্রের যোগদানের কথা, যদি অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি আইনে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সরকার যদি তাঁকে অব্যাহতি দেন, তবে পরবর্তী লড়াইয়ে ক্রে টোকাওতে অস্কার বোনাডেলার বিপক্ষে অবতীর্ণ হবেন। —সদর পালচৌধুর

সম্পাদক-জয়ন্তী সেন

বসুদেবী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২
বসুদেবী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহাত্মা কালো প্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

প্রথম খণ্ড বোর্ড বাধাই (মণ্ডল) : মূল্য—বার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড " " : মূল্য—বন টাকা
তৃতীয় খণ্ড " " : মূল্য—বন টাকা

চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—বার টাকা

পঞ্চম খণ্ড : মূল্য—(বোর্ড বাধাই) আট টাকা

অন্ন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা

চাকরীর উন্নয়ন নীতি করিয়া বিজ্ঞানমতে
বলীয়েল হটন

বাণিজ্যিক্য লক্ষ্যে লস্কাভ

করিয়া সোভিয়ান হটন

হাজার জিনিষ

সহস্র পণ্য প্রস্তুত করিবার সহজ ও
সরল উপায়

প্রতি ভাগ এক টাকা

—প্রথম ভাগে আছে—

বস্ত্র-প্রক্রিয়া ১৫৬ রকমের; ফলপ্রদ মৃদুশিখোণ
০৪১ প্রকারের। চমকপ্রদ যাদু-বিজ্ঞান ৮৫
প্রকারের। মনোহারী আতসবাজী ৪১ প্রকারের—
এতদ্ভিন্ন

বস্ত্ররঞ্জন—ধাতুরঞ্জন

কাস্তররঞ্জন—ধাতুশিল্প

পেট ও বাণিজ্য—প্রভৃতির

ব্যবহারিক উপদেশ সহ বিস্তৃত ব্যবহারিক
প্রস্তুতপ্রণালী।

—দ্বিতীয় ভাগে আছে—

প্রসাধন সূত্র ১০২ রকমের; বিস্তৃত সাবান প্রস্তুত
প্রণালী; সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী; মোমবাতি প্রস্তুত
প্রণালী; ফলপ্রদ গৃহ-চিকিৎসা—হেকিমী ও
হোমিওপ্যাথি; মস্ত-তন্ত্র; ভাগ্যফল; বুননির প্যাটার্ন।
সমস্তবস্ত্রের যে কিছ, বস্ত্র কিছ, বাহ্য কিছ, আবশ্যিক ভাবে
নিখিয়ার ও নিখাইবার একমাত্র পদ্ধতি।

অন্যান্যরূপের বস্ত্রবল অসংখ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
নামসমূহ মূল্য নির্ধারিত।

ত্রিংশ-সাহিত্য বসুমতীর অমর অক্ষর

অরবিন্দের

ANANDAMATH

কবি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরেজী

- ০ আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের
- ০ আনন্দমঠে—‘বন্দেমাতরম’ মন্তের পুত-প্রকাশ।
- ০ আনন্দমঠে—কবি বঙ্কিম ও কবি অরবিন্দের আনন্দ

আনন্দমঠের এই মহামন্তের অমরশতাব্দীর নামসমূহ

স্বাধীনতা আর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ লোভ্য পণ্য

মূল্য—তিন টাকা

গীতনাট্য-সম্রাট

পণ্ডিত কীরোনপ্রসাদ বিনোবিনোদ

কীর্ত্তন গ্রন্থাবলী

৪র্থ ভাগে—রাজাবতী, নারায়ণী, বঙ্গী, ফুলশঙ্কা, অমর
জয়ন্তী, ফুলী।

৫ম ভাগে—আলিবাবা, রামানন্দ, বাঘশাক্তি, পুষ্করিণী
বৃন্দাবনবিলাস, রূপের ভাষা।

৬ষ্ঠ ভাগে—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুমার
খাজাহান, বিরাটকুমার, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদোতা, কুমারী, কবি
কবিকাননিকা, রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

৮ম ভাগে—আহেরিলা, উলুপী, দৌলতে মুনিসা, বিদ্যা
প্রেমাজলি, মন্দাকিনী, গুহামায়া, পতি
সিদ্ধি, ধ্রুব। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৮ টাকা।

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও বিদ্যা
রাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ।

II বিদেশী ভাষায় নকতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

• • লক্ষ্যপ্রদে পর্ষাপ্ত কল অবশ্যম্ভাবী •

উৎকলনাথ মৃধোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা যা

(ইংরেজী ভাষা সহজে শিক্ষার অমিতীয় সাহায্য গ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - লক্ষ্যার্থ

ইংরেজী হইতে বাংলা—(বোর্ড বাধাই) ০-৫০

ইংরেজী হইতে উর্দু—০-০০

মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে

লুকায় আমনি



সাধনার

মহাভূজরাজ তৈল

মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশধার নারীদের
আকর্ষণের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবোক্ত অঙ্কুর বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য বিলাসিনী মায়েই ব্যবহার
করেন সাধনার মহাভূজরাজ তৈল
বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও
জীতল। তেল উপদ্রবনে ও সংরক্ষণে এর
কড়ি নেই।



সাধনা ওষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ওষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ., অধ্যাপকসাহিত্য, এফ.সি.এস.(লণ্ডন),
এম.সি.এস.(আমেটিক) অগলপুর কলেজের মুদ্রায়ন্ত্রণ
ভূগর্ভ অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র: ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস.(কলি) অধ্যাপকসাহিত্য

19 APR 1967

সাপ্তাহিক বসুমতী



যুক্তফ্রন্ট সরকারের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

৩ জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায়

কলকাতা সম্পূর্ণ শান্ত



৭১ বর্ষ : ৪০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

*** ● ***

6th April. 1967 * Vol 71, No

...কিন্তু, এক বিধিই আপনি নিশ্চিত -

বোরোলীন

-কাটা-ছেঁড়া-ফাটা হাজা, শূন্য, খস, খসে কিংবা বর্ণহীন হকের
যে কোন বিভ্রাটে-বোরোলীন নিভরযোগ্য অ্যান্টিসেপ্টিক স্ক্রিম।





বিষয়	লেখক						পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	২৬৯১
আজকের মানুষ	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	২৬৯২
ভারতদর্শন	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	২৬৯৩
আন্তর্জাতিক	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	২৬৯৭
মা দেখেছি, মা পেয়েছি (স্মৃতিচরন)	১০৫	— প্রীসুধীরঞ্জন দাস				১০৫	২৬৯৮
নব শ্রমিসভা সমীপে	১০৫	—				১০৫	২৭০৫
মিস্তান (গল্প)	১০৫	— সমীর মুখোপাধ্যায়				১০৫	২৭১০
বঙ্গবিশ্ব	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	২৭১৫

শেখারাম
সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র
*
ছোট কাপড়

শৈললাল মনিলাল
বহুবাজার * শ্যামবাজার
কোণ ৩৪-২১৬ টেমাজিগার দক্ষিণ

শ্রীমতী
বিচারী
*
শাল ও আলোয়িত

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা-হাস্যরসাবতার-
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক-রস-সাহিত্যের শ্রষ্টা-
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে-জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জগাই বারিক, বিয়ে পাগলা বড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে-সধবার একাদশী, সমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোষ্ঠ, লীলাবতী, সুরধনু কবি, প্ৰদাশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসাহিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুন্দর যিহ্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

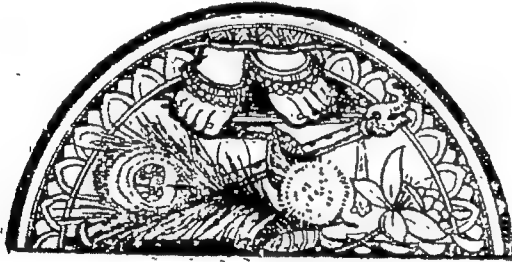
বাংগালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ধর্ম কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিম্বৃত সমালোচনা সহ মূল্য ২৫ টাকা
মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



নিসহ	লেখক	পৃষ্ঠা
জ্ঞানযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৭২১
জ্ঞানব সেই ছেগেটি (প্রবন্ধ)	— সমরজিৎ সেনগুপ্ত	২৭২৭
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২৭৩০
নবগণতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	২৭৩২
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২৭৩৬
জনবৈরী (কবিতা)	— প্রদীপ চক্রবর্তী	২৭৩৮
রংগমণ্ড—ওমেগা এবং এসেগে	— শিলালি	২৭৩৯
রংগমণ্ড	—	২৭৪২
গ্রন্থমেলা	—	২৭৪৭
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	২৭৪৯



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরাচিত

— ভক্তির মন্দিরিনী
প্রেমের অলকানন্দা
আনের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাপ্রবন্ধ আর নাই
চিরসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনের টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমানিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মাণিলাল গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যাকারে)

চন্দ্রশঙ্কর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্য-
কাবের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরুগণ—ইংরেজ ? একবার পেলে হয়—

মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে
বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীবকাশেম—পাপাশ্বা এই রাজ্য
ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে
তাড়াতে হবে—

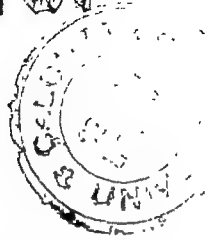
অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু

সম্পাদিকা জয়ন্তী সেন



৭১ বর্ষ : ৪৩শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২০শে চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 6th April, 1967

কুচক্রীদের তৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক হোন

‘এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে’ পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি তীর্থস্থান স্বরূপ যেখানে সর্বজাতি, সর্বধর্ম এসে মিলিত হয়েছে। আবার এই পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে কলকাতা এমন এক শহর যেখানে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সৌহার্দ্যের মধ্যে পাশাপাশি বসবাসে এমন নিদর্শনও কদাচিৎ মেলে। তবু রাজনৈতিক কুচক্রীরাও সুযোগ চন্দ্রানের দুর্ভাগ্য কলকাতার বৃদ্ধকেই সৃষ্টি করেছে কখনো কখনো অশ্রু প্রাদৌশিকতা, সাম্প্রদায়িক বিভেদ। অবশ্য মতলববাজ-দের দুর্ভাগ্য কখনোই চাপা পড়ে নি। সুযোগ পেলেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাতে তারা ষড়যন্ত্রের জাল। সুতরাং এদের ষড়যন্ত্রকে নিমূল করার উপায় সুগভীর আত্মনিত্যিক সতর্কতা এবং আত্মনিত্যিক কঠোরতা। আশা করি পশ্চিম-বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার এই বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ও সতর্ক রয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পর ময়দানের সুবৃহৎ জন-সমাবেশে ঘোষিত হয়েছিল যে, এতকাল ধরে যারা সুখের ঘব করেছে তারা সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, তারা ওং পেতে আছে এবং সুযোগ খুঁজছে।

যাদের হাতে এখনো কালো টাকা এবং এতকাল ধবে যারা কালোবাজারের তদারকি করেছে—তাদের সুযোগ চন্দ্রানের ক্ষেত্রে কিছু সমাজ-বিরোধী যোগানদার ভাল দেবে এবং অকারণে তিলকে তাল করে তুলবে তা বলাই বাহুল্য।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর পুরো একমাসও কাটে

নি। এরই মধ্যে তারা বিভিন্ন জন-কল্যাণের কাজে হাত দিয়েছেন এবং বিশ বছরের পুঞ্জীভূত প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ধাকা সত্ত্বেও তারা এমন কয়েকটি কাজে দক্ষতা দেখিয়েছেন—যাতে কয়েকটি স্বার্থ আত্মপুষ্ট হয়ে উঠেছে। আত্মপুষ্ট হবার কারণও আছে। নতুন প্রাইভেট বাস পার-মিট দানের কারচুপ থেকে শব্দ করে দুর্নীতির নানা কাণ্ডের বেসাতি একের পর এক ধরা পড়েছে। সুতরাং কয়েকটি স্বার্থের এই সমূহ বিপদের দিন থেকে উদ্ধারের একমাত্র আশা রাষ্ট্রপতির শাসন। যা হোক শেষবন্ধা না হোক, গোড়ার গলদ যাতে ধরা না পড়ে। এই নিয়ে দিল্লী পাক্সা—যেখানে আছে কুচক্রীদের ঘাঁটি সেসব জায়গায় শব্দ হোল গোপন সংবাদ আদান-প্রদান। এমন কি, আগেভাগেই ট্রাক কল বৃদ্ধ।

ঘটনা অতি সামান্য। সেই সামান্য ঘটনার মীমাংসাও হয়ে গেছিল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। বাগমারীতে উভয় সম্প্রদায় সানন্দে মিলিত হোল। ধর্মীয় মিছিল বাগমারীতে নিয়ে যাবাব অন্তর্ভুক্তও দেওয়া হোল। উভয় সম্প্রদায় যখন সম্মিলিত এবং গোলযোগের কোনো কারণই যখন নেই তখন মিলিত হোল অবাতালী কয়েকজন ধর্মমতাব-সায়ী। তাবা শান্তিপূর্ণ মিছিলের পাশা-পাশি আমদানী করল অকস্মাৎ সশস্ত্র গুন্ডাদল—যারা বাগমারীতে গেল না ধর্মগ্রন্থ নিয়ে। কিন্তু ধর্মীয় মিছিলের নিষ্পত্তি শিখ ভাইয়েরা গেলেন বাগমারীতে। সেখানে তাদের পুরোভাগে থাকলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ও সোচমন্ত্রী

শ্রীবিম্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সেখানে রচিত হোল অপূর্ব এক মিলনকেন্দ্র।

কিন্তু এ যে অসহ্য! সুতরাং রাজ-নৈতিক কুচক্রীর দল দাবার ঘৃণি চাললেন। কিন্তু চালটা বড়ই বেচাল হোল। তাদের দুর্ভাগ্যে কয়েকজন প্রাণ দিলেও ও কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হলেও সেদিনই সৃষ্টি হোল পশ্চিম বাংলার নতুন এক ইতিহাস বা কংগ্রেসী আমলে কম্পনাতীত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখো-পাধ্যায় শান্তিকামী জনতার সঙ্গে মিলিত হয়ে মাত্র ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে কুচক্রীদের বিরূপে এক ষড়যন্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ডকে নির্বা-পিত ও নিমূল করে দিলেন। অবশ্য বিরূপে একটা কান্ড বা ওলট-পালট ঘট-বার আশায় যারা দিন গুণছিল—তারা এখন নিষ্ফল গর্জন কবছে বা ভালো মানুষ সেজে শান্তির বুলি দান কবছে। কিন্তু আমরা মনে করি, তিলকে তাল করার জন্যে যারা আজ তৎপর তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে এবং এখনি খুঁজে বের কবতে হবে শান্তিযন্ত্রে কারা অশান্তির ইশ্বন যুগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় ও অপদস্ত কবতে চেয়েছিল। মিত্র যারা তাদের সম্বন্ধে সরকার সচেতন থাকুন, কিন্তু শত্রুদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে সতর্কতাই আজ শব্দ একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় নয়, তাদের মূলোৎপাটন করে প্রকাশ্যে শাস্তি-দান করাই আশু কর্তব্য।

সম্পাদকীয়

যোগেশ্বর মাস

রাজনীতিকে যদি নাটক আখ্যা দিই তবে কি অসত্য ভাষণের দায়ে পড়বো? বরং রাজনীতির মধ্যে এমন দৃশ্যের অবতারণা হতে দেখি, যা বাস্তব নাট্যক্ষেত্রে উপস্থাপনার সাহসও কোন নাট্যকারের হবে না বিদগ্ধ সমালোচকের ভয়ে। নির্বাচনোত্তর হিরিয়ানা রাজ্যে পর পর যে-ঘটনাগুলি ঘটে গেল, তাকে নাটকীয় পটপরিবর্তন ছাড়া আর কী বলা যাবে? এত খাটা-খাটনি, মেহনত-খেদমৎ করার পর কংগ্রেস নির্বাচন জিতলো এখানে, আর সরকার গঠন করলো কিনা বিরোধী দল! দলনেতা নির্বাচিত হলে ভগবৎদয়াল শর্মা রাজ্যের মধ্যমন্ত্রী গদি পেলে আবার, কিন্তু জড় করে বসতে-না-বসতেই ফসকে গেল সে আসন, গদি গেল রাও বীরেন্দ্র সিং-এর কাছে। তাও আবার কোন বীরেন্দ্র সিং? কোন কমিউনিস্ট বা সোশ্যালিস্ট এমন কি স্বতন্ত্রী-জনসংগী কোন প্রার্থী নন, বীরেন্দ্র সিং-ও মাত্র কদিন আগেও কংগ্রেস দলভুক্ত ছিলেন, কংগ্রেসের নীতিতে আস্থাভান এখনো। দ্বীতিমত নাটক নয় তো কী এটা?

রাজনীতি যদি নাটক হয়, তবে রাও বীরেন্দ্র সিং-কে তার প্রধান নায়ক অবশ্যই বলা চলে। ইতিহাসের আশ্রয় নিয়ে আরো বলা যায় রাও বীরেন্দ্র সিং ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ভুলারামের বংশধর। এমনটিতে তার নামকের রক্ত প্রবাহমাণ, নামকোঁচিৎ গুণা-ঘলী তিনি অর্জনও করেছেন যথেষ্ট। সামরিক বাহিনীতে ছিলেন বীরেন্দ্র সিং, অসন্তন অফিসারদের কাছ থেকে সেলাম কী করে আদায় করতে হয় সে-রকম তিনি এখানে ভালোই রপ্ত করেছিলেন। রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করে সে-বিদ্যে তিনি ভোলেন নি, কাজে লাগিয়েছেন বরং।

রাজনীতির পাদপ্রদীপে এলেন বীরেন্দ্র ১৯৫৪ সালে। পাতিয়ালা, পূর্বে পাঞ্জাব আর সৌরাষ্ট্র ইউনিয়নকে নিয়ে যখন পঙ্গু রাজ্য গঠিত হলো তার মন্ত্রিসভায়

রাও বীরেন্দ্র সিং-কে প্রথম দেখা গেল উপমন্ত্রীর ভূমিকায়। পাঞ্জাব বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি সেবার। বর্ধিত ও কর্মক্ষমতা দিয়ে তিনি সহজেই সর্দার প্রতাপ সিং কাররোর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, পরে তিনি কাররো মন্ত্রিসভায় পুরোদস্তুর মন্ত্রিপদও লাভ করেন। তার চেয়েও বড় কথা বীরেন্দ্র সিং অল্প দিনের মধ্যেই কাররোর পূর্ণ আস্থা অর্জন করে তার দক্ষিণ হস্ত হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু সে



রাও বীরেন্দ্র সিং

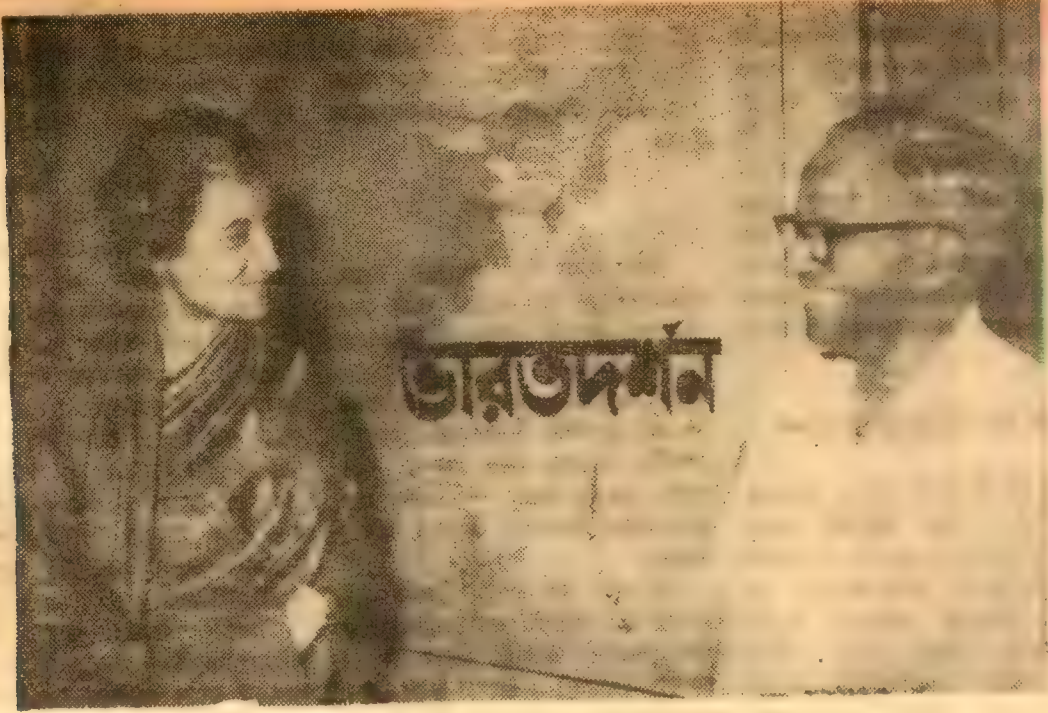
কেবল কিছুদিনের মধ্যচ্ছিন্নতা মাত্র, অচিরে দুই বন্ধুতে মতানৈক্য ঘটলো। কিন্তু কাররোর সঙ্গে বিরোধ সত্ত্বেও বীরেন্দ্র সিং কংগ্রেস ছাড়েন নি। কাররোর পতনে তিনিও আনন্দিত হয়েছিলেন যদিও কারণটা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত। অর্থাৎ মন্ত্রিসভা থেকে বীরেন্দ্র সিং-কে যখন বাদ

দেওয়া হলো তখন তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, কাররোই তার এ-সর্বনাশটি করেছেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, কাররো শেষের দিক পুরনো সুহৃদ বীরেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে বিরোধটা মিটিয়ে ফেলতেই চেয়েছিলেন, তাকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে বলে-ছিলেন পরনো কালো দিনগুলোর কথা ভুলে যেতে।

কিন্তু রাও বীরেন্দ্র সিং তাঁর রাজ-নৈতিক শত্রুদের সহজে ক্ষমা করেন না। আসলে তাঁর চারিদিক কঠোর ও কোমলের অশুভ সংমিশ্রণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন বা তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের মিলন ঘটে না, তাঁদের প্রতি তিনি নিম্ন হতে পারেন, আবার সম-ধর্মী বা সমদর্শীদের জন্যে তাকে উদার মহানুভব হতেও দেখা গিয়েছে। বিরোধকে অহেতুক জঁইয়ে রাখতেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ নেই, ভগবৎদয়াল শর্মার সঙ্গেও একটা বোঝাপড়ায় আসতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অপর পক্ষ থেকে যখন প্রয়োজনানুসারে সাড়া পাওয়া গেল না, তখন মরিয়া হয়েই বিরোধের শেষ দেখার স্বপ্ন ভেঁটি হলেন তিনি।

মধ্যমন্ত্রীর ভগবৎদয়াল শর্মার ওপর বড়ট হয়েছিলেন হিরিয়ানা কংগ্রেসের একাংশ। যেভাবে শ্রীশর্মা রাজ্যের নির্বাচন পরিচালনা করেছেন তাতে তাঁরা আরো চটোছিলেন। কংগ্রেস থেকে কিছু প্রভাব-শালী সদস্য আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন, নির্বাচনের পক্ষে শর্মা-বিরোধিতা চরমরূপ ধারণ করল। নির্বাচনে কংগ্রেসই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল, কিন্তু স্পীকার নির্বাচনে সরকারী প্রার্থীর পরাজয় ঘটলে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। জিতলেন বিদ্রোহী-কংগ্রেস-এর প্রার্থী রাও বীরেন্দ্র সিং। এর পরে মধ্যমন্ত্রীর পদ থেকে শ্রীশর্মাকে অপসারণের দাবি উঠলো। কংগ্রেস হাই-কমান্ড শ্রীশর্মার পেছনে দাঁড়ালেন। ১০ জন এম-এল-এ বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়ে সংস্কৃত ফ্রণ্ট গঠন করে সরকার গঠনের উদ্যোগ করলেন। তাতেও হাই-কমান্ডের টনক না নড়তে ১ জন সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার ৮ জন-ই পদত্যাগপত্র দাখিল করে ভগবৎদয়াল শর্মা এবং কংগ্রেস হাই-কমান্ডকে বেকুব বানিয়ে ছাড়লেন। রাও বীরেন্দ্র সিং সংস্কৃত ফ্রণ্টের নতুন নেতা নির্বাচিত হলেন।

বীরেন্দ্র সিং-এর জনপ্রিয়তা স্বীকা করার মত। তিনি নিজের আহীর সম্প্রদায়ের হলেও অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়েছে, শ্রীশর্মার পক্ষে যা দুর্ভাগ্য ছিল। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং নেতাসম্পন্ন সনোভাবের জন্যেই রাও বীরেন্দ্র সিং হিরিয়ানারাসী আশীর্বাদ নিয়ে ভাবতে-ছোট রাজ্যটির স্বতন্ত্রীয় মধ্যমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেছেন।



ইন্দিরা-নান্দ্যদ্বিপাদ সাক্ষাৎকার

খেতে দাও

কেন্দ্রীয় কর্তারা বলছেন, দুর্ব্বৎসর অতিক্রম ছায়ার মতো সমাচ্ছন্ন করে আছে আসন্ন হিমালয়। শব্দ বলছেনই না, বছরের পর বছর এই প্রকান্ড ছায়াটি ওসারে বাড়ছে। পি এল ৪৮০-র হটায় সে ছায়া বেন আরও ড়াবহ হয়ে উঠেছে। এ ছায়া বুড়ুদু ভারতের ক্ষুধাধীন মূর্তির অশরীরী অকৃত্রিম রূপ। শব্দ দুর্ব্বৎসরের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দায় খালস হওয়ার কেন্দ্রীয় মনোভাবকে কিন্তু এবার কার্ভও ছেড়ে কথা কইবেন না বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন সংসদের বিরোধী সদস্যগণ। কংগ্রেসী সদস্যরাও এখন একযোগে খাদ্যনীতির সমালোচনায় এগিয়ে আসার লক্ষণ দেখিয়েছেন। সবগ্রহই খাদ্য নিয়ে আশঙ্কার ও পরিতাপের ছায়া। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ওরফে সংগ্রহমন্ত্রী বিগত ফরেকটি বছরে দেশের খাদ্যাবস্থাকে ত্রমশে ভরাডুবিব দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, নতুন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রীজগজীবন রামকে তারই তাল সামলাতে হবে। ২১/৩০শে মার্চ তারিখের খাদ্য বিতর্কে তাঁর প্রায় অসহায় অবস্থার বোঝা গেছে যে, এই বহুদেতে তাল সামলানো খুবই কষ্টকর। কিন্তু সব ক্ষুধা-পরিকল্পনা ও বাগাড়ম্বর কালহরণ করতে পারে, কারও মূখ চেয়ে বসে থাকতে পারে না শব্দ ক্ষুধার জ্বালা। বিগত দুই দিবসের খাদ্য আলোচনায়

সেই অধৈর্য আশঙ্কাতুর রূপটিই ফুটে উঠেছিল। দুর্ব্বৎসর আলোচনায় তাই কর্তব্য শেষ করে ওঠা যায় নি। দুর্দিন ধরে চলেছে খাদ্যের ওপর বিতর্ক। ফলশ্রুতি অবশ্য একই তিমিরে। সেই হাহাকার। একই দাবি, খেতে দাও!

নতুন নীতি

অবহেলিত কৃষি ও সৃষ্ট জাতীয় খাদ্যনীতির অভাবের প্রসঙ্গ কংগ্রেসী অ-কংগ্রেসী প্রত্যেক বছর মূখেই তাঁর সমালোচনায় মূখর হয়ে ওঠে।



প্রীজগজীবন রাম

একরোখা দাবি শোনা যায়, নতুন দেশের জন্য একটিমাত্র খাদ্যনীতি চাই। এ নীতির দ্বারা উদ্ভূত ও ঘাটতি রাজ্যের মধ্যে সমতা আনতে হবে। ফুড কর্পোরেশনের মাধ্যমেই সংগ্রহ এবং বন্টন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার প্রয়োজন।

প্রীজগজীবন রাম যোশীর দাবি, খাদ্যশুল প্রথমে বিলোপ করে একক খাদ্যনীতি গ্রহণ এবং অর্থকরী ফলনপ্রসারিত করে সম্ভবপর সকল জমিতেই খাদ্য উৎপাদন করা হোক।

বিরোধী পক্ষের অন্যান্য দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : গোপন মজুত খাদ্যের উদ্ধার, প্রাথমিক কৃষি উৎপাদককে সুবিধাজনক ঋণ দান, স্বল্পমেরাদী শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। শেষোক্ত দাবিটি কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী প্রীজগজীবন রাম গ্রহণ করে বলেন, রবি ও খারিক শস্যের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালে স্বল্পমেরাদী শস্যোৎপাদনের জন্য সরকারী উদ্ভাগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত খাদ্য সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য ইরাম বিভিন্ন রাজ্য ও রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করেন। গোপন খাদ্য মজুত উদ্ধারে মজুতদার এবং কৃষক শ্রেণীর সহযোগিতা আহ্বান করে তিনি উদ্ভূত শস্য সংগ্রহের ভার রাজ্য সরকার-গুলির ওপর ন্যস্ত করতে চান। ছোট ছোট জমি কর্ণকদের ঋণ দানের বিষয়টিকেও অনুকূল গুরুত্ব দান করা

হবে। কেন্দ্রীয় সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রীর ধারণা, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টননীতি বহাল রাখতে হলে নিয়ন্ত্রণপ্রথা অবশ্যই আবশ্যিক, তবে অতিরিক্ত কড়াকড়ি আবশ্যকীয়। কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতা অত্যাৱশ্যক এই মন্তব্য করার সময় প্রীরাম পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার দুই অ-কংগ্রেসী মধ্যমশ্রেণীর কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার যে সহদরতার প্রমাণ রেখেছেন তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিহার, ইউ পি-তে সম্পদীন অবস্থা

গত বছরের খরার দরুন বিহারের খাদ্যব্যবস্থার যে সংকট উপস্থিত হয়েছিল, তার উপশম হতে হয় নি বরং সংকট রূপে তীব্র আকার ধারণ করেছে। উঃ লোহিয়া বিহারের জনাহার মৃত্যুর, অপূর্ণাঙ্গজনক মৃত্যু এবং পরিপাক শক্তির অভাবজনিত মৃত্যুর সংবাদ উপস্থিত করেন ও সে সংবাদ অন্যের দ্বারা সমীক্ষিতও হয়। রাজ্যব্যাপী খাদ্য নিয়ে যে হাহাকার উঠেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিহারকে দৃষ্টান্ত কবলিত এলাকা বলে ঘোষণা করার অনেকেই দাবি উত্থাপন করেন। উত্তরপ্রদেশের কতকাংশের অবস্থাও অনুরূপ।

কেন্দ্রীয় অবহেলার অভিযোগ তুলে বিহার বিধানসভাও বেশ গরম হয়ে উঠেছে। বিহারের খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী শ্রীকামলদেও ঘোষণা করেছেন যে, বিহারকে খাদ্যশস্য সরবরাহ না করলে অথবা উদ্ভূত রাজ্যগুলি থেকে খাদ্য ত্রয়ের অনুমতি না দিলে বিহারও তার খনিজ সম্পদ, কয়লা অত্র প্রভৃতি রাজ্যের বাইরে প্রেরণ করা বন্ধ করে দেবে। খাদ্যমন্ত্রীর বিলোপের জন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে তিনি বিরোধী কংগ্রেস দলকেও অনুরোধ জানান। মধ্যমশ্রেণী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ ইতিমধ্যেই খাদ্য-যোগান বর্ধিত করার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি পেশ করেছেন। মধ্যমশ্রেণী সম্মেলনে বিহারের প্রশ্নটি গুরুত্ব সহকারে উত্থাপিত হবে বলে মনে হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সাহায্যের ভরসা খুব একটা রাখতে পারেন নি, তবে বিহারের সমস্যাটিকে সহনভূতি সহকারে গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রতি তাঁর ভাষণে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সক্রিয় সাহায্য ছাড়া ঔচিত্যবাচক শব্দ দিয়ে সমস্যাগুলিকে আর অধিককাল কেন্দ্রের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। বিভিন্ন অ-কংগ্রেসী রাজ্য থেকে যেরকম সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে তাতে কেন্দ্রকে এবার খাদ্য সমস্যা সমাধানে উঠে পড়ে লাগতেই হবে। অন্যবাদী

জমি কোথাও আর ফেলে রাখা চলেবে না। বৈদেশিক মুদ্রাস্ফীতির জন্য চালের বদলে পাট বা চিনি উৎপাদনও বোধহয় বন্ধ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ

আজ বলেই নয়, কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গ যে তার ন্যায্য দাবি পেশ করে বহু ক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এ সংবাদ সকলেরই অগণ-বিস্তার জানা আছে। এবারের বিতর্ককালে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী কেন্দ্রীয় অবহেলার প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গ তার প্রাপ্য সহনভূতি লাভে এবারও বঞ্চিত হয়েছে।

পি এস পি সদস্য শ্রীসমর গুহ জানতে চান কংগ্রেসী আমলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য প্রেরণের হার কি ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি, দেনও নি। তিনি জানান বর্তমানে ১৫ হাজার টন চাল ও ৭০ হাজার টন গম মাসিকহারে পশ্চিমবঙ্গে প্রেরণ করা হচ্ছে।

কেরালার খাদ্যাভাব

কেরালার খাদ্যব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করার দিল্লী পর্যন্ত ছুটে হয়েছিল মধ্যমশ্রেণী নান্দ্রিপাদকে। অপেক্ষার তর সময় নি আগামী মধ্যমশ্রেণী সম্মেলন পর্যন্ত। খাদ্যভাবে ভেঙে-পড়া রেশন ব্যবস্থাকে কোন রকমে রক্ষা করাই শ্রীনান্দ্রিপাদের বর্তমান চিন্তা। এজন্য তিনি মাদ্রাজ অঙ্গ এবং মহীশূরেও খাদ্যের সন্ধান ফিরেছেন, কিন্তু বৃথাই। কেউ সাহায্যের বাহু এগিয়ে দিতে রাজী নয়। এই তিন রাজ্য বরং কেরালাকে বাদ দিয়ে নিজেদের আদান-প্রদানের দ্বারা আপন সমস্যা সমাধানে অধিকতর আগ্রহী। ই এম এস-কে সূত্রাং কেন্দ্রের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। কেরালার রেশন ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাকে রাজ্যের বাইরে থেকে প্রতি মাসে আমদানী করতে হবে ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য। অঙ্গ থেকে আগামী মে মাস পর্যন্ত এককলা খাদ্যশস্য লাভের আশা নেই। তবে প্রশ্নোত্তরে শ্রীনান্দ্রিপাদ জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাস উৎসাহব্যঞ্জক এবং তিনি আলোচনার শূণ্য। তিনি কেন্দ্রকে কেরালার খাদ্য দ্বার্তিতার জন্য দায়ী করেন। অর্থকরী শস্য ফলাও নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্র কেরালার জমিকে অ-খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করেছে, সূত্রাং খাদ্য দ্বার্তিত পূরণের সমগ্র দায়িত্বও কেন্দ্রের। পশ্চিম-

বঙ্গও অনুরূপ দৃষ্টি দেখিয়ে বলতে পারে খাদ্যের বদলে পাট ফলাতে গিয়েই রাজ্যের কপালে।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, রাজ্য মধ্যমশ্রেণীর হায়দরাবাদ-অভিজ্ঞতা। আই পি এ সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যমশ্রেণীকে এই বলে আশ্বাস দেন যে, অঙ্গ কেরালাকে পঞ্চাশ হাজার টন চাউল প্রেরণ করবে। কিন্তু অঙ্গের মধ্যমশ্রেণী বন্ধ জানালেন যে, কেরালার জন্য রক্ষিত এই পঞ্চাশ হাজার টনই মহারাষ্ট্র গোয়া এবং বিহারে প্রেরণ করা হয়েছে আর কেন্দ্রীয় নির্দেশেই তা করা হয়েছে, তখন কেন্দ্রের বিচিত্র ব্যবহারে হতবাক হতে হয়। সম্ভবত প্রশ্নটি কেরালার মধ্যমশ্রেণী রাজ্য মধ্যমশ্রেণী সম্মেলনে উত্থাপিত করবেন।

বিভিন্ন রাজ্যের উদ্ভূত শস্যের পরিমাণ সম্পর্কেও কেন্দ্র সঠিক সংবাদ সরবরাহ করেন নি বলে তাঁর সাম্প্রতিক সফরে নান্দ্রিপাদ জানতে পেরেছেন। কেন্দ্র বলছেন, মাদ্রাজ এক লক্ষ টন উদ্ভূত শস্য কেরালাকে সাহায্যার্থে দান করতে পারে; অঙ্গের উদ্ভূত পরিমাণ কেন্দ্রীয় বিচারে ৮-৯ লক্ষ টন। কিন্তু মাদ্রাজ জানিয়ে দিয়েছে তার উদ্ভূত পরিমাণ বলতে কিছুই নেই। অঙ্গ সরকারের বক্তব্য, স্বাভাবিক সময়ে পাঁচ-ছয় লক্ষ টনের বেশি হয় না, এ বছর তো উদ্ভূত পরিমাণ চার লক্ষের ওপর কিছুতেই হবে না। সূত্রাং সমস্ত চিঠিই একান্ত গেলমেলে ও হতাশাব্যঞ্জক। তবে আশ্বাসের কথা ই এম এস কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা-আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। কেন্দ্র ৭০ হাজার টনের খাদ্য দ্বার্তিত পূরণের আশ্বাস দেওয়ার এবং চূড়ান্ত চাল প্রেরণের ব্যবস্থা করার ই এম এস আনন্দিত। কোন ভাণ্ডার থেকে এই খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হচ্ছে সে সংবাদ ভাঙতে তিনি রাজী হন নি।

সতর্কীকরণ

বাম কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রী এ কে গোপালন আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, কেন্দ্র যদি অ-কংগ্রেসী রাজ্যগুলিতে খাদ্য সাহায্যের ব্যাপারে পক্ষপাতীত্ব করে তবে কেরালার সংগ্রামী জনসাধারণ না খেয়ে মরার চেয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেই মরবে। প্রয়োজন হলে কেরালার নেতৃবৃন্দ অন্যান্য অ-কংগ্রেসী রাজ্যে জনমত গঠন করবেন ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযানে রাজ্য সরকারগুলির সাহায্য প্রার্থনা করবেন।

কেরালার শ্রীকান্তন নায়ার একটি সাংঘাতিক সম্ভাবনার কথাও অকুণ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করে বলেন, উদ্ভূত রাজ্যগুলি অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্য প্রেরণে বিমূৰ্হ হলে, অভাবগ্রস্ত রাজ্যগুলি ভারতীয় মুনিয়মের সঙ্গে সম্পর্ক পথান্ত গ্রহণ করে নিজে বাঁচবার চেষ্টা করতে পারে।

ডি এম কে সদস্য বলেন মাদ্রাজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআম্বাদুরাই-এর পরামর্শ অনুযায়ী এখনই বর্মী থেকে খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মাদ্রাজ :

মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআম্বাদুরাইও বলেছেন যে, প্রয়োজন হলে এবং খাদ্যের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণ পরিণত হলে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপকে কেন্দ্রীয় জনগণের সামনেই উদ্ঘাটিত করে শাস্ত হবেন না, সমগ্র বিশ্বের সামনেও সেই বৈষম্যমূলক আচরণের চিত্র তুলে ধরবেন। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে কেন্দ্রে বৈষম্য অপসারণের কাজে তিনি কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য লাভ করবেন বলেও দাবি করেন।

শ্রীআম্বাদুরাই বলেন, বর্মীয় কন্নড় তামিল তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি ফেলে রেখে বাস্তুত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিনিময় মূল্যে বর্মী থেকে চাল আমদানীর দাবি কেন্দ্রীয় সরকার উত্থাপন করতে পারেন। কেন্দ্রের উচিত বিষয়টি এখনই গ্রহণ করা।

কেন্দ্র কি সতর্ক হচ্ছে?

উপরোক্ত খাদ্যাভাবের ওপর দুকপাত করলেই দেশের আগামী খাদ্যের ভয়াবহ রূপটি মনকে আশঙ্কায় সম্বলিত করে চারদিকে খাদ্য নিয়ে যে হাহাকার তাতে কৃষি ও খাদ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিনির্ভরশীল নীতি পরিত্যাগ করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার আশু প্রয়োজন। সুখের বিষয় পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় কেন্দ্রের সেই তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাবেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শ্রীজগজীবন গ্রাম অধিক শস্য ফলানোর জন্য কয়েকটি কার্যকরী উপায় অবলম্বনের আশ্বাস দিয়েছেন। এক হাঁপ পরিমাণ জমিও যাতে পতিত না পড়ে থাকে সেদিকে এবং রবি ও খারিফ শস্যের উৎপাদনকালের ব্যবধানে যে অন্তর্বর্তী সময় জমি অফলপ্রসূভাবে ফেলে রাখা হয়, সে সময় ভূঁট প্রভৃতির চাক্ষুশ ব্যবস্থা করে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি করার আবশ্যিকতা কেন্দ্রীয় সরকার এবার স্বীকার্য বলে মনে করেছেন। ভূমি ও

ভূমি-নির্ভর সম্পদায়ের প্রতি নতুন মনোভাব নিয়ে খাদ্যের মোকাবিলা করার কেন্দ্রীয় ইচ্ছা এবং প্রত্যেক রাজ্যের চাহিদার প্রতি সম্ভাব্য সহানুভূতিশীল নজর এক সময় প্রাতিশ্রুতি বাস্তবিকভাবে



শ্রীআম্বাদুরাই

কার্যে রূপায়িত হলে কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী যে এবার আবহমানের চম সংশোধন করতে পারবেন এবং সে-কারণ নতুন দপ্তর গ্রহণ করে দেশবাসীর অভিনন্দন লাভ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীআম্বাদুরাই-এর পরামর্শও স্বতঃপ্রণীত প্রাধান্যযোগ্য। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পি এল ৪৮০-নির্ভর ভারতে পুনরায় বর্মী চাল আনয়নের জন্য তৎপরতা গ্রহণ করতে পারেন এবং ভারতের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির কথা জানিয়ে বর্মী সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করতে পারেন।

বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে হটে গেলেও এবং করতলগত আরও অনেক ক্ষেত্রে দলের গদি টলমল করলেও কংগ্রেসী দলে এখনো পর্যন্ত গাদির মোহ একই রকম আছে।

ডেপুটি স্পীকার হিসেবে কংগ্রেসী সদস্য শ্রী আর কে খাদিলকার উপস্থিত প্রার্থী সন্দেহ নেই। শ্রীখাদিলকারের প্রতি দলমত নির্বিশেষে সবার মনেই একটি শ্রদ্ধার আসনও আছে, কিন্তু গাদির মোহে কংগ্রেস অগ্রপশ্চাৎ সিদ্ধান্ত ঘূলিয়ে ফেলার শ্রীখাদিলকারকে বিরূপ অবস্থার মধ্যে বিরোধী-শূন্য সভায় ডেপুটি স্পীকার হিসেবে নির্বাচিত হতে হল। ব্যাপারটা যে শ্রীখাদিলকারের পক্ষে খুবই পরিতাপজনক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু উপায়ও নেই বা ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমালে করে দিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী।

বিরোধীদের স্মারা মনোনীত প্রার্থীকেই ডেপুটি স্পীকার হিসেবে নির্বাচিত ও গ্রহণ করা হবে বলে পূর্বাঙ্কে একটু মোকাপড়া করেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দল গদির মোহ পরিত্যাগ করতে পারে নি। প্রধানমন্ত্রী একটা খোঁড়া যুক্তি সাজিয়ে বলেছেন, যে সময়ের মধ্যে ডেপুটি স্পীকারের নাম পেশ করার কথা ছিল, বিরোধীরা সেই সময়ের মধ্যে কোন নাম প্রস্তাব করতে পারেন নি। তা ছাড়া ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র নেতা শ্রীমাসানী নারিক তাঁদের ছিলেন যে, বিরোধী পক্ষে অন্তত তিনটি দল তাঁদের মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন করেন না। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধীর যুক্তি, কংগ্রেস প্রার্থী না দাড়ি করলেও ডেপুটি স্পীকার পদে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াবেন। তাতে অবস্থা একই হ'ত।

কিন্তু উল্লিখিত যুক্তি কতদূর গ্রাহ্য তা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। শ্রীমাসানীই এখন জানতে চান, বিরোধীদের সর্বন্যাত

বি, সি, যাইতি এও কোং

—ইলেকট্রো প্লাস্টিক সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যায়েল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং গেলিট
করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শৌ ক্রম :—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কালি-১২। ফোন : ০৪-৪১৭৪

০, রামমোহন পাল সেন, কালি-১২।

অফিস-কেন-০৪-৪৮৪৪

প্রার্থীকে সমর্থন করার কংগ্রেসী প্রতি-
প্রতি কংগ্রেস রক্ষা করবে কিনা তখন
শ্রীমদ-নাছোড় কংগ্রেসী পক্ষে এবং বিরোধী



শ্রীখাদিলকার

সদস্যদের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডার সমস্ত
জিনিষটাই ভাঙল করে দেওয়া হয়।
বিরোধীরাও প্রতিবাসে সভাগৃহ ত্যাগ
করেন। নির্বাচিত হন শ্রী আর কে
খাদিলকার।

বিরোধী মনোনীত শ্রীকুন্তেকে সমর্থন
করতে শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের এই
অনিচ্ছায় বিরোধীরা সর্বশেষ দুঃখিত।
এমন ঘটনা বাস্তবিকই অপ্রত্যাশিত একটা
হেলেমানুষী। লোভ সম্বরণ করতে না
পারলে শিশুরা যেমন প্রতিদ্রুতি ভঙ্গ করে
ব্যাপারটা তাই-ই। শিশুরা অবোধ, কিন্তু
এ ঘটনা বড়োরা ঘটলে তাকে হেসে
উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্যাপারটা কলঙ্কিত
হয়। প্রধানমন্ত্রীর শ্রীমাসানীর বক্তব্যকে
অতদূর অকিঞ্চে ধাক্কাও যথেষ্ট কারণ
ছিল না। প্রথমত শ্রীগোপালন এবং শ্রীভাঙ্গে
হাতে বেশ কিছু সময় রেখে
খান্নিয়ে দিয়েছিলেন যে, শ্রীকুন্তেই
তাদেরও প্রার্থী; দ্বিতীয়ত শ্রীমাসানীই
নির্বাচনের প্রাকালে কংগ্রেসকে
প্রতিদ্রুতি রক্ষার আহ্বান জানান। সুতরাং
প্রতিদ্রুতিতা যে হত না এবং বিরোধী পক্ষ
যে শ্রীকুন্তেকেই সর্বসম্মত প্রার্থী হিসেবে
খাড়া করতে চেয়েছিলেন এ ব্যাপারটি
স্পষ্টই ছিল। কিন্তু কংগ্রেস স্পীকার
নির্বাচনের সাফল্যের কথা স্মরণে রেখেই

সম্ভবত আর লোভ সম্বরণ করতে
পারেন নি।

নিঃসন্দেহে এই ঘটনা কংগ্রেস ও
বিরোধী পক্ষে সহযোগিতাপূর্ণ আবহাওয়া
সৃষ্টির প্রতিকূলতা করবে। আর এই ঘটনাই
প্রমাণ করছে, কথায় ও কাজে কংগ্রেস যে
এবার কথঞ্চিৎ সংস্কৃত হবে বলে অনেকেই
মনে মনে আশা পোষণ করেছিলেন,
কার্যত সেই আশার অপমৃত্যু ঘটবে।
ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের ব্যাপারটাই
আশা হ্রাসের একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ তুলে
ধরল।

তবে বাঘটি বংশবের স্পষ্টবক্তা
শ্রীখাদিলকারের জনপ্রিয়তা এর ফলে কমে
যাবে বলে ধারণা করার কোনও কারণ
নেই। তিনি স্পষ্টবাদী এবং ন্যায়ানুসারী
বলেই পরিচিত। বিরোধীদের অস্থি তিনি
অর্জন করতে পারবেন হতেই বিশ্বাস।

শ্রীখাদিলকারকে স্পীকার নির্বাচনে
কংগ্রেসের তরফে দ্বিতীয় প্রার্থীরূপে
বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু রোহি-
বিরোধীদের উদ্ভূত ভোটের মধ্যে অসহায়
সৈনিকের ভূমিকার ফলে দিয়ে কেন্দ্রীয়
নেতৃ শ্রীনাথ সঙ্গী বরোহিত পাক করে
নিয়ে গেছিলেন।

কংগ্রেস নির্লোভ নয়, এটা সুবিদিত।
সেজন্য সে দুঃখে আর কালহরণ করার
মানে হয় না। বরং শ্রীখাদিলকারের নির্বা-
চনে তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের দায়িত্বটাই
এখন আমাদের পালন করা উচিত।

তার সিং-এর তালুক

ভবি তারা সিং ডুলবার পাত্র নন। তার
শিক্ষিতানের তালুক চাই-ই, তা সে শিখ
সম্প্রদায় তাঁকে চান বা নাই চান। বিগত
সাধারণ নির্বাচনে এটা বেশ পরিষ্কার
হয়ে গেছে যে, তারা সিং-কে কেউ চাইছেন
না। অর্থাৎ তারা সিং-এর তালুকের
জন্ম কারও বিশেষ মাথা বাধা নেই। হলে
কি হয়, তারা সিং-এর নিজস্ব মাথা বাধা
এখন বেশ টাট্টির উঠেছে। রাজনৈতিক
ক্ষেত্রে পরাজিত ও মৃতপ্রায় হয়ে উনি এখন
প্রায় ক্ষেপে উঠেছেন।

গত জানুয়ারী মাসে যমুনানগরে তারা
সিং এক দুঃসাহসী এবং জাতীয় সংহতি-
বিশেষী ভাষণ প্রদান করেন, যার নির্দলি-
তাব্দ হল, শিখগণ শিখিস্তান চান বা নাই

চান তারা সিং-কে একটা তালুক ও তহবিল
পাইয়ে দেওয়ার জন্য সাগরপারের বিদেশী
এবং দোরের পাশের পাকিস্তান বড়ই
উদ্ভাবী হয়ে আছে। তারা সিং প্রয়োজন
মনে করলেই এঁদের শরণাগত হবেন।

ভারতীয় যুদ্ধনিয়ে বসে এমন মারাত্মক
উক্তি তারা সিং করতে পারেন আর সরকার
নিষ্ক্রিয়? বাস্তবিক তারা সিং-কে কোন
জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীই সহ্য করতে
পারেন না। রাজ্য সভার সদস্যবর্গও
পারেন নি। তাঁদের মধ্যে অনেকে স্বিথা-
হীনভাবে প্রশ্নও তুলেছেন, তারা সিং-এর
এমত আচরণ লক্ষ্য করে তার প্রতিও একই
রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা কেন হবে না,
শেষ আবদুল্লা ও মদুলা সরভাই-এর
প্রতি যে ব্যবস্থা ইতিপূর্বে গ্রহণ করা
হয়েছিল।

উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চাবন
বলেছেন, মা ঠেং! তারা সিং-কে ভয়
করার আদৌ কোনও কারণ নেই। বেশ
বিচার-বিবেচনা করেই কাজ করতে হবে
আমাদের। তারা সিং-এর বক্তব্য মনে হয়
সুযোগ পেলে ইনি গেরিলা যুদ্ধের আয়ো-
জন করবেন। সুতরাং, শ্রীচাবন মনে
করেন, জাতীয় স্বার্থে এই বিষয়ে বিরোধী
দলগুলিকে একটি সুষ্ঠু, দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ
করতে হবে।

তারা সিং-এর তালুকাঙ্ক্ষা নাগাদে
মতই ভ্রমাবহ। কেন্দ্রীয় সরকারের তাই এ
বিষয়ে বেল পাকিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার
নীতি বজ্রন করাই বাঞ্ছনীয়। এইসব
জাতিদ্রোহীকে অন্ধুরে জন্ম করাই সম-
ধিক্ত। একথা সকল জাতীয়তাবাদী দেশ-



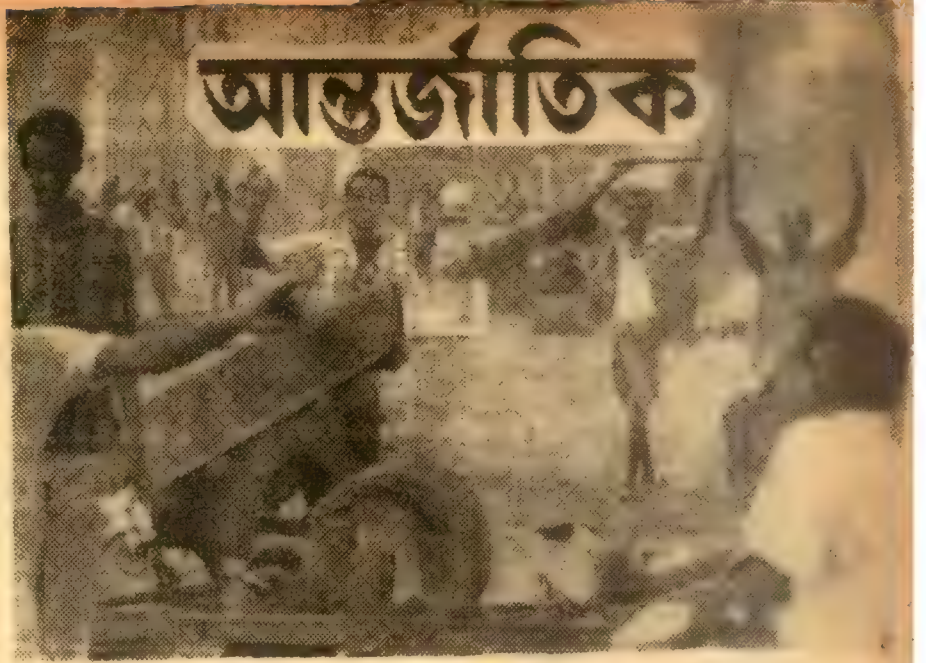
তার সিং

দরদীর সঙ্গে শত্রুদ্রুতিসম্মত শিখ সম্প্র-
দায়ও স্বীকার করবেন।

(০১-০-৬৭)

উপনিবেশকদের মরণ কামড় কতখানি মারাত্মক জীবদ্ভিতির অধিবাসীরা তার একটা সদ্য প্রমাণ পেলে। আফ্রিকা মহাদেশে ফরাসীদের এই শেষ উপ-নিবেশটিতে সম্প্রতি রেফারেন্ডাম বা গণভোট নেওয়া হলো : সোমালিল্যান্ড স্বাধীনতা চায়, না ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়? কিন্তু ভোটপত্র শেষ হবার আগেই এখানে দাঙ্গা বেধে যায়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জনরোষ দমন করার জন্য আঞ্চলিক ফরাসী সৈন্য এগিয়ে এসে অটোমোটিক রাইফেল ফিरे। ফ্রান্স থেকে প্লেন বোঝাই হত্নামলো ছত্রী সেনাবাহিনী। জনতা ইটপাটকেল দিয়ে লাড়তে চেষ্টা করেছিলো, ব্যারিকেড রচনা করেছিলো যাতে তাদের পাড়ার সৈন্যরা না ঢুকতে পারে। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সাবোকাঁ অস্ত্র যুদ্ধে তারা কতক্ষণ? ফলে ১৭ জন সোমালীয় প্রাণ দিতে হলো যদিও সোমালীদের হিসেবে ওই সংখ্যা ৩০-এর কম নয়।

গণমত ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত থাকার স্বপক্ষেই গিয়েছে, স্বাধীনতাকামীরা ছিলেন সংখ্যালঘু। কিন্তু এ কেমনতরো গণমত নেবার চর? সোমালিল্যান্ডের মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজারের মতো; কিন্তু ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছিলো মাত্র ৩৯ হাজার অধিবাসীর। তাও ফরাসী উপনিবেশবাদীরা বেছে বেছে তাদেরই ভোটাধিকার দিয়েছেন যারা ফ্রান্সের প্রভুত্বের জন্যে উদগ্রীব। অর্থাৎ ফ্রান্স জানে যে, সোমালিল্যান্ডে উপজাতীয় কোন্দল প্রবল এবং দুই প্রধান উপজাতি আফর এবং ইসা পরস্পরের ওপর খলহস্ত। সে জন্যেই যাদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যে দেখা গেলে ২২ হাজারই আফর এবং মাত্র ১৪ হাজার ইসা। ক্ষিতীয়ত গণমত নেবার আগে প্রচার সোমালি নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিলো এবং হাজার হাজার সোমালিকে বাইরে চালান দেওয়া হয়েছিলো। আরো অভিযোগ উঠেছে যে, প্রতিবেশী রাজ্য ইথিওপিয়া থেকে ভোট দেবার জন্যে প্রচুর সংখ্যক আফর উপজাতীয়দের আমদানী করা হয়েছিলো যারা ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার স্বপক্ষে ভোট দিয়েছে। অবশ্য এ অভিযোগগুলির জবাব দেওয়া হয়েছিলো এভাবে যে যেসব সোমালির ভোটাধিকার দেওয়া হয় নি আসলে তারা সোমালিল্যান্ডের বাসিন্দা নয়; হয় তারা যাবাবর, নয়তো



জিবুতিতে ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষিত স্বাধীনতাকামী সোমালী জনতা।

অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্র সোমালিয়া থেকে আগত।

এ অবস্থায় ভোটের ফলাফল কী হবে তা সবাই জানতো। গত বছর আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট দ্য গল যখন জিবুতি সফরে এসেছিলেন তখনই সোমালীরা প্রচণ্ড বিকোভের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে স্বাধীনতা দাবি করেছিল। চার্লস দ্য গলও তখন গণবিকোভের গুরুত্ব বুঝে এখানে গণমত নেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সোমালিল্যান্ডকে হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছেই যে তাঁর ছিলো না এটুকু বুঝতে কারো বাকি ছিলো না। এমন ফল রচনা করা হয়েছিলো যে যাতে সোমালীদের ভোট লাঠিও না ভাঙে। সোমালীদের গণমতের ক্ষুধাও মেটানো হলো অথচ উপনিবেশটাকে পকেটেও রাখা হলো—কটনীতির পাকা চাল দিলেন চার্লস দ্য গল।

তবে সোমালিল্যান্ড সম্পর্কে তাঁর দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রও নিষ্পন্থ ছিলো না, বরং তাদের আগ্রহ ছিলো স্বার্থ জিমে প্ররোমায় যদিও সে স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। ইথিওপিয়া চেয়েছিলো, সোমালিল্যান্ডে ফরাসী প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকুক। কারণ, তা যদি থাকে তবেই তার স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত হবে। জিবুতি হলো ইথিওপিয়ার বহির্বর্গজ্যের একমাত্র রাস্তা, এই বন্দর দিয়েই সে তার পণ্য আমদানী-রপ্তানী করে। আর জিবুতি থেকে আন্দ্রিস আবাবার একমাত্র সংযোগরক্ষাকারী পথ হলো ফ্রাংকা ইথিওপিয়ান রেলপথ। অপরপক্ষে, স্বাধীন সোমালিয়া চায় প্রতিবেশী উপ-

নিবেশ সোমালিল্যান্ডও ফরাসী কবল-মুক্ত হোক। সে এটাও মনে করে যে, ফরাসী 'সোমালিল্যান্ড' আসলে তারই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সোমালিল্যান্ডের গণমতকে উপলব্ধ করে তাই ইথিওপিয়া এবং সোমালিয়া করেকটি বাছা-বাছা জারগার তাদের সেনাবাহিনীও

সাপ্তাহিক বসুমতীর

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

	টাকা	পয়সা
বার্ষিক	১৪.০০	০০
ত্রৈমাসিক	৭.০০	০০
মাসিক	৩.৬০	০০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিজর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মসূচক

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল লেখা তাঁর সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই স্বাস্থ্যময় পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানা সহ ডাকটিকিটসহ খাম থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

মোতায়েন করোছলো প্রয়োজনবোধে কাজে লাগাবার জন্যে।

কিন্তু ফ্রান্সে এখানকার কোর্শলে পার পেয়ে গেলেও ব্যাপারটা এখানেই নিষ্পত্তি হবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ ইসা কিস্সা মেগাদিশু উপজাতীয়রা গণ-মতের নামে যে এখানে প্রহসন করেছে তা রাষ্ট্রসংঘের গোচরে আনবে বলে জানিয়েছে। ফরাসী পার্লামেন্টে ভেদুটি নির্বাচনেও ইসা উপজাতীয়রা অংশ গ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করেছে। তাদের পদত্যাগ মতামতকে বরং আরো জোরদার করে তোলবার জন্যে স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে তারা শপথ নিয়েছে। বাকী আফ্রিকা থেকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ হাত গুটিয়ে নিয়েছে, সোমালিল্যান্ডও কি তারা বেশিদিন থাকতে পারবে? গত সাধারণ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট দ্য গলের শক্তি যে যথেষ্ট খর্ব হয়েছে একথা তুললে চলবে কেন?

ফ্রান্স:

পার্লামেন্টারী নির্বাচনে অতৃতপূর্ব সাক্ষ্য অর্জনের পর এখানকার বামপন্থী দলগুলি তাদের নির্বাচনী ঐক্যকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে সচেষ্ট হয়েছে। নির্বাচনের সময় যেমন এখানকার

কমিউনিস্ট পার্টি, বামপন্থী ফেডারেশন এবং বামপন্থী সোস্যালিস্ট দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্য গলের শাসক পার্টির বিরুদ্ধে নির্বাচন-যুদ্ধ করে দ্য গলকে জয় করেছিলেন সেই ঐক্যবদ্ধ জোটকে স্থায়ী দেবার জন্যে নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা মোটামুটি যোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। বামপন্থী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টে বামপন্থীদের স্থায়ী প্রতিনিধি দল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিলো যার কাজ হবে নিজেদের মধ্যে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সম্ভব হলে বামপন্থীদের মধ্যে পরিবর্তন কোর্শলে সমতা বজায় রাখা। এ প্রস্তাব কমিউনিস্ট পার্টিও সমর্থন করে বলেছে যে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে যাতে তারা একত্রে কাজ করতে পারে সেজন্যে গর্ব প্রবর্তে চেষ্টা করা হবে। বামপন্থী সোস্যালিস্ট পার্টিও ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীতে সম্পূর্ণ গায় দিয়েছে।

এবারকার নির্বাচনে দ্য গলের ইউ-এন-আর টায়ে টায়ে তার মানরক্ষা করতে পেরেছে। জাতীয় পরিষদ বা পার্লামেন্টে ৪৮৭টি আসনের মধ্যে তারা কেবল নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠতার

জন্যে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন ২৪৪টি আসনই লাভ করেছে। অন্য দিকে ফ্রান্সের মিতরা এবং গী মোলের বামপন্থী ফেডারেশন পেরেছে ১১৬টি আসন এবং কমিউনিস্ট পার্টি ৭০টি আসন। একথা ঠিক যে, ফ্রান্সের সংবিধান অনুযায়ী দ্য গলের দলের শক্তি খর্ব হলেও পঞ্চম রিপাবলিকের আশু কোন বিপদ ঘটছে না। কারণ নির্দলীয়দের মধ্যে অনেকেই দ্য গলকে সমর্থন করবেন এবং ডেমোক্রেটিক সেনেটর দলের সদস্যরাও গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রশ্নে দ্য গলের পেছনেই থাকবেন। কিন্তু পার্লামেন্টে বিরোধীপক্ষ যে আরো শক্তিশালী হলো গত তিন দশকে যা সম্ভব হয় নি সেই বামপন্থী ঐক্যের ফলে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দ্য গলকে তার বৈদেশিক নীতিতে বিশেষ পরিবর্তন না ঘটলেও হয়তো চলবে। বরং কমিউনিস্ট এবং সোস্যালিস্টরা তাঁকে সমর্থনই জানাবেন তিনি যদি আগের মতো ন্যাটোর প্রতি আগ্রহ না দেখান, ইরোরোপে আমেরিকার খবরদারীকে অগ্রাহ্য করেন এবং অপরপক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন বা পূর্ব ইরোরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নিকটতর করেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাঁকে এবার বেশ শক্ত পাল্লায় পড়তে হবে। কারণ, ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে গত কয়েক বছরে। প্রথমত শ্রমিক অসন্তোষ এখানে তীব্র হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক থেকে জাহাজঘাটা পর্যন্ত বহু জায়গায় গত কিছুদিন ধরে ধর্মঘট চলছে। ব্যবসারে হ্রাসের জন্যে বেকারের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। জীবনধারণের ব্যয় যাচ্ছে বেড়ে, কিন্তু আয় কমেই কমছে। চাকরীর নিরাপত্তা সম্পর্কেও শ্রমিকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বামপন্থী দলগুলি জনসাধারণের এ-অসন্তোষকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে সরকারের বিরুদ্ধে। গৃহ-সমস্যা, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি সমাজ কল্যাণমূলক প্রশ্নে বিরোধীরা সরকারকে এবার বিস্তৃত করে তুলবেন স্বভাবতই। প্রেসিডেন্ট দ্য গল অবশ্য ১৯৬৭ সালকে 'সমাজ কল্যাণ বছর' বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার জন্যে তিনি খরচ জোগাবেন না সমাজ কল্যাণ করবেন। দ্রুত জিনিষ এক সপ্তে এবং একই হারে করার মতো আর্থিক সংগতি কি ফরাসী জাতীয় অবনীতির আছে?



যা দেখেছি, যা পেয়েছি

শ্রীমুদ্রাঙ্গন দাস

স্মৃতিচয়ন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(পঞ্চম অধ্যায়)

দক্ষিণের বাড়ি

রমানাথ দাশের পঞ্চম পুত্র চন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র এবং মধ্যের বাড়ির কাশীশ্বরের ছোট ভাই বীরেশ্বর বসতি করেছিলেন তেলিরবাগ গ্রামের মাঝখান দিয়ে যে খালটি বইত পূর্বাঙ্গনের দিকে তারই দক্ষিণ পাড়ে। সে বাড়ি ছিল খুব ছড়ান এবং বাড়ির পূর্বদিকে যে পুকুরিণীটি ছিল সেটি ছিল গ্রামের অন্যান্য সব পুকুরের চেয়েই বড়। এত বড় ছিল সে পুকুর যে উত্তর থেকে দক্ষিণ পাড় ঝাপসা দেখাত। এই বাড়ির নাম ছিল দক্ষিণের বাড়ি। বীরেশ্বর ছিলেন আইনজীবী। মোক্তারী পরীক্ষা পাশ করে তিনি কলকাতার ব্যাপৃত হলেন ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে। পশার যখন বেশ জমল তখন তিনি কালীঘাটে অনেক বিধা জমি কিনে মস্ত বাড়ি তৈরি করে নিয়েছিলেন। শুনছি তিনি আপন অধ্যবসায় ও বুদ্ধির বলে বৃহত্তর ও স্মরণভাণ্ডার মহারাজাদের বিধা মোক্তাররূপে বিস্তর অর্থ উপার্জন করতেন। স্বতন্ত্র হাজারা রোড বৈথানে কালীশ্বরের উপরের পোল দিয়ে আলিপুত্রের পলিশ ও জল কোর্টের দিকে গেছে সেই পোলের এ-পারেই একটি রাস্তা দক্ষিণ দিকে কালীমন্দিরের দিকে চলে গেছে। সেই রাস্তার এখন নাম হয়েছে কালীঘাট রোড। ঠিক হাজারা রোড ও কালীঘাট রোডের মোড়ে ছিল বীরেশ্বরের বসতবাড়ি। হাজারা রোড থেকে কালীঘাট রোডে ঢকে অল্প একটু এগিয়ে গেলেই ডান দিকে একটি ফটকের মধ্যে দিয়ে ড্রাইভ অর্থাৎ গাড়ি যাবার রাস্তা সোজা চলে যেত তাঁর বাড়ির গাড়িবারান্দার সামনে। কালীঘাট রোড থেকে বাড়ি পর্যন্ত পূর্বদিকে ছিল অনেকটা জমি এবং তাতে ছিল কত ফল ও ফুলের গাছ। উত্তরে বাড়ির সীমানা ছিল সেই

পোল পর্যন্ত। দক্ষিণেও অনেকটা সংলগ্ন জমি ছিল। পশ্চিমে ছিল কালীশ্বরের অথবা টলস নালা। সেই গঙ্গায় এ বাড়ির বাঁধান ঘাট ছিল এঁদের মেয়েদের স্নান ও পূজার জন্যে।

বাড়িটি ছিল চকমেলান অর্থাৎ মাঝখানে একটি বড় বাঁধান উঠানের চারিদিকে অসংখ্য ঘর। পেছন দিকে একটি বেশ ভাল সিঁড়ি ছিল কিন্তু দক্ষিণ-পূর্বে ছিল একটা খুব উঁচু উঁচু খাপওরাল। এক-পাল্লা সরু সিঁড়ি। ছেলোপলেদের সে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবার ব্যথেষ্টই ভয় থাকত। ওটা বোধ হয় পরে কোন রকমে তৈরি করা হয়েছিল বাহির বাড়ি থেকে দোতলার যাবার জন্যে। বাড়ির দক্ষিণের দিকে ছিল প্রধান বৈঠকখানা এবং তার সামনে বারান্দা। বৈঠকখানা ঘরখানি ছিল অন্যান্য ঘরের চেয়ে উঁচু। সুতরাং দেখাত যেন দেড়তলার সমান। তার উপরে যখন ঘর হল তখন তার ছাদও দোতলার অন্যান্য ঘরের ছাদের চেয়ে অনেক উঁচু হয়ে দেখতে হল যেন আড়াইতলা। এই বাড়িতে বাস করতেন বীরেশ্বর তাঁর বিশাল পরিবার নিয়ে। জাতপুত্র দুর্গামোহনও সস্ত্রীক এ বাড়িতে থাকতেন এবং কলেজে পড়তেন। এই বাড়িতেই ভূমিকা হন দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা। সেই প্রকাণ্ড বাড়ির চন্দ্রপাশ্চাত্য প্রশস্ত জমিগলি সবই ধীরে ধীরে বিক্রি হয়ে গিয়ে খোলার মাঠকোঠা মাথা তুলে দাঁড়ানতে রাস্তা থেকে সে বাড়ি এখন আর দেখাই যায় না। সেই লোক-জমকালো বাড়িটি সংস্কারের অভাবে এখন ভস্মপ্রায় হয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। শুনছি নাকি তা-ও বিক্রি হয়ে বাড়িটি বংশের সন্তানদের হাতের বাইরেই চলে যাবে।

বীরেশ্বরের ছয় পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মোহিনীমোহন খুব কম বয়সেই মারা গেলেন। তাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বড় ছেলে ক্ষিতিমোহনকেও

আমি নিজ চক্ষে দেখি নি। শুনছি তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। বীরেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনিই হলেন এ বাড়ির কর্তা। শোনা কথা যে তিনি নাকি খুব মজলিসি ও আমদাদে মানুষ ছিলেন। পাড়ায় অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁর ছিল যাদের প্রতি কটাক্ষ করে বাড়ির লোকেরা নেপথ্যে বলত মোসাহেব। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ত্রিকি মজলিস বসত এবং সেই সন্ধ্যাজ্ঞার দিনেও নাকি তাদের জলযোগে খরচা হত দিনে অন্তত দশ টাকা। ক্ষিতিমোহন তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র বিশ্বরঞ্জনকে রেখে মারা যান।

বিশ্বরঞ্জনের লেখাপড়া খুব বেশি এগোয় নি। কিন্তু তিনি খেলা-ধুলায় বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার খুবই নাম করেছিলেন এবং বন্ধুসহলে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল। সবাই তাকে দলপতি বলে মেনে তাঁর হুকুম তামিল করত। একবার অর্ধদায় যোগে কলকাতার অসম্ভব লোকসমাগম হয়েছিল। সেই সমস্ত কংগ্রেসের তরফ থেকে যাত্রীদের সুবিধের জন্যে হাসপাতাল ও অন্যান্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। দুই সহস্রাধিক কিশোর যুবক—আমিও ছিলাম ছোটদের মধ্যে—নাম লিখিয়েছিলাম স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্যে। সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দলপতি হয়েছিলেন বিশ্বরঞ্জন। স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ ছিল বিস্তর। যাত্রীদের রাস্তা দেখিয়ে স্নানের জন্যে সবচেয়ে কাছের ঘাটে নিয়ে যাওয়া, প্রয়োজন হলে তাদের তলিপতলপা মাথায় বা পিঠে বসে নেওয়া, অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। দলপতির আদেশের অপেক্ষায় স্বেচ্ছাসেবকেরা উদ্ভূত হয়ে থাকত। হুকুম যখন আসত তখন 'না' বলবার যো নেই। একেবারে ফেঁজী সংঘম। বলতেই হবে যে স্বেচ্ছাসেবকদল সেবার অর্ধদায় যোগে অসাধারণ কষ্ট করেছিলেন এবং দলপতি বিশ্বরঞ্জনের আদেশ তাঁরা

অকস্মেৎ পাকন করোছিলেন। বিশ্ব-রঞ্জনকে সে সব সখের সেনাদের সুখ-দুঃখের দিকে বিশেষ নজর ছিল দেখেছি। সভাই তিনি দলপাতি হবার যোগ্য ব্যক্তিই ছিলেন। বিশ্বদাদার পুত্রসন্তান ছিল না। ছিল দুটি ফুটফুটে সন্তানের মেয়ে—ইলা ও লীলা। তাঁরা এখন ইহজগতে আছেন কি না জানি না।

বীরেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রমোহন নিজের নামের ইংরেজী বানানে 'ইউ' না লিখে 'ডিরিউ' লিখতেন। লেখন্যে সংক্ষেপে সবাই তাঁকে বলত 'ডিরিউ', এম, দাশ'। তাঁকে দেখেছি। গায়ের রং অস্ফা, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বেশ বড়ই, খুব ভারি ধরনের এবং চরিত্রবান মানুষ তিনি ছিলেন। ব্যারিষ্টারী ছিল তাঁর পেশা। তিন বাকীপুত্রের আদালতে প্র্যাকটিস করতেন এবং পশারও কিছু জমিয়ে ছিলেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে-ছিলেন। পিতা বীরেশ্বর বিনি আশ্রন স্নাতকপুত্রের ব্রাহ্ম হলে তাঁদের একত্রে করে-ছিলেন তিনি বোঝে ছিলেন না এই সময়ে এই যা রক্ষা। আমার বতবুর মনে পড়ে তাঁর ছেলের ও মেয়েদের ব্রাহ্মমতেই বিবাহ হয়েছিল।

উপেন্দ্রমোহনের চার ছেলের মধ্যে তিনজনকে আমি দেখেছি। দেখি নি প্রবোধরঞ্জনক—তিনি বোধ হয় বালক বয়সেই মারা যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষিণা-রঞ্জনকে দেখেছি বেশ কাছাকাছি থেকেই। তিনি ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করে বিলেতে যান উচ্চ শিক্ষার জন্যে। সেখানে ডাক্তারী পরীক্ষার পাশ করে তিনি বিখ্যাত রোগীশা প্রতি-ষ্ঠানে প্রসূতি-বিজ্ঞান শিক্ষা করে দেশে ফিরে এসে কলকাতাতেই প্র্যাকটিস করতেন। তিনি যখন ক্যাম্পবেলে পড়তেন তখন আমাদের বাড়ি মাকে মাকে আসতেন। আমার মায়ের তখন ছিল হজমের সমস্যা। মোটা রবারের নল মূখ দিয়ে গিলে পাকস্থলী গরম জল দিয়ে ঝোয়ানো দক্ষিণাদাদাই মায়ের জন্যে ব্যবস্থা করে-ছিলেন। নিজে বসে দক্ষিণাদাদা মাকে নির্দেশ দিতেন কেমন করে পেট ঝোয়াতে হয় এবং অজীর্ণ ভাতগুটি বের করে আনতে হয়। বিলেত থেকে ফিরে এসেও তিনি মায়ের কাছে অনেক সময় আসতেন। প্রসূতি ডাক্তার বলে দক্ষিণাদাদা সারা কলকাতার বিস্তারিত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। জাঁত অমায়িক ধর্মপরাশ্রয় মানুষ ছিলেন দক্ষিণাদাদা। পরিবারের বাবতীর জাতি-দের যখন প্ররোজন হত দক্ষিণারঞ্জনকে সাহায্য ও সেবা সব সময়েই সবাই পেতেন। তাঁর একমাত্র পুত্র দিলীপরঞ্জনও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে বিজ্ঞান গি্রে প্রসূতি-বিজ্ঞানে বিশেষ

পারদর্শিতা লাভ করে ফিরে এসে এখন কলকাতার নিজের বাড়িতেই নাসিংহোম প্রতিষ্ঠা করে বেশ পশার জমিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনেও তিনি যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। পিতার অনেক সদগুণ তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন।

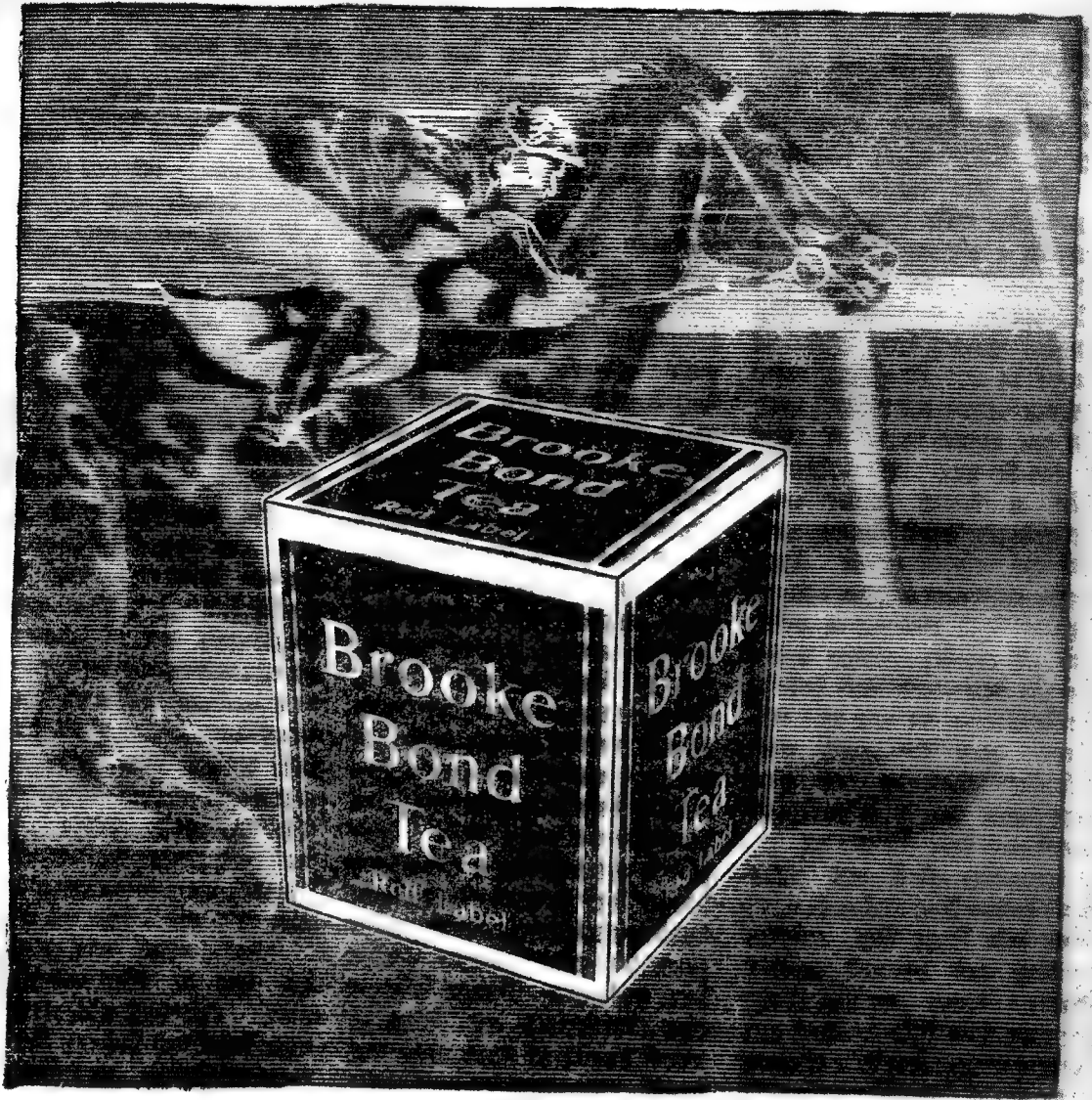
উপেন্দ্রমোহনের দ্বিতীয় পুত্র প্রিয়-রঞ্জন ভীষণ পরীক্ষার পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। তৃতীয় পুত্র সুরেশ-রঞ্জন বাকি আমরা দক্ষিণাদাদা বলতাম তিনি এদেশে বি-এ পাশ করে বিলেত যান উচ্চ শিক্ষার জন্যে। সেখানে অল্পকাল পড়ার পরই তিনি রেল এ-টি-এস পদ-প্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি রেলের কাজে বেশ উন্নতি করে ডি-টি-এস পদ লাভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও বেশি বয়স পান নি এবং বলতে গেলে অকালেই মারা গেছেন। তাঁর তিনটি ছেলে—প্রদীপ, কমল ও সুজিত। তিন-জনই নামকরা মাচেস্টার অফিসে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে কাজ করে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

বীরেশ্বরের তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল রাজমোহন। দেখতে অনেকটা তাঁর নিজের দ্বিতীয় ভ্রাতা উপেন্দ্রমোহনেরই মতন ছিলেন। তিনি এখানে বি-এ পাশ না করার কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নি পরীক্ষায় বসবার অধিকারী ছিলেন না। সেই কারণে তিনি এটর্নি হবার জন্যে বিলেতে গিয়ে ইনকর্পোরেটেড ল' সোসাইটিতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু সে দেশের জলবায়ু তাঁর সহ্য না হওয়ায় তিনি তাঁর আর্টি-কেল কলকাতার এক এটর্নির কাছে বদলী করে এনে পরে বিলেতের এটর্নি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার এটর্নিশিপের কড়া আইনের মধ্যে ভাঁড়ি মেরে কলকাতার প্র্যাক-টিস সুরু করেন। কিন্তু আইনজীবীর পেশা থেকে ঘোড়দৌড়ের দিকেই ছিল তাঁর বেশি ঝোক। ঘোড়দৌড়ের আগের দিন থেকেই কালীঘাটের বাড়ি লোকে লোকাণ্য হত। শুধু ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। তাঁর নিজেরও ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া ছিল। কালীঘাটের বাড়ির পূর্ব-উত্তরে যে জমি ছিল তাতে ঘোড়ার আস্তাবল আমিও দেখেছি। তখনও ইলেকট্রিকের বন্দোবস্ত তেমন চালু হয় নি। আস্তাবলে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে ঠান্ডা রাখবার জন্যে হাতে-টানা পাখার বন্দোবস্ত দেখে অবাক হয়ে পড়তাম। কোন ঘোড়ার বাগ কটা দৌড় জিতেছে, তাব মাই বা কে ছিল এবং তারই বা কতটা কত এইসব নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে ঠিক হত এই ঘোড়াটা দৌড়ে কি স্থান লাভ করবে। সে এক ব্যাপার। সেই সঙ্গে দিনশেষে ভীষণভোজন। এটা

সহজেই অনুমান করা যায় যে আইন এবং ঘোড়দৌড় দুই-ই একসঙ্গে চলতে পারে না এবং তাতে কোনটাই ভাল চলে না। হলোও তাই। একে একে তাঁর ঘোড়া সব বিক্রি করে গেল। বাড়ির সংলগ্ন জয়গাজিমির বেশির ভাগই জাটে না উঠলেও তাঁর নিজেরই বিক্রি করতে হল এবং এটর্নি অফিসও সেই সঙ্গে বন্ধ করে তদন্ততল্লা গুটিয়ে রাজমোহনকে যেতে হয়েছিল জগদলক্ষ্মীর অনুস্থানে রেঙ্গুনে যেখানে ছিলেন পিতৃব্যপুত্র দুর্গামোহনের কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষ-রঞ্জন। রেঙ্গুনে রাজমোহন বেশ পশার জমিয়েছিলেন কিন্তু কয়েক বছর পরেই তিনি মারা যান।

রাজমোহনের প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার কিছু পরে রাজমোহন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ছিল কমলা। এই জ্যোতিষার মত সুগৃহিণী খুব কমই দেখা যায়। ঘর-কমার কাজের ত' কথাই নেই, নানা রকমের হাতের কাজে এই জ্যোতিষা ছিলেন একেবারে পারদর্শী। তাঁর হাতের সুচীশিল্প ছিল অদ্ভুত সুন্দর। কি চমৎকার কাঁথা যে তিনি সেলাই করতেন তা দেখবার মত হত—কত রকমের সেলাইয়ের প্যাটার্ন। তা ছাড়া কনো নারকালের ছাই দিয়ে গগ্যাজলি ও কত রকমের অপূর্ব সুস্বাদু নাড়ু করে তিনি ছেলেমেয়েদের ঝাওয়ারতেন। আমিও তার থেকে বঞ্চিত হই নি। তারোঁষ আঁটির ছোবড়া ও নারকালের ছোবড়া দিয়ে হাতে বুনো কত রকমের পাখী বসান ঝড়লুপ্তন তিনি করতেন। কমলা জ্যোতিষাকে শেষ দেখি যখন দ্বিতীয় মহাব্যুথের অব্যবহিত আগে জাপান ঘুরে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর রেঙ্গুনের বাড়িতে কয়েকদিন ছিলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মৃদুভাবী এবং ঘেরের প্রতি-ভূতি। অনেক ঝড়ঝুঝা গেছে তাঁর মাঝার উপর দিয়ে কিন্তু কিছুতেই তাঁর মানসিক বিদ্রোহিত ঘটতে পারে নি। এই অসীম সহনশীলতা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে বার কথা পরে বলব।

রাজমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রসিক-রঞ্জন অল্প বয়সেই মারা যান। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশরঞ্জন রেঙ্গুনে পোর্ট কমিশনারের অফিসে সুপারিস্টেণ্ডেন্ট অব ল্যান্ডস-এর কাজ করতেন—বেশ উচ্চপদস্থ কর্ম-চারী। এ রকম আত্মপর ভোলা মানুষ চারী। এ রকম আত্মপর ভোলা মানুষ সমসারে বিরল। সার্থক তাঁর মা তাঁকে 'ভোলা' নাম দিয়েছিলেন। ছেলে-বুড়ো সবাইয়ের সঙ্গে আমাদের কালীঘাটের এই ভোলাদাদা মিশতে পারতেন এবং এখনো পারেন। ভৌলরবারের দাশ গোষ্ঠীর



বাজি ধরলেই জিতবেন

স্বাদ-গন্ধের দোড়ে ক্রক বগু রেড লেবেল না জিতেই
পারে না। সেরা সেরা চায়ের ব্রেণ্ড। প্যাকেট পিছু
ডের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন। আপনার জন্য
ক্রক বগু রেড লেবেল চা।

বংশাবলী প্রণয়নে এঁর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি গরীব-দুঃখীর জন্যে সর্বদা ভাবেন। রোগ্যানে কাজ করার সময় সেখানে তিনি নিজ অর্থ-ব্যয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ল্যাবরেটরীর বাঁহুগুটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন তা নিজে দেখে এসেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আছে তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের। ভগবত কৃপায় দু'জনেই এখনো আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন। দাশ গোষ্ঠীর অগ্রজেরা একে একে পরলোকে চলে যাবার পর ভোলাদাদা যে এখন এই পরিবারের পয়লা নম্বর হয়ে পড়েছেন সেই গৌরবের কথাটা তিনি বলে বেড়াতে ভোলেন না, ভোলা নাম হলে কি হয়। তাঁর দু'টি ছেলে সুশীল ও সুভাষ। সুশীল ওরফে শৈল কন্সট্রাক্ট-অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। এখন তিনি পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া এয়াল্ডু-মিনিয়াম ওয়াক'স-এর জেনারেল ম্যানেজার হয়েছেন। খুবই স্নেহপ্রবণ ও জাতি-বৎসল এই ছেলেটি। আমাকে কেনিয়া গিয়ে তাঁর কাছে থাকবার জন্যে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তা পড়ে মৃদু হয়ে-ছিলাম। রক্তের টান একেই বলে। কালীঘাটের ভোলাদাদার ছোট ছেলে দু'ভাষ আছেন ভারতীয় ফৌজে। পদ-খাদ্য এখন তিনি লেঃ কর্নেল।

রাজমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র সারদা-রঞ্জন প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল রেলপুনে। তারপর তিনি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে রেশমুনেই প্রাকটিস করতেন। বৃদ্ধের পর যখন রেলপুনে ছাড়তে হল তখন তিনি কলকাতায় এসে কাজ শুরু করেন। পরে তিনি ন্যাশান্যাল ওয়ার ফ্রন্টের সহাধিক হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। তিনি একটি ইংরাজ মহিলা (ডরথী)-র পাণিগ্রহণ করেছিলেন। ডরথী একেবারে এঁদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠীমাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং শুনেনি যে তিনি জ্যেষ্ঠীমার সংগে সংগে সম্প্রাপ্তজ্ঞাও করতেন। ইনি এখন বিলেতে ফিরে গেছেন। সারদারঞ্জনর চারটি মেয়ে ও একটি ছেলে। মেয়েদের সবাইয়ের বেশ ভালভাবেই বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেটির নাম সন্মিতরঞ্জন— ভাক নাম রতন। কালীঘাটের ভোলাদাদা এঁর ছোট বয়সে একে পাদরী সাহেব বলে চালাতেন। রতন এখন ভারতীয় ফৌজের গ্রিনেডিয়ার্স গার্ডে পদমর্যাদায় মেজর।

দক্ষিণের বাড়ির বীরেশ্বরের চতুর্থ পুত্র ছিলেন প্যারীমোহন। তিনি বি-এ পাশ করবার কিছু পরে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসে ঠিকে গাড়ি বিভাগে ইনস্পেক্টর হয়েছিলেন। পরে সে কাজ

ছেড়ে তিনি কাঠের ব্যবসারে মন দেন। কালীঘাটের বাড়ির পুত্রের জমি যেটুকু তখনো তাঁদের আয়ত্তে ছিল সেখানে কারখানা বসল। বৈদ্যুতিক করাতে কাঠ চেলা করা হত। নতুন বাড়ির জন্যে দরজা, জানালা ও কাঠের নতুন আসবাব-পত্র সেখানে তৈরি হত। পি এম দাশ এ্যান্ড কোং-এর বেশ খ্যাতিও রটেছিল। কালীঘাটের বাড়ির হুত-গৌরবও যেন খানিকটা ফিরে এলো। বাড়িতে আবার লোকসমাগম শুরু হল ও খাওয়া-দাওয়ার হৈ-হুজুত আবার ফিরে এলো। কালী-ঘাটের বাড়িতে বিধবাদের রান্নাঘরে রামুন-ঠাকুর দিয়ে রান্না করাতে হত। আবার হিবি ডি হি, ঠিক এই সময়ে প্যারীকাকার দোতলার দক্ষিণের বড় শোবার ঘরের দক্ষিণ বারান্দার আলিসায় এসে বাসা বাঁধল একাট শাদা লক্ষ্মীপেঁচা। বাড়িতে হৈ হৈ পড়ে গেল—সেই পেঁচার বাসের জন্যে সুন্দর করে কাঠের ঘর করে দেওয়া হল। কালীঘাটের বাড়ির বৌয়েরা ও মেয়েরা একেবারে বললেন যে 'মা লক্ষ্মী'ই ফিরে 'আইছেন'। আমরা শুধুকা সহকারে দেখে এলাম সেই লক্ষ্মী-পেঁচা। সারাদিন সে তার ঘরের এক-কোণে চুপ করে বসে থাকত এবং অব্যাহত দশকদের দিকে গোল গোল চোখে চেয়ে মনের অসন্তোষ প্রকাশ করত। রাতে সে বের হয়ে যেত খাবারের খান্দায় কিন্তু নিয়মিত ফিরে আসত সুযোগের সংগে সংগেই। প্যারীমোহনের শ্বিত্রীয়া পত্নীকে আমরা 'নয়া খুড়িমা' বলতাম। তাকে নিয়ে প্যারীমোহন বিলেতে চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন। নয়া খুড়িমা যে একবর্ণ ইংরেজী না পড়েও কেমন করে বিলেত খুঁজে এলেন তা ভেবে আমরা অবাক হতাম। প্যারীমোহন নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। নয়া খুড়িমাও তাকে অনুসরণ করেন।

বীরেশ্বরের চতুর্থ পুত্রের নাম ছিল জ্ঞানেন্দ্রমোহন। জেন্দুকাকা ওকালতী পাশ করবার পর স্বর্ণাঙ্গী বরদানাথ হাল-দার, বীর কথা আগে বলেছি, তাঁর সাহায্যে তিনি বিজনীর রাণীদের সহ-কারী দেওয়ান হন। তারপর বরদাবাবুর মৃত্যুর পরে তিনি কিছুদিন মৃত্যু দেওয়ানও হয়েছিলেন। দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে নানা রকম দলাদলি থাকে এবং তারই খামেলায় জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে বিজনীর দেওয়ানী ছেড়ে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরতে হয়। জেন্দুকাকার স্ত্রীকে বেশ কাছাকাছিই দেখেছি—কমনীয়, ছোট-খাট মহিলা। মুখে রা নেই, বেন স্তম্ভ। কখনো কাউকে উঁচু গলায় কথা বলতে শুনিনি। তাঁর চোখ দু'টি একটু কটা এবং চোখের তারার চারপাশে দু'টি

সবুজ চক থাকত। তাঁর দু'টি ছেলে নলিনী থাকে ডাক্তার হারদা বলে এবং প্রমথ বীর ডাকনাম ছিল ফটিক—তাঁরা দু'জনেই লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিলেন। ফটিক আমার বয়সীই ছিলেন। আমি কালীঘাটের বাড়িতে তাঁদের সংগে খুড়ি ওড়াতে যেতাম। সেই ছোট খুড়িমা বড়ই দুঃখিনী ছিলেন। একে একে তাঁর বড় দু'টি ছেলেই চলে গেলেন। তারপরে জেন্দুকাকার আরো চার-পাঁচটি ছেলে হয়েছিল। তাঁদের নাম ছিল রাধিকা (ডাকনাম কার্তিক) সুহৃদ (ডাকনাম) গণেশ) অমির, বিমল, বীরেন ও খোকা। মেয়ে ছিল চারজন। কার্তিক বিলেত থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে আসেন। প্যারী-কাকা বেঁচে থাকতেই কার্তিক ও গণেশ এ কাঠের কারবার চালি দাঁড়ালেন। কিন্তু কি কারণে জানি না সে কারবার ফেল হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। মনের কুসংস্কার কি না বলতে পারি নে কিন্তু শুনেনি ঠিক এই দু'দিনের সময় শাদা লক্ষ্মীপেঁচাটি সেই যে একাধা রাতে বের হয়ে গেল সে আর ফিরল না। সংগে সংগে কালীঘাটের বাড়ির দীপশিখা যেটি আবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা যেন ফুৎকারে নিভে গেল। বাড়িতে ভাড়াটে বসল ঘরে ঘরে, বাইরের আটনিয় হল গরু-মহিষের খাটাল। সংস্কার অভাবে সে গমগমে অট্টালিকা ভূনপ্রাস্ত হয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। শুনছি এবার নাকি বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে।

দক্ষিণের বাড়ির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে এ বাড়ির কয়েকটি মেয়ের কথা। বীরেশ্বরের দু'টি মেয়েই অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পিছুগুহে ফিরে এসে আশ্রয় পেয়েছিলেন। বড় পিসিমা ছিলেন নির্বাবাদী মানুষ, সাতোও নেই পাঁচোও নেই। কোন কিছুই মধ্যে তিনি থাকতেন না। ছোট পিসিমা, নাম ছিল তাঁর শশিমুখী, তিনি ছিলেন একেবারে অন্য রকম। যা তিনি ন্যায্য মনে করতেন তার জন্যে গলা বাড়িয়ে কোন্দল করতে তিনি পিছপাও হতেন না। তাঁর বাপের বাড়ির গরব ছিল বিস্তর এবং কোন রকম বেচাল দেখলে তিনি ছেলেমেয়েদের বেশ ধমকে দিতেন। বীরা খাতানি খেতেন তাঁরা ছোট পিসিমার চোখের ভুগুটিটার দিকে ইঙ্গিত করে নেপথ্যে বলত—'এ রে, ট্যারা পিসি আসছে।' ছোট পিসিমার ভাইয়ে-দের মধ্যে প্রিয় ছিলেন তাঁর ছোট ভাই, জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং প্রাতুপুত্রদের মধ্যে জেন্দুকাকার দুই ছেলে কার্তিক ও গণেশ। কার্তিক গণেশের স্বার্থপরকার্যে তাঁর পিসিমা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তারি বোধ হয় আশঙ্কা ছিল প্যারী-কাকার মৃত্যুর পর কালীঘাটের বিশাল

সাম্প্রতিক বঙ্গমতী

বাড়ি ও যাবতীয় সম্পদ নয়া খুড়ির বাপের বাড়ির দিকেই চলে যাবে। কত-বাব আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে বলে গেছেন—“রাখাল, তোরা দেখস না, দাশ গুন্ঠীর চিহ্নটুকুও লোপ পাইবো। প্যারীকে বল্ যে বাড়িটা ও কারবারটা কীর্তিক গণেশের নামে লেইখ্যা দেউক অখনি”। দুই পিসিই চলে গেছেন।

মনে পড়ে রাজ্জু জ্যোতিষশাস্ত্রের বড় মেবে নেড়িদিদিকে বাঁর ভাল নাম সুহাসিনী। যেমন তিনি ভাল তেমনি উদার ছিলেন তাঁর স্বামী সুরেন্দ্রনাথ সেন। তিনি ছিলেন লোকাল অভিটার। পরে তাঁকে রাজমোহন রেশ্মানে নিয়ে গিয়ে ঢাক্ষে দেন পোর্ট কমিশনের অফিসে। সেই কাজে তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ কবে অবসর গ্রহণ কবে কর রহর হল তাঁর কলকাতার বাড়িতেই দেহ-রক্ষা কবেছেন। সেই যে বেগুনে গেলেন সেই ইন্তক নেড়িদিদি ও সুরেনবাবু স্বামী-স্ত্রীতে মিলে রাজমোহনের পরি-বারের গার্জীবানস্বরূপ হয়ে সকল ধান্দা নীকবে বয়ে এসেছেন। নেড়িদিদিও ছিল বাপের বাড়ির গৌরব বোধ এবং ভাই অন্ত প্রাণ। নিঃসন্তান দম্পতি ভাইষেদেব ছেলেমেয়েদেরই মানদ্র কবে তুলেছেন। সুরেনবাবু চলে গেছেন। কিন্তু নেড়িদিদি তাঁর বৃদ্ধ দেহনলে স্বতটুকু পাবেন ভাইষেদেব ছেলেমেয়েদের কল্যাণ কামনা করেই যাচ্ছেন।

আব মনে পড়ে চিরদুঃখিনী মকুলকে। জেন্দুকাব মেয়েদের মধ্যে মকুল হল দ্বিতীয়। তিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। খুব অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হোসেছিল। তাঁর প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা হতে হতেই তিনি বিধবা হলেন। মাথাষ আকাশ ভেঙে পড়ল সেই অন্তঃসত্ত্বা অভাগিনী কন্যার। বাপের বাড়িতে তিনি এলেন আশ্রয় নিতে। একটি ছেলে জন্মাবাব কর্দন পবেই চলে গেল। সেই ছেলেব মৃতদেহটিকে আঁকড়ে ধবে মকুলের সে কি মমম্মদ কামাই না শুনোছি। তাঁর আপন ভাইষেরা পেছপা হওয়াষ আমাকেই মকুলের সেই ছেলেটিকে তাঁর বুক থেকে টেনে নিতে হযেছিল। অসহায় ভগিনীর সে কাতর গোষ্ঠানী আমি জীবনে এখনো ভুলতে পারলাম না। তারপর মকুল রয়েই গেলেন কালীঘাটের বাড়িতে ভাগ্যবিড়ম্বিতা বাঙালী বাল-বিধবা কন্যা। এখন মকুলের অনেক বয়স হযেছে। বোগে শোকে তিনি জর্জর হয়ে পড়েছেন। দেহমনেব ক্লান্তিতে তিনি বোধ হয় এখন নিষ্কৃতিব অপেক্ষায় দিন গুপছেন। নববর্ষে মনে পড়ে কালীঘাটের বাড়ির পুরানো দাসী শ্যামা কটকে। একেবারে পরিবারের

মানদ্র হয়ে গিয়েছিলেন। দুর্নিয়র তাঁর কেউ ছিল না। জেন্দুকাব ছেলেরাই ছিলেন তাঁর সকল হৃদয়ের ভালবাসার ধন। মৃত্যুর সময় তাঁর যা কিছু সামান্য সত্তর ছিল সব দিয়ে গেছেন ঐ ছেলে-দের। এত মায়া, এত দরদ সচরাচর দুর্লভ এ জগতে।

(ষষ্ঠ অধ্যায়)

পশ্চিমের বাড়ি

১১

গ্রন্থনাথ দাশের চতুর্থ পুত্র এবং চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রতনকৃষ্ণ দাশ ছিলেন তেলিরবাগের পশ্চিমের বাড়ির কর্তা। তাঁর ছিল চারটি ছেলে—জগবন্ধু, গোপীমোহন, কেদারেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বর। পশ্চিমের বাড়িতে এই চার ভায়ের ছিল চারটি পুত্রক ভিটা। পশ্চিমের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল একটি পুষ্করিণী যাকে “পশ্চিমের বাড়ির পুঁথিব” বলা হত। পশ্চিমের বাড়ির চারিদিকে ছিল কষেক বিঘা জমি যাতে আম-কাঁঠালের অনেক গাছ ছিল। পশ্চিম দিকে খাল পাড়ে ছিল দুটি উচু তালগাছ যা বহর থেকে দেখা যেত দুটি সজাগ প্রহরীব মত। এই পশ্চিমের বাড়ির একটি ভিটাই ছিল আমাদের পিতামহের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ি।

জগবন্ধু ওকালতী পাশ কবে বাজ-সাহীতে প্র্যাকটিস কবতেন এবং কালক্রমে সেখানকর সবকারী উকিল হয়ে বেশ পসাব প্রতিপত্তি অর্জন কবেছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলে তাঁর খুল্লতাত কাশীশ্বর আপন কর্নিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহনকে তাঁর কোলে দত্তকপুত্র স্বরূপে দান কবেন। এই দত্তকপুত্রে ভুবনমোহন মধ্যের বাড়ি থেকে পশ্চিমের বাড়ি চলে এলেন। বজ্জের সম্পর্কে ভুবনমোহন সত্যবজ্জন, সত্যীশ-বজ্জন ও জ্যোতিষবজ্জনের আপন কাকা ছিলেন কিন্তু দত্তক দানেব পর আইনবলে তিনি আমাদের গিতৃদেব বাখালচন্দ্রের আপন জ্যেষ্ঠতুত ভাই হলেন। অর্থাৎ স্বশাবলীতে তিনি পশ্চিমের বাড়ির বাবুদেব এক ভিগ্রি কাছ চলে এলেন। ভুবনমোহন তাঁর দত্তকগ্রহীতা পিতা জগবন্ধুর পর্যক্টে আপন মায়েবই মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা কবতেন এবং পশ্চিমের বাড়ির খজুর ভাইষেদেবও আপন ভাইষের মতই স্নেহ কবতেন। দত্তক দান সত্ত্বও ভুবনমোহনের আপন মায়েব পেটেব ভাইষদেব সত্ত্ব সম্পর্কেবও কোন বাতিল হয় নি। কালীমোহনকে তিনি খুবই ভক্তি কবতেন ও মানতেন। দুর্গামোহনের সত্ত্ব প্রথম দিকে অনেককাল একত্রেই বসবাস কবতেন। তারপর তিনি পটুয়া-

টোলা লেনে একখানা ভাড়া ঘাটতে থাকতেন। পবে তবানীপুত্রে খবাকের কাঁসারিপড়া রোড, পিপুলপাতি লেন এবং শেষে কালীমোহন আলমের উত্তর সংলগ্ন জমিতে নিজ বাড়ি ১৪৭নং বগা রোডে যেখানে এখন চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের গোয়েন্দা ব্রক টেরি হয়েছ মোহন-খান বাস কবতেন।

ভুবনমোহনও তাঁর দুই অগ্রদেব ন্যায় ওকালতী পাশ করে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস সুরু করেন। পবে তিনি এটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাইকোর্টে এটর্নি বকো নাম লেখান এবং এটর্নি অফিস খোলেন। এক সময়ে আমার পিতৃদেব সেই অফিসে তাঁর দাদার কাছে “আর্টিকেল ক্লাইক” হয়ে এটর্নির কাজ শিখতে আরম্ভ কবেন। ভুবনমোহনের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এবং এমন কি গ্রামের লোকেরাও আসত, যেত এবং বাসও করত। আমার পিতাও সর্বাঙ্গনে তাঁর আগ্রের অনেক বছর ছিলেন সেকথা পরে বলব। ভুবনমোহন পরম ধর্মপরায়ণ ও চরিত্রবান পুত্র ছিলেন। তিনি খুব উচ্চ শিক্ষিত এবং সাহিত্যরাসিক বলে খ্যাতি লাভ কবে-ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই তিনি খুব প্রাজ্ঞ প্রবন্ধ লিখতে পারতেন। তিনি কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থও লিখে সুর দিবেছিলেন। তিনি দুর্গামোহনের সত্ত্ব ব্রাহ্ম ধর্মে লীনা নিয়ো ছিলেন কিন্তু তাঁর মধ্যে গৌড়ামি ছিল না। তিনি দেশের আবহমানকালের ঐতিহ্যে অগ্রাহ্য বা বর্জন কববার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ বিষয়ে তিনি অনেকবার হৃদয় দেবেন্দ্রনাথের সত্ত্ব একমত ছিলেন। বহু পুর্বে ‘ব্রাহ্ম পার্জিব ওপিনিয়ন’ বকো দে কাগজ ছিল—ভুবনমোহন ছিলেন ‘ডক্টর সম্পাদক এবং তাতেই তিনি বহু সূচিন্তিত প্রবন্ধ লিখতেন ধর্ম, সমাজ, বাজ্ঞনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে এই কাগজই যখন পবে ‘বেগল পার্জিব ওপিনিয়ন’ বলে নাম পাঠান তখনও ভুবনমোহনই তার সম্পাদনা কবতেন। এই কাগজেব বিষয়বস্ত ও কাক্য লঙ্ঘনমিত্ত হযে যাওয়াষ এরই পরিপূরক অন্য একটি কাগজও তিনি সম্পাদনা কবতেন যার নাম ছিল ‘মেসেঞ্জার’। সেই কাগজে তিনি ধর্ম, স্ববন্দীষ নানা সমস্যার আলোচনা কবতেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি অতি সুগভীর গুরুত্বপূর্ণ বলে শিফতসম্মতে গৃহীত হযেছিল। তিনি যে কেবল প্রবন্ধ লিখতেন তা নয়। দেবেন্দ্রনাথ প্রবন্ধই লিখতেন তা নয়। দেবেন্দ্রনাথ নৈতিক সমস্যার দিকেও তাঁর দৃষ্টি হির এবং সেই সূত্রে তিনি ইন্ডিয়ান এজেন-সিবেশন-এর সত্ত্ব যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হযে তিনি একজন কমিশনারও হয়েছিলেন।

ভুবনমোহন বেশ খরচে ছিলেন। অনেক ছিল তাঁর পোষা-আত্মীয় ও অনাত্মীয়। তা ছাড়া তিনি মানুষকে অবিশ্বাস করতে পাবতেন না। অনেক মকেলের জন্যে “জামিন” হয়ে তাঁকে থেসারতের দায়ে পড়তে হয়। দেনা যখন তাঁর পরিশোধের সাধের বাইরে চলে গেল তখন তাকে দেউলিয়া আইনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেই দেউলি-ও তিনি একটি পোষাকেও বলতে পারেন নি তাদের নিজের পথ দেখতে। কত লোকের ছেলের পড়াশুনার খরচ, চিকিৎসার খরচ যে তিনি অকাতরে নীরবে দিয়েছেন তার কোন হিসেবই নেই। দান ও বদান্যতা ছিল জ্যেষ্ঠামশায়ের স্বভাবেরই ধর্ম।

দেউলিয়া নাম লেখানর পর এটর্নির আফিসও বন্ধ হয়ে গেল। তিনি কাজকর্ম থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়ে পুর্নুলিয়াতে গিয়ে সন্ত্রীক বসবাস করতে লাগলেন। সে সময় দেখেছি তিনি অতি নিবর্তচিত্তে উপনিষদাদি বহু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। পুর্নুলিয়ার বাড়ির দক্ষিণের বারাদার যেখানে তক্তপোষে বসে তিনি লেখাপড়া করতেন তাব পাশেই নিচু আলমারিতে ঝকত ম্যাকসমুলারের ‘সেক্রেড বুকস অব দি ইস্ট’ বলে একটি গ্রন্থের সিরিজ। সগুণি আমিও দেখেছি। এই সময় জ্যেষ্ঠামশায়ের যাবতীয় খরচাদি চিত্তরঞ্জনই করবরাহ করতেন। ভুবনমোহনের সহ-অধিশারী মৃত্যুর পর তাঁর নিজেবও শরীর ভেঙে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় চিকিৎসা ও সেবা শূদ্রব্রাহ্মণ জন্মে। কলকাতায় যখন তিনি রোগশয্যায় পড়ু আছেন তখন পুত্র চিত্তরঞ্জন আইন-জ্ঞতভাবে বাধ্য না হলেও পাওনাদারদের সম্মত বাকী পাওনা শোধ করে পিতাকে ও নিজেকে ঋণমুক্ত করেন। ভুবনমোহন কেন এই দিনটির জন্যেই উদগ্রীব হয়ে থাকিরেছিলেন। এর অল্পকাল পরেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভুবনমোহন অসুস্থতামে মহাপ্রাণ করেন। জীবনে জ্যেষ্ঠামশায়ের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে খুব কমই এসেছিল। আমার বাবা ও মায়ের মূখে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনোঁছি এবং নিজেও তাঁকে সামান্য ঘেঁটু দেখেছি ও জেনোঁছি তারই ভিত্তিতে অসম্মোচে বলতে পারি যে, জ্যেষ্ঠামশায়ের মত এমন নিরহঙ্কার, অমায়িক, শিক্ষিত, চরিত্রবান মানসীল পুর্নুষ জগতে কমই দেখা যায়। জ্যেষ্ঠামশায়ের সহঅধিশারী ও ভাবন-সঙ্গিনী নিস্তারিণী দেবীর কথা এবং তাঁর নির্মল চরিত্রের গুণাবলী বলে শেষ করা যায় না। এ রকম মায়ী, মমতা ও এত মস্তুর আশ্রিতজনবাংসল্য অন্য কারো মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জ্যেষ্ঠামা সম্মানই বাংলা পড়তে জানতেন। অতি

অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল বলে তাঁর লেখাপড়া বিশেষ এগোয় নি। তা ছাড়া সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার তেমন রেওয়াজও ছিল না। বিয়ের পর সুবহু সংসারেব যাবতীয় ভার নিতে হয়েছিল বলে তিনি বাড়িতে বসে লেখাপড়া শেখবার সময় ও সুযোগও তেমন পান নি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তাঁর মনের যে প্রসার ও হৃদয়ের যে উদারতা দেখেছি—তা আত্মকালকার শিক্ষাভিমাত্রী শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে পাওয়া দুর্লভ। অসাধারণ ছিল তাঁর মনের জোর ও সত্যনিষ্ঠা। এ রকম ধর্মপরায়ণা, আশ্রিতবৎসল্য, মিত্তভাষণী, মহাবীরা নারী জীবনে কমই দেখেছি। দুর্গামোহনের প্রথমা পত্নী স্বস্তময়ীর মৃত্যুর পর তাঁর শেষ তিনটি শিশুসন্তান সত্যীশবল্লভ, জ্যোতিষরঞ্জন ও শৈলবালার তত্ত্বাবধানেব ভার পড়েছিল চিত্তরঞ্জন-জননী নিস্তারিণী দেবীর উপর। তিনি তাঁর অন্তরের সকল স্নেহমমতা দিয়ে এই মাতৃহারা শিশু তিনটিকে আপন সন্তানদের মতই বড় করে তুলেছিলেন। এই শিশুবা বড় হয়ে মৃত্তকণ্ঠে বলে গেছেন—“ঠাইন খুড়ির সঙ্গে ও স্নেহে আমরা মায়ের অভাব অনুভব করি নাই।” আমার পিতা ছিলেন তাঁর সম্পর্ক হিসেবে খুড়তৃত বংশধরের ঘরের দেওর। আত্মকালকার দিনে এই সম্পর্ক খতবোর মধ্যেই আসে না এবং অনেকে বোধ হয় এই সম্পর্কে স্বীকারও করেন না। কিন্তু সন্তানপ্রতিম দেওরটির উপরে জ্যেষ্ঠামা তাঁর অন্তরের স্নেহ মমতা অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন এবং সুখ-দুঃখে তাঁকে আগলিয়ে রেখেছেন যেমন করে পক্ষীমাতা তার শাবককে নিজ ডানার আশ্রয়ে ঢেকে রাখে। এই রকম পিতা-মাতার সদৃশগুণরাজ নিয়ে জন্মেছিলেন চিত্তরঞ্জন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে রাস পূর্ণিমা তিথিতে পুর্নুলিয়ার বাসভবনে মহাপ্রাণ করেন এই সাধবীমতী বমণী পরিবারস্থ সকলকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে। মায়ের মূখে শুনোঁছি জ্যেষ্ঠামা মারা গেলে বাবা যে রকম ছেলেমানুষের মত কেঁদেছিলেন তাঁর আপন মায়ের মৃত্যুতেও নাকি তেমন কাঁদের নি। জ্যেষ্ঠামার হিন্দুমতে প্রান্থ বাবাই করেছিলেন।

৥ ২ ৥

ভুবনমোহনের ছিল তিন পুত্র—চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তকুমার। এবং পাঁচটি কন্যা—তরলা, অমলা, প্রমীলা, উর্মিলা ও মুরলা। মধ্যের বাড়ির কালী-মোহনের আপন দুই ছেলেই তাঁর জীবদ্দশায় পব পর মারা যাওয়ায় কালী-মোহন তাঁর উইলেব দ্বারা তাঁর পত্নী চন্দ্রমণিকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়ে যান এবং সেই অনুমতি বলে বিধবা

চন্দ্রমণি বসন্তকুমারকে আপন স্বামীর দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই দত্তকের সূত্রে বসন্তকুমার পশ্চিমের বাড়ি থেকে মধ্যের বাড়ি চলে যান। মধ্যের বাড়ির কাছে পশ্চিমের বাড়ির যে পুত্রগ্রহণ হয়েছিল ভুবনমোহনকে দত্তক নিয়ে বসন্তকুমারকে মধ্যের বাড়ির কালী-মোহনকে দত্তক দিয়ে যেন সেই পুত্রগ্রহণ শোধ হয়ে গেল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর (বাংলা ১২৭৭ সালের ২০শে কার্তিক) ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্তরঞ্জন জন্ম গ্রহণ করেন কলকাতার পটুয়াটোলা লেনস্থ একটি ভাড়াটে বাড়িতে, যেখানে ভুবন-মোহন তখন বাস করতেন। সেদিন কে জানত যে তাঁর ঘরে একটি দিকপাল এসে দেখা দিলেন। চিত্তরঞ্জনের জন্মের অল্প পরেই ভুবনমোহন ভবানীপুত্রে উঠে আসেন। কাছেই চিত্তরঞ্জনের প্রথম শিক্ষা হয় ভবানীপুত্র লন্ডন মিশনারী স্কুলে। ঐ স্কুল থেকেই তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে যান। আমার পিতৃদের চিত্তরঞ্জনের খুল্লতা হলেও বয়সে প্রায় তাঁর কাছাকাছিই, নরত বড় জোর দু-তিন বছরের বড় ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে বেশ একটি মধুর হৃদয়তা ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে বাবা চিত্তরঞ্জনের সহপাঠী ছিলেন। আর সে সময়ে সেই কলেজে তাঁদের সঙ্গে পড়তেন দক্ষিণের বাড়ির জ্ঞানেন্দ্রমোহন, প্রখ্যাত বিচারপতি স্যার বমেশচন্দ্র মিত্রের মধ্যম পুত্র বিনোদচন্দ্র মিত্র (পরে বিনি স্যার বি. সি. মিটার নামে খ্যাতিলাভ করেন), হরিদাস বসু (পরে বিখ্যাত ব্যারিস্টার এইচ. ডি. বোস) বিচারপতি স্যার চন্দ্রমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র সুব্রহ্মচন্দ্র ঘোষ (পরে বিনি কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নি হবোঁছিলেন)। স্কুল ও কলেজে পড়ার সময় চিত্তরঞ্জনের এমন কিছু অসাধারণ মেধা পরিলক্ষিত হয় নি। বাবাকে বলতে শুনোঁছি—“চিত্তের ক্রাশের পড়ার চাইতে বাংলা সাহিত্যের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। বিষ্ণুমবাবর উপন্যাস ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিও খুব ভালবেসে পড়ত। ইংরেজী বিভক্ত সভার চিন্তা ভালই বলত।” চিত্তরঞ্জনের এই সাহিত্যবোধ উত্তরকালে ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে তাঁর ‘গালপ’, ‘মালা’, ‘সাগর সঙ্গীত’, ‘অন্তর্বাণী’, ও ‘কিশোর কিশোরী’ কাব্যগ্রন্থে ও তাঁব নানা ভাষণে। বাবার মূখে আরো শুনোঁছি যে চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সী কলেজের স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন এবং সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবার ক্ষমতা তিনি তখন থেকেই অর্জন করে-

ছিলেন। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন ও আমার বাবা দু'জনেই বি-এ পরীক্ষায় পাশ হলেন। চিত্তরঞ্জন তখন গেলেন বিলেতে আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্যে আর আমার বাবা তাঁর জ্যেষ্ঠত্ব দাদা ভুবনমোহনের আর্টিকেলড ক্লাক হয়ে এটর্নি পরীক্ষা দেবার জন্যে তাঁরই আফিসে বের হতে সুরু করলেন।

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একই জাহাজে বিলেতে গেলেন যুবক জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (পরে নাম করা আই-সি-এস জে, এন, গুপ্ত) মশায়। বহুকাল পরে আমি যখন কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করি তখন এক বছর পূজার ছুটিতে তাঁর সঙ্গে কালিঙ্গপা শহরে কয়েকবার দেখা হয়েছিল। তিনি 'স্যান্ডি' বলে একটা বাড়িতে থাকতেন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা বাবার কাছে শুনেছিলাম। আমি যেতাম তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে। আমি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও প্রাচীন আভিজাত্যের অভ্যাসে তিনি আমার বাসাবও আসতেন সৌজন্য-বিনিময় করবার জন্যে ছোড়ায় চেপে।

কত কথাই না তাঁর কাছে শুনেছি চিত্তরঞ্জন ও সত্যীশরঞ্জন সম্বন্ধে। একদিন কথা বলতে বলতে পুরানো দিনের স্মৃতি যেন জেগে উঠল তাঁর মনে। বিশুদ্ধ বাংলায় অনেক কথা বলে শেষ করলেন এই করুণীত কথায়—“বাবা, তুমি জান না চিত্ত ও সত্যীশের সঙ্গে ও তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার কি প্রীতিবন্ধন ছিল। বহুদিন হয়ে গেছে আজ তাঁরা দু'জনেই চলে গেছেন। আমাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন হওয়ায় আমরা দেখা-সাক্ষাতে কিছুটা তফাৎ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কি যেতে পারে?” দেখলাম বলতে বলতে যেন ব্যস্তের চোখ দুটি ছল-ছল করে উঠল। অতি সন্তোষচিত্তে সোঁদিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

চিত্তরঞ্জন আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতকার্ষ হতে পারেন নি—কেন তা পরে বলব। জে এন গুপ্ত পরীক্ষায় পাশ করে সে চাকুরীতে ঢুকে গেলেন। শেষ পর্যন্ত চিত্তবঞ্জন ইনার টেম্পল ইন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে এসে ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস সুরু করলেন। কলকাতা হাইকোর্টে তখন বড় বড় উঁকল কৌশলীতে ভরা। ভীষণ প্রতি-দ্বন্দ্বিতা ছিল পরস্পরের মধ্যে এবং সেখানে দস্তখস্ট করে পসার জমান এক কঠিন ব্যাপার ছিল। তার উপরে চিত্ত-রঞ্জনকে দৈবদুর্বিপাকে পড়তে হল। তাঁর পিতা ভুবনমোহনের বাড়িতে আত্মীয়, অনাত্মীয় অনেক পোষ্য পালিত হতেন।

ভুবনমোহন নিজেও খরচে ছিলেন বেশ। তার উপরে বন্ধু-বান্ধব ও মজেলের খাতিরে তাদের জন্যে জামিন হয়ে অনেকবার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যে ভুবন-মোহনকেই দায়ী হয়ে স্বীয় মস্তকে বিপদে ঝগড়ার গ্রহণ করতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই। চিত্তরঞ্জন যখন দেশে ফিরে সবে কাজে লেগেছেন তখন ভুবনমোহনের অনেকগুলি ঋণ পরিশোধের দিন এসে পড়েছিল কিন্তু অর্থাভাবে তা শোধ দেবার সামর্থ্য তখন তাঁর ছিল না। পাওনারীদের কাছে সময় প্রার্থনা করলে তাঁরা সময় দিতে রাজী হলেন এই সর্তে যে, ভুবনমোহনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনও হ্যান্ডনোট পাণ্টে নতুন হ্যান্ডনোটে সই দেবেন। গতান্তর ছিল না। পাণ্টন হ্যান্ডনোটে সই দিয়ে দম ফেলবার মত কিছুটা সময় পেলেন পিতা-পুত্রে এই ঋণভারে সাধারণ মানুষ মর্সাড়িয়ে যেত। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দমলেন না। একাগ্রচিত্তে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন আইন ব্যবসায়ের অর্থ উপার্জনের খান্দায়।

হ্যান্ডনোট পাণ্টিয়ে নতুন হ্যান্ড-নোটে সই দিয়ে কিছুটা সময় পেয়েও শেষ পর্যন্ত নতুন হ্যান্ডনোটের মোয়াদের মধ্যেও সে ঋণ পরিশোধ করা গেল না। পিতাপুত্রের দেউলিয়া আদালতের শরণা-পন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ১৬ই জুন ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে দু'জনেই দেউলিয়ার নাম নিয়ে পাওনারীদের তাগিদ থেকে তখনকার মত রেহাই পেলেন। কিন্তু উদীরমান ব্যবহারজীবীর পক্ষে দেউলিয়া দুর্নাম যে কতখানি মর্মস্পর্ক দুষ্ট তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যেরা হয়ত বুঝবেনই না। একে তো আপন মনের মধ্যে দেউলিয়া নামের প্লানি নিত্য নিরন্তর পুঞ্জীভূত অভিশাপের মত চেপে থাকে, তাব উপরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ও কুসা-কসরীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ টিপ্পনি, টিটকারী ও স্পেষ যে কি কঠিন বন্দনা তা অনুমান করা কঠিন নয়। পিতা ভুবন-মোহন কাজ থেকে অবসর নেওয়ার সংসারের সকল গুরুদায়িত্ব পড়ল একলা চিত্তরঞ্জনের উপর। মাথা গুঁজে যুবক চিত্তরঞ্জন সে প্লানি বহন করে গেছেন নীরবে পিতার মৃদু চেয়ে। সেই সময় তাঁর মনে যে সংঘম ও দৃঢ় সংকল্প এসেছিল তা তাঁর জীবনের পরম পাথর হয়েছিল। জীবনের এই কঠিন সংগ্রামে তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন এবং সকলেই জানেন যে তাঁর পিতার জীবদ্দশাতেই চিত্তরঞ্জন সমস্ত সেনা কড়ায়-গন্ডায় শোধ দিয়ে-ছিলেন যদিও আইন অনুসারে তা দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না।

বিলেত থেকে ফিরে আসবার বছর

তিন-চারেক পরে ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে চিত্ত-রঞ্জনের বিবাহ হয় বিক্রমপুরস্থ নওগাঁ গ্রামের ধর্মনিষ্ঠ ও চরিত্রবান বরদানাথ হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তীর সঙ্গে। বরদানাথের ও তাঁর সংসাহসের কথা আগেই বলেছি। ভুবনমোহনের সঙ্গে বরদানাথের খুবই সৌহার্দ্য ছিল। উভয়েই ব্রাহ্মসমাজের নাম করা সভা। বরদানাথ জানতেন ভুবনমোহন ও চিত্তরঞ্জনের আর্থিক অনটনের কথা। দেউলিয়ার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে বরদা-নাথকে অনেক শূড়ানুধ্যায়ী বন্ধু নিষেধ করেছিলেন। এ সমস্ত কথা জেনেশূন্যেও বরদানাথ আপন প্রাণাধিকা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে চিত্তরঞ্জনের হাতেই সমর্পণ করে-ছিলেন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে যে চিত্তবঞ্জন জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করবেনই। ভগবানের দয়ায় তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর এই আশার সাক্ষ্য দেখে গিয়েছেন। এই কল্যাণময়ী মহিলা, বাসন্তী দেবী, আপন স্বামীর সকল কর্তব্যসাধনেই নিত্য স্বয়ংবতী ছিলেন। যখন চিত্তরঞ্জন তাঁর প্র্যাকটিসের উচ্চ শিখরে আবোহণ করে প্রভূত অর্থোপার্জন করছিলেন এবং দেশাস্থাবোধে বাজার মত ঐশ্বর্যের মোহ এক মূহুর্তে ভুলে গিয়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফকির হয়ে গেলেন তখনও এই সাধুদেী রমণীব মূখে এতটুকুও ভ্রুকুটি দেখি নি। স্বামীব সঙ্গে তিনিও নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইংবাজের জেলে যেতেও স্বেচ্ছা বোধ করেন নি। ১৯২১ খৃস্টাব্দে দাদাবাবু ও তাঁর একমাত্র পুত্র চিত্তরঞ্জন (ডোম্বল) যখন জেলে তখন চট্টগ্রামে যে রাজনৈতিক কনফারেন্স হয় তাতে বাসন্তী দেবীই সভানেত্রী পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ভগবানের দয়ায় তিনি এখনো আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন এবং এখনো আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ দিয়ে থাকেন।

যারা হাইকোর্ট সম্বন্ধে এতটুকুও খোঁজ-খবর বাখেন তাঁরা সবাই জানেন যে, যদিচ হাইকোর্টের আদিত্য বিভাগের কৌশলীদের বিস্তার আয় হয় তথাপি এই বিভাগে প্র্যাকটিস জমান সময় সাপেক্ষ



এবং জুনিয়ারদের কপালে একসের টাকা এটর্নি আফিস থেকে আসে ঢাকচেলে অর্থাৎ ইন্টারের ছুটির আগে যখন চড়কে ঢাকের বাজনা বাজে এবং শারদীয়া বন্ধের আগে যখন পুজার কাসির ঘণ্টা ও ঢোল বেজে ওঠে। এই থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই বিভাগে পশার জমাতে গেলে দাঁতে দাঁত দিয়ে লেগে পড়ে থাকতে হয়। তবে যাদের হাঁড়ি চড়ে না তাদের এই বিভাগে হা পিতোষণ করে পড়ে থাকা সহজ ত নয়-ই, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। পরন্তু কৌজদারী এক মক্ষ্মলের আদালতের কাছে দক্ষিণাটা নগদদলগদী পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জনের পারিবারিক অবস্থা তখন একেবারেই স্বচ্ছল ছিল না। তাঁর পুরানো সহপাঠী বি, সি, মিটার ও এইচ, ডি, বোস সাহেববা। অনেক চেষ্টা করতেন হাইকোর্টের আদম বিভাগের কাছে তাকে টেনে রাখবার জন্যে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ছিল শিরে সংক্রান্ত এবং নগদ টাকার প্রয়োজন। এই জন্যে তাকে কলকাতার পুলিশ কোর্টে এবং মক্ষ্মল আদালতে কৌজদারী মামলা করতে যেতে হত। অনেক সময়ে সংসারের তাগিদে দক্ষিণাটা ন্যায্য না হলেও তাঁকে কম ফীসেই কাজ নিতে হত। মাঝে মাঝে যখন বাইরের কাজ হাতে থাকত না তখন তাঁর ঐ দুটি সুইদ তাকে নিজেদের ব্রীফ দিতেন তাঁদের হয়ে করে দেবার জন্যে। এটাকে হাইকোর্টের চলতি কথায় বলে ব্রীফ হোল্ড করা। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এটর্নি ও জজেরা যেন চিত্তরঞ্জনকে গুরুপনা দেখতে পায় এবং এটর্নি বা সারসিবি চিত্তরঞ্জনকেও ব্রীফ দেয়। এ রকম বন্ধ-বৎসলতা সত্যি বিরল। বাই হোক সংক্ষেপে বলি যে, সাংসারিক কাবণে চিত্তরঞ্জনকে নগদ ফীসের লোভে কৌজদারী মামলাই বেশি নিতে হত এবং কৌজদারী মামলায় তিনি বেশ সুনাম অর্জন করে ফেলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। এটি সময়ে আলিপুর জজ কোর্টের উকিল শবচন্দ্র সেন মশায় যিনি পরে চিত্তরঞ্জনের তৃতীয় ভাগিনী প্রমীলাকে বিবাহ করেন তিনি অনেক মৌকন্দমা জটিল দিবে চিত্তরঞ্জনকে নিজ পায়ে নড়াতে খবই সাহায্য করেন। শরৎ-ঋতু ছিলেন ডক্টরলাস রাজবাড়ির বাঁধা উকিল। তাঁর সুপারিশে ডক্টরলাসের সব মামলাই আসতে লাগল চিত্তরঞ্জনকে কাছে। ১৯০৭ সালে এল চিত্তরঞ্জনকে পশাবের পবতা। ১৯০৭ সালে হল স্বদেশভারম মামলা শ্রীঅরবিবন্দ বিরুদ্ধে। সে মামলার সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্র পাল গেলেন আসনের জন্যে জেলে এবং প্রমাণভাবে

শ্রীঅরবিবন্দ পেলেন খালাস। তারপর এল 'সন্ধ্যা' কাগজের সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নামে মামলা রাজদ্রোহের জন্যে। চিত্তরঞ্জন তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তারপর এলো বিখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলা শ্রীঅরবিবন্দ ও পরগিশ জন যুবকের বিরুদ্ধে। কি হে-হে পড়ে গিয়েছিল সেই মামলার সময়। আমরা তখন ছোট। সরকারী তরফে ছিলেন বিখ্যাত কৌন্সিলী ইয়াডলি নটন সাহেব। শ্রীঅরবিবন্দের তরফে প্রথমে বোমিকেশ চক্রবর্তী, কুমুদনাথ চৌধুরী ও অনেক জুনিয়ার ছিলেন। চাঁদা ভুলে যে টাকা উঠেছিল তা নিশ্চয়ই হয়ে গেলে বড় কৌন্সিলীদের সম্ভব হল না ঐ মামলার কাজ চালিয়ে যাওয়া। তখন ডাক পড়ল চিত্তরঞ্জনের। তিনি সব ছেড়ে ছুড়ে দিবে ঐ মামলা নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন। অনেক মাস মামলা চলার পর দু-পক্ষের সওয়াল জবাব হল। চিত্তরঞ্জনের শেষ বক্তৃতাটির তুলনা নেই। ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে শ্রীঅরবিবন্দ ও অনেক জন আসামী খালাস হলেন। বাকিদের মধ্যে শ্রীঅরবিবন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্র এবং উল্লাসকর দত্তের হল প্রাণদণ্ড এবং অন্যান্য ক'জনের হল সশ্রম কারাবাস দীর্ঘ মেয়াদের জন্যে। পরে হাইকোর্টের আপিলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন। মসীপান্তর বাসের হুকুম হয়েছিল। এর পর এল ঢাকা যুগ্মস্তের মামলা, গ্রান্ড খুনের মামলা এবং আরো কত কি। এই সব মামলার চিত্তরঞ্জনের কৌজদারী মামলা চালানার কৃতিত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। ইতিমধ্যে দেওয়ানী মামলার হাইকোর্ট আদম বিভাগেও চিত্তরঞ্জনের বেশ প্রতিষ্ঠা হয়ে আসছিল। ১৯০৯-১৯১০ সালে আরো জজ কোর্টে এল ডোমরাও রাজগীর মামলা। কলকাতায় ছিল এক বিখ্যাত এটর্নি আফিস—ম্যানুয়েল আগরওয়ালা। তাঁর বড় সিরিক তখন ছিলেন ধনুলাল আগরওয়ালা। তিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জনের গুরুগাহী পুস্তপোষক। তাঁর পবামর্শে কেশবপ্রসাদ যিনি ডোমরাও গদি দাবি করে মামলা এনেছিলেন তিনি চিত্তরঞ্জনের শরণাপন্ন হন। এই মামলা চলে প্রায় বছরখানেক। বহু বিজ্ঞ আইনজ্ঞ লোকেরা মত-প্রকাশ করেছিলেন যে ঐ মামলার কেশবপ্রসাদের জিতবার কোন আশাই নেই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন প্রাণপণ পরিশ্রম করে এই মামলার জয়ী হয়েছিলেন এবং তাঁর মক্কেল ডোমরাও রাজগীরকে আসীন

হন। এই ডোমরাওরাজ সংক্রান্ত আরো দু'টি বড় মামলায়ও চিত্তরঞ্জন নিযুক্ত হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের ডাক পড়েছিল লক্ষ্মীপুর কেসে, মহেশপুর রাজ কেসে এবং আরো কত কি মামলায়। এই মামলার সাফল্যের জন্যে চিত্তরঞ্জনের দেওয়ানী মামলার কৃতিত্বেরও প্রভূত খ্যাতি রটে। এর পর থেকে তিনি মক্ষ্মল গেলে এটর্নিরা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন দাশ সাহেব কবে কলকাতায় ফিরবেন। যেদিন সকালে কলকাতায় ফিরতেন সেই দিনই সকালে বাড়িতে কম্পালটেশন এবং সেই দিনই কোর্টে হাজির হতেন চিত্তরঞ্জন। তৃতীয় ডোমরাও কেস শেষ হয় ১৯২০ খৃস্টাব্দে। এই মৌকন্দমায় জয়লাভের পরেই নাগপুরে চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনে কীপরে পড়েন এবং প্র্যাকটিস বন্ধ করে দেন। সেই সময়ে তিনি দুইটি মামলা করবার অধিকার সংরক্ষিত করেছিলেন—একটি এই তৃতীয় ডোমরাও কেসের পাটনা হাইকোর্টে আপিল আর কলকাতার বিখ্যাত মিউনিসিপ্যালিটির মামলা যা করতে তিনি অস্বীকারবন্দ্য ছিলেন গভর্নমেন্টের কাছে। শেষ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট তাকে শেষোক্ত মামলা থেকে অব্যাহতি দেন এবং তিনি নানা কারণে ডোমরাও কেসের আপিলে পাটনা যেতে পারেন নি। এই অসহযোগরত গ্রহণের পর চিত্তরঞ্জন আর কখনো আদালতে প্র্যাকটিস করতে যান নি। দেশের জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীজীর দেওয়া 'দেশবন্দু' আখ্যাকে স্কল অন্টার দিয়ে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ ত্যাগ ও দেশ-প্রেমের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রচার করেন। তৃতীয় ডোমরাও কেসে তাঁর ফীস ছিল মাসিক ৪৫০০০ হাজার টাকা ও আরায় থাকার ব্যবতীয় খরচ। আমি তখন বিলেত থেকে ফিরে এসে প্র্যাকটিস সুরু করেছি। চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী ন্যায্য গর্বভরে পরে আমাদের হাসতে হাসতে বলেছেন—“তোরাও ত প্র্যাকটিস করছিস—দেখ কি রোজগার করিস। আমার হাতের এই পাঁচ আঙুলের মধ্যে দিয়ে মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা গলে গেছে রে।” কথাটা নিছক সত্য। আইনজীবীমহলেও চিত্তরঞ্জন পূর্বই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এটর্নি কিশোর ঘোষের অধিকৃত চিত্তরঞ্জনের মস্ত বড় তৈলচিত্রটি আঙ্কণ বার জাইব্রেরার বড় ধরনের দক্ষিণের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। [কমন্স]

নব মন্ত্রিসভা প্রতীপে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গত সপ্তাহে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতি ঘোষণা করেছেন। অহেতুক দুঃখ-দর্দশাকারী লেভি, কৃষিম অভাব ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি-কারী ধানা ও জেলা কর্তন ও তার সহচর নন্দী-ভূগাী অবস্থা হরানকারী পুষ্টিশ ও আমলা জ্বলুম বশের ঘোষণা হয়েছে। উপস্থিত কলকাতার রেশনিং রাখলেও শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার এক আন্তরিক প্রয়াস সম্পূর্ণ। ডঃ ঘোষের এই নীতি সাহসিকতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। তথাকথিত সোসালিস্ট মগজের আমলা নির্ভরশীলতা অপবৃদ্ধির কুঙ্কন মূর্ত এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও তাকে আরো-পিত করার জন্য সাড়ে বারিষভাজার কৈবিনেটেব সমর্থন আদায়করণে তাঁর কৃতিত্বকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু মুন্সিফ-আসান ও সমাধান হয়ে গেলে বলে উল্লসিত হবার কারণ নেই। ষ্ট্যান কোণে ঝড়ের কালো মেঘ যে কোন সময় গ্রাস করতে অপেক্ষমাণ হয়ে আছে। খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে সে মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলতে পারে। এখনই পরাজিত কংগ্রেসীরা রাতারাতি চরম বাম-পন্থী হওয়াই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও সিদ্ধি পুনরুদ্ধার করতে চটুদারী কথাবার্তা আরম্ভ কবেছেন। এই নতুন খাদ্যনীতিকে জোতারেব স্বার্থ সংরক্ষণে নিরোজিত বলতে আরম্ভ করেছেন। অন্য কা কথা। আর সাম্যবাদ কণ্ডুনে অভ্যন্ত ও অভিজ্ঞতা তখন ঝাঁপ ভেঙে ফলা তুলে এগিয়ে এসে ছোবল বসাতে পারে। এ বসের খরা আক্রমণে সত্য সত্যই অজন্মা ও ফসল হানি ঘটেছে। তাই এতদিন যারা মুনাক্ষা শিকারে হাত পাকিয়ে এসেছে তারা চপ করে বসে থেকে দেশপ্রেমিক হয়ে যাবে এ বিশ্বাস না হওয়ার কথা। তা হলে কি কোন উপায় নেই? তা ছাড়া এই সরকার তো কংগ্রেসের তাঁর বিভিন্ন কালা-কানুন অচল করে দিয়েছেন। তা হলে ইচ্ছা করলেই সপ্তে সপ্তে সমাজ-বিরোধীদের সামলাবে কেমন করে? শলথ গতির ভারতীয় পেনাল কোড আর পাশাপাশি সংবিধানের ২২৬ ধারা অক্ষুন্ন রেখে কি এই অপবাধীদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এইখানেই নতুন মন্ত্রিসভার আসল পরীক্ষা দিতে হবে।

একবারে রেশনিং তুলে দিলে হয়ত

পরীক্ষায় বসতে হত না। কিন্তু কলকাতা ও শিল্পক্ষেত্রে এখনকার মত রেশনিং থাকার শিরে সুপাখাত ঘটার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাগা যাতে একবারে না বাঁধতে হয় সেই প্রচেষ্টাই করতে হবে। এই রেশনিং বজায় রাখতে হলে প্রোকিওরমেন্ট বা সংগ্রহ করতে হবেই হবে এবং সে জন্য উৎপাদকদের স্বারম্ব হতে হবে। উৎপাদকরা কি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সহযোগিতা করবে? অবশ্য ধানের দাম কংগ্রেসী সরকারের চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু কি সংগ্রহ আশানুরূপ হবে? কংগ্রেসী সরকারের অভিজ্ঞতা বলে যে, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। এখানেও নতুন সরকারের পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। লেখকের মতে কিন্তু ভয়ের কিছুই নেই। কংগ্রেসী সরকার কিন্তু ঐ পরীক্ষাই বার বার দিয়েছে ও বার বার ফেল করেছে। সুতরাং তাদের অভিমত ও পথ বে নির্ভুল নয় তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেস সরকার আর একবার স্বা-সমস্যার পথে আর একটি পরীক্ষায় বসেছিল কিন্তু পরীক্ষার উত্তর দান সম্পূর্ণ করতে পারে নি। খাদ্য ব্যবসারে ব্যাঙ্কের দান দান বন্ধ, খাদ্যের ফাটকাবারি বন্ধ ও মজুত করার পরিমাণ নির্দিষ্টকরণ প্রভৃতির পর শেষ ধানের কেনাবেচা বন্ধ করার আদেশ দান করে গেছে পূর্বনো সরকার এবং তা এখনও বলবৎ আছে। উদ্দেশ্য ছিল যে, এই আদেশ দান করলে সংগ্রহ ব্যবস্থা কার্য-করী হবে। তবুও ভীতিমুক্ত না হতে পেরে ফাঁড় কর্পোরেশনের হাতে সংগ্রহ ব্যবস্থা তুলে দিয়েছিল এবং দায়িত্ব অস্বী-কার করার দরজাটা খোলা রেখে দিয়েছিল।

তা হলে মোক্ষা কথা এই দাঁড়ায় যে, সকল সম্ভাবা ছিন্ন বন্ধ করার সকল প্রচেষ্টা চানিয়েও ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছিল ভূতপূর্ব সরকারের। এখন এই সরকারের কি প্রচেষ্টা হবে। বর্তমানের ঘাটতি ও তার সমাধান এবং বৃদ্ধিসম্মত ক্রয়সাধ্য মূল্যে বাজারে পাওয়ার ব্যবস্থার আশায় নতুন যে খাদ্যনীতি চালু হল তা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। অর্থাৎ আইনের রক্তচক্ষুর সাহায্যে নয় বরং সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ওপর নতুন খাদ্যনীতি দাঁড়াতে চাইছে। লেখক গোড়া থেকেই যে কথা বলতে চেষ্টা করেছি তাই সমর্থন মিলছে।

জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে—এ বিশ্বাস আমরা করি। গত বিশ বছরে ভীতিভিত্তিত ও শাস্তি আরোপিত আইন ও আদেশ ইত্যাদি দিয়ে কল্যাণপ্রসূ গর্ভাধান প্রচেষ্টা চালান হয়েছে ও তার ফলে ক্রমশঃ হুতরাষ্ট্র ও হীনবীর্য পাণ্ডু-পুত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। রামাঘর থেকে ক্ষেত-খামার পর্যন্ত একটা অদৃশ্য শকলে বাঁধা আছে। এই শিকলের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসংখ্য স্বার্থের মানুষেরা ভিড় করে আছে। সেখানে কারোর ভূমিকা অপব্যোজন নয় এবং একে অপবের ওপর নির্ভরশীল। একটি গ্রন্থি ছিন্ন হলে সমস্ত শোগসূত্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রণ করলে ছিন্ন গ্রন্থির দাগ মিলিয়ে সহজভাবে গ্রন্থির শিকল বজায় থাকে। খাদক ও উৎপাদকের সপ্তে জুড়ে আছে জমিব মালিক, সারের চালানকারী ও বিক্রেতা, যন্ত্রপাতির নির্মাতা ও যোগানকারী, বলদের ব্যবসায়ী মহাজন ও দাদনকারী, অসংখ্য ছোট ছোট ফরিয়া, পাইকার ব্যবসায়ী, অসংখ্য রুকের বান-বাহন সরবরাহকারী এবং শেষ অসংখ্য ছোট ছোট মৃদিজাতীয় ব্যবসায়ী। এরা সবাই অর্থনীতির ভাষায় মিডলম্যান ও এদের কারোর ভূমিকা আদার ব্যবসায়ী নয় বরং রাষ্ট্রের সচল জাহাজ এরা পরিচালনা করে। তাই মিডলম্যানরা রক্তগোষক বাদুড় বলে আইনের এক খোঁচায় নস্য্য করার চেষ্টা শূদ্র মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র হয়। একটি ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিকভাবে ভেঙে দিলে সেই শূন্য স্থান পূরণ করার বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে দিতে হয়। আর সেই বিকল্প ব্যবস্থা যেন ঐ অদৃশ্য শৃঙ্খলের সাথে বেমানান মিশে গিয়ে কাজকে সচল রাখতে পারে সেটাই দেখার দায়িত্ব থাকে ঐ নেতৃবর্গের ওপর। আর এই উৎপাদন ও খাদকের সপ্তে জড়িত অসংখ্য স্বার্থের কোন অংশ যদি অস্বাভাবিকতা প্রকাশ করে বা প্রয়োজনানিতির ভূমিকা নেই তা হলে কি কারণে তা ঘটছে সেইটাই অনু-সন্ধান করতে হবে সর্বপ্রথমে। তখন সেই রোগের মূলে কারণ আবিষ্কার করে সঠিক চিকিৎসা করতে হবে এবং সেখানে অপারেশন অপরিহার্য হলে নির্মমভাবে তা করতে হবে অবশ্য রোগীকে বাঁচিয়ে রেখে।

নিয়ন্ত্রণ আলাগা করার ফলে খাদ্য সম্পর্কিত স্বাভাবিকরূপে অস্বপ্রকাশ কবরো। মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে না, কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি হবে না—এইটাই স্বাভাবিক রূপ। এই স্বাভাবিক রূপ লাভ যদি না করে তা হলে কি কি কারণ এই অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করছে সেটা জানা দরকার। একটি মানবের মনের লোভ বা রিপন আর একটি বাইরের জগতে সেই লোভকে ইচ্ছন দেওয়া, পরিবেশ। আমাদের দেশের পরিবেশটা দেখা হোক। দেশে তিনটে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হয়ে গেছে। দেশের পরিচয় এখনও ডেভেলপিং। অর্থাৎ নির্মল পর্বে এখন সম্পূর্ণভাবে ছবি, অস্পষ্ট। তাই জাতীয় মানসিকতা এখনে অস্পষ্ট এবং চরিত্রও অসম্পূর্ণ। অথচ হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা খাটছে। বৈদেশিক উন্নতির ছাপ প্রকট। শহর (নাগরিক?) সভ্যতা তার বৈভব, তার চিত্র চম্পলকাবী ওজ্জ্বল্যে মানুষের চোখ ধাঁধাবে দিচ্ছে। তাবই অংশীদার হতে চাওয়া অন্যায় নয় আর তা পেতে অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা কিছুটা মাদ বিচিত্র নয়। কেন না সম্পদের বল্টন এ দেশে অভাবমুক্ত অসামাজিকতা। প্রায়ের উৎপাদকরা যদি এই সম্পদের স্বাধীন দেখে

তবে তা একান্ত স্বাভাবিক। উৎপাদকদের, সন্তান-সন্ততিদের, উচ্চাশ্রিত, রেডিও, ট্রানজিস্টার, ও সাইকেল পাবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই অনায়াস নয়। তা পেতে গেলে স্বাভাবিক পথ সহায়ক না হলে একটা অস্বাভাবিক পথে ঘাটতি সৃষ্টি বা পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি করে তা করতে হয়। আর এই অস্বাভাবিক পথে যে বড়িক নিয়ে নেমে পড়ে সে হয়ত আমাদের ভাষায় মুনোফা-শিকারী হয়। এই বড়িক নেওয়ার অর্থ আইনকে ফাঁকি দেওয়া ও তার জন্য প্রশাসকমন্ডলীকে যথাযোগ্য সন্তুষ্টিবিধান করা। দেশের সম্পদের ন্যায্য বন্টন সমাজের সকল স্তরে সম্ভব হলে তখনই সম্ভব খাদ্যের এই অস্বাভাবিকতা দূর করা। আর সবাই ওপরে বাজারের অন্যান্য উপকরণগুলিকে মূল্যবৃদ্ধি প্রবণতা বন্ধ করা দরকার। যদি বাংলা দেশের উৎপাদক দেখে তার নিত্য প্রয়োজনীয় তেল, মশলা, কাপড়, ইত্যাদি যোগ্যতা, তার দেশে হয় না, সেগুলি প্রতিদিনই উচ্চ মূল্যে দাবি কবছে তা হলে কেবল বাঙালী কৃষকরা নিশ্চয়ই দেশপ্রেম দেখাতে উৎসাহ হলে ন্যূনতম করবে না। নিত্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণগুলির সহজলভ্যতা ও ন্যায্য

মূল্যতার ওপর বাজারের সকল দ্রব্য নির্ভরশীল। তাই নতুন সরকারকে সর্বাঙ্গে এই দিকে দৃষ্টি দান করা কর্তব্য। আর সকল শাসনযন্ত্র সঠিক পথে চলে অগণিত জনতার শ্রুভেচ্ছা ওপর। শ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে সারা পৃথিবীতে এক ধরনের অবক্ষয়ী মানসিকতা গড়ে উঠেছে। ইউরোপে জীবনের অনিশ্চয়তা ভোগ সর্বস্বত্বের পথে ঠেলে দিয়েছে ও তার ফলে সামাজিক শক্তির শৃঙ্খলাহীনতা ঘটছে। আর পশ্চাদপদ দেশগুলোতে তাবই প্রেতচ্ছায়া পড়ছে। নানা সমাজ-বিরোধী শক্তিরূপে। অবশ্য পশ্চাদপদ দেশগুলোতে নব-লক্ষ্য স্বাধীনতা, এ স্বাভাবিক প্রবর্তাকে লালন করতে সাহায্য করেছে। নিঃসন্দেহে এই মানসিকতাকে সমর্থন করা উচিত। এই মানসিকতাকে সৃষ্টিস্থল উপায়ে চারিত্র করাই হবে নেতৃত্বের প্রধানতম কাজ ও তাদের সহযোগিতা উদ্ভূত করা। মধ্যে সমৃদ্ধির চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। সহযোগিতার মানসিক পরিমন্ডল গড়ে উঠলেই বা গড়ে তুললেই অনেক মুস্কিল আসান হয়ে যাবে। নেতৃত্ব যেন পুন্যনো ভুলেব পুনর্বাস্তি বন্ধ কবে এইদিকে একটু দৃষ্টিদান করেন। —শ্রীসর্বজ

ভারসাম্যের খেলা—



পরিবহনের জন্য তেল

অটোমোবাইল শিল্পের উৎপত্তি ও উন্নয়নে তেল একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। ডিজেল ও গ্যাসোলিন ইত্যাদির প্রত্যেক মোল শক্তি থেকে শুরু করে হাইড্রোজেন গ্যাসের সর্বশেষ চাপের ব্যতিক্রম, ছোট এয়ারোপ্লেনের জন্য তেল এবং ইস্পাত ওয়ালিং-এর জন্য তেল—অটোমোবাইল শিল্পে তেলের ব্যবহার অসংখ্য রূপে, এমন কি গাড়ির সাজসজ্জা, রং ও সিন্থেটিক টায়ারও।

আমাদের শিল্প, পরিবহন ও কৃষির ক্ষমতা বর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য

পেট্রোলিয়াম ও ম্যাক্রোপলিমার বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ সরবরাহ করে ইন্ডিয়ান অয়েল ভারতের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।



—অর্থনৈতিক সহচরিত্বের আতীশ নামে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড





লাট, সাইকেলে জি. টি. রোড দিয়ে
হুপপথে বাড়ি ফিরছিলো। আজকাল
ফ্যাক্টরী আর বাড়ি, এর মধ্যে অনেক
আলপিন ছড়ানো বলেই তিন মাইলের
স্বাস্থ্য হ'মাইল ক'রে নিয়ে ঘুরপথে
চুপি-চুপি চোরের মত নিজের পাড়াতে
চুকতে হয়। জাতজাতো সব
ফেল। 'বুড়োটা' মানে ঐ ইউনিয়নের
সেক্রেটারী মাথার সজারদর কাটির মত
প্যাকা চুল, তোবড়া মুখ, বদু ঘোষ,
হেরে গেল, আর তারপর থেকেই—

এই কিছুক্ষণ আগে, রীম সেকশনের
অপারেটর শৈলেন দাঁত বার করে
হেসে হেসে বলল, দেশলাই-এর কাঠি
দিয়ে দাঁত খুঁটলে চলবে না। মেসিনে
হাস্ত লাগাও। অবশ্য অডেন্স নেই
অনেকদিন। একটু অসুবিধে ত' হবেই।
আর ফ্যাক্টরীর মধ্যে চুক্কি খাওয়ার
পাট্টা এবার তুলে দাও। ওতে কোন
ফরসা নেই।

লাট, প্রথমটার বুকতে পারে মি।
ওকেই বলছে ত' মসিনে হাত

লাগাবার কথা বলছে? সে-ও অপারেটর।
বটে কিন্তু শৈলেন কি জানে না, বদু
ঘোষের ইউনিয়নের সে এ্যাকটিভ
মেম্বর? ও, তাও তো বটে, বদু তা তো
হেরে গেছে। তাই বদু শৈলেনটা দাঁত
বার করে হাসছে। তাই বদু ওরকম
বলছে শৈলেন। ওকি জানে না, আর
একটু বাড়াবাড়ি করলে হামানদিস্ত
দিলে ওর দাঁতগুলো সব লাট, ভেঙে দিতে
পারে। কিন্তু লাট, নিজের ব্যবহারেই
সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়ে গেল। রাগে
ভেতরটা পুড়ে গেলেও বাইরে রাগ প্রকাশ
করলো না। এ ব্যাপারটাও তার পক্ষে
একবারে নতুন। তার তো বয়লারের
মত বাস্ট করার কথা। তা নয়, চুপচাপ
হাতের দেশলাই কাঠিটা মেঝেতে ফেলে
দিলো। আর সত্যি সত্যি, যেন
শৈলেনেরই কথা শুনে মেসিনের সামনে
এসে দাঁড়ালো গম্ভীর হয়ে। দুইখে,
ক্লান্ত এবং শৈলেনকে কুবে একটি থাপ্পড়
না মারতে পারার রাগে লাট, তখন
পড়ছিলো।

ড, হলেকশনের দুর্দিন আগেও
লোকটা হাত না কচলে, মাথা না চুলকে,
খোসামোদ না-করে কথাই বলতে পারতো
না। বলতো, মাইরী গুরু, তুমিই
ভরসা। কাকে কতো ডিজেল আর
মবিল দোব? বুড়োকে বলে একটা
লিফট যদি পাইয়ে দাও মাইরী গুরু,
তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

কিন্তু কি সব হয়ে গেল। মাস্তর
দুর্দিন আগেও—বুড়োটাও হেরে গেল
আর তারপর থেকেই—

চারের দোকান থেকে ভবপেট টেনে
ফুলবাজারের কো-অপারেটিভ-এর দোকানে
বুকের ছাতি ফুলিয়ে রাজার মত চেয়ারে
বসে থাকতো লাট। আর তার মুখের
খুঁতু রাস্তায় পড়ে যাবার আগেই জ্বিতে
টেনে নেবার জন্যে অমন দশ-বারোজন
সর্বদা তৈরি থাকতো। লাটদার একটা
মুখের কথার তখন কতো দাম। এখন
আর কেউ ছায়া মাড়াচ্ছে না। দ্যাখে,
চোখাচোখি হয়, আর ফিক-ফিক হেসে
শুধু করে সরে পড়ে। আচ্ছা, হাম জি

দেখ লেগে যা। রাগে, দৃষ্টিতে, ক্ষোভে লাটু, সাইকেলটা জোরে জোরে চালাতে লাগলো।

দুর্দিন আগে ভূদির কাছে গিয়েছিলো লাটু। লাটু আর সহ্য করতে পারছিলো না। পুরনো-দিনের মত আবার সে ফুলবাজারের কো-অপারেটিভ-এর দোকানের সামনে একটা চেয়ারে ছাতি ফুলিয়ে রাজার-মত বসে বসে অভ্যর্থনা দিতে চায়। বাজারের উত্তীর্ণ মস্তানদের নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ির নাকের ভগায় তিন-তাস খেলতে চায়। বাকি খুশি তাকে মনের মতো করে বিস্তি গেরে দিতে চায়। তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেদের চোলাই শাইয়ে পোস্ত করে তুলতে চায়। রিক্সায় উঠে রিক্সা-ওয়ালাকে ভাড়া না দিতে চায়। মাংসের দোকানে বিনা পরসার মাস কিনলে যদি মাংস-ওলা বলে, যাবু, গরীবের গা থেকে মাংস কেটে নিচ্ছে। তাহলে তাকে টেনে একটি চড়ু কবাতো চায়।

সবচেয়ে খারাপ লাগলো যখন অলোক চাটুজ্যে, কলেজের ইংরেজীর মাস্টারটা পর্বন্ত তাকে এড়িয়ে গেল। এমনি গুন্ডা বলে, মস্তান-বলে তাদের ঘেমা করতো। ওরা চোলাই না খেলেও পাছে চোলাই-এব গম্ব নাকে ঢোকে তাই কাছে এলে সবসময় চোখ-মুখ কঁচকঁচই কপা বলতো। মাস্টারটা তাদের সঙ্গে কংগ্রেস অফিসে বসে গ্রুপ মিটিং করতো না। এমনি আলাদা আলাদাভাবে একা একা বদু ঘোষেব বাড়িতে গিয়ে চেহারাটা দেখিয়ে আসতো। তারা যখন 'বন্দে-মাতরম'-দেশের খেয়ে বিদেশের দালালি চলবে না চলবে না, 'বাংলা কংগ্রেস বড়টা হুয়া, ভুলো মাং, ভুলো মাং' আওয়াজ দিতে দিতে মিছিল সাজিয়ে মাঠে মিটিং করতো, বারবার বলেও সেই মিছিলে মাস্টার শালাকে পাওয়া যায় নি, কিন্তু মাঠে ঠিক বদুদার পাশে হাজির আছে, খালি কাজ রাগাবার ভাল, এমনি পাঞ্জী। সেই পাঞ্জী বেটা পারের কাছে আবাব বসে কেউ কেউ করে বলুক বদুদার সঙ্গে আমার বিষয়ে কিছু কথা হয়েছিলো? তুমি একটু বলো না, তুমি বললে উনি আর 'না' করতে পারবেন না। যদি সরকারী কলেজে চাকরিটা আমার হয়। ভদ্ররলোক।

ইলেকশনের ভরাডুবি পর লাটু একটু উৎসাহ নিয়েই অলোক চাটুজ্যের কাছে গিয়েছিলো। যা কখনো করে নি। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে মাস্টারমশাই-এর বৌ-এব গলা পেল, মেয়ে এখন আমার বড়ো হয়েছে। ওসব গুন্ডা-বদমায়েস এখানে আসে আমি তা চাই না। বেশ

জোরে জোরে কথাগুলো বলেছিলো। লাটু আর দাঁড়ানি নি।

সমস্ত দরজা একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমন কি নিজেদের দরজাও। ইলেকশনে কংগ্রেস হেরে গেছে বলে সব-খানেই সে হেরে গেছে নাকি! মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লেগেছিলো লাটুর। নিশ্চিন্ত কি সত্যিই হলে গেছে? তাহলে কি সত্যি সত্যিই সব পাট গুটিয়ে ফেলতে হলে? বাতাস তুমি কোনদিকে বইছো এখন, সত্যি করে বল তো?

রাগে, দৃষ্টিতে, ক্ষোভে পাগল হয়ে গিয়ে ভূদিকে বলেছিলো, তোর হাত ভ' ম্যাজিক জানে বে। দু-একটা ছাড় না। সেই বদুদার কথা মত যেমন সেবার ছেড়েছিল ১নং কুলি খাওয়ার গোলমাল থামানোর জন্যে। মাইরী সৈদিন কি মালই তৈরি করেছিল। অপারাপ চায়টে লাস পড়ে গেল। আর স্ট্রাইকও খেলে গেল।

আর ভূদি তার জবাবে কি বলেছিলো? ভূদি, রেলের ওয়াগান-ভাঙা মালটি, বলল কিম্বা, তোর বদুদা কোম্পানীর দারোগান। 'তুই বদুদার দারোগান। ছুচোব বেটা চামচিকে, বেরো এখন থেকে।' এখন দিন বদলে গেছে।

আবে যা। তোদের দিন বদলায় না। তোরা চাকর হয়ে জন্মেছিস। চাকরই থাকবি চিরটাকাল। সৈদিন আমার চাকর ছিল। এবার নতুন দলের চাকর হবি।

কি বে শালা, উপকরটও ভুলে গেছি নেমকহারাম, দাদাকে বলে চারকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলাম মনে নেই?

চাকরি দিয়েছিলি হক কথা, ভূদি যেন মাইকেব সামনে বদুদার ঢঙে বড়তা মারছে, এমনি এমনি কি চাকরি করি? আটটি ঘণ্টা আর তার ওপর ওভার টাইম করলে শরীরে কি থাকে বে! চাকরি দিয়েছিস যেমন তেমনি ততো যেমার কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিরোছিস তুয়ে খাচ্ছিস কেন? তুই ভুলে যেতে পারবি, চাকরি পাবার জন্যে আমার বোনকে রাতের বেলায় বদু ঘোষের বাড়িতে একা একা যেতে দিয়েছিলো লাটু, এ কথা আমি ভুলি নি। এ সবেন এখন ফর-সালার দিন।

আর কোনো কথা বলে নি, ভূদির হুলো বেড়ালের মত মৃদুখা চাকাপানি হয়ে ওঠার আগেই, রাগে, দৃষ্টিতে আর এক দৃষ্টবশে লাটু সেখানে থেকে হন হন করে বেরিয়ে এসেছে।

অথচ এই ভূদিটাই, সাইকেলের প্যাডেলে জোরে জোরে চাপ দিতে দিতে লাটু মনে করবার চেষ্টা করলো, বছর দুয়েক আগে একটা ওরাগান-ভাঙার কেসে জড়িয়ে পড়ার কেসে পরে এসে পড়েছিলো। পাড়ার ছেলে। তাহাড়া ভান্ডো বোমা বাধতে পারে। সময়-অনমনে দরকার হয়। অজ্ঞেব লাটু ওর পিঠে দুটো থাম্পড় কসিয়ে সৈদিন ওবে

কেশ পরিচর্যা

অপরিহার্য...



বেঙ্গল

কেমিক্যালের

ক্যান্ডারাইডিন

হেয়ার অয়েল

চুলের গোড়া স্থৃষ্ণ ও

সবল রাখে, চুলের গোড়া

বাড়াতে সাহায্য করে

ও চুল ওঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা-বোম্বাই
কানপুর

লাহস দিয়েছিলো, ঘাবড়াস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। 'যা' দোকানের পেছন দিকে। এক পাশের চিড়িয়ে নে গে যা।

সোজা তারপর লাটু চলে আসে জানায়। পুন্নিশ স্টেশনে মেগন কব্বার জেন্যে রিসিভারটা তুলে নেয়। হ্যাণ্ডো ও সি। হ্যাঁ। আমি লাটু। আপনি লাটুবাবু? বলুন কি করতে পারি। ওয়াশিং-ডাওয়ার কেসটা তুলে নিন। জাঙ্গে, তা কি করে হয়। আরে মশাই, সব হয়। দিনের পর যদি রাত হয়, ডি আই জি কে তেলিয়ে তেলিয়ে একটা মাথার গনস্টেবল থেকে যদি ও সি হওয়া যায় তাহলে ঐ কেসটা আর হাস আপ করা যায় না? আপনি বড় চড়া চড়া কথা বলছেন। যদুদাস কি জানেন? আপনি যদুবাবুকে কি পেরেছেন? এসব আমরাই 'ডিল' করি। দেখুন, বেশি কথা আমি জানি না। এই ঠকান রইলো। আর আপনি বদলির জন্যে তাঁর থাকুন। ঐ শেষের কথাতেই কাজ হয়েছিলো। ভুঁদির কেসটা চাপা পড়েছিলো।

সাইকেলটা নিয়ে বাকি ঘুরতেই, উঃ, ফসহ্য একটা ছেলে শ্লোগান দিচ্ছে, জোড়া-বলদ কোথায় গেল? একদংগল শমতানের বাচ্চা জবাব দিচ্ছে, দাঁড়ি ছিঁড়ে গালিয়ে গেল।

ছেলেটা আবার মস্তর কাড়ছে, ফ্যান্টরী দাদা কোথায় গেল?

একদংগল পাক্কীর পাঝাড়া জবাব দিচ্ছে, ফ্যান্টরী ছেড়ে গালিয়ে গেল।

উঃ, কোথাও এতোটুকু শান্তি নেই। ছোঁড়াগুলো এইসব বলি দিনরাত আওড়াচ্ছে। তাকে দেখেই বোধ হয় হস্রা করে উঠলো। 'এরাই কংগ্রেস অফিসে ফসে আলদুর দম, বোঁদে উড়িয়েছে আর স্নাতের বেলা কংগ্রেস অফিসের কালি আর কাগজ নিয়ে ওদের 'পোস্টার' জিঞ্জেস! লাটু আগে একটু লাল চোখ ঝুরিয়ে তাকালেই চৌ চৌ দৌড় মরতো। এখন আর গ্রাহাই করছে না। কংগ্রেস হেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একি হাল হোল। কি স্ব্ফুর্তি ও বেটােদের। ষাশের মাচার মাথায় লাল শালদুর ওপর ফলা আর বেগুন। এতো লোক ছিলো। মাটি ফুঁড়ে সব রাস্তার বেরিয়ে পড়েছে। বিজয় মিছিল আসছে। জরীর ওপর গাঁদাফলের মালা জড়িয়ে এক বেটা বাংলা কংগ্রেস। আর এক বেটা করোয়ার্ড ব্রক। আর এক বেটা চীনের দালাল। আবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে এ ওর গায়ে মারছে। কোমরে কাগড় তুলে যুড়োদের পরন্তু হেই যেই করে নাচার বাহার কি। মড়াশদম বোমা ফটানো সে কি উজাস। কেছে বেছে লাটুর বাড়ির

সামনেই দশ-বারোটা বোমা ফাটালো। ঐ বেটা কংগ্রেস আর যদু ঘোষই যতো নশ্টের গোড়া। জিততে পারলো না। হেবে মরলো। জিততে পারলে ঐ বেটা বাংলা কংগ্রেস আর চীনের দালাল আর সুভাষ বোসের দালাল—এসব কটার হাতে মাথা কাটতো লাটু। লেকটিস্ট বাড়ির ঐ মেয়েটার দিকে লাটুর অনেকদিনের তাক। এই সুযোগে মাল খেয়ে একবার ও বাড়িতে ঢুকতে পারলে যা হোত না—

যদু ঘোষ জিততে পারলো না। উস্টে লাটুদের ধমকে দিলো। কাল ওর বাড়িতে দরজা-জানলা বন্ধ করে মিটিং হাঁজিলো। যদি ঘোষ জ্বারখেরে গলায়, যা বিস্ত্রী গলা, বলল, লাটু, তোমাদের জন্যেই আমার হার হোল। তোমরা আর এসো না জ্বাশনে। তোমাদের জন্যে আমার মৃত্যু দেখানো ভার। কারো কারো গলায় লাটু, বলল, কেন যদুদা? আবার জিগ্যেস করছো কেন? নিকিড়ি পাড়ায় তোমরা দুর্গা পূজোর দিন রাতে ওদের ঘরে ঢুকে কেন মস্তানী করেছিলে? পাড়ার লোক তখন আমার কাছে আসে এর একটা বিহিত করতে। সেদিন তোমাদের বাঁচাতে, মলের খাতিরে, আমিই উস্টে পুন্নিশের কাছে রিপোর্ট করি, নিকিড়ি পাড়ার গুন্ডারা আমার বাড়ি হামলা করেছে। এর একটা বিহিত করুন। এই ক'রেই তো তিন শো ভোট আমার চলে যায়।

এখন যদু ঘোষ এইরকম গাইছে। শালা, জগৎ বেইমান। আর ঐ নিকিড়ি পাড়ার বৃধ থেকে যদি যদু ঘোষ ভালো ভোট টানতো এ সব করা সত্ত্বেও তখন কিন্তু এসব নিয়ে যদু ঘোষ আর উচ্চবাচ্য করতো না। শালা বকোথামিক!

সব শালাই কেমন এখন উস্টো গাইছে। সেই শব্দ পারছে না। অলোক চাট্‌জ্যো, মাস্টারটা, ওটা ভো, কে বলল যেন, সেদিন ওদের যিছিলে ছিলো, সে নাকি নিজের কানে শুনছে, মাস্টারটা, যদুদার পেল্লারের ইংরেজীর মাস্টারটা বলছে, বন্ধ বাড় বেড়েছিলো। হাতে মাথা কাট-ছিলো। ঘুঘু, ভেজাল আর ধরাধরিব রাজস্ব এবার শেষ হল। ওরে ব্যাটা-খিস্মি! তবু যদি না-লাটু-জানতো তোমার কীতি! শালা বাড়িতে তোমার বউ, ছেলে, ভূমি ম্যাজিস্ট্রেটের বোকে পড়াতে। সেখানে গিয়ে এমন কান্ড করেছিলে যার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট শেষে ইঞ্জল বাঁচাতে এখান থেকে বদলি নিয়ে চলে যায়। শালা, ইংরেজীর মাস্টার, লাটু, চোলাই খায় বলে লাটুর সামনে চোখমুখ কুঁচকে কথা বলা! এদিকে ত' চোলাই দেখলে ভিন্নমি যাও ওদিকে স্নেয়েদের দিকে বাড়তি নজরটা ঠিকই ত' আছে।

সেই অলোক চাট্‌জ্যো কেমন এখন

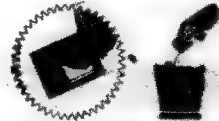
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেছে। পাশ দিয়ে একটা বিরাট, ফুল-ভরা কুচ্ছড়া গাছ চলে গেল। সাইকেল চালাতে চালাতে লাটু ফোর্স করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। বেশ ছিলো মাইরী দিনগুলো। ফ্যান্টরী ভো নামকো ওয়াসেত যাওয়া! পাশ করে ঢুকতে একবার পারলে হশ তারপর আবার কাজ কি। ওরা ইউ-নিয়নের লোক না? এক-একবার মেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। কে কোথায় পাটা ইউনিয়ন গড়ার জন্যে কাকে ফসলাচ্ছে, খোঁজ রাখো, ঠিক সমবে যদুদাকে তা' বলতে হবে, ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে কাগজ পড়ো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, চায়ের কাপের পর কাপ ওড়াও, ব্রেকে ক্যান্টিনে গিয়ে ভরপেট খেয়ে আবার ইউনিয়নের ডানহাত বলে বাঁটা ভর্তি মাংস বাড়িতে নিয়ে যাও; কমিউনিস্ট দেখে আব হাত পাকাও, সুযোগ এলে তুলোদানা করো। আগে ছিলো লাটু, হেলপার, ফিটার মেট। ফিটার মেট খেলে/কিনে। এখন আরো একটা লিফট পাবাব ছিলো। যদু ঘোষ জিতলেই 'জিনিসটা' পাকা হত। নিজের কোঁকানি খেল আবার এখন লাটুদের কোঁকানি দিচ্ছে। যদুদাই সে 'পিকআপ'। রাগের মাথায় কি একটা করে ফেলোছিলো ইলামবাজারে, মাল খেয়ে কাকে যেন লাটু হাঁকড়েছিলো। পুন্নিশ পি. ডি. অ্যাঙ্কে ওকে ধরে। যদুদা ও. সি-কে বলে ওকে ছাড়িয়ে আনে। ও মে কদিন জেলে ছিলো সে কদিনের 'হস্তা' যদুদাই কোম্পানীর কাছ থেকে আদার করে ওকে পাইয়ে দেয়। তারপর থেকে ও যদুদার 'বাঁডগার্ড' হয়ে যায়। যদু ঘোষ ওকে ট্রেড ইউনিয়নে কাউন্সিলের মিটিং-এ দিল্লীতে ডেলিগেট করে পাঠিয়েছিলো। জেনেভা কনফারেন্সে নিজের সংগে নিয়ে গিয়েছিলো। বিনিময়ে যদু ঘোষ যখন যা' বলেছে ও তা' পালন করেছে। দৃকপাত করে নি। কি করে নি ও? কি করতে বাকী রেখেছে লাটু? সেনার শাস্য আপেলনের সময় ওরা সব গেটে শুরেছিলো। সেতে দেবে না। এদিকে যদু ঘোষের হুকুম, ফ্যান্টরীতে ঢুকতেই হবে। -কোনো-কথা-নষ। যেতে গেলে মাড়িয়ে যেতে হয়। প্রথমে থিসিত করেছিলো লাটু। তাতে কোনো কাজ হোল না। ওরা আগ বাড়িয়ে বগড়া করলো না।

তারপর বোমা মারার ভয় দেখিয়ে-ছিলো, তাতে ওরা যখন জোরে জোরে হেসে ওঠে, এই এ্যাভোটেটুকু বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, তখন ওদের বুকুর ওপর দিয়ে হেটে গিয়ে ফ্যান্টরীতে ঢোকে লাটু, পারের তলায় বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের হাড়-গুদো মড়মড় করে উঠেছিলো। কেউ



টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে!

জামা কপিড় কাঁচবার পর ধোবার সময় সাধারণ
মাত্র টিনোপাল দিবে দিল। দেখবেন, আপনার
সাদা কাপড়গুলি—সার্ট, শাড়ি, তোয়ালে, চাদর,
সবই উজ্জ্বল ধবধবে সাদা হয়ে উঠবে।
আর এইরকম সাদা ধবধবে করতে খরচই
না কত? কাপড় পিছু এক পরসী ও রস। চারের
কামচের চার ভাগের এক ভাগ টিনোপাল এক
ঝালতি কাপড়কে সাদা ধবধবে করে দেবে।
সব সময়ই বৈজ্ঞানিক উপকরণ-টিনোপাল
ব্যবহার করুন। এতে কাপড় জামার ক্ষতি
হওয়ার কিছু নেই।



টিনোপাল বন্ধ করা
এক্সট্রামিনিয়াম ফয়েল
প্যাকেট পাবেন।
এক প্যাকেট টিনোপাল ঝালতি
ভরে কাপড়কে সাদা ধবধবে করো
ব্যবহারে কত সুবিধা, একটুও অপব্যক্তি
হবার আশঙ্কা নেই। এক ঝালতি
কাপড়ে মাত্র এক প্যাকেট
টিনোপাল। কম কথা নয়।



টিনোপাল এমের গেসিটার্ড ট্রেডমার্ক
কে. আর. গিল্পি, এম. এ. বাল, হাইড্রাল্যাভি।

একটি গার্মেন্ট লিমিটেড পোর্ট ব্রিসল, ব্রিসল, ইংল্যান্ড।

BBN/SC-229 A 89m

পারে নি। সকলেই ফিরে গিয়েছিলো। শব্দ, লাট, যদু ঘোষ বলেছে বলে, মাড়িয়ে চলে এলো। কেন? লাটের বকের ভেতর কি একটা জলজন্তু বসে নেই? সেখানে কি কষ্ট নেই? সে কি যদু কান কাটা হয়ে গেছে? তা তো নয়। একেই বলে নুনের দাম দেওয়া। লাট, গুণে গুণে নুন খাওয়ার দাম দিয়েছে।

ফ্যাক্টরীতে ওয়াকার্স কমিটির নির্বাচন। ব্যালটে হবে। ব্যালটে হোলো লাটরা নির্বাচন হারবে। অবশ্য তাতে ইউনিয়নের ভোটা কোন কতি নেই। কিন্তু ইচ্ছা বড়ো কথা। ওয়েলিংটন-এর সেই বড়ো লোকটা, হিন্দুস্থানী মহলে শব্দ প্রতাপ, মাঝে মাঝে গৌক পাকার আর বৈনি ডলে আর যদুকে কি করে নাস্তানা বদল করা আর তার পাঁচ খেলে, তাতে এমন হুমি রেখেছিলো, শালা বড়োটা রোজক থেকে নিচে রাস্তায় কুমড়োর মত গাড়ির মায়। ভিড় জমে যায়। খবর পেরে ইউনিয়ন অফিস থেকে যদুনা ছুটে আসে। তারপর তাকে দেখতে পেয়ে সকলের সমনে বাপ-না তুলে মাছেতাই গালাগাল। চপ করে সব সহ্য করেছিলো সেদিন লাট। এক-একবার মনে হাছিলো যদু ঘোষের টিটি সে চপে করে। কিন্তু যদু ঘোষের টিটি সে চপে করবে বৈকি। তার টিটি যদু ঘোষ টিপে রেখেছে চিক্কালের জন্যে। কেন না সে যে যদু ঘোষের নুন খেয়েছে। সে ত' নেমকহারাম করতে পারবে না। সেদিন সে একটি কথাও বলে নি। একগাদা লোকের সামনে যদু ঘোষের গালাগাল সে চপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহ্য করেছে। কেন না যদু ঘোষের এমনি নির্দেশই ছিলো। যদু ঘোষ যে গুডারাক বরদাস্ত করে না। অন্য রাজনীতির লোকের ওপরও যদু ঘোষের রাগ নেই ওয়াকার্স কমিটির নির্বাচনের কিছু আগে এ খেলায় প্রয়োজন ছিলো।

লাট, ভালো আছো? কে? পরেশ গাঙুলী? পরেশ গাঙুলী লাট, ভালো আছে কি না জিজ্ঞাস করছে? সাইকেল চালাতে চালাতে জবাব দেওয়া গেল না। ঠাট্টা করলো না কি? কিন্তু ঠাট্টার মত তো শোনালো না। 'বাংলা বন্ধের' দিন লাট, ফ্যাক্টরী শ্রমিক প্যাক্ট আর মার্কা মারা বৃট পরে মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলো। তার আগের দিন ইউনিয়ন অফিসে দেড় শো জনের গ্রুপ মিটিং-এ যদুনা সবাইকে কড়া করে হুশিয়ারী দিয়েছিলো, সবাইকে ফ্যাক্টরীতে আসতে হবে। ফ্যাক্টরীর ভেতরে রাউটি আর ডিমের বন্দোবস্ত হয়েছে। দুটো কলটার সিমেন্ট স্রাবের তারা ইচ্ছে করলে বাড়ি নাও যেতে পারে।

ফুলবাড়ারে অতো সকালেও সেদিন কোয়ার ভিড়। চ্যাংডুরা একটা গাছের গাড়ি ফেলে ব্যারিকেড তৈরি করেছে। কে একজন একে যেতে বাধন করলো। লাট, মাল খেয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলো। কিন্তু অনর্থক বামেলায় জড়াতে চায় নি।

লাট, বলল, ফ্যাক্টরীতে যাবে না। পেটেল ভরবার জন্যে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। ওর এই জবাবে কেউ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। আবহাওয়া ক্রমশই গরম হয়ে উঠছে। কেটলীতে জল টংকল করে ফুটছে। পরেশ গাঙুলী তখন বললে, আচ্ছা তুমি বাও।

ও গাড়িতে জোর স্টার্ট নেয়। পাশে দাঁড়ানো ছিলো একটা সাইকেল। সাইকেলটা সম্ভবত এমনভাবে ইচ্ছে করে দাঁড় করানো হয়েছিলো যাতে মোটর সাইকেলটা যেতে না পারে। লাট, এককণ চটে নি। নানাজনে নানা টিটিকারি দিচ্ছে, 'কোম্পানীর দালাল' পর্বন্ত বলছে, তবু মেজাজ গরম করে নি। কিন্তু এমন যখন ওর মোটর সাইকেলটা কামড়া করে আটক করা হল, তখন ও আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলো না।

লাট, গরম হয়ে বলল, সাইকেল হঠাৎ। নইলে ওটা গুড়ো হয়ে যাবে। হঠাৎ পরেশ গাঙুলী দেখলো লাটের চ্যাবোজ বদিসে এখন গ্রহণ না করে জাহাঙ্গীর ফুলবাড়ারের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে যাবে। আর ফুলবাড়ার ভেঙে গেলে ফ্যাক্টরীর ওদিকের প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ভেঙে যাবে। সুতরাং অনিচ্ছে সত্ত্বেও পরেশ গাঙুলী নাটকীয় ভংগিতে পকেট থেকে দেশলাই বার করে, একটা চোখ ওর আবার কথা বলতে গেলে কুচকে যায়, সেইরকম একটা চোখ কুচকে, ভারী গলায় বললে, আমার হাতের এই দেশলাই দেখছো। জ্বলন্ত কাঠিটা তোমার মোটর সাইকেলে ফেললে ওটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার চেয়ে সরে পড়ো।

সরে পড়বো? চারদিকে ডাকিয়ে দেখলো লাট। ওদের দলের কোন মস্তান আশে-পাশে নেই। এখানে গোঁয়াতুমি করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে হবে। মার খাবে কোন শালা?

সুতরাং 'আচ্ছা' বলে লাট, মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়। সেই প্রথম লাটের পরাজয়। সেই মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাওয়াই কি লাটের শেষবারের মত চলে যাওয়া? আর কি লাট, ফিরতে পারবে না বিজয় গোরবে? আগেকার জেঙ্গা আর কি ফিরে পারে না? রাগে, দুঃখে, কোভে লাট, অশ্রুর মত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তীরবেগে মোটর সাইকেল চালাতে লাগলো। কিন্তু পরেশ গাঙুলী। পরেশ গাঙুলী

তাকে 'ভালো আছো' জিজ্ঞাস করলো কেন? সে ত' ওর শত্রু। তার ভালো-খারাপ পরেশ গাঙুলীদের কাছে ভালো নয়।

বাড়ির কাছে এলো। বাইরের দিকে যে আলোটা জ্বলে সেটা এ কদিন জ্বলছে না। দু-দিন ধরে ফিউজ হয়ে গেছে। দু-রে একটা মিউনিসিপ্যালিটির আলো টিম-টিম করে জ্বলছে। এগাশটা নিঃস্বপ্নে। নিজের বাড়ি চুকতেই কেমন গু হুম হুম করে। কে হয়তো পাঁচলের আড়ালে আছে রেক্সের ভেতর হাত ঢুকিয়ে। কে, এখানে? শালা কাপড়টা নড়ে উঠলো। পাঁচী বলল, আমি। ও। লাট, তোক গিলল। তা রোজকে চপচপ বসে আছিস যে। হাঁড়ি চড়াস নি?

কি দিয়ে হাঁড়ি চড়বো, বলতে পারো? চাল এনেছো?

না। চাল আনার কথা বলে দিয়েছিলো বটে পাঁচী। আনা তো হয় নি। তাহলে গাড়ির শিপিডের এখন শুরোরের পেট ভরবে কি করে?

আই চোশরাও। পাঁচী কি ফুলে গেল লাটকে? একদিন এমন লাখি কষিয়েছিলো ভাগ্যেটে যে পেটের বাচ্ছাটা নট হয়ে গিয়েছিলো। রাবণের পাট কুছো নাকি? ফুটুনি ত' এখানে। বাও না ফুলবাড়ারে। কোটিরে বিষ বাড়াবে।

কি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, হাতের কাছে ছিল সাইকেলটা, ওটাই মাথার ওপর তুলে ফেলল।

মাগবে? মারো না দেখি? অন্ধ-কাবো পাঁচীর ধকলকে চোখের তারা দুটো চকচক করে উঠলো।

সাইকেলটাকে মাথার ওপর থেকে ঝপাং করে নামালো লাট। তারপর কোনোদিকে দৃকপাত না করে ফুলবাড়ারের উদ্দেশ্যে ছুটলো। একটা আশ্রয় তার চাই। যেমন করে হোক। এভাবে চোরের মত, চুপিচুপি সে বাঁচতে পারবে না। সবাই তাকে ঘেঁষা করবে, টিটিকারি দেবে, ঠাট্টা করবে, পাশ কাটাতে, এভাবে সে বাঁচতে পারবে না। নিষ্ঠুরা কি সত্যি একবারে হেলে পড়ছে? বাতাস কি সত্যিই উল্টো দিকে বইছে? তার দিন কি সত্যিই এবার ফুরলো?

একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজন কে পাঁচকড়ির দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে পাঠালো ছেলোটা একটুও দেরি করে নি, তবু তাকে হিড় হিড় করে পাঁচকড়ির দোকানের সামনে নিয়ে সোপাটে চড় মারতে মারতে চেঁচাতে লাগলো, শালা, সেই সাতঘন্টা ধরে সিগারেট আনছো? হারামজাদা!

দোষের মধ্যে পাঁচকাড় বলেছে, মারতে হয় ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মারো। এটা দোকান। আরো খন্দের আছে। বাঁ হাতে চিৎকা লাটুর সোডার বোতল। লাটু, পাঁচকাড়ের মাথার ওপর ওটা তুলে ধরলো। 'দুঃখ' বনবন শব্দ হল। ফিনিক দিয়ে গুঁড় ছুটলো। খুন, খুন হয়ে গেছে। আওরাজ উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। একটা হাস পড়ে গেছে। পাঁচকাড় খুন হয়ে গেল। ফুলবাজারের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত যেন ইয়ারে ইয়ারে আওরাজ ছুটলো। শরে শরে মানুষ গর্জন করে উঠলো। শালা, অনেক অভ্যাস করে। আজ শালার চামড়া খুলে নাও। কে একজন বাঁশের মণ্ড ভেঙে একটা বাঁশ খুলে নিয়ে নেবে এলো হুকুর দিতে দিতে। কিসের এতো দাপ? এতো দাপ কিসের?

দুঃখার বা পিঠে পড়তে না পড়তেই কে যেন ওকে আগলে ধরেছে মনে হল। জাকিয়ে দেখলো পরেশ গাঙুলী। এই পরেশদা, ওকে ছেড়ে দাও মাইরী। ওকে পিঠিরে হাতু করবো আজ। না ছাড়লে মাইরী ওর সঙ্গে তোমাকেও বেতে হবে।

কি বাজে বকাহিনী? এ তো ওদের রাত কাশ করছিল? ওকে একা পেরে ধীরে দেখাচ্ছিল? পরেশ গাঙুলী দুঃপাশ থেকে মার ঠেকাতে ঠেকাতে লাটুকে ঠেলে নিয়ে চলল।

বেশ, ওকে নাকখণ্ড দিতে হবে। ও নাকখণ্ড দিক। বলুক আর কখনো করবে না। দুঃপাশের কিল চড় খেতে খেতে রুখে উঠে লাটু, বলল, মতো মারবি মার। নাকখণ্ড কখনো দেবো না।

পরেশ গাঙুলী ওকে এক ধাক্কা দিয়ে একটা রিকসার তুলে বলে, চলো। বেশি কথা বোলো না। আজ আমাদের দিন খুলে বেঁচে গেলে। যদি তোমাদের দিন হতো আমরা কি বাঁচতাম? আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে আগুন জ্বলতো।

মোটামুটি নিরাপদ একটা জায়গার লাটুকে নামিয়ে দিলো পরেশ গাঙুলী। ফুলবাজার অশান্ত হয়ে উঠেছে। তার অনেক কাজ। পাঁচকাড়কে হাসপাতালে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। ফুলবাজারকে শান্ত রাখতে হবে। হাংগামা বাড়তে দেওয়া যায় না। ও চলে গেল।

গাড়ি অন্ধকারের বন্ধ চিত্রে হঠাৎ হেডলাইটের আলো লাগলো লাটুর চোখে। জিপ গাড়িটা কাছে এগিয়ে এলো।

লাটু? কে, বদমা? বদমা, আমাকে বাঁচান।

আমি তোমার বাড়িতেই গিয়েছিলাম লাটু।

বদমা, শালারা আমাকে ছেঁকে ধরেছিলো একটা আগে। পুলিশে একটা খবর দিন।

ঈশ্বর উদ্ভেজনা আর বিরক্তির মতো অন্ধকার কোণ থেকে বদমা বোম্ব বলল, পরেশ গাঙুলীটাই সবচেয়ে পাজী। ওটার লাস নামিয়ে দাও আগে তারপর আমি আছি।

গাড়ি স্টার্ট নিলো। লাটু, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জিগোস করলো, কোথায় যাচ্ছেন?

সেই কথাই বলতে এসেছিলেন। মাছি দমদম। আমাদের ইউনিয়নের জরুরী সভা দিল্লীতে। দেখো সব। এ পাড়াটা ভালো নয়। তাই রাঙিরেই এসেছিলাম। আচ্ছা।

জিপটা হলো উড়িয়ে চলে গেল। অনেকক্ষণ সেইদিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে লাটু বলল—শালা।

রাত আর একটু গভীর হলে পরেশ গাঙুলীর বাড়ির কড়া নড়ে উঠলো।

কে? আমি লাটু। কি হয়েছে? পরেশ গাঙুলী ছুটে বেরিয়ে এলো। আবার হাংগামা বাধিয়েছে কেউ তোমার সঙ্গে?

না। আমি হাংগামা বাধাতে চাইছি। বলো, কাকে মারতে হবে। আমি তৈরি হয়ে এসেছি। তোমাদের গারে বে শালারা হাত দিয়েছে কাঁধ থেকে তাদের হাত দুটো আমি নামিয়ে দেবো।

পরেশ গাঙুলী স্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো লাটুর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, কাউকেই মারতে হবে না ভাই। যদি আলো নেভাতে চাও তাহলে কি ভূমি রাস্তার জুম ফাটাতে ফাটাতে যাবে না মেন সুইচ অফ করে দেবে, কোনটা লাটুভাই?

মেন সুইচ?

হ্যাঁ। পরেশ গাঙুলী দুঃপাশে বললে, ফায়েরী থেকে বদমা মোমকে জড়ো।

বেশ, ভাই হবে।

না। সব অন্ধকার হয়ে যার নি। এখনো আলো আছে। আগুন আছে।

এতোদিন পর আবার সে মাথা তুলে চলবার সাহস পেরেছে। মরুর আনন্দে লাটু উড়ে উড়ে চলল। একেবারে সোচ্চার গংগার ধারে। মায়ের দানি, কামাল ছেলে যেন মায়ের কাছে অনেক দিন পর ফিরে এলো।

গায়ের কামাটা মাটিতে জড়িয়ে ফেলে লাটু সেই নিজনি নিয়ম, অন্ধকার গংগার জলে প্রাণভরে সাতার কাটতে লাগলো। আর মুক্তি। আর তাকে নিমকের দাম দিতে হবে না। সে এখন আগেকার লাটু। নিম্পাশ, নিম্নলোকে কিন্তু ভেঁজনি দুরন্ত। সেই প্রথম জন্মা নেবার দিনের লাটু। আবেগে লাটু, সেই অন্ধকার, নিজনি নদীর বৃকে মৃদু লুকিয়ে আলোর গলে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, না, মাগো।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫৬

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - লাহোর

বেঙ্গলুরু - কলকাতা - গোহাটী



এ বহুতর্কের মূল কোথায়

গত বুধবার ২৯শে মার্চ তারিখে কলকাতায় যে লজ্জাকর এবং দুঃখজনক ঘটনার প্রকাশ ঘটল তার পিছনে যে কোন কোন মহলের নেপথ্য হস্তের ইঙ্গিত আছে একথা অবশ্য নতুন করে ব্যাখ্যায় বলায় কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

তবে যারা আশা করেছিল যে এই রকম একটা অঘটনের সৃষ্টি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ ও হেয় করবে এবং তাদের মধ্যে বেসব অভ্যুত্থাসাহীরা আশা করেছিল যে এই মওকায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৯ সালের কেরালা সৃষ্টি করবে, তাদের সেই আশা যে অক্ষুরেই বিনষ্ট হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কেন না এইরূপ একটি গুরুতর আকার ধারণ করা বিষয়ের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি মাত্র করবে হুঁটার মধ্যে করে যুক্তফ্রন্ট সরকার এক নতুন নজীর স্থাপন করেছেন।

একথাটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে পিছন থেকে কোন উস্কানি না থাকলে নিতান্তই সংখ্যালঘু একটি শ্রেণীর পক্ষে যারারক অস্ত্রশস্ত্র, কুপাণ, বশী ও আশ্রয় নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার বুকে এই তাণ্ডব সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না।

এবং এও সত্য যে যেমূল বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এই তাণ্ডবের বিস্ফোরণ, তা এতই অর্কিষ্ঠকর যে, তার জের টেনে ঘটনাকে এতদূর গড়িয়ে নিয়ে আসা অসম্ভব, যদি না এর পিছনে সুপরি-কল্পিত বড়বন্দু থাকে সেইসব এক দেশীয় অবাঙালী অর্থবান শ্রেষ্ঠিকুলের এবং প্রতিপ্রিয়ালী রাজনীতিকদের, যারা ছলে-এলে-কৌশলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কণ্ঠাঘাত করার চেষ্টা করছে বেশ কিছুদিন ধরে।

এই হাঙ্গামার মূলে যে কোন ধর্মীয় স্বার্থ নেই, আছে মোটর-স্বার্থ জন-সাধারণ তা এক মুহূর্তেই বুঝে উঠতে সক্ষম হয়েছে। পরিবহনমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু প্রাইভেট বাসের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে যে ব্যাপক তদন্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন বর্তমান ঘটনার মূল সেখানে, বাগমারীতে নয়। আর এই লাইসেন্স-ওয়ালাদের পিছনে আছে কলকাতার এক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠিকুল তথা বিশিষ্ট রাজনীতিকেরা যারা ঘোলা জলে মাছ ধরতে ভালবাসে।

সৌভাগ্যক্রমে ব্যাপারটির কপনাতীত দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার জনসাধারণ সুখী হয়েছেন যদিও কোন কোন মহল রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছে—এ যেন আলান ডালেদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কিউবা আক্রমণের হটকারিতা।

কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার জেনে রাখুন এটাই শেষ নয়, এই শুরুর, কেন না যেহেতু যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণের প্রভুত আস্থা-ভাজন হয়েছেন এবং বিভিন্ন কল্যাণকর কাজের উদ্যোগ দেখাচ্ছেন, সেইহেতু কারেমী স্বার্থ ও সম্প্রদায়িক স্বার্থের লোকেরা বৃকতে পেরেছে যে, যেহেতু এই সরকারকে রাজনৈতিকভাবে হটানো যাবে না, অতএব এই জাতীয় দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে আইন ও শৃঙ্খলার ধূয়া তুলে প্রতি মুহূর্তে তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে। নতুবা কেন বড়বাজার থেকে ঘন ঘন দিল্লীতে টেলিগ্রাম ও টেলিফোন হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিপন্ন, কেন কলকাতার এই হাঙ্গামাকে অকস্মাৎ সরকারতীয় ইস্যু করে তোলায় অপচেষ্টা হচ্ছে, কেন নয়-দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন, কেন পাজাবের মুখ্য-

মন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নিকট টেলিফোনে বিবরণ জানতে চাইছেন, কেন পাজাব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও কয়েকজন লোকসভার সদস্য ব্যস্ত হয়ে কলকাতার হুটে এলেন? এর চেয়ে তো অনেক বড় বড় কাণ্ড ইতিপূর্বে কলকাতায় বহুবার হয়ে গেছে বেগুনের ভুলনায় অতি তুচ্ছ এই ব্যাপারটিকে এইভাবে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে কারা তুলছে?

এই সকল কারণেই বর্তমান মন্ত্রিসভাকে অধিকতর হুঁসিয়ার হতে হবে। যারা বর্তমান মন্ত্রিসভাকে এভাবে অপদস্থ বা উৎখাত করতে চাইছে তারা এর পরেও আরও সর্বোপযোগী ফাঁকিরে থাকবে, নানাভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও হীন প্রাদেশিকতাকে জাগিয়ে তুলে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করবে, কাজেই এই লোকগণিকে যেভাবেই হোক বাঁজে বার করে নির্মম শাস্তি দিলে প্রমাণ করতে হবে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রয়োজনে চরম কঠোর হতেও বিশ্বাস বোধ করেন না।

যেখানে হুঁসিয়ার হতে হবে

আজকের সমাজে যারা এলাইট শ্রেণী, সেই সদ্য গজিয়ে-ওঠা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থবহ হওয়া ভিন্ন ভারতীয় আমলা-তন্ত্রের আর কোন কাজ নেই, তদুপরি এদের পিছনে আছে সেই পুরাতন ব্রিটিশ ও কংগ্রেসী আমলের ট্রাডিশান, জন-সাধারণের প্রতি অসীম ঘৃণা ও অবজ্ঞা। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস হাতে ক্ষমতা পেলে এরা আতঙ্কিত হয়েছিল, কেন না দেশের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গী, জাতির জনক এবং অন্যান্য প্রমুখ কংগ্রেসী নেতাদের সম্বন্ধে এদের মনোভাব ও মতামত সম্বন্ধে সেদিনের কংগ্রেসী নেতারাও যে ওয়াকিবহাল ছিলেন না তা নয়। কিন্তু যখন তারা উপলব্ধি করেছিল যে কংগ্রেসী নেতাদের

সাম্প্রতিক বঙ্গবন্ধু

এবং এখন যা করতে হবে

একথা অবশ্য যুক্তফ্রন্ট সরকার উপলব্ধি করেছেন যে জনসাধারণ যদি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, অথবা সরকার যদি জনসাধারণের সহযোগিতামূলক মনোভাব আকর্ষণ করতে সমর্থ না হয় তাহলে সে সরকারের পক্ষে দিনগত পাপক্ষয় করা ভিন্ন আর কোন কাজ করা সম্ভবপর নয়, কেন না আমরা দেখেছি যে বিগত কংগ্রেসী যুগে জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের সংযোগ সর্বদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যদিও জনসাধারণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন।

জনসাধারণের সহযোগিতা আকর্ষণ করতে গেলে বহুতাবাকি করে কোন কাজই হবে না কেননা বিগত উনিশ বছরে কংগ্রেস সরকার কম বাণী দেন নি, কম ভাল কথা শোনান নি। তাছাড়া সেই সরকারের প্রতি জনসাধারণের কোন আস্থা ছিল না। ইতিপূর্বে তারা নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল তুলনামূলকভাবে কম ভোট পেয়ে, নিজেদের যুগে নয়, বিরোধী শক্তির সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অস্বার্থের সূত্রযোগে।

জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে গেলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এমন কতকগুলি কাজ করতে হবে যাতে জনসাধারণ সরকারকে একই সঙ্গে ভয় ও ভীতি করতে দেখে। জনতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক করলেই যে জনসাধারণের আস্থা অর্জন হওয়া যায় তা নয়, তা হওয়া যায় একটি ক্ষয় কালের ক্ষয়ই যা হচ্ছে যুক্তের দমন আর শিকড় পালন। উৎকট রোগের জন্য উৎকট দাওয়াই-এর প্রয়োজন। মহাভারতের ভীম যে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন তার কারণ তাঁর চরিত্রে বহু দোষ থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়টিতে তাঁর উত্তম খবল ছিল যে কখনো জাল ও বাতল আশ্বাসে জনসাধারণী ভীমকে দেখে দশকের প্রেক্ষমাণে একটি আশ্বাস ও আশ্বাসের অভিজাত কুড়ি ওঠে কেন না যখন যখন করে যাবৎ এই প্রকট প্রত্যাপন রয়েছে যে উৎকট পাপের উৎকট পাপবিধান করতে পারে।

প্রবর্তন আমাদের যেসব দুর্নীতির তদন্ত করেন বলে যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিলেন তা করতে তারা যেন আর বিলম্ব না করেন। যেসব ক্ষেত্রে পেশনিক উদাহরণ রয়েছে, যেসব বাসের পারমিট ও লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপার, অথবা ভ্রমণ সন্দের অস্বার্থিত, সেখানে জন এই প্রকট প্রত্যাপন করেছেন যে জন-মিত্রিক দু'আলের মধ্যে আর রিপোর্ট প্রকাশিত হোক এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে

অস্বার্থিতের মধ্যবোগ শাস্তিবিধান করা হোক। জনসাধারণ যদি দেখেন যে বর্তমান শাস্তিবিধান রীতিমত কঠোরতার মধ্যে এই কার্যে অবতীর্ণ হয়েছেন তাহলেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে।

জনসাধারণকে যুক্তফ্রন্ট সরকার শাস্তি দেখেন এই বিশ্বাসেই জনসাধারণ দেশের সর্বত্র জাজ জাজ মিরোধী অভিমত পৌঁছানোর সঙ্গে সহযোগিতা করেন, বহু ক্ষেত্রে তারা নিজের উদ্যোগী হয়ে দুর্নীতিশূন্যতা ব্যক্তি, জজদ বঙ্গা খাদ্য-শস্য ইত্যাদিকে বাইরে বার করে জালদে, প্রতিদিনই সংবাদপত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ স্থান থেকে এই জাতীয় সংবাদের উল্লেখ থাকছে। জনসাধারণের এই পিপাসার বজায় রাখা প্রয়োজন, যে কারণে সরকারের কঠোর অভিকর্তার দ্রুততার সঙ্গে অস্বার্থিতের শাস্তি দেওয়া। কয়েকজন রাজবোয়ালকে এই মহাভারত এমন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন, তাহলেই জনসাধারণ সরকারকে ভয় ও ভীতি করবেন। জনসাধারণ যখন সরকারকে ভালবাসে, এটা সরকারের জাদু হওয়া উচিত নয়, কিছুটা তা বলাও উচিত।

বিগত উনিশ বছরে কংগ্রেসী রাজ্যে আইন মেনে জীবনযাপন করাটাই শে-জাইনী হয়ে গেছে। তারা জিনিস আইনকে ব্যাপ্যগত প্রদর্শন করে এদের তাদেরই খেলা জানা লাভ হয়েছিল, আইন সঙ্গত জীবনযাপনটাই একটা জলজর বিবর হয়ে উঠেছিল। উনিশ বছর ধরে গড়-ওঠা মানসিকতা ততক্ষণ পর্যন্ত ঘোম করা যাবে না বতকশ না পর্যন্ত বেঁচে গেলে যায় যে অন্যায় করে পার পাওয়া যায় না। এমনই আমরা সরকারকে জনসংযোগ করছি যে তারা তাদের অনুসৃত নীতিগুলি আরও কঠোরতার সঙ্গে কার্যকরী করুন।

নতুন খাদ্যনীতি

অবশ্যে খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ জনসাধারণের বহুপ্রত্যাশিত খাদ্যনীতি বিধান সভার পেশ করেছেন। এই খাদ্যনীতির বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে তাড়াহুড়ে করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি, সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে, এমন কি প্রাক্তন শাসকদের সঙ্গেও, এবং কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে সুপারিকম্পিতভাবে নতুন নীতিগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন খাদ্যনীতি নমনীয়, প্রয়োজনে পরিবর্তন ও সংশোধনসাপেক্ষ। এই খাদ্যনীতি প্রবর্তনের জন্য ডঃ ঘোষ অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হয়েছেন। সর্বপ্রকার পূর্বসংস্কার-মুক্ত হয়ে ধীরম্যতিক্রমে যে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান অবস্থায় এর চেয়ে ভাল কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। বর্তমান অরশদে এই

বাইরে থেকে বড়টা শব্দ বাদাম মনে করা গেলে নেতারা সেরকম নয় তখনই তারা সেই অবস্থার সুযোগ নিতে বিলম্ব করে নি। কলকাতা কংগ্রেসী রাজ্যে এরাই হয়ে উঠেছিল ডি-ফ্র্যাঙ্কো শাসক। এরা বন্ধুতে পেরেছিল যে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতাকে সেই ইংরাজ শাসনেরই বাদামী সংস্করণ, লক্ষ্য করেছিল যে সমাজতন্ত্র কথটি কংগ্রেসের একটি চটুল শ্লোগান, দেখতে পেরেছিল যে একাদিকার ব্যাপারী কংগ্রেসী আমলে হচ্ছে শিল্পপতি, বৃষ্টি আমলে যারা সর্বদাই ভারতের মুক্তি-আন্দোলনসমূহের বিরোধিতা করে রাজ-ভক্তির পরাক্রম্য দর্শিয়েছে, তাদেরই মাথার খন্ডের টাঁশ উঠেছে, কাজেই তাদের সঙ্গে এই আমলাতান্ত্রিক শক্তির অধি-প্রম ও অশুভ পরিণাম ঘটতে হবে বেশি বিলম্ব হয় নি যার ফলে নিম্ন পর্যায়ের বি, ডি, ও থেকে শুরু করে এস, ডি, ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেজেষ্টারী, ডিরেক্টর প্রভৃতি অনেকে কালো টাকার পাড়ি-বাড়ি হাক্কাদার সুযোগ পেয়েছে, টাকার ব্যাপারে স্বেচ্ছাকৃতভাবে এরা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে, সুপারিকম্পিতভাবে এরা অস্বতন কর্মচারীদেরও করাপ্ট করেছে। পশ্চিম-বঙ্গে এখন দেখা গেলে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার অর্পাদিনেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সরকারকে উৎসাহিত করা তামাসা নয়, তখন এরা প্রত্যেক প্রতিকূলতার দিকে না গিয়ে নতুন কার্যের অবলম্বন করেছে এবং তা হচ্ছে এখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রতি একান্ত ভীতি ও আনুগত্যের ভাব দেখিয়ে ধীরে ধীরে মন্ত্রিসভাকে কল্যাণ করা ঠিক যেমনটি তারা উনিশ বছর আগে করেছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার যেন এদের ধাপ্পায় না ভেজেন কেন না যার মদের নেশা হয়ে গেছে পাকাপাকিভাবে, সে যেমন মদ না খেয়ে থাকতে পারে না তেমন উনিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে এদেরও বহু নেশা হয়েছে, টাকার নেশা, ক্ষমতার নেশা, ধন-আশ্রিত জগতের আর্থিষ্ঠাতিক, আর্থি-দৈবিক ও আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার ভোগের নেশা যা এদের পক্ষে আজ একান্তই প্রয়োজনীয়, যে জনাই এরা পুঁজিপতি, কণ্ডাক্টর, লাইসেন্স-পারমিটওয়ালাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, রাষ্ট্রের অধিকারে কংগ্রেস ভবনে যাবে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পিছনে ছাঁঁরি মারবে। কাজেই এই আমলাতন্ত্রের ঐক্যবিশীলভ চটুল, নায়িকা ধরণের আধা আধা বদলিতে মন্ত্রীরা আশা করি বিদ্রান্ত হবেন না।

নীতি অনুযায়ী কাজ হবে, আগামী বছরে অবস্থা দেখে নতুনতর নীতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই কারণে যে বৎসরাধিককাল ধরে বঙ্গদর্শনে আমরা যে নীতির কথা বলে আসছি তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরেই গ্রহণ করা হয়েছে। যারা নিয়মিত বঙ্গদর্শন পড়েন তারা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে একমত হবেন। আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে নীতি নির্ধারণে বিশ্বাসী এবং বর্তমান মনিসভাও যে এই বিশ্বাসের স্বারা চালিত হয়েছেন তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গেল।

প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার এ বছরের গোড়ার দিকে এবং গত বছরের শেষের দিকে, অর্থাৎ ধান ওঠার মরশুমে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বৃষ্টির স্বারা চালিত হয়েছিল। তাদের পক্ষে ধনী জেতদারদের অগ্ন্যপ্ৰশ্ন করা সম্ভব ছিল না, দরিদ্র কৃষকদের ওপরেই বাধ্যতামূলকভাবে লেভি ধার্য করা হত, এবং তা কোন বিশেষ নীতিকে ভিত্তি করে নয়। এরই ফলে কৃষকমহলে দারুণ ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল যে কারণে ভোটের স্বার্থে কংগ্রেস সরকার এই মরশুমে আর লেভি আদায় করে নি। ভেবেছিল যে চাষীরা মহাজনদের কাছে বেশি দামে ধান বিক্রি করে সেই কাঁচা টাকা পাবার আশঙ্কায় মশগুল হয়ে কংগ্রেসকে ভোট দেবে, তারপর গদিতে পুনরায় ফিরে এসে পাঁচ বছরের জন্য দিবা ক্ষমতা ভোগ করা যাবে এবং ক্ষুধিত মানবদের ওই নির্বাচনের ওজর দিয়েই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা যাবে। এই কারণে তারা সংগ্রহের দিকে মোটেই নজর দেয় নি। আমরা এই কথাটি বারবার বঙ্গদর্শনে বলে এসেছি।

কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে এবারে বিধি বাম। ওই বিপজ্জনক নীতির ঋকি নিয়েও নির্বাচনে তারা পরাস্ত হয়েছে। এ সম্ভাবনাটাও আমরা নির্বাচনের আগেই উপলব্ধি করেছিলাম এবং লিখেছিলাম যে তারা স্বাভাবিক আবেগে ভাঙার শূন্য করে রেখে যাবে এবং নতুন বামপন্থী সরকার ভাঙার চাল না পেয়ে চোখে সর্বের ফুল দেখবে। কেন না সংগ্রহ না করলে, চাল পাওয়া যাবে কোথা থেকে? ফুড কর্পোরেশন যা সংগ্রহ করেছে তা একান্তই অকিঞ্চিৎকর। মিলওয়ালাদের কাছ থেকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লেভি নেবার কথা ছিল। তারা আগেই অন্যর চাল বেচে দিয়ে কংগ্রেস সরকারকে কলা দেখিয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতা পেলেন তখন দেখা গেল সরকারী ভান্ডার একেবারেই প্রায় শূন্য, গ্রামাঞ্চলের সব চাল মহাজনদের মঠের। কতই রেশন ব্যবস্থা

অব্যাহত রাখতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই। কাজেই মধ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী দিল্লী গেলেন এবং ১৫ লক্ষ টন খাদ্যের দাবি জানালেন। এ দাবি মোটেই অসঙ্গত নয় কেন না গতবারে এর চেয়ে কিছু বেশি খাদ্য তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পেয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এবারে পশ্চিমবঙ্গকে কতটা খাদ্য দিতে পারবে তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায় নি।

চাষীর ঘরে এখন ধান-চাল যা আছে, বিগত আমলের কংগ্রেসী লেভি-নীতির প্রয়োগে তা থেকে এক ছটাক চালও বেরবে না এটা জেনেই ডঃ ঘোষ সংগ্রহের সামগ্রিক ধারাটাই বদলে দিয়েছেন। ধান-চালের খরিদমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষকদের উদ্বেগ করতে চাইছেন যাতে



ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ

তারা স্বেচ্ছায় সরকারকে ধান-চাল বিক্রি করে। কোন জুলুমবিধি নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যাতে সংগ্রহকার্য হয় সেদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার নজর দিয়েছেন। তা ছাড়া যে মূল্যে সরকারের তরফ থেকে ফুড কর্পোরেশন ধান-চাল কিনবেন, সে মূল্য বাজার দরের সমতুল্য, কাজেই কৃষকের পক্ষে সরকারকে ধান-চাল বেচতে কোন আপত্তি থাকবে না। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে ফুড কর্পোরেশন ধান-চালের সংগ্রহমূল্য বাড়ানোর সুপারিশ করেছিল এবং তৎকালীন মধ্যমন্ত্রী তা নাকচ করেছিলেন)।

আমরা বারবার বলে এসেছি যে চাল কলগুলির ওপর একান্তভাবে নির্ভর করা

বিগত কংগ্রেস সরকারের পক্ষে বিরূপ ভুল হয়েছিল কেন না এই কলওয়ালাদের মূল্যফাখোরী চরিত্র এতই প্রকট যে কোন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন সরকারই এদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। (কলওয়ালাদের যে পঞ্চাশ ভাগ লেভি দেবার কথা ছিল তার কতটুকু দিয়েছে?) সৌভাগ্যক্রমে ডঃ ঘোষ এদের এই চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর সরকারের তরফ থেকে তাদের শুল্ক ধান ভাঙতে দেওয়া হবে এবং নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে তারা ধান থেকে চাল বার করে দেবে। এখানে ফাঁকির কোন সুযোগ নেই।

আন্তঃজেলা কর্ডন তুলে নিয়ে সরকার আরও একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করেছেন। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে বিচার করলে দেখা যায় যে, আন্তঃজেলা কর্ডন বজায় রাখা কার্যত অসম্ভব, এবং এতকাল সেই অসম্ভবের পিছনে মিথ্যা ধাওয়া করে সময়, শক্তি ও অর্থের ব্যাপক অপচয় হয়েছে যার তুলনায় কাজ কিছুই হয় নি। আর তা ছাড়া আন্তঃজেলা কর্ডন বজায় রাখলে ঘাটতি জেলাগুলিতে ব্যাপক ভয়াভাব দেখা দেয়, পক্ষান্তরে উদ্ভূত জেলাগুলিতে চালের দাম পড়ে গিয়ে তা কৃষকের পক্ষে লোকসানের কারণ হয়। কাজেই নতুন মনিসভাকে ধন্যবাদ যে তারা এই অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপটিকে তুলে দিয়েছেন।

গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে চালের চোরাচালান তখনই বন্ধ হতে পারে যদি রেশনে সাতদিনের মত খাদ্য যোগানো সম্ভব হয়। একথা আমরা পূর্বে বলেছি। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীও আমাদের সঙ্গে একমত এই বিষয়ে এবং তিনি জানিয়েছেন যে ভবিষ্যতে যাতে রেশনে চাল ও গমের পরিমাণ বাড়়ে তার কিছু উপায় তিনি করবেন।

সব মিলিয়ে বিচার করলে এর চেয়ে ভাল কোন খাদ্যনীতি এই মুহূর্তে অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না। কেন না প্রাক্তন সরকার সবদিকেই ভরাডুবি ঘটিয়ে গেছিল। স্বয়ং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বাংলাদেশের খাদ্যের ক্ষেত্রে বর্তমান শঙ্কাজনক অবস্থার জন্য বিগত মনিসভাকে দায়ী করেছেন কেন না শতটা ধান সংগ্রহ করা উচিত ছিল বা করা যেতে পারত তা করা হয় নি। ধান-চাল সংগ্রহের সময়ও ভীতি অল্প। এইসব দিক বিচার করে নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে বর্তমান মনিসভার খাদ্যনীতি একান্তই বাস্তবানুগ হয়েছে।

রূপ সাধনায় সাধনায়

দুটি অনবদ্য অবদান



সাধনা বিউটি ক্রিম

প্রতিদিন বক চর্চায় একান্ত
প্রয়োজন। কৃত্রিম কোমল
শেলব তত্ত্ব ও যৌবন স্থলভ
লাবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথপেস্ট

দস্তরাজি মুক্তার মত শুভ্র
ও উজ্জ্বল, মাটি সূত্র ও অম্ল
মুখ দুর্গন্ধমুক্ত ও স্বচ্ছ করে।

সৌন্দর্যে পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮



অধ্যাপক - জীবনেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এ.
আচার্য-সাহিত্য, এফ. সি. এস. (মেড.)
এম. সি. এস. (পার্মেডিক) কামনগর
স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্যসংগ্রহে তুতপূর্ণ অবদানক।

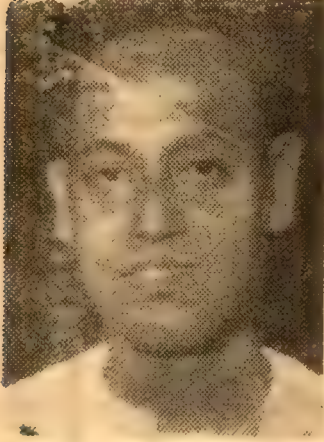
কলিকাতা কেন্দ্র - ৪৪১ কলিকাতা রোড,
এম. সি. সি. এস. (মেড.) কামনগর-৪৮

৫-৪৪/১-৫৭৪



শ্রমজের শ্রমনীতি

বহুজন্ট সরকার যে আইন নীতি মানবের প্রতিনিধি, শোষণ ও পুঞ্জিবাদী শ্রেণীর স্বার্থের ধারক নয়, সে কথা শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় দস্তরের ভার



শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাতে নিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য সহজ-শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে মালিক-পক্ষের হয়ে পুঁজি শ্রমিক ঠাণ্ডানোর দায়িত্ব নেবে না বা তা নেওয়াও উচিত নয়।

বহুজন্ট বর্জ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর যৌথ ইউনিয়নের অধিকার, ঋণ-ইত্যাদির দ্বারা দাবি আদায়ের অধিকার, মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। ইংল্যান্ডের মত দেশে, যাকে এই শ্রেণীর রাষ্ট্র বলা যায়, শ্রমিকদের এই সকল অধিকার স্বীকৃত, এবং সেখানে শ্রমিক আন্দোলন, ঋণ-ইত্যাদি ঘটলে মালিকপক্ষের হয়ে শ্রমিক ঠাণ্ডানোর রীতি পুঁজি শ্রমের নেই। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই বিষয়ই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গ করে চেয়েছেন, যা লংবিধানসম্মত, ন্যায়সঙ্গত এবং বাস্তবীয়।

কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণার পর মালিকপক্ষে গ্রাহি গ্রাহি বল পড়ে যায়, অবশ্য যার কোনই কারণ থাকা উচিত নয়। ফলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে এই আশ্বাস দেন যে বর্তমান সরকার এই ঘোষণার দ্বারা নিশ্চয়ই শ্রমিকদের নিজেদের হাতে আইন নিতে উৎসাহিত করছেন না। তিনি আরও জানিয়েছেন যে হিংসাক্রম কোন ঘটনা ঘটান উপক্রম হলে পুঁজি শ্রমিকদের অবশ্যই হবে, কিন্তু, পূর্ববর্তী

আমলে যা ছিল, পুঁজি মালিকের দালালী করবে না। অতীতে এমন দেখা গেছে বহুক্ষেত্রে যে পুঁজি মালিকের হয়ে নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর গুলী চালিয়েছে, বহুক্ষেত্রে সুপারিক্যাপতভাবে ইউনিয়নের কর্মী ও নেতাদের হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে, পুঁজি সেখানে সরকারের নির্দেশে তদন্ত করে নি যা মালিকপক্ষের এজেন্ট হয়েই কাজ করেছে। এসব নতুন মানসভার আমলে আর হবে না। শ্রম-পতিরা শ্রমমন্ত্রীর এই আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন যা আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি।

শ্রম ও মূলধনের বিরোধের ক্ষেত্রে বহুজন্ট সরকার নতুন নীতি প্রবর্তন করেছেন যা হয়েছে সরকারের মধ্যস্থতার আশ্রয়ে মিটমাটের বন্দোবস্ত। তদুপরি শ্রমপতিদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি শ্রমমন্ত্রী আদায় করতে পেরেছেন যে সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে ছাটাই বা লে-অফ তাঁরা করবেন না। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখা হবে এ বিষয়ে শ্রমিক ও মালিক-পক্ষকে একই সিদ্ধান্তে আনতে পারার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে শ্রমমন্ত্রীর বোল আনা প্রাপ্য এবং বর্তমান সরকারের শ্রমনীতি এতই আদর্শস্থানীয় হয়েছে যে বিরোধী-পক্ষীয় কংগ্রেস সদস্যগণ তা সমর্থন ও অনুমোদন করেছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শ্রমক্ষেত্রে এমন কিছু লোক আছে যারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই গণ-তান্ত্রিক সংস্কারসমূহ ভাল মনে গ্রহণ করতে পারছে না, এবং নানারকম অজ্ঞ-বাজে কথা তুলে নিজেরাই শ্রমক্ষেত্রে অশান্তি ডেকে নিয়ে আসছে। এই প্রসঙ্গে একটি বণিক সমিতির জনৈক কর্তব্যাক্তির বক্তব্য আগাগোড়াই উদ্দেশ্যমূলক ও বিভ্রান্তিকর। ঘোষণা করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে নাকি শ্রমপতিরা নিরাপদ বোধ করছে না, আরও অনেক কিছু। যখন শ্রমপতিরা শ্রমমন্ত্রীর কথায় সন্তোষ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন, যখন পশ্চিমবঙ্গে শ্রমনীতি সর্বসম্মতি-ক্রমে আইনসভায় গ্রাহ্য হয়েছে, তখন এই ধরনের অশ্রুত ও বিভ্রান্তিকর ঘোষণা একজন দায়িত্বশীল শ্রমপতির মুখ থেকে কেন বেরুল তার কৈফিয়ৎ তলব করা উচিত। তবে কি এই ব্যক্তি তাদেরই প্রতিনিধি যারা হলে বলে কৌশলে বহুজন্ট সরকারকে উদ্বেদ করার চেষ্টা করছে? সংবাদে প্রকাশ কলকাতায় গত সপ্তাহের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্ররোচনা কলকাতার প্রেসিডেন্টহলের একাংশ থেকে এসেছিল। এই ব্যক্তি কি তাদেরই মুখ-পাত্র? আমরা এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। (৩১।১০।৬৭)



২৯শে মার্চ লালবাজার পুঁজি কন্ট্রোল ব্লকের পাশের ঘরে বসে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয় মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ পরিমিত অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ দান করছেন।

আমিথুগোষ্ঠ একাট শ্রমচার্য



ভানুজি সিংহ

শত্ৰুভাজিত শহর প্রাপ্তে
বিহারের করুণ দৃশ্য

আমি লিখেছি দংশ অবস্থায়
হিমাংশুকে নিয়ে গণেশ, মাখন, আনন্দ ও
আমি প্রধান বাহিনী হতে একবার মাত্র
এক ঘণ্টার জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর
তাদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপন
আর সম্ভব হয় নি। প্রায় ঘণ্টাখানেক
শহরে অপেক্ষা করছি, তারপর ছয় সাত
মাইল পাহাড়ের রাস্তা ধরে মোটরের হেড-
লাইট জ্বালিয়ে তাদের সন্ধান করে
বৌড়িয়েছি, আবার শহরে ফিরে এসেছি—
যদি ইতিমধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী
তারা শহরে এসে থাকে! কিন্তু শেষ
পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আর দেখা হল না।
আমরা তিনজন—আমি, গণেশ ও মাখন
নৌকা করে শহর থেকে দূরে সমুদ্র উপ-
কূলে পতেঙ্গা নামক স্থানে উপস্থিত
হই। খোলা ধানক্ষেতের মধ্যে একটি খালি
আটচালা দেখতে পাই। সেই আটচালাটিই
আপাতত আমাদের আশ্রয়স্থল। চারিদিক
খোলা, আশপাশে কোনও লোক নেই।
প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা ও পরবর্তী
প্রায় করার জন্য বর্তমানে এই পরিভ্রম
আটচালাটি খুবই উপযুক্ত মনে হল।

রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য কোন
অবস্থাপন্ন কৃষক এই আটচালাটি যে
তাদের বাবহারের জন্য তৈরি করেছে সেই
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আমরা এখানে
আপাতত বিশ্রাম নেব ঠিক করছি।
এখন সকাল প্রায় আটটা বেজেছে।
মাখনকে পাঠালাম কিছু চিড়ে দই নিয়ে
আসতে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাখন চিড়ে
দই নিয়ে ফিরে এল। তৃপ্তি বা আনন্দের
সঙ্গে আহাৰ করছি কিনা তা মনে নেই
তবে আমরা খেরেছিলাম। গণেশ খুব
সামান্যই খেল। সকালে দিনের আলোতে
খুব স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার মূখে
কপালে ও হাতে চিকেন-পজের গুটি ফুটে

উঠেছে। সাধারণত চিকেন-পজের বেরূপ
টেম্পারেচার দেখা যায়, তার চাইতে
অনেক বেশি জ্বর উঠেছে বলে মনে হল।
সারাটা দিন ও রাত্রির পরিশ্রম এবং তার
ওপর না ঘুমিয়ে থাকার জন্য যদি জ্বরের
তাপমাত্রা বেশি হয়ে থাকে তাহলে আশ্চর্য
হওয়ার কিছু নেই।

গণেশকে খুব ক্রান্ত ও দুর্বল
দেখাচ্ছিল। তবু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে
আমাদের কারও পক্ষেই চাপ করে বসে
থাকার উপায় ছিল না। গণেশ জ্বর গারে
ক্রান্ত শরীরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার
যোগ দিল। সর্বাঙ্গিক ভাবে চিন্তে আলো-
চনা করে মোটামুটি এইরূপ একটি
প্রোগ্রাম নিলাম—(১) শত্রু সৈন্য এসে
পৌছবার আগে খুব সম্ভব আমাদের
প্রধান বাহিনী অন্তত ১৯শে সংখ্যার বা
রায়ে শহরে এসে প্রবেশ করবে। ১৯শে
তারিখে রায়ে বা ২০শে তারিখ সকাল
এগারোটা বারোটোর আগে শত্রু সৈন্য
চট্টগ্রামে এসে পৌছতে পারবে না। (২)
তাই আমরা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে
শহরে প্রবেশ করব। (৩) যদি প্রধান
বাহিনী তখনও এসে না পৌছয় তবে
আমরা শহরের একেবারে উত্তর-প্রান্তে
আনন্দের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেব।

আমরা আনন্দ ও হিমাংশুকে
আনন্দের বাড়ির টিলার নিচে ১৮ তারিখ
রায়ে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। কাজেই
আমাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে,
আমরা প্রথমে সেখানে আনন্দ ও
হিমাংশুর খোঁজ নেব। সেই একই দৃষ্টি-
ভঙ্গী ও যুক্তি দিয়ে বুঝেছি যে,
আমাদের প্রধান বাহিনী যদি সরাসরি
শহরে প্রবেশ নাও করে তবু তারা
scouting করতে-অনুসন্ধান করার
উদ্দেশ্যে আনন্দের বাড়িতে কাউকে
পাঠাবে, কারণ, পলিশ-লাইন থেকে
আসবার সময় আমাদের গাড়িতে আনন্দ
ও হিমাংশু ছিল। ভাড়াটা প্রধান বাহিনীর

সঙ্গে আনন্দের বাড়ি ভাই—সেবপ্রসাদ আছে।
উপরন্তু আনন্দের বাড়ি টিলার ওপর
অবস্থিত এবং সেই টিলাটি ছিল পর্বত-
শ্রেণী সংলগ্ন। তারা যে সর্বপ্রথম এই
বাড়িটিতে সংযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা
করবে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলাম।
প্রধান বাহিনী খুব কাছে এসে পাহাড়ে
আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে পারে
এবং সংবাদবাহককে এই বাড়িটিতে
পাঠিয়ে আমাদের সংবাদ নেওয়া তাদের
পক্ষে খুব স্বাভাবিক ও সহজ লক্ষ্য বলে
আমরা ধরে নিই।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শহরে প্রবেশ
করা ঠিক করছি। প্রায় চারটার সময়
আমরা আবার নৌকা ভাড়া করে শহরের
দিকে ফিরে এসেছি। সূর্য প্রায় অস্ত
যাবে এমন সময় ডুবলমুড়িং জেটীর
পশ্চিমে আমাদের নৌকা ভেড়তে
বসলাম। মাঝি আমাদের কথামত নৌকা
ভেড়তে আমরা কণ্ঠস্বী নদী তীরে
নেমে পড়ি। একটু এগিয়ে এসে একটি
গাছের ছায়ার নিচে আমরা তিনজন
বসলাম। অপেক্ষা করছি সূর্যাস্তের। এমন
সময় প্রায় আট-দশজন যুবক নদীর ধারে
বিকলে বেড়াতে এসেছে। মনে হল তারা
খুব নিকট অঞ্চলের ছাত্র-যুবক। ওরা
সকলে আমাদের তিনজনকে খুব লক্ষ্য করে
দেখেছে। আমার মনে হল আমাদের
কাউকে হয়ত ওরা চিনতেও পেরেছে। তবু
তারা আমাদের কাছে আসে নি। আমরাও
মুখ ঘুরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম,
চিনতে পারলেও যেন একটু সংশয় থাকে।
সেখানে বসেছি সেখান থেকে তাদের দূরত্ব
খুব বেশি ছিল না। তাদের কথাবার্তা
স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। শহরের অবস্থা
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা কানে আমাদের
আমরা তাদের বাক্যলাপ শুনতে আরও
বেশি মনোযোগী হলাম।

তাদের মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা

মোহন—একজন বললে : “শহর খালি, মোকানপাট সব বন্ধ।”

স্বিতীয়—“কি করে জানলে?”

প্রথম—“আমার কাকা মোকান বন্ধ করে পালিয়ে এসেছে।”

আর একজন—“একজন ইংরেজও শহরে নেই। তাদের ছেলে-মেয়েদের জাহাজে নৌকিয়ে রেখেছে। বিকেলে আরও একজন ইংরেজ পরিবার ডকল্যান্ডিং স্টেশনে টেনে এসেছে। তাদেরও প্রাণ্ত করে জাহাজে পাঠিয়েছে।”

প্রথম—“তাদের অবস্থা একেবারে সঙ্গীন! ইংরেজেরা তাদের মেয়েদের জাহাজে পাঠিয়ে পুরুষেরা শহরের বাইরে পাহাড়তলীর উপকণ্ঠে নাকি আত্ম-হত্যার জন্য বাঁহ রচনা করেছে।”

স্বিতীয়—“তুই কি করে জানলি?”

প্রথম—“আমাদের পাশের বাড়ির মোকরা কল্যাণী করছিল।”

তাদের কথা থেকে মোকরাটি বুঝতে পারলাম—শহর একেবারে খালি, ইংরেজ পুরুষেরা সবাই পাহাড়তলীর সাহেব-পদবীতে আত্মহত্যার জন্য আশ্রয় নিয়েছে, মহিলা ও বালক-বালিকাদের নদীতীরে নিরাপত্তা থাকার ব্যবস্থা করেছে।

সূর্য অস্ত গেল। আমরা আর দেরি না করে উঠে পড়ি। শহরের দিকে রওনা হলাম। ডবলমুড়িং-এর রাস্তা ধরে রেল-লাইন আসি। ভারপূর রেল-লাইন ধরে শহরে প্রবেশের অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের পর অতিক্রম করে সরকারী কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হই। আমাদের সকলের প্রাথমিক এবং ছাত্রদের প্রথম প্রিয় হেডমাস্টারমশাই অশ্বিনী-কুমার (‘অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য’) কোম্পাটের পাশ দিয়ে আমরা তিনজন কোন রকম গোপনতা অবলম্বন না করে নিভয়ে চলছি। তাঁরই ছাত্র আনন্দ, রামন, দেবু, সহায়রাম, মতি, রজত, সুধেন্দু, মিহির প্রমুখ ছেলেরা আমাদের সঙ্গে ছিল। প্রত্যেকটি ছেলেই তাঁর আভ্যন্তরীণ স্নেহের পাত্র। আমাদের সঙ্গে এখন রাখন আছে। যদি তখন তাঁর দেখা পেতাম তবে খুবই ভাল লাগত। আমাদের নিবাস ছিল তাঁর মত স্নেহপ্রবণ ও তেজস্বী শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের এইরূপ সাহস, স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেম দেখে নিশ্চয় খুশি হতেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করতেন।

তখনও সন্ধ্যা হয় নি। তবু জানালা ফেলা সব বন্ধ। কারও বাড়ির সুরঙ্গা খোলা দেখি নি। অশ্বিনীকুমারের বাড়ির সামনে দিয়ে পথটি গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তায়। সেই কাঁচা পথটি ধরে সোজা পুলিশ কন্সটবলের পাশ দিয়ে এসে সদরঘাট হতে পল্টনে যাওয়ার প্রধান সড়কে পৌঁছলাম।

পথ জন-মানবশূন্য। আমরা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকণ্ঠ থেকে একেবারে পূর্ব সীমানায় এলাম। এই সাত আট মাইল পথ আতঙ্কিত জনতার সম্মুখীন হয়ে শহরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

আমরা শহরের প্রধান প্রধান সৈন্য ও পুলিশ ঘাঁটি বাধার করে নেওয়ার পর ইংরেজ কন্সটবলের খুব তৎপরতা ও সাহসের সঙ্গে সেই রাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মৌলিনগার নিয়ে আক্রমণ করতে পরাক্রম প্রদর্শন করে নি। ইংরেজ সমর-বিশারদেরা যখন বুঝল যে, আমরা অসমর্থ নিয়ে অসুস্থ দেহে উধাও হয়েছি, তখন তারা অত্যন্ত আক্রমণের আশঙ্কায় আত্মরক্ষার জন্য অবস্থা অনুযায়ী নতুন সশস্ত্র গ্রহণ করে। শহর পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে পাহাড়তলীর সাহেব-পদবীতে বাঁহ রচনা করা সাবাস্ত করে এবং তাদের সাহায্যার্থে বাইরে থেকে সৈন্য এসে পৌঁছবার পূর্বে বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্মুখ সমর বা তাঁদের অত্যন্ত আক্রমণ পরিহার করে চলার কৌশল প্রেরণ করে।

১১শে ডিসেম্বর দিনের বেলা, শত্রুশক্তি নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের বিপদের কোন আশঙ্কাই ছিল না সেই সব স্থানে খুব সামান্য ঘোরাক্ষেরা করেছে। সন্ধ্যার আগে তারা সবাই আবার গা ঢাকা দিয়েছে—পাছে অত্যন্তভাবে আক্রান্ত হয়।

জনমানবহীন পরিত্যক্ত শহর। ইংরেজ দলের সকলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে রেল-কলোনীতে। আর আমাদের অনুযায়ী বিপ্লবী সরকার প্রধান বাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করছে শহরের অনতিদূরে পাহাড় অঞ্চলে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস! দুই পক্ষের মাঝখানে পড়ে আছে পরিত্যক্ত এই শহর আর যেন লক্ষণ সেন পরিত্যক্ত শহরের মতই এই শহরের বুকের ওপর দিয়ে আমরা তিনজন বখতিয়ার খিলজীর ন্যায় শহর জয় করে চলেছি। কোন পথচারী বা আর কোন সঙ্গীই আমাদের ছিল না—বর্তমানে আমাদের কন্সটবল বা সহায় মাত্র দুটি গুলীভরা পিস্তল। প্রধান বাহিনীকে তখনও পরিত্যক্ত শহরের বুকে দেখতে না পেয়ে মনে মনে খুব রাগ, ক্ষোভ ও দুঃখ হল। নিজেকে শত সহস্র তিরস্কার করছি—কেন আমি প্রধান বাহিনী ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও চলে এলাম! কেন গণেশ ও আমি প্রধান বাহিনীর সঙ্গে থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরে এসে শহর দখল করলাম না!

গত রাতে আনন্দ ও হিম্মতকে রে টিলার নিচে নামিয়ে গেছি সেখানে এসে পৌঁছলাম। টিলাটির ওপরে আনন্দের বাড়ি। বাড়িতে তার মা-বাবা, ছোড়া

ছোটকোন (আনন্দ ও দেবুর ছোট ভাই) এবং বাড়ির পুরোনো ভূতা ছাড়া আর কারও উপস্থিতি না থাকার সম্ভব। জানি না আনন্দ ও হিম্মত কোথায়! তারা কেউ সেই বাড়িতে উপস্থিত থাকুক আর নাই থাকুক, তাদের কোন খবর হয়নি সেখানে পাওয়া মনে—আর তখনও যদি প্রধান বাহিনীর কাছ থেকে সংবাদ এসে না পৌঁছয় তবু কিছুকালের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ সংযোগ স্থাপন করতে সেই বাড়িতে আসবেই।

তখন মাত্র সন্ধ্যা সাতটা বেজেছে। চারিপাশের অবস্থা ও ভাবগতিক দেখে মনে হল পুলিশ এই বাড়িতে হানা দেয় নি। কোনদিকেই শত্রুর কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু টিলার ওপর উঠতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে ভয়ে যেন ভেতরটা শূন্য হয়ে যাচ্ছিল। শত্রুর অপ্রত্যাশিত আক্রমণকেও হয়ত আগে এতখানি ভয় করি নি। গতকাল রাতে পুলিশ-লাইন যখন আক্রমণ করতে গিয়েছিল তখনও আমরা মনে এত শঙ্কা জাগে নি, টিলার ওপর উঠতে গিয়ে আতঙ্কে যেন শিউরে উঠিলাম। কিসের ভয়? কেন এই আতঙ্ক? কি কারণে হৃদয় দুর্দ, দুর্দ, কাঁপছে? কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা আনন্দ ও দেবুর (শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত) মা-বাবা ও ছোড়াবির সামনে গিয়ে দাঁড়াই! জানি না মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়াবির কাছে আজ আমাদের কি স্থান! যে পরিবার আজ এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত—যাদের এতখানি বিপদের বোকা মাথায় নিতে হয়েছে, তাঁরা কি আমাদের কমা করতে পারবেন? তাঁরা কি আজ আমাদের এই বাড়িতে স্থান দেবেন—তাঁরা কি আরও বিপদের আশঙ্কায় ভয়ে বিহবল হয়ে পড়বেন না? তাঁরা কি আমাদের আগের মত স্নেহ সম্ভাষণ জানাতে পারবেন, না কি দুঃখ থেকে দেখামাত্র রুঢ় প্রত্যাখ্যান জানাবেন—রাগে, ক্ষোভে, অভিমানভরে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? মনের মধ্যে এইরূপ শত শত চিন্তা এসে ভিড় করেছে। মতই টিলার ওপর উঠছি ততই এক অজন্মা ভয়ে বুক কাঁপছিল। বিশ্বা মন্দন থাকা সত্ত্বেও সাহসে ভর করে আমরা সোজা এসে দাঁড়িলাম মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়াবির সামনে।

সে যে কি এক অপূর্ব দৃশ্য! কি এক অনাবিল আনন্দ—নির্বাক মুহূর্ত স্বদেশ-প্রেমের কি যে সে মাধুর্য! আমাদের সব ভুল সব সংশয় সব বিশ্বা মন্দন এক নিমেষেই মিলিয়ে গেল। দুঃহাত বাড়িয়ে তাঁরা গর্বের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন—অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করলেন চট্রগ্রামের প্রতিটি বিপ্লবী সন্তানের মঙ্গল কামনা করলেন—আমাদের সেকোচের আর

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তড়াতাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়

নতুন

মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' বিসিই ইনস্টিটিউটের
বিজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার ক্ষমতা আবিষ্কার করেছেন
নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার
নতুন উপায়।

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-
বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী
প্রয়োগ করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন-এর ১৪
কোটি দ্রব্য কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করার শক্তি বিজ্ঞপ্ৰায় বৈদ্য
জার। শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং শরীরের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

শরীরের মধ্যে কাজ শুরু করে ব্যথা-অনেকক্ষণ পরে কাজ চলতে থাকে।
নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করার সক্রিয় উপাদানটি অতি নরমকই
এবং খুবই সূক্ষ্ম। শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ মিনিট পর্যন্ত শরীরের
মধ্যে থাকে। সেইকালেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা
দূর করে দেয় এবং তার কল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

কতি সন্ধ্যায়ই আপনি বেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি
মেজাজে খুসী খেতে পারেন—ওকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস কল্যাণ
যে কোনো দরম শানিয়েের সঙ্গে।

সিরোক্ত একাধিকের ব্যপায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যবহার:
ব্যথা-বেদনা • মাথাব্যথা • পান-ব্যথা • হাতব্যথা • খাঁট বেদনা • জ্বর-জ্বর-জ্বর • দু
কল দুঃখ • পশা-ব্যথা।

আজো: প্রায়ঃ১৪: হুইট ট্যাবলেট। প্রায়ঃ১৪: হল সবার ব্যবহারঃ বিতরিত
কলঃ একট ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন



আরাম

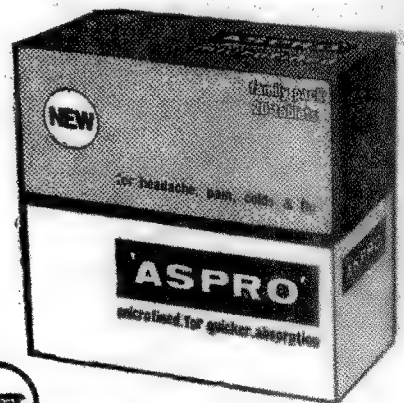


আরাম

ট্যাবলেটের কণাগুলি সারার দল
হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেয়।
হয়—আপনার আরাম পেতে
লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে আর ১৪ কোটি দ্রব্য কণা
রহিত। ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেয়।
ততই তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।



নতুন

মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

নির্বোধ্য-এর ১৪ টেবী

কোন অবকাশ রইল না। আমরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এত ক্ষতি, এত বিপদ, এত উৎপীড়ন, নিপেষণের সমস্ত ঝড়িক মাথার নিয়ে কি করে তাঁরা তখনও স্থির ছিলেন জানি না। যখন একটু ভেবে দেখি তখন অবাক হতে হয়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত বাড়ির বড় ছেলে সশস্ত্র বৃদ্ধ-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে—প্রধান বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। সে যুদ্ধে প্রাণ দেবে। আনন্দও সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধ-বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। আজ সে বাড়িতে আছে। কাল বা আজ রাতেই হয়ত সেও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে—হয়ত মেশিনগানের মুখে তারও জীবন চলে যাবে। মা-বাবার কাছে দুটি পুত্রের জীবনের চেয়ে আর কি বেশি মূল্যবান থাকতে পারে। বাড়ির দুটি ছেলের এই সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমরাই যে দায়ী সেই সন্দেহে গতকাল রাতেই আমাকে তাঁরা অভিমানভরে অনুযোগ জানিয়েছেন—ছোড়াদি বলে—ছিলেন—“দুজনকেই আপনাদের সশস্ত্র সজ্জামে নেওয়া উচিত না।” মাসীমা ব্যস্ত ভক্তিরে আবদার জানিয়েছিলেন—“টুনকে (আনন্দ) অস্ত্র দিচ্ছি নাও তোমরা।” তখন তাদের সান্নাধ্য দেওয়ার কোন উপায় আমার ছিল না। কেবল বিবেক আমার ক্ষতরক্ত অভয় দিয়ে বলে উঠল—“তারা নেই, চট্টগ্রাম বৃদ্ধ-বিদ্রোহের আদর্শ শিতা-মাতার অন্তরকে দুটি কেন, শত পুত্র বিয়োগের বাঘাও কাতর না করে পুত্রদের বিজয় গৌরবে স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করে ফুটাবে।

বুকে এই আশা নিয়ে আমি আগের দিন রাতে আনন্দের সঙ্গে মাসীমা ও ছোড়াদিকে কোন সদৃশ্য না নিয়ে চলে আসি। আজকে তাঁরা সেই উত্তর পেয়েছেন। আমাদের তাঁরা কমা করেছেন। পুত্রের জন্য স্বাভাবিক চিন্তা, বিপদের আশঙ্কা ও চিরকালের জন্য তাদের হারা-বার ভয় তাঁদের মনকে বিচলিত করেছে। সন্দেহ নেই, তবু তরুণ বিপ্লবীদের স্বাধীনতা বৃদ্ধকে তাঁরা আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিগত দিনের ছোট্ট এই ঘটনাটি কোনদিনই ভুলি নি—ভুলবও না। সে আজকের কথা নয়। বৃটিশ সরকারের দুর্দমনীয় শক্তি তখনও বিরাজ-মান। কতখানি সাহস, কতখানি ষেঁষ, কতখানি অত্যাচার ও উৎপীড়ন উপেক্ষা করবার মত মনোবল থাকলে তবে আমাদের দ্রুত সশস্ত্র বিপ্লবীদের সেই একটি রাত্রের জন্য নিজ বাড়িতে স্থান দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

এতকণ মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়-দির কথাই বললাম। আনন্দ বাড়িতে ছিল।

আমরা এসেছি দেখে সে কেন হাতে স্বর্গ পেল। এতকণ সময়ের মধ্যে সে যেন অসহায় অবস্থায় ভেসে বোড়িয়েছে—কোথাও কোন একটি অবলম্বন পাওয়া যায় কিনা ভেবেছে কিন্তু নিরাশ হয়ে সময় কাটিয়েছে মাত্র। ভেবেছিল আমাদের কারও সঙ্গে তার আর যোগাযোগ হবে না। কি ভেবে যে সে হিমালয়ের সঙ্গে নেমে পড়ল গভীর তরঙ্গ সঠিক কারণ সে নির্ণয় করতে কোনদিনই পারে নি। আমরা যখন চলে গেলাম তার কিছুক্ষণ পরে সে একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে—কি করে আমাদের সঙ্গে আবার মিলিত হবে। হিমালয় তার নিজ বাড়িতে চলে গেল। আনন্দ একেবারে একা। কণিক ভুলের জন্য অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, আশঙ্কার মধ্যে তাকে প্রায় যারো বঁটা লাগিত পেতে হয়েছিল। এখন আনন্দ আমাদের পেয়ে সত্যিই বৃদ্ধ উপলব্ধি বোধ করল।

চট্টগ্রামে আগের দিন রাত্রের অভিজ্ঞতার পর, মেশিনগানের গুলীর মধ্যে থেকে একবার বেঁচে ফিরে এসে আনন্দ আবার মৃত্যুমুখে না গিয়ে অন্য পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু আনন্দ সেই কাতর বিপ্লবী নয়। এখনও আমাদের যুদ্ধের প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা বাকি আছে। সে আমাদের সঙ্গে মৃত্যুমুখে যাবেই। আনন্দের বিপ্লবীমনের পরিচয় দিলাম এই কারণে যে পরে আমরা দেখতে পাব আমাদের কোন কোন তরুণ কল্পের মধ্যে স্বর্গভ্রম দেখা দেয়—তারা রাতের জীবনে একবার মৃত্যু বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে আর সৈনিক যেতে চায় নি—সবলে বিপ্লবের পথ পরিহার করেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি ‘মরণ-পাগল’ তরুণের দল অনিভিজ্ঞ অবস্থায় যে সাহস নিয়ে বিপ্লবী বলে যোগ দিতে আসে একবার মৃত্যুর মূল্যোৎসর্গ হবার পর যুদ্ধে মরতে হলে যে সত্যি কতটা সাহসের প্রয়োজন তা প্রথম উপলব্ধি করে এবং সেই সাহস না থাকায় একবার মৃত্যু বিভীষিকার বান্ধব অভিজ্ঞতার পর তাদের মধ্যে অধিকাংশই আর কখনও কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করে না। বাংলা দেশের বিপ্লবীদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে আজ এই রুঢ় অথচ বাস্তব সত্য অব্যবহার করা যাবে না যে মনের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শ পোষণ করা সত্ত্বেও এই তরুণদের মধ্যে অনেকেরই আর কখনও কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে সাহসী হয় নি, দলের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকে আত্মসন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেছে। ইতি-হাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে শত্রু তরুণেরাই নয় প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা, যারা সমস্ত ক্ষতরক্ত দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের মধ্যেও অঙ্গুলি-

মের কয়েকজন নিষ্ঠাবান বিপ্লবী ছাড়া আর কেউ কোন সশস্ত্র সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেন নি, এমন কি আর কখনও রিভলভার বা বন্দুক পিস্তলের সংস্পর্শে আসার সাহসও রাখেন নি। এই সত্য উদ্ঘাটন করে আজ আর আমি কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে চাই না। আমার শত্রু এইটুকু অনুদ্রোহ প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা যদি নিজ নিজ চূড়ি-বিচ্যুতি আগামী দিনের তরুণদের জানিয়ে দেন, তবে তাঁরা কারও কাছে ছোট হবেন না, বরঞ্চ তরুণেরা তার থেকে শিক্ষালাভ করতে পারবে। তরুণদের একান্তভাবে জানা উচিত বইয়ের পাতায় বিপ্লবের চিন্তা আর কার্যক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রাম এক নয়। তার জন্য চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও prolonged subjective preparation (দীর্ঘদিনের মানসিক প্রস্তুতি)।

সেই রাতে প্রধান বাহিনীর সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আনন্দের বাড়িতে অপেক্ষা করাই ঠিক হল। তখনও কোন সংবাদ-বাহক প্রধান বাহিনীর কাছে থেকে এসে পৌঁছয় নি। বতকণ তাদের সংবাদ না পাচ্ছি ততকণ এই বাড়িতে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন কার্যকরী পথও ছিল না। এই বাড়িতে মাসীমার তত্ত্বাবধানে আমাদের যেন আর কোন ভাবনাই রইল না। মাসীমা, ছোড়াদি ও স্বয়ং মেসোমশাই আমাদের রক্ষার ভার নিলেন। স্থির কর-লেন তাঁরাই পালা করে সারারাত বেগে পাহারা দেবেন—আমরা শুভ্র ক্রান্ত, তাই যেন বা পারি কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। শত্রু আগমন সংবাদ তাঁরাই আমাদের আগে থেকে দেবেন। আর প্রধান বাহিনী থেকে যদি কেউ সংযোগ স্থাপন করতে আসে তবে তো আমাদের তাঁরা ছেঁকে নেনেই; তাই দেরি না করে যেন আনন্দ বাঁওয়ার পর বিদ্রোহ নিই।

তাঁদের আগ্রহ ও বর দেখে আমাদের মনে হচ্ছিল সার্বক আমাদের বিপ্লবী অভিযান। গুলীভরা দুটো করে রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা জানি না। বতাই আশা করি না কেন, আশ্চর্য যে প্রধান বাহিনীর কোন সংবাদবাহক এই বাড়িতে এলো না। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি জানালার কাঁকে সূর্যের আলো ঘরের মেঝের এসে পড়েছে। চট করে বিছানার ছেড়ে আমরা উঠে পড়-লাম। চা খাওয়ার ডাক এসেছে। খাওয়ার টেবিলের চারপাশে আমরা চারটি চেয়ারে বসলাম। চা ও চায়ের সঙ্গে আরও কিছু খাবার এসে পৌঁছতে তখনও কিছু বাকি। তাই সময়ের সম্ভাবহার করার ইচ্ছে হল। কিছু কেবোসিন চেয়ে নিয়ে আমরা আমাদের আটটি রিভলভার ও পিস্তল পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলাম।

সকাল থেকে ছোটকোন (আনন্দের ছোট ভাই) টিলার নিচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। তখন তার বয়স মাত্র আট-নয় হবে। তাকে শেখানো ছিল যে যদি পুলিশ পার্টিকে দূরে আসতে দেখে তবে সে আগে থেকে চেঁচিয়ে পুলিশের আগমন-

বাড়া মালীমাদের জানাবে। ছোট হলো ছোটকোনকে এই বিষয়ে নির্ভর করা যেত। তবে এই বাড়িতে পুলিশ আসবার কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি নি। কেন আসবে এখানে? এখানে যে দেবু আনন্দ কেউ নেই সে ধারণা করার

মত যথেষ্ট তথা পুলিশের কাছে ছিল। তবে আমরা ছোটকোনকে পাহারায় মোতায়েন করেছিলাম।

আমাদের রিভলভার পরিষ্কার করা তখনও শেষ হয় নি। ছোটদি খাওয়ার প্লেট হাতে দরজায় পা দিয়েছেন আর

আপনিও কি ভাবছেন না

কয়েক বছর পরেই

- মোহুর বিয়ে দিত হাত
 - ছেলের পড়াশুনা রাখা
 - একখানা বাড়ি করা
- পারলে ভালো হয়...

এই বুক অফারগুলি যেটার পক্ষে অসম্ভবমান নির্দিষ্টকালীন জমা পরিকল্পনা হ'ল একটা বেশ ভালো এবং প্রশংসিত পদ্ধতি।

প্রতি মাসে পোট অফিসে নিয়মিতভাবে ৫ টাকা বা এর জগিতাক ৩০০ টাকা পর্যন্ত ৫, ১০ বা ১৫ বছর পর্যন্ত জমা দিলে, ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনি যত টাকা জমা দিয়েছেন (সঞ্চয়িত) তেরং পাবেনই তার সঙ্গে ঐ টাকার হুদ ও বোনাস পাবেন আর তার জন্য কোন আয়কর দিতে হবে না। ৫ বছরের নির্দিষ্টকালীন হিসাবে প্রতি মাসে ১০ টাকা জমা দিলে ঐ সময়ের পর আপনি হুদ ও বোনাসসহ আয়করমুক্ত ১৫০০ টাকা পাবেন এবং ১৫ বছরের হিসাবে পাবেন ২৫০০ টাকা। ১০ বা ১৫ বছরের হিসাবে আপনি যে টাকা জমা দেন তাতে মোট আয়করও খাদিকটা রেহাই পাওয়া যায়।

আপনার কাছাকাছি

পোট অফিসে

অসম্ভবমান নির্দিষ্টকালীন জমাকল্প

একটা পাশ বই করুন



জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

ছোট্টকোনের আওলাজ শব্দে গাই—“মা, আসছে! মা, আসছে!” সেই চিৎকার শুনে চা খাওয়া আর হল না। রিভলভার পারস্কারের তো কথাই ওঠে না। মৃদুত আমরা তাঁর হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে সংলগ্ন পাহাড়ের সারির মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম।

আনন্দের বাড়ির টিলার নিচে দাঁড়িয়ে প্রায় দু-শ' গজ বিস্তৃত রাস্তার উত্তর প্রান্তে দৃষ্টি রাখা সম্ভব ছিল। ছোট্টকোন পুর্লিশের ছোট্ট একটি দলকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে জানিয়েছে। প্রায় দু-শ' গজ রাস্তা মোটরে এসে টিলার নিচে গাড়ি রেখে আরও প্রায় একশ' গজ টিলাটি বেয়ে উঠে তারপর বাড়িতে আসতে হয়েছে পুর্লিশদের। কাজেই পুর্লিশ এসে পৌঁছবার আগেই আমরা জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের কোলে অতর্কিত করেছি।

এই বাড়ির আধ মাইল দূরে আমরা পাহাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক পরে, প্রায় সকাল দশটা হবে, সাহসে ভর করে আমরা চারজন—মাখন, আনন্দ, গণেশ ও আমি—আবার আনন্দের বাড়ির দিকে অগ্রসর হই। যাদের অসহায় অবস্থায় পুর্লিশের সম্মুখীন হতে দেখে এসেছি, তাদের কি হল জানা প্রয়োজন। এই কর্তব্যবোধের তাগিদে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে আবার সেই পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করি।

মাসীমা ও ছোড়দির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম কি যেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারা খুব বিচলিত। অত্যন্ত ব্যাকুল, বিহবল ও হতবুদ্ধি হয়ে যেন অসহায় অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের এক অমঙ্গল আশঙ্কায় একেবারে মূবড়ে পড়েছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা খুব অবাক হয়েছেন—ভাবতে পারেন নি দিনের আলোতে আবার এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা সেখানে ফিরে আসব।

ভীত-গ্রস্ত স্বরে তারা আমাদের জানালেন—আনন্দের পিতাকে পুর্লিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুর্লিশ তাঁর কাছে হিমাংশুর নামে ডাকারের একটি প্রেসক্রিপশন পেয়েছে এবং হিমাংশুর জন্য যে ওষুধ সংগে করে আনাছিলেন তাও পুর্লিশ হাতেনাতে ধরেছে। তাই আর কোন উপায় রইল না। পুর্লিশ তাঁকে থানায় নিয়ে গেছে।

মাসীমার কি ভয়ানক বিপদ! তাঁর মানসিক অবস্থা শব্দে অনুভবই করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। বড় ছেলে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে মৃত্যু-প্রতীক্ষায় আছে; শ্বিতীয় ছেলে আমাদের সঙ্গে আসন্ন বিপদের মধ্যে চরম পরীকার জন্য সময়

গুণে আর স্বামী শব্দে কারাগারে নিষ্কিন্ত হয়েছেন।

মাসীমাদের এমননি করে চারিদিক থেকে বিপদের পর বিপদ ঘনিরে এসেছে। এই-রূপ মানসিক অশান্তি, আশু বিপদের আশঙ্কা—এই অবস্থায় তাঁদের কি-ই বা সাম্রনা দেব, কি-ই বা অভয়বাণী শোনাব। কিন্তু এত বড় বিপদের মধ্যে মাসীমা খুব বিচলিত হয়েছেন বটে তবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঐর্ষ্যের হানি ঘটে নি। প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন নিজেকে শান্ত রাখতে।

তারপর মাসীমা খুব শান্ত ধীরকণ্ঠে আমাদের বললেন—“তোমাদের বাবা আর এক মৃদুতও এখানে থাকা ঠিক হবে না। এখানে থাকলে প্রাণ দিয়েও আমরা তোমাদের রক্ষা করতে পারব না। তোমরা আর কোন নিরাপদ স্থানে চলে যাও।” বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। চোখ দুটি জলে ভরে গেল। অধর দুটি কাঁপছিল—আরও যেন কত কথা বলার ছিল। নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে আবেগভরে বললেন—“আমার প্রাণতরা আশীর্বাদ রইল। ভগবান তোমাদের রক্ষা করবেন!” এইটুকু বলে তিনি যেন সব ভাষা হারিয়ে ফেললেন—কেবল তাঁর সজল নয়নের দৃষ্টিতে তাঁর অন্তরের অক্ষুণ্ণ আশীর্বাদ প্রকাশ পাচ্ছিল।

ছোড়দি নিরবিক নিস্তব্ধ। ছোট্টকোন বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে আছে। সে যেন সবটুকু বুঝতে পারছিল না। তবে সে বুঝেছে তার দাদারা যুদ্ধ করবে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। এতেই সে খুব খুশি। তবে মার চোখে জল কেন? ছোড়দির চোখ ভবে কেন ছল-ছল? ছোট্টকোন একবার মার কাছে আর একবার ছোড়দির কাছে গিয়ে সাম্রনা দিচ্ছিল—“তুমি কাঁদছ কেন মা?” “ছোড়দি ভূই বা অমন করছিস কেন?” “দাদারা তো যুদ্ধ করবে—ভয় কি—আমাদের স্বাধীন হতে হবে তো!”

একেবারে নিরবিক দশকের মত আমরা চারজন এই জীবন-নাটকের দৃশ্যটি দেখে ও শুনে গেলাম। আমাদের বলবার যে কিছুই ছিল না। মাসীমাকে প্রণাম করলাম। আনন্দ—তাঁদের আদরের টুন—মাগের চরণখুলি মাথায় নিল, দিদির পা স্পর্শ করে বিদায় নিল। অতি করুণ এই বিদায়ের পালা। ছোড়দির সব ঐর্ষ্য, মাসীমার অসীম আত্ম-সম্বরণের ক্ষমতা কোথায় যেন বানের জলে ভেসে গেল। মাসীমা আর থাকতে পারলেন না। টুনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—আর যেন তিনি তাকে ছাড়বেন না। কত স্নেহ-চন্দন, কত আদর, কত করে বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। আনন্দ বিহবল হয়ে পড়েছে। আবেগভরে আনন্দ

মাকে বলল—“তুমি ভেবো না মা। তোমার আশীর্বাদ পেয়েছি, আর ভয় করি না। তোমার মত মা পেয়েছি বলে আজ আমরা গর্বিত। মা তুমি হাসিমুখে আমাদের বিদায় দাও।” পাছে ছেলেদের অমঙ্গল হয় তাই মা হাসতে চেষ্টা করলেন—চোখের জল মূছে ফেললেন।

পেছনের সব টান, সকল আকর্ষণ ছেড়ে আমরা উন্মাদগতিতে সম্মুখ পাশে চলছি। মাসীমা আবার গণেশ ও আমাকে উদ্দেশ্য করে আকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন—“তোমাদের হাতে টুন ও খোকা (দেব-প্রসাদ গুপ্ত) সঁপে দিলাম। তাদের ভাল-মন্দের সব ভার তোমাদের ওপর রইল। তোমরা বেঁচে থাক। তোমরা জয়ী হও। তোমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ সফল হোক!”

আমরা তখন আরও দূরে এগিয়ে গেছি। তিনি চিৎকার করে টুনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—“খোকাকে বলিস আমি তার ওপর একটুও রাগ করি নি। তোদের মা বলে আমি গর্বিত—নিজেকে আজ খন্য মনে করছি!”

১৮ই তারিখ রাতিতে যখন আনন্দের সঙ্গে বেরিয়ে আসি তখনও মাসীমা কাতরকণ্ঠে আমার কাছে “আবেদন” জানিয়েছিলেন—“খোকা আর টুনের ভাল-মন্দের সব ভার তোমার ওপর রইল।” আজ ২০শ তারিখ সকাল বেলা মাসীমা আবার সেই একই করুণ আবেদন জানালেন—“তোমাদের ওপর খোকা ও টুনের ভাল-মন্দের ভার রইল!” মাসীমার ব্যথিত অন্তরের আবেদনের উত্তর আমার হৃদয়ে ধনিত হল—“ব্রিটিশ শত্রু সংগে মরণ-যুদ্ধই আমাদের ‘ভাল’ আর সেই হল আমাদের ‘মন্দ’ কি আমি দিতে পারি তাদের? আমি তাদের দিতে পারি কৃষা, তুকা, বিনির রজনী ও সুদীর্ঘ চলার পথে ক্ষত-বিক্ষত চরণ-যুগল—সর্বশেষে মহৎ আদর্শ পালনের বিনিময়ে দিতে পারি বিজয় গৌরব”—গ্যারিবন্দির কথাগুলি আমার হৃদয়ে এইভাবে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

আমরা পাহাড়ের উচ্চ-নিচ পথে অনেকদূর এগিয়ে গেলাম। চোখের সামনে শব্দে তাঁদের শোক-বিহবল গর্বেজ্জ্বল মুখগুলি ভাসতে লাগল। দূর থেকে শেষবারের মত দু’হাত তুলে তাঁদের প্রণাম জানালাম। আজ ভাবছি তাঁদের স্বদেশ-প্রেমের কাহিনী কি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে না? ক’রা স্বদেশপ্রেমের কথা কিভাবে লিখবেন জানি না—তবে দেশবাসী যে এই বিপ্লবী পরিবারের অবদান ভুলবেন না—প্রস্থার চোখে দেখবেন সে বিশ্বাস আমার আছে।

[কল্যাণ]

ভঙ্গার সেই ছেলেটি

সম্রাজ্ঞ সেনগুপ্ত

ভঙ্গা তীরের সেই ছেলেটির কথা আজ কি মনে পড়ে? ভঙ্গার জলতরঙ্গ বাতাসে হিল্লোলিত। শত শত ছোট নৌকা। নৌকার উপর মাঝ-মাজা। তারই পাশে ছুটে চলেছে বড়লোকের কতো রকম প্রমোদ-ভরী, ছোট ছোট জাহাজ।

ছোট ছোট জাহাজের মানুষলের উপর রঙ বেরঙের মোরগ বা তীর। কোনো-টার বা মর্দুটবন্দ্য হাতে খোলা তলোয়ার।

দূরন্ত বেগে ছুটে চলে বড়লোকের জাহাজ বড় মেজাজে। পাশে ভাসমান ছোট তরীগুলি কাঁপত থাকে। নীল জলের তরঙ্গাঘাতে নীল স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায় গরীব ছেলেদের। কিন্তু এদের কথা কে ভাবে?

ভঙ্গার তীরেও যেন সৌন্দর্য ধরে না। যেন সারা দেশটা সোনালি বড়ি পরেছে। হেলে দলে হাসছে দিকে দিকে গম ফেঁচ। চাষীরা আসে, ফসল ফলায়। কিন্তু একটি দিনাও ঘরে ঢোকে না তাদের।

ছোট একটি গ্রাম। নাম, নিকানি নোভুঙ্গরঙ। ভঙ্গার তীরে এমন অবস্থার মধ্যে জন্মালো এক শিশু। মালটা হচ্ছে ১৮৬৮। পৃথিবীকে চেনবার আগে, মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই ছেলেটি হারালো তার পিতাকে। পিচ বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে আশ্রয় পেয়েছিল সেই শিশু, মায়ের কোলে। ন বছর যখন বয়স—পৃথিবীর সঙ্গে সবে যখন তার কৌতূহলের মধ্যে পরিচয় সূর্য

হয়েছে—তখন একদিন সে হারালো তার মাকে। শেষ আশ্রয় ঠাকুঁদা আর ঠাকুঁমা। ঠাকুঁমার কোল জুড়ে বসলো এই কিশোর। মনে তার তখন অনেক প্রশ্ন। আর সেই মন নিয়ে চোখ মিলে তাকালো ভঙ্গার দিকে—যে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যার বৃকে সে শুনতে পার গরীবদের মর্মভেদী কান্না, ঘনী দস্যুর নৃশংসের আকাশছোঁড়া উজাস। যে দেশের বৃকে এমন সুন্দর ভঙ্গা প্রবাহিত—সেই ভঙ্গায় এই ভয়ঙ্কর নৃশংস-লাীলা! যার তীরে সদা উর্বর মাটি যে মাটির দাগ মোছে না কৃষকের হাত থেকে—সেই কৃষকের ঘরে হা অন্ন রব।

ছোট গ্রামটিতেও কি দস্যুর শেষ আছে। ছোট ছোট মজুররা স্বেদের সঙ্গে অশ্রুপাত করেই জবেজান। পেট ভর্য ভরে না। আর চারিদিকেই কি বীভৎস দৃশ্য। ঘন্য পল্লীতে ভন্দরলোকদের আসা-যাওয়ার শেষ নেই, মাতালের চিৎকারে পাড়া মাথায় উঠেছে। তবু এই জগতের বাসিন্দা হওয়া ছাড়া সেই শিশুর গতানুগতিক নেই। পিতামহ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

লোক। শেষে ঋণগ্রস্ত হয়ে প্রায় পাগল হলেন। নরম চুলে হাত বুলিয়ে এই দস্যুর জগৎ থেকে উদ্ধারের আশায় ঠাকুঁমা কাঁহিনী শোনান। আর ভগবানের উপর ছেড়ে দেন ভবিষ্যৎ।

এই শিশুর দু'চোখে দেখা দস্যুর জগৎ মিথ্যা ছিল না। মিথ্যা ছিল না বলেই—একদিন সেই শিশুর ক্রমশঃ পরিণত মনে জেগে উঠল ধ্যান-ধারণার নতুন জগৎ। যে জগৎ অভিনব স্বপ্নের জগৎ বলে বোধ হলেও, সত্যিকারের স্বর্গহার্য মানুষ্যের বাস্তব জগৎ। যে জগতে গিরে একদিন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

“রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূর্খে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই ওরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।” [২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০]

অন্য কোনো দেশের মতোই নয় যে দেশ, সে দেশ গড়ার কাজে মহান কর্মীদের অবদান সত্যতই অমরণীয়। কিন্তু যাদের আমরা অন্যান্য দেশে কম্পালোকের বসিন্দা



রোনা রোলার সঙ্গে মার্কিন গোলক

কাল ধরে নিই এবং মাদের কল্পনার সঙ্গে
স্বস্তব জগতের কোনোদিন মিল থাকে
না—তাদের দেখা জগৎ-এ তাঁরা নিগ্রহ
থেকে যে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে-
ছেন তাই প্রেরণা দিয়েছে সর্বহারাদের
প্রতি বিপ্লবের শক্তিসঞ্চার করতে।
বাস্তবিকপক্ষে অন্যদেশের লেখকদের মধ্যে
ভাবের ষটিকাঘাতে বস্তুর মতো ঘটে।
ভগ্না তীরের সেই ছেলেটি জীবন
বৃত্তান্তের প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়েই
দেখোছিল, এ জগৎ-এ নির্মম অত্যাচারীর
ধনের বনিয়াদ প্রত্যহ দৃঢ়তর হচ্ছে। জর-
শাসিত রাশিয়ায় এটাই সম্ভব। আর এই
সম্ভবকে অসম্ভব করে তুলতে বা
প্রয়োজন—তা হচ্ছে মনকে বথার্থভাবে
প্রস্তুত করা। সেই প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে
আসতে পারে পরিবর্তন। সেই শিশুকাল
থেকে যে মানুষকে চারধারে দেখে এসেছে—
তারা দীনতায় ভারাক্রান্ত, হতাশায় মলিন,
বেদনায় রিক্ত—এদেরই জাগিয়ে তোলা
দরকার। কারণ একদিকে এদের মধ্যে
যেমন আর্থিক দীনতা, আর একদিকে
এদের মনে অর্থবানের দম্ভের বিরুদ্ধে
রুদ্ধে ঘণা। নিজেদের রিক্ততার জন্যে
শেষের প্রতি অসীম বিকোভ। এদের
জাগিয়ে তোলাই বড় কথা। তবু সারা
দেশময় যে আর্তি তাঁর প্রতীকীতে সেই
ছেলেটি একদিন নাম নিলেন : মাক্সিম
গোর্কি। গোর্কির অতি পরিচিত পাঠকরাও
কেন ভুলে গেছে তাঁর আসল নাম :
এলেক্সিস মাক্সিমোভিচ পেশকভ।

মাক্সিম গোর্কির নামের সঙ্গে পরিচিত
নয়, এমন ভাষা একালেও পৃথিবীতে
আছে কি না জানি না। তবে মাক্সিম
গোর্কির যাবতীয় রচনা শুধু তাঁর
স্বদেশেই আবদ্ধ নেই। তাঁর কারণ
নির্পীড়িত মানুষ আপন গরজেই মাক্সিম
গোর্কির রচনাকে নিজের বলে কাছে টেনে
নিরেখে।

বিংশ শতাব্দীতে গোর্কির এই অনন্য-
সাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ এই নয় যে,
কোনোরকম সোনার কাঠি দিয়ে তিনি
রূপকথার জগতের দৃষ্যর খুলে দিলেন।
মোট কথা, তাঁর কালে এমন অনেক উচ্চ
লেখক ছিলেন। যারা সেই কাজ করতে
সক্ষম ছিলেন। তাঁদের প্রতিভা অসামান্য
ছিল এবং বাকপ্রোটি ও ওজস্বিতা গুণে
কম দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু নিরাম, নিরাশ্রয়
ও মৃৎ মানুষের যন্ত্রণা নিবারণ করতে
তাদের কাঠির পরিবর্তে ঝাটের কাঠি ঢের
ব্যবহার করতেন। কারণ তা' জজাল দূর
করতে পারে। মাক্সিম গোর্কির রচনার
কৌশলের গুণে অপেক্ষা সামাজিক ও
রাষ্ট্রিক পটভূমি ও বাস্তবসম্মত মানুষ
এসে স্থানীয়কার করলো। আর শোষিত
মানুষ কান্না নিয়ে এলো না, শোষণের

হাত থেকে মুক্তির জন্যে বথার্থ অধিকারে
বাচবার জন্যে। নৈরাশ্যের বদলে,
স্বভাবতই গোর্কির রচনায়, দেখা গেল
উত্তেজনা, আশা, চাঞ্চল্য এবং যুগান্তের
সুনির্দিষ্ট প্রতিচ্ছবি—প্রমিত যেন
সত্যিকারের মানুষ।

মাক্সিম গোর্কির চিন্তার যে আশাবাদ
তাই তাকে চেকভ-এর তুলনায় পৃথক করে
রাখতে পেরেছে। টলস্টয় বা চেকভ—তাদের
প্রত্যেকের রচনায় বেদনাহত মানুষ যন্ত্রণার
ছটফট করছে, গোর্কির রচনায় সে মানুষ
যন্ত্রণা-মুক্তির আশ্বাস পেয়েছে। সেই
কারণে বলা যায়, যে বিশ্বাসের ছবি
গোর্কি তাঁর গল্পে উপন্যাসে নাটকে
ডায়েরি প্রভৃতিতে তুলে ধরেছেন—তাঁর
জুড়ি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত হয় নি।
কিন্তু তাঁর সংগ্রামী বোধ, শোষণের
অবসানের সঙ্গে সর্বহারাদের প্রতিষ্ঠার
অপ্রতিহত চিন্তা সর্বদেশের পাঠকদের
চঞ্চল করে তুলেছে। জিম দেশের
লেখকেরা প্রেরণালব্ধ হয়ে নতুন করে
উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বিশ্ব সাহিত্যের
আধুনিকতম সৃষ্টির ফল যে গোর্কির
সাহিত্য মহারহ—থেকেই সম্ভব হয়েছে
তা অস্বীকার করার মতো বাড়ুলজা আর
নেই। গোর্কি রুশীয় ইতিহাসের
সর্বাপেক্ষা বিশৃঙ্খল ও ষ্ট্রাজিক বছর-
গুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন
এ কথা ঠিক কিন্তু একালে তাঁর চিন্তা
সর্বদেশবিস্তারী।

মাক্সিম গোর্কির সাহিত্যিক অবদান
মহাত্মা গান্ধীকে বিশ শতকের প্রথম দশ-
কেই আকৃষ্ট করেছিল। ১৯০৫ সালে
গোর্কির উপর এক প্রবন্ধ লেখেন তিনি
'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজে। এতে তিনি
মাক্সিম গোর্কিকে মানবাধিকারের প্রের্ত
বোম্বা বলে অভিহিত করে লেখেন যে,
"কিছুদিন আগে রাশিয়াতে বিদ্রোহ ঘটে
গেছে। তাতে যারা যোগ দিয়েছিলেন
তাদের মধ্যে গোর্কির নাম উল্লেখযোগ্য।
তিনি অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ
করেছেন এবং প্রতিপালিত হয়েছেন।
তিনি একজন চর্মকারের শিক্ষানবিস
হিসেবে জীবনানুভব করেন। কিন্তু সেই
চর্মকার স্বল্পকালের মধ্যেই তাকে শিক্ষা-
নবিসের কাজ থেকে খতম করে দিয়ে-
ছিল। তারপর তিনি সৈন্যবিভাগে
যোগদান করেন। সৈন্যবিভাগে থাক-
কালীন পড়াশুনার দ্বারা শিক্ষার দিকে
মন দিলেন। ১৮৯২ সালে তিনি প্রথম
বই লিখেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।
লেখার কাজ তিনি চালিয়েই যান। তাঁর
প্রধান লক্ষ্য ছিল জনসাধারণকে সত্যক
রাখা, যাতে তারা নিজেদের অধিকার
রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত রাখে।
তিনি অর্থের জন্যে প্রক্ষেপ করেন নি।

তাঁর রচনাবলী এমন কটুভাবে পুষ্প
ছিল যে, সরকারী কর্মচারীরা তা বিশদ-
সূচক সংকেত বলেই ধরে নিতে বাধ্য
হয়েছিল। জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্যে
তাকে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।
তিনি জেলকে ভন্দরলোকের স্থান বলেই
ধরে নিয়েছিলেন। একথা বলা হয় যে,
সারা রুরোপে আর এমন কোনো লেখক
নেই যিনি গোর্কির মতো জনগণের
অধিকারের জন্যে লড়াই করে গেছেন।"

মহাত্মা গান্ধীর উপরিউক্ত কথা থেকেই
বোকা যায় যে, ভগ্নাতীরের সেই ছেলেটি
ধীরে ধীরে বড় হবার সঙ্গে একদিন
দেশের সীমানা ছাড়িয়ে কিভাবে অন্য
দেশের সংগ্রামী মানুষের চিন্তার দ্বা
মেয়েছিল।

ইংরেজশাসিত তদানীন্তন ভারতবর্ষে
(১৯০৫ সালে) গোর্কির সম্বন্ধে
গান্ধীজীর মূল্যবান চিন্তার প্রকাশ
ঘটলেও, গোর্কি ১৯০৬ সালে নিউইয়র্কে
গেলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা এবং বিরাপতা
এই দুই-এরই মধ্যোচ্চ হতে হয়েছিল।
আমেরিকার অধিকাংশ কাগজের প্রথম
পৃষ্ঠায় উপরিভাগে গোর্কিকে অভ্যর্থনা
জানাতে গিয়ে লেখা হয়েছিল 'দি গ্রেট
রাইটার', 'দি অ্যামব্যাস্যাডর' অব 'দি
রাশিয়ান পীপল' ইত্যাদি। কিন্তু দুইয়ের
যেমন ছলনার অভাব হয় না, তেমনি
গোর্কির ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত টেনে
এনে, (অথচ যে বৃত্তান্ত কোনোমতেই
দৃশ্যীয় নয় বরং গোর্কির মতো
মহানুভব লেখকের পক্ষে ভূষণস্বরূপ)
ভোজসভায় তাঁকে ডেকে সেই ভোজসভা
পরিভ্রমণ করে অপমান করা হোল।
সবচেয়ে দৃষ্টান্তের ব্যাপার এই যে, মার্ক
টোয়েনের মতো লেখক এতে হতাশিত
দান করেছিলেন। 'কমন'-ল-ওয়াইক'
সমিতিবাহারে নিউইয়র্কে হাওয়ার জন্যে
আমরা গোর্কির মধ্যে অনন্যসাধারণ
শৌর্যেরই পরিচয় পাই।

১৯০৭ সালে প্রকাশিত হোল মাক্সিম
গোর্কির জীবনের সর্বপ্রের্ত সৃষ্টি—"মা"।
এই উপন্যাস বের হবার পরই দু' ডজন
ভাষায় সম্বর অনূদিত হয়। ভারতের
বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ ও হাদ্য
সমালোচনা হয়েছে। বাংলা ভাষায়
একাধিক অনুবাদক 'মা'র অনুবাদ করে-
ছেন। তবে কোনোটা বা সংকিশ্ণাকারে
কোনোটা বা সম্পূর্ণ অনূদিত। গোর্কির
সমস্ত রচনাই একালে আধুনিক ভারতীয়
ভাষাগুলিতে অনূদিত হয়েছে। আর
বাংলা ভাষাতেই এতো সংখ্যক অনুবাদক
এ কাজে রতী ছিলেন বা আছেন যে,
তাঁদের নাম প্রকাশ করতে গেলেই দীর্ঘ
স্থান অধিকার করবে। এতদসত্ত্বেও বলা
দরকার যে গোর্কির 'মা'-ই যে আবেদন—

তার তুলনা নেই। তারিণের দশকে 'আ'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৪-তেও নতুনভাবে বের হয়েছে। এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ ও প্রযোজনা দিয়েছিলেন লিটল থিয়েটার গ্রুপের উপল দত্ত পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে। তার দেওয়া নাট্যরূপ দ্বিপ্রান্তেও মণ্ডল্য হয়েছে। সে দিবসেও এই নাটক মণ্ডল্য করা হয়। 'আ' উপন্যাস-টির ওপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র কাহিনীর প্রযোজনা করেছেন মলিনা দেবী। তিনি এই কাহিনীর প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণও হয়েছেন।

মোটকথা গোর্কির উপন্যাস-গল্প প্রভৃতির প্রভাব অসামান্য। এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশে যেখানে গরীবদের দুর্দশা অবগনীর এবং ধনীদিগের সুখভোগ অপ্রলিহ সেখানে গোর্কির মতো মহান লেখক পাঠক তথা লেখকদের অনুপ্রাণিত করবেনই। সেই কারণে বাংলায় শরৎচন্দ্র, হিন্দীতে প্রেম চন্দ্র গোর্কির সাহিত্যের প্রচণ্ড অনুরাগী ছিলেন। তারপর সাহিত্যের সিংদরজা দিয়ে যখন তথাকথিত নিচু কপালের মানুষ ঢুকে লাগলো, তখন তাঁরাও এই প্রথম শ্রেণীর লেখকের আদর্শকেই অবলম্বন করলেন। কিন্তু তাঁরা জয়ী হলেন। একালের বাংলা ভাষার খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা এ আদর্শে পরিচালিত মনে হয়।

অবশ্য আমাদের দেশে অতীত বিশেষত গোর্কির কাল থেকে আমরা বহু দূরে এসে পৌঁছলেও এখনো বহু সাহিত্যিকের নিদ্রা দূর হয় নি। তাই কেউ কেউ অর্থের জন্য অর্থবানের ভজনায় রত। সরকারী প্রসাদ-পুষ্ট ও করুণাভিক্ষুক বৃক্ষজীবীদের শ্রেণীর মধ্যেই এটা সম্ভব। ১৯০৭ সালে 'আ' বের হলে—

"Lenin hailed it as a courageous affirmation of socialist ideals, but it was hardly to the liking of Russian intellectuals; it seemed so much of an anachronism in the then prevailing atmosphere of defeat and triumphant Governmental reaction."

(Modern Russian Literature by Mare stonim)

বুদ্ধিজীবীরা বৃক্ষজীবীদের ভুল অবশ্য মার্ক্স গোর্কি কর্মের দ্বারা ভেঙে দিয়েছিলেন। বিশেষত ১৯১৮ থেকে ১৯২১ বালের মধ্যে সাহিত্যিকরা ১৯১৭-র বিপ্লবের সাফল্যের পর আর শোষিত ও

নিঃশেষিত রাশিয়ার মধ্যে অত্যন্ত অভাব ও দুর্দবস্থার মধ্যে পড়েছিল। এই দুঃসময়ে এগিয়ে এলেন গোর্কি। তিনি সরকারী দক্ষিণে স্বয়ং পুষ্ট হবার মানুষ নন। অন্য খাত্তে গড়া মানুষ তিনি। তবে তিনি জানতেন যে, লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিক নেতারা তাঁদের দিকেই তাকিয়ে চায়। এই 'চায়'-এর পরিবর্তে তিনি একটি সুযোগ গ্রহণ করলেন, আর সেই সুযোগ একমাত্র সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর স্বার্থে। যা অতীতকালে ভারতীয় সাহিত্যিকদের কাছেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

"Gorky saved hundred of artists, writers and scholars from starvation, humiliation and death. He intervened on behalf of grand dukes and poets, of former bourgeois and professors sentenced to death. His was a gigantic task. : he was trying to preserve the intelligentsia, whom he styled the 'only draft-horse harnessed to the ponderous wagon of Russian history'. To provide them with work and bread, Gorky organised International Literature, a huge publishing enterprise supported by the state, which employed hundreds of writers and scholars as translators, researchers and editors ; he also founded the The House of Art and The House of the Scholars, which gave shelter to hundreds of intellectuals in Petrograd."

(Modern Russian Literature by Mare stonim)

গোর্কি রোমান্টিসিজমের সঙ্গে রিয়ালিস্টিক অবজারভেশনের এক অপূর্ণ মিশ্রণ। ঘটিয়ে সাহিত্যে এনেছিলেন 'সোসিয়ালিস্ট রিয়ালিজম'। স্বদেশকে তিনি এমন ভালবাসতেন যে, সেখানের শয়তানের মতোও স্বকীয় চাতুর্ষ্য-লক্ষণ লক্ষ্য করেছেন। তবে তাঁর চিত্ত ছিল আন্তর্জাতিকতাবোধে উন্মোচিত। সামগ্রিক সাহিত্য বিচারে সেটাই প্রমাণিত হয়। এবং তাঁর সাহিত্যের প্রচার সে কথাই প্রমাণ করে। তিনি তাঁর নিজের পেশাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দায়িত্বপূর্ণ জন-সেবার কাজ বলে মনে করতেন। তাই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, 'একজন সাহিত্যিকের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন হওয়া উচিত।' সেই কারণে তিনি

সাম্যবাদী সৌন্দর্য-বিস্তারনে মৌলিক নীতির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাযুক্ত ছিলেন। আবার গোর্কির মহৎ ব্যক্তিত্বের গুণেই প্রবীণ লেখকদল ও নবীন প্রতিভাধারী লেখকবৃন্দ একত্র হতে পেরেছিলেন। কে. ফেডিন বলেছেন, "বংশীবাদকের মতো তিনি সাক্ষরদের সংগীত বাজিয়েছেন এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁর বংশীবাদনে সাহস সঞ্চয় করেছে এবং তাদের গৃহা থেকে বের করে এসেছে।"

যাহোক, নিরবধিকালের সাহিত্যিক মার্ক্স গোর্কির জন্মশতবার্ষিকী উদ্-যাপনের আর বেশি দেরি নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, এ দেশের সাহিত্যিকগোষ্ঠীর প্রগতিশীল দলও এ ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত নীরবতা পালন করছেন। কিন্তু এই মহান সাহিত্যিকের জন্মশতবার্ষিকী পালনের দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমাদের সরকারেরও এই ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত এবং সাহিত্য আকাদেমির মাধ্যমেই সরকার 'গোর্কি' শতবার্ষিকী পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। গোর্কির নামে একটি বিশ্ব সংস্থা স্থাপন করাও যেতে পারে—যেখানে বিশ্ব-সাহিত্যিকরা ফি-বছর মিলিত হয়ে মত বিনিময় করতে পারবেন। ফলে সাংস্কৃতিক ভাবের আদান-প্রদান আবে সহজতর হবে এবং বৃদ্ধ-ভীত পৃথিবী সাহিত্যিকদের সাহচর্যে সুস্থতার পথ খুঁজে পাবে। এই ধরনের কাজে ইউনেস্কোর কিছুটা উৎসাহ থাকা উচিত।

গোর্কির জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে এই অশা করবো,—আমরা যেন তাঁরই মতো বৈশ্বের মানুষের সঙ্গে সর্বদেশের সর্বহারা মানুষের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি।

শ্রীমদ্র গোপালী বিবাক্ত

নিদ্রা-মাপন

[বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকাসহ]

শ্রীচৈতন্যদেব-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-লীলার স্বরূপ প্রকাশ করবার জন্যই শ্রীমদ্র গোপালীর দ্বারা শ্রীবিদ্য-মাধব নাটক রচনা করা হয়েছিল। মহাপ্রভু বলিযাচেন—

"মদন প্রসন্ন ই'হাব কাব্য সালম্বার।

এছে কবিতা বিনা নহে বাসব প্রচাফ।

মূল্য : তিন টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১১

খাদ্য বনাম ক্ষুধা

জীবনের অন্যতম ধর্ম ক্ষুধা; আর ক্ষুধার বৃহত্তম চাহিদা খাদ্য। ক্ষুধা লোপ পেলে বৃহত্তে হবে, জীবন নেই; অথবা থাকলেও সুস্থ অস্থায়ী আছে। আর যদি খাদ্যের অভাব ঘটে তো বৃহত্তে হবে, ক্ষুধা মিটছে না; এবং আঘাতটা লাগছে জীবনের একেবারে ভিত্তিমূলে গিয়ে। ফলে, জলের অভাবে নদী যেমন, রসদের অভাবে প্রাণীও তেমনি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। জলবায়ু উপকরণটুকু না পেয়ে তার জীবনপ্রদীপ নিভু নিভু করছে। রসদের অভাবে জীবনপ্রদীপ অকালে নিভে যাওয়ার ঘটনা পৃথিবীর সব যুগের শব্দ ইতিহাসেই অপরিহার্য। সাম্প্রতিককালেও প্রদীপ নেভার ট্রাজেডী হাসেশাই দেখছি। কিন্তু এখনও অবধি ধর্মব্রতী খাদ্য-উৎপাদনের যে ক্ষমতাটুকু আছে, তা' নিয়ে সে তার সন্তানদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে।

এদিকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এখনও অবধি পারে বটে, কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতেই আর পারবে না। কারণ, পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, খাদ্যের উৎপাদন সে হারে বাড়ছে না। অতএব এমন দিন এলো বলে যখন পৃথিবীর কোটি কোটি হতভাগ্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দূর্ভিক্ষের অনলে জ্বলে পুড়ে মরবে। এ সম্পর্কে মনীষীদের অনেকেই সাবধান করে দিচ্ছেন আমাদের। বলছেন, অবস্থা যদি এইরকমভাবে এগিয়ে চলে তো ভবিষ্যতে হাজার পরিকল্পনার মালা গেঁথেও উদ্ভূত ক্ষুধা-মহাব্যাজকে শান্ত করা যাবে না।

আজকের কথা এই যে, বিজ্ঞানীরা যে ভবিষ্যতের কথা বলছেন, তা' আমাদের অদূরবর্তী। ওদের হিসাবমতো ২,০০০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৬০০ থেকে ৭০০ কোটিতে পৌঁছবে। এই হিসেবটাকে উড়িয়ে দিতে পারলে প্রশ্ন হতুম। কিন্তু তা' যে পারাচ্ছে নে, সেজন্যে মা বস্তীর কৃপাদৃষ্ট দায়ী। চোখের সামনেই দেখছি, শতকরা ২ হারে প্রতি বছর পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। অতএব এখন যে সংখ্যা ৩৩০ কোটি, আগামী ৩০ বছরের মধ্যে তা' বেড়ে গিয়ে বিশ্বগণ হওয়া মোটেই অসম্ভাবিক নয়।

এদিকে সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে অনুন্নত দেশগুলিকে ঘিরে। সে সব দেশে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির হার উন্নত দেশগুলির প্রায় সমানই আছে, কিন্তু

জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে উন্নতদের ওরা ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূর।

উদাহরণ হিসেবে আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি অনুন্নত দেশের কথা বলা যেতে পারে। এই দেশগুলোতে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৪-৫ ছাড়িয়ে গেছে; অর্থাৎ, গড় বৃদ্ধির বিশ্বগড়কে অতিক্রম করেছে।

অতিক্রমের এই হার বজায় থাকলে প্রায় ১৭ বছরের মধ্যেই ওদের জনসংখ্যা এখনকার জনসংখ্যার দ্বিগুণ হবে। এদিকে হিসেব মিলছে, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোকই এখনও অনুন্নত দেশে বাস করে। অপরদিকে ইরোরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নত অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পৃথিবীর গড়-বৃদ্ধি বছরে শতকরা ২-এর তুলনায় অনেক কম। ফলে, উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলোর মাথা-পিছু খাদ্য বরাদ্দের পার্থক্য দিন দিন কমে না গিয়ে বরং বাড়ছে।

দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধির পূর্ববর্তী কালে অনুন্নত বা অর্ধোন্নত অনেক দেশ থেকেই উন্নত দেশগুলোতে খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হত; এবং এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল প্রতি বছর গড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে অবস্থা দাঁড়িয়েছে উল্টো। এই পর্বে দেখা গেল, উন্নত দেশগুলো থেকে অনুন্নত দেশসমূহে খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধি শেষ হবার পর প্রথম কয়েক বছর ধরে রপ্তানীর হিসেব হ'ল গড়ে বাৎসরিক ৪০ লক্ষ টন। ১৯৫০ সালের পর থেকে অনুন্নত দেশগুলোতে খাদ্য-ঘাটতির পরিমাণ অতি দ্রুত বেড়ে চলল। ফলে, বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর বহরও দ্রুত হতে উঠল অসম্ভাবিকরকম। ১৯৬১-তে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াল ২ কোটি ১০ লক্ষ টন এবং ১৯৬৬-তে এই সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ টনকে ছাড়িয়ে গেল।

অনুন্নত দেশগুলোতে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যে এই খাদ্য-ঘাটতির প্রধানতম কারণ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এদিকে অনুন্নত দেশগুলোতে যখন খাদ্য-ঘাটতির জন্যে হাহাকার, তখন উন্নত দেশগুলোতে মাথা-পিছু বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণ কমেই বাড়ছে। এই বাড়তির চেহারাটা আশাপ্রসন্ন বটে। ১৯৫৪-৫৫ সালে উন্নত দেশের কেউ যেখানে ১০০

গ্রাম খাদ্য পেত, ১৯৬৪-৬৫ সালে সেখানে সে পেয়েছে ১১৭ গ্রাম। অর্থাৎ, এই দশ বছরে উন্নত দেশগুলোতে মাথা-পিছু খাদ্য-বরাদ্দের পরিমাণ আগের ৬ ভাগের ১ ভাগ বেড়েছে।

অথচ অপরদিকে উৎপাদন-বৃদ্ধির দৌড়ে উন্নত দেশের সমপর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও অনুন্নত দেশগুলো খাদ্য-সমন্বয় সমাধান করতে পারল না। কারণ অনুন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেল এবং মৃত্যুর হার কমে গেল অনেকখানি। মৃত্যুর হার কমে যাওয়ার মূলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কিসমতের অগ্রগতি যে দায়ী, একথা অস্বীকার করা চলে না।

অস্বীকার করা চলে না যে, মৃত্যুর হার ভবিষ্যতে হ্রাসের আরও কমে এবং মৃত্যুকে এইভাবে বিলম্বিত করার মধ্য দিয়ে মানব-সাধনার জয়যাত্রাই সূচিত হবে। অতএব একদিকে জন্মহার কমিয়ে অপরদিকে খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে না পারলে সমস্যা সমাধানের পথ নেই।

ভারতবর্ষের সমস্যা এরই মধ্যে জটিল হয়ে উঠেছে। এখানে লোকসংখ্যা বাড়ছে ভয়াবহ গতিতে; কিন্তু খাদ্যোৎপাদন সে হারে বাড়ছে না। ১৯৬০ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ। জন্মের ক্রমবর্ধমান হার যদি বজায় থাকে তো ২০০০ খৃস্টাব্দে এ দেশের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে তিন গুণ, অর্থাৎ ১২০ কোটিরও বেশি। অপরদিকে ১৯৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে জন্মের হার যদি বর্তমানের অর্ধেক দাঁড়ায়, তবে ২০০০ খৃস্টাব্দে এদের লোকসংখ্যা ৯০ কোটির বেশি হবে না। অর্থাৎ, জন্মের হারকে কমাতে পারলে সমস্যা তবু আরম্ভের মধ্যে থাকবে। কিন্তু ট্রাজেডী এই যে, তেমন কোনো ইঙ্গিত আমরা বর্তমানে ভারতবর্ষ থেকে পাচ্ছি না। বরং আমরা লক্ষ্য করছি, অনাগতদের প্রশ্নের চেয়েও বড় হয়ে উঠছে, যারা আছে তাদের কাছে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার সমস্যা। এ সমস্যা শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর অনুন্নত ও অর্ধোন্নত বহু দেশেই দিন দিন তীব্র হয়ে উঠছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশেই যথাযথ আহার জুটছে না মানুষের। কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় আতনাদ করছে। বিশ্ব খাদ্য-ও কৃষি সংস্থা হিসেব করে বলেছেন, এই দুঃসহ অবস্থা থেকে ওদের মুক্তি দিতে হলে ১৯৭০ খৃস্টাব্দের মধ্যে

খাদ্যের উৎপাদনকে শতকরা ৪৫ ভাগ বাড়ান দরকার। এ ছাড়া ২০০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে খাদ্যোৎপাদনকে বর্তমানের আড়াই গুণ করতে পারলে সমস্যা হয়তো সমাধান হবে। কিন্তু প্রশ্ন, সমাধানের এই পথ ধরে আমরা এগোচ্ছি কি?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত একটি পরিসংখ্যানের স্মারক হতে হয়। সেখানে দেখি, ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ খৃস্টাব্দের মধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার ১২টি অনূন্নত দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন গড়ে প্রতি বছর শতকরা ৪ হারে বেড়েছে। বলা বাহুল্য, উৎপাদন-বৃদ্ধির এই হার ২০০০ খৃস্টাব্দে খাদ্যশস্যের লংঘনকে আড়াই গুণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অতএব, আরও অনেক দ্রুতগতিতে উন্নয়ন দরকার এবং এই উন্নয়ন করতে গেলে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণকে বাড়াতে তো হবেই, উপরন্তু বাড়াতে হবে ভূমির উৎপাদন-ক্ষমতাকে।

এদিকে মানবসভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বেড়েছে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণকে বাড়িয়ে। কিন্তু সমস্যা হল এইভাবে নিত্য নতুন ভূমি কাজে লাগাতে পারবো আমরা আর কতদিন? অনূন্নত ও অর্ধোন্নত দেশ-গুলোতে অনাবাদী কৃষি-ভূমির পরিমাণ এরই মধ্যে খুব কমে এসেছে। উন্নত কয়েকটি দেশে এখনও কিছু অব্যবহার্য জমিকে কৃষিকার্যে লাগান যেতে পারে বটে; কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ধরনের ভূমির পরিমাণও খুবই সীমাবদ্ধ। অতএব, ভূমির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবার দিকে নজর না দিয়ে এখন আর উপায় নেই।

উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপের উন্নত দেশগুলো ভূমির একর-প্রতি উৎপাদন বাড়াবার দিকে এরই মধ্যে মনোনিবেশ করেছে। কিন্তু আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার অনূন্নত দেশগুলো এখনও এদিক দিয়ে অনেকখানি পিছরে আছে। কারণ, এই সব অঞ্চলের কৃষকদের প্রায় সকলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মাধ্যমিক আমলের যে সব পদ্ধতিতে ওরা চাষ করে, উৎপাদন-বৃদ্ধির পক্ষে সেগুলো সহায়ক নয়। বিগত ২৫ বছরের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, উন্নত দেশ-গুলোতে একর প্রতি ফলন বেড়েছে শতকরা ১০৯ ভাগ; কিন্তু অনূন্নত দেশে এর পরিমাণ হল শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগ মাত্র।

অতএব সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ইশ্বন যোগাচ্ছে,

অনূন্নত দেশের হতভাগ্যরা; কিন্তু খাদ্য-শস্যের উৎপাদনের দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ওরা পিছিয়ে পড়ছে। তাই ক্ষমা ক্রমেই ঘিরে ধরছে ওদের। খাদ্যাভাব ওদের ঘরে ঘরে হাহাকার ছড়াচ্ছে।

এই সর্বনাশ থেকে মূর্তন পায়, একদিকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ান এবং অপরদিকে জনসংখ্যা কমান। অবিলম্বে যদি এ পথ ধরে না চালা আমরা, তবে ২০০০ খৃস্টাব্দের ফদুপা শুধু আমাদেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করবে।

কারও চিন্তা, কি

করে বুদ্ধিমানের মতো জগা

টাকা খাটানো যায়।

আবার কারও চিন্তা সামান্য

শ্রায় থেকে কি করে

ছুটো পয়সা বাঁচানো যায়।

সমস্ত। হিসেবে দুটোরই

গুরুত্ব সমান।

আর্থিক এসক

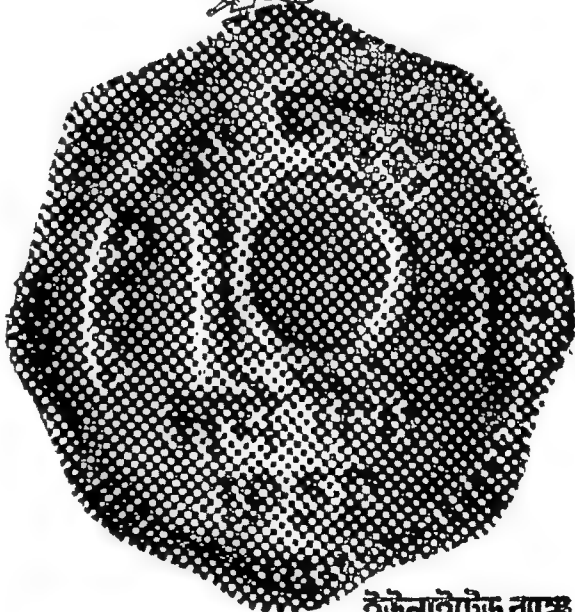


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

আর্থিক ব্যাপারে

আপনাকে

সাহায্য করতে প্রস্তুত।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :

৪, ক্লাইভ স্ট্রীট

কলিকাতা-১।



আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

পশ্চিমবঙ্গে ৮০টিরও অধিক শাখা আছে



সুবর্ণলতা

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাচূর্ণা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ওই ঘামটাই হলো শেষ উপসর্গ।
দু'দিন দু'রাতিশুর, শব্দ ঘামছে।
হাত থেকে কপাল, কপাল থেকে
সর্বাঙ্গ। মুছে শেষ করা যাচ্ছে না।
তা' হয়, সকলেরই মরণকালে এরকম
হয়।

ওই ঘামটাই যেন জানান দিয়ে বলে
‘পৃথিবীর জীব ছাড়ছে তোমার এবার।’

জৈদী রোগী নিয়ে ভুগেছে এতদিন
সবাই, চিকিৎসা করতে পারে নি সমারোহ
করে, আর এখন তার জৈদ মানা-চলে
না। এখন অভিভাবকদের হাতে এসে
গেছে রোগী। অতএব দু' দিনেই দু'শো
কাশ! যেখানে যত বড় বড় ডাক্তার আছে
সবাইকে এক একবার এনে হাজির কববার
পন নিরেছে যেন ‘সুবর্ণলতা’র ছেলেরা।

কদিন আগেই মানুকে চিঠি লেখা
হয়েছিল ‘শেষ অবস্থা, দেখতে চাও তো
এসো।’ মানুও এসে পড়লো ইতিমধ্যে।
আর চিকিৎসার তোড়জোড়টা সেই বেশি
করলো।

বিরের ব্যাপারে মাকে মনঃক্ষুব্ধ
করেছিল সে বোধটা ছিল একটু। এসে
একেবাবে এমন দেখে বড় বেশি বিচলিত
হবে গেছে। তাই বড় ডাক্তার আনছে।

প্রথমটা অবশ্য প্রবোধ অনুমতি
নিরেছে। সামনে এসে হুমাড়ি খেয়ে
বলেছে, ‘আব জৈদ করে কি হবে স্নেহবোঁ,
চিকিৎসা কবতে দাও? তুমি বিনি
চিকিৎসেয় চলে যাবে, এ আপশেষ রাখবো
কোথায়?’

স্নেহবোঁ ওই ঘামের অবসন্নতার মধ্যেও
যেন হাসে একটু, ‘আপশেষ রাখবার
জায়গা ভেবে কাতর হচ্ছে? তবে তো
জৈদ ছাড়তেই হয়। কিন্তু আর লাভ
কি?’

‘লাভের কথা কি বলা যায়?’
স্নেহবোঁকে এতগুলো কথা বলতে দেখে
যেন ভয়টা কমে ভরসা আসে প্রবোধের।
তা'হলে হয়তো সীতা নিদানকাল নয়,
সাময়িক উপসর্গ! নাড়ী ছেড়ে গিয়েও
বেঁচে যায় কত লোক।

তা'ই ব্যস্ত হয়ে বলে, ‘লাভের কথা
কি বলা যায়? চামড়া ফুড়ে ওষুধ
দেবার যে ব্যবস্থা হয়েছে আজকাল, তাতে
না কি গম্ভীরের মতন কাজ হয়।’

‘চামড়া ফুড়ে?’ সুবর্ণ এবার একটু
স্পষ্ট হাসিই হাসে। নীল হয়ে আসা
ঠোঁটের সেই হাসিটা কোঁতুকে স্বসে
ওঠে, ‘তা' দাও।’

পাওয়া গেল অনুমতি।
অতএব চললো রাজকীয় চিকিৎসা।
পরে আর আপশেষ রাখবার জন্যে
জায়গা ঝুঁজতে হবে না সুবর্ণলতার
স্বামী-পুত্রকে।

শব্দ চিকিৎসাতেই নয়, শেষ দেখা
দেখতে আসার সমারোহও কম হল না।
প্রবোধের তিনকুলে যে যেখানে ছিল
প্রবোধের এই দুঃসময়ের খবরে ছুটে
এল সবাই। খবরদাতা বৃন্দো। কাঁদতে
কাঁদতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এল সে।

স্নেহ জোঠিকে সীতাই বড় ভালবাসতো
ছেলেটা ছেলেবেলার। সময়ের ধুলোর
চাপা পড়ে গিয়েছিল সেই অনুভূতি,
হঠাৎ এই ‘শেষ হয়ে যাচ্ছে’র খবরটা যেন
উড়িয়ে দিয়ে গেছে সেই ধুলো।

তা' বৃন্দো বলেছে বলেই যে সবাই
আসবে, তার মানে ছিল না। বৃন্দো যদি
নিজের মা'র শেষ খবরটা দিয়ে বেড়াতো,
কাজন আসতো?

সুবর্ণলতা বলেই এসেছে।

এটা সুবর্ণলতার ভাণ্ডা বৈ কি।

এত কার হয়?

তা' সুবর্ণলতার দিকে যে ওবা সারা-
জীবন সবাই তাকিয়ে দেখেছে।

ভাণ্ডা সুবর্ণকে মগডালে তুলেছে, অথচ
নিজে সে সেখান থেকে আছড়ে আছড়ে
মাটিতে নেমে এসে ঘূর্ণি ঝড় তুলেছে।
এ একটা আকর্ষণীয় দৃশ্য বৈ কি।

তা'ই তাকিয়েছে সবাই।

আর যার দিকে সারাজীবন তাবিয়ে
থেকেছে, তার তাকানোটা জীবনের
মত বন্ধ হয়ে যাবার সময় দেখাব সাধ
কার না হয়?

আসে নি শব্দ তাদের কেউ, যেখানে
থেকে ‘সুবর্ণ’ নামের একটা স্বাক্ষরকে মোরে
ছটকে এসে এদের এখানে পড়েছিল।
তাদের কে খবর দিতে যাবে? তাদের
কথা কার মনে পড়েছে? কে বলতে পারে
খবর পেলেও আসতো কি না। সেখানে
তো অনেকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে
সুবর্ণের।

কিন্তু প্রবোধের গুণ্ঠিতও তো কম নয়।

তাতেই বিরাম নেই এই দু'দিন।
এসে দাঁড়াচ্ছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিৎকারে রোগিণীকে সম্বোধন করে আপন আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত করে দিতে চাইছে, তাদের জ্ঞানার জগতে মৃত্যুকালে কার কার এমন ঘাম হয়েছিল সেই আলোচনা করছে ঘরে বসে, এবং রোগিণীর জ্ঞান চৈতন্য নেই এই ধরে নিয়ে হা-হুতাশ করছে।

অবশ্য ব্যতিক্রম আছে বৈ কি।
পুরুষেরা সবাই এরকম নয়।
এদিক থেকে খবর নিয়েও বিদায় নিচ্ছে অনেকে।

জিগোস করছে 'কথা কি একেবারে দৃশ্য হবে গেছে!....চোখ কি একেবারে খুলছে না? গগণাজল আছে তো হাতের কাছে? তুলসী গাছ নেই বাড়িতে?'

শুভানুধ্যায়ীই বৈ কথা!

কিন্তু স্বভাব যায় না মলে কথাটা দাঁতি বৈ কি।

নইলে মৃত্যুর হাতে হাত রাখা মানুষ্যতাও কি না কারুর শত ডাকেও চোখ খুলছে না, আবার কারুর একটা ডাকে টেনে টেনে খুলছে চোখ।

ময়লা কাপড় আর ছোঁড়া গেঞ্জিপরা আধবড়ো দুলো যখন কাছে এসে ফুঁপিয়ে বলে উঠলো, 'মেজমামা' তখন তো আবাব কথাও বেরোলো গলা থেকে।

অস্পষ্ট, তবু বোঝা গেল, 'পালাও যাবে।'।

তা' এ অবিশ্যি প্রলাপের কথা।

অমন ভুল কথা, অর্থহীন কথা এক-আধটা বেরোচ্ছে মূখ দিয়ে।

আবার ঠিক কথাও বেরোচ্ছে।

যখন বিবাজের বর এসে মাথার কাছে বসেছিল, আব বিরাজ চোঁচিয়ে বলেছিল, 'মেজবো, দেখ কে এসেছে,' তখন আন্তে আন্তে হাত দু'টো জড় করবার চেষ্টা করে বলেছিল, 'নমোসকার।'।

'ভুল'টা বাড়লো রাগের দিকে।

সারা রাত্তির ধবে কত যেন কথা কইল, কত যেন শপথ কবলো, কাকে যেন কত কি নির্দেশ দিলো।

আবাব এক সময় প্রবোধের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বলে উঠলো, 'ক্ষমা।'।

আর কিছু নয়।

কে বলবে ক্ষমা চাইলো, না ক্ষমা করে গেল।

না সে রহস্য কোনোদিনই ভেদ হবে না।

তবে যাবা কাছে ছিল, তারা ধবেই নিল ক্ষমা চাইলো। অনেক দৌরাশি

তো করছে স্বামীর উপর। জীবনভোরই করেছে। এখন মরণকালে অনুতাপ আসছে।

কিন্তু তারপর এ সব কি কথা বলছে প্রলাপের মধ্যে?

... ..

'বলেছিলাম আর চাই না, আর চাই না, যাবার সময় বলে যাচ্ছি চাই!.....এই দেশেই—চাইব না? শোধ নিতে হবে না?'
কে জানে কি চাইছিল সে, কিসের শোধ দেবার শপথ নিচ্ছিল।

'তা' ও আর খতব কবে কি হবে? প্রলাপ প্রলাপই। ওর আর মানে কি?

সাব্য বাত যমে-মানুষে যুদ্ধ চললো, রাগি শেষে যখন পূর্ব আকাশে দিনের আলোর আভাস দেখা দিবেছে, তখন শেষ হলো সেই যুদ্ধ।

পরাজিত মানুষ হাতের ওষুধের বড়ি আছড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, বিজয়ী যম নিঃশব্দে অদৃশ্যপথে অন্তর্হিত হলো জরলম্ব ঐশ্বর্য বহন করে নিয়ে।

ছাড়িয়ে পড়লো ভোরের আলো।

ভুলে দেওয়া হলো বারান্দা ঘেরা সেই ত্রিপল আর চিকু। দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব কোণ থেকে আলোর বোঝা এসে পড়লো বিছানার ধারে। সে আলো মৃত্যুর কালিমার উপর যেন একটা সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়ে দিলো।

বড় সন্দেহের সমারোহের। যারা দেখলো, বললো—

কিন্তু সে কথা তো আগেই বলা হবে গেছে।

বলা হবে গেছে—

সুদর্শনতার মৃত্যুটা শোকের নয়, অভিনন্দনের।

আর এরপর একটা সমারোহের শ্রাদ্ধ হবে সেটা হয়তো বলবার দরকারই হবে না। মাতৃশ্রাদ্ধ তো শুম্ভ শ্রাদ্ধ নিবেদনই নয়, সেটা যে কৃতী পুত্রদের মান-সম্মানের গাপকাঠি।

আবাব সুদর্শনতার ছেলেদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হা'র সঙ্গে মিশেছে—অবচেতনে লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম ক্ষীণ ব্যাপসা একটুকরো অনুশোচনা।

কে জানে এ সন্দেহ ঠিক না ভুল।

... ..
মান্দ বললো 'এটা হোক। যা খচা লাগে, আমি 'বোঝা' করবো।'

মান্দব দাদাবা বললো 'তা' যদি করতে পাবো আমাদের বলবার কি আছে? ভালোই তো।'

প্রবোধ হাউমাউ করে কেঁদে বললো, 'কর ববা কর তোরা—তাই। আশ্বাটা

শান্তি পাবে তার। এই সবই তো ভাল-বাসতো সে।'

কে জানে মান্দর এই সদিচ্ছা তার অপরাধ বোধকে হাল্কা করে ফেলতে যাওয়া কি না, অথবা অনেকটা দূবে সরে গিয়ে 'মা' সম্পর্কে তার মনের বোঝাগুলো নগনীয় হয়ে গিয়েছিল কি না।

নিত্য সংঘর্ষে 'লানিতে যে ছাঁদনকে খুঁজি ছিন্ন অবমান বলে মনে হন, দু'র পবিত্রশ্রুতিতে সেই জীবনই একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিস্তৃতির মহিমার, ব্যাপ্তির মহিমায়। নিত্যন্ত নিকট থেকে যে আগুন শব্দ দাহ আর উত্তাপের অনুভূতি দেয়, দূরে গেলে সেই আগুনই আলো লেগাব।

দূরত্বই সম্ভ্রম, দূরত্বই প্রত্যয়।

প্রাণের শেষে ওই যে এনলার্জ ফটোখানা দেয়ালে বুললো জীবনম্বর একটি প্রসন্ন হাসি মুখে ফুটিয়ে, ওই ছবিব বংশধরেরা কি কোনদিন সন্দেহ করবে এ হাসিটুকু কেবলমাত্র ফটো-গ্রাফারের ব্যগ্র নির্দেশে ফসল।

মান্দও হয়তো দূবে চলে 'গবে তার মায়ের রক্ত অসমান কোণলুলো ভুমে গিয়ে শুম্ভ স্থির মসৃণ মূর্তিটাই দেখতে পেরেছিল, কিন্তু পেল বড় দৈবতঃ আর তখন কিছু করার ছিল না মান্দর।

তাই মান্দ ভেবে-চিন্তে ওই কথাটাই বললো। কাঙালী খাওয়ানে হোক এই উপলক্ষে।

খরচটা সে একাই বহন করবে।

তবে আর বলার কি আছে? 'যমরু' আর কথাত দুটোবই তার নিত্য।



গৌর মোহন দাস এন্ড কোং

২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,

কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৫৮০

তা' নিল মান্দ।

অতএব সুবর্ণলতার প্রাপ্তি কণ্ঠালী ভোজন হলো। অনেক কাণ্ডালী এল, আহত, রবাহত, অনাহত। কাউকেই বর্ণিত করলো না এরা। আশা করলো সুবর্ণলতার বিগত আত্ম পরিচয় হলো এতে। বিশ্বাস রাখলো ছেলের আশীর্বাদ করছে সুবর্ণলতা আকাশ থেকে।

পরদিন মান্দ চলে গেল বোকে বাপের বাড়ি রেখে দিয়ে। ছুটি ফুরিয়েছে তার।

তার পরের দিন তার বোনেরা, পিসিরা, জ্যেষ্ঠ-খুড়িরা। 'নিয়মভঙ্গ' পর্বন্ত ছিল সবাই, মিটলো তো সবই।

শব্দ পারুল আসে নি এই মহতী উপসবে। পারুলের আসবার উপায় ছিল না।

নিমন্তব্য হয়ে গেল বাড়ি, স্তিমিত হয়ে গেল দিনের প্রবাহ। রোগের বশি থেকে এই পর্বন্ত চলছিল তো উত্তাল বাড়ি। ক্রান্ত মান্দগলো এবার অনেক দিনের ক্রান্তি পুঁথিরে নিতে ঘুমিয়ে নেবে কিছদিন, দুপরে সম্মুখ, যখন তখন।

বকুল ঘুমিয়ে পড়েছিল ভর দুপুরে, জেগে উঠলো পড়ন্ত বেলায়। তাড়াতাড়ি বাকি দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ছুটে চলে এল বারান্দার দিকে।

সহসা যেন একটা অকরণ শূন্যতা গ্রাস করতে এলো বকুলকে। কতদিন ধরে যেন বারান্দাটা ঘেরা ছিল, আঠ তার এক কোণে একটা মৃত্যুশয্যা বিছানো ছিল। বারান্দার আসল চেহারাটা এমন ফাঁকা, তা' ভুলে গিয়েছিল বকুল।

আন্তে ফিরে এল, ছাতে চসে গেল।

দেখলো পশ্চিমের আকাশে বিশাল এক চিতা জ্বলছে। তার আঁশ আভা ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে মাটিতে। মা'র চিতা দেখে নি বকুল, বকুলের শ্মশানে যাবাব প্রশ্ন ওঠে নি। বকুল তাই নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল সেদিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।...যখন... আস্তে আস্তে নিভে গেল সে আগুন, মনে পড়লো তার একদিনের কথা। এই ছাতেই ওই কোণ-টায় আব এক চিতা জ্বলতে দেখেছিল সে। কোনোদিন জানলো না কি ভস্মীভূত হয়েছিল সেদিন।

আজ ঘরের আগে মা'র ফেলে যাওয়া সমস্ত কিছ, তবু তবু করে দেখাছিল বকুল, কোথাও পার নি একটি লাইন হস্তাক্ষর। সুবর্ণলতা যে নিরক্ষর ছিল না, সে পরিচয়টা যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে সুবর্ণলতা।

বকুল ছাতের সেই চিতার কোণটার ধসে রইল অশ্বকারে।

কড়া নাড়ার শব্দে এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিল জগদা।

অবাক হয়ে বললো, 'তুই এই রোদ্দুরে? কার সঙ্গে এসেছিস?'

'কিয়ের সঙ্গে?'

'কিয়ের সঙ্গে একা এলি তুই? বলিস কি? খুব সাহস আছে তো? কিন্তু কেন বলতো হঠাৎ?'

বকুল আস্তে বলে, 'জ্যাঠামশাই, আপনাদের প্রেসটা দেখতে এলাম।'

'প্রেসটা? আমার প্রেসটা? এখন দেখতে এলি তুই?' হা হা করে হেসে ওঠে জগদ, অথচ বকুলের মনে হয় বড়ো-মানুষটা যেন কে'দে উঠলো 'হা হা' করে। কিন্তু হাসিই। হাসি থামিয়ে জগদ কথাটা শেষ করে 'প্রেস' আর নেই, 'প্রেস' ভুলে দিয়েছি।'

'ভুলে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ও ভুলে দেওয়াই ভালো,' জগদ হঠাৎ অন্যদিকে মৃদু ঘুরিয়ে দাঁড়ায়, জোরে জোরে বলে, 'কে অত ঝামেলা পোহায়। ওই যে ঘরখানা শূন্য পড়ে আছে দাঁত খিচিয়ে।'

বকুল মহত্ব করেক স্তম্ভ থেকে বলে, 'আজ্ঞা জ্যাঠামশাই, যে সব বই ছাপা হয়, তার পান্ডুলিপিগুলো কি সব ফেলে দেওয়া হয়?'

জগদ সন্দ্বিষ্ট গলায় বলে, 'কেন বল দিকি?'

'এমনি, জানতে ইচ্ছে করছে।'

জগদ তেমনি গলাতেই বলে 'এমনিই

না তোর, ইয়ে তোর মা'র সেই খাতাটা খুঁজতে এসেছিস?'

'না এমনি। বলুন না আপনি! থাকে সে সব?'

'থাকে, ছিল—' জগদ হঠাৎ চোঁচিয়ে ওঠে, 'গুদোম ঘরে সব ডাই করা পড়েছিল। আদি সন্তকালের সব। ওই ব্যাটা নিতাই, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুঁথি-ছিলাম আমি, প্রেস' উঠিয়ে দিলাম দেখেই য়েখানে যা ছিল কে'টিয়ে শিশি-বাতল-গুদোকে বেচে দিয়েছে। শুনোছিস কখনো এমন কান্ড? দেখেছিস এমন চামার? আমিও তেমনি। দিয়েছি দু'র করে। আর হোক দিকিনি এ মৃত্যো!...আর বসবি আর!'

'না থাক, আজ যাই।'

'সে কি রে? এই এলি রোদ ভেঙে, বসবি না?'

'আর একদিন আসবো জ্যাঠামশাই।' হে'ট হয়ে প্রণাম করে বকুল জ্যাঠাকে।

জগদ ব্যস্ত হয়ে সরে দাঁড়ায়, 'থাক থাক। বড়ি ঘুমোছে দেখা হল না।'

বকুল উঠানে নামে ভুলে ভুলে আরও একবার প্রণাম করে জ্যাঠাকে, তারপরে বলে, 'খাচ্ছি তবে।'

'খাচ্ছিস। চল না হয় আমিই একটা এগিয়ে দিই—'

'না না-দরকার নেই। আপনি বড়ো-মানুষ এই রোদ্দুরে—'

'তবে যা সাবধানে যাস।'

'আপনি বড়োমানুষ—এই অপমান-গারে মেখেও দাঁড়িয়েই থাকে জগদ দরজায়। দরজার শেকলটা টেনে দিয়ে বোরিয়ে পড়ে না সঙ্গে সঙ্গে গট গট করে। তার মানে বকুলের কথাই ঠিক। বড়ো হয়ে গেছে জগদ।

বকুল রাস্তার নামে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাকি সেই দাঁত-খি'চানো ঘরটার উদ্দেশ্যেই মনে মনে একটা প্রণাম জানিয়ে মনে মনেই বলে, 'মা, মাগো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, লেখা, না-লেখা, সব কথা আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোর পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অশ্বকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।'

যদি সে পৃথিবী শূন্যতে না চায়, যদি অবজার চোখে তাকায়, বুকবো আলোটা তার আলো নয়, মিথ্যা জৌলুদের ছলনা। অগশোধের শিক্ষা হয় নি তার এখনো।

সামনের রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে যায় বকুল, পিছ পিছ আসা 'দেহ-রক্ষণী'র কথা ভুলে গিয়ে।

[সমাপ্ত]

‘জুলাবি চা’

তাজা ও সেরা। একবার
থয়ে দেখুন।

৪৬নং ক্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
(পার্ক স্ট্রীট থেকে যাত্র ৩ মিনিটের
পথ)।

বিশ্বজ্যোতিষের

প্রাদীপ

ডঃ নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২০৮

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা অশ্বঘোষ, ভাস্কর ও শূরসেনের নাটকগুলির আলোচনা করেছি। এর পরেই আসছে কালিদাসের কথা। ইংল্যান্ডের শেক্সপীয়ারের মতই কালিদাস একটি রহস্যময় জীবন ও জীবনকাল সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছুই বলা সম্ভবপর নয়। কালিদাসের জীবন সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন কালিদাস প্রথম জীবনে গুরু ছিলেন পরে দেবীর কৃপায় সর্বাধিকারী হন এবং তিনি সিংহলে জনৈক গণিকার গৃহে পরলোকগমন করেন। তিনি নাকি রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার একজন সদস্য ছিলেন, ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকমহলেও কালিদাস সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। সেগুণ্ডির মধ্যে আপাতত প্রবেশ না করে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তিনি গুপ্তবংশীয় সম্রাট শিবতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন ছিলেন, সেই হিসাবে তাঁকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে স্থান দেওয়া যায়। কালিদাসের রচনাবলী থেকে এটুকু প্রতীয়মান হয় যে তিনি অশ্বঘোষের বচনাবলী এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ৪৭০ খ্রিস্টাব্দের মাল্লাসোর লেখমালায় কালিদাসের রচনাবলীর কিছুটা পরোক্ষ প্রভাব আছে। তাঁর রচনাবলী পাঠ করে এটুকু বোঝা যায় যে ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে তিনি শৈব ছিলেন এবং তিনি ভারতের বহুস্থান পৰ্যটন করেছিলেন।

কালিদাসের নাটকরত্ন

কালিদাস ছিলেন একই সঙ্গে কবি ও নাট্যকার। কবি হিসাবে তাঁর পরিচয় আমরা পূর্ববর্তী নিবন্ধে উল্লেখ করব। এখানে তাঁর নাট্যকবিতার আলোচিত হবে।

কালিদাসের সর্বাধিক বিখ্যাত নাটক হচ্ছে **শকুন্তলা** এবং এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যান অবলম্বনে কালিদাস এই নাটক রচনা করেছেন। তবে তিনি অম্বভাবে মহাভারতকে অনুসরণ করেন নি বহুস্থলেই তিনি নিজস্ব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। মহাভারতে আছে রাজা দ্রুপদেবের সঙ্গে শকুন্তলার পরিচয় হয়েছিল যখন শকুন্তলার পালক পিতা কণ্ণবর্মণ ফুল তোলার জন্য আগ্রাসের বাইরে গেছিলেন। কিন্তু কালিদাস তাঁকে দীর্ঘদিনের জন্য কার্যপালকে আগ্রাসের বাইরে পাঠিয়েছেন। মহাভারতে শকুন্তলা নিজের পরিচয় ও জন্মকাহিনী নিজেই দ্রুপদেব নিকট বলেছেন, কিন্তু কালিদাসের নাটকে তা অনুসূর্য্যাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলা ও দ্রুপদেবের প্রেমের মধ্যে কিছুটা দূর কবিতার চিহ্ন আছে, কিন্তু এ সমস্ত কালিদাসে অনুপস্থিত। দ্রুপদাসার অভিলাষ, শকুন্তলাব অঙ্গুরী হারিয়ে যাবার কাহিনী, মাহের পেট থেকে তাব উদ্ধার এবং নাটকের শেষ অঙ্কে কালিদাসের মৌলিক সৃষ্টি। বিভিন্ন ঘট-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কালিদাস মধুরভাবে নাটকের পরিণতি টেনেছেন। এ ছাড়া নাটকটির সর্বাঙ্গ জুড়ে আছে প্রকৃতির প্রতি নাট্যকারের অসীম ভালবাসা ও সংলাপের কাব্যময়তা। ভুললে চলবে না যে কালিদাস একজন মহাকবি ছিলেন। এই সব কারণে পাণ্ডিত্যের শকুন্তলাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের মধ্যে অন্যতম বলে ঘোষণা করেছেন।

শকুন্তলার পরেই উল্লেখ করতে হয় কালিদাসের **মালবিকাগ্নিমিত্রের** কথা। সম্ভবত এই নাটকটি কালিদাসের প্রথম রচনা। নাটকের কাহিনীটি নিম্নরূপ : নাটকের নায়িকা মালবিকা ছিলেন বিদর্ভ দেশের রাজকন্যা, এবং তিনি ছিলেন **মদনরাজ** অগ্নিমিত্রের ভাবী বধূ। কিন্তু

শত্রুহস্তে মালবিকার ভ্রাতা **মাধব সেন** বন্দী হলে মালবিকা অগ্নিমিত্রের সম্মানে বিদিশার দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথে পুনরায় এক দস্যুদলের হাতে বন্দী হন। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেও পলায়ন করে তিনি বিদিশার উপস্থিত হন এবং অগ্নিমিত্রের অন্যতম পত্নী ধারিণীর গৃহে গরিচারিকারূপে আশ্রয়লাভ করেন। সেখানে খুব সহজেই তিনি রাজা অগ্নিমিত্রের দৃষ্টিপথে পড়ে যান, এবং উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয়ের সঞ্চার হয়। অগ্নিমিত্রের প্রথমা পত্নী ধারিণী অবশ্য ব্যাপারটাকে মেনে নেন, কিন্তু অশান্তি আসে কনিষ্ঠা পত্নী ইরাবতীর দিত থেকে। এইভাবে অন্তঃপুরে শত্রু হয় একটি চক্রান্তের খেলা। শেষ পর্যন্ত এমন দুটি ঘটনা ঘটে যাতে অগ্নিমিত্রের স্ত্রী মালবিকার মিলনের পথ সুগম হয়ে যায়। বিদর্ভ থেকে সংবাদ আসে যে, মালবিকার ভ্রাতা মাধব সেন শত্রুর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে পুনরায় সিংহাসনে আসীন হতে পেরেছেন, এবং অগ্নিমিত্রের পিতা পূর্বমিত্র যবনদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। সেই উপলক্ষে জনা গেল যে মালবিকা আসলে দাসী নয়, বিদর্ভরাজকন্যা। বিষয়টির মধুর সমাপ্তি ঘটল। এই নাটকে চরিত্রের সংখ্যা অল্প, এবং পূর্বমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্র নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক চরিত্র। ওই নামের রাজারা শূরবংশীয় ছিলেন এবং মগধে রাজত্ব করেছিলেন। কালিদাসের প্রথম নাটক হিসাবে কিছু গুটিও এখানে আছে। এই নাটকে সবচেয়ে বেশি যে চরিত্রটি প্রস্ফুটিত তা হল বিদ্যকের চরিত্র। প্রেমের বিষয় সেই অগ্নিমিত্রের প্রধান মন্ত্রণাতা, এবং ঘটনাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার তাব অবদান অনেকখানি।

কালিদাসের শেষ নাটকটি হচ্ছে **বিক্রমোর্বশী**। শকুন্তলাব মত সর্বজন-সুন্দর না হলেও সুপরিপক্ব লেখনীর

প্রভাব এই নাটকের সর্বত্র। উর্বশী ও পুরুষবীর প্রেম-কাহিনী রীতিমত পুরাতন। এই কাহিনীর আদি উৎস পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। সেখানে ছিল স্বর্ণকন্যা উর্বশীর সঙ্গে মর্ত্যের মানব পুরুষবীর প্রেম ও বিচ্ছেদের কথা। পুরুষবীরকালে সাহিত্যে এমন কি পুরাণ-কল্পেও এই কাহিনীটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস কোথা থেকে এই রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন সে কথা বলা শ্রুতই কঠিন তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শেষ অংকটি কালিদাসের মৌলিক সৃষ্টি। স্বর্ণনটী উর্বশী স্বর্ণের অজস্র সূত্রে মধ্য বাস করেও পুরুষবীর প্রেমকে ভুলতে পারে নি, কেন না এই পুরুষবীর তাকে অসুরদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং মর্ত্যবাসীর অক্ষুণ্ণ প্রেমের আশ্বাদ দিয়েছিলেন যা স্বর্ণনটীর রূপনার অর্জিত ছিল। স্বর্ণে একটি নাটকের অভিনয় হাঙ্কিল বার নাম লক্ষ্মী-বন্দ্যবর। সেই নাটকে নাট্যকার ভূমিকার অভিনয় করার সময়ে উর্বশীর মূখ থেকে 'পুরুষোত্তমের' স্থলে 'পুরুষবা' কথাটি বোঁকিয়ে যায়। এই অপরাধে তাকে পৃথিবীতে নির্বাসিত হতে হয় এবং দেবতারা এই বিধান দেন যে সেখানে উর্বশীর একটি সন্তান হবার পর তাকে আবার স্বর্ণে ফিরে আসতে হবে। এদিকে পৃথিবীতে পুরুষবীর সাহচর্যে উর্বশীর দিনগুলি পরম সুখেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু পুত্রের মৃদুদর্শনের পর অনিবার্য বিচ্ছেদ উভয়ের জীবনে নেমে আসে। এখানে কালিদাস যে চিত্র এঁকেছেন তা বাস্তবিকই মর্মস্পর্শী। অবশ্য শেষ পর্বতে বিচ্ছেদ হয় নি কেন না অসুরদের সঙ্গে লড়াই-এ রাজা পুরুষবীর সাহায্য দেবতাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন ছিল।

হর্ষ

কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের কবি ও নাট্যকাররূপে খ্যাতি ছিল, এবং তিনিই বিখ্যাত নাটক তাঁর নামে প্রচলিত আছে। সেই তিনিই নাটক হল রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা এবং নাগানন্দ।

রাজ-অন্তঃপুত্রের প্রেমকে বিষয়বস্তু করে প্রথম দু'টি নাটক রচিত হয়েছে। রত্নাবলী নাটকের নায়ক হচ্ছেন সেই রাজা উদয়ন যিনি ভাসের দু'টি নাটকের নায়ক। রাজা উদয়নের সঙ্গে সিংহল রাজকুমারী রত্নাবলীর প্রণয়-কাহিনীই এতে বর্ণিত হয়েছে। মন্ত্রী যোগেশ্বরায়ণের ব্রহ্মস্বতায় সিংহলের রাজা উদয়নের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে রাজ্য হন, এবং কন্যা রত্নাবলীকে জাহাজে করে পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু সমুদ্রে সেই জাহাজ ডুবে যায় এবং কৌশাম্বী রাজ্যের জনৈক বণিক তাকে উদ্ধার করে রাজ-অন্তঃপুত্রের রাণী বাসবদত্তার কাছে সমর্পণ করে। রত্নাবলী সেখানে সাগরিকা নামে বাস করতে থাকে। রাণী অবশ্য তাকে সর্বদাই রাজ্যের কাছ থেকে আড়াল করে রাখেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্যের (এখানে বঙ্গ-দেশের রাজা উদয়নকে বঙ্গ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে) সঙ্গে সাগরিকার গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই কার্যে রাজ্যের বিদূষক রাজ্যের মন্তব্য সহায় ছিল। সব জানতে পেয়ে রাণী বাসবদত্তা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং সাগরিকাকে বন্দী করে রাখেন। শেষ পর্বতে সাগরিকার আসল পরিচয় পাওয়া যায়, জাহাজডুবির সমুদ্র যারা তার সঙ্গে ছিল তারা রাজসভায় এসে সাগরিকার আসল পরিচয় ব্যক্ত করে—যে সে সিংহল রাজকন্যা, রত্নাবলী। এদিকে রত্নাবলী আবার সম্পর্কে রাণী বাসবদত্তার নিজের মাসভুতো বোন। কাজেই রাণীও রাজ্যের সঙ্গে রত্নাবলীর বিবাহে কোন আপত্তি করেন না।

প্রিয়দর্শিকার কাহিনীও রত্নাবলীর অনুরূপ। এখানেও নায়ক সেই একই ব্যক্তি, রাজা উদয়ন, যিনি নাটকে বঙ্গ নামেই পরিচিত। তাঁর সঙ্গে অপরাজিত দু'বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকার বিবাহ হবার কথা ছিল, এবং সেই অনুযায়ী তাকে অঙ্গদেশ থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল রাজা বঙ্গের রাজধানী অভিমুখে। কিন্তু পৃথিবীতে কলিঙ্গরাজ অঙ্গরাজ্যেব সৈন্যদের আক্রমণ করে এবং প্রিয়দর্শিকাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এদিকে রাজা বঙ্গের জনৈক সেনাপতি কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করে প্রিয়দর্শিকাকে উদ্ধার করেন এবং প্রিয়দর্শিকা রাজা বঙ্গের অন্তঃপুত্রের রাণী বাসবদত্তার আশ্রয় পায়। পরের ঘটনা সর্বত্রই রত্নাবলীর অনুরূপ। রাজা প্রিয়দর্শিকার রূপে মৃদু হন এবং তাই নিয়ে রাণী বাসবদত্তার সঙ্গে রাজ্যের মনোমালিন্য, অন্তঃপুত্রের ষড়যন্ত্র, বিদূষকের নানান বুদ্ধির প্রয়োগ ইত্যাদি বহু ঘটনা এই নাটকে স্থান পেয়েছে। রাণী বাসবদত্তা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রিয়দর্শিকাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রাজ-অন্তঃপুত্রের প্রিয়দর্শিকা আরণ্যকা নামে পরিচিত ছিল এবং তার আসল পরিচয় কেউ জানত না। পরে তার পরিচয় প্রকাশ পায় এবং এও জানা যায় যে প্রিয়দর্শিকা রাণী বাসবদত্তার মাতুল কন্যা। ফলে রাজ্যের সঙ্গে তার সহজেই বিবাহ হয়ে যায়।

হর্ষের তৃতীয় নাটক নাগানন্দের কাহিনী অবশ্য ভিন্ন ধরণের। এই নাটকের কাহিনী কথাসরিংসাহার গ্রন্থের জীমূত-

বাহনের কাহিনীর অনুরূপ। জীমূত-বাহন ছিলেন বিদ্যাধরদের রাজা। অত্যন্ত দানশীল পরোপকারী এই রাজা নিজ রাজ্য থেকে স্বেচ্ছানিবাসন নিয়ে একটি পর্বতে বাস করছিলেন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করলেন যে পক্ষীরাজ গরুড় নাগরাজ বাসুকি প্রেরিত একটি করে নাগ ভক্ষণ করে যায়, কেন না গরুড়ের সঙ্গে সম্পর্কাত্মক এইরকমই একটা বোঝাপড়া ছিল। এই নিষ্ঠুরতা বন্ধ করার জন্য জীমূত-বাহন একদিন নিজেরই দেহ গরুড়কে উৎসর্গ করলেন, এবং গরুড়ও তাঁকে চিনতে না পেয়ে ভক্ষণ কবতে আরম্ভ করল। জীমূতবাহনের এই অদ্ভুত আশ্চর্য্য দেখে দেবতারাও স্থির থাকতে পারলেন না। স্বয়ং গৌরী এসে জীমূতবাহনকে নব-কলেবর দান করলেন। গরুড়ও ভুল বুদ্ধিতে পেয়ে তাঁর ক্রমাগতই হল এবং হিংসা ত্যাগ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। স্পষ্টতই এই নাটকে বৌদ্ধ ধর্মীর আদর্শসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে নাটকের পাঠ-পাঠীদের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীও আছেন।

মহারাজ হর্ষবর্ধন, সত্যই এই নাটক-গুলির রচয়িতা কি না তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। হর্ষের সভাসদদের মধ্যে অনেক বড় বড় কবি, পণ্ডিত ও নাট্যকার ছিলেন। তাঁদেরই কাউকে দিয়ে হর্ষ এই নাটকগুলি লিখিয়েছেন এই অভিযোগ অনেকেই করেছেন। কিন্তু হর্ষের পক্ষে সাহিত্যিক হতে বাধা কি ছিল? হর্ষের জীবনীকার বাণভট্ট হর্ষের কবিত্বাতির উল্লেখ করেছেন। এমন কি সপ্তম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক হুই-সিং লিখেছেন যে তিনি শিলাদিত্য (হর্ষের উপাধি) রচিত বোধিসত্ত্ব জীমূতবাহনের (নাগানন্দ) কাহিনী মণ্ডস্থ হতে দেখেছেন।

ভবভূতি

কালিদাসের উত্তবঙ্গীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ভবভূতির নাম। তাঁর অপর নাম ছিল শ্রীকণ্ঠ, উপাধি ছিল উড়ুম্বর; পিতা নীলকণ্ঠ মাতা জাতুকণ্ঠী, জন্মস্থান বিদর্ভের পশ্চিমপূর্ব। ভবভূতি অষ্টম শতকের প্রথম দিকের লোক।

ভবভূতি মোট তিনটি নাটক লিখেছিলেন, যোগুলির মধ্যে দু'টি নাটকের কাহিনী বামায়ণ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, এবং তৃতীয়টি একটি সামাজিক নাটক, দশ অঙ্কে বিচিত্র একটি প্রকরণ। তাঁর প্রথম নাটকটির নাম মহাবীরচরিত, সাত অঙ্কে রচিত এই নাটকটিতে রামচন্দ্রের প্রথম জীবন, বিশেষ করে তাঁর যোদ্ধা-

জীবনীটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁর মিতব্যয়ী নাটকটি, যা তিনি সর্বশেষে রচনা করেছিলেন, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে পরিচিত। এই নাটকটির নাম উত্তররামচরিত, যা পূর্ববর্তী নাটকটির মতই সাত অঙ্কে রচিত। এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের কাহিনী। রাবণ বিজয়ের পর রাম অযোধ্যায় ফিরে আসার পর যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল, যেমন সীতা পরিত্যাগ ইত্যাদি। ভবভূতির তৃতীয় নাটকটি হচ্ছে মালতী-মাধব। নায়ক মাধব ও নায়িকা মালতীর প্রেমই হচ্ছে এই নাটকের বিষয়বস্তু। বস্তুত এই নাটকটি সংস্কৃত 'রোমিও-জুলিয়েট' অবশ্য পরিণতির দিক থেকে মিলনাত্মক।

যদিও ভাষা, বর্ণনা ও রচনাশৈলীর দিক থেকে কালিদাস অনন্য তথাপি পাণ্ডুরামের নোভাবসমূহের নিখুঁত বর্ণনার ভবভূতি কালিদাসকেও ছাপিয়ে গেছেন, বিশেষ করে করুণরসের ক্ষেত্রে ভবভূতি অমিত্যয়ী। তবে ভবভূতির ভাষা অলংকারবহুল। কালিদাসের সারল্য তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। তদুপরি তাঁর রচনায় হাস্যরসের একান্তই অভাব, সকল সংস্কৃত নাটকের বাধাধরা বিদুষক চরিত্রটিকে ভবভূতি একেবারেই নিবাসিত করেছেন। ভবভূতির উত্তররামচরিতের বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর পূর্বে আরও একজন একটি নাটক লিখেছিলেন যার নাম ধীরনাগ। সম্ভবত তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের লোক ছিলেন।

ভট্টনারায়ণ, বিশাখদত্ত এবং অন্যান্য নাট্যকারগণ

ভট্টনারায়ণ ও বিশাখদত্ত উভয়েই ছিলেন অষ্টম শতকের গোড়ার দিকের লোক। ভট্টনারায়ণের একটি নাটকই এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, নাম বৈশাল্যহার। এই নাটকের কাহিনী মহাভারত থেকে সংগৃহীত হয়েছে, নায়ক হচ্ছেন ভীম, দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণই এই নাটকের বিষয়বস্তু। এই নাটকটির ক্ষেত্রে যে কথটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য তা' হচ্ছে এই যে নাটকটি সম্পূর্ণভাবে বীররস-আশ্রয়ী।

বিশাখদত্ত বা বিশাখদেব মৃচ্ছকটিক সন্নিহিত শব্দটির মতই মৌলিক দাবি করতে পারেন তাঁর বাস্তবধর্মী নাটক মদ্রারাক্ষসের জন্য। এই নাটকের পটভূমিকা সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক ও ইতিহাস-আশ্রয়ী। এতে বর্ণিত হয়েছে মগধের নন্দবংশীয় রাজগণের পতন এবং মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়। এই নাটকে

কোন উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র নেই, এবং প্রেমপ্রসঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত।

রাজা যশোবর্মণ রচিত রামায়ণের একটি ছয় অঙ্কের নাটক, সম্ভবত রামচন্দ্রের জীবনকথা অবলম্বনে রচিত। এই নাটকটির কোন পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি তবে আনন্দবর্ধনের ধন্যলোক এবং দশরথপুত্র, নাট্যদর্পণ নাটকলক্ষণ-রসকোষ শৃংগারপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই নাটকটি উল্লিখিত হয়েছে। এই নাটকের রচয়িতা যশোবর্মণ ছিলেন সম্ভবত কান্যকুব্জের রাজা, যিনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন ৭০৬ খৃষ্টাব্দে।

আরও কয়েকজন রাজা নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন যাদের মধ্যে সর্বাঙ্গে নাম করতে হয় পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্মণের। ইনি ৬০০ থেকে ৬৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন। মহেন্দ্র বর্মণ যা রচনা করেছিলেন তা' হচ্ছে একটি প্রহসন, নাম মন্ডবিলাস। এই প্রহসনে তিনি তদানীন্তন বৌদ্ধ ও শৈব সন্ন্যাসীদের কয়েকটি আচরণের প্রতি শাণিত বিদ্রুপাণ বর্ষণ করেছিলেন।

কলচুরিয়ারাজ নরেন্দ্রবর্ধনের পুত্র অনঙ্গ-হর্ষ মাত্ররাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের লোক ছিলেন। অভিনবগুপ্তের রচনাবলী থেকে তাঁর রচিত দুটি নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়, একটির নাম চন্দ্ররাজব যা রামায়ণ অবলম্বনে রচিত, স্থপরিচয় নাম জাপস-বৃন্দরাজ যা উদয়ন বসবদত্তা ও পদ্মবতীর দ্বিকোণ প্রেমের বৈ পদ্রাতন কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

চালুক্যরাজ মিত্যয়ী পুত্র-কর্ণী বা বিজয়-ভট্টারিকা রচিত কৌমুদী-মহেন্দ্রব নামক নাটকের কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মগধরাজ সন্দ্রবর্মার পালিত পুত্র চন্দ্রসেন কিভাবে লিচ্ছবিদের সহায়তায় পালক-পিতাকে বধ করে সিংহাসনে আসীন হয়েছিল, সেই কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক ভাবা- এই চন্দ্রসেনকে গুপ্তবংশীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে আভিন্ন মনে করেন, কিন্তু এব কোন কাণ নেই।

খৃষ্টীয় নবম শতকে অর্থাৎ একজন শক্তিমান নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছিল যার নাম রাজশেখর। এ'ব রচিত চাবখানি নাটক পাওয়া গেছে—বিশ্বকলভাঙ্গিকা,

By Profs. S. Basu, B. E. & S. Mukherjee M.A.

1. B. E. College, Shibpur, Durgapur, Jalpaiguri, Jadavpur etc. 7 years Ques. & Ans. up to 1966. Extra Gen. Knowledge. Essays, Interview etc. F s. 8:50 Science in Bengali. Es. 4:50
2. I. I. T. Kharagpur, Kanpur, Bombay, Madras, Delhi etc. previous 7 years Ques. & Ans. up to 1966, Extra Gen. Knowledge, 55 Essays, Precis, Interview etc. Rs. 7:50. Current Affairs ... 50.
3. Special Class Rly. Apprentice Selection Guide Rs. 7:50
4. Marine Engg. Guide, Calcutta & Bombay R. 8:50.
5. B. O. A. T. Admission Guide ... 9:50.
6. Do Final Questions ... Rs. 5.
7. Master guide to Rly. Service Trainy Guard, Train Clerk etc. 9 years Ques. & Ans. etc. Rs. 3:50, with a separate Booklet for Current Affairs. Rs. 4:00
8. Guide : Murshidabad Technology R: 5:00.
- A. M. I. E. Sec. A, Previous 5 years' Question & Ans. (10 Terms) of all Subjects. Price list on request.

রূপসাধনা, ব্যায়াম ও চরিত্র গঠন

নারীর গায়ের বর্ণ, নাক, মূখ, চুল, বক্ষ ও সর্বশেষের শ্রীবিশিষ্ট করিতে এ বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করুন। লিপিভুক্ত বস্তু প্রণীত ২৫ খানা চিত্র সম্বলিত। ৪ ৫০

ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সী

২ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জনবৈরী

প্রদীপ চক্রবর্তী

চারিপাশে দৃষ্টচক্র, তার চর। ওৎ পেতে আছে
তীক্ষ্ণ নখ, লুপ্ত দাঁত, ভেদবুদ্ধি। তবু ছদ্মবেশ
নিরে চীৎকার করছে কর্ণভেদী স্বদেশ, স্বদেশ।
তারা হঠাৎ হারিয়ে রাজ্য সাম্রাজ্যবাদীর কাছে।
সর্বস্ব মটগেজ দেবে বলে আশ্বসুখে নাচে।
এবং বিবর থেকে বের হয়ে করছে প্রবেশ
কেউ ধর্মীর মর্শ্বেরে। এমন কি জঘন্য বিশেষ
ছড়াচ্ছে জাতির নামে জনবৈরী আনাচে-কানাচে।

হত্যায় রক্তাক্ত হাত করবে তারা কিভাবে গোপন?
কোথায় লুকোবে তারা লুপ্তিত সম্পদ, ঐ প্রাসাদ?
আমরা করবো না আর ছল। মানুষ, সত্যক শ্বেকো।
নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে সাপ, সবে যে-বীজ বপন
করেছি আমরা, তার অক্ষুরিত মহীরুহে হাত
কে দেয়? রক্তাক্ত হাত পড়ে যাবে জলন্ত শিখার।

কর্ণমঞ্জরী, বালরামায়ণ ও বালভারত।
প্রথম নাটকটি রঙ্গাবলীর বিশুদ্ধ অনুকরণ,
দ্বিতীয় নাটকটির বিশেষত্ব এই যে নাটকটি
আগাগোড়া প্রাকৃত রচিত, তৃতীয় ও চতুর্থ
নাটক দুটি যথাক্রমে রামায়ণ ও মহা-
ভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে।
একাদশ শতকের বিখ্যাত নাট্যকার কুঙ্ক-
মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকটি রূপক-
ধর্মিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। গাপ, পুণ্য,
সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি বিমূর্ত ভাবসমূহ এই
নাটকের পাত্রপাত্রী। বেদান্তদর্শনের গৌরব-
গান করাই এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত নাট্যমণ্ডলের কয়েকটি দিক

মঙ্গলাচরণ—প্রতিটি সংস্কৃত নাটকই
কোন কোন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনার
পর অভিনীত হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে
শিব বা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা
হত। নাগানন্দ নাটকে অবশ্য বৃক্ষকে
বন্দনা করা হয়েছে। এই প্রার্থনাকে বলা
হত নান্দী, এটি আবৃত্তি করত মণ্ডের
ম্যানেজার বা সূত্রধার। আরও আগের যুগে
একটু জমকালো ধরনের অনুষ্ঠান করা
হত যার নাম ছিল পূর্বরঙ্গ।

প্রস্তাবনা—অতঃপর সূত্রধার নটনটীদের
মধ্যে নিয়ে এসে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয়
করিয়ে দিয়ে অভিনয়ের সাফল্যের জন্য
দর্শকদের অগ্রিম শ্রুতজ্ঞা চাইত। এই রীতি
গ্রীক মণ্ডেও ছিল।

অঙ্ক—এক-একটি অঙ্ক যেন নাটকের
এক-একটি অধ্যায়। সকল অভিনেতার মণ্ড

থেকে নিষ্কাশিত হয়ে গেলেই একটি অঙ্কের
সমাপ্তি হয়েছে এই রকম মনে করা হত।
দুটি অঙ্কের বিরতিকালকে বলা হত
বিশ্রাম বা প্রবেশক, ক্ষেত্রবিশেষে
এই সময় একজন বক্তা নাটকের কাহিনীর
সূত্রটি অঙ্কের রাখার জন্য কাহিনীর
কিছু অংশ স্বমুখে বিবৃত করত।

অভিনয়—পাত্রপাত্রীদের বিভিন্ন মনো-
ভাবসমূহকে মূলত আটটি ভাগ করা
হয়েছে। এইগুলিকে বলা হয়েছে রস। এই-
দিক থেকে বিচার করলে বিভিন্ন রসের
প্রয়োগ কয়েকটি নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ
বাঁধা থাকত। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর
পক্ষে তার বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না।
মণ্ডে কখনোই যুদ্ধের দৃশ্য বা মৃত্যুর
দৃশ্য দেখানো হত না। আর কোন
নাটকই বিরোগান্ত ছিল না।

ভাষা—স্বগতোক্তি ক্রেত্রে, জমজমাট
প্রেমের বৃণ্যে বা আবেগদীপ্ত অংশসমূহে
সাধারণত ছন্দোবদ্ধ সংলাপ ব্যবহার করা
হত, অবশিষ্ট ক্ষেত্রে সাধারণ গদ্যেই পাত্র-
পাত্রীরা সংলাপ বলত। উচ্চবর্ণের চরিত্ররা
সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলত, পক্ষান্তরে
যেখানে পাত্রপাত্রী একান্তই সাধারণ মানুষ,
তাদের সংলাপের ভাষা ছিল প্রাকৃত।
সংস্কৃত নাটকে তিন প্রকার প্রাকৃতের
ব্যবহার ছিল—শৌরসেনী, মহারাম্ভরী ও
মাগধী।

চরিত্র—সংস্কৃত নাটকের চরিত্রসমূহ
মূলত মানুষ, দেবতা ও অর্ধদেবতা,
অসুরা, গন্ধর্ব ইত্যাদি নিয়ে রচিত হত।
কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাসবিখ্যাত

পুরুষেরা নায়ক হয়েছেন (যেমন মদ্রা-
রাক্ষসে), কোথাও বা সাধারণ মানুষ
(যেমন মুচ্ছকটিকে)। নায়িকারা দু'ভাগে
বিভক্ত—বয়স ও বারংগনা। রোমান্টিক
নায়কেরা বেশির ভাগই পূর্ব থেকে
বিবাহিত, কিন্তু তার জন্য কুমারী
নায়িকাদের সঙ্গে প্রেম আটকাত না।
কয়েকটি বাঁধা চরিত্র প্রতিটি নাটকেই
থাকত, যথা বিদুষক, বিট এবং শকার।
বিদুষকদের সঙ্গে শেস্তপীয়ারের ক্লাউনের
তুলনা করা যায়, এরা নায়কের বিশ্বস্ত
সহচর, বুদ্ধিদাতা এবং নায়িকার সঙ্গে
নায়কের মিলনের মধ্যস্থ। বিট হচ্ছে রাজ-
সভার সাধারণ ভাড়ি। শকার হচ্ছে রাজ্যের
শ্যালিক কোন গোঁণ পত্নীর দ্রাড়া। এদের
কাঙ্ক্ষা ছিল রাজসভার বসে থাকা এবং
মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে গরম গরম কথুতা
করা। এদের ভূমিকার দর্শকেরা আনন্দ
পেত।

মণ্ড—বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষেই নাটক
মণ্ডস্থ হত, কাজেই কোন বাঁধাধরা মণ্ড
ছিল না। যে কোন একটা হলঘরেই অভিনয়
করা চলত। মণ্ডে পদার ব্যবহার ছিল
(অগ্নি-ক্ষেপণ)। হাতে আঁকা দৃশ্যাবলীও
ব্যবহৃত হত। সাজবস্ত্র থাকত মণ্ডের পিছনে,
যার নাম ছিল লেশখা। রাজসভাঘর,
তপোবন ইত্যাদির দৃশ্যাবলী ঘরসহকারেই
প্রস্তুত করা হত। বাস্তব অবস্থা দেখানোর
জন্য মণ্ডে এমন কি রথ পর্যন্ত নিয়ে
যাওয়া হত। নায়ক-নায়িকাদের পোষাক-
পরিচ্ছদ, মেক-আপ প্রভৃতির ওপরেও
যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হত।

স্টেজে পতন : স্টেজে পড়ে যাওয়া ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়। তবে পড়বার আগে সমস্ত শরীরটাকে বিলম্ব করে নিতে হবে—তাহলেই পড়বার ফলে শরীরের কোথাও কোন ব্যথা লাগবে না। নিচের ছবি অনুসারে পাঁচটি অবস্থার ভেতর দিয়ে গেলেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে।

১। প্রথমে শরীর আলগা করে পেছনে দুলিয়ে নেবে।

২। শরীরকে দুলিয়ে সামনের দিকে নেবে।

৩। জানু পেতে বসবার অবস্থায় আসবে।

৪। কটি থেকে পাশের দিকে ঘুরবে এবং দেহের ওপরের দিকটা নামিয়ে আনবে—এইভাবে প্রথমে একদিকের কাঁধ এবং পরে অন্যদিকের কাঁধ মাটি স্পর্শ করবে।

৫। এইবার মাথা মাটি স্পর্শ করাবে। প্রথম স্টো-মোশনে অনু-শীলন করলেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠবে। অভ্যাসের দ্বারা পরে পড়বার গতিও বেড়ে যাবে।



ড্রামাটিক এক্সেসিস্‌ যখন ঘুরে ঘুরে এক চরিত্র থেকে আর এক চরিত্রে যেতে থাকবে তখন সেই অনুসারেই চরিত্র-গুলিকেও স্থান বদলে বদলে নিজস্বের ওপর ঠিক সময়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

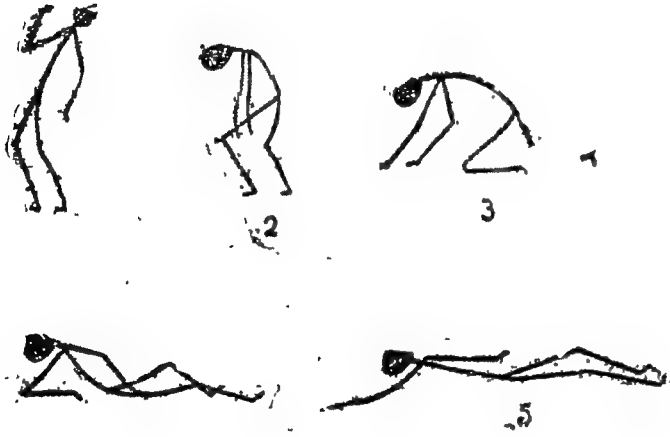
একটা কথা মনে রাখা দরকার, শৃঙ্খল কঠোরই অভিনেতার একমাত্র সম্পদ নয়। অভিনয়ে মুখ-চোখের ভেতর দিয়েই তো ভাবের অভিব্যক্তিটা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। একবার কল্পনা করুন তো যে অন্ধকার

সময়েই যেন দর্শক অভিনেতার চোখ দুটি দেখতে পান এমনভাবে দাঁড়াতে হবে—কারণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ভাব-ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শেষত অভিনয়ের সময়, অর্থাৎ যখন দৃ্জন অভিনেতা মূখোমুখি হয়ে কথা বলছেন—তখন প্রডিউসার সংলাপের নাটকীয় প্রাধান্য অনুসারে, যখন যিনি প্রধান তাকে আপ-স্টেজে বা স্টেজের পেছন দিকে (দর্শকদের থেকে দূরে) মূখোমুখি করে দাঁড়ি কবাবেন। অপ্রধান চরিত্র ডাউন স্টেজে পাশ ঘিরে কথা বলবেন। এ সম্বন্ধে মিস্টার জনু কারনেল্ড বলেছেন—

“The effect of this arrangement is two-fold. The up-stage character is emphasized by reason of his greater effectiveness. And, because of this emphasis, he not only dominates the scene, but appears also to dominate the other character, who haudicapped by his position, becomes, apparently, subordinate to him. We may call this principle that of dramatic domination.”

দৃ্জনের বেশি চরিত্র মঞ্চে ওপর থাকলে গ্রুপিং-এর সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। সাধারণত যে অভিনেতা যখন কথা বলছেন দর্শকের দৃষ্টি গিয়ে তাঁরই ওপর পড়ে। কিন্তু মনঃসংযোগের মত দর্শকের দৃষ্টিও সহজে এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না—মঞ্চের ওপর একটা দৃষ্টিকেন্দ্রে বা focal point খুঁজে বেড়ায়—যার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখা যায়। এই দৃষ্টিকেন্দ্র সৃষ্টি করার জন্যই প্রডিউসারকে চরিত্রের প্রাধান্য অনুসারে গ্রুপিং-এর ব্যবস্থা করতে হয়।



গ্রুপিং ও ডেকর

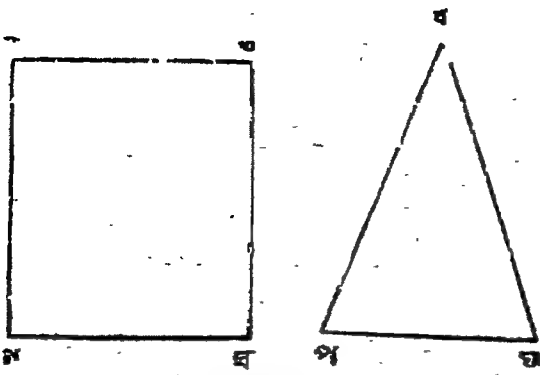
দর্শকমন সক্রিয় রাখার জন্য যেমন ক্রমাগত মূভমেন্ট ও সংলাপের বৈচিত্র্য আনা দরকার, সেই সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে মূভমেন্টের ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশে গ্রুপিং-এর বৈচিত্র্য ঘটতে হবে।

সংলাপ এবং মূভমেন্টের বৈষম্যের দিকটা ভেবেই প্রডিউসার ঠিক করবেন যে কিভাবে গ্রুপিং করবেন। অর্থাৎ নাটকে যখন যে চরিত্রের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তখন তাকে মঞ্চে এমন জায়গায় থাকতে হবে যার ফলে সহজেই সব দর্শকের দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ে।

মঞ্চে থেকে শৃঙ্খল অভিনয়ের সংলাপ শুনছেন? সত্যিই এমনটা যদি হয়, দেখাবেন অল্পক্ষণের ভেতরেই দর্শকের মন কিম্বা পড়েছে। সুতরাং এমন জায়গায় অভিনেতাকে দাঁড়াতে হবে সেখান থেকে তার সমস্ত মুখ-চোখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব স্পষ্টভাবে দর্শকের দৃষ্টিতে পায়।

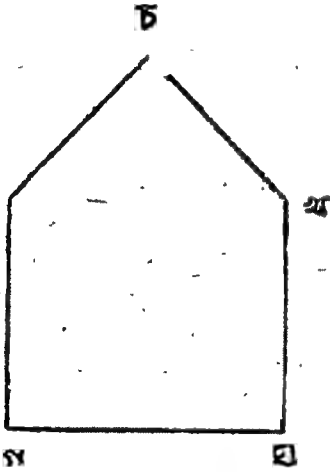
স্বগতোক্তির সময় অভিনেতার পক্ষে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে মঞ্চের ডাউন স্টেজ—অর্থাৎ মঞ্চের আলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যতটা সম্ভব দর্শকদের কাছাকাছি চলে আসা। এক্ষেত্রেই কাটিয়ে ওঠবার জন্য মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলবার দরকার হতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ

সাপ্তাহিক বসুমতী

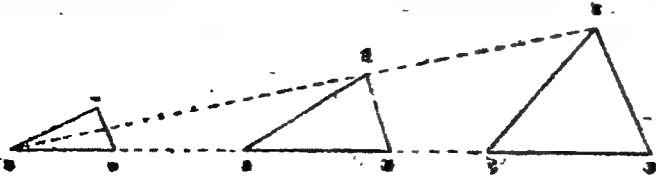


ওপরের ক খ গ ঘ চতুর্কোণটির ওপর চোখ পড়লে কোন বিশেষ জায়গায় গিয়ে দর্শকের দৃষ্টি নিবন্ধ হবে না—ক্লাগত এ-রেখা থেকে ও-রেখার ঘুরে চোখে ক্লান্ত আসবে। কি প ফ ব ত্রিভুজটির বেগার ফল হবে অন্য ধরনের, ফ ব এবং প ব লাইনে দিয়ে ঘুরবে দৃষ্টি-গিয়ে নিবন্ধ হবে চরমসীমা বা apex ব-তে।

এইবার চতুর্কোণ ক খ গ ঘ ওপরে ভেঙে ত্রিভুজাকৃতি করে দেখা যাক—



এবার দ-কেব দৃষ্টি গ ক এবং ঘ খ রেখা ধবে সোজা গিয়ে নিবন্ধ হবে চরমসীমা চ-তে। সুতরাং একথা বুঝতে কারোবই ভ্রমবিধা হবে না যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যে চরমসীমা পাওয়া যায়, চতুর্কোণে তা নেই। এবার কয়েকটি ত্রিভুজ নেওয়া যাক। প্রত্যেক পরের ত্রিভুজটিকে আগেরটির থেকে বড় হতে হবে—



এক্ষেত্রে দর্শকের চোখ প্রথমে সব থেকে ছোট ত্রিভুজটির চরমসীমা খ-তে

গিয়ে ধামবে—তারপর পরের ত্রিভুজের ছ-তে এবং শেষে সরে সরে বড় ত্রিভুজের ঠ-তে—এই সবচেয়ে বড় ত্রিভুজের চরমসীমা অর্থাৎ ঠ-ই হবে তার স্থায়ী দৃষ্টি-কেন্দ্র—আর এবার ত্রিভুজটিও হবে অনেক বড়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাহায্যে আঁকা ক ঠ ড। এই রীতি অনুসারেই প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য ঘরের আসবাবপত্রও ঠিকভাবে সাজাতে হবে।

ওপরের ত্রিভুজের কোণগুলোকে এবার মঞ্চে দাঁড়ানো চরিত্র হিসাবে কল্পনা করা যাক।

এখানে ২, ৫ এবং ৮নং-এর অভিনেতার সব থেকে আকর্ষণীয় জায়গায় দাঁড়িয়েছেন। প্রথমেই চোখ পড়বে ২-এ, তারপর ৫-এ এবং শেষে ৮-এ গিয়ে দৃষ্টি নিবন্ধ হবে। ১ ও ৩-এর তুলনায় ২ দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান স্থানে। তেমনি ৪ ও ৬-এর তুলনায় ৫-এর হয়েছে স্থান প্রাধান্য—আবার ৭ ও ৯-এর থেকে ৮ রয়েছেন অনেক ভাল জায়গায়। আবার ১ থেকে ৯ অবধি পরীক্ষা করলে দেখা যাচ্ছে, ৮-ই রয়েছেন একেবারে সব থেকে প্রধান জায়গায় অর্থাৎ চরমসীমায়।

ডার্টন স্টেজ থেকে অভিনেতা যত আপ-স্টেজের দিকে যাবেন ততই তিনি

দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন—কিন্তু তারও একটা সীমানা আছে—জন ফার-নেন্ডের মতে সেটা হল—

Until a point is reached, about two-thirds of the distance towards the back wall where there is a rapid decrease, till the very back of the stage ceases to have any importance at all.

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে ত্রিভুজাকৃতিতে অভিনেতাদের মধ্যে গ্রুপ করাতে গিয়ে ব্যাপারটা যেন জ্যামিতিক ত্রিভুজের মত না দেখতে হয়—মোটামুটি ঐ ধরনে সাজাতে হবে—কিন্তু তাই বলে এই ত্রিভুজের আকার যদি প্রকট হয়ে দেখা দেয় তবে সমস্ত অভিনয়টাই মাটি হয়ে যাবে।

পরিচালকের পক্ষে অভিনেতাদের একই সারিতে দাঁড় করিয়ে অভিনয় করতে দেওয়াটা হচ্ছে সব থেকে বড় অপরাধ। প্রত্যেক অভিনেতার খেয়াল রাখা দরকার যে অভিনয়ের সময় অন্য অভিনেতা যেন তাঁর দ্বারা ঢাকা না পড়েন। বসে-থাকা চরিত্রের থেকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা চরিত্রের

ওপর নজর পড়ে বেশি—এমন কি বসে-থাকা চরিত্রটি যদি আপ-স্টেজে থাকেন, তাহলেও।

ডেকর বলতে সমগ্র প্রদর্শনীর pictorial aspect-কেই বোঝান—সেটিং, লাইটিং, ফার্নিচার-সাজানো, সাধারণ মণ্ড-সজ্জা, সব কিছুই ডেববব ভেতর আসে।

আজকের দিনের মণ্ডসজ্জা করতে গিয়ে, এই কথাটাই প্রথমে মনে রাখতে হবে—

“The important quality in the decor is that it should have some sort of form which is refreshing and unexpected, without being in any way startling or distracting John Fernald. এই ফর্মটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সেটিং-এর ওপর। এক্ষেত্রে স্কোয়ার সেটিং না করে নাটকের বিশেষ তাৎপর্ষের ওপর নজর দিয়ে প্রয়োজক মণ্ডসজ্জার architectural variety আনতে

পারেন। লাইভ, মেক-আপ, সেটিং প্রভৃতি বিষয়গুলি আজকাল ইউরোপের নাট্যাভিনয়ে এক-একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেই কারণেই ওদেশে এই সব বিষয়কে specialized study-র পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

এবার সর্বকালের এবং সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্যার হেনরী আরভিং-এর থিয়েটার সম্বন্ধে বক্তৃতা থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। নাট্য-পরিচালনা শিক্ষার্থী ছাত্রদের পক্ষে এসব মতামত খুবই মূল্যবান হবে বলেই আমার বিশ্বাস। স্যার হেনরী বলেছেন—

“গানের বেলাতেও যেমন সঙ্গীত-বিদ্যার কলাকৌশল জানা না থাকলে স্মরণশীলকে সঙ্গীতে রূপায়িত করা যায় না, তেমনি নাট্যশাস্ত্রের কলাকৌশল আরও না থাকলে লিখিত নাটকের পাত্র-পাত্রীকে মঞ্চে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হিসাবে প্রাতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না।

“অভিনয় দেখতে দেখতে নাটক সম্বন্ধে যেসব সংস্কৃত, আভাস, ইঙ্গিত, ইশারা পাওয়া যায়, নাটক পড়ে তা আহরণ করা সম্ভব হয় না। মেলানেশোর দ্বারা দৈনন্দিন জীবনে কেসব লোককে জেনেছি এবং চিনেছি, তাদের সম্বন্ধে বই পড়ে যদি জানতে হোত তাহলে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে কতটুকু পরিচয় আমার পেতে পারতাম— for words, as Tennyson says, ‘half-reveal, half-conceal the soul within’। নাটক সম্বন্ধেও তাই— পড়ে বোঝা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝার মধ্যে অনেক তারতম্য আছে।

“কিভাবে অভিনয়কার চর্চা করে সত্যিকার অভিনেতা হওয়া যায়, এ ধরনের প্রশ্ন করে বহু বুক প্রত্যাহ আমাকে চিঠি লিখে থাকেন। অনেকে মনে করেন অভিনেতা হতে গেলে কিভাবে বক্তৃতা বা আবৃত্তি করতে হয় এ বিষয়ে কয়েকটি lesson নিলেই আসল শিক্ষা হয়ে গেল। আমি যে ব্রীজিতে নিজেকে গড়ে তুলেছি তার থেকে হয়তো অনেক শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারেন। ছেলে বয়স থেকেই

আমার একটি অভ্যাস ছিল যে সের-পায়ারের কোন নাটক দেখতে যাবার আগে, আমি নাটকটি কিভাবে অভিনীত হবে সে সম্বন্ধে একটি নিজস্ব ধারণা মনে মনে আঁচ করে নিতাম। অভিনয় দেখতে গিয়ে বক্তৃতে পারতাম যে, নিজে যেভাবে নাটকটি সম্বন্ধে ভেবেছিলাম তার সবটাই প্রায় তুলে চরা। আসল প্রোডাকশন দেখবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলত্রুটিও শুধরে নিতাম! আমি বিশ্বাস করি বহু ভুলত্রুটি সত্ত্বেও এই প্রণালীতে কাজ করতে করতে নিজের চিন্তাধারাকে একটা স্বাধীন পথে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়। তা না করে ধার করা ধারণা অনুসারে নাটকের অভিনয় করলে পূর্বসূরীদের ব্যর্থ অনুকরণই করা হয়—Tradition-এর ওপর নির্ভর করতে করতে মনে একটা দাস্যভাব আসে—স্বজনশীল মানুষের সমস্ত মৌলিকতা নষ্ট হয়ে যায়। মৌলিক সৃষ্টির ভেতর যে স্বাভাবিকতা ও প্রাণবন্ততা আছে, অনুকরণে তাই হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক এবং প্রাণহীন।”

অবশ্য চন্দ্রশঙ্কর নাটকের হেলেনের বর্ণিত সেই গাথাটির মত মৌলিক হবার কথা স্যার হেনরী বলেন নি। এক তথা-

কথিত প্রযোজকের সাজাহান প্রোডাকশন বেধে আমি জাম্বাব বনে গিয়েছিলাম। একটিন্না দৃশ্যে ইনি সাজাহান করলেন—দৃশ্যটি ঔরঙ্গজেবের দরবারকক্ষ। সেই একই কক্ষে দেখলাম কাতরাতে কাতরাতে দারা নাহিদা মরুভূমির দৃশ্য করলেন—সাজাহান জাহান্নারাকে নিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফালেন—সুজা-পিয়ারা প্রেমের ফোয়ারা বইয়ে দিলেন। ভদ্রলোকটির তখন এক বিরাট বপুসম্পন্ন মহাবনী পেটন ছিলেন—নাম বগেশ্বরবাবু। বগেশ্বরবাবুর হাতেখরা খবরের কাগজগুলো খুব ফলাও করে ঐ সাজাহানের প্রচার করলেন—তথাকথিত প্রযোজকটির মৌলিকতার প্রশংসার এ’রা শিশিরবাবু, অহীনবাবুকেও প্রায় নক্ আউট করে দিলেন। আজ বগেশ্বর-সঙ্গে ঐ সাজাহান মশায়েরও অবস্থা সঙ্গে ঐ সাজাহান মশায়েরও অবস্থা হয়েছে সঙ্গীন—টাইমনের শ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থা আর কি! তবে সবচেয়ে কণিত হয়েছে বাংলা রংগমঞ্চে—এ ভদ্রলোককে আজ এবং প্রাণবন্ত না রাখতে পারলে আমাদের রংগমঞ্চে নিত্য-নতুন মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন দেখব কি করে?

[কল্যাণ]

ছ’ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণ বার ই’ল

মনোরঞ্জন রায়ের

কমিউনিস্ট পার্টি কী ও কেন?

এই দ্বিতীয় মুদ্রণই বইখানির জনপ্রিয়তার নিদর্শন। কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে যদি সর্বিস্তারে জানতে চান, তাহলে বইখানি আজই সংগ্রহ করুন।

বইখানিতে আছেঃ—কমিউনিস্ট পার্টি কাদের পার্টি, অন্য রাজনৈতিক দল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্য, পার্টি ও ব্যক্তি, পার্টি ও জনগণ, পার্টিতে উপদল সৃষ্টির কারণ, সংশোধনবাদের উৎপত্তি, ভারতের পার্টিতে আধুনিক সংশোধনবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ইত্যাদি।

মূল্য—১.৫০

এই লেখকের অন্যান্য বইঃ—

গৌতম বুদ্ধ	৪.০০	ইতিহাস কী ও কেন?	০.০০
ইতিহাস রচনা	৪.০০	আদিম সমাজের ইতিহাস	৫.০০

(এপ্রিলে বের হবে)

প্রকাশক—অন্নপর্ণা প্রকাশনী

C/o. নিরঞ্জন রায় এন্ড কো.

শাকসেনা বিল্ডিং

১/২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা-১

পুস্তক বিক্রয় ও এজেন্টের কার্যনির্বাহী হওয়া হয়।

INTERADS



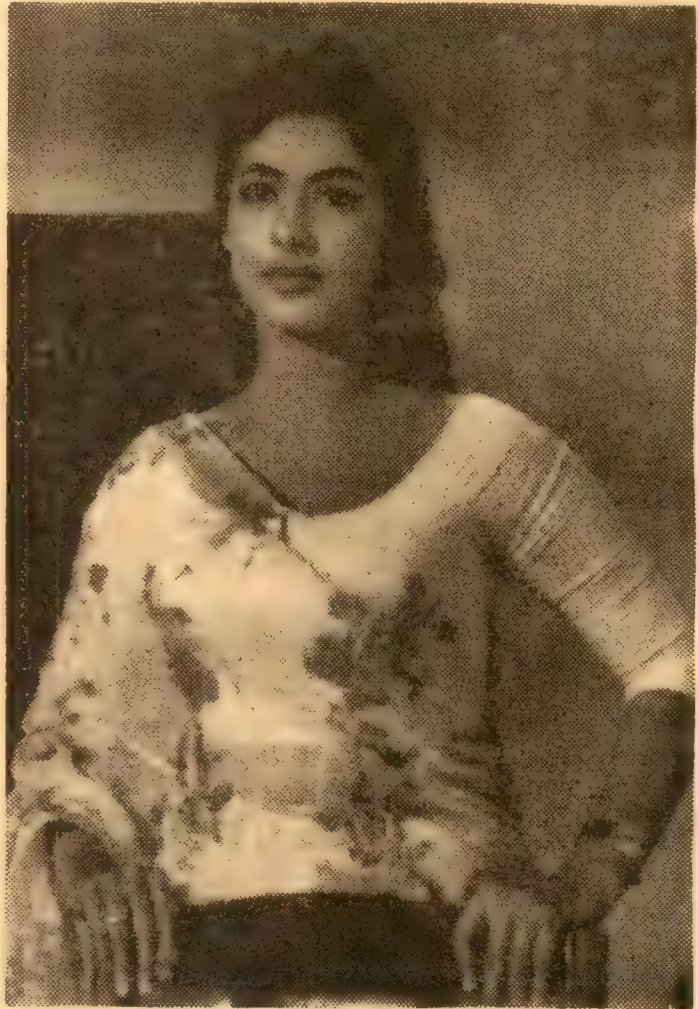
শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীদের কনভেনশন

ঐক্যবাদের খবরে প্রকাশ, পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতিকর্মীগণ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সমর্থনে এক কনভেনশন আহ্বান করেছেন। এই কনভেনশনের আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন সূ-পরিচিত শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীগণ এবং বহু নাট্যসংস্থা। আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন সত্যজিৎ রায়, মন্মথ রায়, মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মল্লিক, মৃণাল সেন প্রমুখ এবং গণনাট্য সংঘ, গণশিল্পী সংস্থা, রূপকার, থিয়েটার সেন্টার প্রভৃতি প্রায় সত্তরটি সংস্থা। আবেদনকারীরা বলেছেন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানান এবং কুড়ি বছরের রাহুত্বের পর নাট্যজগতে যাতে সুস্থভাবে কাজ করা সম্ভব হয়, সাম্রাজ্যবাদী আমলের বাধাগুলি দূর হয়ে সহজ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থন আরো ব্যাপক ও দৃঢ় হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা তাঁদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অতি-নমনযোগ্য এবং অত্যন্ত জরুরী ও সম্মেলনযোগ্য প্রচেষ্টা। গত সংখ্যায় এরূপ একটি উদ্যোগের জন্য আমি সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলাম। সংস্থাগুলির উদ্দেশ্যে লিখেছিলাম—যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য, প্রতিক্রিয়ার বিজ্ঞানিত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য নতুন পরিমার্জিত নতুন নাটক রচনা করা; যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে এবং তাঁদের গণসমর্থনের ভিত্তিকে আরো মজবুত করার জন্য শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমাবেশ করা। আশার কথা, এইরূপ প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই সূত্র দিয়েছে।

গত মাসে একটি পেশাদার নাট্যমঞ্চ ও কয়েকজন শিল্পী সাহিত্যিকের উদ্যোগে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে দৃষ্টি সভায় সমর্থনা জানান হয়েছে। এ দৃষ্টি অন্তর্ভাবের মধ্যে

আহূত কনভেনশনের চরিত্রগণ তফাৎ রয়েছে। অন্তর্ভুক্ত সভা দৃষ্টিতে কেবলমাত্র সমর্থনা জানান হয়েছে, মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন আরো ব্যাপক করার জন্য সাংস্কৃতিক জগতের উন্নতির সহায়ক

কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নি। একটা সভা অন্তর্ভাবের মধ্যেই কাজ শেষ হয়েছে। দৃষ্টি সভার কোনটিতেই সক্রিয় জাতের সংস্কৃতিকর্মী ও গোষ্ঠীর সমাবেশ সম্ভব হয় নি। দৃষ্টি সভাতেই এমন লোকদের সভামঞ্চে বসে থাকতে দেখা গেছে যারা প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদের সমর্থক বলে পরিচিত, নির্বাচনের সময় তাঁদের স্বাক্ষরিত বিবৃতি তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করেছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের অবিচ্ছিন্ন খাদ্য আন্দোলনের সময় তাঁদের অনেকে গুলীবিষ জনতাকে শান্ত থাকার বিবৃতি প্রচার করে ময়ন-নীতির সমর্থন জানিয়েছিলেন। পুরস্কার ও অনগ্রহপূর্ণ এইসব শিল্পী সাহিত্যিকরা সাতারটি যুক্তফ্রন্টের সমর্থক হয়ে পড়েছেন যেখানে অনেকে কৌতুকবোধ করেছেন। কিন্তু কনভেনশন যারা আহ্বান করেছেন তারা দীর্ঘকাল থেকে প্রগতিশীল বলে প্রসিদ্ধ, এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধতা করে আসছেন। তাঁদের বিবৃতিতেই প্রকাশ পাচ্ছে কেবল লোক দেখান —বর্ননা অনু-



হীরেন নাগ পরিচালিত 'জীবন-মুহুর্ত' ছবির নায়িকা সুপ্রিয়া দেবী

ঠান তাঁদের লক্ষ্য নয়, বা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ নিয়ে তাঁরা উদ্যোগী হন নি। তাঁরা চান যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে সমগ্র শিল্পী-সাহিত্যিকসমাজকে সমবেত করতে, এবং এমন কর্মসূচী প্রণয়ন করতে যাতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভিত্তি আরো মজবুত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রগতিশীল কর্মসূচী গ্রহণে আরো সাহসী হতে পারেন। কেবলমাত্র কনভেনশনেই এই অনুষ্ঠান শেষ হবে না, শিল্পীদের এক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপ লাভ করবে।

শিল্পীদের গত বিশ বছরের আন্দোলনের এক স্বাভাবিক কর্মকর্তা এই কনভেনশন। গত বিশ বছর প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনে যেসব শিল্পী সমর্থন জানিয়েছেন, জনগণের সঙ্গে থেকে প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধতা করেছেন তাই এই কনভেনশনের জন্য এগিয়ে এসেছেন। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম কেবলমাত্র কলকাতা শহরে নয় জেলায় জেলায় এরূপ কনভেনশন করা উদ্যোগীদের ইচ্ছা। যাতে সারা পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চিত্র মণ্ডিতসভার কাছে উদ্ভূত হয়। কেবলমাত্র শহরে শিল্পীদের সুবিধা ভোগ করার এতদিনের ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রামীণ শিল্পীরা যাতে প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। পুরস্কার ও আর্থিক সাহায্য কেবলমাত্র কলকাতার কয়েকজন মন্ডলিমের 'জনিয়াস'এর একচেটিয়া না হয়ে জেলার ও গ্রামের শিল্পীরাও যেন কোনরূপ অনুপ্রেরণা থেকে বঞ্চিত না হয়। যদি লোক-শিল্পী ও শিল্প পারিটোভ করতে না পারে তবে নতুন দিনের তাৎপৰ্য কি? কলকাতার শিল্পী গান গেয়ে মন গাড়ি বাড়ির মালিক হয়েছে, লোকশিল্পী তখন নিজের জীবন ধারণের জন্য পানিবিড়র দোকান করছে এই চিত্র গ্রামে দেখে দেখা ধারে।

সুতরাং এই কনভেনশন পশ্চিমবঙ্গের লোকজগৎকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে এমন আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসমাজ ও প্রত্যেকটি নাটকের দলের অংশগ্রহণে এই কনভেনশন সফল হোক।

—সুজন

চিত্রশ্রমোন্মোচন

জাপানী চলচ্চিত্র

৮শে মার্চ লোটাস সিনেমা হলে জাপানী চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন হয়েছে।



‘হাই এ্যান্ড লো’ ছবির একটি দৃশ্য

এই উৎসবের উদ্যোগী সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা। তাঁরা জাপানের কনসাল জেনারেলের সহায়তায় এই উৎসবের আয়োজন করেছেন। উদ্বোধন দিনে প্রদর্শিত হয়েছে—আকির কুরোসাৱা পরিচালিত বিখ্যাত চিত্র ‘সেভেন সামুরাই’। এই ছবিটি গত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল। ৩০শে মার্চ প্রদর্শিত হয়েছে ‘মিস ব্লু স্কাই’। ছবিটির পরিচালক আকির আইনরে।

ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন একটি জাপানী উপন্যাস। উপন্যাসটি জনপ্রিয়, ছবিটিও সেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ছবিটি বিশেষভাবে যুবসমাজকে লক্ষ্য করেই নির্মিত। ছবির নায়িকা ইয়োকো স্কুলের পড়া শেষ করে ওসাকাতে এল বাবার কাছে থাকতে। কিন্তু বাড়িতে কন্সার মত তার সম্বৰ্ণনা হল না, তাকে পরিচারিকার কাজ ও কিছটা সেভাবে থাকতে দেওয়া হল। ওসাকা আসার সময় ঠাকুরমার মৃত্যুকালে সে জেনে এসেছে বাড়িতে যিনি আছেন তিনি তার সৎমা, সে মা-বাবার প্রণয়ের সন্তান হলেও তাদের বিয়ে হয় নি, এবং শেষ পর্যন্ত তার মাকে অজ্ঞাতবাসে মেতে হয়েছে। ইয়োকো তার মাকে খুঁজে বার করার জন্য প্রতিজ্ঞা করল। সৎমা ও বোনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইয়োকো বাড়ি ত্যাগ করে এক চায়ের দোকানে কাজ নিল। তার স্কুলের শিক্ষক তাকে ভালবাসে, কিন্তু মৃদু খুলে জানাতে পারে নি। এদিকে তাকে

ভালবেসেছে এবং তার কাছ থেকে প্রতি-প্রতি আদার করেছে হিবুকা নামের বৃদ্ধ। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক ও হিবুকায় সহায়তায় সে তার মাকে খুঁজে বার করল। রোগশয্যায় শায়িত শিতাকেও সে তার কাজের জন্য সমালোচনা করল। মাকে ভালবেসেছিল তাকে বিয়ে করার মত সাহস না থাকার তিনি সারা জীবন প্রেমহীন জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত করে-ছেন এবং পারিবারিক জীবনে একদিনের জন্যও সুখ পান নি। তার কন্সার সংগ্রামও বিচলিত না হয়ে পারল না।

ছবির সূত্রতে ইয়োকোর সঙ্গে শিক্ষকের কথোপকথনে তার ‘মিস ব্লু স্কাই’ নামের তাৎপৰ্য প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষক তাকে শিখিয়েছিল সব সময় আশা-বাদী হবার জন্য। কণ্ঠকালের স্রোত থাকলেও আকাশ নীল। নীলাকাশ ঝড়ঝগাইনি দিনের পরিচায়ক। মেঘ থাকলেও আকাশ আবার নীল হয়ে উঠবে এটাই ত সত্য। ইয়োকোর জীবনেও বাধা-বিপত্তি এসে-ছিল, কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে সে সুখী জীবনের সন্ধান লাভ করেছিল। তাই জীবনযাত্রার পথে অশ্রু হারাতে নেই।

ছবিটি সহজ মৃদুভাবের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হয়েছে এমন কোন শিল্পমূল্যের ছবি না হলেও সুবকর মৃদুভাবের ভরা ছবিটি দেখতে ভাল লাগে। লম্বাছবির জীবনের একটা বর্ষা মনেপ্রাণ করে তুলে ধরেছে। ইয়োকোর চরিত্র



‘মার্কোপোলো’ ছবিতে লী-মু-মুন ও হর্ট বটোলজ

জাপানী অভিনেত্রী মিচিও ইয়াসুদার অভিনয় এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকের ছুমিকাতিনর উচ্চারণ।

জন করেছেন। সাতটি ছবি—‘রিক এন্-কাউটার’, ‘গ্রেট এক্সপেটেশনস’, ‘অলিভার টুইস্ট’, ‘জেনেভিয়েভ’, ‘দি ইম্পট্যান্স অফ বিইং আরনেস্ট’, ‘দি হাউসিং ভার্সন’, ‘রেড গডজ’ ও কয়েকটি তথ্যচিত্র এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত।

রামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী

গত ২৫শে মার্চ বহু জ্ঞানী, গুণী, নাট্যমোদী ও ভক্ত সমাবেশে বিশ্বরূপা মঞ্চমাণ্ডে এক ভাবগম্ভীর শ্রদ্ধা নিবেদন

আসরের মাধ্যমে ভগবান রামকৃষ্ণের ১০২তম আবির্ভাবোৎসব ও নটগুরু গিরিশচন্দ্রের ১২৪তম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামকৃষ্ণ প্রশস্তিগানে অনুষ্ঠানের উন্মোচন হয়। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উদাত্তকণ্ঠে “ভগবান রামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র” সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ঠাকুরের আবির্ভাবকাল জাপক ১০২টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়। অতঃপর বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণে সমাগত অতিথিদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

সোভিয়েত ভারতীয় সঙ্গীত-নৃত্য দল

মস্কোর প্রোত্‌বুদ বিশ্বখ্যাত ভারতীয় শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্করের স্মরণার্থে মৃত্যু হন। সম্প্রতি চাইকোভস্কী হলে সোভিয়েত সফররত ভারতীয় শিল্পী দলের এই অনুষ্ঠান হয়।

সোভিয়েত সফরাগত ভারতীয় সঙ্গীত-শিল্পী দলের এই অনুষ্ঠান স্মরণ হই পণ্ডিত রবিশঙ্করের রচিত ভারতীয় বন্দ্যসঙ্গীত অকেন্দ্রায়। সোভিয়েত সফরের জন্য তিনি বিশেষভাবে এটি রচনা করেন।

অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা নর্তকী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান অতি সুন্দর ও কমনীয় ভঙ্গীতে দুটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। একটি হল ১৭ শতাব্দীর চিরায়ত নৃত্য ও অপরটি উড়িষ্যার মন্দির গায়েত্রী ভিত্তিচিহ্ন থেকে আহরিত নৃত্যরূপ।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পূর্ব-ভারতের মণিপুত্রী, উত্তর-ভারতের কথক ও দক্ষিণ-ভারতের কথাকালি নৃত্য। এ

উৎসাহকণী

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব

এবার মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ই থেকে ২৫শে জুলাই। এই উৎসবের আদর্শবাণী : মানবতার জন্য চলচ্চিত্র, জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব ও শান্তির জন্য। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের এবার পঞ্চমবর্ষ। এই উৎসব হবে নভেম্বর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব-কালে।

সিনে সেন্ট্রালের উদ্যোগে ব্রিটিশ ছবি

ব্রিটিশ ইনফর্মেশন সার্ভিসের সহ-যোগিতায় ‘সিনে সেন্ট্রাল, কলকাতা’ আগামী ৮ই এপ্রিল থেকে ১৫ই এপ্রিল অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ও সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল ব্রিটিশ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়ো-



‘সেডেন সামুদ্রাই’ ছবির একটি দৃশ্য



পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ছবিতে রংরাও, এন, টি, সন্ন্যাসী ও সানিয়ারী

ছাড়া তবলা-তরণবাদনও বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিনিধি দলের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান একজন এ, পি, এন সংবাদদাতাকে বলেন: “ভারতের নানা অঞ্চলের সঙ্গীত চিরায়ত নৃত্য ও লোক-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান বিশেষভাবে নির্বাচিত করে পরিবেশন করা হয়েছে। এর জন্য আমাদের দলের শিল্প-উপদেষ্টা পণ্ডিত রাবিশঙ্কর বিশেষভাবে নির্দেশনা দেন।” এই অনুষ্ঠানে উভয় দেশের মৈত্রীকে আরও দৃঢ়তর করবে বলে তিনি আশা করেন।

সোভিয়েত যুব প্রতিনিধি সম্বর্ধনা

গত ২৬শে মার্চ মহাজাতি সদনে বিপুল দর্শক সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ যুব সংস্কৃতক সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের যুব সংগঠন পক্ষ থেকে শান্তি, প্রগতি, ঐক্য ও চির তারুণ্যের প্রতীক সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিদের আহ্বান জানিয়ে বলা হয় যে, “আপনারাই মানব প্রগতির অগ্রদূত, আজ এই শৃঙ্গ মন্ডলে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে আপনাদের সংযোগ সাধিত হোক।” সোভিয়েত যুব প্রতিনিধি দলের নেতা

সাগিন্ নামাংবায়ের অভিনন্দনের উত্তরে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রগতিশীল যুব-শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই সম্বর্ধনা সভার সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণ করেন শ্রীমণি সান্যাল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিদের নানা উপহার দেওয়া হয়। সম্বর্ধনা শেষে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাতে অংশগ্রহণ করেন রুমা গুহঠাকুরতা, শ্রী ডি, বালসারা, অরুণাভ মজুমদার প্রমুখ। আফ্রিকা, রাশিয়া, উজবেকিস্তান, ইংরেজি ও বাংলা লোক-সঙ্গীত অনুষ্ঠানটিতে পরিবেশিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গিক প্রাণিকর বিষয় ছিল, সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাদের লোক-সঙ্গীত, মুকাভিনয়, নৃত্য দর্শকদের গভীর আনন্দ দান করে।

মর্দিতকথা

ভারতীয় নৃত্য

গত ২৯শে ও ৩০শে মার্চ নিউ গ্রন্থাগার মধ্যে এক উপভোগ্য নৃত্য

অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ভারতবিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান। তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন তাঁদের নাচ দেখার আকর্ষণও কম নয়। তাঁরা হলেন জাভেরী ভান্নী চতুর্দার এবং কথক নৃত্যশিল্পী উমা শর্মা।

বীরেন্দ্র শঙ্করের প্রযোজনায় এক ভারতীয় শিল্পদল সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে নৃত্যাদি প্রদর্শন করে ফিরে এসেছেন। এঁদের সঙ্গে রাবিশঙ্করের মত শিল্পীও ছিলেন। দেশে ফিরে আসার পর এই দলের শিল্পীদের একটা অংশ কলকাতার এসে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। বিদেশে এঁরা কিভাবে নৃত্য প্রদর্শন করেছেন সে সম্পর্কে একটা ধারণা এই অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া গেছে।

প্রথমে ইন্দ্রাণী রহমান ভারত নাট্যে মোহিনী, আটম নাচলেন। লাস্যময় দেহভঙ্গী, লাবণ্য ও তেজস্বিতার তিনি দর্শকদের বিমোহিত করে রাখেন। তাঁর প্রতিটি মুদ্রা, অভিনয়, চোখের কান্না এবং পদসঞ্চালনের অর্থ প্রতিটি দর্শকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপরে তিনি আবার নাচলেন ‘ওড়িশী’। সাজসজ্জায়, অলঙ্কারে এবং দেহভঙ্গিমায় তিনি কেন সপ্তদশ শতাব্দীর ওড়িশী নর্তকীকে প্রাচীন মন্দিরগায় থেকে উদ্ধার করে

মুখে জীবন্ত করে তুললেন। সর্বশেষে তিনি ভারত নাট্যম রীতিতে লোক-নৃত্যের মেজাজে জীবনীশক্তিতে ভরা এক চামড়াময় নর্তকীর অভিব্যক্তিতে দর্শক-মনে প্রেরণা জাগিয়ে তুললেন। ইন্দ্রাণী রহমান বর্তমান ভারতের প্রেষ্ঠা নর্তকীদের অন্যতম। তাঁর ব্যক্তি ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে দেশ-দেশান্তরে পৌঁছেছে। এই অনুষ্ঠানেও তিনি যে প্রেষ্ঠা—তা তিনি প্রমাণ করেছেন।

জাভেরী ভূমী চারজন প্রথমে বর্ণ-বাজনাময় কুচিপুড়ি নৃত্য এবং পরে মণিপুড়ী রাসনৃত্য প্রদর্শন করেন। মণিপুড়ী নৃত্য অপেক্ষা কুচিপুড়ি নাচটিতেই তারা বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। উমা শর্মা কবক নৃত্যের বিভিন্ন রীতি প্রদর্শন করে প্রশংসা লাভ করেছেন। অনুষ্ঠানে কথাকলি নাচও ছিল (শিল্পীর নাম সম্ভবত শঙ্করণ)। কিন্তু অল্প পরিসরে এই নাচ আমাদের কৃপ্ত করতে পারেন নি।

এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীদের ভারতীয় বিভিন্ন রীতির নাচের পরিচয় দান করা। তাই নাচ-

গুলিকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়ে পরিবেশন করার কথা ভাবা হয় নি। সর্বশেষে সব রীতির নাচ দিয়ে ভারতে বিবিধের মাঝে একের কথা জ্ঞাপন করা হয়েছে। শেষের এই অনুষ্ঠান উদ্দীপনাময়।

নজরুল নম্রা

গত ৩১শে মার্চ নজরুল একাডেমির উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের বাস-গৃহে নজরুল সম্মার পঞ্চম অধিবেশন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে কবির সম্মুখে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রগতি মুখার্জী (বর্মণ) ও শ্রীমতী সীমা মুখার্জী।

প্রথমে সীমা মুখার্জী গাইলেন 'করুণ কেন জরুণ আঁখি', 'আমার নমনে কৃষ্ণ নয়নে অরা', 'কেন দিলে কাঁটা—যদিগো কুসুম দিলে' এবং 'মোর ঘুম-ঘোরে এলে মনোহর'। সীমা মুখার্জী তাঁর মিষ্টি গলায় আবেগ দিয়ে গান-গুলির কথাকে যেন একে একে ছাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ফুঁকে এক একটি পাগড়ির মত করে। তাঁর সঙ্গীত শ্রোতাদের কাছে উপভোগ্য হয়েছে। সুপরিচিতা ক্ল্যাসিক্যাল গায়িকা শ্রীমতী প্রগতি মুখার্জীর

(বর্মণ) কণ্ঠ নজরুল সঙ্গীত শোনায় জন্য শ্রোতাদের আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর মধুর কণ্ঠে সেই আগ্রহ তৃপ্ত করেছেন। তাঁর উচ্চারণে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও নজরুলের সুরের বিশুদ্ধতায় ও সুমার্জিত কণ্ঠের মাধ্যমে তিনি এক সুরময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি একে একে গাইলেন : মোর প্রথম মনের মুরুর, কেন আঁখিবারি, আজ এ প্রাণ নিশি। সঙ্গীতাত্যাক শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর মরদ ও আবেগ দিয়ে কবির অতীত দিনের গানের রীতি অনুসরণ করে গাইলেন অজলি লহা সঙ্গীতে। তাঁর প্রস্ফাগুলি শ্রোতাদের অভিকৃত করে তোলে। তারপরে তিনি গাইলেন—বসন্ত এল, এলরে। শ্রোতারা তাঁকে আর ধামতে দিতে চান না, ওদিকে কবিও বার বার তবলার দিকে হাত দেখিয়ে ইসারা জানাচ্ছেন। তিনি আবার গাইলেন—প্রাণ আসিল ফিরে এবং পরদেশীরে যাওয়ে ফিরে। রাত নটার অনুষ্ঠান শেষ হল। কবিকে আসর থেকে নিয়ে যাওয়া হল। অন্যদিনের তুলনায় এদিন কবিকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।



(১) রবীন্দ্রনাথ ও দিল্লীসাহিত্যে
আধুনিকতার সমস্যা—বিষ্ণু দে। লেখক-
সমবার-সমিতি; ৭০-বি শ্যামাপ্রসাদ
মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য :
চার টাকা।

(২) মৃদল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা—
রাজেন্দ্রবর মিত্র। ঠিকানা : এ। দাম :
পাঁচ টাকা।

বলতে শিখা নেই, প্রায় দু-তিন
বৎসর পর যেন একখানা উৎকৃষ্ট বই
পড়লাম।

আলোচ্য গ্রন্থটি এমনই যে,
আলোচনা প্রসঙ্গে কবিমানস, কবিচেতনা,
কবিজীবনকে পৃথক করা যায় না। কারণ
কবিজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বিদগ্ধচিন্তার
ভিত্তিতেই গ্রীদে “রবীন্দ্রনাথ ও দিল্লী-
সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা” সম্বন্ধে
মননশীল হার্দ্য আলোচনা করেছেন।
সেই সপ্তে কাজ করেছে গ্রীদে’র বিশ্ব-
জনীন বোধ। সেই পটভূমিকায় তিনি
রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিষ্কার করে-
ছেন। আমাদের প্রান্ত ধারণার মূলে
তিনি সজোরে মসায়্যাত করেছেন। অবশ্য
বর্তমান গ্রন্থে আধুনিকতার সমস্যাটিকে
মৌলিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর সেই
সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ
আসবেনই। স্বভাবতই গ্রীদে বলেছেন,
“বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে
শিল্পসাহিত্যে তো বটেই দেশের সমস্ত
সংস্কৃতি, মানসজীবন ও কর্মের আধুনিক-
তার আদি ও মৌলিক দৃষ্টান্ত।” তারপর
শব্দে রচনা হলেও অকপট সত্যভাষণে
গ্রীদে এইভাবে এগিয়ে গেছেন—“দেশের
সীমার নিবন্ধ থেকে তাই একটু আশ্চর্য
রাজ্যে পারে যে রবীন্দ্রনাথের সমবয়সীরা
অথবা তাঁর পরবর্তীরা যারা মনের ও
লেখার ধরণ-ধারণে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রিক,
তবুও এই আত্মসচেতনতার সমস্যায় তাঁর
পূর্ববর্তী মাইকেলকে, এবং প্রায় যেন
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে তাঁদের
মানসিক ঘর-সংসারের শান্তি এবং
সাহিত্যিক গুরুগাছ সরল স্বচ্ছলতা,—যেন
বা নিজের মুখোমুখি হবার, নিজের তত্ত্ব-
জিত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নে দীর্ঘ
হবার মহান দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যই তাঁদের
জীবনে ও মনে ঘটে নি।” বরঞ্চ পরে
মবীনতর উত্তরাধিকারীরা সচেতন মনের
স্বাক্ষর রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,
জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র
মিত্র ও অমিয় চক্রবর্তী। অবশ্য আমরা
নিঃসন্দেহে পণ্ডিত আলোচনার বিষ্ণু দে’র
নাম যত্ন করতে পারি। কিন্তু বৃদ্ধদেব
বসু সম্পর্কিত পণ্ডিতভিত্তিক আলোচনার
গ্রীদে’র সপ্তে আমরা মতানৈক্য পোষণ
করি। বৃদ্ধদেবাব্দ, তো রবীন্দ্রনাথ ও
মোহিতলালেরই চর্চাচর্চা করেছেন।
বড়জোর তাঁর সপ্তে বদলেয়ার-ভাষি যোগ
করা যেতে পারে।

ইন্দ্র মেলা

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়
কথা হচ্ছে, তিনি ‘উপনিষদের তত্ত্ব
ভারতীয় অধ্যাত্মের মানবিক বিকাশ এনে-
ছেন স্বকীয় নতুন রূপে।’ আত্ম-
সচেতনতাই আধুনিকতার মূল। আর
সেই মূল থেকে বাহির্জগতে যা প্রকাশমান
—তা ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ নয়, ব্যক্তি-
স্বরূপ থেকে মূর্তি বা নিষ্কমণ। অবশ্য
ব্যক্তিস্বরূপ ও আবেগ ব্যতীত আধুনিক
কাব্যেরও মূর্তি নেই, কিন্তু তা
ডায়ালেকটিক হওয়া চাই। সেই বোধ ও
বোধি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল বলেই
তিনি আমাদের চিন্তে সত্যের মধ্যে প্রতি-
ষ্ঠিত। সেই কারণে গ্রীদে বলিষ্ঠ চিন্তা-
ধারার অনুশীলনে যথার্থই বলেছেন যে,
“রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার ও
তত্ত্বের জগৎ এবং কবিকর্ম বা বিশেষ করে
চর্যকর্মের প্রচণ্ডতার মধ্যে স্বল্পময়তা
কোনো মনোযোগী-ভক্তেরই লক্ষ্য না করে
থাকার উপায় নেই।” এই ধরনের
বক্তব্যের বেগ তীরের ফলার মতো—এক
এইভাবে আগাগোড়া একেবারে অভিনব
পন্থায় আলোচনার স্বারা রবীন্দ্র সম্পর্কিত
প্রাচীন মতবাদীদের আলোচনার বাধ তিনি
ভেঙে দিয়েছেন। প্রবন্ধে এই ধরনের
ব্যবহার বিদ্রোহতুল্য গণ্য হতে পারে,
কিন্তু বিষ্ণু দে’র মতো অগ্রজ কবির কাছে
এটাই কাম্য ছিল। বিষ্ণু দে’র আলো-
চনাটি অনাদিক দিয়েও অন্য কারো সপ্তে
তুলনা করা যায় না। কারণ রেখট থেকে
সূত্র করে যুরোপীয় আধুনিক ভাব-
ধারার মানসপ্রবণতাকে যেভাবে তিনি লক্ষ্য
করেছেন—তাতে তাঁর বক্তব্য আরো প্রাজল
ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে
পেরেছে। ৫৯ পৃষ্ঠায় ইংগ-মার্কিন
কবিদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা
আজ বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গ্রীদে
আমাদের উপকারই করেছে। পৃথিবীকে
যখন কোনো এক প্রেণী সর্বনাশের পথে
নিরে যায় তখন তাদের ব্যাপারে সত্যক
হতে হয় বৈকি। সর্বশেষে বলা উচিত,
গ্রীদে’র দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
আহবানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক
বক্তৃতামালা উপলক্ষে এই প্রবন্ধ পাঠ
করেছিলেন, তাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ
করার জন্য লেখক সমবার সমিতি
নিঃসন্দেহে পাঠকের কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হবেন।

আমাদের দেশে সঙ্গীত রসালপাসুর
অভাব নেই, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কিত
আলোচনার মনোযোগ দানের লোকের
সংখ্যা মূর্তিময়। বলা যেতে পারে যে,
একমাত্র সঙ্গীতকলাবিদ ও কিছু বিশ্লে-
জন একত্রে প্রবেশ করতে সমর্থ হন।
তার কারণ এই যে, সঙ্গীতশাস্ত্রের
আলোচনা যা করা হয় এবং এই
সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করা হয়—তা
সাধারণ জনের কাছে দুর্বোধ্য ও দুস্তর।
তাই সঙ্গীত রসপারাবারে পাড়ি দিতে
ইচ্ছুক শ্রোতা সঙ্গীতশাস্ত্রে আকট
মূর্খ। স্বভাবতই সম্পূর্ণ সঙ্গীত
রসগ্রহণেও সেখানে বাধার সৃষ্টি হয়।
তাই চাই দুই-এরই যোগফল। মোট
কথা ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের একটি
ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রয়োজন। সেই
চেষ্টা যে একেবারেই হয় নি, তা বলাই
না। কিন্তু কোনোমতেই তা পূর্ণাঙ্গ
নয়। এ যাবৎ লিখিত ভারতীয় সঙ্গীত-
শাস্ত্রের ইতিহাস বাংলা ভাষার প্রকাশ ও
সুন্দর প্রচারের জন্য লেখক সমবার
সমিতি আয়োজন করুন—এই আমাদের
আকাঙ্ক্ষা। যা হোক করতে হবে।
উপর উল্লিখিত শ্রীদে’র গ্রন্থটিতে মধ্য-
যুগীয় ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসকে
গ্রীদে’র মিত্র তুলে ধরেছেন। মৃদল
যুগের সঙ্গীতচিন্তা সম্বন্ধে যে তিনি
বই-এর কথা আমরা জানি, তা হচ্ছে
আইন-ই-আকবরী, রাগদর্শন, ও তুহ-
ফাতুল হিন্দ। এই তিনটি গ্রন্থকে
ভাষাভিজ্ঞ ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ গ্রীদে’র তুলে
ধরেছেন। গ্রীদে’র অন্যতম যে কাজ
সম্পাদন করেছেন তা হচ্ছে এই যে,
গ্রন্থবিবরণসহ উপযুক্ত গ্রন্থের রাগ-
রাগিণী সংক্রান্ত তথ্যগুলির সূক্ষ্ম
আলোচনা। এই আলোচনা সকল
জনের পক্ষেই সহজবোধ্য হতে পারে।
আপাতত বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকেরা
এই ধারণার উপনীত হবেন যে, এই গ্রন্থ
সেই স্বার উন্মোচন করলো—যেখানে প্রবেশ
করলে অনুভব করা সম্ভব হবে যে,
মৃদল যুগে ও সমগ্র মুসলিম যুগে
মুসলমানগণ ভারতীয় সঙ্গীতকে কিভাবে
পর্ববেক্ষণ করেছেন। আশা করি,
সঙ্গীতরসিকরা এই গ্রন্থ পড়বেন।

পলাতক ছায়া—সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম : তিন টাকা।

শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় সৌন্দর্য-বোধের কবি। এর আগে যে ক'খানি তাঁর কাব্যগ্রন্থ পড়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, তাতে দেখা গেছে তাঁর নিসর্গচেতনা, জীবনাবিস্কারের অভীশা, বিজ্ঞানী-সুলভ মননজাত দৃষ্টি ও ভৌগোলিক ব্যাপ্তি। তাঁর কবিতায় বাঁধাধরা মুকে বিদেশী ললনার আঁট-সাঁট গোষাকের পরিবর্তে স্বদেশী প্রিয়মুখের দীপ্ত মিহ্রিত। তাই সুনীলবাবুর কবিতা আধুনিক কাব্য প্রকাশের ইংগিতবাহক হলেও ধ্বনিতে স্বচ্ছন্দ।

‘পলাতক ছায়া’। এ কোণ ছায়—
 থাকে ধরার জন্য কবির অপ্রতিরোধ্য
 জাতিসার? কবি নিজেই বলেছেন : ‘নাই—বা
 পেলাম আমি গোলাপের সমস্ত
 ছায়ার ৪/৫কেইটি পেলাব পার্শ্ব,
 কিছু রঙ, কিছু, বা সুবাস/জগে থাক
 মনে’। কারণ ‘সবয়ে সাজাই আমি প্রতি-
 দিন মনের বাগান’।/ যদিও বন্ধু বলেন—
 ‘তারা তো যাবেই যাবে/দিনশেষে ; ওরা
 একমুঠি হলো হবে’।/ আমাদের মনে হয়,
 বন্ধুর এই কথার পরও কবি জানেন,
 একমুঠো হলো এভাবে সৃষ্টি করাই
 জীবনের চরম সাধনার ফল। তারপর
 সেই ধূলি-তিলকেই তো কবির সার্থকতা।
 এ সাত্ত্বিক কবি অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে
 পলাতক ছায়ার পেছনে ছোটেন। তিনি
 বেদনার বৈভবে পশুরা সাজান (দীপ
 জ্বললে রাখি দ্রুতবা, পৃঃ ১১)। আর
 জ্বলেন দীপ। কারণ এ জীবনে ‘কী
 জ্বলত দিলে কবি বেদনার সমুদ্রমঞ্চে’
 (‘হে মহাজীবন,’ রবীন্দ্রনাথ স্মরণে)।
 আশ্চর্যের ব্যাপার কবির ব্যক্তিজীবনেও
 যদি ব্যথা-বেদনা থেকে থাকেও তা থেকে
 উত্তীর্ণ হয়ে “জীবনকে সে জ্বালিয়ে রাখে
 জ্বল হোমানলে” (সে)। কিভাবে সেই
 জীবনকে জ্বালিয়ে রাখা হয়? এবং
 সেই জীবন কি? তার পরিচয়, আমাদের
 মনে হয়, কবিজীবনের সার্থক সৃষ্টি—
 ‘বিশ্বলক্ষ্য’, ‘রক্তগোলাপ’, ‘একটি স্রোতের
 কোরক’, ‘হাসো, নাচো, গাও’, ‘প্রতিহত
 ভরণ’, ‘একজন শিক্ষকের কাহিনী’তে
 বিনয়কররূপে মুদ্রিত। জীবন সম্বন্ধে

বিদগ্ধ অভিজ্ঞতা না থাকলে এই জাতীয়
 কবিতার সৃষ্টি সম্ভব নয়। অবশ্য এর
 মধ্যেই কবিভাবনা পরিসীমিত নয়।
 জানলা দিয়ে ভব, আলো আসে, আছে
 নদী, আছে মাঠ, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর,
 আছে যুগান্তাপ। তার মধ্যে আছে—
 ‘কে আনে সুখার স্বাদ ভালবেসে নিঃসঙ্গ
 জীবনে,/ সে কি মায়া? ছায়া হ’য়ে ধরা
 দেয় সত্যের নিজনে’।/ পলাতক ছায়া,
 তাই, পালাবে কোথায়। জীবন যে আরো
 লড়। ৫৩টি কবিতায় তাঁর প্রকাশ।
 ছন্দ-বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। কাব্যগ্রন্থের
 উপযুক্ত ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট।

বস্তু স্মার তত অরণ্য—লোকনাথ
 ভট্টাচার্য। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স
 প্রাঃ লিঃ; ১-সি, কলেজ স্কয়ার,
 কলিকাতা—১২। দাম : সাড়ে ৬ টাকা।

মানুষের মনের দুয়ার খুললেই,
 দেখা যায় সেখানে অরণ্যের ঢেয়ে গভীর
 অন্ধকার। বিশেষত যুগ যতো এগোচ্ছে,
 আমরা ততো বেশি সভ্যতার সম্মুখীন
 হচ্ছি—মন হচ্ছে ততো বেশি ফল্গুনাবিধ।
 মনের কথা অকপটে খুলে বলা যায় না
 বলেই আত্মদংশনে নিপীড়িত হতে হয়।
 নিজের কান্নাই নিজেকে করতে হয়
 জ্বাবারিহ। ধীরে ধীরে ধরা পড়ে
 যাবতীয় ভ্রম দ্রাব্য। একালের লেখকরা
 এই মনকেই নানা কার্যকারণের মধ্য দিয়ে
 ধরতে চায়। অবশেষে দেখা যায় উপন্যাসের
 ঘটনার কাব্যিকতার সঙ্গে সেরকম কোনো
 কারণ অন্তর্নিহিত নেই। এই ধরণের
 উপন্যাস রচনায় চাতুর্য ও মনস্তত্ত্ব—
 দু’য়েরই সমন্বয় সাধন করতে হয় অনেক
 সময়। উপর্যুপ উপন্যাসটি তার ব্যতিক্রম
 নয়। উপন্যাস রচনার ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-
 নাথ-এর ‘ঘরে-বাইরে’র কথা মনে পড়লেও
 বিষয়বস্তুতে শ্রীভট্টাচার্য তিন বন্ধুর ও
 তাদেরই একজনের স্ত্রীর মনোবিকলনের
 কথাই উপন্যাসাকারে হাজির করেছেন।
 বেড়াতে যাবার পথে বন্ধু, মাথনের
 গাড়িটা চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট ঘটায়
 সুবিমল। সুবিমলের স্ত্রী শান্তা, রাখন
 ও শরদীন্দ্রের আঘাত সিরিয়াস নয়। কিন্তু
 সুবিমলের বন্ধুর পাঁজরা ভেঙে ভিতরে
 ঢুকে গেছে, অর্থাৎ সিরিয়াস ব্যাপার।
 নার্সিং হোমের এক একটি পৃথক ঘরে
 এই অবস্থাতেও চিন্তার লাগাম খুলে
 দিয়েছে তারা। মাথনের ধারণা—তার
 গাড়িটাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই

সুবিমল দু’ঘণ্টা ঘটিয়েছে। এখানে
 ভাবনা অনেকাংশে অর্থনৈতিক প্রতি-
 বন্দিতার। শরদীন্দ্রের মানসিক
 প্রতিক্রিয়া এই যে, শান্তার সঙ্গে তার
 ঘনিষ্ঠতা সুবিমল মনে মনে পছন্দ করে নি
 বলেই—তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে সুবিমল
 এই কাজ করেছে। এমন কি নার্সের
 কাছে সুবিমলের মারা যাবার কথা শুনে
 শান্তাকে নিয়ে ঘর করার কল্পনা করেছে।
 অবশ্য শরদীন্দ্রের চরিত্রে জটিলতা সৃষ্টির
 দ্বারা শ্রীভট্টাচার্য যথার্থ মর্মেসমান্য
 দেখিয়েছেন। কারণ শরদীন্দ্রই শান্তার
 সঙ্গে সুবিমলের বিরোধ ব্যবস্থা করে
 দিয়েছিল। শান্তার সঙ্গে কলেজজীবনে
 অভিনয় করেছে অর্থাৎ পরস্পর তার
 পাটনায়। তবু শান্তাকে বন্ধুর স্ত্রী
 হিসেবেই মেখেই সুখী ছিল। কিন্তু
 সুবিমলের আচরণকে সে ঠিক ধরতে না
 পেরে তার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার
 শেষে তার মনে হৃৎস্বপ্নের সৃষ্টি হয়েছে।
 অবশ্য ছোট-খাটো অপারেশন হলেও তার
 আগে এবং কত-বিকত অবস্থায় এ সব
 কথা কি করে মনে হয়! বর্তমান শিক্ষার
 তবে কি এটাই অবদান? শান্তা, অবশ্য,
 ভাবে তার সন্তান হয় নি বলেই সে
 বেদনায় সুবিমল আত্মহত্যা করতে
 চেয়েছে। কিন্তু অ্যাকসিডেন্টের পরই
 শান্তার কেবিনে শুয়ে মনে হলো,
 “আবার হবে, হয়তো ইতিমধ্যে হয়েছে,
 এ্যাকসিডেন্টে হবে সম্ভব হয়েছে, সব ঠিক
 হতে চলেছে...” এই ধারণার কথা তো
 শান্তা আগেই সুবিমলকে বলতে পারতো।
 আর কি না সে ডাক্তারের কাছে বারবার
 গেছে আর প্রকৃতিগত নানা ঘটনা অনি-
 বাধ্যভাবেই ঘটছে—যার জন্যে লেখককে
 নানা বিকল্প বর্ণনা দিয়ে পাঠককে সন্তোষভূ-
 তিতে হয়েছে। মোট কথা,
 অ্যাকসিডেন্টের কারণ, শরদীন্দ্রের সঙ্গে
 বন্ধুবন্ধির চেয়ে অ্যাকসিডেন্টের ভয়ে
 শান্তার আকস্মিক আত্মনাদ, যাতে
 সুবিমলের পাটা ভুল করে রেকের ওপর
 না পড়ে সজোরে এ্যাক্সিলেরেটারের ওপর
 গিয়ে পড়ে...”। অতএব নিশ্চিতভাবে
 জানা গেল অ্যাকসিডেন্ট ইচ্ছাকৃত নয়।
 সুতরাং তা নিয়ে সুদীর্ঘ ধানাই-পানাই
 অপয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি।
 আসল কথা, মানুষের মনের সঙ্গে মনের
 সম্পর্ক কতদূর এবং সেই কারণে মান-
 ুষ কী বিচিত্র জীব—এটাই উপন্যাসিকের
 বক্তব্য মনে হয়। ‘বস্তু স্মার তত অরণ্য’-এর
 সার্থকতাও সেখানে নিহিত।

মোহনবাগানের রোভার্স কাপ জয়

বোম্বাইয়ের মাঠে বাংলার ফুটবল-জগতের মর্যাদা রক্ষা করল মোহনবাগান রোভার্স কাপ জয় করে। এ বছর বাংলার বাইরের ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির আসরে সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন কলকাতা ময়দানের দলগুলি শোচনীয় ব্যর্থতা প্রদর্শন করে। দিল্লীর দিল্লী ক্লথ মিলস প্রতিযোগিতা এবং ডুরান্ড কাপের আসরে কলকাতার দলগুলির ক্রীড়াধারা সকলকে হতাশ করে। এ বছর রোভার্স কাপের আসরে ১৯৬৪ সালের বিজয়ী কলকাতার বি, এন, রেল দল প্রথম খেলায় অনামী দিল্লী সেক্রেটারিয়েটের কাছে পরাজিত হয়। মহামেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও বিদায় নিতে বাধ্য হয়। কলকাতার দলগুলির মধ্যে একমাত্র কোনক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করে মোহনবাগান ক্লাব। ইদানিং দেখা যাচ্ছে সামরিক দলগুলি ধীরে ধীরে সর্বভারতীয় ফুটবল-জগতে প্রাধান্য বিস্তার করছে।

বাংলার বাইরের দু'টি শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা রোভার্স এবং ডুরান্ড কাপের মধ্যে কলকাতার দলগুলি ডুরান্ড জয় করেছে একাধিকবার, কিন্তু রোভার্স কলকাতায় এসেছে মাত্র কয়েকবার। মোহনবাগান এপর্যন্ত মোট আটবার রোভার্সের ফাইনালে উন্নীত হয়েছে এবং মাত্র দু'বার মোহনবাগান লাভ করেছে রোভার্স কাপ। মোহনবাগান প্রথম রোভার্স কাপ লাভ করে ১৯৫৬ সালে। এবছর নিয়ে উপর্যুপরি তিন বছর একটানা



রোভার্স কাপ

মোহনবাগান



জোয়া ফোলিকে মাথায় শূঁধি মারছেন ক্রে

মোহনবাগান ফাইনালে খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে মোহনবাগান ফাইনালে পরাজিত হয় কলকাতার বি, এন, রেলের কাছে এবং ১৯৬৫ সালে বোম্বাইয়ের মফংলালের কাছে।

এবছর ফাইনালে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী দল গোয়ার ভাস্কা ক্লাব "জ্যাস্ট কীলার" আখ্যা লাভ করেছে। কারণ অল্পখ্যাত ভাস্কা ক্লাব শক্তিশালী পাঞ্জাব পুলিশ এবং ব্যাঙ্গালোরের চিফ ইনস্পেক্টর অফ ইলেকট্রনিকসের মত

কীলার হিসাবে মোহনবাগানকে ধারেল করতে সক্ষম হবে।

ফাইনাল খেলা সূর্য হল, কিন্তু কুপারেজের সমবেত বাইশ হাজার দর্শক প্রত্যক্ষ করল মোহনবাগানের একচ্ছত্র প্রাধান্য। মোহনবাগান দলের পুরোভাগের ক্ষুরধার আক্রমণ, রক্ষণভাগের দুর্ভেদ্য বাহু এবং দলগত ক্রীড়াশৈলীর উজ্জ্বল রূপের কাছে ম্লান হয়ে যায় ভাস্কা দল। প্রথম থেকেই মোহনবাগান দলের পুরোভাগের আক্রমণের টেউ আছড়ে পড়তে থাকে ভাস্কা দলের গোলের ওপর। মোহনবাগান দলের ফরোয়ার্ডরা যদি একটু লক্ষ্য স্থির করতে পারতেন তবে তাঁদের পক্ষে আরও কয়েক গোলে জয়ী হওয়ার এতটুকু অসম্ভব হত না। কারণ মোহনবাগান দলের ফরোয়ার্ডরা বেশ কয়েকটি গোলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। প্রথমার্ধের মধ্যভাগে সমাজপতি এবং কানন বল আদান-প্রদান করে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময় গোলের প্রায় ত্রিশ গজ দূর থেকে চাকিতে একটি তীর সট করেন কানন এবং ভাস্কা গোলরক্ষক এ্যাগনেলোকে হতভম্ব করে বারের তলদেশ স্পর্শ করে বল গোলে প্রবেশ করে। এই গোলাটি খেলার একমাত্র এবং মোহনবাগানের বিজয়সূচক গোল। খেলার পরবর্তী সময়ে শূন্য গোলের সুযোগের অপচয় হয়। মহারাষ্ট্র সরকারের অর্থমন্ত্রী এবং পশ্চিম ভারত ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীওয়ানথেন্দে খেলার শেষে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

রোভার্স কাপ সহ বিজয়ী মোহনবাগান দল গত ২৯শে মার্চ হাওড়া স্টেশনে

শ্রীঅমিতাভ

দলকে পরাজিত করে যথেষ্ট বিস্ময়ের সঞ্চার করে এবং প্রথম রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলার সম্মান অর্জন করে।

এ বছর রোভার্স কাপের ফাইনালে কুপারেজে দুই দল ভাস্কা ক্লাব এবং মোহনবাগান ক্লাব মাঠে অবতীর্ণ হলে ভাস্কা ক্লাবকে সমর্থন করে দর্শকদের উল্লাসধ্বনি একটু বেশি মাত্রায় ধ্বনিত হয়। মোহনবাগান ক্লাবকে হৃৎধ্বনির মধ্যে অভিনন্দন জানায় অপেক্ষাকৃত কম দর্শক। কয়েকটি কারণে মোহনবাগান ক্লাব বোম্বাইয়ে জনপ্রিয়তা কিছুটা হারিয়েছে। যাই হোক ভাস্কা ক্লাবের সমর্থকেরা ভেবেছিল চিৎকার এবং গলাবাজি করে অন্তত মোহনবাগানকে বেকায়দায় ফেলবে। তাঁরা বোধহয় আশাও করেছিলেন যে গোয়ার ভাস্কা ক্লাব এ বছরের জ্যাস্ট

পন্যত হলে উৎসাহী সমর্থকেরা তাদের অভিনন্দন জানান এবং ক্লাব তাবুতেও সেদিন বহু সমর্থকের ভিড় হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ক্রিকেটে বদ্বি এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে বোম্বাই; ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ সম্মান রঞ্জী ট্রফি বহুদিন ধরে বোম্বাইয়ের ঘরেই বন্দী। ১৯৬৬-৬৭ ক্রিকেট মরশুমের রঞ্জী ট্রফি বিজয়ী হয়ে বোম্বাই উপর্যুপরি নবমবার এই সম্মান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করল। আর মোট আঠারবার রঞ্জী ট্রফি জয় করেছে এ-পর্বন্ত বোম্বাই। কয়েক বছর থেকে বোম্বাইয়ের সঙ্গে ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে রাজস্থান। রাজস্থান ফাইন্যালে উঠেছে সাতবার এবং ছ'বার তারা ইনিংসের ব্যবধানে পরাজিত হয়; শুধু এ বছর পাঁচদিনের খেলায় চূড়ান্ত কোন ফলাফল হয় নি এবং প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই বোম্বাই বিজয়ী সাবাস্ত হইছে। ইতিপূর্বে প্রতিবারই বোম্বাই চূড়ান্ত ফলাফলে জয়ী হইছে।

বোম্বাইয়ের রাবোন স্টেডিয়ামে বোম্বাই-রাজস্থানের ফাইন্যাল খেলা এ বছর আশানুরূপ পর্বায়ে উন্নীত হয়। রাবোনের পিচ নতুনভাবে নির্মিত হইছে এবং এই পিচে বেশি রান সংগ্রহ করা ব্যাটসম্যানদের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর। কিন্তু ফাইন্যাল খেলার পাঁচদিনে সংগ্রহীত হইছে মোট ১০৬৭ রান এবং মোট ২৬টি উইকেটের পতন ঘটেছে। রাজস্থানের অধিনায়ক টেস্ট খেলোয়াড় হনুমন্ত সিং এই খেলার হীরা। হনুমন্ত উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন, দ্বিতীয় ইনিংসে ডবল সেঞ্চুরী। তিনিই চতুর্দশ খেলোয়াড় যিনি রঞ্জী ট্রফিতে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। এই খেলায় মোট পাঁচটি সেঞ্চুরী হইছে; বোম্বাই দলের পক্ষে শত রান করেন দিলীপ সরদেবাই এবং বাপু নাদকানী। দিলীপ সরদেবাইয়ের দুর্ভাগ্য মাত্র এক রানের জন্য তিনি ডবল সেঞ্চুরী করার কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারলেন না। রাজস্থানের পক্ষে সুবর্বার সিং সেঞ্চুরী করেন। ভারতীয় টেস্ট উইকেট রক্ষক ফারুক ইঞ্জিনিয়ারও ইংলন্ড সফরের প্রাক্কালে এই ম্যাচে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। উইকেট রক্ষক হিসাবে তিনি আটটি ক্যাচ ধরেন এবং এটি রঞ্জী ট্রফির খেলায় একটি নতুন নজীর।

রাজস্থান দল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে এবং প্রথম দিনের শেষে ৭ উইকেটে ২৩৬ রান সংগ্রহ করে। সুবর্-

বীর সিং সংগ্রহ করেন ৭৯ রান এবং হনুমন্ত সেঞ্চুরীর কৃতিত্বসহ ১০৯ রান। দ্বিতীয় দিন ২৮২ রানে রাজস্থানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। বোম্বাই দিনের শেষে ২ উইকেটে ২৭২ রান সংগ্রহ করে। সরদেবাই সেঞ্চুরী করে ১৬৫ রানে অপরাধিত থাকেন এবং অজিত ওয়াদেকার ৮০ রান সংগ্রহ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বোম্বাই দল ৭ উইকেটে ৫৮৬ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সরদেবাই মাত্র এক রানের জন্য দ্বিধাধিক রানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। সরদেবাই ১৯৯ রানে বোম্বাইর বলে ডিপ এন্ড্রো কভারে হনুমন্ত সিংয়ের হাতে ধরা পড়েন। নাদকানী সেঞ্চুরী করেন ১০০ রান সংগ্রহ করে এবং জার্দিকার ৮৫ রান সংগ্রহ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে রাজস্থান ব্যাটিংয়ে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এবং সুবর্বার, হনুমন্ত এবং শর্মার ব্যাটিং নৈপুণ্যের জন্য সাত উইকেটে ৪৪৫ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে শেষদিন চা পানের বিরতির পরে। সুবর্বার সেঞ্চুরী এবং হনুমন্ত অপরাধিত ডবল সেঞ্চুরী করেন। এদের ব্যক্তিগত অবদান সুবর্বার ১০২ রান, হনুমন্ত অপরাধিত ২১০ রান এবং আরও



হনুমন্ত সিং

উল্লেখযোগ্য হল শর্মার মূল্যবান ৭৪ রান। খেলার অবশিষ্ট সময়ে বোম্বাই দুটি উইকেট হারিয়ে ৫৪ রান সংগ্রহ করে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে জয়ী হয়।

বোম্বাইয়ের রঞ্জী ট্রফি খেলোয়াড় দিওয়াদকর এই খেলার শেষে তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন।

* * *

ভারতের একটি ক্রিকেট দল হায়দ্রাবাদ রুজ সিংহল সফর করলেন। সিংহল ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির একাদশের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী খেলায় হায়দ্রাবাদ রুজ মিলিত হয়। বোর্ড একাদশ প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ২৮২ রান এবং হায়দ্রাবাদ রুজ দল ২০৮ রান। প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় এম, এল জয়সীমা শত রান করেন এবং ১১৭ রানে অপরাধিত থাকেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আগামী ইংলন্ড সফরে ভারতীয় টেস্ট দলে জয়সীমা স্থান লাভ করতে পারেন নি।

রেল এবং মাদ্রাজ যুগ্ম বিজয়ী

গতবারের জাতীয় হকির যুগ্ম বিজয়ী ভারতীয় রেল দল এবারও জাতীয় হকির সম্মান মাদ্রাজের সঙ্গে যুগ্মভাবে লাভ করল। মাদ্রাইয়ে ফাইন্যাল খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার এবং অতিরিক্ত সময়েও কোন গোল না হওয়ার উভয় দলকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। সাধারণত ফাইন্যাল খেলা প্রথম দিন অমীমাংসিত থাকলে খেলার ভাগ্য চূড়ান্ত নির্ধারণের জন্য দ্বিতীয় দিন খেলার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এবার দ্বিতীয় দিন খেলা অনর্ধিত করার মত সময় পরিচালকরা পান নি। কারণ বিশজন খেলোয়াড়কে জলম্বরের শিক্ষা-শিবিরে যোগদানের জন্য ৩১শে মার্চের মধ্যে উপস্থিত হতে বলা হইছিল।

মাদ্রাজ এবং রেলের খেলা দেখার জন্য প্রায় কুড়ি হাজার দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাটি প্রথম থেকে শেষ পর্বন্ত ছিল আকর্ষণ এবং উত্তেজনায় পূর্ণ। মাদ্রাজ দলের গোলরক্ষক মুনীর সেটের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য রেল দল কোন গোল করতে পারে নি।

এবার নিয়ে মাদ্রাজ দু'বার জাতীয় হকিতে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু দু'বারই যুগ্ম বিজয়ী। রেলওয়ে এবার নিয়ে মোট সাতবার লাভ করল বিজয়ীর সম্মান। গতবার তারা সার্ভিসেসের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী হইছিল। রেলওয়ে টেসে জয়ী হইলে প্রথম ছ' মাস

সাপ্তাহিক বসুমতী



মিলিগ সরদেশাই

জাতীয় হকির বিজয়ীর সম্মান রত্নসম্বারী
কাপ রাখার যোগ্যতা লাভ করে।

মরদানের হকি লীগ

মরদানের তিন প্রধান আবার সুদূর
করেছে হকি লীগের অসমাপ্ত পর্বের
খেলাগুলি। গত সপ্তাহের হকি মাঠের
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ইন্টবেঙ্গল দলের
একটি মূল্যবান পয়েন্ট অপচয় এবং
মোহনবাগান-মেসারসের মধ্যপথে পরি-
ত্যক্ত খেলার ঘটনা।

বেশ কয়েকদিন পর মোহনবাগান হকি
মাঠে মেসারসের সঙ্গে লীগের খেলায়
মিলিত হলে মাঠে বহু দর্শকের আগমন
হটে। বোম্বাইয়ের মোহনবাগান দলের
রোভার্স কাপ জয়ের বিজয়-উৎসব করার
জন্য বহু সমর্থক মাঠে সমবেত হয় বাজী
সহ। দর্শকদের গ্যালারী থেকে বাজী
ফুটতে থাকে খেলা সুদূর হবার সাথে
সাথে। প্রথমার্ধের কুড়ি মিনিটে সঈদ
মোহনবাগানের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করলে
সমর্থকদের উৎসাহ চরমে ওঠে, মাঠের
মধ্যে বিস্ফোরিত হয় দু-একটি বাজী,
খেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং দলের নিরাপত্তার
অজুহাতে মেসারাস দল খেলা অসমাপ্ত
রেখেই মাঠ ত্যাগ করে। পরবর্তী পেলায়
মোহনবাগান ২-১ গোলে পরাজিত করে
পোর্ট কমিশনারসকে। পোর্ট কমিশনারসের
এ পালের দেওয়া পরিশোধমূলক গোলাটি
এ মরশুমের মোহনবাগানের বিপক্ষে
দেওয়া প্রথম গোল। লীগের নবম খেলায়
তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর মোহনবাগান
খালসা রুজকে ১-০ গোলে পরাজিত
করেছে। খালসা রুজ এই দ্বাদশ ম্যাচে
প্রথম পরাজিত হল, তাদের কতিতর সংখ্যা
মোট চার পয়েন্ট। অপরপক্ষে মোহন-
বাগানের কতিতর সংখ্যা এক পয়েন্ট।

প্রথমার্ধে খেল মিনিটে বেনি বড়লে
পেনাল্টি পুল থেকে মোহনবাগানের
একমাত্র বিজয়সূচক গোলাটি করেন।

লীগে ইন্টবেঙ্গল দলের প্রথম অগ্র-
গতি ব্যাহত হয় মহামেডান দলের বিপক্ষে।
ইন্টবেঙ্গল-মহামেডান খেলাটি গোল-
শূন্যভাবে শেষ হবার ফলে ইন্টবেঙ্গল
একটি পয়েন্ট অপচয় করে। পূর্বের
খেলায় ইন্টবেঙ্গল কোনক্রমে ১-০ গোলে
জয়ী হয় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিপক্ষে।
লীগের নবম খেলাতেও প্রায়ের দলের
বিপক্ষে বহু কটে ১-০ গোলে জয়ী
হয় ইন্টবেঙ্গল। লীগের দশম খেলায়
ইন্টবেঙ্গল দলের খেলার উন্নতি পরি-
লক্ষিত হয় এবং ইন্টবেঙ্গল এই খেলায়
পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টসকে অনারাসে ০-০ গোলে
পরাজিত করে।

বর্তমানে লীগের দোড়ো একমাত্র



বাণু, মাঝকানী

বি, এন, রেল দল এখনও একটি পয়েন্টও
অপচয় করে নি। বি, এন, রেল দল
ইন্টার্ন রেলকে ১-০ গোলে
পরাজিত করে তাদের অপরাধিত
আখ্যা ক্ষুদ্র করে। বি, এন, রেল দল
এ পর্যন্ত নয়টি খেলায় অংশগ্রহণ করে
সত্তাহ করেছে আঠারো পয়েন্ট।

সমাচার দর্পণ

বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান মহম্মদ
আলি ক্রে এবং আর্জেণ্টিনার প্রেস্ত
মুর্টিমোন্দা অস্কার বোনাডেলর মধ্যে
খেতাবের লড়াই অনুষ্ঠিত হবার কথা
আগামী ২৭শে এপ্রিল টোকিওতে।
জাপান বারিং কমিশনের পক্ষ থেকে বলা
হয়েছে যে তাঁদের সংস্থা এই লড়াই

খেতাবের লড়াই হিসাবে অনুমোদন
করবে না, কারণ তাঁদের কোন অনুমোদন
গ্রহণ করা হয় নি এবং জাপানে দুই
বিদেশী মুর্টিমোন্দার লড়াইয়ের ব্যাপারে
তাঁদের সংস্থার আইন অন্য ধরনের।

* * *

টরেন্টোর অনুষ্ঠিত কানাডিয়ান
সোর্টিংনয়াল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার
ফাইনালে ভারত ০-১ খেলার পরাজিত
হয়েছে ডেনমার্কের কাছে। ভারত ০-২
খেলার কানাডাকে পরাজিত করে ফাইনালে
উন্নীত হয় এবং ডেনমার্ক পরাজিত করে
এবারের সম্ভাব্য বিজয়ী মালয়েশিয়াকে
৪-১ খেলায়। এই প্রতিযোগিতায় মোট
খেলাটি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে।

* * *

অস্ট্রেলিয়া ত্যাগকারী বিদেশী
টেনিস খেলোয়াড় বব হিউইট এবার দক্ষিণ
আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করবেন ভের্ডিস
কাপের খেলায়। আন্তর্জাতিক লন
টেনিসের নিয়ম মত তিন বছর দক্ষিণ
আফ্রিকার বসবাস করার ফলে তিনি দক্ষিণ
আফ্রিকার পক্ষে খেলার যোগ্যতা অর্জন
করলেন।

* * *

ইংল্যান্ডের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরা-
চরিত বার্ষিক বোট রেসে অক্সফোর্ড ০৮
লেন্থে কেম্‌ব্রিজকে পরাজিত করেছে।
প্যাটনী থেকে মর্ট লেকের এই দূরত্ব
অতিক্রম করতে অক্সফোর্ড দল ১৮ মিনিট
৫২ সেকেন্ড সময় গ্রহণ করে। অক্সফোর্ড
এবং কেম্‌ব্রিজ দলের মধ্যে মোট ১১০ বার
এই রোয়িং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
হয়েছে। অক্সফোর্ড ৫১ বার, কেম্‌ব্রিজ
৬১ বার বিজয়ী হয়েছে আর একবার
সমান মানে ডেড হিট হয়েছে।



অরসীয়া

একটি অবিস্মরণীয় বোট রেস

ইংল্যান্ডের দুই বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজের মধ্যে রেবারেযি বার্ষিক সব দিকেই। তবে এই দুই সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বোট রেস অনেক প্রতিযোগিতার আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্র আকর্ষণকে হার মানায়। প্রতি বছর মার্চ মাসের শেষ শনিবার প্যাটনীর থেকে মট লেক পর্যন্ত জলের ধারে অফুরন্ত কৌতূহলী দর্শকের ভিড়। ঘোড়দৌড়ের আগে রেসদৌড়ের যেমন অশ্বের পদক্ষেপের দ্রুততার চলচেরা হিসেব করে বাজী ধরেন সেই রকম এই বোট রেসের দাঁড়ীদের দাঁড় ফেলার ছন্দোময় দ্রুততার বিচার করে চলে জোর বেটিং। কেউ চায় অক্সফোর্ড জিতুক, কেউ চায় কেম্ব্রিজ জিতুক। কারণ কেউ বা বাজী ধরেছে অক্সফোর্ডের ওপর আর কেউ বা ধরেছে কেম্ব্রিজের ওপর। মোট কথা মার্চ মাসের শনিবারের শীতের সকালে উন্মাদনা আর উত্তেজনার আগুন পোহানোও একটা বিরাট উপলক্ষ।

অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজের এই বোট রেস আজকের নয়; একশো তেরো বছরের এই বোট রেসের ইতিহাস নানা রঙীন রোমাঞ্চের কাহিনীতে ভরা। কিংবদন্তী আছে যে এই বোট রেস দেখার জন্য জলদেবতা নেপচূনের নাকি আবির্ভাব হয় টেমসের জলে মার্চ মাসের এই দিনটিতে। জলদেবতা নেপচূন যাদের আশীর্বাদ করেন জয়মাল্য ওঠে তাদেরই গলায়। এই বিজ্ঞানের যুগে এই অলৌকিক কাহিনী কেউই বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু বোট রেসের ইতিহাসে অনেক অপ্রত্যাশিত ওলট-পালট ফলাফলে এই কিংবদন্তী সম্বন্ধে কোন ধারণা জন্মালে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

এ বছরও মার্চ মাসের শেষ শনিবার দুই দলের বোট নামল বথারীতি জলে। শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য বিজয়ী অক্সফোর্ড দলই রেস জিতল। জয়-পরাজয়ের খতিয়ানে এখনও কিন্তু এগিয়ে আছে কেম্ব্রিজ। এ পর্যন্ত দুই প্রধানের মধ্যে রেস হয়েছে মোট একশো তেরো বার। কেম্ব্রিজ জয়ী হয়েছে একষটি বার আর অক্সফোর্ড একষ বার। একবার কিন্তু ফলাফল হয়েছে সমান সমান। আর সেই অবিস্মরণীয় বোট রেসের কথা “ডেড হিট” বলে ইতিহাস হয়ে আছে।

১৮৭৭ সালের সেই বোট রেসের “ডেড হিটের” অবিস্মরণীয় ফলাফল

অতীতে আর শ্বিতীয়বার হয় নি আর ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ। ক্রিকেটের টেস্ট খেলার আসরে “টাই টেস্ট” যেমন প্রায় অসম্ভব ঘটনা ঠিক তেমনি হল বোট রেসে “ডেড হিট”। অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট-ইন্ডিজের রিসবেনের “টাই টেস্ট” এক রোমাঞ্চের গল্পের মত হয়ে আছে ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায়।

সেদিনও ছিল ১৮৭৭ সালের মার্চ মাসের শেষ শনিবার। সূর্যকরোজ্জ্বল শীতের সকালে, তীব্র কনকনে এলোমেলো ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে বোট রেস উৎসাহী



বব হিউইট

প্রতীক্ষমাণ দর্শকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না টেমসের তীরে তীরে। বোট রেসের সূর্যতেই বাধা; কেম্ব্রিজের নৌকার দাঁড় আর হাল ঠিকমত ফিট করা ছিল না বলে নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে সূর্য হল রেস। তবে রেস সূর্য হয়েছিল, এমন সময় অতি উৎসাহী দর্শক বোঝাই একটা নৌকা হঠাৎ এসে পড়ল গতিপথে। ভাগ্যক্রমে অপের জন্য একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত ঘটল না। অক্সফোর্ডের বোটের দাঁড় শূন্যমাত্রা ওই দর্শক বোঝাই নৌকা স্পর্শ করে গেল।

সেদিন বোধহয় কেন এক অশুভ লগ্নে অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজের বোট রেস সূর্য হয়েছিল। কারণ পদে পদে বাধা; চলার পথে আরও দু-একটি জল-যান গতিপথে এসে সংঘর্ষের সম্ভাবনা

সৃষ্টি করে বোট রেসকে বিপদসঙ্কুল এবং আনিশ্চিত করে তুলেছিল।

এত বাধার মধ্যেও কিন্তু দুই দলের যোদ্ধারা নির্বিকার; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাদের লক্ষ্য শূন্য মট লেকের শেষ সীমার সেই ভাঁটিখানা, কে আগে অভিন্ন করবে ওই সীমানা। শীতের সকালের তীব্র কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় যোদ্ধাদের গা দিয়ে ঘাম বরছে; কিন্তু শরীরের সমস্ত শক্তি তারা তখন নিঃড়ে ঢেলে দিচ্ছেন দাঁড়ের ওঠা-নামার ছন্দের মাঝে। একবার এগিয়ে যাচ্ছে কেম্ব্রিজ, আর একবার অক্সফোর্ড। কোন দলই একটানা প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে নি। শেষ মুহূর্তে বোট দু’টি রেসের শেষ সীমা মট লেকের মদের ভাঁটি পার হয়ে গেল। সেই সময় এই বোট রেসের শেষ সীমানায় নির্দিষ্ট কোন চিহ্নিত সীমানা ছিল না। বিচারক “ফেলপস” বসে থাকতেন এই ভাঁটি-খানার পাশে, তিনি যা ঠিক করতেন তাই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হত। এদিন ‘ফেলপস’ ঠিক জারগাতেই প্রস্থত ছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন এবারের প্রতিযোগিতা সমান সমান হয়েছে, অর্থাৎ ডেড হিট। কিন্তু অক্সফোর্ডের সমর্থকরা হৈ-ঠে করতে লাগলেন, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের দলই জয়ী হয়েছে। কিন্তু অনেক বাদানুবাদের পর বিচারক ‘ফেলপসের’ রায়ই বহাল থাকল।

ওই সময় বিচারক ফেলপস সম্বন্ধে অনেক কৌতুককর গল্পের প্রচলন হয়। মট লেকের ধারে কনকনে শীতের সকালে অপেক্ষা করছিলেন বিচারক ফেলপস; কখন দুই দলের বোট আসবে প্যাটনীর থেকে। কিন্তু রেস দেরিতে সূর্য হওয়ায় ‘ফেলপস’ ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাই কনকনে শীতে শরীরটাকে চাঙ্গা করার জন্য পাশের মদের ভাঁটিতে ঢুকে দু-এক পান্ডর খেয়ে নিলেন তিনি। শরীরটা চাঙ্গা হল বটে কিন্তু মাথাটা একটু বেশি হবার জন্য নেশাটা জমে উঠল। নেশায় বৃদ্ধ ফেলপস গাছের তলায় বসে, কখন দুই দলের নৌকা পার হয়ে গেছে খেয়াল নেই, হুঁস হল লোক-জনের চিংকারে। কাদের নৌকা আগে গিয়েছে তা তিনি কিছুই দেখেন নি। তাই বৃদ্ধি করে বলে উঠলেন “ডেড হিট”।

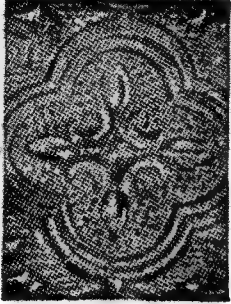
গল্পটি সত্য কি মিথ্যা জানা নেই। তবে যাই হোক হয়ত বা ফেলপসের ভুলের জন্য ১৮৭৭ সালের বোট রেস অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

—মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

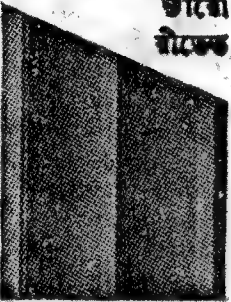
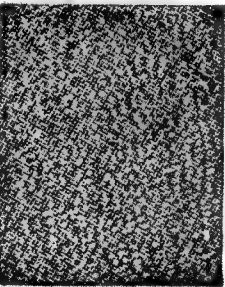
সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গবন্ধু (প্রাঃ) লঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

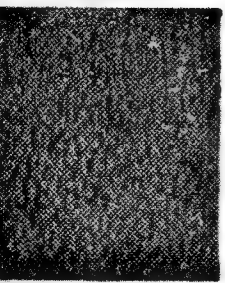
বঙ্গবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



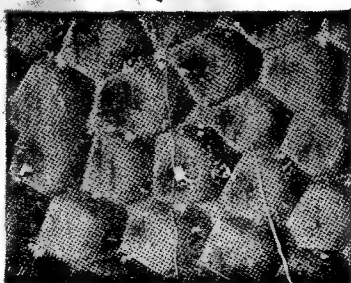
মরেক

ভায়ে
বীভেড

মরকো পিন্‌হেড



রাফকাট



হামার্ড

আজকালকার হুপতিরা বৃহনির্মাণে এইচ পিজি গ্রাস ব্যবহার করেন

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-
কাছারি, কলকারখানা, ইন্ড্র ও
হাসপাতালে হু বক ইঞ্জিনিয়াররা
অর্ধতই এইচ পি জি গ্রাস বাগান,
কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি
গ্রাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বহার
য়েখে তৈরী হয়। বিশেষতঃ শতাব্দিক
কলনের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান
পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী
কৃপনতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান
পিলকিংটন গ্রাস ওয়ার্কস এই এইচ
পি জি গ্রাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর-
যোগ্য ভান ছিলি কেনা।

হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্রাস ওয়ার্কস
লিমিটেড

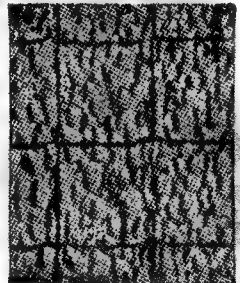
19 APR 1967

হেল্যাগোনাল
ওয়্যারড

শিট গ্রাস



জর্জিয়ান ওয়্যারড



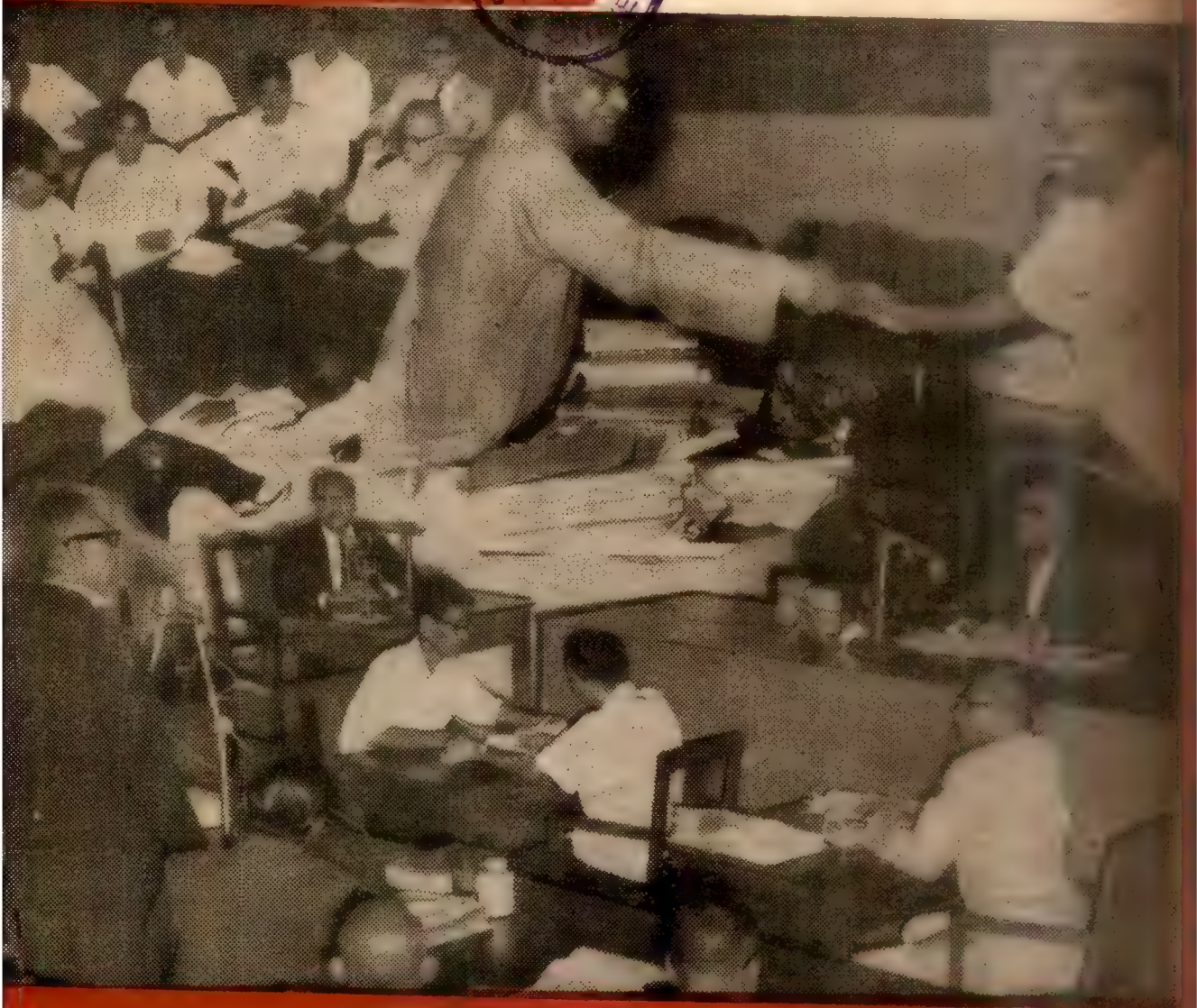
ম্যানেজিং এজেন্টস
ভালুকহার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিভিঃস
৪, চিত্তরঞ্জন আভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

সাপ্তাহিক বসুমতী



কর্মমুখর কলকাতায়

- (১) শিল্পে শান্তিরকার আলোচনা
- (২) অজয়-নাম্বুদ্রিপাদ সাক্ষাৎকার
- (৩) লেন কমিশনের বৈঠক



: ৪৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ



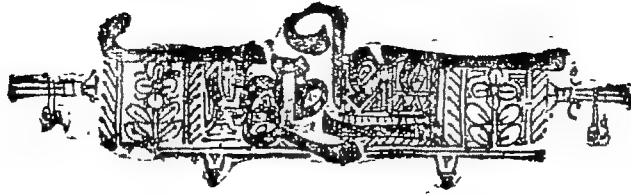
13th April, 1966 * Vol. 71, No.



ছবির মত মৃদু খাঁর তাকেই বলি চিরময়ী।

ফার্মিনা প্রোর

ছোঁয়া পেয়ে সবাই হয়ে উঠল তা-ই।



বিষয়	লেখক	বিস্তার
সম্পাদকীয়		২৭৫৫
আজকের মানুষ		২৭৫৬
ভারতবর্ষ		২৭৫৭
আন্তর্জাতিক		২৭৬১
যা দেখছি, যা শুনছি (স্মৃতিচয়ন)	শ্রীসুবীরজন দাস	২৭৬৩
নব মন্দির সভাপত্র		২৭৭০
ঘড়ীকাঁকী (অনুবাদ গল্প)	অমলমোহন রায়মৌলিক	২৭৭৬
জগদর্শন		২৭৮০
অগ্নিদুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	২৭৮৫

সাহিত্য-সম্রাট—বঙ্গদেশের অশ্রুত কবি

বন্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলানন্দরায়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাখারানী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩ টাকা

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মদ্রিচরাম গড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরসাগর কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাধাই)—সাতো চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিস্তা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজসাগর কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, নিবিধ কাব্য, মল্ল কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাধাই) সাতো তিন টাকা

শ্রী মতিলাল দাস প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

- ১। চলার পথে (উপন্যাস)
- ২। মনুষ্য (উপন্যাস)
- ৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সম্বলিত)
- ৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
- ৫। চার্বাক (নাটক)

বঙ্গমতী প্রাইন্ট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চোমৎ লামার চোমৎ উত্তরবর্ণা	—	২৭৯০
(কেউ ভুলতে পারছে না (কবিতা))	— মনোরমা সিংহরায়	২৭৯২
সেতার (গল্প)	— মাণিক মৃৎপাখ্যায়	২৭৯৩
বিল্লী থেকে	— বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৭৯৬
পাক-ডারভের রূপরেখা	— প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	২৭৯৮
বিশ্বসাহিত্যের 'আদিপর্ব'	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২৮০১
রাশিমাণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	২৮০৪
রূপগজগৎ	—	২৮০৬
পাঠকমন	—	২৮১১
বেলাহালা	— শ্রীঅমিতান্ত	২৮১৩

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান
ভক্তিজগতের কৌস্তভরস, উগ্ৰসত্ত্বগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
সদৃশ মহাপরিভূক্তিশাল্য সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রলাপ ও শিক্ষাসূচক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণভক্তের জন্য যে
উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমদখনিঃসৃত শিক্ষাসূচক
শ্লোকই তাহার একমাত্র রচনা।—শ্রীল
কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুসুন্দরিত পদ্যানু-
বাদে এই অমূল্য মধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস
বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য
ভক্তিরিতমত।

দলভঙ্গার
শ্রীচৈতন্যমণ্ডল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস
বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপৃক্তিত।

আত্মতত্ত্ব
বৈষ্ণব দর্শনের সুস্বাতন্ত্র্য অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা
শ্রীপ্রমোদ দাস ঠাকুর বিরচিত।
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভক্তির নিগূঢ়
মর্মসমাহিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার
সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণ-
দাসের সুসুন্দরিত পদ্যানুবাদ।

পাশ্চাত্য-দলন

মুদ্রিতমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-
সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের
অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের
প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।—সুদূরে
নামমাত্র মূল্যে বিতরণিত।
মূল্য : ৩ টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেনা

মূল্য এক টাকা
কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-
শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়ো গল্পে
ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির দিনে, বৃন্দাবনের
বৃষ্টি, কাঠের কপাল, হাঙর মানুসের
চোখের জল, ভুলের ভুল, মৃগী চাচা,
বৃন্দাবনের গল্প, একটার বদলে দুটো,
নতুন সিনেমার ছবি, ছাদের গল্প, ইন্দুরের
কীর্তিকাহিনী, বাঁদরের মেটলিচকাড়ি।

ছড়া—হট্টমালার বস্ত্রবাড়ী, হোহোহো
বুড়ি করে, পাগোয়ান প্যারাম, উলটো
বাকির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের
বায়েরাম, হাবুদাবুর মনের কথা, আন্দ
কালের বন্দী বৃড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী পূর্ণা রায় কর্তৃক
সুচিত্রিত
উপহার দিব্য মত বই।

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মজুসা

২৮০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



৭১ বর্ষ : ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পরস
বৃহস্পতিবার, ৩০শে এপ্রিল, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 13th April, 1967

শিল্পে শান্তি রক্ষার উপায়

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে শান্তি রক্ষার সমস্যাটি এখন বড় আকারে দেখা দিয়েছে। বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলেই এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সমস্যার কারণগুলি অগ্রাহ্য করা যায় না। এদেশের মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সম্বন্ধে তেমন সচেতন ন'ন বললে—ভুল বলা হয় না। মালিকদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা। অথচ যে শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সামান্য রোজগারের স্বারা সংসার প্রতি পালন করে তাদের ভালো-মন্দের দিকটা বিচার করাই হয় না। দক্ষ বা অদক্ষ—দুই শ্রেণীর শ্রমিক আকস্মিক ছাঁটাই, কারণনা বশত প্রভৃতির সম্মুখীন হয়। আকস্মিক ছাঁটাই করার ব্যাপারটিও অ-মানবোচিত। এইভাবে ছাঁটাই করার জন্য কোনো কারণ দর্শাবারও প্রয়োজন হয় না। শ্রমিকদের চাকরিতে নিয়োগ করা হয় এমনভাবে যাতে তারা বিধিবশভাবে স্থায়ী করার সুযোগ পায় না। একটি বিশেষ সময় অন্তে তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর অস্থায়ীভাবে আবার কাছে নিয়োগ করা হয়। ফলে চাকরির সমস্যা থেকে এরা কোনদিনও রেহাই পায় না। এদের ভবিষ্যৎও অশুকারাজ্য। এর ভুলনাম বৈদেশের বজেরীরা রাষ্ট্রগুলির দিকে লক্ষ্য কবলে দেখা যায় যে সে-সব রাষ্ট্রে শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান নানাভাবে করা হয়েছে। সেই কারণে রাষ্ট্র শিল্পোন্নত হয়েছে, মালিকপক্ষও লাভবান হয়েছেন এবং শ্রমিক-মালিক উভয়পক্ষে একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের দেশকে শিল্পোন্নত করার জন্য প্র্যানিং কমিশন বারবার ফতোয়া জারি করেছেন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এমনই যে, শ্রমিক কল্যাণের কথা যেটাই বলা হয়ে থাকুক না কেন, তা সম্ভব হয়

নি মালিকপক্ষ বরাবর শ্রমিকপক্ষকে সম্মেদের চোখেই দেখে আসছেন। শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধার কথা তাঁরা কোনোদিনই ভেবে দেখেন নি। তাই ছাঁটাই লে-অফ, লক আউট প্রভৃতি ঘটনাগুলি এখন আর নতুন শোনার না। অবশ্য ডাঃ বিধনচন্দ্র রায় যখন পশ্চিমবঙ্গে মধ্যমশ্রমী ছিলেন তখন শ্রমমন্ত্রী সাতারের সহযোগে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটিকে নতুনভাবে বিচার করে দেখতে চেয়েছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়তে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সে পথে এগিয়ে যেতে পারেন নি। অতএব ছাঁটাই-এর খড়া এবং নানাবিধ অবিচার থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে শ্রমিক সংস্থাগুলি আত্মরক্ষার জন্য নানা কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেছিল। সেই সব পন্থার মধ্যে বিধি-সম্মত ক্ষুরধার অস্ত্র ছিল ধর্মঘট। কিন্তু নিঃসম্মতিক ধর্মঘট করা সত্ত্বেও দেখা গেছিল সরকারের অসহযোগিতায় শ্রমিকরাই বিপদাপন্ন হয়েছে। যে সমস্ত ব্যাপার সরকার নিয়োজিত ট্রাইবুনালের কাছে সালিশের জন্য প্রেরিত হয়েছিল, তাদের স্বর শ্রমিকপক্ষে যাওয়া সত্ত্বেও সেগুলি মালিকপক্ষ কোনোদিন কার্যকর করেন নি। তাই ন্যূনতম বেতন বা পাওনা বোনাস থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়েছে। তাদের চাকরিতেও স্থায়ী করা হয় নি। বিচারের ব্যয় সত্ত্বেও তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের আর একটি পন্থা হচ্ছে ঘেরাও। এই ঘেরাও যদি এমনি হয় যে, কাউকে এক নাপাড়ে গাছে ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে অন্তরীণ রাখা—তাহলে নিশ্চয়ই তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে, স্বয়ং

মালিক অপেক্ষা হাজার হাজার টাকার অফিসারদের অব্যবহার-এর জন্য অনেক অর্থ নষ্ট হয়। এমন কি, শিল্পক্ষেত্রের সমগ্র চিত্রটিও শিল্পপতির কাছে তাদের জন্যই সুস্পষ্ট নয়। আমাদের মনে হয়, এদেশের শিল্পপতিরা শুধুমাত্র মুনাফার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করেন না, দেশের কথাও তাঁরা বিবেচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত কংগ্রেসী শাসনে শিল্পক্ষেত্রে যাই ঘটুক না কেন, শিল্পে শান্তি রক্ষার সমস্যাটি বর্তমান সরকারের নতুন করে বিবেচনা করে দেখছেন। এই ব্যাপারে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে চুক্তি কার্যকর করা। বিগত সরকারের আমলে কোনো চুক্তিই রক্ষিত হয় নি। এবং আমরা মনে করি একালেও হবে না যদি মালিকপক্ষ কর্মসংস্থানের সংকোচন করেন ও শ্রমিকদের চাকরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নির্বিকার থাকেন। শ্রমিকদের ঘেরাও নিবারণের জন্য মালিকপক্ষকে সহায়তাবে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সরকারের আমলে পূর্বতন সরকারের আমল অপেক্ষা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘেরাও-এর সংখ্যা নগণ্য সংখ্যক হলেও ত্রিপাক্ষিক আলোচনার সময় মালিকপক্ষ থেকে এর ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিবারের প্রতি মনোনিবেশ করলেই শিল্পে শান্তি বজায় সহজ হতে পারে। আর তা রক্ষার দায়িত্ব শ্রমিকপক্ষ অপেক্ষা মালিকপক্ষেরই বেশি। আশা করি, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় সেই মনোভাব সৃষ্টি হলেও শিল্পক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠবে।

সিঙ্গাদকী

আজকের মানুষ

একটি মৃদুত যেন একটি দুরসহ বছর। কিন্তু এমনি ১৮টি দিন নীরবে প্রতীক্ষা করেছেন, বৃকে বল ও মনে আশা নিয়ে। কিন্তু যখন বুঝলেন যে, চন্দ্রভান ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না, তখন চরণ সিং আর কালবিলম্ব না করে সিংধালত নিয়ে ফেললেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক সিংধালতের ফল কংগ্রেসের পক্ষে অভাবনীয় ছিলো। ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তর প্রদেশকে অকংগ্রেসীদের হাতে ছুঁতে দিতে হয়েছে।

মধ্যমন্ত্রী-শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত প্রবীণ ও প্রভাবশালী নেতা শ্রীচরণ সিংকে তুচ্ছজ্ঞান করতে চেয়েছিলেন। বিধানসভার দলনেতা নির্বাচিত হয়ে তিনি যেন হরাকে সরা জ্ঞান করেছিলেন, তাই ইচ্ছে মতো মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন তিনি। কিন্তু চরণ সিংকে অবজ্ঞা করার অর্থ যে স্বহস্তে নিজের কবর রচনা করা—এ দ্ব্যস্তব জ্ঞান সিং-বি-গুপ্তের সৈন্য হই নি।

চন্দ্রভান ব্যক্তিগত আকোশের বশে চরণ সিংকে বা তাঁর প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন, অস্বীকার করবে না উত্তর প্রদেশ। উত্তর প্রদেশের ইতিহাসের সঙ্গে চরণ সিং-এর জীবনীতহাস আজ একাকার হয়ে গিয়েছে। রাজ্যটি যখন সংযুক্ত প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল তার বহু আগে থেকেই উত্তর প্রদেশের প্রতিটি সংগ্রামেই চরণ সিং-এর সৈনিকের ভূমিকা ছিলো। আইন অমান্য আন্দোলনের ডেউয়ের দোলায় যখন দেশের দিক-দিগন্ত ঝৈলিত—তরুণ চরণ সিং-এর কণ্ঠেও যবন শোনা গিয়েছিলো স্ববাক্য চাই, আজাদী চাই। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ এবং পরে এল-এল বি ডিগ্রী নিয়ে চরণ সিং জাতীয় মুক্তিবাক্তে নিজেকে উৎসর্গ করেন। আর্থ সমাজভুক্ত হয়ে তিনি প্রথমে সমাজ আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক জীবন সুরু করলেও পরে আর্থসমাজের রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সার ছোট্ট রামের অনুরাগী হিসেবে চরণ সিং আর্থসমাজের একজন উদ্যোগী কর্মী ছিলেন। পরে বিখ্যাত নেতা পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্ডের সান্নিধ্যে এসে চরণ সিং জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং দেশ সেবার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেন।

এ-কারণে তাঁকে—করকবার কারাবরণ করতে হয়েছিলো, কিন্তু মৃদুত পেয়ে আবার পুনরো পথই ধরেছিলেন।

সিং-বি-গুপ্ত না মানতে পারেন, স্বয়ং পণ্ডিত পথ চরণ সিং-এর চারিত্রিক-দৃঢ়তা, তাঁর—পাণ্ডিত্য ও বিদ্যেবৃদ্ধির সঠিক মূল্যায়ন করেছিলেন। কংগ্রেস যখন ক্ষমতা নিলেন এখানে, পন্ডজী তাঁর মন্ত্রিসভায় চরণ সিংকে স্থান দিতে, তাঁর যোগ্যতাকে পূরনকৃত করতে

করতে হয়েছিলো, কিন্তু মৃদুত পেয়ে আবার পুনরো পথই ধরেছিলেন।



শ্রীচরণ সিং

ভুল করেন নি। বাস্তবগক্ষে, স্বাধীনতার পর উত্তর প্রদেশে যতবারই সরকার গঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই চরণ সিং-এর অনিবার্য উপস্থিতি ঘটেছে। ব্যতিক্রম হয়েছিলো মাত্র এইবার। চন্দ্রভান গুপ্তই তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন চরণ সিংকে বাদ দিয়ে, প্রিন্স অফ ডেনমার্ককে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক অভিনয় করার মতো। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, ডেপুটি মন্ত্রী থেকে সুরু করে শ্রীচরণ সিং বিভিন্ন মন্ত্রিসভার বিভিন্ন দপ্তরের ভার নিয়ে কাজ

করেছেন। কখনো বা তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কখনো অর্থমন্ত্রী আবার কখনো রাজস্ব-মন্ত্রী। শ্রীমতী সূচতা কপালনীর আমলে তিনি ছিলেন রাজ্যের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন দপ্তরের মন্ত্রী।

একথা সত্যি যে, চরণ সিং-এর সঙ্গে মতানৈক্য অনেক নেতারই হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর প্রধান কারণ হলো, কৃষি ও খাদ্যের প্রশ্নে চরণ সিং-এর কয়েকটি নিজস্ব চিন্তাধারা বা মতামত রয়েছে। তিনি তাঁর সব ছাড়তে রাজী, কিন্তু নিজের বিশ্বাস বা মত কখনই ছাড়বেন না। এজন্য বহু সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর মতান্তর থেকে মনান্তর পর্বন্ত হয়েছে, কিন্তু আপোষ করে নিজের ভাব-ধারাকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। ডঃ কম্পর্গনন্দের মন্ত্রিসভা তিনি এককথায় ত্যাগ করেছিলেন যখন দল-নেতার সঙ্গে মতের বিরোধ হয়েছিল তাঁর। সমবায় চাষ পরিকল্পনার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ও অবিসম্মাদী নেতা জওহরলাল নেহরুর সঙ্গেও কি তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয় নি?

কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা একবাক্যে সকলে স্বীকার করবেন যে, ব্যক্তিগত জীবনে চরণ সিং-এর মতো সং ও নিষ্ঠাবান নেতা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে দুর্লভ। এজন্যই মীরাট নির্বাচনী কেন্দ্রে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়ে কোন বিরোধী দলই তাঁকে অসম্মান করেন নি।

গ্রন্থকার হিসেবেও চরণ সিং-এর বেশ খ্যাতি আছে। জমিদারী উচ্ছেদ এবং ভারতীয় কৃষিসমস্যা সম্পর্কে তাঁর লেখা বই সৃষ্টিসমাজের প্রাণ আকর্ষণ করেছে। উত্তর প্রদেশে আজ যে ভূমিধারী পরি-কল্পনা চালু হয়েছে: চরণ সিং-ই তাঁর জনক।

৪৫ বছর ধরে একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁদ করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক সন্দেহ নেই, চরণ সিং-এর প্রাণে সে ব্যথা জেগেছিলো যখন তাঁকে কংগ্রেস ছেড়ে পাণ্ডা জনক কংগ্রেস গঠন করতে হলো। কিন্তু তাঁর কাছে দেশ আগে, দল নয়; তাই দেশের স্বার্থে তিনি সিং-বি-গুপ্তের সঙ্গী, মনোভাবের জবাব দিলেন উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটিয়ে। এতদিন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্যমাত্র ছিলেন চরণ সিং, এখন নেতৃত্ব নিয়েছেন তিনি, উত্তর প্রদেশে চরণ সিং-এর সরকার গঠিত। দায়িত্ব শূন্য মধ্যমন্ত্রী বলেই নয়, বিভিন্ন পরম্পরাবিরোধী চিন্তাধারার রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি কেমন করে দুরন্ত পায়ারার অভিক্রম করেন—দেশবাসীর সাগ্রহ দৃষ্টি থাকবে সৈদিকে।

উত্তরে হাওয়া

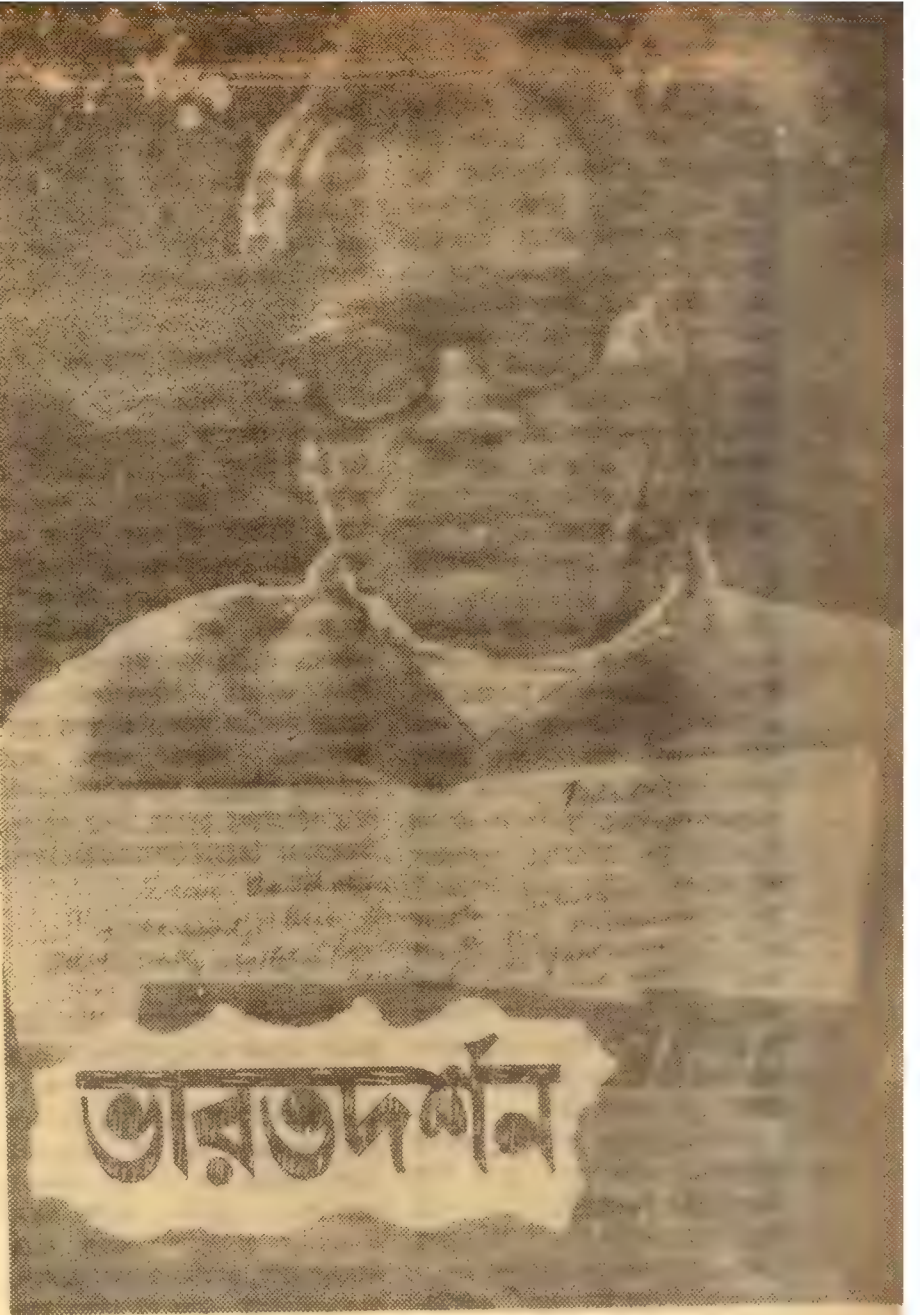
বিহার তো আগেই গেছে, অতঃপর উত্তরপ্রদেশও ভারতের কংগ্রেসী মানচিত্র থেকে খসে পড়ল। এই নিরে একে একে নটি রাজ্যে কংগ্রেসী পতন, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ও দলের পক্ষে নিতান্তই হৃদয়-বিদারক সংবাদ। তবে উত্তরপ্রদেশে যে এমনটা হবে এজন্য মনে মনে কংগ্রেসের পক্ষে প্রস্তুত থাকারই কথা। কিন্তু সি বি গুপ্তের বড়ই সাধ-আহ্বাদ ছিল হৃত-রাজ্য পুনঃসংগ্রহের। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসে ক্ষমতার লড়াই গোটা রাজ্যটাকেই এক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছিল।

রাজ্য কংগ্রেস প্রধান শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী, শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের পরমা নম্বর বৈরী তো নির্বাচনেই কাং হলেছিলেন, শ্রীমতী কৃপালনী অক্ষমতার অপবাদ নিয়ে লোকসভায় চলে গেলেন। শ্রীগুপ্তের পথ এদিক দিয়ে বেশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু বিধি বাম। প্রাক্তন স্বাধীনতাশাসনমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং যে অকস্মাৎ শ্রীগুপ্তের বাড়ি ভাতে ছাই দেবেন, শ্রীগুপ্ত লোভহয় অতটা আঁচ করেন নি। তবে শ্রীচরণ সিং শ্রীগুপ্তকে আদর্শেই যে সহ্য করতে পারেন না এবং এমনশই তিনি যে বিরোধীদের দিকে ঝুঁক-ছিলেন এটা সর্বজনবিদিত। কিন্তু কে ভেবেছিল চরণ সিং এমন নাটকীয়ভাবে রাজ্য বিধানসভায় সদলবলে প্রবেশ করে রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিরোধীদের একটা সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে সতের ভোটে বিরোধী প্রস্তাবকে তুচ্ছ করে জিতিয়ে দেবেন আর শ্রীগুপ্তের সাধের সিংহাসন টলমল করে উঠবে। আঠার দিনের গুপ্ত-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ না করে উপায়ন্তর খুঁজে পাবে না। চরণ সিং মন্ত্রিসভায় যোগ দেন নি শ্রী সি বি গুপ্তের ওপর তাঁর আস্থা না থাকার জন্য। অতঃপর তিনি কংগ্রেস দলও ত্যাগ করলেন দল হিসেবে কংগ্রেসের ওপরই আস্থা হারিয়ে। নির্বাচনী ফলাফলেও কংগ্রেসের চৈতন্যোদয় হয় নি দেখে তিনি রম্যাহত। স্বতঃমানে উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভায় তিনিই যুক্ত দলের নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর-প্রদেশের রাজনৈতিক দলাদলির শিকার জনসাধারণ অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কাছে এবার নতুন কিছুর আশা করলেন।

নতুন মন্ত্রিসভার প্রসঙ্গে আমার আগে যে উত্তরে হাওয়ার দাপটে আজ কংগ্রেসে সামগ্রিকভাবে ফাট ধরেছে, উত্তরপ্রদেশে সে হাওয়া তেমনভাবে বইতে শুরু করলো ভার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা যাক।

প্রাক্ নির্বাচনী ভাঙন

গোন্ডা নির্বাচনী এলাকায় যেমন শ্রীমতী কৃপালনীর বিরুদ্ধে কতিপয়



ডঃ রামমোহন লোহিয়া শ্রীমতী শ্বেতানা প্রেরিত পত্র পাঠ করছেন

কংগ্রেসী নেতা সক্রিয় ছিলেন বলে অভি-যোগ এবং গোন্ডা জেলা পরিষদের সভাপতি সন্ত বক্স সিং (কং) নিজেকে নিষ্কল্ল রেখেছিলেন বলে সংবাদ; রাণী-ক্ষেত্রে শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের নির্বাচনী এলাকায়ও ডেমন গুপ্তবিরোধী কংগ্রেসীরা গুপ্তের পক্ষে সামান্য পরিগ্রহও করেন নি। সি বি গুপ্তকে পরস্যাওয়ারা একশ্রেণীর শ্রোণীস্বার্থবাদীর ওপর মূখ্যত নির্ভর করতে হয়। জনৈক কনকুকের চিনি ব্যবসায়ীর প্রদানদেই ছিল সি বি গুপ্তের প্রচারদপ্তর। কিন্তু শ্রীগুপ্ত জন-অপ্রিয় নেতা। সাধারণের কাছ থেকে তিনি তিল প্রমাণ সাহায্য পেয়েছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকৈলাস প্রকাশকে মীরাতে সহায়দের বাহ-

এগিয়ে দিতে পারতেন স্বয়ং চরণ সিং; কিন্তু গুপ্তবিরোধীর কাছে সে সমর্থন প্রত্যাশিত ছিল না।

নির্বাচনের পর দেখা গেল শ্রীগুপ্তের উপদলীয় অবস্থা বেশ কাঁহিল। কমলাপতি ত্রিপাঠী পরাজিত হলেও গুপ্তবিরোধীরা হাল ছাড়েন নি, শ্রীচরণ সিং-এর নতজ্ঞে দল বাঁধবার চেষ্টায় আছেন।

রাজ্য কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ সহায় হাওয়া বুঝে পূর্বাভাসেই রায় দিয়ে-ছিলেন যে, রাজ্যে কংগ্রেসী সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার সম্ভব সম্ভাবনা। আর সে জন্যই বিরোধী দলগুলির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু কে কার কথা জানে। বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে পারামিট লাইসেন্স রাজ্য দখল

করার দাবী দিই গুরুতর। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রতরং কমতা চাইলেন। চাইলেন-যখন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্নে জোর টাং অব ওয়ার চলছে তখনও এবং কোনরকম অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই। অথচ গুরুত্ব উপদলের শক্তি ছিল নতুন বিধানসভায় ৯৪ জনের মত। আর রাজ্যের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ছিল পূর্ববর্তী নির্বাচনী ফলপ্রসূতির আলোকে নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৬২ সালে কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচক সমর্থনের হার ছিল শতকরা ৩৬ দশমিক ভিন। এবার তা নেমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বর্ষাশ দশমিক দশে। গতবারের ২৪৯টি আসনের জায়গায় এবার কংগ্রেস লাভ করেছিল মাত্র একশত আটানব্বইটি আসন।

বিরোধীরা এজন্যই একজোটে মন্ত্রিসভা গঠনের আশা পোষণ করছিলেন। কিন্তু চট করে একমত হতে পারেন নি। কম্যুনিষ্ট এবং জনসংঘের একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কাজ করার সম্ভাবনা ছিল স্বল্প। এমনও প্রস্তাব এসেছিল যে, কোয়ালিশন যদি অসম্ভব হয়, তবে জনসংঘ বা এস এস পি'র মধ্যে যে কোন দল এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করুক, অন্যান্য অকংগ্রেসী দল সমর্থন জানাক। কিন্তু উত্তরের কেউই নিজের কাঁধে অতবড় দায়িত্বটি এক কথায় তুলে নিতে রাজী হন নি। অথচ এমনি এক পরিস্থিতিতে সি বি গুপ্ত লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। আঠার দিনে সেই ভুলের মামুলও তাঁকে কাজে কাজেই প্রদান করতে হল।

অতঃপর বিহারে কম্যুনিষ্ট জনসংঘ হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজী হলে জরসা পেল উত্তরপ্রদেশও। আর দুই দলের মিলনে একটি ফলপ্রসূ হাইকেনের ভূমিকা গ্রহণ করল এস এস পি।

অতঃপর চরণ সিং যখন নাটকীয়ভাবে কংগ্রেসের ভরাদুর্বি খটিয়ে শ্রীচন্দ্র-ভান গুপ্তের 'অনেক দিনের আশা'কে মাঠে মারলেন, বিরোধী সংযুক্ত বিধায়ক দল তখন ফ্রন্টের নবনির্বাচিত নেতা শ্রীরামচন্দ্র ডিকলকে সিরিয়ে ফ্রন্ট নেতা হিসেবে চৌষটি বছরের অভিজ্ঞ নেতা শ্রীচরণ সিংকে দলপতি নির্বাচিত করলেন। শ্রীসিং মন্ত্রিস্বের ব্যাপারে লম্বা অভিজ্ঞতার লিষ্ট তুলে ধরতে পারেন। কেন না ১৯৫১ সাল থেকেই তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় কোন না কোন দপ্তরের মন্ত্ররূপে গৃহীত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভেঙে-আসা জনকংগ্রেসীদের বিধানসভায় প্রতিনিধি সংখ্যা এখন কুড়ি। এর মধ্যে জনা দুই নিদলীয় সদস্যও আছেন।

গুপ্তমন্ত্রিসভাও সুচেতা-মন্ত্রিসভার মতো রাজ্যের মূল সমস্যাসমূহের দিকে

নজর দিতে যে আদৌ আগ্রহী নন, শ্রীচরণ সিং সেই আশঙ্কা করেই দলত্যাগ করে জনকংগ্রেস গঠনে আগ্রহী হয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে ক্রমেই চরণ সিং এর দল ভারী হয়ে উঠবে খসে-পড়া কংগ্রেসী সদস্যদের জনকংগ্রেসে যোগদানের দ্বারা।

চরণ সিং-এর প্রতিশ্রুতি

অংশত পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনুরূপ প্রতিশ্রুতি ও আবেদন নিয়ে সংযুক্ত বিরোধী দলের নতুন মন্ত্রিসভা উত্তরপ্রদেশের নান্দরিক গণের সম্মুখীন হয়েছেন। শ্রীচরণ সিং খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভরতা এবং দলনীতি দরী-করণের প্রতিশ্রুতি দেন। মজুতদারী, কালোবাজারী এবং স্বজন-পোষণের অভিশপ্ত অনাচার দমন করা হবে বলেও তিনি জানান। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় রাজ্যের নবগঠিত সরকার জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা আহ্বান করেন, তবে পুলিশের সদিচ্ছাকে জনস্বার্থবাদী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে চিন্তা করেছে, উত্তরপ্রদেশ সেভাবে চিন্তা করছেন কি না জানা যায় নি।

চাই 'স্বাধ, কাজ' :

দেবার মতো এখন কিছ নেই

শ্রীচরণ সিং জনগণের প্রতি প্রায় নিশ্চিত নিষ্কাম কর্মপ্রচেষ্টার দাবি জানিয়ে বলেছেন, সবশক্তি দিয়ে কাজ করুন। কিন্তু প্রতিদানে একটি সুস্থল দলনীতি-মুক্ত শাসনব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই তাঁর পক্ষে রাজ্যবাসীকে উপহার দেওয়ার মতো নেই। শ্রীসিংকে ধন্যবাদ, তিনি লম্বা-চওড়া প্রতিশ্রুতি না রেখে ধীরে ধীরে এগোবার যে সংকল্প গ্রহণ করেছেন, অ-সাম্প্রতিকমুদ্র হলে তা নিশ্চয় ফলপ্রসূ হবে।

গুপ্ত ফাশ

শ্রী সি বি গুপ্তের সেই পঁয়ষিট লক্ষ টাকার তহবিল সম্পর্কে এবার একটা তদন্ত বসানো হোক বলে রাজ্যে সাধারণ দাবি উঠেছে এবং সে বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন বলে শ্রীচরণ সিং আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেসীমহল গদি টলে যাওয়ার সি বি গুপ্ত ও বারানসী দলের ওপর মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। এখন গুপ্ত এবং বারানসী দাসের নীতিই চরণ সিং-এর দলত্যাগের কারণ বলে অভিযোগ এনেছেন দলীয় সদস্যগণ।

ধর্মের কল

কম্বার বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তবে এমনভাবে খুব কম ক্ষেত্রেই কল-

কম্বার নড়াচড়া প্রত্যক্ষ করা যায়। সাম্প্রতিক কমতাগর্বে এক ধাক্কাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে অতুল্যাবাদুর বিরুদ্ধেও একই আওয়াজ উঠেছে। চরণ সিংকে কি বাংলার অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই হিসেবে স্মরণ করা যায়। কংগ্রেসী পতন সম্পূর্ণ হলে মুক্ত কংগ্রেসী সভারা উল্লাসভাবে অতুল্য-নীতির বিরুদ্ধে এবং অজয়বাবুর ওপর অন্যাস আচরণের বিরুদ্ধে প্রস্ন উত্থাপন করতে সাহসী হলেন। তবে অজয়বাবু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে ভোট-বৃক্ষে পরাস্ত করে কংগ্রেসী নেতৃত্বের খোঁতা মুখ ভোঁতা করে ছেড়ে দিয়েছেন। অতুল্যবাবুকেও বাংলাদেশ সাফ জবাব জানিয়ে দিয়েছে—চাই না। কিন্তু উত্তর-প্রদেশে সি বি গুপ্ত এবং বারানসী দাস উভয়েই নির্বাচনে তরে এসেছিলেন। তদ্রূপ ধর্মের কল বাতাসে নড়ল।

অনড় নেতৃত্ব

কংগ্রেসের পক্ষে বিহার এবং প্রধান-মন্ত্রী-প্রসবিনী উত্তরপ্রদেশ হাত-ছাড়া হওয়া মানেই চূড়ান্ত 'ডিসগ্রেস'। কিন্তু কাল না শোনে ধর্মের কাহিনী। এতো-তেও স্বাধির ও পণ্ডা নেতৃত্বে চৈতন্যদায়ের চিহ্নমাত্র নেই। গণস্বার্থকে দলস্বার্থ হিসেবে গ্রহণ না করলে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থকে দলস্বার্থের কাছে সমর্পণ না করলে গণ-তন্ত্রে কোনও রাজনৈতিক দলের অপমৃত্যু ঘটেছে একথা সাবধানেই বলা যায়। কংগ্রেসের অবস্থা আজ অনুরূপ। দেশের স্বার্থ তো দূরের কথা, কংগ্রেসী নেতৃত্বে আজ ধারা আছেন তাঁরা দলীয় স্বার্থকেও ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে অক্ষম। কমতা করায়ত্ত করার জন্য প্রয়োজন হলে এরা দেশের মানুষকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে এবং দেশের নিরাপত্তাকে পর্বস্ত বিপর্ষয়ের মধ্যে ঠেলে দিতে কসর করেন না। এই পণ্ডা চিন্তা-সম্বল স্বাধির নেতৃত্বের ধারণা, স্বাধীই বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে পুনরায় কংগ্রেসের হাতে ভারতের জমিদারী তুলে দেবে এবং তখন জনগণের ওপর কমতা-সীল দুঃশাসন হননকারীর মতো চেপে বসবে।

সম্প্রতি পাজ্জাবে সন্ত তারা আকালী দলের সঙ্গে সুবিধাবাদী জনৈক দল-ত্যাগী কংগ্রেসী ও একজন নিদলীয়র যোগসাজস এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বান-চাল করার অপচেষ্টা কংগ্রেসকে তার চোপসানো কুসফুসে পুনরুত্থ সঙ্কোচন প্রসারণ অনুভব করতে সাহায্য করবে বলে মনে হচ্ছে। বড় আশা নিয়ে সব জায়গায় সেই ধূর্ত শৃগালটির মতো ওং পেতে বসে অপেক্ষায় আছে কংগ্রেস। মুখ

কয়েক এখন সংগীত শোনাবার ইচ্ছা
জন্মলৈই মনোবাহ্য। পূর্ণ হবে কংগ্রেসী
কৃষ্ণী স্বাধীনাবাদীদের। কিন্তু তার-
পরও অনেক কথা অনেক প্রশ্নই থেকে
যাবে। গণ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা কাড়া-
কাড়ির কোনরকম খেলাই কারও পক্ষে
শুভ ফল প্রসব করবে না। দেশের সেই
ভয়াবহ অশান্তির মুহূর্তকে আনয়নের
জন্য যারা চেষ্টা করবেন, তাঁরা জনতার
মনের আগুন নিয়ে খেলার আগে যদি
পাঁচবার ভেবে দেখেন এবং ক্ষমতালোভে
গদগদ হয়ে অবিস্মারকারী কোন কাজে
বাঁপিয়ে না পড়েন তবে বাস্তবিক
দেশের দশের এবং নিজের মঙ্গলসাধন
করতে পারবেন। অন্যথা অন্ধকার
ভবিষ্যৎ কর জন্য কি উপহার বহন করে
আনবে আজকের জোরালো পরিস্থিতিতে
তা মালুম করাও সম্ভব নয়।

কংগ্রেসী অর্থনীতির তাঁর সমালোচনা

লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর
বিতর্ককালে কংগ্রেসপক্ষের দু'জন
মুখপুণ্ড বক্তা তাঁর ভাষণ ও মূল্যায়ন
করির স্বারা কংগ্রেস অনুসৃত অর্থনৈতিক
নীতির সমালোচনা করে সর্বত্র মূল
কংগ্রেস সরকারকে সচেতন করেন। বক্তা-
দ্বয়ের একজন হলেন প্রাক্তন আইনমন্ত্রী
শ্রীমশোক সেন এবং অপরজন দ্বিতীয়
কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীমশোকপ্রকাশ।
প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী এক বর্তমান
বাহ্যিক কংগ্রেস নেতা শ্রীমশ্যানে কবীর,
স্বতন্ত্র দলের শ্রী সি সি দেশাই এবং এস
এস পি'র শ্রী এস এম ঘোষাও দেশের
বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের
শোচনীয় ব্যর্থতার উল্লেখ করে বক্তৃতা
করেন। শ্রীমশোক সেন : প্রাক্তন আইন-
মন্ত্রী শ্রীমশোক সেন বলেন কখনই সমস্যা
ভীরভা লাভ করেছে তখনই কংগ্রেস
সরকারের স্বার্থ নীতির ব্যতিক্রম
সমালোচনার কংগ্রেসী হয়েও ক্রিয়াক্রান্ত
ইতস্তত করেন নি। ভারতের যেকোন
কম্পর্কে ডি আই আর-এর কলঙ্ক চাপিয়ে
রাখার জন্য নির্বাচনের আগে তিনি
সরকারকে কলঙ্কহীন ভাষায় উৎসাহ করে-
ছিলেন। মুদ্রামূল্য হ্রাসের স্বারা দেশের
আর্থিক স্বচ্ছতা ও বিদেশে স্বাধীনতায়
ঘটিয়ে সরকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে
সাহসিকতার অভাবই প্রমাণ করেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের
নিরপেক্ষ নীতি বর্তমান আন্তর্জাতিক
রাজনীতিতে অচল বলে শ্রীসেন মন্তব্য
করেন। আজকের পৃথিবী এখন দু'টি
মুখপট গোষ্ঠীতে বিভক্ত (সমাজবাদী
ও পুঁজিবাদী) তখন গোষ্ঠীবিরুদ্ধিত
নিরপেক্ষতাবাদ কলুষতাপকে সর্বাঙ্গ বন্ধ
করে চলা অসম্ভব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে,
ভিত্তিকতায় প্রসঙ্গে আমেরিকা জাপান
আছে পরোক্ষভাবে আপনাকে অসহায়

করে পূর্ণ নিরপেক্ষতা স্বাক্ষর ভারত যে
সক্ষম হয় নি একথা বললে হয়ত অস্বীকার
হয় না। সুতরাং শ্রীসেন বলেন এই নীতি
বর্তমান পরিস্থিতিতে সংরক্ষণ করে
চলা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন, তখন
প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে
বলেই মনে হয়।

রাজ্যপালদের পক্ষে সরকার গঠনের
প্রশ্নে পক্ষপাতহীন ও সাহসিক হওয়ার
প্রশ্নও শ্রীমশোক সেন উত্থাপন করেন।
বলা বাহুল্য এই প্রশ্নে রাজস্বদানের
ঘটনার রাজ্যপালদের পক্ষপাতভেদের প্রতিই
ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রাজস্বদানের প্রশ্নে স্বতন্ত্র দলের শ্রী সি
সি দেশাই এবং এস এস পি'র সদস্য শ্রী এস
এম ঘোষাও বক্তব্য রাখেন। শ্রীদেশাই
প্রসঙ্গত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল
সুখাদিয়াল বিরুদ্ধে একটি চাক্ষুষকর
অভিযোগও উত্থাপন করে জানান।
উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমশ্যানে কবীর
কমিটির হাতে জুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি
দিয়ে তিনি তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করার
জন্য উপযুক্ত তথ্যাদি পেশ করতেও
পারেন।

শ্রীমশ্যানে রাজস্বপতির শাসন
ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবি জানান।
শ্রীমশ্যানে কবীর কংগ্রেস সরকারের
অসততা, বিপ্লবিতকর চিন্তা ও দোঁটনা
নীতির স্বেচ্ছাচিন্তা সমালোচনা করেন।
সরকারী অসম-বটননীতির জন্যই দেশের
লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহার ও অর্ধাহারে
মুমূর্ষু।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের শ্রীমশোকপ্রকাশও সমা-
লোচনার কঠোর বাক্য প্রয়োগে ইতস্তত
করেন নি। তিনি সরাসরি অভিযোগ
করেছেন কংগ্রেস সংগঠনের প্রতিই। জনগণে
চোরেছেন বিদেশী ও দেশীয় ধনিক
গোষ্ঠীর অর্থপটু কংগ্রেস নির্বাচনী
ভবিষ্যের টাকার হিসেব। রক্ষপ্রকাশের
বক্তব্যে কংগ্রেস সংগঠনের প্রতিই সন্দেহ
প্রকাশিত হয়েছে।

লোকসভায় এবিষয়ভাবে সরকার-
পক্ষীয় এবং বিরোধীদের বক্তৃতা
সম্মুখীন ইন্দ্রা-সরকারকে ইতিপূর্বেও
হতে হয়েছে ডি-আই-আর ও মুদ্রা মূল্য
হ্রাস প্রসঙ্গে। তখন শ্রীমশ্যানে, শ্রীকুমারেনন
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কেউই সরকারের বিভিন্ন
দ্রুত নীতিকে সমর্থন জানায়তে পারেন
নি।

আজ কেন্দ্রেও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার
পতন আসন্ন বলে অনেকেই মনে করছেন।
শ্রীমশোকপ্রকাশ বলেছেন, নির্বাচনের ফলা-
ফলও কংগ্রেসকে সমীচিৎ শিক্ষাদান করে
নি। একই কথা বলেছিলেন উত্তরপ্রদেশের
প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং কংগ্রেস ভাগের
কারণস্বরূপ। তিনি আজ কংগ্রেসী
মন্ত্রিসভার নেতা।

আশ্চর্যের কথা, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ
তরুণ নির্বিকার এবং মোহাচ্ছন্ন। এই
মনোভাবের পরিবর্তন বাতীত সংগঠন
হিসেবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে
টিকিয়ে রাখাই একটি কঠিন সময়ে
পরীক্ষামূলক শক্ত কাজ হবে এ বিষয়ে
সন্দেহের অবকাশ কম।

সরবর্তী প্রেসিডেন্ট

কেন্দ্রে কংগ্রেসের টলমলে অবস্থায়
এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্নেও একটা
কঠিন সমস্যার জাল সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান-
মন্ত্রী চাইছেন তাঁর মনোনীত
ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা-
পূর্ণ আসনটিতে আহ্বান করে
এনে বসাতে। কিন্তু তাঁর মনোনয়নে
কংগ্রেসীকুল যে একযোগে সাড়া দেবেন
এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।
বিরোধী অবস্থা মন্ত্রীর কোর্টের প্রধান
বিচারপতি শ্রীমশ্যানে রাওকে রাষ্ট্রপতি
পদে নির্বাচিত করার প্রশ্নে সকলে একমত
হয়েছেন। দেশের সংকটজনক
পরিস্থিতিতে অপ্রত্যাশিত
ব্যবস্থাসম্পন্ন নেতৃবর্গ মনে করছেন সর্বজন
প্রিয়ের জ্ঞান সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণকেই পুনর্বার
রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বহনে রাজ্যী করিয়ে
নিত।

ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া বর্তমানে
কুশাশাচ্ছন্ন। এই মুহূর্তে দেশে সজ্জিত
ও একই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। রাষ্ট্রপতি
নির্বাচনে এ কারণেই এমন কাউকে প্রার্থী-
রূপে বাছাই করা সরকার বিন বরপা
কংগ্রেস ও বিরোধীদের উভয়েই প্রত্যা-
জ্ঞান। পূর্ববৈশ্বকম্বলয়ের ধরনে তেমন
বাতি একজনই আছেন তিনি বর্তমান
রাষ্ট্রপতি ডা. রাধাকৃষ্ণ। সুতরাং তাঁকেই
পুনর্বার রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণের
অনুরোধ করলে এবং তিনি রাজী হলে
একটি মহতী সমস্যার কলম থেকে উভয়
পক্ষই উপহার পেতে পারেন।

মুদ্রা হ্রাস-এর প্রশ্নে দু'দু'টি
সম্পন্ন রাজনীতির কারবারিরা আবার
সম্মুখীন। তাঁদের বক্তব্য বিচার বিভাগকে
স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখতে হলে কলুষভূমি
কোন বিচারকে (তা তিনি মহতী
উপযুক্ত হ'ল না কেন) রাষ্ট্রপতি পদের
জন্য মনোনয়ন দেওয়াটা বাথেন্ট সমীচীন
হবে না। জজ সাহেবদের রাজ্যপাল বা
রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করার নীতিতে
ভবিষ্যতে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা
খর্বিত হওয়ার সম্ভবত আশংকা মোটেও
অমূলক নয়। বিচারকালে যদি রাজ্য
পাল ও রাষ্ট্রপতির পদকে মনে মনে সন্মান
দেওয়ার সুযোগ পান তবে তাঁদের কাছ
থেকে স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ণ বিচারলাভ
করা সর্বদা সম্ভব হবে না। এই দু'টি
পদের জন্য আকাঙ্ক্ষাই বিচারকদের

কমতাসীন সরকারের ওপর স্বাধীন মতামত পোষণে নিষেধপ্রদত্ত করতে পারে এবং সে কারণে বিচার বিভাগের ওপরও সরকারী প্রভাব ক্রমশ পক্ষ বিস্তার করবে, যা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

আজকের সঙ্কটময় সময়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণকে পুনর্বীর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান জানালে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও জাতীয় ঐক্যবিশ্বাসের পথ সুগম হবে বলে যারা বিশ্বাস করেন, ঘটনাবলীর প্রতি নজর দিলে, তারা যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের একটি সুন্দর ও সহজ সমাধানের সন্ধান করেছেন, এ বিষয়ে মতবিশেষের কারণ থাকে না।

পাঞ্জাব :

গদি চাই

কংগ্রেসের পক্ষে গদির জন্য চরমকর উদ্বেগ ব্যস্ততা গদি-শিকারী কংগ্রেসের দু'পটি সাধারণের কাছে মেলে ধরেছে। পাঞ্জাবে তারই জন্য দৃষ্টিতে যে চাঞ্চল্য এবং উত্তেজিত সাদা পোনা গেল তাতে দেশের লোক একটি প্রহসনের মিত্তীয় অন্ধ দর্শনের ফলত সুযোগ লাভ করলেন।

নির্বাচনে কংগ্রেসের ধরাশায়ী অবস্থার চিত্র যখন বিভিন্ন রাজ্যে পরিষ্কৃত হয়ে উঠতে থাকে, প্রহসনের সূত্র তখন থেকেই। সদস্য ভাঙিয়ে গদি অধিকারের চেষ্টা না-হলে জবরদস্তি রাজ্যপালের দ্বারা কেন্দ্রীয় শাসন চালু করার অপপ্রয়াস, যাতেও অক্ষম হলে রাজ্যত্বের চরম গোল-মেলে অবহেলায় সৃষ্টি করে কমতাসীন মুক্তকণ্ঠ সরকারগুলিকে কাবু করার প্রাণান্ত গোপন প্রচেষ্টা।

পাঞ্জাবে মণ্ডকাটা প্রায় ভালই লাগেছিল। প্রায় সম্মানে গদি লাভের সুযোগ হয় হয় অবস্থা। অন্তত কংগ্রেস-পক্ষ নিজেরাই ঘটনাটি সম্যক উপলব্ধি করার আগেই উদ্ভাবন হয়ে নতুন শূন্য করেছিলেন এবং বিধানসভায় এমন হুটগোল তুললেন যে সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখতে হল স্পীকারকে।

অথচ ঘটনার গুরুত্ব বিচার করলে দেখা যাবে যে, একটি সংশোধনী প্রস্তাবে বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে যে চারজন সরকারপক্ষীয় সদস্য একযোগে ভোট দিয়ে ক্ষমতা ভোটে সরকারের পরাজয় সম্ভব করেছেন, (৪৯-৫০ ভোটে) তারা অদৌ সরকারের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন করেন নি। উত্তরপ্রদেশে যেমন চরণ সিং তাঁর দলবলসহ কংগ্রেস ত্যাগ করে বিরোধীদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং শুধুমাত্র গুরুমন্দিরসাই নয়, সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসী নীতির প্রতিই অনাস্থাজ্ঞাপন করেন, পাঞ্জাবে তার কিছুই হয় নি। পাঞ্জাবী ভাষাকে রাজ্য সরকারী ভাষা করা ও খাদ্যের পাইকারী ব্যবসা

রাস্তায় করার উদ্দেশ্যে যে সংশোধনী প্রস্তাব বিরোধী কংগ্রেসে উপস্থাপিত করেন, সেই মূল দু'টি বিষয়ের সঙ্গে প্রথমত সরকারী নীতির কোন বিরোধ নেই। দ্বিতীয়ত এই লব্ধ প্রশ্নে সরকার পক্ষের দু'একজন সদস্যের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করাও এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়, যার জন্য সরকারকে পদত্যাগ করতেই হবে। সব থেকে বড় কথা হল, যে চারজন সদস্য বিরোধী প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দিয়েছেন তারা উত্তর-প্রদেশের মতো কমতাসীন দল ত্যাগ করে সরকারপক্ষের সংযোগবিস্তারও স্বীকার করেন নি। সুতরাং সরকারের পদত্যাগের কোন প্রশ্ন এক্ষেত্রে ওঠে না। ইংল্যান্ডেও এমন অবস্থার উইলসন সাহেবও তড়ি-তড়ি পদত্যাগ করতে ও গণতন্ত্র রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নি যদিও গণ-তান্ত্রিক রীতির সেখানেই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

কিন্তু কংগ্রেসীরা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। সমস্ত সংসদীয় ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়ার জন্য তাঁদের লক্ষ্য-কক্ষ কুখ্যাত গদিদোভী আপনাকে জনগণের সমক্ষে বিকৃতভাবে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। গদির চানে কোন প্রশ্নের কোন বিশেষ অবস্থার সম্যক গুরুত্ব অনুধাবন করার মতো মানসিক সৈধ্য আজ আর কংগ্রেসের নেই। কুড়ি বছর কমতার আরামকোয়ার অবসরধাপন করে এঁদের চিন্তার ধার এইভাবেই খর্বিত হয়ে আসছে। যদি ধরা যায় যে কংগ্রেসকে গদি ছেড়েই দেওয়া হ'ল তখন কি কংগ্রেসী দেশহিতৈষীর দল গণ-আস্থা নিয়ে রাজত্ব করতে পারবেন! এ বিষয়ে কংগ্রেসের অন্ধ গদিদোভী নেতৃত্ব ছাড়া আর কেউই স্থির নিশ্চয় নন। কেন না মন্দিরসভা গঠনের পরই অনাস্থার ভোটে সে সরকার ভেঙ্গে যাবে।

তাই বিবেকবান মাত্রেই উত্তেজিত গদিপ্রেমীদের নিষেধ আজ এই বলেই উপদেশ দেবেন যে, ধীরে, অধৈর্য হয়ে গদির আকাঙ্ক্ষাকে এমনভাবে প্রকট করে গণ-আস্থাকে আরও চোট খাইও না ভবিষ্যতে সাধের গদিলাভের পথ তাতে অধিকতর কণ্টকিতই হবে।

অন্যপক্ষে মুক্তকণ্ঠ সরকারকেও তারা বলবেন আস্থাভাজক ভোটের মাধ্যমে তারা যেন গদিপ্রিয় বিরোধী কংগ্রেসীদের মূখের মতো জবাব দিয়ে অবিলম্বে সংসদীয় কার্যদি শূন্য করে দেন ও রাজ্যে প্রশাসনিক সঙ্কট সৃষ্টির আশু অন্যতর সম্ভাবনা থেকে পূর্বাপেক্ষা সতর্ক থাকেন।

স্বেতলানার চিঠি

স্ট্যালিন কন্যা শ্রীমতী স্বেতলানার

চিঠি নিয়ে ভারতময় একটি প্রশ্নই পাক খাচ্ছে : শ্রীমতী স্বেতলানাকে কি ভারতবর্ষ সামান্য একটু বসবাসের জায়গা দিতে পারত না! দিলে সোভিয়েট দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কি সত্যিই এমনই একটা পর্যায়ে উপনীত হ'ত যা দুই দেশের সৌহার্দ্যকে ভিত্তি করে তুলত! স্বেতলানা যে চিঠি সংসদ সদস্য ডঃ রাম-মনোহর লোহিয়ার কাছে লিখেছেন সেটিকে কেন্দ্র করেও সরকারপক্ষকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়েছে। কেন না স্ট্যালিন কন্যা জানিয়েছেন, তিনি বৈদেশিক দপ্তরের প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং-কে শ্রীমতী স্বেতলানার ভারতে অবস্থানের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শ্রীদীনেশ সিং দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে এই অজুহাতে তার প্রতি কোন সাহায্যের বাহু এগিয়ে ধরতে অসম্মত প্রকাশ করেন।

কিন্তু সরকারপক্ষ শ্রীমতী স্বেতলানার এমন অতিবোধে অস্বীকার করে জানিয়েছেন যে, স্ট্যালিননন্দিনী আদৌ সরকারের কাছে অনুরূপ কোনও আবেদন করেন নি। সরকারপক্ষের বক্তব্য অসত্য না হতে পারে; শ্রীমতী স্বেতলানা হয়ত 'অফিসিয়ালী' ব্যাপারটা মুত করেন নি। সুতরাং ফাইল নাড়াচাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে নি এবং শ্রীমতী স্বেতলানার কাছ থেকে অফিসিয়াল আবেদন আসার প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু সেখানেই কি সব শেষ?

বিরোধীপক্ষ এমন সহজভাবে ঘটনাটি মেনে নিতে রাজী নন।

বস্তুতপক্ষে শ্রীদীনেশ সিং তখন বৈদেশিক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি শ্রীমতী স্বেতলানাকে 'প্রপার চ্যানেল'র অবশ্য অতিক্রমণীয় রাস্তাটি বাংলাে না দিয়ে নিজের দায়িত্বে তাকে হত্যা করলেন কেন, স্বভাবতই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। বিরোধীপক্ষ তারও থেকে গভীরে গেছেন। তাঁদের বক্তব্য : প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রী ঘটনাটির অপব্যাখ্যা করেছেন এবং তন্দ্বারা সংসদের অধিকারভঙ্গ ও অসত্য ভাষণের দায়ে নিজেরা জড়িয়ে পড়েছেন। মাননীয় স্পীকার প্রধানমন্ত্রী ও অপর দু'জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অধিকারভঙ্গের প্রশ্নটি মেনে নিয়ে ব্যাপারটির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বর্তমান কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং তাঁর বৈদেশিক কাকিমার ভারতে অবস্থানের জন্য কেন যে কোন প্রথাবদ্ধ প্রচেষ্টা করতেও গররাজী হলেন, অতঃপর সেই পুরানো কাসন্দ্রী নিয়ে সংসদভবন তোলপাড় হবে।—(৮।৪।৬৭)

এডেন :

রাষ্ট্রসংঘ মিশনকে পাতত্যাড়ি

গড়তে হয়েছে। এখানে তিন সপ্তাহ থাকার ও কাজ করার কথা ছিল মিশনের, কিন্তু পাঁচ দিন না বেতেই তাঁদের তলিপতঙ্গা গাড়ি নিয়ে জেনেভা ফিরতে হয়েছে রোম হয়ে। তিনজন সদস্যবিশিষ্ট মিশনের নেতা ছিলেন ভেনেজুয়েলার মিঃ ম্যানুয়েল পেরেজ-গুয়েরেরো। আর দু'জন সদস্য হলেন আফগানিস্থানের আবদুল সাত্তার সালিজী এবং মালির মোসা লিও কিতা। এডেন ত্যাগ করার কারণ দেখাতে গিয়ে মিশনের নেতা মিঃ গুয়েরেরো অভিযোগ করেছেন যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সহযোগিতা না পেয়ে মিশনের 'মিশন' অব্যর্থ ব্যর্থ হয়েছে এ অবস্থায় এডেন ত্যাগ করা ছাড়া অন্য পথ নেই।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের এক প্রস্তাবক্রমে এই মিশনটি এডেন এসেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, এডেন বা দক্ষিণ আরাবিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার আগে সেখানকার সামগ্রিক অবস্থার তদন্ত ও পর্যালোচনা করা। একথা সত্যি যে, মিশন যেদিন এডেনের মাটি স্পর্শ করেছিল, সেদিন থেকেই এখানে হাঙ্গামা অশান্তি সূরু হয়ে যায়। যে-পাঁচদিন মিশন এডেনে ছিল, সে কদিনই এখানে হরতাল পালিত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দলের মধ্যে দাঙ্গাও বেধেছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফলে কয়েকজন আরবীয় হতাহত হয়েছে, ব্রিটিশ পক্ষও কয়েকজন আহত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আরবীয় দলগুলি কার্যত রাষ্ট্রসংঘের মিশনকে বর্জন করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিশন তাদের কাজ করে যাবার সঙ্কল্পে অটল ছিল এজন্যে যে তারা জানতো, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পেলে আর সব পেতে তাঁদের অসুবিধা হবে না। কিন্তু সেই অতি প্রয়োজনীয় বস্তুই অতাব ঘটলো।

জাতীয়তাবাদী দলগুলির মধ্যে ফ্রন্ট 'FLOSY বা Front for the Liberation of Occupied South Yemen)-ই প্রধান। তাছাড়া রয়েছে জাতীয় সত্তিবাহিনী (NLF বা National Liberation Front), দক্ষিণ আরবীয় লীগ ইত্যাদি। এন-এল-এফ অবশ্য ফ্রন্টসই দল-ছাড়া পাঁচটি, আর ফ্রন্ট নিজেকে আগে সোস্যালিস্ট পার্টি। ফ্রন্ট বক্তব্য হচ্ছে, দক্ষিণ আরাবীয়াকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে, অন্য কোন দলের সে-অধিকার নেই। সে জন্যে তাঁরা চেয়েছিলেন যে রাষ্ট্রসংঘের মিশন যদি এখানে কারো সঙ্গে আলোচনা-বৈঠক করে তো করতে হবে একমাত্র



আন্তর্জাতিক

ফ্রন্টসই সঙ্গে। মিশন সদস্যরা এডেনে এসে ফ্রন্ট সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ আবদুল ম্যাকাউয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হন নি। অবশ্য তাঁদের একথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রসংঘ বা তার মিশনের বিরুদ্ধে ফ্রন্টস কোন অভিযোগ নেই, কিম্বা এদের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন অগ্রস্থা নেই। তাঁরা দক্ষিণ আরবীয়ার সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্যেই লড়াই, রাষ্ট্রসংঘ বা মিশনের বিরুদ্ধে নয়।

দক্ষিণ আরবীয়ার চরিত্র জানতে মিশনের বাকি ছিল না। রাষ্ট্রসংঘ মানে ওই মিশনের নিয়োগকর্তাই মিশনকে তা আগাগোড়া জানিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে বটেন জোর করে এখানকার অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এডেনকে দক্ষিণ আরব ফেডারেশনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে কার্যত বিরোধের বীজ পুতেছিলেন। সে-ফেডারেশন হলো ১৬টি প্রদেশের সম্মিলন, যার শাসনভার রয়েছে ১৬ জন শেখ বা সুলতানের ওপর। সুলতানদেরা জানেন যে, বটেনের দয়ার ওপরই তাঁদের বর্তমান ও

ভবিষ্যৎ, কাজেই এখান থেকে বটেন পলায়ক, বা দক্ষিণ আরব, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করুক—এটা শেখেরা কখনই চান নি। কারণ, দেশের স্বাধীনতার অর্থ হলো, তাদের ক্ষমতালোপ, ক্ষমতা তখন জাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে যাবে।

বটেনও যতই মুখে বলুক না কেন, যে দক্ষিণ আরবের ভাগা সে এখানকার অধিবাসীদের হাতেই ছেড়ে দেবে, আসলে এই লাভজনক উপনিবেশ থেকে হাত গুটোবার ইচ্ছে তারও নেই। সেই তার প্রমাণ হচ্ছে, মিশনের কাজে মত সাহায্য বা সহযোগিতা এখানকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ করে নি। এমন কি, এখানকার রেডিও টেলিভিশন থেকে, মিশনের জন্যে মিঃ গুয়েরেরোর যে ভাষণ দেবার কথা ছিলো ফেডারেল গভর্নমেন্ট তাও বন্ধ করে দিয়েছে। ব্যাপারটির তদন্ত করার জন্যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হার্ভি হাভিন অবশ্য নির্দেশ পাঠিয়েছেন কিন্তু অনেক দেরিতে, তার আগেই মিশন জেনেভা পৌঁছে গিয়েছেন এক এডেনে আর তাঁদের ফেরার পরিকল্পনা নেই বলেও জানিয়ে দিয়েছেন।

যটিনাটা অত্যন্ত মনোহর সন্দেশ নেই, এবং দক্ষিণ আরব সরকার বা বৃটেনের পক্ষে ঐশ্বর্য্যপূর্ণও বটে। কারণ, মিশনকে কার্যত প্রত্যক্ষমান করার অর্থ রাষ্ট্রসংঘকেই অপমান করা। মিশন জানিয়েছিলেন যে, সূক্ষ্মতানদের তাঁরা সরকার বা সরকারের প্রতিনিধি বলে গণ্য করবেন না, তাঁদের দেখবেন ব্যক্তি হিসেবে। এতে তাঁরা চটে থাকবেন, কিন্তু বাস্তব ঘটনাকে মিশন ভোলে কী করে। গত বছর রাষ্ট্রসংঘের ডিকলো-মাইজেশন কমিটি যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন তাতেই তো কল্য হইয়াছিল যে, ফেডারেল সরকারকে তাঁরা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বলে স্বীকার করেন না। মিশন সে-প্রস্তাবের বাইরে যান কী করে?

এ-ঘটনার পর মিশন সদস্যরা স্বভাবতই খুবই ক্লান্ত হয়েছেন। মিশন সদস্যের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র 'সার্চ' বা তল্লাশী করে ফেডারেল সরকার রাষ্ট্র-সংঘের মর্যাদা আরো ক্ষুণ্ণ করেছেন। বৃটেনের ভূমিকা সম্পর্কে মিশন সদস্যদের কোন রকম মোহ ছিলো না, মিশনের একজন সদস্য তো অকপটে বলেছেন যে, পৃথিবীতে বৃটেন বড় রক্তপাত ঘটিয়েছে অতটা আর কেউ ঘটায় নি। কিন্তু এর পর কী হবে? জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন যে আরো জোরদার হবে, সেটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বৃটেন? সে কি মিশনকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? অবশ্য তার জন্যে তার আন্তরিক ইচ্ছে আছে কি না তাতেও সন্দেহ রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

ডাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ হামফ্রে দৃ-সংগৃহের জন্যে ইয়োরোপ সফরে বেরিয়েছিলেন। সাতটি রাষ্ট্র রয়েছে তাঁর সফর তালিকায়, এ-পর্ব্বন্ত পাঁচটি দেশের রাজধানী তাঁর সফর করা হয়েছে।

জেনেভা ছিলো হামফ্রেস সফর তালিকায় প্রথম। জেনেভাকে প্রথম স্থান দেবার কারণ হলো এখানে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র ও কমন মার্কেটভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কেনেডী রিভল্ড পুঙ্খক আলোচনা হইছিলো তখন। স্ব্ভবতীয়ত সোভিয়েট প্রতিনিধিদের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিরা এখানে নিরাসীকরণ আলোচনা চালাচ্ছেন। জেনেভায় বিরূপ সমালোচনার বিশেষ সম্মুখীন হামফ্রেকে হতে হয় নি বটে, তবে, কেনেডী-রিভল্ডের আলোচনায় যে আমেরিকার অনুকূলে যাচ্ছে না—এ-খবর তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ আমেরিকা যখন রাসায়নিক আমদানীর

ওপর শুল্ক হার কমতে অনিচ্ছ প্রকাশ করলো তখন কমন মার্কেটভুক্ত দেশ-গুলিও জানালো যে, মার্কিন কৃষিক্রয়ের ওপর তারাও শুল্ক কমাবে না। হামফ্রে এই বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যে, যদি ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে কমন মার্কেট মার্কিন শর্তে রাজী না হয়, তবে সে আরো কঠোর সরবরাহ নীতি নেবে এবং পাঁচ বছর ধরে শুল্ক আলোচনা চালাবার অধিকার দিয়ে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো তা বিবেচনা করবে না। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধের প্রশ্নে অনায়াসে একমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কারণ দুই প্রধান শক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া যখন এ ব্যাপারে একমত তখন ছোটখাট রাষ্ট্রই ইচ্ছে থাকলেও করতে কী পারবে?

জেনেভা থেকে হামফ্রে ইল্যাপড গিয়েছিলেন। শহরের বাইরে রাণী জুলিয়ানার রাজপ্রাসাদে গেলেন। আলোচনা হলো পররাষ্ট্রসচিব জোসেফ লাস-এর সঙ্গে। মিঃ লাস অবশ্য মিঃ হামফ্রে ভিত্তেতনাম বৃক্ষ বৃক্ষ করার পরামর্শ দিতে ভোলেন নি।

এরপর পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন। গত নভেম্বরে এরহাডের পতনের পর পশ্চিম জার্মানীতে খ্রিস্টান ডেমো-ক্রেট সোস্যালিস্ট কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে। এই নতুন সরকারের সঙ্গে আমেরিকা এখনো আগের মতো সহরম-মহরম করে উঠতে পারছে না, কারণ নতুন সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে খানিকটা স্বাধীনভাবে চিন্তা করছেন। অর্থাৎ তাঁরা এক সঙ্গে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ রাখতে চান, আবার পূর্ব ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতে চায়। আবার পশ্চিম জার্মানী এটাও চায় না যে, মস্কোর সঙ্গে ওয়াশিংটনের বন্ধুত্ব গাঢ় হোক, কারণ তার ভয় হচ্ছে, সেক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানীকে ডিঙিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইয়োরোপের দিকেই আমে-রিকা ঝুঁকবে বেশি, এবং পশ্চিম জার্মানী বিশেষ পাতা পাবে না আর। তাছাড়া মস্কো-ওয়াশিংটন সৌহার্দ্য গড়ে উঠলে সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুত্বের মূল্য হিসেবে আমেরিকা হয়তো জার্মানী থেকে তার ২,২৬,০০০ সৈন্যও তুলে নিয়ে যাবে। তা যদি করে তবে সেই সম্মুখণে সোভিয়েট রাশিয়া পশ্চিম জার্মানী আক্রমণ করে বসবে বলেও বন ভয় করে। এখানে তাঁর পুরনো বন্ধু পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলি ব্রাউন্টের সঙ্গে হৃদয়তাপূর্ণ আলোচনাও হলো, কিন্তু চ্যান্সেলর কুর্ট ফিসিংগারের সঙ্গে

সাক্ষাৎ হলো যখন হামফ্রে পশ্চিম বার্লিনে গেলেন।

কিন্তু তার আগে ইতালীতে হাম-ফ্রেকে হতাশ হতে হলো। হামফ্রে রোমের অংশের দেখতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পথে তাঁকে রক্ত চুবিয়ে দিলো এখান-কার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তেতনাম নীতির জন্যেই যে-এ-অপমান তাঁকে সহ্য করতে হলো তা আর কটকে বলতে হবে না। রোম থেকে ফেরেশ গিয়েছিলেন হামফ্রে গত বছরের কন্যাবিক্রম শহর পরিদর্শনে। এখানকার শিল্পকার্য রক্ষার জন্যে সাড়ে ছ' লাখ ডলার সাহায্যও দিয়েছিলো আমেরিকা, কিন্তু তার বিনিময়ে হামফ্রেকে যে এককম বিরূপ সম্বর্ধনা পেতে হবে তা কখনই তিনি ভাবতে পারেন নি। পদ্ম ডিম, পদ্ম কমলালেবু—খোলা মাড়িতে বাবার সময় হামফ্রে মৃত্যুর ওপর এসে পড়েছিলো এমন কিছু অস্বাভাবিক উপ-হার। তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছিলো: 'বুনে', বুনে আমেরিকা, ইত্যাদি ভাষায়।

বৃটেনে গিয়েছিলেন হামফ্রে এর পরে। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী উইলসনের মঞ্চস্থান সরকারী বাসভবনে দু'জনের মধ্যে আলোচনা স্থির ছিলো। কিন্তু সেখানেও 'বুনেদের কনফারেন্স', 'শান্তি সভা নয়, বৃক্ষ সভা' ইত্যাদি শ্লোগান শুনতে হয়েছিলো। পশ্চিম বার্লিনে ১১ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। এ'রা নাকি হামফ্রেকে মারার জন্যে কোনো তৈরি করেছিলেন! কিন্তু পরের দিন দেড় হাজার লোকের এক জনতা ধনি তুললো : নাপাম বোমা দিয়ে শান্তি চাওয়া চলবে না, মার্কিন বুনে, ইউ-এস মানে এস-এস (মানে নাৎসী) ইত্যাদি। প্যারিসেও একই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো। একেই ক্রান্ত আমেরিকার ভিত্তেতনাম নীতির ঘোরতর বিরোধী, তার ওপর হামফ্রেকে দেশ সফরে আসতে দেখে ফরাসীরা যেন হাতের কাছে শিকার পেয়ে গিয়েছে। তাঁর ভাষায় আমেরিকার সমা-লোচনা করলো তারা, শুনিয়ে দিলো আমেরিকার সম্পর্কে করাসী মনোভাব।

কিন্তু যে-কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে লজ্জাশালী রাষ্ট্রের ডাইস প্রেসিডেন্টকে এ বিরূপ সম্বর্ধনা পেতে হলো সেই ভিত্তেতনাম নীতি কি তাঁরা পরিবর্তন করবেন? মিঃ হামফ্রে তাঁর সফরের ডিও অডিভক্ত প্রেসিডেন্ট জনসনের কাছে অবশ্যই রিপোর্ট করবেন, কিন্তু ডাঙে প্রেসিডেন্টের অব্যবহৃত ঘটে কিনা সন্দেহ।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুপ্রিয়জন দাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৪০৪

আমি যখন কলকাতায় গিয়ে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে হাইকোর্টে ভর্তি হই তখনো চিত্তরঞ্জন কলকাতাতেই কাজ করছিলেন। তৃতীয় ডোমরাও কেস করতে যাবার আগে প্রায়ই তখন সেন্সস কোর্টে তিনি আসামীদের পক্ষে নিযুক্ত হতেন—দৈনিক-দক্ষিণা দুটি হাজার টাকা। দুর্গামোহনের পূর্ব সতীশরঞ্জন তখন স্ট্যান্ডিং কোর্সিলী। দুই ভাই বিপরীত দিকে থাকলেই খুঁটিনাটি কথা কুটীকাটি লেগেই থাকত। এই সব আইনের তর্ক শোনবার মত, শেখবার মত। দুপক্ষেরই আইনজ্ঞানের গভীরতা ছিল বিস্তর। কয়েকবারই এই রকম তর্ক-বিতর্ক শুনছি হাইকোর্টের উত্তর দিকে নুতন সেন্সস কোর্টে। তখন এ সব আইনের প্রসঙ্গে কথাবার্তা বোকবার মত জ্ঞান-আমার সামান্য একটু হয়েছিল বলেই তাঁদের তর্কবিতর্কে কার হার কার জিত তা বুঝতে পারতাম। দুইজনেরই কাজের ধারা বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখেছি। চিত্তরঞ্জনের ছিল অসাধারণ জেরা করবার ক্ষমতা এবং যে কোন লিখিত আইনের ধারাগুলির বিশ্লেষণ করে তার নিহিতার্থ বের করা। আইনজ্ঞ হিসেবে সতীশরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। সতীশরঞ্জনকে 'আইন' প্রসঙ্গে বিতর্কশক্তি ও বাস্তবতার মধ্যে উদ্ভা বা ভাবাবেগ দেখি নি। সমস্ত কাগজপত্র তম তম করে পড়ে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ঘটনা বিন্যাসগুলি তিনি—জজের সামনে খুব আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে পারতেন। বিপক্ষের উকিলের সওয়াল জবাবে তিনি পারতপক্ষে বাধা দিতেন না। তাঁর নিজের সওয়াল জবাবে বিশেষ কোন তাপ-উত্তাপ থাকত না। শান্তভাবে খুব মনোগ্রাহী করে তিনি মক্কেলের বক্তব্যটি আদালতে পেশ করতে পারতেন। তাঁর কর্মধারার

একটি বেশ উচ্চ মান ছিল। কখনো তার নিচে তিনি নামতেন না এক খুব অল্প সময় তার উর্ধ্বে উঠতেন। অর্থাৎ সতীশ-রঞ্জন একটানা সমান তাগেই মামলা করতেন—উঠতেনও না নামতেনও না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ধারা ছিল ভিন্ন রকমের। চিত্তরঞ্জনের বাস্তবতার একটা ভাবাবেগ দেখা যেত। তাঁর সওয়াল জবাবের কোন নির্দিষ্ট মান ছিল না। আগেই বলেছি জেরায় ও আইনের ধারার বিশ্লেষণে চিত্তরঞ্জনের জুড়ি মেলা শক্ত ছিল। যে মামলার তাঁর মন বসত সেই মামলার তাঁর জেরা ও বহান শুনবার মত হত। এই ধরনের মামলার তাঁর বাক্য-বিন্যাস ইংরেজীতে যাকে বলে 'রিলায়ান্ট' তাই হত। আবার যে মামলার তাঁর মন ঠিক বসত না সে মামলাটা কোন রকমে দুকুড়ি সাতের খেলার মত চালিয়ে নিতেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোন কোন মামলার চিত্তরঞ্জন বাস্তবতার ও কর্মকুশলতার ব্যবহারজীবীর কৃতিত্বের উচ্চাশ্রয়ে উঠে যেতেন, আবার কোন কোন মামলার অত্যন্ত সাধারণ পর্বায়ের কোর্সিলী মত সওয়াল জবাব করতেন। আগেই বলেছি দুই ভাই সাধারণত বিপক্ষ দলেই থাকতেন এবং কোর্টে দুজনের মধ্যে বচসা লেগেই থাকত। তাঁদের মধ্যে পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই ছিল কিন্তু তাতে তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের মনোমালিন্য বা আত্মীয়তার অভাব কখনো ঘটে নি।

রাজনীতিক্ষেত্রেও দেখেছি সতীশ-রঞ্জন ও চিত্তরঞ্জনের মতভেদ। সতীশ-রঞ্জন ছিলেন লিবারেল দলে অর্থাৎ যাকে বলা হত নরমপন্থী। তিনি মনে করতেন যে দেশ বা দেশবাসীদের আশ্রিত আশ্রিত তৈরি করে নিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ও অর্থ-নৈতিক দিক থেকে দেশের উন্নতিসাধন প্রথম কর্তব্য এবং তা স্বতঃপূর্ব পর্যন্ত না হচ্ছে ততদিন স্বাধীনতা দাবি করবার

অধিকার আমাদের নেই। চিত্তরঞ্জন ছিলেন চরমপন্থী, কংগ্রেসের একজন দেশমনা নেতা। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতা না পেলে দেশের শৃঙ্খলা, ব্যবসায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব নয়—কেন না, রাজশক্তি আছে বাগড়া দেবেই। তিনি জানতেন যে স্বাধীনতা দানস্বরূপে কেউ কখনো পায় নি এবং আমাদেরও সে সম্পদ 'নজের' জোরে দখল করে ছিনিয়ে নিতে হবে অনিচ্ছুক রাজশক্তির হাত থেকে। দুই ভারের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল এবং লোকে বলত যে আলি ইমাম ও হাসান ইমামের মধ্যে যে দৃষ্টিকোণের পার্থক্য ছিল সতীশরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও সেই রকম প্রভেদ ছিল। দুই ভাই একত্র হলেই তর্কবিতর্ক, ট্রীবিং চাপড়ান ও উচ্চৈশ্বরে হাঁকডাক সেগে যেত। মনে আছে একবার সাধারণ নির্বাচনের সময় সতীশরঞ্জন বড়বাজার এলাকা থেকে বাংলার আইন সভায় নির্বাচন প্রার্থী হলে দাঁড়ালেন। চিত্তরঞ্জন তখন বাংলা কংগ্রেসের একজন সন্ন্যাসী। স্বতীশ সেনগুপ্ত, সূভাষচন্দ্র, সত্যেন মিত্র, নির্মল চন্দ্র ইত্যাদি তাঁর বিশ্বস্ত সামন্ত তাঁরা তখনকার দিনের এক অজ্ঞাত কলশীল উকিলকে সতীশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপে দাঁড় করালেন কংগ্রেসের টিকিট দিয়ে। অনেকে বললেন যে বড়বাজার অঞ্চলে সতীশরঞ্জনের বহু বিশিষ্ট ধনী মক্কেল আছে সুতরাং তাঁর জয় অনিবার্য। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা স্ট্রেট বদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গেল। ভোটের দিন এলো। চিত্তরঞ্জন প্রত্যেকটি পোলিং বুথের সামনে নীরবে হাত জেড় করে দাঁড়ালেন অল্প সময়ের জন্যে। অগণিত ভোটাররা চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে ভেতরে গিয়ে ভোট দিয়ে এল। ভোটের গণনা হল—দেখা গেল সতীশরঞ্জন হেরে ছুত হয়ে গেছেন এবং সেই প্রতি-যোগিতায় জয়লাভ করে শ্রীসত্যেন্দ্ৰপতি

রায় যশস্বী হয়ে পড়লেন। বাস্তবিকপক্ষে জয়টা কিন্তু হয়েছিল চিত্তরঞ্জনই এবং তাঁর অসাধারণ ত্যাগের। দুই লোকেরা বলেছে যে অনেক ভোটের সত্যীশরঞ্জন-গাড়ি চেপে তাঁরই বিপক্ষে ভোট দিয়ে এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক অনেকা আত্মীয়তার গাণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে নি এবং দু'জনের মধ্যে পারিবারিক মনো-মালিন্য সৃজন করে নি।

আর একটি বিষয়ে সত্যীশরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে প্রভেদ দেখেছি। দু'জনেই অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। আগেই বলেছি তেলিরবাগের আতিথি-শালা, দাতব্য ঔষধালয় ও কে.এম.ডি.এম. হাই স্কুলের জন্যে দু'জনেই যত্ন হস্তে অর্থ সাহায্য করেছেন আত্মিক। এ-ও বলেছি যে ব্রাহ্মসমাজের জন্যে এবং সরস্বতীর গোথলে মেমোরিয়াল স্কুলের জন্যে সত্যীশরঞ্জন অনেক টাকা তুলে দিয়েছেন নিজের মজলুদের কাছ থেকে এবং নিজেও অকাতরে দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জনও তেমনি মজলু হস্তে দান করে গেছেন। কত দক্ষ ছেলের পড়া খরচা, পরীক্ষার ফিস, বইয়ের দাম দুই ভাই যে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁদের দানের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করোঁগ। কোন ছেলে সত্যীশরঞ্জনের কাছে সাহায্য চাইতে এলেই তাকে বলা হত যে স্কুলের হেড মাস্টারের কাছ থেকে কিংবা সত্যীশ-রঞ্জন চেনেন এমন কারো কাছ থেকে একটি লিখিত সুপারিশপত্র আনতে হবে। সেই রকম চিঠি আনলে তবে সে সত্যীশরঞ্জনের কাছ থেকে সাহায্য পেত। অর্থাৎ সত্যীশরঞ্জন দেবার আগে জেনে নিতেন যে টাকাটা সৎপাথে পড়ল কি না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের কাছে সুপারিশপত্রের দরকারই হত না। চাইবার মত চাইতে পারলেই প্রার্থী পেয়ে যেত সাহায্য—সে পড়ার জন্যেই হোক, মেয়ের বিয়ের জন্যেই হোক, কি বাপ-মায়ের প্রাস্থ্যের জন্যেই হোক। অনেক সময় দেখা গেছে যে প্রার্থীটিই আরজি একেবারে সঠিক। মিথ্যা এবং দু-একবার এ-ও হয়েছে যে টাকাটা পেয়েই সেই প্রার্থীটি ১৪৮ নং থেকে বেগিয়ে চড়কডাঙার মোড়ে যেখানে এখন পূর্ণ-খিয়েটার হয়েছে সেখানে যে দিশী মদের দোকান ছিল তাইতে সে ঢুকে পড়েছে। চিত্তরঞ্জনকে সে কথা বলার তিনি বলতেন “আমার দানেই সুখ, দানই আমার ধর্ম।” যে আমাকে ঠিকেরে ধাপা-মেয়ে টাকা নিয়ে গেল সে হস্ত প্রস্টাচার বা পাপ করল। কিন্তু তার বিচারের ভার ভগবান আমার উপর দেন নি—আমাকে দিয়েছেন দেবারই কত বা।” এর উপরে কথা চলে না। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে চিত্তরঞ্জনের দান অনেক

সময় অপারোই পড়েছে এবং মিথ্যারই প্রণয় দিয়েছে।

অসহযোগের গ্রহণ করায় একদিনে চিত্তরঞ্জনের সমস্ত আয় বন্ধ হয়ে গেল। স্বভাবতই তাকে ব্যয় সংকুলান করতে হল এবং তাইতে বাড়ির পুরাতন রাজকীয় চালাচলন কেটেছেটে ফেলাতে হয়েছিল। যখন তিনি স্বচ্ছলতার উচ্চ শিখরে উঠেছেন তখনই তাকে কপ করে নেমে আসতে হল। কৃষ্ণসামনের পথে। নিম্নে অস্তিত্ব হয়ে গেল বাবুগিরির চাল ও বন্দু-বান্ধবদের খাওয়া-দাওয়ার ঢালা নিমন্ত্রণ। বন্দু হয়ে গেল বাবুচি-খানা এবং উঠে গেল ইংরেজি কায়দায় সাজান খাবার ঘরের মস্ত বড় টেবিল স্কোপিঙ্ক খাবার টেবিলে ঠাসাবানো মারসিরাইসড, সাদা চাদর ও ছুরি-কাটা চামচের ঝকঝকে বাহার আর বাবুচি-খানার চব্বিশো পরিপাটি খানা। নিজে দেখেছি তাঁকে কালাইমোহন আলয়ের উত্তরপূর্ব কোণের নিশী রামাঘরের বিজলীপাখার নী বাসায় মটিতে আসল পেতে প্রশান্তচিত্তে আহার-সমাপন করতে। পুরানো খানা কামরার একমাত্র চিহ্ন-স্বল্প রইল টিকে মুসলমান বয়স্ক দুই। এইরকম কৃষ্ণসামনে অনভ্যস্ত চিত্তরঞ্জনকে যে খুব বেশি রকম পাঁড়া দিত তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কোনদিন তাঁকে অবস্থি প্রকাশ করতে শুনিনি সেই সময়কার অনটনের জন্যে। এইরকম দৈহিক কষ্টের উপর পড়েছিল অসাধারণ কর্মভির। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্বই পড়েছিল তাঁর ঘাড়ে। প্রায়ই মফস্বলে যেতে হত নিজেকে এবং অনেক সময় সঙ্গীক এবং অন্য সহকর্মীদেরও পাঠাতে হত। সেই অনটনের সময়ও তাঁর আপন তহবিল থেকে সঞ্চিত অর্থের উপরেও প্রায়ই টান পড়ত এই সব খরচা মেটাতে। অন্যমন, পরিশ্রম, দুর্ভিক্ষ সর্ব মিলিয়ে চিত্ত-রঞ্জনের স্বাস্থ্যের উপর অসহনীয় চাপ পড়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তৃতীয় ডোমরাও কেসের প্রতিবন্দী কোর্সিলী স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের সনির্বন্ধ অনুরোধে চিত্তরঞ্জন গেলেন দার্জিলিং পাহাড়ে বারু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। ১৯২৫ খৃস্টাব্দের মে মাসে। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনকে আপন বাড়ি সেন্ট্রাল এসাইড ছেড়ে দিলেন বসবাস করবার জন্যে এবং এমন কি দৈনিক বাজার ও ঘাটতীর খরচা বাতে চিত্তরঞ্জনের না লাগে সেই মর্মে তাঁর নিম্নস্ত সম্পত্তি ভত্তাবধারণ ও সর্বজনপ্রিয়

অনুপালন গোম্বামী (ওরফে ন্যাড়াবাদ) মহাপ্রয়োগে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রতি-বন্দীর প্রতি সরকার সাহেবের এই সৌজন্য ও বদান্যতা সত্যি প্রশংসনীয়। কয়েকদিন দার্জিলিং শহরে বেশ ভাল থেকে চিত্তরঞ্জনের শারীরিক অবস্থা উন্নত হবার খারাপ হয়েই চলল। সপ্তাহান্তে একটু একটু জ্বর হতেই লাগল। অবশেষে ১৫ই জুনের রাত্রে এলো ভীষণ জ্বর এবং ১৬ই জুন বিকালে দেহস্থ সব ক্রান্তি অপনোদন করে তাঁর আরও কাজ অসমাপ্ত থাকতেই মৃত্যু তাকে কোলে তুলে নিলেন। দেশবন্দু মৃত্র আত্মা পরমাত্মর মধ্যেই বিলীন হয়ে গেল। খসে পড়ল বিক্রমপুর তেলিরবাগের দাশ গোষ্ঠীর গৌরবের উজ্জ্বল মৃদুটে মধ্যমিণি। ডুবে গেল ভারতের ভাগ্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। হাহাকার উঠল দেশময়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সাম্বনার বাগী লিখলেন—

“এবেঁছিলে সাধে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।”

দেশবাসী আপামর সাধারণ নরনারীর কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল ১৫ই জুন ১৯২৫ খৃস্টাব্দ।

চিত্তরঞ্জনের অশ্রুতপূর্ব ত্যাগ ও দেশের স্বার্থে তাঁর আত্মবলিদান সেনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে ভারতবর্ষে ইতিহাসে। তাঁর আইন ব্যবসারে কৃতিত্ব ও কর্মকুশলতা, ভারতের রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর অজ্ঞাত অবদান, তাঁর স্বদেশপ্রীতি, তাঁর হৃদয়ের তেজস্বিতা, কারাবরণ, নিঃস্ব। গরীবের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি, নারীবজ্রাতর কল্যাণে আপন শেষ সম্বল বসত বাড়ি টুকুও দান—এই সব কাহিনী এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে গেছে। এত সমবেদনা রোধে ন্যায়পরায়ণতা তিনি পেলেন কোথা থেকে; তাঁর জীবনে পিতা ভুবনমোহনের ও মাতা নিম্ভাতিরণী দেবীর প্রভাব কতটা প্রকট হয়েছিল এবং সহযমিনী বাসন্তী দেবীর সাহচর্য ও সহযোগিতা তাঁর জীবনে কতটা সহায়তা করেছে এই সব প্রশ্নের বিশ্লেষণ ইতিহাসিকরাই বিচার-বিবেচনা করবেন। অনুসন্ধান পাঠক এ বিষয়ে অনেক তথ্যাদ সংগ্রহ করতে পারবেন তাঁর ভ্রত সহকর্মী স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্তের বাঙালয় লেখা ‘দেশবন্দু স্মৃতি’ ও ইংরেজিতে লেখা ‘দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন’ গ্রন্থে। চিত্তরঞ্জনের পারিবারিক জীবনের কথা, তাঁর মহামানবিকতার কাহিনী ও তাঁর রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরই জ্যেষ্ঠা কন্যা অপরূপা দেবী তাঁর আনন্দ চিত্তরঞ্জন গ্রন্থে।

আমি তেলিবাগের দাশ গোষ্ঠীর কিংবা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনের ইতিহাস লিখতে বসি নি। আমার এই স্মৃতি-রুধায় আমি শুধু বলব সেই ভুবনমোহন ও সেই নিস্তারিণী দেবীর কথা যাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে প্রতিপালিত হয়েছিলেন আমার পিতা-মাতা। আমি শুধু বলব সেই চিত্তরঞ্জনের কথা যিনি ছিলেন আমার দাদাবাবু, আমি বলব সেই ঘাসন্তী দেবীর কথা যিনি আমার স্নেহ-ময়ী বোঁটান হয়ে এখনো আমাদের মধ্যে ভাগ্যক্রমে বেঁচে আছেন। আমার সকল শিক্ষা এবং আমার জীবনে যদি এতটুকুও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরে থাকি তবে সেই প্রতিষ্ঠাটুকুও সম্ভব হয়েছে এঁদের আনুক্রম্য উপদেশে ও উৎসাহে। জীবনের এই গোখলি লগ্নে দাদাবাবু ও বোঁটানের কাছ থেকে যে স্নেহ ও অনু-কম্পার দান পেয়েছি জীবনভরে আমার এই স্মৃতিচরনে তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করে তাঁদের কথা সত্যতত্ত্বচিন্তে স্মরণে রেখে নিজেকে পবিত্র করে চলে যেতে চাই।

II & II

চিত্তরঞ্জনের ছিল দুইটি কন্যা ও একটিমাত্র পুত্র। বড় কন্যা অপর্ণা দেবীর ডাকনাম সোনা। তাঁর সুসাহিত্যিক বলে খ্যাতি আছে। আপন পিতার জীবনী 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' ছাড়াও তাঁর অন্যান্য রচনা আছে, বিশেষ করে বৈষ্ণব পদা-বলীর উপরে। তাঁর পদাবলী কীতনের মুছনা এখনো ঘেন কান পাতলেই শুনতে পাই। বিক্রমপুর হাসাড়া গ্রামের স্বর্গীয় শ্রীশ রায় মহাশয়ের পুত্র সুখীর রায় ব্যারিস্টারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে-ছিল। তিনি যখন হাইকোর্টে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তিক সেই সময়ে কোর্টে সওয়াল-জবাব করতে করতেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এঁদের তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা। বড় ছেলেটি ব্যাবিস্টারী করেন এবং পশ্চিম-বঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে রাজনৈতিক মহলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। চিত্তরঞ্জনের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণী রূপে-গুণে আনন্দদায়িনী। তিনি অনেক সংস্কৃত কাব্য বাঁড়িতে বসেই অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর সংগে বিয়ে হয়েছিল-স্বাষ্টগুরুদেব, সুব্রহ্মনাথের দৌহিত্র ও স্বর্গীয় ইউ. এন. মুখার্জীর জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার মুখার্জী। ডাক্তার কেশ্বজ থেকে পাশ করে ফিরে এসে কিছুদিন মধ্য-প্রদেশে অধ্যাপনার কাজ করে পরে কলকাতা কর্পোরেশনের সহ-কর্মসিচিব পদে নিয়ো-জিত হন। তিনি ক্রমশ উন্নতিলাভ করে সেখানকার মধ্য কর্মসিচিব পদে উঠে

সুখ্যাতির সংগে কাজ করে অবসরগ্রহণ করেন। ইনিও হৃদরোগেই ১৯৬৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারীতে মারা যান। এঁদের তিনটি পুত্রই শিক্ষিত ও নিজ নিজ কর্মে বেশ উন্নতিলাভ করেছেন। এই দুই বোনের মধ্যে ছিলেন চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র চিত্তরঞ্জন যার ডাকনাম ছিল 'ভোম্বল'। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চমকদার কোন তকমা পান নি এবং সেরকম চেষ্টাও করেন নি কিন্তু গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে বেশ ব্যুৎপত্তি লাভই করেছিলেন। পিতার সংগে ইনিও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কাবাবরণ করেছিলেন। ভোম্বলের হৃদয় বদান্যতায় টুটুটু বুরা ছিল। পরের দৃষ্টিতে তিনি সমবেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেন এবং অকাতরে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। এ রকম দয়ালু ও পরদুঃখকাতর মানুষ কমই দেখেছি। গরীবের শীতে কণ্ট হচ্ছে দেখে নিজের গায়ের শীতবস্ত্রটি তাকে দান করতে এতটুকুও দ্বিধা তাঁর ছিল না। ভোম্বল অত্যন্ত অল্প বয়সে পিতৃ-বিয়োগের এক বৎসর পরেই ২৩শে জুন ১৯২৬ সালে পত্নী সুজাতা ও তিনটি কন্যা—আদিত, স্বরূপা ও ইন্দ্রাণীকে বেথে অমরধামে চলে গিয়েছেন। বহুমতী সুজাতা আপ্রাণ চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে কলকাতায় এবং কলকাতাব বাইরে বিদ্যালয় স্থাপন করে দেশের নাবী কল্যাণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে নীচের দেশসেবা করে চলেছেন। ছোট মেয়েটি অল্প বয়সেই মারা গেছেন। বড়টির বিবাহ হয়েছে স্বর্গীয় জি সি মুখার্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অধীপ মুখার্জীর সংগে। স্বনামখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় জরদীপ এঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র। চিত্তরঞ্জনের তিনটি সন্তানের সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও পণ্ডিত সম্পর্ক গড়ে উঠে-ছিল তার স্মৃতি এখনো আমার জীবনে পরম সম্পদ হয়ে সঞ্চিত হয়ে আছে। আমাক, ভোম্বলকে এবং চিত্তরঞ্জনের বড়দিদি তরলা দেবীর একমাত্র পুত্র সুখার্জীমোহন গুপ্তকে একসঙ্গে দেখলেই দাদাবাবু তাস বলতেন—'গির্দানি'। এব মধ্যে আমি জিলাম পিতা ভোম্বল ছিলেন 'পুত্র' ও সুখার্জীকে বলা হত 'পরিগ্রাহ্য' যত দুঃখ বর্ষা মাগাতেন সলৈ কোষ হয়। সে সব দিনের কথা পবে যথাস্থানে বলব।

II & II

ভুবনমোহনের দ্বিতীয় পুত্র প্রফুল্ল-বজ্রন বিলেত থেকে ব্যাবিস্টারী পরীক্ষায় পাশ করে ফিরে এসে কলকাতায় প্র্যাকটিস

আরম্ভ করেন। তিনি পড়াশুনার বরাবরই ভাল ছিলেন এবং অত্যন্ত অধ্যয়নশীল ছিলেন ছেলেবেলা থেকেই এঁরও চিত্তরঞ্জনের মতই সাহিত্যসংবাদ ছিল। চিত্তরঞ্জনের কবিতা লিখতেন বাংলায়, প্রফুল্ল-বজ্রন লিখতেন ইংরেজীতে। এর ইংরেজী কবিতাগুলি পুস্তকাকারে যথ এ্যান্ড দি স্টারস নামে প্রকাশিত হয়েছিল। যে কয়টি কবিতা আমি পড়েছি তাতেই তাঁর ভাবানু-ভূতির স্পর্শ পেরেছি। তিনি বিলেতে পাঠদশাতেই সেখানকার এক ডাক্তারের কন্যা ডরথীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সেই ইংরেজ কন্যা পুত্রবধূরূপে দাশ পরিবারের সকলের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তিনি খুব ধীর ও শান্ত-স্বভাবা মহিলা ছিলেন এবং আপন শাশুড়ি নিস্তারিণী দেবীকে খুব সম্মি- করে চলতেন। এ দেশে এসে তিনি বেশির ভাগ সময়েই বাঙালী মেয়েদের মত শাড়ি পরতেন। গোড়ার দিক প্রফুল্ল-বজ্রন কলকাতায় তেমন পনার জমাতে পারেন নি। এক সময়ে তিনি বেনারস জেলা কোর্টে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে-ছিলেন। পরে যখন পাটনা হাইকোর্টে স্থাপিত হল তখন রাজেন্দ্র প্রসাদ (পরে যিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়ে-ছিলেন), দুই ইমাম খাতা ও অন্যান্য বহু ব্যবহাবজীবীদের সঙ্গে প্রফুল্লবজ্রনও পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে যান। সেখানে তাঁর পড়তা খুলে যা এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বলে খ্যাতি লাভ করে সেই হাইকোর্টের জজ পদে নিযুক্ত হন। বেশ কয় বছর জজীয়তী করার পর তিনি সেই কাজ ইস্তফা দিয়ে সেখানেই আবার প্র্যাকটিস শুরু করে মারা ভারতবর্ষের বড় বড় মামলার নিষ্পত্তি হতেন। তাঁর আইনজ্ঞান অতি গভীর ছিল এবং নিজ মরেলের কেসটি অতি সম্পন্নভাবে সাজিয়ে কোন না কোন প্রাচীন নজিরের ছকে মধ্যে ফেল জরলাভ করতেন। দাদাবাবুকে একাধিকবার বলতে শুনছি—“প্রফুল্ল আমার চেয়ে ঢেব বেশি আইন জানে।” আমি যখন জজ হলাম কলকাতা হাইকোর্টে তখন তিনি আমার কোর্টেও দু' একবার মামলা করতে হাজির হয়েছেন। পবে যখন আমি সুপ্রিম কোর্টে গেলাম, তখন সেখানও প্রফুল্ল-বজ্রনকে মামলা করতে দেখেছি। অসাধারণ ছিল তাঁর হার্মানিয়ানের কাবদা ও আঠনের অন্তর্নিহিত নীতির বিশ্লেষণ ক্ষমতা। সুপ্রিম কোর্টে বিবাহ ল্যান্ড বিফরম আইনটিকে সংবিধানের বিরোধী বলে খণ্ডাবার যে একটি সওয়াল জবাব তিনি করেছিলেন খুব কম কোর্টসিলাই সেরকম চিন্তাকর্ষকভাবে তা করতে পারত। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমি ও আমার

সতীর্থ জজেরা একমত হতে পারি নি কিন্তু তাঁর অসাধারণ আইনগত নৈপুণ্য দেখে আমরা জজেরা সবাই বিস্মিত হয়েছিলাম। দানখ্যানও ছিল তাঁর মন্দ নয়। বঙ্গবান্ধবদের খাওয়াতে খুব ভাল বাসতেন। তিনি সম্প্রতি ওরা সেটেশ্বর ১৯৬৩ সালে মাঝা গেছেন। তাঁর ছিল দুটি কন্যা—গৌরী (পিকো) ও উমা (মণি) ও একমাত্র পুত্র শঙ্কর। শঙ্কর মোটর দুর্ঘটনায় বিহারে মারা যান। মণির বিয়ে হয়েছিল রণজিৎ গুপ্তা নিন পরে পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান সচিব হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। মণিও অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। বেঁচে আছেন খালি পিকো। এ'র স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। তিনি আই এম এস হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে ফৌজী ডাক্তার হয়েছিলেন। পরে সে চাকুরী ছেড়ে তিনি রেল কোম্পানীর ডেপুটী চীফ মেডিক্যাল অফিসারের পদে মোতায়েন হন। সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি বড় বড় চা বাগানের চীফ মেডিক্যাল অফিসাররূপে কাজ করতেন। পিকোও একটি ছেলে এবং দুইটি মেয়ে। বড় মেয়ে মিতার বিয়ে হয়েছে সুবিখ্যাত আইনজীবী ও প্রাক্তন ল মেম্বর বি-এল মিটারের ছেলে ভাস্কর মিত্রের বিনি এন্ড্রু ইউন কোম্পানীর এডভক'ন উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত ও প্রবীণ কর্মী।

১৭৪

এইখানে ভুবনমোহনের কন্যাদের কথা না বললে মনে তৃপ্তি পাব না। আগেই বলেছি ভুবনমোহনের ছিল পাঁচটি মেয়ে। মিনি সবচেয়ে বড় ছিলেন, তিনিই হলেন ভুবনমোহনের প্রথম সন্তান। নাম ছিল তাঁর তরলা। বড়বা ডাকতেন তাঁকে 'তরু' বলে এবং আমরা সব ভাইয়েরাই ডাকতেন 'দিদিমণি' বলে। দিদিমণি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ও তেজস্বিনী রমণী। সকালে সম্ম্যায় ভগবত উপাসনা তিনি নিবিষ্টচিত্তে করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি ছোটদের সঙ্গে সবদাই হাসিমুখেই কথা কইতেন কিন্তু অন্যায় কাজের জন্যে তিরস্কার করতেও পরাম্ভ হতেন না। দৃষ্টান্তরূপে দিদিমণি রাগ করবেন, অসুখী হবেন এই দৃশ্চিন্তা থাকত সবাইয়ের মনে। দূর্নীতির প্রশ্ন তিনি কখনই দিতেন না। কারো আচরণে দূর্নীতির প্রকাশ পেলে তার সঙ্গে সকল সম্ভব ত্যাগ করবারও সংসাহস তাঁর ছিল। অসত্যকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। অসাধারণ ছিল তাঁর মনের বল। কাড়-রাইদের জমিদার ভক্ত রাম কালীনারায়ণ

গুপ্তের মধ্যম পুত্র প্যারীমোহন গুপ্তের সঙ্গে দিদিমণির বিবাহ হয়েছিল। তিনি ছিলেন সিভিল সার্জন ডাক্তার। প্যারী বাবুকে আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তিনি বোনির ভাগ সমরই মফস্বলে কাজের জায়গাতেই থাকতেন।

আমার বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি প্যারীবাবু অত্যন্ত চরিত্রবান ও সংযত চিত্ত মানুষ ছিলেন। জ্যেষ্ঠামশায় ও দাদাবাবুর আর্থিক সম্পদের দিনে দিদিমণি ও প্যারীবাবু তাঁদের অনেক সহায়তা করেছেন। সেই দুর্দিনের কথ দাদাবাবু কখনো ভোলেন নি। দাদাবাবু খুবই ভালবাসতেন ও প্রাণা করতেন দিদিমণিকে। প্যারীবাবু অল্প বয়সেই মারা যেতে দিদিমণির সাজান সংসার একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল। অনেক গুলি সন্তান নিয়ে দিদিমণি অক্লান্ত সাগরে ভাসলেন। কিন্তু ভগবত ভক্তি ও বিশ্বাস তিনি কখনো হারান নি। সংসারের কোন বিপর্যয় তাঁকে বিধ্বস্ত করতে পারে নি। বড় মেয়ে বন্দু (মলিনা) অল্প বয়সেই মারা যান। কোলের ছোট মেয়ে শণি (লীনা) প্যারী-বাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই চলে গেলেন। কিন্তু দিদিমণি অটল রইলেন এবং আপন কর্তব্য পথে বন্ধপরিকর হয়ে এগিয়ে চললেন। সেই দুর্দিনে দিদিমণিকে আপন বন্ধের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন দাদাবাবু। পরম স্নেহভরে এবং কর্তব্যবোধে। সংসারের সকল ঝড়-ঝাপটা থেকে তিনি দিদিমণিকে আগলিয়ে রাখতেন। দিদিমণির মূখ্যে কথা বের হতে না হতেই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতেন দাদাবাবু। এ রকম ভাই জগতে বিরল। দিদিমণির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিজের ছেলে-মেয়েদের স্কোন তফাৎ করতে দেখি নি দাদাবাবু ও বোঁঠানকে। অনেক সময় প্রয়োজনবোধে নিজের সন্তানদের যদি বা কোন বায়না উপেক্ষা করেছেন দিদিমণির ছেলে-মেয়েদের এতটুকু আবদার ও আবেদন দাদাবাবু ও বোঁঠান কখনো প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে মনে পড়ে না। দিদিমণির সব কণি কন্যার বিবাহের ব্যবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন দাদাবাবু এবং দিদিমণির একমাত্র পুত্র সুধাংশুকে নিজ ব্যয়ে বিলেতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে এনেছিলেন তিনিই। সুধাংশু পাটনা হাইকোর্টে বেশ পসার জমিবে শেষে ইনকাম ট্যাক্স টাইবুন্সালের জুডিসিয়াল মেম্বর হয়ে অনেক দিন সুনামের সঙ্গে কাজ করে কিছু দিন হয় অবসর নিয়ে পাটনা শহরে আপন বাড়িতেই বসবাস করতেন। দাদাবাবু মারা যাবার পর তাঁর শব-শোভাযাত্রার ভিড় বধন দিদিমণির রসা রোডের বাড়ির

সামনে দাঁড়াল তাঁকে শেষ দর্শন দেবার জন্যে তখন জনতার মধ্যে থেকে দেখেছি দিদিমণির আত্মনিবন্ধ শান্ত মুখশ্রী ও সংযত ব্যবহার। বোধ হয় মনে মনে তিনি একটু প্রার্থনা করলেন এবং তারপর হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করলেন জনতাকে এগিয়ে যাবার জন্যে। এত বড় শৈথব্য তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। অসাধারণ ছিল দিদিমণির ভগবানের বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস।

দিদিমণির বড় মেয়ে বন্দু (মলিনা) মারা যান ছোট বয়সে। আমি তাঁকে দেখি নি—দেখলেও মনে নেই। আমি দেখেছি দিদিমণির পরের পাঁচটি মেয়ে ও সুধাংশুকে। এই পাঁচটি মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শণি (লীনা) প্যারীবাবুর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মারা যান। বাকি চারজনের মধ্যে মিনি বড় তাঁর নাম অমিয়া—ডাকনাম টুনু। টুনুর মুখে এমন একটি কমনীয় লাভণ্য দেখেছি যা ভোলা যায় না। একটি মিষ্ট হাসি তাঁর মুখে লেগেই থাকত। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কালীঘাটের কেশব-চন্দ্র মুখার্জির। কেশবচন্দ্র বহু বছর বর্মীতে ব্যারিস্টারী করে যুথের সময় দেশে ফিরে এসে এখন অবসর জীবন-যাপন করছেন।

দিদিমণির তৃতীয়া কন্যার নাম নলিনা—ডাকনাম ববুস। ববুসকে একটু গম্ভীর প্রকৃতির বলে মনে হয়েছে। কি অপূর্ব গানের গলা ছিল ববুসের। এখনো মনে আছে আমার বিয়েতে তিনি গান করেছিলেন। ববুসের বিয়ে হয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট জজ রাববাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের মেজ ছেলে খগেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে। খগেনবাবু ছিলেন বিলেত ফেরৎ ডাক্তার। তিনি ভবানীপুর ও কালীঘাটেই প্র্যাকটিস করতেন। এ রকম বিজ্ঞ ও হাতযশওয়ালা ডাক্তার দেখি নি। অত্যন্ত দয়ালু ছিল তাঁর মন। অনেক সময় দেখেছি যে বোগীর কাছ থেকে দক্ষিণা ত' নেনই নি বরং তাকে নিজের গাঁত থেকে পয়সা দিয়ে ওষুধ পর্বন্ত কিনে দিয়েছেন। আমি এবং আমাদের পরিবার যে খগেনবাবুর কাছে নানা রকমে খণী সে কথা স্বীকার করে মনটা হাল্কা করে নিতে চাই। আমাদের বাড়ির সব অসুখে চিকিৎসা করতেন খগেনবাবু। একটি পয়সাও নিতেন না। বাড়িতে কারুর অসুখ করলে খগেনবাবুকে একবার খবরটা দিতে পারলেই সবাই নিশ্চিন্ত। তারপর রোগীব ভায় থাকত খগেনবাবুর উপর সম্পূর্ণভাবে। আমাদের আর কিছু ভাববারই দরকার থাকত না। খগেনবাবু আমাকে নিরতিশয় স্নেহ করতেন এবং আমার প্র্যাকটিস-এ

রূপ সাধনার সাধনা

দুটি অবদ্য অবদান



সাধনা বিউটি ক্রিম

প্রতিদিন চক চর্চায় একান্ত
প্রয়োজন। কুসুম কোমল
পেনর তনু ও যৌবন স্থলস্থ
লাবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথ পেস্ট

দম্বরাজি মুক্তার মত শুভ্র
ও উজ্জ্বল, মাড়ী শুষ্ক ও শুষ্ক
মুখ ত্বর্গকমুক্ত ও স্বচ্ছ করে।

শীঘ্রই পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ—ঔষধগোপাল ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বিদ-শ্রী, এম. সি. এল. (লণ্ডন)
এম. সি. এম. (আমেট্রিক) ভাণ্ডারপুত্র
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এম. (কলিঃ) স্নাতকোত্তর।

S. M. / 1-67 B

উন্নতি হচ্ছে জেনে খুশি হতেন। প্রায়ই বলতেন—“ভূমি বহু দূর উঠবে—এ কথা আমি বলে গেলাম—দেখে নিও সম্বন্ধীর পো।” বাবার সঙ্গে ছিল তাঁর নাতজামাই সম্পর্ক এবং সেই সুদেই এই সম্বন্ধন। যখন আমি কিছু কিছু টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করছি তখন একদিন খগেনবাবুকে বললাম—“খগেনবাবু, এখন ত’ আমি পারি আপনার ফিস দিতে—কি বলেন?” বেশ একটু হেসে বললেন—“পার ত’ দিও, তোমার কাছ থেকে নিতে আপত্তি নেই।” এরপর আমার, কি আমার স্ত্রীর, কি আমার ছেলে-মেয়েদের অসুখে খগেনবাবুকে সাধ্যমত ভিজিট দিয়েছি, কিন্তু আমার স্বচ্ছল অবস্থার সমস্ত খগেনবাবু আমার বাবা মায়ের অসুখে কোনো ফিস নেন নি। হেসে বলতেন—“ওদের জন্যে ত’ ভূমি দারী নও, তোমার কাছ থেকে তাঁদের জন্যে টাকা কেন নেব?” আমার বাবা মাকে খগেনবাবু খুবই প্রাণ্য করতেন। তবে বাবা সম্পর্কে তাঁর দাদামশ্বরের হওয়ায় তাঁর সঙ্গে খগেনবাবুর রসিকতাও চলত বেশ। বাবা যখন খগেনবাবুর প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আদ্যোপান্ত পড়ে মৃদু তুলতেন অমনি খগেনবাবু বলতেন যে, কোন একটা ওষুধ কিম্বা তাঁর ডোজ সম্বন্ধে বাবার একটু খটকা বা ভয় হয়েছে। আর যাবে কোথায়। দড়াম করে বলতেন—“কপোতেশ্বরের চাকরী ছেড়ে এইবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার একটা বই আর এক ঝাণ্ডা ওষুধ কিনে কলে বের হও গিছে।” একবার আমার মেজ বোন সুনীতি (মুন্না) বিন তখন বরিশালে তাঁর স্বামীর ধর্মস্থলে বাস করছিলেন তাঁর খুব অসুখ করছিল। আমি সম্মান্য কোর্ট থেকে ফিরে বাবার মৃদু কালিমা দেখেই ঘুমতে পেরেছিলাম যে একটা কিছু অমটন ঘটেছে। জিজ্ঞাসা করার একখানা টেলিগ্রাম আমার হাতে দিলেন। টেলিগ্রামটা পড়ে আমি বললাম—“খগেনবাবুকে ধলছে?” বাবা বললেন—“খগেনকে তার সব কাজকর্ম ফেলে বরিশালে যেতে কি হবে বলি, কি ভাবে।” আমি তখনই গেলাম খগেনবাবুর রসা রোডের বাড়িতে। সব কথা শুনে তক্ষুণি একটা ফর্দ করে দিলেন—“এইসব ওষুধ ব্যাল্ডেল ইত্যাদি কিনে এখনি প্যাক করে দাও—আর ঐ সম্বন্ধীকে বোলো আজই রাতে আমার সঙ্গে বরিশাল যেতে হবে। আমি ততক্ষণ এখানকার রোগীদের একটা কিছু ব্যবস্থা করে রাখছি।” ফিরে এসে বাবাকে সে খবরটা দিতে বাবার মৃদু যে কি অনির্বচনীয় আনন্দের ছবি ফটে উঠতে দেখলাম তা বর্ণনা করা যায় না। সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে বাবা ও খগেন-

বাবু বরিশালে চলে গেলেন। ঠিক সময়ে চিকিৎসা হওয়ার আমার বোন গুণ্ডু সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন। খগেনবাবু সেবারে বরিশালে তিন দিন ছিলেন কলকাতার সব কাজ ফেলে। কি-ই-বা দিতে পেরে-ছিলাম তাঁকে। সে ঋণ ত’ টাকায় শোধ হয় না। খগেনবাবু অকালে কি এক বিজ্ঞাতীয় রোগে মারা গেলেন। আমি তখন ছুটিতে বাইরে ছিলাম। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর কোন সেবা আমি করতে পারি নি। তাঁর একমাত্র ছেলেরিট অমলেন্দু (বোকা) কলকাতাতেই আছেন।

দিদিমণির সঙ্গে মেয়ে অরুণা (বিবন) বাইরে থেকে দেখতে একটু ঘেন গম্ভীর কিন্তু অন্তরঙ্গমহলে তাঁর রূপগুণের অন্ত ছিল না। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ডাক্তার অমৃতলাল মিত্রের। তিনি আরাতে প্র্যাকটিস করতেন বলে তাঁর সঙ্গে তেমন আলাপ আমার জন্মে নি। তিনি কয়েক বছর আগে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। ছোট মেয়ে সাহানা (বুন্দু)র নাম বাংলা দেশে শিক্ষিতসমাজে সবাই জানে। কি গানের গলা। যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির উঠানে ১১ই মার্চের সাধ্য রক্তোপাসনার সময়ে সমবেত সহস্রাধিক জনগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুন্দু একক সঙ্গীত করতেন তখন বুন্দুর মৃদু কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সদ্যবিচিত ব্রহ্মসংগীতের অপূর্ব মূর্ছনা উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠে একটি শাস্ত শব্দ স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করত প্রোভাদের অন্তরের মধ্যে। বুন্দু সুসাহিত্যিকও বটে। তাঁর লেখা কবিতা-গুলি মর্মস্পর্শী। এক্ষণে তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁর স্মৃতিকথা লিখছেন। পড়ে আনন্দ পাই। তাঁর স্বামী বিজয় বসুও ডাক্তার ছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। তিনি এখন আব ইহলোকে নেই। দিদিমণির চারটি কন্যা যারা জীবিত রয়েছেন তাঁরা সবাই এখন পান্ডিত্যের প্রীতিরবিন্দু আশ্রমে আছেন। তাঁদের সঙ্গে আর এ জীবনে দেখা হবে কি না ভবিষ্যৎই জানেন। ববুস ও বুন্দুর গান এখনো কানে বাজে। দিদিমণির ছেলে সুধাংশু ও তাঁর ছোট দুই মেয়ে বিবন (অরুণা) ও বুন্দু (সাহানা)-র সঙ্গে আমার অতি মৃদু সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনে তাঁদের প্রভাব যে কত সুগভীর ছিল তা পরে বলব।

ভবনমোহনের দ্বিতীয়া কন্যা অমলা দেবীর নাম বাংলা দেশের শিক্ষিতসমাজে অজানা নয়। আমরা এঁকে ডাকতাম ‘বড়দিদি’ বলে। আমরা বড়দিদিকে ভয়ও করতাম ভালও বাসতাম। কড়া শাসন

ছিল বড়দিদির। কোন অগম্য চোখে, পড়লে অমনি শাস্তি দিতেন। কিন্তু মজা ছিল এই যে তিনি মনে করতেন যে তিনি ভালবাসেন বলেই তিনি শাস্তি দেবার অধিকারী। যদি তাঁর পেটোয়া কোন ছেলে-মেয়েদের অন্যে শাসন করতেন বড়দিদির সেটা মোটেই পছন্দ হত না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ভূত করে বলতেন—“শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।” বড়দিদি খুব সৃষ্টিশক্তি মালিনী ছিলেন। তাঁর মধ্যে সাহিত্য প্রতিভার অপূর্ব বিকাশও দেখেছি। তাঁর রচিত দুইখানি নাটক তিনি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। প্রথমটির নাম ছিল “ভিত্তাশরণী”—সেটি বোধ হয় কলকাতার কোন এক থিয়েটারে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। শেষেরটির নাম দিয়েছিলেন “শক্তি”। এটি ছাপা হয়েছিল কি না স্মরণ নেই। শান্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের পরস্পর-বিরোধী হিংসাত্মক মনোভাবের মধ্যেও একটি অপূর্ব সুন্দর প্রীতির কাহিনী ছিল এই নাটকের বিষয়বস্তু। এ ছাড়া কত গান বড়দিদি নিজেই রচনা করে সুর দিয়েছেন। বড়দিদির গানের তুলনা নেই। আজকাল দেখি আমাদের বেশ ভাল ভাল নামকরা গায়েরা—তিনি পুরুষই হোন কি মেয়েই হোন—মৃদুগানের সামনে একটা মাইক না হলে গাইতেই পারেন না এবং গান করবার সময় খেঁচি হারিয়ে যাবার ভয়ে গানের বই কি খাতা হাতে ধরে থাকবেনই থাকবেন। এতে যে গানের রস কতটা কমে যায় তা তাঁরা হয়ত উপলব্ধি করেন না। তা ছাড়া গানটা গাইতে গাইতেই মৃদুস্থ হয়ে যান এবং মন থেকে যখন কথাগুলি বের হয়ে আসে তখন তার মধ্যে যে দরদের স্পর্শটুকু থাকে বই হাতে করে সারাক্ষণই সেই দিকে তাকিয়ে গান করলে সে দরদ ত’ থাকেই না, গানের রসভঙ্গ হতেই হয়। বড়দিদির আমলে মাইকের রেওয়াজ ছিল না, এবং তাঁর যা গলা ছিল তাতে মাইকের কোন প্রয়োজনই হত না। বিশাল কংগ্রেস প্যাঞ্ডলের এক প্রান্ত থেকে সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যেত বড়দিদির গলায় ‘বন্দেমাতরম’ গানখানি। সব গানেরই কথাগুলি শোনা যেত স্পষ্ট এবং তা যেন তাঁর অন্তরের উৎস থেকে উচ্ছ্বাসিত হবে বোঝিয়ে আসত। বেশ অনুভব করা যেত যে, গানের ভাবার্থটি তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। সে গানের তুলনা নেই। আমি যত গান শুনেছি তার মধ্যে দিদিমণি (তবলা)-র মেয়ে বুন্দু (সাহানা)-র গান বড়দিদির গানের কাছাকাছি এসে পড়েছিল গলার সৃষ্টি লাগিতো, উচ্চারণের স্পষ্টতা ও অন্তরের অনুরোধে। জোড়াসাঁকোর

চাঁকুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের দাশ পরিবারের সম্ভাব ও যাতায়াত ছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড়দিদি ও বন্দুকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বড়দিদির কথা রবীন্দ্রনাথের লেখা “অন দি এজেন্স অব টাইম” গ্রন্থে বিশেষ করে উল্লিখিত আছে। যে সময় আমাদের দেশে গ্রামো-ফোন প্রথম চালু হলো তখন রেকর্ডে গান শুন্য যত থিয়েটারের অভিনেত্রী এবং বাদ্যজ্ঞীরা ভদ্রবাবু ছেলের মধ্যে স্বর্ণীয় লালচাঁদ বড়লই বোধ হয় প্রথম গ্রামো-ফোনে গান দেন এ দেশে। ভদ্র পরিবারের মেয়েদের মধ্যে বড়দিদি (অমলা দাশ)-ই প্রথম গান রেকর্ড করান। সে কি গান— “একি আকুলতা ভুবনে”, “ওহে জীবন বজ্রভ”, “চিব সখা হে”, “এ ভরা বাদর মাহ ভাদব” এবং আবো কত কি। গানের মত গানই বটে। সে সুবর্ণালি আঙ্গু ও ধেন কানে বাজে। আমি যখন শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়ি তখন ছুটিতে ঘাড়ি এলেই বড়দিদিকে শোনাতে হত তাঁর বিবাকার নতুন গানগুলি। বড়দিদির বিয়ের কথা হয়েছিল শুনিয়ে কিন্তু অভিভাবকদের আপত্তি হওয়ায় সে বিয়ে হয় নি। বড়দিদি চিরকুমারীই রয়ে গেলেন। শেষ বয়সে বড়দিদি দাদাবাবুর পুত্রুল্লার বাড়িতে থাকতেন এবং সেখানে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গরীব দুঃস্থার সেবা নিজে করে নিয়োজিত করেছিলেন। এই পুণ্য কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন আমাদের প্রমদা-দিদি যিনি ছিলেন মধোব বাড়ির কাশীবব নাথের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত কন্যা শ্যামাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। বলাই বাহুল্য যে বড়দিদির এই লোকহিতকর কর্মে স্বর্ণোজ অর্থের প্রয়োজন হত এবং বহুলাংশেই তা সরবরাহ করতেন দাদাবাবু হাসিমুখে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে। বড়দিদির এতটুকু ইচ্ছাও সম্পূর্ণ থাকত না দাদাবাবুর দক্ষিণ্যে। অনাথ আশ্রমের একটি মেয়ে—নাম ছিল তাঁর নন্দরাণী—তাকে বড়দিদি সন্তানের মত পালন করেছিলেন। সেই নন্দরাণীর বিষেতে দাদাবাবুই সব ব্যয়ভার বহন করেছিলেন রুনা ভগিনীরা ইচ্ছার চবিত্ত্যাক্রমণ। সেই সময়ই বড়দিদি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর চিকিৎসার জন্য তাঁকে যখন কলকাতায় আনা হয়েছিল তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে যে অনেক সময় বসতাম তা বেশ মনে আছে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে বড়দিদি পবলোকগমন করেন।

নদিদি প্রমীলা ছিলেন ডবনমোহনের তৃতীয়া কন্যা। শুনিয়ে ছোট বয়সে নদিদি খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আলিপুত্রের অতি

বচকণ্ঠ উকিল ও দাদাবাবুর একজন পরম শ্রদ্ধানুযায়ী বন্দু শরৎচন্দ্র সেন যার কথা আগেই বলেছি। শরৎবাবুর মত এমন বন্ধুবৎসল, পরোপকারী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। ভাইবাদের মধ্যে এই নদিদির সঙ্গেই বাবার বেশি সম্প্রীতি ছিল। ঝগড়াও হত হামেশাই। সে সব মজার গল্প বলব পবে। নদিদির নিজেই সন্তান হয় নি। একটি কুড়ান ছেলে—তার ভাল নাম কি ছিল শুন নি বা মনে নেই, কিন্তু তাকে ডাকত সকলে “ভগা” বলে—তাকে পেলেছিলেন নদিদি। ভগা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোষ মানল না। সে খেলত যত রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে এবং তার চালচলনে কোন উন্নতিই দেখা যায় নি। নদিদি মারা যাবার পরে না আগে ভগা কোথায় যে অন্তর্ধান করল কেউ জানে না।

দাদাবাবুর চতুর্থ সহোদরা উর্মিলা দেবী। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আয়-করেন তদানীন্তন এ্যাসেসার অনন্ত-নারায়ণ সেন মশায়ের। উর্মিলা দেবী, যাকে আমরা ছটকীদিদি বলেই ডাকতাম বেশ লেখাপড়া জানা বিদুষী মহিলা ছিলেন। খুবই সহজভাবে হক কথা শুনিয়ে দিতে তিনি স্মৃতি করতেন না। তাঁর কাছে ঢাকঢাক গুড়গুড় কিছু ছিল না। তিনি দাদাবাবুর সঙ্গে দেশসেবার স্বতী হয়েছিলেন। ‘নারী কর্ম মন্দির’ প্রতিষ্ঠানটি ছটকীদিদিই করেছিলেন। এই প্রতি-ষ্ঠানের কল্যাণ-কাজ দাদাবাবুর রাজ-নৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক হয়ে-ছিল। রাজবোব এ জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-স্বদীপনী উর্মিলা দেবীর উপরও পড়েছিল এবং আখেরে তাকেও জেলে যেতে হয়েছিল। আগেই বলেছি যে তিনি বেশ স্পষ্ট বক্তা ছিলেন এবং সেই কারণেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাতৃস্বদেব সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। ক্রমে তিনি রাজনীতির সঙ্গে পাকিল আবর্জনা থেকে সবে দাঁড়িয়েছিলেন। পারিবারিক দিক থেকে তিনি আমাকে এবং আমার সহধর্মিণীকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের দশই তারিখে দেহব্রজা করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ এক্ষণে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক বলে খ্যাত হয়েছেন।

ছোটদিদি মবেলা (বেবলা)-র মত ভাল মানুষ জগতে বিরল। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বৌদান বাসন্তী দেবীর পিসততো ভাই বিবাজমোহন চট্টো-পাখায়েব সঙ্গে। বিবাজবাবু ছিলেন স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার এ সুলেখক বিজয়-

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভ্রাতা। বিবাজ-বাবু বিলেত থেকে বয়ন শিল্প শিখে ফিরে এসে বঙ্গালক্ষ্মী মিলে কাজ করতেন। পরে তিনি নিজেই কল্লার খনি ও নানা-বিধ ব্যবসায় খুলে প্রচুর আর্থোপার্জন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই ব্যবসায় টিকল না এবং বিবাজবাবুকে দেনার দায়ে বিব্রত হতে হয়েছিল। কিন্তু এই ভাগ্যবিপর্যয়ে আমাদের বেবলা দিদির মধ্যে এতটুকুও ভাববৈষম্য দেখি-নি। গুরুে স্মৃতি হাসিটুকুও মধ্যে একাবিন্দুও কালিমাযাত হয় নি। যখন বেবলা দিদি ঐশ্বর্যের উচ্চ শিখরে আসীন, যখন তাঁর বাড়িতে মানাগণ্য লোকের সমাগমের অন্ত ছিল না তখনো ছোটদিদি তাঁর গরীব ভাই আমাদের কথা ভোলেন নি। প্রতি বৎসর তাঁর বাড়িতে খুব ঘটা ববে ভাইফোঁটা হত। কলকাতায় থাকলে সত্যীন্দ্রনাথ ও দাদাবাবু ও আর সব ভাইয়েরা আসতেন বেবলা দিদির আমন্ত্রণে ঘোঁটা নিতে। আমার ও আমার ভাইদেরও ঢাক পড়ত এই অনুষ্ঠানে। সরু বেনো পাটি বিছিয়ে এক লাইনে সব ভাইদের বসিয়ে বেবলা দিদি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের কপালে চন্দন, কাজল ও নৈবেদ্য ফেঁটা দিবে আমাদের যমদুয়ারে কাটা দিবে যেমন করে যমুনা নাকি হমকে দিবে ফেঁটা। তারপর ঠাসা বোবা খান্টি-পুয়ের কালপেড়ে কৌচান ধতি চান্দ ও ছুরিভোজন। একবার আমা বত ছেলে সুব্রজকেও বসিয়ে বেবলা দিদি তাঁর মেয়ে মৈত্রেয়ী (বুড়ি)-কে দিয়ে ফেঁটা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসব আদব-আপ্যাবন জীবনে ভোলবার নব। আমার বাবা মাকে ও আমাদের ভাইবোনদের বেবলা দিদি ভালবাসতেন আপন জনের মত। বেবলা দিদির এক ছেলে বাহুর ব্যবসায় করতেন। তাঁর মেয়ে মৈত্রেয়ীর বিয়ে হয়েছে দীনু ব্যানার্জীর সঙ্গে। বিবাজবাবু, বেবলা দিদি ও বাহুরা এখন ইহজগতে নেই কিন্তু বেবলা দিদির স্মৃতির সৌভাগ্য আজও আমার চিত্তে ভবে রয়েছে। মৈত্রেয়ী (বুড়ি) এখন পন্ডিচেবীতে শ্রীঅবিনন্দ আশ্রমে বাস করছেন।



রমানন্দের পুত্র পশ্চিমের বাড়ির রতনকুমার দশের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন গোপীমোহন। ইনি হলেন আমার পিতৃমহা। আমার পিতা রামালচন্দ্র গোপীমোহনের একমাত্র ছেলে বিনি গোপীমোহনের মৃত্যুবলে ও তার পর বহুদিন বেচেছিলেন। এঁদের কথা পরে একটু খুঁটিয়ে বলার প্রয়োজন হবে। আপাতত এইখানে এই বলেছি যে খেচৎ হলে যে আমার পিতামহ গোপীমোহনের পেশা ছিল মুসলমানী। তিনি একসময়ে স্বর্গমানের মহারাজাধিরাজের কর্মদারী সেরেস্‌তায় সামান্য মুসলমানী চাকরি করতেন। পরে চক্ষু অন্ধ হয়ে যাওয়ার তিনি কাজকর্ম ছেড়ে তেলিবাগেই বাস করে সেইখানেই দেহবন্ধ্যা করেন। আমার বাবা রামালচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দাদাবাবুর সংগে বি.এ. পাশ করে তাঁর জ্যেষ্ঠত্ব ভাই ভুবনমোহনের আর্টিকেল ক্লাক হয়ে এটর্নিগিরি পড়তে তাঁর অফিসেই বের হতেন। ভুবনমোহন দেউলিয়া হওয়ার বখান তাঁর অফিস উঠে গেল তখন বাবাও এটর্নি পড়া ছেড়ে দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি নেন এবং সেই চাকরিতে উন্নতি করে লাইসেন্স অফিসার হয়ে অবসরগ্রহণ করেন। আমরা এখন তিন ভাই ও তিন বোন। আমি বি.এ. পাশ করে দাদাবাবুর অনুকম্পায় বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় পাশ করে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টেই প্র্যাকটিস আরম্ভ করি। বহু বৎসর প্র্যাকটিস করার পর আমি কলকাতায় জজ হই এবং পরে এক বছর পাঞ্জাবের প্রধান বিচারপতির কাজ করে সুপ্রিম কোর্টের জজ হই। সেখানে চার বছর ভারতের প্রধান বিচারপতির কাজ করে ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে অবসর নিয়ে ছয় বছর স্বাধীনভাবে বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে কাজ করে এখন অবসর-জীবন বাপন করছি কলম্পুতে এবং এই ক্ষুতিচয়ন করছি। আমার দুটি ছেলে ও একটি কন্যা। বড় ছেলে সুব্রজ আমাদের বায়ুসেনায় গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও চীফ স্টেট পাইলট বলে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। এখন বায়ুসেনা তাকে ব্যাংগালোরে যেখানে জেট প্লেন সব তৈরি হচ্ছে সেখানে চীফ স্টেট পাইলটরূপে কাজ কবতে পাঠিয়েছে। ছোট ছেলে সুহসরজন বি.এ. পাশ করে বিলেতে গিয়েছিল ব্যারিস্টারী পড়তে এবং সেইখানে পাঠ্যকম্পাতেই বিষ্যাত এম্বু ইউল কোম্পানীতে কাজ পেয়ে লন্ডনে তাদের হেড অফিসে এক বছর শিক্ষানবিশী করে এখন তাদের কলকাতায় অফিসে একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভরূপে কাজ করে-

ছেন। সম্প্রতি মোটর দুর্ঘটনায় তিনি ও তাঁর বড় মেয়েটি একযোগেই মারা গেছেন। আমার একমাত্র মেয়ে অঞ্জনা (বাজল)-এর সংগে বিয়ে হয়েছে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার সেন, মশায়ের কনিষ্ঠ পুত্র অশোককুমার সেনের। অশোক ব্যারিস্টারী ব্যবসারে বিশেষ সুনাম অর্জন করে রাজনীতি-ক্ষেত্রে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষের লোকসভার সভ্য হয়ে বছর ন'য়েক আইনমন্ত্রী থেকে এখন আবার ফিরে এসেছেন ব্যারিস্টারী ব্যবসারে। আমার কন্যা অঞ্জনা চার ছেলে-মেয়ের মা হলেও কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. এবং ল পরীক্ষার কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছেন নিজের অধ্যবসায় গুণে। আমার মেজ ভাই নিশীথরজন (নসু) আই.এস.সি. পাশ করে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়-এ বছর দু'য়েক পড়ে ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে এসে কলকাতা কর্পোরেশনে স্ট্রুডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ঢুকে ক্রমান্বয়ে এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার, রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার পদে ওঠেন। সেখানে আপন কৃতিত্ব ও আপন সততা ও চরিত্রবলে উন্নতিলাভ করে এক-জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হয়েছিলেন এবং তার পরই তিনি কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে চলে যান। সেখানে তিনি চীফ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে খুব সম্প্রানের সঙ্গে কাজ করে-ছিলেন। তাঁর কাজের মেয়াদ তাঁরা তিন তিনবার বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং বখান ট্রাস্টীরা তাকে চতুর্থ বছরের জন্যে থাকতে অনুমোদন করেন তখন তিনি তাঁদের সে অনুমোদন স্বাক্ষরের জন্যে দ্বন্ধ্যা করতে না পেরে কাজে ইস্তফা দেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশ্বভারতীর অবৈতনিক চীফ ইঞ্জিনীয়াররূপে গুরুদক্ষিণা দিচ্ছেন। একই সঙ্গে তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ইঞ্জিনীয়ারিং পরামর্শদাতা। তিনি বিয়ে করেছেন আমার সহধর্মিণীর সহোদরা বোন রেণুকাকে। তাঁদের একটি-মাত্র কন্যা। আমার ছোট ভাই প্রদোষ-রজন (বুধা) কলকাতায় বি.এ. পাশ করে বছরখানেক ল' কলেজে পড়ে বিলেতে যান ব্যারিস্টারী পড়তে। সেখান থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে ফিরে এসে তিনি কলকাতাতেই প্র্যাকটিস শুরু করেন। মাঝে তিনি ছোট আদালতে বার তিনেক অস্থায়ী জজীয়তি করে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে তিনি কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনালের এ্যাসেসর হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে দুই টার্ম অধীনে চার বছর (১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত) কাজ করে এখন আবার ব্যারিস্টারী করছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে প্রসাদরজন শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে

আর্কিটেকচার কোর্সের তৃতীয় বার্ষিক প্রোগ্রামে ভালভাবেই পড়াশুনা করছেন। আমার বড় বোন সুমতি (খুকী)-র জন্ম হয় দাদাবাড়ি হাসান গ্রামে ১৮৯৬ সালে। তিনি আমার চেয়ে প্রায় দু'বছরের ছোট। তাঁর বিয়ে হয়েছিল মধ্যপাড় গ্রামের 'নামাচরণ গুপ্তের মধ্যম পুত্র উপেন্দ্রমোহন গুপ্তের সঙ্গে। বিয়ের সময় খুকীর বয়স ছিল নয় থেকে দশের মধ্যে। তিনি এম.বি. ডাক্তারী পাশ করে বিহার সরকারের এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের কাজে ঢাকেন। তিনি বিলেত থেকে এম.আর.সি.পি. ও ডি.টি.এম. পাশ করে পাটনা মেডিক্যাল কলেজের বীজাণু বিষয়ক অধ্যাপক (প্রফেসর) হন। এক্ষেত্রে অবসর নিয়ে তিনি পাটনাতেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন প্রচুর সুনামের সঙ্গে। এঁদের তিনটি ছেলেই সুযোগ্য। বড়টি অরুণ, এক.আর.সি.এস. পাশ করে হাড়ের সার্জেন ও কানপুর মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর। দ্বিতীয় ছেলে অশোক আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করছেন। ছোট ছেলে অলক পাটনায় এবং পরে বিলেতে ডাক্তারীতে ডিগ্রি এবং পরে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি নিয়ে পাটনাতেই ডাক্তারী করছেন। আমার মেজ বোন সুমতী (গুগু)-র জন্ম হয় ১৯০০ খৃস্টাব্দে কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুরের টাঙ্গাবাড়ি গ্রামের 'ভুবনমোহন গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র গুপ্তের। হেমবাবু এম.এ. পাশ করে সরকারী লোকাল অডিটর হয়ে কাজকর্ম করে অবসর নিয়ে পুণ্য তাঁদের বড় কন্যার কাছেই ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে ও চরিত্রের বিশুদ্ধতায় ও মাঝের হেমবাবু আত্মীয়-অন্যায়ী সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। তিনি এই কমান হল পুণ্যতেই পরলোকগমন করে-ছেন। তাঁদের একমাত্র ছেলে সিন্ধার্ঘ বিলেতে কলার খনিতে সহ-ম্যানেজারী করছেন। আমার ছোট বোন অন্নপূর্ণা (বুড়ি)-র জন্ম হয় ১৯১২ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। তাঁর বিয়ে হয় চট্টগ্রামের পড়ইকোড়া গ্রামের 'যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ সেনগুপ্তের সঙ্গে। অবিনাশ রিভার সার্ভে জানতেন এবং কলকাতা পোর্ট কমিশনে বেশ কয়েক বছর উচ্চ পদে কাজ করে সেই কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজেই ব্যবসায় করতেন। অকালেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল এবং বুড়ির অকালান্ত সেবা সত্ত্বেও তিনি ১৯৫৮ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতাতেই পরলোকগমন করেন। তাঁদের একমাত্র ছেলে দেবব্রত (সোতর) বি.এ. এল.এল.বি. পাশ

করে বিখ্যাত বিড়লা প্রতিষ্ঠান কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যান্ড কটন মিলস কোম্পানীতে বেশ উচ্চ পদস্থ কর্মচারী হয়ে স্বভাবগুণে সকলের শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হয়েছেন।

৯

পশ্চিমের বাড়ির রতনকৃষ্ণ দাশের তৃতীয় পুত্র ছিলেন কেশোরাম। তিনি ওকালতী পাশ করে ম্যুন্সেফী-চার্কির নিয়োজিতেন এবং ক্ষমতাপ্রাপ্তে কার্যে ক্রিয়াজীবন করে তিনি সাবজজ হয়েছিলেন। সে আমলে সাবজজ হওয়াটা সহজ ব্যাপার ছিল না এবং তখনকার দিনে সাবজজদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল বিস্তর। কৃতিত্বের সঙ্গে সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করে তিনি অবসর নেবার পরে পরলোকগমন করেন। কার্যব্যাপশে তাকে নানা জেলায় ঘুরতে হয়েছিল। তারই বাসায় থেকে আমার পিতা ঢাকায় ও পরে হুগলীতে লেখাপড়া করতেন। এই ঠাকুরদাকে আমার মনে নেই কিন্তু এর সহধর্মিণীকে আমার বেশ স্মরণ আছে। আমাদের এই ঠাকুমা ছিলেন বেশ করুণা এবং মস্ত সংসারের উপযুক্ত গৃহিণীই তিনি ছিলেন। যখন এর পুত্রবধূরা সংসারের ভার নিতে সমর্থ হলেন তখন এই ঠাকুমা মন দিয়েছিলেন নানা টোটকা শুধু তৈরি করে বিলিয়ে দেবার কাজে। তিনিই জিনিসের কথা আমার এখনো মনে আছে। প্রথমটি ছিল গাধার দুধের চাল। গাধার দুধের মধ্যে চালগুড়ি ভিজিয়ে রাখবার পর যখন চালগুড়ি সব দুধটা শুধু নিত তখন সেই চালগুড়িকে ঠাকুমা আমাদের কলকাতায় ও মক্কেলে যেখানে মত জ্ঞাতগোষ্ঠী আছে সবাইয়ের বাড়িতে কোটায় ভরে পাঠিয়ে দিতেন। এই চাল নাকি বসন্ত রোগের প্রকৃষ্ট নিরাময়ক। ঠাকুমার অনুশাসনে শীত শেষে গরম পড়তে আরম্ভ করলেই নিভা সকালে আমাদের তিন-চারটি চাল মুখে দিয়ে জল খেতে হত। অন্যথা করবার ঘো ছিল না। আর একটি জিনিস যা ঠাকুমা পাঠাতেন সেটা হল বিশুদ্ধ কবিরাজী মতে তৈরি পাকের বড়ি। বাড়িতে ভূরিভোজন হলেই রাতে শোবার আগে আস্ত কি অর্ধেক বড়ি সেবন ছিল আমাদের অবশ্য কর্তব্য। খেতেই হত। তবে খেয়ে দেখেছি মন্দ নয়—বেশ নোনা ও কষা আস্বাদ। আর আস্ত বড় বড় টিনে ভরা দাঁতের মাজন প্রায় সারা বছরের মত। খুব মিষ্টি কত বাটা বাড়ির সঙ্গে পিপারমেন্ট ও সুপারী-পোড়া ছাই এবং আরো কত কি মাল-মসলা দেওয়া, দাঁত মাজবার পাউডার। দাঁতে লাগাতেই বেশ সির সির করে উঠত

পিপারমেন্টের কাঁচ। মৃন্মা খুব যত্নের সঙ্গে এই সব জিনিস তৈরি করতেন এবং বিলিয়ে দিতেন। এই ঠাকুমা মারা যান কামরাঙাতলার আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের বাড়িতে। মনে আছে তার মৃতদেহ বহনের জন্যে আমিও কাঁধ দিয়েছিলাম। এই বোধ হয় আমার প্রথম শব পরিবহন।

কেশোরামের ছিল চার ছেলে—তড়িৎ, ললিত, অবনী ও সুব্রহ্মণ্য। কলকাতায় এরা সব ভাই কণ্ঠ একসঙ্গে থাকতেন প্রথমে জেলেপাড়ায়। সে রাস্তা-টার এখন নাম হয়েছে গিরিশ মধ্যাজী রোড। সে বাড়িটা ছিল তিন মহলা। রাস্তার উপরেই প্রথম মহলার থাকতেন জ্যেষ্ঠাশায় তড়িৎমোহন। একটা উঠান পেরিয়ে ছিল দ্বিতীয় মহলা—সেখানে বোধ হয় থাকতেন ললিত জ্যেষ্ঠাশায়ের ছেলেমেয়েরা। তারপর আর একটা উঠান পেরিয়ে ছিল তৃতীয় মহলা। সেখানে থাকতেন অবনী ও সুব্রহ্মণ্য। সামনের বড় রাস্তার ওপারেই ছিল একটা মস্ত বড় পুকুর। তার পাড়ে উঁচু বাঁশের মাচায় বসন্ত জেলেদের বড় বড় মাছ ধরার জাল বোঝে শকোবার জন্যে। অনেকদিন

এখানে থাকার পর এরা উঠে যান ভবানী-পুত্রে জগদ্বাবুর বাজারের উত্তরে কামরাঙা-তলার আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে অনেকখানি জমিওয়ালা ভাড়াটে বাড়িতে। আমি আর তড়িৎ জ্যেষ্ঠাশায়ের মেজ ছেলে সুবোধ ঘুড়ি উড়িয়েছি বিস্তর এ বাড়িতে। এ বাড়িতেই মারা যান এ বাড়ির ঠাকুমা।

কেশোরামের বড় ছেলে তড়িৎ-মোহন ওকালতী পাশ করে অল্প কিছু দিন প্র্যাকটিস করেছিলেন। খুব মৃদু-চোরা মানুষ ছিলেন বলে সে জ্যেষ্ঠাশায় হাইকোর্টের স্ট্রান্সেটোরের চাকরি নেন। তার তিন ছেলে—সুধীর, সুবোধ ও কৃষ্ণ। সুধীরদাদা কি একটা আফিসে স্টেনোগ্রাফারের কাজ করতেন। খুব অল্প বয়সেই মারা যান একমাত্র ছেলে অনিলকে রেখে। সুবোধ ছিলেন আমারই বয়সী। ষাড়গ্রামে অনেকটা জমি কিনে তিনি দেখানে চাষাবাদ করতেন। সুবোধের সঙ্গে আমার খুবই সদ্ভাব ছিল। ছোট ছেলে কৃষ্ণরজন যাকে কেশা বলা হত তিনি হাইকোর্টের আফিসে কাজ করতেন। ইনিও অল্প বয়সেই মারা যান। এঁদের

জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভিনব ইংরাজি গ্রন্থ।

৪০ বৎসরের গবেষণালব্ধ আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা অভিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর রাজ-জ্যোতিষী ডঃ হরিশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের সুবৃহৎ গ্রন্থ নানারূপে সম্বিজত হইয়া বাহির হইল—

এ গাইড টু এস্ট্রোলজি

বাঙ্গালী গ্রন্থকাবের ইহাই বর্তমানে একমাত্র সরল ইংরাজিতে লিখিত সকল তথ্যে পরিপূর্ণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই।

এই পুস্তকের তথ্যসমূহে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যাইবে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপূর্ণ বহু বিচিত্র জীবনধারা শাশিচক্র সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ইহাতে ফলিত ও গণিত জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসা-জ্যোতিষ এবং বিবিধ নশ, অন্তর-দশা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে পরিবেশিত হওয়ার সাধারণ ব্যক্তিরাও সহজেই জ্যোতিষ বিদ্যায় জ্ঞান-অর্জন করিয়া কোন্ঠি নির্মাণ ও বিচার করিতে পারিবেন।

মূল্য—১১ টাকা মাত্র।

পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত হস্তরেখা বিচারের দুইটি গ্রন্থ পঠিকার সম্পাদকবৃন্দ ও পাঠকগণ দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত।

১। জ্যোতিষ অব প্যাম্পট্রী (ইংরাজি)—দেশে ও বিদেশে বহু বিকৃত ও সর্বজন সমাদৃত। মূল্য—৭ টাকা

২। সামুদ্রিক রত্ন (বাংলা)—পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ। মূল্য ৬

প্রাপ্তিস্থানঃ

হাউস অব এস্ট্রোলজি, ৪৫এ, এস, পি মধ্যাজী রোড, কলিকাতা—২৬

(হাজরা পার্কের পূর্বে) ফোন—৪৭-৪৬৯০

এবং পরিবেশকঃ

বাক-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১

মা এ বাড়ির বড় জ্যেষ্ঠমাকে বেশ মনে আছে। তিনি খুব সহস্রশীলা মহিলা ছিলেন। মাকে খুব পছন্দ করতেন। কেরোরেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র ললিতমোহন ওকালতী পাশ করে বাপে-রই মত মনোহরী চাকরিতে ঢুকে সাবজজ হয়ে অবসর নেন। এর সহস্রশীলা আমাদের নেজ জ্যেষ্ঠমা ছিলেন তখনকার দিনের আয়কর কমিশনার রমেশচন্দ্র সেনের ভগিনী। এই জ্যেষ্ঠমা বাবাকে খুব স্নেহ ও যত্ন করতেন বাবা যখন তাঁদের বাড়ি থাকতেন হুগলীতে সেই থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

ললিত জ্যেষ্ঠমার তিন ছেলের মধ্যে বড় ছিলেন নলিনীরঞ্জন। তিনি মায়ের বাড়ির প্রফুল্লরঞ্জন এবং আমার ছোট পিনতুত ভাই টোনাদাদার সমবয়সী ছিলেন। নলিনীদাদার বিষের কথা আমার অল্প অল্প মনে আছে। উত্তর-পূর্ব কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রীট না কোথায় যেন বিয়ে হয়েছিল তা ঠিক মনে নেই। তবে বিয়ের পরের দিন আমরা যে তাঁর বউকে এনেছিলাম লোরের সাকুলার রোডের জোড়া গির্জার সামনে দিয়ে তা বেশ মনে আছে। আমাদের এই বৌঠানের গায়ে রঙ বসতে গেলে একরকম শ্যাম-বর্ণই ছিল কিন্তু ডারি সুন্দর একটি হাসি তাঁর মুখে লেগেই থাকত এবং তাইতে তাঁর মুখে একটি অপূর্ণ লাভ্য উছলে উঠত। পরে যখন ওয়া উঠে সাকুলার অঞ্চলে এখন যেখানে সাদান এডেনউ হয়েছ সেখানে নিজ বাসায় গেলেন তখন সময় উপলে মাকে মাঝে গিয়ে নেজ জ্যেষ্ঠমায়, মেজ জ্যেষ্ঠমা, এই বৌঠান ও অন্য ভাই-বোনের দেখে আসতাম। খুব গম্ভীর মুখ করে বৌঠানকে বলতাম—‘দাদাকে বিয়ে দিয়ে তোমার নিয়ে এলাম ত।’ মর্মার্থ হচ্ছে খব সেই সুবাদে আমাকে একটা বেশি খাতিব করতে হবে। বৌঠান হাসিমুখে বলতেন—‘ইস’। সেই হাসিটুকুই হত বেশি খাতির। নলিনী কোন একটা গভর্নমেন্ট অফিসে কাজ করতেন জুলে গেছি। নিত্য নিয়মিতভাবে লেকের রাস্তায় সকালবেলা হেঁটে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে সেখানেও দেখা হত। নলিনী-দার দুটি ছেলের কেউই আইনের লাইনে আসেন নি। তাঁরা বোধ হয় বিজ্ঞানের দিকে ঘেঁষেছেন।

ললিত জ্যেষ্ঠমার দ্বিতীয় ছেলের নাম আশুতোষ। তিনি এতগুলি ‘রঞ্জন’-এর বাহু ভেদ করে কি করে যে শূন্য আশুতোষ হয়ে গেলেন জানি নে। আশু ছেলে-বয়েস থেকেই লেখাপড়ায় ভাল ছেলে ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে

পড়তেন। লেখাপড়া শেষ করে তিনি ওকালতি না করে পৈতৃক কাজেই ঢুকলেন অর্থাৎ মনোহর হইলেন। উপর্যুপরি তিন পুরুষের হাকিম। আশু ক্রমে কাজে উন্নতি করে পাকা ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়ে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিচার-বুদ্ধি ও ন্যায়-নিষ্ঠা দেখে সরকার তাঁকে অবসরগ্রহণ করবার সময় থেকেই নানা লেবার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বা মেম্বর নিযুক্ত করেছেন। এই কাজে আশু খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর দু-একটি এ্যাওয়ার্ড এখনো দাগগুপ্ত এ্যাওয়ার্ড বলে খ্যাত ও প্রশংসিত। আশুর তিনটি কন্যা কিন্তু ছেলে নেই।

ললিত জ্যেষ্ঠমার ছোট ছেলে রবি-রঞ্জনও হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট এবং এখন বেশ পসার জমিয়ে বসেছেন। তাঁর বড় ছেলে অসিতরঞ্জনও এ্যাডভোকেট। শুনছি তিনিও নাকি মনোহরী নবেন। নিলে হবেন তিনপুরুষের হাকিম। অন্য দুটি এখনো কলেজে পড়ছে।

কেরোরেশ্বরের তৃতীয় পুত্র অবনী-মোহন অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি ভাবানীপুরে একটা বাংলা স্কুলে মাস্টারী করতেন। তাঁর একটিমাত্র ছেলে—সুনীল রেলের কাজ করেন। অনেকদিন গোমো স্টেশনে এ্যাসিস্ট্যান্ট-স্টেশন মাস্টার ছিলেন। এখন কোথায় আছেন খবর জানি না। তাঁর মা, আমাদের সেজ খড়িমা, খুব স্নেহশীলা মহিলা ছিলেন।

কেরোরেশ্বরের কনিষ্ঠপুত্র সুব্রহ্ম-মোহন কোন একটা সরকারী অফিসে কাজ করতেন। খুব গম্ভীরধরণের মানুষ ছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন আমার মায়ের আপন জ্যেষ্ঠতুত বোন এবং আমা-দের কুমদিনী মাসীমার একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী গোড়ায় ছিলেন আমাদের দাদি হয়ে গেলেন আমাদের ছোট খড়িমা।

সুব্রহ্মাকার তিনটি ছেলেই পড়াশুনায় খুব ভাল হয়েছিলেন। বড়টিকে আমরা প্রথমে প্রবোধ বলেই ডাকতাম—বোধ হয় সুবোধের ভাই বলেই, কিন্তু পরে তাঁর পোষাকী নাম হয়েছিল সুকুমাররঞ্জন। সুকুমার বরাবরই ছিলেন ক্লাসের ভাল ছেলে। বি-এ পরীক্ষায় বোধ হয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে অশ্রুতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে প্রথমস্থান পেয়েছিলেন। খুব পড়তেন। সুবোধ আর আমি যখন কামরাঙাতলার বাড়িতে ঘুড়ি ওড়বার হোগাড় করতাম ঠিক সেই সময়ে সুব্র-

কাকা অফিস থেকে ফিরে কাপড় ছেড়ে একটু জলযোগ সেরে সুকুমারকে নিয়ে বসতেন পড়াতে। ব্যাচারা সুকুমার আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতেন। প্রথমটা চাইতেন একটা হাপাস চোখে কিন্তু পরে অভ্যাসবশে তাঁর খেলার ইচ্ছে বোধ হয় চলে গিয়েছিল। পড়ার ঠেলায় তাঁর চোখে উঠল চশমা এবং ক্রমে চশমার কাঁচ মোটা হয়েই চলল। আমি বিলেত চলে যাবার পর সুকুমার দাদা-বাবু (চিন্তরঞ্জন)-এর বেশ ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। দাদাবাবু তখন কল-কাতার মেম্বর এবং স্বরাজ পার্টির কার্ডিন্সলারদের মধ্যে সুকুমারও ছিলেন একজন কিছুদিন পর্যন্ত। পরে তিনি দিল্লীতে কোন একটা কলেজে ভাল চাকরি পেয়ে সেখানেই অধ্যাপনা কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অল্প বয়সেই সুকুমার মারা যান। সুকুমারের দুটি ছেলেই খুব ভাল ছেলে হয়ে খ্যাতিমান হয়েছেন। বড়টি—সুহাসরঞ্জন—আই.ই.এস. পরীক্ষায় পাশ করে নানা জায়গায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এখন বোধ হয় বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অর্থসচিব হয়েছেন। ছোট ছেলে মনোজও ভাল পাশ করে উচ্চ সরকারী কাজ করছেন। সুব্রহ্মাকার মেজ ছেলে নীহাররঞ্জন, তাঁকে আমরা নীরু বলেই ডাকি। তিনি একেবারে সুব্র-কাকারই মত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বাবা যখন কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স অফিসার তখনই নীরু কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্সপেক্টর হয়ে কাজে ঢোকে। এখন তিনি অবসর নিয়ে নিজের আলাদা বাড়িতেই বাস করছেন। সুব্রহ্মাকার ছোট ছেলে সরোজরঞ্জনও লেখাপড়ায় ভাল। তিনি ওকালতীর দিকে না গিয়ে একটা স্কুলের হেডমাস্টারী করছেন। তিনি বিয়ে করেন নি।

পশ্চিমের বাড়ির রতনকঙ্কের ছোট ছেলে বৈকুণ্ঠেশ্বর ছিলেন আমার ছোট ঠাকুর্দা। তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে ছোট ঠাকুর্দাকে দেখেছি—ছোট-খাট ফরসা মানুষটি ছিলেন তিনি। ছোট ঠাকুর্দা আমার মাকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি অপূর্বকই মারা গেছেন। এই হল সংক্ষেপে পশ্চিমের বাড়ির কথা।

নব মন্ত্রিসভা প্রেসীপেট

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ নয়া খাদ্যনীতি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি সূর্য খাদ্যের ঘাটতি মেটানোর জন্যে সচেতন হবেন। কেবল শস্যজাতীয় খাদ্য নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন খাদ্য যেমন মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের কথা তিনি চিন্তা করছেন। একদা দুধ আর মধুর দেশ বলে খ্যাত বাংলাদেশ আজ দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জ্বেরোতে পারাকে যথেষ্ট ভাগ্য মনে করে। এখানে প্রোটিন খাদ্যের সরবরাহ যা উৎপাদনের কথা শুনেলে আমরা সহজে বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। বাই হোক এই প্রোটিন খাদ্যের দপ্তর কিন্তু ডাঃ ঘোষের হাতে নেই। এ দপ্তরের ভার পড়েছে তরুণ দেশনেতা কাশীকান্ত মৈত্রের হাতে। কাশীকান্তবাবুর দৃষ্টি-ভঙ্গি শুধুমাত্র প্রগতিশীল নয়, বরং সংস্কারমূলক ও পুষ্টিবোধের দ্বারা চালিত নয়ও বটে। অতীতে বিধানসভায় তাঁকে একলাই কংগ্রেস সরকারের অতিরঞ্জিত খাদ্য ঘাটতির প্রতিবাদ করতে ও দেশের খাদ্যাভাবকে কৃত্রিম বলে ঘোষণা করার দৃষ্টান্ত দেখতে দেখছি। স্বাভাবিকভাবে আমরা সকল নেতৃবৃন্দের চেয়ে একটু আলাদা কিছু তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি।

আমি বাঙালীর সর্বাধিক প্রিয় খাদ্য মাছ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে চাই। এই মাছই বাঙালী খাদ্যের মূল প্রোটিন সরবরাহ করে। আজও উত্তর ভাষাতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধারণা যে বাঙালী মেথার উৎকর্ষতার একমাত্র কারণ এই মৎস্যহার। কিন্তু এই মাছ আজ বাঙালীর কাছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। যা পাওয়া যায় তা আবার সাধারণের ক্রয়ক্ষমতাব্যবহির্ভূত। ফলে বাঙালী মাছ খাওয়ার অভ্যাস পরিবর্তন করে নিরামিষাশী হতে হচ্ছে। অন্যদিকে আবাব নিরামিষাশী অবাঙালী সম্প্রদায় আবাব মাছ খাওয়ার অভ্যাস হতে পড়েছে। অর্থাৎ মাছের চাহিদা বেড়েছে কিন্তু সরবরাহের পরিমাণ তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে। পশ্চিম বাংলায় চালের ঘাটতি এক ত্রিনিক রোগে পরিণত হয়েছে এবং মাছেরও সেই দশা। কিন্তু চালের উৎপাদন বাড়বার জন্যে হাজার বকমের প্রচেষ্টা হয়েছে ও চলেছে কিন্তু মাছের উৎপাদনের জন্যে কিছুই করা হয় নি। তিনটে পঞ্চবার্ষিক

যোজনা চলে গেল কিন্তু মাছের উৎপাদনে সরকার কোন সক্রিয় ভূমিকা তো নেয় নি বরং উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জেনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। যখন মাছের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায় ও কাগজে-কলমে একটু হৈ-চৈ আরম্ভ হয় তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যদপ্তর তাড়াতাড়ি কোমরের বেল্টটা এঁটে একটু হাঁক-ডাক দিয়ে তাদের তৎপরতা দেখায়। তারপর আবার নাসিকা-ছিদ্রে সরিষার তেল প্রদান। কিন্তু গত বছর পাঁচেক তাদের একটু তৎপরতা দেখা যায়, যখন থেকে নানা রকমের ক্রেতা-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু সরকার সম্বটঘাত না হয়ে সম্বট-নির্মাতা হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গভীর সমুদ্র মৎস্য ধরার পরিকল্পনা নিয়ে ৮০ লক্ষাধিক টাকা খেসারৎ দিয়ে ঘুরে উঠেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কল্যাণী ও জোনপুরে এই রকম দুটো-একটা জায়গায় মাছের

উৎপাদনে নেমে দপ্তরের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আন্দোলক বাস্তবানুগ প্রয়োগ কোথাও ছিল না।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে দেশের সমস্যা যত গভীর হয় তখন প্রশাসকবৃন্দের ততই উৎসব মনোবৃত্তি প্রখর হয়ে ওঠে। তখন তারা দপ্তরের বরাদ্দ বাড়তে সচেতন হয় এবং বরাদ্দ অর্থে জুয়া খেলাও এত বাজী ধরে নানা কষ্টকল্পিত স্কীম রচনা করে। সমস্যা সম্বটময় হলে জনসাধারণের প্রেস ও বিধানসভায় আক্রমণ বটে তাদের নিজ নিজ পন্থানুসারে। তখন বিভাগীয় দপ্তরের এই কষ্টকল্পিত স্কীমগুলোর অনুমোদন সহজসাধ্য হয়। আয় এই অনুমোদন পেলে গোবী সেনের টাকা, অপব্যয়ের খাতে গভীর খাদ খনন করে চলতে থাকে। মৎস্যদপ্তরের ইতিহাস এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উপরন্তু সার্ভে না করে গভীর সমুদ্রে মাছের প্রচেষ্টার সরকার ইতিহাস নাই না দিলাম। কিন্তু এখানে



নতুন দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধবস্ত্র

উষা ট্যালিকম পাউডার

বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড সহযোগে গন্ধ
ঘামাচি স্থায়ীভাবে দূর করে

উষার দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধ আপনাকে
সাব্যদিন নিম্ন প্রকৃষ্ট ও স্বাভাবিক
বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড-থাকার ইহা
অতি-সুগন্ধ-সামান্য-কবিতা আপনাকে
অস্বস্তিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করে।
বিশুদ্ধ ও বরফ সুলভ পণ্য
সমান-উপযোগী।

**বঙ্গল
কোমিক্যাল**

কলিকাতা
বোম্বাই • কানপুর



ক্ষান্ত হলে কথা ছিল না। আবার নতুন উদ্যমে নতুন নতুন খাদ তৈরি করা হচ্ছে। এমনি আর একটি স্বামী তৈরি হয়েছে 'দক্ষিণ লবণহুদে মৎস্য উৎপাদন' বার নাম। পাছে অকৃতকার্য হলে সরাসরি বদনামের ভাগী হতে হয় তাই ফিশ-কর্পোরেশন গঠন করে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই কর্পোরেশন গঠন, কি ভারত সরকারের বা রাজ্য সরকারের আর এক অক্ষমতার নিদর্শন। সরকারী-প্রশাসন পৃথাক অতি জটিল ও জঘন্য হওয়ায় কোন রাজ-কর্ম সঠিকভাবে সঠিক সময়ে করা যায় না এই অভিযোগ মনে নিয়ে তারা কোম্পানী পরিচালন পদ্ধতিকে নির্ভুল এই কথা প্রচার করছে ও আপনাদের অক্ষমতাকে আড়াল করতে চাইছে। এটা কি তাদের প্রতি অনাস্থা পরিচায়ক নয়? অথচ এই কর্পোরেশন থাকবে সরকারের হাতে এবং এর পরিচালনার ভার থাকবে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের অফিসারদের হাতে। সরকারী দপ্তরখানা ছেড়ে কোম্পানীসুলভ প্রতিষ্ঠানে বসলেই রাতারাতি কর্মদক্ষতা ও দক্ষতা বেড়ে যায় কেমন করে? তা যদি হোত তা হলে সারা দেশের সরকারী ছাপমারা কোম্পানী পরিচালন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানগুলোয় এই রকম কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হোত না। অবশ্য জাতীয়-করণ প্রচেষ্টার জন্য কোটি কোটি টাকা নষ্টকে জাতীয় ক্ষতি মনে না করলে কোন কথা ওঠে না। এই কোম্পানীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় ক্ষতির অঙ্ক যত সংখ্যাই বৃদ্ধি করুক এবং তা যতই জাতীয় ক্ষতি হোক তবুও তা আত্মরক্ষা করছে নিজস্ব সমাজতন্ত্রের নামে। আর সমাজতন্ত্রের ভেতরকার বজায় রাখতে পারলে সকল দুর্ভিক্ষ ও সকল অক্ষমতা যে বেহাই পেয়ে যাবে এ গল্প তথ্য ধবতে পেরেছে উচ্চ প্রশাসকমণ্ডলী। তাই সরকারী টাকার পরিচয় হয়েছে গোঁরা সৈন আর অপচয়ে নতুন নামকরণ হয়েছে সমাজতন্ত্র। তাই সমালোচনা করতে গেলে কপালে পুঞ্জ-পতির দালাল এ কলঙ্ক নিতে হবে। স্বতন্ত্র সরকারের মৎস্যদপ্তরের ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় যদি সরকারী প্রশাসক-দপ্তরের এই ভেতরকার না ধরতে পারেন এবং সে সম্বন্ধে যথোচিত সাবধান না হন তা হলে তাকে তাঁর সকল আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও অউমতার গ্রানি নিয়ে ফিরতে হবে। মাছের সমস্যা সমাধানে তিনি যদি আন্তরিক প্রয়াসী হন তাহলে সর্বপ্রথমেই এই বিভাগীয় ষড়-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হবে। এই পরিকল্পনায় কোন সচল সক্ষম চিন্তাধারা নেই। গত কয়েকটি পরিকল্পনায় যে যে বিষয়ে খরচা করা হয়েছিল সেই সেই বিষয়ে (Head) কেবলমাত্র টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি

করা হয়েছে ও বিবিধ খাতে একটা মোটা অঙ্ক রাখা হয়েছে। এই বিবিধ খাতে অঙ্ক দিয়ে বিচিত্র উদ্ভট পরিকল্পনা রচনা করার সদর দরজা খোলা রাখা হয়েছে। লেখকের এই খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করার সময়ে কিছুক্ষণ উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং শুনলে মন্ত্রীমহোদয় বিস্মিত হবেন যে একাদিনের মধ্যে ষড়-পরি-কল্পনার খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং নতুন কিছু চিন্তাধারার কোন অবকাশ থাকতে পারে কি? গতানুগতিক শাসনব্যবস্থা ও গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলিত এই পরিকল্পনায় দেশের কিছু করা যাবে না একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গে মাছে ঘাটতি ও পূর্ববঙ্গের মাছ আমদানী বন্ধ হওয়ায় সেই ঘাটতি তীব্র সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। সমাধানের একমাত্র পথ এই ঘাটতি পূরণ করা তা সে বাইরে থেকে সরবরাহ বাড়িয়ে হোক বা রাজ্যের মধ্যে উৎপাদন করে হোক। বাইরে থেকে সরবরাহ বাড়িয়ে তা করা যাবে না এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ওড়িশা, বিহার, উত্তর প্রদেশ এমন কি রাজস্থান থেকে মাছ আনিতেও সমাধান হবে না। বরং নিরামিষাণী অঞ্চলে আম্র আহারকারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় সেখান থেকে আমদানী ক্রমশ হ্রাস পাবার সম্ভাবনা। তাহলে একমাত্র সমাধান লুপ্তি আছে যে রাজ্যের মধ্যে মাছে উৎপাদন সর্বাধিক পরিমাণে বাড়ানোর উপর। এইবার প্রশ্ন আসে এই উৎপাদন কে করবে? সরকার না সম-বায় না ব্যক্তিগত উদ্যম? সরকারী আমলা-শক্তি নির্ভরশীল প্রচেষ্টায় মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে সারা দেশের ঘাটতি মেটানো সম্ভব বলে দেশের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশ্বাস করে না। দেশের সাধাবণ লোকেরও সরকারী প্রচেষ্টার উপর আস্থা নেই। এবং যে কারণে আস্থা নেই সে কাবণগুলো রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয় একথাও সকলে বিশ্বাস করেন। ব্যক্তি-গত উদ্যম ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে অন্তত মাছের বিষয়ে যে রাখতে হবে এ-বিষয়ে কেউ-ই সন্দেহিত হবে না। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা তো এখনও বজায় আছে তবু কেন এত দুঃপ্রাপ্য ও দুর্ভিক্ষ? এই প্রশ্নের মধ্যে সমাধান লুকিয়ে আছে।

বাংলা দেশের মাছের উৎপাদক শ্রেণীর পরিচয় ও তাদের সামর্থ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদক শ্রেণী অবহেলিত ও অব-জ্ঞাত শ্রেণীর মধ্য থেকে আসছে যারা দেশের বৃহত্তম দরিদ্র শ্রেণীর একটা অংশ। এদের মূলধন ও সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নেই এবং মহাজনের দাদনে এরা সারা বছর বাঁধা থাকে। আব দশভাগ উৎপাদক

স্বচ্ছল শ্রেণীভুক্ত হলেও তাদের অবস্থা হালে পানি না পাওয়ার অবস্থা। অর্থ থাকলেও নানা প্রাকৃতিক ও সরকারী বাধা কাটিয়ে উঠতে পাবার অবস্থা নেই। গোটা উৎপাদক শ্রেণীর প্রতি কারোর সহানুভূতি নেই—না সরকারের, না জনসাধারণের। জনসাধারণের সহজলভ্য মাছ না খেতে পাওয়াই তার একমাত্র কারণ। সরকারের সহানুভূতি না থাকার কারণে সরকার বিষয়টির গভীরে কখনও অনুধাবন করার চেষ্টা করে নি বরং আমলা ষড়যন্ত্রের কন-ডাক্তারি বলি হয়েছেন। আমলারা উৎপাদক শ্রেণীর ঘাড় দোষ চালান দিয়ে নিজেদের অক্ষমতাকে ঢেকে এসেছেন। তাই উৎপাদক শ্রেণীর কপালে জুড়েছে অকারণ কালোবাজারি ও মুনাসফিকারীর কলঙ্ক।

মাছের দুটো জাত আছে। মিঠে জলের মাছ ও নোনা জলের মাছ। রুই, কাংলা, মৃগেল মাছই প্রধানত মিঠে মাছ অবশ্য তার সঙ্গে কই, সিঙি, মাগুর, শোল ইত্যাদি বিল মাছকে মিঠে মাছের শ্রেণী-ভুক্ত করা যায়। ভেটকি ভাঙুন, পারসে, টাংরা, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি মাছকে নোনা মাছ বলে থাকি। পোনা মাছের অভাবকেই আমবা মাছের ঘাটতি বলতে বৃদ্ধি বিশেষ করে অতিরিক্ত মূল্যবান হলে তো আর কথাই নেই। পশ্চিমবঙ্গে যে জলকর আছে সেখানে একটা চেষ্টা করলে যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া যায় একথা কিছু প্রাক্তন সরকার জেনেও চেষ্টা করে নি। পূর্বব, ডোবা, বড় পুষ্করিণী ও দীঘি ইত্যাদির পরিমাণ ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার একর। আব বিল, ভেড়ি, বিল, বাঁওড় ইত্যাদির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার একর। কেবলমাত্র বৃন্দ জলাশয়ের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৬৬ হাজার একর। তা ছাড়া নদী, খাল, খাঁড়ি ও সমুদ্রের অফুরন্ত উৎস আছে পশ্চিমবঙ্গে। এই বিপুল পরিমাণ জলাশয় থেকেও পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন হয় মাত্র ৮৬ হাজার টন বা ২০ লক্ষ মণ। একরে দু'মণ মাছও উৎপন্ন হয় না। এত কম উৎপাদনের কারণ কি? টাউন ও কাশি প্রায়নিঃ-কর্মশনের রিপোর্ট থেকে মোটামুটি জানা যায় যে (১) মোট জলকরের পরিমাণের দুই পঞ্চমাংশ মজে গেছে, (২) বিল বাঁওড় শ্রেণীর জলকরের এক বিরাট অংশ চাবের আওতায় আনা হয়েছে, (৩) মৎস্যজীবীদের একান্ত মূলধনের অভাব ও (৪) এস্টেট জ্যাকুইজিশন এ্যাক্টে ফলে জলকরের স্বত্ব ইত্যাদি নিয়ে আমলা-মোকদ্দমা। সবার উপরে একটা কথা এই দাঁড়ায় যে মৎস্য-জীবীদের একান্ত মূলধনের অভাবই মৎস্য উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। সে না পারে হাজিরমজা জলাশয় পূর্ণ সস্কার করতে, না পায় প্রয়োজনীয় বস্তাপাতি কিনতে ও

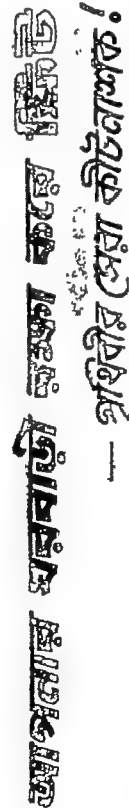
এক মুন্সীজীবী সরকারী খামারে পোনা
মাছের চারা কিনতে গিয়ে দেখলেন বাজারে
যখন ১ কিলো চারার দাম ৬ টাকা তখন
সরকারী খামারে তার মূল্য ১২ টাকা।
তিনি চারা না কিনে সংবাদটি যুগান্তর
কাগজে পরিবেশন করে দিলেন। অশুভ
প্রতিক্রিয়া হল। কর্মকর্তাদের মধ্যে ঘোষণা
করা হল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি
কিলোগ্রাম ৬ টাকা সাবসিডি দিয়ে মাছের
চারা বিক্রয় করবেন। কি সাহায্যের ব্যবস্থা।
আমলাতলের তথা সরকারী মৎস্য চাষের

কি অসামান্য উন্নতি। আরও শ্রদ্ধা
বিস্মিত হবেন যে সরকারের হাতে যে
নিষ্কল্প সামান্য জলকর আছে তার প্রমা-
জন মেটাতে যে মাছের চাষা বরকার হস্ত
তাও সরকারী খামারে উৎপন্ন হয় না।
বাল্যবে টেন্ডার দিয়ে সেই মাছের নয়
সংগ্রহ করে এই সরকার। এই আমদার
মৎস্যদপ্তর। আমলাভ্রমের কবলে পশ্চিম-
বঙ্গে যে মাছের খেলা চলছে তা আশ্চর্যী
সংখ্যায় আরও কিছু নতুন মন্ত্রী মহাশয়ের
নজরে আনার চেষ্টা কবব। —গীর্ষা



‘एहि छ’न मर्णा

মুখ্য আর্থে সর্বত্র । মুখ্য-মণ্ডল্য কোন কোন কতি কর না, মৌর্য-মণ্ডল্য।
বৃত্ত বাহ্য বাহ্য । ওরা যখন কামড়ায়, ওদের মুখের লাল। আপনায় রক্তে
আবশ কবে । ওতে ইজান্ ও থাকতে পারে এবং সেই থেকে মালেকিয়া,
ভেদ বা ফাইলেক্সিয়াসিন (গোয়া) দেখা দিতে পারে ।



એમાં મોટાડ હમોન, હેનક, (મોનિંગ નાચરલ આર્મિ પ્રાઇ ડુબોઇઝે ગમિલિટુર)

বুড়ী কাকী

প্রেম চলর.



২০৫৮

বুড়ো বয়সে সত্যি কি আবার শিশু-
স্বভাব ফিরে আসে? হয়ত বা তাই।
তা না হলে বুড়ীকাকীই বা কেন রোজ
খাবার সময় এত চোঁচামোঁচ করবেন।
কিন্তু কি আশ্চর্য! তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ই
তো জ্বাব দিতে বসেছে;—হাত, পা,
চোখ, কান—কোনটাই বা নয়। সারাদিন
বিছানায় পড়ে থাকেন। কিন্তু হলে
হবে কি; জিহ্বা স্বাদেব বিস্ময়ার
চুটি হলেই তিনি কাঁদতে শুরু করবেন।
কাঁদা তো নয়—শেন ব্রীতিমত
চাঁকর।

কাকীর পতিদেব অনেক দিন হল
গত হয়েছেন এবং একমাত্র পুত্রসন্তান
সেটিও পনের পা দিতে না দিতেই মরে
গেল। কাকীর সংসারে আপন বলতে
একমাত্র ভাইপো ছাড়া আর কেউ নেই;
সুতরাং তাকেই তিনি নিজ সম্পত্তি
লিখে দিলেন। সম্পত্তি হাতে পাবার
আগে পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে
কাকীর কত সেবা-শুধই না করেছে।
কিন্তু যেই বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে গেল
তাদের কাকীর প্রয়োজনও ফুরলো।
এমন কি কাকীকে দু'বেলা পেটভরে
খেতেও তাবা দিত না।

যাই হোক এজন্য পণ্ডিত বৃদ্ধিবাম
কিন্তু তার অধাণিনী শ্রীমতী রূপা
দেবী—কে বেশি দারী সেটা কিন্তু
নিরুপণ করা দুঃসাধ্য। বৃদ্ধিবাম
সম্পত্তি প্রকৃতির লোক; কারণ লোকে
জানত তাই বলে জানে—যেন কাকী অন্ত
প্রাণ। কিন্তু বুড়ীকাকীকে সে যে
ভাল খেতে-পবতে দেয় না সেটা—তো
আব কেউ জানে না। সত্যি তে! যদি
সর্বাধিক সহানুভূতি দ্বারা কণ্ঠসিদ্ধ
এবং তবে মিছিমিছি অর্থব্যয় করা কেন!
যদিও রূপা বুদ্ধভাষণী তবু হঠাৎ
কিছু কবে ফেলতে ভয় পেত। কারণ
ঘন্যার করলে যদি তার সন্তানদের
একস্যাণ হয়। তদুপরি পরকালেরও

তো একটা ভয় আছে। সুতরাং রূপাব
বিবাহের কাকীর তত দুঃখবোধ হতো
না যতো হত বৃদ্ধিবামের ভালমানুষীতে।
এজন্য কি বৃদ্ধিবামের অনুতাপ
হতো না? হবে না কেন—হতো। এত
বিষয়-সম্পত্তির মালিক—কত না তার
যশ প্রতিষ্ঠা। এ সব তো বুড়ীকাকীর
জনাই। কিন্তু হলে হবে কি! পাড়া-
প্রতিবেশী অথবা কোন সম্মান প্রকৃতির
লোক দু-চার দশ বসে কাকীর সঙ্গে
সুখ-দুঃখের দু-চারটি আলাপ-আলোচনা
করলেই বৃদ্ধিবামের মেজাজ বিগড়ে
যেত। কারণ—পাছে বা তার দুর্ব্যবহারের
কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এজন্য কাকীকে
কত গালমন্দই না শুনতে হতো।

বুড়ো লোকদের সঙ্গে শিশুদের
কেন যেন একটা বিদ্বেষভাব থাকে।
বাপ-মা যদি শিশুদের এই বিদ্বেষ-
ভাবটিই ইন্দ্রিয় যোগাতে থাকেন তবে
বুড়ো লোকদের কি শোচনীয় অবস্থাই
না হয়। কোন শিশু হয়ত এসে বুড়ী-
কাকীকে চিমটি কেটে সরে পড়ল—
আবার কেউ বা হয়ত জলের কলকুচা করে
কাকীর সারা শরীরে ছিটিয়ে দিল।
এতে কার না ক্রোধ হয়। বুড়ীকাকী
নিশ্চয়ই চাঁকর করে উঠবেন। চাঁকর
করলে কি হবে। এজন্য কি কেউ এগিয়ে
আসবে? মোটেই না। তবে, হ্যাঁ,
কাকী যদি উত্থাপ্ত হয়ে রূপার ছেলেমেয়ে-
দের বকতে শুরু করেন তবে ঘটনা-
স্থলে রূপা অবশ্যই হটে আসবে
এবং শ্রদ্ধা ছুটে আসাই নয়—বুড়ী-
কাকীকে বাপান্ত করে ছাড়বে। রূপার
জিহ্বা কৃপাণের ভয়ে তাই তো কাকী
চুপ করে থাকেন এবং মনের ব্যথা জাঘব

করবার জন্য অশ্রুকার কুঠিরতে বসে
ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে কাঁদেন। সমস্ত
পরিবারের মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধিবামের
ছোট মেয়ে লাডলীর সঙ্গেই তাঁর যা
কিছু ভাব। লাডলী তার ভাইদের ভয়ে
নিজের ভাগের লজ্জেন্স, চকলেট, বিস্কুট,
মুড়ি-মুড়িকি বা কিছু পায় সব কাকীর
পাশে বসে নিশ্চিন্ত মনে আহার করে।
কাকীর অশ্রুকার কুঠিরটাই ছিল লাডলীর
একমাত্র রক্ষাগার। যদিও বুড়ীকাকীর
ভোজন লোলুপতার দরুণ নিজের ভাগ
থেকে কাকীকে কিছু খেসারত দিতে হতো
বটে; কিন্তু তবু লাডলীর এতে বরং
লাভই হতো,—কেন না এখানে ভাই-
দের অত্যাচারের ভয় ছিল না।

॥ ২ ॥

আজ বৃদ্ধিবামের গৃহে বিবাহ-
উৎসব। সন্ধ্যা হতে না হতেই হ্যাঁজাঝ
বাতি জ্বলছে। ঢাক-ঢোল, সানাই
বাজছে। বাড়ির সামনের মস্ত বড়
মাঠটার ভাব খাটান হয়েছে। গ্রামের
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে
সানাই-এর সিনেমা গানটির সুব শুনছে।
পর পর চার-চারটি উদ্দনে কড়াই
চাপান হয়েছে। কোনটাতে লুচি—কোন-
টাতে বা কচুরি। মালপদ্মা, বৌদেও
হবে। বড় ডেকচাঁতে আলুর দম
চেপেছে। খাঁটি ঘি ও ক্ষুধাবর্ধক
চটকদার মসলার গন্ধ বাতাসে ভেসে
আসছে।

বুড়ীকাকী তার নির্দিষ্ট কুঠিরতে
বিষম মনে বসে আছেন। এমন দিনে
ঘরে বসে থাকতে কি মন চায়! কিন্তু
না চাইলে হবে কি। অন্তত আজকের
দিনে লোকজনের সামনে উপস্থিত হলে

তার কি আর রক্ষে আছে—রূপা অপ-
মানের চূড়ান্ত করে ছাড়বে। যাক;
যেয়ে কাজ নেই।

আঃ! কি মিশ্রি গন্ধ। সুগন্ধি
মুসলার গন্ধ বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই
আলদার দম হবে। মালপুয়া হবে, মোহন-
ভোগ থাকবে—লুচি থাকবে—কচুরি,
সন্দেশ কত কি।

আমাকে খেতে দেবে তো। কে জানে
রূপা মনে মনে কি মতলব আঁটছে।
অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল—কৈ আমার
জনা তো কেউ খাবার নিয়ে এল না।
ভুলে যার নি তো? সব দিয়ে-থুয়ে বুঝি
আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ কথা
ভাবতেই কাকীর দুঃখ জলে ভরে এল।
কলা ছেড়ে হাউ-মাউ করে কাদতে ইচ্ছা
হলো। কিন্তু শব্দকাজে অমঙ্গলের
ভয়ে চেপে গেলেন। “পেটভরে লুচি দই
সন্দেশ খাবার ভাগ্য কি আর আমার
হবে?”

লুচির কথা মনে হতেই দম কেটে
কমা আসতে চায়। “না, আর কতক্ষণ
ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব। আমার দুঃখের
কথা কাকেই বা জানাই। আজ লাড়লী
পোড়ারমুখীরও দেখা নেই। মেরেটা
এলে আর কিছু না হোক—অন্তত
জানতে তো পারতাম কি কি খাবার
হয়েছে। সত্যিই তো; এখানে শুধু
শুধু বসে পেন হা-পিতোশ করে মরাই,
কড়াইটার পাশে একবার গিরে বসলে
হয় না? লুচিগুড়ি, সন্দেশ ও সুভোল
করে বেলে কড়াইটার ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে।
লুচিগুড়ি কেন ঘি-এর সাগরে—সাঁতার
কাটছে। লুচিগুড়ি খেতে কি নরম
আর কি খান্সাই না হবে;—ফুলো ফুলো
লালচে আভা। কেন ভাল হবে না—
রূপা নিশ্চয়ই বেশি করে মরেন দিতে
বলেছে। ফুল বাগানের ফুলের গন্ধ ও
শোভা যেমনটি হয় তেমনটি কি আর
ঘরের সাজান ফুলে হবে?”

অতএব মনে মনে অনেক বিচার-
বিতর্কের পর কাকী লুচির বাগানে যাও-
য়াই স্থির করলেন। কিন্তু যাবেন কেমন
করে?—পায়ে হেঁটে—খাবার তো শক্তি
নেই। কোনরকমে দুঃহাতের কনুই-এর
ওপর ভর করে পা দুটি একরকম জোঁর
করে টেনে টেনে অনেক কষ্টে কাকী
চাকারটি পেরুলেন এবং ধীরে ধীরে
ঠিক তেমন করেই সামনের উদ্দণ্ডের
পাশে বসে গেলেন। কাকীর ধৈর্যের
কথা আর কিই বা বলব?—অনেক দিন
যাবৎ খেতে না পেয়ে কুকুর যেমন
খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রূপার দম ফেলবার অবসর নেই;—
কখন এঘর—কখনো ওঘর। কখন বা
গাছার তদারক করছে—কখন বা ভাড়ার

ঘর। কেউ বা বসে বলছে, “বামুনটাকুর
ভাঙের সব্বং চাইছেন”। আবার কেউ বা
এসে—জানতে চাইছে খাবারের পাত
পড়তে আর কত দেরি। বেচারি একা;
—কাদকই বা সামলাবে। সারাদিন
লোকজনদের সঙ্গে বকে বকে রূপার
গলার স্বর বসে গেছে; গরমে শরীর
হাস-ফাঁস করছে এবং এত কর্মবাস্ত যে
এক স্নান জল খেয়ে কিবা দু-চার দণ্ড
বসে হাতপাখা দিয়ে শরীরটাকে একটু
মাস্তা করে নেবে—সে অবসরটুকুও তার
নেই। সব দিকে তার কড়া নজর রাখতে
হচ্ছে। কারণ চোখের একটু আড়াল
হলেই তো খাবার জিনিষ পাচার। এরকম
অবস্থায় বুড়ীকাকীকে উদ্দণ্ডের পাশে
সেখতে পেয়ে কি রূপার মেজাজ ঠিক
থাকে। ব্যস্ত ভেমন করে কেঁচো ধরে
রূপাও ঠিক তেমন করে কাকীর হাত
দুটি ধরে শক্ত কাকুনি দিয়ে বলতে
লাগলো, “ছিঃ, ছিঃ? কি ঘেমা, খনি
মেয়েমানুষ তুমি, বলিহারী তোমার
সাহস। পোড়া পেটের জ্বালায় নিজে
তো জ্বলছই, আমাদেরও জ্বালাছ।
পেট তো নয়—বেন জালা। একটু তর
সইল না। কেন, ঘরে বসে থাকতে কি
দম আটকে আসছে? দেবতার ভোগ
হলো না। আত্মীয়-কুটুম্ব কারো পাতে
কিছু পড়ল না—তা সবাইকে ফেলে
তোমাকেই সবার আগে খাওয়াতে হবে?
ঘর থেকে বেরিয়েই বুকের ওপর সওয়ার
হয়ে বসলে? এমন ভিড় কেটে ফেল।
দিন রাত যে এত কাঁড়ি কাঁড়ি গিলছ সে
সব স্বার কোথায়? বাইরের লোকজন
তো এই ভাববে বুড়ীকে বুঝি এরা পেট-
ভরে খেতেও দেয় না। তাই তো বেচারি
পেটের জ্বালায় মরতে বসেও ছুটে
এসেছে। ছাঃ, ছাঃ। বুড়ীর ক্রমেরও
অরুচি মো। এখন বলছি, ভাল চাও
তো এখান থেকে সরে পড়। লোক-
জনদের আগে খাওয়া হোক পরে
তোমার ব্যবস্থা।”

সত্যি তো। গহের নিমন্ত্রিত
অতিথিরা এখনও অভূত। একটি শব্দ
নয়—কেন প্রতিবাদ নয়—এমন কি
চাইকারও নয়;—কাকী কোনদিকে না
তাকিয়ে সোজা নিজ কুঠারিতে ফিরে
গেলেন।

নিমন্ত্রণ কঠোর আঘাত।

বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নদীগর্ভে পতিত
হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন পাম্বস্বিত
বারিসমূহ এই শুন্যস্থান পূরণ করতে
যেয়ে আসে—ঠিক তেমন হৃদয় ও
মস্তিস্কের সমস্ত বিচার-শক্তি মূহুর্ত
মধ্যে এক হয়ে কাকীর মনের এই শুন্যতা-
ও আঘাতকে পূর্ণ করে

বুড়ী নিজ কুঠারিতে ফিরে অন-
শোচনা করতে লাগলেন। সত্যিই তো;
আমি কত নিচুতে নেমে গেছি। রূপার
প্রতি তার মনে আর বিদ্‌মাত্র বিবেচ
নেই।

কিন্তু ঘি ও স্বাদিস্ট মিঠাই-এর
সুগন্ধ তাকে থাকতে দিচ্ছে কৈ। প্রতিটি-
মুহুর্ত যেন একটি মৃগ বলে মনে হচ্ছে।
বিছানায় শুয়ে থাকতেও মন চাইছে না
—শুধু এগাশ-ওপাশ করছেন এবং বিড়
বিড় করে আপন মনে বলছেন, “কে জানে,
রূপা হয়ত ধরে নিয়েছে আমি তো
ঘরের লোক—আমাকে—আবার ডাকতে
হবে কেন? চলেই না হয় বই।”

এদিকে ভোজনক্রিয়া পুরোদমে চলছে।
কেউ পাত চাটছে, কেউ হাত চাটছে।
আবার কেউ বা নিজের খাওয়া শেষ করে
আড়চোখে দেখে নিচ্ছে অন্যের খাওয়া শেষ
হতে আর কত দেরি। কেউ বা ভাবছে,—
তাই তো, এতগুলো বৌদে কেন পাতে রেষে
বাছি। অথচ ভিতরে যেতে না চাইলেও
জোর করে মূখে গুঁজে জল খাচ্ছে। আবার
কেউ বা দই খেয়ে পাত চাটছে কিন্তু
সম্বন্ধে চাইতে পারছে না।

ঠিক এমনি সময় বুড়ীকাকী
নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সামনে এসে উপস্থিত
হলেন। বুড়ীকাকীকে দেখতে পেয়ে
একবার চোঁচিয়ে বলে উঠল—“এই
বুড়ীটা কে গো—? ওকে শীগগির ধর।
দেখ কাউকে না ও ছুঁয়ে দেয়।”

পণ্ডিত বৃন্দারাম কাকীকে দেখতে



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২০৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬০৮০

পেয়েই লুচির কাঁকাটা হুড়ে ফেলে দ্রুত এগিয়ে এল।

সুদের পরসামনা দিয়ে ভেয়ে-পড়া কোন খাতককে হঠাৎ দেখতে পেয়ে দুদখোব মহাজন যেমন তাকে হেঁচড়ে টানতে থাকে—ঠিক তেমনি করে বৃন্দা-রাম বড়ীকাকীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

দুরন্ত ভণ্ডারীর এক নিশ্বাসেই কাকীর এত সাথের ফুলবাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই খেল। কি, চাকর কেউ বাকি নেই। যাঁড়ের কড়া-গিঁমী তারাও খেল। কিন্তু যেতে পেলেন না কেবল একজন—তিনি আমাদের হৃদয়গাঁ কাকী।

একমাত্র লাডলী ছাড়া বড়ীকাকীর জন্য কেউ একটু ভাবলো না। পিতা-মাতার এই নির্দয় ব্যবহারে লাডলীর মনে শব্দ দখলই হলো না—ফোঁড়ও হলো। তার শিশুমনে বার বার এই প্রশ্নটাই উঠতে লাগল—“কেন ভরা কাকীকে খেতে দিল না? দু-চারটি লুচি দিলে এমন কি ক্ষতি হতো? কাকী যদি সবার আগেই খেতেন তাহলেই বা এমন কি অন্যায় হতো?”

লাডলী কিন্তু নিজের ভাগের লুচি সন্তুষ্ট কিছুই যায় নি। সব পাতুলের বড় বাজটার স্বর করে সাঁজিয়ে দেবে। কখন এ বাজটা কাকীর কাছে নিয়ে যেতে পারবে তাই ফিকির-ফাদি মনে মনে আঁটিবে।

১৪১

বাড়ি প্রায় শ্বিপ্রহর। সারাদিনের ণ্টার্নি—রূপা ঘুমে স্রুতেন্য। কিন্তু লাডলী—? তার চেঁষে ঘুম নেই। খাবার বাজটা বকের কাছে ধুব সাবধানে সে জেবে দিয়েছে। “মামণি—এবার ঘুমিয়ে পড়ছেন—এই তো সুযোগ। চুপি চুপি পা ফেলে যেতে হবে—শব্দ হলেই বিপদ। লষ্ঠনের আলোড়ি কখন কেন নিতে গিয়েছে। চারিদিক জ্বলজ্বল। শব্দ উল্লসিত হয়ে উঠছে। বড় উল্লসিত পাশে একটা কুকুর নিশ্চলভাবে শুয়ে আছে। লাডলীর লুচি হঠাৎ নিম্নগাছটার ওপর পড়ল এবং মনে হলো প্রবল শব্দ হনুমান, বেন নেখানে বসে আছেন। হাতে গদা—এ তো দীর্ঘ পুষ্টি কতদূর পর্যন্ত না লোম এসেছে। ভয়ে লাডলীর দুচোখ কঁপ হয়ে এল। হঠাৎ কুকুরটি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। কুকুরটিকে জাগতে দেখে লাডলীর মনে সাহস হলো। সে তখন কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা কাকীর ঘরের দিকে পা বাড়াল।

১৪২

বড়ীকাকীর এইটুকু শব্দ স্বরণ আছে কে বেন তাঁকে পাহাড়ের ওপর

দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে শব্দ লেগে তাঁর দুটি পাই বেন খেঁতলে গেছে। একটু বাদেই আবার তাঁর মনে হলো কে বেন তাঁকে “পাহাড়” থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। ভয়ে তিনি জ্ঞান হারালেন। কিছক্ষণ বাদেই আবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। “উঃ! কি ক্ষমা! ভাই তো এখন কি করি? ক্রোধা যাই—কাকেই বা বলি। হুঁ, তোরা ভেবেছিস বড়ী মরে গেলেই বাঁচ। শব্দ তো দুবেলা দু’ মতো খেতে দিস। আমি পক্ষ, অসহায়। না পারি হটিতে না পারি চলতে। না হয়, আমি উল্লসিত পাশে একটু বসেই ছিলাম।—ভাই বলে আমাকে এমনি করে সবার সামনে দিয়ে টেনে-হাঁচড়ে নিয়ে এলি? রূপাও কি আমাকে ক’ম অপমান করেছে।” দৃষ্টি ও ক্রোধে কাকীর চিবকার করে কান্দতে ইচ্ছা হলো। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কে বেন তাঁকে

সাম্প্রতিক বঙ্গমতীর আগামী আকর্ষণ

শিশুমনের গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ নতুন পটভূমিকায় শরীরে দ্বন্দ্ব উপন্যাস লিখছেন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত কথালিপি শ্রীমদোজঃমহা।

জানবে। “কাকী, কাকী, শীগগির, উঠে পড়। দেখ, তোমার জন্যে খাবার এনেছি।” লাডলী পাতুলের বাজটি বের করে কাকীর হাতে দিল।

কাকী—“খাবার বুঝি তোর মা পাঠিয়েছেন?”

লাডলী—“না ভো। এসব আমার নিজের ভাগের খাবার।”

“আমার এখন ক্ষিদে পায় নি কি না—ভাই তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি।”

কাকী খাবার পেয়ে মহা খুশি। লুচি, বোলে, কচুরি, দই বা কিছু পেলেন সবই চোঁছে-পুঁছে খেলেন।

লাডলী—“কাকী, পেট ভরল তো?”

বৈশাখের তাপদগ্ধ দিনে সামান্য মাত্র বর্ষণে উষ্ণতা যেমন বৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি এই সামান্য আহারে কাকীর ভোজনস্পৃহা আরো বেড়ে গেল।

“নারে লাডলী, পেটের এককণাও ভরল না। তোর মাকে গিয়ে বল না আরো কিছু লুচি-মিষ্টি পাঠিয়ে দিতে।”

লাডলী—“মামণি, এখন শব্দে আছেন। কিছু বলতে গেলেই তেড়ে আসবেন।”

কাকী—“তা’ হলে আর যেয়ে কান্ন নেই।”

কাকী শব্বার বাজটা হাতে নিয়ে হাডডাতে লাগলেন এবং লুচি, কচুরির

জাঙা দু-চার টুকরো বা কিছু হস্ত ঠেকল ভাই তিনি মূখে পুরতে লাগলেন। বার বার তিনি ঠোঁট চাটছেন। কিন্তু চাটছেন আর মনে মনে শ্বিপ্র করছেন যেমন করেই হোক আরো লুচি-মিষ্টি পেতেই হবে।

সন্তোষের সেতু যখন ভেঙে যায়—তখনই সৃষ্টি হয় বাসনার আবর্ত।—অথবা, যেমন মদ-মাতাল—নেপার আমেজ লাগলেই—আরো মদ খেতে চাব।

তিনি তখন লাডলীকে বললেন—“দেখ, যে উল্লসিত বসে লোকজন সব খেয়ে গেছে—ঠিক সেখানটায় আমাকে নিয়ে যেতে পারবি?”

“হুঁ, কেন পারব না। যাবে তুমি সেখানটার?”

লাডলীর কি আর অত কিছু বড়বাব বঙ্গ হয়েছিল। সে তখন কাকীকে ধরে এনে এঁটো পাতাগালি ব সামনে বসিয়ে দিল। বাথকো ক্ষীণতনু, ক্ষুধাতুরা, বৃন্দাহীনা ঐ রমণী এঁটো পাতার ভুজাবশেষ পরম তৃপ্তিতে আহাৰ করছেন আর আপনমনে বলছেন, “আঃ? দই তো নয়—যেন অমৃত। হাতের তলাটা মাথনে ভরে গেছে। কচুরিগালি খেতে কি ভালই না হয়েছে। আর লুচি? যেমনি খাস্তা—তেমনি নয়।”

বাথকোর অন্তিমদশার ভাগস্পৃহা বুঝি ব্যাধি বিশেষ—নতুবা কাকীরই বা কেন এমনটি হবে।

১৪৩

হঠাৎ রূপার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার তার কোল ঘেঁসে লাডলী ঘুমুচ্ছিল। আশ্চর্য? মেয়েটা গেল কোথায়?

লাডলীকে দেখতে না পেয়ে রূপা তত্তপোশের তলার—ঘরের এপাশ-ওপাশ খুঁজতে লাগল। হঠাৎ বাইরে তাকাতেই সে দেখতে পেল লাডলী উল্লসিত এক পাশে দাঁড়িয়ে এবং বড়ীকাকী একটু দূরে এঁটো পাতাগালি সবিধে কি বেন মূখে পুরাচ্ছিল। রূপা এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল। কি করণ ও মামসংশয়ী দৃশ্য। এক রাজকন্যা তুচ্ছ আহাৰ লোভে—উচ্ছ্রিষ্ট ভোজনে ব্যাপ্ত।

রূপার মনে হতে লাগল পা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে—গ্রহ-নক্ষত্র মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরপাক খাচ্ছে। সত্যি কি প্রলয় ঘনিষে এল। রূপা ক্রোধে গজ্ঞে উঠল না—এমন কি তিরস্কারও করল না। রূপার দুচোখ ঘেঁষে নেমে এল প্রবল অশ্রুধারা। মন তাঁর প্লাবিত ভরে গেল।

রূপা ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে একটি

বড় খালায় সমস্ত খাবার প্রচুর পরিমাণে
সাজিয়ে বড়ীকাকীর সামনে এনে ধরল।
গভীর রাত্রি। চারিদিক নিবন্ধ।
শব্দ কুকুরটি মাকে মাকে লেজ নেড়ে
নীরবতা ভঙ্গ করছে।

রূপা স্নেহপূর্ণস্বরে বলতে লাগল,
"কাকীমা, এই দেখ, তোমার জন্য কত

খাবার এনোছি। বস্তু ভুল হয়ে গেছে।
তোমাকে সময়মত খাবার পাঠাতে পারি
নি—সেজন্য ক্ষমা করো।"

মিষ্টি খাবার হাতে পেলে ছোট
শিশু যেমন সব কিছুর ভুলে যায় বড়ী-
কাকীও ঠিক তেমনি পরম তৃপ্তিতে খালা
থেকে খাবার খেতে লাগলেন।

রূপা দাঁড়িয়ে থেকে—এই অপরাধ
দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগল।

—শ্রীঅমল্যমোহন রায়মৌলিক

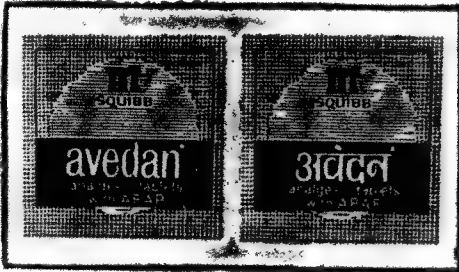
[হিন্দী সাহিত্যসম্রাট প্রেম চন্দর-এর
"বড়ীকাকীর" অনুসরণে।]

বুতন!

মাথাধরা? সর্দি? ফু?

অবেদন

আশ্চর্যজনক 'অ্যাপেপ' যুক্ত দ্রুত, নিরাপদ, নিশ্চিত আরাম এনে দেয়
মাথাধরা সর্দিতে



অবেদন বুতন—তাই পরীক্ষা করে দেখুন। মাথাধরা, দাঁতব্যথা, পিঠের ব্যথা, ও পেশীর বেদনা, সর্দিতে
ও ফুতে এবং বিশেষ বয়সসমূহের দিনগুলিতে দ্রুত কার্যকরী, দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবার জন্য দুইবেল এই
আবিকার, অবেদন।

অবেদন অতুলনীয়! এতে আছে আশ্চর্যজনক 'অ্যাপেপ' ও সেইসঙ্গে বিরাগদ, দ্রুত ক্রিয়াকারক বাধা-
দূরকারী অত্যন্ত উপাদান।

অবেদন ব্যথা দূর করার জন্য বিশেষ কলপ্রদ এবং অত্যন্ত সহজে গ্রহণযোগ্য। এতে ক্ষতিকারক কিছু নেই
এবং অভ্যাসে পরিণত করে না।

III. অবেদন
EQUABB

'অ্যাপেপ' যুক্ত
কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ করে—
বহুকালের জন্য আরাম দেয়।
সারাতাই কেমিক্যালস্

মাত্রা: ১-২ ট্যাবলেট

© ই. অ. অ. দুইন এন্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের
স্বত্বাধীনে 'ট্রেডমার্ক' ব্যবহারকারী আইসেনসেলের
অধীনে 'অবেদন' নামে ইন আইসেনসেল মিলিতে।



মুক্তি-যুদ্ধের সময় এক মাল

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনের একমাস পূর্ণ হল। ইতিহাসে যে প্রবাদ আছে 'নির্মিত হলো বি ক্ষে, সেই ভাবেই দেখে যেন হচ্ছে যে নতুন সরকারের সিংহাসন এক আলোর কার্যকরী তার ভবিষ্যৎ সাফল্যেরই নির্দেশ দিচ্ছে।

কংগ্রেসী অপশাসনের অবসানের পর যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিকট জনসাধারণের প্রত্যাশা অনেক। অগ্নিও নতুন সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ভাবাশ এই সরকার জনজীবনের দুর্দশা লাঘবের জন্য নানা দিকে আগ্রহ চেপ্টা করে যাচ্ছেন। বিগত এক মাসে নতুন সরকার কী করেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে।

শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েই পশ্চিম-বঙ্গের নতুন সরকার সর্বপ্রথম কুখ্যাত নিরাপত্তা আইন তুলে দিয়েছেন। এই কালা কানুন নামে পরিচিত আইনের মোহাই দিয়ে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে জেলে পোরার ক্ষমতা প্রাপ্তন সরকারের ছিল এবং তারা নির্বিচারে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করেছে নিজের পর দিন করে। যারা মধ্যে ব্যক্তিগতবিরোধ কথন অগতে কখনো ক্রান্ত হত না, তাদের আমলে কার্যত জনসাধারণের তুলন প্রাধান্যতাই ছিল না। পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে, কখনো বা শাসকসলার জ্ঞানকেন্দ্রের জ্ঞান-তেই যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করাই যেন ক্রীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কুখ্যাত আইনটিকে তুলে দেবার কালে এই প্রথম জনসাধারণ প্রকৃত অর্থে প্রাধান্যতা পেয়েছেন। জন-সাধারণ মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার আরও একটি কুখ্যাত

আইন তুলে দিয়েছেন যেটি হচ্ছে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন, যে আইনের উদ্দেশ্য ছিল প্রগতিমূলক চিন্তাধারাসমূহ থেকে জন-সাধারণকে আড়াল করে রাখা এবং জন-আইনের মধ্যে প্রগতিমূলক নটিক অভিনয়ের আগে পুলিশের অনুমতি লাগত।

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে সরকারের প্রত্যাশিত। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রত্যাশা করেছেন যে প্রম-বিরোধের ক্ষেত্রে কোন হিংসারক ঘটনা ঘটল ক্ষমতাধরা না থাকলে আহতক পদাধি অধিকপদের মাজল হয়ে অধিকদের ওপর হামলা করবে না। এতাবৎ প্রম-বিরোধের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা সত্যই অগ্ন ছিল। তা ছাড়া সরকার ও অধিকপদের মধ্যে একটা জনকাক্ষা হয়েছে যে হাজিই বা কোন-কক্ষ করার দিশান্ত হনবার আগে সরকারের মধ্যে অধিকপদকে আরোচনার কপতে হবে, এবং কোন প্রম-বিরোধের ক্ষেত্রে উপস্থিত হলে তা যাতে সরকারের মামলাতারা আগেযে মেটে সেনাধিকই যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার নজর দেবেন। নিয়মসমূহে এই সিদ্ধান্ত এই রাজ্যের বহু সমস্যা-কর্তাকৃত প্রমশিপের জগতে একটা নতুন পথের সৃষ্টি করতে চলেছে।

শিক্ষকের সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও যুক্তফ্রন্ট সরকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন, আর আশা করলেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষকদের পেন্সনের কানশা। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সমান করে মহাব ভাতা প্রদান কথন যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়ত শীঘ্রই মোমাণা করবেন। করকা প্রকল্প রূপায়ণে যে অচেনাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার তা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্রীমি সংস্কারের ক্ষেত্রেও কোন কোন বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন

না পরিচালিত কিছু কাজ হয়েছে। সরকারের হাতে থেকে-যাওয়া কয়েক লাখ বিঘা জমি যার কংগ্রেসী আমলে কোন বিলিবাণস্থা হয় নি, যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা পাওয়া-মাত্রই তা ক্রীমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণিত হতে চলেছে, এবং ভাগ চাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার জনাভিকিল্যেই কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছেন। প্রশাসনিক ও অপরাধের দুনীতিত মননের ক্ষেত্রেও যুক্তফ্রন্ট সরকার আগ্রহ করছেন, এবং প্রাপ্তন কংগ্রেসী আমলে স্থান ও পরিমহনের ক্ষেত্রে যে সকল দুনীতিত চলেছিল সেগুলির তদন্তকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই রাজ্যের সর্বশেষ বহু সমস্যা অর্থাৎ শাসনসমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোৎকৃষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন, এবং সেই অনুযায়ী ইতি-মধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে।

মাত্র এক মাসের মধ্যে এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কতব্য সম্পাদন বা মায়গ্রহণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের উজ্জল ভবিষ্যতের উল্লেখ দিচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে অভ্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে। এই সরকারকে উৎসাহ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে কল্যাণত মালা ধরনের অপচেষ্টা হচ্ছে। সে অপচেষ্টার শুরুর হয়েছে গ্রাম কোম্পানীর ভাড়া আড়ানো দিয়ে। বিষয়টি এখন আমলাতন্ত্রের এজিয়ারে আছে বলে এই যুক্তফ্রন্ট একটা বড় কামোজা শ্বগিত রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ যে কোন বড় অকলম্বন করে সরকারকে অপকলম্ব করার চেষ্টা করছে আর প্রমাণ পাওয়া গেছে হাওড়ায় ট্যান্ডিওয়ালাদের আকৌজক অরশ্বান সম্মতে এবং চৌরগণী জগলের একটি ঘটনায়। কিন্তু উত্তম

সাম্প্রদায়িক বন্দন

কয়েকটি বক্তৃতা সরকার আঁত দ্রুত সমস্যার সমাধান করে দিয়ে অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দেন। অতঃপর প্রতিভাবান শক্তিগুলি একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এই সেদিন। কিন্তু সরকার আঁত দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাদের বাড়িঘাতে ছাই দিয়েছেন। একথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে একটি বিশেষ শ্রেণীর বাবসায়ী সম্প্রদায় এই সব অগ্নিকর্মের পেছনে ইম্মন যোগাচ্ছে। এবং স্থানীয় রাজনীতির স্বার্থ তার সপক্ষে যুক্ত হয়েছে। এই সব উপাদানের সপক্ষে সরকারকে একহাতে লড়তে হচ্ছে, অপর হাতে পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য কাজ করে যেতে হচ্ছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে এই এক মাসে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার যা করেছেন তা গণগত ও পরিণামগত উভয় দিক থেকেই ভারতের আর কোন রাজ্যসরকারের তুলনায় অনেক বেশি।

ভাগচাষীর স্বার্থরক্ষার পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সেই করাচী কংগ্রেসে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ভূমি-সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু বিগত বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে তা কোনদিন কাজে পরিণত হয় নি। একটি চিত্তাকর্ষক শ্লোগান হিসাবে ভূমি-সংস্কারের কথাটা কংগ্রেসী নেতারা বার বার উচ্চারণ করেছেন, এমন কি মায়াপদ্রে কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষ শাস্ত্রী বার জমি তার শ্লোগান আউড়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভূমিতে যে কায়মীস্বার্থে যুগ যুগ ধরে বাসা বেঁধে আছে তা হটানোর কোন চেষ্টাই কংগ্রেস সরকার করে নি। কেন করে নি তার কারণ দুই স্পষ্ট, কেন না মূখে অনেক বৈপ্লবিক মূলি আওড়ালেও কংগ্রেস বরাবরই এই কায়মীস্বার্থের ধারক ও বাহক। কাগজে-কলমে জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত হলেও তাতে জমিদারদেরই লাভ হয়েছে সবচেয়ে বেশি, কেন না কংগ্রেস সরকার প্রায় মৃত অশ্বটিকে জীবিতের দলে কিসে নিয়েছেন) ভূমিাধিকারী শ্রেণীর কোন স্বার্থই ক্ষুন্ন হয় নি।

অথচ পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশে এত অধিক চাষ হয় না যেমন ভারতে হয়। তার কারণ এদেশে 'কার জমি কে দেয় মই' এই কথাটি এত সত্য যে তা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। যে চাষ করে সে জমির মালিক নয়, কবি নজরুলের ভাষায় 'মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ, মাটির মালিক তাঁহারা হন।' মাত্র কদিন আগে

হুগলী জেলার বলাগড় অঞ্চলে গিয়েছিলাম। স্টেশনের নিকটেই সরকারী কৃষিক্ষেত্র, যেখানে এখন গমের চাষ করা হচ্ছে। গাছগুলিতে শীঘ্র ধরেছে। যে লোকটি আমাদের রিকসা টানছিল সে বলল, এখানে যা ব্যয় করা হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ ব্যয় করার সুযোগ পেলে আমরা এরচেয়ে ভাল ফসল তৈরি করতাম, কিন্তু জমি কোথায়? চাষের সময় লোকটি ভাগে চাষ করে, অন্য সময় রিকসা টানে। সে কেন জমির স্বত্ব নেবে? কেন জমিতে ব্যয় করবে? কেন না আজ সে যে জমিতে কাজ করছে আগামী বছর সেই জমিতেই যে সে চাষ করবে তার গ্যারান্টি কোথায়?

অতএব ভাগচাষীদের স্বার্থ কিছটা সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। কংগ্রেস সরকার জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দিয়েছিল তাতে কিছু লাভ হয় নি। কেন না প্রকৃতির দিক থেকে সেই সরকারের পক্ষে জোতদার শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস সরকার আইনের ফাঁকি ঠিকই রেখেছিল, বিশাল বিশাল জোতদার মালিকদের বেনামে জমি হস্তান্তর করার ঢালাও বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। কাজেই বিগত সরকারের জমি সিলিং-এর পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত হাস্যকর ফল প্রসব করেছিল।

১৯৫৯ সালে কেরালায় নাম্বার্ডিপাদ সরকার ভূমি-সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন একথা অনেকেই অবগত আছেন। তাঁরা এই কাজে নামবার আগেই একটি পাকা কাজ করেছিলেন যা হচ্ছে আইন করে ভূমি হস্তান্তর বন্ধ করে দেওয়া। এটুকু না করলে প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই জমির সর্বোচ্চসীমা কার্যকরীভাবে বাধা সম্ভব নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে এই কায়মীস্বার্থের লেজে পা পড়ল আর যায় কোথায়? কেবলে নাকি গণতন্ত্র মহা বিপদে পড়েছে। অতএব যা ঘটবার তাই ঘটল। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যাকারজনক পদ্ধতিতে তথাকথিত গণতন্ত্রবাদীরা একটি বৈধ সরকারকে উচ্ছেদ করল। কায়মীস্বার্থের লেজে পা দেবার এই পদ্ধতি।

ভূমিরাজস্বমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে, আইন করে ভাগচাষীদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা যাবে না যদি না তারা নিজেরা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হয়ে আন্দোলন করে। এই উক্তি কে কোন মহল বড় বেসামাল হয়ে পড়েছেন, কোন কোন সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই মড়াকানা জুড়ে দিয়েছেন। আমাদের কয়েকটি সংবাদপত্রের অবস্থা দেখলে সত্যই মায়ী হয়। একই মুখে ভূমি-সংস্কারের কথা বলা, জোতদারশ্রেণীর বাপান্ত করণ, আবার তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কিছু

ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গেলে সর্বশেষ হল বলে মড়াকানা জুড়ব।

সে যাই হোক যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাগচাষীদের ন্যায় স্বার্থে বজায় রাখতে পারেন, তাহলে বহুল প্রস্তাবিত ভূমি-সংস্কারের পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করা হবে। তবে এই প্রসঙ্গে ভূমি-রাজস্বমন্ত্রীর প্রতি আমাদের অনুরোধ এই যে তিনি যেন যথেষ্ট সতর্কতার সপক্ষে এই পথে পদক্ষেপ করেন, কেন না কায়মীস্বার্থে যা দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। সম্ভাব্য সকল রকম দুর্ব্যোপায় জন্মই প্রস্তুত থাকতে হবে।

আগুন নিয়ে খেলা

লিওনার্দো সোজলের লেখা একটি বই আছে যার নাম লাস্ট ডেজ অফ ব্রিটিশ রাজ। বইটির মলাট ওন্টোলেই একটি ছবি পাওয়া যাবে, এক হতভাগ্য রিকসাওয়ালার মৃতদেহ, ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল। সে বোচারী শ্বিজাতিকৃত, মাউন্টব্যটেন পরিকল্পনা, গান্ধী-নেহরু-জিন্না, মুসলিম লীগ-কংগ্রেস কিছই বুঝত না, কলকাতার রাস্তার রিকসা টেনে কয়েকশে দিন গুজরান করত। অথচ বৃহৎ রাজনীতির খেলা যারা খেলেছে, সেই নির্ভর খেলার শোচনীয়তম বলি হতে হল সেই হতভাগ্য অতি সাধারণ মানুষটিকে, উদরাস্ত খেটে দুমুঠো অন্ন যোগাড় ভিন্ন যার জীবনের আর কোন লক্ষ্য ছিল না।

এ কথা জলের মত পরিষ্কার যে, তারাই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধার যারা নেপথ্যে থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতালব্ধের জন্য কুট চক্রান্ত করে। ইম্বর জানেন এই সব ধুরন্ধর রাজনীতিকদের কেন ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো দুই ধারায় চালান করে ফাঁসিকাঠে লটকানো হয় না, উটে ফুলের মালা পরানো হয়।

এইরকম চারজন মন্ত্রেলের স্থান পাওয়া গেছে যারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে আগুন নিয়ে খেলা করতে চলেছে যার পরিণাম হয়ত শেষ পর্যন্ত খুবই খারাপ হবে। এদের পিছনে নিশ্চয়ই একটি বিশেষ মহল আছে যাদের মুখপাত্র হয়ে এরা কাজ করেছে। আমরা গত সংখ্যায় লিখেছিলাম যে ২৯শে মার্চের হাঙ্গামার পেছনে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার একটা মূল্য চক্রান্ত ছিল। সে অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে, কুলি থেকে সাপ বেরিয়ে পড়েছে।

এই চারজন হল গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির সদস্য যারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিগত হাঙ্গামার অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাতের দাবি জানিয়েছে।

এই চারজন কলকাতা ঘুরে প্রধান-মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিধানে ব্যর্থ হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সবচেয়ে বড় অপরাধ বোধ হয় যে মাত্র চার মণ্ডার মধ্যে তারা হাঙ্গামা বন্ধ করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনেছিলেন যে কুড়ির তুলনা আর কোথাও নেই। বহি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যাপারটিকে আরও গড়াতে দিচ্ছেন, তাহলে এই যে সব লোক কুপান নিয়ে তাম্বল চালিয়েছিল তাদের মধ্যে দশ জনও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারত কি না সন্দেহ আছে। যে সম্প্রদায়ের লোকদের প্রাণরক্ষা যত্ন-ক্রম সরকার করলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকুক, এই চার ব্যক্তি উল্টে সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সারা ভারতের সামনে হেঁচকি দেয়। আরও মজার কথা কংগ্রেসের মূখপত্র এটি পত্রিকার এদের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি বেশ কল্যাণ করে ছাপা হয়েছে।

এখানে কয়েকটি কথা খোলাখুলি বলা প্রয়োজন। এদের মতলব খুব সরল, তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করা। শিখ ভাইদের একাংশ নিজেকে এ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয় নি, তাদের মদ্য যোগাচ্ছে এক প্রেণীর অবাঙালী দণ্ডক সম্প্রদায়। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজ-নৈতিক। কেন না গত বিশ বছরে ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কম-সে-কম পঞ্চাশটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে যে-গুলির ভয়াবহতা ও বিশালতার তুলনায় বর্তমানের হাঙ্গামা একটা অতি তুচ্ছ লোকাল ডিসিপিউট ছাড়া কিছু নয়। অথচ এগুলির জন্য তো তৎকালীন গভর্নমেন্ট সমূহকে উৎখাত করার দাবি ওঠে নি? আজই বা কেন সে দাবি উঠছে? কিন্তু একটা কথা থেকেই যায়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বৈধ সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য কেন্দ্রের কারো কারো প্রচ্ছন্ন সমর্থন পিছনে নিয়ে এরা আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটানোর পরিকল্পনা করছে। যে উদ্দেশ্যে এরা যা করতে নেমেছে বা নামতে চলেছে তা সিন্ধু করার জন্য কতজনের প্রাণ বলির প্রয়োজন হবে এটা তারা ভেবে দেখেছে কি? পিছনে যতই অর্থবান লোকরাই থাকুক না কেন সংখ্যা-জঘিষ্টের নিরাপত্তা যে সংখ্যাগরিষ্ঠের শৃঙ্খলার ওপর নির্ভরশীল এ কথা বোধ হয় তারা আজ বিস্মৃত হয়েছেন।

২৯শে মার্চ তারিখের ঘটনাটি যে মাত্র চার মণ্ডার মধ্যে আরও এসেছিল চার জন যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে জন-সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাই একমাত্র

দায়ী। ঘটনাটি ঘটায় সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ পিছনকার মতলবটি ধরতে পেরেছিলেন, বৃহতে পেরেছিলেন এর পেছনে জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ ও উৎখাত করার চক্রান্ত আছে, তাই তারা ঘটনাকে বেশিদূর গড়াতে দেন নি, সর্বশক্তি দিয়ে তারা শান্তিরক্ষার কাজে সাহায্য করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গবাসী স্বভাবতই সাম্প্র-দায়িক বা প্রাদেশিক নন। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ইতিপূর্বে বাঙালীকে সাম্প্র-দায়িক উপাধি দেওয়া হওয়ার শিকার হতে হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগেই আসামে 'বঙাল-খোদার' হুমুসে কিভাবে বাঙালীরা ধনে-প্রাণে বিনষ্ট হয়েছে সে কথা আজ অনেকেই স্মরণ আছে। কিন্তু তার বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গে একজন অসমীয়াও নিহত হন নি। এ সুনাম পশ্চিমবঙ্গের আছে।

কাজেই যারা এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন নিয়ে খেলা করছে তাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে এভাবে তারা সারা ভারত জুড়ে অশান্তি ও বিভেদের বীজ প্রত্যক্ষভাবে বুনছে যার ফল ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হবে। লোক-গুলিকে চেনা গেছে কাজেই এদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করা এই মূহুর্তেই প্রয়োজন। আমরা সাধারণভাবে সকল অবাঙালী বন্ধুদের এবং বিশেষভাবে শিখ বন্ধুদের অনুরোধ করছি যে তারা যেন এই সব বিভ্রান্তিকর প্রচারণার শিকার না হন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(৩)

গত সপ্তাহে স্থানাভাবের জন্য স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্যসমূহ রাখা হয় নি, বর্তমান সপ্তাহে আবার তা পেশ করছি। এখন থেকে আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি ও অনাচারের নিদর্শনস্বরূপ একের পর এক স্পেসিফিক কেস তুলে ধরে সেগুলির প্রতি স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

বর্তমান সংখ্যায় আমরা একজন কর্মচারীর কথা লিখবো। এর পরিচয় হচ্ছে যে ইনি স্বাস্থ্য-অধিকর্তার ব্যক্তিগত কর্মচারীদের অন্যতম এবং সেই সঙ্গে নাকি একটি বিশেষ চক্রের মধ্যমণি।

এই বিশেষ চক্রটি ডিরেক্টরেটের এসটারিসসেন্ট বিভাগের কতিপয় অঙ্গাঙ্গ কর্মচারী নিয়ে গঠিত যার কাজ হচ্ছে নিয়োগ, বদলী ও প্রমোশনের জন্য প্রার্থীদের নিকট থেকে টাকা নেওয়া। এটি সামুদ্রিক ঘরের ব্যাপার নয়, বেশ ঘলাও

কারবার। এই চক্রের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে এই চক্রের মধ্যমণি এই বিশেষ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বহু অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু যেহেতু তারা সকলে বড় বড় অফিসারদের আশ্রিত, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই এখাবৎ গ্রহণ করা হয় নি।

এই চক্রটির আল সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়ানো এবং এই চক্রের হয়ে যারা কাজ করে তাদের প্রতাপ এতই বেশি যে সং ও ন্যায়বুদ্ধিসম্পন্ন অফিসারেরাও এদের কেশাঙ্গ স্পর্শ করতে অক্ষম। চক্রের মধ্য-মণি এই কর্মচারীটি এভাবে বিচরণ করেন যেন তিনিই আসল অধিকর্তা, মোটামুটি পরিমাণে রাজতন্ত্রের বিনিময়ে নিয়োগ, বদলী ও প্রমোশন প্রদানে ইনিই ভগবান-রূপে বিবেচিত হন।

নদীয়া জেলায় কর্মরত এই চক্রের একটি লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করে নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর মত একজন কর্মদক্ষ ও সং অফিসার কিভাবে বিভ্রান্ত ও নৈরাশ্যপ্রণীড়িত হয়েছেন তার বিবরণ এখানে দেওয়া হল। ইনি নাকি দু'খানি ডি.ও. চিঠি দিয়েছিলেন, একটি ডেপুটি ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস (অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন)-কে অপর একটি ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস (স্বাস্থ্য-অধিকর্তা) পি. এ.-র নিকট। চিঠি দুটির তারিখ ও নম্বর যথাক্রমে ১৮।৮।৬৬ নং ৪৭৭২ এবং ২।৮।৬৬ নং ৮২৬৬। এই পত্র দুটিতে তিনি একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রমাণসম্বলিত কয়েকটি অভিযোগ পেশ করেন। প্রত্যন্তরে তাকে জানান হয় যে, এই কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, কিন্তু পরে জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টর তাকে (নদীয়ার পূর্বোক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে) নাকি ধমক দিয়ে জানিয়ে দেন যে, এসব বিষয়ে অভিযোগ করার কোন প্রয়োজন নেই (বি, ও, ২৮৯, তার ২৬।৮।৬৬)। কারণ নদীয়ার যে লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই লোকটির সঙ্গে আমাদের পূর্বোক্ত চক্রের মধ্যমণি, স্বাস্থ্য-অধিকর্তার ব্যক্তিগত কর্মচারীদের অন্যতম এই বিশেষ কর্মচারীদের বোগা-যোগ আছে এবং এই ব্যক্তি এই চক্রেরই একজন এজেন্ট।

এই বিশেষ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমা হয়ে আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিকে একটু নজর দিলেই অল্প তথ্য তার হাতে গিয়ে পড়বে।

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ন্যাথ-কেন্দ্র জড়তাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়



মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেগমাই আমাদের সমস্যা 'অ্যাসপ্রো' বিসিও ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেগনা দূর করার অত আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেগনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড কলতে কি বোঝায়? মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেগনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'তে যোগানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী দ্রুত করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন আর ১০ কোটি দূর করা হয়েছে। এর সঙ্গে বেগনা দূর করার ক্ষমতা বিজ্ঞানগত কৌশল দ্বারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে ব্যথা-বেগনা দূর করে।

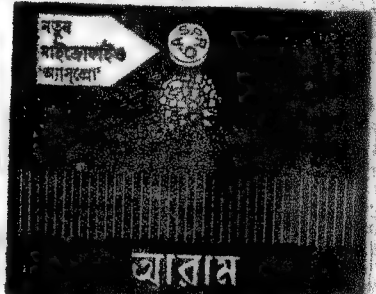
দুই ঘণ্টার মধ্যে কান শুক হয়ে যায়—অনেকজন বলে কান চলতে থাকে। নতুন মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র ব্যথা দূর করার ক্ষমতা উপাদানটি অতি সূক্ষ্ম এবং দুই মিনিট শরীরের সঙ্গে মিশে নিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইসঙ্গেই মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' অসহনীয় তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেগনা দূর করে দেয় এবং তার কোন অস্বস্তিকর দ্বারা হয়।

কতি সন্ধ্যায় আসনি বেতে পারেন? নতুন মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনাকে ঘুমের পুরী বেতে পারেন—তখন, আপনার সঙ্গে মিশিয়ে আপনি এক রাত ঘুম করুন যে কোনো দরম পানীর সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের ব্যথা-বেগনা নতুন মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' দ্বারা: ব্যথা-বেগন, মাথাব্যথা, হাত-পা ব্যথা, বসন্ত, জ্বর, মল-মত্র-জ্বর, হৃৎকেন্দ্র ব্যথা, গলাব্যথা।

মাত্রা : প্রাপ্যবয়স : ছোট ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে সবার সাথে। প্রাপ্যবয়স : একটু ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল ডাক্তারের নির্দেশনায়।

নতুন মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' বিজ্ঞানে কাজ করে দেয়



আপনার ব্যথা-বেগনা দূর করার জন্য নতুন মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র একটি ট্যাবলেট আর ১০ মিনিটের মধ্যে কাজ করে। তাই শরীরের সঙ্গে মিশে নিয়ে ব্যথা-বেগনা দূর করে দেয়।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড হওয়ার জন্য নতুন মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র একটি ট্যাবলেট আর ১০ মিনিটের মধ্যে কাজ করে। তাই শরীরের সঙ্গে মিশে নিয়ে ব্যথা-বেগনা দূর করে দেয়।

নতুন মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেগনা দূর করার আধুনিক উপায়।



মাইক্রোস্ট্রাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেগনা দূর করে

প্রাপ্যবয়স : ১০ বৎসর

AGG 100

পঞ্চায়েৎ আইনের সংশোধন

গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বক্তৃষ্ট সরকার বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইনের আমূল সংশোধনের উদ্যোগী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবার ৬ই এপ্রিল তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন যে, বর্তমানে এই সংক্রান্ত যে আইন চালু আছে তাতে গ্রামবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকার তো বাড়েই নি, উল্টে তা একটা ক্রমিক দুর্নীতির উৎস হয়ে রয়েছে।

পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রবর্তনের পরিকল্পনা এদেশে বহুদিনের কিন্তু কার্যত যে পঞ্চায়েতী আইন এখানে চালু রয়েছে তাতে জনসাধারণের অধিকার একান্তই সীমাবদ্ধ এবং দলীয় স্বার্থে পঞ্চায়েৎকে ব্যবহারের সুযোগ প্রচুর এবং বিগত শাসক দল যে এই সুযোগ নিয়ে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে তার পক্ষে এত ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন।

বর্তমানে বক্তৃষ্ট সরকার প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করেছেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা সাময়িক কেন না, পঞ্চায়েৎ আইনকে একেবারে ঢেলে সাজাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এই কারণেই আপাতত যে সব অ-গণতান্ত্রিক বিষয়গুলি পঞ্চায়েৎ আইন জুড়ে বিরাজ করছে সেগুলির পরিবর্তন বক্তৃষ্ট সরকার করতে চাইছেন।

অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন ও মানোনয়ন ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচন বন্ধ না হলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধানদের মারফৎ দুর্নীতি ও সরকারী অর্থের অপচয়ের সংযোগ পূর্ণ। ইতিপূর্বে এদেরই হাত দিয়ে গ্রাম, রিলিফ প্রভৃতি খাতে প্রচুর অর্থের অপচয় ঘটেছে। গ্রামাঞ্চলে যে সব সরকারী কর্মচারী আছেন তাঁদেরও স্বাভাবিক কাজ-কর্মের পক্ষে পঞ্চায়েৎ সমূহের ৬১ সব কর্মকর্তারা বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছেন এমন বহু অভিযোগই ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। তাদের ওপর কর বসানোর যে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে এবং বিচার-বিভাগীয় যে সামান্য ক্ষমতা পঞ্চায়েতের প্রধানরা ভোগ করে সেগুলির অপব্যবহারেরও প্রচুর উদাহরণ আছে।

বস্তুত এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে প্রচলিত পঞ্চায়েৎ আইন

সমূহ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়েই রচিত হয়েছিল। এর দ্বারা গ্রামাঞ্চলে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানো ভিন্ন কোন কাজই করা হয় নি। কাজেই পঞ্চায়েৎ আইনসমূহের আগাগোড়া সংশোধন প্রয়োজন। বারান্তরে আমরা বিশদভাবে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

খাদ্যনীতি অনুমোদিত

বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতি অনুমোদিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সংখ্যার বঙ্গদর্শনে আমরা লিখেছিলাম যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় এর চেয়ে



শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ভাল খাদ্যনীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, এবং কেন ছিল না সে কথা আমরা বিগত সংখ্যায় লিখেছি।

বক্তৃষ্ট সরকার যে খাদ্যসমস্যাকে প্রকৃতই দলীয় রাজনীতির উদ্দেশ্য রাখতে পেরেছেন তার প্রমাণ খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ বিরোধীপক্ষের কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যদিও একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে বর্তমান বিরোধীপক্ষ, অর্থাৎ কংগ্রেস বিষয়টিকে আজও পর্যন্ত দলীয় স্বার্থের উদ্দেশ্য রেখে দেখতে চাইছেন না। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ বিধানসভায় অভিযোগ করেছেন যে, কংগ্রেস বস্তার মধ্যে সহযোগিতার কথা বললেও আসলে তাঁদের বস্ত্যে শত্রুতারই সূত্র ধরানিত হয়েছে। বিরোধীপক্ষের নেতার নিকট থেকে ডঃ ঘোষ কিছু পরামর্শ চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর

আহবানে সাড়া দেন নি, একথা বলে ডঃ ঘোষ হাতে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন।

রেশনের চালের দাম না বাড়িয়ে অপর পক্ষে চাষীদের কতি না করে চাল সংগ্রহ করতে সরকারকে যে পরিমাণ টাকা সাবসিডি হিসাবে ব্যয় করতে হবে তাতে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে বলে কংগ্রেস দল থেকে যে অভিযোগ উঠেছে তার জবাবে ডঃ ঘোষ বলেছেন যে, অর্থনীতির সংকটের যে কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য দায়ী প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার। আজ যে কংগ্রেস দল দরিরের বন্দু হবার ভান করছিলেন তারা কি কালো টাকা উন্মোচন রাজী আছেন? তারা কি কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রীর নিকট পুরাতন সমস্ত নোট বাতিল করার পরামর্শ দিতে রাজী আছেন? তারা কি ধনিকশ্রেণীর সর্বোচ্চ মায় বেঁধে দিতে রাজী আছেন? এই সব উপায়েই মদ্রাস্থ্যনীতি বন্ধ করা যায়—বোশ দরে ধান কিনে ঘাটতি দিয়ে চাল দিলে মদ্রাস্থ্যনীতি ঘটে না।

বিধান পরিষদে ডঃ ঘোষ বলেন যে, কেন্দ্রের নিকট থেকে পনের লক্ষ টন খাদ্য-শস্য সংগ্রহ এবং চৌরাকারবারী বন্ধ করতে পারলে খাদ্য সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। ডিফারেন্স নীতি বদল করতে হবে এই মন্তব্য করে তিনি বলেন যে, দু-তিন বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বরম্ভর হতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, এই খাদ্য-নীতি গ্রামের খাদ্য কুড়িয়ে শহরে আনার নীতি নয়।

নিম্নলিখিত সংশোধনসমূহ সহ খাদ্য-নীতি বিধানসভায় অনুমোদিত হয়েছে। (১) মিলের বানি খরচ বস্তা পিছদ আড়াই টাকার স্থলে দু' টাকা দেওয়া হবে, (২) অনুপাদক কোন ব্যক্তি ৫০ মণ ধান বা সেই অনুপাতের চালের বেশি রাখলে সরকারকে হিসাব দিতে হবে। (৩) সেচ এলাকায় দশ একরের বেশি এবং অসেচ এলাকায় বারো একরের বেশি জমির মালিককে ১০ই এপ্রিলের মধ্যে তার উৎপন্ন ধান-চালের পরিমাণের কথা সরকারের নিকট ঘোষণা করতে হবে। পরিবারের মধ্যে মাথাপিছু নয় মণ করে এবং বীজ মজুর খোরাকী প্রভৃতি ব্যবদ একর প্রতি দু' মণ রেখে উৎপন্ন ধানের হিসাবও উক্ত তারিখের মধ্যে দিতে হবে। এরপর সরকারী এজেন্টের কাছে তা বেচতে হবে। (৪) এর পরেও যে সব ধনী চাষীরা সরকারকে ধান চাল দেবে না বা যে সব মজুরদার জনসাধারণের খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আইনানুসারে তাদের ওপর কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

আমরা বাকি শেষ আমরা

অনুসন্ধানের ব্যর্থ চেষ্টা

১৮ই এপ্রিল রাত্রি আমরা চারজন—মাখন, আনন্দ, গণেশ ও আমি হিমাংশুকে দক্ষ অবস্থায় মেটরে নিয়ে শহরে আসবার পর সেই যে এক অশুভ মুহূর্তে অপরিবর্তিতভাবে প্রধান নলের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তারপর ২০শ তারিখ সকল এগারোটো, বারোটো পর্যন্ত চেষ্টা করেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা গেল না। আনন্দদের বাড়িতে খুব আশা করে অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু তাদের কাছ থেকেও কোন খবর পেলাম না। আমরা শেষবারের মত মানসীমা, ছোট্টাদি ও ছোট্টাকোনের নিকট হাতে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

দুপুরবেলা আনন্দদের বাড়ির টিলাটির আশে মাইলের মধ্যে পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা কোন একটি নরাপদস্থানে বিশ্রাম করছিলাম। প্রধান অংশের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আর কি করতে পারি? এই একটি প্রশ্ন আমাদের মনকে আলোড়িত করছিল। গণেশকে চিকেন পুজ ও জ্বরে বেশ কিছুটা যে ক্লান্ত করেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তথাপি গণেশ, বিপ্লবী গণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈন্যবাহিনী, এই দায়িত্ববোধ তাকে একেবারে অস্থির করে তুলেছে। প্রধান বাহিনীর সঙ্গে আছেন চট্টগ্রাম শাখার ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনীর প্রেসিডেন্ট সুবর্ণ সেন। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। শব্দ বনে বনে চিন্তা করলে চলবে না। তাদের খুঁজে বার করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কোথায় খুঁজব? এ প্রশ্ন একেবারে অসম্ভব। তবু আমরা ব্যস্তপারিকর—তাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

আমাদের ধারণা হয়েছিল বিপ্লবী বাহিনীর প্রধান অংশ তখনও শহর থেকে খুব দূরে যায় নি, তারা শহরের উপকণ্ঠ

থেকে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যেই কোন স্থানে হয়ত শিবির স্থাপন করেছে। এত অল্প সময়ে দুর্গম পাহাড়ী জঙ্গলপূর্ণ পথে খুব বেশি দূর যাতায়াত সম্ভব নয়, তা ছাড়া ওরাও নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে যোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে। কাজেই যত কঠিন কাজই হোক না কেন বৃষ্টি, কৌশল ও এফগ্রাতার সঙ্গে ওদের খুঁজে বের করার জন্য আমাদের একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

প্রায় একটা-দেড়টার সময় আমরা চারজন বাজিদবস্তানের (মুসলমানদের একটি দল, অর্থাৎ সব ধর্মমতের লোকই স্থানে পুজো দিতে যেতো) রাস্তা ধরে আরও উত্তরে এগোতে লাগলাম। আমাদের চারজনেরই বাঙালী পোষাক—খুঁটি আর সাট। মাখন ও আনন্দের ফর্সা গায়ের রং ও অল্প বয়স এই দুই বৈশিষ্ট্যই পথচারীদের মনে সন্দেহ উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তবু একরকম বেপরোয়া হয়েই আমরা চারজন ওর মধ্যে যতটুকু সম্ভব সাদা পোষাক পরা পুলিশের C.I.D.-র মত বেশভূষা ও হাবভাবের কতকগুলি বিশেষত্ব বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করলাম। যেমন C.I.D. পুলিশের মত মালকোচা দিয়ে খুঁটি পরা, সাটের হাতা গুটিয়ে কলারটাও বৈশিষ্ট্যস্বরূপ উল্টে দিলাম, পেন্সিল ও নোট-বইয়ের মত করে বুক পকেটে কাগজ গুজে রাখলাম আর C.I.D. অনুচরদের মত হাঁটা চাহনি ও ভাবভঙ্গী সব অনুকরণ করতে চেষ্টা করলাম।

সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথের ধারে বেছে বেছে ছয়-সাতটি পান-বিড়ির দোকানে আমরা গিয়েছি। কখনও পান-বিড়ি কিনছি আবার কখনও বা দোকানে বসে চা খেয়েছি। কেবল এক দোকানে বিড়ি কিনবার সময় চট্টগ্রামের ভাষার প্রশ্ন করি—

“হেঁদুর পোয়া ঐ স্বদেশী অল্

গেল কোঁড়ে? বড় দুরং আইফও বাইড ন পারে মত লার। পান-বিড়ি কিনলে লাই ইঁকা কন কেউ আইসো নি?” (এ সব হিন্দুর ছেলে স্বদেশীরা গেল কোথায়? মনে হচ্ছে এখনও খুব দূরে যেতে পারে নি। পান-বিড়ি কেনা জ্ঞান এদিকে কি কেউ এসেছে?)।

দোকানদার—“কোঁতে কৈয়ম বা- কোঁড়ে গেইয়ে? আরার দোলাসড? তারা কিল্যাই আইব?” (কি করে বলবো বাবু কোথায় গেছে? আমাদের দোকানে কেন তারা আসবে?)।

দোকানদার আমাদের প্রশ্ন দুটো বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল। সে অবশ্য উত্তর দিয়ে গেল কিন্তু তার চোখ-মুখে দেখে মনে আমাদের সম্বন্ধে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে—আমরা কারা? আমানে সাহায্যে আসবে এমন বিশেষ কিছু বলতে পারবে বলে মনে হল না, আ আসরাও তাকে বেশি ঘাঁটাতে চেষ্টা করি নি। তারপর একটি চায়ের দোকানে সামনে বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছি আর তিন চারজনের কথাবার্তা শুনছিলাম। তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝেছি তখনও দূর একেবারে খালি—বাইরে থেকে তখনও মিলিটারী এসে পৌঁছয় নি। কানে এল একজন বলছে—“বাইরে থেকে তারা প্রচুর সেপাই আনবে আর তারপর চট্টগ্রাম শহর একেবারে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে। তখন মজা বুঝবে বাবুদা!” বলাই বাহুল্য তারা সবাই চট্টগ্রামের ভাষার কথা বলছিল। যে বলছিল তার মনের কথা কেড়ে নিয়ে আর একজন বলে উঠল—“কি বলছিস্ মিঞা? তাদের প্রাণে নি কোন ভয়ভর আছে? তারা কি কাউকে পরোয়া করে?”

তাদের মধ্যে এই ধরনের কথা শুনে বেশ মজা লাগছিল। আমরা যতক্ষণ পারি বসি—হয়ত কোন নতুন কথা শুনি বা যদি প্রধান বাহিনীর সম্বন্ধে তাদের কথার মধ্যে কোন হাদিস পাই। কিন্তু

বিশিষ্ট সেখানে বসে আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তাদের সবার উদ্দেশ্য দৃষ্টি আমাদের প্রতি নিবন্ধ ছিল। তাদের চোখমুখ দেখে যে কেউই বুঝবে যে এই চরিত্রন আশঙ্ককে তারা কোনমতে "সাধারণ আগন্তুক" বলে ধরে নিতে পারছে না। তাদের মধ্যে একজন আমাদের প্রশ্ন করে বসলো—

"আপনারা কারা? কোথেকে এসেছেন? কোথায় যাচ্ছেন?"

এইরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন যে হতে পারি সে সম্মুখে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম উত্তর দিলাম—

"আমরা শহর থেকে আসছি। বিদ্রোহীদের খোঁজ পেতে চাই—এই-ই আমাদের ডিউটি। যদি কেউ খবর দিতে পারেন সরকার তাঁকে অনেক পুরস্কার দেবে।"

মনে হ'ল আমাদের পুলিশের গোয়েন্দা বলে তাদের মন স্বীকার করে নিতে চাইছে না। আবার ভাবছে সত্যি যদি আমরা পুলিশ হই তবে তাদের পক্ষে এমন কিছু করা বা বলা উচিত হবে না যাতে তাদের কোন ক্ষতি হতে পারে। তাই আমাদের উত্তর শুনে একটু থেমে গেল। তারপর আর একজন বলল—

"তাদের সংবাদ কি আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব? কোথায় গেছে, কোথায় মুকিয়ে আছে তা কে জানে?... আচ্ছা শহরের খবর কি? এখনও পল্টন এসে পৌঁছয় নি?"

যখন এইভাবে সেই ভয়লোক কথা বলছিল তখন আর যাবা উপস্থিত ছিল তাদের পরস্পরের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে এমন আমাদেরই সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল এবং দু-একটা কথা কানে এল—"এ-উনও স্বদেশী মত লার।" (এরাও যেন স্বদেশী মনে হচ্ছে)।

অবস্থা খুব অন্ধকূলে নয় মনে করে আমরা বৈশিষ্ট্য সেখানে থাকা উচিত হবে না ভেবে চায়ের দাম মিটিয়ে দিলাম। দাম মেটাবার সময় যার সঙ্গে কথা বলছিলাম তাকে চট্টগ্রামের ভাষায় উত্তর দিই, যার অর্থ এই "খুব শীঘ্রই বহু সৈন্য আসছে। সারা শহর ছেয়ে ফেলবে। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের খবর পেতে হবে। আচ্ছা আসি আমরা।" এভাবে আমরা আরও তিন-চার জায়গায় 'বিদ্রোহীদের' সম্বন্ধে নানাভাবে কথা তুলেছি। কোথাও সন্দেহ করেছে, কেউ বা কোথাও উত্তর দিয়েছে, আবার হয়ত একজন প্রশ্ন করেছে—কে আমরা? এক জায়গায় খুব ক্রমাতিকে পড়েছি। একজন আমাদের শাসিয়েছে—"হুঁসিয়ায় থাকবেন। আপনারা উদ্দেশ্য জানলে ও খোঁজ পেলে তারা

আপনাদের মেরে ফেলবে। আমরা যাব কোন বাসেলায় থাকতে চাই না।"

দুপুরে রোদে এইভাবে যোরাঘড়ি করে বেশ ক্রান্ত হয়ে পড়েছি। একদিকে শারীরিক ও মানসিক ক্রান্তি, তার ওপর তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। হেঁটেই বা কি হবে—কোথায় তাদের সন্ধান পাবো? পুলিশ-লাইনের দু-তিন মাইলের মধ্যে এবং পাঁচলাইশ রেল-স্টেশনের আশে মাইল অন্তর্ভুক্ত। রেল-লাইনের ধারে একটি গাছের ছায়ায় আমরা বসে পড়ি। কোথায় একটু জল পাবো? যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর চারিদিকে চরে দেখছি—যদি কোথাও জলের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে। পুকুর, ডোবা, টিউবওয়েল বা কোন চাষীর বাড়ি কিছুই চোখে পড়ে নি। দূরে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে যখন জলের সম্মানে বাস্তু তখন কে জানতো আমাদের কাছেই আছে তৃষ্ণা নিবারণের কল। যেখানে বসেছি তারই কয়েক হাতের মধ্যে দেখতে পেলাম একটি তরমুজ ক্ষেত। প্রচুর তরমুজ। তৃষ্ণা যেন এখন আরও বেড়ে গেল। তরমুজ পেলে যেন এখনই খাই। সামনেই একজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করি এই তরমুজ ক্ষেতটি কার এবং অভিপ্রায় জানালাম—আমরা তরমুজ কিনতে চাই। সৌভাগ্য আমাদের, সেই কুবকটি স্বরং তরমুজ ক্ষেতের মালিক। বরস তার প্রায় তিরিশ হুই—জাতিতে মুসলমান। তার কাছে আমাদের নিবেদন জানাই—তরমুজ কিনতে চাই। বড় বড় দু'টি তরমুজ সে খুব খুশি মনেই এনে দিল। ন্যায্য মূল্যে আমরা তা কিনে নিলাম।

তরমুজ দুটো কেটে ছোট ছোট ফালি করে আমরা খেতে শুরু করি। কেউ বসা কেউ বা অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলাম। আমাদের তরমুজ ভক্ষণের দৃশ্য হয়ত খুবই উপভোগ্য হয়েছিল, নইলে সেই চাষীভাই সেখানে দাঁড়িয়ে নিবিস্টচিত্তে কি দেখছিল? আপন মনে আমরা যে যা পেয়েছি খেয়ে চলেছি। এমন সময় আমাদের চমকে দিয়ে চাষীভাই বলল—"বাউ উইক্যা চাতক্। দেইখান নি সিপাই অল্‌ আইয়ের যে? হেঁদুর পোয়া দেইলে তারা ধরব। অনিরা বাই যাতকগে।" (বাবু এ দিকে দেখুন। দেখেছেন সিপাই আসছে? হিন্দুর ছেলে দেখলে তারা গ্রেফতার করবে। আপনারা পালিয়ে যান)।

সত্যি দেখলাম বহু সৈন্য High Port-arms-এর পাজিসনে, অর্থাৎ বৃক্কের সামনে আড়আড়ভাবে দাঁড় হাতে বন্দুক ধরে প্রস্তুত হয়ে চলেছে যেন কোন আসন্ন শত্রুর সম্মুখীন হবে। প্রত্যেকটি রাইফেলের মাথায় সগুন

চড়াই ছিল। সৈন্যরা রেল-লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছিল আমাদের দিকে। সৈন্যদের প্রতি যখন চাষীভাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তখন আমরা ও তাদের মধ্যে ব্যবধান প্রায় এক শ' গজের মত। কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল তা সঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তবে আমরা যে তাদের লক্ষ্যবস্তু নয় তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় নি। কিন্তু তবু তাদের গতিপথেরই ধারে একটা গাছ-ভায়ায় আমরা বসেছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা যে আমাদের সন্দেহ করবে না সে কথা ভাবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া এই পল্টনের সঙ্গে চট্টগ্রামের পুলিশবাহিনীর কর্মচারীরা যদি থাকে তবে গবেষণা ও আমাদের দেখতে পেলেই যে চিনবে তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। এত সব কথা লিখতে বা পড়তে বা সময় লাগছে তার সহস্র ভ্রমশংকর এক অংশেরও কম সময়ে আমাদের মনে এ সব চিন্তা হয়েছে। সৈন্যদের দেখামাত্র আমাদের হৃদয় 'আসন্ন ভয়ে' কেঁপে উঠেছে। এই ভয় মৃত্যু ভয় নয়। এখন আমাদের চিন্তা, আমাদের পরিকল্পনা—যে কোন উপায়ে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে সংযোগস্থাপন করা। তাই এই অপ্রত্যাশিত বিপদের সামনে পড়া আমাদের কাছে খুবই অবাঞ্ছিত—আশ্চর্য্যলক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই যেন সব শেষ হয়ে না যায়—সেই জনাই ভয়। কিন্তু বিপদ তখন ঘরের দরজায়, আর আমাদের তো বিপদ-সমুদ্রেই বাস, শিশির-বিন্দুত্বা এই সামান্য বিপদ কি আমাদের মনে সাহসের অভাব ঘটতে পারে?

সাহস আছে ঠিকই, তবু অজানা আশঙ্কার বুক কাঁপছে—এইরূপ ক্ষেত্রে বুক কেঁপেই থাকে। কোমরবন্ধের সঙ্গে রিভলভারগুলিকে চাষীভাইয়ের অজান্তে একটু ঠিক করে নিলাম—যেন সময়ে ব্যবহার করতে একটুও দেরি না হয়। সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চাষীভাই বেরূপ বন্দুকের সাহায্য করেছে, তার জন্য তাকে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করতে পারি নি। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ভাব রেখে চাষীভাইকে চট্টগ্রামের ভাষায় উত্তর দিলাম—"সিপাই আইয়ের ত' আরার কি? আরার চোর না? ধাইর কেয়া?" (সিপাই আসছে তো আমাদের কি? আমরা কি চোর? পালাব কেন?)।

মুখে তো খুব বড়াই করে চাষীভাইকে জানালাম সেপাই আমাদের কি করবে, পালাবো কেন—ইত্যাদি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থাটা। মনে মনে প্রমাদ গণেছিলাম—করক-মিনি-টের মধ্যে সমুদ্র-সমরে আমাদের প্রাণ দিতে হবে। তবে কেবল স্থাপ দেব না—

প্রাণ নেবও। সফটস্ময় মহুতগুণি
কিভাবে কেটেছিল তা' লিখে বোঝানো যায়
না। সেপাইরা মাচ' করে আসছে। বিশ-
গ্রিশ গজ মাত্র বাকি। আশ্চর্য! আমাদের
দিকে তাদের লক্ষ্য একেবারে ছিল না।
তারা তো যাচ্ছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ
করতে। রেল-লাইনের ধারে সাধা পোষাকে
সাধারণ চারজন লোকের মধ্যে স্বয়ং
বিপ্লবী বাহিনীর সৈন্যাবধি ও সহকারীরা
যে বসে আছে তা' কি করে বুঝবে তারা।
উদাত্ত সঙ্গীন হাতে সৈন্যদল রেল-
লাইনের বাঁ দিকে, অর্থাৎ উত্তরে নেমে
নিকটস্থ পাহাড়ের দিকে রওনা হল।
আমরা বসেছিলাম লাইনের অপর পারে—
দক্ষিণে। খুব বেশি হলেও আমাদের
ওখান থেকে বিশ-পঁচিশ গজ সামনে
দিয়ে আমাদের প্রক্ষেপ না করেই তারা
পাহাড়ের দিকে বিদ্রোহীদের খোঁজে
চলে গেল।

এখন বিকেল প্রায় চারটে-সাতটে
হবে। বিশ তারিখ বিকেলে যখন আমরা
সৈন্যবাহিনী দেখতে পাই তখন অনুমান
করেছি অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে
ব্রিটিশ সরকারের সৈন্য চট্টগ্রামে এসে
পৌঁছেছে। বিশ তারিখ সকাল পর্বন্ত
সামরিক শক্তির Balance of Power
আমাদের দিকে ছিল আমরা যদি তখনও
offensive নিতাম তা'হলে আমাদের
দৃঢ় বিশ্বাস অবশিষ্ট শক্তি যা' ছিল তা'
নিরে ইংরেজদের Defensive Position
নেওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

বিশ তারিখ রেল-লাইনের ধারে
পাহাড় অভিমুখে যে সৈন্যবাহিনীকে যেতে
দেখতে পাই তার বিশদ বিবরণ আমরা
মামলা চলাকালে পেয়েছি। জাক্সেন্ট
কপি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"On the morning of the
20th April, a detachment of the
Eastern Frontier Rifles consist-
ing of about 120 men under
col. Dallas Smith arrived from
Dacca accompanied by Mr.
Lowman, the Inspector Gene-
ral of Police, and the same
day a small detachment
consisting of about 30
men of the Surma Valley
Light House (Auxiliary
Force) also arrived. With the
help of these reinforcements
the local authorities set about
the task of locating and cap-
turing the raiders, who, it was
suspected, had retired into the
jungle clad hills which extend
north-eastwards from the police

lines. On the afternoon of
20th April Mr. Lowman, Col.
Dallas Smith, Mr. Johnson and
Mr. Shooter with a party of
about 100 men searched these
hills up to Nagarkhana hill
about two miles from the lines.
On the Nagarkhana hill they
found a piece of a black velvet
badge with silver embroidery
like those found at the police
lines, and at the house of
Ganesh Ghose and Ananta
Singh...." (Judgement, Armo-
ury Raid case No I, Page—68).

(কর্নেল ডালাস স্মিথের অধীনে ঢাকা
থেকে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ারস রাইফেলস রেজি-
মেন্টের একশ' বিশজন সৈন্য কুড়ি তারিখ
সকাল বেলা এসে পৌঁছয়। পদলিখের
ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান তাদের
সঙ্গে এসে পৌঁছলেন। সেইদিন তিরিশ-
জনের আরও একটি ছোট সৈন্যদল—যুরমা
ভ্যালি লাইট হর্স (অরিলিয়ারি ফোর্স)
এসে গেল। চট্টগ্রামের কতৃপক্ষ এই সব
সৈন্যদের আগমনে নব-শক্তিতে বলীয়ান
হয়ে বিদ্রোহীদের সম্মান পাওয়া ও তাদের
পাকড়াও করার জন্য উঠে পড়ে লাগল।
তারা অনুমান করে বিদ্রোহীরা পদলিখ
লাইনের উত্তর-পূর্বে বনজঙ্গলে আবৃত
পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। কুড়ি তারিখ
বিকেল বেলা মিঃ লোম্যান, কর্নেল ডালাস
স্মিথ, মিঃ জনসন ও মিঃ শূটার একশ'জন
সৈন্য নিয়ে নাগরখানা পাহাড় অনুসন্ধান
করে। পদলিখ লাইনের দু' মাইল দূরে
এই পাহাড়টি অনুসন্ধান করে রূপালী
জরির কাজ করা কালো ভেলভেট ব্যাজ
তারা কুড়িয়ে পায়। একই রকম ভেলভেট
ব্যাজ কতৃপক্ষ পদলিখ লাইনে এবং গণেশ
বোষ ও অনন্ত সিংহের বাড়িতেও
পেয়েছে।

সরকারীপক্ষের সব বিবৃতি বিশ্লেষণ

করেই প্রমাণ করা যায় যে, তাদের অনেক
কথাই মিথ্যা বানানো এবং বিভ্রান্তকর।
সরকারীপক্ষের মিথ্যা উদ্ঘাটন করার
উদ্দেশ্যে আমি বিপ্লবী যুগের এই
অধ্যায়টি লিখছি না। তবে সরকারীপক্ষের
একেবারে জাজুল্যমান মিথ্যার স্বরূপ
প্রকাশ করবার প্রয়োজন আছে—অন্তত
একটি বিশেষ ক্ষেত্রে। তারা জালালাবাদ
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে সেই
রাতে পালিয়ে এসেছে। অদ্রাশ্তভাবে এই
স্বীকারোক্তি তারা মামলার সময় দিয়েছে।
এই বর্ণনা আমরা পরে পাব। যেহেতু
তারা জালালাবাদ রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছে
সেইহেতু তাদের অপ্রাপ চেষ্টা দেখতে
পাই একটা মিথ্যা সাফাইয়ের আবরণে
তাদের সেই পরাজয়ের প্লানিকে ঢেকে
রাখবার। পরে তাদের উক্তি থেকে জানতে
পারব—জালালাবাদ যুদ্ধে বিদ্রোহীদের
বিরুদ্ধে তারা মাত্র চৌষট্টিজন সৈন্য
পাঠিয়েছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।
২০শে এপ্রিল অনুমানের ওপর নির্ভর
করে খোঁজাখুঁজি করবার জন্য যাদের
একশ'জন সৈন্য সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন
হয়েছে তারাই আবার যুদ্ধ অনিবার্য জেনে
মাত্র চৌষট্টিজন সৈন্য জালালাবাদ রণক্ষেত্রে
পাঠিয়েছে বলে সত্য মাপনের যে চেষ্টা
করেছে তাতে তারা হাস্যাস্পদ হয়েছে। এই
সব তথ্য আমি পরে প্রকাশ করব। এই
বিষয়ে পরে বুঝতে সুবিধা হবে বলে
আমি এইটুকু এখানে বলে রাখছি যে তারা
স্বীকার করেছে একশ' সৈন্য নিয়ে বিশ
তারিখ বিদ্রোহীদের ঋজুতে গিয়েছিল।

আর একটি কথা। খুব সাধারণ
বুদ্ধিতেও বুঝতে পারা যায় যে, কতখানি
অসত্য তারা আমাদের বিশ্বাস করতে
বলছে—বিশ তারিখ সকালে ১২০ ও ৩০
জন সৈন্য চট্টগ্রামে এল এবং মাত্র পঞ্চাশজন
সৈন্য শহর জয়বাহানে রেখে একশ'জনকে
নিরে বিদ্রোহীদের বন্দী করতে গেল।
আমি পরে দেখাবো যে মিঃ উইলকিনসন,
জেলা শাসক, নিজ যুদ্ধে বলেছেন, শহর

Profs. Basu, Mukherji's Engineering Guides 1967

Shibpur, Durgapur, Jalpaiguri, Jadavpur etc. 7 years
Ques. & Ans. up to 1966 8-50. Science in Bengali 4-50.

(2) I. I. T. Kharagpur, Kanpur, Delhi etc. 7 years
Ques. & Ans. up to 1966. 7-50. (3) Marine Engg.
Calcutta & Bombay. 8-50. (4) B. O. A. T. Admission
Guide. 9-50. Guide to Murshidabad Technology. Previous
Questions & Ans. up to 1966. 5-00.

Oriental Book Agency 2B, Shyama Ch. De St., Cal.

আক্রান্ত হতে পারে এই আশঙ্কা করে তিনিই সুবাইকে জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে শহরের নিরাপত্তার জন্য ফিরে আসতে আদেশ দিয়েছিলেন। যাদের কাছে শহরের নিরাপত্তা সব প্রধান তারা মাত্র পশ্চাৎজন সৈন্য শহরে রেখে আমাদের বন্দী করার জন্য একশ' সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন—এটা অবিশ্বাস্য। পরে আমরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি তা থেকে নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে, ২০শ তারিখ সকাল বেলা Eastern Frontier Rifles-এর এক ব্যাটালিয়ন, প্রায় ৭৫০ বা ৮০০ সৈন্য, ও Surma Valley Light House-এর দুটি কোম্পানী—প্রায় ৩৫০ জন সৈন্য চট্টগ্রামে এসে পৌঁছল।

আরও একটা বিশেষ জিনিস বিপ্লবীদের বৃদ্ধবার আছে। Internal Security (অন্তর্ভর্তী নিরাপত্তা) রক্ষা করার দায়িত্ব কত পক্ষের কাছে সর্বপ্রধান; এবং সেইজন্যই তারা প্রাদেশিক রাজধানী কলকাতা থেকে কোন সৈন্য অপসারণ করা সমীচীন মনে করে নি। কিভাবে এবং কতখানি প্রাদেশিক কত পক্ষ কলকাতার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল সেই তথ্যও আমি পরে লিখব। চট্টগ্রামে আকস্মিক যুব-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবার পর তারা বিস্মিত হয় এবং বিপ্লবীরা কতখানি প্রস্তুত তা প্রথমে বুঝতে পারে নি। সেই জন্য আকস্মিক আক্রমণে যদি বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতাও বিধ্বস্ত হয়, সেই আশঙ্কায় নিরাপত্তার প্রাথমিক নীতি অনুযায়ী ইংরেজ কত পক্ষ কলকাতাকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য সচেষ্ট ছিল। সেইরূপ বিবেচনা করেই তারা ঢাকা থেকে সৈন্য পাঠাল। ১৯৩০-সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি ছিল অতি সামান্য। প্রধান শহর বা রাজধানী যদি হৃদয়গত অর্ধকৃত আক্রমণে দখল করা যায়, তবে ব্রিটিশ সরকারকে পরাস্ত করার জন্য সেটি যে কার্যত একটি বাস্তব রণনীতি তা আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু অতীতের বহু ব্যর্থতার ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতা থাকায় সেইরূপ ব্যাপক পরি-ক্ষপনা ও সংগঠন গড়ে তুলবার জন্য আমরা চেষ্টা করি নি তা আগেই বলেছি। আমাদের অজ্ঞতার জন্য নয় অক্ষমতার কারণবশতই রাজধানী আক্রমণের প্রায় করতে পারি নি সেই যুগে। সেই পরি-স্থিতিতে ভেবেছিলাম যদি একটি বিপ্লবী দল নিজেদের সীমিত শক্তি নিয়ে গোপন-ভাবে সব আয়োজন সম্পন্ন করে একটি জেলাও অধিকার করতে পারে তবে, সেই সফলতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কেন ভারতের বিপ্লবীরা ইংরেজ শাসন অবসানের

জন্য আত্মপ্রত্যয় পাবে না, কেন কলকাতার মত প্রধান শহরে দশটি করে সেইরূপ দুর্ভেদ্য বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে পারবে না? সুব' সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের যুবকেরা 'ভবিষ্যতের পানে' তাকিয়ে এইরূপ একটি বিপ্লবী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিল। Example is greater than precepts!—বাস্তব দৃষ্টান্ত নীতিবাক্য থেকে অনেক বেশি কার্যকরী।

এদিকে আমরা তখনও ভরমুজ্জ হাতে বসে—আর এক হাতে রিকলভারটি চাষী ভাইয়ের দৃষ্টির অগোচরে অনুভব করছিলাম। সৈন্যরা আমাদের বেন অবহেলা করেই দুর্ভেদ্য বিপ্লবীদের “বন্দী” করার উদ্দেশ্যে বীরদর্পে নাগরখানা পাহাড়ের দিকে চলে গেল। এই নাগরখানা পাহাড়ই সেই অতীত বিপ্লবী ঐতিহ্য বহন করছে। এই সেই পাহাড় যার পাদদেশে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে মুখোমুখি চৌকি-দুয়ের মধ্যে আমার গুলী বিনিময় হয়; ঐই সেই পাহাড় যার বৃকের ওপর আমার দ্বিভুজভারের গুলীতে আহত হয়ে রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়েছিল দুইজন সিপাই ব্রীফমোহন ও আলি হোসেন; এই সেই পাহাড় যার প্রশস্ত হৃদয় সেই দিন ভবিষ্যৎ বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে মাস্টারদা, নির্মলদা ও রাজেন দাসের পটাসিয়াম সামানাইডের সাহায্যে চিরনির্মিত দেহকে কোন এক মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করে তুলেছিল; এই সেই সম্পদ-বেষ্টিত পাহাড়, ১৯২০ সালে একজন সহৃদয় চাষীর সাহায্যে যাত্রা দৃঢ় বেঠুনী ভেদ করে থোকা, অবনী ও আমি বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছি। নাগরখানা পাহাড়ের সেই বিপ্লবী ঐতিহ্য আজও কর্নেল ডালাস, স্মিথ ও মিঃ লোম্যানের সৈন্যদের বিমূষ করেছে—শত্রুপক্ষকে সেইদিন বিপ্লবীদের পরিত্যক্ত ডেলভেট ব্যাজ কুড়িয়ে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের এই নাগরখানা পাহাড়ের কাছাকাছি আমরাও ঘুরেছি—দেখা পাই নি। চট্টগ্রামের বিস্তৃত গিরিপ্রেণী সম্বন্ধে যদিও কিছু ধারণা আছে তাঁরা বুঝবেন খুব কাছাকাছি যদি বন-জঙ্গল ঘেরা পর্বতের আড়ালে অবস্থান করা যায় তাহলে অপর পক্ষ তা সহজে জানতে পারবে না—যদি পাহাড়ের আড়ালে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকার জন্য হঠাৎ অজ্ঞাতে শত্রুপক্ষের গুলীতে গিয়ে না পড়ি। এই কারণে একেবারে আন্দাজে পাহাড়ের মধ্যে তাদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু ভেবেছিলাম তারা লোকালয়ে কাউকে না কাউকে না পাঠিয়ে পারে না, কারণ তাদের সঙ্গে আহারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। খেতে তো হবেই। তাই আশা করে-

হিলাম যদি কোন দোকানে তাদের কারও সম্বন্ধে জানতে পারি যে কেউ সেখানে এসেছে, তবে কাছাকাছি পাহাড় অনু-সন্ধান করে দেখার চেষ্টা করব। কিন্তু সকল চেষ্টা যখন অগাধত নিষ্ফল হোল তখন ভাবতে লাগলাম আর কি করা যায়।

আমাদের কাছে এখন প্রশ্ন হোল—আমরা কোন পাহাড়ে লুকিয়ে থাকব না কি গ্রামে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেব, না কি আবার শহরেই ফিরে যাব? শহরে ইতিমধ্যে মিলিটারী এসে গেছে, কাজেই সেখানে বিপদ মাথায় নিয়ে যাওয়ার উচিত সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকতে পারে—তবুও একটি কারণে শহরে ফিরে যাওয়াই সাবাস্ত করলাম। আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝেছি মাস্টারদার আমাদের খোঁজ না করে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন তা সম্ভব না। আনন্দের বাড়িতে খোঁজ নেওয়ার জন্য কাউকে পাঠান নি সত্যি—তাই স্বভাবত অন্য কোথাও সংবাদবাহককে পাঠিয়েছেন অনুমান করা যায়। তবে আর কোথায় প্রধান বাহিনী থেকে সংবাদবাহক যেতে পারে? এইরূপ নানা চিন্তা করে স্থির করি সতীদার (সতীভূষণ সেন) সঙ্গে শহরে দেখা করতে চেষ্টা করব। তাঁর কাছ থেকে শহরের খবরাখবর পাবো, আর চট্টগ্রামবাসীর প্রতি-ক্রিয়া কিরূপ তারও একটি বাস্তব চিত্র তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। সতীদার কাছে যাওয়ার মধ্য উদ্দেশ্য অবশ্য এটি নয়। আমাদের মনে একটু আশা ছিল যদি মাস্টারদারা কাউকে সতীদার কাছে আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়ে থাকেন। তারপর ভেবে স্থির করি যদি শহরে প্রবেশ করা খুব দুঃসাধ্যও হয় তবু সতীদার কাছে একবার যাওয়ার জন্য চেষ্টা কবে দেখতে হবে।

আর রেল-লাইনের ধারে বসে সমস্ত কাটান নিশ্চয়োজন। ধীরে ধীরে শহরের দিকে এগোতে লাগলাম। কাছাকাছি কয়েকজন লোক সেই চত্বরে সৈন্যদের আবির্ভাব দেখেছে ও আমাদের চারজনের গতিবিধিও লক্ষ্য করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের দেখে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে লাগল—আমরা কারা? কেউ কেউ আমাদের প্রশ্ন করেছে আর আমরা তাদের যথাযথ উত্তর দিয়েছি। কেউ সন্তুষ্ট হয়েছে কেউ বা সন্দেহ করেছে। তাদের মধ্যে একজন মাতঙ্গর গোছের লোক বেশ উত্তেজিত হয়ে আমাদের পরিচয় জানতে দাবি করে। আমাদের কোন কথাই তার বিশ্বাস জন্মাতে পারে নি। সে আমাদের থেকে পঁচিশ গ্রিণ গজ ব্যবধান বজায় রেখে সমানে অনুসরণ করছে। আমরা একটা জোরে জোরে হাটছিলাম। সেও হুঁ

হাটতে সুর্য করল এবং খুব চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করতে চেষ্টা করছে। আমরা স্বদেশী, আমরা ডাকাত, আমরা পালাচ্ছি, আমাদের ধরতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে—ইত্যাদি বলতে বলতে লোকজন ডাকডাকি করছিল। দেখতে দেখতে তার সঙ্গে প্রায় দশ পনেরোজন লোক যোগ দিল। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হতে চলেছে। তাদের সঙ্গে কোন কথা বলে যে কিছু সর্বাধা করা যাবে সেও উপস্থিত ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে বত দূর সম্ভব তাদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে দ্রুত কোন পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়াই প্রের মনে করি। শহরের দিকে যাওয়ার পথেও মাঠ দিয়ে মাইলখানেক এগিয়ে গেলে পর্বতশ্রেণীর সংস্পর্শে আসা যায়। তাই সেইরূপ পাহাড়ের সারি লক্ষ্য করে আমরা মাঠের মধ্যে নেমে পড়লাম। সেই উত্তেজিত লোকের দলটিও মাঠের ওপর দিয়ে হাটতে লাগল। এ কি বিভ্রাট! এও যেন ১৯২০ সালের অতি শোচনীয় অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। রেলের টাকা লুট করার পর “সুলুকবাহার” বাসগৃহের দরজা থেকে আমাদের ছজনকে বারো মাইল পথ কিন্তু জনতা পুলিশ ও দফাদারদের প্ররোচনায় অনুসরণ করেছিল। এও কি সেইরকমেরই এক অব্যাহত অবস্থা! সৌভাগ্য আমাদের যে এই কপিট লোক খোলা মাঠে বারো মাইল অনুসরণ করবার সুযোগ পায় নি। আমরা মাইলখানেক পথ অতিক্রম করে একটা পাহাড়ের অন্তরালে প্রবেশ করি। তখন সূর্য প্রায় অস্ত যাওয়ার মুখে। তাই সেই কিন্তু দলটি নিরস্ত হোল আর আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সন্ধ্যা নেমে এল। আমরাও ইতিমধ্যে শহরের উত্তর প্রান্তে প্যারেড গ্রাউন্ডের রাস্তায় এসে পৌঁছোছি। ১৯শ তারিখে দক্ষিণ প্রান্তের কর্ণফুলী নদীর তীর হতে শহরে ঢুকেছিলাম। সেই দিন সন্ধ্যায় জনমানবহীন পরিত্যক্ত শহরের বৃক্কের ওপর দিয়ে আমরা তিনজন হেঁটে বেড়িয়েছি। ২০শ তারিখ সকালে বা দুপুরে মিলিটারীর সমাগম হয়েছে। আজকের সন্ধ্যায় উত্তর প্রান্তের পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে শহরে প্রবেশ করছি। আজ আমরা চারজন—সঙ্গে আনন্দও আছে। আজকেও কি শহর গত সন্ধ্যার মত পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকবে?

আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। তবু সাবধানতার সঙ্গে শহরে প্রবেশ করি। অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তা ঘরে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের পাশ দিয়ে এসেছি; বিভাগীয় কমিশনারের বাংলার পাহাড়ের

নিচের রাস্তা অতিক্রম করে সতীদার বাড়ির কাছে নন্দনকাননে এলাম। কিন্তু কে মিলিটারী? বিভাগীয় কমিশনারের বাংলোতে আলো দেখা যাচ্ছে না কেন? চট্টগ্রামে ইতিমধ্যে মিলিটারী আনা সত্ত্বেও শহরের defined target বর্জন করে চলার রণনীতি কতৃপক্ষ প্রের মনে করেছে। স্টীমার, জেট, পাহাড়তলীর সাহেব কলোনি নিয়ে চট্টগ্রামের ইংরেজদের সন্দেহ বৃদ্ধি রচনা করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় ও রাতিবেলার অতিক্রান্ত আক্রমণের সম্ভাবনাকে রোধ করবার জন্য রণ-কৌশল অনুযায়ী বিপ্লবীদের আকস্মিক আক্রমণের সর্বাধা ও সর্বোপায় হতে বাধ্যতাপূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে তারা কোন বিচ্ছিন্ন target বা লক্ষ্যবস্তুর অস্তিত্ব ২০শ তারিখ রাত্রেও না রাখাই উচিত মনে করেছে। তাই বিভাগীয় কমিশনার তাঁর বাংলা পরিচালনা করে নিরাপদস্থানে চলে গেছেন।

আমরা একেবারে সতীদার বাড়ির কাছে এলাম। নন্দনকাননে প্রতি ঘরে ঘরেই আমাদের চেনে। তখন রাত প্রায় সাতটা-আটটা হবে। কিন্তু রাস্তায় লোক নেই। ঘরে আলো জ্বলছে না। সব বাড়ির দরজা বন্ধ। তবে মনে হোল সতীদার বাড়ির পাশের বাড়িতে কোন বিয়ের উৎসব চলছে। বিয়েবাড়ি, হেঁটে নেই, দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি কিছুই দেখা যাচ্ছে না, মিটমিট করে আলো জ্বলছে। তবু মনে হ'ল প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন পাড়ার লোক নৈমন্তিক রক্ষা করতে এসেছে। বাড়ির সামনে কোন গাড়ি-বোড়া না থাকায় দূরের কোন আতিথি আসে নি বলে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল। তবু এত লোক! কে গিয়ে সতীদারকে ডেকে আনবে? আমাদের কাউকে পরিচিত কেউ দেখবে বলে কোন ভয়ই মনে ছিল না। কেবল সতীদার কথাই ভাবছিলাম—যদি আমাদের সঙ্গে সতীদারকে কোন গুরুতর দেখে ফেলে তবে ভবিষ্যতে, আমাদের আসবার জন্য, তাকে শব্দে শব্দে পুলিশের হাতে কট পেতে হবে। তাই এত ভাবনা—এত সাবধানতা!

সতীদার কাছে মাখনকে পাঠানোই সাবাস্ত হ'ল। মাখন বৃষ্টি ও কৌশলের সঙ্গে সতীদার কাছে গেল এবং তাকে জানাল যে আমরা তাঁর জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছি। সংবাদ শেরে সতীদার তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন। তিনি সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানালেন—গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন। আমরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ি।

সংক্ষেপে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা

হ'ল। আমরা কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাড়ার বিবরণ দিই, প্রধান বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য কিভাবে চেষ্টা করছি তাও বলি এবং জানতে চাইলাম যে তখনও তাঁর কাছে কেউ মাস্টারদার কাছ থেকে আমাদের খোঁজ নিতে এসেছে কি না? না, তখনও কেউ আমাদের খোঁজে আসে নি। পরে আমরা জেনেছি প্রধান বাহিনীর সব খবর দিয়ে আমাদের খোঁজ নিতে দু'জনকে সতীদার কাছে পর পর পাঠানো হয়েছিল। তারা কেউ-ই সতীদার কাছে তো যায়ই নি এমন কি ফিরে গিয়ে মাস্টারদারের যে খবর দেবে তারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি। তারা আমাদের সংগঠনের গ্রামাঞ্চলের অংশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তাই পুলিশ কোন প্রকারে তাদের নাম ও পরিচয় জানতে পারে নি। আর তারাও পুলিশের অস্ত্র-তার সুযোগ নিয়ে দাঁড়া বাড়ি ফিরে গেল—শহরেও ঘুরে বেড়িয়েছে। আমাদের নামলার সময় তাদের মধ্যে একজনকে জেল ও কোর্টে আসা-যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। দু'পক্ষ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার ভুল সংশোধন করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু দু'ভাগী আমাদেরই—ভুলের মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর—তবু সংযোগ স্থাপন হ'ল না।

সতীদার কাছে চট্টগ্রামবাসীর আশঙ্কা, উৎসাহ ও সমর্থনের কথা শুনলাম। তিনি জানালেন যাদের সাপেই পাড়ার কথা হয়েছে তারাই একবাক্যে বলছে যে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজের বিরুদ্ধে আর এইরূপ সশস্ত্র আক্রমণ কখনও হয় নি। তারা চট্টগ্রামের বিপ্লবী সন্তানদের এই মহান অবদানের প্রতি হৃদয়ের আন্তরিক প্রশংসা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে—তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করছে, পুজো দিচ্ছে—তোমাদের স্বার্থ ত্যাগ, আত্মবলি, সাহস ও বিক্রমের আদর্শ যেন বিপ্লবী ভারতকে উদ্ভূত করে এই আমাদের একমাত্র কামনা!

সব মনে নেই। সতীদার আবেগভরে আনন্দে ও উৎসাহে অনেক কথা বললেন। তাঁর কাছে এসে সতীদার আমরা আরও সজীব হয়ে উঠলাম, প্রেরণা পেলাম। সতীদার কাছে আমাদের পথের প্রয়োজনে টাকা চাইলাম। তাঁর বাড়িতে খরচের জন্য যা দু'একশ' টাকা ছিল সবই আমাদের এনে দিলেন। আমরা বিদায় নিলাম। তিনি বৈয়াকব অভিনন্দন জানালেন। স্বতন্ত্র তাঁর চোখের সামনে থেকে আমরা অন্তর্ধান করি নি ততক্ষণ তিনি একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমরা চট্টগ্রাম শহরের বৃক্ক মিলিয়ে গেলাম।

শৈশবলামার চেয়ে উত্তরবঙ্গ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ॥

কোনরূপ তথ্যানুসন্ধান না করেই একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, শিক্ষার দিক দিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই উত্তরবঙ্গেও পশ্চাৎপদ রয়েছে এখনও পর্যন্ত। বিভাগ-পূর্ব দিনাজপুর জেলা সম্পর্কেও একথা বলা চলত। ইংরাজ আগমনের সময় থেকেই এই জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে দেখা যাবে যে—ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনে যে সমস্ত স্থানে নিয়মিতভাবে বসবাস করত—ঠিক সেই স্থানগুলি মাত্র শিক্ষার দিক দিয়ে ক্রমশ উন্নত হয়ে ওঠে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য—তবে প্রশাসনিক নীতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর একটা সার্বিক গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হলেও শিক্ষার দিক দিয়ে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। পশ্চিম দিনাজপুরে একমাত্র কৃষি ব্যবস্থা ছাড়া, বন, খনিজ সুবিধা, শিল্প প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগই ইংরাজদের সামনে ছিল না। কোনও কোনও সময়ে দিনাজপুরের কিছু কিছু অংশে নীলচাষ করা

হত বটে—কিন্তু তা তেমন বিশেষ লাভজনক ছিল না বলে নীলকররা ক্রমান্বয়ে মিস্ট্রিস প্রচারেই বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ত। পার্শ্ববর্তী জেলা মালদহে রেশম-কীটের ব্যবসা যখন জাঁকিয়ে ওঠে, তখন দিনাজপুরের অন্তর্গত কয়েকটি সমৃদ্ধ অংশে রেশমের কারবারও গড়ে ওঠে। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গ ও মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ীরা দিনাজপুরের এই সব রেশমের আড়ত থেকে কেনাঘোড়া সূত্র করে—এবং তার ফলে মিস্ট্রিসের কিছু ইউরোপীয় দিনাজপুরের ওই সব এলাকায় এসে বাস করলেও স্থানগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে কোনরূপ প্রচেষ্টা চালায় নি। পক্ষান্তরে কোচবিহার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে বসবাসকারী ইংরাজ সিভিলিয়ানরা দ্রুত শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে যত্নবান ছিল।

বিগত শতক থেকে ইংরাজদের সেই ধারাটিই বয়ে চলে এসেছে এবং তারই ফলে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান এগিয়ে গিয়েছে, দিনাজপুর ও মালদহ জেলা তার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে নি। তাছাড়াও আরও একটি কারণ হল দিনাজপুর জেলার উর্বর জমি ও অত্যধিক উৎপাদন ব্যবস্থা। এই জেলার

কৃষির উন্নয়ন করা যেতে পারে পূর্ববঙ্গের কৃষি ব্যবস্থার পরেই। ফলে কৃষিজীবীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে উত্তরবঙ্গের মধ্যে দিনাজপুরেই সবচেয়ে বেশি এবং অন্যান্য অকৃষিজীবীরাও কৃষিসংক্রান্ত ব্যবসা ও কর্মে লিপ্ত থাকার দরুন শিক্ষার অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। ১৯০১ সাল থেকে শিক্ষার একটি মোটামুটি অগ্রগতি হয়েছিল ঠিকই—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল দেশবিভাগের সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এলাকা এবং শিক্ষিত অধিবাসীদের অধিকাংশ সহ বেশির ভাগ স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বিভাগের পর এই বিষয়টি সম্ভবত কতৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ফলে পশ্চিম দিনাজপুরের সমগ্র অংশেই ব্যাপকভাবেই শিক্ষার উন্নয়ন চলছে। বালুরঘাট কলেজের জনৈক অধ্যাপকের অভিমত অনুযায়ী—শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি এদিকে জাগ্রত থাকলেও মুন্সিফ হল, এই অঞ্চলের জীবনধারা পশ্চাতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রের প্রাথমিক ভিত্তি এখনও দুর্বল। অন্যতম এই জেলার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষাই বিনা ব্যয়ে এবং বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সরকারী প্রচার বিভাগকেও তৎপর হতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বপ্রকার ব্যয়ই বহন করতে হবে।

পশ্চিম দিনাজপুরে বিভাগান্তর কালে শিক্ষার অগ্রগতি কিরূপ ঘটেছে তার একটি দশম বার্ষিক সমীক্ষা এখানে গ্রহণ করা যাক। ১৯৫১ সালে পশ্চিম দিনাজপুরে শিক্ষিতের হার ছিল ১০.৫০ এবং ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭.০৬, এবং এই সংখ্যা মোটেই অবহেলার ষোণ্য নয়। ১৯৫১ সালের জনগণনায় ৫ থেকে ১৪ বছরের বালকবালিকাদের শিক্ষা গ্রহণের সংখ্যা ছিল ২৪, ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬এ। অবশ্য এই সংখ্যা সমগ্র রাজ্যের তুলনায় অনেক নিচে হলেও জেলাভিত্তিক উন্নয়নকে উপেক্ষা করা চলে না। আলোচ্য সময়েই বালুরঘাট মহকুমায় প্রতি হাজারে শিক্ষিতের সংখ্যা হল ২১৫, এবং সর্বাপেক্ষা শিক্ষিতের হার চল বালুরঘাট মহকুমায় বালুরঘাট থানায়।



শ্রীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিরূপাক্ষ মন্দির—প্রায় আড়াইশো বছর আগে রাজা রামনাথ সংস্কার করেন।

১৯০০ সালে পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের 'খালিল' এই জেলার মফঃস্বল এবং অননুন্নত অঞ্চলের শিক্ষা সম্পর্কে সন্তোষজনক তথ্য সরবরাহ করা চলে। সমগ্র জেলায় এই সংখ্যা হল ৫৫০৩৩ এবং এর মধ্যে ৩৪৭১ জন হলেন পুরুষ। আশ্চর্যের বিষয় হল সমগ্র জেলার অননুন্নত অঞ্চলের শিক্ষার হারের সঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুরের উক্ত অঞ্চল প্রায়শ সমতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে এই সামান্য সময়ের মধ্যেই।

১৯৪৭ সালে যখন পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়, তখন সর্বমোট জেলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল ৩টি, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৭টি এবং ২০৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নতুনভাবে জেলা গঠনের সময়ে—উৎকর্ষ এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পাকিস্তানের অংশে যায় এবং ওই সময়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় কোনও কলেজ ছিল না। বিভাগের পূর্বে ১৯৪৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে একই সময়ে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ইসলামপুর যখন পশ্চিম দিনাজপুরের অঙ্গভূক্ত হয়, তখন এই অংশের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কল্পণ। সমগ্র ইসলামপুরের তখন একটিমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়, পাঁচটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় এবং একশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

এইবার সমগ্র জেলার একটি সমীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। ১৯৫১ সালে এই জেলায় পাঁচ হাজার তিপায় জন ছাত্র সংবলিত উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল বোল, ছয় হাজার চার্লানজন ছাত্রছাত্রী সহ মধ্যম-মান বিদ্যালয়ের সংখ্যা আটত্রিশ এবং বিরাটসহ হাজার দুশো আটত্রিশজন ছাত্রছাত্রী সহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল—পাঁচশো নয়।

১৯৫২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায়—উচ্চবিদ্যালয়—সতের, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা পাঁচ হাজার তিনশো তিরিশ, মধ্যমমান বিদ্যালয় উনচত্রিশ—ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দুই হাজার একশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঁচশো নয়—ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সাতচত্রিশ হাজার নশো তেত্রিশ।

উনিশশো তিপায়-চরায় সালে হাই স্কুল—কুড়ি, ছাত্রছাত্রী, ছ' হাজার চার্লান, মিডল স্কুল ছেচত্রিশ—ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দুই হাজার চার্লান পঞ্চাশ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ছশো বোল—ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তিপায় হাজার নশো একত্রিশ।

উনিশশো পঞ্চাশ-ছাপায় সালে—হাই-স্কুল বাইশ—ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছ' হাজার নশো, মিডল স্কুল—তিপায়, ছাত্রছাত্রী



বাগড়ের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—পাশে কলিকাতা পুনর্ভবা এখনও প্রবাহিত।

সংখ্যা তিন হাজার দুশো আটত্রিশ, প্রাইমারী স্কুল—সাতশো তিপায়, ছাত্রছাত্রী বাট হাজার সাতশো ছয়।

উনিশশো সাতায়-আটায়—হাইস্কুল চত্রিশ, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা আট হাজার একশো ছয়, মিডল স্কুল—আশি, ছাত্রছাত্রী চার হাজার আটশো সত্তর, এবং প্রাইমারী স্কুল—নশো তিরানব্বই, ছাত্রছাত্রী একাত্তর হাজার একানব্বই জন।

উনিশশো উনবাট-বাট—হাইস্কুল ছাত্রিশ, ছাত্রছাত্রী আট হাজার ছয়শো বাইশ, মিডল স্কুল—পঁচাত্তি ছাত্রছাত্রী পাঁচ হাজার পাঁচশো পনের এবং প্রাইমারী স্কুল এক হাজার আটচত্রিশটি, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সাতাত্তর হাজার আটশো ত্রিশটি।

এছাড়া মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা-গুলিতে প্রায়শ জুনিয়র মাদ্রাসা আছে—সেগুলি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। জেলার একটিমাত্র সংস্কৃত অধ্যাপনা কেন্দ্র বিদ্যমান।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা পরিষদ পরিচালিত একটিমাত্র ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী আছে। সরকার পরিচালিত পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা—দশ। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নৈশ বিদ্যালয় আছে ত্রিশটি। এই নৈশ বিদ্যালয়-গুলিতে সাধারণত নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিরাই অধ্যয়ন করেন। গ্রামাঞ্চলে এবং অননুন্নত এলাকাগুলিতে সাধারণের জন্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠাগার আছে তেইশটি।

জেলার দুইটি কলেজের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে এই দুইটি কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। বালুরঘাটের কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ পদে রয়েছেন প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী ডঃ সুধীর করণ।

পশ্চিম দিনাজপুরের অনগ্রসরতা

বিবেচনা করাই এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা হয়েছে কার্যত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় থেকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে শুধুমাত্র জেলার যোগা-যোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই চলেছে এবং পশ্চিম দিনাজপুরের রেল যোগাযোগের স্বল্পতা হেতু সড়ক যোগাযোগের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। নর্থ ইস্টার্ন স্ট্রাকচার রেলের একটি লাইন জেলার রাধিকাপুর থেকে রায়গঞ্জ এবং ডালখোশ থেকে ইসলামপুর মোট ৬০ মাইল পথ কভার করেছে। জেলার সদর শহর বালুরঘাট থেকে নিকটবর্তী রেল স্টেশন রায়গঞ্জ পঞ্চাশ মাইল দূরত্বের ব্যবধান। রেলপথের স্বল্পতা হেতু জেলার ভিতর দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক সংখ্যক সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে এবং বলা যেতে পারে জেলার প্রত্যেকটি থানার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। চৌত্রিশ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার ফলে কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে পশ্চিম দিনাজপুরের ইটাহার থানা থেকে রায়গঞ্জ এবং করণ-দাঁড়ি থানা হয়ে সীমান্তবর্তী পূর্ববঙ্গ জেলায় প্রবেশ করেছে। পশ্চিম দিনাজ-পুরের আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন বাস মার্টিস তৈরি চালু রয়েছে। এছাড়া নর্থবঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন জলপাইগুড়ি থেকে ও শিলিগুড়ি থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে সার্ভিস রেখেছেন এবং মালদা-বালুরঘাট-রায়গঞ্জ ছোট ছোট রুটেও চালু রেখেছেন। নর্থবঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের একটি ডিপো রায়গঞ্জে রয়েছে। জেলার

কেউ ভুলতে পারছে না

মানোরাশা সিংহরায়

সোনার মাঠে সোনার জ্যোৎস্না ছিলো।

কৃষকেরা ধান কেটে চলে গেছে।

স্বতঃস্ফূর্ত সেই ধান

চাঁদের আলোতে অন্ধুত দেখাচ্ছিলো।

একটু দূরে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে

কৃষকেরা আলো জেলেছে,

কাঠের আগুন জ্বলছে তামাক ধাবে বলে।

কড়া তামাকের গন্ধে সেই জায়গা তখন কাঁকালো।

আর তাদের দক্ষিণে

একদল তরণ ছেলে নেচে নেচে গাইছে,

‘ও আমার সোনার বাংলা,

আমি তোমার ভালবাসি।’

হার, এতো ধান তবুও অন্নহীন দেশ

আর তবুও সোনার বাংলা, সেই শস্যশ্যামলা বাংলা

তাকে কেউ ভুলতে পারছে না, পারছে না, পারছে না।

কর্মরত লোকসংখ্যার মধ্যে দু’হাজার আটশো ঊনসত্তাই জন (১৯৬১ জনগণনা) বিভিন্ন প্রকার পরিবহন কার্বে নিযুক্ত রয়েছেন।

বিভাগোত্তর সময়ে বালুরঘাট শহরের সন্নিহিত একটি বিমান অবতরণক্ষেত্র নির্মিত হয়েছে। প্রধানত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিমান ব্যবস্থা থাকলেও কলকাতা-বালুরঘাট যান্ত্রিকবহনের কাজও বিমানগুলি করে থাকে। এই বিমান অবতরণক্ষেত্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিমান-বন্দর হিসাবে গঠন করবার প্রয়োজনীয়তার বিষয় কতৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন সম্প্রতি।

জেলায় ১৭২টি ছোটবড় ডাকঘর আছে। এই সংখ্যার মধ্যে মাত্র ৬টি হল টেলিগ্রাফ অফিস। ডাক তার বিভাগের উত্তরবঙ্গ বিভাগের অন্তর্গত চারটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ জেলার টেলিফোন যোগাযোগ রক্ষা করছে। এক্সচেঞ্জগুলি হল—হিলি, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ এবং বালুরঘাট।

পশ্চিম দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি এবং সাধারণ সংস্কৃতি বর্তমান সময়ে এসে কোন খাতে বইছে—তা গভীরভাবে গবেষণার বিষয়। ইতিপূর্বে রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ভাবনা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে—পশ্চিম দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতির মধ্যে রাজবংশীদের অবদান তার থেকে পৃথক নয়। তা সত্ত্বেও একমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি-ধারণাকে জেলার মান হিসাবে নির্ণয় করা চলে না। বসতি বিন্যাসের বৈচিত্র্য হেতু এই জেলার গ্রামীণ সংস্কৃতির উপর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলার প্রভাব যথেষ্টভাবে পড়েছে এবং এই প্রভাব থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের নিজস্ব সংস্কৃতিয়ারা পৃথক করে আলোচনা করা যথেষ্ট অনাটনীয় মাপের বিষয়। অন্যান্য জেলার মধ্যে মালদহের গম্ভীর বা গম্ভীরা, আলকাপ প্রভৃতির চর্চা পশ্চিম দিনাজপুরের কোন কোনও ক্ষেত্রে নজরে পড়ে। প্রস্তাবনা, বিষয় বৈচিত্র্য ও আনন্দনৈতিকভাবে মালদহের অবদানের সঙ্গে পশ্চিম দিনাজ-

পুরের কার্যত কোন পার্থক্য নেই। আবার লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান, ছাড়া রত উদ্‌যাপন, হোমালি, গাথা প্রভৃতির প্রভাব রয়েছে অবিভক্ত বাংলার রক্তপূরুর।

পশ্চিম দিনাজপুরের নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষের ভিতর থেকে কোন কোন সময়ে প্রতিভাবান কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাদের রচনা যদিও প্রাচীন ধ্যান-ধারণার গম্ভীর ছাঁড়িয়ে আধুনিক পর্ষায় এসে পৌঁছায় নি, তবুও অনেক সময় এই সব অখ্যাত গ্রাম্য কবিরাই রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির উপাখ্যান থেকে ঋণ্ডকাব্য রচনা পর্বিত্ত করে থাকেন। বালুরঘাটের প্রাচীন সংস্কৃতি অনাটনীয় কেন্দ্র প্রাচ্য ভারতীতে এইরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের সম্মান পাওয়া যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিম দিনাজপুরের বসতি বিন্যাসের বৈচিত্র্য হেতু এই জেলার সংস্কৃতির কোন মাপকাঠি নিরূপণ করা দুর্বহ। পার্শ্ববর্তী মালদহ জেলা সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য হতে পারে—কিন্তু মালদহ জেলার নানাবিধ জাতি ও উপজাতির বসবাস এবং তাদের পরস্পরের ভাবধারণার সংমিশ্রণ যত সহজে ঘটেছে পশ্চিম দিনাজপুরের বেলায় ঠিক তত সহজে ঘটতে পারে নি। এদিক দিয়ে বলা চলে যে, সমগ্র উত্তরবঙ্গের যে নিজস্ব সংস্কৃতি চেতনা যুগাভীত কাল থেকে বহমান—পশ্চিম দিনাজপুর ঠিক সেই আওতায় পড়ে না বলা যেতে পারে। এদিক দিয়ে পূর্ববাংলার সঙ্গেই তা সহজেই তুলনীয়।

এই বিষয়টির কেউ কোনদিন কারণ বিশ্লেষণ করে দেখেন নি বলে মনে হয়। তবে একটা কারণ সহজেই অনুমান করা চলতে পারে। সম্ভবত সেটা হলো জেলার প্রাকৃতিক গঠনভঙ্গী—জেলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ এবং গ্রামীণ ভাবধারণার প্রাচুর্য। এই গঠনভঙ্গী পূর্ববাংলার কাছাকাছি। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নদীবহুল—জেলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ হল কৃষি এবং বলাই বাহুল্য মধ্যাধীনতা প্রাপ্তির বিশ বছর পরেও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার যথেষ্ট

লোকাদিক্য ঘটলেও এখনও এই জেলা গ্রামবহুল। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় যেটুকু তা হল এই যে, প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বহু রাজবংশের উত্থান-পতনের ফলে—বহু উপজাতির মিলন এই জেলাতেও ঘটেছে—উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায়। কিন্তু সেই মিলনের ফলে নানাতর ধারার গতি পশ্চিম দিনাজপুরে নেই—যা আছে তা হল, বঙ্গসংস্কৃতিরই এক অনুরোধ উপধারা এবং স্ফুটিত গতিবেগ।

দেশ বিভাগের পর চিন্তাশীল বহু মানুষ পশ্চিম দিনাজপুরে এসেছেন স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য। এই শ্রেণীর বেশির ভাগ মানুষই শহরমুখী এবং তাদের সংস্কৃতি চিন্তাও আধুনিক অনাটনীয়নের ফসল হিসাবে গণ্য করা চলে। সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে এগুলি সীমাবদ্ধ। এদিক দিয়ে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারামপুর প্রভৃতির অগ্রগামিতা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এবং এর মধ্যে বালুরঘাটের অবদানই সমাধিক।

জেলায় কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে, এর মধ্যে বালুরঘাট থেকে শ্রীরাধামোহন মোহন্ত সম্পাদিত ‘আত্রেয়ী’ সম্ভবত প্রাচীন এবং সর্বাধিক প্রচুর সংখ্যাসূক্ত। বালুরঘাট থেকেই প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপত্র হল ‘মহুপনী’, এবং এইটি ছাড়াও আরও দু’একখানা সাহিত্যপত্র আছে এবং তা অন্যান্য স্থান থেকে প্রকাশিত হয়—তবে অনিয়মিতভাবে।

বালুরঘাটের নাট্যগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী হিসাবে উল্লেখ করলেও সম্ভবত অত্যাঙ্গি হবে না। বালুরঘাটে, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির অনাটনীয় ও প্রচারকল্পে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে এবং এই সংস্থার অনাটনীয়ও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

[কম্বাঃ]

আলোকচিত্র—পূর্ণেশ্বর পালচৌধুরী

‘খুঁজলে গিন্নী, আজ কিছ্ টাকা
পাব আপিসে। বিকেলে ফিরেই ছেলে-
মেয়েদের জামা-কাপড় কিনবো, তোমাকে
নিরে কেমন?’ ‘কিন্তু প্রফুল্লবাবু ফিরে
আসেন নি আর আপিস থেকে। হস্ত-
মস্ত হয়ে আপিস বাবার পথেই স্টেট
বাসের বলি হয়েছেন।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে
ঘুচিপাড়া ধান্য মারফৎ খবরটা যখন
পৌঁছলো বাড়িতে—সবাই তখন কাম্বায়
ভেঙে পড়লো। পড়লো না শুধু একজন
—শর্মিলা। প্রফুল্লবাবুর বড় মেয়ে। চোখ
দুটো বড় বড় করে শুধু একবার চমকে
উঠেছিল সে—তারপরই আবার অনেকটা
স্বাভাবিক হল। ছোট তিন বোন আর মা
সবাইকে সান্ত্বনা দিল সে। শোকের
বাড়িতে আশে আশে কাম্বায় রেশ খেমে
এলো।

কিন্তু শর্মিলা যেন বড় গম্ভীর হয়ে
গেলো সেই থেকে। সদা হাসি-খুশি
প্রাণোচ্ছল সেই মেয়েটি কেমন যেন
পার্বণের প্রতিমা হয়ে গেলো। স্কুলের
পড়া শেষ হলে কলেজে বেঁচে দেন নি
বাবা তাকে। ‘না মা, এবার গান-টান
শেষো, তারপর দেখেশুনে একটা—’
বাবার কথাগুলো ভেসে ওঠে শর্মিলার
মনে আর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে বুকটা
তার দুলে উঠলো। এ তিন বছর সেতার
নিয়েই কাটিয়েছে সে। সংসারে পাঁচটা
মানুষ, বাবার প্রতিভেক্ট ফান্ডের সামান্য
কটা টাকার কদিন আর চলবে?
তারপর?

তারপর কি? শর্মিলা কিছুতেই এর
উত্তর খুঁজে পায় না। এই ভাবনাই তাকে
পেয়ে বসেছে দিন-রাত। মার কাছে এসব
প্রশ্ন আর জিগ্যেস করে না সে। একদিন
জিগ্যেস করে অত্যন্ত অপ্ৰতিভ হয়ে-
ছিলো। মা হাউ হাউ করে কেঁদে ভাসিয়ে

মানিক মুখোপাধ্যায়

মেজার

দিলো, সারাদিন কিছ্ই খেলো না। মাঝে
মাঝে কাম্বায় রেশ যখন খেমে আসে
তখনই চাপা দীর্ঘশ্বাসে মেয়েকে বুক
টেঁদে বসেছেন, ‘তাই তো মা, কি হবে
তারপর? কোথায় যাবো আমরা?’

অথচ এ প্রশ্নের উত্তর পেতেই হবে
শর্মিলাকে। কন্টে-সন্টে দু’তিনটে মাস
বড়জোর চলবে হয়তো।—তারপর বাড়ি
ছেড়ে দিতে হবে, বোনদের স্কুল ছাড়িয়ে
দিতে হবে—নাঃ, ভাবতে পারে না আর।
একটা চাকরি পাওয়া যায় না? অল্প
মাইনের সামান্য একটা চাকরি।

কিন্তু কে দেবে চাকরি তাকে? কাছে
বলবে সে চাকরির জন্য? আত্মীয়-স্বজন
যারা বাবা মা বাবার পর প্রথম প্রথম
আসতেন—তারা কেউই বড় একটা আশ্রয়
না আর। শর্মিলা বুঝতে পারে কেন
তারা আসেন না। বাবা বলতেনঃ ‘কোন-
দিন চাইবি না মা কারো কাছে কিছ্’।
না চাইতে যা পাবি তা নিয়েই খুঁদি
থাকবি।’ কিন্তু এখন সে কি করবে?

প্রতিবেশী সুজয়বাবু একদিন হঠাৎ
ডেকে পাঠালেন শর্মিলাকে।

কেমন আছো মা, আজকাল যে আর দেখতে পাই না তোমাকে।

মাথা নিচু করে থাকে শর্মিলা। কোন উত্তর দেয় না।

আমার ছোট্ট মেয়ে টুনিকে ডুঁমি সেতার শেখাতে পারবে মা? তোমার পারিশ্রমিক বাবদ আমি মাসে পাঁচশ টাকা করে দেবো।

অত্যন্ত লজ্জা পায় শর্মিলা। কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে—কিন্তু কাকাবাবু, আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতেই হবে আপনাকে। যে কোন চাকরি। বরুণেই তো পারছেন আমাদের অবস্থা।

কথাগুলো বলতে বলতে শর্মিলার দু'চোখ বেয়ে জল নেমে আসে।

নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো মা। কিন্তু চাকরির বা বাজার, চাওয়া মাত্রই তো পাওয়া যায় না। আমি—থুঁসবো, নিশ্চয়ই থুঁসবো মা। সুজয়বাবুরও চোখ দুটো হলহল করে ওঠে।

শর্মিলা উঠে পড়ে। রাস্তার মোড় ঘুরতেই ছোটবেলার সাথী শ্রীমন্তর সঙ্গে দেখা। শ্রীমন্ত এখন কলেজে পড়ে। 'শোন ভাই', শ্রীমন্তকে ডাকে শর্মিলা। 'আমাদের বড় বিপদ। একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারিস আমাকে?'

চাকরি! চাকরি কোথায় পাবো আমি? তবে শুনেছি খবরের কাগজে বোজাই অনেক বিজ্ঞাপন থাকে চাকরির, আর এম প্লসমেন্ট এক্সচেঞ্জও অনেক লোক নাম লেখায় চাকরির জন্য—জবাব দেয় শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্তের উত্তরটা মনে ধরে শর্মিলার।

একদিন অনেকগুলো বরখাস্ত পাঠিয়েছে সে। শিক্ষিকা, অফিস ক্লার্ক, সেলস্ গার্ল, টেলিফোন অপারেটর, নাস্—কোন পছন্দ-অপছন্দ নেই তার। এমপ্লসমেন্ট এক্সচেঞ্জ গিয়ে একদিন নামও লিখিয়ে এসেছে সে।

সেদিন সুজয়বাবু মেয়েকে সেতার শিখিয়ে বাড়ি ফিরেছে শর্মিলা। ঘরে ঢুকতেই গোল বোন উম্মিলা একটা চিঠি দিলো হাতে। এইমাত্র দিবে গেছে ডাক-পিওন। এক নিম্নবাসে খামটা ছিড়ে ফেলে সে। ইংরেজিতে টাইপ করা চিঠিটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাকরি। চিঠির ওপরে শর্মিলা দস্তব নাম। চৌকঙ্গীর রয়সল বেসেতার সেরাস গার্ল—মাসে ৮০ টাকা মাইনে, দুপরের গিল ফ্রি, আর কাজ ভালো হলে তিন মাস পরে ১০০ টাকা মাইনে। হাতে যেন স্বর্গ পেলো শর্মিলা।

সুজয়বাবুকে দেখিয়েছিলো চিঠিটা শর্মিলা। উনি বললেনঃ কিন্তু এ চাকরি তো ভদ্রবরের মনোবা করে না মা। রেস্টোনার কত আজ্ঞে-বাজ্ঞে লোক আসে

সেখানে কি ভদ্রবরের মেয়েরা কাজ করতে পারে? এ চাকরিতা নেয়া তোমার ঠিক হবে না মা।

কথাগুলো শুনে বড় ভেঙে পড়ে শর্মিলা। তারপরেই শব্দ হয়ে বললেঃ কাকাবাবু, সব জেনেও আমাকে এ চাকরি করতে হবে যদিও না অন্য একটা কিছু পাই। আপনি যেন কাউকে কিছু বলবেন না, মাঝেও না।

শর্মিলা সেই চাকরি নিয়েছে। মা কিছুতেই রাজী নন। শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ আচ্ছা কর। মাকে বুঝিয়েছে শর্মিলা, কিছু কষ্ট নেই এ চাকরিতে—রেস্টোনার অকেন্সি পাঠিতে সে শব্দ সেতার বজাবে, খারাপ কি? মাকে এই মিথ্যে কথাটা বলার জন্য রোজ তাকে সেতারটা নিয়ে বেবোতে হয়। রেস্টোনার গিয়ে রেখে দেয় সেতারটা—আবার ফেরার সময়ে ওটাকে বয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু শর্মিলাব ভালো লাগে না এই পরিবেশ। কি কুর্ভাসিত মনোবৃত্তি এখানকার লোকগুলোর। ভালো কথাগুলোকেও এক্স নোংরা করে বলে। অন্য মেয়েরা কেমন সহজ হয়ে গিয়েছে এদের সংগে—এতটুকু অসন্তুষ্টির ছাপ নেই তাদের মুখে। কেমন হেসে হেসে বে-আবু চণ্ডে সবাব সংগে তারা কথা বলে। মালিকের তাদের বেশ খাতির করে। অথচ শর্মিলায় সারা গা ঘিন-ঘিন করে সব সময়। একদিন মালিক তাকে ডেকে স্পষ্টই বলে দিলেঃ দেখুন মিস দস্ত, এটা রেস্টোরা, বাড়ি নয়। এখানে নির্লজ্জতাই দরকার। আপনার সার্ভিস মোটেই ভালো হচ্ছে না। ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করুন। ক্লায়েন্টদের খুশি করতে পারলে আপনার লাভ হবে।

শর্মিলা কেঁদে ফেলে কথাগুলো শুনে। সহকর্মীরা সুবন্ধা কাজের স্বাক্ষর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। দুটো গাল টিপে আদর করে বললেঃ কাদিছিস কেন বোকা। বুঝতে পারছিস না, কোথায় এসেছিস। যাদের কেউ নেই, তারা ই এখানে আসে। ভয় কিসের? উপায় থাকে পালিয়ে যা। নইলে আমাদের মতন পোড়ামাখী হ। এখানে লজ্জাকে বিসর্জন দেয়াটাই চাকরি।

শর্মিলা এখন বুঝতে পারে কোথায় এসেছে সে। কিন্তু কোথায় পালাবে সে? পাঁচ-পাঁচটা মানুষ—রোজগার না থাকলে কি যে হবে ভাবতে পারে না আর।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ইম্বরের উদ্দেশ্যে শর্মিলা প্রণাম জানায়ঃ ঠাকুর, আজ যেন একটা ভালো চাকরি খোঁজ পাই। আমি যে আর পারছি না.....

অন্য একটা কিছু পেলেই সে এই নরক থেকে পালাবে।

মা রাখারানী কেমন মেন অনেকটা পাথর হয়ে গিয়েছেন আজকাল। কথা-বার্তা বলেন না বললেই হয়। মেয়েরা সব বোঝিয়ে গেলে রান্না-বান্নার পাট চুকিয়ে এসে শুরুর থাকেন। চুপচাপ। ইম্মুকে থেকে ফিরে মেয়েরা হৈ চৈ শব্দ করে দেয় অনেকদিন। সে কি মা, এখনও খাও নি তুমি। এমনি করলে মরে যাবে যে।

হুঁস আসে মেয়েদের কথায়। স্নান হেসে বলেনঃ দূর পাগলী সব, ভেদের ফেলে আমি মরতে পারি।

দুঃসপ্তাহে একদিন ছুটি পায় শর্মিলা। সেদিনটার জন্য অনেক কাজ জমে থাকে তার। সেদিন সে মস্তপক্ষ বিহঙ্গ। ছোট বোনো সেদিন দিদির জড়িয়ে থাকে সারাক্ষণ। কোন ভোরে বেরিয়ে যায় দিদি আর ফেরে কোন রাতে, ওরা দেখতেই পায় না দিদির। মাও সেদিন আঁচলে আঁচলে রাখেন মেয়েকে।

সেদিন শর্মিলার ছুটি। সকালবেলা থেকেই বোনরা আশ্বাস-ধরেছে, দিদি চিড়িয়াখানায় যাবো—শাদা বাঘ এসেছে। দিদিও রাজী। কতদিন ওরা কোথাও বেরায় না। সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। বোনদের ফুঁটি আর ধরে না। বাড়িতে মা একা রইলেন।

বিকেল গড়িয়ে এলো। রাখারানী শুরুর শুরুর আকাশ-পাতাল ভাবছেন। পোড়া চোখে ঘুমও আসে না আজকাল। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দে চমকে ওঠেন রাখারানী। এ শব্দের সংগে পরিচিত নন তিনি। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দিলেন।—কে সেজদা, তা' এতোদিন পর হঠাৎ কি মনে করে? সেজদা অর্থাৎ কালকাটা স্টীল কোম্পানীর ছোটনাহেব এম এন ঘোষ—শর্মিলার সেজমামা। এতোদিন পর হঠাৎ এমন অসম্মানে সেজদাকে দেখে সচ্যাকত হন রাখারানী।

জবাব না দিয়ে ঘোষ সাহেব ঘরে ঢুকলেন।

কেমন আছিস তোরা সবাই? একদিন গেলেও তো পারিস। অনামনস্কভাবেই কথাগুলো বলেন ঘোষ সাহেব।

আর যাবার মত মুখ কি, রেখেছেন, ভগবান। হলহল চোখে উত্তর দেন রাখারানী।

মেয়েরা কোথায় গেল?

চিড়িয়াখানায়। আজ শর্মির ছুটি—বোনদের নিয়ে বেড়াতে গেছে।

আজ রাধা, শর্মি নাকি চাকরি করে?

হ্যাঁ, করে সামান্য একটা। তাইতেই তো চলছে।

ঃ ঠিক চাকরি, কোথায় করে?
রাধারাণী বিরক্ত হয় এতো সব প্রশ্নে।
নিম্প্রভভাবেই জবাব দেন : অতো-শত
জানি না। শুনেছি সেতার বাজায়।

ঃ হুঁ, সেতার বাজায়। ওই কথাটাই
বলতে এসেছি তোকে।—উত্তেজিত কণ্ঠে
বলে চলে যাব সাহেব।

ঃ তুমি কি এতোদিন পর আমার এই
উপকার করতে এসেছো দাদা?

ঃ দেখ রাধা, মেয়ে ইচ্ছা শুইয়ে
চাকরি করবে, সে চাকর বেঁচে থাকার
চাইতে কি মরে যাওয়া ভালো না?
তোদের কি প্রেস্টিজ জ্ঞানটাও রইলো
না?

ঃ মানে?—গর্জে ওঠেন রাধারাণী—
কি সব বলছো যা-তা!

ঃ মানে আর ভেবে বলে কাজ নেই।
কাল স্বচক্ষে যা দেখে এলাম—তা আমি
মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারি না।

ঃ বলতে হবে না দাদা, দোহাই
তোমার, দুর্নীতি পারে পড়ি। তুমি এখন
যাতি যাও। তাহলেই আমার অনেক
উপকার হবে।

গর্জতে গর্জতে ঘোষ সাহেব বেরিয়ে
যান। রাধারাণী পাখরের মত নিশ্চল
হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।

মাঝ রাধারাণী আর পারে না।
জীবনটা এমন গোলকধাঁসার মতন মনে
হয় নি কোন দিন তাঁর। রাধারাণীর
মনে পড়ে যায় সেদিন যখন প্রথম বধু হয়ে
ছিলেন এ সংসারে। মনে পড়ে যায় স্বামী
মারা যাবার পর শর্মিলার সেই কঠিন
শুদ্ধ—ওই একরকম মেয়ে—সংসারটাকে
চিটানোর জন্য কি মরণপণ করেই না
লাড়ছে। অথচ এলেটুকু বন্ধুতে দেয় না
তাকে। ওই মেয়েই তাকে শিখিয়েছে—
কাদার কড়াপায় বেঁচে থেকে লাভ নেই
না। খেটে যদি বাঁচতে পারি তবেই
বাঁচবো—নইলে সবাই মিলে এক সাথে
মরবো।

মাঝ সেজদার কথা সত্যি হলেও
শর্মিলার ওপর কোন রাগ নেই, কোন
অভিমান নেই তাঁর। দাদার ওপরেও
কোন রাগ নেই তাঁর। শুধু জীবনের
ওপর, বেঁচে থাকার ওপর প্রচণ্ড অভিমান
এলো রাধারাণীর। এ ঘৃণার পক্ষ থেকে
মাঁচতেই হবে তাকে। চম্পল হয় রাধা-
রাণী। সমস্ত শরীর তার কাঁপতে থাকে
ঊষ্মজনন।

সময় নেই, সময় নেই আর। এক্ষুণি
গুরা এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি একটা
পিসিসল দিয়ে একটা খাতার পাতা ছিঁড়ে
ফলাইন কি লিখে ফেলেন তিনি।
চিরকুটী রাখলেন খাটের ওপর। হঠাৎ
কি রকম ক্ষেপে গেলেন—কৃষ্ণ উত্তেজিত
হাঁটু ধুঁক। চেনাই যায় না তাকে।

দুটো হাত এলোমেলো ছুঁড়তে লাগলেন
ক্রমাগত। কি যে করবেন কিছুই ঠিক
করতে পারছেন না। একটা ভয়ংকর
আকোশ আজ পেয়ে বসেছে রাধারাণীকে।
কিস্তি কেন? কেন?

কেনর উত্তর দিতে পারেন না
তিনি। রাধারাণীর মনে হচ্ছে
যেন একটা ভয়ংকর অন্ধকার নেমে
আসছে। ভয়ংকর সর্বগ্রাসী অন্ধকার।
ভয়ে চীৎকার করে ওঠেন রাধারাণী।
হঠাৎ চোখ পড়লো দেয়ালে টাঙানো
শর্মিলার সেতারটার ওপর। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ
তোকে—তোকে আমি শেষ করবো আজ'
—কিস্তিকারিত দুই চোখে রাধারাণী এক-
লক্ষ টেনে নামালেন সেতারটাকে।
শীর্ণ দুই হাতে ওটাকে তুলে আছড়াতে
লাগলেন মেঝের ওপর। কঠিন আত-
নাদের বংকরে যন্ত্রটা খান-খান হোলো
ভেঙে। রাধারাণীর মনে কেমন একটা
আনন্দদর পরিভূঁপ্তর শিহরণ বেলে
গেলো। চাকিতে একবার দেখে নিলেন
ঘরটা। পা দুটো নিশ্চল হয়ে আসে
তাঁর। নী না ধামলে চলবে না। দ্রুত
বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।

সারাটা দিন হেঁ হেঁ করে মেয়েরা যখন
ফিরলো বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা।
ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের দরজা
খোলা দেখে চমকে ওঠে মেয়েরা : এ কি?

ঘরটা এমন অন্ধকার কেন? তাড়াতাড়ি
আলো জ্বালো শর্মিলা। মা, মা কোথায়?
মা.....মা.....। ভয়বিহ্বল চার-বোন
পরস্পরের মুখের দিকে চায়। একি?
সেতারটার এমন হাস কেন? চমকে ওঠে
শর্মিলা। ধরধর করে কাঁপতে থাকে
তার শরীর।

ছোট বোনই খাটের ওপর চিরকুটী
পেলো প্রথম। : দিদি, এটা কার চিঠি?
চাকিতে শর্মিলা চোখ বুদিয়ে নেন
চিঠিটায়। বোবা হয়ে যায় শর্মিলা।
সব চুপচাপ। তারপর একবার
চীৎকার করে ওঠে শর্মিলা—নেই!
নেই! ওরে মা নেই! মা গঙ্গায় ভুবে
মরতে গেছে!.....রইলো না—রইলো
না—কিছুই রইলো না আব আমাদের।

তিন বোন দিদির জড়িয়ে কাঁদতে
লাগলো অঝোবে। শর্মিলাও আর পারে
না—কারও ওপর কোনদিন সে অভিমান
কবে নি—কিন্তু আজ মার ওপর প্রচণ্ড
অভিমানে সেও কাঁদতে লাগলো হাউ-
হাউ করে।

তারপর কান্না যখন বোবা হয়ে
এলো, শর্মিলা বোনদের গায়ে হাত
বুলোতে লাগলো পবন স্নেহে। "ভয় কি
বোন, আমি আছি। আমি কখনো
তোদের ছেড়ে যাবো না।"

বোনেরা সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে
থরে দিদির।

তু' মাসের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণ বার হ'ল

মনোরঞ্জন রায়ের

কমিউনিস্ট পার্টি কী ও কেন ?

এই দ্বিতীয় মুদ্রণই বইখানির জনপ্রিয়তার নিদর্শন। কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে
যদি সবিস্তারে জানতে চান, তাহলে বইখানি আজই সংগ্রহ করুন।

বইখানিতে আছে :—কমিউনিস্ট পার্টি কাদের পার্টি, অন্য রাজনৈতিক দল থেকে
কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্য, পার্টি ও ব্যক্তি, পার্টি ও জনগণ, পার্টিতে উপদল সৃষ্টির
কারণ, সংশোধনবাদের উৎপত্তি, ভারতের পার্টিতে আধুনিক সংশোধনবাদের সংক্ষিপ্ত
ইতিহাস, কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ইত্যাদি।

মূল্য—১.৫০

এই লেখকের অন্যান্য বই :—

গোতম বুদ্ধ	৪.০০	ইতিহাস কী ও কেন?	৩.০০
ইতিহাস দর্শন	৪.০০	আদিম সমাজের ইতিহাস	৫.০০

(এপ্রিলে বের হবে)

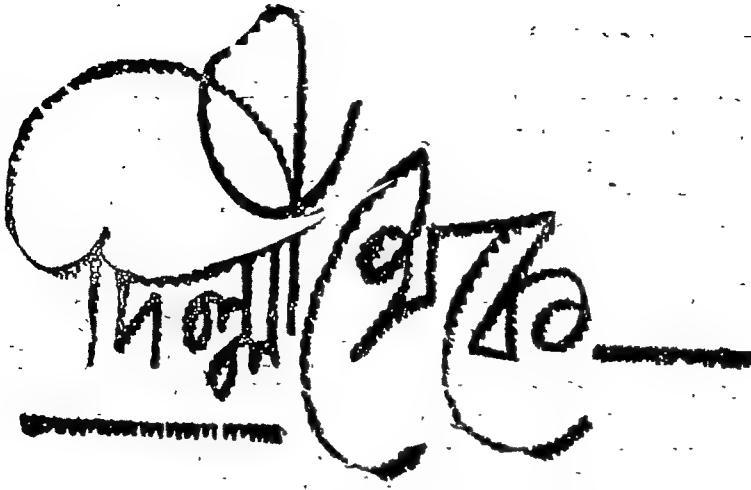
প্রকাশক—অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

C/o. নিরঞ্জন রায় এন্ড কো

শাকসেনা বিল্ডিং

১/২, জ্যাকসন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

পুস্তক বিক্রয় ও এজেন্টদের কমিশন দেওয়া হয়।



আর আকাশকুসুম চয়নে নয়। বিরহের বেলা যে কাঁটতেই চায় না। জীবনে সব পেয়েও যে কিছুই পায় না তাঁর জীবন সীতাই দুর্বিষহ। জাহান আরা বেগম তিক করেছেন দিল্লী শহরটা এবার আপন মনের মতন করে সাজাতে হবে। আপন ঘর যখন সাজানো হলো না তখন জনমানসের ঘরই সাজাতে হবে। এবার সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে। বাসর-সজ্জা সাজানো যে জীবনে সম্ভবপর হলো না, তাকে দিয়েই এই বিরাট হিন্দু-স্থানের রাজধানী দিল্লীকে রাজরাণীর বেশে সাজাতে হবে। সমগ্র দিল্লী শহরকে দিতে হবে অপূর্ব মনোরম ব্যবেশ।

বেগমবাগ তৈরি হচ্ছে গেছে। জাহান আরার নির্দেশেই দিল্লীর রাজপথ চাঁদনী চকের মাঝখানে বিরাট খোলামেলা রাজ-উদ্যান। লাল কেল্লার ভিতরের বাগিচা শূন্য মোগল উদ্যান। সেখানে সেই প্রাস বীথি অশ্রুবাগে শূন্য রাজপরিবারের সদস্যদেরই আনাগোনা এই বেগমবাগের খসব্দ ফুলের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াবে দিল্লীর সাধারণ জনমানসের প্রেমিকবৃন্দ। ভাবতেও শিহরণ জাগে মনে।

অদূরে কতেপুর্নী মসজিদ। বড় বেশী রকমের বড় এই প্রার্থনাগৃহ। তবুও ভিতরে জায়গা বড়ই কম। মমতাজ সতীন সতীমা বেগম ফতেপুর্নীর নাম দিল্লী শহরে ক'জন জানেন? সমগ্র হিন্দুস্থানে আপন সৌন্দর্যের জন্য মমতাজ মহল বিস্তার করেছিলেন আপন খ্যাতি। তাঁর উজ্জ্বল ভাস্বে রাজপ্রাসাদের আর সব বেগমের সৌন্দর্য যে ম্লান হয়ে গেছে। ফতেপুর্নী বেগম কোন একদিন সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্রী ছিলেন। আজকাল শূন্য কোরাণ পাঠ নিয়েই দিন কাটান। তাঁরই অসীম আগ্রহে সম্রাট সাজাহান এই মসজিদ তৈরি কবেছেন একদিন। ফতেপুর্নী বেগমের জীবন ধন্য।

মসজিদ-মঠ তৈরি করলে যে পুণ্যার্থন

হয় তাতে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ জীবনে না হলে পর জন্মে নিশ্চিত। জাহান আরার অসীম আগ্রহে সম্রাট সাজাহান কাশ্মীরের মনোরম পরিপার্শ্বে একাধিক শিবমন্দির তৈরি করে দিয়েছেন। এবার দিল্লীর বৃকে তৈরি করতে হবে মসজিদ।

সম্রাট সাজাহান এসব ব্যাপারে নিজেই আগ্রহশীল। প্রিয় কন্যার অকারণ সম্মা-সিনীবেশে মাঝে মাঝে তাঁর বৃকে ডেঙে যায়। তবুও মৃদু ফটে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। তাছাড়া শরীরটাও বিশেষ ভালো নেই আজকাল। ক'দিন থেকে করোকা দর্শনেও দাঁড়ানো হচ্ছে না। মনে হয় এ যেন একটা গ্রহসন মাত্র। কি দরকার প্রজাবর্গের এ প্রভাতী বন্দনা গ্রহণের। তাঁরই বা এত কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসে নিজেদের বহু মূল্য সময়ের অপচয় কবেন কেন? তাই বেগম জাহান

শ্রীনিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

আরা যে মহতে দিল্লীতে সর্বসাধারণের জন্য একটা বিরাট প্রার্থনাগৃহ নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সম্রাট সাজাহান এক ব্যাকো তাতে রাজ্যী হয়ে গেলেন। অস্বস্ত এই সব নিম্প্রয়োজনীয় করোকা দর্শনের হাত থেকে কিছুদিন নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। করোকা দর্শনের ডিডু কমানো যাবে। জনতাকে পাঠাতে হবে মসজিদে, মন্দিরে। কেন এ ব্যথা হলো? কে বলে দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের সমান। এ সব যে শূন্য অলীক উচ্ছ্বাস।

ফতেপুর্নী মসজিদের অদূরে ছোট সোনালী মসজিদ। চাঁদনী চক আর লাল কেল্লার অদূরে দিল্লীর বরবেশ কবি শারমাদের দরগা। তার ঠিক সামনেই তোলা হবে নতুন মসজিদ। দেশ-বিদেশ থেকে আনা হবে কারিগর। আনা হবে বহু মূল্য প্রস্তররাশি, শ্বেতমর্মর তার কাছে ম্লান।

সম্রাট বললেন, কি নাম বললে তোমার।

যুবরাজ দারাশিকো এগিয়ে এসে বলেন, জাহাপনা এরই নাম ওস্তাদ খালিল। ওরই কথা পেশ করেছিলাম সেদিন। ভাণ্ডী মিষ্টি হাত। তাছাড়া নিজে ভল্ল লোক। ভল্লি ছাড়া শূন্য কারিগরী বিদ্যাটুকু থাকলেই চলবে কেন?

সম্রাট বললেন, বেশ তাহলে জাহান আরার পরিকল্পনাকে রূপায়িত করো এর সাহায্যে। অর্থের কোনো কুপণতা করো না। দিল্লীর জম্মা মসজিদ আগ্রার জম্মা মসজিদের চেয়েও বড় হবে। শূন্য তাই নয়, আমি চাই বেগম জাহান আরার বাসনা পূর্ণ করতে সমগ্র সাম্রাজ্যের যত মেধাবী কারিগর আছে প্রয়োজন হলে সবাইকে এখানে সমবেত করতে পারো। জানো তো জাহান আরার বাসনা কি?

যুবরাজ জানালেন এ বাসনার কথা তিনি বহু পূর্বেই জানতেন। জাহান আরা চান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম ভজনাগার তৈরি করতে। বামশা বেগমের এ কামনা পূর্ণ করতে যুবরাজ চেষ্টার কোনো হ্রাস করবেন না।

দারার এ প্রতিশ্রুতি কতখানি আন্তরিক তার অন্তরের কথা সম্রাট সাজাহান তা জানেন। মাঝে মাঝে এই দুই পুত্রকন্যার দিকে তাকিয়ে তিনি ভারি অবাক হন। দর্শন তাঁর বেশি আসে না। জীবনের দীর্ঘ সাতাশটা বছর কেটেছে শূন্য রণাঙ্গনে। তবুও মাঝে মাঝে দর্শন রহস্য এসে মনের আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মেলে যায়। তখন মনে হয় এই দুটি জীবন যেন দুটি দেবিশব্দ—যেন একই বৃন্দে ফোটা দুটি ফুল।

ওস্তাদ খালিল সেলাম পেশ করে চলে যান। এ যে এক গুরুদাস্ত্রি পড়লো তাঁর ঘাড়ে। খোদাতালা অসীম মেহেরবান। এ বাসনা যে তাবু দরিদ্র মনে বহুদিন থেকে বাসা বেঁধে ছিল। দারার সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনাগার তৈরি করতে হবে। লক্ষ লক্ষ পবিত্র তীর্থযাত্রীর পদাবধতে সেই ভজনাগার হবে এক মহান মিলনতীর্থ। দয়ালু পরমেশ্বর তাঁর এ বাসনা যেন আজ পূর্ণ করলেন। এতদিনের আজান, এতদিনের নামাজ যেন সার্থক হতে চলেছে।

মনে মনে মক্কা মদিনাব সেই মহা-পুরুষকে স্মরণ করেন। সীতাই তিনি অন্তর্হামী। এতদিন ইচ্ছাই ছিল শূন্য লক্ষ পজারীর ভজনাগার নির্মাণের। ছিল না সামর্থ্য। কোথেকে কোন পরম পবিত্র মতর্জের পরম দয়ালু খোদাতালা তাঁর সেই দরিদ্র মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করলেন সম্রাটনন্দিনীর একটা অতি সাধারণ শব্দে। অপূর্ব তাঁর লীলা-খেলা। খালিল সাহেবের দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। অদূরের অন্তঃসঙ্গী সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে মনে করজোড়ে

গাণ্ঠাঙ্ক বসন্ততী

জীবন্তি করেন “বিন্দিয়া, রহমান, রহিম।”

সাতটা পাখী মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। শব্দকর্মে শব্দ ইঞ্জিত। শব্দ চিহ্ন। শব্দভাবন।

মসজিদের জন্য শ্রমিক দল কাজ শুরু করে দেয়। দেশ-বিদেশে খবর গেছে। সাজাহান অতি শ্রীলভাবে ফকীরের জীবন-স্থাপন করছেন শব্দ অস্তরাজ্য পবিত্র করতে। জাহান আরার মদুতটুকু অবসর নেই।

দামী দামী পাথর এলো ইটালী থেকে উপটোকন হিসেবে, এলো ভূমধ্য সাগর প্রান্ত থেকে। এলো শ্রমিক দল, এলো আর্কিটেকট, এসো শ্রম্যবনয় তাপস দল।

যুবরাজ দাণ্য এবার নিজে শ্রমিকদের উদ্ভাবন করছেন। তাজমহল তৈরি করতে গিয়ে দু-দুটো শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছিল। ভারি বাধা সেরেছিল যুবরাজের মনে, জাহান আরার মনে। এবার এ পূণ্য কাজে যেন কোনো বাধা না আসে, যেন কোনো অপরাধ না স্পর্শ করে এ শব্দকর্মে।

খালিল শব্দ প্রার্থনায় দিন কাটান। দিনের বেলা মসজিদ নির্মাণ, রাত কাটে

গভীর ধ্যানে। জগতের কোটি কোটি তীর্থ-যাত্রীর পরম পবিত্র স্পর্শে যে মঙ্গলঘট ভরা হবে চলে তার প্রস্তুতি।

জায়গা চাই। অনেকখানি জায়গা। আপামর জনসাধারণ এক পঙ্কতিতে দাঁড়িয়ে সম্রাটের সঙ্গে দুনিয়ার মালিককে জানাবে হৃদয়ের প্রেত অর্ঘ্য। হিন্দুস্থানের মালিক দাঁড়াবে দিল্লীর সর্বহারা ফকীরের পাশে—দীনদুনিয়ার মালিকের সামনে যে নেই কোনো ভেদাভেদ, নেই কোনো শ্রেণী, বৈচিত্র্য, জাতি, কুল, মান।

একদল শ্রমিক এসেছে বহু দূর থেকে মসজিদ নির্মাণের খবর পেয়ে। তারা কিছুই জানে না। তা না জানতে। তাদেরও কাজ দিতে হবে। সমগ্র সাজাহানাবাদে দু’ধারে রোপণ করতে হবে বট অশ্ব আশ্রয়ক। এ সমগ্র অনুপম সাজাহানাবাদকে করতে হবে ছায়াখন শান্ত সিন্ধ মনোহারী। পথিকের ক্রান্তি দূর করতে হবে—জীবনপথে যাব কোনো শাস্তি জটিলো না সমগ্র জীবন, তার হৃদয়ে, তার নির্দেশনামায়, তার ইচ্ছাতেই সমগ্র সাজাহানাবাদে আরোপিত হল লক্ষ লক্ষ চারু গাছ। যেন এক বিরাট বৃক্ষারোপণ মহাৎসব।

দরিয়াগঞ্জের দু’পাশে সারবন্দুভায়ে দাঁড়ালো নতুন প্রহরী—নীলব প্রহরী, বট, অশ্ব, আম, তেঁতুল। ধীরে ধীরে এর শাখায় পল্লবে বেড়ে উঠলো। হাতছারি দিয়ে কাছে ডেকে নিল দু’রাগত পথিকদের, এসো এই পরম পবিত্র জুহুয়ার পথে, এসো ধর্মের পথে, এসো ন্যায়ের পথে, এসো সত্যের পথে, এসো মহামিলনের পথে।

জাহান আরা তাতেই খুশি। সাজাহান খুশি ততোধিক। মেয়ের মুখে হাসিটুকু দেখেন না আজ কতদুঃখ। খুশি যুবরাজ দারা। খুশি দিল্লীবাসী জনসাধারণ। খুশি হিন্দুস্থানের পূণ্যাত্মা তীর্থযাত্রীর দল। মক্কা-মদিনা দূরে, বহু দূরে কোথায় সে অর্থ? কোথায় সামর্থ্য? এই পূণ্যক্ষেত্রেই জানানো যাবে দয়ালু পবনেশ্বরের শব্দ বন্দনা।

জাহান আরার মনে নব আনন্দের নিসর্গ বয়ে চলেছে।

প্রতিটি মানুষের মনে যে মক্কা-মদিনার পবিত্র তীর্থভূমি এনে দেয়, প্রতিটি মনোমাল্লের যে পরম পিতা শত কমল প্রস্ফুটিত করেন দিল্লী শহরের এ বিরাট দেউল নির্মাণ কি তাঁরই শব্দ ইঞ্জিত?

আর একটি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ—



পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল। পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা-দিবসের উদ্‌যাপন বিশেষ জাঁকজমকের মধ্যে হয়ে গেল। সে কথা পূর্বেই বলেছি। রাজসাহীতে থেকে নিজের চোখে যা দেখেছি, পরে পূর্ব-ফ্রন্টে (তখনও ‘পূর্ব-পাকিস্তান’ নামকরণ হয় নি) বিভিন্ন জেলার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের কাছে শুনিয়ে, সর্বশেষ রাজসাহীর মতই আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমকের সাথেই প্রথম স্বাধীনতা দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। ভারতের নেতৃবৃন্দের কাছে তখনও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রক্তের বিনিময়ে সংগ্রাম করলেন, জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে রক্ত ও অশ্রুর অর্ঘ্যে স্বাধীনতা-দেবীর যে পূজো সুরু হয়, সে পূজো বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে চসতেই থাকে। তার ছেদ নেই—বিরাম নেই—কত যে তরুণ শহীদ তাঁদের কাঁচা মাথা উপহার দিলেন—কতজন যে তাঁদের বৃকের তপ্ত তাজা রক্ত উজাড় করে ঢেলে বিলেন, স্বাধীনতা-দেবীর চরণতলে, তাব সম্পূর্ণ পরিমাপ আজও হয় নি; তাই, কোনও কোনও নেতা নিজদের দুর্বল ও দুর্নীতি-পূর্ণ শাসন ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের চরম দুঃখ-দুর্দশার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলেন যে, দেশ উচিত দাম না দিয়েই স্বাধীনতা পেয়েছে এ-জনাই সেই দাম এখন দিতে হবে। কিন্তু, হিসাব-নিকাশ একদিন অবশ্যই হবে—স্বাধীন ভারতের পূর্ণ ইতিহাসও একদিন লেখা হবে এবং সেই ইতিহাসে, সংগ্রামের ও সংগ্রামীদের বীর্য ও ত্যাগের ইতিহাস রক্তের তাকরেই লেখা হবে। সেই সত্যিকারের ইতিহাসে আমাদের লক্ষ্যের কিছু থাকবে না—গৌরবের কথাই তাতে জ্বল জ্বল করবে। আমাদের সেই গৌরবময় ইতিহাসের নাযক-নাযিকারা সকলেই ছিলেন জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড এক দেশ; এ দেশের অধিবাসী সকলেই সম্মিলিতভাবে এক জাতি (নেশন), এবং স্বাধীন ভারতে সেই দেশের হবে একই জাতীয় পতাকা। সেই সম্পূর্ণ নিয়েই

তাঁরা সংগ্রাম করেছেন, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু স্বাধীনতা যখন এল, তখন দেখা গেল, এক দেশ বিভক্ত হয়ে দুইটি ‘দেশ’ হল, দুই দেশে দুইটি জাতীয় (নেশন) কৃত্রিমভাবে গড়া হল এবং দুই দেশের দুইটি জাতীয় পতাকাও হল। স্বিজাতি-ভেদের প্রবক্তা ‘মুসলিম লীগ’ স্বাধীনতা-হরণকারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও সংগ্রামই করলেন না; তবু—তবু, কিন্তু, তাঁরা স্বাধীন হলেন, একদিন আগেই—১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালে! এরও পেছনে একটা ইতিহাস আছে। সেই কথাই বলছি।

ব্রিটিশের রাজপ্রতিনিধি ও ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টবেটনের ভাবতবর্ষ-বিভাগের প্রস্তাব, অবশেষে ‘কংগ্রেস’ ও ‘মুসলিম লীগ’-এর নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে রাজী হলেন। নেহরুর ‘হাঙ্কার বছরের চেষ্টাতেও মুসলিম লীগের পাকিস্তান হবে না’ ঘোষণাটি ভাঙত মহাসাগরের অতল জলে ডুবে গেল! জিন্নাহ সাহেবেরও ‘কীটমন্ট পাকিস্তান তিনি গ্রহণ করবেন না’ ঘোষণাটিও আরব সাগরের জলে ভেসে গেল। উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতারা ই অবশেষে দেশ-বিভাগ করে খণ্ডিত অংশই গ্রহণ করলেন! তাঁরা একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, ‘দুই দেশেরই সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথেই সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবেন—উভয় সরকারই, সংখ্যালঘুদের ‘জান ও মাল’-এব পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই তাঁদের রক্ষা করবেন। এই চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরদাতা হিসাবে ভারতের পক্ষ থেকে নেহরু-প্যাটেল ও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে, জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী সাহেব ছিলেন। একমাত্র গান্ধীজী, দেশ-বিভাগ মেনে নিতে রাজী নন। লর্ড মাউন্টবেটন, গান্ধীজীকে আহ্বান করে তাঁকে দেশ-বিভাগের প্রস্তাব জানান। গান্ধীজী মেনে নিতে রাজী হন না। বড়লাট ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টবেটন, তাঁকে বলেন যে, “কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি (ওয়ার্কিং কমিটি) তো আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। তাঁরা এখন আমার সাথেই আছেন।” গান্ধীজী উত্তরে জানান—“দেশ কিন্তু

আমার (গান্ধীজীর) সাথেই আছেন।” গান্ধীজী ঐ কথা বলেন বটে, কিন্তু দেশ যখন বিভক্ত হতে চলেছে, তখন তিনি তার মোটেই কোনওরূপ বিরোধিতাই করেন নি। দেশকে ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সংগ্রাম করার জন্য কোনও আহ্বানও করেন নি। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কর্মবীর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর এ এক অমৃত নিষ্করতা! দেশের চেয়ে সেদিন কী তাঁর কাছে ব্যক্তিই বড় হয়েছিল? যে গান্ধীজী তাঁর নীতির জন্য তাঁর জীবনসংগিনী মাতা কস্তুরবাকেও আশ্রম ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে গান্ধী নীতির জন্য তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও ত্যাগ করেছিলেন, সেই গান্ধীজীই তাঁর রাজনীতিক শিষ্য জহরলাল নেহরু ও সর্দার বজ্রভাই প্যাটেলের প্রতি মোহ-বশেই কী দেশের এত বড় সবনাশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন না? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? হয়তো, নব ভারতের ঐতিহাসিকরাই একদিন এ প্রশ্নেরও উত্তর দেবেন। আমি শুধু আমার মত ভুক্তভোগী জনসাধারণের মনের কথাটাই এখানে তুলে ধরছি।

যাক, দেশ বিভাগের প্রস্তাব তো পাকা হয়ে গেল। দুই দেশের নেতাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ‘জান-মাল’ রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ঘোষণার পরও কিন্তু লর্ড মাউন্টবেটন ও তাঁর সরকার মনে করলেন যে, ক্ষুদ্র জনসাধারণ নিজ নিজ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হয়তো একটা অমানুষিক বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে; তাই, তার প্রতিরোধের জন্য বিভক্ত দেশের দুই সীমান্তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্য পঞ্চাশ হাজার ফৌজের এক বাহিনী গড়ে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে রাখলেন। এই ফৌজের সর্বাধিনায়ক হলেন, গেন্ডার জেনারেল রিঙ্গ (Rees) এবং তাঁর সহ অধিনায়ক হিসাবে থাকলেন, ভারতের সীমান্তে ভারতীয় ফৌজের রিজার্ভের দিগম্বর সিং এবং পাকিস্তান সীমান্তের ভার নিলেন কর্নেল (বর্তমানে ব্রিটিশ মার্শাল ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) আব্দু খাঁ। এই রক্ষকরাই সেদিন শুকক

হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। প্রাণ ভয়ে পলায়মান ভীত-সম্ভ্রান্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগী জনতা নৃশংসভাবে সোদীন-নিহত হয়েছিলেন, উভয় সীমান্তেই। কত লোক যে মরেছেন, তার কোনও হিসাব নেই। লিওনার্ড মোসলির (Leonard Mosley) লিখিত 'The last days of the British Raj' (ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ কয়েকদিন) নামক বইয়ে দেখতে পাই যে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকে নয় মাসের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ হিন্দু শিশু ও মুসলমানকে দেশত্যাগ করতে এবং তাঁদের মধ্যে ছয় লক্ষ লোককে নৃশংসভাবে নিহত হতে হয়েছিল। আর সে কী শৃঙ্খলিত হত্যা! অত্যন্ত জঘন্য নৃশংসভাবে হত্যা। শিশুদের পা ধরে দেওয়ালে আঁহীড়িয়ে মাথা ভেঙে দেওয়া হয়েছে; স্বাীলোক হলে তাঁদের উপর বলাৎকার করে তাঁদের সতীত্ব নাশ করা হয়েছে, তাঁরা বালিকা হলে তাঁদের উপরও বলাৎকার করে তাঁদের স্তন কেটে দেওয়া হয়েছে এবং গর্ভবতী স্বাীলোক হলে তাঁদের পেট চিরে দেওয়া হয়েছে। সোদিনেব হত্যাকারী ঐ নর-পশুদের বীভৎসতার কাছে পশুও বোধ হয় স্তান হয়ে গিয়েছিল। এ'রাও কি স্বাধীনতার বলি নয়? ঐ সমস্ত লোক কোনও রাজ-নীতি করেন নি—কোনও সংগ্রামও করেন নি; তবু, তাঁদের ভীত নৃশংসভাবেই নিহত হতে হল। কেন? খণ্ডিত ভারতের আপোষে স্বাধীনতা লাভের জন্য নয় কি? স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করলেও বোধহয় এত লোককে ঐভাবে মরতে হত না; এত লোককে বাস্তুত্যাগ করেও পথের ভিখারী হতে হত না! তবু—তবু, আজও নেতারা জোর গলায়ই বলেন যে, বিনা রক্তপাতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি! কেউ কেউ আবার বলেন যে, আমরা স্বাধীনতার জন্য উঁচুত মূল্য দিই নি।—এইরূপ উঁচুত ধনুত্বের চরম নিদর্শন নয় কি? সুখী-সমাজই সে বিচার করে দেখবেন। আমি আমার কথা থেকে দূরে সরে গিয়েছি। বা বলছিলাম, তাতেই আবার ফিরে বাই।

এদিনে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে লর্ড মাউন্টবটেনের ভাবত ও পাকিস্তানকে ক্ষমতা হস্তান্তর তথা স্বাধীনতা দেওয়ার দিনটি ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। প্রথমে ভারত ও পাকিস্তান—উভয় রাষ্ট্রই ঠিক করেছিলেন যে, ১৫ই আগস্ট তারিখেই (১৯৪৭ সালের) উভয় রাষ্ট্রই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। সকালে রাজপ্রতিনিধি লর্ড মাউন্টবটেন দিল্লী থেকে করাচীতে গিয়ে পাকিস্তানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেই বিকেলে দিল্লীতে ফিরে

এসে ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং তারপর থেকে লর্ড মাউন্টবটেন উভয় রাষ্ট্রেরই বৌধ বড়লাট (Governor General) হিসাবে অন্তর্বর্তীকাল কাছ চালিয়ে যাবেন। এই ব্যবস্থা কিন্তু শেষে বানচাল হয়ে যায়, জিন্নাহ সাহেবের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে। জিন্নাহ সাহেব মত পাটগলেন। তিনি দাবি করলেন, পাকিস্তানের বড়লাট হবেন তিনিই। আর কেউ নয়, লর্ড মাউন্টবটেন তো নয়ই। জিন্নাহ চারদ্রের বৌশক্তিই এখানে ফুটে ওঠে। আচারে-ব্যবহারে পোষাকে-পরিচ্ছদে চেহারায়ও বটে, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি অভিজাত সম্প্রদায়ের ইংরেজের মতই অত্যন্ত দাম্ভিক, অতিশয় ক্ষমতা-প্রিয় আত্মবিশ্বাসীও বটে। বিনয় বলে কোন গুণ তাঁর চরিত্রে মোটেই ছিল না। তাঁর নিজের সম্বন্ধে এতই উচ্চ ধারণা এবং নিজের শক্তিতে এতই বিশ্বাস ছিল যে তিনি কখনও কারো কাছে নীতি স্বীকার করেন নি। তিনি নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই মনে করতেন তাঁর তুলনায় আর সকলেই ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র। এই আত্মশ্রুতি—এই অহমিকাবোধই এবং ক্ষমতা-প্রিয়তাই রাজনীতি ক্ষেত্রেও অনেক সময় তাঁকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। মনে পড়ে, ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসেব নাগপুর কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা। কংগ্রেস নেতা হিসাবে জিন্নাহ সাহেবও সেখানে গিয়েছেন। মণ্ডে বক্তৃতা দিতে উঠে, কথা প্রসঙ্গে তিনি "মোলানা" মহম্মদ আলি সাহেব সম্বন্ধে বললেন— "মিস্টার মহম্মদ আলি!" আর যান কোথায়—চতুর্দিকে হৈ হৈ। দাবি উঠলো—"বলুন, মোলানা মহম্মদ আলি!" তিনি কিছুতেই বললেন না—কলে তাঁর ভাষণও শেষ হতে পারলো না—সেই থেকে তিনি কংগ্রেসই ছাড়লেন। শৃঙ্খলিত কংগ্রেসই ছাড়লেন না—দেশও ছেড়ে বিলেতে চলে গেলেন ব্যারিস্টারী করতে। সেখানেও থাকতে পারলেন না, আবারও দেশে ফিরে এসে জাতীয়তাবাদী থেকে একেবারে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হলেন! যে জিন্নাহ সাহেব কোনও দিনই ধর্মের ধারকাছ দিয়ে যান নি, তিনিই হলেন ইসলামের একমাত্র প্রবক্তা। তাঁর যেমন ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তেমন ছিল অনমনীয় ব্যক্তিত্ব—যে ব্যক্তিত্বের কাছে, তাঁর দলের (মুসলিম লীগের) অন্য কেউই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতেন না। এমন কি যে ধন-ঋণের পাশাপাশি একমাত্র দুহিতা মহিলাকে তিনি ভালবাসে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর সাথেও তিনি নিরন্যও রোম্ব শেষ পর্যন্ত চলতে পারেন নি। তাঁর বুদ্ধি ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে অতি সঙ্গতভাবে তাঁর আশে-পাশের লোককে অত্যন্ত ছোট

করেই দেখতে সর্বদা সজাগ রেখেছে। এক্ষেত্রে, আমার মনে হয় তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রেও সময়ে সময়ে ভুল পথে পদক্ষেপ করেছেন। এই বকম একটি ভুল পথেই তিনি পা দিয়েছিলেন, লর্ড মাউন্টবটেনকে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে রাখার সিদ্ধান্তের মত পাঠিয়ে। লর্ড মাউন্টবটেন যদি ভারত-পাকিস্তানেব বৌধ বড়লাট থাকতেন, তা হলে পাকিস্তানেরই লাভ বেশি হত। ইংরেজের নীতিই ছিল, ভারতবর্ষের বিভাগ করে, 'হিন্দু ভারত' ও 'মুসলমান ভারত' সৃষ্টি করা। লর্ড মাউন্টবটেনও সেই নীতিরই ধারক ও বাহকই ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুরও লর্ড মাউন্টবটেন পরিবারের প্রতি বিশেষ একটা দূর্বলতা ছিল, যে দূর্বলতার ফলেই কাশ্মীর প্রশ্নকে তিনি ইউ, এন, ও-ব (U. N. O) দরবারে পেশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, লর্ড মাউন্টবটেনকে যৌধ বড়লাট রাখলে পাকিস্তানের পক্ষে হয়তো কাশ্মীর সম্পর্কে মোটেই কোন কাশেলা হত না—কাশ্মীর পাকিস্তানেবই হত। কিন্তু তা হল না। জিন্নাহ সাহেব নিজেই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার উভয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সূচী (Time table) বানচাল হয়ে গেল। ১৪ই আগস্ট বিকেলে রাজপ্রতিনিধি লর্ড মাউন্টবটেনকে করাচীতে গিয়ে জিন্নাহ সাহেবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হল এবং সেখানকার উৎসব আয়োজন শেষ করে লর্ড মাউন্টবটেন দিল্লীতে ফিরতে পারলেন গভীর ব্যথিতে। ভারতে, তাই ক্ষমতা হস্তান্তর হল, রাত ১টার পরে। দেশীয় মতে সোদিনও ১৪ই আগস্টই হয়, কিন্তু ইংরাজি মতে রাত ১২টার পবেই নতুন দিন সূর্য হয়, তাই ইংরাজি মতে সোদিনটা হয়, ১৫ই আগস্ট। এই কারণেই পাকিস্তানের স্বাধীনতার একদিন পরে অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট তারিখে ভাবতের স্বাধীনতা দিবস পড়ে।

আগস্ট মাসের সূর্য থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ আবশ্য হয়। উভয় পাঞ্জাবেই গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডও সাথে সাথেই চলতে থাকে। সারা ভাবত-বর্ষ জুড়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ধমকমে ভাব সর্বত্রই দেখা দেয়। দেশ বিভাগের এটাই পরিণতি। ভাবত-বর্ষের একপ্রান্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিহত হলে, অপব প্রান্তের বাংলা দেশেব মুসলমানও আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের ওপরেও ঐ হত্যার বদলা নেওয়া হতে পারে

বলে। পাক-ভারত উভয় রাষ্ট্রেরই সংখ্যা-
লব্ধ সম্প্রদায় যেন একে অন্যের পরস্পরের—
প্রতিভূ-প্রতিনিধি (hostage)! এক
রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন বিপন্ন
হলে, অপর রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে,
সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জনগণের দরবারে
সেই অপরাধের দায়িত্ব নিতে হয়। প্রাণ
দিয়ে সেই অপবাদের (১) প্রায়শ্চিত্ত
করতে হয়! পূর্ব পাক্সাব থেকে ট্রেনের
মুসলমান যাত্রীদিগকে হত্যা করে কামরার
গায়ে লিখে দেওয়া হয়—“পাকিস্তানকে
উপহার”, পরদিনই পশ্চিম পাক্সাব থেকে
অনুরূপই উপহার (১) আসে ভারতে। এই
অবস্থার পরিবেশে লর্ড গান্ধীজী
সরকারও যেমন চিন্তিত হয়ে পড়েন,
তেমনি চিন্তিত হন—মহাত্মা গান্ধী।
মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির হিন্দুদের কথা
চিন্তা করে নোয়াখালির পথে
কলকাতায় আসেন। লর্ড মাউন্টবটেন,
কলকাতায় অবস্থিত পূর্ব-পশ্চিম সামরিক
বাহিনীর প্রধান জেনারেল টুকেরকে
পূর্ব-পশ্চিম শান্তিবক্ষ্য জন্য পশ্চিমবঙ্গের
মত পণ্ডাশ হাজার ফৌজের একটি বাহিনী
দিতে চান কিন্তু জেনারেল টুকের তা নিতে
রাজী হন না। তিনি মনে মনে ঐ পণ্ডাশ
হাজার সশস্ত্র ফৌজ বাহিনীর চেয়েও
শক্তিশালী একজনকে একটি বাহিনীর
সাহায্য নেওয়ার কল্পনা করেন। সেই এক-
জনকে বাহিনীর অধিনায়ক হলেন, মহাত্মা
গান্ধী।

এদিকে, প্রতিদিনই পশ্চিমবঙ্গ থেকে
হত্যা, আব হত্যা, বীভৎস হত্যার, গৃহ-
হিংস্র নারীহরণের ও লুণ্ঠনের সংবাদ,
দংবাদপত্রের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে
পড়তে থাকে; আর কলকাতায় মুসলমান
অধিবাসীদের হৃৎকম্প ও ততই বাড়তে
থাকে। ১৯৪৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবদী
সাহেব, যে সব মুসলমান সিপাহী দিয়ে
কলকাতার পুলিশ বাহিনী দ্বারা ফেলে-
ছিলেন, তাঁরাও অধিকাংশই পাকিস্তানের
নতুন রাষ্ট্রে গিয়েছেন। পদস্থ মুসলমান
সরকারী কর্মচারীরাও চলে গিয়েছেন।
এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করে
কে? তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। সম্ভবত
এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল
টুকের। সাহেবের পরামর্শে বাংলার তদানী-
ন্তন নাট সাহেব (ফ্রেডারিক বারোজ) এক
মুসলমান প্রতিনিধিদল নিয়ে মহাত্মা
গান্ধীর সাথে দেখা করে তাঁকে স্বাধীনতা
দিবস পর্যন্ত কলকাতাতেই থাকতে
অনুরোধ করেন। মহাত্মা গান্ধীর কাছে
কিন্তু ঐ দেশ বিভাগে অর্জিত স্বাধীনতা
দিন মোটেই সুখের দিনরূপে দেখা দেয়
নি। তিনি ঐ দিনটিকে শোকের দিনই
মনে করেন, কারণ, তিনি সত্য ও
অহিংসের তত্ত্বিতে সারা জীবনব্যাপী

সাধনায় যে নয়া এক বিশ্বসমাজে—যে
সমাজে থাকবে না শোষিত ও শোষণকারী,
মানুষে মানুষে গড়ে উঠবে একটা প্রেম
ও প্রীতির সম্পর্ক—গড়তে চেয়েছিলেন,
দেশ বিভাগে ফলে তাঁর সেই
সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। ভারতবর্ষ এক
বিরাট দেশ, বহু ভাষার বহু সংস্কৃতির
বহু ধর্মের বহু জাতির মহান তীর্থ ও
মিলনভূমি এই ভারতবর্ষকেই গান্ধীজী
বিশ্বের একটি ছোট সংস্করণ ধরে নিয়ে
এখানেই তাঁর সাধনার পর্বীক্ষাক্ষেত্র
হিসাবে নিয়েছিলেন কিন্তু দেখা গেল,
এখানে হিন্দু-মুসলমান এক সাথে
বাস করতে পারলেন না—মুসলমানের
জন্য আলাদা বাসভূমির দরকার হল।
আর, তাঁর রাজনীতিক শিষ্যরা সেই দেশ-
বিভাগই মেনে নিলেন। তাঁর সারা
জীবনের সাধনা, তাঁর জীবদ্দশাতেই ব্যর্থ
হয়ে গেল। তাই, এই দিনটি তাঁর কাছে
সুখের দিনরূপে দেখা না দিবে, দেখা
দিল একটা শোকের দিন হিসাবে। আজ-
কের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্মরণ করলেন,
১৯৪৬ সালের নোয়াখালির অত্যাচার-
পীড়িত দৃশ্য হিন্দুদের কথা—তাঁদের
প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি
নোয়াখালিতে যাওয়াই স্থির করেছেন
কিন্তু গভর্নর বারোজ সাহেব ও মুসলমান
প্রতিনিধিদলও নাছোড়বন্ডা—তাঁদের স-
কলেরই বিশেষ অনুরোধ, গান্ধীজীকে
কলকাতাতেই থাকতে হবে। গান্ধীজী
মুসলমান প্রতিনিধিদের বলেন, এক সত্রে
তিনি কলকাতায় থাকতে রাজী আছেন—
সেই সত্রেই হচ্ছে, নোয়াখালির হিন্দুদের
উপর কোনরূপ অত্যাচার হবে না,
সেই দায়িত্ব তাঁদের নিতে হবে। প্রতিনিধি-
দল রাজী হয়ে নোয়াখালিতে মুসলিম
লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে তৎক্ষণাৎ লোক
পাঠিয়ে সেখানে শান্তি বজায় রাখার
নির্দেশ দেন। নোয়াখালিতে কোনও
অশান্তি ঘটে না। এই প্রসঙ্গে একটা
কথা বলি, সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা
যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেন, তার মূল উৎস
কোথায় তা এই ঘটনা থেকেই রোকা যায়।
১৯৪২ সালে ঢাকা জেলে থাকার সময়
দেখিছি, সেখানে প্রায়ই হিন্দু-মুসলমানের
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ’ত। দাঙ্গার পরেই,
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যখন মহান্নার
সদরদেব ডাকিয়ে দাঙ্গা বন্ধ করতে
বলতেন, তখনই দাঙ্গা বন্ধ হ’য়ে যেত।
পরবর্তীকালে, ১৯৫০ সালে যখন পূর্ব-
বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু-নিধন
চলছিল তখন, বন্ধু ব্রজমাধব দাস
‘এম এল এ’র কাছে শুনেছি, সেখানে
কিছুই হয় নি, সেখানকার তৎকালীন
পুলিশ সাহেব আবদুল্লা সাহেবের জন্য।
আবদুল্লা সাহেব না কি জেলার সর্বত্র
মুসলমান নেতাদের জানিয়ে দেন যে যদি

জেলায় কোন স্থানে একটি হিন্দু
নিপীড়িত, নিগহীত বা নিহত হয়,
তাহলে তার ফল ভোগ করতে হবে
মুসলমান নেতাদের। ফলে, সেখানে
কোনই অশান্তি হয় নি। স্বাধীন দেশের
শাসকেরা এই মূল সূত্রটি মনে রেখে
ব্যবস্থা অবলম্বন করলে, আমার মনে হয়,
অনেক অশান্তির হাত থেকেই দেশ রক্ষা
পেতে পারে।

গভর্নর বারোজ সাহেবের সাথে
মুসলমান প্রতিনিধিদল যখন গান্ধীজীর
সাথে দেখা করেন, তখন জাঁদরেল (!)
সুরাবদী সাহেব কলকাতায় ছিলেন না।
তিনি গিয়েছিলেন করাচীতে জিন্নাহ
সাহেবের সাথে দেখা করে পূর্ব-বঙ্গের
শাসনক্ষমতার প্রধান অধিকারী হওয়ার
তাল্লির করতে। জিন্নাহ সাহেব, সুরাবদী
সাহেবের সাথে দেখাও করেন নি। এক-
নাথক নেতা ও শাসকবা চিরদিন তা-ই
করে থাকেন। শক্তিশালী পরবর্তী
নেতাকে আমল দেন না। জিন্নাহ সাহেবও
ছিলেন রাজনীতিকক্ষে্রে একনাথক
(ডিক্টেটর); আর সুরাবদী সাহেবও
ছিলেন প্রবল শক্তিশালী নেতা; সুতরাং
জিন্নাহ সাহেব, সুরাবদী সাহেবকে কোন
পাতাই দেন নি। লিখাকত আলি
সাহেবের কাছে, সুরাবদী সাহেব জানেন
যে পূর্ব-বঙ্গের শাসনক্ষমতার অধিকারী
হওয়ার তাঁর এই সম্ভাবনা নেই।
সুরাবদী সাহেব অদৃষ্টে করাঘাত করে
ফিরে আসেন কলকাতায়, গান্ধীজীর
সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং গান্ধীজীর
সত্মত তিনি গান্ধীজীর সাথে বেলে-
ঘাটার এক ভাঙা ‘প্রাসাদে’ আস্তানা নেন।
সুরাবদী সাহেবের এও এক রূপ।
একবারে সাধু ফকির! বরাবরই তিনি
দুর্ভিক্ষ সাহসী। এবারে এখানেও তিনি
যথেষ্ট সাহসেরই পরিচয় দেন। জনতা
তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এসেছেন—
তিনি সাহসের সাথে গান্ধীজীর পক্ষপটে
আজ্ঞাদিত হ’য়ে তাঁদের সম্মুখীন
হয়েছেন—গান্ধীজী, সুরাবদী সাহেবকে
আড়াল করে তাঁর কাছে হাত দিয়ে জনতার
সামনে দাঁড়িয়েছেন! সে এক অদ্ভুত
দৃশ্য—ছায়াছবিব দৃশ্যের চেয়েও
রোমাঞ্চকর। সেই রাতেই, অর্থাৎ
স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব রাতিতেই যেন
বাদদশের স্পর্শে কলকাতার অবস্থা
সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে গেল—ধুমধামে ভাব
সম্পূর্ণ কেটে গেল। হিন্দু-মুসলমান
রাস্তায় রাস্তায় মিলিত হয়ে পরস্পর
পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, পরস্পর
পরস্পরকে আভর মাধলেন, পরস্পর
পরস্পরের গায়ে গোলাপজল ছিটালেন।
পরদিন উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যেই ভারতের
প্রথম স্বাধীনতা দিবস কলকাতার ও সারা
পশ্চিমবঙ্গে প্রতিপালিত হল।

বিশ্বসাহিত্যের *

ডঃ নরেন ডক্টাচার — প্রাদিপট

২১

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

সংস্কৃত নাটকের কথা পূর্ববর্তী দুটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। এইবার সংস্কৃত কবিতা ও কাব্যের কথা আসা যাক। দার্ভাগ্রমে প্রাক-খৃষ্টীয় যুগের কোন নিখুঁত কাব্যগ্রন্থের নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তার অর্থ এই নয় যে, খৃষ্টপূর্ব যুগে সংস্কৃত কবিতা ছিল না। বৈদিক সাহিত্যের বহু অংশই ছন্দে রচিত। ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে অনেক ভাল ভাল কবিতা আছে যার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে কিছু কিছু করেছি। কিন্তু সাহিত্যের যে ধারাটি বিশেষভাবে কাব্য বলে পরিচিত ঠিক সেই ধারার কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি খৃষ্টপূর্ব যুগে। রামায়ণকে বিশুদ্ধ কাব্য বলতে অনেকেই আপত্তি করেন, কেন না কাব্যের শাস্ত্রীয় লক্ষণের সঙ্গে রামায়ণ সর্বদা সামঞ্জস্য রেখে চলে নি। পতঞ্জলি বাররূচ নামক একটি কাব্যগ্রন্থের কথা তাঁর নিজের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই গ্রন্থ আজও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।

অশ্বঘোষ

অশ্বঘোষ রচিত নাটকসমূহের কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু কবি হিসাবেও অশ্বঘোষ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নামে অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে যেগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সৌন্দর্যনন্দ নামক কাব্যগ্রন্থ। আঠারোটি সর্গ বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাব্যে বৃন্দের সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতপ্রাতা নন্দের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। নন্দ তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ও জাগতিক সুখভোগের প্রতি রীতিমত আসক্ত ছিলেন। বৃন্দ নানাভাবে বহু উপদেশ দিয়ে ও অলৌকিক ঘটনাবলী

দেখিয়ে তাঁর মতিগতিকে ধর্মপথে আকর্ষণ করলেন। সৌন্দর্যনন্দ কাব্যের এই হচ্ছে বিষয়বস্তু।

কিন্তু অশ্বঘোষের বিখ্যাততম কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে বৃন্দচরিত। এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিখ্যাত চীনদেশীয় লেখক ই-সিং বলেছেন যে, মূল কাব্যগ্রন্থটি আঠারটি সর্গে বিভক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই কাব্যের যে পটুখি পাওয়া যায় তাতে সতেরটি সর্গ আছে, এবং এই সতেরটির প্রথম তেরটিই খাঁটি, বাকিগুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কাব্যে বৃন্দের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। কবি এখানে সম্পূর্ণভাবে রামায়ণকে অনুসরণ তথা অনুকরণ করেছেন। রামচন্দ্রের বনবাসযাত্রার দৃশ্যের ছকে বাসিয়ে বৃন্দের গৃহত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। শূন্যস্থানের চরিত্র দশবর্ষের ছাচে গড়া, অশ্বঘোষ কল্পিত সুন্দরী চরিত্র প্রতি মহাতেই সীতাদেবীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আগেই বলা হয়েছে অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের লোক ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বৃন্দচরিত বাঙাল্য অনুবাদ করেছিলেন শ্রীবন্দীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত আরও অনেকটি কাব্যগ্রন্থ আছে যেগুলির অবশ্য মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন ব্যাখ্যা করা। —এগুলি হচ্ছে মহাযানপ্রমোৎপাদ, বজ্রসূচী ও গুপ্তী-লোচনগাথা। এই প্রসঙ্গে তাঁর নামে প্রচলিত আরও একটি কাব্যগ্রন্থের কথাও উল্লেখযোগ্য যা সূত্রালংকার বা কম্পনা-মহি-ভক্তিকা নামে পরিচিত। এই কাব্যে কিছু কিছু অংশ মধ্য এশিয়া থেকে পাওয়া গেছে।

আর্যশূর, নাগার্জুন, আর্যদেব ও অসঙ্গ

এঁরা চারজনই ধর্ম ও দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে কাব্যকে কাজে লাগিয়েছেন। এঁরা সকলেই খৃষ্টীয়

তৃতীয়-চতুর্থ শতকের লোক। আর্যশূরো বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে জাতকমালা বা পাল্লি জাতককাহিনীগুলির মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটির সংস্কৃতে অনুবাদ। অবশ্য সবগুলি কবিতার অনূদিত হয় নি, কিছু কিছু গদ্যানুবাদও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। চীনাভাষায় এই গ্রন্থটি ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে অনূদিত হয়েছিল, এবং সেই হিসাবে আর্যশূর খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক অবসৃত হয়েছিলেন ধরে নেওয়া যায়। দার্শনিক নাগার্জুন, যিনি সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক, দুটি দর্শনশাস্ত্রভিত্তিক কাব্য রচনা করেছিলেন—মধ্যমককারিকা ও সূত্রলোচন। আর্যদেব জম্মগ্রহণ করেছিলেন সম্ভবত খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে। তাঁর রচিত চতুঃশতিকার স্বাক্ষর ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্যে একটি কাব্যিক স্যাটায়ার। অসঙ্গের মহাযান-সূত্রালংকার খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত। নামের দ্বারাই কাব্যগ্রন্থটির বিষয়বস্তু সূচিত হচ্ছে।

মহাকবি কালিদাস

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা নাট্যব্যবস্থার হিসাবে কালিদাসের পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু তাঁর অধিকতর পরিচয় বোধ হয় কবি হিসাবে। একই সঙ্গে তিনি মনোকাব্য ও গীতিকবিতা রচনায় ক্ষেত্র বিস্তারিত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

কালিদাসের মহাকাব্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় কুমারসম্ভবে। মোট আঠারটি সর্গে রচিত এই মহাকাব্য বর্ণিত হয়েছে তাবকাসুদ বধার্থে মৈত্র-সেনাপতি কুমারের শিবের ঔষে ও পাবতীর গর্ভে জন্মসম্প্রদেয় কাহিনী। মঞ্জিনাথের মত টীকাকারে বা এই মহাকাব্যের প্রথম আটটি সর্গের টীক রচনা করেছেন, কেন না তাঁরা মনে করেছেন যে পরবর্তী সর্গগুলি সম্ভবত কালিদাসের রচনা নয়। এ যুগের পরিচ্ছন্নতাও অনুব্রূপ ধারণা

পোষণ করেন। এই মহাকাব্যে বিভিন্ন চরিত্রের কালিদাস অংশে প্রভাব পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম সর্গে হিমালয়ের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন- অথবা তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তার তুলনা নেই। স্বর্গবিলাপের অথবা ছন্দবোধী শিবের সঙ্গে পার্বতীর কথোপকথনের দৃশ্যটি যে কোন পাঠককেই আভূত করে।

রঘুবংশ মহাকাব্যটি ইতিহাসধর্মী। একদা এই মহাকাব্যটি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে কালিদাসের অপর একটি নামই হয়ে গেছে "রঘুকার"। রঘুবংশের মোট দ্বিশতক রচনার বস্তুত এই মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে। মূলত রামায়ণ ও বিভিন্ন পুরাণকে অবলম্বন করেই এই মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে। এটিও কিন্তু অসম্পূর্ণ রচনা, কালিদাস এই গ্রন্থের মোট ত্রিশটি সর্গ রচনা করে যেতে পেরেছিলেন। ইতিহাসধর্মী হলেও কাব্যিক সৌন্দর্য এই মহাকাব্যে কোথাও ঘাটত হয় নি।

অতুসংহার সম্ভবত কালিদাসের প্রথম রচনা, এমন কি এটি তার নিজস্ব রচনা কি না তা নিয়েও পণ্ডিত-দের মধ্যে বিতর্ক আছে। অতুসংহার একটি গীতিকাব্য। ছরটি সর্গে ছরটি ক্ষুদ্র এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। প্রতি স্লোকেই কবির বর্ণনাশক্তি প্রকৃষ্টভাবে নিখুঁতভাবে পর্বতের ক্ষমতার পরিচয় দিতে উঠেছে।

সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয় কালিদাসের মেঘদূতের কথা। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি চিরদিনই পাঠকের মধুর আবেগসমূহকে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। মেঘদূতের স্লোকের সংখ্যা একশোটির কিছু বেশি। কাহিনীটির মূল কথা হচ্ছে প্রভুর অভিসম্পাতে বার্মাগিরিতে নির্বাসিত এক বিরহী বন্ধু অলকাপুত্রীতে তার বিপদস্বা পত্নীর নিকট বার্তা পাঠাচ্ছে মেঘকে দূত করে। যক্ষ বর্ণিত মেঘের সেই সম্ভাব্য গমনপথটির বর্ণনা লাস্তবিকই বিস্ময়কর। কবি বিশেষভাবে এই কাব্যের জন্য মন্দা-প্রান্তা ছন্দকেই পছন্দ করেছিলেন। মেঘদূতকে ঠিক কোন কার্যকর হুকে ফেলা যাবে তাও একটা সমস্যা। ইংরাজীতে যে ধ্বনির কবিতাকে 'এলোজি' বলা হয় মেঘদূতের ধ্বনি অনেকটা সেইরকম। ভারতীয় সমালোচকদের মধ্যে স্থিরবাব মেঘদূতকে মহাকাব্য বলতে চান, কিন্তু কল্পভ্রমের মতে এটি একটি খণ্ডকাব্য। সে যাই হোক এই ক্ষুদ্র কাব্যটি সর্বযুগের পাঠক ও সমালোচকের মনোহরণ করেছে।

ভারবি ও মাঘ

ভারবি খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধের লোক ছিলেন। ৬০৪

খৃস্টাব্দে অইহোল লেখকগণ এক কাহিন্যবৃত্তি গ্রন্থে ভারবির খণ্ডে পাওয়া যায়। যে কাব্যগ্রন্থটি ভারবিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত করেছে তার নাম 'কিরাতার্জুনীয়'। মহাভারতে একটি কাহিনী আছে যে অর্জুনের বীর্য পরীক্ষা করার জন্য কিরাতবংশী মহাদেবে একটি বরাহ নিখ উপলব্ধ করে তার সঙ্গে যুগাড়া বাধান, এবং সেই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবৃত্তি হয়। শেষ পর্যন্ত ভাব্য মহাদেবের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং অর্জুনকে আশীর্বাদ করে পার্বতীসহ তিনি কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারবির রচনা সুন্দর হলেও বর্ণনার প্রচুর কৃষ্টিমতা আছে। তার উত্তরাধিকারী মাঘও রচনার ক্ষেত্রে কৃষ্টিমতার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। মাঘ খৃস্টীয় সপ্তম শতকের লেখক ছিলেন, তার রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম 'শিশুপাল বধ'। এই কাব্যের কাহিনীর উৎসও মহাভারত। চৌদ্রাজ শিশুপাল ছিল বরাবরই কুকের বৈরী। কুষ্ণ তার মাঠে আশ্রয় দিয়েছিলেন যে শিশুপালের একশো অপরধি তিনি ক্ষমা করবেন এবং তা' করেও ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধিরের রাজসভায়, তার রাজসূয় যজ্ঞের সময়, অকস্মাৎ একটা বাক্সে অহিলায় সর্জনসমক্ষে শিশুপাল কুষ্ণকে লোকচক্ষে হের করার চেষ্টা করলে কুষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে তাকে বধ করেন।

পরবর্তী কাব্যগণ

মাঘের সমকালীন অথবা কিছুটা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁর বিনী বজ্জীরাঙ্গ প্রীধরসেনের পুষ্ঠপোষকতার ডাক্তিকাব্য বা রাবণবধ কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। একটি বিশেষ কারণে এই কাব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণগ্রন্থের মূল সত্রগুলি উদাহরণ তিনি তার কাব্যে দিয়েছেন। এ ছাড়া ভলংকারশাস্ত্রের নিয়মগুলিও উদাহরণ দেবার জন্য তিনি একটি 'গোটা সর্গ' ব্যবহার করেছেন। কাব্যপাঠের অনন্দলাভের সঙ্গে সঙ্গে যারা নিখুঁতচাষ এবং বাড়তি পবিপ্রম না করে ব্যাকরণ শিখতে চান তাঁদের পক্ষে এটি অতুল্য উপাদেয় ব্যবস্রুতি।

ভট্টিকে অনুসরণ করে আরও একজন ব্যাকরণ শেখানোর জন্য কাব্য রচনা করেছিলেন। ইনি হচ্ছেন কাশ্মীর দেশের কবি ভোমক। এর রচিত কাব্যের নাম 'রাবণজর্জুনীয়', সাতাশটি সর্গে কার্ত-বীর্ষজর্জুনের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু

বর্ণনাগুলি আসলে হচ্ছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সুসমূহের উদাহরণ।

এরপর তিনটি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলি কালিদাসের নামে প্রচলিত, কিন্তু কালিদাসের রচনা নয়। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ঘটকপুত্র কাব্য, বাইশটি স্তবকে রচিত মেঘদূতের প্যারোডি, বিষয়বস্তু হচ্ছে রিহিগী পত্নী বর্ষাকালে অনুপস্থিত স্বামীর নিকট মেঘকে দূত করে বার্তা পাঠাচ্ছে। বাকি দুটি কাব্য মল্লময় এবং শৃঙ্গার-ভিলক কালিদাসের নামে প্রচলিত। কিন্তু এই তিনটি কাব্যই পত্রবর্তী যুগে রচিত।

সপ্তম শতকের আর একজন গৌড় কবির নাম বৃন্দাবন (ইনি বিখ্যাত গৌড় লেখক বৃন্দাবন নন) যার কাব্যের নাম পদ্যচ্যুদামণি। দশটি সর্গে রচিত এই কাব্যে বৃন্দাবনের জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে। কলহন তার রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্তের সভাসদ জনৈক কবি মেঘরচিত হস্তবীৰ্য নামক একটি কাব্যের উল্লেখ করেছেন। কাব্যটি এখনো পর্বন্ত পাওয়া যায় নি কিন্তু উক্ত কাব্য থেকে রজশেখর, কেমেন্দু, রাঘব প্রমুখ প্রাচীন লেখকেরা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সপ্তম শতকের অপর একজন কবি কুমারদাস কুড়িটি সর্গে জানকীহরণ কাব্য রচনা করেছিলেন, যার বিষয়বস্তু নামেতেই বোঝা যাচ্ছে।

শতকসমূহ ও লিরিক-সাহিত্য

একশোটি স্তবকে একটি বিশেষ ধরনের কাব্য রচনার রীতি প্রাচীনকালে ছিল। এই শ্রেণীর কাব্যকে বলা হত শতক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ভট্টহারির শতকটির কথা এসে পড়ে-শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও কৈরাম্যশতক। এই ভট্টহারি সম্ভবত বাক্সপাঠীর নামক বিখ্যাত ব্যাকরণগ্রন্থের রচয়িতা, যিনি ৬৫০ খৃস্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন। এর পরেই উল্লেখযোগ্য অমর বা অমরক রচিত অমরশতক যার অনেকগুলি সংস্করণ আমাদের হাতে এসেছে। এই কাব্যে প্রেমের বিভিন্ন দিকের কথা কবি লিখেছেন। সপ্তম শতকের আর একজন কবি মাহুর মাহুরেশ্বর বা সূর্যশতক লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, এবং তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তার সমকালীন বিখ্যাত গদ্যলেখক বাণভট্ট লিখেছিলেন দেবীশতক।

ইংরাজীতে লিরিক বলতে যে জাতীয় রচনাকে বোঝার সংস্কৃত সাহিত্যে সেই জাতীয় রচনাকে একান্তই অভাব। পূর্বো-ল্লিখিত অমরশতক ও ভট্টহারির শৃঙ্গারশতককে কিছুটা লিরিক-ধর্মী

সাপ্তাহিক বসুমতী

যা যেতে পারে। অমর ও ভূত্বাহার উভয়েই প্রেমকে তাদের রচনার বিষয়বস্তু করেছেন, কিন্তু অমরশতকে কবি যেভাবে নিজের মনের কথাকে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন, শেখেরশজন সেখানে বহুলাংশে কৃষ্ণিমতার আশ্রয় নিয়েছেন।

পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে প্রেমকে বিষয়বস্তু করে যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে গোবর্ধনের নাম উল্লেখযোগ্য যিনি ছাল-বিরচিত গাথাপুস্তকটির অনুকরণে আধাসপ্তশতী নামক একটি কাব্য লিখেছিলেন সাত শো শ্লোকে। ইনি বর্ণেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন, অর্থাৎ সেই হিসাবে জয়দেবের সমকালীন যিনি একাদশ শৃঙ্গারের লোক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের কথা আমাদের মনে উদ্ভিত হয়। গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের শাস্বত প্রেমলীলা। গীতগোবিন্দ শ্বাদশটি সর্গে বিভক্ত, ও অষ্টদশী ছন্দে রচিত। এই কাব্যে কবি বিস্ময়কর ছন্দোনিপুণ্য দেখিয়েছেন। কবির জন্মস্থান বাংলাদেশে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে। লক্ষ্মণসেনের আরও একজন সভাকবি ছিলেন ধোয়ো যিনি কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে পবনদূত নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্য হিসাবে পবনদূত লিরিকধর্মী। কাশ্মীরী কবি বিলহনের চৌরপগাশিকা একটি উল্লেখযোগ্য লিরিককাব্য। ইনি একাদশ-শ্বাদশ শতকের লোক ছিলেন। চৌরপগাশিকার শ্লোকের সংখ্যা মোট পগাশটি যা কবি নিজ প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন। গল্প আছে যে এই কবি গুজরাটের রাজকন্যা চন্দ্রলেখার প্রেমে পড়েছিলেন, এবং সে কথা প্রকাশিত হওয়া-মাত্র রাজা কবির প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন। বধ্যভূমিতে কবি মৃত্যু মৃত্যু এই পগাশটি শ্লোক রচনা করেন, ফলে রাজা খুশি হয়ে তাঁর উপর থেকে দণ্ডাজ্ঞা তুলে নেন এবং চন্দ্রলেখার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন।

ঐতিহাসিক কাব্য

প্রকৃত অর্থে ইতিহাস রচনার রীতি প্রাচীন ভারতে ছিল না। একমাত্র ফলহন ছাড়া আর কোন লেখককেই ঋগ্বেদ পাওয়া যায় না যাকে হেরোডটাস বা যুর্কিডিসের পাশে স্থান দেওয়া যায়। আমরা গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে অজ্ঞত ঐতিহাসিক কাব্যের পরিচয় পেয়েছি যেগুলির উল্লেখ আমরা প্রথমদিককার রচনাগুলিতে করেছি। কিন্তু যথার্থ ইতিহাসকে বিষয়বস্তু করে এক রাজতরঙ্গিণী ছাড়া কোন কিছু লেখা হয় নি।

তথাপি সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসাশ্রয়ী কয়েকটি কাব্যের উল্লেখ করেছেন। এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় বাণভট্টের হর্ষচরিতের কথা। বাণভট্ট সম্রাট হর্ষবর্ধনের অনুগ্রহভাজন সভাসদ ছিলেন এবং হর্ষবর্ধনের জীবনের গোড়ার দিকটা এখানে বর্ণিত হয়েছে। হর্ষচরিতে বাণভট্ট হর্ষেরই চরিত্রকথা রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি মোটেই ইতিহাসাশ্রয়ী ছিল না। বহু নাটকীয় ঘটনার তিনি আমবানী করেছেন যেগুলির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। যেমন হর্ষবর্ধনের ভ্রমী রাজ্যস্রী শব্দহস্ত থেকে পলায়ন করে বিশ্বাপর্বতের অরণ্যে আশ্রিতে আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছেন এমন সময়ে তাঁকে অনুসন্ধানরত হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর রোমাঞ্চকর সাক্ষাৎকার, এসব ঘটনা নাটকেই মানায় ইতিহাসের উপজীব্য বিষয় হতে পারে না।

এদিক থেকে অষ্টম শতকে রচিত বাকপতির গোড়বহু কিছুটা বস্তুনিষ্ঠার দাবি করতে পারে, যদিও এই গ্রন্থের নামক যশোবর্মী, যিনি সম্ভবত কাশ্মীর-রাজ্য ললিতাদিত্যের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন, এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নায়করূপে চিত্রিত হয়েছেন। এখানে জানানো প্রয়োজন যে গোড়বহু সংস্কৃত ভাষায় রচিত নয়, আগাগোড়াই মহা-রাষ্ট্রীয় প্রাকৃততে রচিত। সৌদিক থেকে একাদশ শতকে রচিত বিক্রমাংকদেবচরিত (এই বিলহন চৌরপগাশিকা কাব্যের লেখক) অপেক্ষাকৃত সার্থক রচনা। এই গ্রন্থে চালুক্যরাজ্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। এখানেও অবশ্য কবিকল্পনার বাহুদ্বা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনীগ্রন্থ হিসাবে তা রসোত্তীর্ণ। একথা সম্মা্যকর নন্দী রচিত রামচরিতের ক্ষেত্রেও খাটে, যে গ্রন্থে পালবংশীয় রাজা রামপালেব জীবনী আলোচিত হয়েছে, কিছুটা রূপকেব আড়ালে। এ ছাড়া হেমচন্দ্রের কুমার-পালচরিত, সোমেশ্বর দত্তের কীর্তি-কোমুদী, আরিসিংহের স্কৃত-সংকীর্তন, শম্ভুর রাজেন্দ্রবর্ধন প্রভৃতি যে গ্রন্থগুলি পাওয়া গেছে সেগুলিকে সার্থক সৃষ্টি বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে পদ্ম-গুপ্তের নবসাহসারচরিত কাব্যটির কথাও উল্লেখযোগ্য, যা আসলে একটি হিস্টোরিকাল রোমান্স, যেখানে ইতিহাসকে উপলক্ষ্য করে একটি জল্পিত প্রেমকাহিনী আঠারোটি সর্গে বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম কলহনের রাজতরঙ্গিণী। এগারো শতকে রচিত এই গ্রন্থে কাব্যিকারে বর্ণিত হয়েছে কাশ্মীরের সামগ্রিক ইতিহাস। একমাত্র কলহনই

বিশুদ্ধ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচনার কার্যে অগ্রসর হয়েছেন। কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ববর্তী লেখকদের রচনাবলী এমন কি লেখমলাসমূহ থেকেও তিনি ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন, এবং লিখেছেন সম্পূর্ণ পক্ষপাতবিহীন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে স্পষ্টভাষণ করতে কলহন স্বাধীন হন নি, এমন কি যার রাজত্বকালে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই অত্যাচারী রাজা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে তিনি ভীত হন নি। বস্তুত জাত ঐতিহাসিক বলতে যা বোঝায় কলহন তাই ছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রেই তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ তথা প্রাদেশিকতা বোধের উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন, এমন কি বহুক্ষেত্রেই যে ভাষায় তিনি স্বজাতির সমালোচনা করেছেন, অন্যায়ের প্রতি যে ঘণার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা যে কোন দেশের এবং যে কোন যুগের পাঠকের মনেই বিস্ময় ও প্রশংসার ভাব উদ্বেক করবে। তদুপরি ভাষা, ছন্দ ও উপমার উপর কলহনের বিস্ময়কর অধিকার ছিল, এককথায় বলতে গেলে কাশ্মীরের ইতিহাস জ্ঞানার জন্য রাজতরঙ্গিণী একমাত্র অপরিহার্য গ্রন্থ, যার সাহায্য ব্যতিরেকে এধুগেও কাশ্মীরের কোন ইতিহাস রচিত হতে পারে না।

সাপ্তাহিক বসুমতীর

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

	টাকা, পু.
বার্ষিক চাঁদা (সভাক)	১৪.০০
মাসিক " "	৭.০০
ত্রৈমাসিক " "	৩.৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মাব্যয়

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানাসহ ডাকটিকটসহ খাম থাকলে একমাত্র অননোনীত গল্প ক্ষেত্র পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ক্ষেত্র পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

বঙ্গবন্ধু ও দেশে মিলন

আধুনিক নাট্য পরিচালনা : পরি-
ালককে নাটক মণ্ডল্য করবার সময় টিম
একটি-এর উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে
হবে।-প্রত্যেক অভিনেতা যদি অভিনয়ের
দময়ে পূর্ণ মনঃসংযোগ সহকারে নিজের
দায়িত্ব পালন করে যান তাহলে নাটক
অব্যাহত গতিতে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে
যাবে। অভিনেতা হিসাবে আমি মঞ্চে
রয়েছি-আর একজন অভিনেতা সংলাপ
কলে চলেছেন। এই সময়টায় আমি কি-
ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো, হাত দুটি নিজেই
বা কি করব? প্রডিউসার জবাব দেন-
শ্বর হয়ে থাকুন, দেখুন এবং অন্য
অভিনেতা যে সংলাপ বলছে তা মন দিয়ে
শুনুন।-যদি সংলাপ শোনার প্রয়োজন
না থাকে তাহলে শব্দ শ্রবণ হয়ে
শাকুন। স্টেজে দাঁড়িয়ে বা বসে আছি,
অথচ শোনার প্রয়োজন নেই। সে আবার
কি রকম? প্রডিউসার বলবেন সে
ধরনের পাত্রপাত্রীও স্টেজের উপর থাকে
বৈ কি। যেমন ধরুন চেষ্টার নাটকে
-চেষ্টার চরিত্র নিজেই কথা বলতে
ভালবাসে-অন্য চরিত্রের কথা কান নেয়
না। যে অভিনেতা মঞ্চে আছেন, অথচ
প্লের ভেতর নেই (মানে সংলাপে তাঁর
অংশ নেই) তাকে মোটেই অস্বস্তি বা
বিবাক্তিবোধ করতে হয় না, যদি তিনি
একথা স্মরণে রাখেন যে, দর্শকরা ঐ
সময় মোটেই তাঁকে নজরে আনছেন না
বা তাঁর দিকে চাইছেন না-এবং তাঁরা
যে অভিনেতা সংলাপ বলছেন তাঁকেই
দেখছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর কিছু করবারও
নেই-কিন্তু করলেই বরং দর্শকদের মন
নাটকের কাহিনী থেকে বিচ্যুত হয়ে
তাঁর দিকে যাবে এবং নাটকের সাবলীল
গতি অথবা ব্যাহত হবে। তাই বলে কি
তিনি নিপ্রাণ হয়ে থাকবেন? কখনই
নয়। মনের দিক থেকে প্লের সঙ্গে তিনি
অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে অপেক্ষমাণ
রইবেন। তাঁর ভূমিকা যতই ছোট হুক,
মনে রাখতে হবে যে, সেটি নাটকের
একটি অংশবিশেষ এবং মঞ্চে বা ঘটছে
তার উপর তিনি সঠিকভাবে মনঃসংযোগ
করলে অন্যান্য অভিনেতাদের যথেষ্ট
কাজের সুবিধা হবে এবং দৃশ্যের যথার্থ
পরিবেশ সৃষ্টি হবে-যার তিনি যদি
অনামনস্ক হন তাহলে সমস্ত দশাটিই

মাটি হয়ে যাবে। নিজে সংলাপ না বলেও
অভিনেতা নাটক রসসৃষ্টিতে যথেষ্ট
সাহায্য করে থাকেন-কারণ তাঁর কার্য-
করী উপস্থিতিটা দর্শকদের অবচেতন
মানসে একটা সুদৃঢ় পতিভ্রমার সৃষ্টি
করে।

এ বিষয়ে একটি চমৎকার উদাহরণ
দেওয়া যেতে পারে। ঘটনাটি ঘটেছিল
একটি স্কুলের ম্যাকবেথ নাটকের প্রডাক-
সনে। যে সময়ে ম্যাকবেথ প্রথম ব্যাঙ্কের
প্রোত্সাহ দেখাছিলেন, একটি ছোট্ট
একটি ভূমিকার চাকররূপে অতিথিদের
পেয়ালার মদ ঢালছিল। বালকটি এই
দৃশ্যের ইমোশনাল টেনশনের সঙ্গে
এতোটা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল যে,
সম্পূর্ণ আনন্দেতনহীনভাবে সে নিজের
কাজ বন্ধ করে এবং ম্যাকবেথের দৃষ্টি
নিজের চোখ দিয়ে অনুসরণ করে স্তব্ধ
হয়ে দাঁড়িয়ে রইল-দেখেই মনে হচ্ছিল
যে শব্দ ভয় পেয়েছে-তার দৃষ্টি শূন্য
চেয়ারে গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছিল যদিও
চেয়ারে ব্যাঙ্কের প্রোত্সাহ বাস্তবভাবে
প্রতিভাত হয় নি। প্রোত্সাহের অপসারণ
অবধি ছেলোটি এইভাবেই ছিল। তার পরে
দেহকে শিথিল করে নিয়ে মদ পরিবেশন
সমাধা করে, অতিথিদের সেবাকার্যে রত
অভিনয় এই দৃশ্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে
এবং ম্যাকবেথের অভিনয়কে প্রাণবন্ত
করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল সে
কথা বলাই বাহুল্য। এ না করে বালকটি
যদি আত-অভিনয় করতো বা অস্বাভাবিক
আচরণ করতো তাহলে এই দৃশ্যের সমস্ত
ইলিউশন নষ্ট হয়ে যেত।

আসলে নাটকের প্রতীতি হচ্ছে ফুটবল
খেলার সময়কার বলটিব গতি-অর্থাৎ
জমাগত একদলের কাছ থেকে অন্যের
কাছে চলে যেতে থাকে। প্রডিউসার বা
ডিরেক্টরের কাজ হলো সব সময় নজর
রাখা যাতে দর্শকের দৃষ্টি ঐ প্রতরূপ
বলটির উপর গিয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে।
যার অধিকারে যখন ঐ বলটি থাকবে,
দর্শকের নজর গিয়ে পড়ছে তার উপর
এমন কিছু ঘটা উচিত নয়, যার ফলে
দর্শকের এই মনোনিবেশ নষ্ট হয়ে যায়।
অভিনয়ের সময় এই প্রতরূপ বলটি
কিন্তু সমস্ত কোন বিশেষ নটের আয়ত্তাধীন

হয়ে থাকল-আবার হয়তো কিছু
সময়ের জন্য ঐ বলটিকে নিয়ে কয়েকজন
প্রয়োগ, নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান
করলেন। আবার পরে হয়তো বলটি
কয়েকজন খেলোয়াড়ের কাছ দিয়ে দ্রুত-
বেগে চলে যাবে এবং ঐ খেলোয়াড়দের
প্রত্যেকেরই কাজ হবে বলটির গতিবেগ
অপ্রতিহত রাখতে সাহায্য করা। যখন
যার পায়ে বলটি থাকবে, তখন দর্শকের
দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে তাঁরই উপর-তাঁর
মানে এই নয় যে, অন্য খেলোয়াড়রা এই
সময় নিরপেক্ষভাবে অবলম্বন করবেন-
প্রত্যেককেই সজাগ থাকতে হবে যাতে
বলটি তাঁর কাছে এলেই ঠিকমত গ্রহণ
করতে পারেন।

সুতরাং আবার একই কথার পুনরা-
বৃত্তি করি-নাটকের মণ্ডল্যভিনয়ের পরি-
স্কৃষ্টে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি
সম্পূর্ণভাবে মনঃসংযোগ করেন তবেই
টিম-একটি-এর পূর্ণ বিকাশ দেখা
যায়। এভাবে অভিনয় করতে পারলে,
নটের আর বারবার তাঁর ডিরেক্টরকে
জিজ্ঞেস করতে হয় না-অম্মকে যখন
সংলাপ বলতে থাকবেন-সেই সময়টার
আমি কি করবো? কিভাবে দাঁড়িয়ে
থাকবো? হাতগুলো কিভাবে রাখবো?
ইত্যাদি।-এসব প্রশ্নের উত্তর হলো-
শ্বর হয়ে থাকবে-যা ঘটছে দেখবে-
যদি কিছু শোনার থাকে-শুনবে-যদি
তার দরকার না থাকে শব্দ চূপ করে
থাকবে।

বাড়িতে নিজের পাট তৈরি করবার
সময় অভিনেতার উচিত অন্যান্য যে সব
অভিনেতার সঙ্গে তাঁকে কথাবার্তা বলতে
হবে, তাদের সংলাপগুলোও ভাল করে
পড়। কারণ এর থেকেও তাঁর নিজের
চরিত্রের প্রতি অনেক আলোকপাত হতে
পারে। এবং এ ছাড়াও তিনি বুঝতে
শিখবেন তাদের কথা বলার সময় তিনি
কিভাবে রিএক্ট করবেন।

তাছাড়া সহযোগী অভিনেতার
সংলাপের সঙ্গে পরিচয় থাকলে অভিনয়ের
সময় ঐ সহযোগী অভিনেতা যদি নিজের
কোন লাইন ভুলে যায়, তবে তার কাছা-
কাছি থেকেই তাকে সাহায্য করা যার
এবং নাটকের গতি কোনক্রমেই ব্যাহত হয়
না।

অভিনয়ের সময় কখন নিজেকে
প্রাধান্য দিতে হবে এবং কখন নিজেকে
গুটিয়ে নিতে হবে প্রত্যেক নটকে সে
বিষয়া আশু করত হবে। কিছু কিছু
এমন অভিনেতা দেখা যায়, বিশেষত
অপেশাদারী দলে-যারা মঞ্চে টেবিল,
চেয়ার ইত্যাদির পেছনে আশ্রয় নিয়ে
নিজদের লুকিয়ে রাখতে চান। কিছুতেই
এরা স্টেজের সেন্টারে এসে দর্শকদের
face করতে পারেন না। সামান্য স্টেজ-

সময় হলেই অভিনেতা বসতে পারবেন যখন তাঁকে কোন কিছু দরকারী কথা বলতে হবে তখন নিজেকে কতকবার চেষ্টা করে কোন রকমে সংলাপটা আউড়ে গেলেই চলবে না। পরিশ্রমভাবে দর্শকদের সামনে এসে তাঁর বক্তব্য বলে যেতে হবে। অবশ্য কিভাবে বলবেন, মণ্ডের কোনখান থেকে বলবেন, কণ্ঠস্বর কতোটা তুলবেন এসব বিষয়ে পরিচালক তাঁকে নির্দেশ দেবেন।

ভালভাবে অভিনয় শিখতে হলে অভিনেতার উচিত বিভিন্ন ধরনের রোলে অভিনয় করা। যেমন ঐতিহাসিক, কামিক, অশ্রুত ধরনের চরিত্র, রোমান্টিক চরিত্র প্রভৃতি। এর কালে তাঁর অভিনয় এমন একটা বিস্তৃতি এবং সুদূরপ্রসারী শক্তি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে যাতে করে সুদূর নট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর কোনই অসুবিধা হবে না।

একটি বা দুটি টাইপের অভিনয় নিয়েই যে অভিনেতা নিজেকে ছাঁচে-বাঁধা নট হিসাবে আটকে ফেলেন তাঁর অভিনয়ে আর কোন উন্নতি দেখা যায় না। দর্শকদের কাছে এ ধরনের অভিনেতাদের অভিনয় ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে ওঠে। কারণ, কোন দর্শকই ক্রমাগত একই ধরনের অভিনয়রীতি, একই ধরনের বাচনভঙ্গী কারিগরী বা অঙ্গভঙ্গী দেখা পছন্দ করেন না। চরিত্রাভিনেতাকে নিজের পাট তৈরি করতে গিয়ে প্রত্যেক অভিজ্ঞতার উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়। প্রত্যেক দিন যে সব লোকের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মূদ্রাদোষ ইত্যাদি ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অভিনেতাকে নিজের চোতন মনে টেনে নিয়ে, সেখান থেকে অবচেতন মনের মধ্যে জমা করে রাখতে হয়। ভবিষ্যতে দরকার মত ঐ সব অভিজ্ঞতাকে মডেল করে তিনি নিজের চরিত্র সৃষ্টি করেন। এই সব লোককে তিনি প্রত্যহ নানা জায়গায় দেখতে পান—বাস্তায়-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে, দোকানে-বাজারে, পার্কে বা বক্তৃতার মাঠে অথবা জনতার মাঝে। এসব লোক কিভাবে হাঁটিছে, কি ভঙ্গীতে কথা বলছে, রাখা বা হাত নাড়ছে, তাদের কণ্ঠস্বর কিরকম, তাদের মুখে কিভাবে মনের ভাব ফুটে উঠছে, এই সব নজর করে দেখতে হবে। এসব থেকে কিছু কিছু নিয়েই তিনি

অভিনয়ের সমস্ত সুযোগ মত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারবেন। এইসব লোকের শব্দ বাইরের দিকটা দেখে মনে গেঁথে নিলেই চলবে না—যাতে তাদের মনের গভীরে ঢুকে তাদের অন্তরের ভাবধারাও তিনি আয়ত্ত করে নিতে পারেন, সে চেষ্টাও অভিনেতাকে করতে হবে। এই সব কাজে তাঁকে খুব সহানুভূতির ভাব নিয়ে এগুতে হবে। ইন্টুইশন ও ইমাজিনেশনকে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করতে হবে। নিরপেক্ষভাবে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে সাধারণ লোকে কি ভাবে আনন্দ, দুঃখ, ভয়, উত্তেজনা, হতাশা প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হয় এবং তার ফলে তাঁদের কণ্ঠস্বর এবং গতিভঙ্গী কিভাবে প্রভাবিত হয়।

ভার্স-ড্রামার অভিনয়ে কোন বিশেষ টেকনিকের সাহায্যের দরকার হয় না—বলিও কবিতার সংলাপ বলাটা কষ্ট করে শিখতে হয়, যেমন গান করার বেলাতেও গানের জন্য গলা সাহায্যে হয়।

পৃথিবীর সমস্ত সেরা নাটকগুলিই কবিতার লেখা, যেমন ইন্কাইলাস, শেরশায়ার, কালিদাস, রোমিন, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস প্রমুখের লেখা নাটকগুলি। আর শ্রেষ্ঠ নাটক থেকেই শ্রেষ্ঠ অভিনয়েরও সৃষ্টি হয়। কারণ ভাল নাটকে অভিনয় করতে গেলে অভিনেতার মধ্যেও

থাকা চাই কয়েকটি বিশেষ গুণ—কেমন। স্ক্রিপ্ট কম্পনশক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা গভীর অনুভূতিপ্রবণতা। দু-চারটে সহজ সামাজিক নাটকে অভিনয় করেই এ্যাকটর হওয়া যায় না। 'বিসজ'নের রঘুপতি বা জয়সিংহ, 'রাজা ও রাণী'র বিক্রম প্রভৃতি চরিত্রকে যখন অভিনেতা প্রাণবন্ত চরিত্র হিসাবে মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে তখনই বৃদ্ধব সে সত্যিকার জ্ঞাত-অভিনেতা।

ভার্স-ড্রামা অভিনয়ের সমস্ত পরিচালক ও অভিনেতাদের আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। সে কথাটা হলো এই যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতার নাটকের পরিবেশন—নাট্যকাব্যে কাব্যের পরিবেশন নয়। কবিতার নিজের বক্তব্য বলতে গিয়ে অভিনেতাকে মনে রাখতে হবে যে, তিনি অভিনয়ের সংলাপ বলছেন—কবিতার আনুভূতি করছেন না। নাট্যকাব্যের নাটকের দিকটাই প্রধান একখণ্ড। স্বরণ রাখলে কাব্যের দিকটাও আপনা থেকেই এসে যাবে। অবশ্য যে অভিনেতার মধ্যে কম্পনার প্রাচুর্য নেই, যার মনে-প্রাণে ছন্দ নেই, গানের রেশ যার কানের পর্দায় কোন অনুপ্রাণ জাগায় না, তাঁর কখনও নাট্যকাব্যে অভিনয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। [কমলা]

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের এগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - লাহোর

বেঙ্গলুরু - শ্রী রংপুর - গোহাটী

বঙ্গভ্রমর

যাত্রার দলগুলির সমস্যা

যাত্রাগান বাংলার জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক মাধ্যম। জেলা শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে ও নদীবন্দরে যাত্রার দলগুলি মানুষের সাংস্কৃতিক কল্যাণ মিত্রিয়ে আসছে দীর্ঘকাল থেকে। যখন পশ্চিমী ধারায় থিয়েটার প্রযত্ন হয় নি—তখন যাত্রার দলগুলিই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করে জনশিক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে; নাচে ও গানে লোক-সংস্কৃতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। থিয়েটারের তেজী সময়ে এমন কি শহরে শহরে সিনেমা বিন্দারের পরও যাত্রার জনপ্রিয়তা কমেনি। একইভাবে যাত্রার দলগুলি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করে গেছে, মাসখানো যাত্রাদলের চাহিদা কিছুটা কমেছিল—বিশেষ করে কলকাতা ও বড় বড় শহর অঞ্চলে, যেখানে সিনেমা ও আধুনিক নাট্যমঞ্চ জনচিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাত্রার দলগুলির রক্ষণশীল চিন্তাধারাও এই ক্ষমা অবস্থার জন্য কিছুটা দায়ী। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ চিন্তাধারাও এই ক্ষমা অবস্থার জন্য কিছুটা দায়ী। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ যাত্রাদলের প্রতি মানুষের আগ্রহ আবার বেড়েছে। যাত্রার দলগুলি বর্তমানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিকের সঙ্গে আধুনিক নাটক অভিনয় করেছে। এমন কি মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে রূপলাভ করেছে এমন সামাজিক নাটকও অভিনয় করেছে। দলগুলির গঠনেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে স্ত্রী-ভূমিকায় এবং নর্তকীরূপে মহিলাশিল্পীরা অংশগ্রহণ করছেন। সঙ্গীত কলকাতার মানুষও যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। মঞ্চভাড়া করে বা প্যাণ্ডেল বেঁধে বড় বড় যাত্রাদলের অভিনয় হচ্ছে। সত্যম্বর অপেরা ও তরুণ অপেরার দু-জন প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপে জানা গেল কলকাতায় বর্তমানে ১০টি প্রথম শ্রেণীর ও ১৯টি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রাদল আছে। এই দলগুলিতে প্রায় নেড়ু হাজারের মত শিল্পী ও কর্মী নিযুক্ত আছেন। এই শিল্পীদের অনেকের বেতনের হার কলকাতার পেশাদারী মঞ্চার শিল্পীদের মত। কারো কারো আরো বেশি। এই হিসাবের বাইরে প্রতি জেলায় দু-চারটি করে যাত্রার দল আছে।

প্রথম শ্রেণীর দলগুলিকে দল রক্ষার প্রয়োজনে শিল্পীদের সারা বছর বেতন দিতে হয়। যাত্রা দল পরিচালনায় কামেলা কম নয়। তাঁদের প্রতিদিনই এক স্থান হতে আর এক স্থানে যেতে হচ্ছে। কখনো নিকটবর্তী অঞ্চলে, কখনো রাজ্যের বাইরে। শারদীয়া উৎসবে ও কালীপূজার সময় কয়লাখনি ও চা বাগান অঞ্চলে যাত্রাদলের বায়নার জন্য ভীষণ ব্যস্ততা শুরু হয়। যাত্রাযাত্রের জন্য লরী প্রধান সহায়। দূরের স্থানে ট্রেন, স্ট্রীয়ার ইত্যাদি। যাত্রাযাত্রের বায়ের চাপে দলগুলি সব সময় দৃষ্টিচ্যুতপ্রস্তু এবং আয়ের মোটা টাকা এ গণ্ডি বেরিয়ে যায়।

এই প্রতিনিমিত্তক নৃপ করে বললেন যাত্রার দল শহরের শিক্ষিত মানুষের কাছে উপেক্ষিত। কিন্তু দলগুলির জনপ্রিয়তার ভূমিকা যদি চিন্তা করা হয় তবে উপেক্ষার কোন কারণ থাকে না। রাজ্যসরকার টোকরজনী শাখার দ্বারা যে কাজ করে থাকেন—আরো বেশি করে সেই কাজ যাত্রাদলগুলিকে দিয়ে করান যায়। বছরে যাত্রার দলগুলি প্রায় পোনে দুই কোটি মানুষকে তাঁদের অনুষ্ঠানে সমবেত করেন। এতদিন কংগ্রেস সরকার তাঁদের উপেক্ষা করেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি এঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেন তবে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে নতুন দিনের বাণী নিয়ে যাবার জন্য এঁরা হবেন শক্তিশালী মাধ্যম। এঁদের কিছু কিছু জসুবিধার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। রেল যাত্রাযাত্রের ব্যাপারে যাত্রার দলগুলি যে সুবিধা পেতে দেশরক্ষার হৃদয়ে তা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। রেলওয়ে কনসেনস পোতে হলে যাত্রার দলগুলিকেও রবীন্দ্র ভারতীর সার্টিফিকেট নিতে হয়, জেলায় বা মহকুমায় অভিনয় করতে হলে জেলা শাসকের অনুমতিপত্র যোগাড় করতে হয়, এসব কামেলায় যাত্রাদলগুলি বিব্রত। তার ওপর রয়েছে প্রমোদকরের চাপ। কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য চ্যারিটি শো করেও এঁরা প্রমোদ কর থেকে রেহাই পান না। পেশাদারী থিয়েটার যদি কর-মুক্ত হয় তবে যাত্রা দলগুলির ওপর কর থাকবে কেন? কংগ্রেস সরকারের এই বৈষম্যনীতির পরিবর্তন হওয়া উচিত।

—সুজম।



‘এ ম্যান কুড গোট কিলড’ ছবিতে মেলিনা মারকোরি।

নাটকের কথা

স্বীকৃতি

ডাকব্যাক রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা তাঁদের সংগঠনে ২৬তম বার্ষিক অনুষ্ঠান বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে করেছেন। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার, শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে ডাকব্যাক শিল্প সংস্থা ও কর্মীদের উন্নতি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে গত বছরের নাটকে অংশ গ্রহণকারীদের পুরস্কার বিতরণ করেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী ডি. বোস।

হেড অফিসের প্রাণগে নির্মিত প্যাণ্ডেলে রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা নাট্যকার সলিল সেনের ‘স্বীকৃতি’ নাটক অভিনয় করেন। এই নাটকটি রঙমহল মঞ্চে দীর্ঘ সময় অভিনীত হয়েছিল। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন সুদীনীকুমার ঘোষ, সুদীপ বোস, সুবিনমলজ্যোতি ঘোষ, সুভাষ ভট্টাচার্য, মানস চ্যাটার্জী, অমলেশ দত্ত, পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী, জ্যোৎস্নারঞ্জন ঘোষ, সলিল মুখার্জী, রতীলাল রায়, রবীন দাস, সত্যপ্রিয় বোস, স্মিথেন সেন এবং মিতা চ্যাটার্জী, গীতা নাগ, সবিতা সমাদ্দার, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী। নাটকটি পরিচালনা করেছেন সঞ্জীবচন্দ্র দাস।

সংস্কৃতির বিশ্বরঙ্গমঞ্চ দিবস উদ্‌যাপন

ঢাকাসেভা (হাওড়া)-র ঐতিহ্যশালী সংস্থা 'সংস্কৃতি' গত ২৭শে মার্চ বিশ্বরঙ্গমঞ্চ দিবস বিপুল উদ্‌যাপনার সাথে উদ্‌যাপিত করেন। এই উপলক্ষে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। উৎসবে পেরোহিতা করেন নির্মল পাঠ। কবি ও নাট্য-সমালোচক নিমাই মাস্তা আন্তর্জাতিক নাট্যধারা ও নবনাট্য আন্দোলনের ওপর এক সুদীর্ঘ ও তথ্য-পূর্ণ ভাষণ দেন। নাটকের বিভিন্ন বিষয়ে কালি দেয়াশী 'নাটক : শিল্প ও চরিত্রের উন্নতির সহায়ক' ভাষ্যক সাধুর্বা 'নাটকের সমাজজীবনে প্রভাব' কৃষ্ণ পাঠ 'নাট্য সংস্কার উন্নতি' বিশ্বনাথ রায় 'সমাজ ও নাটক' চন্দ্র পাঠ 'সংস্কৃতি ও নাট্য আন্দোলন' কাশী দে 'নাটক ও পরিবেশ' সম্পর্কে বিশ্লেষণী আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক নাট্য-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বক্তাই আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীপাঠ সমাজজীবনে নাটকের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

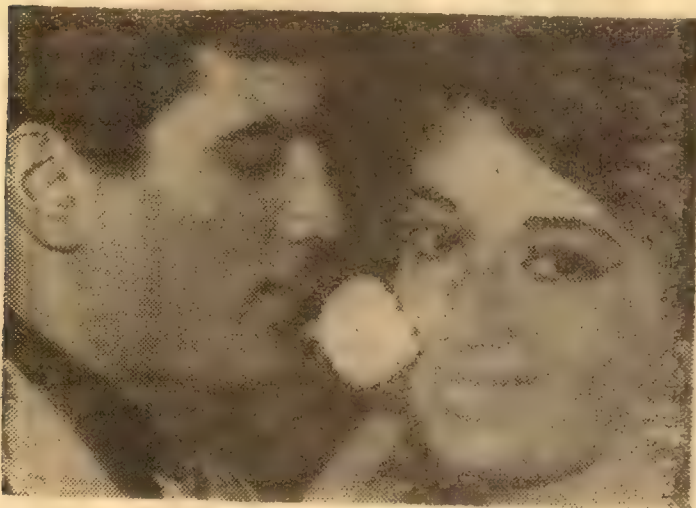
সুডিও থার

জীবন মৃত্যু

বি. এন. ডি মন্ডলের প্রথম ছবি 'জীবন মৃত্যু' মন্ডলের প্রতীক্ষায় রয়েছে। এই ক্রাইম রোমাণ্টিক কাহিনীর ছবিটির পরিচালক হীরেন নাগ। ছবির বিভিন্ন



'হোটেলী সোলাকাং' ছবিতে উত্তমকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা



'রাজ' ছবিতে রাজেশ খান্না ও ববিতা

ভূমিকায় অভিনয় করেছেন : উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া, কমল মিত্র, ভরুণকুমার, অপর্ণা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, সুব্রতা চ্যাটার্জী, দীপক মৃধাজী প্রমুখ।

অজানা শপথ

বিলীন সরকার প্রযোজিত সরকার প্রোডাকশনের "অজানা শপথ" ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ রচনা ও পরিচালনা করছেন সলিল সেন। সুদৃশ্যিষ্ঠ করছেন—হেমন্ত মৃধাজী। নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতে রয়েছেন—হেমন্ত মৃধাজী ও আরতি মৃধাজী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার আছেন বখারমে বিমল মৃধাজী ও সুবোধ রায়।

সৌমিত্র চ্যাটার্জী ও মাধবী মৃধাজী ছবিটির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন দিলীপ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, সত্য ব্যানার্জী,



এলিট সিনেমার প্রতিষ্ঠাতা 'ই. ই. এফ. অব. ভার্জিনিয়া উলফ' ছবিতে এলিজাবেথ টেলর, রিচার্ড বার্টন, জর্জ সেনগল।

জহর দেবী, রেবা দেবী, জহর রায়, হরিশ্চন্দ্র মদ্যাজী, প্রসাদ মদ্যাজী, রেণুকা রায়, মিন্টু চক্রবর্তী নবাগতা শিবানী বসু, চন্দ্রমা পাল, বঙ্কিম ঘোষ, অননু দত্ত ও অজিত চ্যাটার্জী।
শ্রীরঞ্জণ পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট

বাদল রাজ সিনহা প্রযোজিত জহর-পিকচার্সের 'রহস্যময়ী' হাসির ছবি ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচনা করেছেন প্রণব রায়। পুণেন্দ্র রায়-চৌধুরী ছবিটির পরিচালক। সুর সৃষ্টি করেছেন-শ্যামল মিত্র। নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতে আছেন-সম্মা মদ্যাজী, শ্যামল মিত্র ও লীনা ঘটক।

ভানু বন্দোপাধ্যায় ও জহর রায় ছবিটির প্রধান দৃষ্টি চরিত্রে রূপদান করেছেন।

অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করেছেন-অনুপকুমার, কমল মিত্র, প্রসাদ মদ্যাজী, পাহাড়ী সান্যাল, বীরেন চ্যাটার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, শীতল বানার্জী, শ্যাম লাহা, রূপক মজুমদার, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, কল্যাণী ঘোষ, প্রতিমা চক্রবর্তী, শ্রীভেন্দু চ্যাটার্জী ও ললিত চক্রবর্তী।

শচীমায়ের সংসার

অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে মিত্র চিত্রমের নিবেদন 'শচীমায়ের

সংসার' ছবির চিত্রগ্রহণ এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সুর হতে বলে জানা গেছে। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন-বংশীচন্দ্র আশ। সুর সৃষ্টি করেছেন সন্তোষ মদ্যাজী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে—দিবোন ঘোষ ও নানা বসু।

চিত্রগ্রহণে আছেন—অসীমকুমার, তরুণকুমার, সবিভা বসু, ললিত চক্রবর্তী, মলিনা দেবী ও গুরুদাস বানার্জী। জয়া ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

দৃষ্ট প্রজাপতি

কৌশল চ্যাটার্জী প্রযোজিত ললিত চিত্রমের মিলিট ছবি 'দৃষ্ট প্রজাপতি' বর্তমানে মূল্য প্রতীক্ষায়। বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'রাধা মধুরা অম্বা মধুরা' উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য, সংলাপ রচনা ও পরিচালনা করেছেন



গুরু বাগচী পরিচালিত 'শ্রীমতীর' একটি দৃশ্যে মঞ্জু দে ও বিকাশ রায়

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

অসীমকুমার। বাণীপ্রী পিকচার্স হাবিটির
পরিবেশক।

সত্যজিৎ রায়ের
'নায়ক'

আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত 'নায়ক'
স্পেনের মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে
প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ভারত
সরকার এই ছবিটি সিডনী চতুর্দশ

চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত
করেছেন। ৩০শে মে হতে ১২ই জুন
পর্যন্ত এই উৎসব হবে।

অভিশপ্ত চন্দল

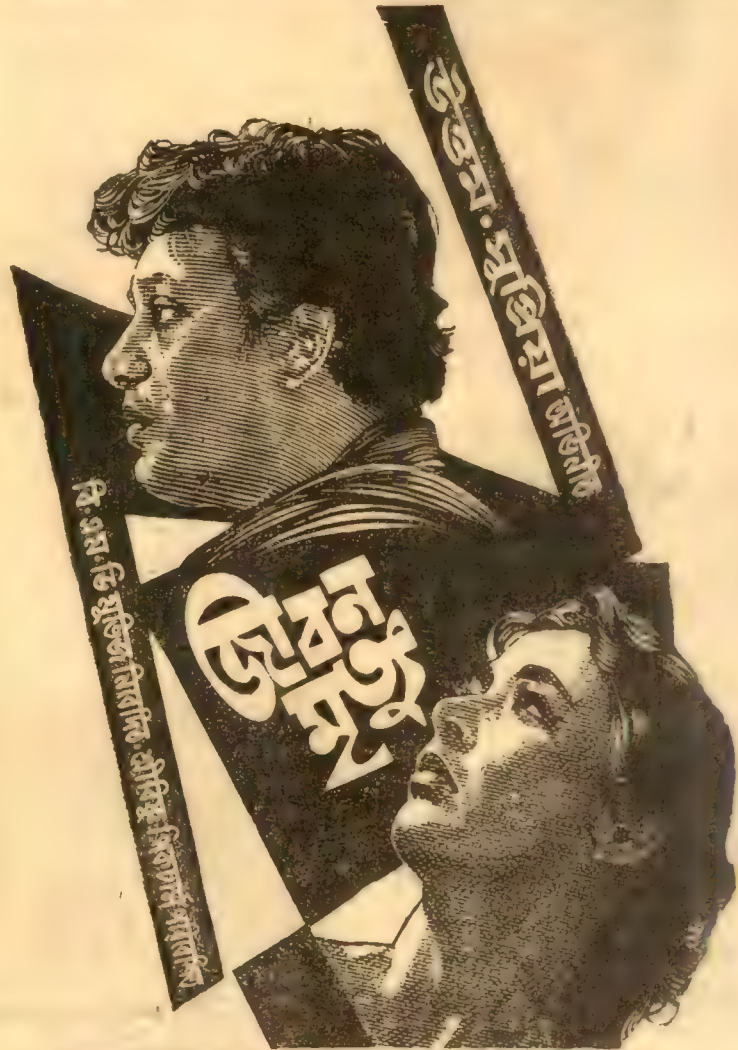
৪।৫ নেপাল ভট্টাচার্য প্রথম লেন থেকে
অশোক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন : 'অভিশপ্ত
চন্দল' মঞ্চ দ্যে পরিচালিত প্রথম ছবি নয়,
দ্বিতীয় ছবি। তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি
'স্বর্গ' হতে বিদায়।'



'মিলন'-এর একটি দৃশ্যে সুনীল দত্ত ও
নুতন।

প্রখ্যাত পরিচালক—শ্যাম চক্রবর্তী। সুদ-
সৃষ্টি করেছেন—হেমন্তকুমার মুখার্জী।
রবী নাথ, মকুল দত্ত ও শ্যাম চক্রবর্তী
রচিত কয়েকটি গানে কণ্ঠ দান করেছেন
—কিশোরকুমার, রাণু মুখার্জী ও
নীলিমা চ্যাটার্জী।

চরিত্র চিত্রণে আছেন : কিশোরকুমার,
তনুজা, সবিতা চ্যাটার্জী, তরুণকুমার,
ফানু রায়, কেট মুখার্জী, মাঃ শান্তনু
চ্যাটার্জী, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী,
শিব ভট্টাচার্য, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী, চন্দনা
ভট্টাচার্য, কবিতা বসু, রমা গোস্বামী,
নীলিমা পাল, সুরেখা পণ্ডিত এবং



পরিচালনা : শ্রীরেন নাগ • প্রযোজ : গোপেন মল্লিক • কাহিনী : ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

শুভারম্ভ ১৪ই এপ্রিল

উত্তরা. পূর্ববী. উজ্জলায়



প্রযোজনা
কমল-ব্রজ
সুত্রকা-শক্তি
এন-বিশ্বনাথ
অবধি-প্রশান্তকুমার
দীপক-মণি ব্যানার্জী



বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বহু অনুষ্ঠানে
হুকাভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন
করেছেন।

সংবাদিকতা

বৃহস্পতি মণ্ডিতভার সন্ধ্যায়
শিল্পী সমাবেশের প্রস্তুতি

রাত ৩টা এপ্রিল কলকাতা ও নিকট-

শ্রীমত মোহনলাল বিহারি

বিদ্রোহ-মাধব

(বিদ্রোহ স্রোতীকৃত টীকা)

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-
লীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমত
মোহনলাল দ্বারা শ্রীবিদ্রোহ-মাধব নাটক রচনা
করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

“মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালস্বার।

এই কবিতা বিনা নহে রসের প্রচার।”

মূল্য : তিন টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

কর্তা জ্যোতিষ্মতের বিভিন্ন নাট্য সম্প্রদায়
প্রতিনিধিদের এক সভায় আগামী ২৬শে
এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের নাটক, সংগীত,
চলচ্চিত্র শিল্পী ও কর্মীদের এক সম্মেলন
অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই
সভায় সভাপতিত্ব করেছেন নাট্যকার
শ্রীমন্মথ রায়। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার প্রতি
সমর্থন জানিয়ে নাট্য উন্নয়ন সম্পর্কে
সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন
সর্বশ্রী সূর্য্য প্রধান, কল্পতরু, সেনগুপ্ত,
দিগদীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, উমানাথ
ভট্টাচার্য, ত্রিদিব লাহিড়ী, নিমল ঘোষ,
রমেন লাহিড়ী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র
সরকার, শৈলেন মহান্তী, হরিপদ চ্যাটার্জী,
তাপস সেন প্রমুখ। সভায় সম্মেলনের জন্য
এক প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে।
প্রস্তুতি কমিটির কনভেনর নির্বাচিত
হয়েছেন সূর্য্য প্রধান। এই প্রস্তুতি
কমিটিতে সভাপতিত্ব রায়, বসু, সৌমিত্র
চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত প্রমুখ আছেন।
সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ২৬শে
এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে
সম্মেলন এবং ২৮শে এপ্রিল ময়দানে
শিল্পী ও কর্মী সমাবেশ হবে। বিভিন্ন
নাট্যসম্প্রদায় ১০ জন পর্যন্ত প্রতিনিধি
পাঠাতে পারবে। প্রতিনিধি ফী ১ টাকা।
প্রস্তুতি কমিটির সঙ্গে সম্প্রদায় ৬-৮টার

বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এবং রয়াল
ইউনিয়ন অফিসে (ডেটোল কলেজের
পাশের গলি) যোগাযোগ করতে পারা
যাবে।

স্বাধীন জন্মোৎসব পালনের উদ্যোগ

গত বছরের মত এবারও নাট্য
সম্মেলনের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে
২৫শে বৈশাখ বিরতিহীন স্বাধীন
জন্মোৎসব পালিত হবে। অনুষ্ঠান
সৌন্দর্য প্রত্যয়ে ৫টার আরম্ভ হবে,
পারিসমাপ্তি পরদিন ভোর ৫টার।

অনুষ্ঠানক্ষেত্র মহাজাতি সদনের
মধ্য এই উপলক্ষে সর্বদা সর্বসাধারণের
জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অনুষ্ঠানেও
সর্বস্তরের শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকেরাও
অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

অহোরাত্রব্যাপী এই অনুষ্ঠানে
সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, পাঠ,
নৃত্যনাট্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে
প্রশ্নোত্তর প্রদান করা হবে।

যোগদানেচ্ছ, ব্যাক্সা কার্যালয়ে
(২-ই, বন্দাবন গাল লেন, কলিকাতা-৩)
ফোন : ৫৫-২৪৭০) শ্রীসুশীল সিংহের
কাছে অনুসন্ধান করতে পারবেন।



‘জীবন মৃত্যু’ ইতিবে সন্নিভা বিশ্বাস ও সন্ত: ব্যানার্জী

সাপ্তাহিক বঙ্গমতীতে প্রকাশিত

শ্রীকামাখ্যা গ্রামের প্রবন্ধ এবং আমার পত্র উক্ত কাগজেই প্রকাশিত ভূপেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'ইতিহাসের উপাদান' নামক রচনা এবং তৎসংক্রান্ত শ্রীমতী শান্তি দাসের পত্রের উত্তরে যথাক্রমে লিখিত হইয়াছিল। কামাখ্যাবাবুর প্রবন্ধ এবং আমার পত্রের উত্তরে লিখিত শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়ের চিঠি এবং তাহাকে লিখিত ভূপেন্দ্রবাবুর পত্র সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর ১৬-২-৬৭ তারিখের ৩৬নং সংখ্যায় পাঠ করিলাম।

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পত্রে আমাকে কিছু জ্ঞানদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ হইয়া বিপ্লব-চরিত্রের বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার জন্য তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে আমি কৃতজ্ঞ। আমি 'বস্তুনিষ্ঠ' হইয়াই বলিতে চাই যে, সুধীরবাবু বিপ্লব অর্থাৎ 'রাষ্ট্রবিপ্লব' বলিতে কি বোঝেন তাহা আমি বুঝিলাম না। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি কোথায়ও কি দেখাইতে পারিবেন যে, স্বৈরাচারী শাসকের হাত হইতে কোন পরাধীন জাতি তাহার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অহিংস সংগ্রামের দ্বারা হিনাইয়া লইয়াছে?

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা যদি তিনি তোলেন তবে তাহাকেই 'বস্তুনিষ্ঠ' হইয়াই মানিতে হইবে যে, নেতাজী অনুষ্ঠিত সশস্ত্র বিপ্লব এবং যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপ ব্যতীত স্বাধীন ইংরাজ এক ইঞ্চি জমিও ছাড়িয়া দ্বাইত না। লালকেল্লার আই-এন-এ গ্রেসেল-এর সময়ই ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর ইংরেজের সমগ্র প্রভাব যে কিন্ট হইয়া গিয়াছে তাহা অকিনলে প্রমুখ সেনা-নায়ক বুদ্ধিতে পারাতেই ব্রিটিশ কুটনীতিজ্ঞরা স্থির করিলেন যে, ভারত সাম্রাজ্য আর আরও রাখা যাইবে না। কাজেই মাউন্টবেটন-প্রদত্ত টোপ সাদরে রাখা হইল। সংগ্রাম-কালত আপোষলোভী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মহাশ্বাকে 'বাই-পাস' করিয়া সেই টোপ গিলিয়া ফেলিলেন। কংগ্রেস এবং ব্রিটিশের একান্ত তাবদার মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের হস্তে ভারত-বর্ষকে দুই টুকরা করিয়া ভারত ও পাকিস্তানের শাসনদণ্ড অর্পণ করার পরম দক্ষিণ চতুর ইংরেজ দেখাইয়া গেল। ইহাই কি অহিংসা মন্তে হৃদয় জয় করিয়া ন্যায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির নজীর?... বস্তুনিষ্ঠ সুধীরবাবুকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অহিংস বিপ্লবেও এই স্বাধীনতা আসে নাই। অহিংস বিপ্লবকে হত্যা করিয়া অতি অসংপথে জওহরলাল-প্যাটেল-রাজাজী-আজাদ প্রমুখ কংগ্রেসী হাইকমান্ড মাউন্টবেটন-প্রদত্ত টোপ গিলিয়া দেশের শাসনভার লাভ করিয়া-



ছিলেন। এই হঠকারভার প্রধান বলি হইতে হইল মহাত্মার যথার্থ অনুগামী এবং অহিংস বিপ্লবের একমাত্র আপোষহীন নায়ক সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান ও তাহার অর্গণিত পাঠনা কম্বীদিগকে। এত বড় নিষ্ঠুর নিলম্বতা ও ক্রমহীন বিশ্বাসঘাতকতার পুজারী যে সব নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীকে উপেক্ষা করিয়াই মননে বাসিলেন তাহাদের এবং তাহাদের অনুগামীদের স্বরূপ জনসাধারণের বুদ্ধিতে বিশ বৎসর কাটিয়া গেল। সুতরাং আজ সুধীরবাবুদেরও 'বস্তুনিষ্ঠ' হইয়া বুদ্ধিতে হইবে যে, মহাত্মার 'অহিংসা' বিশ বৎসরের উপর (১৯২১ সাল হইতে) চালু রাখিয়া তিনি একটি মাত্রই অহিংস বিপ্লবী নায়ক সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই মহান নায়ক হইলেন খান আবদুল গফফর খান। বিপ্লবী বলিয়াই গফফর খান দূর্ব্ব পাঠন জাতিকে অহিংস রাখিয়া পরাধীন ভারতে শেষ পর্যন্ত অপূর্ব সংগ্রাম সাধিত করিয়াছিলেন। স্বৈরতান্ত্রিক পাকিস্তানে এই বিপ্লব-চেষ্টার জন্যই দীর্ঘ ১৮ বৎসর কারাকক্ষে কাল কাটাইয়াছেন এবং আজ আফগানিস্তানে নির্বাসনে বাস করিয়াও 'পাখতুনিস্তান' গাড়বার সংকল্পে তিনি অহিংস যুদ্ধ প্রস্তুতি চালাইতেছেন।

কিন্তু ১৯৪৭ সালেই মহাত্মার ব্যক্তি-গত এবং আদর্শগত পরাজয় ঘটিয়া গেল। চেলাদের হাত হইতে তিনি যেমন দেশ বিভাগের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, তেমন তাহার প্রিয়তম শিষ্য মহান আবদুল গফফর খানকেও রক্ষা করিতে পারিলেন না।

১৯৪৭ সালেই একদিন গফফর খান বিবাদকরণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন : "So Mahatmaji, you will henceforth regard us as Pakistanis, aliens, will you not?" (১)

দেশবিভাগের পরিকল্পনা তখন খান দ্রাভম্বরকে না জানাইয়াই (যদিও গফফর খান তৎকালে দিল্লীতে) কংগ্রেস কর্তাদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। তাই বাদশা খাঁ আরো বলিলেন : "A terrible fate awaits us in

the N. W. F Province. We do not know what to do?... We are thrown to the wolves." (২)

মহাত্মা ইহার উত্তরে আদর্শসুন্দর খুব ভাল ভাল কথা বলিলেও তাহার পাশ্বে সঙ্গীদের কাছে আসতে বলিলেন :

"The sight of his grief wrings my heart. But if I were to give way to grief, brave Pathan though he is, it will break his heart." (৩)

বাদশা খাঁ বিদায় নিলেন। তিনি শুনিলেন না, গান্ধীজী তখন অতি দৃশ্যে স্বগত-ই যেন বলিলেন :

"My life work seems to be over." (৪)

অতএব ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, গান্ধীজীকে হত্যা নাধরাস করে নাই, তাহার এবং তাহার আদর্শের হত্যা সাধিত হইয়াছে তাহারই তথাকথিত অহিংস ভক্তদের দ্বারা।

এত কথা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য যে সুধীরবাবু ও প্রমুখ ভূপেন্দ্রবাবু যত বড় বড় কথা বা বিশ্বরাজনীতির জাঞ্জার মন্থন করিয়া যত বিপ্লব-দর্শনই পরিবেশন করেন না কেন, আমরা সাধারণ লোক common sense (অবশ্য ইহা অতি rare sense) হইতে এইটুকুই বুঝিয়াছি যে, 'সশস্ত্র বিপ্লব' ছাড়া পৃথিবীতে কোন পরাধীন রাষ্ট্রেরই এতাবৎ স্বাধীনতা অর্জন করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, এবং অহিংসার উপাত্তা মহাত্মার অতীতপূর্ব সংগ্রামে আমাদের দেশ বহু দূর অগ্রসর হইলেও উহাতে সাম্রাজ্য-লিপ্সু ইংরাজ যথাপ্রয়োজন কাহিল হয় নাই। অথচ ১৯৩৯ সালে পরাধীন ভারতেই ভূপেন্দ্রবাবুরা নিরস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়া ইঠাৎ 'গান্ধীবাদী' হইলেন।

উত্তম কথা। কিন্তু 'আজ্ঞার বিপ্লবী' ভূপেন্দ্রবাবু এবং ১৯৩৯ সালেও 'শিশু-বিপ্লবী' সুভাষচন্দ্রের মধ্যে 'বিপ্লবের ধারণা সম্পর্কিত পাথক্য যদি আমরা দেখাইয়া থাকি তবে তাহা 'বুদ্ধিবর্জিত' ও 'বিশেষপূর্ণ' (ভূপেন্দ্রবাবুর মতে) হইবে কেন? যে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব ১৯৩৯ সালেও ভূপেন্দ্রবাবুরা দেখেন নাই সেই সুভাষচন্দ্রই কিন্তু মাত্র উহার দুই বৎসরের মধ্যে 'নেতাজীর' বৈপ্লবিক-ভূমিকার ইংরাজের আঁচকে প্রভাবিত করিয়া দৃজয় বিপ্লবী সংগ্রামের

স্মৃতি : (১), (২), (৩), (৪) — "Thrown To The Wolves (Page 48) হইতে গৃহীত।

সাধারণ বুদ্ধি শাসকে রাখা করিয়া
দিলেন।

অধিকন্তু, যে ভূপেন্দ্রাবাদ প্রমুখ
১৯৩০-৩২ সালেও আদর্শ বিপ্লবীর
রোল-এ পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই
১৯৩৯ সালে মহাত্মার অহিংস আন্দোলনের মধ্যে মহাবিপ্লবের স্বাদ পাইয়া
সুভাষ বিতাড়ন ও বাংলার 'এড হক'
কংগ্রেস সংগঠনের মত বৈপ্লবিক কর্মে
আত্মনিয়োগ করিলেন। বিপ্লবী ভূপেন্দ্র-
বাদ এবং তাঁহার বন্ধুরা ভারত স্বাধীনতা
করিবার যুদ্ধক্ষেত্রের বিরোধিতা করিলেন
না, বরঞ্চ কংগ্রেসী অপশাসনের অংশীদার
হইলেন। কই, মহাত্মার মধ্যস্থ আপোষহীন
বিপ্লবী শিষ্য আবদুল গফফর খানের মত
'অহিংস বিপ্লবের' পক্ষে ভুলেও তো
তাঁহারা পক্ষ চালালেন না।

গান্ধী-মত সুধীর ঘোষের প্রবন্ধ
হইতে উদ্ধৃতি দেওয়াতে ভূপেন্দ্রাবাদ ও
সুধীরাবাদ বিচলিত হইয়াছেন। এই
উদ্ধৃতি দিবার কারণ ভূপেন্দ্রাবাদের প্রতি
বিশেষ প্রচার হইতেই পারে না। ভূপেন-
দ্রাবাদ প্রাচ্য ও বর্ষায়ান নেতা। তাঁহাকে
আমরা শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাঁহার কাছে
আমরা এমন লেখাই চাহিয়াছিলাম যাহা
অপরের প্রতি বিশেষভাবে না হয়, প্রের-
ণনাতা দোষে দৃষ্ট না হয়। তাঁহারই

ভাষায় 'বিপ্লবের জন্যে প্রাণ দিবার
উদ্দেশ্যের একদিন যারা ঘোররোহিলেন
তাঁদের' আমরাও শ্রদ্ধা করি। তাঁহাদের
শ্রদ্ধা করি বলিয়াই ভূপেন্দ্র দত্ত মহাশয়ও
শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু যেদিন তিনি সশস্ত্র
বিপ্লব ইংরেজ শাসিত ভারতের সর্বক্ষেত্রেই
প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলিয়া প্রচার করিয়া
নিছক অহিংসার পূজারী হইলেন, সেদিন
আমরা বেদনা পাইয়াছিলাম। কিন্তু তথাপি
তিনি যদি অহিংস বিপ্লবী বাদশা খরি মত
ভয়হীন আপোষবিমুখ সংগ্রামী পথে
চলিতে পারিতেন তবে তাঁহাকে আমরা
অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাইতাম। দুঃখের বিষয়
ভূপেন্দ্রাবাদ আজও সেই মনের 'রিয়াস-
শনারিদের সঙ্গে থাকিয়াই অহিংস বিপ্লব
করিতেছেন, যাহারা মহাত্মাকে
ineffective করিয়াছিলেন, আবদুল
গফফর খানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা
করিয়াছিলেন, দেশকে স্বাধীনতা করিয়া-
ছিলেন এবং বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া শাসন-
যন্ত্র আঁকড়াইয়া থাকিয়া কালোবাজার
দনীতি ও অপশাসন চালু রাখিয়া-
ছিলেন। সুতরাং এ অবস্থায় ইতিহাসের
উপাদান দিতে বাইরা তাঁহার আত্মপ্রচার
কোন রকমে সহ্য করিলেও তিনি অপরের
কুৎসা প্রাক্ষণভাবে পরিবেশন করিতে
থাকার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা কঠিন
সমালোচনার সম্মুখীন হইতে বাধ্য। ইহা
ভূপেন্দ্রাবাদের প্রতি বিবেচ্য বর্ষণ নহে,
ইহা অপ্রিয় সত্য ভাষণ।

সুধীরাবাদ এবং ভূপেন্দ্র দত্ত মহাশয়
উভয়েই বিপ্লবের 'ক্রমবিবর্তন'ের কথা
লিখিয়াছেন। ভূপেন্দ্রাবাদ একদিন
মানুষের হিংসামেষে ও অশান্তিহীন
স্বর্গরাজ্যের সম্ভাবনার কথাও বলিয়াছেন।
যে বস্তু আমরা জীবদ্দশায় কেহই দেখিব
না তাহা আসিবে শুনিয়া কেহ খুশি
হইতে চাহিলে আমরা আপত্তি করিব না।
অধিকন্তু 'ক্রমবিবর্তন' সব কিছুরই
ঘটিলে থাকে বলিয়া আমরাও স্বীকার
করিব। ভারতবর্ষের বিপ্লবের ইতিহাসেও
এই ক্রমবিবর্তন দামোদর চাপেকারের
আবির্ভাব হইতে নেতাজীর ইচ্ছা
রণাঙ্গনে পদার্পণ পর্যন্ত স্বর্ণাকরে
সূচিত। এবাংবধ ক্রমবিবর্তন বুদ্ধিবাদ
কমতা আমাদের আছে। কিন্তু সুধীর-
াবাদের 'ক্রমবিবর্তন' বলিতে যদি
পর্যায় জাতির মর্দকিত্তে সাহিংস-
বিপ্লব' পরিভাষ্য হইয়া 'অহিংস-
বিপ্লব'ই Ultimate হয় তবে সেই
ক্রমবিবর্তন আমরা বুঝি না, কারণ

যাজবের ইতিহাসে উহা এতাবধি গ্রাহ্য হয়
নাই।.....

মানুষের যে 'নতুন সমাজের' স্বপ্ন
আজ ভূপেন্দ্রাবাদ দেখিতেছেন তাহাকে
রূপায়িত করিবার মাধ্যম যদি 'অহিংসা'
হয় তবে তৎকারণে 'হিংসা' নিশ্চয়ই সর্বতো-
ভাবে পরিত্যাজ্য। এরূপ অহিংসার সাধক
একটি বৃদ্ধ, একটি খুস্ট, একটি গান্ধী
বা বড় জোর একটি আবদুল গফফর খান
হইতে পারেন। কিন্তু এসব মহাপুরুষ
বহু যুগের ব্যর্থতানে দূর-একটি করিয়াই
আসেন। তাঁহারা কোন কালে পরাধীন
জাতিকে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আনিয়া সেন
নাই বা দিতে পারেন নাই। কারণ
তাঁহাদের চেলারা নেহরু-আজাদদের মত
সংগ্রামে কাতর হইয়া, গুরুদর আদর্শের
বিচ্যুতি ঘটাইয়া আত্মের 'বীশুদ্ধি'কে
বিস্তৃত করিয়া থাকেন।

১৯৩০ সালের ভূপেন্দ্রাবাদ, ১৯৩৯
সালে যে ক্রমবিবর্তনে বিশ্বাসী হইলেন
তাহা তাঁহাকে বিশ্বাস-দর্শন হইতে এত দূরে
লইয়া গিয়াছে যে, বিপ্লবীর দৃষ্টি-
কোণ হইতে রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাসের
উপাদান যোগাইবার মানসিক যোগ্যতা
তাঁহার ক্রীণ হইয়া গেল। ইহাতে সুধীর-
াবাদের দৃষ্টিভিত্তি হইবার কিছুই নাই—
'ক্রমবিবর্তন'ের ইহাই যে ধারা।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্ষেত্রেও
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ,
ভাই পরমানন্দ প্রমুখ বহু রথী-মহারথীর
জীবনে ক্রমবিবর্তন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।
কিন্তু তাঁহাদের 'বিবর্তন' বিপ্লবমুখী
বলিয়া আমরা বুঝি না বলিয়া তাঁহারা
কখনো আমাদের কাছে কম শ্রদ্ধার পাত্র
নহেন। কারণ তাঁহাদের অবদান আমরা
নত মন্তকে স্বীকার করি। তাই বিপ্লবের
ইতিহাসে ভূপেন্দ্রাবাদের অবদানও পরম
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে আমাদের
গর্ববোধ হয়। কিন্তু উত্তরকালে তাঁহার
অবৈপ্লবিক রোল (আমাদের মতে) বা
প্রেক্ষমান্যতাদৃষ্ট বক্তব্যের কোন সমালোচনা
করায় তাঁহার প্রতি বিবেচ্য বর্ষণ হইতেছে
বলিয়া বাঁহারা ভাবেন—তাঁহাদের জন্য
আমরা দুঃখিত। তাঁহাদের স্পর্শকাতর
মনের কাছে আমাদের নিবেদন যে, এ-
ক্ষেত্রেও 'বস্তুনিষ্ঠ' হইবার চেষ্টা কেন
তাঁহারা করেন।

শ্রীমান সেন

২৫১-এ-৪৯, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
রোড, কলিকাতা-৪৭।

॥ শিশু সাহিত্য সংঘের বই ॥

- ১। রমণী-বোম্বালা বিশ্বনাথ— ২-৫০
- ২। নিরোহিলে-অনুবাদক—
নিখিল সেন ৭-০০
- ৩। ভূপেন্দ্র ভারত-খগেন্দ্র মিত্র ও
রামেন্দ্র দেশমুখ্য ৪-০০
- কিশোরদের জন্য—
- ১। বাঘের আত্মজ্ঞা—
রামেন্দ্র দেশমুখ্য— ২-০০
- ২। ছোটদের মোকাবেলা—
খগেন্দ্রনাথ মিত্র— ২-০০
- ৩। দেবীপার্বতীর নাটকের গল্প—
খগেন্দ্রনাথ মিত্র— ২-০০
- ৪। আমাদের নেহেরু—
নিখিল সেন— ২-৫০
- ৫। ছবিতে বুদ্ধবোধ (বাংলা ও
হিন্দী)—রজ রায়চৌধুরী— ১-৫০
- ৬। রক্তের ডাইরী—
সলিল সরকার— ১-৮০

পরিবেশক

শরণ বুক হাউস

১৮-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২। ৩৪-৩৭৩৩

তরুণ বৈদ্যনাথের পক প্রণালী নয়

নদী-মাতৃক বাংলাদেশের তরুণ বীর বৈদ্যনাথ নাথের নাম প্রথম বিজয়ী হিসাবে খোদিত হল প্রথম অনর্দিত পক প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতার বিজয়ীর ট্রফির বুকে। বাংলার আর একজন যুবক লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক লাভ করেছেন দ্বিতীয় স্থান অবশ্য রেলওয়ের প্রতিনিধি হিসাবে। মোট আটজন প্রতিযোগীর মধ্যে দু'জন মাত্র শেষ পর্যন্ত পক প্রণালী অতিক্রম করতে সক্ষম হন। বাংলার আর একজন প্রতিনিধি দেবী দত্তও দুর্ভাগ্য, তাঁর মাত্র সাতশো গজ দূর থেকে তাঁকে রণে ভগ্ন দিতে হয়।

বৈদ্যনাথ নাথের এই বিজয় একলা প্রমাণিত করল যে, বাংলার বহু তরুণ প্রতিভা অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। উপযুক্ত সুযোগের অভাবে বাংলার বহু সন্তরণ প্রতিষ্ঠার যোগ্য বিকাশ ঘটেছে না। গত বছর মিহির সেন একক প্রচেষ্টায় এই পক প্রণালী অতিক্রম করেন প্রায় পঁচিশ ঘণ্টা সময়ে। কিন্তু তালাইমারার থেকে ধনুশ্কাটির সাড়ে বাইশ মাইলের জলভাগ বৈদ্যনাথ নাথ অতিক্রম করেছেন চোদ্দ ঘণ্টা উনচল্লিশ মিনিটে; আর লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিকও সময় নেন আঠারো ঘণ্টা পনেরো মিনিট। গত বছর মিহির সেন যে পথে পক প্রণালী অতিক্রম করেন, এবার প্রতিযোগিতার জন্য সে পথের কিছু পরিবর্তন করার ফলে দ্রুত প্রায় তিন মাইল দূর পায়।

সিংহলের তালাইমারার উপকূলে ভোর চারটে চারের সময় এয়ার মার্শাল অর্জুন সিং পিস্তল ধরনির সাহায্যে প্রথম পক প্রণালী প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। আটজন প্রতিযোগী সমুদ্রের বুকে বাঁপ দিয়ে পড়েন। অন্ধকারের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকেন সাঁতারুরা আর অনেকগুলি নৌকা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

বাংলার বৈদ্যনাথ নাথ সূর্য থেকেই অগ্রগামী থাকেন। পক প্রণালীর প্রায় অর্ধেক পথ বৈদ্যনাথ নাথ যে কৃতিত্বের সঙ্গে অতিক্রম করেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। বেলা সাড়ে সাতটার সময় তিনি সাত মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং বেলা দশটা দশের সময় দেখা যায় তিনি অতিক্রম করেছেন প্রায় অর্ধেক পথ একটানা অগ্রগামী থেকে। বলতে গেলে এই সময় তাঁর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় দু' মাইল। এই সময় লক্ষ্মী ভৌমিক ছিলেন বৈদ্যনাথের প্রায় এক মাইল পশ্চাতে এবং দেবী দত্তও ভৌমিকের প্রায় সাথে সাথেই ছিলেন। বেলা বারোটোর সময় দেখা গেল সমানভাবে এগিয়ে চলেছেন বৈদ্যনাথ নাথ, তাঁর পেছনে এক এক করে আছেন লক্ষ্মী



সাহনবাগান এং মেলার দলের খেলার একটি দৃশ্য

ভৌমিক; দেবী দত্ত; কে কে মন্ডল; এন সি পাল; ডি কালী; এ ওয়াই সাঠে; ইউ সি ভামা।

জল থেকে প্রথম প্রতিযোগী উঠে পড়লেন বেলা একটার সময়, তিনি হলেন রেলওয়ের একাধিক বৎসর বয়স্ক সাঁতার, কে কে মন্ডল। এই সময় মন্ডল কিন্তু বারো মাইল অতিক্রম করে এসেছিলেন।

প্রীতিমিত্র

মন্ডল ভীষণভাবে মাথার যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন, এছাড়া তাঁর চোখ জ্বালা করছিল।

রামেশ্বরমের উনত্রিশ বৎসর বয়স্ক মৎস্যজীবী ডি কালীর সম্বন্ধে স্থানীয় লোকেরা খুবই আশাবাদী ছিলেন। ডি কালী নির্ধারিত সাঁতার পথের একটু বাইরে দিয়ে সাঁতার সূর্য করেন, কর্ম-কর্তাদের অনেক অনুরোধে তিনি কণপাত না করে আদম ব্রিজের এক মাইল দূর দিয়ে সাঁতার কাটতে থাকেন। কালী স্থানীয় অধিবাসী সেই জন্য এখানকার জলভাগ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল কিছু বেশি। কালীর আশা ছিল যে, দু'পদের পর তিনি একটি স্রোতের সাহায্য লাভ করতে পারেন এবং সেই জন্য এক মাইল দূর

দিয়ে সাঁতার কেটে ভাবছিলেন যে স্রোত এলেই সকলের আগে ধনুশ্কাটিতে উপনীত হতে পারবেন। কিন্তু তাঁর আশানুযায়ী স্রোতের সৃষ্টি না হবার ফলে বেলা চারটার সময় শ্ব-ইচ্ছায় তাঁকে জল থেকে তোলা হয়। বাংলার দেবী দত্ত এবং ভারতীয় বিনান বাহিনীর এন সি পালের দুর্ভাগ্য, তাঁরা অপেক্ষা জন্য শেষ সীমান উপনীত হতে পারেন নি। শেষ দু'জন সাঁতার, বোম্বাইয়ের সাঠে এবং উত্তরপ্রদেশের ভামাকে জল থেকে তোলা হয় রাতে। সেই সময় তাঁরা তীব্র জ্বর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে ছিলেন।

বিপদ-সঙ্কুল পক প্রণালীতে কোন বাধা বা বিপদের সৃষ্টি হয় নি। দ্বিধার সর্পের আনাগোনা ছিল ঘটে, কিন্তু তারা কোন বিপদের সৃষ্টি করে নি। সূর্যের প্রথম উত্তাপ শব্দ সাঁতারদের যথেষ্ট বেগ দিয়েছে। প্রতিযোগীরা "গগলন" ব্যবহার করেন নি বলে সমুদ্রের জলে দীর্ঘ সময় সন্তরণ তাঁদের চোখের জ্বালা বাড়িয়েছে। মূল্যবান "গগলন" ব্যবহারের আর্থিক সংগতি না থাকলেও তরুণ সাঁতারেরা প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক সরঞ্জাম ব্যতীত তারা দুঃসাধ্য কাজ করতে পারেন।

এবারের প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি স্থানের জন্য পুরস্কার প্রদানের কবস্থা করেন ভারতীয় সন্তরণ সংস্থা। কিন্তু

দুর্জন মাত্র শেষ সীমায় উপনীত হতে সক্ষম হন। প্রতিযোগিতা সূর্য হবার দুর্দিন পূর্বে বোম্বাইয়ের একজন মহিলা জাতীয় মিস খুরসীদ বাস মান্দাপামে উপনীত হন পক প্রণালী সন্তরণের আশায়। কিন্তু প্রতিযোগিতা কমিটি তাকে নিরাশ করেন।

গত বছর মিহির সেন যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলেন; এবারের প্রতিযোগিতারও সে সমস্ত সুবিধা লাভ করেন। সাতারদুদের যাত্রাপথে হাঙর প্রতিরোধকারী ঔষধ দেওয়া হয়েছিল, ভারতীয় নৌবহরের "সার্প স্টাররা" ছিলেন বিষধর সাপ আর হাঙরের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে। এছাড়া ভারতীয় নৌবহরের দুটি জাহাজ এবং মোটরবোট এবং অনেকগুলি নৌকা সাতারদুদের সঙ্গে ছিল। ভারতীয় বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এয়ার মার্শাল অর্জন সিং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাতারদুদের সঙ্গে থেকে তাঁদের উৎসাহিত করেন।

সাতারের শেষে মধ্যরাত্রির কিছুক্ষণ পরে প্রথম পক প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতার বিজয়ী হিসাবে বাইশ বছরের বাঙালী তরুণ বৈদ্যনাথ নাথের হাতে পক প্রণালী চ্যালেঞ্জ গ্রীফ তুলে দেন এয়ার মার্শাল অর্জন সিং। অত রাতেও বহু স্থানীয় অধিবাসী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতার ঢাকুরিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা বৈদ্যনাথ নাথের সাতারের হাতেখড়ি রবীন্দ্র সরোবরে সি, আই, টি'র সাতার শিক্ষক স্বর্গত বিমল দেব'র কাছে আজ থেকে প্রায় সাত বছর পূর্বে। ১৯৬০ সালে এই রবীন্দ্র সরোবরে অনুষ্ঠিত এক মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েই বৈদ্যনাথের জয়যাত্রা সূর্য। বৈদ্যনাথ নাথ বাংলা স্কুল দলের পক্ষে এবং বাংলার পক্ষে জাতীয় সন্তরণে জুনিয়র বিভাগে এবং সিনিয়র বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করে বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। বৈদ্যনাথ নাথ দূরপাল্লার সাতার সূর্য করেন ১৯৬৩ সালে। বলতে গেলে শ্রুতমাত্র গত বছর থেকেই তিনি এই দূরপাল্লার সাতারে সাফল্য লাভ করছেন। ১৯৬৫ সালে ব্যারাকপুর্ গাম্খীঘাট থেকে বেনিয়ারটোলা ঘাট পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে দশ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম বিজয়ী সম্মান অর্জন করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে জগদীপুর্ থেকে বহরমপুর্ পর্যন্ত ভাগীরথীবক্ষে দীর্ঘ পর্যটনশীল মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বৈদ্যনাথ প্রথম স্থান লাভ করেন। গত বছর নভেম্বর মাসে রমানাথ স্মৃতি সন্তরণ প্রতিযোগিতার দূরত্ব বর্ধিত করে করা হয় বাইশ মাইল এবং ভারতীয় সন্তরণ সংস্থা

পক প্রণালী সন্তরণের ট্রায়াল হিসাবে এই প্রতিযোগিতাকে স্বীকৃতি দেন, এবং বৈদ্যনাথ অনার্সে বিজয়ীর পৌরব অর্জন করেন।

বিপদ-সঙ্কুল পক প্রণালী জয় করে বৈদ্যনাথ নাথ প্রমাণ করলেন যে, হেলায় তিনি জয় করতে পারেন ইংলিশ চ্যানেলকে যদি তিনি লাভ করেন উপযুক্ত সুযোগ। আমার মনে হয় ভারতীয় সন্তরণ সংস্থার উচিত তরুণ বৈদ্যনাথ নাথকে ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণের একটি সুযোগ দেওয়া।

সুত্রের নতুন সম্মান

বাংলার তরুণ স্টেট খেলোয়াড় সুত্রের গুহ ইংলন্ড যাত্রার প্রাকালে এক নতুন সম্মান লাভ করেছেন। আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, কয়েকদিন পূর্বে মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকার পক্ষ থেকে একটি পত্র পান তিনি। এই পত্রে হিন্দু পত্রিকার পক্ষ থেকে জানান হয়েছে যে, উক্ত পত্রিকা ১৯৬৬-৬৭ সালের সেরা পাঁচজন ভারতীয়



সুত্রের গুহ

ক্রিকেট খেলোয়াড়ের অন্যতম নির্বাচিত করেছেন বাংলার সুত্রের গুহকে।

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র উনিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ খেলোয়াড় সুত্রের গুহর এই নতুন সম্মানে বাংলার সমস্ত ক্রিকেট অনুরাগীই গর্বিত এবং আনন্দিত। বাংলার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ভাগ্যে এই সম্মান দুর্লভ। এ বছরের "ইন্ডিয়ান ক্রিকেট প্রকাশনীতে প্রেস্ট পাঁচজন ক্রিকেটারের মধ্যে অন্যতম বলে সুত্রের গুহর নাম উল্লিখিত হবে।

তিন প্রধানের লড়াই

ময়দান হকি লীগের চলতি মরশুমের সম্মান যে কার ভাগ্যে তা এখন ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই শক্ত। কারণ ময়দানের তিন প্রধান বি, এন, রেল, মোহনবাগান এবং ইন্সটেব্গল বর্তমানে এমনভাবে অবস্থান করছে যার ফলে শিকে কার ভাগ্যে ছিঁড়বে শেষ পর্যন্ত তা বলা যাচ্ছে না। অবশ্য লীগের দৌড়ে বি, এন, রেলদল সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করছে। কারণ লীগের খেলায় বি, এন, রেলদল একটি পয়েন্টও অপচয় করে নি। অন্যদিকে মোহনবাগান অপচয় করেছে একটি পয়েন্ট এবং ইন্সটেব্গল দুই পয়েন্ট। এখনও এই তিন প্রধান অপরাজিত আখ্যা অক্ষুণ্ন রেখেছে। লীগের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী খেলার ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করছে লীগের ভাগ্য। এই তিনটি খেলার তিন প্রধান পরস্পরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় মিলিত হবে!

গত সপ্তাহে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বি, এন, রেল চারটি খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং বলতে গেলে সব কটি খেলাই তাদের ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সাফল্যের সঙ্গেই বি, এন, রেল সব কটি বাধা অতিক্রম করে। বি, এন, রেলদল মহামেডান স্পোর্টিংকে ২-০ গোলে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে ২-০ গোলে, পোর্ট কমিশনার্সকে ২-০ গোলে এবং খালসা ব্রুজকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। লীগের দৌড়ে প্রথম থেকে বেশ অনেকদূর পর্যন্ত খালসা ব্রুজ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মূল্যবান পয়েন্ট হারিয়ে তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

ইন্সটেব্গল ক্লাব লীগের খেলায় দ্বিতীয় পয়েন্ট অপচয় করে ইন্সটার্ন রেলের বিপক্ষে। ইন্সটেব্গল এবং ইন্সটার্ন রেলের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় গোলশূন্য ফলাফলে। স্বাদর্শ খেলায় ইন্সটেব্গল খালসা ব্রুজকে ২-০ গোলে পরাজিত করে লীগের একটি শক্ত বাধা অতিক্রম করে। ইন্সটেব্গল ক্লাবের দুর্জন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় গুরুদ্বজ আহত থাকার জন্য এবং ইনামদুর কলকাতায় বাইরে জরুরী কাজে যাবার ফলে ইন্সটেব্গলের শক্তি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মোহনবাগান এরিয়ান্স ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করে পুরো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। মোহনবাগানের সঙ্গে মেসার্সের খেলাটি পুনরনুষ্ঠিত হয় এবং এই খেলায় মোহনবাগান শোচনীয়ভাবে ৯-০ গোলের ব্যবধানে মেসার্সকে

প্রস্তুত করে। এই খেলায় ডায়ান দু'বার এক বডলে একবার হ্যাট্রিক করার সুযোগ পাত করে। মোহনবাগান এবং এন্টালী ৪, সি, দলের খেলায় মাঠে কিছু অপ্রীতি-জন ঘটনা ঘটে। শ্বিতীয়ার্থের পাঁচ মিনিটে বেশী বডলে মোহনবাগানের পক্ষে বিজয়সূচক গোলাটি দেবার পর, এন্টালী দলের খেলোয়াড়রা ইচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক ফাউল করে খেলতে থাকেন। শ্বিতীয়ার্থে এন্টালীর অর, কানন ডায়ানকে এমন মারাত্মকভাবে আঘাত করেন যে ডায়ানকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। দর্শকদের উত্তেজনার জন্য নয় মিনিট খেলা বন্ধ থাকে।

সম্রাচার দর্শন

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং বর্তমানে ইংল্যান্ডের নাগরিক বেসিল ডি ওলিভিয়েরা শ্রেষ্ঠ পাঁচজন ক্রিকেটারের অন্যতম হবার সম্মান লাভ করেছেন। উইসডেনের ১৯৬৬-৬৭ সালের সেরা পাঁচজন ক্রিকেটারের প্রকাশিত নামের মধ্যে আছেন; কব বারবার, কলিন মিলবার্ন, জন মারে, সের্গে নার্স এবং বেসিল ডি ওলিভিয়েরা। ইংল্যান্ড টেস্ট দলের নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার ওলিভিয়েরা বর্তমানে ওরচেস্টারশায়ারের সদস্য।

* * *

অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলোয়াড় নর্মান ও'নীল ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। হাঁটুর



বেদনাথ ন.৬



জোহান্সবার্গে একটি সম্মেলনা সভায় স্থানীয় স্কোরের সঙ্গে বেসিল ডি, ওলিভিয়েরা

আঘাতের জন্য তিনি ক্রিকেট থেকে সরে আসতে বাধ্য হচ্ছেন।

* * *

ব্যাঙ্ককে এশীয় যুব ফুটবল প্রতি-যোগিতায় ইন্ডোনেসিয়া ক্লাবের স্টপার সুদীন ভট্টাচার্য ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। গতবারও ম্যানিলায় ভারতীয় জুনিয়র ফুটবল দলের নেতৃত্ব করেন সুদীন ভট্টাচার্য। ভারতীয় দলে আছেন—গোলে: কে, সরকার (বাংলা) এবং চিম্বাবন্দ (মহীশূর); ব্যাক—এস, ভট্টাচার্য, এ ব্যানার্জী সুদীন দাস, এম, কর্মকার (বাংলা); এবং তারা সিং (পাঞ্জাব); হাফ—দিলীপ পাল, মোহন সিং, এ, লতিফ (বাংলা); ফরোয়ার্ড—করিম হোসেন (মহারাষ্ট্র); পি, কানন, হাবিব, বি, লাহড়ী এবং এস, দাস (বাংলা); খাপা (অন্ধ্রপ্রদেশ); এ, শর্মা (দিল্লী); সর্দার খান (মহীশূর)।

* * *

আগামী জুলাই-আগস্ট মাসে ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় স্কুল-ক্রিকেট দল গঠনকল্প বোম্বাইতে এক সম্মেলনের একটি প্রায়শ অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রশ্রমিক খেলোয়াড়কে এই প্রায়শের জন্য বোম্বাইতে ডাকা হয়েছে। এর মধ্য থেকে চূড়ান্ত বোলজন নির্বাচিত খেলোয়াড়

আগামী ১লা থেকে ১৫ই জুলাই দিল্লীতে অনুষ্ঠানের পর ইংল্যান্ড যাত্রা করবেন।

বোম্বাইয়ের প্রায়শে বাংলা থেকে চার জন আছেন এরা হলেন রাজা মহাশর্মা, দীপঙ্কর সরকার, অলক মজুমদার এবং এ, চাকলাদার।

* * *

ইডেন উদ্যানে ভারত এবং ওয়েস্ট-ইন্ডিজের শ্বিতীয় টেস্ট খেলায় শ্বিতীয় দিনের হাঙ্গামার জন্য সেন তদন্ত কমিটির বৈঠক শুরুর হয়েছে। কমিশনের সম্মুখে প্রথম সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্যদান করেন প্রীসীতেশ রায় এবং তাঁর সাক্ষ্য দুর্ভাগ্যবশত গৃহীত হয়। দুর্ভাগ্যের পক্ষে এ্যাড-ভোকেট জেনারেল প্রীশঙ্করদাস কানাজী; সি-এ-বির পক্ষে খ্যাতিমানা কৌসলী প্রীঅমিয় বসু এবং প্রীসীতেশ রায়ের পক্ষে কৌসলী প্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ পত্রস্থ করা হবে।

* * *

আই-এফ-এ নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রীশেনহাশু আচার্য। আই-এফ-এ' নব-নির্বাচিত গভর্নিং বডির সভায় এই সিদ্ধান্ত ভোটে গৃহীত হয়। বিদ্যায়ী সভাপতি প্রীঅতুল্য ঘোষ সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

আই এফ এর দুপ্টচক্রের একটি নতুন চাল

কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা অনেকে আশা করেছিলেন যে, আই এফ এর পরিচালক মণ্ডলীতে এবার বৃদ্ধি পরিবর্তনের হাওয়া লাগবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে ওখানকার স্বার্থান্বেষী দুপ্টচক্রটি একটি নতুন চাল চালার চেষ্টায় আছেন। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে, লোক দেখানো দু-একটা পরিবর্তন হলেও শেষ পর্যন্ত পূর্বের দুপ্টচক্রটির হাতেই পূর্ণ কতৃৎ থেকে যাবে।

বর্তমানে আই এফ এর সভাপতির পদে আসীন আছেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। আই এফ এর প্রাক্তন বেতনভুক্ত সম্পাদক শ্রী এম দত্তরায় মহাশয়ের এবং তাঁর অনুগামীদের অনুরোধে এবং উপরোধে শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় ক্রীড়াঙ্গণের এই সম্মানীয় পদটি অলংকৃত করেন। আই এফ এর সভাপতি হবার পর শ্রীঅতুল্য ঘোষ এমন করেকটি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন যে, তখন ক্রীড়ামোদীরা চমকে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত আশার বাণীর মধ্যে ছিল “স্টেডীজাম সমস্যা”। দু বছর ধরে না ধরেই ক্রীড়ামোদীরা বৃদ্ধিতে পারলেন আসার সেই বুলি আর কিছুই না স্ট্যান্ট! এরপর শ্রীঅতুল্য ঘোষ আই এফ এর সভাপতি থাকাকালীন সময়েই ১৯৬৩ সালের আই এফ এর তহবিল থেকে বিরাট অর্থ তহরূপের কাণ্ডটি ধরা পড়ল। আদালতের বিচারে একজন হিসাবরক্ষক দোষী সাব্যস্ত হলেন। তৎকালীন বেতনভুক্ত সম্পাদক শ্রী এম দত্তরায় তিনি আই এফ এর সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য মাসিক বারোশো টাকা বেতন গ্রহণ করতেন, এই তহরূপের পর সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিলেন।

কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের খুবই সুখের খবর যে, অল্প কিছুদিন পূর্বে এক বিবস্ত্রসূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ আই এফ এর সভাপতির পদ থেকে সরে আসার কথা চিন্তা করছেন এবং তাঁর এই ইচ্ছার কথা তিনি তাঁর অত্যন্ত অনাগত করেকজন আই এফ এর গভর্নিং বডির সদস্যর কাছে ব্যক্ত করেছেন। সরকারিভাবে এবং পাকা-পাকিভাবে এই সম্বন্ধে কোন সংবাদ দ হয় নি অবশ্য। শোনা যাচ্ছে যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভাপতির পদ থেকে সরে গেলে একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে এই সভাপতির পদে বসানো হবে। এই

বিচারপতি ভদ্রলোক নাকি অতুল্য ঘোষের খুব প্রিয় পাত্র এবং আই এফ এর ক্ষমতা-শালী চক্রেরও প্রিয়।

অন্য দেশে ক্রীড়া সংস্থাগুলিতে পরিচালক মণ্ডলীতে অতীতের ক্রীড়াবিদরা স্থান পান। প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ ক্রীড়াবিদরা পরিচালনার দায়িত্ব নেবার ফলে খেলার জগৎ প্রভূত উপকৃত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ক্রীড়াসংস্থাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে সম্পূর্ণ একটি বিপরীত এবং অভিনব চিত্র। আমাদের দেশে অতীতের খ্যাতিনামা ক্রীড়াবিদ, এককালে যাঁরা দেশ-বিদেশের মাঠে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, তাঁদের কোন স্থান নেই; নেই তাঁদের প্রতিভার এবং অবদানের যোগ্য স্বীকৃতি। আমার মনে হয় আই এফ এর সভাপতি পদে অতীতের খ্যাতি-নামা ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পালকে বসানো উচিত; অবশ্য তিনি রাজী হলে। শ্রীগোষ্ঠ পালের মত লোককে সভাপতির আসনে বসাতে পারলে আই এফ এর দুর্নাম অনেকাংশে কেটে যাবে। আজকে আই এফ এর পরিচালনার দায়িত্ব বাদির ওপর ন্যস্ত আছে তাঁদের কজন ফুটবলে ঠিক মত পা দিয়েছেন জানি না; ভাল ফুটবলার হওয়া তো ধরের কথা!

আই এফ এর বর্তমান পরিচালকদের মধ্যে যে বৈনিয়া বৃদ্ধির প্রভাব অতিমাত্রায় বিদ্যমান-তার একটি উদাহরণ আমি তুলে ধরি। বিদেশী একটি ফুটবল দল মিডলেস ওয়াডার্স দূর প্রাচ্য সফরের শেষে জুন মাসে কলকাতায় একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন আই এফ এর কাছে সবভারতীয় ফুটবল সংস্থার মাধ্যমে। আই এফ এর গভর্নিং বডির সভায় মিডলেস ওয়াডার্স দলের প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলে অধিকাংশ সদস্যই প্রস্তাবটি নাকচ করে দেবার মত প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য যে, যখন এই বিদেশী দল সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা নেই, তখন এই দলের প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। এই সমস্ত সদস্যরা এখনও কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের চিনতে পারলেন না, এই হল আশ্চর্যের কথা। ফুটবলের ভরা মরশুম জুন মাসে নাম-গোত্রহীন বিদেশী দলও কলকাতায় এলে আর্থিক ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই।

এখন অত্যন্ত বিনীতভাবে আই এফ

এর পরিচালকমণ্ডলীর কাছে করেকটি প্রশ্ন পেশ করাছি। ১৯৬৩ সালে আই এফ এর তহবিল তহরূপ সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু আজ ১৯৬৭ সালের ফুটবল মরশুম এসে গেল সেই অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট, আজও প্রকাশিত হল না কেন? নিরপেক্ষ একটি অনুসন্ধান কমিটি দিয়ে সমস্ত ঘটনার তদন্ত করলে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্যই প্রকাশিত হত।

প্রতি বছর চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত যে অর্থ আই এফ এ তহবিলে জমা পড়ে, সেই অর্থ বিভিন্ন চ্যারিটির খাতে ব্যয় করা হয়। আই এফ এর বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবে স্পষ্টভাবে এই চ্যারিটির অর্থ বিলি বন্টন সম্বন্ধে তথ্য থাকা প্রয়োজন। কারণ জনসাধারণের অর্থ ঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কি না এ নিশ্চয় জানা প্রয়োজন। আই এফ এর ওপর জনসাধারণের খুব বেশি আস্থা নেই, তা ছাড়া ১৯৬৩ সালের তহবিল তহরূপের ঘটনাটি এখনও কেউই ভোলেন নি। এ বছর আই এফ এর বার্ষিক সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের যে হিসাব পেশ করা হয়েছে তাতে এবং সম্পাদকীয় বিবরণীতে চ্যারিটি ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের বিলি-বন্টন সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের প্রদত্ত হিসাবে বিভিন্ন চ্যারিটি মাচ থেকে চ্যারিটি ফান্ডে জমা পড়েছে ১৪০,৬৬০ টাকা ৪৫ পয়সা; কিভাবে এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে এই অর্থ তার কোন হাদিস মেলে নি। আমরা সে কথা জানতে চাই।

আই এফ এর সভাপতি পদে আর একজনের নাম শোনা যাচ্ছে। তিনি হলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক-কুমার সরকার। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা শ্রীঅশোককুমার সর্বদলের লোকের সমর্থন লাভ করতে পারবেন।

আই এফ এর ক্ষমতামালী দলটি বর্তমানে এতদূর শেকড় গেড়ে বসে আছেন যে, খুব সহজে তাঁদের স্থানচ্যুত করা সম্ভব নয়। এই চক্রের যথেষ্টচারিতার ফলে বাংলার ফুটবল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই দুপ্টচক্রের চক্রান্তেই গত বছর লীগ ফুটবলে ওঠা নামা বন্ধ হয়ে যায়। আই এফ এর এই দুপ্টচক্রের ভাঙন যত দিন না ধরানো যাবে, ততদিন বাংলার ফুটবল ধীরে ধীরে অধোগামীই হবে।

—সুদর্শন

সম্পাদক—জয়ন্তী সেন

বসুমতী প্রেস লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

‘মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে

লুকাই আসি



সাধনার

মহাভূজরাজ তৈল

মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের
আভিলাষের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
“চুল তার কবের অঙ্কুর বিন্দিশায় নিশা”
সেইজন্য সৌন্দর্য বিলাসিনী মায়েই ব্যবহার
করেন সাধনার মহাভূজরাজ তৈল
বিশুদ্ধ আরবের মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও
সীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর
অড়ি দেই।

19 APR 1967

সাধনা ওষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ওষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. অধ্যাপক (মাস্টার), এফ.সি.এস. (লণ্ডন),
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ডাঙলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রে
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি.) অধ্যাপক (মাস্টার)

সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু



রাজধানী দিল্লীতে

- (১) ড. শান্তকে নেহরু পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান
- (২) মধ্যমন্ত্রী সম্মেলন



১৪৪ নং সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ই বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

20th April, 1967 * Vol. 71. No.



...কিন্তু, এক বিষয়ে আমরা নিশ্চিত—

ঘোড়েলীল

—কাতো-ছেংডা-ফাতো হাজা শাকানা খস-খস কিংবা বগ-হীন হাকো



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিশ্বাবাউলীর বৃত্তান্ত (ছোট উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৪৯
নির্বাসন (গল্প)	— রবীন্দ্র গুহ	২৪৫৬
গ্রামবাংলার কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	২৪৫৯
কীটময় ঔষধি চাই (কবিতা)	— নন্দিতা ভৌমিক	২৪৬৪
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	— বৃন্দদেব ভট্টাচার্য	২৪৬৬
গ্রন্থমেলা	—	২৪৬৮
পাঠকমন	—	২৪৬৯
হৃদয়মণ্ড—ওদেশ এবং এদেশ	— শিলালি	২৪৭০
হৃদয়মণ্ড	—	২৪৭২
খেলাধুলা	— শ্রীআমিতাভ	২৪৭৭

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক) মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলোক। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নিষ্পত্তি বাস্তবচ্যুত মুকুন্দরাম দুষ্ট ও বেদনাক্রান্ত বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তিগত দুষ্ট কি করিয়া সর্বজনের দুষ্ট হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

ভক্তসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভক্তিসাধন-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, 'সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিন্তকরী বিশ্ববিমোহন মহাকাব্য—
সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগৎজ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতারণা—সরস্বতীর বরপদ—
সৌন্দর্যের মহাকাব্য—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুন্দরিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাগবিনাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসামৃৎক। ৪.৫০

দ্বিতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শতবোধ, দ্বারিংশৎ-পুস্তিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৬.৫০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—

সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—

রায়শ্যামকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অমদ্যামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সভ্যপীর, খেড়োভেড়ের কৌতুক, ফদরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলিবাজা, চণ্ডী, নাগামৃৎক, 'সংস্কৃত, পাশী, হিন্দী' নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসন্তী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



৭১ বর্ষ : ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য—২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৬ই বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 20th April, 1967

নতুন বছরে নব আয়োজন

নতুন বছর ১৩৭৪-এ পদার্পণ করল। এই পদার্পণ নিঃশব্দ নয়, নানা ঘটনার ঘণ্টাধ্বনি যেন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে। ১৩৭০-এ আমরা বলছিলাম, উত্তীর্ণ, জাগ্রত। ১৩৭৪-এ আমরা বলছি, চৈর্যবোত। জনগণের চরণধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কংগ্রেসী আমলে যে অপশাসন ও অত্যাচারে জনগণ জঞ্জালিত হয়েছিল তার প্রাজিশাখ তারা গ্রহণ করেছে। তারা নিজেদের প্রাতিষ্ঠিত নতুন সরকারের মাধ্যমে শৃঙ্খলিত-বলগেই নয়, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়েছে।

আজ মনে পড়ছে ১৩৭০ প্রবেশ করেছিল পশ্চিমবঙ্গে বিগত সরকারের গুলারী মূল্যে। মনে করুন, বাঁধ ভাঙা সেই গণ-আন্দোলন। সেই সূত্রে আমরাও প্রতিষ্ঠিত গ্রহণ করেছিলাম। সংবাদপত্র ও পত্রিকা জনগণের বড় হাতিয়ার। আবার এইসব পত্রিকাই করতে পারে জনতার বিবৃদ্ধি চব্বিশ শতাব্দী। কিন্তু আমরা জানি, জনশক্তির চেয়ে বড় শক্তি আধুনিক রাষ্ট্রাভ্যন্তরে আর অন্য কিছু নেই। তবু এই সত্য উপলব্ধি ক'জন করে? তাই পশ্চিমবঙ্গের ছন্দবেশী বহু পত্র-পত্রিকা যখন জনবিরোধী গুণায় লিপ্ত ছিল, তখন জনগণের তীব্র আশা-আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করে আমরা বলছিলাম ১৩৭০-র নতুন বছরে যে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে তা সার্থক হবে। তেরশ' তির্যাসরেই তা সার্থক হয়েছে। আজ এই মুহূর্তে আমরা প্রতিষ্ঠিত গ্রহণ করছি যে, এই সার্থকতার পথে আমরা হবো চিরজাগ্রত প্রহরী। আমরা প্রমাণ করবো, জনগণের সামগ্রিক কল্যাণের

জন্যই যে-জনমুখী নতুন সরকারের প্রতিষ্ঠা। তার চলার পথে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টিত। সেই সূত্রে সরকারেরই সুবিধার্থে আমলাতান্ত্রিক হুটিদলিও দেখিয়ে দেব।

অবশ্য সম্মুখে আজ পূর্বতপ্রমাণ বাধা, চলার পথে অসংখ্য কণ্টক। আর এই বাধা ও কণ্টক সৃষ্টি করবে বিগত সরকারের চর ও চেড়বৃন্দ। বলা বাহুল্য, এরা সবাই অতীত গোপনে কর্মরত। প্রবাস্য বৃষ্টিতে এদের গোপন হস্ত সম্প্রসারিত, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্যে এরা উঠে-পড়ে লেগেছে—কিছুদিন আগেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিশেষত এদের সম্মুখে সবচেয়ে বেশি সাবধানতার প্রয়োজন এই কারণে যে, এরা দীর্ঘকাল ধরে কুকর্মে রত ছিল, বর্তমান জনপ্রিয় সরকারের অমলে এদের বিরত হওয়ার কোনো কারণ নেই বরং কালোবাজারের ঘাঁটিদলি থেকে তাদের কাণ্ড-কারখানার মাধ্যমে জনপ্রিয় সরকারকে জনচক্ষে হের ও অপদম্ব করাই হবে এদের প্রধান কাজ।

গ্রাম থেকে শহরে তাই চাই সরকারের সঙ্গে যেমন জনসংযোগ, তেমন জনে জনে যোগাযোগ। একমাত্র সত্য জনতার প্রহরার ফলে সমস্ত ষড়যন্ত্রকে চরমার করা সম্ভব। মজুত খাদ্যাশ্য ও বে-আইনী অর্থসম্পদ উদ্ধৃত এবং নতুন বছরে নতুন ফসল উৎপাদনের অপসীকার মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। সরকারের বহু অর্থে পোষা গোয়েন্দা বিভাগ দীর্ঘকাল ধরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে জনতার স্বার্থ রক্ষা করার কাজ ফুলে গেছে, এতদিনের কারেন্সী স্বার্থের রক্ষক পদলিণ বিভাগের অবস্থা উদ্বেগ।

অতএব বর্তমান সরকারের চলার পথে সুবিধা ও অসুবিধাগুলিও আজ উপলব্ধি করতে হবে। ছন্দবেশী শত্রুর কোনো-প্রকার অপপ্রচারের দ্বারা আমরা যেন বশীভূত না হই। সারা ভারতব্যাপী চরম শত্রুতা সৃষ্টি হবে। কারেন্সীস্বার্থের গায়ে হাত পড়লেই, তারা মরণকামড় দেবে। আর কারেন্সীস্বার্থের গায়ে হাত পড়তে বাধা নড়ে জনগণের কল্যাণ হওয়া অসম্ভব। কোটি কোটি কালো টাকা জমা থাকলে কিভাবে জনপ্রিয় সরকারগুলি জনকল্যাণ সাধন করবেন? সেই কারণে ভারতের রাজ্যে রাজ্যে যে নব নব অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের একজোট হতে হবে। এ ছাড়া গতানুগতিক নেই।

আসলে জনসাধারণ সত্য ও সত্য-জাগ্রত থাকলে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী সার্থক করে তুলতে সক্ষম হবে। যে নতুন ফসল ফলাবার আয়োজন শুরুর হয়েছে তারই জন্যে আসুন, আমরা সকলে মিলে বৈশাখের বুদ্ধি মাটিকে উর্বর করে তুলি। বিক্ষমবলিষ্ট বাংলা আবার সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হয়ে উঠুক। প্রান্তরে প্রান্তরে শিল্পনগরীর চুল্লীর অগ্নিশিখায় দূর হতে থাক অন্ধকার। জ্যোতির্ময় হোক সমস্ত মানব।

সঙ্গীতদর্শী

জাতির মানুষ

নির্বাচন অর্থে সাধারণভাবে যদি আমরা বুঝি যে একটা ছাপানো ফর্মে বাগাতা লিপিবদ্ধ করে তলায় নিজের মামটি সই করে নির্বাচনপ্রার্থী হতে হয়। কিন্তু ডঃ জাকির হোসেন কিম্বা শ্রীকোকা সুখা রাওকে অবশ্য সে-সব জ্ঞান পোহাতে হয় নি। এমন কি তাঁরা যে প্রার্থী হতে চান—এ কথাটাও তাঁরা নিজেরা মধু ফটে বলার আগে অন্য লোক ছিলেন এবং মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তাঁদের শ্রদ্ধা সম্মতিসূচক এখা দোলাতে হয়েছে মাত্র। ভারতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মজাই এখানে। আরো মজা হলো, প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে সত্যিকারের নির্বাচন এবারেই হচ্ছে, আগে হয়েছিল নাম-কে-ওয়ারে মাত্র।

সৈদিক দিয়ে বলতে গেলে ডঃ জাকির হোসেনকে এই প্রথম নির্বাচন প্রতি-শ্রদ্ধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নির্বাচনই বা বল কেন শ্রদ্ধা, তাঁর ৪১ বছরের কর্মজীবনে তাঁর প্রতিশ্রদ্ধারী হতে দেখা যায় নি বিশেষ কাউকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে ভারত রাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতির পদ পর্যন্ত ডঃ জাকির হোসেন প্রায় বিনা প্রতিশ্রদ্ধার লাভ করে এসেছেন। আজ ৭০ বছর বয়সে যদি তাঁকে নির্বাচনযুদ্ধে নামতে হয় সেটা তাঁর ক্ষমতার প্রতি মোহের কারণে নয়, এবাবকাব সাধারণ নির্বাচনের কথা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক চেহারা পরিবর্তিত হয়েছে, তারই জন্যে নির্বাচন প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য বিরোধীদের সঙ্গে একটা আপোষ-রফায় যদি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজী হতেন, তাহলেও বোধ হয় আজ ডঃ হোসেনকে নির্বাচনী পরীক্ষার সামিল হতে হতো না।

কৃতী পুরুষ ডঃ হোসেন। তাঁর গীতিগাথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বিভিন্ন গ্রন্থামলারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার দিকে তাঁর কৌণিক জ্ঞানবোলা থেকেই, হায়দ্রাবাদের এক কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এ-ধারাটি পেরিয়েছিলেন তিনি। তারপর অঙ্গন করতে হয়েছে স্বীয় বুদ্ধি, নিষ্ঠা ও প্রতিভার স্বারা। প্রাথমিক শিক্ষা এক মুসলিম স্কুলে, এখান থেকে আলিগড়ের এম-এ-ও কলেজে। ১৯১৮ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, পরে এখান থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে আইন

কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু সে কখন? ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যখন ঝড় উঠেছে, স্বদেশী আন্দোলনের ঝড়। গান্ধীজী ডাক দিয়েছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বর্জন করো, কোন সহ-যোগিতা নয় ওই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভগ্ন করেছে। সরকারী অফিস-কাছারিই শ্রদ্ধা বর্জন করা হলো না, ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ থেকেও ছেলেরা বেরিয়ে এলো—জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো প্রদেশে প্রদেশে সে-জারগায়। জাকির হোসেনও ইংবেজ সরকার পরিচালিত আইন কলেজ ছেড়ে যোগ দিলেন 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায়'।

এর পরে তিনি পাড়ি দিলেন জার্মানিতে—সৈদিক শিক্ষা-সংস্কৃতির পট-



জাকির হোসেন

স্থান বলে যার খ্যাতি ছিলো যথেষ্ট। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ডিগ্রি নিলেন জাকির। ১৯২৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পি-এইচ ডি হবার পথ ডঃ হোসেন দেশে ফিরে তাঁর পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায়ই উপাচার্য পদ গ্রহণ করেন। সেই যে শিক্ষাজগতে প্রবেশ করলেন ডঃ হোসেন সেই থেকে প্রায় একটানা ৩১ বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদ অলংকরণ করে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সজীবতা ও আধুনিকতা সংগার করতে চেষ্টা করেছেন।

বিস্তৃত গান্ধীজীর বিখ্যাত নীতি 'জামিয়া' বা বার্লিনের শিক্ষা পরিকল্পনাকে কাজে রূপান্তরের ভার ডঃ হোসেনকেই দেওয়া হয়েছিল। এবং তিনি ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং পরে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে থেকে একই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে চেয়েছেন। দীর্ঘ দিন শিক্ষাসংক্রান্ত উচ্চ প্রশাসনিক পদে থেকে ডঃ হোসেন যেমন প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তেমনি সে-অভিজ্ঞতাকে কাজেও লাগিয়েছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ডঃ হোসেনের মৌলিক চিন্তাধারা দেশে-বিদেশে সম্মানিত হয়েছে। কলকাতা, এলাহাবাদ, আলিগড়, দিল্লী এবং কানপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সাম্মানিক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ভারত সরকারও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে ১৯৫৪ সালে পদ্মবিভূষণ এবং ১৯৬৩ সালে সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকটি উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কমিটির সঙ্গেও ডঃ হোসেন নানাভাবে জড়িত ছিলেন। ইন্টার ন্যাশনাল স্টুডেন্টস সার্ভিসের ভারতীয় শাখার তিনি ছিলেন সভাপতি। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডেরও তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। আর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ তো এখনো তাঁরই দখলে। প্রচলিত অর্থে ডঃ হোসেন শিক্ষকতা বিশেষ করেন নি, তবে প্যাটেল স্মৃতি বঙ্কতামালার অংশগ্রহণ করে তিনি ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন কিভাবে করা দরকাব তাবই রূপরেখা দিয়েছিলেন।

শিক্ষাজগৎ ছেড়ে এই পশ্চিম লোকটিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনা হয় ১৯৫৭ সালে, বিহারের রাজ্যপাল পদে। এখান থেকে ১৯৬২ সালে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতির সম্মানীয় পদটি লাভ করেন তিনি। ডঃ হোসেন উপ-রাষ্ট্রপতি হয়ে দুই বছর বাঁধা কাজই করেন নি, আমত-জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি দেশে শ্রুতচ্ছা মিশন নিয়ে গিয়ে প্রভূত সাফল্যও অর্জন করেছেন তাঁর বিনয়, বুদ্ধিমত্তা ও রাজনীতিতে প্রথমে জ্ঞানের জোরে।

কর্তব্য পালনে ডঃ জাকির হোসেন অনন্ত সিবিয়স বা নিষ্ঠাবান, কিন্তু তাই বলে কি তাঁর সব থাকতে নেই? প্রাচীন পৃথিবী বা প্রবৃত্তির বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করার দিকে তাঁর কৌণিক স্কুলের ছেলের মতো, বাগান পরিচর্যা তাঁর আগ্রহ শিশুর প্রতি মায়ের মতো।



ভারতদর্শন

কয়েকটি অকংগ্রেসী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ডঃ প্রফুল্ল বোস, শ্রীহরমাদন কবীর প্রমুখকে দেখা যাচ্ছে

প্রথম নেহরু পুরস্কার

পরম্পর বৈরীভাবে পদ্ম দুই আদর্শ-ন্যাসারী দুই পৃথিবীর মধ্যে একটি তৃতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা নেহরু-ভাবনায় প্রয়োজন ছিল শান্তি এবং সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই। আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রচেষ্টায় নেহরুজীর পরিগ্রহ অসমর্থক হয় নি। যুগোশ্লাভিয়া আরব যুদ্ধের মতো শান্তিকামী দেশগুলি এই আহবানে সড়া দিয়েছিল, আহুত হয়েছিল বান্দুং সম্মেলন, আকৃষ্ট হয়েছিলেন অনেকেই। বিশ্ব-শান্তির অগ্রদূত জওহরলাল নেহরু তাই বড় বেশি আন্তর্জাতিক ছিলেন। সমস্যা তাঁর কাছে বড় করেই দেখা দিত এবং সমাধানও ছিল না অল্পে সন্তুষ্ট। এমন এক কিশোরবাবুর নামে একটি আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার পুরস্কার যথার্থই অর্থকর। ভারতবর্ষ এক লক্ষ মূল্যের মানে সেই নেহরু পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

নেহরু পুরস্কারের প্রথম প্রাপক নির্বাচিত হন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থার্ট। তখনই আমরা সন্দেশে এই ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। কেন না উ থার্ট হলেন: "The conscience of the United Nations and its inner voice. A man of vision with a profound understanding of the problems of the world, a man of quiet courage and dedication, of steadfast devotion to the cause of peace and understanding between nations..."

হার্ভার্ডের প্রতি প্রদত্ত ভারতীয় মান-পত্রের মুখবন্দে কয়েক ছত্র।

কিশেব শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য এক বিজ্ঞান রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উ থার্টের ব্যগ্রতা তাঁকে জাতি-পুঞ্জের বিবেক এবং অন্তরের ভাস্কর্যটির মূর্ত প্রতীকে পরিণত করেছে। ভারতের রূপটিত ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ রাজ-ধর্মীর বিজ্ঞান ভবনে আরোজিত পুরস্কার বিতরণী সভায় বলেছেনঃ থার্ট প্রকৃত বুদ্ধবাদের ন্যায় সমঝোতার মাধ্যমে শান্তি প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী।

হার্ভার্ডের স্মারক নর, সমঝোতার মাধ্যমেই কিশেব শান্তি স্থাপন করতে হবে এমন স্বপ্ন সন্তবের প্রথম আশাবাদী চিন্তানায়ক ছিলেন জওহরলাল। উ থার্ট নেহরু পুরস্কার গ্রহণকালে সে কথাই আবেগ-স্ফূর্তিতকণ্ঠে স্বীকার করে ঘোষণা করেন: "I join all the people in India and in the world at large who revere his memory and are resolved to continue to work in his spirit and towards his ideals."

নেহরু স্মৃতি-সম্মুখ এই পুরস্কার গ্রহণ করে থার্ট জানান, এই পুরস্কার গ্রহণ করে শান্তির পথে অভিযানে আধিক্যের প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করছেন তিনি।

জগবান তথ্যপত্রের পাদপদ্ম স্পর্শে পবিত্র ভারতভূমিতে বারম্বার শান্তির প্রবক্তারা এসেছেন, শুনিয়েছেন তাঁদের অক্ষর আঁত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী। কিন্তু বিশ্ববাহানাহিনীর অবসান দূরের কথা

ভারতের রাটিতেই যেন হিংসা পাকা বটের কঠিন শিকড়ের মত রাটির সমস্ত সরসতা নিঃশেষে নিঃড়ে নিচ্ছে। বৃষ্ণ চৈতন্যের ভারত সঙ্কীর্ণতার নাগপাশ ছিন্ন করে মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামি, দলগত বিদ্বেষ শ্যামলা রাটির বকে বারম্বার হিংসার শোণিতধার্য বইয়ে দিয়েছে। ক্রুর স্বার্থবুদ্ধি ভারত-ভূখণ্ডকেই অবশেষে বণ্ডাচ্ছিন্ন করেছে আর সেই বিচ্ছিন্ন বিশ্ববিশিত ভারতকে বাই-বিশ্ব থেকে উস্কানি দানের, নীচ প্রচেষ্টা আক্রমণ সমানতালেই চলেছে। শান্তি ও সৌহার্দ্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে দু'একটি কমতাদেশী সম্মুখশালী রাষ্ট্র। ভিয়েতনামে দু'বলের ওপর প্রবলের বর্বর অভ্যাচারের কাছিনী প্রতিটি প্রভাতকে বিমর্ষ করে তোলে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটা অশান্তির কড় তুলবার জন্য কোন কোন পশ্চিমী রাষ্ট্র উদ্ভুদ্ধ হয়ে আছে। বিভিন্ন শান্তি প্রচেষ্টায়ও হিংসার উস্কান পৃথিবীর কিছন্ন চৈতন্যের হয় নি। তরুচ মানবতাবাদী শ্রুতবুদ্ধি প্রচেষ্টার জালিত দেয় নি।

আন্তর্জাতিক শান্তি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নেহরুবাবুকে বোধি থার্ট তাঁর পূর্বদৃষ্টি পদাধিকারকালে সূক্ষ্মভাবে রূপদানের যে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে নেহরু পুরস্কার তার প্রথম প্রাপককে সন্ধান করে নিতে কিছন্ন্য কেন পার নি। সৌন্দর্য থেকে এটা একটা বড় রকমের স্ফলপণ্ড বলা যেতে পারে।

উ থার্ট বিচক্ষণ এবং নিরপেক্ষতার জন্য

দুনিয়ার বিভিন্ন শিবিরেই সমান সম্মানপূর্ণ। উ খাণ্ডের হাতে নেহরু পুরস্কার প্রদত্ত হওয়ায় এই পুরস্কার তার চারিত্র্যকে একটি ব্যক্তি কর্ম ও আদর্শের মধ্যে সুপারিত করার সুযোগ লাভ করল।

ডক্টর অব ল' শেড ইন্টারন্যাশনাল ল'

হে বিচারক! তুমি আন্তর্জাতিক বিচারের অপব্যবহারকে রক্ষা কর! এই আবেদন ছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নীরব বিকোভাকারী ছাত্রগণের হস্তধৃত প্র্যাকার্ডে। আবেদন, নেহরু, শান্তি-পুরস্কারে ভূষিত স্বাধীনপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ খাণ্ডের কাছে। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উপলক্ষে এক ঐতিহাসিক অভূতপূর্ব জনসমাবেশে আচার্য ডঃ জাকির হুসেনের কাছ থেকে বিগত ১৩ই এপ্রিল ডক্টর অব ল' উপাধির সম্মান গ্রহণ করেন।

খাণ্ড একদা ব্রহ্মদেশে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকের সাধনাকে আন্তর্জাতিক বিষয় পরিচালনার সাধক প্রয়োগের স্বীকৃতিস্বরূপ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করে। খাণ্ডের সমাবর্তন স্তবন ভ্যাগের অব্যবহিত পরেই ছাত্ররা ভিরেতনাম থেকে মার্কিন হস্তক্ষেপ অপসারণের দাবিতে নীরবে বিকোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের দ্বিতীয় প্র্যাকার্ডে ছিল ভিরেতনাম সংক্রান্ত খাণ্ড-নীতির সমর্থন।

খাণ্ড তাঁর সমাবর্তন ভাষণে বলেছেন: শিক্ষা যখন চিন্তার, সমাজবোধে এবং নৈতিকতায় সমৃদ্ধ হয়ে মানবের সুসংহত বিকাশে সহায়ক হবে, সেদিন জগতে শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হবে। মানব জড়তার জন্য খাণ্ড তাই এমন শিক্ষণ ব্যবস্থা চান, যন্ত্রা জড়বাদী জ্ঞানের সপে মানবিক চৈতন্যেরও সম্যক উন্মেষ ঘটানো সম্ভব হয়।

আবার মার্কিনী জপ্ত

কিন্তু শান্তির লালিতবাণী যখন ভারতের বৃকে উচ্চারিত হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে সদ্রু মার্কিন মুল্লুকে নতুন চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। ভারত-পাকিস্তানকে সমর যন্ত্রাংশ সরবরাহের চক্রান্ত। নতুন করে মার্কিন যন্ত্রাংশের এই ওদাধ প্রদর্শনের অর্থ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষের মতো আবারও দুই দেশের মধ্যে ভিত্ততা সঞ্চারে মদত দেওয়া এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহের দ্বারা পাকিস্তানের হাতকেই সক্রিয় করা। গত সম্বর্ষে পাকিস্তান ভারতের হাতে চড়াশস্তভাবে পরাধীন হয়েছিল। প্যাটন ট্যাঙ্কের কবরখানা তৈরি করেছিলেন ভারতের বীর সেনাধ্যক্ষ জেনারেল চৌধুরী। যন্ত্রাংশ সরবরাহের দ্বারা পাকিস্তানকে সেগুলিরই সংস্কার সাধনের

সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাসের প্রচেষ্টাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে দুই দেশের জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলিকে ব্যাহত করাও এই দুরভিসন্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে ফেউ-এর মতো লাগিয়ে রাখার জন্য গত দশ বৎসর যাবৎ আমেরিকা যন্ত্রাংশ পাকিস্তানকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করছিল ভারতই দম্ভে পাকিস্তান ভারতভূমিতে প্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টা করে এবং তা এ মার্কিনী অস্ত্রের জোরেই। কিন্তু ঢাল তলোয়ারে সাজিয়ে নিধিরাম সর্দারকে ভারত আক্রমণে পাঠিয়ে নেপথ্যে মার্কিনী বন্দুরা যে পুলকানন্দ অনুভব করছিলেন ভারতের উপযুক্ত প্রত্যুত্তরে তাঁদের চক্ৰ চড়কগাছে আয়োজন করে এবং প্যাটন-কবর দেখতে মার্কিনীদেরও বেশ ভিড় হয়। চোটটা ঢোক গিলেই ইজম করতে হয়েছিল। কিন্তু বছর দুই চপ করে থেকে এইবার যন্ত্রাংশ সরবরাহের হল করে ক্ষতিগ্রস্ত পাকিস্তানী সমরসম্ভারকে গড়ে তোলার কাজে আবার তারা উঠে-পড়ে লেগেছে। আমেরিকা থেকে কোটি কোটি টাকার সমরাস্ত্র মার্কিনী বন্দুরা যখন পাকিস্তানকে সরবরাহ করেন শত্রু ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যই (প্রকৃত ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে, যদিও ফলাও মার্কিনী নির্দেশ অস্ত্র ব্যবহার শত্রু হবে কমান্ডনিজম যন্ত্রাংশের জন্য), ভারতকে ভরন পাই পরসার জিনিসও সুদখোর বন্দুর কাছ থেকে কিনে আনতে হয়। এবারও মার্কিনীরা যন্ত্রাংশ বিক্রি করবেন। বিক্রি করবেন দুই দেশকে সমান হারে। অথচ একে তো পাকিস্তান আগেই বহু শত কোটি টাকার মার্কিনী অস্ত্র পেয়েছে এবং বিনা পরসার প্রাপ্ত বলে শিকারী ভারতীয় জওয়ানদের মূখে সেগুলিকে বেওয়ারিশ পঠির মতো অব্যাহে নিহত হওয়ার জন্য ছেড়ে দিতে পেরেছিল। মায়া-দস্যার বালাই নেই। এখন সেগুলিকে স্পোরার পার্টস সহযোগে পুনরায় 'স্পোরারবল' ঘাতে সে করতে পারে মার্কিনী চক্রান্ত সে কারণেই। কোষিত ভারতের বিরুদ্ধেই) পাকিস্তানকে বিমানে ট্যাঙ্কে ও অন্যান্য সমরাস্ত্রে মার্কিনী সাহায্যের পরিমাণ ১৮০ কোটি ডলার। পাকিস্তানের সাড়ে চারগুণ ভারত-বর্ষ সেখানে রাজার জাতীয় সরঞ্জাম মাত্র পেয়েছে বার মোট মূল্য দশ কোটি ডলারের বেশি নয়। পাকিস্তানিতির এহেন নমন্যর নেপথ্য উদ্দেশ্যও প্রমাণিত হয়ে গেছে ১৯৬৫ সালেই। ভারতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত মার্কিনী অস্ত্রের সংবাদ পেয়েও আমেরিকা কাষিত নিষ্ক্রিয় দশকের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। শেষে পাকিস্তান তাতেও এ'টে উঠতে পারল না দেখে মার্কিন মুল্লুকে পি-এল ৪৮০-র পাচি কবে ভারতকে অন্য

দিক দিয়েও কাবু করতে চেয়েছিল। এ-সবই বড় বেশি প্রত্যক্ষ ভারতাবোধী মনোভাবের পরিচায়ক। সেই আমেরিকা আবার পাকিস্তানের ভাড়াঘর সাজাবার জন্য গা ঝাড়া দিয়েছে শত্নে স্বভাবতই ভারতব্যাপী একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে এবং ভারত সরকারও মার্কিনী উচ্চানিতে দুই দেশের শান্তি তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মার্কিনী রাষ্ট্রদূতকে সেই মর্মে ভারতের প্রতিবাদও জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ মার্কিনীদের কানে লাগে না। সমগ্র বিশ্বমানব একযোগে প্রতিবাদের ও আবেদনের কড় তুললেও ভিরেতনামে মার্কিনী স্বরভাষ ক্রান্তি দেখা যায় না।

মার্কিনী সরকারী মহল অবশ্য বড় বড় বুদ্ধি 'কে'দেছেন। পাকিস্তানকে সমরসম্ভার না দিলে ভারত-বিশেষায়ী নাকি চীনের পো ধরবে। তাই সাত-ভাড়াভাড়ি মার্কিন মুল্লুকে সমগ্র সাহায্যের সম্ভার নিয়ে পাক মিতার মান ভাঙতে হবে। হায়, কার কপালে যে কি দুর্ভোগ লেগা আছে। বিশ্বজুড়ে কমু-নিজম ঠেকাবার জন্য মার্কিন মুল্লুক এখন সবার মান ভাঙিয়ে বেড়াক। একটা বহু শক্তির এমন অসহায় পরাধীনতা লক্ষ্য করে সত্যিই বড় কষ্ট হয়। ক্ষুদ্র পাকিস্তানকেও মার্কিনী প্রতুরা ডরাচ্ছেন, অস্ত্রত তাঁদের বক্তব্যে তারই প্রকাশ।

ভারতের ভালোমানুষী সেই হিসাবেই অন্যায়কে অনবরত প্রগ্র দিচ্ছে। একটা সুস্পষ্ট পার্শ্বপরিবর্তন ছাড়া দুর্জনকে ঠান্ডা রাখার অন্যতর উপায় নেই। বদজনের সপে বজ্জাতিই বিষয়। কিন্তু সে পক্ষ ভারতের মার্কিন-প্রেমী নেতৃবৃন্দই মেরে রেখেছে। গাঁটের কড়ি খরচ করে ভারত আজ মার্কিন মহাদেশের কুপার পাগ। আর একটি পরসো না ছেড়ে পাকিস্তান মার্কিনী বিশাল বন্দুকে নাচিয়ে ছাড়ছে। পাকিস্তানের হাতে কুট রাজনীতির ক্যাপিটাল। ভারতের পক্ষ নেতৃবৃন্দের মনে মার্কিন তোষণের তথা তামাম দুনিয়া তোষণের দুর্বলতা। চোট তাই আসছে এবং আসবেও। মার্কিন মুল্লুকে দোষারোপ করে লাভ কি? নিজের দোষটা, অস্ত্রত কলিকালে যা দোষাবহ তাকে সংশোধনের চেষ্টা করাই এখন একমাত্র উপায়ান্তর।

জগলা সাহেবের সাক্ষাৎ

পূর্বাপর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সমর ভারতের কড়া মনোভাব গ্রহণের দরকার, সে সমগ্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা এমনভাবে তাঁর মন্তব্য প্রয়োগ করলেন যাতে বোঝায়, মার্কিনীদের মনকে ভূত্বিয়ে-বুড়িয়ে আনাই তাঁর লক্ষ্য। আর

এই মনোভাব প্রকাশের মূহুর্তে তিনি সোভিয়েট দুর্নিয়র সঙ্গে আমাদের ক্রম-বর্ধমান মৈত্রীর প্রসঙ্গও সঠিক মনে রাখলেন না। না হলে, ওগো, তোমরা পাকিস্তানকে আর অস্ত্র দিও না—একথা আত্নানাদ করে জানানোর সময় তিনি কেন ফলবেন? কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অস্ত্রশস্ত্র যে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কর্তৃক প্রস্তুত হয়েছিল সে সংবাদ জানানোর পরও আমেরিকার চেষ্টানোদর হয় নি। অথচ ভারত চীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জা চেয়েছিল। আর পাকিস্তান চীন বা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিশ্চয় তা চায় নি।

মার্কিনী মনোরঞ্জনের এহেন প্রয়াসে ভারতবাসীর মাথা ঘেঁটে হয় একথা চাগলা সাহেবকে বোঝাবেন কে। ভারত কি কম্যুনিজম হটানোর মার্কিনী পরিকল্পনার ভাবেদার? পাকিস্তান কি চীন বা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে ভারত শূন্যে ডগমগ হয়ে উঠত? করুণা ভিক্ষা করার আরও তো অনেক পথই খোলা আছে। বন্ধু রাষ্ট্রের মনে বিরূপ প্রতিজ্ঞা সৃষ্টি করে অমিত্রসুলভ কার্য-কলাপে রত বন্ধুদের মদ্যাসম্বারীর কাছে হাত কড়ানো কোন দেশী পররাষ্ট্রনীতি তাই বোঝা ভার।

বুঝতে হবে মার্কিন মূলুক কেন পাকিস্তানকে তেজাজ করে চলে। রাশিয়া চীনের দিকে তার বোঁক রোধ করার জন্যই যদি, তবে ভারত খামকা নিজেকে মার্কিনী কোষে অসহায় নির্বোধ শিশুর মতো অশ্রণ করতে এতো ব্যস্ত কেন? এই নীতির ফলেই কি ১৯৬৫ সালে তাকে একবার হত্যাশ হয়ে ভেবে দেখতে হয় নি যে মোটা বিবে তাই বন্ধুসংখ্যা অপদ্রলি-মেরও নয়! ভারতেরও বা কোন শিকারী হয়েছে! ভারতবাসীর কাছে ক্রমাগত ক্রুদ্ধভাসম্বনের আহবান জানিয়ে মার্কিনী চাপের কাছে নতি স্বীকার করে চলার এই নীতি ভারতবাসীও বেশিদিন বরাদ্দত করবে না, একথা সঙ্গর উপলব্ধি করা প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মার্কিনী-প্রেমীর জন্য ভারত ক্রমাগত ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে এই বা কেমন ধারা বায়না।

আজ একথা আর রেখে-ঢেকে বলার সময় নেই যে মার্কিন মূলুক পাকিস্তানকে নেপথ্যে মদত দিয়ে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ করে সীমান্তে ঠান্ডা লড়াই জিইয়ে রাখতে চায় বা মহান ভারতের শান্তিপ্রিয় আদর্শ রূপায়ণের পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে। ভারতবাসী সরকারের দুর্নীতিকার পা পেতে ভরাডুবি দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতিতে বিশেষ অবস্থিতবোধ করছেন বলেই মনে হয়। ঠিক যে মূহুর্তে

কারো স্বার্থ ঘায়েল হয়ে ভারতে নতুন রাজনৈতিক জাগ্রততার শব্দ, হয়েছে, যখন বিভিন্ন ভারতীয় নেতা ভারতকে (সাহায্যের নামে) তাবোমারির নিগঢ় বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম শব্দ, করার জন্য প্রস্তুত, পাকিস্তানের হাতে পুনরায় ধারাল তরবার তুলে দিয়ে সেই শব্দ মূহুর্তকে পশু করার জন্য আশ্রিতকার চুনক নড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার এই বিচিত্র প্রত্যাক ফলাফল লক্ষ্য করেও ভারত যদি আজ নয়া দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে নতুন করে তার নীতিকে না সাজায় তবে দুর্দিনকে আমাদের মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে, আর সৌদিন কোনক্রমেই আজকের ভ্রমাত্মক নীতি 'কম্বাহ' বলে জনগণের আদালতে পরিগণিত হবে না।

নতুন বছর অনেক নতুন উপহার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে নয়া উপহার আমরা যাতে লাভমানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি নতুন বছরের আব-হাওয়ায় আছে ভারতীয় সত্যকীরণ। ভালোয় মতো, আলোয় আধারে একটি নবতর লমাজীবন রচনার পথে নতুন বছর আমাদের অভিযাত্রী হতে সাহায্য করেছে। সিংহ আর সাকল্যকে এখন সাবধানে আবাহন করে জানতে হবে জীব পুরাতন রতির ক্রম ক্রান্তি লাফ করে। প্রার্থনা, সেই পথিতে সম্মুখ হয়ে উঠুক ভারত ভূখণ্ড। ঐক্য সংহতি আর শব্দ ইচ্ছাই যোক আমাদের পাখের। প্রম হোক আমাদের হাতিয়ার এবং ক্ষুর স্বাধীনতাতে সেই পথি আরামনার পূজার আমরা যেন করতে পারি প্রথম বলি।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন

বিগত ১ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। সম্মেলনে শ্রীমতী গান্ধী যে উপদেশাবলী উপস্থাপিত করেন, সংক্ষেপে তার 'সারমর্ম':

কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন হ্রাস এবং দেশব্যাপী ঋণাত্মক লক্ষ্যের ফলে মূল্য-বৃদ্ধি অনিবার্য।

বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির কাছ থেকে এক কোটি টন খাদ্যাশ্রয় পাওয়ার প্রতিশ্রুতি মিললেও দেশে জোরদার সংগ্রহ অভিযান, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং ন্যায়সঙ্গত বন্টনের আয়োজন করতে হবে।

রাজ্য কেন্দ্রে মণ্ডল্য সর্বথা সম্ভব না হলেও মণ্ডল্যবোধ যাতে সম্মুখ পরিণত না হয় আসল লক্ষ্য সেখানেই রাখতে হবে।

উন্নত অঞ্চলগুলিকে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

এ ছাড়া তিনি পররাষ্ট্রীয় নীতির সমস্যাগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রীগণ একরাজ্য খাদ্যাশ্রয় গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পাঞ্জাব, হারিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশকে নিয়ে গঠিত বৃহত্তর খাদ্যাশ্রয়কে ভেঙে দেওয়া হবে এবং একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি খাদ্য-নীতি রূপায়ণের সমস্যা বিচার করে দেখবে বলে সম্মেলনে স্থির করা হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সদস্যরূপে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রীগণ। রাজ্যের প্রতি খাদ্য বরাদ্দের পরিমাণ ও বন্টন ব্যবস্থাকে যথাযথ রাখার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। তবে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বিহারের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিহারকে অধিকতর সাহায্য প্রদানের কথাও ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় সংগ্রহ ভান্ডারের উন্নত রাজ্য হিসাবে অন্ধ্র, পাঞ্জাব ও উড়িষ্যা থেকে খাদ্যাশ্রয় প্রাপ্তির কথাও শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেন। পাঞ্জাব ও অন্ধ্র উভয়ই হয় লক্ষ টন করে বর্তমান মরশুমে খাদ্যাশ্রয় দিচ্ছে। বিনিময়ে অল্প অবশ্য কেন্দ্রীয় তরফ থেকে পাবে গম ও মাইলোর দু'লক্ষ টন খাদ্যাশ্রয়। উড়িষ্যা ৭৫ হাজার টন চালের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে ৫১ হাজার টন বাকিটা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে মুখ্যত খাদ্যের ওপরই গুরুত্ব আরোপিত হয় এবং দেখা গেছে যে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন চরিত্রের সরকার বর্তমান থাকলেও খাদ্যের প্রশ্নে অনায়াসেই তারা একটা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পেরেছেন। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী জানিরেজেন যে, তারা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী হলেও বর্তমানে একরাজ্য খাদ্যাশ্রয় গ্রহণ করাই সমীচীন বলে গ্রহণ করতে স্বেচ্ছান্বিত নন। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল ঘোষের ভাষণে বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হলেও ড. ঘোষের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি গ্রহণ করতে পারেন নি। ড. ঘোষ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও অন্ধ্রকে নিয়ে একটি চাউল অঞ্চল গঠনের কার্যকরী ফলশ্রুতির চেহারা তুলে ধরেন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপূরনাম সিং আশা প্রকাশ করেন যে সম্ভবত পাঞ্জাব প্রতিশ্রুত পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর খাদ্যাশ্রয়ই কেন্দ্রকে সরবরাহ করতে পারবে। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এ সিংহেও গমের পরিবর্তে আরও চাল দিতে রাজ্যী আছেন।

সম্মেলনের খাদ্য-বিষয়ক আলোচনা মোটামুটি সফলপ্রসূই হয়েছে যদিও কোনও নতুন খাদ্যনীতি বা জাতীয় খাদ্য বাজেট গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নি।

সাম্প্রতিক বঙ্গবর্তা

অর্থমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে অর্থ সংস্থানের প্রশ্নে কিন্তু খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনার মতো একটি সার্বিক সমঝোতা বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এর কঠিন মনোভাবই এজন্য মূলত দায়ী। রাজ্যগুলিকে শূন্য হাতে বিদায় করে তিনি যে লক্ষ্য-চওড়া উঠি করেছেন তাও একান্ত প্রতীকট। সাংবাদিকগণ রাজ্যগুলি অধিকতর অর্থসংস্থানের দাবি করেছেন কি না এই প্রশ্ন করলে শ্রীদেশাই বলেছেন, ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। কেন না আমাদের চাহিদার শেষ নেই।

এহেন মন্তব্যের সময় শ্রীদেশাই হয়ত মনে রাখেন নি যে, চাহিদাটা সৃষ্টি করার জন্য কেন্দ্রের সর্বগ্রাসী ক্ষুধাও কম দারী নয়। রাজ্যগুলির কাছ থেকে মহাজনের মতো কেন্দ্র আশি ভাগ সম্পদ আহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, আর অপদার্থ পরিকল্পনা এবং কুর্নীর্তির স্বারা দেশে অভাব জন্মেতা ও অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সেই তৈরি করা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সাহায্য চাইলেই মোরারজী দেশাইয়ের কাছে সে আর্জি বাতুল চাহিদারূপে গণ্য হয়। তিনি বিক্ষণভার পরাক্রান্ত দেখিয়ে রাজ্যগুলিকে শূন্যে উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দিলেন। অর্থাৎ তোমাদের ঠেকা তোমরা সামলাও, কেন্দ্র সাহায্য ফাহায্য দিতে পারবে না। চমৎকার স্বীকৃতি।

কেন্দ্রীয় ভুল নীতির ফলে দেশে মূদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। কেন্দ্র তার মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মহাধাভাতা দফায় দফায় বৃদ্ধি করবে বিভিন্ন রাজ্যের আহত সম্পদ নিয়ে, কিন্তু রাজ্য কর্মচারীরাও যে একই মূল্যস্তরে জীবন কাটাচ্ছেন এবং তারা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কর্মী। তাঁদের ভাবনাও যে বিভিন্ন সরকারকেই ভাবতে হবে এ চেতনা মোরারজী দেশাইয়ের থাকার কথা নয়। সীমিত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই এঁদের নেতৃত্বাভিলাষ। এঁরা দেশের প্রত্যেক নাগরিকের ব্যবস্থা করতে কিছুমাত্র চিন্তিত নন। প্যারিটির প্রশ্ন এঁদের ধাতো নয় না। ডিসপ্যারিটিই স্বার্থবৃদ্ধি। সুতরাং লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর পাহাড় প্রমাণ চাপকে এঁরা উপলব্ধি করবেন কেমন করে। বরং নিজেরটা গাছিয়ে এঁরা চিরকালই সবাঙ্গে বলতে অভ্যস্ত, আমাদের চাহিদার শেষ নেই। কষাট খাটি। নিজের কর্ম দিয়েই তা তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত উপপদটিও জোগাড় করেছেন। চাহিদা যে কী সীমাহীন এটা বৃকতে মোরারজী

দেশাইকে বেশ পেতে হলে চাহিদারই লক্ষ্যের পাতাল প্রবেশ করা উচিত।

শ্রীদেশাই রাজ্যের কোনরূপ অর্থসংস্থানের সমস্যাই আমলে আনেন নি। রাজ্যগুলিকে ঘাটতি বাজেট উত্থাপন না করতে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভার ড্রাফট নিয়ে কাজ চালানোর রীতি বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ রাজ্যস্তরে খরচ কমিয়ে ও বাজেট পলিনি 'কাপড়ের মাপে কোট তৈরি'র নীতি গ্রহণ করে রচনা করতে বলা হয়েছে।

শ্রীদেশাই যেভাবে শূন্যই কেন্দ্রীয় তহবিল সামলে সেলেন তাতে স্বভাবতই রাজ্যগুলির আহত হওয়ার কথা এবং এই মূহুর্ত থেকেই কেন্দ্র রাজ্য সংঘাতের সূত্রপাত হল বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তাই যথাধর্ম দাবি করেছেন। রাজ্যগুলি যাতে রাজ্যের সম্পদ আরও বেশি পরিমাণে ভোগ করতে পারে এবং কেন্দ্র দৃ-হাত বাড়িয়ে তার চোন্দ আনাই প্রাস না করতে পারে সে জন্য সংবিধানের অর্থসংক্রান্ত তালিকার পরিবর্তন ও সংশোধন করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। প্রকাশ বিহার ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রিস্বরূপ কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন একটি ব্যয়সাধ্য পরিচর-সম্মেলনী মাঠে পর্যবসিত হয়, যার নতুন কোনও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় নি। দেশের আর্থিক সমস্যাকে ঢেলে সাজিয়ে নতুন কোন পথ আবিষ্কারের কোন চেষ্টাই করা হল না। এই সম্মেলন যেন প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর দুটি পৃথক ক্লাস গ্রহণের সামিল, সেখানে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের উপদেশ প্রবণ ও পাঠ গ্রহণের জন্যই আহ্বান জানানো হয়েছিল।

স্বাগত ওয়ানশু

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারকের পদটি শ্রী কে সুব্রহ্মাণ্যের পদত্যাগের ফলে শূন্য হয়েছিল। শ্রীরাও রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধী প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে তাই কার্যভার গ্রহণ করলেন শ্রীকৈলাসনাথ ওয়ানশু। বিচার বিভাগে বহুদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সুদান শ্রীওয়ানশুকে একজন ন্যায়পরায়ণ জনপ্রিয় বিচারক হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তার মনোময়নে সুপ্রীম কোর্ট বার তাই স্বভাবতই আনন্দিত।

ওয়ানশু বর্তমানে চৌবাটি বৎসরের কর্মকর্ম ব্যক্তি। তার স্বভাবজ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে সন্দেহ নেই। শ্রীওয়ানশুর ব্যক্তিত্ব

ভারতীয় বিচার বিভাগ ন্যায়ধর্মের পথে আরও অগ্রসর হোক এই আশা নিয়ে কৈলাসনাথ ওয়ানশুকে আমরা স্বাগত জানাই।

দিন বদলের হাওয়া

অতঃপর দিন বদলের হাওয়া দিল্লীর পুলিশবাহিনীকেও স্পর্শ করে গেল। দিল্লী পুলিশের অভাব-অভিযোগ আজ কিছু নতুন নয়। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরের সঙ্গে পুলিশবাহিনীর তলবকে সমান্দু-পাতিক করার প্রয়োজন বা তৎকারণ পুলিশবাহিনীতে অভূতপূর্ব বিক্ষোভ ইতিপূর্বে দেখা দেয় নি। কেন দেখা দেয় নি, আজ তাই একটা বিস্ময়কর প্রশ্ন। অবশ্য কুলোকে কুখ্যা বলবেন। বলবেন, পুলিশের আবার মাস মাহিনা! কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুরূপভাবে কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দেওয়া স্বাভাবিক মনে করি না। যা উল্লম্ব সত্য তাকে নিয়ে আলোচনা অধিকন্তু।

দিল্লী পুলিশ গত ১৪ই ১৫ই এপ্রিল হাজারে হাজারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সমস্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তারা স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর প্রাসাদ ঘেরাও করলে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হল। কেন্দ্রীয় সরকারকে পুলিশ দমনের জন্য মিলিটারী, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশী পুলিশ, পঞ্জাব সশস্ত্র পুলিশ আহ্বান করতে হল। ধর্মঘটী সশস্ত্র পুলিশকে নিরস্ত্র করে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে এবং ১৪৪ ধারা জারী করে ঘটনার গুরুত্বকে স্বীকৃতি জানাতে হল কর্তাদেব। এখন পুলিশের ওপর আর ভরসা নেই। মেয়ে পুলিশের ওপরও নয়। তাঁরাও আন্দোলনে অংশভাগিনী।

বিচার দাবিতে জনগণ যখনই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন, পুলিশবাহিনী তখনই শিকারী নেকড়ের মতো খাঁপিয়ে পড়েছে তাঁদের ওপর। আজ অকস্মাৎ সেই পুলিশই নিজেকে সমর্পণ করছে মিলিটারি ট্রাকে গ্রেপ্তার বরণ করে। এও কি জলাট-লিপি!

খুব অল্প সময়েই অবস্থা আমন্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ধারণা। কিন্তু এই বাহ্য। দাবিয়ে রেষে অবস্থাকে কত দূর আরম্ভাধীন করা যাবে তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। রাজধানীর রাজপথ জনপথ ট্রাফিক পুলিশ শূন্য। রাজপথ জুড়ে পুলিশী মিছিল। এ দৃশ্য আশঙ্কাজনক।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কোন পর্যায়ে ঠেলে দিলে পুলিশ ধর্মঘট এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে পারে, দিল্লীর ঘটনাবলী তারই নজীর।

(১৫-৪-৬৭)

একটা যুগের অবসান হলো, নতুন যুগের সূচনাও হলো সেই সঙ্গে। কিন্তু সে যুগ গত হলো তার কিছুটা ঘাইয়ের চাবিকা ছিলো তবু, কিন্তু সরু হলো যে যুগের তার সে কোলমিও নেই। ফ্রান্সের মাটি থেকে ন্যাটোর সদর দপ্তর গাটিকে নিতে হতো। নতুন করে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা পত্তন করা হলো বেলজিয়ামে।

প্রিন্সিপাল দ্য গল গত বছর চরমপত্র দিয়েছিল ১৯৬৬ এপ্রিলের মধ্যে ফ্রান্স থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারিয়ে নিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিলো হয়তো ফ্রান্সকে বদ্বিধা-সূচিয়ে সিংধান্ত পাটটানো যাবে, হয়তো 'এপ্রিল ফুল' দিবসের মতো সবাই অপসারণ কার্য দেখতে এসে হেড কোয়ার্টারের নতুন সাজ দেখে বোকা বনবে। কিন্তু দ্য গলের যে কথা সেই কাজ, এপ্রিল ফুলের হুমকী দেখানো তাঁর ধর্ম নয়।

দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে প্যারিসের কাছে রোকেনকুর-এ ন্যাটোর সদর দপ্তরটি ছিলো। ন্যাটোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো পশ্চিম ইয়োরোপের প্রতিরক্ষার জন্যে আর একটি সংস্থা 'শেপ'-SHAPE যা সুপ্রিম হেড কোয়ার্টার্স, এ্যালায়েড পাওয়ার্স, ইয়োরোপ। এই দিন ১৫টি সদস্যরাষ্ট্রের পতাকা নামিয়ে ফেলা হলো নতুন করে ব্রাসেলসের ফাটোতে প্রতিষ্ঠিত হলো।

একথা সত্যি যে শেপ অপসারণে ফ্রান্সের কিছু আর্থিক ক্ষতি হবে অন্তত সাময়িককালের জন্যে। কারণ এটা শূন্য ন্যাটোর স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে এখানে পশ্চিমী মার্কিনয়ার শ্রেষ্ঠ সামরিক পরামর্শেরাই শূন্য মিলিত হতেন তা নয়। এর দরুণ ফ্রান্সের অর্থগমও হতো। এ দপ্তরে প্রায় ২৫ হাজার ফরাসী কাজ করতো। কানাডা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রগলোতে ২৫ হাজার সৈন্যের এবং তাদের ৭০ হাজার আপনজনদের জন্য প্রতি দিন যে হরেক-রকমের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র লাগতো তার পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টাকা। ফ্রান্সের অর্থনীতি এর দ্বারা একটু ঘা খাবে বৈকি। অর্থাৎ কুড়ি হাজার বেকার ফরাসীকে যেমন চাকরী দিতে হবে তেমনি যে বিদেশী মদ্রা সে চাকরী দিয়ে এসেছে তা থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হবে।

তবে, তার লাভও হয়েছে বেশ। 'শেপ' যে সামরিক উপকরণ এখানে সংরক্ষিত করেছিলো তার মালিক এখন ফরাসী সরকার। সে-উপকরণের মধ্যে রয়েছে ৪৬টি নতুন বিমান ঘাঁটি, ১৭টি পোলারিস ঘাঁটি, ১২০০ হাইল পাইপ লাইন এবং আরো অনেক বস্তুর প্রস্তুতি



দ্য গল-এর চরমপত্র

ও প্রতিরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য বস্তু। ন্যাটোর প্রশ্নে মার্কিন প্রভু ফ্রান্স স্বীকার করছিলো না, দ্য গল এবার আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, ইয়োরোপের ব্যাপারে আমেরিকার কর্তৃত্বের। কিন্তু আমেরিকা সে বাধা শুনতে চায় নি। সে জনোই ফ্রান্স পর্যায়ক্রমে ন্যাটো থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। তবে ফ্রান্সের বুক থেকে ন্যাটোকে নিশ্চিহ্ন করা প্রেসিডেন্ট দ্য গল-এর পক্ষে সাহসিকতার কাজ।

বুটেন :

বৃহত্তর লন্ডন মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন বিশ্বসংবাদের মর্যাদালাভ করেছে। শহরটি লন্ডন বলে নয়, নির্বাচনী ফলাফল মিউনিসিপ্যালিটির ৩৩ বছরের রেকর্ড ভগ্ন করেছে বলে। এবং এ ফলাফল দেশের সাধারণ নির্বাচনের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করবে বলে অনেক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ মনে করছেন। নির্বাচনে লেবার দলের শৌচনীয় পরাজয়ের অর্থ দলের নীতিরই পরাভব সূচনা করেছে বলে বিজয়ী টোরী দল প্রচার করতে সুরু করে দিয়েছে।

বৃহত্তর লন্ডন মিউনিসিপ্যালিটির আসন সংখ্যা কলকাতা করপোরেশনেরই মতো ১০০টি। তার মধ্যে এবার রক্ষণশীল দল ৮২টি আসন দখল করে নিয়েছে, শ্রমিক দল পেয়েছে মাত্র ১৮টি। অর্থাৎ ৩৩ বছর ধরে যে মিউনিসিপ্যালিটি লেবার দলের দখলে ছিল এবার তা তাদের হাতছাড়া হয়েছে। অথচ মাত্র আগের বারের (১৯৬৪ সালের) নির্বাচনেও লেবার ৬৪টি আসনে জয়লাভ করে মাত্র ৩৬টি আসন টোরীদের দিয়েছিল। ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে শ্রমিক দল যেখানে পেয়েছিল মাত্র ২০.৯৫০৫১টি ভোট। এবারে সে

জায়গায় তাদের ৭.৫৬,১১৫টি ভোট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। অপরপক্ষে কনজারভেটিভসরা ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে ৯,৭৬,২৭৬টি ভোট পেলেও এবার তাঁরা ১১,৫২,৬৩৫টি ভোট পেয়ে মিউনিসিপ্যালিটির শাসন পরিচালনার ভার অর্জন করেছেন। শ্রমিক দলের পক্ষে একমাত্র সান্দ্রনা হতে পারে এই যে, এবারে মাত্র শতকরা ৪১ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন, গতবারে দিয়েছিলেন শতকরা ৪৪ জন।

দলের বিস্ময়কর সাফল্যে রক্ষণশীল নেতারা স্বভাবতই আনন্দে গদগদ হয়েছেন, পার্টি অফিসে শ্রুতির জোয়ার বইছে। দলনেতারা ইতিমধ্যেই বলতে সুরু করেছেন, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের ফলাফল উইলসন সরকারের পতনেরই সূচনা। দলনেতা মিঃ এডওয়ার্ড হীথ তো সদৃশে ঘোষণা করেছেন যে, শ্রমিক শাসনের বিরুদ্ধে যে সারা দেশ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, বৃহত্তর লন্ডন মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন তাবই সাক্ষ্য দিচ্ছে। শ্রমিক দলের মন্ত্রীকেও অবশ্য স্বীকার করতে হয়েছে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে তাঁর দলকে শক আঘাত পেতে হয়েছে।

কিন্তু এ অঘটন ঘটলো কী করে? স্বভাবতই মিউনিসিপ্যালিটির শাসন পরিচালনায় লেবার দলের যথেষ্ট দুর্ভাগ্য ছিলো। শহরের কয়েকটি দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান করতে পারে নি বিদেশী লেবার দল। যানবাহন সমস্যা, পথচারী সংস্কার, গৃহ ও বাসস্থান সমস্যা, স্কুলের ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে শ্রমিক দল ব্যর্থ হতে হয়েছে। কিন্তু করদাতাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারে নি। সে-জন্যে রক্ষণশীল দল তাঁদের নির্বাচনী ইস্তহারে ভালো ভালো মনে-ধরা কয়েকটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা ভোটারদের প্রলুব্ধ করতে

পেরেছিলাম। বানবাহন সমস্যা উত্তরণের জন্যে রক্ষণশীল দল লন্ডন শহরের জন্যে মনো-রেল স্থাপনের সংকল্পের কথা বলেছে। বৃটিশ রেল কর্তৃপক্ষের হাতে যে উদ্ভূত জমি রয়েছে তা দেখা করে সেখানে নতুন বাড়ি তৈরি করে ভাড়াটীদের দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গ্রামার স্কুল-গুলি সর্বপ্রথমে রক্ষা করার কথাও ইস্তাহারে বলা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি সকলেই দেয়, ভোটারদের সামনে ভবিষ্যতের সঙীন ছবি তুলে ধরাই নির্বাচনী কৌশল। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পালন করা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় কি?

কিন্তু লেবার দলের পরাজয় কি একারণই হয়েছে? একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এক্ষেত্রেই কারোই পছন্দ নয়, পরিবর্তন সকলেই চায়। এ বার্ষিক ভারতবর্ষ এবং ফ্রান্সের মাধ্যম নির্বাচনেও সম্প্রতি দেখা গিয়েছে। লেবার দল গত ৩০ বছর ধরে বৃহত্তর লন্ডন শহরের শাসন চালিয়ে এসেছে, ভোটাররা এ ব্যবস্থার, এ এক্ষেত্রেই থেকে মন্থিত পেতে চেয়েছিল। অর্থাৎ ভোটাররা সব সময়েই বিচার-বিবেচনা করে ভোট দেন না, সকলের সে রাজনৈতিক চেতনাও নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা হাওয়ার অনুকূলে চলেতে পছন্দ করেন, বোকের মাধ্যম, ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে ভোট দিয়ে বসেন। বৃহত্তর লন্ডন মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনেও হয়তো তাই হয়েছে।

অবশ্য তাই বলে লেবার দলের কাজ ও নীতি করদাতাদের একেবারে প্রভাবান্বিত করে নি মনে করলে ভুল করা হবে। নির্বাচনের মাত্র দুদিন আগে অর্থমন্ত্রী কলাম্বানের বাজেট ভোটারদের মনে যথেষ্ট শঙ্কার সৃষ্টি করেছিল, তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। বহু লেবার দলের সমর্থকও বাজেট প্রকাশিত হবার পর তাঁদের সমর্থন লেবার দল থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাছাড়া কর্মচারীদের মাইনে বৃদ্ধি বন্ধ করার নীতি গ্রহণ করেও শ্রমিক সরকার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল।

বৃহত্তর লন্ডনের পৌর শাসন রক্ষণশীল দলের হাতে এসেছে। কিন্তু এতে শহরের রাতারাতি পরিবর্তন উদ্ভূত হবে আশা করলে ভুল করা হবে। কারণ, করদাতাদের প্রতি লেবার পৌর কর্তৃপক্ষ নির্দয় বা হৃদয়হীন ছিলেন, নগর উন্নয়নে তাঁদের আন্তরিকতা ছিলো না—একথা সত্য নয়। রক্ষণশীল পৌর কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন ব্যাপারে জাতীয় শ্রমিক সরকারের ওপর নির্ভর করতে হবে। আর্থিক সাহায্যের জন্যে তো বটেই। অর্থাৎ শ্রমিক সরকারকে ডিঙিয়ে রক্ষণশীল মিউনিসিপ্যালিটির গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। তবে একটা সত্যি যে, উন্নয়নমূলক

কোন কাজে শ্রমিক সরকার কোন রক্ষণশীল হওয়ার অগত্যে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করবেন না, বহু সহযোগিতাই করবেন। দেখা যাক, ৩০ বছর পরে কমন্ডা লাভ করে রক্ষণশীল দল লন্ডনের চেহারা কেন করে পাল্টান।

চীন:

কিছুদিন বন্ধ থাকার পর লিউ-বিরোধী বিকোভ প্রদর্শন সূত্র হয়েছে আবার। কুরকদিন আগে রাষ্ট্রপ্রধান লিউ শাও-চি তাঁর শ্রী মাদাম কোয়াং মেই ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা ধনিত করায় জন্যে ২০ হাজার লোকের এক সভা হয়ে গিয়েছে। সভায় লিউ শাও-চিকে স্বাধীনতা, বিশ্বাসঘাতক, চীনের ব্রুশেড, বিপ্লবের শত্রু ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে।

চীন থেকে যে খবরগুলি বেড়া ডিঙিয়ে আসছে তার মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা এত বেশি যে হাল চীনের আসল চেহারা ঠাহর করার বিশেষ উপায় নেই। কথায় কথায় বিদেশী মাংবাদিকদের বহিস্কার করা হচ্ছে, সর্বশেষ শিকার হয়েছেন যুগোস্লাভিয়ার ডানয়ুগ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জনৈক সংবাদদাতা। তবে সব সংবাদ একত্র করলে চীনের মোটামুটি একটা চিত্র অবশ্যই খাড়া করা যায়। এবং সে-চিত্রটি হলো, এখানে অনিশ্চয়তার এখনো অবসান হয় নি। মাওপন্থীরা কমন্ডার সবল ঠিকই, কিন্তু মাও-বিরোধীদের একেবারে নিমূল করা সম্ভব হয় নি। চেয়ারম্যান মাও-এর দলে সেনাবাহিনী রয়েছে, রেড গার্ডস বা লাল-রক্ষীরা রয়েছে, সংবাদপত্র এবং বেতার স্টেশনও রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিউ শাও-চির প্রভাব একেবারে নষ্ট করে ফেলা যাচ্ছে না। এখানে নতুন করে লিউ-বিরোধী অভিযান সূত্র করা হয়েছে সে জন্যেই।

পর পর দুটো বিরাট জনসভা ডেকে লিউ শাও-চি, তাঁর শ্রী, প্রাক্তন প্রচার সচিব তাও চু, প্রাক্তন উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রী, প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ, পিকিংয়ের প্রাক্তন মেয়র পেঙ চেন—এক এক করে সকলের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করা হয়, এবং পাইকারীভাবে সবাইকে বিপ্লবের শত্রু ও শোমনবাদী বর্জেরা বলে তাঁর নিন্দা করা হয়। একটা জনসভাকে পরিণত করা হয়েছিল গণ-আদালতে। সেখানে “অপরোধীদের” হাজির করা হয়েছিলো আসামীর কাঠগড়ায়, বাধ্য করা হয়েছিলো মাথা ও মূখ নিচু করে রাখতে। মাদাম লিউকে একটা পিঙ পঙ বলের হার পরতে বাধ্য করা হয়েছিলো—বলগুলোর ওপর লেখা ছিল “শোমনবাদী”।

চীনা জনসাধারণের একটা অংশে লিউ শাও-চির হত্যাব্যবস্থা রয়েছে তার

প্রমাণ হলো মাওপন্থীদের সঙ্গে লিউ-পন্থীদের সংঘর্ষ বাবছে জারগার জারগার। লিউ নাকি মাও-পন্থীকে চালেজও নিক্ষেপ করেছেন তাঁর ভক্তজনের পরীক্ষা দিতে। সে পরীক্ষার মাও যে খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না—সে বিষয় মাও নিজেও নিঃসন্দেহ মনে হয়। সে জন্যেই চীনের এমন কি গোটা কমিউনিস্ট দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আত্মিক বলে যিনি এতকাল সম্মান ও প্রম্মা লাভ করে এসেছেন সেই লিউ শাও-চির সমস্ত কীর্তিগাথাই মূছে দেবার চেষ্টা চলেছে। লিউর How to be a Good Communist একদিন কমিউনিস্ট দুনিয়ার একখানা অবশ্য পাঠ্য বই ছিলো। কিন্তু সে বই রাখা এখন গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে। সে বইয়ের দুটি হয়তো এই যে, এখানে মার্ক্স-এংগেলস-লেনিন এমন কি স্ট্যালিনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও মাও-এর নামোল্লেখ করা হয় নি।

লিউ-বিরোধীরা তাঁকে কাগজে বাধ বলে আখ্যা দিয়ে বসছেন যে, এককালে লিউ দেশের জন্যে ও পার্টির জন্যে অনেক কিছু করেছেন বটে। কিন্তু তিনি হালে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি শোমনবাদের দিকে বকে পড়েছেন, আজ তিনি দেশের শত্রু। সংবাদপত্রে, পোস্টারে, রেডিওতে একনাগাড়ে লিউ-বিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে, সভা-সমিতি ডেকে নিন্দাবর্ষণ করা হচ্ছে। মাদাম লিউকে তো ‘পকেটমার’ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

পরস্পর-বিরোধী সংবাদে একটা উদাহরণ হলো, যদিও লিউর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযান বিকোভ দেখানো হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, আবার সরকারী-ভাবে একথা অস্বীকার করাও হচ্ছে। এবং কমিউনিস্ট পার্টির পলিটবুরোর এক সভায় লিউকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে অপসারণ করে সে জারগার প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইকে নিয়োগের খবর পাওয়া গিয়েছিলো, কিন্তু পরক্ষণে তাকে আবার অস্বীকার করাও হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে এই অশান্তি, উত্তেজনার একটা কিম্বদন্তি ফল হয়েছে এই যে, চীনের অর্থনীতির অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে একটা নিরুৎসাহ ভাব দেখা দিয়েছে, তারা উত্তেজনার পর উত্তেজনার এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, স্বাভাবিক কাজে মন দিতে পারছে না। সেনাবাহিনী বা জাতীয় মন্ত্রি ফৌজের ওপর তাই ভার দেওয়া হয়েছে অনেক কলকারখানা এবং জমির কৃষি ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্যে। কিন্তু এ-ব্যবস্থা তো অনিশ্চিতকাল ধরে চলতে পারে না, সেনাবাহিনীকে সারাক্ষণ ফিরে যেতেই হবে।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুখীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(পঞ্চম অধ্যায়)

উত্তরের বাড়ি ও পূর্বের বাড়ি

॥ ১ ॥

রমানাথ দাশ ঝাঁর নাম আগে অনেকবার বলেছি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন মনোহর। মনোহরের ছেলে রাম-রমণের ছেলে না থাকায় তিনি এক দত্তকপুত্র নেন ঝাঁর নাম ছিল রামকিশোর। এই রামকিশোরের দুই ছেলে—রামকমল ও দুর্গানন্দ। এঁরাই হলেন তেলিরাগের বাবুদের উত্তরের বাড়ির দুই ভিত্তির কর্তা। রামকমল কি তাঁর পুত্র অক্ষয়কে আমি দেখি নি। কিন্তু অক্ষয়দাদার তিন ছেলেকে আমি বেশ ভাল করেই জানতাম। জ্যাকি সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন আমার ভাইপো। কিন্তু বয়সে তাঁরা তিনজনই ছিলেন আমার চেয়ে বড়। বড় ভাইপো বিভূভাইয়ের যাকে বলতাম ‘বিভূভাইয়ের ব্যাটা’ তাঁকে বেশ মনে আছে। তিনি দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন) কোর্টের মুহুরীর কাজ করতেন। অত্যন্ত সাদাসিধে ভাল মানুষ ছিলেন বিভূভাইয়ের ব্যাটা। তাঁর পোষাকে কাপড়ে কোন বাবুগিরী দেখি নি। মোটা গলাবন্ধ কোট গায়ে দিয়ে তিনি কোর্টে যেতেন। খুব পান খেতেন এবং পানের পিক অনেক সময় জামায় কাপড়ে লেগে যেত। অনেক সময় দাদাবাবু কি বোঠানের কথাটা ঠিকমত না বুকে উল্টো কিছু একটা করে ফেললে যখন বকুনী খেতেন তখন মুখে কথাটি কইতেন না। সবাই জানে উকিল ও ব্যারিস্টারবেব বাবুবা মক্কেলদেব কাছ থেকে তহরারী আদায় করেন এবং অনেক সময় একটু হয়ত জুলুমও করেন বড় উকিল কৌন্সিলীর বাবুবা। কিন্তু বিভূভাইয়ের ব্যাটার কি রকম একটা আভিজাত্যজ্ঞান ছিল। তিনি মক্কেলদের কাছে টাকা চাইতে পারতেন না। কেউ যদি বলত চাইতে তখন তিনি জবাব দিতেন—‘চেহারা দেখছ না, দিব কইখনে ফলে দাঁড়াল এই যে বড় কৌন্সিলীর বাবু হয়েও

বিভূভাইয়ের ব্যাটা অর্থ উপার্জন তেমন করতে পারেন নি। কিন্তু সংসার পালন করে গেছেন তিনি হাসিমুখে সবাইকে নিয়ে। অশ্রুত দেখেছি নিজের ভাইয়ে-দের উপরে তাঁর স্নেহাসক্তি। তাঁকে হাজার কথা শোনাও তাঁর মুখে রা বের হত না কিন্তু তাঁর ভাইয়েদেব যদি কেউ মন্দ বলত বিভূভাইয়ের ব্যাটা কিছুতেই তা বরদাস্ত করতে পারতেন না, একেবারে রেগে ফোঁস করে উঠতেন। বিভূভাইয়ের ব্যাটার স্ত্রীকেও খুব মনে আছে। বেশ লম্বা-চওড়া মহিলা তিনি ছিলেন। মনটিও ছিল তাঁর স্নেহরসে ভরা। তাঁর দেওব ইন্দুভূষণের প্রথমা স্ত্রী মারা যেতে তাঁর সন্তানদের ইনিই মানুষ করেছিলেন আপন সন্তানদের মতই। বিভূভাইয়ের ব্যাটার দুই ছেলে অমিররঞ্জন ও বিনয়-রঞ্জন। অমিরর ডাক নাম দিয়েই আমি তাকে চিনি। সে ডাক নাম ছিল ‘ধুম্বইল্লা’। অনুসন্ধানে জেনেছিলাম যে তাঁদেব বাড়িতে পালা কীর্তনের সুরুতে যেই না খোল-কবতালের ধুম্বল বা রোল উঠল ঠিক সেই সময়েই অমির ভূমিষ্ঠ হয়ে ছিলেন এবং সেই থেকেই তাঁর নাম ‘ধুম্বইল্লা’। ধুম্বইল্লা অনেকদিন হয় কলকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেই বসবাস কবছেন এবং কংগ্রেস কর্মিমহলে বেশ তাঁব প্রতিষ্ঠা আছে। এঁরও তার বাপেরই মত একটা আভিজাত্যজ্ঞান আছে। ধুম্বইল্লার একটা ভাল চাকুরী হলে তাঁদের পরিবারেব একটা সুরাহা হবে ভেবে একজন শূভাখী একবার তাঁকে বললেন—‘ওরে ধুম্বইল্লা, নির্মল চন্দ ত’ এখন কইলকাতাব মেরর তার লগে ত’ তর খুবই জানাশোনা কছ’। তাবে যইরা কর্পোরেশনে একটা ভাল চাকরি দেওয়াইতে কইলে ত’ পারছ’।’ ধুম্বইল্লা তাব দিকে শানিকটা চেয়ে বললেন—‘জানছ না, হায় আমার কো-ওয়ার্কার। তার কাছে থোসা-মোদ করুম নেকি চাকরির লেইগ্যা’। শেষ পর্যন্ত ধুম্বইল্লা কংগ্রেসকর্মীই রয়ে গেলেন। মান নিশ্চয়ই কিছু সত্তর

করেছেন কিন্তু ধনস্থানে হয়েছে তাঁব শান।

বিভূভাইয়ের ব্যাটার মেজ্জভাই ইন্দু-ভূষণ কোন একটা নির্দিষ্ট বাঁধা চাকরি করতেন না। শেয়ার বাজাবে ঘুরে দালালী কববার চেষ্টা করতেন। আমি কলকাতা হাইকোর্টে ভর্তি হবার অল্প পরেই আমার বাবা মনে করলেন যে, ইন্দু-ভূষণ খুব কাজের এবং তিনি আমাব মুহুরী হলেই নাকি আমার পসাবেব আর ভাবনা থাকবে না। বিভূভাইয়ের ব্যাটা দাদাবাবু মুহুরী ছিলেন বলে দাদাবাবু বড় কৌন্সিলী হয়েছিলেন এ রকম কোন ভাব বাবার মনে ছিল কি না জানি নে। যাই হোক বাবার কথামত ইন্দুভূষণ ভাইয়ের ব্যাটা আমাব বাবু মোতায়েন হলেন। বছরখানেক কাজও করেছিলেন অর্থাৎ সকালবেলায় একবাব এসে আবার সাবাদিন শেষাব বাজাব ঘুরে বিকেলে আমার চেম্বারে দেখা দিতেন। দিনের মধ্যে তাঁব দেখাই পেতাম না—আর পসাবেব দেখা আরো কম। যাই হোক ইন্দুভূষণ ভাইয়ের ব্যাটারই এইবকম দশটা ও পাঁচটায় হাজিরা দেবাব কাজটা পছন্দ হল না। শেয়ার বাজাবে যার আনাগোনা তাব এইরকম অর্বাচীন ছোকরা ব্যারিস্টারের কাজ পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি আপনা হতেই সবে পড়লেন। তাঁর প্রথমা পত্নী একটি ছেলে—প্রমোদকে বেখে মারা যান। প্রমোদ তাঁর জ্যেষ্ঠিমাব কাছে মানুষ হয়েছিলেন। প্রমোদ বেলগুয়েতে কাজ কবেন শুনোছি। ইন্দুভূষণ ভাইয়ের ব্যাটা স্বিতীয় দার পরিগ্রহ কবেছিলেন এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুটি ছেলে হয়েছিল। একটি অশ্ব এবং বড়টি কি একটা কাজ কবছেন। অশ্ব ছেলেটি শুনোছি খুব সুন্দব গান কবেন। বড়ই দুঃখ পেয়েছেন এই ভদ্রমহিলা ঐ দুটি সন্তান মানুষ করতে তাঁর স্বামীব মৃত্যুর পর। পরিশেষে ক্রান্ত হযে একদিন রাস্তায় বাসে চাপা পড়ে মারা গিয়ে তিনি মৃত্য পেয়েছেন।

পারেশরজন ছিলেন বিভূতভাইয়ের ব্যাটার ছোট ভাই। তাঁর ডাক নাম ছিল দম্মা। ছোট বয়সে ক্ষমতা করায় তাঁর নাকের মাঝখানে হাড়টি কেটে ফেলাতে হয়েছিল বলে তাঁর নাক কেবল একটা ফুটেই ছিল এবং একটু নাকিসূরুর কথা কইতেন বলে ছোটরা একটু ভয় পেত। কিন্তু খুব সংলোক তিনি ছিলেন। নিজের সাধ্যমত রোজগার করে তিনি সংসারে সাহায্য করতেন। বস্তুতত্ত্ব বিভূতভাইয়ের ব্যাটা মারা যাবার পর এই দম্মা ভাইয়ের ব্যাটাই ছিলেন তাঁদের সংসারের অভিভাবক।

রামকমলের ছোট ভাই দুর্গামোহনের একমাত্র ছেলে মোহিনীদাদাকে দেখে ধাক্কা দেওয়া আমার মনে নেই। মোহিনীদাদার মা—জ্যোতিমাকে অল্প অল্প মানে আছে। শুনছি মথুরা বাড়ির মেজ কতী দুর্গামোহনের স্ত্রী রত্নময়ীর সংগে এঁর খুব সখ্যতা ছিল এবং সেই ভিত্তিতেই উত্তরের বাড়ির এই জ্যোতিমার গ্রামের মধ্যে বেশ হাঁক-ডাক ছিল। মোহিনীদাদার স্ত্রীকে বেশ মনে আছে। মাকে তিনি শাসুড়ি বড়ই শ্রদ্ধা করতেন। সেই রোঁটানটি বেশ হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। মোহিনীদাদার একমাত্র ছেলে রত্নরঞ্জন বড় হয়ে এম্পরার অফ ইন্ডিয়া লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানী, যার চীফ এক্সেসিভ নিয়োজিতেন। দুর্গামোহন দাস, সেই কোম্পানীতে বরবর সুখ্যাতির সংগে কাজ করে অবসর নিয়ে কলকাতাভ্যেই বসবাস করছেন।

॥ ২ ॥

এবার বলি তেল্লুরবাজারে দশ গোষ্ঠীর সেই সব শাখার মানুষদের কথা ঘুরা গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বসতি করে ছিলেন। যদুনন্দনের তৃতীয় পুত্র হরিহরের পৌত্র রাজরামের ছিল তিন পুত্র—রামমোহন, জগমোহন ও রত্নমোহন। রত্নমোহন অপত্যক মারা যান। বড় ছেলে রামমোহনের প্রপৌত্র তারিণীচরণ হলেন পুত্রের বাড়ির এক ভিত্তার কতী। জ্যোতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন আমার দাদামশায়। এঁকে আমি দেখেছি। বেশ ফরসা ছিল এঁর গায়ের রঙ এবং বড়দের কাছে শুনছি যে বয়সের সময় নাকি তিনি খুব সৌন্দর্যই ছিলেন। শুনছি তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ দম্পতি সন্তান নিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে পার্লিশ করতেন। কালীমোহন ও দুর্গামোহনের বিমাতার বিষয় নিয়ে এখন হয় তখন এই তারিণী দাদামশাই নাকি সেই ছড়াটা যা আগেই উল্লেখ করছি সেটা বানিয়েছিলেন। তাঁর বড় ছেলে ছিলেন মনোমোহন। মনোমোহন জ্যোতিমশায়

কলকাতার ছোট আদালতে সেরেসডারারী কাজ করতেন। মাঝে মাঝে জ্যোতিমশায় জুনিমোহনের সংগে দেখা করতে কালীমোহন আসলে আসতেন। এই জ্যোতিমশায়ের সহধর্মীণীর সংগে আমার মাতের বেশ সৌহার্দ্য ছিল। বেশ ফরসা ছিল সেই জ্যোতিমার গায়ের রঙ। তাঁরই আগ্রহে তাঁর আপন খুড়তুত ভাই উপেন্দ্রমোহনের সংগে আমার বোন সুস্মৃতি—যার ডাক নাম খুকী—তার বিয়ে হয়েছে। একবার পুত্রের বাড়ির এই জ্যোতিমাই পদ্মা থেকে সদ্য ধরা ইংলিশ মাছ রুড়াইতে তেল দিয়ে না ভেজে আগুনের উপর চিমটি দিয়ে ধরে ঝলসিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। অপূর্ব লেগেছিল। তখন থেকেই বোধ হয় খেতে ভাল লাগবার একটা বিশেষ গুণ আমার হয়েছিল। মনোমোহন জ্যোতিমশায়ের বড় ছেলে যতীন্দ্রমোহন কলকাতা ছোট আদালতেই ওকালতী করতেন। একটু মৃদুচোরা মানুষ তিনি ছিলেন এবং উদ্বেজিত হলে একটু ভোতলামি এসে যেত। এই কারণে যতীন্দ্রমোহন পসার মতটা হুগুয়া উঠত ছিল তা হয় নি। মনোমোহন জ্যোতিমশায়ের দ্বিতীয় ছেলে বীরেন্দ্রমোহন কি একটা আফিসে কাজ করতেন মফস্বলে। ছোট ছেলে হীরেন্দ্রমোহনের ডাক নাম ছিল ছোটকা। ছোটকাদাদা আমার চেয়ে বছর দুয়ের বড় ছিলেন। একটু ফ্যাকাশে ধরনের ছিল তাঁর গায়ের রঙ এবং গড়নে তিনি ছোটখাট মানুষটি ছিলেন। আমবা একসঙ্গে খেলতাম যখন গ্রামে ছিলাম কিছুদিন ছেলে বয়সে। তিনি পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলেন। তিনি বেশ হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্বোল্স পুরীকার শেষ হল। এম.এ. ভালভাবে পাশ করে তিনি লাহোরে ডি.এ.ডি. কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হয়েছিলেন। যখন পাঞ্জাব দুই ভাগ হল তখন তিনি লাহোরে ইংরেজীর সিনিয়র প্রফেসর। সে সময় পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে চলে এসে তিনি বোধ হয় আসলার ডি.এ.ডি. কলেজে অধ্যাপক হন। খুব সুখ্যাতি তাঁর ছিল ছাত্রমহলে ভাল পড়ান বলে। এখন তিনি অবসর নিয়ে কলকাতায় আছেন। ছোটকাদাদা বিয়ে করেন নি।

তারিণীদাদামশায়ের ছোট ছেলের নাম ছিল হরেন্দ্রমোহন। আমরা ডাক্তার হারানকাকা। তিনি মৃদুসীসজে মোজারী করে বেশ স্বচ্ছন্দেই সংসার চালাতেন। হারানকাকা ছিলেন ছিপছিপে লম্বা, ফরসা মানুষ এবং একটু বেশি রক্ত-আর্কিক। বোধ হয় সেটা তাঁর পেশার অনুরোধে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তিনি জন্মাবার সময়ে যে ধাত্রী ছিলেন তাঁকেও আমি দেখেছি। তাঁর কথা না বললে

আমার আত্মজীবনী বই থেকে যাবে। কালো কুচকুচে ছিল তাঁর রঙ। আর্মি যখন দেখেছি তখন বয়স হয়েছে তের। বসে বসে খেলে হুকায় জমাক খেতেন ও বাড়ির বোর্ডিকদের নানা রকম নির্দেশ ও উপদেশ দিতেন। সে বাড়ির জ্যোতিম ও আমার মা সবাই তাঁকে 'ধাই ঠাইন' বলতেন। শুনলাম তাঁর নাম 'গুলকী ধাই'—নামটা 'গোলকী'র অপভ্রংশ কি না তা অনুসন্ধান করি নি। একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন এবং বোয়েরা তাঁকে ভয় ও সম্মতি করে চলত। তিনিও খুব স্নেহ করতেন তাদের এবং বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের। হারানকাকা ও তাঁর ছেলেরাই বিশেষ করে ছিলেন এই ধাত্রীমাতার স্নেহের পাঠ। একবার শুনছি হারানকাকা, তাঁর স্ত্রী ও ছেলোপেলো তেল্লুরবাজার থেকে কোথায় যাবার জন্যে তারপাশা বা লোহজঙ্গ জাহাজঘাটার নৌকা করে গিয়েছিলেন জাহাজ-ধরবার জন্যে। সংগে ছিলেন 'গুলকী ধাই'। সেরিস পদ্মার ভীষণ বড় এবং বড় বড় ঢেউ। তাঁদের নৌকাটি জাহাজঘাটার রমাটের সংগে ধাক্কা খায় সজোরে। এই ধাক্কা 'গুলকী ধাই' ও তাঁর কোলে হারানকাকার ছেলোটি উল্টে পড়ল জলে। সোরগোল পড়ে গেল। যখন 'গুলকী ধাইকে' চলে ধরে টেনে তোলা হল তখন দেখা গেল তিনি হারানকাকার ছেলোটিকে একেবারে বুকের মধ্যে শক্ত করে আগলিয়ে রেখেছেন। দুজনেই হেঁচে গেছেন। অগ্নিজননের ভালবাসার এই রকম নিদর্শন খুবই বিরল হয়ে গেছে জগতে আজকাল।

রাজরামের দ্বিতীয় পুত্র জগমোহনের পাঁচটি ছেলের মধ্যে শিরচন্দ্র ছিলেন চতুর্থ। শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মহেশ-চন্দ্র-এর বড় ছেলে ছিলেন শরৎচন্দ্র বিনিভারতীয়দের মধ্যে প্রথম হলোছিলেন এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্পেক্টর অফ স্কুল। এই শরৎচন্দ্রের বড় ছেলে স্মারকানাথের চারটি ছেলে—প্রমথ, বিনয়, শচীন ও মোহিত। স্মারিক জ্যোতিমশায়কে দেখেছি বলে মনে পড়ে না কিন্তু তাঁর চারটি ছেলেকেই জানি, বিশেষ করে বিনয়, শচীন ও মোহিতকে। প্রমথ ছিলেন ইনকাম টেন্স অফিসার। বিনয় অর্থনীতি বিশারদ—লক্ষ্যী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন বহু বৎসর এবং শেষ সময়ে বোধ হয় অর্থনীতি বিভাগের ডীন (অধ্যক্ষ)-ও হয়েছিলেন। অর্থনীতিতে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের জন্যে ভারত সরকার তাঁকে 'টিয়ারফ কমিশন'-এর সদস্য নিযুক্ত করেছিলেন। সেই নাগে তিনি খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বর যখন নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল তখন

বাংলা দেশের ডানানীলন মধ্যমশ্রী
ভাষার বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে রাজা-
পাল বিনয়কেই সেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের
উপাচার্য পদে বহাল করেছিলেন। তখন
সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহ্যিক কোন চিহ্নই
ছিল না। একেবারে সূর্য থেকে বিনয়কে
তার গোড়াপত্তন করতে হয়েছিল। বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট ও রেগুলেশন তৈরি
করা, ফ্যাকাল্টি ও পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন,
অধ্যাপক নিয়োগ, ঘর বাড়ি তৈরি করা,
রাস্তাঘাট, জলের ব্যবস্থা—অর্থাৎ সংক্ষেপে
বিশ্ববিদ্যালয়ের জুতা সেলাই থেকে
চুড়ীপাঠ পর্যন্ত সমস্ত কাজই বিনয়কে
এক হাতে করতে হয়েছিল। অসাধারণ
পরিশ্রম এবং বিস্তারিত অধ্যবসায়ের সংগে
তারিটি বছর কাজ করে শিলিগুড়ির ফাঁকা
মাঠে রামমোহনপুরে একটি বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের পত্তন করে নেই চালু বিশ্ববিদ্যা-
লয়টি তার স্থলাভিষিক্ত উপাচার্যের হাতে
ভুলে দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন।
নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার
কাজে বিনয়ের কর্মতৎপরতার তুলনা
নেই। নিরপেক্ষ লোকদের কাছে তিনি
স্বীকৃতিও পেয়েছেন প্রচুর। স্মারক-
নাথের তৃতীয় পুত্র শচীন খুবই যোগ্য
যাতি। এদেশে এম-এসসি পরীক্ষার
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিলেত গিয়ে
ইনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি
ও হয়ে ডি-এসসি উপাধি পেয়েছিলেন।
এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনিও প্রফেসর
হয়েছিলেন। ইনি লন্ডনের এফ-এন-আই
উপাধিও লাভ করেছেন। কিছুকাল ইনি
ইউনেস্কোর কৃষি সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা
ছিলেন। যখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
স্থাপিত হল তখন শচীনই হলেন তার
প্রথম উপাচার্য। তাঁর পরিচালনায়
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও অন্যান্য
বিষয়ে পড়াশুনা খুব উদ্যমের সংগেই
শুরু হয়েছিল। তিনিও কল্যাণী বিশ্ব-
বিদ্যালয়কে একেবারে গোড়া থেকেই গড়ে
তুলেছেন। তাঁর প্রথম চার বছর কাজ
শেষ হতে না হতেই বাংলা সরকার আরো
চার বছরের জন্যে উপাচার্য পদে তাঁকে
বহাল রেখেছেন। ইনি বিয়ে-থাওয়া
করেন নি। এঁদের ছোট ভাই মোহিত
বিলেত থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে দেশে
ফিরে বেশ বড় সরকারী চাকরি গ্রহণ
করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুব আদর্শ-
বানী পুরুষ। সরকারী চাকরি ছেড়ে
তিনি বিহারে অনেক জমি নিয়ে একটি
কৃষি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন তাঁর
স্বামীর সহযোগিতায়। তিনি বিবাহ করে-
ছিলেন মধোর বাড়ির কালীমোহনের এক-
মাত্র পৌত্রী কুমুমের একমাত্র কন্যা
স্নেহের একটি মেয়েকে। বিহারের
জমিদারী উচ্ছেদ আইন হবার পর এঁদের

ফার্মটিকে সংকুচিত করে ফেলেতে হবে
দেশে মোহিত ফার্ম বন্ধ করে দিয়ে
২৪ পরগনার রিষড়া গ্রামে বসতি
করেছিলেন। সেখানে দুর্ভিক্ষের হাতে
নিশীথরায়ে তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই
নিহত হন। দুটি সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন
অকালেই শেষ হয়ে গেল। স্মারকনাথের
দ্বিতীয় ভ্রাতা শশিভূষণের ছিল দুই
ছেলে। বড়জন বিধু, বি-এ, বি-টি পাশ
করে অধ্যাপনা করছেন এবং ছোট ভাই
ইন্দ্র হয়েছেন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।
মহেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কালী-
কুমারের কথা বাবা-মার কাছে শুনেছি।
তিনি আমারই মামাবাড়িতে বিয়ে করে-
ছিলেন বলেই তাঁর সংগে মায়ের মাধ্যমে
আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কালীকুমারের
বড় ছেলে উপেন্দ্রকাকা পদুর্লভ্যেতে
ওকালতী করতেন। তিনি গান্ধীজীর
খুব ভক্ত ছিলেন এবং অনেক সমাজসেবা
করেছেন। নিষ্ঠার সংগে তিনি চবকা
কাউতেন ও কংগ্রেসের কাজে রতী ছিলেন।
সে জন্যে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকারও
করতে হয়েছে। উপেন্দ্রকাকার তৃতীয় ভাই
ভূপেন ছিলেন পশু চিকিৎসক এবং সেই
ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডাইরেটর হয়ে-
ছিলেন। এক সময়ে বেলগাছিয়ায় ভেটোর-
নারী কলেজের প্রিন্সিপ্যালও ছিলেন।
জগমোহনের চতুর্থ পুত্র শিবচন্দ্রের
ছোট ছেলে গোবিন্দের ছিল দুই ছেলে।
বড় ছেলে রাইচরণের মধ্যম পুত্র হরলাল
ছিলেন ভাগলপুর কলেজের নামকরা
প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর ছেলে রঘুনাথও
অধ্যাপক এবং অন্য ছেলেটি আই-ই-এস-
পাশ করে আবগারী - ডিপার্টমেন্টে
সহায়ক।
জগমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্রের
জ্যেষ্ঠপুত্র কালীপ্রসাদের বড় ছেলের নাম
ছিল প্রসন্নকুমার। এই প্রসন্নকুমারের
ছিল পাঁচটি সন্তান। বড় ছেলে করুণা
জ্যেষ্ঠামশায় ওকালতী করতেন। করুণা
জ্যেষ্ঠামশায়ের বড় ছেলে রমেশ—
(কান্দুদাদা) কি একটা কলিয়ারী আফিসে
কাজ করতেন। মেজ ছেলে ভূপেশ তেলির-
বাগের একজন কৃতী সন্তান। আমার
চেয়ে বছরখানেকের বড় ছিলেন তিনি।
এঁকে আমরা “বটাদাদা” বলে ডাকতাম।
বটাদাদা এদেশে ডাক্তারী পাশ করে
বিলেত-গিয়ে এম আর সি পি ডিগ্রী
পেয়েছিলেন। দেশে ফিরে তিনি একসময়
সিংহল স্পীপেব কলম্বো শহরের হেলথ
অফিসার ছিলেন বেশ কিছুদিন। সেখানে
কর্মকুশলতা ও সততার জন্যে বটাদাদা
ডুয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।
কলম্বো থেকে তিনি বম্বেতে হেলথ অফি-
সার হয়ে কয়েক বছর খুব যোগ্যতার
সংগে কাজ করেছেন। সেই আমলে

কলম্বো যা বম্বেব হেলথ অফিসার হওয়া
চরটিগার্নি কথা ছিল না—খুবই উচ্চ
পর্যায়ের যোগ্যতা বরকর হত এই পদ
পেতে হলে। বটাদাদার কর্মতৎপরতা
সভ্যতা ও সৌজন্যে জনে বম্বে শহরে
তিনি খুবই সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।
তের্মান সুগৃহিণী ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী
তরুণালা। তরু বটাদানের মধ্যে একটি
মিষ্টি হাসি বরাবরই দেখেছি। বুদ্ধিমত্তা
জ্যেষ্ঠ ছিল তাঁর চোখে মুখে। স্বামী-
স্ত্রীতে এরকম অপূর্ণ মনের মিল কমই
দেখা যায়। দুজনেই ছিলেন অতিথি-
বৎসল। বাঙালী কেউ বম্বেতে গিয়ে
বটাদার বাড়িতে অস্তুত একবার পাশ
পাড়েন নি এমন খুবই কম ছিলেন।
বম্বের রমকৃষ্ণ মিশনের সংগে বটাদাদা ও
বটাদানের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অর্থে
সামর্থ্যে সেই মিশনকে এই দম্পতি খুব
সাহায্য করতেন। আমার বড় ছেলে
সুবজ্ঞনকে ওরা দুজনেই খুব স্নেহ
করতেন। আমার বড় ছেলেটি বারু
সেনায় স্টেট পাইলট। একবার ঐ অঞ্চলে
তিনি একটা হাওয়াই জাহাজের দুর্ঘটনায়
পড়ে গিয়ে বেশ একটু আহত হয়েছিলেন।
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র বটা-
দাদা ও বটাদান তাকে নিজের বাড়ি এসে
খেতে বস ও শূশ্রুষা করেছিলেন সে কথা
আমার ছেলে কিংবা আমি ও আমার স্ত্রী
কখনো ভুলব না। ছোট বয়সে একসঙ্গে
খেলোছিলাম বলেই হোক, কিংবা জ্ঞাতি
সম্পর্কের দরুনই হোক এই দম্পতি



এই হ'ল মশা



এই হল মশার যম
লাল টিনে ফ্রিট...

মশা, মাছি ও অন্যান্য মগ
উড়ে-চলা পোকামাকড় মেরে ফেলে

ফ্রিট

আপনার ঘরবাড়ি রক্ষা করে—
এটি পৃথিবীর সেরা কীটনাশক জিনিস।

এসো স্ট্যান্ডার্ড ইন্সট্রাকশন
এবং গাইডলাইন অনুসরণ করে
ফ্রিট ব্যবহার করুন।

MEF-9 ৬৪

আমাকে ও আমার পরিজনদের খুবই স্নেহ করেছেন সব সময়ে। বসন্তের কাজ থেকে অবসর নিয়ে বটাদাদা দিল্লীতে তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত ছাউরের দপ্তরের সচিবরূপে কিছুকাল কাজ করবাব পর বাংলা দেশের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে তিনি বাংলা সরকারের ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস হয়ে কয়েক বছর অত্যন্ত সুখ্যাতির সংগে কাজ করেছিলেন। কলকাতা যলে ঢেঁকী স্বপ্নে গেলেও খান ভানে। বটাদাদা কলকাতায় এলে বোঁঠানেরও সুরু হল নতুন করে সমাজসেবার কাজ। মধ্যের বাড়ির দুর্গামোহনের কন্যা লেডি অবল্য বসন্ত প্রভিভিত্ত বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের কার্যভার সে সময় পড়েছিল এই বোঁঠানেরই উপরে। বটাদাদার শরীরটা ভেঙে পড়ায় তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়ে এই সেদিন মনোহর পুকুর রোডে আপন বাড়িতেই দেহত্যাগ করেছেন। আমি যখন দিল্লীতে তখন বটাদাদাকে কাজের জন্যে মাঝে মাঝে দিল্লী যেতে হত। আমি যখন বলতাম এবার আমার বাড়ি এস। বটাদাদা বলতেন—‘জানিস্ ত’..... কের বাড়িতে আগে আমি উঠতাম। এখন তার স্বাস্থ্য ভাইগ্যা পড়েছে। যদি আমি এখন তার বাড়ি যাই তবে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন।’ এইরকম ছিল তাঁর উদার মন। আমি যখন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর কাজ করতাম তখন কল্যা তুললেই বটাদাদা বলতেন—‘তব বাড়িতে আমি মৃত্যু আগে যাম্‌ই।’ সে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। আমি ঋণীই রয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি যে তেলিরাবাগের দাশ গোষ্ঠীর সন্তান এর জন্যে তিনি খুবই গৌরব বোধ করতেন যেমন আমবা সকলেই করি।

করুণা জ্যোতিষশাস্ত্রের তৃতীয় ছেলে নৃপেশও ছিলেন এম.বি. ডাক্তার এবং বাংলা সরকারের ডেপুটি ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস হয়েছিলেন। তাঁর ডাক নাম ছিল ‘টটা।’ তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁর আরো দুই ছোট ভাই আছেন—প্রাণেশ ও রাজেন, কিন্তু তাঁদের সংগে আমার তেমন সংস্রব হয় নি।

প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় পুত্র অর্থাৎ করুণা জ্যোতিষশাস্ত্রের মেজ ভাইয়ের নাম ছিল ললিতমোহন। তিনি আমার বাবার ছোট ছিলেন। ললিতমোহন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন। তিনি ওকালতী পাশ করছিলেন কিন্তু ওকালতী করতেন কি না তা সঠিক আমার জানা নেই। তবে শুনেছি যে শনিবার শনিবার তিনি রীতিমত ঘোড়দৌড়ে হাজিরা দিতেন। সেই সূত্রে দক্ষিণের বাড়ির রাজকুমারী-মশায়ের কলকাতার কালীঘাটের বাড়িতে টিপ সংগ্রহ করতে যেতে হত। আমার

আপন পিসতুত ভাই রেবতী থাকে আমরা সোনাদাদা বলতাম তিনি ললিতমোহনকে বলতেন ‘টপী দাশ।’ রেস কোর্সে নাকি ললিতমোহনের কাছে থাকত একটা বোলান ব্যাগ ও মাথায় জকিদের মত একটা টপী পরে তিনি প্রাইভেট বুকীর ব্যবসা করতেন। সোনাদাদা ছিলেন দুর্মুখ। তিনি বলতেন—‘বাজির টাকা না দিয়া কোনদিন টপী দাশ যে মাইর খাইব কে জানে।’ ললিতমোহনের সব ছেলেদের নামের পেছনেই ছিল ‘ইন্দু।’ এঁদের মধ্যে বিমলেন্দুকেই দেখেছি কয়েকবার। বিমলেন্দু এখন বোধহয় কলকাতার সাহিত্য পরিষদের বেশ উচ্চপদস্থ, কর্মচারী। করুণাজ্যোতিষশাস্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাই—হেমন্ত ও দেবেন্দ্রের সংগে আমার পরিচয় তেমন হয় নি। তাঁর সবচেয়ে ছোট ভাই জিতেন্দ্রমোহনকে মনে আছে একটা বিশেষ ঘটনার জন্যে। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন মধ্যের বাড়ির কালীমোহনের পৌত্রী কুসুমকুমারীর মেয়ে সরস্বতী স্বামী শশিকুমার সেন যিনি পরে বিখ্যাত চোখের ডাক্তার হয়েছিলেন তাঁর এক বোনকে। জীতুকার সেই স্ত্রীর সন্তান হবার সময়ে দারুণ অসুখ হবারছিল। শেষ সময়ে শশিকুমার কলকাতা থেকে তেলিরাবাগে এসেছিলেন এবং প্রাণপাত করে বোনকে বাঁচাতে চেষ্টা করেও পারলেন না তাঁকে রাখতে। আমি তখন মার সংগে তেলিরাবাগেই ছিলাম। মৃত্যুর পর দেহের ক্রান্তির কোন ছাপই সেই খুঁড়িমার মুখে ছিল না। মৃত্যুখানি দেখাছিল প্রশান্ত, পরনে ছিল রঙা পাড়ের কাপড়। কপালে ও পায়ে লাগান ছিল সিন্দূর। মৃত্যুতে খুঁড়িমার মুখে যেন অপূর্ণ শ্রী ফুটে উঠেছিল। সেই মৃত্যুশ্রী ও তাঁর স্বামী ও আত্মীয়স্বজনের কাতর কল্যা আমার শিশু মনে এমন সুগভীর ছাপ দিয়ে গিয়েছিল যে আজ পর্যন্তও তা ভুলি নি। বিকেলে আমরা মধ্যের বাড়ির পুকুরে ডুব দিয়ে শূন্য হয়ে এলাম।

জগমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল—হরিহর। এই হরিহরের দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণারঞ্জন দাদা-মশায়কে দেখেছি। অতি সজ্জন ও চরিত্রবান পুরুষ তিনি ছিলেন। তিনি একটি স্কুলে সহ হেড মাস্টারী করে দিনাজপুর থেকে চলে এসেছিলেন অবসর নিয়ে। রিখিয়াতেই বেশির ভাগ থাকতেন অবসর জীবন কাটাবাব জন্যে। যখন কলকাতায় থাকতেন অনেক সময় আমাদের বাড়ি আসতেন। রাস্তা থেকে—রাখাল, রাখাল আছে হে’ ডাকে দাদামশায় নিজের

আগমনী জানিয়ে দিতেন। হেঁটে আসতেন অনেকদূর থেকে। শরীর বেশ শক্ত সবল ছিল। বাবার সংগে গল্প করে আবার হেঁটে চলে যেতেন উত্তর-পূর্ব কলকাতায়। দক্ষিণা দাদামশায়ের ছয়টি ছেলে। বড় ছেলে প্রভারঞ্জন এম.এ., বি.এল., পাশ করে হিপুরার জমীদারী করতেন। চতুর্থ ছেলে লোকেশরঞ্জনকেই বেশি ভাল করে চিনি। লোকেশরঞ্জন সম্পর্কে আমার কাকা, কিন্তু বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। তিনি আমাকে ‘ভাইপো’ বলে ডাকেন কিন্তু আমি বয়সের সুযোগ নিয়ে তাঁকে নাম ধরেই ডেকে থাকি। লোকেশ এম.এ., বি.এল., পাশ করে প্রধানত আলিপুরেই প্রাকটিস করতেন। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টেও মামলা নিয়ে প্রায়ই গিয়ে থাকেন। বেশ পশার জমিয়ে নিজেই বালিগঞ্জ অঞ্চলে বাড়ি করে নিয়েছেন। বেশ জ্ঞাতব্যবসল মানুষ তিনি। তাঁর দুটি ছেলেই পড়াশুনা ভাল, বিশেষ করে ছোটটি। এঁর একমাত্র কন্যার সংগে আমার ছোট বোন অমৃতাচার্য ছেলে দেব-ব্রত (গোতম)—এঁর বিয়ে হয়েছে। দক্ষিণা-দাদামশায়ের তৃতীয় পুত্র ব্রজেনের সংগে আমার আলাপ না হলেও তাঁর বড় ছেলে আলোকরঞ্জনকে তাঁর খুব ছোট বয়সেই দেখেছি। আলোক শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করতেন। তখন থেকেই তাঁর সাহিত্যবসবোধের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর উদ্যোগে তাঁদের ক্লাসের ছেলেরা একটা মাসিক পত্র বের করতেন। আলোক বেশ ভাল কবিতা লিখতেন সেই পত্রিকায়। এখন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের সিনিয়র লেকচারার হয়ে অধ্যাপনা রত গ্রহণ করেছেন। আলোক বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত এবং লেখনও ভাল। এই হরিহরের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র দাদামশায়কে খুব কম দেখেছি। তিনি ডেপুটি প্রেসিডেন্সী পোস্ট মাস্টার জেনারেল পদে কাজ করে অবসর নিয়ে কলকাতার এণ্টালী অঞ্চলে কামারডাঙায় বাড়ি করে বসবাস করেছেন মৃত্যু কাল পর্যন্ত তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র উবানাথ কাকা দাশগোষ্ঠীর বংশাবলীটি পরিবর্তিত করে একেবারে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত টেনে এনে আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এঁর অন্য ভাইদের সংগে তেমন আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ আমার হয় নি।

যদুন্দনের মধ্যম পুত্র শিবরামের পৌত্র কৃষ্ণরামের চার পুরুষ নিচে কমলা-কান্তের তিন ছেলে শ্রীনাথ, চন্দ্রকুমার ও আনন্দও পুত্রের বাড়ি বাসিন্দা। শ্রীনাথ জ্যোতিষশাস্ত্রের ছেলে ছিল না। চন্দ্রকুমার জ্যোতিষশাস্ত্রের ছেলে সুরেন্দ্র করেন ওকালতী। তাঁর ছেলে সুধীর হলেন

দ্বাদশমাসিক বসন্ত

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার। আনন্দ জ্যোতিষশাস্ত্রের ছিল পাঁচজন ছেলে। ছোট ছেলে—প্রমথরঞ্জন এন্ড্রাস ক্রাসে উঠে কি মসুখে তেলিরবাগেই মারা গেলেন। তখন আমি সেখানে ছিলাম। মৃত্যু বালক মনে খুবই দাগ কেটে যায়—তাই মনে আছে প্রমথরঞ্জনদার মৃত্যু। আনন্দ জ্যোতিষশাস্ত্রের পাশের বাড়িতে যেখানে শ্রীনাথ দাশ থাকতেন সেখানে নাকি একবার ডাকাত পড়েছিল এবং ডাকাতরা জনালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রামদা দিয়ে কোপ মেরেছিল শ্রীনাথ জ্যোতিষশাস্ত্রের গলা লক্ষ্য করে। ভাগ্যক্রমে খাটের বেড়াটার মধ্যে দাঁটা লেগে গলায় কেবল অঙ্গ একটু আঁচড় পড়েছিল। আনন্দ জ্যোতিষশাস্ত্রের বড় ছেলে সত্যীশ ওকান্তী করতেন বর্মার উত্তরপ্রান্তে ম্যাড্রালে শহরে। তাঁকে দেখি নি, নামই শুনেছি। এঁর সেক্স ভাই সরলরঞ্জনকে দেখেছি বেশ কাছাকাছি থেকে। সরলদাদার গায়ের রঙ ছিল কমলা এবং দেখতে খুব সুন্দরই ছিলেন। আমাদের বাড়িতে এঁর মায়ের সংগে তাঁর গল্প জমত কি দিয়ে কি রান্না করা যায় এই নিয়ে। সরলদাদা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে নেপাল রাজ্যবাড়িতে রাজবৈদ্যরূপে খুব খ্যাতি ও সম্মানলাভ করেছিলেন। বয়স হয়ে গেলে তিনি অবসর নিয়ে বউবাজার স্ট্রীট, যার এখন নাম হয়েছে নিপিন গান্ধী স্ট্রীট, সেই রাস্তায় 'তেলিরবাগ ভবন' নামে খুব উচ্চ প্রাসাদ তৈরি করে নিজ বাড়িতেই মারা যান। মৃত্যু আগে সরলদাদা অনেক বই লিখে গেছেন। শেষের দিকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ায় মসুখে মসুখে লেখেন আর অন্য কেউ লিখে নিত। এঁদের ততীর ভাই নলিনীরঞ্জন কি করতেন ঠিক জানি না। চতুর্থ ভাই অবনী দাদাকে ঢের বেশি দেখেছি। তিনি বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করতেন।

যদুন্দনের মধ্য পুত্র শিবরামের কনিষ্ঠ পৌত্র চন্দ্রশেখরের ঘরে তিন পুত্র নিচে ছিলেন রামকিশোর। এই রামকিশোরের ছিল দুই ছেলে কালী ও হুমি। মহিমের ছেলে ছিলেন লাল-বিহাবী। লালবিহাবী জ্যোতিষশাস্ত্র ছিলেন দাম্ভিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি ঈশ্বরীতথ্যবী ছিলেন সেই আমলেই এবং আপন বাড়ির পূজাপার্বণে তিনি নিজেই পৌরোহিত্য করতেন সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে। শুনেছি তিনিই গিরেছিলেন আমার বাবার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করতে। কবিবাজী ছিল তাঁর বাবসায়। কলকাতার কালীমোহন আলয়ের নিচে একটা ঘরে তাঁকে থাকতে দেখেছি। তাঁর গড় ছেলে, কবীন্দ্রদাদা, ঈশ্বরিক বাবসায় মনোমগ্ন করেছিলেন। ছোট ছেলে

শিবেন্দ্র ছিলেন আমার বয়সী। ছোটক-দাদা, বটাদাদা, শিবেন ও আমি নাকি ছিলাম সেকালে হরিহরাস্বামী। শিবেন পোস্ট অফিসে পোস্টমাস্টারী করে অবসর নিয়েছেন। রামকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র মহিমচন্দ্রের তিন ছেলেকেই দেখেছি। চন্দ্রচন্দ্রকাকা আমার মায়ের খুব স্নেহের পাশ ছিলেন। হুমীকেশ ও মুরলী কাকারও আমাদের বাড়ি আসতেন ও আমাদের সংগে দেখা হত। এঁরা তিন ভাই-ই রাঁচিতে কর্মপলক্ষে গিয়ে সেখানেই বাড়ি করে রয়ে গেছেন।

১০১

এতক্ষণ আমাদের দাশ গোষ্ঠীর বিভিন্ন বাড়ির কয়েক পুরুষ সন্তানদের কথা যতটুকু মনে আছে বললাম। আগেই বলেছি তেলিরবাগের ভূইঞারা নামেই জমিদার। জমিদারী তাঁদের বিশেষ কিছু ছিল না। সংসারের ভরণপোষণের জন্য তাঁদের গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। বাইরে প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্যে তাঁদের দক্ষতরমত লেখাপড়া শিখে জীবন সংগ্রামে নামতে হয়েছিল। এককথায় বলতে গেলে যদুন্দন বংশীর দাশ গোষ্ঠীর সন্তানরা বুদ্ধিজীবী। জীবিকা উপার্জনের অনুরোধে তাঁরা অনেকে বিদেশেই বাসা বেঁধেছেন এবং জাতিদের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছেন। তারপর ১৯০৫/১৯০৬ সালে তেলিরবাগ গ্রাম-টুকু কীর্তিনাশাব কৃষ্ণগত হওয়ায় আমাদের এক গ্রামে পাশাপাশি থাকার যে বন্দন তাও খসে গেল। এই সব কারণে দাশ গোষ্ঠীর অনেক শাখার লোকের সংগে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি।

দাশ গোষ্ঠীর সন্তানেরা কর্মব্যপদেশে ভারতবর্ষের চতুঃসীমানায় ছড়িয়ে পড়েছেন। এক সময়ে পূর্বের বাড়ির হীরেন্দ্র (ছোটকাদাদা) ছিলেন পশ্চিমে লাহোরে পূর্বের বাড়ির সরলদাদা ছিলেন উত্তরে নেপালে, দক্ষিণের বাড়ির জেনুকালা ছিলেন পূর্ব আসামের বিজুনী স্টেটে ও পূর্বের বাড়ির সত্যীশদাদা ছিলেন বর্মার ম্যাড্রালে শহরে এবং মধ্যের বাড়ির জ্যোতিষদাদা ও দক্ষিণের বাড়ির রজু জ্যোতিষশাস্ত্র ছিলেন রেঙ্গুনে এবং পূর্বের বাড়ির বটাদাদা ছিলেন দক্ষিণে কলম্বোর হেলথ অফিসার। আমরা দুই দুই ছড়িয়ে গেছি কিন্তু তেলিরবাগের মোহ আমাদের যায় নি। আমাদের এই পরিবার লেখাপড়ার খুবই অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। ছেলে ও স্ত্রী প্রায় সবাই শিক্ষিত। আগা যে জাতিদের বর্ণনা দিয়েছি তার থেকেই বোঝা যাবে যে আমাদের দাশ গোষ্ঠী থেকে তিন পুরুষের মধ্যে কত মোকতার,

এটলী, উকিল, ব্যারিস্টার, সাব-জজ, ছোট আদালতের ও ট্রাইবুনালের জজ, হাই-কোর্টের জজ, অধ্যাপক, উপাচার্য, ইঞ্জিনীয়ার ও বড় চাকুরে প্রসূত হয়েছে। আমাদের বাপ-ভাইদের লাইন যদি বাদই দিই এবং যদি আমাদের আদিপুরুষ পাশ থেকে নিচে বাইশ পুরুষ বা যদুন্দন থেকে অধস্তন নবম পুরুষ মাত্রই ধরি অর্থাৎ আমাদের ও জাতি-ভাইদের একটি লাইনই ধরি তবে দেখা যাবে যে আমাদের এই তেলিরবাগ দাশ গোষ্ঠীর এই একই বাইশ পুরুষে প্রসূত হয়েছে কত শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাবান পুরুষেরা। প্রায় এক ডজন উকিল। জন নয়-দশ ব্যারিস্টারদের মধ্যে একজন (সত্যীশরঞ্জন) হলেন এ্যাডভোকেট-জেনারেল ও ল মেম্বর ও একজন চিত্তরঞ্জন হলেন সর্বসম্মত ব্যারিস্টার ও অগ্রণী দেশনেতা এবং বাকী ব্যারিস্টার-দের মধ্যে তিনজন (প্রফুল্লরঞ্জন, জ্যোতিষ-রঞ্জন ও সুধীররঞ্জন) হলেন তিন হাইকোর্টের জজ এবং সেই তিনজনের মধ্যে একজন (সুধীররঞ্জন) আবার হলেন পাজারের ও পরে সর্বভারতীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ। তিনটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি উপাচার্য (সুধীররঞ্জন, বিনয় ও শচীন) বের হয়েছেন এই গোষ্ঠীর একই পুরুষ থেকে। তার পর ডিস্ট্রিক্ট জজ (আমৃতোব), সাব-জজ, ছোট আদালতের জজ ও ট্রাইবুনালের জজ, (প্রদোষরঞ্জন) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (সুহাসরঞ্জন) ও ক'জনা। কলেক্টর প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপকও হয়েছেন একাধিক। বড় ডাক্তার (সরলরঞ্জন ও ভূপেশ) চীফ ইঞ্জিনীয়ার (নিশীথরঞ্জন) একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (ইন্দ্র-ও-বাদ যায় নি। এই একই লাইনের মধ্যে অনেক শিক্ষিতা মেয়ে ও সমাজসেবিকা রয়েছেন যেমন—সরলা রায়, লেডী বসু, অমলা, উর্মিলা প্রমুখ তেলিরবাগের দাশ-গোষ্ঠীর কৃতি সন্তানদের উদাহরণ ও সাহচর্য গড়ে তুলেছে আমার হৃদয় মনকে এবং তাঁদের চরিত্রবল আমাকে উন্মুখ করেছে জীবনের যাত্রাপথে। দাশ গোষ্ঠীর সন্তানদের যে তালিকা ও বর্ণনা দিলাম তা যে কোন অভিজাত গোষ্ঠীর পক্ষেই যে গৌরবজনক তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মধ্যের বাড়ির দুর্গামোহনের জ্যোতিষকন্যা সরলা (মিসেস পি-কে-রায়) আমাদের সরদার সত্যী-বল্লভের—‘আমার বাপের বাড়ি তেলিরবাগের দাশ বংশ খুবই উচ্চ বংশ।’ এই বংশে জন্মলাভ করার গৌরবও যেমন অনেক তার দায়িত্বও তেমনি বিস্তর। এই অভিজাত বংশে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। [কম্পঃ]

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র নাহিড়ী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[স্বাধীনতার পরে]

বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা দিবস আজ স্বর্ণপূর্ণ জ্যৈষ্ঠ-জন্মকের মধ্যে এসে গেল। উৎসবেরও শেষ হল। যোগে গেল শত্রু অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, আর উত্তেজনা। শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা—জনসাধারণের মনেও বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা! কেন যে এমন হল, সে কথা একটু পরেই বলছি। স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানের ও ভারতের শাসন-ক্ষমতায় ঝাঁপা এলেন এবং এসে কী বললেন এবং কী করলেন, সেই কথাটাই আগে বলে নিই।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হলেন, কায়দ-ই-আজম (শ্রদ্ধেয় নেতা। এই উপাধিটি মহাত্মা গান্ধীই দেওয়া) জনাব মহম্মদ আলি জিন্নাহ। ~নতুন সংবিধান প্রণেতা বিধানসভার (Constitution Assembly) ও পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টও তিনিই হলেন। কেন্দ্রীয় বিধানসভার বা সংসদের প্রেসিডেন্টরূপে স্বাধীনতাতে নির্বাচিত হওয়ার পরেই তিনি যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন—“আজ থেকে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দু ও আর হিন্দু, মুসলমান ও আর মুসলমান থাকবেন না—সকলেরই একমাত্র পরিচয় হবে, সকলেই পাকিস্তানী। শাসন-ব্যবস্থার শাসকের কাছে শাসিতের মধ্যে ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতিগত কোন কৈমাই আর থাকবে না।...” এমনি ভাল ভাল কথাই তিনি সৈদিন শুনিয়েছিলেন। আমরা যারা পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত, এবং জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলাম, তাঁরাও সবই খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এই তো জাতীয়তাবাদীর কথা। আরও ভেবেছিলেন, দেশ-বিভাগের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে একটা আশঙ্কা হয়েছিল, তা বোধহয় সম্পূর্ণ অ-মূলক। রাষ্ট্র আলাদা হলেও আমরাও হয়তো সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে সমান অধিকার নিয়েই, স্বাধীন দেশের মানুষের মত এক ও অভিন্ন মর্যাদা নিয়েই, পাকিস্তানে বাস করতে পারবো। আমাদের ঐ ধারণা যে কত বড় ভুল ছিল, আজ আমি পরবর্তীকালে চোন্দ বছর

পাকিস্তানে থেকে প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। এই বিষয় নিয়ে—জিন্নাহ সাহেবের ঐ ঘোষণা নিয়ে আমরা নিজের মধ্যে পরবর্তীকালে অনেক আলোচনা করেছি। পাকিস্তান পার্লামেন্টের ও কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর জনৈক প্রবীণ বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে, জিন্নাহ সাহেবের রাজনীতিক জীবন সূর্য হয় জাতীয়তাবাদী হিসাবেই এবং পরবর্তীকালে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী রাজনীতিক মতবাদের একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক হলেও, তাঁর ভেতরের জাতীয়তাবাদ একেবারে মরে যায় নি—সময়ে সময়ে সেটা বিদ্যুৎ কলকের মত এক একবার চমক দিয়ে ওঠে। বৈদিন জিন্নাহ সাহেব, ঐ ভাষণ দেন, সৈদিন জাতীয়তাবাদের এমনি একটা চমক তাঁর মনে খেলে ও গিয়েছিল কিন্তু সেটা স্থির থাকতে পারে নি। স্থির থাকতে যে পারে নি, বন্ধুটির মতে, তাঁরও পেছনে নাকি একটি কারণ আছে। মোলানা সাঈয়দ হোসেন ছিলেন এক অত্যন্ত ক্ষমতামূলী সাম্প্রদায়িক নেতা। জিন্নাহ সাহেবের ঐ ভাষণের পরে নাকি তিনি ঘোষণা করেন যে, জিন্নাহ সাহেব যদি তাঁর ঘোষণা মত কাজ করতে চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি করাচী শহরের রাস্তায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন। তিনি নাকি জিন্নাহ সাহেবের মুসলমানদের সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করে প্রচার চালাতে থাকেন, ফলে যে জিন্নাহ সাহেব আচার-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে খাঁটি একজন বিলাতী সাহেবের মতই বরাবর চলতেন তিনি আশঙ্কায় জন্ম—তাঁর প্রভাব যাতে মুসলমান সমাজের মধ্যে ছড়ান না হয় সে জন্য মুসলমানী পোষাক পায়জামা-সেরওয়ানি পরতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাঁকে মসজিদে গিয়ে নামাজও আদায় করতে হয়েছিল! আব একবারও পরে দেখিছি, জিন্নাহ সাহেবের মুসলমানদের সন্দেহ প্রকাশ করে চাপা গুজব চলতে। সেটা হয়েছিল জিন্নাহ সাহেবের একমাত্র মেয়ে যখন একজন খৃষ্টানকে বিয়ে করেন। এটাই তো স্বাভাবিক। আগুন নিয়ে ঝাঁপা খেলা করেন, সেই আগুনে কোন এক অসতর্ক মুহুর্তে যে খেলোয়াড়েরও হাত পুড়তে পারে, তা তো সকলেরই জানা

কথা। কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের গত জীবিত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বাস্তব রাজনীতিক যে কেন সেটা বোঝেন নি, সেইটাই আশ্চর্য। ধর্মকে হাতিয়ার স্বরূপ নিয়ে জিন্নাহ সাহেব সারা ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বেলিয়েছিলেন, সেই আগুনে তাঁরও হাত পোড়াটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। আমার সেই প্রবীণ রাজনীতিক বন্ধুটির উক্তিই যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে কার্য-কাণ্ড সম্পর্কে স্বাভাবিক পরিণতিই বলতে হয়। কিন্তু আমি আমার বন্ধুটির উক্তি পুরোপুরি মেনে নিতে পারি নি। তা মানতে হলে জিন্নাহ সাহেবের ক্ষরধার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে খাটো করতে হয়। আমি তাঁকে যেমনটি দেখেছি এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে যা জেনেছি, তাতে জিন্নাহ সাহেবের বুদ্ধিকে কখনই ছোট ভাবতে পারি নি। আমার মতে, কায়দ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেব সৈদিন যে ভাষণ সংবিধান-রচয়িতা সংসদে দিয়েছিলেন, সেটার মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা ছিল না, ছিল বহির্বিবেচ্য প্রচারণা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ঘুম পাড়ান। পাকিস্তানে চোন্দ বছর থেকে সেখানে মুসলিম লীগের রাজনীতিক গভীরভাবে নিবীক্ষা করে যা দেখেছি ও বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যে গুস্তা-হাতীই যেমন দুই রকমের দাঁত থাকে—এক ধরনের দাঁত লম্বা হয়ে বাইরে বের হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে হোম শোভাবর্ধনের ও আশঙ্কায় জন্ম; আর, দ্বিতীয় ধরনের দাঁত থাকে, মুখের মধ্যে—সেই দাঁত দিয়েই চিবানোর কাজ হয়—পাকিস্তানে মুসলিম লীগের রাজনীতিতেও ঐবং দুই রকমের দাঁত আছে। প্রকাশ্য সভায় যে সব ভাল ভাল কথার ভাষণ দেওয়া হয়, সেটা তাঁর শোভাবর্ধনের দাঁত; আর, চিবানোর দাঁত থাকে, তাব মুখের মধ্যে। সে দাঁতকে পরখ করা যায়, শাসন কর্তৃপক্ষের গোপন নির্দেশের (সারকুলারের) মধ্যে। বাইরের লোকে তাকে দেখতে পান না—কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই তাঁর কাঠিন্য ও কঠোরতা বুঝতে পারেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমার মনে হয়েছে, জনাব জিন্নাহ সাহেবের সংসদের সেই বক্তৃতাও

ছিল তাঁর শোভাবর্ণনের দাঁত! আমার দৃষ্টিতে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল, তথা সংবিধান-সংসদের প্রেসিডেন্ট কয়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেবের এটাই ছিল আসল স্বরূপ; এই স্বরূপের সম্পূর্ণ ছাপই তিনি রেখে গিয়েছেন মুসলিম লীগের রাজনীতিতে। আজও কিন্তু মার্শাল আয়ুব খানের পরিচালনায় পরিচালিত মুসলিম লীগ সেই নীতিই আরও গভীর হিংস্র ভাবেই চালাচ্ছেন। সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে করবো।

পাকিস্তান সরকারের প্রথম প্রধান-মন্ত্রী হন, নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক। ইংরেজ আমলে বহুকাল যাবৎ ভারত-বর্ষের কেন্দ্রীয় সংসদের (সেমেন্টাল এসেমবলির) মুসলিম লীগের সদস্য হিসাবে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জিন্নাহ সাহেব মুসলিম লীগের প্রাণস্বরূপ হলে, লিয়াকত আলি সাহেব ছিলেন, তার দেহ। শুনোছি, লিয়াকত আলি সাহেব যখন বিলেতে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন সেই সময়ই না কি জিন্নাহ সাহেব, ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব মানতে না পেরে বিলেতে চলে যান সেখানে থেকে আইন-ব্যবসা করার জন্য। সেই সময় জিন্নাহ লিয়াকত আলি সাহেব যে জিন্নাহ সাহেবের সাথে দেখা করে তাকে বিশেষ অনুবোধে ভারতীয় রাজনীতিতে ফিরে এসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে রাজী করান—এটাই আমি লিয়াকত আলি সাহেবের কাছ থেকেই শুনিয়েছিলাম। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী রূপে রাজসাহীতে এসে আমার সাথে একান্তে আলাপে তিনি এই কথাটি আমাকে বলেছিলেন। আরও তিনি বলেছিলেন যে, জিন্নাহ সাহেবের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক হচ্ছে, পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্কের মত। তাই, জিন্নাহ রাজনীতির সার্থক রূপায়ণই দেখেছি। তাঁর প্রধান-মন্ত্রিত্বের আমলে। লিয়াকত আলি সাহেব ছিলেন, কথাবার্তায় অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। জিন্নাহ চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু জিন্নাহ নীতির তিনি একজন পরিপূর্ণ রূপকার। জিন্নাহ নীতিই মুসলিম লীগের রাজনীতি: আর সে নীতির মূল কেন্দ্রই হল, ভারত-বিশ্বেষ। সম্পূর্ণ নারসিনীতি। লিয়াকত আলি সাহেব, এই নীতিকে রূপ দেন। এই নীতিরই ফল আজও চলছে কাশ্মীরকে অবলম্বন করে। কাশ্মীরের জন্য তিনি পাকিস্তানের প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন—উদ্যত হস্তের বন্ধু-দৃষ্টি। পাকিস্তানের সর্বত্র রাস্তায়

রাস্তায় বাড়িতে দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পেয়েছিল বন্ধুদৃষ্টির ছবি! আমি দেখেছি, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসাবে জনাব ফিরোজ খান নুন এসেছেন রাজসাহী শহরে। জিন্নাহ হলে জনসভা হল। খান সাহেব তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণ শেষ করলেন। উদ্যত হস্তের

দৃষ্টি দোঁখয়ে—একেবারে নাৎসী কারদাগ। সেই থেকেই পাকিস্তানে ঐ একই নীতি চলছে। যিনি যখনই গদিতে বসছেন, তিনি তখনই নিজেদের গলদ থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর জন্য কাশ্মীর নিয়ে জিগির তুলছেন। কাশ্মীর সমস্যা যদি কোনও কালে কোন



যাক একে দাঁত আর সুন্দর হাসি

সাদনা দশন

সাদনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দস্তলোগের ভয় থাকে না। দস্তলরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাদনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ঔষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ., অধ্যাপকদাসী, এফ.সি., এস.এল.ও.এন.,
এম.সি., এস.এস. (আমেরিকান) ডাঙলপুর কলেজের রূপায়নশাস্ত্রের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি., এস.এল.ও.এন., অধ্যাপক

ভাষ্য মিটেও যায়, আবার আর একটা কিছু নিয়ে নতুন একটা সমস্যা অবশ্যই সৃষ্টি করতেই হবে। সেটা গ্রিপ্পুরা রাজ্যও হওয়া অসম্ভব নয়। ভারত-বিশ্ববন্ধকে ভিত্তি করেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে এবং সেই পাকিস্তানকে যাঁচিয়ে রাখতে হলে, ভারত-বিশ্ববন্ধকে আশ্রয় করেই চলতে হবে। জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তান রাজনীতির জন্ম দেন এই নীতিতেই ভিত্তি করে, এবং লিয়াকত আলি সাহেব, একজন একান্ত বাধ্য ও অনাগত পুত্রের মতই পিতার সেই নীতিকে রূপ দেন। তবে একথা অবিশ্যম্বাদিতভাবে সকলেই স্বীকার করবেন যে, লিয়াকত আলি খান ছিলেন, পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ রূপকার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শূভানুধ্যায়ী। পাকিস্তানকে তিনি এক সুদূর ভিত্তির ওপরেই গড়তে চেয়েছিলেন। এই গড়ার জন্যই তিনি পূর্ব-বঙ্গকে, তথা পূর্বপাকিস্তানকে সব সময়েই উপনিবেশ হিসেবেই দেখেছিলেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে সেই নীতিই যে একমাত্র সুষ্ঠু, নীতি তা তিনি মনে করতেন, ভারত-বিশ্ববন্ধ যে নীতির মূল কথা, সেই নীতির জন্যই ভারতের সাথে পাকিস্তানকে সংঘর্ষের জন্যও সর্বদা প্রস্তুত করে রাখতেই হবে; আর তিনি এটা জানতেন যে, ভারতের সাথে সংঘর্ষ বাধলে, পূর্ববঙ্গকে তথা পূর্ব পাকিস্তানকে কোনও সামরিক কৌশলেই রক্ষা করা সম্ভবপর নয়; তাই তিনি পূর্ব-বঙ্গকে উপনিবেশ হিসেবেই দেখেছেন এবং পূর্ববঙ্গের অধিবাসীকে তিনি সব সময়েই সন্দেহের চোখেই দেখেছেন এবং তাঁদের মন থেকে তাঁরা যে বাংলার অধিবাসী 'বাঙালী' সে কথাটা যাতে চিরদিনের জন্য মুছে যায় তার জন্য সংবিধান তৈরি হলে তাতে দেখা যায়, 'পূর্ববঙ্গের' পরিবর্তে প্রদেশের নাম হল, 'পূর্ব পাকিস্তান'। এটাও লিয়াকত আলি সাহেবেরই চিন্তাশীল মনের অভিব্যক্তি-মাত্র। বিশিষ্ট রাজনীতিকের মতই তাঁর চিন্তাধারা ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার ফলেই তিনি ১৯৫০ সালের দাম্পার সময়ে নিজের জীবনও বিপন্ন করে দিল্লীতে গিয়ে ৬ই এপ্রিল-নেহরু-লিয়াকত চুক্তি সম্পাদন করে আসেন। পাকিস্তানের মন্ত্রী ডাঃ আব্দুল মোতালেফ মালিক সাহেব রাজসাহীতে গিয়ে এক জনসভায় নেহরু-লিয়াকত চুক্তির যে কপী দিয়েছিলেন, এ এখানে সংক্ষেপে বলছি। রাজসাহীর মুসলিম লীগের জনৈক নেতা নেহরু-লিয়াকত চুক্তিকে একখানি চোখা কাগজ বলে বর্ণনা করলে, ডাঃ মালিক তাঁকে গভৃতা মণ্ড থেকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে

বলেন যে, এ চোখা কাগজখানি যদি সেদিনে না হত, তাহলে আজ আর পাকিস্তান থাকতো না। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাম্পার প্রতিরীক্ষায় নেহরু ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রয়োজনবোধে "অন্য পন্থা" অবলম্বন করবেন। সেই অন্য পন্থাটিই হচ্ছে, সামরিক আক্রমণ। ভারতের সৈন্যরা সীমান্তে প্রস্তুত হয়ে কেবল আদেশের অপেক্ষা করছেন, এই খবর পেয়েই লিয়াকত আলি সাহেব স্থির করেন যে, তিনি স্বয়ং দিল্লীতে গিয়ে নেহরুকে ধরবেন। লিয়াকত আলি সাহেবের মস্তিসভার জরুরী ঐক্য বসে। তিনি তাঁর প্রস্তাব দেন কিন্তু অপর মন্ত্রীরা সকলেই অকম্পার গুরুত্ব বিবেচনা করে আপত্তি জানান। দিল্লীতেও তখন পুরোদমে মুসলমান-নিধন চলছিল। সকলেই মনে করছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি সাহেব দিল্লী গেলে তিনিও নিহত হবেন। এসব ছেনে-শূনেও লিয়াকত আলি সাহেব, তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তিনি নাকি সেদিনে বলেছিলেন— "এক দিকে পাকিস্তানের অস্তিত্ব, আর অপর দিকে আমার জীবন! আমার জীবন দিল্লীও যদি আমি পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারি, সেই চেষ্টাই আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করতে হবে।"

তিনি সেদিন কারো কথা শোনেন নি—তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন। যখন তিনি রওনা হন, তখন নাকি এরোড্রোমে লিয়াকত আলি সাহেবের স্ত্রী-পুত্ররা কান্না-কাটি করেন—তবু তিনি গেলেন এবং এ চুক্তি সম্পাদন করে বিজয়ী বীরের মত আবার করাচীতে ফিরলেন। এই সব কথাগুলো আমার নিজের নয়—পাকিস্তানেরই তৎকালের একজন কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলী। সত্যিই, এমন গভীরভাবে আর কোন প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানকে নিজের জীবনের চেয়ে বড় করে ভালবাসতে পেরেছিলেন কিনা আমি জানি না! লিয়াকত আলি সাহেবের রাজনীতিক মতবাদের সাথে আমরা কোনও দিনই একমত ছিলাম না, বরং সে মতের বিরোধীই ছিলাম। তাঁর রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীও আমরা সমর্থন করি নি কিন্তু একথা আমি অন্তত অকপটে স্বীকার করি যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের প্রতি তাঁর প্রেম, তাঁর ভালবাসা ছিল সকলের সব সন্দেহের ওপরে। এই দেশপ্রেমের জন্য আমি তাঁকে আমার অন্তরের প্রাণ্য জানাই। তিনি আজ সকলের সব প্রাণ্য নিদার পরপারে; তবু তাঁর উদ্দেশ্যে আমার প্রাণ্য জানাই। আশা করেছিলাম, তাঁর খণ্ডিত ভারতবর্ষের একাংশের প্রতি এই প্রেমই হয়তো আবার একদিন সর্ব-

ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর দ্বারা তা হতে পারলো না কিন্তু আমি সারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, আবার যদি কোনও নেতা পাকিস্তানে দেখা দেন যার, দেশের প্রতি লিয়াকত আলি সাহেবের মতই প্রেম ও ভালবাসা অফুরন্ত থাকবে, তাহলে তাঁর দেশের স্বার্থেই তিনি ভারত-বিশ্ববন্ধ ত্যাগ করবেন এবং পাক-ভারত উপ-মহাদেশকে এক মহান শক্তিশালী দেশ হিসাবে গড়ে তুলতেই সাহায্য করবেন। এটা আমার সারা অন্তরের শব্দ, বিশ্বাসই নয়—এটাই আমার অন্তরের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—এটাই ভবিষ্যৎ—এটা হতেই হবে। ব্যতিক্রম নেই; নচেৎ পাক-ভারত উপ-মহাদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তা কখনই হতে পারে না—হবে না।

যাক, কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের হাল লিয়াকত আলি সাহেব শক্ত হাতেই ধরলেন। এদিকে, পূর্ববঙ্গেও অবটন ঘটে গেল। সুদূরবর্তী সাহেবের সাক্ষাৎ বাগান শুকিয়ে গেল। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় নাজিমুদ্দিন সাহেব দেশের মধ্যে ছিলেন না। সুদূরবর্তী সাহেবই বাংলার মুসলিম লীগের একমাত্র কর্তাব্যক্তি। তিনি নিজের পছন্দ মত তাঁর সমর্থকদেরই নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করালেন। তাঁরাই নির্বাচিতও হল। বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুদূরবর্তী সাহেবই হলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর ভগবান করেন আর এক। সুদূরবর্তী সাহেবের বেলায়ও তাই হল। তিনি জনাব নূরুল আমীন সাহেবকে তাঁর মস্তিসভায় নিলেন না। তাঁকে করে রাখলেন এসেম্বলির স্পীকার। ভগবান জাবলেন, 'তোমাকে মারিবে যে গোফুলে বাড়ছে যে।' স্পীকারের পদে থেকেই নূরুল আমীন সাহেব বাড়তে থাকলেন—তিনি দলের মধ্যেই গোষ্ঠী গড়তে থাকলেন। শক্তিশালী নেতা নূরুল আমীন সাহেবের তৎপরতার গোষ্ঠীর শক্তি অলঙ্কা বাড়তে থাকলো। দেশ-বিভাগের পরে এই শক্তির সাথে এসে যোগ দিলেন, সিলেটের মুসলিম লীগের সদস্যগণ। দেশ-বিভাগের ফলে সিলেট, আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। সিলেটের হিন্দু-মুসলমান বাঙালীরা অসমিয়া অধিবাসীদের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই শ্রেষ্ঠ অদুরদর্শী অসমিয়া নেতাদের চিরকালই চক্ৰশূল ছিল; তাই, তাঁরা দেশ-বিভাগের আগেও সিলেটকে বাংলার মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি উত্থাপন করেন। দাবিতে যখন ফল হয় না,

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

তখন তাঁরা “বাংলাস খেদা” আন্দোলন গড়ে তোলেন। এরই পরিণতি হল, সিলেটের পূর্ববঙ্গভূমি। দেশ-বিভাগের সময় স্বেচ্ছাস্থ হইছিল যে সিলেটের অধিবাসীদের গণ-ভোটে ঠিক হবে, সিলেট ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী তখন শ্রীগোপীনাথ বরদলুই; আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, শ্রীমন্ত শ্রীবসন্তকুমার দাশ (বর্তমানে, পরলোকগত)। কথায় আছে, ‘নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা।’ সত্যিই কেউ নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করেছেন কি না, কেউ দেখেন নি কিন্তু অসমিয়া নেতা বরদলুই সাহেবের বেলায় দেশবাসী সেই দশাই দেখলেন। তিনি সিলেটকে পাকিস্তানে ঢেলে দেওয়ার চক্রান্তই মনে উঠলেন। এই সম্বন্ধে আমি একদিন শ্রীবসন্ত দাশ মহাশয়কে ঢাকায় বসেছিলাম যে, ‘আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকতে সারা ভারত থেকে মুসলিম জাঁগের জেহাদী ফৌজ-কে প্রচারণার নামে গুন্ডামি করতে সিলেটে ঢুকতে দিয়েছিলেন কেন? শ্রীমন্ত শ্রীকিরণশঙ্কর রাফ বদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকতেন, তাহলে কিন্তু তিনি কিছুতেই তা দিতেন না এবং গণ-ভোটের ফলও উল্টাই হত।’ উত্তরে শ্রীদাশ বলেছিলেন, —“আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবরদলুই আমাকে আমাব নিজ দায়িত্বে ইচ্ছামত কাজ করতে দেন নি। সেই সময় আমাব উচিত ছিল, পদত্যাগ করা কিন্তু তা না করে আমি যে পাপ করেছিলাম, তারই প্রায়শ্চিত্ত আজ করছি, পাকিস্তানে থেকে।” শ্রীদাশ চরম মূল্য দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত কবে গেলেন। সিলেটে বার ৫০ বিঘাবও বেশি জমির উপর বিরাট বাড়ি ছিল, তিনি তাঁর পৈত্রিক সেই ভিটাতে দেহত্যাগ করতে পারেন নি। আরবী শাসনের আমলে তাকে কলকাতায় এসে জামাই-এর ভাড়াটে বাড়িতে দেহত্যাগ করতে হয়েছে। এব মধ্য কত বড় যে অন্তর্বেদনা লুকিয়ে আছে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ বুঝবেন না!

আসামের স্বকীয়গণনা সাম্প্রদায়িক (এটাও এক প্রকারে গুন্ডাবন্ধ সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া কিছু নয়) নেতাদের দুষ্কর্মের ফলেই সিলেট পাকিস্তানে গিয়েছে। আবার, নাগা-মিজো প্রভৃতি অঙ্গলও ভারতের হাতের বাইরে ষাওষাব উপক্রম করেছে। আজও আসামে বাঙালীদের দুর্ভোগের শেষ হয় নি। জানি না, কবে অসমিয়া নেতাদের, তথা ভারতের উচ্চস্তরের কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে।

যাক, নরুল আমীন সাহেবের দলের সাথে সিলেটের সদস্যরা মিলিত হওয়ায়

তিনিই নেতা নির্বাচিত হলেন এবং পূর্ব-বঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন। নরুল আমীন সাহেব ও পূর্ব দিনাজপুরের জনাব হাসান আলি সাহেবও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন। সুবাসদী সাহেব তখন, রাজনৈতিক দরবেশ হয়ে মহাত্মার পার্শ্বচর রূপে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষা করার কাজে আত্মনিয়োগ করে চললেন।

এইরূপেই পাকিস্তানে ও পূর্ববঙ্গে, স্বাধীনতা পরে প্রথম পূর্বের কাজ সুরু হল কিন্তু অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, আর উত্তেজনা পূর্ববঙ্গের প্রতি গ্রামে গ্রামে ব্যাপকভাবে দেখা দিল। দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা, দেশভিত্তিক সার্বজনীন স্বাধীনতারূপে দেখা দিতে পারলো না। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় মনে করলেন, তাঁরা এক মহৎ বিজয়ের অধিকারী হয়েছেন; আর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভাবতে লাগলেন, তাঁদের অতি ঘৃণ্য এক পরাজয় হয়েছে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের কথাবতীর মধ্যে দিয়ে এই মনোভাবেরই প্রচার দিয়ে চললেন। তাঁদের ভাষণেব মূল বক্তব্যই হল—শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের শক্তিতেই মুসলমানদের জন্য বাসভূমি ‘পাকিস্তান’ অর্জন করেছেন। অ-মুসলমানরা এখানে ‘জিম্মি’ অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে পবিত্র আমানত! এই ‘জিম্মি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ যত ভালই হোক না কেন, সাধারণ মুসলমানগণ কিন্তু বুঝলেন যে অ-মুসলমানগণ তাঁদের কাছে ‘জায়ানো’ মাছেব মতই আমানত! জায়ানো মাছকে যেমন আমানত রেখে প্রয়োজনবোধে ছল থেকে তুলতে, কাটতে ও খেতে পারা যায়, অ-মুসলমান সম্প্রদায়কেও তাই করা চলবে। এটা বিকৃত অর্থ নিশ্চয়ই কিন্তু এই ধারণাই স্বাধীনতার প্রথম পূর্ব সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মেছিল। আজও যে তা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে তা বলা যায় না; তবে, সেই ব্যাপকতা আজ আর

নেই। সেদিনের এই ব্যাপকতার জন্যই; প্রত্যেকেই মনে করতেন, -আইন-শৃঙ্খলার মালিক তাঁরা নিজেই। কেউ কারো কথাই শোনেন না। দারোগাবাদ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সাহেবের কথা শোনেন না, দারোগার কথা কনস্টেবল শোনেন না, আবার জনসাধারণের মধ্যে একশ্রেণীর লোক, থানা-পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব—কাউকেই গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না; ফলে, সবাই দেখা দেয়, -অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা; আর এর জন্যই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা দেয়; একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা। অ-মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনা এই ভেবে যে, তাঁরা কি আর এদেশে ধন-প্রাণ নিয়ে নিরাপদে থাকতে পারবেন? উচ্চস্তরের কিছু কিছু লোক, এবং তাঁদের দেখাদেখি, নিম্ন-স্তরেরও কিছু লোক দেশত্যাগ কবতে সুরু করেন। মুসলমানদের মধ্যেও উত্তেজনা; কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরাই তো এখন দেশেব মালিক—হিন্দুরা তো তাঁদের প্রজা! হিন্দু মালিকের সাথে প্রজার যে সম্পর্ক এতদিন তাঁরা ভোগ কবে এসেছেন, এবারে তা সুদে-আসলে শোধ কববেন! মুসলমানদের মধ্যে যে ভাল, সংলোক ছিলেন না, তা নয়, বরং ভাল লোকেব সংখ্যাই বেশি ছিল কিন্তু তাঁরাও নিজেদের অক্ষম মনে করতেন: কারণ, গুন্ডা-শাহীর কাছে সরকারী ওপর-ওয়ালারাও—বিশেষ কবে, থানা কতৃপক্ষ—নতি স্বীকার করে চলেন বা গুন্ডা দলকেই সাহায্য করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যেখানে শৃঙ্খলা বজায় রেখে ন্যায় বিচার করতে চান, সেখানে তাঁর আদেশও তার অধস্তন কর্মচারীরা শোনেন না।

পববতী পৃষ্ঠাগুলোতে এই অবস্থারই একটা ধারাবাহিক ইতিহাস উদাহরণ সহ দিতে চেষ্টা করবো এবং সাথে সাথে ভারতেই বা কী অবস্থা চললো তাবও ইতিহাস, যতটা জেনেছি দেব।

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং শ্লেটিং

করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শ্রী ক্রম :- ৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন : ০৪-০১৭০

৩, রামমোহন পাল জেন, কলি-১২।

অফিস-ফোন-০৪-৪৪৪৬

আমরা যার কাছে একটি শব্দ আমরা

পর্বত-জন্তুরা

১৮ই এপ্রিল রাতে আমরা চারজন দল অবস্থার হিমায়িত করে নিয়ে পল্লিশ-লাইন ছেড়ে আসার পর ২০শ তারিখ রাত প্রায় আটটা সাড়ে আটটার সময় সতীদার সঙ্গে দেখা করি। এই সতীদার সময় আমাদের কিভাবে কেটেছে—কতখানি উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার মধ্যে আমরা ছিলাম, কিরূপ বেপরোয়া হয়ে গিয়ে প্রবেশ করেছি, প্রধান বাহিনীর কাছ থেকে একটা সংবাদ পাওয়ার আশা নিয়ে কতখানি আমরা বিপদ জেনেও আনন্দের ব্যাভিষ্টে সারা রাত অপেক্ষা করেছি, কিতাবে আনন্দের ব্যাভিষ্টে আকস্মিক পল্লিশের হানা উপেক্ষা করলাম—আবার বিপদ অগ্রাহ্য করে দিনের বেলায় কি করে তাঁদের ব্যাভিষ্টে ফিরে এসে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, নেহাৎ জন্মের জেনেও দিনদুপুরে শহরের বাইরে রাস্তার ধারে কোকানে কোকানে নানা অজুহাতে প্রধান বাহিনীর খোঁজ পাওয়ার জন্য কতখানি চেষ্টা করেছি, কর্ণেল জ্যাকস স্মিথ ও মিঃ লোমন্ডের পরিচালিত সৈন্যদের সম্মুখে পড়েও কিভাবে নিস্তার পেলাম এবং সরকারী দালাল প্ররোচিত একদল উত্তেজিত গ্রামবাসীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ২০ তারিখ রাতে সৈন্যদের আগমনবার্তা জেনেও কতখানি বড়কি নিয়ে সতীদার সঙ্গে শহরের মধ্যে দেখা করতে এলাম সেই সব বিবরণই আমি এতক্ষণ দিয়েছি। এবারে প্রধান দলটি এই সময়ে কি করেছে তার বিবরণ দেবো।

আমরা শেড়োলে গাড়ি নিয়ে চলে আসার পর মাস্টারদা, নির্মলদা, অম্বিকাদা ও লোকনথ প্রধান দলটির সঙ্গে পল্লিশ-লাইনের কাছে প্রায় বিশ-বিশ মিনিট অপেক্ষা করে। তাঁরা আমাদের গাড়ি অনুসরণ করে শহরে প্রবেশ করবেন, নাকি আমাদের ফিরে আসাবার জন্য সেখানেই অপেক্ষা করবেন তাই ভাব ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন আমরা হয়ত

ইমরাতকে মাইল দেড় দুই দূরে তাদের বাড়ির কাছে আমাদের দিগে জঙ্কুণি ফিরে আসব। যখন ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেও ফিরে এলার না তখন তাঁদের মনে নানা সন্দেহ-স্বপ্ন দেখা দিল—কি করবেন? পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরে প্রবেশ করবেন না কি নতুন পরি-স্থিতিতে অন্য রণকৌশল গ্রহণ করবেন তা নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে সামান্য আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলছিলেন না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা, কিছু মানসিক নিষ্ক্রিয়তা, কিছু সোলাসমান মনোবৃত্তি। সম্প্রতি কোন অভিমত প্রকাশ না হলেও অধিনায়কদের দৃষ্ট একটা ছাড়া ছাড়া কথায় দেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের ধারণা হয়েছিল যে, নেতারা ভেবেছেন তাঁরা এখন এক নতুন পরি-স্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। গণেশ ও আমার অনুপস্থিতি, ম্যাগাজিন রাইফেল ও মেশিনগানের কার্যে না পাওয়া এবং শত্রুপক্ষ জেটী ও পাহাড়ভল্লীর আঘাত থেকে মেশিনগান ও অস্ত্র নিয়ে ইতিমধ্যে সংযবস্থ হয়ে প্রতি-আক্রমণ করতে সমর্থ হয়েছে—এই অবস্থার শহরে প্রবেশ করে অসম্মান স্বীকৃতি নিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত, না কি চট্টগ্রামের পাহাড় ও বন-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে “গেরিলা যুদ্ধ” চালিয়ে শত্রুপক্ষকে অধিক সময় ব্যতিব্যস্ত করা অধিকতর শ্রেয়—এই প্রশ্নে তাঁদের মন আলোড়িত হচ্ছিল। কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তখনও বিধা।

এইরূপ বিধা, স্বপ্ন, নিরাশা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে যখন বিপ্লবী বা সামরিক নেতারা কাল অতিবাহিত করেন তখন যদি তাঁদের মধ্যে কেউ এগিয়ে এসে বিধাহীনচিত্রে কোন একটি নির্দেশ দেন এবং তা যদি নির্ভুল নির্দেশ নাও হয় তবু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে উপস্থিত সবাই সেইরূপ ভুল নির্দেশের অনুবর্তী হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে

কারও কারও ধারণা ছিল আমরা ফিরে আসব। সেই ধারণা অনুযায়ী আমরা কিন্তু তখনও ফিরে আসি নি। বিধাতন্ত্র তাইদের মন—কিছু ঠিকও করে উঠতে পারছেন না। এমন সময় প্রায় তিনপোয়া মাইল দূরে একটি পাহাড়ে কোন সাহেবের কামোরে উদ্দেশে কোন একটি মোটা গাড়ি হেড লাইট জ্বালিয়ে পাহাড়ের অর্ধচন্দ্রাকার রাস্তা দিয়ে দূরে গিয়ে উঠছিল। সেই সময় মোটরের লাইটের রশ্মি স্বভাবতই গাড়ির মূখ বোন্নার সঙ্গে তাঁদের মস্তক ওপর দিবে তখন পাশ থেকে বাঁ পাশে চলে গেল। এই মোটরের আলো অতখানি দূর থেকে সম্মার ওপর দিয়ে যাই একবার চলে যায় তাহলে শুকুণি সেই গাড়ি থেকে শত্রুপক্ষের কেউ আমাদের দেখে ফেলবে এইরূপ ধারণা আজ নিশ্চয়ই কারও মনে হবে না। কিন্তু বাস্তব যুদ্ধ-ক্ষেত্র এমনই ভয়াবহ যে যুব সাহসীদেরও এইরূপ সামান্য অর্ধহীন মোটর লাইটও সচ্যকিত করে ভাবাতে পারার জন্য যথেষ্ট—এই বৃষ্টি শত্রু আমাদের দেখতে পেল।

যারা তখন প্রধান বাহিনীর সঙ্গে দেখানে উপস্থিত ছিল তাদের কয়েক-জনের কাছ থেকে আমি পরে জেনেছি এবং আজও এইটি লেখার সময় আমার বমছে শুধুই প্রথম সারির একজন, কালী দে উপস্থিত আছে—আমি আজ আবার তার মূখ থেকেও শুনলাম—এ মোটরের লাইট দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেতর-ঐরূপ একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—তাদের মনে হল শত্রুপক্ষ হরত মোটর লাইটের সাহায্যে তাদের অবস্থানটি বুঝতে চেষ্টা করবে এবং তাদের লক্ষ্য করে মেশিনগান চালাবে। ঠিক ঐরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার সময় অম্বিকাদা সবাইকে ডেকে বললেন—“এখানে আব বোশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। follow me! আমাকে অনুসরণ কর।” অম্বিকাদার এই নির্দেশ কতখানি নির্ভুল ছিল বা মাস্টারদা নির্মলদার ভা মনে নিয়ে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে যাওয়া কতখানি

দেখা যায় আমি এখানে করতে বাঁধা নী। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি impersonally—নৈব্যক্তিকভাবে আশীর্বাদবৃক্ষের এই অধ্যায়টি লিখতে। যদি সেভাবে আসা-গোড়া লিখে যেতে পারি তবে আমার সীমাবদ্ধ শক্তিতেও মনে করব যে আমি কর্তব্য পালন করতে চেষ্টা করি নি।

সকলেই আমিকানাকে অনুসরণ করল। আমিকানা বিশ্ববাহিনীতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেইরূপ অনিশ্চয়তা, নির্নিশ্চিততা ও বিশ্বাসহীনতার মধ্যে দৃঢ় ও স্পষ্ট নির্দিষ্ট আদেশের প্রয়োজন ছিল। আর কোন আদেশ যখন এল না তখন আমিকাদার নেতৃত্ব ও নির্দেশ যে কার্যকরী হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। তাছাড়া সার্বিক প্রায় মানস্টারদা, নির্মলদা ও আমিকাদা বাদে এখানে আর কেউ ছানভেনও না।

রাত প্রায় দেড়টা দুটো হবে, ওরা সকলেই পদূলিশ-লাইন পরিত্যাগ করে কাঁটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমিকাদার স্মৃতিপথ লক্ষ্য করে মাঠে নেমে পড়ল। প্রত্যেকেই সঙ্গে একটি মাস্কেট্রি, দুটো বা একটি করে বিল্ডার, হ্যাভারসেক জীর্জ কাভার, তেলের ছোট টিন, কাবও স্কারও সঙ্গে ওয়াটার কোরয়ার, সবার সঙ্গে কিছু ফাস্ট-এডের ওষুধপত্র ও ব্যান্ডেজ প্রভৃতি ছিল। পুরনে তাদের বুট-পাট্টা ও খাকি পোষাক। খাওয়া নেই, ফুস্কার বৃদ্ধি ফাটছে। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাবা মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে বোম্বপাড়া অতিক্রম করে চলেছে। চলার পথে যেন কিছুই প্রতি শ্রক্ষেপ নেই। ঝিক্সু এক সময় হঠাৎ তারা একটি বাঁশের বেড়ার সামনে এসে পড়ল। এত দূর্বল বোম্ব করছিল যে এই বেড়া ঘুরে পথ চলার ইচ্ছেও তাদের ছিল না। পরিশ্রান্ত হয়ে সেখানেই সকলে বসে পড়েছে।

একটু পরেই বোম্ব যায় যে, এই বেড়ার ঘেরা দুটো মস্ত বড় তরমুজ ক্ষেত তাদের সামনেই রয়েছে। তরমুজের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সাথে সাথেই তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেন আরও অনেকখানি বেড়ে গেল। তাদের আর তরমুজই ছিল না। কয়েকজন বাগানে পড়ে ও তরমুজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে সবটিকে সরবরাহ করল। সকলে মিলে তপ্তির সঙ্গে যখন তরমুজ খাচ্ছে তখন তরমুজ ক্ষেতের মালিক হঠাৎ তাদের দেখতে পায়। এতজন খাকি পোষাক পরা সশস্ত্র যুবক দেখে সে ভয় পেয়েছে। খুব সম্ভব পদূলিশ-লাইনের গোলমালও তার কানে এসেছে। তবু সেই চাষী মালিক পশন করল—“তোঁবা কন?” (তোমারা কান?)। লোকনাথ জবাব দিল—“আমরা পদূলিশ। আকাতরা এইদিকে পালিয়েছে। আমরা

ভোরে অনুসন্ধানে চলেছি।” এই কথা শুনে ক্ষেতের মালিক বগল—“যাও আপনাদের চিনতে না পেয়ে আমি ভুল করেছি। আমাকে মাফ করবেন। আপনরা যত পারেন তরমুজ খান। আমি ভেবেছিলাম যে, কি জানি বাইরে থেকে কেউ বৃষ্টি-তরমুজ চুরি করতে এসেছে।” এই সহৃদয় ক্ষেতের মালিক নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে, তারা পদূলিশ নয়—বিপ্লবী দল।

লোকনাথ তার কাছে জানতে চাইল কোন দিকে বেড়ার দরজা আছে। প্রথমে লোকনাথের দরজাটি দেখতে পায় নি। সেই চাষী তাদের বেড়ার দরজাটি দেখিয়ে দিল—বাঁশের তৈরি ছোট গেট তাদের খুব কাছেই ছিল, তবু আগে চোখে পড়ে নি। তরমুজ খাওয়ার পর ক্রান্ত দেহ নিয়ে তারা আর উঠতে চাইছিল না। কিন্তু সেখানে দেরি করা তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। ভোরের আগে পথচারীদের আবির্ভাবের পূর্বে চাষীরা লাঙল হাতে এসে যেন তাদের দেখতে না পায় তেমন কোন সুবাসিত পাহাড়ের আড়ালে সারাদিনের জন্য, অস্তিত্ব সন্ধ্যা পর্বত, তাদের অপেক্ষা করতে হবে। নির্মলদা সকলকে একরকম জোর করেই তুলে দিলেন। রাত থাকতে থাকতে উপবৃত্ত সুবাসিত স্থান ধরে নিতে হবে। হুকুম হল—“In single file march!” (একজনেব পেছনে আর একজন—এরূপ করে একটি লাইনে হেঁটে চল)।

তরমুজ ক্ষেত অতিক্রম কবে তারা আবার রাস্তায় এল। একটু এগিয়ে রেল-লাইন অতিক্রম করে তারা উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল। তাদের সঙ্গে কোন কম্পাস ছিল না—তবু তাবা অনুমান করেছে যে, বোধহয় তারা সামান্য কোণাকৃতিভাবে পাহাড় লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর তারা একটি পুকুর পাড়ে এসে উপস্থিত হয়। পুকুর দেখে সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যে যত পারল পেট ভরে জল খেল। হাত মুখ ধুয়ে তারা একটু সস্ত্র বোধ করছিল। এই পুকুর পাড় ধরে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে একটি পাহাড়ের ওপর সন্ধ্যা উঠল। পুকুর ধাবে সারের ওপর একটি ছোট টিনের চালা ছিল। দোশট সান হয় চাষীরা দুপুরে ঐ চালায় নিদ্রা বিশ্রাম করে। সেই জন্য পাহাড়ের ওপর পব তারা আরও এগিয়ে অন্য আর একটি পাহাড় তাদের বিশ্রামের জন্য মননানীত করল।

সকলেই ক্রান্ত দেহে এগিয়ে পড়েছে। লোকনাথের সামনে তাবা দুমিয়ে পড়ে। তার শরীরের বিপ্লবী সৈনিক পাহারায় নিহত ছিল। সন্ধ্যা চন্দ্রা একটানা ঘুমের পর সকাল আটটা সাত আটটার তারা

ক্ষেত্রে ওঠে। হস্ত আশ্রয় অনুমোদিত কিন্তু আশ্রয়-ভাণ্ডার তাদের শরীরের ওপর পড়ায় সেই উদ্ভাসে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হবে কি আশ্চর্য! এত কান্ড করবার পর—মৃত্যু, যুদ্ধ, আগুনের ভয়াবহ দৃশ্য তারা এইমাত্র দেখে এসেছে; প্রত্যেকের সঙ্গে রাইফেল, প্রতি মৃত্যুতে আনন্দ যুদ্ধের আশঙ্কা বিদ্যমান—তবু শান্ত মনে ঘুমিয়েছে তারা! “জীবন-মৃত্যু পায়ের ভাড়া, চিত্ত ভাবনাহীন”—ভাবহীন ভাবনাহীন চিন্তাহীন তরুণ বিপ্লবীরা শান্ত মনে ঘুমিয়ে উঠল।

তাদের প্রথম কাজ হল নিজ নিজ মাস্কেট্রি পরিষ্কার করা ও তেল দিয়ে চালু অবস্থায় তৈরি রাখা। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভেঙে কটা-কট টিক-টাক শব্দ হতে লাগল। পাখি সব স্থলরব করে তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছিল। মিলিটারীতে এইরূপ অবস্থার বিশেষ কিছুভাবে বুঝতে ও কাজে লাগতে হয় সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি আছে। যদি পাখিরা কোন স্থানে বিশেষভাবে কলরব করে তবে সে স্থানে শত্রুপক্ষের পেট্রল পাট, স্কাউট বা সৈন্যদের কোন অংশের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য নির্দেশ আছে। আবার নিজেদের অস্তিত্ব বিপদ দলের কাছ অপেক্ষিত রাখার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় সেই সম্বন্ধেও Jungle Warfare (জঙ্গল যুদ্ধ) বিষয়ক পদ্বিত্বকালে অনেক উপদেশ আছে। আমাদের সেই সব শিক্ষা ছিল নয় বললেই হয়। তবু সাধারণ বুদ্ধিতে সদা-জাগৃত বিপ্লবী মন অবস্থানবাহী নিজেদের সামলে নিয়ে যে চলবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। নিজের পাহাড় মাস্কেট্রি পরিষ্কারের সময় ছোট ছোট শব্দ যখন একেবারে মুখরিত হয়ে উঠল তখনই আবার ফিসফিস করে মুখে নির্দেশ প্রত্যেকের কাছে প্রচারিত হল—“খুব আস্ত, বিনা শব্দে রাইফেল পরিষ্কার কর।” মৃত্যুতে আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

এই পাহাড়টির ওপর গাছপালা বোম্বপাড়া প্রভৃতি খুব কম। তাই ছায়া ছিল না বললেই হয়। পাহাড়ের একেবারে ওপর থেকে যদি দক্ষিণে কিছুটা নেমে যাওয়া যেত তবে সেখানে নির্জনতা ও গোপন অবস্থানের সুবিধা ছিল অনেক বেশি। তাছাড়া সেই স্থানটি ছায়ায় ঢাকা—অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও শীতল। ধীরে ধীরে খুব সন্তপণে একজন-দুজন কবে সেই ছায়াঘেরা স্থানে তারা নেমে এল।

লোকনাথ সবাইকে নির্দেশ দিল চার জন পাঁচ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঐ স্থানে সুবিধেযত জায়গা বেছে নিয়ে বিশ্রাম করতে। নির্মলদা, মানস্টারদা,

অম্বিকাদা সকলের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলেছেন—তাদের মনোভাব বদলেছেন। সবার Morale খুব উচ্চস্তরে আছে—তরুণেরা যুদ্ধের জন্য আকুল প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত করছে। তখনও তারা সার্বিক প্রায় সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাই ভাব-ছিল পাহাড়েই তাদের যুদ্ধ করতে হবে।

১৯ তারিখ সকালে দুপুরে ও বিকেলে আমরা তিনজন যখন সমুদ্রতীরে পতেঙ্গা গ্রামের কাছে অপেক্ষা করছিলাম তখন আমাদের প্রধান বাহিনী চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে এই পাহাড় অঞ্চলেই অবস্থান করা সাব্যস্ত করে। আমাদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান প্রায় পঁচিশ মাইল হবে। এইরূপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমরা দুই পক্ষই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের কথা ভেবে অস্থির হয়েছি। আমাদের কথা আগে জানিয়েছি এখন তাদের কথা বলছি।

অম্বিকাদা ও নির্মলদার সঙ্গে মাস্টারদা পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, একজনকে শহরে পাঠাবেন আমাদের খোঁজ নিতে। শহরের বেশির ভাগ তরুণ বন্ধুরাই পদলিশের চেনা তাই গ্রাম অঞ্চলের ছেলে দ্বারা শহরের গুপের সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশা করত না তাদের অস্তিত্ব পদলিশের পক্ষে জানা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য ছিল। সেইরূপ একজন তরুণ বন্ধুকে আমাদের খোঁজ করার জন্য পাঠানো হল। তার ওপর নির্দেশ ছিল যে সে অর্ধেন্দু দত্তের সঙ্গে দেখা করবে। অর্ধেন্দু সঙ্গে যদি দেখা না হয় বা তার কাছ থেকে যদি খবরাখবর পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে সে সতীদার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা কববে। তাছাড়া তাকে বলা ছিল যে, নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী সম্ভাব্য অন্যান্য সব স্থানে সে আমাদের খোঁজ করে দেখবে।

সতীদার পবিচয় আমি আগে দিয়েছি। অর্ধেন্দু দত্ত বি-এ ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী ছাত্র—তারকেশব দস্তিদারের সহপাঠী। সে চট্টগ্রাম কলেজে পড়ত ও কলেজের খুব কাছে অর্ধেন্দু ও সুনীলেন্দু দস্তিদারের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া কবে অর্ধেন্দুর ছোট ভাইয়েব গৃহ-শিক্ষক হিসেবে পড়াশোনা। ১৯২৬-এ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমি সর্ব প্রথম অর্ধেন্দুর সঙ্গে বিপ্লবীসহ স্থাপন করি। তাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবতাম—সে যে পদলিশের চর নয় সে সম্বন্ধে আমি সূনিশ্চিত ছিলাম। মাস্টারদাও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানতেন—সে যে কখনও পদলিশের স্বারা প্রভাবিত হতে পারে না এই ধারণা তাঁরও ছিল। তবু শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে যত্ন-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রথম সারির পর্যায়ভুক্ত

করতে পারি নি। যতদূর আমার মনে পড়ে বোধ হয় অর্থনৈতিক চাপে সে হেথাপড়া নিয়ে বিশেষভাবে জড়িত ছিল—মৃত্যু প্রোগ্রামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মধ্যে তার অনেকখানি ফাঁক ছিল। যদিও আমরা অর্ধেন্দু দত্তকে প্রথম সারিতে নিতে পারি নি তবু আমাদের বিশ্বাস ছিল বিদ্রোহের পর যদি শহরে আসা হতো তবে ১৯ তারিখ সকালে অর্ধেন্দু নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে অন্য হাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে যোগ দিত—তখন আর ইউ-নিভার্সিটি পরীক্ষার কোন মোহই তাকে বিরত করতে পারতো না।

অর্ধেন্দুকে আমরা প্রথম সারিতে মনোনীত করতে পারি নি বটে, কিন্তু আবার যাদের প্রথম আক্রমণ চালাবার জন্য বাছাই করলাম তারাই যে শেষ পর্যন্ত তাদের বিপ্লবী সাহস ও বিক্রমের সঠিক পরিচয় দিতে পেরেছে তা নয়। বিগত ইতিহাস নিরর্থক ও একতবফা হয়ে বাবে যদি আমাদের দৃষ্টির বিষয় উল্লেখ না করে কেবল সাফল্যের দিক প্রচার করে ভাবী-কালের তরুণদের মন Complacence আত্মতৃপ্তি মারাত্মক দোষে আচ্ছন্ন করতে সাহায্য করে। অগ্নিযুগের এই ইতিহাসের সামান্যতম অবদানও যদি শিক্ষার্থে গ্রহণ করার যোগ্য বিবেচিত হওয়ার আশা করি তবে আমার মনে হয় দৃষ্টিভঙ্গির পবি-বর্তন প্রয়োজন। অতীত বিপ্লবীদের দৃষ্টি দেখিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা আমার কাজ নয়—তাদের দৃষ্টি আছে, বিচারিত কব্বণ ইতিহাসও হয়ত পাওয়া যাবে—তবু আইরিশ বিপ্লবী নেতা লেলোরের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হবে—প্রথম অ্যাকসন হয়ত ভুল হবে, হয়ত অনেক ক্ষেত্রে আমরা অক্ষমও হবো তবু সেই অক্ষমতাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইব না। তবু ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে আমাদের অক্ষমতা, দৃষ্টি-বিচারিত সব তুলে ধরবে যেন তরুণ সাহসীরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বাস্তব ও ভয়াবহ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, যেন বুকতে পারে মেশিন-গানের গুলী ও মৃত্যু-বিভীষিকা অতি সাহসীকেও অনেক ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে আমার এই ভাষাটি প্রকাশ কবতে হচ্ছে। বাছাই করে এক তরুণ বিপ্লবীকে—যার ছিল মৃত্যুপণ—তাকে পাঠানো হল আমাদের দুই অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের এক পবিত্র বিপ্লবী দায়িত্ব দিয়ে। সে শহরে এল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা অপ্রাপ্ত সত্য যে সতীদার সঙ্গে সে দেখা করে নি বা তাঁর দেখা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অর্ধেন্দু সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কি না তা আমার জানা সম্ভব হয় নি। কিন্তু

সতীদার সঙ্গে যে সে দেখা করে নি বা করতে পারে নি সেই সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত; কারণ সতীদার কাছ থেকেই জেনেছি যে তাঁর কাছে কেউ প্রধান বাহিনীর সংবাদবাহক হয়ে আসে নি। উপরন্তু পরবর্তী ঘটনা খুবই “অস্বাভাবিক” ও বেদনাদায়ক। এই তরুণ বিপ্লবী যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল তার কিছুই তো সে করেই নি অধিকন্তু প্রধান বাহিনীর কাছে সে আর ফিরেও যায় নি। সোজা বাড়ি চলে গেল সে। তারপর কয়েক দিনের মধ্যে বি-এ পরীক্ষা দিল এবং পাশও করল। এক সাধারণ নিরীহ নাগরিক সেজে পদলিশের সন্দেহের উদ্ভব গতিবিধি বজায় রেখে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার মূল্য যে কতখানি তা কেবল তারাই উপলব্ধি করবে যাদের সামনে ভবিষ্যতের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে।

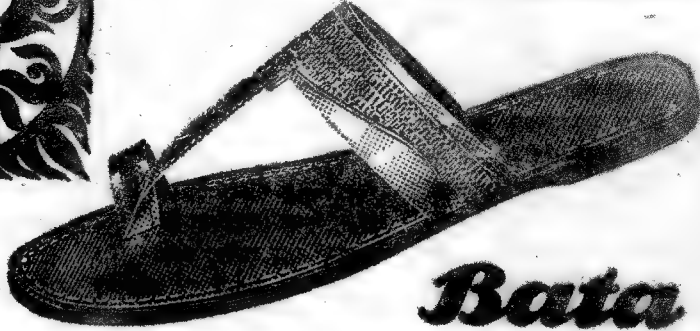
পাহাড়ের ওপর থেকে প্রধান দলটি একটি নিচে নেমে এলো। ছায়াম ঘেরা জায়গাটায় এসে তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কয়েকজন অবশ্য প্রহরী হিসেবে যে নিযুক্ত ছিল তা বলাই বাহুল্য। দুপুরবেলা তারা আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তৃষ্ণায় তাদের বুক ফেটে যাচ্ছিল। জল—একফোটা জল। এই পাহাড়ে ওঠার সময় তারা একটি পুকুরের ধাপ দিয়ে এসেছে। সেখানে গেলেই জল পাওয়া যায়। কিন্তু দিনের বেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে পুকুরে যাওয়া আসা সম্ভব ছিল না। অগত্যা তৃষ্ণায় বুক ফাটুক তবু পুকুরে যাওয়া চলবে না। এমন নিদারুণ অবস্থায় তাদের মধ্যে এমন একজনও কেউ ছিল না যে নাকি গাছের সবুজ পাতা, ঘাস প্রভৃতি চিবিয়ে শরৎ মূখ ও গলা ভেজাতে চেষ্টা করে নি। ঘাস, পাতার অতি বিপ্লব রস স্বাভাবিক অবস্থায় কারণ পক্ষে গলাধঃকরণ করা সহজ নয়। কতখানি তৃষ্ণা তাড়নায় অধীর হলে মানুষ লতা, পাতা, ঘাস চিবিয়ে তৃষ্ণার জ্বালা নিবারণ কবতে কুণ্ঠিত হয় না তা সাধারণ লোকের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।

প্রত্যেকে অন্তরে, হয়ত নির্দেশ পেয়েছে—জল আমাদের চাই, শত বাধা থাকলেও জলের ব্যবস্থা কেন করা হবে না? কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে কে? অধিনায়কেরা তখনও ভাবছিলেন—তখনও জ্বলন্ত ব্যবস্থার জন্য কাউকে স্কাউটিং কববার জন্য পাঠানো সাব্যস্ত করেন নি। যদি জেনারেলশিপ বলতে আমরা এই বুদ্ধি যে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করে সৈন্য সংগঠন করা এবং যে কোন অবস্থায় কঠিনতার মধ্যেও সেই সৈন্যের Discipline মেনে চলতে বাধ্য থাকবে তবে তা দুর্বলতাগ্রস্ত জেনারেল-

গরমে চলন হালকা পায়ে

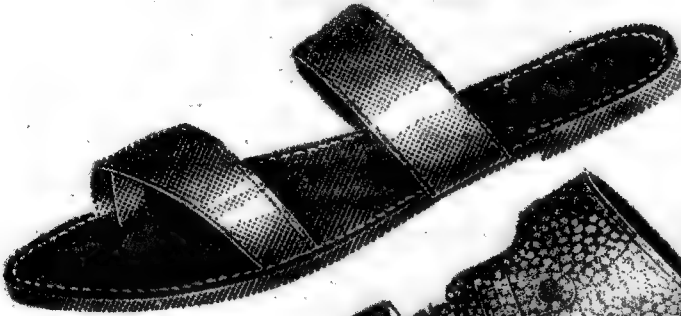


শীতলীয়ে খাদিক এদিক-ওদিক চলন, নিমেষেই
ঘড়বেন বাটার সন্ডাল আর চম্পল এদের বৈশিষ্ট্য কী।
কী আরাম এদের পায়ে দিয়ে! কী মসৃণ চামড়া!
এমন হাওয়া-খেলানো নকশা, নির্মাণশৈলী আর
মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে।
স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।
আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও
চম্পলের নতুন মনোহর ফ্যাশান।

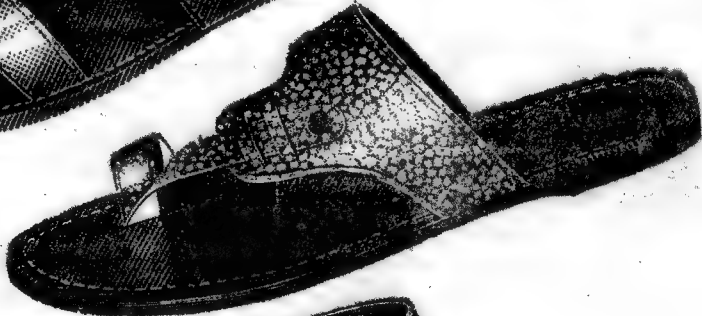


স্যান্ডাল ৭.৯০

Bata



স্যান্ডাল ৯.৯০



স্যান্ডাল ৭.৯০



স্যান্ডাল ৯.৯০



স্যান্ডাল ৯.৯০

শিপের প্রতীক হতে পারে জেনারেল-শিপের বাস্তব রূপ নয়। প্রকৃত জেনারেল যিনি হবেন তাঁকে সশস্ত্র মনুষ্যে বিনা-হীনচিত্তে বাস্তব কার্যকরী পন্থার নির্দেশ দিতে হবে। নইলে দুর্বল নেতৃত্বের ফলে জোর করে শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

টির অশান্ত চঞ্চল টেগরা (হরিগোপাল বসু, লোকনাথের কনিষ্ঠ ভাই) সদা adventure প্রিয়—দুঃসাহসিক কাজ করতে সে সব সময় উদ্ভূত। তার ভাল লাগছিল না এভাবে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে থাকতে। কিছু একটা করা চাই। জলের খোঁজে সে যাবে—লোকচক্রের অন্তরালেই বৃদ্ধি করে বঙ্গজালের আড়ালে সে জল আনতে যাবে। টেগরা তার এরূপ মনোবাসনা জানাল হনার (মনোরঞ্জন সেন) কাছে। Undaunted—চিরনিভীক মনোরঞ্জন এক কথার রাজা। তারা দুজনে সবার অজ্ঞাত-সারে অতি সন্তর্পণে ও গোপনে অতি ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে গেল। জলাশয় খুঁজে পেয়েছে। প্রাণভরে জল পিঁয়েছে। সামনে আম গাছ—অনেক আম। কাঁচা আমও তারা পেট ভরে খেয়েছে। তারপর দুটো Water-carrier (জল-পাত্র) ভর্তি করে জল নিল। আর অনেকগুলি কাঁচা আম পেড়ে থলি ভর্তি করে সঙ্গে করেকটি বেলও নিয়ে নিল।

তারা যখন adventure করে আবার সবার সামনে হাসিমুখে পাহাড়ে ফিরে এল তখন তাদের ওপর রাগ বা বিরক্ত হওয়ার অবসর কেউই পায় নি। দু'টি মাত্র জল ভর্তি Water-carrier। এই সামান্য জল প্রায় বাটটি ভূষিত কঠিন সিন্ধু করবার পক্ষে নিতান্তই অল্প। দেখতে দেখতে দুটো Water-carrier প্রায় শেষ হয়ে গেল। অবশিষ্ট করেকিছু জল, যা তলার পড়েছিল তা' নিঃশেষ করার জন্য টেগরা নিজে Water-carrier-টি তুলে মূখের সামনে নিয়েছে আর ঠিক সেই সময় বালক পুলিন তার পাশে দাঁড়িয়ে করুণ দৃষ্টিতে চাতকের মত করেকফোটা বারিবিন্দুর জন্য টেগরার কাছে অনুরোধ জানাল। টেগরা সাময়িক হাসি আবহাওয়ার মধ্যে অতটা লক্ষ্যই করে নি। সে যেমনি Water-carrier তুলে ধরে মূখের কাছে নিচ্ছে তখন লোকনাথ চট করে টেগরার হাত ধরে ফেলল এবং খুব তীব্র কণ্ঠে বলল—“তোরা লজ্জা করছে না? তুই তো আম খেয়েছিস—জলও খেয়েছিস। যে জল চাচ্ছে তাকে না দিয়ে জল খেতে তোর কোনো সৎকাচ হচ্ছে না?” তার চপলতা ও ঔদাসীন্যের জন্য নিজ প্রয়োজন অপেক্ষা সাধারণ প্রয়োজন যে অনেক বেশি—এই সভ্য কেন সে উপলব্ধি করে নি; একথা ভেবে মনুষ্যে সে ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মাটির

সঙ্গে মিশে গেল। তৎক্ষণি সে দু' হাত বাড়িয়ে পুলিনকে তার Water-carrier-টি দিয়ে দিল।

অনেক ঘটনার মধ্যে সাধারণভাবে নিতে গেলে এইটিও হয়তো খুব সামান্য ও তুচ্ছ। কিন্তু সত্যিই এটি একটি তুচ্ছ ঘটনা নয়। এই সৈদিনও কালী দেবী কাছে আমি আবার এই ছোট ঘটনাটি শুনলাম। সে সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। আজও তার চোখের সামনে ছবির মত এই “তুচ্ছ” ঘটনাটি ভাসছে। সে বর্ণনা দিতে দিতে আবেগভরে বলে গেল—

“.....হাজার হলেও লোকাদার আপন ছোট ভাই। টেগরায় হয়তো সবার চাইতে ছোট ছিল। কিন্তু ছোট ভাইয়ের প্রতি লোকাদা স্নেহাঙ্ক হন নি। লোকাদার বলিষ্ঠ কঠব্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছিল। আজও আমার চোখের সামনে সেই দৃশ্য নৈশ্চলিক কঠব্যবোধের এক আদর্শ হয়ে জেগে আছে।

তারপর কালী দে আমাকে জানাল টেগরা কতখানি লজ্জা পেরেছিল ও অপ্ৰতিভ হয়ে পড়েছিল—“লোকাদার কথা শুনে টেগরা চমকে ওঠে—তার মূখ-চোখ অপরাধীর মত ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অসাবধান মনুষ্যেও কোন সাধারণ প্রতি তার এই ঔদাসীন্য কেন এই ভ্রম—তা' ভেবে সে যেন নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না! তার স্বগতোক্তি শুনতে পেলাম—‘এর চাইতে আমার মরই ভাল!’”

সঙ্গে যে আম ও কটি বেল এনিছিল তা হাতে-হাতে বিলি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে কাঁচা আমগুলি যতই টক বা কষা হোক না কেন তা' নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। আমার খোসাও তারা চিবিরে খেয়েছে। হয়তো আমার আঁটিগুলিও শেষ পর্যন্ত তারা ফেলে রাখে নি। অম্বিকাদা সবার কাছে ঘুরে ঘুরে বললেন—“আজ রাতে, অর্থাৎ ১৯ তারিখ রাতে” তিনি সবার জন্য আহারের ব্যবস্থা করবেন।” নিমলদা মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুকের বাড়ি পরিবেশন করে সবাইকে উৎকৃষ্ট রাখতে চেষ্টা করছিলেন। অম্বিকাদার কাছ থেকে রাতে আহারের আশ্বাস পেয়ে নিমলদা বেশ একটু রুগ্ন করে বললেন—“আর কি বাই? অম্বিকাদা অন্তরে থাইলে ডর কিয়র? প্রী চিয়ার্স ফর অম্বিকাদা—রাতুয়া আরারে অম্বিকাদা খাওয়াইবো!” (আর কি ভাই? অম্বিকাদা সঙ্গে থাকলে ভয় কি? রাতে অম্বিকাদা আমাদের খাওয়াবেন—প্রী চিয়ার্স)।

হাসি-ঠাট্টার ভাব তরণদের খুব ভাল লাগছিল না। টেগরা তরল পরিবেশের মধ্যে গান্ধীর্ষ ও পরোক্ষ বিবাদের অবতারণা করে বসল—“খাওয়া হয়তো নিশ্চয়ই হবে—কিন্তু আমরা যুদ্ধ কখন করব?”

স্পষ্ট প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর কেউ দিতে পারলেন না। অম্বিকাদা হাসিমুখে একটা জবাব দিলেন বটে তাতে বিপ্লবী আকৃষ্ট সনের সূনিদিত পথ-নির্দেশের অভাব ছিল। অম্বিকাদা বললেন—“যুদ্ধ আনরা করব। কিন্তু শরীর রাখতে খেতে তো হবে? কেবল মরলে তো চলবে না, মারতেও তো হবে!”

বিধু ভট্টাচার্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করা ডাক্তার। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে—গোল্ড মেডেল পেয়েছে। আমাদের মধ্যে কেন, অনেকের মধ্যেই এইরূপ উচ্চস্তরের রসবোধ খুব কম দেখা যায়। তার বীরত্ব ও সাহসের অনেক কথাই আমার এই লেখার ক্রমশ প্রকাশ পাবে—সে জালালাবাদের যুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে। বিধুর চরিত্রে বিপ্লবী প্রেরণা ও হাস্যরসের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তা' সচরাচর চোখে পড়ে না—অন্তত আজও আমার সৌভাগ্য হয় নি এ রকম আর কারও সংস্পর্শে আসবার—যার অন্তরের বিপ্লবী প্রেরণার সঙ্গে হাস্যরসের সুপ্রবাহ বিধুর চরিত্র মাধুর্যের সমকক্ষ। বিধুর হাস্যরস এত natural এবং এত সহজ স্বাভাবিক ও সুন্দর ছিল যে সামান্য কথাও যখন সে বলত তখন সেই বাচনভঙ্গী, বক্তব্যের বিশেষ স্থানে হঠাৎ থেমে পড়া, অন্যের হাসির খোরাক হুগিয়ে অন্তত রকমে নিজের গান্ধীর্ষ বজায় রাখার কৌশল, বিভিন্ন উপমা ও প্রবাদবাক্য ঠিক স্থানে ও ঠিক সময়ে এত সুন্দর করে টুক করে বলবার পন্থাটি আমাদের চমৎকৃত করেছে। আমি জানি যদি আমার লেখার মধ্যে বিধুর করেকটি কথা যথাযোগ্যভাবে উদ্ধৃত করিও বা তাতে সত্যিকারের স্বাদ আমি পাঠকবর্গকে দিতে পারব না—তার কারণ, বিধুর বাচনভঙ্গী, গলার স্বর, চোখমুখের cynchronised অভিব্যক্তি, মাপা হাসি, কম্পিত রাগ ও অভিমানের ভান, প্রভৃতির television চিত্র তাতে অবতীর্ণ থাকবে।

নিমলদা, অম্বিকাদা ও টেগরার কথার মাঝখানে বিধু কুমিল্লার ভাষায় বলল—“হু, মরম যখন তখন খাইয়া-দাইয়া মরণ ভাল। অম্বিকাদা কইছে, মাইয়া মরণের লাগি। ব্যাস, মরণের আগে খামুও ভাগো মারমুও।” বলার মধ্যে এত রস ছিল যে সবাই সেখানে হেসে উঠল। কিন্তু বিধু এই কথাগুলি বলেই একেবারে চুপ।

সবাই হাসল। হাসল না একজন—টেগরা। তার স্বগতোক্তি সবাই শুনতে পেল—“মেরেই মরব—ভবে সবার আগে মরব আমি। খাওয়া হোক আর নাই হোক—চাই যুদ্ধ।”

খবে নিচু স্বরে টেগরা কথাগুলি

সাহিত্যিক বসন্ত

বলে। 'বৃন্দ চাই'—এই কথাটি নাগর-
খানা পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ধ্বনিত
হোল। বিপ্লবীদের অন্তর উদ্বেলিত
কণ্ঠে উঠল। প্রত্যেকের হাতে
রাইফেল দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হল। প্রত্যেকের
মন বলে উঠল—'বৃন্দ চাই।' ক্ষমা, তুচ্ছ,
বিনিময়, প্রাপ্তি, ক্রান্তি সব বৃহত্তে বিদায়
নিল, নিজীব ভাব সবার মধ্য থেকে কেটে
গেল। সবাই সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে
উঠল।

লক্ষ্য হয়ে এল। তখনও আমাদের
খোঁজ নিয়ে সেই বৃন্দক বৃন্দ ফিরে এল
না। কি করে ফিরবে—সে যে তখন আবার
নির্বিশেষ নিশ্চিন্ত নিরীহ নাগরিক
জীবনে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখছে। পরীক্ষা
দিয়ে বি-এ পাশ করতে তো হবে!

রাত প্রায় আটটা সাড়ে আটটার সময়
নির্দেশ হল পাহাড়ের ঢাল—বয়ে সবাই
যেন নিচে নেমে আসে। এই নাগরখানা

পাহাড়ের পাদদেশে তারা একজনের পাশে
একজন দাঁড়াল। কতজন উপস্থিত গণনা
করা হল। তখন তারা মাত্র ছাপায় জন।

১১ তারিখ রাতি আটটা বা সাড়ে
আটটার সময় যখন তারা নাগরখানা
পাহাড়ের নিচে ফল-ইন হয়ে, এক সারিতে
দাঁড়িয়ে নিজেরদের সংখ্যা গণনা করছে,
প্রায় সেই সময় আমরা তিনজন আনন্দের
বাড়ির টিলাটির ওপর তার মা, বাবা
ছোড়াদি ও ছোটকোনের সঙ্গে মিলিত
হয়েছি। আনন্দ আমাদের সঙ্গে আবার
যোগ দিল। আমরা তখন সংখ্যায় হলাম
চারজন। হিমাংশু দম্ব অবস্থায় একা
অন্যত আছে।

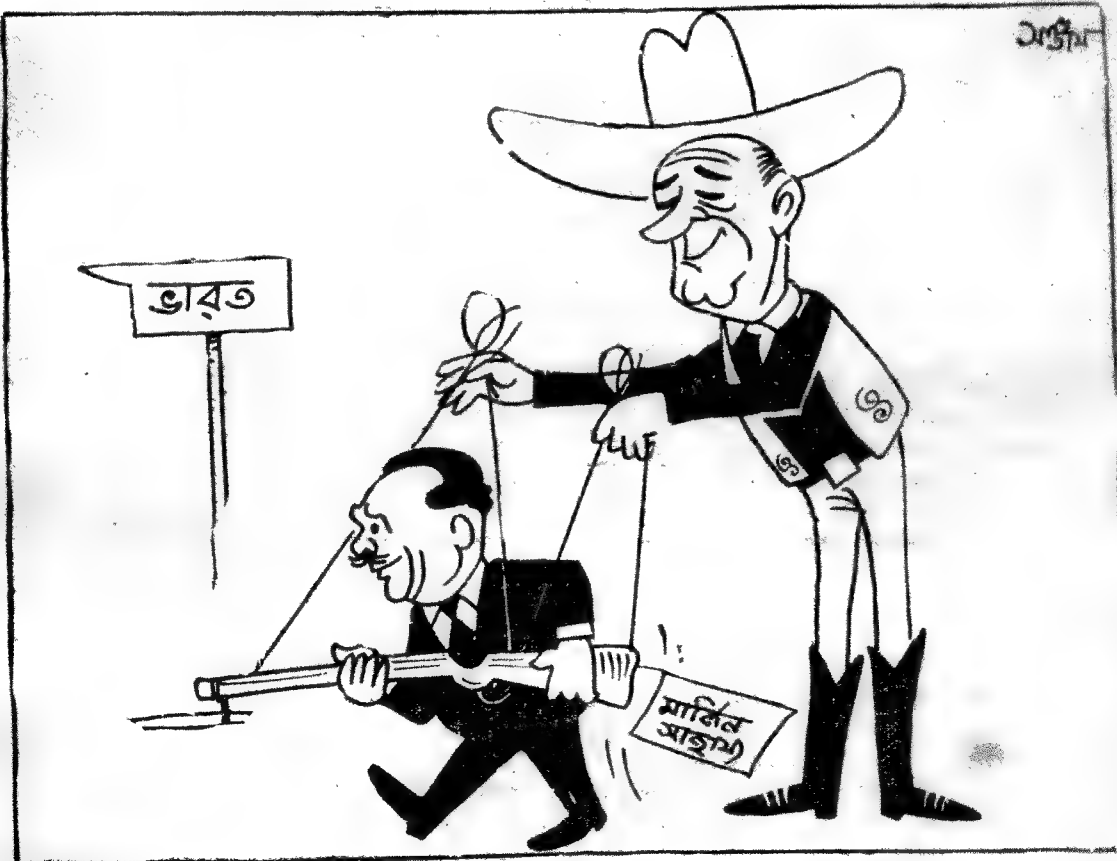
১১ তারিখ সারা রাত তাদের
অপেক্ষায় আমরা ছিলাম আনন্দের বাড়ির
টিলায়। সংবাদবাহক বৃন্দ নির্দেশ মত
যদি অর্ধেকের বাড়ি এসে থাকে তবে
আমাদের ওখান থেকে তিন শ' গজের

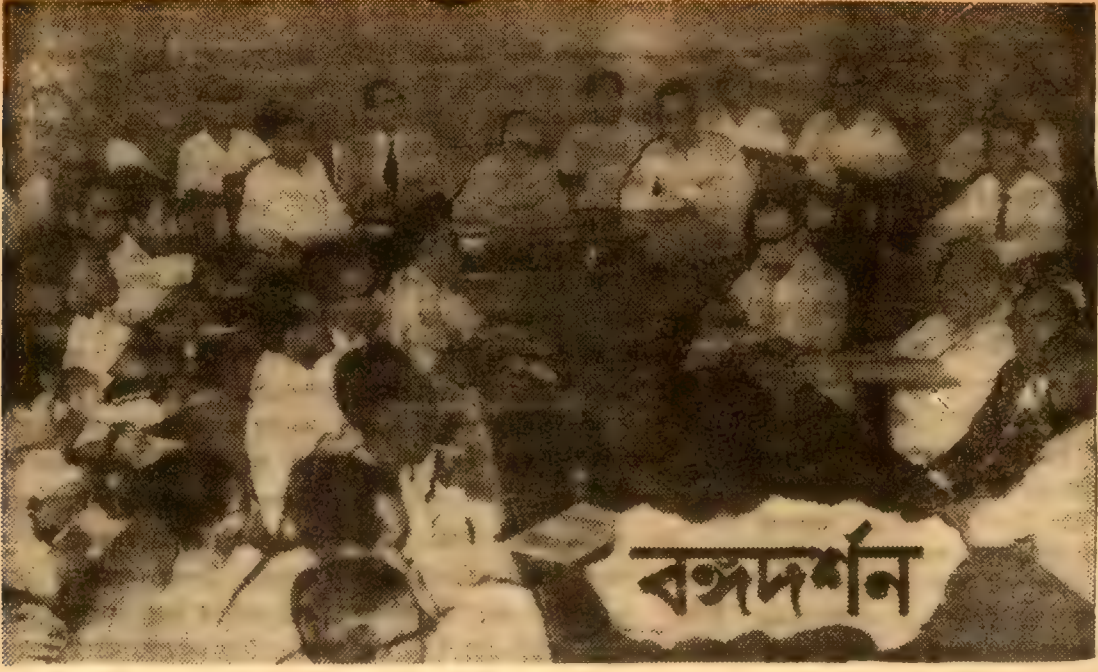
মধ্যে সে ঘুরে গেছে। দৃতীয়া আমাদের
বৃন্দকে চারিদিকে লক্ষ্য রেখে
সহজেই সে আনন্দের বাড়িতে আমাদের
খোঁজ নিতে পারত।

১১ তারিখ রাতে তাদের কিছু
খেতে হবে। তারপর কি করবে? শহরে
আসবে—না কি আরও কোন নিরাপদ
পাহাড়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? তারা
আহারের অশ্বেষণে ও তারপর নিরাপদ
স্থানের অনুসন্ধানে মার্চ সুরু করল।
১১ তারিখ রাতে চট্টগ্রাম শহর পরিভ্রমণ
অবস্থায় ছিল—তখনও বাইরে থেকে কোন
ফোর্স এসে পৌঁছতে পারে নি। প্রধান
বাহিনী নিশ্চেষ্ট—আমাদের অপেক্ষায়
সময় কাটাচ্ছে আর শত্রুপক্ষ ক্ষিপ্ততার
সঙ্গে সৈন্য সমাবেশ করতে বাসত।

[কল্যাণ]

পুতুলনাচের ইতিকথা---





রাজ্যে শিল্পে শান্তিরক্ষায় প্রমিত-মালিক-সরকার ত্রিগাণ্ডিক বৈঠক

দুর্য্যোধন ছলের অভাব হয় না

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন হবার পর প্রথমমন্ত্রী প্রীত্ববোধ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সংগত কারণেই ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রমিতবিরোধের ক্ষেত্রে মালিক পক্ষের এজেন্ট হিসাবে শ্রমিক ঠাণ্ডানোর জন্য পদূলিশ প্রেরণ করা হবে না। কেন না এটা একটা জংলী নিয়ম, ধনতন্ত্রবাদের গীঠস্থান অর্থাৎ বটেন, আমেরিকা ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে এ রকম কোন রীতি নেই। এই বিশেষ নজরটি কংগ্রেসী আমলের একটি স্ট্রিট, মালিকপক্ষের দালাল হিসাবে পদূলিশের ঠাণ্ডাড়ে বৃত্তি এ দেশেই সম্ভব হয়েছিল। কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকার এ জাতীয় বঙ্গজাতি বরদাস্ত করতে পারেন না।

এই ঘোষণার পরেই মালিকমহল চঞ্চল হয়ে উঠল। তখন প্রথমমন্ত্রী তাদের সমস্ত বিষয়টা বুঝিয়ে বললেন যে, এতে তাদের ঘাবড়াবার কিছুই নেই, প্রতিটি সভ্য দেশের যা নিয়ম এখানেও তা আচরিত হবে। কোন হিংসাত্মক কাণ্ড ঘটলে, বা কোন বিপদের আভাস দেখা দিলে পদূলিশ যথারীতি যাবে, আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিলে তা রক্ষা করবে, শুধু মালিক-পক্ষের ভাড়াটে গুন্ডার ভূমিকায় অভিনয় করবে না। মন্ত্রামন্ত্রী আরও স্পষ্ট জানানলেন যে, প্রমিতরা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিক তা যুক্তফ্রন্ট সরকার চান না, কিন্তু এতাবৎ যে মালিকেরা তাবোদার কংগ্রেস সরকারের সুযোগে নিজেদের হাতে আইন রেখেছিল, সেটাও চলবে না।

যে সব শিল্পপতিরা প্রথমমন্ত্রীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতে এসেছিল তারা তখন খুশি হয়ে বিবৃতি দিলে যে, সরকার সঠিক পন্থাই নিয়েছে। কেন না প্রথমমন্ত্রীর যুক্তি অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কয়েকটা স্বার্থ কোন দিনই যুক্তি ও ন্যায়ের দ্বারা চালিত হতে শেখে নি। বিলাতের ক্যাপিটালিস্টদের যেটুকু লোক-দেখানো বাহ্যিক নীতিবোধ আছে এদের তাও নেই। এদের এক পাশ্চা, ভারতীয় চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি মাঝখান থেকে এক বিবৃতি দিয়ে বলল যে, তারা নাকি এখানে ব্যবসার পক্ষে নিরাপদ অবস্থা বোধ করছে না। কথাটির ইঙ্গিত পরিষ্কারঃ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

দুর্য্যোধন ছলের অভাব হয় না। যারা স্বভাব-দুর্বৃত্ত তারা কদাপি ভালো কথায় কান দেয় না।- এরা এবার আর এক পাশ্চা আশ্বাস ধরল। চারদিকে নাকি দারুণ প্রমিতবিরোধ হচ্ছে। এ রকম হলে কল-কারখানা চালানো মুশ্কিল হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার বললেন যে, ধর্মঘট করার অধিকার সম্পূর্ণ বৈধ অধিকার, অন্তত সংবিধানে তাই লেখা আছে, আর যারা এই সংবিধান তৈরি করেছিল তারা তো তোমাদেরই লোক ছিল, একান্ত আপন জন। তদুপরি তোমরা ছাঁটাই করবে, লে-অফ করবে, ট্রাইবুনালের দ্বারা কার্যকরী করবে না, সবিন্দন মজদুরী আইনও লঙ্ঘন করবে, আর প্রমিতেরা তাদের দুর্য্যোগের জন্য গতজন্মের কর্মফলকে দায়ী করবে এ তো কোন কথা হতে পারে না।

কিন্তু আগেই বলছি শয়তানের শিং আছে কিন্তু তা দেখা যায় না। পশ্চিম-বঙ্গের সরকার নবগঠিত, সামনে অনন্ত

সমস্যা আর বিগত উনিশ বছরের জঞ্জাল তার মাড়ে। এই অবস্থার সুযোগে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে র্যাকমেল করে দেখা যাক মা কি স্ফায়ার করা যায়। আবার নতুন বাক্সা উঠল, ঘেরাও বন্ধ করতে হবে, ওটাকে বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার সবিনয়ে জানানলেন যে এ বছরে ঘেরাও-এর সংখ্যা মাত্র চৌত্রিশটি, গত বছরে তা ছিল সাতশোরও বেশি। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করা এবং এই সরকারকে উচ্ছেদ করাই এদের কামা। এবং তলে তলে এরা যে সে চেষ্টা করছে না তা নয়। কিছুকাল আগে কলকাতার রাস্তায় শিল্পেরা উন্মত্ত কূপাণ হস্তে যে তাণ্ডব করল তার পিছনে যে অন্তত একটিও শিল্পপতি গোষ্ঠী আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ওই প্রতিষ্ঠানের জনৈক পি আর ও-র সঙ্গে ওদের নেতাদের দহরম মহরমের অভিযোগে যে অভিযোগ বিধান সভায় উঠেছিল।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতি-গোষ্ঠী শিল্পক্ষেত্রে একটা অচল অবস্থা এনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বিপদে ফেলতে চায়। তার প্রত্যক্ষ নজর রয়েছে ট্রাম কোম্পানীর ভাড়া বাড়ানোর বিষয়টি। এখন অবশ্য হাইকোর্টের নির্দেশে ব্যাপারটি চাপা আছে কিন্তু তা কালক্রমে আত্মপ্রকাশ করবেই। পূর্জিবাদীদের শ্রেণীচরিত্র বদলায় না, ন্যায়সংগত ও যুক্তিপূর্ণ কথায় তারা কোন দিন কান দেয় না। গত দু বছরের মধ্যে এদের প্রভাব ও প্রতাপ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিম নেহরুর মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় সরকার এদের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ কবেছেন। এদের পিছনে আছে বৈদেশিক শক্তি, ভারতের রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের প্রভাব এ নির্বাচনে দারুণ বেড়ে গেছে, একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গও করল।

অন্যান্য রাজ্য নিয়ে এই পুঁজিবাদীরা বড় একটা মাথা ঘামায় না। সে সব স্থানে কংগ্রেস পরাজিত হলেও বার্ষিকমতায় আসীন হয়েছে তারা এদেরই লোক। সেখানে এদের কোন চিন্তা নেই। কিন্তু প্রগতিশীলতার জয় হয়েছে ভারতের মাত্র দুটি রাজ্যে। কাজেই এ দুটি রাজ্যের উপরেই এদের এত আকোশ। কেরলের বিগত কমিউনিস্ট সরকার শত্রুদ্রুমের সে দেশের বেকার সমস্যার মূখ্য চেয়ে বিভ্রান্তির রেখায় কারখানা খুলতে দিয়েছিলেন এবং সত্য হয়েছিল যে, সেই কারখানায় কোন ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে না। এতখানি মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সেই সরকারের বাড়ি মটকাতে পুঁজিবাদীরা মোটেই পিছপা হয় নি। কেরালার চেয়েও পশ্চিমবঙ্গ অধিকতর শিল্পোন্নত। কাজেই শিল্পের ক্ষেত্রে গোলমাল বাধাতে পারলেই বার্ষিকমত সরকারের উদ্দেশ্য চাইছে তাদের প্রভুত সুবিধা হয়।

এই সকল কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্রুতমত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুগ্রহ দেখানোর প্রয়োজন নেই। এরা যদি গ্রেট করে যে, এদের আদার না মেটাতে এরা কারবার মটকাতে তাতে আশঙ্কার কিছু নেই। মনোফার কামধেনু ত্যাগ করা অসম্ভব। এদের কোন কথাতেই আমল না দেওয়া উচিত, কেন না এরা সরকারকে ভয় দেখিয়ে কিছুটা বাগেন করতে চায়। সরকার দৃঢ় মনোভাব দেখালে এরা আপনাই গুটিয়ে যাবে। এদের প্রতি কোন অনুগ্রহ নয়।

এ ছাড়া সরকারের তরফ থেকে আরও একটি ঘোষণা করার প্রয়োজন আছে। শ্রমবিরোধের অঙ্গুহাতে যদি কোন মালিকপক্ষ কারখানা বন্ধ করে দেয় সরকার তৎক্ষণাৎ সেই কারখানার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই ঘোষণার স্বারা তারা অনেকটা টাইট হবে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে খোঁজ নিয়ে জানতে হবে কোন কোন কারখানা শ্রমবিরোধে সংক্রান্ত গ্রেইবদনালের রায় মেনে চলছে না, এবং সেই সব কারখানাকে বাজেয়াপ্ত করে সরকারী মালিকানাধীন আনতে হবে। স্বাধীন শক্তি যদি মেহনতী মানুষের অনুকূল হয় এরা শত্রু সোরগোল তোলা ভিন্ন আর কিছুই করতে পারবে না। সকলেই শত্রুর ভয় নরমের যম, এটাই জগতের রীতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দৃঢ় হন সকল সমস্যারই

সমাধান হবে। এই মর্মেতে পুঁজিবাদী শক্তিসমূহকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল নীতিই শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ট্রেড ইউনিয়ন আইনে দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে যে সকল পথের নির্দেশ আছে শ্রমিকেরা যদি সেগুলি অনুসরণ করেন সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু বলার নেই। গত বছরের তুলনায় এবারে ঘেরাও-এর সংখ্যা কিছুই নয়, মালিকপক্ষ অহেতুক সোরগোল তুলছে। তাদের এই মর্মেতে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন, এজন্য সরকারকে অবশ্যই দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে।

আজ্ঞা

বাঙালী হিসাবে আমরা প্রাদেশিকতাকে বা সাম্প্রদায়িকতাকে চিরকালই ঘৃণা করে এসেছি। বরং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বেশি। বাংলাদেশে যারা রাজস্ব-রাজস্বগারের শাস্ত্র্য এসেছেন তাঁদের প্রতি বাঙালী কোনদিনই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে নি, বা তা করতে হবে একথাও বোধ হয় স্বপ্নে ভাবে নি। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, বাঙালীকে হয়ত এই চিরচিরিত ঐতিহ্য বদলাতে হতে পারে, যদিও তার জন্য চেষ্টা দারী নয়।

বিষয়টা খুলে বলছি প্রয়োজন। নয়াগিরিতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট জনৈক শিখ প্রতিনিধিদের নেতা দাবি করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কমপক্ষে পাঁচশ' বাসের পারামিট তাঁদের নাকি দিতেই হবে। এরকম দাবি করার ফলাফলটা যে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াতে পারে, একথাটা তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি? আজ পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাসের পারামিট শিখেরাই নিয়ে বসে আছেন, এটা বাস্তব সত্য। প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারকে অন্যদিকে যতই দোষ দেওয়া যাক না কেন, সেই সরকার প্রাদেশিক মনোভাবসম্পন্ন ছিল, একথা কেউ বলে না। বর্তমান নেতৃত্ব এই জাতীয় সংস্কারমুদ্র। কিন্তু তা বলে এইরকম অধৈমিকভাবে দাবি যারা করেন তাঁদের মনোভাব সম্বন্ধে সতর্ক থাকার একান্ত প্রয়োজন।

এ শিখ নেতা যে জাতীয় দাবি করেছেন, অনুদ্রুপ দাবি অন্য রাজ্যের লোকেরা যদি তাঁদের দেখাশোনা করেন, তার পরিণামটা কি হবে? বাঙালীরাও যদি পালা দাবি করে যে, পাঞ্জাবে এতগুলি চাকরি বা এতগুলি ব্যবসার পারামিট প্রয়োজন, তাহলে তাঁরা সেটাকে কিভাবে নেবেন? পশ্চিমবঙ্গে আরও অনেক

প্রদেশের অধিবাসী, আরও অনেক সম্প্রদায়ের লোক থাকেন, কই তাঁরা তো কখনও একথা বলেন নি যে, আমাদের এতগুলি চাকরি দিতে হবে বা এতগুলি পারামিট দিতে হবে?

এই জাতীয় অধৈমিক দাবি করে তাঁরা যে পথ দেখালেন তার পরিণাম জাতীয় সংহতির উপর যে অত্যন্ত কুফলপ্রদ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এঁদের দেখাদেখি ভিন্ন প্রদেশবাসীরাও অনুদ্রুপ দাবি করবেন, যার চরম পরিণামে আমরাও অন্যান্য রাজ্যের কাছ থেকে অনুদ্রুপ দাবি করব। ফলে এক রাজ্যের সঙ্গে অপর রাজ্যের সম্পর্ক দাঁড়াবে শুল্ক নগ্ন স্বার্থের এবং তারই সংঘাতে ভারতের বাস্তবিক ঐক্য তাসের ঘরের মতই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে তাঁরা বোধহয় সেটার পরোয়া করেন না, কেন না তাঁদের মন্ত্রকের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাপ্রবণতা, যা সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। ওখানকার রাজনীতির ঐটুকুই মূলধন।

কিন্তু এ যারাজক বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গের নেই, এই কারণেই চিরকালই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সকল রাজ্যের অধিবাসীকেই সমান চোখে দেখে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি চরম শত্রুতামনোভাবসম্পন্ন রাজ্যও নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রী ও পরিবহনমন্ত্রী কি সিদ্ধান্ত করবেন সে কথা তাঁরাই জানেন, তবে আমাদের মনে হয় এ রকম অধৈমিক সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক মনোভাবসম্পন্ন দাবির উত্তরে তাঁদের আর একটি বাসের জন্যও পারামিট না দেওয়া উচিত।

আজব দেশ, আজব বিনিয়োগ

যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রচার ও তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসোমানাথ লাহিড়ী এমন একটি তথ্য সম্প্রতি আহরণ করেছেন যা দেখে অনেকেরই চক্ৰ চক্ৰ-গাছ হবে।

সংবাদটি ছোট, একটি প্রখ্যাত ইংরাজী পত্রিকার একটি অবহেলিত কোণে কোনক্রমে যেন স্থান পেয়েছে, যাতে শ্রবণ কলেকেরই চক্ৰ এর ওপর পতিত হয়। কিন্তু ছোট হলেও সংবাদটিব গুরুত্ব মোটেই ছোট নয়। পশ্চিমবঙ্গের আঠারো হাজার ম্যানসানের জন্মের রহস্য ওইটুকু ছোট শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে।

ম্যানসান কথাটির অর্থ অনেকেরই বোধহয় নেই। বৃহদায়তন বিল্ডিং, যা সচরাচর অফিসাধির জন্য ভাড়া দেওয়া হয় বর্তমানে এবং সেই উদ্দেশ্যেই গৃহগুলি নির্মিত। এগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়

দীর্ঘাঙ্গিক বসুমতী

করে বড় বড় শেরিয়া বা ব্যাংক বা কোম্পানী তৈরি করে এবং মোটা টাকাখান খানায় অফিস বা কোম্পানীকে ছাড়া ঘিষে প্রতি বছর মোটা টাকা উপায় করে, এটাই তাদের অন্যতম বিজ্ঞানস।

এইসব ম্যানসানগুলি তুলতে যে মোটা মূলধন লাগে তা' বিভিন্ন লসনীকারক কোম্পানী থেকে নেওয়া হয় নানাভাবে। গৃহনির্মাণে অর্থ লসনী করাও নিরাপদ কেন না বাজারের যে অবস্থা, মূল্যাক্ষয়িত ঘটর দরুন যেভাবে টাকার মূল্যমানের অবনতি ঘটেছে দিনের পর দিন তাতে এই খাতে লসনী করতে আমাদের দেশের পুঞ্জি-পতি শক্তিগুলি বিশেষ আগ্রহশীল।

কংগ্রেস সরকার যখন সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করেছিল তখন এটুকু আশা করা গিয়েছিল যে তার দ্বারা আর বাই হোক পুঞ্জিপতিদের ধনবিস্তৃতি অধিকতর সাহায্য করা হবে না। কোন মুখ এটা আশা করে নি যে কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের জমি ও উপাদানের উপাদানসমূহকে ব্যক্তিগত মালিকানা আওতা থেকে সরিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানা নিয়ে আসা হবে। তবে অনেকেই এটা আশা করেছিল যে, যখন মৌখিকভাবেও সমাজতন্ত্রের কথাটা সরকারী কর্তাদের কাছ থেকে ঘন ঘন শোনা যায় তখন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কোন প্রতিষ্ঠান দেশের পুঞ্জিপতিদের অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হবে না, বা ব্যক্তিগত পুঞ্জির দালালের ভূমিকায় অভিনয় করবে না।

কিন্তু কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের এমন অপার মহিমা যে এখানে সবই সম্ভব। নতুবা এল-আই-সি অর্থাৎ লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের মত প্রতিষ্ঠানও আজ পুঞ্জিপতিদের রক্ষিতাবা ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে এ দশা চোখে দেখতে হত না।

এবারে আসল কথাটি খুলে বলা যাক। লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের একটি স্কীমের কথা আমনারা অনেকেই অবগত আছেন যে স্কীম অনুযায়ী মধ্যবিত্ত এবং অল্পবিত্ত মানুষদের বাসগৃহ নির্মাণের প্রয়োজনে ঋণ মঞ্জুর করার কথা ছিল। এই উদ্দেশ্যে পলিসি হোল্ডারদের দেয়া প্রিমিয়ামের একটা মোটা অংশ ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু সেই টাকার মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্ত মানুষদের গৃহনির্মাণ বাসগৃহ ঋণ না দিয়ে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে পুঞ্জিপতিদের ওই বিরাট বিরাট ম্যানসান তৈরি করার জন্য। কে বলে এল-আই-সি ব্যবসা বোকে না।

ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রীর ক্ষতিসাধন করেছে। তিনি এই বিষয়ে বর্তমানে অধিকতর তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। আমরাও বিস্ময়ে চোখ ফুট করে ভাবছি, একেই বলে কংগ্রেসী সমাজতন্ত্র।

শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(১)

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসমস্যা এত জটিল এবং এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে কয়েকটি স্বার্থ ও দুর্নীতি এভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, তার মূলোৎপাটন করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী প্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য প্রগতিশীল চিন্তাধারার অনুগামী, সেই হিসাবে তাঁর কাছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষা অনেক। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রের নানান সমস্যার কথা আমরা তাঁর নিকটে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমেই বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের নিয়ে শব্দ করতে হয়, কেন না বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া শেখে এবং শিক্ষক-মশাইরা তাদের তা শেখান। কাজেই শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার প্রথমেই আসে বিদ্যালয় এবং শিক্ষক প্রসঙ্গ। এখানে সেই সকল বিদ্যালয়ের কথাই বলা হবে: বেঙ্গল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতনের ঘাটতি অংশটা সরকার বহন করেন। বলা বাহুল্য এই রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যাই এখানে সর্বাধিক।

পশ্চিমবঙ্গের শতকরা নিরানব্বই ভাগ স্কুলেই একটি কয়েকটি স্বার্থের চক্র আছে। মোটামুটিভাবে এই চক্র গড়ে ওঠে ম্যানেজিং কমিটি নামক একটি ফালতু সংস্থার কতিপয় প্রভাবশালী সদস্য প্রধান শিক্ষক ও কতিপয় স্বার্থান্ধা শিক্ষককে নিয়ে। যদি কোন সং প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষক এই চক্রের ইচ্ছা বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহলে তাঁদের অসীম লাঞ্ছনায় সম্মুখীন হতে হয়। এখন অনেকেই প্রশ্ন করবেন বিদ্যালয়ে কয়েকটি স্বার্থের সুযোগ কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে তা খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, বিদ্যালয়ের মত কমপ্লেক্স খাবা কমই আছে।

প্রথম টুইশানির স্বার্থ। একসঙ্গে এটি একটি লাভজনক ব্যবসা, যা ঠিকমত চালাতে পারলে বাড়ি বাড়ি করা যায়। কলকাতা শহরে নবম থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রের জন্য রেট অনন্য একশা টাকা, মফস্বলে প্রায় পঞ্চাশ। কোচিং ক্লাস না খুলেও একজন শিক্ষক সপ্তাহে তিনদিন হিসাবে দিনে স্বচ্ছন্দে আটটি টুইশানি করেন। অবশ্য সব শিক্ষকের ববাজে এ বকম জেরে নে না, তাঁরা টুইশানি ক্ষেত্রে মনোপাল নিয়ে বসে থাকেন যারা এ চক্রে অন্তর্ভুক্ত কেন না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হেডমাস্টারমশাই গৃহশিক্ষককে বেকসম্পদ করেন। বলা বাহুল্য, বাইরে এরা এতগুলি ছেলো পাড়িয়ে ক্লাসে মোটেই মন দিয়ে পড়াতে

পারেন না, তা ছাড়া অন্য শিক্ষকদের তুলনায় এদের ক্লাসও কম থাকে, যা নিয়ে অপরাপর শিক্ষকেরা ক্ষুব্ধ হলেও তাঁদের কিছু করার নেই, কেন না এই কজন কড়পক্ষের পক্ষপটীগ্রিত। একই বিদ্যাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ প্রতি-লেজড ক্লাস প্রতিটি বিদ্যালয়ে থাকার দরুন যারা এ চক্রের বাইরে তাঁরা নানারকম কমপ্লেক্সের শিকার হন, ফলে ক্ষতি হয় ছাত্রছাত্রীদের।

অবশ্যই এই কয়েকটি স্বার্থের চক্রগুলির ক্ষেত্রে শব্দ প্রাইভেট টুইশানির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি বছর ছাত্রপাঠ্য বই নির্বাচনের সময় এরা আবার আসর জমায়। বিভিন্ন প্রকাশকের সঙ্গে এদের যোগাযোগ থাকে এবং অর্থের বিনিময়ে এরা নিম্নমানের ভুলত্রান্ত সম্বলিত পুস্তকও পাঠ্য করতে কুণ্ঠিত হন না। অনেক বিদ্যালয়েই এই পুস্তক নির্বাচনের কাজটি করে ম্যানেজিং কমিটি নামক ফালতু প্রতিষ্ঠানটি, অর্থাৎ এ কমিটির দু-এক জন সদস্য, প্রধান শিক্ষক ও আরও কয়েকজন শিক্ষক বাঁদের নিয়ে সাধারণত বিদ্যালয়সমূহের এ কুচক্রগুলি গঠিত। এটি একটি ফলাও কারবার। এমনও হয় একটি প্রকাশকের সকল পুস্তকই পাঠ্য করা হয়, যার বিনিময়ে এ প্রকাশকের কাছ থেকে মোটামুটি টাকা পাওয়া গেল, যা এই বিশেষ কজন ব্যক্তির ভোগে লাগল।

যত বই স্পেন্সিয়েন কর্পি হিসাবে স্কুলে আসে তা সবই তো আর পাঠ্য হয় না। কাজেই বার্ষিক বইগুলি কি হয়? আগেকার দিনে সেগুলি দারিদ্র ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হত। এখন তা সোজাসুজি বিক্রি করে দেওয়া হয়। এই বইগুলি কেনার লোক আছে, যারা জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এসে অর্থমূল্যে সমস্ত স্পেন্সিয়েন কর্পি কিনে নিবে যায়। বলা বাহুল্য এ টাকার বিশেষ কয়েকজনেই ভোগে লাগে।

এই পুস্তক নির্বাচন নিয়ে আবার বিশেষ খেলা চলে, প্রাইমারি বিদ্যালয়সমূহে। বহু প্রাইমারি বিদ্যালয় কলকাতার কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত এবং মফস্বলে শহরে মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্রামে জেলা স্কুল বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। কাজেই এই সব ক্ষেত্রে পুস্তক নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলি নয়, যে স্কুল বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের অধীনে এ বিদ্যালয়গুলি, সেখানকার কয়েকজন ব্যক্তি, স্বভাবতই যারা সদস্য বা কমিশনার বা কাউন্সিলার। কোন প্রকাশকের একটি বইকে পাঠ্য করার অর্থ মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন না

জেলা স্কুল বোর্ড পরিচালিত যতগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সবগুলিতেই সেগুলি পাঠ্য হবে। কাজেই কামিশনের টাকাটিও মোটা। এই উপলক্ষে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, স্কুল বোর্ড ও কর্পোরেশনে নোংরামির বান ডেকে যায়। প্রকাশকদের যেন নীলামে তোলা হয় এবং হার হাইলেন্ড বিডিং তার বই-ই পাঠ্য করা হয়। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালের সংগৃহীত আমাদের তথ্যাবলীতে জানা যায় যে, প্রকাশকদের কাছ থেকে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তরফ থেকে চাঁদা হিসাবে টাকা নেওয়া হয়েছে এবং তাদের দেওয়া চাঁদার পরিমাণের ভিত্তিতে তাদের প্রকাশিত পুস্তক-সমূহকে পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

আবার পূর্বতন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের কামেশ্বরী স্বার্থের চক্র প্রসঙ্গে। পরীক্ষার পর প্রমোশনের সময় এই চক্রটি আবার বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে কেন না তারা প্রাইভেট টুইশানের নামে বছরের পর বছর গার্জেন্টদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে চলেছে তাদের ছাত্র-গুলিকে প্রমোশন না দিলে চলে না। ফলে অনেক অযোগ্য ছাত্রও প্রমোশন পেতে পেতে উচ্চতম শ্রেণীতে এসে ওঠে এবং ফাইনাল পরীক্ষার অকৃতকার্যদের তালিকা বৃদ্ধি করে।

অনেক ক্ষেত্রে সেখানেও বন্দোবস্ত আছে। আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একটি বিশেষ মফস্বল শহরের কথা যেখানে কয়েকজন নামকরা শিক্ষক ছাকালো কোচিং ক্লাস চালান। আড়কাঠি মারফৎ এমন কথা শহরময় রটানো আছে যে এদের সাজেস-শ্যানসমূহ অপ্রাপ্ত, তা' পরীক্ষার আসবেই। বেতনও নেহাৎ কম নয়, মাসিক চার্লিশ টাকা। এই কোচিং ক্লাস এই শহরটির সব স্কুলেরই দৃষ্টি-কেন্দ্র করে শিউক নিয়ে গঠিত। এবারে অপ্রাপ্ত সাজেসশানের ফাইনালী শুনুন। ফাইনাল পরীক্ষার সময় নৈজের কোচিং ক্লাসের ছাত্রদের এরা হলের মধ্যে খোলাখুলিভাবেই সাহায্য করেন, প্রশ্নের উত্তর বলে দেন, অঙ্ক বলে দেন, কেন না বছরখানেক ধরে কোচিং ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রের কাছ থেকে এরা মোটা টাকা খেয়েছেন, সেই নুনের দাম দিতে হবে তো। কিন্তু একটি পরীক্ষা হলের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক একদল ছাত্রকে সাহায্য করবেন, তা' দেখে নিশ্চয়ই বাকি ছাত্ররা চাপ করে বসে থাকবে না, অতএব তাদেরও কিছু গ্রেস, কিছু কনসেন্সন দিতে হবে, তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা-বাস বা টোকাটুকি করলে কিছু বলা থাকবে না, আর কোন মূখ্যই বা বলা থাকবে? এখন বুঝতে পারছেন? ইদানীং টোকা-টুকির প্রাবল্য এত বেশি কেন? এ নিয়ে

অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং ছেলেদের উপরেই দোষ দিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজছেন। কিন্তু সমস্যা দেখানো নয় সমস্যার মূল অন্যত্র। এর জন্য নিঃসন্দেহে এক শ্রেণীর শিক্ষকই দায়ী। সং শিক্ষকেরা সব দেখেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হন কেন না প্রতিবাদের ফল তাঁদের উপরে বড় ভয়ানক হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(৪)

এবারে আমরা স্কুল অফ ট্রিপিক্যাল মেডিসিনে নিয়োগের ব্যাপারে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের কয়েকটি অভিযোগ আনিচ্ছি।

(১) ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে এক ব্যক্তিকে ট্রিপিক্যাল স্কুলের কোন একটি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়, যিনি মেডিক্যাল লাইসেন্সই লোক নয়; তবে যার একটি বড় কোয়ালিফিকেশন এই যে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন বড় কর্তার আত্মীয়। যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিটির ওই পদ পাওয়া উচিত ছিল তাঁকে আগেই অন্য বদলী করে রাখা হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিটির হয়তো অন্য বিষয়ে যোগ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু বর্তমান পদে পক্ষে তিনি একান্তই অনুপযুক্ত, ট্রিপিক্যাল স্কুলে ডাক্তারদের পড়াবার যোগ্যতা তাঁর নেই। ছাত্ররা এ'র পড়াতে না পারার কথা নিয়ে বহুবার বর্তমান ডিরেক্টরের কাছে লিখিত নালিশ জানিয়েছেন।

(২) ১৯৬৬-র ওই নভেম্বর তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয়েছিল যে “কলকাতা স্কুল অফ ট্রিপিক্যাল মেডিসিনের এন্টোমোলজি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর যে মনোভাব প্রকাশ করে চলেছেন, তাতে সর্বাঙ্গতঃ মহল ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই মহলের অভিযোগ যে অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয় উপেক্ষা করে উক্ত বিভাগে স্বজনপোষণ চলছে।”

যাকে রীডারের পদে নিয়োগ করা হয় তাঁর এন্টোমোলজি বা পতঙ্গবিজ্ঞান বিষয়ে কোন গবেষণা বা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছিল না। ওই পদটির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৬-র ৪ঠা নভেম্বর-অমৃত-বাজার পত্রিকায়। দরখাস্ত দেবার শেষ তারিখ ছিল ওই মাসের ১৫ই। ওই পদের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল ওই বিষয়ে ডি-ফিল ডিগ্রী।

যাকে এই পদে নেওয়া হয়েছে তখন তাঁর ডি-ফিল ডিগ্রী ছিল না, অথচ তিনি দরখাস্ত করেছিলেন এবং ইন্টারভিউতে আবৃত্তি করেছিলেন। ১৯৬৭-র ৪ই ফেব্রু-

য়ারী তারিখে ইন্টারভিউ হয়। ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টর ডাঃ চন্দ্রীলাল মুখার্জী, ডি-জি, ডাঃ কে, এন, রাও এবং ট্রিপিক্যাল স্কুলের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাঃ চৌধুরী। অধ্যাপক পদের জন্য তারা কোন লোকই খুঁজে পেলেন না (১) এবং আমাদের আলোচ্য ভদ্রলোককে রীডারের পদে নিয়োগ করা হল (ইন ইন্টারভিউ-র একদিন আগে ডি-ফিলের বেরালটো যেমন করে হোক নাকি বার করতে পেরে-ছিলেন)। এই নিয়োগটি সম্পূর্ণ নিয়ম-বহির্ভূত, কেন না ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের আইন অনুযায়ী ডি-ফিল ডিগ্রী লাভের পর তিন বছর শিক্ষকতাব অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন ব্যক্তিকে রীডারের পদ দেওয়া যায় না। ভদ্রপরি এই ভদ্রলোকের প্রতি কর্তৃপক্ষের আশ্চর্য কণ্ঠা। রীডার হওয়া সত্ত্বেও একে বেতন দেওয়া হচ্ছে অধ্যাপকের। এমন চক্কেলজাহানি কান্ড কি আর কোথায় দেখা গেছে? স্বজনপোষণের বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত হল না। উক্ত ব্যক্তিকে আবার নাকি বেলজিয়ামে পাঠিয়ে দেওয়া হল উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য, অবশ্য এন্টোমোলজিতে নয়।

কিন্তু রীডার এবং অধ্যাপকের পদের জন্য যোগ্যতার লোকের অভাব ছিল না। অন্তত একজনও ছিলেন যার ওই এন্টোমোলজিতে ডি-ফিল ডিগ্রী ও ওই বিভাগে তিন বছর (প্রায়) শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছিল। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও এই জাতীয় স্থূল স্বজনপোষণের নমুনা একান্তই পীড়াদায়ক।

(৩) ট্রিপিক্যাল স্কুলের বর্তমান সেক্রেটারী আগে ট্রিপিক্যাল স্কুলের স্টাফ ছিলেন—হেডক্লার্ক থেকে প্রমোশন পেয়ে তিনি ওই পদে আসনি হয়েছেন। বর্তমানে যিনি হেডক্লার্ক আছেন তিনিও খুব যোগ্য লোক। তিনি সেক্রেটারী ছাড়াও নিজে অনেক সময় অনেকবার সেক্রেটারীর পদে অফিসিয়েন্ট করেন। কিন্তু এখন একটি নতুন নিয়ম চালু হতে চলেছে। রাইটার্স ব্লিভিং থেকে ডিউটি বি, সি, এস-এর লোক আসবে সেক্রেটারী হয়ে। আগে যদি প্রমোশনের ভিত্তিতে পদটি পাওয়া যেত, এখন তার ব্যতিক্রম হবে কেন? এখানকার মিনিয়ার ম্যানকে দিতে আপত্তি কি? এই ব্রকম প্রমোশন থাকলে অফিসের লোকের কক্ষকর্মের আগ্রহ বাড়বে না কি? যে ব্যক্তিগণটি চালু রয়েছে এবং যার জন্য কোন অসুবিধা হচ্ছে না, অনাবশ্যকভাবে তা পরিবর্তনের কোন অর্থ হয় না। এডে ভিক্টরের স্টাফেরা ক্ষুব্ধ হবেন এবং যিনি বাইরে থেকে আসবেন তিনিও বিশেষ সহযোগিতা পাবেন না।

—(১৪-৪-৬৭)

নব মন্ত্রিসভা প্রেরীপেত্র

পূর্ব-প্রকাশিতের পর।

সংবাদে প্রকাশ, যুক্তফ্রন্ট সরকারের মৎস্যমন্ত্রী কলকাতার মৎস্য সঙ্কট সমাধানের জন্য এক ঐকান্তিক চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যেই কলকাতার মাছের ডালার, আড়তদার ও উৎপাদকদের সঙ্গে বসে সমস্যাটি বুঝতে চেষ্টা করছেন। এমন কি এরই মধ্যে সামুদ্রিক ও নোনা মাছের বড় চালানী কেন্দ্র ক্যানিংয়েও হানা দিয়েছেন। প্রশংসাবোধ্য প্রচেষ্টা। কিন্তু আমি যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করেছি তাতে আবার আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছে। আমলাতন্ত্রের মায়াজাল ছিন্ন করতে তিনি সক্ষম হবেন কি না সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উৎপাদকরা সরাসরি আবার সম্প্রদায় প্রকাশ করছেন সরকারের আন্তরিকতায়। তাঁরা ডাঃ সাহাকেও ছাড়া অনুসারী ভূমিকায় দেখে শনিষ্ঠকুরের কথা মনে করছেন। তাঁরা তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি জানতে একেবারেই অনাগ্রহী কিন্তু তাঁর আন্তরিকতার পরিমাপ করতে চ্যালেঞ্জ নিতে রাজী আছেন। দীর্ঘদিন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টর ছিলেন ও এক বিরাট অফিস চালিয়ে এসেছেন। শব্দমাঝ তাঁর মাহিনা বাবদ দেশের রাজস্ব খাতে আঞ্জও পর্যন্ত যে ব্যয় হয়েছে সেই পরিমাণে মাছ উৎপাদন করেছেন কি না এ প্রশ্ন যে কোন ন্যায়িক রাখতে পারে। তাঁর কৃতিত্বের একমাত্র সাক্ষী অধুনা লিকুইডেটেড গভার্নর সমুদ্রে মৎস্য শিকার ব্যবস্থা। তাঁর বৈজ্ঞানিক মূল্যবান উপদেশে দেশের উৎপাদনে কি অবদান বেখেছে তা তিনি আজও পর্যন্ত দেখাতে পারেন নি। মৎস্যভুকবা অজ্ঞ মানুষ, হয়ত তাঁর শিক্ষার পরিচয় রাখে না, কিন্তু দিনের পর দিন বাজার থেকে শুনা থলি হাতে যে ফিরতে হচ্ছে আগের চেয়ে যে অনেক বেশি পরিমাণে এটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে।

সারা বাংলা দেশের মৎস্যভুকদের কথা তুললে আরও করুণ অবস্থা। শব্দমাঝ কলকাতার বাজারের খরিদ্দার আমাদের যে অবস্থা তাই সামলাতেই এই সরকারের হিমসিম অবস্থা। কেন? কী হল তাহলে তিন তিনটে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়? পরিকল্পনার নিশ্চয়ই অভাব হয় নি? কনফারেন্স, মিটিং, কাগজ কলম পুস্তিকা প্রকাশ ও লক্ষ লক্ষ টাকার আমলা নিয়োগ

সবই ত' হয়েছিল, তবুও মাছ গেল কোথায়? প্ল্যানিং ত' এক ধরনের হিরিরলুঠ ব্যবস্থায় পরিণত। আমি আগের সংখ্যায় বলেছি যে, দেশের সমস্যা যত গভীর হবে আমলাতন্ত্রের ততই উৎসব মনোবৃত্তি প্রখর হবে। তখন সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় প্ল্যানিং চলবে। যে প্ল্যানিং দেবে আত্মীয় ও প্রিয়গোষ্ঠীর চাকরীর সুযোগ আর ক্ষমতা দেখানোর জন্য প্রশাসনিক পদ সৃষ্টিকরণ ও যথেষ্টাচারে সরকারী তহবিলের অঙ্ক হ্রাস করার উপায় উদ্ভাবন। মাননীয় মন্ত্রীমশাই আমার কথার বথার্থতা হিসাবে তাঁর বিভাগে একটু অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, যে কথা বলতে চাই তা এই যে, কলকাতার মাছের জন্য প্ল্যানিং হয়েছে বার বার কিন্তু মাছের উৎপাদন বা জোগান বাড়ে নি। তাদের মতে অপরাধ উৎপাদকদের ও ব্যবসাদারদের। দেশের এমন দুর্ভাগ্য যে, লাভের সুনিশ্চিত বিরাট বাজার কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও কি উৎপাদক বা কি ব্যবসাদার কেউই তাদের প্ল্যানিংয়ে কণপাত করেন নি। তাদের মূল্যবান বৈজ্ঞানিক উপদেশকে কাজে লাগান নি। কেন? এ প্রশ্ন কিন্তু আঞ্জও সরকার করেন নি। বরং আমলাতন্ত্রের বেকর্ড বাজিয়ে শুনছেন যে দেশের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের কালো-বাজারী মনোবৃত্তিই এই অনীহার কারণ। খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে বলিষ্ঠ নেতা কাশীবাবু কি পুরানো বেকর্ড বাজাবেন? এই মৎস্য ব্যবসারে যদি কালোবাজারীর সুবর্ণসুযোগ থাকে তবে কালোবাজারের প্রাপ্তিকুল সেই অবাঙালী সম্প্রদায় কিন্তু এ ব্যবসারে এখনও উৎসাহিত হন নি। বাঙালীবা বোকা বলে ব্যবসারে প্রসিদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু অতি বড় শব্দভেদে কলকাতার অবাঙালী ব্যবসায়ীদের এ কুখ্যাতি দিতে পাববে না। তবুও মাছের ব্যবসা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। তাঁরা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও মহাজন হতে রাজী নন অথচ মহাজনী কারবারে তাঁদের দৃষ্টি শকুনকে হার মানায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যবিভাগ এবার চিনি খাওয়াতে চিন্তামণির ভূমিকা নিয়েছে। নিজেরা মাছ চাষ করে সেই

মাছ কলকাতাবাসীদের খাওয়ানো হবে। তাই দক্ষিণ লবণ হুদে মাছ চাষের পরি-কল্পনা হয়েছে। আদা জল খেয়ে মৎস্য-বিভাগ লেগেছে। সরকার নিজে মাছ চাষ করবে। আর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে পাবলিক সেক্টরই ত' উৎপাদনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত মুনাকা-শিকারী তথা কালোবাজারী বন্ধ আর সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে জনপ্রিয়তার আফিস ধরিয়ে দেয়া যাবে জনসাধারণকে। কত মাছ চাষ হবে? কলকাতার ঘাটটি মেটাতে কি তা সক্ষম হবে? কলকাতার (মেট্রো-পলিটান ডিস্ট্রিক্ট) দৈনিক মৎস্য চাহিদা ১৯৬১ সালের সেন্সাসের জনসংখ্যার ভিত্তিতে অবশ্য ১৫ শতাংশ নিরামিষাশী বাদ দিয়ে ধরা হয়েছে ১১,০০২ মণ আর গড়ে দৈনিক যোগান হয় ৪১০০ মণ। আবার এই ৪১০০ মণ যে চালান আসে তার ৪০ শতাংশ কলকাতার বাইরে বিভিন্ন সহরতলী দুর্গাপুর চিত্তরঞ্জন কুলটী বানপুর্ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে চলে যায়। এমন কি ইলিশ ও চিড়ি সদরে দিল্লী পর্যন্ত চলে যায়। তাহলে ১৬৪০ মণ মাছ কলকাতার বাইরে চলে যায়। অর্থাৎ ২৪৬০ মণ মাছ কলকাতায় থাকে। ১১ হাজার মণেব প্রয়োজন আর জোগান হয় বস্তৃত আড়াই হাজার মণ। আর এই মাছের মাত্র ২৭ শতাংশ আমদানী হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আর বাদ বাকি ৪৫ শতাংশ আসে বিহার উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য থেকে ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসত ২৮ শতাংশ। পাকিস্তানের আমদানী বন্ধ হয়েছে অর্থাৎ ১১৪৮ মণ দৈনিক আমদানী বন্ধ। তা হলে দৈনিক কলকাতায় বিলম্বযোগ্য মাছ থাকে (২৪৬০—১১৪৮) ১৩১২ মণ। আবার এই মাছের অন্তত ২০ শতাংশ নোনা মাছ। তা হলে কলকাতায় মাছের অবস্থা কেমন তা সহজে অনুমান করা যায়। এই দশ হাজার মণ ঘাটটি মেটাতে সরকার নিজে লবণ হুদে পোনা মাছ চাষে নেমেছেন। লক্ষা ঠিক হয়েছে ৫০০ মণ দৈনিক যোগান। মাছ চাষ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিস কর্পোরেশন। মূলধন নামানো হয়েছে ২.৫৪ কোটি টাকা।

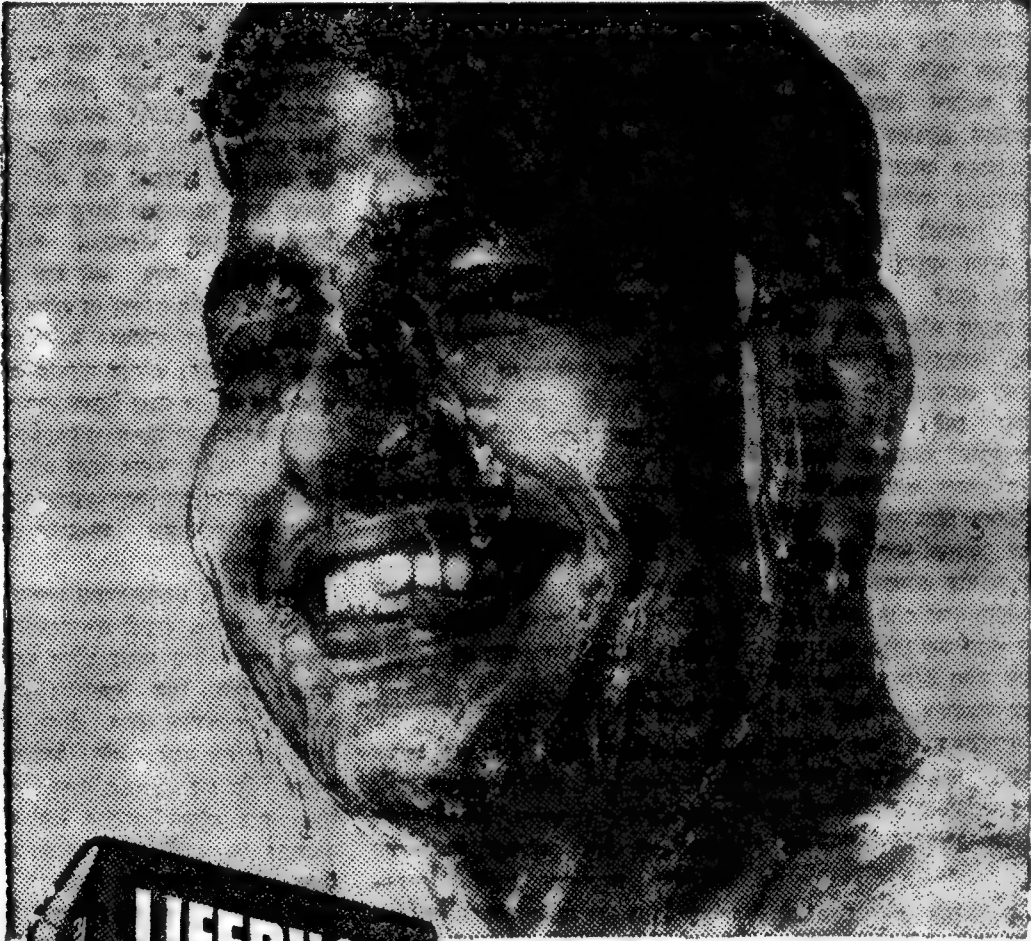
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই পরি-

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

ফলপনাকে আমরা মৃত্যিক প্রসবকারী
কলতে অভ্যস্ত দুঃখের সূণ্যে বাধ্য হইছি।
অপনয় ও অপচয়কারী বলে বার বার
সাবধান বাণী উচ্চারণ করলে
কারেমীন্দ্রার্থের দালাল আখ্যাত লাভ
করা বিচিত্র নয়। কিন্তু এই উৎপাদন

কি সম্ভব? দক্ষিণ লবণ হ্রদে মাছের
আবাদবোগ্য জমির পরিমাণ কখনই ১৫
হাজার বিঘা হবে না যদিও তারা ইচ্ছাকৃত
ভাবে ৩০ হাজার বিঘা হিসাবে ভুল
তথ্য পরিবেশন করেছে। ১৫ হাজার বিঘায়
গড়ে তিন মণ উৎপাদন হলে ৪৫ হাজার

মণ হতে পারে। অর্থাৎ দৈনিক কোনমতেই
১২৫ মণের বেশি হতে পারে না। সরকারী
আমলারা অবশ্যই ধারণা দিচ্ছেন যে,
দৈনিক উৎপাদন হবে বিঘা গিছ ৫ মণ।
মৎস্য উৎপাদকের প্রাঙ্গণ যে, উত্তর লবণ
হ্রদে যে সরকারের মাছের ভেড়ি ছিল এক



লাইফবুয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবুয় মেঘে রাত ফুরলেই তাজা বরষায়ের হরের। এই

চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের

সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবুয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী বেশ আছে।

লাইফবুয় ধুলোময়লার রোগবীজনাশু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরি

সিএলএল-১৮-১৯ ৪৫

যা ডাঃ সাহার নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত তার বিধা পিছন উৎপাদন কি ও মণ ছিল? সর্বপ্রথম পুরস্কার-বিজয়ী যে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ছিল তার উৎপাদন হার কত ছিল? সুতরাং এই ২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার ফিস কর্পোরেশনের প্রচেষ্টার মূলে সত্যতা ও আন্তরিকতার অভাব একথা বলতে বাধা কোথায়? এই অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের অভিযোগ যে, কোন এক ব্যক্তিগত কারণে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে একথার কি প্রতিবাদ করা যায়? কেন ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিন-তিনবার একুইজিশানের নোটিশ দিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে এইভাবে বাধা দিয়ে ফলপ্রসূ জমিদারলোকে বন্ধ্যা করা হচ্ছে? কেন একুইজিশানের নোটিশ বর্তমান থাকতে আবার ফিসারী রিকুইজিশান ও একুইজিশান নামে নতুন আইন করে তাদের জব্দ করা হল? উৎপাদকদের অভিযোগ যে, যেহেতু তারা মৎস্যজীবীরা সমাজের চির অবহেলিত তফসিলী সম্প্রদায় থেকে এসেছেন ও তাদের কোন ইউনিয়ন নেই তাই তাদের ওপর এই স্বেচ্ছাকৃত অত্যাচার চলছে। তাদের আরও অভিযোগ, গত তিন-তিনটে পরিকল্পনার তাদের জন্য সরকার একটি কানাকড়ি দিয়ে সাহায্য ত করেন নি, বরং রক্তচক্ষু দেখিয়ে এসেছেন। তারা বলেছিলেন তাদের জন্য ৩।৪ লক্ষ টাকা সাহায্য হিসাবে খরচা করা হোক সরকারের তরফে তা হলে তারা দৈনিক ৩০০ মণ সরবরাহ করবেন সাহায্যের এক বছর পরে। অথচ ফিস কর্পোরেশন তিন বছরের আগে বিক্রয়যোগ্য মাছ বাজারে চালান দিতে পারবে না। ট্যাক্সদাতারা এই পরিকল্পনার দাবিকে 'বন্ধকর ম্খরভাষণ' বলতে পারে।

সরকারী উৎপাদনের প্রচেষ্টাকে তাই মৎস্যজীবী সম্প্রদায় গৌরী সেনের টাকা বলে। কি উৎপাদন বা কি বন্টন সকল ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাধারা শুধুমাত্র অসম্পূর্ণ নয় বরং ধূম্রজাল সৃষ্টিকারী। প্রকৃত মৎস্যজীবী কিন্তু সাহায্য পায় না। আর এই সাহায্য না পাওয়ার জন্য দারী সরকারী পলিসি। সমবায় প্রতিষ্ঠানকে সকল বিষয়ে সাহায্য ও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য প্রস্তাব। দেশের বৈষয়িক অবস্থায় এই বিন্দু বিন্দুর সহযোগে মহাসিন্দু রচনা পৃথিবীতে সঠিক। আমাদের মূলধন অবস্থার করুণ চিত্র কে না জানে। তাই বাস্তবে যদি সমবায়কে কাজে লাগান যেত তা হলে সে তিলে তিলে তিলোত্তমা হতে পারত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, শিব গড়া আর হল না। কেন না যে

কংগ্রেস এই সমবায়কে দেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন তারা কিন্তু তা বিশ্বাস করতেন না। তারা দেশের গণতন্ত্র সম্বন্ধে এক নতুন সংজ্ঞা পর্যন্ত দিয়েছিলেন যার নাম সমবায়মূলক গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। সংজ্ঞায় এত বড় বিপ্লব কেউ পৃথিবীতে উপহার দিতে পারে নি। কিন্তু আসলে এটি এক ছদ্মবেশ। পার্টি সংগঠন ও পার্টির লোকদের ফিড করার জন্য এটিকে আর এক মোটাক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। আর এটি আমলাতন্ত্রের কাছে ধরা পড়েছিল। তাই সেই সমবায়গুলো সাহায্য পেয়েছে যারা তদানীন্তন সরকার পার্টির অনুমোদন ধন্য ছিল। সে সমবয়ে আন্তরিক সমবায়ী থাক বা না থাক। তার ফলে সমবায় আন্দোলন গোড়া থেকে দূষিত হয়ে পড়েছিল। অসাহায্য তার রপ্তে রপ্তে ঢুকে পড়েছে। সুতরাং ওখা ডেকে আপন শান্তি করা সরকার সবার ডেকে পায়। মাছের জন্য সমবায়গুলো উপরোক্ত মতের বাতিল নয়। এমন দেখছি যে একটি প্রকৃত সমবায়ী প্রতিষ্ঠান বহু চেষ্টা করে দীর্ঘদিনে কোন

সবিনয় নিবেদন

পার্কদের অনুরোধে প্রীতবর্ত্ত এখন থেকে তার স্বনামেই সমিতিভাবে লিখবেন। সম্পাদিকা : গাঃ বঃ

আনুগত্য লাভ করে নি অথচ করক দিনের মধ্যে এক নতুন সমবায় মোটা অঙ্কের টাকা গ্রহণ করেও ব্যবসা আরম্ভ করে নি। সরকারী কর্মচারীরা কিছুতেই সমবায়কে কোন সুযোগ-সুবিধা দিতে চায় না এবং যাতে না দিতে হয়, তার জন্য নানা ধরনের আইনগত ও উদ্দেশ্যহীন ফাঁকি তুলে দিনের পর দিন হস্তরানি করে। ভূমিরাজস্ববিভাগ ও সেচ বিভাগের হাতের জলকর বন্দোবস্ত নেওয়া প্রকৃত সমবায়ের পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য দর্শনদানের গোপন দরজা দিয়ে যেতে জানলে আলাদা কথা। মন্ত্রীমশাই দেখতে চাইলে এরকম অনেক ঘটনা দেখাতে পারি। সেচদপ্তরের কোন জলকরকে কোন সমবায় প্রতিষ্ঠানের জন্য মৎস্যবিভাগ ও সমবায় বিভাগ বিশেষভাবে অনুমোদন করলেও সেচদপ্তরের ফেলে রেখে দিয়েছে। যদিও সেচদপ্তরের চীফ ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত তাগাদা দিয়েছিলেন। এ এক অসম্ভব ব্যবস্থা। কোন ভদ্র মানুষের পক্ষে সমবায় করা সম্ভব নয়। অসম্ভব হয়রানি আর সবার ওপরে এক

স্বাযোগ্য অবস্থা—ওখানে ঢোকা যায় না ও বেরনো যায় না। সমবায় আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করতে হলে সম্পূর্ণভাবে নতুন পন্থাতি তৈরি করতে হবে সরকারী প্রশাসনবস্তুর।

কলকাতার মাছের দাবি মেটানো কোন অতি বৃহৎ সমস্যা নয়। কলকাতার দক্ষিণে সুন্দরবন। অসংখ্য নদী নালা খাঁড়ি ও জলাশয়ে ভরা। এখানে একটু চেষ্টা করলে কলকাতার চাহিদা মেটানো যায়। এখানে মাছ চাষ করতে মাছের ডিম সংগ্রহ করতে হয় না অর্থাৎ খরচ করে। চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভেটকি, টাংরা, পারসে, ভাঙন ইত্যাদি মাছের অসংখ্য ডিম পাড়ে নদীতে। এই জল তুলে নিতে হয় জোয়ারের সাহায্যে বাধ বন্দী মাঠে অথবা বিলে বা খালে। কিন্তু ধান চাষের মধ্যে অজুহাতে এইগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই মাছ চাষের একমাত্র খরচা বাধ দেওয়া বা বজায় রাখা। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে সরকার এগিয়ে এলে এক বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু সরকার এই বুদ্ধি নিতে চায় না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই বুদ্ধি নেওয়া অসম্ভব হয় কিন্তু সরকার সহজেই নিতে পারে। অনন্ত সম্ভাবনা এখানে লুকিয়ে আছে।

আর মিষ্টি জলের পোনা মাছের জন্য সরকারের আরও অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। পোনা মাছের ডিম সংগ্রহ হীরে সংগ্রহের সমান। একটা ডিম প্রসবকারী মাছকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া নিয়ে ডিম তৈরি করা হয় আর এই ডিমের এক কুনকে বিক্রি হয় ১২০০ টাকা পর্যন্ত দরে। আর অবৈজ্ঞানিকভাবে ডিম সংগ্রহ ব্যবস্থার জন্য কোটি কোটি মাছের ধ্বংস-সাধন ঘটে। সরকার কি এদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না? তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার ল্যাবরেটরী কি এগুলো সম্ভার উৎপন্ন করে বাজারে সহজসাধ্য করতে পারে না? মিঠে জলের বিল মাছ যেমন কই, শোল, ল্যাঠা, পটু ইত্যাদি মাছ অতি আদর ভবিষ্যতে বাংলা দেশের বৃদ্ধ থেকে নিশ্চয় হয়ে যাবে। মাছের অত্যধিক চাহিদা থাকায় প্রতি বছর পুকুর ডোকা ছেঁচে ফেলা হয় ও মৎস্য প্রজননকারী ও প্রসবকারী মাছ নির্বিচারে ধ্বংস করা হয়। এখন এদিকে সরকার নজর না দিলে বাঙালীর প্রিয় মাছগুলো আর রক্ষা করা যাবে না। আইন করে এই ধরনের মাছ ধরা প্রতিরোধ করতে হবে। অকারণ জলাশয় শুকনো করা বন্ধ করতে হবে। এই দিকে মন্ত্রিপরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কি?

—এস এম এলি

অকথ্য কথন। সে বিস্তান্ত কওনের
নয়, বলনের নয়। তবু যদি সে বিস্তান্ত
শুননের জন্যে মন আনচান করে তবে
ফিরে যেতে হবে বাইশ বছর আগের
পূর্ববাংলার আসমানে জ্বালামে। সাহজাদ-
পুত্রের আরও অনেকটা দক্ষিণে লাঙল-
মুড়ার চর পেছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে
যেতে হবে দোয়ালী গাষের বকুলতলার
থারে একটা ছোট কুঁড়ে ঘরে। সেখানে
সেই ছোট ঘরে অন্ধকারে চাঁদ ওঠে,
রূপসায়ের জোয়ার ভাটা খেলে, আর
জোয়ার ভাটার খবর জেনে নাও চালিলে
অরুণরতনের সন্ধান কবে বিদ্যেধরী।

অকথ্য কথন! সে বিস্তান্ত কওনের

নয়, বলনের নয়। বিদ্যেধরী রসের তরী
বার, জোয়ার ভাটার আনাগোনায়ে সন্ধান
চালায়। কে জানে কখন চাঁদ ওঠে আর
মাছ ধরা পড়ে জালে। জাল পেতে বসে
থাকে বিদ্যেধরী। ধরা দেয় না, ধরা পড়ে
না। শুধু ধরতে চায়। ধরা কি যার?
অত সহজ কল্প নয়। বিদ্যেধরী জাত
পাটন। যাওয়া-আসার বিরাম নেই তার।
তার সে বিস্তান্ত কেই বা বোঝে। কেই
বা শোনে? শুনলেই কি বোঝা যায়।

অকথ্য কথন। সে বিস্তান্ত তবু যদি
শোনবার জন্যে মন টনটন করে, তবে
মাঘী শুক্লা দ্বয়োদশীতে সায়েরে বে মেলা
হয়, সেদিকে চোখ ফেরাতে হবে। নিতাই
চাঁদের জন্মদিনে সায়েরের খ্যাপা খেপার
মেলা। মাঘী শুক্লা দ্বয়োদশী তিথিটি
পড়ে ফাল্গুনে। তখনো শীতের দমকা
বাতাসে মাঝে মাঝে গা শিরশির করে।
আবার দুপুরের চাঁদিকাটা রোদে গা
চিড়বিড় করে। সকাল আর বিকালের

রোদ বড় মিঠে। শীতও নয়, গরমও নয়,
একটানা হাঁটো। সড়ক পেরিয়ে বাঁদিকে
ঘোব। একটা ছোট খাল পেবোতে হবে হাঁটু
আঁশ কাপড় তুলে। খালটার যমুনার
সঙ্গে ধোঁগ, জোয়ার ভাটা স্রোত আছে।
বোঁচকা-বুঁচকি সাবধান। চ্যাঙারি ধামা
সাবধান, একবার জলে পড়লে স্রোতে টেনে
নিষে যাবে। পার হবার সময় টিপে টিপে
পা ফেলতে হয়। স্রোতের টানে পা
কসকালে নাকানি-চুবুনি।

এক মন না হলে পার হওয়া বিপদ।
দু'মন তিন মন হয়েছে কি স্রোতের মূশে
কুটো, মন এক করে পার হও। এদিক
ওদিক তাকিও না, পারের নিচে স্রোত বড়
জ্বর।

পড়েছে। কালোপানা ধামড়া ছেলেরা
পড়েছে। বিদ্যেধরী এপারে এসে হেসে
খুন।

ওব পবেই আসছিল একটা যাত্রা দলের
গোটা বাবো চোন্দ মনিষি। ছামডার
দল। সঙ্গে জন দু'চার ভারিষ্কি মানুষ।
দুটো বেঁটেখাট ঝোড়াব পিঠে যাত্রা দলের
সাজসরঞ্জাম। ওদেরও গন্তব্য সায়েরের
মেলা। খাল পার হয়ে আরও সাড়ে তিন
কোশ পথ পেবোতে হবে। সন্ধ্যার মূশে
পৌঁছোন যাবে কি যাবে না সেইটাই
ভাবনা।

বিদ্যেধরীর শাড়ি তখনো হাঁটু।



বিদ্যাভাটলার
বৃত্তান্ত
স্বর্গে প্রবেশিকা

একদিকে হাত দিয়ে পক্ষপাত করে।
একদিকে শাড়ি নামাবে। নামাবে
আবার পক্ষে। খাট শাড়ি। এখানকার
জোয়ার তাকে বোনা। বুক পেঁচিয়ে
শাড়ির আঁচল উঠেছে কাঁখে, কিন্তু তাকেও
সবটা আরও হয় না। নাই বা হোল,
বাইরের আর কেমন তেমন, মনের আর
ওর বড় জ্বর।

ওর বাপের মৃত্যুর খবরটা কে না
জানে! মৃত্যুই বা বলা কেন, অপমৃত্যু।
সে মৃত্যুর কথা ভাবলে গা জ্বরিয়ে ওঠে।
বকুলতলার পূবেও নয় দক্ষিণেও নয়,
কোণাভূমি দিকে একটা বিল, বিলের পাড়ে
বটগাছ একটা—গাছ সবুজ কাঁপালো মাথা
নিরে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছ
তলার কচি-কাঁচা ছেলেপুলে মরে গেলে
পোড়ান হয়, এখানে ওখানে দু-চারখানা
পোড়া কাঠের টুকরো, চাদের কাঁচার টুকরো।
পাশে বিল। কোথাও এক হাটু, জল,
কোথায়ও বা এক মানুষ। ডাঙায় জোলা
জমি। পাকের সোঁদা-গম্ব। পাকের ওপর
চুক টুক করে লম্বা লম্বা হালকা পা
ফেলে একে একে বেড়ায় বক, বিলে হাঁস
আর কাদাখোঁচ।

ওখানে কি করতে গিয়েছিল
বিদ্যেশ্বরীর বাপ কে জানে? রাতবিয়রে
ওই সব স্থানে শনশনে হাওয়া আর
হাওয়ার আগে পাছে চলেন তেনারা।
তেনাদের এক একটা কাপড়ের ডাল ভেঙে
পড়ে। আর মনিষ্যের ঘাড় ভো নরম
কম্বু। ঘাড় মটকে গিয়েছিল নিশ্চয়।
ভোরে দেখা গেল দাস খ্যাপার মৃত্যুখানা
বিলের ধারে পচা পাকের ভেতরে কে যেন
চুকিয়ে দিয়েছে। পাকের ভেতরে মৃত্যু-
খানকে একেবারে সোঁদিয়ে দিয়ে দমবন্দ
হয়ে মেরেছে। ঘাড়টা কি আর মটকায়
মি, নিশ্চয় মটকেছে। তেনাদের অসামান্য
হুম্ম নেই। বাতাসের আগে পাছে চলেন।
কল্ল রে বাপু! রাতবিয়রে ওই সব স্থানে
হাওয়া।

এ সব সৃষ্টির কথা। কুজন মৃত্যুক
হানে। সব জানা আছে। ওসব বৈজ্ঞানিক
আত্ম-ফাত্মার কল্প নয়। দাস খ্যাপাকে
মেরেছে। পাকে জোর করে মৃত্যু সোঁদিয়ে
দিয়ে চেপে ধরে দম বন্ধ করে মেরেছে।
এ সব বিভ্রান্ত কি আর রাখা ঢাকা যায়।
মেরেছে জুড়ান। ধামডুমুরি যুবোপদ্রব
জুড়ান। পিঠখানা মস্ত ঘাসে ভেজা,
কাছিমের পিঠেব মস্ত নীরেট। দেহখানা
খাট, শক্ত যেন গাব ভেজান কাঠের মত।
ওই নাটো জুড়ান মেরেছে দাস খ্যাপাকে।

না কললেও বোঝা যায় অনেক কিছু।
কত কল কত মাছ, আসিটে গাংগে বোঝা
যায়।

খ্যাপার কাছে কিছুকাল ধরে গতা-

হারা ছিল ওর। নাটো জুড়ান খ্যাপা
রেখেছিল খ্যাপার কাছে সাধনভজন করত।
খাটো একখানা কাপড় হাটুর ওপর তুলে
কোমরে কাপড়ের একটা দিক আঁট করে
বেঁধে মাঝে মাঝেই বকুলতলার ধারে তাকে
দাঁড়িয়ে বসে থাকতে দেখা যেত। চোখদুটি
সব সময়ই ক্রমচার মত লালচে। কুজন
বলে কল্লের গুণে। কল্লের দোষ অথবা
গুণ খ্যাপারও ছিল। দমের কাজ করতে
হয়, দম না দিলে চলবে কেন?

সৃজন বলে, নাটো জুড়ান কল্লের
লোভে যেত বকুলতলায় দাস খ্যাপার
কুঁড়ে ঘরে। কুজন বলে, ও সব তামাসার
কথা রাখ। আসলে নজর ছিল ওর বিদ্যে-
ধরীর ওপর।

নাটো জুড়ান ভাড়া বলে গিয়েছিল।
দিন রাত পড়ে থাকত দাস খ্যাপার কাছে,
দমের কাজ করত তখন। নিম্বাস
প্রশ্বাসে দমের কাজ, খ্যাপার এক-
তারটা নিয়ে দু-চারবার মনের আনন্দে
গান ধরবার চেষ্টা করছিল। ঘরভেঁড়ে
গলায় ধবোঁছিল, অ গুরু, আমি ত' জানি
না সাতার। আমারে মাইর না চুবাইয়া!
গুরু গ-গ অ-অ-অ।

সূরের টানের চোটে দুটো কাক
উঠান থেকে কা-কা করতে করতে পালিয়ে
গেল। একটা বাচ্চা বকুলগাছে উঠতে
গিয়ে চেঁচান শব্দে দম্ব করে পড়ল।
বিদ্যেশ্বরী হেসে খুঁদে। অক্রে আমার
গাভনদার। গাওনা শুনৈয়া গাদা হাইস্যা
মইল। নাটো জুড়ান—গুরু—গ-অ-অ-অ—
খামাল।

ওটা ওর হলো না। খ্যাপা দাস অনেক
তালিম দিয়েও ওর দ্বারা ওই দমের কাজটা
করতে পারল না। তা না পারুক। মাঝে
মাঝে কুমড়াটা লাউটা কখনো বা একটা
আমত তরমুজ নিয়ে আসে নাটো জুড়ান।
চুরি করে আনে। খ্যাপা জানে না।

বিদ্যেশ্বরীর কেমন একটা সন্দেহ হয়।
কনে পাইলা ফলফলায়?

চাইয়াচিন্তা নিয়া আইলাম।

নাটো জুড়ান হাসে। সামনের দুটো
দাঁতের মধ্যে ফাঁক দেখা যায়।

কুজন বলে, জুড়ান নাকি বিদ্যাকে
শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চেয়েছিল।
গুরুকন্যা, তা ইউক, বিয়া করলে কিছু
অর্থ নেই। খ্যাপা কিন্তু রাজী নয়।
বিদ্যা শব্দে হেসে খুঁদে। জলের কাছিম
আকাশের চান্দ ধরতে চায়। সূরের
বলিহাবী! হাসনেরই কথা।

নাটো জুড়ান নাছোড়বান্দা। গায়ের
জোর ওর আছে, দমের জোরও বেড়েছে।
নাটো জুড়ান ছাড়বে না। একটা হেস্টেনেস
করে ফেলাতে চায়। দাস খ্যাপা নারাজ।
গায়ে ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে মিটি মিটি
হাসে।

আর শোন, হাওয়া শোন, শুন
হুইয়া নে।

রাসক যে জন প্রেম জোয়ারে রসের
তরী যায়। তারা জোয়ার ভাটার খবর
জাইন্যা স্থানে তরী চলায়। ডুবাক
বাজে। শব্দ ডুবাক। বদ্যেবরী খজনী
বাজায়।

প্রায়তলা হয় প্রায়ের থানা, লোভী
কামুক যাইতে মানা। সাধু বাইয়া বাইয়া
যায়।

নাটো জুড়ানকে বোঝান দার। দাস
খ্যাপার কথাতেই দাস খ্যাপাকে ঘামেল
করতে চায়।

পিকিভি লইয়া সাদন।

নাটো জুড়ান প্রকৃত চায়। ভজনের
জন্মেই প্রকৃত চায়। প্রকৃত ছাড়া আবার
কিসের সাধন! ও সব কথা জুড়ান মানবে
না।

দাস খ্যাপা বুকোয়। সে পৈঠের
উঠতে তোর দু-চার জন্ম কাটাতে হবে।

নাটো জুড়ানের খাট দেহটা আরও শক্ত
হয়, কল্ল নিয়ে চোখ লাল করে গুম
হয়ে বসে।

কুজন বলে, নাটো জুড়ানই মেরেছে দাস
খ্যাপাকে।

আশ্চর্য তামাসা এই, দাস খ্যাপা এত
সিখা এত ঝাড়ফুক উদ্‌দার-ভাদারি,
বাত, কক, জ্বর পিত্ত ভাল করে, জলে
ডোবা নাওয়ের খোঁজ বলে দেয়। বৃষ্টির
দিনক্ষণ বলে দেয়, সে কিনা জানতে পারল
না জুড়ান ওকে মারবে আর তার কোন
পিত্তকার করতে পারল না? তাম্বব
কারখানা!

কথাটা কিন্তু সত্য নয়, প্রতিকার
করতে যে খ্যাপা ইশান দাস পারে নি তা
নয়। মরবার পর তার আত্মা কার্ব করেছে।
বেশি দিন নয়, একদিনের ভেতরেই নাটো
জুড়ানের রক্তবর্ষি রক্ত বাঁহা। ব্যস, জুড়ান
চোখ কপালে তুলল। মৃত্যুর পর ওপারে
গিয়েও কি দাস খ্যাপা তাকে ছাড়বে?
হাওয়ার হাওয়ার লড়াই চলবে। তেনারা
হাওয়ার আগে পাছে ঘোরেন কিনা।

কিন্তু খ্যাপা রাতবিয়রে অমন
জায়গায় গেল কেন? কারণ একটা ছিল।
ছাদেক ফকির থাকে ওখান থেকে দু' রশি
তফাতে। বটগাছটা ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে
বেশ কিছুটা গিয়ে জোলাপাড়ার কাছে
একটি ঘরে থাকে ছাদেক ফকির।
মুরশেদের কুপাস্ত তাব সিঁথি সামর্থ্য
অনেক বেশি বলেই লোকে জানে, তার
ছেঁড়া বস্ত্রের একটা টুকরো পেলে এবং
খারপ করলে উদ্‌দার-ভাদারি, জ্বর জ্বালা
সব ভাল হয়ে যায়। জোলাদের সব
মুস্কিলের আসান এই ছাদেক ফকির।
মাঝে মাঝে দাস খ্যাপা ছাদেক ফকিরের
কাছে যেত রাতবিয়রে। মস্ত একটা

রোয়াইল গাছের ডালয় ছোট একটা ছাপরা। সোটা দুই নারকেলের মালাই আর একটা পুরোন সারিগা। ছাদের ফকির এই নিয়েই আছে। সারিগা কাঁখে নিয়ে নারকেলের মালাই নিয়ে ভিক্ষায় বেরোয়। মুরশেদের নাম আর তাঁরই দয়ার কথা শোনায় ফকির।

দাস খ্যাপা গহিন রাতে ওর কাছে গভাগতি করত রসের ভিয়ান জ্বাল দিতে। দমে দমে রসের ভিয়ানে নাড়াচাড়া। নীরেক্ষীরে একাকার। গুরু মুরশেদ একাকার। দাস খ্যাপা সেই সন্ধ্যানে যেত ফকিরের কাছে। ফকির নাকি সন্ধান জানে। এ গহিন রাতে গহিন জ্বলের কথা। কেই বা বলতে পারে!

সে রাতেও বোধ হয় ফকিরের কাছেই ঘাছিল ঈশান দাস।

মাক পথে নাটা জুড়ান তার গেটে হাতের কাঁকড়া চিপুনিতে ধরেছিল তাকে। ফেলোছিল পাকে।

মরতে মরতেই 'কি' সিদ্ধা খ্যাপা বাপ মেয়ে দিয়েছিল তাবে? তা হবে। তা নইলে ফিবে ঘরে গিয়ে রক্তবিম।

কুমি বলে—বাগের কথা যদি কও, জুড়াইনার নিকাশ করছে খেপী।

বাগ নাকি মেরেছিল খেপী, বিদ্যায়রী। ও তখন দমের কাজ করছিল, অক্রেসে টের পেরেছিল এব পরেই জুড়ান খেয়ে আসবে তার দিকে। সেই সন্ধ্যাই বাগ মেরেছিল। বিদ্যায়রী বড় ভয়ঙ্কর মাইয়া। জাত সাপের মত।

কুমি থাকে বকুলতলার বিদ্যায়রীর ছাপবার কাছাকাছি খেঁজুর গাছটার কাছে। কালো কুচকুচে মেরেমানুষ কুমি। বড় ডেয়ো পি'পড়ের মত চকচকে কালো। কুমির ভাই আছে একটা ছোট বন্ধর দশেকের। জাতে মালী, বাবুদের বাড়ির উঠোন কাঁট দেয়, ময়লা পরিষ্কার করে। ভাই বাই করুক, মালিনীর কাজ কুমি পছন্দ করে নি। যদিও হাটে মেলার ঘর নিয়ে বসে না, তবু সবাই জানে। কুমির ছাপরার বাস্তুরে মানুষের মাতায়াত আছে। সন্ধ্যার পর ঘবে লণ্ঠন জ্বালাবার কিছু পরেই গা ঢাকা দিয়ে ওর ছাপরায় আসে কবিরাজ মশাই। দয়াল কবিরাজ।

বষেণ ষাট হলেও বেশ শক্ত সমর্থ মানুষ। নিষমের ব্যতিক্রমটি হবার জো নেই। রায়ে অনিদ্রা স্নায়ুর পক্ষে হানিকর। ভাই সন্ধ্যার কিছু পবেই মাঝে মাঝে বেত-ঝোপ। পিঠা কুমড়ার গাছেব তলা দিয়ে নোংরা একটা পথে হুমির ঘরে চলে আসে। পথটা বাবুদের বাড়ির পেছন দিকের পথ। আবহাওয়া ফেলবার ভাব বাসন-কোসন মজ-বাব জাযগা। ওদিকটা লোকজন চলাচল প্রায় কবেই না। ওই পথেই আসে দয়াল কবিরাজ। কাকপক্ষী টের পায় না। কবি-

রাজ মশায় ভাবে তাই। কিন্তু বাস্তবের চোখ আছে। গাছ-গাছালির দাঁষ্ট আছে। সবাই জানে কবিরাজ মশায় কুমির ঘরে যায়। শব্দ কবিরাজ মশায় জানে না যে কথটা সবাই জানে।

পথটা আসতে এক-আধ দিন কষ্ট হয়। মোটা বেটে মানুষ। ঘরে ঢুকেই বাঁপটা নিজেই বন্ধ করে দেয়।

তার আগেই কুমি চলে মশলী দেয়া তেল মেখে পাতা কেটে জোলাদের বোনা তাঁতের লাল শাড়িটা পরে বসে বসে পান চিবোর কবিরাজ মশায়ের জন্যে।

একদিন বলে,—গলাভা শুকাইয়া গ্যাছে গা।

—জল খাইব্যান?

—আম্পন্দা তর কম না রে মাগী। তর হাতে জল খাম? কথাতা কইলি কি বুলিয়া?

কুমির হাতের জল খাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না কবিরাজ মশায়। আরে হামো, হামো। বিশেষ করে কবিরাজ মশায় সান্ত্বিক মানুষ।

তারপর বাড়ি ফিরে স্নান করে শুম্ব কাপড় পরে জপে বসে কবিরাজ মশায়। দিনের পাপ দিনে ঝুর্ন। জমা করা-করি নেই।

কিন্তু তাই বলে ওর হাতের জল গলাধঃকরণ করা। রাম রাম হরি হরি।

মাসে মাসে পাঁচটা করে টাকা দিত কবিরাজ মশায়। বলে-কয়ে আরও আট আনা বাড়িয়েছে কুমি। তাতেও ওর কুলোয় না। আলতা, ফুলেল তেল, বছরে চারখানা শাড়ি, খাওয়া-পরা সব কি কুলোয়? ভাইটা মালীর কাজ করে। উঠোন কাঁট দেয়, বাগানে কোদাল চালায়, আম পেড়ে দেয় আগডাল থেকে। বাবুদের বাড়ি থাকে, খায়। দু' টাকা মাইনে পায়। পুজো-পার্বণে দু'খানি ধুতি, একটা গামছা। দাঁদির কাছে আসে দু'পদরে। বাবুদের বাড়ির আচাবটা, আমটা, জামটা, মুড়ি, জিলিপী নিয়ে আসে। দাঁদিকে দেয়। দাঁদির পাশে শব্দে একটা ধুম দেয়। নয়তো দু'পদরে বেরিয়ে যায় আর পাঁচটা জামড়ার সঙ্গে গাব পাড়তে বা তেঁতুল খেতে।

খেপীব সঙ্গে কুমির পরাণের টান দু'চার দিনের নয়। ছোটবেলা থেকেই দু'জন একসঙ্গে খেলা কবেছে, কাগড়া করেছে। সাতার কেটেছে, শাপলার মালা গেঁথেছে, বিলে গিয়ে পশুপাতা এনে পি'পড়ে ধরে পুছেছে। খেপীকে ও জানে। পরাণ দিয়ে জানে। বিদ্যায়রী ভিক্ষে করে খায় বরং বলা যায় গান বেচে।

কুমি জানে ও বড় জাঁহাজ মাইয়া। কাক শকুন চৌকরাতে এলে ঝুখতে জানে বিদ্যায়রী। ওর নিজের যৌবনের উজ্জানে নিজেই চান করে খেলা করে আর নাকি

অপেক্ষা করে একজনার—ওর মনের এক আশ্চর্য মানুষের। এসব কথা কুমি ভাবা বোঝে না। ও চিল শকুনের চৌকরে আয় কাপটা-কাপটিতে নিজের যৌবনকে নিঃশেষ করে দিতে দিতে বিদ্যায়রীর কথা ভাবে। পরাণটা টনটনিয়ে ওঠে। হিংসেও হয়, খুশিও হয়।

নাটা জুড়ান খেপীর কিছু করতে পারবে না কুমি জানত।

প্রথম প্রথম অতটা বুঝতে পারে নি। ভেবেছিল বিদ্যা খেপী এইভাবে বোধ হয় মজল। নাটা জুড়ান ওখানে গিয়ে জুটো কেন? নাটাকে ও চেনে। ওর কাছে দু'চারদিন এসেছিল। একদিন চাবটে পরস্যা নিয়ে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার পর আর কুমি ওকে নিজেব ঘরে আসতে দেয় নি। হঠাৎ কিছুদিন বাদে একেবারে ঈশান খ্যাপার চেলা হয়ে উঠল কি করে জুড়ান। ওর ভেতরের জ্বুর লালামাথা দাঁত দেখেছে কুমি। নাটা জুড়ানকে তার চিনতে বাঁক নেই, নজরটা ওর কোনদিকে। বিদ্যা খেপীর দিকে সন্দেহ কি?

দিনকতক পরে বকুলতলার ছাপরায় ধারে দাঁড়াল বিকেলে। তখনো সূর্য ডোবে নি। দূরে গাছ-গাছালির আগায় রোদের চিকচিকে আভা রয়েছে। বকুল গাছটার মাথায় পাতার ওপর ছিটে ছিটে নরম রোদ। নিচে বাটে ছায়া ছায়া অশ্ব-কার হয়ে আসছে। ঘাটলার কাঠখানায় ঠিক পাশে একটা কুকুর এসে হাঁপাতে হাঁপাতে জিভ বার করে জল খাচ্ছে।

কুমি গা ধুয়ে উঠল। ভিক্ষে কাপড় দু'ভাঁজ করে গায়ে জড়াল। ফাঁকা রাস্তা মার্চ, কত রকমের জনমানুষ যায় আসে। বাইরে লাজলজ্জা কুমির একটু বেশি। খেপীর আবার ঘরবার সমান। ঘবেও যেমন, বাইরেও তেমন। সবম ধেমার বেশি কম নেই। ওই এক পদের মাইয়া।

মাটিলেপা ছোট উঠোনটার বসে পুরোন সাবিল্লার তার কসছিল বিদ্যা। বাপ ঘরে নেই। বোধ হয় বলে গেছে সারিগার তারটা বেঁধে রাখতে। ওব পেছনে লাউগাছেব গোড়া। লাউগা তরতরিয়ে উঠেছে ছাপরার চালো। চাল ভর্তি লাউ-



চন্দ্রা আর আউ ফুলে। বিদ্যা একটা চটপটে বসে তার কসছে।

একদা সন্মর দাঁড়িয়ে দেখে কুমি একটা হাঁক দিয়ে বলল,—অ খেপী, তর ঘরে নিমান্দর আইল?

মোটো ভারটা আঁটতে আঁটতে চোখ তুলল বিদ্যা। মস্ত কাঁসার বাটির মত চকচকে মুখখানা। দম ফেলে একটু হাসল। তারটা বেশ জড়ত করে লাগান হয়েছে। কানটা মোচড়তে মোচড়তে তারটা টান টান করে আঙুলে আওয়াজ তুলল—ডুং-ডুং-টুং—

সান্নিগার ছড়িটা ঘরে। আঙুলে আওয়াজ তুলে গলা ছড়ল খেপী।

হাসরে পিঁপটী কেয়ল-জানল্যাম না। মন-দরদী খুইজ্যা পাইল্যাম না।

মস্ত চোখ দুটো বেন রসে ভরা দুটি



শিশুদিগের যত্ন

রোগে উপকারী

স্বল্প দ্রব্যকোষ মধ্যে মধ্যে কালমেঘ সেবন করাইলে লিভারের দোষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

কালমেঘ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে কালমেঘ তিক্ত, অম্লিদীপক, বলকারক ও পিত্তনিঃসারক।



ইহা আবালবৃদ্ধ সন্তানের পক্ষেই হিতকর

বেঙ্গল

কেমিক্যাল

কলিকাতা-বোম্বাই-কামরূপ

লিঙ্গের অন্তঃ। শঙ্খা গরিম্বার। হাসি হাসি খাশি লেপটে রয়েছে মুখখানা। ছাপরার ছায়ায় উঠোনটা আস্তে আস্তে অশ্বকার হয়ে আসছে। ভিটের তলায় নাবাগ জমিনের ওপারে একটা গাছপালা জঙ্গল, ঢালতে আর বেত বন। হাওয়ায় হাওয়ায় পাখীর কিচির-মিচির কণীণ হয়ে ভেসে আসছে। তারও ওধারে বেশ দূরে বাবুদের বাড়ির জমকালী মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। অস্পষ্ট অনেক রকম আওয়াজ খেপীর গানের সঙ্গে মুর মিলিয়েছে।

নয়দা দুয়ার খুইল্যা রাখলাম, ভেতরে ঢুকল বন্দুয়া। মন-দরদী খুইজ্যা পাইল্যাম না।

কুমি থমথিময়ে তাকিয়ে থাকে। খেপীর গাওনা শুনলে নড়তে পারা যায় না। যেমন আছে তেমন থাক, যেন পাথর বানিয়ে দেয়। একটু নড়তে-চড়তে ভয় করে। নিম্বাসের বায়ু কণ্টার এসে থম্ব ঘরে।

খেপী নিশ্চয়, মস্তর-তন্তর জানে, নইলে ও আওয়াজ তুললে সব শরীর ঝিম ধরে যায় কেন। পরাগটা যেন ফলা ধরে খির হয়ে থাকে কেন? কি গদগ-তুক আছে ওর আওয়াজে।

বড় ভয়ালক মাইয়া। কুমি জানত, বিদ্যা একখান সোজা মাইয়া নয়।

নাটা জুড়ানকে আরেছে বিদ্যা খেপী। এতে ওর কোন সন্দেহ নেই।

বাইরের আর, যেমন তেমন, মনের আর, ওর বড় জ্বর। তাই সায়েরের মেলায় যেতে যেতে খালটা পেরিয়ে বিদ্যা যখন হাঁটুর ওপর কাপড় তুলল, কুমি কিছু বলতে পারল না।

বাহাদুরের কালো মিনকেস্ট গদমরের মত ছেলোটা যখন খালের জলে ছুঁড়নি খেল, আর বিদ্যা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। তখনো কিছু বলতে পারল না। কুমি জানে, খেপীর মনের আর, বড় জ্বর।

বাপ তো মরে গেছে—বছর ঘুরতে এল। এখন পর্যন্ত কোন জ্ঞান মরদ ওর কাছে যেতে পেল না। দু-একজন যে চেষ্টা কবে নি এমন নয়। কানাকান্দির দাউসা পাল দু-একবার ঘুর-ঘুর করবেছিল ঘাটের কাছাকাছি। দাস পাল মস্ত ব্যাপারী। পাটের ব্যাপারী। আশিডল আশিডল টাকা। কোথেকে খবর পেয়ে এখানে ঘুর-ঘুর কবেছিল কিছুদিন। ঘোপে-ঘোপে কথাটা পাড়বাব চেষ্টা করছিল।

কুমির সঙ্গে বিদ্যা একদিন গা শুতে এসেছিল বকুলতলায়। কুমির সামনেই দু-চার কথার আদান-প্রদান হোল। বিদ্যা কিন্তু একটুও চটে নি। হাসছিল।

দাউসা ব্যাপারী এদিক-উদিক তাকিয়ে কুমিকে লক্ষ্য করেই বসেছিল—এডি কল কন্যারে। এখানে তর সর্গে দৌধ কাল? থাকে কেন?

বিদ্যারী জমাব দিল। কুমি কিছু বলবার আগেই বলল,—এখানে ত পাটের চাব নাই। ডোমাক কান এখানে ফুটি ফাটি দিব্যার দেহি?

পাটের ব্যাপারী দাস, মুরের দাম মোটো মোটো আঙুলে গুছে হাসে,—বুঝ ব্যার পারছস কান আসি? তর কথাডা পাকা কইর্যা কইয়া ফালা।

বিদ্যা খেপী হেসে খুন—কয় কি লো কুমি। ব্যাপারী পাট চেনে, মাইয়া চিনল না। মাছ ধরবার চাব, ঘাট চিনবার পারে না। বলি অ ব্যাপারী, আগে ঘাট চিন্য লও, তর স্যান চান্দ ধরা পড়ব।

দাউসা বলে,—ঘাটেই 'ত' আইছি।

—আঘাটর কুমার আছে, তাও জান না ব্যাপারী?

বিদ্যা বলকে বলকে হাসে। কুমিও হাসে। কথার মানে সব বোঝা যায় না, তবু বোঝা যায় ব্যাপারীকে নিয়ে তামাসা করছে বিদ্যা। তামাসাই করে। একটুও রাগে না। কুমি কখনো কারো ওপর বাগতে লেখে নি বিদ্যাকে। হাসতে জানে, চোখা চোখা কথা কইতে জানে। আর কুমির মনে হয়, গদগ-তুকও জানে।

দাস, ব্যাপারীকে কি যে করে দিলে খেপী। ঘাট থেকে ধবে নিয়ে এল উঠানে,—আইস, বইস, জড়ত কইর্যা বইস, গান শোন। পাটের ব্যাপার নিয়া কাল কাটাইল্যা, মানবের ব্যাপার জানলা না।

কুমি কলসীটা উঠানে রেখে মজা দেখতে দাঁড়ায়। ও জানে, বিদ্যা খঞ্জনী নিয়ে আওয়াজ তুললে দাস, ব্যাপারীর মুখবুন্দ সব ভেঙে যাবে। মুরের ত্যাড়া-বীকা হাসি থাকবে না। কিছুক্ষণের জন্যে ব্যাপারীর বকের হাওয়া কণ্ঠে এসে থমকে যাবে। দম ফেলতে পারবে না। মস্তর-পড়া আপের মত খির হয়ে নুয়ে পড়বে।

বিদ্যা আওয়াজ তুলল,—

আগে তর ঘোল আনা করগা ঠিক।

নদীর তলে ফান্দ পাইত্যা চান্দ ধরবি যদি ও রসিক।

বলিহারী। কুমি বা বলেছে তাই। ব্যাপারীর চোখ খির, দম কমে আসতে আসতে থম্ব ধরে গেছে। কুমির অবস্থাও তাই। ওর আওয়াজের হাওয়া বীকা বকের হাওয়ায় মিলে তাকে থমকে দেয়। চমকে দেয়। কি করে কে জানে।

ওরা নাকি দমেব কাজ করে। হাওয়ার খবর জানে। তাই কি ব্যাপারীর বকের হাওয়া বোঝ করে দিতে পারলে কণ্ঠে। আওয়াজের হাওয়া ভারি মজার। গান সবাই গায়, হাওয়ার ঠিকমতে আওয়াজ তুলতে পারে না।

কোথায় বা পাটের চাব। গজের মুর। আর আশিডল আশিডল টাকা। ব্যাপারী তখন

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার

ব্যথা-বেদনা তড়াতাড়ি দূর

করবার আধুনিক উপায়



মাইক্রোকোকাইন 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক সুবেদনাল পূর্ব ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন। নতুন মাইক্রোকোকাইন 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোকোকাইন বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোকোকাইন বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা হুব তথাব যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'তে মেশানো হয়, তা'ও ভগ্ন বেশী হয় করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১০ কোটি দ্রুত করা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করার শক্তি দ্বিগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুহুর্তের মধ্যে কান্ড শুরু হয়ে যায়—অস্বস্তিকর হয়ে কান্ড চলেতে থাকে : নতুন মাইক্রোকোকাইন 'অ্যাসপ্রো'র ব্যথা দূর করার সফল উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীঘ্রই শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ও থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইকালেই মাইক্রোকোকাইন 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা বের করে দেয় এবং তার ফল অনেককাল স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি যেতে পারেন : নতুন মাইক্রোকোকাইন 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুদী যেতে পারেন—চকনো, কলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো সর পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের জরুরি নতুন মাইক্রোকোকাইন 'অ্যাসপ্রো' ব্যবহার : ব্যথা-বেদনা, মাথাব্যথা, গা-ব্যথা, হাতব্যথা, খাটে বেদনা, জ্বর-জ্বর-জ্বর-জ্বর, জ্বর-জ্বর, গলাব্যথা।

মাত্রা : প্রাপ্যবয়স : ছোট ট্যাবলেট : প্রয়োজন হলে আবার ব্যবহার নির্ভর করে : একটি ট্যাবলেট বা আপনার জরুরির নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোকোকাইন 'অ্যাসপ্রো' কিতাবে কান্ড করে দেখুন



ট্যাবলেটের ক্যাভিটির গাভার বড় বড় ছিদ্র, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে পেরে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোকোকাইন হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোকোকাইন 'অ্যাসপ্রো'র একটি ট্যাবলেটে আর ১০ কোটি দ্রুত করা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তড়াতাড়ি ব্যথা দূর হয়।

নতুন মাইক্রোকোকাইন 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার আধুনিক উপায়।



মাইক্রোকোকাইন
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

নির্বাহক-এম এম জৈন

ফলা হাওয়ায়। বৃক্কের খাতাল জাতির চলেছে।। ডধানের বৃক্কভাঙা টান নেই।

আগে ওর বোল আনা করগা ঠিক।

বোল আনার ওপর সতেরো আনা ঠিক করই এনেছে দাউসা ব্যাপারী। বেশ জামবেও খুশী হল। কুঁমির সঙ্গে বিদ্যাকে দেখে ভৎসাত পেরোছিল। কুঁমিকে সে জানে, হাতের দ্রব্য না হোক, টাকায় এ দ্রব্য মেলে। কুঁমিকে পাটেব মত টাকায় কেনা-বেচা করা যায়। তার সঙ্গে যখন এ খেপীটা ঘোরাফেরা করছে, তখন এটাও নিশ্চয় তাই। টাকার কথাটা নিজে না পেড়ে বিদ্যার কাছ থেকে পাকা কথা শুনতে চেয়েছিল।

বোল আনাব ওপর সতেরো আনা বোঝে পাটেব ব্যাপারী। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু কি যে একটা আওয়াজ তুললে। হাওয়ার টানে যেমন আওয়াজ আছে তেমনি আওয়াজ। হাওয়ায় আর আওয়াজে কেমন মিলে মিশে যায়।

ব্যাপারীর মনে আর কাণাকাড়িও রইল না। সব ঠিক করা সত্তেরো আনা হাওয়ার উড়িয়ে দিলে।

—বাইর্যা, বাইর্যা গাইছস্। আর এক-খান শুন।

মজা লেগেছে ব্যাপারীর। বৃক্কের হাওয়ায় কাঁপুনি। কেমন একটা খুঁশির কাঁপুনি উঠেছে।

ওর ঠিক করা সতেরো আনা বৃক্কি সেদিন মাটি। কোন কাজে লাগল না।

গান শুনল। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা আস্ত টাকা বার করে বিদ্যার হাতে দিয়ে সেই ধমধমে বৃক্ক আর আনমনা চোখ গিরে পথ ধরল। কানাকান্দীর পথ। কে জানে কতক্ষণ এই আচ্ছন্ন ভাবটা থাকবে। বেশ কিছু সময় পরে হয়তো মনে হবে, এ যাত্রা কিছুই তো হোল না।

আবাব মনে হবে, কিছুই কি পায় নি, কিছু পেরেছে।

যা চাইতে চেয়েছিল, তা পাওয়া গেল না।

কিছু পেল। রোদপড়া বিকেলে কিছু খুঁশি পেল। সে তার পরাণভার ওপর কেমন একটা মজা টের পেল। এ মজা-টুকুর দাম আর যা চাইতে গিয়েছিল তার দামের সঙ্গে দর কমান্বিত করতে বসল হয়তো ব্যাপারী। এ কারবারের হিসেব-নিকেশ কবতে গেলে রাত ভোব হয়ে যাবে।

কাজ নেই আর ওসবে।

কমিষ মনটা বড় জ্বালা করছিল। খেপী সঙ্গের তার আর বোধ হয় মেশা চলে না।

সে কি! আর খেপী কি! এক-একবার ভেবে বড় দমে যায় কুঁমি। খেপী কেমন আলগোড়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছে, কোন ব্যাটার সাধা হচ্ছে না তাব ধাবে-কাছে যেসতে। কি করে পারে এ? কি

পেরেছে ও, বার জন্যে-দেহের-সুখকে সুখ বলে মানতে চায় না। চৈত মাসের কাঠফাটা রোদের মত দেহটা ওর জ্বলে না, চিড়বিড় করে না তাপে-উষাপে। কোথেকে এত ঠান্ডা ভেজা বাতাস পায় দিন-রাত, ব্যাটাগুলোব সামনে অক্লেশে অমন ভিজে ব্যানার মত শুঁক হয়ে থাকতে পারে। মিটিমিটি হাসতে পারে মজা পেবে। কিসের মজা পায় ও!

কুঁমি-অতসব বোঝে না, ও একটি মাত্র সুখ জানে, দেহের সুখ। কালো পাথরের মত দেহটিকে নিত্য ভেলেজলে মাজা-ঘষা করে। ক্ষিপে পেল-আধ সের চালের ভাত খায় গোটা চারেক পেয়ালা দিয়ে আর কাঁচা মরিচ দিয়ে। তারপর হয়তো খেল খানিকটা চালতে মাথা। খুব কসে নুন মরিচ ডলে নিয়ে টেক ঝালে টং হয়ে ওঠে। লালার শোসানী বেশ ভাল লাগে। তারপর চাটাই অথবা ছোট শীতলপাটিটি পেতে ঘুম। দিবা টসটে চোখ-মুখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠে বিকালে ফুলেল তেল চাঁদিতে কপালে দিয়ে পাতা কাটা, বিকেল গড়াবার আগেই বকুলতলার ঘাট।

না, খেপীর সঙ্গে ওর মিল নেই একটুও। তবু কোথায় যেন একটা মিল। যেন রশি দিয়ে ওর মনের একটা কোনও জারগা সব সময় টেনে রেখেছে খেপী। কিসের এই টান। না, সে খেপীর সঙ্গে আর মিশবে না। মেশা উচিত নয়।

তার জন্যে খেপীকে মানব ভুল বোঝে, ভাবে খেপীও বোধ হয় ভেতর ভেতর নন্ট। বাবুদের বাড়ি কথাটা নিয়ে একটা গোল উঠেছিল। যেমন কুঁমি, তেমনি বিদ্যা খেপী, একই পদার্থ। এগুলোকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া উচিত।

না, কি দরকার। বর্জ্য ছিল মেকবাব, ওরা তো কারও ক্ষতি করছে না। ঘবে ঘরে যা মনে নেয় করুক, বাইরে কিছু তোরি-বোরি দেখলে মাথা ন্যাড়া করে নেংটি পরিণে বিদেয় করে দোব।

বাবুদের বাড়িতেই যখন এমন সব কথা উঠেছে, তখন খেপীর সর্বনাশ করাটা তার আর উচিত নয়।

কথাটা বলেওঁছিল বিদ্যাকে।

—এউগা কথা কমু তরে।

—এউগা ক্যান, দশগা কথা কইবার পারস।

—তামসা করিস না। আমি ভাবত্যাছি—

—ভাবন কিসের?

—তর কথা ভাবত্যাছি। তর লগে আর কথা কমু না। এয়ানে আসুস না।

—ক্যান? কি অইল?

—অইব আবার কি? তুই আর কথা কইস্ না আমার লগে।

বিদ্যা খুব হেসে উঠল।

মুখ ব্যাজার করে কুঁমি ফল-আমি নন্ট হইয়া গোছি গা। মানবে তকু নন্ট ভাবব।

—আমিও নন্ট।

—দুর বালাই। আমার নাগাল জাইত। মারা মাইয়ার লগে তর মিশার কাম নাই।

—আমার জাইত কবে নন্ট হইয়া গ্যাছে গা। তুই আর আমি একই পদ।

—এডা তুই কেমন কথা কইলি?

বিদ্যা ওকে জড়িয়ে ধরেছিল।—ঠিকই কইছি। আমার ভিতরে ছয়ডা কুজন আমারে টাল সামলাইবার দেয় না। জাইত লইয়া টানাটানি করে। ছয়ডা দসিয়ার আমি সাম-লাইবার পারি না। বাইরে তুই নন্ট হইলি, মানবে দেখল। ভিতরের খপর রাখে কেডা?

অতশত বোঝে না কুঁমি। ওর কালো কুচকুচে মূখের ভেতর লালচে চোখ দুটো ভেজা ভেজা লাগে। বিদ্যা ওকে চেপে ধরে হাসে।

—ভাবিস না। তুই আর আমি একই পদ। সঙ্গলেই তাই। ছয় দসিয়ারে যে সামলাইবার পারে, জাত আছে সেই সাইয়ের। জাইত আর কারু নাই। সঙ্গলে আমরা এক জাইত।

কি যে বলে খেপী। কিছু বোকবার উপায় নেই।

কুঁমি না বোঝে ওর কথা, না বোঝে ওর ভাব-গতিক। মাথাটা খ্যাপা গোছের। মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকে। বরা-বরই এমনি খ্যাপা-খ্যাপা ভাব-গতিক।

তা হোক, ওর কথা বোঝা যায় না। কিন্তু গলার মিঠে আওয়াজটা বৃক্কের হাওয়ায় মিষ্টি ছড়ায়। গলাখানা যেন রসে ভিজিয়ে রেখেছে সব সময়। কি যে টান লাগে। চিনির রস জ্বাল দিয়ে দিয়ে যেমন আঠা আঠা করে মোটা দাঁড় মত লম্বা করে নিয়ে কদমা বানায়, ও যেন সেই কদমা বানানর মিষ্টি রশি দিয়ে মনটাকে আঠালে করে টানে।

সায়েরের মেলায় বিদ্যেধরী যখন বাঁবার গোছগাছ করল, কুঁমি ওর পেছন ধরল। মাঘী শুক্লা ঠরোদশীতে নিতাইচাঁদের জন্মদিনে সায়েরের মেলা। খ্যাপা খেপী, বাউল বোল্টম জমায়েত হয় দেখানে।

বিদ্যেধরী বৃচকি গোছাল। পেছন ধরল কুঁমি। ধর্ম-কর্ম তো কিছুই হোল না, তবু যদি বিদ্যেধরীর কল্যাণে কিছু ধর্ম হয়। কুঁমিও পোটলা কাঁধে নিল। দুজনেই হাঁটা ধরল মেলায় পথে।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নির্বাসন

ঘুম ভাঙতেই বিছানা থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামলেন দীননাথবাবু। ঘরের মধ্যে এলোমেলোভাবে কয়েকবার পায়চারী করলেন। কি যেন খুঁজলেন। জিনিসটা যে কি ঠিক-ঠিক তা স্মরণ করতে না পারায় খুঁজে পেলেন না। এজন্য মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হলেন। হৃদয় শিশুর মত এটা-সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ এক সময় চিংকার করে উঠলেন—ওগো, শুনছ, একবার এদিকে এসো ত'।

দীননাথবাবু খুব অশান্ত স্বভাবের মানুষ নন। অহেতুক উচ্চস্বরে কথা বলা বা ছোটখাটো ব্যাপারের জন্য কাউকে বিরক্ত করা তিনি পছন্দ করেন না। সংসারের কোনো ব্যাপারে দখল ভ' দেনই না, এমন কি নিজের সুবিধা-অসুবিধা-গদুলির জন্য পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ কি হল দীননাথবাবুর?

প্রথম ডাকে কোনো ফল হল না। কেউ এগিয়ে এলো না দীননাথবাবুকে সাহায্য করতে, বা সাড়াও দিল না। ব্যাডির বরষক লোকেরা শুদ্ধ একবার

অবাক সতক দৃষ্টিতে দাঁকপের ঘরের দিকে ফিরে তাকাল। দীননাথবাবু আরো কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে একা-একা পায়চারী করলেন। এটা-সেটা জিনিসপত্তর নাড়াচাড়া করলেন, কিন্তু তবু কেউ এলো না। অবশেষে তিনি চৌকাঠ ডিঙিয়ে দাওয়ার নামলেন। বেশ উঁচু গম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় হাকডাক সুরু করলেন—কই গো শুনছ, একবারটি—

এমন সময় সহসা তাঁর লক্ষ্য পড়ল পাশের ঘরে ছোট মেয়ে রিণু অন্ধ কব্ধে। তিনি বেশ রুদ্ধ ধমকের সুরে কথা করে উঠলেন—এই, আমি চিংকার করছি শুনতে পাচ্ছিস না? যা, তোর মাকে একবার ডেকে দে—

অহেতুক ধমক খেয়ে বিরক্ত হল রিণু। সে উঠল না। সেখান থেকেই গলার পদ। চড়িয়ে চিংকার তুলল—মা, বাবা তোমাকে ডাকছেন—

দীননাথবাবু মেয়ের বে-আদর্শ লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হলেন। কঠিন দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন রিণুর দিকে, কিন্তু কিছু বললেন না। মৃগালিনী শাড়ির

খুঁটে হাত মূছতে মূছতে রাস্তাবদ থেকে বেরিয়ে এলেন। চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ।

—কি হয়েছে, ঘুম ভাঙতেই অত হাঁকাহাঁকি সুরু করলে কেন?

স্বীর চোখের দিকে তাকিয়ে দীননাথবাবু বললেন কিছু একটা অন্যায়ে হয়ে গেছে। তিনি অপ্রস্তুত হলেন।

—না, মানে, আমার—দীননাথবাবু কিছুতেই স্মরণ করতে পারলেন না কিজন্য ডেকেছেন তিনি স্বীকে। বাব বার স্মৃতির দ্বারা আঘাত হেনে-হেনে ক্রান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। এ সময় তাকে বড় অসহায় দীর্ঘ দেখাচ্ছিল। মৃগালিনী সেদিকে তাকিয়ে কংকার দিয়ে উঠলেন—যত বয়স বাড়ছে দিন দিন তত পাগলামী জাগছে তোমার। একপাল লোকজন ব্যাডির মধ্যে আর তুমি হাঁই হাঁই করে চিংকার করছ। জানো না আমি এসময় রাস্তাবদে বসন্ত থাকি। নিম্ন-অনু আফিস বাবে, তপু কলেজ বাবে, ছোট বোমার আমার গানের ইস্কুল আছে, এর মধ্যে তুমিও যদি আবাস—মৃগালিনী কথা সুরু

করলে—আমি খামতে চান না। কখনো
ধর্মের দ্বারা বা ধর্মের আদরের
সুখে, —কখনো বা অভিযোগের—সুখে।
অত্যাচার কখনো শুনতে শুনতে দীননাথ-
বাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। কিন্তু সহসা
আপিস-ইস্কুল-কলেজ আর বোমার গানের
ক্লাসের নাম শুনলে ভুলে যাওয়া জিনিসটার
নাম মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি ব্যস্ত
হয়ে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ত। আমা-
কেও ত বেরতে হবে এখন। আমার
দাড়ি কামানোর জিনিসগুলো আর এক
বাটি জল দিয়ে ধাও।—

মৃণালিনী অবাক হলেন—বেবুতে
হবে মানে? বাজারটার ত হবে গেছে
সেই কোন সকালে, তুমি আবার বেরবো
কোথায়?

নির্বিশেষ দীননাথবাবু বললেন—
কেন, আপিস যাবে।

—আপিস!

মৃণালিনী ভড়কে গেলেন। দীননাথ-
বাবু স্ট্রীপ চোখে কিসের লক্ষ্য করে
কৌতুকবোধ করলেন। সহসা তিনি এক
কাণ্ড করে বসলেন, ঈষৎ ঘাড় ঝুঁকিয়ে
মৃণালিনীর কানের কাছে মুখটা এনে
ফিস ফিস করে বললেন—আজ যে আমার
পেনশনের দিন গো, তোমার জন্য কি
আনব বলা?

উষ্ণ নিশ্বাসের আপটা লেগে
মৃণালিনীর কানের লতি দপদপ করে
উঠল। মুখখানা রঙা হয়ে উঠল। ঝাঁপিতে
ঘাড় সরিয়ে নিলেন তিনি। এদিক-ওদিক
দ্রুত নজর ঘুরিয়ে দেখে নিলেন আশেপাশে

কেউ আছে কি না। পাশের ঘরের
জানালায় ধারে বসে রিপট অক্ষ কবছে।
বড় ছেলে দিব্যোস-তখনো ঘুমিয়ে, বাইরে
থেকে দরজার মাথায় শেকল তোলা।
মৃণালিনী কাউকে কাছোঁপটে দেখতে
পেলেন না, তবু সম্প্রস্তু হয়ে রইলেন।
দীননাথবাবু হাসছিলেন। পরীয়ে
ঝাঁকানি দিয়ে কি একটা কথা বলতে
গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। মৃণালিনী,
লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য
হয়ে গেলেন।

শোভিত করতে করতে মনে মনে হিসাব
কষে ফেললেন দীননাথবাবু—কার জন্য
কি আনবেন। মৃণালিনীর অনেক দিনকার
সখ পুরনো চশমাটার ফ্রেম বদলার।
প্রত্যেকবার এক-একটা অজুহাত দিয়ে
ঠেকিয়ে রাখেন, এবার মনে মনে ঠিক
করলেন—সবায় আগে এই কাজ।

দাড়ি কামিরে এক কাপ চা খেলেন
দীননাথবাবু। ছোট বোমা সঙ্গে জল-
খাবার এনেছিল, দীননাথবাবু তা ফিরিয়ে
দিলেন। একটু পরেই 'ত' খেতে বসলেন,
এখন আবার জলখাবার কেন! চা খেয়ে
হাতের কোষে তেল নিয়ে মাধার তালু
চাপড়াতে-চাপড়াতে দীননাথবাবু তাকালেন
বড় ছেলে দিব্যোসের ঘরের দিকে। কি
ঘুম রে বাপু, আটটা বাজল এখনো মটকা
মেয়ে পড়ে আছে! এর পর আপিস যাবে
কখন?

পরের জন্য দুর্ভাবনা করে নিজের
সর্বনাশ করতে নারাজ দীননাথবাবু,
তিনি ছুটলেন স্নানঘরের দিকে। বড়ো

মানুষ, দৌড়ে লাফিয়ে চলতে কষ্ট হয়,
তবু ষড়তা সম্ভব বৃদ্ধ চান করে দৌড়
মানলেন দীননাথবাবু। অস্তত সেই রকম
একটা ভান করলেন। ইস, কি বেলা হয়ে
গেছে—

সওয়া আটটার খাবার টেবিলে বসলেন।
দিব্যোসের ছোট ছেলে নানকু এসে আশ্ব্যার
ধরল—দাদু, খাবো, আমি খাবো তোমার
সঙ্গে—

দীননাথবাবু নাতিকে পাশে বসিয়ে
নিলেন। এমন সময় দিব্যোস উঠল, কিন্তু
কোনো উচ্চবাচ্য না করে সোজা বাথরুমে
ঢুকল গিয়ে।

—দাদু, তুমি কোথায় যাবে?

—আপিস।

—আমি যাবো।

—দুব বোকা, সবাই আপিস যায় না।

—তুমি কেন যাও তবে?

—আমার কাজ আছে, আমি একটা
জিনিস আনতে যাবো।

বিদ্যুৎস্পর্শে নানকু লাফিয়ে উঠল—
আমার জন্য বল আনবে?

—আনব।

কিন্তু বড়?

দীননাথ হাসতে হাসতে হাত দুটো
টানটান করলেন—এই এ্যাস্তো বড়।

নানকু খুশিতে নেচে উঠল—কি
মজা, কি মজা!

পোনে ন'টার মধ্যে দীননাথবাবু
সেজেগুজে ফিটফাট। দিব্যোস তখন সব
হাতমুখ ধুয়ে চায়েব পেয়লা হাতে
নিচ্ছে। এত বেলা করে ঘুম থেকে
ওঠা মোটেই পছন্দ করেন না দীননাথ-
বাবু। বিশেষ করে খাদ্যের স্কুল-কলেজ
বা আপিস-কাছারি যেতে হয়, তারা কেন
এত আলসে হবে। এই ত সময়, ছোট্টাছটি
করে কাজ করার পরিশ্রম করব। এরপর
ত মাটির দিকে চোখ টেনে-টেনে চলতে
হবে।

দীননাথবাবু ভেবেছিলেন ধূতি-
পাজাবী পরবেন। কিন্তু সহসা মত বদল
করলেন। বৃদ্ধ বয়সেও ধূতি-পাজাবী
পরে আপিস যান নি কখনো। চম্পল পায়-
দেন নি। আপিস সম্বন্ধে বরাবরই বেশ
উচ্চমানের ধারণা পোষণ করতেন তিনি।

ট্রাউজারটা চলচলে হওয়ায় একটা
বেল্ট বাঁধলেন দীননাথবাবু। পুরনো-
দিনকার বেল্ট বেশ চওড়া আর মোটা।
শক্ত করে টেনে বাঁধার জন্য কোমরের
দু'পাশের জামগায়-জায়গায় প্যাণ্ট কঁচকে
রইল। কাজের ফাকে-ফাকে মৃণালিনী
দু'দু'বার এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে
গেলেন। দরকারি জিনিসপত্রের হাতের
কাছে গুছিয়েটুছিয়ে দিলেন। তবু
খুঁতখুঁতানির শেষ নেই। সবশেষে
আয়নার কাছে গিয়ে যখন চিরুণী খুঁজে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - জামশেদপুর - পোহাটী

পান্ডাটিক বন্দুভর্তী

পেলেন না, তখন আবার হকিডাক সমুদ্র করলেন। আশ্চর্য, মৃণালিনী এলেন না। এল বড়ছেলে দিব্যোসের বউ অগ্নিমা। শব্দরের হাতে চিরুণী তুলে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। টাক মাথায় চিরুণী চালাতে চালাতে সহসা দীননাথবাবুর মনে হল, অগ্নিমা যেন মৃদু টিপে-টিপে হাসছিল। তাই ত', অমন করে হাসছিল কেন অগ্নিমা?

কানের লতির পাশের চুলে পাট তুলতে তুলতে দীননাথবাবু অনেকক্ষণ মনে-মনে এই হাসির কারণ খুঁজলেন।

গিলির মূখেই ষ্ট্রাম ব্রাস্তা। অন্যান্য সময় যখনই বাড়ির বাইরে বেরোন দীননাথবাবু, হাতে ছড়ি নেন। আজ নিলেন না। ঝাড়া হাতপায়ে পান চিবুতে চিবুতে বাস স্টপে এসে দাঁড়ালেন। তখনো পথে-ঘাটে তেমন ভিড় জাগে নি। আপিসগামী বাবুদের চহল-পহল বাড়বে আরো কিছুক্ষণ বাদে। দীননাথবাবু একটুকাল দাঁড়িয়ে রইলেন। ইচ্ছা করেই পর পর কয়েকটা ষ্ট্রাম ছেড়ে দিলেন। তারপর সহসা এক সময় হুট করে একটা বাসের পা-দানিতে লাফিয়ে উঠলেন। বাঁ পাশের রঙ ওঠা চকচক হাতল ধরে একটুকাল দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিতরে অনেকগুলি সিট খালি ছিল, কন্ডাক্টর সৈদিকে ইশারা করল—ওখানে দাঁড়াবেন না দাদু, ভেতরে চলে আসুন। ভেতরে অনেক জায়গা আছে—

কন্ডাক্টরের কথা বলবার ধরণ শুনে খুশি হলেন না দীননাথবাবু। দাদু! দাদু মানে কি? অল্প ডেপো ছোঁড়া! কি যে দিনকাল পড়েছে, ভদ্রলোকের ছেলেরা পর্যন্ত মান রেখে কথা কইতে জানে না। এবাই আবার শিক্ষা-দীক্ষার মড়াই কবে! দূর, দুঃ, যতোসব চাষা—

দীননাথবাবু বিষয় বদনে এগিয়ে এসে একটা সিট দখল করে বসলেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। শির-দাঁড়াটা সামান্য গিছনের দিকে হেলিয়ে একটু টানটান হলেন। কোমরের কসি টাইট লাগছে। মাছাটা টনটন করছে। হাত দুটো একত্র জড়ো করে কোলের ওপর রাখলেন দীননাথবাবু। বেল্টটা একটু আলগা করার কথা ভাবলেন একবার, কিন্তু কবলেন না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার জানালার দিকে মৃদু ফেরালেন।

এ সময় দীননাথবাবুকে বেশ হতাশ আর ক্রান্ত দেখাচ্ছিল। বাঁ পাশের বাড়ি-ঘর দোকানপাট খুব দ্রুত তাঁর চোখের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। তিনি ম্লান নিশ্চুপ।

দুরনো, আফিসের কাছাকাছি বাসটা এসে দাঁড়াতেই দীননাথবাবু লাফিয়ে

শাললেন। কি ভেবে হঠাৎ এভাবে নেমে পড়লেন তা তাঁর মূর্খ দেখে ধরা গেল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সাড়ে নটা। দরওয়ান সব সদর গেট খুলেছে। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে লোকটার মূর্খের দিকে তাকালেন তিনি, চিনতে পারলেন না। নতুন রিক্রুট নিশ্চয়। দুরনো আমলের রঘুবীর পাড়ের কথা মনে পড়ল দীননাথবাবুর। সে আমলে কত খাঁতির ছিল তাঁর। ঢুকতে-বেরুতে যুটের গোড়ায় শব্দ তুলে লম্বা সেলাম ঠুকত রঘুবীর! দীননাথবাবু যখন রিটার্নার হন, তখন রঘুবীর পাড়ের চাকরির বয়স উনিশ বছর। একটা ছোট নোটবুকে উনিশটা লাল কালির ফোঁটা দেখে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন দীননাথবাবু। প্রতি বছর পরলা জানুয়ারী রঘুবীর একটা করে ফোঁটা দিত ছোট বইটার ওপর।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেন দীননাথবাবু। কড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্তপণে ভিতরের দিকে উঁকি দিলেন। কেউ কোথাও নেই, শূন্য চেয়ার টেবিল, মাথার ওপর ইতস্তত অনেকগুলি সিলিং-ফ্যান ঘুরছে বনবন করে। দীননাথবাবু পূর্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে তাকালেন যেখানে তাঁর চেয়ার-টেবিল ছিল। এখন সেখানে মস্ত মস্ত দুটো আলমিরা রাখা হয়েছে। দীননাথবাবু দু'পা ভেতরে ঢুকলেন। ডাইনে-বামে নজর ফেললেন। কত কিছু বদলে গেছে! প্রতিটি টেবিলের ওপর গাদা-গাদা ফাইল। একটা কলিং বেল রাখা পর্যন্ত জায়গা নেই।

উত্তর দেয়ালের ঘড়ির নিচে তিনি তাঁর টেবিলটা খুঁজে পেলেন। দীননাথবাবু অবাক হলেন, গত গার্সেও এমনিটি ছিল না। তবে কি সুমথবাবু বদলি হবে গেলেন! দীননাথবাবুর খুব প্রিরপার ছিলেন সুমথ ভট্টাচার্য। তাঁর রিটার্ন-মেন্টের পর সুমথবাবুই প্রমোশন পেয়ে দখল করেছিল সেকশন ইনচার্জের পদ। ফিটফাট পবিচ্ছন্ন স্বভাবের মানুষ সুমথ ভট্টাচার্য। একসঙ্গে দুটো বোশি ফাইল জমতে দিতেন না। সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠতেই সুমথবাবুর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল দীননাথবাবুর।

সুমথবাবুর বাঁ দিকে বসত দীনেশ রাহা। পাতলা ছিপছিপে রোগাটে ধবণের চেহারা। সাবান্ধ ঘাড় গুঁজে কাজ করত। কখনো ক্রান্তিবোধ করত না। মাঝে মাঝে ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা বাদে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ফুকত। দীননাথবাবুকে সম্মিহ করত খুব। নিরান্ন শান্তপ্রকৃতির সেই দীনেশ রাহা হঠাৎ ভালবেসে বিয়ে করে বসল ডেসপাচ সেকশনের লিডিকা

বিশ্বাসকে। সেই নিয়ে কি কান্ড! দিন-কয়েক দীনেশকে নিয়ে সবাই খুব জমে রইল। অহেতুক ঈর্ষায় জ্বলে মবল যুবক ছোঁড়ারা। বুড়োরা বলল—টিকবে না হে, পচা সুড়োর গিট, টান পড়লেই ছটকে যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে গেল। দীননাথবাবুর রেকমেডেশনে প্রমোশন হল দীনেশ রাহের। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মা হল লিডিকা।

—কে, বড়বাবু না? নমস্কার এজ্ঞে—
দীননাথবাবু অবাক হলেন—বেন?
বল্টু! কেমন আছো?

কণ্ঠে হতাশার বেশ টালল বল্টু চাপরাশি—আর আছি বড়বাবু, কোন-রকমে পাপাঙ্ক করছি। চাকরিতে আর সুখ নেই।

দীননাথবাবু অবাক হলেন—কেনো?
তুমি ত' প্রমোশন পেয়েছ শুনিয়েছি।

বল্টু বলল—সেইটাই দঃখ বড়বাবু, তিন টাকার পোরমোশন নিয়ে একশো টাকার লোকশান সহিতে হচ্ছে।

—সে কি, তা' কেন?

—আর বলেন কেন, জমানা বদলে গেছে। এখন ত' আর বডসাহেবের কাজ করি না, তাই ঠিবা দার কনটাকটারবাও পাস্তা দেয় না। শ্লার যতোসব স্বার্থ-পরের গদর্ভি—

স্বন্দেব হেরে যাওয়া কুবু-বেড়ালের মত রাগাবোষে জ্বলতে থাকে বল্টু চাপরাশি।

ক্রমে ক্রমে একজন দঃজন করে ভিড় জমতে লাগল। তিনটি ছেলে অসম্ভব



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং

২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট

কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৫৮০

হইচই করতে করতে ভিতরে ঢুকল। দীননাথবাবু চিনিলেন না কাউকে। একটু পরে লাতকা আর দীনেশ এলো। ওরা দু'র থেকে নমস্কার করল দীননাথবাবুকে। কাছে এলো না। অথচ দীননাথবাবু আশা করেছিলেন, অন্তত দীনেশ তার সঙ্গে কথা বলবে। গত মাসে যখন এসেছিলেন তিনি, লাতকা বলছিল কি একটা শক্ত অসুখে ভুগছে ওদের ছেলোট। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কথাটা মনে পড়তেই দীনেশের সঙ্গে কথা বলবার জন্য দীননাথবাবুর মনটা ছটফট করতে লাগল। তিনি ছোট ছোট পা ফেলে ভিতরে ঢুকলেন। পা ঝুলিয়ে টেবিলের ওপর বসে কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছেলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছিল দীনেশ। ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগ্রেট থেকে ধোঁয়া উড়ছে। দীননাথবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসল সে সন্ধিরে।

—কেমন আছেন দীননাথবাবু?

বিস্ময়ে চমকে উঠলেন দীননাথবাবু। কি শান্ত ঠান্ডা কণ্ঠস্বর। আগে তো এমন করে কথা বলত না—বলত বড়-বাবু। বড়র সঙ্গে বাবু কথাটা বেশ লম্বানের সঙ্গে উচ্চারণ করত।

দীননাথবাবু হাসলেন। একটা-দুটো কথা বললেন। দীনেশ আর তার বন্ধুরা তাঁদের পূর্বকার আলোচনার ফিরে গেল। কথাব ফাঁকে-ফাঁকে ঘন ঘন সিগ্রেট ধূঁকতে লাগল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দীননাথবাবু সন্তপণে সরে এলেন সেখান থেকে।

দীননাথবাবু ভাবলেন, একবার লাতকাব কাছে গেলে হয়। ডেস্কের ওপর গোড় তিনেক ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল লাতকা। এমন সময় চশমাচোখে ছোকরামত একটা লোক ভেতরে ঢুকতেই দীনেশ এবং তার বন্ধুরা চটপট সে যার টেবিলের দিকে এগুল। লোকটি অসম্ভব

গম্ভীর মুখে বসল। গয়ে দীননাথবাবুর চেয়ারে। সন্মুখবাবুর ট্রান্সফার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন এবার দীননাথবাবু। হঠাৎ কি মনে হল, লাতকার কাছে না গিয়ে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর পুরনো টেবিলটার দিকে এগুলেন। চশমাচোখে ছোকরামত যুবকটি ততক্ষণে একটা ফাইলের মধ্যে ডুব দিয়েছে। দীননাথবাবু চিনককণ্ঠে মিন মিন করে তাঁকে নমস্কার করলেন। ছেলোট মুখ না তুলেই বলল—বসুন।

তারপর আবার সব চূপচাপ। অনেকক্ষণ বসে রইলেন দীননাথবাবু। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে কি না। লাতকার সঙ্গে চোখাচোখি হল। দীননাথবাবুর মনে হল নরম চাপা চোটে সে যেন হাসল ঈষৎ।

—বলুন, কি চাই?

একসময় মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল ছেলোট। কৃতজ্ঞতার গলে পড়লেন দীননাথবাবু। —না না, চাই না কিছু। এমনি আলাপ করতে এলাম।

ছেলোট বুদ্ধি বা অবাক হল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দীননাথবাবুর মুখের পানে, তারপর যথারীতি কাজে মন দিলে।

দীননাথবাবু বললেন—আমি আগে এ সেকশনের ইনচার্জ ছিলাম। সন্মুখ আমার সাকসেসর।

ছেলোট আবার মুখ তুলল। বেশ ভালো করে নিরীক্ষণ করল দীননাথবাবুকে। সামান্য হাসল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। দীননাথবাবু এই সুযোগে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চাপরাশি এসে খবর দিল—হুজুর ইয়াদ কিয়া।

ভাড়িঘড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল ছেলোট। দীননাথবাবু বসে রইলেন চূপচাপ। পশ্চাতে ছেলোয়ের গুঞ্জন শুনলেন। ফস করে জ্বলে-ওঠা দেশলাই কাঠির আওয়াজ শুনলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো ছেলোট। দীনেশকে ডেকে একটা জরুরী কাজ বুদ্ধিরে দিল। ফের ডুবে গেল কাজের মধ্যে। কোনো কথা বলতে না পেয়ে, ডয়ানক অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন দীননাথবাবু। অনেকক্ষণ দোন্ডোন্ডো করার পর উঠে দাঁড়ালেন।

ছেলোট মুখ তুলল। দীননাথবাবু বললেন—হাই। ছেলোট ঈষৎ শান্ত হাসল।

বারান্দার এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। চতুর্দিকে লোকজন ধরে বেড়াচ্ছে। সকলের মুখের দিকে তাকালেন দীননাথবাবু। অসেকেই অপরিচিত। চেনাজানাঘের মধ্যে কেউ কেউ একটা-

দুটো কথা বলল। কুদল জিজ্ঞাসা করল। দীননাথবাবু সে সব কথার বিস্ময়ে প্রাণের স্পর্শ পেলে না। তাঁর যেন মনে হচ্ছিল—কোনো নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনলে উদ্ভ্রম্বাসে তিনি ছুটে এসেছেন। সবাই ভাবছে—দারুণ দুঃখে ম্রুহমান তিনি, কেউ তাই তাঁর চোখের দিকে স্থির হয়ে তাকাতে পারছে না। কথা বলতে গিয়ে সঙ্কোচবোধ করছে। কিম্বা অবহেলা? কথাটা মনে হতেই দীননাথবাবু চমকল হলেন। কি জানি কেন সহসা তিনি দারুণ দুর্বলতাবোধ করতে লাগলেন। মাথাটা ঘুরে উঠল।

—মুকুন্দ, শোন।

একজন মধ্যবয়স্ক লোক পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, দীননাথবাবু ভাড়াভাড়ি কাছে ডাকলেন তাকে। ধীরে পায়ে অনিচ্ছাসহে কাছে এলো মুকুন্দ।

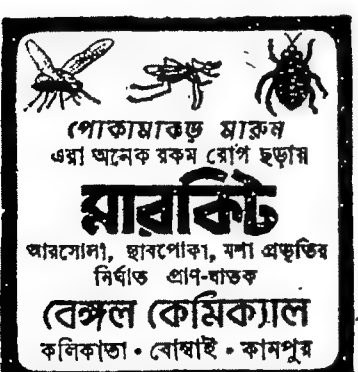
—কিছু বলছিলেন বড়বাবু?

—হ্যাঁ, মানে, আমাকে একপল্লী খাওয়াতে পারো?

মুকুন্দ বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন নয়? দেখি যদি প্লাস পাই পাঠিয়ে দেব।

মুকুন্দ চলে গেল। দীননাথবাবু দেয়ালে ভর দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বুদ্ধিরে মুকপুতালি দান্ড হয়ে এলো। তিনি চোখ খুললেন। জল এলো না। কয়েক পা এগিয়ে তিনি চোখ তুলে তাকালেন ডেস্‌পাচ সেকশনের দিকে, মাথা নিচু করে একমনে কাজ করছে মুকুন্দ। চোরের মতন পা টিপে টিপে সরে এলেন দীননাথবাবু। আর ঠিক তখনই তিনি চিৎকার শুনলেন—‘ক্যাস এসে গেছে, ক্যাস এসে গেছে’।

সকলে ছোটোছোটো সদর করল। দীননাথবাবু পাশ কাটিয়ে, হাতের দিকে চলে গেল কয়েকজন। এতক্ষণ পর এইবার হঠাৎ দীননাথবাবুর মনে পড়ল তাঁর পেনশন তুলতে যাওয়ার কথা। কিন্তু তেমন উৎসাহবোধ করলেন না। ক্রান্ত বিষয় পা ফেলে ফেলে তিনি বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এলেন। দেয়াল ধরে একটুকাল দাঁড়ালেন। লম্বা লম্বা নিশ্বাস নিলেন। ঘোলাটে ব্যাপসা দৃষ্টি। এইভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একসময় সহজ স্বাভাবিক হওয়ার জন্য প্রাণপণ হলেন দীননাথবাবু। রোলিং ধরে ধরে সাবধানে সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করতে লাগলেন।



পোকা মাকড় মার্কট
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায়

মারকিট

আরসোনা, ছাবপোকা, বশী প্রভৃতির
নির্ধাত প্রাণ-হাতক

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

ওধানটার দাঁড়ালে ভালই লাগবে।
এ যেখানটার আমে জামে সেগনে আর
শিরীষে জড়াজড়ি। তাল আর তেঁতুলের
ছায়ার ঘন জটলায় জটিল। এ যেখানে
একদা প্রবল প্রবাহিনী, কিন্তু অধুনা
শীর্ণপ্রোতা সরস্বতীর বিস্তীর্ণগর্ভ
খাত জুড়ে গজিয়েছে অনেক গাছ আর
আগাছ। কোপেঝাড়, লতায়-পাতায় ঘন
হয়ে রচিত হয়েছে এক অসম্পূর্ণ অরণ্যের
অভাব। এ যেখানটার ছায়া সুনিবিড়
বগলপত্রীর একখানি আস্ত সমগ্র ছবি যেন
ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা আছে বলে মনে হয়।
ভয়ও করবে। কারণ নিজ'নতা
এখানে ভয়াল। নেংশন্দ এখানে কঠিন।
সোজা পাকা পিচ ঢালা লম্বা রাস্তাটির
দু'পাশে যতো গাছ ততো ছায়া, যতো
ছায়া ততোই শীতল, শীতল আর শব্দ-
হীন। নিজ'নতা এখানে যেন মস্ত
ঠাণ্ডা ভারী পাথরের মত চেপে বসে বসে।
যেন থম্বরা দীঘর কালো জল, যেমন
অতল, তেমনই ঠান্ডা। গা শিউরায়, দম
আটকে আসে।

শব্দ এলোমেলো বয়ে যায় পাগলা
ঝাটাস, দু'পাশের জগলে শব্দ ওঠে
সরসর, মরমর। ঝরা পাতার স্তপাকার
জজ্বলে নাড়া দিয়ে, ঝাঁপ খেয়ে খেয়ে পড়ে
হাওয়ার ঝাপটে। হেলেপড়া বাঁশবন
রব তোলে কোঁ-কটকট, কটকট।
নিজ'নতা যেন আরও নিখর হয়। আরও
জমাট বাঁধে। পাখীর কিচির্মিচি, হাওয়ার
হায় হায়, আর বন-বনানীর আরও অনেক
শব্দের অশরীরী আনাগোনা। কচিৎ
কখনো শোনা যায় একটি-দুটি সাইকেল
কিংবা রিক্সার ঘণ্টির ঠুন ঠুন, কখনো
বা খুলো উড়িয়ে আশ-পাশের কুটি-কাঠি
পাতা-লতার জগলে ঝড় উঠিয়ে সবেগে
ছুটে চলে যায় একখানি বাস, একটি বা
লরী। সুইচলা হন' সজোরে বাজে।
নামে একটি-দুটি মানুষ—ওঠেও বা হয়তো
কেউ কেউ। নিজ'নতা তখন ভাঙে।
টুকরো হয়, খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে
ছায়ার মতো ছড়িয়ে পড়ে, মায়ার মতো
মিলিয়ে যায়।

মানুষ তখন আবার স্বাভাবিক।
ক'পা এগিয়েই ছোট্ট একটু মোচড় দেওয়া
মোড়। সামনেই একান্ত প্রশস্ত আলো-
খলমল সুদীর্ঘ এক দিগন্ত থেকে আর
এক দিগন্তে ছোঁয়া নবনির্মিত রাজপথ—

“দিব্রী রোড”, মানুসজন, লোকালয়।
শিশুর স্বর, বয়স্কের ডাকাডাকি। ঘরে
ঘরে ঘরবসতের চেনা আওয়াজ, বেঁচে
থাকার নিচু সঙ্কেত।

ভরসা পাবে মানুষ, আগের গা-ছমছম
ভয়ের অশরীরী আক্রমণ কাটিয়ে উঠে
সহজ হবে, স্বাভাবিক হবে, সোজা শব্দ
বড় বড় পা ফেলে হেঁটে চলে যাবে আবার
তার আপন গন্তব্যপানে। সামনেই গ্রাম
“রাজহাট”।

লোকে বলে রাজার হাট থেকে
হয়েছে—“রাজহাট”। উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ
কুলীন রায় রাজারী এসে বসত করে-
ছিলেন এখানে—আশি-বিশার গড়-কেটে।
উপাধি ছিল রায়মহাশয়—তাই মশাইদের
গড়ও বলেন কেউ কেউ। তাঁদেরই বসানো
এক প্রকাণ্ড হাট বসতো এখানে। হাট
বসলেই চলে কেনাবেচা, সওদা আর
সওদাগরী। সওদার টানে এলো সওদা-
গর। প্রথমে অস্থায়ী, পরে স্থায়ী বস-
বাস গড়ে উঠলো এখানে-ওখানে। রায়-
কুলের রাজ-বসত আগে থেকেই ছিল।
তখন গ্রামখানিকে সুসম্পূর্ণ করবার

প্রয়োজনে ছয় ঘর ছত্রিশ জাতি এনে পত্তন
করালেন তাঁরাই। সরস্বতী গর্ভোচ্ছিত
রাজহাট হাট-বসতি থেকে লোক-
বসতি হলো। সপ্তগ্রামের একেবারে
সংলগ্ন এবং সরস্বতী ধারাখোঁত বলে
এর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধেও কল্পনা
করে নেওয়া যেতে পারে সহজেই।

বন্দর সপ্তগ্রামের বাণিজ্য তথা পণ্য-
খ্যাতি অর্ধেক পৃথিবীর সীমানা ছুঁয়েছিল
এককালে। প্রকাণ্ড সরস্বতীর প্রবল
ভরণ-ভোগে হিন্দোলিত নৌবহর সমুদ্র
পার হয়ে চলে যেতো ইরানে, ইরাকে,
রোমে আর পারস্যে, কাবুল কিংবা ইন্দো-
চীনে। বহন করে নিয়ে যেতো
বহুমূল্য পণ্যভার, আহরণ করে নিয়ে
আসতো বহুমূল্য পণ্যসম্পদ। কিন্তু
সেদিনের সেই খ্যাতি কীর্তি মৌরবে
গর্বিত উজ্জ্বল-সমুজ্জ্বল দিনেও
রাজহাটের নাম স্থান পায় নি ইতিহাসে।
কারণ রাজহাট তখন রাজহাট ছিল না,
রাজধানী সপ্তগ্রামেরই অংশবিশেষ বার
সাতগাঁ নামে পরিচিত ছিল। জন-বসতি
ছিল কিন্তু বড় বন নয়। তৎকালীন
নগর নির্মাণের বিশেষ রীতি অনুযায়ী

নগরীর মধ্যভাগেই হতো সবচেয়ে ঘন-
বসতি জনবসত, আশ-পাশে বিরল বসতি
পান্থশালা, নাবিক নিবাস, বিদেশী জাহাজ
নোঙর ফেলে বিশ্রাম নিতো এই সব
এলাকায়, মূল নগরীর একটু বাইরে,
কিন্তু কোলাহল তথা কেনাবেচার প্রায়
গা ঘেঁসে বললেও চলে। তাই রাজহাটের
মাটি খুঁড়লে জাহাজের হাল, নৌকার
নোঙর যতো পাওয়া গেছে, জনপদ
বসতির স্মৃতিচিহ্ন ততো নয়। রাজহাট
নামকরণ অনেক পরের। তখনও সরকার
সাতগাঁও আছে, রাজধানী সপ্তগ্রামও
অস্তিত্বহীন নয়, কিন্তু বন্দর-সপ্তগ্রাম
হয়েছে অসুস্তমিত। ওঁদিকে নতুন বন্দর
চট্টগ্রামের ঘটছে অভূতপূর্ব, আর এদিকে
কলকাতা, সুতানুটী, গোবিন্দপুরের
মাটিতে জলাজপল আর জলজ আধার
আড়ালে বসে বিদেশী বাণিক-লক্ষ্মী
গুণছেন অন্ধকার প্রহর। হুগলী নদীর
তীরে তীরে আর রাজধানী সপ্তগ্রামের
এখানে-ওখানে অতিক্রান্ত পতঙ্গীজ
আক্রমণে বার আগমনের আগামী দিনের
আভাস। রাজহাটের প্রতিষ্ঠা এইকালে।
মূল নগরী সপ্তগ্রাম, কিন্তু শহরের সঙ্গে
সংলগ্ন শহরতলীর মতো এর ইতিহাসও
অবশ্য স্বীকার্য।

পোড়ামাটির কিছু পুতুল, অশুভ-
দর্শন পাথ এবং কিছু পাথরের মূর্তিও
পাওয়া গেছে রাজহাট কিংবা তার আশ-
পাশের এই সব এলাকা থেকে। বার
অধিকাংশই হয়েছে অপহৃত, কিংবা
অপসৃত—উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে।

আল্লামা তিন ফুট উঁচু অখণ্ড
কলিপাথর থেকে কেটে তোলা, অপূর্ব
সুন্দর একটি সুবর্মিত দেথা গেল
রাজারহাটেরই এক প্রাচীন পরিবার
চক্রবর্তীদের ঠাকুর ঘরে। সুবর্মিতিকে
এক সুপ্রাচীন শিল্পশৈলীর নিদর্শন
বলে মনে করা যেতে পারে।
স্বিভূজ কমলধারী, পদতলে সালস্কৃত
উষা, মাথার ওপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত
মেঘকুল—পলায়নপর অন্ধকার। সপ্তাব-
বাহিত রথের অরুণ সারথী। অট্টোপে
অশ্রুতলঙ্কার, চুড়া মকুট এবং উপবীত
শোভিত এই মূর্তির পায়ে বৃট জুতা
আছে। সুবর্মিত শিল্পে বা কৃষাণ
প্রভাব বলে স্বীকৃত হয়। রেখাও
কোথাও শাক্তবীণী সুবর্মিতিও বলা
হয়ে থাকে একে। শোনা-গেল—কোন
এক পুকুরের গর্ভ থেকে এটিকে উদ্ধার

করোছিলেন চক্রবর্তী পরিবারেরই কোন এক পূর্বপুরুষ। সর্বশেষের কৃষ্ণকর্ত এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও অস্পষ্ট নয়। এ যদি সপ্তগ্রামে মুসলমান আক্রমণের ফলশ্রুতি স্বরূপ হয়ে থাকে, তবে সে আক্রমণের ঝাণ্টা এই রাজহাটের প্রান্তেও এসে পৌঁছেছিল। এবং স্বীকার করতেই হবে অবশ্যই ধন-জন-সম্পদে শোভিত, মূর্তি-মন্দিরে শোভাময় এক সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল এখানে, নইলে নিরালো জঙ্গলে হানাদার আসে না। এলেও ধ্বংসের চিহ্ন বহন করে এনে ফেলে যায় না জনপদ-বসতি থেকে দূরে। সপ্তগ্রামের পৌরবের কালে সমৃদ্ধি ছিল এই এলাকা-টিরও। এই সব ছড়ানো ছিটানো প্রমাণ পদচিহ্নেই রয়ে গেছে যার অস্পষ্ট এলো-মেলো আভাস, অস্তিত্ব আর অস্তগমনে আবছা অ-প্রমাণিত ইতিহাস।

ইংরাজ আমলেও কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য রাজহাটে ছিল। প্রকাণ্ড এলাকা জুড়ে ভগ্নজীর্ণ নীলকুঠি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। এছাড়াও চাল এবং তাঁত কাপড়। সপ্তগ্রামের বণিক বাজারের খ্যাতি তখন অস্তপ্রায়। নাম শোনা যাচ্ছে নবোদিত হুগলীর। এবং হুগলী নদী থেকে সরস্বতীর খাত বেয়ে সোজা আনাগোনা তখন এই সব এলাকায়। সহজও বটে। রাজহাটে রায় রাজাদের বসতি পত্তন সম্ভবত এই কালে, কিংবা এর কিছু আগে। গতগৌরব সপ্তগ্রামের কেনা-বেচার শেষ বাজারটুকু তখনও টিকে ছিল রাজারহাটের প্রাঙ্গণ-আশ্রয়ে, শ্রুষ্টির শেষ সূত্র প্রান্তে ভর দিয়ে।

আজকের রাজহাট একেবারে অন্য-রকম। অতীতের সব স্মৃতি ধূয়ে মুছে একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছে নিজেকে। বাণিজ্য নেই, কিন্তু আছে

বণিকমন্যভা। এই দুনিয়ার টিকে থাকার ক্রমা-ধরনের খাতার পাতার বাঁ দিকের ওপরের সারিতেই তাদের নামটা টিকিয়ে রাখতে চাইছে রাজহাটের মান্দু। বাঁচতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শূন্য নিজেকে নয়, আগামীকালের ইতিহাসকেও।

রাজহাটের মান্দু আজ নিঃসন্দেহে জীবন-সচেতন। এলাকা ৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১২ হাজার। রাজহাট, কোড়লা, ধুলিয়াড়া, ভাঁটুয়া, ভাতুড়িয়া, আমপালা, ডুয়াগাছি। এই ছয় গ্রামসভা নিয়ে রাজহাট অঞ্চল। আয়তনে খুব বড় নয়। কিন্তু প্রকারে গুরুভার। তপশিলী উপজাতি এলাকা। সমস্যা তাই অনেক। সমাধানের ব্যবস্থা এতই অপ্রচুর যে লিখতে গেলে এক দীর্ঘ 'নাই' মহাভারতের সূত্রপাত করতে হয়। রাস্তাঘাট অতি যাচ্ছেতাই। আন্দাজ ৬৫ থেকে ৭০ মাইল রাস্তা আছে সমস্ত এলাকায়। যার মধ্যে মাত্র ৯ মাইল পাকা। বাদবাকী সবই কাঁচা এবং উল্লেখযোগ্য রকমের অ-সংস্কৃত। বিশেষ করে রাজহাট-গান্ধীগ্রাম, ভাঁটুয়া-বরুণাপাড়া, চৌতাড়া-বেলগোছিয়া প্রভৃতি রাস্তাগুলি অবশ্যই মেরামত হওয়া দরকার এবং তা এখনই।

রাস্তা তৈরি হলেও সমস্যার শেষ হবে না। পুঁল এবং সাঁকো চাই। কৃষ্ণিত সরস্বতী এই জোড়া নদী এবং ঝোয়ার খালের জলধারা সারা অঞ্চলটিকে প্রায় শতধাবিভক্ত করে রেখেছে বললেও চলে। পায়ে পায়ে পুঁল আর সাঁকো। পাকা কম, বাঁশের আর কাঠেরই বেশি। বর্ষার বান আসে। পুঁল ভাঙে। কাঠ, বাঁশ জলে ভেসে যায়, পথ চলার হয় অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। আবার বর্ষা কাটে, শরৎ আসে। বাঁশ-দড়ি কাঠ-কুটো জুটিয়ে এনে ভাঙা পুঁল নতুন করে আবার বাঁধে

পায়ের মান্দু। পরের বর্ষার আবার ভেসে যায়। এই দুর্ভোগের একটা পাকাপাকি প্রতিকার হওয়া এখনই দরকার। অস্তত ধুলিয়াড়ায় কৃষ্ণিত নদীর ওপরে একটি বাঁশের সাঁকো যেখানে প্রায় ৫০।৬০খানি গ্রামের মান্দুদের অশেষ দুর্ভোগের কারণ হয়ে রয়েছে, সেটির অপসারণ এবং নব নির্মাণ। ভাতুড়িয়ায় খোয়ার খালের ওপরে একটি পায়ে চলার পুঁল, চৌতাড়ায় জলার ওপরে একটি বড় সেতু এবং তারাবিহারী গ্রামে সরস্বতীর ওপরে বাঁশের পুঁলটি সারিয়ে ফেলে একটি পাকা সেতুর নির্মাণ অতি অবশ্যই এবং অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দরকার।

চৌতাড়া, ভাতুড়িয়া, বেলগোছিয়া আদিবাসী-অধুষিত অঞ্চল। প্রায় ৫ হাজার আদিবাসীর বাস এখানে। কেন্দ্রীয় সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ থেকে এক লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং কাজও শুরুর হয়েছে কিছু কিছু। শোনা গেল এই সূত্রে জলার ওপরে একটি সেতুও নাকি মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু নির্মাণের কাজ আজও শুরুর হয় নি। কবে হবে এবং আদৌ হবে কি না সে সম্বন্ধে কোন আশ্বাস রাখতে পারছেন না গ্রামবাসী। যদিও আদিবাসী কল্যাণ কমনায় অনেক টাকা এবং অনেক পরিকল্পনাই প্রবৃত্ত হয়েছে এই এলাকা-টুকুর ওপরে, তবু সর্বস্ব ভেৎসাকে দিয়ে চাষিকারিটি আমার আঁচলে বেঁধে রাখার সব কাজের ঢাকা আঁটকে ঠেকে থাকবে স্বরকার, নেড়বড়, ভাঙাচোরা ঐ বাঁশের সাঁকোর।

নলকূপের সংখ্যা কম। তপশিলী এলাকা। দরিদ্র, অশিক্ষা আর ব্যাধির তাই পাশাপাশি সহ-অবস্থান। অথচ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা দাতব্য চিকিৎসালয় নেই। চিকিৎসা করাতে হয় মগুরা, পোলবা বা চুঁচুড়া থেকে। সব দিকেই ৫।৭ মাইলের ধাক্কা, পরিবহন ১৯ নম্বর বাস। চুঁচুড়া-পোলবা-পাটুয়া মহা-নদ। সার্ভিস ৪০ মিনিট অন্তর। আসে ঘন্টাবানেকের ব্যবধানে। বিগড়ালে বা রিসার্ভ চলে গেলে তো কথাই নেই।

পরিবার পরিকল্পনার কাজ হয় নি কিছু। প্রচারের অভাবই ভয় জনা দারী। শোনা গেল সম্প্রতি পোলবা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অস্থায়ী একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এখানে। কিন্তু কাজ কিছু হয়েছে বলে মনে হলো না।

প্রধান ফসল—আম, কাঁটাল, কলা। হাঁ, বান, পাট নয়। বান, পাট ভাল হয় না এখানে। যদিও মাটি ভাল, ডাকলে কথা কর—এমনই ভাল, থাকে বলে অজানা নৌশীশ। তবু হয় না। কারণ



রাজহাটে—কৃষ্ণিত নদীর ওপর একটি বাঁশের সাঁকো

সেই আদি ও অকৃতিম। সেচ নেই, যদিও একদিকে কৃষ্টি, অন্যদিকে সরস্বতী এই জোড়া নদীর অববাহিকায় রাজহাট। এবং যদিও জলে এবং জলায় পায়ে পায়ে প্রায় বারমাসই পল্কিল হয়ে থাকে রাজহাট। তবু 'লিফ্ট' বসে নি। ডিপ টিউবওয়েল বসেছে কিন্তু চালু হয় নি। আর তাই শস্যের চেয়ে ফলের ওপরেই বেশি নির্ভর করেছেন এ অঞ্চলের চাষী।

আমের ফলন খুব ভাল এখানে। আকারে আকৃতিতে এবং আশ্বাদনে সুন্দর। রং ভাল, খেতেও ভাল, ফলেও প্রচুর। হিমসাগর, সরি আর বোম্বাই চালু আম। ল্যাংড়া তেমন ফলে না। রাজহাটের সরি আর হিমসাগর নিখিল ভারতীয় ফল প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের পুরস্কার জিতে এনেছে। পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীতারাপদ মন্ডল ও শ্রীসুনীল-কুমার দাস।

দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে আমের বাগান আছে, আম চাষ নেই। নেই বৃষ্টি না হলে সেচের ব্যবস্থা, খরায় কাটার দুটি শৃঙ্খমে পড়লে মস্ত হোস পাইপ দিয়ে জল ছিটিয়ে নাইয়ে দেবার ব্যবস্থা নেই। কুরাশায় গাড়ি পোকা লেগে বউল খেয়ে দিলে ডি-ডি-টি স্প্রে করারও উপায় কিংবা উদ্যোগ নেই। সারা বছরের মস্ত মরশুম। মরশুমের পসরা ফল, আমের ফসল তাই আজও অবহেলিত, শতকরা নিরানব্বই ভাগই প্রকৃতিনির্ভর। প্রকৃতি কৃপা করলে আম ফলে, নইলে গুটি করে, বউল মরে, কখনো বা অপটু আমে পোকা লেগেও মার খেয়ে যায় ফলন। চাষী চেয়ে দেখে, কর্তি-পড়তি ফসল পেড়ে নেয়। আর বড়জোর চেষ্টা করে বছরে একবার বাগানের জমিতে লাঙল দিয়েই খালস, তার কর্তব্য সেখানেই শেষ।

অপ্রাসংগিক হলেও উল্লেখ না করে পারা গেল না—উত্তর প্রদেশের মালিয়ারাদ নামে একটি জায়গা আছে। মালিয়ারাদের দেশেরী আম প্রসিদ্ধ। এখনকার চাষী প্রকৃতিনির্ভর নয়। সারা বছরের ডাড-কাপড়ের সংস্থান ঘরে আসে দু'মাসের এই আমের ফসল থেকে। কাজেই প্রকৃতিনির্ভর থাকলে তার চলেও না। আম চাষে সে স্বয়ং উদ্যোগী। উত্তর-প্রদেশে গরম যখন অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করে, প্রচণ্ড লু হাওয়ার ঝাঁটার ফলে কালো হয়ে কুঁকড়ে যেতে চায় কচি আমের কুঁড়ি, করে পড়ে, আঁধি কড়ে। তখন শব্দ হয় আমচাষীর কাজ। বাগানে বাগানে বড় বড় কুরা কাটান থাকে। ছোট ছোট পাম্প বসিয়ে গ্রীষ্মে তপ্ত গাছ আগ-গোড়া নাইয়ে দেওয়া হয় প্রতি রাতে। গরমকালে গোড়ায় জল পায়। আমের



রাজহাটের পাশে কীলকুটির বন্যাবনাশ

গুটি বোটার জোর পেয়ে সতেজ হয় আবার। ইউ, পি-র আমের ফসল তাই পুরোপুরি চাবের মরাদ্দা পেয়েছে। করা খরা নেই, মালিয়ারাদের দেশেরী, লক্ষ্মীয়া সফেদা, কিংবা বনারসী ল্যাংড়ার। ইদানীংকালে ইউ, পি গভর্নমেন্ট সচেতন হয়েছেন এ বিষয়ে। ছোট পাম্পের বদলে বড় পাম্পের সুবিধা পাচ্ছে চাষী। আর-বাগানেও সেচ পুকুর কাটা যায়, কৃষি কল ব্যবদেও পেতে পারেন চাষীরা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বাগান মালিকদেরও দৃষ্টিপাত করতে বলি এদিকে।

কলার বাগান অনেক। বেশির ভাগই চাঁপাকলা। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চাঁপাকলা প্রায় একচেটে অধিকার স্থাপন করেছে বললেও চলে। বড় কাঁদি, ফলে অনেক, ফলন ভাল এবং দুঃখচেটে গাছ। বড় বৃষ্টি খরা করা সহিতে পারে। ফলে চাষীর ঘরে দুটো শস্যময় ভুলে দেয় চাঁপাকলা। রাজহাটে অবশ্য মর্তমান এবং কালী-বোয়েরও চাষ দেখলাম।

সামান্য ধান, কিছু রবিশস্যও আছে। কিন্তু জলের অভাবে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। পশ্চিম হুসর জমি খটখট করে শুকিয়ে। কচি সবুজ ধান খড় হয়ে শূন্য পড়ে ক্ষেতের আলো। অগ্নানে শূন্য মরাই। অলক্ষ্যে যেন এলোচল উড়ে করে কেঁদে কেঁদে মাঠে মাঠে। বকু হিম-করা সে আওয়াজে আগামী আকারের ইঙ্গিত।

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় ১৪টি। গড়-পড়তা প্রায় ৮০ থেকে ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করবার সুযোগ পাচ্ছে প্রতিটি বিদ্যালয়ে। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয় নেই। কলেজ-গিঠের মধ্যে ব্যাংকল। ব্যাংক থেকে

হয়, মাসে ১৫।২০ টাকার খাজা। শিক্ষার সুযোগ তাই সীমিত এখানে।

বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে গাম্বীয়ায়। স্বয়ং গাম্বীজীর পদপাতন্য প্রতিষ্ঠান। পূর্বে মোকবসতি প্রায় ছিল না বললেও চলে এখানে। প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করেই আমের সূত্রপাত। সহশিক্ষা। পুরুষ মহিলা সমান সমান। মস্তুর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ফুল, ফল, ফসলের আবাদ চারিদিকে। সামনের গোলাকার চক্রে গাম্বীজীর যে আবক্ষ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে গেল ওটি প্রথম বছর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের দান। ওপাশে মুরগী, পালন, মোমাছির ঘর। চাবু এবং কারুশিল্প। পড়াশুনার হলঘরটি প্রকান্ত। দৈনন্দিন পাঠ্যক্রম জাড়া সভা-মিতির সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় এইখানেই। জানালার পর্দা-গুলি টানা; আড়াল করা। সারা ঘরে গরম ভিজ ভিজ অসুখের। এখন বিকেল, এখন ক্রাস হচ্ছে না। তাই এ ঘর খালি। এখন শিক্ষার্থীরা কস্ত আছেন অন্য কাজে। শিক্ষাসূচী ছাড়া অপরাপর কাজও করে নিতে হয় তাঁদেরই। গাছে জল দিতে হয়, কোদাল কোপাতে হয়। মাটি ফেলে ঘাস বেছে আগাছা নিড়িয়ে আবাদ করতে হয় সময়ে ফল, ফুল শাক-সবজীর। মুরগী দেখাশুনা, মোমাছির যত্নও তাঁদেরই। এখন রাত্য়াক্ষর। দৈনিক আঠারো কে-জি আঠার বটির তদারকি বাস্তব আছেন আপাতত। ভাইয়েরা মাখন, বোনেরা বেলে কেম। হেইয়ো হেইয়ো করে ঘাঁরা আটা মাখছিলেন এবং অগ্নি-প্রতি চাকি-কেঁদে খটখট শব্দ ভুলে ঘাঁরা কচি বেলেছিলেন গরমে গলদঘর্ম-হাঁদব কাজকেই আর ডেকে বিরত করলাম না।

আপাতত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোই ভাল। এবং ঘুরতে ঘুরতেও খুঁচরো খবর কিছু সংগ্রহ করা গেল। যথা এখানেও চোর আসে। এসেছিল এই কিছুদিন আগেই। জানলা দিয়ে লগা বাড়িয়ে ছিটকনি খুলে জামা কাপড় চাদর শাল আরও কি কি সব নিয়ে গেছে। চোর খরা পড়ে নি। (পড়বে এমন আশাও করেন না কেউ।) বলাই বাহুল্য চোরাই মালও খুঁজে পাওয়া যায় নি আর। তারপর থেকেই মেয়েদের নাকি ভীষণ ভয়। তাঁরা চোকা সিরিয়েছেন। জানলার ধার থেকে জামা কাপড় আর জিনিসপত্র সিরিয়েছেন। সব জানলা বন্ধ করে ডবল ছিটকনি শক্ত করে এঁটে শূঁছেন সব। এবং তার পরেও অজ্ঞাত কোনো উপায়ে ছিটকনি খুলে জিনিসপত্র কিছু হাতের নাগালে না পেয়ে ক্রুদ্ধ চোর লগা দিয়ে যদি খোঁচা মারে এই দুর্ভাবনার আবার ঘুমও হচ্ছে না কারও কারও।

আরও জানা গেল রাস্তা নেই। এদিকও প্রতিষ্ঠানের বয়স হলো অনেক দিন। এবং বহিরাগত এতগুলি মানুষের আগম-নিগম লেগেই আছে বছর বছর। তথাপি বহু দরবার করে ও বহু গর্তে সন্ধানিত খানা-খন্দে উঁচু-নিচু শীত-গ্রীষ্মে একগল্য ধলো, এবং বর্ষায় এক কোয়ার কাদা—এ রাস্তাটিকে পাকা করানো যায় নি। সম্ভব হয় নি বিশেষ কোনো সংস্কার সাধনও।

কিন্তু তার চেয়েও দুর্শ্চিন্তার কথা চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নেই।

প্রভাতবাবু—মানে অথাক শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামীরও ঘোষ করি এইটেই সবচেয়ে বড় দুর্শ্চিন্তা। এতগুলি বাইরের মানুষের ভাল-অমলের ভাবনাচিন্তা করতে হয় তাঁকে। সকলের বড়টা, চিন্তাটাও তাই বড় রকমের। ডাক্তারখানা নেই, সারা অঞ্চলে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। জ্বরুরী প্রয়োজনে রোগী স্থানান্তরিত করতে হলে নেই উপযুক্ত পথ কিংবা পরিবহন। দর-কারে অ্যাম্বুলেন্স ডাকবেন কাছপিঠে টেলিফোন নেই। এবং এ রাস্তার বর্ষাকালে তো অ্যাম্বুলেন্স আসবেই না, অন্য সময়েও বড়ই মুশ্কিল।

ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রায় সব রকম সরঞ্জাম হাতের কাছেই মজুদ রেখেছেন তিনি। কিন্তু তারপর—তারপরেও তো আছে। প্রাথমিক চিকিৎসায় বাগ মানে না এমন রোগও তো হয়। আর মানুষেরই হয়। তখন?

কুয়াল স্পনসর্ড লাইব্রেরী নেই। রাজহাট সাধারণ পাঠাগার আছে। এ অঞ্চলের একটিমাত্র ভাল গ্রন্থাগার। পুস্তক প্রায় ১,৮০০। সদস্য সংখ্যা এক শতেরও ওপর। পাকা বাড়ি জমি-জায়গা সবই আছে এঁদের। স্পনসর্ড কেন হয় নি বোকা গেল না। শোনা গেল কর্তৃপক্ষ নাকি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তাঁদের অনুরোধ ওটা তাঁরা একটু তাড়াতাড়িই নিয়ে ফেলেন। শিক্ষার প্রয়োজনেই গ্রন্থাগার। নিরক্ষরতা দূরীকরণ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে পোলবা রকে। অথচ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের এই দোনা-

মনা অনাথাই আনছে সাধারণ মানুষের। শ্রমশান নেই। এ না-থাকলে যে কি দুঃসহ বন্দনা সে একমাত্র বৃত্ততে পারেন তাঁরাই, অন্ধকারে এই পথ ভেঙে কোড়ো দুর্ভোগ রাতে শব্দেই কাঁধে করে ছুটেছে হয় বাঁদের, কিংবা শীত নিশীথে দারুণ ঠান্ডায় সারা পৃথিবী বখন আতপের আরাম খোঁজে, তখন বাঁশ দাঁড় কাঠ-কুটো আনতে হয়, জোটাতে হয় লাঠি আর লাঠন। করতে হয় ঢাকা-পরসার ব্যবস্থা, মৃতদেহ নিয়ে হুগলী বাওয়ার খরচ অনেক। (কাছপিঠে শ্রমশান থাকলে যা হয়তো অর্ধেক দাঁড়াতে পারতো।) মৃত্যুশোক ভুলে প্রিয়জন তখন ভাবতে বসে মড়ার ভাবনা। গ্রামে গ্রামে মৃত মানুষের শ্রমশান আর মৃত পশুর ভাগাড়ের অভাব এক দুর্ভাগ্য সমস্যা হয়ে উঠে দিনের পর দিন।

অনেক পুরানো স্মৃতিভড়ানো কাহিনী আর কিংবদন্তী ছড়ানো রয়েছে এদিকে-ওদিকে। মীরতলা, পীরতলা, গাজনতলা, আর বড়িমার থান। অনেক কথা-কাহিনীর জন্মভূমি, অনেক স্বপ্নাদ্য আর সাধনা সম্ভব ইতিবৃত্তের পীঠস্থান।

বড়িমা গ্রাম্য দেবী। সম্ভবত ওলাইচন্ডী। মূর্তি নেই। একখানি শিলা মাত্র। শনি-মঙ্গলে পূজা হয়। বাহুল্য কিছু নেই ফুল-চন্দন, তেল-সিঁদুর। বৈশাখ মাসে বিশেষ পার্বণ। ঢাক, ঢোল বাজি-বাজনা। কলেরা বসন্ত দেখা দিলেও তাই বিশেষ মানসিক। বছরে একদিন সারা গ্রামের মেয়েরা আসেন। সেদিন তাঁদের মাঠ পালদুনী বা বনভোজন। রাঁধেন, বাড়েন, খান-দান। সারা বছরের স্তম্ভ প্রাপ্তগণ মূর্খিত হয়ে ওঠে হাসি-গান, হৈ-হৈ কথা কলরবে। বেলা যায়, সন্ধ্যা আসে। গুছিয়ে নিয়ে চলে যায় যে যার। শূন্য অগ্নি স্তম্ভ আঁধারে ভরে যায়। একা অন্ধকারে—নীরবে বসে থাকেন বড়িমা। একটি বছর পরে আবার আসবে তাঁর মেয়েরা, বৃষ্টি তারই প্রতীক্ষায়। রোগ ভোগ আধি বালাই দূর করেন, শান্তি দেন-কল্যাণ আনেন। দেবী নন তিনি—মা—সকলের বড়িমা।

মীর সাহেবের তলা আছে ওপাশে রাজহাট দক্ষিণ পাড়ায়। সিদ্ধ সাধক মীর সাহেব। কিংবদন্তী বলে : গর্বিত রাজা বন্দী করেছিলেন তাঁকে। আটকে রেখে দিয়েছিলেন শক্ত মোটা লোহার গরাদ দেওয়া দরজার ওপাশে, কপাটের আড়ালে।

সন্ধ্যা হয়, অন্ধকার নামে। নামাজের সময় যায় উৎরে। একটু জল চান ফাঁকির, ওজু করবেন তিনি। দিয়া চান—আঁধারে ডাকা যায় না ভগবানকে।

প্রহরী বলে হুকুম নেই। জল পাবে

॥ বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অর্ঘ্য ॥

“যদিও মা তোর দিবা আলোকে
ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর;

আমরা বৃচাব মা তোর দৈন্য!
মানুষ আমরা নহি তো মেঘ!
দেবী আমরা! সাধনা আমরা!
স্বর্গ আমরা! আমরা দেশ!”

মাতৃমন্দের স্বর্ষিক, অপরাজের মানবমহাস্বায় স্বন্দর্শী কবি, বৃগপ্রবর্তক নাট্যকার স্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ডে আছে, স্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক সাজাহান, তৎসঙ্গে সর্বজনসমাদৃত নাটক সিংহল বিজয়, সোরাব রস্তুম ও পরপারে। মৃদুগ পরিপাট্য ও গ্রন্থন সৌকর্যে মনোহর। কবির প্রতিকৃতি সমন্বিত সুদৃশ্য আর্ট পেপারের জ্যেকেটের প্রচ্ছদ; কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি—১২

রূপ সাধনায় সাধনার

দুটি অনবদ্য অবদান



সাধনা বিউটি ক্রিম

প্রতিদিন বক চর্চায় একান্ত
প্রয়োজন। কৃৎস্ন কোমল
পেলব তন্তু ও যৌবন স্নাতক
লাবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথপেস্ট

দন্তরাজি সুকার মত শুভ্র
ও উজ্জ্বল, মার্জী মুখ ও সুস্বাদু
মুখ স্বর্গকমল ও অমল করে।

শীঘ্রই পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকতা-৪৮



অধ্যক্ষ—ড্রাগস্টার্স বোর্ড, এম. এ.
আব্দুল করিম শাহী, এফ. সি. এস. (লন্ডন)
এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের ইন্সপেক্টরের কৃতপূর্ণ অধ্যাপক।

জনিকতা কেন্দ্র—ডাঃ মনোজ কুমার, এম. বি. বি. এস. (কলিকতা) আব্দুল করিম শাহী

কীটঘ্ন ঔষধি চাই

নাম্বতা ভোজ্য

বস্তুত বিচার করলে দেখা যাবে গদ্যো-পদ্যে বহু
জমেছে জঞ্জাল। দেশে যখন হা-অন্ন চতুর্দিকে,
স্বদেশের নামাবলী গায়ে নিয়ে পান করছে লোহু
প্রকদল লোক। সপো সাগরপারের বালি শিখে
হারিঙ্গল ছাড়িয়েছে দেশে অমৃত বস্তুর নামে
নির্লজ্জ নন্দিতা শূদ্র। এবং গোপনে খেয়ে ভোজ্য
শাঁ হাতে পকেট ভরে নিয়ে বেচতে চায় পুরো দাদে

আজো জনতার ভাগ্য। জেনো, তারা বেঁড়ে যাচ্ছে রোজ।

যদিও বদলার রঙ, তবু ভাবে এখনো সময়
আছে হাতে। মায়াকামা জুড়ে যদি ব্যর্থ করা যায়
জনতার পদধনি, হবে লক্ষ্যভেদ। তারা দিন
গুনছে। বেড়িওতে ফের পুনশ্চ কি বিবরের জয়।
কীটঘ্ন ঔষধি চাই। তার আগে আইডেন্টফাই
করুক সমস্ত লোক। হয় হোক অবস্থা সঙ্গীন।

মু, দিয়া পাবে না। ব্যথিত ফকির নথ
শিরে দিয়ে মাটি খোঁড়েন জল ওঠে তাতে।
হাতের আঙুলে ফুঁ দেন জ্বলে দিয়া।
নামাজ করেন, ভগবানকে ডাকেন তিনি,
কোনো বাধা থাকে না আর।

খবর পেয়ে রাজা আসেন, প্রাশ্নার
প্রশ্নাম জানিয়ে স্বহস্তে মুক্ত করেন
ফকিরকে। ইনাম দেন, ইমান দেন, আর
দেন ডেরা বেধে বাসা করবার একটু-
খানি স্থান। মহিমাভাজিত সেই স্থান-
টুকুই যন্ত্র করে বাঁধিয়ে রেখেছে মানুষ।
সেই মীর সাহেবের তলা। মুসলমানদের
পীঠস্থান। ভক্তদলে হিন্দু মুসলমান
ধাম বিচার নেই। সবাই আসে, পূজা দেয়
সিঙ্গী খায়। মানত মানসিক করে।

জলেশ্বরী পূজা হয়। তিথি ধরে
পূজা যত্নেতে বোধন। সপ্তমী, অষ্টমী,
নবমীতে পূজা। দশমীতে বিসর্জন।
মূর্তি সিংহবাহিনী। স্বর্ণবর্ণী, চতু-
ছুজা, কুঠার কার্দুক বরাভয়ধারিণী।
অনুমানে মনে হয় মূর্তি জগদ্ধাত্রী।
কিন্তু করীন্দ্রাসব বিজয়ের কাহিনীটি
অনুপস্থিত এখানে। অর্থাৎ কেশরী
পদদলিত করী-কুম্ভ অনুপস্থিত।

মেলা আছে কয়েকটি। খুব বড়
না হলেও খুব ছোটও নয়। ওলাবিবির
মেলা ভাটায়। ধুলিয়ার্ডার দশহরার
মেলা মনসা পূজার দিনে। জাঁকজমক
আছে। লাঠি খেলা দেখতে ভিড় হয়
অনেক।

তারাবিহাবীতে গাজনের মেলাবও নাম
আছে। বড়োশিব বাণলিঙ্গ এ অঞ্চ-
লের প্রাচীনতম দেবতা। মন্দির সম্প্রতি
সংস্কার হয়েছে ত্রিপল্লী কল্যাণ সমিতির
চেষ্টায়। মেলার প্রচলনও তাঁরই করেছেন।
এপারে তারাবিহারী ওপারে দেবা-
নন্দপুর। মাঝখানে শূদ্র সরস্বতীর
কূপ ধারায় এতটুকু এক বাঁশের সাকো।
আশ-পাশে আদিগন্ত মাঠ, কোথাও বা
ভাল সেগুন শিরীষের জড়াজড়ি জটলা।

শরৎ সাহিত্যের পাতায় পাতায় এই
মাঠ এ মাটি এ ছোট সাকো আর এ চিক-
চিক শূকনো নদীটুকুর কত চকিত
অনাগোনাই আমরা দেখেছি। আপন
নিভৃত নিবিড় ছায়া ফেলে নিঃশব্দে
উপস্থিত হয়েছে এ আমবাগান, এ বাঁশবন,

সবুজ শূন্যতার বাড়ল-বাঁশী বাজানো ঐ
নিঃসীম উদার, অনন্ত উদাসীন প্রকৃতি
বিস্তার। আমরা তাকে দেখেছি। আমরা
তাকে চিনেছি, কখনও বা চিনতে পারি নি।
তবু যে ছিল আছে থাকবেও চিরকাল।
লোকে বলে পিয়ারী পিণ্ডিতের বাড়ি
ছিল বাড়োলে, ভিটে আজও আছে।
লোকে বলে রাজলক্ষ্মী বাস করে গেছেন
এখানে, প্রমাণ পাওয়া যায়, লোকে বলে
তারাবিহারীর বিসর্জনের ঘাটটিই অক্ষয়
হয়ে টিকে রইলো শ্রীকান্তের পাতার
পাতায়। শরৎচন্দ্রের বাস্তব অনুভূতির
মানসস্বরূপ হয়ে।

কিন্তু লোকে তো অনেক কিছুই
বলে। সব কি সত্য হয়, না বিশ্বাসের
কম্পিতপাথরে যাচাই করেই নেওয়া যায়
তাকে। আমি সে চেষ্টাও করি নি। আমি
শূদ্র দেখেছি। দেখেছি আর ঘুরেছি।
ঐ পথে, ঐ ঘাটে ঘাটে, হাটে আর মাঠে।
আর এখন এই বনস্পতিজায়ায়। মস্ত
মোটা বট বেথানে শতাব্দীর সাক্ষ্য
নামিয়েছে কাঠা কাঠা জায়গা জোড়া মোটা
মোটা ঝুরির ঝাঁকে। মাথার ওপরে
শাখায় পাতায় সবুজের সঘন বিস্তার।
আর অসংখ্য ছোট ছোট লাল মটরদানা
ফলে অবগের অনাবিল আমন্ত্রণ।

এখন ঘাস মরেছে, জ্বালা জুড়িয়েছে,
শান্ত হয়েছে সারা শূদ্রপুত্রের সূর্যের
কামড়। এখন শান্তি, এখন আরাম,
এখন ঝিরি ঝিরি হাওয়ায়, মৃদু মৃদু
ঘুমে গা জোড়া ক্লান্ত, চোখ জোড়া
অবসাদ। এখন স্বপ্ন নামলে ক্ষতি কি,
ক্ষতিই বা কি—

কিন্তু বেলা তখন পড়েছে। সরস্ব-
তীর সামান্য জলে সিঁদুরে রং। একটু
পবেই শোনা যাবে নীড়ে ফেরা পাখীদের
কিচিমিচি। ঘবফেরা মানুষের বাস্তবতার
আভাস।

কিন্তু ওদিকে আকাশের চকুটি
ভয়াল। সেই কখন বেলা থাকতে ঈশানের
কোল ঘেঁসে ঘনিয়েছিল এতটুকু এক
বাচ্চা মেঘ। তারপর বেলা গেল, সে বড়
হলো ফুললো, ফাঁপলো, মস্ত জোয়ান হয়ে
ছড়িয়ে পড়লো আকাশের এ মাথা থেকে
ও মাথা পর্যন্ত। তখন তার রং গাঢ়
তার রূপ ভীষণ। গরু, গরু, গরু

আর চিকি চিকি চমকে সে জানিয়ে দিলো
আসন্ন অকাল বৈশাখীর আগমনের
অনিবার্য ইঙ্গিত।

হু-হু ছুটে এলো এলোমেলো খ্যাপা
হাওয়া। পালাতে দিলো না আগ্রহ
নিতে দিলো না। গাছ-গাছালি লুটোপুটি
হাওয়ায় হাওয়ায় হা-হা রব। জঞ্জালের
পাতার পাতায়, ধুলোর জঞ্জালে এক ক্ষিপ্ত
ঘূর্ণিত পলায়নপর নৃত্যমত্ততা, কিন্তু
কতক্ষণই বা, চড় চড় করে এলো বৃষ্টি।
আকাশজোড়া ধুলোর ঝড় মৃদুতে ধুয়ে
নেমে গেল সে ধারায়। বজ্রামৃত তরুশ্রেণী
নত হয়ে গ্রহণ করলো সে ধারায়। শূকনো
খরা মাটি বক ফুড়ে বেরবে এলো
ভিজ়ে সরস সৌন্দর্য গন্ধ। ঝড় তখনও
উলোটি পালোটি, বর্ষণ যেন ছুরির
ধার। আর মাঝে মাঝে ওপবে ঘন
পাতার আচ্ছাদন ছেদ করে শরীরের
এখানে ওখানে আচ্ছাদে পড়ছে শাণিত
শিলার শীতল স্পর্শ। বড় লদ গোল
পাতার ছাতাধরা সেগুনের সাধ্য কি সে
বর্ষণ প্রতিরোধ করে!

থামলো বৃষ্টি, আকাশ পরিস্কার,
ঝবঝব হাওয়া, মাঝে মাঝে তখনও
উদ্দাম। জামা ভিজ়ে, কাপড় ভিজ়ে।
মাথার চুল ভিজ়ে। সপসপ জল গড়াচ্ছে
নাক বেয়ে, বক বেয়ে, কানো পাতি আর
চিবকের ডগা বেয়ে। ভিজ়ে গায়ে বাতাস
লেগে তখন দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক। শীত
নিঃশব্দের কাঁপুনি নেমেছে চৈর রাহির
সম্ভার।

ততক্ষণে তাবা ফুটেছে আকাশে। পথ
ঘাট মাঠ ময়দান জলে একাকার। কুলকুল
জল নামছে ছোট ছোট লোল বেয়ে।
বাঁধানো রাস্তাটি যেন জলে ধোওয়া কালো
পাথর।

জামা-কাপড় জ্বতো ছাতা গাছের
নিই। চেন টানা হাতবাগে আছে কামেরা
আর কাগজপত্র। বন্ধা সেগলি ভজ়ে নি।
কাপড় গাট্টিয়ে জ্বতো হাতে সঁটি পর্যন্ত
ঠাণ্ডা খোলা জলে পা ডুবিয়ে চপ চপ
করতে করতে রওনা এবার। বাত হয়েছে,
শেষ ট্রেন বাকি বা চলেই গেল।*

* আলোকচিত্র লেখিকা কবু-
পুহীত : পরের ব্যরে 'মগরা'।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

৩৪ বৃন্দাবন উদ্যোগ

জন্ম-শতবর্ষ স্মরণে

রাইট ব্রাদার্স-এর একজন, —উইলবার

আদিমকাল থেকেই পৃথিবীর রাজ্য হবার স্বপ্ন দেখেছে মানুষ। সাগর দেখে বলেছে, ভাসবো। আকাশ দেখে ভেবেছে, উড়বো। ভাসতে সময় লাগে নি বেশি দিন। কিন্তু উড়বার পিছনে দীর্ঘযুগের প্রতীক্ষা; হাজার হাজার বছর ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা, আকাশ-যাত্রী অগণিত পাখি দেখে ভাবা, কি সুখী ওরা! কেমন উড়তে পারে আকাশে!

কিন্তু ওরা পানে, আর মানুষ পারে না কেন? প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষদেরও এই ছিল জিজ্ঞাসা।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ বছর। প্রাগৈতিহাসিকদের অনেকেই ফসিল হয়ে বাদুঘরে আশ্রয় নিল। কিন্তু আদিমকালের সেই জিজ্ঞাসাটা হারিয়ে গেল না কিছুতেই। একালের অনেককেও বলতে শোনা গেল, মানুষ পারে না কেন? রাইট ব্রাদার্স জবাব দিলেন এর। দেখিয়ে দিলেন, মানুষও পারে। এঁদের একজন উইলবার রাইট আজ থেকে এক শত বছর আগে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।

উইলবার-এর অনুজ ও সহযোগী অরভিল বয়সে তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট। অরভিল-এর জন্ম হয় ১৮৭১ খৃস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট। উভয়েরই জন্মস্থান আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওর একটি শহর ডেটন।

আলোচ্য প্রবন্ধে উইলবার-এর কথা বলতে গিয়ে অরভিলকেও টেনে আনবো আমরা। কারণ, পাখির যেমন দুটি ডানা থাকে, বিমানের যেমন থাকে দুটি পাখা, ওঁদের জীবনসাধনার রথটাও তেমন। দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে এগিয়ে গেছে। একজনকে বাদ দিয়ে অপবজ্ঞের কথা বলতে গেলে এক পাখাবিশিষ্ট পাখি বা এক ডানাওয়ালা বিমানের কথাই মনে আসবে।

রাইটরা চার ভাই। উইলবার ও অরভিল ছোট। ওঁদের বাবা রেভারেন্ড মিলটন রাইট মিতব্যয়ী ও ধার্মিক ছিলেন। ধর্মবাক্যের কাজ করে সামান্য যা কিছু পেতেন তিনি তা দিয়ে কায়ক্লেশে সংসার

চলত। কিন্তু তাই বলে সংসারের দারিদ্র্য তার শিশুপুত্রদের বিদ্যা-চর্চায় ছায়া ফেলাতে পারে নি। মিলটন রাইট-এর পারিবারিক গ্রন্থাগারটি বেশ সমৃদ্ধই ছিল। নিত্য নতুন বই আসত ওখানে; এবং মানতেই হবে, শৃঙ্খলায় এই বই-কেনার ব্যাপারে রেভারেন্ড মিলটন অমিতব্যয়ী ছিলেন। বই কিনতেন তিনি সন্তানদের কথা ভেবে। বলতেন, ধর্মচর্চার চেয়েও বড় কাজ ছোটদের লেখাপড়া শেখান।

ছোটরা পড়ত। প্রায়ই দেখা যেত, উইলবার আর অরভিল আবিষ্কার ও অভিসানের বইগুলো নাড়াচাড়া করছে।

ওদের মা ছিলেন ছুতোরের কাজে দক্ষ। একবার ছেলেমেয়েদের জন্যে তিনি একটি স্পেল-গাড়ি তৈরি করেন। এ ছাড়া হাতে-গড়া বিচিত্র সব পণ্যে হামেশাই ঘর সাজাতেন তিনি। উইলবার ও অরভিল তাকে সাহায্য করত। অনেক সময় আবার দেখা যেত, ভাইকে সঙ্গে নিয়ে উইলবার নিজেই ওদের বসন্তবাড়ির আদল বদলাতে লেগে গেছে।

সত্যি সর্বক্ষণ নানা কাজে ব্যস্ত থাকে কিশোর। ঘর-মেরামতির কাজ করে কখনও। কখনও ঘর সাজায়। আবার কখনও একমনে বই পড়ে। ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বই পড়ত উইলবার। ওঁদিকে খেলা-ধুলোতেও সে ছিল খুব পটু। একবার তুষারের উপর হকি খেলতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনল। হঠাৎ পড়ল দুর্ঘটনার এবং সামনের দিককাব কয়েকটি দাঁত খেসারত দিল। তার হুংপিণ্ডও দুর্বল হয়ে পড়ল এই আঘাতে। তাই নিরুপাশ হয়েই স্কুল ছাড়তে হল তাকে। লেখাপড়ার প্রায় সবটুকুই করতে হল ঘরে, বসে। ওঁদিকে মা শয্যাশায়ী। তাই ঘরের কাজকর্মও দেখতে হত উইলবারকে। মায়ের সেবা-শুশ্রূষার তত্ত্বাবধান করতে হত।

১৮৮৯ খৃস্টাব্দে মিসেস রাইটের মৃত্যু হয়। উইলবার তখন ২২ বছরের যুবক। তখন জীবনে নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখেছে সে। কিন্তু স্কুল বা কলেজী-শিক্ষার সার্টিফিকেট হাতে নেই বলে চাকরীর প্রতিযোগিতার সুবিধা কবতে পারছে না।

মাধ্যমিক স্কুলে পড়বার সময় গ্রীক, ল্যাটিন ও ত্রিকোণমিত শিখেছিলেন উইলবার। কিন্তু সার্টিফিকেট কিছু পান নি। তাই এবার থেকে এমন সব কাজ

বেছে নিলেন তিনি, যেখানে একদিকে আছে স্বাধীনতা এবং অপর্দিকে আছে হাতের দক্ষতা দেখাবার সুযোগ।

একবার গীজার কাজ নিলেন উইলবার। ওখানকার কাগজপত্র ভাঁজ করার কাজ। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, হাতে আর ভাঁজ কবছেন না তিনি। ভাঁজ করার জন্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছেন।

ওঁদিকে আর একটি যন্ত্রকে নিয়ে দু' ভাই মশগুল। যন্ত্রটি হলো একটি ছাপা-কল। ওখান থেকে সংবাদপত্র বের করতেন ওঁরা। নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বৃন্দাবনবাদের মধ্যে তার কপি বিক্রি করতেন। তবে মুনাক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ ওঁদের ছিল না। আগ্রহ ছিল ছাপার কাজে।

ঐ সংবাদপত্রটিতে উইলবার লিখতেন। মাঝে মাঝে। বেশ ভালোই লিখতেন। পাঠকরা বলতো খাসা লেখে ছোকরা। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে যেমন, হাসিবি ঘটনা নিয়েও তেমনই সুন্দর লেখে।

পরবর্তীকালে এ প্রশংসার মর্যাদা রেখেছিলেন উইলবার। সত্যি খুব সুন্দর লিখতেন তিনি।

কিন্তু লেখা বা সংবাদপত্র-প্রকাশ, এই সব কিছুর থেকেও উইলবারের কাছে প্রিয় ছিল তাঁর পারিবারিক পরিবেশ। মাষেব মৃত্যুর পর বোন ক্যাথারিন ও ভাই অরভিলকে নিয়ে বাবার সঙ্গে থাকতেন তিনি। অগ্রজবা আলাদা বাড়িতে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু উইলবার কোনোদিন অরভিল ও ক্যাথারিন-এব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি। এ'বা তিন ভাই-বোন বরাবর একই বাড়িতে থাকতেন এবং তিন জনই ছিলেন অবিবাহিত।

উইলবারকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনাদের কেউই যে দিনে কলেন না?

—তারা ঠিক। কবলম ন—উইলবার জবাব দিয়েছিলেন,—কাবণ এ'ই শব্দে বোকে পাওয়ান-পবান এবং উড়বার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিব সংস্থান সম্ভব নয়। অর্থ কলিয়ে উঠবে না।

আসলে কিন্তু তা নয়। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে সাইক্লোব বাবসা সুদ কবার পব থেকে বাইটদেব আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল।

প্রথমে ও'বা অপর প্রতিষ্ঠানের তৈরি সাইকেল বিক্রি করতেন। তারপর সুদ করলেন মেরামতির কাজ। অবশেষে

মিসেসরাই সাইকেল রান্নাতে লাগলেন। এদিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির প্রথম প্রদর্শন করলেন উইলবার। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের আকারে কিছু সংখ্যক প্রচারপত্র ছড়িয়ে দিলেন তিনি। জানালেন, যারা প্রচারণার সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তাদের প্রত্যেককে পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করে রাইট-বাইসাইকেল। পুরস্কারের লোভে অনেকেই যোগ দিত এই প্রতিযোগিতায়। তা ছাড়া জিনিস ভালো অথচ সস্তা বলে আশে-পাশের স্কুল-কলেজেরও অনেকেই সাইকেল কিনত।

কিন্তু উইলবার-এর বেশিদিন মনে ধরল না এ ব্যবসা। তিনি চাইলেন কলেজে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে পিতা মিলটন রাইটের কাছে এ নিয়ে চিঠিও লিখলেন। পিতার সম্মতি মিলল। কিন্তু অসম্মত হলো উইলবার-এর বিবেক। পারিবারিক দায়-দায়িত্বকে এড়িয়ে কিছুতেই কলেজে ভর্তি হতে পারলেন না তিনি। থেকে গেলেন ছোট ভাই অরভিল ও বোন ক্যাথারিন-এর সঙ্গেই।

রাইট ভাইদের মিল নিয়ে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, ভুল বোঝাবুঝি ওঁদের মধ্যে নাকি ঘোষানোই হয় নি। ব্যাপকে এক একাউন্টে টাকা থাকতো ওঁদের। বাড়িতে অধিকাংশ সময় ওঁরা একই ঘরে থাকতেন, দরকার হলেই রান্না করতেন পালা কবে। আবার গোরবের দিনে জন্মের মালা একা পবেন নি ওঁদের কেউ; দু'জনে একই মালাব অংশীদার হয়েছেন।

একবার। ফ্রান্সে গেলেন উইলবার। লিডজিয়ন অব অনার'-এ সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু সম্মান গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি। তিনি বললেন, অরভিলকে অনুরূপ সম্মান না দেখালে এ তিনি কিছুতেই গ্রহণ করবেন না।

আর একবার ঐ ফ্রান্সেই এক প্রতিষ্ঠান ২০,০০০ ফ্রাঁ পুরস্কার দিল উইলবারকে। উইলবার বললেন, 'এব অর্থক' অর্থ' অরভিল-এর প্রাপ্য'। বলেই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সামনে ১০,০০০ ফ্রাঁ অর্ধেকের জন্যে আলাদা কবে রাখলেন।

রাইট ভাইদের মধ্যে এইরকম অমীমাংসিত মিল ছিল বলেই আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ওঁরা যুগ্মভাবে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

ছোটবেলায় নতুন কোনো জিনিস দেখলে ঠিক একই বকমভাবে কৌতুহলী হবে উইলবার ওঁরা। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের ঘটনা, উইলবার-এর বয়স তখন এগারো, আর অরভিল-এব সাত। মিলটন রাইট একদিন উজ্জ্বল বাদ্যের ছোট্ট একটা মডেল নিয়ে এসেন। মডেল দেখে উইলবার এবং অরভিল দু'জনেই বিস্ময়ে আত্মহারা। দু'জনেই এক ভাবনা, বাদ্য ওড়ে, কিন্তু মানুষ কেন ওড়ে না?

ভাবনাটাও ততই মকুলিও পল্লবিত হয়ে উঠল। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে বার্লিনের অটো লিলিয়েনথেল্ সম্পর্কে লেখা পড়ে হঠাৎ নতুন এক আলোক বুঁজে পেলেন ওঁরা।

ভাবলেন, মানুষের আকাশে উড়ে বেড়াবার স্বপ্ন কোনোদিন হয়তো সফল হলেও হতে পারে। এদিকে পরের বছর লিলিয়েনথেল্ এক দুর্ঘটনায় নিহত হলেন। এ সংবাদে দারুণ আঘাত পেলেন রাইট ভাইরা। ওঁরা ভাবতে লাগলেন, কেন ঘটল এই দুর্ঘটনা? কোনোমতেই কি একে এড়ান যেত না? এবার পড়াশুনা চলল পুরোদমে। ডেটন পাবলিক লাইব্রেরী-তে পড়ে রইলেন উইলবার আর অরভিল। কিন্তু আসল উত্তর ওখান থেকে মিলল না। নিরুপায় হয়ে ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে তাই উইলবার এক চিঠি লিখলেন অধ্যাপক ল্যাংলীর কাছে। ল্যাংলী আকাশচারণ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনের 'স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউট'-এর সম্পাদক। উইলবার লিখলেন, আকাশচারণ সম্পর্কে খুবই কৌতুহলী ওঁরা এবং এ সম্পর্কে ওঁরা কিছু পুঁথিপত্রের সংগ্রহ পেতে চান।

সংগ্রহ দিলেন ল্যাংলী। এমন কিছু পত্র-পত্রিকার কপি জ্ঞানালেন, যাদের থেকে আকাশে-ওড়া সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন তথ্য জানা যায়। পত্র-পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করলেন রাইটরা; পড়লেন পরম আগ্রহ নিয়ে এবং স্পষ্টই বুঝলেন, আকাশে উড়বে বলে মানুষ সর্বাধিক কাল ধরে সাধনা করেছেন; কিন্তু সফল হন নি ওঁদের কেউই। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি থেকে শুরু করে ল্যাংলী ও এডিসন পর্যন্ত সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। কেন ব্যর্থ হয়েছেন ওঁরা?—উইলবার ভাবতে লাগলেন, ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ, ওঁদের কেউই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন নি। বারমুদ্রে দীর্ঘকাল ভেবে থাকতেই যে সকলের আগে দরকার, তা' নিষে ভাবেন নি কেউ।

উইলবার ও অরভিল এবার নতুন উদ্যমে পরীক্ষা শুরু করলেন। দুই-পাখাযুক্ত একটি ঘড়ি তৈরি হল। তারপর ঘড়ির সঙ্গে সাতো জোড়া হল এমনভাবে যাতে সেটি আকাশে উড়বার সময় তার পাখা দুটিকে প্রয়োজনমতীয় মাটিতে দাঁড়িয়েই মোচড়ান যায়। এই ঘড়ির পরীক্ষা থেকে নতুন এক অভিজ্ঞতা লাভ করলেন রাইট ভ্রাতৃদ্বয়। সম্মানিত পোঁছুলেন, ভারসাম্য অর্চনা রাখতে পারলে এজিনহীন বিমানপোত চালনা করাও দুঃসাধ্য কিছু নয়। এই সিদ্ধান্তের পর অনাতিবিলম্বে কাজে নামলেন ওঁরা। যন্ত্রাংশের আবহাওয়া দপ্তর থেকে বিভিন্ন স্থানে বায়ুর গতিবেগ সম্বন্ধে খবর নিলেন। পরীক্ষার জন্যে উত্তর ক্যারোলিনা প্রদেশের নিউর্ন সমুদ্রোপকূলকে বেছে নেওয়া হল। ১৯০০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে শুরু হল এজিনহীন বিমানপোত গড়ার কাজ। বিমানপোতের পরীক্ষা হবে নিউর্ন কিটি হকে। গাড়িমালা নেই ওখানে। ঘরবাড়ি নেই বড় একটা। শুধুমাত্র উঁচু-নিচু সব বালির খাড়ি নিয়ে ক্যারোলিনার ঐ সমুদ্রসৈকত। উইলবার সেখানে পোঁছুলেন ১৯০০ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। তিনি বালির ওপরেই তাঁবু গাড়লেন একটা। বিমানপোতের বিভিন্ন অংশ এবং যন্ত্রপাতিগুলোকে রাখলেন তার মধ্যে।

মাস শানেক পর, অক্টোবরে অরভিল কিটি হকে এসে আগ্রজের সঙ্গে যোগ দিলেন। এজিনহীন বিমানপোতের অংশগুলোকে একত্রিত করা হল এইবার। সব মিলে পরীক্ষণীয় বস্তুটির ওজন দাঁড়াল ৫২ পাউন্ড। আর লম্বায় ১৭ই ফুট হল সেটি। কিন্তু রাইটরা লক্ষ্য করলেন, এজিনহীন বিমানপোতটিকে আশানুরূপভাবে গড়ে তুলতে ওঁরা পারেন নি। পোতটির ভার নিয়ে ওপরে উঠবার ক্ষমতা খুবই সামান্য। তাই প্রথমে ওতে মাত্র ৫০ পাউন্ড ভার চাপিয়ে ব্লুডিং মতো উড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর ওড়ান হল কিমানপোতের ধরণে। অবশ্য ওতে যাত্রী কেউ থাকল না; এজিনও নয়।

এদিকে রাইটরা দেখলেন, যেমন কুরেই ওড়ান যাক না কেন, মাত্র দশ মিনিটের বেশি ওকে শূন্যে রাখা সম্ভব না। অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এজিনহীন বিমানপোতটিকে আরও বড় করে গড়া দরকার। রাইটরা এবার নিজেদের বাড়ি ফিরে গেলেন। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের শন্যান গড়লেন একটি এবং তারপর কিটি হকে ফিরে এলেন ১৯০১ খৃস্টাব্দের শবৎকালে। আবার পরীক্ষা চলল পুরোদমে। কিন্তু এবারেও ব্যর্থতা।

এইভাবে ব্যর্থতার সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে এগোলেন রাইটরা। ওঁদের মূলমন্ত্র ছিল শুধুমাত্র প্রকৃতিক অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়েরই জ্বলন্ত প্রতীক রাইটদেব আয়োজিত 'উইন্ড-টানেল'-এর পরীক্ষা-গলো। 'উইন্ড-টানেল'-এর পরীক্ষা থেকে জানলেন ওঁরা, বাতাস বিমানপোতের পাখার ওপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গবেষণার সর্বাধিকার জন্যে ১৬ বর্গ ইঞ্চি ব্যাস যন্ত্র আর ৬ ফুট লম্বা একটি 'উইন্ড-টানেল' গড়া হয়েছিল। এই গবেষণার অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রাইটরা নতুন আর

এইভাবে ব্যর্থতার সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে এগোলেন রাইটরা। ওঁদের মূলমন্ত্র ছিল শুধুমাত্র প্রকৃতিক অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়েরই জ্বলন্ত প্রতীক রাইটদেব আয়োজিত 'উইন্ড-টানেল'-এর পরীক্ষা-গলো। 'উইন্ড-টানেল'-এর পরীক্ষা থেকে জানলেন ওঁরা, বাতাস বিমানপোতের পাখার ওপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গবেষণার সর্বাধিকার জন্যে ১৬ বর্গ ইঞ্চি ব্যাস যন্ত্র আর ৬ ফুট লম্বা একটি 'উইন্ড-টানেল' গড়া হয়েছিল। এই গবেষণার অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রাইটরা নতুন আর

এইভাবে ব্যর্থতার সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে এগোলেন রাইটরা। ওঁদের মূলমন্ত্র ছিল শুধুমাত্র প্রকৃতিক অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়েরই জ্বলন্ত প্রতীক রাইটদেব আয়োজিত 'উইন্ড-টানেল'-এর পরীক্ষা-গলো। 'উইন্ড-টানেল'-এর পরীক্ষা থেকে জানলেন ওঁরা, বাতাস বিমানপোতের পাখার ওপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গবেষণার সর্বাধিকার জন্যে ১৬ বর্গ ইঞ্চি ব্যাস যন্ত্র আর ৬ ফুট লম্বা একটি 'উইন্ড-টানেল' গড়া হয়েছিল। এই গবেষণার অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রাইটরা নতুন আর

এই এঞ্জিনহীন বিমানপোত গড়লেন। ১৯০২ খৃস্টাব্দে কিটি হকে এই পোতটিকে কম করে হাজার বার ওড়ান হল। কিন্তু মাক্সলোর নাগাল পাওয়া গেল না।

অবশেষে ১৯০২ খৃস্টাব্দে শেষদিকে হাইটরা এঞ্জিনচালিত বিমানপোত গড়লেন। ঠিক স্থির করলেন। ঠিক হল, ৮ অশ্ব-শক্তি বিশিষ্ট এমন একটি পেট্রোল-এঞ্জিনকে কাজে লাগান হবে, যার ওজন ২০০ পাউন্ডের বেশি নয়। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই এ ধরনের এঞ্জিন পাওয়া গেল না। অগত্যা হাইটরা নিজেরাই প্রচেষ্টা করলেন। একটি পেট্রোল-এঞ্জিন তুললেন। নবনির্মিত যন্ত্রটি হল ১২ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট এবং তাব ওজন দাঁড়াল ১৭০ পাউন্ড।

এইবার সত্যিকারের বিমানপোত গড়ার আয়োজন চলল। হাইটরা হিসেব করে দেখলেন, পোতটির পাখার বিস্তার কম করে ৪০ ফুট হওয়া দরকার। সবশেষে এল 'প্রপ্যালার' গড়ার প্রশ্ন। হাইটরা খুব সাবধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই যন্ত্রটি গড়লেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সমগ্র বিমানপোতটি তৈরি হয়ে গেল। উইলবার ও অরভিল আবার কিটি হকের সমদ্রুত-সকতে গেলেন।

শেষ মর্মে অনেক বাধাবিঘ্ন দেখা দিল। শস্য বিকল হবার উপক্রম করল এক-একবার। কিন্তু তবু দমলেন না হাইটরা। চব্বিশ পবীক্ষার জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হবে থাকবে। কেন না ঐদিন আমেরিকার এই নির্জন সমুদ্রোপকূলে সম্পূর্ণ অনাদৃত ও অবহেলিত পরিবেশে বিজ্ঞানের যে পবীক্ষা হয়েছিল, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও তার ফল ভোগ করছেন।

১৪ই ডিসেম্বর কিটি হকে শীত বেশি ছিল; কিন্তু আকাশ ছিল পরিষ্কার। বাতাসে কুয়াশার নামগন্ধ ছিল না। উইলবার ও অরভিল বিমানপোতটিকে পরীক্ষা-স্থলে নিয়ে গেলেন। স্থানীয় পাঁচ-ছয় জন মাত্র অধিবাসী এ কাজে ওদের সাহায্য করেছিল।

বিমানে প্রথমে কে উঠবেন, লটারী করে তা স্থির হল। লটারীতে উইলবার জিতলেন। তারপরেই পাইলটের আসনে গিয়ে বসলেন তিনি। যন্ত্রে চাপ দিলেন এমনভাবে যাতে 'প্রপ্যালার' ঘোরে, বালি ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে বিমানপোতটি এবং খানিক দূর গিয়েই ওপরে ওঠার মতো শক্তি সঞ্চার করে।

পাশেই ছিলেন অরভিল। দৃঢ় দৃঢ় বক্ষে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হলেন দেখে যে, বিমানপোতটি শূন্যে উঠে মাত্র চার সেকেন্ড থাকল এবং

তারপরেই মাটিতে নেমে এল আকাশমুখী ভাবে। যন্ত্রযানটি কয়েক ফুট মাত্র উঠেছিল; তাই মনে আঘাত পেলেও দেহের আঘাতটা গুরুতর হয় নি উইলবারের।

১৭ই ডিসেম্বর আবার পরীক্ষার আয়োজন হল। এবার পাইলটের আসনে বসলেন অরভিল। যথা সময়ে 'গিয়ার'-এ চাপ দিলেন তিনি। বিমানপোতটি এগিয়ে চলল। খানিকটা দূর অবধি উইলবার ছুটলেন তার পিছদ পিছদ।

সাক্ষ্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়ে উঠল এবার। অরভিল ১২ সেকেন্ড শূন্যে অবস্থান করে ১২০ ফুট পথ অতিক্রম করলেন। তারপর ঐদিন সকালে আরও তিনবার আকাশে উঠলেন হাইটরা। শেষ অবধি উইলবার ৫৯ সেকেন্ডে ৮৫২ ফুট গেলেন। সমুদ্রোপকূলে আর নয়, স্থির করলেন হাইটরা, এবার ঘরে ফিরে গিয়ে পরীক্ষার আরও ব্যাপক আয়োজন করা দরকার।

আয়োজন আটরেই হল। ডেটন-এর কাছে মাঠ ভাড়া নেওয়া হল একটি উইলবার ও অরভিল সাইকেল-বাবসা খেঁড় দিচ্ছে সর্বক্ষণ আকাশ-পরিভ্রমণ স্বপ্নে মতে রইলেন। ওদের অক্লান্ত সাধনায় স্বপ্ন ধীরে ধীরে সত্যি হয়ে উঠল। ১৯০৪ ও ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বিমানপোতের 'সে' এঞ্জিন গড়া হল তা' আগেবটির তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। অবশেষে ১৯০৫ খৃস্টাব্দের শেষদিকে ৩৮ মিনিটে ২৪ মাইল পথ পাড়ি দিলেন হাইটরা। পথ অবশ্য ওদের বিমানচালনা-ক্ষেত্রটির মধ্যেই সীমিত ছিল। শূন্যপথে বার বার ওরা এ ক্ষেত্রটিকে পরিভ্রমণ করলেন। কিন্তু দৃষ্টান্তের ভয়ে উঠলেন না বেশিদূর। মাটি থেকে দশ-পনেরো ফুট উচ্চতায় থেকেই সমুদ্র তৈরি হলেন।

এদিকে বাইটদের কীর্তিকলাপের কথা শুন্যে সমগ্র ইয়োরোপে সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু যন্ত্রাণ্ড সবকার প্রথমে খুব একটা আগ্রহ দেখান নি।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের মে মাসে উইলবার ইয়োরোপে গেলেন। প্যারিসে অরভিল এসে যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে। ফরাসী, ব্রিটিশ ও জার্মান সরকার ওদের আবিষ্কার ও গবেষণা সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ করলেন। এতদিনে টনক নড়ল আমেরিকার কর্মকর্তাদের। ওদের আহ্বানে হাইটরা তাড়াতাড়ি স্বদেশে ফিরে এলেন।

১৯০৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে উইলবার আবার গেলেন ফ্রান্সে। সকলের সামনে বিমান-চালনা করে দেখিয়ে দিলেন, আবিষ্কার যা ওরা করেছেন, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট: ভৌতিক কিছু নয়। উপস্থিত সকলেই তারিফ করল উইলবারকে। রাতারাতি তিনি ইয়োরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে গেলেন।

শরৎকালে অরভিল এসে যোগ দিলেন উইলবারের সঙ্গে এবং তারপর আরও কয়েক জায়গায় বিমান-চালনা করলেন ওরা। অবশেষে ঘরে ফিরলেন সাক্ষ্যের জয়মালা নিয়ে।

রাইট বিমান-কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হল। উইলবার হলেন সেই কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট। বিমানের চাহিদা বাড়তে লাগল ক্রমেই। অর্ডার এল রাশি রাশি। ওদিকে ইয়োরোপে বাইটদের নকল করে বিমান গড়া হচ্ছিল। এ সংবাদ শোনা মাত্র উইলবার অস্থির হয়ে উঠলেন; সঙ্গে সঙ্গেই ছুটলেন ইয়োরোপে।

দারুণ পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল। দুর্বল ও অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন। এসেই পড়লেন টাইফয়েড জ্বরে। ১৯১২ খৃস্টাব্দের ৩০শে মে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হল।

মৃত্যুর পূর্বে উইলবারকে শ্রদ্ধা জানালেন অনেকেই। অনেকেই প্রশান্ত-বর্ষণ করলেন। কিন্তু অরভিল সেগুলোব কোনো টিকেই তেমন আমল দেন নি। তিনি বাব বাব কবে পড়ছিলেন তাঁদের পিতাভায়েরীতে খুঁজে পাওয়া কয়েকটি কথা। সেখানে উইলবার সম্পর্কে মিলটন রাইট লিখেছেন,

“অদ্ভুত বুদ্ধি ছেলেটার; অদ্ভুত শান্ত তার স্বভাব। অপরিসীম আত্ম-বিশ্বাসের অধিকারী সে; তার বিনয়ের তুলনা নেই।”

উইলবারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরাও ঠিক এই একই কথা বলবো। আর বলবো, গৌরবের সোপান বেয়ে ওপরে ওঠবার সময় মানুষ যেন পূর্বসূরীদের সাধনাকে যথোচিত মর্যাদা দেয়; সোপান বারি গড়েছেন, তাঁদের প্রতি যেন উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানায়।

শ্রীমামিনীমোহন কর প্রণীত

কল্যাণ দেবিশ্রে

মূল্য : এক টাকা

ছেলেদের জন্য আর একখানি রহস্যোপন্যাস। পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

উপহার দিবার যোগ্য বই

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

শ্রীশৈল চক্রবর্তী দ্বারা সুচিত্রিত

ছাপা ও বাঁধাই মুদ্রকর।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিশনিবহরী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১৬

এক মেলা

মেম্বারজ :—সি এম বাউরা। প্রকাশক
—ওরাইডেনফেল্ড এন্ড নিকলসন।
মূল্য : ৫৫ শিলিং।

চরিত্র বহুবেরও অধিককাল ধরে
মরিস বাউরা অক্সফোর্ডের বিখ্যাত রূপ-
কথার নায়ক হিসাবে খ্যাতি পেয়ে
এসেছেন। তাঁকে ঘিরে প্রচুর কাল্পনিক
কাহিনীও গড়ে উঠেছে। প্রাণবন্ত এবং
উজ্জ্বল হাস্যরসাত্মক মন্তব্য করবার
ক্ষমতা তাঁর যশ এবং খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে
দিয়েছে।

বাউরার অমৃত্ত বাকচাতুর্যের খ্যাতি
আছে। যে কোন দলে, বসে, তা সে
অধ্যাপক, লেকচারারদেব গোষ্ঠীই হোক বা
আন্ডার গ্র্যাজুয়েট দলই হোক, কথা-
বার্তায় তিনি তাঁর প্রোজাদের সম্মোহিত
করে রাখতে পারতেন। টোয়েন্টিথ থেকেই
অক্সফোর্ডে বাউরার সঙ্গে পরিচয় আছে
একথা বলতে পারলে, অনেকেই রেশ গর্ব
বোধ করতেন। কেউ কেউ বলেন, একদিকে
বাউরা যেমন সুন্দর, হাসিতামাসা করে
প্রোজাদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন,
আবাব সময় সময় তাঁর ককেশ ব্যবহারে
লোকে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো। তাঁর ঘনিষ্ঠ
বন্ধুরা বলতেন তিস্ত্রা, রিচুপ-এরং
বিশেষ-পবারণতার মূখ্যাসের অন্তরালে
বাউরার আসল চরিত্র হচ্ছে বন্ধবৎসল,
মধুর এবং দরদী। এই বিকল্পধর্মী এবং
অনিয়ন্ত্রিত আত্মজীবনীটির, সবচেয়ে
আকর্ষণীয় গুণ হল এই যে, বইটি পড়তে
বসে এর মধব হাস্যবস এবং আরসংগীত
সম্প্রীতির ভাবটা পাঠকমনকে আগাগোড়া
অনন্দে ভরপূর কবে রাখে।

এই আত্মজীবনীতে বিশেষভাবে নজরে
পড়ে যে লেখক নিজের সম্বন্ধে যা
বলেছেন তার থেকে অনেক বেশি বলেছেন
অন্যান্য লোকেদের কথা। মরিস বাউরার
জন্ম হুষ্ চারনাতে। ওখানে তাঁর বাবা
চাইনিজ কাস্টমস সার্ভিসে কাজ করতেন।
এবং মরিসকে ইংল্যান্ডের একটি স্কুলে
লেখাপড়া করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—
ভারপর তিনি যখন চেলটেনহামে।
১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ১৮ বছর বয়সে
দানার অফিসারের পদে উন্নীত
হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরটা
তাঁর যুদ্ধে ভেতর দিয়েই কাটে। সেই

মজার প্রচলিত গল্পটি—অর্থাৎ তাঁর কর্নেল
ভর পেয়ে পলাচ্ছিলেন এবং বাউরা তাঁকে
গুলী মেরে তাঁর পালানো বন্ধ করে-
ছিলেন; এই ঘটনা আত্মজীবনীতে, কোন
স্থান পাষ নি।

শান্তি স্থাপনের পর বাউরা অক্স-
ফোর্ডের নিউ কলেজে ভর্তি হন এবং
সেখান থেকে মোডস ও গ্রেটসে প্রথম
শ্রেণীর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ওয়াড-
হ্যামে তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করা হয়।
এই ক্ষুদ্র বিখ্যাত কলেজটিতেই তিনি
আত্মজীবন যুগ ছিলেন এবং ১৯৩৮ সালে
এর ওয়ার্ডেন নির্বাচিত হন।

বহু বছর ধরে অক্সফোর্ডে শিক্ষকতা
এবং পরিচালকের কাজে আবশ্য থাকলেও
কেউ তাঁকে “ক্লয়েস্টার্ড জন” বলে
কৃপমণ্ডকতার কালিমা লিপ্ত করতে
পারেন নি। দেশ ভ্রমণ ব্যাপারে বাউরার
ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর
তিনি ছিলেন উৎসাহী ছাত্র। ক্রমে ক্রমে
বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ছাড়িয়ে তাঁর বশ
এবং খ্যাতি বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়ে
পড়ে। বাউরার সম্বন্ধে একটা গল্প খুব
বেশি চলিত ছিল। হিটলাবেরা সঙ্গে যখন
তাঁর দেখা হয় তখন ফুরেরারের “হাইল
হিটলার” ধানিব উত্তবে বাউরা ন্যিক
জবাব দিয়েছিলেন: হাইল বাউরা! (১) বলে।
দুঃখের বিষয়: কথাটা সত্য নয়। বাউরা
জাঁর এই আত্মজীবনীতে এই কাহিনীকে
স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। অবশ্য
এই প্রচলিত উড়ো কাহিনীটি শুনে তিনি
বে মনে মনে যথেষ্ট আত্মশ্লাঘা অনুভব
করেছেন সে কথা ঠিক। অবশ্য এই
ধরনের আরও অনেক সত্য ঘটনা
বাউরাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এবং অক্স-
ফোর্ডের এলাকার বাইরেও সে সব
কাহিনী যথেষ্ট পরিচিত লাভ করেছে।

বাউরা শব্দ বড় ক্লাসিকাল স্কলার
হিসাবেই বিদ্যমানসম্মানে সুপরিচিত নন—
তাঁর জ্ঞানামলক (বিভিন্ন দেশের
সাহিত্যিকদের নিয়ে) সমালোচনার বই-
গুলোও পণ্ডিত সমাজে সাদরে গৃহীত
হয়েছে। ইংরাজ পাঠকদের কাছে বিশেষ
শতাব্দীর বিদেশী কবিদেরও প্রথম
পরিচয় করিয়ে দেন মরিস বাউরাই। এই সব
কবিদের সম্বন্ধে সহজ সুন্দর জ্ঞানগর্ভ

প্রবন্ধ লিখে। এই প্রসঙ্গে মরিস বাউরার
অমূল্য গ্রন্থ “হেরিটেজ অফ সিম্বলিজম”
বইটির কথা মনে পড়ে। এ বইতে বহু
বিদেশী কবি, যথা—বদলেয়ার ভ্যারলেন,
ম্যালামে, রিচক, স্ট্রফেন, জর্জ প্রমুখের
সম্বন্ধে বৈদ্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

এই মেম্বার্স থেকে সবার আগে, যা
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে
বন্ধুদের প্রতি তাঁর আন্তরিক টান।
কিছু পরিচিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অবশ্য
তিনি কড়া ধরনের মন্তব্য করেছেন, কিন্তু
মোটামুটিভাবে যে সব লোককে নিয়ে
তিনি আলোচনা করেছেন তাঁদের প্রতি
তাঁর স্নেহের ভাবটাই পরিপূর্ণ হয়ে
উঠেছে এই আত্মজীবনীতে। বইটির
একমাত্র দোষ হল এই—সময় সময় সম্পূর্ণ
অপরিচিত চরিত্রকে অত্যন্ত বেশি
আবগেপূর্ণ মনোভাব নিয়ে তিনি পাঠক-
দের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন।
একটি পরিচ্ছেদে তিনি তাঁর হারজার্ডের
অবস্থানকালের বর্ণনা করেছেন। এ
জায়গাটা পড়বার সময় মারে মারে মনে
হয় কোনো স্থানীয় পরিচয় এই জায়গার
কোণে অতি উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা পড়ছি।

কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ছবি-
গুলো বাউরা অত্যন্ত সুন্দর এবং রিশদ-
ভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর বন্ধুদের একটা
বিরাট ব্যাপক ছিল—হেনরী গ্রীন
(ঔপন্যাসিক) এবং জন বেটজামেন
(কবি) থেকে ফের্নান্ড ফ্রান্সকাটার,
এভেলিন ওয় থেকে রেকিউজি স্কলার
ক্যানটোরোউইক্স, হিউ গ্রেটস্কেল থে
লেডী অটোলিন, মবেল, তাছাড়া কয়েক
পুরুষের বাছাই করা অক্সফোর্ড জনস।

অক্সফোর্ড সম্বন্ধে বইয়ের ক্রোড় হল
আছে এবং যাঁরা বাউরা বর্ণিত সময়ের
অক্সফোর্ডের জানেন, এ বইটিকে তাঁরা
অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং তথ্যপূর্ণ আত্ম-
জীবনী হিসাবে গ্রহণ করবেন একথা বিনা
স্বিধার বলা যেতে পারে। বাউরা বর্ণিত
সময়ের আগেকার একশো বছরের অক্স-
ফোর্ডকে জানতে হলে যেমন মার্ক
প্যাটিশনের মেম্বার্স অবশ্য পাঠ্য
বাউরার সময়ের অক্সফোর্ডকে স্পষ্টভাবে
জানতে হলে বাউরার মেম্বার্সও তেমনি
অপরিহার্য। অবশ্য একথাও অস্বীকার
করা যায় না যে, ইউনিভার্সিটি লাইফের
কাল দিকটা সম্বন্ধে লেখক খুব অল্প
কথা বলেছেন—ওখানকার সঙ্গীর্ষতা,
হিংসাত্মক এবং নানা ধবনের যড়যন্ত্র
প্রভৃতি বিষয় তিনি কিছুই লেখেন নি।
এ সব সত্ত্বেও অক্সফোর্ড সম্বন্ধে যা তিনি
লিখেছেন তা খুবই প্রামাণ্য এবং বিশ্বাস-
যোগ্য। বাউরা নিজে স্কলার এবং সেই
জনাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট
স্কলারশিপের দিকটা তাঁর লেখায়
অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভা দিয়েছে।

শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার—পঞ্চাশ বছর আগে ও পরে” (সাপ্তাহিক বঙ্গমতী ১০-৬৭)—নামক রচনায় বাঙালী চরিত্রের একদিকের গতি ও প্রবণতা, এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক মানে সে কোন স্থানে পড়ে আছে, তার একটি উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ। গ্রন্থ বছর আগে নীরদবাবু যা বলেছিলেন, তা এখন পড়তে গেলে প্রায় ‘প্রফেটিক’ বলে বোধ হবে। দেখা যাবে প্রফুল্লচন্দ্রের অনুমিত মস্তিষ্কের অপব্যবহার পঞ্চাশ বছর পরেও চলছে, তবে উল্টো দিকে।

প্রফুল্লচন্দ্রের এই প্রবন্ধের তারিখ নীরদবাবু অনুমান করেছেন ১৯১০ বা ১৯১১। এই প্রবন্ধ ‘পুস্তিকাকারে বেরিয়েছিল—দু-আনা দাম মনে পড়ে—আমিও কিনেছিলাম, হয় তো আরও কিছু পরে এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। খুব সাড়া জাগিয়েছিল তা। প্রফুল্লচন্দ্রের এই রচনা প্রথমে বেরিয়েছিল সুপ্রভাত নামক মাসিকপত্রে, প্রকাশের বৎসর ১৯১০।

নীরদবাবুর আরও মনে পড়ে পুরাতন-পন্ডীবা প্রফুল্লচন্দ্রের এই লেখাটাকে ‘আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার মস্তিষ্কের অপব্যবহার’ এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন।”

এই পুরাতনপন্ডীদের মধ্যে একজনের মনোভাবের প্রমাণ আমরা কাছে আছে। তাঁর নাম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বঙ্গবাসীতে পর পর পাঁচটি প্রবন্ধ লিখে প্রফুল্লচন্দ্রকে গাল দেন। মনে হয়, নীরদবাবুর এর কথাই অস্পষ্টভাবে মনে পড়েছে। পাঁচটি রচনার নাম ছিল ‘পি. সি. রায়ের মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার’।



এর প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১০ই পৌষ ১৩১৬ (ইং ১৯১০, অতএব নীরদবাবুর অনুমান ঠিক)। দ্বিতীয়টি ১৭ই পৌষ, তৃতীয়টি ২৪শে পৌষ, চতুর্থটি ২রা মাঘ এবং পঞ্চমটি ৯ই মাঘ। সাতদিন পর পর। ইন্দ্রনাথের ছদ্মনাম ছিল পণ্ডনন্দ (এ নামে তাঁর কাগজও ছিল একখানা)—অতএব প্রফুল্লচন্দ্রের বিবৃদ্ধিও পাঁচটি প্রবন্ধ লিখেই তিনি আনন্দ লাভ করেছিলেন।

ইন্দ্রনাথের প্রথম রচনাটি থেকে তারিখ ইত্যাদি জানা যাবে। তিনি এক স্থানে লিখেছেন—

“নির্বাসিত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা শ্রীকুমদিনী মিত্র বি-এ সম্পাদিত ‘সুপ্রভাত’ নামক কাগজে পি. সি. রায়ের এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধের নাম “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার।” সেই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত বা বিতরিত হইতেছে।”

প্রথম প্রবন্ধের প্রথম লাইনেই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি আক্রোশ প্রকট। যথা—“যিনি জাতিতে কায়স্থ, নামে প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ছিলেন, তিনি স্বেচ্ছা দেশে গিয়া সামান্য শিখিয়া পুনরায় এদেশে আসিয়া উক্টর পি. সি. রায় হইয়াছেন।”

ইন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তিই ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিচার, প্রাচীন শাস্ত্রাদির পটে। এরূপ তা ‘সেল্ফ-ওপিনিওনেটেড’। তা এই জাতীয়—যথা—

“শাস্ত্র প্রদর্শিত পন্থা পবিত্র্যাগ করাতেই... আমাদের বর্তমান দুর্দশা ঘটিয়াছে।”...“সত্যের স্বরূপ কি, সত্যের আকার কেমন, পি, সি, রায় কি তাহা জানেন? সামান্য মনুষ্যেব জাগ্রদশায় বাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, পবমার্থতঃ তাহা যে সত্য নহে, একথা পি, সি, রায় কখনও শুনিনাছেন কি? যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, দূর্বাক্ষণ অনুবাক্ষণের সাহায্যেও যাহা দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাকে আমরা স্বল্প পদার্থ বলি। আব যাহা...কোনও যন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হয় না, তাহার নাম সুক্ষ্ম পদার্থ। পি, সি, রায় স্বল্প-সুক্ষ্মের এই প্রভেদ অবগত আছেন কি? যোগসাধনার বলে—তপস্যার বলে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে, মৃত্যুর এধারে এবং ওধারে সমান দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে পারা বার, পি, সি, রায় সে বিষয়ে কোনও সংবাদ রাখেন কি?”.....

সংবাদ যে তিনি রাখেন না, তার প্রমাণ তার বেঙ্গল কেমিক্যাল নামক প্রতিষ্ঠানের জন্মদান।

পারিমাণ গোহুরামী
কলিকাতা

চিৎড়ি—তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই। অনুবাদ : বোম্বাই বিশ্বনাথম ও নিলীনা আব্রাহাম সাহিত্য অকাদেমী, বরাদ্দ-সরোবর টেঁড়িয়াম, ব্লক ৫-বি, কলিকাতা-২৯। মূল্য ১ সাত টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের গোঁড়ামির জন্যে মালয়ালম আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে গণ্য হলেও, বারি এই ভাষার রচনা সম্বন্ধে সাহিত্য পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে এই ভাষার স্থান সরকারী বিধিনিয়মের অনেক উচ্চত্রে। অবশ্য সাহিত্য অকাদেমী ভারতের প্রধান ভাষাগণিতে রচিত সাহিত্যের জন্য যে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা কবে দু-কল বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন, তারই সীমিত সযোগে মালয়ালম ভাষায় লিখিত মূল উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ ‘চিৎড়ি’ পড়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। কেন্দ্র প্রদেশের সমস্ত উপকুলে রয়েছে জেলোদের গ্রাম। সেই জেলোদের

জীবনযাত্রা, সংস্কার, প্রাচীনিকতা, তদুপরি চিরন্তন যে প্রেম—তার উপর ভিত্তি করে উপন্যাসটি রচিত। একদিকে বাস্তবজীবন, আর একদিকে রোমান্টিকতা—দুই-এর সমন্বয় সাধিত হয়েছে উপন্যাসেব বিষয়-বস্তুতে। বলা প্রয়োজন যে, ভূমিকায় নারায়ণ মেনন উপন্যাসটির উপর একটি সম্ভব আলোচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই আলোচনার সঙ্গে শ্রীমেনন উপন্যাসিকের জীবনবোধ ও চিন্তাশীলতা সম্বন্ধে যথাক্রমে আলোকপাত করে উপন্যাসের মধ্যে যে বাস্তব, সত্যিকারিতা রয়েছে তার কার্যকারণ ইঙ্গিতকাণ্ডে নির্দেশ করেছেন।

অবশ্য ‘চিৎড়ি’র মধ্যে যেতাই দৈনন্দিন জীবনের আরোপ করা হোক না কেন, এটি চিরন্তন সাহিত্যেরই অন্তর্গত। সৌন্দর্য্য দিয়ে এ বইকে পুষ্টকৃত করে ও বিভিন্ন ভাষায় এই উপন্যাসের অনুবাদে ব্যবস্থা

করে সাহিত্য অকাদেমী একটি সং যাত্র করেছেন। কিন্তু এই সং কাফ সর্বত্র লক্ষিত হয় না বলেই সাহিত্য অকাদেমীর মতো ভ্রূ প্রতিষ্ঠানটিও সমালোচনার শিকার হয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরন্তন সাহিত্যেব (যেমন, ‘পদ্মা নদী’ মাঝি) ভাষান্তর অনুবাদের ব্যবস্থা তাঁরা কি করেছেন? তা যদি করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে, সেখানেও কারুতামার বাবার মতো লোভী ও ধর্ম্মার্থ জ্ঞানশূন্য লোকের অভাব নেই। যা হোক, এতো কথা বলার কাব্য এই যে, সাহিত্য অকাদেমী বাঙালীত্ব বোঝা-জালে আবদ্ধ না হয়ে, কোনো বিপথগামী উদ্দেশ্যপ্ররোচিত না হয়ে, হিন্দীকে

হয়—ভারতীয় সাহিত্যগোষ্ঠীকে সম দৃষ্টিতে বিচার কবে এগুলিকে সর্ব-ভারতীয় সাহিত্যরসিকদের কাছে ভাষান্তরের মাধ্যমে পৌঁছে দিন।

কিন্তু তুমি শিল্পী নও

স্বরবিন্যাস

"Articulation is the courtesy of the actor as punctuality is the courtesy of kings."—C. Coquetin.

অভিনেতাকে এমনভাবে সংলাপ বলতে হবে যাতে প্রেক্ষাগৃহে সব দর্শকই তাঁর কথা ভালভাবে শুনতে পারে। দর্শককে যদি কান খাড়া করে এবং বিশেষভাবে চেষ্টা করে অভিনেতার বক্তব্য বুঝতে হয় তবে কিছুক্ষণ বাদেই নাটক দেখা ব্যাপারটা তাঁর কাছে একটা বিরক্তিকর জিনিস বলে মনে হবে। আবার অভিনেতার বাচনভঙ্গী যদি একটানা সুবেব বা একঘেয়ে ধরনের হয় সেক্ষেত্রেও দর্শকের মন যাবে ঝিমিয়ে এবং সজাগ দৃষ্টিতে অভিনয় দেখবার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলবেন। শব্দ কণ্ঠস্বর সবাই শুনতে পেলেই "সব হচ্ছে গেল" একথা মনে করলে চলবে না। কর্কশ, ঘ্যানঘ্যানে, বাজখাই, গদগদ, বহু জাতের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমাদের সাধারণ জীবনে পরিচয় ঘটে থাকে।

অভিনেতাকে চরিত্রানুগ কণ্ঠস্বরের ব্যবহার করতে হবে অভিনয়ের সময়। স্বরবিন্যাসের টেকনিক শিখতে হবে—সাধনার দ্বারা আরম্ভকণ্ঠ হতে হবে। কণ্ঠস্বরকে বিভিন্ন পদ্যের খেলাতে হবে—শীর্ষবিন্দুতে তুলে, অন্যান্যসেই আবার নামিয়ে আনতে, হবে একেবারে নিন্মতম পদ্য।

"It is the actor's job to see that his voice is pleasing in its quality, sufficient in its quantity, and capable of an infinite variety of mood and character"—John Bourne. কিন্তু এ-গুণগুলোকে সাধনা করে আয়ত্ত করতে হবে।

সংলাপের স্বাভাবিকতা

"মঞ্চে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে হবে"—এ ধরনের একটা কথা অনেকেই বলে থাকেন। অথচ এই তথ্যাকথিত স্বাভাবিকতা বলতে তাঁরা কি বোঝেন

তা কিন্তু মোটেই স্পষ্টভাবে বলতে পারেন না। থিয়েটার জিনিসটা ঠিক three-sided drawing room নয়। সুতরাং বাস্তব জীবনে বসবার ঘরে বসে স্বাভাবিকতার মতো না কবে, বা ভাবভঙ্গীবিজ্ঞিত ভাবে চা খেতে খেতে যে ভাবে কথাবার্তা বলা হয়, স্টেজে তাই কবলে তাব ভেতর সত্যিকার বাস্তবতা কিছুতেই ফুটে উঠবে না।

একথাটা প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, এ ধরনের স্বাভাবিকতার মঞ্চে কোন স্থান নেই। প্রেক্ষাগৃহে হয় তো হাজার বা দু' হাজার লোক বসে রয়েছেন। অভিনেতার কণ্ঠস্বরকে এমনভাবে তুলে কথা বলতে হবে যাতে শেষ পর্যন্ত দর্শকেরাও তাঁর সব কথা বেশ স্পষ্টভাবে শুনতে পান। অত্যন্ত নিবিড়ভাবেও যখন নায়ক-নায়িকা

সাঙ্গাংক-বসন্তীয় আগামী

আজকের

পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ নতুন পটভূমিকায় শীঘ্রই সুবহু উপন্যাস লিখছেন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কথাসিংশী শ্রীমদোজ বসু।

প্রেমালাপ করছেন, তখনও একথাটা মনে রাখা দরকার : You must speak up. You must be heard. আগে তো দর্শকদের শুনতে হবে যে, অভিনেতা বা অভিনেত্রী কি বলছেন—তারপরে-তো-তিনি বিচার করবেন যে অভিনয় স্বাভাবিক হচ্ছে কি না। Strain করে চিৎকার কবলেই কণ্ঠস্বরের কিস্কৃতি বাড়ানো যায় না। বরং যত কম Strain করা হবে, ততই ভাল। স্বর-নিয়ন্ত্রণ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারলে অভিনেতা দেখতে পাবেন যে, সামান্য হা-হুতাশ করবার সময়ও পেছনের দর্শকেরা সব কিছু শুনতে পাচ্ছেন।

এ্যাক্টর ও প্রডিউসার

আজকের দিনের মধ্যাভিনয়ে প্রডিউসারকে একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হয় নাট্য-প্রযোজনার ব্যাপারে—আর এটাই তো উচিত, কারণ তাঁর দায়িত্ব তো কম নয়। সময়ে সময়ে অবশ্য একটু বেশিও

তুলে ধরা হয়—নাটকের প্রডাকসনের ব্যাপারে তিনি প্রায় ডিক্টেটরের মতো গিয়ে ওঠেন।

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে—এক্সপ্রেসিনিষ্টিক এবং এ জাতীয় স্টাইলাইজ নাটকের কথা বাদ দিলে—প্রডিউসারের কাজ হচ্ছে অভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে সমতা বজায় রাখবার চেষ্টা করা এবং নাটকের উদ্দেশ্য এবং কাহিনীর ভাষা দেওয়া। তাঁর ভাল জাতীয় টেকনিশিয়ানও হওয়া দরকার—কারণ তিনিই অভিনেতা-অভিনেত্রী, দৃশ্যপট, লাইটিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিকের ভেতর হারমনির সৃষ্টি করে নাটকের মণ্ডরূপ দেন।

নাটকের প্লট বা কাহিনীকে স্পষ্টভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার দায়িত্ব প্রযোজকের। এর জন্য প্রডিউসারকে প্রথমেই নাটকটিকে খুব ভালভাবে পড়ে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। কারণ নাট্যকারের আসল বক্তব্যকে বেশ ভালভাবে উপলব্ধি সাহায্যে বুঝতে হবে। প্রেক্ষাগৃহে কিন্তু নিজ নিজ চরিত্র নিয়েই ব্যস্ত। সমগ্র নাটকের বিভিন্ন দিক তৈরি করে মণ্ডস্থ করার দায়িত্ব তাদের নয়—সেটা নাট্য পরিচালকের।

আগেই বলেছি পরিচালককে নাটকটি ভালভাবে পড়তে হবে—ওপর ওপর পড়লে চলবে না। যে নাটক যত উচ্চস্তরের হবে, সেই অনুপাতে সে নাটক সঠিকভাবে বোঝা একটা দুরূহ ব্যাপার হবে দাঁড়াবে। নাটকের শ্রেষ্ঠতার মান অনুসারে আবার বিভিন্ন ধরনের ভাবের জটিলতার প্রশ্নও দেখা দেবে।

প্রডিউসার নাটকটি প্রথমবার পড়ে নাট্যকারের মূল বক্তব্য বুঝে নেবার চেষ্টা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রডাকসন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ছাঁচ তৈরি করে ফেলবেন—এতে নাটকটির রুলিং আইডিয়া বুঝতেও সুবিধা হবে। তারপর নাট্যকার যেভাবে পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যান করে কন্সট্রাকশন করেছেন সেদিকটা ভালভাবে বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করে দেখবেন। তাঁকে নোট রাখতে হবে লেখক কোন কোন জায়গায় ক্লাইমেক্স সৃষ্টি করেছেন, কোন কোন অংশে লেখকের বক্তব্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে, কোন কোন বাক্য এবং শব্দের ওপর জোর দিতে হবে ইত্যাদি।

তারপর যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নাটকের চরিত্রগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। নাট্যকার তাঁর কাহিনীতে যে প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছেন তাতে কোন চরিত্রের কোথায় স্থান, চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের দৈহিক আকার, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাবানুভূতির গভীরতা সব কিছুই প্রযোজকের আয়ত্তে থাকা দরকার।

এরপর প্রযোজক কলকাতার জাপারটার মনোনিবেশ করলেন। এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিকে খুঁজে বা খুঁজি 'অর্থ' প্রযোজকের কাছে স্পষ্ট নয়, যা যে অভিনেতা সে সব বলছেন তাঁর চরিত্রের লক্ষণে ও সব কথাই কোনও সম্প্রতি নেই এবং সমগ্র প্লের পরিপ্রেক্ষিতে তার জ্ঞানপূর্ণ বোঝা যায় না।

He must be able to bring out whatever special qualities of music, rhythm, or phrasing the author has employed.

এরপর পরিচালক সেটিং এবং ক্যামেরার বিষয় মনে মনে একটি পরি-কল্পনা করে নেবেন। তারপর তিনি স্ক্রিপ্টটি নিয়ে মন্তব্যপারদের জন্য কাছে লাগবেন। তাঁকে মনে রাখতে হবে লক্ষ্যকর্মের নাটকটিকে ভাল লাগাতে হবে—তাদের সবার মনের ওপর নাটকটির প্রভাব বিস্তার করতে হবে—নাটকটির অভিনয় যাতে সবাই স্পষ্টভাবে দেখতে পায় সে ব্যবস্থাও পরিচালককেই করতে হবে। নাটকের গতি স্বচ্ছগতিতে এগিয়ে যাবার জন্য এবং নাটকের নানা জায়গার গুরুত্ব অনুসারে গ্রুপিং সৃষ্টি করাও নাট্য-প্রযোজকেরই একটি প্রধান দায়িত্ব। এমন কাজ ঠিকভাবে না করতে পারলে নাটকের গতি অব্যাহত থাকবে না এবং অভিনয় একঘেয়ে হয়ে উঠবে। চরিত্র গঠনে গ্রুপিং সৃষ্টি করতে এবং নাটককে গতিশীল করতে মুভমেন্টের দরকার—সেই জন্যই মুভমেন্টের ব্যাপারে ডিরেক্টরকে বিশেষ ঐচ্ছনীয় হতে হবে।

এদেশে এবং ওদেশে বহু বিখ্যাত অভিনেতাও মুভমেন্টের ব্যাপারে যথেষ্ট অজ্ঞান বোধ করতেন বলে শুনছি। লানীরাবু, অমৃত মিত্র প্রমুখ কলকাতা স্টেট নাটক অভিনয়ের সময় বিশেষ মূর্ত্ত করতেন না। পাশ্চাত্যের সব কালের সেরা অভিনেতাদের পরীক্ষিত বীর স্থান সেই বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেতা স্যার হেনরী আর্চার্ড পর্বন্ত মুভমেন্টের ব্যাপারে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। একদিন স্টেজ রিহাসালের সময় তাঁকে একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে হবে—বিহ্বলভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন—How do I go there? এলেন টেরী ঠাট্টাচ্ছলে তার উত্তর দিলেন—Hire a hansom-cab.

প্রতিউসার সব পারেন, শূন্য পারেন না অভিনেতার ভেতর ব্যক্তিকের সৃষ্টি করতে। শিশিরবাবুরের যুগে প্রত্যেক গড় অভিনেতার ভেতরই এই ব্যক্তিকের হাপ থাকতো—শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র, রাধিকানন্দ, তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনো-রঞ্জন ভট্টাচার্য, দক্ষিণদাস, বিশ্বনাথ রবি রায়, জুসেন রায়, শৈলেন চৌধুরী,

মুশলি, চন্দ্রশীলা, প্রভৃতি কলকাতা প্রত্যেকের অভিনয়ের থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হত—তাই তাঁদের অভিনয়ে বে গিলের সৃষ্টি হত। আজকের মধ্যে অভিনয় দেখতে গিয়ে তার অভাবটাই বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

বাস্তবজীবনেও সত্যিকার বড় হতে হলে এই ব্যক্তিকের দরকার। আমাদের বাংলা দেশে এক এক সময় যারা বঙ্গেশ্বরের ভূমিকা নিয়েছেন তাঁদের কথা একবার স্মরণ করুন। আজও প্রখ্যাত মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসবে—সুরেশচন্দ্র বান্যাসিং, দেশবন্ধু, চিত্ত-রঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র—একবার দেখলেই সামান্য লোকও মনেপ্রাণে বুদ্ধিতে পারত এঁরা সব মহামানব—গোলাপের সুগন্ধের মত এঁদের ব্যক্তিকও ছিল স্বেচ্ছাকৃত। স্বাধীনোত্তর যুগে আমাদের সেনার বাংলায় এল দুর্ভাগ্যের রাতি। মুখ্য-মন্ত্রীর পদে এলেন সর্বজন প্রেমের ডু প্রফুল্লকুমার ঘোষ। কিন্তু কুচক্রী মিরজাফরদের চক্রান্তে অনতিকালের ভেতরই তাঁকে অপসারিত হতে হল। তারপর থেকেই মেকী বঙ্গেশ্বরের দল অধঃমুখ সেনার বাংলায় ওপর দিয়ে শৈশবচিক উল্লাসে চালিয়ে চললেন তাঁদের পেছন্দরা খেলা। এই সব বঙ্গেশ্বর কোথায় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে এ খেলা চিরদিন চলবে না—তাদের

আঙ্গল বীভৎস চেহারাটা একদিন জন-গণের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়বেই—সৈন্য বঙ্গবাসী বুদ্ধিরে দেবে হেঁচকি-পেজি বঙ্গেশ্বর সেজে বসলেই তাকে পঞ্চ-কুকের মত অপসারিত হতে হবেই।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও শিশিরোত্তর যুগে বহু তথাকথিত নাট্য-প্রেমিকের দর্শন আমরা পেরেছি। এরা কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে কবরের পর বছর গ্রান্ট হিসাবে দিল্লীর সম্প্রতি নাটক আকস্মিক থেকে টেকা নিয়ে নিজেরা আত্মদান করেছে—এমন লোকও এদের ভেতর আছে যে বছরের পর বছর লাইব্রেরীর কই কেনকার জন্য সরকারের থেকে টেকা নিয়ে একটি কইও কেনে নি—মার্কিনীদের পল্লোহন করে মার্কিন সফরে গেছে। আবার সেই হাওরা বিপরীতমুখী হয়েছে অমনি রাশিয়ান সরকারের পল্লোহনে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। যদি এইভাবে রাশিয়ান একবার হয়ে আসা যায়। তথাকথিত কিছু নাট্যচর্চা আবার উঠেপড়ে পল্লোহনে নতুন সরকারকে ভোষণ করে সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য। কিন্তু আজকের বাংলার সরকার অন্য জাতের। তাঁরা কাঁচ-কাণ্ডনের তথাকথিত বেশ ভাল-ভাবেই বোঝেন এবং জানেন। সুতরাং এখন আর এভাবে কিছু হবে না।

[সমাপ্ত]

ছ' মাসের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণ বার ক'ল

অনোত্তর রায়ের

কমিউনিস্ট পার্টি কী ও কেন ?

এই দ্বিতীয় মুদ্রণই বইখানির জনপ্রিয়তার নিদর্শন। কমিউনিস্ট পার্টি সম্প্রদায় যদি সর্বিস্তারে জানতে চান, তাহলে বইখানি আজই সংগ্রহ করুন।

বইখানিতে আছে—কমিউনিস্ট পার্টি কাদের পার্টি, জন্ম ঐতিহাসিক দল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পর্ষদ, পার্টি ও ব্যক্তি, পার্টি ও জনগণ, পার্টিতে উপদল সৃষ্টির কারণ, সংশোধনবাদের উৎপত্তি, ভারতের পার্টিতে আধুনিক সংশোধনবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ইত্যাদি।

মূল্য—১.৫০

এই লেখকের অন্যান্য বই—

দৌতর হৃদয়	৪.০০	ইতিহাস কী ও কেন?	০.০০
ইতিহাস দর্শন	৪.০০	আমিল সত্যের ইতিহাস	০.০০

(এপ্রিলে বের হবে)

প্রকাশক—অল্পপূর্ণা প্রকাশনী

C/o. নিরঞ্জন রায় এন্ড কোং

শাকসেনা মিডিয়া

১/২, ম্যাকসন সেন, কলিকতা-১

মুদ্রক বিজ্ঞান ও এডাল্টের কলিকতা প্রেস।

সুপার

আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র

আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ, অনেক কথা লোকে বলে থাকে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজেও কিছু কিছু অভিযোগ প্রকাশ হয়; বেতার গ্রাহকরা চিঠিপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের যারা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তারা এসব কথায় কান দেন না। তারা ভুলে যান যে আকাশবাণী (রেডিও) কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। অনেক সময় বেতারে বাংলা কখনে এমন উক্তিও শোনা যায় যা ভারত সরকারের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সংগতি সম্পন্ন নয়। গ্রামোফোন রেকর্ডের বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠানে হিন্দী ফিল্মের গান শুনতে শুনতে গানের উত্তরা গানের বিরোধী হয়ে ওঠেন। বাংলা দেশে সূচ্যাত বহু গায়ক-গায়িকা থাকতেও তাঁদের সুযোগ না দিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে সময় পূরণ করা হয়। নাটকের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সুনজরে পড়া শিল্পীদের বাইরে অন্যদের এখানে প্রায় প্রবেশ নিষেধ। কে ভাল অভিনয় করতে পারেন সে কথা বিচার্য নয়, তার আগে খবর নেওয়া হয় অভিনেতা বা নাট্যকার কিরূপ মতামত পোষণ করেন। নাটক বাছাইয়ের ব্যাপারেও তাই। অনেক প্রগতিশীল নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের এখানে প্রবেশ নিষেধ। বেছে বেছে এমন নাটকও গ্রহণ করা হয় যে নাটক শুনতে বলে কিছুক্ষণের মধ্যে রেডিও বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ পরিবারের সকলকে নিয়ে সে নাটক শোনা যায় না।

আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র যারা প্রোগ্রাম পেয়ে থাকেন তাঁদের ভাগ্যবানই বলতে হবে। তবে তাঁরাও জানেন না কখন তাঁদের প্রতি এ সব কর্মচারী সূত্রসম্মত হয়েছেন আর কখন অপ্রসন্ন। প্রাসঙ্গিক একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। জনৈক প্রবীণ লেখক রেডিও-র জন্ম-কাল থেকে প্রোগ্রাম পেয়ে আসছিলেন। তাঁর আলোচনা যথেষ্ট জনপ্রিয়। কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার কিছুকাল পরে দেখা গেল তাঁর প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেল। এই বন্ধ হবার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতে পারলেন না, রেডিও-য় তাঁর নিয়মিত প্রোগ্রামের মধ্যেও প্রশ্ন—সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ও সরস আলোচনা শোনা যায় না কেন?

বিভিন্ন বিভাগে আলোচনা ও কথনের জন্য কিছু লোক প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁদের সম্পর্কে একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে এই ‘প্রতিভাবান’ লোকেরা একটা গোষ্ঠীভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে এঁদের ছাড়া রেডিও-র কথা বলার মত যে লোক আছে এই কর্মচারীরা তা বোধ হয় মনে করেন না। তাই যত্নে ফিরে নানা বিষয়ে একই কণ্ঠস্বর শুনতে হয়। এঁদের অবিস্ম্যকারিতায় কেউ প্রতিমাসে প্রোগ্রাম পাচ্ছেন, কেউ বছরে একটর বেশি পাচ্ছেন না। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কথনের জন্য যাদের ডাকা হয়, তা কিসের ভিত্তিতে হয় বোকা মূর্খকল। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, যারা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মহলে বেশি ঘোরাফেরা করতে পারেন, মানসিক দিক থেকে (রাজনৈতিক অথবা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে) তাঁরা এক গোত্রভুক্ত; তাঁরাই সুযোগ পেয়ে থাকেন বেশি। এমন কথাও শোনা যায়, রেডিও পরিচালনার ব্যাপারে নিষ্পত্তি না হয়েও এখানে এমন এমন ‘অভিভাবক’ আছেন যারা পেছন থেকে নীতি নির্ধারণ করেন ও নাম সুপারিশ করেন। একটু মনোযোগ দিয়ে কয়েকদিন রেডিও-র সব বিভাগের প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ করে কখন ও আলোচনা শুনলে প্রোগ্রামের কাছে একটা দিক নির্দেশ প্রকাশ হবে। ‘বিচার্য’ বিষয় এই দিক নির্দেশ আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে না প্রতিকূল! এছাড়া রেডিও-র কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য যে প্রোগ্রাম হয় এতকাল তা কেবলমাত্র বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিতে পরিচালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ গত সাধারণ নির্বাচনে আমূল পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। জনসাধারণের ইচ্ছা ও ঐক্যে বর্তমানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কাজ চালাচ্ছেন। জনস্বার্থে, অমনতি মানুষের কল্যাণে আজ কুড়ি বছরের অচল রুথের ঢাকা কাদা থেকে টেনে তুলতে হবে। আকাশবাণীর পরিচালনা যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাপার, তবুও রাজ্য সরকারের এ বিষয়ে কিছু ভাবার দরকার আছে, কলকাতা কেন্দ্রের জন্য উপদেষ্টা কর্মিটির পুনর্গঠনের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমন প্রোগ্রাম ও তার জন্য ব্যক্তি বাছাইয়ের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। আকাশবাণীকে কেন্দ্র করে যদি কিছু কাদা জমে থাকে তাকে অবিলম্বে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আকাশবাণী পরিচালিত হোক সকল মানুষের কল্যাণে!—সুজন।



মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত ‘তিন অধ্যায়’ ছবিতে দিতা দত্ত।

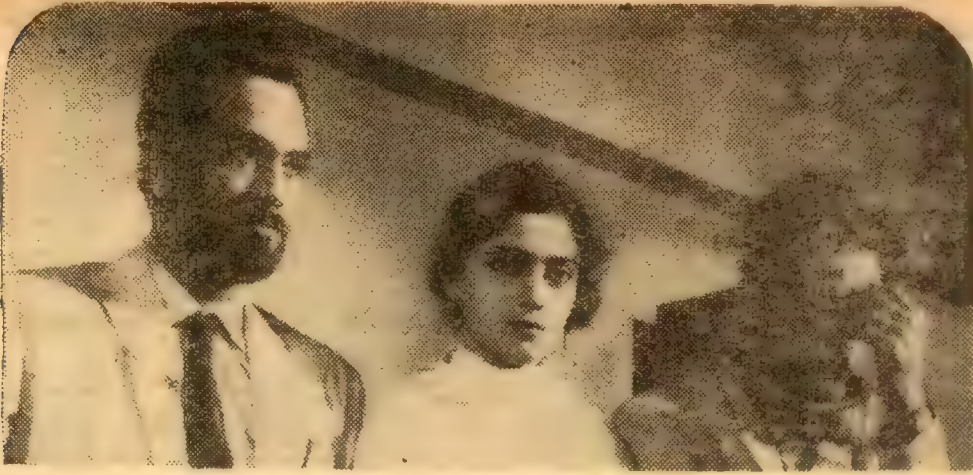
চিত্র আলোচনা

ছুটি

[পরিচালনা : অরুণধী দেবী]

একদিন যারা অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ এখন চলচ্চিত্র পরিচালনায় হাত দিচ্ছেন। মজা দে দুটি ছবি পরিচালনা করেছেন। এবার অরুণধী দেবী পরিচালিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অরুণধী দেবীকে প্রথমে দেখেছিলাম গায়িকারূপে, তার পরে অভিনেত্রী, এখন তিনি চিত্র-পরিচালিকা। সঙ্গীত জগতের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তাও রক্ষা করেছেন সঙ্গীত পরিচালনা করে। অরুণধী দেবীর প্রথম ছবি ‘ছুটি’ সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে। বিমল করের ‘খড়কুটো’ কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা, সঙ্গীত পরিচালনা ও পরিচালনার কাজ অরুণধী দেবী করেছেন, ছবির সংলাপে কিছুটা সাহিত্যের মেজাজ পাওয়া যায়, সে কাজটা বিমল করের নিজের।

‘ছুটি’ এক কাব্যরসের বিবাদ-মধুর কাহিনীচিত্র। এই কাহিনীর নায়িকা প্রমর এক মাতৃহারা তরুণী, সবে কৈশোরের



ছবিটির একটি দৃশ্যে অজিতেশ, নন্দিনী ও মৃণাল

সীমা আতিক্রম করেছে। বাবার দ্বিতীয়বার বিবাহ বেমন সে মেনে নিতে পারে নি, তার মনে প্রশ্ন উঠেছে তার বাবা কি তাহলে তার মাকে ভালবাসত না? তেমনি সংমার উপেক্ষাও তাকে পীড়িত করেছে। তার বাবা স্থানীয় বিশপ। একদিকে নব বিবাহিতা স্ত্রী আর একদিকে মাতৃহার। মনতানের প্রতি মমতা, এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। ভ্রমরের প্রতি তার স্নেহ প্রকাশ্যে প্রকাশ করা তার পক্ষে সহজ ছিল না। এই বিবাদময় পরিবারে কলকাতা থেকে এল অমল। জর্নাবরল পাহাড়ী পরিবেশে দু'জনার মধ্যে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গতা জেগে উঠল। সেই অন্তরঙ্গতা থেকে প্রেমের ফুল ফুটে উঠল। জীবনে যখন সবেমাত্র স্বপ্নের সাতরঙ দেখা দেবার উপক্রম হয়েছে এমন সময় ডাক্তার এসে জানাল ভ্রমর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত—তার জীবনের দিন সীমাবদ্ধ। জগৎটা তার কাছে সবেমাত্র মধুর মনে হচ্ছে—সে সময় তার বাবা বা অমল কেউ চায় না তার জীবনের মেলাদ এখানে শেষ হোক। অথচ এই বিবাদময় পরিস্থিতিতে মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকল না।

পরিচালিকা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে ভ্রমরকে একাত্ম করে চমৎকার পরিবেশ রচনা করেছেন। সৌন্দর্য ও মধুর মেজাজ সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব দর্শকদের তৃপ্ত করবে। ছবির প্রতিটি চরিত্র দর্শকদের মনে রেখাপাত করে। তার মধ্যে ভ্রমর সর্বাধিক বেশি। প্রধানত চরিত্রটি সংবেদনশীল, দ্বিতীয়ত এই চরিত্রকে নন্দিনী মালিয়া যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। নবাগতা নন্দিনী প্রথম অভিনয়ে দর্শকদের মনে রেখা-

পাত করেছে। ভ্রমরের সং বোন কৃষ্ণার চরিত্রটিকেও উপভোগ্য করে তুলেছে রমি চৌধুরী। এই চরিত্রটি ছবির একটি রিলিফ চরিত্র। এদের তুলনায় অমলের চরিত্রে মৃণাল কিছুটা আড়ষ্ট। সংমার চরিত্রে দেবারতি সেন এবং ভ্রমরের বাবার ভূমিকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথভাবে চরিত্র প্রকাশ করেছেন। ছবিটির কোন কোন অংশ দর্শকদের ভালই লাগবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এই ছবি অনর্থক দীর্ঘ হয়েছে। এই দৈর্ঘ্যের জন্য মাঝখানে বড় বেশি একঘেয়ে এবং ধীর মনে হয়। এই ধীরগতি উপভোগ্যতার বাধা সৃষ্টি করে। সামগ্রিকভাবে রস-বোধের পরিচয় দিয়েও কয়েকটি স্থানে পরিচালিকা স্থূলতাকে প্রস্তর দিয়েছেন। যেমন নন্দিনীর রোগের খবর শোনার পর পরিচারিকার ছোটকালের পদতুল কোলে করে বসা ইত্যাদি।

ক্যামেরার কাজ স্বচ্ছ ও কাব্যের মেজাজ গড়ে তোলার সহায়ক হয়েছে।

নাটকের কথা

অফিস ক্লাবের বাৎসরিক আনন্দানুষ্ঠান

গত ৭ই এপ্রিল শুক্রবার ইউনি-ভারসিটি ইনস্টিটিউটে কলকাতাবন্দর প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ৮নং কলকাতা জেটি রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক

আনন্দানুষ্ঠান সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রী কে. জি. নটরাজ ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী।

সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী জগন্নাথ গাঙ্গুলী, বুদ্ধদেব রায়, গণিমালা রায় ও সুদীপ্ত রায়।

সংগীতানুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বুদ্ধদেব রায়ের পরিচালনার রাগ-সমৃদ্ধ রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটি। তবলা সংগতে শিশুশিল্পী মাঃ শেখর অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

ক্লাবের সভাবৃন্দ কর্তৃক বীরু মুখো-পাধ্যায় রচিত “এতটুকু বাসা” নাটকটি হরিপ্রসাদ দাসের পরিচালনার সাফল্যের সঙ্গে মণ্ডস্থ হয়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন সর্বশ্রী সুধেন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, কমল মিত্র, সন্তোষ ঘোষ, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, তারাপদ দাস, কান্তি গাঙ্গুলী, শশাঙ্ক সিংহরায়, জয়নারায়ণ ঘো, ননীগোপাল চক্রবর্তী, অমর দত্ত ও পরেশ বিশ্বাস। স্ত্রী চরিত্রে রূপদান করেন—রেবা কুন্ডু, মালা দাস (মহাপাত্র), কমল ব্যানার্জী ও মন্দিরা দাস।

হরিশচাটা ফার্ম কৃষি মহাবিদ্যালয়ে অভিনয়

হরিশচাটা ফার্ম কৃষি মহাবিদ্যালয়ে মঞ্চে সম্প্রতি আর্ট থিয়েটারের সদস্যগণ শীতল সেনের “কৃষ্ণকলি” এবং শ্রীভূষণী লাহিড়ীর “হেঁড়া তার” সাফল্যের সংক্ষেপে অভিনয় করলেন। শিল্পীদের মধ্যে

সুনীল মুখোপাধ্যায়, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, মম্বথ সরকার, কালিঙ্গা তৌমিক, জনিল মুখোপাধ্যায়, শংকর রায়চৌধুরী, বেলা সরকার, বেলা রায়, কুমুদ ঘোষ প্রমুখ বিশেষ সাধকতাল্লাভ করেন। অগ্নিমা মজুমদারের অভিনয় যথার্থ না হওয়ায় নাটকটির একটি দিকের ব্যঙ্গনা ব্যাধাপ্রাপ্ত হয়।

‘নবদর্বাদলশ্যাম’ ও ‘লারনিং ট্রা...’

গত এই এপ্রিল মাসে প্রাক্তনী গোষ্ঠী ‘নবদর্বাদলশ্যাম’ নাটকটি মঞ্চস্থ করে। অভিনয়রাংশে ছিলেন সবশ্রী স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রজন রায়, অজন্তা ও মনোজিং লাহিড়ী। সঙ্গীত পরিচালনায় অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে কুমারী জ্যোতি হালদায় ও প্রীরাম চক্রবর্তী শ্রমিকদের অভিনন্দন লাভ করেন।

‘লারনিং ট্রা দ্য বারনিং ঘাট’ নাটকীয় কৃষ্ণা ব্যানার্জী ও সমর কান্তর অভিনয় ব্যতীত আর সুবাই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

অংবাদকনী

গোপীকৃষ্ণের বিশ্বরেকর্ড

নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণ একটানা নয় ঘণ্টা কথকন্যতা পরিবেশন করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। গত ১০ই এপ্রিল বোম্বাইতে এই অনুষ্ঠান হয়েছে। বেলা দুটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়, রাত এগারোটায় শেষ হয়। এই নয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনটি পূর্ণাঙ্গ ব্যালে এবং বেনারস ঘরানার কথকন্যতা অংশ গ্রহণ করেন। একক নৃত্যে দশাবতার নৃত্যরূপ পরিবেশন করেন। তাঁর নাচ শ্রদ্ধা হবার সময় খুব বেশি জনসমাগম হয় নি। কিন্তু শেষ দিনে এত বেশি দর্শক উপস্থিত হয় যে হলে স্থান সংকুলান একটা সমস্যা হয়ে ওঠে। এত দীর্ঘকাল এককভাবে নৃত্য প্রদর্শনের গোপীকৃষ্ণ এক বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করলেন। ইতিপূর্বে এক

ইতালীয় তরুণী ছয় ঘণ্টা টাইট নেচেছিলেন কিন্তু শেষ সময় নর্তকী অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু গোপীকৃষ্ণ নয় ঘণ্টা নেচেও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন এবং মনে হচ্ছিল আরো অনেককাল নাচতে পারেন। সিতারা এসে থামিয়ে না দিলে হয়ত তিনি আরো নাচতেন।

সোভিয়েত-ভারতের মূকাভিনেতা

সোভিয়েত দেশের অন্যতম মূকাভিনেতা ইয়রী চুরীন ও ভারতের মূকাভিনেতা অরুণাভ মজুমদারের মূকাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। উভয় শিল্পীর পরিবেশন ধারা ভিন্ন ধরণের, কিন্তু উভয়ের অনুষ্ঠান যেমন আকর্ষণীয় তেমনি আনন্দদায়ক। এক সাক্ষাৎকারে কাহিনী ফিচার পরিবেশনে অরুণাভ প্রসঙ্গে ইয়রী উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন, সোভিয়েত যুব-প্রতিনিধিরাও প্রশংসা করেছেন। তাঁরা মজুমদারকে যুব প্রতীক চিহ্নে ব্যাচ ও পুরস্কার প্রদান করেন।



হাতির একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয় দেবী

জীবনচরিত্র

কাজী সখানাচী এক বিবর্তিতে জানাচ্ছেন যে কবির জন্মতিথিতে গত বছর সচিবদানন্দ সেনমজুমদারের পরিচালনায় যে জীবনীচিত্রের কাজ শুরু হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার জন্য যথাসময়ে তার কাজ শেষ করা সম্ভব হয় নি। স্থানীয় চিত্রব্যবসায়ী এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দরজায় ধর্না দিয়েও কোন সফল পাওয়া যায় নি।

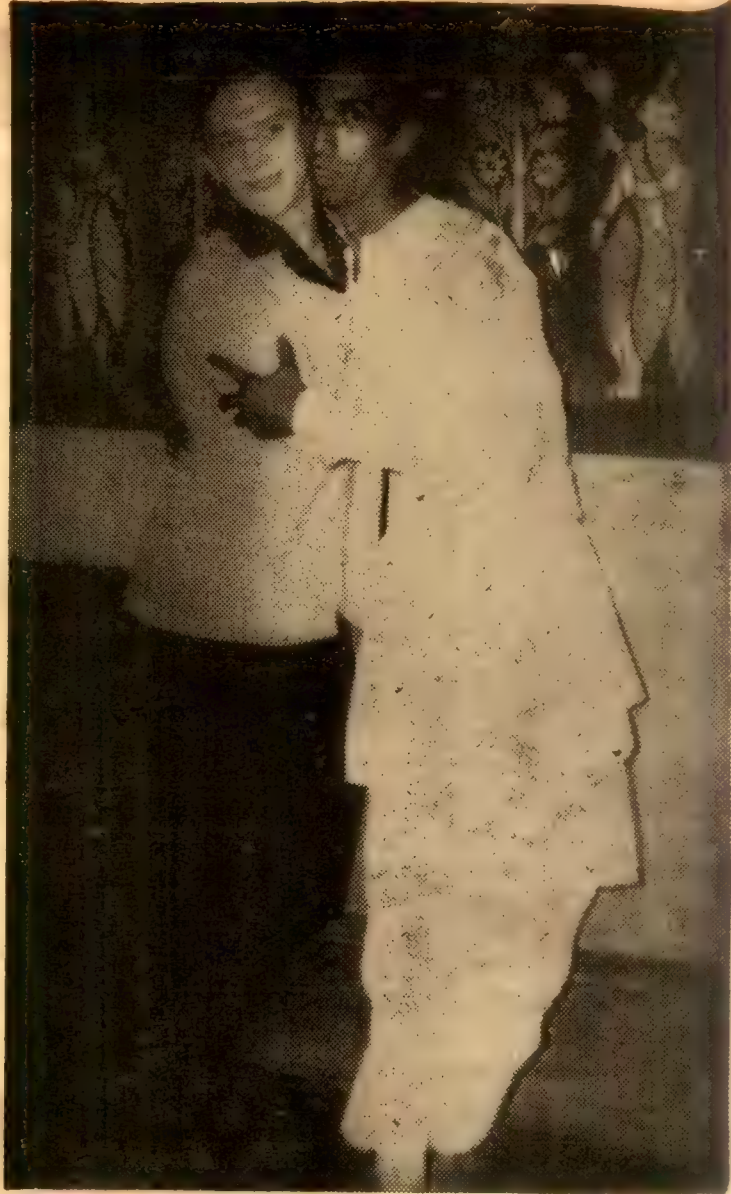
ছবিটির নির্মাণ ব্যাপারে যখন আর কোন আশা ছিল না এমন সময় কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি 'নজরুল কালচারাল ফিল্ম সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করে জনসাধারণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে ছবিটি নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বিবর্তিতে তিনি চিত্রটির নির্মাণ ব্যাপারে জনসাধারণের সাহায্য কামনা করেছেন।

ব্রিটিশ চলচ্চিত্র উৎসব

গত ৮ই এপ্রিল একাডেমি ফাইন আর্টস হলে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ সাহিড়ী। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে, ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের সহযোগিতায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন স্বাধীনভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহরিশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রধান মিঃ এল আর এইচ রাউডন। সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার সভাপতি শ্রীমধু বসু অভ্যাগতদের স্বাগত জানান করেন। ৮ই থেকে ১৫ই এপ্রিল এই উৎসবে কয়েকটি বিখ্যাত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ও পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখান হয়েছে।

কবিয়াল রমেশ শীলের নৃত্য

পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল গত ৬ই এপ্রিল তাঁর স্বগ্রাম চট্টগ্রামের গোমদাঙীতে শেষনিবাস ত্যাগ করেছেন। অবিভক্ত বাংলার প্রথম শ্রেণীর কবিয়ালদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। গত মহাব্দয়ের সময় দার্ভিক ও মানদ্বয়ের



আলিমপুরত দুই দেশের দুই মুকার্ভিনেতা ইমরুী টুরী (রাশিয়া) ও অরুণাভ মজুমদার।

দুখ-দুর্দশা সম্পর্কে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ইত্যাদি বিষয়ে কবিগান গেয়ে তিনি সারা বাংলায় বিশেষ প্রস্ফার আসন লাভ করেছিলেন। একদিকে যেমন সর্বধর্ম সমন্বয়ের আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিশ্বাসীদের মধ্যে, তেমন অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের মনে রমেশ শীলের প্রতি গভীর প্রস্ফা ছিল। দেশ ভাগের পরে তিনি চট্টগ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁকে বারবার পাকিস্তানী শাসকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হয়। তিনি দু'বার বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন। পূর্ব বাংলার

নির্বাচনে হুজুফস্টের জয়লাভে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত। তাঁর রচিত গানগুলি জনতার মুখে মুখে রাজনৈতিক ধর্মের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হাতিয়াররূপে কাজ করেছে। জনমতের চাপে পূর্ববঙ্গ সরকার তাঁকে দিল্লী-সাহিত্যিক ভাতা দিতে বাধ্য হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮০ বছরের অধিক হয়েছিল। জীবনের মধ্যাহ্নে তিনি সমন্বয়বাদী মাইজ-ভাঙারের পীরের শিষ্য ছিলেন, পরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন।



‘মিলন’ হিন্দী হাফতে নতুন ও মেঘন ডাস

মিলন

গান্ধলী প্রমুখ। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন, সমীর বসু, সুদ্রত সেনগুপ্ত, মালবিকা মজুমদার, সুমিতা চ্যাটার্জী, নন্দিতা গান্ধলী, নীলাঞ্জনা রায়, বৃন্দা মিত্তাল, গীতা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

যশে সহযোগিতা করেন, ইরেন মাস্টা, বিজিত ঘোষ ও শিশির চ্যাটার্জী। সংগীত তথা এই পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানটির সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন হিমমতী রায়চৌধুরী।

বসন্ত নৃত্য নাচ:

সুখায়ত সাংস্কৃতিক সংস্থা অর্থাৎ শিল্পী সোসাইটি সম্প্রতি গাড়িয়াহাট রোড-স্থিত সিংহীপার্ক এক উন্মুক্ত পরিবেশে মগ্নস্থ করেন কবিগুরুদের ‘বসন্ত’ নৃত্যনাট্যটি।

অনুষ্ঠান সুরু হয় সাক্ষাদ হোসেন ও তার সহশিল্পীদের সানাই বাজনার মাধ্যমে। এই প্রবীণ শিল্পী প্রায় পৌনে দু’ ঘণ্টা ধরে তার পরিণত শিল্পকৃতি পরিবেশন করেন।

পরিচ্ছন্ন নৃত্যনাট্যটি অত্যন্ত পরিবেশনদুঃ হয়েছিল। নৃত্য রচনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা ও কবির ভূমিকায় কণ্ঠদান করেন স্বাক্ষরে অমিতাভ ঘোষ ও বন্যা মজুমদার। নৃত্য রচনা ও অংশগ্রহণে ছিলেন কটু পাল, পরেশ দাস ও রামগোপাল ভট্টাচার্য। নৃত্যের অন্যান্য শিল্পী হলেন, প্রান্তিকা দেব, অনসূয়া চ্যাটার্জী, স্বরূপা স্বরূপচৌধুরী, মানসী দেবচৌধুরী, ডালিয়া দেবাজী, ইন্দ্রাণী মুখার্জী, ঈশিতা



গান্ধলী প্রমুখের নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

দুই প্রধানের হকিমুদ্দীন খবর দিয়েই এবার শুরু করছি। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল দুটি নাম পাগল করে দেয় বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে। এই দুই দলের মিলনের মাঝে যে এক দারুণ উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা এবং উন্মাদনার সঞ্চার হয় তার মূলত প্রমাণ হল ফুটবল মরশুমের দুটি চ্যারিটি ম্যাচ। এই মরশুমের হকি লীগের প্রদর্শনী খেলায় এই দুই প্রধানের সাক্ষাৎকারে ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠের দর্শকাসন ছিল পূর্ণ।

লীগ-চ্যাম্পিয়ানশীপের সম্মানের প্রশ্নে এই প্রদর্শনী খেলার গুরুত্ব ছিল অসীম। খেলার ফলাফল গোলান্দ্যু ছুঁবার ফলে পরোক্ষভাবে বলতে গেলে উপকৃত হল গতবারের লীগ বিজয়ী বি, এন, রেলদলই। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের দলগত ত্রুড়িনৈপুণ্যের বিচারে বলতে গেলে ফলাফল ন্যায্য; কারণ উভয় দল প্রায় সমান সুযোগ লাভ করে। মাঝ মাঠেই খেলা প্রায় বেশিরভাগ সীমাবদ্ধ থাকায় উভয় দলের গোলরক্ষকেই মারাত্মক তেমন কোন আক্রমণধারা প্রতিহত করতে হয় নি। খেলার মধ্যে একমাত্র দুটি ঘটনা ছাড়া খেলা বেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই শেষ হয়। মুখ্যতমপক্ষে বিপক্ষজনকভাবে বাধা দেবার জন্য ইস্টবেঙ্গলের ওয়াহিদ সাময়িকভাবে মাঠ থেকে বহিস্কৃত হন। ইস্টবেঙ্গলের শি ঘোষ মোহনবাগানের আজহার হোসেনের স্ট্রিকের আঘাতে আহত হলে আম্পায়ার আজহারকে পাঁচ মিনিটের জন্য বহিস্কৃত করেন। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য এই খেলায় তাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য স্কুজম রক্ষণভাগে গুরুত্বপূর্ণ এবং আক্রমণভাগের মধ্যমাণি ইনামদুর রহমানের সাহায্য লাভে বাণ্ডিত হয়।

অপরাজিত আখ্যা বজায় রাখলেও ইস্টবেঙ্গল ইতিমধ্যে চারটি ম্যাচব্যান পয়েন্ট অপচয় করার ফলে লীগের সম্মানের দৌড়ের বেশ তফাতে চলে গিয়েছে। লীগের চতুর্দশ খেলায় ইস্টবেঙ্গল ফান্টমসের সঙ্গে গোলান্দ্যু ফলাফলে খেলা ছুঁ করার ফলে একটি পয়েন্ট অপচয় করে। মানের দিক থেকে এই খেলা মোটেই আশানুরূপ পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। ফান্টমসদল রক্ষণাত্মক পন্থাটিতে খেলার ফলে, তাদের রক্ষণভাগের ওপর বেশি চাপ পড়ে, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দলের পুরোভাগের গোল করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

হকি লীগের শীর্ষ অবস্থান করছে বর্তমানে বি, এন, রেলদল। লীগ জয়ের সম্ভাবনা তাদেরই প্রায় পুরোপুরি, কারণ চোন্দটি খেলায় অংশগ্রহণ করে



শক প্রণালী সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিজয়ী বৈদ্যনাথ নাথ বাবা-মা এবং ছোট বোনের সঙ্গে রোগ্য কপ ফা।

তারা একটি পয়েন্টও নষ্ট করে নি। বি, এন, রেলদলের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের খেলার ফলাফলের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের ভাগ্য।

বি, এন, রেলদলের প্রয়োদশ এবং চতুর্দশ খেলার অনায়াস সাফল্য দেখে মনে হচ্ছে বাকি পাঁচটি খেলাতেও অনুপ্রাণিত রেলদল সাফল্য লাভ করে লীগ ঘরে তুলতে পারবে। বি, এন, রেলদল

পড়েই মোহনবাগানের ফারোয়াহ রেশী বড়ল-এর নাম বড়লে খালে লেখা হত; কিন্তু বড়ল জানান যে তাঁর নামের উচ্চারণ বড়ল নয় এবং নাম সম্মোহন করার অনুরোধ তিনি জানান। রক্ষণাত্মক মোহনবাগান ৩-০ গোলে পরাজিত করে এবং ফারোয়াহকে ১-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান লীগে একটি কঠিন বাধা অতিক্রম করে।

বাইটন হকি

ভারতীয় হকি রু রিবন্ড হিসাবে খ্যাত বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা সতেরেই এপ্রিল শুরু হচ্ছে। এবারের প্রতিযোগিতার আসরে মোট চোন্দটি দল অংশগ্রহণ করবে। বহিরাগত দল হিসাবে মোট চোন্দটি দল আমন্ত্রিত হয়েছে। গভ-বারের বিজয়ী পাকিস্তান পুর্নেশ এবং ম্যানাসদল কেন্দ্র অক সিলম্যানস এবারেও অংশগ্রহণ করছে। এই দুটি দল চতুর্থ রাউন্ডে খেলা শুরু করবে। এবারের বহিরাগত দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাগপুরে ইউনাইটেড, উত্তর প্রদেশ যি. ই. জি. বুদ্ধকী, ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল, নর্থ-ইস্টার্ন রেজিমেন্ট, হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট, এ, এস, সি, সেন্টার, সাদান রেল এবং ভূপাল একাদশ।

গ্রীষ্মকাল

এরিয়ান্সকে অনায়াসে ৩-০ গোলে এবং গ্রীয়ার স্পোর্টিংকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে।

মোহনবাগান দুটি খেলা ছুঁ করে ২ পয়েন্ট অপচয় করে চোন্দটি খেলায় সংগ্রহ করেছে ছাব্বিশ পয়েন্ট; মোহনবাগান এবং রিভারসাইডার্স দলের খেলাটিতে, শেষাঙ্গ দল মাঠে অনুপ্রাণিত হওয়ায় খেলাটি অনুকীর্ণ হয় নি। লীগ কমিটি এই খেলাটি সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নি। এই সম্বন্ধে আমাদের একটি অনিশ্চিত প্রমসংশোধন করে নিচ্ছি, শব্দ আমাদের খেলাধুলার পাতাতেই নয় সব সম্বাদ-

সেন উদ্যত কমিশন

ইডেন উদ্যানে পরলা জান্দুয়ারী ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট খেলার গণ্ড-গোল সম্পর্কে সেন তদন্ত কমিশনের বৈঠকে প্রথম সাক্ষী হিসাবে পদলিখের হাতে - নৃশংসভাবে নিগূহীত দর্শক শ্রীসীতেশ রায়ের দুর্দিনব্যাপী সাক্ষা-দানের পর আরও কয়েকজন কমিশনের সম্মুখে সাক্ষাদান করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউ-নিয়নের তরফ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সাহায্যার্থে গত টেস্ট ম্যাচের সময় ইডেন উদ্যানে একটি স্টল ভাড়া নেওয়া হয়, এবং শ্রীঅমলেন্দু গাঙ্গুলী স্টলের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি স্টলের ভাড়া বাবদ সি এ বি কর্তৃপক্ষকে পাঁচশ' টাকা দেবার পর, তাদের কাছ থেকে একটি রসিদ পান এবং তাতে লেখা ছিল দান হিসাবে সি এ বি পাঁচশত টাকা গ্রহণ করল এবং রসিদে কোন স্ট্যাম্প ছিল না। কৌসলী শ্রীঅমিয় বসুর জেরার উত্তরে শ্রীগাঙ্গুলী বলেন যে কমপক্ষে একলক্ষ লোক যে মাঠে ছিল এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ; কারণ তাঁর মতে যেখানে পাঁচজনের বসবার জায়গা ছিল সেখানে এক বৌদ্ধিতে আট থেকে ন'জন বসেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে শ্রীসীতেশ রায়ের ওপর পদলিখের অমানুষিক অত্যাচারই দর্শক-দের রোষের মূল এবং প্রধান কারণ। অকারণে পদলিখের সীমাহীন ঔষধত্যাগ অমানুষিক অত্যাচারে মাঠে উপস্থিত হািমলাদর্শকরাও উত্তেজিত হয়ে পদলিখের

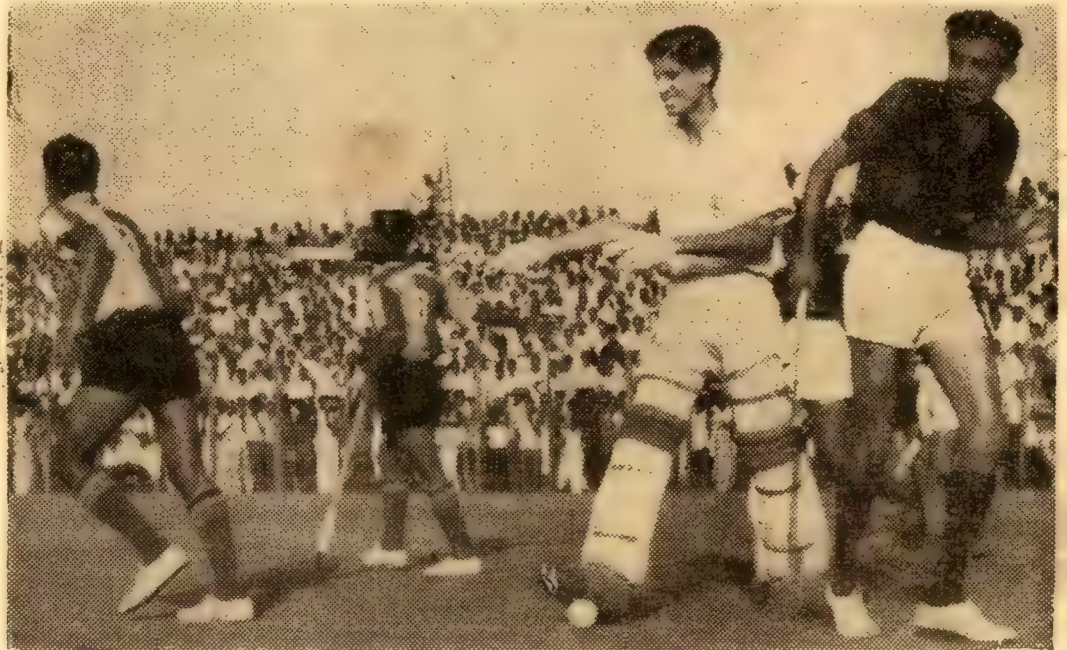
বিরুদ্ধে কট্টাতি করেন। জেরার উত্তরে শ্রীগাঙ্গুলী বলেন যে উত্তেজনার মধ্যে দর্শকরা যুদ্ধে দাঁড়ালে প্রায় দু'হাজার পদলিখ ইডেন উদ্যান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। তিনি লক্ষ্য করেন যে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন এবং কয়েকজন ছাত্র পিচ পাহারা দেন।

সেন কমিশনের সম্মুখে পরলা জান্দুয়ারী ইডেন উদ্যানে ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক একজন প্রেস ফটোগ্রাফার শ্রীঅলক মিত্র সাক্ষা দেন। তিনি বলেন সিরিজ দর্শক শ্রীসীতেশ রায়ের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ১লা জান্দুয়ারী টেস্ট খেলা পরিত্যক্ত হবার মূল কারণ। সি এ বি-র কৌসলী শ্রীঅমিয় বসুর জেরার উত্তরে শ্রীঅলক মিত্র বলেন যে শ্রীসীতেশ রায়ের পক্ষ থেকে কোন উস্কানীমূলক আচরণ হয় নি। শ্রীসীতেশ রায়ের কৌসলী শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্যের জেরার উত্তরে শ্রীঅলক মিত্র বলেন যে, পদলিখদের শ্রীসীতেশ রায়কে প্রহার না করার অনুরোধ করলে তিনি নিজেই পদলিখদের হাতে প্রহৃত হন এবং হট্টুতে আঘাত পান। জেরার উত্তরে শ্রীমিত্র আরও বলেন যে তিনি পদলিখদের গণ্ডগোলের সময় ই'ট-পাটকেল ছুঁড়তে দেখেছেন, এমন কি যে সব দর্শক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পলায়ন করছিলেন, সেই সব নিরীহ দর্শক-দের ওপরও পদলিখ আক্রমণ চালায়। শৃঙ্খমাত্র শ্রীসীতেশ রায়ের ওপর অত্যা-চারের পর একদল ক্ষুব্ধ দর্শকের হাতে পদলিখ প্রহৃত হয়।



সি. এ. বি. ব. ড. ড.

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এস কে গুহ কমিশনের সম্মুখে সাক্ষাদান প্রসঙ্গে জানান যে কলকাতা পদলিখের একজন ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে তিনি দু'টি প'য়তাল্লিশ টাকার টিকিট সংগ্রহ করেন। মাঠে প্রবেশ করে তিনি দেখেন তাঁর একটি টিকিটের নম্বরের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া জায়গা মাঠে নেই। জেরার উত্তরে তিনি আরও জানান যে দর্শকদের বসার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল অপরিসর এবং খুবই অসুবিধাজনক। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, তিনি এবং বহু দর্শক শ্রীসীতেশ রায়কে টানতে টানতে মাঠের মধ্যে নিয়ে যেতে দেখেন, এবং এর



মোহনবাগান এবং ইন্সটিটিউটের প্রথম ডিভিশন হকি লীগের প্রদর্শনী খেলার দৃশ্য

কারণ তিনি জন্মভেন না তখন। কিন্তু দশকদের অন্তিমের ফেটে পড়ে যখন প্রীতীতেশ রায়ের ওপর অমানবিক অত্যাচার পুলিশ চালাতে থাকে এবং সকলেই ছিলেন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ।

স্কুল ক্রিকেটার নির্বাচনে গলাধ

বাংলা দেশের চারজন স্কুল ক্রিকেটার বোম্বাইয়ের ট্রান্সালের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এই চারজনের মধ্যে একজন খেলোয়াড়ের নির্বাচন নিয়ে খেলোয়াড় মহলে যথেষ্ট আলোচনার গুরুত্ব উঠেছে। সকলেরই প্রশ্ন উদ্ভূত উদীয়মান স্কুল ক্রিকেটার পলাশ নন্দী কেন নির্বাচিত হলেন না এবং হিন্দী হাই স্কুলের দত্তকেই বা কেন বাদ দেওয়া হল। বিশেষত পলাশ নন্দী এবার বাংলা স্কুলের পক্ষে যে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়, কলকাতা ক্রিকেট লীগের খেলাভেদে পলাশ নন্দী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন এবং ক্রীড়ামোদীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন।

রাজা মুখার্জী এক দীপঙ্কর সরকার স্কুল ক্রিকেটারদের মধ্যে বর্তমানে অন্যতম শ্রেষ্ঠের দাবি রাখেন; অলক মজুমদার একজন চৌকশ ক্রিকেটার তিনি এবং দীপঙ্কর সরকার রঞ্জী ট্রফিতে বাংলার পক্ষে খেলেছেন। এ চাকলাদারের নির্বাচন বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট বিতর্কের সঞ্চার করেছে।

খুব বিস্ময়কর পাওয়া গেল



নিমাই রায়



রাষ্ট্রপতি প্রীতীতেশ রায়ের কাছ থেকে পদ্মভূষণ সম্মান গ্রহণ করছেন সত্যি, মিথি

প্রকাশ উঠিত ক্রীড়াপরিচালক হিসাবে খ্যাত কোন এক ঘোষ মহাশয়ের অদৃশ্য হাতের খেলায় এবং আপ্রাণ চেষ্টায় একজন খেলোয়াড় আশ্চর্যভাবে বোম্বাইয়ের ট্রান্সালে চলেছেন। আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে যে একজন খেলোয়াড় নাকি খিদিরপুরের কোন এক স্কুলে ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁকে আর স্কুলের ছাত্র হিসাবে গণ্য করা চলে না। আমরা জানি না এ বিষয়ে বাংলার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ কোন খবর রাখেন কি না? তবে ওই খেলোয়াড় যদি সত্যিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তবে তাঁকে স্কুলের ছাত্র হিসাবে গণ্য করে অন্য একজন সত্যকার যোগ্য খেলোয়াড়কে তারি ন্যায় সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে আমাদের বলার কিছু নেই। খুঁটির জোরে যদি এসব হয়ে থাকে তবে কর্তৃপক্ষ কেন ভুলে না বান যে দিন এখন বদলাচ্ছে।

সম্রাটের দর্পণ

পক প্রমালী সন্তরণ প্রতিযোগিতা বিজয়ী বৈদ্যনাথ নাথ মাদ্রাজ মেলবোর্গে গত ১১ই এপ্রিল হাওড়া স্টেশনে উপনীত হলে বিশেষ জনতা এই তরুণ বীরকে অভিনন্দন জানাল। প্রথমেই বৈদ্যনাথ তারি মাতা এক সিঁড়িতে প্রণাম করেন। কল-

কাতার সমস্ত সন্তরণ সংস্থার প্রতিনিধিই বৈদ্যনাথকে অভিনন্দন জানাবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন; এই সমস্ত সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে মালাভূষিত করা হয়। অতি-উৎসাহী কয়েকজন আবার স্টেশনের মধ্যেই বাজী পোড়াতে সুরু করেন। বৈদ্যনাথ নাথকে দেখে বেশ ক্রান্ত মনে হচ্ছিল। তিনি জানান যে আগামী বছর আবার তিনি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন এবং আরও কম সময়ে বিজয়ী হবার চেষ্টা করবেন।

* * *

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ১৯৬ রানে সি এ বি-র নক আউট প্রতিযোগিতায় ফাইনালে কালীঘাটকে পরাজিত করে পঞ্চমবার বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে। গতবারও তারা বিজয়ী হয়। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে স্পোর্টিং দল ৪৩০ রান সংগ্রহ করে। সুন্দর খেলে সেন্দূরী করেন পঞ্চক্স রায় এবং নিমাই রায়। নিমাই রায় করেন ১৮৬ রান এবং পঞ্চক্স রায় ১৫১ রান। প্রত্যুত্তরে কালীঘাট ইনিংস শেষ করে মাত্র ২০৭ রানে। তরুণ খেলোয়াড় অলক মজুমদার ৭১ রান সংগ্রহ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ডাক্তার গুপ্তের ২৫ রান এবং টি জে বানার্জীর এই রান উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশে হকির জনপ্রিয়তার সুযোগ আছে

হকিতে ভারতের বিশ্বজোড়া সম্মান; কিন্তু এই হকি ভারতে কতটা জনপ্রিয় এই প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বোধহয় খুব আশাপ্রদ উত্তর পাওয়া যাবে না। বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানের অধিকারী হকি ভারতের ক্রীড়ামোদীদের কাছে জনপ্রিয়তার ফুটবলের কাছে পরাজিত। আমাদের কলকাতার ময়দানে ফুটবল আর হকির বর্তমান চিত্র তুলে ধরলে এই জনপ্রিয়তার সত্যতা প্রমাণিত হবে। অবশ্য একথা সত্য যে ভারতের পূর্বাঞ্চলের দেশ-গুলিতে হকি ক্রীড়ামোদীদের হৃদয় জরে সক্ষম হয় নি। বোধহয় ভারতের উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেই হকি একমাত্র উল্লেখযোগ্যভাবে সমাদৃত।

ক্রিকেটের মত অতটা না হলেও কয়েকটি কারণ হকির জনপ্রিয়তার পথে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে। বিশেষত যে সব রাজ্যে বর্ষার প্রকোপ বেশি সে সমস্ত রাজ্যে হকি চলতে পারে একমাত্র শীতপ্রধান রাজ্যেই হকির আয়ুষ্কাল কিছুটা বেশি। গ্রীষ্মকালেও হকি খেলার যথেষ্ট অসুবিধা আছে। আবার যে কোন মাঠেই হকি খেলার অনেক অসুবিধা আছে।

হকি খেলার মধ্যে গতি আছে এবং তীব্র উত্তেজনাও আছে; কিন্তু খুব বেশি আশ্রয়ার্থের বাঁশি হকি খেলার আকর্ষণকে অনেকটা ক্ষয় করে। আর হকির মধ্যে আছে অনেক নিয়মকানুনের কচকাঁচ। কয়েক বছর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ধীরে ধীরে হকি সাধারণ মাঠে-ঘাটেও প্রবেশ করছে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে হকির এক ম্লান রূপ। একমাত্র ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গণেব পীঠস্থান বলেই কলকাতা ময়দানে তবুও হকি কিংগ্জ সম্মানলাভ করেছে। বাংলা দেশে বিভিন্ন জেলার হকির উল্লেখযোগ্য প্রচলন নেই। সত্যি কথা এই যে, বাংলা দেশে হকি উপেক্ষিত। বাংলা দেশের মাঠে-ময়দানে হকির প্রসার এবং জনপ্রিয় হবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এখন শুধু প্রয়োজন বাংলা হকি পরিচালকদের এবং জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সশীলিত এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা। অবশ্য বেঙ্গল হকি এ্যাসো-

সিয়েশনের ওপর কোন দোষ আমি দিচ্ছি না। কারণ তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, এবং তাদের অসুবিধার কথাও পরে আলোচনা করছি।

বাংলা দেশের একমাত্র জনপ্রিয় খেলা হল ফুটবল এবং বাংলার গ্রাম, নগর এবং প্রতিটি জনপদের মাঠে-ময়দানের ফুটবল খেলা যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চে হয়। বাংলা দেশের লোকেরা যথেষ্ট ক্রীড়ানুরাগী। ফুটবলের আয়ুষ্কাল বাংলা দেশে বড়জোর মার্চ বা এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। মাঝখানের এই পাঁচ-ছ মাস সময় বাংলা দেশের বিভিন্ন মাঠে-ময়দানের মন্দা মরশুম। এই শীতকালীন মরশুমের খেলা সাধারণত ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি। কিন্তু একমাত্র কলকাতা ছাড়া বাংলা দেশের অন্যান্য স্থানে ক্রিকেট একেবারে সামান্য ভাবে খেলা হয়; ভলিবলের প্রচলন তবুও কিছুটা লক্ষণীয়। কিন্তু এই সময়ে হকি খেলার প্রচলন অনায়াসে করা চলে এবং একটু চেষ্টা করলে ফুটবলের মত জনপ্রিয়তাও অনায়াসে হকি অর্জন করতে পারে বাংলা দেশে। কারণ একথা সত্য যে শীতকালের এই চার-পাঁচ মাস বাংলা দেশের বিভিন্ন মাঠে-ময়দানে হকি অনায়াসে প্রচলন করা চলে। ক্রিকেটের মত হকি প্রচুর ব্যয়সাধ্যও নয়। ক্রিকেটের জন্য আবার প্রচুর সময় ব্যয় ছাড়াও আছে বিরাট প্রস্তুতিপর্ব। বাংলার কয়েকটি জেলার বড় শহর ছাড়া ক্রিকেটকে এইভাবে গ্রহণ করার মত পর্যায়ের এখনও উন্নত হয় নি অন্যান্য স্থান। শীতকালে বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধুলার স্কারাই তৃপ্ত থাকতে হয় গ্রাম বাংলার ক্রীড়ানুরাগীদের।

এখন এই গ্রামের বা শহরের বিভিন্ন মাঠে হকির প্রচলন করার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে? তাছাড়া শুধু হকি স্টিক হাতে দিয়েই খেলোয়াড়দের মাঠে নামিয়ে দিলেই চলবে না, তাদের যথার্থ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করতে হবে। এই বিষয়ে আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। উত্তরবঙ্গের কোন একটি চা-বাগানে একবার কোন কাজের উপলক্ষে শাবার সুযোগ হয়েছিল। বিকালবেলায় দেখলাম চা-বাগানের মাঠে প্রায়কোটা যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চে হকি খেলছে, একটু অবাধ হয়েছিলাম ওই প্রায় পাণ্ডববর্জিত স্থানে

হকি খেলা দেখে। উৎসাহী লোক হিসাবে খেলা দেখলাম, বুকলাম এদের ঠিকমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল খেলোয়াড় এদের মধ্যে থেকে পাওয়া যেতে পারে। এমন কি ঠিকমত খেলার কলা-কৌশল শেখাতে পারলে ওই সব দল কলকাতার মাঠের অনেক প্রথম বিভাগের সঞ্চে পান্না দিতে পারে।

বাংলার বিভিন্ন জেলার ক্রীড়াঙ্গণ-গুলির দায়িত্ব বিরাট, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাদের পক্ষে কোন কিছু করে ওঠা খুবই কঠিন। আর্থিক অবস্থা আমাদের বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশনেরও এমন নয় যে, তাদের কাছ থেকে জেলা সংস্থাগুলি কোন সাহায্য আশা করতে পারে। আর শুধু হকি খেলা ছাড়া, বেশি সংখ্যায় হকি প্রতিযোগিতার আয়োজন যদি না করা হয়, তবে বিভিন্ন জেলার উৎসাহী হকি খেলোয়াড়দের মধ্যে উদ্দীপনার সম্ভার হবে না প্রয়োজনমত।

বাংলার অন্যান্য স্থানের এই হল পূর্ণ বিশ্লেষণ করা একটি ছবি; কিন্তু ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গণের পীঠস্থান কলকাতা ময়দানের হকির চিত্রও কিন্তু খুব রঙীন নয়। ময়দানের কয়েকটি প্রধান দলের উৎসাহী সমর্থকদের জন্য হকি মাঠের ভিড় ধীরে ধীরে বাড়ছে। হকি মাঠে ভিড় বাড়লেই একথা মনে করলে ভুল হবে যে হকির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ তৈরি হচ্ছে।

নানা সমস্যা আর রাজনীতির ঝোঁরপ্যাঁচে পড়ে ময়দান হকির অবস্থা সঙ্গীন। হকির উন্নতির জন্য আমাদের পরিচালকদের যে আদৌ মাথাব্যথা নেই এর যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অল্প কিছুদিন মাত্র পূর্বে, মানে এ বছর হকি মরশুমের সূর্যোদয়ে বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশনের ক্ষমতা দখলের জন্য দুটি দলের মধ্যে কি নোংরামিই না হল। ফলে এবার হকি লীগ সূর্য হরছে প্রায় একমাস ধরিতে।

বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশনের এখন দরকার উপযুক্ত অর্থ সাহায্য। কারণ অর্থের জন্য বাইটন কাপে বি, এইচ, এর পক্ষে বাংলার বাইরের অনেক যোগদানেছ, দলকে আমন্ত্রণ জানান সম্ভব হয়ে উঠছে না। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল বি, এইচ এ-কে মফস্বলে হকির প্রসারের জন্য উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করলে বোধহয় বাংলা হকি বিরাটভাবে উপকৃত হবে।

—সদ্যাজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সংবাদিকা—কলকাতা সেন

কলকাতা (প্রাঃ) লি-এর পক্ষে ১৯৬৬, বিশিষ্টবিহারী গান্ধী স্ট্রীট কলকাতা-১২

—এই প্রবন্ধে প্রিন্টকর্মের গুরুত্ববোধের কৃতিত্ব হৃদিত ও প্রকাশিত।

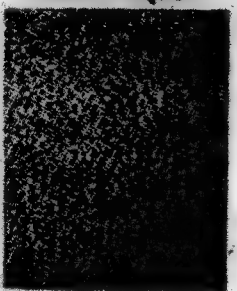
26 APR 1967



মরোব



ডায়ে
সিমেট



মরকো পিন্বেড



মাককাট



মাককাট

আজকালকার ছপতিরা গৃহবিম্বাণে এইচ পিজি শ্লাস ব্যবহার করেন

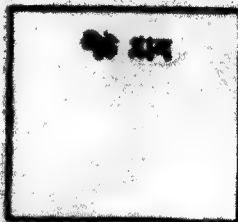
আজকালকার দিনের বাড়ীতে ও অফিস-
কম্পাউন্ড, কলকারখানা, ইত্যাদি ও
জানপাড়াতে ছপতী ইলিনিয়ার্স
বর্তমানে এই পি জি শ্লাস ব্যবহার
কেননা উহা আমাদের যে এইচ পি জি
শ্লাস উৎকর্ষের সর্বোত্তম মান পদার্থ
যেমন তৈরী হয়। কিন্তনের পাতালিক
কম্পোজ ষ্ট্রাকচারালকারী এজেন্টস
পিমেন্টের প্রকার-এক কারখানা
কম্পোজের সাহায্য দিয়ে বিদ্যমান
পিমেন্টের শ্লাস উৎকর্ষ এই এই
পি জি শ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেননা নামেই নির্ভর-
যোগ্য ভাবে বিক্রি করেন।

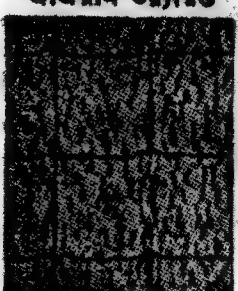
হিন্দুস্থান
সিমেন্ট কোম্পানী
লিমিটেড
কলিকাতা-১০



হেম্যাগোনাল
ওয়ার্ড



পেট শ্লাস

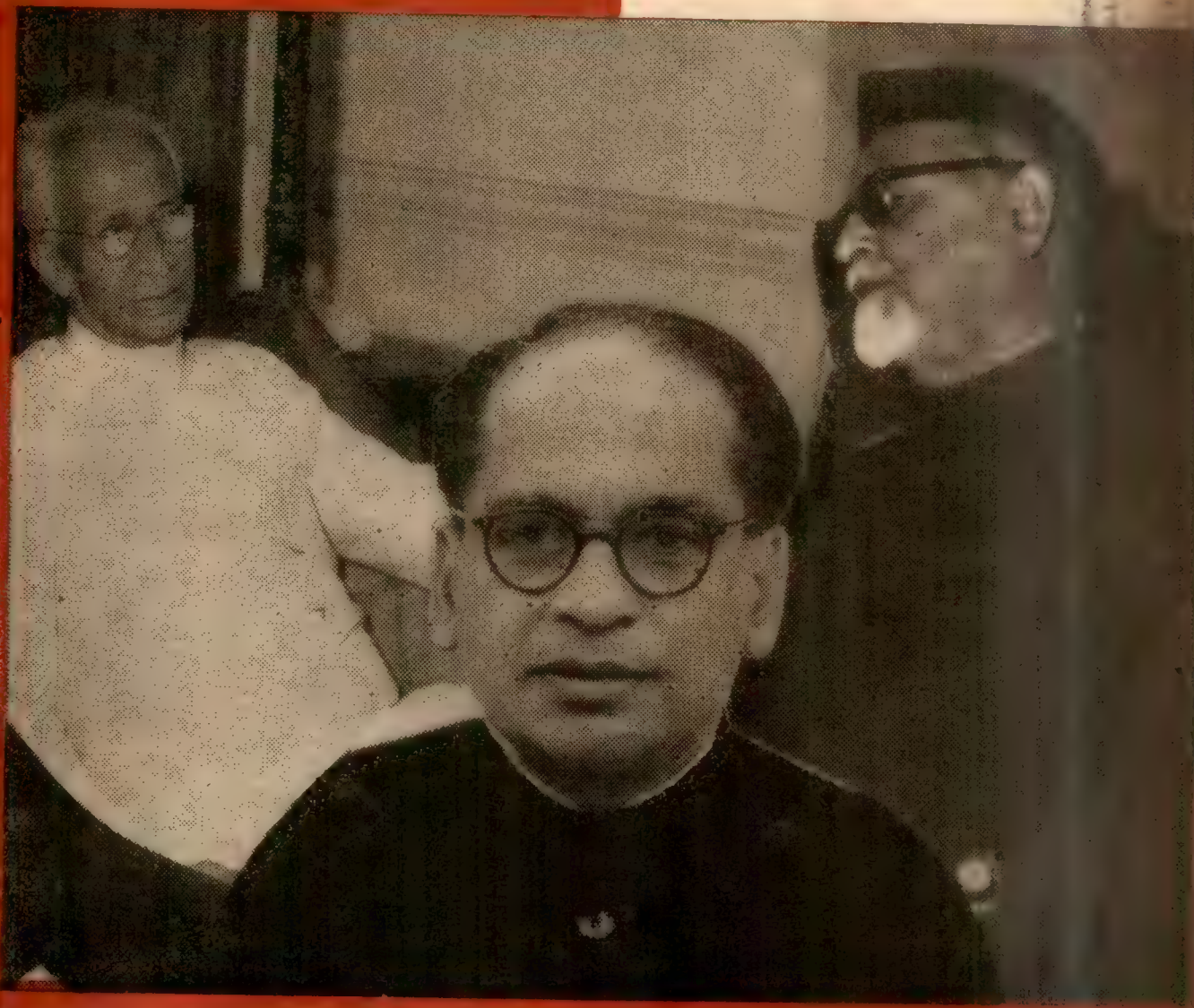


মজিয়ারান ওয়ার্ড

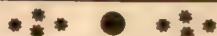
আমেরিকা কোম্পানী
ডায়ালক্স ল
ক্যান্ড কোম্পানী
এইচডেইট লিমিটেড
হিন্দুস্থান লিমিটেড
১, চিত্তরাম স্ট্রায়েট,
কলিকাতা-১০

সাপ্তাহিক বসুমতী

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা



কর্ম : ৪৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ



27th April, 1967 * Vol. 71, No



ছবির মত মুখ যার তাকেই বলি চিত্রময়ী।

ফেমিনা প্রাণ

ছোঁয়া পেয়ে সবাই হয়ে উঠল তা-ই।



বিষয়	লেখক	তুচ্ছ
সম্পাদকীয়		২৮৮৩
আজকের মানুষ		২৮৮৪
ভারতদর্শন		২৮৮৫
আন্তর্জাতিক		২৮৯১
যা দেখেছি, যা শেয়েছি (স্মৃতিচরন)	— প্রীত্বীরঙ্গম দাস	২৮৯৩
অবত্যা	— চন্দ্রশেখর	২৮৯৮
নব মন্বিসভা সমীপে		২৯০০
বঙ্গদর্শন		২৯০২
অগ্নিবর্গের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৯০৭

লাহিত্য-সম্রাট-বঙ্গোদ্যতরূপে মন্দের কবি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরী, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—অনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অমূল্যলম), মৃচিরাম গড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

সদৃশ্য কাণ্ড ও বোর্ডে বাঁধা (রাজ সংস্করণ) মূল্য প্রতিখণ্ড ৪.৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুদ্ধো শালিকের ঘাড়ের রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ডে বাঁধা)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিস্তা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, রাজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়ার কানন, হেকটর বধ। (বোর্ডে বাঁধা)—সাড়ে তিন টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রাণসঞ্চিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুদের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাংগালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু কবি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, স্মৃতিস্মৃত সমালোচনা সহ সর্বস্বত্ব গ্রন্থ মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিদ্যাবাউলীর বৃত্তান্ত (ছোট উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১১৭
একটি দল্লভের প্রভাত (কবিতা)	— রাধামোহন মহান্ত	২১১৪
বিশ্ব প্রচেষ্টার একটি বিশ্লত অধ্যায়	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২১১৭
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২১২৪
জন্মদার সুরেন মিস্ত্রি (গল্প)	— আশুতোষ সরকার	২১২৭
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	— বৃন্দদেব ভট্টাচার্য	২১৩০
হৃৎসঙ্গ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	২১৩৫
হৃৎসঙ্গ	—	২১৩৫
পাঠকমন	—	২১৪০
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	২১৪১



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাসবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরাচিত

ভক্তির মন্বাকিনী
প্রেমের অলকানন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিরসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন—সংস্করণ
মূল্য পনের টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীশিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মাণলাল গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বঙ্গমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্য-
কারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ভূতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরুগণ—ইংরেজ ? একবার পেলে হয়—

মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে
বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য
ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে
তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা



৭১ বর্ষ : ৪৬শ সংখ্যা—মূল্য—২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISA
Thursday, 27th April, 1967

অফিসারদের রদবদল

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর এই সরকারের মন্ত্রিসভা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বালিস্ত নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী বলেই কিছু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অফিসারদের স্থান বদলের ব্যবস্থা করেছেন। মন্ত্র্যামন্ত্রী এগারো জন 'ওপরঅলা' অফিসারের অদল-বদলের নির্দেশও পাঠিয়েছেন।

এই সংবাদ প্রকাশ হবার পর অনেকেই খুশি। খুশি হবার কারণ এই যে, বিগত সরকারের হুকুম পালনের জন্যেই অনেক ওপরঅলা অফিসার এক ধাপ থেকে আর এক ধাপ উঁচুতে উঠেছে, কারো বা কার্ণ-কালের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে। পূর্বতন সরকারের দলীয় স্বার্থরক্ষার মতোই এদের কার্ণকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। মন্ত্রীর অন্যান্য আদেশের বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো প্রতিবাদ তারা করে নি। ফলে দুর্নীতির পর দুর্নীতি সৃষ্টি হয়েছে। অফিসাররা যেখানে নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি এবং মন্ত্রীর শব্দ দল-পোষণ দল-তোষণ করেছেন সেখানে সাধারণ মানুষ শব্দ হস্তরানি ভোগ করেছে এবং হস্তরানিতেই শব্দ শেষ নয়, বিলম্ব থেকে রেহাই পাবার জন্যে বেআইনী অর্থ খরচ করতেও তাদের বাধ্য করেছে। পারিমাণ লাইসেন্স স্বাগদান প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাই ছিল দুর্নীতির বাসা। আর বাসা বেঁধেছিল বিগত সরকারের প্রিয় অফিসারবন্দ। তাদের দক্ষত কর্মের জন্যেই তদারিক কমিশন জনসাধারণের কাছ থেকে ১৯৬৬ সালে যোল শত অভিযোগ পেয়েছিলেন। চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ মোট তিন মাসের মধ্যে সেই ধরনের অভিযোগের সংখ্যা ৪৫০। কল্পনা করুন, যারা নানা কারণে অভিযোগ করে নি তাদের সংখ্যাই বা কতো! বিগত সরকারের আমলে অভিযোগ ছিল বহু

সুদূরবিস্তারী কিন্তু কখনই বা সে অভিযোগ পেশ করেছে? ভয় ছিল এই যে, অভিযোগ করলে উল্টো অভিযুক্ত হতে হবে। তবু নাছোড়বান্দা বা সংসাহসীরা এগিয়ে এসে অভিযোগ করেছে। আর অভিযোগ যারা হাতে কলমে করে নি তারা ব্যালট পেপারে তাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে এবং কংগ্রেস সরকারকে সরিয়ে করেছে নতুন সরকারকে প্রতিষ্ঠিত। তাদের এই পরিবর্তন নিয়ে আসার মধ্যে এটাও তারা বাস্তবভাবে চায় যে, প্রাক্তন পৌঁধরা আমলারাও সরে যাবে। আর যে সমস্ত সংন্যারনিস্ত অফিসাররা বিগত সরকারের শৈন্যদলিতে পড়েছিলেন তারা বর্তমান সরকারের শাসনযন্ত্রটিকে সুদৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাবেন। তবে এটাও ঠিক যে, মন্ত্রীর এবং বড় বড় অফিসাররা চোখ খোলা রাখবেন, তথাকথিত নিন্দাস্তরের কেরানীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সামগ্রিক বিষয়টিকে বিচার করবেন। মোটকথা জনগণের শাসনে এক চক্ৰ হরিণের মতো মন্ত্রীর কিংবা ওপরঅলারা শাসন অক্ষপন্নীয়। অবশ্য বিগত সরকার রুট মেক্সরিটির জোরে এই অক্ষপন্নীয় ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম। সে চরম শিক্ষা দিয়েছে।

সুতরাং এতসব চোখে দেখে যুক্তফ্রন্ট সরকারের যেন যথার্থ শিক্ষা হয়। তারা এগারো জনকে বদলীর আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা গেছে যে, কেউ কেউ বদলীর আদেশ মেনে নিতে গররাজি, কেউ বা অসুস্থ বলে জানিয়েছে—(বদলীর আদেশ শব্দেই এক শ্রেণীর অফিসার যা প্রায়ই করে থাকে)। আদার ব্যাপারী যারা, তাদের অবশ্য জাহাজের খবরে কাজ নেই। সাধারণ মানুষ এখন চায় যে, সর্বাপেক্ষা

নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল ব্যক্তিকে উচ্চপদে বহাল রাখা হোক, অন্যায়ের প্রাধান্য করতে গিয়ে পূর্বতন সরকার যাদের রাজ্যের চাকরি থেকে কৌশলে বিতাড়িত করেছে তাদের পূর্ব পদে ফিরিয়ে আনা হোক। এতে সরকারের কাজ গতিশীল হবে। কুচক্রীরা চক্রান্ত জাল রচনা করতে সাহসী হবে না। এমন কতকগুলি বিভাগ আছে—যে সব জায়গায় যোগ্য অফিসারের অভাব। শব্দ তাই নয়, এতোদিন সেই সব অফিসার মন্ত্রীদের মন জুগিয়ে এসে উচ্চ ধাপে উন্নীত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, খাদ্য ও কৃষি দপ্তর একালে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এখানে যারা উচ্চপদে বহাল তব্বতে এতোকাল ছিল তারা সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে নতুন সমস্যা সৃষ্টি কবেছে। স্বভাবতই বর্তমান বাদ্যমন্ত্রীর উত্তর প্রফর বোবের বিদ্যা, বুদ্ধি, সত্যতা ও প্রখর কর্মশীলতার ধারে কাছে এরা যেঁবতে পারে নি, তাই তিনি নতুন লোক পছন্দ করেছেন। আমরাও তা সমর্থন করি। কারণ, অনেক সময় পরিবর্তন কার্যক্ষেত্রে গতিশীলতা দান করে এবং পুরাতন স্ববির নীতির অবসান সম্ভব হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার জনস্বার্থে নতুন নীতি গ্রহণ করেছেন। এই নীতিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে এমন সব সংবুদ্ধিসম্পন্ন অফিসারই একালে প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্র্যামন্ত্রী উচ্চপদের অফিসারদের প্রয়োজন বোঝে অপসারিত কিংবা গ্রহণ করুন। এ পক্ষে কোনোক্রম স্বীকৃতি, সংকোচ, দূর্বলতা ও বিলম্ব শব্দ জনতাব অসন্তোষ সৃষ্টি করতেই সহায়তা করবে।

সিদ্ধান্তকীর্ণ

ঐতিহ্যের হাবিব

ঐতিহ্যের দৃষ্টিভঙ্গী হবে নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানভিত্তিক। ঐতিহাসিক ঘটনার ম্যাক্সা করতে গিয়ে তাঁর কোন পক্ষ অবলম্বন করা চলবে না, নিছক ঘটনাকে চিত্তাকর্ষক করার জন্যে কোন কাম্পনিক মনগড়া কাহিনী জুড়ে দেওয়াও অপরাধ। কারণ তা ঐতিহাসিক, অসত্য এবং বিপজ্জনক। ভাবাবেগের দ্বারা যেমন তিনি পরিচালিত হবেন না, তেমন কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষকে খুঁশি করার উদ্দেশ্যে ফরমাইসমারফিক ইতিহাসও তিনি রচনা করতে পারেন না। দায়িত্ব কঠিন সন্দেহ নেই, সেজন্যেই সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, বাস্তববাদী ঐতিহাসিক বা ইতিহাসবেত্তার সংখ্যা এদেশে খুবই কম। অর্থাৎ মহম্মদ হাবিব এখানে বেশি নেই।

সুদী ও পশ্চিম সমাজের বাইরে অধ্যাপক হাবিবের এমন কি পরিচিতি আছে? থাকবার অবকাশই বা তিনি দিলেন কখন? একে বরাবরই লাজুক প্রকৃতির, তার ওপর প্রচাব-প্রকাশ থেকে দূরে থেকেছেন। পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত, নয়তো কোন ছটিস বিয়য় নিয়ে তর্ক-বৃন্দ। তাঁর যেটুকু খ্যাতি সীমাবদ্ধ গন্ডীর মধ্যে, যদিও সে গন্ডীর সীমা নিত্যন্ত ক্ষুদ্র নয়। কিন্তু আজ হাবিব বুদ্ধিজীবী ক্ষুদ্র গন্ডী ভেঙে পৌঁছে গিয়েছেন দিকে দিকে, স্বেচ্ছাচারে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্যে হাবিব একজন প্রার্থী, বিবোধী দলগলি কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রী ভি, ভি, গিরিব বিরুদ্ধে হাবিবকেই তাঁদের প্রার্থী মনোনীত করেছেন।

হঠাৎ বামপন্থীদের নজর মহম্মদ হাবিবের ওপর পড়লো কেন? উনি কি বামপন্থী রাজনীতি কবেছেন? না, সক্রিয় রাজনীতি বলতে যা বুঝি, তাতে অধ্যাপক হাবিব আগ্রহ দেখান নি বিশেষ। তবে একথা সত্যি যে, তাঁর ধ্যান-ধারণা সাধারণ নিপীড়িত জনতাকে ঘিরেই, তাদেরই সংগে তিনি একাত্ম হয়ে আছেন দীর্ঘদিন ধরে। কারণ ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি

দেখেছেন যে ইতিহাসের নায়ক কোন রাজা-মহারাজা বা বাদশা আলমগীর নন, ইতিহাসের সত্যিকারের উপাদান জনতার মধ্যে, অত্যাচার, অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায়, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্যে।

ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক হাবিব, ভারতের মধ্যযুগ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জড়ি নেই, অর্থারিট তিনি। সংস্কারমুগ্ধ মন নিয়ে ইতিহাসের বিচার করেছেন, ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই বৈশিষ্ট্য



হাবিব

অর্জন কবেছেন চিন্তাধারা গতানুগতিকতা পরিহার করতে পেরেছেন বলে। এ-বাবদে তাঁকে কম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় নি, কিন্তু যাকে একবার হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেছেন তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন, শত হুমকী সত্ত্বেও বর্জন করতে পারেন নি। গজনবীর সুলতান মামুদ সম্পর্কে তাঁর বই বেরোয় ১৯২৪ সালে। কী ঝড় বয়ে গেল তাঁর ওপর দিয়ে। গোড়া মুসলমানরা প্রকাশ্যে তাঁকে

বিধর্মী বলে উপহাস করোঁছিল। অপরাধের মধ্যে অধ্যাপক হাবিব লিপে-ছিলেন যে, সুলতান মামুদ মুসলমান হলেও নিছক স্বর্ণের লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে নিয়েই ভারত অভিযান করেছিলেন। গোড়া মুসলমানেরা এতে চটেছিলেন এজন্যে যে অধ্যাপক হাবিব নিজেকে একজন মুসলমান হয়ে আরেকজন মুসলমানের “চরিত্রহীন” করেছেন বলে।

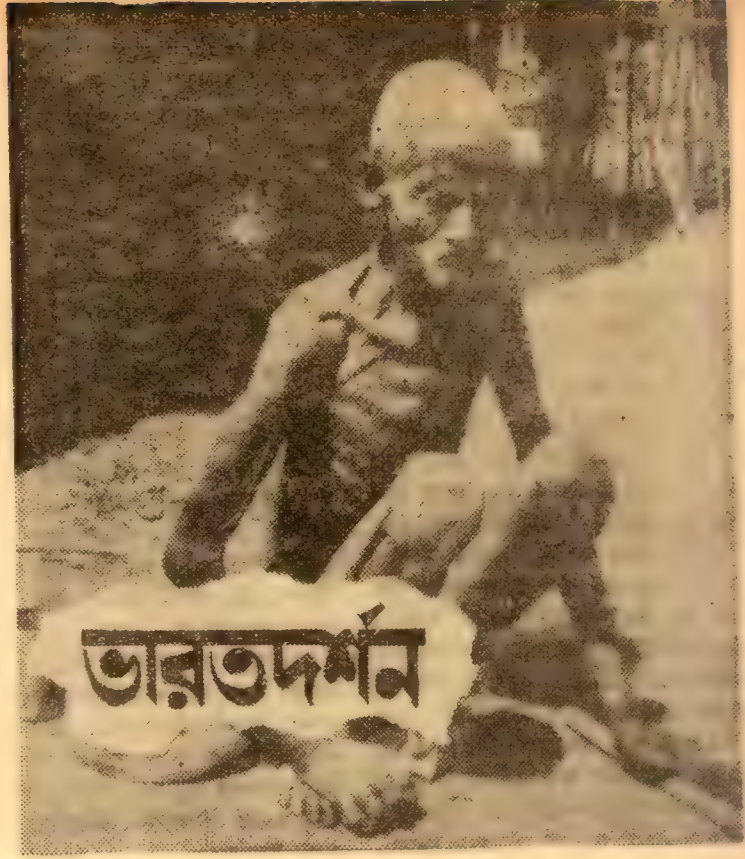
অধ্যাপক হাবিব মুসলমান ঠিকই, তবে ধর্মের গোড়ামি তাঁর কোনকালেই ছিল না, অবশ্য ধর্মবিশেষীও নন। তিনি একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান, তদুপরি বাস্তবনিষ্ঠ ঐতিহাসিক। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করতে পারে নি, উদার শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি পিতা ব্যারিস্টার মহম্মদ নাসিমের কাছে। উত্তরপ্রদেশে তাঁর জন্ম, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করে অক্সফোর্ড গিয়েছিলেন “অনাস” লাভ করার জন্যে। বিলেত থেকে ফিরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ যখন পান তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫। একটানা প্রায় ৫০ বছর অধ্যাপনা করেছেন এখানে। পড়েছেন, লিখেছেন মূল্যবান গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে কমিউনিস্ট চীন সহ বহু বিদেশে গিয়েছেন, প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু সমালোচনাও।

বুদ্ধির লড়াইয়ে তাঁকে নামতে হয়েছে স্বীয় পুত্র ডঃ ইরফান হাবিবের বিরুদ্ধেও। যিনি নিজেকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্যতম অধ্যাপক। সুলতান মামুদের ওপর তাঁর লেখা বইয়ের পরবর্তী সংস্করণটি যখন মাও সে-তুং-এর নামে উৎসর্গ করেন তখনও তাঁর বন্ধুরা বিরূপ হয়েছিলেন। কিন্তু কে না জানে যে, অধ্যাপক হাবিবের চিন্তাধারা বামপন্থী রাজনীতির সংগে সমান্তরাল?

রাষ্ট্রপতি বরণ

ভারতের রাষ্ট্রপতি ছরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত নন, একটি ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে তাঁকে নির্বাচিত করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ। সুতরাং প্রতিনিধগণের সমর্থন পূর্বাঙ্কে স্থির করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গোলমালে আব-হাওয়া এড়িয়ে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অধিকারী জনপ্রতিনিধিরা ইচ্ছে করলে রাষ্ট্রপতিকে বরণ করেও আনতে পারেন। ইতিপূর্বে ডঃ রাধাকৃষ্ণ বিনা প্রতি-দ্বন্দ্বিতায়ই রাষ্ট্রপতিপদে সম্মানীন হয়েছিলেন। এবারও তার সম্ভাবনা যে একেবারেই ছিল না এমন নয়। বিরোধীরা কেন্দ্রে কমতাসীন কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে আপোষে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি ঘরষে অনিচ্ছুক ছিলেন এমন কিছু জানা যায় নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কোন আপোষে আসতে রাজী হলেন না। কেবলমাত্র অকংগ্রেসীদের সঙ্গেই নয়, স্বয়ং কংগ্রেসপ্রধান কামরাজের মতেও শ্রীমতী গান্ধী স্বীকৃতি জানাতে পারেন নি। শ্রীকামরাজের সঙ্গে অনেক অকংগ্রেসীও ডঃ রাধাকৃষ্ণকেই পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণে রাজী করাতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যেখানে তেমন ইচ্ছুক নন, সেখানে রাষ্ট্রপতি পদে ডঃ রাধাকৃষ্ণের পুনরায় প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশিত নয়। ডঃ রাধাকৃষ্ণ অবশ্য স্বতন্ত্র যুক্তিতে (প্রায় দু'বল যুক্তি) পুনশ্চ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাজনীতির পক্ষবিন্দুতাকে ভালমনে গ্রহণ করতে অক্ষম বলে জানিয়েছেন। স্পষ্টতই এহেন যুক্তি খুব জোরালো বলে মনে করা যায় না। কারণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মর্যাদার পদটিকে নিয়ে রাজনীতি (বিশেষ ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে) হবে না এমন আশা করাই অনুচিত। ব্যাপারটা যেখানে পুরোপুরি রাজনৈতিক, রাজনীতি সেখানে দূরে বসে থাকবে এই বা কেমন কথা। আসলে ডঃ রাধাকৃষ্ণের অনিচ্ছার অন্যতর কারণ সন্দেহ করাও অযৌক্তিক নয়।

যাই হোক, আপোষে কার্যোপ্ধার যখন হল না তখন সম্ভাব্যতাই, অকংগ্রেসীরা নিজদের প্রার্থী দিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুন্দর রাওকে। প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী ডঃ জাকির হোসেন। ব্যাপারটা নিয়ে জল মোলা হল অনেক। শেষে প্রশ্নটার মধ্যে অনেকে সাম্প্র-দায়িকতার বিষ ছড়াতেও পিছপা হলেন না। দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পদটি নিয়ে শক্তির লড়াই অবশেষে যে সাম্প্র-দায়িক মনোভাবের গোড়ার ইশ্বন দিয়ে বিভিন্ন অকংগ্রেসী দলকে বিপাকে ফেলবে



বিহারের দৃষ্টিকর্ষীভূত বৈজনাথপুর গ্রামের অসহায় কৃষাকান্তর এক বৃদ্ধের ছবি। বৃদ্ধের পেটে গাভরিন কোন দানশানি পড়ে নি।

এতোটা নিন্মাগণীয় রাজনীতি সত্যিই অভিশপ্ত।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে রাষ্ট্রপতির পদেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা বহাল করতে হবে এ বৃদ্ধি অবশ্যই মুখের না হলে তাকে বলা যেতে পারে মুখ উস্কানী বৃদ্ধি। কিন্তু রাজনীতি সেই স্তরেই দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের বৃহৎ সাম্প্রদায়িকতা নামক চীজটি বেওয়ারিশ ছাগলের মত সর্বদাই রাজনীতির বজ্রভূমিতে গলার দড়ি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এবং যখন যার সুবিধে সেই এক একটি কোপ বসিয়ে আপন স্বার্থে বলিদানের ব্যবস্থা করছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও সেই অনন্ত ওসারের সাম্প্রদায়িক ছাগটিকে ব্যবহার করার নোংরামি প্রবেশ করেছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আসল প্রশ্নটি কিন্তু সাম্প্রদায়িক নয়। আসল প্রশ্ন কংগ্রেসী কিম্বা অকংগ্রেসী। অবশ্য ডঃ রাধাকৃষ্ণকে থেকে যেতে রাজী করানো হলে হয়ত এ প্রশ্ন মাথা চাড়া দিত না। কারণ অকংগ্রেসীদের অনেকেই তাঁকে দলের উর্ধ্ব জ্ঞানী ও শ্রম্ভাভাজন ব্যক্তিত্বরূপে গণনা করেন। ডঃ হোসেনও নিঃসন্দেহে শ্রম্ভ্য এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে সুন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা থাকছে, ডঃ হোসেনকে মেনে নেওয়া মানেই প্রধানমন্ত্রীর একরোখা

মনোনয়নে স্বীকৃতি দেওয়া বা অকংগ্রেসী-দের পক্ষে যথেষ্ট মর্যাদাকর তো নয়ই, হয়ত বা বহু কংগ্রেসীও প্রধানমন্ত্রীর এই একরোখা নীতিতে সর্বান্তঃকরণে খুশি নন।

এমতাবস্থায় পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। ডঃ হোসেন যদি নির্বাচিত না হতে পারেন তবে সে পরাজয় তাঁর নয়, সে পরাজয়ের দায়িত্ব বর্তাবে প্রধানমন্ত্রীর ওপরই। সুন্দর রাওকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নিলে ডঃ হোসেনকেও রাষ্ট্রপতিরূপে মেনে নিতে বাধ্য থাকত না অনেকেই। কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হয় নি। অবস্থা তাই বর্তমানে কংগ্রেসী আর অকংগ্রেসীদের মধ্যে একটি মর্যাদার লড়াই-এ দাঁড়িয়েছে যাকে সাম্প্রদায়িকতার সুদূর ব্যাখ্যা করার অর্থ জাতীয়তাবিরোধী অপকর্ম।

সংকট আরও একদিকে উঁকি দিচ্ছে। যদি ডঃ হোসেন নির্বাচনে বেরিয়ে আসতে না পারেন তবে, এখনই বিভিন্ন কোণ থেকে আওয়াজ উঠেছে, ইন্দিরা-সরকারের পতনই তার স্বারা সূচীত হবে, কেন না ডঃ হোসেন কংগ্রেস প্রার্থী হলেও বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রার্থী।

অথচ এই সংকটজনক পরিস্থিতি

থেকে উদ্ধার পাওয়ার এখন আর অপর কোনও ন্যায় উদ্ভূত নেই।

পাতিল চান কালো টাকার জমিদারি

যে টাকা বোহসেবী তাকে হিসেবের আওতায়ে এনে কালোকে সাদা করার জন্য কংগ্রেসী সরকার একাধিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে আসছেন। সম্প্রতি জনতার রায়ে পারভাত প্রান্তিক কংগ্রেসী মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল হিসাব-বাহিত্ব অর্থে হিসাবী সম্পদের মধ্যে গণনীয় করে আনার জন্য আবার এক প্রয়াস শুরুর করেছেন বলে জানা গেল। বিগত ১৯৭৭ এপ্রিল বোম্বেতে হীন কালো টাকা দিয়ে বোম্বেই ইমারত তৈরি করা হোক বলে মন্তব্য করেছেন। বোম্বের গৃহসমস্যা সমাধানের জন্য পাতিল সাহেবের অকস্মাৎ এহেন মাথা ব্যথা খুব সুলক্ষণাক্রান্ত মনে হয় না। কেন না পাতিলসাহেব গৃহহীন বোম্বেবাসীকে কালো টাকার অধর্মশালায় এনে তুলতে চান। অর্থাৎ পাতিলীর বায়না : পাতিলপুত্রীর টাকা দিয়েই এবার অবাধ প্রাসাদ বানানো হোক। কালো টাকার পবিত্রপ্রমাণ অন্যায়কে সমর্থন করার এ এক নাক খোলানো কৌশল। কৌশলীর সাধারণ বক্তব্য, ও টাকা তো পচে যাচ্ছেই, তার থেকে ঐ দিয়ে কিছু জনহিতকর (!) কাজ হোক না কেন। এ বেন ভেজালে ভেবে অনেক তো লুটোই, এবার ধর্মশালা বানানো যাক গোছের কথা। তা তাও ধর্মশালা অপেক্ষাকৃত ক্রীণ (বাচ্য পরিবেশ বহু ক্ষেত্রেই আনুক্রমিক)। ধর্মশালা বানানোর পর মুনোফা উত্তোলনের প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু কালো টাকার অ-ধর্মশালা-গুলি কালো টাকা বিনিয়োগেরই রাস্তা খুলে দেবে। যে অর্থ অনুপার্জিত, পাতিলসাহেব চান তাই হোক বংশ-পরম্পরায় ইমারতি জমিদারির উপার্জনের উৎস। আর এ ব্যাপারটা স্বীকার পাওয়া মানেই কালো টাকা সংগ্রহে উৎসাহদান এবং এই বক্তৃতিকে দীর্ঘায়ু করে রাখা। দেশের ভাগ্যানিশ্চয় ইওয়ার এক বৃক আকাশিকা নিয়ে বারিা দিব্যরাজ ফল্গীফিকির জাটেন, আশ্চর্যের কথা, সামান্য কালো টাকার ভাগ্য নিখারশে তারি চুড়ান্তভাবে ক্ষমতা প্রদর্শন করে আসছেন। কালো কী উপায়ে সাদা করা যায় এছাড়া দ্বিতীয় পথ আবিষ্কারের কিছুমাত্র ইচ্ছাই যে এদের মধ্যে নেই, কিম্বা কারেমী স্বাধের বিরগভাজন ইওয়ার দৃষ্টিসাহস যে এরা রাখেন না, কালো টাকা নিয়ে এমত ডিগবাজি খওয়ার লক্ষ্যেই তা পরিষ্কৃত হয়। পাতিলসাহেবের এখনও বোঝা উচিত যে দীর্ঘকাল ক্ষমতার থেকে তার দল ঐ পাতিলপুত্রীর ক্ষমকদের সঙ্গেই মিথালি বন্ড ভালো, তাঁদের মোসারেসবী

করে এসেছেন জনগণের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি সঙ্কে। তাঁদের এই দুরাচারকে জনগণ সহ্য করে নি। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাত থেকে কালো টাকা জবর দখল করার উপায় উদ্ভাবন না করে সেই মুষ্টিমেয় বক্তৃতি সংরক্ষণে আজও একইরকম আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকলে জনগণ ব্যাপারটা খুব সহজভাবে গ্রহণ করবেন না। কালো টাকাকে বিধিবদ্ধ করার জন্য এই মত আগ্রহ না দেখিয়ে সভাকার অনুসন্ধানের মারফৎ কালো টাকা ভূগর্ভস্থ বাজার থেকে উদ্ধার করে আনার উপায় সম্ভান পাতিলসাহেবরাই করতে পারেন, কেন না একমাত্র দরদীই বলতে পারেন হুগীর আসল দরদ (ব্যথা) কোথায় টাটকে। পাতিলসাহেব নয় কালো টাকার ফাঁপা মানুষের সেই পচমান ক্ষতস্থানটির যথাযথ সম্ভান করে তাই প্রকাশ করার চেষ্টা করুন।

জনগণকে অনাহারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিভিন্ন অসদুপায়ে সংগৃহীত অনুপার্জিত কালো টাকার ক্রমফীতি রোধ করার একমাত্র উপায়, কালো টাকার কান ধরে তাকে আলোয় বার করে আনা; আপায়ন করে কালো টাকাকে জমিদারির ভুক্ত প্রদান করা নয়।

মাদক বর্জন নয় : একটি সং পরামর্শ

যে কারণেই হোক, পাতিলসাহেব মাদক বর্জন সম্পর্কে একটি সং পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে মাদক বর্জনের স্ভায়া বা বর্জিত হয়েছে তা আসলে মাদকদ্রব্য নয়, সরকারের রাজস্ব। তিনি আরও বলেছেন, কোন নৈতিক বিধিনিষেধকে আইনত বাধ্যতাপূর্ণ করায় তাঁর বিরোধী।

একথাও অবশ্যই স্বীকার্য যে নৈতিক চেতনা না দেখা দিলে আইন করে মাদক বর্জন সফল করা অসম্ভব। মাদকদ্রব্যের ওপর করভার বরং সর্বাপেক্ষা চড়িয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় গ্রহণ করাই বিধেয়। পরস্যা বারিা অবশ্যে ছড়াতে চান মাদক-বিলাসীদের মধ্যে তাঁরাই একটা বড় অংশ। এদেশে তাঁদের হাত থেকে পরস্যা ছেঁকে তোলার মতো বিভিন্ন প্রত্যাক কর বসানোয় এখাবৎকাল সরকার খুব আগ্রহ প্রদর্শন করে আসেন নি। মাদকদ্রব্য এবং বিলাস সামগ্রীর ওপর কর বৃদ্ধি করলে অনেক ফলভূট টাকার সদগতি হতে পারে।

বড় বড় বারে দৈনিক এক এক ব্যক্তিই শ' শ' টাকার রঙিন পানীয় গলধঃকরণ করে বাড়ি ফেরেন। খেঁজ করলে দেখা যাবে এই সব বারে যেমন নিজের অনুপার্জিত আয় ঢেলে খওয়ার লোকের প্লাসে কপটের জন্ম হচ্ছে। অর্থাৎ এক

শ্রেণীর ক্ষমতাবান পুরুষ কন্সট্রাক্টর লেনদেনটা টেবলেই সেয়ে যান এবং তাঁদের পানীয় তক্ষা মিটিয়ে যান বড় বড় কন্সট্রাক্টররা পাটি। এ-ও এক বোহসেবী টাকা খরচের জায়গা। সুতরাং টাকা তুলতে হলে এখানে চার ফেললে জমা ভালই হতে পারে।

যেখানে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন সেখানে নীতিগতভাবেই নতুন কর ধার্যের উৎস সৃষ্টি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে নতুন আয়ের ব্যবস্থা মাদকদ্রব্য এবং অতি মহাখর বীলাস সামগ্রীর ওপর কর ধার্য করে করা যেতে পারে। আর তা নৈতিবাচকভাবে হলেও জনহিতকর কাজই হবে।

কেরালায় এই উপায়ে বাৎসরিক আট কোটি টাকা সংস্থানের আশা করা হচ্ছে।

শ্রীপাতিল মাদক বর্জন নীতির বিরুদ্ধাচারী মনোভাব পোষণের সঙ্গে রাজস্ব বৃদ্ধির দিকটোও উল্লেখ করার তাকে ধন্যবাদ জানাবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল দেখে তৃপ্তি অনুভব করছি।

বিহার সরকারের ঐতিহাসিক ঘোষণা : দৃষ্টিকোণ স্বীকৃতি

দৃষ্টিকোণ আইনের বাধ্যবাধকতা এড়ানোর জন্য চরম দৃষ্টিসময়ও দৃষ্টিকোণ-কবলিত অঞ্চলকে দৃষ্টিকোণ এলাকা বলে ঘোষণা করতে সরকারের তরফে গররাজি থাকাই স্বাভাবিক বলে যে ধারণা আমাদের মনে প্রাণীকৃত ছিল, বিহার সরকার রাজ্যের সাতটি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে দৃষ্টিকোণ এলাকা বলে ঘোষণা করার সেই ধারণা এবার ওলটপালট হয়ে গেল। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এই প্রথম রাজ্য সরকারের স্ভায়া খরাপীড়িত অঞ্চলকে দৃষ্টিকোণ এলাকা বলে ঘোষণা করা হল। শব্দ তাই নয়, এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগে বিহার সরকারকে কেন্দ্রের সঙ্গে বেশ বড় রকমের মতানৈক্যে উপনীত হতে হয়। অবশেষে বৃহৎ সরকারের করেকজন মন্ত্রী কেন্দ্রের সম্মতি ব্যতিরেকেই এক তরফাভাবে দৃষ্টিকোণগুলি ঘোষণা করার জন্য রাজ্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও খরাপীড়িত অঞ্চলকে দৃষ্টিকোণ এলাকা বলে ঘোষণা করার জন্য পীড়াপীড়ি করলে রাজ্য সরকার এই ঐতিহাসিক ঘোষণার স্ভায়া দেশের প্রকৃত চিত্রকে খামাচাপা দেওয়ার নীতি পরিহারের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

দৃষ্টিকোণ ঘোষণার ফলে ঘোষিত অঞ্চল-গুলিতে সরকারী পাওনা আদায় স্থগিত রাখা হয়েছে এবং দৃষ্টিকোণ আইন বলে জেলা কতপক্ষে গ্রাণ অধিকর্তা হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

রূপ সাধনায় সাধনা

দুটি অনবদ্য অবদান



সাধনা বিউটি ক্রিম

প্রতিদিন স্বক চর্চায় একান্ত
প্রয়োজন। কুণ্ডল কোমল
পেলব তনু ও যৌবন স্থলভ
জীবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথপেস্ট

দস্তরাঙ্গি মুক্তার মত শুভ্র
ও উজ্জ্বল, মাটি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র
অংশ দূরীভূত ও স্বচ্ছ করে।

শীঘ্রই পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ—ডী.বোম্পেটল যোশ, এম. এ.
আর্কিটেকশালী, এফ.সি. এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) আগলপুত্র
কংসজের কামান শাস্ত্রের স্তম্ভপূর্ণ অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ সরেন্দ্র যোশ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ) আর্কিটেকচার্য।

সাপ্তাহিক বঙ্গবর্তী

যতদূর এক কোটি সাতাশ লক্ষ ভৌগোলিক হাজার মানুষ দার্ভিক-কবলিত অঞ্চলে দার্ভিক আইনের সাহায্য পেতে পারবেন।

জৈনিক সরকারী মদ্যপাত্র সেই সঙ্গে আরও জানান যে, দার্ভিক এলাকার বহির্ভূত অঞ্চলকেও অভাবহীন মনে করার কাবণ নেই, বরং উত্তর বিহারের অধিকাংশ অঞ্চলের অবস্থাও এতই রকম। তবে জৈনের দার্ভিক সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। কেন্দ্রীয় সাহায্য ঠিক মত না পাওয়া গেলে এসব অঞ্চলকেও দার্ভিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলে ভবিষ্যতে ঘোষণা করতে হতে পারে।

রাজস্বমন্ত্রী শ্রীইন্দ্রদীপ সিং জানিয়েছেন যে, হাজারিবাগে ৫১ জন এবং গয়ায় ১৫৭ জনের অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে সরকার অনুসন্ধান শুরু করেছেন।

বিহারের বিভীষিকাময় অবস্থায় লক্ষ লক্ষ অনাহারী মানুষ কয়েক সহস্র গবাদি পশু ফেলে বেথেই আহারের সন্ধানে অন্যত্র বাস্তুত্যাগ কবে ছাড়িয়ে পড়ছেন। নিখিল ভারত সেবক সমাজের সহ-সভাপতি স্বামী হরিনারায়ণানন্দ মতে সত্তর লক্ষ বিহারী রাজ্যের নরটি খরাপীড়িত অঞ্চলে মৃত্যুর মধোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন।

বাজ্যেব মধ্যবিস্তৃত সমাজের অবস্থাও সঙ্গীন। লক্ষাধিক পরিবার অর্থাভাবে অনাহারপীড়িত। এই শোচনীয় অবস্থার মোকাবিলায় জন্য একগুণত কোটি টাকার সাহায্য এখনই প্রয়োজন বলে স্বামী হরিনারায়ণানন্দ মন্তব্য করেন।

মুন্সিপাল হল রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে এই সাহায্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এজন্য কেন্দ্রের মধ্যপেক্ষী হওয়া ছাড়া গতান্বর্ত নেই।

কেন্দ্র কি করছে

কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের অবস্থা সূচক অনুধাবন করছেন এবং সাহায্য প্রেরণের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, গ্রাণকাষে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের কোন মতানৈক্য ছিল না। তবে বিহার যে চার লক্ষ টন খাদ্যশস্য না হলেই চলবে না বলে আওয়াজ তুলেছে তার পেছনে কোন বাস্তব যুক্তি শ্রীরাম স্বীকার করেন না। তিনি জানান, কেন্দ্র থেকে সওয়া এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য মাসিক প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। এপ্রিল থেকে এক লাখ পঁচাত্তর লক্ষকে বাড়িয়েও দুই লক্ষ টনের সংস্থান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও দুই থেকে সওয়া দুই হাজার টন বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে বিহারের অবস্থা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রকে আর পাঁচটি রাজ্যের কথাও ভাবতে চলে।

কয়েকটি রাজ্য ছাড়া সর্বত্রই জে ডাড়ে মা ভবানী অবস্থা। কংগ্রেসী মালিকদের হাতে দেশের এই দুঃস্থতা বছরের পর বছর ধরে স্পষ্টীকৃত হচ্ছিল। বিহারে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলে দার্ভিক ঘোষণা করে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার কোন চেষ্টাই হত না। কেন না কংগ্রেসী মালিকদের আবার প্রেস্টিজ্জ জ্ঞান টনটনে। দেশে দার্ভিক একথা স্বীকার করলে নেতৃত্বের মাথা নিচু হয়। তার থেকে মরু না দশ-বিশ লাখ মানুষ। কেন্দ্রের সঙ্গে দার্ভিক ঘোষণা নিয়ে সেই কারণেই মতানৈক্য। রাজ্য সরকার বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতি দিয়ে বিহারকে রক্ষা করলেন বা করার শেষ চেষ্টা করলেন। এই ঘোষণা রাজ্যে চেতনা সৃষ্টি করে যখন কার্য-ক্ষমী হবে, অন্যান্য রাজ্যে এবং বিহাৰীশেও তেমনি এই ঘোষণার প্রভাব বিহারের অনুকূলেই কাজ করবে। কংগ্রেস সরকার জনগণের দুঃদৃশার কথা এতোকাল শ্রদ্ধা ধামাচাপা দিয়ে আসতেই শিখেছেন। এখন অকংগ্রেসী সরকারগুলির কার্যকলাপ দেখে অধোবদন লুকানোর আর জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। জগজীবন রাম আমতা আমতা করে স্বীকার করেছেন, দার্ভিক ঘোষণার দ্বারা বিহাৰীশেও প্রভাবিত করা যাবে বলে রাজ্য সরকার মনে করেন। কংগ্রেস সরকার সে কথা কখনো মনে করে নি কেন। দেশের লোকের চোরে দলের লোকের প্রেস্টিজ্জ রক্ষার জন্যে। বিহারের অবস্থা রাতারাতি সঙ্গীন হয় নি। কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে মানুষ গাছের পাতা চিবুচ্ছিল। সে সময় কংগ্রেসীরা বাস্তব ছিলেন ইলেকসন আর দলাদলি নিয়ে। আজও কি অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে।

দার্ভিক নিয়ে দলবাজির অভিযোগ

দার্ভিকপীড়িত বিহারে খাদ্যশস্য ন্যাকারজনক রাজনৈতিক দুর্ভাবাসম্বন্ধে অভিযোগ এখনও অপ্রতুল নয়। এই পৈশাচিক দুর্ভাবাসম্বন্ধে সঙ্গে কালো-বাজারী ও মজুতদার এবং রাজ্য প্রশাসনের কিছু হোমরা-চোমরা, পুন্ডলিশ দপ্তরের স্বভাবপাপী ও পরাজিত কংগ্রেসী মন্ত্রী-দের যোগসাজসের সরাসরি অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে।

সংযুক্ত সরকারের জনহিতকর কর্ম-সূচী নামে মুনাক্ষোখের কালোবাজারী এবং মজুতদার ও তথতলোভীদের ভবিষ্যৎ অশুকারাজ্য হতে চলছে। তারা একটা মোটা রকমের মরণ-কামড় বসিয়ে যেতে চায়। রাজ্য পরিষদে এই কুচক্রীদের মুখোমুখি সরকারপক্ষ খুলে দিয়েছিলেন রাঁচিতে উজ্জ্বল আচরণের মূলে কংগ্রেসী চক্রান্তের অভিযোগ টেবলমশ

করে। খাদ্যমন্ত্রী মহামায়াপ্রসাদ সিংহও রাঁচির ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশ্যে আইনসভায় বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, সমাজ-বিরোধীর সঙ্গে ছোট বেঁধে রাঁচিতে গণ্ডগোল সৃষ্টি করার মূলে ছিলেন সেই সব শত্রুমান পরস্বাপহরক যাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার অনুসন্ধান কমিশন বসাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দুর্নীতি দমন, মজুতদারী বন্ধ করা, গোপন ভান্ডার থেকে খাদ্যশস্য উদ্ধার করা ও পূর্ববর্তী কংগ্রেসী সরকারের কতিপয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করার ঘোষণাই রাজ্য সরকারের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। পাপ-চক্র এখন যে কোন উপায়ে সরকারের পতনকে স্বরাস্বিত করে নিজেরা বাঁচতে চায়। এজন্য দশ-বিশ লাখ মানুষ মারতেও তাদের আপত্তি নেই। মহামায়া-প্রসাদ সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের পতনের জন্য এয়া নিশিদিন একটির পর একটি সমস্যার জট পার্কিয়ে তোলায় চেষ্টা করছে।

বিরোধী কংগ্রেস পক্ষ যখন রাজ্য-ব্যাপী অরাজকতার অভিযোগ তুলে সরকার উল্টে দেওয়ার জন্য টেবল চাপড়াতে শুরু করেন। রাজ্য স্বায়ত্ত-শাসনমন্ত্রী তখন আর-চুপ করে থাকা সমীচীন বোধ করেন নি। তিনি রাজ্য সরকারের পতনের জন্য চক্রান্ত করার অভিযোগে কংগ্রেস পক্ষকে সরাসরি অভি-যুক্ত করেন এই বলে যে, গত ৫ই মার্চ কতিপয় কংগ্রেসী নেতা রাজ্যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন বলে সলা-পরামর্শের জন্য গোপন বৈঠকে মিলিত হন। বাজ্যে অনভিপ্রেত ঘটনাবলীর পেছনে ছাত্র বা সমাজ-বিরোধীরা নয়, কংগ্রেসী চক্রান্তই সক্রিয় ছিল সরকার অবগত আছেন—একথাও মন্তব্যের সকলের মূখের ওপরই ঘোষণা করেন।

খাদ্য সংকট জিইয়ে রাখার পৈশাচিক চক্রান্ত

লুকানো মজুত উদ্ধারের জন্য সরকারী প্রয়াস বানচাল করার মজুতদার ও কালোবাজারীদের সঙ্গে সরকারী অফিসারদের কতিপয়ও হাত মিলিয়েছেন বলে অভিযোগ প্রকাশ। বড় বড় মজুতদারকে রেহাই দিয়ে ছোট ব্যবসায়ীদের টুপি টিপে ধরার কৌশল অবলম্বন করেছেন তারা। অনেকক্ষেত্রে 'রেইউ' করার আগে সংশ্লিষ্ট মজুতদারকে গোপনে সংবাদ দিয়ে নাকি সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা দরার মাল পাচার করে দিতে পারেন। অন্যদিকে খোলাবাজারে চড়াও হয়ে অফিসার ও পুন্ডলিশ অকারণ সম্মানের সৃষ্টি করে

সাপ্তাহিক বসুমতী

খোলাবাজার থেকেও খাদ্যশস্যের যোগান বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। ফলত বাজারে খাদ্যশস্যের দাম মণ প্রতি ষোল টাকা বেড়ে গেছে রতারাতি। স্বয়ং প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায় চোখ রাঙা করে বলেছেন, মজুত-দারি বন্ধের সরকারী প্রচেষ্টা চলতে থাকলে খাদ্যনীতির মারাত্মক ফলাফল দেখা দেবে। খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সম্বন্ধে ঘোষণা করেছে, সরকার যদি নীতি পরি-বর্তন না করেন তবে, বাজার থেকে কণা-পরিমাণ খাদ্যশস্যও উবে যাবে।

কী প্রচণ্ড দুঃসাহস ও উস্কানী থাকলে তবেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এ ছেন উপায়ে জনগণের সরকারকে চোখ রাঙাতে সাহস পায়। কিন্তু এটাই বিভিন্ন রাজ্যের, যেখানে জনপ্রিয় সরকার কাজ চালাচ্ছেন, চিহ্ন। কোথাও কুচক্রীরা সরাসরি কোথাও বা গোপনে জনগণের সরকারকে বেকারদার ফেলবার অহরহ চেষ্টা করছেন।

কিন্তু এদের এই দুঃসাহসের দাঁতের গোড়া না ভাঙলে জনপ্রিয় সরকারের পক্ষেও কোন রকম জনহিতকর কাজ করা সম্ভব নয়। বিহার সরকার তাই প্রশাসনিক কর্তাদের ওপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে জনগণের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গদীর জন্য এবং অসুখীদের অর্থ-জালসার জন্য যে পৈশাচিক চক্রান্ত শুরুর হয়ে গেছে সেখানে দেশবাসীর জীবনমরণ সমস্যাটা আরো কোন প্রশ্নরূপে পিশাচ-কুলের চোখে ধরা দেয় না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৃদ্ধ, মানব চিরকাল স্বার্থ-সম্বন্ধীদের হাতে পড়ে মার খেতে পারে না। কুচক্রীরা বতই তাদের ধারালো অস্ত্রে দাঁক দিক তাদের দিনও আঙুলে গোঁষা হচ্ছে। এই সত্য মনে রেখে তাদের এখন সংবত হওয়ার সময়। অন্যথা মরণ-কামড় যে অনিবার্য মৃত্যুকে দৃষ্টান্তে পারে না সেই বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে তাদেরও ধ্বংসমুখি হতে হবে অদূর ভবিষ্যতে।

মহাধর্ভাতার সংস্থান

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে সর্বত্র মহাধর্ভাতা প্রদানের প্রস্নটি অতঃপর বিভিন্ন রাজ্যে টল খেতে শুরুর করেছে। কেন্দ্রীয় অর্থনীতির কল্যাণে দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া। কেন্দ্র নিষ্পন্ন কর্মচারীদের জন্য দফায় দফায় মহাধর্ভাতা বৃষ্টির সুপারিশ গ্রহণ করে এতাবৎ কেন্দ্রীয় কর্মীদের মহাধর্ভাতা বৃষ্টি করে আসছিল। কেন্দ্রের ওপর টেকা দিয়ে চেষ্টার অব কমান্স এবং বড় দরের সওদাগরী অফিসগুলিও কর্মচারীদের হাতে বেশ কিছু পরিমাণ কাগজের নোট তুলে দিয়ে দেশের মূল্যমানকে অবাধে

চড়তে দেওয়ার পথ সুগম করে এসেছে। আর তারই প্রচণ্ড প্রহার সহ্য করে আসছেন বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী কর্ম-চারীরা ও অসুখবিস্ত সম্প্রদায়।

সাপ্তাহিক বসুমতীর মাধ্যমে আমরা বহুকাল যাবৎ এই বিষয় অর্থনৈতিক অবস্থা বহাল রাখার কংগ্রেসী নীতির বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলাম। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও ক্রমে মহাধর্ভাতাকে কেন্দ্রীয় হারে প্রদান করার দাবি উত্থাপন করলেন। আশা ছিল নির্বাচনের পর এ বিষয়ে একটা সূচন ফয়সালা হবে। অকংগ্রেসী সরকারগুলি এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের স্বার্থও হয়েছিলেন, কিন্তু উপমুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়ে-ছেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানো কেন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব। এতৎ সত্ত্বেও কয়েকটি রাজ্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের তোল্লাকা না করেই সমহারে মহাধর্ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু বহুক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি এবং আদৌ সম্ভব হবে কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহও দেখা দিয়েছে।

যে উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা দীর্ঘকাল ধরে একটি সুসং-গঠিত ঐতিহাসিক আন্দোলন পরিচালনার সাফল্যলাভ করেছিলেন; চরণ সিং মন্দি-সভার আমলেও কিন্তু তাঁদের আশা পূর্ণ হল না। উত্তরপ্রদেশের অকংগ্রেসী সরকার কর্মীদের মহাধর্ভাতা বৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বটে তবে তা কেন্দ্রীয় হারে নয়। উত্তরপ্রদেশ সরকারী কর্মচারী সমিতির যুগ্ম সংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা শ্রী পি এন সুকুল সরকারী সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন : এই সিদ্ধান্তে কর্মীদের অর্থের দাবিও মিটল না। যদি কেন্দ্রীয় হারে মহাধর্ভাতার দাবি মেনে না নেওয়া হয় তবে কর্মচারী-বৃন্দ পুনরায় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

কতুত, আজ আর অর্থের সংস্থান করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না বলে অকংগ্রেসী সরকারের পক্ষেও তরে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ একদিন এরাই এই দাবিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন

অর্থের সংস্থান বিভিন্ন রাজ্য সরকার-গুলিকে করতেই হবে তা সে কেন্দ্রের সঙ্গে বণ্ডা করেই হোক বা অন্য যে কোন উপায়েই হোক। এজন্য সাধারণ জনগণকে আঘাত কববে না এমনভাবে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর চাপিয়েও আবহমানের অবহেলিত রাজ্য সরকারী কর্মচারী স্বার্থ তাঁদের দেখতেই হবে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন অর্থ সংস্থানের জন্য (বাৎসরিক দশ

কোটি টাকা) প্রয়োজনমত অনাশ্রয় পদ ছাটাইও করতে হবে। অর্থাৎ অকংগ্রেসী রাজ্যে ছাটাইয়ের সম্ভাবনাকে ঘোষণা করা হচ্ছে। কর্মচারী নেতা শ্রী সুকুল এই ঘোষণাকে প্রত্যাশার অপমৃত্যু বলে বর্ণনা করেছেন। এবং অতঃপর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বিহারের সরকারী নন-গেজেটেড কর্মীরাও উচ্চতর হারে মহাধর্ভাতা পাবেন বলে জানা গেছে। দশ থেকে নব্বই টাকা হবে এই ভাতা বৃষ্টি করা হচ্ছে। স্বভাবতই নিচের তলার মানুষ যাদের আর সর্বনিম্ন তাঁদের প্রবোজনও কম বলেই সরকারী ধারণা প্রচলিত আছে। এজন্য ডিএ কমিশনগুলি সর্বোচ্চ প্রাপ্যকে জন্য সর্বোচ্চ মহাধর্ভাতাই প্রদান কবে আসেন। এক্ষেত্রেও তাই। একগত টাকা পর্যন্ত বেতনভোগীরা পাবেন ৩৯ টাকার হার এবং সেটা ক্রমশ ওপরের দিকেই কলেবরে বৃষ্টি পাবে।

জল দাও

বিহার ও উত্তরপ্রদেশে জলের অভাবে পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র দক্ষিণ বিহারেই আঠার হাজার গ্রাম জলাভাবে মরণাপন্ন। বর্তমানে বিশেষ ট্রেনযোগে দেহরি-অন-সন থেকে পালানো জেলায় পানীয় জল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। ইতি-মধ্যে পোনে চার লক্ষ কাঁচা ডিউবওয়েল বসানো হলেও বহুক্ষেত্রেই জল শুকিয়ে যাচ্ছে। বিহারের এই পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য সেনাবাহিনীর কাজে নেমেছেন। প্রায় শ' খানেক সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ার আটটি নলকূপ বসিয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁদের কর্মজগতপতাও বৃষ্টি করা হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের মিরজাপুর জেলায়ও সত্বে মানুষের কণ্ঠে জলের জন বিশৃঙ্খ আতর্নাদ।

মিরজাপুরেও জল নিয়ে যাত্রা হচ্ছে বিশেষ ভ্রাম্যমাণ জলাধারে। দু'ন কুড়িটি গ্রামে মাথাপিছু দু' গ্যালন জল বিনামূল্যে সবববাহ করা হচ্ছে প্রতিদিন। চরম জলাভাবগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এই গ্রাম-গুলিতেই পঁয়ষট্টি হাজারের মতো। জল নিয়ে যেতেই নাকি কোন কোন অঞ্চলে গ্যালন প্রতি খবচ এক টাকা। নারায়ণসীর পাথরুবে তহশিল চাকিরাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের আয়োজন চলছে।

পাটনা জল সরবরাহ সংস্থার দুর্নীতি

খাদ্য হোক, পানীয় হোক যেখানেই সুযোগ মানুষ মেরে শকুনিব ভোগেছে সেখানে পুরণ করে আসা হিচ্ছিল। বিহা-রের সংযুক্ত সরকার জল নিয়ে এই

সাপ্তাহিক বসুমতী

পৈশাচিক ভোগেচ্ছার কীর্তিকাহিনী উন্মার করার জন্য পাটনা ওয়াটার সান্দ্রাই দপ্তরের ওপর একটি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকাশ, পাটনার জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতকরণের জন্য পূর্ববর্তী সরকার পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু অর্থগত অমানুষিকতা সেই ব্যয় অর্থ স্বব্যাথে আত্মসাৎ করেছে আর এই দুর্ভিক্ষে সহযোগিতা করেছেন জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী। বর্তমান রাজ্য স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী জানান যে, নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক স্বার্থে একটি মোটা বকমের তহবিল তহবিল করা হয়, তদন্ত হচ্ছে তাকে কেন্দ্র করেই।

ইতিমধ্যে পাটনা ওয়াটার সান্দ্রাই বোর্ডকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার উদ্যোগ-আরোহণ চলছে।

মানবরাগের টাকা নিয়ে ব্যক্তি ও দলীয় তহবিল গঠনের নীতিতে বোধহয় এদেশের মতো এমন অকুতোভয়ে আর কোথাও কেউ প্রদর্শন করে না। তার কারণ বোধহয় এই যে, আত্মহত্যা করলেও মানুষের শাসিতর সম্মুখীন হয় কিম্বা একজনকে খুন করলে খুনীর যে শাসিতর বিধান আছে, লক্ষ মানুষকে ভিলে ভিলে খুন করার জন্য তেমন কোন শাসিতর আওতার কার্যকে ফেলা হয় না। ইতিপূর্বে তদন্তও এসব ব্যাপারে সহসা বসত না, বরং ধামা চাপা পড়ত। এখন তদন্ত বসছে, কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। তদন্তে দোষী প্রমাণিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য চরমতম শাসিতর বিধানও সঙ্গে সঙ্গে রচিত হওয়ার দরকার। যেন আইনের ফাঁক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য দণ্ড নিয়ে সমাজের সব থেকে বড় অপরাধীরা পার পেয়ে না যেতে পারে, অতঃপর সেই বিনয় দরকার। দেশ পাপাচারে ডুবেছে। শত্রু হাতে হাল না বয়লে সেই পাপাসক্তি থেকে মুক্তি নেই।

উত্তরপ্রদেশ :

ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি পালনে
দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ

সংযুক্ত বামপন্থী সরকার উত্তরপ্রদেশের জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করছেন বলে সবাসরি অভিযোগ এনেছে বাজ্য কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং পার্টির তবফে জানানো হয়েছে যে, কংগ্রেসী শাসনে দীর্ঘকাল মানুষ যে বিচার ভোগ করে আসছে দ্রুত তার প্রতিবিধান না-কবা হলে সংযুক্ত সরকার দাবী করে পড়বে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য ডঃ আহমেদ পার্টির প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পার্টির প্রস্তাব দৃঢ়শাস্ত

জনগণের ক্রোধকে মানসিকতারই প্রকাশ, কোনও অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নয়। তিনি এই বলে সংযুক্ত সরকারকে সতর্ক করে দেন যে, ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য সরকারের পক্ষে সম্ভাব্য সমস্ত পন্থা গ্রহণ করা পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি সরকারকে সমর্থন করবে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনে অনিচ্ছা দেখা দিলে পার্টিকে যাধ্য হয়েই নীতি পরিবর্তন করতে হবে। কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিমরাঙ্গম প্রধার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে কৃষিকর চালু করে দরিদ্রতম চাষীদের সুবিধাদানের চেষ্টা করার পক্ষপাতী এই উপায়ে লোকসান তো নেইই, উল্টে পনের থেকে কুড়ি কোটি টাকার সংস্থান হবে।

খাদ্যশস্যের মূল্য বেঁধে দিয়ে, বিক্রয় করে সংস্কারসাধন করে এবং প্রফেশন ট্যাক্স ছিমিকর প্রভৃতি রহিত করে সাধারণ মানুষের ওপর থেকে পার্টি সস্তর বোকা হালকা করে আনতে চান।

কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহাশ্রী ভাতা প্রদান এবং সরকারী

দ্রম সংশোধন

“সাপ্তাহিক বসুমতী”র ৭৯ বর্ষ ৪৪শঃ সংখ্যায় প্রকাশিত “যা দেখছি, যা পেরেছি” স্মৃতিচরন রচনায় ২৭৬০ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামের ২৩ পৃষ্ঠিকিতে ‘বতীশ’ এর পরিবর্তে ‘বতীন’ এবং ২৭৬৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের ৩৯ পৃষ্ঠিকিতে “এদের তিনটি পদ্র ও একটি কন্যা”র পরিবর্তে “এদের তিনটি পদ্র ও তিনটি কন্যা” পড়তে হবে।

সম্পাদক, সাঃ বঃ

ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের। কেউকে সম্বন্ধে নির্ধারিত করতে হবে।

জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেনঃ ন্যূনতম কর্মসূচীর মধ্যে খাদ্যশস্যে স্টেট স্টোভ-এর যে প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে, স্বয়ং মধ্যমস্ত্রী এবং রাজ্যের বহুসংখ্য অকংগ্রেসী দল জনসংঘ সেই নীতির বিরোধী—এহেন অবস্থায় কম্যুনিষ্টরা কী করবেন। ডঃ জে এ আহমেদ জবাবে জানানঃ সংযুক্ত সরকারের অন্যতম সদস্য-রূপে সরকারের ওপর এ বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করার পূর্ণ অধিকার পার্টির আছে এবং সেদিক দিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি নিশ্চেষ্ট থাকবে না।

প্রশ্নটি গুরুতর। খাদ্য স্টেট স্টোভ-এর প্রশ্নটি নিয়ে মতবিরোধেব সম্ভাবনাই এর দ্বারা সূচিত হয়। ন্যূনতম কর্মসূচী

রূপায়ণে সরকারের দীর্ঘসূত্রতাও কোন কোন জনহিতৈষী দলের মধ্যে বিরূপা প্রতিপ্রায় সৃষ্টি করতে পারে। আর এই মতবিরোধের সম্মুখ নিয়ে সংযুক্ত সরকারের পরিচালনাগত দূর্বলতাও ক্রমেই স্পষ্ট আকার নিতে পারে। অনেকেই জানেন, মধ্যমস্ত্রী শ্রীচরণ সিং কয়েকটি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গোড়া মতের পক্ষপাতী। জনসংঘের চরিত্রও যথেষ্ট জনহিতকর নয়। দক্ষিণপন্থীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ফলপ্রসূতি অবশ্যই জনহিতায় হয় না। উত্তরপ্রদেশের বিমিশ্র মতাবলম্বী সরকার ন্যূনতম কর্মসূচী সূত্রায় কিভাবে কার্যত রূপায়ণ করবেন তা বোধহয় কৌতূহলের সঙ্গে অতঃপর লক্ষণীয়। দক্ষিণপন্থীকরণের অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ সমস্যা দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

কমলাপতি ত্রিপাঠী বড় দেরিতে
এলেন

অবশেষে উপনির্বাচনের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসপ্রধান শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী জনগণের ছাড়পত্র নিয়ে রাজ্য আইনসভার প্রবেশাধিকার পেলেন। তবে বড় দেরি হয়ে গেছে। কংগ্রেসভাগী বর্তমান অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মধ্যমস্ত্রী চরণ সিং ছিলেন সি বি গুপ্ত বিরোধী কমলাপতি গোষ্ঠীর অন্যতম শক্তিশালী নেতা। কমলাপতি পূর্বে আসতে পারলে হয়ত চরণ সিং অন্য উপায়েই সি বি গুপ্তকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে দেখতেন। অবশ্যসক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের ভাগ্য আগের মতই কুশাশঙ্ক হইতে থাকত। কেন না কমলাপতি উপদলকে আমল না দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গণবিভাগভাজন সি বি গুপ্তকেই রক্ষাকবচ পাঠিয়েছিলেন এবং এই হাদকারে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর দানও ছিল লক্ষণীয়। গুপ্ত-তহবিল কুশাঙ্ক সি বি গুপ্তকে কেন্দ্রীয় জলের আড়ালে আশ্রয় না দিলে ইউ পি সি সি-তেও বিরাট ভাঙন দেখা দিত না। নির্বাচনে গুপ্তদলীয় চক্রান্তে অনেক কংগ্রেসী নেতাকে কুপোকা হতেও হত না। বাক্য যা ঘটেছে, জনগণের মগলের জনহী তা ঘটে গেল। পাপ জমা হলে চাকা এইভাবেই ঘোরে। পাপ তরাচ দূর্বলিত না হলে ফিরে চক্রবর্তনও অনিবার্য—অতঃপর কুটিল রাজনীতির ক্ষেত্রে এই নৈতিক চেতনা জাগ্রত থাকার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে।

(২২।৪।৬৭)



সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রীসের সাম্প্রতিক ক্ষমতা দখলকালে ট্যাঙ্ক ও সাজোয়াবাহিনী বেষ্টিত গ্রীক পার্লামেন্ট ভবন

গ্রীস :

গণতন্ত্রের সূতিগৃহে গণতন্ত্রকেই টুটি টিপে হত্যা করা হলো। এখানকার নিয়মতান্ত্রিক সরকারকে বাতিল করে দিয়ে, প্রধানমন্ত্রীকে বন্দী করে ২৬ বছরের রাজা কনস্ট্যানটাইন এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। দেশের শাসনভার এখন কার্যত দক্ষিণ-পশ্চিম সামরিক পুরুষদের হাতেই রয়েছে। এ-উপলক্ষে একটা হুকুমনামাও জারী করা হয়েছে যেখানে রাজার স্বাক্ষরও রয়েছে। হুকুমনামাটির দ্বারা জনগণের বাকস্বাধীনতা এবং অন্যান্য কয়েকটি মৌলিক অধিকার বাতিল করা হয়েছে।

এ-হুকুমনামা ছাড়াও এথেন্স বেতার-কেন্দ্র থেকে সেনাবাহিনী যে ঘোষণা করেছে তাতে বলা হয়েছে যে, সৈন্যরা রাস্তায় টহল দেবে অতএব কোন লোক যেন রাস্তায় না থাকে। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলও স্থগিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে, ব্যাংক থেকে টাকা তোলা নিষিদ্ধ হয়েছে, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সোনা বিক্রয় এবং বিদেশী মদ্রা বিনিময় বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ধাদ্যশস্যের মজুতদারদের বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে বিচারের কথা বলা হয়েছে। বেতারকেন্দ্রটি সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে, অসামরিক

বেতার স্টেশনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মিঃ পানায়োটস কানালো-পোলস এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ জর্জ প্যাপানড্রুকে বন্দী করে ৬৬ বছরের সুপ্রিম কোর্টের এ্যাটর্নি-জেনারেল মিঃ কনস্ট্যানটাইন কোলিয়সকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। সেনাধ্যক্ষ জেনারেল স্প্যান্ডিকাকিস নতুন উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ লাভ করেছেন।

দেশে বহু-আকাঙ্ক্ষিত সাধারণ নির্বাচন এখন আসন্ন (আগামী ২৮শে মে



কনস্ট্যানটাইন

নির্বাচনের দিন স্থির ছিল) এবং পরবর্তী পার্লামেন্টের অধিবেশন ৫ই জুলাই সূর্য হবার কথা ছিল তখন এই আকস্মিক পটপরিবর্তনে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু গ্রীসের সাম্প্রতিককালের ইতিহাসের সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের কাছে রাজা কনস্ট্যানটাইনের এ-কাজ অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ, গ্রীসের রাজা শূন্য সিংহাসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে রাজ্যী ছিলেন না, নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রদানে তাঁর অনীহা জন্মে গিয়েছিল, তাঁর দেশ শাসনের বাসনা রয়েছে মনে। তাই জো-হুকুম লোককে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে তিনিই বাতে দেশের প্রকৃত শাসক হতে পারেন তারই জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন কনস্ট্যানটাইন গত দু'বছর ধরে।

গ্রীসের বর্তমান সংকটের গোড়া খুঁজতে হবে সেই দু'বছর আগে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসের ঘটনার মধ্যে যখন রাজা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি মিঃ প্যাপানড্রুকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। মিঃ প্যাপানড্রু তখনই নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রদানের এ-অগণতান্ত্রিক কাজের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, এবং জনপ্রিয় নেতার সঙ্গে হাজার হাজার গ্রীক কণ্ঠ সৈনিন মিলেছিল। সৈনিন যে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ-মিছিলের ডেউ উঠেছিল তাতে পদলিখের গুলীতে একজন ছাত্র প্রাণও হারিয়েছিল। মিঃ প্যাপানড্রু সরাসরি জনতার উদ্দেশে ধল-

ছিলেন : রাজা রাজ্য করেন মাত্র, দেশ শাসনের ভার জনসাধারণের ওপর। কিন্তু রাজা সে যুক্তি মানেন নি, প্যাপানড্রুকে অপসারণ করে নিজের লোককে প্রধান-মন্ত্রীর পদে বসিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজার বিরোধের একটা কারণ অবশ্যই ছিল। প্রধানমন্ত্রী জর্জ প্যাপানড্রু সেনাবাহিনীর কয়েকজন দক্ষিণপন্থী অফিসারকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাতে রাজী হন নি। এক্ষেত্রে প্রতি-রক্ষামন্ত্রীকেই প্রধানমন্ত্রী তার ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারতেন পার্লামেন্টারী রীতি অনুযায়ী। কিন্তু রাজা কনস্ট্যানটাইন সেই সময়ে নিয়মতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সমর্থন জানালেন। জর্জ প্যাপানড্রু তখন বাধ্য হয়ে নিজেই পদত্যাগ করলেন, সরকারের পতন ঘটল।

জর্জ প্যাপানড্রু সেদিন এ যুক্তি নিয়েছিলেন এ আশাতেই যে তাঁর বা তাঁর সেক্টর ইউনিয়ন দলের সমর্থন ছাড়া গ্রীসে কোন সরকারই বেশিদিন টিকতে পারে না। প্যাপানড্রুর হিসেবে গোল-মাল ছিল না, যদিও সংকট আরো আগে আসবে বলে আশা করেছিলেন তিনি।

কিন্তু সরকার ধলার ব্যাপারে গ্রীস সাম্প্রতিককালে একটা রেকর্ড স্থাপন করেছে। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ওখানে ৪০টিরও বেশি সরকারের পতন ঘটেছে, রাজা কনস্ট্যান-টাইনও সরকার নিয়ে গত দু'বছরে কম পরীক্ষা চালালেন না।

জর্জ প্যাপানড্রুর বিরুদ্ধে রাজার অভিযোগ এই যে তিনি তাঁর ছেলে অ্যান্ড্রিয়াসকে রক্ষা করার জন্যেই রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। অ্যান্ড্রিয়াসকে এখানকার একটা গোপন সংস্থা 'আস-পিডার নেতা বলে বর্ণনা করা হয়। 'আসপিডা' রাজার বিরুদ্ধে ঝড়বন্থে লিপ্ত রয়েছে। গত নভেম্বরে সেনা-বাহিনীর ২৮ জন অফিসারের বিরুদ্ধে বিচার করা হয় এবং ১৫ জন অফিসারকে ৪ থেকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় তখন কনস্ট্যানটাইন-প্যাপানড্রু বিরোধ চরমে ওঠে।

গ্রীসের দক্ষিণপন্থী সামরিক শাসন প্রবর্তনের একমাত্র কারণ যে জর্জ প্যাপানড্রু এবং তাঁর দলকে চিট করা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ নির্ধারিত দিনে (২৮শে মে) সাধারণ নির্বাচন হলে সেক্টর ইউনিয়ন দলই যে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে রাজার মনেও সে সম্পর্কে সংশয় নেই। কারণ,

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এখানকার কমিউ-নিস্টরাই শব্দ ক্ষেপে নি, সাধারণ গণ-তন্ত্রপ্রিয় নাগরিকও রাজতন্ত্রের অবসান চায়, অসংলগ্নিক রাজশাসন এবং রাজার ক্ষমতাপ্রিয়তার খোর বিরোধী। নির্বা-চনকে বানচাল করাই যে রাজার উদ্দেশ্য ছিল নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কনস্ট্যানটাইন কোলিয়সের প্রথম ভাষণেই তার অপ্রান্ত পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কোলিয়স এই বলে সেনাবাহিনীর হাতে শাসনভার নেবার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন যে একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যেই না কি এ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে না কি কোন সঠিক ফলাফল পাওয়া যেত না, বরং দেশে রক্তপাত ঘটত!

রাজা কনস্ট্যানটাইনের এ গণতন্ত্র-বিরোধী কাজের তীব্র প্রতিবাদ দেশে-বিদেশে শোনা যাচ্ছে। সোভিয়েট সংবাদ-পত্র 'প্রাভদা'র ভাষ্যকার তো এর পেছনে সি-আই-এর হাত আছে বলে মন্তব্য করেছেন। গ্রীস ন্যাটোর একটা সদস্য-রাষ্ট্র, কাজেই রাজতন্ত্র-বিরোধী এবং বিশেষত যে দলের (সেক্টর ইউনিয়ন) পেছনে কমিউনিস্টদের নৈতিক সমর্থন রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তাকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়ার অর্থ আমেরিকাকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলা। কারণ এখানে জাতীয় সরকার গঠিত হলে ডার খাদ্যানীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী আর ভ্রা যদি হয়, তবে আমেরিকার ব্যবসায়ের আরো হান্দা নেমে আসবে।

কিন্তু সামরিক কতৃৎ এখানে কত-দিন স্থায়ী হবে? বলা শক্ত। তবে, সরকার-বিরোধী গোপন আন্দোলন ইতি-মধ্যেই সূর্য হয়ে গিয়েছে। একটা গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে দেশের গণ-তন্ত্রপ্রিয় ও প্রগতিশীল জনতার কাছে রাজতন্ত্র-ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এককাটা হবার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জর্জ প্যাপানড্রু আরো জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন জননেতা বলে। ইতিমধ্যে প্যাপানড্রু যদি রক্ষণশীল দলের সঙ্গে আপোস না করেন, এবং পিতা প্যাপানড্রু ও পুত্র অ্যান্ড্রিয়াসের মধ্যে এ ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সামরিক শাসন আন্দোলনের চেউয়ের তোড়ে উড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি সামরিক কতৃৎপক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের পাইকারী হারে দেশে পুরোদস্তুর স্বৈর-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

বারবারি ব্যাফল

(উড়িয়া সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)

প্রথম পুরস্কার—১, ১০,০০০ টাকা

০টি দ্বিতীয় পুরস্কার— প্রত্যেকটি ২৭,৫০০ টাকা।

০টি তৃতীয় পুরস্কার— প্রত্যেকটি ১০,৭৫০ টাকা।

০.০০,০০০ টাকারও বেশি টাকার ১০০০টি গ্যারান্টি প্রদত্ত পুরস্কার।

ক্রোজিং—১৫-৬-৬৭ : : খেলা—২০-৭-৬৭

প্রতি টিকিট ১ টাকা মাত্র

১৫ টিকিট ১০ টাকা, ৬০ টিকিট ৩৬ টাকা মাত্র

খুচরা টিকিটের জন্য পুরা নাম, ঠিকানা সহ টাকা মনিঅর্ডার অথবা ইন্ডিয়ান

পোস্টাল অর্ডারে পাঠাইবেন। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

পুরস্কার তালিকা, ফর্ম ইত্যাদির জন্য স্বয়ং আসুন অথবা লিখুন :—

মহাত্মা গান্ধী রোড ও

আমহাস্ট স্ট্রীট জংশন

জে. দত্ত,

চীফ ডিস্ট্রিবিউটর

২৬, আমহাস্ট স্ট্রীট,

কলিকাতা-১।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(অন্যতম অধ্যায়)

ভেলিরবাগের অন্যান্য বাসিন্দাদের কথা

ভেলিরবাগ গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দাদের আমি দেখেছি এবং যাঁদের কথা আমার কিছুটা স্মরণ আছে তাঁদের সম্বন্ধে দু' কথা এখানে বলা অপ্ৰাসংগিক হবে না। আমার জীবনকাহিনীর সংগে এঁদের কোন সম্বন্ধই নেই তাই বা বলব কেমন করে? এঁরা গ্রামের মধ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন সেই পরিবেশই গোপনে গোপনে আমাকে পুষ্ট করেছে। ভেলিরবাগের আকাশ-বাতাস মাটি ও জল যেমন আমার অস্থি মজ্জার অনুপ্রবেশ করে গেছে আমার অজানিতে তেমনি করেই ভেলিরবাগের এই সব বাসিন্দারাও আমার জীবনকে গড়ে তুলেছেন অদৃশ্য ও দূরত্বের।

প্রথমেই বলি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের বাসিন্দা 'উকিল বাড়ির' লোকদের কথা। এ বাড়ির সবাই পেশায় উকিল ছিলেন না, এঁদের পদবীই ছিল উকিল। উকিল বাড়ির কতাই ছিলেন স্বর্ণীর অভয়চরণ উকিল। এঁর ছিল তিন ছেলে। প্রথম পক্ষের সন্তানের নাম অম্বিকাচরণ উকিল ও দ্বিতীয় পক্ষের দুই সন্তানের নাম সারদা ও বরদা উকিল। তা' ছাড়া এ বাড়ির শ্যামাচরণ উকিল ছিলেন সাব-জজ এবং তারকচন্দ্র উকিল এম.এ.বি.এল. পাশ করা উকিল হয়ে মুনসীফগে প্রাক্তিস করতেন। এঁদের মধ্যে দুইজনকে আমি কখনো চক্ষেও দেখি নি, কিন্তু আমার পিতৃদেবের মুখে তাঁদের ভূরসী প্রশংসাবাদ শুনেছি। অন্যান্য মত্রেও তাঁদের কার্যকলাপের কথা জেনে মোহিত হয়েছি এবং তাঁরাও যে আমার স্বগ্রাম-বাসী ছিলেন এইজন্যে মনে মনে গৌরবও বোধ করেছি। অভয়চরণবাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে অম্বিকা উকিল ছিলেন নামকরা ইংরাজী অধ্যাপক। তিনি ঢাকার বিশ্বাত

উকিল ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের লোকের হিতকর কাজে ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ। আজকাল সমবার নীতির ব্যাখ্যান ও স্বদেশী কারবারের উপ-যোগিতার অনেক কথাই আমরা শুনতে পাই। কিন্তু বছর ষাটেক আগে যখন সমবার সমিতি ও দেশী বাণিজ্যের কথা আমাদের দেশের গণ্যমান্য নেতারা ভাবতেনই না তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সে সব বিষয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে দেশ-বাসীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে গেছেন। সেই আমলে অম্বিকা উকিলই সেই সব নীতি হাতে-কলমে কাজে লাগাবার যে চেষ্টা করে গেছেন সেইটেই ছিল তাঁর প্রধান কীর্তি। সেই সময়ে—সুন তারিখ মনে নেই—অম্বিকাবাবু ভেলিরবাগেরই কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলের কাছে স্বনামধন্য কৃষ্ণদাস পাল মশায়ের মন্দির মূর্তির পূবে গা দিয়ে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের একটি নিচু একতলা ঘরে ইন্ডিয়ান পাইওনিয়ার্স কোম্পানী লিমিটেড নামে একটা দোকান খোলেন। হিসাবদারেরা শুনেছি প্রত্যেকে একশ টাকা দিয়েছিলেন। আমার পিতৃদেব ও পিতৃব্যপত্র চিত্তরঞ্জন, সত্যীশরঞ্জন ও জ্যোতিষরঞ্জনও এক এক শ' টাকা দিয়ে শেয়ার নিয়েছিলেন। সেখানে চাল, ডাল, তৈজসপত্র সব পাওয়া যেত এবং কিছু কিছু মণিহারী জিনিসও থাকত। বৎসরান্তে স্টক মেলাতে গিয়ে শুনেছি তখনকার দিনের ঐ সব যুবকেরা চালের কস্তার উপরই শূরে ঘুমিয়ে রাত কাবার করে দিতেন। এমনি ছিল তাঁদের উৎসাহ। এখন স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের লেখার খাতার বাজার ভরে গিয়েছে কিন্তু তখনকার দিনে সে সব ছিল না। এই ইন্ডিয়ান পাইওনিয়ার্স কোম্পানীই প্রথম 'পাইওনিয়ার্স' এক্সার-সাইজ বুক নামে ছেলে-মেয়েদের লেখার খাতা বাজারে চালু করে। সেই কোম্পানীই এখন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ঘড়িঘরে উঠ

গিয়ে নাম করা কারবার চালাচ্ছে। এর পর মরমনসিংহের স্বনামখ্যাত দেশহিতৈষী জমিদার রজেন্দ্রকিশোরের অর্থানুকূল্যে অম্বিকাবাবু হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটির পত্তন করেন। সে সোসাইটির নাম বাংলা দেশে আজ কে না জানে। অর্ধের লোলুপতা অম্বিকাবাবুর একেবারেই ছিল না। কাজই তাঁকে শেয়ে বসেছিল। তিনি যশ ও মান পেয়ে গেছেন বিস্তারিত কিন্তু ধন সঞ্চয় তাঁর বিশেষ কিছুই করা হয় নি। সে কর্মযোগী আজ মহাপ্রয়াণ করেছেন কিন্তু গ্রাম্যবনচিত্রের সেই বিশিষ্ট স্বগ্রামবাসীকে গ্রাম্য নিবেদন করি। তাঁর একমাত্র ছেলে রামদাসের শান্তিনিকেতনে রক্তচক্ষুধারের ছাত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি গুরুলোকগমন করেছেন। এই পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান অম্বিকাবাবুর বৈমায়ের ভাই সারদা উকিল যিনি একজন যুব উচ্চ-দরের আর্টিস্ট বলে খ্যাতি লাভ করে ছিলেন। তাঁর হাতে অঁকা অনেক দেয়াল তৈলচিত্র লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসকে আজও মনোহরিত করে রেখেছে। তাঁর পুত্র শান্তনুও একজন ভাল আর্টিস্ট। সারদাবাবুর ভাই বরদাবাবুকে দিল্লীতে শিক্ষিত ব্যক্তিমানই চেনেন। দুই ভাই মিলে তাঁরা আটের একটি বিশিষ্ট ধার সৃষ্টি করে গেছেন যাকে লোকে এখানে বলে—'উকিল স্কল অফ আর্ট'। বরদাবাবুর প্রধান কীর্তি দিল্লীর জেমসফোর্ড ক্লাবের সামনে অবস্থিত 'ইন্ডিয়ান ফাইন আর্টস এ্যান্ড ক্রাফটস'-এর প্রতিষ্ঠাতা। সৌভাগ্যক্রমে ইনি এখনো আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন। এই বাড়ির ভবানীচরণ উকিলেরও নাম শুনেছি টিনের বাজে রং লাগাবার এক নতুন কার্যদা প্রবর্তনের জন্যে।

ভেলিরবাগের বাবুদের জমিদারীর ঠাট বজার রাখবার জন্যে তাঁদের তিন হিমায় তিনজন দেওয়ানজী ছিলেন। বাবুদের অবতমানে জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের এবং খাজনা আদায় উপদেষ্টার দায়িত্ব

থাকত এই তিন দেওয়ানজীদেরই ওপরে। কাজেই গ্রামের মধ্যে এঁদের বেশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। এঁরা বাবুদের বিশ্বস্ত কর্মচারী, পরামর্শদাতা এবং বাবুদের মা, বৌবিয়েরা যারা গ্রামে থাকতেন তাঁদের এঁরা এক রকম অভিভাবকই ছিলেন বললেই চলে। বাড়ির ছেলেমেয়ে বৌবিয়েরা এঁদের খুবই সম্মতি করে চলতেন। বস্তুত এঁরা বাড়ির আপন লোক বলেই গণ্য হতেন।

বাবুদের মধ্যে মধ্যের বাড়ির আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ছিল এবং তেলিরবাগের বাইরে বরিশাল অঞ্চলেও এঁদের বাড়িটি কিছু জমিদারী ছিল। তাঁদের বাড়ির দেওয়ানজীর নাম ছিল হরিচরণ কর, কিন্তু তাঁকে সবাই হরি সিং বলেই ডাকত। কারণটা খুলে বলি। মধ্যের বাড়ির কাজে বোগ দেবার আগে ইনি ছিলেন দেওয়ানী আদালতের পেয়াদা। সেই আমলে কোর্টের সব পেয়াদাদেরই বলা হত 'সিং'। সাধারণ মানুষদের মনে প্রাধ্বা, ভক্তি বা ভয় সঞ্চার করবার জন্যে এই নামকরণ হয়েছিল কি না জানি না। যাই হোক তিনি যখন তেলিরবাগের মধ্যের বাড়ির বাবুদের দেওয়ান হয়ে এলেন এই 'সিং' পদ-মর্যাদাটাও তাঁর সংগে সংগেই এসে গেল। একবার যে 'সিং' হয়েছে সে চিরকালই 'সিং' থাকবে এই নীতি অনুসারেই বোধ হয়। আমরা তাঁকে হরি সিং পিসা বলে ডাকতাম। জ্যেষ্ঠা না, খুড়ো না, পিসা কেন বলতাম তা জানি না। আমাদের গ্রামের কোন সেরেকে তিনি বিয়ে করে-ছিলেন বলে তাঁকে পিসা বলা হত কিনা সে খবর শুনিনি। যাই হোক অনাস্থ্য-জনকে এই রকম আস্থ্যয়ের নামে ডেকে আপন করে নেওয়াই ছিল তখনকার দিনের রেওয়াজ। হরি সিং পিসা মানুসটি ছিলেন বেস্টে-খাটো। গায়ের রং ময়লা। ছাটাই করা খোঁচা খোঁচা গোফ ছিল তাঁর মুখে। মুখে-মুখে একটা ওজ্জ্বল্য সবদাই দেখা যেত। দেখলেই মনে হত খুব বুদ্ধি-মান, চালাক-চতুর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। সেটা হবারই কথা। হাজার হোক কোর্টের পেয়াদা ছিলেন ত? কিন্তু দুষ্ট লোকেরা অর্থাৎ যারা তাঁকে দেখতে পারতেন না তাঁরা বলতেন লোকটি ধূর্ত ও পাচাল মানুস। জমিদারী কাজকর্মে তিনি যে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। কোর্টের পেয়াদারা আইনের মার-পাচি জানবেই কি। যাই হোক মোটের ওপর তাঁর কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে সকলেরই প্রশংসা ও ভয় ছিল এবং তেলিরবাগের জন্যে দুটি দেওয়ানজীরা একে 'সিনিয়র' বলে মানা করতেন। হরি সিং পিসার বাড়ি-খানা ছিল মধ্যের বাড়ির পুকুরের দক্ষিণ-

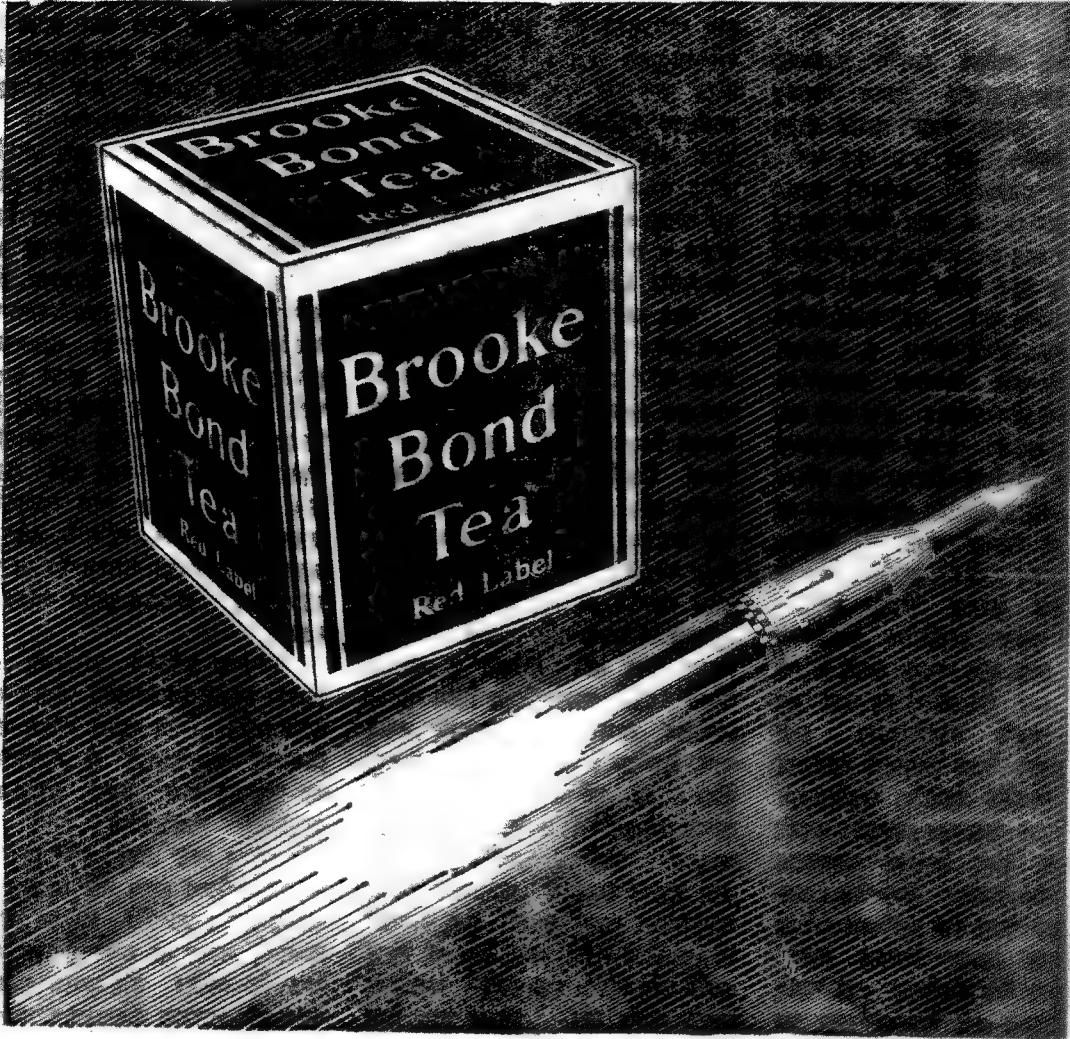
পূর্বে কোণে-সিকদার বাড়ির কয়েক শ হাত পূর্বে। এঁর ছেলে কুমারদীকান্ত ওরফে ভ্যাগা আমার বয়সী ছিলেন এবং বড় দেওয়ানজীর ছেলের যে প্রধান্যটুকু তিনি প্রাপ্য মনে করতেন তা দাবি করে আদায় করেই নিতেন।

দক্ষিণের বাড়ির দেওয়ানজী বিপিন সোম ছিলেন বিপরীত আকৃতির ও প্রকৃতির। গায়ের রঙ বাঙালীদের পক্ষে ফরসাই ছিল বলতে হয়। দৈর্ঘ্য বেশ লম্বা, চুলে পাক ধরেছিল। গুরু-শ্রম-সাফ কামান। তিনি ছিলেন মিতভাষী ও অমায়িক নির্বিবাদী মানুস। তাঁর ছেলে দিগীন্দ্র তেলিরবাগের স্কুলে কিছু-দূর পড়ে কলকাতার আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। আমার বাবা তাঁকে কলকাতা কর্পোরেশনে একটি বেইলিকের কাজে ঢুকিয়ে দেন। দিগীন্দ্র আমার বাবাকে কাকাবাবু, মাকে খুড়িমা এবং আমাকে দাদাবাবু বলে ডাকতেন। একে-বরে ঘরের মানুস তিনি হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির মাসের বাজার করে তিনি তা মটের মাথায় দিয়ে আনতেন ভবানীপুর জগদ্বাবুর বাজার থেকে। তারপর মায়ের কাছে বসে হিসাব দিতেন। সে হিসাব-নিকাশ ছিল এক পূর্ব। বড়-দিনের বন্ধে দেশ থেকে ফিরে আসবার সময় আমাদের জন্যে তিনি নিয়ে আসতেন কিছু তাজা কলাই (খেসারী) শাক, পাত-ক্ষীর ও গোয়ালন্দার খেজুরে গুড়। দিগীন্দ্র বেশ অল্প বয়সেই মারা যান। বিপিন সোম থাকতেন তেলিরবাগের মাঝখান দিয়ে যে খালটি বয়ে বেত তারই দক্ষিণ পারে। অন্য দুই বাড়ির দেওয়ানজীরা মারা যাবার পর বিপিন সোম তিন বাড়িরই দেওয়ানজীর কাজ দেখতেন।

পশ্চিমের বাড়ির দেওয়ানজীর নাম ছিল কালীমোহন মৃধাজি। সবাই তাঁকে প্রশংসা করত এবং তারই নিদর্শনস্বরূপে তাঁকে ডাকত কালীঠাকুর বলে। নির্বাক, মিতভাষী ও নেহাত ভাল মানুস, তিনি সাতো ছিলেন না পাঁচো ছিলেন না। বেশ ফরসা সুদর্শন চেহারা ছিল তাঁর। আমার বাবা-মাকে ইনি খুব স্নেহ করতেন। গায়ের লোকেরা সবাই এঁকে ভালবাসত এঁর ভদ্র ব্যবহার ও সৌজন্যের জন্যে। এঁর বড় ছেলে বীরেন্দ্র ওরফে বীরা ছিলেন আমার সমবয়সী বা একটু বড়। পড়াশুনা তাঁর বেশি এগোয় নি। বড় হয়ে কলকাতার ছোট আদালতের এক উকিলের মৃহুরীর কাজ করে কোন রকমে সংসার চালাতেন। খুব হাসি-খুশি মানুস ছিলেন। বস্তুত জীবনটাকে হেসে-খেলেই কাটিয়ে গেছেন। এঁর ছোট

ভাই অবনী-ডাক নাম হারাইন্যা-প্রথমে দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন)-এর বড় জামাতা সুধীর রায় ব্যারিস্টারের মৃহুরী ছিলেন। রায় সাহেবের অসময়ে আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলেন তখন ইনি তাঁর কাছেই কাজে লেগেছেন। সুধীর বিষয় যে সিদ্ধার্থ রায়ের পণার ও প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়ছে অবনীও আর্থিক স্বচ্ছলতা সেই অনুপাতেই বেড়ে চলেছে। অবনী তাঁর বাপের মিত্র স্বভাবটি পেয়েছেন। কালী ঠাকুর থাকতেন তেলিরবাগের উত্তর-পশ্চিম কোণায় পাঠক বাড়িতে। এঁদের বাড়িটির নাম পাঠক বাড়ি হল কেন তার একটু ইতিহাস আছে। তেলিরবাগের ভূইঞারা যখন সেই গ্রামে বসতি করলেন তখন তাঁদের কাজে লাগে এমন সব লোকদেরও সেই গ্রামে বসিয়েছিলেন-যেমন, পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, ভূইয়ালী, গোয়ালী বাড়ী, কাওয়ালী ইত্যাদি। বাবুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ-মহাভারত পাঠের জন্যে এসে-ছিলেন গোলোকচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কথকতা ও পাঠ করতেন বলে তাঁকে পাঠক বলা হত। এবং সেই জন্যে তাঁর বাড়িকে পাঠক বাড়ি বলত। তাঁর এক কন্যার দুটি সন্তান, কালীমোহন ও লালমোহন, তাঁদের দাদামশায়ের বাড়িতেই থাকতেন। এই কালীমোহনই পরে পশ্চিমের বাড়ির দেওয়ান কালী ঠাকুর বলে পরিচিত হয়েছিলেন। লালমোহনের ছিল এক ছেলে ভুবনমোহন যাকে আমরা ডাকতাম "ভুবইন্যা" বলে। ওই বাড়িতে আর একজন থাকতেন তাঁর নাম ছিল দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। তিনি গোলোক চক্রবর্তীর কি হতেন জানি না। তাঁর ছেলে হরপ্রসন্নকে বেশ চিনতাম। হরপ্রসন্ন বড় হয়ে কলকাতার ছোট আদালতের বেঞ্চ ক্লাক হয়েছিলেন।

পুরোহিত বাড়ির কয়েকজনকে মনে আছে-কাউকে একটু আবছা রকমে, কাউকে বা স্পষ্টভাবে। এ পাড়ায় একটি পরিবার বাস করতেন তাঁদের পদবী ছিল চ্যাটার্জী। তাঁরা আমাদের পুরোহিত ছিলেন না। কি সুবাদে তাঁরা তেলিরবাগে বসতি করলেন জানি না। হতে পারে তাঁদের কেউ পুরোহিত গোষ্ঠীতে বিয়ে করে শ্বশুরালয়েই রয়ে গেছেন। এ বাড়ির কতটা ছিলেন বোধ হয় দুর্গাপ্রসন্ন চ্যাটার্জী-ঠিক মনে নেই। তাঁর ছিল তিনটি ছেলে হরিপ্রসন্ন, আশুতোষ ও অবিলাশ। বড় দু'জন ঢাকায় পড়া-শুনা করার একটু যেন শহুরে হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা পারে মোজা দিতে



পরিতৃপ্তির নতুন জগতে পাড়ি দিন

মন-মেজাজ চাঙ্গা করতে হলে চাই ব্রক বণ্ড রেড লেবেল চা।
প্যাকেট পিছু ঢের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন।
ব্রক বণ্ড রেড লেবেলের অপূর্ব স্বাদগন্ধ আপনাকে পরিতৃপ্তির
এক নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবে।

জুতা পরে লেসের ফিতে বাঁধে। গ্রামের লোকদের সংগে যেন ঠিক খাপ খেত না।

পশ্চিম বাড়ির অর্থাৎ আমাদের বাড়ির কুলপুরুষোচিত ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী। তাঁরই কাছে আমার হাতে খড়ি হয়েছিল। সেই কথা পরে বলব। তিনি বেশ মোটাসোটা ভারিজনী ধরনের মানুষ ছিলেন। এ ছাড়া তাঁকে আমার আর বেশ মনে নেই। শুনেছি পাণ্ডিত্যের জন্যে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল না—দাবিও যে ছিল তা-ও না। তবু সবাই তাঁকে পমাই পাণ্ডিত বলেই জানত ও ডাকত। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্র চক্রবর্তীকে আমার বেশ মনে আছে। এর ডাক নাম ছিল রাজু ঠাকুর। গ্রামের পুরুষোচিতদের লক্ষ্যমান যথেষ্টই ছিল—বিশেষ করে মহিলা মহলে—কিন্তু বয়সমানদের দেওয়া দক্ষিণায় যে তাঁদের সংসার চলত না তাতেও কোনই সন্দেহ নেই। সুতরাং পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব রাজু ঠাকুরকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। কলকাতায় কি একটা ক্লাবে ইনি অবসর সময়ে ক্রিকেট খেলতেন এবং উইকেটকীপার বলে বেশ খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। সেই খ্যাতির সংবাদ গিয়ে পৌঁছল নাটোরের পুণগ্রাহী স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের কানে। আর যায় কোথায়। তখনই তখন পড়ল রাজু ঠাকুরের কলকাতায় নাটোরের রাজবাড়িতে। দিনকতক খেলা-হল্লায় তাঁকে পরখ করা হয় এবং অচিরে তিনি বহাল হলেন বিখ্যাত নাটোর ক্রিকেট দলের উইকেটকীপাররূপে। খুবই নাম করেছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ বড় খেলায় তিনি নেমেছেন মহা মহারথীদের সঙ্গে। সবাই জানে যে ক্রিকেট ম্যাচে হৃদয়ের বিরতির সময় বেশ বড় রকমের ভোজ হয়। রাজু ঠাকুর নিষ্ঠাবান রাজ্ঞ ছিলেন। বাবুচির রান্না খানা টেবিলে লেজদের সংগে বসে খাওয়া-দাওয়া কদাচ তিনি করতেন না। তাঁদের ছোঁয়া জল-স্পর্শও তিনি করেন নি কখনো। তিনি বাইরে থেকে বড় জোর একটি ডাব কিনে খেতেন। কিন্তু খেলেই ত' জীবন চলে না। এ জন্যে তাঁকে মটর গাড়ি চালানো শিখতে হয়েছিল। লাইসেন্স হবার পর তিনি দাদাবাবু চিত্তরঞ্জনর বার্লিয়েট গাড়ি চালাতেন। মটর ড্রাইভারের কাজ করলেও তাঁকে বরাবরই পুরুষোচিতের গুণমান দেওয়া হত মৃত্যু পর্যন্ত। এ সম্মান স্বভাবগুণেই তাঁর প্রাপ্য ছিল।

দক্ষিণের বাড়ির কুলপুরুষোচিত ছিলেন রামচন্দ্র চক্রবর্তী ওরফে রাম ঠাকুর। পাতলা ছিপছিপে ছোটখাটো পৌরবর্ষ মানুষ। রাম ঠাকুরের আর্থিক অবস্থা একেবারেই স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু তার

জন্যে তাঁকে নিজের ভাগ্যের উপর দোষারোপ করতে কখনো শোনা যেত না এবং সেই অজুহাতে তাঁর কারুর উপর কোন দাবি-দাওয়াও ছিল না। আমার মা তাঁকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। গ্রামস্থ সবাইয়ের সুখে-দুখে খোঁজখবর নেওয়া ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। সবাই তাঁকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। তাঁর বড় ছেলে এখন মীরাতে সরকারী কাজ করেন ও ছোট ছেলে বোধ হয় দক্ষিণ কলকাতায় চারচন্দ্র কলেজের বড়বাবু।

আর মনে পড়ে লাখু ঠাকুরকে। তাঁর ভাল নাম একটা কিছু নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু আমি ত' কখনো শুনিনি। শুনলে থাকলেও ভুলে গেছি। অনুমান করি লক্ষ্মণ কিংবা ঐ ধরনের কোন নাম তাঁর ছিল। ইদানীং দু'একজনকে লিঙ্গাসা করেছি তাঁরা যেন আমার প্রশ্নে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা ত' জানেন লাখু ঠাকুর বরাবরই লাখু ঠাকুর। মায়ের কাছে শুনেছি যে কিশোর বয়সে লাখু ঠাকুরের দৌরাখোর নাকি বাগানে ফল-ফুল কিছু থাকত না। নষ্টচন্দ্র ও অন্যান্য উদ্ভট উপদ্রবে গ্রামবাসীদের তিনি না কি ক্রোপিয়ে তুলেছিলেন! গ্রামের সবাই লাখু ঠাকুরের উপর যতই মারমুখো হয়ে উঠল মধ্যের বাড়ির মেজগিরাই দুর্গা-মোহনের সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ী না কি ততই লাখুকে আগলিয়ে রাখতেন মা যেমন করে দয়ন্ত ছেলেকে আগলিয়ে রাখেন গুরুজনদের শাসন থেকে। লাখু ঠাকুরের ডানপিটেমির নাকি অন্ত ছিল না কিন্তু একটি তাঁর গুণের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারত না। গানের গলা ছিল তাঁর অসাধারণ সুমিষ্ট। ছোট বয়সে আমি যখন লাখু ঠাকুরকে দেখি তখন তিনি প্রোচুরে পৌঁছে গেছেন। তখন তিনি সংসারী এবং ছেলিপিলেও ছিল। একটি ছেলের দৌরাখোর খ্যাতি তখন বেশ চালা হয়েছিল। গ্রামের বন্ধারা বলতেন—‘বাপের সুগুণটুকু পায়েন নাই, কুগুণটুকু পাইছেন ঠিকই।’ লাখু ঠাকুরের গান আমিও শুনেছি। গভীর রাতে ‘পুরৈত পাড়া’-র দিক থেকে গম্ভীর গলায় গান ভেসে আসত দক্ষিণ বাতাসে খালের উপর দিয়ে। সে কি রামপ্রসাদী সুরের মূর্ছনা! দরাজ গলায় গানের প্রতিটি কথা স্পষ্ট শোনা যেত। শেষের দিকে লাখু ঠাকুর ঢাকার কাছাকাছি কোন জায়গায় এক ভাঙা কালীমন্দির জবর দখল করে না কি সেবাইত হয়ে বসে-ছিলেন। সেই মন্দিরের জমিজমা নিয়ে কি যেন মামলা হয়েছিল তারই কাগজপত্র নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ‘সত্যীশের দেখাইতে’। আমার বাবা-মাকেও দেখে গেলেন। চলে তাঁর

তখন জট বাঁধতে সুরু করেছে এবং পরণে টুকটুকে লাল রঙের ধুতি লুঙ্গীর মত করে পরা এবং গায়ে লাল রঙের কুর্তা ও চাদর। আমি তখন বিলেত থেকে সদ্য ফিরে হাইকোর্টে নাম লিখিয়েছি। লাখু ঠাকুর কাগজগুলি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন ‘সত্যীশের দেখাইছি। হ্যায় কইল বাদীপক্ষের আজিটা প্রলিঙ্গ। আমার জবাবদাওয়া সে-ই দেইখ্যা দিছে।’ সত্যীশরঞ্জন তখন বাংলা দেশের এ্যাডভোকেট জেনারেল। পুরানো দিনের সম্পর্কের দাবিতে লাখু ঠাকুর তখনও তাঁকে ‘সত্যীশ’ বলেই ডাকতেন। এ্যাডভোকেট জেনারেলকে দিয়ে যখন জবাব দাওয়াটা পাশ করিয়ে এনেছেন তখন লাখু ঠাকুর আমার মত অবাঁচীন ব্যারিস্টারকে কাগজপত্র দেখান দরকারই মনে করলেন না। সেই মামলার শেষ পর্যন্ত কি ফলাফল হল তা আর শুনিনি এবং লাখু ঠাকুর এখনো বেঁচে আছেন কি না তা-ও জানি নে। এতদিন বেঁচে থাকার কথা নয়।

‘সিকদার বাড়ি’-র মহিমচন্দ্র হোড় ছিলেন আমার ছেলেবেলার তাঁদের বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি মধ্যের বাড়ির বড় ও মেজবাবু, কালীমোহন ও দুর্গামোহন-এর বেয়ারার কাজ নিজে হাতে-কলমে করেছেন। দুর্গামোহন দেশে এলে তাঁর ‘মহিম ভাই’ ছাড়া চলতই না। এই সব মহারথীদের সংগে বাঁর কারবার ছিল আমার মত চুনোপুটি ভুইঞা যে তাঁর আমলেই পড়বে না তাতে আশ্চর্য হবার আর কি আছে। মহিমজ্যেষ্ঠা আমাদের কাছে তাঁর পুরানো মনিবদের অনেক গল্প বলতেন। সেই গল্প থেকেই তাঁদের উপরে মহিমজ্যেষ্ঠার স্নেহ ও সম্ভ্রম স্পষ্ট অনুভব করতাম। আমি যখন দেশে যেতাম মহিমজ্যেষ্ঠা তখন অবসরপ্রাপ্ত বেয়ারা। কাজ না থাকায় বাড়ির মেয়ে ও ছেলেদের সংগে খিচিমাটি তাঁর লেগেই থাকত। সেবার তাঁদের বাড়ির মেয়েরা কি যেন ব্রতপালন করছিলেন। সেখানে গিয়ে শুনলাম মহিমজ্যেষ্ঠাও না কি ব্রত



ঐতিহাসিক বসুন্ধরী

করছেন। শুনুন অবাক! পুরুষ মানুষ কে আবার কবে ব্রত করে? মহিমজ্যোতা বললেন—জানস না, মাইয়ারা বরত করে ভাল খাওনের লাইগ্যা। বরত করলে যদি ভাল খাওন যায় তবে আমিই বা বরত করুম না ক্যান।’ বসুন্ধরী যে এ সওয়াল জবাব অকাত্য। মহিমজ্যোতার বড় ছেলে জগদীশ ওরফে জগাদা ভাবতেন যে তিনি একটা কিছ্ হলেও হতে পারতেন কিছ্ কি একটা অজানা কারণে যে হলেন না তা আজ পর্যন্ত কেউ জানতেই পারল না। কাবণটা ‘জগাদা’ নিজেই জানতেন কি না জানি না অন্তত কাউকে স্পষ্ট করে সে সম্বন্ধে কিছ্ বলেন নি। বার কয়েক দেশের হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে জগাদা গ্রামেই বসে গেলেন, কেন না এত মরুস্থলী স্থানীয় মনিব থাকতেও কেউ তার জন্যে কিছ্ করলেন না। অবশেষে মহিমজ্যোতার খাতিরে তাঁর প্রাক্তন মনিব দুর্গামোহনের কৃতী সন্তান সতীশরঞ্জন আমাদের জগাদাকে ‘শ’ পাঁচেক টাকা দিলেন ঘিরের ব্যবসা করতে। মাস কতক জগাদা তেলিরবাগের ও আশে-পাশে গ্রামের গোয়ালাদের কাছ থেকে খাঁটি ঘি কিনে কলকাতায় নিয়ে জানাশুনা বড় বাড়িতে বিক্রি করে বেড়ালেন। সবাই ভাল জগাদার একটা সুবাহা হয়ে গেল। ভাগ্য মানুষের সংগে সংগে যায়। অজানা কি কারণে এবং কার যেন কি দোষে জগাদার সে ব্যবসায় ফেঁসে গেল। কারণটা যে কি এবং দোষটা যে কার আজ পর্যন্ত দেশের আবালবৃন্দবনিতারা কেউ জানতে পারে নি। জগাদা একটা অনির্দিষ্ট দৃষ্ট গ্রহের প্রকোপে পড়ে হাত গুটিয়ে দেশের বাড়িতেই বাকী জীবনটুকু কাটিয়ে দিলেন। মহিম জ্যোতার ছোট ছেলে মরইন্যার বরস ছিল আমারই সমান। খুবই শান্ত স্বভাবের ছেলে তিনি ছিলেন। সন্মিষ্ট ব্যবহার, মুখে তাঁর হাসি লেগেই থাকত। দাদাবাবু চিত্তরঞ্জনের পিতা আমার জ্যেষ্ঠামশায় ভুবন-মোহনের ফুট ফরমাইস খাটবার জন্যে তাকে পুরুলিয়াতে পাঠান হয়েছিল। জ্যেষ্ঠামশায় ভুবনমোহনের মৃত্যুর পর মরইন্যা কলকাতায় কালীমোহন আলয়ে দাদাবাবু চিত্তরঞ্জনের পুত্র চিররঞ্জনের কাছে লেগেছিলেন। খুবই কম বয়সে মরইন্যা মারা গেছেন তাঁর মৃত্যুতে মনে খুব ক্রেশ পেরেছিলাম তিনি আমাদের খেলাধুলার সাথী ছিলেন বলেই।

তেলিরবাগের কাওলী বাড়ির লোকের বাজনার জন্যে খুব সন্মান ছিল। রামকানাই কাওলীর ব্যান্ড পার্টির নাম এবং তাঁর নিজের অপূর্ব ঢোল বাজনার খ্যাতি ঢাকার সবাই জানত। শ্যামাচরণ

ও হরিচরণ কাওলীর যাত্রার দলও ছিল সুপ্রসিদ্ধ সেই আমলে ঢাকা ও আসামে।

চাঁড়াল বাড়ির ডেপার আমার মায়ের খুবই অনুগত ছিলেন। তিনি গ্রামেই ছুতার মিস্ত্রির কাজ করতেন। একবার ডান কি বাঁ পায়ের বড়ো আঙুলে একটা বাটালি পড়ে গিয়ে অথবা অন্য কোন কারণে বড়ো আঙুলে খোঁচা খেয়ে ঘা হয়ে সে আঙুল পেঁকে ওঠায় তাঁকে একেবারে অসুস্থপচার করে কেটে ফেলতে হয়েছিল। সে সময় তিনি আমাদের বাড়িতে ছিলেন এবং মা তাঁর অনেক সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। তিনি মাকে ডাকতেন ‘সোনাখুড়ি’ আর আমরা ভাই বোনেরা তাকে ডাকতাম ‘ডেপার ভাই’ বলে। খুব আপনজনব মতই হয়ে গিয়েছিলেন। আমার মা প্রাচীনকালের বয়স্কা স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ‘ডেপার ভাই’-এর দৃষ্টি ছেলে-দুর্গা-মোহন ও প্যারীমোহনকে আমাদের হাজরা রোডের বাড়িতে ঘরের কাজের জন্যে তিনি রেখেছিলেন। চাঁড়ালের জল অশুদ্ধ বলে কোন আর্পাতিই গ্রাহ্য করেন নি। সেই দুই ছেলে এখন কোথায় আছে, কি করছে কিংবা আদৌ আছে কি না তার খবর জানি নে। তাদের সব চেয়ে ছোট ভাই অমূল্য গ্রামে ডানপিটেমি করে বেড়াতে। পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভলান্টিয়ারী করতেন এবং এখন বলেন যে নবায়ণগঞ্জের এক অত্যাচারী ইংরেজ সাহেবকে মেরে ফেলে না কি গা ঢাকা দেবেছিলেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি ধবা পড়েন নি। এখন তিনি অল্প হয়ে গেছেন এবং পলিটিক্যাল সাফারার বলে বাংলা সরকারের কাছ থেকে একটি বৃত্তি পেয়ে থাকেন।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে যে খাল ছিল তার দক্ষিণ পাড়ে পুরৈয়ত পাড়া ও দক্ষিণের বাড়ির মাঝখানে বারুই অঙ্গলের দত্ত বাড়ির দুর্জনকে বেশ মনে আছে— যোগেন্দ্র ও তার ছোট ভাই যতীন্দ্র। যোগেন্দ্র ভাই ১৯০৯ খৃস্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে কিছুদিন তেলিরবাগ স্কুলেই মাস্টারী করে তিনি কলকাতায় গিয়ে মধ্যের বাড়ির সতীশরঞ্জনের ব্যক্তিগত সহায়করূপে কাজ করে অবশেষে ১৯২২ খৃস্টাব্দে এম্পায়ার অব ইন্ডিয়া লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে বেশ যোগ্যতার সংগে কয়েক বছর কাজ করে ১৯৫৬ সালে অবসর নিয়েছেন। যতীন্দ্র ১৯২০ সালে বি. এ. পাশ করেন কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্যে আর বেশি পড়তে পারেন নি। ইনিও তেলিরবাগ স্কুলে মাস্টারী ও সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাজ করে নেপালের রাজকুলপুরোহিতের বাড়ির ছেলেদের গৃহশিক্ষক হয়ে দু বছর

কাজ করেছিলেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিবের আফিসে পাঁচ বছর কাজ করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিবের ব্যক্তিগত সহায়ক হয়েছিলেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পদে কাজ করে ১৯৫৯ সালে অবসর নিয়ে এখন গোবিন্দনিবাস গ্রামে নানা জনকল্যাণ কাজে ব্যাপৃত আছেন। এই দু’টি ভাই আমাদের পরিবারের সংগে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

মধ্যের বাড়ির গৃহদেবতা কালচাঁদ বিগ্রহের নিত্য সেবার জন্যে ছিলেন গোসাই পুজার পুরোহিত বামমণি ঠাকুর। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামবাসী কিন্তু সপরিবারে তেলিরবাগেই থাকতেন। লম্বা ছিপছিপে রোগা মানুষ—গায়ের বগু ঘন কৃষ্ণবর্ণ। নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে গ্রামের সবাই ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। তাঁর একমাত্র পুত্র চন্দ্রকুমার অত্যন্ত ভাল মানুষ এবং বলতে গেলে গোবোচারী মানুষ ছিলেন। গ্রামের হাইস্কুলেই পড়তেন। বেশ কয়বার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হয়ে পড়াশুনার ইচ্ছা দিয়েছিলেন। চন্দ্রকুমার ঢাকুরিয়াব লালিত জ্যেষ্ঠামহাশয়ের কলকাতার বাড়িতে আগ্রহ নিয়ে চাকরির অনেক চেষ্টায় নিষ্ফল মনোরথ হয়ে শেষ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা ব্যবসাতে লেগেছিলেন। পশার কতদূর হবোঁছিল বলতে পারি না। তাঁর বড় ছেলেটি—নাম ভুলে গেছি, তিনি লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছেলে হয়েছেন। যাদবপুর থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে একটি বৃত্তি পেয়ে তিনি অক্সফোর্ডে পড়তে গেলেন। ডিরেছেন কি না খবর পাই নি।

গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দাদের কোন ব্যক্তি বিশেষকে তেমন মনে পড়ছে না। তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ না করার মানে এই নয় যে, তাঁরা সম্বোধনীয় নন। বর্ধকা-হেতু আমার স্মৃতিশক্তি কয়ই এই অনুল্লেখ্য একমাত্র কাব্য। বালক বয়সে যদিও দেখেছি সে সব মানুষের অধিকাংশই আজ আব ইহজগতে নেই। যদিও বয়স অল্প ছিল তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত এখনো জীবিত আছেন। কিন্তু আমাদের গ্রামখানি পশ্চিম কৃষ্ণগত হবাব ফলে তাঁরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে নতুন আবাস তৈরি করেছেন। তাঁদের সংগে আমার সম্পর্ক একবকম নেই বললেই চলে। গ্রাম চলে গেছে, গ্রামের সেই মানুষেরাও আজ নেই যদিও প্রভাব অলঙ্ঘ্য আমার জীবনকে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তবু তাঁদের কথা ভাবতেও এবং বলতে মনে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করি।

[ক্রমশঃ]

আবজ্ঞা

চন্দ্রশুভ্র

ভাষার ওপর অন্যভাষীর স্থূল হস্তক্ষেপ নারীর শীলতাহানির তুল্য অপরাধ। এবং ক্ষমার অধোগ্য এ অপরাধের প্রতিবিধানে অক্ষমতা ক্রীত্বের নামান্তর।

বাংলা-ভাষী বাঙালী কি তাহলে অধুনা ক্রৈবাতা-প্রাপ্ত?

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাল প্রাণ-সমুদ্রের গর্জন ভঙ্গ বঙ্গেও শোনা গিয়েছিল। হয়তো তা শেষ গর্জন। সে গর্জনে দুর্দান্ত আয়ুবশাহী সরকার শেষ পর্যন্ত মাথা নত করেছিল পূর্ববঙ্গে বাংলা-ভাষীদের পায়ের।

ভাষাব মর্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ববঙ্গের এই অতুলনীয় সংগ্রাম ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের বাংলা-ভাষী জনাচিতে কেন বিস্মৃতিমাণ সাড়াও জাগালো না, নিঃসন্দেহে তা ঐতিহাসিক ও সমাজ-তাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়।

অথচ ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের সচেতনতাও লক্ষ্য করা যায়। এখানে সাহিত্যের বাজার প্রত্যহই সরগরম, সাহিত্যের জন্য পুরস্কারও নগণ্য নয়, লেখকে-লেখকে ফলহ-কোন্দল, এবং যত লেখক, তত দল।

তবু কি আশ্চর্য, একজন সাহিত্যিকও, একজন সাহিত্য-পাঠকও, একটি সাহিত্য-সম্মেলনও বাংলা-ভাষার ওপর হিন্দীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেন না। ইতিপূর্বে কেউ করেছেন কি না জানি না, করলেও তা এত নিন্দকণ্ঠ শুনানি নি। শক্তিশালী আক্রমণকারীকে একক শক্তিতে নয়, সমবেত শক্তিতেই প্রতিহত করতে হয়। প্রতিবাদের ভাষায় লালিতা নয়, পৌরুষেব প্রয়োজন।

হিন্দী আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত বাংলা-ভাষীকে বৃক্ষে দাঁড়াতে হবে, প্রতিবোধে ষত বিলম্ব হবে, বাংলা-ভাষার জুড়িপূর্ব আশঙ্কাও তত বাড়বে।

আত্মতুচ্ছ কোন বাংলা-ভাষী যদি বলেন, শত আক্রমণেও বাংলা-ভাষা তার নিজেব জোরে টিকে থাকবে, আমি তাঁর সঙ্গে একমত হবো না। শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিকেও আন্তে আন্তে 'বিষপ্রয়োগে' হত্যা করা যায়।

হিন্দীর আক্রমণ নিঃশব্দ, এইজন্যই বাংলা-ভাষীকে অবিলম্বে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

*

দিল্লী থেকে কলকাতা আসার পথে একটি আপাতসামান্য ঘটনার আবির্ভূত এই চিন্তাগর্ভাই মনকে পীড়া দিচ্ছিল।

দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ হিন্দীভাষীদের এস্তায়ার। অতএব সেখানকার রেল-ওয়ে স্টেশনগুলির নাম নাগরী হরফে লেখা থাকাই স্বাভাবিক। ট্রেন মোগল-সরাই পেরিয়ে বিহারে প্রবেশ করার পরও একই দৃশ্য, সব স্টেশনের নামই নাগরী হরফে, কারণ বিহারেও হিন্দীর প্রাধান্য। ইচ্ছে কবে জানতে, উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া স্মারভাঙ্গা প্রভৃতি জায়গায় যেখানে অধিকাংশেই ভাষা মৈথিলী, সেখানে স্টেশনগুলির নাম মৈথিলী হরফে কি না, কারণ হিন্দী ও মৈথিলীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয় রকমের। কিন্তু আমাব ট্রেন যখন বিহার পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করল, তখনও ঐ একই দৃশ্য, যে দৃশ্য হিন্দীর দর্পিত অস্তিত্ব অসহনীয়।

বাংলাদেশের সীমানার যখন ট্রেন প্রবেশ করে তখন আমি নিদ্রামগ্ন। তারপর এক সময় ঘুম ভাঙে, প্রাতঃবাশ সেবে নিয়ে একটি বইয়ে মনোনিবেশ করি। ইতিমধ্যে সিগন্যাল না পেয়ে গাড়ি ছোট একটি স্টেশনে থামে। চোখেব সামনেই সেই অখ্যাত স্টেশনের নাম : 'তালিত'। বাংলা-দেশের স্টেশন, কলকাতা থেকে বোম্বাই দূরে নয়, অথচ শিলা-ফলকে তার নাম প্রকাশ্যে বড় নাগরী হরফে লেখা। ইংরেজীতে এবং বাংলা হরফে লেখা নামও চোখে পড়ল, কিন্তু যথেষ্ট ছোট হরফে লেখা সেই নাম দুটি নাগরী হরফের নামের পায়ের নিচে যেন সলজ্জ সন্ত্রস্ত দুই ক্রীতদাস।

তালিত-এর পরের স্টেশনগুলির নামেও ঐ একই ঘটনার স্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি : প্রকাশ্যে নাগরী হরফের পায়ে নিচে ইংরেজী ও বাংলা হরফের নাম।

জানি, নাগরী হরফ আর হিন্দী ভাষা এক নয়। কিন্তু নাগরী আর হিন্দী আজ একাত্ম, আর বাংলাদেশে বাংলা হরফকে পদদলিত করায় এই চেষ্টাই বা কেন? বাংলাদেশের স্টেশনের নাম-ফলকে প্রথমে বাংলা হরফে নাম লেখা থাকবে না কেন? দক্ষিণ ভারতের স্টেশনের নামফলকে প্রথমে কোন হরফে নাম লেখা থাকে—নাগরীতে কি?

সোজা কথায় : অহিন্দীভাষী অঞ্চলে স্টেশনের নাম প্রথমে স্থানীয় ভাষার হরফে লেখা থাকবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে বাংলার, অন্ধ্র তেলুগুতে, মাদ্রাজে তামিলে, গুজরাটে গুজরাটীতে। অন্যথায় সক্রিয় প্রতিবাদ।

বাংলাদেশের জনপ্রিয় সবকারের কাছে চন্দ্রশুভ্রের অনুরোধ, তাঁরা অনিলম্বে কেন্দ্রীয় সবকারের ওপর প্রবোজনানুভাষী চাপ সৃষ্টি করে স্টেশনের নাম বাংলা হরফে লেখানোর ব্যবস্থা করুন। নাগরী হরফেব নাম থাকুক বাংলার পবে, ইংরেজীর পাশে।

বেলদপ্তরের রাষ্ট্রদূত বাঙালী, সুতরাং বাঙালী হিসাবে আমাদের আশা, তিনি আমাদের অনুরোধ বক্ষা করবেন। এবং অহিন্দীভাষী অঞ্চলে স্থানীয় ভাষা ও হরফেব প্রতি বধ্যাযোগ্য মর্যাদা দেখাবেন।

হিন্দীমত্ত ওপবঙালাদের চক্রান্তে যদি অহিন্দীভাষীদের সামান্য আশাটুকুও পূরণ না হয়, তবে অন্য পন্থা, অর্থাৎ হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন। বাংলাদেশের যুবসমাজ তখন আলবগতবা দিয়ে নাগরী হরফে লেখা নামাবলী যুছে দেবেন, এই বিশ্বাস চন্দ্রশুভ্রের এখনো বর্তমান।

আপাতদৃষ্টিতে নাগরী হরফে স্টেশনের নামের অস্তিত্ব সামান্য ঘটনা। কিন্তু এই ধরনের সামান্যের সমবাহেই অসামান্যের আবির্ভাব। হিন্দীভাষীদের প্রতিষ্ঠানের কথা ছেড়েই দিলাম, রেলওয়ে স্টেশনে, এয়ারপোর্টে, জাহাজ-ঘাটের, খাম, পোস্ট-কার্ডে 'কিম্বা মনি-অর্ডারে যে কোন সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানেই আজ হিন্দীই উৎপাত দৃষ্টি-দ্রুতসহ। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম, আজকাল দমকম এয়ারপোর্টে যোষণাদিও হিন্দীতে হচ্ছে। হিন্দীতে হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থিত এয়ারপোর্টে সমস্ত যোষণা হিন্দী ও ইংরেজী সঙ্গে বাংলাতেও তো হতে পারে। কিন্তু তা' আদৌ হয় না কেন?

বাংলাদেশে হিন্দী উৎপাতের কারণ আমাদের অপার ঔদাসীন্য, আমরা আত্ম-তুচ্ছ এবং আত্মমর্যাদা-অচেতন। বাংলা-দেশে হিন্দীর নিঃশব্দ বিধিক্রিয়া শব্দ হ'য়ে

গেছে, বাংলাদেশের যুবসমাজ এখনই যদি সচেতন না হন, তবে ভয়াবহ পরিণাম অনায়াস-কল্পনীয়।

*

ওপরের আলোচনা থেকে চন্দ্রগুপ্তকে হিন্দী-বিরোধী মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত হিন্দী-বহু সমস্ত ভারতীয় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এবং সেই কারণেই তিনি সর্বাপেক্ষে নিজের ভাষাব মর্যাদা-রক্ষার প্রশ্নে চিন্তিত। বাঙালী শরৎচন্দ্র তার শঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রেম চন্দ্র রাহুল সংকুতায়ন কিম্বদন্তির প্রতিও তিনি সমান শ্রদ্ধা-সম্পন্ন। তাঁর ক্ষোভ অত্যন্ত হিন্দী-প্রেমীদের ঔষধতর বিরুদ্ধে, যাদের অবিস্ময়কারিতায় হিন্দীভাষা ও সাহিত্য এখন অহিন্দীভাষীদের অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই অত্যন্ত হিন্দীপ্রেমীরা একটি সার কথা ভুলে গেছেন : যে-কোন ভাষা নিজের ক্ষমতাকেই পথ কেটে চলে। অর্থাৎ কোন ভাষার ভৌগোলিক পরিধি বাড়ার জন্য বলপ্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ইংবেঙ্গী ভাষার বিস্তারনীনতা।

ভারতের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সংহতির প্রশ্নে সব, কিন্তু হিন্দীকে স্ববিশেষভাবে রাষ্ট্রভাষা কবে তুলতে গিয়ে জাতীয় সংহতির মূল্যে কঠারাম্যাত কবছেন। তা নয় পরন্তু সংবিধানবিরোধী কাজও কবছেন, কারণ সংবিধানে চোদ্দটি আঞ্চলিক ভাষাই সমান মর্যাদাসম্পন্ন।

সর্বোপরি অহিন্দীভাষী অঞ্চলে জোর করে হিন্দী চালাতে গিয়ে হিন্দী-মতের দল হিন্দীর গতিমারাকে উদ্ভেদন করছেন।

*

কিন্তু বাংলা? বাংলাদেশে বাংলাই কি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত? স্বাধীনতার পর বিশ বছর অতীত হলো, কিন্তু সরকারী কাজ-কর্মে আজো বাংলাভাষা অচ্ছন্ন। রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ-পূর্তির বছরে সরকারী কর্তাদের কাছে মহান প্রতিজ্ঞা শূন্যে ছিলাম : অতঃপর সরকারী কাজ-কর্মে বাংলা ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞা আর দশটা সরকারী ঘোষণার মতোই ফাইলচাপা পড়ে যায়। আমাদের জনপ্রিয় সরকার কি পূর্বতন সরকারের প্রতিজ্ঞাক কার্যকরী করবেন?

পবিত্র সংখ্যায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জন্য সরকারের এবং আমাদের কিস্তি অবশ্যকরণীয় সম্পর্কে আলোচনাও ইচ্ছা রইল।

॥ বিশ্ব সাহিত্যে বঙ্গমতীর অর্হত্তম অর্থ্য ॥

সেঙ্গপীষর গ্রন্থাবলী (বোর্ড বাঁধাই)	১ম খণ্ড	৩-৫০
সেঙ্গপীষর গ্রন্থাবলী	২য় খণ্ড	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী — উপন্যাস	১ম	৩-০৩
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী — "	২য়	৩-০৩
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী — "	৩য়	৩-০৩
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী — সাহিত্য	১ম	৩-০৩
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী — "	২য়	৩-০৩
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী — "	৩য়	৩-০৩
(কাপড় ও বোর্ড বাঁধাই)	প্রতি খণ্ড	৪-৫০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী	১ম	৩-০৩
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী	২য়	৩-০৩
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী	১ম	৩-০৩
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী	২য়	৩-০৩
মানিক গ্রন্থাবলী	১ম	৩-০৩
মানিক গ্রন্থাবলী	২য়	৩-০৩
দামোদর গ্রন্থাবলী	১ম	৩-০৩
দামোদর গ্রন্থাবলী	৪র্থ	৩-০৩
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী	১ম	৩-০৩
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী	২য়	৩-০৩
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী	৩য়	৩-০৩
যোগেশ গ্রন্থাবলী	১ম	৩-০৩
যোগেশ গ্রন্থাবলী	২য়	৩-০৩
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী		৩-০৩
বঙ্গলাল গ্রন্থাবলী		৩-০৩
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী		৩-০৩
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী		৩-০৩
হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী		৩-০৩
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী		৩-০৩
স্কট গ্রন্থাবলী	৩য়	৩-০৩
মাইকেল গ্রন্থাবলী — ১ম	বোর্ড বাঁধাই	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী — ২য়	"	৩-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী — ১ম	"	৩-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী — ২য়	"	৩-৫০
নুপেন্দ্রকৃষ্ণ গ্রন্থাবলী	"	৩-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী	"	৩-৫০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী	"	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মখোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী	"	৩-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী	"	৩-৫০
শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থাবলী	"	৩-০০
শৈলজা গ্রন্থাবলী — ১ম	"	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী — ২য়	"	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী — ২য়	"	৩-০০
অসমগ্র গ্রন্থাবলী	"	৩-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী — ১ম	"	৪-৫০
কালিদাস গ্রন্থাবলী — ৩য়	"	৬-৫০
সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী — ১ম	"	৩-০০
সংসাহিত্য-গ্রন্থাবলী — ২য়	"	৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী	"	৩-০০
রামপদ গ্রন্থাবলী	(কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা)	৩-৫০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। কবির প্রতিকৃতি সমন্বিত স্মরণীয় প্রচ্ছদ)		৬-০০

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

নব মন্ত্রিসভা প্রার্থীপত্র

(প্রকাশিতের পর)

অবশেষে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভীমরুলের চাকে বা দিয়েছেন। এক বাকি উচ্চ-পদাধিকারী সচিব তথা কমিশনারগণের উপর বদলীর আদেশ হয়েছে। মৌরসী পাড়ার এই সুরক্ষিত দুর্গের উপর অজয় বাহিনীর প্রথম গোলাবর্ষণ। কেবলমাত্র রাইটার্স বিল্ডিংসের সকল কর্মচারীরা খুশি হয় নি সারা দেশের অগণিত জন-সাধারণও স্বস্তিবোধ করেছে। প্রতিক্রিয়া শূন্য হয়েছে। এখনই ধরাধরি, তাম্বুর-ও তোষামোদ চলছে যদি বদলী বন্ধ করা যায়। লালবাড়ির মোহ, তার জ্বোলুস, তার যদুজ্ঞা ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যবস্থা থেকে কে বা নির্বাসন চাইতে পারে? স্বাভাবিক হত্যার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চাপা ক্লোথ কুটিল পথে আত্মপ্রকাশ করছে স্থানে স্থানে। সুযোগ পেলে তা বদলা নিতে পিছপা হবে না। প্রাক্তন মধ্যমন্ত্রী এদের প্রায় সর্বশক্তিমান কবোঁছিল রাতারাতি সচিবদের কমিশনার করে। প্রফুল্ল সেনের সরকারের বহু কুকাঁতির এরা নায়ক। ডজন ডজন কমিশনার তৈরি করার পিছনে কোন ব্যক্তি ছিল না। একটি ব্যক্তি ছিল যে, এদের দিয়ে প্রয়োজনমত সকল বেআইনী কাজকে সচল করানো আর তা সম্ভব হয়েছিল এই কমিশনারের টোপ-পিলিয়ে। অবশ্য কয়েকজনের অবৈধ-প্রমাণনের অভিযোগকে চাপা দেওয়ার জন্য আরও কয়েকজনকে কমিশনার করতে হয়েছিল।

এক দলের অভিমত যে, বদলীর এই ব্যাপক প্রচেষ্টা দক্ষতার ক্ষতি সাধন করতে পারে। দীর্ঘদিন একটি দপ্তরের সঙ্গে বন্ধ থাকার ফলে উপর থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত কাজের ও প্রশাসনিক যন্ত্রের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ পরিচিতি গড়ে উঠেছে। সুতরাং বদলীর আদেশে নতুন আগন্তুকদের পক্ষে সেই পরিচিতি গড়ে তুলতে অনেক সময়ের প্রয়োজন এবং তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে কাজের মন্দরতা আসতে বাধা ও পরিষ্কৃতির জরুরী দিকগুলো উপেক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। এ অনুমান যে একান্ত অমূলক এ কথা বলা যায় না। তবে যে পদ্ধতিতে কাজ চলে তাতে এই পরিবর্তনে খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। অবশ্য, “বাবহারের আগে ব্যোজটাকে নেড়ে চেড়ে দেখায়” কিছুর উপকার হতে পারে।

প্রতিটি উপরের অফিসার তাদের মনোমত যে ‘সংসার’ গড়ে তুলেছিল তাদের নিজ নিজ দপ্তরে, তার সঠিক অনুসন্ধান ও প্রয়োজনমত তার সংশোধন ও সংবর্ধন না হলে বাস্তব ফললাভ করা যাবে না। এই সংসার ডেপুটি থেকে পিরন-পর্যন্ত প্রসারিত। এখানে বাঁশের চেয়ে কণ্টর প্রতাপ অনেকাংশে প্রবল। এই কণ্টরদের কথাবার্তা আচরণ ও ব্যবহারই মানুষকে সরকার-বিরোধী করে তোলে। এদের চক্রান্ত এদের দুর্নীতি আমলাতন্ত্রে শিবির অসাধ্য ব্যাধি সৃষ্টি করেছে। এদের দূতসাহসিকতা ঘৃণ্য ও সীমাহীন। অবিবাহিত জনৈক মন্ত্রীকে (উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত) কি করে হাত করা যায় এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন ডেপুটি সেক্রেটারী ও ডেপুটি ডিরেক্টরের মধ্যে খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসে রসালো আলোচনার কথা আমি শুনিয়েছি। তারা কোন কোন মহিলাকে নিয়োগ করা শ্রেষ্ঠতম উপায় বলে প্রেস-প্রিয়মান করেছেন। এই ধৃষ্টতা অমার্জনীয় কিনা সে প্রশ্ন বড় নয় কিন্তু কংগ্রেস রাজত্বের শাসনযন্ত্রে এরা কি করত সেটা সহজে অনুমান করা যায়। কংগ্রেসী আয়লে উচ্চপদস্থ অফিসাররা বেশির ভাগ মন্ত্রীকে ব্র্যাকমেল করত। মিথ্যা তথ্য, মন্তব্যের কারচুপি ও মারপ্যাচ দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করত। সে অভ্যাস এখনও বদলায় নি। তাই তাদের হাতে কক্ষে খেয়ে না যায় এই সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সতর্কতা দরকার। আর সতর্কতা সৃষ্টি সম্ভব হয় যখন আমলারা, তা সে বড় আর ছোটই হোক ভয় করতে থাকে। সমস্ত প্রশাসনযন্ত্রে এমন একটা শিথিলতা ও ঔদাসীনা গড়ে উঠেছে কংগ্রেস আমলে যে, তারই স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছে অপ্রাধিকার ও ভয়হীনতা। উচ্চতম অফিসারদের বিশেষত সচিবদের মন্ত্রীদের প্রতি কটাক্ষ করতে দেখেছি মন্ত্রীদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে। কেবলমাত্র বদলীর ভয়টুকু ছাড়া অন্য কোন ভয় ছিল না। এই মলিন-সভার সম্বন্ধে এখনও ভয় আছে কিন্তু যদি কোথাও তার মধ্যে ছিদ্রের সম্ভাবনা পায় তা হলে সে রক্ষণগত শনি হয়ে উঠবে। রাইটার্স বিল্ডিংসে এখন একটি মন্ত্রীকে সবাই ভয় করছেন তিনি ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। অবশ্য সারা দেশের মানুষের সর্বাধিক শ্রদ্ধা আছে

তার প্রতি। দুরূহতম তার দায়িত্ব। খাদ্য ও কৃষির তিনি কর্ণধার। সকলেই সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে ও বিশ্বাস করছে যে কিছুর একটা সমাধান তিনি করে যাবেন।

সকল মানুষের সমান দক্ষতা থাকে না আর মন্ত্রীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেখানে দক্ষতা ও মান মোটামুটি ঠিকই থাকে। যতই তুলানুসারীর পরিবর্তন হোক। তাই প্রশাসনিক সংস্কার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। যেখানে সচিব থেকে কেরানী পর্যন্ত দক্ষতা দেখাতে ও বজায় রাখতে কোন অসুবিধা না হয়। দুর্নীতি সম্বন্ধে সেই একই কথা প্রযোজ্য। দুর্নীতি সৃষ্টিকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থার অবসান না হলে কেবলমাত্র ভয়ের স্ফারা সমাধান হবে না। পশ্চিমবঙ্গের ভিজিলান্স কমিশনার প্রস্তাব করেছেন যে, এই কমিশনের সাথে সাথে অভিযোগ কমিশনার পদ সৃষ্টি করা দরকার। এ প্রস্তাবে অভিযন্ত্র থাকলেও প্রতিকারের পথ সুগম হবে না। অভিযোগ শোনা বা জানার দরজা প্রসারিত করতে হবে সকলের জন্য এ বিষয়ে মত-বৈধতা থাকতে পারে না কিন্তু প্রতিকারের পথে পথে যে অসংখ্য বাঁক, কাঁটা ও গর্ত ছড়িয়ে আছে তা কি বাধা দেবে না? তাই পদ্ধতি পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ‘ক্যালেন্ডার অব রিটার্নস’ ব্যবস্থাপটিকে পদ্ধতিভিত্তিক করতে আগেই বলেছি।

বাস্তবভিত্তিক পলিসির উপর প্রশাসনিক দক্ষতা একান্ত নির্ভরশীল। অবশ্য বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার বাস্তবভিত্তিকতার সীমা নতুন নতুন দিগন্ত রচনা করেছে। তাই যার পক্ষে যা সম্ভব তাই বরং মোটামুটি মেনে চললে ভাল হয়। প্রফুল্ল সেন মশাই লেভী কবোঁছিলেন খাদ্য-বার্টিজ সমাধানের জন্য। অংকের নির্ভুলতা ছিল—বার্টিজের পতিমাণ ঠিক করে বার্টিজ পূরণের জন্য লেভী দিবে শস্য সংগ্রহ করতে চেষ্টাছিলেন। দূরে আর দূরে চারের অঙ্ক। কিন্তু সংগ্রহ করার মৌসিনাবী যে অবাস্তব এই সড়ক ধরার স্তানের পরিচয় বাখতে পারে নি। তাব কুফল হাতে হাতে পেয়েছে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মনোবা: কিন্তু ভুল ধরতে পেরেছে। ভুল ধবার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন

পান্থাহিক বঙ্গমতী

সচিব পরিবর্তন দিয়ে। কিন্তু এই পদ-ক্ষেপ যেন শেষ না হয়। 'আগে কহ আর' নিশ্চয়ই যেন তার অনুসরণ করে।

পলিসি রচনায় বাস্তবতা যেমন অপরিহার্য তেমনি পরিচালন পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করার মধ্যে নেতৃত্বের বাহাদুরি লুকিয়ে থাকে। সেই সুদূর অতীতে কোঁটিল্য এই ব্যবস্থার উপর যে জোর দিতে চেয়েছিলেন তার গুরুত্ব কখন পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটে নি। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ বিষয়টা আপাতদৃষ্টিতে ঘৃণ্য হলেও আমাদের শাসনতান্ত্রিক অনাচার দূরীকরণ ও অপচয় বন্ধ করা বাবে না। আমদরবারও সাহায্য করতে পারে যদি ভাঙ্গা দিয়ে চোখ ভোলা-বার উপায় না হয়।

দুরত্বের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, নতুন মন্ত্রিসভা কিন্তু ভাঙ্গা প্রকাশের মোহ ত্যাগ করতে পারে নি। ভূমি সমস্যা ও শ্রম সমস্যা বিষয়ে এই মোহ দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। অভাব অভিযোগকে প্রশমনের নামে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন। সব কিছুকে কায়মী স্বার্থের চক্রান্ত বলে এড়িয়ে গিয়ে প্রশমন করতে বা দমন কবে প্রতিরোধ করতে গেলে বিপদ এড়ানো যাবে না। তবে যদি সম্ভ্রানে এই সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে পার্টি সংগঠনের আয়তন বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য হয় তা হলে অন্য কথা। উপরে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বজায় রেখে নিচের এই প্রচেষ্টা ভাল কি মন্দ তা ভাবা বিচার করবেন। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন দেখা দিলে সেটা উপেক্ষা করা

উচিত হবে না। কোন মন্ত্রীর প্রভাবিত অঞ্চলে বিরোধী পক্ষকে (বংগ্রেস নয়) ভোটদানের শাস্তি স্বরূপ বেশ কয়েক ধব মানুষ ভিটমাটি ত্যাগ করে বাস্তব আশ্রয় নিয়েছে এই অভিযোগ উঠেছে। তদন্ত কবে দেখবেন কি? জমি বন্টনের নামে পার্টি ফান্ডে মন্ত্রীর স্বার্থান্বেষিত চাঁদা বইয়ে বাব-হার কি মন্ত্রীর আচরণবিশিষ্ট? নব গঠিত মন্ত্রিসভা মানুষের আশ্রয় দিগন্ত প্রসারিত করেছে কিন্তু তাব আকাশে অবিরেচনায় বা অজ্ঞতার বাহুব কবাল গ্রাস ছায়া ফেলতে না পারে তা দেখাব জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্নিবন্ধ অনুবোধ করি।

—এন কে দত্ত

সংকট ও সমাধান---





গোড়াতেই বহুবর্ষের পাঠকদের নব-বর্ষের সাদর সন্মিলন জ্ঞাপন করছি। এটা অবশ্য বিগত সপ্তাহে করা উচিত ছিল, কিন্তু যেদিন বাংলা ১৩৭৪ সাল এল তার আগের দিনেই বহুবর্ষের প্রেসে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনার জন্য আমরা দুঃখিত।

আমাদের এই কাঁচারটির নামের সঙ্গে যে নামটি একান্তই জড়িয়ে আছে, সেই 'বহুবর্ষ' পরিচয় নববর্ষ উপলক্ষে ষষ্ঠিকল্পে তাঁর পাঠকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, যে বছরটি গেল সেটা আর ফিরে আসবে না। এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই, তবুও বাংলা ১৩৭৩ সালটি মানুষ দীর্ঘকাল ধরে নানা কারণে স্মরণ করবে।

কেন না ওই একটি বছরই স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের ঐতিহাসিক-রূপে চিহ্নিত হবে। বিগত উনিশ বছরের দুঃসহ গতানুগতিকতা ও অযোগ্যতার বোঝাকে এক ধাক্কা সরিয়ে দিয়ে ১৩৭৩ সালেই ভারত-বর্ষ নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিবর্তনের পটভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আরও সুদূরপ্রসারী। আমার বতস্বর স্মরণ আছে, গত বছরের সূচনায় আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে চিরান্তকাল ধাক্কা দিয়ে গাড়ি ভাঙতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। আজ এক বছর পর দেখাচ্ছে সে আহ্বান নিষ্ফল হয় নি।

১৩৭৩ সালটি জন্মগ্রহণ করেছিল বিগত দ্বাদশ আন্দোলনের শহীদদের রক্তের চিহ্নসমূহকে বক্ষে ধারণ করে। জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সেই চিহ্নগুলি কোনদিনই অপসৃত হয় নি। সারাটা বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের অন্তরদেশে তুফান আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। বাইরে তার প্রকাশ খুব সামান্য হলেও, তার স্তব্ধ চেহারার দিকে তাকিয়ে আসার

আনন্দগিরির বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কেউ বুঝতে পারে নি।

কিন্তু বিস্ফোরণ সত্যি ঘটছিল, সাধিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসের সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম নীরব বিপ্লব। তার সাক্ষী হয়ে ১৩৭৩ সাল ভারতের ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ কোন একটি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নহে। -সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্য, মিশ্রিত সুখ দুঃখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবির্ভূত বিরহ মিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানা পক্ষ বাহিয়া নানা শোকতাল অতিক্রম করিয়া সংসার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর সে নববত থাকিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্য পথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।' চলো যাওয়া ১৩৭৩ সালটিও আমাদের কাছে এইরূপ।

প্রথম কালবৈশাখী

গত বুধবার ওই বৈশাখ এই বছরের প্রথম কালবৈশাখী ঘটল। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল কালবৈশাখী ঘটে নি।

ক্ষতি কম হয় নি, বিশেষ করে উত্তর-বঙ্গে। কুচবিহারে বহু বাড়ি ধ্বংস, গাছপালা উৎপাটিত হয়েছে, শহরে লাল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়েছে। রায়গঞ্জ শহরে ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে মাটির বাড়িগুলি ধ্বংস গেছে। গোপালগঞ্জ অঞ্চলেও ক্ষতি বড় কম হয় নি। বেলঘরিয়ায় একটি স্কুল বাড়ি ধ্বংস পেয়ে কয়েকজন ছাত্রী আহত হয়েছে। বনগাঁয়ে পুলিশ ব্যারাক ভেঙে পড়েছে।

যাঁরা এই ক্ষতির শিকার হয়েছেন

তাঁদের প্রাতঃ আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করব যে, এই কালবৈশাখীতে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সরকার তাঁদের দিকে সহৃদয় দৃষ্টিপাত করবেন।

কিন্তু এই ক্ষতি সত্ত্বেও নতুন বছরের এই প্রথম কালবৈশাখী দেখে অনেকেই আনন্দিত হয়েছেন। বহু যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষের মনে একটা বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কালবৈশাখী বাহ্যত কিছু ক্ষতি করলেও পরিণামে তা বড় শুভফল দেয়। অভিজ্ঞ বৃদ্ধেরা বলেন যে, যে বছরে ভালরকম কালবৈশাখী হয় সেই বছরে বৃষ্টিও বড় ভাল হয়। ধার্মিক সমগ্র ভাবতের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন এই একটি জিনিসই আজ ভারতে একমাত্র প্রয়োজনীয়।

কাজেই পর পর কয়েক বছর অনুপস্থিতির পর, অকস্মাৎ এই কালবৈশাখীর আগমনে অনেকেরই অন্তরে ধূশির প্রাবল্য বয়ে গেছে। কালবৈশাখী আপাত-ক্ষতিকর হলেও পরিণামে তা কল্যাণের দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই বুদ্ধি বাঙালী কবিরা, কালবৈশাখীর বন্দনায় পশ্চিমবঙ্গী। 'পুরাতন ক্রান্ত বছরের নিষ্ফল সমুদ্রকে' উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কালবৈশাখী করে নতুনের পত্তন। তাই কবির কথায় বলতে ইচ্ছা হয়—

চৈত্রের চিতাভস্ম উড়ায়ে

জুড়াইয়া জ্বালা শূন্যের তৃণ অন্ধুরে সঞ্চারি রস

মধু ডরে বৃকে মৃন্তুর

সে আসিছে আজ কালবৈশাখে

শনি টংকার তাহার পিনাকে

চমকিয়া উঠি, তবু জয় জয়

তার সেই শূন্যকীর্তি

কাজেই এই কালবৈশাখী পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে শুভক্ষর হোক, নববর্ষে এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

ঘেরাও প্রসঙ্গে পুনর্বাসন

পত্রিকার চক্ষু আছে দেখিতে পার না—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বোধোদয়ের' এই রচনাটি বোধ করি পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে একান্ত ভাবেই প্রযোজ্য।

বোধ হয় ঘেরাও কালিকাল পড়েছে। নতুবা যে সংবাদপত্রগুলিতে 'ঘেরাও-এর' মত 'ছোটলোক' সংবাদ কোনদিন দেখি নি, আজ সেই সব সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ঘেরাও-এর ফলাও সংবাদ দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবছি এদের মতলবটা কি? যারা এ কথা বলেন যে, কোন কোন সংবাদপত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর দালালি করা ভিন্ন আর কিছু করে না, তাঁদের কথাকে এতদিন আমল দিই নি। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে তাঁরা বোধ হয় ভুল বলেন না।

কয়েকটি কথা স্পষ্ট করে পুনরায় ঘলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। ঘেরাও নিয়ে প্রত্যেকেই আজ মাথা ঘামাচ্ছেন, দৈনিকপত্রের সম্পাদক মশাইরা বলছেন, আহা এমনভাবে ঘেরাও করলে ননীমোপাল মালিকেরা বাচবে কি করে? কিন্তু একটা কথা—ঘেরাও কি কোনদিন ছিল না?

গত সংখ্যায় আমরা দেখিয়েছি যে, গত বছরের তুলনায় এ বছরে ঘেরাও-এর লংখ্যা অতি নগণ্য, প্রায় কিছু নয় বলতে গেলে। ঘেরাও চিরকাল হয়েছে, কিন্তু আগে এই সব ঘেরাও-এর সংবাদ কোন কুলীন কাগজে ঠাই পেত না। ওই সকল সংবাদ ছাপিয়ে সম্পাদক মশাইরা নিজেদের হাত কণ্টামিনেন্ট করতে কোনকালেই রাজী ছিলেন না। একমাত্র বিভিন্ন বামপন্থী দলসমূহের মূখপত্রগুলিতেই এই সকল সংবাদ থাকত। এই কথাটি যিনি অস্বীকার করবেন তাঁকে আমরা সোজাসৃজি মিথ্যা-বাদী আখ্যা দেব।

অতএব ঘেরাও চিরকাল ছিল। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে তা নিয়ে সংবাদপত্র-গুলি মোটেই নাচানাচি কবে নি, কেন না তা কবতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের প্রতি অনেক অন্যায়েরই সংবাদ প্রকাশ করতে হত, দেখাতে হত কিভাবে পুলিশ দিয়ে শ্রমিক ঠেঙানো হয়, দেখাতে হত কিভাবে ট্রাইবনালের রায়গুলির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়, দেখাতে হত আরও অনেক কিছু, যা দেখাতে হলে পৃষ্ঠা কভার করা বিজ্ঞাপন জড়ত না। কাজেই সেই সব ঘেরাও ও অন্যান্য আশোলনের খবর একমাত্র পেতেন বিভিন্ন বামপন্থী দলের কর্মী ও সমর্থকগণ, যারা বিভিন্ন বামপন্থী দলের মূখপত্র-গুলি চয় করতেন সবসাধারণের মধ্যে

প্রসারের খবর কোনদিনই তেমনভাবে প্রচারিত হয় নি।

কাজেই আজ কোন কোন সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ঘেরাও-এর ফলাও সংবাদ দেখে একটা সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে। এগুলি শুধুমাত্র যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার চক্রান্ত। গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে শ্রমমন্ত্রী একটি বিবৃতিতে কয়েকটি কারখানার কত পক্ষের নামে সুস্পষ্ট অভিযোগ এনেছেন যে, সেই সব কারখানার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রাইবনালের রায়সমূহকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা হয়েছে, এবং যে সকল কারণে সেই সব কারখানার ঘেরাও করা হয়েছে তার প্রতিটি কারণই ন্যায্য, অন্যথা আর কোন উপায় ছিল না।

শিল্পে শান্তিরক্ষার দায়টা শ্রমিকের, মালিকেরা সব ঘোরা তুলসীপাতা এই জাতীয় মনোভাব গড়ে তুলতে কোন কোন সংবাদপত্র সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এবং কোন কোন মহলে এরা কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে। এদের এই প্রচারের বিরুদ্ধে সকলেরই সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তা আছে, যে কারণে আমরা বঙ্গদর্শনের পাতায় ঘন ঘন একই প্রসঙ্গের আলোচনা করছি।

সরকারী সংগ্রহনীতি

নববর্ষের প্রথম দিন থেকেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছেন, সরকারী ধান-চাল সংগ্রহকে জোরদার করার জন্য। মন্ত্রীদের এই সফরে আশাতীত ফললাভ হচ্ছে। যদিও এটা সংগ্রহের মরশুম নয় এবং যদিও বহু কৃষক ইতিমধ্যেই মহাজনদের কাছে তাঁদের ধান-চাল বিক্রয় করে দিয়েছেন। তথাপি সংগ্রহের কার্য ভালভাবেই চলছে, যাতে মনে হয় তিন লক্ষ টনের সরকারী টাগেটি শীঘ্রই পূর্ণ হবে।

খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ একটি গুরুত্বপূর্ণ হুঁসিয়ারী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ধান-চালের সংগ্রহ মূল্য বাড়িয়ে তা বাজার দরের সমান করে দেওয়া হয়েছে, কৃষকদের স্বার্থে পীড়ন-মূলক লোভ তুলে নেওয়া হয়েছে, আন্তঃ জেলা কর্ডন ব্যবস্থাও আর কার্যকরী নেই। এমতাবস্থায় এত সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও যাদের চাল আছে তারা যদি চাল দিতে অস্বীকার করে বা চোরাকারবারের মতলবে তা এখনো লুকিয়ে রাখে, তাহলে তাদের ক্ষমা করা হবে না। তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

বস্তুত কয়েক ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যেই দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। গোপন মজদুর সংগ্রহেব চেষ্টা পুরো-

পুরিই চলছে এবং ইতিমধ্যেই প্রচুর ধান-চাল উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল সংবাদ সংবাদপত্রে বড় একটা প্রকাশিত হচ্ছে না এবং না হওয়ার পিছনেও বোধ হয় কয়েকটি স্বার্থের কিছু খেলা আছে। আমি বিশেষভাবে জ্ঞান একটি দৈনিক পত্রিকায়, হুগলী থেকে একজন সংবাদদাতা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মজদুর উদ্ধারের সংবাদ এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোন গুরু কারণে সেই সকল সংবাদগুলিকে প্রকাশিত না করে চেপে দেওয়া হচ্ছে। আরও একটি প্রখ্যাত পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক সেদিন আমার কাছে দৃঢ় করে বলছিলেন যে, তাঁর দেওয়াও এইবকম গোপন মজদুর উদ্ধারের বহু সংবাদ সফলতম পত্রিকাটি ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রকাশ করে নি। অথচ এই সংবাদগুলি প্রকাশিত হলে মজদুরদের ভয় পেয়ে মজদুর ছেড়ে দিতে পারে, জনসাধারণও জানতে পারেন সরকার কি করছেন।

অভিজ্ঞতার নিরিখে খাদ্যনীতির আরও দু'একটি মৌলিক পরিবর্তন করা হয়েছে; তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে ধান-কলগুলি চালের পাইকারী কেনাবেচা করতে পারবে না। তারা একমাত্র সরকারকেই তাদের সমুদয় স্টক বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে। নিঃসন্দেহে এটা খাদ্যনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন। চালকলওয়ালাদের দুর্ভিক্ষনিষেক কাজ-কর্মের অসম্পন্ন পরিচয় আমরা দিয়েছি, এগুলির জাতীয়করণ করা এই মর্মে প্রয়োজন।

এখনো পর্যন্ত কেন্দ্র কটকটক চাল দেবে তা জানা যায় নি, তবুও নিজস্ব উদ্যমে তব করে যুক্তফ্রন্ট সরকার চাল সংগ্রহে সচেষ্ট পড়েছেন। ইতিমধ্যেই অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, কেন না ধান-চাল সংগ্রহের মরশুম দীর্ঘকাল আগেই চলে গেছে এবং বিগত সরকারও একদানা শস্য সংগ্রহ করে রেখে যায় নি। বর্তমান সংগ্রহনীতির সাফল্যের উপরই পশ্চিমবঙ্গের গোটা বছরটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

হাওড়া-নৈহাটি ও শিমানদহ-ব্যান্ডেল লোকাল চাল হোক

কয়েকদিন পূর্বে হুগলীঘাট স্টেশনে যাত্রীরা একনাগাড়ে ছত্রিশ ঘণ্টা ট্রেন আটক করে একটা রীতিমত রেকর্ড করেন। কেনে সভ্যদেশে একটি পাথে পব পর তিন দিন ট্রেন বন্ধ হয়ে আছে, এটা যেন কল্পনাই করা যায় না। অথচ এটাই ঘটেছে।

কারণ সেই সনাতন। নৈহাটি-ব্যান্ডেল লাইনে ট্রেনের স্বল্পতা। অথচ যাত্রী স্বল্প নয়। কাজেই ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

গাণ্ধ্যীক বঙ্গমতী

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এই বঙ্গদেশে নৈহাটি-চুচুড়া লগ্ন সার্ভিসের শোচনীয় দুর্দশার দৃশ্য এঁকেছিল। গঙ্গা শূন্য হয়ে যাওয়ায় লগ্ন পারাপার, হুগলী জেলার সঙ্গে চব্বিশ পবনা জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। একদিকে একটি জেলা শহর অপরাধকে একটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চল, প্রতিদিন বিশ হাজার যাত্রীর পারাপার হবার সমস্যা এতদিন মেটাচ্ছিল ঐ লগ্ন কোম্পানী, কিন্তু গঙ্গার বর্তমান অবস্থায় ভাসমান জেট প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত (হবার সুযোগ আদৌ আছে কি না বলা যায় না) ঐ কোম্পানীর পক্ষে সঙ্গত কারণেই লগ্ন চালানো সম্ভবপর হচ্ছে না। কাজেই দুই জেলার নির্ভরযোগ্য যোগাযোগের পথ মাত্র দুটি অবশিষ্ট আছে। একটি বাসীব বিবেকানন্দ ব্রীজ আর হুগলীর জুবিলী ব্রীজ। তদুপরি নৈহাটি ও তৎসংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে, যেখানে কয়েক লক্ষ মানুষ বাস করে, একটিও হাসপাতাল নেই। প্রতিনিয়ত অজস্র রোগী চুচুড়া সদর হাসপাতালে গঙ্গা পার হয়ে চিকিৎসার জন্য আসে। কল-কাবখানায দুর্ঘটনা ঘটলে, বিংশ শতকের বর্ত্ত দশকেও তিন মাইল পথ ঠেঁগিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে, আহত ব্যক্তিকে চুচুড়া হাসপাতালে আনতে হয়, বহু ক্ষেত্রে গঙ্গার মতোই তাদের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে।

যতদিন লগ্ন ছিল, ততদিন বা হোক করে চলত। এখন লগ্ন প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লোকদের ভরসা নৈহাটি-ব্যান্ডেল রেল লাইন। নৈহাটির পথের স্টেশন গরিফা, তারপর পূর্ব পাথ হয়ে হুগলীঘাট, তারপর ব্যান্ডেল। নৈহাটি থেকে ট্রেনে উঠে হুগলীঘাটে নামলেই বা হুগলীঘাট থেকে ট্রেনে উঠে নৈহাটিতে নামলেই পাবাপারের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাব জন্য ট্রেনের সংখ্যার বাধার প্রয়োজন। সারাদিনে মাত্র বারোবার ট্রেন যাওয়া-আসা করে। প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছই নয়। কোন-দিনই ছিল না, যাত্রীদের অভিযোগ বরাবর; তবে এবারে লগ্ন সার্ভিস বন্ধ হওয়ায় অবস্থাটা শূন্য চরমেই ওঠে নি, সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে।

এই অবস্থায় আমাদের নিজস্ব একটি প্রস্তাব আছে, যা একমাত্র কার্যকরী ও ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব। নৈহাটি-ব্যান্ডেল লাইনে ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে বলায় না। আমাদের প্রস্তাব গতিপথের একটু পরি-বর্তন করা হোক। হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকালগলিকে পূর্ব পার করে নৈহাটিতে আনা হোক, অনুরূপভাবে শিয়ালদহ-নৈহাটি লোকালগলিকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত নিয়ে আসা হোক। আরও বুঝিয়ে বললে ট্রেনগুলির গতিপথ এইরকম হবে

হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল, তারপর হুগলী-ঘাট, তারপর গরিফা, তারপর নৈহাটি—এই হবে হাওড়া-নৈহাটি লোকালের যাত্রাপথ। অনুরূপভাবে শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি, তারপর গরিফা, তারপর হুগলী-ঘাট, তারপর ব্যান্ডেল এই হবে শিয়ালদহ-ব্যান্ডেল লোকালের যাত্রাপথ।

এইটুকু করলে গাড়ির সংখ্যা বাড়তে হবে না। উল্টে যে গাড়িটি নৈহাটি-ব্যান্ডেল লাইনে যাতায়াত করছে, সেটিকে সরিয়ে অন্য স্থানে দেওয়া চলেবে, যাত্রীদের অভিযোগও দূর হবে, তদুপরি লগ্ন সার্ভিস বন্ধ হওয়ায় দুটি জেলার যে যোগসূত্র বিনষ্ট হতে চলেছে, তার একটা সমাধান হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি নিবেদন (২)

এবারে ম্যানেজিং কমিটি নামক বন্ধু-টির কথায় আসা যাক, প্রতিটি ইন্সকুলের কাছেই বা একটা অভিযাপ ছাড়া আর কিছই নয়। ইন্সকুল চালানো একালে একটি লাভজনক ব্যবসা এবং বহু টাকা চালা-চাষির সুযোগ এখানে থাকে বলে বহু অব্যাহত বাড়ি ইন্সকুলের ম্যানেজিং কমিটি-গুলিতে ভিড় করে।

ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারীর হাতেই ইন্সকুলের অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলি ন্যস্ত থাকে বলে হেডমাস্টারকে সব সময় ম্যানেজিং কমিটির ডিকটেশনে চলতে হয়। এবং এই ট্রাডিশানটা আজকাল এতই শিকড় গেড়ে বসেছে যে, স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হেডমাস্টারদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষকদের ভাগ্য, বেতন, ছুটি থেকে আরম্ভ করে প্রশ্নপত্র, পুস্তক নির্বাচন, প্রমোশন সমস্ত কাজই আস্তে আস্তে এই ম্যানেজিং কমিটির কৃষ্ণগত হয়ে পড়েছে।

অথচ কোন জাতীয় লোক নিয়ে এই পরিচালক সমিতি গঠিত হয়? চন্দন-নগরের একটি ইন্সকুলকেই আমাদের বন্ধু প্রমাণের জন্য ব্যবহার করছি। এই বিদ্যালয়টিতে কোনদিনই পরিচালক সমিতির কোন ফেয়ার ইলেকশন হয় নি। সম্প্রতি জনসাধারণের চাপে এই প্রথম তা হয়েছে। যদিও নতুন পরিচালক সমিতি কাজ করার অধিকার পেয়েছে কি না জানি না। পূর্বতন ম্যানেজিং কমিটির জনৈক মধ্যমিগ ছিলেন একজন আগরওয়ালা, যার বাড়ি সম্প্রতি আবার সার্চ হয়েছে, বেজাইনী মালপত্র রাখার অভিযোগে। অপরাপর সদস্যগণেরও বিশেষ সামাজিক সন্মান নেই। বরং কোন কোন বিষয়ে রীতিমত দুর্নীতি আছে। এরা যে কিভাবে নির্বাচিত হয়েছিল সে একটি রহস্য। অথচ এই ইন্সকুলটি প্রচুর টাকা সরকারী সাহায্য

পেয়েছে এবং জনসাধারণ সঙ্গতভাবেই সন্দেহ করেন যে, সেই টাকার অবকাঠামোই অপব্যবহৃত হয়েছে। বিন্টিং ও ফার্নিচার ব্যবসা বা ব্যয় করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে তা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আরও বহু অভিযোগ এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে আছে। সে কথা আমরা যথাস্থানে পরে প্রকাশ করব।

উপরের বক্তব্য থেকে একটা কথাই প্রমাণিত হয় যে, ম্যানেজিং কমিটির ডাল কাজ করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু খারাপ কাজ করার, বিশেষ করে যেখানে অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলি জড়িয়ে আছে, সুযোগ অসাধারণ। উপরে আমরা যে বিদ্যালয়টির উদাহরণ দিলাম এটা কোন একক বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়। খোলা-খুলিভাবে বলতে হলে এক কথায় বলা যায় যে, প্রতিটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি এক একটি চোরের আড্ডা।

অথচ কোন বিদ্যালয়তনব একটি পরিচালক সমিতি না থাকলেই নয়, অথচ যতমান ধরনের পরিচালক সমিতিগুলি কাজের চেয়ে অকাজই করে বেশি। এই জন্য এই পরিচালক সমিতিগুলির গঠন-তন্ত্রের আমূল পরিবর্তন করা উচিত। যাতে অব্যাহত ব্যতিরাম ম্যানেজিং কমিটিতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ম্যানেজিং কমিটিগুলি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের নিয়েই গঠন করা উচিত। পুরাতন বিদ্যালয়ের প্রতি প্রাক্তন ছাত্রদের একটা স্বাভাবিক গম্বুজ থাকে এবং চিরকালই তা থাকতে বাধ্য। কালেই একমাত্র এদের নিয়েই ম্যানেজিং কমিটিগুলি গঠিত হলে বিদ্যালয়নন্দনের আত্মন্ত্রণ দমনীত বন্ধ হবে।

স্বাধ্যামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন (৬)

ইতিপূর্বে আমরা স্বাধ্যামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অনেকগুলি স্পেসিফিক কেস তুলে ধরেছি। যদিও সেগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে এমন কোন খবর এখনও আমরা পাই নি যদিও আমরা তা একান্তভাবে আশা করেছিলাম।

এবারে আমরা আরও একটি বিশেষ প্রসঙ্গ তুলে ধরি। যাঁ বিরুদ্ধে আমাদের এবাবে অভিযোগ তিনি হচ্ছেন নীলম্বরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের রেডিওলজি বিভাগের একজন কর্তব্যক্তি। তিনি গত সাত বছর ধরে এখানে আছে, যদিও তিনি এখন বিশেষ অস্ট্রেন্টশন ভোগ করছেন।

এই বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ খুবই স্পষ্ট। প্রথম হচ্ছে, তাঁর অভ্যন্তরিত ব্যবহার, যা শূন্যমাত্র রোগীদেরই নয়, তাঁর সহকর্মীদেরও বিরত ও বিরক্ত করে।

এখন

ন্যাশনাল একো

মডেল
এম-বি-টি-১৫০৪
ভারতের একমাত্র
ট্রানজিস্টর ও

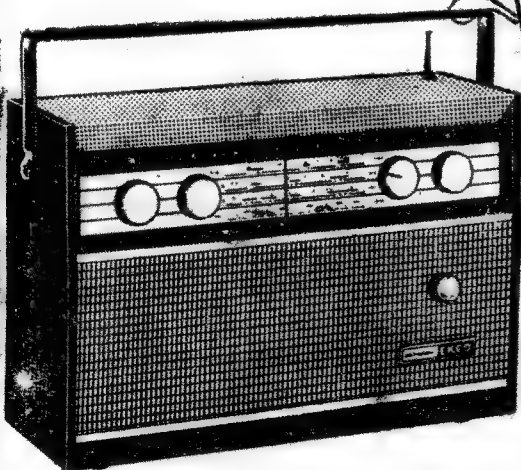
মেইনস্ সেট আর
সেইসঙ্গে পাবেন অতুলনীয়
অপূর্ব টিউনিংয়ের
ব্যবস্থা!

পতন্থর আমরা প্রথম ট্রানজিস্টর ও মেইনস্ সেট, মডেল
এম-বি-টি-১৫০৪ উপস্থিত করেছিলাম। এবছর আমরা আরও
এগিয়ে গেছি। এখন এম-বি-টি-১৫০৪ মডেলের সঙ্গে আপনি
পাবেন এক অতুলনীয় অপূর্ব টিউনিংয়ের ব্যবস্থা, যার ফলে যে
শর্ট ওয়েভ স্টেশন থাকা কখনো-কখনো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে তা
টিউন করা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে। আরামে বাসে স্পষ্ট

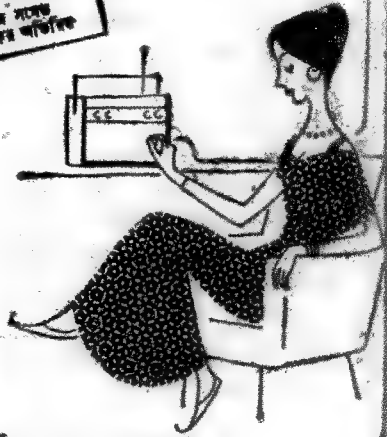
চমৎকার আওয়াজে শুনতে পাবেন।
অন্তান্ত বৈশিষ্ট্য: ১০টি ট্রানজিস্টর ও ডায়োড; ৪ টি ব্যাজ;
টোন কন্ট্রোল; ইলিপটিক্যাল স্পীকার; মেমোরি, টেপ রেকর্ডার
ও ব্যক্তি স্পীকারের জন্য সংযোগ-ব্যবস্থা। ৬ টি সেল
ব্যাটারি প্যাক বা ২০-ভোল্ট এ-সি মেইনস্-এ কাজ করে।

GRA

বেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিঃ
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাস • দিল্লী
• বাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ • পাটনা



মাত্র মাত্র
৫৪১ টাকা
একটিই সঙ্গে
অন্যান্য বই আভিষ্কার



আমি ন্যাশনাল-একো এর
প্রতিটি সেটের স্বাক্ষর প্রতীক

© 1954 National Ekko

সাম্প্রতিক বঙ্গমতী

অপরপর স্ট্রাইকের তিনি নানান কারণে উভ্যন্ত করেছেন এবং করে চলেছেন।

তার কর্মশক্তির কয়েকটি নমুনা শুনুন। শুধুমাত্র এক-বের দিনটা জানিয়ে দেবার জন্যই রোগীদের মস্তুর পর মস্তি আটকে রাখা হয়। প্রয়েটিং লিফ্টে রোগীদের নাম উঠতে পারাটা ভাগ্যের কথা, বহুক্ষেত্রে যেগুলি খুবই শক্ত কেস, সেগুলিরও এক-রে হতে অনাবশ্যক দীর্ঘদিন সময় লাগে। এই দীর্ঘদিন সময় লাগা ও রোগীদের হয়রানির কারণ হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটি। যে যন্ত্রটিতে এই কাজ হয় তা এতই সেকেন্ডে এবং তার পদ্ধতি এতই হতাশাজনক যে, তা দিয়ে একাধিক কাজ চলে না।

অঙ্ক এ মহামান্য ব্যক্তিটি নতুন যন্ত্র ব্যবহার করবেন না। মাত্র কয়েক বছর আগে একটি শক্তিশালী এক-রে মেশিন বসানো হয়েছিল, কিন্তু এ, সি, কলস্ট পাওয়া গিয়ে না, এই অজ্ঞানতায় তিনি তা চালান নি। যার ফলে প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগৃহীত এই মেশিনটি অকেজো হয়েই পড়ে আছে।

আরও একটি এক-রে যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে আছে কয়েক মাস ধরে, যদিও সেটিকে ক্ষুদ্র দৈবর প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। অনুরূপিক যন্ত্রপাতি, স্পেরার পার্টস প্রভৃতির অভাব না থাকা সত্ত্বেও এ মেশিন সারানোর কোন ব্যবস্থা তিনি করতে অনিচ্ছুক। এর ফলে প্রত্যহ প্রচুর মূল্যবান এক-রে ফিল্ডও নষ্ট হচ্ছে।

ফিল্ডের স্টক রাখার পদ্ধতিও নোখ-খুঁত। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রত্যহ বহু ফিল্ডের মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হয়। পুনরায় এক-টেনশন পাবার আগে পর্যন্ত আলোদের আলোচ্য ব্যক্তিটি কখনও নিয়মিতভাবে হাসপাতালে ছাঁজরা দিতেন না।

আমরা শুধুতে পারি না, এমন সরকার তাদের মিস্যালভর পরিবর্তন করে এই ভুললোককে শুনায় একটেনশন দিয়েছেন। আমরা স্বাধীনতার নিকট অন্বেষণ

জানাবো যে, এই ব্যক্তি সম্বন্ধে যেন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালে এক-রে ব্যবস্থার উন্নতি তথা আধুনিকীকরণ দ্রুত সম্পন্ন হয়, যাতে রোগীদের অনাবশ্যক হয়রান হওয়া থেকে রেহাই মিলতে পারে।

একটি আবেদন

হুগলী থেকে শ্রীমতী বাশী ঘোষ আমাদের কাছে একটি পত্রযোগে জানিয়েছেন যে, তাঁর স্বামী শ্রীসদাশীতকুমার ঘোষ



শ্রীসদাশীতকুমার

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে হুগলী গবর্ন-মেন্ট হোমিং কলেজে লাইব্রেরিয়ান থাকা অবস্থায় কংগ্রেস-বিরোধী মতবাদ পোষণ করার জন্য শিপিং অফিসে গ্রেপ্তার হন এবং তারপর প্রায় এক বছর সাসপেন্ড থাকার পর তখনকার শাসকশক্তির হস্তক্ষেপে তাঁকে ১৯৫৯ সালে এপ্রিল মাসে পুন-ব'হালু করে বাড়িগোমে বদলি করে দেওয়া হয়, সেখান থেকে আবার বারাসাত কলেজে। সাসপেন্ড থাকাকালীন তিনি মূল বেতনের এক-চতুর্থাংশ পেয়েছেন এবং বাকিটা, প্রায় হাজার টাকার মত, শাস্তি

হিসাবে তিনি আজও পান নি। শ্রীমতী ঘোষের বক্তব্য এই যে এখন যখন এই রাজ্যে জনদরদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন তাঁর স্বামীর প্রাপ্য অর্থ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, বিপদের কূলে রতমান সরকার যখন ভূতপূর্ব সরকারের নিকট রাজ-নৈতিক কারণে শাস্তিপ্ৰাপ্ত কর্মচারীদের বিষয় বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছেন।

দুর্গাপুর কোক-ওভেন

শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসদাশীত ধাড়া দুর্গাপুরে রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন দুর্গাপুর কোক-ওভেন প্রজেক্ট ও দুর্গাপুর কেমিক্যালের কার্যকলাপ, বিশেষ করে উক্ত সংস্থায় লোকসান, দুর্নীতি ও সাধারণ শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে তদন্ত করে দুটি মস করার জন্য অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিটি বসাবার যে নিশ্চয় করেছেন তা বাস্তবিকই অভিনন্দনযোগ্য।

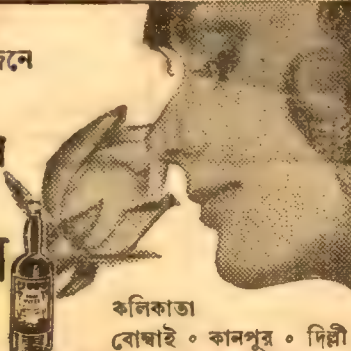
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গত বছরে দুর্গাপুর কোক-ওভেনে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলির সম্বন্ধে তদন্ত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে ওই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের চাপে সমস্ত বিষয়গুলিকে খামাচাপ দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীধাড়া সম্প্রতি উক্ত দুটি সংস্থা পরিদর্শন করে ওখানকার ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন যে ওই দুটি সংস্থায় সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের ক্যান্টিন ও খাওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, হাসপাতালের সুযোগ নেই বললেই চলে। সাধারণ শ্রমিক কর্ম-চারীগণ যে-কোন স্বার্থভাণ্ডে প্রতুত, কিন্তু তাঁদের বিন্দুমাত্র মর্যাদা দেওয়া হয় না। তা ছাড়া তাঁদের বহু নান্য অভিযোগ আছে। তিনি মাননীয় রক্ষা অ্যাবস্থা, বিশেষ প্রশাসনিক অবস্থা ও দুর্নীতির বহু প্রমাণ দেখিয়েছেন।

বহুত বিগত সরকারের আমলে শিল্প-ক্ষেত্রে যে নিরাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলির প্রতিটি রম্বে যেভাবে অনাচার ও দুর্গতির শিকড় বিস্তার লাভ করেছিল, তাতে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যদি শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ধরনের আমলাতান্ত্রিক বাধাকে উচ্ছেদ করে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে সাফল্যের নিদর্শন দেখাতে পারেন তবেই তা জাতির জীবনে একটি নতুন আশার সঞ্চার করবে।



উৎসবে
অনুষ্ঠানে, নিত্যপ্রয়োজনে
বেস্ল
কেমিক্যালের
উৎকৃষ্ট
রোজ ওয়াটার
(গোলাপজল)
ব্যবহার করুন



কলিকাতা
বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

আমিথুগোষ্ঠ প্রকাশ মহাভারত



অনন্ত চিত্র

শ্রিতীর দিনের নিদারুণ আভিজাত্য

মাগরখানা পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে একবার দলের সংখ্যা গুণে নেওয়া হল—সবাই উপস্থিত, কেউ পেছনে পড়ে নেই। রক্তত (সেন) সবার আগে ঝোপঝাড় এঁড়িয়ে বা কোন জঙ্গল জায়গার বাধা কেটে-কুটে পরিষ্কার করে পথ দেখিয়ে চলেছে।

রক্ততের শারীরিক শক্তি ও তদুপরি দম হয়তো দলের সবার চাইতে বেশি। সে শরীরচর্চার কারও থেকে কম ছিল না। তাছাড়া ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে চট্টগ্রামে তার নাম প্রসিদ্ধি পেয়েছে। কাপ, মেডেল ও শীটে তার ঘর ভর্তি। ম্যাচ খেলে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুটবল-মাঠে প্রায়টিস করে রক্তত খেলোয়াড় হিসেবে নিজের খ্যাতি বাড়ানোর প্রচেষ্টা করেছে প্রচুর। রক্তত ফুটবল স্টেয়ার, রক্তত শরীরবিদ—খেলাধুলা ও ডন-কুস্তি করে দক্ষতা লাভ করেছে রক্তত।

সাধারণতই মনে হবে—এ আর কি যেমন হয়, ফুটবল খেলে ও শরীরচর্চা করেই দিন কাটাতে রক্তত! কিন্তু সাধারণ খেলাধুলা ও শরীরচর্চার জগতে রক্তত ছিল ব্যতিক্রম—সবার চাইতে আলাদা। শরীরচর্চা ও খেলাধুলাতে রক্তত যেমন দক্ষ ছিল তেমনি আবার চিত্রাঙ্কনেও তার নিপুণ হস্তের তুলি তাকে শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে। যখন সে মাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন একবার বাংলার ল্যাট স্যার স্টানলী জ্যাকসন তাদের স্কুল (সরকারী কলেজিয়েট স্কুল) পরিদর্শন করতে আসেন। সেই সময় বালক রক্তত দু'মিনিটের মধ্যে ল্যাটসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রতিভূতির পেন্সিল স্কেচ করে তাঁকে উপহার দেয়। বলা বাহুল্য রক্ততকে শিল্পচর্চার জন্য ল্যাটবাহাদুর একটি বৃত্তি মঞ্জুর করেন এবং কলকাতা আর্ট কলেজে সে যদি কখনও ভর্তি হয়

তবে তাকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

রক্ততের পিতা চট্টগ্রামের প্রখ্যাত উকিল শ্রীরজনলাল সেন আর খ্যাতনামা চন্দ্র-চাঁকিংসক 'কিরণ সেন তার নিজের কাকা। তাঁরা ও পরিবারের সকলেই রক্ততের শিল্পপ্রতিভা ও তার প্রতি ল্যাটসাহেবের অতর্কিত আগ্রহ এবং অনুগ্রহ দেখে বে খুবই উৎসাহ পেয়েছেন তাঁ সহজেই অনুমান করা যায়। রক্ততের আর একটি কৃতিত্বের কথা এখনও বলা হয় নি—সুদক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় রক্তত, পারদর্শী শক্তিবিদ রক্তত, সুনিপুণ শিল্পী রক্তত, লেখাপড়ায়ও ততোধিক কৃতিত্ব অর্জন করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই সে রক্তত, যে লোকনাথের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক ধাক্কায় A.F.I. অর্মানীর লোহ-কপাট ভেঙে চুরমার করে।

রক্তত আগে আগে—আর সবাই তাকে অনুসরণ করে পাহাড়ের নিচে মাঠে নেমে এল। এখানে অম্বিকাদা আবার তাদের Fall-in করালেন। পাহাড়ের রাস্তায় চলার সময় তারা অল্প-কতদূর গিয়েই একবার করে গুণে গুণে দেখেছে তারা সকলেই উপস্থিত কিনা। বন-জঙ্গল, উঁচু-নিচু জায়গা, রাশের অন্ধকারে ঘোরা পথে চলা প্রভৃতি কারণবশত সব সময়েই তাদের আতঙ্ক ছিল যদি কেউ কোথাও হারিয়ে যায় বা পেছনে পড়ে থাকে।

পাহাড়ের নিচে মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে গণনা শেষ হওয়ার পর অম্বিকাদা তাদের বললেন শুরুর পড়ে বিশ্রাম করতে। সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে বাজিদবোস্তাম দরগা—একজন ফকির সাহেবের সমাধিস্থান। এটি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই তীর্থক্ষেত্র। এই দরগাটি একটি পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপিত। বেশ অনেকখানি পাহাড় বেয়ে উঠে তারপর দরগায় পৌঁছনো যায়। পাহাড়ের

পথে দরগার ওঠার সময় একটি বিশেষ নামকরা পুকুর আছে। পুকুরটি প্রায় হাজার বছরের পুরনো। এই পুকুরে শত শত কাছিম ও মাছ একসঙ্গে বাস করে। কেউ এই পুকুরের মাছ বা কাছিম ধরে বিক্রি করে না। প্রত্যেকেই এই তীর্থস্থানের পুকুরটির মাছ ও কাছিমের অপূর্ব সংমিশ্রণের দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন না। মন্দির, কলা প্রভৃতি নিয়ে মাছ ও কাছিমদের ডাক দিলে তারা জল থেকে ভিড় করে শান-বাঁধান মস্ত বড় সিঁড়িতে উঠে এসে খাবারগুলি খায়। এ এক অপূর্ব দৃশ্য! ফকির সাহেবের দরগার সঙ্গে এরূপ একটি বিচিত্র পুকুর দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এই পুকুরের সীতীর ইতিহাস আমি বলতে পারবো না। আমার কাছে ফকির সাহেবের দরগার আকর্ষণ কোনদিনই ছিল না বললেই হয়; তবে এই জীবন্ত পুকুর যে বিশেষ ধরনের ঐতিহ্য বা বৈচিত্র্য যুগ যুগ ধরে বহন করে এসেছে তা' দেখে আমি একসময় মুগ্ধ হয়েছি। বাজিদবোস্তাম দরগার নাগরখানা পাহাড়ের উত্তরে সংলগ্ন একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত।

যেখানে আমাদের প্রধান বাহিনীকে অম্বিকাদা শুরুর বিশ্রাম করতে বলেছেন সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে দরগার পাহাড়টির নিচে আরো একটি জলাশয় ছিল। লোকেরা এই পুকুরের জল খাওয়ার জন্য ব্যবহার করত। আমাদের সৈনিক বন্দুরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এই পুকুরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়েছে ও যে বস্তু পারে জল খেয়েছে। তাদের সমস্ত গতি-বিধি অতি গোপনে ও সন্তর্পণে করতে হয়েছে। তাই তাদের ওপর আদেশ ছিল শোয়া অবস্থায় যতদূর সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে বিশ্রাম করতে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জলের জন্য আধ মাইল যাওয়া-আসা করতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে ভেবে অম্বিকাদা তাদের সেখানে নিঃশব্দে বিশ্রাম করতে আদেশ দিয়েছেন। অনেকে

সাহিত্যিক বসন্ত

এই সময়টুকুর ভেতরই বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। আশ্বকাদা, নির্মলাদা, লোকনাথ ও মাস্টারদা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে ব্যস্ত। তখনও কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছতে পারেন নি।

অমরেন্দ্র নন্দী শেষবারের জন্য সবাইকে জিজ্ঞেস করল—“আর কেউ জল খেতে চাও—আর কেউ পুকুরে যাবে?” হু-চার-জন তখনও ঘুমে অচেতন। অমরেন্দ্রের ডাক শুনে হু-একজন জেগে উঠল। তারা অমরেন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে জল খেয়ে ফিরে এল।

সবার জল খাওয়া, হাতমুখ ধোয়া প্রভৃতি শেষ হওয়ার পর আশ্বকাদা নিশ্চিন্তে ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলে গেলেন—“Be ready, be ready!” তারা সবাই কোলা, রাইফেল, রিভলভার, কাতুজ প্রভৃতি নিয়ে তৈরি হল—এখনই আবার মার্চ শুরু করতে হবে। লোকনাথ ও আশ্বকাদা এবার সবার আগে আগে পথের নির্দেশ দিয়ে হাটতে লাগলেন। বাজিদ-বোস্তাম, দরগার গা ঘেঁষে যে রাস্তা উত্তরে গেছে সেই পথ ধরে তারা হেঁটে চলেছে। এই সময় আশ্বকাদা বেছে বেছে কয়েকজনের কাছে জানতে চাইলেন, ফতেয়াবাদে থানার এলাকা কে চেনে এবং ফতেয়াবাদে কার বাড়ি? ফতেয়াবাদের একজন এগিয়ে এল। তাকে পাশে নিয়ে আশ্বকাদা চলেছিলেন। সেই তরুণ যুবক রেল লাইন ধরে ফতেয়াবাদের দিকে সবাইকে পরিচালিত করছিল। আশ্বকাদা তাকে বললেন সে যেন তার বসন্তবাড়ি ও রেল স্টেশনের কাছে না গিয়ে দূর দিয়ে ঘুরে যায়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী আবার তারা মাঠে নেমে পড়ল এবং রেল স্টেশন ও পরিচিত গ্রামটি এড়িয়ে নিরাপদে মার্চ করে চললো।

আশ্বকাদা ফতেয়াবাদের সেই তরুণের কাছে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন যে ‘লাইলার হাট’ সে চেনে কিনা? এই প্রাসঙ্গ্য হাটটি সম্বন্ধে তার পূর্বে জ্ঞান ছিল। আশ্বকাদা ফতেয়াবাদের সেই ছেলের সঙ্গে নির্মলাদা, লোকনাথ, রজত ও আর একজনকে লাইলার হাটে পাঠালেন। আশ্বকাদা তাদের সঙ্গে টাকা দিলেন এবং বললেন যা খাবার পাওয়া যায় তাই যেন নিয়ে আসে।

রাত তখন প্রায় দুটো বেজেছে। পাঁচজনেরই মিলিটারী পোষাক পরা। হাতে তাদের রাইফেল এবং প্রত্যেকের কোমরে রিভলভার। তারা পাঁচজন জন-মানবহীন নির্জন হাটে গিয়ে উপস্থিত হল। রাত দুটোর সময় হাট বসে না। তাই রাতে হাট দেখে মনে হয় যেন একটি পরিভ্রমণ। দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া

দোকানখর আছে—সবগুলোরই দরজা বন্ধ, সকলেই ঘুমেছে।

অন্যদের অগোচরে লোকনাথ তাদের মধ্যে একজন দোকানীকে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে ওঠালো। সেই দোকানদার এই পাঁচজনকে সৈনিকবেশে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেল। সভরে জিজ্ঞেস করল—‘কি চান?’ লোকনাথ দোকানীকে দেখে বেশ যত্নে পেরেছে যে সে তাদের সৈনিক-বেশ দেখলেও ঠিক ইংরেজ সরকারের সৈনিক বলে মনে করে নি। তবু লোকনাথ বলল—‘আমরা বিস্কুট, পাউরুটি, কলা, চিড়ে প্রভৃতি কিনতে এসেছি। তোমার দোকানে যা আছে সব দাও।’ দোকানী প্রশ্ন করলেন—‘এত খাবার কি হবে? কোথায় নেবেন? কি ভাবে নেবেন?’

লোকনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—‘আমরা পুলিশ। হাটহাজারী হাই-স্কুল মাঠে আমরা ক্যাম্প করেছি। আমরা ডাকাতদের ধরতে এসেছি। তাদের খবর পেলে দেবে—পুরস্কার পাবে।’ ইতিমধ্যে দোকানীর সঙ্গে আরও দু’জন এসে জুটলো। তারাও লোকনাথ-দের আপদমস্তক খুব নিরীক্ষণ করে দেখছে। পুলিশ বলে তাদের ধাপ্পা দেওয়া খুব সহজ নয়। ক্রান্ত শ্রান্ত দেহ—স্নান নেই, খাওয়া নেই, নিদ্রা নেই—তাছাড়া সুন্দর ইন্দিয়া কলার পোষাকের বদলে কাদা-মাটি মাখা খাকি পোষাক তাদের পরিধানে ছিল বলে পুলিশের দল যে তারা নয় সে রূপ অনুমান করা দোকানীদের পক্ষে খুব শক্ত ছিল না। ইংরেজ সরকারের পুলিশ নয় বলে বুঝলেও কি দোকানীদের মধ্যে কেউ সাহস করে প্রশ্ন করবে তাদের মনের সংশয় দূর করবার জন্যে? না, সেইরূপ মনোভাষা কারও থাকলেও তা’ তার গোপন মনেই সমাধি লাভ করেছে। দোকানীরা জিনিস বিক্রি করবে লভ্যাংশ পাবে। তাদের অত সব কাজ কি? তারা আর কোন প্রতিবাদ বা অত রাতে ঘুম থেকে উঠে চাহিদা অনুযায়ী মাল বিক্রি করতে প্রস্তুত নয়—এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করে পাঁচজন রাইফেলধারী সৈনিকের কাছে অপ্রিয়ভাষন হওয়া সুবিবেচনাপ্রসূত নয় বলেই মনে করে।

হাসিমুখে উৎসাহের সঙ্গে তারা দু’টি বড় বড় বড়ি নিয়ে এল। তারপর দোকানে যা ছিল—সব রকম বিস্কুট, পাউরুটি, কলা, চিড়ে প্রভৃতি বড়িতে বোঝাই করে দিল। মূল্য মাত্র আঠারো টাকা। সবার কাছে আজ হয়ত অত্যন্ত লাগবে আঠারো টাকার কতটুকু খাদ্যবস্তুই বা তারা পেয়েছিল! সে সময়ে চার আনার কুড়িটা ডিম, তিন বা চার পরসায় এক সের দুধ, তিন পরসায় একটা কুলকপি, চার-পাঁচ আনার বড় ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। আঠারো

টাকার বিনিময়ে তারা বড় বড় দুই বড়ি ভর্তি বিস্কুট, কলা প্রভৃতি নিয়ে রওনা হল।

দোকানীরা ভদ্রতা করে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁচজন বিস্কুট সৈনিক খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে বিগ্রামরত সাথীদের কাছে ফিরে এল।

এতক্ষণ একটি পুকুরের সন্নিকটে সুন্দরী বাগানে আশ্বকাদা ও মাস্টারদার নেতৃত্বে প্রধান রাইফেলটি অপেক্ষা করছিল। খাবারের বড়ি দেখে তরুণ সাথীরা আশ্বস্ত হল। কেউ কেউ আনন্দে আশ্বকাদাকে প্রীতিয়ার্স জানাল, আশ্বকাদা সবাইকে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতে বললেন। চারজন যুবক খাবারগুলি সবাইকে ভাগ করে দিল। গ্রুপে গ্রুপে খাওয়া সেরে পুকুরে গিয়ে জল খেয়ে ও হাতমুখ ধুয়ে সকলে আবার মার্চ করার জন্য প্রস্তুত হল।

এখন রাত প্রায় তিনটে বেজেছে। তারা চৌধুরীহাট স্টেশনের কাছে ছিল। স্টেশনের পাশে এই পাহাড়টি বাকি রাত-টুকুর জন্য ও পরের দিন ২০ তারিখের সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে অপেক্ষা করবার মত উপযুক্ত কিনা তা’ নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আশ্বকাদা আলোচনা করলেন। তারা সাবাস্ত করেন যে আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং তারপর স্টেশন থেকে যতদূর সম্ভব ব্যবধান রেখে তাদের সেই-দিনের জন্য আস্তানা ঠিক করতে হবে।

এরপর তারা স্টেশনটি পাশে রেখে সামনের দিকে আরো প্রায় আধ মাইল এগিয়ে গেল এবং বাঁ দিকের মাঠে নেমে পড়ে সামনের পর্বতশ্রেণী লক্ষ্য করে এগোতে লাগল। এক ঘণ্টার মধ্যে কোন একটি পাহাড় তাদের বেছে নিতে হবে। ভোর হওয়ার আগে নির্জন ও নিরাপদ পাহাড়ের অন্তরালে তাদের ক্যাম্প করতেই হবে।

প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রায় আধমণ বোঝা আছে। অধিকাংশ ছেলেদেরই কিই বা বয়স! তবে বয়সের তুলনায় প্রায় সকলেরই মেহ অনেক বেশি সুস্থ-সবল—ডন-কুস্তি করা শক্ত শরীর। তবু বাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই কেবল যত্নে পারবেন যে, যত শক্তির অধিকারীই হোন না কেন অতখানি ওজন সঙ্গে নিয়ে দূর-দূর-দূর গরিপথ, ভাঙাচোরা মাঠের রাস্তা ও বন-জঙ্গলের বাধা সরিয়ে পরিষ্কার করে মার্চ করা কতখানি কষ্টসাধ্য। এক ঘণ্টার মধ্যে এই-রূপ নানা বাধা অতিক্রম করে খুব বেশি দূর অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খুব বেশি হলেও তারা এই এক ঘণ্টার মধ্যে দু’ মাইল পথের বেশি এগোতে পারে নি। ১১ তারিখ শেষরা

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তড়াতাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়



মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সকলকে 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার অত আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আমরা তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোসফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোসফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'তে মেশানো হয়, তাৎক্ষণিক ভাবে কাজ করে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেট এখন গ্রাম-গ্রাম কোটি কল কল করেছে। এর ফলে বেদনা নাশ করার শক্তি দ্রুতগতির বৈশিষ্ট্য লাবণ্য শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুঃখের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

দুঃখের মধ্যে কাজ শুরু করে আর—কমেক্সন দূর কাজ করতে থাকে। নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র ব্যথা দূর করার সক্রিয় উপাদানটি অতি নরমকৈ এবং খুবই শীঘ্রির শরীরের মধ্যে মিশে গিয়ে ৩ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইভাবেই মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে এবং আরও কম কমেক্সন সৃষ্টি হয়।

অতি নরমকৈ আপনাকে খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনাকে খেতে খুসি খেতে পারেন—চকনো, কলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো সরল পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের ব্যর্থার নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যবহার: ব্যথা-বেদনা, মাথাব্যথা, গা-ব্যথা, দাঁতব্যথা, গাটে বেদনা-অব-সর-জ্বর-হু-ভেদু-জ্বর-সন্দাহা।

আজ্ঞা: আন্তরিক: প্রুটি ট্যাবলেট: জরোকন বলে আরার ব্যবহার: নিত্যের জ্বর ও রক্ত ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

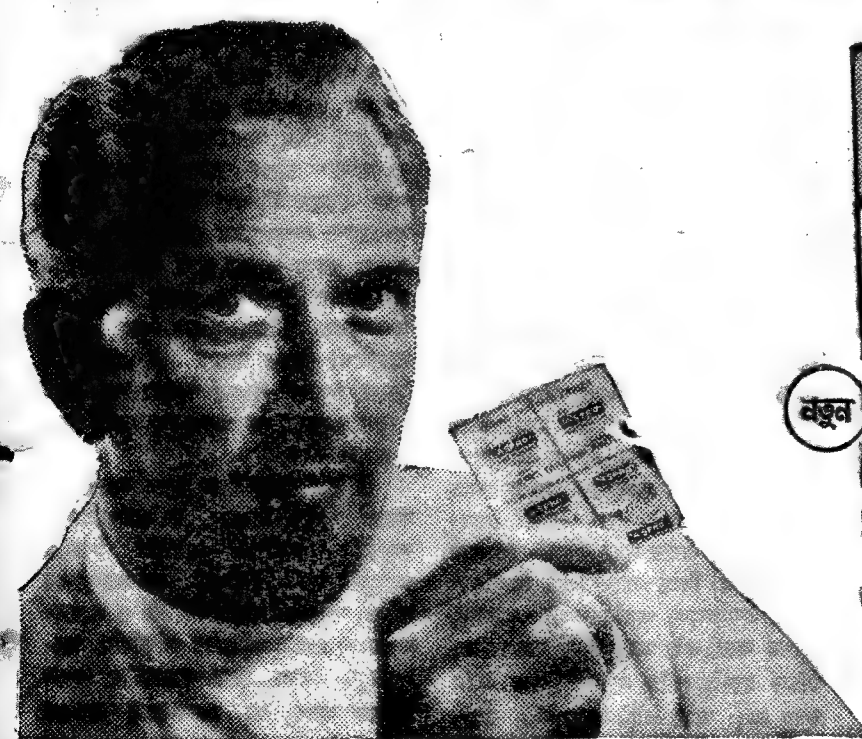
নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ইচ্ছাক্রমে কাজ করে দেখুন



ট্যাবলেটের কণাগুলির দ্বারা দ্রুত কাজ হয়, তাই শরীরের মধ্যে মিশে গিয়ে দ্রুত ব্যথা-বেদনা দূর করে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোসফাইণ্ড ইচ্ছাক্রমে কাজ করে নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র অতি ট্যাবলেট আরও ৩০ কোটি কল কল করেছে। তাই শরীরের মধ্যে কম-সর মিশে যায় এবং খুব তড়াতাড়ি ব্যথা দূর করে।

নতুন মাইক্রোসফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সবলমূলক উপায়।



মাইক্রোসফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

সিঙ্গেল-এক ট্যাবলেট

মাত্র এই দুই মাইল পথ অতিক্রম করতে তারা যে কঠিন ও নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা তাদের প্রত্যেকের জীবনে বিপ্লব। সামরিক অভিজ্ঞতার বাস্তব শিক্ষার এক মূল্যবান সঞ্চয়।

বিস্কুট খেয়েছে, জল খেয়েছে, তবু একশ' দুশ' গজ যেতে না যেতেই আবার তৃষ্ণা পেয়েছে। তবু তাদের চলতে হয়েছে। তৃষ্ণার জ্বালা কেবলই বেড়েছে। শারীরিক সহ্যশক্তি সকলের সমান ছিল না। কেউ কেউ খুব কাতর হয়ে পড়েছে। একফোটা জলের জন্য ছটফট করেছে তবু সম্মুখপানে তাদের গতি অব্যাহত রেখেছে। সবার জিত গলা শুকিয়ে গেছে। সামনে যে মা লতাপাতা পেয়েছে তাই চিবিয়েছে—একটু গলা ভিজিয়ে নিতে। তাতে কিই বা হয়—কতটুকু তৃষ্ণা মেটানো যায়। বরষা পিপাসা আরো বেড়ে গেল। এমন সময়, এইরূপ নিদারুণ তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একজন সাথী তার বন্দুক পরিস্কার করার মোবিল জেলের ছোট টিনটি খুলে মোবিল খেয়ে ফেলল। কি ভীষণ অবস্থা! মোবিল তেলে কি তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে? তার মূখ জিত গলা বন্ধের ভেতর যেন কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সব যেন পড়ে যাচ্ছে। সে আর চলতে পারল না—চলে পড়ল। ফিস্ ফিস্ করে মূখে মূখে সেই নিদারুণ খবর সবার কাছে চলে গেল। মার্চ কর্নিকের জন্য বন্ধ হল। দু'জন ডাক্তার সাথী—নরেশ ও বিষ্ণু, তার কাছে ছুটে গেল। ফাস্ট-এড্ দিতে চেষ্টা করল। ফাস্ট-এড্ দেবার উপকরণ কি আর আছে—কি দিয়ে ফাস্ট-এড্ দেবে? গলায় আঙুল দিয়ে বমি করাল, বাতাস করে বোটকু সম্ভব সূক্ষ্ম করতে চেষ্টা করল। কেউ একজন গাছের সবুজ পাতা নিয়ে রস বার করে তাই তার মূখে দিয়েছে। ফাস্ট-এড্ কতখানি কাজে লেগেছিল জানি না—তবে তাকে সবল সূক্ষ্ম করে তোলার জন্য বার বার তাকে বলা হল—“শক্ত হও,” “ভেঙে পড়ো না,” “বিপ্লবের দুর্গম পথ এইতো মাত্র সূত্র,” “ক্ষমা, তৃষ্ণা বিনিময় রজনী ও রক্তবরা চরণই তো আমাদের একমাত্র পাথর—একমাত্র সাথী!” সাথীদের কণ্ঠে এইসব উৎসাহবাণী তার কানে ধ্বনিত হতে লাগল। তৃষ্ণা, কর্নিকের দুর্বলতা ও অবসাদ বিপ্লবী প্রেরণার কাছে পরাজয় স্বীকার করল—মোবিল সেবনের প্রতিজ্ঞা ও দুর্বলতা সে কাটিয়ে উঠল। বন্দুকে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। আবার সে সজীব হয়ে উঠেছে। তাকে সাথীদের মাঝে যেতেই হবে।

ফিস্ ফিস্ করে আবার তাদের কাছে

মার্চ সূত্র করার অর্ডার গেল। মার্চ আরম্ভ হল। আর বেশি দূরে এগোনো গেল না। ভোর হয়ে আসছে—তার আগেই তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে ‘ক্যাম্প’ পাতবে। প্রায় আধমাইল পাহাড়ের ঢাল দিয়ে তারা এগোলো, তারপর একটি পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করে। পাহাড়টার ওপর উঠেই সবাই বসে পড়েছে—কেউ কেউ একেবারে শরীর টান করে শুয়েও পড়েছে। তাদের মধ্যে সবল সূক্ষ্ম বন্দুকের একটি ছোট দলকে নরেশ রায়ের চার্জ দেওয়া হল। নরেশ তাদের মধ্যে বেছে বেছে দু'জন করে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় এই রকম গোপন স্থানে পজিসন নিতে বলল। শত্রুর আগমনবার্তা যেন আগে থেকে জানা যায় তাই এই ব্যবস্থা। প্রহরী মোতায়েন হলো আর অন্য সাথীরা সবাই ক্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই অঝোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

২০ তারিখ—রৌর উঠেছে। এখন সকাল প্রায় এগারোটো বেজেছে। এমন সময় আনন্দের বাড়িতে অতর্কিতে পুলিশ হানা দিয়েছে আর আমরা চারজন আনন্দের বাড়িরই আধমাইলের ভেতর পাহাড়ের আড়ালে বসে সময় কাটাচ্ছি।

এই সময় অস্বিকাদা ফতেয়াবাদের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে সে তার বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর আনতে পারে কি না। কি ধরনের খবর তার আনতে হবে সেইরূপ ধারণাও অস্বিকাদা তাকে দিলেন—কোন সৈন্যের গতিবিধি এইদিকে আছে কি না, শহরে সৈন্য এসে পৌঁছেছে কি না ইত্যাদি এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য যে কোন খবর পাওয়া যায়।

মাস্টারদা জানতে চাইলেন—“যে কোন খবর বলতে অস্বিকাদা কি বলতে চাইছেন?” অস্বিকাদা তখন তাকে বন্ধিয়ে বললেন—“তুমি খোঁজ করে দেখবে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে কি না—এখনও ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে কি না।”

তখন প্রায় বারোটো বেজেছে। অস্বিকাদা তাকে পাঁচ টাকার একটি নোট দিলেন। তাকে চারটার সময় খবর নিয়ে ফিরে আসতে বললেন এবং আসবার সময় যদি পারে তরমুজ প্রভৃতি ফল নিয়ে আসবার কথাও বললেন। টেগরা তার সঙ্গে যেতে চাইছিল। অস্বিকাদা টেগরাকে যেতে নিষেধ করলেন। সে একাই গেল। টেগরা তাকে যাবার সময় বলল—“ফেরবার সময় সঙ্গে কিছু লবণ নিয়ে আসবি।” একা একজনকে এমন করে পাঠানো, বিশেষ করে এই তরুণটিকে, অস্বিকাদার উচিত হয়েছিল কি না সে বিচার আমি করব না। তবে এই তরুণটিও কোন খবর নিয়ে আর ফিরে আসে নি।

২০ তারিখ সারাটা দিন যখন তাদের পাহাড়ের ওপর কাটছে তখন আমরা তাদের পরিত্যক্ত নাগরখানা পাহাড়ের কাছে রাস্তার ঘুরে বেড়াচ্ছি—চা ও পানের দোকানে তাদের খোঁজ নিতে চেষ্টা করছি। তারপর কর্নেল ডালাস স্মিথের ফোর্সের সম্মুখীন হওয়ার পর ও কিছু ক্ষিপ্ত লোকের হাত থেকে বেঁচে আমরা চারজন রাত প্রায় সাড়ে সাতটার সময় শহরে সতীদার কাছে এসেছি। আমাদের প্রধান বাহিনী প্রায় একই সময়ে ২০ তারিখ রাতি সাতটা-আটটা নাগাদ পাহাড়ের নিচে মাঠে নেমে এসেছিল।

শ্বিত্তরী সংবাদবাহক ফিরে এল না। ২০ তারিখ রাতেও প্রধান বাহিনী শহরে এসে আক্রমণ করার কোন প্রায়ন করে নি। ২০ তারিখ রাতে শহরে আমাদের চার-জনের জন্য যেমন কোন আশ্রয় বেছে নিতে হবে, ঠিক তেমনই প্রধান বাহিনীরও এই রাতে আর কোন পাহাড়ে ক্যাম্প স্থানান্তরিত করতে হবে। পাহাড়ের নিচে নেমে এসে নিয়মিত গুপ্তি করা হল—এখন তারা চরায়জন।

দু'জন সংবাদবাহকের মধ্যে প্রথম-জনের মারফৎ মাস্টারদা আমাদের বৃ-বিদ্রোহের একটি বাস্তব রিপোর্ট সংক্ষেপে লিখে সতীদার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন সতীদা হয়ত কোন সূত্র ধরে জাতীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সতীদার কাছে সেই রিপোর্ট গিয়ে পৌঁছল না।

শহরের বৈরুপ অবস্থা আমরা নিজের চক্ষে দেখেছি তাতে পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন একটি ছেলে সতীদার কাছে অনায়াসে আসতে পারত। কতখানি স্মারিক দুর্বলতার শিকার হলে পরে একজন দীক্ষিত বিপ্লবীও এতখানি শঙ্কান্বিত হতে পারে তা এইরূপ অভিজ্ঞতার আগে ভাবাই যেত না। প্রাণের ভয় বড় ভয়! বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা তথাকথিত বিপ্লবী জোয়ানকে প্রথম সূযোগেই সমস্ত দলকে বিপ্লবের মূখে ফেলে পলায়ন করতে অনুপ্রেরণা দেয়। দু'জন সংবাদবাহক প্রথম সূযোগেই সরে পড়লো।

এ তো গেল ঠিক লোক বাছাই না করার ভুল। তাছাড়া গেরিলাবাহিনীর স্কাউটিং প্রভৃতির প্রাথমিক নিয়মও আমাদের জানা ছিল না। গেরিলাবৃন্দে নীতি অনুযায়ী কোন স্কাউট বা সংবাদবাহককে প্রধান বাহিনীর গতিবিধি, অবস্থান বা তাদের হেড কোয়ার্টার কোন কোথায় আছে তা কোনমতেই জানতে দেওয়া হয় না। এইরূপ নিয়ম অনুসরণ

সামান্যিক বসুধাতী

করার বিশেষ কারণ অনুমান করা একটুও কঠিন নয়। কোন সংবাদবাহক বা স্কাউট যদি শত্রুর কবলে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে তবু যেন বিরুদ্ধপক্ষ প্রধান বাহিনীর অস্তিত্বের খেঁজি না পায় তারই জন্য গেরিলা নীতি অনুসারে সংবাদ-বাহকের প্রধান বাহিনীর অবস্থান না জানা উচিত ছিল। এই নীতি যদি তারা অনুসরণ করত তবে তাদের স্কাউটদের নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল যে কোন একটি পরিচিত নির্দিষ্ট স্থানে কয়েকটি বিকল্প সময়ে যেন উপস্থিত হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রধান বাহিনী তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ গোপন রেখে বাছাই করা কোন একজনকে সংবাদবাহকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাঠাত। তারপর ডাকে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসত। বলাই বাহুল্য সংবাদবাহকের সঙ্গে শত্রুপক্ষের আর কোন লোক গোপনে প্রতীক্ষা করছে কি না তা দূর থেকে স্পষ্টই দেখা যায় এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান ধার্য করা হতো। যদি এইরূপ ব্যবস্থা তারা করত পারতেন তাহলে স্কাউটদের বারোটার সময় পাঠিয়ে চারটার সময় ফিরে আনার জন্য নির্দেশ দিতেন না। এত অল্প সময়ের মধ্যে দশ-বারো মাইল পথ গিয়ে ফিরে আসা, বিশেষ করে সংবাদসংগ্রহ করে ফিরে আসা একেবারেই সম্ভব ছিল না। স্কাউটিং-এর পদ্ধতি সম্বন্ধে আগে বেরূপ বললাম সেইরূপ নিয়ম অনুসরণ করে যদি বাছাই করে সংবাদসংগ্রহ ও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পাঠানো হত ও এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য যুদ্ধিসংগত সময় ধার্য করা হতো তবে হয়ত বা স্কাউটিং-এর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমাদের এই বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবের জন্য স্কাউটিং যেটুকু হয়েছে তাতে স্ফুল্জ তো পাওয়া গেলেই না বরং কতিই হল—কারণ, সেই যুদ্ধজন ও হয়ত সবার সঙ্গে থেকে যুদ্ধে প্রাণ দিত—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রলোভনে নিজেদের বিপ্লবী পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগই পেত না।

২০ তারিখ রাত্রেও তারা দই, চিড়ে, কলা প্রভৃতি দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছে। পুকুরের পাড়ে বসে তারা খেয়েছে। তারপর প্রস্তুত হয়ে আবার পাহাড়ের পথে মাচা করেছে। বেনদিন তরুণদের মধ্যে গুরুজন দেখা দিল। তাদের মধ্যে নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা, রুজত, মনা, দেবু, প্রমুখ মরণ-পাগল যুবক বিপ্লবীরা প্রশ্ন তুললে—“কেন আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে বন-বাদাড়ে স্নান-খাওয়া, নিদ্রা সব ছেড়ে ঘুরে বেড়াছি? আমাদের কি প্রাণ? কি আমাদের উদ্দেশ্য?”—নেতারা এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। ক্রমেই

যে তরুণদের খৈয়ের বাঁধ ভেঙে পড়বে তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। আজ তারা শহর থেকে আরো দূরে উত্তরে মাচা করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের প্রবল ইচ্ছে শহরে প্রবেশ করতে হবে—শত্রুকে আগে আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে তাদেরই শত্রুকে প্রথম আঘাত হানতে হবে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ না করে একরূপ অলসভাবে সময় কাটানোর প্রতি-ক্রিয়া তাদের মনে তীব্রভাবে দেখা দিল। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। ২০ তারিখ রাত্রে তারা স্থির করল যে শহরের দিকেই তারা ফিরে যাবে।

তখন রাত প্রায় বারোটা একটা হবে। প্রধান বাহিনী শহরের দিকে এগোতে লাগলো। সকলে দুর্গম পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। সেই বৃক্ষাচ্ছাদিত জঙ্গল সবারইকে ভীষণ কাতর করেছে। তবু আজ তাদের মনের প্রতি-ক্রিয়া অন্যরূপ—কর্মসূচী স্থির আছে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের শেষ চেষ্টা হবে তারপর তারা আর অপেক্ষা করবে না, আক্রমণ করার জন্য শহরে প্রবেশ করবে।

সামান্যিক বসুধাতীর আগামী

আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ নতুন পটভূমিকায় শীঘ্রই সক্রিয় উপন্যাস লিখছেন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কথামিশ্রী শ্রীমদোজ বসু।

ভোর হতে বেশি ব্যাক নেই। সামনে খুব উচু একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হয় ঘন ঘন ঢাকা দুর্গম অতি উচু এই পাহাড়ে কোন লোকই ওঠে না। নিরাপত্তার কথা ভেবে এই পাহাড় যত দুর্গমই হোক না কেন তার ওপর ক্যাম্প স্থাপন করা উচিত বলে তারা মনে করেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী দল এই পাহাড়ের প্রাকৃতিক কাঠিন্য ও আপাতদৃষ্টিতে দুঃসাধ্য খাড়া পথ দেখে বিচলিত হয় নি। বরং তরুণদের adventure করার স্পৃহা বেড়ে গেল। দুর্গম পাহাড়ে তারা উঠবেই। সঙ্গে আছে প্রায় আধ মণ বোঝা। Where there is a will :- there is a way ! —ইচ্ছা থাকলে পথ খুঁজে পাওয়া যাবেই।

বীরদর্পে খাড়া উচু পাহাড়ে তারা উঠতে লাগল। কোন সময় এমন স্থানে পা দিয়েছে যে পা শিথলে অনেকদূর নিচে গড়িয়ে পড়েছে। কোন সময়ে ছোট চারা

গাছ বা সামান্য লতা ধরে স্থির থাকতে চেষ্টা করেছে কিন্তু অনেক সময় চারা-গাছ উপড়ে এসেছে ও লতা ছিঁড়ে গেছে। তারা এত বাধা সত্ত্বেও দমে নি। অসাধ্য সাধন তাদের করতেই হবে। সামান্য অভিজ্ঞতার পর তারা উপায় উদ্ভাবন করল কি করে পাহাড়ের খাড়াই পথ বেয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ তারা মাটি কেটে বা শক্ত গাছের শেকড় ধরে ভাল করে পজিসন নিল। তারপর একজন তার রাইফেলের একদিক এগিয়ে দিল সাথীর হাতে যে না কি কয়েক ধাপ ওপরে পজিসন নিয়ে বসেছে। সাথী তাকে টেনে তুলল। পর পর ওপরের দিকে বিশেষ বিশেষ অসুবিধা-জনক স্থানে এরূপ দৃঢ় নির্ভরশীল পজিসন আগে থেকে বলিষ্ঠ সাথীরা নিয়েছে এবং একজনের পর একজনকে তারা ওপরে তুলে এনেছে।

পাহাড়ের ওপরে ওঠার পর আবার গমলা হল। সবাই এসেছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা বিপ্রায় কবতে লাগল। পালা করে পাহারা দেওয়া-জন্য প্রহরী নিযুক্ত হল। ক্রান্ত দেহে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

এই পাহাড়টি ফতেয়াবাদের দক্ষিণে মাইল দুয়ের মধ্যে হবে। সন্ধ্যা প্রায় আটটা বেজেছে। একে একে তাবা ঘুম থেকে উঠলো। দিনের আলোতে এখন এই পাহাড়ের অবস্থান ঠিক মত বোঝা গেল। তারা যত খাড়াই পথে পাহাড়ে উঠেছে পশ্চিম দিকে পাহাড়টি তত খাড়াই ছিল না। খুঁজে খুঁজে তারা দেখতে পেয়েছে পাহাড়ের নিচে সবু একটি জল-স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সেই সরু জল-স্রোত ধরে তাদের মধ্যে কেউ এই স্রোতের ঊৎপত্তিস্থান খুঁজে পেয়েছে। পাশের পাহাড়ের ওপর থেকে ঝরণার মত শীতল জল ঝরে পড়ছিল। তারা ছোট ছোট দলে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে—জল খেয়েছে।

এই পাহাড়ে ওঠার আগে মাচা করার সময় তারা তরমুজ ক্ষেত অতিক্রম করে যাচ্ছিল। প্রত্যেককে বলা হয়েছিল একটি করে ছোট বা মাঝারি সাইজের তরমুজ যেন সঙ্গে নিয়ে আসে। সকল আটটা নটার সময় তাদের কিছু খাওয়া-দাওয়া করা দরকার। সঙ্গে তরমুজ অত্র ভাবনা কি! তাতেই সকালের ব্রেকফাস্ট হবে—নাই বা হ'ল চা ডিম আর টোস্ট। কিন্তু দুর্গম পথ চলাকালে এবং শেষপর্যন্ত খাড়া পাহাড়ে ওঠার সময় তারা তরমুজ ফেলে দিয়েছে। একে তো অশ্বশস্য ও কার্তুজের বোঝা, তার ওপর তরমুজ বয়ে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। রাইফেল, কার্তুজ তাদের প্রাণের চাইতেও

অন্দের বিনিময়ে তরমুজ ফেলে আসা খুব সম্ভব—শতগুণে তা' প্রায় বলে তারা মনে করেছে।

এখন যখন সবাই জানতে পারল যে তরমুজ তাদের সঙ্গে আনা হয় নি তখন অম্বিকাদা খুব চটে গেলেন। সবাইকে তিরস্কার করতে লাগলেন—“আশ্চর্য! এ কি করে তোমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল? গাওয়ার প্রয়োজন আছে। শক্তি বজ্রাঘ্রাথতে হবে; নইলে শত্রুর সঙ্গে লড়াই কি করে? এখন কি খাবে? তরমুজ না এনে তোমরা অনায়ে করছ।”

তরুণ বিপ্লবী কেউ বলে উঠল—“আমরা তবমুজ থেকে বন্দুক অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছি।”

অম্বিকাদা—“আমি বন্দুক ও তরমুজ, দুই-ই প্রয়োজন বলে মনে করি।”

নির্মলদা একটু হেসে আবহাওয়া হালকা করে দেওয়ার জন্য অম্বিকাদাকে উদ্দেশ্য করে চট্টগ্রামের ভাষায় বললেন—“অম্বিকাদাদা, অণ্ডনে কি যে কণ্ডন! ছোড ছোড পোয়াউলব্ তিন দিন ধরি আবে খাওন নাই, সোয়ান নাই, ঘুম নাই—তও কোনমতে হাঁড়ি আই পাহাড়ত উইঠ্যা যে কত ন; তার উয়াব আর তরমুজ কোয়া ন আইন্যা ইয়ান্ এগ্গুয়া কথা হইল যে না? তরমুজ লই হারা রাস্তা হাঁড়িলে তারা পথং মরি পড়ি থাইক্‌তা। তারা পথং মরি থাইলে অণ্ডন তরমুজ কেনে খাইত?.....।” (অম্বিকাদা আপনি যে কি বলেন! ছোট ছোট ছেলেদের তিনদিন ধরে স্নান-খাওয়া ঘুম নেই, তবু কোনমতে যে তারা পাহাড়ের ওপরে পৌঁছতে পেরেছে এই কত না; তার ওপর কেন তরমুজ আনলো না—এ কি একটা কথা? তরমুজ নিয়ে সারা রাস্তা হাঁটলে তারা পথেই মরে পড়ে থাকত। পথেই যদি মরে পড়ে থাকত তবে আপনার তবমুজ কে খেত?)।

নির্মলদা এত সুন্দর করে কথাগুলি বলেছেন যে সবাই খুব উপভোগ করেছে। সবাই হেসে উঠল—অম্বিকাদাও সবার জুড়ে হাসলেন।

এমন সময় নরেশ রায় সবাইকে খুব আশ্চর্য করে দিল। নরেশ বলল তারা ছোট ও মাঝারি ধরনের দশটি তরমুজ সঙ্গে আনতে পেরেছে। মধুর স্ববসি শব্দে সকলের মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নরেশ দশটি তরমুজ অম্বিকাদার সামনে এনে দিল। অম্বিকাদা নরেশদের খুব প্রশংসা করলেন। তারপর অম্বিকাদা সবুজ ফালি ফালি করে নিজ হাতে প্রত্যেকের জন্য এক টুকরো হিসেবে দশটা তরমুজ কাটলেন।

বালক টেগরা—সদা উজ্জল, সদা জীবী! সব সময় সে চান নতুন কিছ

করতে—একটা adventure। অম্বিকাদা যখন তবমুজ ফালি করছিলেন তখন সে এক টুকরো তরমুজ তাঁর দৃষ্টির অগোচরে সরিয়ে ফেলে। তার সমবয়সী কয়েকটি বন্ধুর কাছে এইরূপ নিষেধভাবে হাত সাফাইয়ের বিষয় জানিয়ে সে খুব আনন্দ পেলে। বন্ধুরাও খুব খুশি—এখন দেখবে তারা অম্বিকাদা কি করেন।

সবাইকে দিতে গিয়ে যখন তরমুজের টুকরো একটি কম হ'ল তখন অম্বিকাদা একেবারে রেগে আগুন। তিনি খুব কঠিন ভাষায় বললেন—

“আমি জানতে চাই কে না জানিয়ে তরমুজের টুকরো নিয়েছে? শৃঙ্খলা ভঙ্গের এইটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট অপরাধ। আমি চাই যে না জানিয়ে তরমুজ নিয়েছে সে স্বীকার করবে।”

অম্বিকাদাকে আর বলার সুযোগ না দিয়ে টেগরা জানালো—“আমি নিয়েছি। আমি অপরাধী। আমাকে শাস্তি দিন।”

অম্বিকাদা খুব রেগেছেন। টেগরার এরূপ উপেক্ষার ভাব দেখে তিনি এত বেশি বেগে গেলেন যে লোকনাথকে কঠোর আদেশ জানালেন—

“লোকনাথ! তুমি টেগরাকে গুলী কর। বিপ্লবীদের কাছে উচ্ছৃঙ্খলতার কোন স্থান নেই। তোমার ভাই বলে টেগরাকে তুমি আশ্রয় দেবে না। তাকে এক্ষণি গুলী কর।”

অম্বিকাদা ব্যাপারটাকে খুব seriously নিয়েছেন। কঠোর discipline তিনি impose করতে চাইছেন। হালকা পরিপরিবেশ ক্রমেই যেন গান্ধীর্ষে পরিণত হ'ল। ব্যাপার আরও অনেক গুরুতর আকার ধারণ কবল যখন লোকনাথ অম্বিকাদাকে উত্তর দিল—

“আমার ভাই বলে টেগরা অন্যায় করেও ক্ষমা পাবে—এইরূপ ধারণা করা আপনাব ভুল। বিচার করুন। যদি টেগরা প্রাণদণ্ডের হুকুম হয় তবে আমিই তাকে গুলী করব।”

অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠল যখন সবাইকে স্তম্ভিত করে বুক টান কবে টেগরা সোজা অম্বিকাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বকের ওপরে জামা সরিয়ে ফেলে স্মৃতি বন্ধে চাপড় দিয়ে অম্বিকাদাকে আহ্বান জানালো—

“আপনার সামনে এই আমি বুক পেতে দিলাম। আমি অপরাধ করছি গুলী করুন। সোনা ভাই (টেগরা লোকনাথকে এই নামে ডাকত) দাঁড়িয়ে কেন? গুলী কর।”

ব্যাপার খুবই সামান্য। তবু রাগের মাথায় ছোট জিনিসও এতদূর গড়িয়ে গেল যে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে—কি জানি যদি কোন অনর্থ ঘটে যায়!

আবহাওয়া খয়তমে হয়ে উঠেছে, বাড়ির পূর্বাভাস যেন। সবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে অপেক্ষা করছে—এখন কি ঘটবে।

টেগরা যখন জামা একেবারে চরম স্তরে নিয়ে গেছে তখন অম্বিকাদার রাগ যত বেগে যতখানি চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল, ঠিক ততখানি দ্রুতগতিতে নেমে এল, তাঁর সব রাগ যেন মূহূর্তে একেবারে জ্বল হয়ে গেল। অম্বিকাদা টেগরাকে বুক জড়িয়ে ধরলেন। তিনি সন্মুখে তাকে সম্বোধন করে বললেন—“ওরে বাবা, তুই তো আমার চেনেও বেশি রেগেছিছ। আচ্ছা, আমি কি তোদের ওপর রাগ করতে পারি—গুলী করতে পারি—এই তো মনে হ'ল? তোদের ওপর রাগ করব না তো কার ওপর রাগবো? দুঃশূন্য ছেলে—দুরন্ত ভাইটি আমার!” খুব স্নেহভরে অম্বিকাদা টেগরার পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন।

সবাই হাঁক ছেড়ে বাঁচলো, খুশি হ'ল যখন এই ছোট নাটকের এইরূপ সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটল। তরমুজ খাওয়া সুখ হ'ল। সবাই খুব তৃপ্তির সঙ্গে তরমুজ খেল। কেবল খেল না টেগরা। নির্মলদা তাকে অনেক সাধাসাধি করলেন—তবু সে তরমুজ খাবে না। টেগরা সহজ হতে পারছিল না। সে ভাবতেও পারে নি যে একটা সামান্য মজা করার জন্য, এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটিতে তাকে এত লাজ্জনা সহ্য করতে হবে। যদি সে একবারও বুঝত যে সে একটা অপরাধ করতে যাচ্ছে তবে কি সে একটি তরমুজের টুকরোতেও হাত দিতে যেতো, না তাই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মজা করা চেষ্টা করতো। তার অভিমান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সকলেই তরমুজ খাবে আর সবার ছোট টেগরা খাবে না—এটাই সকলের কাছে অতি নিদারুণ মনে হ'চ্ছিল।

এই জটিল অবস্থার সমাধান করলেন স্বয়ং অম্বিকাদা। দূর থেকে এতক্ষণ তিনি টেগরাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি টেগরার কাছে গিয়ে বললেন—“আমি অপরাধ করছি। তুই আমাকে ক্ষমা করতে পারবি না?” টেগরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। অম্বিকাদা বললেন—“আমিও এখন পর্যন্ত তরমুজ খাই নি। চল এইটি দু'জনে ভাগ করে খাই।” টেগরার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারা দু'জনে তরমুজ খেল। সবাই এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। বিপ্লবী কাঠিন্যের মধ্যেও এই বৈচিত্র্য তাদের কাছে মরুভূমির মাঝে যেন মরুদ্যান বলে মনে হয়েছে।



স্বপ্নাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিদ্যা বাউলীর হস্তান্তর

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ দ্বিতীয় ॥

জ্বালানোর দৃপ্তের মাটি ফাট রোন্দর। মাঠের আলের মাটি চির খেরে টগছে। খুলো মাটির চনচনে গরমে অনেকটা পথ পার হয়ে সুবর্ণ ভোবার বেশ খানিকটা আগে মেলায় পৌঁছেছে বিদ্যাধরী আর কুমি।

মস্ত মাঠে মেলা বসেছে। ছোট ছোট দরমা আর টিনের ছাপরা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ছাপরার সামনে দোকান পেছনে বসবাস। মাঝখানে একটা চট অথবা কাপড়ের আড়াল।

মাঠের উত্তরে গৌরাঙ্গা মন্দির। মস্ত নিতাই-গৌর মূর্তি। মন্দিরটা পাকা। অনেকদিনের পুরোন, তাই জায়গায় জায়গায় আস্তর খসে পড়েছে। অনেক-কাল আগের পাতলা ইটের গাঁথনি বেরিয়ে পড়েছে। তারি ওপর চুনের পোঁচ লাগান হয়েছে। আস্তর করবার সময় ছিল না, নয়তো পরসা ছিল না।

অধিকারীদের মন্দির। এক সময় ধারের অধিকারীরা মস্ত মানুষ ছিল। রাখীর ব্যবসা ছিল। এমন হাটেরে পণ্ডাশ হাটে ছিল না, যারা এদের কাছ থেকে রাখীর মাল না কিনত, আর এমন চাষী ছিল না, যারা এদের কাছে মাল না বেচত। ঝড়, চাল, ডাল, কলাই, কুমড়া বহু মাল তারা সস্তার সময় কিনত, বর্ষার আকাশে অনেক চড়া দরে মাল ছাড়ত।

ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও ধর্মজ্ঞান ছিল এদের গোড়া থেকেই। অনেকে বলে

নিতাইচাঁদের দয়াল ওদের পরসা দেখতে দেখতে পাহাড় হয়ে উঠল। আবার নিতাই-চাঁদের রোষেই নাকি ক্রমে ক্রমে অবস্থা পড়ে গেল। মেলায় আগুন লাগল সেবার। নিতাইচাঁদের সেবার চুটির জন্যে যে তাতে আর সম্ভব কি!

তারই মাস কয়েক পরে আগুন লাগল রাখী মালের গুদামে। লাখ টাকার মাল-পত্র কয়েক ঘণ্টার ভস্মনাশ। সেই শোকে মাস দুয়েক পরে মোহনচাঁদ অধিকারীর মৃত্যু। তার পরে যথারীতি ভাই ভাই খাওয়া-খাওয়ার। ভাগাভাগি, শরিক, মামলা মোকদ্দমা, এক বছরে অধিকারীরা সর্বস্বান্ত।

বড় জাগ্রত এই নিতাইচাঁদ। কথা কয়, স্বপ্ন দেয়, নামেতে ভাব লাগে।

চন্দ্রশ প্রহর নাম হয় এই মেলায় সময়। ভজ্ঞ নিতাই গৌর রাখে শ্যাম।

দমাদম আছড়ে পড়ে নৃত্য করতে করতে। শ্রীখন্ডিত যে অধিকারীর ছেলোট খরে তার তো খুলোয় গড়াগড়ি। ভাবের বন্যা বয়ে যায়। জয় গৌর, জয় নিতাই—বলতে বলতে কত পাশাড ভাবে দুমড়ে মচড়ে খুলোয় পড়ে। চোখের জলে খুলো ভিজ়ে যায়। নিতাইচাঁদের অপার মহিমা!

পণ্ডাশ একশ' গ্রামের কত মানুষ আর কত ভক্তসাহু জমায়েত হয় এ মেলায়। তার ঠিকঠিকানা নেই। বাহা, গান রোজই চলে। তিনদিন তিনরাত নামকীর্তন। সাতদিন মেলা। যত মানুষ আসে সবাই প্রসাদ পায়। খিচুড়ি, ভাজা, বোঁদে। ছোট

এক একটা ভোবার মত মস্ত কড়ার রসো চড়ে। সকালের রাঘা শেষ হয় বিকেলে। রাতের রাঘা মাঝরাতে। দিনরাত এহু-টানা কলরব। শব্দ শেষ রাতের দিবে একটু নিবৃত্ত।

ঈশান খ্যাপা ব্যর কয়েক এসেছিল। বছর দশেক আগে বাপের সঙ্গে একবার এসেছিল বিদ্যাধরী। আর এসেছে এইবার। কুমি এসেছে এই প্রথম।

এসে ওর চন্দ্রশ্রবণ—উ রে বাপু রে, দম বন্দ হয়া আছে।

এত মানুষ, এত ভিড়, এত দোকান-পাট, গাওনাবাদি, দম বন্দ হয়ে আস্ত আর বিচি কি?

—থাকুম কনে? থামু কি?
কুমির তেল চুকচুক আমেসী দেহ-খানা খুলোর খসখসে, চুল রুফ, চোপ লাগ।

বিদ্যাধরীর মুখখানা যেমন তেমনি। মস্ত চোখ দুটোর খুঁশি উপছে পড়ছে। বৌচকা-বুঁচকি নামিয়ে বসল ওরা একটা কুজগাছতলায়। কুজগাছে কাপড়া পাতা-গুলোর বাতাস লাগে। বড়বড় করে নড়েচড়ে।

বিদ্যাধরীর মস্ত চোখ দুটো দীর্ঘর জলের মত নিখর। আহা রে কত মানুষ! মানুষের জোয়ারে ডুব দিয়ে প্রাণ ঠান্ডা। অগুন্ডিত টুকরো টুকরো প্রাণ। নানা মানুষ, নানা মন, এ যেন বৈশ্বানন্দ দর্শন। বড় ভাল লাগে বিদ্যাধরীর। বড় বড় চোখ দুটো মেলে ধরে চারদিকে।

এরি ভেতর মেলা জমজমাট। ছোট

ছোট খুপারীর মত ছাপারার সামনে কাঠের পাটাতন পেতে কত দ্রব্য সাজিয়ে বসেছে। খেলনা কাঠের মাটির চিনেমাটির, চুড়ি-বালা কচের, তাঁতের শাড়ি, চাদর খুঁত। জিলিপী কদমা মুড়ি।

কুমি বিদ্যার দিকে তাকায়।—চাটি মুড়ি জিলাপী কিনা লইয়া আস।

বিদ্যা বলে—রইস, আগে দেইখা লই। দেখছস রঙের বাহার, আহা রে রঙের শোভা দাখ।

রোম্ভরে হেঁটে হেঁটে প্রাণ আইচাই। খাদয় পেট চড়াড়ি আর বিদ্যা কি না রঙবেরঙের মেলার শোভার মশগলে। একেবারে খেপী!

—আলো, রাখ তর খ্যাগামী। শোভা পরে দেখিস অনে। আগে মুড়ি লইয়া আস।

কুমি নিজেই ওঠে। বিদ্যাধরী বসে থাকে কুলগাছটার নিচে। কুমিটা ঘর বাঁচাতেই দিন কাটল। মনের খবর জানল না। ঘরের যত্নে দিন কাটল। ঘরের মানুষের খবর জানল না।

চোখের দৃষ্টি এক ছুটে সড়ক পার হয়ে আকাশের কিনারায় গিয়ে চৌকছে। পশ্চিম গগন লাল। সূর্য জ্বলতে আর কতই বা দেরি। সড়কের ওপর সারি সারি মানুষ তখনও। তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে মেলার দিকে। ওই তো সেই বাহার দলের মানুষগুলো আসছে। ওই সেই-কালো ঘিনকেট গদাধর ছেলোটা। যেটা খাল পেয়েতে গিয়ে আছাড় খেয়েছিল। পেছনে গোটা কতক অল্পবয়সী ছায়াছায়া। বিদ্যা চোখ মেলে দ্যাখে। শব্দ দেখতে চায়।

তার মনের রঙ আর কারো রঙ মেলে কি না দেখতে চায়। ভিতরে যার সন্ধান করেছে এতকাল বাইরেও তার সন্ধান চায়। পরগণায় রঙ খরেছে কিছুকাল, রসের ধারা বইছে। ও সে রসের তুফান তুলতে চায় বাইরে ঘরে সেই মনিষ্যির দর্শনে। সেই মনিষ্যির সন্ধান করছে বেশ কিছুকাল। তার দেখা পেল না।

হাওয়ায় হাওয়ার তুফান তোলে রসের ছোঁয়ায় রসের ছোঁয়ার বয়। তারই সন্ধান করে চলেছে খেপী। ঘরে আর মন টেকে না। বড় হাসফাঁস করে মাঝে মধ্যে। সেই মনিষ্যির দেখা না পেলে রসের তুফান উঠবে না। তাকে মনের পেঁচের বসান যাবে না।

বিদ্যাধরীর গা শিরশির করে। বৃকের হাওয়া বাইরে ছুটে চায়। আওয়াজ হরে কণ্ঠ দিয়ে বেরোয়।

হায় রে হায়! হায় পিবাঁতি কেনে জানলাম না। মন দরদী খইল্যা পাইল্যাম না।

শয়তো দুরার খইল্যা রাখলাম। ভিতরে ঢুকল যন্তরায়।

বিদ্যাধরীর খঞ্জনীও আওয়াজ তুলেছে। নিমেষ করেক মানুষ ঘিরে ধরে।

হায় রে হায়! বাইর্যা গাইছে বাউলী!

ওই পাউচা, অই মকুইন্দা, শইন্যা যা। বাউলার গান শইন্যা যা রে!

অগো অ পচার মায়। এয়ানে আইস। অ খেমদী, অ আমি, শইন্যা যা।

জাকাজাকিতে ভিড় জমে গেল কুল-তলার চারপাশে।

বিদ্যাধরীর খোঁপাটা মাথার চাঁদির ওপর চুড়ো করে বঁধা। মুখে ভরা-ভরলত খুঁশি। চোখ দুটো যেন রসাল দুটো লিচু।

—গলাখান বড় মিঠা গো। এয়াকে নোতুন দেখি জ্যান!

হউক, আর একখান হউক!

কুমির চক্ষু স্থির। মুড়ি জিলিপী কিনে নিয়ে আসতে আসতে পিপড়ের ছাঙালের মত মানুষের ভিড়।

খেপী আওয়াজ তুলেছে। ওকে সামলান দায়। কটা দিন খেপীটাকে সামলে নিয়ে চলতে হবে। নইলে ওর আওয়াজের হাওয়া যদি এগুঁলোর বৃকের হাওয়ায় লাগে। তবেই সন্ধান।

ভিড় আর কমবে না। এ কি আকর্ষণ রে বাবা। টেনে ধরে রাখবে সেই কদমা চিনির রশি দিয়ে।

—সরেন, আপনারা সরেন। এখন আর গান অইব না।

তাকাল সবাই কুমির দিকে। এ বুচকুচে কালো মাগীটা আবার কে? এটাও কি বাউলী নাকি? এটাও কি গান জানে নাকি? এমনি জবর গান? এমন মন টনটনানি গান?

—অখন আমরা খামু। আপনারা যান অখন।

দু' চারটে পরসা আখলা সামনে পড়েছিল। মকুম দোকানী একখানা সিকি নিয়ে নিজে এগিয়ে এল বিদ্যার কাছে। ওর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বলল, বাইর্যা গাইছস। ল, একখান সিকিই দিল্যাম তরে।

কে এই বড়লোকের ব্যাটা। একখানা গান শানে একটা সিকি দেয়! কুমি তাকাল।

—অই ওয়ানে আমার দোকান। বাইস, চুড়ি দিমু অনে।

চুড়ির দোকান দিয়েছে মেলার, তার এত ফুটানী!

বিদ্যাধরী হাসল, পরসা নিল। খঞ্জনী রাখল থলেতে। থলের সব আছে। খুন-খারাপী রঙের সেমিজের মত লম্বা জামা। স্তম্ভিকর মালা, খঞ্জনী, গুবুগুবী। এক-

আরটা পাশে পড়ে আছে। সেজেগুজে যদি আওয়াজ তোলে খেপী! এক মেলার। ঐ কাণ্ডে যে হবে, কুমির ভাবতেই বুক কাপে।

মকুম দোকানী চলে গেল।

কুমি বিদ্যার কাঁকালে একটা ঠালা দিল।—অ খেপা, সাবধান কইল, আলার চোখে নিশা দেখলাম ক্যান।

বিদ্যাধরী হেসে উঠল। ও সব নেশা অনেক দেখেছে বিদ্যাধরী। নাটা জুড়ানের চোখেও নেশা ছিল। চোখের নেশার আগুন সর্বাপেক্ষে ছাড়িয়ে পড়ে। সর্বাপেক্ষে মরে। ছিবড়ে নিরে দান কাটল। রসের খবর জানল না। এদের জন্যে দুঃখ হয় বিদ্যাধরীর।

নাটা জুড়ানের জন্যেও ওর কণ্ঠ হয়।

ও জানে, বাপকে নাটা জুড়ানই মেরেছে। বাবার মৃত্যুর কারণ নাটা জুড়ান নয়। সে নিজেও নয়। ওই চোখের আগুন। আগুন ছাড়িয়ে পড়েছিল নাটা জুড়ানের অঙ্গ থেকে বাবার দিকে, তাব দিকে। সে আগুন নেভান গেল না।

বাবার কোন দোষ ছিল না। নির্দোষী মানুষটা অমন করে মোলো গো! থাকে সই যেভাবে নেয়। থাকে দিয়ে সই যা করায়। এ ভবে সইয়ের লীলা চমৎকার। নাটা জুড়ানেরই বা কি দোষ। ওর চোখের নেশা ওকে পাগল করে তুলেছিল। তাতে ওর দোষটা কি? যার হাওয়া যেমন বয়। হাওয়ায়-খবর না জানতে পারলে তার আর দোষ কি?

মুড়ি আর জিলিপী এনেছিল কুমি। বিদ্যাধরীর কোঁচড়ে ঢেলে দিল মুড়ি। জিলিপী এনেছে পশমপাতার মুড়ে। গোল পাতাখানা মেলে রাখল সামনে ঘাসের ওপর।

—ল বাইরা ল!

মুড়ি চিবোতে চিবোতে জিলিপী তুলে কামড় দিল কুমি।

—আলো, থাকুস কনে?

মুড়ি চিবোতে চিবোতে বিদ্যা বলল, —থাকার ভাবনা কি? এত বড় ঝাঁট পইড়্যা রইছে।

—ওশা, কস কি?

—ক্যান, এই বোড়ইগাছের নিচে থাকুস।

কুলগাছের নিচে রাত কাটতে কুমি রাজী নয়। সারারাত এই কুলগাছতলায়। কি সর্বনাশ! খেপারি যামন কথা।

—এয়ানে আমি রাইত কাটাইবার পারুম না।

—ক্যান?

—মর্দাগুলো রইছে।

বিদ্যা হাসল—তর এত মর্দা মানুষের ভয় থাকনের কথা না।

এটা একটা খোঁচা। কুমির অত ভয়

পাণ্ডাহিক বসুমতী

কিসের? তবু ভয়টা কুমিরই বেশি, লম্বাও বেশি। গানের শাড়ি সাপটে ঢেকেঢ়েকে থাকে। কিন্তু কেন, কুমির তো এমন লম্বা-বতী হবার কথা নয়।

বিদ্যার খোঁচাটা খেয়ে কুমির মদুখানা শুকোল।

বিদ্যা বন্ধুতে ভুল করেছে।

লম্বা আর ভয় কুমিরই বেশি থাকবার কথা। চিল-শকুনের ঠোকর খেয়ে ক্ষতাবক্ষত ও দেহ। ও নোতুন কোন চিল-শকুনের আশঙ্কার ভয় পায়। তাদের নজর এড়াবার জন্যে ভাগাড় ঢেকে রাখতে চায়। বিদ্যা কি বন্ধুবে? বিদ্যা জানে না এই মরদ মানুষের বেহায়া ব্যাভার। তাদের দয়ামাহীন অত্যাচার। ওগুলো শকুনের মত ঠোকরায়। বজাঙ্ক হয়ে উঠলেও তাদের উন্নত সৃষ্টির একটু কম পড়া চলবে না।

বিদ্যা সেই উন্নত চোখ দেখে নি। সময়কালে ওদের চোখ জানানোরের মত জ্বলে।

কুমি সে যন্ত্রণা জানে, তাই ভয় পায়। চুপচাপ আর একটা জিলিপী তুলে নেয় কুমি। তৌচড় খেয়ে মড়ি মড়ি করে তুলে মধু ফেলে। আবার জিলিপী কামড়ায়। শুকনো মধু এদিক ঠদিক তাকায়।

সম্মা হয়ে এসেছে। কুলগাছের নিচে অন্ধকার ঘন হয়ে আসবার আগেই কিছু দূরে নাটমন্দিরে পাঁচ-ছটা হ্যাঙ্কাক বাতি জ্বলে। দোকানে কোথাও লণ্ঠন কোলে, কোথাও বা ছোট ছোট গ্যাসের বাতি। আলোর স্পষ্ট হয়ে ওঠে মস্ত ঝাটটা। বিদ্যার মধু হ্যাঙ্কাক বাতির শাদা ভালো এসে পড়েছে। মচ মচ করে মড়ি চিবোতে চিবোতে তাকায় চারিদিকে। আলোয় মানুষের ছড়াছড়ি। কলরব বেড়েই চলেছে। আশেপাশের গাঁবের ছেলবড়ো মেয়েমরদ ভেঙে পড়েছে মেলায়। দোকানে দোকানে ভিড়। নাদরঘোলা ঘুরছে বনবানিয়ে।

বিদ্যা গা দুলিয়ে দুলিয়ে মড়ি চিবোয়—কুমি লো!

বিদ্যা খুঁশির চোটে কথা বলতে পারে না।

কমি তাকায়।

বিদ্যা কলববে আলোয় মানুষের ভেতরে জগোমগো। অলো অ কুমি। আমার নি নাচ আইসে।

নাচ! কুমি জিলিপীখানা এক কামড়ে শেষ করে ধমক দিয়ে বলে—অখন নাচন কিয়েব?

—আমার নাইচ্য নাইচ্য ঘুরতে ইচ্ছা করে।

দফা সেরেছে। খেপী যদি এখন নেচে নেচে গলার আওষাষ তোলে, ভিড় হয়ে যাবে। এখন কমির এসব ভাল

লাগছে না। এখন নাচন-গাওন কিসের। সময়ে সব হবে। আসার পর থেকেই লক্ষ্য করছে কুমি। খেপী যেন আনমনা। ভেতরের কি একটা জোয়ারে বুলবুলিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। রসে ভেজা টসটসে চোখ আর গা দোলানী। দেখলেই বন্ধুতে পারে কুমি। খেপীর ভেতরে রস যেন গুবগুবিয়ে ওঠে।

—অখন নাচন কিয়েব? / রাইত পোয়াইক। কাইল বিয়ানে নাচিস।

কাল বিয়ানের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। তা কখনো হয়।

বিদ্যা দুলে পাক দিয়ে উঠতে যায়। কুমি ওর হাত চেপে ধরে।—আই খেপী রইস।

বিদ্যা আবার বসে পড়ে কুমির হাতের চাপে। কুমির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।—কি কস?

কুমি শেষ জিলিপীখানা শেষ করে বলে—জল খামু।

বিদ্যা বলে,—আমিও খামু।

কুমি পেটীলা থেকে কলাই করা বাটি বার করে আপন মনেই বলে—কাছাকাছি ঘাটলা আছে নি?

—চল, আউগাইয়া দেহি।

ওরা ওঠে। কুমি বলে,—পেটীলা লইয়া চল।

—ক্যান?

—চদুরি হইবার পারে।

বিদ্যা তাকায় চারপাশে। হ্যাঁ ঠিক দেখেছে, সেই মধুকুম্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে একটু তফাতে কুলগাছের ওধারে একটা মনসাকীটা কোপের পাশে। নজর তার বিদ্যার দিকে।

—শুইন্যা যান।

বিদ্যা অক্রেপে ডাকল মধুকুমকে। মধুকুমর হাতে একটা কণ্ডির ছড়ি। দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এল। চোখেমুখে বেশ আনচান ভাবখানা।

—এয়ানে নি ঘাটলা আছে?

মধুকুম দেখিয়ে দিল—উই সোজা দক্ষিণে চিবিব ওপারে। একটা পুকুরবাট আছে।

—আমরা গ্যালাম। আমাগো জিনিস থাকল এয়ানে।

বলে কুমির হাত ধরে টানল বিদ্যা-ধরী। এগিয়ে চলল চিবিব দিকে। কুমির হাসি দেখে কে? মধুকুমকে পাহারাদার ঠিক করেছে খেপী। ওর ভাবসাবই আলাদা। কি কাণ্ডই করে খেপী। চোরকে বলে বস্তু আগলাতে। কুমির হাসি আর থামে না। বিদ্যাও হাসে। —ভালই হইল। মনে অ পলক পাইল।

—দূর ছাইডা, তর কাণ্ড দেইখা মরি।

চিবিব কাছে এগিয়ে এল। নিচে সত্যিই পুকুর। মস্ত পুকুর। কোণাকুণি ঘাটে নামল ওরা। কিন্তু আঘাটার কে উষু

হয়ে বসে চোখেমুখে জল ছিটোছে? হে ওটা?

হঠাৎ বিদ্যা চিংকার করে উঠল,— অরে মারে, সাপ!

কুমিও তাকাল। সামনে একটা হাত দেড়েক লম্বা সাপ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। দৌড়োবে কি দাঁড়াবে ওরা বোঝবার আগেই যে মানুষটা আঘাটার উষু হয়ে মধু ধুঁছিল, নিমেষে ছুটে এসে একটা মস্ত শস্ত মাটির ঢেলা মারল সাপটার দিকে ছুড়ে। সাপটার গায়ে লাগল কি না কে জানে। বেঁকে সড় সড় করে চলে গেল সাপটা চিপিঁর ওপর দিয়ে।

কুমি তখন ধরধর করে কাঁপছিল। বিদ্যার একখানা হাত ধরেছিল। বিদ্যা হাঁপাচ্ছিল। মস্ত চোখ দুটো মেলে দেখছিল চিবিটার দিকে।

—তোমরা এয়ানে কি কামে?

তাকাল বিদ্যা। কুমিও।

ওমা এ যে সেই মানুষটা। কালো খিনকেন্ট গদাধর সেই ছেলোটা যে খালের জলে আছাড় খেরেছিল।

—ভাগ্য তুমি আইছিল।

মানুষটা তাকাল বিদ্যার দিকে। টানা-টানা চোখ দুটো শান্ত, উত্তেজিত নয়। স্বভাবশান্ত চাউনী। শুধু একটু যা বোকা-বোকা।

—জোছনা পক্ষ তাই রক্ষা। অন্ধকারে ওয়ার পিঠে পাডা দিলে ফৌস কইয়া উঠ।



এই হ'ল মশা



এই হ'ল মশার যক্ষ

লাল টিনে ফ্লিট

মশা, হাছি ও অন্যান্য দূষ

উড়ে-চলা পোকামাকড় মেরে মেরে

ফ্লিট

আপনার ঘরবাড়ি রক্ষা করুন

এটি পুঁথির সেরা কটনাপক দ্রব্য

এসো স্টোর ইন্ডান, ইন্ড

এইমিড হাউসের মাথের দার

ফ্লিট মশা

CME-7 00

একটি দৃশ্যের প্রভাত

রাধামোহন মহাস্ত

নীল আলো স্বপ্ন ঢালে নাগরিক সভ্যতার চোখের পাতায়
পলাশ-রঙের মন, ছড়াছড়ি, জোড়া-জোড়া পা-ফেলে কী নাচ।
তখন বিকেল-সূর্য ফিক করে হেসে ওঠে বস্কম ডানায়
কুতূবমিনার শিরে, সনাতন প্রতীকের কী প্রচণ্ড আঁচ.....

লাল দুর্গ চোখে তন্দ্রা, অনাসক্ত, পার্বতীর ভেঙে গেছে ধ্যান।

তবু মহানগরের উন্মিলিত সাগরের এসেছে যে ডাক.....

তুমার সাগর চিরে মিত্রতার রক্তপোত আনে উপহার

লালিত বাসনা-ভীর্ষে মর্ষাদার অপমৃত্যু বসন্তবাহার
লাল দুর্গ চোখ তবু তন্দ্রালস, বসন্তায় পৃথিবী অবাক.....

জন-জনাদর্শন কণ্ঠে এসেছিল যে আহবান শুন নি আমরা!

দিগন্তে উদিত পুনঃ মনুষ্য গণ-ভারতের কল্যাণ প্রতীক
চিনি নি আমরা তারে, মগধকৃষ্ণা পিছদ পিছদ ছুটোঁছ গোপনে
নব-মহানগরের তপস্যার দিশাহারা প্রলুপ্ত নাবিক!

ঃ শ্মশানের সন্মতলে জাগে রুদ্ধশিল্পী শিব সান্নিধ্য নয়নে;.....

জনগণমন আজ দুঃস্থ দুঃ প্রত্যয়ের সংকল্পে অটল!

কুমি এতক্ষণে বলে,—তুমিই বাচাইল্যা
আমাগো।

মানুষটা হাসল।—আমি বাচাই নাই,
তোমাগো বাচাইছে চান্দ।

আহা কি কথা রে। বিদ্যা চোখ
শিখর করল ওর দিকে। কথায় মন্ত কথায়।
আসমানে চাঁদ যদি না উঠত, জ্যোৎস্নার
আলো যদি না পড়ত তবে সত্যিই তো
ওরা কেউ গিয়ে সাপটার ওপর পা দিত
আর সপ্তে সপ্তে ফণা তুলে দংশন। আমি
বাঁচাই নি। বাঁচিয়েছে আকাশের চাঁদ
আর জোছনা।

প্রাণভবা কথা। বহুদিন পরে এমন
রসের কথা শুনল বিদ্যা খেপী। জীবন
মিড়ার সময়ে এমন কথা সবাই বলতে
পারে না।

—কি কামে আইছিলো?

—জল খাইতে।

—দ্যাও, বাটিখান, দ্যাও, জল আইন্যা
দেই।

কুমির হাতের কলাই করা বাটিটা
লক্ষ্য করে বললে মানুসটা। বন্ধুতে
পেরেছিল ওরা ভরে আর ঘাটে নামতে
পারবে না। তখনো দুজন দুজনের হাত
মুপে ধবে আছে।

শুক্রা গ্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে।
হঠকে জ্যোৎস্নার আলোর ঘাটের ঘাস কাঁদা
মাটি চিকচিক করছে। অনেকটা নিচে ঘাট।
ফাল্গুনে বোধ হয় জল শুকিয়ে মজে
গেছে অনেকটা।

এখানে হ্যাঁজাক বাতির তীব্র শাদা
আলোর চোখ ধাঁধানি নেই। ঢিবি থেকে
বেশ খানিকটা নিচে সে আলো এসে
পৌঁছোয় নি। দূরের কলরব ভেসে আসছে
বাতাসে। ঢিবির এক ধারে সারি সারি
কতকগুলো গাছ দুলছে বাতাসে। কি
গাছ চেনা যায় না। বোধ হয় মাদার-
গাছ।

কুমি বাটি এগিয়ে দেয়। এক বাটি
জল এনে দেয় মানুসটা।

বাটির জল হাতে দিয়ে হেসে বলে—
এইটার নাম সায়র। নিতাইচান্দে সায়র।
এই নামেই সায়রের মেসার নাম।

কথাব মত কথা। এই পুরুষের নাম
সায়র। তাই সায়রের মেসো।

—নিতাইচান্দ নি প্রেমের ভান্ডারী।
এই সায়রের জলে প্রেমের মাখামাখি।

একটু থেমে বলে কালো মানুস,—
দেইখ অনে কাইল বিয়ানে। সপ্তলে চান
কইরব সায়রের জলে। সায়রের জল পান
চানের মন্য নি জানো?

বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ। কথায় কোন
জড়তা নেই, বেশ ভন্দব ভন্দর কথা। যেন
গম্ব পাঠ শোনাচ্ছে। না রায়মঙ্গল,
মনসামঙ্গলের গান শোনাচ্ছে। কথায় মত
কথা বলতে পারে।

বিদ্যা খেপীর চোখের পলক পড়ে না।
সায়রের জলে চান করবার, জল পান
করবার মর্মকথাও জানে।

—হ, এ জল চানে পানে প্যামের
উদয় হয়। নিতাইচান্দ প্যাম বিলার।

হায বে কথা! এ জল স্নানে পানে
প্রেমের উদয় হয়। এ সব মর্মকথা সকলে
জানে না। সকলের জ্ঞানবার কথা নয়।
যে মর্ম বোঝে সেই সে মাত্র জানে।

কুমি এতক্ষণে সহজ হতে পেরেছে।
হেসে উঠল কুমি। বাস্তবে কুমি চোখে
চাউনি তারহা হয়। চং চং উথলে
ওঠে। কুমি তারহা চোখা দুটি হেনে
বললে,—চলো খেপী। রাইত বিবাইতে,
প্যামেব কথা শুননের কাম নাই।

বিদ্যা মানুসটিব দিকে তাকিয়ে বলল,
—তোমার নামডা কি?

—আমাক চিন না? কিস্টাগ্রার
মদন। কাইল আমাগো গান শুইনো।

কুমি বিদ্যাকে ধরে টানল। ঢিবি
পার হয়ে চলল ওরা।

কুমি বিদ্যার দিকে একবার তাকাল।
বিদ্যার মস্ত চোখ দুটো আনমনা। তা
আর হবে না কেন? মানুসটা সাই জোয়ান।
খাড় পর্যন্ত কুচকুচে কালো চুল। টানা-
টানা চোখ, চোখা নাক। হাত দুখানা
যেন কশাগাছের খোড়। ভালই লাগে
দেখতে। দেখলেই কেমন মন টনটন
করে। চোখের দুটি তারহা হয়।

দয়াল কবিরাজ, খলিফা দাস, শেখ

পরমানন্দ হালুইকর—না, এ কারো মত
নয়। এ যেন এক অন্য মানুস। নরম-
সরস কথা, ভারী গম্ভীর গলা অথচ ঠান্ডা
স্বর। ভারী সুন্দর মানুস। বয়েস আর
কত হবে কুড়ি কি বাইশ, তার বোশ নয়।
কুমির চেয়ে কিছু ছোট হতে পারে।
খেপীর সমান সমান বয়েস হবে হয়তো
বা।

কুমির দেহখানা চনচন কবে।

বিদ্যায়ত্নী দুলে দুলে চলেছে এগিয়ে।
কিস্টাগ্রার মদন ওর মন ছেয়ে রয়েছে।
ও বন্ধুতে পারছে না, কেন মনের হাওয়া
উজান ধরেছে। টেনে রেখেছে ওর
পিঞ্জরার পরাণখানা।

মদন কথা কইতে জানে। রসের খপস
রাখে, এমন মানুস কই তার চোখে আর
কবে পড়েছে। ওই এংটেল মাটি রঙের
চিকচিকে মধুখানা। টানা টানা চোখ
দুটো ওর ভেতরটা টেনে রেখে দিয়েছে।
কি টনটনে টান। খেপী ধম মেয়ে
গেছে। মানুসে মানুস চিনে, তবে কি
চেনাচেনা লাগে। বিদ্যায়ত্নীর ভাব লাগল,
কেন?

দুলে দুলে এগোচ্ছে বিদ্যায়ত্নী।

—অ কুমি?

—কি কস?

—বাও করস না ক্যান?

—কি কম?

—ভাবস কি?

এবারে একটুখানি হাসল, বাঁকা হাসি,
মুখ বোঁকিয়ে বলল,—অই বোগদাটার কথা
ভাবত্যাঁহি।

—বোগদা কেডা? কালো মদন।

ধনুকের মত বোঁকে রয়েছে কুমির
মনখানা।—না বোগদো মদন।

কুমির বোকা মদন, খেপীর কালো
মদন। কুমির দেহে ঘর্নির উত্তাপ।
খেপীর মনে উজান বাও। কুমির চোখে
নেশা ধরেছে। খেপীর মনে রঙ ধরেছে।
দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে সেসে উঠল
এবার।

১৯১৫ সালের ৬ই আগস্ট তারিখের
সম্ভবতঃ প্রথম পত্রিকায় বড় হরফে ছাপা—

“পলিটিক্যাল সাসপেন্ডেড অরগেজেন্ট।
লিকোয়েল টু এ হাইওয়ে রবারি।”

তারপরে লেখা ছিল, “বিপিন গাঙ্গুলী
ডাক্তারি সংক্রান্ত ঘটনার কাছেই একটি
রিভলভার সমেত গ্রেপ্তার হয়েছেন।”

অতঃপর ১৪ই আগস্টের পত্রিকায়
প্রকাশ—১২ই তারিখে হ্যারিসন রোডের
‘প্রমজীবী সমবায়’ পুলিশ হানা দিয়ে
খানা-ভাঙ্গাসী চালিয়েছিল। পরে ১৬ই
আগস্টের সংবাদে দেখা যায়—৭ই আগস্ট
মেসার্স হ্যারি এন্ড কোম্পানীতে খানা-
ভাঙ্গাসীর ফলে হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ
বিপ্লবী বাদে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারা
ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্টে অস্ত্রধারী
হয়েছেন। অনেকটা এই সময়ে পুলিশ যে
ডাঃ বাদগোপালের বাড়িতেও হানা দিয়ে-
ছিল তার নজর পাওয়া যায় তাঁর স্মৃতি
থেকে। এই সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

“সেই সময় (৩রা সেপ্টেম্বর) আমার বন্ধু
আশু দাস জার্মানী থেকে এক বিশেষ দ্রুত
মারফৎ প্রেরিত বিস্ফোরক তৈরির নির্দেশ
(formulae) আমার দিতে এসেছিল।
ভদ্রলোকের নাম ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য।
.....আশুকে চাকর সাজিয়ে সরিয়ে
দিলাম।” (পৃ ৩৯৩-৩৯৪)। অপরদিকে
এই সময় বরাবর ‘মেমোরিক’ ইত্যাদি
জাহাজযোগে বিদেশ থেকে অস্ত্র আম-
দানির প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় এবং ফাঁগ চক্র-
বর্তী প্রমুখ বিপ্লবীরা বিদেশেই গ্রেপ্তার
হন। এই সকল খবর যতীন্দ্রনাথের কানেও
বখাসময় ঠিক ঠিক পৌঁছে গিয়েছিল।

অপরদিকে রাসবিহারীর বৃহত্তর
বৈপ্লবিক আয়োজন বিফল হওয়ার পরে
যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—“ওটা যখন হোল
না, আর আমি যখন বেরিয়েছি, ক্যালকাটা
পুলিশকে প্যারালাইজ করে যাব।” এই
বিবরে অন্যর আলোচনা করা হয়েছে। তা’
ছাড়া বালেশ্বরে আত্মগোপন করতে যাওয়ার
প্রাক্কালে যতীন্দ্রনাথের উক্তি—“যে পর্যন্ত
আমি ভাল করে না বুঝব যে তোমরা
আর সবাইকার জন্যেও এইরূপ নিরাপদ
স্থান ঠিক করে রেখেছ.....এ বন্দোবস্ত
মানতে পারব না; আমরা সব নাম-কাটা
সেপাই, প্রতি-মুহুর্তে মৃত্যুর আদেশ
শুনবার প্রতীক্ষায় আছি.....এক সঙ্গে
ধাকতে চাই, তা’ হলে একটা ‘এফকিউ
স্ট্রাগল’ করা যেতে পারবে, ‘হাইচ উইল
ক্রিয়েট এ মরাল ইম্প্রেশন’—।” এই কথা-
গুলি লিখেছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল,
আন্দামানে অবস্থানকালে জ্যোতিষচন্দ্র
পালের কাছে শুনেন তাঁর ‘বঙ্গজীবনের’
বিত্তর ভাগে (পৃ ১০৪, ১০৫)।

বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি

— বিস্মৃত অধ্যায় —

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এখন ফিরে যাওয়া যাক পূর্বোক্ত খানা-
ভাঙ্গাসীর দিকে। প্রকাশ ১৯১৫ সালের
জুন মাস থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ‘হেল-
ফারিকের’ (ক) কাছ থেকে কলকাতার
বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে ৪০,০০০ টাকা
পৌঁছাবার পরে সেই খবর সরকার জানতে
পারে। (খ) এরই ফলে ‘প্রমজীবী সমবায়’
‘হ্যারি এন্ড সন্স’ প্রভৃতিতে খানাভাঙ্গাস ও
গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা চলে, আর সেই সু-
ধরেই পুলিশ শেষে হানা দেয় বালেশ্বরের
‘ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ম’ (গ) প্রকাশ—

(ক) অন্যত্র উদ্ধৃত আসল নাম
“থিরোডের হেলফারিক”—নরেন্দ্রনাথ ভট্টা-
চার্য (এম এন রায়) অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায়
ব্যটালিয়ার পৌঁছানর পরে যার সঙ্গে তার
পরিচয় হয়েছিল। (কনফিডেন্সিয়াল
রিপোর্ট—মিঃ নিক্সন, পৃ ৯২)।

(খ) “The whole of the money
received from Bankok and
Batavia was not completely
traced but some of it certainly
found its way into the hands
of such people as Abinash
Chandra Chakrabarty (recal-
ling the Alipore Conspiracy
Case, 1908), Benoy Bhusan
Dutta Chowdhury, Amarendra
Nath Chatterjee, Jitendra Nath
Basu and Gopal Chandra Roy*
(নলিনীকান্ত করের ইচ্ছানাম)। Al-
together Rs. 43,000 were receiv-
ed in Calcutta of which the
local revolutionaries drew ap-
proximately Rs. 33,000...”
(Confidential Report, Page
86)।

(গ) “The Balasore connec-
tion was brought to mind the
fact that Harry & Sons had
dealings with the Universal
Emporium, Balasore, a business
under Saileswar Basu, the
brother of Shyam Sundar Basu.
Further, as early as March

‘কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবীর আত্ম-
গোপন করে বালেশ্বরে অবস্থান করার
খবর পাওয়া যায় মেসার্স টেগার্ট, ডেন-
হাম ও বার্ড, ৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবারে
কলকাতা থেকে রওনা হয়ে যান এবং
বালেশ্বরে পৌঁছে তিনজনকে গ্রেপ্তার
করেন।.....পুনেরার খোঁজ-খবর করে তারা
নিশ্চিত হন যে নীলগিরি স্টেটের বড়ার
অবস্থিত কোম্পোদা নামক স্থানে আরো
কিছু আত্মগোপনকারী অবস্থান কর-
ছিলেন।” (এ বি পত্রিকা ১৪-৯-১৫
এবং ১৮-৯-১৫)। এই কথাগুলি পরে
প্রকাশ পেয়েছিল বাদীপক্ষের কৌশলি
মিস্টার মানুকের বিবৃতি থেকে, স্পেশাল
প্রাইভটনালের সামনে ১লা অক্টোবর
তারিখে।

কোম্পোদার ডাকবাংলোতে পৌঁছান
মাত্র পূর্বোক্ত পুলিশের মহারথীরা গ্রামের
লোকদের মধ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা করে-
ছিলেন যে একটি ভীষণ ডাকাতির দল
এসে তাঁদের দেশে লুণ্ঠিরে আছে, আর
গ্রামবাসীদের মধ্যে যে বা যারা তাদের
ধরতে বা ধরিয়ে দিতে পারবে সরকারপক্ষ
থেকে তাকে বা তাদের যথেষ্ট পুরস্কার
দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। এই খবরগুলিও
যতীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছতে দেরি হয় না।

প্রকাশ—চিহ্নপ্রিয় ও মনোরঞ্জন যতীন্দ্র-
নাথকে আলাদাভাবে গা-ঢাকা দিতে পীড়া-
পীড়ি করেছিলেন কিন্তু তিনি তাতে রাজী
হন নি। (এ বি পত্রিকা, পৃ ৯০)। এখানে একটা কথা
উঠতে পারে যে অন্য কাজের ভার তাঁর
সহকারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে তিনি
যদি অপর স্থানে সরে যেতেন, পুলিশ
সম্ভবত তাঁকে ধরতে পারতো না, আব সেই
অমূল্য জীবনের স্বাধীন আবার কোন সমস্যা
তিনিই একটা বৃহত্তর বিপ্লবের সূচনা
করতে পারতেন। কিন্তু যে কারণেই হোক,
তিনি সঙ্গীদের ঐভাবে বিপদের সামনে

1915, information had been
received that Jatin Mukherjee
and some of his associates had
gone to a place in Balasore..”
(Ibid, Page 87)

ছেড়ে নিজে সরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন নি—এইটাই সত্য। কাজেই তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়েছিল তাঁরা তিনজনেই ১০।১২ মাইল দূরে অবস্থিত তালার্ডিহ নামক স্থান থেকে বাকি দু'জনকে (জ্যোতিষ ও নীরেন) প্রথমে আনতে যাবেন। (এই খবরগুলি হচ্ছে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের 'বন্দীজীবন' ২য় ভাগে উল্লিখিত জ্যোতিষ-চন্দ্র পালের কথার সারাংশ, পৃঃ ১০৫, ১০৬)। ডাঃ বাদুগোপাল তাঁর 'স্মৃতি'-তে এই সময়কার ঘটনা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার সাবাংশ হচ্ছে—“তালার্ডিহ যাত্রার পূর্বে শচীন্দ্রনাথ নিজেই মণীন্দ্র চৌধুরীর প্রাণেশ্বর নলিনী কর বলেন, মণীন্দ্র চৌধুরী নয়, আসল নাম হচ্ছে শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী) বাড়িতে যান, কিছু টাকা ও একটা বন্দুক আনতে।.....রাত আন্দাজ এগারটা হবে। বাড়ির পিছনের জানালা দিয়ে কার চাপা গলার আওয়াজ—‘দাদা, দাদা’ মণিদা কাঁ করে বুদ্ধে ফেলেন—এ যেন যতীনের কণ্ঠস্বর।.....যতীনদা বললেন—‘পঞ্চাশটা টাকা’.....তারপর মণিদার কাছ থেকে একটি বন্দুক চান।.....মণিদা খুব অনমনস্ক করে বললেন তাঁরা যেন মেঘাসানি পাহাড়ের কোলে কোলে চলে যান। তা’ হলে কোন বিপদ তাঁদের স্পর্শও করতে পারবে না।...যতীন্দ্রনাথ...‘খালি প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি লুকিয়ে বেড়াব? আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাব।’ (‘বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি’, পৃঃ ৪০৪)। আলোচনা প্রসঙ্গে মনে হতে পারে যে একাধিক ব্যর্থতা আব গ্রেপ্তারের স্ববরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নৈরাশ্যে ক্ষণিক বড় মানুষের মনকে স্পর্শ করা অস্বাভাবিক ছিল না। এই সম্বন্ধে মনে পড়ে জোসেফ মের্জিনির জীবনের অনুরূপ অবস্থার কথা। ‘দুটি অভিযানের ব্যর্থতা আর কাজের চাপ, উৎকণ্ঠা ও গোপনতায়, মের্জিনির স্বাস্থ্য এক সময় ভেঙে পড়েছিল, মন ভারাক্রান্ত হয়ে হতাশার নিম-শ্চিত হয়েছিল’।* সেইরূপই আলোচ্য

সময়ে যতীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক অবস্থা (আভাষ অন্যত্র পাওয়া গেছে) ও পরি-স্থিতির মধ্যে তাঁর পক্ষে ঐরূপ মরিয়া

the leadership of which, contrary to his advice, was vested to an adventurer who exhausted the funds and delayed action until all chance of success was gone. The failure of the two expeditions and the strain of work, anxiety and secrecy, which they involved, preyed on Mazzini's health and plunged him for a time in black despair. The forms of his dead comrades rose up before him ‘like the phantoms of a crime and its unavailing remorse. I could not recall them to life. How many mothers I had caused to weep.’ How many more must learn to weep, should I persist in the attempt to arouse the youth of Italy to the noble action.. Diplomatic notes poured down upon Switzerland, and Mazzini was banished from the Republic. Again he managed to elude the police, leading a hunted life, now sheltered by some Protestant Pastor, now spending months in untenanted houses where in the moaning of the wind he heard Ruffini's voice calling him. Gradually the tempest of doubt subsided. ‘One morning I awoke to find my mind tranquil and my spirit calmed..The first thought that passed across my spirit was, ‘Your sufferings are the temptations of egoism, and arise from a misconception of life’.. Material desires he had surrendered long ago, but he had clung to the affections. ‘I should have thought of them, as blessings from God to be accepted with thankfulness, not as of something to be expected and exacted as a right and a reward. Instead of this,

হয়ে নিদেন একটা মারণ আঘাত হানবার বিষয়ে সঙ্কল্প গ্রহণও অস্বাভাবিক ছিল না। তবে একথা সত্য যে সেইরূপ জীবন-দানও সোঁদীন হয়তো প্রয়োজন ছিল, আর সেটা যে ব্যর্থ হয় নি তার সাক্ষ্য বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবের ইতিহাস আজও বহন করে আছে। এই বিষয়ে প্রমথের শ্রীমৈলোক্য চক্রবর্তী লিখেছেন—“তিনি সম্ভ্রম সংগ্রামে মৃত্যু বরণ করিয়া জাতির মধ্যে একটা আদর্শ রাখিতে চাহিয়া-ছিলেন।” (‘জৈলৈ দিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম’, পৃঃ ১০০)। যতীন্দ্রনাথ ঐভাবে দুটি সংগীকে আনবার জন্যে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করেছিলেন অশ্বকার রাতে পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে তালার্ডিহর পথে। জ্যোতিষ পালের কাছে শুনে এই কথা লিখেছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁর ‘বন্দীজীবনের’ ২য় ভাগে।

১২ মাইল পথ পাশা হে’তে গিয়ে আবার ফিরে আসতে আসতে ভোর হয়ে গিয়েছিল। ফেরবার সময় তাঁরা ঠিক কোথায় যাবার জন্যে মনশ্চক্রে করেছিলেন সে কথা আজ বলা শক্ত। সারা রাত অনিদ্রা, অনশন ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সকালের প্রথম আলোতে তাঁরা একটি চম্বীকে দেখতে পান, নাম ‘সোনা সাহ’। ৯ই সেপ্টেম্বর, সকাল ৯টা হবে—সোনা সাহ তাঁর সাথীর সঙ্গে নদীতে মাছ ধরা শেষ করে ডিঙিটিকে সবে তীরে বেঁধেছে। অপর পারে পাঁচটি আগন্তুক এসে তাকে ডাক দিয়ে বলতে থাকেন যে, তাঁরা সরকারী লোক, তাঁদের একটু খেয়া পার করিয়ে দিতে হবে। ছোট ডিঙিতে অতগুলি লোক ধরবে না বলে সোনা সাহ অসম্মতি জানান। (এ বি পত্রিকা—৪।১০।১১১৫)।

শেষে তাঁরা টাকার লোভ দেখিয়েও বলেছিলেন তাঁদের জিনিসগুলি অস্তিত্ব পার করে দিতে, তাঁরা সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যাবেন; তাঁরা সরকারের লোক বলেও তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সে তাতে রাজী হয় নি। কারণ সরকারের লোক বলে পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেও তাঁদের কাপড়-চোপড় বিশেষ না থাকার

*Forged signatures, enervating drugs, physical torture were used..Dreading he might succumb, Jacope Ruffini, Mazzini's dearest friend committed suicide..Mazzini himself was condemned to death..but he remained hidden in Marseille for a year, pushing on the crusade. In the middle of July 1833 he went to Geneva to organise another insurrection,

I had made a condition of fulfilling my duties. I had not reached the ideal of love, love that has no hope in this life. I had worshipped not love but the joys of love.” (Introduction to the ‘Duties of Man and Other Essays’ by Joseph Mazzini—Pages xvii & xviii).



“ভারি খুশি
হলুম শুনে যে
কাল রাত্তিরে
খুব তৃপ্তি করে
খেয়েছ —
সব কিছুই আমি
কুমুম বনস্পতিতে
রোধেছিলাম।”

“বলতে চাও মুচি, তরকারি... সব কিছুই।”

“হ্যাঁ ভাই, এমন কি মিষ্টি বাবারলোও। লেবু, মালা, রানিবার পকে কুমুম সজি
খুব ভালো। যেমন টাটকা, তেমনি খাঁটি। ২-কেজি ৪-কেজির সীল-করা টিনে
পাওয়া যায়। আনতে-নিতেও খুব সুবিধে।”

“তবে আমার লোভ হচ্ছে। কুমুম কিনে দেখতে হবে তো।”

“শেখ। তোর রানার দান দেখবি আগের চেয়ে আরও ভাল হয়ে গেছে।”

কুমুম বনস্পতি ‘এ’ আর ‘ডি’ ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এর
উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পারেন, কারণ কুমুম বনস্পতি
উৎপাদনের প্রত্যেকটি তরফে ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষিত।
প্রতিদলের বীজকে টিনে শুঁয়ে কারখানার সীল করা হয়।
সব রানিবার টাটকা পাবেন।

খাঁটি স্বাদ পেতে হ’লে
কুমুম
বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন



কুমুম প্রোডাক্টস লিমিটেড
কলিকাতা-১

JWTKPK 29444

সোনা সাহু ও উপস্থিত গ্রামবাসীদের মনে কোতাহল জেগেছিল, আর এটাও স্বাভাবিক। তা ছাড়া সোনা সাহু নাকি তার ভাইয়ের কাছে শুনিয়েছিল যে পুলিশ কতকগুলি আগন্তুককে খোঁজ করছে। যাই হোক ইতিমধ্যে আরো করেকটি কাঠবাহী বড় নৌকা সেখানে এসে হাজির হয় এবং তারই একটির সাহায্যে তাঁরা খেয়া পার হয়ে নেন। পাঁচটি পরস্পর বিনিময়ে পনের বছরের বালক, 'দুর্লি মাঝি' তাঁদের এ খেয়া পার হওয়ার সহায়তা করেছিল। তারপরে বতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবীরা এভাবে কোনক্রমে নদী পার হয়ে যখন জংগলের দিকে চলতে থাকেন, সোনা সাহু আদি গ্রামবাসীরাও তাঁদের সঙ্গ নেয় এবং অল্পবিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে এগিয়ে চলে। তা ছাড়া কোন সময় দফাদারকেও খবর পাঠিয়ে দেয়। সোনা সাহু এই সুযোগে তাঁদের কাছে আর একটি খবর জেনে নিয়েছিল যে তাঁরা রেলের স্টেশনের দিকে যেতে চান। (এ বি পত্রিকা—৪।১০।১৯১৫)। অতঃপর দফাদার তখন বাড়িতে না থাকায়, তার ভাই এসে সোনা সাহুর দলে যোগ দেয় ও নবাগতদের গতিরোধ করে তাঁদের পরিচয় জানতে চায়। বিপ্লবীরা তখন প্রথমে তাদের থাকা ঘরে সরিয়ে দিয়ে সেই স্বতন্ত্র জবাব দেন এবং শেষে নিজদের পিস্তলগুলি বার করে দু'চারটি ফাঁকা আওয়াজ করেন। এইভাবে গ্রামবাসীরা তাঁদের সঙ্গ ছেড়ে একটি দূরে সরে গেলেও, আরো উত্তেজিত হয়ে তফাতে থেকে তাঁদের অনুসরণ করা শুরু করে। অতঃপর এই বিপ্লবী পথিকরা 'দুর্লি' নামক এক গ্রামে পৌঁছান।

গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সোনা সাহুর দল এইবারে সেই আগন্তুকদের আবার ঘিরে ফেলবার উপক্রম করে। এখন নিরুপার হয়ে তাঁরা গুলী ছুঁড়তে বাধ্য হন। ফলে গ্রামের সদীর 'রাজু মহান্তি' মারা যায়।

—“The Bengalis fired this time, one villager being killed and three wounded.” (A. B. Patrika. 4.10.1915)।

বিপ্লবীরা আবার চলতে থাকেন এবং শেষে ময়ূরভঞ্জ রোড পার হয়ে আর একটি সড়ীর সামনে হাজির হন। তখন তাঁরা নিজের নিজের আগ্নেয়াস্ত্র কাপড়ের সাহায্যে মাথায় বেঁধে, একে একে সেই সড়ীটি পায়ে হেঁটেই পার হয়ে যান, কারণ নদীতে তখন বেশি জল ছিল না। তারপরে তাঁরা হাজির হন 'চশাখন্দ' নামে এক গ্রামে। ইতিমধ্যে এস-আই চিন্তামণি হুমবংশে গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে,

দূর থেকে এই আগন্তুকদের অনুসরণ করছিলেন। এই কথা জানা যায় চিন্তামণির বিবৃতি থেকে।

সাক্ষী চিন্তামণি বলেন যে, ১ই তারিখে ফুলারিঘাটের উত্তরে একটি গাছের ওপর থেকে তিনি রাস্তাটি লক্ষ্য করছিলেন...ঘাট পর্যন্ত তিনি পুলিশের পোষাকে ছিলেন, তারপরে সেই পোষাক ত্যাগ করে গ্রাম্য পোষাক পরিধান করেন। (এ বি পত্রিকা—১১।১০।১৯১৫)।

অপরদিকে এই সেক্টরের (ক) ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি ও এস-ডি-ও (গ্রীনলিনী কর বলেন তাঁর নাম প্রীকামাখ্যা...) রাজ্য পুলিশের সাহায্যে কোম্পোদার আশ্রয় যখন সার্চ করতে যান সেই সময় আশ্রয়ের উত্তানে লাইসেন্স-হীন আগ্নেয়াস্ত্রের চিহ্ন দেখে তাঁদের সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়েছিল বিপ্লবীদের সেই স্থানে অবস্থান সম্বন্ধে। তাই তাঁরা রাজ্য থেকে বাইরে যাবার সমস্ত পথে পাহারা বসিয়ে দিয়েছিলেন।

—“Steps were taken to guard the exists of these States.” (A. B. Patrika 18.9.1915)।

অপরদিকে বিপ্লবীরা চশাখন্দ গ্রামে পৌঁছে ধানক্ষেতের মধ্যে অবস্থিত একটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে হাজির হন। সেখানে ঝোপের আড়ালে থেকে বাইরের গতিবিধি দেখবার পক্ষে একটি উপযুক্ত স্থান তাঁদের লক্ষ্য হয়। কাজেই সেই স্থানটিতেই তাঁরা তখন আশ্রয় নেন।

ইতিমধ্যে বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে পূর্বোক্ত দফাদারের ভাই তিনজন গ্রামবাসীর সঙ্গে বালেশ্বর পৌঁছে পুলিশ সুপার এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খবরটি শুনিয়ে যান। তাঁরাও অর্মানি এক বিরাট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। খবরে প্রকাশ আশপাশ থেকে ব্যবহার-যোগ্য সমস্ত মোটরগাড়ি জের করে উক্ত বাহিনী সংগঠনের কাজে লাগান হয়েছিল।

—“১৯ তারিখে বেলা দু'টা আন্দাজ সময়ে সাক্ষী (মিস্টার কিলবি) মেজর ফ্রেথের কাছ থেকে একটি মোটরগাড়ি সংগ্রহ করে ম্যাজিস্ট্রেট রাদারফোর্ডকে ড্রাইভার নিযুক্ত করেছিলেন।” (এ বি পত্রিকা

(ক) প্রীকামাখ্যা কর বলেন—পুলিশ দল ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কোম্পোদার ডাকবাংলোতে পৌঁছায়। আর সেই খবর পেয়েই দাদারা সেই রাতেই রওনা হয়েছিলেন সতীশ ও নীরেনকে আনতে। ২৪।১২।১৬ তারিখে শোনা)।

—৫।১০।১৯১৫)। ডাকাত ধরার অজুহাতে সহপ্রাধিক গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সেই পুলিশবাহিনী বড়িবালামের কাছে পৌঁছে, মিস্টার কিলবি তাঁদের লোক-গুলিকে নানা দলে ভাগ করে বিপ্লবীদের পথ রোধ করার জন্যে চারিদিকে ছাড়িয়ে দেন। ইতিমধ্যে মিস্টার রাদারফোর্ড তাঁর পূর্বোক্ত লোকজন নিয়ে যথাস্থানে হাজির হন। মিস্টার কিলবি ও তাঁর মহারথী সহকারীদের অজানা ছিল না যে তাঁদের জন্যে তাঁদের অত তোড়জোড় তাঁরা দলে পাঁচজনার বেশি নন।

সশস্ত্র বিপ্লবের মতবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের, তখনকার সরকারী বীরগোষ্ঠী কতখানি আতঙ্কের চোখে দেখতেন উপরোক্ত ব্যবস্থা তারই আভাস। বাই হোক, মিস্টার কিলবি এবার সাহসে ভর করে, সদলবলে এগোতে থাকেন সেই পাঁচটি বিপ্লবীর উদ্দেশ্যে, বারী তখন দু'দিন, দু'রাতি অনাহারে, অনিদ্রায় ও কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত, তবে মানসিক ভেজে সহস্রের সমান। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁর 'বন্দীজীবন' ২য় ভাগে লিখেছেন—“এবার আর নিস্তার নাই, পুলিশ নিতান্তই সন্নিকটে। তখন বতীন্দ্রনাথের সঙ্গীরা মজল নরনে প্রার্থনা করিলেন—তাহারা মরেন মরেন, বতীন্দ্রনাথ হুমবংশে স্থানান্তরে গমন করুন। কিন্তু বতীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।” (পৃঃ ১০৮)।

এইবার মিস্টার কিলবির ভাষাতেই বলি—“তাঁদের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা গুলী ছোড়া শুরু করেন...সাক্ষী ও অন্যান্যেরা তখন শুরুর পাড়ে বকে হেঁটে অগ্রসর হন; বাঙালীদের গুলীবর্ষণ চলতেই থাকে...তাঁরা কেবল চারটি ঝোপ দেখতে পেরেছিলেন আর তারই ভিতর দিয়ে গুলী আসছিল...কিন্তু বাঙালীদের দেখতে পান না।” (এ বি পত্রিকা—৫।১০।১৯১৫)।

কাজেই এখন দেখা যাচ্ছে বালেশ্বরের বিখ্যাত বৃন্দে প্রতিবন্ধিতা হয়েছিল—কম্বাক্তর, পরিশ্রমক্লান্ত পাঁচটি বাঙালী বনাম কিলবি - ডেনহাম - টেগার্ট-রাদারফোর্ড-আর ই বি রেনল্ড (ডি-আই-জি, সি-আই-ডি, পাটনা) সহ পর্যাপ্ত অস্ত্র সজ্জিত এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর, আর তার সঙ্গ ছিল মিথ্যা প্রচারের দ্বারায় উত্তেজিত লাঠি হাতে অসংখ্য গ্রামবাসী* তারপরে শুরু হয় গুলীর বিনিময়।

* প্রসঙ্গত বর্তমানে একটা কথা উঠেছে যে সৈনিকের বিপ্লবীদের কাজ-কর্মের মধ্যে প্রথম থেকেই গণসংযোগের

—“Fusillade was exchanged between the parties lasting over three quarters of an hour.”

—“তিন কোয়ার্টার ধরে উত্তরপক্ষের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন গুলীবর্ষণ চলছিল।” (ক) (এ বি পত্রিকা—১৮।১।১৯১৫)। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে ভাগ্যলক্ষ্মী সেদিন বিপ্লবীদের অন্তরায় হয়েছিলেন। অন্যত্র আলোচিত ব্যারাকপুরে ট্রাক রোডে বিপ্লবীরা বার পড়ার সময় দেখা গেছে, তিন যখন সহকর্মীদের খুঁজতে বার হন, নিরামিত অভ্যাস মত একটি রিভলবার পকেটে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি গুলীভরা ছিল কি না, তা’ দেখতে ভুলে যান। এখনও হয়েছিল তেমনই আর একটি মরাত্মক ঘটনার পুনরাবিত্ত। ব্যবহার উপযোগী টোটা হাতের কাছে রাখা ছাড়াও এক ব্যাগ ভর্তি আলাদা মজুত টোটা তাদের সঙ্গে ছিল, বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে। ডাঃ বাদুগোপাল তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন,—“প্রায় দু’ তিন ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। স্বদেশী বীরদের টোটা ফুরিয়ে

এল। বতীন্দ্রনাথ হুকুম দিলেন ছোট চামড়ার খলিটি খুলে আরো টোটা বের করতে।...খলিটির চাবি পাওয়া গেল না। ...দাঁতে করে সেটা কাটবার চেষ্টা হল। ...কাটা গেল না।” এই বিষয়ে বলা প্রয়োজন, পূর্বে চলতে চলতে কোন সময় ঐ ব্যাগের চাবিটি যে কোথায় পড়ে গিয়েছিল, সেই বিষয়ে কেউই আন্দাজ করতে পারেন নি। (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—ডাঃ বাদুগোপাল যথোপাধ্যায় পৃঃ ৪০৬—৪০৮)। টোটা ফুরিয়ে গেল, এমন সময় বতীন্দ্রনাথের পেটে গুলী লাগল। তাঁর চেয়ারেও লেগেছিল। জ্যোতিষ আহত। চিন্তাপ্রিয় আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। সমালোচনার চোখে এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে বর্তমানে যে যাই বলুন—১৯১৫ সালের বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণের মানসিক গঠন-প্রণালী, স্বাধীনতা অর্জন সম্বন্ধে গণ-চেতনা পরিষ্কৃত করার ব্যাপারে পরিপন্থী অবস্থা, আর সেই সঙ্গে দেশের লোকের মধ্যে পুরুষকারের ক্রীড়া প্রাপ্তি প্রভৃতি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালের বিপ্লবীদের কাজকর্মের দৃষ্টি-বিচ্যুতির পর্য্যালোচনা করার স্থানের চিরকালই অভাব থাকবে। দুর্জয় বিরুদ্ধ অবস্থার ভেতরে পড়েও বতীন্দ্রনাথের ঐভাবে আত্মদানের মর্মকথা তৎকালে বোধগম্য হয়েছিল একজন স্বাধীনচেতা বিরুদ্ধপক্ষীর মনে কোন প্রতিবন্ধ্য ধরে তার প্রমাণ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে।—

“Though I had to do my duties, I have great admiration for him. He was the only Bengali who died in an open fight from a trench.”

—“যদিও আমাকে আমার কর্তব্য করতে হয়েছিল, তাঁর জন্যে আমি সপ্রশংস প্রশংসা জানাব। তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি ট্রেনের ভেতরে থেকে সমগ্র সমরে হত্যাধর্য করেছিলেন।” শচীন্দ্রনাথ সান্যাল লিখেছেন—এই কথা নাকি টেগার্ট সাহেব বতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পরে বলেছিলেন ব্যারিস্টার মিঃ জে এন রায়ের কাছে। অতঃপর ‘বন্দীজীবনের’ ২য় ভাগে দেখা যায় বাদুগোপাল একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“বতীন্দ্রনাথ তখন সাথীদের বলিলেন, আর শক্তি ক্ষয় করিয়া লাভ নাই: চিন্তাপ্রিয় গেল, আমিও বাঁচিব না, তোমরা আর প্রাণ দিও না...অবশেষে তাঁহারা বতীন্দ্রনাথের অশেষ অনুরোধে আত্মসমর্পণ করিলেন।” (পৃঃ ১৩৯)। উক্ত বিষয়ে তিনি আরো লিখেছেন যে, এই সমস্ত কথা তিনি শুনেছিলেন আত্মমানে অবস্থান

কালে জ্যোতিষচন্দ্র পুরসের স্বাক্ষরিত বর্তমান আলোচনার দৃষ্টি বিরুদ্ধ মত দেখা গেলেও প্রত্যক্ষদর্শী জ্যোতিষচন্দ্র পালের কথাই অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হবে, আর সেইটাই স্বাভাবিক।

অতঃপর মিস্টার কিলবির সাক্ষ্য দেখা যায় তাঁরা বিজৈতদের কাছে গিয়ে দেখেন—

“...three big Mauser and one small Mauser Pistol lying on the ground near the man and also two stocks for converting big Mauser Pistols into rifles and a quantity of Mauser ammunitions. Witness fetched water in his topee for wounded men and subsequently fetched beds from the neighbouring village. The wounded and the corpse were put on bed and brought into Balasore.”

—“...তিনটি বড় মশার এবং একটি ছোট মশার পিস্তল লোকটির কাছে মাটিতে পড়েছিল, আর ছিল বড় মশার পিস্তলকে রাইফেলের মত করে ব্যবহার করার জন্যে দুটি বন্দুকের কুন্দো। তা ছাড়া ছিল কতগুলি মশার টোটা.....। সাক্ষী তাঁর টপির সাহায্যে আহতদের জন্যে জল এনেছিলেন এবং পরে নিকটস্থ গ্রাম থেকে বিছানা আনিরেছিলেন। আহত ও নিহতদের সেই বিছানায় শুইয়ে বালেশ্বরে আনা হয়েছিল।” (এ বি পত্রিকা—৫।১০।১৯১৫)। তবে এই বীর বিপ্লবীদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ নয়, এটা ছিল স্বার্থ নিবন্ধন ব্যাপার; মামলা, সাজাবার অভিসন্ধি। অতঃপর সরকারী পক্ষের কৌশলী বাকিপুরের ব্যারিস্টার মিস্টার পি সি মানক ১লা অক্টোবর তারিখ সওয়ালে বলেছিলেন—“যে পিস্তলগুলি ঐভাবে পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে তিনটি ছিল ১৯১৪ সালে রক্তা কোম্পানী

ছড়াবেই ছিল এই দুর্দৈবের কারণ। তবে চন্দ্রনাথ দেশীয় অবস্থা ও মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সেইরূপ প্রয়োজনীয় গণ-জাগরণের পরিকল্পনা, আর সংশ্লিষ্ট উপায়ের বিষয়, তৎকালীন বিপ্লবী চিন্তা-শীলরা যে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন আজ তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে আজ এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আলোচ্য সময় পর্বত গ্রামবাসীরা বিপ্লবীদের হত্যার জন্যে কিছুই করেন নি, বরং বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আর তার মূলে ছিল সংগঠনের দুর্বলতা।

(ক) নজিনী কর বলেন—“১৯৪০ সালে তিনি ডেরিগনশোনে মিলিটারি রেশন সরবরাহের কাজ নিয়েছিলেন। সেই সময় একদিন কোন সেপাই রেশন নিতে এসে গল্প করে যে, সে ১৯১৫ সালে বালেশ্বরের যুদ্ধে সরকারের পক্ষে ছিল। বিপ্লবীরা সাহেবদের টপি লক্ষ্য করে গুলী চালাচ্ছিলেন। তাই দেখে সাহেবরা কয়েকটি লাঠি খাড়া করে তার ওপর নিজেদের কয়েকটি টপি আটকে দেয়। ফলে বিপ্লবীরা সেই দিকে গুলী চালান। এই সুযোগে সাহেবরা অপরদিক থেকে হুকে হেঁটে বাবুদের কাছে পৌঁছে যায়।” (২৪।১২।৬৫ তারিখে ব্যক্তিগত শোনা)। যেভাবেই হোক, রণচ্যুতদের (ট্যাকটিকস) দিক থেকে এই কৌশল অবলম্বন প্রতিপক্ষের রণ-দক্ষতার কথাই প্রকাশ করে।

* এই বিষয়ে ডাঃ বাদুগোপাল তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন—“১৯৪৮-৪৯ সালে বিখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ঐ স্থানে আত্মস্থানে গিয়েছিলেন। তিনি যে সব তথ্য সংগ্রহ করেন তাতে কিন্তু আত্ম-সমর্পণের কথা আসেই না। দাদা জ্যোতিষ ও চিন্তকে নিয়ে কর্মীরা যখন বালুত, সেই অবকাশে শরৎসেনার আত্মগোপন রেখে ঘিরে ফেলে এবং পিছন থেকে এসে সেবারত ছেলে দুটিকে গ্রেপ্তার করে।” (পৃঃ ৪০৯)।

থেকে অপহৃত অস্ত্রেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ।" (এ বি পত্রিকা—২।১০। ১৯১৫)।

যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেপ্টেম্বরের ৯ই তারিখে রাত ৮-৩০ মিনিটের সময় আর তিনি ইহুদ্য ত্যাগ করেছিলেন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালের ভোর ৫টা সময়। মিস্টার কিলবি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর) ৪ঠা অক্টোবর তারিখে তাঁর সাক্ষ্য বলেছিলেন—“মৃত্যুর আগে যতীন ইংরাজীতে বলেছিলেন—দেখবেন ব্রিটিশ রাজ্যে এই ছেলেগুলির ওপরে যেন কোন অবিচার না হয়। যা কিছু ঘটেছিল তার জন্যে দায়ী আমি।” (এ বি পত্রিকা—৫।১০। ১৯১৫)। মিস্টার কিলবি যতীন্দ্রনাথের শেষনিবাস ত্যাগের আগের কথাগুলি এইভাবে বিচারকের সামনে উপস্থাপিত করে আপন সভ্যতাই পরিচয় দিয়েছিলেন সভ্য, কিন্তু সেই তরুণ বিজ্ঞতা কটিকে নিয়ে সেদিন যে বিচার প্রহসন হয়েছিল, তার ফলে নীরেস্ত ও মনোরঞ্জন ফসির আদেশ হয়, আর জ্যোতিষ পালের স্বাধীন স্বাধীনতার দণ্ড হয়েছিল। তার পরে আদ্যমানে থাকার সময় প্রচণ্ড পীড়নের ফলে জ্যোতিষ পালের মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটে। পরে তিনি বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত হন আর সেই স্থানেই দেহ-ত্যাগ করেন।

পরিণতি

“They considered that they were numerically strong to deal with the troops in Bengal but they feared reinforcements from outside. With this idea they decided to hold up three main railways in Bengal by blowing up the principal bridges. Jatindra was to deal with the Madras Railway Station from Balasore. Bholanath Chatterjee was sent to Chakradharpur to take charge of the Bengal Nagpur Railway while Staish Chakrabarti was to go to blow up the bridge on the East India Railway. The asylum at Chakradharpur had apparently been arranged for by Bholanath Chatterjee in March 1915 and Bholanath was kept there (joined later by one

Girish and. Durgadas Mukherjee) till sometime in August Noren Chaudhury and Phaniendra Chakrabarti were told to go to Hatia. first to obtain control of the East Bengal Districts and then to March on Calcutta. The Calcutta party under Noren Bhattacharjee and Bipin Ganguli were first to take possession of all the arms and arsenal around Calcutta, then to take Fort William and afterwards to sack the town of Calcutta. The German officers arriving in the Maverick were to stay in East Bengal and raise and train armies.” (Confidential Report, 1917, of J. C. Nixon, I. C. S.—pages 92, 93).“

আলোচ্য বিপ্লব-প্রতীতি সম্বন্ধে নিকসন সাহেবের মতে এ উৎসাহী যুবক দল তাঁদের পরিকল্পনার বহু আকাঙ্ক্ষিত পরিসমাপ্তির কথা বা ভেবেছিলেন সেটা ছিল নিম্নোক্ত ভিত্তিতে—

কলকাতার তাঁদের পরিচালনাধীন ৫,০০০ যুবক ছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে বিপ্লবের সাফল্যের খবর বোম্বার সঙ্গে এ সংখ্যা অন্তত ২০,০০০-এ পরিণত হবে। তা ছাড়া প্রথম অভ্যুত্থানের সঙ্গেই মফস্বল থেকে আরো ৫০,০০০ যুবক এসে সেই বিদ্রোহে যোগ দিতে পারেন। আর এই অক্ষাণী অতি অকাজ আন্দাজ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না—

These figures can be nothing but very sanguine gausses ?

তাই সেদিনকার এ বিপ্লব আয়োজনের প্রতীতিপত্র দেখা গিয়েছিল—(ক) বাঙ্গা-গোপাল ও নলিনী কর সিলেটের দিকে যাত্রা করেছিল। (খ) প্রাণকুমার ও দীর্ঘেশ রায় মৈমনসিংহ অভিমুখে; (গ) সুধীর সোম ও বিজয় চক্রবর্তী কুমিল্লা অঞ্চলে; (ঘ) নরেন চৌধুরী যান মৈমনসিংহ-এর হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর দলের সাহায্য কামনায়; (ঙ) আব্বা যাদু-গোপাল, প্রাণকুমার ও যোগেন্দ্রনাথ বসু আসেন বরিশালের সতীশ মুখার্জীর (প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী) পরামর্শ ও আশীর্বাদ নিতে। (চ) অপরিদ্রায়ে অন্তরীণে বন্দীদের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল, অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাঁরা আত্মসমর্পণ করে বিপ্লব আয়োজনে সহযোগিতা করবেন—

কিন্তু এত পরিপ্রসার সত্ত্বেও তাঁরা

গণসংস্কারের ব্যবস্থার কথা বাদ দিয়েও (হয়তো সেই প্রচেষ্টার সময় ছিল না), খবর রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, কোন একফাঁকে তাঁদের এই প্রাণপাত প্রচেষ্টার সংকেত সরকারের কানেও পৌঁছে গিয়েছিল এক অশ্রুত মর্মেতে। অন্যত্র আলোচিত টেলিগ্রামের সূত্র ধরেই সরকার রায়মঙ্গলের ইশ্টিতে একটা বিশেষ কিছু আন্দাজ করে নিয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, আর তারই ফলে সঙ্গে সঙ্গে হাতির এন্ড সন্স প্রতিষ্ঠিতে খানাতজারাস আরম্ভ হয়। এইভাবেই ১৯১৫ সালের বিপ্লব আয়োজন প্রতীতি-পত্রই পরিসমাপ্ত হয়। (পূর্বোক্ত কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টের পৃঃ ৯০, ৯৪-এর সারাংশ)।

এই সকল ব্যাপারের ওপর ভিত্তি করেই ১৯১৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর পবিত্র ভারত সরকারের মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট থেকে হুকুম জারি হতে থাকে নানা প্রসঙ্গে। বিশেষ করে রেল লোচল ইত্যাদির ওপরে। কারণ তখনও তাঁদের বন্দ্যমূল ধারণা ছিল যে, ভারতে বিদেশ থেকে অস্ত্র চালানোর ব্যবস্থা তখনও চালু ছিল এবং পরবর্তী ক্রিসমাসের ছুটিতে আবার কিছু সংঘটনের তাঁরা একটা আশঙ্কা করেছিলেন। (পূর্বোক্ত রিপোর্ট, পৃঃ ৩১)। অতঃপর ১৯১৬ সালের ৩রা জানুয়ারী একটি টেলিগ্রাম সরকারের হাতে পড়ে নিম্নোক্ত মর্মে—

“Nova Goa—to F. J. Roy care of A. Laird, Weltevredm—No news, how doing, very anxious. P. Chatterton

Pundilick Kamat's Place Panjim”

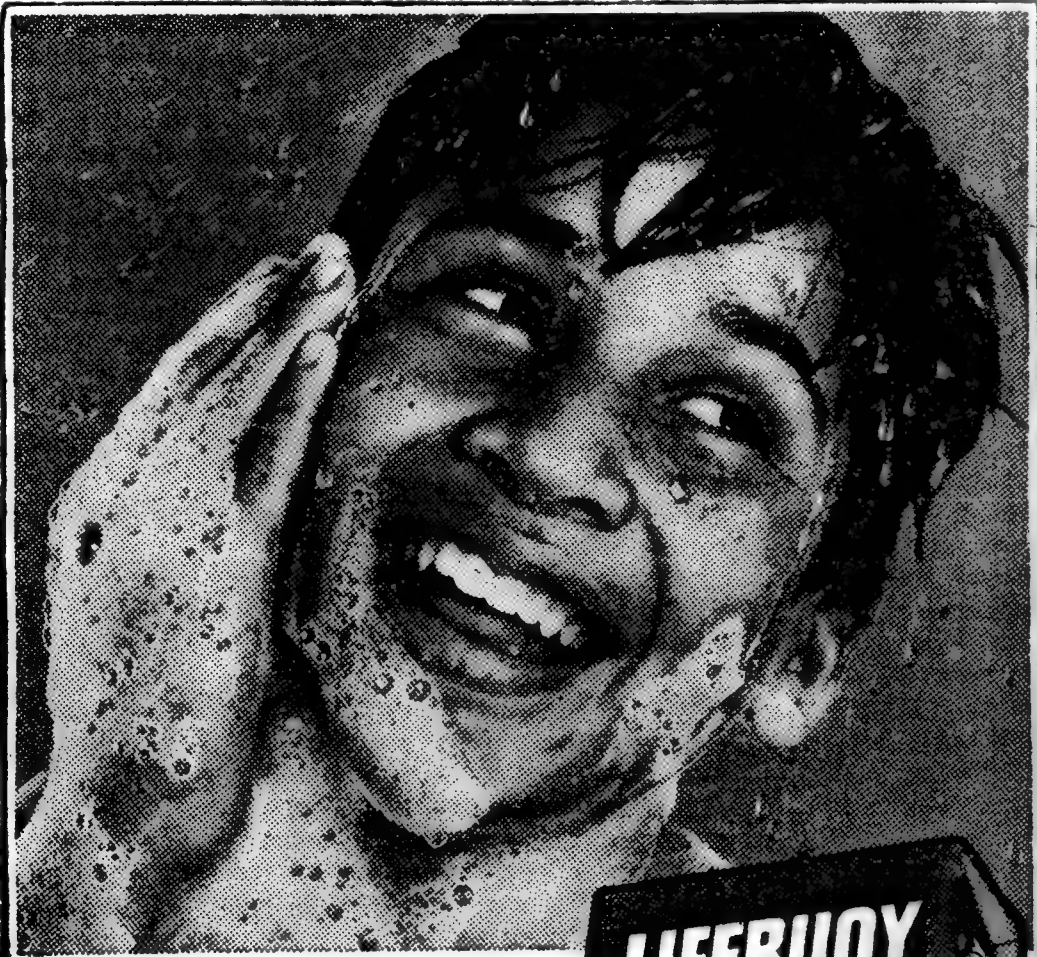
এই টেলিগ্রামটি সম্ভবতঃ বিবেচনায় সরকারী অফিসাররা আবার সোনার দিকে ঝুঁকনা হন এ বিষয়ে অনু-সন্ধানের জন্যে। ফলে বিনয়ভূষণ দত্ত আর ভোলানাথ চ্যাটার্জী উক্ত টেলিগ্রামের প্রেরক সাক্ষ্য হন। শেষে সোয়ানীজরা এ আশ্রিত দুটিকে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তুলে দেন। এই ঘটনার কিছু পরেই, অকথা অভ্যুত্থানের ফলে, কারাগারের অন্তরালে নিজের খতিয় সাহায্যে গলায় ফাঁস বেঁধে ভোলানাথ আত্মহত্যা করেন। তাই নিকসন সাহেব তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে লিখেছেন—“অনুসন্ধানের পরে আরো ঘটনা সম্বলিত যে সকল খবর প্রকাশ পেয়েছিল, এই হচ্ছে তার সারমর্ম।...এই প্রতীতিপত্র নিশ্চয়ই হৃদয়ের আগের প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে।” (পূর্বোক্ত রিপোর্ট পৃঃ ৯০) প্রকাশ-সেতারিকের আগমন প্রতীকার

সাম্প্রতিক বস্তুত্ব

স্বাধীনতার আন্দোলনের সাক্ষর প্রতাপাদিত্যের সঙ্গোপিত বিপ্লবীদের যোগসাজস ছিল। আর উক্ত অভ্যুত্থানের সহায়তাকল্পে তিনিও লোকজন, নৌকা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে মনে হয়, নেতাজীর 'দিল্লী চলো'

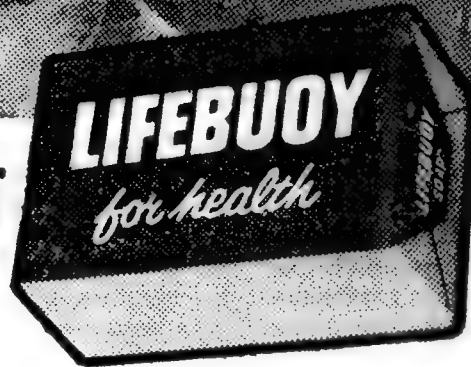
হুঁসি বাদ দিয়েও, ১৯৪২ সালের আন্দোলনের কার্যক্রমের সঙ্গোপ এই প্রস্তুতির অনেকটা মিল দেখা যায়। যথা রেল-লাইন উপড়ে ফেলা, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া, গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা আর স্বাধীন ভারতের দ্বিবর্ণ

পতাকা উড়িয়ে দেওয়া, শত্রুসৈন্য আনয়নেওয়া ও তাদের রাসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু অভাব ছিল,—গণসংযোগের ব্যবস্থা আগে থেকে হয় নি—যেটা '৪২ সালে সংঘটিত হয়েছিল নিজের স্বাভাবিক গতিতে।



লাইফবয়

যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে



লাইফবয় মেখে মান করলেই তাক্সা বরকরে হবেন।
এই চমৎকার সুই পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু
গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে!

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজমূল ধুয়ে দেয়

বিশ্বসাহিত্যের * প্রাদিপর্ষ

ডঃ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য

২২২

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

এবারে পুরাণের কথাই আসা যাক। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকটা জুড়ে আছে এই পুরাণসমূহ। মহাভারতের মত পুরাণ-সমূহকেও পঞ্চম বেদ বলা হয়। পুরাণ কথাটির অর্থ 'যা প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান রয়েছে।' মহাকাব্যস্বরের মত পুরাণেও আছে অজস্র কথা ও কাহিনী, ইতিহাসধর্মী বিষয়সমূহ, স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুকরণে অপরাধ ও দণ্ডের তালিকা, তদুপরি আছে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের (যেমন বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত ইত্যাদি) প্রলেপ। বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা এর প্রকৃতি এতই জটিল যে এক কথায় পুরাণের কোন সজ্ঞা দেওয়া যায় না।

অমরতেন্দ্র নামক অভিধানে পুরাণের যে পঞ্চ লক্ষণের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাতে প্রতিটি পুরাণে সর্গ (জগৎ সৃষ্টির বিবরণ), প্রতিসর্গ (জগতের ধ্বংস ও নবরূপ প্রাপ্তির বিবরণ), বংশ (দেবতা ও ঋষিদের বংশাবলী), লক্ষ্যভ্রম (বিভিন্ন মন্দির বৃন্দ) এবং বংশানুচরিত (রাজবংশ কখন)। কিন্তু পুরাণসমূহের বিষয়বস্তু আরও বিশাল যে জন্য পুরাণগুলিতেই বলা হয়েছে যে ওই পঞ্চ লক্ষণ শব্দসমূহ উপ-পুরাণগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহা-পুরাণগুলির ক্ষেত্রে আরও পাঁচটি লক্ষণ আছে, যোগালি হচ্ছে ব্রহ্মী (জীবিকার উপায়সমূহের বর্ণনা), রক্ষা (দেবতাদের অবতারণার কথা), মৃত্তি (মৃত্যুর পর মোক্ষলাভের কথা), হেতু (অব্যক্ত জীবন) এবং অপভ্রম (ব্রহ্মতত্ত্ব)। কিন্তু এই দশ লক্ষণের স্ফারাও পুরাণসমূহের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

পুরাণের সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ এবং রচনাকাল

প্রচলিত মত অনুযায়ী আঠারটি মহা-পুরাণ ও আঠারটি উপ-পুরাণ বর্তমান

কিন্তু আসলে উপ-পুরাণের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। এই আঠারটি মহা-পুরাণের মধ্যে, প্রচলিত মত অনুযায়ী, বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, নরসিং, পদ্ম এবং বরাহ সাত্ত্বিক পুরাণ যোগালি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্ম, বামন এবং ভবিষ্য রাজসিক পুরাণ যোগালি ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে রচিত। এবং মৎস্য, কুর্ম, লিঙ্গ, শিব, অগ্নি ও স্কন্দ তামসিক পুরাণ যোগালি শিবের উদ্দেশ্যে রচিত। এই শ্রেণীবিভাগ একান্তই কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং এই তালিকার এমন কতগুলি পুরাণ আছে যোগালি একেবারেই অব্যাহত।

এই কারণেই ওই কাল্পনিক শ্রেণী-বিভাগকে গ্রাহ্য না করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নতুন ধরনের শ্রেণী-বিভাগ করেছেন। প্রথম বিভাগে রয়েছে পদ্ম, অগ্নি ও নারদ যোগালির বিষয়-বস্তু হচ্ছে ব্যবহারিক বিদ্যা, কেন না এ-গুলিতে চিকিৎসা, ব্যাকরণ, নাট্যতত্ত্ব, সঙ্গীত, জ্যোতিষ প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়গুলিই সমাধিক গুরুত্বলাভ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে পদ্ম, স্কন্দ ও ভবিষ্য যোগালির প্রধান বিষয়বস্তুই হচ্ছে ব্রত ও তীর্থ কথন। তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে ব্রহ্ম, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত। এই তিনটি পুরাণই সংশোধিতরূপে আমাদের হাতে এসেছে; অন্যতম দু'বার এই তিনটি পুরাণের মূল অংশ নতুন করে লেখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীতে সেই পুরাণ-গুলিকে রাখা হয়েছে প্রকৃতির দিক থেকে যোগালি ইতিহাসধর্মী। এতে আছে ব্রহ্মাণ্ড ও হারিয়ে যাওয়া বায়ু। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বায়ু-পুরাণের আসল অংশটি হারিয়ে গেছে। পঞ্চম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলি যথা লিঙ্গ, বামন ও মার্কণ্ডেয়, প্রথম দুটির উদ্দেশ্য শিবের বন্দনামান এবং তৃতীয়টির উদ্দেশ্য দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন। ষষ্ঠ

শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে যোগালির প্রবক্তা-রূপে বিষ্ণুর কোন না কোন অবতার কল্পিত হয়েছেন। এই পুরাণগুলি হচ্ছে বরাহ, কুর্ম এবং মৎস্য।

পুরাণগুলি একই সময়ে রচিত হয় নি, বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্ন যুগে রচিত হয়েছে। রচনাকাল মোটামুটি ৪০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। উপ-পুরাণগুলির মধ্যে অনেকগুলিই আবার আরও পরবর্তীকালে রচিত।

মহা-পুরাণসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পুরাণসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুরাণ। এই পুরাণটি নাকি পুণ্ড্রসত্য পেরেছিলেন ব্রহ্মার কাছ থেকে, পরাশর পেরেছিলেন পুণ্ড্রসত্যের কাছ থেকে, মৈত্রেয় পেরেছিলেন পরাশরের কাছ থেকে। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা তেইশ হাজার বলে দাবি করা সত্ত্বেও আসলে সাত হাজারের বেশি শ্লোক এতে নেই। এখানে পৌরাণিক পঞ্চ লক্ষণ নিখুঁতভাবে মেনে চলা হয়েছে। পুরাণটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন। নারদ বা নারদীয় পুরাণের প্রবক্তারূপে নারদ কল্পিত হয়েছেন। শ্লোকসংখ্যা তিন হাজার। বিষ্ণুর সৌরবকীর্তনই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। মহা-পুরাণ হিসাবে গণ্য হলেও আসলে এটি একটি অতি অব্যাহত রচনা যার কোন কোন অংশ খোঁড়ালি এমন কি সম্পদ শতকেও রচিত। এতে স্পষ্টতই মুসলমানদের উল্লেখ আছে যা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, রচনা-কালের দিক থেকে এই পুরাণ কত অব্যাহত। ভাগবতপুরাণও বিষয়কেন্দ্রিক, শ্লোকের সংখ্যা আঠার হাজার। এতে ব্রহ্মাণ্ডের বর্ধ ও সারস্বত কল্পের বিস্তৃত বিবরণ আছে। এখানে ৩৩২টি অধ্যায় বারোটি স্কন্দ বা ধর্ম-বিন্যস্ত হয়েছে। এই পুরাণের দশম স্কন্দে বর্ণিত কৃষ্ণের জীবনকথা অত্যন্ত জনপ্রিয়। নরসিংপুরাণ

সাংগাহিক বঙ্গমতী

সম্মুখে ওই পুরাণেই কথা হয়েছে যে, গরুড়-কল্পে ভগবান বিষ্ণু নিজেই এই পুরাণ বর্ণনা করেছে, বিনতার গর্ভে জন্ম থেকে শুরু করে। তবে এই পুরাণের বাস্তব চরিত্র ভিন্নরূপ। সেখানে ব্যবহারিক বিদ্যাসমূহের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। পদ্মপুরাণ আকারের দিক থেকে অতি বৃহৎ, শ্লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার এবং মোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত—সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তর-খণ্ড। বিষয়বস্তু দেখে যা মনে হয় এই পুরাণটিও অব্যচীন, দ্বাদশ শতকের পূর্বে রচিত নয়। বরাহপুরাণ-ও ওই একই সময়ে রচিত হয়েছে। সমগ্র পুরাণটি বরাহরূপী বিষ্ণু কর্তৃক তথ্যপ্রদা পৃথিবী দেবীকে শোনান হয়েছে, শ্লোকসংখ্যা দশ হাজারের কিছু বেশি। উপরি উক্ত সব ক’টি পুরাণেরই উদ্দেশ্য বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণনা।

এর পবে প্রচলিত মত অনুযায়ী যে-গুলি রাজসিক পুরাণ সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। প্রথমেই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের উল্লেখ করছি যে পুরাণের প্রবক্তা হিসাবে ব্রহ্মা কম্পিত হয়েছেন, এতে ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্মার অণ্ডের বিশদ বর্ণনা তা ছাড়া ভবিষ্যৎ কল্পসমূহের বিশেষ বিবরণ আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ নামক জনপ্রিয় গ্রন্থটি এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেরই একটি অংশ। অনুরূপ ব্রহ্মপুরাণ-ও ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত বলে পবিচিত। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা সাত হাজারের কিছু বেশি। এখানে যে দেবতাটি প্রাধান্য পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন সূর্য। প্রথম দিককার অধ্যায়গুলিতে যথাক্রমে সৃষ্টির বর্ণনা, মন্বন্তরসমূহের বর্ণনা, চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত ইত্যাদি সংক্ষেপে কথিত হয়েছে। এই পুরাণে উড়িয়া দেশ, বিশেষ করে উড়িয়ার হিন্দুরা দিব কথা উল্লিখিত হয়েছে, যা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এর লেখক উড়িয়ার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ একান্তই অব্যচীন, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে রচিত, প্রকৃতির দিকে একান্তই সাম্প্রদায়িক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এই পুরাণের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। শ্লোকসংখ্যা আঠাশ হাজারেরও বেশি। ভবিষ্যৎপুরাণও একটি অব্যচীন পুরাণ যার শ্লোকসংখ্যা সাত হাজার। বিষয়-বস্তুর দিক থেকে এই পুরাণের প্রকৃতি অপরাপর পুরাণের চেয়ে পৃথক। এখানে বিশেষ করে ব্রত-পার্বণ আচার-অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বামনপুরাণের শ্লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার। এই পুরাণের প্রবক্তা বামনরূপী বিষ্ণু, কিন্তু তাহলেও এই পুরাণে শিবের কিছুটা প্রতিপত্তি আছে। এটিও একটি অব্যচীন

পুরাণ। রাজসিক শ্রেণীর সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য পুরাণ হচ্ছে মার্কণ্ডেয়পুরাণ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এই পুরাণ প্রকৃতই মহা-পুরাণ আখ্যা পেতে পারে। এতে আছে অজস্র কথা ও কাহিনী, নৈতিক অনুশাসন ও ধর্মীয় নির্দেশ। বিখ্যাত দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী যা যে কোন দেবী-পূজায় পাঠিত হয়, পূর্বাব্যেব একটি অংশ। মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল সম্ভবত খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক।

বার্ক রইল তথাকথিত তামাসিক পুরাণ-গুলির কথা। এখানে প্রথমেই মৎস্য-পুরাণের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই পুরাণের প্রবক্তারূপে মৎস্যরূপী বিষ্ণুকে কম্পনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিতে এটি কিছুটা শৈব। শ্লোকসংখ্যা চোদ্দ হাজারের কিছু বেশি। প্রসঙ্গের বিভিন্নতাও এই পুরাণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এটি একান্তই অব্যচীন গ্রন্থ নয়। কূর্মপুরাণও কূর্ম-রূপী বিষ্ণু কর্তৃক কথিত। প্রকৃতির দিক থেকে বিষ্ণু এই পুরাণের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও এই পুরাণটিতে শিব ও দুর্গার কথাই বেশি। লিঙ্গপুরাণে লিঙ্গপূজাব মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। শিবপুরাণকে অনেকে মহা-পুরাণ বলে মানতে আপত্তি করেন, যদিও এই পুরাণ বিশালাকার এবং বেশ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত, এই খণ্ডগুলির

নাম সংহিতা, বায়বীয়-সংহিতা এবং জ্ঞান-সংহিতা যেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্কন্দপুরাণ সকল পুরাণের মধ্যে বৃহত্তর যদিও তা একান্তই অব্যচীন রচনা। দেখে যা মনে হয় অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকে স্কন্দপুরাণ—এই সার্বিক নামের দ্বারা একত্র করা হয়েছে। তবে দেবতা স্কন্দ এই পুরাণের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে আছেন। এই পুরাণের বিভিন্ন খণ্ডগুলি যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রচিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, যেমন কাশী-খণ্ড কাশীতে, আবন্ত্য খণ্ড অবন্তীতে, উৎকলখণ্ড উৎকলে, কুমারিকাখণ্ড কুমারিকায় অর্থাৎ ভাবেভেব সর্বদিক্ণ প্রান্তে। অগ্নিপুর্নাণ একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণ, যা নামে অগ্নির উদ্দেশ্যে রচিত হলেও আসলে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তনই এই গ্রন্থের উপজীব্য। এতে চিরাচরিত বিষয়বস্তু ছাড়াও রাজ্যব কতবা, যুদ্ধনীতি, রাজবল্ল্য স্মৃতি থেকে আইন-সমূহের সারাংশ, সুশ্রুত-সংহিতার চিকিৎসা বিষয়ক অংশ, পার্শ্বানব ব্যাকরণের কয়েকটি নিয়ম ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উপ-পুরাণগুলির কথাও কিছুটা বলবাব প্রয়োজন আছে কেন না রচনাকালের বিচারে সকলে মহা-পুরাণই যে সকল উপ-পুরাণের পূর্ববর্তী তা নয়,

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজুগাডা - ত্রিপুরা - গোহাটা

যদ্বং করেকাট মহা-পুঁরাণ রচনাকালের বিচারে এতই অর্বাচীন যে সেগুলিকে উপ-পুঁরাণের সামিল করা যায়। প্রচলিত মত অনুযায়ী মহা-পুঁরাণের ন্যায় উপ-পুঁরাণের সংখ্যাও আঠারটি—সনৎকুমার, নরসিংহ, (বৃহ) হারদীয়, শিবধর্ম, দূর্বাসা, মন্দ (নন্দী), কপিল, বামন, উশ্ন, মানব, বরুণ, মহেশ্বর, সাম্ব, সৌর, পরাশর, মারীচ, ভাগব ও কালিকা। কিন্তু এই তালিকায় দেবীপুঁরাণ ও দেবীভাগবতের উল্লেখ নেই। শেষোক্ত তিনটি পুঁরাণ, অর্থাৎ কালিকা, দেবী ও দেবীভাগবতের অন্যান্য দিনে বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই তিনটি পুঁরাণই পরবর্তীকালে রচিত একান্তভাবেই শাক্ত-সম্প্রদায়ের নিজস্ব। অন্যান্য পুঁরাণে যেমন বিষ্ণু, শিব প্রমুখ বিভিন্ন দেবতাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিচয় আছে এই তিনটি পুঁরাণে তা নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেবী এক ও অশ্বিতীয়রূপে বিরাজ করছেন। দেবীপুঁরাণ ও দেবীভাগবত নিঃসন্দেহে বঙ্গদেশে বাঙালী লেখকের দ্বারা রচিত। কালিকাপুঁরাণ রচিত হয়েছে কামরূপ বা আসামে, লেখক অতি চতুর লোক ছিলেন এবং বহুক্ষেত্রেই দেবীর বর্ণনার কালিদাসের কুমারসম্ভবের কার্বন কপি করেছেন।

পুঁরাণের বিষয়বস্তু

আমরা প্রথমে বিভিন্ন পুঁরাণ কথিত সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে আরম্ভ করব। মোটামুটি এক্ষেত্রে সকল পুঁরাণের ছকই এক-রকম, তবে যে পুঁরাণ যে সম্প্রদায়ের, সেই সম্প্রদায়ের পরমতম দেবতাই সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত। তিনিই আসল ব্রহ্ম, পুরুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে মহৎ বা বৃক্ষের সৃষ্টি করেন; বৃক্ষ থেকে অহংকাব, পশু ভ্রমার (চৈতন্যময় উপাদান) এবং পশুভূত (পাথিবী উপাদান) তথা এগারোটি ইন্দ্রিয় (জনেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি) ও মনের সৃষ্টি হয়। আর একটি কাহিনী অনুযায়ী ব্রহ্মা ও রমন থেকে তৈরি করেছিলেন যথাক্রমে দেবতা, অসুর, পিতৃগণ এবং মনুষ্যদের, তারপর অপরাপব প্রাণী ও উদ্ভিদাদি। তারপর তৈরি হল নরজন্য ঋষি, রত্ন নামক দেবতাপ্রণী, স্যারম্ভব মনু এবং শতরূপা মামক, এক কন্যা। এই জাতীয় বহু ধরনের সৃষ্টিতত্ত্বই পুঁরাণে আছে, অনেক ক্ষেত্রে এক পুঁরাণেই একাধিক তত্ত্ব আছে। প্রতিটি সৃষ্টির আরম্ভকাল ব্রহ্মার একটি দিনের সমান এবং তা পৃথিবীতে চোদ্দজন মনুর রাজত্বকালের সমান।

এবং পুঁরাণকথিত কল্প, মন্বন্তর যুগ ইত্যাদির কিছু পরিচয় দেওয়া থাকে। মানুষের এক বছর সমান দেবতাদের একটি দিন, দেবতাদের ১২০০০ বছর অর্থাৎ মানুষের ৪,৩২০,০০০ বছরে চতুষ্টয় বা মহাযুগের পূর্ণতা ঘটে। চতুষ্টয় সত্য (কৃত), ত্রেতা, ম্বাপর ও কলির সমাহার, এবং যুগাংশগুলি চার, তিন, দুই, এক এই অনুপাতে বর্তমান। সেই হিসাবে সত্যযুগের কাল ৪৮০০ দেববর্ষ, ত্রেতা-যুগের কাল ৩৬০০ দেববর্ষ, ম্বাপরযুগের কাল ২৪০০ দেববর্ষ এবং কলিযুগের কাল ১২০০ দেববর্ষ। মানুষের বছরের হিসাবে করতে গেলে প্রত্যেকটি সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে গুণ করে নিলেই চলবে। দুটি যুগের মধ্যে দু-ধরনের ট্রানজিশন পরিয়ড আছে। এগুলিকে বলা হয় সন্ধ্যা বা সন্ধ্যাংশ। সত্যযুগের ৪০০ যুগ ৪০০ সমান ৪০০ বছর, অনুরূপভাবে ত্রেতাযুগের ৬০০ বছর, ম্বাপরের ৪০০ বছর এবং কলির ২০০ বছর। মন্বন্তর ও কল্পের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

প্রায় প্রতিটি পুঁরাণেই কিছু কিছু ভূবিস্তান্ত আছে। সমগ্র পৃথিবী সাতটি স্তরীণে বিভক্ত, এবং প্রতিটি স্তরীণ যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সূরা, ঘণি ইত্যাদি সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এই সাতটি স্তরীণ হচ্ছে জম্ম, মক্ষ, শাল্মলি, কুশ, কৌণ্ড, শাক ও পুষ্কর। ভারতবর্ষ জম্ম স্তরীণের একটি অংশে অবস্থিত, বার উত্তরে হিমালয়, এবং ভিতরে সাতটি পর্বত আছে—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তি-ময়, ক্ষক, বিন্ধ্য, ও পারিপার। এই সব পাহাড় থেকে নির্গত নদীগুলির নামও পুঁরাণে উল্লিখিত আছে। মোটামুটি ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে পুঁরাণকারদের কিছুটা ধারণা ছিল।

পুঁরাণসমূহের আর একটি বৈশিষ্ট্য বংশাবলী বর্ণনা। বৈবস্বতমন্ড থেকেই এই বংশাবলী বর্ণনার সূত্রপাত হয়েছে। মনুর দশ পুত্র, যাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ইলা একই সপ্তে পুরুষ এবং নারী ছিলেন, সেই হিসাবে তাঁর বংশাবলীও দুটি শাখা সৌদম্ন এবং ঐল। অপব পুত্র ইক্ষাকুর বংশ মধ্যদেশে রাজত্ব করেছিল। এইভাবে মনুর দশ পুত্রের বিস্তৃত বংশাবলী বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন পুঁরাণে দেওয়া হয়েছে। পৌরাণিক হিসাব অনুযায়ী মনু থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৯৫ পুরুষের। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরবর্তীকালের বিভিন্ন রাজবংশকে বোঝাতে গিয়ে পুঁরাণে ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন

রাজবংশেরও কথা কোন কোন পুঁরাণে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন গুপ্তবংশ বা আশ্ববংশ।

বিভিন্ন পুঁরাণে বৈদিক যুগের পরবর্তীকালের ধর্মব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় তা খুবই চিত্তাকর্ষক। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে বৈদিক দেবতাদের পতনটি ভাল করে লক্ষ্য করার মত। বেদের প্রধান সকল দেবতাই প্রায় পুঁরাণসমূহে তাত্পর্ষহীন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই বিখ্যাত ইন্দ্র, বরুণ, উষা, অদিত প্রমুখ পুঁরাণে একান্তই গোপচরিত্র পরিগত হয়েছেন। পক্ষান্তরে যে সব দেবতার বেদে বিশেষ প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন নি যেমন, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি, এরাই বিভিন্ন পুঁরাণে সকল দেবতার পুরোভাগে চলে এসেছেন। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম পুঁরাণসমূহকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পুঁরাণে জৈন, বৌদ্ধ ও অপরাপর নাস্তিক মতবাদসমূহকেও নিন্দা করা হয়েছে, কেননা এগুলি পৌরাণিক ধর্মের আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। পৌরাণিক ধর্মের প্রবণতা একেশ্বরবাদী; বৈষ্ণবপুঁরাণগুলিতে একমাত্র উপাস্য দেবতা বিষ্ণু, শৈবপুঁরাণগুলিতে শিব, শাক্তপুঁরাণসমূহে শক্তি। অপরাপর দেবতার অস্তিত্ব মেনে নিলেও যে পুঁরাণে যে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে সেই দেবতার কাছে অপর সকলে তুচ্ছ, এমন ভাব দেখানো হয়েছে।

পুঁরাণ অনুযায়ী জীবনের উদ্দেশ্য চারটি—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্ম-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিভিন্ন পুঁরাণে একমাত্র উপাস্য দেবতাদের গৌরবগান, পাপ ও তার শাস্তির অঙ্গ প্রবিবরণ, নরকের বর্ণনা, বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের যাত্রা বর্ণনা, বিভিন্ন ব্রত ও দানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থ-প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুঁরাণে বিশেষভাবে রাজধর্মের ওপর লেখা হয়েছে। শাসকদের জন্য পক্ষান্তরে বিভিন্ন বৃত্তিও অঙ্গ উল্লেখ পুঁরাণে আছে যেগুলি গ্রহণ করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। কামপ্রসঙ্গে আছে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ ও সেগুলির নিয়মসমূহ, স্ত্রীর কর্তব্য ইত্যাদি নানান ধবনের কথা ও কাহিনী। মোক্ষ-প্রসঙ্গে যোগসাধনা ও ভক্তিব কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে যেগুলির দ্বারা বহু জন্মান্তর পার হয়ে মুক্তিলাভ করা যায়। শৈবপুঁরাণগুলিতে যোগসাধনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে বৈষ্ণবপুঁরাণগুলিতে ভক্তির কথাটাই প্রাধান্য লাভ করেছে।



জন্মদায়ক মূর্খতা

হ্যাঁ, মিস্তির যদি বলতে হয়তো বলতে হয় সুরেনকেই। এমন পাকা হাতের পাকা গাধুনির মিস্তির গোটা টালিগঞ্জ খুঁজে আর একটি পাওয়া যবে কি না সম্ভব। পেলে আব সকাল-সন্ধ্যে অত মানুষ একা সুরেনকেই বা খুঁজে মরবে কেন?

খোঁজে কাবণ সুরেন হচ্ছে রাজ-মিস্তির। হ্যাঁ সত্যিকারের রাজমিস্তিরই বটে। যেমন কাজ করে রাজের, তেমনি রাজার মতোই মেজাজখানাও তার। তার ওপর চেহারাটাও তেমনি।

অবশ্যি বাজারজড়ার চেহারা জন্মদায়ক মিস্তির মানুষ কখনো নিজের চোখে দেখে নি। তবু সুরেন মিস্তিরকে দেখে রাজা বলেই আদাজ করে তারা। বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় কাজ থেকে ফিরে এসে দশ বালতি জল ঢেলে নেয়ে-থুয়ে একখাবা সন্ধ্যাবেলায় জেলে চুলগুলোকে যখন চক্চকে করে সুরেন—চোকো ছাপ চিৎপুর্ন লুপ্টিগাটাব সঙ্গে মানানসই ডোরাকাটা কলারওয়াল ফুফুয়াটা গায়ে দেয়—নসিদ্দাব মোজার ওপর ইয়া মোটা টায়ারের চম্পলজোড়া পায় দিয়ে যখন যোগানদার নিতাইকে ডাকতে ডাকতে অস্বিকার দোকানের দিকে এগোয়—এবং দু'ঘণ্টা পরে যখন নিতাইয়ের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে ইহসংসারের তাবৎ ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র, পবিচিত্ত-অপরিচিত মানুষের মা-বোনের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে করতে ঘরে ফিরে আসে—জন্মদায়ক মিস্তির মানুষ তখন রাজা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না সুরেনকে। তার

ওপর কখনো যদি কাঁধের গামছা মাথায় পেঁচিয়ে দাঁড়ালো তো সে মূর্তি ভয়ঙ্কর।

তখন যমুনা চেঁচায়। যেহেতু মাথায় যদি তাজ উঠল তো হাতে রাজদণ্ডও সে নেবেই। তবে বাপেরও যেমন বাপ থাকে সংসারে, রাজার ওপর তেমনি মহাবাহুরও সম্মান জানে যমুনা। তাই সে চেঁচায়। চোঁচিয়ে-মেঁচিয়ে গোটা বস্ত্র একর করে রটিয়ে দেয় সুরেন মিস্তিরর আগের বোটা মোটেই ওলাওঠায় মরে নি। ওই নিম্ববংশে হারামী এমন করে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মেরেছে।

কথটা সত্যি কি মিথ্যে—কি কতোখানি সত্যি আর কতোখানি মিথ্যে—জন্মদায়ক মিস্তির মানুষ সঠিক জানে না। সে সুরেনের এ বস্ত্রতটে আসার অনেক আগের ঘটনা। তবে জেনে দরকারও নেই-কিছু। এ সব ব্যাপারে সঠিকের চেয়ে বৈঠক জানাই সুবিধের। সঠিকে একটার বেশি গপ্পো হয় না। বৈঠক নিষে একশো রকমের গপ্পো বানিয়ে একশো জনকে চমকে দেয়া যায়। অতএব - সুরেন মিস্তিরর পয়লা নম্ববেব বোটা যে করেই হোক মবে গিয়ে জন্মদায়ক মিস্তির উপকারই কবেছে। আব উপকার করেছে যমুনার। না হলে কেজা শূন্যে গোটা বস্ত্রতব মানুষ হাম্লে এসে না পড়লে রাজার দণ্ড মাথায় পড়ে কোন দিন যমুনাও ঠান্ডা হয়ে যেতো।

কিন্তু রাজামানুষ সুরেন যেতো মদই থাক, পাড়ার লোকের সামনে কখনো বেখেয়াল হয় না। তাব ওপব বয়সে, মানে,

মর্যাদার কতো গুরুজনও যে সামনে এসে পড়েছে। অতএব ডান্ডাটা উঠানে ছুঁড়ে দিয়ে মাথার তাজও খুলে ফেলে সুরেন। দাওয়ার ধারে পা কুঁদিয়ে বসতে বসতে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, সেটা না মরলে তোর অত সোহাগ রাস্তাস কোথায় মাগী?

—সোহাগ! এর নাম সোহাগ! ওই যে বলে না—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিভা মারার লাগর।

—লাগর নয় লো, গোসাই। ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন ডুলটা শৃঙ্গরে দিতেই গায়ের জ্বালায় যমুনা আরো ভেতে উঠে জ্বাব দেয়, ওই হোল। লাগরেই কুলোয় না—তার আবার গসাই!

যমুনার কথা শূনে গোটা উঠান হেনে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সব হাসিকে চম্ফে দিয়ে হেসে ওঠে সুরেন মিস্তির স্বয়ং। সে বড়ো অশুভ হাসি। বৃকের মর্মাটা পাকিয়ে উঠে হো হো শব্দে দমক-মারা হাসি।

এমন হাসি সুরেন হাসতো পাঁচ বছর আগে। কেওড়াপুকুকের বাপদী-যোজলের বড়ো মেয়েটা—যমুনাও এমন অশুভ স্বপ্নের কথা শূনে। যমুনা ক্ষেপতো। ক্ষেপে গিয়ে সতেরো বছরের ঢল-নামা দেহে সুরেনের হাসির মতোই পাক-দেয়া দমকে ফুঁসতে ফুঁসতে মূর্খের সামনে ধরে দিতো এমন একখিল পান, যার নেশায় বৃন্দ হয়ে ঘরে ফিরে ঘরের বোঁ-এব চূণ খসার অপরাধটুকুও সুরেন মিস্তির সহ্য

করতে পারতো না! বোঁটাকে বেধড়ক ঠাঙাতো সুরেন।

যমুনা যে বলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মেয়েছে, কথাটা মিথ্যে নয়। অবশ্য সুরেনের কথাও সত্য। শেষমেশ ওলা-ওঁটা হয়েই মরেছিল বোঁটা। কিংবা ওদের জন্মের কথাই মিথ্যে। সুরেন পরলা-মশ্বরের বোঁটা মোটে ময়েই মি। ভেদ-যমির অঙ্কিলার সুরেনের হাত থেকে পার হয়ে বেঁচে গেছে সে।

আসলে ময়েছে যমুনা। তিলে তিলে মরছে। পান খাইয়ে আর হেলে-থলে কটা দিন কাটে? তারপর থেকেই তো—

এখন আর হাসে কৈ সুরেন? হাসলেও পাঁচ বছর আগের সেই দমক-মারা হাসি জাগে না আর বৃকে। পাঁচ বছর আগের সেই বৃকখানাই কি আর সুরেনের বৃকে আছে? যমুনার চেঁচানোব চোটে উঠান জুড়ে এতোগুলো লোক এসে না জুটলে আজো সুরেন হাসতে পারতো না। হাতের ছাড়া উঠানে না ফেলে ফেলতো তিন বছার মা যমুনা পিঠের ওপবই।

তবে একবার হেসে যখন উঠেছে—এবং চোলাই-এর নেশার বেশ দমক দিয়েই উঠেছে যখন হাসিটা—তখন বেশ দূলে দূলে বসিকতা করেই সুরেন মিস্তিরি জবাব দিল, ভাত দিই না তো খাস কি?

—খাই পিঁড়ি। ছাই খাই। পাঁশ খাই। কি খাই পাড়ার লোকে দ্যাখে না? লকালবেলার দুটো টাকা ফেলে দিয়ে যে ঘর থেকে বেরোও—

আজকের বাজারে সঁতাই ভাতে ফুলের না। কি করে ফুলোবে? সকালে বাচ্চা তিনটেব চা-বুড়ির ব্যবস্পা করতেই তো আনা আশ্বেক বেরিয়ে যাস। তার-পরই চিন্তা হয় সুরেনের জন্যে। মাছ ছাড়া তো একটি বেলাও ভাত উঠবে না তার। চুনো-চানা কিনতে গেলেও আট-দশ আনার কম হয় না। দুটো মোটে টাকা থেকে আর বাকি থাকে কতো? তাই দিয়ে চাল-ডাল তেল-নুন, মশলা-পাতি, মাংস পান-সুপ-বিটা ইত্যাদি কিনতে হ'লে ছাই-পাশের পিঁড়ি ছাড়া আর কোন রাজ-ভোগটা যমুনার কপালে জুটবে?

কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য কবে না সুরেন। নিজেরটা তার পুর্বোপদ্রি বজায় থাকলেই হোল। যমুনার গায় খিড়ই উঠুক আর মাথার চলে শকুনই বাসা বাঁধুক না কেন, সুরেন মিস্তিরির আর যেন যায়-আসে না কিছুই। আটপোরে একখানা শাড়ি অষ্টপ্রহর টেনে টেনে সারা দেহে দর্গম্বেব সঁটি করে যমুনা। কিন্তু সুরেন তার নিজের চুলের সুবাসেই মগন। ওই দুটো টাকা থেকেই সাবান কিনতে হয় যমুনা। চার-ছ' পরসার সাবান—

সুরেনের মৃগি কাচতেই খতম। কতরাটা যদি ফিটফাট করে না রাখে একদিন, সেদিন যমুনার মরণ। তিন-তিনটে বাচ্চা। তাদের কি চেহারা—কি চাল-চলন দেখে যমুনার সাধ্য নেই—মানুষ কি শয়তানের বাচ্চা।

শয়তানের বাচ্চাই বটে। যমুনা তাই ধলে। বলে আম বোধহয় নিজের গায়ের বাথা কমাতেই ওদের পিঠে দুম-দুমিয়ে কিলোয়। তবে গায়ের বাথা শুধু তো যমুনার একার নয়। সারাদিন ইঁট টানার ফলে সুরেনের গায়েরও কিছু কম হয় না বাথা। তবে তার গায়ের বাথা মারতে তো ষোভল হাতে বসেই আছে অম্বিকা। মদ তো নয়—ওষুধ। সুতরাং ওতে যমুনার কলবার নেই কিছু। বলতে গেলে দুটো টাকাও বশ্ব হয়ে যাবে।

হয় না যে তাও নয়। যেদিন শুধু ডাণ্ডার শোষ হয় না যমুনার বেবাদাপ্র, সেদিন ওই দু' টাকাও বশ্ব রাখে সুরেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অবগ্য মনে মনে হাসে। গত রাতে অম্বিকার দোকান থেকে উঠতে উঠতে কি আর এক পরসাত ছিল নাকি পকেটে বে দিয়ে যাবে যমুনাকে? কিন্তু রাজার মেজাজ সুরেনের। অতখানি দারিদ্র্য প্রকাশ করার মানুসই সে নয়। অতএব পকেট বেদিন ফাঁকা, সেদিন কিছু না কিছু একটা দোষ যমুনা করবেই। আর দোষ যখন করেছেই, তখন সাজা পেতে হবে না?

—থাক পড়ে তুই উপাস।

—আমি না হয় উপাস পড়েই রইলুম। বাচ্চাগুলো? শয়তানের বাচ্চাগুলো খাবে কি? আমাকে?

—তাই থাক।

তাই খায় তিন-তিনটে বাচ্চা। যমুনাকে আঁচড়ে-কামড়ে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খায়। তখন বাধ্য হয়েই যমুনাকে পাড়ার বেরতে হয়। পাড়া মানে তো জলদার বাস্তির বিশ-পঁচিশটা ঘর। পঁচিশ কেন, এমন হালের পাঁচশোটা ঘর থাকলেও যমুনার ভাগ্যে ইতর-বিশেষ ঘটতো কি না সন্দেহ। যে ঘরে যমুনা যায় এক কোঁটো চাল খাব চাইতে, সে ঘরই শুকনো। জলদার বসিততে বাস কববে, আবার ঘরে থাকবে দুবেলার সংগ্রহ, অত সুখ ঈশ্বর এক কপালে লেখে না।

তাই পাড়ার লোকে দেখে। দেখে রাজমিস্তিরি বোঁ তিন-তিনটে বাচ্চা নিয়ে—

—চপ কর যমুনা, চপ কর। ঘরে চলে। খেতে দিবি নে?

দেবে না মানে? কতদিন পর আজ সুরেন মিস্তিরি হেসেছে। সেই হাসি—

যে হাসির দমকে তুলে বাঁদী-মোড়লেন বড়ো মেয়েটা একদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল। পাগলই তো। পাগল ছাড়া আবার এমন মানুসের ঘর করে কোন্ মেয়ে? কোন্ মেয়ে পারে এমন ঘোড়া এক খেনে মাতালের সামনে অতখানি সোহাগ করে আবার ভাত বেড়ে দিতে?

ঠিক যেন যমুনার পায়রাটি। সেদিন ভোরে চাতালে মৃধ ধুতে গিয়ে যমুনা খরোছিল। ডানা-ভাঙা রক্ত-মাখা এইটুকু এক পায়রা। কে জানে কার খোপে—হয়তো ঘুমিয়েছিল দুটিতে। একদিন যমুনা যেমন ঘুমোতো সুরেন মিস্তিরি ইরা বৃকে লেপ্টে। হয়তো ভাম ঢুকে থাকবে, নয়তো অন্য কোনো শত্রু। মাদীটাকে মৃধে করে নিবে গিয়ে থাকবে। মন্দাটাই হয়তো জ্ঞান দিয়ে চেয়েছিল ঠেকাতে। কিন্তু—

আশ্চর্য! যমুনারও একজোড়া পায়রা ছিল এককালে। ভামেই খেয়ে গেছে ওদের। যমুনা জানে, অমনিতে দুটিতে যতো পীবিভই থাক, ভাম যখন খেতে আসে তখন নিজের জ্ঞান বাঁচাবার চেষ্টা ছাড়া কেউই কাবু জন্যে কিছু করে না। তবু রক্তাক্ত মন্দাটাকে দেখে যমুনা ভাবল না যে মাদীটাকে যখন ভামে নিয়ে যায়, ওটা তখন কোনোমতে নিজের প্রাণটি নিয়ে পালিবে তার চাতালে এসে কচু গাছটার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। বরং ভাবল—

সেই ভেবেই পায়রাটাকে স্বর করে যমুনা। ডানার ক্ষত সারলেও উড়তে পারে না পাখীটা। ভাঙা ডানার উড়বে কেমন করে? না উড়ুক। যমুনা ওকে খুঁটে খুঁটে খাওয়ার। কোলে করে—আদব করে। বলে, খেয়েদেয়ে ভাগদ কর গতবে। কেমন সুন্দর মাদী এনে তোর বিয়ে দিই দেখিস।

সুরেন মিস্তিরিকেও ঠিক তেমনি হয়েই খুঁটে খাওয়ার যমুনা।

—এটা আবার কি মাছ?

—চিনতে পার না? শোল মাছ।

—ক্যাংড়ার চর্চাড় রাঁধিবি বলেছিলুম না?

—ক্যাংড়া পাই নি বাজারে।

—পাস নি. না হাস নি?

—যাই নি তো শোল মাছ এলো কোথেকে?

—শোল মাছ তোর পছন্দ তাই এনেছি। খা তবে, তুই-ই খা।

খালাটা ছুড়ে যমুনার কোলের ওপর ফেলে দিবে সুরেন মিস্তিরি উঠে পড়ল। উঠে সোজা চাতালে গিয়ে হাতমৃধ ধুয়ে এসে দাওয়ার গা ছাড়িয়ে চিৎ হয়ে শুরে পড়ল।

আর ঘরের মধ্যে যমুনা—কালের ওপর ছড়ানো একখালা ভাত নিয়ে কি যে করবে কিছু ঠাহর করতেই পারল না। স্তম্ভ হয়ে বসে রইল—অনেকক্ষণ। কি করবে সে? সুরেনকে সে চেনে। এখন যদি হাত ধরতে যায় যমুনা, সেই হাতেই সুরেন তাকে মারবে। যদি পা ধরে সাধতে যায় যমুনা, লাথি মারবে সুরেন। ঘরে এসে শূতে বললে পারে তো দাওয়াটাও ছেড়ে দিয়ে যোগানদার নিতাইয়ের ঘরেই চলে যাবে। কি করবে যমুনা?

রাত তখন এমন একটা বেশি কিছু হয় নি। জলদার বস্তির বাইরে বড়ো রাস্তার ভদ্রলোকেরা এখনো চলাফেরা করছে। তবে জলদার বস্তির যেমন চেহারা, তেমনি চাঁরঘাও আলাদা। উদযান্ত খেটেখুটে এসে ঘরে একবার ঢুকতে পারলে আলো জ্বেলগে গপ্পো করতে বসবার মতো সাধ বা সাধ্য কবুবই থাকে না। তাই রাতে ব'টাও না বাজতে বাজতেই জলদার বস্তি অন্ধকার। নিশ্চুপ।

ব্যতিক্রম যমুনার পায়রাটা। ওর কি ঘুমটুয়ে কিছু নেই নাকি কে জানে! মাঝে মাঝেই চি'চি'করে ককায়। ককায় আর ভাঙা ডানার আপটা মারে খোপে। ওর জ্বালায় দুপুররাতেরও একেকদিন ঘুম ভেঙে যায় যমুনার। ভাগ্যস সুরেন মিস্তিরি নেশাব ঘোরে মড়ার মতো ধুমোয়। তার ঘুম ভাঙলে আর এতোদিন এটাকে যমুনা বাঁচিয়ে রাখতে পারতো না। প্রথমদিন দেখেই তো সুরেন অর্ডার করেছিল, কেটে চাট বানিয়ে রাখিস। রাস্তিরে মালের মূখে খাবো। সুরেনকে বিরক্ত করলে যমুনার মনের এমন বীরপদ্রুঘটি কবেই চাট বনে যেতো।

যমুনা তাই ভয়ে-ভয়ে থাকে। পায়রাটা ছটকটিয়ে উঠতেই ছুটে গিয়ে শান্ত কবে। আদর করে। সোহাগ কবে। আহা! একে একা কেউ নাকি থাকতে পারে সংসারে! কাঁদিস নে বাছা, কাঁদিস নে। একলা একটা মাদী জোগাড় করতে পারলেই তোকে এনে দেব।

আজো হঠাৎ তেমনি করেই ছটকটিয়ে উঠল পায়রাটা। চমক ডাঙল যমুনার। অমনি সে ছুটে গেল দাওয়ায়। পায়রাটাকে শান্ত করতে নম, গেল সে চিং হয়ে শূয়ে পড়া সুরেন মিস্তিরির শিয়রে। বলল, পায়রাটা খেতে চেয়েছিলে। কাটব? বল

কাটব? কি গো? কথা কও না ক্যান? কাটব?

—যা যা—ন্যাকামো করিস নে। সুরেন মিস্তিরি উল্টো হয়ে শূল। যমুনার তবু এক জপনা, ন্যাকামো কি? পায়রার মাংস তো তুমি ভালোই খাও। বল, কাটব? কাটব?

—আমি বললেই তুই কাটবি?

—কাটব। এই তোমার গা ছুঁয়ে দিবি কাড়িছ, কাটব—কাটব।

—তবে কাট।

বলেই চোখ বুজল সুরেন। যদিও তার গা ছুঁয়ে দিবি কেড়েছে যমুনা, তবু তার অত আদরের পায়রাটাকে সত্যি-সত্যিই কাটবে—সত্যি-সত্যিই কেটে ফেলতে পারবে—সুরেন বিশ্বাস করে নি। জবাব একটা না দিলে বিরক্ত করতে ছাড়বে না, তাই বলল, কাট। কিন্তু সে চোখ বুজতে না বুজতেই খোপের ঢাকনাটা ছটকে পড়ার আওয়াজের সঙ্গে পায়রাটার চি'চি' কাংরানির চোটে চোখ খুলে দেখে—ও রে বাপ! বে!

সুরেন মিস্তিরি শিউরে উঠল কাটবে আর কতোক্ষণে—পায়রাটাকে বাঁ হাতে টিপে ধবে ডান হাতে টেনে টেনে পালকগুলো ছিঁড়ে ফেলছে যমুনা। তখন পায়রাটার বা কাংরানি আর ছটফটানি, তার একটাই অর্থ—একটাই নাম—মরণযন্ত্রণা!

ছিঁড়ে ফেলা পালকের গোড়া থেকে দয়দরিয়ে নেমে আসছে রক্ত। রক্তে রক্তে ভেসে যাচ্ছে যমুনার হাত। কিন্তু তার হৃৎকোপও নেই। রক্তাক্ত আঙুলগুলো যেন পায়রাটার ছটফটানির সঙ্গে তাল দিয়ে নাচতে নাচতে পরিষ্কার করছে তার চামড়া।

নেশা-টেশা উবে গেল সুরেনের। ছিল শূয়ে, লাফ দিয়ে উঠে উবু হয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে যমুনা তাকাল তার মুখেব দিকে। সে কি চোখ! যমুনার এমন চোখ সুরেন কখনো দেখে নি।

তারপর পালক-ছেঁড়া পায়রাটাকে আগুনের ওপর তুলে ধবল যমুনা। শূয়োগুলো পুড়তে পুড়তে পায়রাটা যখন ধড়ফড়িয়ে মরছে—সুরেন আর সহ্য করতে পারছে না। তখন তার মনে হচ্ছে শূদ্দ পায়রাটা নয়, যমুনার হাতে উস্কে দেয়া আগুনে যেন তার নিজের দেহটাও তাঁর যন্ত্রণায় কল্‌সে কল্‌সে যাচ্ছে।

সে যন্ত্রণা আর আতঙ্কে শিউরে ওঠা চোখে সুরেন দেখল এক নতুন যমুনা—পাঁচ বছর আগের বাম্পীপাড়াব সেই প্রথম যৌবনের জোয়াবে উছলে ওঠা মেয়েটার সঙ্গে যার কোনো মিল নেই—মিল নেই! পাঁচ বছর ধরে সুরেন মিস্তিরির একঘেয়ে ঘরে ঘর করতে করতে তিন-তিনটে বাচ্চার জন্ম দিয়ে উপোসী নেড়ি কুতুব মস্ত জরাজীর্ণ যমুনার সঙ্গে। আজকের যমুনার চাপ চাপ রক্তে কালো সূঁচালো আঙুলগুলোর দিকে তাকিবে এবং উল্টে-পাল্টে কল্‌সাতে থাকা পায়রাটাকে দেখতে দেখতে সুরেন মিস্তিরির দম আটকে এলো।

এখন সে কি করবে? পালাবে? !

না। অভখানি শক্তি আব সুরেনের পায়ে নেই। এ যমুনার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার সাহস আব বেঁচে নেই তার বৃকে।

অগত্যা সুরেন সূঁড়সূঁড় কবে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মশারির আড়ালে বাচ্চা তিনটির ওধাবে গিয়ে কঁকড়ের মূকড়ে শূয়ে পড়ল সে।

দাওয়ায় মশা পিষতে ব্যস্ত যমুনার গলায় তখন কি খুশির সুর। ডেবে বলল, শোও, রান্না হলে ডাকবখন আমি।

তাই যেন ডাকে যমুনা। নযতো সুরেন যে এই শূয়েছে, আর উঠতে পারবে না।



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড টীনা বাজার ফ্রন্ট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

কোলাহল-বিব্রাট

জাপানি কি কলকাতার কেউ? বাজার অঞ্চলে থাকেন? শ্যামবাজার, বাগবাজার, বড়বাজার বা বোঁবাজার? না কি মফস্বলের? বাজার করতে বা অন্য কোনো কাজে মাঝে মাঝে আসেন কলকাতার? যেখানকারই হোন, শ্যামবাজারের বা সাদান এ্যাডিন্দার, শহরের বা পল্লীর, স্কুল-কলেজের বা কারখানার, বিধানসভার বা লোকসভার, কোলাহলের সঙ্গে নিশ্চয়ই কম বেশি পরিচয় আছে আপনার। নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করেছেন, বিকট কোনো চীৎকার বা রাফসে কোনো শব্দ আপনাব মনে কোনো পুলক সঞ্চার করে না। অথচ আশ্চর্য, শহর কলকাতার লক্ষ লক্ষ লোক এবং কল-কারখানার কোটি কোটি শ্রমিক কিন্তু এই পুলক-সম্ভাবনা-হীন কোলাহলমুখর পরিবেশেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। ওরা জানতেও পারছে না, আধুনিক সভ্যতা-সমুদ্র থেকে সমুদ্রিভ শব্দ নামক হলাহল কী অপারিসমীম ক্ষতি করছে ওদের; অদৃশ্য শব্দ-দানব কী আশ্চর্য ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসে ওদের দেহে-মনে ক্ষুরপনের প্রভাব বিস্তার করছে।

গোড়াতে কলকাতার কথাই ধরা যাক। কিছদিন আগে এই শহরের কোলাহল পৰিমাপ করার ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রমিকদের শেষে রিপোর্টও বেরিয়েছিল বেশ ফলাও করে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ কলকাতার; রিপোর্টে পাশ-মার্কও সে পেল না। দেখা গেল, গড়ের ঝাঠের একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়েও যে পরিমাণ কোলাহল কানে আসে, সহজ দৃষ্টিতে তা মানুষের সহ্য-সীমার অতীত। আর বাজার এলাকাগুলোর অবস্থা? মান-বাহনের স্বর্গরাজ্য চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট পাড়ার হাল-চাল? জনস্রোত দুর্বার জলোচ্ছ্বাসের মতো আছড়ে পড়ছে যে দুর্গট স্টেশনে, সেই শিয়ালদা এবং হাওড়া খবর?

রিপোর্টাবরা বললেন, খবর খুবই খারাপ। শিয়ালদা কর্মব্যস্ততায় এবং কোলাহলে শব্দ ভাবতবর্ষেরই নয়, তামাম দুনিয়ার অন্য সব স্টেশনকে ছাড়িয়ে গেছে। ইন অর্ডার অব মেরিট-এ হাওড়াও খুব একটা পিছিয়ে নেই। আর চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট পাড়ার মোটর গাড়ির আতর্নাদ ন্য-ইয়র্কের

ফিফথ এ্যাডিন্দাকে টেক্সা মেরেছে। শেষের খবরটি শুনে তার্কিকদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'এ কেমন করে হবে? গাড়ি কি আর আমেরিকার তুলনায় কলকাতার বেশি চলে'?

—'তা' চলে না, কোলাহল পরিমাপক বিশেষজ্ঞরা বুঝিয়ে দিলেন, 'জবে আমেরিকায় যেমন অবস্থা, তেমন ব্যবস্থা। ওখানে গাড়ি যেমন ভাল এবং মজবুত, রাস্তাও তেমনই বড় এবং মসৃণ। তাই ওখানকার কোনো রাস্তায় চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটের চার গুণ গাড়ি চলেও কোলাহল কলকাতার রাস্তার তুলনায় সিকি ভাগ হয়'।

শুনোছি, কলকাতার কোনো কোনো রাস্তায় ট্রাম টার্মী টেম্পো বাস লরী ট্যালা রিক্সা ইত্যাদিতে মিলে যে বিচিত্র একতান সৃষ্টি করে তার প্রভাবে বিদেশীদের কেউ-কেউ শহরনের ভুল্পো পৌঁছেন এবং অবলীলাক্রমে মুছা বাবার উপভোগ করেন। কিন্তু আমরা এত সহজে মুহিত হই না। শহরনের ভুল্পো আমরা পৌঁছই ঠিক তখনই, যখন কোনো খুনী ডবল-ডেকার বা হিংস্র লরী এসে সবিকমে আমাদের ঘাড় চাপে এবং কোলাহলমুখর এই বিশ্বজগৎ থেকে চিরকালের মতো আমাদের মুক্তি দেয়।

কিন্তু আমেরিকা বা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে এত সহজে মুক্তি পাবার উপায় নেই। কারণ, সে সব দেশের মানুষেরা কোলাহল সম্পর্কে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সচেতন। আমরা যখন শিয়ালদা বা ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা পেরোবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করি, ওরা তখন সুরাসরি কোর্টেব দরজাঘ হাজির হয়ে কোলাহলের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়। আমাদের শ্রমিকরা যখন মন্ত্ররাজ্যের গর্জন শুনতে শুনতে ঘর্মাক্তকলেবরে কাজ করে, ওদের শ্রমিকরা তখন শব্দদানব থেকে সৃষ্ট শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যটুকুর ক্ষতিপূরণের জন্যে সদলবলে দাবি জানায়।

মনগড়া কথা বলছি নে এমন দাবি জানাবার ঘটনা পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে আজকাল হামেশাই ঘটছে। শ্রমিকরা বলছে, শব্দের দৌরাত্ম্যে কানে-খাটো হস্তেছি, অতএব খেসারত দাও।

দাবিটা অর্থোক্তিক নয় মোটেই। কারণ, কল-কারখানার বিকট শব্দে অনেক

শ্রমিকেরই শ্রবণেন্দ্রিয় দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকে আবার ক্ষতিটা পাকাপাকিভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়; দুর্বল ইন্দ্রিয় ধীরে ধীরে বিকল হয়ে গিবে ওদের বোধ করে।

এই ধরনের বিধবদ নিয়ে তুলসীলাল কান্ড প্রথম সূত্র হয় আমেরিকায়। ১৯৪৮ সালের ঘটনা। ন্যা ইয়র্ক রাজ্যের এক শ্রমিক তার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ করল। আদালতে গিয়ে বলল, মালিকরা কিস্ত-কিমাকার সব যন্ত্র এনেছে কারখানায়। বিকট তাদের আওয়াজ। সে আওয়াজে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হয়েছে। অতএব ক্ষতিপূরণ চাই।

নালিশ শুনে বিচারক বিব্রত হলেন ঘটে প্রথমটায়। কিন্তু শেষ অবধি রায় ঠিকই দিলেন। বললেন,—হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ডলার। বিচারকের রায় শুনে শ্রমিক-মহলে হৈ-ঠে পড়ে গেল। শ্রমিকরা এ-ওর কানের দিকে ডাকল। অনেকে আবার গিয়ে ভিড় করল কানের ডাকারের দরজায়। 'ই এন টি' স্পেসিয়ালিস্টরা প্রমাদ গলেন। ওদের অনেককেই বলতে শোনা গেল, 'তাই তো! কানে-খাটো লোকের সংখ্যা এত বেশি তা তোর কই এতদিন জানতুর না'!

ওদিকে আদালতেও চাঞ্চল্য। কারখানার শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা দায়ের করেছে। মালিকের দল নিজেদের কান মলতে মলতে খেসাবত দিচ্ছেন।

খেসারতের পৰিমাণ বছর খানেকের মধ্যেই কয়েক কোটি ডলাবে গিয়ে পৌঁছল। শাসকরা দেখলেন, এর একটা বিহিত না করলে নয়। কানের দায়ের কল-কারখানায় ডালা পড়বে তা না হলে।

নতুন আইন প্রবর্তিত হ'ল অচিরেই। ঘোষিত হ'ল, কারখানার হৈ-হট্টগোলের পরিবেশ ছেড়ে নির্জনে গিয়ে অন্তত কয়েক মাস না থাকলে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে মামলা করা চলবে না। ভিন্ন পরিবেশে থেকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতি ঘটেছে শব্দের দোষে।

এই সর্তে শ্রমিকরা অসুবিধায় পড়ল। কেন না, কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে ক্ষতি

পরিবেশে থাকা অধিকাংশের সম্ভব নয়। অতএব, এই নতুন আইন চালু হবার পর থেকে কোলাহল-পীড়িত শ্রমিকদের মামলার সংখ্যা কমেই কমে এসেছে।

এদিকে মামলার সংখ্যা কমল বটে, কিন্তু কোলাহল কমল না; শব্দের অত্যাচার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দিন দিন বেড়ে চলছে।

মনে হয়, বন্দ-প্রভাবিত আধুনিক সভ্যতার এ অত্যাচার থেকে মুক্তি নেই। জনসংখ্যা বত বাড়বে, বন্দপাতি ও কল-কারখানার সংখ্যা বত বেশি হবে, কোলাহলও ততই শক্তি-সঞ্চার করবে। ক্রমশই জোরে কথা বলা অভ্যাস করতে হবে আমাদের। শব্দের দাপটে যখন-তখন শব্দ ভেঙে গেলেও বিরক্তি প্রকাশ করা চলবে না। আর চিন্তার মধ্যে যদি জট পাকিয়ে যায় অথবা দুশ্চিন্তার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে জীবনটা জটিল হয়ে ওঠে তাহলে কিছুতেই বলা চলবে না, কোলাহলের হাত থেকে ছুটি চাইছি।

তবে একটা কথা; যদি বলি, ছুটি চাইছি নে, বন্দসভ্যতার সব কিছু বজায় রেখে শব্দমাত্র কোলাহলকে একটু-আধটু ছুটিতে চাইছি, তাহলে নিশ্চয় ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দূর হয়। যদি বলি, অটুট রাখতে চাই সব কিছু, অথচ কোলাহলটুকুকে কমিয়ে ফেলতে চাই, তবে নিশ্চয় সাপও মরে এবং লাঠিও ভাঙে না।

আশার কথা, সাম্প্রতিককালে কোলাহল-দৈত্যকে শান্ত করার আরোজন উপায় পাওয়া হয়েছে। তবে সে পথের বিস্তৃত পরিচয়টুকু প্রদান করার আগে কোলাহল আমাদের কি কি ক্ষতি করে, সবাপ্রাণে সেগুলো বলা দরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষতির কথা একটু আগেই বলেছি। কিন্তু সে ক্ষতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এখনও বাকী।

বিশ্লেষণের 'রপোর্ট' দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বলছেন, অনেকেরই হৃৎযন্ত্রে জ্বালা আছে যে কানের খুব কাছে হঠাৎ বড় আকারের কোনো পটকা ফাটলে কিছুক্ষণের জন্যে কোনো কিছু শোনা যায় না। মনে হয়, সাময়িকভাবে বধির হয়ে গেছে। কিন্তু পটকা যদি একটি না ফেটে একের পর এক অনেকগুলো ফাটে, তবে এ বধিরত্ব অচিরস্থায়ী না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। আর শব্দের অত্যাচারটা একটুক্ষণের বা কিছুক্ষণের জন্যে না চলে যদি কিছুদিনের জন্যে চলে তাহলে বধিরত্ব এমন কি চিরস্থায়ী হওয়াও বিচিত্র নয়।

শব্দের প্রভাবে কানের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কত-

খানি ক্ষতি হ'ল, বিজ্ঞানীরা তার মাপজোক করে থাকেন। শব্দের প্রচণ্ডতা ওঠা মাপের ডেসিবেল নামক এককের সাহায্যে। বিশেষ কোন প্রকার শব্দ-কম্পনের মধ্য থেকে কে কতটুকু শব্দে শব্দ, তা' ডেসিবেল-এর সাহায্যেই বোঝান হয়ে থাকে। যেমন, যদি বলা হয়, কোন শব্দকে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫ ডেসিবেল উঁচুতে না ওঠালে বিশেষ কোনো একজন ব্যক্তি শব্দে শব্দে পাবে না, তবে বুঝতে হবে, সে ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষতির পরিমাণ ১৫ ডেসিবেল।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে, স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি বলতে আমরা কি বুঝি? উত্তরে বলবো, আমরা বুঝি এমন এক শক্তিকে যা ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক কিছু সংখ্যক সুস্থ ও সবল মানুষের শ্রবণ-ক্ষমতার গড়। যুক্তরাষ্ট্রে এই গড় নির্ধারিত করে থাকেন 'আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডস এসোসিয়েশন'।

এদিকে সবাই আমরা জানি যে, শব্দের প্রাব্যতা এবং গুলু বহুল পরিমাণে নির্ভর করে শব্দতরঙ্গের স্পন্দনের ওপর। সেক্ষেত্রে ৩,০০০ 'সাইক্ল' অবধি স্পন্দন কথাবার্তা বোঝার পক্ষে খুবই উপযোগী। শব্দতরঙ্গের স্পন্দন যদি এর চেয়ে বেশি থাকে, তবে বুঝতে হবে, পরিবেশ অপেক্ষাকৃত কোলাহলময়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে গানকে টেনে আনলে চলবে না। কেন না, শব্দতরঙ্গের দ্রুত স্পন্দন গান-উপভোগের ক্ষেত্রে অত্যাধিক। কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্রে এই স্পন্দন যদি স্বাভাবিকের চেয়ে সব সময়ই বেশি হয়, তবে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষতি অবধারিত। দেখা গেছে, এরকম পরিবেশে বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষতিটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে।

এতক্ষণ অবধি শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপর শব্দের প্রতিক্রিয়ার কথা বলা গেল। এইবার অন্যান্য সব প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক। অনেকেই বলে থাকেন, আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে বহুবিধ অশান্তির মূলে এই শব্দ ও কোলাহল। তা' ছাড়া অজীর্ণতা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হঠাৎ হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া এবং অপ্রকৃতিস্থতার জন্যেও অনেকে কোলাহলকে দায়ী করেন। সন্দেহ নেই এই অভিযোগগুলোর অধিকাংশই স্থূল কম্পনাশ্রিত। কিন্তু তাই বলে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, কোলাহল নানাভাবে আমাদের ক্ষতি করছে। কারণ, আমাদের অনেকেই এ বস্তুটিকে আদৌ গুরুত্ব করেন না। অনেকেই কোলাহলের মধ্যে থাকতে হলে যখন-তখন রেগে যান, ঠিকভাবে ঘুমুতে পারেন না, কাজে

মনোনিবেশ করতে পারেন না এবং কথা বলেন খুব জোরে। আর এই যে অসুবিধা-গুলো, এরাই হ'ল কোলাহলের কয়েকটি গুরুতর প্রতিক্রিয়া।

কোলাহল কিভাবে মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করে তা' নিয়ে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে বিস্তারিত গবেষণা হয়ে গেছে; এবং এই গবেষণার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে এমন সব জায়গাকে কোলাহলের স্বর্গরাজ্য যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। লন্ডন শহরের কেন্দ্রবর্তী কয়েকটি অঞ্চল, লন্ডন এয়ার-পোর্ট এলাকা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি কর্মব্যস্ত শহরকে পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এই সকল এলাকার হাজার হাজার লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পব কয়েকটি আকর্ষণীয় তথ্যের খোঁজ মেলে। জানা যায়, কোনো এলাকায় যত বেশি কোলাহলই থাকুক না কেন, সেখানকার এক-চতুর্থাংশ লোক তা' নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। কোলাহল সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকে ওরা। রেল-লাইনের ধারে বা এয়ার-পোর্টের পাশে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মৃশকিল দাঁড়ায় কোলাহলপূর্ণ জায়গার এক-দশমাংশ লোককে নিয়ে। নিজেরা করে নি, এমহা যে কোনো প্রকার শব্দের হৃদিস পেলেই ওরা বিরক্ত হয়।

এদিকে এয়ার-পোর্টের খুব কাছাকাছি যারা থাকে, এমন কয়েক শত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানা যায়, ওদের এক-তৃতীয়াংশেরই কোলাহল গা-সহ্য হয়ে গেছে। অপরদিকে এক-চতুর্থাংশের অভিমত হল, কোলাহল কিছুতেই বর-দাস্ত করতে পারছে না ওরা। অনেকে আবার দূর, দূর বন্ধে ভাবছে, পোর্টের কাছে বিমান-দুর্ঘটনা যদি হয় তাহলে ওদের অপঘাত-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এ ছাড়া রক্তপথের পাশে যারা থাকে, তাদেরও অনেককেই বহু বিচিত্র ভাবনার শিকার হতে দেখা গেছে। হঠাৎ ক্যাচ করে শব্দ হল একটা; রক্ত কঁপল কোনো গাড়ি; সঙ্গে সঙ্গেই আঁককে উঠলেন অনেকে। ছুটলেন দেখতে, কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটল কি না। অনেকে আবার ছেলে-মেয়েদের গাড়ি-চাপা পড়বার ভয়ে সর্বক্ষণ অস্থির।

কিন্তু এই সবই হ'ল কোলাহলের প্রতিক্রিয়ার কথা। এইবার তার নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে আসা যাক। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো কোলাহল-নিয়ন্ত্রণ করবে বলে উঠে-পড়ে লেগেছে; এবং এ ব্যাপারে ওরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে কল-

সাংস্কারিক বস্তুমতী

কারখানাগুলোকে। কারণ, কলে-কারখানায় যারা কাজ করে, শ্রমিকদের অত্যাচার তাদের প্রতিনিয়তই সহ্য করতে হয়। অতএব, কোলাহল-নিয়ন্ত্রণের কথা ভাববাব আগে সর্বপ্রথমে জানা দরকার শ্রমিকদের সহ্যসীমা কতটুকু; কতখানি উচ্চ পর্দা অবধি শব্দ পৌঁছলে ওদের শ্রবণশক্তির কোনো ক্ষতি হবে না।

শব্দ ও কোলাহলের এই সহ্যসীমা নিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ওখানকার 'স্ট্যান্ডার্ডস্' এসোসিয়েশন' থেকে কমিটি গড়া হয়েছে একটি। কমিটির সভারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছেন, কোন ডেসিবেল-এ এবং শব্দতরঙ্গের কোন স্পন্দনসীমা অবধি প্রতিদিন কত ঘণ্টা করে কাজ করলে শ্রমিকদের শ্রবণশক্তির কোনো ক্ষতি হবে না। ক্ষতির সম্ভাবনা যেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে, কোলাহল-নিয়ন্ত্রণের আয়োজন সেখানেই হচ্ছে ব্যাপকভাবে। 'ই.এন. টি' স্পেসালিস্টরা কিছুদিন পর পর শ্রমিকদের পরীক্ষা করে দেখছেন, ওদের শ্রবণশক্তির কোনো ক্ষতি হ'ল কি না। ক্ষতির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা

থাকলেও শ্রমিকদের 'ইয়ার-প্লাগ্' এবং 'ইয়ার-মাফ্' ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া অনেক কারখানাতেই যন্ত্রপাতির শব্দকে কমানোর আয়োজন চলছে। কল-কম্পার চাষিদেরকে বেষ্টনীর ইচ্ছা হলে কোথাও; কোথাও আবার কারখানা-ঘরের দেওয়াল 'সাউন্ড-প্রুফ্' পদার্থ দিয়ে গড়া হচ্ছে।

এদিকে মোটর গাড়ির শব্দকে কি করে কমানা যায়, তা' নিয়েও অনেক ভাবছেন। আমেরিকায় এবং আরও অনেক উন্নত দেশে বাস্তবতার উপবিতলতে যথাসম্ভব মসৃণ করে গড়া হচ্ছে। এই সব দেশের মোটর গাড়ির যন্ত্রপাতিগুলোকে 'সাউন্ড-প্রুফ্' পদার্থ দিয়ে ঘেরা হচ্ছে। টায়ার গড়া হচ্ছে এমনভাবে—যাতে করে গাড়ি চলবার সময় শব্দ কোনোক্রমেই বেশি না হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে? আমরা রাস্তা-গুলোকেই এমনভাবে তৈরি করছি, যাতে যানবাহন চলাচলের সময় শব্দ সপ্তমে পৌঁছতে পারে এবং প্রশ্ন চাইলেই যে কোনো গাড়ি হয় আশেপাশের বোকানের বা বাড়ির আর না হয় ল্যাম্প-

পোস্টের বা বটগাছের সংসদ্বন্দ্ব লাভ করতে পারে। এ ছাড়া কোলাহল-সুপ্তির অন্য সব রোমন্থক উপকরণ তো আমাদের আছেই। আছে মাইক-এম্প্রিফায়ারের মাধ্যমে আতনাদ-ছড়ানোর বিস্ময়কর আয়োজন। আছে পিঙ্গে-চমকানো সব গান; যাদের এক-একটিকে হাজারবার করে চালিয়ে পাড়ার লোকের কর্ণেদ্রয়-গুলোকে অবলীলাক্রমে ঝাঁঝ করা যায়।

ভাগ্য ভাল বায়োরাবী পুঞ্জের উদ্যোক্তাদের। আর হতভাগ্যের অধিকারী 'ইন' এন' টি স্পেসালিস্টরা। কথায় কথায় কান পরীক্ষা করাই না আমরা। শব্দ-তখন মামলা ঠুক না। মামলা যদি ঠুকতুম অথবা কান যদি পরীক্ষা করাতুম তো পুঞ্জের উদ্যোক্তার চাঁদার জন্যে এলে উল্টো বলা যেত, উৎসব-শেষে কান-মেরামতের জন্যে টাকার দরকার। অতএব তোমাদের কাছে চাঁদা চাইছি কিছু। দাও তো ভাল, আর না যদি দাও তো মনে রেখো, পরে কোর্ট-কাছারিতে দেখা হবে।



সেরা সওদা

রোভার সাইকেল যে কোন পথে স্বচ্ছন্দে চলার জন্যই তৈরি। যেমন যেকোনো চোরা, তেমন আছে সব রকম ধকল সহ্য করার শক্তি। আর তাই রোভার সাইকেলের উপর লোকের এত আস্থা। আশ্চর্যের একটি অতি জনপ্রিয় সাইকেল।

ROVER

এডভান্সড সাইকেলস লিমিটেড

মার্কেটাইল বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

রেজিষ্টার্ড-অফিস ও ফ্যাক্টরী-গৌহাটি

কেবলস্ এডভান্সড সাইকেলস্ : কলিকাতা; রোভার : গৌহাটি

বারবার বান'হাম তাঁর 'গ্যার্ডস
সেটস্ টক্ শপ্' বইতে প্রডিউসার
সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন:
'প্রডিউসারের কাজের ভেতর প্রযোজনা
এবং পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই
অন্তর্ভুক্ত।'

প্রথম রিহাসালের থেকে উদ্ভাষন
রজনী পর্যন্ত একটি নাটকে কত কাজ
এবং কত লোকজন লাগে ভেবে দেখুন
তো। অভিনয় ভাল হোক কি মন্দ হোক
সে কথা বাদ দিলেও, নাটক মণ্ডস্থ
করতে হলেই বিভিন্ন ধরনের এবং শ্রেণীর
লোকের বোধ প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর
করতে হয়। এর ভেতর যে নাট্যকার
নাটক লিখেছেন তিনি হচ্ছেন একজন।
তাঁর লেখা নাটকটির অভিনয়ের জন্য
টিম-ওয়ার্কের দরকার হয় অভিনেতা,
স্টেজ ম্যানেজার, ছুতোয়, আলোকসম্প্রী,
দৃশ্যসজ্জাকর, পোষাক নির্মাতা, প্রপার্টি-
ম্যান এবং আরও অন্যান্য ধরনের লোকের
ভেতর। নাটকের মণ্ডস্থপায়ণে যখন
এত লোকের যত্ন প্রচেষ্টার দরকার হয়,
তখন একথা জোর গলায় বলা যায় যে,
অভিনয় ভালই হোক আর মন্দই হোক,
পান্ডুলিপি থেকে আমরা যে নাটক পড়ি
আর মণ্ডস্থপায়ণে যা দেখি এবং শ্রুতি
তার ভেতর যথেষ্ট তফাৎ আছে।

কোন কোন সময় নাটকের পান্ডু-
লিপির থেকে মণ্ডস্থর স্নে অনেক ভাল হয়ে
যায়, আবার এর উল্টোটাও ঘটে। মণ্ড-
স্থপায়ণ এমন হতে পারে যে, নাট্যকারের
দিক থেকে হয়তো তাঁর বক্তব্যের আদর্শ
প্রতিফলন হয়েছে, অথবা তাঁর বক্তব্য ও
চাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ বিকৃত প্রতিচ্ছবিও মণ্ডে
দেখা যেতে পারে। আবার এও সম্ভব
যে, নাটক অভিনয়ের সময় অংশত বা
অসম্পূর্ণভাবে ruling idea of the
play-কে তুলে ধরেছে দর্শকদের সামনে।
কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই পান্ডুলিপির নাটক
আর মণ্ডস্থ নাটক এক ধরনের হতে পারে
না। কারণ পান্ডুলিপির নাটক হচ্ছে
অসমাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ জিনিস এবং
মণ্ডাভিনয়ের সময়েই তার পরিপূর্ণ রূপ
দেখা যায়। এই পরিপূর্ণ রূপ পেতে
হলে যখন এত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের
দরকার হয়, তখন এই সব লোককে
নির্দেশ দেবার জন্য, এবং এক সঙ্গে
সমতা রেখে এবং পারদর্শিতার সঙ্গে কাজ
করাবার জন্য দরকার হয় সুদক্ষ পরি-
চালকের।

নাটকের প্রযোজক তা হলে হচ্ছেন
এমন এক ব্যক্তি যিনি দলের সবার সম্মতি
এবং সহযোগিতায় এই সব ব্যাপারে
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিভাবে অভিনেতার-
সংলাপ বলবে, টাইমিং, স্টেজের ওপর
নড়াচড়া, কাজকর্ম (ব্যক্তিগত এবং সমষ্টি-
গত), নাটকের আলোক নিয়ন্ত্রণ, দৃশ্য-

বঙ্গদেশে মিনালি

সম্প্রদায়, সাজসজ্জা এবং সরঞ্জাম বিষয়ক।
অল্প কথায় বলতে গেলে তাঁরই দায়িত্ব হচ্ছে
নাটকে প্রাণবন্ত সমগ্ররূপ দেবার, নাট্য-
কারের কাজকে সম্পূর্ণ এবং সার্থক করে
তোলা।

নাটক যদি বেশ ভাল হয় তাহলে
নিচুমানের বা খারাপ প্রডাকসন সত্ত্বেও
সে নাটক অনেক সময় দর্শকদের স্মারা
গৃহীত হয়। সাধারণ জাতের নাটক খারাপ
পরিচালনার ফলে ফ্লপ্ করার সম্ভাবনাই
বেশি। আবার এই জাতীয় নাটকই ভাল
প্রডিউসারের হাতে পড়লে মনে হবে
নাটকটি বেশ ভাল নাটক। প্রডিউসার
হচ্ছেন নাটক এবং অভিনেতা উভয়েরই
সেবক। দু'দিকটাই তাঁকে সমানভাবে
বজায় রাখতে হয় এবং দেখতে হয় এই
উভয়দিকই যেন আবার পরস্পরের সেবক-
রূপে কাজ করে। প্রডিউসার নাটককে
খাটো করে অভিনেতাদের তুলে ধরবেন না
বা অভিনেতাদের খাটো করে নাটককে
অথবা বড় করবেন না বা এই উভয়কেই
ছোট করে নিজের কৃতিত্ব দেখাতে যাবেন-
না। তাঁর কাজ—প্রকাশ করা, সৃষ্টি করা
নয়। কিন্তু নাটকে যদি প্রকাশ করে
দেখাবার কিছু না থাকে সেক্ষেত্রে তিনি
প্রাণবন্ত কম্পনশক্তি দ্বারা এবং অভিনেতা-
দের প্রতিভার সূচক ব্যবহারের সাহায্যে
নাটককে কৌতুকলোম্বীক এবং জীবন-
শক্তির দ্বারা মণ্ডিত করে তুলতে পারেন।

সময় সময় নাট্যরসিক লোকদেরও
প্রশ্ন করতে শোনা যায় অভিনয়ের ক্ষেত্রে
প্রডিউসারের সত্যিকার দরকারটা কি? এ
প্রশ্ন তাঁদের মনে উঠতো না, যদি এঁরা
শুরু থেকে প্রডাকসন অবধি দেখবার
সুযোগ পেতেন—অর্থাৎ নাটকের স্ক্রিপ্ট
থেকে প্রথম প্রদর্শনী অবধি কার্যপরিচয়
তাদের চোখের সামনে ঘটতো। আর
নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে
দেখা যায়, যদিও আধুনিক যুগেই
প্রডিউসারশ্রেণী জনসাধারণের চোখের
সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, থিয়েটারের
আদিম অবস্থা থেকেই সব সময়েই একজন
না একজন প্রডিউসার বা ডিরেক্টর নাট্য
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। গ্রেট
এ্যাকটিং-এর যুগে কি প্রডিউসারদের
অস্তিত্ব ছিল? তখন বেশির ভাগ
সময়েই গ্রেট এ্যাক্টররা নিজেরাই প্রডিউ-

সারদের কাজ করতেন। আরভিং তাঁর
অভিনীত সব নাটকের পরিচালনা নিজেই
করতেন। এক সঙ্গে ঘটটার পর ঘটটা
তিনি কাজ করে যেতেন—ভূমিকানুযায়ী
অভিনয় শিক্ষা দিয়ে। ছোট ভূমিকা-
গুলোও তিনি অবহেলা করতেন না—
আপ্রাণ পরিগ্রহ করে ঐ সব চরিত্রের
অভিনেতাকে পারদর্শী করে তুলতেন,
সামান্য কয়েক লাইনের সংলাপও তিনি
যেমনভাবে বলাতে চান সেইভাবে শিক্ষা
দিয়ে অভিনেতাকে রপ্ত করে নিতেন। যে
দৃশ্যে জনতা আছে, তার গ্রুপিং,
মডমেন্ট ও সংলাপ বাদনের ব্যাপারে
আরভিং আপ্রাণ পরিগ্রহ করতেন। শুরুর
তাই নয়, আলোকসম্পাত এবং নাম করা
সঙ্গীতজ্ঞদের পাশাপাশি অভিনেতাদের
রেখে সূচকভাবে কাজ করিয়ে নিয়ে
প্রডাকসনকে সর্বাঙ্গিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী
করে তুলতেন। সারা বান'হাম ও তাঁর
প্রডাকসনের ব্যাপারে আরভিং-এর মতই
সর্বদিকে নজর রেখে অবিরাম পরিগ্রহ
করে যেতেন। এঁদের সমসাময়িকদের
ভেতর এক ডুজেরই ছিলেন অন্য ধরনের—
সর্বদিকে সমতা রেখে কাজ করবার সম্বন্ধে
তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। টিম-
ওয়ার্ক, স্টেজ সেটিং এবং পরিবেশ সৃষ্টি
করার ব্যাপারে তিনি নিজে বিশেষ নজর
দিতেন না—এসব কাজের দায়িত্ব অর্পিণ্ড
হোঁত স্টেজ ম্যানেজারের ওপর। কিন্তু
ডুজেরই ছিলেন এমন এক মহৎ শিল্পী
যাঁকে সাধারণ বিচারের মাপকাঠি দিয়ে
বিচার করা চলে না। যারা তাঁর অভিনয়
দেখতে যেতেন—তাঁর প্রতি ছাড়া অন্যদিকে
নজর দেবার মতন ইচ্ছা বা অবকাশ তাঁদের
থাকতো না।

আজকের দিনে অবশ্য এমনটা ঘটতে
পারে না। পরিচালকের এসব দিকে নজর
রাখতেই হবে। আজকের দর্শকেরা যেমন
একদিকে ভাল অভিনেতাদের দেখতে যান,
তেমনি নাটকের প্রতিও তাঁদের কম
আকর্ষণ থাকে না। অভিনয় খুব ভাল
হোল। কিন্তু নাটকের মণ্ডস্থপায়ণ যদি
কোন কারণে আশাপ্রদ না হয়, তাহলে
আজকের দিনের দর্শক নিশ্চয়ই বিবর্তিত
বোধ করবেন। সেই জন্যই আজকাল
নাটককে বাদ দিয়ে অভিনয় বা অভিনয়কে
বাদ দিয়ে নাটকের কথা ভাবা যায় না।

আজকের দিনেও বেশির ভাগ সময়েই হয়তো সাধারণ দর্শক অনেক ক্ষেত্রেই নিকট অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। তবে একথাও স্বীকার করতেই হবে যে, তারা আগেকার তুলনায় অনেক বেশি সচেতন এবং সমালোচকের মনোভাব নিয়ে অভিনয় দেখতে যায় এবং সামগ্রিকভাবে অর্থ্যাৎ প্রে এবং গ্রাউন্ডসদের যত্নমভাবে মানসপটে রেখে, নাটকের বিচার করবার চেষ্টা করে। নাটক থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়ে যে নট অভিনয় করেন, তাঁর অভিনয় দেখে দর্শকরা সন্তুষ্ট হন না। এই সব কারণেই এ যুগে নাটকের প্রযোজনায় দিকটার ওপর এত নজর দেওয়া হয়ে থাকে।

গ্যারিক, কান, সিডনস, টেরী এবং লে আমলের অন্যান্য বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনীতে যে সব চিঠিপত্র সন্নিবেশিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার অভিনয়েব সমালোচকেরাও আজকের মতই সূক্ষ্ম বিচারশক্তিসম্পন্ন এবং অনুভূতির ক্ষমতা নিয়ে নাটক দেখতেন। কিন্তু ইংলন্ডে শ', আচার এবং গ্র্যান্ডভিল বার্কারের আবির্ভাবের আগে, দর্শক এবং সমালোচকদের কাছে প্রে এবং প্রডাকসনের থেকে অভিনেতাদের আকর্ষণই ছিল সমাধিক।

এরপর সবাই স্বীকার করবেন যে প্রত্যেক নাটকের মণ্ডাভিনয়ের জন্য পরিচালক বা ডিরেক্টরের কিছু নির্দেশ চিরকালই দরকার হয়েছে—এতে নাট্যকার এবং অভিনেতারাই সব থেকে বেশি উপকৃত হয়েছেন। একথাও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, আজকের দিনে দর্শকদের কাছে নাটকের নাটকীয় মূল্যটাই সমাধিক বেশি, অভিনয়টাই একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু নয়। অর্থাৎ যে শ্রেণীর দর্শক নাটককে সুন্দর অভিনয় দেখাবার মাধ্যম হিসাবে গণ্য করতেন বর্তমান যুগে তাঁদের আর কোন আসিত্ব নেই।

আজকাল নাটকও লেখা হচ্ছে বিভিন্ন

ধরনের—এই সব নাটকের সঙ্গে ভাল রেখে অভিনয়ের ভঙ্গীকেও নানাভাবে বদলাতে হচ্ছে। কোন নাটকে কি ধরনের অভিনয় হবে, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নির্দেশ নেওয়া দরকার হয়ে পড়ছে। প্রডিউসার এবং অভিনেতাদের সহযোগিতায় এ সব ব্যাপার নির্ধারিত হচ্ছে আজকের দিনের মণ্ডাভিনয়ে।

আগেই বলেছি আরভিং-এর সময়ে এবং তাঁর অনেক আগের যুগেও দলের প্রধান অভিনেতা—সাধারণত ইনিই হতেন গ্রাউন্ড ম্যানেজার—নিজের প্রডাকসনগুলির পরিচালনা করতেন। এ বিষয়ে কখনও কখনও স্টেজ ম্যানেজার তাঁর সহকারী কাজ করতেন। শেক্সপীয়ারের আগে থেকেই এ নিয়মটা চলে আসছিল। তারপর এল একটা সময় যখন নাট্যকার এবং নট-নাট্যকারেরা পরিচালনার দায়িত্ব নিতেন—যেমন, শেক্সপীয়ার, মিল্লের প্রমুখ। পিনোরো আগে ছিলেন নট এবং পরে নাট্যকার। গ্র্যান্ডভিল বার্কার নিজের এবং অপরের লেখা অনেক নাটক প্রডিউস করেছেন। বার্নার্ড শ'ও অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করেছেন। শ' তাঁর নাটকের অভিনেতাদের বুঝিয়ে দিতেন কি করতে হবে এবং বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন কি কি তারা করবে না। অবশ্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কোন নাটকের প্রডাকসন ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ অবধি তিনি পরিচালনা করেছেন বলে জানি না।

নাট্যকার এবং অভিনেতাদের সহযোগিতার ফলেই নাটকের মণ্ডরূপায়ণ সম্ভব হয়। তাই বাল কেউ ভাববেন না যে আদর্শ নাট্য পরিচালক হতে হলে নাট্যকার এবং অভিনেতা হওয়া দরকার। অবশ্য একথা ঠিক যে, যে পরিচালকের নাট্যরচনা এবং অভিনয় বোঝার জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর আরও অন্যান্য গুণ থাকা দরকার। তাঁর রূপনাশক্তি এমন হওয়া দরকার যাব ফলে স্পষ্ট দেখেই মানসচক্ষে তিনি সম্পূর্ণ নাটকটির মণ্ডস্থ বস্তু পুনরুৎপাদনা করে নিতে পারেন। দৃশ্যজনকে নিয়ে একযোগে কাজ করবার শক্তি না থাকলে পরিচালক হওয়া যায় না—আবার এই দৃশ্যজন তো এক ধরনের হয় না। তাদের ভেতর কেউ কেউ হয়তো প্রতিভাশালী, কয়েকজন অত্যন্ত বশিমান, আবার অনেকে হয়তো ছেলেমানুষীতে ভরা। পরিচালককে এদের সবার মন জয় করে তাদের ভেতরের সেবা জিনিসকে বের করে আনতে হয়, দরকার মত স্নেহশীল এবং প্রয়োজনবোধে উৎপীড়কব ডমিকায় কাজ করতে হয়।

“He must combine nurse and dictator; be able to flatter and to speak brutal truths.”

বারবারা বানহামের ওপরে বর্ণিত কথাগুলি খুবই কন্সট্রাক্টিভ। আধুনিকতম প্রডিউসাররা পরিচালকের কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে সবচেয়ে জোর দেন এই সব বিষয়ে—

(১) Director must not behave as a dictator.

(২) He will control—but never coerce his actors.

পরিচালককে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হয় অভিনয় শেখাবার সময় তিনি যদি মেজাজ দেখান তাতে শিক্ষার্থী ঘাবড়িয়ে যাবে এবং ফলে তার অভিনয় আরও খারাপ হতে থাকবে।

এই অনীম ধৈর্য আমি দেখেছি নাট্যাচার্শ শিশিরকুমারের ভেতর। কিভাবে ব্যালের নর্তকী প্রভা এবং চারুশীলা তাঁর শিক্ষাগুণে বাংলা রঙ্গমঞ্চে অপ্রতিমস্বামী অভিনেত্রী হিসাবে যশস্বী হয়েছিলেন একথা সর্বজনবিদিত। শেষ বরসে শ্রীরঙ্গমের আমলে অতি সাধারণ অভিনেত্রী সাবিত্রীকে দিয়ে যেভাবে শিশিরকুমার বিম্পদ ডমিকায় অভিনয় করিয়েছিলেন নাট্যমোদীবা আজও সে কথা বিস্মৃত হয় নি। আমাদের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নাট্যশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। এক সময় অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে এখানে ডিন করে নিয়ে আসা হয়—বীদ্যে শিশির যুগে পরিচালক বা অভিনয় শিক্ষক হিসাবে অহীন্দ্রবাবুর কোন পরিচয়ই আমরা পাই নি। তারপরে শুনেছি অভিনয় শিক্ষা দেবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে এক তথাকথিত পরিচালককে—যার নিজস্ব কোন প্রডাকসনেই দর্শকের সমাগম হয় না। তবে এই ভদ্রলোকের নিয়োগের পেছনে ষথেষ্ট সরকারী প্রভাব ছিল। আজ জনগণের আন্দোলনের ফলে পূর্বতন সরকার অপসারিত হয়েছে—বর্তমানের সরকার, যারা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার, তাঁদের দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করছি। বিখ্যাত পরিচালক শ্রীমধু বোসের মত সুযোগ্য ব্যক্তি যখন এখনও আমাদের মাঝে রয়েছেন, তখন তাঁকেই সাদরে অভিনয় শিক্ষা দেবার কাজে অহীন জ্ঞানো উচিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অকর্মণ্য সব লোককে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

বর্তমান সরকার নানা দিকে নানা গুরুত্বপূর্ণ সাধনে ব্যস্ত—তবুও তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ যেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যভিনয় শিক্ষার ব্যাপারটা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।

[ক্রমশঃ]

সংগীত-নাটক

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

প্রথম ভাগ ও স্থিতীয় ভাগ

প্রতি ভাগ—৫।

হারমোনিয়াম শিক্ষা

মূল্য—৩।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

কলিকাতা—১১



চলচ্চিত্র সমিতিসমূহের সম্মেলন

কলকাতায় তিনদিনব্যাপী ফিল্ম সোসাইটিসমূহের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরূপ সম্মেলন কলকাতায় এই প্রথম। গত বার বছরের অধিককাল কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান জেলাশহরে এবং কলকাতায় অনেক ফিল্ম সোসাইটি ও ক্লাব গড়ে উঠেছে। সারা ভারতে এরূপ সমিতির সংখ্যা ৬০টি, এবং ৩০ হাজারের অধিক সদস্য রয়েছেন। এ ধরনের সমিতির মাধ্যমে প্রধানত বিনিয়াদী ছবিসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে, এবং বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের প্রতি-প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির সঙ্গে সদস্যগণ পরিচিত হচ্ছেন। চলচ্চিত্র সমিতির কাজ যথায়ভাবে সম্পাদিত হতে পারে দেশের চলচ্চিত্র উন্নয়নের প্রাথমিক ভিত্তি রচনার সহায়ক। চলচ্চিত্র দর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের ছবি উপলব্ধি ও মূল্যায়নের যে ক্ষমতা জন্মে, নতুন নতুন কলা-কৌশল ও আঙ্গিক সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হবার যে সুযোগ সৃষ্টি হয় তাতে দেশের চলচ্চিত্র বিকাশলাভ করে। একারণে গণতান্ত্রিক সরকার চলচ্চিত্র সমিতিগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। ফিল্ম আরকাইভ থেকে ছবি সরবরাহ করা, বিভিন্ন দেশের ছবি আনবার সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া ইত্যাদি কাজে সব দেশের সরকার সহযোগিতা করে থাকে। আমাদের দেশে যেভাবে চলচ্চিত্র সমিতি গড়ে উঠেছে তাতে এখনো সৌখীন দর্শকের প্রাধান্য। চলচ্চিত্র কলাকুশলী ও চলচ্চিত্র নির্মাতারা এখন পর্যন্ত চলচ্চিত্র সমিতির সঙ্গে ভালভাবে যুক্ত নয়। ফলে স্টুডিও-গুলির উপর চলচ্চিত্র সমিতিগুলির প্রভাব দেখা যায় না। দর্শক সাধারণের মনে ও দৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত পরিবর্তন হয় নি। দর্শক তৈরিতে চলচ্চিত্র সমিতিসমূহের ভূমিকা এখনও নগণ্য। সমিতির সদস্যদের চলচ্চিত্র উপলব্ধির স্তর আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়। নন্দতা বা শৃংগারের দৃশ্য আছে এমন ছবি দেখার জন্য পুরুষ ও নারী সদস্যরা ঘেরপ ভিড় করেন, অনেক সময় পুলিশের সাহায্যে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এরূপ ছবি একবারের জায়গায় তিনবার দেখিয়ে সদস্য দর্শকদের আশ মেটান যায় না। অথচ পৃষ্ঠভকীন, আইজেনস্টাইন, ডব্লিউস্ট্রোফের ছবির সময় দেখা যায় তেমন দর্শকের ভিড় নেই। এমন কি জাপানী ছবি দেখার আগ্রহ তত দেখা যায় না। যত আগ্রহ ছবিতে নিউ ওয়েভের ছাপ দেখলে দেখা যায়। একারণে কেউ কেউ বলে থাকেন ফিল্ম সোসাইটিগুলির সদস্য বৃন্দের প্রধান কারণ 'আনসেন্সরড' ছবি দেখার সুযোগ। এই সুযোগ নেবার জন্য একদল টাকাওয়ালা অথবা উন্নাসিক এসব জায়গায় ভিড় করেন। এই অভিযোগ অংশত সত্য স্বীকার করলেও চলচ্চিত্র সমিতিগুলিতে সিরিয়াস সদস্যের অভাব নেই। এক থেকে বহু সমিতি-গঠনের জন্য কৃতিত্ব এই সিরিয়াস সদস্যদের।

মূলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কিছু বিকাশলাভ করতে পারে না। এমিক থেকে চলচ্চিত্র সমিতিগুলির আত্মবিশ্লেষণ করা দরকার। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে এই যে সম্মেলনে দর্শক থেকে যন্ত্রী অনেকের আগমন ঘটল, অনেক আলোচনা হল তার সবকিছু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই তিনদিনের অধিবেশনে এমন কিছু ঘটে নি যাতে ভারতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে এবং সত্যিকার ফিল্ম এপ্রেশিয়াশনে অথবা ছবির সত্যিকার মূল্যায়নে সাহায্য করা হয়েছে। অধিকাংশ আলোচনার স্তর এত উন্মার্গগামী যে জনসাধারণ বা ছবির জগতের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক আছে মনে হয় নি। এই জনবিরুদ্ধতা ও উন্মার্গগামিতাই প্রতিফলিত হয়েছে ফিল্ম সোসাইটি



লোফিয়া লরেন এবার অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন।

সদস্যদের নির্মিত ছবিগুলিতে। বিশ্ব-বন্দু নির্বাচন হতে আঙ্গিক রচনায় তাঁদের নিজস্ব পরিবেশ ও গোষ্ঠীর চিন্তার মধ্যেই তাঁরা আবদ্ধ রয়েছেন। সাধারণ মানুষকে নিয়ে তাঁদের চিন্তার জগৎ গড়ে ওঠে নি, যতটা গড়ে উঠেছে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। আলোচনার বিষয়বস্তু অনেক, কিন্তু আজকের দিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের যারা, গতিপ্রকৃতি ইত্যাদির যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থাকা দরকার ছিল, বিশেষ করে মাস্টারি দৃষ্টিভঙ্গিতে, তেমন আলোচনার স্থান এখানে ছিল না। যেখানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সেখানেই মাস্টারি দৃষ্টিভঙ্গি এসে পড়ে। আমরা রাজনীতির বাইরে একথা বলে উতপাদীর মত বালির নিচে মাথা লুকান বার, কিন্তু সত্যিকার বিশ্লেষণ, সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ বা প্রেরণা সৃষ্টি করা চলে না। ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রেও এরূপ বিশ্লেষণমূলক আলোচনার প্রয়োজন ছিল। মার্কিন স্পাই সিরিজ নামে এক ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ছবির বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারিত হয় নি। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ব্যতীত কেবলমাত্র দেখানাকাং, ছবি দেখা, বুকে ডিনার প্রেরণা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফিল্ম সোসাইটি মডেমস্টের সামগ্রিক বিশ্লেষণের সময় এখন এসেছে।

—সুজয়

ছবি ত্রয়োদশ

জীবনমৃত্যু

(পরিচালক : হীরেন নাগ)

দর্শক মনোরঞ্জন এবং টিকেট ঘরের দিকে লক্ষ্য রেখে ছবিটি নির্মিত। পরিচালকের এটি দ্বিতীয় ছবি। প্রথম ছবি কাহিনীর দিক থেকে ভাল ছিল কিন্তু তাতে আর্থিক সাফল্য আসে নি। দ্বিতীয় ছবি কাহিনীর দিক থেকে পুরাতন ছকবাঁধা কাহিনীর নতুন নাম মাত্র। তবে এ ছবিতে প্রযোজক আর্থিক সাফল্যলাভ করবেন, এটাই পরিচালকের সাফল্য।

কলেজে সকলের প্রিয় ছাত্র অশোক। গোপাল সপ্তে তার ভালবাসা—দুঃপক্ষের অভিভাবকের সম্মতি পেয়েছে। উপযুক্ত আয় করতে পারার অপেক্ষায় তাদের বিয়ে স্থগিত আছে। অশোক ব্যাংকে একটি চাকরী পেল, কিছুদিনের মধ্যে নিজের যোগ্যতা ও কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ে সহকারী ম্যানেজারের পদ লাভ করল। এই উন্নতিতে ব্যাংকের কয়েকজন কর্মচারী ঈর্ষান্বিত হল এবং তাকে অসদৃশ্য করার চক্রান্ত শুরুর হল। গোপাল

সপ্তে তার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে, আশীর্বাদের দিন সে গ্রেপ্তার হল ব্যাংকের ও লক্ষ টাকা আত্মসাতির অভিযোগে। বিচারে তার সাত বছর জেল হল। জেল থেকে ফিরে এক সহকর্মীর মুখে সে শুনল তার চারজন সহকর্মী চক্রান্ত করে টাকা সরিয়েছে এবং তার উপর দোষ চাপিয়েছে। অশোকের জেলে থাকাকালে দুঃসহ বেদনায় তার মা পাগল হয়ে মারা যায়, গোপাল দুঃ গ্রামে চলে যায় শিক্ষার কাজ নিয়ে। অশোক কারো খোঁজ না পেয়ে রতনগিরি যায় এক বন্ধুর কাছে, কিন্তু তাকেও না পেয়ে ফরেষ্ট বাংলায় রাত্রির জন্য আশ্রয় লাভ করে। মধ্যরাতে সে এক বিরাট বড়-বন্দ্য আবিষ্কার করে রতনগিরির রাজাকে পথে বসাবার। অশোকের সততায় রাজা বিপদ থেকে মুক্ত হয়। তার প্রতিদানে রাজা অশোককে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এবার অশোক শান্তাপ্রসাদের হস্তবশে কলকাতা এসে একে একে শত্রুদের শায়েস্তা করে। গোপাল সপ্তে তার পুনর্মিলন হয়।

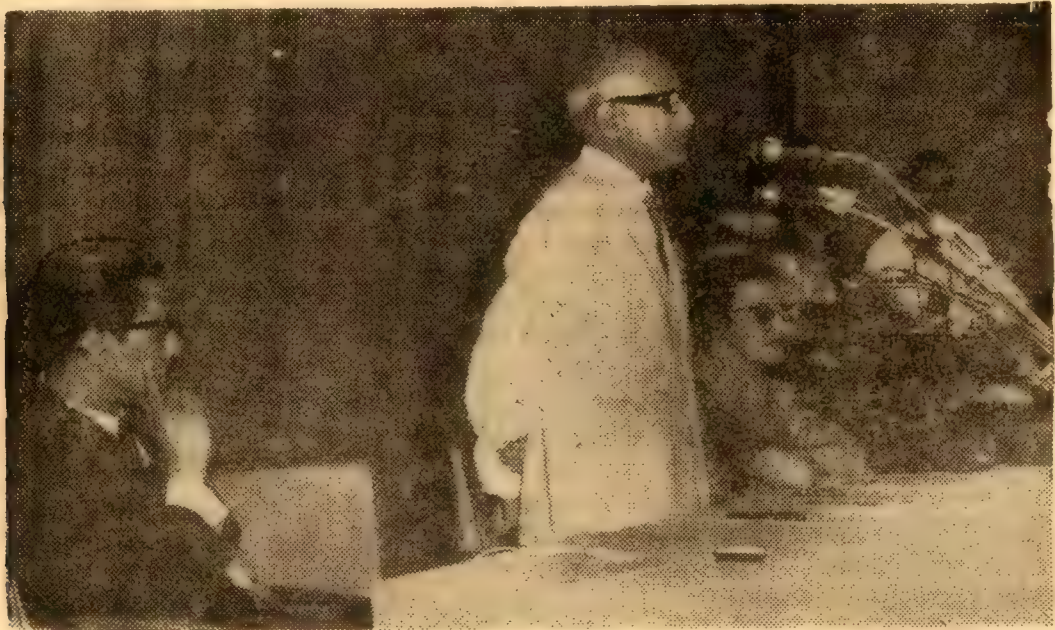
কাহিনীর প্রথমাংশ উপভোগ্য। হাসি-খুশিতে দর্শকরা আনন্দ লাভ করেন। দ্বিতীয়াংশ কিছুটা জোর করে অগ্রসর হওয়ার মত। রতনগিরির রাজার অর্থের জোরে শান্তাপ্রসাদ যত সহজে তার শত্রুদের একে একে কুপোকাৎ করল, বাস্তব-

জগতে আসলে তত সহজে হয় না। বিশ্বনাথ রায়রা এ ধরনের ছকবাঁধা কাহিনী লিখে থাকেন—বাস্তবকে উপেক্ষা করে। এসব কাহিনীর মর্মকথা—যথা ধর্ম তথা জয়। এ ধরনের কাহিনী সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে।

পরিচালক এই গল্পকে সরস করে তুলেছেন। তবে তাঁর কয়েকটি দৃষ্টি চোখে পড়ে। শান্তাপ্রসাদরূপী অশোককে কেউ চিনতে পারল না, গোপাল দৃষ্টিতেও ধরা পড়ল না। অশোকের হাতে লেখা বাংলা অক্ষরের চিঠিটা পেয়েও গোপাল চিনতে না পারা অস্বাভাবিক। তাদের মধ্যে হাতের লেখার পরিচয় নিশ্চয় ছিল। শান্তাপ্রসাদের 'মৈত্রী আপ'-এও কিছু দৃষ্টি ছিল। যে দৃষ্টি দর্শকদের চোখে পড়লেও তার শত্রু ও গোপাল চোখে পড়ে নি।

প্রধান ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয় দর্শকদের ভাল লাগে। অন্যান্য ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, কমল মিত্র, দীপক মুখার্জী, বিষ্ণু ঘোষ, প্রশান্ত কুমার, এন বিশ্বনাথন, প্রসাদ মুখার্জী, অমর মল্লিক, অপর্ণা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, প্রমুখ।

ছবিতে গোপেন মল্লিক পরিচালিত সঙ্গীতের কাজ উপভোগ্য।



সার্বভৌম ফিল্ম সোসাইটি সম্মেলনে শ্রীবালা আহম্মদ আব্বাস বক্তৃতা দিচ্ছেন, তাঁর দৃশ্য পাশে বসে আছেন শ্রীচন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও মিস মারী সিটন।

দুর্ঘটনায় সঙ্গীতশিল্পী নিহত

গত ১৬ই এপ্রিল রবিবার মধ্যাহ্নে বেহালার তারাতলা রোডে এক বাস-মোটর সংঘর্ষে সঙ্গীতশিল্পী মলয় মৃধোপাধ্যায় এবং তাঁর সহশিল্পী সুদান্ত মৃধোপাধ্যায় ও রতন গাঙ্গুলীর মৃত্যু হয়েছে। মৃধোভিনেতা অরুণাভ মজুমদার গুরুত্বর-রূপে আহত হয়ে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে আছেন। এই শোকাবহ দুর্ঘটনায় ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর আহত হয়েছেন। মৃধোভিনেতা অরুণাভকে দেখবার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং চিকিৎসার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতার বিভিন্ন শিল্পীগণ হাসপাতালে গিয়ে তাঁর খোঁজখবর করেছেন। এক সঙ্গীত অনুষ্ঠান থেকে ফেরবার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

‘অগ্রদূত’-এর মতীন দত্তের জীবনাবসান

‘অগ্রদূত’ পরিচালকগোষ্ঠীর অন্যতম স্রীযতীন দত্ত গত শনিবার ১লা বৈশাখ পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা রেখে গেছেন।

১৯৩৪ সালে তিনি কালী ফিল্মস স্টুডিওয় শব্দবন্দীরূপে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ—‘স্বপ্ন ও সাধনা’, ‘বাবলা’, ‘সমাপিকা’, ‘অগ্নিপরীক্ষা’, ‘সবার উপরে’, ‘পথে হল দেবী’, ‘লালভুলদ’, ‘বাদশা’, ‘নারীকা সংবাদ’ প্রভৃতি অগ্রদূত পরিচালিত ছবির সঙ্গে তাঁর কর্মোদ্যম জড়িত।



মালয় সেন পরিচালিত ‘অজানা পথ’ ছবিতে মাধবী মৃধাজী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়



গুরুবাগচী পরিচালিত ‘তীরভূমি’ ছবিতে মাধবী মৃধাজী ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

সুডিও থ্রু

গড় নাসিমপুর

স্যাজে প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি গড় নাসিমপুর-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি ‘জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার’ জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘গড় নাসিমপুর’ ছবিতে উত্তমকুমার, সৌমিত্র ও বিশ্বজিৎকে একসঙ্গে দেখা যাবে। কালী-পদ সেন সঙ্গীত পরিচালনা করবেন।

অপরিচিত

সমরেশ বসুর ‘অপরিচিত’ অবলম্বনে আর. ডি. প্রোডাকসন্স একটি ছবি তুলছে। ছবির কয়েকটি চরিত্রে উত্তমকুমার,

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী



‘পায়াল’ ছবিতে শম্ভু মিত্র ও পঙ্কজ ব্রিত্ত

সৌমিত্র প্রমুখ অভিনয় করবেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত। সুরারোপ করছেন রবীন্দ্র চ্যাটার্জী।

অজানা শপথ

সরকার প্রোডাকশনের ‘অজানা শপথ’ ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনার

দায়িত্ব একাই গ্রহণ করেছেন সলিল সেন। সুর সৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখার্জী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন সৌমিত্র, মাধবী, পাহাড়ী জন্মাল, ছায়াদেবী, জহর ব্রায়, রেণুকা রায় প্রমুখ।

আমানত

বোম্বাই-এর প্রযোজক শত্ৰুজিৎ পাল

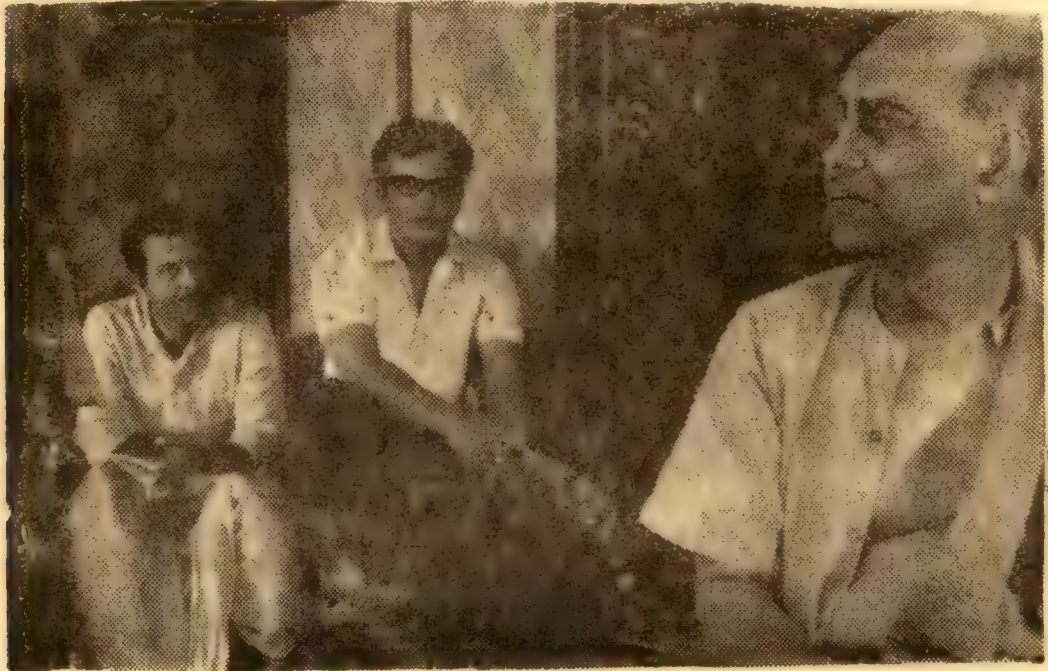
কেনিরা, উগান্ডা, তাজানিকার পটভূমিতে একটি ছবি করছেন। কাহিনী পারিবারিক হলেও আফ্রিকার জীবজন্তু ছবিতে থাকবে। ছবির নাম রাখা হয়েছে ‘আমানত’। মনোজকুমার, সাধনা, বলরাজ সাহানি, শশিকলা, অচলা সচদেব, মেহমুদ প্রমুখ এই ছবিতে অভিনয় করবেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন টি, প্রকাশরাও।

জুঁহি কী কলিয়া

নবীন বঙ্গ পরিচালিত হিন্দী ছবি ‘জুঁহি কী কলিয়া’র নায়ক নির্বাচিত হয়েছেন উত্তমকুমার। তার সঙ্গে অভিনয় করছেন নতন, অশোককুমার, শশিকলা, দর্পা খোটে, মেহমুদ, নিম্মি এবং মিশরের নর্তকী জোহরা জামীল।

সি এন টি’র ৭ম বার্ষিকী অনুষ্ঠান

বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে সি এন টি’র ৭ম বার্ষিকী অনুষ্ঠান গত ১লা বৈশাখ সকাল ৯টায় হয়ে গেল। রূপকথা, সোনার পেয়লা, লড়াই—এই তিনখানি নাটিকা ও নৃপের নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সি এন টি’র শিশুরা তাদের সুন্দর অভিনয় ও নৃত্যে সকল ছোট-বড় শ্রমিকের মন ভোলাতে পেরেছিল। শিশুদের কাকলি ও ঘন ঘন করতালি



স্টার প্রোডাকশনের সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘চাঁড়িয়ামানা’ ছবিতে শৈলেন মৃধোপাধ্যায়, উত্তমকুমার ও প্রসাদ মৃধোপাধ্যায়



জার্মান ব্যালে নৃত্যে বিজয়ের একটি অভিব্যক্তি

অনুষ্ঠানের সাফল্য ঘোষণা করেছিল। কাকিল দাস, কাকিল চ্যাটার্জি, রীতা সরকার, স্বপ্না সেনগুপ্তা, রীতা সেনগুপ্তা, সুপ্রিয়া গাঙ্গুলী, শব্জা চক্রবর্তী, রাজাশ্রী সরকারের অভিনয় খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এ ছাড়া দলের সকলের অভিনয়ই একবাক্যে সুন্দর বলা চলে। নৃত্যে বলবদল চৌধুরী, জলি চৌধুরী, নন্দিতা মজুমদার প্রশংসা পাবার যোগ্য। কণ্ঠদানে ছিল গৌরী সেনগুপ্তা, তপতী দাস ও গীতা মিত্র।

নবগঠিত জার্মান ব্যালে নৃত্য সম্প্রদায়

কয়েক বছর আগেও ব্যালে নৃত্যে জন ক্রয়কোর পরিচালনায় এমন একটি সুদৃশ্য ব্যালে নৃত্যশিল্পীগোষ্ঠী জার্মানিতে গড়ে উঠেছে যে একটি জার্মান জাতীয় ব্যালে গঠন করার কথা হচ্ছে।

জন ক্রয়কোর দলে বর্ষিষ্ঠ 'সোলো' নৃত্যশিল্পী হিসেবে যারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা হলেন মার্সিয়া হেভি, আনা কারডুস ও বিরজিট কাইল। পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুদৃশ্য শিল্পী হলেন ইগন ম্যাডসেন।

ব্যালে নৃত্যের ক্ষেত্রে অপর খ্যাতিমান পরিচালক হলেন কেনেথ ম্যাকমিলান। ক্রয়কো ও ম্যাকমিলান দুজনেই বিদেশী এবং লন্ডনের রয়্যাল ব্যালের সভ্য।

অঙ্গদকলী

ফিল্ম সোসাইটি সম্মেলন

গত ২১শে থেকে ২৩শে এপ্রিল কলকাতায় রবীন্দ্র সদনে সারা ভারত ফিল্ম সোসাইটিসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দিন ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসাইটিজের সভাপতি শ্রীসত্যজিৎ রায়ের অনুপস্থিতিতে সেক্রেটারী শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত ভারতে ফিল্ম সোসাইটিসমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভায় চিত্র প্রযোজক, পরিচালক ও পর্বালোচক শ্রীখাজা আহম্মদ আব্বাস এবং ব্রিটিশ চিত্র পর্বালোচক শ্রীমতী মারী সিটন বক্তৃতা করেন।

প্রথম দিনের অধিবেশনে ভারতের প্রাথমিক ফিল্মের কয়েকটি রীল, ভারতের অন্যতম প্রথম চলচ্চিত্রশ্রুতা দাদাভাই ফালকের জীবনের অংশ ও তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ চিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের অংশ-বিশেষ দেখান হয়। এই সঙ্গে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের নির্মিত 'নেভার অন এ

সানডে' এবং পরীক্ষামূলক ছবি 'অপরিচয় কি বিশ্বাচল' দেখান হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যথাক্রমে 'ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসের মূল শিক্ষা' 'জাতীয় চলচ্চিত্রের উপর গঠনগত প্রভাব' 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশে সরকারের ভূমিকা' 'চলচ্চিত্র মূল্যায়নের বা উপলব্ধির ভূমিকা ও পদ্ধতি' 'ভারতীয় চলচ্চিত্র মূল্যায়নের প্রভাব' 'চলচ্চিত্র সমিতির আন্দোলনের সমস্যা' ইত্যাদি বিষয়ে বহু বক্তা আলোচনা করেন।

এই সম্মেলনে বোম্বাই, মাদ্রাস প্রভৃতি রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটিসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রকর

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

মূল্য দুই টাকা মাত্র

বঙ্গদ্রুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

সাপ্তাহিক বসুমতীর ১০৭০

বঙ্গদেশের বহুসংখ্যক ২০শে জৈন তারিখের (৪০ সংখ্যা) রূপকল্পে প্রকাশিত সূজন লিখিত "শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীদের কনভেনশন" শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রবন্ধটিতে গত মাসে একটি পেশাদার নাট্যমঞ্চে যুক্তফ্রন্ট মন্দিরভাষ্যে সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত উক্ত মণ্ড বিবরণ পা। কিন্তু প্রসঙ্গত যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সঠিক নয়। মন্তব্যটি নিম্নরূপ—

".....অনুষ্ঠিত সভা দৃষ্টিতে কেবলমাত্র সম্বন্ধনা জানান হয়েছে, মন্দিরভাষ্য প্রতি সম্বন্ধ আরো ব্যাপক করার জন্য সাম্প্রতিক জগতের উন্নতির কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নি।.....দৃষ্টি স্ভাভেই এমন লোকদের সভামঞ্চে যসে থাকতে দেখা গেছে যারা প্রতিরোধশীল মন্ত্রীদেব সমর্থক বলে পরিচিত, নির্বাচনের সময় তাঁদের স্বাক্ষরিত বিবৃতি তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করেছে।....."

এ বিষয়ে আমাদের কতব্য যে, বিশ্বরূপায় শিল্পী, কর্মী ও কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে সম্বন্ধনার আরোজন হয়েছিল তাতে যুক্তফ্রন্ট মন্দিরভাষ্য নিকট দৃষ্টি আবেদন জানান হয়েছিল। একটিতে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাম্প্রতিক পরিমন্ডলের কথা বিবেচনা করে পৃথক সাম্প্রতিক মন্দিরভাষ্যের সৃষ্টির অনুরোধ জানান হয় যাহা স্বাভাবিক গণাধিকারিক সংস্কৃতির প্রসার ও উন্নতির পথ প্রশস্ত হতে পারে এবং অপরিচিত রবীন্দ্র সন ও লোকরঞ্জন শাখার পরিচালকমন্ডলীকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক করে সূচনাক্রমে গণশিল্পের প্রসারের পথকে প্রশস্ত করার প্রস্তাবও রাখা হয়। ১৭।৩।৬৭ তারিখের দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর বা আনন্দবাজারে এর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাভাবিক বিশ্বরূপায় অনুষ্ঠিত সম্বন্ধনা সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যুক্তফ্রন্ট মন্দিরভাষ্য মধ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ। এবং বিশ্বরূপায় শিল্পীদের পক্ষ থেকে শ্রীমতী জয়ন্তী দেন ও সূমিতা সান্যাল, কর্মীদের পক্ষ থেকে শ্রীরামচরণ সিং ও কতৃপক্ষের শ্রীমতীবিহারী সরকার। এঁদের মধ্যে কেউ প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদেব সমর্থক বলে আমাদের জানা নেই।

—সার্ববিহারী সরকার

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭১ বর্ষ ৩৬শ ও ৩৮শ সংখ্যায় চোমলায় চোখে উত্তর-বঙ্গের তথা ৭২ দিনাজপুরের রমণীর ও



দর্শনীয় বিভিন্ন স্থানের পরিচয় পাড়ে খুব আনন্দ পেলাম। একটি মজে যাওয়া দীঘিকে বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীচোমলামা ৩৬শ সংখ্যায় লিখেছেন, মহারাজ বাগশ্রীর দুই রাসীর নামানুসারে বাগশ্রীর অল্পে বহুতরমে কালোদীঘি ও ধলোদীঘি নামে প্রাচীনকালেই দুটি জলাধার তৈরি হয়েছিল। আজও এই দুটি মজে যাওয়া দীঘি দেখিয়ে লোকে কালোদীঘি ও ধলোদীঘি বলে প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করে। ৩৮শ সংখ্যায় তিনি লিখেছেন, 'গঙ্গারামপুর থেকে এক মাইল দূরে মুসলমান আমলের ধলদীঘি নামে একটি মজে যাওয়া দীঘির নাম করা যেতে পারে। গোড়ের কোন এক বদান্য মুসলমান নৃপতি এটি খনন করিয়েছিলেন গ্রামের অধিবাসীদের পানীর জলের কষ্ট নিবারণের জন্য'। আবার তিনি লিখেছেন, 'মহারাজা বাগ এখানে তাঁর ইন্টেনসিভ শিবির মন্দির নির্মাণ করেছিলেন'।

৩৬শ সংখ্যায় বর্ণিত ধলোদীঘি এবং ৩৮শ সংখ্যায় বর্ণিত ধলদীঘি সম্পর্কিত দুটি জলাধারকে বন্ধাচ্ছে। শ্রীলামা দুইভাবে দুটি দীঘিকে বর্ণনা করলেও আসলে দীঘি একটিই এবং তা ধলদীঘি নামেই পরিচিত। মহারাজ বাগশ্রীর দ্বিতীয়া মহিষীর নামানুসারেই এই দীঘির নামকরণ হয়েছিল এবং এই দীঘির পাড়ে শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ তাঁরই ইন্টেনসিভ মন্দির বলে কথিত। বর্তমানে এই দীঘিকে আর মজা দীঘি বলা যায় না। কারণ পূর্ববঙ্গের অনেক উচ্চাঙ্গ এর দুই পাড়ে বসবাস করতেন। তাঁরা এই দীঘির পাড়ে থেকে প্রচুর পানি উৎপাদন করে বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতেন। অপর দুই পাড়ে দুটি শিক্ষায়তন এবং অদূরে সম্রাট উন্নয়ন সংস্থার কার্যালয় গড়ে উঠেছে। দীঘির ভেতরটাও সংস্কার সাধিত হয়েছে। শ্রীলামা বর্ণিত নিকটবর্তী পশ্চিম প্রদেশী ইদানীংকালে কেবল পশ্চিম প্রদেশীতেই সীমাবদ্ধ নেই। একটা বিরাটকর মেলায় উপযোগী ব্যবতীয় জিনিসের আমদানী হয় এই দীঘির পাড়ের কিন্তীপ পাড়ে। এই মেলায় আর-ব্যবের সমস্ত দারিদ্র তথাকার বিখ্যাত

ফকির সাহেবদের। এঁদের মধ্যে বর্তমান কালে জনাব ওয়াহেদ আলী ও পিয়ার আলী শা ফকিরের নাম করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ৩৬শ সংখ্যায় শ্রীলামা বর্ণিত কালোদীঘি কালদীঘি নামে পরিচিত। এই কালদীঘির নামের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের একটি কাহিনীও স্মরণীয় হয়ে আছে। কয়েক বছর আগে একজন কুখ্যাত আসামী এই দীঘিতে ডুব দিয়েছিল, আজও সে ওঠে নি। শ্রীলামা ৩৮শ সংখ্যায় আরও একটি কথা লিখেছেন যে 'মুসলমান রাজত্বের সময় গঙ্গারামপুরের নাম ছিল দমদমা'। এখানেও একমত হতে পারছি। কারণ দমদমা একটি স্বতন্ত্র স্থান এবং গঙ্গারামপুর থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। গঙ্গারামপুর ও দমদমা নামে দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চল পৃথক হতে পারে।

কৃষ্ণদাস দাস
খুবলিয়া, নদীয়া

বেশ কিছুকাল ধরিয় আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় ডঃ নরেন ভট্টাচার্য বিচারিত "বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব" পাঠ করিয়া বিস্মিত ও পূর্ণকিত হইতেছি। ইতিপূর্বে এইরূপ বিরাট পরিধিতে কোন বাঙালী সাহিত্যিক এইরূপ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট মৌলিকত্বের দাবি করিতে পারে। তাছাড়া ল্যাটিন সাহিত্য, প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্য, হিব্রু, আরব, আর্মেনীয় প্রভৃতি সাহিত্যের আদিযুগ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট পরিপ্রাণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিবে। বর্তমানে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের উপর লিখিতেছেন দেখিতেছি। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় পাঠকদের দেওয়া সহজসাধ্য নহে। তথাপি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে, অল্প পরিসরে তিনি কল্পাতিকল্প বিষয়গুলির উপরেও আলোকপাত করিতেছেন। আজকের সাহিত্যের এই কালবাজারের যুগে এইরূপ একটি প্রমথ্য গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ করার জন্য আপনাদের অতিমন্দন জানাইতেছি।

শ্রীমদীনকুমার দাস
কোদালিয়া, ২৪-পরগণা

সেন তদন্ত কমিশনের অধিবেশনে

“ইডেন উদ্যানের স্টেট ম্যাচের দর্শক জনক ফঁটার মূল কারণ হল দর্শক আসনের চেয়ে অনেক বেশি টিকিট বিক্রয়”; সেন তদন্ত কমিশনের সম্মুখে সাক্ষাদানের সময় মন্তব্য করেন ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং খ্যাতনামা ক্রীড়া পরিচালক শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত। শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের সাক্ষাদানের সময় সেন তদন্ত কমিশনের কক্ষটি দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল। কমিশনের সম্মুখে প্রায় চারঘণ্টাব্যাপী সাক্ষা দেন শ্রীগুপ্ত এবং চারজন কৌশলী তাঁকে জেরা করেন।

নিজের কৌশলী শ্রীতপন-রায়-চৌধুরীর জেরার উত্তরে শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত জানান যে, বিভিন্ন ক্রীড়াসংগঠনের সঙ্গে সন্দীর্ঘকাল তিনি জড়িত এবং ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল বহুকাল। ৩১শে ডিসেম্বর তিনি ইডেন উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর মতে মাঠে প্রায় আশী হাজার দর্শক ছিল। শ্রীগুপ্ত বলেন যে, দর্শক আসনের তুলনায় অনেক বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছিল এবং এটাই গুডগোলের প্রধান কারণ। তিনি স্বীকার করেন যে, দর্শকদের বসার ব্যবস্থা বদ্বৈ শোচনীয় ছিল এবং তাঁর মতে এই সব অব্যবস্থার জন্য দায়ী সি-এ-বির কর্মকর্তারা। ষাট টাকার সিজেন টিকিট কাস্টমস তাঁবুর সামনে চড়া দামে বিক্রয় হতে তিনি নিজে দেখেছেন বলে কমিশনকে জানান। অন্যদের বঞ্চিত করে, সি-এ-বির প্রিয় কয়েকটি ক্লাবকে বেশি টিকিট দেবার অভিযোগ তিনি করেন। কংগ্রেস দলকে প্রচুর টিকিট দেওয়া হয়েছে বলে তিনি শুনলেও কোন কোন প্রত্যাক প্রমাণ তিনি পান নি। মরাজ হাতে সি-এ-বি নানারকমের কমপ্রিমেন্টারী কার্ড বিতরণ করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এই সময় সি-এ-বির কাছে শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের লিখিত একটি চিঠি সি-এ-বির পক্ষ থেকে কমিশনের সম্মুখে পেশ করা হলে কিংবদন্তি আলোড়নের সঞ্চার হয়। এই চিঠিতে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীশৈল মুখার্জীর জন্যে তিনি কয়েকটি কমপ্রিমেন্টারী টিকিট চেয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে জেরা করা হলে প্রশ্নটির সরাসরি উত্তর তিনি এড়িয়ে যান।

পুলিশের কৌশলী শ্রী ডি এন দাশের জেরার উত্তরে শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত জানান যে, অতিরিক্ত ভেড়ার কার্ড বিলি করে বিশ্বখ্যার জন্য দায়ী সি-এ-বির বেতনভুক কর্মচারীরা। তিনি আরও বলেন যে, সি-এ-বির একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা শ্রী এস কে খান্না ব্যক্তিগত কার্য-সিদ্ধির জন্য অনেক টিকিট নিয়েছেন বলে

খেলাধুলা



নবনির্মিত আই, এফ, এ ভবনের আরোম্বাটন করছেন পশ্চিমবঙ্গের অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতি বসু।

তিনি জেনেছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, স্পোর্টিং ইউনিয়ন তাঁবুর ভেতরে শ্রী এম দত্তরায় লুকিয়ে আছেন এই সন্দেহে বিক্ষুব্ধ ক্রীড়াব্যোদীরা স্পোর্টিং ইউনিয়ন তাঁবুতে আগমন ধরিয়ে দেয়।

ইডেন উদ্যানে নবনির্মিত কংক্রিট স্টেডিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শ্রীগুপ্ত জানান যে, এই নির্মাণ কার্যের জন্য

শ্রীঅভিভাষ

ঠিকাদার নিযুক্ত হয় রামরতন; এই রামরতন পূর্বে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের মালী ছিল এবং সেখানে কর্মচ্যুত হবার পর সি-এ-বিতে মালী হিসাবে যোগদান করে। কংক্রিটের কাজ সম্পর্কে তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাই ছিল না। বিচারপতি শ্রীসেনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীগুপ্ত বলেন যে, স্টেট ম্যাচের টিকিট সরকারী প্রেসে ছাপান দরকার এবং বিশেষ কমিটির তত্ত্বাবধানে টিকিট বিতরণ হওয়া উচিত।

কৌশলীদের জেরার উত্তরে শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত মন্তব্য করেন যে, খেলাধুলার মাঝে আজ রাজনীতির প্রবেশ ঘটেছে। কংগ্রেস

নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষকে ক্রীড়াঙ্গণে এনেছেন শ্রী এম দত্তরায় এবং এই ঘটনা তাঁকে সবচেয়ে বেশি দ্রুত দিয়েছে।

স্টেটসম্যানের ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীজেরী সায়ম সাক্ষাদান প্রসঙ্গে জানান যে, স্টেট ম্যাচের ষষ্ঠ দিন গুডগোলের সময় স্পেশাল পুলিশ এবং হোমগার্ড অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি জানান যে, প্রায় দুইশত ক্রীড়া সাংবাদিকের দেখাশোনার ভার তাঁর ওপর থাকার ঘটনার দিন মাঠের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলা তাঁর পক্ষ সম্ভব নয়। তবে ১লা জানুয়ারীর ঘটনা সম্পর্কে তিনি প্রাক্তন মধ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে একটি চিঠি দেন। আর একজন সাক্ষী চ্যাটার্জি এ্যাকাউন্টেন্ট শ্রীসমীর মুখার্জী সি-এ-বির দর্শক আসনের অব্যবস্থা ও পুলিশী অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীসমীর মুখার্জী ওইদিন পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। আর একজন সাক্ষী কালানন্দ পণ্ডিতের ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীতপ্ত গুহ সাক্ষাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, বিনা প্ররোচনার পুলিশ পশ্চিম টাকার গ্যালারীর দর্শকদের উপর লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে।

সাপ্তাহিক বন্যমতী

টেনিসের কার্যসূচী

আই এফ এর নতুন ভবন

আগামী ২৮শে, ২৯শে এবং ৩০শে এপ্রিল ভারত ডেভিস কাপের পূর্বাত্তলের খেলার ইমলিত হচ্ছে ইরানের সঙ্গে। ভারত এবং ইরানের এই খেলা অনর্ধিত্ত হবে ইরানে। ভারতীয় ডেভিস কাপ দলে আছেন রমানাথন কৃকান, জয়দীপ মৃথাজী এবং শিবপ্রসাদ মিশ্র। এছাড়া দলের সঙ্গে থাকবেন একজন নন প্রেসিং অধিনায়ক।

অল ইন্ডিয়া লন টেনিস এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী আর কে খান্না জানান যে, এ বছর চারজনের একটি সিনিয়র দল এবং তিনজনের একটি জুনিয়র দল ব্রুটেন এবং ইউরোপ সফরে প্রেরণ করা হবে। সিনিয়র দলে থাকবেন আর কৃকান, জয়দীপ মৃথাজী, প্রেমজিৎ লাল এবং এস পি মিশ্র। জুনিয়র দলে থাকবেন বলরাম সিং, আনন্দ অমৃতরাজ, সৌরভ মিশ্র। জুনিয়র দলের দুজন খেলোয়াড়কে আবার আগস্ট মাসে কানাডায় প্রেরণ করা হবে। টোকিওতে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা অনর্ধিত্ত হবে। ভারত থেকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য দুজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন, এরা দুজন হলেন আনন্দ অমৃতরাজ এবং সি জি কে ভূপাতি।

ইন্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন এতদিন পর নবনির্মিত নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠল। আই এফ এ স্থাপিত হয় ১৮৯০ সালে এবং দীর্ঘ প্রায় ৭০ বৎসর আই এফ এ বিভিন্ন স্থানে কাটিয়েছে ভাড়া বাড়িতে। সুতারকিন স্ট্রীটে আই এফ এর নবনির্মিত বাড়িটি তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার টাকা। আই এফ এর এই নিজস্ব ভবনটি চারতলা নির্মাণের কথা ছিল, কিন্তু এখন দোতলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। বাড়িটিতে জায়গা আছে প্রায় দু' হাজার বর্গ ফিট। আই এফ এ ভবনের একটি অংশ ভাড়া দেওয়া হবে বলে কতৃপক্ষ জানিয়েছেন এবং ভাড়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার লাভ করবেন বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান। সভাগৃহ হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি প্রশস্ত হল নির্মিত হয়েছে এবং টিকিট বিক্রয়ের জন্য কাউন্টার এবং লাইন দেওয়ার স্থানেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

গত ১লা বৈশাখ আই এফ এর নবনির্মিত ভবনের স্বারোচ্ছাটন করেন পশ্চিমবাংলার অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। স্বারদেশে গ্রীষ্মকুে অভ্যর্থনা জানান আই এফ এর নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রীম্নহাংদু আচার্য, অল ইন্ডিয়া ফুটবল

ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী এম দত্তরায় এবং শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত প্রমুখ। শঙ্খধ্বনির মধ্যে ফিফা কেটে নতুন ভবনে প্রবেশ করেন শ্রীজ্যোতি বসু। এই অনর্ধিত্ত উপলক্ষে নবনির্মিত ভবনের ছাদে একটি সভা অনর্ধিত্ত হয়। শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে, সরকার রাজনীতিকে খেলার আঙিনায় প্রবেশ করতে দেবে না। খেলাধুলার উন্নতিকল্পে সকল প্রকার সাধ্যমত চেষ্টা সরকার করবে।

আই এফ এর সভাপতি শ্রীম্নহাংদু আচার্য সকলকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ সূত্র করেন। কলকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি স্বীকার করেন এবং বলেন যে, এই সম্বন্ধে কি করণীয় এবং কত দূর করা সম্ভব তা তিনি দেখবেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য আগামী বছর আই এফ এ তার পঁচাত্তর বৎসর পূর্তিতে প্রাতিনিম্ন জয়ন্তী উৎসব পালন করবে।

বৈদ্যনাথ সম্মানিত

পক্ষ প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বৈদ্যনাথ নাথকে বেংগল এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই সম্বর্ধনা অনর্ধিত্তানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য।



পূর্বাত্তল ভলিবল বিজয়ী সার্ভিসেস দল



প্রথম ভিভিসন হক লীগে মোহনবাগান এবং কাস্টমস দলের খেলায় দৃশ্য

শিক্ষামন্ত্রী ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, বৈদ্যনাথের এই জয় আমাদের হৃদয়গৌরব পূনরুদ্ধার করেছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের অনুপ্রাণিত হবার জন্য তিনি আবেদন জানান। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান যে, বৈদ্যনাথের পক্ষ প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতার আর্থিক সাহায্যের জন্য বাংলা এ্যাসোসিয়েশন অফ স্টুডেন্টসের পক্ষ থেকে যে সাহায্যের আবেদন করা হয়েছিল তা সরকার মঞ্জুর করবেন। বিভিন্ন সন্তরণ সংস্থার পক্ষ থেকে বৈদ্যনাথ একটি স্বর্ণপদক একটি রৌপ্যপদক এবং একটি রেজার উপহার পান।

বাইটনের খেলা শুরু হয়েছে

ময়দান হক লীগ সমাপ্ত হবার পূর্বেই শুরু হয়ে গেল বাইটন কাপের খেলা। ১৯৬৭ সালের বাইটন কাপের উদ্বোধনী খেলায় খালসা ব্রুজ দল মিলিত হয় রাজস্থানের সঙ্গে এবং পোর্ট কমিশনার্স দল আর্মেনিয়ান্সের সঙ্গে। উদ্বোধনী খেলাতেই এ বছর বাইটনের প্রথম হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন খালসা ব্রুজ দলের জাগিনন্দার সিং। খালসা ব্রুজ রাজস্থানকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়, হ্যাট্রিক সহ একই চরটি গোল করেন জাগিনন্দার সিং। পোর্ট দল ১-০ গোলে আর্মেনিয়ান্সকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়। দ্বিতীয়

রাউন্ডের একটি খেলায় মেসারসকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে এন্ড্রালী এ-সি তৃতীয় রাউন্ডে নাগপুর ইউনাইটেড দলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

এবার প্রথম ভিভিসন লীগের কথা আলোচনা করা যাক। এই লেবা যখন প্রস্তুত করছি মোহনবাগান দলের তখন বাকি আছে আর মাত্র দুটি খেলা। এই দুটি খেলার একটিতে বি এন রেলের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলার ফলাফলের ওপর চ্যাম্পিয়নশিপের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করছে। কাস্টমসকে ২-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় পুরো পরেন্ট সংগ্রহে সক্ষম হয়। মোহনবাগান এবং জ্যাভেরিয়ান্সের খেলাটিতে কিন্তু মোহনবাগান অল্পের জন্য সম্মান রক্ষা করতে সক্ষম হয়। জ্যাভেরিয়ান্সের রক্ষণভাগের দৃঢ়তার জন্য মোহনবাগান কোনক্রমে ১-০ গোলে জয়ী হয় এবং খেলা শেষ হবার ঠিক পূর্বে মূহুর্তে পেনাল্টি পূঙ্গ থেকে বেণী বড়ল জয়সূচক গোলটি করেন।

অন্যদিকে ইন্স্টেবল এখনও তার অপরাধিত আত্মা বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য লক্ষ্যবস্তুর থেকে একটু দূর দিয়ে। মেসারসকে ইন্স্টেবল অনামাসে ০-০ গোলে পরাজিত করে পুরো পরেন্ট সংগ্রহ করে। পরবর্তী একটি খেলায় ইন্স্টেবল ২-০ গোলে জয়ী হয় পুলিশের বিপক্ষে। ইন্স্টেবল

বো এ সিকে পরাজিত করে ২-০ গোলে।

মাদ্রিদের আন্তর্জাতিক হক ট্রাডি-যোগিতার জন্য ভারতীয় হক দলের নাম ঘোষিত হয়েছে। এই দলের অধিনায়কত্ব করছেন প্রবীণ বিশ্বখ্যাত হক খেলোয়াড় পৃথ্বীপাল সিং। বাহাদুর থেকে এই দলে দুজন খেলোয়াড় আছেন। একজন হলেন গোলরক্ষক মুনাজী এবং অন্যজন ফরোয়ার্ডের ওসমান খান। ভারতীয় দলে আছেন নিম্নোক্ত খেলোয়াড়গণ। গোলে—মুনীর সেট এবং মুনাজী; ব্যাকে—পৃথ্বীপাল সিং, মুনাজী সিং এবং বিনোদ কুমার; হাফে—বলবীর সিং, কর্ণাজ সিং, হরমিক সিং, অমরজিৎ সিং এবং মহীন্দর লাল; ফরোয়ার্ডে—কলবীর সিং, পিটার, বলবীর সিং, রামলাওরা, ইন্দার সিং, ওসমান খান, যোগীন্দার সিং, বলবীর সিং এবং তারসেম সিং।

লালচান দর্শন

পূর্বাঞ্চল ভলিবল প্রতিযোগিতার এবার বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে মার্ডিসেস দল এবং রানার্সের সম্মান লাভ করেছে বাংলা দল। এই ভলিবল প্রতিযোগিতা কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশনের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মার্ডিসেস দল প্রতিযোগিতায় লাভ করে হয় পরেন্ট এবং বাংলা দল চার পরেন্ট।

এদের লক্ষ্য কোন্ পথে

ভারতের ক্রীড়ামোদনমূলক এখনও ঠিক সম্পূর্ণরূপে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার, অথবা এর আসল কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার চিত্র পাবার সুযোগ লাভ করে নি। কয়েকদিন পূর্বে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের সভায় একটি প্রশ্ন প্রধানত উপস্থিত সকলকে নাড়া দিয়েছে। এতদিন এই সংস্থা কাজের কাজ কি করেছে? কোন সদস্যর এই প্রশ্নের পাওয়া বোধ হয় সম্ভব হয় নি। কিন্তু এই সংস্থার ক্ষমতার পরিধি এবং গঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিশ্লেষণ না করে কোন মন্তব্য করাও মনে হয় উচিত নয়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য আছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা, এদের আবার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে। ফুটবলের সর্বময় কর্তা হল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন, ক্রিকেটে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, হকিতে ইন্ডিয়ান হক ফেডারেশন ইত্যাদি। এই সব সংস্থাগুলি আবার আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদন লাভ করে এর সভ্য এবং খেলার নিয়মকানুন ছাড়াও অন্য কয়েকটি নিয়মকানুন এদের মেনে চলতে হয় আন্তর্জাতিক নিয়মের গাড়ীর মধ্যে থেকে। অন্য কোন বিষয়ে অবশ্য এই সমস্ত সংস্থার কার্যাবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থা হস্তক্ষেপ করে না।

এক শব্দ উদ্দেশ্য নিয়ে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টস জন্ম নিল। পরিকল্পনা ছিল যে, ভারতের ক্রীড়া সংস্থাগুলির সর্বময় কর্তা হিসাবে উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টস বিরাজ করবে। কিন্তু আসলে দেখা গেল উদ্দেশ্য খুবই শূন্য এবং খাতায় কলমে সদস্যপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে ওই সর্বময় সংস্থা জন্ম নিলেও কার্যক্ষেত্রে, অগ্রসর হবার কোন ঠিকমত পথ না রেখে কাউন্সিল যাত্রা শুরু করেছে। ফলে দেশবাসী অগণিত ক্রীড়ামোদী ঠিক বুঝতে পারল না যে কি উদ্দেশ্যে এবং কেন এই সংস্থা গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে শাখা হিসাবেও গঠিত হল রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল। কিন্তু সব কিছুই গোলমাল হয়ে গেল, দেখা গেল যে বলতে গেলে যেখান থেকে যাত্রা সেখানেই স্থিতি। এমন কি কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দও ভাবতে লাগলেন;

আই জো কি করবো ভেবেছিলাম? ঠিক করলাম? আর কি অবশ্যেই বা আছে।

জেনারেল কারিয়াস্পা অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের সভাপতি হবার পর সংস্থার আসল রূপটি বুঝতে পারলেন এবং তিনি নতুন পথে এই সংস্থাটিকে পরিচালনার জন্য দৃঢ়সংকল্প হলেন।

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টস বর্তমানে মহাজনী কারবার করছে বললে ভুল বলা বোধ হয় হবে না। আমাদের সরকার একটি বিশেষ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা এই কাউন্সিলের হাতে দেবার ফলে কাউন্সিলের ইচ্ছা বেড়েছে এবং বিভিন্ন স্পোর্টস সংস্থাগুলি বর্তমানে মান্য করে চলার চেষ্টা করছে কাউন্সিলকে। সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস বৈদেশিক মন্ত্রীর চাবিকাঠি বর্তমানে এই কাউন্সিলের হাতে। বর্তমানে কোন স্পোর্টস সংস্থার কোন সফরের জন্য বা অন্য কারণে বৈদেশিক মন্ত্রীর প্রয়োজন হলে দরবার করতে হবে এই অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের কাছে। কাউন্সিল তারপর বিবেচনা করে ভারতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মন্ত্রীর জন্য ভারতীয় অর্থদপ্তরের কাছে আর্জি করবে। ফলে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা প্রথমে যেমন এই কাউন্সিলকে ভাল চোখে দেখতে না পেয়ে পাতাই দিতে চায় নি, এখন ঠেকার পড়ে কাউন্সিলকে সম্মিহ করতে বাধ্য হচ্ছে। নইলে এক কলমের খোঁচায় বৈদেশিক মন্ত্রীর ব্যবস্থা বরবাদ হওয়া এতটুকু মুশকিল নয়।

ভারতীয় সরকার খেলাধুলার খাতে প্রতি বছরই অর্থমঞ্জুর করেন এবং শিক্ষাদপ্তর হল খেলাধুলার ভারপ্রাপ্ত দপ্তর। শিক্ষাদপ্তরের তরফে এই খেলাধুলার খাতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের ভান্ডার বর্তমানে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের হাতে। ভারতের বিভিন্ন খেলাধুলার উন্নতিকল্পে এই অর্থ ব্যয়িত হবে। কয়েকটি ক্রীড়া সংস্থা ছাড়া অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। এক একটি ক্রীড়া সংস্থার আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে বিদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে প্রতিনিধি প্রেরণ করা তো দূরের কথা একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের সুবিবেচনা এবং সহানুভূতি লাভ করতে পারলে এই সমস্ত সংস্থাগুলির মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার হতে পারে।

বিভিন্ন ভারতীয় ক্রীড়াসংস্থাগুলি বিদেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণের জন্য দল নির্বাচন কার্য নিজেরাই সম্পন্ন করেন। এই সব দল নির্বাচনের ব্যাপারে প্রায়ই বহু পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ শোনা যায়। সেই জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন কমিটিতে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টস একজন করে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণের কথা উত্থাপন করে। কাউন্সিল অবশ্য বলে যে তাদের প্রেরিত প্রতিনিধি নিরপেক্ষ পর্ববেক্ষক হিসাবে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার অবস্থান করে তাদের দল নির্বাচন পর্ববেক্ষণ করবেন এবং এই সম্বন্ধে কাউন্সিলের কাছে বিবরণ পেশ করবেন।

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের এই প্রস্তাবে একেবারে বৈক্য বসে প্রতিটি ক্রীড়া সংস্থা। তারা নির্বাচনকমন্ডলীর মধ্যে বাইরের কাউকে প্রবেশ করতে দিতে একেবারে নারাজ। কারণ দল নির্বাচনের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করতে তারা বশ্চর্য্যকর। এই পরিস্থিতিতে অবশ্য সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু করারও নেই বটে কাউন্সিলের।

তবে একথা কেউই বোধ হয় অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বিভিন্ন ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দল নির্বাচনের ব্যাপারে বহু যোগ্য খেলোয়াড়কে অন্যায়াভাবে দল থেকে বাছ দেওয়া হয়ে থাকে। যদি কখনও কোন ক্রীড়া সংস্থার দল নির্বাচনের ব্যাপারে কোন গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তখন রঙ্গমঞ্চে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের প্রবেশ করা উচিত। সেই জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিল অভিযোগের শব্দ তদন্তই করবে না। এই সমস্ত পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্নীতির জন্য দায়ী করা তাদেরও খুঁজে বার করতে হবে। এবং প্রয়োজন হলে খেলাধুলার ক্ষেত্র থেকে এই ধরনের বিপজ্জনক চরিত্রের বিতাড়নের ব্যবস্থাও গ্রহণের কথা চিন্তা করতে হবে।

তবে একথা সত্য যে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টস যে বর্তমানে ভারতের খেলাধুলার উন্নতিকল্পে কাজ করতে চায় তার প্রমাণ ইদানীং আমরা কয়েকটি পেয়েছি। বোম্বাইয়ে এবং সভায় কাউন্সিল ভারতীয় দলের বৈদেশিক সফরে যাত্রাভারতের অর্থেক ব্যয় সরকারকে বহন করার সুপারিশ করেছে। তবে কাউন্সিল আরও বলেছে যে, যে সমস্ত ক্রীড়া সংস্থাগুলির ভান্ডার একেবারে শূন্য তাদের ক্ষেত্রে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কথা কাউন্সিল চিন্তা করে দেখবে।

—জিচ্চ্য চক্রবর্তী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বঙ্গমতী প্রেস হইতে গ্রীষ্মকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জীবনের
মামুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহোষ প্রতিনিহ আহারের পর
চুইবার করে দু'চামচ মুক্তসজীবীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজ্ঞাকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্রান্তি দূর হবে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অকক ডাঃ বোমেন চন্দ্র বোস, এম-এ,
আইউরোপায়া, এম, সি, এস, (লন্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাসলপুর
কলেজের ইন্সপেক্টর পাবের তৃতপূর্ণ
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন চন্দ্র বোস,
এম-বি, বি-এস, আইউরোপায়া।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮



কর্মচক্ষু পশ্চিমবঙ্গের কার্যকর্মে চিত্র

- (১) রাইচৌর্য বিল্ডিংয়ে প্রশাসন সংস্কার কমিশনের বৈঠক
- (২) রবীন্দ্রসদনে সংগীত-নাট্য-চলচ্চিত্র শিক্ষণী ও কর্মী সম্মেলন
- (৩) পল্লী বাংলায় ধান-চাল সংগ্রহ অভিযানে মৃদাঙ্গস্ত্রী



...কিন্তু, এক বিষয়ে আপনি নিশ্চিত

বোরোলীন

—কাটা-ছেঁড়া-ফাটা হাজা, শূকনো, খসখসে কিংবা বগচীন হলে
যে কোন বিভ্রাটে—বোরোলীন নির্ভরযোগ্য অ্যান্টিসেপটিক

জুহী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২১৪৭
জাজকের মামলা		২১৪৮
আমি বাঁদের দেখোছি	— পরিমল গোস্বামী	২১৪৯
ভারতবর্ষ		২১৫০
সাম্প্রতিক		২১৫১
বা দেখোছি, বা পেরোছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরজন দত্ত	২১৫২
নবম্মিনসভা সমীপে	— এস কে শক্তি	২১৫৩
এই দিন (কবিতা)	— প্রদীপ চক্রবর্তী	২১৫৪
বঙ্গদর্শন		২১৫৫

ধন্যবাদ
সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র
*
চিঠি কাগজ

শৈললাল মনিলাল
বহুবাজার শ্যামবাজার
ফোন-৩৩-২২২৬ ট্রামজিপার দক্ষিণে

মিষ্টান্ন
বিছানা
*
শাল ও আলোয়ান

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের প্রবর্তা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিজ্ঞে পাগলা বড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, সমালয়ে জীবন্ত মান্দু, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে পরদর ভিন্ন গোষ্ঠ, লীলাবতী, সুব্রতনী কাম্য, স্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

উক্ত পঞ্চদশ মোহাল এম, এল, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য স্রোমাণের স্বর্ণখনি)

‘রক্তনদীর ধারা’, ‘অপরায় বিজ্ঞান’ ও বিখ্যাত বিচার কাহিনী নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উন্মোচন ও যথার্থ রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবতা ন জানিত। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্য বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাভ হইতে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধবাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

বঙ্গদত্ত প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
হরিপদ, কালাচাঁদ আর কুকুরটা (গল্প) ...	- সত্যেন সেন	২১৭২
অগ্নিবায়ুগের একটি অধ্যায় ...	- অনন্ত সিংহ	২১৭৫
বিদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত (ছোট উপন্যাস)	- স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৮১
পাক-ভারতের রূপরেখা ...	- প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	২১৮৫
গ্রাম বাংলার কথা ...	- পারুল ভট্টাচার্য	২১৯১
অবতাব্য ...	- চন্দ্রদুর্গ	২২১৭
স্বপ্নমগ্ন ওয়েশে এবং এনেশে ...	- শিলানি	৩০০০
গ্রন্থমেলা ...	-	৩০০১
রঙ্গজগৎ ...	-	৩০০২
বেলায়, দা ...	- শ্রীঅমিতাভ	৩০০৬

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের —নবতম অধ্য—

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
যেহে আছে আজ আমার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর;

আমরা বুচার মা তোর দৈন্য!
মানুষ আমরা নহি তো মেঘ!
দেবী আমরা! সাধনা আমরা!
স্বর্গ আমরা! আমার দেশ!

স্বপ্নমগ্নের কবিত্ব, অপরাধের মানবমাহাত্ম্যের স্বন্দরশী কবি, যুগপ্রবর্তক
কবিগুরু শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়েব প্রণবলী। প্রথম খণ্ডে আছে, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলালের
শ্রেষ্ঠ নাটক সাজাহান, তৎসঙ্গে সর্বজনসমাদৃত নাটক সিংহল বিজয়, সোরাব
হস্তম ও পরপারে। মদ্রল পারিপাট্যে ও গ্রন্থন সৌকর্যে মনোহর। কবির
প্রতিকৃতি সমন্বিত সূদৃশ্য আর্ট পেপারের জোকেটের প্রচ্ছদ: কাগজ ও
বোডে বাঁধা। মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



৭১ বর্ষ : ৪৭৭ সংখ্যা—মূল্য—২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২০শে বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 4th May, 1967

শিক্ষা-সংস্কার ও ভাষা-সূত্র

বিগত কুড়ি বছরে সারা ভারতে যেভাবে শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে, তাতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কথা জেনে সরকার শিক্ষার হেরফের বহুবার করেছেন। কিন্তু তা থেকে কোনো রকম সফল লাভ করা যায় নি। কারণ শিক্ষানীতি এতোদিন দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথেই পরিচালিত হয়েছে। এমন কি সর্বস্বতীর কমলবনে মত্ত হস্তীদের আহ্বান জানিয়ে অনেক সময় অধটন ঘটানো হয়েছে, তাও আমবা লক্ষ্য করছি। দুর্ভাগ্যব ব্যাপার, আমাদের নেতৃত্ব প্রথমে এই সব ঘটনাকে বড় একটা আমল দেন নি। না দেবার কারণ ছিল অন্য। সেই কারণ এই যে, এদেশে অর্থবানের সন্তানদের পড়ার জন্য আছে পৃথক ব্যবস্থা এবং এখানে পড়া শেষ হলে কিংবা বাল্যাবস্থাতেই বিদেশে পড়াশুনোব জন্য বিদেশী মদ্রা। সুতরাং এদেশে সাধারণ ছেলেদের সামাজিক দুরবস্থার মধ্যে গবীর বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া হচ্ছে কি না—তা নিয়ে মাথা-ওয়াল ব্যক্তিদের মাথাব্যথার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মাথাব্যথা দেখা দিল তখনই এখন শিক্ষাঙ্গণে সুদূর হোল চরম নৈরাজ্য, শিশুহারা ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, ক্ষমার্ত শিক্ষকদের আন্দোলন এবং অন্য দৃশ্যে রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন। শিক্ষাক্ষেত্রে একটা নতুন নীতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নবগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্থান পেলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুণা সেন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে।

ডঃ সেন মন্ত্রিসভা গ্রহণ করার পরই ঘোষণা করলেন যে, শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার রাজনীতিব আবহাওয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের

বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা করেছেন। বর্তমানে সংসদীয় সর্বদল শিক্ষা কমিটির বক্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে। এই বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা-দীক্ষা পরিবর্তিত হতে পারে। তবে এই পরিবর্তনের দ্বারা শ্রেণীবিন্যাসে পড়ানো ব্যবস্থাকে কিছুটা গ্রহণ করা হলেও অনেক নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই সব নির্দেশের মধ্যে রয়েছে দশম শ্রেণী ও কলেজীয় শিক্ষার মাধ্যমতী দুই বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার-সাধন এবং ধনী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে গরীব ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা। সর্বাপেক্ষা সুসংবাদ হচ্ছে : সংসদীয় সর্বদল শিক্ষা কমিটির দ্বি-ভাষা-সূত্র।

কমিটির যাবতীয় তথ্যের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে উপবিভক্ত বিষয়-গুলির মধ্যে দুই বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত বর্তমান বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যুক্ত রাখাই শ্রেয়। এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জুনিয়র কলেজের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। ধনীদেব ও গরীবদের বিদ্যালয়ের পার্থক্য দূরীকরণ আপাতত হয়তো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তা সম্ভব না হওয়ায় ধনীদেব সন্তানদের জন্য ব্যবস্থিত বিদ্যালয়গুলিতে স্থানীয় গরীবজনদের সুযোগ দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থনীয়। কিন্তু ঐ সব স্কুলে বেতনের অঙ্কটাও কম নয়। সেই অর্থ কি সরকার দেবেন? কমিটির দ্বি-ভাষা-সূত্র সর্বশেষ পরিস্থিতিতে না কি বানচাল হবার উপক্রম হয়েছে। অন্তত-পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসিত বক্তৃতা ও কেন্দ্রীয় উপপ্রধানমন্ত্রীর জোরালো বক্তৃতা দ্বি-ভাষার পক্ষে। অবশ্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী সরলমতি ছাত্রদের উপর কতকগুলি

ভাষা চাপিয়ে দিয়ে প্রতিভাকে অজুহে বিনষ্ট করে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যে বিপথে চালনার ঘোরতর বিরোধী। দ্বি-ভাষা-সূত্রে মাতৃভাষা ও ইংরেজী অথবা হিন্দী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমরা মাতৃভাষা ও ইংরেজী অথবা ক্ষ কোনো একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষার পক্ষে। তবে মাতৃভাষার স্বতন্ত্র পর্বন্ত না প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকসমূহ অনূদিত হচ্ছে, ততোদিন আমরা চাই, পঠন-পাঠন ব্যবস্থা মাতৃভাষা ছাড়া বিকল্প হিসেবে ইংরেজীতেও বহল থাকুক। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক স্বার্থে দ্বি-ভাষা-সূত্র রক্ষার জন্যে হিন্দীকে অহিন্দী ভাষাভাষীদের উপর আবশ্যিকরূপে চাপিয়ে দেওয়া একেবারেই অনাবশ্যক। তবে অন্যান্য ভাষা শিক্ষার ইচ্ছা ছাত্রদের জন্য কমিটি যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা অবশ্যই সমর্থনীয়। কিন্তু দ্বি-ভাষা-সূত্র কোনোমতেই সমর্থনীয় নয়। বাস্তব শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, দ্বি-ভাষা-সূত্রে শিক্ষার চেয়ে রাজনৈতিক দিকটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মন্তব্য নিঃপ্রয়োজন।

আমাদের ধারণা, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূরীকরণে দৃঢ়সংকল্প। সবার বাথার সম্মুখীন তিনি হচ্ছেন। সেই বাধা অপসারণে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীদের দায়িত্বও কম নয়। কিন্তু তঁরা কি একমত হবেন, না স্বাধীনভাবে তথা পরমা আবায় সেই অস্বকার, অপাকা এবং পুনরাবিত্তন সম্মেলন?

সংসাদিকা

আজকের মানুষ

নতুন আত্ম নন, তবু নতুন। এই প্রথম নয়, তবু প্রথম। এক যুগ আগে বান্দুং সম্মেলন সেরে ফেরবার পথে ১৯৫৫ সালে প্রথম আগমন ঘটেছিলো তাঁর, অন্য পরিচয়ে। সেদিন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, আজ রাষ্ট্রপ্রধান, প্রেসিডেন্ট। ইসমাইল আল আজহারি দিল্লীতে চেনা মুখ।

ভারতও তাঁর কাছে চেনা, ভারতকে, তাঁর নেতাদের তিনি হৃদয় দিয়ে জেনেছেন। ভারতের দুই নেতা গান্ধীজী আর জওহরলাল আজহারিরও প্রস্থের নেতা, তাঁর গুরু, আদর্শ। তাই প্রেসিডেন্ট আজহারির দপ্তরে এই দুই নেতার প্রতিষ্ঠিত সম্মানজনক অবস্থান। পরিচিত মুখ, জনতার লোক আজহারি সূদানেরও। কিন্তু তিনিই সূদানে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেন। ব্রিটিশ শাসনাধীনে সূদানেরও বুকে একদিন রক্ত ঝরেছিলো, অত্যাচারিত নিপীড়িত জনতার ক্রন্দন-রোল এখানেও উঠেছিলো। সেদিন গ্যাজেটস জেনারেল কংগ্রেস দল গঠন করে আজহারিই এগিয়ে গিয়েছিলেন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে আজহারির সংগ্রাম ছিলো আপোষহীন, তাই দেশের আপোষকামী, মরমপন্থী নেতা যারা ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও বিরোধ করতে হয়েছে তাঁর। এক হাতে তিনি বিদেশী শত্রুকে রুখেছেন, অন্য হাতে দাবিয়ে বেখেঁটছেন স্বাধীনস্বাধী চাওয়াদের। সংগ্রাম তাঁকে কম' করতে হয় নি।

যে কোন প্রথম শ্রেণীর নেতাব মতো আজহারির বাণীমতা বিস্ময়কর। বস্তুত তাঁর বাকচাতুর্য, যুক্তি উপস্থাপনার অভিনব এবং বিরোধী পক্ষের যুক্তিখণ্ডনে স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা শীগগিরই তাঁর খ্যাতি এনে দিল। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন দেশের যুঁখিযুঁখি, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত। বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ আজহারি বুঝেছিলেন সূদানেব মজ্জি যদি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে আদায় করতে হয়, তবে একক সংগ্রামে তা সহজসাধ্য হবে না, সমস্বার্থের শক্তিশালী প্রতিবেশীর সহায়তা তাঁকে নিতে হবে। তাই মিশরের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করলেন তিনি, ব্রিটিশ উপনিবেশ-বাদের বিতাড়নের জন্যে মিশরও সমান আগ্রহী।

ইতিমধ্যে ব্যাপক, জাতীয়তাবাদী

গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন সংগঠন ন্যাশনাল যুনিয়নিস্ট পার্টি গড়ে তুলেছেন তিনি, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সকলেই এই মোর্চার মিলিত হয়ে বিদেশী শাসককে চরম আঘাত দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ব্রিটেন অবশ্য তার অন্যান্য উপনিবেশে যেমন, তেমন সূদানেও 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' বা ভেদ নীতি এখানেও প্রয়োগ করেছিলো, সূদানবাসীও



আজহারি

তার রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন জরুরী ও জাতীয় প্রশ্নেও বিশ্বাসিত্ব করতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু দলে ভারী ছিল ন্যাশনালিস্ট যুনিয়নিস্ট পার্টি, নেতৃপদ পেয়েছিলেন ইসমাইল আজহারিই। তিনিই ছিলেন সূদানের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক, তাঁর ওপরেই সকলের আশা-ভরসা।

তাই গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' ডাকের

মতো আজহারিও বৈদিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের প্রতি 'জিলা' (ভোগ করো)-র গর্জন তুললেন, সেদিন ব্রিটিশের হিংস-পাঙ্করেও খিল ধরেছিলো বৈকি। বিদায় নিতে বাধ্য হলো ব্রিটিশশক্তি, তার মানে স্বাধীন সূদানের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর গদিটা আজহারিই পেলেন। স্বাধীনতা পাবার পর সূদানকে স্বভাবতই উপনিবেশবাদ-বিরোধী জোটে সামিল করেছেন প্রধান-মন্ত্রী আজহারি, অননুসৃত সূদানের দ্রুত শিপোপায়নের জন্যেও ব্যবস্থা নিয়ে ছিলেন।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অলসভাবে সময় কাটায় নি কখনো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের এজেন্টরা এখানে বরাবরই সক্রিয় ছিলো, আজহারি বা সরকার-বিরোধীদের শক্তি ষোগাতে কার্পণ করে নি তারা। তাদের চক্রান্ত একেবারে ব্যর্থ হয় নি, যদিও তা সাময়িককালের জন্যে মাত্র। অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে আজহারির দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি, প্রধানমন্ত্রীর পদ তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছিলো। কিন্তু আবদুল্লা খলিলের নতুন সরকারের চরিত্র ধরা পড়তে দেরি হলো না। দেশের দারিদ্র্য ঘোচাবার নাম করে তিনি সাহায্যের জন্যে আমেরিকার স্বারস্ব হরেছিলেন, আজহারি দেশব্যাপী প্রতি-বাদের প্রবল কড় তোলা সবেও। খলিল তাঁর দেশবাসীকে বিশ্বাস না করতে পারেন, আজহারি করতেন। তাই খলিলকে দেখা গেলো জনতার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে, নিজের চালাতে না পেরে দেশের শাসনভার তিনি তুলে দিলেন সাময়িক কর্তৃপক্ষের হাতে। এই সাময়িক চক্রের পেছনে কার মলিন হস্তটি ছিলো তা আর বুঝতে বাকী রইলো না যখন আজহারি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাকে দক্ষিণ সূদানে নির্বাসন দেওয়া হলো।

কিন্তু সে কদিনের জন্যে? জনতা যাকে চায়, দেশের প্রয়োজন যাকে, তাঁকে বেশিদিন অন্তরালে রাখা কি সম্ভব? সাময়িক শক্তি কি জনশক্তির চেয়েও বড়ো? ১৯৬৪ সালে সাময়িক শাসন বরবাদ করে দেওয়া হলো, নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হলো সূদান। আর সেই রাষ্ট্রের প্রধানের পদ যে অবিসম্বাদী জননেতা আজহারিই পাবেন এ আর বিচিৎ কি!

আজহারি তাঁর দেশকে নতুন সম্ভাব-নার পথে নিয়ে চলেছেন। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সূদানের বন্ধুত্ব ঘটেছে, ঘটছে সমাদর্শী ভারতের সঙ্গেও। সহযোগিতা ছাড়া অননুসৃত দেশগুলির উন্নয়ন সম্ভব নয়, উন্নত দেশের ভরসা থাকা তো নিরাপদ নয় সব সময়। সেজন্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেতৃত্ব করে আজহারির আজ ভারতদর্শন, দু-দেশেব বন্ধুত্ব ও বাণিজ্য-সম্পর্কের প্রসার হোক—এই তাঁর কামনা।

আমি তাসস্বীপে বসেছি

পরিমল চৌধুরী

(১৭) শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(১৮৯০)

সুনীতিকুমারের সান্নিধ্যে এসেছি অনেকদিন অনেক উপলক্ষে। ১৯৩২ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তাকে বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছে প্রথম পরিচয়েই। তিনি সংস্কৃতিমান। বিদ্যা যখন অহঙ্কারের বদলে অলংকার হয়ে ওঠে তখন তার সংস্পর্শে এলে মন আপনা থেকেই খুশি হয়ে ওঠে। ব্যাবহারিক জীবনে সংস্কৃতির পরিচয়। এটি হল ব্যক্তিগত আচরণের কথা। নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতির অর্থ আরও জটিল এবং ব্যাপক।

সুনীতিকুমার যখন আলাপ করেন, মজলিশ মেজাজে থাকেন, তখন তাঁর সমস্ত বাক্যের ভিতর দিয়ে বিদ্যার এক অশ্রুত বিকিরণ ঘটতে দেখা যায়, এবং তা সবাইকে গম্যনভাবে খুশি করে তোলে। আসলে তিনি মজলিশ মেজাজেরই মানুষ, তাই তাঁর যা কিছু দেখা এবং জানা বিষয়, তাঁর যা কিছু বিদ্যা, তাকে এক অভূতপূর্ব সরসতায় মণ্ডিত করে তিনি তাঁর আলাপের সহজ উপকরণরূপে ব্যবহার করতে পারেন। পাণ্ডিত্যের এমন সরস সংস্করণ সহজে দেখা যায় না। বিদ্যার প্রামাণ্যবাদ বলা চলে বোধ হয় একে—সব বিদ্যাই আসরে বসে তাঁর সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করা!

বিদ্যা সবার ক্ষেত্রে ঠিক এমন হয়ে ওঠে না। অবশ্য সবই মনের গঠনের উপর নির্ভর করে। তাই সাধারণতঃ লোকের ধারণা, সংস্কৃতি এমন একটি জিনিস যা জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে শো-কেসে সাজিয়ে রাখা যায়। সংস্কৃতি বিক্রি করা যায়। আজকাল যেমন নাচগানকেই সাধারণভাবে লোকে সংস্কৃতি বলে জানতে শিখেছে। সংস্কৃতি দেশে ও বিদেশে প্রচার করা হয় শুধু নাচগানের সাহায্যে। জাতীয় সংস্কৃতির এটা অবশ্যই একটি অঙ্গ, কিন্তু এখন সংস্কৃতির একমাত্র অর্থই এইটি দাঁড়িয়ে গেছে।

সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে কথাটির

ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা মনে এলো। শ্রীশ্রীনাথ ঠাকুর সংস্কৃতির সমার্থকরূপে “কৃষ্টি” শব্দটি ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। এই অর্থে “কৃষ্টি” ব্যবহারে তিনি এতই বিরক্তি বোধ করতেন যে, শেষ পর্যন্ত “ভাসের দেশ” (১৯৩০) নামক নাটকে “কৃষ্টি” নিয়ে যথেষ্ট বিদ্রুপ করেছেন।

একটুখানি নমুনা দিই—

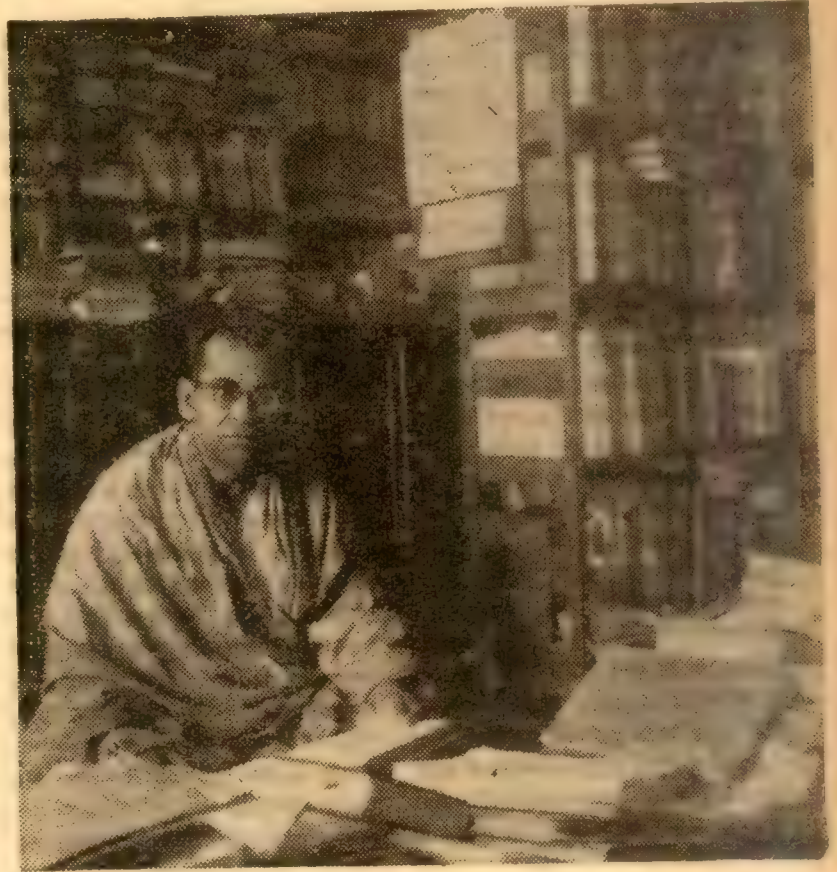
রাজা। ওহে ইস্কাবনের গোলাম।
গোলাম। কী রাজাসাহেব।
রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসস্বীপ-প্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসস্বীপের কৃষ্টির রক্ষক। রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। কৃষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ কৃষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নব-তম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন। সকলে। কৃষ্টি কৃষ্টি কৃষ্টি।

অন্যত্র—

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাসস্বীপের কৃষ্টি। বাঁচাও সেই কৃষ্টি।



শব্দগূহের পাঠপরিবেশে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখক কর্তৃক ১৯৩৯ সালে গৃহীত

অন্য—

টেকাকুমারী। (সকলে) আমরা চালাব
অবাধ্যতামূলক বে-আইন।

গোলাম। এ কী হল। হার কৃষ্টি, হার
কৃষ্টি, হার কৃষ্টি। গোলামের মূখের একটি
গানেও বলা হয়েছে, “কেমনে করিবে রক্ষা
কৃষ্টি, সে দেশে নিশ্চিত অনাসৃষ্টি।”
উদ্ভূতির মধ্যে “নবতম অবদান” কথাটি
লক্ষণীয়। এই অবদান শব্দটির অপ-
ব্যবহারের উপরেও রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত
ছিলেন।)

১৯০৭ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী চন্দন-
নগরে গঙ্গাবক্ষে রবীন্দ্রনাথের বোটের
মধ্যে বসে (সেখানে সুনীতিকুমার উপস্থিত
ছিলেন) আমি কৃষ্টি প্রসঙ্গে কথা তুলে
রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলাম, শব্দের ব্যবহার
নিরে বখন যে রীতিকে গাল দেওয়া যায়,
কিছদিন বাদে দেখি সেটাই স্থায়ী আসন
লাভ করেছে, যেমন সংস্কৃতি অর্থে আপনি
কৃষ্টি ব্যবহারের বিরোধী, কিন্তু ওটা নিরে
আলোচনা করতে করতে আরও বেশি বেশি
চলছে। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে
বলেছিলেন, “আমার কৃষ্টি আছে এটা
স্বীকার করে তো?” (এই পর্যায়ের প্রথম
রচনা দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু এই সংস্কৃতি ও কৃষ্টি দুটি
শব্দের অর্থ যে বিভিন্ন, তা বিশদভাবে
বিশ্লেষণ সুনীতিকুমারই করেছিলেন এর
বছর পনেরো আগে ১৯২২ সালে। এবং
রবীন্দ্রনাথের “কৃষ্টি”বিরোধিতার মূলেও
সুনীতিকুমার। আমি সুনীতিকুমারের
“সংস্কৃতিকী” গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ
“সংস্কৃতি” (বাক্-সাহিত্য) থেকে কিছু
উদ্ধৃতি দিচ্ছি প্রামাণ্যরূপে।—(গ্রন্থখানি
সুনীতিকুমার ৩০।৩।৬২-এ আমাকে
উপহার দিয়েছিলেন; এতদিনে প্রাপ্তি-
স্বীকার করা গেল।)

...“কৃষ্টির অর্থগত পরিবর্তন বৈদিক
আর সংস্কৃত সাহিত্যে যা দেখা যায়, তা
থেকে কিন্তু বাঙালয় গৃহীত এর Culture
অর্থ সমার্থিত হয় না। কৃষ্টির মূলগত
অর্থ ‘কর্ষণ-কার্য’, তা থেকে ‘চাষ-করা
ক্ষেত’, তা থেকে ‘ক্ষেত্র, ভূমি, দেশ’, এবং
তারপরে ‘দেশের মানুষ, জাতি’। বৈদিক
ভাষায় ‘কৃষ্টি’ মানে ‘জাতি’; যেমন ‘পশু-
কৃষ্টির’ মানে ‘পাতি জাতি’—প্রথম-প্রথম
আর্যজাতির পাঁচটি প্রধান শাখা...সম্বন্ধে
এই পশুকৃষ্টির শব্দ প্রযুক্ত হত, পরে সমগ্র
মানবজাতিকে বোঝাবার জন্য এই শব্দের
অর্থ প্রসার ঘটে। ‘চাষ-অর্থেই ‘কৃষ্টি’ শব্দ
পরবর্তী সংস্কৃতে মেলে। Culture অর্থ
নয়। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘কৃষ্টি’ শব্দ
সম্পর্কে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন।

“সংস্কৃতি শব্দ Culture-এর প্রতি-
শব্দ হিসাবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশি
হন।.....‘সংস্কৃতি’ শব্দটি Culture বা

Civilization অর্থ আমি পাই প্রথমে
১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহা-
রান্দীর কথার কাছে। Culture-এর বেশ
ভাল প্রাতিশব্দ বলে শব্দটি আমার মনে
লাগে।.....১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি।
তিনি আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়ে-
ছিলেন কিনা, জানি না—সম্ভবত শব্দটি
তার অবদিত ছিল না। তবে আমার বেশ
মনে আছে Culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে
‘সংস্কৃতি’ শব্দ সম্বন্ধে তিনি তার সম্পূর্ণ
অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, ‘কৃষ্টি’ শব্দ আর
ব্যবহার করা ঠিক হয় না, এ কথাও
বলেন।”.....

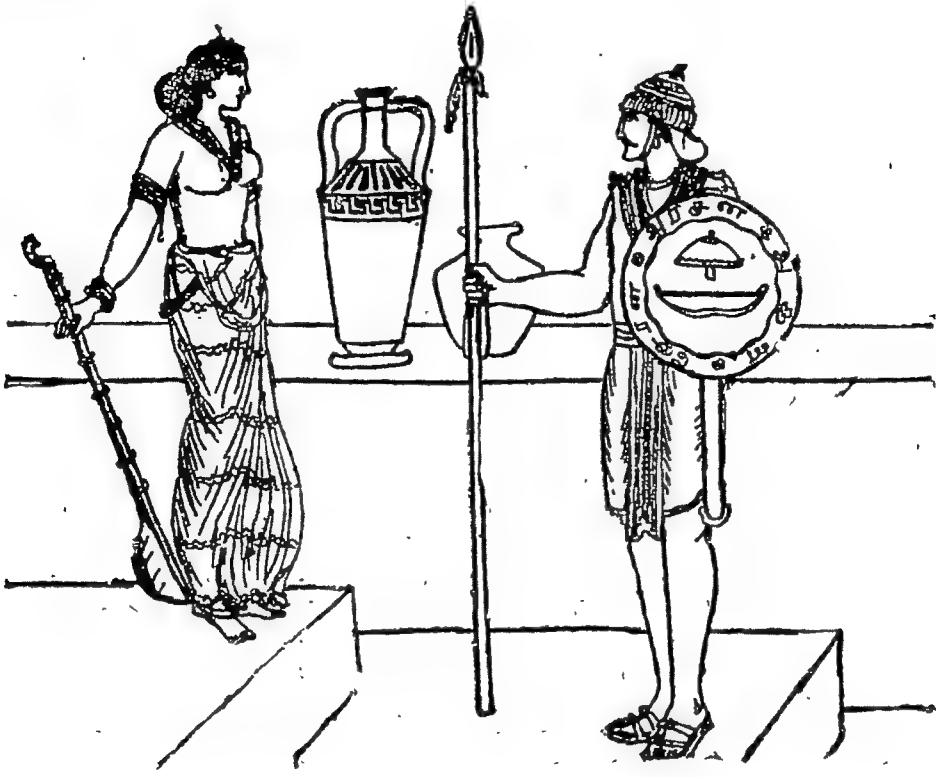
সুনীতিকুমার সম্পর্কে যিনিই কিছু
লিখেছেন, তারই প্রধান কথাটি মানুষ
সুনীতিকুমার সম্পর্কে। পরিচয়ে আলাপে
এই দিকটিই তার বড় হয়ে ওঠে। পাণ্ডিত্য
যাঁ বেশি তিনি উল্লেখভাবের হন, অথবা
মিতব্যাক হন, গম্ভীর প্রকৃতির হন, এই
জাতীয় সব ধারণা সুনীতিকুমার তার
জীবনে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। তাকে
একমাত্র শিক্ষকরূপে চিহ্নিত করাতেও এই
ভুল হয়ে থাকে। কিন্তু আমি তাঁর সাহ-
চর্যে এসে তাঁর সম্পর্কে একটি বড় সত্য
উপলব্ধি করতে পেরেছি এই যে, শিক্ষকতা
তাঁর জীবিকা হলেও মনে-প্রাণে তিনি
ছাত্র, শিক্ষার্থী। তাঁর শিক্ষার বয়স ও কাল
আজও শেষ হয় নি। চোখ ও মন পারি-
পার্শ্বিক সম্পর্কে সদাজাগ্রত। সুনীতি-
কুমারকে লেখা (২৯।৯।১৯) প্রথম
চৌধুরীর একখানা চিঠির একটি কথা
থেকে তাঁর মনোভাব এই দিকটি সম্পর্কে
ভালভাবেই জানা যাবে—প্রথম চৌধুরী
লিখেছেন—“আমরা বলভূম যে সুনীতির
কানে ধরা পড়ে না এমন শব্দ নেই। এখন
দেখছি তোমার চোখে ধরা পড়ে না এমন
জিনিসও কম আছে।”

এটি স্বভাবতই সত্য কথা। সুনীতি-
কুমার ভাষাতাত্ত্বিক। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে
পৃথিবীর অন্যতম প্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। এ
কাজে সকল দেশের মানুষের ভাষার তুলনা-
মূলক রূপ ও তার প্রণীবিভাগ, মূল
ধ্বনিতত্ত্ব ও আনুশঙ্গিক বহু বিষয়ে চরম
জ্ঞান থাকা দরকার। মানুষের ভাষা, মানুষের
সৃষ্টি। জন্মগত অধিকার এতে নেই।
বংশগতি নিয়ন্ত্রণকারী gene ভাষার বাহক
নয়। অতএব ভাষার মূল খুঁজতে গেলে
মানুষ নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য আরও
যে যে উপায় অবলম্বন করেছে, তার সঙ্গেও
পরিচয় থাকলে কোন একটি ভাষাকে তার
স্বার্থ পটভূমিতে এবং পরিপ্রেক্ষিতে দেখা
সম্ভব হয়। মানুষ আত্মপ্রকাশের জন্য
সম্পদীত এবং চিরশিল্পও তার অন্যতম
প্রধান উপায়স্বরূপ জ্ঞান করেছে, বিম্ব-
প্রকৃতিকে নিজ নিজ কল্পনা অনুযায়ী

ব্যাখ্যা করেছে এবং কোনো একটা কাল্পনিক
অদৃশ্য ক্ষমতাকে মান্য করে চলবার রীতি
প্রচলন করেছে। এইসব আত্মপ্রকাশের
উপায় ও তার সঙ্গে আত্মরক্ষার উপায়ও
তার নিজস্ব উদ্ভাবন। গৃহ নির্মাণ,
সমাজ বা গোষ্ঠী গঠন প্রভৃতি এর আওতার
পড়ে। মোটের উপর এ সবই তার আত্ম-
প্রকাশেরই একটি জটিল রূপ, এবং সব
মিলিয়ে যা হয় তাই তার সামাজিক সাম-
গ্রিক সংস্কৃতির রূপ। ভাষাও সংস্কৃতির
প্রধান অঙ্গ। অতএব শব্দ ভাষার ইতি-
হাস জানতে আনুশঙ্গিক বহু জিনিস
জানা দরকার। এই জানা in depth পরি-
মাপ করতে হলে সংস্কৃতির সকল বিভাগের
সঙ্গে কতখানি পরিচয় এ প্রশ্ন এসে পড়ে।
অতএব সুনীতিকুমার যে শিল্পের নানা
বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে-
ছেন, (এবং স্বয়ং উচ্চাঙ্গের চিত্রশিল্পী
হওয়াতে এই জ্ঞানলাভ তাঁর পক্ষে সহজ
হয়েছে) তা অস্বাভাবিক নয়। সবচেয়ে বড়
কথা তিনি সমাজের আদি ও ঐতিহাসিক
যুগের নানা শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়ে-
ছেন আপন রুচির গরজে, ভাষাতত্ত্বকে
গভীরভাবে আত্মস্থ করার গরজে এবং
শিল্পকে ভালবাসেন বলে। তাঁর নানা
জাতীয় শিল্পনমুনার সংগ্রহ দেখলেই সে
বিষয়ে অনেকটা ধারণা হবে। তিনি নানা
দেশে ভ্রমণ করে সংস্কৃতির ঐতিহাসিক (প্রী-
ডাইমেনশন্যাল) রূপ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ
পেয়েছেন।

১৯৬২ সালের (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯) ‘কথা-
সাহিত্য’ নামক মাসিক, বিশেষ সুনীতি-
কুমার সংবর্ধনা সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়।
এই সংখ্যায় আমি সুনীতিকুমারের নিজ-
হাতে আঁকা কয়েকখানি ছবি সহ তাঁর
শিল্পকৃতির দিক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ
লিখেছিলাম। কিন্তু চিত্রগঠন তিনি ভাষার
সাহায্যেও যে কত সুন্দরভাবে করতে
পারেন, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে তাঁর
‘পথ চলতি’ (গ্রন্থপ্রকাশ) নামক বইয়ের
নানা রচনায়, বিশেষ করে তাঁর শৈশব-
স্মৃতি বর্ণনার মধ্যে। একটুখানি পড়লেই
এর চিত্রধর্মিতার আকর্ষণ মনকে বিরাম-
হীনভাবে টেনে নিয়ে যাবে শেষ কথাটি
পর্যন্ত। তবে সবখানি পাঠের আনন্দ
থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করে আমাকে
নমুনাস্বরূপ অল্প একটুখানিই এখানে
উদ্ধৃত করতে হল—

.....“আমাদের পাঠশালার ভাষার পক্ষে
সুঁকিয়াস শব্দটির উপরে একটা মন্ত মৃদুর
দোকান ছিল। আমাদের সংসারের “মাস-
কাবারী বাজার”, প্রতি ইংরিজি মাসের
গোড়ায় বাবা মাইনে পাবার দৃ—একদিনের
মধ্যেই আনা হ’ত। ঠাকুরদাদা সাধারণতঃ
এই বাজার করে আনতেন। হেঁদুয়া
পুঁদুয়ের কাছে মাণিকতলা শব্দটি এক



সুনীতিকুমার জন্মকৃত একটি রেশাচিত্র

বড়ো বাজার ছিল—শিমলার বাজার। সেই বাজারের সামনে খুব বড়ো একখানা গোলদারী দোকান ছিল, 'গোবর্ধন পাল আর প্রীনগেন্দ্রনাথ' সে—এঁদের দোকান ছিল। ঠাকুরদাদা এই দোকানকে "গোবর্ধন মদুদী"—র দোকান বলতেন। সারা মাসের উপযোগী চাল, দাল, তেল, ঘণী, গুড়, চিনি, নুন, আটা, ময়দা আর মশলা সংগ্রহ করে রাখা হ'ত। একটু বড় হ'য়ে ঠাকুরদাদার সঙ্গে এই দোকানে আমিও যেতুম। সেখানে বিরাট বিরাট কুতার মধ্যে মন মন রকমারী চাল, সে-রকম বিরাট আকারের জ্বালার আর গামলার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের দাল, মাটির মটকীর মধ্যে আর ছোট ছোট টিনের মধ্যে ঘণী, ঘরের অর্ধেকখানা জোড়া গুড়ের নাগাড়ি, সিমেন্টের চৌবাচ্চা ভরতি নুন, এ-সমস্ত আমার শিশু-মনকে তখন যেন অভিভূত করে ফেলত। ক্রমাগত নানান রকমের জিনিস, কাঁচা খাদ্যদ্রব্য, বড়ো বড়ো দাঁড়িপাল্লায় ওজন হ'চ্ছে; খুন্দেদের ভীড়; একটি ছোটো বাজ কোলের সামনে রেখে দোকানের মালিকেরা লম্বা লম্বা কাগজের ফালির উপর খসখস করে ফর্দ লিখছেন, মুখে-মুখে হিসেব করে টাকার অঙ্ক ফেলছেন; বাইরে কাঁকা নিয়ে ওজনখানেক পশ্চিমা মটো অপেক্ষা করছে, ভিতরে এসে মাল ওজন করছে, এরাই জিনিস-পত্র

কাকার ভরে মাথার ক'রে খুন্দেদের বাড়ি পৌঁছে দেবে।"

আর এক স্থান থেকে অন্য দোকানের কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করি—

"দোকানের চারিদিকে নানা ধামার মধ্যে, মাটির গামলায় আর হাঁড়িতে চাল, দাল প্রভৃতি জিনিস রেখে, সামনে তেলের আর ঘণীর হাঁড়ি নিয়ে, বাঁশের উঁচু মাচার উপরে পসার সাজিয়ে দোকানী ব'সে জিনিস বিক্রি করত। খুন্দেদের বাটিতে বা অন্য পাত্রে একটি ছোট ছেঁদাওয়ালা কাঠের খুরির মতন পাত্রে মধ্য দিয়ে বাঁশের হাতাওয়ালা নারকল মালায় ক'রে হাঁড়ি থেকে তেল নিষে ঢালত—এ কাঠের ছেঁদা-খুরিটি ফুন্দিলের কাজ করত, তেল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত না। মদুদীর সামনেই একটা মাটির গামলার এক গামলা কড়ি থাকত, আর সেই কড়ির গামলার উপর একটি কাঠের বারকোশ। সেই বারকোশটি ছিল তখনকার দিনের দোকানের Counter; তার উপর জিনিস-পত্র রাখা হ'ত—খুন্দেদের বাটি, ঘটি, বোতল আর ওজন-কবা জিনিসের ঠোঙা।.....উত্তম-মদুদীর দোকানে বারকোশ-কাউন্টারের সামনে মাচার উপরে একটি ছোট কাঠের চৌকির উপরে দোকানদার ব'সত। তার পাশে, মাথায় ছেঁদাওয়ালা একটা বাজ থাকত, তার ভিতর

টাকা-পয়সা ফেলত। দূরের গামলা বা ধামা থেকে কোনো জিনিস নিতে হ'লে, খুব লম্বা, বাঁশের হাতলে বড়ো মালা লাগানো থাকত, তাই দিয়ে জিনিস তুলে নিত'। একটা জিনিস আমার বেশ লাগত, উপবেব চালের বাঁশ থেকে একটা মোটা শক্ত দোড়ি মদুদীর মাথার কাছে ঝুলত, তাব তলায় কতগুলো ন্যাকড়া দিয়ে মুর্তো ক'বে বেশ একটা ধরবার জায়গা, যাতে হাত পিছলে না যায়। উঠে দাঁড়াতে হ'লে মদুদী ঐ দোড়ি ধরে উঠত, আর দূরেব জিনিস হ'লে দোড়ি ধরে ঝুঁকে নিত।"...

সুন্দর এই বর্ণনাগুলি, পড়তে বসলে সেকালের এক একটি দোকান ঘব, তার বিক্রেতা, ক্রেতা ও বিক্রেয় জিনিসপত্র সহ ছবির মতো ফুটে ওঠে চোখেব সামনে। সুনীতিকুমার নিজে উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর, তাই ভাষায় ছবি আঁকা এমন সহজ তার কাছে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার পরে এমন সুন্দর ছেলেবেলা আর আমি পড়ি নি।

প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে উল্লিখিত চিঠির কথাটিই আবার এখানে স্মরণ করি—"তোমার চোখে ধবা পড়ে না এমন জিনিসও কম আছে।" ১৯১৯ সালের লেখা এই চিঠি, ১৯৫১ সালে লেখা এই শৈশবস্মৃতি। তখন তিনি বলেছিলেন,

সুনীতিকুমারের শিরোবাসী দুটি চোখের দেখার কথা, আর এই ‘স্মৃতি’তে দেখা যাবে তাঁর মনোবাসী দুটি চোখের দেখার কথা। দুটি দেখাই সমান চিত্রশর্মা।

এসব ছবি আমার নিজের কাছে আরও বেশি ভাল লেগেছে এ জন্য যে, আমিও শৈশবে দূর পল্লীতে প্রায় এই রকমই দেখেছি। তার বর্ণনা দিলেও প্রায় এই রকমই হবে। তবে সুনীতিকুমার তাঁর বাল্যকালে কাঁড়ির প্রচলন দেখেছেন, আমি তা দেখি নি। ১৯১০ সালে প্রথম কলকাতা আসি। অল্পদিনের জন্য, এবং তারপরে বহুবার এসেছি এবং বড় রাস্তার উপরেই এ জাতীয় মোকান অনেক দেখেছি, সম্ভবত এখনও বাজার এলাকার ভিতরে ঢুকলে এ জিনিস দেখা যাবে। তবে আমি তেলের জন্য দোকানে ব্যবহৃত তালের মালায় বাঁশের হাতল লাগানো হাতা দেখেছি পল্লী গ্রামে। নারকল মালায় হাতা দেখি নি।

এই বইতে “হেড-পাণ্ডিত মশায়” নামক স্মৃতি অধ্যায়ের এক স্থানে আছে—“বাঙলা ব্যাকরণের পাট আমাদের এই হাই স্কুলে ছিল না।” অথচ এই ছাত্রই পরে বাংলা ব্যাকরণের সর্বপ্রধান পণ্ডিত রূপে বাংলাদেশে এবং ভাষাতাত্ত্বিকরূপে পৃথিবীব্যাপ্ত হয়েছেন। এমন হয় সংসারে। ভাগ্য-দেবতা বড়ই পরিহাস-প্রিয়।

সুনীতিকুমার আমার চেয়ে প্রায় আট বছরের বড়, আমি তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পাই নি, কিন্তু তিনি নিজেই তৈরি একটি সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। এবং তাঁর কাছে বসে তাঁর মধ্যে আরও অনেক বড় জিনিস দেখেছি। নানা উপলক্ষে তাঁর কাছে এসেছি। তাঁর স্টিকারাস রো-এর বাড়িতেও গিয়েছি এবং নতুন বাড়ি ‘সুধার্মা’র প্রবেশের কিছুদিনের মধ্যেই, মনে পড়ে, নিমন্ত্রণ খেয়েছি। শিশির-কুমার ভাদুড়িও সোঁদিন ভোজন-পাণ্ডিতে ছিলেন, মনে আছে। শনিবারের চিঠির সম্পাদনাকালে (১৯৩২ থেকে ১৯৩৬-এর কয়েক মাস) প্রথমে তাঁর সামিথো আসি। আমার একটি রচনা শনিবারের চিঠিতে ছাপা হবার জন্য তৈরি হয়েছিল, তার প্রকৃতি তাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। কিন্তু তার বিষয়টি এমনই সাময়িক ছিল যে, তাঁর নিজ উদ্যোগই হয়ে সেটাকে প্রকাশদ্বারা পরিচাল্য পাঠিয়ে দিলেন। তখন “শ্রী” কথাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীল-প্রকাশ্য বিরুদ্ধে এক প্রোগ্রাম মসলমান আন্দোলন করছিলেন। এই আন্দোলন হয়ে বুদ্ধিহীন, তাই নিজেই আমার সে রচনাটি তৈরি হয়েছিল। কিছু কঠিন মর্মে ছিল ঐ রচনায়। এবং এটি যে তাঁর

ভাল লেগেছিল তাইতে আমি তখন যথেষ্ট পদরক্ষিত হয়েছিলাম।

শনিবারের চিঠির আশ্রয় এবং ধর্মতলা স্ট্রীটে বঙ্গাশ্রী মাসিকের আশ্রয়—দুইয়েতেই সুনীতিকুমারের আবির্ভাব সবার পক্ষেই আনন্দদায়ক ছিল। পূর্বে উল্লিখিত সংবর্ধনা সংখ্যায় আমি সুনীতিকুমারের চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও যে কথা বলেছি তা এই—

...“আর দেখেছি রসনাবিলাস। সে রসনা যেমন প্রিয় বাক্যে বিলাসী তেমনি প্রিয় খাদ্যে। বঙ্গাশ্রীর চৌকলে খবরের কাগজে পরিবেশিত মৃড়ি বেগুনি পেন্সিলের পাহাড়ের দিকে সবার সঙ্গে গণতান্ত্রিক দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করতে তাঁর কৌশল অন্যান্যের চেয়ে কিছু কম ছিল না। নীরস পাণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্য ভিন্ন অন্য কিছুতে খুব মাততে পারেন না।” (উদ্ধৃতি শেষ)

শিল্পের সকল বিভাগেই সুনীতিকুমারের সমান আকর্ষণ। রম্মনশিল্পেও তাঁর আকর্ষণ, অবশ্য ভোক্তারূপে। এবং এ শিল্প মানুষের সমাজে সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকৃত।

বারট্রান্ড রাসেল তাঁর একটি রচনায় বলেছিলেন, কোনো জিনিসের সম্পর্ক তথ্য জানা থাকলে সেই জিনিস বেশি উপভোগ করা যায়। এ তথ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য হতে পারে, ঐতিহাসিক তথ্য হতে পারে, ভৌগোলিক তথ্য হতে পারে এবং আরও অনেক রকম হতে পারে। কিন্তু কোনো জিনিস উপভোগে তার সম্পর্কিত তথ্য জানা আর না জানার মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা বোঝা বা বোঝানো শক্ত।

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর “এ প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড” পড়তে গিয়ে পদে পদে এ কথা অনুভব করছি যে, তিনি বিমানে উড়ে যেতে বইতে পড়া জ্ঞান থেকে রোমের বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সৌধ বা সৌধবলয়ও আকাশ থেকে নিঃসন্দেহরূপে চিনতে পেরে খুব খুশি হইয়াছিলেন। সমস্ত বই-খানাই এই পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে প্রথম দর্শন মিলিয়ে দেখে বেশি আনন্দ পাওয়ার ইতিহাস। বারট্রান্ড রাসেলের উক্তি সত্য মনে হবে নীরদবাবুর দৃষ্টান্ত থেকে।

তেমনি সুনীতিকুমার যখনই কোনো বিদেশী ভাষা শোনেন বা পড়েন, বা প্রথম কোনো দেশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন, তখন এ সবের পটভূমির ইতিহাসটা অবশ্যই তাঁর মনে জেগে ওঠে, এবং বাইরে থেকে সাধারণ মানুষের দেখা বা জানায় যে আনন্দ জাগা সম্ভব, নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পান। তবে সব জিনিস উপভোগেব মুহূর্তে তার ইতিহাস মনে পড়া কি অত্যাৱশ্যক? কারণ, আশ্রয় মৃড়ি উপ-

ভোগের সময় বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্বজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সুনীতিকুমার যে আমাদের অপেক্ষা তা বেশি উপভোগ করেছিলেন তা বোধ হয় না। প্রতিদিনের পরিচয়ে কোনো জিনিসের পটভূমি অবান্তর হয়ে ওঠে সম্ভবতঃ।

কিন্তু তত্ত্বকথা থাক। আমি ‘ভাল-বাসা’ বিষয়ে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। রবীন্দ্রনাথ যৌবন বয়সে একটি গান রচনা করেছিলেন—ভালবাসায় বিভ্রান্ত এক সখী আর এক সখীকে ভালবাসা কাকে বলে জিজ্ঞাসা করছেন, এই হল সেই গানের মূল কথা। প্রথম কয়েকটি কথা এই—

সখী, ভাবনা কাহারে বলে।

সখী, যাতনা কাহারে বলে।

তোমরা যে বল’ দিবস-রজনী

‘ভালোবাসা’ ‘ভালোবাসা’—

সখী, ভালোবাসা কারে কর!

সে কি কেবলি যাতনাময়।

তাহে কেবলি চোখের জল?...

ইত্যাদি

এই গায়িকা-সখী আগের যুগের, তাই তিনি সুনীতিকুমারের “সংস্কৃতিকারী” নামক গ্রন্থপাঠের সুযোগ পান নি। কারণ এই বই ছাপা হয়েছে ১৯৬১ সালে। এই “সংস্কৃতিকারী”র প্রথম প্রবন্ধটি যদি তাঁর পড়া থাকত তা হলে “ভালোবাসা কারে কর” তা তিনি বিশদভাবেই জানতে পারতেন। এবং যুক্তিতে পারতেন ভালবাসা কেবলই যাতনাময় নয়, সখী সখীকে ভাল বুদ্ধিয়েছেন। কারণ ভালবাসার ইতিহাস সহজেই তিনি আরম্ভ করতে পারতেন, বিনা অশ্রুতে, বিনা যাতনায়। ভালবাসা Without tears!

“ভালোবাসা কারে কর”—তার উত্তর ভাবাত্তর তরফ থেকে সুনীতিকুমার এইভাবে দিচ্ছেন—

“ইংরিজি love-এর প্রতিশব্দ এখন যা বাঙলায় জোরের সঙ্গে চলছে, সেটা হচ্ছে ‘ভালোবাসা’। ইংরিজিতে খুবই বাচস্প্যমতা আছে, ওদের ভাষায় ‘লাভ’ এই একটি ‘সিলেবল’ বা অক্ষরের দ্বারা প্রকাশিত ভাবটিকে বাঙলায় জানাতে হলে কিন্তু চারটি অক্ষর ‘ভা-লো-বা-সা’-র দরকার হয়। কিন্তু ‘ভালোবাসা’ শব্দটি (বা মিলিত শব্দ দুইটি), দু-শ বছর আগে বাঙলা ভাষায় ‘লাভ’ এই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হত না। তখন ‘ভালো-বাসা’-র অর্থ, শ্রম বা কেবল প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, প্রীতি, প্রভৃতি ছিল না;—‘ভালোবাসা’ এই মিলিত শব্দটি কতকটা যেন বর্ণ-বা রাগ-হীন নিঃপ্রাণ শব্দ ছিল। এর অর্থ ছিল তখন, ‘ভালো বলে অনুভব করা,

ভালো মনে-করা? 'ভালো-বাসা' শব্দের 'বাসা' বা বাস্ ধাতু, 'বোধ করা' অর্থে প্রযুক্ত হ'ত—এখন এই অর্থে ধাতুটি অপচলিত হ'য়ে যাচ্ছে। 'ভালোবাসা'-র পাশাপাশি 'মন্দ-বাসা' শব্দটিও মাঝে মাঝে শোনা যায়; কিন্তু প্রাচীন বাংলাতে 'বাস্' ধাতু বেশ জীবিত ধাতু। এই ধাতুর সহযোগে 'ভালো-বাসা', 'মন্দ-বাসা'-র মতন পুরাতন বাংলায় 'ভয়-বাসা', 'দুঃখ-বাসা', 'লজ্জা-বাসা', 'দুঃখ-বাসা' প্রভৃতির প্রয়োগ খুবই মেলে।... খ্রীস্টীয় ১৮-র শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার ভাওয়ালে বসে পোতুগীস পাদ্রি বা সাধু-সাবা মানোএল দা-আস্-সুন্দুপসাঁউ' তাঁর যে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' বই লেখেন, আর যে বই রোমান অক্ষরে লিখবেন ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে ছাপান, তাতে কিন্তু 'ভালোবাসা' অর্থে 'দয়া করা' প্রযুক্ত হয়েছে, অন্য শব্দ নয়; বীশু মানুসের প্রতি দয়া করেন, আর 'মাউগ' আর 'ভাতার'ও পরস্পরের প্রতি দয়া করে।' রবীন্দ্রনাথের গানের সখী শব্দ এই-টুকু পড়লেই তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যেতেন। 'ভালোবাসা' কারে কর' কোনো এক যুগে এর অর্থ শেষ হয় নি; যুগে যুগে এর ব্যবহারিক অর্থের বদল ঘটেছে। উক্ত সখীর প্রশ্ন যদি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি বিষয়ক হয়, তবে তার জন্য ফ্রয়েডের কাছে যাওয়া প্রয়োজন।)

সুদনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্ব ভরানক কিছদ নয়। এই একটি শব্দের সঙ্গে যে ইতিহাস জড়িয়ে আছে, তা অন্য যে-কোনো কাহিনীর চেয়ে কি কম চিত্তাকর্ষক?

সুদনীতিকুমারের শিল্পবোধের উন্মেষ প্রথম জীবন থেকেই লক্ষ করা যায়। সংবৎসর সংখ্যা কথাসাহিত্যের প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে তাঁকেই প্রাথমিকরূপে দাঁড় করিয়েছি। তা থেকে একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করি—

...“পদলিবিহারী সেন সম্পাদিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অভ ওরিয়েন্টাল আর্ট কর্তৃক প্রকাশিত মুখপত্রের বিশেষ গোলাডেন জর্জবিলী সংখ্যাটি অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা করা হয়েছে। এই সংখ্যায় সুদনীতি-বাবুর একটি দীর্ঘ (ইংরেজী) রচনা আছে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে।... তিনি বলছেন, তাঁর বয়স যখন ১০ বছর তখনই তিনি অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে চমকিত হন। কথ্যটি ইংগিতপূর্ণ। জন-সাধারণ যখন আর্টের বিচারক সেজে অবনীন্দ্রনাথকে ভিত্তি সমালোচনায় জর্জর করছে, সে সময় বাসক সুদনীতিকুমার অবনীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়েছেন। তিনি আরও বলছেন—From very child-

hood I had formed a very great love for pictures. I used to collect all sorts of pictures, and particularly what attracted me most was pictures of soldiers in various kinds of uniform from different countries, and illustrations of great historical events, or of romantic stories.” (উদ্ধৃতি শেষ)

তাঁর শিল্পপ্রিয়তার ইতিহাস আছে এই কথাগুলোই মধ্যে। কিন্তু ছবি আঁকার বিদ্যাটি তিনি নিজেই আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি যখন স্কটিশ চার্চ কলেজে ইন্টার-মিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র (১৯০৮) তখন স্মিথের গ্রীস ইতিহাস তাঁদের পাঠ্য ছিল। এই বইতে গ্রীকদের ছবি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, এবং তাঁর আঁকা ছবিতেও যে গ্রীক প্রভাব লক্ষ করা যায় তা এ জন্যই। (কিন্তু চিত্রশিল্প মাঝেই যার কাছে গ্রীক, তিনি এই গ্রীক প্রভাব না বুঝলেও ছবির সৌন্দর্য উপভোগে অসুবিধা বোধ করবেন না।)

সুদনীতিকুমারের এই নানা দেশীয় ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদের ছবি ভালবাসা একবার খুব কাজে লেগে গিয়েছিল কলেজে পড়বার সময়েই। শিশিরকুমার ভাদুড়ি তখন (১৯০৮) তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এবং সুদনীতিকুমার ইন্টার-মিডিয়েটের। কলেজ থেকে জুলিয়াস সীজার অভিনয় হবে। খিষোটোরের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-পোশাক তখন ভাড়া পাওয়া যেত গ্র্যান্ড হোটেলের নিচের একটি দোকানে। একজন উদ্যোগী ব্যক্তি সেখান থেকে পোশাক এনে দেবেন ভার নিলেন, এবং তার জন্য ১০০ টাকা অগ্রিম নিয়ে নিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তেও যখন পোশাক এলো না, তখন ষোল্জ নিয়ে দেখা গেল, সাজ-পোশাকের দোকানে ঐ টাকা জমা পড়ে নি, লোকটি নিখোঁজ। এবং আরও জানা গেল ঐ দোকান দেশী লোকদের কাছে কোনো পোশাক ভাড়া দেয় না।

সুদনীতিকুমার বললেন, কিছদ ভাবনা নেই, আমরাই পোশাকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তিনি তখনই আনন্দ সিংহ ও নীহার বসু নামক দুই কলেজ বন্ধুর সহযোগিতায় কাজচলা গোছ পোশাক তৈরি করে জুলিয়াস সীজার অভিনয়ের সফল ব্যবস্থা করে দিলেন। এই নাটকে শিশিরকুমার রুটাসের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। এই সময় থেকেই শিশিরকুমারের সঙ্গে তিনি স্থায়ী সখ্যসুদ্রে আবদ্ধ হন। এবং পরে ইনস্টিটিউটে চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়েও তিনি গ্রীক সৈন্যদের

পোশাক রচনায় সাহায্য করেছিলেন। ‘সংস্কৃতিকী’ নামক গ্রন্থখানি তিনি ‘অভিনয় হৃদয় সুহৃৎ ও সৌদর্যোপকরণ সতীর্থ স্মরণে’ শিশিরকুমার ভাদুড়ির নামে উৎসর্গ করেছেন।

শিশিরকুমারের নাট্যরূপ পরি-কল্পনায় সুদনীতিকুমার নেপথ্য থেকে অনেক সাহায্য করেছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর ‘বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ‘লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শিশিরকুমার তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সকলেই এসেছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে থেকে অভিনেতাদের সম্বন্ধে ঐ কথাই বলতেন। আড়ালে আড়ালে থেকে তাঁকে সাহায্য করতেন আরো কয়েকজন বন্ধু। বৈমল প্রহরাত্তিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত সুদনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।’

আমার সঙ্গে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত সুদনীতিকুমারের সান্নিধ্য অব্যাহত ছিল, কিন্তু তারপর তিন চার বছর মাঝে মাঝে দেখা হলেও বৈঠক কোথাও ছিল না। ১৯৪০ সাল থেকে কয়েক বছর (সম্ভবত তিন বছর) আমি ম্যাট্রিকুলেশন বাংলা বিশ্বতীয় পত্রের পরীক্ষকরূপে প্রধান পরীক্ষক সুদনীতিকুমারের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পাই। পূর্ববর্ণিত সাহিত্যিক আভার অনুকল্প আভা বলা যায় একে। এখানেও বন্ধুদের মিলন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অজয় ভট্টাচার্য, প্রমথ বিশী, মনোজ বসু প্রভৃতি। কুলদারজন রায়ও ছিলেন এই বিশ্বতীয় পত্রের পরীক্ষক। বহু পরীক্ষকের ভিড়, তাঁরা তো খাতা বুদ্ধিবে দিয়ে চলে যেতেন, খাতা দিতে গিয়ে অন্যের খাতা গুলে নিতে হত। হিসাব মিললে সুদনীতিকুমার রসিদ দিয়ে দিতেন। পর বৎসর থেকে উপরন্তু স্ক্রুটিনির কাজও জটিল। অন্য পরীক্ষকের খাতা পরীক্ষা করে দেখতে হত মার্ক দেওয়া যথাযথ হয়েছে কি না, টোট্যাল ঠিক হয়েছে কি না, কোনো প্রশ্নের দু'বাব উত্তর লিখলে তার ধরা পড়েছে কি না, অথবা কোনো উত্তরের পাশে মার্ক দিতে ভুল হয়েছে কি না। স্ক্রুটিনাইজারের এই ছিল কাজ। দিনে তিন চার শ থেকে সাত আট শ পর্যন্ত খাতা কেউ কেউ এভাবে পদে পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন। আমি বেশি পাবতাম না। এই স্ক্রুটিনির কাজেও কেউ কেউ ভুল করে বসতেন। একবার একজন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁর কোনো আত্মীয়ের মার্ক জানবার জন্য রোল নম্বর সহ লোক পাঠিয়েছিলেন। এই অনুরোধে সুদনীতিকুমারকে

বেশ একটু বিরক্ত বোধ করতে দেখেছি তখন।

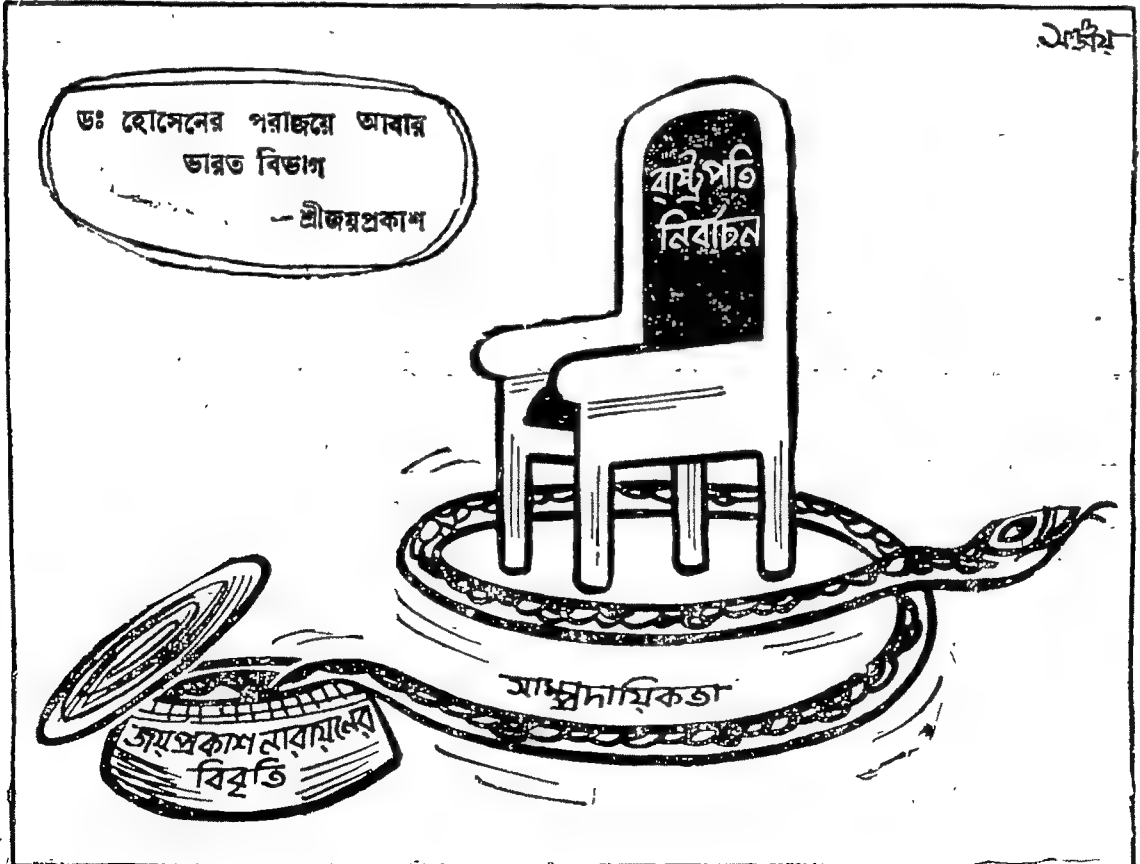
কিন্তু সেই বিশেষ রোল নম্বরের খাতা বার করে এক নতুন জিনিস আবিষ্কার হল। অর্থাৎ মূল পরীক্ষক একটি উত্তরে মার্ক দিতে ভুলে গেছেন, এবং যিনি স্ক্রুটিং করছিলেন তিনিও তা ধরেন নি, ব্যাপারটা তাই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কম নয়, মোট ১০ মার্ক বাদ পড়েছে! অতএব একই সঙ্গে দুটি বিপত্তি। স্ক্রুটিং হয়ে গেছে এমন খাতা থেকে এ জাতীয় ভুল, স্ক্রুটিনাইজারের পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু অপেক্ষিত বিপদ ঘটল না। সুনীতিকুমারের উদারতা স্ক্রুটিনাইজারকে বাঁচিয়ে দিল। পরীক্ষকের ভুল খরা পড়লে তা তালিকাভুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার নিয়ম। কিন্তু সুনীতিকুমার কোনো পরীক্ষককে সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে পারে এমন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে পারতেন না। তাঁর স্নেহশীল উদার মন কোনোরকমেই পরীক্ষকদের ক্ষতি হবে এমন কাজ করতে

পারত না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষার খাতা দেখা সম্পর্কে একটু বেশি অসন্তুষ্ট ছিলেন। সুনীতিকুমার তা জানতেন, কিন্তু তবু প্রতিবারই তিনি তাঁকে বন্ধুর মতোই গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে আমি সুনীতিকুমারের নিজেরই উক্তি উদ্ধৃত করেছি। এই পর্যায়ে “বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়” নামক রচনা। কয়েক বছর পরে অন্য প্রধান পরীক্ষকের কাছে কাজ করতে সেই পরীক্ষকের কড়াফড়ি মেজাজ দেখে বিভূতিভূষণ খাতার দুটি-বিচ্ছুরিত আমি নিজেই, তাঁর খাতা পরীক্ষার সময়, সংশোধন কবে দিয়েছি একবার। কিন্তু পবে অন্যের হাতে পড়তে তা আর সম্ভব হয় নি, তাঁর পরীক্ষকবৃত্তিবণ্ড হেঁদ পড়ে গেল তখন থেকে।

সুধর্মার নিচের একটি প্রশস্ত ঘবে পর্বতপ্রমাণ পরীক্ষার খাতার উচ্চ বাণিজ্যগল্লোর পরিবেশে গ্রীষ্মকালের তপ্ত দিনে আমাদের মধ্যে সুনীতিকুমারের আবির্ভাব একটা স্মৃতিস্তম্ভ হাওয়া বইয়ে দিত। আমরা ভুলে যেতাম

আমাদের হিসাবী কর্তব্য, তিনি নিজেই ভুলিয়ে দিতেন। নানা প্রসঙ্গে আলাপ শুরু করে তিনি পরীক্ষকদের নিয়ে মজলিশ জমাতেন। এগনি একটা দিনে তাঁর কোনো বেদনাময় স্মৃতিমূলক কাহিনী বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসজ্জল হতে দেখেছি। সে এক আশ্চর্য বিয়োগান্ত পরিণতির গল্প। কিন্তু সে প্রসঙ্গে থাক।

যিনি অনেক বেশি জানেন, নিজের বিদ্যা সম্পর্কে যার আত্মবিশ্বাস প্রকৃত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁর পক্ষে অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবার কোনো হেতুই নেই। তাই তাঁর পক্ষে উদার এবং পরম ক্ষমাশীল হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। তাই সুনীতিকুমারকে আপন বিদ্যার অহংকার নিয়ে কোনো প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে কখনো দেখি নি। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যে বিস্ময় সৃষ্টি কবেন, কিন্তু সুমার্জিত সংস্কৃতি ও উদার প্রতিভার স্মারা সবাইকে সমানভাবে আকর্ষণ করেন।





শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে ডঃ জাকির হোসেন ও শ্রীসদ্বা রাও

রাজনৈতিক-উন্মাদ বিপজ্জনক

আগামী ৬ই মে চতুর্থ নির্বাচনোত্তর ভারতে বিশেষ ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। একাধিক প্রার্থীর মধ্যে যে দুই ব্যক্তির অন্যতম ভারতের রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন, ভারতবাসীর চক্ষে তারা উভয়েই জ্ঞানীগুণী ও প্রশ্বেদ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কিন্তু রাজনীতিতে এই ব্যক্তির সঙ্গে অধিকতর ভাবে আর যে প্রশ্নটি জড়িয়ে থাকে, তা হল মতাদর্শ। অর্থাৎ গণতন্ত্রে ব্যক্তির উদ্বেগ ও যা বিবেচ্য, তা হল মতাদর্শ। কেন না গণতান্ত্রিক দেশ ব্যক্তির স্বাধীনতা পরিচালিত হয় না, হয় দলগত মতাদর্শের স্বাধীনতা। ব্যক্তির ভালোমন্দ অপেক্ষা দলের ভালোমন্দ নীতি। ব্যক্তির বর্ণ বা সম্প্রদায় অপেক্ষা দলের বর্ণ ও নীতিই বিবেচ্য।

তাই ডঃ জাকির হোসেন কিম্বা প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীসদ্বা রাও-এর চেয়ে বড় প্রশ্ন আজ কংগ্রেস নাকি অ-কংগ্রেসী। শেষোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতেই ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন নতুনভাবে। নতুনভাবেই, কারণ এতাবৎকাল রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে লড়াই হয় নি। আর কেন হয় নি? না, ঐ শেষোক্ত প্রশ্ন পূর্বাচ্ছেই সমাধান করা ছিল। দল ছিল সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ। কংগ্রেসের প্রার্থীই নির্বাচনে অবধারিতভাবে তরে গেছেন। শ্রীমান শ্যাম বদ্র, মধু হলেও তরৈই যেতেন।

তবু কংগ্রেসী নীতির সঙ্গে বিভেদটুকু লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্যই বিপক্ষ দল কংগ্রেসী প্রার্থীর বিপরীতে প্রার্থী রেখেছিলেন। স্বর্গত রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারেন নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন আমরণ কংগ্রেসসেবী। দলের ও মতাদর্শের প্রশ্নেই সুতরাং অকংগ্রেসীদের পক্ষে তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করতে হয়েছিল। অথচ তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থীও রাখা হয় নি। কেন না তিনি কংগ্রেসী টিকেট পেলেও ছিলেন নির্দলীয় মানুষ। ব্যক্তির প্রশ্ন এখানে ছিল একমাত্র উজ্জ্বল বিবেচ্য বিষয়।

বর্তমানে দেশের পুরো রাজনৈতিক চিত্রটাই বেবাক বদলে গেছে। ভারতবাসী অভূতপূর্ব অনীহার সঙ্গে কংগ্রেসী নীতিকে ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কংগ্রেসের একচ্ছত্র সুখের প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, বড় আদরের সাজানো বাগানটি শুকিয়ে মড়িয়ে গেছে। জনগণের রায়ে এখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অধিকারী কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যগণ এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোট ফলের হিসাবে অকংগ্রেসী ভোটেরই সংখ্যাধিক্য। বিরোধী রাজ্য সদস্যগণ অর্থাৎ এম এল এ-রা সংখ্যায় কংগ্রেসের চেয়ে প্রায় ৬৭টি বেশি আসনের অধিকারী। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কাজে কাজেই এবার কংগ্রেস ও অকংগ্রেসীদের লড়াইটা একটা দ্রুততা বিষয় হয়ে উঠেছে।

অর্থাৎ এইবারই প্রথম দুটি দল মতাদর্শে লড়াই-এ নামছেন দু'দিকেই লড়িয়ের ক্ষমতা নিয়ে যা ইতিপূর্বে অকংগ্রেসীদের ছিল না।

বিনা যুদ্ধে রাজ্যলাভ করে এসে কংগ্রেস এমন এক স্বভাবের বশবর্তী হয়ে পড়ে যে, এবার নির্বাচনের ফলাফলে তার চক্কু স্থির হয়ে গেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে সুস্থ জয়-পরাজয়ের নিয়মটা ভারতের মাটিতে লোপাট হয়ে ছিল বন্দিন, কংগ্রেস ছিল পরম নিশ্চিন্তের মসনদে আরামের তথ্যে নবাবীরাণা বিচ্ছিন্ন।

চতুর্থ নির্বাচনের নির্দেশ, নবাবী-রাণার দফা কাবার করে দেওয়া হয়েছে। এবার খেটে খাও। অর্থাৎ এবার থেকে কাজ দেখিয়ে তবে তথ্যাদিকারী হতে হবে, গান্ধীটুপি পরে নয় (আজ, কী কুক্ষেণে কংগ্রেসী নেতারা টুপি বজরন করেছিলেন!)

জনগণের কাছ থেকে এমনভাবে খেটে খাওয়ার নির্দেশ প্রেরিত হওয়ায়, অকংগ্রেসীরা সেই নির্দেশ আপ্রাণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বন্ধপরিকর। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমেও কংগ্রেসকে তাই সম্মিলিতভাবে চ্যালেঞ্জ করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

পূর্ববর্তী সংখ্যায় বলোছি, কংগ্রেসী হোসেন এবং অকংগ্রেসী রাওকে নিয়ে দুই দল কেমনভাবে লড়াই-এর আয়োজন করছেন। বলোছি, সম্মুখে সমর ঘোষণা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় রাজনীতির বহুভূমিতে সাম্প্রদায়িকতার বাধা ছাড়াই ওপর কেমনভাবে খাড়া নিয়ে কাঁপ দিয়েছেন। মতাদর্শের লড়াইয়ে হার-জিতের আনির্গত লক্ষ্য করে তিনি ও তাঁর সমর্থকবৃন্দ একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার অসুস্থ গরলস্রোত কেমন কৌশলে প্রবহমান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনুভব করেছেন এবং জাতির জীবনে তা কী মারাত্মক সর্বনাশকে আবাহন করে আনতে চলেছে। প্রসঙ্গত আরও বলছি, শ্রীহরমঙ্গল কবির প্রমুখ কয়েকজন ইষ্টাং অংগ্রেসী নেতা কেমন করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতের জন্মগত কুসংস্কারের মূলে কাদাজল সিঞ্জে তৎপর হয়ে উঠছেন।

কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণ অর্থাৎ এক কালের সেই প্রাণেশ নেতা জে পি'র প্রশ্নটা কি রকম? অর্থাৎ হোয়াটস গ্র্যাভাউট জে পি! তিনিও প্রশ্নটাকে সাম্প্রদায়িক করে তুললেন, যদিও প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবেই মতাদর্শগত।

জে পি অকস্মাৎ সবাইকে এমন করে ডিঙিয়ে গিয়ে খামকা খটস করে একটা সর্বনাশা এলোপাখাড়ি উত্তি করে বসলেন কেন?

তিনি অনেক বিচার-বিবেচনা করে অকস্মাৎ এক ভবিষ্যাবাদী করে বসেছেন। জা হল এই যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শুধু জাফির হুসেনকে পরাজিত করার মানে দ্বিতীয় দফা ভারত বিভাগ।

এমন গর্হিত বাক্য কোন একজন সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে খুনলে তার নির্বাং মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে, কিম্বা মনে কু-অভিসন্ধির বিকার প্রবেশ করেছে বলে আপামর জনসাধারণ ধরে নিতেন। এবং সেই অব্যবহিক চাঁদা করে চাঁট মারতেও ইতস্তত না করে সোজা স্ট্রীচ কিম্বা লাম্বিনী পার্কে ভরে দিয়ে আসতেন। কিন্তু জে পি'র বেলায় দু'য়ের একটাও করা যায় না। এককালে তিনি মস্ত বড় ভি আই পি ছিলেন। এখন সর্বস্থানে জাডনা অনুভব করে সর্বোদয়ের মধ্যে জালা যাতনা জুড়েছেন বলেই তাঁর মূল্যবান বাণীগলিকে ফেলে দেওয়া যায় না। কাগজওয়ালারা এ নিয়ে গবেষণা করবেন, করাই উচিত। যদিও অন্য এমন কথা উচ্চারণে একটি সেকলার টেটের নাগরিককে কোনও বিশেষ ধারার সোপর্দ করা হত কি না জানি না। হলে সাংবাদিকদের দায়িত্ব কমত।

অনেকেই অবশ্য জে পি'কে লস্ট পলিটিকেল জিনিয়াস (?) অর্থাৎ অকালমত রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা না, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলেই অধুনা গণ্য করে থাকেন। কেন না ইদানীং তাঁর অনেক

উক্তি মতো এমন সব বিবরণ থাকবে, যাকে ঠিক শৃঙ্খল গণ্য করতে সম্ভব হয়। সে সবকিছু উক্তি জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা না করে অত্যন্ত শিথিলভাবেই প্রবৃত্ত হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হল জাতীয় একো ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশ বিভাগের মত একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে উত্থাপন করার দায়িত্বহীনতা একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে কী করে সম্ভব! জে পি কি এইভাবে একটা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী প্রশ্নকে তার ফলপ্রসূ সম্পর্কে সচেতন হয়েই উত্থাপন করছেন না। এ কথা অন্য কোন দলের মারা উক্ত হয়ে ভারতরক্ষা আইন তৈরির প্রয়োজন হত। জে পি'র এই দায়িত্বহীন উক্তি মারামে তিনি হয়ত সংখ্যালঘুর মনে বিবরণ ছিটে দিয়ে নিজের অডীট সিদ্ধ করতে চান। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে এই পন্থা কতদূর মারাত্মক হতে পারে এবং জা আদৌ কোনরকম উদ্দেশ্যের পথে কি না সে বিষয়ে রাজনৈতিক পর্ববেক্ষকরা গবেষণা করবেন। আমরা সাদা মনে শুধু এইটুকুই বদিক এই মারাত্মক উক্তি কোনও দায়িত্বশীল ভারতীয় নাগরিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে এটা কম্পনাতীত। মনে করি, জে পি'র রসনা সংবত করার প্রয়োজন।

পরিশেষে এই ভেবে ভাগ্যকে ধন্যবাদও দিই যে, শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণকে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থীরূপে খাড়া না করে বিরোধীপক্ষ হাথুট বিচক্ষণতার পরিচয়ই দান করেছেন। আজ ভারতের বৃক্কে যে রাজনৈতিক সঙ্কট দাপিয়ে বসছে, তাতে রাজনীতি ক্ষেত্রে তিলকে তাল করনেওয়ালার এবং সংহতি নষ্টকারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের স্থান সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়াই শ্রেয়।

জয়প্রকাশজী অতঃপর শিথিল রাজনৈতিক প্রফেসির লোভ সম্বরণ করুন, জনগণের তরফে এই আবেদন রাখারও বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছি।

রাজস্থানে সুখাডিয়াই মধ্যমস্ত্রী হলেন

শেষ পর্যন্ত শ্রীমোহনলাল সুখাডিয়াই রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। অবশ্য এজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাবার সমস্ত আর একজনের প্রতি অধিকতর অভিনন্দন জ্ঞাপন না করলে শুধু অবিচার নয়, অকৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়। সত্যি বলতে, রাজস্থানে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কার্যে রাখার জন্য তাঁর প্রচেষ্টাই সমগ্রিক স্মরণীয়। রাজস্থানের সোভাগ্য বা দুর্য্যোগ যাই হোক না কেন,

সেই স্মরণীয় ব্যক্তি রাজস্থানের রাজ্যপাল থেকে এই আশ্বস্ত কংগ্রেসী আমলের দিনে সরে গেছেন। কিন্তু সে কারণেই অকৃতজ্ঞতা অশোভন। সুখাডিয়া মন্ত্রিত্ব করার সময় করার জন্য যত চালই চলে থাকুন, দুঃসময়ে পূর্ববর্তী রাজ্যপাল ডঃ সম্পূর্ণানন্দ চালাকির মারাই মহৎকার্য সিদ্ধ করতে সর্ব-প্রবণ গ্রহণ না করলে বর্তমান মধ্যমস্ত্রী সুখাডিয়ার স্বপ্ন আদৌ ফলবতী হওয়ার সুযোগই পেত না। সুতরাং রাজস্থানে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার জন্য অভিনন্দন প্রাপ্য ডঃ সম্পূর্ণানন্দের প্রথমে, শ্রীযুক্ত সুখাডিয়ার তারপর।

রাজস্থানে রাষ্ট্রপতির শাসন কার্যে করা হয়েছিল অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করার জন্য। তদানীন্তন রাজ্যপাল ডঃ সম্পূর্ণানন্দ বিধানসভার বিরোধীপক্ষ আপন সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিচয় দিলেও মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাঁদের কাছে আহ্বান জানান নি। অজহাতও ছিল অপ্রত্যাশ্য। অন্য সাধারণ এবং অপ্রত্যাশিত। ডঃ সম্পূর্ণানন্দের বিবেচনার : একটি সম্পূর্ণ দলীয় ব্যাপার না থাকলে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব নহে। বিরোধী সংখ্যক দলে বিভিন্ন দলীয়ের সঙ্গে যে সমস্ত নির্দলীয় আছেন তাঁরা ন-গণ্য। একক গরিষ্ঠ দল কংগ্রেসকেই, সুতরাং মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, তাঁর এবাধিষ বৃদ্ধি কেউই মেনে নিতে পারেন নি। সকলেই সন্দেহ করেছেন ও পরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, বিরোধী জেটে ভাঙন ধরিয়ে কংগ্রেসকে দলে ভারী করবার জন্য ওটা ছিল একটা সম্পূর্ণানন্দের চাল, বরং পিছনে সঞ্চিত ছিল শ্রীযুক্ত সুখাডিয়ার পাক্সা অভিজ্ঞ-মন। শ্রীসুখাডিয়া ১৯৫৪ সাল থেকে রাজস্থানে 'ননস্টপ' মধ্যমস্ত্রীত্বের দায়িত্ব চালায়ে আসছেন। তাঁর ব্লেক অব সার্ভিস প্রথম হল রাজস্থানে রাষ্ট্রপতি শাসন কার্যে হওয়ায়।

নির্দলদের দল নেই। তাই তাঁদের নীতিও নেই (অর্থাৎ 'কু'-ই হোক 'সু'-ই হোক দল মাত্রেরই নীতি আছে;) এমনিই এক ব্যক্তিতে বিরোধীদের হাতে ক্ষমতা দিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন; ফলত বিরোধ। আর তার পরই রাষ্ট্রপতির শাসন কার্যে করা। শ্রীযুক্ত সুখাডিয়াও আশু বজ্রাট প্রত্যক্ষ করে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রপতির শাসন কার্যে হয় তার পরে। (তৎপূর্ববর্তী এবং তৎকালীন ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা কোডুহকী পাঠক সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৬।৩।৬৭ তারিখের 'ভারতবর্ষ' পাবেন)।

১৫ই মার্চ তারিখে বিরোধী নেতা প্রমথ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপতির সামনে সশরীরে সংঘর্ষ ঘনেন ১৩ জন সদস্যকে হাজির করেন। তখন কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা একশতই। অর্থাৎ বিরোধীরা হাতেকলমে একশতই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, রাজ্যপাল কে সম্পূর্ণনিষেধের সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিই বিরোধীপক্ষকে আসে মন্ত্রি-ভাড়া গঠনের সুযোগ দিল না। অর্থাৎ এই প্রলোভনো অকথ্য সৃষ্টি করে বিরোধী প্রর-ভাড়াগণের জন্য সুখ্যাতির হাতে সুযোগ তুলে দেওয়া হল। বিরোধী-পক্ষের এ যুক্তি অত্যন্তই হৃদয়-বান্ধব। উত্তর সপক্ষে ছিল সেনা।

জ সম্পূর্ণনিষেধ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের পথ সুগম করে অকলস নিলেন। তাঁর পটভূমিতে পুনরায় যাচাই বাছাই এবং গণতন্ত্র রক্ষা করতে এলেন শ্রীমন্ত দাস। রাজ্যপালের দায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রীমন্ত দাসই আবার ডাক দিলেন দুই পক্ষকে। দেশব্যাপী তখন দর-ভাড়াগণের এক স্বা-সাজানো হয়ে গেছে।

দুই পক্ষ নিজ নিজ সমর্থক তালিকা তৈরি করলে দেখা গেল মোট ২১ জন সদস্যকে নিয়ে দুই পক্ষই স্বপক্ষ সমর্থনের দাবি তুলেছেন। রাজ্যপাল তখন এ একশ জনকে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনভাবে ডেকে তাঁদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট বিবৃতি আদায় করে নিলেন। এবার কংগ্রেসীরা উঠতে দেখা গেল, এ একশজনই কংগ্রেসের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। অর্থাৎ, অ-কংগ্রেসীদের এতো কাণ্ডের পর অবশ্যই মনে হওয়া স্বাভাবিক, অনেকেই কংগ্রেসী টোপ পিলেছেন। বিরোধীপক্ষের ভয় সুতরাং ভিত্তিহীন ছিল না। ঘটনাস্থা একটি সরলপন্থার মতো পারস্পর্য রক্ষা করে শেষ সমাধানে এসে উপনীত হয়েছে।

অবশ্য কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানানো মানেই শেষ সমাধান নয়। তার পরও অনেক জলই ঘোলা হবে, যে সম্পর্কে মধ্যমস্ত্রী সুখ্যাতির স্বপ্ন সচেতন।

ক্ষমতাভার গ্রহণের পরই (রাজ্যপানে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটে ২৬শে মার্চ) তাই শ্রীমন্তদাসকে বলতে শোনা গেছে, বিধানসভার অধিবেশনের বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও যে মাসের প্রথম সপ্তাহেই আহ্বান করা হবে। এর ফলে বিরোধীরা শক্তিপরীক্ষার সুযোগ পাবেন। কিন্তু আসলে বিরোধীদের সুযোগ দানই কি উদ্দেশ্য! এবং এতো কাণ্ডের পর এমন সম্প্রদেয় বিধানসভা আহ্বানের প্রেরণা-লাভ কি সম্ভব! কমা করবেন, এ প্রশ্নও বর্তমান পরিস্থিতিতে অধীনের মনকে

নাড়া দিয়েছে। আমার ভো বরং উল্টোটাই মনে হয়। অর্থাৎ শ্রীমন্ত সুখ্যাতির দেরি করে সুবিধাবাদী সদস্যদের পুনরায় পার্শ্ব পরিবর্তনের সুযোগ দিতে চান না। তাড়াতাড়ি, অর্থাৎ লোহা গরম থাকতে থাকতে তার ওপর কংগ্রেসী উল্টিক খুঁদে দেওয়ার এ হল আর একটি কূট চাল। কালে কী না যায়! রাজ্যপানের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কালক্ষেপে ঘৃণ ধরতে পারে। এবং শ্রীমন্তদাসের বিরোধীপক্ষকে সুবিধানও সে কমা মনে রেখেই। ননষ্টন তের বছরের মন্ত্রিসভার শ্রীমন্ত সুখ্যাতির এখন কতটাই তাঁর মানব। এইভাবে বিপর্যয় ঠেকিয়ে চলতে পারলে রাজ্যপানের বিল বুজোরাদেরও তিনি কালক্রমে কাত করতে পারবেন। কেন না এবারের অভিজ্ঞতা মারাত্মক।

কালো চাকর যে দর্শনীর খেলায় তামাম রাজ্যপান চতুর্থ নির্বাচনে ইতি-হাস রচনা করেছে, শ্রীমন্ত সুখ্যাতির এবার নিচয় হৃদয়লগ্ন করবেন যে তার মারাত্মক শক্তি কেমনভাবে কংগ্রেসী রাজ্য টেললিয়ে দিয়েছিল।

রাজ্যপানের শিক্ষা

অনুভব করবেন, জনগণের সঙ্গে থাকার তার থেকে কত বেশি নিরাপদ। কুয়ের পোষকের এখাবৎকালীন কংগ্রেসী নীতির অদলবদল তাই সুখ্যাতির মন্ত্রি-সভাতে প্রারম্ভি বা অগ্রাধিকার পাবে বলে আশা রাখা যার বোধ হয়।

সুখ্যাতির উপলব্ধি করবেন, কুয়ের গোষ্ঠীর বন্ধু কেবলমাত্র চাকর সঙ্গী। কিন্তু জনগণের শুভেচ্ছা কল্যাণকামী সরকারকে চিরকালই রক্ষা করবে। রাজ্য নীতির প্যাচ নিয়ে জনগণের মাথা বাথা নেই। এমন কি তাঁরা কোন বিশেষ রাজ-নৈতিক মতাদর্শ দ্বারাও পরিচালিত হয়ে রাজ্যপানের নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রিত করেন নি। তাঁরা চেয়েছেন কংগ্রেসী জন-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রাখতে এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়েই প্রতিবাদ রাখতে। কিন্তু রাজনৈতিক অসচেতনতা এবং অভাবজনিত স্বভাব-হানির দরুন রাজ্যপানে তাঁরা শাসনক্ষমতা তুলে দিতে গেছিলেন ধনকুবেরদের হাতে। কিন্তু মধ্যমস্ত্রী শ্রীমন্ত সুখ্যাতির মতো বিচক্ষণ মানুষ নিচয় অনুভব করেছেন, কুয়ের গোষ্ঠীর টাকা কংগ্রেসী নীতির অবনতি মানবের নৈতিক অধঃপাতের সুযোগ নিয়ে কেমনভাবে সেখানে জন-গণকে বিভ্রান্ত করতে উদ্যত হয়েছিল। রাজ্যপানের এই শিক্ষা সুতরাং নক-গঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে নতুন দিশ-দর্শনে সাহায্য করেছে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শ্রীমন্তদাসের আগামী দিনে স্বতর্মান কাজে লাগাবেন, জনগণ তথা কংগ্রেসের ততই রক্ষণ।

নতুন হাওয়া

সম্ভবত কংগ্রেস কিছুটা ধাক্কা দিয়েছে রাজ্যপানে। অন্তত মধ্যমস্ত্রী

আপনাকে সারাদিন
শ্রীমন্ত দাস
ব্রহ্মা

দুর্গন্ধনাশক

আন্তিমাত্রসুত

একমাত্র

টালুকম পাউডার



দ্রি ক্যান্ডিলা কেমিক্যাল কোং লিমিটেড

লক্ষ্য গ্রহণের পরেই সাংবাদিকদের কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ নীতির যে দু-একটি ভাষণ তুলে ধরেছেন, তাতে নতুন মন্ত্রিসভা কিছ্ মূখ্য বদলে কাজ করতে উৎসুক বলে মনে হচ্ছে। অবশ্যই এজন্য কংগ্রেসের প্রতি গণমতের প্রবল ধিক্কারই প্রেরণাত্মক। জনগণ যদি এইভাবে নির্বাচনে তাঁদের কুশাসন-বিরোধী বিক্ষোভকে প্রকাশ করেন তবে আগামীকালে ক্ষমতাসীন সরকারসমূহ বেশ সতর্ক হয়ে চলবারই চেষ্টা করবেন। একটা এলো-পাথাড়ি নির্বাচনও দেশের আবহাওয়া কি পরিমাণ পাটে দিতে পারে নাগরিক-বৃন্দ তা চতুর্থ নির্বাচনোত্তর পর্যায়ে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁরা অতঃপর আরও সতর্কভাবেই তাঁদের গণ-তান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। সেজন্য প্রতি রাজ্যে প্রতিটি ক্ষমতাসীন সরকারই জনকল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য। অন্যথা পরবর্তী নির্বাচনে কিম্বা তারও আগেই গদি ছাড়তে হবে যদি জনতার মধ্যে সতর্কতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

নতুন কথা ভাবতে হবে

শ্রীসুখাভিরা উপলব্ধি করেছেন, কংগ্রেসের কর-সংক্রান্ত আইন গণ-লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে। কর প্রদানে জনগণের আপত্তি নেই, কিন্তু জটিল পদ্ধতি দমনীতি এবং লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা নজর দেবেন।

সেচাব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি করে দৃষ্টান্ত কবলিত, অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানহীন বেকার জনগণের জন্য সম্ভাব্য আয়ের পথ প্রস্তুত করার দিকেও সুখাভিরা মন্ত্রিসভার দৃষ্টি থাকবে। আর আশ্চর্য কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাও এবার জনগণের বক্তব্য শুনবেন। তবে ব্যাপারটা এখন আইন সরলীকরণের প্রশ্নেই শ্রীযুত সুখাভিরা আবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক।

লক্ষণীয়, মুখ্যমন্ত্রী কালোবাজারী উৎসাহের প্রশ্নটি সরাসরি উত্থাপন করেন নি। বলেন নি কেমন করে কুকেরগোষ্ঠীর দাপট কমিয়ে রাজস্থানকে প্রতিষ্ঠিত-পন্থীদের কবল থেকে ধীরে ধীরে উদ্ধার করে আনবেন। রাজস্থানের মূল সমস্যা কিন্তু এইখানেই। তাই ইতিপূর্বে আমরা বলেছিলাম, রাজস্থানে কংগ্রেস ডুবছে স্বথাত সলিলে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী সুখাভিরা নিম্নোক্তমান কংগ্রেসের উত্তরণের আশা বৃক ফুলিয়ে প্রকাশ করতে চাইলেন না এতো কান্ডের পরেও। এই প্রকান্ড খোঁচাটা তাই সহজে বোধগম্য। হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী আইনের দিকটা দেখিয়ে সব সমস্যাকে আইনী বিধিনিষেধ বলে বাস্তবকে চোখ ঠারলেন। কিন্তু এত-দূরীয়া আগেও যেমন, এখনো তেমন বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব হবে?

বরং এই মুহূর্তে টিকে থাকতে হলে রাজস্থানের কংগ্রেসী সরকারকেও নতুন করে ভাবতে হবে। সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসী নীতির ক্ষেত্রে কার্যমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হলেও রাজ্যের স্বার্থে কার্যমী স্বার্থ-গোষ্ঠীকে খতম করতেই হবে। না হলে এখানের টলমলে কংগ্রেসী রাজত্ব টিকবে রাখা মুশ্কিল। কিন্তু রাজস্থানের কংগ্রেসী সরকারের এখন বিশেষ অবস্থা। চূড়ান্ত কোন পথ অবলম্বন করা অসম্ভব। এই দুরূহ সমস্যার সমাধান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত সুখাভিরা তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কেমন করে সমাধান করবেন, অতঃপর সেটাই সবিশেষ লক্ষণীয়।

শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন

গত বোল বছরে দেশে যে শিক্ষা-বিস্তারণ বিশেষ তাৎপর্যসহ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত তিনদিন-ব্যাপী শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের উন্মোচন-কালে প্রধানমন্ত্রী সে সম্পর্কে শিক্ষা কমিশন সহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে জাতীয় স্বার্থে শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য আহ্বান জানান।

অর্থমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী প্রীমোরারজী দেশাই এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, শিক্ষা-সংস্কার কার্যকরী করার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে না অর্থের প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন অর্থের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, আর্থিক প্রশ্নটা বেশ ভারী হলেও তা কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের নাগালের বাইরে নয়।

সম্মেলনে দ্বি-ভাষাসূত্র বজায় রাখা

পক্ষে অনেকের আগ্রহ থাকলেও, শিক্ষা-মন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে, শিক্ষার মান বাড়তে হলে ছাত্রদের ওপর থেকে ভাষা শিক্ষার বোঝা হ্রাস করতেই হবে। কেন না কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষার পেছনেই ছাত্রদের ৪৫ থেকে ৫৫ শতাংশ ভাগ সময় ব্যয় করতে হয়। এই অপচয় নিবারণ একান্তই দরকার।

এ বিষয়ে উপমুখ্যমন্ত্রীর বৃষ্টিও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, তিনি বলেন, জাতীয় সংহতি ও একের প্রয়োজনেই দ্বি-ভাষাসূত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পনের বছরের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষাকে পরিবর্তিত অবস্থায় নিয়ে যেতে তাঁর আপত্তি নেই।

গান্ধীজী প্রবর্তিত বদ্বিনয়াদী শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহে প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বদ্বিনয়াদী শিক্ষার ভিত্তি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। কিন্তু কেউ তৎপ্রতি যথোচিত দৃষ্টিমান করেন নি। শিক্ষাকে চাকুরী লাভ ও বিবাহে যোগ্যতার মাপকাঠি রূপে এদেশে ব্যবহার করা হয় বলেও প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ। তিনি বলেন, ছাত্ররা কারিক শ্রমে বিমূর্খ। একই সঙ্গে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাও দুর্ভিত্ত এ কথার স্বীকৃতিও পাওয়া যায় তাঁর কাছে।

খুবই অল্প দিনের কথা; দেশের সর্বত্র ছাত্রবিক্ষোভ উন্মোহন আকার ধারণ করেছিল। তখনই নেতৃবৃন্দের মনে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন যে একান্তই আবশ্যিক এ সম্পর্কে চেতনা জাগে। শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন সুতরাং যত দূর সম্ভব গুরুত্ব সহকারেই অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের মতো শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনও একটি বৈঠক ও পরিচয় সম্মেলনীতে পর্যবসিত হলে দেশের সম্মুখে উপস্থিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অবহেলা করা হবে। সৌভাগ্যত আমাদের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন সকলের প্রাধ্বা ও আস্থাভাজন। তাঁর দপ্তর চূপ করে বসে থাকবে না। তবে এককভাবে কোন দপ্তরই একটি সর্ব-ভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এজন্য রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের সহায়তা প্রয়োজন।

আমাদের বর্তমান রচনার এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। কারণ এই রচনা যখন ছাপাখানায় যাচ্ছে তখনও রাজধানীতে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের বৈঠক চলেছে। আগামী সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

(২৯-৪-৬৭)

‘গুলাবি চা’

তাজা ও সেরা। একবার
থিয়ে দেখুন।

৪৬নং রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের
পথ)।

স্ট্যালিন-স্টালিনী স্বেতলানা শেখ পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছেছেন। ভারতে তাঁর স্বপ্নকালীন অবস্থানের সময়েই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার চেষ্টা করেছিলেন নয়া দিল্লীর মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে। কিন্তু সেরি, এস-চেষ্টা তাঁর সফল না হলেও সুইজারল্যান্ড থেকে এখানে আসার পথে বিপত্তি দেখা যায় নি।

নিউ ইয়র্কের কেনোডি বিমান বন্দরে পৌঁছে স্বেতলানা এখানকার সাংবাদিকদের কাছে যে কথাগুলো বলেছেন তা যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। একে সোভিয়েট যুনিয়ন থেকে এ-ধরনের প্রথম শ্রেণীর-স্বয়ং স্ট্যালিনের মেয়ে-স্ট্যালিন ২২ বছর বয়সে গোটা কমিউনিস্ট দুনিয়ার অবিনবাদী নেতা ছিলেন—তাইই কন্যা সাধের কমিউনিস্টদের স্বর্গরাজ্য মস্কো ছেড়ে পুঙ্খবাদী মস্কোকে পাড়ি দেবেন—এটা কেউ ভাবতে পারেন নি। তবে, স্ট্যালিনের মেয়ে হলেও কমিউনিস্টদের গুরুকন্যা হলেও রাজনীতিতে স্বেতলানার কোন আগ্রহ নেই। ভারতীয় নেতা ডঃ রামমেনোহর লোহিয়াকে এক চিঠিতে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, রাজনীতিতে তিনি ঘূণা করেন। রাজনীতির পাঠস্থান, কমিউনিজমের তীর্থক্ষেত্র সোভিয়েট রাশিয়ার আলো-হাওয়ার মানদণ্ড হলে স্বেতলানার পক্ষে একথা বলা উচিত হয়েছে কি অনুচিত হয়েছে, সে-প্রশ্নে খাবার দরকার নেই। তবে কথা থেকে যায় যে, মাদাম স্বেতলানা যে সোভিয়েট রাশিয়ার খুব সুখে-শান্তিতে ছিলেন না, সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে যে তাঁর অনেক অভিযোগ ছিল, সাংবাদিকদের সামনে-রাখা তাঁর বক্তব্যে তাই অস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।

সোভিয়েট প্রধানের মেয়ে হয়েও স্বেতলানার মনে সুখ ছিলো না—ভাবতেও বিস্ময় জাগে। কিন্তু ঘটনাটা তাই। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছেন, রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে স্ট্যালিন-পত্নীর। কেউ বলে আশ্বস্তা করেছিলেন তিনি, কেউ বলে নৃশংস স্ট্যালিনই সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে গলা টিপে মেরেছেন। তারপর এক এক করে দুই স্বামীকে খুঁয়েছেন স্বেতলানা। পিতা স্ট্যালিনই স্বেতলানার মনের মানুষকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন প্রথম বিয়ে বাতিল করে দিয়ে। জাঁকজমক করে বিবাহোৎসব করে দিয়েছিলেন স্ট্যালিন তাঁর আদ্যুত কন্যার, কিন্তু সে-বিয়েও বেশিদিন টেকে নি, সুখ তাঁর সহ্য হয় নি।

দুঃ তাইকেও হারাতে হয়েছে স্বেত-



নিউ ইয়র্ক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বেতলানা

লানার—একজনকে নাৎসীরা গুলী করে হত্যা করেছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, আরেকজন, যিনি বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনিও রহস্যজনকভাবে মারা গিয়েছেন। আশ্বস্তাই করেছেন হয়তো। পিতা স্ট্যালিনের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে সত্য, কিন্তু ক্রুশ্চাভ আমল থেকে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যে আদর্শগত জেহাদ শুরু হয়, রাশিয়ার ইতিহাস থেকে স্ট্যালিনের নাম মুছে দেবার যে দম্মক প্রচেষ্টা হয় তা স্বেতলানার পক্ষে খুব সুখকর ছিলো না। কাজেই স্বেতলানার মনে শান্তি থাকবে কোথেকে?

স্বেতলানার আর একটা ক্ষোভের কারণ হলো ভারতীয় বিপ্লবী ব্রজেশ সিংকে উনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সোভিয়েট সরকার তাকে বিদেশী স্বামী গ্রহণ করতে দেন নি। কিন্তু ব্রজেশ সিং স্বেতলানার শত্রু বন্ধুই ছিলেন না, তাঁর অতৃপ্ত হৃদয়ে ব্রজেশকে তিনি স্বামীর আসনই দিয়েছিলেন। কিন্তু সেও মাত্র কিছুদিনের জন্য। মৃত্যু বখন ব্রজেশকে তাঁর হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিলো, তখন স্বেতলানা বেন চারদিকে অন্ধকার দেখলেন। মস্কো তখন তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছিলো। স্বামীর চিতাভস্ম পবিত্র প্রাণসঙ্গমে বিসর্জন দেবার অনুমতি নিয়ে তিনি ব্রজেশের দেশে এসেছিলেন ভারতে। কালকাত্যকার করেকদিন থেকে তিনি ভারতকেই ভালোবেসে ফেললেন। নির্ভাবতী হিন্দু বিধবার মতো স্বেতলানা ভারতে নিরাশ্রিত খাদ্য খেলেন, পরলেন

থান। দু'বেলা পুজো-আচ্চা করলেন। কালকাত্যকারে থাকার সময়েই তিনি সিঁথানুত নিরেছিলেন যে মস্কো আর তিনি ফিরতে পারবেন না, ব্রজেশহীন মস্কো তাঁর কাছে শূন্য, আকর্ষণহীন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ চেয়েছিলেন তিনি, প্রাথমিক প্রচেষ্টার সফল হলেও মার্কিন সরকার তখন কুটনীতির স্বার্থে সোভিয়েট সরকারকে চটাতে চান নি। তাই নিউ ইয়র্কের বিমানের টিকিট কেটেও স্বেতলানাকে রোম হয়ে সুইজারল্যান্ড পৌঁছাতে হয়েছিলো। সুইস সরকার এই শ্রান্ত, ক্লান্ত, রাজনীতিতে অনাগ্রহী ভদ্রমহিলাকে থাকতে দিতে আপত্তি করেন নি, কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, তাঁর শান্তির দরকার। তাই তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিগ্রাম করতে দিয়েছিলেন সাময়িক ভিসা দিয়ে, যদিও বলা হয়েছিল যে, স্বেতলানা যতদিন খুশি সুইজারল্যান্ডে থাকতে পারেন।

কিন্তু বেশিদিন তাঁকে থাকতে হয় নি, পাড়ি দিলেন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তাঁর বাসনা পূর্ণ হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর মনের কতখানি জুড়ে ছিলো তা স্বেতলানার এখানে এসে প্রথম কথাতেই পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে। স্বেতলানা সাংবাদিকদের কাছে বলেছেনঃ 'আমি এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়েছি।' স্বেতলানা আরো বলেছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার তিনি এক অস্বস্তিকর জীবন-কাল্পনিক করে

কিন্তু কিছই ছিলো না, তিনি কেন ছিলেন রাষ্ট্রের একটা সম্পত্তিমান। রাষ্ট্র তাঁকে যেভাবে চালাবেন, সেভাবে চলতেই তিনি রাজ্য ছিলেন। একটা উদাহরণ দিয়ে স্বেতলানা বলেছেন যে, তিনি কাকে বিবেক করবেন না করবেম তা ঠিক করবে কমিউনিস্ট পার্টি বা সোভিয়েট সরকার—এ ব্যবস্থা মানতে তাঁর মন রাজী ছিলো না। সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধী হবার প্রধান কারণ ওই ব্যক্তি-স্বাধীনতা করার হবার জন্যেই।

আলিলুরেভা স্বেতলানা (তাঁর মায়ের নামের সঙ্গে মিল রেখে কুমারী নামই স্বেতলানা নিয়েছেন) কয়েকটি কবিত্বপূর্ণ কথাও বলেছেন কেম্বেডজি বিমান বন্দরে উপস্থিত শ' খানেক সাংবাদিকের কাছে। তিনি বলেছেন যে, ছোটবেলা থেকেই তাঁকে কমিউনিস্টদের দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, এবং তিনি এতে বিশ্বাসও করেছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার আর সবায়ের মতো। কিন্তু যখন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন আসতে লাগলো, তিনি অন্যভাবে ভাবতে লাগলেন। রাশিয়ার ছেলে-মেয়েরা এখন ভাবতে সূর্য করেছেন, আলোচনা এবং তর্কও করছেন, অন্ধভাবে সব কিছ মেনে নিতে রাজী হচ্ছে না আর তারা। ধর্মের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস আলিলুরেভার মনকে আরো ভাবিয়ে তুলেছিলো। সত্য বটে তাঁর পরিবারের কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, বা কর্মশিক্ষাও তাঁকে কেউ দেয় নি। কিন্তু যখন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই তাঁর মনে ধর্মভাবের উদয় হয়েছে। হৃদয়ে ঈশ্বরের স্থান না দিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে—একথা স্বেতলানা বিশ্বাসই করতে চান না। এই আন্তিকতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসই তাঁকে কমিউনিস্টদের লোড়িমী থেকে মুক্তি দিয়েছে বলে স্বেতলানা সাংবাদিকদের কাছে কবুল করেছেন। অবশ্য তাঁর কাছে পুঁজিবাদ বা সাম্যবাদের আলাদা কোন মানে নেই—হুই-ই সমান তাঁর কাছে। তিনি সংলোকই দেখতে চান।

মস্কোতে স্বেতলানার এক ছেলে জোসেফ ও এক মেয়ে একাতেরিনা রয়েছে। তাদের জন্যে মায়ের হৃদয় কাদছে ঠিকই—তাঁর আশা—তিনজনে আবার মিলিত হবেন—সেই শ্রুতদিনটির দিকে তাকিয়ে আছেন স্বেতলানা।

স্বেতলানা আমেরিকার লন্ড আইল্যান্ডের স্ট্রাট জনসনের বাড়িতে অতিথি। একটা বই লেখার ব্যস্ত এখন তিনি, যে-বইয়ে তাঁর নিজের জীবনী ও সোভিয়েট

রাশিয়ার অন্তরাল কাহিনী থাকবে। স্ট্যালিনের মেরের লেখা গ্রন্থ—স্বভাবতই নীলামের ডাকের মতো দাম উঠবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মস্কোস্থ প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জর্জ কেনান এ ব্যাপারে স্বেতলানাকে যে-পরামর্শ দিয়েছেন সে-অনুযায়ী হার্পার এ্যান্ড রো প্রকাশকের কাছে স্বেতলানা বইটির স্বত্ব বেচে দিয়েছেন। অবশ্য বইয়ের আকারে বেরুবার আগে নিউ ইয়র্ক টাইমস ও লাইফ ম্যাগাজিনে সে-কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। স্বেতলানা ঘোষণা করেছেন যে, বই বিক্রির টাকা থেকে তিনি কালেক্টিং, সুইজারল্যান্ড এবং আমেরিকার সেবা প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করবেন।

স্বেতলানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগ্রয় নিয়েছেন। এতে সোভিয়েট প্রতিক্রিয়া যে

গান্ধাহিক বঙ্গবন্ধুর আগামী

জাকব্দ

পশ্চিমবঙ্গের গণজাগ্রোদানকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ নতুন পটভূমিকায় শীঘ্রই সুবহু উপন্যাস লিখছেন গণপ্রতিষ্ঠ কথাসিংশী শ্রীমোনোজ বসু।

বিরূপ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে তা কী রূপ পরিগ্রহ করে তা এখনো জানা যায় নি।

গ্রীস :

সামরিক অভ্যুত্থানের পর এখানে যা চলছে তাকে গ্রাসের রাজ্য ছাড়া আর কী বলা যায়? কারণ হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সামরিক আইন নামমাত্র শিথিল করা হয়েছে, বাড়ির কতটুকু খানায় গিয়ে বাড়ির লোকের সংখ্যা, অতিথিদের নাম ও বিভাগ ইত্যাদি দিয়ে আসতে হচ্ছে। সংবাদপত্র বেরুচ্ছে বটে কিন্তু সরকারের কাজের কোন সমালোচনা বরদাস্ত করা হচ্ছে না, কঠোরভাবে সেন্সর করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত এখানে প্রায় পাঁচ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র দাবি করছে। গোটা একটা খেলার স্টেডিয়াম নাকি কারাগারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বন্দীদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হারি সঙ্গে রাজার বিরোধ চরমে ওঠার জন্যে এখানে সংকট দেখা দিয়েছে—সেই জর্জ প্যাপানড্রু তো গ্রেপ্তার হয়েছেনই, তাঁর ছেলে আন্দ্রিয়াসকেও জেলে শেঁরা হয়েছে। আন্দ্রিয়াসই

গোপন সংস্থা 'আমপিডার' নেতা হারি সঙ্গে কমিউনিস্টদের যোগাযোগ রয়েছে বলে সামরিক সরকার অভিযোগ করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে আরো ঘোষণা করা হয়েছে যে, সামরিক আদালত গঠন করে সমস্ত অপরাধীর বিচার করা হবে—প্যাপানড্রু এবং আন্দ্রিয়াস তো বাদ যাবেনই না।

ইতিমধ্যে গুজব শোনা গিয়েছিল—এখানকার কমিউনিস্ট নেতা মানোলিস গ্লেজোসকে নাকি ফাঁস দেওয়া হয়েছে। সংবাদ পেয়ে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো মস্কোস্থ গ্রীক রাষ্ট্রদূতকে ডাকিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন যে, লেনিন শান্তি পুরস্কার-বিজয়ী গ্লেজোসের গায়ে যদি আঁচড়টি লাগে তবে সোভিয়েট সরকার চূপ করে থাকবেন না। মস্কোর তরুণেরা গ্রীক দূতাবাসের সামনে বিকোভ প্রদর্শনও করেছে। অবশ্য গ্রীসের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, এখানে কারুর ফাঁস হয় নি, গ্লেজোসের তৌ নয়ই।

এ-গুজবও ছড়িয়েছিল যে, রাজা কনস্ট্যানটাইনকে নাকি বাধ্য করা হয়েছে সামরিক অভ্যুত্থানে সাহায্য দিতে, নইলে সিংহাসনচ্যুত করা হবে বলে তাঁকে নাকি ভয় দেখানো হয়েছিলো। সামরিক সরকার অবশ্য এ-সংবাদের প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন যে, রাজার সঙ্গে তাঁদের কোন বিরোধ নেই, তাঁকে অন্তরীণ করে রাখার সংবাদও মিথ্যে। তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত, এবং ক্যাবিনেট সভায় যথারীতি সভাপতিত্ব করবেন।

কিন্তু এই সামরিক অভ্যুত্থানের প্রেরণা যোগালো কে? এখানকার কমিউনিস্টরা তাদের গোপন বোতরকেন্দ্র থেকে প্রচার করছে যে, আমেরিকার গোয়েন্দাবাহিনী 'সি-আই-এ'র হাত আছে এর পেছনে। ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে গ্রীসকে মুক্ত করার জন্যে ওই গোপন বোতরকেন্দ্র থেকে গ্রীক তরুণদের আহ্বান জানানোও হয়েছে। কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের পর এবং বিশেষত সামরিক আদালতে বিচার সূর্য করা হলে গ্রীসও মধ্য প্রাচ্যের দেশের মতো অনিশ্চয়তার আবর্তে পড়ে যাবে। গ্রীস ন্যাটোর একটা সদস্য। কাজেই এখানে মার্কিন স্বার্থ একেবারে নেই মনে করার কারণ নেই, বর্তমান দক্ষিণপন্থী সামরিক নেতারা 'সি-আই-এ' বা আমেরিকার প্রেরণায় উদ্বেগ্ন হয়েছেন বলেও অনেকের ধারণা। এ-ধারণা জন্মাবার কারণ হলো, লাতিন আমেরিকার স্বাধীন দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতিই অনুসরণ করে চলেছে।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুখিবজ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রিতীয় পর্ব

লক্ষ্য ও শৈশব

(নবম অধ্যায়)

পিতা মাতার বিবাহ

তৈলিরাগের পশ্চিমের বাড়ির গভন-কৃষ্ণ দাশের শ্রিতীয় পুত্র ছিলেন আমার পিতামহ গোপীমোহন। গোপীমোহন পদ্মার দক্ষিণ পাণের কোন গ্রামেব এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর ভাল নাম ছিল হবসুন্দরী এবং ডাকনাম ছিল ট্যাপা লক্ষ্মী। গোপীমোহন বর্ধমান রাজ্য এস্টেটে সামান্য মুন্সিয়ানা চাকুরী করে কোনমতে সংসার চালাতেন। গোপীমোহনেব অনেকগুলি সন্তান হয়েছিল কিন্তু সবাই দুর্ভাগ্যবশত বয়সেই মারা গেছেন। একটি ছেলে নগেন্দ্র সাত বছরের হয়েছিল কিন্তু একদিন রাতে তিনি পান মুখে করে শ্বাসেছিলেন এবং ঘুমের ঘোরে সেই চিবান পান গলায় ঠেকে বিবস্ম খেয়ে শ্বাসরোধ হবে নগেন্দ্র মারা যান। আমাদের মা বিয়ের পর তৈলিবাগে এসে এই কথা শোনেন এবং আমাদের উপর তাই কড়া হুকুম ছিল কখনো রাতে পান মুখে করে শোয়া চলবে না। গোপীমোহনের বড় মেয়ে বৈশ বস পেয়েছিলেন। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল কামাবাড়া গ্রামের প্রাণহরি সৈনের সংগে যিনি পরে এক সময় তৈলিরাগ কে. এম. ডি. এম স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছিলেন। ছেলে কেউ বাঁচে না দেখে বংশ লোপের ভয়ে গোপীমোহন ও হবসুন্দরী উভয়েরই শ্রুৎ মন খারাপ ছিল। এমন সময় তাঁরা শ্রুৎ মনে যে বর্ধমানের কাছেই কোন এক গ্রামে 'রাখাল রাজা' বলে এক জাগত বিগ্রহ আছেন তাঁর কাছে শ্রুৎমনে নিবিস্টচিত্তে আত্মসমর্পণ কবলে ঠাকুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। পাড়া-পড়শীর পরামর্শে হব-

সুন্দরী সেই 'রাখাল রাজা' ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে হত্যা দিলেন। শেষকালে ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে এরপর শীগগিরই তাঁর এক ছেলে হবে এবং সে ছেলে দীর্ঘজীবন লাভ করবে। দৃষ্টান্তে হবসুন্দরী ফিরে এলেন খাড়িতে। তারপর যথাসময়ে জন্মালেন এক সুদর্শন ছেলে। রাখাল রাজা ঠাকুরের অনুকম্পায় ছেলে হয়েছিল বলে ছেলের নাম হোলো রাখালচন্দ্র। এই রাখালচন্দ্রই হলেন আমাদের পিতা।

উপবৃদ্ধি কয়েকটি ছেলে শৈশবেই হারিয়ে আমাদের ঠাকুরা হবসুন্দরী বাবাকে বাচ্চের মধ্যে তুলো দিয়ে ঢাকা আঙুরের মত যত্নে রাখতেন। কিন্তু তবু তাঁর মন মানে না—কি জানি যদি এই ছেলেও চলে যায়। যদিচ ঠাকুর আশ্বাস দিয়েছিলেন ঠাকুরাকে যে তাঁর এই ছেলে দীর্ঘায় হবে তবু মায়ের মন বোঝে না। ঘব পোড়া গরু যেমন আগুন দেখলেই ভয় পায় তেমনি বাবার এতটুকু সদি-কাশি হলেই ঠাকুরা ঘাবড়িয়ে যেতেন। ঠাকুরা আবার চললেন 'রাখাল রাজা' ঠাকুরের মন্দিরে—বাবার দীর্ঘায় কামনা করার জন্যে, না, আর একটি ছেলের কামনার যাতে করে দু'জনের একজন অন্তত বেঁচে থাকবে—তা জানি নে। ঠাকুরা কি আশ্বাস পেলেন এবার জানা গেল না, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁর আব একটি সন্তান হোলো—মেয়ে। ঠাকুরের দয়ালু যখন মেয়ে তখন তার নামকরণ হোলো 'রাখালী'। এই রাখালীই হলেন আমাদের আপন ছোট পিসিমা।

রাখাল আব রাখালী পিতৃপিতৃ দ্বই ভাই-বোন একসঙ্গে মানদ্রু হতে লাগলেন। এইরকম কাছাকাছি ভাই-বোন হলে যা হয়, এদেরও তাই হোল। অর্থাৎ ভাবও যেমন ছিল ঝগড়াও হোলো তেমনি। আর তা ছাড়া বাবা ছেলে হওয়ায় ঠাকুরা তাঁর বায়না বেশি শ্রুৎতেন বলে রাখালীর

অদৃষ্টে ঠাকুরার মুখ ঝামটা প্রায়ই নাকি খেতে হোলো। মার কাছে শ্রুৎ বাবার অসুস্থ হলে যখন তাঁর ভাত বন্ধ এবং সাগর খেতে হোলো তখন নাকি রাখালীবও সাগর খাবার ব্যবস্থা হোলো। সন্দেহ ভঞ্নের জন্যে বাবা নাকি তাঁর বোনের মুখের কাছে মুখ নিবে শ্রুৎ দেখতেন রাখালী আর কিছু খেয়েছে কি না। মার যখন আমাদের এসব গল্প বলতেন তখন বাবা শ্রুৎ হাসতেন এবং 'খাৎ' ছাড়া আর বড় কিছু ওজব-আপত্তি করতেন না। এই সময় থেকেই ঠাকুরা বাবার খাবার যে ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা কবেছিলেন বাবা সেই ব্যবস্থামতই বরাবর খেয়েছেন আমার বিয়ে পর্যন্ত। সিদ্ধ চালের ভাত, দু-এক টুকু কাচি পটল সমেত ও একবারি দুধ ভাত। মুসুরির ডাল ছাড়া অন্য ডাল বাবা কখনো খেতেন না, খেলেই নাকি অস্বল হয়ে গলা জ্বালা করবে। এটা তাঁর মনের বিকার, না, সত্যি জানি নে। তবে দেখছি শেষ বয়সে আমার স্ত্রী এটা-ওটা বেধে দিলে খেয়ে নিতেন। অস্বল হয়েছে বলেও শ্রুৎ নি কোন দিন।

এই সময় দৈব-দুর্ভাগ্য ঘটল পরিবারের মধ্যে। অকস্মাৎ আমাদের ঠাকুরা গোপীমোহন অসুস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। তিনি নিবুপায় হয়ে শ্রুৎগামে তৈলিরাগে ফিরে এসে সেই-খানাই রয়ে গেলেন। অতি কষ্টে সংসার চালত। খাজনার টাকা বা ভাগ প্রজ্ঞাদেব কাছ থেকে যা ধান পাওয়া যেত তাই কুটে চাল কবে তাই দিয়ে খাওয়া হোলো। আশে-পাশের জমি থেকে শাক-সবুজ যখন যা পাওয়া যেত তাইতেই হোলো ব্যঞ্জন। মধ্যের বাড়ির দুর্গামোহন দাশ আমাব ঠাকুরাকে শ্রুৎ ভালবাসতেন। যখনই তিনি দেশে আসতেন তখনই তাঁর সোনা খড়ির সংসারের লোকেদের পরনের কাপড়, জামা আনতেন ও নগদ কিছু

ঢাকাও দিচ্ছেন আমাদের ঠাকুর হাতে।

কথায় বলে বিপদ যখন আসে তখন একলা আসে না। সমসাময়িক রাখালীর বিয়ে হোলো - বিক্রমপুরস্থ সেনার গুণ গ্রামের তারকেশ্বর সেনের সংগে। ক্রমান্বয়ে আমাদের সেই ছোট পিসিমার চারটি ছেলে, হয়েছিল, অপূর্বকুমার, রোহিণীকুমার, রেবতীমোহন ও রমণীমোহন। ছোট ছেলে, রমণীমোহনের বয়স যখন খুবই কম তখন আমাদের ছোট পিসেমশায় স্ত্রী ও চারটি সন্তান ফেলে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ছোট পিসিমার ছিল বাতের ব্যায়াম। তিনি চারটি ছেলের হাত ধরে অল্প পিতার আগ্রহে তেলিবাগ গ্রামে এসে উঠলেন ঐ অনটনের সংসারে। মেয়েকে ও নাতীদের বৃদ্ধি তুলে নিলেন আমাদের ঠাকুর ও ঠাকুরা। তাঁরা সবাই দৈন্যদশার মতোই দিন কাটাতে লাগলেন। ক্রমশ ছোট পিসিমা বাতের ব্যায়াম পদ্ধতি ও চলচ্চিত্র রহিত হয়ে শয়্যা নিলেন এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ছোট ছেলে রমণীমোহন (টোনা দাদা) যখন এগার বছর বয়সের তখন ছোট পিসিমা মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ কবলেন। ছোট পিসিমা মারা যাবার বছর পরে যখন অপূর্ব (বড় দাদা) ও রমণী (টোনা দাদা) রেডুনে ছিলেন কর্মব্যপদেশে তখন ছোট পিসেমশায় ফিরে এসে দেখা দেন। রেবতী (সোনা দাদা)-র কলকাতার বলরাম বোস ঘাট রোডের বাড়ির সামনের রকে বসে খেলো হুঁকাব চোখ বুজে সুখচাঁন দিতে দেখেছি ছোট পিসেমশায়কে পরম নিশ্চিন্তভাবে কেন দুনিয়ার কোনো চাপলাকর ঘটনাই ঘটে নি। এর অল্পদিন পরে ছোট পিসেমশায় ও মারা গেলেন।

আমাদের পিতা বালাবরসে দেশেই পড়াশুনা করেন। শুনোছি তিনি প্রথমে রাজকুমার চন্দ্র ওরফে নদের চাঁদ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পাঠশালায় পড়েছিলেন। এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে গ্রামের লোকেরা গ্রাম্য ভাষায় বলত নদি পণ্ডিত। বাবা প্রাই-মারী স্কুল থেকে প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গ্রামেই ছাত্রবৃত্তি পড়েন। একমাত্র জীবিত ছেলেকে যতদিন নিজের কাছে চোখে চোখে রাখা যায়—এই ছিল ঠাকুরার মনোগত ইচ্ছা। কে জানে, কখন ছেলের কি অসুখ-বিসুখ করে। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বাবা ভালভাবেই পাশ করেছিলেন বলে শুনোছি। ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর প্রশ্ন উঠল—ততঃ কিম। ছেলের যদি পড়াশুনা কবতেই হয়—তবে তাকে বাইরে না পাঠিয়ে উপায় নেই। তেলিবাগে তখনো হাই স্কুল হয় নি। ঠাকুরা আর কি করেন, ছেলেকে ঢাকায় পাঠাতে হোলো হাই স্কুলে পড়তে। তখন বাবার খুশীতাত কেদারেশ্বর ঢাকায়

মুনসেফ, না সাব-জজ। বাবা সেখানে গিয়ে খুড়ামশায়ের বাড়িতে থেকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। গ্রামের স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ায় বাবার বয়স একটু বেশিই হয়েছিল। বাবা ভের-চান্দ বছর বয়সে ঢাকায় ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হলেন। তখন সেখানে একজন ব্রাহ্ম যুবক মাস্টার ছিলেন যার নাম ছিল রজনীকান্ত ঘোষ। বাবার কাছে সেই ধর্মপরায়ণ, চরিত্রবান মাস্টারের অনেক গল্প শুনোছি। ছেলেরা ময়লা নোংরা কাপড় পরলে তিনি বলতেন—‘কাপড়টা ভাল করে নিজ হাতে কেটে নিতে কষ্ট নেই কিছ’। আলস্য ত্যাগ করে তাই করাই উচিত, কেন না ক্রিনলিনেস ইজ নেকস্ট টু গডলিনেস। এই সময়ে বাবার সংগে কে কে পড়তেন, তা’ বিশেষ কিছুই শুনিনি। যখন এই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে বাবা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলেন কিংবা উঠব উঠব করছেন তখন তার বয়স পনের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তখনই তার বিয়ে হোলো বিক্রমপুরস্থ হাসাড়া গ্রামের স্বর্গীর পীতাম্বর সেনের চতুর্থ পুত্র ও ঢাকার উদীরমান উকিল কৈলাশচন্দ্র সেন মশায়ের একমাত্র কন্যা কিনোদিনার সংগে।

বিক্রমপুরস্থ হাসাড়া গ্রামটি একটি বড় এবং বর্ষিক গ্রাম। গ্রামটির চারি পাশে বিস্তৃত বিল। শুনোছি হাসাড়ার বিলটি বিখ্যাত আইরল বিলেরই একটি অংশ। প্রথমে হরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিক্রমপুর’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে একসময়ে হাসাড়ার ঘর ও লোকসংখ্যা ছিল এই রকম—

মোট বাড়ির সংখ্যা—	১৬০৫
লোকসংখ্যা হিন্দু (পুরুষ)	২৬১৪
হিন্দু (স্ত্রী)	৩০৬৮
মুসলমান (পুরুষ)	৮৯৪
মুসলমান (স্ত্রী)	৯৫০

মোট জনসংখ্যা— ৭৫২৯

গ্রামে ইংরেজী স্কুল ও পোস্ট অফিস ছিল এবং এখনো আছে। গ্রামবাসীদের দুবিধার জন্মে। এই গ্রামের ব্রাহ্মণ গিরিশ মুন্সী ছিলেন বিশেষ নামকরা লোক। ঘোষদের বাড়িতে ছিল, খুব শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন পরিবার। কলকাতা হাই কোর্টের স্বনামধন্য জজ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ যিনি ঐ হাই কোর্টের অনেকদিন অস্থায়ী মুখ্য বিচারপতি হয়েও কাজ করেছেন তিনি হাসাড়া গ্রামের ঘোষদের বাড়ির তথা বিক্রমপুরের একটি উজ্জ্বল-তম রক্ত। তাঁর তিন পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র, সত্যীশচন্দ্র এবং সুব্রহ্মচন্দ্র। রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র কলকাতা হাই কোর্টের বড়

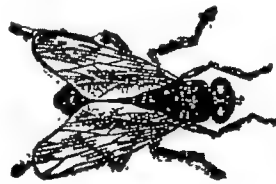
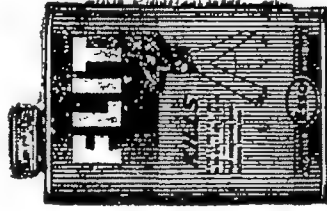
উকিল ছিলেন। তাছাড়া তিনি হিন্দু আইন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং বই লিখেছেন। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি গরীব কিস্তি মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে লেখাপড়া করবার সুযোগ দেবার জন্যে অনেক বৃত্তি দেবার ব্যয়সাধন করেছিলেন। স্যার চন্দ্রমাধবের দ্বিতীয় পুত্র সত্যীশচন্দ্র ছিলেন উকিল যার ছেলে বিমলচন্দ্র কলকাতা হাই কোর্টে বেশ বড় ব্যারিস্টার বলে খ্যাতি পেয়ে গেছেন। ছোট ছেলে সুব্রহ্মচন্দ্র ছিলেন এটর্নী। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি বাবা ও দাদাবাবু চিত্তরঞ্জন-এর সংগে পড়তেন ও একসঙ্গে বি. এ. পাশ করেন। কলকাতার ডাবানীপুরে, হরিশ মুখার্জী রোডে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়িতে ছিল তৎকালীন ষষ্ঠ গণ্যমান্য লোকদের যাতায়াত। হাসাড়া ঘোষদের বাড়ির মহেন্দ্র ঘোষ ছিলেন ঢাকার বড় উকিল ও হরেন্দ্র ঘোষ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সোমের বাড়ির মাখন সোম ছিলেন স্কুলের মাস্টার। রায়ের বাড়ির রমেশ রায়ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। এই রায়বাড়ির সুধীর রায়ের সংগে দাদাবাবু চিত্তরঞ্জন-এর বড় কন্যা অপর্ণা (সোনা)-র বিয়ে হয়। হাসাড়ার আরো কয়েক ঘর বৈদ্য ছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রমেশ সেন যিনি কলকাতা হাই কোর্টের বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন; তাঁর ভাই আল-পুরের উকিল গুণেশ সেন যার সঙ্গে আমার বড় মামার ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছিল এবং দীনেশ সেন যিনি ছিলেন মুনসেফ। এ ছাড়া আর এক ঘরে ছিলেন দুই ভাই পীতাম্বর ও নীলাম্বর সেন। তাঁদের পদবী ছিল সেন কিন্তু মুন্সী বলেই তাঁরা পরিচিত ছিলেন। বোধ হয় কোনো খেতাব পেয়ে থাকবেন। পিতৃ-বিরোগের পর পীতাম্বর ও নীলাম্বর পৃথক হয়ে যান। নীলাম্বর হাসাড়াতেই অন্য বাড়িতে চলে যান। তিনি পরে উকিল হয়ে বিবিশালে প্রভুত খ্যাতি ও অর্থ অর্জন করে; বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি করেছিলেন। তাঁর বীরশালের বসন্ত বাড়িটি, তাঁর বিলাতি ঘোড়া ও লাড়ি দেখবার মত ছিল। তাঁর বড় ছেলে আমাদের যোগেন্দ্র মামা খুব ভাল শিকাবী ছিলেন। এই পীতাম্বর সেন বা মুন্সীর ছিল পাঁচটি ছেলে—কালীকিশোর, হর-কিশোর, রাজকিশোর ও বমজ দুই ছেলে তারিণী ও কৈলাস। রাজকিশোর অল্প বয়সে মারা যান। পীতাম্বরের দুর্দীপ মেয়ে ছিল—অম্মা যার বিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুরস্থ বিদগাও গ্রামের মহিম দাশ-গুপ্তের সংগে এবং শশিমুখী। ‘মহিম দাশগুপ্তের একমাত্র পুত্র ছিলেন যোগেন্দ্র-দাশ দাশগুপ্ত। কালীকিশোরের ছেলে

ছিল না—ছিল একটি মেয়ে। কালীকিশোর ঠৈরিক বিষেব আপন হিস্যা থেকে হাসাড়া গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বদ্যালয় স্থাপন করে গিয়েছিলেন। সে স্কুলেব নাম ছিল কালীকিশোর এইচ. ই. স্কুল। হাসাড়া পার্কস্থান হয়ে যাবার পর সে স্কুলের নাম বজায় আছে কি না আমার জানা নেই। হরকিশোরের ছিল দুই স্ত্রী কিন্তু দু'জনই নিঃসন্তান। যমজদেব মধ্যে যেটি বড়—তারকচন্দ্র তাঁর ছিল এক মেয়ে কুমুদিনী। তাঁর সংগে বিয়ে হয়েছিল সেনারঙ গ্রামের বিপাবদ বাড়ির দেবেন্দ্র সেনের। কুমুদিনীর এক ছেলে শ্বিজেন্দ্রনাথ ও এক মেয়ে লক্ষ্মী। তারকচন্দ্র অপুত্রক হওয়ায় তিনি আপন যমজভাই কৈলাসেব ছোট ছেলে ষতীন্দ্রনাথকে পোষ্য নেন। ভগবানের মার কে খুশিতে পারে। ষতীন্দ্রনাথ বিবাহের অল্পকাল পরেই তারকচন্দ্রের জীবদ্দশায় একটি মাবালক পত্নী রেখে মারা যান। কৈলাস ছিলেন প্রথমে বরিশালের এবং পরে ঢাকার নামকরা উকিল। কিছুদিন তিনি কলকাতায়ও এসেছিলেন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই আমলে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং বক্তৃতাও দিয়েছেন শুনোছি। এই কৈলাসের ষতীন্দ্র ছাড়া আরো তিনটি ছেলে ছিল—যোগেশ, বশ্কম ও অতুল। যোগেশ করতেন কবিরাজী, বশ্কম করতেন ঘর-বাড়ি তৈরির কণ্ট্রাইরী কারবার। অতুল ঢাক। আসানুসঙ্গা স্কুলেব পাশ করা ওভার-সিয়ার হয়ে আপন ভাই বশ্কমের কারবারে যোগ দেন। কৈলাসের একমাত্র মেয়ে ছিলেন বিনোদিনী। সেই বিনোদিনীর বিয়ে হয় তেলিরবাগের পশ্চিমের বাড়ির গোপীমোহনেব একমাত্র পুত্র রাখালচন্দ্রের সংগে। তখন কনের বয়স ছিল দশ এবং বরটির বয়স ছিল পনেরো এবং পড়তেন তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ষতীন্দ্র শ্রেণীতে। এই রাখালচন্দ্র এবং বিনোদিনীই হলেন আমাদের বাবা ও মা।

শুনোছি বাবার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে তেলিরবাগ থেকে একজন ভারীক ধবণের জজাতিপুত্রের বাড়ির লাল-বিহারী জ্যেষ্ঠামশায়—সেপেন কৈলাসচন্দ্রের বাস ভবনে। কৈলাসচন্দ্র তখন ঢাকায় ওকালতি করেন এবং তাঁর বেশ পসাব হয়েছিল এর আগেই। সেখানে কি কথা-বার্তা হলো তার বিবরণ সবটা জানিও না এবং বলবারও দরকার নেই। মোট কথা হলো বিবাহের ষাবতীয় শতাব্দী লিপিবদ্ধ করে একটি সরু লম্বা কাগজে দুই পক্ষ সই করলেন। এই 'নির্ণয় পত্রমিদং কার্য্যপ্রচাগে'-র একটি কপি নিয়ে লাল-বিহারী জ্যেষ্ঠামশায় তেলিরবাগ ফিরে গেলেন। এই 'নির্ণয় পত্রটি' পরে মায়ের হাতে

আসে এবং সেটিকে তিনি খুব সম্বন্ধে রক্ষা করতেন এখনকার মেয়েরা যাঁদের রেজিস্ট্রারের কাছে বিয়ে হয় তাঁরা যেমন যত্ন করে রাখেন রেজিস্ট্রার ও বিয়ের সাক্ষীদের সই কবা ও শিলমোহর লাগান তাঁদের বিবাহের নিদর্শনপত্রটি। ওই 'নির্ণয় পত্রটি' আমি দেখেছিলাম এবং পড়েও-

ছিলাম। সেই 'নির্ণয় পত্র' থেকে জানা যায় সেকালের লোকেরা কেমন আটখাট বেঁধে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতেন। খুবই দুঃখের বিষয় যে সেই 'নির্ণয় পত্রটি' অন্যান্য অনেক মূল্যবান জিনিসের সংগে বাড়ি বদলের হিড়িকে কোথায় হারিয়ে গেছে। মোন্দা কথা এই

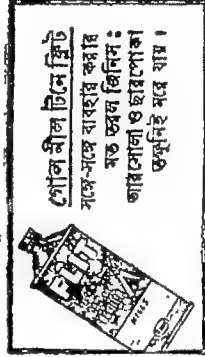


এই হল নাতি

নাতি জন্মায় বস নোংরা জায়গায়। সাংঘাতিক রকমের 'দীনা' ব্যক্তি যেন বেড়ায়, আর চাইকরড ও কলেরার মত দারিদ্র্য মহামারী রোগ ছড়ায়। আপনার বাড়িতে যখনই নাতি ছাড়া উপদ্রব দেখা দেবে, মরে-জ্বা-ওদের মৃত্যু করবেন।

এই হল নাতির মামা—লাল টিনে ফ্রিট

নাতি, দীনা ও অসুস্থ উভেচলা পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্যে ফ্রিট ছড়িয়ে দিন। পাঁচটি শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরী লাল টিনের ফ্রিট হুঁতাবে কাছ করে : পোকামাকড়গুলোকে মড়ে-মড়ে কাবু করে নাতিতে কেলে এবং একটু পরেই ওরা মরে যায়।



আপনার মরনাভী রক্ষা করে ফ্রিট
— প্রতীবীর প্রেরা কীটনাশক!

ওগো স্কাগোড... ইটালি, ইনক. ১ ফ্রিট লাইসেন্স - অস্ট্রিয়ার ফ্রাঙ্কো সার্বিকত্বক

CMEF-10 BG

মনে আছে যে, কন্যার পিতা বিবাহের পর জামাতার পড়াশুনার সকল ব্যয়ভার বহন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গহনা কত ভরির হবে তারও উল্লেখ ছিল, কিন্তু বিস্তারিত ফর্দের কথা আমার মনে নেই। তাছাড়া ছিল একটা শর্ত যে বরকে যথোপযুক্ত সম্মানের সংগে চলন করে নিয়ে যেতে হবে এবং বরযাত্রীদের সাহায্যে কন্যার পিতাই দেবেন। সন তারিখ বা শুনেনিহাম মায়ের কাছে তা' ফুলে গেছি—আমাদের বাবা-মায়ের বিষয়ে নির্বিশেষে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। শুনেনিহাম বর নিয়ে বাবার জন্যে আমার দাদামশায় একটা হাতী ও ঢাকা থেকে গড়ের বাজনাও পাঠিয়েছিলেন। বড় হয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করেছি—“দিদিমা গো, তোমার কতটা বড়লোক আছিলেন। তোমরা কি দেখেছা পনের বছরের বয়স খার্ড জাপের পড়ুরা পোলা যার বাপ অম্ব তার লগে তোমাগো একমাত্র মাইয়ার বিয়া দিচ্ছিল।” দিদিমা হেসে জবাব দিয়েছিলেন—“আরে সেই আমলে মাইনস্রে মাইয়া বিয়া দিত বংশ দেইখ্যা। তেলির-বাগের বদনন্দন বংশের দাশ গুদুঠার খুব নামডাক আছিল। ফলটা ত' কিছু খারাপ হয় নাই। কি কস'?' বলেই আমার মাথার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

(দশম অধ্যায়)

পশ্চিমের বাড়ির নতুন সোনা বোঁ

আমার ঠাকুমা যখন অল্প বয়সের বোঁ ছিলেন তখন তাঁর শ্বশুর-গাশুড়িয়া তাঁকে ডাকতেন সোনা বোঁ বলে। সে সূত্রে ভাসুর ও দেওর পুত্রেরা তাঁকে ডাকতেন সোনা খুড়ি বা সোনা জ্যোতি। তারপব আস্তে আস্তে তিনি যখন বার্ষিকের দিকে এগুলেন এবং তাঁকে বোঁ বলে ডাকবার লোকেরা একে একে চলে গেলেন—অর্থাৎ তিনি বোঁ পর্বতার থেকে শাশুড়ি পর্বত্রে এলেন তখন আমার ঠাকুমা সোনা বোঁ পদ থেকে প্রমোশন পেয়ে হয়ে দাঁড়ালেন সোনঠাইন। বাড়ির দেওয়ানজীবা ও প্রজারা ঐ সোনঠাইন বলেই তাঁকে জানতেন এবং ডাকতেন। আমাদের মা যখন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি এলেন তখন হলেন ‘পশ্চিমের বাড়ির সোনা বোঁ’।

মা যখন শ্বশুরবাড়িতে এলেন তখন তাঁর বয়স বোধ হয় দশেরই কোঠায়। মায়ের গায়ের বগু ময়লাই ছিল। তবে মুখশ্রী বেশ কমলীয়ই ছিল। মাঘের নাকটি ছিল বেশ খাড়া তবে গোড়ার দিকটা ছিল একটু চাপা। দেখতে অনেকটা টিয়া পাখীর ঠোঁটের মত—ইংরেজীতে যাকে বলে ক্র্যাফুলাইন। মার চোখ দুটি ছিল

বেশ বড় বড়। চোখের তারা দুটির চারিপাশে খুব ক্ষীণ একটি সাদা রেখা নজর করলে দেখা যেত। ওই রেখার জন্যে মার চোখ দুটিকে যেন করুণায় ভরা মনে হতো। মায়ের চুলের গোছা ছিল খুব ঠাসা এবং কোঁকড়ান। মাকে কখন প্রসাধনের চেষ্টা করতে দেখি নি। চুলে প্রায় ঢিলে খোঁপাই করতেন। চুল বাঁধতে দেখি নি কোন দিন। ছোট বয়সে মা শুনেনিহাম বেশ গোলগাল আকৃতিরই ছিলেন। বড়দের কাছে শুনেনিহাম মার কণ্ঠার হাড়ই নাকি দেখা যেত না। বাবা বর্ণনা দিতেন ‘নিশ্চইষ্ঠা মাইয়া’ বলে।

বড় লোকের একমাত্র মেয়ে—যিনি জীবনে কখনো বাড়ির বাইরে যান নি—তিনি দশ বছর বয়সে এলেন—শ্বশুর-বাড়িতে এক দাসী সংগে নিয়ে। দাসীটির নাম ভুলে গেছি তবে বেশ পুরনো দাসী। সেই সময়ে মেয়ে প্রথম শ্বশুর ঘরে গেলে সংগে দাসী বাবার রেওয়াজ ছিল। এই দাসী শ্মিরাগমন পর্বন্ত মায়ের সংগে তার নতুন শ্বশুর ঘরে থাকত। শ্মিরাগমনের সময় দাসীও মায়ের সংগে তার বাপের বাড়ি চলে যেত এবং পরে যখন মেয়ে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতো তখন আর দাসী যেতো না। এই দাসীর কর্তব্য ছিল মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ির মেয়েদের সংগে মেলামেশা করতে শেখান এবং কায়দা মতন চলা-ফেরা করতে মদত দেওয়া। এই দাসীর পরামর্শে এবং নির্দেশে মায়ের নতুন পরিবেশে সুবিধে হবে এবং বাপের বাড়ির একজন লোক সংগে থাকলে বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন করবে না—এই ছিল সেকালের লোকের ধারণা এবং সেই জন্যেই হয়েছিল পুরনো দাসী মায়ের সংগে পাঠাবার প্রথা। তবে অনেক সময় দেখা যেত যে এই দাসী এক-এক সময়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির বৌ-ঝিয়েদের কাছে খানিকটা চাল দেবার চেষ্টা করত, বিশেষ করে যদি সে বড় লোকের বাড়ির দাসী হতো। আগেই বলেছি আমার ঠাকুমা গোপীমোহন অম্ব হয়ে বাগুয়ান তাঁকে কাজ-কর্ম ছেড়ে স্বগ্রামে ফিরে অনেক অস্বচ্ছলতার মধ্যে সংসার চালাতে হতো। মা যেদিন শ্বশুরবাড়ি পৌঁছলেন তার পরের দিন সকালেই মাঘের সংগে যে দাসীটি এসেছিল সে খবরটা বাতে সব বৌ-ঝিয়েরা ও বিশেষ করে শাশুড়ি স্থানীয় মহিলাবা শুনতে পান এই রকম গলায় অতি নির্বিকারভাবে প্রচার করল যে—‘আগো দ্যাখেন, আমাগো মাইয়ার সকালে ঘি দিয়া ভাতে-ভাত খাওনের অভ্যাস—সমর্থতা হচ্ছে যে সেই রকম ব্যবস্থাই যেন হয় এ বাড়িতেও। যে বাড়িতে কল্টে-সল্টে হাঁড়ি চড়ে সে

বাড়িতে এই ধরনের কথা যে খুব সুপ্রাচ্য হোলো না তা' দশ বছরের মেয়ে আমার মা-ও বেশ অনুভব করে ফিস্ ফিস্ নিচু গলায় ঘোমটার মধ্যে থেকে দাসীকে ভৎসনা করে বললেন—‘তুই থামা’। তারপর দুপুরের খাবার পর অন্যান্য বউদের সংগে মা যখন এঁটো বাসনের খানিকটা তাড়া দু'হাতে ধরে পেছনের খিড়কী ডোবার দিকে চললেন মেয়ে আনবার জন্যে দাসীটি কস' করে মার হাত থেকে সেই বাসনগুলি কেড়ে নিয়ে চলল ডোবার দিকে। বাসনগুলি দাসী নিয়ে গেলে ক্ষতি ছিল না কিন্তু বাবার আগে সে যে মন্তব্য করল—‘আমাগো মাইয়া পারে নাকি এই কাম করতে’—তাইতে মায়ের যেন লম্বায় মাথা কাটা গেল। পরে তাকে আড়ালে ডেকে মা ধমক দিয়ে বললেন—‘তুই কথা কইস না’ কে কার কথা শোনে। বড় লোকের বাড়ির দাসীর কর্তব্যই যেন ছিল গরীব কুটুম বাড়ির খুঁত ধরা। মায়ের কাছে গল্প শুনেনিহাম যে সে সময় মা কেবল ভগবানকে ডাকতেন যে শ্মিরাগমনের দিন যেন শীগগির শীগগির আসে, কেন না বাপের বাড়ি গিয়ে দাসীর সব কীর্তি তাঁর মাকে বলে দেবেন। তাছাড়া শ্মিরাগমনের পর যখন আবার শ্বশুরবাড়ি আসবেন তখন সংগে ঐ দাসীটা আসবে না এই রক্ষে। মা খুব হাসতেন যখন ঐ দাসীটির চালিয়াতী কথার পুনরাবৃত্তি করতেন আমাদের কাছে।

দশ বছরের ছোট মেয়ে প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসে কি দেখলেন? দেখলেন যে খুব শ্বশুর অম্ব, কোনো রোজগার তাঁর নেই। ঘরে আছেন এক শাশুড়ি আর একটি রুদ-ভঙ্গন নন্দ—রাখালী ও তার চারটি ছেলে। ছোট ভাগনেটির বয়স তখন হবে বছর দুই অর্থাৎ মায়ের থেকে মাত্র আট বছরের ছোট। মায়ের কর্তব্য হোলো তাঁর শ্বশুরের ঠাকুরকি ও তাঁর ছেলেদের, বিশেষ করে ছোটটি (রমণী)—র হেফাজত করা। মা লেখাপড়া শেখেন নি। তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়ার তেমন রেওয়াজ ছিল না। মা কোনোমতে বাংলা ছাপা বই একটু একটু পড়তে পারতেন এবং খুব সামান্য বাংলা লিখতে পারতেন নানা রকম বানান ভুল করে। কিন্তু সেকালের মেয়েদের মনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির মানুষদের আপন করে নেওয়া এবং তাদের সুখী করা যে মেয়েদের একটা অবশ্য কর্তব্য এই বোধটি তাঁদের মা-ছোট-খড়ির ব্যবহার দেখে এবং নানা ব্রতাদির কথা শুন্যে তাদের মনে বৃদ্ধমূল হয়ে থাকত। অনেক লেখাপড়ার চেয়ে এই শিক্ষাকটুর দাম ছিল ঢের বেশি। সেকালের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি

গিয়ে বৃক্ষ শব্দে ও অন্যান্যদের সেবা করাটাকে তাঁদের কতব্য বলে জেনেই বেশ হাসিমুখেই তা করতেন এবং তাঁদের সেবা-শ্রদ্ধা করে মনে একটা প্রসন্নতাও লাভ করতেন। এই রকমভাবে চললে যে স্বামীও শ্রুতি হবেন সে কথাও যে মেয়েদের মনে থাকত না তা-ও নয়।

আমাদের মা প্রথম থেকেই একান্তমনে শব্দদের সেবার লেগেছিলেন। ঠাকুরমার লগ্নে লগ্নে মাকেও রান্নাঘরের যাবতীয় কাজ করতে হতো। ঠাকুরমার যখন বয়স হোলো তখন একা মাকেই রান্নাও করতে হতো। আগেই বলেছি যে আমাদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। চাল কিনে খাবার সংস্থাও ছিল না। ক্ষেতের থেকে বা ধান পাওয়া যেত তাকে নিশ্চয় করে চাষকিতে ছেঁটে চাল করে নিতে হতো। শব্দ-শাশুড়ি ঠাকুরমার ও তাঁর ছেলের এবং ছোট শব্দদের বৈকুণ্ঠবরকে খাইয়ে তারপর মাকে খেতে হতো। অনেক সময় শাক ব্যঞ্জনও অপরিপাক্ত অবশিষ্ট থাকত না। নুন ও কাঁচা লবঙ্গ দিয়েই অনেক সময় কাজ চালিয়ে নিতে হতো। সুস্থ সবল শরীরটাকে পুষ্ট রাখবার জন্যে এবং পেটটা ভরাবার জন্যে ভাতের পরিমাণ মা একটু বেশিই খেতেন। তারপর উঠেই বাসন মেজে স্নান হতো। ধান ভানবার পালা। মাকেই দিতে হতো, চাটকিতে পাড়। গ্রানের কোন সম্পর্কীয়া স্নান করে ধানগুলি বসে বসে উল্টিয়ে দিতেন। অল্প বয়স থেকেই এইরকম অনেকগুলি ভাত কাঁচা লবঙ্গ কিংবা তেঁতুল দিয়ে খেয়েই চাটকির পাড় দিতে দিতে ঘটি ঘটি জল খাওয়ার মার ছোট বয়স থেকেই অজীর্ণ রোগ দেখা দিয়েছিল। সে রোগ মাকে আমরণ পর্যন্ত কষ্ট দিয়েছে। তাছাড়া ধান সিদ্ধ করা ছিল এক ব্যাপার। তখন চাইলেই পাথর কল্লা পাওয়া যেত না এবং মা-ও পাওয়া যেত তা কেনার পরস্যাও আমাদের পরিবারের ছিল না। এজন্যে মাকে বাড়ির সংলগ্ন বাগান থেকে শুকনো পাতা ও ছোট ছোট শুকনো ডাল সংগ্রহ করে নিরে আসতে হতো। সেই আধ-শুকনো পাতা ও ডালে আগুন দিয়ে ধীরে ধীরে চোঙার ঠোঁটে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখা ছিল এক কষ্টসাধ্য কাজ। ধোঁয়ার মার চোখে জল বেয়ে পড়ত-চোখে তন্দ্রাকার দেখতেন।

এর উপর যখন আমাদের ছোট পিসিমা অচল হয়ে অনেক মাস বিছানায় কাটিয়ে শেষে মৃত্যুতে নিশ্চুতি পেলেন তখন এই ভাগনে চারটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ল আমাদের মায়েরই উপর। টোনা দাদাকে মা ছেলের মত করেই বড় করে তুলেছিলেন। এইরকম কষ্ট করে এবং নিজের শরীরটাকে তিলে তিলে ক্ষয় করে আমাদের মা আমাদের সংসারের সেবা করে গেছেন তাঁর দশ বছর বয়স থেকেই।

আর একটা ব্যাপার যা হোতো তার কথা বলতে গেলেই মা হেসে ফেলতেন। মাকে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে তৈজসপত্র, কাপড়-চোপড় বিছানা-পাটি বেশ ভাল-রকমই দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া পরে স্নান বছরের চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি ও বছরের পরনের কাপড়, বিছানার চাদর, গামছা ইত্যাদি আমাদের দাদামশায় নির-মিতভাবে প্রতি বছর পুজার সময় নৌকো বোকাই করে তেলিরবাগে পাঠাতেন। চাল, ডাল, ইত্যাদি জিনিসগুলি সংসারের কাজে লগ্নে যেতো এবং তাঁর চাল আসার জন্যে আমার মায়ের ধান ভানার কষ্টটারও লাঘব নিশ্চয়ই হতো। কিন্তু কাপড়-চোপড়, চাদর, গামছা থাকত আমার ঠাকুরমার জিম্মায়। মার কপালে না কি চাদর পাতা বিছানায় ওয়াড় দেওয়া বালিশে মাথা রেখে শোবার সৌভাগ্য জুটত খালি বাবা যখন ছুটি-ছাটতে বাড়ি আসতেন। সে সময় ঠাকুমা বিছানার সাফ চাদর ও বালিশের খোল বের করে দিতেন এবং মাকে নির্দেশ দিতেন—‘রাখালের লেইগ্যা পাইত্যা দিও।’ অন্য সময়ে মা শূভেন তেল-চুকচুক বালিশটার উপর গামছাটা পেতে আন পুরনো ছেঁড়া পরনের শাড়ি একখানা ময়লা ছেঁড়া তোষকের উপর বিছিয়ে। বছরের পর বছর নাকি এই ব্যবস্থাই ছিল। একবার হয়েছে কি, বাবা এসেছেন দেশে ছুটিতে। ঠাকুমা ভুলেই গেলেন সাফ চাদর ও বালিশের খোল বের করে দিতে। মা-ও ঠাকুমাকে মনে করিয়ে দেন নি—হয়ত ইচ্ছে করেই, বাবাকে জানিয়ে দিতে যে মার বিছানার অবস্থাটা সচরাচর কেমন থাকে। শহর ফেরতা ছেলে রায়ে শূভে এসে বিছানার অবস্থা দেখে শু’ অবাক। মা হেসে কুটি-কুটি। সেদিন রায়ে কতই না জানি হাসাহাসি হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীতে। যাই হোক, পরদিন ঠাকুরমার খেলাশ হোলো

এবং দিন থাকতেই পরিষ্কার চাদর ও বালিশের ওয়াড় বের করে দিলেন। ঠাকুমা বোধ হয় আগের রায়েই ঘটনাটার ইঙ্গিত বুঝেছিলেন। মা হাসতে হাসতে বলতেন এর পর তাঁকে আর বালিশে গামছা পেতে ও ছেঁড়া শাড়ি বিছানায় বিছিয়ে শূভে হয় নি।

ওদিকে বাবা ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলেয় শ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উঠলেন। আর কলকাতায় দাদাবাবু (চিন্তরঞ্জন) ডবল প্রমোশন পেয়ে বাবাকে প্রায় ধরে ফেললেন। বাবা তখন দাদাবাবুর চেয়ে এক ক্লাশ উঁচুতে পড়েন। ঢাকায় পড়ার এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল যা বলা প্রয়োজন। দাদামশায়, আগেই বলেছি, মায়ের বিয়ের সময় প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিলেন যে বাবার পড়াশুনা যাবতীয় খরচ তিনি বহন করবেন। বাবা যখন ঢাকায় তাঁর খুল্লতাতে কেদাবেব্বরের বাড়ি থেকে কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন দাদামশায় তখন ঢাকাতেই প্রাকটিস বেশ জমিয়ে বসেছেন। বাবা দাদামশায়ের বাড়ি নৈমন্ত্য না হলে যেতেনই না। এটা দাদামশায়ের পছন্দ হতো না। তিনি চাইতেন যে একমাত্র জামাইটি তাঁর ছেলেরই মত তাঁর বাড়িতে আসবে, বাবে, খাবে এক

সাপ্তাহিক বসুমতীর

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

	ট, প্
বার্ষিক চাঁদা (সডাক)	১৪.০০
মাসিক " "	৭.০০
ত্রৈমাসিক " "	৩.৫০

ভিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে আশ্রম টাক্স জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মীদায়

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁর সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ জামরায় যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানাসহ ডাকটিকিটযুক্ত খাম থাকলে একমাত্র অনমনীয় গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদক

মাস গেলে পড়া-খরচের টাকাটা নিয়ে যাবে। বাবা কিন্তু চেয়ে হাত পেতে টাকাটা নিতে সক্ষমতা ও লক্ষ্যবোধ করতেন। বাবার মনের ভাব ছিল—ইনি যখন খরচের টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ওরই কর্তব্য। টাকাটা পৌঁছে দেওয়া। দু'জনেরই কেমন যেন একটা জিদ লেগে গেল। দিদিমার কাছে শুনেছি তিনি দাদামশায়কে অনেক ঝুঁকিয়েছেন কিন্তু কোনো ফল হয় নি। শেষে দাদামশায় করলেন কি প্রত্যেক বছর পূজার সময় নাকো বোকাই করে আমাদের সংসারের সকলের কুলায় এমন বছরের চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, পরনের কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি তেলিরবাগে পাঠিয়ে দিতেন যার দাম নগদ পড়া খরচেরও বেশি। দুই দিকের গোঁই-ই বজায় রইল শেষ পর্যন্ত। মা যখন এসব গল্প আমাদের বলতেন তখন বাবা হাসতেন আর বলতেন 'আমি ছোট বয়সে অভাবের জন্যে একটু বেশি অভিমাত্রী হবো গিয়ে শব্দরমশায়ের কাছে অপরাধই করছি। এখন নিজের জামাই হওয়ায় তাঁর মনো ভাবটা বুঝতে পারি।'

বাবা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে হুগলীতে গেলেন এফ. এ. পড়তে। খুল্লতাত কদারেশ্বর তখন সেখানে বদলী হয়েছেন। হুগলী কলেজে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথমবার ফেল হয়েছিলেন বলে চাদর মড়ি দিয়ে বাবার কান্নার কথা মা বলতেন হাসতে হাসতে। তার পরের বছর যখন পাশ হলেন দাদাবাবুও সেবার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করে বাবাকে ধরে ফেললেন। এর পর বাবা কলকাতায় বি. এ. পড়তে এলেন জ্যেষ্ঠামশায় ভুবনমোহনের বাড়িতে থেকে। জ্যেষ্ঠামশায় ও জ্যেষ্ঠিমা যে হৃদয়টা কত স্নেহপ্রবণ ছিল তা' এর থেকেই বোঝা যায়। জ্যেষ্ঠামশায় তা' পশ্চিমবঙ্গ বাড়ি এসেছিলেন দত্তক পুত্ররূপে। বজ্রের টান এমন আর কিই বা ছিল। তাঁর সংগে আমাদের বাবার যে সম্পর্ক ছিল আজকের দিনে অনেকে তা' ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। এরকম অবস্থায় আজ-কালকার লোকেরা হয়ত 'গণ্ডস্যোপবি বিস্ফোটকম' বলে মুখ ফিরিয়ে নেবেন এবং এরকম অনাহুতদের দায় ঘাড়ে নেবেন না। কিন্তু জ্যেষ্ঠামশায় ও জ্যেষ্ঠিমা অন্য ধাতুতে তৈরি ছিলেন। জ্যেষ্ঠামশায় তাঁর সোনাখুঁড়িকে ও জ্যেষ্ঠিমা তাঁর সোনাঠাইনকে আপন-জনেরই মত জ্ঞান করতেন ও ভালও বাসতেন। বাবা যখন কলকাতায় এলেন বি. এ. পড়তে এবং রইলেন জ্যেষ্ঠামশায়ের বাড়ি তখন তাঁর বয়েস হবে প্রায় ছুড়ি বছর। মা রইলেন দেশের বাড়িতেই অশ্ব শব্দর, বৃন্দা শাশুড়ি ও মা-হার্য

এখানে কণ্টিকে নিয়ে। তখন তাঁর বয়স সবে পনেরো ছাড়িয়ে বোলয় পড়েছে।

আমাদের মা আমাদের সংসারে এসে শারীরিক অনেক কষ্টই পেয়েছেন। শরীর তাঁর তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে গিয়ে তিনি বিষম অস্বস্তির অসুখে পড়লেন। সে অসুখ মা'র আমার গিল। কিন্তু এত দৈহিক কষ্ট সত্ত্বেও মা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আপন কর্তব্যকে যে মহিমাম্বিত করে যেতে পেরেছিলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর দুই শব্দর—গোপীমোহন ও বৈকুণ্ঠেশ্বর—আন্তরিক আদরে ও আপ্যায়নে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গৃহ-দীপটি জ্বালিয়ে মা বসতেন তাঁর শব্দরের পায়ে কাছ। অনেক সময়ই তাঁর গা হাত পাটাতে হাত বুলিয়ে আরামও করিয়ে দিতেন। মা'র তখন বয়স হয়েছে বোল বছর কিন্তু তখনো মা'র ছেলিপলে হয় নি। বর্ষমানের কাছাকাছি থাকলে ঠাকুমা যে মাকে জাগ্রত সেই 'রাখাল বাজা' ঠাকুরের মন্দিরে নিয়ে যেতেন হত্যা দেবার জন্যে তাতে কোন সন্দেহই নেই। দুরত্বের ও খরচের বাহুল্যের জন্যে যখন সে চেষ্টা সম্ভব হোলো না তখন বৃন্দা তাঁর পিতলের মালার ডোঙাটা থেকে জপের মালাটা হাতে নিয়ে মোজার মত চেহারার একটা থলেব মধ্যে হাত গুঁজে মালা জপ করতেন ঠাকুরদার ঘরের দাওয়ায় বসে—বুঝি বা একটি নাতির আগমনেরই প্রত্যাশায়। আমার ঠাকুরা ছিলেন তখন দুর্গ্গিহীন। তিনি হাত বাড়িয়ে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতেন—'তব হইব, দেখিসু তব হইব—আমি কইয়া গোলাম তব হইব। ক্যাবল আমিই দেইখা যাইতে পারম না।' মা'রও বোধ হয় তখন 'ছেলে হয় নি, ছেলে হয় নি' এই অনুশোচনা শ্রুতি শ্রুতি মনের মধ্যে মাঝে মাঝে পিপাসা জেগেছিল। তাই অশ্ব শব্দরের এই আশীর্বাণীতে মায়ের চোখে জল এসে যেত। মা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন—'আমার শব্দরঠাকুরেব সেই আশীর্বাদই আসছে তরে লইয়া।'

আমার ছোট ঠাকুরা বৈকুণ্ঠেশ্বর ছিলেন অপূত্রক। তাঁকে আমি দেখি নি। কিন্তু ছোট ঠাকুমাকে দেখেছি। ছোট-খাট গৌবর্ণ মানুষ্যটি সন্তান না হওয়ায় বোধ হয় একটু খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন। আমার ছোট ঠাকুরা মনে মনে হয়ত ভয় করতেন—ভয়টা নেহাৎ ভিত্তিহীনও ছিল না—যে আমার মায়ের বোধ হয় খেতে ক্ষমত হয়। আহা, বড়লোকের কঁচি মেয়ে—ওকে দেখবার-শোনবার কে-ই বা আছে—এই ধরণের ছিল তাঁর ভাবনা। তিনি এক কাণ্ড করতেন রোজ। খাবার পত্র তিনি এক বাটি ঘন দুধে ভাত মেখে

খেতেন। গ্রীষ্মকালে তার মধ্যে বাড়ির গাছের আম কি কাঁঠাল গুলে নিতেন। তিনি যতটা পারতেন তার চেয়েও খানিকটা বেশি করেই মাখতেন। খানিকটা খেয়ে বাকীটা তিনি রেখে দিয়ে বলতেন—'সোনারবো তুই খাইচ'। ছোট পিসিমাও মাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি যে অশক্ত হয়ে কোনো কাজে মাকে সাহায্য করতে পারতেন না, তাঁর সেবায় মাকে যে আরো খাটতে হোত, এবং এই অনটনের সংসারে চারটি গিশদু-সন্তান নিয়ে এসে তিনি যে তাঁর বাপ-মাকে বিরত করে ফেলেছেন এই বোধ ছোট পিসিমার মনকে নিত্য-নিয়ত পীড়া দিত। বাবা ছিলেন তাঁর পিতৃপরিচি দাদা। খুব ভালবাসতেন সেই একমাত্র দাদাকে। সেই দাদার বোঁকেও পিসিমা ভালবাসতেন মায়ের স্বভাবের গুণে এবং আপন প্রাণের টানে। আমার ঠাকুমা-ও মাকে খুবই স্নেহ করতেন। অনটনের সংসারে মায়ের যে কষ্ট হোতো ঠাকুমা তা' তার জন্যে দায়ী ছিলেন না। মায়ের তখন পর্যন্ত ছেলে না হওয়ায় ঠাকুমা, একমাত্র ভয় ছিল বংশটা বুঝি লোপই পায়। সেইটুকু বুঝে মায়ের জন্যে তিনি বোধ-হয় মায়ের উপর একটু বিরূপ ছিলেন সেই সময়টাতে। কে জানে।

একই কর্মসূচী অনুসারে অনটনের মধ্যেই চলল মায়ের একঘরে জীবনযাত্রা। একমাত্র বৈচিত্র্য ছিল বাবার বাড়ি আসা ছুটির দিনে। দেহমনের সব ক্রান্তি ঐ কটা দিনে কোথায় যে চলে যেত কে জানে। আর ছিল গ্রামের সমবয়সী আর দু'টি বোঁয়ের সমবেদনা ও স্নেহ। তাঁরা ছিলেন পুঁরের বাড়ির মনোমোহন জ্যেষ্ঠামশায়ের স্ত্রী, আমাদের ছোটকা দাদার মা ও সেই বাড়িরই করুণা জ্যেষ্ঠামশায়ের স্ত্রী, আমাদের বটা দাদার মা। তেলিরবাগের এই তিনটি বোঁয়ের মধ্যে যে প্রগাঢ় সখ্য ছিল তা' বোধহয় সম্ভব হয়েছিল ছোট গ্রামে একসঙ্গে বাস করবার দরুণই। এ ছাড়া বিদু ভাইয়ের ব্যাটার বউ—যিনি সম্পর্কে মা'র নাতিবোঁ—ও মোহিনী দাদার বোঁ খুব আসতেন মায়ের কাছে। এই রকমেই কেটে গেল আরো বছর তিন-চারেক। তারপর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের আগে-পিছে আমরা দুই ঠাকুরা—গোপীমোহন ও বৈকুণ্ঠেশ্বর—দুই জনেই স্বগ্রাম তেলিরবাগেই দেহরক্ষা করলেন। ছোট ঠাকুমা কাশী-বাসী হলেন। আমার আপন ঠাকুমা—তেলিরবাগের সোনাঠাইন—তাঁর মায়ের ঘরের মা-মরা চারটি নাতি ও পুত্রবধূ সোনাবোঁকে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায় তাঁর ভাসুরপুত্র ভুবনমোহনের আশ্রয়ে। মা'র বয়েস তখন হবে উনিশ-গড়ি। টোনা দাদার বয়স তখন এগার কি দ্ব।

[ক্রমশঃ]

নব মন্ত্রিসভা প্রত্যাগমন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আসন্ন ঝড়ের সম্ভবত্ববোধে আপনাদের চুড়ান্ত আকর্ষণ করা আশ্চর্য্য বোধ করছি। যদি এখনই সচেতনতার অভাব ঘটে ও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা না হয়, তাহলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটা কিছুমাত্র বিস্ময়কর হবে না। যুক্তফ্রন্টের তরী চালনা মাকিদের ব্যক্তিগত দক্ষতা যতই থাক ও দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার যতই পাক ধরুক, তবু নিরাপদে তাঁরা বন্দরে ফিরে আসতে পারবেন না। যুক্তফ্রন্ট যে তরী চালনা করছেন তা এমনিতেই 'বীর্ষ' ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তার তলায় আছে অসংখ্য ছিদ্র ও জোড়াতালি। তাই আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রশাসনিক কাঠামো, পদ্ধতি ও ব্যবস্থার সংস্কারসাধনকে অপরিহার্য্য মনে না করলে ছিদ্র ও ভাঙাচুরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে ভরাডুবি আহ্বান করতে পারে। সাধারণ মানুষ যদি দেখে এই সরকারের পরিচালনার সঙ্গে বিদায়ী সরকারের কোন পার্থক্য নেই, যদি দেখে সেই হয়রানি, সেই দীর্ঘসূত্রতা ও অসদ্ব্যবহার চলেছে, তাহলে তারা প্রতিশ্রুতির সকল উল্লেখ চিরকৈ ছিঁড়ে ফেলতে দ্বিধা করবে না। বিশেষত যখন সরকারের পতন ঘটান সম্ভব এ বিশ্বাস জন্মেছে এবং যখন দেখেছে ভারতের রাজ্যে রাজ্যে সে পতন ঘটছে।

কিন্তু ঝড়ের সম্ভবত্ব বলতে আমি বাইবেল যজ্ঞবল্লভের কথা বলতে চাই। যে মোরসী স্বয়ং মালিকবা রাস্তারটি উৎখাত হয়ে গেল তাবা কিন্তু কক্ষে ভেঙে পড়ে নি কিংবা নীরবে অগ্রপাক্ত করছে না। তারা হতরাজ্য পনবশ্য করতে শূন্য বন্দপবিকর নয়, রীতিমতো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কলকাতা কর্পোরেশন ও ২৪-পরগনা জেলা পরিষদের নির্বাচন তার নমুনাযাত্র। কলকাতা পৌরসভা নির্বাচন শূন্য বিস্ময়কর নয়, ভাৎপর্ষপূর্ণ। কংগ্রেস তার দলীয় সংখ্যা ছাড়া অতিরিক্ত ভোট সংগ্রহ করেছে। অম্বচ নির্বাচনের আগের দিনে কংগ্রেস দলের কয়েকজনের ডিগবাজীও ঘটিছিল। অর্থাৎ কংগ্রেস, আব তার শক্তিকর্মকারী কোন ঘটনাকে উপেক্ষা করবে না এবং সেজন্য যে-কোন মূল্যে যে-কোন আপোষ ও যে-কোন বশোবস্ত করতে বিন্দুমাত্র দৌর করবে না।

তা ছাড়া পার্টি হিসাবে কংগ্রেসের কোথা-গারের সম্পদ এখনও অবিশ্বাস্য আয়তনে বর্তমান। ২৪-পরগনা জেলা পরিষদে কংগ্রেসের বিপুল ভোটাদিক্যে জয়লাভের ফলাফলও সুদূরপ্রসারী। যারা মনে করেন যে ওখানে পরাজিত হওয়ার আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই, কেন না অধিক সংখ্যক সদস্যরা কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন—তাঁরা কিন্তু অনুদানে ও বিশেষণে ভুল করছেন। এখানে নির্দলীয় সদস্য আছেন বেশ কিছু—সংখ্যক অবশ্য গারে কংগ্রেসী নামাবলী জড়িয়ে, কেবল কাজকর্মের সুবিধা হবে এই আশায়। তাঁরা কংগ্রেসের চার-আনা সদস্যও নন। এমন কি একজন সদস্য থাকে কংগ্রেস গত নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতার জন্য দু' বছরের জন্য বহিস্কৃত করেছে তিনিও কংগ্রেস সমর্থন করেছেন প্রকাশ্যে প্রস্তাবকের পাশে নিজেকে সমর্থক হিসেবে ঘোষণা করে।

জেলা পরিষদে সদস্যদের চরিত্র জানা দরকার ও মূলত দু'ভাগে ভাগ করে দেখতে হবে। সকল সদস্যরা প্রায় পদাধিকার বলে সদস্য—একদল আইনসভা ও পালামেন্টের সভ্য হিসাবে পদাধিকারী হয়ে এসেছেন আর একদল এসেছেন আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতির পদাধিকার বলে। কিন্তু আইনসভার সদস্যরাই এভাবে জেলা পরিষদ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছিলেন। আইনসভার সদস্যদের প্রভাবই এখনও কার্যকরী এবং নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ডাইস-চেয়ারম্যান দু'জনেই বিধানসভার সদস্য। কিন্তু আইনসভা সদস্যদের সর্বা-পেক্ষা মোটা অংশ এখন যুক্তফ্রন্টের দখলে। ৫০ জন বিধানসভা সদস্যের ৩৮ জনই যুক্তফ্রন্টের। একটি লোকসভা সদস্য কংগ্রেসের নেই। তবেও তারা অন্য সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। বিশেষত ঐ সভাপতি-সদস্যদের এলাকায় বেশির ভাগ বিধানসভা সদস্য পদ যুক্তফ্রন্টের দখলে গিয়েছে। এ সত্ত্বেও তারা সরাসরি যুক্তফ্রন্টকে তাদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে—ডর পাওয়া দূরের কথা। এরা জানে সবক'ব তাদের দলীয় নয় এবং এরা এও জানে সরকারের বিবোধিতা কবে আঞ্চলিক পরিষদের কাজকর্ম সূগম হবে না। তবেও তারা কোন দু'সাহসে যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করতে সক্ষম হল? আজ যদি

যুক্তফ্রন্ট সরকার এই বিষয়ে সচেতন না হন বা কারণ অনুসন্ধান না করেন তা' অদূর ভবিষ্যতে বিপর্যয় এড়ানো যাবে না।

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার দু'মাসের মধ্যে দিকে দিকে যেমন জন-সমর্থন লাভ করছেন, ঠিক বিপরীতে তেমনি শত্রুপক্ষ যজ্ঞবল্লভের জাল পেতে চলেছে। যুদ্ধং দেহি বলার অপেক্ষায় ওৎ পেতে আছে কোন রকম ভীতিবোধ না করে। আজও যখন জন-সমর্থন ঘটছে অজ্ঞপ্রথার তখন শত্রুপক্ষ তাকে কোন পরোয়া না করেও প্রত্যাঘাত করতে এগিয়ে এসেছে। সোজা কথায় এই সবকারকে ভয় করার কিছু নেই, এ এক নিছক চোড়া সাপ কৌস করলেও বিষদীত নেই এই ধাবণাই বশ্মমূলে হয়ে উঠেছে শত্রুপক্ষের কাছে। তাই দৃষ্টান্তকারী যারা কিছুদিনের জন্য অশ্বকারে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয়লাভ করছিল, তারা আবার প্রকাশ্যে রাহাজানি করতে বেরিয়ে পড়েছে। ২৪-পরগনা জেলা পরিষদের নির্বাচনের কথা স্মরণ করুন। যে বেশির ভাগ সদস্য আঞ্চলিক পরিষদ সভাপতি, তাদের বেশির ভাগের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে টেস্ট বিলিফ ইত্যাদির বিষয়ে বেশির ভাগের হাত পরিষ্কার নয়। এমন কি কয়েকজনের বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত চলেছে। এ ছাড়া আরও একজন পদাধিকারী সদস্য আছেন—তিনি ২৪-পরগনা স্কুলবোর্ডের সভাপতি। গত নির্বাচনে কংগ্রেসী প্রয়োজনে অসংখ্য শিক্ষক ও বিদ্যালয় সঙ্কটের পিছরে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘ দিনের নানা দুর্নীতির অভিযোগ আছে এই বোর্ডের বিরুদ্ধে। তবুও তারা ভয় পেল না, যুক্তফ্রন্টের সবকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন কববেন এ ঘোষণা বার বার কবা সত্ত্বেও। আবও লক্ষণীয় বিষয় যে এই নবনির্বাচিত চেয়ার-ম্যানের বিরুদ্ধে অতীতে বহু বিষয়ে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সংবাদপত্রে ও বিধানসভায়ও এই ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই অভিযুক্ত দুর্নীতিবাজরা প্রকাশ্যে যখন চ্যালেঞ্জ জানাতে বেরিয়ে পড়েছে, তখন অপকাশ্যে তাদের প্রস্তুতি যে বিরাট ও ব্যাপক একথা অনুধাবন না করলে মূঢ়তা প্রকাশ হবে মাত্র।

সং নাগরিকরা যুক্তফ্রন্টের সরকারকে

এই দিন

শ্রমীণ চক্রবর্তী

এই দিন

রক্ত রঙিন।

কৃষ্ণচূড়ার ডালে কার উজ্জ্বল।

করকপ্সালে আজ মহা উজ্জ্বল।

ফেব্রুয়ারির কাছে আমাদের স্বপ্ন।

এই দিন : এই পথ থাক চিরদিন।

বিশ্বের ঐক্য

আমাদের লক্ষ্য;

জীবনের সংগ্রামে মুখের আকাশ।

চক্রবর্তীতে চক্রবর্তীতে আগুনের শিখা।

মাঠে মাঠে শিবে শিবে নব ছন্দিকা।

নেই উদ্ভত ভাঙ্গা,

শব্দ আছে অভিসন্ধি।

চারিদিক ডাক দিক সেই ইতিহাস॥

দীর্ঘস্থায়ী দেখতে চান কিন্তু সরকারের কার্যাবলীতে হতাশ বোধ করছেন। যারা সমাজদ্রোহী বলে পরিচিত, যে প্রতিষ্ঠান-গুলি প্রতিষ্ঠানশীল বলে চিহ্নিত তারা কিছুদিন চূপচাপ থেকে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রথম প্রথম এরা সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই জল্পদিনের মধ্যে সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। আজও কালোবাজারীরা নিষ্ঠুরে কালোবাজার আলো করে রেখেছে। সেই সব পুঁজি শ্রমিকদের অত্যাচার আর দুর্নীতিতে দেশের মানুষ চাহি চাহি ডাক ছেড়েছিল—তারা স্বপদে সমান মহিমা বিরাজ করছে। কোথাও কোন দুষ্কৃতকারীর ভয় পাবার কোন কারণ নেই। সেই ঘৃণ, সেই দর্শনী ও সেই হস্ত-রানির কোন পরিবর্তন হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে বেপরোয়া ভাবটা একটু গোপনীয়তার পর্দা টেনে চলছে। হয়ত নতুন মন্ত্রিসভা অতীতের কেরল সরকারের ঘটনার কথা মনে রেখে একটু ধীরে ধীরে চলতে চাইছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে সকল অশুভশক্তি মাকড়সার জাল পেঁখে ফেলেছে সেটি বোঝা দরকার। তা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে, প্রশাসনিক দপ্তরের ওপরতলার বৈশিষ্ট্য ভাগ কর্মচারী এই সরকারের শক্তি ও সুনাম বৃদ্ধি হোক তা চান না। তাই এক গভীর নৈরাশ্য-বোধ করছেন। তাঁদের ক্ষমতার মধ্যে হস্তক্ষেপ হচ্ছে ভেবে তাঁরা অস্বাভাবিক ভাবে উঠেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যায়ী পক্ষে ক্যাম্পকে মিত্রপক্ষীয় মনে করছেন। কংগ্রেসী শাসনে অপ্রতিহত ক্ষমতা ব্যবহারের মোহে তাঁরা নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রিসভার ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে রাজী নন। অবশ্য মন্ত্রিসভার নবলক্ষ্য ক্ষমতার অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ অপব্যবহারের পর্দায় পড়ছে কিছু কিছু। ফলে শত্রুপক্ষের

হাত জোরাগো হয়ে পড়ছে। কার্যে মীমাংসা, পুঁজিপতি মনোভাব বা সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ-বাদীদের চক্রান্ত বলে গালি-গালাজ করে আত্মসন্তোষ লাভ করা যেতে পারে—কিন্তু তাতে সরকারের শক্তি ও সুনাম বৃদ্ধি ঘটবে এমন সম্ভাবনা নেই। এই উদ্ভিতে শত্রুর শক্তিতে যে ভাঙন ধরবে এমন নিশ্চয়তা আছে কি? অনিচ্ছতার দরুণ অপব্যবহার ঘটলে সংশোধনের পথ খোলা থাকে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের শত্রুদের নিজ নিজ সংগঠন-স্বার্থে স্বেচ্ছাকৃত ব্যবহার হতে দেখলে সংশোধনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। “কৃষকদের জরুরী সমস্যা সমাধানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের করণটি আশু সিদ্ধান্ত” নামে এক মূর্খিত কপি প্রশাসনিক দপ্তরকে বাদ দিয়ে গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক পার্টি দ্বারা বিলি করা হচ্ছে এবং বিলি করার সময়ে যে সমস্ত প্রবোচনামূলক কথা বলা হচ্ছে তা কি দায়িত্ব ও শাসন-শৃঙ্খলা সম্মত? গ্রামেব শ্রমবৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা যে আতঙ্কিত বোধ করছেন—একথা কি অনুসন্ধান করে দেখবেন?

আরও একটি বিষয়ে জনসাধারণ বিভ্রান্ত বোধ করছে ও শত্রুপক্ষের সক্রিয় হাত লক্ষ্য করছে। ওপরে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও সুপার ক্যাবিনেট এক যৌথ-প্রচেষ্টায় কাজ-কর্ম চালাতে চাইছেন—কিন্তু নিচে সাংগঠনিক লাইনে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাক-নির্বাচন পর্বের মত কটু-কটু দোষারোপ ও আপত্তিকর ব্যবহার করে চলেছেন। মানুষের চোখে যদি যুক্তফ্রন্টের সম্মিলিত প্রচেষ্টা মেকী ও ছন্দবোধ বলে প্রতিভাত হয় তা হলে এই সরকার আদর্শে অনুকূল আবহাওয়া বজায় রাখতে

পারবে কি না ভেবে দেখা দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের শত্রুদের দলের উচ্চতম নেতৃত্ব এমন সব কথাবার্তা বলছেন যাতে জনসাধারণের মনে ঐক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগার সম্ভাবনা। গত ২৪শে এপ্রিল এস-ইউ-সি পার্টি ময়দানের জনসভায় যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা আর ঘাই হোক, ঐক্য সহায়ক নয়। তা ছাড়া ‘টিম স্পিরিট’ বলে একটা কথা আছে। যখন সকল দল মিলে সম্মত হয়ে একটা কর্মসূচীর ক্ষতিতে একটা সরকার গঠন করা হয়েছে তখন প্রত্যেক দলের নীতি ও পথের সূক্ষ্ম ধারা থেকে বিচ্যুতি মেনে নিষে আপোষ হয়েছে। যদি বিপ্লব ছাড়া অন্য গতান্তর না থাকে এবং বিপ্লব জন্ম দিতে একমাত্র মনোপলি অধিকার কোন দলের থাকে তা হলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কি প্রথম অপবাধ হয় নি? অবশ্য যদি মন্ত্রিসভা অংশ গ্রহণ পার্টি বিস্তৃতি লাভের অন্যতম হাতিয়ার হয় তা হলে অন্য কথা। কিন্তু জনসাধারণ ধোঁকাবাজি ধবতে সক্ষম এ প্রমাণ গত নির্বাচনে দিয়েছে। আজ যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ধরনের অনেক সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো সম্বন্ধে সজাগ না হন তা হলে আত্মতৃষ্ণায় অপমত্যু ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

এখনই কংগ্রেস বলতে আরম্ভ করেছে যে, আগামী জুলাই মাসে আবার তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বাজেট পেশ কববেন। শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশি বলে বৃদ্ধিমানের মত যুক্তফ্রন্ট বিষয়টা নস্যাৎ করে দিলে আমরা সূখী হবো। কিন্তু জেলা পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফলকে আমরা ইবান কোণে ঝড়ের লক্ষণ বলেই আশঙ্কা করছি।

—এস কে শক্তি



স্বাধীনতা

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারের পতন হবার পর থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত জনজীবনে যে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল সেই স্মৃতি একটি শাস্বত সম্পদ। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ঘিরে জনসাধারণের প্রত্যাশা অসীম। তবে এ কথাও ঠিক যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শক্তি সীমাবদ্ধ; কেন না রাষ্ট্রশক্তির, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক শক্তির শতকরা আশী ভাগই যেখানে কেন্দ্রের কৃষ্ণগত, সেখানে রাজ্যসরকারের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, সামগ্রিক কোন সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনা আপাতত সম্ভব নয়। জনসাধারণের যে অংশটি রাজনীতি সচেতন তারাও তা আশা করেন না।

তথাপি সীমাবদ্ধ পরিসরে যুক্তফ্রন্ট সরকার অনেকগুলি ভাল কাজ করেছেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্ততপক্ষে তারা জনসাধারণকে এটুকু বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছেন যে তারা প্রাপ্ত কংগ্রেসী সরকারের মত ধনিক-তোষক নন, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি তারা পূর্ণ করার জন্য সত্য সত্য রয়েছেন। ইতিমধ্যেই তারা অনেক অগণতান্ত্রিক আইন তুলে দিয়েছেন এবং অনেকগুলি সংস্কার-মূলক কাজ করেছেন। আমরা পূর্বে সেই কাজগুলির একটি তালিকাও পেশ করেছিলাম। এ কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁদের প্রাপ্য।

তবু একটা কথা বলার আছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা অত্যন্ত ভালোমানুষীয় স্বারা চালিত হচ্ছেন। তাঁরা মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের শ্লোগান তুলেছেন। কিন্তু নৈতিকতার কাছে আবেদন জানিয়ে এদেশে কোন

কাজ হবার নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান মহল থেকে নৈতিকতার নিকট অজস্র আবেদন জানিয়ে এদেশে কোন কাজ হয় নি। গান্ধীজীও মানুষের নীতিবোধের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু নিজের চেলাঘেরই তিনি নৈতিক করে তুলতে পারেন নি। কমিউনিজমের সাতশো কেতাব হজম করেও মানবেন্দ্রনাথ রায় শেষ পর্যন্ত মানুষকে পরম নৈতিক এই সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন, কিন্তু মানুষ যে প্রকৃতিগতভাবে নৈতিক, ভারতবাসীর দিকে তাকিয়ে একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব। বরং হব্‌স্ বা বলেছেন তাই কিছুটা সত্য : আমরা যেটুকু নৈতিক আচরণ করি তা শুধু মার খাবার ভয়েই।

এই কারণেই সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তের স্মৃতি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। অর্থাৎ কিছু অন্যান্যকারী রীতিমত উত্তম-মধ্যম সাজা পেলেই বাকি সব আপনিই শাস্যতা হয়ে যাবে। এবং জনসাধারণ এই মূর্ত্তে এটাই প্রত্যাশা করছেন। আমরা পূর্বে কোন একটি সংখ্যার বঙ্গদর্শনে লিখেছিলাম যে মহাভারতের ভীম চরিত্রটি এত জনপ্রিয় এই কারণে যে, তিনি উৎকট অপরাধের উৎকট শাস্তিবিধান করতে জানতেন। সমসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে পিছন থেকে কি কলকাটি নেড়ে গেছেন, তা নিয়ে শঠিক বা প্রোতারা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু যখনই গদাহস্তে যাত্রার আসরে ভীমকে দেখা গেছে, প্রোভাদের চোখেমুখে কুটে উঠেছে আনন্দের দীপ্তি, কেন না তারা যুগ যুগ ধরে এই লোকটিকে খুঁজে

চলেছেন, অন্যান্যকারীর যুদ্ধের রক্ত পান করতে যিনি সভ্যতাসিঁড়ি কোন বাতি-কের স্বারা বিদ্রাস্ত হন নি।

এই কথাটা বিশেষভাবে এই কারণে বলা যে কংগ্রেসী আমলের বিজ্ঞান দূর্নীতির জন্য এ পর্যন্ত কেউ সাহো পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই কথা স্পষ্টভাবে বার বার বলেছেন যে, প্রতিটি দূর্নীতিয় ব্যাপারকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করে দোষীদের শাস্তিবিধান করবেন। কিন্তু সেইরকম কোন ব্যাপক তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বলে কোন সংবাদ আমরা পাই নি। ফলে যারা দূর্নীতিতে অভ্যস্ত তারা ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করেছে যে বর্তমান সরকারও বিগত কংগ্রেস সরকারের মত যতটা গর্জাল ততটা বর্ষান না।

অবশ্য মাত্র দু' মাসের মধ্যেই সব কিছু আশা করা হয়ত সম্ভব নয়, তবুও মনে হয় যে যুক্তফ্রন্ট সরকার অধিকতর দৃঢ় হলে বোধ হয় আরও ভাল হত। সদিচ্ছার স্বারা ব্যবস্থা রদবদল করা যায় না। মোজেস বলেছিলেন, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ। এই নীতি বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

এ কথা সত্য যে প্রচলিত ব্যবস্থাকে রাতারাতি উল্টে দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সরকার ইচ্ছা করলে সেই ব্যবস্থার দাস না হয়ে প্রভু হতে পারেন। এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, বর্তমানে যে ধরনের আমলাতন্ত্র প্রচলিত আছে তা বাতিল না করা পর্যন্ত মৌলিক কোন কাজ করা সম্ভবপর নয়। এই আয়লা-তন্ত্রকে হয়ত এই মূর্ত্তে বিদায় করা যাবে না। কিন্তু তার উপরে মন্ত্রীদের

সাম্প্রতিক বঙ্গমন্ত্রী

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা মোটেই অসম্ভব নয়। সেটা নির্ভর করে মন্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের উপর। সাংবাদিক হিসাবে আমরা কোন কোন মন্ত্রীর ভয়ে আমলা-তান্ত্রিক প্রধানদের খর খর করে কাঁপতে দেখেছি। আবার এও লক্ষ্য করেছি যে অনেক মন্ত্রী আমলাতান্ত্রিক প্রধানদের কথাতোই ওঠা-বসা করেন। শেষের পৃথটি বিপজ্জনক, আর এই পথে পা দিয়েই কংগ্রেস সরকারের পতন হয়েছিল।

এই কারণে আমরা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন আত্মসম্বুদ্ধি মনোভাব ত্যাগ করে অধিকতর দৃঢ় হন। জগৎ শক্তির ভক্ত নরেন্দ্র বর্ম। এই কারণে আজ সরকারকে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তাঁরা নিজেরা যেমন অনায়াস করেন না, তেমনি তাঁরা অনায়াস সহ্যও করেন না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই মন্ত্রণে জেহাদ ঘোষণা করা হোক। প্রতিটি দপ্তর সম্বন্ধে তদন্ত কমিশন বনানো হোক, এবং অর্থ ও অপরাধের শক্তির অপব্যবহারের প্রমাণ থাকলে বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে তাদের কঠিন শাস্তিবিধান করা হোক। মানুষ এতেই সূচী হবে, এবং এতে জনমানসে যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাধীন-প্রভাব বরবর থেকে যাবে।

পদলিখ

এটা আশা করা গিয়েছিল যে কংগ্রেসী শাসনের অবসানের পর পরিবর্তিত পরি-স্থিতির সঙ্গে পদলিখ খাপ খাইয়ে নেবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে সর্বত্র তা সম্ভব হয় নি। এটা সম্ভবপর হচ্ছে না উপরতলার কয়েকজন অফিসারের জন্য, এ তথ্য পদলিখমহলে অনুসন্ধান করে জেনেছি।

পদলিখের কাজ “ল এবং অর্ডার” বক্ষা, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এই প্রাথমিক কাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে পদলিখ উদাসীন রয়েছে। আমাদের অফিসে কুফনগর থেকে এমন একজন ব্যক্তি কিছুদিন আগে এসে-ছিলেন বাকি রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষের হাতে সপরিবারে দৈহিকভাবে রীতিমত প্রহত ও লাঞ্চিত হতে হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর জন্য পদলিখ কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নি।

নিশ্চয়ই যুক্তফ্রন্ট সরকার পদলিখ-বাহিনীর প্রতি এমন কোন নির্দেশ দেন নি যে পদলিখ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্বটুকু পালন করবে না।

বাগমারী দক্ষিণে ঘটনার সময়ও পদলিখের বিরুদ্ধে নিষ্কৃত্যতার অভিযোগ এসেছে। চিরকালের প্রথাই হল আইন ও

শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পদলিখ নিজ সিংহাসনেই কাজ করবে, এবং তার আচরণ সম্বন্ধে কোন কথা উঠলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার পক্ষেই আইনসভার জবাবদিহি করবেন (যদি অবশ্য অধিকারের মাত্রা না ছাড়িয়ে যায়)। পদলিখের নাকের ডগার উপর মারামারি হওয়া সত্ত্বেও পদলিখ হাত-গুটিয়ে বসেছিল। অর্থাৎ এ থেকে এ কথাই দাঁড়ায় যে যেন চোর-ডাকাত ধরতে গেলেও মন্ত্রিসভার অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

অথচ যুক্তফ্রন্ট সরকার পদলিখকে নিজ কর্তব্য অধিকতর দায়িত্বসহকারে পালনের জন্যই আহ্বান জানিয়েছিল। মধ্যমস্তরী স্বয়ং পদলিখদের সভার তাদের সহযোগিতা চেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে সীমান্ত পথে প্রচুর চাল প্রত্যহ পাচার হচ্ছে, কিন্তু পদলিখের নিষ্ক্রিয় আচরণের জন্য তা ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

অথচ সামগ্রিকভাবে পদলিখবাহিনী কিন্তু আধিকৃত উৎসাহেই কাজ করতে ইচ্ছুক। এমন পদলিখ কর্মচারীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি যিনি কংগ্রেসী আম-লের তুলনায় স্বিগুণ উৎসাহে কাজ করছেন, এবং মজুত চাল প্রচুর উল্লেখ্য করে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য হল সামগ্রিকভাবে তাঁরা সকলেই অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু পদলিখ লাইনে সার্ভিসেশনের প্রশ্নটি বড় মারাত্মক। উপবণ্ডবাদের মজির বিরুদ্ধে কোন কাজ করা চলেবে না, তা সে কাজ বতই সং উদ্দেশ্যে করা হোক না কেন। ফলে মর্দুটিমেয় ডি, আই, জি, এবং এস, পি’র জন্য তাঁরা অধিকতর উৎসাহে কাজ করতে পারছেন না।

বিষয়টি সত্যই গুরুত্ব চিন্তাসাপেক্ষ। কংগ্রেসী আমলে এই স্তরের অফিসারেরা প্রচুর সুযোগ-সুবিধে ও মজা লুটেছেন। এঁরা বর্তমান পরিবর্তনকে মোটেই ভাল চোখে দেখতে রাজী নন। কাজেই তাঁরা পবাক্ষে পদলিখবাহিনীকে ‘গ্রে কোলড’ এই নীতি গ্রহণ কবতে নির্দেশ দিয়েছেন। একজন ডি, আই জি’র বিরুদ্ধে কংগ্রেসী রাজনীতি করার অভিযোগ তো আই, পি, এস অফিসারেরাই এনেছেন। কাজেই এই শ্রেণীর লোকেরা তো সর্বক্ষেত্রেই অসহ-যোগিতা করবে।

এই কারণে পদলিখ বিভাগের উপর-তলার খুব বড় রকমের রদবদল ঘটাবার প্রয়োজন এই মন্ত্রণে আছে। সরকারকে এ বিষয়ে আমবা অবহিত করছি।

শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি নিবেদন—(০)

বিগত দু’টি সংখ্যায় আমরা শিক্ষা-মন্ত্রীর নিকট বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ

অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছি যে, ম্যানেজিং কমিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির গঠনতন্ত্র অমূল্য পরিবর্তন করতে না পারলে বিদ্যালয়গুলি কোনদিনই শিক্ষা-দানের উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারবে না। এই কারণেই আমরা সুপারিশ করেছি যে, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য যিনিই হোন, না কেন, তাঁর পক্ষে সেই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেন না যে বিদ্যালয় থেকে তিনি শিক্ষালাভ করে গেছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ থাকবে, তা’ তাঁকে এমন কোন কর্মে প্রবৃত্ত করবে না যা বিদ্যালয়ের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

শিক্ষকতা বাঁরা করেন তাঁদের কথা এবারে আসছে। বেতন বাড়ানোর চেয়েও শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনটা আরও অনেক বেশি। শিক্ষক সম্প্রদায় আজ একটা হীনমন্যতায় ডুগছেন। আজকের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজেই শিক্ষক বলে পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করেন। এর কারণ এই নয় যে তাঁরা কম বেতন পান বলে অর্থকুলীন সমাজে অপাত্তের। আগেকার দিনে এমন ছিল না, যদিও তখন শিক্ষকদের বেতন অনেক কম ছিল এবং বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সর্বোচ্চ ছাপ নিয়ে খুব কম লোকই তখন শিক্ষকতায় আসতেন। তথাপি সেসবুগের শিক্ষকরা কোন কমপ্লেক্সে ডুগতেন না যে রকম ভোগেন এ যুগের শিক্ষকেরা। তখন শিক্ষকদের বেতন তেমন না থাক, কর্মে স্বাধীনতা ছিল, যা তাঁদের বাঁর সেটুকু গুণ ছিল সেটুকু গুণের স্বীকৃতি ছিল, যে কারণে অর্থ না থাক, নিজেদের মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁরা রীতিমত সজাগ ছিলেন। আজকের এমন-এ পাশ শিক্ষক, চাকরিতে ঢুকেই প্রায় দু’শো পঞ্চাশ টাকা বেতন পান, যা খুব খারাপ নয়, অন্তত অন্যান্য চাকরির সঙ্গে তুলনা করলে। আমার নিজের ধারণা বেতন যতই বাড়ানো হোক না অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের পরিবর্তন না কবলে শিক্ষকদের হীনমন্যতাবোধ দূর হবে না, আর তা না হলে তাঁরা মন দিয়ে কোনদিনই ছাত্র পড়াতে পারবেন না।

আজকের শিক্ষক যে অভাবট: সবচেয়ে বেশি বোধ করেন তা’ হচ্ছে স্বাধীনতার অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী-ধারী যে ব্যক্তিটি পড়াতে এলেন তাঁকে যদি পদে পদে ইনকিয়ারর এলিগেণ্ট-সমূহের মন জুড়িয়ে চলতে হয় তার চেয়ে বিভ্রম্যাকর আর কিছুই নেই। যিনি যে বিষয়ে দক্ষ তাঁকে সেই বিষয়ের ক্লাস দেওয়া হয় না। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই উপরের ক্লাসগুলি স্টুডেন্টস কন্সজন্সের করায়ত্ত থাকে কেন না টুইশান-স্বার্থ

আছে। কাজেই মনোমত ক্ষেত্র না পেয়ে প্রথম স্তরে তাঁরা শিক্ষার্থী, এবং বিত্তীয় স্তরে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। যিনি নিজ কর্মক্ষেত্রেই নিজ ব্যক্তিগত গোড়াতেই খুঁইয়ে বসলেন, বা তা করতে বাধ্য হলেন, বাইরের জীবনেও সেই মনোভাবের স্ফারাই তিনি চালিত হতে শুরু করলেন।

বি. টি. পাশ করে তাঁরা শিক্ষাদান সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করে এলেন, যদি সেভাবে তাঁরা বিদ্যালয়ে পড়াবার চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁরা কতৃপক্ষ ও আর সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হবেন। অথচ আমি বিশেষভাবে জানি বি. টি.-তে শিক্ষণ সম্বন্ধে শিক্ষকেরা যে শিক্ষালাভ করেন তা সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা' কাজে লাগানোর কোন সুযোগ না থাকায়, শিক্ষকমশাইরা হতাশ হয়ে পড়েন। ফলে যে শিক্ষা তাঁরা লাভ করে এলেন নিজেরাই সেই শিক্ষাকে বাস্তব করতে শুরু করেন, এবং যদি-ই বা কোন উৎসাহী শিক্ষক সেই পন্থা অবলম্বন করে পড়াতে আরম্ভ করেন, তিনি তাঁর সহকর্মীদের এমন শাণিত ব্যঙ্গের কবলিত হন যে, নিজের পবিত্রত্যাগ করতে বাধ্য হন।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি? মনের দিক থেকে কতখানি দেউলে হয়ে পড়লে নিজ অর্জিত বিদ্যার প্রতি নিজেই বিদ্বেষ করেন তা' থেকেই বোঝা যায়। শিক্ষক-মশাইরা খোলাখুলিভাবেই বলেন যে, তাঁরা বি. টি. পড়তে হান বর্ষিত স্কুলে বেতন পাবার জন্য। অথচ শিক্ষকমশাইরা যে তাঁদের শিক্ষা পন্থাভিত্তিক অবলম্বনে পড়াতে নারাজ তা' নয়, কিন্তু সে পরিবেশ কোথায়? এর জন্য বিদ্যালয় কতৃপক্ষকে কোন অর্থব্যয় করতে হবে না, প্রয়োজন সহানুভূতির, সং প্রচেষ্টাদ্বারা স্বীকৃতি দানের। কিন্তু এটুকুর অভাবেই আজকের শিক্ষক ক্রান্তেই পড়ে।

আমি আমার নিজের কথা কিছু বলি কেন না বেশ কিছুকাল শিক্ষকতা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করতাম সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, সভ্যতা ও বিদ্যাবিশিষ্ট সব কিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন সেই অশ্রুপূর্ণ একজন আদর্শ-পুরুষ। সেই রকম মহৎ ব্যক্তিত্বের পরিচর আমি জীবনে অল্পই পেয়েছি। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেও সেখানে শিক্ষকতা করতেন, অবশ্য বেতন না নিয়ে। আমাদের তিনি বলে দিয়েছিলেন, এ তোমাদেরই ইচ্ছা, যা ইচ্ছে তাই করো। ইচ্ছা না ছিল হাজার কড়া কড়ি, শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে না গেলেও ক্ষতি ছিল না, এককথায়

ইচ্ছা না হলেই রাজি ছিল। এমন এক কোন লীডারশিপ ছিল না। কিন্তু শিক্ষক-মশাইরা কোনদিনই তাঁদের সেই অধিকার-গুলির অপব্যবহার করেন নি। বেতন ছিল অত্যন্ত, তখনকার অন্য যে কোন ইচ্ছার তুলনায় প্রায় অর্ধেক, কিন্তু তা' নিয়ে কারো কোন অভিযোগ ছিল না। আমরা ইচ্ছাটাকে নিজস্ব মনে করতাম। প্রয়োজনে ইচ্ছা বসার আগে আমরা বাড়তি ক্লাস নিতাম, প্রয়োজনে গ্রীষ্ম বা পূজাবকালের মধ্যেও নিয়মিত ক্লাস নিতাম। এগুলি আমরা করতাম নিজেরাই দায়িত্বে, আমাদের কেউ তা' করতেনও বলে নি। আবার ভাল না লাগলে কোন ক্লাসে গিয়ে বলে আসতাম যে 'তোদের এ ক্লাসটা আজ নেব না'। যদিও একজন হেডমাস্টার ছিলেন, আমাদের মালিক কেউ ছিল না, আমরা নিজেরাই ছিলাম নিজের মালিক। ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্কও ছিল আশ্চর্য সন্দর। আর তখন রেজাল্টও ভাল হত।

তারপর একদিন সেই মহৎ ব্যক্তিত্বের মৃত্যু ঘটল। ধীরে ধীরে অব্যাহত লোকেরা ইচ্ছার মাথায় চেপে বসল। তাদের কাজও হল শিক্ষকমশাই-এর ছিদ্রাশ্বেষণ, কে ইচ্ছা এক মিনিট দেরি করে এসেছেন। তারা আবার ছেলেরদের ভেতর থেকে আড়কাঠি তৈরি করে, কোন শিক্ষক ক্লাসে কি পড়াচ্ছেন তার হিসাব নিতে আরম্ভ করলেন। আর সেই দিন থেকেই শিক্ষকতার মানেরও অবনতি ঘটল। আগে নিয়ম ছিল ক্লাসের আগে শিক্ষকমশাইরা হাজির হলেই হল, আর ক্লাস শেষ হলেই তাঁরা চলে যেতে পারতেন। যার প্রথম পরিয়ড়ে অক্ষ আছে তাঁর একটু দেরি করে এলেও চলত, বা যার পঞ্চম পরিয়ড়ের পরে সৌদিনের মত আর ক্লাস নেই, তিনি চলে যেতে পারতেন। এতে ইচ্ছারও কোন ক্ষতি হত না, আর শিক্ষকমশাইদের কোন ব্যক্তিগত কাজ থাকলে ওই সময়ে তাঁরা তা করতে পারতেন। এখন নিয়ম হল যে তাঁদের দশটার হাজির হতেই হবে এবং বিদ্যালয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতেও হবে। এর ফলে ক্যাডুয়াল লীডার সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করল বা আগে একেবারেই ছিল না বললেই চলে। নিয়ম-কানুন ও কৈফিয়তের চাপে শিক্ষকমশাইরা তাঁদের পূর্বকার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেললেন। তাঁরাও রুটিন ওয়ার্কে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। সে আগ্রহ আর নেই, কোনক্রমে দিনগত পাগল্য করা।

আমার পক্ষে অবস্থাটা আরও শোচনীয় হয়েছিল, কেন না আমি ছিলাম অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ, অতীতের দিন-গুলির সঙ্গে নতুন পরিস্থিতির তুলনা করে সর্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করতাম।

যে আমি অতীতে কারো নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও নিজের বরাদ্দ ক্লাসগুলি ছাড়াও দিনের পর দিন অসংখ্য একস্ট্রা ক্লাস নিয়েছি, ইচ্ছা বসার আগে ও ইচ্ছা শেষ হবার পরে, সেই আমাকে দু' মিনিট দেরির জন্য যদি কৈফিয়ৎ তলব করা হয় তাহলে তা মনের দিক থেকে মনে নেওয়া শক্ত। কাজেই আমার সঙ্গে প্রায় প্রত্যাহই গণ্ডগোল লাগত। তবুও আমি যতদূর সম্ভব মনোবোঝা দিয়ে ছাত্রদের প্রতি আমার কর্তব্য পালনের চেষ্টা করতাম।

কিন্তু চরম আঘাত একদিন এল অন্য ভাবে। এগারো ক্লাসে আমি পড়াতাম ধর্মবিজ্ঞান। আমার পড়ানোর বিষয় সৌদির ছিল 'অনুন্নত দেশের আর্থিক উন্নয়ন' সেই প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে অনুন্নত দেশে নেতৃত্বের সময় আর্থিক উন্নতির পথে একটি রীতিমত বাধা। জনৈক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যের পুত্র সেই ক্লাসের ছাত্র ছিল। পরদিন প্রধান শিক্ষকমশাই আমার ডেবে বললেন যে সেক্রেটারী নোট পাঠিয়েছেন যে তুমি ক্লাসে রাজনীতি করছ, সরকার-বিরোধী কথা বলছ। আমি সর্নিয়ে তাঁকে জানালাম যে এ কথা বইতেই লেখা আছে, এবং বই খুলে তা দেখিয়েও দিলাম। তা সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষকমশাই আমার বললেন যে, তুমি আরও সতর্ক হয়ে ক্লাস নেবে।

হ্যাঁ আমি চরম সতর্কই হয়ে গেছিলাম এর পর থেকে ষড়দিন ইচ্ছা ছিলাম ততদিন ক্লাসে শব্দ পাঠ্য বইটা খুলে রীডিং পড়েই গেছিলাম। তার চেয়ে বেশি একটি কথাও বলি নি। যখন ইচ্ছা থেকে একেবারেই বিদায় নিলাম, তখন আমার মনে কোন বেদনাবোধেরই উদয় হয় নি।

উপরি-উক্ত ঘটনাটি থেকে একটি বিষয়ই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষকতা কোন যান্ত্রিক বিষয় নয়, এবং তা সার্থক হতে পারে একমাত্র উপযুক্ত পরিবেশ থাকলে, এবং তা তৈরি করতে অর্থ লাগে না, একটি পয়সাও ব্যয় হয় না। যেখানে প্রধান শিক্ষক পাঠের দালাল সেক্রেটারীর চরণে তৈর প্রদানে নিযুক্ত, যেখানে ননম্যাট্রিক ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এম-এ পাশ শিক্ষকমশাই-এর পড়ানোর খুঁত ধরেন সেখানে শিক্ষকের মানসিক অবস্থা যে শিক্ষাদানের অনুকূল হয় না এ-কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। বলা বাহুল্য এই পরিবেশে শিক্ষাদান সম্ভবপর নয়।

অবশ্য কোন আইন করেও এই সমস্যার সমাধান নেই, তবে ম্যানেজিং কমিটির গঠনভঙ্গি কিছু পরিবর্তন করে, একমাত্র প্রাক্তন ছাত্রদের স্ফারা তা গঠন করতে পারলে, অনেকগুলি বাজে আমেলার হাত থেকে শিক্ষকমশাইরা রেহাই পেতে পারবেন! (২৮।৪।৬৬)



হরিপদ, কালচাঁদ আর কুতূহল

কাঁপের দরজা খুলে বাইরে এসে একটা হাই তুললো হরিপদ। এত ভোরেই কালচাঁদের দোকানে খন্দের ভিড় লেগে গেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মূখ দিয়ে বেরিয়ে যায়— “শা—”, কালীর পটটার ওপর চোখ পড়তেই সামলে নিয়ে একটা প্রশ্ন করে আর মনে মনে বলে, “মা, মা, মাগো সবই তোর খেলা মা, মানুষ তো পুতুল।”

নেশাটা বেশিই জমেছিল কাল। দোকান খুলতে দেরি হয়ে গেছে। আর খুলেই বা কি হবে? খন্দের তো সব গিয়ে জোটে ওখানে। এখানে খন্দের তো সেই ব্যাটা কুর, গুইবাবু, কেঠো-ফাঁড় আর দ-চারটে উটকো, আলটু-ফালটু লোক। বাঁধা খন্দের সব ভেগেছে।

টিনের চালার মধ্যে সিনেমাটায় ভিড় হয় খুব আজকাল। রাস্তার ওপারে কালচাঁদের দোকানে লাইন লেগে যায়, তিন-চারটে লোক হিমসিম খেয়ে যায় বোলান দিতে। এঁটো গেলাসের পাহাড় জমে রোজ। ইস্টারভ্যালের সময় তো কালচাঁদের দোকানে চা পাওয়াই দম্ভুরমত নয়।

‘চলো হে হরিপদ’ পাঁচনই গেলো

যাক।’ বলতে বলতে যারা চায়ের জন্যে এসে দাঁড়ায়, তাদের মধ্যে গেলাস ছুঁড়ে মারতে হচ্ছে হয় হরিপদর। মূখে বলে, “সবই মায়ের খেলা। কাকে বেটি কখন তোলে আর কখন ফেলে দেয়, কে বলতে পারে। কেলে ব্যাটার এখানে গেলাস খুঁড়ে খুঁড়ে হাতে কড়া পড়ে গেছে; নেমকহারাম ব্যাটা আমার দোকানটা ফাঁক করে, খন্দেরপাতি ভাঙিয়ে গুঁছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ও কদিন, দেখেন আপনারা। ব্যাটা চোর কোথাকার, নেমক-হারামের ডিম।”

কথাগুলো যে সত্য নয়, তা হরিপদও জানে, এখানকার খন্দেররাও জানে। তাকে খেয়েছে গাঞ্জা। আগে সেই গাঞ্জা খেতো, শেষে গাঞ্জাই তাকে খাচ্ছে। সকাল-বিকেল সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দোকানের পেছনে আড্ডা জমে গাঞ্জার। দোকানটা দেখতো কালচাঁদই, না হলে গাঞ্জার দম দিয়ে হরিপদর যা মেজাজ। তখন সেই বা কে আর লাটসাহেবই বা কে?

মুচিপাড়ার মাঝাই ম্যাস্টিক পাশ করে দূর্গাপুরে চাকরি পেল। দেশে বেড়াতে এসে, হাওয়াই-সার্ট আর প্যান্ট চাড়িয়ে দোকানে এসে বললে, “কই গো হরিপদ-

খুঁড়ো; একটা চা দাও তো ভাল করে আর সিগ্রেট এক প্যাকেট।”

হরিপদ চটেই খুন। বলে, “ব্যাটা-ছেলে, তোর বাবা গদাই আমার চেরকাল বাবাঠাকুর বলে এলো, আর লাটের ব্যাটা লাট বলে কি না খুঁড়ো, তাও নাম ধরে। বেজাতের আসুন্দা দেখ, আমার কাছে সিগ্রেট চাইছে। দেবো জুড়িয়ে মূখ ছিঁড়ে।”

মাঝাই মারমুখো হয়ে আস্তিন গোটায়ে, চেঁচায়, “বামুন হয়ে সাতজাতের এঁটো গেলাস ধোর, আবার বামনাই ডাট। আর দেখি তোর ক’জোড়া জুতো আছে? গেঁজেল কোথাকার।”

হরিপদ ছেঁড়া স্যান্ডেল নিয়ে মারতে ওঠে। গাঞ্জার সঙ্গী গুইবাবু ধরে বসায়, বলে, “খেতদাও হরিপদ দা খেতদাও! ঘোর কলি, ঘোর কলি। আর হয়ে এলো, দেরি নেই। কি সব বোমা-টোমা বানাচ্ছে ওরা, দিগ্ না গোটাকতক ফেলে, সব চুকে বৃকে যাক্। মা, মা, সব তোরই লীলে মা তোরই লীলে।” কালচাঁদও সবাইকে বৃকিয়ে-সৃকিয়ে সরিয়ে দেয়।

গুইবাবুর কাছে বেশ কটা টাকা পাওয়া হয়েছে। মূখে প্রাণের ইয়ার

পঞ্চভেদ, কিন্তু টাকা কটা উপদ্রুত-হস্ত করার নামও নেই। হরিপদ সেদিন বলেছিল, “গুইবাবু, এবার একটু ক্রিপে করুন, অনেকদিন হতে চললো। ভাড়া দেবে তুমি, ব্যাটা সাক্ষাৎ শনি ঐ ওধারে ঘসে আমার সম্বলনাশ করছে।”

গুই বলে, “আহা, সে কি আর আমি খুঁজি নে ভাবো, হ্যাঁ হরিপদদা। এই তোমার গিয়ে ছেলের টাকাটা এলেই সব মিটিয়ে দেবো।”

ছেলের টাকাও আসে, খরচও হয়ে যায়, হরিপদর টাকা শেষ হয় না। আজ অমৃতের অসুখ, কাল খাজনার তাগিদ। বাহানা লেগেই আছে। কড়া করে কিছু খলতে পারে না হরিপদ। হাজার হোক—বন্দু লোক। মাসিক্তনেক আগে পাঁচটা টাকা টেকিয়েছিল, বাস।

গাজার আর এক দৈসর ব্যাকাঠাকুর। সে অবিশ্যি চা খেয়ে নগ্না সাতটা নয়া দেয়, কিন্তু গেলে তার নিজের বড় কাঁচের গেলাসের প্রায় এক গেলাস চা। তাও ফৈজ কত। “কিহে ভায়া, চিনি দিতে ছুলে গ্যাছো না কি হে? দাও, দাও আর একটু দাও।” ছোট গেলাসের মাপের চিনিতে বড় গেলাস ভর্তি চা মিষ্টি হয় না সত্যিই, তাই চামচ দুয়েক চিনি আরো দিতে হয়। স্ফুস্ফুস করে দুটো চমুক মেরেই দাঁত বের করে বলবে, “চা-টা বড্ডো কড়া করে ফেলেছো হে ভায়া, একটু দুখ.....বাস্! বাস্!.....আঃ!” র্যাকে তিন টাকা কে-জি চিনি। পাঁচ-ছ’ চামচের কম ব্যাকাঠাকুরের সানায় না। আর মফং বিড়ি টানবে গোটা ছয়েক। কালাচাঁদ থাকতে এরকম হতো না। মদু-মিষ্টি করে হেসে বেশ বলতো, “আপনার পেটের রোগ ঠাকুরমশায়, চা বেশি না খাওয়াই ভালো।” মাসকাবারে গুইবাবুর টাকাটাও বেশ আদায় করে নিতো। সে পারে না। এমন খোসামোদ করে যে সামনে কিছুই থলা যায় না। বোকে সে সবই।

কালাচাঁদ বেশ গুচ্ছিয়ে নিয়েছে। ছেলেটা বহুকাল ছিল তার কাছে। বলতে গেলে তার কাছেই মানুব। এখন আর কোনো সম্পকই নেই। খালি হরিপদর পোষা কুকুরটা কেবল একবার এ-দোকানের আবার ও-দোকানের সামনে ঘোরাঘুরি করে। মাঝে মাঝে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকায় আর লেজ নাড়। ঘুমোবার সময় দুটো দোকানের ছাই-মাদাটার ওপরে গিয়ে শুয়ে থাকে।

ব্যাকাঠাকুরের জন্যেই কালাচাঁদকে সে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছিল। সবাই জানলেও, কালাচাঁদ কিন্তু সে কথা কোনদিন কাউকে বলে না। কথা উঠলে বলে, “আমার অদেউ।”

তাকে না জানিয়ে কালাচাঁদই বা

ব্যাকাঠাকুরকে এমন অপমান-হেনস্তা করতে গেল কেন? তখন দোকানটা বেশ চালু ছিল। উত্তরায়ণের দিন। ভোর থেকেই দোকানে ভিড়। বেলা তিনটে নাগাদ, সে একবার খালি ভাত খেতে বাড়ি গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে ব্যাকাঠাকুর কাদছে আর বলছে, “হ্যাঁ রে কেলে! তুই, তুই আমার চোর বললি? পুজারী বামনকে অপমান করলি তুই? এই যে হরিপদ, তোমার কেলে আমার বলে কি না চোর। কেলে, তুই দেখেছিস আমার বাজ্ঞে হাত দিতে? জিগ্যেস করো তো ভায়া?”

কালাচাঁদের বক্তব্য, ব্যাকাঠাকুর না কি এক ফাঁকে দুখানা দশ টাকার নোট সরিয়ে রেখেছে পাঁজীটার ভেতর। পাঁজীটা অবশ্য তারই, একটা কি ‘খ্যান’ দেখবার জন্যে সে নিজেই এনেছিল।

ব্যাকাঠাকুর হাতদুটো জড়িয়ে ধরে কাদতেই হঠাৎ হরিপদর মাথার রক্ত চড়ে উঠেছিল। পান্ডবের দিন, তাই দুখিলিম বেশিও টানা হয়েছিল। কালাচাঁদের গলাটা ধরে হরিপদ বলেছিল,—

“হারামজাদা, বেইমান কোথাকার, তুই ব্যাটা চোর। তুই-ই টাকাটা সরিয়ে বামনের ছেলের নামে দোষ দিচ্ছিস। বেরো, বেরো, আমার দোকান থেকে।”

গলাধাক্কা খেয়ে রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল কালাচাঁদ। পরে রাস্তার ওধারে মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিল। কিন্তু হরিপদ ওকে ডাকেও নি, ওদিকে তাকায়ও নি। শূন্য কুকুরটা কালাচাঁদের পাশে গিয়ে বসে লেজ নাড়ছিল।

ঠিক একবছর হলো আজ। আজও উত্তরায়ণের মেলা। খন্দের কিছু তারও আজ হবে, কিন্তু বিস্কুট, সিগারেট কিছুই নেই। চা চিনিও কম। উনুনটায় আঁচ দেয় হরিপদ।

বাক্সটা খুলে দেখে মোট পাঁচ টাকা একশ নয়া পড়ে আছে। ঘরে চাল নেই। রেশনের মাথাপিছু পাঁচশো ছাড়াও দু’

কে-জ চাল লাগে রোজ। রুটি কেউ কিছুতেই খাবে না জলখাবার ছাড়া।

উনুনে হাওয়া দিতে দিতে হরিপদ দেখে কালাচাঁদের দোকানে ভিড় বাড়ছে। ভিনগায়ের এক ভদ্রলোক রিকসা থেকে নেমে চা চাইলো। ‘যাক্’ বউনিটা হেলো’ ভাবলো-হরিপদ। কিন্তু, চা খেয়ে বাবু যখন একটা পাঁচ টাকার নোট বান করলো, তখন তার মেজাজটা টক হয়ে যায়, বলে, “লোট রেখে ভাঙানি দেন মশায়, সাতটা নয়ান জন্যে পাঁচ টাকার খুচরো কোথায় পাবো?”

হরিপদর রক্তস্বরে বাবুও বিরক্ত হয়ে বলেন, “দাও দু’ প্যাকেট সিগ্রেট দাও, তাহলে চেজ হবে তো?”

রেগে গিয়ে হরিপদ বলে, “সিগ্রেট-মিগ্রেট বেঁচি নে মশায়, খুচরো দিন।” পাঁচ টাকার নোটটা ছুড়ে দেয় ভদ্রলোকের দিকে।

কালাচাঁদের দোকান থেকে দামী সিগারেট কিনে, সাতটা নয়া হরিপদর সামনে ফেলে দিয়ে গজ গজ করতে করতে চলে যান ভদ্রলোক, “যেমন ছিরির চা, তেমনি কথাবার্তা, আস্ত রাস্কেল।”

শেষের কথাটা হরিপদ শুনতে পায় নি। মেজছেলেটা কখন থলে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার গালে সজোরে এক চড় মারে হরিপদ। ছিটকে পড়ে ছেলেটা কাদতে থাকে। হরিপদ বিভ্রিবিড় কবে, “শা—শুয়োরের পাল এসে জুটেছে। খেলে, খেলে আমার খেলে। রাবণের গুদ্বি। মরেও না তো দু-একটা।”

ব্যাকাঠাকুর এসে জুটেছে দাঁত বের করে। মাতস্বরী করে ছেলেটাকে তুলে খুলোটুলো খেড়ে দেয়। দোকানের খুলোমাথা কাঁচের বয়েম থেকে তল্যাকার একটা ভাঙা লেবেনচুম্ব ছেলেটার হাতে দিয়ে বলে, “নে বাবা নে, কাদিস নি। রাত প্রাতকালেই এইচিস বাপকে জ্বালাতে। দাও হে হরিপদ, তোমাব

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং প্লটিং

করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম :- ৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২ । ফোন : ৩৪-৩১৭৩

৩, রামমোহন পাল সেন, কলি-১২ :

অফিস-ফোন-৩৪-৪৮৪৪

কম্পন বন্ধ।" নিজের বড় কম্পন স্পেসটা এগিয়ে দেয়।

হঠাৎ গাটা রি রি করে জ্বলে ওঠে। বহু না বলে বাস্ক থেকে দু'বেলি চলেয় দান তিন টাকা বার করে নিয়ে, পদশ মেনো ভক্তার দোকান থেকে চলে এনে ছেলটাকে বলে,—

"নে ভাগ, আর এই নে পণ্ডাশ নয়া, ভেদ মাকে দিস, যা হয় করবে।"

বউনিটা হয়েছে, এবার হরিপদর নিজেই চা খাবার গালা। চুপ করে হুপেচুপে চা ছাঁকতে থাকে। আজ মেজাজটা এমন বম্কে গেছে যে ব্যাংকাঠাকুরের কথা শুনতে বা তার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। ব্যাংকাঠাকুর এসেই বলে যায়, "আ রে স্যা, স্যা; শুনুনো ভায়া, কালকের ছোড়া ঐ অঘরাটা, গাল টিপলে এখনো দুখ সেরেনো ছোড়াটা লটখট পাকিরে বসে আছে। রেজেনটারি করে না কি বিয়ে হবে বন্দোবানো। রামোচন্দর, মেসাপিগিও নেই, সাতকুস্তার পাতচাটা... স্যা, স্যা।"

চারেন গেলাসটা নিয়ে ফুড়ু কবে একটা চুমুক মেনেই বলে, "কি ভায়া, টিদি বাড়তে নাকি। তুমি ভায়া চিন্তামণি, একটু..." হরিপদ গোমড়া মুখটায় দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। কোনোমতে চাটা গলা দিয়ে নামিয়ে, দোকানের পেছনে দাঁড়িয়ে ছোট কল্কেটা সেজে ষথারীতি হাঁক পাড়ে "এসো ভায়া, মন খারাপ করে আর কি হবে বলো। সবই সেই লীলা-মরীর লীলা। মা, মা, মাগো।" বেদম হুটো টান মেরে আবার ডাকে, "কই হে..."

হরিপদ উত্তর দেয় না। ব্যাংকাঠাকুর একবার উঁকি মেরে দেখে কল্কেটা রেখে দেয়। ফতুরার পকেট থেকে সাতটা নয়া বার করে বলে, "নাও ভায়া, চলি এখন। পাঁচটা পুজো সারতে হবে। হ্যাঁ। আমার দাক্-ঢাক্-গুড়-গুড় নেই। সবাইকে লি, আমি বাপু একটু চা না খেয়ে যাবো না। তাতে আমার ডাকো, আর এই ডাকে...ছা।"

কয়েকটা খন্দের আসে চা, বিড়ি আর জুকোনো কৌটার কালো গুলী। হরিপদর স্বরচিত ঐ মোদকটার জন্যেই আজও দু'চারটে বাঁধা খন্দের আছে। বুনো সিঁখি দিয়ে ঠেঁবি ঐ অপরাধ বস্তুটিকে লোকে বলে, "হরিপদর কালো বোমা।"

একটা বড় গুলী মুখে ফেলে দেয় হরিপদ, আরো এককপ কড়া করে চা পান আর ভাবে এক বছরের মধ্যে কি হয়ে গেল, ঠিক একবছর। শূটকে গুঁইবাবুকে দেখে তার গা জ্বলে যায়। বলে ওঠে—

'হ্যাঁ, ভাল কথা, টাকাটা এবার দিয়ে ফেলুন গুঁইবাবু, একশ টাকা তিপ্পাম নয়া। আজই ব্যবস্থা করুন। আর ফেলে রাখতে পাবো না।'

গুঁইবাবু খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকে। তারপর পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলে,—

"আজ এইটে রাখো হরিপদ। আবার পরে দেখছি।"

হরিপদ আজ নাছোড়বান্দা, বলে, "আবার পরে কেন গুঁইবাবু। কাল তো থোকা একশো টাকা পাঠিয়েছে, মনি-অর্ডারে। দয়া করে নিয়ে আসুন। বিশেষ ঠাকা আমার। আমি চা ছাঁকছি, ঘুরে আসুন একবার বাড়ি থেকে।"

গুঁইবাবু গুটি গুটি পা বাড়ায় বাড়ির দিকে। যেতে যেতে শুনতে পায় হরিপদর গলা, "বেশি দৌর করবেন না, চা-টা আবার জুড়িয়ে যাবে।" গুঁইবাবু ভাবে, আজ হলো কি হরিপদর, ব্যাংকাঠাকুর আজ আসে নি নাকি? ব্যাংকাঠাকুর নিয়ে আসে গুঁইবাবু। মুখ বুজে চা খেয়ে সাত নয়া বার করে দাম দিতে যায়।

হরিপদর মেজাজটা ঠান্ডা হয়েছে এতক্ষণে। বেশ খুশি মনেই বলে, "ওটা আজ থাক, গুঁইবাবু। মনে করেন হালখাড়া করলেন। আজ বছরকার একটা দিন তো বটে।"

একটু বেলা হতেই হঠাৎ কি মনে করে দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেয় হরিপদ। ভেতরে চুপ করে বসে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর মা কালীর ছবিটা আর কালো গুলীর কৌটোটা থলেয় ভরে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় বাড়ির দিকে। বাবার আগে একবার কালাচাঁদের দোকানের ভিড় দেখে হাসে।

বিকলে আর দোকানই খোলে না হরিপদ। সিনেমার "রামপ্রসাদ" দেখাচ্ছে। রাত নটার শোতে কুড়ি নম্বর টিকিট কাটে, বহুদিন পরে। কালাচাঁদ থাকতে মাঝে মাঝে আসতো, এখন আর আসাই হয় না।

সিনেমার ঢোকায় আগে নিজের বস্-দোকানটার দিকে একবার তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হরিপদ। অশ্চর্য, সব নিঃশব্দ, শব্দ কুরুরটা সামনে সোজা হয়ে বসে রয়েছে; যেন কি শব্দ হচ্ছে কালাচাঁদের দোকানের দিকে। কালাচাঁদের দোকানের হাজ্জাকটায় আলো বড় জোর, চোখে লাগছে। ভিড়ের মধ্যে কালাচাঁদের গোল মুখটা ঘাসে চক্ চক্ করছে। দেখে

বেশ লাগলো হরিপদর। সেই চ্যাংজ ছোড়াটা আজ বিরাট মরদা। এক বছরে যেন তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে কলাগাছের মত। কিন্তু সেই এক ভাব। এত খাটছে তবু একগাল হাসি, ব্যাজার নেই একদম।

ইন্টারভ্যালে কালাচাঁদের দোকানের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে হরিপদ বলে, "কেলে, একটু চা খাওয়াবি বে? হরিপদকে দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কালাচাঁদ কয়েক মুহূর্ত; পরে সামলে নিয়ে নিজের হাতে এক গেলাস চা করে বেরিয়ে আসে কালাচাঁদ হরিপদর কাছে। গেলাসটা হাতে নিয়ে একটু ফাঁকায় নিমগাছের তলায় এসে দাঁড়ায় হরিপদ। কালাচাঁদও সঙ্গে সঙ্গে এসে প্রণাম করে দাঁড়ায়। দু'জনাই দু'জনায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুঁটির আড়াল পড়ায় হরিপদর মুখে আলো নেই। কালাচাঁদও আলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। কেউ কোনো কথা বলে না। সিনেমার ঘণ্টা বেজে ওঠে, ছবি আবার আরম্ভ হবে। চা-টা খেতে ভুলে গিয়েছিল হরিপদ, তাই এক চুমুকে শেষ করে মাটির গেলাসটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে হরিপদ চলে যায়।

সিনেমা ভেঙে যাবার অনেকক্ষণ পরে, সব নিঃশব্দ। কালাচাঁদ একরাশ টাক ও ভাঙানি গুলতে থাকে। গোলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ শুনতে পায় খুব চেনা কটা কথা, "কেলে, আজ কত হ'লো রে?" চমকে ওঠে কালাচাঁদ। তাকিয়ে দেখে সামনের বেশিতে বসে আছে হরিপদ।

কালাচাঁদ বলে, "এজ্ঞে আপনার ছিচর-ণের কিপায়, আজ দু'শো বস্তিগ টাকা একান্তো নয়া।" কালাচাঁদ একটা দামা সিগারেট আর দেশলাই ভিজ্জিয়ে এগিয়ে দেয়।

আরামে সিগারেটটা টানতে টানতে, একটা সন্ধ্যটান দিয়ে হরিপদ বলে ওঠে, "জানিস্ কেলে, দোকানটা ভুলে দেবো ভাবছি।"

কালাচাঁদ বলে, "তাই করেন বাবা-ঠাকুর। শূধো শূধো দুটো রেইকে কি হবে। আমিও পরে উঠি নে।"

হরিপদর চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখে ভাবও চোখ দুটো ভিজে ভিজে, কিন্তু মুখে একমুখ হাসি।

কুরুরটা কখন দু'জনায় মাঝখানে এসে, লেজ নাড়তে সুরু করে ছোজোরে।

আমরা যাকে একটি শব্দ বোঝাই

চরম সংকটময় মুহূর্তে অটুট দেশভক্তি

বিশ তারিখ শেষ রাত্রে ভোরের আলো দেখা দেওয়ার বেশ কিছু আগে আমাদের প্রধান বাহিনী একটি অতি উঁচু ও দুরারোহ নতুন পাহাড়ের ওপর ক্যাম্প স্থাপন করেছিল, তার পরে আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে শহরে প্রবেশ করার জরুরী-কল্পনা করতে তাদের সারা সকাল, দুপুর, বিকেল ও সন্ধ্যা কেটে যায়। এই বৃত্তান্ত আমি আগে লিখেছি।

প্রায় এই চব্বিশ ঘণ্টা সময়, ২০ তারিখ সন্ধ্যা থেকে ২১ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা চারজন কোথায় ছিলাম বা কি অবস্থায় সম্মুখীন হয়েছি তার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। ২০ তারিখ রাত্রি আটটার কিছু আগে আমরা তো সতীন্দার কাছ থেকে বিনায় নিয়ে শহরের বুকে প্রবেশ করলাম। দুপুর ও বিকেল পর্যন্ত প্রধান বাহিনীর সংবাদের কোন সূত্র না পাওয়ায় আমরা ঠিক করেছিলাম যে শহরে ফিরে গিয়ে সতীন্দার সঙ্গে দেখা করব এবং তারপর রক্তের বাড়ি গিয়ে উঠব। সেখানে থাকার যদি সুযোগ পাই এবং তা সম্ভব হয় তবে সেটা গ্রহণ করব। রক্তের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিতে কেন আকৃষ্ট হয়েছি তার একটু ইতিহাস এখানে বলা ভাল।

আনন্দ গুপ্ত ও শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্তের বিপ্লবী পরিবারের মত শহরের দক্ষিণ প্রান্তেও অপর একটি 'বিপ্লবী পরিবারের' সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। এই বাড়িটি শহীদ রক্ত সেনের বাবা রজনলাল সেনের। বাড়িটি কর্ণ-ফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। আনন্দ-দেব বাড়ির পেছন দিকে যেমন ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণীর মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা সন্দিগ্ধ ছিল, তেমনি এই বাড়িটির অবস্থান নদীকূলে হওয়াতে নৌকা করে আসা-যাওয়ার খুব সুবিধে ছিল। রক্তের মা, বাবা, ছোট ছোট সব ভাই-

বোনেরা সকলেই আমাদের সমরক। রক্তের বাবা আগে অবশ্য আমাদের বিপ্লবী কার্যকলাপের কিছুই জানতে পারেন নি, কারণ আমরা তাঁর কাছে সব সময় বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করতাম।

রক্তের বাবা রজন সেন ছিলেন চট্টগ্রাম জজকোর্টের প্রখ্যাত উকিল। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে প্রায় সমস্ত সরকারী উচ্চপদস্থ জেলা-প্রধানদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ টাউন ক্লাবের সভাপতি—যে টাউন ক্লাবের সভ্যরা ছিলেন সবাই পুলিশ, সরকারী কর্মচারী ও তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। রজনবাবু আমাদের সকলের মেসোমশাই—রাশভারী লোক, তাছাড়া তিনি যে পরিবেশে থাকতেন, তাতে আমাদের সন্দেহ ও আশঙ্কার ষাধেন্ট কারণ ছিল। কিন্তু আমাদের জীবনের অনেক ছোটখাটো অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলাম—আপাতদৃষ্টিতে অবস্থা যতই প্রতিকূল থাকুক না কেন, এমন সব ক্ষেত্র ও সুযোগ আসে যা প্রতিকূল অবস্থার পরিবর্তনও সম্ভব করে তোলে।

রক্তের মা—আমাদের সকলের মাসিমা। তিনি আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতির বিষয় জানতেন। তবে চট্টগ্রাম শহরের সমস্ত বড় বড় ঘাঁটি আক্রমণ ও সমস্ত শহরটি দখল করার পরিকল্পনার কথা তাঁর জানান কথা নয়। এমন কি তা রক্তের পক্ষেও জানা সম্ভব ছিল না।

রক্ত এঁদের বড় ছেলে। যখন সে প্রথম আমাদের সংস্পর্শে এলো তখন সে গভর্নমেন্ট কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্র হিসেবে রক্তের তুলনা ছিল না। রক্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের বিপ্লবী দলের সভ্য হল। রক্তও টাউন ক্লাবের সভ্য। বড় বড় ফুটবল ম্যাচে রক্ত অংশগ্রহণ না করলে তাদের চলে না। সাব-ইন্সপেক্টর ছিন্দিক দেওয়ান, হেম গুপ্ত প্রমুখও খুব

ভাল খেলোয়াড়। রক্তের সঙ্গে তাদের খুব বন্ধুত্ব। যখন-তখন তারা রক্তের বাবার কাছে যায় এবং ক্লাবের প্রযোজনে প্রেসিডেন্ট রজনবাবু ও রক্তকে যখন দরকার তখনই কোতোয়ালীতে বা পুলিশ ক্লাবে সেই খেলোয়াড় পুলিশদের কাছে পাঠাতে।

স্বনামধন্য সুবিখ্যাত চন্দ্র-চিকিৎসক পরলোকগত ডাক্তার কিরণ সেন রজনবাবুর নিজের ছোট ভাই। রক্ত কাকু কিরণ সেনের অত্যন্ত প্রিয়। রক্তকে উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি বিলাত পাঠাবেন স্থির হয়েছিল।

এই হল রক্তের পারিবারিক পরিচয়। তার চারদিকের বিপ্লব-পরিপাক্ষী পরিবেশের মধ্যেও সে তার বিপ্লবী সাথীদের সঙ্গে অচল অটল হয়ে রইল। আমাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ঘনিষ্ঠে এল। আমাদের বৈপ্লবিক শিক্ষা-পদ্ধতিও সেই সঙ্গে বদলে গেল। অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হল। হাত-বোমা ছোড়ার কায়দা ও বিভিন্ন আস্ত্রক্ষার উপায় শিক্ষা দেওয়া হল। মোটর গাড়ি চালানো, বোড়ার চড়া, প্রভৃতিও প্রায় সকলকেই শিখতে হল। রক্ত এই সমস্ত বিষয়েই সুদক্ষ ও আশ্চর্য রকম পারদর্শিতা লাভ করল। বিপ্লবী সভ্যদের মধ্যেও সকল বিষয়ে পারদর্শী যুবক খুবই বিরল। রক্তের মত যুবক তাদের মধ্যে আরও বিরল।

বিপ্লবী সংগঠনের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠোর। ব্রিটিশ সরকারের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে পরাস্ত করে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা ও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিব জন্য আমাদের অনেক বিশ্বাসী বন্ধুকেও অবিশ্বাস করতে হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরে ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে আক্রমণের পূর্বে মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে, এবং সেই কারণে অনেক বিশ্বাসী সদস্যকেও সন্দেহের চোখে দেখতে হয়েছে। বিপ্লবী পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করে তোলবার জন্য

আমাদের সাংগঠনিক শৈলীগানে ছিল—
“ভুলক্রমে একজন অবিশ্বাসীকে নিগূঢ়
পরীক্ষণনার কেন্দ্রস্থলে গ্রহণ করার চেয়ে
হাজার জন অতি বিশ্বাসী তরুণ বিপ্লবীকে
প্রত্যাখ্যান করাও শতগুণে শ্রেয়।”

নিরাপত্তার জন্য এইরূপ কঠোর
নীতির অনুসরণ না করে আমাদের উপায়
ছিল না। রক্ততকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস
করেও আবার বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী প্রতিকূল
পরিবেশের জন্য তার প্রতি আমাদের
সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। রক্তের
মগোচরে খুব সতর্কতার সঙ্গে তাকে
স্বাধীন অনুসরণ করার জন্য আমি,
সেনারজন, মাখন ও দেবকে নিযুক্ত করে
ছিলাম এবং বেশ কিছুদিন ধরে তাদের
এই কাজ আমিই পরিচালনা করি।
ইংবেজ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ
চালানোর গুরুদায়িত্ব থাকে দেবার
আমাদের ইচ্ছে—তাকে সবচেয়ে বেশি
পরীক্ষা করে নিতে হবে। রক্তত সেই
পরীক্ষারও উত্তীর্ণ হল।

রক্ততের বৈপ্লবিক শিক্ষা তার বাড়ির
সবাইকে, এমন কি ছোট ছোট ভাই-
বোনদেরও দেশাত্মবোধে উদ্বেগু করেছিল।
তারা তাদের অজ্ঞানতাই বিপ্লবী আদর্শে
দীক্ষিত হয়েছে। রক্ততের সেই মা, যিনি
হাসতে হাসতে রক্ততকে বলছিলেন—
“তোকেই যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গ
করতে পারি, তবে তোব এই সামান্য
অভাব আমি পূরণ কবতে পারব না?”—
এই বলে যে মা সোদিন পুরুষ হাতে
গলার হাবিটিও খুলে দিয়েছিলেন, সেই
মায়ের কাছে এবং সেই বাড়িতে আমাদের
স্থান হবে না তা আমরা একবারও ভাবি
নি। মাসিমা অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য
তো পাবই তাছাড়া রক্ততের বাড়িটিও
মানা দিক থেকে সুবিশেষজনক ছিল।

রক্ততের বাড়ির কম্পাউন্ড অনেক বড়।
বাড়িটি দোতলা। দোতলায় দু’টি ঘর।
রক্তত যে ঘরে থাকত সে ঘরটি প্রায় সব
দময়েই আমাদের দখলে থাকতো। আমা-
দের গোপন সভা, রিভলভার-পিস্তলের
ব্যবহার ও পরিষ্কার করা, ইত্যাদি প্রতিটি
কাজ এই ঘরটিতে হতো। পুলিশের
সন্দেশের সম্পূর্ণ বাইরে এই বাড়ির
বৈপ্লবিক অস্তিত্বটি বজায় ছিল কেবলমাত্র
রক্তনবাবের সরকারী মহলের সঙ্গে ব্যক্তি-
গত সম্পর্ক থাকার জন্যে। কি করে
পুলিশ সন্দেশ করবে শ্রীরজন সেনের
মাড়িতে তাঁবই ছেলে, যে টাউন ক্লাবের
সভা, তাঁরই সহযোগিতায় ও তার মায়ের
সম্পূর্ণ সমর্থনে আমাদের বৈপ্লবিক
প্রস্তুতির অনেক রকম কাজই সেই বাড়িতে
চালিয়েছি।

সবদিক ভেবে চিন্তে আমরা ২০
ভাদ্রিখ রাতে রক্ততের বাড়ি যাওয়া ও

সুযোগ-সুবিধা থাকলে সেখানেই আগ্রস
গ্রহণ করা একরূপ মনস্থ করে ফেলি।
কিন্তু নন্দনকাননের যে স্থান থেকে
সতীদাকে ছেড়ে এলাম সেখান থেকে
রক্ততের বাড়ি প্রায় মাইল দুই হবে। এই
দু’টি মাইল একেবারে শহরের যুদ্ধের
ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হল।
কোতোয়ালীর আই, বি, ইন্সপেক্টরের
বাড়ির সম্মুখ দিয়ে হেঁটে এলাম। কে
কোথায়? কোন বাধাই পেলাম না।
তখন প্রায় আটটা বেজেছে। রক্ততের
বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়িলাম। আমাদের
সঙ্গে রক্তত নেই। সেই একই প্রশ্ন—কি
অবস্থায় মাসিমাকে আমরা পাব? রক্ততের
বাবার সামনে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে
না। কে জানে বাড়ির অবস্থাই বা কি?
রক্তত তো তার বাবার বন্দুক নিয়ে এসেছে
এবং এই আক্রমণের জন্য আমরা তা
ব্যবহারও করেছি। কি জানি কোনো
পুলিশের উপপাত ইতিমধ্যেই তাদের
বাড়িতে হয়েছে কি না। এই সব ভেবে
নিয়ে প্রথমে মাখনকে পাঠানো হল
মাসিমার কাছে স্কাউটিং করে দেখে
আসতে।

মাখন মাসিমা-র উদ্দেশ্যে খুব
সন্তর্পণে পেছনের দরজা দিয়ে অন্যের
দৃষ্টির অগোচরে বাড়ির ভেতর ঢুকলো।
তারপর আব আমরা তাকে সেখান থেকে
দেখতে পারছিলাম না। খুব অনিশ্চয়তার
মধ্যে ছিলাম—কি জানি কি হবে! যদি
কেউ দেখে ফেলে? যদি মাসিমা উপস্থিত
না থাকেন? আর যদি সে মেসোমশায়ের
সামনে গিয়ে পড়ে? কিন্তু মিনিট
তিনেকের মধ্যেই মাখন ফিবে এল এবং
একটু দূর থেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ
কবে হাতের ইসারায় ডেকে সে ঘুরে আগে
আগে চললো। আমরা তাকে অনুসরণ
করলাম। মাসিমা সিঁড়ির গোড়ায়
দাঁড়ানো। মূখের ওপর আঙুল চেপে
ইসারায় বললেন—“কোন শব্দ যেন না
হয়।” তাঁর নির্দেশ অনুসরণে আমরা খুব
চুপি চুপি দোতলায় রক্ততের ঘরে চলে
গেলাম।

ধীর পদক্ষেপে ও অতি সন্তর্পণে
যখন রক্ততের ঘরে এসে পৌঁছলাম, তখন
দেখি দোতলার দু’টি ঘরই সম্পূর্ণ খালি
করে রাখা হয়েছে। মেসোমশাই, মাসিমা
ছোট ছোট ভাই-বোনেরা সকলেই নিচের
তলায়। কি আশ্চর্য ব্যাপার মাসিমা কি
কোন কারণে রক্তত ও তার সতীর্থ সাথী-
দের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন?

কিছুক্ষণেই মধ্যেই মাসিমা আমাদের
জন্য রায়েব আহায়েব প্রচুর ব্যবস্থা করে
নিয়ে এলেন। মাসিমাকে আমরা সবাই
প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের প্রাণভবা
আশীর্বাদ জানালেন। মাসিমা আমাদের

কাছ থেকে সব খবর শুনলেন—কি করে
আমরা দলচ্যুত হয়ে পড়লাম এবং তাদের
সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপনের আর
সুযোগ হ’ল না। রক্তত প্রধান বাহিনীর
সঙ্গে আছে জেনে আশ্বস্ত হলেন—কিন্তু
আমাদের অজ্ঞানত যেন একটি দীর্ঘশ্বাস
ত্যাগ করলেন।

আমাদের নিজেদের মধ্যেও মাসিমার
সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা হচ্ছিল, যেন
নিচের তলায় কেউ টের না পায়। মাসিমা
আমাদের কড়া হুকুম দিলেন, যেন আমরা
ওপরের ঘর থেকে কোন কারণেই নিচে
না যাই—খাওয়া-দাওয়া, স্নান, বাথরুম
সব ব্যবস্থাই ওপরে হবে এবং তিনি একাই
এই সবকিছুর ব্যবস্থা করবেন। তিনি
আবার সকালে আসবেন—এই কথা জানিয়ে
মাসিমা চলে গেলেন। আমরা চারজনও
সারাদিনের ক্লান্তির পর নিজ নিজ
রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।
আমাদের মনে হয়েছিল রক্তনবাবের বাড়ি
হয়ত পুলিশ খুব শীঘ্র খানাতল্লাস করবে
না এবং আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত
নিরুদ্বেগে এখানে থাকতে পারবো।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জানলার
ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখলাম। সব ঠিক
আগের মতই আছে, কেবল নেই রক্তত—
এই বাড়ির বড় ছেলে। মাসিমা আমাদের
জন্য চা, ইত্যাদি নিয়ে এলেন। আমরা
খুব তৃপ্তির সঙ্গে সবকিছু খেলাম; কিন্তু
কেবল মনে হচ্ছিল অন্য সবার কথা—
কোথায় তারা—কিভাবে আছে তারা।
মাসিমা নিচে থেকে ঘুরে এসে জানালেন
যে মেসোমশাই আমাদের সঙ্গে দেখা
করতে চান—আমাদের অনুমতি চাইছেন।
যিনি আমাদের আগ্রয়দাতা, যার ছেলে
আমাদের বিপ্লবী সংগঠনের গৌরব, যার
স্বাভাবিক একজন শ্রেষ্ঠ বীর নারী—
তিনি অনুমতি চাইছেন আমাদের সঙ্গে
দেখা করতে। আমরা সসম্মানে মাসিমাকে
বললাম—“আপনি মেসোমশাইকে একদুপি
পাঠিয়ে দিন। তাকে বলুন তাঁর বিপ্লবী
সন্তানরা তাঁব আশীর্বাদের অপেক্ষায়
আছে।”

মেসোমশাই এই প্রথম আমাদের প্রকৃত
স্বরূপ জেনে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে
আসছেন। রক্তত যে আমাদের একজন
প্রধান বিপ্লবী সাথী তাও তিনি বর্তমানে
জেনেছেন। কি প্রতিকূল পরিবেশের
লোক তিনি। কে জানত ভারতের
স্বাধীনতার জন্য তাঁর অন্তরের এই গভীর
অনুচ্ছিত কথা? মেসোমশাই এলেন।
আমাদের বৃদ্ধে জড়িয়ে ধরলেন—কত শত
পুঞ্জীভূত অন্তরের আবেগ কত সহস্রভাবে
যে তিনি ব্যক্ত করলেন তা আমি ভাষায়
প্রকাশ করতে পারবো না। সেই দিন সেই
মহান পুরুষ তাঁর এতদিনের মিথ্যা আবরণ

ক্লেশমোচন করে আমাদের সামনে এসে ঝাঁপালেন তাঁর সত্যিকারের দেশপ্রেমের পরিচয় নিয়ে। তাঁকে আমরা আমাদের বিপ্লবী অন্তরের প্রাণী জানালাম। তাও যেন তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের কাছে স্থান হয়ে গেল। ইন্ডিয়ান রিপাব্লিক আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন ফিল্ড মার্শাল ও আর একজন জেনারেল, রজতের বাবা রজনলালের কাছে যে অতি ক্ষুদ্র, তাঁর আকাশচুম্বী দেশভক্তির কাছে তাদের স্বদেশপ্রেম যে অতি সামান্য, তাঁর আত্ম-ত্যাগের মহিমা যে কোন বিপ্লবীর তুলনায় যে কিছুমাত্র কম নয়—এই সত্য সেদিন অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলাম।

আনন্দমঠের সেই মহামন্ত্র—“আমাদের ঘর নাই, বাড়ি নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, আমরা জানি জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গদীপ গরীয়সী!”—বিপ্লবী-যুবকদের উদ্দেশ্য করেছিল। রজনলাল, সরকারী মহলের বন্দু ও আপাতদৃষ্টিতে সেই পরিবেশের মধ্যে যিনি মানুষ, তাঁর বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্রের কোন আকর্ষণ বা মোহ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের শ্বিতীয় দিনই আমাদের জীবন্ত বা মৃত ধরবার সাহায্যের মূল্য হিসেবে সরকার আমার এবং গণেশের মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা করে এবং আনন্দ ও মাখনের—প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। তখনকার দিনে আমাদের চারজনের মূল্যের বিনিময়ে রজনলাল, সরকারী মহলের বন্দু, রজনলাল, অনা-ন্নায়ে বারো হাজার টাকার মালিক হতে পারতেন। সেই সুযোগ রজনলালের প্রচুর ছিল। এমন কি সেইরূপ কোন প্রভাষণে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রেখেও তিনি পুলিশকে আমাদের সংবাদ দিতে পারতেন—সেই সুবিধারও রজনলালের অভাব ছিল না। স্বদেশপ্রেমের মহা মূল্য-যান কণ্ঠিপাথরে রজনলালের সঙ্গে তথাকথিত স্বদেশপ্রেমের ধ্বজাধারী অনেক রণী-মহারথীদের বিচার করলে, তাদের অনেককেই অতি জঘন্য তস্কর বলে প্রতিপন্ন হতে হবে—অন্তত তাদের নিজে-দের বিবেকের কাছে।

মেসোমশাই আমাদের কাছে অস্ত্রাগার আক্রমণের মোটামুটি বিবরণ জানলেন। রজত যে তার ভূমিকা অক্ষরে অক্ষরে সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছে, সেইজন্য তিনি অত্যন্ত গর্বিত। চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকদের এই সাধক স্বতন্ত্র অভিযানকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। চট্টগ্রামের যুবকেরা যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল বৈপ্লবিক

অধ্যায় সৃষ্টি করেছে—এই আনন্দে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন।

আমাদের এমনি ধরণের কথাবার্তা চলছিল। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। রজতের ছোট ভাই-বোনরা বাড়ির কম্পাউন্ডে খেলা করছিল এবং তাঁদের ওপর মাসিমা দায়িত্ব দিয়ে-ছিলেন পথের দিকে নজর রাখতে। আবার সেই ঘটনা—আনন্দের ছোট ভাই যেমন “মা আসছে” বলে চিৎকার করে জানিয়েছিল পুলিশের আগমনবার্তা; আজ আর রজতের ভাই-বোনরা চিৎকার দেয় নি, চিৎকার দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পুলিশ খুব কাছেই এসে পড়েছিল। ছুটে গিয়ে তারা মাকে ধর দিল। তৎক্ষণি মেসোমশাই জানতে পারলেন। এক মুহূর্তে তিনি একটি ছোট টেবিল টেনে ঘরের মাকে আনলেন। রজতের বাড়ির ওপরের প্রধান ঢালু ছাদের নিচে একটি ঘর-জোড়া কাঠের পাটাতন ছিল এবং সেই পাটাতনের ওপরে ওঠবার একটি চতুষ্কোণ ফাঁক ছিল। এক গজ চতুষ্কোণ তক্তা কেটে সেই ফাঁকটির একটি ঢাকনি করা ছিল। এই ঢাকনিটি সরিয়ে ভেতরের ছাদের ওপরে লুকোনো ষার এবং সাধারণত বাড়ির এই ফাঁকা স্থানটিতে ঘরের অনেক জিনিসপত্র রাখা হত। আমরা এই ফাঁকা জায়গায় আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও লুকিয়ে রাখতাম। মেসোমশাই যেমনি টেবিলটি এই চতুষ্কোণ তক্তার ঢাকনির নিচে রাখলেন তৎক্ষণি আমরা একের পর এক এই ঢাকনি সরিয়ে ঐ ফাঁকা স্থানটিতে আগ্রস্র নিলাম। মাখন ও আনন্দকে কাঠের ছাদের এক কোণে পজিশন নিতে ইঙ্গিত করলাম। আমি ও গণেশ এই ঢাকনির ওপর চেপে বসলাম। প্রত্যেকের হাতে দুটো করে গুলীভরা খোলা রিভলভার। ট্রিগারে আঙুল ঠেকানো আছে। এই সমস্ত ব্যাপারটা সম্পন্ন করতে আমাদের এক মিনিটের বেশি সময় লাগে নি। মেসোমশাই টেবিলটি আবার ঘরের কোণে ঠেলে রেখে নিচে চলে গেলেন তাঁর চেম্বারে। আমরা আমাদের লুকোনো ‘পজিশন’ থেকে ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বাইরের সব দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু বাইরে থেকে আমাদের দেখতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না—যদি কেউ বাইরে থেকে এই চতুষ্কোণ কাঠের ঢাকনিটি সরিয়ে না ফেলে। তবে পুলিশ ঘরে প্রবেশ করলে এই ছিদ্রপথের ঢাকনিটি তাদের চোখে পড়বেই, যদি কেউ এক-জনও একবার ওপরের দিকে তাকায়।

সার্জেন্ট কেলী ও ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রাক্তন সৈন্য বত্মমানে ডি, আই, বি—স্যার শচীন ভৌমিক, এক-দল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ছুটে এসে

যাড়িতে ঢুকলেন। সেপাইরা সবাই রাই-ফেল, ফ্যারিং পজিশনে, হাতে নিয়ে ঢুকলো আর কেলী সাহেব ও শচীনবাবু, দু’জনেই হাতে খোলা রিভলভার নিয়ে আগে আগে এলেন। প্রায় ১৫।২০ জন সেপাই সমস্ত বাড়িটি ঘিরে ফেললো। আর প্রায় দশজন সেপাই নিয়ে শচীনবাবু ও কেলী সাহেব রজনলালের চেম্বারে এসে উপস্থিত। আমরা তাদের কথাবার্তা গলার আওয়াজ সব শুনতে পাচ্ছিলাম। দু’এক মিনিট কথা শোনার পর বুঝতে পারলাম তারা রজতের বাবাকে নিয়ে সমস্ত বাড়ি ভ্রাসারী করতে সুরু করেছে। প্রত্যেকটি সেক্টপূর্ণ মুহূর্ত ক্রমেই আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগলো। এবার মনে হ’ল নিচের সব ঘর দেখা শেষ করে তারা ওপরে আসছে। সিঁড়ির ওপর যুটের আওয়াজ ক্রমেই স্পষ্টতর হতে লাগলো। মাঝে মাঝে শুনলাম শচীন ভৌমিক বলছেন—“আপনি আগে চলুন!” কানে এল মেসোমশাই তাদের বললেন, “আসুন, আসুন—ওপরের দু’টি ঘর দেখুন এসে,” ইত্যাদি। আমরা বুঝতে পারছিলাম তাঁর কি ভীষণ মানসিক অবস্থা! কি নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি!

প্রথম ঘরটাতেই আমরা ছিলাম। কিন্তু প্রথম ঘরটাতেই তিনি যেন কোনমতেই আগে পা বাড়াতে পারলেন না—তবুও ভে-এক মিনিট হলেও বেশি সময় পাওয়া যাবে আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচবার। শ্বিতীয় ঘরটি দেখবার পর এই শেষ ঘরে পুলিশ মেসোমশাইকে সামনে রেখে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলো। কি এক মর্মান্তিক ও করুণ দৃশ্য! মেসোমশাইকে সম্পূর্ণ অসহায় ও অসম্মানজনক অবস্থায় দেখলাম। মেসোমশাইয়ের পিঠ লক্ষ্য করে শচীন ভৌমিক ও কেলী সাহেবের রিভলভার দু’টি উদ্ভাট হয়ে আছে। তাঁকে এই অসহায় অবস্থার সামনে রেখে, তাঁর আড়ালে ‘বীরপুরুষ’ দু’জন মিলিটারী কায়দায় এই ঘরে প্রবেশ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরা উদ্ভাট রাইফেল নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

একবার—যদি একবার ভুলক্রমেও ওপরের দিকে তাদের মধ্যে কেউ তাকাতো, তবে যে কি ঘটতো তা! আজ বলতে পারছি না। নিশ্বাস বন্ধ করে অক্ষয় প্রতি মুহূর্ত গড়িছি। আমাদের হাতের উদ্ভাট রিভলভার। মেসোমশাইকে দুই দিকের পরস্পরবিরোধী রিভলভারের মধ্যে দেখে আমাদের সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ঝরাছিল। যদি সংঘর্ষ হয় তবে তাঁর কি হবে! ক্ষুদ্র বৃত্তি দিয়ে বেশি ভাববার সময় বা মান-সিক অবস্থা ছিল না। খুব সম্ভব হয়ত ফেশী স্টেশনের সংঘর্ষের মতই গুলী

চলারাম (এই সংবর্ষের কথা আমি শুনে
হলো)। আমরা মেসোমশাইকে বাঁচিয়ে
গুলী ছুঁড়লেও তারা কি মেসোমশাইকে
অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই
দিত?

পড়তে যতক্ষণ সময় লাগছে তার
সঙ্গেই সকলে এই খালি ঘরটি ঘুরে দেখে
চলে গেল। কি আশ্চর্য! কেউ ওপরে
মুদ্রাই দিল না। সবাই ব্যস্ত যদি তাদের
আশেপাশে বা পেছন থেকে কেউ তাদের
ওপর অতর্কিতে গুলী ছোঁড়ে। তাই
তাদের দৃষ্টি ছিল আশেপাশে ও রজন-
ঘবুর দিকে। মেসোমশাই হাজার হলেও
টিকিল-অভিনয় করলেন চমৎকার।
সবাইকে বোকা বানিয়ে বিদায় দিলেন।
তবে আমরাই কেবল বুঝেছিলাম যে তাঁর
গলা একটু কাঁপছিল, মাঝে মাঝে কিছু
সামঞ্জস্যহীন কথাও বলেছিলেন। সেই
সম্পর্কের মধ্যে পড়লে জানি না কখন এমন
মাথা স্থির রেখে মেসোমশাইয়ের মত
সাক্ষ্যের সঙ্গে বিপদকে পরাস্ত করে
জয়ী হতেন।

দুপুরবেলা মাসিমা আমাদের খাবার
আনলেন। খাওয়ার পর মেসোমশাই
আবার এলেন পরামর্শ করতে—আমাদের
ভবিষ্যৎ প্রায় নিশ্চয়। কিছুক্ষণ কথা বল-
বার পর প্রায় দুটোর সময় আবার আর
একদল পুলিশকে দৌড়ে বাড়ির দিকে
আসতে দেখা গেল। আমরা আবার সেই
কাঠের ছাদে আগ্রস্র নিলাম—কিন্তু এবারে
দুর্লভ এই বাড়িতে না এসে পাশের
মাড়িতে ঢুকছিল। এক ঘণ্টা পরে মেসো-
মশাই ও মাসিমা—দুজনে এলেন। তাঁদের
দুজনের চোখই ছিলছিল। আমাদের এখানে
থাকা উচিত হবে না, তা' তাঁদের জানিয়ে-
ছিলেন। আমরা কোথায় যাব, কি করে
বিপদের পর বিপদ থেকে বাঁচবো, কি করেই
বা প্রধান বাহিনীর সঙ্গে আমাদের
যোগাযোগ হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ কি—
ইত্যাদি চিন্তায় তাঁরা আর স্থির থাকতে
পারছিলেন না। বেশি বোকামি কিছুই
ছিল না। তারা বুঝেছিলেন যে এর এক-
মাত্র পরিণতি মৃত্যু। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর
জন্য কাতর হওয়া বাড়ুলতা। ভাই তাঁদের
দৃঢ় মনোবল তাঁদের সাহায্য করল বিপদ
ও মৃত্যুভয়ে হাসিমুখে জয় করতে।

তাঁরা আমাদের খাওয়া-দাওয়া করে
যেতে বললেন। কিন্তু তা' সম্ভব ছিল না,
কারণ, তাহলে সময়মত গন্তব্যস্থলে
পৌঁছানো সম্ভব হবে না। মেসোমশাই
আমাদের কিছু টাকা দিলেন সঙ্গে রাখবার
জন্য। সন্ধ্যার একটু পরে আমরা তাঁদের
ছাড়া থেকে বিদায় নিলাম। তাঁরা তাঁদের
গলতানদের এইরূপ জীবন-মরণ অনিশ্চি-
তের মধ্যে বিদায় দিতে বাধ্য হলেন, তাই
তাঁদের চোখে জল। পিতা-মাতা নিজ

স্বপ্নের কথা না ভেবে পারেন না। পুত্রের
সুখ-স্বাস্থ্য সাথীদের এই দুর্ভাগ্যে বিদায়
দেবার সময় মায়ের বিগলিত স্নেহের
করুণ উচ্ছ্বাস আমাদের অভিভূত করে
ফেললো। আমরা তাঁদের প্রণাম করলাম।
তাঁরা আমাদের সবাইকে দু'হাত তুলে
আশীর্বাদ করলেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন—
“এ জীবনে হয়ত তোমাদের সঙ্গে আর
দেখা হবে না, রক্ততাকেও হয়ত আর দেখতে
পাবো না। জানি না পরলোক আছে
কি না, পরজন্ম আছে কি না জানি না,
প্রার্থনা করবো যেন তোমাদেরই আমরা
পরজীবনে আবার পাই.....।” আমরা
রাস্তার বাঁক ঘুরে তাঁদের দৃষ্টির বাইরে
চলে গেলাম।

২১ তারিখ, তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে
সাতটা। এই সময় আমাদের প্রধান
বাহিনীও প্রতিদিনের মত পাহাড় থেকে
নিচে নেমে এসেছিল তাদের পরবর্তী
দিনের পরিকল্পনা নিয়ে। প্রধান বাহিনীর
কথা এখন স্থগিত রেখে আমাদের চার-
জনকে কথা আর একটু বলি। ২১ তারিখ
রাতে চট্টগ্রাম শহর আর শহর-পরিভ্রমণ
নয়—সৈন্যদের হাতে চলে গেছে। সৈন্যরা
বেছে বেছে গুরুত্বপূর্ণ বাড়িগুলি পাহারা
দিচ্ছে আর মোটরযোগে সারা শহর টহল
দিচ্ছে বেড়াচ্ছে।

ফিরিশী বাজার—শহরের মধ্যে একটি
বিশেষ অঞ্চল। আমাদের এখন এই অঞ্চল
তো অতিক্রম করতেই হবে, তাছাড়া
শহরের মধ্যে আরও আশঙ্কাজনক
স্থান। পেরিয়ে তবেই আমরা গন্তব্যস্থলে
পৌঁছতে পারবো। আমরা ডেবে-চিলেতে
স্থির করি স্ট্রিমার জেটি ও ডবলমুড়ি-
এর স্টেশনের কাছে “ডেবার” তাঁরে রেলের
ক্রাস কোয়ার্টারে দীনেশের কাছে যাব।
দীনেশ চক্রবর্তী আমাদের দলের একজন
সভ্য। দীনেশ ও তার দাদা একসঙ্গে
থাকত। তারা দু'ভাই ছাড়া কোয়ার্টারে
অর্থাৎ তাদের বাসায় আর কেউ থাকত না।
ডেবা একটি মস্তবড় দীঘি—সকলে
“লেক” বলতো। দীনেশের দাদার
কোয়ার্টারটি ডেবার একেবারে উত্তর-পূর্ব
প্রান্তে। তার দাদা রেল সামান্য পোস্টে
চাকরি করতেন। দীনেশের সর্গে গণেশ-
এরই বেশি জানা-শানা ছিল।

রক্ততদের বাড়ি থেকে খুব সটকাট
রাস্তা ধরে যদি দীনেশের বাড়ি আসতে
হয় তবে আমাদের প্রায় সাড়ে তিন
মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। খুব
তাড়াতাড়ি হাটা সম্ভব ছিল না। সম্ভবপক্ষে
খুব লম্বা রেখে আমাদের পথ চলতে
হয়েছে। শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা
বর্তমানে সম্ভব বর্জন করে চলেছে। গলি-
ঘুঞ্জির পথ নিরাপদ ছিল, কারণ সৈন্যরা
শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাতেই

যে টহল দেবে তা' ধরে নেওয়া কঠিন
ছিল না। গলি ও নিজস্ব রাস্তার মধ্যে
অত অল্প সময়ের সৈন্যদের ছোট ছোট
দলে ভাগ হয়ে প্রবেশ করা অসাধ্য ছিল।
শহরের মূল ও প্রধান সামরিক ঘাঁটিগুলি
ও প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পূর্ণ
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার আগে সামরিক
নীতি অনুযায়ী সৈন্যদের চারদিকে ছড়িয়ে
দিয়ে সামরিক শক্তিকে কোনমতেই খর্ব-
করতে পারে না। এই মূল সত্যের ব্যতি-
ক্রম চট্টগ্রামে সমর-বিশারদেরাও ২১ তারিখ
রাতিবেলা পর্যন্ত করতে সমর্থ হয় নি।

তাদের সেই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ
নিলাম আমরা। প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পথ
বর্জন করে চলেছি। তবে সারা পথটি
অতিক্রম করার সময় মাঝে মাঝে প্রধান
রাস্তাও আমাদের পার হতে হয়েছে।
আমাদের বিশেষ সতর্কতার জন্যই হয়ত
সেই রাতে অতর্কিত আক্রমণ থেকে বেচে-
ছিলাম। পথ চলার সময় কোন একটি
নিরাপদ স্থানে আগে দাঁড়িয়ে অনেকদূর
পর্যন্ত দেখে নিয়ে যখন বুঝেছি যে সৈন্য
বাহিনীর মোটর আসছে না বা টহলদার
কোন সৈন্যদলের আসবার সম্ভাবনা কম
এবং যদি সৈন্যদল আসতেও থাকে তবে
তাদের পেঁছার আগেই আমরা সামান্য
একটুখানি বড় রাস্তা অতিক্রম করে টুক-
করে কোন একটি গলিতে ঢুকে পড়তে
পারবো, তখনই সেইরূপ বিপদসঙ্কুল পথ
আমরা দ্রুত পেরিয়ে গেছি।

এইভাবে প্রায় চার মাইল পথ আসতে
আমাদের বেশ দেরি হয়ে গেল। এখন
প্রায় সাড়ে নটা বা দশটা হবে। ঐ ডেবা
লেকের তিন পাশে সারি সারি ক্রাস
কোয়ার্টারের বাড়ি—সবগুলিই যেন ইতি-
মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শেষের দিকে
আমরা এক পোরা মাইল পথ ধানক্ষেতের
ওপর দিয়ে একেবারে শেষপ্রান্তে উত্তর-পূর্ব
কোণে দীনেশের কোয়ার্টারের বাইরে এসে
উপস্থিত হলাম। প্রত্যেকটি কোয়ার্টারে
আছে দু'টো করে ঘর, সামনে একটু
বারান্দা, রান্নাঘর, স্নানের ঘর, মাঝে
উঠান ও সবটা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।
প্রতিটি কোয়ার্টারে প্রবেশপথ মাত্র একটি—
কাঠের দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ করার
ব্যবস্থা আছে।

আমরা যখন এসে পৌঁছলাম,
দীনেশের কোয়ার্টারের প্রবেশদ্বার ভেতর
থেকে বন্ধ ছিল। আমরা দু'জন—গণেশ
ও আমি বিশেষ পরিচিত, আনন্দ খুব
ছোট, তাই সর্বদিক বিবেচনা করে মাখনবে
পাঠানো হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাখন
দীনেশকে ডেকে নিয়ে এল। দীনেশ
আমাদের দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে
উঠল। সে কি করবে, কি করতে পারে,
আমরা কি চাই তা' জানবার জন্য সে ব্যস্ত

সাহিত্যিক কলমে

হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হ'ল—আমরা বাইরে যাতে একটু অপেক্ষা করব, সে বাড়িতে গিয়ে রান্না-ঘরটির দরজা খুলে রাখবে আর বলাই বাহুল্য উ'চু দেওয়াল ঘেরা কম্পাউন্ডের প্রবেশপথও ভেজানো থাকবে। আমরা কিছুক্ষণ পর একেবারে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়ে আশ্রয় নেবো—তার দাদা যেন কোনমতেই টের না পায়। তারপর সময়মত সে একবার এসে তার দাদার অজান্তে গেট বন্ধ করবে এবং রান্নাঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা দেবে—আগে যেমনটি ছিল ঠিক তেমন করে রাখবে।

রান্নাঘরটি অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল। দুই ভাই, কারও রান্না করার বালাই নেই—হোটলে খেত। বড় ভাই সকাল নটার মধ্যে চাকরিতে বেরিয়ে যায়। তারপর দীনেশই বাড়ির একমাত্র কর্তা। কিন্তু দীনেশের দাদা যতক্ষণ উপস্থিত আছে ততক্ষণ তাঁর অগোচরে সব কিছুই আমাদের করতে হবে—একটু হাঁচি বা কাশি, তাও চলবে না। পাশের ঘরে শোনা বাবে; সামান্য খুঁচুখাট শব্দও দীনেশের দাদার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। জুতোয় মটমট আওয়াজ তাঁর কানে গেলে তক্ষুণি সন্দেহ করে কিসের শব্দ তা' অনুসন্ধান করতে আসতে পারেন। এইসব অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা চারজন দীনেশের নির্দেশ অনুসারে “চোরের” মত চুপি চুপি জুতো খুলে নিয়ে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে প্রবেশ করি। গেটের ও রান্নাঘরের দরজা দুটিই ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিলাম। সময়মত দীনেশ দাদার পাশের ঘাট থেকে বাথ-রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে গেট বন্ধ করে ও রান্নাঘরের বাইরে থেকে, যেমন থাকে তেমন, তালাটা লাগিয়ে দিল। প্রথমপর্ব এইভাবেই শেষ হ'ল।

মতদূর মনে পড়ে খাওয়া-দাওয়া যা' মাসিমার ওখানে সেয়ে এসেছি তারপর আর সেই রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা কিছু করি নি। দীনেশ বোধহয় একঘটি ভর্তি জল রেখে গিয়েছিল। ধরে নেওয়া যায় যে এখন আমরা নিরাপদে আছি। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোলে কী?—কেবল যেন হাঁচি-কাশি দিয়ে নিজের ভাগ্য না করি। পরিশ্রান্ত ছিলাম কাজেই ঘুমোবার ইচ্ছাও ছিল প্রচুর; কিন্তু কার সাধ্য ঘুমোই! মস্ত বড় বড় মশা বন্ বন্ করে সারা ঘরটা ঘুরছে—আজ যেন তাদের সামনে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছে। চার-চারটি মানুষের রক্ত প্রাণভরে খাবে—কত তাদের আনন্দ! কিন্তু আমাদের এদিকে প্রাণ যায় আর কি! না পারি ঘর ছেড়ে অন্যর ঘেতে, না পারি মশা মারতে—আওয়াজ হবে।

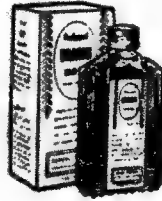
এত মশা ও এত বড় বড়, আমি নাসরখানা বা ফেশীর পাহাড়েও দেখি নি। কি মুশ্কিল! পাখা ছিল না, তার ওপর সব ক'টি জনলা-দরজা বন্ধ ছোট একটি ঘরে চারজনের একসঙ্গে থাকাও যেন তথাকথিত “ব্ল্যাক্ হল” ট্রাজেডির বিভী-ষিকাময় গল্পের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। সারা রাত মশা তাড়বার জন্য দু'টি হাত সমানে নাড়তে হয়েছে সবাইকে। ক'দিন ধরে ভো শরীর-চর্চার নাম নেই—তা' বেশ exercise হ'ল সারা রাত ধরে!

কোনমতে রাত কাটলো। সুবেরে আলো জ্বলল ও দরজার ফাকে এসে ঘরের মেঝেতে পড়েছে। দীনেশের দাদা ঘুম থেকে উঠেছেন। তাঁরা দুই ভাই কথাবার্তা বলছেন, সবই শুনতে পাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হয়েছে যদি কোন কারণে তাঁরই বাসায় আমাদের চারজনের

অস্তিত্ব তিনি জানতে পারেন। তিনি যে আমাদের কিছু কীত করবেনই সেদিকে ভাবার কারণ না থাকলেও কোনরূপ বৃদ্ধি নেওয়া উচিত হবে না মনে করেই আমাদের অস্তিত্ব তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখবার জন্য এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করেছি। অগত্যা যদি তিনি আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে জেনেও ফেলতেন তবে তিনি একা আমাদের আটটি রিভলভারের বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস করতেন তা' মনে করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তিনি জেনেও যদি না জানার ভান করে শেষ-পর্বন্ত অফিসে গিয়ে পুলিশে খবর দেন!—এইরূপ আশঙ্কা করছি বলেই সতর্কতা অবলম্বন না করে উপায় ছিল না।

দীনেশের দাদা অফিসে গেলেন। দীনেশ এখন বাড়ির সর্বময় কর্তা। সে

বেঙ্গল কেমিক্যালেন্স



মুদ্রাসিত **ব্রাক্সী**
হেয়ার অয়েল

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়
আয়ুর্বেদ-নির্দেশিত উপকরণ প্রস্তুত



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ও বোম্বাই ও কানপুর ও দিল্লী

1901/10/10

স্বাভাবিক সন্দেহ

রাসায়নের দরজা খুলে দিল। বট, কি সে আরাম! বস্তু ঘরে বাতাস এসে ঢুকলো—এতক্ষণ পরে সহজে যেন একটু নিশ্বাস নিতে পারলাম। আমরা সবাই পর পর হাত-মুখ ধোয়া, স্নান, বাথরুমের কাজ সমাধা করছি। দীনেশ ঘটি ভর্তি চা ও সেই সঙ্গে পাউরুটি প্রভৃতি খাবার আনলো। আমরা সকালের চা, টোস্ট, ইত্যাদি খেলাম। তারপর দীনেশের অনুপস্থিতিতে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম ঠিক করলাম।

আজ ২২ তারিখের সকাল। যুব-বিদ্রোহের প্রথম গুলী চলেছে ১৮ই তারিখ রাত দশটার। তখনও কে জানতো ২২শে এপ্রিল—১৯৩০ সাল, ভারতের গগনে স্বর্ণাঙ্করে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের বিজয় গৌরবের ইতিহাস লেখা হবে? কে ভেবেছিল তরুণদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ইংরেজ শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধ, আজই বিকালে জালালাবাদ রণাঙ্গনে ঘটেবে? তখনও কি বুঝছি যে সেই একই রাতে ফেণী রেল স্টেশনে সশস্ত্র পদাতি ও মিলিটারী বেস্টনী ভেদ করে আমরা চারজনও সফলতার সঙ্গে বেরিয়ে আসব? ২২শে এপ্রিল বিপ্লবীদের একটি শূন্য দিন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় মুহূর্ত।

সকালে চা খাওয়ার পর আমরা আলোচনা করে নিম্নলিখ প্রোগ্রাম গ্রহণ করি—

(১) শহর মিলিটারীর দখলে। এখন বাধ্য হয়ে আমাদের খন্ড-যুদ্ধ বা শত্রুর ছোট ছোট ঘাটি বা ইংরেজ শাসক-দের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য রণকৌশল বর্তমান অবস্থায় প্রযোজ্য হবে না।

(২) প্রধান বাহিনী যখন ২১ তারিখ রাত পৰ্যন্ত শহরে প্রবেশ করে নি তখন আমরা স্বাভাবিকই একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, তারিখ শেষ পর্যন্ত গ্রামের অভ্যন্তরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আগ্রহ নেবে এবং বিভিন্ন ছোট ছোট বৈপ্লবিক আন্দোলন চালাবে।

(৩) ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করবার বৈপ্লবিক রণ-কৌশল যখন আমাদের গ্রহণ করতেই হবে,

তখন কতক আশার, কয়েক ও লোকনাথের কার্যকর কলকাতা হওয়াই প্রের। আমরা চট্টগ্রামে খুবই সূচন-চিত। কাজেই আমাদের চট্টগ্রামে লুকিয়ে থেকে বৈপ্লবিক কাজ পরিচালনা করা খুব কঠিন হবে এবং আমাদের গোপন অস্তিত্ব অপেক্ষাকৃত সহজে প্রকাশ পেরে অন্যদের নিরাপত্তা বিধায়িত হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা আছে। এই কারণে কলকাতার মত প্রধান নগরীতে আমাদের মত স্বল্প পরিচিত লোকের লুকিয়ে থেকে বৈপ্লবিক আক্শন করার অনেক বেশি সুযোগ আছে।

(৪) সর্বোপরি বাংলার রাজধানীতে নতুন ধরনের বৈপ্লবিক আক্শন হওয়া উচিত। নতুন ধরনের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বলতে আমাদের মনে করেকটি পরিকল্পনাই ছিল। তার মধ্যে একটি প্রবল ইচ্ছা ছিল—ইংরেজের অত্যাচারের জবাবে বা বিশেষ কোন দাবি আমাদের জন্য বাংলার লাট বা চীফ সেক্রেটারী অথবা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখের মধ্যে কাউকে না কাউকে hostage (কোন সতের বিনিময়ে বন্দী) রেখে ব্রিটিশ সরকারের নিকট চরমপত্র বা শেষ প্রস্তাব দাখিল করা। অতীত আক্রমণ করে যদি তেমন কাউকে একবার বন্দী করে নিয়ে যাওয়া যায়, তারপর তাঁকে লুকিয়ে hostage রাখার সমস্যাটিকে যে খুব সহজেই সমাধান করা যাবে সে বিশ্বাস আমাদের ছিল। আন্ত গ্রে-নাইট ব্লক বা ল্যান্ড-মাইন স্থাপ্য সুরক্ষিত কোন গৃহে hostage-কে আবদ্ধ রেখে, সেই একই গৃহের ওপরে সাইন-বোর্ড দিয়ে জানিয়ে দেব এবং জানানো হবে—আমাদের প্রহরী সশস্ত্রদা ইলেকট্রিক সাইচ ও রিভলভার হাতে পাহারা দিচ্ছে; যদি সরকার সত পালন না করেই hostage-কে উদ্ধারের

জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করে তবে তাঁকে জীবন্ত পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই—তার চূর্ণ-বিচূর্ণ বিক্ষিপ্ত দেহ নিয়েই তাদের সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

এহরূপ পরিকল্পনার চিন্তাই তখন করছি, বাস্তবে রূপায়িত করবার কোন চেষ্টা হয় নি। প্রায় দেড় বছর পরে আমাদের মামলা চলার সময় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির বিনিময়ে চট্টগ্রাম জেলা-শাসককে hostage রাখবার জন্য এক বিস্তারিত প্ল্যান আমরা অর্ধেন্দু গুহের (আমাদের সঙ্গে তারও মামলা চলছিল এবং ডিনা-মাইট-বড়বন্দরের সেই প্রধান নেতা) মারফৎ মাস্টারদার কাছে পাঠাই। এই সম্বন্ধে পরে আমি যথাস্থানে লিখব।

মোটামুটি এইরূপ কতকগুলি প্রশ্ন আলোচনা করার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে সেইদিন সম্মার সময় চট্টগ্রাম ছেড়ে কলকাতা অভিমুখে রওনা হবে। সেইজন্য কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করে কতকগুলি আবশ্যকীয় জিনিস যোগাড় করবার জন্য দীনেশের কাছে একটি তালিকা দিলাম। আমাদের জন্য কতগুলি জামাকাপড়, বিছানা, তেল, সাবান, Safety Razor, ছাতা, ঘটি ও সর্বোপরি একটি হারিকেন লাম্প যোগাড় করতে দীনেশকে বলা হল। যুবতে হস্ত কারও অসুবিধে হচ্ছে না যে কেন আমরা হারিকেন লাম্পটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলাম। সম্মার সময় ও রাতির প্রথম দিকে আমরা গ্রামবাসী বাড়ীর ছদ্মবেশে গ্রাঙ্ক রোড আতিক্রম করে প্রধান স্টেশনের দু-তিনটি স্টেশন পরে ভাটিয়ারী হতে ট্রেনে চাপখোঁঠক করছিলাম। টহলদার সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এইরূপ পরিস্থিতিতে একটি প্রজন্মিত হারিকেন হস্ত সমস্যার সমাধান করতে খুবই সাহায্য আসবে। বলা বাহুল্য, আমরা দীনেশকে ভালভাবেই লুকিয়ে বসেছিলাম যে জিনিস-গুলি যেন কোনমতেই নতুন না হয়—সব পুরোনো হলোই আরো ভাল।

আমরা দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। চারটার সময় দীনেশ সব জিনিস সংগ্রহ করে আনবে এবং ঘাটী সেজে ২২শে এপ্রিল সম্মার আমরা চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করব বাংলার রাজধানী কলকাতার বৃকে বিপ্লবের আগুন জ্বালাতে—যদি সম্ভব হয় তবে বাংলার লাটকে hostage রেখে ইংরেজদের চরমপত্র দিয়ে দাবি করব—ভারত ছাড়, নইলে তোমাদের মৃত্যু।

[ক্রমশঃ]



2642

সাপ্তাহিক বসন্তভাট

মটা দুয়ারের আনাগোনা দেখেই সুখ চাইল। অথচ ঘর যে পচে আসবে, ভেঙে পড়বে, সে খপর কুমি রাখে না।

গুনগুনিগে উঠল বিদ্যা—অ বৈরাগী ভাঙা ঘরে মন টিকে না করি কি?

ভোবেব ফুরফুরে বাতাসে আলতো আওয়াজ তোলে থেপা। মকুন্দ কোঁটার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে আর একটা বিড়ি ধরাল। ওর সামনে এসে উবু হয়ে বসল।

অ বৈরাগী ভাঙা ঘরে মন টিকে না করি কি।

দুখা বাইরা কেউছা ওঠে, বাতা ভরা টিকটিকি।

অ বৈরাগী ভাঙা ঘরে মন টিকে না করি কি?

—বাইরা গলা তোমার।

গুটিগুটি মেবে আর একটু এগোয় মকুন্দ।

বিদ্যা ফিক ফিক হাসে। মস্ত এক-খোঁয়া হাস দিয়া বলে,—ক্যান রূপ কম কিসে?

—হ হরীর নাগাল—।

—তয়?

ডগমগিয়ে ওঠে বিদ্যাধরী। মকুন্দ আরও একটু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ নেয়।

—বীরা নি হইছে?

অক্লেখে বলে বিদ্যা।—হ, কোন জন্মে।

মকুন্দ একটু টাল খায়।—কস্তা কোমানে?

বুকটায় আঙুল ঠেকিয়ে বিদ্যাধরী বলে—এখানে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে বিদ্যাধরী। মকুন্দ বোকা বোকা চোখে তাকায়। কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। জিভ দিয়ে শুকনো মোটা ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে টাঁক থেকে দুটো টাকা বার করে।

—অলো থেপী লো—ও—ও—ও—

কুমির গলার আওয়াজ শুনতে পায় বিদ্যাধরী। নড়েচড়ে ওঠে।

মকুন্দ গলাটা কেশে সাফ করে নিয়ে বলে,—ট্যাহা দুইডা অহনি লইবা, না রাইতে?

হেসে বিদ্যা ডাকায় নাটমন্দিরের দিকে। কুমি এদিকে আসছে। কুমির দিকে আঙুল দেখিয়ে বিদ্যাধরী বলে,—ওয়াকে ট্যাহা দেওয়া। উই যে আসত্যাছে।

বলে উঠে পড়ে। এগিয়ে যায় কুমির

দিকে। কুমি চোখমুখ শুকনো করে এগিয়ে আসছে। বিদ্যাকে না দেখে ভর পেয়ে গেছে। বিদ্যার হাসি পায়। সকাল হলেই কুমির ভয় শব্দ হয়। সুখিদেরের সঙ্গে বড় আড়াআড়ি।

কুমি এগিয়ে এসে ওর দিকে তাকিয়ে অবাক, বিরক্ত। ভোর বিখানে চান সেরে সেজে-গুজে আয়না মহল হয়ে বসে আছে। কুমিকে একবার ডাকতেও কি পারত না?

মকুন্দ কুমির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কুমি বাসী মূখে বিরক্ত। ঘুম থেকে উঠে বাসী মূখে একটা পান-দোজা খাওয়া পৰ্বন্ত হয় নি। এদিকে নাট-মন্দিরের তাকুটি তাকুটি। আর বিদ্যা হাওয়ার নিখোঁজ। কেন যে মরতে মেলায় এসেছিল কুমি? যেতে পারলে বাঁচে। যে কটা রাত এখানে কাটেবে সে কটা রাতই যন্ত্রণার রাত। কবিরাজ মশাই নেই। পরমা হালুইকর নেই। সম্মার পর এক এক করে নিরিবিজি মানুষের সঙ্গে হাসন নেই। উল্লী নেই। গুজ্জুজ করে কথার জাল বোনা নেই। হৈ-হজ্জা লেগেই রয়েছে।

নাটমন্দিরে গিরে বিদ্যা বলল,—জ' চান সাইর্যা আয়।

হাই তুলল কুমি।—হ হাই।

পোটলা-পুটলি খুলে ডুরে শাড়ি-খানা বাব করল কুমি। বিদ্যা সাজতে পারে আর ও সাজতে পারে না? গামছা কাঁখে ফেলে চলে গেল কুমি। সেই ঘাটেই যাবে। আর কোন ঘাট চেনে না। বিদ্যা একতারাটা হাতে নিল। কাঁখে বোলাল গুবগুবি।

পুব আকাশটার চড়া রঙ ধরেছে। দূরে সড়কের ওপারে ঘন গাছ-গাছালীর মাথায় লাল আভা ঠিকরে পড়ছে। ভোরের ঠান্ডা শিরশিরে বাতাসটা গরম হয়ে উঠছে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ-গুলোও সব আস্তে আস্তে তেতে উঠছে। ঠিক দুপুরের রোদের তাড়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলো সব টং হয়ে উঠবে। সব যেন দড়ায় দড়ায় বাঁধা একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই।

দড়ায় দড়ায় বাঁধা। প্রিকিতির পৈঠের সঙ্গে মানুষের ভেতরের পৈঠে। যার যেমন পৈঠে সে তেমন চোখে প্রিকিতি দেখে। কোন পৈঠেতে বাস করছে সে, তাই যদি জানতে পারত, তবে তো এই

সংসারে গোলমালের বাজার বসত না। সবাই সেয়ানা হোত। বিবেণীর ঘাটে নেমে ভিয়েন চড়াও। রসের ভিয়েন জ্বাল দিয়ে দিয়ে ঘন করে তুলত।

খপর জানে না। হাওয়ার খপর জানে না, পৈঠের খপর জানে না।

মকুন্দ দোকানী জানে না, ও আসলে কুমিকেই চায়, বিদ্যাকে চায় না। বিদ্যার অন্য পৈঠের বাস। সেখানকার বাসিন্দা কারো সম্মান বুঝি পেল। মনে হয় যেন পেল।

পোটলা-পুটলি কাঁখে তুলল বিদ্যা-ধরী। নাটমন্দির ছেড়ে একতারা নিয়ে এগোল অধিকারীবাবুদের বাড়ির লাগোয়া এক সারি কতকগুলো ঘরের পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় দুটো অর্জুন-গাছ লক্ষ্য করে।

মস্ত দুটো অর্জুনগাছ পাশাপাশি, এখানে-ওখানে কচুন। আর আগাছা দোপাটি। মাঝে মাঝে শিয়ালকাটার ঝোপ। বাঁ পাশে তাকাও ঘর, সামনে তাকাও লাল টকটকে আকাশখানার সীমানা। দূরে একটা কাঠের পুল খালের ওপর। বড় সুন্দর স্থানটুকু। এদিক-ওদিক রসভরা চোখে তাকাল। মনে উঠল গুনগুনানি।

ভিজ়ে শাড়িখানা নিয়ে মেলে দিল ছোট ছোট কচুগাছের ওপর।

একতারাটা নিয়ে বসল এসে অর্জুন-গাছের তলায়।

আওয়াজ না তুলে আর উপায় আছে? হাওয়া যে ঠেলে উঠছে কণ্ঠ পৰ্বন্ত।

এ ভবে সাঁইয়ের লীলা চমৎকার।

চন্দ্র মেইলা দ্যাক রে মন আমার।

বাতাসে সুরে মাখামাখি। উদারায় আওয়াজ তারায় ওঠে। কাছাকাছি মানুষের কানের ভেতরে তীরের মত বিধে চমক লাগায়। চোখ ফেরায়। শব্দ চোখ ফেরান কেন, দেখতে দেখতে আশপাশে দুটো-চারটে কুঁচো-কাঁচা জমায়েত হয়, জিলিপীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যারা জিলিপী খাচ্ছিল এগিয়ে আসে তারা। কাঁখে গামছা নিয়ে মাথায় গায়ে খাবলা তেল মেখে চানে যাবার পথে দাঁড়িয়ে পড়ে দু-চারজন। জামগাছের আড়ালে ঘোমটে টেনে দাঁড়ায় গুটিকতক মেয়ে বউ ওদের বাস কাছাকাছি। সকালে জল আনতে যাচ্ছিল।

সাপ্তাহিক বসুমতী

আসমানে জমীনের রংগে

মনের রংগে একাকার।

ও ভূই, চন্দ্র বৃহস্পতি অশ্ব রশ্মি,
রংগ দ্যাখস অশ্বকার।
চন্দ্র মেইল্যা দ্যাখ বে মন আমার।

বিদ্যাধরীর দেহখানা দুলছে, দুলতে
দুলতে দুলতে পাক ঘুরল, যেন হাওয়ায়
অক্রেপে পাক খেল। দেহখানা হাওয়ার
গুণে শোলার মত হালকা লাগে। মৃৎ
ঘুরিয়ে মস্ত চোখদুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
তাকায়। তাকায় বাইরে। না, ও সামনের
কাউকে দেখবার কোন চেষ্টাই করে না।
গ্রাহ্যের ভেতর আনে না। লোক না
পোক! মনের তাগিদে সুব তোলে।
ঘুরের হাওয়ার ঠালায় আওয়াজ তোলে,
কে শুনল আর কে শুনল না, কি আসে
যায় তাতে।

আসল কথা নিজেকেই নিজে শোনায়।
যার বার শোনায়, একই কথা বার বার
ধলে। আওয়াজ দিয়ে বলে, তবু যদি
মন বশে আসে। মনটা বড় পাঞ্জী
ছ্যাচোর, এই বুলল তো এই বেকৈ বসল।
আবার পিঠে হাত বোলাও। শোন। কথা
শোন। অশ্ব হয়ে থাকলে চলবে ক্যান?
তাকা দ্যাখ চোখ মেলে তাকিয়ে।

বিদ্যা থেপী কয় ওরে মন,
মানুষ আইছে ঘাটের ধার।
দেইখ্যা শূইন্যা ল'রে চিন্যা
হাঁব যদি পারাপার।
চন্দ্র মেইল্যা দ্যাখ রে মন আমার।
এ ভবে সাইয়ের লীলা চমৎকার,
চন্দ্র মেইল্যা দ্যাখরে মন আমার।

ডান হাতে একতারাটা উঁচু করে ধরে
তিন-চারটে পাক খেল বিদ্যাধরী।

অমন লম্বা ভারী দেহ যেন পাট-
কাঠির মত হালকা। পাঁচ বছরের মেয়ের
মত বাতাসে ঘুরপাক খেল। ফিঙের
মত হালকা হয়ে গেছে। কেউ বা চার
পয়সা জিলিপী এনে দিল, কেউ দুলে
পয়সা, কেউ দু'কুন্কে মর্দি, গানে সবাই
ধুশি। বাউলী বোম্ভারীর গান এমনি
এমনি শুনতে নেই তিছ দিতে হয়।
সবাই একটু অবাক। একে মেলায় এর
আগে কখনো দেখা যাব নি। কোথায়
ঘর, কোন গাঁয়ে? কোথা থেকে এল।
বলিহারী গলাখানা। সাত সকালে মেলার
সমাজ এনে দিয়েছে।

কিবা গলা কিবা নাচন।

আচ্চা! আপনা-আপনি ফিস-
ফিসিয়ে উঠল মদন ভুইয়া। কিস্টাঘার
মদন।

সাবি সারি ঘরগুলোর দুখানা খরে
অধিকারীরা থাকতে দিয়েছে ওদের।
যাত্রাগান গাইবে। ওদের থাকবার ব্যবস্থা

করতেই হবে। খাওয়া দিতে হবে। জল-
খাবার দিতে হবে, তাছাড়া টাকা দিতে
হবে। ওদের কদর আলাদা। ওরা পথের
বাউল বোম্ভারী নয়।

এদের ভেতর মদন ভুইয়ার মর্বাদা
বেশি। কিস্টার গান ও গায়, যে কোন
পালাগানে মদন গায়ের মদন। বিশ-
পঞ্চাশ গাঁয়ে ওব গলার সুখ্যাত করে
সবাই। ভাবভাগিতে একটু মর্বাদা নিয়ে
থাকে মদন। সকালে একটা প্যাটারার
ওপর বসে মদন মর্দি গুড় খেয়ে সব
একটা সিগ্রেট ধরিয়েছে, কানে এল কানের
পর্দা কাঁপান সুরেলা আওয়াজ।

ভোর বিষানে কেডা সুর ধরল?
ও বেরিয়ে এল। সঙ্গে সিঁথি সাজে
যারা সেই ছ্যামড়া গোটা ছয়েক। মদন
মর্বাদার ভানটা বজায় রেখে বেশ ভারী
গম্ভীর চালে এসে একটা অর্জুনগাছের
পাশে দাঁড়াল। দেখল সেই মেয়েটা।
এটা বাউলী বৃকতেই পারে নি মদন। ও
চুপ করে দাঁড়িয়ে বইল। মাথায় খোঁপাটা
বেঁধেছে চুড়োর মত, গায়ে ঢোলা সোমিকের
মত পরনে। একতারার লাউয়ের ডোলটা
বেশ বড়। ভারী মিঠে আওয়াজ উঠছে।

আর একটা সিগ্রেট-বার করল মদন।
মেলায়-টেলায় এলে ও সিগ্রেট কেনে,
কাঁচি মার্কা সিগ্রেট, এটাও মর্বাদারই
একটা অঙ্গ। মদন ভুইয়া একটা ফালনা
মানুষ নয়। তার একটা মর্বাদা আছে।
পরনের ধুতিটা আর পিরানটা সোডায়
কাচা। নিজে কাচে না। সিঁথি দলের
ম্যাগাকে দিয়ে কাচার। হয়তো একটা
পয়সা দেয় ওকে বাতাসা খেতে।

দেখে শূনে তাম্জব বনে গেছে মদন।
আচ্চা! মৃৎ দিয়ে ওর আপনা-
আপনি বেরোল। বাউলের গান ও অনেক
শুনেনে, কিন্তু এ গানটা শোনা গানের মত
নয়। আবার গানের শেষে পদকন্ডার
নাম বলল, বিদ্যা থেপী। ব্যাপারখানা
কি! বিদ্যা থেপী কি ওর গুরুদেবী?
থাকে কোথায়, কোন গাঁয়ে?

লোকজন পাডসা হয়ে এল। একটা
চট পেতে বলল বিদ্যা। কোঁচড়ের মর্দি
রাখল একটা ত্যানায় বেঁধে। একতারা
পাশে রেখে তখনো গুনগুন করছিল। এ
ভবে সাইয়ের লীলা চমৎকার।

মদন সেখে কাউকে কিছু বলতে পারে
না। বিশেষত গানের ব্যাপারে। ওর
একটা মর্বাদা আছে। বিদ্যাধরী কিন্তু
তাকাল না একবারও ওর দিকে। এতটা
সময় গেল। এত জনা এল, ওকে
দেখে মনে হোল ও যেন কারো দিকেই
তামন করে তাকায় নি। যাকে বলে দৃষ্টি,
সেই দৃষ্টিটা ওর চোখে ছিল না। চোখের
তার দুলে বোধ হয় কি একটা
হাওয়ায় আচ্ছন্ন ছিল।

মদন সিগ্রেটটা মূঠো করে জোরালো
টোনে অর্জুনগাছের পাশ থেকে একটু
সরে এসে কাশল। বেশ জোরে কাশল।
সিঁথি ছ্যামড়া ম্যাগা ওরা চলে গেছে যবে।
মদন বায় নি।

কাশির শব্দে কোন কাজ হোল না।
এ ক্যামন মাইয়ামানুষ। আচ্চা!

পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বার করে
এগোল মদন। ও তো জানে বাউল-
বাউলীরা গাঁজা তামুক খায়, সিগ্রেট পেলে
ভালই লাগবে। তাছাড়া সিগ্রেট-
খাওয়াইয়া মানুষটার মর্বাদা সম্বন্ধে
সচেতন হবে।

এগিয়ে এসে বিদ্যার দিকে সিগ্রেটটা
বাড়িয়ে ধরে বলল,—ধরো ছিক্রেট খাও।
বিদ্যাধরী তাকাল। সামনে মদন।
ওর সামনে হাত বাড়িয়ে একটা সিগ্রেট
ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হেসে উঠল বিদ্যাধরী খিল খিল
করে। কালা মদন এসে দাঁড়িয়েছে।
চেহারাটা ওর আঠার মত চোখে লেগে
রইল। যেন একখানা ছবি।

—এডা কি?

—ছিক্রেট।

আবার হাসল বিদ্যাধরী। দুলে
দুলে হাসল,—দ্যাও, রাইখ্যা দেই।

কালা মদনের এ দানটা ও প্রত্যাখ্যান
করতে পারল না। সিগ্রেট কাকে বলে
জানো না। হাতে নিয়ে দেখল, কাগজে
মোড়া তামুক।

মদন গম্ভীরস্বরে বলল,—গলাখানা
বেশ সাফ তোমার।



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার ফ্রন্ট

কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬০৮০

বিদ্যার চোখদুটো ভিজ়ে ভিজ়ে,

বলল,—তুমি শুনইনছ?

একটু ভাচ্ছিল স্বরেই বলল মদন।

—হ, ব্যাড়াইবার বাইর অইছিলাম। কসে
আওজ় আইল।

মুচকি হাসল বিদ্যায়রী,—কস সাথক
অইছে?

ওর গান শুন়ে কর্ণ সাধক করবে
মদন। মদনকে ভাবল কি বাউলী!
বাহারের গান ও অনেক শুন়েছে, এ গান
তাব কাছে অতি তুচ্ছ। তবু মৃধের
ওপর বলে একটা ঝগড়া পাকাবার দরকার
নেই।

সিগ্রেটে টান দিয়ে মদন বলল,—পদ-
কল্পা কেডা?

বিদ্যা হাসে।—তা দিয়া কাম কি?

বিদ্যা ত্যানার বাঁধা মূড়ি বার করে,
ধান চারেক জ্বিলপী,—খাইবা?

মদন সিগ্রেটে লম্বা একটা টান দিয়ে
সিগ্রেটটা ফেলে দেয় ছুড়ে। সিগ্রেটটা
কচুবনের পাশে গিয়ে পড়ে। ধোঁয়া
উঠতে থাকে। টানা ধোঁয়া দক্ষিণের
দ্বাতিসে বেকে বেকে ওপরে ওঠে।

দুখানা জ্বিলপী নিয়ে বিদ্যা বলে,
—বইয়, খাও।

মদন ভুইয়ার মর্ষাদার একটু বাধা
বাধা ঠেকে। তবু উবু হয়ে বসে, হাত
পেতে বলে,—দাও। ভেমন খিদা নাই।
মূড়ি খাইয়া আইছি। মূড়ি কৈল খামু
না।

—মূড়ি দিমু না। জ্বিলপী খাও।
উপরে মচাইচা, মধ্যে রস।

ফিক করে হাসে বিদ্যায়রী। মাঝে
মাঝে অকারণে ফিক ফিক করে হাসা ওর
স্বভাব। ভেতরটায় ডগমগিয়ে ওঠে
খুশি। এমনি এমনি। কোর কারণ
নেই, তবু খুশি, তবু রসে টইটুদর।

মদন জ্বিলপীতে কামড় দিয়ে বলে,
—কাইল রাইতে ছিল কনে?

—নাটমন্দিরে।

—আর একজন কনে?

কুমির কথা বলছে মদন। কালা
সম্প্রায় ওদের দুজনকেই দেখেছিল কালা
মদন। আর একজনকে দেখে প্রশ্ন।
ফিক ফিক করে হাসে বিদ্যা। পা দুখানা
ছাঁড়িয়ে বসে মূড়ি চিবোয়। বসার ভংগী
আলগা, কথা আলগা, হাসি আলগা, আট-
সাঁট বাঁধন নেই। কেমন ছাড়া-ছাড়া
কোলগা ভাব।

—আর একজন যে আছিল, তেনারে
চাঁপ না কান?

কুমির কথা আবার জিজ্ঞেস করে
মদন। হাসি পায় বিদ্যায়রী। খুব হাসি
পায়। মূড়ি চিবোতে চিবোতে হাতে
মৃধ ঢেকে মৃধ নিচু করে হাসে।

—অত হাসনের কি অইল?

—তোমার রকম-সকম দেইখ্যা হাস
আইল।

মদন বেশ গম্ভীর হোল। বাউলীটা
ফাঞ্জিল। এরা এমনি ফাঞ্জিল হয়।
কথার কথায় ফাঞ্জলামী করা এদের
স্বভাব। আশ্চর্য্য এদের দিতে নেই।
তার ওপর হাজার হোক মদনের মর্ষাদা
বলে একটা কথা আছে। জ্বিলপীটা
শেষ করে হাত দুটো ঝড়ে মদন। তাকায়
বিদ্যার দিকে।

একবার ভাবে উঠবে, কিন্তু উঠতে
পারে না। বাউলীটার গানের আওয়াজ
তখনো রিণরিণ করে বাজছে ভেতরে।
দেখতেও বেশ মিষ্টিমিষ্টি। একটা মিঠে
টান ওকে বসিয়ে রাখছে, উঠতে দিচ্ছে না।
বিদ্যার মৃধখানা বেশ গোলগাল। নাকটা
চাপা, চোখদুটো মন্ত মন্ত, রসে খুশিতে
ভেজা ভেজা, হাসি তো লেগেই রয়েছে।
গালে দুটো খুশির মত টোল। যেন
অন্ত একখানা জলজ্বালন্ত হাসিখুশি।

একটা জীবন্ত আনন্দ।

ওই একতাল খুশির কাছে দু' দণ্ড
বসতে কার না ইচ্ছে হয়। বেশ ভাল
লাগে। ভেতরে তোমার বতই ধোঁয়া
জমুক না। খেপীর হাসির হাওয়ার সব
সাক্ষ। একেবারে পরপরিষ্কার প্রাণখানা
নিজে যেন দেখতে পাবে। ওর নাচন
হাসনের বাতাস লেগে সব যেন ফস্
খোলসা করে দেবে। জজ্বাল খুলো মরসা
কিছু যদি জমে থাকে, হাওয়ার কাপটায়
সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

উঠতে পারছে না মদন। অজ্ঞান-
গাছের নিচে বসে বিদ্যানের ভুরভুরে
বাতাসের মত মিঠে মিঠে লাগছে। অনেক-
গুলো ভাবনা জমে ছিল ওর মনে। যাত্রা-
দলের বিবৃদ্ধে অনেক ব্যাটা-ত্যাড়া
ভাবনা চিন্তা কিছুদিন থেকেই ওকে
বিরত করছিল। আজ এই মত সে সব
ভাবনাগুলো মুছে গেছে।

আশ্চর্য্য, বাউলীটার কাছে বসে কথা
বলতে তার কিছু বেশ ভালই লাগছে।
তবু মর্ষাদা বলে একটা কথা আছে।

মদন বেশ ভন্দর ভন্দর কথা বলে,
—নিবাস কোয়ানে?

ফিক করে হাসে বিদ্যা।—সবখানে।

মদন হাসে এবার। কথটা বলেছে
মন্দ নয়।—কইব নে ঘর কনে?

—দেয়াইল।

মদন চেনে।—অ দোয়াইল। গত
ননে কানাকান্দিতে আমাগো গাওনা হই-
ছিল। নিচয় শুনছিলো?

—না। শুন নাই।

—নামডা কি তোমার?

—বিদ্যাদার।

রা রা করে একটা চিংকার আসে,—
আলো অ খেপী!

কুমির গলার আওয়াজ। কুমি দেহ-
খানা মেজে ধরে চান করে ধীরে সুস্থে
নাটমন্দিরের কাছে এসে দেখে সব ফক্স।
খেপীও নেই। পোটলা-পুটলিও নেই।
সম্বনাশ। গেল কোথায়? কুমির বুক
ধড়ধড় করে। এমন সলগী নিয়ে মেলায়
এসে পদে পদে বিপদ। না আছে
আজ্ঞেল, না আছে বুদ্ধি। খেপী যেন
চর্কি-বাজীর মত হাওয়ার হাওয়ার ঘোরে।
কখন কোথায় যায়। কিছু পাক্তা রেখে
যায় না। রসে সয়ে আরামে হাই তুলে
জিরোতে সাতাতে জানে না। কি
ভয়ঙ্কর মাইয়া!

—অলো, অ খেপী!

বিদ্যা মৃধখানা উচিয়ে বলে ওঠে,—
আয় লো, আয়—

মদন হাসে। মন্দ লাগছে না ওর।
বলে,—তোমার নাম খেপী?

—মানবে কয়।

কুমি এগিয়ে এল তেড়ে। বৌশ
দুর কিছু নয়, একটু এগিয়েই অজ্ঞান-
গাছের তলা।

এসেই ফেটে পড়ে।—তর আক্কেলখানা
কেমন লো? বলন নাই, কওন নব
চড়ুইয়ের নাগাল ফুরত ফুরত উড়ছে
দ্যাখ! শোক্‌দুর করছি তর নগে আইনা!
অম্মা, ই কেডা?

মদনের দিকে চোখ পড়তে নিজেকে
সামলায় কুমি।

বিদ্যা ফিক করে হেসে বলে,—কালা
মদন।

—আই—আই—জিভ কাটে কুমি।
মৃধ ফিরিয়ে হাসে। খেপীটার কোন
কান্ডজ্ঞান নেই, ভন্দর-ভন্দর মানবটাকে
মৃধের ওপর বলে বসল, কালা মদন।
আই—আই—। ছিক্ক্যা!

মদন যেন শুনতেই পায় নি। উঠে
পড়ে। উঠে একটা হাই তোলে। আর
তাকায় না ওদের দিকে। ওর একটা
মর্ষাদা বলে কথা আছে। মৃধের ওপর
কালা মানিক সম্বোধনটি ওর মর্ষাদার
পক্ষে হানিকর। কি আর করা যাবে,
বাউল বাউলীরা ওমনি ধরণের।

কুমি লেপটে বসে অজ্ঞানগাছের
তলায়। হঠাৎ বিদ্যাকে জড়িয়ে ধরে
পুলকের হাসি হাসতে থাকে।

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পূর্বেই বলেছি, ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগের দিন রাতে মহাত্মাজী, তাঁর মানব-প্রেমের যাদুস্পর্শ সাম্প্রদায়িক হিংসা-স্বেষে জর্জরিত কলকাতার ধুম ধমে বিধাত আবহাওয়া কীভাবে সম্পূর্ণরূপে শূন্যে মিলিয়ে দেন। শূন্য মিলিয়েই দেন না, তার জায়গায় পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-সৌহার্দ্য-শুদ্ধতা ও সদিচ্ছার এক নতুন ভাবধারার জোয়ারে সারা কলকাতাকে, তথা পশ্চিমবঙ্গকে ভাসিয়ে দেন। আমি তখন পাকিস্তানের রাজসাহী শহরে। কলকাতার সে দৃশ্য চোখে দেখি নি; তবে শুনেছি যে, সে দৃশ্য অভিনব ও অবিদ্বন্দ্বীয়। তাই তো ছিল স্বাভাবিক কিন্তু সেই স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক করে তুলেছিল, মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হিংসা ও জাতি-বিশেষ। বাঙালী চিরদিনই স্বাধীনতা-প্রিয় ও স্বাধীনতার পূজারী। স্বাধীনতা-দেবীর পূজায় তাঁরাই সব চেয়ে বেশি অর্ঘ্য, বেশি বলি দিয়েছেন, আব স্বাধীনতা যখন তাঁদের স্মার-প্রাপ্তে এসে দাঁড়িয়েছে তখন কি সেই বাঙালীরা উৎসব-মুখর না হয়ে পারেন? উৎসব-মুখর হওয়াটাই ছিল তাঁদের পক্ষে অতি-স্বাভাবিক কিন্তু মুসলিম লীগের সূচক সাম্প্রদায়িকতার আগুন ও যুক্ত বাংলার মধ্যমশ্রী মুসলিম লীগ নেতা সুরাবদী সাহেবের অ-মুসলমানের ওপর অত্যাচার-উৎপাদন এবং ১৯৪৬ সালের হত্যার তান্ডব, যার ফলে সোনার বাংলা বাঙালীর প্রাণের দেবতা জননী-জন্মভূমি—বিভক্ত হচ্ছে, তাঁদের মনকে বন্ধ-কঠিন করে তুলেছিল—তাঁরা প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিলেন, সব অপরাধের এবারে শেষ করে দেওয়া হবে—সুদে-আসলে রক্তের বিনিময়ে। সুরাবদী সাহেবও, খতম হবেন—সাথে সাথে খতম হবেন, শত শত নিরীহ-নিষ্পাপ মুসলমান জনতাও! কিন্তু তা হল না—বাংলাব ও বাঙালীর সৌভাগ্য যে তাঁদের হাত রক্তে কলুষিত হল না। কলুষিত তো হলই না—তার জায়গায় দেখা দিল প্রেমব মিলন—হৃদয়ে হৃদয়ে আন্তরিক কোলকুলি। এই অবস্থা

সৃষ্টির জন্য মহাত্মা গান্ধীর দান তো আছেই—সেটা সর্বজন স্বীকৃত। আমি মনে করি, সুরাবদী সাহেবের দানও কম নয়। তিনি যদি সেদিন তাঁর নিজের মৃত্যু ভয় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে হৃদয় জনতার সামনে হাত-জোড় করে না দাঁড়াতে, তাহলে হয়তো অবস্থার ঐরূপ বৈদ্যুতিক পরিবর্তন সম্ভব হত না মহাত্মাজীর একক প্রচেষ্টায়। সুরাবদী সাহেবই ছিলেন, অ-মুসলমান জনতার পয়লা নম্বর শত্রু। সেই শত্রুই আজ তাঁদের সম্মুখে—ইচ্ছা করলেই তাঁরা আজ তাঁকে শেষ করে দিতে পারেন কিন্তু শত্রু আজ আর হিংস্র নয়—পরাজিত ও নতজানু—জোহা পরশমণির সম্পর্কে সোনা হয়ে গিয়েছে! সুরাবদী সাহেবের সেদিনের ভূমিকা আওরঙ্গজেবের অভিনয়কেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুরাবদী সাহেব সেদিন যদি অভিনয়ও করে থাকেন (পরবর্তীকালে তাঁর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে ভারত-বিশেষী জিগির শূন্যে, আমার মনে হয়, সেদিনের সেটা তাঁর অভিনয়ই ছিল) তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর অভিনয় অতি নিখুঁত ও মনোরমই হয়েছিল। হৃদয় জনতা সেদিন শূন্য শান্ত হয়েই ক্ষান্ত হন নি, সেদিনে তাঁরা প্রেমের বন্যায় ভেসে গিয়েছিলেন। আমার বিবাস, কলকাতার তথা পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজ সেদিনের সেই অঘটন ঘটনের জন্য যেমন মহাত্মাজীকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন, সুরাবদী সাহেবকেও তাঁরা তাই করেন। সুরাবদী সাহেব দেশ-বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের মধ্যমশ্রী যদি হতে পারতেন, তাহলে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায আগেই চলে যেতেন; কিন্তু অবস্থা অন্য বকম দাঁড়াতো। সুরাবদী সাহেব যে পূর্ববঙ্গের মধ্যমশ্রী পান নি, সেটা পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদরূপেই দেখা দিয়েছিল।

কলকাতাব আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। স্বাধীনতার দিনে সবাই খুশি। মুসলমান খুশি, অ-মুসলমান খুশি, জনতা খুশি, রাজনীতিক

নেতারাও খুশি, সরকারের কতৃপক্ষ মন্ত্রীরাও খুশি। খুশির বন্যায় কলকাতা “ডুবু ডুবু”, বাংলা “ভেসে যায়।” গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অন্তর্বর্তীকালীন ছায়া-মন্ত্রিসভা (Shadow Cabinet) শেষ হয়েছে। তিনি আবার স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গড়েছেন। ছায়া-মন্ত্রিসভাতে থাকা কালেই তিনি তাঁর চরিত্রের সত্যতা ও দৃঢ়তার জন্য বাংলার জন-মনে একটা বিশিষ্ট ছাপ কাটতে পেরেছিলেন। ডঃ ঘোষ, মহান ত্যাগী, নিরলস কর্মী, এবং চরিত্রে অত্যন্ত সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠ ও নীতিপরায়ণ। তিনি অকৃতদার; সূত্রবাক্য তাঁর অর্থের প্রয়োজন খুব কম। তাই অর্থের প্রতি তাঁর লোভ বা আকাঙ্ক্ষা নেই। ইংরেজ আমলে তিনি ট্যাকশালে যে চাকুরী পেয়েছিলেন, তাঁর আগে আত্র কোনও ভারতবাসীই তা পান নি; তবু তিনি দেশের ডাকে—মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সে চাকুরী ছেড়ে নেমে পড়েন। এহেন ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মধ্যমশ্রী হয়েছেন। স্বাধীনতাব ছোঁয়াচ লেগে তাঁর কর্মশক্তি যেন চতুর্দশ বেড়ে গিয়েছে। দিবা-রাত্রি তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভাব সকল সদস্যই খেটে চলেন দেশ থেকে ইংরেজ-আমলেক সর্বদা দূরীত সমুদ্রে উচ্ছেদ কববেন। গান্ধীজীবী পূর্ণাঙ্গ কলকাতাব রাষ্ট্র নীতিক আবহাওয়া বদলে যাওয়ার তিনি খুশি মনেই তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শের পথে এগিয়ে চলেন। অতিব্রত উৎসাহ ভরে এই এগিয়ে যাওয়াই কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়। সে কথা পবে যথাসময়ে বলবো। এখন শূন্য এইটুকু বললেই বোধ হয় তাঁর চারিত্রিক রূপরেখা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হবে যে তিনি তাঁর নীতিকই কবেছিলেন তাঁর জীবন-বেদ। তার ফলে, তাঁকে কিছু কিছু লোকের কাছে অপ্রিয় হতে হয়েছে। এই অপ্রিয় হওয়াব ঘটনা সম্পর্কে আমার শোনা একটা গল্প বলি। তাতেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফটে উঠবে। গল্পটি শোনা আমার আর একজন প্রিয়

মহাশয়ের কাছে। ডঃ ঘোষ, তখন 'অভয় আশ্রম' ছেড়ে 'খাদি প্রতিষ্ঠানে' এনেছেন। সতীশবাবু ও প্রফুল্লবাবু গিয়েছেন পাবনার খন্দার ফিরি করে বিক্রি করতে। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে তাঁদের সাথে দেখা হয় পাবনার উকিলসভার এক সদস্যের সাথে। ঐ সদস্যটি ছিলেন, প্রফুল্লবাবুর ছাত্র-জীবনের সহপাঠী বশু। বহুকাল পরে, দু'বন্ধুর মিলন। বশুটি দুই নেতাকেই তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। সতীশবাবু, তো নিরামিষাষী—কিন্তু প্রফুল্লবাবু তা তো নন—ই বরং বড় বড় কই মাছের প্রতি—বিশেষ করে সেই কই মাছের সিরিষাবাটা দিয়ে পাত্তিরি প্রতি তাঁর একটা আসক্তি বরাবরই ছিল। ভ্রম-লোকের বাড়িতে প্রফুল্লবাবুর জন্যে সেই কই মাছই সেইভাবে রাখা হয়েছে। উকিলবাবুর স্ত্রী পরিবেশন করছেন। প্রফুল্লবাবু মাছটি খেয়ে খুব প্রশংসার মুখের হয়েছেন। মেয়েরা তাঁদের মাতৃ-জ্ঞানোচিত স্বভাবের জন্যেই সম্ভবত যে জিনিষটার প্রশংসা হয়, সেই জিনিষটিই আবারও দিয়ে থাকেন।—মহিলাটি তাঁর মাছের প্রশংসা শুনে আবার মাছ নিয়ে এসে দিতে উন্মত্ত হয়েছেন। প্রফুল্ল-বাবু নিবেশ করা সত্ত্বেও মহিলাটি আবারও যখন আর একটা মাছ প্রফুল্লবাবুর পাতে দিয়েছেন তখনই না কি প্রফুল্লবাবু একে-বারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তড়াক করে আসনের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। সতীশবাবু ভো কাণ্ড দেখে একেবারে অবাধ, উকিলবাবু অবাধ ও লম্বিত, আর মহিলাটি ভো সমাধিক লম্বিত। প্রফুল্লবাবুকে আমি বহুদিন হতে বিশেষ-ভাবে জানি বলেই, ঘটনার গল্পটি আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। প্রফুল্ল-বাবুর চরিত্রের বহু গুণের মধ্যে এ-ও একটা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত মহৎ লোকেরই না কি কিছু কিছু খোঁসালও থাকে।—প্রফুল্লবাবুও আছে। তিনি ঘোরতর নীতিনিষ্ঠ। তাঁর জীবন-নীতির একটুও ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। হলেই তিনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে তীক্ষ্ণতাও যথেষ্টই আছে। প্রফুল্লবাবুর চরিত্রে এই তীক্ষ্ণতা কী করে এসেছিল, তা আমি জানি না; তবে, চরিত্রের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে আর একজন শ্রম্বেশ নেতার একটি উক্তি এখানে নিবেদন করছি। ১৯৩২ সাল। আমি, মেদিনী-পুর জেলের ২০ ডিগ্রির একটি 'সেলে' আছি। কুমিল্লার তৎকালীন নেতা শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার মহাশয় এসে আমার পাশে 'সেলেই' জায়গা নেন। দু'জনের মধ্যে রোজ নানা বিষয়ে আলাপ-

খালোচনাও হয়। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বসন্তদা বলেন,—“বিয়ে করলে মানুষের কর্মশক্তিও বাড়ে এবং মেজাজের তীক্ষ্ণতাও কমে যায়। সুভাষবাবু যদি বিয়ে করতেন, তাহলে তাঁর কর্মশক্তি আরও বেড়ে যেত এবং এখন তাঁর মেজাজে যে তীক্ষ্ণতা দেখা যায় তা-ও কমে যেত।” এটা অবশ্য আমার কথা নয়—বসন্তদার অভিমত। আর একজন বাংলার প্রসিদ্ধ নেতা—বগুড়ার শ্রম্বেশ শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় (মতীনদা) ১৯৩৫ সালে দমদম জেলে আসন্ন যুক্তিমুখী কয়েকটি তরুণ বন্ধুর বিদায়-অভিনন্দন সভায় বলে-ছিলেন যে—“ভাই সব, তোমরা স্বদেশী কর, আর বাই কর, আমার কথা আগে গিয়ে বিয়ে করো। তারপরে কাজ.....। আমি বিয়ে না করে আজ অভাব বোধ করছি। কিন্তু সময় আর নেই—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।.....” তিনিই বা এই যুক্তি কেন দিয়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। প্রফুল্লবাবুর মেজাজের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে কথা-প্রসঙ্গে এই অভিমত দুটি এখানে তুলে ধরেছি দেখে কেউ যেন মনে না করেন যে, শ্রম্বেশ নেতা প্রফুল্লবাবুকে লোকটাকে ছোট করার জন্য আমি এই কথাগুলো বলছি। মোটেই তা সত্য নয়; বরং প্রফুল্লবাবুর প্রতি আমার প্রশ্ণা তাঁর অতি-অনুরাগী কোন বন্ধুর চেয়েই কম নয়, যদিও আমি রাজনীতিক্রমে তাঁর সব কাজ সব সময়ে সমর্থন করতে পারি নি। এক সপ্তকে আমরা—আমি ও প্রফুল্লবাবু বেশ কিছুকাল খাদি প্রতিষ্ঠানে ছিলাম। ১৯২১ সাল থেকে একসাথে প্রাদেশিক কংগ্রেসেও ছিলাম। পরস্পরকে পরস্পর বেশ ভালভাবেই জানি। এই জানার ফলেই দেখেছি সময়ে সময়ে তাঁর মেজাজের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণতা। এই তীক্ষ্ণতা আরও একবার দেখেছিলাম। রাজসাহী শহরে। আচার্য পি সি রায় মহাশয়কে নিয়ে প্রফুল্লবাবু ও আমি গিয়েছি রাজসাহীতে। রাজসাহীর তৎকালীন নেতা শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মৈত্র (বর্তমানে পরলোকগত) মহাশয়ের বাড়িতে আমরা উঠেছি। কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা অনেকেই এসেছেন, আচার্য-দেবকে একবার ছাত্রদের 'কমন-রুম' নিয়ে গিয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য। কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র মৈত্র মহাশয় আসেন নি। ডঃ ঘোষ তাতে আচার্য রায় মহাশয়ের প্রতি অসম্মান করা হয়েছে বোধ করে মনে মনে অত্যন্ত আহত বোধ করেছেন এবং তাঁর সমস্ত রাগের তীক্ষ্ণতা তিনি ছাত্র-দের ওপর বোঝে দেন। ঐ প্রাথমিক শ্রেণীর একটি ছাত্র তাঁর ভরসনায় কেঁদে ফেলে। এবং আচার্য পি সি রায় মহাশয়-ই পরে ছেলোটিকে কোলে

নিয়ে শান্ত করেন এবং কলেজের 'কমন-রুম'ে যান ও ভাষণ দেন। এক অকৃতদার নেতা ছেলোটিকে কাঁদানেন, আর এক অকৃতদার মহান নেতা ক্রন্দনরত ছেলোটিকে শান্ত করলেন। এই দেখে স্বভাবতই মনে হবে যে বিয়ে না-করা সম্পর্কে দুই নেতার যে অভিমত ওপরে তুলে ধরেছি, তা তাহলে ঠিক নয়। ঐ অভিমত ঠিক, কি বে-ঠিক সে সম্বন্ধে আমার কোন নিজস্ব মতামত দিতে চাই না; তবে একটা কথা শুধু এখানে জানিয়ে রাখতে চাই যে আচার্য পি সি রায়েরও বহু খোঁসালই ছিল এবং তাঁর মেজাজ কখন কখন তা বোঝাও শর ছিল।

যাক, আমার দৃষ্টিতে প্রফুল্লবাবুকে আমি যেমন দেখেছি, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক কথাই বলে ফেলেছি। জানি না, কথাগুলো অব্যক্ত হয়েছে কি না, অথবা তা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর কারণ হয়েছে কি না! হয়ে থাকলে পাঠকদের কাছে মার্জনা চাই।

এখানে আরও একটি কথা বলতে চাই। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের নব রূপায়ণে যে সব কংগ্রেসী রাজনীতিতে প্রথম দীক্ষা নেন, অর্থাৎ যারা তাব আগে কোনও দিন সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন নি, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই দেখেছি, এমন একটা অহমিকা বোধ আছে যাকে ইংরাজিতে বলা হয় Superiority Complex যাতে তারা মনে করেন যে তাঁরাই একমাত্র লোক যারা এবং তাঁদেরই প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠানের যা দেশে স্বাধীনতা এনেছেন আর সকলে অথবা কংগ্রেসের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠানভুক্ত যারা আছেন, তাঁরা কেউ কিছু নন—স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদেরও যে বিশেষ দান আছে, তা ঐসব গান্ধী-সেবক কংগ্রেসীরা ভাবতে যেন একটু কুণ্ঠা বোধ করেন। পাকিস্তানে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যেও এই একই মনোভাব দেখেছি। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় অবশ্য এই শ্রেণীর মধ্যে পড়েন না, বা তাঁর পড়া উচিত নয়; কারণ ছাত্র-জীবনেই তিনি রাজনীতিক দলের সম্পর্কে এসেছিলেন। তবে, কিন্তু গান্ধীবাদে দীক্ষা নেওয়ার ফলে তাঁর পরিপূর্ণভাবে মগজ খোলাই-এর (brain wash) পরে তাঁর মধ্যেও অঙ্গ-বিস্তর ঐ ভাবটা এসে গিয়েছে। তার ফলে, তাঁর নিকলস্ক চরিত্র, কটর নীতিনিষ্ঠতা সত্যতা প্রকৃতি বহু গুণ সত্ত্বেও রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি কিছু শব্দও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রথম মধ্যমস্ত্রী হিসাবে দূর্নীতির বিরুদ্ধে সত্যতার অভিধান সৃষ্টি করে, বড় ব্যবসায়ী মহলে প্রবল শব্দ; আর ঐ

রূপ সাধনায় সাধনার

দুটি অনবদ্য অবদান



সাধনা বিউটি ক্রিম

প্রতিদিন স্বক চর্চায় একান্ত
প্রয়োজন। কৃষ্ণ কোমল
পেলব তমু ও যৌবন স্থলভ
লাবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথ পেস্ট

দস্তরাজি মুক্তার মত শুভ
ও উজ্জ্বল, মাটি স্বাস্থ ও সুদৃঢ়
মুখ দুর্গন্ধমুক্ত ও স্বচ্ছ করে।

সৌন্দর্যই পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন)
এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের কৃতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ রমেশচন্দ্র বোষ
এন. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্যঃ

শত্রুদের সাথে হাত মেলায় তাঁর রাজ-নীতিক ক্ষেত্রে শত্রুরা, যার ফলে তিনি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কিঞ্চিদধিক হয় মসের মধ্যেই। প্রফুল্লবাবুর পরাজয়ে সৈদীন সত্যনারাই পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু সত্যদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, স্বাধীনতার প্রথমদিন থেকে—ততদিন তিনি অত্যন্ত খুশি মনেই অক্লান্তভাবে কাজ করে গিয়েছেন। গান্ধীজীর যাদুস্পর্শ স্বাধীনতার প্রথম উৎসবে যে প্রেমের—যে মিলনের বন্যার দেশকে ভাসিয়ে নিয়েছিল—সেই বন্যার জোয়ার সেই দেশের মুখ্যমন্ত্রীর ও তাঁর মন্ত্রিসভার গায়েও যে লাগবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী? লেগেছিলও। সবাই সৈদীন খুশিতে ভরপুর।

কলকাতা, তথা পশ্চিমবঙ্গ সৈদীন খুশিতে ভরপুর হলেও কিন্তু ভারতের রাজধানী দিল্লীতে তা হয় নি। সেখানে বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। লিওনার্ড মোসলে (Leonard Mosley) তাঁর বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ কর্দিন 'The last days of the British Raj' পুস্তকে এদিনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তারই ভাবটা এখানে তুলে ধরছি। দিল্লী-সংসদের সদস্যগণ ইন্সতিয়ার করা খুশি বা পায়জামা পরে এবং মাথায় গান্ধী টুপি দিয়ে সম্মুখ হতে না হতেই সকলে সেজে একত্রিত হয়েছেন। তাঁরা মধ্যাহ্নের অপেক্ষায় সবলেই উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। মধ্যাহ্ন এলেই এতদিনের ব্রিটিশ-পতাকা নেমে পড়বে, সেখানে স-গোঁরবে উঠবে স্বাধীন-ভারতের জাতীয় পতাকা। ওঃ, সে কী মধুর ক্ষণ! এতদিনে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে। অবশেষে, সেই স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতার জন্য কত লোক প্রাণ দিয়েছেন, কত লোক জেলে গিয়েছেন, কত লোক সর্বস্বহারা হয়েছেন, সেই স্বাধীনতা আসছে! খুশিতে আজ তাঁদের মন ভরপুর। কিন্তু নেতাদের মধ্যে বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। কেউ বা খুশি, কেউ বা বিষাদাক্রান্ত। নেহরুর দুখে-আলতা গোলা রং-এর মুখখানি যেন শূন্যে ঝুলে পড়েছে, তাঁর চোখের কোণে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে, তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। প্যাটেল, যেন বোমের বাদশাহের মত বিজয়-পতাকা উড়িয়ে স-গোঁরবে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন। রাজাগোপালাচায়াই মন যেন খুশিতে একেবারে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়েছেন। রাজকুমারী অমৃত কাউর তো কাঁদছেনই। একমাত্র অতি বিষাদাধীন মোলানা আবুল কালাম আজাদের মুখে হর্ষাৎকল্ল

জনতার মুখের মধ্যে দেখা যায় না। একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত পাহাড়ের মত অথবা একটা বাজ-পড়া প্রকান্ড মহারুদ্ধের মত—তিনি সর্ব সৌন্দর্যহারা হয়ে যেন জনতা থেকে দূরে ছিটকে পড়েছেন। তাঁর কাছে আজকের এই দিনটি জীবনের সবচেয়ে বড় শোকের দিন রূপে দেখা দিয়েছে।

নেতাদের মধ্যে এই বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া কেন হল, সেই প্রশ্নটার-ই একটা বিশ্লেষণ দরকার। আমার দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখে, বিচার করে আমি যা বুঝছি, তা-ই এখানে নিবেদন করছি।

যে নেহরুকে আমরা দেখেছি যে তিনি সারাজীবন 'দৌড়-কাঁপ' করে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন, কখনও তাতে পরিশ্রান্ত হন নি, যে নেহরু সম্পর্কে তদানীন্তনকালের ইংরেজ পরিচালিত 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল যে ১৯৩৭ সালের নতুন সংবিধান অনুসারে সাধারণ নির্বাচনে নেহরু তিন মাসকাল সারা ভারতবর্ষের চরিকর মত ঘুরে বৃত্তা করেছেন—কখনও ট্রেনে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও বা পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছেন—এ তিন মাসকালের প্রতিদিন গড়ে তিনি তেরটি (১০) সভায় বৃত্তা করেছেন, তবু তাঁর শরীরে ক্লান্তি আসে নি, সেই নেহরুরই আজ এত ক্লান্তি কেন? ১৯৩৭ থেকে আজ ১৯৪৭ সাল। মাত্র এই দশ বছরের মধ্যে নেহরুজী কি বুড়ো হয়ে গেলেন, এত শ্রম-কাতর হয়ে পড়লেন? না,—তিনি বুড়ো হন নি, তিনি শ্রম-কাতরও হন নি। তবে? কারণ অনুসন্ধান করতে হলে নেহরু-চরিত্রের বিশ্লেষণ দরকার (আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমার বিচার এখানে তুলে ধরছি)। নেহরু অত্যন্ত সাহসী, স্বাধীনতার সংগ্রামী জনতার বীর সেনাপতি। শত যুদ্ধের অক্লান্ত সৈনিক, অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে বলীরান নেতা, আজ স্বাধীনতা যখন দ্বারপ্রান্তে তখন তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত! এ ক্লান্তি তো পরিশ্রমের ক্লান্তি নয়—এ অন্তর্মুখের অবসাদ, ক্লান্তি। নেহরুর মধ্যে দুইটি মানুষ অনবরত সংগ্রাম করে চলেছেন। একটি মানুষ হলেন—কবি, দার্শনিক, সু-পণ্ডিত, সু-লেখক, অক্লান্ত কর্মী, বীর সেনাপতি। তাঁর মধ্যে আছে দার্শনিকের সুদূরপ্রসারী অবিস্মৃতি; আর, অপর মানুষটি হলেন,—অত্যন্ত ভাব-প্রবণ। তাঁর ভেতরের এই কবি-সুলভ ভাব-প্রবণতাই তাঁকে সময় সময় অস্থির ও চপলমতি করে তোলে। এই শেষের মানুষটিই তাঁকে প্রতি পদে বাস্তবধর্মী হতে বাধ্য দেয়—কাল যা বলেছেন, আজই তার বিপরীত

কথা বলতে বাধ্য করে। তিনি তাঁর বিচারবুদ্ধিতে সমাজতন্ত্রবাদকেই ভারতের সব সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু ভাব-প্রবণ মানুষটি সামনে এসে তাঁর চলার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তিনি বাস্তবধর্মী আপোষহীন সংগ্রামী রাজনীতিক নেতা সুভাষচন্দ্রের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ পিতার বিরুদ্ধেও যুদ্ধের শাগিত অস্ত্র ধারণ করেন, আবার পর-মুহুর্তেই আপোষকামী মহাত্মা গান্ধীর কাছে মাথা নত করেন, সুভাষ-চন্দ্র যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তৎকালীন ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারত-আক্রমণ করেন, তখন আমরা দেখছি, জহরলাল নেহরু কলকাতায় এসে দৃপ্তকণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করতেও শিধা বোধ করেন নি, আবার সেই নেহরুকে দেখছি, 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতেও! তাঁর জীবনে চিন্তার এই বৈপর্য্য-সংগ্রাম আমরা বহুবারই লক্ষ্য করছি। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-নিধন ও হিন্দু-দের প্রাণভরে দলে দলে বাস্তবত্যাগ করে ভারতে আসতে দেখে তিনি পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রোষে ফেটে পড়েন এবং দৃপ্তকণ্ঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অন্য পদ্ধতি' (other method) গ্রহণের হুমকি দেন কিন্তু পর-মুহুর্তেই আবার দেখছি, রাণাঘাট স্টেশনে এসে বাস্তব-ত্যাগীদের মধ্যে উপস্থিত হ'লে একটি কনকৃত্যাগী মহিলার প্রকৃত কানে একটি সোনার 'দুল' বুলতে দেখে, মুহুর্ত-মধ্যে পূর্ববঙ্গে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের ওপর জনদ্বিষ্ট সব অত্যাচার-উৎপীড়ন নস্যং ক'বে দিয়েছেন। নেহরুজীর মধ্যে এই-রূপ অসামঞ্জস্য কথা, কথা ও কাজ আরও বহু-বহুবার দেখছি। ক্রমশ সেন্সব কথাও 'পাক-ভারতের রূপরেখা'র এসে পড়বে। সে সব ক্রমশ বলবো। এখন শুধু এইটুকুই বলছি যে নেহরুজীর ভেতরে আজ যে ক্লান্তি দেখা যাচ্ছে, তা এ বৈপর্য্য-সংগ্রামের অন্তর্মুখেরই ফল। ১৯৪৬ সালেই লক্ষ্মী শহরে এক জনসভায় নেহরুজী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে মুসলিম লীগ হাজার বছর চেষ্টা করলেও 'পাকিস্তান' কারোম কিছুতেই হবে না কিন্তু আজ, মাত্র ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। এর মধ্যেই সেই নেহরুজীই 'পাকিস্তান' মেনে নিয়ে ভারতবর্ষ ভাগ করলেন! নেহরুজীর বুকে চিন্তার এই তীক্ষ্ণ কাটা না-বৈধার তো কথা নয়। তিনি যে ভাব-প্রবণ। তাঁর প্রাণে দেশ-বিভাগের আঘাত বিশেষভাবে লাগাই তো সম্ভব। লেগেও ছিল; তাই স্বাধীন ভারতের প্রথম পতাকা উত্তোলনের

পর তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে—আমাদের যেসব স্বাধীনতা-সংগ্রামী সহযোগী ও জনতার যারা আজ ভারত থেকে পৃথক এক রাষ্ট্র—পাকিস্তানে পড়লেন, তাঁদের আমরা কখনই ভুলবো না, তাঁরাও যে আমাদেরই রক্ত-মাংসের সমতুল (flesh of flesh and blood of blood) তাঁদের জন্য আমাদের হৃদয়ের ও রাষ্ট্রের দরজা সর্বদাই খোলা থাকবে। কিন্তু জাতিই কি পাকিস্তানী হিন্দুদের জন্য—বিশেষ করে স্বাধীনতার সহযোগী বন্ধুদের জন্য নেহরুজীর হৃদয়ের ও রাষ্ট্রের দরজা আজও খোলা আছে? হৃদয়ের দরজার কথা নেহরুজীই বলতে পারতেন কিন্তু রাষ্ট্রের দরজা যে খোলা নেই তা তো সকলেই দেখছেন। নেহরুজীর হৃদয়ের দরজাও বোধহয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে, পাঠান-বাব সীমান্তগান্ধী নামে খ্যাত খান আবদুল গফুর খানকে আজ কাবুলে বসে কাঁদতে হত না। সীমান্তগান্ধী ১৯৫৫ সালে রাজসাহীতে বন্দন গিয়েছিলেন, আমি তাকে হিন্দু নরনারীকে দর্শন দেওয়ার জন্য ‘সুপার-মোহন মৈত্র মহাশয়ের বাড়িতে’ নিয়ে গিয়েছিলাম। স্বর্গীয় সুপারমোহনের কনিষ্ঠ দ্রাভা—শ্রীমান সত্যেন্দ্রমোহন মৈত্র, এ ঘটনাস্থলে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্মরণ করে ৫।৮।৬৫ তারিখে আমাকে পত্র লিখেছিল, সেই পত্রটিই এখানে আমি হুবহু উদ্ধৃত করছি। এ পত্রে লিখিত প্রতিটি কথাই আমার সামনেই সোদিন হয়েছিল; আমি—জানি, এর একটি কথাও বাহুল্য, অতিরঞ্জিত বা অসত্য নয়।

“সীমান্ত প্রদেশের খুদাই-খিদমৎগার আধিনায়ক অখণ্ড ভারতবর্ষের মুক্তি-কামী বীর সৈনিক খান আবদুল গফুর খান (বাদশা খাঁ) যে বলেছেন—(প্যারিস-লালজীকে) ‘You are enjoying the fruits of freedom and have thrown us to the wolves. ...I am sorry, you have forgotten us.’ এই কথাগুলি অপ্রিয় হলেও অতি সত্য। ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কি এই সত্য কথায় মৰ্যাদা দেবেন? তাঁরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। তা না হলে বাস্তবচ্যুত যারা এদিকে তাদের জন্মস্থান ত্যাগ করে চলে এসেছে, তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ‘fugitive’ (পলাতক) বলে অভিহিত করতেন না। ওরা ‘fugitive’ কিজন্য হবে? ওরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছে, ভারতবর্ষ ওদের জন্মভূমি। ‘পাকিস্তান’ ঘরে একটি পৃথক দেশ করে দিয়েছে কে?

ঐ নেতৃবর্গ। বাদশা খাঁর তিত্ত সমালোচনা বর্তমান ভারত ভূখণ্ডের নেতৃবর্গকে হত্ব করতাই হবে। আপনার উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর বাদশা খাঁ রাজসাহীতে আমার গৃহে পদার্পণ করে হিন্দু নরনারীকে দর্শন দিয়েছিলেন। আমার গৃহ ধন্য হয়েছিল, আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেছিলাম সেদিন। বাদশা খাঁকে শ্রীমান বীরেন জিজ্ঞাসা করেছিল,—‘Khan Saheb, what will be the condition of the Hindus in Islamic State?’

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—‘খোদা রশুলের যে ইসলাম, তাতে তোমাদের ডর নাই, তবে এই আদমিদের ইসলামে তোমাদের অবশ্যই ‘ডর’ আছে। তোমরা এতবড় শক্তিশালী ব্রিটিশের সংগে লড়াই করেছে, প্রয়োজন হলে তোমাদের সেইরূপ এদের সাথেও লড়াই করতে হবে। এদের ‘ইনশানিফে’ নেই—ইংরেজের কিছুটা ছিল। দেখ, এরা জেলে নিষে মেরে পাকিস্তান তিনখানা হাড় ভেঙে দিয়েছে, আমাকে ‘পয়জন’ করেছিল, আমার ১০৭ ডিগ্রি টেম্পারেচার হয়েছিল, ইত্যাদি। তারপর অল্প একটু চূর্ণ করে থেকে এই সৌম্য শান্ত সমাহিত ব্যক্তি অতি ক্ষোভে বলেছিলেন—গান্ধীজী আমাদের let down করেছেন। (উদ্-ইংবেজী মিশিয়ে তিনি বলেছিলেন) আমি তাঁর পেছনেই বসেছিলাম। এখনও আমার

কানে তাঁর কথাগুলি বাজছে। আপনার এসব নিশ্চয়ই মনে আছে। গান্ধীজী সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য অন্য কেউ করতে পারে নি। কিন্তু গফুর খান সত্যকার সত্যপ্রিয়, সত্যকে প্রকাশ করে বলেছিলেন। তিনি কাবুলে বলেছেন—‘There can be peace in the sub-continent only if India and Pakistan one.’ এতে বোঝা যায়, Pakistan become one’. এতে বোঝা যায়, তিনি দেশ বিভাগের একান্ত বিরোধী ছিলেন। ‘You have forgotten me’—একথা বলে তিনি নেতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মাত্র—তিনি আমাদের মনের দুঃখের কথাই বলেছেন। তিনি ভয়শূন্য। পাকিস্তানে আমার গৃহে বসেই যখন পাকিস্তানের বিবেক বলে কিছু নেই বলতে পারেন, তখন কাবুলে তাদের Wolves বলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি?

ওপরে উদ্ধৃত এই চিঠিখানির ওপর কোনও মন্তব্য আমি নিঃপ্রয়োজন মনে করি। চিঠিখানিতে ভুলভোগীর মনের বাধা সন্ধ্যা প্রকাশিত হয়েছে; তাই চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করলেম। সাথে সাথে ভাব-প্রবণ প্রধানমন্ত্রী নেহরুরও বকে কাটা কোষায় বিংশছে, তারও সম্ভান পাওয়া যাবে। জহরলালজীর ক্রান্তির মূল নিহিত তাঁর মনের এই স্বেচ্ছের—এই ভাব-সংগ্রামের মধ্যেই।

প্যাটেল যে বোমের বাদশাহের মত

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের এগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজবাবা - জীবনগর - কোলকাতা

বিজয় পতাকা উড়িয়ে সগৌরবে চলে-
ফিরে বেড়াচ্ছিলেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্য-
পূর্ণ ছিল। তিনি বোধহয় ভাবছিলেন,
ইংরেজ তো চলে যাচ্ছে, এইবার দেখা
যাবে! রাজনীতিতে একান্ত বাস্তব-
বাদী প্যাটেল ছিলেন, নিজের শক্তির ওপর
আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। যেভাবে পরবর্তী
কালে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতভুক্তিতে
স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন, যেভাবে
তিনি জুনাগড়বাসীদের দিয়েই জুনাগড়
দখল করিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে-
ছিলেন, কে জানে তাঁর হয়তো তেমনই
কোন মতলব ছিল কি না? আমি কিছুটা
জানি বলেই বিশ্বাস করি যে তাঁর একটা
পরিকল্পনা ছিল কিন্তু আততায়ীর হাতে
গান্ধীজীর নিহত হওয়ার সব পরিকল্পনাই
ব্যর্থ হয়ে যায়। তা যদি না হত, তাহলে
সীমান্তগান্ধী আবদুল গফ্ফার খান
সাহেবকেও আজ কাবুলে বসে অশ্রু-
বিসর্জন করতে হত না। আর পূর্ব-
বঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানকে
আজ বাস্তবতাগত করে ভারতে এসে না-
থরকা, না-ঘাটকা হয়ে পথে পথে
ভিখারির মত ঘুরে বেড়াতে হতো হত
না। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের পশ্চিমবঙ্গের
মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে অপসারণ ও
শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের পশ্চিমবঙ্গের
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদলাভও সর্দার প্যাটেলের
পরিকল্পনারই একটি অঙ্গ ছিল। সব কথা
আজও খুলে বলার সময় আসে নি, তাই
আজ সেকথা অনুশ্রবণই থাকলো, যেমন

ময়ূর কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা
রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে
অভিনব আয়োজন।

বিতানন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিক্রমপ্রিয়া,
মহামায়ার চর ও পুণির্মিলন।

মূল্য দুই টাকা

বঙ্গদূতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলি-১৬
মূল্য তিন টাকা

অপ্রকাশিত আছে মোলানা আবদুল কালাম
আজাদের 'India wins Freedom' পুস্তকের
একটি অংশ আজও অপ্রকাশিত।
বর্ষায়ান নেতা রাজাগোপালাচরীর
মন খুশিতে মাতোয়ারা—একবারে উগমগ।
তা তো হওয়ারই কথা, কারণ তাঁর ভারত-
বর্ষকে বিভাগ করে 'পাকিস্তান' সৃষ্টির
পরিকল্পনা সফল হয়েছে, সার্থক হয়েছে—
কংগ্রেসের নেতারা তা অবশেষে মেনে
নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান রাজ-
নীতিক নেতা বলে সর্বজন স্বীকৃত।
বুদ্ধিমান তো ষটেই। বুদ্ধিমান বলেই
১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়'
আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেস ছাড়লেন;
ফলে ইংরেজও তাঁর 'তায়ফ' করলেন,
কংগ্রেসেও তিনি অ-পাণ্ডিত্য হলেন না।
সেই সময়েই তিনি দেশ বিভাগের তাঁর
পরিকল্পনা প্রচার করলেন। সেই পরি-
কল্পনাই কিছু রদবদল করে এতদিনে
গৃহীত হয়েছে। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে
তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারত বিভাগের
কথা প্রকাশ্যে বলেন! আজ সেই পরি-
কল্পনা গৃহীত হয়ে ভারত স্বাধীন হতে
চলেছে। তিনিও আবার ঠিক সময় কালেই
এসে কংগ্রেসমহলে ভিড়েছেন। বুদ্ধি-
মানের লক্ষণই তো তাই। আমি বিপ্লবী
দলেব দুইটি প্রবীণ বন্ধুকে জানি। তার
মধ্যে একটি বন্ধু বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি
বলে সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর সম্মুখে অপর
বন্ধুটি একদিন বলেছিলেন—“আপনারা
সকলেই তো—বাবুকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান
বলেন কিন্তু তাঁর বুদ্ধির দৌড় তো আমি
দেখতে পাই না! তাঁর বাবা মৃত্যুকালে লাখ
টাকার ওপর রেখে গিয়েছিলেন। তিনি
সেই টাকা ভেঙেই সারা জীবন খাচ্ছেন।
সে টাকা থেকে নিজে কিছুই রোজগার
করতে পাবেন নি। এই তো গেল তাঁর
সংসারের দিক দিয়ে বুদ্ধির দৌড়। আর
দলে? দলেও তিনি বড়োমুদ্রে লিপ্ত হয়ে
দলকেও ভেঙেছেন। তবুও তিনি
বুদ্ধিমান!” রাজাজী সম্পর্কে ঐরূপ কথা
বলাব ধ্বংসাত্মক অবশ্য আমার নেই। তবু
দেশের নেতাদের কাছে বিষয়টিকে তুলে
ধরিছি। তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন।
বর্তমানে তিনি কাস্মীর পাকিস্তানকে
দিয়ে তার সাথে মিট-মিট করাব ওকালতি
আবার সুরু করেছেন। কংগ্রেস নেতারা
আজ সেটা না মানলেও কবে যে আবার
মেনে নেন, সে বিষয়ে আমার মনে আশঙ্কা
জাগেছে। সম্প্রতি শেখ আবদুল্লাহকে ছেড়ে
দেওয়ার জন্য তিনি অপর কয়েকজনের
সাথে পাকিস্তানের কণ্ঠস্বরের সাথে কণ্ঠ
মিলিয়েছেন। তিনি যে সব কথা এক এক
সময়ে বলছেন, অন্য কোন দলেব কোন
নেতা সেইরূপ কথা বললে, দেশ-নেতাদের
কাছে তিনি দেশদ্রোহী আখ্যা পেতেন এবং

তাঁর স্থান হ'ত—জেলের চার দেওয়ালের
মধ্যে। কিন্তু রাজাজী যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি—
—তাঁর সব কিছুই ভাল। তিনি দেশ-
বিভাগের পরিকল্পনা করে স্বাধীন ভারতে
প্রথম ভাবতীয় 'গভর্নর জেনারেল' হয়ে-
ছিলেনও সুতরাং তিনি যদি খুশি না
হবেন, তবে আর কে খুশি হবে? তাই,
তিনি খুশিতে মাতোয়ারা—উগমগ।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ কাদি কাদি হয়েছেন।
'India devided' (ভারত বিভাগ)
গ্রন্থের প্রণেতা বহু পরিপ্রেক্ষিতে বসে
বইখানি লিখে দেখিয়েছিলেন যে ভারত
বিভাগের পরিকল্পনা কত অ-বাস্তব। তাঁর
সেই অ-বাস্তব বলে বর্ণিত জিনিসই আজ
বাস্তব রূপ নিচ্ছে। তা দেখে তিনি
অ-সুখী হবেন না তো আর কে হবে?
তাই তিনি কাদি কাদি।

রাজকুমারী অমৃত কাউর কাদিছেন।
তিনি যে মায়ের-জাত! লক্ষ লক্ষ সন্তানের
রুদন এবং ভাবীকালের আরও—আরও
রুদন তাঁর বুক তোলপাড় করে তুলেছে—
সন্তানের কান্না তাঁর মধ্যে রূপ নিয়েছে।

আর বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন একমাত্র
রাজনীতিক নেতা—মোলানা আজাদ দেশ
বিভাগে কংগ্রেসের সম্মতি দেখে এবং
সৈন্যদলের ও সরকারী কর্মচারীদের
ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়ার পরি-
কল্পনা দেখে, দেশের ও দেশবাসীর
ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি আকুল হয়ে-
ছিলেন। তাই তিনি বাজ-পড়া একটা
প্রকাশ্য মহীরুহের মত—একটা ধ্বংস-
প্রাপ্ত পাহাড়ের মত সব সৌন্দর্য হারিয়ে
সবার থেকে আলাদা হয়ে দু'বে ছিটকে
পড়েছেন। তিনি দেশের ও দেশবাসীর
ভবিষ্যৎ ভেবে বিষাদ-ক্লিষ্ট। ভাবী
বিপ্লবের রোধ করার ক্ষমতা আজ আব তাঁর
নেই। 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠান দেশ বিভাগ
মেনে নিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসের একজন
নৈতিক সৈনিক।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের প্রথম
স্বাধীনতা দিবসের উৎসব হয়ে গেল।
রাজধানীতে নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বা
হাসলেন, কেউ বা কাঁদলেন, কেউ বা
হাসি-কান্নার মাঝামাঝি এক জায়গায়
দাঁড়িয়ে নিলিপ্তভাবেই উৎসবে অংশ
নিলেন। জনতা তখনও দেশ বিভাগের
ফলাফল ততটা কিছুই বুঝলেন না—তাঁরা
উৎসবের আনন্দই উপভোগ করতে এসে-
ছিলেন—ভোগ করে গেলেন! ভারতবর্ষ
বিভাগ হয়ে গেল, স্বাধীনতার সাথে
সাথে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান
হল কি? হিন্দু-মুসলমানের মিলন হল
কি? ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সৌহার্দ্য
ও শ্রান্ত প্রতীতি হল কি? সেই কথা-
গুলোই আমি পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে
ক্রমশ তুলে ধরবো। [ক্রমশঃ]

গ্রামবাংলার কথা

লোকে বলে বাণিজ্য-সাম্রাজ্যে চণ্ডীর কোপে পড়ে ছয় ডিঙা ডুবোছিল ধনপতি সওদাগরের,—সে এখানেই। এই মগরার খাল—বা কুন্তি নদী গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে যেখানে,—সেই সঙ্গমের মুখে। উদাহরণ-স্বরূপ চণ্ডীর মন্দির, নাম মগরাই চণ্ডী। প্রবাদ—সদল-বলে পিতাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে ধনপতিপুত্র শ্রীমন্ত প্রীতিষ্ঠা করেছিলেন এই মন্দির ও বিগ্রহ চরে গিয়েছিলেন পূজার প্রচার।

কিংবদন্তীটির বিশ্বাসে অসুবিধা আছে। সাধু ধনপতির বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে দেবীর কোপ এবং মগরার দূর্ভাগ্য তুলে ছয় ডিঙা ডুবিয়ে দেওয়ার কথা চণ্ডীমণ্ডলে আছে। কিন্তু সেই মগরা এই মগরা কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশও রয়েছে প্রচুর। এই মগরা সেই মগরা হলে তার উল্লেখ থাকতো ত্রিবেণী কিংবা সাতগার আশে-পাশে। কিন্তু আমরা পাচ্ছি—

বামভাগে হালিশহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী
দু-কুলের কোলাহলে কিহুই না শুন।

* * *

সাতগার বেনে সব কোথাও না যায়,
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।

গুপ্তামের পুর গরিফা, গোন্দলপাড়া, জগদল, ইছাপুর, নিমাইতীর্থের ঘাট—অর্থাৎ বৈদ্যনাথী প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে জামু-পার্বিক এবং ব্যাক্তমিক। মগরার কথা কোথাও নেই।

মগরার কথা পাওয়া গেল অনেক পরে। একবারে চিৎপুর, সালাখে, কলকাতা পেরিয়ে যাবার পর।—

ফরার বহিছে ডরা তিলেক না রর।
হ্রিপার সালিখা সে এড়াইয়া যায়।
কলিকাতা এড়াইল বানিয়ার বালা।
বেতড় এতে উত্তারল অবসান বেলা।

তারপর হিজলী, বালুরঘাট, কালীঘাট, মাচনহাট, বৈকুণ্ঠঘাট, বারাসত এবং হরভোগ। অবলিঙ্গ সাধুর শিবপূজা এবং প্রভাতে সাতনার উত্তরণ। তারপরে মগরার প্রবেশ। কড়-বুড়ি ও সাধুর ছয় ডিঙা নাশ।

বলাই বাহুল্য এই মগরা সেই মগরা হতে পারে না। বরং বর্ণনা অনুযায়ী একে চাঁদিশ পরগনা জেলার বর্তমানে মগরাহাট নামে যে স্থান আছে, এই মগরাহাট মনে করাই সঙ্গত। যদিও সন্দেহের একটুখানি খোঁচা খুঁচা করে এখানেও বিবর্তে থাকে মনে। গঙ্গার বহমান খারা থেকে মগরাহাটের দূরত্ব

অনেকখানি। তথাপি এটাও খুব একটা জোরালো যুক্তি নয় প্রতিবাদের। গঙ্গা গতি পরিবর্তন করতে পারে। নদীস্রোত শূন্যকরে সরে গিয়ে লম্বা-চওড়া তাঁরভূমির সৃষ্টি করেছে হামেশাই। ৫-৭-১০ মাই-লের ব্যবধান তাঁর হলে যাওয়াও বিরল নয়, বিচিত্র ডো নরই। কাজেই যুক্তি প্রমাণ সাক্ষ্য তর্কসাপেক্ষ রূপেই আলোচ্য মগরার প্রাচীনতাকে মঙ্গল-কাব্যের যুগ পূর্বন্ত পিছিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই।

অজকের মগরা বিখ্যাত তার গল্প-খ্যাতিতে। বিকি-কিনির এতবড় বাজার

পারুল ভট্টাচার্য

আজ কেন বোধকরি গভ একশো বছরেরও হজলীর আশেপাশে আর ছিল না। আজ থাকলেও খুব বেশি নেই।

পূর্বে-পশ্চিমে কুন্তি নদী, উত্তর-দক্ষিণে জি. টি-রোড। সোজাসুজি দু'টি সরল রেখা হয়ে চার ভাগে বিভক্ত করেছে মগরাকে। নদীর ধারে ধারে বতসুর নজর যায় সারি সারি চিমনী, ইটখোলা, টালি-খোলা, ধানকল, সুরকী মিল। গল গল কালো ঘোঁরা গ্রাস করছে আকাশকে। ধন গলি, ঘিঞ্জি বসত। সব মিলিয়ে মগরা একটি আশ্রিত সমস্ত গল্প-সহর।

যদিও রাস্তাঘাট মোটামুটি ভাল। হাট, বাজার, স্কুল, কলেজ, রাস্তার লাইট, হাতের কাছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবই আছে, তথাপি মগরা একখানি গ্রাম। মগরা থানার চুচুড়া-মগরা অঞ্চলের অধীনস্থ একটি ইউনিয়ন বোর্ড। হ্যাঁ—ইউনিয়ন বোর্ড। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয় নি এখনও। কি সব কেস বন্ধে হাইকোর্টে। মিটে গেলে অঞ্চল হবে। এবং আশা করা যাচ্ছে মিটেও যাবে খুব শীঘ্রগিরই।

এলাকা ৩-১৬ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা ৮৭২২। ১৯৬১ সনের আদম-সুমারী মতে। এখন বেড়ে হয়েছে প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি। স্থায়ী পরিবার ১৮০৪টি, বাদবাকী সবই অস্থায়ী। এটা-সেটা দরকারে গ্রামিক-

সৈদিক থেকে এসে ডেরা বেঁধেছেন। চলে যাবেন আবার কল্ল ফুরোলে।

রাস্তাঘাট মোটামুটি ভাল। এদিকে জি, টি, রোড, ওদিকে মগরা-বানপুর রোড। রাস্তা দু'টির সামান্য অংশই পড়েছে মগরায়। সব মিলিয়ে মাইল দুই হবে পাকা রাস্তা সমস্ত এলাকায়, কি তার চেয়ে হয়তো সামান্য বেশি।

বাস চলে জি, টি, রোডের ওপর দিয়ে—৭ নম্বর বালীখাল-বর্ধমান। ৪ নম্বর মেল—চুচুড়া-মেমারী। ৪ নম্বর লোকাল চুচুড়া-মগরা স্টেশন ভায়া ত্রিবেণী। আর ২৩ নম্বর চুচুড়া-বর্ধমান। লোচলে মগরাবাসীর সুবিধা খুব। এতগুলি বাস ছাড়াও রয়েছে ট্রেন। ব্যাংকল-বর্ধমান মেন লাইনে ব্যাংকলের পর মগরা স্টেশন।

কাঁচা রাস্তা ১২ মাইল। বেশির ভাগই ভাল। কেবল গজঘন্টা-এস, টি, কে, কে, রোড এবং জি, টি, রোড থেকে বাসদেবপুর কালীতলা পূর্বন্ত যে রাস্তাটি গিয়েছে—এ দু'টি ছাড়া। এই রাস্তা দু'টির দুরবস্থা দেখা গেল। মেরামত দরকার এবং এখনই।

জি, টি, রোড থেকে সামান্য তল্লাজে গ্রাম মেতিগড়া। শতাব্দিক তপালী পরিবারের বাস এখানে। কিন্তু কোন রাস্তা নেই। অন্য সময় কোন-কোন বর্ধাকালের অবস্থা অবর্ণনীয়। চার-দিকে ধানক্ষেত, মাঝখানে একটি ন্যূপের মত গ্রামখানি। সমস্ত জগতের সঙ্গে সংযোগ বিহীন একেবারে। সেক্ষেত্রে মৈথোর একটি পারে-চলা-পথ এখানে এখন দরকার।

জিউবওয়েল আছে ৩৫টি। বেশির ভাগই ভাল। একেকো থাকে গজঘন্টার ৪ থেকে ৫টি। এবং বেশির ভাগ সময়েই একেকো হয়ে গেলেও গ্রামবাসী নিজেরাই করে নেন মেরামত। স্ব-ব্যয়ে এবং উদ্যোগে। শুভলক্ষ্য সন্দেহ নেই। মানুষের নাগরিক চেতনা বাড়ছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে সরকারী সম্পত্তিতে স্বাধিকার বোধ।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ১টি। মগরা, বনের মাঠ, নতুন গ্রাম, হোদিয়াপোতা, শক্তি দেবপাল, জগদল এবং গজঘন্টা

দুটি। পুরানোপোতা ও বাগাটীতে আছে নিন্দা বনুয়াদী। আর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হয়ে গিয়েছে মেতিগড়ায়। অনুমোদন পায় নি এখনও, আশা করা যাচ্ছে পেয়ে যাবে শীগ্গিরই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাড়ি-ঘরগুলি ভাল এখানে। বিশেষত মগরা উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাড়িটি তো আশাতীত রকমের ভাল। প্রকাণ্ড দোতলা ভবন। ওপরে নিচে সাতখানি ঘর। সামনে বাগান, কল, পায়খানা, বাথরুম সব লাগোয়া। প্রাথমিক তো পরের কথা, অনেক উচ্চ বিদ্যালয়েও সম্ভব হয়ে ওঠে না এমন সু-বন্দোবস্ত।

তবে ভবনটি পুরনো হয়েছে ইদানীং। প্রকাণ্ড বাড়ি মেরামতে তাই খরচ অনেক। সম্ভবত এই কারণেই হাত পড়ে নি আজ পর্যন্ত। কিন্তু আর দেরি না করে হাত দেওয়া দরকার। বিলম্বে আরও বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা।

পড়াশুনার ফলাফলও খুবই ভাল এদের। আজ পর্যন্ত আটবার বৃত্তি পেয়েছে এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। ১৯৪২ সনে স্কুল প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৫ থেকে বৃত্তি পেয়ে আসছে বরাবর। ১৯৫৬-র পেয়েছে একসঙ্গে ৪ জন।

মেয়েদের জন্য জুনিয়র হাই স্কুল রয়েছে বাগাটীতে। ছাত্রী প্রায় দুশো। গোলদের জন্য হাইয়ার সেকেন্ডারী দুটি। বাগাটী রামগোপাল উচ্চ মাধ্যমিক সম্ভবত এ অঞ্চলের সব চেয়ে পুরনো স্কুল। প্রতিষ্ঠা ১৮৫০ সনে। সগোরবে টিকে আছে আজও, ছাত্রসংখ্যা হাজারেরও ওপর। তবে, সিটু নেই-নেই সমস্যা লেগেই আছে বছরের পর বছর। শিক্ষক

আছেন ভালই। ক্লাক ৩ জন, এর ওপরেও মালী, কেয়ার-টেকার। সব মিলিয়ে এক বিপুল বাহিনী বললেও চলে।

অপরটি মগরা উত্তমচন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক। অনুমোদন পেয়েছে চলতি বছরে। ছাত্রসংখ্যা চারশো। শিক্ষক ১৪ জন।

প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক। অনুমোদন পেয়েছে এই বছর। নিজের বাড়ি নেই। উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ভবনে কাজ চলে সকালের দিকে। ছাত্রীসংখ্যা মোটামুটি ভালই।

কলেজ আছে বাগাটীতে। শ্রীগোপাল বানার্জী মহাবিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাগাটী গ্রাম নিবাসী প্রখ্যাত ব্যবসায়ী স্বর্গীয় শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নগদ ৪০ হাজার টাকা ও জমি দান করে। সরকারী অনুমোদন পেয়েছে ১৯৫৮-তে। ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা ১০০০। যার মধ্যে শ'চারেক আছেন রায়িকালীনে। অধ্যাপক ৪০ জন। আবাসিক ব্যবস্থা আছে। ছাত্র-ছাত্রী পৃথক পৃথক। ৮১ ও ৫০টি সীটে যথাক্রমে এখন রয়েছেন ৬০ জন ছাত্র ও ৩০ জন ছাত্রী।

পাঠ্যবিষয় কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য। কলা ও বিজ্ঞান দিনে পড়ানো হয়। বাণিজ্য রাতে। হুগলী সদর মহকুমায় রায়িকালীন পাঠ ব্যবস্থা নেই আর কোনও কলেজে। কিন্তু অত্যন্ত মুস্কিলের কথা এই যে শ্রীগোপাল বানার্জী কলেজের রায়িকালীন এই ব্যবস্থাটি সরকারী অনুমোদন পায় নি আজও। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মানা অসুবিধা। কলেজের লাইব্রেরী, কমন-রুম ইত্যাদি তাঁরা ব্যবহার করতে পারছেন না। কতৃপক্ষেরও অসুবিধা।

পরিচালন ব্যবস্থা জটিলতর হচ্ছে দিনের পর দিন।

অন্যস' আছে ইতিহাস, বাংলা এবং কেমিস্ট্রিতে। কিন্তু পড়ানো হয় কেবল মাত্র ইতিহাসে। শোনা গেল কলেজ কতৃপক্ষ আরও কয়েকটি বিষয়ে অন্যস' অধিকার-প্রার্থনা করেছেন এবং এই বাড়তি পাঠ চালু করতে অধিকন্তু কোন খরচের সম্মুখীন হতে হবে না এমন আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ এ সম্বন্ধে নিরুত্তর।

পড়াশুনা মোটামুটি ভালই এদের। ছুটির দিনে স্পেশ্যাল ক্লাস নেবারও ব্যবস্থা আছে। দুটি ছাত্র ন্যাশনাল স্কলারশিপও পেয়েছেন দেখা গেল। খুচরো অসুবিধা অনেক রয়েছে কলেজ চালানোর ব্যাপারে। ক্যান্টিন নেই। কাছের পাঠে দোকান-পসারও নেই তেমন। ফলে টিফিন খেতে ছেলে-মেয়েদের দৌড়তে হয় এক মাইল। কলেজে ক্যান্টিন একটি হওয়া দরকার এবং একদুটি।

কলেজের বাড়িভারী নেই। প্রকাণ্ড জমি পতিত পড়ে আছে বে-ওয়ারিশ গরু-ছাগলের বারমесе চারগুড়মি হয়ে। সব চেয়ে অসুবিধা কোনো জিমন্যাসিয়াম কিংবা খেলার মাঠ নেই। অথচ হোটেল রয়েছে। বারমесе বাসিন্দা ছাত্র-ছাত্রী রয়েছেন। তাঁদের খেলাধুলা এবং বেড়ানোর একটা বন্দোবস্ত হওয়া অবশ্যই দরকার।

ভাল গ্রন্থাগার এখানে একটিই। মগরা সাধারণ পাঠাগার। প্রতিষ্ঠা ১৯০৯ সনে। পুস্তকসংখ্যা প্রায় ৩২৬৬—পত্র-পত্রিকা প্রায় সবই নেওয়া হয় এখানে। তিনতলা নতুন বাড়ি। আশপাশে পরিসর কম, তাই মাথা ঠেলে উঠেছে ওপরের দিকে। পরপর তিনখানা ঘর তিনতলা। ওপরতলার পাঠকক্ষ—“মহাধনাথ স্মৃতিকক্ষ”। মূল ভবনখানি “হরিপদ স্মৃতিসৌধ”। দেওয়ালপত্র “দৈনালিকা” প্রকাশ হয় মাসে মাসে। সম্পাদক—শ্রীহেমেন চৌধুরী। বর্তমানে রুর্যাল লাইব্রেরী স্কিমে পড়েছে গ্রন্থাগারটি। সদস্যসংখ্যা প্রায় চারশো।

মগরার ‘দে’ পরিবার। বিশেষত শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দে এবং তাঁর ভ্রাতৃগণের বহু দান রয়েছে এই এলাকার নানা উন্নয়ন-কল্পে। বিশেষ করে উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয় এবং এই গ্রন্থাগারটি প্রধানত তাঁদেরই দানে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও ছোট বড় খুচরো অনেক দান তথা সহযোগিতা আছে। সামগ্রিকভাবেই মগরাবাসী কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে।

মহিলা সমিতি আছে কোলায়। ভাল এবং চালু। সাপ্তাহিককালে ব্যবহারিক



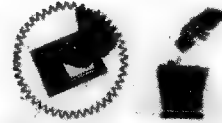
ভগ্নাঙ্গারী মগরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন



‘এত
সাদা
ধবধবে
হয়
কিসে?’

টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে!

জামা কাপড় কাটবার পর ঘোঁষার সময় সামান্য মাত্র টিনোপাল দিখে দিন। দেখবেন, আপনার সাদা কাপড়গুলি—সার্ট, শাড়ি, তোয়ালে, চাদর, সবই উজ্জ্বল ধবধবে সাদা হয়ে উঠবে। আর এইরকম সাদা ধবধবে করতে খরচই বা কত? কাপড় পিছু এক পরস। ও নর। চারের চামচের চার ভাগের এক ভাগ টিনোপাল এক বালতি কাপড়কে সাদা ধবধবে করে দেবে। সব সময়ই বৈজ্ঞানিক উপকরণ-টিনোপাল ব্যবহার করুন। এতে কাপড় জামার ক্ষতি হওয়ার কিছু নেই।



টিনোপাল বন্ধ করা এলুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকেট পাবেন। এক প্যাকেট টিনোপাল বালতি তরে কাপড়কে সাদা ধবধবে করে। ব্যবহারে কত সুবিধা, একটুও অপব্যয়। হবার আশঙ্কা নেই। এক বালতি কাপড়ে মাত্র এক প্যাকেট টিনোপাল। কম কথা নয়।



টিনোপাল এফের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
মে. আর. পায়লী, এম. এ. বাল, মহিষারলাও।

প্রধান গার্ল লিমিটেড শোভা কলিকতা-১০০, বোম্বাই-১ বি-৯৫

43200/SG-223A 000

পুষ্টি পর্বদের কাজ নিয়েছেন এরা। দস্তান-সম্ভবা মাতা এবং শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের ডিম ও সস্কী খাওয়ানো হচ্ছে এদের তত্ত্বাবধানে। কয়েকটি স্কুলের খাচ্চাদের টিফিন সরবরাহের ভারও এরা নিয়েছেন শোনা গেল।

খেলাধুলার প্রতিষ্ঠান রয়েছে বাগাটীতে বান্ধব সমিতি ও মগরার বি.এফ.সি-অর্থিং বরেন্দ্র ফুটবল ক্লাব। বি.এফ.সি-র নিজস্ব মাঠ নেই। বান্ধব সমিতি অনুষ্ঠালীন করেন বাগাটী কুল মাঠে। তথাপি উৎসাহ আছে। টার্নামেন্ট খেলা হয়। খেলার নামও আছে বি.এফ.সি-র সদস্যদের।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র মগরা প্রাথমিক। সাবসিডেরারী কিছু নেই এখানে। এক প্রাথমিকেই কাজ চালাতে হয় সারা এলাকার। কাজের সুবিধার জন্য ছোট ছোট উপকেন্দ্র করে নিয়েছেন মধ্য চিকিৎসক। ব্যাণ্ডেল রাজার, দিগমুই, চন্দ্রহাটী, আকনাতে একটি। শোনা গেল সাবসিডেরারী করার জন্য চেষ্টা না কি হয়েছে। হোয়েড়া, দিগমুই ও গোঁতে। কিন্তু জমি পাওয়া যায় নি বলে হচ্ছে না। গ্রামবাসীকে আরও একটু উদ্বার হতে বলি এ বিষয়ে।

রোগীর ভিড় অসাধারণ। আউটডোরে প্রতিদিন ২৫০ থেকে ৩০০। ইনডোরে প্রসূতি রেগিনী মাসে ১২০ থেকে ১৩০টি। অপরাপর রোগীও থাকেন ভর্তি হয়ে। সংখ্যা গড়পড়তার মাসে ৭০ থেকে ৮০ জন। শয্যাসংখ্যা ফুড়ি। ৮টি পুরুষ, ৮টি মহিলা ও নাকী চারটি সংরক্ষিত সংক্রামক রোগীদের জন্য।

ডাক্তার আছেন পুরো সময়ের জন্য দু'জন। পাটটাইম একজন। অপরাপর মিলিয়ে কর্মচারী দ্বিগুণের উর্ধ্বে।

জলকন্ঠ এখানে ভীষণ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দু'টি টিউবওয়েল আছে। যার একটি ভাঙা। এখনি মেরামত করা দরকার। একটি কুয়া আছে দেখা গেল। সামান্য সংস্কার করে নিলেই জল ব্যবহারযোগ্য হয়। বসবাসকারীদেরও কন্ঠ ঘোচে। কিন্তু এই স্বসামান্য বদন্যতা-টুকুরই অভাবে জল জল হাহাকার এখানে লেগেই আছে।

সংক্রামক রোগীদের ঘরে টিনের ছাদ। দায়ুণ গরমে ভেতে একবারে অগ্নিবর্ষ হয়ে আছে। শীতেও অবস্থা খুব সুবিধার হয় না। কনকনে হিম ছাদ ফুড়ে গিয়ে গেঁথে যায়। মৃতপ্রায় কলেরা রোগী বা অচেতন ডিপথিরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি এ ঘরে শুয়ে আছে ভাবতেই হৃৎকম্প ধরে যায়।

বৈদ্যুতিকরণ মগরা গ্রামের প্রায় সর্বত্রই হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও

রয়েছে বিদ্যুৎ। কোয়ার্টারের মধ্যে কেবল ডাক্তারদের কোয়ার্টারে আছে। আর কোথাও দেখা গেল না।

পরিবার পরিকল্পনার কাজ ভালই হয়েছে এখানে মনে হলো। লুপ গ্রহণ করেছেন প্রায় দেড় হাজার মহিলা। পুরুষের বন্যাকরণ অস্ত্রোপচার হয়েছে ৩০০ এবং অন্যান্য পদ্ধতি নিয়ে নিয়মিত উপস্থিতির সংখ্যা ১০০ জন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বক্ষ্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনা থেকে একটি অনুবীক্ষণ কন্ঠ পেয়েছেন এরা। খুঁড় বিনামূল্যে পরীক্ষা করে দেওয়া হয়। কিন্তু রক্ত বা মল-মূত্র পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের অনুরোধ যতটুকু যখন রয়েছেই আর মগরা যখন সদর পল্লীজাল নয়, সহজেই মানুষের গমনাগমন সাপেক্ষ তখন মাসে নির্দিষ্ট কোন একটি-দু'টি দিনে টেম্পরারী একজন প্যাথলজিস্ট পাঠিয়ে অপরাপর পরীক্ষাগারের সুযোগ এখানেই করে দিতে পারেন জেলা মধ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক। তাতে করে সাধারণ মানুষের অপারিসমি উপকার তো হয়ই, সদর হাসপাতাল চুঁচুড়ার ইমামবাড়ি হাসপাতালের ওপর থেকেও চাপ কমে, ভিড় কম হয়। নিবাস ফেলে বাঁচে রেখানকার মানুষ।

সমগ্র হুগলী জেলার মধ্যে মগরা একটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রথম শ্রেণীর স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলে পরিচিত। কিন্তু চুঁচুড়াই বাঁহাতি একটি ভোবা দেখা গেল। স্বল্প জন, সবুজ বর্ণ। পাক পচা দু'দুখে নীড়ানো দায়। শোনা গেল ওটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরই সম্পত্তি। সম্পত্তিটি ঠিক কত মূল্যবান বোকা গেল না। নিশ্চয়ই অনেক মূল্যবান। নইলে ওটিকে ভরাট করিয়ে ফেলার পরিবর্তে ঘর করে জীয়ে রেখে দেওয়ার মানে কি! কিন্তু গিছনে ইনডোর বিভাগের ঠিক এদিকটার সুপেট এবং সঘন অঘন একটি শিয়াল-কাটার কোপ পুঁখে রাখা হয়েছে কেন বুঝতে পারা গেল না। ফুল ফোটানোর প্রয়োজনে নিশ্চয়ই নয়। আসলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সৌন্দর্য এবং তার সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতার দিকে খুব বেশি দৃষ্টি দেন না জেলা স্বাস্থ্য কর্মসূচক। নইলে সাধারণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, চুঁচুড়া সদর হাসপাতাল ইমামবাড়ির দুই ফেটের দুই পাশে বংশানুক্রমে বিবর্তিত ওই কচুরী পানার কাড় অমন বর্ষিষ পেতে পারতো না। প্রতিদিন শত শত রোগী যেখানে আসছে আরোগ্য কামনায়, এই জাতীয় অপরিচ্ছন্নতা সেখানে শব্দ অসঙ্গত নয়, অসহ্যও বটে।

থানা আছে। যদিও জি, টি, রোডের

ওপরেই। তবে চিনে নেওয়া দু'স্কর। এমনিই নকলি অপারিসর এবং অপরিচ্ছন্ন বটে। বাউন্ডারীর দেওয়াল নেই। কচিটারের পলক বেড়া। এক-থানা গাড়ি এসে দাঁড়াবে তার স্থানাভাব। অফিসের অবস্থা তথৈবচ। টেবিল, চেয়ার, রায়ক, আলমারী ফাইল-পত্র ঠাসা। দু'জন মানুষ ঘরে চুকলো তো দেখ দেখ, পাঁচজনে নাড়িবাস।

শব্দ এখানেই নয়। মগরা থানারই আর এক শাখা-কেন্দ্র দ্বিবেণী কাঁড়। সেখানেও এই রকমই দু'রবস্থা। নোংরা খোওয়া ওঠা পলস্তার চটা বাড়ি। ছাদের ছিদ্র বেয়ে কর কর করে বর্ষার জল। ব্যারাক-বাড়ির বিছানা-পত্র গুটিয়ে কোণ নিয়ে বসে থাকেন বিজ্ঞানমত কর্মচারী। পুলিশ কাঁড় অথবা থানার এবিসিখ দু'রবস্থা শব্দ এই দুই জায়গাতেই সীমাবদ্ধ নয়, দেখা যাবে আরও অনেক স্থানে।

আবাদী জমি আছে অনেক। প্রধান ফসল ধান। ডিপ-টিউবওয়েল বসেছে দু'টো। একটা হোদিশোভায়, অপরটি আলখোজার। চালু হয় নি একটিও। অভাব বিদ্যুতের। তার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না রেল লাইন রূপ করে। শোনা গেল রেল কর্তৃপক্ষ আপারি জানিয়েছেন রেল লাইন রূপ করে নেওয়া যাবে না বিদ্যুতের তার।

মেলা হয় মগরার রথের। অনেক পুরনো রথ। প্রতিষ্ঠাতা প্রীপ্রভাস আদক। নতুন গ্রামের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত যাত্রা। পথের দু'পাশে বসে মেলা। সাধারণত রথের মেলা যেমন হয়ে থাকে তেমনই। তবে গাছ-গাছালি কিছু কম। আর অন্যান্য রথের মেলার হরেক রকম পাখীর যে কিচরিমিচির শোনা যায় এখানে সেটিও নেই বললেই চলে।

চণ্ডীর মন্দির আছে আমোদঘাটার পুরনাই চণ্ডী। এ অঞ্চলের লৌকিক দেবতা। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে পূজা। ধুমধাম আছে পূজার। বারোয়ারী কালীপূজা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। এ অঞ্চলের সব চেয়ে নামকরা বাহা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই উপলক্ষে। পেশাদার দল আসে নানা দিক থেকে।

সারা বছরের সেরা উৎসব মগরার সর্বস্বতী পূজা। নৈহাটীর কালী, চুঁচুড়ার কার্তিক, আর চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীর মতোই প্রকাণ্ড প্রতিমা। ধুমধাম বাজ-বাজনা, মোড়ে মোড়ে থিয়েটার, প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে বিচিত্র অনুষ্ঠান, জেল খাওয়ানোর হুড়াহুড়ি প্রসাদ বিতরণের ধুম। সব মিলিয়ে চার পাঁচ হাজার টাকাও খরচ হয়ে থাকে কখনো কখনো এক-একটি পূজার। অবশ্যই এত

বড় উৎসব একদিনে সেরে ফেলা সম্ভব হয় না। তিন দিন চার দিনও রয়ে যান প্রতিমা। আর যে কদিন থাকেন সেই কদিনই হৈ-হৈ-হুড়োহুড়ি। বড়ো-বাচ্চা, কচি মখের সার, আলোর শোভা, মাইকের চিংকার, পরিশেষে সুদীর্ঘ বিশাল এবং অভ্যন্তরীণ জাঁক-জমকপূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমার বিসর্জন।

মগরা প্রধান তার ব্যবসা-বাণিজ্য। বাজার, বেসাত, দোকান-পসার, আড়ত, সারি সারি স্যাকরার দোকান। মোড়ে মোড়ে ময়রা আর মোটর মেগামতী কারখানা। ইটখোলা গোটা তিনেক, চালিখোলা আটটি। কাপড়ের দোকান কুড়ি থেকে বাইশ। লোহা-লকড় গোটা পাঁচেক, কাঠগোলা পাঁচ-সাতটা, হাঙ্কিং মেশিন গোটা ছয়েক—আসল কাজ ধান ভাঙা এখন বন্ধ, গম ভাঙা হয়। চলছে টিম্ টিম্ করে, না চলারই নামান্তর।

এ ছাড়াও রয়েছে কামারশাল, ছুতোর ঘর। বাসনের কারবার, কোল্ড স্টোর, মাছের আড়ত। ৩০।৩৫ মণ মাছের বিক্রি রোজ। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসে মাছ। সওদা করে ব্যাপারীরা। চালান চলে যায় কলকাতা, গুৱাহাটী, শেওড়াফলি, হুগলী, চুচুড়া, গম্ভা ডিঙিরে নৈহাটী পর্যন্ত। চিলিং সেন্টার আছে। ১-২০ পরমা লিটার দুধ। তিন থেকে চার হাজার টাকার লেন-দেন রোজ।

প্রধান ব্যবসা আগে ছিল ধান, চাল, খোল-ভুঁই আর বালির। প্রবাদ ছিল ধুলো-বালি-আগড়া, তিন নিয়ে মগরা। ধুলো—কারণ সওদা আসবে, মান্দ্র আসবে, দল বেঁধে আসবে গরুর গাড়ির ঝাঁক। ধুলো উড়বে মান্দ্রের পায়ে, সওদার গায়ে, গাড়ির চাকায় চাকায়। ধানের ধুলো—ডালের ধুলো, তিলের, তিসির ধুলো, আরও কত তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মগরার সে ধুলোর খ্যাতি আজও স্মান হয়েছে কলা যাবে না। আজও গাড়ি আসে—সেকালের সেই হটর হটর গরুর গাড়ি নয়, একালের মস্ত টায়ারে ভারী শরীর, সুৱেলা হর্ন বাজানো লরি। তবু তার চাকাতেও ওড়ে ধুলো। বাতাস বয়, পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে ছুটে আসে ছট-ফটে হাওয়া। অমনি ধুলো-মাটি, কাঠি-কুটি উড়ে একাকার, ছড়িয়ে ছড়িয়ে। মান্দ্রের নাক জ্বালা, গলায় কাশি, চোখে-মুখে অবাস্তব প্রসাধনের প্রলেপ।

বালির কথা নতুন নয়। ঈশ্বর বাদামী রং-এর করকরে বড় দানাবিশিষ্ট লাল বালি যা 'মগরা স্যান্ড' নামে বিখ্যাত, যে কোন রকমের বাড়ি তৈরির কাজে শত শত বৎসরের প্রখ্যাত যার—মগরা-স্যান্ড

প্রকৃতি এলাকা—এই মগরা স্যান্ড রেজেন্সি মধ্যেই পড়ে। মাটির নিচে বালির খনি, খাদ খুঁড়ে উঠিয়ে নিয়ে মরাসরি বাজারে পড়ে মাল। কোথাও বা দালাল আছে মধ্যস্থ ব্যবস্থায় কিছু কমিশনভোগী।

সাপ্তাহিক
আজকের
আগামীকালের
সাপ্তাহিক

মিতব্যরী
আজকে বাঁচার
তার কালও বাঁচো
অমিতব্যরী
অরচ করে ফেলে আজ
খুইরে ফেলে
কালও।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস ১
৪, রাইড ষাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১।



আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

পশ্চিমবঙ্গে ৮৫টিরও অধিক শাখা আছে



গ্রানালয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা। চট্টগ্রাম-মগরা উন্নয়ন সংস্থার কার্যালয়টিকে দেখা যাচ্ছে।

এক লক্ষ টাকা এক হাজার হাজার মানুষের কাছে এই ব্যবসায়। একমাত্র মগরা গঞ্জেই ছোট-বড় মিলিয়ে রয়েছে প্রায় বিশ জন বালি ব্যবসায়ী। হুসলী জেলার একমাত্র খনিজ সম্পদ এই বালি একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বাণিজ্যই বটে।

আগড়া মানে ধানের চিটে। ধান-চালের ফলাও ব্যবসা ছিল এককালে তারই ইঙ্গিত।

চালের ব্যবসা নেই এখন আর! সাতটি রাইস মিল মগরায়, বন্ধ হয়েছে এককালে। হাজারেক ওপর মানুষ বেকার হয়েছে শৃঙ্খল। এইটুকু এলাকায়। খোল-ভুঁষ আছে সামান্য। না থাকারই নামান্তর। সরকারী দর, বে-সরকারী দর, সাদা, কালো, চড়া, নরম প্রভৃতি নানাবিধ দর-দামের পাকে-চক্রে ফেঁসে নাতিশ্রাস উঠেছে এই ব্যবসায়ীদের।

ডেকরেটরস আছে। পুজো-প্যাণ্ডেল, বিয়ের মণ্ডপ, আসর, মিটিং সভা-সমিতি সাজিয়ে দেবে তারা। থিয়েটারী দোকান আছে। সিন-সিনারী, বাজনা-বাদ্য সাজ-পোষাক ভাড়া পাওয়া যায়। কাজে কর্মের বাসন-পত্র—আলো, ব্যান্ড, মাইক, গানের রেকর্ড, এমন কি টেবিল, চেয়ার, স্টেজ বাঁধবার তক্তা, বাঁশ-দড়িও পাওয়া যাবে এইখানেই।

ওপাশে কাঁচা মালের বাজার। দুবোলা

বসে। পাওয়া যায় সব। শাক-সব্জী, তরী-তরকারী, ফল-পাকড়, মাহ-মাংস মশলাপাতি, ভাল-ডুল, হাঁসের ডিম, জ্যাম্ভ মুরগী। দাম অস্বাভাবিক। ছুঁয়ে ফেললে হাতে ছোঁকা লাগে—এমনই চড়া। বেশী-মাত্রাজী ডিম ৩২ পরস জোড়া, আলু ১৫ পরস কিলো। কুমড়া ২৭ পরস, কাঁচা আম ৭৫ পরস, মাঝারী সাইজের ককিড় একটি দু-টাকা। দোকানী বললে চাপা দিয়ে রেখে দিলে ওটা নাকি ফুটি হয়ে যাবে, তাই এতো দর। মাংস সাড়ে চার,—এইটে যেন একটু সস্তা বলেই ঠেকলো। মামুলি সাইজের কাটা মাছ ওঠা-নামা করছে ছয় থেকে আটে, ঢেলে চাল বিক্রি হচ্ছে দেখলাম ১-৩০ পরসায়। ওধারে দোকানী হাঁকছে সেরা মাল, সেরা মাল, সস্তায় যায় সস্তায় যায়। মাল পটল, সস্তার নমুনা দু-টাকা কিলো। সরষের তেল ৫ টাকা, গুড় আছে নানান রকম, নাগরী, টিন, ভেলি। দাম চমকে ওঠার মতো।

দশকর্মী ভান্ডার আছে। পুজো-আজার সব রকম সামগ্রী পাবেন সেখানে। সিঁখি পাতা পাওয়া যায়। গাজা, আফিম, চোলাই লিকার আর ষড় রসের সেরা রস সব মকারের শেষ মকারটি—হাঁ লোকে বলে তাও নাকি পাওয়া যায়।

পাওয়া সবই যায়। নেই শৃঙ্খল, স্বাচ্ছন্দ্য। মধ্যবিত্ত মানুষের অবস্থা অবর্ণনীয় এখানে। চিরকালে চেনা সেই আধা শহুরে দুর্গতির শিকার হয়েছেন তারা। পূর্ণাঙ্গ রেশন নেই, মতিফারোজ এলাকা! না পাওয়া যায় চাল, না চিনি, না আটা। পেলেও এত কম, এবং এমনই অনিয়মিত যে তাতে করে গেরব্বর দুর্গতি বাড়বে বই কম না। এদিকে কালো-বাজারে চিনি দু-টাকা, আটা দেড় টাকা। বিধবারা একাদশী ছেড়েছেন অনেককাল। রোগীর পথ হয়েছে মিষ্টতা বর্জিত। প্রকাণ্ড গজ তার ব্যবসাদারী চাল আর বেচাল দুই নিয়ে কাজ-অকাজের চক্র ঘুরে ছুটে চলেছে অতি দ্রুতবেগে। মানুষ কখনো পারছে তার পায়ে পা মেলাতে, কখনো পারছে না। যে পারলো সে এগিয়ে গেলো, এড়িয়ে গেলো দুর্গতি আর দুঃবস্থা, যে পারলো না সে রইল পড়ে, পিষে গেলো সেই চাকার নিচে। দুঃগতির, সমস্ত গতিশীল, আর ঐ যে চাকা সে সেই সময়েরই চাকা।*

[* আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত : পরের বারে "সহানাদ"]

পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে করলে
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কি
না করতে পারেন? কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার
একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ, স্বাধীন-
বলীর সুলভ প্রকাশ। স্বল্পবিস্তৃত বাঙালী
ও বাংলাভাষী এ জন্য অবশ্যই ভূতপূর্ব
মন্ত্রিসভার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই
একটিমাত্র স্মৃতিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা
তাদের দায়িত্ব শেষ করে বহু ব্যক্তিগত
এবং দলগত দায় কাঁধে তুলে নিরোহিতেন।
এই ব্যক্তিগত এবং/অথবা দলগত দায়ের
মধ্যে একটি ছিল প্রাতিভাজন লেখকদের
নান্যভাবে স্বচ্ছ অর্থ বিতরণ। ইতিহাস
নামধারী একটি হাস্যকর গ্রন্থের জন্য
পাঁচ অঙ্কের কত টাকা তৎকালীন মন্ত্রি-
সভা খরচ করেছিলেন, সামান্য কতক
বছর আগেকার পুরনো ফাইলে তার প্রমাণ
বোধ করি ইতিমধ্যে লুপ্ত হয় নি। অথচ
বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত লেখকই স্থায়ী
রকম প্রকাশে সামান্যতম সাহায্য থেকে
যে ঋণিত হয়েছেন তা চল্লিশের অজানা
নয়। একটি ঘটনা বলি : গত বছর কিশ-
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক তাঁর বয়সভাষ্য
গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কিছু আর্থিক
সাহায্য প্রার্থনা করে তৎকালীন মন্ত্রি-
সভার প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দেন।
অধ্যাপক-স্বাক্ষরের জন্য খাত গ্রীসেন
সকাল নটার সময় মহাকরণ ভবনে
জন্মপত্রকে দেখা করতে বসেন। কথা-
সময়ে অধ্যাপক হাজির হন, কিন্তু ঘড়ির
বুড় কাঁটা বন্ধন হরের ঘর পেরিয়ে গেলে,
তখন তিনি তার স্থির থাকতে না পেয়ে
মুখ্যমন্ত্রীর বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন,
‘আরে কে আছে?’ কংগ্রেসের একজন
অর্থচর্চা ভ্রমলোকের নাম করে বেয়ারা
উত্তর দিল : ‘সাহেব এখনও তাঁর সঙ্গে
প্রাণ করছেন, আর ঘণ্টা হয়ে গেছে, মনে
হয় এখন চলে যাবেন। চলে গেলেই আমি
আপনার কথা মনে করিয়ে দেব।’
বেয়ারার কথা সত্য হলো। পাঁচ মিনিট
আগে অর্থাৎ ৯-০৫ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী
অধ্যাপককে ডেকে পাঠালেন, তাঁর
গ্রন্থ উল্টে-পাল্টে দেখে কিছু উৎসাহ-
কম্পক বাণী বিতরণ করে বললেন, ‘এ বইর
জন্য আমি নিশ্চয়ই টাকার ব্যবস্থা করে
দেব। আপনি অমর তারিখ স্মৃতি করায়
আমার সঙ্গে দেখা করবেন।’ আশাবিস্তৃত
অধ্যাপক আবার যথাসময় হাজির,
দীর্ঘকাল অপেক্ষান্তে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান,
এবং আবার মুখ্যমন্ত্রীর কর্তৃত্ব অন্য দিন
সাক্ষাৎকারের নির্দেশ। ষষ্ঠশীল অধ্যাপক
নির্দিষ্ট দিনে (তৃতীয় সাক্ষাৎকারে)
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জবাব পান : ‘আমি
ইজেকশনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, সত্যিই
এখন কিছু হবে না।’ বলা বাহুল্য
অধ্যাপককে আর বৈষপরীকার অবতীর্ণ
হতে হয় নি।

অবতু্য

চল্লিশ

বিধানচন্দ্র রায় এবং প্রবন্ধচন্দ্র সেনের
মুখ্যমন্ত্রীর পাক্ষাটুকু সেদিন অধ্যাপক
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বিধান-
চন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়তো
কিছুটা দুলভ ছিল, কিন্তু নটীর পরি-
বর্তে নটা পরিমিশে তিনি কারো সঙ্গে
সাক্ষাৎ করেছেন কিংবা কোন মানী
ব্যক্তিকে স্তোত্রবাক্যে একাধিকবার
স্মরণ করেছেন, এমন ঘটনা চল্লিশের জানা
নেই।

যে দেশে প্রকাশনাশিল্পের ঔশবা-
কম্বা কাটে নি, অসংখ্য গ্রন্থের প্রকাশ
সত্ত্বেও, এবং যে দেশে প্রকাশন ব্যবসাতে
অর্থনৈতিক ও আর্থিকভদের দুঃসহ ভিড়,
যে দেশে বয়সভাষ্য গবেষণা-গ্রন্থ বা
আন্তর্জাতিক ভাবার রচিত বিজ্ঞান শিল্প-
কলা ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ
সরকারী অর্থানুকূল্য ব্যতিরেকে
অসম্ভব। এবং সেই সরকারী অর্থানুকূল্য
যদি ছন্দ-গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ প্রযুক্ত হয়,
তবে প্রেসামের আর্থনৈতিক নিয়ম
সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কার্যকরী হবে : কৃষ্ণ
সুগ্রন্থকে বাজার থেকে হিটের দেবে।

অতএব বর্তমান সরকারের কর্তব্য :
কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার ব্যৱস্থা
গবেষণা-গ্রন্থাদি প্রকাশে অগ্রণী হওয়া
এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির
জন্য বাংলা ভাষার বিজ্ঞান শিল্পকলা
ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ রচনার যোগ্য ব্যক্তিকে
আমন্ত্রণ জানানো। সাম্প্রতিক হিন্দী
ভাষা ও সাহিত্যের সামান্য খোঁজ-খবরও
বাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন, মূর্তিতত্ত্ব,
জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান পড়তি
কিছুকাল গ্রন্থের সংখ্যা ও গণগত বিচার
হিন্দী বাংলায় চাইতে অনেক বেশি
স্বাধীন। বাংলার এই কলঙ্কমোচনে
বর্তমান সরকার অবিলম্বে একটি সচ্ছ
পরিকল্পনা রচনা করে তাকে কার্যকর
করে তুলতে সক্ষম হোন।

কিভাবে এই পরিকল্পনা রচিত হবে
এবং তাকে বাস্তবায়িত করা যাবে? বাংলা-
দেশে একটি আকাদেমী গঠন করে যে
আকাদেমী গঠনের প্রস্তাব গত ১৬ই
এপ্রিলের একটি সভায় উপস্থাপিত হয়েছে?
চল্লিশের মত, আকাদেমী দেখে

পূর্বমত মূর্তিমের বহু সুযোগসন্ধানীর
চল্লিশের মত হয়ে দাঁড়াবে, আর বাংলা
সাহিত্য পূর্বের ভীমারেই অবস্থান
করবে।

প্রশ্ন উঠবে : আকাদেমী সম্বন্ধে
আগে থেকেই এই নৈরাজ্যজনক মনোভাব
কেন? চল্লিশের অবস্থা ঘরোয়া গোরুর
মতো, আকাদেমী গঠনের প্রস্তাবের
সিঁদুরে মেঘ দেখেই তিনি আতঙ্কিত।
এবং যে কোন শিক্ষিত সন্তানের
মনেই যে দলাদলির বাংলাদেশে আকাদেমী
গঠনের প্রস্তাব মিশ্র প্রতিজ্ঞার ব্যক্তি
করতে বাধ্য, সেদিনের সভায় হুমায়ুন
কবিরের বক্তৃতাতেই তা স্পষ্ট : ‘কবি
আকাদেমী হয় তবে যেন তার স্বাধীন
অবস্থিত রাখা হয় যাতে তা কোনও বিশেষ
গোষ্ঠীর কৃষ্ণগত না হয়।’ বাঙালী
সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের চরিত্র
সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্মুখ
হুমায়ুন কবিরের এই সত্যকথ্যতাই
আকাদেমী গঠনের অপরাধজনক
সম্পর্ক।

আকাদেমীর কর্মকর্তা হবেন কারা?
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের
সমবায়ে গঠিত অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা
লালিত এই আকাদেমীতে রাজনৈতিক
কারণে সাহিত্যিকদের চাইতে ছন্দ-
সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিকসম্মানদের ভিত্তি
হতে বাধ্য। দীর্ঘকাল পুণ্য লিখতে লিখতে
এক সময় খ্যাতিমানদের সম্মুখ পুণ্য-
পোষকতায় ও উত্তীর্ণ-কবিদের প্রচার-
মহিমায় ‘কবি’ হয়ে-ওঠা কোন ব্যক্তি যদি
রাজনৈতিক দলবিশেষের সম্মুখ
আকাদেমীর কর্তা হয়ে বসেন, তা হলে
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কোর
পথে যাবে? কারণ, তিনি এতাবৎকাল
শব্দ পদ্য লিখে এসেছেন, বিশ্ববিদ্যায়
বিস্তৃত মহলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তর্ক-
ভীত নয়। অতএব মূর্তিকলার বা
মূর্ত্যতত্ত্বে পণ্ডিত বাংলায় কোর
বই লিখে নিয়ে যদি তাঁর কাছে
যান, তা হলে তিনি কি বলবেন?
বলবেন, ‘ই সর কি লিখেছেন, ই ছাপিয়ে
বহু বহু, ই ছাপিয়ে বিক্রী হবে না,
আমাদের অত টাকা নেই।’ অথচ বাংলা-

দেশে সাহিত্য-আকাদেমীর (যদি দুর্ভাগ্যক্রমে স্থাপিত হয়) অন্যতম উদ্দেশ্যই হবে গল্প-উপন্যাসের বাইরের বিষয়গুলি সংক্রান্ত অর্থাৎ 'টেকনিক্যাল' ধর্ম প্রকাশ করা, দুঃপ্রাপ্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ, অন্য ভাষায় রচিত সদৃশ গ্রন্থের প্রকাশ ইত্যাদি। নৈরাশ্যজনক শোনাতেও বলব, রাজনীতি-নিরাসিত সূযোগসম্মী বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের দ্বারা সাহিত্য আকাদেমীর এই মৌল উদ্দেশ্য আদৌ সিদ্ধ হবে না।

প্রস্তাবিত এই সাহিত্য-আকাদেমী সরকার-লালিত হলে (সে সরকার কংগ্রেসী না-কংগ্রেসী বাই-হোক না কেন) আকাদেমীর উদ্দেশ্য যে বাধা হতে বাধ্য সে দিনের সভার স্থিতি মন্ডী সোমনাথ লাহিড়ী তাঁর ভাষণে সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন : 'সরকারী দায়িত্ব কোনও মহৎ সৃষ্টি করতে পারে না, বরং সে সৃষ্টিকে বিকলপাণ করার আশঙ্কা থাকে বেশি।'

হুমায়ূন কবির এবং সোমনাথ লাহিড়ীর আশঙ্কাগর্ভ উক্তি এবং বাঙালী সাহিত্যিকদের কৃত্রী দলাদলির ঘটনার পটভূমিতে চন্দ্রগুপ্তের সিদ্ধান্ত : বাংলা-দেশে সাহিত্য আকাদেমী স্থাপনের কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই।

*

আকাদেমীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বের একটি মন্তব্যে ফিরে আসা যাক : আকাদেমী শেষ পর্যন্ত সূযোগসম্মীদের চক্রান্ত-স্থলে পরিণত হবে। সন্দেহ নেই, এই সূযোগসম্মীদের একটি অংশ বর্তমান মস্তিস্ত-বিরোধী এক প্রণেয় কংগ্রেসীয়ক এবং/অথবা সি-আই-এর এজেন্টদের নিয়ে গঠিত হবে। সাহিত্যের তীর ছাড়পত্র নিয়ে সাহিত্য-আকাদেমীতে এরাই হবে সব চাইতে সক্রিয়। এবং সাহিত্যের দাবির অন্ত-স্থলে এরা বাংলাদেশের প্রগতিশীল শক্তির জন্য নিঃশেষে কবর খুঁড়ে যাবে।

এ কথা আজ আর কারও অজানা নেই, বিদেশিক সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার গোপন অর্থ সাহায্যে বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ব্যবসায়ী রীতিমতো ল-প্রতিষ্ঠিত। কলকাতার বইপাড়াতে বিদেশী সরকারের প্রিয় প্রকাশক দ্ব-একজন আছেন, যারা গতকাল আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, আগামীকাল পশ্চিম জার্মানী যাবেন। সাহিত্য-আকাদেমী স্থাপনে এঁদেরই উৎসাহ সবচাইতে বেশি। কেন এই উৎসাহ? আর কেনই বা সব জেনে-শুনে ১৬ই এপ্রিলের সভায় তথাকথিত অকংগ্রেসী প্রগতিশীল কিছু সাহিত্যিক তাঁদের মধ্য ভূমিকা নিতে দিয়েছিলেন? কেন এ জাতের একজন পুস্তক-ব্যবসায়ী সমাগত সাহিত্যিকদের উপর সৌদিন কর্তব্য

কলাহিলেন? সমস্ত দেশে-শুনে নানা সংস্কার বহিরে আসে : তথাকথিত প্রগতি-শীল সাহিত্যিকদের একটি অংশ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সমস্ত মূল্যবোধকে যে-নৈপুণ্যে ব্যহত করে মধ্য গলা টিপে মারতে পারে, বহুনির্মিত অত্যাচার ঘোষণা করতে হয়তো লজ্জায় অধোবদন হবেন। তেমন কোন 'প্রগতিশীল' সাহিত্যিকের মধ্যে বিদেশী সরকারের প্রিয় প্রকাশকের দ্বি-কান্তন সংযোগ যদি কোনদিন আবিস্কৃত হয়, তাহলে আর যিনিই হোন, চন্দ্রগুপ্ত বিশৃঙ্খল আচরণ করেন না। কারণ অধিকাংশ লাস্প্রতিক বাঙালী সাহিত্যিক এবং কৃষিজীবীদের মধ্যে যে-জিনিসের প্রচলিত অভাব তার নাম আদর্শ, অন্যভাবে লুপ্ত জীবনবোধ।

*

অতএব বর্তমান সরকারের কর্তব্য, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের সঙ্গ যথাসম্ভব পরিহার করা। সরকার যদি কোন সূযোগের প্রকাশে অর্থানুকূল্য করতে চান, তবে সেই গ্রন্থের লেখকের নাম গোপন রেখে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অন্তত দু'জন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাবেন। দু'জন বিশেষজ্ঞ যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন, তবে তৃতীয় বিশেষজ্ঞের মত প্রার্থনা করতে হবে। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের মতের উপর নির্ভর করে সরকার গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করবেন। বলা বাহুল্য, বিশেষজ্ঞদের পরিশ্রমের সম্মানমূল্যের ব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য।

বাংলা ভাষায় লেখা টেকনিক্যাল বিষয়ের বই প্রকাশে অর্থ সাহায্য করা ছাড়া এ জাতীয় বইকে রবীন্দ্র-পুরস্কার ইত্যাদি পুরস্কারে সম্মানিত করাও প্রয়োজন। এবং সরকারী পুরস্কার লাভ করলে বই বিক্রি যেহেতু বেড়ে যায়, সুতরাং টেকনিক্যাল বিষয়ের বই পুস্তক হলে, কিছু না হোক হাজার খণ্ড অন্তত, বাজারে বিক্রি হবে। আর তখন বাজারী প্রকাশকরা এ ধরনের বই ছাপতে নিতান্ত নিরুৎসাহ বোধ করবেন না।

এইভাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিল্প-কলা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করে সরকার বাংলা সাহিত্যের দৈন্য দূর করতে পারেন।

*

যেহেতু চলচ্চিত্র, নাটক, রেডিও ইত্যাদি শিক্ষাবিস্তারের ও আনন্দ বিতরণের শক্তিশালী মাধ্যম। এই মাধ্যমগুলির উপর মনোযোগী দৃষ্টি রাখা সরকারের আরেকটি বিশিষ্ট কর্তব্য। সেদিন খবরে দেখলাম, তথ্যমন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ীর পরামর্শক্রমে ভারত সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় আকাশ-বাণীর কলকাতা কেন্দ্রের 'দেশবন্দনা' অনুষ্ঠানে ছুইকোড় কবিদের নিকুণ্ট রচনার

পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ ক্লাসিকাল গীতিকারদের সঙ্গীত পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। যে সময় 'দেশবন্দনা' প্রচারিত হয়, সেই সাত সকালে শ্রীলাহিড়ী বাসায় থাকেন, ফলে আকাশবাণীর অত্যাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য করেছে। কিন্তু আকাশবাণীর অধিকাংশ অনুষ্ঠানই তো তাঁর অন্তর্ভুক্ত থেকে যায়। সেই অনুষ্ঠানগুলিতে যে-মাল পরবরাহ হয় তার দৃ-চারটে নমুনা পেলেন, চন্দ্রগুপ্তের ধারণা, শ্রীলাহিড়ী চিঠি লেখার পরিবর্তে স্বয়ং দিল্লী গিয়ে হাজির হবেন।

আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার আপাতত স্থগিত রেখে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে হিন্দী অনুষ্ঠানের আধিক্যের প্রতি শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দক্ষিণ ভারতের কোন বেতারকেন্দ্রে হিন্দীর এই অত্যাচার আছে কিনা শ্রীলাহিড়ী সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারেন। বহুনির্মিত বহুক্ষণস্থায়ী 'বিবিধ ভারত'-র মাধ্যমে হিন্দী প্রচারের অপচেষ্টা বন্ধ করা শ্রীলাহিড়ীর পক্ষে সম্ভব হবে কি? বহুভাষী অধাবিত কলকাতার প্রোতাদের কথা ভেবে যদি কেন্দ্রীয় বেতার দপ্তর 'বিবিধ ভারত' ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকেন, তবে গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলুগু, মালয়ালম ইত্যাদি অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে দূরে ঠেলে দিয়ে একমাত্র হিন্দীকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন কেন? 'বিবিধ ভারত'-র অর্থও কি কেন্দ্রীয় বেতার দপ্তরের বড় কর্তার জানেন না? 'বিবিধ ভারত'-র অর্থ কি প্রতীপীড়ক হিন্দী গানের সমারোহ?

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রকে পরামর্শ দানের জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার অবিলম্বে একটি উপদেষ্টামন্ডলী গঠন করুন। কলকাতা কেন্দ্রের সলাহকার (পরামর্শদাতা) শ্রীযুত পলিনবিহারী সেন পদাধিকার বলে এই প্রস্তাবিত উপদেষ্টামন্ডলীর সচিবের কাজ করবেন। চন্দ্রগুপ্তের বড় বিশ্বাস, এই উপদেষ্টাদের সাহায্য পেলেন শ্রীসেন কলকাতা বেতার-কেন্দ্রকে সার্বিক শিক্ষাবিস্তার ও আনন্দ বিতরণের এবং বিশেষভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের সার্থক মাধ্যমে রূপান্তরিত করতে পারবেন।

*

হিন্দী ছবির আধিক্য প্রচারে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প আজ সংকটাপন্ন। এক সময় বাংলা ছবি দেখাত এমন সিনেমা হল আজ হিন্দী ছবির জন্য বিখ্যাত। শতকরা মন্বই জন বাঙালীর বাস যে-পাড়ার সেখানেও এমন সিনেমা হল আছে, কামিন-

কালে বাংলা ছাব না দেখানোর উদ্ভত্তা বার
আকাশম্পর্শী। এই সব সিনেমা হলের
মালিক কি বাঙালী? যদি বাঙালী হন,
তারা বাংলা ভাষার শত্রু, যদি হিন্দীভাষী
হিন্দীপ্রেমী হন তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের
ভাববার দিন এসেছে। বাংলার যুবসমাজের
কাছে বাঙালী চলচ্চিত্র-দর্শকের কাছে
চন্দ্রগুপ্তের সনির্বন্দ্য অনুরোধ, এই সব
সিনেমা হলকে তারা বয়কট করুন।
সরকারের কাছে চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শ, এই
সব সিনেমা হলের মালিককে তারা বাংলা
ছবি দেখাতে অনুরোধ করুন; যদি অনু-
রোধে কাজ না হয়, তবে আইনের সাহায্য
গ্রহণ করুন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে
যে সব সিনেমা হল তাঁরী হচ্ছে তা হবে
সেই সব হলকে বাংলা ছবি (অন্তত বছরের
ছ-সাত মাস) দেখাবার সত্বে যেন লাইসেন্স
দেওয়া হয়। বাংলা ছবিকে উৎসাহ দেবার
জন্য সরকার কিছু পুরস্কারেরও ব্যবস্থা
করতে পারেন, হোক সে পুরস্কারের অর্থ-
মূল্য বড়ই সামান্য, কারণ সরকারী স্বীকৃতি
পুরস্কৃত ছবিটির আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে
প্রযোজকের মনে উৎসাহও সঞ্চার করবে।
এ ছাড়া বাংলা চলচ্চিত্র প্রযোজকদের
ইনকাম ট্যাক্স এন্টারটেনমেন্ট ট্যাক্স ইত্যাদির
ব্যাপারে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া
সম্ভব কি না, সে সম্পর্কেও সরকার ভেবে
দেখতে পারেন।

আমাদের জনপ্রিয় সরকার বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নতির জন্য যথাসময়ে তাঁদের কতব্য করবেন এই আশা রেখে চল্লিশ গুলি বাঙালী দর্শকসমাজকে সর্নিবল্য অনুরোধ করছেন, তাঁরা যেন আরো বেশি বাংলা ছবি দেখেন। তাঁদের সাহায্য ছাড়া বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের সংকট-মুক্তি অসম্ভব, এবং বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের সংকট অন্যভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরই অন্যতম সংকট।

বাংলা চলচ্চিত্রের মতো বাংলা নাটকে
উৎসাহ দানও সরকারের অন্যতম কর্তব্য।
বাংলা নাটকের উপর সেন্সর তুলে দিয়ে
বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই আমাদের
কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কলকাতা এবং
কলকাতার বাইরে নাট্যসংস্থার সংখ্যা
অপ্রচুর নয়। এই সমস্ত সংস্থার মধ্যে
নাট্যচর্চনা প্রযোজনা, অভিনয় ইত্যাদির জন্য
যারা ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে
(যদিও জনপ্রিয়তাই নাট্যচর্চতীর পক্ষে বড়
স্বীকৃতি) সরকার তাদের অর্থসাহায্য কিংবা
অন্যবিধ স্বীকৃতি দিতে পারেন। দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ এই সমস্ত সংস্থার মধ্যে স্বাদের
নিজস্ব মণ্ড নেই, সরকার তাদের অর্থ
ভাড়াই রবীন্দ্রসদন বা রবীন্দ্রভারতীর মণ্ড
ব্যবহার করতে দিতে পারেন। রবীন্দ্রভারতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেও সরকার এই সব

প্রখ্যাত নাট্যসম্পাদককে স্বীকৃতি দিতে
পারেন। স্বাভাৱী জনসাধারণ এবং জন-
শাস্ত্রণের সরকারের সক্রিয় সাহায্য এবং
স্বার্থেই মহা নাটকের জন্ম সম্ভব।

মৌলিক নাটক রচনা ও নাট্য প্রযোজনা সম্প্রতি খুবই কমে আসছে কেন তা নিয়ে বাংলার সংস্কৃতিকর্মীদের ভাবতে অনুরোধ করছি। বাংলার নাট্যসংস্থাগুলির অনুরোধ, তাঁর খাবার পরিবেশন ছেড়ে

স্বাভাবিক ভাবে করে তারা আমাদের পরিবেশন
করুন : মৌলিক নাটক রচনাকে উন্নয়ন
দেবার জন্য তাঁর রচনার দৃষ্টান্ত
সঙ্গে মৌলিক নাটক পরি-
বেশন করুন, গোড়ার করেকটি অভিনয়ে
পর সহানুভূতিশীল দর্শকের পরামর্শ
আলোচনা দোষ-ত্রুটি অপসৃত হয়ে পরে
বিশিষ্ট মৌলিক নাটকের আত্মপ্রকাশ সম্ভব
হবে।



সার্থনা দশন নিয়মিত ব্যবহার
করিলে কোন দন্তরোগের ভয়
থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল
ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে
ইহা প্রস্তুত হয়।

ମାଧନା ଓ ସ୍ଥାଳୟ, ଗରା

୭୬, ମାର୍ଦ୍ଦନା ଓଷ୍ଠଧାଲୟ ରୋଡ, ମାର୍ଦ୍ଦନା ନଗର, କଲିକତା-୪୫



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আব্দুল বদশাসী, এক. সি. এস. (লণ্ডন),
এম. সি. এস. (আমেট্রিকা) ভাগলপুর কলেজের বুসাহানশাস্ত্রের
সুতপ্ত অধ্যাপক।

कलिकात्केन्द्र-डः वात्स्यायनः श्याम, अम, वि, वि, अप्र (कलि), आश्विनदास

রঙ্গমঞ্চ ও দেশে শিল্পী এবং এদেশ

আধুনিক নাট্য পরিচালনা

লেখা, অভিনয় করা এবং প্রে-প্রডিউস করা সবই হচ্ছে অত্যন্ত পরিপ্রসঙ্গাপেক্ষ কাজ এবং এই তিনটি কাজ যদি একজন লোককেই করতে হয় তবে শেষ পর্যন্ত কোন কাজটিই সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করা হবে না! নাটক লেখা এবং অভিনয় করা এই দুই বৃত্তির ভেতর প্রথমটিতেই শেক্সপীয়ারের অনেক বেশি পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু অভিনয় সম্বন্ধেও তাঁর প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ছিল এবং অভিনয়ের প্রকৃতি কি হওয়া উচিত তাও তিনি ভালভাবেই জানতেন—হ্যামলেটের শেক্সপীয়ারের উদ্দেশ্যে দেওয়া উপদেশ থেকেই একথা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। কিন্তু অভিনয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা, আর নিজের ভাল অভিনয় করা তো এককথা নয়। শেক্সপীয়ার একথাটা ভালভাবে বুঝতেন বলেই নিজের লেখা হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেটের বাবার গোষ্ঠের ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

বার্ভার্ড শ'ও অতি স্পষ্টভাবে এই কথাটা লিখেছিলেন বিখ্যাত আমেরিকান অভিনেতা জন ব্যারিমোরকে। ব্যারিমোর সে সময়ে লন্ডনে এসে হ্যামলেট নাটক সম্প্রদর্শন করেছিলেন। একটি দৃশ্যে গোটা শতাব্দীতে লাইন বাদ দিয়ে জ্যাক ব্যারিমোর সে জায়গায় মুকাভিনয় করেছিলেন। শ' তাঁর বিশেষ ভঙ্গীতে, চিঠিতে ব্যারিমোরকে লেখেন—“শেক্সপীয়ার নাটক লিখেছিলেন—কিন্তু অভিনয় করতেন ছোট অপ্রধান চরিত্রে। ভূমি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছ, আবার সেই সঙ্গে নাটকের উপরেও কলম চালিয়েছ—অনেক দোষ থাকলেও শেক্সপীয়ার খুব বড় নাট্যকার, তাঁর লেখার উপর কলম চালানোটা খুব সঙ্গত হয় নি।” অবশ্য কোন কোন সমালোচকের মতে শ'-এর বিরূপতার কারণ ছিল অন্য। শ'য়ের সঙ্গে একক দৃশ্যটিতে ব্যারিমোর ঈডিপাস কমপ্লেক্সের অবতারণা করেছিলেন এবং শ'য়ের কনসারভেটিভ নেচার সেটা সহ্য করতে পারে নি। বহুদিন বাদে ঐ একই ভঙ্গীতে ১৯৫৬ সালে ঐ দৃশ্যে পল স্কোফিল্ড অভিনয় করেছিলেন—সে অভিনয় আমি দেখেছি এবং আমার বেশ ভাল লাগেছিল।

গ্যানভিল বার্কার শূন্য নাট্য রচনার মনোনিবেশ করবার জন্য অভিনয় এবং প্রডাকসন করা বন্ধ করে দেন। তবে তিনি ভুল জায়গায় এক্সেসিস দিয়েছিলেন—কারণ তিনি প্রধানত ছিলেন প্রডিউসার—ভবিষ্যতের নাট্যনুরাগীরা তাঁকে প্রডিউসার হিসাবেই স্মরণে রাখবে—নাট্যকার বা অভিনেতারূপে নয়।

ইংলন্ড সাম্প্রতিককালে অ্যান্ডার-অথর-জিরেট্টর হিসাবে যারা নাম করেছেন, তারা হচ্ছেন—নোয়েল কাওয়ার্ড, এমেলীন উইলিয়ামস্। ‘আইভর নোভ্যালো, রডনে এ্যাকল্যান্ড এবং ক্রেমেন্স ডেইন। নোয়েল কাওয়ার্ডের লেখা নাটক আমি পড়েছি—মাকারি ধরনের। কাওয়ার্ডের লেখা ‘নিউজ উইথ ডাওলিন’ নাটকটির মঞ্চাভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ নাটকের মঞ্চ পরিচালক ছিলেন নোয়েল কাওয়ার্ড নিজে এবং স্যার জন গিলগাড। এটি প্রথম দেখানো হয় আরল্যাণ্ডে—কারণ ইনকাম ট্যাক্সের দাবি মেটাতে অপারগ হয়ে কাওয়ার্ড আর বর্তমানে ইংলন্ডে আসেন না। পরে লন্ডনের প্রডাকসন হয়। প্রডাকসনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল পরিচালনার দৃষ্টে। অবশ্য ভ্যালের রোলে স্যার জনের অভিনয়ও হয়েছিল অতুলনীয়। শূন্যেই কাওয়ার্ডের অভিনয়প্রতিভা ছিল সাধারণ স্তরের। এমেলীন উইলিয়ামসের ইরামোর ভূমিকায় অভিনয় দেখে আমি চমকিত হয়েছিলাম। তাঁর নাটকগুলোও পড়তে বেশ ভালই লাগে। লন্ডনের ত্রিটিক মহলে একটা কথা খুব প্রচলিত আছে—নাটককে স্টেজ-সাক্সেস করতে গেলে যে যে কৌশল জানা দরকার জন বয়র্টন স্প্রিটলে এবং এমেলীন উইলিয়ামসের তা খুব ভালভাবে রপ্ত আছে। কথাটা খুবই খাঁটি কথা। আইভর নোভ্যালোর খ্যাতির বেশির ভাগটাই তাঁর মিউজিক্যালস্ রচনার জন্য। সাধারণ শ্রেণীর গান রচনা করে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি গান লিখেই—“Keep the Homefires burning”—তিনি সারা ইউরোপে যশস্বী হয়ে ওঠেন—প্রচুর অর্থলাভও করেছিলেন এই গানটি

থেকে। প্রডিউসার হিসাবেও খানিকটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

যে নাট্যকার অভিনেতা নন, তিনি কি কখনও নিজের নাটকের পরিচালনা করেন? কদাচিৎ করতে পারেন, তবে সাধারণত করেন না। যেসব ডিরেক্টরদের অভিনয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, অভিনেতারা তাঁদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন না। যে নাট্যকারের অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করবার অভ্যাস নেই, স্টেজ-ক্র্যাফ্ট সম্বন্ধে যিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পরিচালনা বিষয়ে স্বভাবতই তাঁর নির্দেশন গুলো হবে অত্যন্ত অবাস্তব এবং অস্পষ্ট। এ ধরনের লোকের নাটকের বিশ্লেষণ হয় বেশির ভাগই সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং বুঝতে পারেন কখন তাঁদের নাটকের সংলাপগুলি সঠিকভাবে বলা হচ্ছে। কিন্তু সঠিকভাবে সংলাপ বলতে পারলেই তো অভিনয় হয় না—তার জন্য আরও অনেক জিনিসের প্রয়োজন হয়। অভিনেতারা শূন্য সংলাপ আবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হন না—তাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। লেখক যদি অভিনয়শিল্প সম্বন্ধে ভালভাবে পারদর্শী না হন—তবে তাঁর পক্ষে অভিনেতাকে সাহায্য করা সম্ভব হয় না—বরং তাঁর মত পরিচালকের হাতে পড়লে অভিনেতার সমাধিক ক্রটিই হয়ে থাকে। লেখক এবং অভিনেতার সহযোগিতার ফলেই চরিত্র সৃষ্টি হয়।

The author may not know how to invent “business”; may not know how to subdue one actor for the sake of another, or both for the sake of the scene, or how to bring out the best, not the worst, in certain performers, and so on. The production of the play is made up of a thousand details. Actors who feel they are misdirected or insufficiently directed become uneasy, diffident and intractable.

প্রডিউসারদের মঞ্চ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তাঁরা নিজেরা প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা কিনা এ প্রশ্ন এক্ষেত্রে ওঠে না—অন্যদের নির্দেশ দেবার এবং কিভাবে অভিনয় করতে হবে সে সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকলেই প্রডিউসারের দায়িত্ব সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করা যায়। এ্যাকটিং সম্বন্ধে কতগুলো গালভরা কথা বলে খিওরাইজ করলে কোন কাজের কাজ হয় না। অনাভিজ্ঞ অভিনেতাদের প্রডিউসারেরই দেখিয়ে দিতে হবে কিভাবে তাঁদের অভিনয়কে সর্বাধিক দিয়ে কার্যকরী করে তোলা যায়। আর

বাংলার লোকগীত—বুদ্ধদেব রায়।
লোকসংস্কৃতি পরিষদ; ৭৯/১০ বি,
লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা—১৪।
মূল্য : ২.২৫।

বুদ্ধদেব রায়-এর প্রধান পরিচয় লোকসংগীতশিল্পী হিসেবে। তাঁর গীত লোকসংগীতে বাংলা দেশের প্রকৃতি ও মানব সমাজভাসিত হয়ে ওঠে। আপাতত তিনি একটি নতুন কাজে হাত দিয়েছেন। এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন। দীর্ঘ সাধনার ফলেই এতে সার্থক হওয়া সম্ভব। তিনি যে কাজটিতে স্বীয় প্রতিভাকে পরিচালিত করেছেন তা' হচ্ছে এই যে, লোকসংগীতের স্বার্থ সুরগদলি বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ঘোলাটি লোকসংগীতের স্বরলিপি বের করেছেন। এই সংগীতগুলির মধ্যে আছে বাউল, দেহতত্ত্ব, ভাটিয়ালি, জারী, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, চটকা, সারি, টুঙ্গ গান। শ্রীযুক্ত রায় স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন মাত্র ঘোলাটি লোকসংগীতের। আমাদের মনে হয়, সম্ভবপর ব্যবহার্য লোকসংগীত-গুলির স্বরলিপি তিনি প্রকাশ করলে বাংলা দেশ উপকৃত হবে এবং ব্যবসায়ী গায়কদের হাতে পড়ে সুর বিকৃত হবে না। আমরা যতদূর জানি, বাংলা লোক-সংগীতের কোষগ্রন্থ প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দান করেছেন। লোক-সংগীতের স্বরলিপি প্রকাশের জন্যেও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যদান করে বাংলার লোকগীতির সুর রক্ষার সহায়ক হতে পারেন। বলা বাহুল্য, যান্ত্রিকযন্ত্রের বিশিষ্টতা এঁর মধ্যে লোকসংগীতের সুর বিনষ্ট ও বিকৃত হতে সূত্র হয়েছে। সুতরাং যেটুকু সময় আছে, তাঁর মধ্যে সুর উদ্ধার করে স্বরলিপির গ্রন্থ প্রকাশ করা হোক। শ্রীযুক্তদেব রায় এই কাজের স্বার্থ যোগ্য ব্যক্তি। অস্তিত্ব বাংলার লোকগীতিতে সেই প্রমাণ আমরা পেলাম।

মহাযামিনী—ইন্দিরা দেবী। ৩০,
কলেজ রো, কলিকাতা—১। দাম : ২.০০।
আলোচ্য পুস্তকটি সাতটি ছোট
গল্পের সংকলন। বলাই বাহুল্য গল্পগুলি

অভিজ্ঞ অভিনেতাদেরও প্রতিভার সম্পূর্ণ
ক্ষয়ণ যাতে হয় সেইভাবেই তাদের
পরিচালিত করতে হবে ডিরেক্টরের।
নাটক-রচনা সম্বন্ধেও প্রডিউসারের ভাল-
রকম জ্ঞান থাকা দরকার—যাতে যে নাটক
নির্নে অভিনয় হচ্ছে তাতে কোন দুর্বল
অংশ থাকলে সে অংশকে পরিমার্জিত
করে নিয়ে তাকে জোরালো করে তুলতে
পারেন।—and however much
they love effective detail, they
must not sacrifice any point
in a play merely for effect.

ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টররা (বেমন রাইন-
হার্ট বা কমিস্যারজেন্ডিস—বাঁদী ও তাঁদের
আদর্শ এবং পৃথিবীর ভেতর মিল ছিল

শ্রদ্ধা মেলা

সবই প্রেমমূলক। প্রেম যে কত গভীর,
দূরবগাহ, দূর্জের, ছন্দবেশী কণ্ঠনার
মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়—তার চমৎকার
চিত্র ফুটে উঠেছে কয়েকটি গল্পের মধ্যে।
গভীর জ্ঞান ও প্রত্যক্ষতা না থাকলে এরকম
রচনা হয় না। ভালবাসার পথ বাধাসঙ্কুল,
প্রেমের পথ সহজ সরল রেখায় চলে না।
তাই দীর্ঘত ও দীর্ঘতার মিলনের মধ্যে কত
বাধা তার সীমা নেই, সেই বাধা কোন
সময় সরে গিয়ে আনে মিলন। আবার
কখনও বাধা চিরকালের বাধাই থেকে
যায়। 'রাহুর প্রেম' গল্পে পিশাচীর প্রেম
সত্যই অভিনব। 'তুমি কি আমার বন্ধু'
গল্পে গীতির সঙ্গে রণজিব-এর প্রেম
তথাকথিত দেহগম্ভীর মধ্যে আবদ্ধ নয়।
তাদের দেহের ওপর দিয়ে ক্ষণিকের জন্যে
ক্রেদাঙ্ক বীভৎসতা ছেঁটে গেলেও পরে
নিষ্কলঙ্ক নির্মল, নিষ্কাম পবিত্র বন্ধনে
তারা পরস্পরে আবদ্ধ হল। 'সরসে
বাখিল', 'তুমি যে তিমিরে', 'অতনুর তাঁর'
গল্পগুলির মধ্যে লেখিকার বাস্তব অভি-
জ্ঞতার পরিচয় রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে
ফরাসী গল্পের ছায়াবলম্বনে রচিত
'বোদিন তুমি প্রিয়' গল্পটি।

সোজা সরলভাবে প্রত্যেকটি গল্পের
কাহিনী বিবৃত। গল্পগুলির মধ্যে
লেখিকার নিজস্বতা রয়েছে। মোট কথা
গল্পগুলো ভালো।

চার চোখের ভাষা—শ্রীসমীরণ রায়।
স্ট্যান্ডার্ড বুক কোং; ১০/১ জি টি
রোড; হাওড়া—১। মূল্য : চার টাকা।

না) নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার
সাহায্যে কোন কোন নাটকে মগ্গাভি-
নের সময় সাফল্যের চরমশীর্ষে তুলে
ধরতেন। কিন্তু মৌলিকতা এবং বিশেষত্ব
দেখাতে গিয়ে নাটকের মূল বক্তব্যকে
বিকৃত করলে অভিনয় ব্যর্থতার পর্ববাসিত
হয়।

শ্লে অভ আইডিয়াজের চরিত্রগুলি
হয় টাইপ ক্যারেক্টার—নাটকের বক্তব্যকে
প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তাদের অব-
তারণা—বেমন গল্‌সওয়ার্দির কয়েকটি
নাটক, সমারসেট মমের আগের দিকে
লেখা নাটক এবং শ'র আলোচনামূলক
নাটক। এ ধরনের নাটকে প্রডিউসারের
কাজ অত্যন্ত সীমিত এবং সহজ। অভি-

অধুনা বহু প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকের
চিত্তের দৈন্য বখন প্রকট হয়ে পড়ছে
তখন নতুন লেখকদের কাছে অস্বাভাবিক
রচনার পরিবর্তে মামুলি প্রেমের উপাখ্যান
পেলেও পাঠকরা মৃত্যুতীব্র জানাবেন।
শ্রীসমীরণ রায় রোগশয্যায় বন্দী হয়েও
প্রেমের উপাখ্যান রচনা করতে গিয়ে
সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
জানিয়েছেন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার শুধু
এই যে, বিধবা ও বিপন্নিকের মিলন-
সাধন ঘটবার মতো চরম বিদ্রোহ দেখাতে
তিনি পারেন নি বলেই সূক্ষ্ম ও
সরলার প্রেম অপ্রাকৃত প্রেমের পর্ববাসিত
হয়েছে। দুই শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা
ভবিষ্যৎ-এর রূপকার ভারাই হলেন
কল্যাণকর। অথচ সমাজের মানব-মানবীয়
নতুন করে সংসার পাততে পেরেছে,
তাদের কর্মোদ্যোগে ও প্রেমায়। তবু
দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, ইংরেজ শাসন-
এর অবসানের দীর্ঘ এক যুগ পরেও
সমাজের মন বদলের, দেশে চরিত্রগঠনের
কোনো চেষ্টা হয় নি। কারণ কারেমই
স্বার্থের কাছে সেটাই ড' কাম্য ছিল।
আমরা মনে করি, ঔপন্যাসিকের আক্ষেপ
সাহস অবলম্বন করা উচিত ছিল। তিনি
কার্যকারণ উপস্থাপিত করলে উপন্যাসটি
তথাকথিত প্রেমের গতির মধ্যে সীমিত
থেকেও পরম আশ্বাদনীয় হতে পারতো।
কয়েকজনের প্রশংসাপত্রে শোভিত গ্রন্থটির
প্রচ্ছদপট স্-অলংকৃত।

নেতাকে এ সব নাটকে সাধারণত এক-
ভাবেই অভিনয় করতে হয়। ভূমিকার
ভেতর দিয়ে অভিনেতার বিকশিত এবং
প্রস্তুতিত হয়ে ওঠবার দরকার হয় না।
কিন্তু যেসব নাটকে চরিত্রগুলি অত্যন্ত
প্রাণবন্ত, অথবা যেসব নাটকে কল্পনার
বিস্তার এবং কাব্যিক গুণ আছে, সে সব
ক্ষেত্রে সত্যিকার যোগ্যতাসম্পন্ন অভিনেতা
এবং প্রডিউসারের দরকার হয়। শ'-এর
'সেন্ট জোন্স' নাটক মগ্গাভি করতে গেলে
ডিরেক্সনের ক্ষেত্রে যে শিল্পকৌশল এবং
কল্পনা-প্রবণতার দরকার, দি ফিলান্ডারার
বা মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশনের বেলার
তার প্রয়োজন হয় না।

কমলা



দু'টি জরুরী প্রস্তাব

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে পশ্চিমবঙ্গের নাটক, যাত্রা, সংগীত, চলচ্চিত্রশিল্পী কর্মীদের যে সম্মেলন হয়ে গেল সেই সম্মেলনে গৃহীত স্মারকপত্রে দু'টি দাবি সম্পর্কে আমরা সজ্ঞারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। উল্লেখযোগ্য যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর আমন্ত্রণে এই সম্মেলন রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই দু'টি দাবির মধ্যে একটি কলকাতা বেতারকেন্দ্র সম্পর্কে। দাবি করা হয়েছে “কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বর্তমান সংকীর্ণ রীতিনীতির পরিবর্তন এবং সমস্ত নাট্যসংস্থার জন্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত। আলোচনাদির ব্যাপারে দলবদ্ধ নির্বাচনে সকলের অংশ গ্রহণের সুযোগ দান এবং বর্তমান বেতার উপদেষ্টা কমিটি প্রগতিশীল চিন্তাধারা সম্পন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের নিয়ে পুনর্গঠিত করা হোক” [স্মারকপত্রের ১০ নম্বর দাবি]। আর একটি দাবি : “পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জ্যোৎস্না শাখার কাঠামো, কর্মসূচী ও নাট্য-লক্ষ্য পুনর্নির্ধারণ করে তাকে যথার্থ গণভিত্তিক চেতনার ধারক ও বাহক করা হোক” [৬ নম্বর দাবি]। বেতারকেন্দ্র সম্পর্কিত দাবির যে সংশোধনী গৃহীত হয়েছে তাতে মজবুত মন্ডল এবং গ্রামের চাষীদের প্রোগ্রাম সংগৃহ্য নতুনভাবে চেলে সাজাবার কথা বলা হয়েছে। প্রতিনিধিরা স্পষ্টভাবে বলেছেন এই দু'টি প্রোগ্রাম শ্রমিক বা কৃষকের কোন উপকারে আসে না। উপরন্তু মজবুতদের বিভ্রান্ত করার কাজ করে। সংগীতশিল্পীদের স্মারকপত্রে ‘অনুরোধের আসর’ এবং ‘বিবিধ ভারতীয় তীর্থ নিন্দা করা হয়েছে। এ দু'টি প্রোগ্রাম স্মারক বাঙালি সঙ্গীত সংস্কৃতিবিনকে কলুষিত করার চেষ্টা হয়ে থাকে। বিকৃত সুরার ফিল্মী গান এই দু'টি কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রচার হয়। অথচ অসংখ্য ভাল বাংলা গান এদের হাতে পড়ে উপেক্ষিত, গায়করা গায়ার সুযোগে বঞ্চিত। সম্মেলনে সংগীতশিল্পীরা এই খামখেয়ালী বঞ্চ করার কথা বলেন। এই দাবিগুলির বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা মন্তব্য করেছিলাম। শতাধিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের ও শিল্প-জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত স্মারকপত্রে এই দাবিগুলি আমাদের মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করেছে। বিশেষভাবে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীজাত কার্যকলাপ সংস্কৃতিজগতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে এই দাবি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেতারকেন্দ্রের রীতিনীতিতে কোন গোষ্ঠীক প্রভাব রয়েছে অধিকাংশ সংস্কৃতকর্মীর এই অভিমত। তাঁরা আরো মনে করেন বেতার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাঙালি বালিস্ত সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্ক নেই। স্থানীয় বেতার উপদেষ্টা কমিটি যাদের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাঁরা আজ মন্ত্রণ থেকে অপসারিত। যুক্তফ্রন্টের আদর্শ ও প্রগতিশীল চিন্তায় যারা অগ্রণী এমন আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়েই স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠিত হওয়া উচিত। সম্মেলনের এই বক্তব্য ও দাবিতে যদি বেতার কর্তৃপক্ষের চেতনোদ্বোধন না হয়, তবে মন্ত্রিসভাকেই এ বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে। এই বিবেচনা পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক জীবনকে বালিস্ত করার সহায়ক হবে। —সুজন



‘বাংলাচরী’ ছবিতে অনিল চ্যাটার্জী

নাটকের কথা

নাট্যসংস্থার তিনটি নাটক

গত ১০ই এপ্রিল মিনার্ভা থিয়েটারে নাট্যসংস্থার উদ্যোগে তিনটি নাটক অভিনীত হয়েছে। এই তিনটি একাঙ্ক নাটক—বথাক্রমে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য-নাটক ‘একলব্য’, কৌশিক সান্যালের ‘বাব’ এবং ‘প্রজাপতির প্রাণ’। এই দিনটি ছিল নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

‘একলব্য’ কাব্য-নাটকটি ইতিপূর্বে করেকবার অভিনীত হয়েছে এবং নাট্যরসিকদের প্রশংসা লাভ করেছে। নাটকটি আয়কর কর্মচারীদের নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। কবি মঙ্গলাচরণ একালের চেতনায় একলব্যের গুরুদক্ষিণা দানের কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন। নাটকের মণ্ডসজ্জা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি প্রশংসনীয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন: রণজিৎ মৃধোপাধ্যায় (একলব্য) এবং সুদীপ সরকার (দ্রোণ)।

কৌশিক সান্যালের ‘বাব’ প্রণয়ী-স্বল্পের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতীক নাটক। এই একাঙ্ক নাটকে বাব ও কাক এবং একটিমাত্র নারী চরিত্র নমিতার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে মিষ্ট ভণ্ডামির একটি চিত্র। যেখানে সরাসরি উদ্দেশ্য সাধনের পরিবর্তে মিষ্ট ব্যবহার ও কথার জাল বিস্তার করে বাবকে মোহগ্রস্ত করে ফেলা হয়। অবশ্য শেষ মূহুর্তে নমিতার গুলীতে ক্রমশ হয়ে বাবের মোহভগ্ন হয়।

পাণ্ডাৰিক বসুভাৰী

অভিনয়ে বাঘের ভূমিকায় মৃকুন্দ দাসের বাচনভঙ্গী চমৎকার। কাকের চরিত্রে রাজেন মৃধোপাধ্যায় ও নমিতারূপে সুবিতা সমাদ্দার যথাযথ।

কৌশিক সান্যালের দ্বিতীয় নাটক 'প্রজাপতির প্রাণ' একটি উপভোগ্য প্রহসন। কন্যাকে বিয়ে দেবার ব্যাপারে পিতা-মাতার অসহায় অবস্থা থেকে এই নাটকীয় কাহিনীর সূত্র। কল্পনায় এখানে অবস্থাটা পাণ্ডে যায়, পাত্ররা আসে দলে দলে পাত্রীর বাড়িতে—আর সে অবস্থা উপভোগ করে কন্যার পিতা-মাতা। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় পাত্র-পাত্রীর মূল্যায়নের ব্যাপারে যন্ত্রের সাফল্য। প্রহসনটি মধুর-বিষাদে মিশ্রিত এবং শ্লেষাত্মক। এই সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক নাটক লিখিত হয়েছে। 'প্রজাপতির প্রাণ' সে সব নাটক থেকে স্বতন্ত্র এবং বুদ্ধিদীপ্ত।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন : সমর চৌধুরী, কৌশিক সান্যাল, দীপালি ঘোষ, দম্ভা চৌধুরী, সুনীল সরকার, প্রণব বসু, ইন্দ্র লাহিড়ী, সমীর রায়, রঞ্জিত মৃধাজী, কল্যাণ সর্বাধিকারী।

নাট্য চলচ্চিত্রশিল্পী ও কর্মী সম্মেলন : যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন

শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীমধু বসু এবং শ্রীকপিতৃবণ মতিলালকে নিয়ে এক সভাপতিমন্ডলী গঠিত হয়েছিল।

নাট্য ও চলচ্চিত্রশিল্পী ও কর্মীদের যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সমস্যা সমাধানের দাবিতে স্মারকপত্রের খসড়া উপস্থিত করেন শ্রীসুধী প্রধান। স্মারকপত্রে বলা হয়, দেশ স্বাধীন হবার পর জনগণের অন্যান্য অংশের মত সাংস্কৃতিক কর্মীরাও আশা করেছিলেন যে, এবার সামগ্রিকভাবে দেশের অবস্থার উন্নতি হবে, কিন্তু বিশ বছরের কংগ্রেসী অপশাসনের ফলে তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয় নি, উপরন্তু সাংস্কৃতিক জীবনে সংকট এসেছে। স্মারকলিপিতে যুক্তফ্রন্ট মন্ডল-সভা কতৃক, পুলিশ কতৃক নাটকের গান্ডলিপি মজুর করাবার বহুনির্দেশিত সাম্রাজ্যবাদী প্রথা ব্যাভিল করবার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে যে সব দাবি করা হয়—তার মধ্যে প্রমোদকর প্রত্যাহার, বাঘা দল-গুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হবার, নাটক ও বাঘা দলের ব্যাভারাতের জন্য ভাড়ার সুবিধা দান, জেলা স্তরের সরকারী হলগুলি বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে

পেওয়া, বছরে ১০ সপ্তাহ প্রত্যেক সিনেমার বাংলা ছবি দেখান বাধ্যতামূলক করা, ফিল্ম প্রোডাকসন ফান্ড গড়ে তোলা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্মারকপত্রের নাটকের অংশের সমর্থনে শ্রীউৎপল দত্ত এবং চলচ্চিত্র অংশের সমর্থনে শ্রীঅজিত লাহিড়ী বক্তৃতা করেন। সংগীত সম্পর্কীয় প্রস্তাব উপস্থিত করেন শ্রীচিন্ময় মৃধোপাধ্যায়। এই প্রস্তাবে অন্যান্য দাবির মধ্যে কলকাতার স্থায়ী কনসার্ট হলের দাবি অন্যতম। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সমস্যা সম্পর্কেও কয়েকটি দাবি করা হয়।

অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ভিয়েননা থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ; ভারতে সি-আই-এর কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ, রবীন্দ্র জন্মদিনকে ছুটির দিন-রূপে ঘোষণা, মার্কিন গোয়েন্দা সিরিজের ও বৌদপ্রধান ছবি প্রদর্শন বন্ধ করা, কাজী নজরুল ইসলামের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান ও তাঁর রচনাবলীর সংকলন প্রকাশ এবং রয়্যালটি ভোগের অধিকার আদায় ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রত্যেক সংস্থার একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

গত ২৬শে এপ্রিল রবীন্দ্রসদনে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য-চলচ্চিত্রশিল্পী ও কর্মী সম্মেলন এই প্রথম। বর্তমান রাজনৈতিক-জগতের সর্বমতের সংস্থার সমন্বয়ে এরূপ সম্মেলন এই প্রথম। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রীর আমন্ত্রণক্রমে এই সম্মেলন রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষামন্ত্রণ শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য উপস্থিত থেকে শিল্পী ও শিল্প কর্মীদের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, এক সময়ে শিল্পীদের এই সদনের রাইরে পথের ওপর বসে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাজলি দিতে হয়েছিল, এক সময় এই সদনে প্রবেশ করার দাবিতে মিছিলকে পুলিশ লাঠি চালিয়ে হাট্টে দিয়েছিল। আজ আমি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে সকল শিল্পীকে এই সদনে আহ্বান জানাচ্ছি এবং ঘোষণা করছি যে, এই সদন শিল্পীদের সকলের। এখানে কোন গোষ্ঠী বিশেষের একচেটিয়া অধিকার থাকবে না।

সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাট্য-সংস্থা, বাঘার দল, চলচ্চিত্র টেকনিশিয়ান সংস্থা, সংগীতশিল্পীদের সংস্থার প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক বিশিষ্ট শিল্পী ও সংস্কৃতি অনুরাগী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনার জন্য

পরিচালনা সুবোধ চিত্র

সম্পাদন: সুচিহ্না যেন উত্তমকুমার সাবিত্রী চাট্জি প্রদীপকুমার

উত্তমকুমার ফাল্গুন নির্দেশিত

রূপবাণী • ভারতী • অরুণা

পদ্মাবী • মৃণালিনী • জয়ন্তী • নৈহাটি সিনেমা • শ্রীলক্ষ্মী • অলকা

প্যামাঝী • বাঘা • বানসী • জ্যোতি • অজন্তা এবং অন্যান্য



‘পায়াল’ ছবিতে গল্পের নায়ক ও নায়িকা

সংস্কৃতি সংসদ নামে এক সংস্থা গঠিত হয়েছে। সম্মেলনে গৃহীত স্মারকপত্র বক্তৃতা মন্ত্রিসভার নিকট উপস্থাপিত করার জন্য এক শিল্পী ও কন্ঠী সমাবেশ হবে। এই সমাবেশের তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে।

সম্মেলনে আরও যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্দকুমার দাস, সলিল সেন, দিগন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোর সেন, উমানাথ ভট্টাচার্য, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, হাবুল দাস, দিলীপ ঘোষাল, তারাপদ লাহিড়ী প্রমুখ আরো অনেকে।

শ্রীমন্ত, রবি ঘোষ, গীতা দে, মিতা চ্যাটার্জী, শেখর চ্যাটার্জী, শোভা সেন, প্রেমেন্দ্র বসু, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ।

চিড়িয়াখানা

সত্যজিৎ রায় ‘চিড়িয়াখানা’ ছবির শেষ পর্যায়ের কাজ শুরু করেছেন গত ২০শে এপ্রিল থেকে। সে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত স্যুটিং চলে চিত্রগ্রহণ শেষ হবে। তারপরে সম্পাদনার কাজ হবে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প অবলম্বনে প্রীরায় এই অপরাধমূলক চিত্রটি তুলছেন। উত্তমকুমার একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

স্টুডিও গ্রাফ

ছোট মা

সুরেশচন্দ্রী সলিল চৌধুরী একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা করছেন। ছবিটির কাহিনী রচনা, সম্পাদ ও পরিচালনার কাজ তিনিই করবেন। ছবিতে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের শিল্পী থাকবেন।

বালক গদাধর

পরশুরাম ঠাকুর-এর পরে তীর্থভারতী এবার ‘বালক গদাধর’ রূপায়িত করবেন। পরিচালনা করবেন হিরন্ময় সেন।

শীলা

কিনে ইউনিটের ‘শীলা’র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অরবিন্দ মুখার্জী ছবিটি পরিচালনা করছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন : সত্যিন্দ্রী চ্যাটার্জী,



নায়ক চরিত্র পরিচালিত ‘দুঃসংপ্রাপ্তি’ ছবিতে সত্যিন্দ্রী চ্যাটার্জী

গলাতক-এর হিন্দীরূপ

ভরুণ মজুমদারের ‘গলাতক’ ছবিটিকে হিন্দীতে রূপ দেবার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে জানা গেল। অনন্দকুমার হিন্দী ছবিতেও নায়কের ভূমিকায় থাকবেন।

সংবাদকল

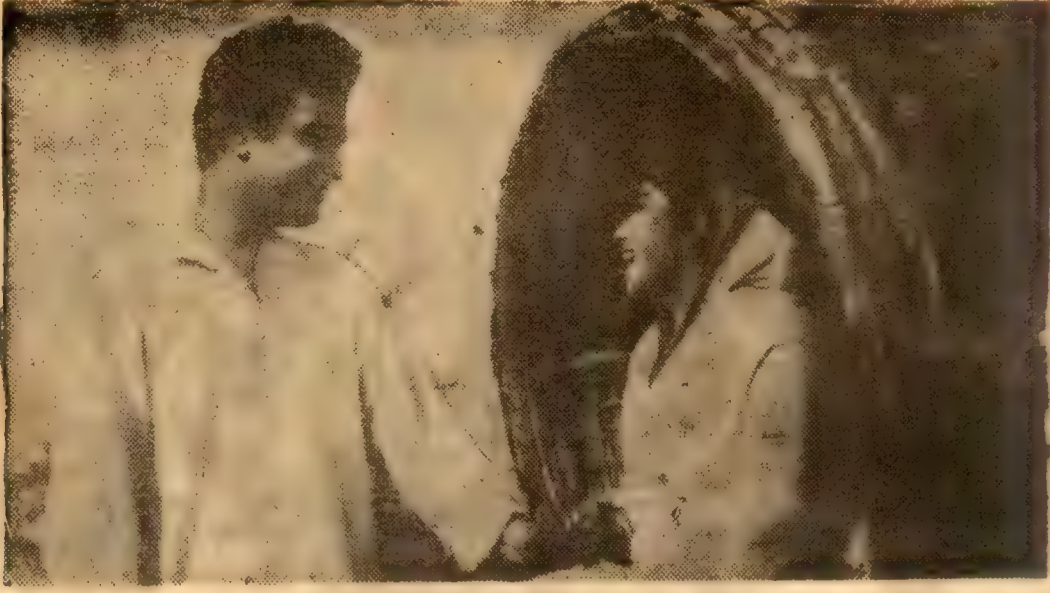
‘সেঙ্গপায়ের ওয়াল’ নিষিদ্ধ

দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ম সেন্সার বোর্ড ভারতে নির্মিত ‘সেঙ্গপায়ের ওয়াল’ ছবিটি সেদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। এই নিষিদ্ধকরণের কারণ বলা হয় নি। তবে অনেকে মনে করেন ছবিটিতে বিভিন্ন জাতির নবো সৌহার্দ্যের কথা আছে এবং ছবিটি ভারতে নির্মিত হওয়া এই নিষেধাজ্ঞার কারণ। এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ রায়। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে পদুমকার লাভ করেছেন মধুর জাফরী।

বিশেষী গল্পের ছবি নিষিদ্ধ হবে

এক সংবাদে প্রকাশ কেন্দ্রীয় তথ্য ও বোতামপত্র এবার বিদেশী গল্পের চিত্র গল্প প্রদর্শন বন্ধ করার কথা চিন্তা করছেন। সাম্প্রতিক গল্পের বাহাদুরমূলক এসব ছবিতে একদিকে ভিন্ন রাস্তার বিরুদ্ধে বিবেচ্য সৃষ্টির চেষ্টা

সাপ্তাহিক বসুদত্ত



‘গৃহবাহ’ ছবিতে উত্তমকুমার ও নাবিত্রী চ্যাটার্জী

থাকে, আর একদিকে থাকে উগ্র যৌনতা। এই ধরনের ছবির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র সাপ্তাহিক বসুদত্তীতে সৃজন তীব্রভাবে নিন্দা করছিলেন। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে, ‘বাই নাইট’ নামের অশ্লীল ছবিগুলির ব্যাপারেও একমাত্র সাপ্তাহিক বসুদত্তীতে নিষিদ্ধ করার দাবি করা হয়েছিল।

সোভিয়েত-মার্কিন যুক্ত উদ্যম

সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্ত প্রযোজনায় একটি ছবি তৈরি হবার কথা স্থির হয়ে গেছে। ছবিটির নাম হবে ‘চাইকভান্স’। চাইকভান্স একজন বিখ্যাত সোভিয়েত সুরকার। বিখ্যাত সোলানলেক বালে নৃত্য তরীই সঙ্গীতে মধুর ও ভাবময় হয়ে উঠেছিল এবং সঙ্গীতজগতে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। ছবিটির অংশবিশেষ আমেরিকার এবং বাকি অংশ সোভিয়েতে তোলা হবে। পরিচালনা করবেন দিমিত্রি তিরোকিন। এই ছবিতে এককালের চিত্রতরঙ্গ প্রোডা গ্রেটো গার্বোকে অভিনয় করাবার জন্য চেষ্টা চলছে।

উত্তমকুমার অসুস্থ

চলচ্চিত্র অভিনেতা উত্তমকুমার গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারের মতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ডাক্তার তাঁকে কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে বলেছেন।

চিঠিপত্র

ভারত সরকার ফিল্ম ডিভিশনের ছবি

পশ্চিমবঙ্গের যে-চিত্রগৃহে বাংলা চল-

চ্চিত্র দেখানো হয় বা হচ্ছে সেখানে কি এখন থেকে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের ডকুমেন্টারী ছবি হিন্দীতে দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে?

২০-৪-৬৭ তারিখে ‘পূরবী’ সিনেমা ‘হলে’ সান্দ্য শো দেখাবার পূর্ব মূহুর্তে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের একটি ছবি দেখানো হয়। ছবিটির আগাগোড়া কমেটোরী দেওয়া হয়েছে হিন্দীতে। সুতরাং আমাদের মতো অহিন্দীভাষী দর্শকদের কাছে ঐ ছবির মর্মকথা এক অক্ষরও বোধগম্য হয় নি। তবে নানা রাজনৈতিক দলের প্রতীকচিহ্ন ও কিছু নেতার মুখ দেখে মনে হয়েছে, একটা কিছু বটে! কিন্তু কী যে বটে তা ফিল্ম ডিভিশনের কর্তারাই জানেন। কারণ তাঁরা বোধ হয় চান নি যে, এর বিষয়বস্তু দর্শকরা জানুন।

কিন্তু আমাদের ভারত সরকারের উদ্দেশ্য কি? ভারত সরকার কি চান না যে, ঐ ছবির মর্ম বাংলা ভাষাভাষীরাও গ্রহণ করুক? অথবা ম্যার্থ-প্রণোদিত ব্যক্তিদের কি এই উদ্দেশ্য যে, বাংলা সিনেমা ‘হল’গুলিতেও হিন্দী সান্দ্যজীবাদ সম্প্রসারিত হোক? আমাদের বিনীত তৃতীয় প্রশ্ন, সেন্সার বোর্ডে বারিা ছিলেন, তাঁরা কি একবারও ভাবেন নি যে, ঐ চিত্রটি বাংলা ভাষাভাষীরাও দেখতে পারে এবং ভারত সরকারের অর্থে যে চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে তা প্রতিটি জাতীয় ভাষায় প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে কি না?

আমরা এই ধরনের একদেশদশী ঘটনার জন্য আপনার মনোবোণ আকর্ষণ করছি—যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

সরকার কি হিন্দীর চিত্র মেয়ে ডরথার অঙ্গসরকে জাগিয়ে তুলবেন?

—দ্বারা সরকার,

বিশ্রাম বোম, কর্মদান বোম, মনোরঞ্জন সরকার, ইন্দ্রা সরকার, মাদুরী বোম গোতম সরকার। ২১-৪-৬৭

২১০ (নিউ) বেচারাম চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা—৩৪

আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র

৪৬শ সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুদত্তীতে সৃজন লিখিত ‘আকাশবাণীর’ কলকাতা কেন্দ্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তিনি আকাশবাণীর সৌভাগ্যের কথা অতি অল্প সময়ে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখনও যদি আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ নীতি না বদলান তাহলে অবস্থা বদল করার সম্ভাবনা নেই। কৃষকদের জন্য যে সমস্যা তৈরি করছে এককথায় তা বেদনাকর। আমাদের দেশের কৃষক এতই শিক্ষিত যে, জলসর, পাউণ্ড প্রভৃতি না দিলে মরবাদি নষ্ট হবে। কৃষকদের কথা বড়ি বড়ি ভুল প্রচার ও গোষ্ঠীভুক্ত নীতি ত্যাগ না করে কেমন করে আকাশবাণীর প্রোগ্রাম তৈরি করা যায় তা বোধ হয় ভ্রমলোকদের অজানা। বাই হোক সাপ্তাহিক বসুদত্তীর নিয়মিত পাঠক বলে এ কথা ভালভাবে জানি যে যেখানে গলদ আছে সেখানেই দৃষ্টিপাত করিয়ে দিয়ে পাঠকসমাজকে সচেতন করার প্রেরণা পত্রিকাটিতে আছে এর জন্য সম্পাদককে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

—নিত্যানন্দ মন্ডল

কাকিনাইল, পোঃ হাপানিয়া (বর্মান)



বিশ্ব টেনিস টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী জাপানের খেলোয়াড়গণ

এশিয়ান ফুটবল

ভারত এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় চতুর্থ রাউন্ডে ইন্দোনেশিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছে। ব্যাংককের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ২৪শে এপ্রিল এই খেলাটি হয়। ভারতের খেলার সূচনা বেশ ভালই হয়। নিপুণ কৌশলে আদান-প্রদান করে শক্তিশালী ইন্দোনেশীয় দলের রক্ষণ ব্যুহ ভেদ করে অপূর্ব দুটি গোল দর্শকদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। বিশ্রামের আগে পর্যন্ত ভারতীয় দল নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখে এবং ২-১ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থাকে। ভারতের পক্ষে গোল দুটি করেন যথাক্রমে কানন ও হবিব।

বিশ্রামের পর ভারতীয় দল বিপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণ বেশিক্ষণ রুখতে পারে নি। ভারতীয় দল ক্রমেই পিছ হুটতে থাকে এবং ইন্দোনেশীয় দল এই সুযোগে একটি পেনাল্টি পায়। পেনাল্টির সাহায্যে গোল শোধ করে ইন্দোনেশীয় দল নতুন উৎসাহে আক্রমণ ধারা রচনা করে। ক্ষিপ্ৰতা, দৈহিক শক্তি, অফুরন্ত দম ইন্দোনেশীয় খেলোয়াড়দের অমোঘ অস্ত্র। ভারতীয় খেলোয়াড়রা এই বলদীপ্ত আক্রমণের মূখে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল। শূন্যমাত্রা অমিত

বিক্রমের সাহায্যে ভারতকে হটিয়ে দিল ৬-২ গোলের ব্যবধানে ইন্দোনেশিয়া।

ইন্দোনেশিয়ার ফুটবল পরাক্রম এতই উন্নত ধরনের যে অনেকেই আশা করছেন এ বছর বিজয়ী হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তাদের। অন্যদিকে বার্মা দল যারা চারবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হবার যোগ্যতা লাভ করেছে তাদের যাত্রা শূন্য বলতে হবে কারণ প্রথম খেলাতেই তারা শক্তিশালী জাপানকে ১-০ গোলে পরাজিত করতে

শ্রীঅমিতাভ

সক্ষম হয়। ম্বিতীয় খেলার বার্মা সিংগাপুর দলের বিরুদ্ধে অতি কষ্টে দুটি গোল করে তাদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখে।

ভারত চতুর্থ রাউন্ডে ইন্দোনেশীয় দলের কাছে পরাজিত হবার আগে মালয়ের সঙ্গে খেলার অশুভ কৃতিত্ব দেখায়। মালয় দল ভারতের সুসংবদ্ধ আক্রমণ ধারাকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বিশ্রামের আগে পর্যন্ত গোলের ব্যবধান ছিল ২-১ কিন্তু শেষের দিকে ভারত আরও দুটি গোল করে। মালয় দলের খেলায় যথেষ্ট

দৈহিক শক্তির স্বাক্ষর ছিল কিন্তু ভারতীয় দলের কৌশল ও চাতুর্যের কাছে তা বিশেষ কার্যকরী হয় নি। ভারতের দিলীপ পাল ১৩ মিনিটের সময় প্রথম গোল করে দর্শকদের মধ্যে উল্লাসের সৃষ্টি করেন। বিশ্রামের আগে কানন আর একটি দর্শনীয় গোল করে ভারতের মনোবল বাড়িয়ে দেন। কিন্তু বিশ্রামের আগে মালয় দল ভারতের বিপক্ষে একটি পেনাল্টি পায়। মালয় দলের ক্যাপটেন আগাস সেলিম নিজে পেনাল্টি সটটি করেন এবং একটি গোল পরিশোধ করে ম্বীয় দলকে অনুপ্রাণিত করেন। এই সময় মালয় দল বিশেষ করে দলপতি সেলিমের নেতৃত্বে আপ্রাণ চেষ্টা করে গোল শোধ দিতে। এই সময় মালয় দল গোল পরিশোধ করার দুটি সুবর্ণ সুযোগ পায় কিন্তু অলপের জন্য তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মালয়ের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা এই সময় বন্ড এগিয়ে পড়ে। এই সুযোগে ভারতের ক্ষিপ্ৰ ফরোয়ার্ডরা বল কাটিয়ে আরও দুটি গোল করে জয়ের পথ সুগম করে। তরুণ খেলোয়াড় ম্বারা গঠিত ভারতীয় দল দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

ময়নান হাক

কলকাতা হক লীগে বি এন আর

পাতাখানক ক্রীড়া

ক্রীড়া এখন ভারতীয় নাই। চ্যাম্পিয়ন-শীপের পাত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। ২২শে এপ্রিল ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে বি এন আর তার বিজয়ের পথ পরিষ্কার করে ফেলেছে। একটি খেলা বাকী। এই শেষ খেলা মোহনবাগানের সঙ্গে। কিন্তু মোহনবাগান দুটি পরেট পিছিয়ে। বি এন আর ১৮টি ম্যাচ খেলে এখনও কোন পরেট হারায় নি। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে বি এন আর ক্লাব এবারেও হকি চ্যাম্পিয়ন হবে।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে ২২শে এপ্রিলের খেলাটি বিশেষ প্রদর্শনী খেলা হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু মাঠে দর্শক সমাগম আশানুরূপ হয় নি। খেলার মানও কোন সময়ই উচ্চস্তরে পৌঁছয় নি। আক্রমণ রচনায় কোন দলই বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না। তবে বি এন আর দলের খেলার কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয় ছিল। বাম প্রান্তের খেলোয়াড় বেগ এবং দক্ষিণ প্রান্তের মুনতাক ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত করেছে। রেল দলের রক্ষণভাগে সৈয়দ ও দলজিৎ নির্ভরযোগ্য প্রহরীর কাজ করেন এবং বিপক্ষের আক্রমণগুলি অতি সহজেই বানচাল করে দেন। খেলার প্রথম দশ মিনিট কোন পক্ষই বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি এবং মাঝ মাঠেই খেলা চলে। রেল দলের সেলিম বেগ ২২ মিনিটের সময় একটি সুন্দর গতির সঞ্চয় করে গোল সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং কোণাকূর্ণি সট করেন। ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক কাপের বলটি গ্যাডে আটকান কিন্তু জেরে বাইরে পাঠাতে পারেন নি। বেগ ছুটে এসে বলটি গোলে ঠেলে দেন—ওয়াহীদের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে কা গোলে প্রবেশ করে। এই একটি গোলেই খেলার ভাণ্ড নির্ধারিত হয়। ইস্টবেঙ্গল গোল পরিশোধের চেষ্টা করে বটে কিন্তু রেল দলের রক্ষণভাগের দৃঢ়তার নিম্মল হয়।

বাইটন কাপের খেলা নির্ধারিত জালিকা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে। বহিরাগত দলগুলি এ পর্যন্ত ভালই খেলছে। প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হওয়ার মাঠ একটু নরম এবং শরৎমাঠে খেলতে অভ্যস্ত দলগুলি একটু অসুবিধা বোধ করছে। হকি খেলা শরৎ মাঠের খেলা এবং ভিজ়ে মাঠে খেলার গতি মন্দার হয়ে পড়ে। ২৬শে এপ্রিলের খেলায় দিল্লী কাস্টমস ফলকাতার মহম্মদান দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় হিন্দুস্থান এয়ারফোর্ট দলের বিরুদ্ধে খেলবে। রূরকারী ইনজিনিয়ারিং দল ৪-১ গোলে রেজার্সকে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছে।

নাগপুর ইউনাইটেড ২৫ তারিখের খেলায় এন্টালি এসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে আর এক ধাপ উঠল। নাগপুর দলকে চতুর্থ রাউন্ডের খেলার জলখন্ডের সিগন্যাল দলের সুপাঃ মোকাবিলা করতে হবে। জলখন্ডের এই দলটি গতবার বাইটন কাপের রানার্স আপ। উত্তরপ্রদেশ একাদশ এ বছর বাইটন প্রতিযোগিতার



জাদু বোরদে

অংশগ্রহণ করবে না। মীরাতের ফ্রেসারস ক্লাব উত্তরপ্রদেশের স্থানস্থান পূর্ণ করবে। বেনারসের ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ২৪শে এপ্রিলের খেলায় প্রায়ার দলকে এক গোলে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছে। এ দলটি এ বছর আন্তঃ রেল প্রতিযোগিতায় রানার্স আপের সম্মান লাভ করেছে। চতুর্থ রাউন্ড থেকেই বাইটন কাপের খেলা জমজমট হবে।

অর্জুন পুরস্কার

ভারতের চ্যাম্পিয়ন ক্রীড়াবিদ ১৯৬৬ সালের অর্জুন পুরস্কার লাভের জন্য মনোনীত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় ভারতের পক্ষে সাক্ষ্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের প্রতি বছর ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মান দেবার ব্যবস্থা শুরু হয় ১৯৬১ সাল থেকে। ১৯৬৬

সালে অর্জুন পুরস্কার প্রাপকদের নাম নিচে দেওয়া হল।

ক্রিকেট—চাঁদু বোরদে।

লন টেনিস—জয়দীপ মুখার্জী।

স্নাতক—রীমা দত্ত।

গ্যাথলেটিকস—আজমীত সিং এবং বি এস বড়ুয়া।

ফুটবল—ইউসুফ খাঁ।

হকি (পুরুষ)—ভি জে পিটাব এবং গুরবঙ্গ সিং।

হকি (মহিলা)—সুনীতা পূর্বী।

টেবল টেনিস—উষা সুন্দররাজ।

ভারোত্তোলন—মোহনলাল ঘোষ।

কুস্তি—ভীম সিং।

মুষ্টিবন্দু—হাওয়া সিং।

গলফ—পি জি শেঠী।

স্মারক দর্শন

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড় খোদাইজি পঞ্চম রাউন্ড পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। কোরিয়াকে পরাজিত করে পঞ্চম রাউন্ডে রাশিয়ান খেলোয়াড় সারখোজানের কাছে খেলা হার স্বীকার করেন। খেলার ফলাফল হয় ১২-২১, ১৭-২১ এবং ১০-২১। স্টকহলমে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় জাপানের প্রাধান্য আর একবার চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হল। সাতটি বিষয়ের মধ্যে জাপান ছয়টি স্বর্ণপদক পেয়েছে। কার্যকর স্বর্ণপদকটি পেয়েছে সুইডেন ডাবলস খেলার বিজয়ী হয়ে।

ভারতীয় টেনিস তারকা রামনাথন কৃষ্ণাণ বুওনস্ এয়ারস রিভার শ্রেট টেনিস প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইনালে আমেরিকার ক্লার্ক গ্রেনবারের কাছে ৬-৪, ৬-৪ সেটে পরাজিত হয়েছেন। উইমবলডেনে যোগ দেওয়ার আগে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে অভিজ্ঞতা ও শক্তি সঞ্চয় করছেন। এই প্রতিযোগিতায় উইমবলডেন বিজয়ী ম্যানুয়েল সান্তানাও অংশ গ্রহণ করছেন।

মাদ্রিদ উৎসবে যোগ দেওয়ার পক্ষে ভারতীয় হকি দল কামরোতে দুটি প্রদর্শনী খেলার যোগ দেবে। মাদ্রিদ উৎসব সূর্য হবে ৩০শে এপ্রিল এবং শেষ হবে ৪ঠা মে। মাদ্রিদ উৎসবে আটটি হকি দল অংশগ্রহণ করবে। ভারতীয় দল এই উৎসব অবসানে স্পেন ও ইউরোপে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলার যোগ দেবে এবং কয়েকটি টেস্ট খেলাতেও অংশ গ্রহণ করবে। এই দল স্বদেশে ফেরার আগে ৫ই জুন লন্ডনে একটি হকি টেস্ট খেলার যোগ দেবে।

ভারতীয় টেস্ট দল ইংলণ্ডে উপনীত

ভারতীয় ক্রিকেট বাহিনী উপনীত হয়েছে লন্ডনে; অনুশীলনের জন্য ক্রিকেটের স্বর্গরাজ্য লন্ডনের মাঠে গা গরম করতে তারা নেমেছেন। ইংল্যান্ডের বিচিত্র আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। আর এবার ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের এই আবহাওয়া সমস্যা-একটা বড় সমস্যা; কারণ বোলজেন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র দুজন চান্দ বোরদে এবং অধিনায়ক পতোদির পরিচয় আছে ইংল্যান্ডের মাঠের এবং আবহাওয়ার সঙ্গে। বাকি কজন একেবারে নবাগত ইংল্যান্ডের মাটিতে।

ক্রিকেট আসরে ইংল্যান্ড আর ভারতের



পতোদি

সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, যদিও অবশ্য সরকারিভাবে টেস্ট খেলার সূত্র হয়েছে দু'দেশের মধ্যে অনেক পরে। ১৮৮৬ সালে প্রথম ভারতীয় দল ইংল্যান্ড সফর করে; প্রথম সফরের এই পাশী দলটির নেতৃত্ব করেন ডঃ ডি এইচ প্যাটেল। ভারতীয় দল প্রথম সরকারিভাবে ইংল্যান্ড সফরে যায় ১৯৩২ সালে পোর বন্দরের মহারাজার নেতৃত্বে। একটি মাত্র টেস্ট খেলা সেবার অনুষ্ঠিত হয় এবং এই টেস্টে কিন্তু অধিনায়ক করেন সি কে নাইডু। আজ পর্যন্ত পাঁচবার ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছে ভারতীয় টেস্ট দল এবং এর মধ্যে চারবারই নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয়েছে রাজা-রাজাদের হাতে। শুধু একমাত্র ১৯৫২ সালের সফরে অধিনায়ক ছিলেন বিজয় হাজারে।

অধিনায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভারতীয়

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বদনাম। বহু যোগ্য খেলোয়াড়কে অধিনায়কত্বের সম্মান থেকে বঞ্চিত করার অনেক নজীরই আছে। ১৯৫৯ সালে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় অধিনায়ক নির্বাচিত হন ডি কে গাইকোয়াড়। সারা ভারতবর্ষ গাইকোয়াড়ের নির্বাচনে ষেমন সেদিন অবাধ হয়েছিল ঠিক তেমনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন সেদিন গাইকোয়াড় স্বয়ং। শোনা যায় ভারতীয় টেস্ট দলে স্থান পাবার আশাই তিনি ত্যাগ করেন। এই জন্য ইংল্যান্ডের কোন এক কার্ডিট দলের পক্ষে খেলার জন্য কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় হঠাৎ তাকে অধিনায়ক বানিয়ে কুতর্ভা হলেন ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তাব্যক্তির, কারণ গাইকোয়াড়ের রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে রাজবৃত্ত।

ভারতের এই অধিনায়ক নির্বাচন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন ইংল্যান্ডের বিস্ময়াক্রান্ত ক্রিকেট সমালোচক হার্ভে ডে। তিনি কিছুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেন যে, ভারতের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হল যোগ্য অধিনায়কের অভাব। এবার ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার পতোদির ওপর অর্পিত হওয়ায় তিনি কিন্তু খুব সন্তোষ প্রকাশ করেন নি। তিনি লিখেছেন যে, একজন যোগ্য অধিনায়ক থাকলে আগামী ইংল্যান্ড সফরে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারত এবং রাবার সম্বন্ধে কোন কিছু মন্তব্য করা খুবই শক্ত হত। অবশ্য অনেকেই ইংল্যান্ড সফরে অধিনায়ক হিসাবে পতোদির নির্বাচন সমর্থন করেছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে ইংল্যান্ডের মাঠ-ময়দান সম্বন্ধে পতোদির অভিজ্ঞতা আছে, কারণ তিনি ইংল্যান্ডেই মান্দ্র এবং বহু বছর সেখানে খেলেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় এবং ক্রিকেট সমালোচক জ্যাক ফিংগল্টন বলেছেন যে, দলীয় সংহতি এবং খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্য ছাড়া জয়লাভের জন্য প্রয়োজন উন্নত ফিল্ডিং। তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়দের ইংল্যান্ডের মাঠে উন্নত মানের ফিল্ডিং প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বিশেষত মূল্যবান ক্যাচ ভূপতিত না করার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলেছেন।

একমাত্র নবাগত কয়েকজন ছাড়া ভারতীয় দলের অন্যান্য খেলোয়াড়ের ফিল্ডিং ভালই। অনেকেই বিষণ্ণ সিং বেদী এবং সূরত গুহের ফিল্ডিং উন্নতির ওপর

জোর দিয়েছেন। টেস্ট দলে নবাগত এই দুজন তরুণ খেলোয়াড় আরও কয়েকটি বড় খেলায় অংশ গ্রহণ করলেই ফিল্ডিংয়ে উন্নতি করতে পারবেন নিঃসন্দেহে। টেস্টের আসরে নবাগত তরুণ খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে সূরতেই সমালোচনার জ্ঞানবাণী বর্ষণ না করে সুযোগ দিয়ে তাদের উন্নতি লক্ষ্য করাই উচিত।

ইংল্যান্ডের ক্রিকেট সমালোচকরা বলেছেন যে, ভারতীয় দলের সব ব্যাটসম্যানই স্ট্রোক ব্যাটসম্যান, ফলে ইংল্যান্ডের সবদিক ঘাসের উইকেটে এঁদের ব্যর্থতার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এই ধরনের উইকেটে কিণ্ডিং রক্ষণাত্মক ব্যাটসম্যানেরই প্রয়োজন। ইংল্যান্ডে স্পিনার চন্দ্রশেখর সম্পর্কে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়েছে। ওখানকার সমালোচকরা বলেছেন যে, ইংল্যান্ডের ব্যাটস-



সূরত গুহ

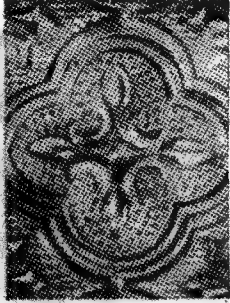
ম্যানদের ঘাসেল করার মারণাস্ত্র পতোদির হল চন্দ্রশেখর। বাংলার তরুণ খেলোয়াড় সূরত গুহের মিডিয়াম ফাস্ট বোলিংয়ের সঙ্গে সুইংয়ের ছোবল ইংল্যান্ডের মাঠে কার্যকরী হবার খুবই সম্ভাবনা আছে। অধিনায়ক পতোদি অত্যন্ত ওপনিং বোলার হিসাবে সূরতের ওপর অনেকটা ভরসা করে আছেন।

তবে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ইংল্যান্ডের মাঠে কে কেমন খেলবেন স্পষ্টভাবে তা এখনই ভবিষ্যব্যাণী করা খুবই শক্ত। কারণ স্রাতীভের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা গিয়েছে যে, বহু ভাল এবং নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ইংল্যান্ডের বিচিত্র পরিবেশে ব্যর্থ হয়েছেন। ভারত এবারের সফরে খেলবে তিনটি টেস্ট ম্যাচ এবং ভারতের জয়ের সম্ভাবনাই চিন্তা করে ভারতীয় টেস্ট দলের সাফল্যই আমরা কামনা করছি। —শ্যামলেশ সান্যাল।

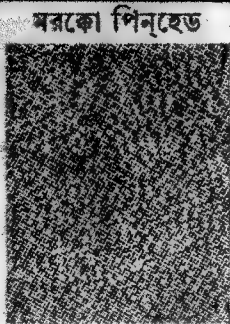
সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

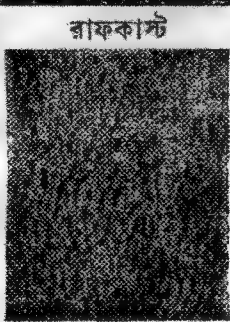
বঙ্গমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



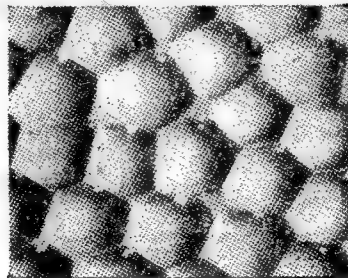
মরেক

চারো
ব্রীডেড

মরকো পিন্‌হেড



রাফকাষ্ট



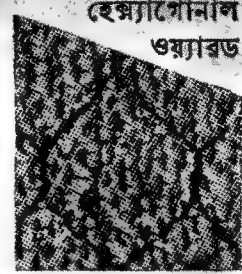
হ্যামার্ড

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্রাস ব্যবহার করেন

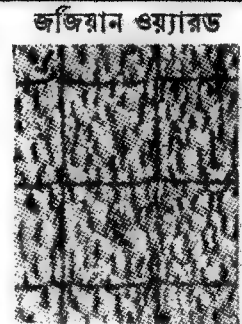
আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইকুল ও হাসপাতালে স্থপতি ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্রাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্রাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্বাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্রাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্রাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর-যোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্রাস ওয়ার্কস
লিমিটেড

হেম্যাগোনাল
ওয়ার্ড

শিট গ্রাস



জর্জিয়ান ওয়ার্ড

ম্যানেজিং এজেন্টস
ভালুকদার ল'
অ্যান্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন আভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

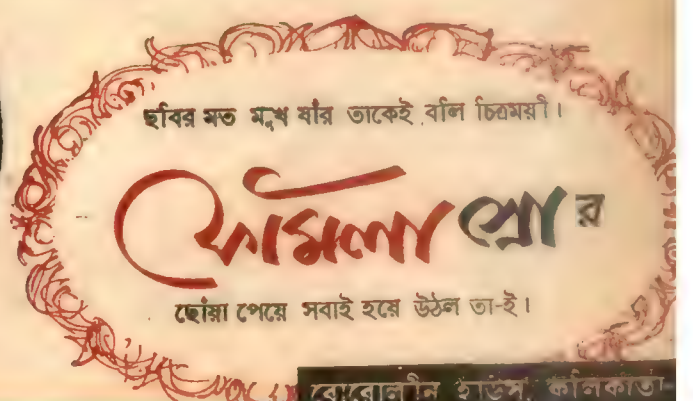
সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

কল্পে আশ্রয় তুমি ভাবি অন্যমনে
এই পোড়ো কামি ভেঙে অন্যতর সকলবেশের
ঘর-ভরা শূন্যতা সারিয়ে দীপ্ত, পূর্ণ.....



বর্ষ : ৪৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

11th May, 1967 * Vol. 71, No. 4



ছবির মত মুখ বার তাকেই বলি চিত্রময়ী।

চন্দ্রিকা প্রো

ছোঁয়া পেয়ে সবাই হয়ে উঠল তা-ই।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা



বিষয়	লেখক /	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩০১১
আজকের মানুষ	...	৩০১২
বিদেশে রবীন্দ্র-সমালোচনা (প্রবন্ধ)	— ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায়	৩০১৩
নির্বাকের গৃহা, শব্দের কাক (প্রবন্ধ)	— ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	৩০১৭
আধুনিক সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	— সোমেন্দ্রনাথ বসু	৩০২০
ভবু রবীন্দ্রিক প্রাণ শেল (কবিতা)	— বিষ্ণু দে	৩০২৬
প্রত্যহ নতুন নিম্নলিখিত (কবিতা)	— ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র	৩০২৬
সর্বগ্রাসী ধম্মালের কালো ছায়া (কবিতা)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩০২৬
ভারতবর্ষ	...	৩০২৬
আন্তর্জাতিক	...	৩০৩০

বসুমতি সাহিত্য মন্দিরের —নবতম অধ্য—

শব্দিত মা তোর দিবা আলোকে
যেহে আছে আজ জীবন বোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার লগাটে তোর;

ধামরা ঘুটাব মা তোর দৈন্য!
মানুষ আমরা নাই তো মেঘ!
দেবী আমার! সামনা আমার!
স্বর্গ আমার! আমার দেশ!

মাতৃমন্দির স্বত্বিক, অপরাধের মানবমাহাত্ম্যের স্বস্বদর্শী কবি, যুগপ্রবর্তক নাট্যকার শ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ডে আছে, শ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক সাজাহান, তৎসঙ্গে সর্বজনসমাদৃত নাটক সিংহল বিজয়, সোরাব রস্তুতম ও পরপারে। মৃদুগ পারিপাট্যে ও গ্রন্থন সৌকর্ষে মনোহর। কবির প্রতিকৃতি সমন্বিত সুদৃশ্য আর্ট পেপারের জ্যেষ্ঠেটের প্রচ্ছদ; কাপড় ও বোডে বঁধা। মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

বসুমতি প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬. বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



বিষয়	লেখক	মূল্য
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচরন)	— সুধীরজন দাস	০০০৫
বঙ্গদর্শন	—	০০০৬
রবীন্দ্র-বিশ্ববীর্ষের কথা (প্রবন্ধ)	— বিশ্ব মদ্যোপাধ্যায়	০০৪২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পিতৃস্মৃতি (প্রবন্ধ)	— পরিমল গোস্বামী	০০৪৫
জ্ঞানবৃক্ষের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	০০৫০
বিদ্যা বাউলীর বক্তাবলি (ছোট উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	০০৫৮
অনহৃত দ্বিজদর্শক (কবিতা)	— দ্বর্গাদাস সরকার	০০৬৬
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিল্পালি	০০৬২
পাতকজন	—	০০৬৩
রঙ্গমঞ্চ	—	০০৬৪
খেলাধুলা	— প্রীতমিতাভ	০০৬৯

সাহিত্য-সম্রাট-বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিশ্ববন্ধু, বঙ্গলাল্লুরায়, মৃণালিনী, রজনী। [মুদ্রিত] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—মুগ্ধশালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দ্রিয়া, রক্তাক্ষী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—অনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [মুদ্রিত] মূল্য—৩ টাকা

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ 'অনুশীলন'), মদুচিরাম গদ্য, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

মুদ্রণ কাগজ ও বোর্ডে খরচ যোগ্য সংস্করণ
মূল্য প্রতিখণ্ড ৪-৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীররাগনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘড়ে রো একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাধাই)—সাতো চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শারম্ভা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপ্রদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়ী কানন, হেকটর রথ। (বোর্ড বাধাই) সাতো তিন টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রাণসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সাহিত্য এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষর বাড়াল, রাজকুমার রায় প্রভৃতির কাব্যগদ্যে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবহু প্রবন্ধ
মূল্য তিন টাকা



৭১ বর্ষ : ৪৮শ সংখ্যা—মূল্য—২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 11th May, 1967

কবির জন্মদিনে আমাদের কত'বা

পাঁচিশে বৈশাখ আবার ডাক দিয়ে গেল। আমবা সেই ডাকে সাড়া দিয়েছি। আজ আমাদের নিজেদের কাছেই এই প্রশ্ন : সেই ডাকে আমাদের সাড়ায় বতোখানি সভ্য নিহিত আছে? আব, তাব প্রমাণই বা কই? প্রতি বছরই কালের অমোঘ নিবসে পাঁচিশে বৈশাখ আসবে। প্রতিটি বছরের প্রতিটি পাঁচিশে বৈশাখে যদি কর্মের ছন্দে চিবকালের করে তুলতে পাবি তাহলেই কবির জন্মদিন আমাদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে।

বর্তমান ভবক্ষব জটিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ—এই কথা বলে হাল্কা আনন্দের সময় এখন নয়। কিন্তু কে দেখাবে পথ? কে উদ্ধার করবে আমাদের এই নিমজ্জমান দশা থেকে?

কবির চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে যোগ স্থাপন করলে দেখা যাবে যে, তিনিই আমাদের পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা তা দেখছি না, চমকদারী ঠুনকো সাহিত্য—যাব সঙ্গে দেশের মানুষের প্রাণের যোগ নেই তাকেই মনোহারী করে তুলে ধরা হচ্ছে। সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে কবির সুর ঝঙ্কত হলেও সেখানে সাধনার স্মার্য তা অর্জন করার প্রয়াস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত রচনাগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে আমরা দেখতে পাবো যে, প্রকৃত সাহিত্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যী করার জন্যে নয়। কারণ তা “কো-অপারেটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েন্টস্টক কোম্পানি নয়, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়।” অথচ একালের বাংলা সাহিত্যে এই দিকটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কবিব এ কথাও আজ মনে রাখতে হবে—“বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালির

মন যতই বড় হইবে, ভারতের অন্য জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে।”

বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বাঙালির মন রবীন্দ্রনাথের পর কতটুকুই বা এগিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের কুড়ি বছরের পবও কি—বাংলা সাহিত্য রচিত হয় যে ভাষায় সেই বাংলা ভাষার বিপ্লবী ঘটেছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে শহীদের রক্তে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন পে সগৌরবে স্বীকৃত। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কাজকর্মে অধুনা বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হলেও এর ব্যাপক প্রচারেব আয়োজন কই? বাংলা ভাষা ব্যবহারের পক্ষে যদি কোনো রকম অসুবিধাও থাকে, তা দূরী-করণের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বা কোথায়? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি এমন একটি কমিটি তৈরি করবেন, যে-কমিটি বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের গতিবোধ ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশদান করতে পারেন। তাছাড়া, বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচার ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিদেশী ভাষায় লিখিত আশু প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলিব অনুবাদের ব্যবস্থা করাও দরকার। স্নাতকোত্তর বিদ্যা একালেও বাংলা ভাষার মাধ্যমে সম্ভব হোল না, এর চেয়ে আর দৃষ্টের বা দৈন্যের কারণ কি থাকতে পারে। বিজ্ঞান-বিষয় ন্যাকি মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, এমন কথা কেউ কেউ বলেন। বিজ্ঞানচর্চা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ অভিমত, একবার সুর করে দিলে সর্বোচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষাতেই সম্ভব। ভাবত রাষ্ট্রে মাতৃভাষাগুলির প্রয়োজনীয়তা আপাতত স্বীকৃত হলেও কেন্দ্রীয় দানসত্ত শৃঙ্খলায় একটি বিশেষ ভাষা

জনোই খোলা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারে একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ইচ্ছাতেই এতোকাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাগুলি অনাদৃত থেকেছে। এখন তাঁর প্রচণ্ড বিরোধেব সম্মুখীন হয়ে মাতৃভাষাগুলির মর্যাদা মুখে স্বীকার করে নিলেও তাঁদের মনের কথা বোঝার উপায় নেই। তা নইলে হিন্দী ভাষাকে একেবারে নামে অপরের উপর চাপাবার জন্যে কিন কেনে বজায় রাখছেন? প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী আমাদের কাছে পব-নির্দেশক। তিনি বলেছেন : “এবতৎবে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজী ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাগি মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে করে যথার্থ গানবন হতে পাবে না; হয়তো একাকার হতে পারে কিন্তু একত্ব হতে পারে না। ফলস্র একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর... এটি মিলনের প্রয়াসমাত্র।... সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন অথবা শৃঙ্খলায় মিলন-মাত্র।” আসলে “বাহ্য সামাকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর স্টীম-বোতল চালিয়ে দিয়ে আপন রাজত্বের পাব সমভূম কবতে চায়।” পাঁচিশে বৈশাখে বাংলা সাহিত্যের অবস্থা মাতৃভাষার প্রমোদ ও রাষ্ট্রভাষার বিধান সম্পর্কে যদি কিছু না করে থাকি, তাহলে এখনি তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। তাহলেই কবির পদ্য জন্মদিন আমাদের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

সম্পাদিকা

ভোজকের মানুষ

যমস যত বাড়়ে দায়িত্বের বোঝাও কি তত ভারী হয়? সবার ক্ষেত্রে তা ঘটে না, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির মৃষ্টি নেই। তিনি চান আর না চান, কাজ ছুটবে তাঁর পেছনে। গত তিরিশ বছর ধরে একের পর এক এ-দৃশ্যই দেখে আসছি। ১৯৩৭ সালে মন্ত্রিস্বের দায়িত্ব, আজ উপরাষ্ট্র-পতির। শ্রীবরাহ গিরি ভেঙ্কট গিরির মতো কর্মবহুল জীবন খুব কমই দেখা গিয়েছে। নইলে এই ৭০ বছর বয়সেও তাঁর কাঁধে নতুন দায়িত্ব চাপবে কেন?

অবাণী, শ্রীগিরির অতীত জীবন, তাঁর স্বনামধন্য পিতার কথা স্মরণে রাখলে নতুন জীবন সূর্য্য করার ঘটনায় বিস্ময়েব অবকাশ থাকে না। আইন অমান্য আন্দোলন চলার সময় একথাটা নেতাদের মধ্যে মধ্যে শোনা যেতো যে, 'বাপকা বেটা' বলতে দুজনেই আছেন। এক, মতিলাল নেহরুর ছেলে জওহরলাল, আর, জোগিয়া পান্ডুলু গিরির ছেলে ভেঙ্কট। জোগিয়া গিরি সেদিনের নাগকরা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন।

ভি-ভি গিরির নাম সেদিনই সারা ভাবতে ছাড়িয়ে পড়েছিল যেদিন তিনি বেংগল-নাগপুর রেলওয়ে ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন। বলা বাহুল্য, বাজনারীতিতে সেদিনই তাঁর হাতে-খড়ি নয়। বাজ-দীতিব গণ্ডে যেদিন তিনি প্রথম প্রবেশ করেন সেদিন বগলে তাঁর পুঁথি ছিলো, ছাত্র তখনো। তবে, আব পাঁচ-ছনের মতো সর্বঘণ্টে উপস্থিতিতে তাঁর আগ্রহ ছিলো না বিশেষ, সমস্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান নি। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের অগন্থিত অজ্ঞ শ্রমিকদের জাগাতে হবে, শোষিত ও অত্যাচারিত মজদুরদের নিজে-দের ন্যায্য অধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—এই বাস্তববুদ্ধি তাঁর হয়েছিলো। শিঙালী শ্রমিক-কর্মচারী সংস্থা অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা শ্রীগিরিরই অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা ও গভীর শ্রমিক-দবদের অস্ফাল স্বাক্ষর। অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা এ-আই-টি-ইউ-সি আজ কমিউনিস্ট কবলিত হতে পারে, কিন্তু শ্রীগিরির হাতেই এর প্রাথমিক সূচনা হয়েছিলো।

কিন্তু মজার কথা, শ্রীগিরির রাজ-

নৈতিক জীবন দেশের মাটিতে সূর্য্য হয় নি, হয়েছিল বিদেশে সূর্য্য আলোয়। গঙ্গামের বহরমপুরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রীগিরির জন্ম, গঙ্গাম জেলাটি তখন তেলুগু-ভাষী অঞ্চল ছিলো। এখানকার কালিকোট কলেজ থেকে পাশ করে শ্রীগিরি উচ্চশিক্ষার জন্যে আয়াল্যাণ্ডের ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। ডাবলিনে বার-এ যোগ দিয়ে শ্রীগিরি শব্দ অধ্যয়নই করলেন না, রাজ-নীতিতেও অংশ নিলেন। আয়াল্যাণ্ড



ভি ভি গিরি

তখন বিখ্যাত ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে অগ্নিগর্ভ। তবু গিরি আইরিশদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যোগ দিলেন সিন ফিন আন্দোলনে। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তিনি ডি ভ্যালেরা, কলিন্স, ডেস-মন্ড ফিটজেরাল্ড, কনোলী ইত্যাদি পৃথিবীবিশ্বব্যাপ্ত রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বাজনৈতিক আন্দোলনে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জড়াই করার জন্যে সেদিন আইরিশ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা যেমন নিগৃহীত হয়েছিলেন, তেমন গিরিকেও এ-বাধে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিলো।

১৯১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়া শেষ করার আগেই আয়াল্যাণ্ড থেকে বহিস্কারের আদেশ দেওয়া হয় শ্রীগিরিকে।

দেশে ফিরলেন শ্রীগিরি, জমি ভৈরিই ছিলো এই প্রাচণ্ড তরুণটির জন্যে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি গান্ধীজীর সত্যগ্রহ আন্দোলনে ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে। বার বার কারাবাস করতে হয়েছে, কিন্তু মৃষ্টি পেয়ে প্রতিবারই স্বিগদুণ উৎসাহ নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছেন। কংগ্রেসে যোগদান করে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শ্রম উপ-সমিতিতে তিনি জয়রামদাস দৌলতরাম, আচার্য কৃপালনী, শ্রী জি এল নন্দের সঙ্গে কাজ করেছেন।

শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম করার জন্যে শ্রীগিরি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত ছুটে গিয়েছেন। ১৯২৭ সালে জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, ১৯৩১ সালে বিলাতে গিয়েছেন কর্মচারীদের প্রতিনিধি হয়ে স্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। তাই ১৯৩৭ সনে যখন মাদ্রাজে কংগ্রেস সরকার গঠনের দায়িত্ব নিলেন তখন শ্রীগিরির ওপরেই অনিবার্য ভাব পড়লো শ্রম, শিল্প ও সমবায় দপ্তর নেবার। আবার টি প্রকাশমের সরকারেও শ্রীগিরি শ্রমদপ্তর পেয়ে-ছিলেন (১৯৪৬-৪৭)। ভাবত স্বাধীন হবার পূর্বে শ্রীগিরির ওপর প্রথম দায়িত্ব আসে সংহলে ভারতীয় হাই কমিশ-নারের পদ গ্রহণে। এখানে পাঁচ বছর (১৯৪৭-৫১) থাকার পর শ্রীগিরি ভাবতে ফিরে প্রথম সাধাবণ নির্বাচনে প্রতি-স্বস্থিতা করে লোকসভার সদস্য হলেন। আর শ্রীগিরির সদস্য হওয়া মানেই তো মন্ত্রিস্ব। এবং শ্রম দপ্তরই। কিন্তু গদীব প্রতি যে তাঁর কোন ক্ষোভ ছিলো না এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাস যে সর্বাক্ষর ওপরে তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো যখন ১৯৫৪ সালে ব্যাঙ্ক এ্যাওয়ার্ডে খুশি হতে না পেয়ে তিনি মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন।

এবপরে ১৯৫৭ সাল থেকে শ্রমিক-নেতা গিরিকে দেখা গিয়েছে সংবিধান-সংরক্ষকের ভূমিকায়। প্রথমে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল, পরে কেবালা এবং সর্বশেষ মহাত্মা বাজোয়। এই নিরাভ-মানী, নিষ্ঠাবান, শ্রমিক-দবদী মানব্ধিটি এবার আরো এক খাপ উঠলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত উন্নতিতে তিনি কখনই সন্তুষ্ট নন। যোগ্য পদে যোগ্য ব্যক্তি পেলো আজ দেশ।

বিদেশে রবীন্দ্র সমালোচনা

॥ রবীন্দ্রনাথ রায় ॥

বিদেশে রবীন্দ্র-সমালোচনা আরম্ভ হয়েছে অনেক পূর্বে। পশ্চিম যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, তখন কবির বয়স পাঁচাশ পাঁচ হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণতার পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা দেশের প্রথম সাহিত্যিক-রূপেও স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছেন। কবির পঞ্চাশ বৎসর পুঁতি উপলক্ষে কথ্যীয় শাহীদা পরিষদের উদ্যোগে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখের নেতৃত্বে টাউন হল্‌ এক বিরাট সম্মেলন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এমন কি সে যুগে বঙ্গী রবীন্দ্রবিবোধ আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের নেতৃস্থানীয় কবি শ্রীমন্তেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার 'সূচনায়' লিখেছিলেন: "আমাদের শাসন-কর্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের জাদুর জানিতেন, তাহা হইলে বিদেশে রবীন্দ্রমন্ডল ও মাইকেল

ভারতপ্রদর্শনে এসেছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকোর অকলীন্দ্রনাথের চিত্রশালা দেখতে আসেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফেলু করে তখন ভারতবর্ষের নবজাগরণ দেখা দিচ্ছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোমেনস্টাইনের পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের বাড়ি ও চাহারা দেখে লিগ্যাচার্য এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর ছবি তৈরি করার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের পরবর্তীকালে লিখে-
ছিলেন:

I was attracted each time,
I went to Jorasanko, by their
uncle—a strikingly handsome
figure, dressed in a white dhoti
and chadar, with a white turban.
His

and West' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নীতি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। এই বইটি ১৯০১ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই অনুবাদ সূত্রের ভুল হয়। রোমেনস্টাইন সম্ভবতঃ ১৯০১ খৃস্টাব্দে পরিচয় করেছিলেন, ১৯১০ খৃস্টাব্দে বঙ্গের অনুবাদ 'Hungry Stones' পাঠ্যছিলেন। উক্ত পত্রিকার প্রবর্তক (জানুয়ারি, ১৯১২) ভাণসী লিগ্যাচার্য-কৃত অনুবাদ 'ফান্সিওরগা' পাঠ্য করেছিলেন। প্রত্যেকবার যথোপযুক্ত তাঁর রবীন্দ্রভাবনায় জানিয়েছেন:

"রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের আরও গল্প আছে কিনা জানিবার জন্য তিনি অকলীন্দ্রনাথেরে পত্র দেন। এই পত্রের জবাব দিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণের ৫০-৫১-

সাহিত্যিক বঙ্গবতী

"It looks as though we have at last a great poet among us again."

স্বপ্নকণ্ঠ হৃদয় লিখেছেন:

"I send back the poems. I have read them with more than admiration; with gratitude for their spiritual help, and for the joy they bring and confirm and for the love of beauty which they deepen and for more than I can tell. I wish I were worthy of them."

যেটস লিখিত ইংরেজ গীতাঞ্জলির কৃত্রিমতা আর এক সর্বজননির্দিষ্ট কাহিনী। তিনি এই গুটিপ করা কাঁপ পড়ে কতখানি মগ্ন হয়েছিলেন, তা ভকপটে স্বীকার করেছেন:

"I have carried the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway, trains or in the top of omnibuses and in restaurants and I have often had to close it lest some stranger would see how

মগ্নে প্রাণে আত্মা দিতেও কুণ্ঠিত হন নি—

"some one greater than any of us."

রোডেনস্টাইনের বাক্যে যে সামান্য কৈফের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে অনেক খাতনামা সার্থিতাক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যেটস হেসকলিউ, আর্নেস্ট রীন, কুমারী সিনক্রেরার, এভেলিন আন্ডারহিল, কবার্ট স্ক্রিজেল, অ্যালিস গুমলি, এলবার পাউন্ড। যেটস স্বতঃপ্রযোজিত হয়ে কবির কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। এই সভাতেই কবির সঙ্গে বেভারেল্ড সি, এক, এনড্রুজের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। এর কয়েকদিন পরে ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ব্যাপকভাবে কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। এলবার পাউন্ড 'Poetry'-তে প্রথম রবীন্দ্রকবির আলোচনা করেন এবং গীতাঞ্জলির ছটি কবিতাও এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (ডিসেম্বর, ১৯১২)। তিনি লিখেছিলেন:

"The appearance of the

with Tagore,

from

এলবার পাউন্ড হাজার ইয়োয়েপের খাতনামা মনীষীরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গীতাঞ্জলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'টাইমস লিটারেচার স্যুপ্লিমেন্ট' (৭ নভেম্বর, ১৯১২), 'দি সেশান' (নভেম্বর, ১৯১২), 'নাইনটিস সেপ্টুয়রি' (এপ্রিল, ১৯১০), 'ডাবলিন রিভিউ' (অক্টোবর, ১৯১০) প্রকৃতি পত্রিকায় গীতাঞ্জলি সম্পর্কে বেশ সব আলোচনা হয়েছিল, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়মতী এভেলিন আন্ডারহিল 'দি সেশান' পত্রিকায় যে আলোচনা করেন (জানুয়ারি ইন্ডিয়ান মাস্টিক) তাতে রবীন্দ্রজানমের মিস্ট্রিসজয়ের উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। আর্নেস্ট রীজ 'নাইনটিস সেপ্টুয়রি' পত্রিকায় লিখেছিলেন:

"The songs of Gitanjali even in the English prose-rhythms are irresistibly impressive."

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় গীতাঞ্জলির আলোচনা করেছিলেন প্রখ্যাত সমালোচক লিসল আবারকম্বের। নিউ-ইয়র্কের 'ইভনিং পোস্ট' পত্রিকায় (২৪ মে, ১৯১০) ঔপন্যাসিক মে সিনক্রেরার গীতাঞ্জলির যে সমালোচনা করেছিলেন, তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এই রোডেনস্টাইনের গৃহে সেই স্মরণীয়

কথা উল্লেখ করেন—

In our modern literature that could compare with your songs.

এই সময় রবীন্দ্রনাথ হার্বার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। এখানে ছ' সপ্তাহে ছ'টি প্রবন্ধ পাঠিত হয়। পরে এই প্রবন্ধগুলি 'সাধনা' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এই বক্তৃতাগুলি সেখানকার বিদ্যামন্ডলের উপর কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন আর্নেস্ট রীজ তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা প্রসঙ্গে রীজ লিখেছেন:

"So unusual, so unlike any ordinary guest he looked, but so like my idea of an Hebrew prophet, that I felt almost afraid of him as he entered. But he proved to be the most gracious and natural of guests and the most easy to entertain."

বিদেশে রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রথম অধ্যায় গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর থেকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এক বছর কাল। এই সময়ে ভ্যালো-মন্ড নানাজাতীয় সমালোচনা হলেও সমালোচনার কেন্দ্র ছিল গীতাঞ্জলি। কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে ইয়োরোপে যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার মূলে কোনো কাব্যসমালোচনা বা শিল্প-বিচার ছিল না, ছিল রাজনৈতিক জগী মনোভাব। কারণ রবীন্দ্রনাথের নাম তখনো ইয়োরোপে সুপরিচিত নয়। তা ছাড়া যারা কবির কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তারা একমাত্র গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ ছাড়া আর কিছু পড়েন নি। সুইডিস অ্যাকাডেমি যখন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত এই প্রাচ্য কবিকে পুরস্কৃত করেন, তখন চারদিকে নানা প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠল। নোবেল পুরস্কার সমিতির কাছে সে বছর যে সমস্ত দিক-পাল সাহিত্যিক তাঁদের রচনা পাঠিয়ে-ছিলেন, তারা হলেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি, ফরাসী ঔপন্যাসিক আনা-তোল স্ত্রাস ও জার্মান ঔপন্যাসিক পি রোসেনগার। ইয়োরোপের এই সব খ্যাত-নামা সাহিত্যিকেরা পুরস্কৃত না হয়ে একজন স্বল্পপরিচিত প্রাচ্য কবি পুরস্কৃত হলেন, এই ক্ষোভে যেন গোটা ইয়োরোপ ফেটে পড়ল। একখানি জার্মান পত্রিকায় এই প্রতিবাদ এক নির্লজ্জ ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়েছিল। এই কাগজে লেখা হয়েছিল:

"The protest of all Euro-



১৯৩০ সালে অসলোডে সর্বপন্নী রাধাকৃষ্ণ, অধ্যাপক এন্ড পি জ্যাকস ও সি এফ এন্ড্রুজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ।

pean nations will be raised against Rabindranath Tagore."

কোনো কোনো পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কৃত করার মূলে কী গোপন অভি-সন্ধি থাকতে পারে, তাও আভাসে-ইগিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন। লন্ডনের 'ডেলি নিউজ অ্যান্ড লিডার' পত্রিকা পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পরই সুইডিস অ্যাকাডেমির রুচিবোধ ও রসবোধের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছিলেন:

"The Nobel committee is a conservative body, and the scepticism of Anatole France and the pessimism of Hardy are too unorthodox to find favour."

বলা বাহুল্য এই জাতীয় মন্তব্যের মধ্যে কাব্যবিচারের লেশমাত্র নেই, আছে সংকীর্ণচিত্ততা ও বিস্বেষপ্রসূত গাঢ়দাহ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জাপান ও আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে-ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ইয়োরোপে যে আত্মঘাতী সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কবি শোনালেন সাবধানী বাণী তাঁর 'ন্যাশানালিজম' সম্পর্কিত বক্তৃতামালায়। কবির এই বক্তৃতামালার মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। 'সানফ্রানসিসকো কল' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিরুদ্ধে তাঁর কটুক্তি বর্ণিত হয়েছিল। তাঁদের মতে, রবীন্দ্র-

নাথের এই দর্শন ভারতবর্ষকে এতটুকু এগিয়ে দেয় নি। এই দর্শন গ্রহণ করলে আমেরিকারও ভারতের মতোই দুরবস্থা হত। ভারতবর্ষ দুর্বল, তাই আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত তার কোনো পথ নেই, কিন্তু আমেরিকার জীবনদর্শন পৌরুষ ও দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'জস্ এঙ্গেলস এক্সপ্রেস' নামক পত্রিকার অর্থের বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সম্পর্কে তাঁর কটাক্ষ করা হয়েছে। তাঁদের বক্তৃতা হলো রবীন্দ্রনাথ যে বস্তুর নিন্দা করেছেন, এখানে এসে তাই পাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছেন। পত্রিকগুলির এই বিবোধগারের পিছনে আছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ধনগর্বিত আমেরিকা প্রাচ্য কবির জীবনদৃষ্টি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

১৯২০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খৃস্টাব্দ—এই দশ বছরের মধ্যে ইয়োরোপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ইয়োরোপে বিশেষত জার্মানিতে তিনি বিপুল সম্মানলাভ করেছিলেন। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের জার্মান পত্র-পত্রিকায় এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য ভ্রমণ সম্পর্কে একজন বিদেশী সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য:

"His Western journeys were real missionary expeditions, the result of which was

সত্যিক কবিতা

that the west came to admire and to love India ; for many, perhaps for most, Westerns India to-day is the country of Tagore."

বিদেশে রবীন্দ্র-সমালোচনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে ইংরেজি গীতাজলি প্রকাশের সমকালবর্তী অধ্যায়ে। বিদেশী রবীন্দ্র-সমালোচনার আশ্রয় ও মূল প্রকৃতি আলোচনা করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রপ্রতিভার সামগ্রিক রূপ আজো বিদেশীদের চোখে পড়ে নি। যারা বাংলা জানেন না, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী মূল বাংলাভাষায় পড়েন নি, তাঁদের ভালো-মন্দ বিচারের কতটুকু মূল্য, এ বিষয়ও ভেবে দেখতে হবে। বিদেশী সমালোচকদের একটি বিরাট অংশের ধারণা রবীন্দ্রনাথ গীতাজলির লেখক। আজ পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিদেশী পাঠকের এ সংস্কার কাটে নি। অবশ্য গীতাজলির কবিত্বত্ব অনুবাদ শিল্পসৌকর্যে ও ভাবগভীরতার অসামান্য। তবুও সকলেই স্বীকার করবেন, অনুবাদগ্রন্থ বহু অসামান্যই হোক না কেন, মূলের সূক্ষ্ম গীতিধর্মিতা ও ভাবগভীরতার পরিপূর্ণ আশ্বাদন পাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের রচনাসংগ্রহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'দি গার্ডেনার', 'দি ক্রিসেন্ট মুন', 'দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার', 'দি পোস্ট অফিস', 'ড্রুট গ্যানারিং', 'স্ট্রি বার্ডস', 'লাভার্স গিফট' প্রভৃতি রচনার কথা উল্লেখ করা যায়। 'দি গার্ডেনার' সংকলনটিতে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা নির্বাচন করে অনূদিত হয়েছে। কিন্তু মানসী, সোনার তরী, চিত্রাপবের ঐশ্বর্য-সম্বন্ধ উক্তর রোমান্টিক ভাবনের কবিতাগুলির অনুবাদ থেকে মূলের সামগ্রিক রস আশ্বাদন করা সম্ভব নয়—দুঃখ থেকে স্নেহপদার্থ তুলে নিলে দুঃখের কিছু আশ্বাদন থাকলেও সবটুকু যেমন পাওয়া যায় না, অনূদিত কবিতাগুলিও

তেমনি। 'ড্রুট গ্যানারিং' সংকলনটিতে 'কিছু ও কোমল' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত নানা বিচিত্র ধরনের কবিতার সমষ্টি। নির্বাচিত কবিতাগুলির বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই, কিন্তু এর থেকে কবিমানসের কোনো সুসংবদ্ধ ভ্রমপরিণতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। 'বলাকা'র কবিতাগুলি বিভিন্ন অনুবাদগ্রন্থে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে এই অসাধারণ কাব্যখানির উপর গুরুত্বের অবিচার করা হয়েছে। 'উবশী', 'শাজাহান' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলিকে অনুবাদের সময় এমন সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যে, বাঙালী পাঠকের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিস্ফুট বলে মনে হবে। অনুরূপ অভিযোগ গঙ্গাগঙ্গের বিরুদ্ধেও করা চলে।

বিদেশী সমালোচকের কাছে রবীন্দ্রমানসের যে মূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে, তা কবিপ্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ কি না, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। বিদেশী সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পেয়েছিলেন প্রাচ্যে অধ্যাত্মবাদ, সুগভীর ধর্মীয় অনুভূতি ও মিস্টিক চেতনা। কুমারী রায়ডকোডের গীতাজলি পড়ে মনে হয়েছিল বাইবেলের কয়েকটি অংশের কথা। কুমারী সিনক্রয়ার খৃস্টান মিস্টার্স-জমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তুলনা করেছেন। বিদেশী সমালোচকদের মধ্যে যারা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশের কাছেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রফেট'। কবির চেয়েও রবীন্দ্রনাথের নবীসত্তাই বিদেশী সমালোচকদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য এই জাতীয় মতবাদ রবীন্দ্রমানসের প্রতি সুবিচার নয়। তিনি যে সৌন্দর্যবাসিক কবি এই ধারণা নিশ্চয়ই অনূদিত গীতাজলির পাঠকদের কাছে পরিস্ফুট হয় নি। ফরাসী মনীষী রোমা রোলঁ সেই জন্য এক সময় দৃষ্টি করে তার 'জার্নাল'-এ লিখেছিলেন :

"People see in Tagore only the sage, the educationist, the prophet, and they will not see the Poet."

যারা বাংলা জানেন না, এমন বিদেশী পাঠকের কাছে আজো কবি রবীন্দ্রনাথের সত্যমূর্তি উদ্ভাসিত হয় নি।

বিদেশ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে-সব বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে অবিমিশ্র প্রশংসা ভীর ভাগ্যে জোটে নি, নিন্দার ভাগও সেখানে কম ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে প্রাচ্যের চিন্তাধারার এতই পার্থক্য যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা সেখানে রুচিকর হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ইয়োরোপ ভ্রমণের শেষ অধ্যায়ে তার সাহিত্য সম্পর্কে তেমন

উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা হয় নি, বেশির ভাগ আলোচনা হয়েছে তার রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে। গীতাজলি ইয়োরোপে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তা স্ফীত হয়ে এসেছিল।

যেকালে গীতাজলি ইয়োরোপে আলোড়ন তুলেছিল, সে যুগ যুদ্ধ-প্রস্তুতির যুগ। রণপ্রস্তুতির সেই আসন্ন দুর্যোগময় মুহূর্তে গীতাজলির নরসুন্দর মাধুর্য ইয়োরোপে নতুন বাণী নিয়ে এসেছিল, সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সুইডিস অ্যাকাডেমি সে যুগে যাদের সম্মানিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু মানসিক ঐক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের ঠিক আগে যে দু'জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তারা হলেন মেটারলিংক (১৯১১) ও হাউপটম্যান (১৯১২), রবীন্দ্রনাথের পরে পেলেন রোমা রোলঁ ১৯১৬ খৃস্টাব্দে। এর থেকেই নির্বাচকমণ্ডলীর প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক এক সময় ইয়োরোপে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে রুচির পরিবর্তন। পশ্চিমে আজ রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠ সংকুচিত হয়ে এসেছে। জনপ্রিয় লেখকদের পর্বারে রবীন্দ্রনাথ পড়েন না। রবীন্দ্রনাথ তো ইয়োরোপে অনুবাদক কবি, নিজের দেশে রোমা রোলঁর প্রভাব আজ নিম্প্রভ। মোরারীভায়া-সার্ভের পাঠক-গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে আর স্বাদ পান না। এমন কি স্বয়ং রোটস পর্যন্ত পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের উপর সুবিচার করতে পারেন নি। রবীন্দ্রসাহিত্যে অবাকর নেই, কুসিত প্লানিকে সর্বস্ব করে দেখানোর অপপ্রচেষ্টা নেই। তাই সাধারণ বিদেশী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ আজ শূন্য একটি নামমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। অবশ্য বিশেষজ্ঞদের কথা আলাদা।

বিদেশে রবীন্দ্রসাহিত্যের বখাষ মূলত নিশ্ণীত হয় নি—সে গীতাজলির কালও নয়, আর একালে তো নয়ই। পক্ষ বিশেষত প্রবন্ধ অনুবাদ করা সম্ভব, কিন্তু কবিতা, যা কবির বিশুদ্ধ আন্তরিক অনুভূতি, অনুবাদ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদে বখাষ-রূপ ফোটে নি, সংকলন গ্রন্থগুলিও প্রণালীবদ্ধ নয়। তার ফলে পশ্চিমে রবীন্দ্রপরিচয় আংশিক ও অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগ্যতর ও পূর্ণতর অনুবাদের প্রয়োজন আছে—যার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রবাণীর যথার্থ রূপ বিদেশে পৌঁছতে পারে। বাংলাভাষা যারা জানেন না, তাঁদের মূখে রবীন্দ্রসাহিত্যের নিন্দা বা প্রশংসা কোনোটিরই মূল্য নেই, এ কথা রুচ হলেও সত্য।

কিস্তিবন্দী হিসাবে ট্রানজিস্টার

মাসিক ৩০ টাকা কিস্তি হিসাবে অভ্যুদয়, প্রাস্টিক ক্যাবিনেটে ০ ব্যান্ড অল ওয়াগন্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার ক্রয় করুন। মূল্য ৩২০ টাকা।

আবেদন করুন :

Jagsons Agencies (WBC-88)
P.B. 1212, Delhi-6.

কিছদিন আগে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনে অনেক সহকর্মী অধ্যাপক বস-ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তোমরা কি পাও জানি না, আমি ও-সব ছবির মাথা-বুজু, কিছই বুঝি না। আমার অধ্যাপক-বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, তাঁর নিজস্ব বিষয়ে অধিকার সম্পর্কে আমার নিম্নস্বাস অটুট, কিন্তু তাঁরই মূখ থেকে রবীন্দ্রচিত্র সম্পর্কে যখন তাঁর বিরূপ উক্তি শুনিনি, তখন ভাবতে হয়।

একজন উচ্চশিক্ষিতের মুখে কেন এই বিরূপ উক্তি? আমার ধারণা, রবীন্দ্রচিত্র তিনি খুবই কম দেখেছেন এবং শ্বিতীয়ত, ছবি দেখার চোখ হয়তো তাঁর আদৌ তৈরিই হয় নি। ‘ছবি দেখার চোখ’ প্রদর্শনে আমার বন্ধুর পক্ষে ওকালতী করতে এসে কেউ হয়তো বলবেন, ‘আমাদের অজ্ঞতা দেখে ভালো লাগে, দা ভিগ্গির ছবি বা মিকেলান্জেলোর ডাস্কর্বে’ আমাদের আনন্দ দেখে, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছবি বা একালের আবদুস্তাই আর্ট যদি না বুঝি তাহলে আমাদের শিল্পদৃষ্টির অভাব প্রমাণিত হয় না।’ এ ধরনের যুক্তির বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য : অজ্ঞতা বা দা ভিগ্গির ছবি বা মিকেলান্জেলোর ডাস্কর্বের ভাষার সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচয় ঘটে গেছে, অতএব ও-সব শিল্পকর্ম আজ আমাদের বোধগম্য। তা ছাড়া তাদের দীর্ঘকালীন খ্যাতিও আমাদের মনকে আগে থেকেই তাদের প্রতি সহানুভূতি-সিক্ত করে রেখেছে। কিন্তু কোনরকম শিল্প-অভিজ্ঞতা নেই, এমন কোন লোককে যদি দা ভিগ্গির ছবি বা মিকেলান্জেলোর ডাস্কর্বের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে সে যে উক্তি করবে, সে-উক্তি বোধ হয় রবীন্দ্র-চিত্র-প্রদর্শনে আমার বন্ধুর উক্তির বিশেষ বরবর্তী হবে না।

অর্থাৎ মানুষের মূখের ভাষার মতো শিল্পেরও ভাষা আছে। শিল্পকে বুঝতে গেলে সে-ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। মূখের ভাষা ও শিল্পভাষার মধ্যে একটি মৌল পার্থক্য আছে : মূখের ভাষা ভৌগোলিক ভাবে সীমাবদ্ধ, শিল্পের ভাষা আন্তর্জাতিক।

এই জনাই ‘সামান্য একটা দেশলাইর যাত্রা’ আঁকতে পারেন না, তিনি আঁকছেন ছবি! ইত্যাকার মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশে উপস্থিত হন, ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিরুদ্ধে যুরোপের শিল্প-রসিক প্রদ্যাকের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘অনেক দিন ধরে আমরা যার জন্য চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি সেটা তুমি পেরেছ।’

সাহিত্যক্ষেত্রে স্বদেশী সমালোচকদের একটি অংশের বিরূপ মন্তব্যের অভিজ্ঞতার কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির

নির্যাকের গুহা, স্বপ্নের মাক

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রথম প্রদর্শনীর আরোজন করেন বিদেশে—প্যারিসে, ১৯৩০ সালে। কবির মনে হয়েছিল, তাঁর সমকদার রয়েছে বিদেশে। তাঁর নিজের উক্তি : ‘আমার এই শেষ কীর্তি’ এই দেশেই রেখে যাব।’

এ বছরেই প্যারিস ছাড়া যুরোপের কোপেনহেগেন বার্লিন ও মস্কোতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক ও বস্টনে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী হয়। এবং প্রতিটি প্রদর্শনীতেই সমালোচকরা ছবির মহত্ত্ব সম্পর্কে একমত হন। অর্থাৎ বৈশ্বিকভাবে রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিচার হলো, স্বীকৃত হলো রবীন্দ্রনাথের ছবি একজন কবির সৃষ্টি হিসাবে নয়, একজন মহৎ চিত্রকরের সৃষ্টি হিসাবে।

॥ দুই ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিকে বলেছেন, ‘ভার্সেস ইন লাইন’ বা ‘রেখার কাব্য’। দুটি কারণে এই বর্ণনা তাৎপর্যপূর্ণ : প্রথমত, রেখার জগৎ থেকে তাঁর চিত্রকলা উৎসারিত হয় এবং শ্বিতীয়ত, পরবর্তী-কালে রঙ এসে রেখার সঙ্গে মিললেও খুব কম ক্ষেত্রেই রঙ রেখাকে ছাপিয়ে গেছে, অর্থাৎ বর্ণসর্বস্ব ছবি কবি খুব কমই সৃষ্টি করেছেন। প্রদর্শনটি বিশদ করা যাক।

পান্ডুলিপিতে লেখা কাটকটি করতে গিয়ে কবি দেখেন, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই কাটকটিগুলি একটা-না-একটা দর্শনীয়



ছবি বা প্যাটনে পরিণত হয়েছে এবং এদের কতকগুলিকে সামান্য কারিকুরির মাধ্যমে ফুল পাখি বা চেনা-অচেনা জীব-জন্তুতে রূপান্তরিত করা যায়। ফলে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটির নকশা থেকে দর্শনগ্রাহ্য ছবির জন্মলাভে দেরি হলো না। সাধারণত ফাউন্টেন পেনে আঁকা একান্ত রোমান্টিজমের একরঙা এই ছবিগুলি যে পরবর্তীকালের বর্ণবহুল ছবিগুলির পূর্বসূরী বৃত্তে অসুবিধে হয় না। শুধু বর্ণস্বাক্ষর ছবিতেই বা বলি বেন, পরবর্তীকালের অনেক ছবিরই উল্লেখ করা যায়, রেখার সমন্বয়েই বেগুনি গড়ে উঠেছে। 'সে' (১৩৪৪) বইখানির ছবিগুলি দেখলে বোঝা যাবে, রবীন্দ্রচিহ্নে প্রোথিত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ১৯২৪-২৮-এর 'পূর্ববর্তী' পর্বের পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির মধ্যে ১৯৩৭-এর 'সে'র ছবির অস্বীয়তা অবিস্মরণীয়। জন্মসূত্রে এবং মৌলিক চরিত্রে রবীন্দ্র-চিত্র তাই কখনোই রেখার কাব্য, গতিময় রেখার-রেখার প্রাণবন্ত।

সন-তারিখের হিসাবে, মোটামুটি ১৯২৯ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পীর সংকলন নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন এবং ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চিত্রচর্চা অব্যাহত রাখেন। ছবির সংখ্যা দু' হাজার অতিক্রম করে যায় এই বারো বছরে। শোনা যায়, সাতষষ্ঠি বছরের বৃষ্টি প্রথম যখন ছবি আঁকতে শুরু করেন, তখন "বন্যার মতো তাঁর তুলির টানে বেরিয়ে আসত রূপের রেখা। চার পচিশানা ছবি তিনি দৈনিক শেষ করতেন; তবু যেন তাঁর তৃপ্তি হতো না। সৃষ্টির প্রেরণায় হাতের কাছে যা পেতেন—যেমন ভাঙা কলম বা পেনসিল, যা 'তা' কাগজের টুকরো—তাই দিয়েই হাত চলত। ভালো রঙের ধারণা থাকতেন না..."

মৈত্রেয়ী দেবীর 'মুগ্ধ'তে রবীন্দ্রনাথ থেকে জানা যায়, পাতলা রং শূন্যকোতে সময় লাগে বলে তিনি মোটা রং ব্যবহার করতেন। সৃষ্টির আবেগে তিনি আঁখির হয়ে পড়তেন আর বলতেন, "আমার কি অত ঝগড়া আছে যে, একবার রং দিয়ে একঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকব, যে কতক্ষণে শুকোবে।"

মহৎ শিল্পীর অবচেতন মনের বাসনার আত্মপ্রকাশ প্রচণ্ডভাৱে বিস্ময়কর। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তেমনই এক অবচেতন মনের সৃষ্টিশীল বাসনার আত্মপ্রকাশ, যার প্রচণ্ডতা গৃহে অনন্য সংখ্যায় অজস্র ছবির সমারোহে। 'পূর্ববর্তী' পর্বের 'সে'র সমস্ত তথ্য সমাহৃত হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, ঠাকুরবাড়িতে অন্যান্য বিদ্যার সপে

চিত্রকলা শেখবার ব্যাকুল ছিল (অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে', পৃঃ ১০৯)। 'জীবনস্মৃতি'র এক ভাগ্যগাতে (বিশেষ সংস্করণ ১৩৬৬; পৃঃ ১৪৭) চিত্রচর্চার উল্লেখ প্রসঙ্গে কবি বলছেন : "মনে গড়ে দু'পুরবেলা জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি-আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতোঁছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা।"

আলা কবির 'জীবনস্মৃতি'র সচেতন পাঠক প্রথম যৌক্তিক ছবির আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করার মধ্যে পরবর্তীকালের চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে চিনে নিতে পারবেন।

এর পর ১৯০০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা একটা চিঠি থেকে জানা যায় : "শুনে আশ্চর্য হবেন, একশানা স্কেচ-বুক নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছি।... কুণ্ঠিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ণ স্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না, সেইটার উপর অস্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো, তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে" ('চিঠিপত্র' ৬ পৃঃ ৮)।

শান্তিনিকেতনে কবির কিছু চিত্রচর্চার কথা সম্প্রতি জানা গেছে। এখানে তিনি পেনসিলে মানুষের মুখের অনুরূপ কিছু মুখোশ আঁকেন। সম্ভবত ১৯১৯ সালে 'আনন্দমেলা'র জন্যে আঁকেন একটি ক্যাকটাসের ছবি। তারপর ১৯২০ কিংবা ২১ সালে শান্তিনিকেতনে কোনো পরিবার প্রাচীরের এক কৌতুককর চিত্র-প্রতিযোগিতায় কবি স্বয়ং নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ এবং সি এফ এন্ড্রুজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। বিষয় ছিল মৃদাঙ্কুরিত দিয়ে আলপনার ডিজাইন। ('অমৃত' ১ম বর্ষ, ৫২শ সংখ্যা, পৃঃ ১০৫১)।

২. তিন

উপরের তথ্যগুলি থেকে মনে হয়, ছবি আঁকার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সুস্পষ্ট বা উচ্চকিত না হলেও বরাবরই ছিল। বলতে পারি, ছবি আঁকার ইচ্ছা অবচেতন থেকে চেতনে এসে একসময় তাঁকে নিয়মিত চিত্রচর্চায় নিয়োজিত করে। এই অবচেতন ইচ্ছার কথা ভোঁ নিজেই ১৮৯০ সালের একটি চিঠিতে বলেছিলেন : "লঙ্কার মাথা থেকে মাজা কথা বহি বলতে হয়, তবে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে, তার প্রতি আমি

সর্বদা হতাশ প্রণয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে থাকি; কিন্তু পাবার আশা নেই। সাধনা করার বরস চলে গেছে।"

তবু এক সময় ছবির ব্যাকরণ আয়ত্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের কাছে ছবি আঁকা শিখতে চেয়েছিলেন। নন্দলালের কাছে 'দরকার নেই' উত্তর শুনে তিনি নিরস্ত হয়েছিলেন, হয়তো বা খুশিই হয়েছিলেন। নন্দলাল শেখাতে রাজী হলেও রবীন্দ্রনাথ কতদিন শিখতেন সন্দেহ হয়, কারণ দুই-শিক্ষার দীর্ঘদিন ব্যাপ্ত থাকার ঐখ্য তাঁর ছিল না, বিশেষ করে যিনি নিজের ছবিতে তাদাতাড়ি শূন্যের বলে মোটা রং ব্যবহার করতেন।

প্রথাসিন্দু বীজিত ছাত্রসুলভ পদ্ধতির ছবি আঁকা শিখলে কি আমরা সেই রবীন্দ্রনাথকে পেতাম, যার ছবি দেখে রুয়েপের চিত্রশিল্পী ও শিল্পসমালোচকরা অবাক হয়ে বসেছিলেন, "আমরা অনেকদিন ধরে যার জন্য চেষ্টা করছি, কিন্তু পারি নি, তুমি তাই পেয়েছ", শুনতাম কি পল ভালেরির বিম্বণ উক্তি : "আপনার ছবি থেকে আমাদের শিল্পীরা শিক্ষা নেবে।"

অথচ কাকতালীয় এমনই, যে-রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বারবার রুয়েপীয় শিল্পের অনুকরণ থেকে নিবৃত্তি হবার উপদেশ দিয়েছিলেন (প্রাসঙ্গিক উক্তি : "শিল্পবিদ্যালয়ে আমাদেরকে অপভ্রাতা ইউরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়। তাহাতে হাত এবং মন বিলিতি ছবির ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহার আর কোনো উপায় থাকে না। সেই অভ্যস্ত পথ হইতে প্রত্যাবর্ত হইয়া দেশী চক্ৰ দিয়া দেশী চিত্র-বিষয়কে দেখা আমাদের পক্ষে কঠিন।"—'প্রাচীন সাহিত্য'; "আমাদের ছাত্ররা ইংলন্ডের বিদ্যালয়ের গিরে ছাপ-মারা হয়ে আসে, এ আমার কিছুতেই ভালো লাগে না।... আমার আর্ট রোডেন-স্টাইনের ধামাধরা না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তবে সে আর্ট মহাকালের কাঁটার তড়ানায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আস্তাকুঁড়েই স্থান পাবার যোগ্য।"—অসিতকুমার হালদারকে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে লেখা চিঠি থেকে, 'রবিতীর্থে', পৃঃ ১৪০), তিনি নিজে যখন চিত্র রচনা করতেন তখন তা প্রকাশভঙ্গিতে এবং মেজাজে হলো মৃদ্যত রুয়েপীয়।

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে তাঁর ছবিতে রুয়েপীয় চিত্রের সাধর্ম্য আনেন নি। তাঁর ছবিতে এ সাধর্ম্য এসেছে সহজভাবে, অনিবার্যতার সপে, স্বভাবতই যার উৎস তাঁর ব্যক্তিত্বে, অন্যভাবে মনোচিত্তনো। তাঁর ছবি দেখলে মনে হবে, ভারত-শিল্পের ঐতিহ্য

সাপ্তাহিক বসন্ত

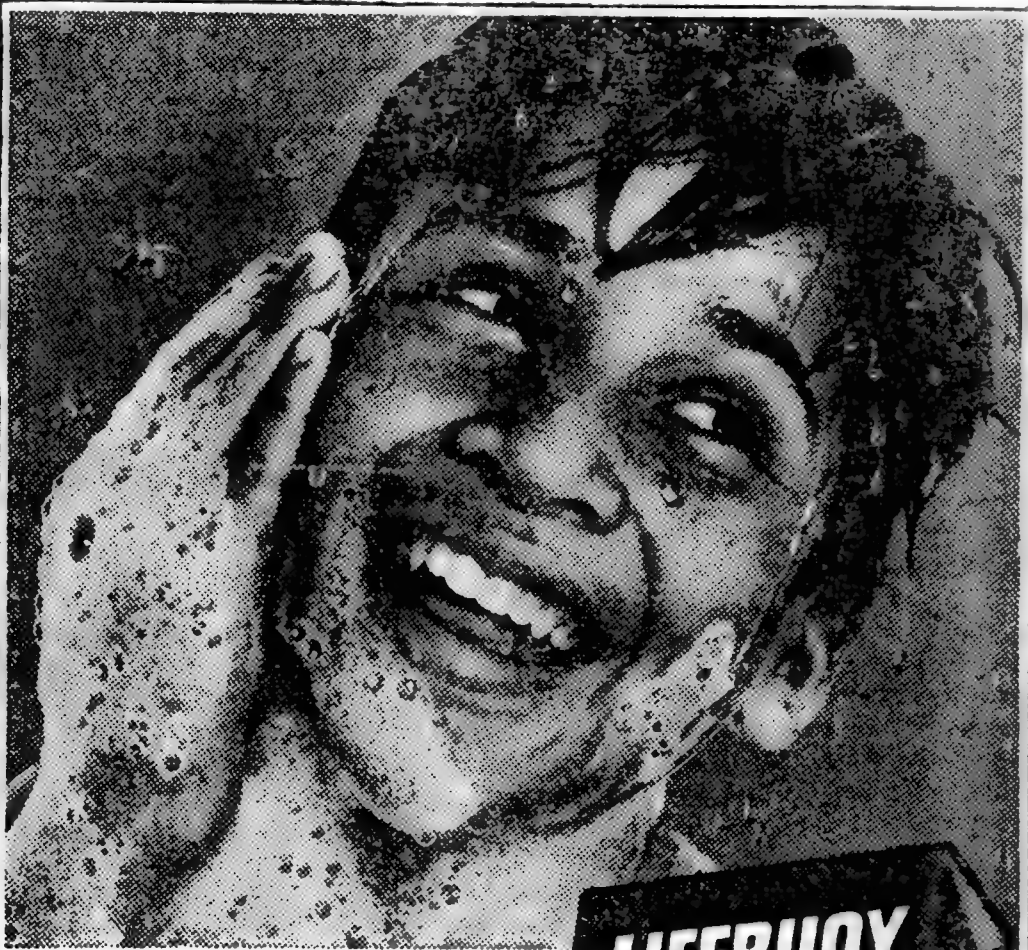
সঙ্গে তা সম্পর্কহীন। তাঁর ছবির সঙ্গে মোশ্‌ড প্রমুখ জার্মান একসপ্রেসনিষ্টদের এবং শাগাল ডাল প্রমুখ সুব্রিয়ালিস্টদের ছবির সাদৃশ্য মেলে। কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে যুরোপীয় চিত্ররীতি-প্রভাবিত বলা যায় না; এবং

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, চিত্ররাজ্যে রবীন্দ্রনাথ অনন্য শিল্পী, চিত্রশিল্পে বাঁধা-ধরা প্রণালীতে অশিক্ত স্বয়ংসিদ্ধ আন্বিতীয় মহাপুরুষ।

॥ চার ॥

সংখ্যায় দু' হাজারের উপর ছবি

এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। মান্দ্র, পুন্দ্র-পারি, গাছপালা প্রকৃতি চোখে-দেখা প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়েই তাঁর ছবি গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর কতকগুলি ছবির বিষয় নিত্যান্ত অবাস্তব, চোখে-দেখা এ বিশ্বের বাইরে যাদের অবস্থান। এই সব বিষয় কখনো



লাইফবয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে মান করলেই তাড়া স্ববস্ত্রে হবেন।

এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু

গুন তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে!

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাদু ধুয়ে দেয়

কখনো অন্যর স্বপ্নে দেখি, দেখে কখনো চমকে উঠি কখনো বা ভয় পাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় ছবিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তাকে তিনি 'নির্বাকের গৃহ' থেকে 'নিখিলের কাছাকাছি' নিয়ে এসেছেন। অন্যত্র তিনি তাঁর চিত্রসৃষ্টিকে 'স্বপ্নের কাঁক' বলে বর্ণনা করেছেন। অবাস্তব, আজগুবি বিষয় অবলম্বনে আঁকা ছবিগুলি যথার্থই 'নির্বাকের গৃহ'-নিঃসৃত, আত্মবিকার অর্থেই 'স্বপ্নের কাঁক'।

অবাস্তব বিষয় ছাড়া নিছক কল্পনানিষ্ঠ বিষয় নিয়ে যখন ছবি এঁকেছেন, তখনও কি বস্তুর 'বস্তুত্ব'-র আড়ালে 'নির্বাকের গৃহ' উঁকি মারে নি? বাঘ অকিতে গিয়ে বা আঁকলেন, তাকে বাঘ বলতে বাঘে, মহিষ অকিতে গিয়ে আঁকলেন মহিষ-সদৃশ জন্তু, কিন্তু বাস্তব মহিষ নয়। মানুষ আঁকলেন, নাক-মুখ-চোখ মিলিয়ে বাইরের চেহারায় খুঁত রয়ে গেল। মনে পড়ছে, একবার রাণী চন্দ্রের একটি প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে তিনি অনেকগুলি প্রতিকৃতি এঁকে ফেলেছিলেন, কিন্তু কোন প্রতিকৃতিতেই যখন চোখে-দেখা রাণী চন্দ্রের বাইরের চেহারা খুঁজে পেলেন না, তখন উপবিষ্টাকে বললেন, "আমার এই ছবিগুলির মধ্যে আমি যত বিচিত্রভাবে তোকে আঁকিয়ার করেছি, এমন আর কে করেছে?"

লেখায় যেমন, ছবিতেও মনই হচ্ছে মায়ক। চোখের দেখা নয়, দেখার চোখই শিল্পীর মূলধন। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' (৭।১৮) আছে, "মানুষ যখন মনন করে তখনই সে বিশেষরূপে বিজ্ঞান হয়—মনন না করলে জানতে পারে না। এই মননকেই বিশেষরূপে জানবার ইচ্ছা করা উচিত।" শেকের কবিতায় অমিতর মুখে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন "মন দিয়ে চেখে খাবার বাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত আমার একেবারেই নয়।" এই 'মন' দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন, তাই তিনি কখনো বাস্তবের সঙ্গে ছবির বিষয়কে আঁকিতভাবে মেলাবার কথা ভাবেন নি। তাই তাঁর ছবি বাস্তব হয়েও বস্তুবর্জিত, নন্দলালের ভাবায় রিয়াল উইদাওট বিয়িং রিইনালিস্টিক।

যেহেতু রবীন্দ্র-চিত্রে মানুষের প্রতিকৃতির (বিশেষত মূখের) প্রাধান্য লক্ষণীয়, রবীন্দ্র-চিত্রের অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে, সে সম্পর্কে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। অন্যদের প্রতিকৃতি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রতিকৃতিও এঁকেছেন, এবং এই আত্মপ্রতিকৃতিগুলি স্বভাবতই আকর্ষণীয়। 'চিত্রালিপি' (২)-তে বে-প্রোফিল আত্ম-প্রতিকৃতিটি দেখা যায়, তার নাক-চোখ-মুখ এবং মাথার সামনের অংশটুকু হচ্ছে লাল ও সামান্য সবুজ এবং সাদা

রঙের সহযোগে আঁকা; মূখের সামনের এবং পেছনের অংশ নানা রঙের মিশ্রণে কালো, অস্পষ্ট, রহস্যময়; কবির ডান চোখের (পাঠকের দিক থেকে বা চোখের) কিয়দংশের উপর সবুজ রঙের হালকা প্রলেপ; সমস্ত কম্পোজিশনের মধ্যবর্তী হলদে ও লালের সহযোগে উজ্জ্বল অংশ-টুকুই কবির মূখ, বলা বাহুল্য, মূখের পুরোটা নয়, সামনের ভাগটুকু। মূখের পেছনের এবং সামনের অর্থাৎ কণ্ঠের বাইরের অংশগুলি কালো করে দেওয়ার অর্থ কি? চোখই বা কেন নিস্কায়ত? কম্পোজিশনগত কারণ ছাড়া অন্য মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে নিশ্চয়ই। এই চিত্রের মধ্যে কোন সমসাময়িক কবিতার প্রতিকৃতি দেখা যায় কি? চিত্ররচনার তারিখ ২৪ এপ্রিল ১৯৩৬। এ তারিখে রচিত পদ্যপুটের 'তোরো' সংখ্যক কবিতার সঙ্গে এর কোন যোগ আছে কি?*

ব্যাকরণের দিক থেকে আলোচ্য প্রতিকৃতি হয়তো দুটিপূর্ণ (শব্দ-সংস্থান ইত্যাদি) কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে এই ছবি উল্লেখযোগ্য : রহস্যের আড়াল থেকে কৃষিপ্রতিম কবি আত্মপ্রকাশ করছেন কয়েক মূহূর্তের জন্য, অন্যতরিলম্বই হয়তো আবার দুর্লভ্য হবেন; চোখে তাঁর নয় দাড়া, রহস্যময় আভা। আমার হাতের কাছে আরেকটি আত্মপ্রতিকৃতি, রঙিন পেনসিলে করা। এই প্রতিকৃতিতেও হলদে ও সবুজের প্রতি পক্ষপাত। প্রায় পুরো জামি জুড়ে মূখের, বিস্তার, পশ্চাৎপট হলদে সবুজ কালো রঙের রেখার ঘন হওয়ার ফলে স্বল্পপরে মূখ বিশিষ্টভাবে ফুটে উঠেছে: আগের ছবির চোখের বৈশিষ্ট্য এতেও উপস্থিত।

মূখের ছবি কেমন হবে কবির আত্ম-প্রতিকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন সঙ্গত। বাইরের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিল থাকা কি দরকার? বলা বাহুল্য, দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথেরই ভাবার সাহায্যে বলতে হয়, মানুষের মূখে "শব্দ চোখে চেয়ে সরাসরি রাস দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা।" অর্থাৎ শিল্পীর হাতে ফুটে উঠবে মানুষের মূখের নয়, মনের চেহারা, আর সেই চেহারা, যাকে বলে 'কারেক্টার' যদি রবীন্দ্রনাথের

প্রতিকৃতিগুলিতে যতটা উঠি থাকে তাই হলেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ প্রতিকৃতি শিল্পী। এই উক্তির সমর্থনে আপাতত 'সে' বইটির উল্লেখ করা যার, যেখানে বিচিত্র মানুষ বিচিত্রতর মূর্তিগণিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের আজগুবি বিষয়ের সংখ্যাও অপ্রচুর নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'চিত্রালিপি' (২)-র ১১ সংখ্যক ছবি 'নির্মূখাবিশিষ্ট একটি অদ্ভুত পাখি যা বাস্তবে দেখা যায় না। 'কল্পিত জানোয়ার' 'আদিম সৃষ্টির আদর্শ' ইত্যাদি অসংখ্য ছবিতে উদ্ভট অদ্ভুত সব জীবন্ত ধরা পড়েছে, যাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ মেলে মনে কিংবা দৃশ্যবশে। এদের সম্বন্ধে এদের স্রষ্টার উক্তি :

"যখন ছবি আঁকতে শুরু করি, আমার একটা পরিবর্তন দেখলাম। দেখলাম গাছের ডালে, পাতার নানারকম অদ্ভুত জীবজন্তুর মূর্তি। আগে তা দেখি নি। আগে দেখেছি, বসন্ত এল, ডালে ডালে কুল কুটল—এই সব। এ একেবারে নতুন ধরনের দেখা। কিন্তু এই রিয়ালিস্টিক মূর্তি কে দেখালে? আর্ট দেখালে। সে বললে, এ অন্যকেও দেখাতে..."

এই সব অদ্ভুত জীবজন্তু বস্তুতই রবীন্দ্র-চিত্রের একটি বিশিষ্ট সম্পদ এবং চিত্ররাসিকের আকর্ষণস্থল। এ কথা অনেকেই জানা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য ছবির যেমন, এই সব ছবিরও বড় একটা নামকরণ করতেন না। অসিতকুমার হালদারের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে, অবনীন্দ্রনাথ এ ধরনের ছবিগুলির চমৎকার নাম দিয়েছিলেন : 'উঁচুচুলাকী', 'আরণ্যক', 'ভীষণডান্ডানারক' ইত্যাদি, কবির ছবিগুলির মতোই সব 'উদ্ভট' নাম 'রবিতীর্থে', পৃ. ১৪২।

II পাঠ II

আশ্চর্য লাগে ভাবতে, প্রচলিত অন্ধনপন্থতির সমস্ত অনুশীলন না করেও রবীন্দ্রনাথ যে-চিত্ররাজি উপহার

* রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাংশ তাঁর প্রতিকৃতি-চিত্রগুলির স্রষ্টা স্বরূপীয় : "কে জানে কার মূখের ছবি কোথায় থেকে ভেসে ঠেকল অন্যহুত, আমার ভুলির ডগায় এসে। সাইকোএনালিসিস যোগে ইহার পরিচর, গাঁজিতেরা জানেন স্পষ্ট, আমার জানা নয়।"

* প্রস্তুতমান একটি গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্র-চিত্রের এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংযোগ দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। পরিসর-স্বল্পতার কারণে খসড়াখানি এই নিবন্ধে রবীন্দ্র-চিত্রসংক্রান্ত গবেষণার একটি সম্ভাব্য পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক বসন্ত

দিয়ে গেছেন, চিত্রগদ্যশুদ্ধতার যা আমাদের বিস্ময়। সমস্ত প্রাকবর্ণিক চিত্র-বিচারিতিকে ছাপিয়ে স্রষ্টার মৌল মহত্ত্ব চিত্রগদ্যে পরিবর্ণিত। বোধ করি এই মহত্ত্বই আমাদের মতো চিত্রগদ্যের সঙ্গে পেশাদারী চিত্রকবদেরও স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছে। রবীন্দ্রচিত্র প্রসঙ্গে এই ধরনের দু'জন স্বনামধন্য ভাবতীয় চিত্র-শিল্পীর অভিমত উদ্ধার করা সঙ্গত হবে:

আচার্য নন্দলালের ভাষায়, “রবীন্দ্র-চিত্রের সর্বত্রই যে বিশেষ গুণাবলী দেদীপমান সে হল—ওজস্ব, প্রাণছন্দ এবং অলেখোচিত প্রমাণ বা পরিমাণ” (পদ্বিন-বিহারী সেন সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪)। রবীন্দ্রনাথের বর্ণলেন-নৈপুণ্য নন্দলালেরও প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর মতে, “রবীন্দ্রনাথের বর্ণরূচি এমন অদ্রান্ত আর এত বেশি পরিশীলিত যে, বর্ণসংগতিতে তাঁর কোথাও কোনো দুর্বলতা দেখা যায় না। বিভিন্ন পদ্যই দু'টি ঘোর রঙও তিনি গায়ে গায়ে ব্যবহার কবেছেন—গাঢ় নীল রঙের পাশে গাঢ়তর কালিমা। অথচ প্রযোগ-নৈপুণ্যের গুণে প্রত্যেকটিতে চিত্রবর্ণের স্তব্বিন্যাসকে স্পষ্ট করে তুলেছে বৈ একশা করে নি” (তদেব, পৃ. ৭)।

আচার্য বাগিনী রায় রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে বলেছেন: “রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তাব শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তাব মধ্যে বৃহৎ রূপবোধের যে আভাস পাই তার জন্য।... রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানব যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা এতখনি নৈতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানবটির ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোবেই, ছন্দগঠনেই” (১৯৬১ সালে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন প্রকাশিত ‘রবীন্দ্রস্মারক গ্রন্থ’)।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কোন কোন যুরোপীয় চিত্রকবের কাজের সাদৃশ্যের উল্লেখ কবেছি। কিন্তু এই সাদৃশ্য আপাত, গভীর নয় এবং এই সাদৃশ্যও মজাজে ও প্রসাদে। আরও বলেছি, চিত্ররাজ্যে রবীন্দ্রনাথ অনন্য। রবীন্দ্রনাথের এই অনন্যতা বিষয়বস্তু বা অঙ্কনশৈলীতেই। শৃঙ্খল নয়, বাহ্যিক অঙ্কনকৌশলেও। চিত্রাঙ্কনকালে রবীন্দ্রনাথের অধৈর্য বা আচ্ছন্ন মতো ছবি একে যাওয়ার ঘটনা সুপরিচিত।

য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পের তেল রঙে তিনি ছবি আঁকেন নি, ঘন জল-রং ছিল তাঁর প্রিয়। আর তাড়াতাড়ি শূন্যে যা ব'লে পেলিক্যানের রং ব্যবহার কবতেন। তুলি ব্যবহার কবেন নি বলা চলে। তুলির উষ্টোদিকের বাঁটটাকেই বরং কাজে লাগাতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলমের নিব আর কলমের উষ্টোদিকের বাঁট দিয়ে ছবি আঁকতেন, দরকার মতো রঙে ভেজানো জোয়ার প্রান্ত কস্মি বা তালুকেও বর্ণপ্রলেপনে কাজে লাগাতেন। বলা বাহুল্য, অঙ্কনপদ্ধতির এই ধরনের কলাকৌশল তাঁরই আবিষ্কার, এবং তাঁরই একান্ত নিজস্ব।

॥ ছফ ॥

এই সব বিচিত্র পদ্ধতিতে বিচিত্রতর

মানসিক অবস্থায় যে সমস্ত চিত্র রচিত হয়, সমালোচকগণের সেগুণী মূল্যায়ন। তেমন প্রাণবন্ত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অগ্রগতি বৈচিত্র্য দেখে মনে হতে পারে তেমন প্রাণবন্ত রিয়ালিস্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্রকো, শাণ্ডাং, তিঁড়ি, সে-অর্থে কি রবীন্দ্রনাথ একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথের চিত্রে বিষয়বস্তু ছিঁড়ি বসন্ত, আকতে বসন্তে না (প্রত্যেক চিত্রেই) ‘আমি কোনো কিংবা’ বসন্তে কখনো কখনো হয়তে বসন্তে ধারণা নিয়ে ছবি ও বসন্তে পর্বত অন্য একটা ছবি এত কখনো বা সেই ধারণাটাই বসন্তে

সামান্য পরিবর্তিত আবেগে



ছবি আঁকা-প্রক্রিয়ায় মধ্যে সুদূরিয়ালিস্ট-দের মনস্তাত্ত্বিক স্বয়ংক্রিয়তা লক্ষণীয়, কিন্তু যেহেতু তাঁর ছবিতে বিস্তৃত বিভিন্ন অংশের সংযোগ-পারস্পর্যে স্বেচ্ছাচল চিত্রের উপস্থিতি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সেই কারণেই তাঁর ছবি শেষ পর্যন্ত সুদূরিয়ালিজমের চরিত্রকে অতিক্রম করে যায়। কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্র-চিত্রকে 'মডার্ন প্রিমিটিভিস' বলতে চেয়েছেন। এক হিসাবে হয়তো 'প্রিমিটিভিস,' বিশেষত কবি যখন বলেছেন 'বিস্মৃত যুগে গৃহবাসীদের মন' তাঁর অবিচ্ছিন্ন ছিল, কিন্তু একটু ভাবলে দেখা যায়, তাঁর ছবি আদিম শিল্পীদের সৃষ্টির মতো রিপ্রেজেন্টেশনাল নয়, সুতরাং সেগুলি 'প্রিমিটিভিস' অভিধা-চিহ্নিত হতে পারে না। এবং 'মডার্ন প্রিমিটিভিস'ও (ইউরোপীয় শিল্পীদের কথা মনে রেখে) তারা হতে পারে না, কারণ ইউরোপীয় চিত্রকরদের প্রাচীন গৃহা-শিল্পে বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইত্যাশাপীড়িত মনের শান্তি ও সম্মানের মত কোন অস্থির চেষ্টা থেকে তারা সজ্ঞাত হয় নি।* রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে কেউ কেউ নোলড প্রমুখ জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টদের কাজের আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছেন। এই আত্মীয়তাও আপাত চোখের বিচার, কারণ এক্সপ্রেশনিস্টদের কাজে বস্তুকে কতটুকু ভেঙে যে-অবাস্তবতা সৃষ্টি করার প্রয়াস প্রকট, রবীন্দ্র-চিত্রে তা অনুপস্থিত, সেখানে 'বাস্তব অপেক্ষা আকারের আবেদন প্রধান। এ যেন কোন-একটা আকারকে তুবড়ে ভেঙে মানবীয় বা স্বাভাবিকের সংগার করে তোলায় চেষ্টা।'

৯ সাত ১১

অতএব রবীন্দ্রনাথের ছবিকে বিশিষ্ট-ভাবে কোন অভিধায় চিহ্নিত করা অসম্ভব এবং তা করতে গেলে অশ্লীল ইঙ্গিত-দর্শনের প্রাপ্তি অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সুদূরিয়ালিজম, এক্সপ্রেশনিজম,

প্রিমিটিভিজম প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রশৈলীর বৈশিষ্ট্য উপস্থিত, কিন্তু কোনটাই উচ্চ-কিত বা একান্তভাবে নয়। এ সমূহ সমালোচক মহলে নিজের কাব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জীবনানন্দ বা বলেছিলেন, রবীন্দ্র-চিত্র প্রসঙ্গেও তাই প্রযোজ্য: 'প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য।' অর্থাৎ



মতে আমি মায় দিতে অক্ষম। ১৯২৮-২৯ সাল থেকে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রকলার সোদর-সম্পর্ক আবিষ্কার মনোযোগী পাঠক ও দর্শকের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। এই সময়-পরি-ধিতে প্রকাশিত 'খাপছাড়া' (মাঘ, ১৩৪০), ও 'সে' (বৈশাখ, ১৩৪৪) এবং রবীন্দ্র কাব্যের চিত্র বা 'ইমেজ'গুলি অধ্যয়ন করলে রবীন্দ্র-মানসের চিত্রমুখিন-তাও যেমন স্পষ্ট হবে, তেমনি রবীন্দ্র-কাব্যে বহু ইমেজের সমান্তর রবীন্দ্র-চিত্রে আকস্মিক দৃষ্টিতে বিলসিত হয়ে উঠবে। রবীন্দ্র-চিত্র ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে কখনো কখনো একথাও শুনছি, ১৯৩০-এর পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তাটা দূর সম্পর্কের। এই অভিমতেও আমার আপত্তি, কারণ ১৯৩০-পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যে রুচিরূপ 'ইমেজ' বা 'অবচেতন-লোকের নিঃশব্দ প্ররোচনা'র দৃষ্টান্ত। সংখ্যায় অল্প হলেও অনুপস্থিত নয়। স্বীকার অন্যান্য অনেক দ্রাব্য মতের মত এসব দ্রাব্য ধারণার সৃষ্টির জন্যে কবি নিজেই মুখ্যত দায়ী, কারণ তিনি একবার বলেছিলেন, 'কবিতার রবীন্দ্রনাথ আর ছবির রবীন্দ্রনাথ এক নয়।'*

সারত, রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ প্রতিভাদের ক্ষেত্রে ঘটনামায়েই দু'দু'য়ে চার হ'য়ে দেখা দেয় না। তাঁদের সার্বিক ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁদের বিচার করা প্রয়োজন। রবীন্দ্র-নাথের ছবিকে বিচার করতে হবে তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে, বিচ্ছিন্ন করে নয়। তাঁর ছবি হ'য়ে-ওঠা পদার্থ, বানিয়ে-তোলা জিনিস নয়। ফুলের সঙ্গে মাটির সম্পর্কের মত রবীন্দ্র-চিত্রকলা রবীন্দ্র-প্রতিভার সমগ্রতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধসম্পন্ন।

(ছবিগুলি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রকাশিত)

* আচার্য নন্দলালও বলেছেন: "রূপ-কল্পনার অসংকৃত রুচিরূপ বোধে আর ভাবব্যক্তির দৃঢ়মনীয় ওজস্বীকৃতিতে রবীন্দ্র-চিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য আছে মনে হয় গৃহবাসী আদিম চিত্রকরের কাজের সঙ্গে। অথচ আন্তরিক কোন মিল নেই। এতে কোন ভুল নেই যে, এগুলি বর্তমান-দীপ্ত চিত্রবস্তুর অপূর্ব প্রকাশ" ('রবীন্দ্রকল', পৃ. ৭)।

রবীন্দ্র-চিত্রের 'সুদূরিয়ালিস্ট', 'এক্সপ্রেশনিস্ট' ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাখ্যার প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য, সমগ্র চিত্র-কর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে তারা গ্রহণীয় নয়। অনেকেই বলেন, ছবির রবীন্দ্রনাথ এবং চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং রবীন্দ্র-চিত্র-কলা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। এ ধরনের অভি-

* রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-চিত্রকলার সংযোগ-সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার অবকাশ আছে। প্রস্ততমান গ্রন্থে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ১৯৩০-এর পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যেও যেমন রবীন্দ্র-চিত্রের সমান্তর মেলে, ১৯৩০ সালের পরবর্তী রচনাতেও তেমনি সত্য ও সুন্দরের রূপদী এইবর্ষের বা তথাকথিত লালিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ

মোমেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্রনাথের মত উদ্ভূত প্রতিভা অধিকাংশ মানুষের বোধ ও বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দিয়ে চলে যায় প্রবল ভরগের মত এ কথা ইতিহাসের সাক্ষ্যে এক পরম সত্যে পরিণত। কখনো কখনো ভাব ফলে কোন কোন সমালোচকের প্রাচীন পুঁথিবন্ধ মনের কাছে তিনি দণ্ডনীয়, কখনো বা উপেক্ষার লঘুহাস্যে অভিযুক্ত, কখনো বা তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রুপের শ্লেষে জর্জরিত। তাঁর জীবৎকালেই দেখেছি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর নিজের সীমাবদ্ধ কাব্যসাম্রাজ্যের ক্ষমতায় রবীন্দ্র-বাকভাষার নবীনতায় বস গ্রহণে অক্ষম হয়ে যে সমালোচনা সুরু করেছিলেন তাতে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত বিবৃতিপত্রের ঝাঁক লাগলো, সুব তীর হতে তীরতব হতে লাগলো এবং একটা স্তরে তা উদ্ভূত ও শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করে গেলো। আজ আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই যে সমালোচনা বিপিনচন্দ্র পালের মত লোক রত তুচ্ছ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে হেয় কবাব চট্টা করেছেন। বিবেচনালব্ধের আদ্যাত্মিক পিঙ্গল ব্যক্তিগত অপছন্দেব সর্বটা প্রচ্ছন্ন নহে। এঁদের সকলেরই বচনায় একটা limited appreciation-এর ছাপ রয়েছে—যা এঁদের অন্যথা মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি সন্নিবিষ্ট করে নি।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে এই জাতীয় সমালোচনা কিছু হতে বাধ্য—কাবণ বৈদব্ধ্য না থাকলে প্রতিভার মল্যাবনোপযোগী নিবাসস্থি লাভ কবা যায় না সে দুরূহ তৎকালীন সমালোচকদের ছিল না। রবীন্দ্রপরিবর্তীকালে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় বিশ বছর পরে আবার কিছু কিছু বচনা দেখা গেল যোগ্যলিখে নিবাসস্থ সমালোচনার উদাহরণ বলে গ্রহণ কবাব বাধ্য আছে। এবার যথা সমালোচক তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন তিক্ততার বাধ্য পীড়িত নন। তাঁরা অনেকেই সাহিত্যবিচারের ভিত্তির মূল্যবোধ থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন। ফলে ব্যঙ্গবিদ্রুপের লঘু তারল্যে এ সমালোচনা চিহ্নিত নয় বরং কোথাও কোথাও অতি গাম্ভীর্য প্রকট হয়েছে—তাতে বিষয়বস্তু প্রকাশে সহায়তা

না করুক অন্তত নির্বিকার ওদাসীন্যেব সৃষ্টি করে নি।

বিপন্ন বোধ কবতে হয় যখন দেখি বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত প্রমুখ সমালোচকেরা তাদের আলোচনার মধ্যে এমন কথা বলে বসেন যা শব্দমাত্র নতুনত্বের আশ্বাদেই মুগ্ধরোচক। তাঁদের রচনা কোন অবস্থাতেই অশ্রদ্ধাজাত নয়, যদিও কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছু পিঠচাপড়ানো তারিফবাক্য আছে। জগদীশ ভট্টাচার্যের কাদম্বরী দেবী ঘটিত খাঁসিসটিতে কোন অবস্থাতেই কেউ বিরূপ সমালোচনা বলবেন না, তবে এখানেও বিশেষ ঘটনার প্রতি ঝোঁক দেবাব আত্মনিক প্রবণতা থেকে একদেশদর্শিতাব অভিযোগ উঠতেই পারে। তবু এঁদের কোন রচনাই সাহিত্য সমালোচনায় এস্ত্রিমার বহির্ভূত নয় যে অর্থে কিছু কিছু ‘প্রগতিবাদী’ বা ‘মার্কসবাদী’ লেখকের রবীন্দ্র গোণ্ডোলকব সমীকরণ চেষ্টা সাহিত্য এলাকা বহির্ভূত।

এলোমেলো ছড়ানো নানা বচনা থেকে দাঁটি বচনা বেছে নিয়ে এই আলোচনা সীমিত রাখতে চাই। একটি আলোচনা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা—Tagore as a lyric poet—প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সালের মে মাসে ‘কোবেস্ট’ পত্রিকায়। অন্যথা সন্নিবিষ্ট ও চিন্তা উদ্রেককারী এই প্রবন্ধটিব মধ্যে সুধীন দত্ত মহাশয় অকারণ কাদম্বরী তত্ত্বকে টেনে এনেছেন এবং বাস্তব সত্য প্রমাণের তিলমাত্র দাবি না নিয়ে যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি অসংলগ্নতা যে কোন পঠকেবই চোখে স্বতঃপ্রতিভাত হবে। অল্প বয়সের একলা কাটানো দিনগুলি তাঁকে কিয়দংশে অন্তর্মুখী করে তুলেছিল সে কথা নতুন কবে কারো প্রমাণ করার প্রয়োজন নহে। কাবণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন। সুধীন দত্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের এই নিঃসঙ্গতার সাক্ষ্য রাখছেন—

That in course of time he and the wife of his brother Jyotirindranath fell desperately in love with each

other did not mend matters at all; and when the family married him off prematurely to prevent scandal, had got worse and worse until his sister-in-law killed herself.

এই কথাগুলি যখন মনে পড়ে যে রবীন্দ্রনাথের লেখা—‘বিদ্যুৎ’-এ উল্লিখিত তথ্যপ্রমাণ সম্বন্ধিত বারংবার বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের দত্ত অনাস্রবে অশ্রুজলিত হয়ে বসে পড়তেন কিন্তু কখনো কোন ভাবসংক্রান্ত কথাই তাঁর মুখে না এতো সন্নিবিষ্ট ঘটনার প্রতি এ ইঙ্গিত। এই ঘটনাবলি কোন প্রমাণে প্রমাণিত হইল না, যেমন প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নি। কিন্তু যখন নিজেই কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে একটি desperate love-এর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং scandal এড়াবার জন্য তাঁর ভাবসংক্রান্ত বিষয়ে দিতে হলো। কিন্তু তারপরেও তিনি মাসে অবস্থা আরও খারাপ হলো তা পর্যন্ত না কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হলো। লেখার অস্বাভাবিক সবলতা দেখানো হয়।

রসরাজ

আত্মজীবনী রবীন্দ্রনাথ

১ম ভাগে—হৃদয়ঙ্গম, ১১ খানি, বড় টাকায়।

২য় ভাগে—খাসদখল, ১০০০ টাকায়।

৩য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

৪য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

৫য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

৬য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

৭য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

৮য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

৯য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

১০য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

১১য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

১২য় ভাগে—বিবাহ দিওয়ানা, ১০০০ টাকায়।

সাপ্তাহিক বসুদত্ত

হয়, লেখক যেন প্রাতি স্তরেই ঘটনাটির প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। যে কোন বিদেশী পাঠক এই ঘটনাকে নিতান্ত বাস্তব সত্য বলেই জানবে; তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না যে, এ কাহিনী লেখকের কল্পনা-প্রসূত—আর কোথাও তার আশ্রয় নেই। সুধীন দত্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি সম্মানিত নাম। তাঁর এই জাতীয় উত্তির প্রতিবাদ কেউ করেন নি। আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি—কারণ এ উক্তি চমকে দেবার চেষ্টা আছে, সেই পরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ নেই।

বুদ্ধদেব বসু শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফরাসী দেশের Two Cities নামক দোভাষী পত্রিকার Western influence on Tagore নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত

হয়। প্রবন্ধটির রচনা ১৯৬০ সালে কলকাতার বেতার ভাষণ উপলক্ষে। সেই প্রবন্ধের একটি ভাবানুবাদ (প্রকরণ) প্রকাশিত হলো বাংলায়। একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর তা বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে স্থান পায়।

মনের মধ্যে কিছু প্রমাণ করার তাগিদ আছে অথচ তার জন্য যথোচিত প্রমাণ সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা থাকলে যে জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করা যায় এই রচনাটি সেই জাতীয়। লেখক কয়েকটি জিনিস রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মন ইউরোপীয় উত্তমর্গদের প্রদত্ত উপকরণে গড়া, তিনি ‘নব্যভারতীয় জাতীয়তাবাদের মদুখপাত্র’, তাঁর রচনার মধ্যেও পশ্চিমপ্রাণীত খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় নি, যেহেতু ভারতের বর্তমান শৌখক ও উৎপাদকগণ সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী। এই প্রবন্ধের বাংলা ও ইংরেজি নামকরণে লেখক যে পার্থক্য রচনা করেছেন তার মধ্যে কিছু ফাঁকি আছে। ইংরেজী প্রবন্ধটিতে বোঝায় রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব। বাংলা নামকরণ হলো ‘রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী’—এতে প্রতীচীর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এমনও বোঝাতে পারে। যাই হোক লেখক তাঁর প্রবন্ধের গোড়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়িক মহলের ‘যান্ত্রিক অর্থে’ প্রভাব সম্বন্ধে কটাক্ষ করে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বলে ঘোষণা কবলেন—“রবীন্দ্রনাথের সেই ভূতলবর্তী মনোলোক, তাঁর কবিসত্তার যা ভিত্তিভূমি—আমি বলতে চাই তার বড়ো একটি অংশ য়ুরোপের অন্তর্ভূত।” আরও বললেন, “রবীন্দ্রনাথের সত্যকার উত্তমর্গ পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে কারা। এই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কথাটি এখনো আমাদের আবিস্কার সাপেক্ষ।”

সুতরাং এই আশা নিয়ে প্রবন্ধ পড়তে সুরু করি কবির ভূতলবর্তী মনোলোকের যথার্থ অবস্থান বা তাঁর ‘সত্যকার’ উত্তমর্গদের খবর জানা যাবে। লেখক প্রথমেই বললেন তথ্য কিছু নেই। তার জন্য অপবাস স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। কেন তিনি একটা সুনির্দিষ্ট তালিকা বেখে যান নি সারা জীবন তিনি কি কি পড়েছেন। তাঁর সমকালীন য়ুরোপীয় অগ্রজ ও অনুজ কবিদের তিনি উল্লেখই করেন নি। ১৮৮০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত য়ুরোপে যেখানে যেখানে যথার্থ স্মৃতি-শীলতা দেখা দিয়েছে সেখানেই রবীন্দ্রনাথ নীরব। লেখক সিদ্ধান্ত করলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রবণতা শুধু সম্প্রসারণের দিকে, পরিণতির সম্ভাবনা তাতে ছিল না। এ কথা যৌথ হয় যের নেওয়া যায়।

লেখক প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন—বললেন পশ্চিমপ্রাণীত রবীন্দ্রনাথের লেখার বেশি প্রকাশ পায় নি, তাঁর ভ্রমণলিপির পাতায় পাতায় পশ্চিমের প্রাতি সচেতন বিমুখতার প্রমাণ। তার থেকে লেখকের সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথ নব্যভারতীয় জাতীয়তাবাদের মদুখপাত্র। রোমান্টিকতার আদর্শে আকৃষ্ট অথচ জাতীয়তার মন্ত্রে স্বীকৃত, স্ববিরোধী ভাবের আলোড়নে মগ্ন রবীন্দ্রনাথ তাঁর য়ুরোপীয় সত্যকে যে সব কবিতায় প্রকাশ করেছেন সেগুলি ‘প্রত্যক্ষরূপে’ সরল। ফলে বুদ্ধদেব-বাবুর উত্তমর্গ সম্বন্ধে দায় রইলো না। য়ুরোপীয় রোমান্টিকতা এবং রবীন্দ্র-চিত্রকলায় য়ুরোপীয় এক্সপ্রেসিওনিস্টদের সাদৃশ্যের উল্লেখ করে বুদ্ধদেববাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়িক যান্ত্রিক প্রভাবের একটি ক্ষুদ্র তালিকা দিলেন। হাইনের সঙ্গে কণিকার সম্পর্ক ‘হযতো কাল্পনিক নয়’, চিরকুমার সভা ও শেষরক্ষার শৈল্পপীরীয় কৌশলের ব্যবহার, প্রভৃতি ‘সত্যকার উত্তমর্গ’ সম্বন্ধে করলেন। অবশেষে একটি ঘটনা না জেনেও তিনি নিশ্চিত হতে পারলেন না যে, যৌবনকালে কবি কিছুমাত্র ফরাসী পড়েন নি। হয়তো অনুবাদে, আকস্মিক বিজ্ঞমভাবে, হয়তো সংবাদপত্রের উদ্ধৃতিতে কিছু ফরাসী কাব্য পড়ে-ছিলেন। তাই ‘যান্ত্রিক’—প্রভাব-সম্বন্ধ-বিরোধী বুদ্ধদেববাবু বললেন যে, বোদলেয়ারের ভ্রমণ ও র্যাবোর মাতাল তরুণীস সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। এই কবিতা প্রতীচীর কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণের অবগুণ্ঠিত স্বীকৃতি।

পর্বতের মৃত্যিক প্রসবেব মত এই অসংলগ্ন, বিক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ প্রবন্ধের বাগাড়ম্বরিত সূচনার পর বহু ফরাসী কবির নামোদ্ধেখ করে লেখক বোঝালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের উত্তমর্গদেব নাম গোপন কবে গেছেন। তিনি নিতান্তই জাতীয়তাবাদী, পশ্চিম সম্পর্কে বিরক্ত (একটিমাত্র ব্যতিক্রমী রচনা বুদ্ধদেববাবু দেখেছেন) এবং পড়ুন বা না পড়ুন ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ কবিতায় বোদলেয়ার ও র্যাবোর কাছে ঋণী।

এ প্রবন্ধ শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রাতি অবিচার নয়, এ নিজের মতলবে গড়ে তোলা কতকগুলি পৌর্বাপর্যায়ীন ধারণার ছবি। লেখক জানতেন তিনি যা প্রমাণ করতে চান তার প্রমাণ তাঁর হাতে নেই। তাই বাকবাহুল্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঋণ প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন এমন কবিদের কাছে যাদের রবীন্দ্রনাথ আদৌ সেই কবিতা রচনাকালে পড়েছিলেন বলে মনে করা যাচ্ছে না।



উৎসবে,
মাস্ট্রলিক অনুষ্ঠানে...

“পুস্পিক মার্কা”

অগুরু

প্রাচীন কাল হইতে
পঞ্চমার্গে ও স্থানিতে
অতুলনীয় এসিক
হুগন্ধি অগুরু উৎসবে,
মাস্ট্রলিক অনুষ্ঠানে ও
নিত্য ব্যবহারে
ভারতের ঘরে ঘরে
ব্যবহৃত হইত।
হুগন্ধি হিসাবে আজও
ইহার সমাদর
অব্যাহত আছে।



বেঙ্গল

কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর



শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ডঃ ত্রিগুণা সেন

শিক্ষানীতি কিস্তি: রাজনীতি

বিগত সংখ্যায় আমরা আশংকা প্রকাশ করেছিলাম যে, রাজ্য মধ্যমন্ত্রী সম্মেলনের মত শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনও একটি বৈঠক-মাত্রে পর্যবসিত না হয়। আশা রেখেছিলাম, এই সম্মেলন কিছু ফলপ্রসূ হোক। অবশ্যই সেটা ছিল সাংবাদিক-ভিত্তিক। কেন না একথা আমরা জানি, নীতি নির্ধারণ যেখানে কূটনীতিরই হাসানুদাস, বৈঠকাদিতে অশ্বাভিষ প্রসবই সেখানে প্রত্যাশিত। বলা বাহুল্য, শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন একটা গোটা অশ্বাভিষ প্রসব না করলেও, ভাষা প্রশ্নে নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে বৈঠক একটি বিরটাকার শূন্যই লাভ করেছে। অতএব একটি নয়-সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে খোড়বাড়ি খাড়া এবং খোড়বাড়ি খোড় নিয়ে আবার কিছুদিন কূটকচালির সুযোগ এলো। সদস্য কমিটি গঠিত হল একটি সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত রচনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবানুসারে এই কমিটিতে থাকছেন, শশিচরণ, বিহার; মহারাজ, গুজরাট, অম্ব, মাদ্রাজ, দিল্লী, হরিয়ানা এবং মধ্য-প্রদেশের সদস্যবৃন্দ।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন সাক বলে দিয়েছেন, ভাষা সমস্যার ব্যাপারে বৈঠক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

নয়-সদস্য কমিটি এক মাসের মধ্যে একটি সর্ববাদীসম্মত কর্মনীতি নির্ধারণ করবেন এবং কমিটির সুপারিশ অঙ্গের পর বিবেচনা করে দেখবেন সংসদ সদস্য কমিটি ও প্রয়োজন হলে জুন মাস নাগাদ পুনরায় শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন থেকে প্রস্তাবগুলি বিবেচিত হবে।

কমিটি হরিয়ানার শিক্ষামন্ত্রী

শ্রীহরম্বারী লালের প্রস্তাবিত সূত্র ধরেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবেন।

হরম্বারী লাল সূত্র

১। যথাসীল একটি সাধারণ সংযোজক ভাষা গড়ে তোলা।

২। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

৩। হিন্দীভাষী অঞ্চলে দ্বিতীয় ভাষা হবে হয় ইংরেজি, নতুবা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষা।

৪। কিন্তু অহিন্দীভাষী অঞ্চলে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি হবে না, হবে কোন ভারতীয় ভাষা অথবা হিন্দী।

৫। তৃতীয় ভাষার শিক্ষা শুরু করা যেতে পারে দশম শ্রেণীর পর।

হিন্দীর গোবর জল

অর্থাৎ হিন্দীভাষী অঞ্চল দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি গ্রহণের যে সুযোগ আগেই পাচ্ছে, অহিন্দীভাষী অঞ্চল তা পেতে পারে দশম শ্রেণী পর্বন্ত পাঠ চুকিয়ে। অহিন্দীভাষী অঞ্চলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দীকে আবশ্যিক করা হয় নি। অন্যথা ভারতীয় ভাষার সঙ্গেই এচ্ছেক ভাষা হিসেবে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই দুর্বোধ্য। হিন্দীকে সংযোগরক্ষাকারী ভাষা (অর্থাৎ যাকে জাতীয় ভাষা বলা যায়) হিসেবে অহিন্দী অঞ্চলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, সোজা সত্য ভাষণে, হিন্দী-ওয়ালাদের ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের প্রবল ইচ্ছাটাই যেখানে সুস্পষ্ট এবং যে কারণেই ভাষা-সমস্যা এতাবৎকাল টাঙানো আছে, সেখানে হিন্দীকে আবশ্যিক না করার অর্থ একটা ওপর চালাকি ছাড়া আর কি

হতে পারে। হিন্দীই যদি সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে গৃহীত হয় (না হলে এক জাতি এক প্রাণ একতার এবং জাতীয় সম্প্রদায়ের গলায় দড়ি পড়বে বলেই যখন আমাদের ধারণা, তখন তা' পরিশেষে গৃহীত হবে); তাহলে এ' চোব মোদা সভ্যতাকে এমন করে ঢাক ঢাক করার প্রয়োজনটা কি। সংযোগরক্ষাকারী ভাষার চাপিয়ে-দেওয়ার মর্যাদা লাভ করলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ঐচ্ছিক হওয়া সত্ত্বেও সকলকেই আবশ্যিকভাবে হিন্দী-কেই গ্রহণ করতে হবে। হিন্দীওয়ালারা সেই সময় আন্তর্জাতিক সংযোগরক্ষাকারী ভাষা ইংরেজিতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে সরকারের Key পোস্টগুলি দখল করার ফলত্ব সুযোগ ভোগ করবেন। ব্যবস্থা চমৎকার এবং এটা হলেই জাতির মান-সম্মত প্রতিষ্ঠিত হ'ল বটে। ইংরেজিকে সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করলেই মহাভারত অশুদ্ধ, এমন ধারণা আর যাদেরই থাক শিক্ত হিন্দীওয়ালাদের থাকার কথাই নয়। কেন না এ'রা মায়ী ড্যাডি তো শিখেই-ছেন। বর্তমানে শব্দ বচনই নয়, আচার-আচরণে এবং সাজে-পোষাকেও এদের ন্যাশনালিজমে ইংরেজি কেতার কোথাও বা কটর মার্কিনী খাচ্ছেই অবাধে গড়ে উঠছে। ভাষা নিয়ে জাতীয়তা সম্পর্কে এই উগ্র সচেতনতা সূত্ররং কোন জাতীয়তাবাদী আকৃতি নয়, কূটনৈতিক চাল। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার এক অতি লালসাসিক প্রয়াস। ভাষাটা এক চাবড়া গোবর নয় যে যত পাপ আর অনাচার সেই গোবর জল খুইয়ে দেওয়া যাবে। জাতীয়তাবাদের আর কোন দিকে হৃদয়ের টান থাক বা না থাক উল্লিখিত উপায়ে ভাষার সাম্রাজ্য স্থাপন করার জন্য ভাষার টান হিন্দীওয়ালাদের ফেঁপিয়ে

তুলেছে। শিবাভাষাই হোক আর দ্বিভাষাই হোক, হিন্দীওরাল উভয় ক্ষেত্রেই এ সাম্রাজ্যবাদী পথ ধরে এগোতে চান। শিবাভাষী হলে রাখো হিন্দী, দ্বিভাষী হলেও রাখো হিন্দী। তোমরা আমার ভাষাটা শেখো, আমরা ইংরেজিটা রপ্ত করি ততক্ষণ। হিন্দী ভাষার গোবর জলে ধুয়ে ড্যাড ম্যামীর দল একা সংহতি জাতীয় চেতনা ইত্যাদিকে পুত এবং পবিত্র করার সুযোগ লাভ করুন। এই অপূর্ব সুযোগটার জন্যই স্বাধীনতা, জাতীয়তা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর অস্তিত্ব।

সম্মেলনের প্রাপ্তি

আপাতত শিক্ষা সম্মেলনে যেটা সব-থেকে বড় লাভ হয়েছে সেটি হ'ল, আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষার স্বীকৃতি, প্রাথমিক স্তরের থেকে স্নাতক স্তরের পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তবে সংসদ সদস্যরা এই ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের জন্য মাত্র পাঁচ বছরের সময় দিয়েছেন যাকে এদেশে যথেষ্ট বলে গণ্য করা যায় না। আমাদের দেশ কম্পনা এবং পরিকল্পনার দেশ। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে এদেশের উৎসাহের তেজ এমন নয় যে চিন্তামাত্র এখানে কেউ কাজে বাগিয়ে পড়বেন। মন্ত্রী মহোদয়রাও সেই অসুবিধার কথা ভেবেছেন। তাঁরাও পাঁচ বছর সময় যথেষ্ট বলে মনে করেন না। তবে পাঁচ বছরে কাজ কিছু পরিমাণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এমন বিশ্বাসও তাঁরা উড়িয়ে দেন নি। স্নাতকপূর্ব পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে হ্রস্ত প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাবে এ পঞ্চবার্ষিক কালের মধ্যেই।

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের উদাহরণস্বরূপ আমাদের পার্বত্য জেলার অধিবাসীরা, বাদির (শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি) জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার বিষয়েও সুপারিশ রাখা হয়েছে।

শিক্ষা পরিচালনাগত ব্যয় বিষয়ক কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা এবং শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে শিক্ষকদের বেতনাদির প্রশ্নেরও আশু মীমাংসার প্রস্তাব আছে। শেষোক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ চাওয়া হয়েছে ৮০ : ২০ হারে।

শিক্ষা স্তর

শিক্ষণ পর্যায়ের পর্যায়ভেদ ব্যবস্থার আবার ক্ষেত্রে গড়ন করতে হবে। অর্থাৎ আগে যেমন ইন্টার-মিডিয়েট কোর্স (দু' বছরের) চালু ছিল পনেরায় সেই

ব্যবস্থা গ্রহণের স্বপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা স্তরের নতুন গঠনপদ্ধতি হবে : দশ বছরের মাধ্যমিক পর্যায়, দু' বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় এবং তিন বছরের স্নাতক পর্যায়। স্নাতক পর্যায় ছিল দু'বছরের কোর্স। ভবিষ্যতে তা এক বছর বাড়ানো হচ্ছে।

নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা প্রবর্তন বিষয়ক শিক্ষা কমিশন সুপারিশ অনুসারে আগামী বছর থেকেই কাজ শুরু করতে হবে বলে স্থির হয়েছে।

এন সি সি ও জাতীয় সেবা বাহিনীর মধ্যে ছাত্রদের একটিকে বেছে নিতে হবে।

অগ্রাধিকার

শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাগ্রাধিকার পাচ্ছে : শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার প্রয়োগ। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেই বৃত্তিগত বিভিন্ন শিক্ষার সুযোগ। পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগার গঠন। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শ্রব-কল্যাণ শিবির গঠন। সকল ছাত্রের জন্যই বিজ্ঞানকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূতকরণ।

শিক্ষক-কল্যাণ বিষয়ক সুপারিশ

শিক্ষকদের মর্যাদা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বৈঠকে শিক্ষা কমিশনের নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি গৃহীত হয় :

(এক) উপদেষ্টা সংস্থারূপে যৌথ শিক্ষক পরিষদ নিয়োগ; (দুই) শিক্ষকদের শিক্ষা সম্পর্কে রাজ্য বোর্ড গঠন; (তিন) শিক্ষকদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক রাজ্য পরিকল্পনা রচনা; (চার) ট্রেনিং শিক্ষারতনগুলির উন্নয়ন।

টাকার জন্যই ভালো কাজ আটকায় আমাদের উপ-প্রধানমন্ত্রীর হাতে অর্থ ভান্ডার। ভান্ডারীরূপে তিনি সম্মেলনে যতটা উপদেশ দিয়েছেন সাহায্যের আশ্বাস ততটুকু মেনে নি তার কাজ থেকে। উপ-প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী বলেছেন টাকার জন্য ভালো কাজ আটকায় না। অর্থাৎ টাকা কেন্দ্র ছাড়ুক না ছাড়ুক, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অতীক্ট সিদ্ধ হবে বলে শব্দক ব্যাক্যপহার দিয়েছেন তিনি, যাকে অপব্যাখ্যা করলে অন্যায়সেই বিদ্‌প বলা যায় : তবে অতখানি বলতে চাই না। একটি প্রশ্ন, ক্ষমতার অধিকারী ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্ন চেপে গিয়ে উপদেশ বর্ষণ করলে, ব্যাপারটিকে কোন আভিযানিক শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা যেতে পারে তা পাঠককুলই বিচার করবেন। শিক্ষা

সম্মেলনের প্রতিটি সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আর সেটাই প্রথম প্রশ্ন। অর্থমন্ত্রী আড়াল দিয়ে নাকিরে ফিরতে চান। এমন হাতটান অবস্থায় কোন সুপারিশই কার্যকরী হতে পারে না। আসল চাবিকাঠি অর্থমন্ত্রীর হাতে।

শিক্ষা মেয়ে অফিসের পোষণের নজর এদেশেই অভ্যস্ত। সম্প্রতি প্রকাশ, দিল্লী প্রশাসনের এডিরারভুক্ত শিক্ষাদপ্তরের বাজেটে বরাদ্দ অর্থের শতকরা দশ ভাগ মাত্র বিয়াল্লিশ জন উচ্চ পদাধিকারী অফিসের পোষণ করতেই ব্যয় হয়। এ শব্দ দিল্লী শিক্ষাদপ্তরের ছবিই নয়, দেশের সর্বত্রই টপ-হেভী প্রশাসনের একই চেহারা। জাতীয় সম্পদের ওপর ট্যাক্স চাপিয়ে টাকা ছেঁকে তুলে তার দ্বারা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভোগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার উন্নয়নসাথে অর্থ বরাদ্দের প্রশ্ন উঠলেই হাহাকার আর কৌণ্ডার পাথ মূখব্যাধনের দ্বারা হতাশা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ওপর দেশবাসীর অগাধ আস্থা। তিনি সহজে ছাড়বার পাচও নন। অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা তিনি করবেনই। কিন্তু সে পথে যদি বাধ সাধা হয়, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন, তিনি যেন জনগণের দৃষ্টি উজ্জ্বলিতরূপে অপচয়ের প্রতি আকর্ষণ করে জনমত গঠনের পথ করে দেন। আমরা জানি, মন্ত্রীর তোয়াজা ডং চিগুণা সেন করেন না। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যও তাই তিনি শেষ নুড়িটিও উজ্জ্বল দেখবেন।

ভাষা প্রশ্ন ভাষা ভাষা

ভাষা প্রশ্নে হিন্দীওরাল জিদ এই প্রশ্ন মীমাংসার সব থেকে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'ভাষা না তেভাষা এর ম্লেও সেই হিন্দীর দ্বারা প্রশ্নটি নিয়ে সূত্রায় যে পরিমাণ রাজনীতি হচ্ছে, শিক্ষানীতি নির্ধারণে তা আদৌ বাস্তবীয় ছি না—মন্ত্রীমহোদয় এই প্রশ্নেই আটকে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী হিন্দীকেই একমাত্র সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে গণ্য করতে উৎসুক। শ্রীমতী গান্ধী জাতীয় সংহতির ভিত্তিতে ভাষা প্রশ্নের মীমাংসা চান। কিন্তু এমন আলতো ছোঁরায় প্রয়োজনীয় ঘি ওঠে না। পাকশালায় তাই রন্ধনের তেড়-জোড়ে ইস্তফা দিতেই হয়। হিন্দীওরালরা হৃদয়ের চেয়ে জোরটাই মুখ্য করেছে।

আসলে জাতীয় সংহতি কতটুকো ভাষাকাণ্ডকে অবলম্বন করেই দাঁড়িয়ে আছে কি না বিচার হওয়া উচিত সর্বো

সেই প্রশ্নই। ভারতে বিশেষত দক্ষিণ ভারতে হিন্দী ইংরেজির মতই Foreign. অন্যান্য অহিন্দী অঞ্চলেও 'খায়গা' খায়গার অধিক হিন্দীর সংগে আমাদের পরিচিত নেই। অর্থাৎ সেখানেও হিন্দী Foreign. দেশের একটি মন্টিমের সংখ্যক লোকের মাতৃভাষাই হিন্দী। এমন হিন্দীকেই সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে গণ্য না করলে জাতীয় সংহতির বারটা বেজে যাবে এহেন মনগড়া যুক্তি আর কতকাল সহ্য করা যেতে পারে। যদি জাতীয় ভাষার প্রশ্ন হয়, তবে সংবিধানে স্বীকৃত প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষাকেই জাতীয় ভাষারূপে গণ্য করা যায়। একটি বিশেষ ভাষাকেই ভারতের সবটুকু উচ্চারিত ভাষা বলে গণ্য করতে হলে সে ভাষা এমন হওয়া উচিত যা সকল ভারতবাসীর কাছেই সমান সুযোগ-সুবিধার বাহক। কিন্তু হিন্দীর বেলায় তা হয় না। হিন্দী মন্টিমেরের মাতৃভাষা এবং সেই সুবাদে হিন্দীভাষীদের অপরাপর ভাষা-মোড়ার নাগরিকের ওপর বিশেষ সুবিধাদানের প্রশ্নটাই রাজনীতির পাঁচো মাজা দিচ্ছে। এতে জাতীয় সংহতির মূলে ভাঙনই করতে পারে, সংহতি গড়ে ওঠে না। আর সংহতি জিনিসটা কেবলমাত্র ভাষা, বিশেষত একটি বিশিষ্ট ভারতীয় ভাষা ভিন্ন চিহ্নে থাকে এমন যুক্তিও অসমর্থ। বহুভাষী ভারতে একটি-মাত্র সংযোগরক্ষাকারী ভাষা নিয়েই প্রশ্ন। প্রশ্নটা আদৌ জাতীয় সংহতির নয়। ইংরেজি সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে এতোদিন চলে আসছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংহতিসাধনে তাতে এতোটুকু অসুবিধা দেখা দেয় নি। জাতীয় আন্দোলন করেছে আমরা এ LINK LANGUAGE-কে অবলম্বন করেই। নেতাদের বক্তৃতাও শুনেছি ইংরেজিতে। ক্রমে ইংরেজিই আমাদের কাছে অনেক সহজবোধ্য ভাষা এবং আপন হয়ে উঠেছে। ভারতের ভাষাগুলি ইংরেজির কাছে পেরেছেও অনেক। সংযোগরক্ষাকারী ভাষারূপে ইংরেজিকেই ধরে রাখলে, রাজনীতির এবং হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধিতে বাস সাধতে পারে কিন্তু জাতীয় সংহতি বা জাতীয় ঐক্যবোধ তা এতোটুকু অসীলোপন করে এমন কথা স্বীকার নয়। অথচ একমাত্র ইংরেজিই ভারতের সব অঞ্চলেই সমান সুযোগ-সুবিধা দান করতে পারে। সুতরাং ইংরেজিকেই সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে বজায় রাখলে এই ফলতু সমস্যার হাত থেকে শতবারিচ্ছিন্ন দেশবাসী রক্ষা পেতে পারত।

ইংরেজির সম্পর্কে আরও একটি বড় যুক্তি এই যে আন্তর্জাতিক জগতজগতের

ভাষারন হিসেবে ইংরেজি আজ সবটুকু স্বীকৃত ভাষা। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে পৃথিবী রোজনই Space-এর প্রশ্নে আমাদের কাছে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে সংহত করার জন্যও বন্ধপরিকর। বিভিন্ন দেশের মানুষকে একই সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে যদি সংহত করার সম্ভাবনার মধ্যে আজকের পৃথিবী সত্য আবিষ্কার করতে পারে, একটা সামান্য ভাষার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ গোড়ামি, স্টেটিস্ট ও অভিসন্ধিকে প্রপ্রয় দানের অবসর আকারে শিক্ষিত দুনিয়া কি করে মেনে নেয়। সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে গ্রহণ করা হলে ভারতীয়রা লোপ পায় না, কোনদিন পায় নি। ইংরেজিকে গ্রহণ করে আমরা দেখেছি আমাদের দেশীয় ভাষার গ্রীষ্ম সাধনই হয়েছে এবং তন্দরাত্তা ভারতের কোন অংশ অংশের থেকে অধিকতর সুবিধাভোগের অনুশীলিত সুযোগও লাভ করে নি। আন্তর্জাতিক কুম্ভলের সঙ্গে যোগসাধনেও আমাদের সুবিধা বৈ অসুবিধা সৃষ্টি হয় নি। এতোগুলি সুবিধা সত্ত্বেও হিন্দীওয়ালাদের হাতে আমাদের ভাগ্যকে অর্থাৎ অহিন্দী-ভাষীদের ভাগ্যকে দল বেঁধে তুলে দিতে হবেই এমন বারনা অর্থোক্তিক এবং তার মধ্যে বিশেষ জাতীয় চেতনার সুবুদ্ধিও জিরাশীল নয়। আচারে ব্যবহারে চলে চলছে পশ্চিমী হয়ে যাওয়াটা লক্ষ্য নয়, যত আপত্তি ইংরেজি ভাষাকে রাখলে এমন অভিসন্ধিমূলক আচরণ কাজে কাজেই দেশব্যাপী প্রভূত সন্দেহের উদ্রেক করেছে। উপ-প্রধানমন্ত্রী মশায়ের আচরণ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। তিনি প্রিভাটসেক্টরের পক্ষপাতী, কিন্তু প্রিভাটসেক্টরও মানতে পারেন এক মতে, তা হল হিন্দীকেই দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষারূপে গণ্য করতে হবে। হিন্দী বারনা ও বারনাক্স ঠিক এইভাবেই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের আকার ধরে সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে, যে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও সাবধানতার প্রয়োজন।

হিন্দী সম্পর্কে মতবিরোধ

শিক্ষার কোন একটি পর্যায়ে হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক না করলে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও একটি দক্ষিণী রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের সময় ও তার পরে তাদের বেসরকারী আলোচনার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন।

হিন্দীভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে বিহার ও হরিয়ানা সংসদীয় কমিটির বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। বিহারে হিন্দী ভাষা

আবশ্যিক হোক বা না হোক, ইংরেজি ভাষা তুলে দেবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মন্ত্রীম্বর প্রিভাটসেক্টর সমর্থন করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন এবং মাত্র একাদশ শ্রেণী থেকে হিন্দী ভাষার পঠন আরম্ভের প্রস্তাব করেন।

দিল্লীর মুখ্য প্রশাসন কার্ডিসলার বিহারের মন্ত্রীর মতানুসারে অবিলম্বে ইংরেজি তুলে দেবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আসামের শিক্ষামন্ত্রীর ভিন্ন মত। তিনি বলেন, শীঘ্রই পার্বত্য এলাকার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে এবং এই অঞ্চল ইংরেজি মাধ্যম গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সংযোগরক্ষী ভাষার প্রশ্নকে আরও পাঁচ বছর চেপে রাখার পক্ষপাতী। তিনি নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষা প্রশ্নে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ হিন্দীর বিরোধী নয়। তবে হিন্দীকে যেভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাও অসংগত।

হিন্দী ভাষার সংগে পশ্চিমবঙ্গবাসীর বিরোধের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এটা বলই বাহুল্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যে হিন্দী ভাষার সাম্রাজ্যবাদী অগ্রগতিককে মেনে নিতে নারাজ তা ভাষা প্রশ্নে বহু বিতর্কে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ অনেক ক্ষেত্রেই একটি গৌড়ামুখ্য দেশ। ভাষা নিয়ে স্টেটিস্ট-মেন্ট স্ট্রিটের ন্যাকারজনক রাজনীতিকে তাই এ রাজ্য একটা দুর্ভিক্ষসিদ্ধ ছাড়া অন্য কিছুই ভাবে না। হিন্দী না হলেই জাতীয়তা শিকের উঠল এমন বাতুল ধারণা পশ্চিমবঙ্গবাসীর নেই। কতিপয় দ্বাতন্ত্রের শ্রেণীর লোক ব্যক্তিগত অধিকার থেকে হস্ত হিন্দীর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী তাকেও অভিসন্ধিমূলক এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত একদশী ধারণাপ্রসূত বলেই ব্যাখ্যা করছেন ও করেছেন। যদি পাবলিক স্টেটিস্টের কথা ধরতে হয়, তবে হিন্দীকেই সংযোগরক্ষী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র আপত্তি আছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রদেশের সম্পর্কে। শিক্ষামন্ত্রী যদি হিন্দীবিরোধী বলতে হিন্দী ভাষাকে জাতীয় ভাষা, কিম্বা ছৎমার্গ বজায় রেখে চললে, সংযোগরক্ষী ভাষারূপে গণ্য করে থাকেন, তবে বলতে হবে পশ্চিমবঙ্গবাসী আদৌ হিন্দীর পক্ষে নয়। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী-উদ্ভাদনাকেও যেমন গ্রহণ করে নি, ইংরেজি

ইতিপূর্বে প্রস্তাবকে তেমন গুরুত্ব দিতে পারেননি। কিন্তু হিন্দী প্রাতি বিরূপতাই কি এর যথেষ্ট প্রমাণ নয়। শিক্ষার মাধ্যমরূপে পশ্চিম-বঙ্গবাসী অবশ্যই মাতৃভাষা প্রবর্তনের জন্য এমন কি রাজ্য সরকারী ভাষারূপে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা দান করার জন্য আবেদন জানিয়ে আসছেন। কিন্তু ইংরেজির স্থানে হিন্দীকে গ্রহণ করার জন্য কারও মনে এতোটুকু সাড়া নেই।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, অনেক জায়গায় হিন্দী শিক্ষার আগ্রহই হিন্দীর প্রতি সমর্থনকে প্রমাণ করে। কিন্তু এছাড়া আরো পশ্চিমবঙ্গবাসী যারা হিন্দীর প্রতি গ্রহণ করেছেন, তারা তা আগ্রহের আভিপ্রায় করেন নি। করেছেন চাকরির জগতের কিছু সুযোগ-সুবিধার আশায়। বেকার দেশে এমন প্রলোভন খুঁজি স্বাভাবিক। যদিও হিন্দী শিক্ষার দ্বারা চাকরির বাজারে সুবিধাজাতের মতো অবস্থা এখনো আসে নি। কিছু কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে উন্নতির সোপান অবশ্য হিন্দী জ্ঞানের দ্বারা বিচার্য। এই অবস্থাটা একটা প্রত্যক ও পরোক্ষ চাপেরই পরিচায়ক হিন্দী-প্রাতির নয়। অন্যান্য অহিন্দীভাষী অঞ্চলেও, অধিনের ধারণা একই মনোভাব অংশ গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী সেজন্যই বোধহয় ইংরেজি এবং মাতৃভাষা শিক্ষাকেই আবশ্যিক করতে চেয়েছেন। মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন হিন্দীকে ঐচ্ছিক ভাষার মধ্যেই গণ্য করা উচিত। অন্য মহাশয়ের কেরালাও ইংরেজিকে আবশ্যিক ভাষা হিসেবে বজায় রাখার পক্ষপাতী। তারা ত্রিভাষাসূত্রের সমর্থক। দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রেও হিন্দীকে তারা দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসেবে রাখতে চান না।

কিন্তু প্রধানত বারাই ত্রিভাষাসূত্রের স্বাধীন ধরে আছেন তাঁদের আসল লক্ষ্য হিন্দী চাপানো। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সোমাদ সদস্য কমিটি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ত্রিভাষাসূত্র প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। ত্রিভাষাসূত্রে হিন্দীর দাপট অবশ্যীকৃত। এই সূত্র মাতৃ-ভাষার সঙ্গে হিন্দী বা ইংরেজিকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে রাখা করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু বহু ব্যঙ্গাঙ্গ্য বহু বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত শিক্ষা কমিশন যে সরকারের একটা বক্তৃতাধর্মী কাল্পনিক মাত্র তা কে জানত। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করা

হল না। তাই নিয়ে রাজনীতি এইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দীওয়ালারা হিন্দী চাপাবেনই। অহিন্দীভাষীদের গা' কাড়া দিয়ে এই জবরদস্তি ফেলে দিতে হবে, অন্যথা অহিন্দীভাষী অঞ্চলের সম্ভাবিতবর্গ (এমনিতেই হিন্দী প্রাধান্য সহ্য করে আসতে হচ্ছে) অশেষ দুঃখিতর শিকার হবে। অহিন্দীভাষীদের বলতে হবে, আমরা ছোটো স্টেটমেন্টের দ্বারা আপনাপন ভবিষ্যৎকে ঝড়কুটোর মত ভাসিয়ে দিতে পারি না। ইংরেজি ভাষাটা সব'গুণে স্বাভাবিকতাই তো কট্টেই, তাই হিসেবেও সহজে শিক্ষণীয়। শতাব্দী-ব্যাপী এই ভাষার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। হিন্দী সে হিসেবে আমাদের কাছে Foreign-তোমরা বত হিন্দী চাপাবে তাই প্রশ্নের মীমাংসা ততই সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠবে। তবে এই প্রশ্নকে কোন রকম আশ্বাস দিয়ে আর টাণ্ডিয়ে রাখা যায় না। হিন্দীকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে এই দুর্য্যভিসম্বন্ধে ইতি করতে হবে। না হলে অহিন্দীভাষীর ভবিষ্যৎ আপন হাতে অহিন্দীভাষীরাই ভবিষ্যৎ করে দেবেন। দেশের কোটি কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়েও রাজনীতি-ওয়ালাদের এই ভাষা নিয়ে খেলার অবসান ঘটতে হয়। কতকগুলি স্বার্থের উদ্দেশ্যেই হলে হতে পারে না রাজ্যের ছাত্র-সমাজ এবং আগামী অহিন্দীভাষী ভারত। ভাষাকে কেন্দ্র করেই স্বাধীনতা দেশে সংহতি হননে উদ্যত হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার দরকার দেশের ঐক্য এবং সংহতির প্রমেনই হিন্দীর আকার পরিভাষ্য করতে হবে।

মনে রাখতে হবে বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা কমিশনও একই কথা বলেছেন। ভাষা প্রশ্ন সম্বন্ধে তাদের মন্তব্য: রাজনৈতিক কারণেই ত্রিভাষাসূত্রকে গ্রহণ করা ইচ্ছিক। শিক্ষার প্রশ্নটা সেখানে একটা চোখে ধুলো দেওয়ার উপায় মাত্র।

শিক্ষা নিয়ে রাজনীতির এই লোম্বা খেলার অবসান যথাসম্ভব হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দেশের কিসকালে ভাষা নিয়ে যে তীব্র আন্দোলন হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি না করে হিন্দীওয়ালারা হিন্দী চাপানোর চেষ্টার কাল্পিত মিন এবং কথার শিক্ষা সংস্কার (সংস্কার নয়) প্রচেষ্টায় সহ মনো-ভাক নিয়ে এগিয়ে আসুন দেশের যশস্বী জনগণেরা এটাই একমাত্র কাম্য।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চতুর্থ নির্বাচনের পর সম্পূর্ণ পাক্টে যাওয়ার এই প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে গেল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তির লড়াইয়ের মাধ্যমে।

ইতিপূর্বে নির্বাচনের বা জগদীশ্বরকে হিসেবে এককর্ত্ত আবিপত্য ভোগ করতে কংগ্রেস।

সিমান্ত পরিবর্তন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রসঙ্গে ডি এম কে বিরোধী পক্ষের সূচক রূপে ও অধ্যাপক হাবিবকে সরাসরি সমর্থন জানিয়ে দলের সিমান্তে অনিশ্চিততার আবহাওয়ার অবস্থান ঘোষণা করেন।

ইসমরুল কবীরকে কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করে ডি এম কে সিমান্ত কাটল করে জানান, ডি এম কে হুসেনকেই সমর্থন করার পূর্বে সিমান্ত পরিবর্তন করে রকের সদস্যদের ইচ্ছামত স্টেটমেন্টের অধিকার নেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কংগ্রেস গ্রুপও সুদ্বা রাওকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থনের সিমান্ত ঘোষণা করেছিলেন।

পড়ে থাকলেন শূদ্র

আর এস পি এবং এস ইউ সি দল। এ'রা একটা অজুহাত তুলে পরোক্ষ কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনেই অংশ গ্রহণ করলেন। সুদ্বা রাওকে যেহেতু স্বতন্ত্র দলের নায়ক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দল সমর্থন জানিয়েছেন, অতি প্রত্যাশিতরা তাই পরোক্ষ সমর্থন জানানোর কংগ্রেস প্রার্থীকে। এই দুই দল অস্তিত্বের এহেন প্রত্যাশিত-পন্থার বিন্দিত হয়েছেন অনেক। খুঁজিয়ে নাক দেখানোটা যেমন কৌশলই হোক বাস্তব চোখ আছে, নাক তাঁরা ঠিকই দেখে নেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই দুই দলের ভূমিকাও আসলে কোন পক্ষ বেঁচে চলেছে, সাধ-রূপের কাছে তাও আর চাপা থাকল না। অবশ্য এই দুই দলের নগণ্য প্রতিরোধ একটা প্রকান্ড কোন সরকার আকার ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না, এটাই সত্য। (৬।৬।৬৭)

নরজেন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিজ্ঞানসুন্দর গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয়-পাঠ টোল

বঙ্গবন্ধু গ্রাইভেট সিস্টেম

১৯৬৬, নির্মাণকারী নন্দলাল শীল, কলকাতা-১৬



মাও সে-তুঙ ও লিন পিয়াও

ব্রিটেন :

। রাজনীতিতে যেমন রাতারাতি মতের পরিবর্তন ঘটে অমন আর কোথাও না। সরকারের বাইরে থাকলে বিরোধীরা ভূমিকায় যে কাজ বা নীতিয় সমালোচনায় একদিন নেতারা মধ্যে রক্ত তুলেছেন, গদি পেয়ে তাদেরই আবার সেই ঘণিত ও সমালোচিত নীতিকে আঁকড়ে ধরতে দেখা যায়। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী উইলসনকেই দেখুন না। মাত্র চার বছর আগেও তিনি প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন তিনি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কমন মার্কেটে যোগ দিতে চেয়েছিলেন বলে। আর সেই উইলসন সাহেব আজ নিজে কী করছেন? কমন মার্কেটে প্রবেশাধিকার লাভের জন্যে তিনি কি আজ যে কোনো ঋণ নিতেই প্রস্তুত হন নি?

ব্রিটেন আবার কমন মার্কেটের সদস্যপদ লাভের চেষ্টা করছে। ১৯৬০ সালে রক্ষণশীল সরকার প্রথম এ-চেষ্টা করেছিলেন, শ্রমিক দল সেদিন তার বিরোধিতা করেছিলেন। ব্রিটেনের মনস্কামনা সেদিন পূর্ণ হয় নি, শ্রমিক দলের বিরোধিতার জন্যে নয়, প্রধানত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলের আপত্তির কারণে। কিন্তু আজ সেই শ্রমিক দলই সরকার গঠনের পর ডিগবাজী খেলেন। রক্ষণশীল দল অবশ্য বাধা দিচ্ছেন না, বাধা এসেছে শ্রমিক দলেরই বাম-ঘেঁষা রাজনীতিকদের মধ্য থেকে। ইতিমধ্যে নির্বাচনের পর ফ্রান্সে

দ্য গলের শক্তি ও প্রতিপত্তি বেশ খানিকটা ঘা খেয়েছে। কাজেই ব্রিটেনকে যদি এবার কমন মার্কেটে অভ্যর্থনা জানানো হয় তবে তাতে বিস্ময়ের বিশেষ কিছু থাকবে না।

স্বতন্ত্র বিশ্ববন্দুখে যখন ইয়োরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়, তখন নিত্যন্ত বাঁচার তাগিদে ১৯৫৭ সালে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, লাক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস ইত্যাদি ছ'টি দেশ নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পন্ন করে, রোম চুক্তি যার নাম,



উইলসন

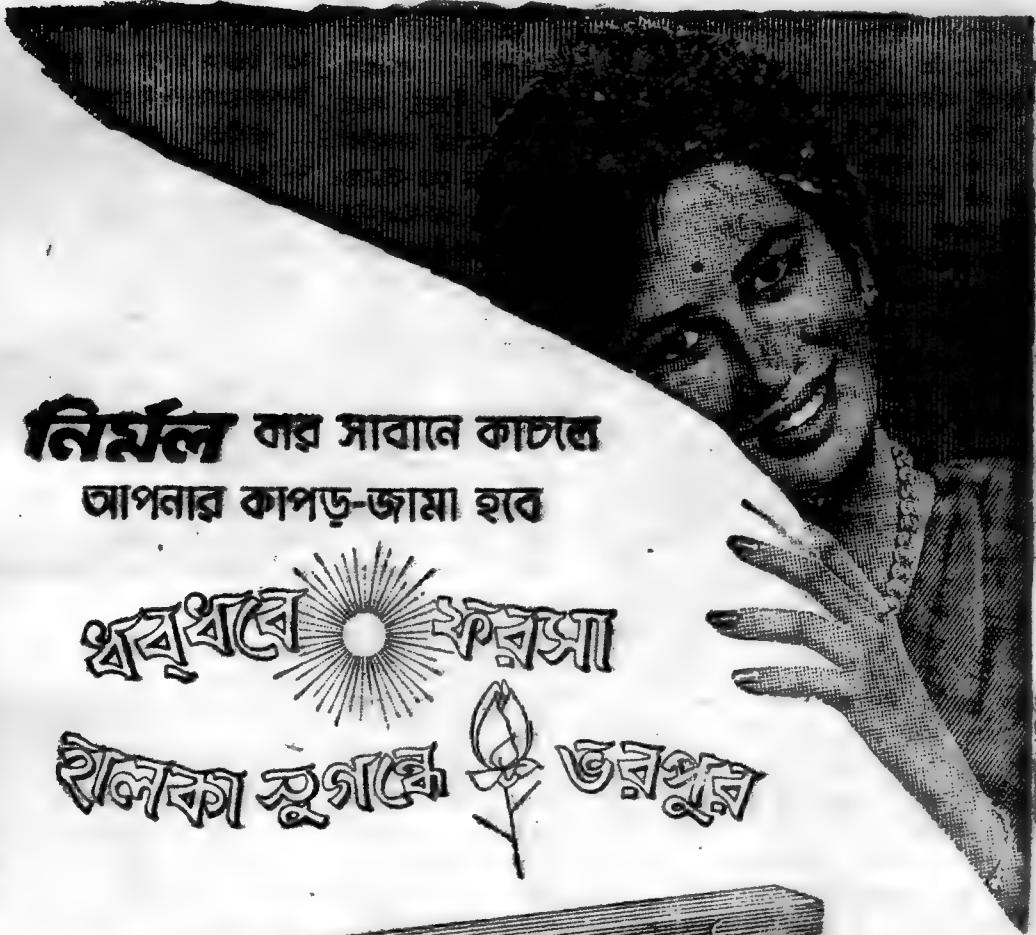
এবং ইয়োরোপীয় কমন মার্কেট নাম পরিণাম। চুক্তির ফলে ওই দেশগুলি পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রপ্তানীগত বহু সুযোগ-সুবিধে পরস্পরকে দিতে স্বীকৃত হয়। স্বতন্ত্র বিশ্ববন্দুখের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বা শিল্প উৎপাদনের দিক দিয়ে বিরাট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো তাতে ইয়োরোপের এই দেশগুলি খুবই উদ্ভিগ্ন বোধ করছিলো। সোভিয়েট আক্রমণ রোধ করতে হলে পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলিকে একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক সংস্থায়ও সামিল হতে হবে রোম চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির মনে এই ধারণাই ছিলো।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ থাকার জন্যে ব্রিটেন সেদিন কমন মার্কেটের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। বরং সে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি পশ্চিম ইয়োরোপের আর ছ'টা দেশকে নিয়ে ইয়োরোপীয়ান ফ্রী ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন বা 'ফ্রিটা' গঠন করলো। তাছাড়া কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলি তো তার সহায় ছিলোই। কিন্তু যখন দেখা গেলো যে কমন মার্কেটভুক্ত দেশগুলি বেশ দ্রাব্য ঘর গড়িয়ে নিচ্ছে, তাদের জাতীয় আয় বেড়ে যাচ্ছে অথচ মার্কিন চাপে পড়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে প্রায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তখন কমন মার্কেটে ঢোকানোর জন্যে সে ফিকির খুঁজতে লাগলো।

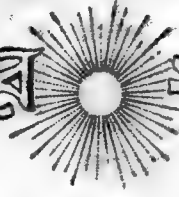
শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসার পর আজ নানা কারণে ব্রিটিশ অর্থনীতির সংকট আরো গভীর হয়েছে। তার বাহিরাগিজে ঘাটতির বোকা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, অথচ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি বন্ধ ইত্যাদি কয়েকটি পন্থা নেবার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান স্তম্ভ। বিশ্বের বাজারে স্টার্লিং-এর মান ক্রমবর্ধনের মুখে। আমেরিকার অর্থনৈতিক চাপে ব্রিটেন আজ দিশেহারা। এ-অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী উইলসন একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, কমনওয়েলথ-এর স্বার্থ দেখার মতো ফুরসৎ তিনি যেন আর পাচ্ছেন না। তা ছাড়া এতদিন 'এফটা'র যে সদস্য রাষ্ট্ররা কমন মার্কেটে ঢোকানোর পথে ব্রিটেনকে বাধা দিয়েছিলো তারাও যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। ব্রিটেন একবার মার্কেটে ঢুকে পড়তে পারলেই তাদের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে, সুড় সুড় করে তারাও একে একে ঢুকে পড়বে—এই তাদের আশা।

কিন্তু এবার বাধা এসেছে থোদ শ্রমিক দল থেকেই। মাইকেল ফুট, ইম্যানুয়েল শিনওয়েল, টম ড্রাইবার্জ প্রমুখ ৭৪ জন শ্রমিক এম-পি একটা যুক্ত-বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, যে সোভিয়েট-ভীতির কারণে একদিন রোম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো সে-ভীতি আর নেই, কাজেই কমন

কলিকাতা



নির্মল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে

শ্রব্ধে  শ্রী
হালকা সুগন্ধে  উরপুর



নির্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-
জামা দেখতে ককরকে পরিষ্কার হয়, আর
লত খোঁকার স্বগন্ধে ভরে উঠে।

নির্মল বার সাবানে চটপট সেবার কেনা হয় আর সেই
কেনার জেনকালি ও খুসোখুসো জড়বড় বেরিয়ে যায়।
আপনার কাপড়-জামা স্বকরকে তকতকে সেবার, নত
যোগে সেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে।

নির্মল দিয়ে কাচলে পরসারও সাফল্য হয়। জের বেশী কিন
যলে—সাবানটি শক থাকে, তাড়াতাড়ি করে যায় না।

নির্মল

পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে

সুখম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

SWTAN 300

মার্কিটের সদস্যপদ ভিকার কোন প্রদানই
করে না। তাছাড়া কমন মার্কিটে ঢুকলে
কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির প্রতি বিশ্বাস-
ঘাতকতাই করা হবে।

কমনওয়েলথ-এর মধ্যে ভারতবর্ষ,
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইতিমধ্যে
ব্রিটেনের কমন মার্কিটের সদস্যপদ
প্রার্থনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ
জানিয়েছে। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে
ব্রিটেনের অবশ্যই অধিকার আছে স্বাধীন-
ভাবে কাজ করার, সিদ্ধান্ত নেবার।
কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব বলেও তো একটা
কথা আছে। এই উন্নয়নশীল দেশগুলি
যে এর ফলে প্রচণ্ড শুল্কগত বাধার
সম্মুখীন হবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই। এ-অবস্থার ভারতকেও যে তার
পথ বেছে নিতে হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ
নাই। এর পরেও কমনওয়েলথ-এ থাকার
মার্ককতা কোথায় তাও ভেবে দেখা
চলবে। আজ যখন অর্থনৈতিক সহ-
যোগিতাই সবচেয়ে বড় দরকার, তখন
সামরিক জোটের মত অর্থনৈতিক জোট
সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয়ের বাঁজ
বপন করবে না?

চীন:

কমতার লড়াই এখানে এখনো
অব্যাহত রয়েছে, বরং ক্রমশ তীব্রতর
হচ্ছে। প্রবল কমতার অধিকারী হয়েও
অর্থাৎ বিপুল সেনাবাহিনীর সমর্থন
পেয়েও এবং লালরক্ষীদের পাশে পেয়েও
মাও সে-তুঙ যেন রাষ্ট্রপ্রধান লিউ সাও-
চি'র বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারছেন না।
বরং সাংহাই এবং চীনের পারমাণবিক
অস্ত্রাগার অঞ্চলে দুই দলে লড়াই সমানে
চলেছে।

এই দীর্ঘকালব্যাপী লড়ায়ে
একথাটিই প্রমাণ হচ্ছে যে, লিউ সাও-
চি'র ভক্ত ও অনুরক্তের সংখ্যা এখানে কম
নাই। তাঁর পেছনে লালরক্ষী নেই বটে,
কিন্তু সেনাবাহিনীর একাংশে যে তাঁর
প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে তার বহু প্রমাণ
পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ সেনাবাহিনী
আজ একটি অবিচ্ছেদ্য সংস্থা হয়ে লিউ

সাও-চি'র বিরুদ্ধে লড়াই করছে না।
লিউ'র বিরুদ্ধে প্রচারের অবশ্য কাল্পিত
নাই, এবং স্বয়ং মাও এবার সেই প্রচার-
যুদ্ধে নেমেছেন। এক সভার মাও
অভিযোগ করেছেন যে, লিউ'র কিম্ব-
বিত্যাত গ্রন্থ, যা কমিউনিস্ট দুনিয়ার
এতদিন মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের পরে
গ্রন্থা অর্জন করে এসেছে—সেটি নাকি
শোষণবাদী বুদ্ধোন্নয়নের একখানা
ক্লাসিক গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।
নেতা ও গুরু যেখানে আসরে অবতীর্ণ
হয়েছেন সেখানে শিষ্যরা তো দলপুঞ্জ
উৎসাহ নিয়ে কাদা-ছোড়াছড়িতে নামবেই।

মস্কো বেতার থেকে সম্প্রতি সংবাদ
প্রচার করা হয়েছিলো যে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী
লিন পিয়াও যিনি মাও সে-তুঙের
স্বলাভিষিক্ত হবেন বলে একরকম স্থির
হয়ে রয়েছে—তিনি নাকি আর মাও সে-
তুঙের কাছে কল্কে পাচ্ছেন না, দু'জনের
মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে। এ-
সংবাদের সত্যি-মিথ্যা যাচাই করা
মুস্কিল, তবে তারপরেই একটা অপেরা
থিয়েটারে মাও-পিয়াও-এর যুগলমুখিতি
দেখা গিয়েছে বহুদিন বাদে। থিয়েটার
হলে সেই দৃশ্য আবার দেখা গিয়েছিলো:
অর্থাৎ মাও সে-তুঙের সেই উদ্ভূতির বই
হাতে করেই শ' যুবক-যুবতী নেতাকে
গ্রন্থা জানাচ্ছে। এই তরুণ দলের ওপর
মাও-য়ের যাতে আস্থা অবিসল থাকে
তারই জন্যে যে এ-দৃশ্যটির উপস্থাপন
করা হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।
আবার পচি মাস পরে লিন পিয়াও-এর
দর্শন পেয়ে এখানকার যুবকদের মন
থেকে সেই আশঙ্কাও দূর হয়েছে যে,
প্রতিরক্ষামন্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

এদিকে লিউ সাও-চি'র দলকে
সম্পূর্ণভাবে নিম্নল করা যাচ্ছে না,
বরং কয়েকটি জায়গায় দু'দলে যে সংঘর্ষ
হয়েছে, বিভিন্ন বিদেশী সূত্রে পাওয়া
সংবাদে জানা গিয়েছে যে, তার ফলে বহু
মাও-পন্থীর মৃত্যু ঘটেছে। গুরুত্বপূর্ণ
অন্তঃমণ্ডলিয়া নাকি মাওপন্থীদের
সম্পূর্ণ দখলে এসেছে, কিন্তু সর্বত্র একই
ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর ঘটছে কই?
দু'বছর হতে চললো এখানে এই কমতার
লড়াই চলেছে। লালরক্ষীদের দৌরাণ্ডো
সারা দেশে একটা অনিশ্চয়তা ও
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে কৃষি
ও শিল্প উৎপাদন ভয়ানকভাবে ব্যাহত
হচ্ছে। কিন্তু এ-লড়ায়ের শেষ কোথায়?
অনেকের ধারণা, মাও সে-তুঙের মৃত্যুর
আগে আর চীনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে
আসবে না। কিন্তু লিউ সাও-চি'র সঙ্গে
লিন পিয়াও-এর সম্ভাবই বা কোথায়?
তবে, লিন পিয়াও অবশ্য মাও-এর মতো

প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা নন। তবে, লাল-
রক্ষীরা তো তাঁরই কথায় উঠছে বসছে।
তবে কি, লিউ সাও-চিকে খতম না
করলে সমস্যা মিটেবে না? কিন্তু লিউকে
খতম করলেই তো লিউবাদের অবসান
হটেছে না সঙ্গে সঙ্গে। অতএব সমাধান
কোথায়? সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেই বা
তার বিরোধ মিটেবে নী করে? সে যে
বিশ্বনেতৃত্বের স্বপ্ন দেখছে!

একদিকে অন্তঃকলহ অন্যদিকে
বাইরের অশান্তি। ইন্দোনেশিয়ার চীনা
অধিবাসীদের ওপর দিয়ে ধকল কিংবা কম
যাচ্ছে না। গত সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ার
জনতা ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে
চারজন চীনা অধিবাসী প্রাণ হারিয়েছে।
সেই থেকে ইন্দোনেশিয়ার চীনা দোকান-
গুলি হরতাল পালন করছে দোকান বন্ধ
করে। লুণ্ঠ-পর্বও নেহাৎ কম হয় নি।
শেষ পর্যন্ত জেনারেল সুহার্তো চীনা
সমস্যা মেটানোর জন্যে একটা কমিটি
গঠন করেছেন। কারণ, চীনা ব্যবসায়ীরা
ধর্মঘট করার ফলে এখানে কাজ-করবার
বিলকুল বন্ধ—যার প্রতিবাদে ইন্দোনে-
শিয়ার দু'বছর অর্থনৈতিক ওপর শুল্ক
হতে পারে না। কিন্তু কমিটি গঠন করার
আগেই চীনা ব্যবসায়ীদের সরকার-
বিরোধী বড়বন্দে সাহায্য করার অপরাধে
জাকার্তা থেকে চীনা কূটনৈতিক
বাহিন্য় হন। এর প্রতিশোধ চীনও নিতে
ছাড়ে নি। লালরক্ষীরা গত কয়েকদিন
ধরে পিকিঙের ইন্দোনেশীয় দূতাবাস
অবরোধ করে রেখেছে। শোভাযাত্রা করে
জেনারেল সুহার্তো ও নাসদুনের
কুশপদস্তলিকা দাহ করেছে। চীন সরকারও
দু'জন কূটনৈতিকের ওপর বাহিন্য়
আদেশ জারী করেছেন। সতর্কতামূলক
ব্যবস্থা হিসেবে ইন্দোনেশিয়া সরকার
তার পিকিঙ দূতাবাস থেকে সমস্ত শিশু
ও মহিলাকে ফিরিয়ে এনেছেন। আশ্চর্য
রাজনীতি! মাত্র দু'বছর আগেও চীন ও
ইন্দোনেশিয়া ছিলো হরিহর আখ্যায়
মতো অবিচ্ছেদ্য, এখন পরস্পর প্রায়
শত্রুতে পরিণত। চীন সরকার ইন্দোনে-
শিয়াকে হুশিয়ারী দিয়েছে যে ইন্দোনে-
শিয়ার চীনা অধিবাসীদের ওপর কোন
আঘাত এলে চীন তা কিছুতেই হজম
করবে না। সুকর্ণ-পতনের পর চীন-
ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছে
তা সহজে জোড়া লাগবার নয়।

এজেন্ট আবশ্যক

শতকরা ০৫ টাকা হিসাবে কমিশনে প্রতি
নগরে এবং শহরে সুবিখ্যাত এসকর্ট ট্রান-
জিস্টার বিক্রয় করিবার জন্য। স্যাম্পেলের
জন্য পত্র লিখুন।

The Manager (WBC-55)
P. B. 1115, Delhi-6.

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুপ্রবীণ দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

II একাদশ অধ্যায় II

বাবা মায়ের কলকাতায় আগমন

হুগলী কলেজ থেকে এফ এ পাশ করে বাবা এলেন কলকাতায় বি এ পড়তে। তখনকার দিনে কলেজে জায়গা প'ওয়ার বোধ হয় তেমন অসুবিধা ছিল না। দাদা-বাবু ও বাবা দু'জনেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকলেন বি এ ক্লাসে। কয়েকজন সহপাঠীদের নাম যা বাবার মুখে শুনছি তা' আগেই বলেছি। কলেজে পড়ার সময় দাদাবাবু কি বাবার মধ্যে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয় নি। বাবার মুখে শুনছি যে দাদাবাবুর সেই সময় থেকেই সাহিত্যের দিকে ঝুঁকি ছিল। বশীশ্ব-মাবব উপন্যাস ও বঙ্গদর্শনে যে সব কবিতা ও প্রবন্ধ বেব হোতো সেগগুলি দাদাবাবু খুব আগ্রহের সংগে পড়তেন। কলেজের বিতর্কসভায় বক্তৃতা দিতেন ভাল। স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীও দাদাবাবু হয়েছিলেন এবং সবাইকে একত্রে জুটিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা চখন থেকেই তাঁর দেখা গিয়েছিল। খুড়া-ছাইপোতে সম্ভাব ছিল বিস্তর এবং সেই প্রীতির সম্পর্ক তাঁদের বজায় ছিল আমরণকাল। একটা জিনিস বড় হয়ে লক্ষ্য করছি। বাবা ও দাদাবাবু প্লেন বি এ পাশ কবা ছাত্র হলেও ইংরেজীটি লিখতেন খুব চমৎকার প্রঞ্জল ও শ্রুতিমধুর ভাষায়। বাবা পূর্বনো ইংরেজ কবিদের; বিশেষ করে মিলটনের, কাব্যগ্রন্থ থেকে অনায়াসে বড় বড় পদগুলি মৃদুস্বপ্ন বলে যেতে পারতেন অনর্গল। আমার হাল ফ্যাসনের ছাত্র—পূর্বনোদের বলি তারা কেবল মৃদুস্বপ্ন বুলিই শিখেছে পাখী পড়ার মত—তাদের কিছু বোমোদয় হয় নি। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের একঘেঁষে চাকরি করেও বাবা যে ইংরেজী লিখতে পারতেন ও সাহিত্যবস সম্ভাগ করতে পারতেন আমবা তার সিকির ভাগও পারি নে।

বাড়িতে জ্যোতিষা নিস্তারিণী বাবাকে স্নেহ করতেন আপন ছেলের মত। খাওয়া-দাওয়া কোন প্রভেদ তিনি করতেন না

বাবা ও তাঁর সন্তানদের মধ্যে। বাবা বলতেন, "বৌঠাইন অনেক সময় চিন্ত কি মাইয়াদের না দিয়াও আমাকে দিতেন ভাল খাবার জিনিস থাকলে।" বোধহয় আশ্রিতজনের মনে কণ্ট হবে এই ভেবেই জ্যোতিষা এইরকম কবতেন। এই সব ছোট-খাট ব্যাপার থেকেই জ্যোতিষা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের হৃদয়ের প্রসার কিছুটা অনুমান করা যায়। বাবার মুখে শুনছি একবার নাকি বাড়িতে কি ভাল আয় এসেছিল। জ্যোতিষা সেগুলি ছাড়িয়ে কাটছিলেন সবাইকে ভাগ করে দেবার জন্যে। বাবাও বসে গেলেন আর একটা ব'টি পেতে। আম কাটছেন আর খেয়েই চলেছেন। দোষের মধ্যে জ্যোতিষা বাবার কাণ্ড দেখে বললেন—'আরে রাখাল, সকলেই খাইব ত'?' আর যায় কোথায়। জমনি বাবা ব'টি দা ফেলে রাগ করে ছল ছল চক্ষে দোড়ে বেব হয়ে গেলেন। তারপর জ্যোতিষার সে কত সাধ্যসাধনা—দেওয়ার রাগ উপশম করবার জন্যে। বাবা বলতেন, "বৌঠাইনের কাছে আমার আবদার বায়নার অন্ত ছিল না। এখন মনে করলেও লজ্জায় মইয়া বাই। কিন্তু বৌঠান সব সহ্য করতেন। এমন বৌঠান আর হয় না।" আমি বড় হবে যখন এসব শুন্যে চিত্তরঞ্জনের সহর্মিণী বাসন্তী দেবী' উদ্দেশ্য করে বলতাম—'আমার বৌঠাইন ছাড়া অর্বাশ্য।' বাবা তখন সোজা হয়ে বসে জবাব দিতেন—'রাখ তর বৌঠাইন। আমাব বৌঠাইনের কইবা আঙুলেব সমান না। আমার বৌঠাইনের তুলনা নাই।' বৃক্ণতাম বাবার মনে-প্রাণে তাঁর বৌঠানের জন্যে কি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল।

জ্যোতিষার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ন'দিদি (প্রমীলা)-র সংগে বাবার খুব বেশিরকম ভাব ছিল। ভাব যেমন ছিল ঝগড়াও তেমনই হোতো হামেশা। ঝগড়া হলে দিনকতক প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ তাঁদের হোতো না। কথাবার্তা চলত পরোক্ষভাবে দেয়ালের মারফৎ। যেমন—'দেয়াল ওকে বল না অমরু কাজ করতে।' তুরন্ত

জবাব যেত—'দেয়াল, বলে দিও বে ত'সদ! বয়েই গেছে ও কাজ করতে।' এইরকম। আমার বাবার খাওয়া-দাওয়ার খুব বাহ-বিচার ছিল আগেই বলেছি। ঠান্ডা-নির্দেশে সাদাসিধে খাওয়াটাই বাদার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বাবা তেগজালা পেটির মাছেব তেল কখনই খেতেন না, খেয়ে পাছে বুক জ্বালা করে এই ভয় পাতে ওইরকম মাছ পড়লে সেটা অন্য কারো ভোগে আসত। ন'দিদি আবাব তেল-আলা পেটির মাছ পছন্দ কবতেন এবং বাবার থালা থেকে তিনিই সেটা পেতেন। একবার হয়েছে কি—দু'জনে ভীষণ বকড়া হয়েছে কি নিয়ে। প্রত্যক্ষ বক্ণা বক্ণা। খাবার সময় দেখা গেল বেশ তেগজালা পেটির মাছটা বাবারই পাতে পড়েছে। বার্তা গেল দেয়াল দূতের মাফৎ—'দেয়াল, ও যদি পেটির মাছের পেতে না খায় তবে আমাকে দিলেই ত' পারে।' সেবার আড়িটা হয়েছিল একটু বেশি রকম জোর। বাবা জবাবই দিলেন না। মাছের তেলআলা অংশটুকু কেটে মাটিতে ফেলে বাটি দিয়ে সেটা ঘষে দিলেন। অমনি ন'দিদির উল্টল কান্না। নালিশ গেল জ্যোতিষার কাছে। জ্যোতিষা বললেন 'ঝগড়া করবি আবাব মাছও চাইবি।' বাবারই হয়ে গেল জয় সেবার। আব একবার যে কাণ্ড হয়েছিল সেটা শুনতে আজগুর্বা গম্পের মত। ন'দিদির একটা মোটা কাঁচের বোতলে অনেকগুলি পোনা লাল মাছ ছিল। ন'দিদির সে গাহগুলি ছিল খুব পেটোষা। জল বদলান, মহ-গুলিকে রোজ খাওয়ান এসব ন'দিদি খুব নিষ্ঠাব সংগেই করতেন। সেই কাঁচর বোতলে কারো হাত দেবার যো ছিল না। একদিন হয়েছে কি—বাবাব সংগে ন'দিদি কি নিয়ে হোলো তুমুল ঝগড়া। বাবাও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ন'দিদিকে শাসনান—'তব ওই লাল মাছগুলাইনব ত' হিংগাইয়া হিংগাইয়া মারুমা।' সবাই শুন্যে যে বাবা ঐ কথা বলেছেন। আ' হ'বি ত' হ, পবদিন সকালে দেখা গেল সে সত্যি সত্যি সব মাছগুলি মরে ভেলে

উঠেছে। আর যাবে কোথায়। নর্দাদির ধুব ধারণা হোলো তাঁর কাকারই এই অপকর্ম। বাবা অনেক অনুনয়-বিনয় করে বললেন বাবাবার যে তিনি যথার্থই মাছ-গুড়িকে মারেন নি—এমন কি বোতলটো ছোঁইনি নি। কে শোনে কার কথা। বিষম কান্দল বেধে গেল। বাড়িময় সোরগোল। নর্দাদি কাদিতে কাদিতে বললেন, “কাকাই মারছে। ও কইছিল মারুম।” জ্যোতিমা নিস্তারিণী অনেক বোঝালেন নর্দাদিকে যে মাছগুড়ি নিজেরাও স্বাভাবিকভাবেই মরতেও পারে। বাবাকেও ধমকালেন—‘ক্যান তুই এ রকম কইলি।’ বাবা জবাব দেন—‘কইছি দেইখ্যাই মারছি না কি?’ শেষ পর্যন্ত যখন ঝগড়া কিছুতেই মিটল না তখন জ্যোতিমা হয়বান হয়ে রেগে বললেন—‘তরা যদি এমন কইরাই ঝগড়া করবি তবে তরা কথা বলিস ক্যান। কথা না কইলেই ত’ আর কথা কাচাকাটি হয় না।’ দুই পক্ষই এই উপদেশ শিরোধার্য করে নিয়ে কথা বশ করলেন। আশ্চর্য, কিন্তু সত্যি কথা—সেইদিন থেকে নর্দাদি আর বাবার মধ্যে ঝগড়াভাও একেবারে বন্ধ, কি প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ। দু’জনেরই সমান হ্রিদ—সেই-ই হাব মানবে না। বাবাব কাছে শুনোই এই আড়ি চলোছিল তাদের মধ্যে বিশ বছরব্যবও ওপরে। নর্দাদির বিষে হয়ে গেল—তিনি আলোদা বাড়ি গেলেন। বাবাও পরে আলোদা বাড়ি গেলেন। তবু কথা বন্ধ। বহু বছর পরে নর্দাদি স্ব-ন মরণাপন্ন অসুখে পড়ে কালীমোহন আসমে এলেন সেবা-শুশ্রূষার জন্যে এবং সে বাড়ির পেছনের গাড়ি-

বারান্দার ওপরের ঘরে মৃত্যুশয্যায় কষ্ট পাচ্ছেন বাবা আস্তে আস্তে একদিন সন্ধ্যার দময় সে ঘরে গিয়ে নর্দাদির খাটের পাশে বসলেন। ধীরে ধীরে বাবা বললেন—‘পরিমিলা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর—আমি সত্য-সত্যই তোমার মাছ মারি নাই।’ নর্দাদি বাবার হাতখানা ধরে শান্তস্বরে বললেন—‘কাকা, আমি তোমায় ছুল বুকে কষ্ট দিইছি, নিজেও দুঃখ পেয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।’ দু’জনেরই চোখে অঝোর ধারার নেমে এল প্রায় বিশ বছরের পুঞ্জীভূত অভিমানের তুষার গলা চোখের জল। সেই স্রোতে ভেসে গেল ছুল বোঝাবুঝির প্লানির কালিয়া। স্বপ্নিত পেলেন দু’জনেই। বাবার মুখে শুনেছি যে মৃত্যুর আগে নর্দাদির মনে বিশ্বাস এলো যে বাবা তাঁর মাছগুড়ি মারেন নি এর জন্যে বাবার মন থেকে জগন্দল একটা পাথরের বোঝা নেমে গেল। এর করদিন পরেই নর্দাদির পুণ্যাত্মা দেহমুক্ত হয়ে অমরখামে চলে গেল। যথাকালে দাদাবাবু ও বাবা দু’জনেই বি এ পরীক্ষা দিলেন এবং দু’জনেই পাশ হলেন। দাদাবাবুকে তখন বিলেতে পাঠান হোলো আই. সি. এস পরীক্ষা দেবার জন্যে। বাবা জ্যোতিমায়ের কাছে আর্টিকেল্ড ক্লাক হয়ে এটর্নিসীপ পড়া শুরুর করলেন এবং জ্যোতিমায়ের আঁকসে নিয়মিত বের হতে লাগলেন। এ কথা বাবা কখনো ভাবতেই পারতেন না যে তাকেও জ্যোতিমায় বিলেত পাঠিয়ে লেখা-গড়া শিখিয়ে আনবেন। সেটা তিনি আশাও করেন নি। কিন্তু একই সংগে

ছেলে ও দেওর বি এ পাশ করে শব্দ ছেলেই বিলেত গেল আর দেওরের যাওয়া হোলো না—এই ভাবনাটা জ্যোতিমায় মনে বোঝ হয় নিরন্তর খচখচ করত। সে সময়েই জ্যোতিমায়ের সংসারে চানাটানি দেখা দিতে শুরুর করেছিল। তা’ না হলে জ্যোতিমা খুব সম্ভব বাবাকেও বিলেত পাঠাতেন। সে রকম দরাজ মন জ্যোতিমায় ও জ্যোতিমা দু’জনেরই ছিল। আমার জন্মের পর জ্যোতিমা অনেক সময় দুঃখ করে বাবা-মাকে বলতেন—‘আমি পারলাম না রাখালেরে চিত্তর সংগে বিলাত পাঠাইয়া পড়াইয়া আনতে। তবে চিত্তর যদি রোজগার হয় তবে চিত্তর ছেইলারে বিলাতে পড়াইয়া মানশষ কইরা দিবই।’ এ কথাটা মায়ের মুখে আমি অনেকবার শুনেছিলাম মা যখন জ্যোতিমায় গুণের কথা বলতেন আর চোখ মুছতেন।

দাদাবাবু যখন বিলেত যান তার পরই জ্যোতিমায়ের আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে লাগল। বাড়িতে ছেলে-মেয়ে ছাড়াও অনেক আত্মীয় আশ্রিত ছিল। বাবাও এসেছিলেন জ্যোতিমায়ের বাড়ি থেকে পড়াশুনা করতে। তখন জ্যোতিমায় তাঁর বড় ভাই কালীমোহনের বাড়ির সংলগ্ন উত্তরের জমিটুকুতে যেখানে এখন চিত্তরুজন সেবাসদনের গোয়েন্দা ব্লক হয়েছে সেখানে বাড়ি করে কান্টারিপাড়া থেকে এসে বাস করছিলেন। অনাত্মীয় দেশের লোকেরাও প্রায়ই আসত-যেত এবং কেউ কেউ থাকতও। এই সংকটের দিনেও জ্যোতিমায় তাঁদের কাউকে বলতে পারলেন না নিজের পথ দেখতে। তার ওপর আমার ঠাকুমাও এলেন বিধবা হবার পব তার চারটি দৌহির ও পুত্রবধূ আমার মাকে নিয়ে। জ্যোতিমায় ও জ্যোতিমা ‘না’ বলতে পারলেন না। জ্যোতিমায়ের সেই অনটনের দিনে যখন ঠাকুর-চাকর কমাতে হয়েছে তখন মা আসায় জ্যোতিমায় সংসারের দিক থেকে বেশ খানিকটা সুবিধেও হয়েছিল। বৃহৎ সংসারের রামাঘরের কাজে মা শরীর দিয়ে খেটে জ্যোতিমায় কিছুটা কষ্ট লাঘব যে করতেন তাতে সন্দেহ নেই। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাবে তাদের খাইয়ে তাঁর করিয়ে সংগে টিফিন দিয়ে স্কুলে পাঠান, ভোলা (বনস্ত) ছেলে মানুষ, তাকে খাইয়ে দেওয়া এই সব কাজে মা জ্যোতিমায় সাহায্য করতেন। এসব কাজ—রান্না, ছোট ছেলের হেফাজত ইত্যাদি মায়ের অভ্যাসই ছিল। তেলিরবাগের কঠিন অতিষ্ঠতা মায় এখানে বেশ কাজে লেগে গিয়েছিল। বাবা প্রায় ম্যানোজিং ক্রাকের মত জ্যোতিমায়ের আঁকসের ও বাইবের মোটা কাড়গুড়ি দেতেন এবং জ্যোতিমায়কে সেই সবের ধকল থেকে বাঁচাতেন। বাড়িতে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীনগর - গোহাটী

সাপ্তাহিক বঙ্গবর্তী

মা রান্নাঘরের কাছে জ্যেষ্ঠামার দক্ষিণ হস্ত হয়ে তাঁর নির্দেশ তামিল করতেন শরীর দিয়ে খতটা সম্ভব হতো। আর এই সময়ে প্যারিবাৎ ও দিদিমণি তরল্য তাঁর বাপের বাড়ির জন্যে যে অর্থ-সামর্থ্য অনেক সাহায্য করতেন তা' আগেই বলেছি। কথায় বলে 'দশপুত্রসম কন্যা যদি পাশ্রে পড়ে'। দিদিমণি এই প্রবাদবাক্য সার্থক করেছিলেন। তিনি সংপাশ্রেই পড়েছিলেন। মেয়ে-জামাই উভয়ে সেই সংকটের দিনে জ্যেষ্ঠামশায়ের পরিবারের জন্যে অকুণ্ঠভাবে স্বাধ-ত্যাগ করেছেন। এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যা দিদিমণি ও অন্যান্য দিদিদের মধ্যে একাধিকবার শুনিয়েছে। একদিন এমন হোলো যে জ্যেষ্ঠামশায়ের ক'টা মোটা হ্যান্ড নোটের দেনা মোটাবার দিন প্রায় সমাগত। দিতে না পাবলে পাওনাদারদের কাছে শিরশ্ছেদ হবে এবং তারা আদালতের আগ্রস নেবে। জ্যেষ্ঠামশায়ের মন ভাবনায়-চিন্তায় ব্যাকুল এবং সেই অশান্তির জন্যে তাঁর মুখে কালিমা পড়ে গেল। অথচ টাকা সংস্থান করা যাচ্ছে না। বাবা এদিক-ওদিক ঘুরে টাকা যোগাড় করবার ব্যথা চেষ্টা কবে-ছিলেন। এমন সময় সম্ভাব্য পব মা তাঁর গহনাব বাক্স এবং গায়ে যা কিছু গহনা

ছিল সব একত্রে করে জ্যেষ্ঠামশায় বৈথানে বসেছিলেন সেখানে তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিলেন। মা'র হাতে তখন শাঁখা ও লোহা ছাড়া গলায়, গায়ে আর কোন গহনাই রইল না। মা'র বয়স তখন হবে বছর কুড়ি। সেই বয়সের যুবতী মেয়ের পক্ষে গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে দেওয়া যে সহজ ব্যাপার ছিল না তা' সহজেই অনুমেয়। জ্যেষ্ঠামশায় ছিল ছিল চোখে মায়ের মূখের দিকে খানিকটা চেয়ে রইলেন। সে চাহনির মধ্যে যে অনিবচনীয় কোমলতা ফুটে উঠেছিল তাইতেই মায়ের সব ত্যাগ সার্থক হয়ে উঠল। তাঁর ভাসুরঠাকুরের যে এতটুকু উপকারও মায়ের দ্বারা হোলো সে কথা ভেবেই মা মনে শান্তি ও আনন্দ পেলেন। ছেলের বয়সী ছোট ভাইয়ের স্ত্রী গায়ের গহনা নিয়ে যে জ্যেষ্ঠামশায়ের পাওনাদারদের ঠেকাতে হোলো এর থেকেই বোঝা যাবে যে টাকাটার কতখানি জরুরী দরকার তখন জ্যেষ্ঠামশায়ের হয়েছিল। নেহাৎ অপারগ না হলে জ্যেষ্ঠামশায় কখনই মায়ের এই গহনা নিতেন না। দাদাবাবু তাঁর দিদির আব খুড়িমার এই স্নেহের দান আমরণ শেষ দিয়ে গেছেন। টাকার হিসেব করলে তিনি পেয়েছিলেন বত দিয়েছেন তার

চতুর্গুণ। কিন্তু দুঃখের দিনে যা পাওয়া যায় তার ত' মূল্য নেই। সে খণ গোপ-প্রাণের প্রশ্নই দাদাবাবুর ঘনে ওঠে নি। সারাজীবন ধরে দাদাবাবু আমরদের পরিবারের সকল বোঝা বহন কবে গেছেন সমুদ্রতটের ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে। মায়ের এই কৃতজ্ঞতাপ্রসূত ত্যাগ লক্ষ্য করছিলেন আর একজন মহাশয়সী মহিল—আমাদের দিদিমণি। তাঁর ছেলো সুধাংশু বঙ্গ বিলেত থেকে ফিরে প্রাকটিস করতে সুন্দ করলেন এবং কিছু কিছু বোজগারও করতে লাগলেন তখন দিদিমণি মনে-জন্যে ভাবী ওজনের ছয় গাছা ধরে নোনায় চুড়ি এবং গলাব হার তৈরি করিয়ে মা'র পরিণে দিয়ে যেন মনে অপার আনন্দলাভ করলেন। মা'র বয়স তখন দ্ব্যুচ্চ পঞ্চ হবার মত। তিনি সংকুচিত হয়ে বসে উঠলেন—'ভাসুরবা এই বড়ো বয়সে গরম পরতে লক্ষ্য কবে।' দিদিমণি বললেন—'না খুড়িমা এ তোমার পরতেই হবে। আমার ভাল লাগবে।' সেই চুড়ি ও হার মা নিজা ব্যবহার করে গেছেন যত্ন পর্যন্ত। এ ছাড়া মায়ের আর কোনো গহনাই ছিল না। দিদিমণি এই স্নেহের প্রতিদানও অমূল্য সম্পদ ছিল মায়ের কাছে। [দে-৪৫]

শাঠে শাঠ্য—



পশ্চিমবঙ্গের শাসনপ্রণয়নীতি কঠোরতর হওয়ার সুভা বনা—সংবাদ



এবারে কালবৈশাখীর দারুণ আব-
হাওয়াতে এখনো তেমন গরম পড়ে নি,
কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজারে যে
আগুন জ্বলছে তা সহজে নিভবে বলে
মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে তরিতরকারীর
বাজার প্রত্যহ যেনো হু হু করে চড়ে
মাছে তাতে চিন্তিত হবার বীতিমত কারণ
দেখা গেছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার অবশ্য বাজার দরের
এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে চিন্তিত
হয়েছেন। বারমাসে তরিতরকারীর মধ্যে
আলুর দামই সবচেয়ে বেশি, কেন না
এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় সাধারণ
মানুষের এবং এই আলুর দামের নির্বিঘ্নেই
কাঁচা তরকারীর বাজার গুঠানামা করে।

বিগত কংগ্রেসী সরকারের আমলে
বিশুদ্ধ মজুতদাবীর উদ্দেশ্য নিয়েই
অনেক ঠান্ডাঘর গড়ে উঠেছিল। এক-একটি
ঠান্ডাঘর বা কোল্ড স্টোরেজ গড়ে তুলতে
অন্যুদ্বিতীয় লাখ টাকা ব্যয় হয়। বলা
বাহুল্য, এই ঠান্ডাঘর তৈরি করতে যে সে
লোক পারে না। একমাত্র তারাই এই
কর্মটি করতে পেরেছে যারা বিগত আঠারো
বছরে বহু লাখ টাকা উপার্জন করতে সক্ষম
হয়েছে। আরও সহজ করে বললে, দু-
একটি ক্ষেত্র বাদ দিলে, এই ঠান্ডাঘরগুলি
আসলে কালো টাকার সৃষ্টি।

গত বছরে আলুর উৎপাদন যে
একাত্তিই কম হয়েছিল তা নয়। এবং ঠান্ডা-
ঘরওয়ালারা, তথা অসাধু ব্যবসায়ীরা যারা
ঠান্ডাঘরে মাল রেখে চতুর্গুণ মূল্যায়ন
তালে থাকে, এই আলু কিনেছিল বর্তমান
দামের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে। খুচরো দামই
তাই ছিল, পাইকারী দাম নিশ্চয়ই আবে
কম। অথচ আজকে এই ঠান্ডাঘরের
সুযোগে তারা ঠান্ডা মাথায় অতিমূল্য
লুণ্ঠেছে। অন্যান্য তরিতরকারী ও ফল-

মূলের ক্ষেত্রে ঠান্ডাঘরগুলি মালিকদের
অতিমূল্য তুলতে সাহায্য করা ভিন্ন
অন্য কিছু করে না।

কাজেই সরকারের উচিত এই মূহুর্তে
ঠান্ডাঘরগুলিতে মজুত করা সমৃদ্ধ মাল-
পত্র আটক করে তা বাজারে বার করা এবং
পরবর্তী পর্যায়ে ঠান্ডাঘরগুলির জাতীয়-
করণ করা। এই একটি উপায়েই মাত্র বেশ
কয়েকটি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর ন্যায্যসংগত
মূল্যমান বজায় রাখা সম্ভব।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, এই ঠান্ডা-
ঘরওয়ালারা পরোক্ষে অল্প পুঞ্জির লোকে-
দেব অতিমূল্য লাভেতে শেখায়। অনেকেই
দু-চাবশো মণ আলু মাঘ-ফাগুন মাসে
কিনে ঠান্ডাঘরে জমা রাখে এবং বাজার দর
চড়তে শুরুর করলেই তারা চলতি দরে সেই
জমা রাখার রিসিটটি ঠান্ডাঘরওয়ালাদের
কাছেই বিক্রী করে দেয়। এও একরকম
ফাটকাবাজী, এবং এর ফলেও আলুর
বাজার দর এবারে রীতিমত চড়েছে।

শুদ্ধ আলুর ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য
কাঁচা তরিতরকারীর ক্ষেত্রে মূল্যস্তব যেনো
আকাশ ছুঁতে চলেছে তার কোন সংগত
কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন
বাজারে ঘুরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে
তাতে আমরা দেখেছি যে মূল্যবৃদ্ধি
অস্বাভাবিকতায় ক্রেতারা অভ্যস্ত পরিমাণে
জিনিষ কিনছেন, যাব ফলে প্রচুর তরি-
তরকারী অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে। সেগুলিকে
নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, কিন্তু তবুও সস্তা-
দরে বিক্রয় করা হচ্ছে না। অতি লাভের
প্রবণতা সর্বস্তরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি
করেছে যার ফলে মনুষ্যসৃষ্ট বিশাল পণ্য
এই অপচয়, চোখে দেখে স্থির হয়ে থাকা
যায় না। যদি দশ সের বিক্রী করে এক
মণ বিক্রী মূল্য লাভ করা যায়, তাহলে
এক মণ বিক্রী প্রচেষ্টা কেন করা হবে এই

মনোভাব বিক্রেতাদের পেয়ে বসেছে। ফলে
যারা আনাজ তরকারী উৎপন্ন করেন,
তারাও যেন প্রবঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি
বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ ক্রেতারা।

মাছের বাজারে আগুন লাগার কোনই
সংগত কারণ নেই, কিন্তু তা আজ সকল
সামর্থ্যের নাগালের বাইরে চলে গেছে।
জনসাধারণ মুখ বুজে মুষ্টিমেয় কয়েক-
জনের বানরামির কুফল হাড়ে হাড়ে ভোগ
করছেন, কিন্তু দুঃসহ অবস্থার প্রতিকারের
জন্য কোন প্রচেষ্টাই করছেন না। ব্যাপার
দেখে মনে হচ্ছে, মন্ত্রীরা যা কিছু করছেন
তা নিজেদের দায়িত্বই করছেন, নিজেদের
ব্যক্তিগত প্রভাব ও সুনামকে পুঞ্জি করে।
কিন্তু মন্ত্রীদের পিছনে যে রাজনৈতিক দল-
গুলির থাকবার কথা সেই দলগুলি কি
নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন? এত যে
ঢাকঢোল পিটিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গণ-
কমিটি তৈরি করা হচ্ছে, সেই গণ-কমিটি-
গুলিই বা কি করছে? আকাশ ছোঁয়া
মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করার কাজে তারা
কতটুকু এগিয়ে এসেছে?

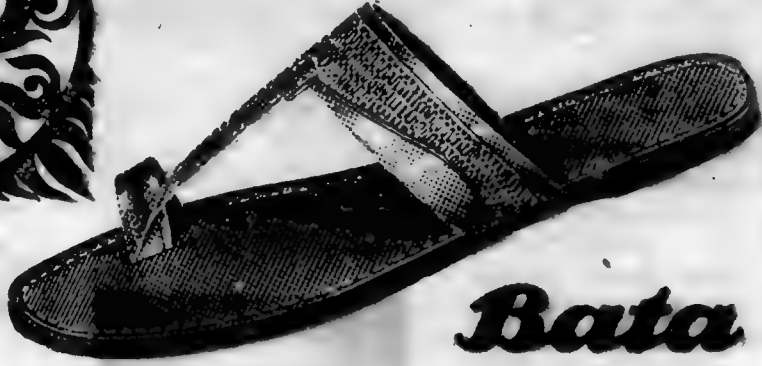
কথাটা যখন উঠলোই তখন আরও কিছু
কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। বিভিন্ন
অকংগ্রেসী দলগুলি মন্ত্রিসভার পিছনে
সর্বশক্তি-নিয়োগ করে কাজ করছেন, এ কথা
নিশ্চয় করার মত কোন কারণ খুঁজে পাওয়া
যাচ্ছে না। চালের প্রকিওরমেন্টের ক্ষেত্রে
এদের পূর্ণ সহযোগিতার প্রমাণ নেই।
যুক্তফ্রন্ট সরকার পুলিশের উপর নির্ভর-
শীল নয়, কেন না পুলিশবাহিনীকে নতুন
আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গড়ে তুলতে
অনেক সময়ে প্রয়োজন। তাঁরা নির্ভর
করছেন জনসাধারণের সহযোগিতার উপর।
সেই হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে গণ-কমিটি
গড়ে তোলার প্রস্তাব উঠেছে প্রগতিশীল
মানুষদের নিয়ে যারা সরকারের সঙ্গে সহ-

সাধারণিক বসন্ত

গরমে চলন
হালকা পায়ে

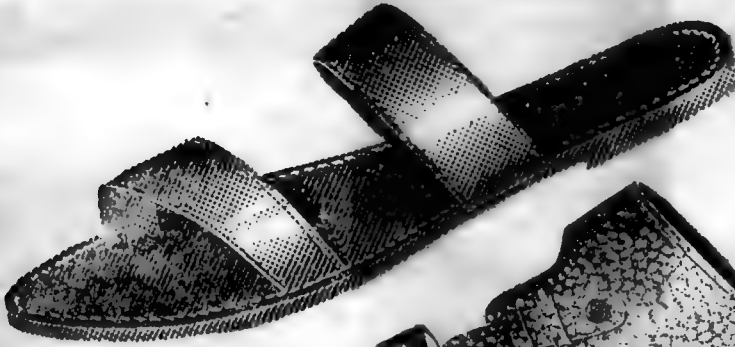


পা গলিয়ে খানিক এদিক-ওদিক চলুন, নিম্নেই
বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পল এদের বৈশিষ্ট্য কী।
কী আরাম এদের পায়ে দিয়ে! কী মঙ্গল চামড়া!
এমন হাওয়া-খেলানো নকশা; নির্মাণশৈলী আর
মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে।
স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।
আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও
চপ্পলের নতুন মনোহর ফ্যাশান।



শ্যানল ৭.১৫

Bata



অনেক ১.১৫



প্রীতি ৭.১৫



একটিলাইট ১৪.১৫



অনেক ১৪.১৫

যোগিতা করবেন শুধু খেলোয়াড় চালানোর জন্য। এক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের শরিক অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দলগুলিরও বিশেষ ভূমিকা আছে, কিন্তু দৃষ্টির মধ্যে রাখতে হবে যে এই ভূমিকা পালনে তারা ঐক্যবাহিনী প্রদর্শন করছেন।

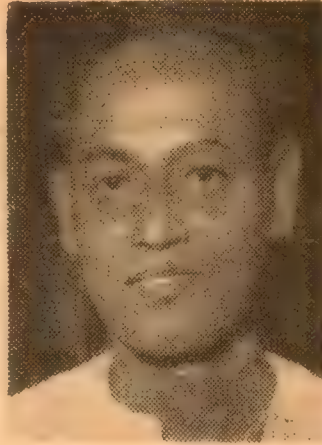
তারা লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে ময়দানে র্যালি করছেন, নিজেদের সমর্থকদের সংখ্যা প্রদর্শন করে বাহবা কুড়িয়েছেন। কিন্তু এই সমর্থকদের নিয়ে ময়দানে সমাবেশ না করে তারা চালকলগুলি বা ঠাণ্ডাঘরগুলি ঘেরাও করলে যে মজুত উদ্ভাস হোত, তাতে দেশবাসীর বর্তমান দৃষ্টিতে যে বহুলাংশে দাব্য হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাহের আড়তদারদের ঘেরাও করে পুকুরে জাল দেওয়াতে বাধ্য করলে গভীর জলের মাহগুলি সহজেই বাজারে আসত, দামও সংগে সংগে পড়ে যেত। যে সকল শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে হয় সেই সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত জনমতের চাপ সৃষ্টি করলে কোম্পানীর দর এবং খরচের দরদস্তুর ব্যবধান অনেকাংশে কমে আসত। দৃষ্টির বিষয়, অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দলগুলি এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছেন না। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করলেও তারা এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারছেন না যাতে মজুতদারেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়, যাতে সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে সক্ষম হয়। আমরা বিভিন্ন অকংগ্রেসী দলগুলির দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি।

আকাশবাণী প্রসঙ্গে

বিগত ১লা মে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মে দিবস পালন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী প্রীত্বোধ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতার যে খসড়াটি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সেই ভাষণের কিসদংশ পরিবর্তন করার উপদেশ দিয়ে তা ফেরৎ পাঠিয়ে শ্রদ্ধা শ্রমমন্ত্রীকেই নয় সমগ্র মন্ত্রিসভাকে তথা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের যে অপমান করেছেন তাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সমেত সমগ্র দেশবাসী ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

শ্রমমন্ত্রীর মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির বক্তব্যের উপর কাঁচি চালানোর ইচ্ছা প্রকাশ করার পিছনে যে কোন মনোভাবটি কাজ করেছে তা নিশ্চয়ই জনসাধারণের অজানা নেই। যে অংশটিতে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানিয়েছিলেন, শ্রমমন্ত্রীর বক্তৃতার সেটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি বলেছিলেন যে, সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার জন্য বর্তমান মন্ত্রিসভা মনের মত কাজ করতে পারছেন না। এই

কথাটির মধ্যে কোন মিথ্যাচার নেই বরং আসল সমস্যাটি এই কথাটির দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বস্তুত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর একটা নিদারুণ সাংবিধানিক সংকট দেখা যাচ্ছে, যে প্রসংগটি আজ সকল রাজ্যেই সর্বস্তরে আলোচিত হচ্ছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে বর্তমান সাংবিধানিক কতখানি সক্ষম সে প্রশ্ন আজ একান্তভাবেই মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তা ছাড়া সাংবিধান কোন অনড় বস্তু নয়, প্রয়োজনে তার সংশোধন বা সম্পূর্ণ পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। আর ইতিমধ্যে তো সাংবিধানের সংশোধনও বহুবার হয়েছে। কাজেই সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার কথা ভুলে শ্রমমন্ত্রী বাস্তব অবস্থাটার



স্বাধীনতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বীকৃতি জানিয়েছেন মাত্র। এতে আকাশবাণীর গোঁসী করার কি কারণ আছে, তা বুদ্ধির অগম্য। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাহবা কুড়ানোর মতলব ভিন্ন শ্রমমন্ত্রীর বক্তৃতাকে ফেরৎ পাঠানোর আর কোন সঙ্গত কারণ ছিল বলে মনে হয় না।

আকাশবাণীর কলকাতা কর্তৃপক্ষ যে চিন্তা ও চেতনার দিক থেকে কত উচ্চস্তরে বিচরণ করেন, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি, যখন তাঁরা একটি বহু-বিতর্কিত উপন্যাস নিয়ে একটি বিশেষ প্রকাশকের স্বার্থে রেডিও সিলোনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তা নিয়ে আমরা তখন এই বঙ্গদর্শনে লেখালেখি করেছিলাম। যে প্রতিষ্ঠানের সমগ্র চিন্তাভাবনার পিছনে অসাধু বাণিজ্য-বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নেই, সেই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোন দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করা যায় না। তা ছাড়া আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ কি ভুলে গেছেন যে,

দিন বদলে গেছে, গত উনিশ বছর ধরে তাঁরা যে দল ও গোষ্ঠীবিশেষের চাক পিটে এসেছেন, নতুন অবস্থায় সেই মনোভাবের পরিবর্তন না করলে ভবিষ্যতে চরম অনর্থ বাধার সম্ভাবনা আছে।

একদিক থেকে অবশ্য আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এই হস্তকারিতা মঙ্গলকর হয়েছে, কেন না এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশবাণীর গঠন-তন্ত্রের আশ্রয় পরিবর্তন প্রয়োজন। কেন্দ্রে অকংগ্রেসী সরকার থাকার জন্য এবং আকাশবাণী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান হওয়ার জন্য তার আনুগত্য ওইদিকেই থাকবে এবং বিভিন্ন রাজ্যে তার প্রতিটি কেন্দ্রের কাজকর্ম বহুক্ষেত্রেই হয়ত সেই রাজ্য সরকারের আদর্শবিরোধী হতে পারে, কেন না আজ ভারতের নয়টি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত। কাজেই আকাশবাণীর রাজ্য সংস্থাগুলির সংগে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিরোধ আজ না হোক কাল হবেই। কাজেই নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয় আকাশবাণীকে সরকারের আওতার বাইরে একটি স্বয়ং-শাসিত সংস্থারূপে গড়ে তোলা হোক, আর না হয় আকাশবাণীর ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক।

ট্রাম কোম্পানীর জাতীয়করণ হোক

সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার ট্রাম কোম্পানী জাতীয়করণের কথা ভেবে চিন্তে দেখছেন। বর্তমানে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি মামলা মহামান্য হাইকোর্টের বিচারাধীন রয়েছে।

ট্রাম কোম্পানীর দৈনিক আয় এক লক্ষ বারো হাজার টাকা, ব্যয় পঁচাত্তর হাজার টাকা, অর্থাৎ দৈনিক নীট লাভ সাতাশ হাজার টাকা।

১৮৮১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কলকাতা শহরে একচেটিয়াভাবে সর্বাপেক্ষা নিকট ধরনের গাড়ি চালিয়ে এই কোম্পানী কোটি কোটি টাকা মুনাফা লাভ করেছে। কিন্তু পুরোনো গাড়িগুলি অচল হয়ে যাবার পর নতুন গাড়ি কেনার জন্য ক্ষয়পূরণ তহবিলে এই কোম্পানী ছিটে-ফোটাও ব্যয় করে নি। অথচ ১৮৮০ ও ১৯০০ সালের আইনের সত্ত্ব ছিল যে গাড়ি, লাইন প্রভৃতি ভাল অবস্থায় রাখার জন্য বা দরকার সেটা পুরোপুরি বরাদ্দ করবার পর মুনাফার খেটুকু ব্যক্তি থাকবে শব্দ সেটাই কোম্পানী পকেটস্থ করতে পারবে। ১৯৪১ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দশ বছরে এই কোম্পানীর মুনাফা হয়েছিল সওয়া চার কোটি টাকারও বেশি। অথচ সেরাসিতি,

নতুন প্রাকৃতিক ভর, লাইনের সংস্কার ইত্যাদির জন্য ওই দশ বছরে কোম্পানী ব্যয় করেছিল মাত্র তের লক্ষ টাকা।

বিস্তৃত সরকারের সঙ্গে গ্রাম কোম্পানীর দীর্ঘকাল ধরে একটি অষ্টম প্রণালী ছিল এবং সেই প্রণালীর ধারণাটি যাতে জনসাধারণ জানতে না পারেন, তদায় জনসাধারণের কল হইল। উক্ত প্রণালীর অষ্টম প্রণালীর ইতিহাসটি এজন্য ধুলে-বলা দরকার। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের উৎকলীয়া সরকারের সঙ্গে গ্রাম কোম্পানীর একটি লেগন চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুসারে সিন্ধুর যে-কুড়ি বছরে, অর্থাৎ ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে গ্রাম কোম্পানী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দশ লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ ২.১০ কোটি টাকা নগদ সেলামী দেবে। বিনিময়ে কোম্পানীকে যথেষ্টভাবে কাজ করতে দিতে হবে। সে বতখানি লাভ করবে তা বেভাবেই হোক, সেখানে হস্তক্ষেপ চলবে না, কোম্পানী বছর-বছর ভিনকলপ চড়া মনোমত। ১৯৭১ সালে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার বছরে, ওই বছরে যে লাভ হইবে তার দশগুণে টাকা কোম্পানীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নগদ গুণে দেবে, এবং তখন কোম্পানী জীব গ্রাম লাইন ও কয়েকখানা ভাড়াচারা গাড়ি ফেলে রেখে পাতভাড়ি গুটোবে।

এখন এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রশ্নের উত্থান কতখানি হইবে? বর্তমান সরকার কি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অগুণী করবেন এবং তারপর গ্রাম কোম্পানী জাতীয়করণ করবেন? অগ্রে সরকার সেই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করলে দেখা যাবে যে, কলকাতার রাস্তায় একটিও গ্রাম নেই, এমন কি লাইন-সমূহ উপস্থিতি হইলে সেও দূরে দূরে গিয়ে গেছে। বস্তুত আজ গ্রাম কোম্পানী মজা। কোম্পানী দেখেছে যে, ইতিমধ্যে সে-কেন্দ্র পরিমাণ লাভ তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে কাজেই কোম্পানী তুলে নিতে ভারের কোন আশঙ্কা নেই।

কাজেই ১৯৭১ পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন কারণ নেই। এই মুহূর্তে বিনা কতিপয় গ্রাম কোম্পানীর জাতীয়করণ করা হোক। আইনগত দিক থেকে বিচার করলে সেই অধিকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে। ১৯৫০ সালের গ্রামওয়ে আইনে সরকারের তরফ থেকে জুড়িগিয়াল ট্রাইব্যুনাল বসায়ের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। গ্রাম কোম্পানীর কার্যাবলী সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য জুড়িগিয়াল ট্রাইব্যুনাল বসালে শ্রুত একটিমাত্র বিষয়ই উল্লেখ্য হইবে। তা হচ্ছে ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর তরফ থেকে শ্রুত গ্রাম কোম্পানীর তরফ থেকে চুক্তি করা হইল কিহীন।

সেই অপরূপে কোম্পানীকে খারিজ করে দিয়ে সরকার তা অন্যায়সে নিজের হাতে আনতে পারেন।

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে গ্রাম কোম্পানীর যে চুক্তি হয়েছিল তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের সঙ্গে মেনে এসেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই চুক্তির অধীনে গ্রাম কোম্পানী যে ব্যয়-ব্যয় নিজ সুবিধার্থে তা লক্ষ্যন করেছে তা আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, কাজেই কোম্পানীর উৎকর্ষিত একটোটা সমস্যা পবিত্র অধিকারটি চুক্তিভঙ্গের মতন গোড়া থেকেই নাকচ হয়ে আছে।

তদুপরি প্রাক্তন অগ্রে সরকারের সঙ্গে গ্রাম কোম্পানীর যে চুক্তি হয়েছিল সরকার সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেই চুক্তিরও স্বাভাবিক মতন হয়েছে। কাজেই সেই চুক্তির বাগল আজ ওয়েস্ট পেন্ডার ব্যকেই স্থান পেতে বাধ্য। এখন রাস্তার গ্রাম চালাতে হলে কোম্পানীকে ওয়েস্ট সরকারের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে আসতে হবে। এটাই হলো কথা। আর জই-গদি হইল সরকার সরকারি কোম্পানীর প্রাক্তন অধিকার-বাড়িল করে-রাস্তার-টাম চালাবার ব্যবস্থা করুন। আর এই রাস্তা স্থাপিত করার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব কোম্পানীর পরিচালন কমতাতা নিয়ে হাতে নিয়ে রাখুন। শেষের কাজটি করতে বিশেষ কোন অসুবিধা এই মুহূর্তে নেই।

বাঁকড়া, পুন্ডুলিয়া ও পশ্চিম বিহারের

এ পর্যন্ত আমাদের হাতে যে সংবাদ এসে পড়েছে তাতে জানা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি জেলা খসাকালিত হইলে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, সরকার তথা জনসাধারণ এই দিকে বিশেষভাবে সচেতন না হলে সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কা রয়েছে।

পর-পর দু-বছর অনাবৃষ্টি-হবার মতন কবির কাজ তা দুরস্থান, পানীয় জল পর্যন্ত সংগ্রহ করা জনসাধারণের পক্ষে রীতিমত কষ্টের হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত পুন্ডুলিয়া শ্রুতিকে খী-খী করছে। এই অবস্থা আবার বাঁকড়া ও পুন্ডুলিয়া জেলায় সমস্তের বেশি প্রকট।

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে দক্ষিণ জেলা বাঁকড়া। পুন্ডুলিয়া ও সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গ চিরকালই উপেক্ষিত। অগ্রেসী আমলে এই জেলাগুলির জন্য কিছুই করা হয় নি। সে প্রকল্পগুলি অবহেলিত হয়েছে।

বাঁকড়ার জলকট চিরকালই। সেই হিসাবে প্রাচীনকালের জমিদারেরা অনেক বড় বড় পুন্ডুলিয়া খনন করিয়েছিলেন।

স্থানীয় ভাষায় বেগুলির নাম 'বাঁকড়া'। এই বৃহদায়তন পুন্ডুলিয়াগুলি, যা কয়েকশত বছর পূর্বে খনিত হয়েছিল, কালক্রমে দেখাশোনা ও সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সেতের উল্লেখ্য-মালের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এই প্রয়োজন শ্রুত আধুকেই উপলব্ধ হচ্ছে না, প্রাচীন-কালেও তা অনুভূত হয়েছিল। সুগমী জেলার বেহুলা নদীটি আসলে একটি মনুষ্যনির্মিত খাল, যা প্রাচীন-কালেই কাটা হয়েছিল। পুন্ডুলিয়ার বিচার-সে-কট কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিকভাবে করা উচিত ছিল, অর্থাৎ মজা নদীর সংস্কার ও খাল খনন, সে-কটির ফেরাটির প্রতিই না পশ্চিমবঙ্গ সরকার, না পশ্চিম-বঙ্গের কৃষিকর্মী দৃষ্টি দিয়েছেন।

তার ফল আজ মনোনিবেশিত হইলে ভোগ করতে হচ্ছে-বাঁকড়া, পুন্ডুলিয়া প্রভৃতি জেলাগুলিকে। প্রাকৃতিক মারাত্মক-পনর-বলি পুন্ডুলিয়ার সকল দেশকেই হতে হয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা-কর পুন্ডুলিয়ার সবই ঘটে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত সারা জগৎকে জানিয়ে হাহাকার কোন দেশ করে না। এইগুলি মৌল সমস্যা এবং যে কোন সভ্য দেশই এই সমস্যা-গুলির সমাধান চোড়া থেকেই করার চেষ্টা করে। শ্রুত ভারতবর্ষে ব্যতিক্রম, বর্ন ও উল্লেখ্যমানে পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন-মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচার-করান-প্রবর্তন-কিছু-কর্মীত-নেই।

বর্তমান মুদ্রণের সরকারের নিজস্ব আমলের একমত আবেদন যে, তাঁরা-ক্যা-রিস্ট-এই জেলাগুলির প্রতি বিন বিচার নজর-হয়ন। সুশ্রের-বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন মন্ত্রী-খরার-সংবাদ-খোনা-মাই-দুর্গত-অপলগ-দুলিতে-ঘুরে-এসেছেন। বিহারের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে-কথা-চ-বইতে-দেওয়া-কায়-না। আমলা-ক্যা, সরকারের প্রচেষ্টায় ও জনসাধারণের সহযোগিতায় আপাতত এই পরিস্থিতির কথোপকথন মোকাবিলা করা হবে।



শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণের নিবেদন (৪)

এইবার পড়াশোনার ব্যাপারে আসা দৃষ্ট। শেষ পর্যন্ত সেই চি-ভাষা সূত্রই মজার রইল, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী উভয়েই সেই সনাতন ধারাকেই মেনে নিলেন, যা কার্যত হল সেই পুরাতন মতকেই নতুন পাত্র পরিবেশন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাতৃভাষা ভিন্ন আর অন্য কোন ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে না, এই বিশ্বাস কি কংগ্রেস, কি অকংগ্রেস কোন নেতারই নেই, সেটা আরও একবার প্রমাণিত হল। আমাদের দেশের পণ্ডিত প্রেমীর মধ্যেও বোধহয় এই বিশ্বাস গড়ে উঠে নি, একতরফা রাজনৈতিক নেতাদের সোহা দেখাও বোধ হয় চলে না।

ইচ্ছা, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস থাকলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করা যায়, তা যে কোন বিষয়েই হোক না কেন, হোক না তা চিকিৎসা বা প্রযুক্তিবিজ্ঞান। মাতৃভাষার উপর দরদ দেখানোর লোকের অভাব নেই, কিন্তু মাতৃভাষার জন্য কাজ করার লোকের স্বল্প অভাব এই দেশে। আঞ্চলিক ভাষার উচ্চতর বিষয়ের গ্রন্থাবলী লেখা হয় না শুধুমাত্র একটি কারণেই, পণ্ডিতেরা লেখেন না বলেই। এর চেয়ে স্থূল সত্য আর কিছুই নেই। যে পণ্ডিত তাঁর বিষয়ের দূরত্ব তত্বসমূহ পরিপাক করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন, তা তিনি মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, একথা সোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বাংলাভাষার কথাই বলা যাক। এখানে পণ্ডিত সম্প্রদায় (যে-একজন দৃষ্টান্ত জড়িতরূপে বাদ দিয়ে) লেখেন ইংরাজীতে, কেন না ইংরাজীর বাজার ভাল, বেশি পয়সা পাওয়া যায়। প্রকাশকেরা বাংলায় এই ছাপাতে রাজী নন, কেন না বাজার স্নায়িক ভেদন পাওয়া যায় না। বাজার ঠিকই আছে, তবে ইংরাজীর চেয়ে কম। সেখানে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই বাণিজ্যিক দৃষ্টির দ্বারা পরিচালিত, সেখানে শিক্ষা-জগৎপাঠী যে বিলকুল কালোবাজারী হবে ভেবে আর লগ্নেহ কি আছে? ...

শিক্ষণীয় বিষয়টী ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা করুক, এটাই নিশ্চয় শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এই যদি হয়, ভাষা নিয়ে তবে এত কড়া

কঠিন কেন? আমাদের ছাত্রদের বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী এই চারটি ভাষা ইংস্কুল স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য, এতগুলি ভাষার মধ্যে কোনটিই তারা ভালভাবে শিখতে পারে না, অনাবশ্যক সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষণীয় বিষয়সকল আয়ত্ত করে। তারা যে আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে, তার কারণ ঐ একটিই। ছাত্রজীবনে সময় ও শক্তির অপচয়ের হাত থেকে তারা রেহাই পেয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মার্কসীট পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, ফিজিক্স, কোম্পিউট, ইতিহাস বা অর্থনীতির মত বিষয়ে শতকরা বাট ভাগ নম্বর পেয়েও অনেক ছাত্র ইংরাজীতে কার্যকর পাস করেছে, যার ফলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে স্থান পেলে তাদের ভবিষ্যৎ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অথচ এদেশে ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে সকলেই ইংরাজীর জন্য সর্বাধিক সময় ব্যয় করে। দ্বারা হিউ-ম্যানিটিজ নিয়ে পড়ছে তাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে অনাগ্রহী, অথচ এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক হবার ধরূপে অনাগ্রহী ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয়েও পাস-মার্কের বেশি নম্বর তাদের বরাতে আসে না।

ভাষা শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তার জন্য পৃথক নবোদ্ভব করলেই হয়। বিভিন্ন ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে বেছে নিলে যে ছাত্র যে ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী, তা সে শিখতে পারবে। কিন্তু শিখতে যে হবেই, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই বা থাকল। বরং মাতৃভাষার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির পরিচিতি বাতে আরও বাড়বে, তারই চেষ্টা করা প্রয়োজন। ইংরাজী সংস্কৃত এবং হিন্দী—এই তিনটি ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয়-রূপে গণ্য করলে, এবং ফাইনাল পরীক্ষায় এইগুলির জন্য পৃথক পৃথক ডিপ্লোমার ব্যবস্থা করলে সবচেয়ে ভাল হয়। এই ঐচ্ছিক বিষয়গুলি পড়ার কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। সাধারণ মেধার ছাত্ররা ঐ ভাষাগুলির একটিও না শিখে মাতৃভাষার মাধ্যমেই মাধ্যমিক বা উচ্চ

মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হোক। অবিকল্পিত হিসাবে যারা যারা ঐচ্ছিক ভাষা-গুলির একটি, কি দুটি, কি তিনটি নিয়েই পড়াশোনা করবে এবং পরীক্ষার বলবে, তাদের ঐ ভাষাগুলির জন্য পৃথক পৃথক ডিপ্লোমা দেওয়া হোক। এতে ভাষা শিক্ষায় আগ্রহও বাড়বে।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থা চালু হলে দেখা যাবে যে, ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে বেশির ভাগ ছাত্রই ইংরাজীকে গ্রহণ করবে, এটা সুনিশ্চিত। বেশির ভাগ ছাত্রের কাছেই সংস্কৃত অতি ভরসাহ বিষয় কাজেই সংস্কৃত ঐচ্ছিক হলে অনেকেই হাফ ছেড়ে বাঁচবে। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে আমাদের একটা জাতিগত দুর্বলতা আছে বটে, কিন্তু তার জন্য প্রত্যেককেই তা গলাধঃকরণ করতে হবে, তার কোন মানে নেই! কাজেই যাদের আগ্রহ আছে তারাই সংস্কৃত শিখুক, এবং ভাল করে শিখুক। তা ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এগ্রিকালচার বাইরেও খাটি ভারতীয় প্রধান সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও আছে। সেগুলির দিকে সরকারের একটু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন চতুষ্পাঠী থেকে উপাধি পরীক্ষার পাস করে প্রতি বছর বহু ছাত্র বার বার এবং তারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ কিছুটা জ্ঞানের অধিকারী হন ইংস্কুল-কলেজের এলাকার বাইরে থেকেও। এদের সংস্কৃত জ্ঞানের ব্যবহারিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে যেন তিনি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করেন। আমি যদি সাহিত্যের ছাত্র হই, ইংরাজী সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস মাতৃভাষার মাধ্যমে কেন আমি আয়ত্ত করতে পারব না? শিক্ষামন্ত্রী নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, লেগুই ও কাজামিয়া ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছিলেন নিজের মাতৃভাষা ফরাসীতে, ফরাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। গ্রন্থটি এতই উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে, পরে সেটি ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছিল। কাজেই ছাত্রদের বাড়ে তিন-চারটি ভাষা শিক্ষার গুরুতর বোকা না চাপিয়ে মাতৃভাষাকেই শিক্ষা-দানের মাধ্যম করলেই ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে প্রকৃত বিদ্যালয়ের সুযোগ উপস্থিত হবে। (৫।৬।৬৭)

আজ আমাদের জাতির পরম সম্পদ,
জ্যোত্স্না পুরস্কারপ্রাপ্ত, বিশ্ববরেণ্য,
কবিকল্প রবীন্দ্রনাথকেও যে অসম্মানের
বোঝা বহন করতে হয়েছিল, নানা
ধরনের বিরুদ্ধ সমালোচনা ও বিদ্বেষ-
জনিত যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছিল,
তা ভাবলে শূদ্ধ বিস্মিতই হতে হয় না,
নিদারুণ পরিতাপও বোধ করতে হয়।

তৎকালে যারা কবির বিরুদ্ধাচরণে
অগ্রণী ছিলেন, তাদের মধ্যে খ্যাতিমান
বিশ্বজনও ছিলেন অনেক। তবুও তারা
যে কবির প্রতি প্রাধান্য হরে তার
সম্বন্ধে কটুক্তি করতে কুণ্ঠিত হন নি,
তার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ব্যক্তি-
গত অসুখ ও অসহিষ্ণুতা। একে ঐ
রূপলাবণ্যে ভরা কন্দর্পকান্দি, ধনীর
ঘরের দলাল, গতানুগতিক থেকে চাল-
চলনে ও পারিবারিক আভিজাত্যে
লোকলের থেকে যেন একটু স্বতন্ত্র, তার
ওপরে কাব্যলক্ষ্যীর বরণে হয়ে, অজস্র
সুন্দর সঙ্গীত ও কাব্যরসধারার প্রবণে
বর্ণনের অনুবর্তন মানসভূমিকে রসান্বিত
করে তুলেছেন, সেক্ষেত্রে মানুষের পরস্পর-
কাতর মন উত্তেজিত না হয়ে পারে না—
হিংসার অনলে দহ হরে উক্ত গুণসম্পন্ন
মানুষকে হের প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে-
পড়ে লাগে।

এবং সে 'লাগা'র লোক আজও
একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তবে
সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সংখ্যায় তারা
অত্যন্ত নগণ্য এবং তাদের বক্তব্য বিদগ্ধ-
সমাজ কর্তৃক হের, অধৌক্তিক ও
অশালীন প্রতিপন্ন। প্রাচীন রবীন্দ্র-
বিশ্বেষীদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে,
তারা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তার
সম্পর্কে যা-তা বলেছেন, আর এঁরা
কবির অবর্তমানে বালসুলভ লক্ষ্যবিক্ষেপে
রবীন্দ্র-যুগের অবসান ঘোষণা করতে
উদ্ভোগী হয়েছেন। এই অর্বাচীনদের
সম্পর্কে শূদ্ধ এইটুকু বললেই যথেষ্ট
হবে যে, মহাকবি বা মহাকাব্য প্রচণ্ডের
অবিনাশী সত্তাকে এ ধরনের মানুস তো
কোন ছার, কালও কোনদিন বিস্মৃতির
অতলে তলিয়ে দিতে সক্ষম নয়।

ভারতের এই ক্ষণজন্মা অসাধারণ
সাহিত্য গুণসম্পন্ন কবির অনন্যসাধারণ
কাব্যশক্তির রসান্বাদনে তাঁর সমসাময়িক-
কালের বোম্বাদের অনেকেই ঠিক ঠিক
তাকে বুঝে উঠতে পারেন নি এবং
অনেকক্ষেত্রে কবির বিশ্বজনীন ভাবতত্ত্বের
গভীরতাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন
নি। তদুপরি তারা রবীন্দ্রনাথের
অনাম্বাদিতপূর্বে কাব্যরসধারাকে বিদেশীয়
ভাবধারার বাহক এবং তাঁকে স্বজাতদ্রোহী
মলে অভিযুক্ত করতেও কুণ্ঠিত হন
নি। অবশ্য এ সকল উক্তি কবির
জীবদ্দশাতেই হাস্যকর, মিথ্যা ও

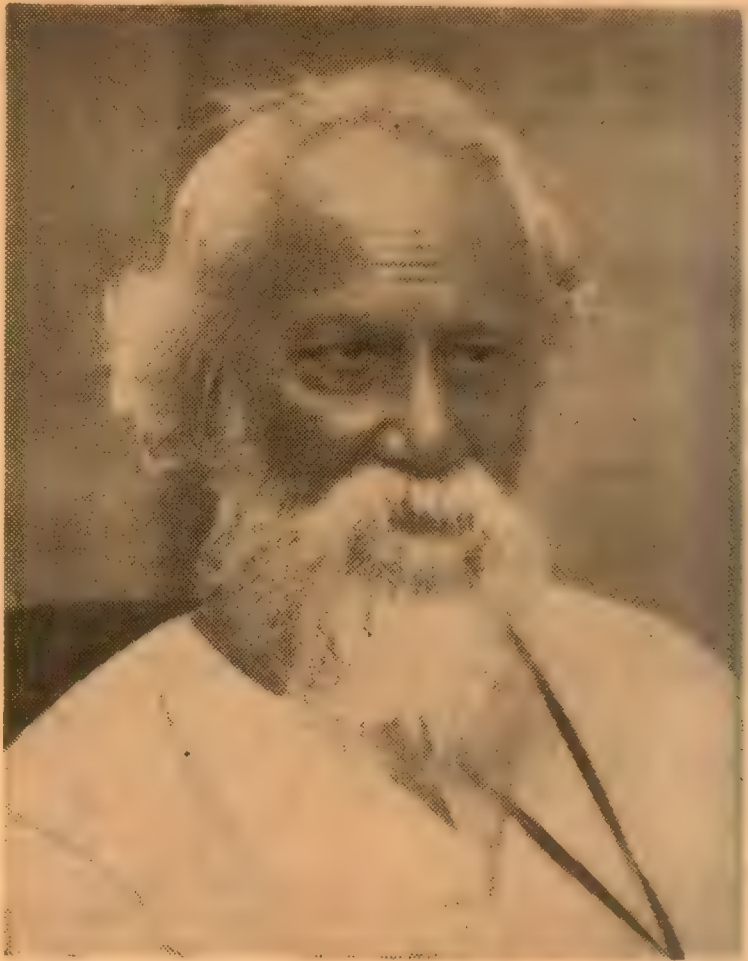
রবীন্দ্র-বিশ্বেষীদের কথা ৩ বিত্ত মুখোপাধ্যায় ৩

ঘাতালের আশ্বাফলন হিসাবে গণ্য হলেও,
সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক
নিদর্শন আজও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

প্রাচীন দৈনিক 'নায়ক' পত্রিকার
সম্পাদক ও সাহিত্যিক বে পাঁচকাড়ি
বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্প্রতি আমরা গ্রন্থা
জনালাম, সেই পাঁচকাড়ি বাড়ুজ্যে ছিলেন
খ্যাতিমান রবীন্দ্র-বিশ্বেষীদের মধ্যে
অন্যতম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে
'বাংলা ভাষা' নামক একটি রচনার মধ্যে
তিনি বলেছিলেন—

“বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের যে আকার
ঠিক করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর সহজে

বদলাইবে না। বিস্ময়জনক ছাঁচের উপর
একটু কারিকরী করিয়াছিলেন মাত্র, ছাঁচ
বদলান নাই। রবীন্দ্রনাথ ছাঁচ বদলাইতে
চাহিতেছেন, তাহা হইবার নহে। কারণ,
বিদ্যাসাগরী ছাঁচ বাংলার সর্বত্র পঞ্চাশ
বৎসরকাল স্কুলে, কলেজে, পাঠশালার
সমানভাবে চলিতেছে, সকল সমাচারপত্র ঐ
ছাঁচে লেখা। যেমন বিদ্যাসাগরের টাইপের
কেস বদলাইবার উপায় নাই, তেমনি
ভাষাও বদলাইবে না। উহা যে সর্বজন-
সমাদৃত ও ব্যবহৃত। উহার ব্যাপ্তি
অত্যধিক, উহার গভীরতা প্রচণ্ড। একা
রবীন্দ্রনাথ জনকরেক চালাচামুড়ার



[শ্রীশঙ্কু সাহার সৌজন্যে]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্য-কবিতার এই বদলারিত পটভূমিতে নারী-একচেঁয়া আশ্রয় স্থির জ্ঞান খালিরাই বৈরাগী-চন্দ্রকে এড়াইন হাঙ্গরা উড়াহারা দিয়ারা, পরেও দিবা। রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি হউন না, যেমন মেধাবী অনন্দবী হউন না, কিস্যামিতের স্মৃতি কামবার উৎকট সাধনা তাহার নাই। তিনি বিদেশের চাকুরি হইলেও, স্বদেশের হৃদয় জ্বালাতন দেখতা হইতে পারেন নাই; তাহার জন্মের ব্যাপ্তি নাই, বিস্তার নাই—হইবেও না। কলিকাতার ছোকরা-ঘরো তিনি কবি হইতে পারেন, শব্দ-লিখ দুই একজন সাহিত্যসেবীর স্মৃতি-ভাঙার হেতু তিনি হইতে পারেন, কিন্তু বাণাল্যের সম্মরণ শিকিভসনাজে তাহার প্রভাব বড়ই কম। তিনি মর্জান ব্যাচারা ব্যাচকেন, ভতর্দিন একটা ইজুক চলিতে পারে—চলিতেও। তাহার দেশের মনজনে নইয়া চলে, তাহার রবির স্পন্দনে অবেশিয়া করে। তবে স্বেচ্ছাচারের শাসন হওয়া কতখান।

ব্যক্তিগত আক্রোশ-আলোচন প্রমোদিত এবং হাস্যকর ও যুক্তিহীন এই সকল উক্তি শুধু আভ্যন্তরীণ মনেই নয়, সেই সময়েই প্রকাশিত হইয়াছিল বহু অসত্য এবং প্রায় বাস্তবের প্রকাশের মত।

ফেলদয়ার এই পটভূমিতে বন্দো-পাখারই নয়, ভবকালের সন্মোচক হিসাবে ব্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কবাবিশারদ, বিখ্যাত নাজিকর ও কবি বিজেন্দ্রলাল রায়, আর্যসম্মতি পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাস, ললিতকুমার কল্যাণপাখার, অক্ষয়কুমার রায়, বিজয়-চন্দ্র মজুমদার, নিত্যকৃষ্ণ বসু, অকিঞ্চন দাস, অরাসিক রায় (ছন্দানন্দ) প্রভৃতি ব্যাত জখ্যাত বহু ব্যক্তি কবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে অপমান ও বিদ্বেষাখ্যক সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। স্বদেশবাসী নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী' নামক গ্রন্থের মধ্যে এবং 'রাজা ও রানীর সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথের ভুল ভুলে গারে যে সম্পর্কে বলেন—

“রাজা ও রানীর অধিকাংশ চরিত্রই কতকটা বহুসাম্য। যেন অগাধোড়া সম্মতি নাই। প্রথমে বিজয়দেবের চরিত্র বরা বাক। বিজয়দেব কিস্যাপরায়ণ বটে। প্রেমের গান্ধীবীর অপেক্ষা উদ্ভাসতাই তাহাতে বেশী বর্তমান। প্রকৃত প্রেম যে কমান্বক ও বহির্বিভিন্নক ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। তিনি উহাকে কেবল দ্বিরাহীন ভোপের বলিয়াই জ্ঞান করেন। এরূপ চরিত্রের নিপরিবর্তন দেখাইতে হইলে উহাকে কর্মক্ষেত্রে

কিনারা ফেলিতে হয়। কবিতা তাহা কিস্যাহেন। কবিতা যত্ন করে কবিতার হৃদয় সে পুরাতনের স্মৃতি স্মাধারা ভাঙতেছে, কবি তাহাও দেখাইয়াছেন। ইহা স্মাভাবিক। কিন্তু কবিকে অবশেষে একটু স্মান্ত কবিতাও নাই। কবি বিজয়দেব আবার 'নব প্রেমের' জন্য ফেলিয়া তুলিলেন কেন? ইহার প্রান্ত বিজয়ের প্রেমের নিত্যন্ত ইজর অনোচিত হইয়াছে।”

এই যথেষ্ট আলোচনার মধ্যে শুধু কিছুই বাক্তি ও বিশেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিজেন্দ্রলাল যেভাবে চিত্রাঙ্গদার আলোচনার মধ্যে কবিকে আঘাত করেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত আক্রোশ ব্যতীত এ যন্ত্রের নিম্নস্বাচরণ সচরাচর সাহিত্যক্ষেত্রে কখনোই দৃষ্ট হ'ত। অতএব এই 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কেই প্রথম চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদে ১৩৩৪ সালে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তার মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কৃতিত্বের কথা সমাজ ও কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে লেখিয়াছেন এবং বলেছেন—

“চিত্রাঙ্গদা যে দুশমনের বন্দু কামনোকে নয়, তা বীর অন্তর চোষ আছে তিনিই প্রত্যাক করতে পারেন। যাদের তা সেই অর্থাৎ বীর অর্থ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বুঝা।”

প্রথম চৌধুরী এই সামান্য উক্তি-টুকুর পরে বিজেন্দ্রলালের 'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধে বহুবারি পাঠ করেন বিশ্মিত হইতে হয়। বিজেন্দ্রলাল বলেছেন—

“এই গল্পটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই গদ্যময় বোধ হইল। কন্যার পিতার সম্মতি জইয়া, কন্যার সম্মতি জইয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা—এ তো সকলেই করে। রবীন্দ্রবাবু যদি তাহা করেন, তাহা হইলে যে কাসমেবের মাশে তাহাকে নামিয়া যাইতে হইবে। রবীন্দ্রবাবু কোর্টশিপের অবতারণা করিলেন। হউক না অসম-ভাবিক, নুতন ব্রহ্ম তো হইল। 'দুর্ভাগ্য' না হয় দুর্ভাগ্য—একটা নতুন হইবে রবীন্দ্র কোর্টশিপ নাইলে প্রেম হয়।

“রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের গল্পাংশ এই—কন্যাকে অর্জুনকে দেখিয়া উলখাচিকা হইয়া কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাহাকে আশ্র-সমর্পণ করেন। অর্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের রূপ ধারণ করেন। অর্জুন তখন সম্মত হইলেন। অর্জুন সেই অনুভূতি কন্যাকে বর্ষাকাল ভোগ করেন। তাহার পরে তাহাদের (বোধ হয়) বিবাহ হয়।

“অনুভূত কোর্টশিপ! এ কোর্টশিপে একজন সামান্য ইংরাজ নারী সম্মত হইত

না। কিন্তু কন্যা একজন বিন্দু, কবী ব্যাচারা লইলেন। সম্বন্ধে।

“রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিস্যে কবিতা পদ্য কবিতা উচিত কিস্যাহেন, দেখেন। একজন সে কোন জয়সংজ্ঞা এরূপ কবিতা তাহাকে কন্যার একাসনে বসিতে দিতে চাইতাম না। অর্জুন একজন কুরূপার কর্মকর্তা করিলেন। একটু ইত্যদ্য করিলেন না, যেন একটু আর শিখা হইয়া না। রবীন্দ্রনাথ থানিয়া একটি জয়সংজ্ঞা সন্মোদন করিলেন। আর তিনি যে-সে ব্যক্তি নহেন, তিনি অর্জুন—রাজপুত্র পুত্রপাণ্ডবের একজন, ঐক্য বাহার নারী করিলেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে উর্ধ্বশরীর প্রেমও প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন! তিনি বেশ্যাসাধিতও অনুচিত বিবেচনা করিলেন, তিনি রবীন্দ্রবাবুর হৃদয়ে পড়িয়া অন্যভাবে একটি রাজকন্যার ধর্মদাশ করিলেন।” (‘কাব্য-নীতি’ নামক ‘সাহিত্য’ পত্রিকার (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) প্রকাশিত নিবন্ধের অংশ-বিশেষ)।

বিজেন্দ্রলালের এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে ভবসমসারিককালে সাহিত্যসমাজে বিশেষ আলোচন ঘটিত হয়। যে ‘সাহিত্য’ পত্রিকার ‘চিত্রাঙ্গদা’র এই আলোচনা প্রকাশিত হয়, এ সালের কার্তিকমাসেই উক্ত পত্রিকার রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনু-রাগী বন্দু প্রিয়নাথ সেন, বিজেন্দ্রলালের বিরূপ ও নিন্দাসূচক মন্তব্যের সম্বন্ধিত উত্তর দান করেন। এই সময় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ও উক্ত ‘সাহিত্য’ পত্রিকার ‘চিত্রাঙ্গদা’র আখ্যাতিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

“চিত্রাঙ্গদা কাব্যখানি সূন্যীতি কি সূন্যীতি প্রচার করিতেছে, নারিক অজাতোপদ্রব্য নববোবনা চিত্রাঙ্গদা সলজ্জা কি নিলজ্জা, নারিক সাতুলী-কন্যাহারী কুরূপা অর্জুন লম্পট কি জিতেন্দ্রিয়; এবং কাব্যপ্রণেতা রবীন্দ্রনাথের বুচি মৃ কী কু, এই সব কথা জইয়া কয়েক মাস ধরিয়া সাহিত্যের আসনে একটি ঘোঁট চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের যশঃ-সুখের কালমেঘরূপ বিজেন্দ্রলাল ‘সাহিত্য’-আকাশে উড়িত।”

‘হিতবাদী’ পত্রিকার সম্পাদক কালী-প্রসন্ন কবাবিশারদ ছিলেন রবীন্দ্র-নিন্দার আর একজন বিখ্যাত ও যন্ত্রণার ব্যক্তি। ১২৯৩ সালে (১৪ই নভেম্বর ১৮৮৬) অশ্রুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের ‘কড়ি ও কোমল’ প্রকাশিত হলে, কবাবিশারদ তার বিদ্বেষাখ্যক সমালোচনা করে একটি পুস্তিকার প্রচার করেন। এই পুস্তিকার লেখকের ছদ্মনাম ছিল ‘রাহু’ এবং পুস্তিকাকর্তার আসল নাম ছিল, ইহা কবিতা নহে, তোমার নহে, শুধু সুরে মিটে কবিতা।

সাহিত্যিক মনোভাব

মনোভাবের পাত্রিক-পাত্রিকাদের অব-
স্থার জন্য এখানে এই পুস্তিকার দু-
চারটি পত্রিক উদ্ভূত করা হল—

“আর তোরা কে দেখতে বাব
ঠাকুর বাড়ী মস্ত কবি!!
হায়রে কপাল হায়রে অর্থ!!
মার নাই তার সকল ব্যর্থ!!”

* * *

“উড়িস্নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোর বক্বকম আর ফোস-ফোসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা।”

সর্বসম্মত আটটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদ
ছিল পুস্তিকাটিতে। প্রথম ‘গ্রন্থ সূচনা’,
দ্বিতীয় ‘মধুরার’, তৃতীয় ‘পুলক নাচিছে
গাছে গাছে’, চতুর্থ ‘নরবস্ত’, পঞ্চম
‘পান’, ষষ্ঠ ‘বন্দনা’, সপ্তম ‘স্বপ্নের
প্রেম’, অষ্টম ‘স্বপ্ন দর্শন’। প্রত্যেকটির
মধ্যেই সমিল লেখ্যাক ইঙ্গিত আছে
কবি সম্পর্কে। প্রত্যেকটি থেকেই কয়েক
ছত্র করে তুলে দিতে পারলে বিষয়টি
আরও স্পষ্ট হত নিঃসন্দেহে, কিন্তু তা
স্থানাভাবে উপস্থিত এখানে সম্ভব নয়।

‘সাহিত্য’ সম্পাদক ও সমালোচক
সুরেশচন্দ্র সমাজপাত সেকালে সাহিত্য-
ক্ষেত্রে একজন দিকপাল গোছের লোক
ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি কিছুটা
রবীন্দ্র-বিশ্বেষী হয়ে উঠলেও, পরবর্তী-
কালে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী হয়ে
ওঠেন। ‘রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’
উপন্যাস সম্পর্কে’ তিনি যা লিখেছিলেন,
শুনুন—

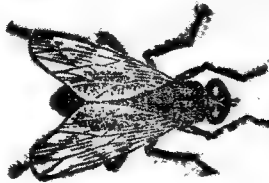
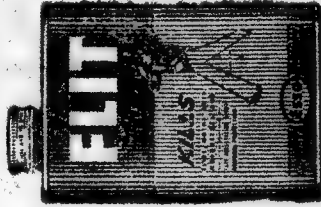
“রবিবাবুর এই বই অত্যন্ত
‘বঙ্গদর্শনে’ বাহির হওয়া বন্ধ হইলেই
বোধ হয় ভাল হয়। (অনেকের ধারণা
এটি তিনি ‘সাহিত্যে’ প্রকাশ করতে
চেষ্টাছিলেন, কিন্তু তা না হওয়ার ক্ষ-
য়)। কারণ, তাহার এই ‘চোখের বালি’
বঙ্গিমবাবুর হউক, তাহার হউক বা
আর যাহারই হউক, ‘বঙ্গদর্শন’ের মধ্যে
চুনকালী মাখিয়া দিতেছে। তাহা এক-
বারের জন্য হইলেও হইত। মাসে মাসে
পূর্বনামজাদা ‘মান্যমান’ লোকের মধ্যম
চুনকালী মাখানটা ভাল দেখায় কি?”

শশাঙ্কমোহন সেন কবি ও প্রবন্ধকার
হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর মধুসূদন,
বঙ্গবাণী, সাবিত্রী নামে কয়েকখান
গ্রন্থও আছে। ‘বঙ্গ সাহিত্যের বর্তমান
অবস্থা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (‘সাহিত্য’,
১৩১২, ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) রবীন্দ্র-
নাথ সম্পর্কে নিত্যকৃৎ বসুদ্র মতই অত্যন্ত
সংযতভাবে একস্থানে লিখেছিলেন—

“ইদানীং রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভাবকে
আবৃত ও আচ্ছন্ন করিতেছে। চিত্রার
কবিতাপদলি তাহার উজ্জ্বল মন্ডলিত।
ছন্দের নৃত্যে, ভাষার স্বাক্ষরে, আকুলতার
আবেগে, ভাবের সুচিকণ সুস্বরশ্মি ভূবিয়া
গিয়াছে। অনেক স্থলে আশ্রিত পদার্থ

অনুভব করা দার হইয়াছে।...তিনি
উপন্যাস রচনার সিংখলাভ করিতে
পারেন নাই।” এই শশাঙ্কমোহন সেন বা
নিত্যকৃৎ বসু প্রভৃতিদের ঠিক রবীন্দ্র-
বিশ্বেষী না বলে রবীন্দ্র-সমালোচক
বলাই উচিত মনে করি।

কিন্তু সত্যাকার রবীন্দ্র-বিশ্বেষী



এই হল মাছির ঘর — লাল টিনে ফ্রিট

এই হল মাছি

রাহি, বর্ষাঊষ্মাত উৎকণ্ঠা পোকাকীড়সমূহ কয়র ভয়ে আপনাবাড়ীতে
শ্রো দিয়ে ফ্রিট ছড়িয়ে দিও। পাঁচটি শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থের সম্মিশ্রণে
তৈরী লাল টিনের ফ্রিট হ'লোব কাছ করে : পোকাকীড়গুলোকে লক্ক-লক্ক
করু'র মাটিতে কেনে এবং একই পরেই ওরা মরে যায়।

রাহি কয়র বত দেওয়া জায়গার। সাংখ্যাতিক রকমের নানা বীজীমু
বের বেড়ায়, আর টাইফয়েড ও কলেরার মত দারুণ মহামারী রোগ
কটি করে। আপনাবাড়ীতে যখনই মাছির উপদ্রব দেখা দেবে, মধু-
কম ওষুধের প্রয়োগ করবেন।



আপনাবাড়ী রক্ষা করে ফ্রিট
— পৃথিবীর সেরা কীটনাশক।

পোকাকীড় টিনে ফ্রিট
সব-সঙ্গে বাথরুম করার
মত জরুরি তিনিস :
পারিসৌল ও ছাত্রশালা
কলুগিই মরে যায়।

এসো স্ট্যান্ড ইকান, ইনক. (প্ৰাইভেট লিমিটেড) কলকাতা

ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের নাম অনেক বিচ্ছিন্ন পাঠকেই আচ্ছন্ন করেছে। নিঃসন্দেহে, গ্রন্থখানি অধুনা দুঃপ্রাপ্য হলেও, এই গ্রন্থে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা ধরনের বিরুদ্ধ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকার গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত হয়েছে, "কবির রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যু নিতুই নব'। তাঁহার নিকট আজ যাহা 'হা' ভাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যনীতি প্রভৃতি সকল রকম নীতিতেই কবিরের মত নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। এই সকল কথাই এই পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।"

চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রায়শই অমরেন্দ্রনাথ রায়ের মত প্রকাশিত হত। একবার উক্ত পত্রিকায় 'কঠোর সমালোচনা' নামক একটি নিবন্ধের এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি বলেন, "কঠোর সমালোচনার আঘাত রবীন্দ্রনাথ খুব অল্পই সহ্য করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই লক্ষ্য আঘাতের ফলে সে তাঁহার একটু উপকার হইয়াছিল, সে কথা তিনি আজ কেন বিস্মৃত হইতেছেন? কেন ছলিয়া যাইতেছেন যে, রাহুর করলে না পড়িলে তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' এর বিবর্তীয় সংস্করণ অতটা আকর্ষণীয় হইত না।"

অতঃপর সামান্য আর দু'চারজনকে কথা উল্লেখ করেই এই আলোচনার সমাপ্তি রেখে টানবো। উপযুক্ত আলোচিত ব্যক্তিদের তুলনায় এ'রা সফরী বা এরণ্ড বিশেষ হলেও, সেকালে রবীন্দ্র-বিশ্বেষীদের মধ্যে একাও বাহবা পেয়েছিলেন। এ'রা হলেন নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য, কবি গিরিজানাথ মধোপাধ্যায়, '২৪ পরগণা ব্যতীত' পত্রিকার সম্পাদক অকিঞ্চন দাস ও অরসিক রায় (জজ্ঞানী-কান্ত দাসের ছদ্মনাম) প্রভৃতি লেখকরা।

রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থ প্রকাশের পর বাড়লা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেকেই কবির ভাষা বিষয়ক উক্তিগুলি সম্পর্কে একমত হতে না পেরে, নানাবিধ হুজুর অবতারণা করে কবির ব্যাকরণ জ্ঞানকে ভ্রমাত্মক অর্থোক্তিক বলে বিদ্রূপ করেন। নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও গিরিজানাথ মধোপাধ্যায় এই দলের অন্তর্ভুক্ত। নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য উক্ত সময় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

সম্পাদিত 'নবভারত' (১০১৮, ক্রান্তিক) মাসিক পত্রিকায় 'রবীন্দ্র-কীর্তি' নামক একটি নিবন্ধের মধ্যে লেখেন—

"যখন কবির কদম্বভূত 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থ বেঙাচির মত সাহিত্য-সরস্বতীতে সাতার দিল, তখনই বুদ্ধিমানেরা যে, অচিরে লেজ পরিহার করিয়া উহা লক্ষ্য-প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে।

"কিন্তু এ যে বেজায় লক্ষ্য! ভাষার Phonology প্রভৃতির সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিরঙ্কুশ কবির ব্যাকরণ অতি দীর্ঘ লক্ষ্য দিতেছে।...ভাষার এই অবাধ নিরঙ্কুশ প্রলম্ব, পূর্বে 'সাহিত্য'-সম্পাদক একটু দমন করিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি হয়ত এখন 'মৌনং হি শোভনং' বলিয়া গা-ঢাকা দিয়াছেন।... আমাদের বিশেষ অনুরোধ তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যেন অধিকার চর্চার ব্যাপ্ত হইয়া অস্তিত্ব সাহিত্যের সৃষ্টি না করেন।"

কবি গিরিজানাথ মধোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের নতুন ভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রতিকূল একটি আলোচনা প্রকাশ করেন 'সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার' নাম দিয়ে। প্রধানত প্রবন্ধটিতে 'বীরবলী' কথা ভাষার প্রতি তিনি কাল কেড়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথ তুমি আর যাই কর, সাহিত্যের মাথা খাইও না—সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত উন্নত আদর্শকে খর্ব করও না।"

আজ এই সকল উক্তি যে কত অসার ও অর্থোক্তিক তা বিজ্ঞানমাত্রেরই উপলব্ধি করতে পারবেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব জাতীয় মন-মানসের যে কি পরিমাণ পরিবর্তনসাধন, এবং ভাষা ও ভাবের উন্নতিবিধান করেছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অবশ্য অতীতকালের সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রিকালজ্ঞ কবির মত ভবিষ্যৎকালের কথা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব ছিল না সত্য, কিন্তু তা হলেও, সৃষ্টিহীন অনেকের এই সকল বিরূপ ও বিদ্রোহিত উক্তি কবিকে যে পীড়িত করেছে, ব্যাখ্যাত করেছে, তাঁর ভাব-চেতনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, একথা ভেবেই আমরা আজকের মানুষ বেদনাবোধ করে থাকি।

কবি-বিশ্বেষীদের মধ্যে আর এক-জনের কিছু প্রলাপোক্তি এখানে উল্লেখ করে এই নিবন্ধ শেষ করছি। '২৪

পরগণা ব্যতীত' সম্পাদক অকিঞ্চন দাস তাঁর 'ভেঙ্কীবাজি' নামক একটি প্রবন্ধের মধ্যে এমন কতকগুলি উক্তি করেন যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য। তিনি বলেন—

"ভেঙ্কীবাজি, জগতে চিরদিন টিকে না, মানুষের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভেঙ্কীবাজিও চিরকালের মত অবসানপ্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শব্দ, তাহার জীবন-কাল পর্যন্ত। অতঃপর আবার বাঙালী-সাহিত্যে নবযুগের উদয় হইবে। আমি সাহিত্যের প্রকৃত প্রীত্ব চাই; তাই দেশের ও দেশের দিকেও আমার চাহিতে হয়। কবিজনোচিত মানের অপেক্ষা ব্যর্থ অনুকরণ লাগসাই তাঁহার বেশি।...

"রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃত আন্তরিকতারই প্রধান অভাব। আন্তরিকতা গুণেই প্রতিভার পরিচয়—সে পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভিতর বড়ই অল্প। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই বাহ্যিককরণ। তাহা কানের ভিতর দিয়া সরাসরি পশে না। তাহার কারণ কি?—তাহার কারণ অনুকরণ।...

"রবীন্দ্রনাথের ভাব যেমন বিকট, ভাষাও তেমনি উদ্ভট। এ মনগড়া ভাষা কতদিন টিকবে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ আছে।...অতঃপর রবীন্দ্রনাথের মনে একটা অহংকার আছে যে, তিনি তাঁহার প্রাদেশিকতা-দুষ্ট ভাষায় দেশের চাষা-মজুরদের বেশ বঝাইতেছেন। হয় ভাষা, যে ভাষা রজেন্দ্র শীল প্রভৃতি স্বপ্নজন্মা পণ্ডিতগণই বঝিতে পারেন না, সে ভাষা চাষী-মজুর কেমন করিয়া বঝিবে? মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি বলিতেছেন, 'এ ভাষা ও ভাব লেখকের ভাষা ও ভাবদৈন্যের সূচক। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের বঝাইবার চেষ্টা একটি ভুল মাত্র।"

এককালে এই ধরনের কদম্বভূত অসূয়া বিষে জর্জরিত হয়ে রবীন্দ্র-বিশ্বেষ প্রচারে উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন সত্য, এবং তাঁরা এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা কবিকে খুবই যন্ত্রণা দিচ্ছেন মনে করলেও, কবি হয়ত তখন এই সংস্কৃত বচন দুটিই চিন্তা করেই নিশ্চিন্ত থাকতেন যে, উপদেশো হি মধোপাধ্যায় মধোপাধ্যায় ন শান্তয়ে, এবং 'কীর্তি'র সা ম জীতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সিঁহস্মৃতি

পট্টমল গোস্বামী

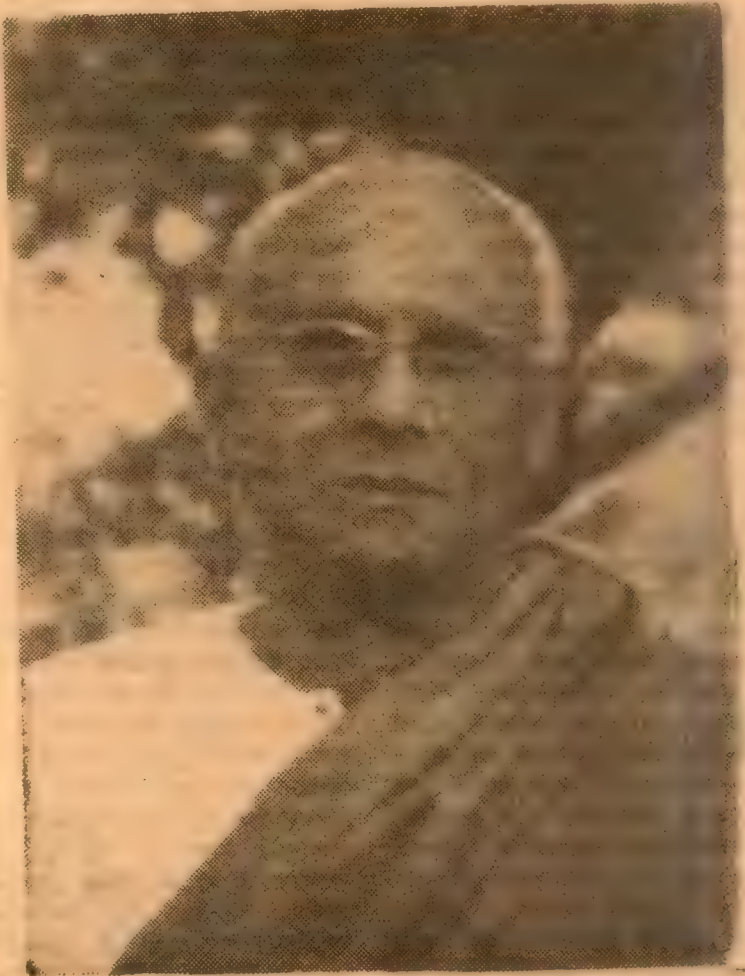
বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি (১৮৬৮-১৯৬১) ছিলেন। একথা অনেকে শুনে থাকবেন, কিন্তু তিনি যে বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন, এ কথা অনেকেই জানবার কথা নয়। না জানবার কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজের। তিনি খ্যাতির অন্তরালে বাসই বেছে নিয়েছিলেন সমস্ত জীবন। তাই তিনি শব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ বংশধররূপে পরিচিত, তাঁর নিজস্ব সন্তাকে, নামা কৃতিকে, পৃথকভাবে পিতার খ্যাতির বাইরে তুলে ধরতে অনিচ্ছুক হয়ে রইলেন। খ্যাতির সিঁহস্মৃতি রইল পিতার দিকে, তিনি নিজেকে রইলেন আড়ালে। এর একটি কারণ তাঁর নিজস্ব নক্সা, আর একটি কারণ, পিতার প্রতি কত ব্যবোধ। কোনো প্রাণীর লেহকোষ-গুণি পৃথকভাবে জীবিত থাকলেও যেমন তারা একমাত্র দেহের উদ্দেশ্য সাধনেই নিযুক্ত থাকে, এবং যতদিন দেহধারীর ব্যক্তিসত্তার মৃত্যু না ঘটে, ততদিন জন্মের আগর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি এ কোষ-প্রকৃতির বিশেষণে চিহ্নিত করা যায়। তিনি পিতার প্রতি মমত্ববশতঃ, এবং হয় তো বা সমবেদনাবশতঃ, পিতার উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় সাধনেই নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনে একের পর এক যে সব আত্মীয়-বিরোগজনিত মর্মান্তিক শোকের ধাক্কা এসে লেগেছিল, তা কিছু পরিমাণ তুলে থাকার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর একটি নির্ভরযোগ্য প্রধান অবলম্বনরূপে পেতে চেয়েছিলেন মনে মনে। এবং রবীন্দ্রনাথও পিতার জীবনের শূন্যতা অনুভব করে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আত্ম-ত্যাগের কঠিন পথকেই নিজের পথরূপে বেছে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ ত্যাগের মূল্য অননুভূত ছিল না। তাই তিনি পুত্রের পঞ্চাশতম জন্ম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন—

...“তপস্যায় ফল তব প্রতিদিন ছিল
সমর্পিত
আমারি খ্যাতিতে।

তোমার সকল চিন্তে
সব বিস্তে
চাঁদঘোষ অতিমুখে পথ দিতোছিলে
মেলে
তারি লাগি যশ নাই পেলে।
কর্মের যেখানে উচ্চ দাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে এক পাশে।

বিদায় গ্রহের রাঁধ দিমান্তের অন্তনত
চায়
রেখে বাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের
ক্ষেত্র পরে।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ছাপ প্রকৃতির
ছিলেন। নিজের দৃষ্টান্তসম্মত বাইরে
মেলে ধরে কারও সহনশীলতা অকর্মণ্যের
ক্রোড় দ্বারা সেই সব দৃষ্টান্তসম্মত পরিণত।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নষ্ট করতে চান নি। নিজের ইচ্ছাকে জোর করেও কারও উপর চাপান নি। সবাই তাঁর ইচ্ছা বুঝে নিয়ে সেই ভাবে চলতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'পিতৃস্মৃতি' নামক বইখানি পড়তে পড়তে অনেক ছবিই জেগে উঠছে আমারও মনে। এ বইতে তাঁর বক্তব্য যে সূরে বলা, তার মধ্যে কোথাও অহংকার নামক কোনো বস্তু নেই, তিনি নিজেকে যেমন বিনয়ী, মধুরভাষী, এবং উদার ছিলেন, তাঁর লেখার প্রতিছব্রে তা ফুটে উঠেছে। আমি নিজে তাঁর সামিথ্যে এসেছি এবং আমার কয়েকটি সমস্যার তিনি যেভাবে অভ্যস্ত সহজে সমাধান করে দিয়েছিলেন, তা তাঁর দিক থেকে তুচ্ছ হলেও তারই ভিতর দিয়ে আমি তাঁর চরিত্রমাধুর্য এবং অহংকারহীনতার রূপ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি। তাই তাঁকে আজও আমি একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু বলে মনে রেখেছি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, “মনস্তত্ত্বে থাকে বলে হীনমন্যতা তা আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বড় হয়েও তা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি বলতে পারি না।”—এই সামান্য আত্মবিশ্লেষক একটি কথাতেও তাঁর স্বভাব অনেকখানি প্রকাশিত। এবং এ বইয়ের লিখনভাষা এ কথার সমর্থন করবে। কোথাও নিজেকে বাড়াবার চেষ্টা করেন নি, বিজ্ঞানীর মতোই যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সব কণনা করে ক্ষেত্রে। তিনি অহংকারশূন্য ছিলেন, অমায়িক ছিলেন এবং কোন্ডের মূহুর্তেও অনুভূতিজিত থাকতেন। এ কথায় কিছুর মাত্র অতিশয়োক্তি নেই। এর আগে রবীন্দ্রনাথ কতখানি রবীন্দ্রানিত্য ছিলেন, তাঁর আভাস দিয়েছি। আমি নিজে একটি অতি কৌতুককর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি পিতার এই পুত্রানিত্যতা বিষয়ে। ১৯২১ সনের শরৎকালীন ছুটির অবসরবাহিত পূর্বের ঘটনা। ঋণশোধ নাটক অভিনীত হবে শান্তিনিকেতনে। তার পূর্ব দিন রবীন্দ্রনাথ পথে বোরিং এসেছেন ঘর থেকে। একটা জরুরী নির্দেশ হয় তো দিতে হবে নাটক সম্পর্কে। সম্ভার কিছুর আগের ঘটনা। বাইরের অতিথি সমাগম হয়েছে প্রচুর। এমন সময় চার-পাঁচজন বহিরাগত এসে প্রণাম করে রবীন্দ্রনাথকে প্রায় বেঞ্চন করে আলাপ জুড়ে দেবার উপক্রম। রবীন্দ্রনাথ বিপন্ন বোধ করে উদ্ভিষ্ট দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাইতেই দেখেন রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু দূরে অন্যদিকে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ “রবী, রবী,” ডাকতে ডাকতে হঠাৎ আলাপোদ্যত বেঞ্চন ভেঙে দ্রুত পা চালিয়ে রবীন্দ্রনাথের দিকে ছুটলেন। ঘটনাটি স্মৃতিচরিত্রে বর্ণিত আছে। আর

সেখানে উপস্থিত থেকে দেখেছি সেদিন রবীন্দ্রনাথ পিতাকে কিভাবে রক্ষা করলেন। এই কৌশল অবলম্বন না করলে সেদিন রবীন্দ্রনাথ সহজে আত্মরক্ষা করতে পারতেন না।

পিতৃস্মৃতি এই পুত্রানিত্য পিতারই স্মৃতি। নিজের এত বিদ্যা, অচ্যুত তা প্রধানত পিতার তত্ত্বসাধনে নিযুক্ত রইল। তাঁর আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষিবিজ্ঞানের প্রয়োগনৈপুণ্য, সহজাত উচ্চ শিক্ষাবোধ, এবং তাঁর স্বহস্তে স্বপরিচালিত বিচিত্র কারুশিল্প গড়ে তোলার ক্ষমতা, তাঁর প্রায় নীরব সাধনার বিষয় হয়ে অন্তরালে থেকে গিয়েছে। তিনি যে কবি ছিলেন, চিত্রশিল্পী ছিলেন, এ কথাও বাইরে প্রচারিত নয়। কৃষিক্ষেত্রে তাঁর নতুন নতুন পরীক্ষার কথা সাধারণের অজ্ঞাত। এ বইতে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। উপরন্তু বইয়ের শেষে গ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের এই বিষয়ে একটি রচনা সংযোজিত হয়েছে, তা থেকে এক বিজ্ঞানীর চোখে আর এক প্রয়োগ-বিজ্ঞানীর কৃতিত্বের সংবাদ অনেকখানি জানা যাবে। মলাটের উপরে যে রঙীন গোলাপগুচ্ছের ছবি আছে, সে ছবিটি রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পকৃতির একটুখানি নমুনা বহন করছে। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের হাতের স্পর্শে এ ছবি বথায়োগ্য পটে স্থাপিত হয়েছে।

এই বইয়ের ভিতর রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা যে অনেকখানি এসে পড়েছে, তার কারণ তো আগেই বর্ণনা, কারণ তাঁর নিজের কথার অনেকখানিই যে তাঁর পিতার অতিপ্রায়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকার কথা। তা সবই পিতার জীবন ও ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এ ইচ্ছা কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও বা গোপ।

পিতৃস্মৃতি তাই সৌজস্যজি পিতৃস্মৃতি। তাঁর নিজের জীবনী নয়। অচ্যুত তারও একটি জীবনী রচিত হবার যোগ্য উপাদান যথেষ্ট আছে। তবু ভাল যে, তিনি এমন একখানা বই লিখেছেন। কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অস্তিত্বের কথা সবাই প্রায় ভুলে যেত যদি না পিতৃস্মৃতি উপলক্ষে এই বইয়ের ভিতর তিনি নিজে প্রকাশিত হতেন। অবশ্য বাংলা বই তিনি তিনখানা ইতিপূর্বে লিখেছেন, (১) প্রাণভঙ্গ (১০৪৮), এবং (২) অতিব্যক্তি (১০৫২)। কিন্তু এ দুখানা বইই বিজ্ঞানের বই সুতরাং সাধারণ পাঠকের অস্পৃশ্য। তৃতীয় বই অবশোধের বস্তুভারিত। তাঁর চতুর্থ বই ইংরেজী—On the Edges of Time (1958), এবং সেখানার নিজের কথা থাকলেও সামান্য বাংলা পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে

থাকার ইচ্ছাতেই সম্ভবত তিনি তা ইংরেজীতে লিখেছিলেন। বাংলা স্মৃতি তিনি কখনোই অনুরোধে লিখতে আরম্ভ করেননি, কিন্তু শেষ করবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাকি অংশ গ্রীকিতীশচন্দ্র রায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বাংলার সঙ্গে অনুবাদের ভাষা বেশ মিলে গেছে।

জীবনী লেখার প্রচলিত নিয়ম মৃত্যুর পরে। কিন্তু এই খ্যাতি-উদাসীন গুণী ব্যক্তিটির জীবনী কেউ লিখবেন এমন সম্ভাবনা না থাকলেও পরিহাসের কথা এই যে, তাঁর ভূমিষ্ঠ হবার অব্যবহিত পূর্বে তাঁর জীবনী লেখা হয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ চরিত্র অনুমান করে। অবশ্য জীবনের সঙ্গে জীবনী মেলে নি। রামায়ণ লেখা হয়েছিল রামের জন্মের পূর্বে। রামচন্দ্র সম্ভবত তার সঙ্গে মিলিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। মনে হয়, প্রতিদিন তিনি রামায়ণ পড়ে সেদিনকার কর্তব্য স্থির করতেন। অর্থাৎ তাঁর জীবনটাই ছিল বাস্তবিক কর্তব্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথের বেলায় জীবনের সঙ্গে জীবন মেলাবার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাঁর জীবনীকার তিনজন—হিতেন্দ্রনাথ, সরলা দেবী ও বলেন্দ্রনাথ। দল-বারো লাইনের জীবনী, ভবিষ্যৎ স্বভাবের খসড়া, পারিবারিক খাতায় লেখা।

“পিতৃস্মৃতি” অর্থে পিতৃপুরুষের স্মৃতিও কিছুর, এবং তা সংক্ষিপ্ত হলেও যথেষ্ট মূল্যবান। অবশ্য প্রিন্স স্মারক-নাথ ও অনেকে স্মৃতির মধ্যে না হলেও, স্মৃতির মধ্যে স্থান পেয়েছেন। তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। একটি অতি বৃহৎ পরিবারের স্মৃতি। প্রায় আড়াইঘর থেকে আরম্ভ করে আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, বিরাট বাড়িটার সঙ্গে, এবং পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন লেখক স্বয়ং গাইডরূপে আমাদের সব দেখাচ্ছেন এবং পর পর বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন। একটি মহৎ কালকে জীবন্ত করে তুলছেন। বিচিত্র চরিত্র সব একে একে দেখা দিচ্ছে। গভীর রহস্যময় বোধ হয় সব, রোমাঞ্চ জাগে শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে। এই পরিবেশ, এই অতীত, মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ গোষ্ঠীর স্মৃতিপুরুষ, এবং যে সব আত্মীয়স্বজন কখনো বা এদের কেন্দ্র করে এসে জড়ো হয়েছিলেন, বই পড়তে পড়তে তাঁরা যেন ছায়ার মতো সব চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

যারা একই গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি হয়েও সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, নাট্য-ভিতরে, দেশপ্রেমের উদ্বেগধনে, স্বদেশী প্রচারে, নতুন মার্জিত সংস্কৃতির জন্মদানে, বাংলাদেশের জন্মান্তর ঘটিয়ে গেছেন

রূপ সাধনায় সাধনার

দুটি অনবদ্য অবদান



সাধনা বিউটি ক্রিম

প্রতিদিন স্বক চর্চায় একান্ত
প্রয়োজন। কুমুম কোমল
পেলব তনু ও যৌবন স্থলভ
লাবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথপেস্ট

দন্তরাজি মুক্তার মত শুভ্র
ও উজ্জ্বল, মাটি স্থূহ ও স্থূহ
মুখ দুর্গন্ধমুক্ত ও স্বচ্ছ করে।

শীঘ্রই পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এক. সি. এস. (গণনা)
এম. সি. এস. (আমেবিক) ভাংলপুর
কলেজের কলামন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এম. (কলিঃ) আয়ুর্বেদচর্চা।

তাদের সম্পর্কে সব কাহিনীই যেন আজ রূপকথা, সব ইতিহাস আজ ইতিকথা। রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগে পড়তে পড়তে। বিচিত্র প্রাতিভা, বিচিত্র চরিত্র। খেয়ালি-পনারও অন্ত নেই। পরিবার কত বড় তা নিয়ে তর্ক। মহারাণী ডিকটোরিয়ার পরিবার বড়, কি ঠাকুর পরিবার বড়। তৎক্ষণাৎ বলেদ্রনাথ (মহর্ষির অন্যতম পৌত্র) কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। দেখা গেল, ডিকটোরিয়া পরিবারের লোক-সংখ্যা টেনেবনে ১০০, কিন্তু মহর্ষি পরিবারেব শতাধিক ব্যক্তি একখানা বাড়িতেই বাস করছেন। এই জাতীয় তৎকালীন কত কাহিনী যে আছে। এ পিতৃস্মৃতি প্রধানত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি হলেও কাউকেই তো বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একা সম্পূর্ণ নন। প্রিন্স দ্বারকানাথের অন্যতম পৌত্র গুণেন্দ্রনাথের পুত্রগণও এদেব সংস্কৃতিজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং আবও অনেকে এদের জীবনে মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন।

রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে চলছি। শিশু ভোলানাথ স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃশ্য উন্মোচিত হল। এমন চরিত্র বাস্তবে যে থাকতে পারে তা বিশ্বাসই হবে না। বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠ আব কতটুকু? “তিনি এক ট্রাইসাইকেল কিনেছিলেন, মস্তবড়ো তাব তিনটে চাকা। সকালবেলা সেই ট্রাইসাইকেলে চেপে তিনি পার্ক স্ট্রীট দিয়ে মধ্যদানে বেড়াতে যেতেন। বেড়াতে যাবার অশ্রুত পোশাক—পাজামার উপর ডবল কোট। কোটের পাতান লাগানো হাংগামা বলে প্রথম কোর্টট উন্টো করে পবতেন, তাতে বুক ঢাকা হয়ে যেত, তারপর অন্য কোর্টটি যেমন সকলে পবে...‘সার সত্যের আলোচনা’ নামে একটি দার্শনিক রচনা লেখা শেষ হষেছে, কোনো বিবৃদ্ধজন-সভায় সেটা পড়া হবে। কিন্তু তার আগে কাউকে পড়ে শোনানো দবকার।...বাড়িতে কাউকে খুঁজে পান না। কিন্তু অপেক্ষা করা তো যায় না। ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল এক বড়ি দাসী, আর কেউ তখন ছিল না। দেখা গেল ঐ দাসী স্বিজেন্দ্রনাথের সামনে ঘোমটা টেনে মেঝেতে বসে, আর উনি ‘সার সত্যের আলোচনা’ আগাগোড়া পড়ে শোনাচ্ছেন।”

এর সম্পর্কে আরো কত গজার ঘটনা। এমন চরিত্র আর বিবর্তী হবো না। এ বইতে এই রকম কত ছোট-খাটো ঘটনা, কত বড় বড় ঘটনা, সুন্দর চিত্রবর্ষী ডায়ায লেখা, পড়তে বসবো ছাড়া যায় না। এই বহু ব্যবহৃত কথাগুলি অবশ্য যে-কোনো ভাল বই সম্পর্কেই বলা হয়, এবং যে-কোনো তৃতীয় শ্রেণীর

জটিলকীট গণের বই সম্পর্কেও বলা হয়। **তবু এই বই সম্পর্কেও এই একই কথা বলাছি** এজন্য যে, এ লেখার সামগ্রিক চিত্র-গ্রাহিতা, ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য, ভারতের এক শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর মিলনকথার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত ঘরোয়া বর্ণনা, রবীন্দ্রনাথের জীবনের চরমতম বেদনার মুহূর্ত থেকে বিপুল আনন্দের মুহূর্ত পর্যন্ত দুটি প্রান্ত, ও তার মধ্যবর্তী শত আলোছায়ার খেলা, তাবপর ঠাকুর পরিবারের ভিতর দৃষ্টিতে দেখা বহু প্রাতিভাধরের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলির বর্ণনা, এবং এ সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা, সব মিলিয়ে এই পিতৃস্মৃতি আমাদের কাছে যে একটানা পড়বার মতো একখানা বই, এ ভিন্ন আর কি বর্ণনাই বা দেওয়া যায় এ বই সম্পর্কে?

এত বিষয় আছে, এত সংবাদ আছে যে, শুধু তার একটি তালিকা দিলেও এ রচনা দীর্ঘ হয়ে পড়বে। তারকনাথ পালিতের বাড়িতে সাহেবি পরিবেশে ডিনারে নিমন্ত্রিত গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র ইত্যাদি সহ রবীন্দ্রনাথের (নিজের মধ্য পূর্ব পরামর্শ অনুযায়ী) সম্পূর্ণ দেশী পোশাকে যাওয়ার কথা, এবং আরও রোমাঞ্চকর—সেই পার্টিতে আদেশপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের সেই স্মরণীয় গান “আমার বোলো না গাহিতে বোলো না”—র রোমাঞ্চকর ইতিহাসটুকুও বাদ পড়ে নি। দ্বারকানাথের অন্দরমহলেই মহর্ষির নিজ পরিবার থাকতেন, তাঁর বর্ণনায় অনেক খবর পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের বার বাব বাসস্থান বদলের খেয়াল, উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামহ থেকে পাওয়া স্বভাববৈশিষ্ট্য “Babu changes his mind”—এর কত মজার কাহিনী, সেকলে বহু বড়ি এদের হাতে কিভাবে ক্রমে বদল হল, তার কাহিনী, ক্যাবেজ রকের ছোট ইতিহাস ও প্রস্তুতকারক ম্যাককেবের ব্যাবসায়িক সত্যতার কথা, ‘বালক’ পত্রিকার জন্মকথা, গানের, অভিনয়ের, বিশেষ করে ডাকঘর অভিনয়ের বহু তথ্য সম্বলিত ইতিহাস একের পর এক দেখে চলছি। তারপর মাঘোৎসবে ‘নীতিন্দ্র দাদার’ (স্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র) ‘নতুন কিছুর কর’র অদ্য খেলালে দূর-দূরান্ত থেকে গাড়ি গাড়ি পুকুরের পানা এনে থাম ঢেকে দেওয়ার ট্র্যাফিড ও কমিডি, বিবৃদ্ধজন সভা, খামখেয়ালি সভা, অনুশীলন সমিতি, এবং পরিবারের চালচলনে পদে পদে অভিনব সৃষ্টির প্রয়াস, কতক অধোন্মাদবৃত্তি (প্রতিভার এইটিই লক্ষণ!), কতক স্বভাবসম্পন্ন খেয়াল, কতক বা ‘মেথড ইন ম্যাডনেস’, কতক প্রকৃত সৃষ্টিমূলক কাজ। কিন্তু সবই

কি সুন্দর, এবং এসব একটি পরিবার সম্পর্কে পাঠকমনে কি অতৃপ্ত হবে, আনন্দশিহরণপূর্ণ সন্ধ্যাই না জাগায়!

শিলাইদহের স্মৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি আশ্চর্য ববর দেখা যায়। তার আগে বলা দরকার যে তিনি ভাল সাঁতার কাটতে পারতেন, এবং গোড়াই নদীর এপার-ওপার করতেন অনায়াসে। (এই নদী ও কুষ্টিয়া মহকুমা আমার নিজের অত্যন্ত পরিচিত। এখানে গেড়াই নদীর প্রশস্ততা নেহাৎ কম নয়।) ঘটনাটি পশ্চানদীর একটা দহের মধ্যে ঘটেছিল। প্রবল সাইক্লোনে বহু সম্পত্তি ভেসে যাওয়ার দৃশ্যের মধ্যে একটি স্ট্রীলোকের চুল দেখে রবীন্দ্রনাথ মাঝদের হুকুম করলেন জালি বোট নিয়ে দেখে আরে বোধ হয় মেবেমানুষ। মাঝিরা সেই জুফানে সাহস পাচ্ছিল না যেতে, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে যাবার জন্য তৈরি। তা দেখে তখন তারা গিয়ে স্ট্রীলোকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো। স্ট্রীলোকটি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। সুন্দরী স্ট্রী, স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করে একাক্ষ করতে যাচ্ছিল।

শিলাইদহের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুবর্গের কথা। এর মধ্যে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে স্বিজেন্দ্রনাথের স্নায়ের নামও আছে। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

বইয়ের ভাষা ছিন্নপত্রের ভাষার মতো সুসজ্জিত, এবং স্নিগ্ধতা গুণসম্পন্ন। পশ্চা ও বোটের কাহিনী রবীন্দ্রজীবনের কত বড় একটি অধ্যায়। তার পর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও তখনকার জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়। ব্রহ্মাবস্থ উপাধ্যায়ের কাহিনী চমকপ্রদ। তাঁর পঞ্জাবী পালোয়ানকে কুস্তিতে হারিয়ে দেওয়ার বর্ণনাটি কৌতুককর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সত্যীশ রায়। এমন একটি তরুণের চরিত্র বাঙালীর মধ্যে আর আছে কি না কিংবা ভবিষ্যতেও দেখা যাবে কি না কল্পনা করা কঠিন। শুধু এই চরিত্রটি এই অধ্যাটিকে অনেক মূল্যবান করেছে। তাবপর রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-বিশোগজনিত যে সব দুঃখের আঘাত তাঁর নিজেকেও সাধনার জীবনে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে, তার মধ্যে সত্যীশ রায় কিংবা অজিত চক্রবর্তী বা মোহিত সেনের অকালমৃত্যুর আঘাতও অবশ্যই যোগ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বুকতে হলে তাঁর জীবনের এই সব আঘাতের সঙ্গে সমবেদনাপূর্ণ পরিচয় থাকা আবশ্যিক। রথীন্দ্রনাথের লেখার ভিতরে সে ইতিহাস খুব বিস্তারিতভাবেই পাওয়া যাবে। কবিপন্নীর মৃত্যুদৃশ্য ডোলবার নয়। রবীন্দ্রনাথের এ এক অসাধারণ সহন-ক্ষমতা। দুঃখের আঘাতকে নীরবে মনে

গ্রহণ কমে অন্তরে পালন করার এই অপরিণামী শক্তি আর কোথায় দেখতে পাব?

এই বইয়ের অন্য অংশে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা, সেখানে প্রথমেই সানফ্রানসিসকোর প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ধ্বংসরূপ দেখার বিবরণ এই প্রথম বাঙালীর লেখায় পেলাম। (আমি নিজে সিনেমায় সে ভয়াবহ দৃশ্য পুনর্ঘটিত হতে দেখেছি।) পরে পিতার সঙ্গে দীর্ঘ পাশ্চাত্য ভ্রমণ, শত রকম শিক্ষাপূর্ণ তথ্য সম্বলিত। এই অংশের সঙ্গে তাল রেখে সে সব কথা সামান্য আভাস দেওয়াও এখানে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এ সব ভ্রমণ নতুন নতুন অভিজ্ঞতার দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। ও সব দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে মিলনের অনেক খবর আছে, যা শুধু এই বইতেই পাওয়া যাবে। বিষম কৌতুককর অথবা চমকপ্রদ ঘটনাও আছে প্রচুর। একবার সুইজারল্যান্ডে থাকতে রবীন্দ্রনাথের যে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়, তা মনে বাখবার মতো। ইটালির সীমান্তে প্রতিমা দেবী সহ পিকনিক করতে গিয়ে সেখানে এক তালগাছ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে তালগাছ কি করে এলো তা জানতে গিয়ে তালগাছের চেয়েও চমকপ্রদ এক অভিজ্ঞতা লাভ হল। ঔদের দলে একজন ছিলেন বিনি এখানকার আঞ্চলিক ভাষা বুঝতেন, তিনি নিয়ে গেলেন নিকটস্থ গাছের জালিকের কাছে, গিয়ে পরিচিত হলেন। এখন শুনলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের পুত্র তখন আনন্দের উত্তেজনায় তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে। তিনি ঔদের প্রায় টেনে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘর বইতে বোকাই। জার্মান ভাষায় অনুদিত রবীন্দ্রনাথের সব বই তো আছেই, তদুপরি বহু সংস্কৃত কাব্য নাটক ও দর্শনের বইও আছে। সুইস কৃষক তিনি। তিনি তাঁর মাটি কোপানো ক্ষুদ্র হাতে মূল সংস্কৃত কাব্য নিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন।

এর ইতিহাস স্মরণীয় নয় কি? রবীন্দ্রনাথ তো এ তথ্য জানবার বহু আগেই লিখে গেছেন “সব ঠাই মোব ঘর আছে”...কিংবা “দেশে দেশে আছে পরমাখ্যায়...” সে কথা কত সত্য মনে হয় এসব শুনলে। অনুরূপ ঘটনা আরও আছে। কিন্তু আগেই বলেছি, সে তালিকা দেওয়া এখানে অসম্ভব। শুধু একটি বিশেষ অধ্যায়ের কথা উল্লেখমাত্র করব। এই অধ্যায়ের নাম “বাবাকে যেমন

দেখেছি।” মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে, এবং যে অন্তরদৃষ্টিতে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। এত অল্প-পরিসরে রবীন্দ্রনাথের মতো একটি অতিশয় জটিল চরিত্রের মানবকে জরিপ করা বাইরে কারও পক্ষে সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজের বলেছেন এ কাজ কঠিন। এবং বলেছেন তাঁর পিতার পক্ষেও নিজেকে জমা কঠিন ছিল।

এ বইতে মোট ৩০টি অধ্যায় আছে। ছুটিকা লিখেছেন এল্‌মহাস্ট। দর্যোজান

ও ডায়ারি অংশে অতিবিক্ত মোট ৭টি রচনা। ‘পরিচয়’ অংশে দুটি রচনা। ‘পূর্ণ পূর্তা’ রঙীন প্রতিকৃতি ৩ খানা। গগনেন্দ্রনাথের পেনটিং একখানা। একরঙা প্রিন্স স্বাবকানাথের ১ খানা। বঙীন প্রচ্ছদ। রুচিসংগত সাজসজ্জা এবং পবিত্র প্রসাধন দেখে সন্দেহ থাকে না যে, এ সব শ্রীপদ্মবিহারী সেনের প্রচ্ছদ ছাত্রের ক্রিয়া। পিতৃস্মৃতির প্রকাশক শ্রীশ্রীশ্রীমান কুন্ডু, “জিজ্ঞাসা” ১৩৩এ বাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯, মূল্য ১৬ টাকা।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায়

এই উৎসবের মধ্যে এক পক্ষকাল

৬ মে থেকে ২০ মে

সুদৃঢ় মূল্যে—শতকরা ১২ই টাকা বাদ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধ গ্রন্থ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতী প্রকাশিত ও প্রচারিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুবিধা পাবেন।

॥ পুস্তকবিক্রেতাদের প্রতি নিবেদন ॥

নির্দিষ্ট সময়ে পুস্তকবিক্রেতাগণ যাতে ক্রেতাসাধারণকে পুস্তক সরবরাহ করতে পারেন সেজন্যে নির্ধারিত অতিরিক্ত কমিশনে এই কথটি কেন্দ্রে তাঁরা পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২, কলেজ স্কয়ার
কলিকাতা ১২

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১০, বিধান সবাণী
কলিকাতা ৬

বিশ্বভারতী গ্রন্থনিবিভাগ

৬।৩, স্বাবকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

জিজ্ঞাসা

১৩০এ বাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯

জিজ্ঞাসা

৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা ২

বিশ্বভারতী শিল্পসদন

শান্তিনিকেতন বীরভূম

মামোদর পুস্তকালয়

২৪, বিজয়চাঁদ রোড। বর্ধাণ

পত্রিকা সিডিকেট

গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী

হাইলাব ডিস্ট্রিবিউটার্স

১৫, এলগিন বোড, এলাহাবাদ

ভারতী ভবন

গোবিন্দ মিত্র রোড

পাটনা ৪

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য

বুক স্টোর

৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা ১৯

বিশ্বভারতী

আমরা বোকা একটি শব্দ আমরা

আর দেরি নয়—যুদ্ধ চাই

১১শে এপ্রিল সকাল ন'টা দশটার সময় ফতেয়াবাদের কাছে কোন একটি উঁচু পাহাড়ে প্রধান বাহিনীকে ছেড়ে এসেছি। সেই সূত্র ধরে আবার তাদের কথা শুনছি। আমরা যখন ২১শ তারিখ সকালে রক্তের বাড়িতে নিশ্চিত মৃত্যুগুণে একটি অব্যাহত সশস্ত্র সংঘর্ষ থেকে অত্যাশ্চর্যভাবে নিষ্কৃতি পাবার জীবন্ত নাটকে লিপ্ত তখন সদা সজীব দুর্বল বালক টেগুবা (হীরগোপাল বল) ও তার সমবয়সী সাথীদের অদম্য উৎসাহ ও স্বতঃস্ফূর্ত চপলতার মাধ্যমে সেই গিরিচূড়া প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

সকালে তাদের তরমুজ খাওয়ার পর্ব সমাপ্ত হবার পব মাস্টারদা, নির্মলদা ও অম্বিকাদা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য আর একবার শেষ চেষ্টা কবে দেখা মনস্থ করলেন। এখন পর্যন্ত যাদের পাঠিয়েছেন তারা কেউ ফিরে আসে নি। তাই খুব বাছাই করে দু'জনকে এক সঙ্গে পাঠাবেন স্থির করলেন। মাস্টারদা ও নির্মলদা পাহাড়ের ওপরে বিশ্রামরত ছোট ছোট গ্রুপের কাছে গেলেন এবং তাদের প্রত্যেকের কাছেই বললেন—“আমরা এমন দু'জনকে চাই যাঁরা ‘পারি নাই’ বলে ফিরে আসবে না। গদেশ, অনন্তদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেই হবে।” প্রত্যেক যুবকসাথী তক্ষুণি রাজী—তাদের মধ্যে কেউ একজনও বলে নি, ‘পারব না’—সকলেই যেতে প্রস্তুত। তাদের উৎসাহকে প্রশংসা করা সত্ত্বেও মাস্টারদা নানাদিক বিবেচনা কবে উপযুক্ত সৈনিককে মনোনয়ন করবেন। তাই মাস্টারদা, নির্মলদা ও অম্বিকাদা সঙ্গে আরো বার দু'থেকে প্রত্যেকের কাছে গেলেন, প্রত্যেকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে তাদের সকলের সম্বন্ধেই ভেবে দেখলেন। তারপর তাঁরা বেছে নিলেন অমরেন্দ্র নন্দী ও অপর একজন যুবককে।

এদের ওপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হ'ল। বিজ্ঞান দু'টি অংশের যোগাযোগ স্থাপন করার এই মহান কর্তব্য সম্বন্ধে অমরেন্দ্র খুব সচেতন। অমরেন্দ্রের সঙ্গে যুবকটি সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন ছিল না—প্রশ্ন থাকলে তাকে বাছাই করা হবে কেন? এরা দু'জনে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মহান দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে গেল। সবাই তাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাল। তারাও প্রত্যাভিবাदन জানিয়ে পাহাড় থেকে নেমে গেল।

তখন প্রায় সকাল দশটা বেজেছে। আবার তাঁরা সেই ভুল করলেন। অমরেন্দ্রদের বলা হল তারা বেন মধ্যে সাড়ে ছটা বা সাতটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসে। আট-ন' ঘণ্টার মধ্যে বারো-চোদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করে শহরে গিয়ে আমাদের খোঁজ-খবর নিয়ে আবার এতটা পথ ফিরে আসা কোনমতেই বাস্তবে সম্ভব ছিল না। এদিকটা বিচার না করেই তাদের সাতটার মধ্যে ফিরে আসবার নির্দেশ দিয়ে scouting duty-তে পাঠানো হ'ল।

অমরেন্দ্রবা চলে যাওয়া পর অম্বিকাদাও আব একটি কর্তব্য নিয়ে ফতেয়াবাদ গ্রামে যাওয়া মনস্থ করলেন। আজ তিনি সকলকে বাঙালীর খাদ্য—ভাত খাওয়াবেন। ১৮ই তারিখে সবাই মধ্যাহ্নভোজন করার পর আজ ২১ তারিখ সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কাবো পেটে ভাত পড়ে নি। সব সময় জলও পায় নি—পাতা-লতা নিংড়ে রস খেয়েছে। তরমুজ, বিস্কুট, চিড়ে, প্রভৃতি একবেলা খেয়ে এই দীর্ঘ সময় তারা অর্ধাহারে কাটিবেছে। আজ রাতে অম্বিকাদা তাদের ভোজনের ব্যবস্থা করবেন—ভাত! এ যেন ভাবতেও আনন্দ হয়—কেবল আনন্দ নয় অল্প অবস্থায় পাকস্থলীর মাংসপেশীও উদ্ভ্রাব ও চঞ্চল হয়ে ওঠে—কতক্ষেণে তারা ভাত খেয়ে তৃপ্ত হবে!

আগেই বলেছি এই পাহাড়টি ফতেয়াবাদের কাছে। ফতেয়াবাদ গ্রামাঞ্চল

অম্বিকাদার নখদর্পণে—এখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দলের সমর্থকেরা অনেকে ছিলেন। অম্বিকাদা প্রথমে একজনের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। সেখানে তিনি তাঁর লম্বা দাড়ি ও গোফ কামিয়ে পরিষ্কার করে ফেললেন। তাঁকে এখন দেখে সহজে চেনা যায় না। চেহারা ও বেশ পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল কারণ ফতেয়াবাদে অনেকেই তাঁকে চেনে। আত্মগোপন করে গ্রামের লোকের চোখে ধুলো দিবে অম্বিকাদা ফতেয়াবাদে করেকজন আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রায় শ'খানেক টাকা যোগাড় করলেন।

তাবপর দু'জন বিবস্ত্র যুবক কম্পীকে ভার দিলেন বাজার করে আনতে ও প্রায় ষাট জনের মত খিচুড়ি বামা কবতে। তিনি আবার বন্দাবস্ত করলেন যাতে তারা বিশেষ স্থানে ঠিক রাত আটটার সময় খিচুড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে কাজটি খুব সহজ, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিচার করলে অনুমান করা বাবে কতখানি দায়িত্ববোধ, বিচক্ষণতা ও নিভুল কম্পী নির্বাচনের ক্ষমতা থাকলে পরে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা যায়। যদি কোথাও একটু ভুল থেকে যেত তবে রাত আটটার সময় কারও খিচুড়ি খাওয়া হোত না—হোত চারিদিক থেকে অতর্কিত গুলীবৃষ্টি!

এখন মাত্র দু'পূর্ববেলা, রাত আটটা বাজতে এখনও অনেক বাকি। অম্বিকাদা এখন আবার পাহাড়ের ফিরে যাবেন। তিনি ঐ দু'জন কম্পীকে সঙ্গে নিয়ে চিড়ে, চিনি, কলা, প্রভৃতি পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বসে আনালেন। সেখান থেকে তাদের তিনি বিদায় দিলেন এবং স্থির করলেন পাহাড়ের ওপরে গিয়ে তিনি কাউকে পাঠাবেন খাবার জিনিসগুণি নিয়ে আসবার জন্য। অম্বিকাদা যখন পাহাড়ের ওপরে সাথীদের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন সবার মধ্যে গল্পন ও কলরব উঠল—“বাঃ বাঃ, অম্বিকাদাকে একেবারে চেনা

মাছে না।” “বা রে, অম্বিকাদার দাড়ি-গোঁফ কোথায় গেল?” “চেনা পদূলিশও অম্বিকাদাকে এখন চিনতে পারবে না।” “এখন পদূলিশ চিনুক বা না চিনুক তাতে কি আসে যায়”—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সবাই একবার অম্বিকাদার নতুন চেহারা দেখে হাসল—সকলেই আনন্দ উপভোগ করল। অম্বিকাদাও তাদের আনন্দে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে দু’জন সাথী চিড়ে, চিনি, কলা, প্রভৃতি সব নিয়ে এল। আনন্দের সঙ্গে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হল। অম্বিকাদা সবার জন্য আহারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন বলে তাঁর মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছিল। সবাইকে সম্মুখ করে তিনি যেন কৃতজ্ঞাবোধ করছিলেন।

এবার অম্বিকাদা তাঁর যাদুকরের ঝুলি থেকে আর একটি অতি মনোরম খাদ্য বাব করলেন। কি সেটি—রসগোল্লা? কেক; সন্দেশ, কাবাব?—এ সবার চেয়েও সুস্বাদু—এগুণিষ অপেক্ষাও রসাল—চটুগ্রামে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র ‘পাণ্ডজনা’! আজকের পাণ্ডজনা। এতদিন খবরের কাগজ তারা দেখতে পায় নি—না পেরেছে কোন খবর শুনতে। জলের অভাবে তুষা, অন্নের অভাবে ক্ষুধা তাদের পীড়া দিয়েছে: আবাব দৈনিক খবর প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে মনের অতৃপ্ত বাননার জ্বালা অনুভব করেছে প্রতি মুহূর্তে। ‘পাণ্ডজনা’ পেয়ে সবাই খবর জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। প্রত্যেকের হাতে হাতে ছুরে বেড়াতে লাগল কাগজটি। ২১ তারিখের খবরে তারা জানতে পারলো শহরে কার্ফু বলবৎ আছে; বাইরে থেকে প্রচুর ফৌজ এসে পৌঁছেছে; বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও কোন সংবাদ নেই। তারা খবরের কাগজটি পড়ে ও অম্বিকাদার মুখ থেকে শহরের সংবাদ জেনে নিশ্চিন্ত হল—তখন পর্যন্ত আমাদেব সপ্তপক্ষের কোন সংঘর্ষ হয় নি বা আমবা তাদের কাছে বন্দীও হই নি। অমবেন্দ্র ও আর একজন সাথী গেছে আমাদের চারজনের খোঁজে—হয়ত আমাদের সম্ভান পাবে, হয়ত আজ আমাদের সঙ্গে প্রধান বাহিনীর মিলন হবে এবং হয়ত আজই আবাব শহরে শত্রুঘাটি আক্রমণ কবতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাবা!

আগেই বলছি গতকাল থেকে যুবক সাথীদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে—তাঁরা অনাহারে, অনিদ্রায় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবে না—সর্বশক্তি নিয়ে শহরে প্রবেশ কবে যুদ্ধ করবে—স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ দেবে। আজ দু’পন্থের ‘পাণ্ডজনা’ পত্রিকার খবর দেখার পর যুবক বিপ্লবীরা ব্যস্ত হয়ে পারল শত্রুপক্ষ এখন

আর অসহায় অবস্থায় নেই। তাঁরা বাইরে থেকে সৈন্য আমদানী করেছে। বিপ্লবী বাহিনীর এখন যুদ্ধ করতে হবে হাজার-গুণ বেশি সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে। ভবু যুদ্ধ করতেই হবে। যত বেশি দেরি হবে তাদের defensive যুদ্ধ ছাড়া গতানুগতিক থাকবে না। সাহসেব সঙ্গে অতর্কিত আক্রমণ যদি তারা আগে করতে পারে তবে হয়ত অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধে পাবে। রক্ত, মন, বিধু, দেবু, নরেশ, ত্রিপুরা, টেগুরা, সুবোধ চৌধুরী প্রমুখ বিপ্লবী যুবকেরা এই নিয়ে আলোচনা করছিল।

ত্রিপুরা (আমাদের বাহিনীর ব্রিগে-ডিয়াল ত্রিপুরা সেন) মাস্টারদাব কাছে গিয়ে বলল—“মাস্টারদা, আর বেশি অপেক্ষা করা আমাদের উচিত হবে না। যত দেরি কবব যুদ্ধের সুবিধা শত্রুপক্ষ তত বেশি করে পাবে। আমাদের আজই শেষরাতে অতর্কিতে শহরে প্রবেশ করে আক্রমণ চালাতে হবে। আপনি এই বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দিন।”

সহাস্য বদনে মাস্টারদা ত্রিপুরাকে উত্তর দিলেন—“হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ, আজই আমবা শহরে শত্রুঘাটি আক্রমণ করতে চেষ্টা করব। আমিও তোমার সঙ্গে একমত। Offence is the best form of Defence? (আক্রমণই সব চেয়ে প্রকৃষ্ট প্রতিবন্ধক)। Defensive যুদ্ধ আমাদের পক্ষে মারাত্মক রকমের ভুল হবে। নিশ্চিন্ত থাক, এখনই আমরা স্থানান্তর গ্রহণ করব।”

যখন ত্রিপুরা মাস্টারদাব সঙ্গে আজই আক্রমণ চালাবার জন্য কথা বলছিলেন তখন টেগুরা (হবিগোপাল বল) নির্মলদার কাছে গিয়ে প্রাণের বিপ্লবী আবেগ জানাল—“নির্মলদা, যুদ্ধের আর কত বাকি? বিলম্ব সহিছে না। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমরাই আগে আক্রান্ত হ’ব। যত বেশি দেরি করব তত বেশি ক্ষয় ও নিষ্ক্রিয়তা আমাদের গ্রাস করবে। আজই রাতে আমবা শত্রুঘাটি আক্রমণ কবতে যাব তো?”

পন্থেরা বছরের বালক টেগুরা ঠিকই বুঝেছিল যে যতই দেরি করবে ততই নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। যুবকেরা জানতো প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পিণ্ডিত মাত্র একটি—আত্মসমর্পণ না হয় সুনিশ্চিত মৃত্যু! আত্মসমর্পণের কথাই যখন ওঠে না তখন যববদেব মনে মৃত্যু-সংকল্প ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে প্রাণ দেবে—এই তো ছিল তাদের স্বপ্ন, তবে দেব কি? দেরি করা মহা ভুল হয়েছে। আজই রাতে শত্রুশিব তাদের আক্রমণ কবতে হবে। নির্মলদা

খুব স্নেহভরে টেগুরাকে সম্বোধন করে জানালেন—“ভাই, তোমরা মরণ-প্যাণ্ডের দল নিষ্ক্রিয় কেন থাকবে? তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও নিষে চল। তোমরা তবুগেরাই আজকের মরণ-অভিযানে নেতৃত্ব দেবে।”

নির্মলদা কেবলমাত্র টেগুরাকে উৎসাহ দিলেন তা নয়, মরণ-অভিযানের যোগ্যতা যে ছোটদেরই সবচেয়ে বেশি তা নির্মলদা অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন। নেতৃত্বের এখন স্থানান্তর নিতেই হবে। মস্ট বদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা ও লোকনাথ কিংবদন্তি আলোচনা কবে স্থির করলেন তাঁরা শহরে প্রবেশ করে অতর্কিতে আক্রমণ চালাবেন। এই স্থানান্তর গ্রহণ কববার পদ নবায়কে ‘Form-up’ কবতে আদেশ দেওয়া হল। অর্ধ-চক্রাকারে তারা সবাই এনে সামনে দাঁড়াল। দ্বিতীয় আদেশে সবাইকে বসতে বলা হল। সবাই বসে পড়ল। সবার হাতে রাইফেল ও কোমরে পিডলভন বাঁধা আছে। মাস্টারদা তাদের সামনে এনে দাঁড়ালেন। সবাই ভালো মাস্টারদা শহরে ইংরেজদের ঘাটি আক্রমণ কবাব স্থানান্তর তাদের কাছে ঘোষণা কববেন। কিন্তু মাস্টারদা সেই ঘোষণা কববার আগে তাদের সবাইকে সম্বোধন কবে বললেন—

“ভাই সব! ১৮ই এপ্রিল আমবা আক্রমণ করতে যাওয়ার পূর্বে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিলাম। আমবা প্রত্যেকে মৃত্যুপণ কবে প্রোগ্রাম নিরেছিলাম। আজ আবাব আমাদের প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে—‘মৃত্যু আমাদের পায়ের ভূতা, চিত্ত ভাবনানী।’ আমি প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন রাখছি, ভেবে বলবে—‘মৃত্যু উপেক্ষা কবে প্রবল শক্তিশালী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের সঙ্গে মরণ-পণ যুদ্ধ কবতে সত্যিই প্রস্তুত কি না?’

মাস্টারদাব প্রশ্ন শেষ হতে না হতে পঞ্চাশটি রাইফেল বিপ্লবীদের হাতে দৃঢ় মূর্তিবদ্ধ হল; পঞ্চাশ জোড়া চন্দ্র প্রতি-শোধ নেওয়ার জন্য লাল হয়ে উঠল; পঞ্চাশ-জন বিপ্লবী নওজওয়ান নিজ নিজ অধর দংশন কবে এক বাক্যে দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল—

“শপথ করছি—ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাই।

“শপথ কবছি—প্রোগ্রাম আমাদের মৃত্যু।

শপথ কবছি—আমবা ইংরেজের হোলে মরব।”

সমস্ত পাহাড়টা যেন নড়ে উঠল। বিপ্লবের প্রচণ্ড শক্তি যেন আগুনবাগিচায় গিবি-গহ্বর থেকে ফেটে পড়ে সমস্ত শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে! মাস্টারদা ধীর শান্তভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে বইলেন। কোনবকম উচ্ছ্বাস বা ভাবানতব তার মধ্যে দেখা গেল না। সকলেই শান্ত—একেবারে নিস্তব্ধ। তারপর নিস্তব্ধতা ভগ্ন কবে

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

মাস্টারদা প্রতিটি কথাই জোর দিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—

“সবার মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের মনোভাব দেখে আমি খুশি হইয়াছি। যুদ্ধ করতে যে আমরা পিছপাও, নই, তা আমাদের জ্ঞান আছে। তবু মানসিক প্রস্তুতিব কোন শেষ নেই। যত বেশি ভাবে যুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি কবা যায় ততই ভাল। তাই আমি আবার বলছি সবাই যেন আমরা মানস চোখে যুদ্ধক্ষেত্রের ভাববহ দৃশ্য একবার দেখতে চেষ্টা করি—মৃত্যুর বিভীষিকা, মরণ-ফলগায় আত্ননাদ, মেশিনগান থেকে গুলীর বৃষ্টিধারা, চাৰিদিকে রক্তস্রোত! শত্রুর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের পঞ্চাশটি মাস্কিট্রি নিয়ে সামঞ্জস্যহীন যুদ্ধ—মৃত্যু আমাদের সন্নিশ্চিত। তাই আমি আবার দ্বিতীয়বার সূচোয়া দিচ্ছি—অন্তরের সঙ্গে ভেবে দেখ। যাদের মনে একটুও দুর্বলতা আছে তারা এখনই মনস্থির কর। নইলে অভিযানের মুখে ফিবে আসা যাবে না—তখন একজনের কাপুরুষতা অন্যকে আক্রমণ করতে পারে। সাহসীদের সাহস যত না ভীতকে সজীব করে তুলতে সমর্থ হয়, তার চাইতে একজনের কাপুরুষতা সমস্ত সৈন্যের morale নষ্ট করে দিতে পারে। তাই আবার আমি সবাইকে বলছি নিজেকে মন তুলিয়ে দেখ। এখনও সময় আছে—ভেবে উত্তর দাও—কি চাও?”

প্রত্যেকের হাতে মাস্কিট্রি কনকন করে উঠল। সবার স্ফীত বক্ষ উন্নত শির। সমস্তের আবার উত্তর এল—“আমরা প্রস্তুত!”

আশ্চর্য! মাস্টারদা তবু কি যেন ভাবলেন। তারপর তিনি আবার বললেন—“আমি সবার কাছে দুটি প্রস্তাব রাখছি। যাব যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ইচ্ছে সে সেইটি স্বীকা ও সংকোচহীন-চিন্তে গ্রহণ করুক তা’ আমি চাই। আমার প্রথম প্রস্তাব—শত্রুর প্রবল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অসমান যুদ্ধে প্রাণ দিবে স্বাধীনতার রক্তাক্ত বিপ্লবে সৌধ নির্মাণ করা। দ্বিতীয় প্রস্তাব—অসমান যুদ্ধে পরিহার কবে আত্মগোপন কবা এবং সময় ও সুযোগ নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ কবে ব্যতিব্যস্ত করা। যাবা আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব মেনে নিতে চাও তাবা কোন সংকোচ কোর না। কেউ কিছু মনে কববে না—এখনও সময় আছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ কবে যাদের ইচ্ছে তাবা নিজেকে দাখিলে চলে যাও এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ করে সংগঠিত হয়ে যেভাবে পার শত্রুকে আঘাত হানবে। .. কারা যেতে চাইছে? যাও।”

কেউ নড়ল না। যে যেখানে ছিল

সেখানেই বসে রইল। অতএব সকলে যে প্রথম প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। মাস্টারদা সবাইকে জানালেন যত শীঘ্র সম্ভব শহবে ইংবেজের ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে—“প্রস্তুত থাক। সাহস, বিক্রম—সিংহবিক্রম চাই।”

শহর আক্রমণ করার একটা সামরিক প্ল্যান তাদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির হল। হাতে সময় খুব স্বল্প। শত্রু প্ল্যান একটি থাকলেই চলবে না, তাকে বাস্তব রূপ দিতে হবে। ‘আক্রমণ কবা হবে’—এইটি General plan. কিন্তু কীভাবে আক্রমণ পরিচালনা করা হবে—সেটিই হচ্ছে Concrete plan. প্ল্যানটিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য এইভাবে নেতাদের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর বিনিময় হয়—

মাস্টারদা—আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমরা initiative হারিয়েছি।

নির্মলদা—তবু, প্রতিকূল অবস্থায়ও কতখানি সুযোগ নেওয়া যায় তাব উপায় খুঁজে বাব করতেই হবে।

নরেশ—এখন আমাদের ভেবে ঠিক করতে হবে শহরে আমবা এক সংগে close command-এ প্রবেশ কবব না কি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ‘সুডুগ পথে’ প্রবেশের কৌশল গ্রহণ করব?

নির্মলদা—এতে কোন বিমত হতেই পারে না। ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শহরে প্রবেশ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

অম্বিকাদা—আমাব মনে হয় প্রথম আমাদের স্থির কবা উচিত কোন পথে আমবা শহরে প্রবেশ কবব।

বিধু—অম্বিকাদা ঠিকই বলেছেন। কোন পথে প্রবেশ কবব, তা’ যেমন ঠিক কবা প্রয়োজন তেমন আবার, আমাব মতে, স্থির কবা উচিত আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কি বা কোনগুলি?

লোকনাথ—কোন পথে প্রবেশ করব এবং কোন শত্রুঘাঁটি আক্রমণ কবব তা যেমন স্থির কবা প্রয়োজন তেব চাইতেও শত্রুর সম্ভাব্য শক্তির পরিমাণ এবং কোথায় কীভাবে তাবা সৈন্য সমাবেশ করেছে তা’ জানা অনেক বেশি আবশ্যক। যদিও তা’ জানা সম্ভব নয় তবু সেই সম্বন্ধে অগা একটা বাস্তব ধারণা কবা উচিত। এই সংগে আমাদের নিজ শক্তির বাস্তব উপলব্ধি থাকলে তবেই আমরা

একটি সঠিক প্ল্যান রচনা করতে পারি।

মাস্টারদা—আমরা ৩০০ বোবের কাতৃজ পাই নি। আমাদের কাছে লাইস-গান বা ম্যাগাজিন রাইফেল নেই। কিন্তু খুব সহজেই ধরে নেওয়া যায় ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষ শহরে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছে। সবকারী গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সব—জেলখানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, কোতওয়ালী, জেলা-প্রধানদের বাড়ি, রেল ও কোর্টের সরকারী ট্রেজারী প্রভৃতি নিশ্চয়ই সৈন্যেরা পাহারা দিচ্ছে। এও ধরে নেওয়া যায় যে তারা শহরের সমস্ত বড় বড় রাস্তা, বিশেষ করে বাইরে থেকে শহরের মধ্যে প্রবেশপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

অম্বিকাদা—আমরা মাস্টারবাবু কাছ থেকে শত্রুপক্ষের ও আমাদের নিজস্ব শক্তি সম্বন্ধে ধারণা কববাব মত একটি বাস্তব চিত্র পেলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় আমরা একটিমাত্র শত্রুঘাঁটি বেছে নিই ও একটি পথেই সকলে একসাথে শহরে অনুপ্রবেশ করি।

লোকনাথ—আমাব মনে হচ্ছে অম্বিকাদা সকলকে একসঙ্গে close command-এ রাখতে চাইছেন। close command-এ সবাইকে রাখবাব যুক্তি হয়ত আছে; তবু আমার মনে হয় একসঙ্গে এক পথে সকলের শহরে প্রবেশ করা ভুল হবে। শত্রুকে বিভ্রান্ত কবা খুব প্রয়োজন। শত্রুপক্ষ যদি একটিমাত্র টার্গেট পার তবে তাদের পক্ষে আমাদের আক্রমণ প্রতিবোধ কবা খুব সহজ হবে এবং একটি টার্গেটকে বিধ্বস্ত কবাও অনেক সুবিধে। তাছাড়া যখন শত্রুর সঠিক অবস্থান আমবা জানি না, তখন কোনমতেই মাত্র একটি দলে আমাদের চলা উচিত হবে না। অন্তত দু’টি দলে ভাগ হয়ে দু’টি ভিন্ন পথে শহরে প্রবেশ কবা উচিত—অন্তত একটি বিকল্প ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এইরূপ আলোচনা তাদের মধ্যে আবে কিছুক্ষণ ধরে চলে। কেবল নেতারা ই আলোচনার অংশগ্রহণ না করে নবিশ ও বিধুর সঙ্গেও পরামর্শ কবা যুক্তিসংগত মনে করেন। নরেশ ও বিধু প্রস্তাব করে

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ॥ বিশ্বদুগদ ডাক্তার

স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি—প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের কাব্য-বাণীর দুই অমর সাধকের অন্তরঙ্গ পরিচয় ॥ মূল্য ৬.০০

দুই মনীষী ॥ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর উদয়দিগন্তের দুই বিচিত্র নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—প্রায় সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও যাদের যাত্রা সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ লক্ষ্যে। বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে উক্ত দুই মনীষীর চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ এবং তুলনা করেছেন প্রথিতযশা লেখক শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মূল্য ৬.০০

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ॥ ধীরেন্দ্র দেবনাথ

রবীন্দ্রচৈতন্য মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে নিপুণ বিশ্লেষণ ॥ মূল্য ৬.০০

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ॥ সূর্যশীল রায়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সম্যক পরিচয় ॥

মূল্য ১০.০০

অন্ন-প্রসাদ ॥ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"স্বপ্নপ্রমাণ নূতন কাব্য নয়—নিভা-নূতন, যাহা কখনও পুরাতন হয় না" ॥ মূল্য ৬.০০

প্রবন্ধসংগ্রহ ॥ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীর অতুল্য রচনা-সংগ্রহ। উক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়ের তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকা সংবলিত ॥ মূল্য ১০.০০

নোকাডুবি পরে ॥ হরেন্দ্রনারায়ণ মদ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের নোকাডুবি উপন্যাসের উপসংহাৰ। রবীন্দ্রনাথ কতৃক আদ্যন্ত পৰিমাৰ্জিত ও পৰিবৰ্ধিত ॥ মূল্য ৪.০০

The House of the Tagores

2.00

Hiranmay Banerjee

Tagore on Literature & Aesthetics

8.50

Prabhasjiban Chaudhuri

শিহ্নস্মৃতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শিহ্নস্মৃতি' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন : 'রবীন্দ্র-পরিচয়-গ্রন্থমালায় এটি অধুনাতম সংস্করণ এবং প্রধানতম আকর্ষণ।...সম্পাদক এবং প্রকাশক প্রবন্ধ প্রসাদনব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র চুটি বাঁধন নি। হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশনায় আশ্চর্য নৈপুণ্য এবং কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এরূপ সর্বাপেক্ষা সন্দেহ বহুদিন হাতে আসে নি। হরেন্দ্রনাথ ছবিতে অঙ্গসজ্জায় আশ্চর্য পারিপাট্য' ॥ মূল্য ১৬.০০

পুণ্যস্মৃতি ॥ সীতা দেবী

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চার মূল্যবান উপকরণস্বরূপ এবং হাস্যপরিহাসদীপ্ত রবীন্দ্র-সংলাপের সংগ্রহস্বরূপ এই দিনলিপি একটি অসামান্য। সেকালের শান্তিনিকেতন-আশ্রমজীবনের এক স্মিধমধুর আলেক্স। সচিত্র ॥ মূল্য ১০.০০

রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনের প্রতিটি বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সহ সাহিত্যকর্মের পরিচায়ক গ্রন্থ ॥ মূল্য ৪.০০

রবিচ্ছবি ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-পরিচয়-গ্রন্থমালায় 'রবিচ্ছবি'র বিশিষ্টতা সর্বজনস্বীকৃত নাট্যপ্রসঙ্গ, অভিনয়-উৎসব, কাব্য ও গান রচনা ইত্যাদি দিক ও বিচিত্র বিষয়ের আলোচনায় বহু অজ্ঞাত-পূর্ব তথ্য উন্মোচন ঘটেছে ॥ মূল্য ৬.০০

রবীন্দ্র-সুভাষিত ॥ বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

রবীন্দ্র-রচনা থেকে উল্লেখযোগ্য উদ্ভূতির সংকলন-গ্রন্থ। রবীন্দ্র সাহিত্যানুবাগীদের আতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ ॥ মূল্য ১২.০০

রবীন্দ্রনাথের

শিক্ষাদর্শন ও সাধনা ॥ সুনীলচন্দ্র নন্দন

রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের বহুগুণ পটভূমিকায় রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনের বিস্তৃত আলোচনা ॥ মূল্য ৬.০০

কবি কণ্ঠ

১ ॥ সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসংগীত-রসিক ও বেকর্ড-সংগ্রাহকদের একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী ॥ মূল্য ৫.০০

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ, রাসবিহারী আর্ভিনিউ, কলিকাতা ২৯

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ১৯

ছ'জন কবে যেন নয়টি গ্রুপ করা হোক— একটি গ্রুপে অবশ্য সাতজন থাকবে। তাদের মতে এই নয়টি দলই স্বাধীনভাবে আক্রমণ চালাবে। ছোট ছোট পদাংশ-মাটিও তারা আক্রমণ করবে। এতে শত্রুকে বাধ্য করা হবে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিতে এবং সেই ক্ষেত্রে শত্রুমাটি আক্রমণ করার বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে।

যা হোক সব দিক বিবেচনা করে— দ্রুত, শারীরিক দুর্বলতা, অপরিণত বয়স প্রভৃতির জন্য চূড়ান্তভাবে নিম্নোক্ত সামরিক প্ল্যানটি গৃহীত হ'ল—

(১) মাত্র দু'টো শত্রুমাটি তারা আক্রমণ করবে—একটি জেলখানা ও অপরিণত বয়সের সৈন্যদের জন্য চূড়ান্তভাবে নিম্নোক্ত সামরিক প্ল্যানটি গৃহীত হ'ল—

(২) শহরে আসবাব জিনিসপত্র দ্রুত ভিন্ন প্রবেশপথ ধার্য হ'ল— ইউরোপীয়ান পল্টনের রাস্তা ও প্যারেড গ্রাউন্ডের পথ অনুসরণ করে শহরে ঢুকবে।

(৩) চোদ্দজন কবে তিনটি ও তেরোজন কবে নিয়ে আর একটি গ্রুপ তৈরি করা হল। এই চারটি

গ্রুপের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন—লোকনাথ, নির্মলদা, অম্বিকাদা ও মাস্টারদা। এই চারটি দলের মধ্যে এমনভাবে তরুণদের বাছাই করে নেওয়া হয়েছিল যাতে প্রত্যেকটি গ্রুপ প্রায় সমান effective হয়।

(৪) দু'টি রাস্তার প্রত্যেকটিতে দু'টি চোদ্দজনের গ্রুপ যাবে। একটি গ্রুপের পেছনে সমর্থন দেওয়ার জন্য আর একটি থাকবে। দু'টি গ্রুপই একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যাবে, একসঙ্গে কাজও করবে কিন্তু পথ-চলা-কালে তারা আলাদাভাবে থাকবে।

(৫) দু'টি গ্রুপ জেলখানা আক্রমণ করবে এবং সব কয়েদীকে মুক্ত করে দেবে।

(৬) অন্য দু'টি গ্রুপ ইম্পিরিয়াল ব্যাংক আক্রমণ করে দখল করবে।

(৭) ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ও জেলখানায় আক্রমণ চলাকালে বা আক্রমণ সমাপ্ত হওয়ার পর এই দুই গ্রুপ সময় ও সুবিধেমত, আদালত ভবনের পরী পাহাড়ের (Fairy Hill) ওপর সংযোগ স্থাপন করবে।

(৮) সর্বশেষে তারা 'পরী পাহাড়ের' ওপর ইংরেজের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধের জন্য ব্যাহ রচনা করবে ও সেই পোস্টে তারা শহীদের মৃত্যুবরণ করবে।

এখন প্রায় তিনটে বেজেছে। আবও পাঁচ ঘণ্টা তাদের এই পাহাড়ের ওপর অপেক্ষা করতে হবে। ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হতে লাগল। সূর্য অস্ত গেল। ছ'টা বাজল, মধ্যে সাতটা হতে চলল কিন্তু কই অমরেন্দ্র এখনও জো ফিবে আসছে না! তারা খুব আশা করেছিল অমরেন্দ্র হয়ত আজ অসাধ্য সাধন কবে ফিরে আসবে। যখন রাত আটটা বেজে গেল তখন তারা একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ল। আর আশা নেই জেনে ধীরে ধীরে সবাই পাহাড়ের নিচে নেমে এল।

২১ তাবিখ রাত আটটার সময় যখন তারা ফতেয়াবাদের নিকটে এই পাহাড়ের নিচে নেমে এসেছে প্রায় সেই সময় আমবা চাবজন বজ্রতের বাড়ি থেকে মাসিমা ও মেসোমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের পথে চলোঁছ।

পাহাড়ের নিচে নেমে এসে তারা গুপে দেখলো সবাই উপস্থিত কি না? আর একটা পথ এগিয়ে গিয়ে তারা এক

পুকুরের কাছে বসল। অম্বিকাদার ব্যবস্থা অনুযায়ী দু'জন কর্মী দু'টি বড় ঝড়ি ভর্তি করে গিচুড়ি নিয়ে এল। এতদিন এত ঘণ্টা পরে সকলেই অতি তৃপ্তিব সঙ্গে গিচুড়ি খেয়েছে সামনের পুকুর থেকে জলও খেয়েছে আকুঁঠ।

এখন দেরি করা চলবে না। তাদের শহরের দিকে যেতে হবে। মার্চ সূর্য ফুরল। আজ তারা খুব কঠিন পথ অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে করে নি। পথ হয়ত সহজে অতিক্রম করা যাচ্ছিল কিন্তু এতদিন বাদে পেটে ভাত পড়ার জন্য একটুতেই তারা পরিশ্রান্ত বোধ করছিল। মার্চ করবার সময় একটা পথ হেঁটেই বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসতে হয়েছে। বিশ্রাম করতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই দু'টি চোখ যেন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে এসেছে—অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। অবশ্য বলা বাহুল্য যাদের পাহারা দেবার কথা ছিল তারা কতব্যে অটল ছিল। সৈন্যরা রাতে মার্চ করবার সময় তাবা তিনবার বিশ্রাম করেছে ও ঘুমিয়েছে। এই কারণে সৈন্যরা তাদের গতি খুব মন্থর। রাত থাকতে থাকতে শহরে পৌঁছানো তাদের পক্ষে যে সম্ভব হবে না তা' অধিনায়কেরা বুঝেছিলেন। আছাড়া যদিও বা শেষরাতে শহরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় তবুও এতখানি শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে আক্রমণ চালান উচিত হবে না। তাই সৈন্যরা ভোর রাতে শহরে প্রবেশ না করে অন্য কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হবে এবং ২২ তাবিখ সারা-দিন বিশ্রাম নেওয়ার পর সম্ভব বা রাতে প্ল্যান অনুযায়ী শহরে ইংরেজদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাওয়াই ঠিক হ'ল।

ভোব হতে আর বেশি বাক নেই। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই কোন একটি পাহাড় বেছে নিতে হবে। এখনই দূরে দেখা যাচ্ছে কোন কোন চাষী লাঙল কাঁধে বোঁরিয়ে পড়েছে। আর দেরি করলে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। তাই সম্মুখে একটি পাহাড়ে তারা খুব দ্রুত উঠতে লাগল। পাহাড়ের ওপরে ওঠার পব কিছুক্ষণে মধ্যে সকাল হয়ে গেল। এই পাহাড়টি অববাকিয়া বটতলীর এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। তারা তখনও জানে না যে এই 'বরবাকিয়া বটতলী'তেই কর্নেল ডালাস স্মিথ ও ডি আর্ট জি মিঃ ফারমাব একটি সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করেছেন। এক মাইলের ব্যবধানে শত্রুর মূখোমুখি যে পাহাড়ে তাবা ২২ তাবিখ ভোর থেকে আশ্রয় নিল সেই পাহাড়ের পজিসন সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আশ্চর্য্যকর অনুকূলে ছিল না। এই পাহাড়টিই জালালাবাদ। [ক্রমশঃ]

সাপ্তাহিক বসুমতীর

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বার্ষিক	চাঁদা (সডাক)	১৪.০০
ত্রৈমাসিক	" "	৭.০০
মাসিক	" "	৩.৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপনাকে আগ্রহ টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মসূচক

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে থাকি। লেখা ঠিকানা লিখা ডাকটিকট যুক্ত থাকা থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

“জালালাবাদ শহীদ দিবস”

২২শে এপ্রিল, ১৯৬৭ সাল। দমদম কাজীপাড়া কলোনীতে এই বিশেষ দিনটি শহীদ স্মরণে যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল। স্থানীয় নেতারা ও সংগঠকরা যাবা এই বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের আগ্রহ, বিপ্লবী নিষ্ঠা ও অতীত বিপ্লবী যুগের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছে। আমাদেরই দলের, সেই-দিনের তরুণ বন্ধু, হরিপদ ভট্টাচার্যের (পুলিশ ডি. এস. পি আসানুজ্জা হত্যার অভিযুক্ত হরিপদ নর) আহ্বান আমি উপেক্ষা করতে পারি নি—আমিও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম।

এককালে স্বাধীনতার জন্য রক্তাক্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম বলে বর্তমানে বিপ্লবের রথ-চক্রে অগ্রগতির সঙ্গে যোগ না থাকলেও অতীতের পাশপোর্ট নিয়ে শহীদ-বেদীর পাশে বসে নিলক্ষের মত কপালে চন্দনের ফোঁটা ও গলায় মালা নেওয়া আমাব অসহ্য মনে হয়। আমি জ্ঞানি আপনাদের এই ভালবাসা আমার অতীতের প্রতি। কিন্তু সেই অতীত আমার বর্তমানকে বিদূষ করে—উপহাস করে। অতীতের বিপ্লবী নিষ্ঠা, সাহস, বিক্রম, চরম স্বার্থত্যাগের আদর্শকে শ্রদ্ধা কবুন, ভালবাসুন কোন ক্ষতি নেই—কিন্তু তাঁদের মধ্যে বাঁকা স্বার্থপর, ভাব্য কাপুরুষ, সুবিধেবাদী, ব্যবসাদার, সিনেমা ব্যবসায়ী, অতুল্যদার বাস পার্বমিট ও প্রফুল্লদার-দেওয়া চাকরী উপভোগ করে ও প্রতি-বিপ্লবী কাজে মনে-প্রাণে লিপ্ত তাঁদের শহীদ-বেদীর পাশে বসিয়ে মালা-চন্দনে ভূষিত করার রীতি সর্বাতোভাবে বর্জিত হলেই ভাল।

সংগঠক ও আহ্বায়কদের প্রতি সত্যিই আমার কোন অনুরোধ নেই। তাঁদের অন্তরের আবেগ ও অতীত বিপ্লবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য যে আকুল প্রয়াস আমি সৈদিন দেখেছি তাতে সে-কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারে না। কত জন—কত বন্ধ-বন্ধু, তরুণ-তরুণী এসে সর্ব সেনের (মাস্টারদা) উদ্দেশে ও শহীদ বেদীমূলে কত মালা, কত ফুলের তোড়া দিয়ে অর্ঘ্য সাজালেন। কত প্রতিষ্ঠান সেনের (মাস্টারদা) উদ্দেশে ও শহীদ-বেদীমূলে ফুলের মালা সাজিয়ে ভাবী-কালের জন্য অনুপ্রবেশ নিয়ে গেল! তাঁদের সবাইকে নিভৃত অন্তরে আমি শ্রদ্ধা জানিযোঁছি।

বর্তমানে যাঁরা বিপ্লবের পতাকা সেই অতীত যুগ হতে সাহসিকতার সঙ্গে বহন করে আসছেন—তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন রায়,

নিরঞ্জন সেন ও সৈয়দা ঘাষ, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সবার অন্তরে বিপ্লবী প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁদের গলার মালা ও বিধানসভার সভা, আগামীকালের প্রকৃত বিপ্লবী, তরুণ সেনের বক্ষ জুড়ে ফুলের মালা ভবিষ্যতেও নিভুল পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু সবল মনে ছোট্ট একটি বালিকা যখন আর সবাইকে, আমাকেও, মাস্টারদার শহীদ-বেদীমূলেব পাশে মালা দিয়ে সম্বর্ধনা করল, তখন আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম আমার মত অবসরপ্রাপ্ত তথাকথিত ‘বিপ্লবীরা’ বিনা সম্বন্ধে মালা নিল গলায়—লক্ষ্মী হল না কারও—এমন কি জালালাবাদের সাথীদের অমানবদনে যে ফাঁসীকাঠে তুলে দিতে গিয়েছে সেও শহীদ-বেদীর পাশে বসে ফুলের মালা গলায় নিতে কোন শ্বশা বা কুণ্ঠাবোধ করে নি। আমার মনে কানে এল শহীদদের অটুহাস আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে। মনে হল মাস্টারদা আমাদের নিলক্ষিতা ও আত্মপ্রবণতার কবুণ দৃশ্য দেখে অলক্ষ্য হাসলেন। আমাব মনে হয় যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকে, যদি পবিত্রতা ও অনুশোচনা হওয়াব মত মনের গঠন হয় তবে বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্কৃত্যতা ও বিপ্লববিরুদ্ধ প্রতিপক্ষ্যাবও নিকৃতি আছে। অতীত বিপ্লবের সামান্যতম পরিশ্রমও যদি আমাদের মধ্যে থাকতো তবে হয়ত সেদিন নিলক্ষিতাব সীমা ছাড়িয়ে আমবা আত্মপ্রবণতা পাপের ভাব আব বেশি বাড়াতাম না।

আমাকে সেই সভায় কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমি কিছু বলি নি। সত্যি, আত্মশোচনায় আমাব সভা ত্যাগ করতে ইচ্ছে করছিল; কিন্তু তা করলে অতি-বিপ্লবী সজে সভা ত্যাগ করার ভেতর নিজের ক্ষুদ্রতা ও আত্মপ্রতিমানই প্রকাশ পেত। তা ছাড়া যারা এই অনুষ্ঠানটি এত সুন্দর করে উদ্‌যাপন করবার ব্যবস্থা করেছেন, যাঁদের সরল বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো বা অবিচার কলাব অধিকার আমাব কোথায়?

কাজেই আমি বসেই রইলাম। নিরঞ্জন সেন মাস্টারদার সঙ্গে রক্তগিরি জেলে ছিলেন। সেই পরোনো দিনের কথা তিনি বললেন—ভাবীকালের ইঙ্গিতও দিলেন। তরুণ সেন বিপ্লবীদের মনের কথাই বলে গেলেন। সৈয়দা ঘাষও ভাবীকালের তরুণদের সর্ব সেনের বৈপ্লবিক অবদান হৃদয়ঙ্গম করতে সার্বজনীন জানালেন। ১৮ই এপ্রিল অস্তাগাব দখল, তারপর ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধ ও পরে প্রীতিলতা ওয়াসাদাবের সঙ্গে পাশ্চাত্যলীর সাহেব-

দের ক্রাভ আক্রমণ কবতে যে প্রত্যাহার অংশ গ্রহণ কবেছে সেই ক্রাভ আক্রমণ সৈদিনের সভায় তাঁর অতীত স্মৃতি আমাদের কিছু বললেন। মাস্টারদার মঞ্চে যাওয়ার কিছু পূর্বে তাঁর শেষ বক্তব্য লিখে চট্টগ্রাম জেলের অন্য একটি বন্দী কালী দেব কাছে গোপনে গঠান। সেই বাণীটিও সভায় পড়া হল। বাণীটি ইংরেজীতে লেখা—এর বাংলা অনুবাদ আমাদের চট্টগ্রাম দলের সভা—প্রবন্ধ শান্তি সেন করেছেন। এই অনুবাদটিও সেখানে পড়া হয়।

অনুষ্ঠানের সব দোষ-ত্রুটি ঢেকে মনে যখন এতদিনের পরোনো সমস্ত বাক্য মাস্টারদার শেষ বাণীটি সেই জনসভায়ের মধ্যে পড়া হল। আমার এই লেখাটি এখানেই শেষ করে দিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু আমি এই লেখাটি বিস্তার করে লিখতে বাধ্য হয়েছি যে কারণে না লিখে আমার ছুটি নেই। এই অনুষ্ঠানের বিষয় লিখতে গিয়ে যা যা বাণী আগে লিখছি তা লেখার প্রয়োজন থাকলেও হয়ত আমি উপেক্ষা কবতাম। কিন্তু এখন যা লিখতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যথার্থ বাক্য। এই মুখ্য বিষয়টি আমি উপেক্ষা কবতে পারছি না।

সেই সভার কয়েক মনোরঞ্জন রায়, বাংলার ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারী, নীতি-দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সেই যুগে চট্টগ্রাম যুদ্ধ-বিদ্রোহের পর ফেণী স্টেশনে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের ছোটখাট একটি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের পর আমি যখন কলকাতার আত্মগোপন কবে আমি ভাব মনোবঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার ব্যবহারের জন্য একবার দেখা হয়েছিল। সেটা বঞ্জনবাবু বোধ হয় সেই সময়ে পার্লমেন্টে চোখের অন্তবালে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তিনি এই সভায় বক্তৃতা দেবার সময় তাঁর সঙ্গে মাস্টারদার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ কবলেন। আত্মগোপন কবে যখন কালীন মাস্টারদা তাঁর সঙ্গে বক্তৃতা দেয়া বরেন্ধেন তাও তিনি চানলেন এবং সভায় আরো বললেন সেই যুগে বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে মাস্টারদার অভিমত যা স্বাধীন মাস্টারদার মূখে তিনি শুনলেন।

এই বিষয়ে তিনি বললেন—জাতীয়তাবাদী তাকে বলেছিলেন—“দেব, আমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বর্তমান আমের সংস্কৃত হতে পারবে? বজ্রঝেব আঘাত কিছু Concession আদায় কবতে পারি না Reforms লাভ কববে। ইতিহাসে আমরা যদি বেশ দ্রুত দিয়ে আরো বেশি Concession কবতে পারি তবে Round Table

Conference-এর পর হয়ত আবেদন কিছু Reforms পাওয়া যাবে।" মনোরঞ্জনবাবু তাঁর ভাষায় মাস্টারদার নামে ঐ কথাগুলি বলে গেলেন; তারপর তিনি যেভাবে মাস্টারদার কথা বুঝেছিলেন তা জোবের সঙ্গে বর্ণনা দিয়ে বার বার বললেন—মাস্টারদার মনে মিথ্যা ধারণা বা illusion ছিল না যে সম্ভ্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে Reforms ছাড়া অধিক কিছু পাওয়া যাবে। "বুঝলি, আমাদের সীমিত শক্তিতে এই সীমাবদ্ধ ফলেব অধিক ভাবা যায় না....", ইত্যাদি, ইত্যাদি মাস্টারদা নাকি তাঁর কাছে বলেছিলেন।

তাবপর মনোরঞ্জনবাবু শ্রেণীসংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের অপ্রতিহত গতি ও প্রচণ্ড বৈপ্লবিক শক্তির বর্ণনা দিলেন। মাস্টারদা তখনই তাঁকে শ্রমিক-কৃষকের চূড়ান্ত বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। মনোরঞ্জনবাবুকে মাস্টারদা শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের কথা যে বলতে পাবেন তাতে আমাব কোন সন্দেহ নেই। মাস্টারদাব প্রতি মনোরঞ্জনবাবু কোনরূপ অশ্রদ্ধা দেখান নি। অতি প্রশ্ণার সঙ্গেই তিনি মাস্টারদাব কথাগুলি বলেছিলেন, তবু মোক্ষা কথা তাঁর বক্তৃতায় যা বোঝা গেল—মাস্টারদা যে সশস্ত্র বিপ্লবের আগুন নিজে জ্বালিয়েছিলেন তার Limitation ভারতে Reforms আনা এবং Reforms-এর জন্য বাংলাদেশে ও ভাবত-বর্ষে বিপ্লবীদের অজ্ঞ প্রাণ আত্মবলি। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সেই অতীত যুগেও হয়ত মাস্টারদা মনোরঞ্জনবাবুকে শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। এতে মতানৈক্য কিছু নেই। তবে মনোরঞ্জনবাবুর অস্বীকার—মাস্টারদার আইডিয়া—বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার Limitations কতগুলি Reforms অর্জন করা—এটা মানা আমাদের কাবও পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার বিশ্বাস মনোরঞ্জনবাবু এইরূপ অবাস্তব কথা মাস্টারদার নামে বলতেই চান নি। হবত বলতে চেয়েছিলেন অন্য কিছু কিন্তু যা প্রকাশ পেল তা মারাত্মক ভুল। বাংলাদেশের বিপ্লবীরা জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য প্রাণপাত করছে। এই ঐতিহাসিক সত্য যদি স্বীকার করা না যায় তবে মাস্টারদার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পেছনে Reforms পাওয়া অবাধ Limitations ছিল বললে কি সত্যের অপলাপ করা হবে না? বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা আসবে না কেনেও মাস্টারদা সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে গেছেন Reforms অর্জন করার জন্য—শত-সহস্র বিপ্লবী তবু প্রাণ দিয়েছে Concession আদায় করার জন্য—এ হেন দৃষ্টিভঙ্গী

কি বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে না? যদি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার বিনিময়ে মাত্র Reform-ই পাওয়া যাবে, তবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য বৈপ্লবিক পথ পরিহার করে কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়াই তো মাস্টারদা ও তারূপ বিপ্লবীদের উচিত ছিল।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিপ্লবের অধ্যায়, ধাৰা ও গতি তাঁরা তখন বোঝেন নি সত্যি। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশী শত্রুকে নিপাত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করতেই হবে—এই সম্বন্ধে কোন বিপ্লবী মনেই বিস্ময় সন্দেহ ছিল না। তাদের চিন্তাধারা দ্রাস্ত বা সীমাবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই যে তবুদের জাগিয়ে তুলতে হবে শত্রুকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে, তাতে কোন আপোষের স্থান ছিল না। এই বৈপ্লবিক প্রেরণা নিয়ে মাস্টারদাব আমল থেকে আবেদন পশ্চিম বছর আগে বালক ক্ষুদ্রিরাম ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণ দিয়েছে। ১৯২৪ সালে গোপীনাথ ফাঁসি মণ্ড থেকে বলে গেল—“আমার প্রতি রক্তবিন্দু ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে।” Reforms-এব কথা বিপ্লবীরা কখনও চিন্তাই করে নি।

একজন ফাঁসি গিঁথে বা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন বৈপ্লবিক আক্রমণ চালিয়ে বা চট্টগ্রামের মত একটি জেলায় যুব-বিদ্রোহ ঘটলেই পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে—এইরূপ অবাস্তব ধারণা কোন বিপ্লবীরই ছিল না। একদিন দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে সেই আশা বন্ধু নিয়ে বিপ্লবীরা প্রাণ দিয়েছে। মাস্টারদার বিপ্লব সম্বন্ধে সীমিত ধারণা থাকতে পারে তবে এইটি নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল যে, সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার আদর্শ স্থাপন করে দেশবাসীকে শিক্ষিত ও উদ্বেগ করে তুলতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য—বটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে পারবার জন্য।

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে আমবা নীতি হিসেবে গ্রহণ করি নি—অহিংস নীতিকে policy হিসেবে গ্রহণ করে অল্প সময়ের মধ্যে দেশ জুড়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা গেছে। তারপর গান্ধীজী—যতবার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বা লবণ আইন ভঙ্গ অথবা ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের জন্য দেশ-বাসীকে ডাক দিলেন ততবারই অহিংসার গান্ধিতে কোন আন্দোলনই নিবন্ধ রইল না। ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন সারা ভাবত জুড়ে প্রবল হিংসাত্মক আন্দোলনে পরিণত হল। তাবপরের পর্যায় ভারতে হিংসাত্মক আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ দেখতে

পাওয়া যায় ভারতীয় নাবিকদের ‘নৌবিদ্রোহ’।

১৮৯৭ সাল থেকে বিপ্লবী দুই ভাই “চাপেকার” প্রাণ দিল পুণায়। তারপর ক্ষুদ্রিরাম, কানাইলাল, যতীন মুখার্জী, সূর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবীরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে আত্মবলি দিলেন। ভারতের প্রত্যেকটি শহরই জানতেন তাঁদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মূলে আছে বিপ্লবের আদর্শ স্থাপন করা ও বটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে উচ্ছেদ করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা—Reform বা Home Rule নয়—নিভেজাল পূর্ণ স্বাধীনতা।

ভারতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের প্রায় বিশ বছর পূর্বে থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে রক্তাক্ত বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভাবতের মাটিকে চব্বি বিপ্লবের জন্য উর্বর করে গেছে সেই ঐতিহাসিক সত্যকে গোড়া গান্ধীবাদীরা অস্বীকার করলেও বিপ্লবীরা তা অস্বীকার করে না। স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহই শেষ রক্তাক্ত সংগ্রাম। তাবপরই চতুর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী চক্র পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান উপহার দৃষ্টি ‘অশান্ত ভাবতের নেতাদের দিবে গেলেন—নেতারাও ভারতের দিক্ চক্ৰবালে রক্তাক্ত বিপ্লবের কাল মেঘ ঘনীভূত হতে দেখে অহিংসা আন্দোলনের Logical (যুক্তিসঙ্গত) মৃত্যু ঘটেছে বন্ধুতে পেরেছিলেন এবং তাই ‘মার্টিনবার্টন এওয়ার্ড’ গ্রহণ করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চাইলেন। ভাবতের জনগণ, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা না করে অবসর গ্রহণ করত না। সূর্য সেন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের একটি সুদৃঢ় সোপান নির্মাণ করেছিলেন—Reforms পাবার লক্ষ্য নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি।

ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার Indian Republican Army, Chittagong Branch কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের নামে সেই জনাই আমাদের ঘোষণা স্বার্থহীন ভাষায় লেখা হয়েছিল—

“The right of ownership of India and the control of her destinies belongs to the people of India only and the long usurpation of that right by a foreign people and Government has not extinguished that right nor it ever CAN. The Indian Republican Army, proclaims to-day its intention of asserting this right in Arms in the face of the world and,

সাপ্তাহিক বঙ্গদত্ত

thus put into actual practice the idea of Indian Independence declared by the Indian National Congress; and hereby pledges the life of every one of the members to the cause of freedom, to the welfare and exaltation of the Motherland amongst all other nations." (Page—49, Printed Judgment of the Chittagong Armoury Raid Case No.—3.)

(ভারতের মালিকানাধীন ও ভাগ্য-নিরন্তরের অধিকার একমাত্র ভারতের জনসাধারণেরই আছে: দীর্ঘকালব্যাপী বৈদেশিক বাজারসমূহ সেই অধিকার খর্ব করিয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদের স্বাধীনতা স্পৃহাকে সে কখনও নির্বাণিত করিতে পারে নাই, কখনও পাবিবেও না। অস্ত্রের সংঘাতে সমগ্র জগতের সমক্ষে আজ ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনী এই অধিকার লাভের আকাংক্ষা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে এবং এইভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-ঘোষিত স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবে কার্যে পরিণত করিতে সংকল্প কবিয়াছে। বিশ্বের দরবারে ভারতের স্বাধীনতা, জনকল্যাণ ও মাতৃভূমির মর্যাদার মহান উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে আজ প্রতিটি সভ্য জীবন-পণ শপথ গ্রহণ কবিতেছে।)

বঙ্গীয় বিপ্লবের পথে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই মহানায়ক সত্য সেনের একমাত্র

কাম্য—একমাত্র আদর্শ ছিল—এতে অন্য কোন অর্থ করার অবকাশ নেই।

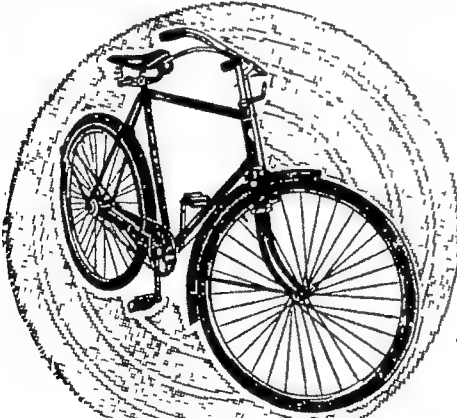
মূল বিষয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। কমরেড মনোবজ্ঞান রায়ের বিপ্লবী নিষ্ঠার প্রতি কোনবকম প্রশংসার অভাব আমার নেই, তথাপি মাস্টারদার সম্বন্ধে তাঁর এই ভুল উক্তি প্রতিবাদ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। তাঁর কথা শুনতে ভুল হবে বা ভুল বুদ্ধি এই প্রসঙ্গে যদি আমি প্রকাশ্যে উত্থাপন করি, তবে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে, এই দায়িত্ব-বোধ আমার আছে। আমার শুনতে বা বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল হয় নি। কারণ বাড়ি ফেরবার সময় বন্ধু গণেশ ঘোষের সঙ্গে এক গাড়িতে আমি উঠি। গাড়িতে উঠেই আমার মুখ থেকে প্রথম কথা বেরিয়ে এল—“মনোবজ্ঞান এ সব কি বলল? মাস্টারদা Reforms-এর আশায় বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিলেন?” স্বভাব-স্বত্বভাবে গণেশ জবাব দিল—“আশ্চর্য! আমার খুব খারাপ লেগেছে। মনোবজ্ঞান কি করে বলল—মাস্টারদা Reforms পাওবার জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা কবেছেন? মনোবজ্ঞানের এই কথায় আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি। এরকম গম্ভীর পরিবেশে কোন বিতর্কমূলক কথা বলা উচিত নয় বলে আমি এটি—এ কিছু বললাম না।”

এই প্রসঙ্গ নিয়ে মনোবজ্ঞানবাবুর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করলে আমার বিশ্বাস তিনি গুরুত্রে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন এবং মূল বিষয় বলতে যে কোথাও তিনি ভুল করে ফেলেছেন, তাও

স্বীকার করবেন। যদি ঐ ভুল-বিস্মৃতি, অতর্জন ভাবীকালের ভুল-বিস্মৃতি কাছে মাস্টারদার নামে নেই, তাহলে মূলক Reforms-এর উদ্দেশ্য প্রচাৰ না হোত, তবে আমরা পরস্পরে আলোচনা কবেই বিষয়টির নিষ্পত্তি করে নিতাম। কিন্তু বিপ্লবী প্রচেষ্টার Minutes: Reforms জেনেও ভাবীকালের বিপ্লবীরা প্রাণ দিয়েছে—এই হাত ধরা মাস্টারদা বা কোন বিপ্লবী সম্প্রদায়েরও মনে থাকুক তা ঈশ্বরের ন্যে বসেই আমার প্রকাশ্যে লিখতে হল।

আমার এই লেখকটিতে ২২ দিনের কাজীপাড়ার জালালাবাদ নিবাসী বিপ্লবী উদ্ভাসপানের একটি অংশ হিসাবে লেখা হয়েছে। আমার ভাল লাগবে। সত্যি বলতে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ্যেই সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমার লেখকটি গড়লে তবেই আমি সার্থক হবো।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের এতদূর বিউগলার সভায় শহীদ স্মরণ 'Last Post' বাজাল। বিউগলের কলারের শব্দ সমস্ত পরিবেশটিকে অন্যপ্রণয়া দিয়েছে। মাস্টারদার বাণীর সেই চিহ্নটি—“শুধু এই—এই হল আমাদের প্রাণ—একটি সোনালী স্বপ্ন—স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন?” আমার অন্তরে প্রতিধ্বনি ডুলেছিল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আমি আমার অন্তরের বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানিয়ে দিয়া নিলাম। —অনন্ত সিংহ



সেরা সওদা

রোভার সাইকেল যে কোন পথে স্বচ্ছন্দে চলার জন্যই তৈরী। যেমন স্বচ্ছন্দে চেহারা, তেমনি আছে সব রকম দৃঢ় সহবার শক্তি। আর তাই রোভার সাইকেলের উপর লোকের এত আস্থা। আজকের একটি অতি জনপ্রিয় সাইকেল।



এভারেষ্ট সাইকেলস লিমিটেড

মার্কেটাইল বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

রেজিস্টার্ড-অফিস ও ফ্যাক্টরী—গৌহাটি

কেবলস্ এন্ড সাইকেলস্ ৪ কলিকাতা; রোভার ৪ গৌহাটি



স্রবাজ্য বন্দ্যোদ্যাত্রা ॥

বিদ্যা বাউলীর হস্তে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পরঃ)

॥ চার ॥

গায়রের মেলা জমজমাট। সম্ম্যাস নৌদিন ভিড় আরও বেড়েছে। চম্বিশ গ্রহর নামকীর্তন শেষ হয়েছে। কীর্তন শেষে মালসা ভোগ, মচ্ছব। দূপদূরে মচ্ছবেব খাওয়া শেষ হয়েছে। পিলাপিল করছে মানুষ। চামা-ভুয়ো! জোলা, খলিফা, কেউ আর বাকী নেই। সার দিয়ে বসে গেছে গাঠেব ওপর। কলাপাতার ওপর পেসাদী খিচড়ি আর ঘাট তরকারি। খেতে কিন্তু অমৃতের মত। ঠা ঠা বোন্দুরে মাখায় গামছা অথবা ঘোমটা মর্দা-মাইয়া বসে গেছে সার দিয়ে।

বিদ্যা-কুমির চক্ষুস্থিখ। হাসি কল-রবের তুফান। পরাণের তুফান।

মচ্ছবেব প্রসাদ-পেয়ে ফিরে এসে বসতে বসতে রোদ চলে গেছে অর্জুন-গাছের ডগায়। সূর্য লেনে গেছেন অনেকটা সড়ক আর আকাশের সীগানাব পারে। ফাল্গুনব চড়চড়ে রোদেব পর একটু যেন ঠান্ডা। বাতাসটা বইছে দমকে দমকে কিন্তু আগে হল্কা এখন একটু যেন শীতল।

চটেব ওপর কাৎ হোল কুমি।—ওবে মা-লো-মা। প্যাট ফাটো ফাটো। খিচড়ি খাইছি অনেকগুলান।

—ঘুমাইস না কইল।

বিদ্যা তাকাল বসে বসে। চোখ বন্ধ ও করবে না। চোখ বন্ধ করতে ও এখানে আসে নি। এসেছে ও দেখতে। চোখ মেলে দেখতে যা কিছু চোখে পড়ে। কখন যে কি চোখে পড়ে মনে রঙ ধরাবে কে

জানে! কুমিটা চোখ বজ্জল। কালচে ঠোঁট দুটো ফাঁক হোল একটু। কালো মিশমিশে হাতখানার ওপব মাথা। হাতের ওপর লাল গাড়ির না পড়ে!

ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মর্দা সকলের মুখেই বেশ তৃপ্তি, হাসি-হাসি ভাব। এত মানুষ, এত আনন্দ। এ মেলায় যে পাবে আনন্দ কুড়োর, যে না পাবে ফাঁকে পড়ে।

মস্ত মস্ত কাঁটা নিয়ে গোটা দশ-বারো মালী মাঠ সাফ করতে লেগে গেছে। মাঠ সাফ হবে, বিরাট চট পাতা হবে, তার ওপব সতর্গি। ফাঁকা আকাশের তলায় যাত্রাগান হবে আজ সম্ম্যাস থেকে রাত ভর। আজকের পালা নিমাই সম্ম্যাস। নিতাই-চাঁদের মেলা নিমাইচাঁদের গান দিয়ে শূর। তোড়জোড় চলেছে চতুর্দিকে। দেখতে দেখতে বেলা চলে পড়ল। অন্ধকার হয়ে এল অর্জুনগাছতলাটা। খেপী বসে আছে তো বসেই আছে। দেখছে তো দেখছেই।

সতর্গির ওপর কিছু কিছু মানুষ জমায়েত হতে শূর কবেছে। একপাশে অধিকারী বাবদের জন্যে খানকতক চেয়ার। সেই চেয়ারের পাশ দিয়ে বাঁশ দিয়ে একটু বেড়ার মত করা হয়েছে। মেয়েদেব বসবার জায়গা। এ ছাড়াও মেয়েদেব বসবার আরও স্থান আছে নাট-মন্দিরে। দেখছে আর ফিক ফিক করে হাসছে বিদ্যা! এয়েন বেড়া নয়, বম্বন! এ তফাৎ নয়, আরও অটি হয়ে কাছাকাছি আসবার টান। মর্দা-মানুষদের ছোঁয়ার ভর, দৃষ্টির ভর, এ যেন এক শব্দ রশির টানকে

আরও জোরালো কবা। আলাদা থেকে এক হবার টান বাড়িয়ে তোলা।

ফিক ফিক করে হাসছে বিদ্যা। ঘরের মানুষের ঠিকানা নেই, ঘর বাঁচাবার ছট-ফটানি। পিঞ্জিরা নিয়ে টানাটানি, পাখীর উদ্দেশ্য নাই। পক্ষী যদি উড়াল দেয় চক্ষুর ইসারায়, পিঞ্জিরা দেইখ্যা থপর পাইত কে? কেই বা বোঝে, কেই বা জানে! বিদ্যা খেপী কাবখানা দেখে অবাক হয়।

কুমি তখনো ভৌস ভৌস করে ঘুমচ্ছে। কালঘুমে পেবেছে ওকে। সম্ম্যাস উঠে গেল। অনেক হাজাক বাতির সাদা দুখেব মত আলো জ্বলে উঠল। আলোর ছাঁট এসে পড়েছে অর্জুন-গাছের তলায়।

মানুষজনে ভরে এল সতর্গি। কুমির ঘুম আর ভাঙে না।

বিদ্যা কুমিকে একটা ঠেলা দিল।—
আলো অ—কুমি। ওঠ।

কুমি গড়িয়ে ওপাশ ফিরল।

বাজনদাররা বাজনা শূর করেছে।

—ঘুমুলি পইড়া গেছে। কুমি লো, ওঠ—।

বাজনাব জমজমে আওয়াজে এতক্ষণ চোখ মেলে কুমি। চোখ দুটো ডলে হাই জ্বলল। কালো মূখখানা চকচক করছে আলোয়। চোখের কোল দুটো ফুলো ফুলো।

যাত্রাগানের আগে সবাইকে জানান দেবার জন্যে তিনদফা বাজনা বাজান হয়। একদফা বাজনা শেষ হোল। লন্টন হাতে

পাণ্ডাহক বসন্তভী

দলে দলে মানুষ আসছে। বিদ্যা বসে বসে দেখছে।

কুমি উঠল। আঁচলে মদ্যখানা যত্ন করে মদ্যছিল। চট করে পোঁটলা থেকে চিরদুর্গা-খানা বার করে চুলেব সাগনের দিকটা আঁচড়ে নিল। একটা পান বার করে মদ্যে পদরল। শাড়িখানা আঁট-সাঁট করে পরে নিয়ে উঠে বলল—চল।

কুমি এসে বাঁশের সীমানার ওপাশে হসতে গেল, খেপী রাজী নয়।

—না, ওখানে বসন্ত না।

বাঁশের বেড়ার ঠিক উল্টো দিকে মজর পড়তেই কুমিও আর আপত্তি করল না। ওকে টেনে নিয়ে ওর নজরের জাবগা-টাতেই চলল। এগিয়ে এসে পেছনে একটা কোণে বসে পড়ল ওরা। বসে কুমি পেছন ফিরে আর একবার তাকাল। হ্যাঁ, মদ্যকুল দোকানী ঠিক ওদের পেছনে বসেছে। কুমিকে তাকাতে দেখে হাসল। হাসি দেখে কুমি চোখ ঘোঁরাল।

দুটো ছোট জ্বালের মেয়ে এসে পেছনে বসেছে। তাতে কার কি আসে যায়। বছর অন্তে একবার মাত্র যাত্রাগান হয়। সবাই গান শোনায় ব্যতিব্যস্ত। পালা-গান জ্বর, নিমাই সম্যাস। নিমাই সাজব কেডা? মদইন্যা।

যাত্রাগান জমে উঠেছে। মদইন্যা—হ্যাঁ মদন ভুইয়ার গান কানে মিঠা রস ঢালে।

ঘরের আগুন বিষ্কুপ্রিয়া, দিবা যাই
মা জ্বালাইয়া
সেই আগুনে জ্বাইলন্যা দিবা নিশি গো
—ও—ও—ও।

মাড় পর্যন্ত চল, হলদে রঙের সিলেকের কাপড় চাদর। মদনের কি শোভা হয়েছে। অত কালো আর দেখায় না। বেশ ফরসা ফরসা দেখাচ্ছে। চোখ দু'খানা যেন কান ছোঁয়া। বলিহারী সুর আর আওয়াজ। নিখুঁত নিষ্কম্প গলা। সুরটা বেশ ভন্দর ভন্দর—যেমন মিঠা তেমন চড়া। এক মাঠ মানুষ সবাই শুনতে পাচ্ছে।

বিদ্যাধরীর নয়নে পলক নাই। কি গান গায়রে কালা মদন! স্যামন গাওনা ত্যামন বাজনা।

নিমাই আব ঘরে থাকবে না। বিষ্কু-প্রিয়া ঘুমুচ্ছে, নিমাইচাঁদ ঘর ছেড়ে যাবার সময়—মদ্যখানা ফিরিয়ে বারবার দেখছে বিষ্কুপ্রিয়াকে। নিমাইয়ের চোখ উদাস—মন উদাস। নিমাই বাউল হবে বড়ি।

বুড়টা কাঁপছে বিদ্যায়। মস্ত চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠছে। এত বড় মাঠ-খানা নিস্তব্ধ-নিশ্চুপ।

নিমাই চলে গেল। আকস্মিক ঘুম

ভাঙল বিষ্কুপ্রিয়ার। নাকের নাকছাঁবি কই তার? নাকছাঁবি খুঁজে পাচ্ছে না। তবে কি হারাল, নাকছাঁবি হাবাল। তার কি সর্বস্ব হারাল।

খইসা পড়ল নাকের সোনা,
অমংগলেব চিহ্ন যায গ জানা।

গান ধবেছে বিষ্কুপ্রিয়া। চিকণ গলায় মৃন্দব লাগছে বিষ্কুপ্রিয়াকে। তার নিমাই বড়ি নেই।

বিদ্যাব বুড়টা যেন আখ মোচড়ানর মত মোচড়ায। তাব কালা মদন নেই, কালা মদন চলে গেছে। আবার কখন আসরে আসবে কালা মদন?

—অ কুমি, বুড়খান আমার কেমন করে লো!

ফিসফিসিয়ে পাশে তাকিয়ে বিদ্যা দেখে কুমি নেই। কুমি গেল কোথায়? কুমি নেই। তার কালা মদন নেই।

খেপীব হাঁপ ধরে যায়। আশে-পাশে তাকায। কুমি নেই।

কুমি তখন মদ্যকুল দোকানীর ছাপরায় হাসতে হাসতে মদ্যকুলর মোষের মত গলাখানা জড়িয়ে ধবেছে। মদ্যকুল হাসছে খুঁক খুঁক করে। বরাবরই ও এই রকম। দোকান সাজাবে, পসার সাজাবে, বিক্রি-বাটা সবই হবে। কিন্তু নজরটা ওর সেই একমুখো। মেলায় গল্পে খুঁপবি পেতে যারা বসে, তাদের কাছে যায না মদ্যকুল। পরসা দিয়ে সওদা কববে। বাসিন্দা নেবে না। দু-পাচ-দশ যাই লাগুক না কেন! এ ওর একটা নেশা।

যাত্রাগান শুরুর হবার আগে বিদ্যা আর কুমি যখন বসতে গেল, ওপাশ থেকে ইসারা করল ও কুমিকে। ইসারায় জবাব দিয়ে কুমি এসে বসল ওর পাশে। গানটা যেমন জমেছে, কুমির পিঠে ঠালা দিয়ে ইসারায় তাকে সঙ্গে আসতে বলল। কুমিও দু-তিন দিনে হাঁপিয়ে উঠেছিল। রাস্তার কটা কাটল যেন শূন্য শূন্য কেমন ফাঁকা ফাঁকা। কুমিও চলে এল। একেবারে মদ্যকুলর দোকানের ছাপরায়।

যাত্রাগানের আসর চলেছে পুরোদমে। নিমাই ঘর ছেড়ে গেল। খুঁকুলির বাজনা শুরুর হোল। এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম। বিদ্যাধরী তাকাল পাশে। একটা কেরো যাচ্ছিল ওর পাশ দিয়ে। ওটাকে ধরতেই গোল পাকিয়ে গেল। ছুঁড়ে ফেলে দিল। কুমিটা গেল কোথায়? ভাবল দু-চারবার। তারপরই জ্বলল। যেখানে খুঁশি যাক না। সব মানুষই মজা চায়, মদ্য চায়। মদ্যেব খুঁজে ছুটে বেড়ায়, গতাগতি করে। জাববার আব আছে কি!

গান শুরুর হয়েছে আবার।
না। মদন ভুইয়া আব তেমন জ্ঞাতে

পারছে না। বরং বিষ্কুপ্রিয়ার গানগুনে, যেন সবাব মনে আত্মনাদ তুলছে। বসন্তে সুরে বেহালাব ছাড়ির টান। বসন্তে ডাল যাকিয়ে। আসব ভিজিয়ে দিয়েছে। তেমন শচীমাতা, তেমন নিতাই, নিতাই দর্শী মায়ের কাছে এসে তাকে সাম্ভনা দিতে

মাগো তুমি ভয় কইবো না,
ভয় কইবো না।
নিমাই হইল বিষণ চৈতন্য
তুমি মাগো হইলা ধন্য।
কইবো না মনা।

বেশ গাইছে নিতাই। নামটা কি এব। গনসাচরণ। তোফা গাইছে গনসাচরণ। মদন ভুইয়াব গলায় কি ঘুঁক ধবলা ন কি? গলা তেমন উঠছে না। তেমন সবেব বোল-বোলানি হচ্ছে না। হোল বি মদনের? নেশা-ভাঙ কবে নালি? তা নিশ্চয় কবে, যাত্রাগান কবে আব নেশা করে না। জন্ম বেড়াল হয়ে আর কৈতর খায় না?

গাঝ রাস্তাবে গান ভাঙল। ভোর হবার তখনো দেরি আছে।

বিদ্যা তাকাল আবার পিছন দিকে। ও মা, ওই তো কুমি। অর্ধাশা যেখানে বসে-ছিল আলে, সেখান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে বসেছে। পাশে ওটা কে? মদ্যকুল। কুমির সঙ্গে কি ফিসফিস কবছিল। বিদ্যা তাকাতেই খেমে গেল মদ্যকুল। কুমিও মদ্যখানা ঘুরিয়ে নিল। বিদ্যা হাসল। বেদম হাসি পেল। ইসাবার ডাব



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড টীলা বাজার কলিকাতা-১

কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

কুমিকে। ভিড় পাতলা হচ্ছে ক্রমে।
মুকুন্দ ভিড়ের ভেতর মিলিয়ে গেল।
কুমি উঠে এল।

আসতেই বিদ্যা বলল,—কোথানে
গেছিলি?

—আ মনণ, যামু আবার কোথানে!
বইষা আছিলাম বাইরে। গরমে ফাঁপড়
ঠেকত্যাছিল।

বিদ্যা আব কিছু বলল না। হাই
তুলল একটা। ভিড় পাতলা হবার পর এক
পাশে শব্দে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

আবার ভোব। আবার দুপুর। আবার
বিকেল।

আজ্ঞেও গান আছে। মাধুব পালা।
আবার সন্ধ্যা নেমে এল। আবার হাজাক
জ্বলল সারি সারি।

ধুম্বলির বাজনা বাজল। ওরা বসল
কালকেব জায়গায়। পাশে ঠিক এসে
দাঁড়াল মুকুন্দ।

কুমি উসখুস কবে উঠল। বিদ্যা
দেখেও দেখল না। যাত্রাদলেব কিস্ট কাল
মদন। কিস্টর গানেই কাল্যামণিক পরি-
চিত। সুখ্যাদ করে সবাই। কাল্যামদন
আজ কিস্ট সাজবে। বিদ্যাব মন আনচান।
কতক্ষণে কাল্যামদন নামবে আসরে।
শুদ্ধ ও নয়, আশে-পাশে অনেকেই উস-
খুস করছিল।

কুমি এল আসবে। কিন্তু এ কি! এ
তো কাল্যামদন নয়! চাবদিকে গুঞ্জন।
অস্ফুট গুঞ্জন। মদন ভূঁইয়া গেল কোথায়?
অসুখ কবল নাকি? না-কি বাগারাগি
করে দল ছেড়ে চলে গেল? কি হোল
মদন ভূঁইয়ার?

বিদ্যার গলাটা তেতো লাগছিল।
গান শুনছিল, কিন্তু মন নেই। কেমন
বিস্মাদ লাগছে যাত্রাগান।

কুমি সেজেছে কালকের নিতাই—মানে
মনসচরণ। গলাখানা ভাল, তবু মদন
ভূঁইয়ার মত নয়।

যাই হোক, জমিয়েছে মনসচরণ।
বয়েস কিছু কম। উঠতি গাওনাদাব।

বিদ্যাধবীর চোখ দুটো একটু যেন
মেঘলা মেঘলা। আনমনা দৃষ্টি। উসখুস
কবে গা চুলকোতে চুলকোতে পাশ
ফিবল বিদ্যা। সত্যি বড় গলম লাগছে এই
ডিডে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আজ্ঞেও
দেখল কুমি নেই। কুমি যে কখন উঠে চলে
গেছে টেবণে পাব নি বিদ্যা।

গবমে ফাঁপড় লাগছিল কুমির। তা
হবে। ওষ নিজেবও ফাঁপড় লাগছে আজ্ঞে।
গলা ঘেমেছে, পিঠ ঘেমেছে।

উঠে পড়ল বিদ্যাধবী। আস্তে আস্তে
বাইরে চলে এল। মানুষের ভিড় বাঁ পাশে
রেখে একটা চকর দিয়ে মাঠের মাঝখানে
এসে দাঁড়াল। দমকে দমকে হাওয়া দিচ্ছে।

ফ-গুনের প্রথমে রাত একটু বাড়লেই
হাওয়া বেশ। কেমন একটু শীত শীত
কবে। ঠাণ্ডা হাওয়া, গায়ে লেগে বেশ
আবাম দেয়, কিন্তু জ্বব-জ্বারির পক্ষে
ভাল নয়।

গায়ে শাড়ি ব আঁচলখানা ভাল কবে
মুড়ে তাকাল বিদ্যাধবী। তখন চাঁদ উঠেছে
আকাশে। মাত্র দুদিন আগে পূর্ণিমা
গেছে। হাজাকের আলোয় লম্বা লম্বা
মানুষের ছায়া পড়েছে মাঠে। গোটা মাঠ-
খানা নিস্তম্ভ। কানে আসছে গাওনা-
বাজনার শব্দ। তাকাল ডানদিকে। সামনে
সড়ক আর খালের পল্লট চাঁদের আলোর
ছায়া ছায় মনে হচ্ছে। পালের পাশে
নিবিড় অন্ধকার। লম্বা লম্বা বাঁশের ডগা
দেখা যায়—বোধ হয় মস্ত একটা বাঁশ-
ঝাড় আছে ওখানে। বাঁশঝাড়ের শন শন
শব্দ বাতাসেব আওয়াজটা আরও বাড়িয়ে
দিচ্ছে। কানের পাশ দিবে মাঝে মাঝে
হু-হু করে হাওয়া বইছে।

ভাল লাগছে না বিদ্যাধবীর। মনেব
তলাটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় যেন কি
একটা পেল বলে মনে হয়। কি পেল?
পাবার আশায় আর সন্ধ্যানে বহুকাল
কেটেছে। মনেব মধ্যে যে আঁজব মানুষ।
সেই মানুষকে পাবার কথা শৈশব থেকে
শুনেছে ও বাবার কাছে। বাবা ওর বকে
টোকা দিবে বলত ছোটবেলায়। এইত্যা
মধ্যে যে মানুষ বইছে, তাক যদি জাইনতে
পাবস, তবু ভূঁইয়া গেলি ছেমডি।

তখন তো ছাই এত কথা বোঝা যেত
না। কতকাল কাটল। ও সেই মানুষের
সন্ধান কবছে। বাবা ওকে দমের কাজ
শেখাল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া। তারও
পরে বয়েস যখন হোল, বাবা এক ভোব
বিয়ানে বলিছিল ওকে, তব মধ্যেই পরুষ
পিকিতি, তব মধ্যেই বজবীজ। অদব
মানুষ নাইম্যা আইসে ঘাটে। নজব রাখলে
টার পারি। সেই মানুষেব যদি ফান্দে
ফালাইবাব পাবস তক লইয়া উঠিয়া আইব
এখানে।

ওব কণ্ঠে আঙুল দিবে দেখাল বাবা।
—এ বড় জোর সাদন ছেমডি। মানুষ
পাইলে রসের ছোতে ভাইয়া যাবি। সুখ
কাবে কয়। বইখবাব পাববি। সংগল
সুখ মনে। মনখান টালমাটাল না হয়
কইল।

এমনি কবে কত কথা বলেছে তাকে
বাবা। কত কথা বইখয়েছে।
বলেই কি ছাই বোঝা যায়! বইখতে
হয় মনে। মনেব মর্ম মনে বইখতে
হয়।

সব কিছু তুচ্ছ কবে একতারা খগ্ননী
আব গানকেই ও আশ্রয় কবে আছে এত-
কাল। এক-একটা গান গাইতে গাইতে

দমের কাজ হয় আপনা-আপনি। থির হয়ে
যায় মন-বাতাস। গানের মর্ম কথা আলোর
মত পরিষ্কার দেখতে পায়। বোঝাতে হয়
না কাউকে। নিজেই বোঝা যায়। গানের
প্রতিটি অক্ষর চোতন হয়ে জ্বলজ্বল করে।
সব রহস্য স্পষ্ট হয়। কিছু আর আবোঝা
থাকে না।

বিদ্যাধবী বাবাব কথা ধুব করে নিয়ে
সেই মুখোই তার নাও বেয়ে চলেছে।
বাইরের সুখ সুখ না, সংগল সুখ মনে।
যে রঙে মন রাঙাও। সেই রঙে রাঙাবে।
তাই তো গানে গানে মনকে বলে। সামাল
সামাল। টালমাটাল হোয় না।

কিছুকাল হোল একটা কথা বার বার
সে বইখতে পাবছে। বসিক মানুষ ধবতে
হলে তাকে দেখতে হবে বাইরের কোন
মানুষের মধ্যে। না হলে কিছুই যেন
পূর্ণ হয়ে ওঠে না। একটা আশ্রয় চাই।
বস্তু একটা চাই। মানুষ একটা চাই। যাকে
ধরে সে মনের সেই অধর মানুষের নাগাল
পাবে, তাকে ফান্দে ফেলতে পারবে।

বার বার সে পালায়। সে মাছ জালে
পড়ে না। ঘাটে বসে বসে অনেক কাল
কাটল। তাকে ধরা গেল না।

সময় বইখ বাঁধ না দিলে আর উপায়
নেই।

কিন্তু কই সে মানুষ? ত্যামন মানুষ
কই। যার ওপব সে মন ফেলে রসের
ভিয়ান চড়াবে। যে তাকে উদ্ধার করবে
রসের স্রোতে। যার সঙ্গে তার দেহের
সম্বন্ধ থাকবে না। যাকে সে বসাবে তার
মনের পৈঠেয়। আশ্বাদন করবে তার
শুদ্ধ বস। সেই মানুষ হবে তার এক-
মাত্র মানুষ। তাব তরে মন-প্রাণ সব ঢেলে
দিবে তাকে ধরে সেই চবম পলকে নেচে
গেয়ে বেড়াবে? কই সে মানুষ?

পীণিত কেমন জানলাম না।
মন দরদী খুঁজিয়া পাইলাম না।

তারই সন্ধ্যানে সে অনেক দিন রাত
কাটিয়েছে। এ মেলায় বইখ তাব সাক্ষাৎ
মেলে।

কে সেই মানুষ? কাল্যামদন?
মনটা টনটনিয়ে ওঠে।

আজ যাত্রাগানে কাল্যামদন নেই কেন?
কি হোল ওব? তবে কি চলে গেল
কোথাও? না কি অসুখ হোল।

কানের পাশ দিয়ে হু হু করে বাতাস
বইছে। বিদ্যাধবীর প্রাণ আনচান করে।
ভাল লাগে না যাত্রা শুনতে। ভাল লাগছে
না আর মানুষের ভিড়। একজনকে সে
খুঁজতে চাইছে।

আস্তে আস্তে এগোয় বিদ্যাধবী।
ওদের থাকবার যে ঘবগুলো আছে সাব-
বাঁধা। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিলে কেমন

অনাহুত দ'জন দর্শক

দুর্গাদাস সরকার

শববাহকেরা তৈরি :

ধাত্রীও প্রস্তুত।

পৃথিবীর অগোছাল জন্মিতে পা রেখে
হো হো করে হাসছেন পারমাণবিক যুগের কাঁবি।

নিরবধি মানুষ আসছে যাচ্ছে

যাচ্ছে আসছে।

কে ভূমি পাঠ করছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট,

কে শোনাচ্ছে : 'এমো আন্স্‌মিতি, এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্,

এতদ্ ব্রহ্মেতি।'

শুনতে পাচ্ছি : 'বিস্ময়িতা হিররহমা নিররাতিজ।'

এলো প'চিশে বৈশাখ।

সাঁধা হচ্ছে স্টেজ।

যে শব্দ মহরতের খসড়া হয়েছিল তৈরি

তা নিপাতনে সিম্ব বলে'

হবে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান।

অপিচ নট-নটীদের অভিনয়ে

সাইরে বইবে আনন্দের প্রাবল্য

দু'জন দর্শক বিনা কার্ডে অদর্শনীয় হাওয়ার সংগে

প্রবেশ করে' সন্ধান করবে অশ্চর্য ঘরে

মন্দের ফলসুধারা।

মড়দের কাশি, ছোটদের হাঁচিতে

মাঝপথে বন্ধ হলে প্রধান অতিথির বাক্যচ্ছটা

সরদালানে ঘোরা-ফেরা করা যুবকেরা

গণ্যমান্য দর্শকদের সংরক্ষিত আসনে বসবে

নিয়মিত হাততালির জন্যে।

সব কিছুই শেষ হবে হাততালিতে।

রক্তগর্ভন হবে শূন্য, মগ্ন হবে ফাঁকা।

তখনো দাঁড়িয়ে থাকবে সেই দু'জনই

গম্ভীর অতীত, নির্মল ভবিষ্যৎ।

একমাত্র যে-নীল আলোটা তখনো জ্বলছে থাকবে

জ্বলক্লেম, ডাড়া-করা স্টেজের মাথায়

তারি তলায় এক থুহুর্তে এসে দাঁড়াবে প্রথম দর্শক!

দ্বিতীয় দর্শক কৃত্রিম উপগ্রহের মতোই

তিন-তিন বার মন্দের উপর যুগে

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে

হাত রাখবে গম্ভীর সিকের রপে ব্যঙ্গ টোড় খাওয়া

এক কোণে ওঁচানো কৃষ্ণনগরের শিশুপীর তৈরি মূর্তিতে

তখনো সেই মূর্তির গায়ে ছেঁড়া মালার গন্ধ।

প্রথম দর্শকের বিস্মিত চোখে চোখ রেখে

কী কঠিন হাসিতে দু'খানা হয়ে যায়...

সেই অপরাধ মূর্তি।

শববাহকের গাজে দু'জন দর্শক বাইরে এসে

সশব্দ পা রাখতেই

একটানা অশ্চর্যে মূর্তির চক্ষুর দীপ্তিতে দেখলে একটা

পথ গিয়েছে পেছনে : খন্ড বর্তমান তাগের ক্রমে : হব,

শ্মশানঘাত্রী তারা নয় : অনাজন স্বীকার করে না গায়ে মেল,

যেখানে ধাত্রী একা বসে' রাত ভাগছেন

একালের গর্ভমন্ডলা থেকে মুক্ত করতে পৃথিবীতে

সেদিকেই তার বিবামহীন চলা।

হয়! ধীরে ধীরে সেই দিকেই এগোচ্ছে
বিদ্যাধরী। হাওয়ার শনশনানি তেমনি
স্বরেছে। একটু যেন শীত শীত কবছে।

এগিয়ে ঘরগুলোর কাছাকাছি গিয়ে
নজর করে। ঘব ঘে সব অন্ধকার। ঘরের
লম্বা ছায়া পড়েছে চাঁদের আলোয়। ঘরের
সামনে ঘর ঘর করে বিদ্যাধরী। এ-পাশ
ও-পাশ করে। না, কাল মদন নেই।
কোথায় গেল কে জানে।

গুনগুনিয়ে ওঠে বিদ্যাধরী। বৃকেব
ভেতবে হাঁসফাস কবে। বেন সে সময়
যুগে কাল মদনকে খবল না।

সময় বৃহৎ বাঁধাল বাঁধল্যা না।

জল শুকাইব, মীন পলাইব,

পস্তাবি রে মন কানা।

সময় বৃহৎ বাঁধাল বাঁধল্যা না।

গুনগুনিয়ে আওয়াজ তোলে বিদ্যা-
ধরী।

কুমিটাই বা গেল কোথায়? সব যেন
কেমন গোলমাল হয়ে গেল। কিছুই ঠিক
ভাল হোল না। মেলায় আসা-যাওয়া সার
হোল। হট্টগোলে রতন হারিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে অজুনগাছ দুটোর দিকে
এগিয়ে আসে বিদ্যাধরী। ওখানেই বসা
যাক, শোয়া যাক। আকাশের দিকে
তাকিয়ে গুনগুনিয়ে রাত কাটান যাক।

মস্ত দুটো অজুনগাছের তলায়
পাতার ফাঁক গলে চাঁদের আলো পড়েছে
ঘাসে মাটিতে। এগিয়ে এসে দু'পা পিছিয়ে
গেল বিদ্যাধরী। কে একটা উবু হয়ে বসে
আছে ওখানে। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের
আলো পড়েছে, সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা
যাচ্ছে একটা কিছু বড় গাছটার গুঁড়িতে
ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে অথবা উবু হয়ে।

ভয় পাবার মেয়ে বিদ্যাধরী নয়।
আরো একটু এগোল এ।

—ওয়ানে কেডা!

আবও এগোল।

—ভূমি কেডা?

চমক লাগল বিদ্যাধরীর। কাল
মদনের গলার আওয়াজ। এখানে কি করছে
কাল মদন! যাত্রাগানের আসর ছেড়ে, নিজের
দেহ শোবার থাকবার ঘব ছেড়ে অজুন-
গাছের তলায়? এখানে বিদ্যা আর কুমি
দিনের বেলাটা রোজ কাটায়, এখানেই বিদ্যা

গান ধবে আওয়াজ তোলে সকায়ে বা
দু'পুবে। এ জায়গটা তাদের বাঁহা জায়গা
এখানে ও কেন?

এগিয়ে এল বিদ্যাধরী।—বে ডা, কানা
মদন?

মদন তেমনি বসে রইল ২৩ বছর।
গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, তাকিয়ে বিদ্যাধরীর
দিকে।

—গান শুনল্যা না?

বিদ্যা বলল,—ভাল লাগল না!

—ক্যান?

বিদ্যাধরী এ কথার ২৩ বছর
একটু তফাতে বসল। গানের ভাষা
শাভিব আঁচল মূড়ি-সুড়ি দিয়ে পা ভাঁজ
কবে বসল। ভাল কবে ভাবনাম চেষ্টা
কবল মদনের দিকে। মদন মূখুটি মিলে
কবে ঘাস ছিঁড়েই একটা একটা বসল।

বসবার ভাঁগটা ক্লান্ত! কবল গর্বিত
চল আঁজ পরিপাটি করে জাঁজুন টাই,
এলোমেলা।

বিদ্যাধরী হাসল।

বিদ্যাধরী

বঙ্গবন্ধু তেজস্বে শিল্পীরা এক এদেশ

অমর ভিয়েনাম

২০শে এপ্রিল শ্রীজোহন দস্তিদার রচিত এবং পরিচালিত এই প্রাগবন্ত এবং বলিষ্ঠ নাটকটির মণ্ডরূপ দেখে এলাম নিউ এম্পায়ারে।

ম্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বৃটিশরা ছিল সাম্রাজ্যবাদের লালসায় আকর্ষিত নিম্নজাত-যুদ্ধোত্তর কালে বৃটিশদের আজ আর সে সূদিন নেই—আজ তাদের অনেকে আমেরিকার ফিফটি সেকেন্ড স্টেট বলেও ঠাট্টা করে। বৃটিশদের স্থানচ্যুত করে আজ পৃথিবীর সেরা সাম্রাজ্যবাদী জাতি হিসাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে মার্কিনীরা—এ ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বসূরী ইংরাজদেরও ছাড়িয়ে গেছে। বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার অসকার ওয়াইল্ড তাঁর একটি রচনায় বলে-
ছিলেন—

When a bad Englishman dies, he is born in America.

যুদ্ধোত্তর মার্কিনীদের স্বরূপটা কত আগেই কেমন সুন্দরভাবে সহজ ভাষায় ওয়াইল্ড পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে গিয়ে-
ছিলেন তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

জোহন দস্তিদারের লেখা ভিয়েনাম সম্বন্ধীয় নাটকটি দেখতে দেখতে আমার বার বার মনে হচ্ছিল ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী মহাশয়, পরি-
কল্পনামন্ত্রী শ্রীযুক্ত অশোক মোটা ও ভূতপূর্ব খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যম মহোদয়কে এনে এ নাটকটি দেখানো উচিত। দেখানো উচিত কিভাবে মার্কিনী তাবোদারী করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের মাতৃভূমির সর্বনাশসাধন করেছেন। কিভাবে নিজের দেশকে বিক্রি কববার ব্যবস্থা করেছেন আমেরিকানদের হাতে। এর ভেতর কংগ্রেস কমিউনিস্টদের মত-
টব্বের কথা শুনে না—বহু নিষ্ঠাবান কংগ্রেস নেতাও স্পষ্ট ভাষায় ভারতের অর্থমন্ত্রীর হ্রাসের তীব্র নিন্দা করেছেন। এই সেদিনও ভূতপূর্ব আইনমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অশোক সেন পাল্যামেন্টে ডিভ্যালুয়েশনের অর্থোক্তিকতা সম্বন্ধে যে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় বিপক্ষ দলের সভারা পর্যন্ত তার ভূয়সী প্রশংসা

করেন। শ্রীযুক্ত শচীন চৌধুরীর দল ভারতবর্ষকে আজ যেভাবে মার্কিনীদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন তার বিষয় ফল কি হতে পারে তা যদি ভাল-
ভাবে বুঝতে চান, তবে রূপান্তরীর ‘অমর ভিয়েনাম’ এবং মিনার্ভার ‘অজেন্সি ভিয়েনাম’ দেখে আসুন। এ কথা আপনাদের অব বিবেচনা কবে বোঝাতে হবে না যে, আমেরিকা ভারতবর্ষকে ম্বিতীয় ভিয়েনামে পরিণত করতে চায়—চাষ ইংরাজ এদেশ ছাড়বার আগে দেশবিভাগ কবে যে চিরন্তন গণ্ডগোলের শুরুর করে গিয়েছিল, সেই গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান এবং ভারতের ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে। অবশ্য একথাও সত্য এ পর্যন্ত যে দেশে এরা নাক গলাতে গেছে সেখানেই দেশভক্ত জনসাধারণের ধাতানি খেয়ে এদের ফিবতে হয়েছে। চীন, কোরিয়া, কিউবা, ভিয়েনাম প্রভৃতি দেশে এদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ব্যর্থ প্রচেষ্টার ইতিহাস আজ কাবও অজানা নেই। কিন্তু নিজের দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা কবতে গেলে নিজেদের গলদ-ত্রুটিগুলো সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন থাকা দরকার। ভারত-
বর্ষ বার বার বাইরের শত্রুর দ্বারা পরাজিত হয়েছে একটিমাত্র কারণে—সে হচ্ছে নিজে-
দের মধ্যে একতার অভাবে এবং দেশের বিভীষণদের বিশ্বাসঘাতকতায়। এদেশে জয়চাঁদ, ভবানন্দ, মীরজাফরদের কখনও অভাব হয় নি। এই কদিন আগেও বাংলা দেশের এক তথাকথিত নেতার কয়েকটি সাক্ষেদ পাকিস্তানী স্পাই হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই সব মীরজাফরের দল দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে চলেছে তা আমরা এখনও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না। বুঝতে পারছি না—আবার যদি স্বাধীনতা হাবাই, তবে আমাদের অবস্থা পথকুঞ্জ-
দেব থেকেও অধম হবে—পদে পদে ওদেশী তথাকথিত শিক্ষিত বর্বরদের বুটের লাথির চোটে আমরা জঞ্জরিত হতে থাকবো। ‘অমর ভিয়েনামে’ এই শিক্ষিত (?) বর্বরদের সুবিচার এবং সুশাসনের ছবিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে দর্শকদের চোখের সামনে। অল্প কিছুদিন আগে যখন বাংলার রাজ্য

শাসন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন এবং বঙ্গো-
ব্বরের কবায়ত ছিল তখন এ নাটকটির প্রথম প্রদর্শনী হবার উদ্যোগ হয়েছিল এক রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। পুলিশ সে প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। আজকের পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার নাটকের ব্যাপারে পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং রূপান্তরী দল মাঝে-মাঝেই এ নাটকটির মণ্ডাভিনয় কববেন বলে মনে হয়। দর্শকেরা নাটকটি দেখলেই বুঝতে পারবেন আগের সরকারের আমলে কি কারণে পুলিশ নাটকটির অভিনয় বন্ধ কবে দিয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে ‘অমর ভিয়েনামের’ প্রডাকসন প্যাটার্নের ওপর ‘অজেন্সি ভিয়েনামের’ প্রভাব অত্যন্ত সুপরিষ্কৃত। কিন্তু তাতে তো দোষের কিছু নেই। বরং অন্যের ভেতর যা সুন্দর তাকে সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ করবার ভেতর পরিচালকের যোগ্য-
তাবই পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকের প্রথম দৃশ্যটি অবশ্য অত্যন্ত শ্লথগতিতে অভিনীত হচ্ছিল বলে বেশ একঘেয়ে লাগছিল। এ বিষয়ে পরি-
চালক মশারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কিন্তু ম্বিতীয় দৃশ্য থেকে শেষ অবধি অভিনয় অবাধগতিতে চলেছিল। শ্রীযুক্ত জোহন দস্তিদারের অভিনয় সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলার আছে—তাঁর ইংরাজী বলার ধরণটা আর একটু ভাল-
ভাবে রপ্ত করে নেওয়া দরকার। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত উপল দস্তের কাছে রোলার, ইংরাজী সংলাপ বিষয়ে তিনি যদি একটু কোচিং নিয়ে নেন, তবে পার্টটি আরও খুলবে। তাঁর অভিনয়ের দোষ দেখাবার জন্য একথা বলছি না, অভিনয় যাতে আরও ভাল হয় সেজন্যই বললাম।

মণ্ডসজ্জা এবং পোষাক পরিচ্ছদ ভালই হয়েছে। শ্রীযুক্ত তাপস সেনের আলোক নিয়ন্ত্রণও প্রশংসনীয়।

পরিচালনা বিষয়েও দু-একটি কথা বলা দরকার—এ নাটকটি কাহিনীপ্রধান, চরিত্রপ্রধান নয়। অর্থাৎ নাটকের কাহিনীটিই স্পষ্টভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই ছিল পবিচালকের প্রধান কর্তব্য। সে কাজ খুব সুযোগ্যতার সঙ্গাই করেছেন পবিচালক জোহন দস্তিদার। সেই কারণেই সামগ্রিক অভিনয়ের ওপর যতোটা জোর দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত অভিনয়ের ওপর সে প্রধান্য দেওয়া হয় নি। এর ফলে নাটকের রুলিং আইডিঘাটও সুদৃবভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিনয়কে তুলে ধরবার যথেষ্ট স্কেপও ছিল এ নাটকে—কিন্তু পরিচালক মশায় যে তা হতে দেন নি সে জন্য তিনি ধন্যবাদার্থী।

মানিমার মেক-আপ বিষয়ে পরি-
চালক মশারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কল্যাণের শিক্ষারূপী নিউ
আরোহণ শব্দক নিম্নে যারোহণ
কমিটিগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে
তার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই।
মন্তব্য যারোহণ কমিটিগুলি অব্যাহত
লোকেরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দখল করে
থাকেন। আমি নিজে হালতু অঞ্চলের
অধিবাসী। এখানকার একটি বিদ্যালয়ের
কথা জানি যার প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ কন্সট
নাম সইটুকু করতে পারেন এবং যার
সেক্রেটারী একজন কর্মজীবিরোধী, পেশায়
যিনি মৎস্যবন্দসমূহী এবং মৎস্যবন্দসমূহীর
অভিযোগে যিনি একবার হালতবাসও
করেছিলেন বলে জানা যায়।

এই অল্পা বোঝার পশ্চিমবঙ্গের
বেশির ভাগ বিদ্যালয়েরই। আর এই জাতীয়
জীবনের মৎস্যবন্দসমূহীর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষিত
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কান্না করাও যে
বিশেষ বিতর্কবাক্য সেটুকু স্বকৃতে কন্সট
হয় না। এই সমস্যা সমাধানের যে পথ
আমাদের নির্দেশ করেছে অর্থাৎ বিদ্যা-
লয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে যারোহণ
কমিটি গঠন করা, এর চেয়ে উচ্চত পন্থা
আর কিছুই হতে পারে না। অল্পা
যারোহণ কমিটিগুলি সম্বন্ধে আমাদের
যে অপ্রিয় সত্য ভাষণ করেছেন তাতে
মৌচকে টিপ পড়েছে। এতে অনেকেই
কিছু হয়ে উঠবে, আর কারণটা সহজেই
অনুমেয়।

—সুপ্রিয় মজুমদার
হালতু, (চম্পদ পরগণা)

“সাহিত্যিক বসুমতী”র ২৭শে এপ্রিল,
১৯৬৭ তারিখের সংখ্যায় “বঙ্গদর্শন”-এর
শিক্ষামন্ত্রী প্রতি অবদান’ শিরোনামায়
বিদ্যালয়ের যারোহণ কমিটি সম্পর্কে
কিছু পড়িয়া সন্তোষিত হইলাম।

একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
যারোহণ কমিটির সদস্যরূপে এই সম্বন্ধে
কিছু নিবেদন করিতে চাই।

যারোহণ কমিটি ইংকুলের পক্ষে
“অভিশাপ” কি না তাহা নির্ণয় করিবার
একক ইচ্ছা লেখককে কেহই দেয় নাই।



পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষৎ কর্তৃক প্রণীত
নিয়মাবলী মন্য করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-
ছাত্রীদের অভিভাবকদের ভেঙে সাধারণত
তিন বৎসর অন্তর যারোহণ কমিটির প্রায়
দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হইয়া
থাকেন। বাকী এক তৃতীয়াংশে আছেন,
প্রধান শিক্ষক, দুইজন শিক্ষক প্রতিনিধি
ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি।
মৌরসীপটীর কোন সুযোগ আইনে নাই।
এই সকল সদস্যরা মূল্য করিয়া
“অভিশাপ” বহন করিতেছেন কি না,
তাহা বিচার করিবার মত সামান্য বিদ্যা-
বৃষ্টি যে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের
নাই, একথা লেখক কিভাবে চিন্তা
করিলেন?

“ইংকুল চালানো একালে একটি
পাভজনক ব্যবসা”—এই মন্তব্য ওমাকিব-
হাল বহলে হাসির উদ্বেক করিবে। সকল
বিদ্যালয়কেই আজকাল একটি আইনের
মাধ্যমে পরিচালনা করিতে হয়। সরকারী
সহায়প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিকে (বাহার
সংখ্যা কয়েক সহস্র) সরকার নির্ধারিত
হারে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন
লইতে হয় এবং সরকার নির্ধারিত স্কেলে
শিক্ষকদের বেতন দিতে হয়। আইনে-
বাসের ভারসাম্য নষ্ট করিয়া অধিক আর
পকেটব্য করার কোন ব্যবস্থা নাই। এই
শতাব্দীর প্রথমে হইতে অনেক ক্ষেত্রে এই
ব্যবস্থা ছিল। আজ তাহা ইতিহাস মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মাধ্যমিক
পর্ষৎ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মাবলী এবং
প্রতি বৎসর অভিভাবক বাধাব্যবস্থা থাকায়
অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলি যথোচিত উপায়ে

বিবেচিত হওয়া ছাড়া পণ্ডিতের নাই।
যারোহণ কমিটির সম্পাদকের হাতে অর্থ-
সংক্রান্ত বিষয় ব্যস্ত থাকে না—ইহা
সম্পূর্ণ যারোহণ কমিটির এতিমার।
কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল গণ-
তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার ন্যায়
সম্পাদক কর্তব্য সম্পাদন করেন।

কাজেই অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে
যারোহণ কমিটির খারাপ কাজ করার
সুযোগ অনাব্যবহৃত নয়—বরং নাই। কারণ
প্রত্যেক স্থানেই জ্ঞাত জনদেবতা আছেন—
নির্বাসে খারাপ কাজ অসম্ভব।

শিক্ষক নিয়োগ, বেতনবৃষ্টি, পদচ্যুতি
প্রভৃতি বিষয়গুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং
মাধ্যমিক পর্ষৎয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ।
বথেষ্টাচার করার কোন সুযোগ নাই।
এই সম্পর্কে নিয়মাবলী সুশৃঙ্খল। ‘হেড
মাস্টারকে কমিটির ডিক্টেশন মেনে চলতে
হয়,’ ‘প্রশংসা, পুস্তক নির্বাচন,
প্রমোদন সমস্ত যারোহণ কমিটির কৃষ্টি-
গত হয়ে পড়েছে,’ ‘স্বাধীন রাষ্ট্রবন্দসমূহ
হেড মাস্টারদের আর কোথাও বৃদ্ধি
পাওয়া যায় না—লেখকের এই সব
অভিযোগ সত্য বলিয়া গণ্য করিতে হইলে
ধরিয়া লইতে হয় যে, বাংলা দেশে কয়েক
সহস্র বিদ্যালয়ে এই প্রকার “ব্যক্তিগত”
প্রধান শিক্ষকদের হাতে জ্ঞানদের ছাত্রদের
ভবিষ্যৎ অর্পণ করিয়াছি। শিক্ষকসমাজ
সম্পর্কে বিশেষত প্রধান শিক্ষকবৃন্দ
সম্বন্ধে এই জাতীয় মন্তব্য অতীতে কেহ
করেন নাই।

চন্দননগরের একটি বিদ্যালয়ের বিষয়
উল্লেখ করিয়া তিনি সাধারণভাবে প্রধান
শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও যারোহণ
কমিটির সদস্যদের চোর সাব্যস্ত
করিয়াছেন। এক দিয়া বহুর বিচার
হয় না যেমন লেখকের অপারীশ
মন্তব্যকে বিচার করিয়া কেহ নিশ্চয়ই
বলিবেন না, যাঁহারা এই কলম ধরেন
তাঁহাদেরই স্বাক্ষর শালীনতা বোঝে নাই।

—সুবাণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
গোপ চাকদহ, (নদীয়া)

তার চুলগুলো শাখা করে দেওয়া হইয়াছিল
বটে, তবে মুখের ওপর কোন বসনের ছাপ
দেখা যায় নি। প্রথমদিকে টেবিলের
সামনে একটি ফুলদানি এবং টেবিল-ল্যাম্প
থাকতে নারক যখন টেবিলের পেছনে
গিয়ে বসছিলেন, অভিটোরিয়াম থেকে তাঁর
মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

‘অমর ভিরোধান’ নাটকটি আমাদের
দেশের সর্বত্র বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে

বার বার অভিনীত হওয়া দরকার। কারণ
এ নাটক দেখে জনসাধারণ অন্তর থেকে
উপলব্ধি করতে পারবেন বিদেশীর ভিকার
থেকে জীবন ধারণ করবার থেকে অনাহারে,
অর্থাহারে থাকে ভাল। কারণ আজকাল
যারা ভিক্ষা দেয় তারা নিঃস্বার্থভাবে
কিছু দেয় না। তারা চায় আমাদের
দেশটিকে নিজেরে করারও করতে।
আমাদের দেশকে আমার সবদিক থেকে
অশ্রুকারের অতলগর্তে ডুবিয়ে দিতে।

আমাদের চন্দন সর্বনাশ করতে। এদেশটাকে
অনেক মার্কিনী দালালে ভরে গেছে—
এমন কি রণালয়ের ক্ষেত্রেও মার্কিনী
ভাবনারের অভাব নেই। এদের সম্বন্ধে
বেশবাসীকে অবহিত হতে হবে—এদের
হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা এক স্মৃত্তক
রক্ষা করতে হবে। এসব বিষয়ে ‘অমর
ভিরোধান’ জাতীয় নাটক আমাদের
অনুদৃষ্টি সন্ধান সজাগ করে রাখবে।

【রসকলা】

স্বপ্নসংগীত

রবীন্দ্রসদন কমিটি পুনর্গঠনের দাবি

২৫শে বৈশাখ আবার দেখা দিয়েছে, আমাদের জীবনে এই দিনটি ঘনিষ্ঠ ও ডাঙপর্বময় হয়ে উঠেছে। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে কত কথা, কত আশা, বাঙালী জাতির কত ভরসার কথা মনে হয়। জাতির অন্তরময় হয়ে উঠেছে এই রবীন্দ্রজন্মদিন।

রবীন্দ্রজন্মদিনে নির্মিত রবীন্দ্রসদনের কথাও এই দিনে মনে পড়ে। প্রথমে নামকরণ হয়েছিল রবীন্দ্রস্মরণী। নামটি মিষ্টি ছিল। তারপরে নাম পরিবর্তন হয়েছে—রবীন্দ্রসদন। এই রবীন্দ্রসদনকে নিয়েও কত কথা জন্মে উঠেছে। সম্মান-অসম্মানের অনেক ব্যাপার, ভাল কাজও আমরা ভালভাবে করতে পারি না তার অনেক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বছর তিনেক আগে এই রবীন্দ্রসদনের সামনের পথের ওপর লরীতে দাঁড়িয়ে খ্যাত-অখ্যাত রবীন্দ্রভক্তরা এক কথার বাঙালী জাতির প্রতিনিধিরা রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘসূত্রতায় এই ভবনের কাজ কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না। এই বিক্ষুব্ধিত জনতার রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রাণান্তিক দানের পর কাজ সত্তর এগোয়, এবং পরের বছর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কিন্তু সেদিনের উদ্বোধনে শিল্পীদের প্রবেশ অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র কংগ্রেসী মন্ত্রীমের পেটোয়া, আমলা-আমলানী, অসাধু ব্যবসায়ী এবং হাতকাটা-পেটকাটা ব্রাউজ পরিহিতা টাইট ড্রেস-ধারিণীদের জন্য ম্বার খোলা ছিল। শিল্পীরা হলে প্রবেশ দ্বারের কথা চয়রে এসে উদ্বোধনে অংশগ্রহণের আবেদন করায় পুলিশের লাঠিতে তার জবাব দেওয়া হয়েছিল। কয়েকজনের মাথা ফাটে, কারো বা হাত-পা ভাঙে। শিল্পীরা বেদনাক্রমে চিৎকার করে যান। সে সময় আমাদের কল্পনামানসে রবীন্দ্রনাথের যে মূর্তি জেগে উঠেছিল : সে মূর্তি স্বদেশী মেলায় জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠের, রায়বোর্ন-নগুটিকে প্রভুত্তর দেবার, হিজলী বন্দীনিবাসে গুলী চালানার প্রতিবাদে মনঃমুগ্ধের নিচে সভায় বক্তৃতা দেবার।

তারপরে একটি রবীন্দ্রসদন পরিচালনা কমিটি হয়েছে। সে কমিটি সরকারী মনোনীত অধিকাংশ পেটোয়া লোকদের দ্বারা গঠিত। শিল্পিসমাজের দাবি ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কমিটি গঠন করা হোক। তৎকালীন সরকার সে দাবি মানে নি। কাজেই এমন লোক কমিটিতে স্থান পেয়েছেন—যারা শিল্পীদের বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেন নি, যারা শিল্পিসমাজের আত্মপ্রত্যয় নন, শিল্পে প্রগতিশীলতার বিরোধী। বর্তমানে জনতার আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধিতে সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকারকে রবীন্দ্রসদন, মহাজাতিসদন ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গত ২৬শে এপ্রিল রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য-চলচ্চিত্র শিল্পী ও কর্মী সম্মেলনে রবীন্দ্রসদনের কমিটি পুনর্গঠনের দাবি করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী প্রিজোতিভূষণ ভট্টাচার্য স্বয়ং সে সম্মেলনে রবীন্দ্রসদনের অতীতের দুঃখজনক ঘটনাবলী উল্লেখ করে বলেন আজ থেকে রবীন্দ্রসদনের যাত্রা শূন্য হোক। তার এই ঘোষণার ডাঙপর্ব হিসাবে তিনি শিল্পিসমাজকে রবীন্দ্রসদনে এসে ২৫শে বৈশাখ উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরই পরামর্শে সম্মেলনে জন্মোৎসব কমিটি গঠিত হয়। রবীন্দ্রসদনে সকল শিল্পীকে অন্তর্ভাবনের অধিকার দেওয়া হয়ত শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্য। কিন্তু বতর্কণ পুরাতন আমলাতান্ত্রিক কমিটি ভেঙে দেওয়া না হচ্ছে ততক্ষণ এই অধিকার লাভ করা যায় না। মনোনীত কমিটির সদস্যপদ শ্রীসত্যজিৎ রায় গ্রহণ করেন নি। কিন্তু কেউ কেউ পূর্নকৃত চিত্রে আমলাভক্তের আশীর্বাদ বহন করছেন। এ কারণে এবার ২৫শে বৈশাখ সকল শিল্পী ও শিল্প সংস্থার পক্ষে বর্তমান কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব হয় নি। এই পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সত্তর রবীন্দ্রসদন কমিটি পুনর্গঠন করা উচিত। নতুবা ভবিষ্যতে তাঁরা রবীন্দ্রসদনের ব্যাপারে শিল্পিসমাজের সহযোগিতা মাও পেতে পারেন, এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা আশা করি ভুল করবেন না যে, শ্রীমধু বসু, শ্রীমন্মথ রায়ের মত লোক থাকতে অন্য কাউকেও নাট্যজগতের প্রতিনিধিরূপে কেউ মেনে নেবে না। রবীন্দ্রসদন কমিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন করা হোক এই দাবি সকলের।—সুজন।



‘নিশাচর’-এর একটি চরিত্রে শিল্পী
মঞ্জুশ্যামা।

লেনিনের মা—আমার নায়িকা

এলেনা কানোয়েভা সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণের শিল্পী। তিনি লেনিনিস্ট কমসোমল থিয়েটারে গত ৩০ বছর যাবৎ অভিনয় করেছেন, এবং পঞ্চাশটির অধিক ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সম্প্রতি তিনি ‘এ মাদার্স হার্ট’ ছবিতে লেনিনের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই ছবিটি দুই খণ্ডের। এক খণ্ডের নাম ‘এ মাদার্স হার্ট’, অপর খণ্ডের নাম ‘এ মাদার্স লায়ালটি’। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক মার্ক ডনস্কয়। এই ছবিতে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অভিনেত্রী এলেনা ফাদেয়েভা লিখেছেন :

আমি থিয়েটারের অভিনেত্রী, চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। মার্ক ডনস্কয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় পর্বস্ত ছিল না। তিনিও মঞ্চে আমার অভিনয় দেখেন নি। সুতরাং তাঁর সহকারী যখন আমাকে এই ভূমিকায় অভিনয় করতে বললেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলাম। ফটো স্টেট একটা আকস্মিক বা ভাগ্যের ব্যাপার,



‘এ মাদার্স হার্ট’ ছবির চিত্রগ্রহণকালে পরিচালক মার্ক ডনস্কয় প্রধান ভূমিকাভিনেত্রী এলেনা ফাদেয়েভার সঙ্গে আলোচনা করছেন।

ডিপ্রেসনের হাতে এর মধ্যে দু’ শতের মত ফটো পৌঁছেছিল। এই অবস্থায় আমার বয়সের অভিনেত্রীর পক্ষে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক নয়। তবু ওরা আমাকে ছাড়ল না, বললেন চেষ্টা করতে দোষ কি? আমাকে আরো বলা হল যে ডনস্কয় আমার ফটোটিকে তাঁর টোবলের ওপর রেখেছেন। তার নিশ্চয় কারণ আছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ডনস্কয়ই আমাকে একটি কঠিন মনোবৃত্তি অভিনয়ের পরীক্ষা করতে বসালেন। দৃশ্যটি হল মারিয়া আলেকজান্দ্রাভনা (লেনিনের মা) জারের কাছে একটা দরখাস্ত লিখে তার সন্তান আলেকজান্দ্রার প্রাণদণ্ড মকুব প্রার্থনা করছেন। আমার ছেলে তখন ফোঁজে ছিল। আমি কল্পনা করলাম যেন ওয়ই কাছে চিঠি লিখছি। এই কল্পনায় আমি ডুবে গেলাম। হঠাৎ আমার মনে হল ডিপ্রেসনের আমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দিকে আমার চোখ পড়তে মনে হল

আমার মারিয়া আলেকজান্দ্রাভনাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এইভাবে এই ছবিতে আমার কাজ শূন্য হয়। ডনস্কয়ের কাজের রীতি আমার ভাল লাগে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস তাঁর মধ্যে প্রবল। তিনি খুবই আশাবাদী। আমার প্রতি আস্থা তিনি প্রতি মনোবৃত্তি প্রকাশ করেছেন। যা আমাকে শক্তি জুগিয়েছে। সৃষ্টিশীল কল্পনার স্বাধীনতা আমার ছিল। প্রত্যেকবার মনে হয়েছে ভূমিকাটি আমি যেন নতুন করে করছি। নিজের মত করে চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করার সুযোগও আমার হয়েছে। শিল্পীর কাছে যা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। চরিত্রটিকে প্রকাশ করার ব্যাপারে শিল্পী আর পরিচালকের ঐক্য থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং এটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। আমি এ পর্যন্ত প্রধান যে চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করেছি সেগুলি অত্যন্ত সাধারণ মানুষের। দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে তাদের বীরত্বকে আমি প্রকাশ করতে

চেষ্টা করেছি। মার্ক ডনস্কয় সম্পূর্ণ একই কথা। তাঁর ছবিতে তিনি সাধারণ মানুষকেই বীর করে তুলেছেন, তাদের আত্মিক শক্তিকে তিনি বড় করে তুলেছেন। সত্তরং এই ভূমিকা অভিনয়ে আমাদের দু’জনার মধ্যে বেশ মিল ছিল। আজকাল শিল্পের জগতে নৌহাতিক দিকটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু ডনস্কয় প্রত্যয়বাচক দিকটাকে বড় করে দেখান। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমি প্রায়শই তুলে ধরার পক্ষপাতী। এদিক থেকে মারিয়া আলেকজান্দ্রাভনা, লেনিনের মা বা নারীদের আদর্শ। একটি আদর্শের প্রতীক। গত তাৎপর্ষের জন্য যা প্রয়োজন সবটাই তাঁর মধ্যে ছিল। আমি এরূপ একটি আদর্শ চরিত্রকেই রূপায়িত করতে চাইলাম যা আমাদের সকলের নিকটতম এবং বিশ্ব হতে। আমি দর্শকদের জানাতে চাইলাম মহৎ মানবিকতার যে আকর্ষণ আমাদের প্রতি নিষ্ঠা তার সবটাই মারিয়া আলেক-

সম্পাদকতা

জান্দ্রাভনা উলানভার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ছিল।

এই দুই খণ্ডের ছবির পরিধি বিরাট। একজন মানুষের জীবনের সম্পূর্ণ অংশ। সুতরাং কি করে লেনিনের মার জীবনে বিবর্তন এসেছে তা আমাদের ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। যদিও জীবনের অঙ্গ-গতির সঙ্গে সঙ্গে বয়সের পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিন্তু আমি তার ওপর তেমন গুরুত্ব দিই নি। চরিত্রটির প্রধান কথা আভ্যন্তরীণ নাটকীয়তা। আমি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি কি করে লেনিনের চিন্তাধারার সঙ্গে মারিক্স আলেকজান্দ্রাভনার চিন্তার পরিবর্তন ঘটিত হয়েছে। প্রথম দিকে তিনি জারের মানবতাবোধ, বিচার ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু শেষের দিকে ছেলেদের মতই তিনি বিপ্লবী চিন্তা-ধারার ভাবতে শুরু করলেন। আমার মনের কথা ছিল এই। ডলস্কর বলে-ছিলেন : আমাদের প্রধান কথা ছিল ভ্যাডিমির ইলিচের জীবন গঠনে পরি-বারের প্রভাব। আমরা চেষ্টা করেছি কিভাবে মা তাঁর ছেলের চিন্তার অংশ গ্রহণ করলেন। ভ্যাডিমির ইলিচের তাঁর মায়ের সম্পর্কে তাঁর জীবনের এক মধুরতম দিককে প্রকাশ করে। এই মহৎ মানুষটি এক মহান সন্তান।

এই মায়ের জীবন কখনও সহজ ছিল না। তিনি তাঁর উদ্বেগ ইত্যাদিকে লুপ্ত রাখতেন। তিনি কখনো শোকে

আচ্ছন্ন হন নি, কখনো অন্যের ক্রোধ আক্রমণের চেষ্টা করেন নি। কেবলমাত্র একটি দৃশ্যে তাঁর পাখি'ব অনুচ্ছিন্ন প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বসে পিরানো বাজাচ্ছিলেন এবং সারাজীবন যেন অতি-ক্রম করে যাচ্ছিল। তারপরে আবার দশ'করা দেবতে পার কিভাবে এই মা বেঁচেছিলেন। এই নারিকার মূর্তি আমার জীবনের প্রিয় সম্পদ। মারিক্স আলেকজান্দ্রাভনা—মা, কন্ডা, আদর্শ, ভ্যাডিমির ইলিচের অনুগত সাহায্যকারী এক কন্ডাবিকৃষ যুগকে অতিক্রম করে-ছেন—দাদ্ভিমর প্রতিভার মত।

কয়েকটি মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাণকরণের অনুরোধ

পূর্বের আফ্রিকান ছাত্র সমিতি গত ২২ মে এক ভারবাহার আমেরিকান চিত্র 'নেক্ট প্রে', 'ড্রামস্ অব দি ডেস্টিনি', 'জুন্ড', 'দি সিংগিং গান' ছবিগুলি ভারতে প্রদর্শন নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা অভিযোগ করেছেন যে, ছবিগুলি আফ্রিকানদের নিকট অসম্মানজনক এবং এর দ্বারা আফ্রিকার সৌহার্দ্যকে আঘাত করা হচ্ছে।

দিল্লীতে রবীন্দ্র-চলচ্চিত্র সপ্তাহ

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে দিল্লীতে প্রাক্তজাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে রবীন্দ্র চলচ্চিত্র সপ্তাহ উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছে। এই হতে ১৩ই মে সাপ্তাহ হাউসে অনুষ্ঠিতব্য এই উৎসবে তিনটি হিন্দী চারটি বাংলা ছবি দেখান হবে। বাংলা ছবির মধ্যে রয়েছে : চন্দ্র-লতা (সত্যজিৎ রায়), খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (অগ্রদূত), শূভা ও দেবতার গ্রাস, শেষের কবিতা (মধু বন্দ্য); হিন্দী ছবি : পোস্ট অফিস, জনজলা, কাবুলি ওয়াল।

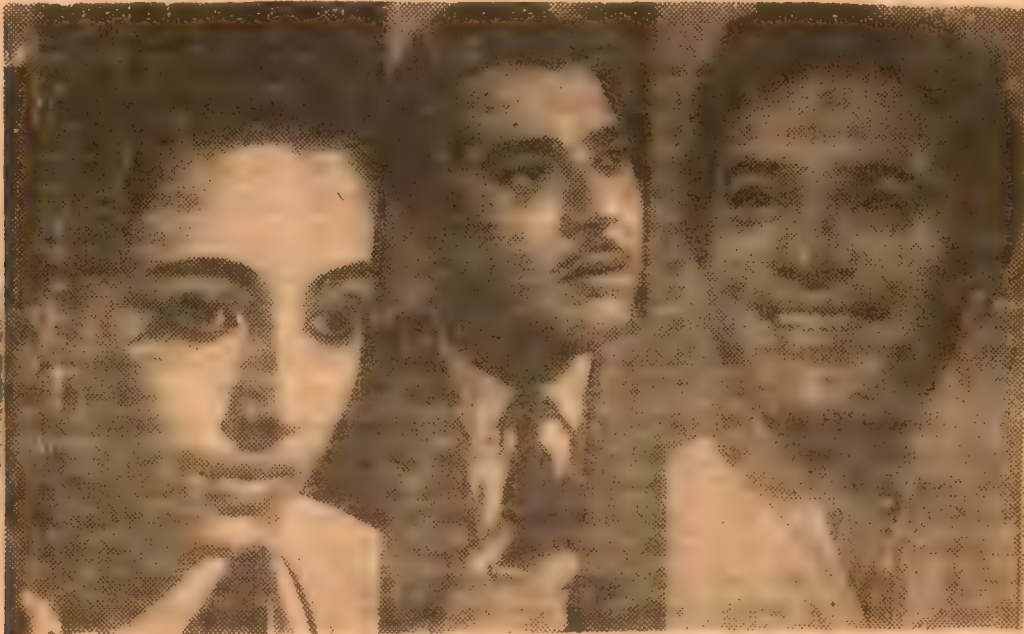
'ইউলিনিস' কান উৎসব থেকে প্রত্যাহত

'জেমস জয়েসের বহু-বিতর্কিত

অনুবাদকতা

লেনিন চলচ্চিত্র উৎসব

লেনিনের জন্মদিবস উপলক্ষে নয়া-দিল্লীতে সোভিয়েত কালচার সেন্টারে লেনিনের জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্রসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে। এই ছবিগুলির মধ্যে ছিল (১) লেনিন ইন পোল্যান্ড, (২) লেনিন ইন ১৯১৮, (৩) পার্সনালি নোন এবং (৪) লেনিন ইন অক্টোবর।



উত্তমকুমার প্রযোজিত 'সুহৃদা' চিত্রে সচিত্রা সেন, প্রদীপকুমার ও উত্তমকুমার

সাপ্তাহিক বসুমতী

উপন্যাস 'ইউলিসিস'-এর চিত্ররূপ গত ৩০শে এপ্রিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে দেখান হয়। কিন্তু ছবির ফরাসী সাব-টাইটেলের ভাষা উৎসব কমিটির সভাদের অস্বস্তির কারণ ঘটায়। ফলে এ ছবিরই একটি মার্জিত সংস্করণ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপারটি ছবির পরিচালক জোসেফিস্ট্রিক অসম্মানজনক বলে মনে করেন এবং উৎসব থেকে ছবিটি প্রত্যাহার করে নেন।

'ইউলিসিস' কান উৎসব বাদেও বার্লিন, ভেনিস এবং মস্কো উৎসবে প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছে। এসব উৎসবে ছবিটি প্রদর্শিত হবে।

কিন্তু 'ইউলিসিস' সম্পর্কে একটি বিশেষ খবর এই যে, ছবিটির নিজ দেশে অর্থাৎ লন্ডনে সম্পূর্ণ ছবি দেখাতে দেওয়া হচ্ছে না। সেন্সর বোর্ড ছবিটির প্রায় ৩০ জায়গার কেটেছে। তার বিরুদ্ধে লন্ডনের বৃহত্তর কাউন্সিল সমীপে ইউলিসিস আবেদন করেছেন।

গায়ক অভিনেতা প্রেসলীর বিবাহ

এলভিস প্রেসলী গত ১লা মে ল্যাস-ভেগাসে তাঁর প্রণয়িনী প্রিসিলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। তারা চোদ্দজন বন্ধুর সামনে শপথ গ্রহণ করেন।

নাট্যোন্নয়নের খসড়া

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাঙ্গবিহারী সরকার

যুক্তফ্রন্ট মন্বিসভার নিকট নাট্যোন্নয়ন সম্পর্কে এক পরিকল্পনার খসড়া পেশ করেছেন। এই পরিকল্পনার একটি সংস্কৃতি মন্বিসভার দাবি করা হয়েছে।

বার্টন—লিজ পুরস্কৃত

ব্রিটিশ ফিল্ম একাডেমির বিচারে গত বছরের শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ অভিনেতা রিচার্ড বার্টন 'দি স্পাই হু কেম ইন ফ্রম কোল্ড' এবং 'হুজ এক্সেড অব ভার্জিনিয়া উলফ' অভিনয়ের জন্য। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন এলিজাবেথ টেলর 'হুজ এক্সেড অব ভার্জিনিয়া উলফ'-এ অভিনয়ের জন্য।

স্টুডিও খবর

সংসার সীমান্তে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে' গল্পটিকে পরিচালক ঋষিক ঘটক চলচ্চিত্ররূপ দেবার কথা চিন্তা করছেন। তার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করেছেন।

দিবারাত্রির কাব্য

মারিক প্রোডাকসন্সের প্রথম প্রচেষ্টা স্বর্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস



'অজানা শপথ' ছাতে মাধবী মৃধাজী

'দিবারাত্রির কাব্য'র কিছু বহির্দৃশ্য পুরুরী সমুদ্রসৈকতে সম্পন্ন হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী—যাঁরা 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবির কাজ করেছিলেন। শিল্প-নির্দেশনা করছেন ততীন ঠাকুর। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী মৃধাজী, কান্দু ব্যানাজী, অজিতেশ ব্যানাজী, অসীমকুমার প্রমুখ। আনন্দের অগ্নিনৃত্যের অংশ শীঘ্র গ্রহণ করা হবে। অজানা ভৌমিক অংশ গ্রহণ করছেন।

জবানবন্দী

দিলীপ বসু পরিচালিত 'জবানবন্দী'র চিত্রগ্রহণের কাজ আবার শুরু হয়েছে ক্যালকাটা মন্ডিটোন স্টুডিওতে। ছবির সুরসংযোজন করছেন রাজেন সরকার। অভিনয়ে আছেন দিলীপ মৃধাজী, কালী ব্যানাজী, অরুণকুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, ললিত চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, অপর্ণা দেবী, ভারতী দেবী, জীবন বসু, সুখেন দাস।

"জীবন সঙ্গীত"—সমাপ্ত প্রায়!

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস "এই ভীষ" অবলম্বনে পি, এম, পিকচার্সের নিবেদন "জীবন সঙ্গীত" ছবিটির চিত্রগ্রহণ এনটি স্টুডিওতে প্রচলিতভাবে এগিয়ে চলেছে। ছবিটির চিত্র-



শ্রীশ্রীমাধ্যমা ছবিতে অসিতবর

নাট্যাত্মিক বঙ্গমতী

ঘাট ও সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জী স্বয়ং। বীরেন্দ্র সেন প্রযোজিত নতুন আঁগকের এই ছবিটির পুরস্কার হলেন—হেমন্তকুমার মুখার্জী। সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, সুনীলবরণ, চণ্ডীদাস, বসু, পশ্চিম ভূষণ ও অতুলপ্রসাদ রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্ত মুখার্জী, প্রতিমা ব্যানার্জী, যুগীশ্বর রায় ও মাস্টার দে।

চরিত্র চিত্রণে আছেন—অনিল ব্যানার্জী, সন্দ্বীপাণী, প্রসাদ মুখার্জী, কালী ব্যানার্জী, খগেন চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু, বিষ্ণু ঘোষ, শেখর চ্যাটার্জী, শোভা সেন, সুমন মুখার্জী, নবাগতা মিতা সেনগুপ্তা, ভাঃ প্রসাদ ব্যানার্জী, নবাগত অসীম চক্রবর্তী, কুবের হাজরা, কমলরাজ, শেফালী ব্যানার্জী এবং রীণা ঘোষ (রাজকন্যা খাত)।

আদ্যর্শিত মহামায়া

শ্রীমতী অগ্নিমা রায় প্রযোজিত অগ্নিমা চিত্রমের মহান প্রচেষ্টা “আদ্যর্শিত মহামায়া” ছবির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে শেষ পূর্ণায়ে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা



‘সেহেরবান’ হিন্দী ছবির একটি দৃশ্যে অশোককুমার নতুন ও সুনীল দত্ত

ও গীত রচনা করেছেন—অনন্ত চ্যাটার্জী। পরিচালনা করছেন—পূর্ণেশ্বর রায়চৌধুরী। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন—সন্তোষ মুখার্জী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অর্ধেন্দ্র চ্যাটার্জী। চরিত্র চিত্রণে আছেন—গুরুদাস ব্যানার্জী, অসিতবরণ, অজিত ব্যানার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, পদ্মা দেবী,

রেণুকা রায়, জহর রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, মাঃ বাপী, আশা দেবী, নবাগতা সুপর্ণা চ্যাটার্জী, হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী, মিজান, ভাওলাল, মলিনা দেবী এবং লিলি চক্রবর্তী। খুব শীঘ্রই ছবিটির পরিচালক শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে বেনারস, গয়া এবং রাজগীরের বিহীন দৃশ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।



মহেশ কটল পরিচালিত ‘পান্কার’ নায়িকা ওয়াহিদা রহমান

ছন্দগীতিকার বর্ষবরণ উৎসব

বেলঘরিয়ার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন ছন্দগীতিকার বর্ষবরণ উৎসব বিগত ৩০শে এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় মোহিনী মিল পূজাপ্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইনমন্ত্রী শ্রীঅমর চক্রবর্তী, পদলিখিত ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীউপানন্দ মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী কলি মুখার্জী। মন্ত্র অগনে শতাব্দিক ছাত্র বৈদিক প্রথার বৈতালিক, মার্গলিক ও বঙ্গপ্রদেশ গ্রহণ করে। নৃত্যে ডলি মন্ডল, ছন্দা ও রঙ্গা ভট্টাচার্য, রীতা ও মীরা সেনগুপ্ত, সঙ্গীতে চন্দনা গুহরায়, গীতশ্রী সেন, উর্মি মুখার্জী, শিখা বর্মান, মালবিকা রায় ও শিপ্রা বিশ্বাস বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়, একক সঙ্গীতে বাঁণা নান, চন্দনা গুহরায় ও গীতশ্রী অতুলনায়, সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীনন্দী মিত্র ও সঙ্গীত পরিচালনে বাঁণা নান।

হকির প্রেক্ষিত আকর্ষণ লীগ চ্যাম্পিয়ন-শীপ ও বাইটন প্রতিযোগিতা। লীগের পালা শেষ হয়েছে। এবারের চ্যাম্পিয়নও বি, এন, আর ক্লাব। নয় নয় দিন বছর জেতা বেশ কৃতিত্বের কথা। শেষ খেলায় বি, এন, আর ও মোহনবাগানের মধ্যে পরস্পর ভাগাভাগি হল। বিশেষ প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। খেলার মান অত্যন্ত দৈর্ঘ্যজনক। খিরঝিরে খুঁটির মধ্যেই খেলা চলে। বিশ্রামের আগে বি, এন, আর ১টি গোল করে। বিশ্রামের আগে থেকেই দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিছু ইন্ট-পাউকেল মাঠে নিকিপ্ত হয়। এক সময় মনে হয়েছিল খেলা বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। খেলা চলতে থাকে। মোহনবাগান বি, এন, আরকে কোণঠাসা করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি কর্নার থেকে আজহার হোসেন গোলটি পরিশোধ করেন। এর পর কোন পক্ষই আর গোল করতে পারে নি। ১৯টি খেলায় এই প্রথম বি, এন, আর দলের গোলের পতন।

বাইটনের খেলা কোয়ার্টার ফাইনালের পর্যায়ে চলেছে। স্থানীয় দলগুলি প্রায় সবই বিদায় নিয়েছে। একমাত্র ইন্টবেঙ্গল রূরকারী ইনজিনিয়ারিং দলকে ২-০ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। ওরা মের এই খেলায় শেষের দিকে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইন্টবেঙ্গল ২ গোলে জিতছে। ইনাম-উর রহমান একাই ২টি গোল করেছেন। হ্যাটট্রিকের সুযোগ এসেছে। বল নিয়ে তিনি গোলের সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন—প্রবল বাধার মুখে তিনি পড়ে গেলেন। বল নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তার পরেই খেলোয়াড়দের মধ্যে লাঠালাঠি। মাঠে বাকি বাকি ইন্ট-পাউকেল পড়তে লাগল। উদ্ভত খেলোয়াড়দের মাঠ থেকে বাইরে পাঠান হল। মাঠ পরিষ্কার করে আবার খেলা সুরু হল। সেমি-ফাইনালে ইন্টবেঙ্গলকে খেলতে হবে গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব পুর্লিশের সঙ্গে।

৩রা মে দিল্লী কাস্টমস-এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাব পুর্লিশের খেলা দেখে অনুমান হয় এবারেও তারা খুব শক্তিশালী। অতি সহজেই দিল্লী কাস্টমসকে তারা ৬-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে বাঙ্গালোরের আর্মি-সার্ভিস দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে ইন্ডিয়ান নৌবিরুদ্ধে। আর একটি কোয়ার্টার ফাইনাল ৩রা মে অর্মামাংসিত হয়েছে—জলধরের সিগন্যাল কোরের ও ভিলাই স্টিল দলের খেলায়। বর্তমানে ৫টি বাইরের দল ও কলকাতার ইন্টবেঙ্গল দল বাইটনে টিকে আছে।

৪ঠা মের খেলায় গতবারের রানার্স



বাইটন কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় কোর অব সিগন্যাল দলের বিরুদ্ধে ভিলাই স্টিল দলের আরম্ভের গোল করার চেষ্টা করছেন।

আশ জলধর সিগন্যাল ফোর দল বিদায় নিল। ভিলাই স্টিল এগিয়ে গোল সেমি-ফাইনালে। অলিম্পিক খেলোয়াড় আরমান এই জয়ের মূলে। এম আলম খেলায় এই খেলোয়াড়ই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ২টি গোল করেন। ভিলাই দলের জয়ের পথ এই একক খেলোয়াড়ের যাদুদণ্ড স্পর্শে সম্ভব হয়েছে। এই গোলের বিরুদ্ধে জলধর দল প্রতিবাদ জানায়। কমিটি প্রতিবাদ অগ্রহা করেছে।

ইন্ডিয়ান নৌবি ও বাঙ্গালোরের এ. এস, সি সেন্টার ৪ঠা মের খেলায় গু করায় আজ সকালে তাদের খেলা দেওয়া

প্রীতিমিত্র

হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা আজ শুক্রবার বিকালে দুটি সেমি-ফাইনাল খেলার নিষ্পত্তি করা। ২টা ১৫ মিনিটে ভিলাই স্টিল আজ সকালে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় বিজয়ী দলের সঙ্গে খেলবে। বিশেষ আকর্ষণীয় খেলা সুরু হয় বিকেল ৪ ঘটিকায় ইন্টবেঙ্গল ও পাঞ্জাব পুর্লিশের মধ্যে। প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত পাঞ্জাব পুর্লিশ দল গতবারে বাইটন বিজয়ী। কোয়ার্টার ফাইনালে দিল্লী কাস্টমসের বিরুদ্ধে তাদের চমকপ্রদ খেলা উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। ইন্টবেঙ্গল দল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিদ্বন্দ্বী দল প্রতি-

দ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলে পাঞ্জাব পুর্লিশ দলকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে।

ইংলন্ড সফরে স্কুল ক্রিকেট দল

স্কুলের ছেলেরদের নিয়ে গঠিত একটি ক্রিকেট দল বছর দুই আগে লন্ডন থেকে ভারত সফরে এসেছিল। গত বছর অস্ট্রেলিয়ান স্কুল ক্রিকেট টীম ভারত সফর করে গিয়েছে। এ বছর ইংলন্ড সফরে যাচ্ছে ভারতের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত একটি দল। কিশোরদের মধ্যে প্রভাভকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলবার এ এক শ্রুত প্রচেষ্টা। যে সব স্কুলের ছেলেরদের মধ্যে ক্রিকেটের সম্ভাবনা রয়েছে তাদের ক্রিকেটে উন্নত দেশগুলিতে খেলতে পাঠিয়ে ভারত অনেক নতুন খেলোয়াড় তৈরি করতে পারবে।

এই ক্রিকেট দলের ১৬ জন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছে। বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছে রাজা মুখার্জী ও দীপঙ্কর সরকার। অধিনায়কের ভার পড়েছে মোহাম্মদ-এর চৌকস খেলোয়াড় অজিত নামকর ওপর। সহ অধিনায়ক মহীশূরের কিরমানি। খেলোয়াড়দের বয়সের গড় ১৬ থেকে ১৭ বছরের মাকামাখি। ১৫ই জুলাই দিল্লী থেকে দলটি ইংলন্ড রওনা হবে। ৬ সপ্তাহ ভ্রমণের পর আগস্ট মাসে দলটি দেশে ফিরবে। বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট দলও ইংলন্ড সফর করছে।

ভারতীয় স্কুল টীমের ক্যাটিং শরি বেশ ভাল। সকল খেলোয়াড়ের কাছ

সাম্প্রতিক বঙ্গবন্ধু

থেকে ভাল রানের আশা করা যায়। তবে ইংল্যান্ডের আবহাওয়া সহ্য করে প্রীমপ্রধান দেশের ছেলেরা কতটা ভাল ফল দেখাবে তা অনুমান করা শক্ত। খেলার ফলাফল যাই হোক না কেন দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এই খেলোয়াড়দের অনেক কাজে লাগবে। এরাই ভবিষ্যতে ভারতের ক্রিকেট সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখবে। এই দলে ভারতের বিখ্যাত টেস্ট ক্রিকেটার অমরনাথের দুই পূর স্থান পেয়েছে। এই অল্প বয়সেই ক্রিকেট খেলায় তারা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। দলে যদিও ফাস্ট বোলার নেই, তবে ভাল মিডিয়াম পেস বোলার ও স্পিন বোলার আছে। ম্যানেজার হিসাবে দলের সঙ্গে থাকবেন লেঃ কর্নেল হেমদ্রা অধিকারী। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শ্রী বি. এল. মাথুর ও শ্রী এস. সাহু নির্বাচক হিসাবে দলের সঙ্গে থাকবেন। বোর্ডের দু'জন কর্মকর্তাকে ফালতু না ঢুকিয়ে আরও দু'জন তরুণ খেলোয়াড়কে দলে নিলে ভাল হত।

ইংল্যান্ডে ভারতের প্রথম খেলা

উরসেস্টার ক্রিকেটে নাম করা টীম। ১৯৬৫ সালের কার্টিস চ্যাম্পিয়ন, ১৯৬৬ সালের রানার্স আপ। এ বছরের ইংল্যান্ড সফরে ভারতের প্রথম খেলা এই

দলের বিরুদ্ধে। ওরা মে'র এই খেলায় অধিনায়ক করলেন চান্দু বোরদে। উরসেস্টারের ক্যাপটেন ডন ক্যানিয়ন টেসে জিতলেন। বোরদে ফিল্ডিং করতে মাঠে নামলেন। আবহাওয়া খুব খারাপ। হাড়কাঁপুনি শীতের মধ্যে ভারতের খেলোয়াড়রা কুঁকড়ে যাচ্ছে। ২৫ মিনিট খেলার মধ্যে সূর্যত গুহ ক্যানিয়নকে বোল্ড আউট করলেন। প্রথম উইকেট লাভের গৌরব সূর্যতের। তরুণ খেলোয়াড়ের পক্ষে শূন্য সূচনা।

২৫ মিনিট খেলা চলার পর বৃষ্টি নামল। ভিজ়ে বলে বোলারদের বল করা অসুবিধা। তা সত্ত্বেও ন্যাটা বোলার বেদী সুন্দরভাবে স্পিন বোলিং করে রানের গতি মশ্বর করে দিলেন।

উরসেস্টার দলের ডি অলিভিয়েরা ও আর হেডলে ভারতের বোলিংকে বেপরোয়া মারতে সূর্য করলেন। অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে ভারতের খেলোয়াড়রা এই আক্রমণের ষোণ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারছিলেন না। ডি অলিভিয়েরা ১৭৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। হেডলের ৬০ রানও উল্লেখযোগ্য। দিনের শেষে ৬ উইকেটে রান উঠল ৩৩৫। বেদী ৩টি উইকেট দখল করে বোলিং-এ কৃতিত্ব দেখান। প্রথম ম্যাচ—তাছাড়া খুব খারাপ আবহাওয়া থাকায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা

স্বাভাবিকভাবে বোলিং বা ফিল্ডিং করতে পারে নি।

৩৩৫ রানে ইনিংস ছেড়ে দেওয়ার ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামে পরের দিন। সারদেশাই ও ইঞ্জিনিয়ার ভারতের পক্ষে ব্যাট করতে নামেন। অল্পক্ষণ খেলায় ৩টি রান ওঠে। তারপর কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। আলোর অভাবে আম্পায়াররা খেলা বন্ধ করে দেন।

সমাচার দর্পণ

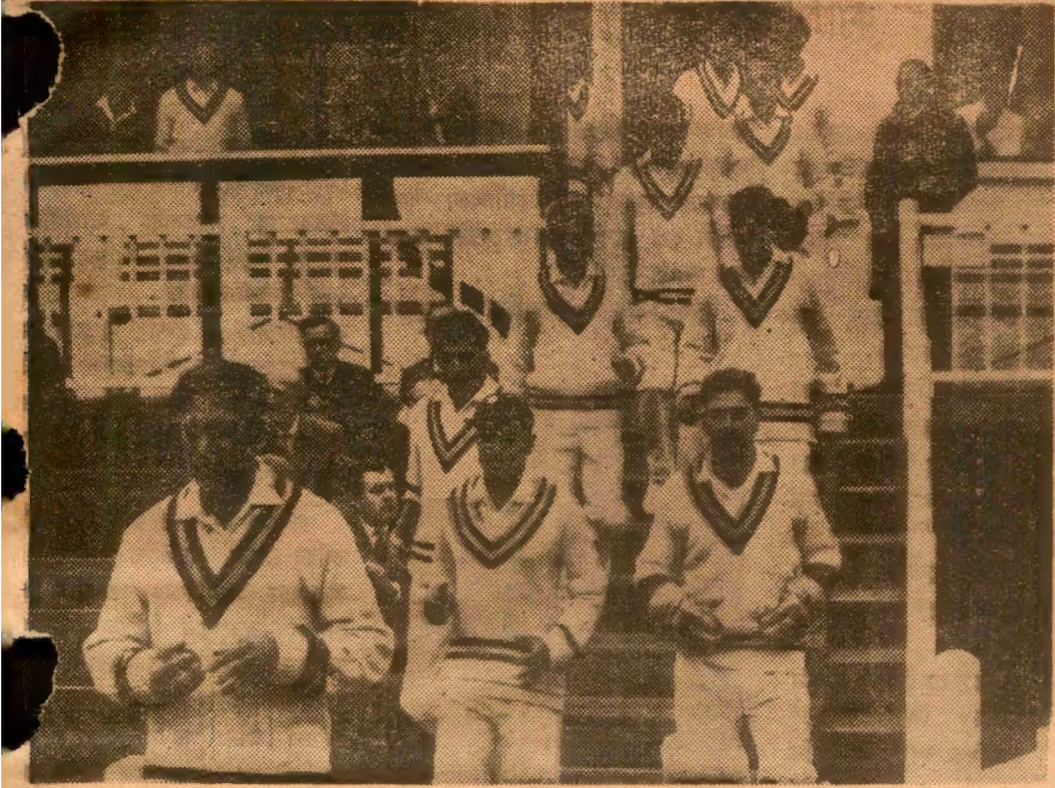
অলিম্পিক বিজ্ঞেতা ভারত মান্দ্রি হকি উৎসবে বেলজিয়াম দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। ১লা মে'র খবরে প্রকাশ বেলজিয়াম দল বিশ্রামের আগে পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দেয়। বিশ্রামের পর ভারত ২টি গোল করেন। পৃথ্বীপাল ও বলবীর সিং ভারতের পক্ষে গোল ২টি করেন।

* * *

রিজ টাউন থেকে প্রকাশিত ২৮শে এপ্রিলের খবরে প্রকাশ গ্যারী সোবার্স ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগামী টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ক্রিকেট কন্ট্রোল



বাইটন ক্যাপের লেডি-ফাইনালে পাকিস্তানি পদার্থের গোষ্ঠ্যক চার্লস ইন্ট বেঙ্গল দলের ইমান-উর রহমানের গোল করার একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করছেন।



ইংল্যান্ড সফরে প্রথম খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল উরলেস্টার বিপক্ষে কার্ল বোরদের নেতৃত্বে ফিল্ডিং করতে যাচ্ছেন।

যোষণা করেছেন এই টেস্ট সিরিজ
শেষ হবে ১৯৬৭-৬৮ সালে যখন
সি, সি দল ওরলেস্ট-ইন্ডিজ সফর
করবে।

* * *

ম্যাচক-এ অনুষ্ঠিত ১৯৬৭ সালের
দ্বিতীয় টেস্ট প্রতিযোগিতায় ইন্দো-
পাকিস্তান ৩-০ গোলে হারিয়ে ইম্প্রোভ
হয়েছে। গভবাদের যৌথ বিজয়ী
এবার ৩য় স্থান লাভ করেছে
পাকিস্তানকে হারিয়ে।

* * *

তহরানে অনুষ্ঠিত ডেভিস
কাপ খেলায় ভারত ইরানকে ৪-১
হারিয়েছে। এস পি মিশ্র তাঁগ
র সঙ্গে সিংগলস খেলার অসুস্থ
ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি না
ইরান এই ম্যাচটিতে জয়ী বলে
করা হয়। ভারত ৩টি সিংগলস
স ম্যাচটি জেতে।

* * *

১৯৬৭ সালের মেয়েদের হকি লীগ



বাসু ডি আর্লাভয়েরা

শেষ হয়েছে। একটি প্রদর্শনী খেলার
লীগ বিজয়ী রেজাল্ট দল অবশিষ্ট দলকে
১-০ গোলে পরাজিত করেছে। খেলার
শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়।
পৌরোহিত্য করেন পঞ্চক গদগুপ্তমহাশয়।
গদগুপ্তমহাশয় ভাষণে মেয়েদের খেলার মাঠে
তীব্র ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেন।

শ্রীমতী গোম্বারী বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ-মাপক

[বিশ্বনাথ ক্রমবর্ধিত টীকা]

প্রীতিভাষ্যে প্রীতীরাগাক্ষের অপ্রাকৃত প্রেম-
লীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমতী
গোম্বারীর দ্বারা প্রীতিমহা-মাধব নাটক রচনা
করাইরাছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

“মধুর প্রসন্ন ইহার কণ্ঠ সালস্বকার।

এই কবিতা বিনা নহে রসের প্রচার।”

মূল্য : তিন টাকা।

বসুদেবী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিশিষ্টমহারাণী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ক্যাসিয়াস ক্রে

ক্যাসিয়াস ক্রে'কে নিয়ে আবার আলোড়ন। বিশ্ব হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে এনেছে। সামরিক আইন অমান্য করে নিজের জন্যে জেল-খানার দরজা উন্মুক্ত করেছে। চ্যাম্পিয়ন-শীপের খেতাব ত' হাতছাড়া হবেই—তার ওপর বছর পাঁচেক শ্রীঘর বাস।

আমেরিকায় সামরিক বিভাগে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। আমেরিকার নাগরিক হিসাবে ক্রে-ও এই নিয়ম মানতে বাধ্য। কিন্তু এই নিয়মের কাছে ক্রে মাথা নত করতে চান না। রক্তে তার বিদ্রোহের ছন্দ। বিবেকের কথাই তিনি শুনবেন, মানুষের তৈরি জংগী নিয়মের কাছে তিনি আজ-সমর্পণ করবেন না।

এপ্রিল মাসের শেষে ক্রে সৈনিক ভর্তির কেন্দ্রে হাজির হলেন। সৈন্য বিভাগে যোগ দেওয়ার প্রাথমিক কাজগুলি তিনি একের পর এক মেনে চললেন। প্রায় ৪ ঘণ্টা ধৈর্যের পরীক্ষায় ক্রে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু শেষকালে সৈন্য বিভাগে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। চুক্তিপত্র সই না করে, তিনি টাইপ করা কাগজ থেকে তার বক্তব্য পড়লেন।

তিনি বললেন—আমার অন্তরের বাণী আমাকে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করতে নিষেধ করছে। সৈন্যদলে যোগ না দেওয়ার ফলাফল আমি জানি। শাস্তি তা সে যতই কঠোর হোক আমাকে আমার স্বিস্থানত থেকে একটুও বিচ্যুত করতে পারবে না।

ক্যাসিয়াস ক্রে ওরফে মহম্মদ আলীর ঘোষণা বিশ্ব বক্সিং এসোসিয়েশনকে চঞ্চল করে তুলেছে। সভাপতি বব ইভান্স ঘোষণা করেছেন—আমেরিকার সামরিক আইন লঙ্ঘন করে হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়নের খেতাব পাবার যোগ্যতা হারিয়েছে। তিনি

আরও বলেন—আমরা শীঘ্রই প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি এবং যোগ্যতম মন্টি-মোম্বা'কে হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন বলে ঘোষণা করা হবে। ক্রে'র খেতাব নাকচ করে দেওয়া হবে।

নিউ ইয়র্কের এথলেটিক কমিশন



ক্যাসিয়াস ক্রে

আরও একটু এগিয়ে গিয়েছে। আর্টজেন মন্টিমোম্বার তালিকা তৈরি। এই তালিকায় ফ্রেড প্যাটারসন, ফিলা-ডেলফিয়ার অপরাধিত মন্টিমোম্বা জো ফ্রেজার প্রমুখের নাম আছে।

ব্রিটিশ বক্সিং বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ টেডি ওয়ালথাম প্রস্তাব অন্যান্য দেশের বক্সিং সংস্থাগুলি আলোচনা করে নতুন হেভি চ্যাম্পিয়ন বাছাই করাই যুক্তিসঙ্গত। তি জোর দিয়ে বলেছেন ছাঁটাই প্রতিযোগিতা ইউরোপের খ্যাতিনামা মন্টিমোম্বা'কে সুযোগ দিতে হবে। পশ্চিম জার্মান কার্ল মিডলবার্জার একজন বিশ্ব মন্টিমোম্বা। ক্রে'র বিরুদ্ধে ক্রে লড়াই বেশ প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। মিঃ টেডির মতে বিশ্ব হেভি ওয়েট প্রতিযোগিতায় কালের দাবি সহজে উ করা চলবে না।

এদিকে যেমন ক্রে'র চ্যাম্পিয়নশীপ গৌরব কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হ অন্যদিকে আমেরিকার প্রখ্যাত এ মার্টিন সুসম্মান তাঁকে ফৌজ আদালতে অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা তিনি বলেন ক্রে'র মামলা অন্তত ব চলবে। তার পর যদি ক্রে'র প্রমাণিত হয় তবেই তাঁকে জেলে আট যাবে।

ক্রে'র এটর্নি মিঃ হেডেন বলে তিনিও একহাত আইনের লড়াই লড়াই বাধ্যতামূলক সামরিক কাজে দেওয়ার যে আইন প্রচলিত আছে আইনকে বাতিল করার জন্য তিনি পাতার একটি মনসাবিদা করেছেন। সদৃশ বলেন—চ্যাম্পিয়নকে জেলে কে? আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই জিতব।

ক্রে'কে মাঝখানে রেখে আইনের ল সূর্য হয়েছে। আইনের প্যাঁচে পড়ে হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন—যিনি অনেক আউটে হারিয়েছেন—আজ কুপোকাং।

—রামানুজ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গবন্ধু (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বঙ্গবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জন্মের জন্ম
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহোষ্য প্রতিদিন আহারের পর
চুইবার করে দু'চামচ মুভসজীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজাফারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



কলিকতা কেম্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র বোস, এম-এ,
আবুদুর্কেনাভা, এম.সি.এস. (মক্কা),
এম.সি.এস. (আমেরিকা), ডাকসমূহ
কলিকতার রসায়ন শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত
অধ্যাপক।

কলিকতা কেম্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র বোস,
এম-বি, বি-এস, আবুদুর্কেনাভা।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকতা ৯৮